Barcode - 4990010250394
Title - Masik Basumati (Year 27, vol.1, 2)
Subject - LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE
Author - Mukhopadhay, Satishchandra, ed.
Language - bengali
Pages - 714
Publication Year - 1948
Creator - Fast DLI Downloader
https://github.com/cancerian0684/dli-downloader
Barcode EAN.UCC-13
4990010250394

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৭শ বর্ষ—ভাদ্র ঃ ১৩৫৫ সাল

১ম খণ্ড ঃ ৫ম সংখ্যা

পুরানো স্মৃতির ঝরা পাতা

"দুর্গোৎসব নিকট হওয়াতে আমাদের দেশস্থ লোকের মন পুলকিত হইতেছে এবং ভাগ্যবন্ত বা গরীব যাঁহারা তামাসা দেখিয়া সুখবোধ করেন তাঁহারা প্রফুল্ল মনে নিরীক্ষণ করিতেছেন দুর্গোৎসবের সে দিন কবে আসিবে আর আর স্থানে স্থানে পূজার তাবৎ প্রস্তুত হওয়াতে চতুর্দ্দিগে ক্রয়-বিক্রয়ের শব্দই শুনা যাইতেছে এবং ধনরূপ দেবতার আরাধনার্থ যাঁহারা এই রাজধানীতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও সামগ্রীসহিত দুর্গার আরাধনার্থ স্বদেশে গমন করিতেছেন ; অতএব এই সময়ে আহ্লাদপূর্ব্বক আহারাদির ধূমেই কএক দিবস কাটাইবেন এবং পরিশ্রমী গরীব লোকেরাও ধনির নিকট তাঁহারদিগের জিনিসপত্র অধিক বিক্রয় করিয়া কএক দিবস সুখে থাকিবেন কিন্তু যদিও এই পুত্তলিকা পূজাদিকে আমরা ঘৃণিত ব্যাপার কহি তথাপি এ কর্ম্মেতে স্বদেশীয় লোকেরদিগের আহ্লাদেই আমরা আহ্লাদিত আছি কেননা যাঁহার যেপ্রকার মত তদনুসারে তিনি কর্ম্ম করুন তাহাতে আমরা প্রতিবন্ধক নহি পরন্ত যেমতে চলাতে যখন তাহারদিগের অনিষ্ট দৃষ্ট হইবে তখন সেই মতে দোষ দেখাইয়া আমরা অবশ্য বারণের চেষ্টা করিব। অদ্যকার জ্ঞানান্বেষণে প্রকাশিত এক পত্রের দ্বারা প্রেরক মহাশয় আমারদিগের জ্ঞাত বিষয় লিখিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরা স্বীয় পরিশ্রমের এবং পিতৃপিতামহাদির সঞ্চিত সম্পত্তি নাচগানেতে ব্যয় করিতেছেন অতএব কহিতেছি এ সকলবিষয়ে আমরা কোন ব্যক্তির চক্ষুকর্ণের সুখের বিপক্ষ নহি কিন্তু আবশ্যক বিষয়ে শৈথিল্য করিয়া অনাবশ্যকবিষয়ে অধিক ব্যগ্র দেখিলে সে বিষয়ে দোষ দেখাইয়া আবশ্যক নিবারণের চেষ্টা করাই আমারদিগের উচিত এবং নাচপ্রভৃতি অন্যান্য বিষয় যাহা দুর্গোৎসবের কালে হইয়া থাকে তাহা ধর্ম্মের অংশ নহে এবিষয়ে আমারদিগের সহিত যে দেশস্থ লোকেরা ঐক্য হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই তবে একথা [illegible] করিতে পারি এবং [illegible] মহাশয়েরাও [illegible] পারেন যে সকল ভারি ভারি বিষয়ে তাঁহারদিগের সাহায্য করা [illegible] তত্ত্ব নেওয়া অত্যাবশ্যক সেসকল বিষয়ে মনোযোগ না করিয়া [illegible] প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়ে কি জন্যে ব্যয় করিতেছেন [illegible] সর্ব্বসাধারণের উপকার যোগ্য এমন কোন বিষয় দেখিতে পান [illegible] যে ঐ সকল বিষয়ে তাহারদিগের সাহায্য করিতে হয় আর [illegible] কি বিদ্যার দ্বারা একেবারেই উচ্চে উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষের [illegible] গ্রামেই কি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে. আর ভারতবর্ষের [illegible] ভিক্ষুকেরাও কি সুখী হইয়াছেন ইহাতে যদ্যপি দেশস্থ [illegible] স্বীকার করেন এ সমুদায়ই হইয়াছে তবে তাহারা [illegible] ব্যয় করিতেছেন তাহাতে আমারদিগের কোন আপত্তি নাই [illegible] বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার জনকের শ্রাদ্ধে এতদ্দেশীয় মহাশয় [illegible] দানের যে নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন সেই দৃষ্টান্ত উপযুক্ত [illegible] করিলে নৃত্যাদির কিয়দংশের কর্ত্তন করিয়া সে ধন বাঁচিবে [illegible] কি কি বিষয়ে খরচ করিতে হয় যদ্যপি দেশস্থ মহাশয়েরা [illegible] জানেন তবে কহিতেছি ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের বিদ্যাশিক্ষা [illegible] ব্যয় করুন অথবা বিলাতে গমনোপযুক্ত জাহাজ নির্ম্মাণার্থ চাঁদা [illegible] এতদ্দেশীয় লোকের উপকারার্থ হইয়াছে তাহাতেই দেউন [illegible] ঐ ধন একত্র করিয়া বাণিজ্য করুন অথবা নানাবিধ শিল্প [illegible] এবং দেশের চাসবৃদ্ধি করুন আর প্রয়োজন মতে যদ্যপি [illegible] নূতন অস্ত্রের আবশ্যক হয় তবে তদর্থে ব্যয় করুন কেন [illegible] সকল বিষয়ে লাভ ও সম্ভ্রমের পত্তন যে প্রকার দৃঢ়তর ভাল [illegible] করাইলে তাহার লাভ সম্ভ্রম তদ্রূপ হইবেক না জ্ঞানান্বেষণে [illegible] সঙ্কীর্ণপ্রযুক্ত পরিশেষে এই কহিয়া সমাপ্ত করিতেছি যে [illegible] যাহা লিখিলাম দেশস্থ মহাশয়েরা তাহাতে মনোযোগ [illegible]

—জ্ঞানান্বেষণ, ৪ কার্ত্তিক, [illegible]

(সংবাদপত্রে সেকালের [illegible])

মহম্মদ আলি জিন্না

ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে জিন্নার আবির্ভাব নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ব্যাপার—ঐতিহাসিক এই কারণে যে, তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন এবং ইতিহাসকে উদ্দীপ্ত করেছেন নিজের ক্ষুরধার রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভার আলোয়, যেমন করেছেন গান্ধীজী, নেতাজী। করাচীর রাজকোটের প্রসিদ্ধ খোজা-পরিবারে তাঁর জন্ম হয় ১৮৭৬ সালের বড়দিনের সন্ধ্যায়। সেদিন খৃষ্টমাস পর্ব্বদিনে করাচী সহরে যে জীবন নবীন জ্যোতিষ্কের মত উদিত হয়েছিল, পরবর্ত্তী কালে তা মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মত কিরণজালে সমগ্র ভারত আলোকিত ক'রে, সেই করাচীতেই পশ্চিম সমুদ্রতীরে অস্তমিত হোলো।

ভারতের বিংশ শতকের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে জিন্না অন্যতম বিরাট পুরুষ। ব্যক্তিত্বের প্রখরতায় আর চরিত্রের দৃঢ়তায় তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। জিন্নার বয়স যখন মাত্র ষোল বছর, তখন তিনি ইউরোপে যান উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য। লণ্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রের তালিকায় আজও তাঁর নাম আছে। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যুবক জিন্না যখন লণ্ডনের ছাত্র-সমাজে এক জন 'debator' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই সময় বাংলার দেশবন্ধুও এক জন কৃতি আইনের ছাত্র হিসেবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভবিষ্যতে যাঁরা এক দিন ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন—সেই জিন্না ও দেশবন্ধুর পরস্পর সাক্ষাৎ-পরিচয় এইখানে প্রথম। সেই সময় জেমস্ ম্যাকলিন নামে জনৈক ইংরেজ ভারতের প্রতি এক জনসভায় কুৎসা রটনা করে। যুবক চিত্তরঞ্জন জানি তার প্রতিবাদ জানালেন প্রকাশ্য সভায় এক অগ্নিময়ী বক্তৃতা ক'রে। সেই জনসভায় শ্রোতাদের আসনে বসেছিলেন ক্ষীণদেহ, তীক্ষ্ণনাসা, প্রিয়দর্শন এক তরুণ। চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে সেই যুবক এগিয়ে এলেন বক্তৃতা-মঞ্চের দিকে। বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণে চিত্তরঞ্জনের অভিমতকে সমর্থন করে তিনিও এক বক্তৃতা দিলেন। সেই যুবক জিন্না। দু'জনের মধ্যে আলাপ হোলো এবং তাঁরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ঠিক এই সময় দাদাভাই নৌরজী সেণ্ট্রাল ফিনসবেরী নির্ব্বাচন কেন্দ্র থেকে হাউস অব কমনস-এর সভ্যপদপ্রার্থী হন। চিত্তরঞ্জন তখন জিন্নাকে অনুরোধ করলেন দাদাভাই নৌরজীর নির্ব্বাচনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে। বলা বাহুল্য, এক দিন দাদাভাই নৌরজীর বক্তৃতায় জিন্না এমন মুগ্ধ হলেন যে, তিনি চিত্তরঞ্জনের অনুরোধ রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন। প্রকৃতপক্ষে, জিন্নার রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের প্রথম গুরুই ছিলেন জ্ঞানবৃদ্ধ এই দাদাভাই নৌরজী। তিনি লণ্ডনের 'ভারত সমাজে' যোগ দিয়া প্রথম রাজনীতি চর্চ্চা সুরু করেন।

১৮৯৬ সালে ব্যারিষ্টারী পাশ করে জিন্না ভারতে ফিরলেন এবং ১৮৯৭ সালে বোম্বাই হাইকোর্টে আইনের ব্যবসা আরম্ভ করলেন। প্রথম তিন বছর অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হয়। এই সময় বোম্বাই গবর্ণমেন্টের জুডিশিয়াল মেম্বর স্যার চা... ওলিভ্যান্ট জিন্নাকে মাসিক দেড় হাজার বেতনে একটি সরকারী চাকরী দিতে... জিন্না তা প্রত্যাখ্যান করেন এই ব... তাঁর আকাঙ্ক্ষা দৈনিক দেড় হাজার উপায় করা। যে ভাবে মতিলাল নেহেরু, চিত্তরঞ্জন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে আইন-ব্যবসায়ে সাফল্য করেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে পরবর্ত্তী কালে তীক্ষ্ণধী বোম্বাইয়ের অন্যতম খ্যাতনামা ব্যারিষ্টাররূপে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নির্ভীক দৃঢ়তা, তাঁর যুক্তিজাল বিস্তারের ... ছিল অনুপম। প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করতে তাঁর বুদ্ধি প্রভাময় তরবারির মত ঝলসে উঠতো। বিচারকগণ ব্যা... জিন্নাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতেন। বহু কাল পরে যখন তাঁকে সাফল্যমণ্ডিত জীবনের রহস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন বলেছিলেন :—"Character, courage, industry perseverence are the four pillars on whicl whole edifice of human life can be built failure is a word unknown to me."

১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলো। ক্রমে রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হলেন। এই সময় (১৯০৫) ভা... রাজনীতিতে গোখলে ও সুরেন্দ্রনাথ দুই সূর্য্যের মত বিরা... ছিলেন। দু'জনাই তরুণ জিন্নাকে প্রভাবান্বিত করলেন। ... সালের কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো কলকাতায়। সভাপতি দা... নৌরজী। এই অধিবেশনে সর্ব্বপ্রথম জিন্না ও দেশবন্ধুকে কংগ্রেসী-মঞ্চে দেখা গেলো। ভাবাবেগহীন যুক্তিপন্থী তেজোগর্ভ বক্তৃতায় এক দিনেই তিনি নেতার আসন লাভ ক... এই বছরই ঢাকা সহরে মুসলিম লীগের জন্ম; কিন্তু জাতীয় ধারায় অনুপ্রাণিত জিন্না আবেদন-নিবেদনের ধামাবাহী লী... দিলেন না। এর পর থেকে জিন্নার রাজনৈতিক জীবন দ্র... ব'য়ে চললো। ১৯০৯ সালে বোম্বাই প্রদেশ থেকে তিনি ... উচ্চ আইন সভার (Supreme Legislative Council নির্ব্বাচিত হলেন। কাউন্সিলের সভাপতি লর্ড মিনটো... বাধলো তাঁর বিরোধ। ১৯১৩ ... জিন্না লীগে যোগদান করলেন। যোগদান করলেও তখনও পর্য্যন্ত ... মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ফুটে... —তখনও তিনি সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ও বিশেষ দাবীগুলির ... তাই করেছেন উদার জাতীয়তা... ভঙ্গী নিয়ে। ১৯১৬ সাল—তাঁ... লীগ-কংগ্রেসের বিখ্যাত লক্ষ্ণৌ ... ১৯১৭ সাল—কংগ্রেসের প্রতি... তিনি লণ্ডন যান। ১৯১৮ সালে রাষ্ট্রক্ষেত্রে গান্ধীজীর অভ্যুদয়ে... থেকে জিন্না নতুন ভাবধারার সঙ্গে ... বিধান করতে পারলেন না। গোখলে-অনুপ্রাণিত জিন্না নি... সীমার মধ্যে রাজনীতি চিন্ত...

অভ্যস্ত। ১৯২০ সাল—কংগ্রেস ত্যাগ করে জিন্না রাজনীতি ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ ও একক হলেন। কংগ্রেসের গান্ধী আন্দোলন তাঁকে পেলো না, প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম রাজনীতি থেকেও তিনি দূরে রইলেন। দীর্ঘ আট বছর কেটে গেল। দূর থেকে জিন্না লক্ষ্য করছিলেন ভারতের বৈপ্লবিক ঘটনাবলী। তার পর চৌদ্দ দফা দাবী নিয়ে ১৯২৯ সালে পুনরায় নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন জিন্না। কিন্তু এবার আমরা যে জিন্নাকে পেলাম, এ সে জিন্না নয় যাঁর মুখ থেকে এক দিন উচ্চারিত হয়েছিল এই কথা: "We are all sons of this land, we have to live together. We have to work together and whatever our differences may be, let us at any rate not create more bad blood···believe me, nothing will make me more happy than to see a Hindu-Muslim Union."। অবতীর্ণ হলেন বটে, কিন্তু ভারতের রাজনীতিতে তখন গান্ধীর অপ্রতিহত প্রভাব। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে জাতীয়তার স্রোত তখন অন্য খাতে বইছে। লক্ষকণ্ঠে জয়ধ্বনি—মহাত্মাজী কি জয়! সেই জয়ধ্বনির মধ্যে তলিয়ে গেলেন জিন্না। গান্ধীর নেতৃত্ব জিন্নার নেতৃত্বকে গ্রাস করলো। জিন্না রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ এবং ইংলণ্ডে বাস করবার সংকল্প করলেন। এইখানেই জিন্নার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম অঙ্কের ওপর যবনিকা পতন।

সেই যবনিকা উঠলো আবার ১৯৩৫ সালে নয়া শাসনতন্ত্র বর্ত্তিত হবার পর। ১৯৩৭ সাল—জিন্না মুসলিম লীগের কর্ণধার রাজনৈতিক চেতনাহীন বিশাল মুসলিম সমাজে সাড়া জাগালেন জিন্না। তাদের করে তুললেন কর্মচঞ্চল। সমগ্র সম্প্রদায়ের অন্তর-বেদনা তিনি অনুভব করলেন হৃদয় দিয়ে আর তার সমাধান করলেন বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে—অবশ্য সে বুদ্ধি উগ্র সাম্প্রদায়িকতার খাদ মেশানো। তাঁর কণ্ঠ আশ্রয় করে লীগের দাবী উঠলো—পাকিস্তান। চকিতে ভারতের রাজনীতির মোড় ঘুরে গেল। কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—কায়েদে আজম জিন্না। জিন্না এবার কায়েদে আজম হলেন—এই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত লীগের তিনিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা।

পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস দ্রুততর বেগে বয়ে চললো। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস যখন গান্ধীর নেতৃত্বে "কুইট ইণ্ডিয়ার" দাবী নিয়ে ইংরেজকে বিস্মিত-বিমূঢ় করে দিল, ঠিক সেই সময় জিন্নার নেতৃত্বে লীগ দাবী জানালো—"Divide and quit"—এবং সেই দাবীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গ যেন আশার আলো পেলেন। ১৯৪৪ সাল—স্মরণীয় গান্ধী-জিন্না আলোচনা। ১৯৪৫—সিমলায় ব্যর্থ বৈঠক। জিন্না অটল—পাকিস্তান চাই। তার পর কিসে কি হয়ে গেলো, কেউ বুঝতে পারল না। যে জিন্না চিরকাল নিয়মতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনের প্রতিবাদ ও নিন্দা করেছেন, কোন্ তৃতীয় পক্ষের নেপথ্য ইঙ্গিতে এবং প্ররোচনায় তিনি এক দিন মুসলমানদের "প্রত্যক্ষ সংগ্রামে" আহ্বান করলেন—তা আজ বোঝা যায়। তার পর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভয়াবহ পরিণতি—কলকাতা, নোয়াখালী, বিহার, পাঞ্জাব, সিন্ধু। সেই রুধিরাক্ত ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলো কীটদষ্ট বিকলাঙ্গ পাকিস্তান ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট। সেই পাকিস্তান আজ স্মারক স্বরূপ জিন্না রেখে গেলেন পরবর্ত্তী বংশধর ও লীগপন্থীদের জন্যে।

আজ গান্ধী নাই, জিন্না নাই। গান্ধী ও জিন্নার মধ্যে বিচ্ছেদ ভারতের এক প্রধান ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা। এই দু'জন মনীষী পৃথক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ভারতের ইতিহাস ভেঙ্গেছেন, গড়েছেন। এক বছরের মধ্যেই এই দুই মহান নেতা জীবনের পরিপূর্ণ পরিণতির সম্মুখে শ্রদ্ধা-সম্মত চিত্তে আমরা আজ নতশিরে দাঁড়াব। আশা করবো, পাকিস্তান ও ভারত জিন্না ও গান্ধীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিশিষ্ট ভাবে বিকশিত হবে।

ক'লকাতা

সব্যসাচী সেন

কাক ডাকে জলন্ত রোদ্দুরে
অবারণে তাবাই যদ্দুরে
প্রকাণ্ড পিচের রাস্তা
　　ট্রাম বাস রিক্সায় মুখর
ক'লকাত্তা শহর!

বহু উর্দ্ধে চির চেনা চির দেখা
　　গম্ভীর আকাশে
প্রাঞ্জল রজত বর্ণ শঙ্খচিল
　　চির অনায়াসে,
রৌদ্রস্নানে তন্ময় চঞ্চল!
ধূলি ধূম লৌহ কাষ্ঠ ইষ্টক প্রস্তরে ঘেরা
　　জন-কোলাহল
ঐশ্বর্য্যের মায়াপঙ্কে মধুলুব্ধ অযুত ভ্রমর
অশান্ত স্বার্থান্ধ হল বিষতীক্ষ্ণ কামনা-জর্জর
ক'লকাত্তা শহর!

বিজ্ঞাপন কি ?

'জয়ঢাক'

প্রচারকলার উন্নতিকল্পে আধুনিক যুগে বহু রকমের প্রচেষ্টা ও গবেষণা চলেছে। এ বিষয়ে অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা অগ্রণী। আর ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, ভারতবাসীর দৃষ্টি পড়েছে বিজ্ঞাপনের দিকে। আজ জাতি, সমাজ ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হলে বিজ্ঞাপনের দিকে দৃষ্টিদান না ক'রে উপায় নেই—পৃথিবীর দরবারে স্থানলাভ করতে হলে বিজ্ঞাপনের আশ্রয় ব্যতীত গতি নেই—ক্ষুধার অন্ন সঞ্চয় করতে হলে বিজ্ঞাপনের পদতলে লুটিয়ে পড়তে হবে—সংসার করতে হলেও বিজ্ঞাপনের গুণকীর্তন করতে হবে। এমন কি মরণকালেও সেই বিজ্ঞাপনের 'অক্সিজেন গ্যাস' ব্যবহার করতে হবে—তার পর মরণ-বাঁচন সে আর এক জনের হাত।

বাঙলা দেশ আজ প্রচারকলায় কতটা পারদর্শী তার পরীক্ষা হওয়ার দিন এসেছে। তার কারণ, বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠতম পণ্য-ব্যবসায়ীদের প্রচারের ভার কোন ইংরেজ কিংবা অ্যামেরিকান প্রচার-ব্যবসায়ীদের হাতে অর্পণ করা হয়নি। ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত ব্যবসায়ী টাটা কোম্পানীর নাম যেমন অ্যামেরিকান প্রচার-ব্যবসায়ী জে. ওয়াল্টার টমসন কোম্পানী প্রচারিত করেন, বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বটকৃষ্ণ পাল কিংবা বেঙ্গল কেমিক্যালের নাম অপর কেউ করেন না—যা করবার তারা নিজেরাই করেন। কারণ, বাঙলা ব্যবসায়ীদের বোধ হয় এ ধারণা হয়েছে যে "আমরা যেমন আমাদের প্রচারের কথা জানি, তা আর কেউ জানে না। আমাদের দেশের শিল্প ও পণ্য কিসের ধারে কাটে তা আমাদের মত আর কে জানতে পারে? আমাদের বিজ্ঞাপনের ভাষায় থাকবে আমাদের কথা, শিল্পে থাকবে আমাদের জাতীয় শিল্পধারার প্রতিচ্ছবি। আমাদের বিজ্ঞাপন দেখেই সাধারণে বুঝবে যে আমাদের বিজ্ঞাপন—তাতে কোন বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের মাথা নেই, কোন বিদেশী শিল্পীর বিকৃত রেখা নেই। তার সবটুকুই আমাদের জাতীয় ধারার বিজ্ঞাপন।'

কথাগুলি কিন্তু আমাদের কথা নয়, স্যর বীরেন কিংবা নলিনীরঞ্জনের নয়, রাজশেখর বসু অথবা স্যর হরিশঙ্কর পালেরও নয়, কথাগুলি বলেছেন অ্যামেরিকার এক কোটিপতি ললনা। গোটা ছয়েক কোম্পানী আছে তাঁর, প্রত্যেকটির বাৎসরিক আয় প্রায় সাত কোটি টাকা।

বাঙলার ব্যবসায়ীদের অবসর সময়ে যদি কেউ প্রশ্ন করেন তাঁরা (তাঁদের মধ্যে যাঁদের সংস্কৃতির প্রতি নজর আছে) হয়তো ঠিক এই কথাই বলবেন। তাঁদের শিল্পমনকে যদি জাগিয়ে তুলতে পারা যায় তাঁদের মুখেও ঠিক এই ধরণের উক্তি শোনা যাবে। নলিনীরঞ্জন সরকার বলবেন—হ্যাঁ, আমি সাবিত্রীর হাতে দিয়াই তো নিশ্চিন্দ আছি।

রাজশেখর বসু নাম করবেন শিল্পী যতীন সেনের।

স্যর হরিশঙ্কর পাল দেখাবেন তাঁদের হোর্ডিং, যাতে বাঙালী আর্টের চরম নিদর্শন রয়েছে।

বাঙলার ব্যবসায়ীদের শিল্পদৃষ্টি তারিফ করার আগে বাঙলা সাহিত্যের একটি পুরাতন লেখা পড়লে কিন্তু তাজ্জব বনে যেতে হয়। ছয় যুগ পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে যে এই ধরণের আলোচনা হয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। রচনাটি ঢাকার 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখায় লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। লেখাটি বিজ্ঞাপনের উপকারিতা ও মহৎ গুণের কথায় পরিপূর্ণ হলেও প্রচারকলার ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন মনে করে উদ্ধৃত করলেম।

"—পাঁজীকে মাথায় করে রাখতে পারি কিন্তু দোহাই, পাঁজীর বিজ্ঞাপনের মায়াজালে পড়তে রাজী নই।" এই ধরণের কথা তো অনেকেই বলে থাকেন।

বাইরের চোখে বাঙলা দেশের বিজ্ঞাপনের অতীতেতিহাস স্মরণ করলে তাই মনে হয়, আজ বাঙলা দেশের কুরুক্ষেত্রে প্রথম খুঁজতে হবে স্বামী বিবেকানন্দের মত পাবলিসিটি অফিসার। তার পর বাঙলার বিজ্ঞাপন-ক্ষেত্র-কর্ষণের কাজে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অন্নদা মুনশী তো রয়েছেন। শুপেন রায়-চৌধুরী আর দিলীপ গুপ্তও আছেন।

লেখাটি উদ্ধৃত হল :—

"...বিজ্ঞাপন এক আশ্চর্য্য পদার্থ, এবং ইহার ক্ষমতা বস্তুতঃই ইন্দ্রজালবৎ। সুসভ্য সমাজের পক্ষে

মহিমা কীর্ত্তন করেন। স্তুতি এক জন কি একটি সম্প্রদায়কেই ভেড়া বানাইয়া থাকে ; বিজ্ঞাপন ভোজরাজনন্দিনীর ভেল্‌কির মত, যুগপৎ সহস্র সহস্র লোকের চক্ষে ধাঁধা লাগায় এবং যেখানে যে অরক্ষিত অবস্থায় থাকে, তাহাকেই ভেড়া বানাইয়াই মন্ত্রসাধকের সান্নিধ্যে টানিয়া আনে। স্তুতিমন্ত্রের আর এক দোষ এই, উহা জপ করিতে হইলে পরগুণ কীর্ত্তন করিয়া করিয়া জিহ্বাকে কলুষিত করিতে হয়, এবং ইহা কখনই সকল সময়ে সুখদ বোধ হয় না। বিজ্ঞাপনমন্ত্রের সাধনায় নিজগুণ বিনা জগতের আর কাহারও গুণ পরিকীর্ত্তন করিতে হয় না এবং নিজগুণ পরিকীর্ত্তনে যাহা কিছু নিন্দার সম্পর্ক থাকে, বিজ্ঞাপনের নামে তাহাও আর স্পর্শে না।

মনে কর, তোমরা তিনটি অজাতশ্মশ্রু যুবা, আর দুইটি অস্ফুটবুদ্ধি বালক কোন এক অন্ধকার গৃহে মিলিত হইয়া সংসারশৈল কি সমাজতরুর মূল ধরিয়া টানাটানি করিতে, অথবা রাজা-রাজড়া কি আর যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে যথেচ্ছ গালি দিতে সংকল্পারূঢ় হইলে। এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করা নিতান্ত সহজ কথা নহে। ইহার জন্য অর্থ চাই, সামর্থ্য চাই, বুদ্ধি বৈভব এবং আর দশ প্রকারের ক্ষমতা চাই। অথচ তোমাদিগের ভাণ্ডারে তাহার একটিও দেখিতেছি না। তোমাদিগের ক্ষীণকণ্ঠ-নিঃসৃত ক্ষীণ ধ্বনি, তোমরা যেখানে উপবেশন কর, সেই স্থানের প্রাচীর চতুষ্টয়কে অতিক্রম করিয়া, কোন প্রকারেই সংসারে প্রতিধ্বনিত হয় না। নৈরাশ্যের এই সমস্ত নিষ্ঠুর লক্ষণ দেখিয়া তোমরা একবারে অবসন্ন হইতে পার। কিন্তু আমি বলিতেছি ইহা কখনই অবসাদের কারণ নহে। তোমরা এই অবস্থায় থাকিয়াও, সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, কায়মনোবাক্যে বিজ্ঞাপনমন্ত্রের সাধন করিতে প্রবৃত্ত হও,—তোমাদের ঐ পাঁচ জনের সামান্য সম্মিলনকে ভারতশোধিনী কি ব্রহ্মাণ্ডপাবনী এইরূপ একটা কিছু ভৈরবনাদি তন্ত্রোক্ত নাম দিয়া সেই নাম গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে, দেশে দেশে, এবং দিগ্‌-দিগন্তরে বিজ্ঞাপিত কর ; দেখিবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ভেড়া বনিয়া স্বয়মিচ্ছু বন্দীর ন্যায় তোমাদিগের দ্বারস্থ হইয়াছে, এবং তাহাদিগের অপকারের জন্য যে কোন সামগ্রীর আবশ্যক, ভক্তিসহকারে তাহা তোমাদিগকে সংকলন করিয়া দিতেছে।

যখন কতকগুলি লোককে ভেড়া বানাইয়া করায়ত্ত না করিলে সংসারে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, এবং বিজ্ঞাপনরূপ মহামন্ত্র প্রয়োগ বিনা কোন মনুষ্যই ভেড়া বনে না, তখন সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়ীকেই এই মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। ইংলণ্ডের এক জন অধুনাতম তান্ত্রিক উপদেশ করিয়াছেন যে, যদি কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অভীষ্ট ফল লাভ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তিকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার ২৭ ভাগ প্রকৃত-কার্য্যে এবং ৭৩ ভাগ সেই কার্য্যের বিজ্ঞাপনে প্রয়োগ করিবেন। উক্ত পণ্ডিত স্বপ্রণীত গ্রন্থে বিজ্ঞাপন শব্দ ব্যবহার না করিয়া, শিঙা ফুকন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু অর্থে দুই-ই এক। সে যাহা হউক, আমার নিকট এই বিভাগটি সুসংগত বোধ হয় না। আমার বিবেচনায় প্রকৃত কার্য্যে মাত্র ১ ভাগ শক্তি এবং কার্য্যের ঘোষণায় ৯৯ ভাগ শক্তি প্রয়োগ না করিলে, দেখিতে দেখিতেই ফল ফলে না।

ভারতবর্ষে এইক্ষণ বাণিজ্যের উন্নতি নাই, স্বাধীন ব্যবসায়ের সম্মান নাই, উমেদওয়ারের চাকুরী নাই, বিবাহ-যোগ্যা কন্যার বর নাই, বরের পাত্রী নাই, বক্তার শ্রোতা নাই, লেখকের গ্রাহক নাই, এবং এইরূপ কোন বিষয়েই কাহারও আশার সাফল্য নাই। এই শোচনীয় অবস্থার যিনিই যে কারণ নির্দ্দেশ করুন, আমি অবধারিতরূপে বলিতে পারি যে, বিজ্ঞাপনমন্ত্রে উপেক্ষাই ইহার প্রধান কারণ। সত্য বলিতেছি, বিনা বিজ্ঞাপনে ভারতের কল্যাণ হইবে না। উকীল বিজ্ঞাপন দিতে জানেন না, মওয়াক্কেল কোন প্রকারেই ভেড়া বনে না। দোকানদার বিজ্ঞাপনের মাহাত্ম্য অনুভব করে না, খরিদদার দ্বারে আসিয়াও গৃহে প্রবেশ করিতে চায় না ; এবং যাঁহারা যাজকতা ও পাঠকতা কি অন্যান্য ব্যবসায় আশ্রয় করেন, তাঁহারাও এই হেতু বাসনানুরূপ কৃতকার্য্য হন না।

বিজ্ঞাপনসাধনায় ইংরেজ সকল দেশের গুরু। ইয়োরোপ ও আমেরিকা বিজ্ঞাপনেরই বিলাসভূমি। কিন্তু অন্যান্য সকল স্থানের উপর লণ্ডনই এ বিষয়ে ললাটভূষণ। লণ্ডনে ঘাটে, মাঠে, হাটে, নগরোপান্তে, উদ্যানে, বিদ্যালয়ে, ধর্ম্মাধিকরণে, ভজনামন্দিরে সর্ব্বত্রই বিজ্ঞাপন। কেহ মরিল, তাহাতে বিজ্ঞাপন ; কেহ জন্মিল, তাহাতেও ঐরূপ বিজ্ঞাপন। চক্ষু মুদিয়া যোগসাধন করিতে হইলেও লণ্ডননিবাসী আগে তিন লক্ষ নিরানব্বই হাজার বিজ্ঞাপন প্রচার না করিয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। অন্যান্য দেশের লোকেরা বিদেশে গেলে, সঙ্গে অনেক সম্বল লইয়া যায় ; লণ্ডনের বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা কএকখানি বিজ্ঞাপন মাত্র পকেটে পুরিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। তাঁহাদিগের কপর্দ্দকও ব্যয় হয় না এবং কোন বিষয়েই তাঁহারা কোন অভাব অনুভব করিতে পান না। কারণ, ঐ বিজ্ঞাপন যাহার কপালে ছোঁয়ান যায়, সেই ভেড়া বনিয়া তাঁহাদিগের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হয়।

এদেশের অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি বহুমূল্য দ্রব্যাদিপূর্ণ দোকান সাজাইয়া বসিয়া থাকেন ; লণ্ডন হইতে কেহ গায়ে একটি ছেঁড়া কোট এবং মাথায় একটি ভাঙ্গা হেট পরিয়া, এখানে আসিয়া, দুই একখানি বিজ্ঞাপন দেখাইয়াই সেই দোকানের সর্ব্বেসর্ব্বা অধীশ্বর হন ; বাবুটি ভাবগদগদ ভক্তের মত মুচ্ছুদ্দির আসনে উপবিষ্ট হইয়া পদলেহন করিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষে অনেক ইংরেজ বিস্তীর্ণ জমিদারি লাভ করিয়া এবং যাইবার সময় সেই জমিদারি একগুণে পঞ্চাশ-গুণ মূল্যে বন্ধক দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা বলিতে পারিবেন যে, ঐ সকল ইংরেজেরা যখন প্রথম শুভাগমন করিয়াছিলেন, তখন একখানি লাঠি আর কএকখানি

[পর পর্য্যায়ে অবশিষ্টাংশ দ্রষ্টব্য]

বিজ্ঞাপন ও প্রচারকলা

শিল্পপ্রচারণী

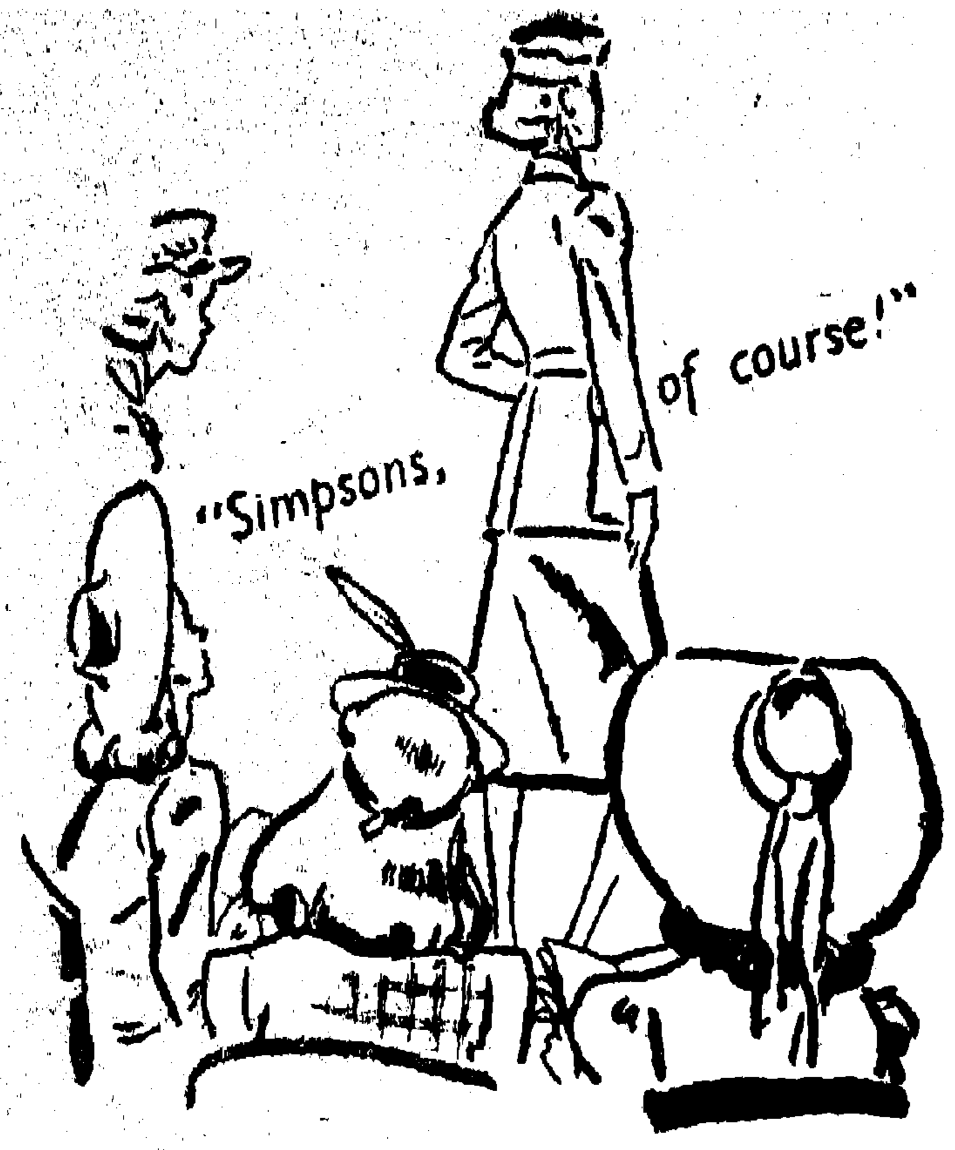

প্রেস্ লে আউট ডবলু, এস্, ক্রাফোর্ড, লিঃ
(সিম্পসন্ কোম্পানীর প্রেস্ বিজ্ঞাপন)

আজ থেকে একশ' বছর আগে যখন এই কলকাতা শহরের বাবুরা 'ফেটিং, সেল্ফড্রাইভিং বগি ও ব্রাউহ্যামে' চ'ড়ে মোসাহেবদের সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন, এমন কি 'বিবিজানের' সঙ্গে একত্রে বসেই চলতেন—'খাতির নদারৎ', তখন কলকাতার পথের উপর 'বেলফুল' 'বরফ' 'মালাই' ইত্যাদির চীৎকার শোনা যেত, মেছো-বাজারের হাড়িহাটা, চোরবাগানের মোড়, যোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোণাগাজীর গলি, আহীরিটোলার চৌমাথা লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকত, ইংরেজী জুতো, শান্তিপুরে ডুরে উড়্নি আর সিম্লের ধুতির কল্যাণে ছোটলোক ভদ্দরলোক আর চেনবার জো থাকত না। একালের মতন সেকালের শনিবারের ও ছুটি-ছাটার রাত্তিরেও শহর গুল্জার হয়ে থাকত। কিন্তু এখনকার গুলজার কলকাতার সঙ্গে তখনকার গুলজার কলকাতার চেহারার কোন সাদৃশ্যই নেই বলা চলে। তখন ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুর-ভুর ক'রে বেরিয়ে যেন শহর মাতিয়ে তুলত। রাস্তার ধারে বড় বড় বাড়ীতে খ্যামটা নাচের তালিম হত, অনেকে রাস্তায় হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে ঘুঙুর আর মন্দিরার রুণুরুণু শব্দ শুনে স্বর্গসুখ উপভোগ করতেন। যত সব বরাখুরে উনপাঁজুরের দল আর বারফটকা বাবুরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে হাসির গর্‌রা ছুটিয়ে মৌ লুটতে বেরুতেন আবার উড়ে বামুনদের দোকানে ময়দা-পেষা দেখে এবং বারবনিতাদের বারান্দায় কোকিলের ডাক শুনে ঘরমুখো হতেন। একালের কলকাতার সঙ্গে এদিক্ দিয়ে সেকালের কলকাতার আজও হয়ত অনেক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু কলকাতার সেই সন্ধ্যা-মূর্ত্তির কোন চিহ্ন নেই আজ। আছে হয়ত, কিন্তু সে চীৎপুরের বে চোরাগলিতে, টেরিটি বাজার অথবা মেছুয়াবাজারের আনাচে-কাণ গলি-ঘুপচিতে। একশ' বছর আগে কলকাতা শহরের রাস্ত দু'ধারে কাটা কাপড়, কাঠকাট্‌রা ও বাসনের দোকান ছিল, পানে খিলির দোকানে বেল-লণ্ঠন আর দেয়ালগিরি জ্বলত, স্যাকরারা তুগ প্রদীপ সামনে নিয়ে রাংঝাল দিত দোকানে, শোভাবাজারের রাজাদে ভাঙা বাজারে মেছুনীরা প্রদীপ হাতে ক'রে পচা মাছ আর লোণ ইলিস বিক্রী করত, কিন্তু আজকের কলকাতার মতন হাজার হাজা লক্ষ লক্ষ বৈদ্যুতিক আলো জ্বল্‌জ্বল্ ক'রে জ্বলে উঠতো না চোখে সামনে, ল্যাম্প-পোষ্টে, দেয়ালের গায়ে, বাসে-ট্রামে-ট্রেণে, হোটেলে কাফে-রেস্তোঁরায়, হাজার হাজার দোকানের সামনে, বাজারে বন্দরে, চৌমাথার মোড়ে প্রাসাদ-শিখরে হরেক রকমের পোষ্টার, সাইনবোর্ড, শোকার্ড, উইণ্ডো-ডিসপ্লে, আলোকচিত্র ও আলোক-অক্ষর ঝলমলিয়ে উঠত না, ধাঁধিয়ে ঝল্‌সিয়ে দিত না শহরের লোকদের। "ডোঙ্গরের বালামৃত" থেকে "ডি গুপ্তর পাঁচন", "মৃতসঞ্জীবনী সুধা" থেকে দেবজনের উপভোগ্য স্কচ হুইস্কি "হোয়াইট লেবেল", উইল্‌সের 'ক্যাপষ্টান' থেকে গণি মিঞার নীল সুতোর "মিঠেকড়া বিড়ি," ফেরাজিনি-অরিজোনার "কেক্-প্যাট্রিজ" থেকে রাজাবাজারের কসাইয়ের দোকানের কাটা গরুর বাসি দাবনা, চৌরঙ্গীর "গ্র্যাণ্ড" থেকে ছাতাওয়ালা গলির "মৃণালিনী কাফে", ডায়মণ্ড নেক্‌লেস, স্বর্ণচূড় থেকে ডেন্‌টিষ্টের দোকানের সাজানো মেকী দাঁতের পাটি, হ্যাট কোট শার্ট স্কার্ট ফ্রক ব্লাউস গাউন থেকে 'মানে-না-মানা' 'দিল্লী-চলো' 'জয় হিন্দ' ভয়েল ক্রেপ জর্জ্জেটের শাড়ী। ট্রাই-বাইসাইকেল পেরাম্বুলেটার থেকে ষ্ট্রীমলাইণ্ড পণ্টিয়াক ষ্টুডি-বেকার পর্যন্ত সব একসঙ্গে অথবা একে-একে উৎসুক-নিরুৎসুক ঘোলাটে-চক্‌চকে চোখের সামনে চম্‌কে উঠে আমার আপনার এবং আরও অনেকের সেন্‌ট্রাল নার্ভাস সিষ্টেমের গোড়া পর্যন্ত এমন ভাবে নাড়া দিয়ে হক্‌চকিয়ে দিত না। শহরের কোন এক অদৃশ্য কোণ থেকে যেন কোন অপারেটার সুদীর্ঘ একটি চলচ্চিত্রের রীল ঘুরিয়ে চলেছে, আর আমরা সকলেই যেন অসহায় দর্শকবৃন্দ। অসহায় বলছি এই জন্য যে, সারা কলকাতা

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

বিজ্ঞাপন বই কিছুই তাঁহাদিগের সঙ্গে ছিল না। লণ্ডনের পুরুষ কেন, বায়ুভরবিলোলিতা অবলাও, বিজ্ঞাপনের বলে সময়ে সময়ে তেমন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে ভেড়া বানাইয়া, তাহার স্কন্ধে চড়িয়া, সাংসারিক সম্পদের উচ্চতম স্থানে আরোহণ করেন। যেই ভেড়াকৃতা বিশ্বমোহিনীর নিরুপম মুখমাধুরী দর্শন করিলে, কেহই উচ্ছলিত প্রেমাশ্রু সংবরণ করিতে সমর্থ হয় না।"—বান্ধব, চৈত্র, ১২৮১]

শহরটাই যেন একটা বিচিত্র প্রেক্ষাগৃহ, আর তার ভেতরেই চলে-ফিরে বসে-দৌড়ে হাঁপিয়ে-হাই তুলে স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন দেখে আমরা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়ে দিচ্ছি। এই আজব প্রেক্ষাগৃহ থেকে মুক্তি নেই আমাদের। নেশাখোরের ট্যাঁকে কাণাকড়িও নেই, রাস্তায় বেরুতেই হোটেলের জ্যাজ-ক্ল্যারিয়নেট ঝন্‌ঝনিয়ে উঠলো, চোখের সামনে বৈদ্যুতিক অক্ষরে ঘোষণা করা হ'ল "স্কচ হুইস্কি হোয়াইট লেবেল" পান করুন। পেটে হয়ত বুভুক্ষু তাড়কা বৈঠক দিচ্ছে, এমন সময় ক্যাসানোভার মেন্নুবোর্ডের কাবাব-কোপ্‌তা-ত্রিয়ানির ঝল্‌কানি উঠলো; গায়ে আধময়লা ছেঁড়া জামার পকেট থেকে ছারপোকা আর আরশুলার বাচ্চারা বেরিয়ে যখন সুড়্‌সুড়্‌ ক'রে পিঠের ওপর ঘু'রে বেড়াচ্ছে তখন হয়ত গোলাম মহম্মদের উইণ্ডো-ডিস্‌প্লের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলাম। এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত ভদ্দর-বেকারের ঝাপসা দৃষ্টির সামনে কাচের শার্সীর ভেতর দিয়ে ষ্টীমলাইণ্ড ষ্টুডিবেকার বাস্তব সত্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্ত্রীর হাতের নোয়াবাঁধানোটাও যখন বন্ধক পড়েছে তখন ঠাকুরলালের মুক্তাহার দেখে কি মনে হয়? কোলের শিশুটার অদৃষ্টে যখন খোট্টা গয়লার পিটুলিগোলাও এক কৌটা জুটছে না, তখন "বনি বেবির" হাতে হর্লিক্‌স আর গ্ল্যাক্সো অথবা লিলি বার্লির হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল বাচ্চাদের দেখে চোখে জল এলেও রেহাই নেই। মুক্তি নেই আধুনিক মানুষের। সংসারের মায়া যদিও বা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে ওঠা যায়, বিজ্ঞাপনের বেড়াজাল আর প্রচারের মোহমায়াজাল থেকে আধুনিক যুগে মুক্তি কোথায়?

দিনের আলোর কথা বলছেন? ইলেক্‌ট্রিক আর নিয়োঁ সাইনস হয়ত দিনের সূর্যের আলোয় চোখের সামনে জ্বলে উঠবে না, কিন্তু শত শত সংবাদপত্র সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপন, লিফলেট পোষ্টার শোকার্ড, সাইনবোর্ড, দেয়ালের গায়ে, ট্রামে-বাসে-ট্রেণে আপনাকে সারাক্ষণ বিব্রত ক'রে তুলবে। আপনি হয়ত মনে করছেন যে রুদ্ধ কারার মতন এই মাটির পৃথিবীতে যখন বিজ্ঞাপন আর প্রচারের কবল থেকে মুক্তি নেই, তখন উদার উন্মুক্ত আকাশের দিকে চেয়ে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন। কিন্তু হায়! তারও উপায় নেই। আকাশের দিকে চেয়ে দেখবেন, লম্বা ষ্টীমার আর ব্যানারের লেজ নিয়ে কোন বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীর পণ্যবারত্তা ঘোষণা ক'রে হাওয়ায় উড়ছে রঙিন ঘুড়ি, আপনার মাথার ওপর। খেলার মাঠের অথবা ময়দানের ভীড়ের ঠিক ওপরে। শুধু কি তাই! দিনের আকাশ কলঙ্কিত ক'রে উড়োজাহাজ কেবল ঘূরপাক খেয়ে খেয়ে ধোঁয়ার অক্ষরে লিখে জানাচ্ছে, সাবান যদি মাখতে হয় তাহলে "পিয়ার্সের"। আর রাতের আকাশে ষ্টীমারের সার্চ্চলাইটের আলোর অক্ষরে আঁকা পণ্যপ্রচার দেখে মুগ্ধ হবেন, না, শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর চাঁদের সৌন্দর্যে আত্মহারা হয়ে কবিতা লিখবেন?

উপায় নেই রেহাই নেই, মুক্তি নেই, বিজ্ঞাপন আর প্রচারের মায়াজাল থেকে। সেকালে সংসারত্যাগীর জন্য নির্জ্জন অরণ্য ছিল অনেক। একালে এমন কোন অরণ্য নেই যা পণ্যমালিকের প্রচারসীমান্ত ছাড়িয়ে। এ-যুগ পণ্যের যুগ, পণ্যই পুণ্য, মুনাফাই কাম্য, প্রতিযোগিতাই সাম্য। সুতরাং পণ্যের প্রচার আর বিজ্ঞাপনই এ-যুগের দৈববাণী। পণ্যই মন্ত্র, পণ্যই ধর্ম, পণ্যই

আর্ট-ওয়ার্ক—হ্যারী বেকক, মিউওয়েল-ইমেট অঙ্কিত
(হারাইট রক্‌এর বিজ্ঞাপন)

জপ-তপ-ধ্যান। মুনাফাই তার ঐশী প্রেরণা। তাই অবাধ প্রতিযোগিতার অবিরাম ঘর্ষণের মধ্যে যদি হঠাৎ-আলোর টুকরোর মতন ঝল্‌কে উঠতে হয়, লক্ষ জোড়া চোখের সামনে যদি দেবতার মতন আবির্ভূত হয়ে ঘোষণা করতে হয় "মা ভৈঃ! আমি আছি! আমি আছি!" তাহ'লে বিজ্ঞাপন চাই, প্রচার চাই।

বিজ্ঞাপনের জন্মকাল

এই সব ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, অনাদি অনন্ত কাল থেকে মানুষের সমাজে 'বিজ্ঞাপন' অথবা 'পণ্যপ্রচার' বলে কিছু ছিল না। শ্রমশিল্প ও যন্ত্রযুগেই এই 'বিজ্ঞাপনের' জন্ম হয়েছে এবং যান্ত্রিক শ্রমশিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য (Free Enterprise) ও প্রতিযোগিতার (competition) যত তীব্রতা বৃদ্ধি হয়েছে, বিজ্ঞাপন ও পণ্যপ্রচারের ছলা-কলারও তত উন্নতি হয়েছে। এই মধ্যযুগের কথাই ধরা যাক। মধ্যযুগের সমাজে বিনিময়-ব্যবস্থা যখন টাকার (Money) মাধ্যমে না হয়ে সরাসরি জিনিসের বদলেই হত তখন বিজ্ঞাপনের কোন গুরুত্ব না থাকাই স্বাভাবিক। পণ্যের উৎপাদনও খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। কারিগর ও কারুশিল্পীরা যা কিছু উৎপাদন করত তার চাহিদা তৈরী করতে হত না, তৈরী হয়েই থাকত সমাজের মধ্যে। তাছাড়া, তার বিশেষ কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও থাকত না বাজারে। মধ্যযুগের বাজারে গরু-ঘোড়া-উটের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের ভীড় জমত ঠিকই, কিন্তু সে ভীড় আর হট্টগোল আধুনিক যুগের বাজারের হট্টগোল নয়। বেচা-কেনার পালাটা বেশ নিরিবিলিতেই শেষ হয়ে যেত, বিনিময় হত জিনিসের মাধ্যমেই বেশী, যার যে জিনিস দরকার সে তাই নিয়ে তার বদলে

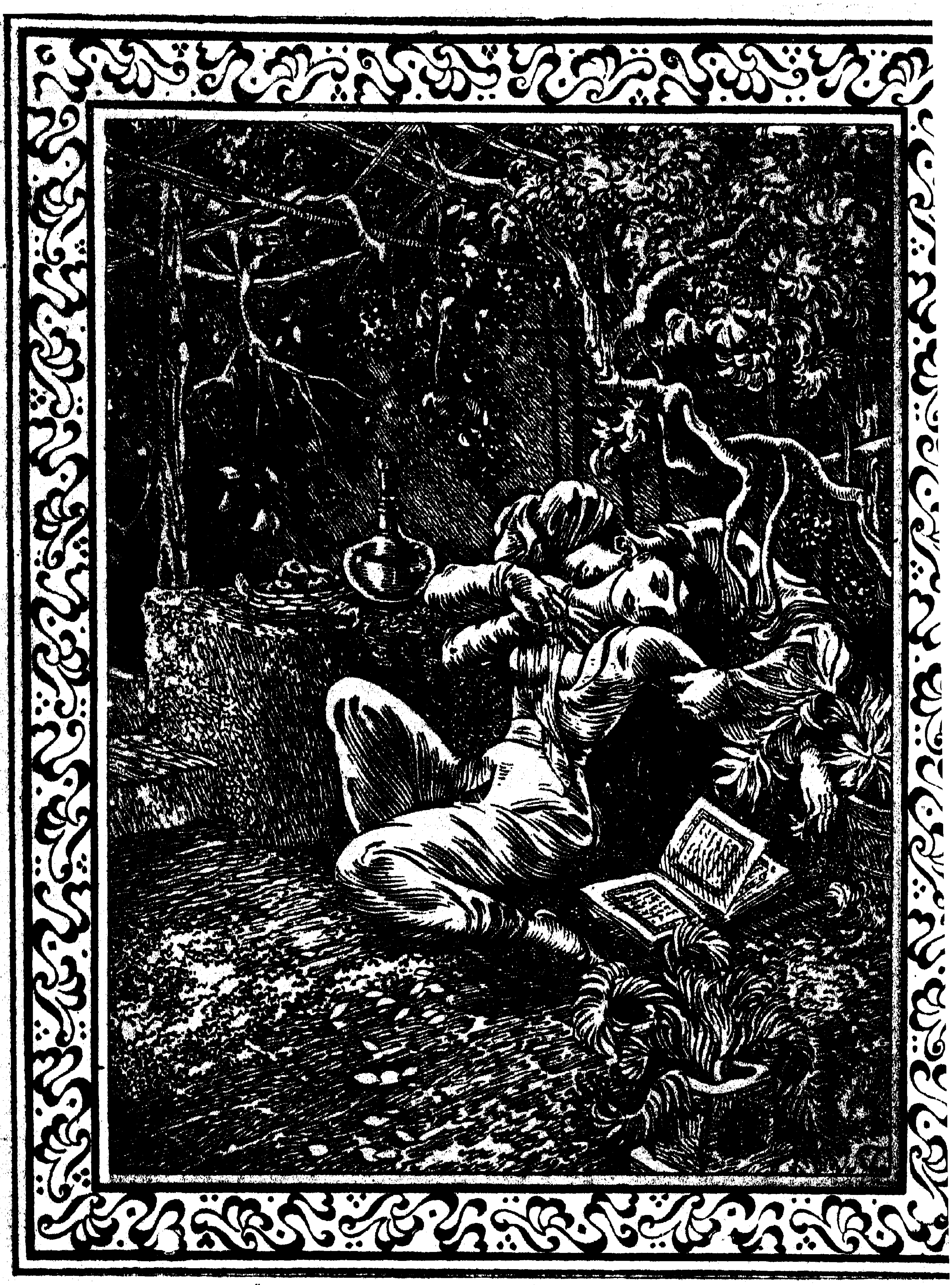

—জ্যোতিষ সিংহ

"কর্ম্ম-ক্লান্ত জগতের শ্রান্ত এ জীবনে যতটুকু অবসর পাও,
তোমার ও দু'টি ব্যগ্র বাহুর বেষ্টনে প্রিয়তমে বুকে টেনে নাও ;
সার্থক করো এ জন্ম আপনা বিলায়ে, প্রাণ তব ভালবাসে যা'রে,
হয় তো জননী লবে মুহূর্তে ডাকিয়া সমাধির আঁধার-দুয়ারে,
নিশীথের মতো তাঁ'র শান্ত অন্তরের গাঢ়তর স্নেহ-আলিঙ্গনে,
চিরনিদ্রা যেতে হবে চিররাত্রি-দিন সংজ্ঞাহীন অনন্ত শয়নে।"

—[illegible]

তার নিজের তৈরী ও উৎপন্ন জিনিস দিয়ে যেত। সর্ব্বশক্তিমান একচ্ছত্র "টাকা-মাধ্যমের" সৃষ্টি হয়নি তখনও। টাকা আর পণ্য-উৎপাদনের যন্ত্রদানবের যখন আবির্ভাব হ'ল সমাজে, হাড়গিলা মুনাফা-শকুন যখন লুব্ধ নখদন্ত নিয়ে সমাজের বুকে চেপে বসল, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আর অবাধ বাণিজ্যের নীতি যখন হাত-ধরাধরি করে হৈ-চৈ শুরু করল চারি দিকে, 'পার্লামেণ্ট' থেকে 'ফুটপাথ' পর্যন্ত, তখন বিজ্ঞাপন ও প্রচার-মাহাত্ম্যও ঘোষিত হল মুক্তকণ্ঠে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে পণ্য-স্বাতন্ত্র্যও জোর-গলায় জাহির করা চায়। হ্যারিংটন আর হরিহর শেঠ স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তি, আত্মপ্রতিষ্ঠার তাদের অবাধ স্বাধীনতা, এই সব বাণী যখন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হল সমাজের মধ্যে তখন কারখানার যন্ত্রে উৎপন্ন 'প-ণ্যরও' একটা স্বতন্ত্র সত্তা, অশরীরী হলেও গজিয়ে উঠলো, পণ্যেরও আত্মপ্রতিষ্ঠার অবাধ স্বাধীনতা স্বীকার করা হল। সাবান, মাথার তেল, মোটর গাড়ী, এ সব জিনিসের শতনাম সহস্রনাম ও গুণসাদৃশ্য যতই থাকুক না কেন, তবু কিউটিকুরা লালেবাই পিয়ার্স ক্যালকেমিকো টাটা-মোদি, মরিস ষ্টুডিবেকার ক্রাইসলার ফোর্ড সকলেরই আত্মমাহাত্ম্য জাহির করার অবাধ স্বাধীনতা আছে এবং প্রত্যেকেরই একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে যা ক্ষুণ্ণ করার অধিকার কারও নেই। এই যে বিচিত্র 'পণ্যস্বাতন্ত্র্য' এরই চরম পরিণতি হল "ট্রেড মার্ক" ও "পেটেন্টের" মধ্যে। বহুরূপী মানুষের হাজার রকমের রুচিগন্ধ স্বাদ-অভ্যাস-মিশ্রিত কলরবমুখরিত বাজারে বেরিয়ে মালিকের মূলধনজাত "পণ্য" সদম্ভে ঘোষণা করল "আমিই ব্রহ্ম, আমি এক অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় নাস্তি"। মার্কিণ ধনকুবের ডু'পণ্টের 'ক্যাণ্ডিই' হোক, আর বাঙলার ছেলে দুলালের 'মিছরিই' হোক, প্রত্যেকেরই অদ্বৈতসত্তা প্রত্যেকেই একক অদ্বিতীয়। প্যাকেট লেবেল আর নামটাই কিন্তু ব্রহ্মত্বের সর্বস্ব, যা-কিছু স্বাতন্ত্র্য তা ওর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। "আমার প্যাকেট আমার, আমার লেবেল আমার, আমার নাম আমার"—ডু'পণ্ট থেকে দুলাল পর্যন্ত সকলেরই এই একই ঘোষণা। তার পর কিন্তু নিউ ইয়র্কের মর্গান থেকে নিমতলার মদনমোহন সকলেই প্রায় সমান। এ-বাজারে 'প্যাকেটে' আর 'লেবেল-'টাই আসল, আর সব ঠিক নকল না হলেও নগণ্য নিশ্চয়ই। "প্যাকেট' 'লেবেল' আর 'পেটেন্ট নামটাকে' যদি ঝাণ্ডা উড়িয়ে জাহির করা যায়, অথবা ঠারেঠোরে নানা ছলা-কলা-ভঙ্গীতে যদি নাম আর লেবেলটাকে লোকের মনের মধ্যে ব্যাধের অব্যর্থ তীরের মতন বিঁধিয়ে ফেলা যায়, তাহলেই বাস্। বাজার মাৎ! চুঁচড়োর দুলাল দু'বছরের মধ্যে চড়্‌চড়্‌ করে চিকাগোর ডু'পণ্ট হয়ে উঠলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিজ্ঞাপন ও প্রচারকলার এমনই ঐন্দ্রজালিক শক্তি!

বিজ্ঞাপন ও প্রচারমাহাত্ম্যের মোহিনীশক্তি অস্বীকার করার সহজ অর্থ হল পণ্যবাজারে একান্ত অকারণে অকাতরে আত্মহত্যা করা। বিজ্ঞাপনের নীতি-দুর্নীতি নিয়ে যাঁরা বচসা করেন, তাঁরা আপাততঃ সেই বচসার ব্যাপারটা স্বচ্ছন্দে ভবিষ্যৎ সমাজের জন্ত মুলতুবী রাখতে পারেন। কথা হচ্ছে, বর্তমান সমাজ এবং তার উৎপাদন ও বিলি-ব্যবস্থা নিয়ে। যত দিন ব্যক্তিগত ভাবে মূলধনের মালিকের মুনাফা ও অবাধ বাণিজ্যের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে, তত দিন পণ্যের বাজারে, কেনা-বেচার বাজারে রীতিমত হৈ-চৈ হট্টগোল হবে, হল্লার চোটে কানের পর্দা ফেটে যাবে, "মনমোহিনী মোচার চপ" থেকে

শো-কার্ড   গ্রামের শেষ—জে, এফ,, বী, অঙ্কিত

(লোটাস্ সুএর পোষ্টার)

'বনস্পতির' ভেপুর শব্দে পথচারীর পথচলা দায় হয়ে উঠবে। পণ্যের সাদৃশ্যের চেয়ে তার তথাকথিত সত্তার স্বাতন্ত্র্য যত দিন মহত্তর বলে স্বীকৃত হবে, তত দিন,—তত দিন তো নিশ্চয়ই, প্যাকেট ও লেবেল-মাহাত্ম্যমাথা হেঁট করে মেনে নিতে হবে, প্রেস ও পোষ্টারের মহিমাও কীর্তন করতে হবে। 'বিজ্ঞাপন' জিনিসটা ভাল কি মন্দ তা নিয়ে তর্ক করার অবসর নেই এ সমাজে। বাজারের পণ্য-প্রতিযোগিতার নির্মম নিষ্করুণ বাণিজ্যিক নির্বাচন ক্ষেত্রে, ডারুইনের বিবর্তনবাদের মূলসূত্র অনুযায়ী, যোগ্যতম হিসাবে আপনার উর্দ্ধতন ও উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হবে না, যদি বিজ্ঞাপনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা আপনি ব্যবসায়ী হয়েও অকুণ্ঠচিত্তে না স্বীকার করেন; "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"—এ-কথা বলেছেন বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাস। এ যুগে যদি সত্যিই কোন রসিক চণ্ডীদাস থাকেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বলবেন—শুধু বলবেন না, বেতার-কেন্দ্র থেকে বার-বার ঘোষণা করবেন—"সবার উপরে বিজ্ঞাপন সত্য, তাহার উপরে নাই।"

বিজ্ঞাপনের রূপভেদ ও প্রচারকলা

বিজ্ঞাপনের রূপবৈচিত্র্যের অন্ত নেই বললেও ভুল হয় না। প্রচারকে উন্নাসিক কলাবিদ্‌রা চিরকাল অবজ্ঞা ক'রে এসেছেন, কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। আমাদের দেশে না হলেও, ইয়োরোপে আমেরিকায় 'প্রচার' এত দ্রুত 'প্রচারকলায়' রূপান্তরিত হয়েছে ও হচ্ছে যে তা ভাবলেও অবাক্ হতে হয়। প্রচারশিল্পী যাঁরা তাঁরাও আজ আর অবজ্ঞার পাত্র নন, চারুশিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য যা-ই থাকুক না কেন, এ-সমাজে পণ্য আর টাকার দ্রীমরোলার সমস্ত পার্থক্য, সমস্ত ব্যবধান-প্রাচীর ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে।

অনেক খ্যাতনামা চারুশিল্পী আজ প্রচার-শিল্পের সাধনায় আত্মোৎসর্গ করেছেন। তাঁরা বাণিজ্যের হাড়িকাঠে আত্মবলি দিয়েছেন কি না সে সব গুরুগম্ভীর বড় বড় শিল্পশাস্ত্রকথার বা নীতিসূত্রের অবতারণা করে লাভ নাই। 'প্রচার' যখন করতেই হবে, 'বিজ্ঞাপন' যখন দিতেই হবে এবং প্রচার ও বিজ্ঞাপন যখন দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিলে-মিশে রয়েছে, তখন তাকে শিল্পকলার স্তরে ঠেলে তুলতেই হয় সমাজের মানুষের তাগিদে। নির্জন ষ্টুডিওতে বসে যে অভিজাত চারু-শিল্পী তাঁর কল্পনা-উর্বশীর সতীত্ব রক্ষা করে তাকে তুলির আগায় পটের উপরে রূপায়িত করেন এবং করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন, তিনি আঁকেন কার জন্যে, কাদের জন্যে? উত্তরে তিনি বলবেন, মানুষের জন্যে, কিন্তু এই সমাজে সেই মানুষ কারা? নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষের জন্যে না, কারণ তারা তাঁর অভিজাত চিত্রের অর্থমূল্য দিতে পারবে না, সুতরাং তারা চিত্রের সমঝ্‌দারও নয়। মূল্য দিতে পারবেন রাজা মহারাজা আর বিত্তবানেরা, এবং নগদ তা দিতে পারেন বলেই এ-সমাজে অভিজাত চারুশিল্পীদের শ্রেষ্ঠ সমঝ্‌দার তাঁরাই। অভিজাতরা এইটুকু বুঝলেন না যে তাঁদের অভিজাত্যটা যোপে টি'কল না। অরসিক ও বদ্‌রসিক মহারাজার হুকুমে যখনই তাঁর কল্পনাসতী দেয়ালের গায়ে ঝ'লে পড়ল তখনই তাঁর গলাতেও ফাঁস পড়ল। চারুশিল্পীদের "চিত্রপ্রদর্শনী" বস্তুটাই বা কি? চিত্রের পসরা সাজিয়ে সঙ্গতিপন্নদের দ্বারস্থ হয়ে হাতজোড় করে পায়ের ধুলো দিতে বলা ছাড়া "চিত্রপ্রদর্শনীর" আর কি সার্থকতা আছে এ সমাজে? ওটাও কি বিত্তবান ক্রেতাদের জন্যে চিত্রপণ্যের দোকান সাজিয়ে বসা নয়?

এটুকু ব'লে নেওয়ার উদ্দেশ্য হ'ল, চারুশিল্পীদের (Fine Artist) নিরুৎসাহ করা নয়, মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করাও নয়, প্রচারশিল্পীদের (Commercial Artist) উৎসাহ দেওয়া, মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলা। লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, প্রচারশিল্পী যাঁরা তাঁদের মনের কোণে কোথায় যেন একটা আত্মগ্লানির ভাব আত্মগোপন করে থাকে। এই আত্মগ্লানি ও আত্মদীনতাবোধের (Inferiority complex) জন্যেই প্রচারশিল্পীরা বিজ্ঞাপন ও প্রচারক্রিয়াকে আজও তেমন ভাবে শিল্পকলার স্তরে তুলতে পারেননি। প্রচারশিল্পীদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তাঁদের চিত্রাবেদন সর্বজনের কাছে, সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছানো দরকার। বিজ্ঞাপন বা প্রচারের এইটাই সব চেয়ে বড় কথা। ধনী দরিদ্র মধ্যবিত্ত সকলের কাছে সমান ভাবে তাঁর আবেদন যদি পৌঁছয় তাহলেই তাঁর প্রচারের সার্থকতা। এর মধ্যে এ কথাও ভুললে চলবে না যে, তিনি তাঁদের কাছেও আবেদন করছেন যাঁরা সমাজের মধ্যে বুদ্ধিমান রুচিবান ও সুরসিক বলে সুপরিচিত। অর্থাৎ বিজ্ঞাপন ও পণ্য-প্রচার সকল শ্রেণীর সকল স্তরের লোকের জন্যে, তার মধ্যে বিত্তবান থেকে বিত্তহীন, রুচিবাগীশ থেকে স্থূলরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি সকলেই আছেন। সুতরাং প্রচারশিল্পীর দায়িত্ব অনেক এবং দেশের সাধারণ লোক সকলেই সমান রুচিবান না ব'লে "বিজ্ঞাপন" স্থূল বা চলনসই হওয়া উচিত ব'লে মহাবিজ্ঞ সবজান্তার মতন যুক্তির অবতারণা করেন, তাঁদের যুক্তিও একেবারে অর্থহীন। "প্রচার" সার্থক করে তুলতে হলে তাকে "প্রচারকলার" পর্য্যায়ে ঠেলে তুলতেই হবে, [illegible]

'বিজ্ঞাপন' ও প্রচারের এই শিল্পকলা ও সুরুচির দিক্‌টা না ভুলে গিয়ে তার রূপবৈচিত্র্য সম্বন্ধে চিন্তা করা [illegible] বিজ্ঞাপনের যে সব বিভিন্ন রকমের মাধ্যম আছে তার মধ্যে স[illegible] হল: প্রেস; পোষ্টার ও বাইরের বিজ্ঞাপন; ডাক-বি[illegible] বহিরঙ্গ-বিন্যাস; বেতার ও ফিল্ম ইত্যাদি।

মোটামুটি এই পাঁচ শ্রেণীর প্রচার-মাধ্যমের মধ্যে প্রথম "প্রেস" মাধ্যমই সর্বপ্রধান। কিন্তু আমাদের দেশের বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে এ কথা কতটা সত্য বা তর্কসাপেক্ষ। সো[illegible] এবং তাড়াতাড়ি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র মারফৎ হাজার লোকের কাছে পণ্যবারতা পৌঁছে যায় বটে, কিন্তু এদিক্‌ বেতার ও সিনেমা আজকাল প্রেসের প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী। [illegible] প্রেসের আধিপত্য লিখতে-পড়তে-জানা লোকসংখ্যা যে দেশে সে দেশে যতটা থাকার কথা, অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিতের যে-দেশে বেশী সে দেশে ততটা থাকার কথা নয়। আমাদের প্রেসের চেয়ে বেতার ও সিনেমার প্রভাব অনেক বেশী হ'তে যদি বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে এগুলি ব্যবহার করা [illegible] এছাড়া আমাদের দেশে পোষ্টার ও বাইরের বিজ্ঞাপন (Outd[illegible] Advertisement) প্রেসের চেয়ে কোন মতেই কম মূল্যবান সার্থক নয়। রেল-ষ্টেশনে, বাসে-ট্রামে, বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পণ্য ভ্যানে, প্রাচীরে, পোষ্টে সার্থক পোষ্টার-প্রচার প্রেসের চেয়ে অ[illegible] বেশী ফলপ্রদ হতে পারে। বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে। বড় শহর মহানগর বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে মফঃস্বল শহর, গ্রা[illegible] হাট-বাজার মজলিসকেন্দ্র তীর্থকেন্দ্র পর্যন্ত পোষ্টার বা প্রাচীর[illegible] যদি লটকে দেওয়া যায় তাহলে তা প্রেসের চেয়ে এ দেশের লো[illegible] কাছে যে অনেক বেশী সার্থক হয়ে উঠবে তাতে আর বিস্ময়ের আছে? বেতার ও ফিল্মের সম্ভাবনাও সেই জন্য প্রচারমাধ্যম হি[illegible] খুব বেশী। বিশেষ ধরণের প্রচার, বিশেষ শ্রেণীর ও স্তরের লো[illegible] কাছে প্রচারের জন্যে ডাক-বিজ্ঞাপনও (Direct Mail) যথেষ্ট সা[illegible] হ'তে পারে। আর দোকান বাজার ও নানা রকমের পণ্যবিপনির ব[illegible] রঙ্গবিন্যাস (Window Display) যে যথেষ্ট মূল্যবান তা তর্ক ক[illegible] বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। এর মূল্যটা যদিও আঞ্চলিক (Local [illegible] তাহলেও বিন্যাসের মানসিক প্রতিক্রিয়াটা স্থায়ীও ব্যাপক।

প্রচারের প্রত্যেকটা মাধ্যমের নানা দিক্‌ নিয়ে বিবাদ আলোচ[illegible] করার সুযোগ এখানে নেই। না থাকলেও, একটা কথা অত্যন্ত সত্যি যে প্রচারের কোন মাধ্যমই সার্থক হ'তে পারে না, যদি না প্রচা[illegible] "প্রচারকলা" হয়। একমাত্র বেতারের আবেদন শ্রবণেন্দ্রিয়ে এছাড়া আর সবগুলি মাধ্যমের প্রধান আবেদন দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর এবং মানুষের স্বাভাবিক রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবোধের উপর। প্রচারকর্তা যদি সাধারণ মানুষের রুচিবোধ নেই ব'লে মনে করেন, বা জনসাধারণকে স্থূলরুচি "জনতা" ব'লে অবজ্ঞা করেন তাহলে তাঁর প্রচার ব্যর্থ হবেই হবে। সাধারণ মানুষের সমস্ত জ্ঞান ও বোধশক্তি তথাকথিত অসাধারণদের চেয়ে অনেক বেশী সুস্থ ও স্বাভাবিক। সুন্দর জিনিষের আবেদন সর্বজনীন—এই মূল্যবান সহজ সত্য কথাটা যেন বিজ্ঞাপনদাতারা না ভুলে যান।

এখানে যে কয়েকটি নমুনা বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল সেগুলি সবই [illegible] (Lay-out) ও [illegible] এ দেশের

প্রচারশিল্পী ও পণ্যমালিকদের লক্ষ্য করা উচিত। পরিচ্ছদ-ব্যবসায়ী সিম্‌পসন কোম্পানী "প্রেস" বিজ্ঞাপনের রূপবিন্যাসের আবেদনটি অত্যন্ত সহজে সোজাসুজি রুচিবাগীশ অভিজাত মহিলামহল থেকে সাধারণ লোকের কাছে পৌঁছে যায়। ছবি, অক্ষর ও বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর এমন সহজ-সুন্দর সমাবেশ, এমন সামঞ্জস্য যদি না থাকে তাহ'লে অধিকাংশ 'প্রেস' বিজ্ঞাপনই ব্যর্থ হয়। চোখের মণিতে ধাক্কা লেগে দর্শকের চোখ অন্য দিকে যদি ঘুরে যায় তাহলে বিজ্ঞাপন যতটা 'স্পেস্' জুড়ে থাকুক না কেন তার আবেদন ব্যর্থ হতে বাধ্য। তেমনি ঠিক "হোয়াইট রক" বিজ্ঞাপনটির ড্রয়িং এবং টাইপের বিন্যাসটি লক্ষ্য করার মতন। হুইস্কির কাছে সোডার জল কিছুই নয়। কিন্তু তাহলেও চোখের মণিতে সোডার জলের যে বোতলটি ভাসছে সেটি পাশ্‌নের সুতো ধ'রে এলে "হোয়াইট রক্" ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। "হোয়াইট রক" সহজেই মনেতে খোদাই হয়ে যায় না কি? জুতোর যে শোকার্ডখানি দেখানো হয়েছে তার মধ্যে জুতোটা অনেক উঁচুতে থাকলেও কেউ বিরক্ত বা অপমানিত বোধ করবেন না, তার সঙ্গে টাইপের সেটিং ও বিন্যাস দেখে বরং জুতো-খানা মাথায় ক'রে নাচতে ইচ্ছে করবে। "লোটাস্ সু"-এর পোষ্টার-খানিও ঠিক তাই। গ্রীষ্মের পরিবেশ যদি অমন সুন্দর ভাবে ছবি-খানার মধ্যে না ফুটে উঠতো তাহ'লে গ্রীষ্মের দিনে লোটাস্ সু কেউ ব্যবহার করার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করত না। "প্রচারকলা" ও "চারুকলার" ব্যবধান যে দ্রুত ঘুচে যাচ্ছে তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

বোঝা গেলেও, আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনদাতারা, প্রচারকর্ত্তা (Publicity Officer) ও প্রচারশিল্পীরা (Commercial Artists) এই সহজ সত্য কথাটা কবে বুঝবেন? দিন দিন তাঁরা বুঝবেন অবশ্য, সেইটাই আশার কথা। তাহলেও, এমন অনেক জুতোর সমাচার, তেল সাবান প্রসাধনের সমাচার, ব্যাঙ্ক-বীমা পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির সমাচার এমন ভাবে কি আমাদের কাছে জানানো হয় না, যা দেখলে মনে হয় চুলে জট পাকিয়ে গেলেও তেল মাখবো না, অর্ধনগ্ন হয়ে থাকলেও পোষাক পরব না, দরকার নেই ব্যাঙ্কে টাকা রেখে আর জীবনটাকে অনর্থক বীমা কোম্পানীতে বন্ধক দিয়ে? এ দেশের বড় বড় জুয়েলার্স ও স্বর্ণকাররা এমন কদাকার ভাবে অলঙ্কার ক্যাটালগে ফোল্ডারে পোষ্টারে এবং প্রেস বিজ্ঞাপনে সাজিয়ে দেন যা দেখলে ভুলেও কোন দিন ভালবেসে কেউ প্রেমিকাকে একটা গলার হার উপহার দেবে না, স্ত্রীকে স্বর্ণচূড় গড়িয়ে দেবে না। মনে হবে নিরাভরণ প্রেয়সীই অনেক বেশী সুন্দরী, তার হাতে বেড়ী আর গলায় শিকল পরিয়ে দিয়ে লাভ কি? এর জন্যে মালিক বিজ্ঞাপনদাতা, তাঁর প্রচারকর্ত্তা বা প্রচারশিল্পী কেউ একা দায়ী ন'ন অবশ্য। মালিকের ইচ্ছা থাকলেও প্রচারকর্ত্তার রুচিবোধ শিল্পবোধ থাকা সত্ত্বেও প্রচারশিল্পী তাকে সার্থক ভাবে রূপায়িত করতে পারেন না। সার্থক প্রচারের জন্যে এই তিন জনেরই সহযোগিতা থাকা দরকার। প্রচারটাকে যদি চাকের বাতি না মনে ক'রে এঁরা তাকে শিল্পকলার মর্যাদা দেন, এবং সাধারণ লোক, প্রধানতঃ যাদের জন্যে সমস্ত প্রচার ও বিজ্ঞাপন, তাদের যদি এঁরা স্থূল রুচির জড়ভরত "জনতা" ব'লে অবজ্ঞা না করেন তাহলেই "বিজ্ঞাপন" প্রথম শ্রেণীর "প্রচারকলার" স্তরে উঠতে পারে। প্রচারের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হবে—সুন্দরের জয় সুনিশ্চিত, সুন্দরের আবেদন সর্বজনীন।

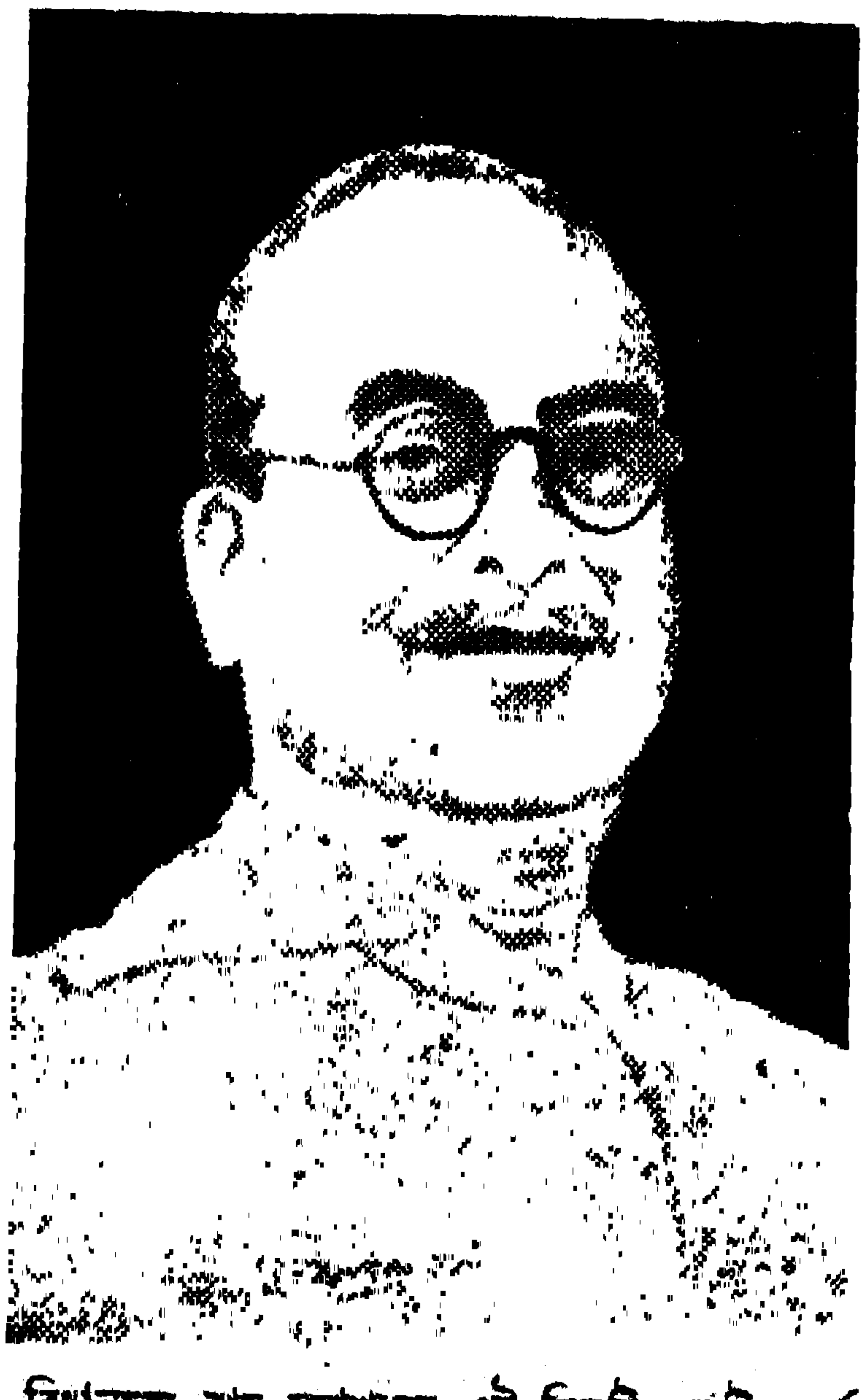

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের এই চিত্রটি একটি চতুর্দশ বৎসরের বালক কর্তৃক অঙ্কিত। শিল্পীর নাম গোপালকৃষ্ণ চৌধুরী। [illegible] কর্তৃক [illegible]।

আমার মাতা

রামপ্যারী সোহাগরাণী কাটজু

ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু

আমার মা

সকল সন্তানই আপনার মাতাকে ভালবাসে এবং সংসারে অন্য কাহাকেও তাঁহার সমতুল্য মনে করে না। কিন্তু আমার মাতা শুধু যে আমারই আদরণীয়া ছিলেন তাহা নয়; তাঁহার পরিচিত এবং আত্মীয় সকলেই মনে করিতেন যে এরূপ ভদ্র মহিলা হাজারে এক-আধটি হয়। মাতার উন্নত ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী এবং বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া আমার মনে হইত যে তাঁহার যে যুগে জন্ম হওয়া উচিত ছিল তার ৫০ বৎসর পূর্ব্বেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আরও ৫০ বৎসর পরে জন্ম হইলে তিনি আমাদের দেশের মহিলা-সমাজের বিবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া সমাজে প্রভূত যশলাভে সমর্থ হইতেন। আমার বিশ্বাস, পাঠক-পাঠিকাগণ এরূপ এক জন বিদুষী মহিলার জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। এই জন্যই আমি আমার মাতার বিষয় কিছু লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। এই প্রচেষ্টায় আমি নিজেও তৃপ্তিলাভ করিব/এই ভাবিয়া যে আমার জীবদ্দশাতেই আমার মায়ের সহিত অপর সকলের পরিচয় করাইয়াছি।

আমার মা ছিলেন তাঁর পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তাঁর পিতা পণ্ডিত নন্দলাল, কাশ্মীরী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রথমে পাঞ্জাবের হিসার জেলায় এবং পরে দীর্ঘকাল হোসিয়ারপুরে সরকারী আধিকারিক ছিলেন। মা'র জন্ম হয় হিসার জেলার সিরসা গ্রামে ১৯০৭ সালের মাঘ মাসে (জানুয়ারী ১৮৫১)। বাপ-মা তাঁর নাম রাখিয়াছিলেন রামপ্যারী। শ্বশুরালয়ে সকলে তাঁহাকে সুন্দর এবং রাখাও হইয়াছিল শুভক্ষণেই। তিনি ভগবান প্রিয় ছিলেন ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কারণ, বিবাহে বৎসর পরে তিনি আপনার সোহাগের প্রতীক—শাঁখা ও সিন লইয়াই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।

নন্দলাল নিজের কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। রামপ্যারীর মাতা এবং পিতামহী উভয়েই বর্ত্তমান ছিলেন, সু তাঁহার আদরের অভাব ছিল না। কিন্তু সেকালের চাল-চলন ভিন্ন ধরণের। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার কোনই চর্চা না। মা বলিতেন যে তাঁহার পিতামহীর বদ্ধমূল ধারণা ছিল কলি অধিবাসীদের মুখ হয় ঘোড়ার মত। বাষ্পীয় শকট তখন সবে চলিতেছে, কিন্তু তাঁহার পিতামহী জীবনে কখনও রেল গা চড়েন নাই এবং বাষ্পের সাহায্যে গাড়ী চলার সম্ভাব্যতা অ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। বাড়ীর মহিলাদের অবস্থা এমনিধারা। কিন্তু আমার মাতামহের বিদ্যানুরাগ ছিল অসাধা স্বীয় পত্নীর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি আপনার কন্যাকে নিজেই লেখা শিখাইয়াছিলেন। ভগবানের অনুগ্রহে আমার মাতার স্মৃতি ছিল প্রখর। তিনি পিতার নিকট হিন্দী ও ফারসী ভাষা শি করিয়াছিলেন। সংস্কৃত, গণিত এবং ভূগোলও তিনি যথেষ্ট অধ করিয়াছিলেন—জ্যোতির্বিদ্যাতেও তাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছিল বিশ জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁহার এতই ব্যুৎপত্তি ছিল যে প্রধান প্র জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার আলাপ-আলোচনা চলি

দীবান হাফিজ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহার বিচারশক্তি ছিল উচ্চ স্তরের। যাহা একবার পড়িতেন বা শুনিতেন তাহা চিরকাল তাঁহার মনে থাকিত। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল বলিলেই চলে।

১২৭৫ সালে নয় বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় আমার পিতৃদেব পণ্ডিত ত্রিভুবননাথ কাটজুর সহিত। আমাদের আদি নিবাস (মালবা প্রান্তের) জাবরা গ্রামে। সহর হইতে দূরবর্ত্তী এক প্রান্তে এই গ্রাম অবস্থিত। ইহাতে ১২৭৫ সালে কোন রেলপথ ছিল না। এই ক্ষুদ্র পল্লীতে প্রাচীন আবহাওয়া ও রীতি-নীতির আবেষ্টনীর মধ্যে মাতা ৫০ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত বন্দিনী ছিলেন। তাঁহার খুব অল্প বয়সেই বিবাহ হয় এবং কিয়ৎকাল পরেই সংসারের সমস্ত ভারই তাঁহার উপর পড়ে। তাঁহার দেবর এবং ভাশুরগণের সকলেরই পৃথক্ পৃথক্ সংসার ছিল। গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম—রান্নাবান্না, ছেলে মানুষ করা, জামা-কাপড় সেলাই করা, ইত্যাদি—সব কাজই তিনি নিজেই করিতেন। অধিকন্তু তাঁহার লেখাপড়ায় বিশেষ অনুরাগ ছিল, নিজেও পড়িতেন, অন্যকেও পড়াইতেন। দ্বিপ্রহরে (বেলা ১টা কি ২টায়) যখন সাংসারিক কাজকর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতেন তখন পাড়ার মেয়েরা তাঁহার কাছে আসিত এবং বাড়ীতে একটি ছোটখাট পাঠশালা বসিয়া যাইত সেই মেয়েদের—তাতে শিক্ষকতা করিতেন মা নিজেই।

কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মধ্যে শ্বশুর-ভাশুরের সম্মুখে ঘোমটা দেওয়ার রীতি নাই। তাঁহাদের পর্দ্দার ব্যবস্থা কেবল মাত্র অপর লোকের জন্য। আমাদের আত্মীয়-স্বজন সংখ্যায় কম ছিলেন না। তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই আমার মাতাকে ঘিরিয়া থাকিতেন। পুরুষ ও বালকগণ তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিত। কখনও সংবাদপত্র পাঠ, কখনও পৃথিবীর নানা স্থানের ঘটনাবলীর আলোচনা, কখনও রাজনৈতিক চর্চ্চা, আবার কখনও বা মামলা-মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত আলাপ হইত। এই সমস্ত বিষয়ই তিনি শুনিতেন ও বুঝিতে পারিতেন। তিনি একবার আমার নিকট একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার বিবাহের কয়েক বৎসর পরে একবার তোমার জেঠামশাই সন্ধ্যাবেলা আসিয়া বলিলেন, 'সোহাগরাণি! আজ নবাব সাহেবের বাড়ীতে কোন ভদ্রলোক একটি প্রশ্নের উল্লেখ করেন। প্রশ্নটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহই তাহার সমাধান করিতে পারে নাই'। প্রশ্নটি কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, কোন ব্যক্তির নয়টি পুত্র ছিল। তাঁহার নিকট ৮১টি মুক্তা ছিল। ঐ মুক্তাগুলির ১মটি হইতে আরম্ভ করিয়া ৮১তমটির মূল্য যথাক্রমে ১৲ হইতে ৮১৲ টাকা। প্রত্যেক পুত্রকে ৯টি করিয়া মুক্তা কি ভাবে ভাগ করিয়া দিলে তাহারা সমপরিমাণ মূল্যের মুক্তা পাইবে? প্রশ্নটি শুনিয়া জটিল বলিয়া বোধ হইল, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সকলে নিদ্রিত হইলে আমি কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে প্রশ্নটির সমাধান করিলাম। পরের দিন তোমার জেঠামশাইকে উত্তরটি দিতেই তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহা নিয়া নবাব সাহেবের দরবারে গেলেন। তথায় তিনি গর্ব্বভরে [illegible] ভাদ্রবধূ প্রশ্নটির সমাধান করিয়াছেন বলাতে সকলেই বিস্ময়ে [illegible]"। [illegible]

বলিয়াছিলেন, আজও আমার মনে আছে। পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবারণের জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১০
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	১৯	২০
৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	২৮	২৯	৩০
৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৩৭	৩৮	৩৯	৪০
৫১	৫২	৫৩	৫৪	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
৬১	৬২	৬৩	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০
৭১	৭২	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০
৮১	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০
৩৬৯	৩৬৯	৩৬৯	৩৬৯	৩৬৯	৩৬৯	৩৬৯	৩৬৯	৩৬৯

স্বগৃহে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া ও অঙ্ক শিখিয়া ২০-২২ বৎসর বয়স্কা কোন মহিলার পক্ষে এরূপ জটিল প্রশ্নের সমাধান করা অতীব বিস্ময়কর সন্দেহ নাই।

আমার মা সাধারণ মেয়েদের মতই গৃহকর্ম্ম করিতেন, কিন্তু তদানীন্তন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবহাওয়ার পক্ষে তাঁহার ভাবধারা ও জীবনাদর্শ ছিল অনেক উচ্চ স্তরের। তাঁহার এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে পুরুষগণ স্ত্রীলোকদিগকে দাবাইয়া রাখিয়াছে। তিনি বলিতেন, পুরুষেরা মেয়েদের গৃহপালিত পশুর মত নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া মনে করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি যদি ৫০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিতেন তবে আধুনিক মেয়েদের আন্দোলনে (ফেমিনিষ্ট মুভমেণ্টে) তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি বলিতেন, মেয়েদের ক্রিয়াকলাপ কেবলমাত্র উনানের পাশেই সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে। খাওয়া-পরা দিয়া পুরুষেরা তাহাদিগকে বাড়ীর দাসী বলিয়া মনে করে। আমি বড় হইয়া এই সব কথা যখন বুঝিতে পারিতাম তখন হাসিয়া মা'কে বলিতাম, "মা, রান্নাঘরে উনানের পাশে তোমাকে যেন ঠিক অন্নপূর্ণা দেবীর মতই দেখায়।" তিনি খুবই রাগান্বিত হইয়া বলিতেন, "তোমরাই ত' এই সব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আমাদের অকেজো করেছ।" তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ছিল যে প্রত্যেক মেয়েমানুষ এমন লেখাপড়া ও হাতের কাজ শিখুক যাহাতে অন্নের জন্য তাদের পুরুষের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেরাই তার সংস্থান করিতে সমর্থ হয়। তিনি বলিতেন, "বিবাহের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই, কেন না ঘর-সংসার করাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। কিন্তু আমি চাই না যে মেয়েরা ভীরু হয়ে থাকে।" তিনি স্ত্রীপুরুষের সমানাধিকারের সমর্থক ছিলেন এবং চাইতেন যে পতি-পত্নী সমানাধিকারের ভিত্তিতেই ঘর-সংসার করুক। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। যখনই শুনিতেন কিংবা সংবাদপত্রে পড়িতেন যে আমাদের দেশে কোন মেয়ে বি, এ, এম, এ পাশ করিয়াছে অথবা অন্য কোন সম্মান লাভ করিয়াছে তখনই তিনি আনন্দে আত্মহারা হইতেন। ইহা আজ প্রায় ৬০-৬৫ বৎসরের কথা; তখন গ্রামাঞ্চল ত' দূরের কথা বড় বড় সহরেও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয় নাই।

সন্তানোৎপাদন বিষয়ে তাঁহার মতামত আধুনিক মতবাদেরই অনুরূপ ছিল। ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং সেই উপায়ে [illegible] তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন, এক একটি সন্তানের [illegible]

জন্ম অন্ততঃ চার বৎসর অন্তর হওয়া উচিত। একটি সন্তান মাতৃস্তন্য দ্বারা বিশেষ বর্দ্ধিত হইলেই পরবর্ত্তী সন্তান উৎপন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন স্ত্রীলোকের প্রতি বৎসর সন্তান হইতে শুনিলে তিনি ঘৃণা বোধ করিতেন এবং তিনি আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীর নিকট ইহার সমালোচনা করিতেন।

বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত ছিল স্বতন্ত্র। বাল্যবিবাহ তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। বিবাহকে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করিতেন না। সমস্ত ব্রাহ্মণকেই তিনি এক মনে করিতেন। প্রত্যেক বর্ণ, শ্রেণী, বর্গ এবং পর্য্যায়ে অসংখ্য বৈষম্য হেতু যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না।

তাঁহার জীবন যথার্থই পুণ্যময় ছিল। তিনি একান্ত শিবভক্ত ছিলেন এবং প্রত্যহ যথারীতি উপাসনা করিতেন। এই কারণেই তিনি যথাক্রমে আমার ও আমার ভাইয়ের নাম রাখিয়াছিলেন কৈলাসনাথ ও অমরনাথ। তিনি অনেক ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। আহারাদিতে বিধি-নিষেধ তাঁহাকে মানিতে হইত, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ গোঁড়ামী ছিল না। তিনি বলিতেন, "শাস্ত্রে যে সমস্ত আহার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তাহার সহিত ধর্ম্ম অথবা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির কোন সম্পর্ক নাই। ইহা করিয়াছিলেন আমাদের ঋষিগণ শরীরকে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে, যেহেতু আহারের দোষে নানাপ্রকার রোগের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে। এই সকল ব্যবস্থাকে ধর্ম্মের রূপ দান করা হইয়াছে শুধু জনসাধারণের প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে, অন্যথায় এসব ডাক্তারী শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

১৩১৫ সালে আমি কাণপুরে ওকালতি করিতে যাই। তথায় ৬ বৎসর অতিবাহিত করিয়া ১৩২১ সালে আমি প্রয়াগ হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করি। ইতিপূর্ব্বে সংযুক্ত প্রদেশের সহিত আমাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। বর্ত্তমানে আমরা প্রয়াগেই বাড়ীঘর করিয়াছি। আমার ওকালতির প্রারম্ভেই মা তাঁহার বন্দিদশা হইতে মুক্তিলাভ করেন। তিনি ১৩১৬ সাল হইতে আমার নিকট কাণপুরে ও প্রয়াগে যাতায়াত করিতে থাকেন। ছিলেন তিনি মুসলমানী এষ্টেট জাবরায়, যেখানে পর্দ্দা ছাড়া এক পা-ও চলিবার উপায় ছিল না; এমন কি মন্দিরে যাওয়া-আসারও চলন ছিল না; আর আসিলেন কাণপুর এবং প্রয়াগের জাহ্নবীতটে—তাঁর গতি সেখানে হইল অবাধ। সাংসারিক কাজকর্ম্ম তাঁর জাবরাতে যেমন ছিল কাণপুরেও ঠিক তেমনই। আমার নতুন ওকালতি আর নতুন জায়গার ঝঞ্ঝাট—তিনি তাহাতেই মগ্ন থাকিতেন। ছেলের ঘর-সংসার সাজানই কি তাঁর কম আনন্দের বিষয় ছিল! অধিকন্তু পর্দ্দার কড়াকড়ি এখানে বিশেষ না থাকায় প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন এবং কৈলাস-মন্দির দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিতেন। এখানেও আমাদের স্বজাতি এবং অন্যান্য অনেক পরিবারের সহিত আমাদের আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। মা তাঁহাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে ভালবাসিতেন। এসব স্থানেও নানা প্রকার আলাপ-আলোচনা হইত এবং তাহা হইতে তিনি নিজের জ্ঞানবৃদ্ধি করিতেন।

আমি প্রয়াগে ৭-৮ বৎসর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিলাম এবং পরে ১৩২৬ সালে নিজস্ব বাংলা ক্রয় করি। এত কালের পর মা তাঁহার নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করিবার পূর্ণ সুযোগলাভ করিলেন। প্রয়াগে আসিয়া তিনি প্রায়ই দুই এক বৎসর করিয়া থাকিতেন। প্রত্যহ ত্রিবেণী, গঙ্গা ও যমুনায় স্নান এবং শিব-কুটী ও পঞ্চমুখী মহাদেবের মন্দিরে গিয়া বিগ্রহ দর্শন করিতেন। ঝুঁসী ও দারাগঞ্জের সাধু মহাপুরুষদিগের সেবা করা তাঁর একটি বিশেষ কাজের মধ্যে গণ্য ছিল। বাড়ীতেও সর্ব্বদা পূজা, পাঠ, কথা, হোম ইত্যাদি চলিত এবং এই সূত্রে পণ্ডিত পূজারীদের সঙ্গে তাঁহার কথাবার্ত্তা হইত। পূজার কোন অঙ্গহানি করা বা কোন মন্ত্রের অশুদ্ধ উচ্চারণ করার উপায় কোন পণ্ডিত মহাশয়েরই ছিল না। তাঁর সকল মন্ত্রই জানা ছিল এবং মন্ত্রসমূহের অর্থবোধ থাকায় সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন হইতেছে কি না তাহা লক্ষ্য করিতেন। তিনি দানশীলা ছিলেন এবং গুপ্তভাবে দান করিতে ভালবাসিতেন। তিনি কাহাকে কখন কি ভাবে সাহায্য করিতেন কেহই জানিত না। ভ্রমণ ও বায়ু সেবন করিতে তিনি সতত উৎসুক ছিলেন। সহরের বাহিরে গিয়া বাস করিবার আগ্রহ তাঁর ছিল, তাই গঙ্গার ধারে আমি একখানি বাগান কিনিলাম। বাগান করিবার বিদ্যা তাঁহার কতদূর ছিল আমি তাহা উপলব্ধি করি তাঁহার প্রয়াগে আসার পরেই। মালীদিগকে ডাকিয়া তিনি নিজে উপদেশ দিতেন। অনেক ফুল ও ফলের গাছ নিজ হাতে রোপণ করিয়াছিলাম—আম, পেয়ারা, চামেলী ও গোলাপের বহু গাছ আজও আমার বাংলাতে এবং বাগানে তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

মা সর্ব্বদাই সাধ্যমত গো-সেবা করিতেন। প্রসবকালে তিনি গরুকে বাড়ীর বৌ-ঝির মতনই সেবা করিতেন। প্রসবের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেই তিনি গরুকে ঘরে আনাইয়া নিজেই তার পরিচর্য্যা করিতেন। প্রসবান্তে গরুকে মাসের পর মাস খুব যত্নের সহিত খাওয়ান হইত। বকনা বাছুর হইলে মার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। ঐ বাছুরকে বাড়ীতেই পালন করা হইত। আমার মায়ের আমলের কয়েকটি গরু এবং ইহাদের বকনা বাছুর আমাদের বাড়ীতে আজও বর্ত্তমান আছে। তাঁহার আদেশ ছিল বাছুর বড় না হওয়া পর্য্যন্ত গরুর একটি বাঁট যেন দোহন করা না হয়। পশু চিকিৎসাতেও তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা লক্ষিত হইত। তিনি কুকুর বিড়াল দু'চক্ষে দেখিতে পারিতেন না; বলিতেন, কুকুর নোংরা আর বিড়াল বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু রঙ-বেরঙের টিয়া, ময়না প্রভৃতি পাখী তিনি খুব পছন্দ করিতেন ও পুষিতেন।

ডাক্তারী বিদ্যার প্রতি মা'র বিশেষ অনুরাগ ছিল। বর্ত্তমান কালে জন্ম হইলে তিনি অবশ্যই লেডী ডাক্তার হইতেন। কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়াও তিনি চিকিৎসায় সবিশেষ অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ ছিলেন। মানব-দেহের গঠন (এনাটমী), হৃদয়, মস্তিষ্ক, কাণ ও চোখের ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। আমাদের আত্মীয়-স্বজনবর্গের অনেকেই ডাক্তার। জাবরা ও ইন্দোরনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হরিরাম পণ্ডিত আমার সহোদরোপম বন্ধু। ইঁহার সহিত মা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবার্ত্তা কহিতেন। তিনিও আমার মা'কে সুযোগ্য পাত্রী বিবেচনা করিয়া সম্মানে এবং সাদরে তাঁহার সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতেন ও অতি নিগূঢ় তথ্যও তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেন। ...

বিভায় তিনি এক জন ভাল লেডী ডাক্তারেরই সমকক্ষ ছিলেন'। বাড়ীর বৌ-ঝি ছাড়া পাড়া-প্রতিবেশী ও চাকর-বাকরদেরও চিকিৎসা তিনি করিতেন। টোটকা এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধপত্রও তাঁহার জানা ছিল। তিনি অশেষ যত্ন ও আন্তরিকতার সহিত রোগীর পরিচর্য্যা করিতেন।

এ সকল গুণ ভিন্ন অন্য যে কারণে সকলে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত তাহা ছিল তাঁর স্বভাবের মাধুর্য্য। আবালবৃদ্ধযুবা সকলেই তাঁহার সান্নিধ্যে পাইত আনন্দ। সেকালের প্রাচীনাদের মধ্যেও তাঁর প্রতিপত্তি কম ছিল না। সামাজিক রীতি-নীতি, বিবাহের দেনা-পাওনা, শাস্ত্রবিধিমতে পূজাপার্ব্বণ ইত্যাদি সকল বিষয়েই তাঁর মতামত অগ্রগণ্য ছিল। বাড়ীর স্কুল-কলেজগামী ছেলেমেয়েগণ মা'র কাছে থাকিতে পছন্দ করিত। ভারতবর্ষের ইতিহাস তাঁহার চিরকাল মনে ছিল। আজকাল গান-বাজনার চর্চ্চা হয়। কিন্তু তিনি গান শিখেন নাই, গাহিতেও জানিতেন না; তবে গান শুনিতে খুব ভালবাসিতেন। আমার মেয়ে লীলার গলা ভাল ছিল। সে যখন ভক্তিভরে মীরার ভজন গাহিত মা তাহা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় হইয়া শুনিতেন। আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পুরুষেরাই মা'কে শ্রদ্ধা করিত বেশী। ভগবানের অনুগ্রহে আমাদের পরিবারে কেহ জজ, কেহ উকিল, কেহ ডাক্তার, কেহ ইঞ্জিনিয়র, ব্যবসায়ী আবার কেহ বা সরকারী আধিকারিক। সকলেরই সর্ব্বদা আসা-যাওয়া ছিল। চাকরকে যখনই জিজ্ঞাসা করিতাম, "অমুক বাবু কোথায়?" উত্তরে শুনিতাম তিনি মা'র কাছে। যেই আসিত সেই তাঁরই কাছে গিয়া নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলিত। তিনি সহানুভূতির সঙ্গেই সকলের কথা শুনিতেন এবং সকলকে সদুপদেশ দিতেন। ভিন্ন ভিন্ন লোকের সহিত তাঁহার কাজের আলাপ করিবার বিষয়-বস্তুও ছিল বিভিন্ন রকমের। ইঞ্জিনিয়রের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে এবং ডাক্তারের সঙ্গে ডাক্তারী বিষয়েই আলোচনা হইত। এদিকে আমি প্রায় প্রত্যহ রাত্রিবেলায় আহারের পর তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইতাম আর আমার মামলা-মোকদ্দমার কথা বলিতাম। তিনি এ সমস্ত বিষয় বেশ ভাল বুঝিতেন এবং স্বীয় অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার বলে এমন সব যুক্তির অবতারণা করিতেন যাহাতে আমার কাজের অনেক সুবিধা হইত।

দুঃখের সময়, আমার মায়ের মত সান্ত্বনা দিতে বোধ হয় কম লোকই পারে। শোকে মুহ্যমান ব্যক্তিও তাঁহাকে দেখিলে এবং তাঁহার শান্তিপূর্ণ উপদেশবাণী শুনিলে সান্ত্বনা লাভ করিত। মনে পড়ে, আমার ভাগিনেয় পিতামাতার বিনা অনুমতিতেই জাহাজে চড়িয়া আফ্রিকা ভ্রমণে বাহির হইলে আমার ভগিনী অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবেই বার বার মায়ের কাছে আসিতেন। তিনি আমায় একদিন বলিলেন যে 'সোহাগরাণী চাচী"র কাছে আসিলে মনে যে অপূর্ব্ব শান্তিলাভ হয় তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। স্বর্গীয়া স্বরূপরাণী নেহেরুর সঙ্গে মা'র ঘনিষ্ঠতা ছিল খুব বেশী। মা'কে তিনি নিজের বড় বোনের মতন মনে করিতেন এবং সেই সূত্রে আমাকেও ছেলে বলিয়া ডাকিতেন। তিনি বলিতেন, "সোহাগরাণীর কথাবার্ত্তা, বিচার-বিবেচনা এবং উপদেশ আমার বড়ই ভাল লাগে। ওঁর সঙ্গে কথা কহিলে আমার সকল কষ্টের লাঘব হয়।" "এরূপ আরও যে কত কথা মনে আসে কি বলিব।

যদিও আমার মা'র কোন জনসভায় যোগদানের অথবা কোন প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করার সুযোগ হয় নাই, তথাপি প্রয়াগের বিস্তীর্ণ সুসজ্জন সমাজে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহার খুবই উৎসাহ ছিল এবং সর্ব্বদাই সে বিষয়ে তিনি ওয়াকিফহাল থাকিতেন। হিন্দু মুসলমান সম্পর্কিত প্রশ্নে তিনি খুব দৃঢ় মতই পোষণ করিতেন। তিনি বলিতেন যে হিন্দুদের উপর অবিচার হইতেছে; যেহেতু এই দেশ হিন্দুদের, ইহার বৃহত্তর অংশের ন্যায্য অধিকারী তাহারাই। তিনি আমার পিতৃদেবের সঙ্গে সারা ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। মুসলমানী আমলে ভারতবর্ষের মন্দির ও শিবালয়গুলির ধ্বংসলীলা তাঁহার হৃদয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল। কখনও সেই প্রসঙ্গের অবতারণা হইলে অন্তরে নিদারুণ ব্যথা অনুভব করিতেন।

ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণের মঙ্গল চিন্তা প্রতিনিয়তই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। এই সম্পর্কে তিনি সর্ব্বদাই গান্ধীজীর মহতী প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তিনি কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর মদ্যপান নিবারণ নীতির সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেন। চা-পানেরও তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। প্রয়াগে মাঘ মেলা উপলক্ষে একবার তিনি ত্রিবেণী স্নান করিতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমরা কোনই বন্দোবস্ত করিতেছ না—গরীবদের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হ'ল মা?" উত্তরে জানিলাম চা-পান প্রসারের জন্য চা-বাগানের মালিকগণ গঙ্গার তীরে তাঁবু ফেলিয়া বিনামূল্যে চা বিতরণ করিতেছে। এরূপ বিতরণের উদ্দেশ্য লোককে চা-পানে অভ্যস্ত করা। আমার চা-পান মা পছন্দ করিতেন না। তাঁহার মতে ভারতীয়দের খাদ্য দুধ এবং দই; তাহা না খাইয়া চা-পান করিলে ইহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও ক্ষুধালোপ অবশ্যম্ভাবী। আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, তোমরা গভর্ণমেণ্টের লোকেরাই সামান্য আয়ের লোভে দেশের সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছ।

মা'র কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ও গম্ভীর ছিল। তিনি বাজে কথা বলিতে ঘৃণা বোধ করিতেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও তিনি নতুন কিছু শিখিয়া জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে সমুৎসুক ছিলেন। তিনি শান্তির প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। আমি কখনও তাঁহাকে ক্রুদ্ধ হইতে অথবা আনন্দে অধীর হইতে দেখি নাই। মনে তাঁর বিদ্বেষ ভাবের লেশমাত্র ছিল না। সুখ ও দুঃখকে তিনি তুল্য জ্ঞান করিতেন। মূর্খ স্ত্রীলোকের মত কান্নাকাটির অভ্যাস তাঁর ছিল না। আমাদের পরিবারে অনেক মেয়েরই বিবাহ হইয়াছে। বিবাহান্তে বিদায়কালে বাড়ীর প্রায় সকলেই অশ্রুমোচন করে, কিন্তু মা'র ছিল সদাই প্রশান্ত মূর্ত্তি—কখনও এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিতে তাঁহাকে দেখি নাই। যদি কখনও তাঁর কোন মেয়ে অথবা নাতনী আসন্ন বিচ্ছেদবেদনায় কাতর হইত, তিনি বলিতেন, "ছিঃ, কাঁদতে নেই। তুই নিজের বাড়ী যাচ্ছিস্—আজ কত আনন্দের দিন!" মা আমার দুঃখও পেয়েছেন অনেক। তাঁর বড় আদরের নিজহাতে মানুষ করা বিবাহিতা মেয়ে ও নাতনী চোখের সামনে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তথাপি এই সুকঠিন অগ্নিপরীক্ষাতেও তিনি অসীম ধৈর্য্য সহকারে শান্ত ভাবেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কখনও মানসিক বল হারান নাই।

তিনি প্রত্যেকের সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ এবং যথাযোগ্য ব্যবহার করিতেন। পিত্রালয়ে তাঁহার এক ভাই ছিল—পোষ্যপুত্র। ভ্রাতৃবধূর সহিত তাঁর ভাব ছিল ঠিক আপন বোনেরই মত। আমার মামীমাও আমাকে নিজের ছেলের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং আমিও তাঁহাকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করিতাম। লাহোরে পাঁচ বৎসর তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়াই আমি বি, এ পাশ করি। আমার মামা বাবুর মেয়ে ও জামাই দেওয়ান বাহাদুর ব্রজমোহন নাথ জুৎশী আমার মা'কে এত ভক্তি করিতেন যে তাহা বর্ণনাতীত। বাড়ীতে মা তাঁর মেয়েদের চেয়ে বৌদের আদর করিতেন বেশী। তিনি বলিতেন, মেয়েরা পরের বাড়ী গিয়াছে—বৌয়েরাই এখন ঘর আলো করিয়া রহিয়াছে। ফলে বাড়ীতে কোন কলহ বিবাদ ছিল না, প্রত্যেকেই আনন্দে ভরপুর থাকিত। বৌয়েরাও তাদের শাশুড়ীকে আপন মায়েরই মতন দেখিত। ভগবানের কৃপায় আমাদের পরিবারে বৌ-ঝিয়ের সংখ্যা বড় কম নয়। মা'কে তারা সকলেই যে ভাবে সম্মান করিত এবং ভালবাসিত তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। প্রত্যেকেই তাঁহার কাছে কিছু না কিছু সুশিক্ষা লাভ করিয়াছে। আধুনিক বি, এ, এম্, এ পাশ করা মেয়েরা এবং প্রাচীনাগণ সকলেই মাকে বুদ্ধিমতী ও অভিজ্ঞা মনে করিতেন এবং তাঁহার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়েরা তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। তাঁহারা অবাক হইয়া ভাবিতেন যে ইংরাজি না জানিয়া এই প্রাচীনার পক্ষে এত ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান ও ডাক্তারী শিক্ষা কি করিয়া সম্ভব হইল? সর্ব্বোপরি তাঁর নানা বিষয়ে নিজস্ব একটা মতামত ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রয়াগে জনৈক পারসী লেডী ডাক্তার ছিলেন—নাম মিস্ কামশরিয়েট। তিনি বিলাত ও আমেরিকা হইতে উচ্চশিক্ষা পাইয়াছিলেন, গুণও ছিল তাঁর যথেষ্ট। মহিলাটি মা'কে এত ভক্তি করিতেন যে, তাঁকে মা বলিয়া ডাকিতেন এবং নিজেকে তাঁর মেয়েরই মতন মনে করিতেন। এরূপ আরও অনেক কথা মনে হয় যাহা বিবৃত করিলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া উঠিবে।

অভ্যাসের ফলে মা'র জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বেশ দখল ছিল। প্রয়াগে থাকা কালে তিনি বাড়ীর চাকর-বাকরদের সন্তানাদি ভূমিষ্ঠ হইলেই তাদের কোষ্ঠী তৈয়ার করিতেন। বস্তুতঃ এই শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। আমার নিকট যখনই কোন জ্যোতিষী আসিতেন আমি তাঁকে সোজা মা'র কাছে পাঠাইতাম ও বলিয়া দিতাম, "মশাই, আমি ত' ও সবের কিছুই জানি না, আপনি মা'র সঙ্গে আলাপ করুন"। ফলে আমিও তাঁদের হাত হইতে রক্ষা পাইতাম এবং তাঁদেরও মুখোস খুলিয়া যাইত। আমি যতদূর জানি মা'র অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক ঠিক মিলিয়াছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন কলেজে পড়ি তখন তিনি আমার কোষ্ঠী করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ৪০ বৎসরের ঘটনাবলী হুবহু মিলিয়াছে। ভবিষ্যৎ জীবনে কি ঘটিবে অন্তর্য্যামীই জানেন, তবে আমার আয়ু কবে ফুরাইবে মা আমাকে তাহাও বলিয়াছেন।

আহারাদির বিষয়ে মা'র খুব গোঁড়ামী ছিল। আমার ছোঁয়া পাক করা কোন খাদ্য তিনি খাইতেন না কিন্তু তিনি অস্পৃশ্যতা মানিতেন না। আমি তাঁহাকে চামার ও মেথরের ছেলেমেয়ে-দিগকেও নিজের কাছে আদর করিয়া বসাইতে এবং তাহাদের শিশু সন্তান কোলে করিতে দেখিয়াছি।

সাদাসিদে ভাবে থাকাই ছিল তাঁর অভ্যাস। তিনি সংযমী ছিলেন। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মধ্যে মাছ-মাংস খাওয়া প্রচলিত আছে, তাঁহাদের ইষ্টদেবতাও শারদা ভগবতী। তথাপি মা বহুকাল মাছ-মাংস খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি এক বেলা আহার করিতেন নিজের হাতে রান্না করিয়া অথবা "কুকারে" সিদ্ধ করিয়া। রাত্রিবেলা এক পেয়ালা দুধ মাত্র খাইতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট ছিল, তবে চক্ষুতারকার দোষে মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে দৃষ্টিশক্তিহীন হন। তথাপি তাঁহার স্বভাব মধুর এবং জ্ঞানপিপাসা অদম্য ছিল।

আমরা পাঁচ ভাই-বোন। সকলকেই তিনি ভালবাসিতেন সমান ভাবে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেই নিজের প্রতি তাঁর স্নেহাধিক্যের গর্ব্ব অনুভব করিতাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমার ২৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তান হয়নি। কিন্তু সেজন্য আমার বিশেষ দুঃখ ছিল না, কারণ সন্তানের অভিলাষ আমার ছিল না ও ইহাকে আমি ঝঞ্ঝাট মনে করিতাম। যখন আমার প্রথম সন্তান কন্যা হইল, তখন স্বভাবতঃই পুত্র-সন্তানের কামনা মনে জাগিল এবং শিব ঠাকুরের কাছে অনুরূপ প্রার্থনাও জানাই। চার বছর পরে যখন তোমার জন্ম হইল তখন আমার শাশুড়ী বলিলেন যে কাটজু বংশে দুই পুরুষ যাবৎ পুত্র-সন্তান জন্মে নাই, পোষ্যপুত্র নিয়েই বংশরক্ষা হইয়াছে। আমার ভাগ্যে কি আর এই ছেলের সুখভোগ করা ঘটিবে? তাঁর কথা ঠিকই হইল আট মাস পরেই তিনি গেলেন পরলোকে। আমিও অসুখে পড়ি। আতুড় থেকে উঠিবার পর থেকে প্রায় দু' বছর চল্‌লো জ্বর—ভাবিতাম যক্ষ্মা হইয়াছে। কিন্তু মরতে মরতে শেষে বাঁচিয়া গেলাম। রাত্রিবেলা মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত, চোখ দিয়া জল ঝরিত। ভাবিতাম এত কামনার ছেলে না জানি কার হাতে পড়িবে, কোন্ মেয়ে এর বিমাতা হইবে, কেই বা একে পালন করিবে। শিব ঠাকুরের কাছে বার বার প্রার্থনা জানাইয়াছি যে ঠাকুর! তুমিই আমায় এই সন্তান দিয়াছ এখন তুমিই দাও আমাকে আয়ু যেন ইহাকে আমি পালন করিতে পারি! ভগবান আমার প্রার্থনা অবশ্যই শুনিয়াছিলেন, তাই দেখ না শুধু তুমি কেন, তোমার ছেলেপুলে এবং তাদেরও ছেলেপুলে মানুষ করিয়া আজ আমি কত সুখ লাভ করিতেছি। তুমিও কিন্তু সদাই আমায় জড়িয়ে থেকে চার বছর বয়স অবধি আমার দুধ খেয়েছ"। এমন মায়ের ঋণ কেহ কি কখনও পরিশোধ করিয়াছে, না করিতে পারে?

জীবনের শেষভাগে চক্ষু নষ্ট হওয়াতে মা'র চলাফেরার অন্তরায় ঘটে। তথাপি তিনি চাকরের হাত ধরিয়া সকালবেলা বাগানে বেড়াইতেন স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে। তাঁর বয়স যখন ৮০ বৎসর তখন গৌতম বুদ্ধের ন্যায় বলিতে আরম্ভ করিলেন যে এ শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই ইহাকে এখন পরিত্যাগ করাই উচিত। অবশ্য স্বাস্থ্যও তাঁর খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল এবং তিনি অন্তিম-কালের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। গহনাপত্র সব মেয়ে, বৌ এবং তাহাদের সন্ততিগণের মধ্যে নিজ হাতে বণ্টন করিলেন। অপর যাহা কিছু তাঁর দান করিবার ইচ্ছা ছিল সবই দিলেন। রাত্রে

একটা বাক্সে মরিবার পর তাঁহাকে পরাইবার জন্ত এক জোড়া শাড়ী অবশিষ্ট রাখিয়া অন্তিম যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। মা চিরকাল নিজেই গীতা পাঠ করিতেন ও শুনিতেন। গীতার অষ্টম অধ্যায় তাঁর খুব ভাল লাগিত। ১৩৪৯ সালের শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে প্রদোষের দিন বেলা দেড় ঘটিকায় জাজ্বল্যমান দিবালোকে মহাত্যাগ-ভূমি প্রয়াগরাজ্যে আমার পরমারাধ্যা মাতা তদীয়া কামনানুরূপ ভাবেই দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার কোন প্রকার কষ্ট হয় নাই—কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে পাশ পরিবর্ত্তন করিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুশয্যাপাশে আমরা সকলেই উপস্থিত ছিলাম। কেবলমাত্র আমার স্ত্রী অসুস্থতা নিবন্ধন নৈনীতালে ছিলেন বলিয়া তাঁর আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল। মুমূর্ষু অবস্থায় মা বার বার তাঁহার কথা বলিয়াছিলেন এবং কয়েক বার জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন, "কই, লক্ষ্মীরাণী এল না? কখন আসবে?" অবশেষে স্থিরচিত্তে ভগবান যেমন বলিয়াছেন—

> বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
> নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
> ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। ২।২২

অর্থাৎ মানুষ যে প্রকার পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, মাতৃঠিক তেমনি ভাবেই তাঁর জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

লক্ষ্মীরাণী কয়েক ঘণ্টা পরেই আসিয়া পৌঁছিলেন এবং মাতৃদেবীর অন্তিম দর্শনলাভ করিলেন। সেই দিনই আমি বুঝিয়াছি কেন হিন্দু রমণীগণ শাঁখা-সিন্দুর লইয়া পরলোকগমনের আকাঙ্ক্ষা করে। ... আমার বহুদিন ধরিয়াই রঙ্গীন পাড়ওয়ালা সাদা শাড়ী পরিতেন। কেহ ... রেশমের শাড়ী পরিতে অনুরোধ করিলে তিনি উত্তর দিতেন ... বয়সে কি আর ওসব মানায়?" কিন্তু অন্তিম যাত্রার ... শাড়ী তিনি বাক্সে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা ছিল সুন্দর লাল শাড়ী। মৃত্যুর পর তাঁহাকে স্নান করাইয়া যখন সে শাড়ী পরান হইল এবং তাঁর সীঁথিতে সিন্দুর দেওয়া হইল তখন তাঁহাকে এতই সুন্দর দেখাইল যেন মনে হইল কোন নববধূ। ভগবানের মায়াবশেই যেন তাঁহার মৃতদেহ হইতে বার্দ্ধক্যের সব চিহ্ন অপসারিত হইল এবং সোহাগরাণী নিজের সোহাগের প্রতীক শাঁখা ও সিন্দুর লইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মহাপ্রয়াণে আমি ব্যথিত হই নাই, কিন্তু মনে দুঃখ হইয়াছিল এই ভাবিয়া যে, আমি তাঁর যথোপযুক্ত সেবা করিতে পারি নাই। অর্থের সাহায্যে সেবার কথা বলিতেছি না, কারণ বাড়ীতে যা কিছু ছিল সবই ছিল তাঁরই। আমি বলিতেছি আমার শরীর দিয়া সেবার কথা। নিজের কাজকর্ম্ম লইয়া এমনই ব্যস্ত থাকিতাম যে সে রকম সেবার অবসরই পাই নাই। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অসুখে-বিসুখে আমার পরিচর্য্যা করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁর কিছুই করিতে পারি নাই। এখন আমার একমাত্র অভিলাষ ও প্রার্থনা—যেন পরজন্মেও তাঁহার সহিত আমার সম্পর্ক বজায় থাকে। তিনি যেন হন আমার গুরু আর আমি হই তাঁর শিষ্য, অথবা তিনি যেন হন আমার পিতা কিম্বা মাতা আর আমি হই তাঁর সন্তান। তবেই আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।

কলিকাতার কুম্ভকার

(প্রচ্ছদপট দ্রষ্টব্য)

লিউইস হেগ

ভারতবর্ষের কুম্ভকারেরা শত শত বৎসর ধরে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি তৈয়ারী করে আসছে, প্রতি সহরে, গ্রামে, বাড়ীতে, জঙ্গলে নানা প্রকার অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখা যায়। প্রায় প্রত্যেক দিনই হিন্দুদের পূজো-পার্ব্বণ উপলক্ষে ছুটি থাকে। আমি বাংলা দেশের সর্ব্বপ্রধান উৎসব দুর্গাপূজার ঠিক আগে কলকাতার কুম্ভকারদের কেন্দ্র কুমারটুলীতে যাই। একসঙ্গে পাঁচটি দেবদেবীর পূজো হয়। কুম্ভকারদের তখন খুব কাজের চাপ পড়ে যায়। হিমালয়ের কন্যা দুর্গার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এই উৎসব। দুর্গা শক্তির প্রতিমূর্ত্তি, এবং দশভুজা। তিনি সিংহবাহিনী এবং তাঁর হাতে খড়্গ। তাঁর সাথে আছেন ময়ূরের উপর উপবিষ্ট রণদেবতা কার্ত্তিক, মূষিকারূঢ় হস্তিমুখ দেবতা গণেশ, বীণা-বাদিনী ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী।

কুমারটুলীতে ছোট ছোট কুটিরে প্রায় এক হাজার কুম্ভকার বাস করে। আমি এই মৃৎশিল্পীদের মধ্যে গিয়ে এদের অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় পেলাম। তারা এতই তাড়াতাড়ি কাজ করে যায় যে, তাদের হাত ও আঙুলের ছন্দোময় ভঙ্গী খুব কমই বোঝা যায়। তাদের চার দিকে শত শত মূর্ত্তি দেখলাম—তার ভেতরে কোনটা অর্দ্ধেক, কোনটা সম্পূর্ণ হয়েছে। দেখলাম, কুলীরা গঙ্গার তীর থেকে প্রচুর মাটি মাথায় করে নিয়ে আসছে। আমি জি, পাল এণ্ড সন্স-এর বিরাট ষ্টুডিওতে গেলাম। এইখানে সমস্ত বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি তৈয়ারী করা হয়, এরা বাংলা দেশের কুম্ভকারদের মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন এবং বিশিষ্ট পরিবার। এই পরিবারটি প্রথম কৃষ্ণনগর থেকে আসে। কুম্ভকারেরা প্রথমে একটি কাঠের কাঠামো তৈয়ারী করে। তার পর খড়ের সাহায্যে দেহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈয়ারী করে। এই খড়ের মূর্ত্তির ওপরে প্রথমে এক প্রলেপ মাটি দেওয়া হয়, তার পর আর একবার মোটা করে মাটি দেওয়ার পর মূর্ত্তি তৈয়ারীর কাজ শেষ হয়। মাটি শুকিয়ে গেলে রং করা হয়।

পালদের মধ্যে এক জন আমাকে তাদের কঠোর জীবনের কথা বলে। ভারতবর্ষের হাজার হাজার মূর্ত্তিকারক কোন প্রকারে জীবন যাপন করে, কেবল মাত্র বড় বড় উৎসবের আগে তারা কিছু অর্থ উপার্জ্জন করে, সমস্ত মূর্ত্তিই বায়না দিয়ে তৈয়ারী করা হয়। এক জন কুম্ভকার সমস্ত বৎসরে গড়ে মাসিক ২৫ টাকা থেকে ৫০ টাকা আয় করে। পরে আমি নিখিল বঙ্গ কুম্ভকার সমিতির উৎসাহী সেক্রেটারী মিঃ এ, পালের সঙ্গে দেখা করি। এই সুসংগঠিত ইউনিয়নের সদস্য-সংখ্যা না কি ৩ লক্ষ। তাদের স্ত্রী এবং শিশুদেরও এর মধ্যে ধরা হয়, কিন্তু কেবল মাত্র উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিরাই ত্রৈমাসিক ৪ আনা চাঁদা দিয়ে থাকে। বাংলার শতকরা ৬০ জনের বেশী কুম্ভকার এই সমিতির সদস্য, এই সমিতি বহু কাজ করে থাকে।

—বিনিজ ম্যাগাজিন হইতে

—অমিতাভ বসু রায়

"হারাই হারাই ভয়ে গো তাই বুকে চেপে রাখতে-যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে—
জানিনে কোন্ মায়ায় ফেঁদে বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহুদুটির আড়ালে।"

—রবীন্দ্রনাথ

প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ আমি বসুমতী মাসিক পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। বাংলার এবং বাঙ্গালীর নিজস্ব অনুভূতি এবং কর্মধারার পূর্ণ বিকাশ আমি একমাত্র বসুমতীতেই সর্ব্বদাই দেখিতে পাইয়াছি। ইহাই আমার বসুমতী-প্রীতির কারণ। আমাদের সেবাসঙ্ঘ বর্ত্তমান বৎসরে রজত-জয়ন্তী উদ্‌যাপন করিবে এবং বসুমতীরও ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় আমরা আপনাদের সমসাময়িক ভাবিয়া গৌরবান্বিত।

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বসুমতীর সর্ব্ব-বিভাগীয় ক্রমোন্নতি এবং বর্ত্তমান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিণতি আমরা আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি এবং আশা করি, পরিচালকগণ তাঁহাদের বর্ত্তমান নীতি বজায় রাখিয়া বসুমতীর সাময়িক পত্রিকা-জগতের শীর্ষস্থান বজায় রাখিবেন। ইতি

শ্রীপ্রফুল্ল দাশগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক, হাওড়া সেবা-সঙ্ঘ।

বসুমতীর রজত-জয়ন্তী উৎসবে আমার আন্তরিক প্রীতির উৎস-মূলে আছে অতীত পাঠোপভোগের সুখ-স্মৃতি। বসুমতী বাণী-সেবার এক বিশিষ্ট আয়োজন। এর পুষ্পের ডালি গত সিকি শতক বহু সুখ-দৃশ্য মধুর-রস ফল-ফুলে সমৃদ্ধ। নবীন চিন্তিতের ভাব-প্রবাহে বসুমতী ভারতের প্রকৃত কৃষ্টির দাবী বিস্মৃত হয়নি। তাই এ পত্রিকা নবীন ও প্রাচীন রস-ধারার মধুচক্র। আজ মনে পড়ছে অক্লান্তকর্মী বন্ধু সতীশচন্দ্রকে। তার জীবন-বৃক্ষের সুফল বসুমতী। আজ এই আনন্দের দিনে বহু শুভানুধ্যায়ীর শুভ-বাসনার সঙ্গে আমিও সমস্বরে বলি—বসুমতী দীর্ঘ-জীবন লাভ করুক, সাহিত্য-রস-প্লাবনের শুভকর্মে আত্ম-নিয়োগ করে দেশের ও দশের হিত-সাধন করুক।

ভবদীয়
শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

—অঞ্জলি সেনগুপ্ত

নূতন যুগের নব পরিকল্পনায় মৈত্রী, সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী নিয়ে বসুমতীর আবির্ভাব হোক বাঙ্গালীর প্রতি ঘরে ঘরে। বসুমতীর মধ্য দিয়ে স্বাধীন ভারতের নব-জীবনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হোক। দু'শো বৎসরের সুপ্তচেতনা জাগ্রত ও প্রদীপ্ত হয়ে উঠুক তার ললিত বাণীর মধ্যে দিয়ে। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতি সবগুলিই বসুমতীকে বহন করিতে দেখি কিন্তু একটি প্রধান ও শ্রেষ্ঠ ললিতকলার বাহন হিসাবে দেখি না। সেটি হচ্ছে সঙ্গীত। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে একটি সঙ্গীত বিভাগ করিয়া বসুমতী আমাদের পরিতৃপ্ত ও উৎসাহিত করিবে।

শ্রীঅশোককুমার বসু
পোঃ বজ্‌বজ্‌,
ডি, এ, ঘোষ রোড

"বিহানবেলা আঙিনাতলে এসেছ তুমি কী খেলাছলে,
চরণদুটি চলিতে ছুটি পড়িছে ভাঙিয়া।"

—রবীন্দ্রনাথ

—নন্দরাণী দেবী

'বসুমতী' সগৌরবে ছাব্বিশ বছর অতিক্রম করে পদার্পণ করেছে সাতাশে। তার বিগত ইতিহাস গৌরব-প্রভ। পৃথিবীর কোণে কোণে ছড়িয়ে থাকে যত মাধুরী তাদের আহরণ করে সে সাজিয়ে তুলেছে নিজের মধু-চক্র। এই পঁচিশ বছরে যত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়ে গেছে, তাদের ইতিহাস তার নখ-দর্পণে। বিশ্বের চিরন্তন সৌন্দর্য্যের মাণিক্য-কণা সে তুলে ধরেছে আমাদের সামনে। পৃথিবীর মনীষিগণের চিন্তারেণু সে অক্লান্ত ভাবে বর্ষণ করে গেছে তার পাঠক-পাঠিকাদের সম্মুখে। আমরা তার কাছে চির-কৃতজ্ঞ।

বসুমতী গ্রহণ করে কি দান করে, এ কথা আমি এখনো ভেবে উঠতে পারিনি। সে বসুন্ধরার বিস্তৃত প্রাঙ্গণ হতে সুগন্ধিত ফুল কুড়িয়ে এনে আমাদের সামনে তার সাজি নিঃশেষ করে দেয়। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের উজ্জ্বলতা টেনে নিয়ে তাকে ছড়িয়ে দেয় ধরণীর বুকে, বসুমতীও তেমনি ভাবে জগতের জ্ঞান-জ্যোতিঃপুঞ্জ আহরণ করে আগ্রহান্বিত পাঠকদের সম্মুখে বিকিরণ করে সাহিত্যের সুধাকণা। বসুমতীর আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে আমাদের—প্রবাসী বাঙ্গালীর কাছে। বহু দূরাবস্থিত বঙ্গভূমির শ্যামল স্পর্শ যেন আমরা পাই তার পাতায় পাতায়। তাই বসুমতী আমাদের কাছে আরও বৈচিত্র্যময় আরও আকর্ষক।

আজ স্বাধীন ভারতের মেঘমুক্ত সুনীল আকাশের তলে, ত্রিরঞ্জিত বিজয়-বৈজয়ন্তীর স্নেহছায়ায় অনুষ্ঠিত হবে তার জীবনের শুভ সমারোহ। তার জীবনের এই স্মরণীয় মঙ্গল-মুহূর্ত্তে আমরা প্রার্থনা করি যেন নব যশ-কিরীটে ভূষিত হোক তার মস্তক। তার সাহিত্য-ধারা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠুক নবীন প্লাবনে। এবং তার অক্লান্ত করদ্বয় যেন চিরদিন দান করে যাক নবোজ্জ্বল জ্ঞানের সপ্তবর্ণা রক্তিমকণা। ইতি

শ্রীমতী লতিকা চট্টোপাধ্যায়
ডেরাডুন।

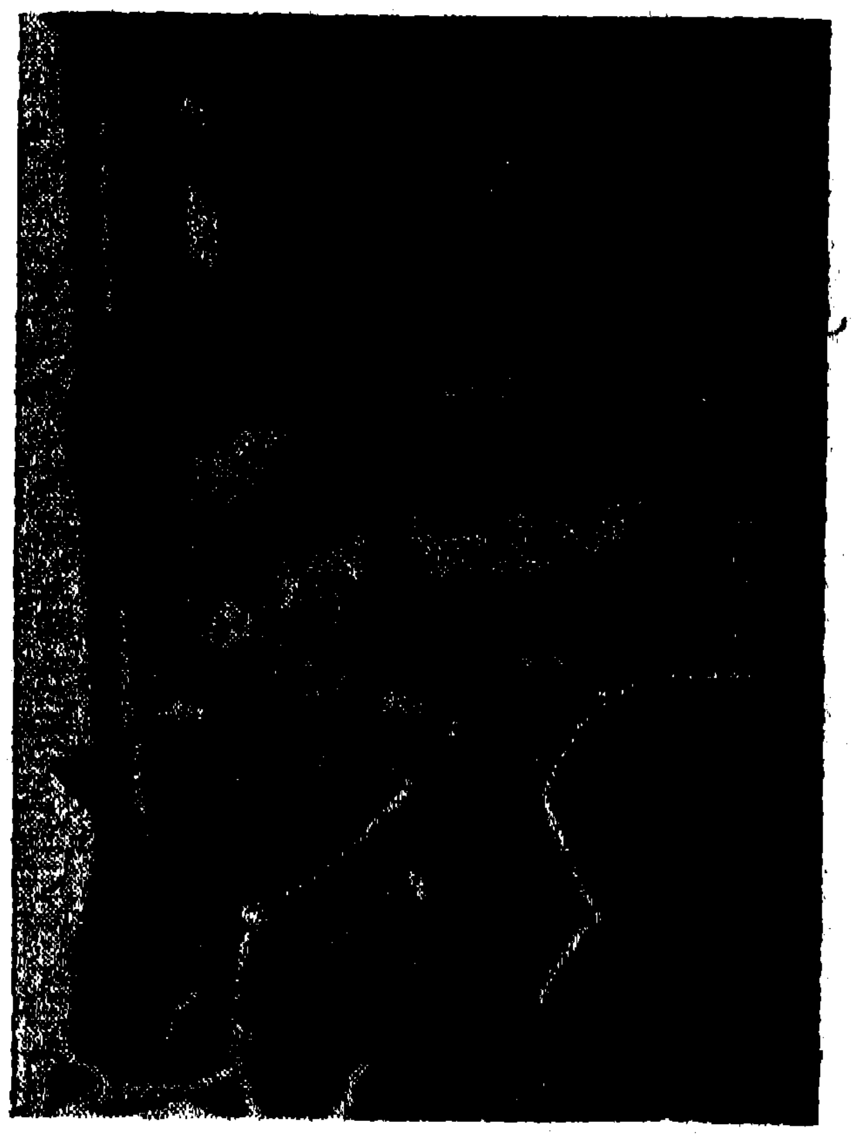

—সুশীল সেন

উদার, বলিষ্ঠ, দলীয় প্রভাবশূন্য, সংযত অথচ স্পষ্ট ও নির্ভীক মতবাদই মাসিক বসুমতীর অত্যধিক সমাদরের প্রধান কারণ। তার পর সুনির্ব্বাচিত কবিতায়, প্রবন্ধে, গল্পে ও ধারাবাহিক উপন্যাসে সমৃদ্ধ হইয়া মাসিক বসুমতীর প্রতিটি পৃষ্ঠাই পাঠকসাধারণকে আনন্দ ও রস পরিবেশন করে।

চলতি ছায়াচিত্রের নির্ভীক ও পক্ষপাতশূন্য পুষ্ট সমালোচনার জন্য প্রতি মাসেই জনপ্রিয় মাসিক বসুমতীর মূল্যবান কয়েকটি পৃষ্ঠা ব্যয়িত হইলে আমাদের মতন সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের বিশেষ উপভোগ্য হইবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি যথার্থ দেশনেতৃবৃন্দের জীবনী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা হইলে পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ কৃতজ্ঞ রহিবে।

শ্রীআশালতা রায়চৌধুরী
একডালিয়া রোড, বালীগঞ্জ।

"ভিখারি ওরে, অমন করে শরম ভুলিয়া
মাগিস কিবা মায়ের গ্রীবা আঁকড়ি ঝুলিয়া।
ওরে রে লোভী, ভুবনখানি গগন হতে উপাড়ি আনি
ভরিয়া দুটি ললিত [illegible] দিব কি তুলিয়া।"

—অ, ক, চট্টোপাধ্যায়

"ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,
শুনত যারা অবাক হত সবে,
দাদা বলত "কেমন করে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে।"
—রবীন্দ্রনাথ

●

আমাদের সামাজিক রুচি ও সংস্কৃতির সুযোগ্য বাহক হবার ক্ষমতা ইহা রাখে, এ বিশ্বাস আমি পোষণ করি। ইহার পাতায় পাতায় বাংলার তথা ভারতের নিজস্ব বাণী সাহিত্যে, শিল্পে, চিত্রে রূপায়িত হয়ে মূর্ত্ত হয়ে উঠুক, ইহাই আমরা দেখতে চাই। পত্রিকাখানি রচনা-সম্ভারে ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ২।৪টি ক্রমশঃ-প্রকাশ্য গল্প ঠিক ধারাবাহিক মত প্রকাশিত না হওয়ায় আমাদের কৌতূহলবৃত্তি নিবৃত্তি লাভ করতে পারে না। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে পত্রিকা মারফৎ বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ ধারাবাহিক ভাবে জানতে পারলে আমরা অধিকতর তৃপ্ত হতে পারতাম।

শ্রীতারকচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি
বীরভূম।

আমি মাসিক বসুমতীকে সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর করি। ইহার প্রথম কারণ, আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি অন্যান্য পত্রিকা যাহা লিখতে ভয় পায় বসুমতী তাহা নির্ভীকচিত্তে নিঃসঙ্কোচে লিখে যায়। দ্বিতীয়তঃ, এই পত্রিকার ভাষা বাস্তবিকই বঙ্গ-ভাষায় গৌরবদান করেছে যাহা অন্য পত্রিকার নিকট থেকে আশা করা যায় না। তৃতীয়তঃ, এই পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে যে রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ দেওয়া হয় উহা যদিও সামান্য, উহার মহত্ব ঢের বেশী। উহা আমাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। তার পর ফটো প্রতিযোগিতা ও ছোটদের আসর ইহা আমাকে বড়ই আনন্দদান করে। ইহা ছাড়া বড় বড় কবিদের ধারাবাহিক লেখা ত আছেই। এই সমস্ত কারণে অন্যান্য পত্রিকার চেয়ে আমি বসুমতীকে অধিক সমাদর করি। আমার মতে এই পত্রিকায় প্রতি মাসে—সেলাই, ঘরকরণার টুকিটাকি ও রান্নাঘর এবং একটি করিয়া সঙ্গীত ও স্বরলিপি দিলে এই পত্রিকাখানি সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয় এবং বহু মহিলা ইহার সমাদর করে এবং গ্রাহিকা হয়। এইগুলি দিয়া নারী জাতির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করাইবেন।

শ্রীমতী প্রভাবতী রায় মণ্ডল
২৪ পরগণা

"আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা—"
—রবীন্দ্রনাথ

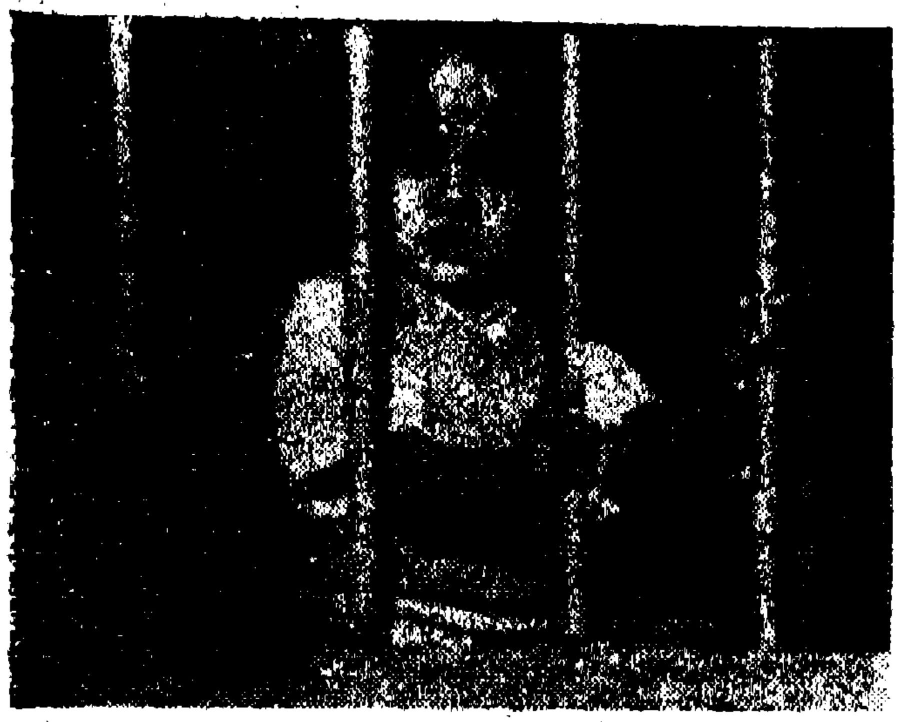

—সন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রমে একদিন যে মাসিক বসুমতীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন দেখিতে দেখিতে তার পঁচিশ বর্ষকাল উত্তীর্ণ হইল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক অবস্থায় ইহার উপর দিয়া বহু ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তবু সতীশ বাবুর কর্ম্মপ্রেরণাকে একটুও শিথিল করিতে পারে নাই। তাঁহার একমাত্র স্বপ্ন ও সাধনা ছিল এই পত্রিকাকে বাঙালীর একমাত্র মুখপত্র করিয়া তোলা। সেই মহাপুরুষের সে-দিনের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। আজ মাসিক বসুমতী বাঙালীর একমাত্র মুখপত্র, তাহাতে কাহারো কোন সন্দেহ নাই। এই পত্রিকায় বাংলার খ্যাতনামা লেখক-লেখিকারা অংশ গ্রহণ করিয়া তাদের ভাব-ভাষার অমূল্য রত্নে সারস্বত কোষাগারকে উজাড় করিয়া এই বসুমতীর সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক দি ইভিনিং ক্লাব, গোলমুড়ি।

●

"ছিলি আমার পুতুলখেলায়, প্রভাতে শিবপূজায় বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।"

"একটি মেয়ে আছে জানি, পল্লীটি তার দখলে—
সবাই তারি পূজো জোগায়, লক্ষ্মী বলে সকলে।
আমি কিন্তু বলি তোমায় কথায় যদি মন দেহ,
খুব যে উনি লক্ষ্মী মেয়ে আছে আমার সন্দেহ।"

—রবীন্দ্রনাথ

●

ধন্যবাদ, সকলের জন্যে আমাকেও স্মরণ করিয়াছেন বলিয়া মাসিক বসুমতীকে সমাদর করিবার কারণ এই যে, ইহা সকল বিষয় সুষ্ঠু-রূপে, সরল ভাবে আলোচনা করে। যা দেশের উন্নতি কামনায়, আপনার যাহা কিছু অদেয় দিতেছে, তার উন্নতি কামনা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিতে হইবে।

গোপেন মল্লিক,
রামগড়

—রবীন মুখার্জী

—ললিতা সরকার

"তবে আমি যাই গো তবে যাই।
ভোরের বেলা শূন্যকোলে ডাকবি যখন খোকা ব'লে
বলব আমি, "নাই সে খোকা নাই"।
মা গো যাই।"

"পূজার সময় যত ছেলে আঙিনায় বেড়াবে খেলে,
বলবে "খোকা নেই রে ঘরের মাঝে"।
আমি তখন বাঁশির সুরে আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফিরব সকল কাজে।"

—রবীন্দ্রনাথ

●

"মাসিক বসুমতী"র আলোকচিত্র বিভাগ সর্ব্বজনপ্রিয়, রুচি-সম্মত ও উচ্চ ধরণের। কিন্তু আলোকচিত্রগুলি যদি "আর্ট অথবা আইভরি" পেপারে ছাপা হয় তাহলে খুবই ভাল হয়। কারণ এমন কতকগুলি চিত্র বেরোয় যাকে যত্নে রাখতে গেলেও তা হাতে হাতে খারাপ হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ, ছোটদের বেশ উপভোগ্য। আরও অধিকতর উপভোগ্য হতে পারে যদি আসরটিতে "ব্যায়াম বিষয়ক" কোন বিষয় প্রকাশিত হয়। কিশোরবর্গের নিকট স্বাধীন ভারতে অধ্যয়ন ব্যতীত একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত খেলাধূলা ও ব্যায়াম।

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোষ
বেলেঘাটা ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী

আমি যাহা চাই তাহা মাসিক বসুমতীর মধ্যেই পাই, অর্থাৎ মাসিক বসুমতীর মধ্য দিয়া আমি আমাদের দেশের সাহিত্য ও সভ্যতাকে জানিতে ও চিনিতে পারি। তাহা ব্যতীত মাসিক বসুমতীর কয়েকটি বিষয়ও আমার অত্যন্ত ভাল লাগে। যেমন "অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ" এবং "এ্যামেচার ফটোগ্রাফি" বিভাগ। আর একটি জিনিষ যাহা সত্যই সমাদর করিবার যোগ্য। সেটি হইতেছে আপনাদের রস পরিবেশন করিবার শক্তি, যাহা বর্ত্তমান কালের অন্য কোন মাসিক পত্রিকার পাতায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বসুমতীর পাতায় মাঝে মাঝে বিদেশী বিখ্যাত উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ প্রচারিত হয়, তথাপি মাত্র তাহা দ্বারা সকল পাঠক-পাঠিকার রস-তৃষ্ণা সম্পূর্ণ হয় না, সুতরাং বসুমতীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে আমার বক্তব্য এই যে, সাধারণের সহিত দেশ-বিদেশের সাহিত্যের পরিচয় যাহাতে আরও ঘনিষ্ঠ হয় তাহার জন্য ইহার পরিধি বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীমতী মীরা বিশ্বাস
লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

—জিতেন্দ্রনাথ মল্লিক

●

"আজকে দিনের দুঃখ যত
নাই রে দুঃখ উহার মতো
ঐ যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান পানে চাহি—"

—রবীন্দ্রনাথ

শীতে উপেক্ষিতা

"রঞ্জন"

পাঁচ

একমাত্র মাদ্রাজীরা ছাড়া আমরা ভারতীয়রা সাধারণত আমাদের নামের মধ্যে আদি নিবাসের বিশদ বিবরণ বহন করে বেড়াইনে। কিন্তু তবু, অস্পষ্ট একটা আঞ্চলিক পরিচয় অদৃশ্যভাবে কোথায় যেন লেখা থাকে। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐক্য নিয়ে আজ থীসিস্ রচনা করা নিরর্থক। ইংরেজের সহায়তায় কায়েদ-ই-আজম সে-প্রশ্নের যে নৃশংস মীমাংসা করেছেন তা আমরা সানন্দে না হলেও সম্পূর্ণভাবে শিরোধার্য করে নিয়েছি। আজ আমাকে তাই দার্জিলিং আসতে হলে বিদেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান পার হয়ে আসতে হয়। কিন্তু, কই, সারা পথে এমন তো একজনকেও দেখতে পেলেম না যাকে দেখেই মনে হয় যে, ইনি নিঃসন্দেহে অভারতীয় এবং বিশুদ্ধ পাকিস্তানী। রাজনৈতিক ঘোষণা দ্বারা নতুন নিশান করা যায়, করা যায় নতুন নিশানা; মানচিত্রের চেহারা বদলানো যায় কালির দাগ মুছে দিয়ে রক্তের দাগ কেটে। কিন্তু আকৃতিগত পরিচয়ের পরিপূর্ণ পরিবর্তন সাধন ঠিক এতটা সহজসাধ্য নয়। আদৌ সম্ভব কি না তাও সন্দেহসাপেক্ষ। চোদ্দই অগস্ট যে দুই ব্যক্তি রহিমতুল্লা ও কৃষ্ণ মেনন বলে পরিচিত ছিলেন, হঠাৎ পনেরই অগস্ট প্রভাতে তাঁরা যখন তাঁদের প্রতিবেশীকে গিয়ে বললেন যে তাঁরা দু'টি বিভিন্ন জাতির লোক, সুপ্তোত্থিত প্রতিবেশী তখন নিশ্চয়ই এটাকে বৃহৎ একটা পরিহাস মনে করে তাঁর ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে

শুধু দেশের নয়, প্রদেশেরও একটা পরিচয় প্রত্যক্ষ থাকে আমাদের প্রত্যেকের আকৃতিতে। দীনেশ সরখেলকে দীনেশ' সাকলাৎওয়ালা বলে ভুল করবার আশংকা নিতান্তই অল্প, মুখ না খুললেও; আসন্ন শ্মশ্রুমুক্ত হলেও যোধরাজ সিংকে ভ্রম হয় না সুন্দরম্ রঙ্গস্বামী বলে। এ প্রসঙ্গে সভয়ে ও সসম্ভ্রমে এ কথারও উল্লেখ করব যে সম্প্রতি যে বঙ্গললনাগণ অঙ্গে সালোয়ার-পায়জামা ধারণ করে প্রাদেশিক পরিচয়ের অবলোপ সাধনে সচেষ্ট হয়েছেন, আমি অন্তত কখনোই তাঁদের কাউকে রাজপুত রমণী ভেবে বিভ্রান্ত হইনি।

যেমন মানুষের বেলায়, তেমনি জায়গার। তারও ভৌগোলিক পরিচয় একমাত্র রেলওয়ে ষ্টেশনের সাইনবোর্ডেই লিপিবদ্ধ থাকে না; ছড়ানো থাকে তার মাটিতে, জলে আর হাওয়ায়। বোলপুর ষ্টেশনে অবতরণ করলে কাউকে বলে দিতে হয় না যে জায়গাটা সাঁওতাল পরগণার, চব্বিশ পরগণার নয়। হরিণাভির রাস্তায় দাঁড়িয়ে অন্ধজনও জানে যে সে হরিদ্বারে নেই। 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো আর'—এ কথা প্রায় প্রত্যেক দেশ সম্বন্ধেই বলা যায়, কেননা প্রত্যেক দেশেরই আছে নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য। বাঙলার শ্যামলতা যেমন একান্তই বাঙলার।

এই সাধারণ নিয়মের বৃহৎ ব্যতিক্রম হচ্ছে দার্জিলিং। বাঙলা কেন, সারা ভারতবর্ষেই দ্বিতীয় দার্জিলিং নেই। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই মনোরম শৈলাবাসে এসে তাই একবারও মনে এই সন্দেহ জাগে না যে স্থানটি পশ্চিম-বঙ্গ নামক প্রদেশের অংশ।

একমাত্র আমলাতান্ত্রিক বিচারেই বাঙলা দেশের অন্তর্ভুক্ত, আসলে সে শাংরিলার শাখা।

বস্তুত বর্তমান দার্জিলিঙের উদ্ভবই সম্ভব হয়েছে তার অবাঙালীদের কল্যাণে। এ যেন অতি স্বর্ণা এক বাঙালী মেয়ে, বিদেশী যাকে বিদেশিনী ভেবে ভুল করে প্রেমে পড়েছে। তার পর ভুল ভাঙলেও মোহ ভাঙেনি, চেষ্টা করেছে পিগম্যালিয়নের মতো আপন স্বপ্নকে রূপ দিতে, প্রাণ দিতে। আশা করি এ-কথা স্বীকার করলে দেশদ্রোহিতা হবে না যে আজকের দার্জিলিং বিলাসী ইংরেজদের কল্পনা দিয়ে রচা। তারা এই স্থানটিকে গড়তে চেয়েছিল স্বদেশের প্রতিবিম্ব করে। দূর দেশে নির্বাসিত স্বামী যেমন প্রোষিতভর্তৃকা পত্নীর প্রতিকৃতি কাছে রেখে বিরহকাতর হৃদয়কে শান্ত করে।

প্রাগ্‌বৃটিশ দার্জিলিঙের ইতিহাসের অধিকাংশই অতীতের অজ্ঞেয়তায় লুপ্ত; বাকিটা হয় ঐতিহাসিকদের পাণ্ডিত্যে আবৃত, নয়তো ইংরেজদের লেখা অপ-ইতিহাসে বিকৃত। বহুদূর-বিস্তৃত সিকিম রাজ্যের এই অনুর্বর অংশটি ছিল একেবারেই অবহেলিত। স্বল্পসংখ্যক লোক বাস করতো গভীর অরণ্যের অনিচ্ছাদত্ত অনুমতি নিয়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জন্তু-সম্প্রদায়ের অবাধ আধিপত্য বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে—আজকের হিন্দু যেমন পূর্ববঙ্গে। তারা ছিল, তারা নেই—ইতিহাস তাদের মনে রাখেনি।

দুরন্ততম সন্তানের জন্যে যেমন মায়ের স্নেহ থাকে সব চেয়ে বেশী, ইতিহাসের তেমনি পক্ষপাতিত্ব আছে রক্তলোলুপ হিংস্রদের জন্যে। তার পাতায় তাই রামদাসের জন্য যদি থাকে চার লাইন, শিবাজীর জন্য আছে চার পাতা। ইতিহাসের বিচারে কালিদাসের জন্যে এক লাইনই যথেষ্ট, বিক্রমাদিত্যের জন্য চাই পুরো একটা অধ্যায়। ইতিহাসের পাতায় নামাঙ্কন করতে হয় শোণিতাক্ষরে, তার বক্ষ ব্যেপে তাই অবাধে বিচরণ করে নেপোলিয়ন আর বিসমার্ক আর ক্লাইভের দল। স্থানাভাব ঘটে শেলী, শিলার আর কবীরের বেলায়। বিদ্বান আর যেখানেই পূজ্যতে হোক, ইতিহাসে নয়। রাজা ও রাজনীতিকদের সেখানে অপ্রতিহত মনোপলি!

যেমন চরিত্রের বেলায়, তেমনি ঘটনার। সেখানেও ইতিহাস সুকৃতির মান মেনে চলে না। নীতিপালনের উল্লেখ থাকে সংক্ষিপ্ততম, অন্তহীন বিস্তৃতি আছে লঙ্ঘনের জন্যে। পাতার পর পাতা জুড়ে আছে রাজ্যজয়ের ইতিহাস, লেখা নেই কোনো রোগবিজয়ের সবিস্তার কাহিনী। দেশে দেশে বা জাতিতে জাতিতে যখন মৈত্রী ও সম্প্রীতি থাকে তখন ইতিহাস তাকে উপেক্ষা করে। ব্যাখ্যান শুরু হয় বিরোধ বাধলে।

ইতিহাসে তাই দার্জিলিঙের আবির্ভাব বিরোধকেই কেন্দ্র করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভুটানীরা সিকিম রাজ্যের যে-অংশটা দখল করে নিল আজ তা কালিম্পং নামে পরিচিত। তার পরে এলো গুর্খারা। নেপাল অধিকার করে আক্রমণ করল সিকিম, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে চলল ছোটো-বড়ো নানা আকারের খণ্ডযুদ্ধ। সিকিমের সাধ্য ছিল না গুর্খাদের উন্নততর যুদ্ধ-পদ্ধতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার। তিস্তা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তারা পদানত করল সমগ্র তেরাই ভূমি। নেপাল রাজ্যের পরিধিই শুধু প্রসারিত

ঊনবিংশ শতাব্দীর বয়স তখন বছর পনের। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব ভারতের বৃহৎ অংশেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এবার প্রয়োজন বিস্তৃতির। য়ুরোপের প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রায় সবাই একে একে রণক্ষেত্র থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। ভারতের অভ্যন্তরের অন্তর্দ্বন্দ্ব সকল প্রতিরোধকে অক্ষম করেছে অনেক দিনের জন্য। সম্মুখে অগ্রগতির পথ অন্তহীন এবং প্রায় বাধাহীন।

কিন্তু উত্তরপূর্ব দিগন্তে দেখা দিল অপ্রত্যাশিত কালো মেঘের আভাস। নেপালের শক্তিবৃদ্ধি। কোম্পানির হস্তক্ষেপের সমর্থনে অজুহাত উদ্ভাবনে অযথা কালক্ষয় হয়নি। আহা, সিকিমের এমন বিপদের সময় ইংরেজ কি পারে নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকতে? বিধিনির্ধারিত কর্তব্য কি নেই ইংরেজের? সিকিমের স্বাধীনতা হরণ করতে চায় নেপাল। ইংরেজ থাকতে এমন ঘটনা হতেই পারে না। পরের স্বাধীনতা হরণ যে ইংরেজের জন্মগত অধিকার। সে অধিকারে আর কারো হস্তক্ষেপ অক্ষমণীয়।

তাই যুদ্ধ ঘোষিত হোলো স্বাধীনতার শত্রু নেপালীদের বিরুদ্ধে। সে সকল যুদ্ধের সঙ্গে আজকের যুদ্ধের সাদৃশ্য সামান্য। মানবের উদ্ভাবনী-শক্তি তখনো এমন পরিপূর্ণভাবে ধ্বংসের সেবায় আত্মনিয়োগ করেনি। সে-যুদ্ধের প্রকৃতি এমন ভীষণ ছিল না, ক্ষেত্র ছিল না বিশ্ববিস্তৃত। কিন্তু আজ যেমন প্রত্যেকটা যুদ্ধের জন্যে নতুন নতুন নাম আবিষ্কার করতে না পেরে বলি, বিশ্বযুদ্ধ এক বা বিশ্বযুদ্ধ দুই তেমনি নেপাল যুদ্ধগুলিরও নম্বর দেওয়া আছে ইতিহাসের বইয়ে। এক, দুই, তিন। সেই যুদ্ধের অন্তত এক জন বীরের স্মৃতির উদ্দেশে কলকাতায় আজো আছে আকাশ-ছোঁয়া এক স্তম্ভ—অক্টরলোনি মনুমেন্ট।

ইংরেজ অপরের স্বাধীনতা সত্যি রক্ষা করে, কিন্তু বিনামূল্যে নয়। মূল্যটা সাধারণত বড়োই উচ্চমূল্য, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সে-মূল্য দিতে হয় রক্ষিত স্বাধীনতাকেই সমর্পণ করে। সিকিমের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হোলো না। তিতালিয়া-য় স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্রে নেপালীরা সিকিম থেকে নেওয়া সমগ্র তেরাইভূমি ফিরিয়ে দিল, কিন্তু সবটা সিকিমের হাতে পৌঁছোলো না—সলিসিটরের আদায়ীকৃত অর্থের কতটুকু বাকি থাকে তার পাওনা মিটিয়ে দেবার পরে?

মেচি থেকে তিস্তা পর্যন্ত জায়গাটা কোম্পানি সিকিমকে ফিরিয়ে দিল বটে, কিন্তু বিনা সর্তে নয়। নেপাল আর ভুটানের মধ্যে অবস্থান করে সিকিম হোলো ইংরেজিতে যাকে বলে বাফার ষ্টেট। কোম্পানি রইল সে-রাষ্ট্রের স্বাধীনতার রক্ষক, কোম্পানি গ্যারান্টি করল সিকিমের সভরেন্টি। ইংরেজের অধীন থাকা যে পূর্ণ স্বাধীনতারই নামান্তর কোম্পানির সাহেবদের মনে সে সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। সেই পূর্ণ স্বাধীনতায় একটু যা কিন্তু ছিল তা শুধু এই যে প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে সিকিমের যদি বিরোধ বাধে তাহলে কোম্পানিকে ডাকতে হবে মধ্যস্থতার জন্য। আর কিছু নয়, শুধু পরোপকার।

বিরোধের জন্য বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয়নি ইংরেজকে। নেপাল-সিকিম সীমান্তে এমনি এক বিরোধ মেটাবার জন্য মহামান্য গবর্ণর জেনেরাল প্রেরণ করলেন দু'টি বিশ্বস্ত অফিসার—ক্যাপ্টেন লয়েড এবং মিষ্টার গ্রান্ট। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুচ্চ

দ' দিন কাটিয়েছিলেন "in the Old Goorkha Station"

Darjeeling." তিনি এলেন, তিনি দেখলেন, দার্জিলিং তাঁর চিত্ত জয় করল। একশ' উনিশ বছর পরে যেমন করেছে আমার।

মিষ্টার গ্রান্ট তদনুযায়ী রিপোর্ট করলেন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড বেন্টিংকের সমীপে। বললেন, রণক্লান্ত সৈনিক ও শাসনশ্রান্ত কর্মীদের স্যানিটরিয়মের জন্যে এমন উপযোগী স্থান আর নেই। কেবলমাত্র অবসর-বিনোদন জন্যই নয়, সামরিক কারণেও দার্জিলিঙের প্রয়োজন ছিল। নেপালের উপর প্রহরিতার জন্য। ক্যাপ্টেন হার্বার্ট ও মিষ্টার গ্রান্টের পরিদর্শনের পরে দার্জিলিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হোলো। কোম্পানির ডিরেক্টররা সে-সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলেন। আর যা বাকী রইল তাকে বলে ফর্ম্যালিটি।

১৮৩৫-এর পয়লা ফেব্রুয়ারী সিকিমের রাজা যে দানপত্রে স্বাক্ষর করলেন তাতে লেখা রইল :

"The Governor General, having expressed his desire for the possession of the hill of Darjeeling on account of its cool climate, for the purpose of enabling the servants of his Government, suffering from sickness, to avail themselves of its advantages, I, the Sikkimputtee Rajah, out of friendship for the said Governor General, hereby present Darjeeling to the East India Company, that is, all the land South of the Great Rangit river, East of the Balasun, Kahail and Little Rangit rivers and West of Rungnu and Mahanadi river."

সিকিমের রাজার সঙ্গে জেনেরাল লয়েডের কী আলোচনা হয়েছিল জানিনে। সে-আলোচনার ফলে কি অবস্থায় রাজাকে ইংরেজের হাতে দার্জিলিং সমর্পণ করতে হয় তারও বিশদ কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই। অন্ততঃ কাগজে-পত্রে লেখা রইল যে ইংরেজ দার্জিলিং হরণ করেনি, উপহার পেয়েছে।

উপহারপ্রাপ্তির চার বছর পরে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ডক্টর ক্যাম্পবেলকে দার্জিলিঙের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে নিয়োগ করা হোলো এবং তখন থেকেই সুরু হোলো দার্জিলিঙের উন্নতি। দশ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা একশ' থেকে দশ হাজার হোলো। ১৮৫২ সালে এক জন সরকারী পরিদর্শক লিখলেন, "দার্জিলিঙের যা কিছু উন্নতি হয়েছে তার সবটুকুর জন্য সকল কৃতিত্ব ডক্টর ক্যাম্পবেলের প্রাপ্য। দুরধিগম্য অরণ্যভূমিকে তিনি পরিণত করেছেন অপরূপ শৈলাবাসে; আবাসের অযোগ্য পার্বত্য উপত্যকা থেকে সৃষ্টি করেছেন অনুপম ভূস্বর্গ।"

নির্মল, উজ্জ্বল, প্রাণদায়ী রৌদ্রে উদ্ভাসিত ম্যালে উপবেশন করে ডক্টর ক্যাম্পবেল ও তাঁর স্বজাতির সকল দুষ্কৃতি ক্ষমা করলেম সানন্দ চিত্তে।

অর্থনীতির ভাষায় যাকে স্ক্যার্সিটি ভ্যালু বলে—দুষ্প্রাপ্যতার মূল্য—দার্জিলিঙের রৌদ্রের তা আছে। বিশেষ করে জানুয়ারীর শেষে। সেই দুর্লভ রৌদ্র যখন আবির্ভূত হয় তখন ঘরে থাকে না কেউ। সবাই ছুটে আসে আকাশের উন্মুক্ততায়; প্রাণ ভরে, দেহ ভরে অঙ্গ পোহাতে। ম্যালে তাই আজ বেশ ভীড়। অর্ধেক আন্দাজ জন কুড়ি লোক বিভিন্ন বেঞ্চিতে বসে প্রার্থনা করছে রোদটা যেন একটু দীর্ঘস্থায়ী হয়। পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, কিন্তু খালি চোখে দূরত্বটা এত বেশী মনে হয় না। এমন অপরূপ প্রভাতে সব কিছুকে কাছে মনে হয়—কাঞ্চনজঙ্ঘাকে, ঐ বেঞ্চির ঐ ভুটানীগুলিকে, পরের বেঞ্চির ঐ ইংরেজকে, তার পাশের ঐ অবাঙালী কিশোরকে।

রৌদ্রের স্বচ্ছতায় অপরিচয়ের ব্যবধান সাময়িক ভাবে অপনীত হয়। এক জন আরেক জনকে ডেকে বলে, "Glorious sunshine, isn't it?" অপর জন সানন্দে উত্তর দেয়, "Isn't it?"

ইংরেজ ভদ্রলোক আলাপটাকে আরো একটু প্রসারিত করে বললেন, "এমন সুন্দর রৌদ্র যে হাতের কাজ ফেলে বেরিয়ে পড়েছি। জলে আর মাটিতে হাত দু'টো প্রায় জমে গিয়েছিল।"

"জল আর মাটি কেন?"

"ওই আমার রুটি আর মাখন। আমি ভাস্কর।"

আর কৌতূহল দমন করতে পারলেম না, বললেম, "কার মূর্তি গড়ছেন এখানে?"

ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে হাসলেন, "দাঁড়ান, তাঁর নামটা লেখা আছে আমার ডায়েরিতে। ঠিক ভাবে কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারিনে।"

ডায়েরিতে নামটা পড়লেম, ভানু ভক্ত।

ক্রমে জানলেম যে ভানু ভক্ত নেপালীদের সব চেয়ে বড়ো কবি। তাঁর ভক্তিরসাত্মক কাব্য নেপালীদের শুধু আনন্দই দেয় না, প্রেরণাও। তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত হচ্ছে আবক্ষ মর্মরমূর্তি যা স্থাপিত হবে ম্যালে। ভাস্কর, যাঁর নাম টমসন, বললেন, "আমার ইচ্ছে ছিল পূর্ণাবয়ব মূর্তি গড়বার। কিন্তু অত খরচা করবার সামর্থ্য নেই এখানকার কর্তাদের। তাই অল্পেই তুষ্ট থাকতে হবে।"

ভাস্কর টমসনের সঙ্গে আলাপ করতে অত্যন্ত ভালো লাগছিল। ভদ্রলোক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন না করে অনেক কথা বলতে পারেন। অনেক দেশ ঘুরেছেন, জানেন অনেক কিছু। বললেন আমেরিকার কথা, অষ্ট্রেলিয়ার কথা। বললেন, "আমার কাঁধে একটা ভূত আছে যে কোথাও বেশী দিনের জন্য একটা জায়গায় থাকতে দেয় না। কিছু দিন পরেই বলে, আবার ঝুলি কাঁধে তোলো, চলো আর কোথাও।"

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "ভারতে কত দিন থেকে আছেন?"

"অনেক দিন। প্রায় তিন বছর হতে চলল।"

"অনেক মূর্তি গড়েছেন তাহোলে এই তিন বছরে?"

"না, খুব কম। যে ভূতটা আমাকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত টেনে নিয়ে বেড়ায় সেই ভূতটাই মাঝে মাঝে মনটাকে বিষিয়ে দেয় বাটালী আর হাতুড়ির বিরুদ্ধে। তখন মূর্তি রেখে আর কিছু করি।"

"যথা?"

"এই তো, গত বছর এমন সময় ছিলেম সীমান্ত প্রদেশে। একটা হাসপাতালে কাজ করছিলেম।

বিস্মিত হলেম। ভদ্রলোকের চেহারায়ই যেন কী রকম একটা ভাব ছিল যা সচরাচর এ দেশে নিরাপদ প্রাচুর্যে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজদের মধ্যে দেখা যায় না। তাঁর কপালী রঙের রুক্ষ শ্মশ্রু ও উদাসী দৃষ্টি থেকেই

[ক্রমশঃ]

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

উন্নত বাহু, দেহ গৌরবর্ণ, গম্ভীর অথচ সুরসিক সুরেশচন্দ্র বাংলার সাহিত্য-জগতে এক দিন অসাধারণ প্রভুত্ব করে গেছেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চারিত্রিক তেজ কিছুটা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন।

'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। সে যুগে 'সাহিত্য' একখানি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা ছিল। এর বার্ষিক দক্ষিণা ছিল মাত্র দু'টি মুদ্রা। ছবি থাকতো না, কাগজও উৎকৃষ্ট ছিল না; তবুও এর পসার ছিল খুব। উমেশচন্দ্র বটব্যাল, অক্ষয় মৈত্র, নবীন সেন, নিখিলনাথ রায়, অক্ষয় বড়াল, রামেন্দ্রসুন্দর, হীরেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি এই কাগজে নিয়মিত লিখতেন। এ কাগজের বৈশিষ্ট্য ছিল 'সমালোচনা'। সহযোগী সাহিত্য-সমালোচনাই লোকে আগ্রহের সঙ্গে পড়তো। সে প্রণালীর সমালোচনা আর দেখি না। বেশ ঝরঝরে, সুরুচির বাধক নয়, অথচ উপভোগ্য। সমালোচনা-সাহিত্যে যে 'আর্ট' থাকতে পারে, তা সুরেশ বাবুর 'সাহিত্য' এক কালে সপ্রমাণ করে দিয়েছিল।

এক জন লিখলেন তাঁর কবিতার বইয়ে, 'অক্ষম তুলিতে ফুল তুলিয়াছি কাঁটা' সুরেশ বাবু সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় ঐ পংক্তিটি উদ্ধৃত করে বললেন, 'এরূপ সত্যবাদিতা দুর্লভ', বাস্তবিকই অন্য কোনও সাহিত্য-সমালোচক সুরেশ বাবুর মতো এমন সরস সমালোচনায় নিপুণতা দেখাতে পারেননি।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় সুরেশচন্দ্র অনেক সময়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতেন। এক দিন আমরা মনে করলাম, সুরেশ বাবুর এই অতিরিক্ত দোষদর্শন-বুদ্ধির প্রতিবাদ করতে হবে। রবি বাবুর 'ভ্রষ্ট লগ্ন 'কবিতাটি সবে বেরিয়েছে, আমরা অপেক্ষা করে রইলাম সুরেশ বাবুর সমালোচনা দেখবার জন্যে—কারণ, কবিতাটি আমাদের খুবই ভালো লেগেছিল। কিন্তু সুরেশ বাবুর সমালোচনা 'হতাশ পথিক, সে যে আমি, সে যে আমি' এই সুন্দর আবেগ-ভরা আবেদন এখনও যেন কানে বাজে। এবারে অভ্যস্ত রীতি পরিত্যাগ করলো এবং তাঁর সে সমালোচনা এত সুন্দর, গুণগ্রাহিতার এত পরিপাটী নিদর্শন যে, সে সমালোচনা সেই উৎকৃষ্ট কবিতার মোটেই অনুপযুক্ত হয়নি।

কিন্তু এর থেকে সুরেশচন্দ্রের রবীন্দ্র-প্রীতি প্রমাণিত হ'ল না, কারণ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ সমালোচনা করবার দিকেই ছিল তাঁর আন্তরিক ঝোঁক। ওদিকে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ আর এদিকে সুরেশ সমাজপতি। এই উভয় পাষাণ-প্রাচীরের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-স্রোত বয়েছিল। ভালই বলতে হবে—পণ্ডিতকে নিয়ে পাতালে যাওয়াও ভাল। সুতীব্র সমালোচনায় কবির কোন ক্ষতি হয়ত হয়নি—কিন্তু উপকার যে হয়নি এ-কথা জোর করে বলা চলে না। নির্ঝরিণীর স্রোত উপলখণ্ডে আঘাত না খেলে তার বেগ বাড়ে না।

আমাদের আড্ডা ছিল হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বাড়ী—৮২ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। হেমেন্দ্রপ্রসাদের সাহিত্য-প্রীতির জন্যই হোক আর সুরেশচন্দ্রের চির অর্থাভাব গতিকেই হোক, সাহিত্য কয়েক বছর ৮২ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদের মাতা সম্পর্কে আমার দিদি ছিলেন, আমার বন্ধু যতীন্দ্রনাথ ছিল সম্পর্কে হেমেন্দ্রপ্রসাদের ভাগিনেয়, এই পরিবেশের মধ্যে আমার যখন ঐ আড্ডায় যাতায়াত ঘটেছিল, তখন আমি বি-এ পড়ি। সেই সময়ে আমার লেখা সাহিত্যে বেরিয়েছিল—সহযোগী সাহিত্যের মধ্যে 'কার্লাইল' ও 'যবদ্বীপ' (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)। আমার সাহিত্য-জীবনের এই প্রথম উন্মেষ। সুরেশ বাবুর মতো লোকের কাছে আমার হাতেখড়ি—এ কথা বলতে আমার এতটুকু কুণ্ঠা নেই। যদিও তাঁর সঙ্গে অনেক বিষয়েই আমার মতের মিল ছিল না।

আমি যখন এই আড্ডার মধ্যে থেকেও এম-এ পাশ করলাম প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে, তখন এই আড্ডায় এক সান্ধ্য সম্মেলনে পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন আমাকে 'আড্ডার জয় হোক্' এই বলে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। সে কথা মনে করে আমি গর্ব অনুভব না করে পারিনে। যে সব বন্ধু ডোবাতে চেয়েও ভরাডুবিতে কৃতকার্য্য হননি তাঁদের উদ্দেশে যোড়করে নমস্কার করি।

সুরেশ বাবুর সম্বন্ধে সব চেয়ে মনে পড়ে এই কথাটি যে, তিনি বড় স্পষ্ট বক্তা ছিলেন, কারও খাতির করে কথা কইতেন না তা সে যত বড় লোকই হোক। এর সঙ্গে তাঁর একটু দোষও ছিল। কোনও বড় লোককে তিনি দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছেন, সেটা আমাদের কাছে বেশ [illegible]

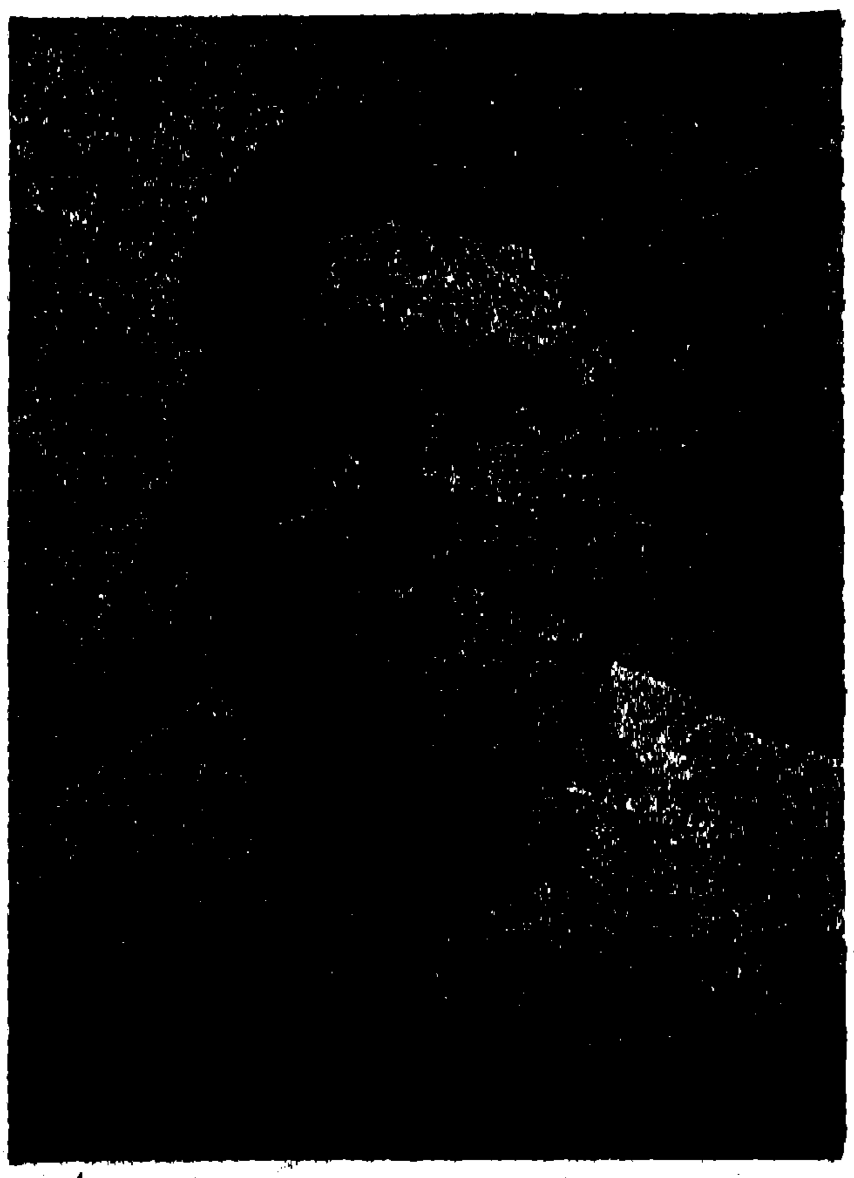

সুরেশ সমাজপতি

বস্তুতঃ, তাঁর স্পষ্টবাদিতায় সব সময়েই একটু হুলের খোঁচা থাকতো।

সুরেশ বাবু শুধু সমালোচনায় যে দক্ষ ছিলেন, তা নয়, তাঁর কতকগুলি ছোট গল্প আছে, সেগুলি অজস্র সুখ্যাতি লাভ করেছিল। তাঁর 'বাঘনখ' গল্পটির সুখ্যাতি রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত করেছিলেন। 'সাজি' বলে তাঁর গল্পের বই আছে—হয়তো এখন দুষ্প্রাপ্য। একটি গল্পের নাম বোধ হয় 'প্রতিশোধ'—আমাদের নাম আছে। আমি সে গল্পে দার্শনিক—যদিও তখন থার্ড ইয়ারে দর্শনশাস্ত্রের ক, খ (অনার্স) পড়ি—সুগায়ক ও সুদর্শন যতীন্দ্রনাথ আছেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ, অনাদিনাথ প্রভৃতি আমাদেরই বন্ধু-বান্ধবকে নিয়েই তাঁর সে গল্পটি লেখা।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক। অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদেরই মেসের ছাত্র। অদ্ভুত ছিল তার প্রতিভা—তার অনেক জিনিষ আমরা (আমি ও যতী) অনুকরণ করেছিলাম। সে গান জানতো না, আমরা জানতাম—যতী তো অত্যন্ত সুগায়ক বলে সর্বত্র পরিচিত ছিল—কিন্তু অনাদিনাথ ইশারা-ইঙ্গিতে আমাদের গান গাইবার সঙ্কেত শিখিয়ে দিত। তার পরিহাসপ্রিয়তা (wit) ছাত্র-মহলে এত পসার লাভ করেছিল যে, অনেকে সে সব শুনতে আসতো। পরবর্তী কালে চিত্তরঞ্জন গোঁসাই যে কমিক করতেন, তার মধ্যেও অনাদিনাথের কিছু কিছু ছাপ ছিল। গোঁসাই অবশ্য অনাদিনাথের কাছ থেকে নেননি—তিনি পেয়েছিলেন আমাদের কাছ থেকে—বিশেষতঃ যতীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। আমরা পেয়েছিলাম অনাদিনাথের কাছ থেকে। সেই অনাদিনাথের মুখে যে গানটি সুরেশ বাবু দিয়েছেন, সে গানটি অনাদিনাথেরই।

বাউল

এসো হে পিওন সখা।
তোমার ঐ রূপে দেও দেখা।
তোমার কাঁধে শোভে চামড়ার ব্যাগ হে
তায় ঝম্-ঝম্ কেবল বাজে টাকা।
ঐ রূপে দেও দেখা॥
তোমার পায়ে শোভে নাগরার জুতো হে
তার আগা-গোড়া কাদা মাখা।
ঐ রূপে দেও দেখা॥ ইত্যাদি

অনাদিনাথ মুখে মুখেই এই সব গান রচনা করতো, ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা পদ্ধতি, কথক ঠাকুরের ভঙ্গী, যাত্রার দলের মাত্রাহীন অভিনয়—এ সব অনাদিনাথ হুবহু অনুকরণ করতো। ব্রাহ্ম সমাজের প্যারডি—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পর্যন্ত সানন্দে শুনতেন। তার মধ্যে অবজ্ঞার ভাব কিছু থাকতো না। উপাসনায় পর আচার্যের মতো গম্ভীর ভাবে বলতেন, 'সঙ্গীত ৩৭২ পৃষ্ঠা'। তখন আমি আর যতী—এক জন মেয়েলি সুরে, অপর জন বাজখাঁই সুরে গান ধরতাম

বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি।

সুরেশ বাবুও অনাদিনাথের পরিহাস-রসিকতায় মুগ্ধ হতেন।

আমার সঙ্গে সুরেশ বাবুর খুব সৌহার্দ্য ছিল—সেটা আরও বেড়েছিল একটি ঘটনায়, তারই উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করি। রামানন্দ ভারতী এক জন সন্ন্যাসী। পূর্বাশ্রমে তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম এবং তাঁর নাম ছিল রামকুমার বিদ্যারত্ন। কবি-অধ্যাপক সুরেন মৈত্র তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। পণ্ডিত লোক—সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয় ভ্রমণ করে তিনি 'হিমারণ্য' নাম দিয়ে এক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখেন। আমি পুরীতে সমুদ্রকূলে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই এবং সাহিত্যের জন্য ঐ হিমারণ্য তাঁর কাছ থেকে নিয়ে আসি। সাহিত্যে ধারাবাহিক ভাবে এই হিমারণ্য যখন প্রকাশিত হয়, তখন অনেকের নিকট ইহা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। এই কারণে সুরেশ বাবু আমার উপর খুব প্রসন্ন ছিলেন। 'হিমারণ্যের' মতো সরস ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বেশী নেই।

ভারতী মশায় একবার ব্যারাকপুর এসে ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে কিছু দিন বাস করেছিলেন। সুরেশ বাবুর উদ্যোগে আমরা উভয়ে আজ-যাই, কাল-যাই করে এক দিন তাঁর দর্শনে যাত্রা করলাম। স্বামীজী সকলকে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। আমরা যাবা মাত্র তিনি তাঁর নেপালী ঠাকুর দেবীকে (পুং) বললেন আমাদের খাবার দিতে। দেবী প্রথমে বললো, 'কিছুই ত নেই।' তার পর স্বামীজী বললেন, 'কেন, আমি যে রাখতে বলে দিয়েছিলাম?' তখন দেবী বললো, 'সে তো খোকন বাবুর জন্যে'।

স্বামীজী বললেন, 'এই তো খগেন বাবু রে।'

দেবী একখানি পরিষ্কার নেকড়ায় বাঁধা কয়েকটি কানাইবাঁশী কলা নেংড়া আম ও সন্দেশ আমাদের দিল।

আমরা খেয়ে-দেয়ে আবার ট্রেণে ফিরলাম। সুরেশ বাবু খু[ব] গম্ভীর। বললেন, 'আপনি স্বামীজীকে খবর দিয়েছিলেন?'

আমি বললাম 'না তো।'

সুরেশ বাবু—'খাবার রেখে দিয়েছেন আপনার জন্যে, আ[র] আপনি বলছেন খবর দেননি! আপনি এর আগে ক[খনও] এসেছিলেন?'

আমি—'এই ত প্রথম। ব্যারাকপুরে এর পূর্বে কখনও আ[সা] তো ঘটেনি।'

বুঝলাম, সুরেশ বাবু সাধু-সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বা[স] করেন না। আমার কথায়ও সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন কর[তে] পারলেন না।

আমাদের সেই কামরায় আসছিলেন এক জন উদাসী-গোছে[র] ভদ্রলোক। উসকো-খুসকো চুল, দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকা। তি[নি] অনেকক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললেন, 'আপন[ার] উপর কোনও সাধুর নজর পড়েছে।'

সুরেশ বাবু চমকে উঠলেন। ভদ্রলোক আমাদের কথোপকথ[ন] কিছুই শুনতে পাননি। খানিকটা দূরে একখানি বেঞ্চি[তে] বসেছিলেন।

আমরা উভয়েই সেই শ্যামায়মানা সন্ধ্যার অন্ধকারে অসমা[প্ত] এক রহস্যের চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলাম।

সেক্সপীয়র

উইলিয়াম সেক্সপীয়রকে নিয়ে গবেষকরা বহু বিনিদ্র রজনী তপ্ত-মস্তিষ্কে কাটিয়েছেন। আর যারা সাহিত্য-রসপিপাসু তারা তাঁর নাটক ও কবিতা নিয়ে নিজেদের মনের ক্ষুধা মিটিয়েছেন। আমরা যারা সেক্সপীয়রের পরবর্ত্তী যুগের মানুষ, যারা তাঁকে দেখিনি, তাদের যে সেই অসামান্য মানুষটি সম্বন্ধে আরো জানবার কৌতূহল থাকবে তাতে সন্দেহ কি? যদিও সেক্সপীয়র সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট জানতে পারিনি তথাপি যতটুক জানা গেছে তাঁর পরিচয়, তাতে অন্ততঃ এ সন্দেহের অবকাশ নেই যে উইলিয়াম সেক্সপীয়র তৎকালের কোন সার্থক-সাহিত্যিকের ছদ্মনাম।

লেখাপড়া যা শিখেছিলেন, তার দ্বারা অত বড়ো সাহিত্যিক হবার যোগ্যতা তিনি পাননি। ষ্ট্রাটফোর্ডের এক মধ্যবিত্ত ঘরে তিনি জন্মেছিলেন। আঠারো বছর বয়সে সাত বছরের বড়ো এক মহিলাকে বিবাহ করে তিনি তিনটি সন্তানের পিতা হন। এই সময় পিতার আর্থিক অবস্থা পড়ন্তির মুখে যাওয়ায় সেক্সপীয়র বাইশ-তেইশ বছর বয়সে লণ্ডনে আসেন ভাগ্য-অন্বেষণে। এই সময় বেশ কিছু দিন ধরে তিনি নানা কূলে জীবন-তরী ভিড়িয়েছিলেন। সেক্সপীয়রের সেই অজ্ঞাতবাস নিয়ে গবেষকরা বহু অনুসন্ধান চালিয়েছেন। কিন্তু এটুকু নিশ্চিত যে, এই সময়েই তিনি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। রঙ্গমঞ্চ এবং তার অন্তরালে যে জীবন কলংকে মহিমায় নিয়ত আবর্তিত তার আবর্তে তিনি নিজের গা ভাসিয়েছিলেন কিন্তু আত্মহারা হননি। সেই অভিজ্ঞতা এক দিকে তাঁকে সফল নট হবার সুযোগ দেয়, অপর দিকে নাট্যকারের মৌলগুণ আরোপিত করে তার মনে। খোলা চোখ এবং প্রখর ধীসম্পন্ন মন নিয়ে যে মানুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তাঁর সাফল্য সুনিশ্চিত। আর তার প্রমাণ শত বার করে সেক্সপীয়রের জীবনে।

সেক্সপীয়র ইংলণ্ডের এক স্বর্ণযুগে জন্মেছিলেন। লণ্ডনে থেকে তিনি সেই যুগের অমৃত পান করেছিলেন আকণ্ঠ। মিলিত হয়েছিলেন ধীমানদের সঙ্গে, দেখেছিলেন ইংলণ্ডের বিক্রম ধীরে ধীরে বাড়ছে। রাজনৈতিক চক্রান্ত ও হত্যা তাঁর চোখের উপর সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং তিনি যে শক্তিশালী লেখনী ধরবেন এ তো অবশ্যম্ভাবী। স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরীর হত্যার ঘটনা তাঁর লণ্ডন-বাসের দ্বিতীয় বছরের গোড়ায় ঘটেছিল। তার পর স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ। এলিজাবেথের মৃত্যু। এই হোল সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক পট-ভূমিকা। তা ভিন্ন তখন ইংল্যাণ্ডের আকাশে শত তারকা। ড্রেক, আর্ল অফ ডরসেট, র‍্যালে, এসেক্স, আর্ল অফ সাদেম্পটন, স্পেনসার, কামডেন, পীল, লজ, কিড, চ্যাপম্যান, ড্রেটন, ন্যাস, ওয়েবষ্টার, বেন জনসন প্রমুখ আরো কত জন।

এই স্বর্ণযুগের ফসল কুড়িয়েছিলেন তিনি। তার অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যও তিনি রেখে গেছেন ভাবী কালের জন্য।

বহু অর্থের মালিক হয়ে সেক্সপীয়র শেষে ষ্ট্রাটফোর্ডে ফিরে যান। জীবনের শেষ কুড়ি বছর নিজের দেশে তিনি বড়লোকের মত বেঁচেছিলেন।

বাহান্ন বছর বয়সে সেক্সপীয়র লোকান্তরিত হন। সেদিন ষোলোশো ষোলো সালের তেইশে এপ্রিল। সেই দিন থেকে নিজের দেশের গীর্জার সমাধি-ভূমিতে তিনি শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন।

আর সারা পৃথিবীর মানুষ সেই এ্যাভনের ধারে ষ্ট্রাটফোর্ডে তীর্থযাত্রা করছে। ভৌগোলিক সীমারেখা তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি—তাঁর মত মানুষকে কোন কালে পারে না।

কিঙ্ লীয়রের প্রচ্ছদপট

সেক্সপীয়রের নাটক ও অন্যান্য রচনা সমূহ আদপে সেক্সপীয়রের লেখা, না অন্য কোন প্রতিভার বিকাশ—তা নিয়ে বহু গবেষণা চলে। এই দুষ্প্রাপ্য ছবি দু'টি সেই ভ্রান্ত ধারণার সংশোধক। কিঙ্ লীয়র নাটকের প্রচ্ছদ ও উৎসর্গপত্র। প্রচ্ছদের চতুর্দ্দিকে সেক্সপীয়রের স্বাক্ষর ও উৎসর্গ-পত্রের হস্তলিপি ও স্বাক্ষর লক্ষ্যণীয়। ইতিহাসের স্বাক্ষর হয়ে আজও রক্ষিত আছে সেক্সপীয়র-সোসাইটির তত্ত্বাবধানে।

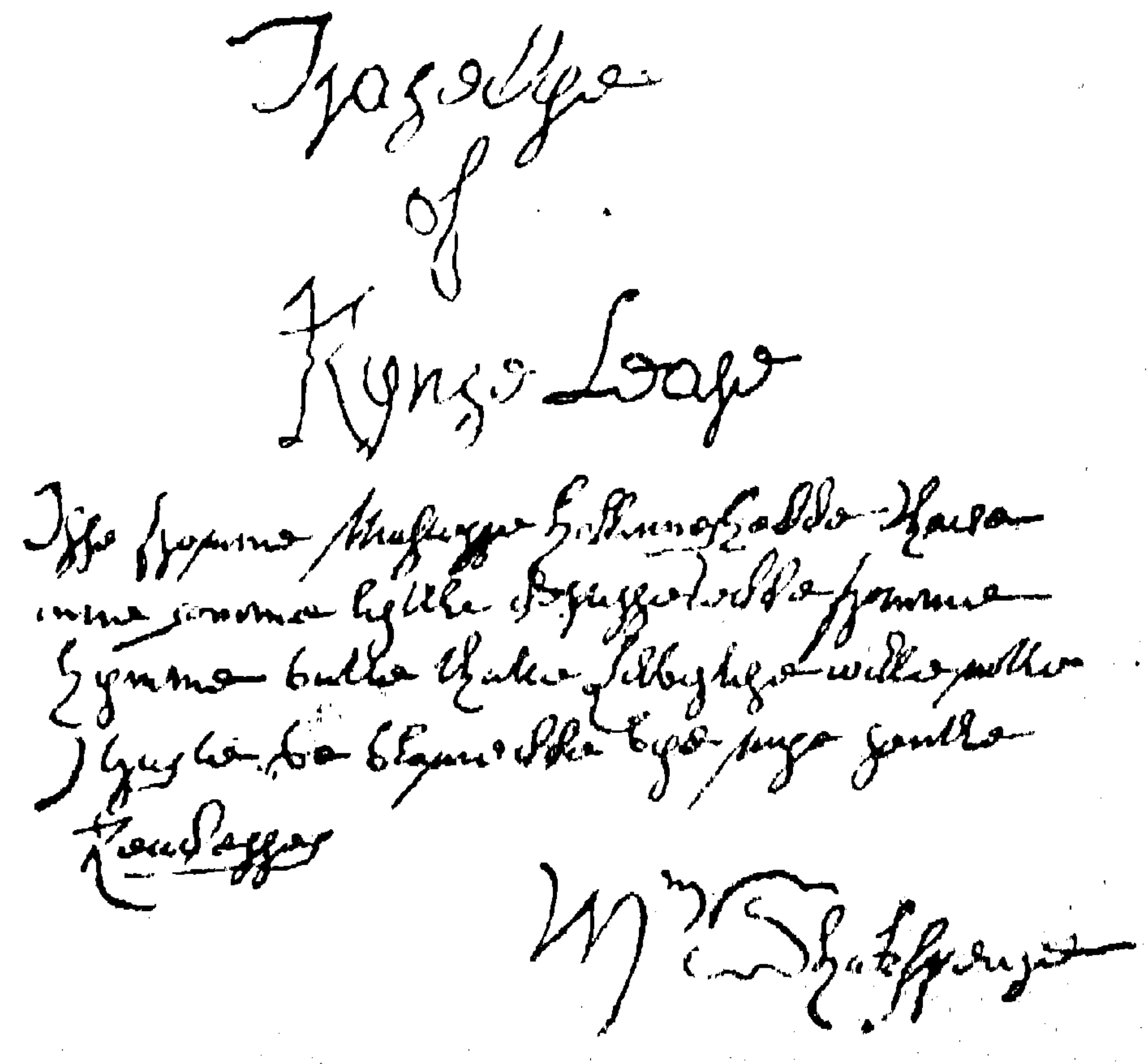

কিঙ্ লীয়রের উৎসর্গপত্র

সেক্সপীয়রের দেশে

অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ষ্ট্রাটফোর্ডের জীবনস্রোত শান্ত নদীধারার মতই নিরুচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হয়, কিন্তু এপ্রিলের সুরুতেই ব্যবসা-বাণিজ্য কেনা-বেচার উত্তেজনায় এই সুপ্রাচীন সহরটি সরগরম হয়ে ওঠে। বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই হোটেলগুলি ভর্ত্তি হয়ে যায়। সেক্সপীয়রের জন্মস্থান, তাঁর মা'র শৈশব কেটে ছিল যে কটেজে, কোন-দিনই যে টাকা আনতে পারবে না ঘরে সেই লোকটিই এক দিন টাকার মালিক হয়ে ফিরে এসে যে-সম্পত্তি ক্রয় করেছিল সেই বিষয়-সম্পত্তি দেখবার জন্য শিলিং দক্ষিণা দিয়েও স্থান-সংগ্রহের জন্য রেল-ষ্টেশনে রীতিমত ছুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি পড়ে যায়। বছরে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক দেখতে আসে এই স্থানটিকে এবং খুব কম করেও অন্ততঃ পক্ষে এর অর্দ্ধেক জন স্মৃতি থিয়েটারে একটি-না-একটি সেক্সপীয়রের নাটক অভিনয়ে উপস্থিত হয়ই।

ব্রিটেনে একমাত্র লণ্ডন ছাড়া পর্যটকদের এমন প্রিয় স্থান আর একটিও নেই। যুদ্ধের পর এই ছোট্ট সহরটি আজ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে নড়বড়ে 'সেক্সপীয়র হোটেলটি' আপাদ-মস্তক চুণকাম করার প্রথম সুযোগ পেয়েছিল। এখানে এখনও ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আছে, যুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডে যে সুবিধা আর কোথাও মেলে না।

সহরটি যেন আন্তর্জাতিক চৌমাথার মোড়ে: গত বছর বিদেশে পর্যটন ও বিদেশী মুদ্রা সম্বন্ধে যথেষ্ট কড়াকড়ি সত্ত্বেও তিপান্নটি বিভিন্ন দেশের লোক এসেছে ষ্ট্রাটফোর্ডে। সেক্সপীয়রের বাড়ীতে অতিথিদের যে নামের পুঁথি আছে তার পাশে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে গেলেই পর পর যাদের নামগুলি চোখে পড়বে তারা হলেন রউনের এক জন রাজপুরুষ, ইস্তাম্বুলের গবর্ণর, পেরুবাসী কূটনীতিজ্ঞ, মাথায় শ্বেত শিরোভূষণ ও ঢিলা আলখাল্লা গায়ে সুদানের পার্বত্য জাতির এক জন প্রধান সর্দার, এক দল ফিনিসীয় নট-নটী ও পেনসিলভিনিয়ার এক জন ব্যাংকার ও তাঁর স্ত্রী।

ছুটিতে সৈনিক আসে এখানে; আসে বহু ক্লাবের মেয়েরা এক দিনের জন্য পিকনিক করতে আর আসে ল্যাংকাশায়ারের মিল ও খনি থেকে পেশীবহুল শ্রমিকের দল। সহরের চারি দিকের সবুজের আস্তরণ বিছানো ময়দান খচিত হয়ে ওঠে সহস্র সহস্র তাঁবু আর পদচিহ্নে।

পয়সা খরচের উপযোগী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেরও অভাব নেই। চতুর ষ্ট্রাটফোর্ড-বাসিন্দারা তাদের সহরটিকে সত্যিই 'সেক্সপীয়র-অন-এ্যাভনে' পরিণত করেছে—নানা স্নানাগারের ব্যবস্থা করে পরিণত করেছে রাণী এলিজাবেথের 'মেরী ইংলণ্ডে'। এখানে নিভৃত নির্জন পথে সাপের মত আঁকা-বাঁকা গলি-ঘুপচি আর টিউডের যুগের কাঠের বাড়ীর ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলা যায়। সেক্সপীয়র যখন জন্মেছিলেন তখনই যাদের যথেষ্ট বয়স হয়েছিল তেমনি সব সময়ের পদচিহ্ন-মলিন কালচে ছাদের নীচে দিব্যি নিদ্রা দেওয়া যায় নিশ্চিন্ত আলস্যে।

সুদীর্ঘ আড়াইশ' বছর পরে ষ্ট্রাটফোর্ডের লোকেরা বুঝতে পেরেছে তাদের সহরের সেক্সপীয়র-মূল্য। সেক্সপীয়র যখন বেঁচে ছিলেন তখনই তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁকে সংশয়িত আশীর্বাদ বলে গণ্য করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর লোকগুলির অন্ধ-গোঁড়ামির দিকেই ঝোঁক ছিল বেশী থিয়েটার তাদের কাছে ছি নানা পাপের নরককুণ্ড বস্তুতঃ, ১৬২২ সালে নাট কারের মৃত্যুর মাত্র ছ'বছর পরে তাঁর পুরোন বন্ধুরা রাজার বিশে অনুমতি নিয়ে নাটক অভিনয় করতে ষ্ট্রাটফোর্ড এলে নগ প্রধানেরা তাদের ছ'শিলিংএর একটি পার্স উপঢৌকন দি অভিনয় না করার অনুরোধ জানিয়েছিল।

তার পর দেড়শ' বছর ষ্ট্রাটফোর্ড সম্বন্ধে কোন প্রকার ঔৎসু দেখিয়েছে তারা হলেন অনুসন্ধানী স্কলাররা—যারা মাঝে-মা আনাগোণা করতেন সেখানে। ক্রমশঃ এই সংখ্যা বাড়তে লাগ এবং ১৭৬৯ সালে হোয়াইট লায়নের জমিদার তার জমিদার সকলকে সেক্সপীয়রের বার্ষিকী উৎসবে মিলিত করতে সম হয়েছিলেন ষ্ট্রাটফোর্ডে। বিখ্যাত নট গ্যারিক তাঁর সাঙ্গোপ নিয়ে এলেন লণ্ডন থেকে এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে এঁরা এসে সহরের প্রধানদেরও চিত্ত জয় করলেন। তার পর হোল তোপধ্বনি সহকারে উৎসব, খানা-পিনা, বাজী-পোড়া সবই ছিল উৎসবে—ছিল না শুধু একটি জিনিষ—। ছিল সেক্সপীয়রের নাটক অভিনয়ের কোন ব্যবস্থা।

একটি শতাব্দী এই ভাবে গ্যারিক-প্রদর্শিত পথে বার্ষিক উৎ চলল। স্থানীয় ব্যবসাদাররা বছরের একটি সময় বহু জন-সমাগ পকেট-ভরানোর সুযোগ পেলে, কিন্তু সহরটির ভাগ্যে তখনও লেখা ছিল চিরকাল বৃহৎ নীরস গ্রাম হয়ে থাকা।'

কিন্তু এই দুর্ভাগ্য থেকে ষ্ট্রাটফোর্ডকে উদ্ধার করেছে শ্মশ্রুমণ্ডি এক দৈত্যকায় মদওয়ালা—নাম তার চার্লস এডোয়ার্ড ফ্লাওয়া ১৮৭০ সালে স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণের প্রশ্ন গুরুতর হয়ে উঠল। চা চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে মত দিলেন: 'সেক্সপীয়রকে বল তার নাটককেই বোঝায়। স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ করতেই যদি তবে সে হবে একটি রঙ্গালয়, যেখানে লোকেরা এসে তাঁর না অভিনয় দেখতে পারবে।

একটি রঙ্গালয়ের জন্য তিনি ইংলণ্ডবাসিগণের কাছে আবে জানালেন। কিন্তু লণ্ডনের খবরের কাগজগুলি আর পলিতকেশ তার এই পরিকল্পনাকে নির্ম্মম উপহাসের দ্বারা জর্জ্জরিত করতে লাগ 'এ পরিকল্পনা এত বড় মনীষীর প্রতি, জাতীয় সম্মান প্রদর্শ এক হাস্যকর প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়।' তাদের বক্তব্য—বৃ সংস্কৃতির লীলাভূমি লণ্ডনই তার উপযুক্ত স্থান। ষ্ট্রাটফো তারা প্যানসে পরিত্যক্ত গ্রাম আর সেখানকার অধিবাসীদের ' নয়' বলে টিটকারি দিতে লাগল।

কিন্তু ফ্লাওয়ারও প্রতিগর্জ্জন করে উঠলেন—'আমরা তি বছর ধরে 'কেউ কেটা-দের দ্বারা উল্লেখযোগ্য কিছু হবার আশায় চা পাখীর মত চেয়ে আছি। কিন্তু এবার এই 'কেউ নয়'রাই করতে পারে দেখাব।'

ফ্লাওয়ার নদীর ধারে দু'একর জমি দিলেন। কিন্তু সারা ইং মাত্র এক হাজার পাউণ্ড সংগৃহীত হোল। পরিকল্পনাটিকে সম করতে লেগেছিল কুড়ি হাজার পাউণ্ড এবং সে সব টাকাটাই ফ্লাও দিয়েছেন নিজের পকেট থেকে। ফ্লাওয়ারের কোন ছেলেপুলে ছিল স্বামি-স্ত্রী তাঁদের সম্পত্তির মোটা অংশই রঙ্গালয় চালানোর জন্য তাঁ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেক্সপীয়র স্মৃতি-সংসদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন

১৮৭৯ সালের এপ্রিল মাসে যেদিন লণ্ডনের একটি কম্পানী কর্তৃক 'মাচ এ্যাডো এবাউট নাথিং' বইখানি অভিনয়ের জন্য সর্বপ্রথম প্রেক্ষা-গৃহের যবনিকা উত্তোলিত হোল, সেদিন রঙ্গালয়টিকে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন একটি অশুভ শ্বেতহস্তীর মত। এমন কি উৎসব-সপ্তাহের দিনগুলিতেও রঙ্গালয়ের আটশ' পঞ্চাশটি আসনের বেশীর ভাগই শূন্য পড়েছিল।

ফ্লাওয়ার তখন ফ্র্যাঙ্ক বেনসেন আর তার দলের সঙ্গে চুক্তি করলেন। বেনসেনকে আবিষ্কার করেছেন এ্যালেন টেরী আর হেনরী আর্ভিং। তখনও তিনি অক্সফোর্ডের ছাত্র। বেনসেন হোল সেই দলের যারা বিশ্বাস করেন যে থিয়েটার শুধু লণ্ডনের অভিজাত সম্প্রদায়ের একচেটিয়া নয়—থিয়েটার জনসাধারণেরও। তিনি এই মতবাদকে কাজে পরিণত করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেলেন।

ইংলণ্ডের থিয়েটারের হৃৎপিণ্ড হবে ষ্ট্রাটফোর্ড। এই মহান্ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে বেনসেন অভিনয়-কৃতিত্বের দ্বারা যেমন, তেমনি স্বকীয় ব্যক্তিত্বের চুম্বকাকর্ষণে সারা ইংলণ্ডের জনসাধারণকে নিয়ে আসতে লাগলেন এ্যাভনের তীরের ছোট্ট সহরটিতে। থিয়েটারের জনপ্রিয়তা এমন বেড়ে গেল যে উৎসব-সপ্তাহকে এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন সপ্তাহে বাড়িয়ে দেওয়ার দাবী উঠতে লাগল। এখন তাই ছয় মাস ধরে উৎসব চলে—দু'শো বার অভিনয় দেখান হয়। নব-নির্মিত রঙ্গালয়ে বারশো দর্শকের আসন-ব্যবস্থা সত্ত্বেও শুধু দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখার জন্যই বহু টাকার টিকিট বিক্রী হয়। বেনসেন প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে অপ্রতিহত ভাবে ষ্ট্রাটফোর্ডে তাঁর রাজত্ব চালিয়েছেন। এই অখ্যাত নগরী আর তার রঙ্গালয়ের নাম আজ সারা জগতের লোকের মুখে-মুখে।

১৮৯২ সালে চার্লস ফ্লাওয়ার ইহলোক ত্যাগ করেন। জীবনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে শেষ কুড়িটি বছর অতি কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনা করতে হয়েছে তাকে। চার্লসের মৃত্যুর পর সে-দায়িত্ব এসে বর্তাল তার দশ ছেলের উপর। ছেলেদের মধ্যে সব চেয়ে নাম-করা হোল আর্কিব্যাল্ড ডেনিস ফ্লাওয়ার।

১৯২৬ সালে থিয়েটারটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনার কথা শুনে আর্কিব্যাল্ড বললেন—'যাক। ভালই হোল। থিয়েটারটিকে বড় করার সময় অনেক দিন হয়ে গেছে।' তাই বলে থিয়েটারটি বন্ধ রইল না—স্থানীয় বায়স্কোপ-হলে অভিনয় দেখান চলতে লাগল।

টাকা তোলার জন্য তিনি আর তার স্ত্রী আমেরিকা ভ্রমণে গেলেন—স্মৃতি-সংসদ কি করছে এবং কি করতে চায় বুঝিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন সারা আমেরিকায়। প্রায় দু'হাজার দাতা সেক্সপীয়র-প্রতিষ্ঠানের হাত দিয়ে ছ'লক্ষ ডলার প্রদান করল তাঁকে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকেও যে দান এল তার পরিমাণও দশ লক্ষ ডলার। এতেই নতুন থিয়েটার তৈরী করার খরচ উঠে গেল—পুরান ধ্বংসাবশেষের সমাধির উপর রচিত হোল নতুন স্মৃতি-মন্দির।

সেক্সপীয়রের স্মৃতি-সংসদের প্রতীক হোল একটি ফুল। এখন এই ফুলের সংখ্যা সাতটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৩০ সালে আর্কিব্যাল্ড ফ্লাওয়ারকে নাইট উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে—গত বছর তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর পুত্র কর্ণেল ফোর্ডহাম ফ্লাওয়ারের এ্যাভনের তীরে একটি সেক্সপীয়র-বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার বাসনা আছে। যেখানে সারা পৃথিবীর শিক্ষার্থী এসে নাটক অভিনয়, অভিনয় পরিচালনা, নাটক রচনা শিক্ষা করবে।

যে ছ'মাস ষ্ট্রাটফোর্ড শীতের ঘুম ঘুমায় না তখন এর কাজ হোল শুধু পান, আহার আর সেক্সপীয়রকে নিয়ে গল্প-গুজব করা। আজ যখনই কোন বিপদ মুখ ভ্যাঙচায় এই পবিত্র সংসদকে অমনি ষ্ট্রাটফোর্ডের কৃষক আর দোকানীরা সংসদের পিছনে এসে দাঁড়ায়।

যেদিন থেকে চার্লস ফ্লাওয়ার তন্দ্রাতুর ষ্ট্রাটফোর্ডবাসীদের ঘুম ভাঙ্গিয়েছেন সেদিন থেকেই সুরু হয়েছে নতুন সংগঠনের পালা। ঘর-বাড়ী, দোকান আর রেঁস্তোরার রং-চটা কুৎসিত পলেস্তারা দেওয়া সম্মুখ ভাগ ধ্বসিয়ে সেই সেক্সপীয়রের দিনের মত সুন্দর কাঠের পুরোভাগ রচনা করা হয়েছে। অগ্নিকুণ্ডের চারি ধারে কাবার্ডে; করিডরের গায়ে সেই এলিজাবেথের দিনের সুশ্রী সুষমা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। প্রায় সোত্তর বছর ধরে তারা সেক্সপীয়রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি গৃহ, স্মৃতি যক্ষের ধনের মত আগলে রেখেছে। কিন্তু আজ সারা সহরটিই যেন সেক্সপীয়রের জীবন্ত স্মৃতি-সৌধ। ষ্ট্রাটফোর্ডের প্রতিটি লোকের সঙ্গে সারা পৃথিবীর অগুণতি সেক্সপীয়র-পাগল লোকেরাও ষ্ট্রাটফোর্ডের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার।

একটি সকাল

অতীন্দ্র রায়

মেঘের শাদায়, আকাশের নীলে গলাগলি,
গাছের পাতায়, হাল্‌কা হাওয়ায় বলাবলি
কতো কী সে কথা এতো ফিসফাস এতো গোপনের—
বসে ভাবি মনে তাই আনমনে—সবুজ-বনের!
শীতের সকাল, হিমেলা সকাল আলো ঝিলমিল,
ধূসর আকাশ, ধূসর পৃথিবী মৌন :—শিথিল
কুয়াশা এখানে, মেঘেরা ওখানে ঘোমটা দিয়ে
উধাও সবুজ পৃথিবী, নীলাভ আকাশ নিয়ে।
মনে হয় যেন এসে গেছি কোনো পরীর দেশে
পায়রার মতো আলগা ডানায় আজকে ভেসে,

স্বপ্নের ঘোরে, তন্দ্রার ফাঁকে পার কখন
এসেচি জানি না হয়ে সমুদ্র-পাহাড়-বন।
রূপকথা-গল্পের এটাই কী স্বপন-পুর?—
ভাবি মনে মনে এলাম যখন অনেক দূর!
এদিক্ ওদিক্ যতো দূর চোখ যায় তাকাই,
কোথায় রাজ-প্রাসাদ?—ধোঁয়া শুধু দেখতে পাই?
এতো কষ্ট সে আমার হবে কী তবে বিফল?—
চলি আর ভাবি পক্ষিরাজের লাগামে চঞ্চল।
কোথায় সে গাছ বুড়ো শুক-শারী যেখানে থাকে,
রাজকুমারীর খোঁজ তারা বলে দেবে আমাকে?—

যুদ্ধের শত্রু চার্চিল

ফ্রেড লংডেন

বর্তমান যুগে বিশ্ব-শান্তির প্রধান অন্তরায় মিঃ উইনষ্টন চার্চিল। চার্চিলের মত প্রথম শ্রেণীর নির্লজ্জ দুর্মুখ এবং মেহনতকারী মানুষের পয়লা নম্বরের শত্রু এ যুগে আর দ্বিতীয়টি নেই। এ শুধু আমার একার কথা নয়। আমি জানি, বিশ্বের অধিকাংশ নরনারীই আমার এই বক্তব্য সমর্থন করবেন।

চার্চিলের সারা জীবনের কু-কীর্তির বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে দু'হাজার পৃষ্ঠার একখানা বই লিখতে হয়, কিন্তু মাসিক পত্রিকায় স্থানাভাব, তাই সংক্ষেপে তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

১৯১০ সালে চার্চিলের "বিশেষ ভাবে শিক্ষিত" পুলিশ সাউথ ওয়েলস্‌এর খনি-শ্রমিকদের একবারে তচনচ করে দেয়। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে খনি-শ্রমিকদের জীবন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। রাস্তা-ঘাটে পুলিশের মার-খাওয়া শ্রমিকদের রক্তাক্ত কলেবরে আর্তনাদ করতে শোনা যেত। ক্রমাগত তাদের সেই করুণ আর্তনাদ শুনতে শুনতে পাশের গ্রামের অধিবাসীরা পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন।

১৯১১ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারে এবং ইয়র্কশায়ারে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। পুলিশ দু'জন শ্রমিককে হত্যা করে এবং ২৫ জনকে জখম করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিলাতের খনি-শ্রমিকদের জব্দ করবার জন্য জার্মাণী থেকে পর্যন্ত কয়লা আমদানী করা হতে থাকে। খনির মালিকরা জনসাধারণকে বলেছিল, "জার্মাণী যখন আপনাদের শত্রু ছিল, তখন জার্মাণদের আপনারা খেতে দেননি, কাজেই খনি-শ্রমিকদেরই বা আপনারা খেতে দেবেন কেন?" বলা বাহুল্য, চার্চিল মালিকদের সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিলেন।

নারী ভোটাধিকার আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারিণী মহীয়সী বীরাঙ্গনাদের উপর চার্চিল এবং তাঁর দালালরা যে কুৎসিত এবং নৃশংস ব্যবহার করেছিলেন, ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

হোয়াইটহ্যাভো খনিতে এক বার বহু শ্রমিক মাটি চাপা পড়ে জীবন্ত সমাধিস্থ হন। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী খনির মালিকদের চার্চিল সর্বতোভাবে রক্ষা করেছিলেন।

১৯২৬ সালে চার্চিল যখন ইংল্যাণ্ডকে স্বর্ণমানের বাহিরে নিয়ে যান, তখন সারা দেশব্যাপী এক ধর্মঘট হয়। মূল্যহ্রাসের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের বেতন শতকরা দশ ভাগ কমান হয়। খনি-শ্রমিকরা বেতন-হ্রাসে আপত্তি করে ধর্মঘট করে। ট্রেড ইউনিয়ন তাদের উৎসাহ দেয়। শ্রমিকদের বিরুদ্ধে চার্চিল তখন পূর্ণমাত্রায় লড়াইয়ের ভিত্তিতে সৈন্য সংগঠন করে। শ্রমিকদের আতঙ্কগ্রস্ত করার জন্য বিরাট ট্যাঙ্ক, বেয়নেট এবং বল কার্তুজের সমাবেশ করা হয়। চার্চিলের দপ্তর থেকে প্রকাশিত কুখ্যাত বৃটিশ গেজেটে মিথ্যা প্রচার করা হত যে, "ওটা ধর্মঘট নয় বিপ্লব।"

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সেনাবাহিনী ভাঙ্গবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চার্চিল অসমর্থ হন। কেম্পটন পার্কে সৈনিকরা ধর্মঘট করে সরকারের দালালী করতে অস্বীকার করে। তখন অন্য এক সেনাবাহিনীর দ্বারা তাদের ঘেরাও করে গ্রেপ্তার করা হয়।

সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে চার্চিলের রাগ সব চেয়ে বেশী। গত মহাযুদ্ধের পর প্রথম যখন সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন চার্চিল এই রাষ্ট্রটিকে অঙ্কুরে বিনাশ করবার জন্য সাসেক্স রেজিমেণ্টকে রুশিয়া অভিমুখে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এই রেজিমেণ্টের সৈনিক মুরমনস্কে নামতে অস্বীকার করে। তখন দাস-মনোবৃত্তিসম্পন্ন সৈনিকদের দ্বারা তাদের ঘেরাও করে মেসিন গান এবং বেয়নেট চালান হয়। ঠিক এর পরই চার্চিল বিভিন্ন রেজিমেণ্টের কাছে এক সার্কুলার দিয়ে জানতে চাইলেন: (১) ধর্মঘট ভাঙতে কোন কোন বাহিনী রাজী আছে; (২) কোন কোন বাহিনী রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছে; (৩) ট্রেড ইউনিয়নের কোন ধরণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন।

চার্চিলের রুশ অভিযানের দুঃসাহসিক অপকর্মের জন্য ব্রিটেনের রাজকোষ থেকে প্রায় ১০ কোটি পাউণ্ড ব্যয় হয়েছিল। তাছাড়া বহু ব্রিটেন এবং রুশের রক্ত-বন্যায় স্নান করে তবে চার্চিলের রক্ত পিপাসার কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হয়।

আয়ার্ল্যাণ্ডের নাজি-ভক্ত ব্ল্যাক এণ্ড ট্যান দলের বীভৎস কার্য্যকলাপ চার্চিল সমর্থন করতেন।

জাপানীরা যখন মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে সেখানকার নিরীহ মানুষদের নৃশংস ভাবে হত্যা করতে থাকে, তখন চার্চিল জাপানীদের সেই সভ্যকরণ-নীতির উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।

আবিসিনিয়ার উপর মুসোলিনী যখন বর্বর অভিযান সুরু করেছিলেন, তখন চার্চিল একটা মিটমাটের জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। ভূমধ্যসাগরে শান্তির খাতিরে ইঙ্গ-ইটালী বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তার খাতিরে আবিসিনিয়াকে ইটালীর হাতে তুলে দেবার জন্য কুখ্যাত লাভাল-হোর চুক্তি চার্চিলের আশীর্বাদ লাভ করেছিল। তিনি মুসোলিনী এবং তার শাসনের পরম ভক্ত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে চার্চিল বলেছিলেন, "আমি ইটালীতে থাকলে ফ্যাসীবাদ সমর্থন করতাম এবং লেনিনবাদের বর্বর ক্ষুধার বিরুদ্ধে ফ্যাসীবাদের সংগ্রামে যোগ দিতাম।" হিটলার সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "হিটলার অত্যন্ত দক্ষ এবং কর্মক্ষম ব্যক্তি। তাঁর আচার-ব্যবহার চমৎকার।" তিনি ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ ও বীভৎস

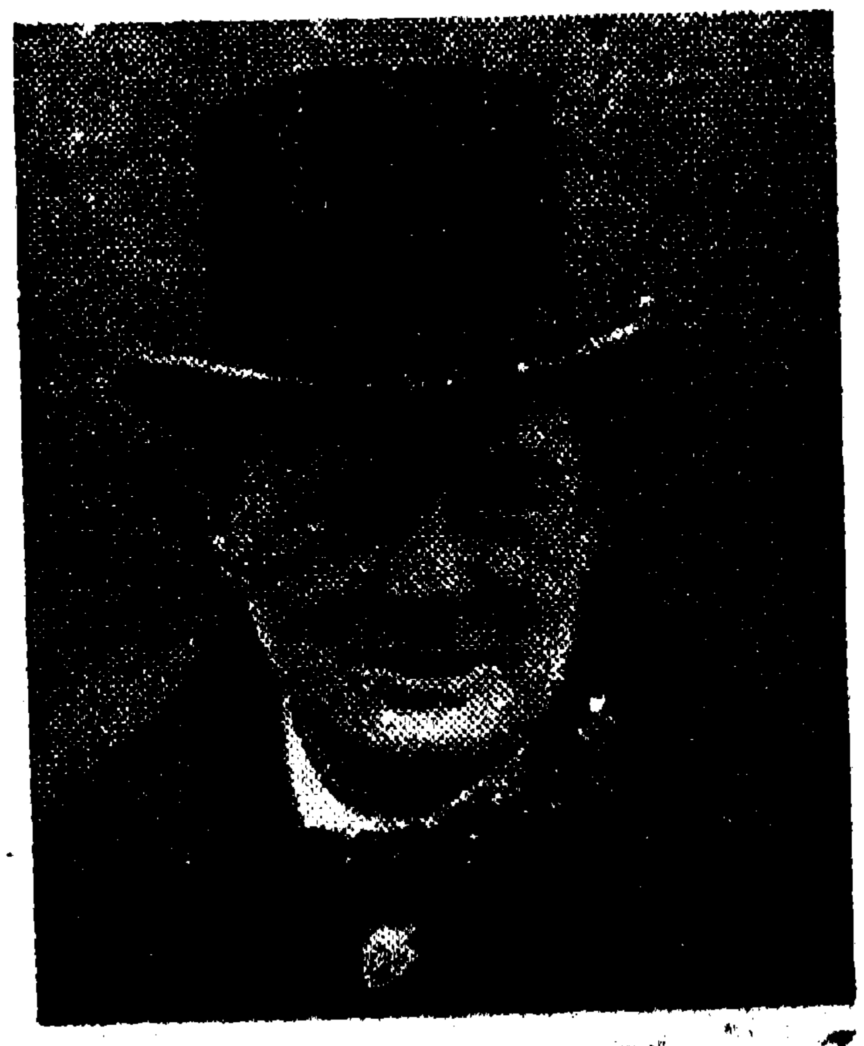

চার্চিল

তাণ্ডব সমর্থন করেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'রক্ষণশীল দলের অধিকাংশ সদস্যই জেনারেল ফ্রাঙ্কোর প্রশংসা করেন।"

এবারকার যুদ্ধের সময় তিনি গ্রীক রিজেণ্টকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, গ্রীসের রাজাকে গ্রীসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং 'এলাস' (E.L.A.S.) ও 'ইয়াম' (E.A.M.) এর গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের কিছুতেই গবর্ণমেণ্টে ঢুকতে দেওয়া হবে না। স্থির হয় যে, গ্রীক গবর্ণমেণ্ট থেকে উদারপন্থীদেরও তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আজ তাই আমরা গ্রীসে দেখাচ্ছি, হাজার হাজার নরনারী-শিশুকে গ্রীক গবর্ণমেণ্ট পাইকারী হারে হত্যা করে সারা বিশ্বের লোককে আতঙ্কগ্রস্ত করে দিয়েছেন। দেশভক্ত গ্রীক নরনারীর রক্তে আজ এথেন্সের রাজপথে জোয়ার নেমেছে। গ্রীক দক্ষিণপন্থী একনায়কত্বের পাশবিক তাণ্ডবলীলা আরও কত নরনারী ও শিশুর রক্ত পান করে যে শেষ হবে, তা একমাত্র ইঙ্গ-মার্কিণ চক্রান্তকারীরাই বলতে পারেন।

চার্চিল গান্ধীজীকে "উলঙ্গ ফকির" বলে উল্লেখ করতেন এবং গান্ধীজীকে "ধ্বংস" করবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

আজকের জগতে চার্চিলের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু দক্ষিণ আফ্রিকার ফিল্ড মার্শাল স্মাট্‌স্। এই লোকটির নির্লজ্জ বর্ণবিদ্বেষ সারা বিশ্বের সভ্য মানুষের ঘৃণার উদ্রেক করে, কিন্তু চার্চিলের আশীর্বাদ লাভে স্মাট্‌স্ কখনও বঞ্চিত হননি।

নিজামের মত মধ্যযুগীয় বর্বর নৃপতির পক্ষ নিয়ে এবং ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চার্চিল জন্তুবিশেষের মত যে রকম লম্ফ-ঝম্ফ করছেন, তাতে ভারতবাসীর কাছে তার পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন করে না।

এই সব ঘটনার পর চার্চিল যখন পশ্চিম-ইউরোপ ব্লক গঠনের জন্য উঠে-পড়ে লাগেন তখন স্বভাবতই মনে হয় যে, পশ্চিম-ইউরোপ ব্লক-গঠনের আসল উদ্দেশ্য আমেরিকার সঙ্গে চক্রান্ত করে পূর্ব ইউরোপের সর্বনাশ সাধনের আয়োজন করা।

চার্চিলের জীবনী রচনাকারী সেনকোর্ট চার্চিলের সম্বন্ধে বলেছেন, "চার্চিল যখন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং যখন ভাগ্য তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল, তখন তাঁর কথাবার্তা এবং কার্য্যকলাপ ছিল স্বেচ্ছাচারীর মত।"

অপর জীবনী-লেখক মার্টিন চার্চিলের সম্বন্ধে বলেছেন, "চার্চিল নির্বাচকমণ্ডলীর পরামর্শ নিয়ে কাজ করাকে সময় নষ্ট করা বলে মনে করতেন। তিনি মুসোলিনীর পদ্ধতি সমর্থন করতেন এবং মুসোলিনীকে প্রথম শ্রেণীর মাথাওয়ালা মহামানব বলে প্রশংসা করতেন।

সমাজতন্ত্রবাদকে চার্চিল চিরদিন "বর্বর ও ক্লীব" ভাবধারা বলে বর্ণনা করেছেন। এক যুগ আগে এই উদ্ধত স্বেচ্ছাচারী লোকটি বলেছিলেন, "জার্মাণ সমর-লিপ্সার অবসান হয়েছে, এখন বৃটিশ সভ্যতার প্রধান শত্রু লেবার পার্টি"। আজ লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসীন। চার্চিল হয়ত দেখে খুশী হয়েছেন যে, লেবার পার্টি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সারা বিশ্বে যথাযথ ভাবে কায়েম রাখার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করছেন না। মালয়, ব্রহ্ম, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া এবং বিশ্বের সর্বত্র 'লেবার' নামধারী তথাকথিত সমাজতন্ত্রবাদীরা যে নৃশংস পদ্ধতিতে মানুষের স্বাধীনতার আন্দোলনকে ধ্বংস করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে তাতে চার্চিলের মনে নিরানন্দ হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু তাতেও তিনি সন্তুষ্ট নন, তিনি সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে রাখতে চান, তাই আজও তিনি পার্লামেণ্টে বসেই লেবার পার্টিকে খিস্তির চূড়ান্ত করেন, কিন্তু লেবার পার্টির সদস্যরা এত হীনমন্যতায় ভুগছেন যে, তারা চার্চিলের খিস্তির জবাব দিতেও ভয় পান।

অনুবাদক—শ্রীসু…

হিন্দুধর্ম্ম

"যখন ধর্ম্মশূন্য সমাজের বিনাশ নিশ্চিত, যদি হিন্দুধর্ম্মের স্থান অধিকার করিবার শক্তি আর কোন ধর্ম্মেরই নাই, তখন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ভিন্ন হিন্দু সমাজের আর কি গতি আছে? তবে হিন্দুধর্ম্ম লইয়া একটা গণ্ডগোলে পড়িতে হইতেছে। আমরা দেখাইয়াছি যে, শাস্ত্রোক্ত যে ধর্ম্ম তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করিয়া কখন সমাজ চলিতে পারে না—এখনও চলিতেছে না এবং বোধ হয় কখন চলে নাই। তা ছাড়া একটা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম আছে, তৎকর্ত্তৃক শাস্ত্রের কতক বিধি রক্ষিত এবং কতক পরিত্যক্ত এবং অনেক অশাস্ত্রীয় আচার-ব্যবহার-বিধি তাহাতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের কি সপক্ষ কি বিপক্ষ সকলেই স্বীকার করেন যে, এই বিমিশ্র এবং কলুষিত হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা হিন্দু সমাজের উন্নতি হইতেছে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, যেটুকু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম, যেটুকু সার ভাগ, যেটুকু প্রকৃত ধর্ম্ম, সেইটুকু অনুসন্ধান করিয়া আমাদের স্থির করা উচিত। তাহাই জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করা উচিত। যাহা প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম নহে, যাহা কেবল অপবিত্র কলুষিত দেশাচার বা লোকাচার, ছদ্মবেশে ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, যাহা কেবল অলীক উপন্যাস, যাহা কেবল কাব্য, অথবা প্রত্নতত্ত্ব, যাহা কেবল ভণ্ড এবং স্বার্থপরদিগের স্বার্থসাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং অজ্ঞ ও নির্ব্বোধগণ কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যাহা কেবল বিজ্ঞান, অথবা ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিজ্ঞান, যাহা কেবল ইতিহাস, অথবা কেবল কল্পিত ইতিহাস, কেবল ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে বিন্যস্ত বা প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় ধর্ম্ম বলিয়া গণিত হইয়াছে, সে সকল এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয়, তাহাই ধর্ম্ম। এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব লইয়া সকল ধর্ম্মেরই সারভাগ গঠিত, এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্বসকল, সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মেই প্রবল। হিন্দুধর্ম্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ আছে, এরূপ আর কোন ধর্ম্মেরই নাই। সেইটুকু সার ভাগ। সেইটুকুই হিন্দুধর্ম্ম। সেটুকু ছাড়া আর যাহা থাকে—শাস্ত্রে থাকুক, অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক—তাহা অধর্ম্ম। যাহা ধর্ম্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য তাহা অধর্ম্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে থাকে বা বেদে থাকে, তবু অসত্য, অধর্ম্ম বলিয়া পরিহার্য্য।"

প্রচার, শ্রাবণ ১২৯১—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালা ভাষায় টেলিগ্রাফি

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

টেলিগ্রাফের ভাষা সেই চিরাচরিত ইংরেজী ভাষায় না লিখে যাঁ কেউ বাঙলা ভাষায় লেখেন? লেখকের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত তবে ভাষাতত্ত্ববিদের সাহায্য এ বিষয়ে অপরিহার্য্য। —মা, ব

কিছু কাল আগে পর্যন্ত ইংরাজীতে চিঠি লেখা একটা ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আজও দেখি, কোনো কোনো ইংরাজী-শিক্ষিত লোক আত্মীয়-স্বজনকে, বন্ধু-বান্ধবকে এমন কি বাবাকে পর্যন্ত ইংরাজীতে চিঠি লেখেন। বাঙ্গালা চিঠির গোড়ায় My dear এবং শেষে Yours-এর বাতিক এখনও কাটে নাই। তবে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে হেয়তা বোধ ক্রমশঃ কমিতেছে। যাঁহারা ইংরাজী জানেন তাঁহারাও বাঙ্গালীকে চিঠি লিখিতে হইলে মাঝে মাঝে বাঙ্গালায় লিখিতেছেন। মাতৃভাষার প্রতি এই করুণা বোধ যদি চিঠিপত্র পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া থাকে তো টেলিগ্রাফ পর্যন্ত আসিয়া উঠিতেছে না কেন? অথচ টেলিগ্রাফের ক্ষেত্রেই মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন সর্বাধিক। আমাদের দেশে বিবাহের অভিনন্দন অপেক্ষা মৃত্যু বা আসন্ন-মৃত্যুর সংবাদটাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে টেলিগ্রাফের সাহায্যে পাঠানো হইয়া থাকে। সহরে ইংরাজী-জানা লোক ততটা বিরল নয়। কিন্তু আমাদের এই দেশটায়—শুধু বাঙ্গালা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের কথা বলিতেছি—নাগরিক অপেক্ষা পল্লীবাসীর সংখ্যাই অধিক। পল্লীর লোকের পক্ষে, অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষে একটি টেলিগ্রাম পড়াইয়া লওয়া যে কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। একটি টেলিগ্রাম লিখাইয়া লইতে হইলেও সারাটা গ্রাম তোলপাড় করিতে হয়। গ্রামে কেন, নগরেও এমন ঘটনা নিত্য ঘটে। হয়তো গৃহকর্ত্তা গিয়াছেন আপিসে, বাড়ীতে গৃহিণী আছেন একলা, তিনি ইংরাজী জানেন না। পিওন টেলিগ্রাম লইয়া উপস্থিত হইল। টেলিগ্রামটা বাঙ্গালায় লেখা থাকিলে সংবাদটা তিনি নিজেই পড়িতে পারিতেন, কিন্তু ইংরাজীতে লিখিত বলিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য তাঁহাকে উৎকণ্ঠা দমন করিয়া রাখিতে হইবে, অথবা ইংরাজী জানা কোনো প্রতিবেশিনীর বাড়ী গিয়া টেলিগ্রামটি পড়াইয়া লইতে হইবে।

এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে এইরূপ অসহায়তা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। তবে এই অত্যাবশ্যক দৈনন্দিন ব্যাপারেও পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতেছি না কেন? এ প্রশ্নের, একমাত্র না হইলেও, প্রধান উত্তর—মুক্তি তো আমরা চাহিতেছি না।

বাঙ্গালায় টেলিগ্রাম আদান-প্রদানের আইনগত কোনো বাধা নাই। আমি যদি বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে কোন সংবাদ টেলিগ্রাফ করিতে চাই, তার-আপিস তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।

একটি মাত্র বাধা আছে। সে বাধা লিপির বাধা। যে মর্স-সংকেত (Morse code) সাহায্যে তার-বার্তা আদান-প্রদান হইয়া থাকে রোমান লিপিতে সে বার্তা লিখিত হওয়া আবশ্যক।

রোমান লিপিতে বাঙ্গালা ভাষা কিরূপে লেখা যায় তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি:

Mahendra,

Tar pailam. Sateroi Mangalber Bombay jaitechi. Tirishe phiribar pathe Nagpure namite pari. Bhabener sambad tar kario.

Suren.

মহেন্দ্র,

তার পাইলাম। সতেরোই মঙ্গলবার বোম্বাই যাইতেছি তিরিশে ফিরিবার পথে নাগপুরে নামিতে পারি। ভবেনের সংবাদ তার করিও।

সুরেন।

বলা যাইতে পারে, এরূপ লিপ্যন্তরণ নির্দোষ নহে। 'namite' শব্দটিকে যদি কেহ 'নামিতে' না পড়িয়া 'নামাইট' পড়ে তো দোষ দেওয়া যায় না। স্বীকার করি, পূর্বাপর পড়িলে ঠিক এই স্থানে এই কথাটিতে ভুল হইবে না। কিন্তু অন্যত্র ভুল হইতেও পারে। সত্য সত্যই এ রকম ঘটনা ঘটে। ট্রামে যাইতে যাইতে একটি প্রাচীর-পত্র নজরে পড়িল, PAPER PATHE; মনে মনে পড়িলাম, 'পেপার পেদ'। অবশ্য এক মুহূর্ত পরেই বুঝিলাম 'পাপের পথে'।

রোমান ২৬টি অক্ষর বাঙ্গালা সব কয়টি অক্ষরের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না। তাহার ফলে গণ্ডগোল ঘটে। অনেক সময় একই অক্ষরকে একাধিক ধ্বনির প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয়। যেমন—T দিয়া ট ও ত ধ্বনি প্রকাশ করা হয়; D দিয়া দ ড ও ড় ধ্বনি প্রকাশ করা হয়। আবার TH-এর দ্বারাও দ ধ্বনি প্রকাশিত হইয়া থাকে। থ বুঝাইবার জন্যও TH ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি বাঙ্গালা অক্ষর বুঝাইবার জন্য একটি করিয়া সুনির্দিষ্ট রোমান অক্ষর বা অক্ষর-সমষ্টি ব্যবহৃত হয় না বলিয়াই লিপ্যন্তরণে ত্রুটি ঘটে। আবার সেই ত্রুটির জন্য উচ্চারণেও বিকৃতি দেখা দেয়। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। কলিকাতা পশ্চিমা ভারতীয়দের মুখে উচ্চারিত হয় 'কলকাত্তা', ইংরেজ তাহাকে লিখিল Calcutta, আমরা তাহাকে নূতন করিয়া পড়িলাম 'ক্যালকাটা'। যে ছিল কলকাতা, রোমান হরফের খাল পার হইতে না হইতেই সে ক্যালকাটা বনিয়া গেল।

সাধারণ ক্ষেত্রে যদি এইরূপ বিপত্তি ঘটে, টেলিগ্রাফের ক্ষেত্রে সে বিপত্তি আরও গুরুতর হইতে পারে। সুতরাং এখানে লিপ্যন্তরণের যথাতথ্য সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হওয়া আবশ্যক। টেলিগ্রাফের জন্য বিজ্ঞানসম্মত লিপ্যন্তরণ-প্রণালী অবলম্বন করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ঐ প্রণালী অবলম্বিত হইলে তদনুসারে মর্স-সংকেতকে (Morse codej) ভারতীয় ভাষার জন্য কার্যোপযোগী করিয়া লওয়া কঠিন হইবে না। কি ভাবে তাহা করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান লেখক কিছু কাল যাবৎ সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। সে পরিকল্পনা সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে কি না এবং হইলে কবে হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা রোমান লিপিতে এবং বাঙ্গালা ভাষায় টেলিগ্রাম লিখিয়া পাঠানো আরম্ভ করি না কেন? তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য এই মুহূর্তেই সম্পূর্ণ সফল হইবে না সত্য, কিন্তু সিদ্ধির পথটা কিছু প্রশস্ত হইলেও হইতে পারে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের লোক টেলিগ্রাম আদান-প্রদান করিতে চাহে এটুকু পর্যন্ত সরকার জানুন। কোন্ উপায়ে জনসাধারণের সে আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ মিটিবে তাহা আবিষ্কার করিতে বিলম্ব হইবে না।

আব্রাহাম লিঙ্কন

শ্রীসজনীকান্ত দাস

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ক্রূর হিংসার হাতে মহত্ত্বের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে বারংবার। কয়েক জন মহামানবের মহৎ জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতি আমাদের স্মৃতিকে ইতিপূর্বেই যথেষ্ট ভারাক্রান্ত করিয়া লজ্জা ও কলঙ্কের কারণ হইয়াছিল। মানুষের কল্যাণের জন্য যুগে যুগে যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই হিংসা-কোলাহল-কলহ-মুখরিত পৃথিবীতে, হিংসার বন্যা রোধ করিবার জন্য তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দ্বিধাহীন অকুণ্ঠ চিত্তে আত্মবলি দিয়াছিলেন, তাঁহাদের আমরা সর্বদা শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করিলেও এ কথাটা কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে, এতগুলি শ্রেষ্ঠ মানুষের চরম আত্মনিবেদনও আমাদের হিংসা-উন্মত্ততা দূর করিতে পারে নাই, আমরা বার বার ভুল করিয়াছি। বার বার আঘাত হানিয়াছি সেই সমর্পিতপ্রাণ মানবসেবকদের বুকে, তবু আমাদের চৈতন্য হয় নাই। মহাজ্ঞানী সক্রেটিসকে আমরা বাধ্য করিয়াছি বিষপানে আত্মহত্যা করিতে, মহা বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসের মস্তক আমাদেরই তরবারির আঘাতে ছিন্ন হইয়াছে, মহাপ্রেমিক যীশুকে আমরা ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছি, মহামানবী জোয়ান অব আর্ককে আগুনে দগ্ধ করিয়া মারিয়াছি, মুক্তির মহাসৈনিক আব্রাহাম লিঙ্কনকে খুন করিয়াছি অতর্কিত গুলীর আঘাতে; তবু মানুষের জয়যাত্রার কাহিনী হইতে এই হীন হিংসার ভয়াবহ প্রভাব দূর করিতে পারি নাই। মানুষের সভ্যতার আপাতত শেষ অর্থাৎ বর্তমান অধ্যায়ও মাত্র সেদিন (গত ৩০শে জানুয়ারি) রক্তরঞ্জিত হইয়াছে, একাধারে হীনতম ও নিষ্ঠুরতম হিংসার আঘাতে—মহান্ আত্মা গান্ধীজীর প্রাণবায়ু যেদিন অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়াছে ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী নগরীর বুকের উপর। গত তিন হাজার বছরের ইতিহাসে একই নিষ্ঠুরতা বার বার অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া আমাদের কাহারো কাহারো মনে সন্দেহ জাগিতেছে, প্রেম ও হিংসার দ্বন্দ্বের শেষ কখনো হইবে না—আমাদের এই মর্ত্যধামে ভগবান ও শয়তানের লীলাভিনয় এমনি করিয়াই চলিতে থাকিবে অনন্ত কাল; হিংসোন্মত্ত পৃথিবী সাময়িক ভাবে শান্ত হইবে প্রেমের শীতল বারিসিঞ্চনে—একেবারে শান্ত হইবে না কোনো দিন। শান্ত হইবে না বলিয়াই সক্রেটিসের হত্যাকারীরা বাঁচিয়া থাকিবে আর্কিমিডিসের ঘাতকদের মধ্যে, আর্কিমিডিসের ঘাতকরা বাঁচিবে যীশুর ক্রুশবিদ্ধকারীদের মধ্যে, তাহারা বাঁচিবে জন্ উইল্‌কিস বুথের অন্তরে, বুথ বাঁচিবে গান্ধীজীর হত্যাকারীর মধ্যে। আমরা কোথা হইতে যে কোথায় গিয়া পৌঁছাইব, তাহা ভাবিতে গিয়া লজ্জাই পাইব মানুষের সভ্যতার ব্যর্থতা দেখিয়া। হিংসাকে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে পশু, তাহাকে মহাকালের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়া দিয়াও আমরা শেষ করিতে পারিলাম না, প্রেম ও করুণা সর্বব্যাপী হইতে পারিল না।

আজ আমরা এই মহাপুরুষ-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ ভাবে স্মরণ করিব আব্রাহাম লিঙ্কনকে—যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান তাঁহার সেই বিখ্যাত "ক্যাপটেন, মাই ক্যাপটেন" অর্থাৎ কর্ণধারের গান গাহিয়াছেন।

তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনের কাহিনী সর্বজনবিদিত। তিনি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি রবিবার ওহিওর এক গরীব চাষীর খামারে (রকস্প্রিং ফার্ম) খুঁটিবাঁধা কুটীরে (লগ কেবিন) জন্মিয়াছিলেন; তাঁহার পিতার নাম ছিল টমাস লিঙ্কন এবং মা ছিলেন ন্যান্সি হ্যাঙ্কস, তাঁহার জন্মের ১৮ দিনের মধ্যে ইলিনয় ভূখণ্ডের গ্রামগুলি এক হইয়াছিল। জীবনের প্রথম ১৯ বছর চাষের কাজে বাবাকে সাহায্য করা ছাড়া কিছুই তিনি করেন নাই, তাহার পর সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া যথাক্রমে কেরানী ও ভাণ্ডাররক্ষীর (ষ্টোর-কীপার) কাজ করিয়াছিলেন, ৯ বছর বয়সে ১৮১৮ সালে তিনি মাতৃহীন হইয়াছিলেন। ওই বছরেই ইলিনয় প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবার অধিকার পাইয়াছিল। উনিশ বছরে অর্থাৎ ১৮২৮ সালেই আব্রাহাম ঘর ছাড়িয়া যাত্রা করিয়াছিলেন নিউ অর্লিন্সের দিকে নৌকাতে। ১৮৩০-এর মার্চ মাসে লিঙ্কন-পরিবার ইলিনয় প্রদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ২১ বছরের আব্রাহাম স্বয়ং এখানেও খুঁটির কুটীর নির্মাণে তাঁহার পিতাকে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই কর্তব্যটি সম্পাদন করিয়া আব্রাহাম স্বাধীন ভাবে নিজের পরিশ্রমে জীবিকা অর্জনের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া স্রোতের শ্যাওলার মতো ভাসিতে ভাসিতে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাইশ বছর বয়সে নিউ সালেমে উপস্থিত হইয়া নিজেকে সাময়িক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কেরানীরূপে। এখানেই তিনি অবসর-সময়ে নিজেকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। আইন ও রাজনীতি ছিল তাঁহার বিশেষ অধ্যয়নের

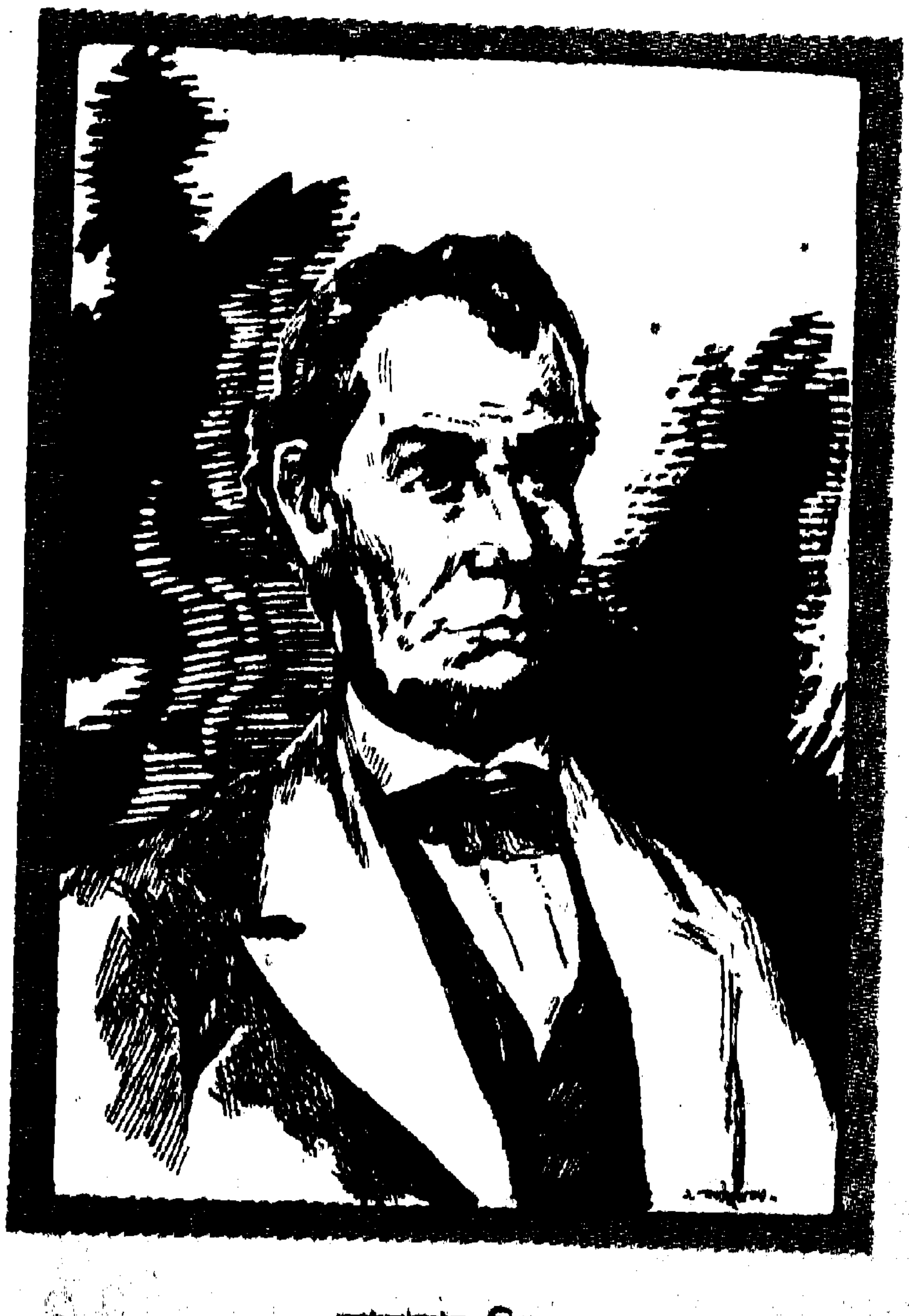

আব্রাহাম লিঙ্কন

বিষয়। পরের বছরেই তিনি নিজেকে এমনই তৈয়ারী মনে করিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রীয় পরিষদের নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। এই বছরেই তিনি রেড ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত ব্ল্যাক হক যুদ্ধে ক্যাপটেন হইয়া অভিযান করিয়াছিলেন এবং কথিত আছে যে এই একুশ দিনের সেনানায়কত্বের মধ্যে তিনি এক জনকেও হত্যা করিতে পারেন নাই সুতরাং সেখান হইতেও তাঁহাকে নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। ১৮৩৩ সালে তিনি শেষ পর্যন্ত নিউ সালেমের একটি ডাকঘরে পোষ্টমাষ্টারের পদ অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই পদে তিনি পুরা চার বছর ছিলেন। পোষ্টমাষ্টার থাকিতে থাকিতেই ১৮৩৪ সালে তিনি আবার নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। পরিষদের কাছে তিনি এমনই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন যে, ১৮৩৬, ১৮৩৮ এবং ১৮৪০-এর দ্বন্দ্বেও তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৭ সালে তিনি নিউ সালেমের পোষ্টমাষ্টারী চাকরি ছাড়িয়া স্প্রিংফিল্ডে উপস্থিত হইয়া জন টি. ষ্টুয়ার্টের অংশীদাররূপে ব্যবসায়ে নামিয়াছিলেন, ১৮৪১ পর্যন্ত ষ্টুয়ার্ট ও লিঙ্কনের এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চলিয়াছিল। ওই বছরে লিঙ্কন ষ্টিফেন টি. লোগানের অংশীদার হইয়া ব্যবহারজীবীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এ ব্যবসা ১৮৪৪ সালে শেষ হইয়া গেলে তিনি উইলিয়াম এইচ. হার্নডনের সঙ্গে লিঙ্কন ও হার্নডন এই নামে স্পিংফিল্ডেই তৃতীয় বার ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই অংশীদারী কারবার তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। ১৮৪৭-৪৮ সালে তিনি কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার পান। ১৮৫১ সালে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। ১৮৫৬ সালে লিঙ্কন রিপাবলিকান দলভুক্ত হন। ১৮৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের এক জন প্রার্থিস্বরূপ দাঁড়াইয়া তিনি পরাজিত হন। কিন্তু ১৮৬০ সালে ষ্টেট রিপাবলিক্যান কনভেনশন তাঁহাকে যুক্ত আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য খাড়া করেন এবং ওই বছরের ৬ই নবেম্বর তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি সোমবার আব্রাহাম লিঙ্কন সপরিবারে স্প্রিংফিল্ডের খুঁটি-ঘর বা লগ-কেবিন পরিত্যাগ করিয়া ওয়াশিংটনের শ্বেতপ্রাসাদ বা হোয়াইট হাউসে প্রবেশের অধিকার লাভ করেন। ওই বছরের ৪ঠা মার্চ লিঙ্কন আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের গদীতে আসীন হন। ১৮৬৪ সালে তিনি পুনর্নির্বাচিত হন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল দক্ষিণ রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিনায়ক জেনারেল রবার্ট ই. লির সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ-বার্তা ঘোষিত হয় অর্থাৎ দাস-ব্যবসায়ের সমর্থনকারীর দল হারিয়া যায়। ১৪ই এপ্রিল তারিখ সন্ধ্যায় ওয়াশিংটনের "ফোর্ডস থিয়েটারে"র প্রেক্ষাগৃহে জন উইলকিস বুথ-নিক্ষিপ্ত গুলিতে তিনি সাংঘাতিক ভাবে আহত হন; পরদিন সকালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

লিঙ্কনের জীবনের এই সব মামুলি খবর আজিকার দিনে আমাদের কাছে বড় নহে। মেরি ওয়েনস্ বা সারা রিকার্ডের সঙ্গে তাঁহার প্রেমের কথা, এমন কি, ১৮৪২ সালে ৪ঠা নবেম্বর তারিখে মেরি টডের সঙ্গে তাঁহার বিবাহের কথাও আমাদের না জানিলে চলিবে। কারণ, ছোট-বড় প্রায় দুই হাজার খণ্ড জীবনীগ্রন্থে তাঁহার জীবনের সামান্য খুঁটিনাটি পর্যন্ত প্রচারিত হইয়াছে। বিখ্যাত কবি ও সমালোচক কার্ল স্যাণ্ডবার্গ সুবৃহৎ ছয় ভ্যলুম জীবনীতে লিঙ্কনের জীবনের কয়েক বছর মাত্র বিবৃত করিয়াছেন, এমিল লাডভিগ, লর্ড চার্নউড্, উইলিয়ম ই. বার্টন, এইচ. জ্যাক ল্যাং, ফিলিপ ভ্যান ডোরেন ষ্টার্ন, ইলিওনর কারজিয়ন, লয়েড্ লিউয়িস্, জেসি টেকে, ওয়ার্ড হিল লামন, জন জি. হল্যাণ্ড, আইজাক এন. আর্নল্ড, নিকলে অ্যাণ্ড হে, আইডা এম টার্বেল—কত জীবনীকারের নাম করিব? শুধু লিঙ্কনের হত্যাকাণ্ড ও তাহার বিচার লইয়া সতেরোখানি সুবৃহৎ বই লেখা হইয়াছে। যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু, তাঁহারা এই সব বই হইতে লিঙ্কনের জীবনের আনুপূর্বিক ইতিহাস সহজেই জানিতে পারিবেন। জন ড্রিঙ্কওয়াটার প্রভৃতি অনেকে নাটকও লিখিয়াছেন তাঁহাকে লইয়া।

ফিলিপ ভ্যান ডোরেন ষ্টার্ন তাঁহার 'দি ম্যান হু কিলড্ লিঙ্কন' অর্থাৎ 'লিঙ্কনের হত্যাকারী' গ্রন্থে যে দৃশ্যে এবং যে ব্যক্তির হাতে লিঙ্কনের জীবনান্ত ঘটে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। হত্যাকারী ছিল রঙ্গমঞ্চের এক জন ব্যর্থ অভিনেতা, তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সে সস্তায় নাম কিনিবে। তাহার রাজনৈতিক মতামত লিঙ্কনের বিপক্ষে ছিল সন্দেহ নাই, বিশেষ করিয়া ক্রীতদাস প্রথা রহিত করার ব্যাপারে লিঙ্কন যেদিন হইতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন সেদিন হইতে বুথের মতো অনেকেই তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিল। কিন্তু এই মতভেদই লিঙ্কন-হত্যার একমাত্র কারণ নহে। বুথ-বন্ধুদের নিকট হইতে এমনও সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে যে, জীবনে সর্বদিক্ দিয়া সে যখন বিফলমনোরথ হয় তখন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মানব লিঙ্কনকে হত্যা করিয়া তাঁহার হত্যাকারিরূপে ভবিষ্যৎ কালে বাঁচিয়া থাকার কল্পনাও সে করিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাহার মনের এই ভয়াবহ প্রবৃত্তিই তাহাকে হত্যায় বাধ্য করাইয়াছিল। এই রঙ্গমঞ্চের ব্যর্থ অভিনেতা রঙ্গমঞ্চকেই বাছিয়া লইয়াছিল তাহার চরম কীর্তির উপযুক্ত স্থানরূপে; দিনটি ছিল ১৪ই এপ্রিল (১৮৬৫) গুড্ ফ্রাইডের স্মরণীয় দিন, ফোর্ডস থিয়েটারে লিঙ্কন সস্ত্রীক দেখিতে গিয়াছিলেন টম টেলরের 'আওয়ার অ্যামেরিকান কাজিন' নাটকের অভিনয়। এই সুযোগ বুথ হারাইল না।

"He peers into the box—The high back of the armchair is in front of him, and he can see a dark head rising above it. Mrs. Lincoln is leaning toward her husband, speaking to him… There can be no hesitation. This is the moment !… He must make his entrance. His pistol is ready in his hand. His breath rushes into his lungs—can they hear the terrible sound of it ? His left hand turns the door-knob—the door opens, letting in the light—his feet move silently on the carpet…The people in the box are all watching the stage. They do not notice him. He steps forward, raising his hand with the deringer in it, he holds it close to that hated head. There must be no chance of missing. Now ! Now !…And then the report, sharp and loud—the pistol

almost seemed to go off by itself, kicking his hand upward. "Sic semper tyranuis ?" he cries. He has done it ! He has killed Linclon ! The man in the chair never moves. He sits there, his head sagging forward, white smoke billowing around him."

[সে বক্সের দিকে তাকাইল। আরাম-কেদারার পিছন দিক্‌টা তাহার সম্মুখে। ইহার উপর সে একটি কালো মাথা দেখিতে পাইল। মিসেস্ লিঙ্কন তাঁহার স্বামীর দিকে হেলিয়া কথা বলিতেছেন··· ইতস্তত করিবার কারণ নাই। ইহাই উপযুক্ত সময় !···সে অবশ্যই প্রবেশ করিবে। হাতে পিস্তল লইয়া সে প্রস্তুত। তাহার শ্বাস রুদ্ধ—কেহ কি তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইতেছে ? বাঁ হাত দিয়া সে দরজা খুলিল এবং কার্পেটের উপর দিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইল। বক্সের দর্শকবৃন্দ সকলেই অভিনয় দেখিতে-ছেন। কেহই তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। সে হাতে পিস্তল লইয়া অগ্রসর হইল এবং সেই ঘৃণিত মস্তকের নিকট তুলিয়া ধরিল। ব্যর্থ হইলে চলিবে না। এইবার ! এইবার !···তার পর একটা তীব্র আওয়াজ···পিস্তলটা তাহার হাত হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। উল্লাসে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। সে লিঙ্কনকে হত্যা করিয়াছে। চেয়ারে উপবিষ্ট লোকটিকে নড়িতে দেখা গেল না। তিনি যেমন বসিয়া-ছিলেন তেমনি বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মাথা সামনে ঝুঁকিয়া পড়িল, আর তাঁহার চার দিকে সাদা ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইতে লাগিল।]

গত ৩০ জানুয়ারী দিল্লীতে বিড়লা-ভবনের প্রাঙ্গণে বৈকাল পাঁচটায় যে ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার হত-ভাগ্য নায়ককে লইয়া যদি কেহ কোন দিন গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহাকেও অনুরূপ বর্ণনার সাহায্য লইতে হইবে। উভয় ব্যক্তিকেই সাময়িক ভাবে একই উন্মত্ততা গ্রাস করিয়াছিল। এক উদ্দেশ্য লইয়া একই ভাবে দুই জনেই অগ্রসর হইয়াছিল পৃথিবীর দুই হীনতম কীর্তির অন্বেষণে। মানব-সভ্যতার কলঙ্কিত ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলি সম্ভবত একই ছাঁচে ঢালা।

আব্রাহাম লিঙ্কনের যে মহৎ আদর্শ, যে প্রাণস্পর্শী বাণী, যে ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠা পৃথিবীকে চিরদিন সত্যপথের সন্ধান দিবে তাহাই আমাদের সর্বদা স্মরণীয়। মানুষ তাহার জীবনের খুঁটিনাটি সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া পৃথিবী হইতে সরিয়া যায়, কিন্তু মহৎ যে, মহাবীর যে, তাহার আদর্শ দিনে দিনে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে, তাহার বাণী কালের ভালে সোনার অক্ষরে লেখা হইয়া জল্‌জল্ করিতে থাকে ; আমাদের দুঃখ ও বিপদের দিনে তাহাই হয় আমাদের সঙ্গী, তাহারাই যোগায় আমাদের মনে সাহস আর ভরসা। তাঁহার কয়েকটি চিরন্তন বাণী তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

১। You can fool some of the people all of he time ; and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.

[(১) কয়েক জন লোককে সকল সময় বোকা বানানো যায় এবং সকল লোককে কিছু কাল বোকা বানান যায়, কিন্তু সকল লোককে চিরকাল বোকা বানানো যায় না।]

২। Let us have faith that right makes might ; and in that faith let us to the end dare to do our duty as we understand it.

[(২) আমাদের এই বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, ন্যায্য অধিকারই ক্ষমতা আনয়ন করে এবং সেই বিশ্বাস লইয়া আমাদের বোধ অনুযায়ী কর্তব্য সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে।]

৩। The ballot is stronger than the bullet.

[(৩) বুলেটের চেয়ে ভোট অধিকতর শক্তিশালী।]

৪। I don't know who my grandfather was, but I am much more concerned to know what his grandson will be.

[(৪) আমার পিতামহ কে ছিলেন, তাহা আমি জানি না, কিন্তু তাঁহার পৌত্র কি হইবে, তাহা জানিতেই আমার আগ্রহ অধিক।]

৫। No man is good enough to govern another man without that other man's consent.

[(৫) যিনি যত ভাল লোকই হউন না কেন, কাহারও সম্মতি ব্যতীত তিনি কাহাকেও শাসন করিবার যোগ্য হইবেন না।]

৬। Killing the dog does not cure the bite.

[(৬) কুকুরকে মারিয়া ফেলিলে তাহার দংশন হইতে আরোগ্যলাভ করা যায় না।]

লিঙ্কন বক্তৃতায় ও কথাবার্তায় বাহুল্য ভালবাসিতেন না। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বদা বাক্‌সংযমের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যখন লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন তখন কাগজ কেনার মতো সঙ্গতি তাঁহার ছিল না। তিনি দেওয়ালে কয়লা দিয়ে রচনা অভ্যাস করিতেন, সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে সংক্ষেপে সারা অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। আর একটি কারণে বাক্যের উপর তাঁহার অসাধারণ দখল জন্মিয়া-ছিল, তিনি নামতা পড়ার মতো পাঠ অভ্যাস করিতেন। জোরে জোরে আবৃত্তি না করিয়া কোনও কিছু পড়িতেন না। ফলে শব্দের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহার একটা স্বাভাবিক জ্ঞান জন্মিয়াছিল। বাল্য-কালে অধীত দুইটি জিনিস হইতে তিনি জীবনের যুক্তি ও প্রাঞ্জলতা শিক্ষা করিয়াছিলেন, একটি হইতেছে ইউক্লিডের জ্যামিতি, অন্যটি বাইবেল। আইনের শিক্ষাও তাঁহাকে কম সংযমী ও যুক্তিবাদী করে নাই। হ্যারিয়েট বুচার ষ্টো তাঁহার রচনা সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন—

"We say of Lincoln's writing, that for all true, manly purposes of writing, there are passages in his state papers that could not be better put—they are absolutely perfect. They are brief, condensed, intense, and with a power of insight and expression which make them worthy to be inscribed in letters of gold."

লিঙ্কনের রচনাবলীর মধ্যে এমন রচনা আছে, যাহা সম্পূর্ণ নিজ এবং তিনি যে ভাবে লিখিয়াছেন, তদপেক্ষা ভাল ভাবে তাহা

লেখা যাইতে পারে না। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাঁহার লেখা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার মত।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে লিঙ্কন যখন রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন ইলিনয়ের প্যাপসভিলেতে একটি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন—এইটি তাঁহার সর্বপ্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা হিসাবে রক্ষিত হইয়াছে। বক্তৃতাটি সম্পূর্ণ এই—

"Fellow-citizens: I presume you all know who I am. I am humble Abraham Lincoln. I have been solicited by many friends to become a candidate for the Legislature. My politics are short and sweet, like the old woman's dance. I am in favour of a national bank. I am in favour of the internal improvement system, and a high protective tariff. These are my sentiments and political principles. If elected, I shall be thankful, if not it will be all the same."

["নাগরিকবৃন্দ: আমার ধারণা আপনারা সকলেই আমাকে জানেন। আমি দীনহীন এব্রাহাম লিঙ্কন। আমার বন্ধুরা আমাকে আইন-সভায় প্রার্থী হইবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। আমার রাজনীতি বৃদ্ধার নৃত্যের ন্যায় সংক্ষিপ্ত ও মিষ্ট। আমি একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা এবং আভ্যন্তরীণ উন্নতির প্রথা ও উচ্চ রক্ষণশুল্ক প্রবর্তনের পক্ষপাতী। ইহাই আমার মনোভাব ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নীতি। নির্বাচিত হইলে আমি বাধিত হইব, না হইলেও কোন ক্ষতি নাই।"]

ডেমোক্রেসি বলিতে তিনি কি বুঝিতেন, একটি অটোগ্রাফে নিজের হাতের লেখায় ও স্বাক্ষরে অত্যন্ত সংক্ষেপে লিখিয়াছিলেন:

"As I would not be a slave, so I would not be a myrter. This expresses my idea of democracy; whatever differs from this, to the extent of the difference, is no democracy."

["আমি যেমন ক্রীতদাস হইব না, তেমনই আমি প্রভুও হইব না। গণতন্ত্র সম্বন্ধে ইহাই আমার ধারণা। ইহার সহিত যদি না মিলে, তবে তাহা গণতন্ত্র নহে।"]

লিঙ্কনের চরিত্র একটি চিঠিতে অতি চমৎকার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লিঙ্কন-পাণ্ডুলিপির বিখ্যাত সংগ্রাহক মিঃ ম্যাডিগান এই চিঠিখানিকে ষোড়শ প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের "most characteristic letter, both in sentiment and phraseology" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অনরেবল উইলিয়ম ডি. কেলি তাঁহার একটি আইন-গ্রন্থ লিঙ্কনের নামে উৎসর্গ করিতে চাহিলে তাঁহাকে তিনি লিখিয়াছিলেন:

"Private

Springfield, Illionis, Oct. 13, 1860.

My dear Sir,

Yours of the 6th asking permission to inscribe your new legal work to me, is received. Gratefully accepting the proffered honour, I give the leave, begging only that the inscription may be in modest terms, not representing me as a man of great learning, or a very extraordinary one in any respect.

Yours very tru[ly]

A. Lincoln."

["ব্যক্তিগত

স্প্রিংফিল্ড, ইলিনয়ে[স]

১৩ই অক্টোবর, ১৮[৬০]

প্রিয় মহাশয়,

আপনার নূতন আইন-পুস্তকখানি আমার নামে উৎসর্গ কর[িবার] অনুমতি চাহিয়া ৬ই তারিখে আপনি যে পত্র দিয়াছেন, [তাহা] পাইয়াছি। আপনি আমাকে যে সম্মান দিতে চাহিয়াছেন, [তাহা] গ্রহণ করিতেছি, কিন্তু উৎসর্গপত্রে আমাকে বড় পণ্ডিত বা [বিশিষ্ট] ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিবেন না।

আপনার বিশ্বস্ত

এ, লিঙ্কন"]

গান্ধীজীর জীবনের সঙ্গে লিঙ্কনের জীবনের অদ্ভুত মিল দেখা [যায়।] দুই জনের চরিত্রও অনেকটা এক ধরণের ছিল। লেখায় ও বক্[তৃতায়] সংযম-ব্যাপারে অবশ্য লিঙ্কন গান্ধীজী অপেক্ষাও সাবধান ছি[লেন।] তাঁহার আর একটি চিঠি অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ বলিয়া শোনাইতে[ছি।] নিউইয়র্কে ওয়েষ্টফিল্ডের একটি ছোট মেয়ে তাঁহাকে লেখে:

"I am a little girl, eleven years old…have any little girls about as large as I am…if you let your whiskers grow…you would look a g[reat] deal better for your face is so thin…I must [not] write any more, answer this right off, good-by[e].

Grace Be[dell]

["আমি একটি ছোট বালিকা। আমার বয়স ১১ বৎসর…আ[মার] মত বড় আপনার কোনও মেয়ে আছে কি…আপনার মুখ এত [সরু] যে, আপনি যদি গোঁফ রাখেন, তাহা হইলে আপনাকে অনেক [ভাল] দেখাইবে…অধিক বাহুল্য, উত্তর দিবেন, বিদায়।

গ্রেস বেডে[ল]

লিঙ্কন তৎক্ষণাৎ জবাব দেন—

স্প্রিংফিল্ড, ইলিনয়, অক্টোবর ১৮, ১[৮৬০]

"My dear little Miss,

Your very agreeable letter of the 15t[h] received. I regret the necessity of saying I [have] no daughter. I have three sons—one sevent[een,] one nine and one seven years of age. They [with] their mother, constitute my whole family. [As] to the whiskers, having never worn any, do [you] not think people would call it a piece of affectation if I were to begin it now?

Your very sincere well-wi[sher]

A. Lincoln"

["তোমার ১৫ই তারিখের পত্র পাইলাম। দুঃখের [সহিত] জানাইতেছি যে, আমার কোন কন্যা নাই। আমার তিনটি

আছে—একটি ১১ বৎসরের, একটি ৯ বৎসরের এবং একটি ৭ বৎসরের। তাহারা ও তাহাদের মাতাকে লইয়াই আমার সংসার। আমি কখনও গোঁফ রাখি নাই। এখন যদি গোঁফ রাখি, তাহা হইলে লোকে আমাকে চালিয়াৎ মনে করিবে, এ কথা কি তোমার মনে হয় না ?

তোমার একান্ত শুভার্থী
এ. লিঙ্কন"]

গ্রেস বেডেলকে গোঁফ রাখার অক্ষমতা জানাইয়া চিঠি লিখিলেও লিঙ্কন এই ঘটনার কিছু দিনের মধ্যেই দাড়ি-গোঁফ রাখিতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন পরে নিউ-ইয়র্কের ওয়েষ্টফিল্ড দিয়া তাঁহাকে এক বার অন্যত্র যাইতে হয় ; তখন তিনি গ্রেস বেডেলের সন্ধান করেন ও তাহাকে হাসিতে হাসিতে জানান , "You see, I let these whiskers grew for you, Grace."

সব শেষে প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের "সর্বশেষ, সংক্ষিপ্ততম ও শ্রেষ্ঠতম" বক্তৃতাটি উদ্ধৃত করিয়া লিঙ্কন-প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। ১৮৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মৃত্যুর পাঁচ মাস আগেই এটি তিনি নোয়াব্রুকসের এক জন সংবাদপত্রসেবীর হাতে দিয়াছিলেন—

"On Thursday of last week two ladies from Tennessee came before the President asking the release of their husbands held as prisoners of war at Johnson's island—They were put off till Friday, when they came again; and were again put off to Saturday.—At each of the interviews one of the ladies urged that her husband was a religious man—On Saturday the President ordered the release of the prisoners and them said to this lady—

["গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবার টেনেসি হইতে দুই জন মহিলা প্রেসিডেণ্টের নিকট আসিয়া জনসন দ্বীপে যুদ্ধবন্দী হিসাবে আটক তাঁহাদের স্বামীদের মুক্তি প্রার্থনা করেন। তাঁহারা প্রেসিডেণ্টের সহিত তিন বার সাক্ষাৎ করেন। প্রতিবারই এক জন মহিলা তাঁহাকে বলেন যে, তাঁহার স্বামী ধার্মিক ব্যক্তি। তৃতীয় দিনে প্রেসিডেণ্ট বন্দীদের মুক্তির আদেশ দেন এবং সেই মহিলাটিকে বলেন—

[এইটিই প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের শেষ ভাষণ]

"You say your husband is a religious man; tell him when you meet him, that I say I am not much of a judge of religion, but that, in my opinion, the religion that sets men to rebel and fight against their government, because, as they think, that government does not sufficiently help some men to eat their bread in the sweat of other men's faces, is not the sort of religion upon which people can get to heaven.

A. Lincoln."

["আপনি বলিতেছেন যে, আপনার স্বামী ধার্মিক ব্যক্তি। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিবেন, আমি ধর্মের বিচারক নহি ; কিন্তু আমার মতে যে ধর্ম লোককে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত করায়—যেহেতু তাহাদের মতে সেই সরকার কয়েক জন লোককে পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাইতে দিতে সাহায্য করে না—সেই ধর্ম স্বর্গে যাইবার ধর্ম নহে।

এ. লিঙ্কন"]

এই মহাসত্যের উপযোগিতা ভারতবর্ষে আজ সর্বাপেক্ষা বেশি অনুভব করিতেছি।

হে সর্ব্বদ ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও ;—আমার সর্ব্ববাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকরি দাও, রাজা কর, রায়বাহাদুর কর, কৌন্সিলের মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৫।

যদি তাহা না দাও, তবে আমাকে ডিনরে আট্‌হোমে নিমন্ত্রণ কর ; বড় ২ কমিটির মেম্বর কর, সেনেটের মেম্বর কর, জুষ্টিস্ কর, অনরারী মাজিষ্ট্রেট্ কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৬।

আমার স্পীচ্ শুন, আমার এশে পড়, আমায় বাহ্বা দাও,—আমি তাহা হইলে সমগ্র হিন্দুসমাজের নিন্দাও গ্রাহ্য করিব না। আমি তোমাকেই প্রণাম করি। ২৭।

হে ভগবন্ ! আমি অকিঞ্চন ! আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও। আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে রাখিও। হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি। ২৮।

—ইংরাজস্তোত্র। বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১২৮১।

ক্লার্ক-ফুলাম

হত্যা-কাহিনী

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

ভালবাসার জন্যে, প্রেমের জন্যে মানুষ পৃথিবীতে করেনি এমন কাজ নেই। নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে বিড়ম্বিত হয়ে স্বার্থত্যাগ ও আত্মদানের যেমন সে চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, তেমনি মোহাবিষ্ট কামাতুর হয়ে সমাজ-সংস্কার ন্যায়-ধর্ম্ম কোন কিছুই ভ্রূক্ষেপ করেনি—বর্ব্বরতার চরম সীমায় নেমে গেছে, কুৎসিত ঘৃণিত উচ্ছৃঙ্খলতার আশ্রয় নিয়েছে অকুণ্ঠিত ভাবে। কিন্তু পরিণামে দুষ্কৃতির ফল মানুষকে ভোগ করতেই হয়েছে, এর হাত থেকে কেউই নিষ্কৃতি পায়নি—বিচারের ন্যায়দণ্ডে তার জীবনান্ত ঘটেছে হয় ফাঁসির মঞ্চে, না হয় অপঘাতে আততায়ীর হাতে।

এমনি একটি মানুষের নিছক কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থের অতি নীচ তুলনাহীন কাহিনীই এই রচনার বিষয়-বস্তু। একাধারে এই কলঙ্ক-কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর, অন্য দিকে তেমনি হত্যাকাণ্ডে বীভৎস।

ভাগ্যচক্রের অদৃশ্য ইঙ্গিতে কর্ম্মোপলক্ষে দুই পরিবারের মিলন ঘটে মীরাটে। এবং এইখানেই বাস্তব-জীবনের এই রোমাঞ্চকর নাটকের সূত্রপাত হয় ১৯০৯ সালে। এদের এক জন ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের নিম্নপদস্থ ব্যক্তি, নাম লেফটনেণ্ট ক্লার্ক; অপর জন মিলিটারী একাউণ্টসের ডেপুটি একজামিনার এডোয়ার্ড ফুলাম।

লেফটনেণ্ট ক্লার্ক ছিলেন জাতিতে ফিরিঙ্গি এবং তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৪২ বৎসর। শিক্ষা-দীক্ষা বলতে তাঁর বিশেষ কিছুই ছিল না এবং চরিত্রের দিক থেকেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত কামাতুর ও নৃশংস প্রকৃতির। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের মহিলা, এবং স্বামীর চেয়ে তিনি প্রায় ছ' বছরের বড় ছিলেন। অর্থাৎ এই বীভৎস ঘটনার সূত্রপাতে (১৯১০ সালে) তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বৎসর। জাতিতে এই মহিলাটিও ছিলেন ফিরিঙ্গি এবং বিবাহের পূর্ব্বে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে নার্সের কাজ করতেন। এক কথায় অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও সাদাসিদে ভালো-মানুষ গোছের মহিলা ছিলেন মিসেস্ ক্লার্ক। পুত্র-কন্যা প্রতিপালন ও সুচারুরূপে সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র আদর্শ। শেষ নিশ্বাসপাতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি তাঁর বিষময় জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, সমস্ত নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করে গিয়েছেন—কোন দিনও মুখ ফুটে কারুর কাছে একটি অভিযোগের কথাও প্রকাশ করেননি।

এডোয়ার্ড ফুলাম এই বীভৎস ইতিহাসের অপর হতভাগ্য ব্যক্তি। অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত প্রকৃতির ধার্ম্মিক পুরুষ বলে সর্ব্বত্র তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি মিলিটারী এ্যাকাউণ্টসে ডেপুটি এগজামিনারের কাজ করতেন। তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৪৪ বৎসর এবং তাঁর স্ত্রী আগাথা ফুলাম বয়সে তাঁর চেয়ে প্রায় আট বছরের ছোট ছিলেন। এই ভদ্র-মহিলা ছিলেন জাতিতে ইংরেজ, উচ্চশিক্ষিতা এবং সাহিত্যানুরাগিণী। ছেলেমেয়েদের প্রতি তাঁর যেমন স্নেহপ্রবণতা ছিল, তেমনি ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম্মেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নানা প্রকার সামাজিকতা, লোক-লৌকিকতা, ও আমোদ-আহ্লাদে হেসে-খেলে দিন কাটানোই ছিল তাঁর জীবনের বিশেষ অঙ্গ। বাইরের দিক থেকে তাঁকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্রের মহিলা বলে মনে হলেও তাঁর চরিত্রের সবটাই ছিল বোধ হয় লোক-দেখানো।

১৯০৯ সালে মীরাটে এই দুই পরিবার বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হলে প্রকৃত ঘটনার সূত্রপাত হয় ১৯১০ সালে। মিসেস্ ফুলাম তখন সবে মাত্র একটি সন্তান প্রসব করে রোগশয্যাশায়িনী, লেঃ ক্লার্ক ডাক্তার হিসাবে তাঁকে দেখা-শুনা করতে আসেন। ডাক্তার নির্দ্দেশ দিয়ে যান, রোগিণীর পরিচর্য্যা চলে—অতি সাধারণ ঘটনা, কিন্তু এরই মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে ভালোবাসার সূচনা দেখা দেয়—পরস্পরের দুর্ব্বার আকর্ষণ গভীর প্রেমে পরিণত হয়।

প্রেমের এমনি বিচিত্র ধারা। সে কোন কিছুরই ধার ধারে না—কোন বাচ-বিচারই তার নেই—সমস্ত যুক্তি-তর্কই তার কাছে উপেক্ষিত। তাই মিসেস্ ফুলামের মত বিদুষী, সুন্দরী, রুচিস্মিতা মহিলাও এক দিন ক্লার্কের মত অতি নীচ স্বভাবের মানুষকেই তাঁর সর্ব্বস্ব বলে স্বীকার করে নিল—তার কামনার হোমানলে নিজেকে উৎসর্গ করল।

এই সময়ে ক্লার্ককে হঠাৎ একবার অফিসের কাজে আগ্রায় বদলি হতে হয়। প্রেমের প্রারম্ভেই এই ব্যবধান উভয়েরই কষ্টকর হলেও, দূরত্বই তাঁদের মিলন-বাসনাকে আরও উদ্দাম ও উগ্রতর করে তোলে। প্রেমের দুর্দ্দমনীয় গতি-পথ খুঁজে পায় পত্রের ভেতর দিয়ে। দিনের পর দিন বিরহ-বেদনার কথা, উদগ্র আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ পেতে থাকে পত্রের সাহায্যে—পরস্পরকে একান্তে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পাবার কথা নিয়ে অবৈধ প্রেমের গতি চিঠিপত্রের সাহায্যে বেড়েই চলে ক্রমাগত। প্রতিদিনই চিঠি লেখেন মিসেস্ ফুলাম। কেবল মাত্র শনিবার ও রবিবারটি বাদ যায় বাড়ীতে স্বামীর উপস্থিতির জন্য। ক্লার্কও নিয়মিত প্রতিটি পত্রের উত্তর দেন এবং সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতি বার মীরাটে এসে গোপনে আগাথার সঙ্গে দেখা করে যান।

এই সময়কার শত-সহস্র পত্রের মধ্যে প্রায় চারশ' চিঠি বিচারকের হস্তগত হয়, এবং এই প্রেমপত্রগুলিই শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের

ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডের প্রধান সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। যে পত্রগুলি এক দিন তাঁদের প্রগাঢ় প্রণয়ের সহায়ক হয়েছিল, সেইগুলিই শেষ পর্য্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় জীবনান্তের প্রধান কারণ। প্রেমপত্র জমিয়ে রাখার অভ্যাস যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, ক্লার্ক-ফুলাম হত্যাকাণ্ডের বিচারের পূর্ব্বে এমন ভাবে বোধ হয় আর প্রমাণিত হয়নি। যেন এক অদৃশ্য শক্তির অভিশাপ ছিল এই চিঠিগুলির উপর। এগুলি কেন যে নষ্ট করা হয়নি তারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই পত্রগুলিই ধীরে ধীরে এই রোমাঞ্চকর হত্যা-রহস্যের সমস্ত গোপনীয় তথ্য উদ্‌ঘাটন করে বিচার ও শাস্তির সহজ পথ নির্দ্দেশ করে। যে চিঠিগুলি পুলিসের হস্তগত হয়, সেগুলি সবই ক্লার্কের কাছে মিসেস্ ফুলামের লেখা। ক্লার্কের লেখা কোন চিঠি পাওয়া যায়নি। মিসেস্ ফুলামকে ক্লার্ক যে চিঠিগুলি লিখতেন, সেগুলির শিরোনাম দেওয়া থাকত: 'মিসেস্ ক্লার্কসন' (Mrs. Clarkson), এবং এই চিঠিগুলি মিসেস্ ফুলাম পোষ্ট অফিস থেকে নিজেই 'ডেলিভারি' নিয়ে আসতেন।

এই সব পত্রের ভিতর দিয়ে এক দিকে তাঁরা যেমন অবৈধ প্রেমের অতলে নিজেদের ডুবিয়ে দিতে থাকেন, অন্য দিকে তেমনি মিলন-পথের বাধা-বিঘ্ন দূর করার জন্য পৈশাচিক ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন গোপনে গোপনে। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, ন্যায়-ধর্ম সব কিছুই আচ্ছন্ন হয়ে যায় তাদের হীন আকাঙ্ক্ষার পাপ-প্রভাবে।

এই সময়কার একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, তাঁদের এই অবৈধ ঘনিষ্ঠতায় মিসেস্ ফুলাম অন্তঃসত্ত্বা হন। এই চিঠিতে মিসেস্ ফুলাম লেখেন:

"প্রিয়তম হ্যারি, আমার সব চেয়ে বড় ভীতি আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে এবং আমি যে আবার ধরা পড়েছি সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। গত দু'দিন বিকাল থেকেই অত্যন্ত অসুস্থ বোধ কচ্ছিলাম, গত কাল বিকালে হঠাৎ খুব খানিকটা বমি হয়ে গেল। এ ব্যাপারে 'এডি' (স্বামী) খুবই হাসতে লাগল এবং বললে যে, 'আমার মনে হয় এবার তুমি পুরোপুরোই অন্তঃসত্ত্বা। অতএব প্রিয়তম, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। অনেক কষ্ট ও যুদ্ধ করেছি আমরা এই আশঙ্কার বিরুদ্ধে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারি না এবং তা করতেও চাই না। বিনা অভিযোগেই এ-ভার আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে।"

কিন্তু শীগ্‌গিরই তাঁর এই ভীতির উপশম হয়। ওষুধের সাহায্যে ক্লার্ক মিসেস্ ফুলামকে তাঁর এই ভার থেকে মুক্ত করে দেন।

ইতোমধ্যে মিঃ ক্লার্ককে আবার বদলি হতে হয় অন্যত্র। কিন্তু তাঁদের চিঠিপত্রের লেন-দেন এবং নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ চলতেই থাকে। কিন্তু এই সময় মিঃ ফুলামের চোখে সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত বিসদৃশ ভাবে দেখা দেয়। মিসেস্ ফুলাম ও ক্লার্কের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠতা ও আরো নানা খুঁটিনাটি কারণে তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কিন্তু সুচতুরা মিসেস্ ফুলামও স্বামীর মনোভাব সহজেই বুঝতে পারেন, এবং ক্লার্ককে একখানি চিঠি লিখে এ বিষয় সতর্ক করে দেন। চিঠিখানি হচ্ছে:

"প্রিয়তম, ডার্লিং—বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার স্বামী আজ ভোর পাঁচটার সময় আমার শোবার ঘরে তোমার সঙ্গে কথা কলাছি দেখে ভীষণ রেগে গিয়েছেন। তোমার সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলা ছাড়া অবশ্য আর কিছুই দেখতে পায়নি। নাইট গাউন পরে আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, এতে তিনি খুবই আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন। এর পর থেকে আমাদের খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে। আমার সঙ্গে আর দেখা না করে আগ্রায় চলে গেলেই ভালো হ'ত। প্রিয়তম হ্যারি, আমরা দু'জনে পরস্পরকে এতো ভালবাসি, তবু হায়! এই রকম বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে নিয়ত যুদ্ধ করা কতো কঠিন! ভগবান আমাদের সাহায্য করুন। তোমার জন্যে আমার খুব দুঃখু হচ্ছে—যদি সামর্থ্য থাকত সমস্ত প্রাণ দিয়ে আমি তোমাকে সাহায্য করতাম। কিন্তু আমি একেবারে শক্তিহীনা। তুমি আমার সব চেয়ে ভালোবাসার জিনিষ; আমার একান্ত অনুরোধ, আমার জন্যে আর কিছু দিন অপেক্ষা করো—তার পর আমি তোমার কাছে একেবারে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে ধরা দেব।..."

এই সব শোনার পর থেকে ক্লার্কের মনে নানা দুরভিসন্ধি জাগতে থাকে। তাদের মাঝখানে, অবাধ মেলা-মেশার অন্তরায় মিঃ ফুলামকে চিরতরে সরিয়ে, শ্রীমতী ফুলামকে সম্পূর্ণ ভাবে পাবার জন্য ক্লার্ক বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন।

সেদিন ২০শে ফেব্রুয়ারী—এই বীভৎস ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। ক্লার্ক যেমন নিয়মিত আসেন তেমনি সেদিনও মিসেস্ ফুলামের সঙ্গে দেখা করতে আসেন মীরাটে। এবং সেই দিনই ক্লার্ক প্রথম মিসেস্ ফুলামের কাছে তাঁর স্বামীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র উত্থাপন করেন। ঠিক হয়, আরসেনিক (সেঁকো) বিষের সাহায্যে আস্তে আস্তে মিঃ ফুলামকে হত্যা করা হবে এবং এই বিষ ক্লার্ক আগ্রা থেকে মিসেস্ ফুলামকে পাঠাবেন। এই বিষের প্রক্রিয়া এতই মন্থর হবে যে, মিঃ ফুলামের মৃত্যুর জন্য কখনো কেউ কোন সন্দেহের অবকাশই পাবে না।

মিসেস্ ফুলাম এই (Arsenic) বিষটিকে 'টনিক' নামে অভিহিত করতেন এবং তাঁর স্বামীর শরীরে কি ভাবে এই মারাত্মক বস্তুটি ক্রিয়া করে চলেছে তার নিখুঁত বিবরণ ক্লার্ককে নিয়মিত লিখে পাঠাতেন। এই সম্পর্কে তাঁর কয়েকখানি চিঠির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল:

"প্রাণপ্রতিম—আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তোমার এই 'পাউডার' আমি মোটেই অনুমোদন করি না। এ ভাবে আর কত শত বছর কাটবে! এবং এর জন্যে সারাক্ষণ আমরা কি ভীষণ সংশয়ের ভেতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছি তা একবার ভেবে দেখ!...

"আমার সর্ব্বস্ব হ্যারি, তুমি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ—ভালো করে একবার ভেবে এমন একটা উপায় স্থির করো, যাতে শীগ্‌গিরই আমরা আমাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ করতে পারি। কোন ছোট পার্শ্বেল যদি আমায় পাঠাও, তাহ'লে তা রেজেষ্ট্রী করে পাঠিয়ো।"...

এই ধরণের চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের মধ্যেও ক্লার্কের আসা-যাওয়া কিন্তু বন্ধ ছিল না। তিনি প্রায়ই আগ্রা থেকে মীরাটে আসতেন, এবং নিজের হাতেই 'টনিক'টি গোপনে মিসেস্ ফুলামের হাতে দিয়ে যেতেন। এই ভাবে ঘৃণিত অপরাধের পর অপরাধ করে চলেন লেঃ ক্লার্ক এবং তাঁকে উৎসাহিত হয়ে সাহায্য করে চলেন মিসেস্ ফুলাম দিনের পর দিন। মিসেস্ ফুলামের একটি প্রেমপত্র থেকে সেই সময় এক দিন ক্লার্কের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। শ্রীমতী ফুলাম লিখছেন:

"ডারলিং, সেদিনকার সেই আবছায়ার মধ্যে দীর্ঘ মোটার-বিহার, সাতার্ন লেনে বেড়ানো—দু'জনে একসঙ্গে সেই আনন্দপূর্ণ দিনটার মধ্যে ডুবে যেতে তোমার কতখানি ভালো লেগেছিল বল তো? সেই ঘন্টাগুলো যেন সুখ-শান্তির সর্বাঙ্গসুন্দর একটি নিখুঁত স্বপ্ন! আমি ব্যাকুল আগ্রহে আবার সেই স্বপ্নের মধ্যে নিজেকে হারাবার জন্যে অপেক্ষা করছি!"···

এমনি গোপন চিঠিপত্র, দেখা-সাক্ষাৎ ও প্রেমের তন্ময়তার মধ্যে দিয়ে আরো একটি বছর কেটে যায়—আসে ১৯১১ সাল। ইতোমধ্যে তিলে তিলে মি: ফুলামকে হত্যা করার যে হীন চক্রান্ত আরম্ভ হয়েছিল, তার ফল ফলতে আরম্ভ হয়। ২১শে জুন প্রথম দেখা দেয় সেই বিষের প্রক্রিয়া। মি: ফুলাম অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কলেরার নানা উপসর্গ প্রকাশ পায় তাঁর শরীরে। বাধ্য হয়ে সেই সময় দশ দিনের ছুটি নিয়ে তিনি মুসৌরীতে বায়ু পরিবর্তনে যান। কিন্তু, কপাল যাঁর ভেঙেছে—বিধাতা যার ললাটে আগে থেকেই দুর্গতির লিপি লিখে রেখেছেন, স্থান-পরিবর্তনে তার আর কি উন্নতি হবে!

মি: ফুলামের এই ক'দিনের অনুপস্থিতিতে ক্লার্কের যথেষ্ট সুযোগ জুটে যায়। মীরাটে এসে তিনি যেন স্বর্গরাজ্য হাতে পান। প্রেমের উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহ সভ্যতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে, পরস্পরকে নিবিড় ভাবে উপভোগ করতে থাকেন তাঁরা। কিন্তু ফুলাম বেঁচে থাকতে এই প্রেমলীলা আর কত দিন নিঃসংশয়ে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। তাই এরই সঙ্গে তাঁরা তাঁকে হত্যা করার নূতন পরিকল্পনা উদ্ভাবন করতে থাকেন। আরসেনিক খাওয়ানো হচ্ছিল মাত্র আড়াই মাস এবং ইতোমধ্যে বিষের প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু প্রেমের উন্মত্ত গতির কাছে বিষের এই মন্থর গতি অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়েই অধৈর্য্য হয়ে ওঠেন, হত্যাকাণ্ডের শেষ দৃশ্যের জন্য—কামনার উত্তেজনায় তাঁদের মন আরও নৃশংস হয়। অল্প অল্প করে বিষ দেওয়ার পরিবর্তে এক দিনেই তাঁরা সমস্ত শেষ করে দিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হন। ঠিক হয়, আরসেনিকের পরিবর্তে Heat-strokeএর তীব্র ওষুধ খাইয়ে দু'-এক দিনেই তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। মীরাটের মত উষ্ণপ্রধান স্থানে Heat-strokeএ মৃত্যু হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়—আর এতে সন্দেহেরও কারু কোন কারণ থাকবে না।

ইদানিং মি: ফুলাম স্ত্রীর এই ব্যভিচারে খুবই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে ক্লার্কের সঙ্গে মিসেস্ ফুলামের মেলা-মেশায় যথেষ্ট বিরক্তও হয়েছিলেন। এমন কি, ক্রমশ: স্ত্রীর প্রতি তিনি এতই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে, অনেক সময় তাঁর হাতের রান্না পর্য্যন্ত খেতেও তিনি ঘৃণা বোধ করতেন। এটা কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু তবুও এ কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য স্থিরচিত্তে এমন এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে! এটা সত্যিই মি: ফুলামের কাছে স্বপ্নাতীত ছিল। কিন্তু এই প্রেম-প্রমত্ত ব্যভিচারিণী স্ত্রী স্বামি-হত্যার জন্য কি ভাবে যে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল, তার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নলিখিত আর একখানি চিঠির অংশ থেকে। সেই চিঠিতে মিসেস্ ফুলাম লিখছেন:

"প্রিয় হ্যারি, পরের চিঠিতে অতি অবশ্যই জানাবে যে, সর্দিগর্মীর (Heat-stroke) মৃত্যুতে কি মুখের আকৃতি ও রঙ কালো হয়ে যায়? এর মৃত্যু কি খুবই কষ্টকর, না এতে মানুষ শীগ্‌গিরই অজ্ঞান হয়ে যায়?"···

এমনি সব পরিস্থিতির মধ্যে যতই দিন যেতে থাকে, ততই আরো উদ্দাম হয়ে ওঠে মিসেস্ ফুলামের প্রেম। তার সমস্ত চিঠি-গুলির মধ্যেই লেলিহান লালসার চিহ্ন—প্রেমাস্পদের কাছে নিজেকে নিবেদন করার নানা রঙ-ঢঙ ও ভাষায় পরিপূর্ণ।

তাঁর এই সময়কার আর একখানি চিঠিতে স্বামি-হত্যার দুর্দমনীয় কামনার কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়। এই চিঠিতে মিসেস্ ফুলাম লিখেছেন:

"প্রিয়তম, আমি মন স্থির করে ফেলেছি। এই বৃহস্পতিবার ২৭শে খাবার সময় সেই তরল পদার্থটি নিশ্চয়ই ওকে খাওয়াব। পাচককে আমি ভালো করে মুর্গীর ঝোল রাঁধতে বলেছি। এই ঝোলে লেবুর রস মিশিয়ে ভাতের সঙ্গে খাওয়ানো হবে। লেবুর রস মেশানো টক ঝোলে, তেতো বিষের কোন স্বাদ পাওয়া যাবে না এবং এতে সন্দেহেরও কোন কারণ থাকবে না। তাছাড়া প্রিয়তম, বৃহস্পতিবার দুপুরে আমরা তোমার সেই পুরানো হাসপাতালের সামনে Berkshire Sports দেখতে যাব। একে এই ভীষণ দুপুরের আবহাওয়া, তার উপর কোথাও এক ফোঁটা বৃষ্টির চিহ্নবাষ্প নেই—কাজেই, এহেন সময়ে রোদ লেগে যাওয়াটা কিছুই অবিশ্বাস্য নয়। সুতরাং বৃহস্পতিবারই বোধ হয় আমাদের এই ভীষণ কাজটির পরিসমাপ্তির শেষ দিন। তোমারও কি তাই মনে হয় না প্রিয়তম?"···

তার পর সত্য সত্যই চিঠির উল্লিখিত ভয়াবহ তথ্য অনুযায়ী কাজ হয়। দ্বিচারিণী ফুলাম-পত্নী স্পোর্টস্ দেখে ফেরার পর, ২৭শে জুলাই রাত্রে খাবার সময় এক ডিস সুপের সঙ্গে 'হীট্ স্ট্রোকের' ওষুধটি মি: ফুলামকে খাইয়ে দেন। খাওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু এই অসুস্থতার মধ্যে যে কারো কোন ষড়যন্ত্র থাকতে পারে তা কেউই সন্দেহ করে না, কারণ ডাক্তাররাও মি: ফুলামের অসুস্থতাকে Heat-strokeএর আক্রমণ বলে সিদ্ধান্ত করেন।

সে যাত্রা মি: ফুলাম কোন রকমে সামলে উঠলেও কিছু দিন পরে আবার তাঁকে খাওয়ানো হয় এই ভীষণ কালকূট এবং পুনরায় তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য। এবারের আক্রমণ কিন্তু মি: ফুলামকে একেবারে অকেজো করে দেয় এবং তিনি হাসপাতাল থেকে ফিরে আসেন সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে। ২রা সেপ্টেম্বর মেডিক্যাল বোর্ড তাঁকে চাকরির সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর পক্ষে বর্তমানে অবসর গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই বলতেও তাঁরা দ্বিধা করেন না।

এই ভাবে বার বার মারাত্মক আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে, অসুস্থতায় ও জীবন সম্বন্ধে হতাশায় প্রথম দিকে মি: ফুলাম সপরিবারে বিলেতেই ফিরে যাবেন বলে স্থির হয়, কিন্তু পরে উক্ত মত পরিবর্তন করে ভারতবর্ষে থাকাই তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন। এবং ভাগ্যচক্রে শেষ পর্য্যন্ত আগ্রায় গিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা হয়। এই স্থান নির্বাচনের মধ্যে মিসেস্ ফুলামের কতখানি প্রভাব ছিল তা জানা যায় না।

এর পর আমাদের ঘটনার পট পরিবর্তিত হয় আগ্রায়। ১৯১১

সালের ৮ই অক্টোবর ফুলাম আগ্রায় পৌঁছান, এবং তার দু'দিন পরেই অর্থাৎ ১০ই অক্টোবর রাত্রেই বহির্বাটীর বারান্দায় খাবার সময় তৃতীয় বার আবার তাঁকে হীট্-স্ট্রোকের সেই ওষুধটি খাওয়ানো হয়। মিসেস্ ফুলাম নিজের হাতে স্বামীর থালায় মাংস ও ঝোলের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে পরিবেশন করেন। ঐ মারাত্মক ঝোল গলাধঃকরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ ফুলাম অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। একে আগে থেকেই শারীরিক অবস্থা তাঁর খারাপ ত হয়েই ছিল, তার উপর আবার এই বিষ শরীরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বমি করতে আরম্ভ করেন। সেদিন ক্লার্ক সেখানে সান্ধ্য-ভোজের অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ঔষধের অছিলায় তিনি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেন। হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের সাহায্যে সেই অবস্থার উপরেই ক্লার্ক ফুলামের শরীরে আরো বিষ ইনজেকসন করে দেন। বিষে বিষে জর্জ্জরিত শরীরের পক্ষে তা আর সহ্য করা সম্ভব হয় না—মিঃ ফুলাম তৎক্ষণাৎ শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করেন—এই নৃশংস ষড়যন্ত্রের হাত থেকে চিরতরে তিনি রেহাই পান। মিসেস্ ফুলাম ও ক্লার্কের এত দিনের দুরভিসন্ধি সফল হয়। সে দিনটা ছিল ১০ই অক্টোবর; তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হয় তার পরের দিন এবং কোন কিছু ধরা পড়া বা সন্দেহ করার মত কোন কারণও ঘটে না।

এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের একমাত্র সাক্ষী ছিল মিঃ ফুলামের এক দশ বৎসর বয়স্কা কন্যা ক্যাথারিন। কিন্তু মার জন্য তার কণ্ঠ নীরব হয়েই থাকে।

বিধবা মিসেস্ ফুলাম আজ বহু দিন পরে অনেকটা নিশ্চিন্ত হন। অনেক দুর্ভাবনা আজ দূর হয়ে গেছে তাঁর মন থেকে। তাঁর এবং ক্লার্কের মাঝখানের একটা বড় বাধা এতো দিন পরে তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে, সেই অনাগত অসীম সুখ-সাগরে নিজেকে তলিয়ে দেবার দিনটির জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন—অপেক্ষা করতে থাকেন কবে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ক্লার্কের স্ত্রীরূপে ঘোষণা করতে পারবেন সেই শুভ দিনটির জন্য। তাঁর সেই সময়কার আর একটি চিঠি থেকে এই কামনার গুরুত্ব ভাল ভাবেই প্রকাশ পায়:

"আমার মিষ্টি মণি, কি অপরিসীম আনন্দেই কেটেছে গত দিনের রাত্রি—বিদায়-ক্ষণে আমায় 'হৃদয়েশ্বরী' বলে তোমার সেই সম্ভাষণ; 'অমূল্য প্রিয়া আমার' বলা—তার পর সারা রাত্রি কি সুখ ও শান্তিতে কাটিয়েছি আর অনুভব করেছি যে, জগতে সকলের চেয়ে বেশী ভালোবাসে আমাকে আমার হ্যারি। আর কেউই আমাকে এমন করে ভালোবাসেনি—এত গভীর, সত্য ও নির্ম্মল ভাবে। প্রিয়তম, এ যে কি—এমনি এক জন শক্তিমান পুরুষের উজাড় করা ভালোবাসা পাওয়া যে হীরা-মাণিকের চেয়েও মূল্যবান মনে হয়।"

আর একখানি চিঠিতে মিসেস্ ফুলাম ক্লার্ককে লেখেন:

"প্রিয় আমার,

সুখ-শান্তির চরম ক্ষণটি এখনো আসেনি আমাদের জীবনে। এখন কেবল একান্ত-চিত্তে আশা ও প্রার্থনা যে, এই চরম মুহূর্ত্তটি যেন আমাদের আনন্দ-মিলনের, দীর্ঘ-বিবাহিত জীবনের, তোমার চিরসাথী হয়ে থাকার দিন হবে, আর পিছিয়ে না যায়। আমি নিশ্চিত জানি যে আমাদের বিবাহিত জীবন হবে অত্যন্ত সুখের, কারণ আমাদের এ-বিবাহ সত্যিকারের ভালোবাসার বিবাহ—তাই নয় কি, প্রিয়তম?"

মিঃ ফুলামের মৃত্যুতে, এক দিকের পথ পরিষ্কার হলেও, অপর দিকে তখনও রইলেন মিসেস্ ক্লার্ক—মিঃ ক্লার্কের পত্নী। তিনিই এখন প্রেমিক-প্রেমিকার চির-মিলন-পথের একমাত্র বাধাস্বরূপ হয়ে দেখা দিলেন। মিসেস্ ফুলাম এ কথা ভালো ভাবেই জানতেন যে ঐ সৎচরিত্রা, শান্তিপ্রিয়া, নীরব মানুষটি বেঁচে থাকতে ক্লার্কের সঙ্গে তাঁর বিবাহের কোন উপায় নেই।

ক্লার্কের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কের কথা পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। কোনও স্ত্রীর পক্ষে স্বামিগৃহে এরূপ যন্ত্রণাদায়ক দুঃখের জীবন কল্পনাতীত হলেও, মিসেস্ ক্লার্ক সকল নির্য্যাতন অদ্ভুত দার্শনিক মনোভাবের সঙ্গে চিরদিনই মুখ বুজে সহ্য করে এসেছেন ক্লার্ক বহু বার তাঁকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করেছিলেন, এবং তাঁর এ সব কাজের বহু প্রমাণও পাওয়া যায়। কিন্তু মিসেস্ ক্লার্ক স্বামীর এই সব ঘৃণ্য কার্য্যকলাপ বা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন বলে, নিজের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সকল সময়েই খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। অথচ এ সব সত্ত্বেও কোন দিন তিনি স্বামি-ত্যাগ বা বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করার জন্য কোনরূপ উৎসাহ দেখাননি। এবং সে জন্য ক্লার্কও চাকরদের টাকা দিয়ে, বিষ খাইয়ে, নানা ভাবে স্ত্রীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেও এ যাবৎ কৃতকার্য্য হতে পারেননি।

এদিকে মিসেস্ ফুলাম অত্যন্ত অধৈর্য্য হয়ে ওঠেন ক্লার্ককে বিবাহের জন্য। তাঁর আর একখানি চিঠির কয়েকটি লাইনে এই মনোভাবের পরিচয় মেলে:

"আমাদের এই দু'টি প্রেমোৎসর্গিত হৃদয়, ভগবানের রাজ্যে সব চেয়ে মধুর বিবাহ-বন্ধনের ভেতর দিয়ে যেন আরও ভালোবাসার ও আরও মধুরতর বন্ধনে পরস্পরের নিকটতর হয়।"...

ক্রমশঃ এই সব চিঠির প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় বীভৎস ভাবে। মিসেস্ ক্লার্ককে হত্যা করার ষড়যন্ত্র আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হয়ে মিঃ ক্লার্ক তাঁর স্ত্রীকে সুনিশ্চিত হত্যা করার এক ঘৃণিত পথ অবলম্বন করেন।

এই হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট পাঁচটি লোকের নাম পাওয়া যায়। (১) বুদ্ধু, ক্লার্কের ভূতপূর্ব্ব চাকর। ক্লার্কের প্ররোচনায় এই একবার মিসেস্ ক্লার্ককে বিষ খাওয়াতে গিছল। (২) বুদ্ধা; (৩) সুখ্খা; (৪) মোহন ও (৫) রামলাল। খুনে গুণ্ডা বলেই এদের পরিচয় ছিল শহরের মধ্যে। ক্লার্কের সঙ্গে এদের এক চুক্তি হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয় যে, এরা ডাকাতির ভাণ করে মিসেস্ ক্লার্কের বাংলোর ঢুকে তাঁকে খুন করবে এবং কৃতকার্য্য হলে পুরস্কারস্বরূপ এক শত টাকা পাবে। ধরা পড়ার পর বুদ্ধার স্বীকারোক্তিতে এই একশ টাকা পুরস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এ-ও প্রমাণ হয় যে, এই সময় মিসেস্ ফুলামের দেওয়া একখানি একশ' টাকার চেকও ভাঙানো হয়।

১৯১২ সালের ৭ই নভেম্বর এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হয়। রাত্রের দিকে দুর্ব্বৃত্তরা গোপনে মিসেস্ ক্লার্কের বাংলোয় প্রবেশ করে। সে দিনটা ছিল রবিবার; ক্লার্ক তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ

করার অছিলায় রাত্রি ১২-৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত রেল-ষ্টেশনে কাটিয়ে বাড়ী ফেরেন। ক্লার্ক এটা নিশ্চিত জানতেন যে, বাড়ী ফিরেই তিনি সব শেষ হয়ে গেছে দেখবেন এবং তার স্ত্রীর হত্যাকাণ্ড ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েই হৈ হৈ হচ্ছে শুনবেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখলেন যে, যা ঘটা উচিত ছিল তা কিছুই ঘটেনি। বাড়ির পোষা কুকুরের চীৎকারে ভাড়া-করা হত্যাকারীরা তাদের গোপন স্থান থেকে বেরুতে পারেনি। এ ব্যাপার চাক্ষুষ করার পর প্রভু নিজেই কুকুরটিকে তাঁর নিজের একটি বিছানার চাদরে মুড়ে বেঁধে বহির্বাটীর একটি ঘরে বন্ধ করে রাখেন।

ক্রমশঃ রাত্রি আরো গভীর হয়, কুকুরের বিরক্তিকর আওয়াজ তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। প্রায় দেড়টা নাগাদ আস্তে আস্তে সয়তানরা প্রবেশ করে মিসেস্ ক্লার্কের ঘরে। তার পর তারা ঐ অসহায়া নারীকে ঘুমন্ত অবস্থায় তরবারির সাহায্যে মাথায় ও শরীরের নানা স্থানে আঘাত করে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। ডাকাতির উদ্দেশে খুন হয়েছে, ব্যাপারটাকে এই ধরণের রূপ দেবার জন্য হত্যাকারীরা ঘরের আসবাবপত্র ছত্র-ছত্রাকার করে যায় বটে, কিন্তু নিজেদের জন্য কিছুই তারা নিয়ে যায় না এবং মিসেস্ ক্লার্কের পাশে ঘুমন্ত ছোট ছেলেটিকেও তারা স্পর্শ করে না।

হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই পুলিসে খবর দেওয়া হয় এবং পুলিস তৎক্ষণাৎ তদন্তের ভার নেয়। কিন্তু এই ঘটনার পূর্ব্বে থেকেই ক্লার্কের সঙ্গে মিসেস্ ফুলামের অবৈধ ঘনিষ্ঠতার কথা আগ্রায় প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর জেনে গেছল, এবং তাঁর সঙ্গে মিসেস্ ক্লার্কের অশান্তিকর সম্পর্কও কারো অজানা ছিল না। কাজেই পুলিসও খুব সহজে হত্যাকাণ্ডটিকে নিছক ডাকাতি বলে গ্রহণ করতে পারেনি। এ ছাড়া আরো অনেক ব্যাপারে পুলিসের সন্দেহের উদ্রেক হয়। প্রথমতঃ, ঘটনা কালে কুকুরের চীৎকার শুনতে পাওয়া যায় না এবং সেই রাত্রেই ক্লার্কের বিছানার চাদর অন্তর্দ্ধান হওয়ার ব্যাপারও পুলিসের নজর এড়ায় না। দ্বিতীয়তঃ, দুর্ব্বৃত্তেরা কিছু না নিয়েই বিদায় হওয়ায় বিশেষ সন্দেহের উদ্রেক করে। তৃতীয়তঃ, ক্লার্ক পুলিসের কাছে তাঁর জবাবদিহিতে একটি মারাত্মক ভুল করেন। তিনি বলেন, যে, ঘটনা কালে তিনি দিল্লী থেকে বোম্বাই যাত্রী এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রেল-ষ্টেশনে যান। কিন্তু এ কথা যে কত দূর মিথ্যা পরে তা প্রমাণিত হয়। দিল্লী থেকে বোম্বাই যাওয়ার কোন ট্রেণ আগ্রার লাইনে যে পড়ে না, সে কথা তখন তাঁর খেয়ালই হয়নি।

এত দিনে দুষ্কৃতির ফল ফলতে সুরু হয়। ১৪ই নভেম্বর তদন্ত শেষে পুলিস ক্লার্ককে গ্রেপ্তার করে। তার পরেই পুলিস মিসেস্ ফুলামের বাংলোয় যায় খানাতল্লাসীর জন্য। এই সময় মিসেস্ ফুলামের বিছানার তলা থেকে একটি টিনের বাক্সের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত চার শত প্রেমপত্র পুলিসের হস্তগত হয়।

ক্লার্কের বাংলো খানাতল্লাসী হওয়ার সম্ভাবনায় ধরা পড়ার ভয়েই বোধ হয় এই চিঠিগুলি মিসেস্ ফুলামের কাছে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।

এই অপ্রত্যাশিত প্রেমপত্রগুলিই শেষ পর্য্যন্ত যেন নিদারুণ নির্ম্মমতায় প্রেমিক-প্রেমিকার অতি নীচ প্রেমধারার প্রতিটি দিনের প্রতিটি কাজের, প্রতিটি পাপের নিখুঁত বর্ণনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও প্রত্যক্ষ ভাবে জগতের সামনে এবং বিচারকদের সম্মুখে দু'টি হত্যা-কাণ্ডেরই সম্পূর্ণ রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে। এই চিঠিগুলি এমন ভাবে রক্ষা করার মধ্যে ক্লার্কের যে কি অভিসন্ধি ছিল তা সত্যিই বোধগম্য হয় না। এই চাক্ষুষ প্রমাণগুলি সরিয়ে ফেলতে পারলে হয়ত তিনি বেঁচে যেতে পারতেন। কিন্তু তা হবার নয়, তাই শেষ পর্য্যন্ত এই চিঠিগুলিই যেন সযত্নে রক্ষিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পথকে সুগম করে দেবার জন্য।

•

১৯১৩ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ক্লার্ক এবং মিসেস্ ফুলামের মামলার শুনানি আরম্ভ হয় এবং মাত্র তিন দিনেই বিচার শেষ হয়ে যায়। এই মামলায় দু'জনকেই দু'টি অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগে মিঃ ফুলামকে এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত হত্যা করার প্রচেষ্টায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়, এবং দ্বিতীয় অভিযোগে ১০ই অক্টোবর মিঃ ফুলামকে হত্যা করার অপরাধে অপরাধী বলে ঘোষণা করা হয়। আসামীদের বিরুদ্ধে সকল প্রমাণ বিচারালয়ে উপস্থিত করার পর, ক্লার্ক নিজে তাঁর সমস্ত অপরাধ স্বীকার করেন এবং তাঁর জবাবদিহিতে বলেন যে, 'একমাত্র আমিই সব কিছু অপরাধের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে দোষী। মিসেস্ ফুলাম আমার নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছেন মাত্র। তাঁর উপর আমার প্রভাব অত্যন্ত বেশী ছিল, সে কারণ তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তাধীন। তিনি যা করেছেন তার জন্য তাঁকে অপরাধী করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে সমস্ত কিছুর জন্যে একমাত্র আমি নিজেই দায়ী। ধর্ম্মাবতার কি আমাকে প্রথম থেকে সব কথা বলবার অনুমতি দেবেন?—গোড়াতে আমারই অভিপ্রায় ছিল তাঁকে অসুস্থ করে ফেলা, এবং অল্প অল্প বিষ খাইয়ে এমনই রুগ্ন করে ফেলা,—যাতে দীর্ঘ দিনের ছুটিতে তাঁকে দেশের বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।...'

এই সমস্ত অমানুষিক বীভৎস ঘটনার মধ্যে ক্লার্কের চরিত্রে কেবল মাত্র এই একটি গুণই বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় যে, শেষ পর্য্যন্ত তিনি মিসেস্ ফুলামের সমস্ত অপরাধের বোঝা নিজের মাথায় চাপিয়ে নিয়ে তাঁকে রক্ষা করার জন্য—অকৃতকার্য্য হলেও, তাঁর নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। বিচারালয়ে তিনি শেষ অনুরোধ করেন মিসেস্ ফুলামের সঙ্গে একবার সাক্ষাতের অনুমতির জন্য। কিন্তু অনুমতি তিনি পেলেও মিসেস্ ফুলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃত হন। এই যন্ত্রণাদায়ক সাক্ষাৎ অপেক্ষা দেখা না হওয়াই হয়ত শ্রেয়ঃ মনে করেন মিসেস্ ফুলাম।

আত্মপক্ষ সমর্থনে মিসেস্ ফুলামও যথাসাধ্য ভাবে এই কথাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, তিনি তাঁর স্বামীকে কখনোই হত্যা করতে চাননি, তবে তাঁকে চিররুগ্ন করে রাখাই ছিল তার একমাত্র অভিপ্রায়। কিন্তু এ বিষয়ে চিকিৎসকগণের বিরুদ্ধ মতামতের সম্মুখে উভয় আসামীরই উক্ত ধরণের যুক্তিহীন উক্তি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়—প্রমাণিত হয় না।

মিঃ ক্লার্ক ও মিসেস্ ফুলাম উভয়েই শেষ পর্য্যন্ত কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ সম ভাবে প্রাণদণ্ডাদেশে দণ্ডিত হন।

এই মামলার বিচার কালে যখন মিঃ ফুলামের ছোট মেয়ে ক্যাথারিন সজল অশ্রুপূর্ণ নয়নে তার বক্তব্য বলতে থাকে, তখন

বাসকসজ্জা

শ্রীশান্তি পাল

বঁধু, কেন কর ভুল? ভাঙিস্ না কূল!
মানের রঙ্গ ছাড়,
বিরলে বসিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া
ফেল না নয়নাসার!
যৌবন নিয়ে এ কি হেলা-ফেলা
পথ পানে চেয়ে কাটে সারা বেলা;
আকাশে ঘনায় ঘোর মেঘ-মেলা
ঘর হ'ল আঁধিয়ার;
স্বপন-বিলাসী সুদূর পিয়াসী
ফিরে আয় এইবার!

বিজুরী ঝলকে থমকে থমকে
চমকি উঠিছে বুক,
নয়নের জল মুছিল কাজল
মলিন হইল মুখ।
কেয়া-কদম্ব বৃথা ফুটে বনে
কলাপী নাচিছে মিছাই ভবনে,
মন-ভাঙা গানে পবনের স্বনে
উচ্ছসি উঠে বুক;
কোথা সে মায়াবী নাহি প্রাণে যা'র
দয়া-মায়া এতটুক!

কি যে হ'ল ব্যাধি দিন কাটে কাঁদি,—
এ-কথা কহিব কা'রে?
যে-জন ঠেকেছে সে-জন বুঝেছে
বিঁধেছে এ-কাঁটা যা'রে!
জাতি-কুল-মান সব তেয়াগিয়া
না ডরি কাহারে দেয় সে ডারিয়া
তন-মন দিয়া অরঘ রচিয়া
ভজে সে নিয়ত তা'রে;
নয়ানের ধারে ভিজায়ে ভিজায়ে
নিছিয়া এ-উপচারে!

শোন্ লো সজনি, এ কাল-রজনী
কাটিবে না জানি তোর,
অবুঝ বাঁশীর নিশান শুনে লো
পরাণ হ'য়েছে ভোর!
যাস্‌নেক' আর বন-পথে ভুলে
গাগরী ভরিতে যমুনার কূলে,
বৃথা পূজা তা'র তুলসী ও ফুলে
মিছে ফেলা আঁখি-লোর;
বাসক-শয়ান শূন্য রহিবে
আসিবে না মনচোর!

বিচারালয়ে এক করুণ মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য দেখা দেয়, অনেকের পক্ষেই অশ্রু-সংবরণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ক্যাথারিন বলে, "বাবা বললেন, ক্যাথারিন আমার, আমি চললুম। লক্ষ্মী মেয়েটি হয়ে থেকো, ভগবান তোমায় আশীর্ব্বাদ করবেন। লিওনার্ডকে আমার ভালোবাসা দিও আর বলো, সে যেন ক্ষোভ না করে।" তার পর তিনি আরো বললেন, "তোমার মা কোথায়?" উত্তরে আমি বললাম, "খাবার ঘরে আছেন, আমি তাকে ডেকে দেব?" বাবা বললেন, "না মণি, তাকে আর আমার প্রয়োজন নেই।"

এর পর মিসেস্ ক্লার্ককে হত্যার দ্বিতীয় মামলা আরম্ভ হয় ১৯১৩ সালের ১০ই মার্চ্চ এবং এর বিচারও মাত্র তিন দিনে, অর্থাৎ ১৩ই মার্চ্চ শেষ হয়ে যায়। এই মামলায় আসামীর সংখ্যা ছিল সর্ব্বসমেত ৮জন। বুদ্ধা, রামলাল, সুখখা, মোহন এবং মিসেস্ ফুলাম ও মিঃ ক্লার্ক। মিসেস্ ফুলাম ও ক্লার্ক সাহেব অপরাধ স্বীকার করেন। অন্যান্যদের মধ্যে বুদ্ধু অপরাধ স্বীকার করে রাজসাক্ষী হওয়ায় বেঁচে যায়। রামলালের অপরাধ সম্পর্কে সন্দেহ থাকায় তাকেও ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকী সকলকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, এবং মিসেস্ ফুলাম ব্যতীত প্রত্যেকটি আসামীকেই ফাঁসি দেওয়া হয়। মিসেস্ ফুলাম শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে পরিত্রাণ পান। কারণ তিনি তখন গর্ভবতী। আইনতঃ গর্ভবতী থাকা কালীন ফাঁসি হয় না। তবে তিনি এত বড় অপরাধের হাত থেকে একেবারেই মুক্তি পান না; ফাঁসির পরিবর্ত্তে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু এই কারাদণ্ডও বেশী দিন তাঁকে ভোগ করতে হয়নি। ১৯১৪ সালের মে মাসে এলাহাবাদের নৈনী জেলে একটি শিশু-সন্তান প্রসবের পরই তিনি মারা যান—অবৈধ প্রেমের পরিণতি, নির্ম্মম নৃশংসতার চরম ফল ফলে উভয়েরই মৃত্যুতে।

১২

গ্রাম্য রাজনীতির ক্ষেত্রে পট-পরিবর্ত্তনের সময় এসেছে। স্বভাব-ভীরু তাঁতিরাও তাঁদের মাকু ঠেলার তালে তালে রাজনীতির আলোচনা করে। লাঙ্গল চালাতে চালাতে গ্রাম্য চাষারাও নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে। প্রাচীনপন্থীরা ঘোষালদের কায়েম রাখতে চায়। নবীনপন্থীরা চায় নতুন কোনও ব্যক্তিত্বকে সিংহাসনে বসাতে। মুখে-মুখে জনমত গঠন হয়ে ওঠে। প্রচার চলে মুখে-মুখে। দ্বন্দ্ব হয় নবীনে-প্রবীণে। যে যার প্রতিপক্ষকে দমন করে—আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করতে চায়।

বুধবার প্রত্যূষে এমনি একটা আলোচনা হচ্ছিল ধোপা-বাড়ীর প্রাংগণে। রজনী শীল জাতে নাপিত, কিন্তু পেশা তার ডাক্তারী, কখনও কবিরাজী কখনও বা ওঝালি! ও এসেছে ধোপা-বাড়ী অষুধ দিতে। সংগে একটা পুরোন পিতলের ঝাঁপি। তার মধ্যে ওর ডিসপেন্সারী। ঐ ঝাঁপির মধ্যে এক কোণে একটা ডিপার্টমেন্টও আছে, যাকে ইংরেজীতে বলে সার্জিকেল ডিপার্টমেন্ট। একটা দেশী নরুণ, একটা দেশী ক্ষুর ও একখানা কাঁচি নিয়ে এই ডিপার্টমেন্টটি বহু দিন ধরে খাড়া হয়ে আছে। ব্যাখ্যা করে বললে বলতে হয়, সুশ্রুতার আমল থেকে। তত্ত্বজ্ঞরা বলেন: রজনী ঘরে বসে যে ক্ষুর দিয়ে সংগোপনে ক্ষৌরি হয়, বাইরে এসে সেই ক্ষুর দিয়েই দুষ্ট ব্রণ নির্মূল করে।

সে পান চিবোতে চিবোতে আরম্ভ করে, 'বিদেয়-আদায় চিরদিনই ঐ ঘোষাল বাবুদের বাড়ী ভাল। ও-বাড়ীতে আমার অষুধ-পত্তর যেমন চলে, তেমনি মাসুলটাও মেলে। বনেদী ঘর, একটু সর্দি হলেই ডাক্তার চাই।'

ধোপা-বৌ জবাব দেয়, 'কিন্তু বাবুরা কোন দিন একখানা কাপড়ও কাচায় না বা মা-ঠাকরুণরা থান কাপড় ছাড়া একখানা শাড়ীও ধুতে দেয় না। আমরা পান-চুণও ফেরি করি, কখনও তো একটি পয়সার পান চুণ ও কোনও ভাই কেনে না! আর মানুষ দেখলে যে অবজ্ঞা! ভুলে গেছ সেদিনের কথা?

কথাটায় রজনীর বুকেও আঘাত লাগে। কারণ এই শক্তি-গড়ের হিন্দু সমাজে শুভ কাজে যাওয়ার সময় তার মুখখানা দেখাও না কি ঐ ধোপা-বৌর মুখ দেখারই সামিল! সে তো স্পষ্টই এক দিন নিজের কানে শুনেছে—ছোট ঘোষাল যাবে সদরে কি একটা কাজে, বড় ঘোষাল বলছে: আগে ধোপা পাছে নাই (নাপিত), সে কাজে যেও না ভাই। ধোপা-বৌও এসেছিল তখন কাপড় নিতে না কি করতে যেন উঠানে, এমনি অশুভ যোগাযোগ! রজনী বলে, 'আরে ও-সব সামাজিক বড়-বড় কথা নিয়ে তোমার আমার মাথা ঘামান চলে না। তবে ঐ যে পান-চুণ-কাপড়-কাচানর কথা বললে, ওসব তারা ব্যয়-বাহুল্য মনে করে—হাজার হলেও তারা বনেদী হিসেবী লোক কি না!'

'তা হলে তারা বাবু না ঘোড়ার ডিম! আর আমাদের বোসেরা উঠতি ঘর হলেও বাবু বটে! পেলে দু'সের চুণও কিনবে, দশখানা শাড়ীও কাঁচতে দেবে। ঘরে মজুত পান থাকলেও মা-ঠাকরুণ দু'গোছ পান কিনে রেখে দামের চেয়েও বেশী এক সের চাল দিয়ে দেবে। আর ওদের বাড়ীর এতটুকু ছেলে-মেয়ে পর্য্যন্ত দেখলেই বসতে বলবে—পানের বাটাখানা তাড়াতাড়ি এনে দেবে। বাবু কত দিন ঘুম থেকে উঠে আমার মুখ দেখেছেন, কই, হেসে ছাড়া তো কথা বলেননি!'

'আরে ও হাসি মুখের, মনের না। সব শেয়ালের এক রা।'

ধোপা-বৌ সজোরে প্রতিবাদ করে, 'মিথ্যা কথা। তোমার অষুধ আমরা খেতে পারি, ঘোষালেরা রাখতে পারে, কিন্তু যাদের দু'টো কাঁচা পয়সা আছে, বিদেশে পাঁচটা ডাক্তার-বদ্যি দেখেছে তারা রাখবে কেন? ওঁদের ওপর তোমার রাগ'তো সেই জন্য? বোসেদের আর সেদিন নেই যে তোমার মেটে বড়ি সস্তা কড়ি দিয়ে গিলবে।'

ওর কথার ঝাঁজে রজনী জ্বলে ওঠে: 'যত বড় মুখ না তত বড় কথা! আচ্ছা, আমি যাচ্ছি ঘোষাল বাবুদের বাড়ী, এক্ষুনি গিয়ে বলছি তোমার অহংকারের কথা।'

মুখরা সুখীর মাও সহজ পাত্রী নয়, সে বলে, 'যাও না, যাও—আমি কারুর খানাবাড়ীর রাইওৎ না যে ভয়ে গর্ত্তে লুকোব!'

ধোপা-বৌর উচ্চ কণ্ঠ শুনে দু'-চার জন করে লোক জড়ো হয়। দাঁড়িয়ে দেখে আর হাসে।

রজনী শ্লেষের স্বরে বলে, 'মানুষ দেখলে অবজ্ঞা করে ঘোষাল বাবুরা। ধোপা দেখলে কি নাচবে তারা, না বাজনা বাজিয়ে তুলবে ঘরে?'

কোমরে কাপড় জড়িয়ে চুণের পাতিলে জল ঢালতে ঢালতে ধোপা-বৌ জবাব দেয়, 'মুখ সামলে কথা বলিস্ নাপিতের পো, ভুলে যাস নে যে তোর মুখ দেখলেও অযাত্রা!'

'কি, নাপিত-ছাপিত যা-তা বলবি?'

ধোপা-বৌ ঘরে যায়। লোকে ভাবে, এই রে, ঝাঁটা আনতে গেল বুঝি—নিয়ে আসে অন্য জিনিস। 'এই নে তোর মেটে বড়ি, আর কক্ষনো আমার বাড়ীমুখো হসনি মুখ্যু-বদ্যি।'

'আমি মুখ্যু! আর তোকে ছুঁলে যে জাত যায়, তুই হলি বুদ্ধির ঢেঁকি!'

'হারামজাদা নাপিত, তোর এত বড় কথা, দাঁড়া হারামজাদা, তোকে একটু শিক্ষে দিয়ে দি। বলে ধোপা-বৌ চুণের পাতিলটা

দক্ষিণের বিল

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

চুলে রজনীর মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে! পাতলা পাতিলটা ভেঙে-চুরে চুরমার হয়ে ওকে চুণে-চুণে একাকার করে দেয়।

রজনী ধবলবর্ণ শৃগালের মত ঝাঁপিটা ফেলে পালায়।

ধোপা-বৌ গোখ্‌রা সাপের মত ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ করতে থাকে। জনমে-মরণে যাদের না হলে চলে না, তাদের ছুঁলে জাত যায়—' একটু বসতে দিতে হাত খসে পড়ে!' তার ইচ্ছা করে যে এই সব অবজ্ঞাকারী বুড়ো মরদগুলোকে তার মুড়ো ঝাঁটাটা দিয়ে এক চোট ঝাঁটিয়ে বায়ু-রোগ ছড়িয়ে দিতে।

সেই সময় নিতাই প্রবেশ করে, 'ধোপা-বৌ তোমার মেয়ে কোথায়?'

নিতাইকে দেখেই ধোপা-বৌ ত্বরায় ক্ষিপ্রা অভিনেত্রীর মত রূপ পরিবর্ত্তন করে—সংহারিণী মূর্ত্তি সহসা অতিথিবৎসলা হয়ে ওঠে। এসো এসো সরদারের পো, এই দাওয়ায় উঠে বসো। সুখী একটু তামাক দে মা। তোমরা কি চাও, এখন বাড়ী যাও।'

ধোপা-বৌকে সকলে চিনত, কেউ আর দেরী করতে সাহস পায় না।

'কাল বাবুর সময় হয়নি, আজ সব শুনবেন।'

ধোপা-বৌ বলে, 'আমরা কোনও দর-দস্তুর করব না—একটা পয়সাও চাই নে, ওর যা ধম্মে-কম্মে নেয় তাই যেন করেন।'

'তোমাদের কোনও ভয় নেই। তোমরা তো কিছু পাচ্ছ না—যদি তোমাদের একটা পথ করে দিতে পারি, তা হলে চিরদিন বসে বসে খেতে পারবে। বাবু কোন দিন জাল-জুয়াচ্চুরি ঠগা-ঠগি পছন্দ করেন না—তোমাদের এমন সুযোগ ছাড়া উচিত না।'

'সে কথা কি আমরা বুঝি নে! অত-বড় লোক কি আমাদের খাবে? এমনি কত লোকের উবগার করছেন।'

এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে একটি মৃতকল্প লোক বলে, 'সুখীমা, আমাকে একটু জল দে।'

সুখী জল নিয়ে যেতেই সে জলের ভাণ্ডটা পাশে রেখে পিপাসার চেয়েও বড় কথাটা বলে, 'ধম্ম ঠেকিয়ে কান্না-কাটি করে তুই দে গে দেখে বাবুকে। কপালে থাকলে তোদের ওতেই সুখ হবে। দেশের ছোট-বড় থাকে বিশ্বেস করে তাকে তোরাও বিশ্বেস কর গে। মরণ-কালে বলে যাচ্ছি, তোদের ওতেই ভাল হবে। তোর মা-মাগীকে কন্ত বিশ্বেস নেই—ওর মন টুস-টুস করছে।'

সুখী একটু হেসে চলে যায়।...

নিতাই বসেছিল—একটু পরেই সেজে-গুজে নিতাইর সাথে সুখী রওনা হয়। ধোপা-বৌ তাকে সাজিয়ে দেয়। যে কাজের জন্য সুখী যাচ্ছে—সজ্জাটা তার চেয়েও বেশী বলে মনে হয়।

১৩

বিপ্রপদ অন্দর-মহলে বসে যেন কি একটা দলিল দেখছিলেন।

নিতাই গিয়ে পায়ের ধুলো নেয়—সুখীও তদনুকরণ করে। দুজনকেই ইংগিতে বসতে বলেন বিপ্রপদ। 'আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে, বিশেষ কাজে আমাকে কোথায় যেন শিবচর কাছারীতে বদলী করেছে। সেই জন্য এখন আর বড়-বৌর আমার সাথে যাওয়া হবে না। ভালই হলো—উনি বাড়ী থাকলে মেয়েদের দু'-একটা সম্বন্ধ আসতে পারে। কিন্তু আমার একটু অসুবিধা হবে। তা হোক।'

'কবে পর্যন্ত যেতে চান?'

'এই দু'-চার দিনের মধ্যেই—বলতে গেলে কি, এখন আর পরের গোলামী করতে ইচ্ছা করে না।'

কমলকামিনী ছিলেন নিকটেই দাঁড়িয়ে, বলেন, 'এত বুড়োও তুমি হওনি বা এমন পয়সাও তোমার নেই যে বসে-বসে খাবে। ও আলস্য!'

'তা ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ!'

'মেয়েদের বিয়ে হলো না, ছেলে মানুষ হয়নি—এর মধ্যে এত আলস্য হলে চলবে কেন?'

বিপ্রপদর মনে একটু আঘাত লাগে, বলেন, 'না না, ও কথার কথা বলেছি—জীবনে এমন কিছু করিনি যে ছুটি চাইতে পারি।'

নিতাই ও সুখী বুঝতেই পারে না যে এই ধনী পরিবারের অভাব কোথায়। এত থাকতেও কেন এরা সুখী নয়!

কমলকামিনী যা বলেছেন তা বর্ণে-বর্ণে সত্য। এতগুলো যাঁর পোষ্য, তাঁর চাই বিস্তীর্ণ ধানী জমি। দেশে যে জমি আছে তা অতি সামান্য—তিন মাসের খোরাকীও হয় না। নগদ টাকা এদিক্‌-ওদিক্‌ ঘোরে—বছরে এক সময় চাল কেনা পড়ে। লোকে বুঝতে পারে না, পুরোন ধান সর্বদা গোলায় মজুত থাকে। ও ধান খোরাকীতে খরচ না করে বর্ষাকালে ধার কর্জ দেওয়া হয়। মাঘ-ফাল্গুনে তা আদায় হয়ে যায়। এত যে জৌলুস তার কোথায় গলদ তা গৃহিণী কমলকামিনী মর্ম্মে মর্ম্মে জানেন। বিপ্রপদ যে জমি চান, তা এ দেশে মিলবে কোথায়? এখানে বহু লোকের বাস, যদিও বা পাওয়া যায় তা লবণ-পোড়া দর। তা কিনে কি এগুন যায়, না আশ মেটে! তিনি চান বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড—বিঘার পর বিঘা তাঁরই জমি, তাঁরই ধান। কোনও সরিক নেই, ভাগী নেই—শুধু তাঁর, একান্ত তাঁরই, জমি। এক-নজরে সীমানা নির্দ্দেশ করা যায় না, বর্ষায় সবুজের বন্যা, পৌষে সোনার ঢেউ। এ জমির সন্ধান তাঁকে কে দেবে?

নিতাই বলে, 'দু'শো কি আড়াইশো বিঘে নাল জমি এক-বন্দে। তার দক্ষিণ সীমানায় একটা বিল—তাতে যেমন মাছ, তেমনি পাখী। এই মেয়েটি একমাত্র ওয়ারিশ।'

বিপ্রপদ চমকে ওঠেন, 'বলো কি! দু'শো কি আড়াইশো বিঘে নাল জমি এক বন্দে—তার একমাত্র ওয়ারিশ আমাদের ধোপা-বৌর মেয়ে সুখী?'

'হ্যাঁ বাবু, আমি কি মিছে বলছি? এই দেখুন নক্সা, এই দেখুন পরচা।'

উপস্থিত সকলেই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। ওর কাপড়-চোপড় যতই ধোপ-দুরস্ত হক, তার সাথে এ ঐশ্বর্য্যের সামঞ্জস্য কোথায়? অন্ধকারে যেমন একটা স্ফুলিংগ জ্বলে ওঠে, তেমনি করে মুহূর্ত্তের জন্য এই ধোপার মেয়ে সুখী জ্বলে উঠে—এমন কি কমলকামিনীকেও ম্লান করে দেয়।

কাগজ-পত্র বিপ্রপদ দেখে বলেন, 'এখন ও চায় কি?'

'বেচতে চায়?'

'জমি এখন কার দখলে?'

'ঘোষালদের।'

'ঘোষালদের!' বিপ্রপদ প্রশ্ন করেন, 'তার মানে?'

নিতাই বলে, 'বড্ড কষ্ট করে ওর এক দাদাশ্বশুর, এই জমি করেছিল। তখন জমিতে ধান হতো না—হতো শাপলা আর শালুক, পানিফলের জলো লতা। পাঁচ-সাত হাত জল! শাপলা আর শামুক বেচে খাজনা দিয়েছে এই আশায় যে পর-পুরুষে হয়ত বিল জাগবে, চর পড়বে, তারা সুখ-সচ্ছন্দে ভোগ-দখল করবে। কিন্তু বুড়োর এমনি কপাল, নিজের দু'-দু'টো বিয়ে—একটা বৌরও ছেলে হল না। বরঞ্চ ধারে-কাছে যারা ওয়ারিশ হবে তারাও গেল মরে। তখন বুড়ো সুখীর নামে একটা দানপত্র করে যায়। সে আজ প্রায় দশ বছরের কথা। ঘোষালরা এই সব কেমন করে যেন টের পায়। একটা জাল মেয়েমানুষ খাড়া করে একটা ভুয়া দলীল নেয় রেজিষ্ট্রী করিয়ে। এবার করে সুখীকে বেদখল। ওরা গরীব, দলিল-পত্র ও বোঝে না, সেই থেকে চুপচাপ।'

'হুঁ।' বিপ্রপদ একটু চিন্তা করে বলেন, 'ব্যাপারটা বেশ জটিল এবং কঠিনও বটে—ঘোষালদের মর্মস্থলে গিয়ে ঘা লাগবে। কিন্তু এ বিবাদ তো কেউ টাকা দিয়ে কিনবে না। প্রতিপক্ষ দুর্দ্দান্ত ও মামলাবাজ। সুখীরা কি চায়?'

'ওরা টাকা-পয়সা কিছু চায় না। মামলা-মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হলে কিছু জমি চায়।'

'তা মন্দ না। আচ্ছা, যদি বছর বছর কিছু-কিছু ধান দেই তবে কেমন হয়?'

'সে ব্যবস্থা আরো ভাল—ওদের কোন ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হলো না।'

'কিন্তু জমি দখল করতে লোকজন চাই—দাংগা-হ্যাংগামা খুন-জখম হতে পারে, এ সব করবে কে?'

'তার জন্য ভাববেন না বাবু। আমি আর ইমান থাকলে হাজার লোক ফিরিয়ে দিতে পারব দু'খানা লাঠি দিয়ে।'

'কিন্তু তোমরা তা করতে যাবে কেন? কি স্বার্থ তোমাদের?'

'আমরা চাষা-ভূষো লোক স্বার্থ-টার্থ বুঝিনে—বুঝি, ডাক পড়লে জান দিয়ে মান রাখতে হবে।'

'তা হলে কালই দলীল রেজিষ্ট্রী হবে।'

নিতাই বলে, 'আমারও তাই ইচ্ছা। তোর মত কি সুখী?'

আগুনের টুকরার মত সুখী শুধু হাসে।

কমলকামিনী ভাবেন: ছোট লোক!

বিপ্রপদ বিরক্ত হন।

নিতাই বলে, 'বাবু, ওর মত আছে।'

১৪

পরের দিন অবশ্য দলীল রেজিষ্ট্রী হওয়া অসম্ভব। এত বড় একটা দলীল লিখতেই প্রায় দু'-তিন দিন সময়ের দরকার। নিতাইকে পাঠান হলো ষ্ট্যাম্প কিনতে। সে ষ্ট্যাম্প কিনে খুঁটি-নাটি কথা জেনে আসবে। সন্ধ্যার সময় নিতাই ছ'ক্রোশ পথ হেঁটে বৃথাই ফিরে এলো। এখানের আফিস ছোট, এত দামী ষ্ট্যাম্প পাওয়া যাবে না, জেলা থেকে আনতে হবে। আর একটা কথা নিতাই জেনে এসেছে, সেইটাই বিশেষ জটিল কথা: কবলার মূল্য কত হবে এবং নিয়ম সে টাকাটা কবলা-দাতার স্বীকার করে নিতে হবে যে নগদ বুঝে পেয়েছি। সাধারণতঃ দাতা স্ত্রীলোক হলে এ নিয়মটা বিশেষ কড়াকড়ি ভাবেই প্রযুক্ত হয়। বিপ্রপদ নগদ টাকা দেবেন না। যদি আফিসে গিয়ে রেজিষ্ট্রীর সময় সুখী কারুর পরামর্শ মত গোলমাল করে, কিম্বা হাকিমের কাছে বলে, আমি নগদ কিছু পাইনি। তখন দলীল তো রেজিষ্ট্রী হবেই না বরঞ্চ এই ষ্ট্যাম্পের টাকা ও অন্যান্য যাবতীয় খরচের ব্যয় সম্যক্ নষ্ট হবে। আগে ওদের ডেকে বিস্তারিত বুঝে-সুঝে জিজ্ঞাসাবাদ করে কাজে লাগতে হয়। স্ত্রীলোকের মন টলতে কতক্ষণ? নিজের দলীল রেজেষ্ট্রী করতে গিয়ে ইদানীং নিতাই পাকা হয়ে গেছে। অনেক ভাল-মন্দ দেখেছে সে। তাই পূর্ব্বাহ্ণেই আঁট-ঘাট বেঁধে যাবে। বাবুর টাকার মমতা ওর নিজের টাকার চেয়েও বেশী। দলীল লেখার পর যদি এমনি একটা গোলমালে রেজিষ্ট্রী পণ্ড হয়ে যায়, লোকে মুখে চুণকালি দেবে—যারা ভিতরের কথা না জানবে তারা ঠগ-জুয়াচোর বলবে। একটা বিধবা স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করতে এসেছে এতগুলো লোক দল বেঁধে। এ কথা গ্রামেও এসে পড়বে কাকের মুখে।

বিপ্রপদ নিতাইর মুখে সব শোনেন। তাঁর মনে বিগত দিনের সুখীর হাসির ভংগিটা চকিতে খেলে যায়। কেমন যেন একটা সন্দেহ হয়। মনটা সংগে সংগে তিক্ত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন: 'নিতাই, কাজ নেই এত ঝঞ্ঝাটে—সুখী সহজ মেয়ে নয়।'

নিতাই বলে, 'বিনা ঝঞ্ঝাটে কি হয় বাবু? কোনও কাজই তো হয় না। এতগুলো জমি, বিশেষ করে উঠতি জমি, বিল শুকিয়ে যাচ্ছে—আর কি কখন কোন সুযোগে হবে?'

কথাবার্তা শুনে কমলকামিনীও এসে বিপ্রপদর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, বলেন,' ওঁর চিরদিনই ঐ এক দেখলাম—এগোতে সংকোচ পিছোতে লাজ। ও করে কি কোনও কাজ হয়? যা করব তা ধর-মার করে করে ফেলতে হয়।'

'আমি কি না বলছি না কি? তবে দেখে-শুনে তো করতে হবে।'

'বেশী কিছু দেখার দরকার নেই—দলীলটা শুদ্ধ কি না তাই শুধু দেখ।'

'আমিও তো তাই বলছি!' বিপ্রপদ ধাক্কা খেয়ে বলেন, 'আমিই তো তাই বলছি।'

'বেশ, তা হলে আমার কথা তুলে নিলাম।'

নিতাই বলে, 'বাবু ধান যখন উঠবে তখন ধানের রাশ হবে পাহাড়ের মত উঁচু। কি করে সে সকল জমি আবাদ করে ফসল জন্মাতে হয়, তা ঘোষালেরা জানে না, ওরা ধানের বিলের চরে দু'-চার বিঘে চাষ করিয়ে সারা বছর বসে খায়। কিন্তু আমি চাষার ছেলে, আমি সব জানি। দিব্য চোখে দেখছি মা-লক্ষ্মী হাসতে হাসতে বোসের বাড়ী নেমে আসছেন। এখন একটু ঝঞ্ঝাট করে মাকে বরণ করে ঘরে তুলতে হবে।'

বিপ্রপদর মন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'তুমি বরণ-কুলো সাজাও নিতাই তোমার মা-ঠাকরুণকে নিয়ে—আমি তো তোমাদের সাথে-সাথেই আছি।'

বিদায় নিয়ে নিতাই চলে যায়।

কত দূর গিয়ে নিতাই হঠাৎ ফেরে। একটা কথা তার মনে পড়েছে। সে মেঠো-পথ ছেড়ে আবার গ্রামের দিকে ঘুরে চলে।

াতও মন্দ হয়নি—অন্ধকারও কম নয়। মাঠের মধ্যে তবু তারার ়ালোতে দিশা পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রাম্য পথে যেন অন্ধকার জমাট ়ঁধেছে। যে ঘন নারকেল-সুপারি বাগান। মোটে কিছু ঠাহরই ়রতে পারে না নিতাই। কোন রকমে সে এক বাড়ীতে উঠে ়ারকেল পাতা চেয়ে নিয়ে ছোট ছোট গোটা চারেক মশাল তৈরী ়রে। এবং একটা জ্বালিয়ে নিয়ে হাঁটতে থাকে। তবু পথের পাশের ়াপ-জংগল এড়ান যায় না। বেতের আঁকড়া পরম বান্ধবীর মত ়াতাইর কাপড়-চোপড় টেনে-টেনে ধরে। জরুরী একটা বৈষয়িক ়রামর্শের জন্য যাচ্ছে, এখন আর যেন তার এ সব ভাল লাগে না— ়মহা বিরক্ত হয়ে আঁকড়াগুলো ছাড়াতে গিয়ে কাঁটার ঘা খায়। ়ার একটু এগোতেই পড়ে একটা সাপের সুমুখে। সাপটা ফোঁস- ়াস করে একেবারে ফুঁসিয়ে মাথা তুলে ওঠে। এখনই বুঝি ছোবল ়রবে। নিতাই একটা আর্ত্তনাদ করে ভিন্ন পথে লাফিয়ে পড়ে ়র চলে। বাপ রে, কি কাল কেউটে। তার বুকের ধড়ফড়ানি ়মতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। সে মশালটা ফিরিয়ে ফিরিয়ে ়থে সাপটা পিছনে পিছনে আসছে না কি। ওগুলো যে হিংস্র! ়তাই মনে মনে ভাবে, যে মাগীর পাল্লায় পড়েছি তার সুরুতেই ়ই, এখন শুভে-লাভে কাজটা হলে বাঁচি।'

'ঠাকুর ভাই, ঠাকুর ভাই, সজাগ আছেন?'

'এত রাত্রে কে ডাকে?' দীনুর বুকটা ধুক-পুক করে ওঠে।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করে, 'চোর-টোর না কি?'

দীনু বলে, 'চোরে ডাকে, না মশাল নিয়ে আসে মাগী?'

'তবে ভূত-পেত্নী না কি?' গৃহিনী দীনুকে জড়িয়ে ধরে।

'কি করে বলি, অসম্ভব না!'

গৃহিণী আর একটু শক্ত করে ধরে।

'একটু ঢিল দে মাগী, আমার যে শ্বাসরোধ হওয়ার জোগাড়।'

নিতাই আবার ডাকে, 'ঠাকুর ভাই, ঠাকুর ভাই!'

দীনু মনে মনে গনে, 'এই, দুই...।' তিনবার ডাকলে নিশ্চয় ়ভুব!

ফিস-ফাস করে কথা বলে অথচ জবাব দেয় না। নিতাইর মন ়নি তে-খিঁচড়ে হয়েছিল, এখন একটু বেশী বিরক্ত হয়ে ওঠে। বেড়ার ওপর বেশ জোরে একটা চড় মেরে ডাকে: 'ঠাকুর ভাই, ়র ভাই! আমি নিতাই সরদার।'

গৃহিণী তখনও ছাড়ে না দীনুকে, বলে, 'নিতাই না গো ডাকু। ়ত মশাল যে!'

'ডাকু আসবে তোর ঘরে কি লুটে নিতে রে মাগী? তোর কি ়দিন আছে?'

নিতাই মশালটা নিবিয়ে ফেলে।

'ছাড়, ছাড়, বাতিটা জ্বালি।'

অগত্যা গৃহিণী দীনুকে ছেড়ে দিয়ে এই দারুণ গ্রীষ্মের রাত্রেও ়াদ-মস্তক একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে।

'এত রাত্রে যে সরদায়ের পো?'

নিতাই চড়া গলায় বলে, 'দোর খুলুন, কাজ আছে।'

দীনু চমকে ওঠে। এ কি নিতাইর গলা? ওর তো শত্রু-মিত্রের ়ব নেই!

নিতাই এবার রীতিমত চটে যায় ন্যাকামী দেখে। সে গোটা আষ্টেক কিল-চড় মেরে দোরটার কলজে নড়িয়ে দেয়। 'আপনি কি ভাবলেন? আপনার হলো কি? দোর খুলুন!'

দীনু কাঁপতে কাঁপতে এক হাতে হুঁকো-কল্কি ও কেরোসিনের ধূমায়মান ডিবাটা এবং অন্য হাতে একটা বাঁশের ঠ্যাংগা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

'এই নেও' বলে নিতাইর হাতে হুঁকোটার বদলে ঠ্যাংগাটা এগিয়ে দিয়ে নিরস্ত্র সৈনিকের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

'এ কি লাঠি-সোটা কেন?' নিতাই বলে, 'চোখ মেলে দেখুন, আমি নিতাই।'

দীনু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলে, 'এত রাত্রে যে?'

'বাবু কাল সকালেই কোথায় যাবেন যেন—এই টাকা দু'টো দিয়ে বললেন যে, তুমি যাওয়ার পথে দীনুদা'কে দিয়ে যেও—কাল হাট-বার আবার, আমার সাথে দেখা হয় কি না কে জানে!'

নিতাইর রচিত কাহিনী অবিশ্বাস করার আগেই দু'টো রজত মুদ্রা গিয়ে দীনুর হাতে পড়ে। দীনু গলে যায়। 'বিপ্রপদ তোমাকে পাঠিয়েছে টাকা দিয়ে! এমন ভাল লোক আর এ গাঁয়ে নেই সরদারের পো, কেমন সত্যি কি না? বসো বসো—তামাক খাও!'

এই তো নিতাই চায়! সে তামাক খেতে-খেতে সব সমস্যার কথা খুলে বলে। সুখীর কথা, বিপ্রপদর কথা কোনওটা বাদ যায় না। এখন কি করা উচিত তাই জিজ্ঞাসা। কেবল জমির পরিমাণ ও মূল্যের কথাটা চতুরতা করে এড়িয়ে যায়।

একটা একটা করে সব শুনে দীনু জবাব দেয়, 'তুমি গিয়ে এখন একটু ঢিল দাও—বলো গে, সুখীর মা, তোমরা ঘোষালদের কাছে যাও। কাকুতি-মিনতি করে যা পাও তাই নিয়ে ঘরে ওঠো: বাবু টাকা দিয়ে কেন, এমনিও কোন বিবাদ কিনতে রাজী না। দেখবে তখন ধোপা-বৌ খুব ধরা-পড়ি করবে তোমাকে। কারণ, ওরা কিছুতেই ঘোষালদের কাছে যাবে না এবং গেলেও রস পাবে না। বরঞ্চ তোমাদের কাছেই পায়ে ধরে ফিরে আসবে। তুমি তার পর দু'চার দিন বাদে বলো: যদি তোমরা একেবারে কোনও দাবী-দাওয়া না করো তবে আর একবার বাবুকে বলে-কয়ে দেখতে পারি। কথার ফাঁকে-ফাঁকে জমি-জমা দখল হলে সে ওদের প্রচুর পরিমাণ ধান দেবে, এই আশ্বাসটা খুবই দিও। তার পর দেওয়া না দেওয়া তো নিজের হাতে, আমার কথা-মত চলো দেখবে বিনা পয়সায় কাজ হাসিল হবে। কিন্তু শীতলাতলা থেকে একটা কিরে-কাণ্ড করিয়ে নিও। ছোটলোক, একবার প্রতিজ্ঞা করলে আর কাঁচাখেগো দেবতার ভয়ে ফিরবে না?' তামাক টানতে টানতে দীনু জিজ্ঞাসা করে, 'জমি কতটা?'

নিতাই মিথ্যা কথা বলে, কারণ পরশ্রীকাতর দীনু না আবার একটা ভেজাল বাধায়। 'জমি বিঘে দশেক হবে।'

'দশ বিঘে দক্ষিণা জমির জন্য এত তেল-নুণ খরচ?'

'তেল-নুণ ঠিক না হলে খেতে ভাল লাগবে কেন? এখন উঠি তাহলে, ঠাকুর ভাই, পেন্নাম।'

'এসো, তা হলে আবার কবে দেখা হচ্ছে?'

'কাল-পরশু যখন এদিকে আসব।'

'সংবাদটা জানিয়ে যেও, বুঝলে?'

কবলায় বহায় ধার্য্য হয়েছে তিন হাজার টাকা। সুধীর মা গত্যন্তর নেই দেখেই রাজী হয়েছে। কিন্তু তার প্রাণটা আগা-গোড়াই ব্যথায় টনটনিয়েছে। এতগুলো টাকা সুধীর হাত-ছাড়া হলো! কবে জমি-জমা সুসার হবে, কবে তার ধান পাবে, কে জানে! এখন তো যথাসর্বস্ব লিখে দিয়ে টাকা না পেয়েও টাকা পাওয়ার কথা স্বীকার করে নিতে হবে! ঘোষালদের কাছে গেলে তারা গ্রাহ্য করবে না, এদিকে বাবুও অসন্তুষ্ট হবেন, তাহলে ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার। অতএব নিতাই যা বলে তাই করা ভাল। কিছু ফসলের তো আশা রইল।

আরও একটা দুরাশা তার অন্তরে উঁকি মেরে যায়—সে দুরাশা গৃহস্থ-ঘরের মা অন্তত নিজের মেয়ের জন্য কামনা করে না। যদি বিপ্রপদর সুধীর ওপর চোখ পড়ে!

তাই দলীল রেজিষ্ট্রীতে কোন বিঘ্ন ঘটে না।

আফিস থেকে ফেরার পথে বিপ্রপদ সুধীর মা'র হাতে একশো এক টাকা গুণে দিয়ে বললেন, 'একেবারে কিছু না দিয়ে কোনও সম্পত্তি কব্জার আমার ইচ্ছা নাই—সেই জন্য আজ এই সামান্য কিছু দিলাম। একেবারে শুধু হাতে তোমরা ফিরলে কি ভাল দেখায়, না আমার মনে ভাল লাগে। যাক্ ভবিষ্যতে আমি তোমাদের ঠগাব না।'

সুধীর মা মহা ওস্তাদ। সে আঁচলে টাকা বাঁধতে বাঁধতে বলে, 'বাবু টাকা দিয়ে আমরা করব কি—এই মেয়েটার ওপর একটু নজর রাখবেন। ও তো যথাসর্বস্ব আপনাকে নিবেদন করে দিল। এখন ও-ই আমার লক্ষ্য। বাপটা তো ওর মরে মরে। এ টাকা আমরা নেব না—আপনি ফিরিয়ে নেন।' বলে বাঁধা আঁচলটা দেখায়।

'না, না—তা কি হয়? তোমাদের আপদে-বিপদে তো রয়েছি! যখনি ঠেকবে আমাকে জানিও—আমি যথাসাধ্য করব।'

সংবাদটা অতি সহজেই গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ে। দীনুর বুকটা ফেটে যেতে চায়। নিতাই শালা ওকে ফাঁকি দিয়েছে। দশ বিঘে নয়, তিনশো কি চারশো বিঘে—দক্ষিণা বিলের জমি। ওর তো কোনও মাপ-ঝোপ নেই। হয়ত আরো অনেক বেশী হতে পারে! বিপ্রপদ রাতারাতি রাজা হয়ে গেল! এবং তার পথ একেবারে নিষ্কণ্টক করে দিল, ও নিজে—মাত্র দু'টো টাকা খেয়ে। ও মূর্খ, ওর চোদ্দ গোষ্ঠী মূর্খ! এখন আর কোনও উপায় নেই। এখন আর কি করবে, তবু গিয়ে সংবাদটা ঘোষালদের দিয়ে আসবে। 'স্বজাতি পরম বান্ধবঃ'। বিপদে-সম্পদে খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার। বিপ্রপদর যে বুদ্ধি, একেবারে অজবুদ্ধি! ও কি শুদ্ধ দলীল গ্রহণ করতে পেরেছে? সম্ভব না। ঠগুক, বুদ্ধিমান পাড়া-পড়শীকে তো ডাকবে না?

ঠিক দুপুর বেলা গিয়ে দীনু ঘোষালদের কাছারীতে হাজির। একটি জনপ্রাণীও নেই। দীনুকে এক ছিলিম তামাক পর্যন্ত কেউ খাওয়াবে এমন বান্ধবও নেই। এক জন অনাহারী ব্রাহ্মণ যে ঠিক মধ্যাহ্নে না খেয়ে ফিরে যাবে, সে খবরটাও কি নেওয়ার কোনও লোক আছে এদের? এরা নিতান্ত অপদার্থ—এদের বারটা বেজে গেছে। এখানে মান-মর্যাদার আর কোনও আশা নেই।···দেখি, বিপ্রপদকে কে হটায়? দলীল একটা হলেই হলো। সাক্ষী-সাবুদ ঠিক থাকলে, জেরায় সত্যি-মিথ্যা গুছিয়ে বলতে পারলে, কত মরা দলীলও খাড়া হয়ে ওঠে। অর্থবলের সাথে জনবলের যোগ চাই—তা বিপ্রপদর আছে, যখন দীনু ঠাকুর পিছে রয়েছে। একটু খামখেয়ালী হলেও বিপ্রপদ লোক ভাল। কবলাদাতাকে যদিও বা বুদ্ধি করে ঠগিয়ে থাকে, কিন্তু দীনুর দক্ষিণাটা তো আগে-ভাগেই পাঠিয়ে দিয়েছে।

ফেরার পথে দীনু বোসের বাড়ীর ওপর দিয়ে যায়। এবং সত্য-যুগীয় প্রথায় উপবীত-হস্তে বিপ্রপদকে আশীর্বাদ করে, 'মহারাজের জয় হক!'

বিপ্রপদ একটু সগৌরবে হেসে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি সমাচার দীনুদা?'

'ব্রাহ্মণ অভুক্ত।'

আরও অন্যান্য অনেকের সংগে দাঁড়িয়ে কমলকামিনী সং দেখছিলেন। এবার উঠে গিয়ে ষোড়শোপচারে একটা সিদে এনে দীনুর সুমুখে রেখে প্রণাম করেন।

১৫

বিপ্রপদ কার্য্যস্থলে রওনা দিচ্ছেন। সাথে কেউ যাবে না—কেবল ইমাম যাবে ষ্টীমার-ঘাট পর্যন্ত। নৌকা-পথ ব্যতীত যাওয়ার উপায় নেই। একখানা ডিঙি-নাও কেরায়া করে আনা হয়েছে। সে এই মাত্র চাল ডাল তেল নুণ নিয়ে গেছে। ভাড়ার টাকা ছাড়া মাঝি-মাল্লাকে যতক্ষণ পর্যন্ত কিম্বা যত দিন পর্যন্ত ভাড়া খাটান যায় সেই অনুপাতে সম্যক্ খোরাকী ও পান-তামাক দেওয়া এ-দেশীয় রীতি। এর জন্য কোনও গরীব গৃহস্থও ঝগড়া করে না। বরঞ্চ যত্ন করেই তার যা প্রয়োজন পূর্ণ করে। মাঝিরাও দেশে দেশে সুনাম করে বেড়ায়।···কি-ছুদিন হয় নতুন ষ্টীমার-লাইন এদিকে হয়েছে। তা না হলে বড় কষ্ট ছিল যাতায়াতে।

মাঝি বলে, 'এহন আর দেরী করলে জাহাজ পাবা না বাবু—জহুরের ওক্ত উৎরা গেছে। ভাডা পরায় শ্যাষ।'

মাঝির কথায় সকলেই তাড়াহুড়া করতে থাকে।

এবার কমলকামিনী স্বামীর সাথে যাবেন না কিন্তু বিপ্রপদর যাতে বিদেশে অসুবিধা না হয় তার জন্য কত কি যে দেবেন আর ইয়ত্তা নেই। একটু আচার, চারটি চিঁড়ে, কিছু ঘি, কয়েকটা গাছের বারমেসে ফল ইত্যাদি করতে করতে দশটা-পাঁচটা শিশি-বোতল-পোঁটলা-পুঁটলী জমা হয়। কিন্তু পুরুষের পক্ষে এ সব গুছিয়ে রেখে খাওয়া অসম্ভব। তবু কি স্ত্রীলোকের মন মানে! অল্প শীতে পাতলা কাঁথা, বেশী শীতে লেপ—কোনটা কখন লাগে বলা যায় না! সবই বেঁধে দেওয়া হয়। বিপ্রপদ হেসে বলেন, 'এ সব রাখবে কে ঠিক-ঠাক করে?'

'কেন, একটা চাকর জুটবে না?'

'মাইনে, খোরাকী, মাসে কত টাকা বাজে খরচ—নিজেরটা নিজেই করে নেব।'

'চাকরী করে তা করা অসম্ভব—আর তুমি সেখানে কর্ত্তা,—তোমার তো একটু মান-সম্মান রেখে চলতে হবে।'

'সত্যিই আমার এখন এক জন চাকরের দরকার। তুমি থাকলে একটা ঝি-টি রাখলেই চলত—কি বলো?'

'না গো, এখন আর তা চলে না। ঘরের কাজ না হয় ঝিতে করল, বাইরের কাজ করে কে? লোক না থাকলে এখন মান বাঁচান দায়।'

'যাক, সাবধান-মত বাড়ীতে থেকো।'

বহু লোক বাইরে অপেক্ষা করে আছে। পুরুত ঠাকুর এসেছেন নগ্রাম শিলা নিয়ে যাত্রা করিয়ে দিতে। দীনু এসেছে দেখা তে, বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে এসেছেন দু'-এক জন। ট-মন্দিরে ভীড় জমে গেছে।

সকলকে অল্প কথায় তুষ্ট করে দেবালয়ে প্রণাম করে বিপ্রপদ কায় গিয়ে ওঠেন। 'ইমামও আসছে না, নিতাইকেও দেখা চ্ছে না—এরা কেউ আমার সংগে যেতে পারবে না, তা আমাকে গেই বলা উচিত ছিল। আমার আর দেরি করে ষ্টীমার ফেল রাও তো অসম্ভব।'

আজ-কাল বিপ্রপদকে খুব সাবধানে চলা-ফেরা করা দরকার। তিষ্ঠা যত বাড়ে শত্রুতার বীজও তত বৃদ্ধি পায়।

একে একে সকলে খাল-পাড়ে এসে জমা হয়েছে। ছেলেরা সছে, মেয়েরা এসেছে, সেবাও টলতে-টলতে বলতে-বলতে আসে— ই বাবু যায়!' এ বিচ্ছেদ দীর্ঘ দিনের নয়—এ বিচ্ছেদ স্থায়ী নও দুঃসংবাদ নয়, তবু পোড়া বাঙালীর প্রাণে বিষাদ আনে। রা ভালবাসে তারা ঘন ঘন চোখ মোছে। যারা পাড়া-প্রতিবেশী রাও অশ্রুরোধ করতে পারে না। বিদেশী পথিক পথের কথা ভুলে নিকের জন্য দাঁড়ায়—এ বিদায়-দৃশ্যে তারও প্রাণ কেঁদে ওঠে। হিন্দু হক, মুসলমান হক—সেও তো বাঙালী। এক বাঙলার মলতা দিয়ে তারও তো মন গড়া!

অমরেশ বিপ্রপদর দিকে তাকাতে পারে না। তার জীবনে দৃশ্য এই প্রথম। চোখ দু'টো বারণ মানে না।

কমলকামিনী ছেলেকে কোলের কাছে টেনে এনে গাঢ় কণ্ঠে লেন, 'কাঁদে না বোকা ছেলে। আবার তো উনি এলেন বলে।'

মাঝি নৌকা খুলতে চায়, কিন্তু কমলকামিনী বাধা দেন, 'আর কটু দেরী করে দেখো—পথে কত আপদ-বিপদ আছে, একটু হুঁশিয়ার য়ে চলা ভাল। ঘাটে পৌঁছুতে রাত তো কম হবে না।'

'কিন্তু ওদিকে যে আমার ষ্টীমার না পেলেও ভীষণ ক্ষতি। বুদের তাগিদের কথা তো তুমি জান।'

কে যেন বলে, 'ঐ নিতাই আসছে।'

কমলকামিনী এবং উপস্থিত সকলের মনেই একটা আনন্দ হয়।

বিপ্রপদ বলেন, 'ইমাম কোথায়? তুমিও যে এত দেরী রলে? যাক সে না আসে তুমিই চলো একটু সংগে।'

'বাবু, ইমামের ছেলেটার কলেরা।'

'কোনটার?'

'বড়টার—সিরাজের।'

বিপ্রপদ তাড়াতাড়ি নৌকা ছেড়ে ওঠেন। বলেন, 'আজ আর মামার যাওয়া হবে না। মাঝি তুমি খেয়ে-দেয়ে এখানে থাকো— াল যাবো।' তিনি দেশের মধ্যে ভাল ডাক্তারটিকে ও প্রয়োজনীয় ষুধ-পত্র নিয়ে রওনা দেন।

কমলকামিনী বলেন, 'আমিও যাবো—তোমরা একটু দাঁড়াও।'

'তুমি যাবে? বলো কি?'

'আজ আর কোনও বলা-বলি নেই—ওদের তো কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। এ রোগ যে কি ভীষণ এবং ছোঁয়াচে তা ওরা জানেই না। একটার জন্য ঘরের সব ক'টা মরবে।'

'তুমি গেলে কি বাঁচাতে পারবে?'

'রোগীকে বাঁচান ঈশ্বরের হাত—তবে নিরোগীকে রক্ষা করা মানুষের সাধ্যের মধ্যে—তাই আমি যাবো—এই নৌকাতেই ওদের ঘাটে যাওয়া যাবে। আমি উঠলাম, তোমরাও এসো—আর হেঁটে যেয়ে দরকার নেই।'

কোলের মেয়ে সেবার দিকে একবার ফিরে না চেয়েও, আধ-ময়লা শাড়ীখানা না বদলেই কমলকামিনী নৌকায় গিয়ে ওঠেন।

খালপাড়ের স্ত্রী-পুরুষের জনতা স্তব্ধ হয়ে থাকে। থাকার কথাও। আজ পর্যন্ত কেউ কখনও শোনেনি যে কোনও হিন্দু-মহিলা কোন নৈতিক দায়িত্ব কিম্বা আর্থিক প্রয়োজনেও কোন দিন কোন মুসলমান-বাড়ী গেছে! শক্তিগড় কেন, আশপাশ গাঁয়ে এ এক নতুন আদর্শ সৃষ্টি!

কমলকামিনী সকলের সাথে-সাথেই ওপরে ওঠেন। তাঁকে দেখে এ-ঘর ও-ঘর থেকে বৌ-ঝিরা অস্ফুট বিস্ময়ের শব্দ করে ওঠে। ইমামের বৌ রোগী ফেলে দৌড়ে যায়! একটা অভাবনীয় তোলপাড় পড়ে যায় মুসলমানপাড়ায়। একে একে গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ে ব্যাপারখানা দেখতে। গর্বে-আনন্দে আশ্বাসে-দুঃখে ইমামের চোখে জল আসে। তার মা এসেছেন যত মুস্কিল আছান করতে!

দিনের বাকী অংশটুকু এবং সারা রাত যমে-মানুষে টানাটানি চলে। জল খাওয়ান, মাথা ধোয়ান, মল-মূত্র পরিষ্কার—এমন কোন কাজ নেই যা না কমলকামিনী সাবধান ও পরিচ্ছন্ন ভাবে করেন। বিপ্রপদ ডাক্তারটিকে ও নিতাইকে নিয়ে সারাটা রাত উঠানে পায়চারী করে কাটান। ছেলেটা ভাল হয়ে ওঠে। ডাক্তার বলে, 'তলপেটে হাত দিয়ে বুঝলাম প্রস্রাব এসে জমেছে—একটু বাদেই হয়ে যাবে! ইউরেমিয়ার ভয় নেই। এখন আপনারা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যেতে পারেন—আর তো সকালের বেশী দেরী নেই, মোরগ ডাকছে, ঐ তো শোনা যাচ্ছে।'

কমলকামিনী সাবধানতা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক করে ফের নৌকায় গিয়ে ওঠেন। তখন পাশের মসজিদ থেকে একটা একটানা মধুর আজানের ধ্বনি ভেসে এসে ওঁদের দু'জনার চিত্ত প্লাবিত করে দেয়। সবই খোদার মেহেরবাণী।

কমলকামিনী না এলে সত্যিকার যম হয়ত ছেলেটাকে ফেলে যেত, কিন্তু অজ্ঞ ও মূর্খরূপী যম সে কি করত বলা যায় না।

পরের দিন আবার সেই বিদায় অংক আসে।···

খাল-পাড় লোকে ভরে যায়।

সেই অশ্রু, সেই বিষাদ, সেই করুণ দৃশ্য মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে।

বিপ্রপদ নায় উঠেছেন—ইমাম শক্ত একটা পাকা-বাঁশের লাঠি নিয়ে গলুইতে দাঁড়িয়ে—এক্ষুনি নৌকা ছাড়বে।···ছাড়লও তাই।

কমলকামিনী জনতার সুমুখ দিয়ে ত্বরায় বাড়ী ফেরেন। তাঁর কোনও দুর্বলতা অশোভন। ফিরে চলে বিষণ্ণমনে অমরেশ ও সেবা।

ধীরে ধীরে ভীড় মিলিয়ে যায়।···

একটা ঘুঘু ব্যর্থ সংগীত গেয়ে চলে পাশের আমরুল গাছটা থেকে।

ডুবন্ত সূর্যের রাঙা আলো কে যেন বাটিতে গুলে গোলাপী জাজম দিয়ে আকাশে আলপনা দিচ্ছে। মেঘের পরে মেঘে সে রঙ

ছড়িয়ে যাচ্ছে। দু'-একটা পাখী এখনও সেই রঙের লোভে লোভে যেন উড়ে বেড়াচ্ছে, ডুব দিচ্ছে—আবার স্থির হয়ে ভেসে চলেছে অনির্দিষ্ট মহাকালের দিকে। নিবিড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে পথ করে শক্তিগড়ের খাল চলেছে নদী-সংগমে। কত আঁকা-বাঁকা পথ তার! অন্ধকার তরুশ্রেণীর মধ্যে যেন তার শ্বাসরোধ হয়ে যাবে—তাই তার স্রোত-বেগ দ্রুত, নৌকা চলেছে তীরের মত। হুঁসিয়ার মাঝি বৈঠা ধরেছে শক্ত করে। এখনি একটা ঘূরপাক খেয়ে কচুরীপানা-গুলোর সাথে নৌকা গাঙে গিয়ে পড়বে।

এখন একটানা নদী—সিধে মেহেরপুরের বাঁক। তার পর মাত্র দেড়-বাঁক জল। কতটুক বা পথ এই তরতরে ভাটায়!

মাঝি সুবিধা বুঝে একটা ভাটিয়ালী গান ধরে। ইমাম তালে তালে মাথা নাড়তে থাকে।

নিরক্ষর একটা বাঙাল মাঝির মুখে কি অপূর্ব গান! কণ্ঠে কি অপূর্ব মাধুর্য্য! ছন্দে-ছন্দে কি অপূর্ব লালিত্য। যেন সমস্ত সুকুমার সাহিত্য ছেনে, নিংড়ে এনে অতি সুকোমল কাব্য—এ পল্লী-গীতি রচিত হয়েছে। এর রন্ধ্রে-রন্ধ্রে রস, এর রন্ধ্রে-রন্ধ্রে লাবণ্য—এ যেন সংগীতের মধুচক্র। এ সংগীতের রচয়িতা যে কবি তার নাম হয়ত সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পায়নি, কেউ কোনও দিন তাকে খুঁজেও দেখবে না, তবু সে যুগ-যুগান্ত ধরে এমনি নিরক্ষর গায়কের মুখে নিরক্ষর সমঝদারদের বুকে বেঁচে থাকবে পূর্ব-বাঙলার সান্ধ্য নদীপথে।

গান থেমে যায়, অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ করে থাকে।

বিপ্রপদ যে ছইর ভিতর আছেন তাও অনেকক্ষণ ধরে বোঝা যায় না।

'ইমাম?'

'বাবু!'

'তোমার ছেলে ভাল আছে শুনে সুখী হলাম। একটু থেমে ফের বিপ্রপদ বলেন, জমি তো কেনা হলো—চাষ-আবাদ করবে কে? দক্ষিণ দেশে লোকে যেতেই ভয় পায়—যে সাপ-কোপ বাঘ-ভালুকের হামলা। শুনেছি না কি দিনের বেলা বাঘ এসে বসে থাকে বিলের ধারে। বিলের দক্ষিণে না কি একটা চরা নদী তার পর সুন্দরবন।'

'বাবু, হে ডর আমাগো নাই—কত জ্যাতা শিয়াল (বাঘ) খাইয়া আছুম আপনাগো আশীর্বাদে!'

মাঝি হেসে বলে, 'কয় কি বাবু, শিয়ালে করতে পারে কি? আমাগো বাড়ী থিইক্যা দক্ষিণের বিল দেহায়—আমরা আছি না সে তাগে!'

ইমাম বলে, যে ওর জন্য কোনও চিন্তা নেই। বিপ্রপদ একটু তাড়াতাড়ি কিছু বেশী দিনের ছুটি নিয়ে ফিরে এলেই ভাল হয়। জমি দখল করার সময় দু'-একটা খুন-টুন হতে পারে—তা তারা চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে লাস সরে জমিন থেকে গায়েব করে ফেলবে, পুলিশের বাপেও টের পাবে না। চাষ-আবাদের জন্যও তারা ভাবে না। 'জো' মত জমি চাইয়্যা 'গোন' মত রুয়ু বীজ—তার পর খোদার ইচ্ছা লক্ষীর দয়া। যতক্ষণ আমরা দুই মিতার বাইচ্যা আছি ততক্ষণ আপনার জনের অভাব নাই বাবু।'

উৎকণ্ঠিত মাঝি ধীরে-ধীরে সব জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়। বলে যে তাদের বাড়ীও বিলের কাছে যেলের চর—সঙ্গে দরকার হয় সেও দু'-দশ জন লোক নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু জমি তাকে বর্গা দিতে হবে।· সে-ও না কি এক জন ভাল চাষী, ও-দেশের সব হাল-চাল জানে।

'আচ্ছা, তোমাকে খবর দেবো।'

কথাবার্তায় ষ্টীমার-ঘাটের বাঁকে নৌকা এসে পড়ে। দূরের লাল আলোটা অন্ধকারে একচক্ষু রাক্ষসের মত দেখায়। ঐটাই ঘাটের নিশানী আলো।···

নৌকা ঘাটে ভিড়তে ভিড়তে ষ্টীমারও এসে পড়ে। মাঝি ও ইমাম চটপট বিছানা-বাক্স লট-বহর ষ্টীমারে তুলে দিয়ে ফ্লাটে এসে দাঁড়ায়।

'সেলাম বাবু।'

সেলাম, সেলাম।'

ষ্টীমার ঘটঘট-খটখট করে নোঙর টানতে টানতে ঘাট ছাড়ল।···

কেবিনে গিয়ে বসতেই বিপ্রপদর নজর পড়ে ষ্টীমারটার নামটার দিকে। এই তো সেই জাহাজ! এখানেই তিনি কুলী হয়ে মোট মাথায় ঢুকেছিলেন। আজ আবার বাবু সেজে এসেছেন। সেই আলো, সেই সিঁড়ি, সেই দোকানী—সব ঠিক। শুধু তাঁরই ভাগ্যের অসীম পরিবর্তন ঘটেছে। হয়ত আরো ঘটবে—ঐ সুদূরে দক্ষিণের বিলে সোনা ফলবে। তিনি শুধু শ্রম করে যাবেন, যত্ন করে যাবেন, যাবেন দিনের পর দিন ক্লেশ করে। তার পর তাঁর করণীয় কিছু নেই।···

আজ যা জটিল বলে মনে হচ্ছে কাল তা সরল হতে কতক্ষণ!

অদৃষ্টই সব। এমন দিন তাঁর গেছে যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খেটেও তাঁর বিশ্রাম মেলেনি, পেট ভরে নিজে খেতে পারেননি। পরিবারবর্গ রয়েছে অর্দ্ধাহারে। হয়ত কেউ কিছু মুখ ফুটে বলেনি, তিনি তো মনে মনে সব বুঝেও বোকার মত চুপ করে রয়েছেন। সামান্য চেষ্টায়, বলতে গেলে এক দিনের চেষ্টায় তাঁর ভাগ্য ফিরল। তার পর তিনি কত লোক কত আত্মীয়-অনাত্মীয়কে যে খাইয়েছেন তার মাপ-ঝোপ নেই। হিসেব করতে গেলে তিনি তাঁর এই সামান্য জীবনে কম করে পাচিশটি শ্রাদ্ধের খরচ জুগিয়েছেন। কত মেয়ের বিয়ের রোশনাই জ্বালালেন। এ সব তিনি অন্তরালে বসেই করেছেন—তবু আজ একটা তৃপ্তিতে তার মন ভরে ওঠে। এ সব ভাগ্য তাঁর না সকলের? তিনি হয়ত নিমিত্ত মাত্র। অন্ধকারে সকলেই সহযাত্রী, তাঁর দায়িত্ব শুধু পুরোভাগে মশাল জ্বালিয়ে চলার।

বিপ্রপদ ঘুমিয়ে পড়েন।

শেষ রাত্রে ষ্টীমারের একটা একঘেয়ে তীব্র হুইসেলে বিপ্রপদর ঘুম ভেঙে যায়। কেবিনে খুব ভীড় হয়েছে। যাত্রীরা ঠাসাঠাসি করে ঝিমাচ্ছে। কেউ বা ষ্টীমারের গতির তালে তালে দুলছে। বাক্স-পেঁটরা-বিছানা-পত্রে কেবিনটা একেবারে বোঝাই। পা রাখার স্থান পর্য্যন্ত নেই। বিপ্রপদর জুতো-জোড়ার ওপর কে যেন এক ব্যক্তি একটা ক্যানভাসের ব্যাগ রেখে, তার ওপর পা দু'খানা ছড়িয়ে দিব্যি আরামে নাক ডাকাচ্ছে। হাঁটু পর্য্যন্ত মোজা-পরিহিত কোনও বৃদ্ধের পা। এক পায় একটা সাদা অপর পায় একটা লাল রঙের মোজা। দেখলে ঠিক ক্লাউনের পা বলেই সন্দেহ হয়। মনে হয়; যেন নিতান্ত তাচ্ছিল্য করেই পরা হয়েছে। ভুল বুঝি হয়ে থাকবে।

হক গে। এখন আর পারিপাট্য দিয়ে কি হবে—শীত নিবারণ হলো বিষয়। চামড়া তো ঢিলা হয়ে গেছে, এখন আর ভাল-মন্দে কি এসে যায়!

বিপ্রপদর দামী জুতা-জোড়া যেন কলার মত চ্যাপটা হয়ে গেছে। তিনি জুতা-জোড়া টেনে বের করতেই মোজা-পরা পায়ের মালিক সামনের দিকে খানিকটা হড়কে যান। মহা ত্রস্ত হয়ে উঠে বসে প্রশ্ন করেন, 'মহাশয়ের নিবাস?'

বিপ্রপদ জুতা-জোড়া সমান করতে করতে জবাব দেন, 'হিন্দু হয়ে আপনি দেখি চামড়া-জোড়ারও কাশী বাস করে ছেড়েছেন।'

মো-মুড়া পায়ের মালিক একটু বিব্রত হয়ে জবাব দেন, 'দেখুন, আমি বুঝতে পারিনি।'

'আপনি তো অবুঝও না—প্রাচীন বলেই মনে হচ্ছে।'

'আপনিও তো নবীন না, কথায় বেশ প্রবীণ বলেই মনে হচ্ছে।'

চোখ তুলতেই বিপ্রপদ দেখেন যে বুড়ো সেন মশাই। তিনি এতটা লজ্জিত হন যে জুতো হাতেই হাত জোড় করে বলেন, 'নমস্কার সেন মশাই, কিছু মনে করবেন না।'

'কে বিপ্রপদ বাবু না কি? আরে ওতে মনে করা-করির কি আছে, বিশেষত, আমার—ক্ষতি হলে হয়েছে আপনারই। তার পর কোথায় চলেছেন? নমস্কার, নমস্কার।'

'এই চাকরি-স্থলে—শিবচর নামে একটা নতুন জায়গায় বদলী হয়েছি।'

'আপনার কথাই ভাবছিলাম। যাক, দেখা হয়ে গেল।'

'আপনাকে তো আমারও দরকার, কিন্তু এখন থাক।'

'না না, বলুন না—তালুক বিক্রীর কথা জিজ্ঞাসা করবেন তো? সে যা শুনেছেন কথা ঠিক। তা, আপনার অভিপ্রায় কি?'

'যদি দয়া করে—'

'বিপ্রপদ বাবু, আপনি ক্রেতা আমি হচ্ছি বিক্রেতা—দয়া কে কা'কে করবে?'

'সে কথা বলছি নে—সে কথা বলছি নে—তবে কি জানেন, যদি উচিত মূল্যটা শুনতে পারতাম—তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখতাম। তালুক বিক্রী করতে চাইলেও এখনও আপনারা বড় লোক। আপনাদের তুলনায় আমরা নগণ্য—মানে-সম্মানে-অর্থে সব দিক্ দিয়ে।'

বৃদ্ধ মনে মনে সন্তুষ্ট হন। 'আপনি মিষ্টভাষী, আপনার সংগে কাজ করায় সুখ আছে। টাকা-পয়সা কিছু কম-বেশীতে এসে, যায় না। এস্তেজালি পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত উঠেছে। ঘোষালেরা কিছু বেশীও দিতে চায়। তাদের ইচ্ছা, যে-কোনও মূল্যে সম্পত্তি খরিদ করা। খারিজা ষোল-আনী তালুক, একটা মস্ত জমিদারির সামিল, বিশেষতঃ স্বদেশে—আপনার তো স্বগ্রামে। এটা খরিদ করা মানে গৌরব ও প্রতিষ্ঠার চরম শিখরে ওঠা। মাত্র তিনটি প্রজা শাসন করতে পারলেই সদর খাজনা আদায় হয়ে গেল। তার পর সারা বৎসর নিশ্চিন্ত। যখন আপনার দু'টো পয়সা আছে তখন এ সুযোগ আপনার ত্যাগ করা বিধেয় নয় বিপ্রপদ বাবু।'

বিপ্রপদ বোঝেন, বৃদ্ধ ঝানু লোক—পাকা জমিদার। কেনা-বেচার ব্যাপারে যে কি করে দু'টো-চারটে মিথ্যা কথা বেশ শ্রুতিমধুর করে বলতে হয় তা তিনি জানেন। এবং এ-ও জানেন যে, এটুকু সত্যের অপলাপে বিশেষ কোনও ক্ষতিই হয় না। 'দেখুন দরাদরি করে এ-সব জিনিস কেনা খুবই কঠিন—যদি অনুগ্রহ করে উপযুক্ত লোকের হাতে দিয়ে যান তবে প্রজারা আশীর্ব্বাদ করবে। অন্যথায় এ বুড়ো বয়সে অভিশাপের ভাগী হবেন। যদি এতগুলো লোককে কোনও অত্যাচারীর হাতে বলির পশুর মত বেঁধে দিয়ে যান, তবে স্বর্গে গিয়েও সুখী হবেন না।'

'এ অতি সত্য কথা—অতি সত্য কথা! টাকা-পয়সা দু'দিনের—যশ চিরদিনের। আপনি কি দিতে পারবেন তা তো বললেন না?'

'ওই তো বললাম দর-কষাকষি করে এ-সব খরিদ করা যায় না। আমি একও বলতে চাই নে দশও বলতে চাই নে। অংকটা তৃতীয় ব্যক্তির মত আপনিই স্থির করে দেবেন।'

'আচ্ছা—আচ্ছা, সে তো ভাল কথাই। আপনাকে না জানিয়ে কোনও কিছু করা হবে না। ঘোষালদের চরিত্র আমার অজ্ঞাত নয়—তাদের আমি এ সম্পত্তি কিছুতেই দেব না—লাখ টাকায়ও না।'

বিপ্রপদ মনে মনে ভাবেন: তবে ঘোষালদের মাঝখানে রাখায় অর্থ দাম চড়ান! বুড়ো সহজ পাত্র নয়। এর কাছে নীতি-কথা স্তব-স্তুতি সব এক দিকে, আর টাকা এক দিকে।

আর একটা প্রমাণও সংগে সংগে পাওয়া যায়।

নিকটবর্তী ষ্টেশনে ষ্টীমার থামতেই সেন মশাই সবিনয়ে নমস্কার করে নেবে যান। বিপ্রপদও দোতলায় রেলিংয়ের কাছে এসে দাঁড়ান। ফ্ল্যাটে ও কারা দাঁড়িয়ে? প্রথম ও দ্বিতীয় ঘোষাল না? হ্যাঁ, তারাই তো! তারাই তো বুড়ো সেন মশাইকে অভ্যর্থনা করে ভীড় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেন মশাই কখন কোন ষ্টীমারে নাবকেন তাই বা এরা জানল কি করে? এ সব পূর্ব-পরিকল্পিত, না হলে শেষ রাত্রে নিতান্ত অসময়ে ওদের এখানে আসা অসম্ভব। আর একটি লোক কে? দীনুদা? ঠিক চেনা যায় না—এর মধ্যে ষ্টীমার ছেড়ে দেয়। বিপ্রপদ একটা মানসিক অস্বস্তি নিয়ে নিজের কেবিনে এসে বসে পড়েন।

দীনু পাখীও না পশুও না। ওর পক্ষে সকলই সম্ভব। কিন্তু ঐ যে প্রাচীন সেন, সেও কি তার সমগোত্রীয় একটা সুবিধাবাদী প্রাণী? আশ্চর্য্য!

বিপ্রপদর অন্তর ঘৃণায় ভরে উঠে···তার পর একটা আক্রোশ হয় সকলের ওপর। তিনি এক্ষুনি নেমে যাবেন। ঘোষালদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যা-হক বলে আসবেন, তাতে যদি সেন মশাই চটে চটুক।

কিন্তু নামার উপায় নেই, ষ্টীমার সশব্দে ডানা পিটিয়ে মাঝ-নদীতে এসে পড়েছে।

[ক্রমশঃ

জয়পরাজয়

শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাশ

"প্রেমে পড়ার সঙ্গেই আমি প্রেমে পড়েছিলাম। তুমি ঠিকই বলেছ, হে বিদেশী যুবক।"

হঠাৎ এ-রকম কথা শুনে খুব ঘাবড়িয়ে গেলাম। মনে মনে অবশ্য আমি বলছিলাম—হুঁ;া, ক্যাসানোভা আবার প্রেমে পড়েছিল? যত সব বাজে কথা। প্রেমে পড়াই ছিল ওর ফ্যাসন, বড় জোর প্যাসন। হ্যাঁ, ফ্যাসন কিংবা প্যাসন।

বেশ জুতসই একটা বাক্যের বাহার দেখাতে পেরে মনে মনে নিজের পিঠ নিজেই চাপড়াচ্ছিলাম।

কিন্তু কে জানত যে এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাসানোভা সশরীরে এসে উপস্থিত হবে আমার সামনে? তালপ্রাংশু, মহাভুজ যাকে বলে, কন্দর্পকান্তি নয়, নারীর মনুষ্যও নয়; ঘোর বাদামী বর্ণ ও দীর্ঘ তীক্ষ্ণ নাসা তাকে সকল পুরুষ থেকে পৃথক্ করে রেখেছে। তবু মুখখানা দেখে মনে হয় যে ভালবাসার জন্যই এ মুখ সৃষ্টি হয়েছিল; কামের কার্মুকের মত ভ্রূ-যুগলের তলায় আয়ত আক্রমণোদ্যত দু'টি চক্ষু কখনো মুগ্ধ কখনো বা স্নিগ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। অবশ্য শুধু মুখ নয়, সমস্ত দেহের মধ্যে একটা শক্তির প্রাচুর্য্য ও ঔদার্য্য রয়েছে যার প্রভাব অস্বীকার করতে পারলাম না। কিন্তু প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার ভিতর একটা দাম্ভিকতা, একটা আত্মপ্রত্যয় যা অবলা নারীকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সবলাকে করতে পারে পরাভূত। তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম।

বললাম—আমি আশা করিনি যে আপনি আমার কথা শুনতে পাবেন। মার্জনা করবেন আমার কথাগুলি।

মার্জনা? তিনি হেসে বললেন—মার্জনা আমি কখনো কাউকে করিনি। জান যুবক, তোমার বয়সের মেয়েদেরও আমি মার্জনা করিনি কখনো।

আস্তে আস্তে সাহস হতে লাগল। বললাম—তবে কি করতেন তাদের নিয়ে?

খুব আত্মতৃপ্ত ভাবে হেসে তিনি বললেন—মার্জনা করতাম না, মজাতাম।

অসম সাহস ভরে বলে ফেললাম—মজিয়ে মজা দেখতেন বুঝি?

সাবাস, ছোকরা, সাবাস! তোমারও দেখছি ভাষার উপর বেশ দখল আছে। এটা বড় প্রয়োজন এ ব্যাপারে। চলে এস, তোমাকে আমার চেলা করে নিই।

সবিনয়ে বললাম—চটবেন না, চেলা হবার জন্য চলতে চাই না, চালাব নিজেকেই যখন চাইব। কিন্তু আপনার পটীয়সী বিদ্যার পাঠ না নিলেও জানবার কৌতূহল হচ্ছে অনেক।

জানতে চাওয়া ভাল, কিন্তু মানতে চাওয়া আরও ভাল—মানুষ যদি মনে নিতে পারি—বললাম সপ্রতিভ ভাবে।

—বেশ, তাহলে তোমার মন বলে একটা জিনিষ আছে মনে হচ্ছে।

—মনও আছে, মানও আছে। আপনার মত মনীষা অবশ্য না থাকতে পারে।

—সাবাস ছোকরা, স্বীকার করছ তাহলে যে এ ব্যাপারে আমার মনীষা আছে। তুমি সমঝদার বটে। তবে শোন আমার কাহিনী।

—তার আগে বলুন, আপনার কি কোন লজ্জা-সরমের বালাই ছিল না অথবা কোন দার্শনিকতা দিয়ে দামী করে রাখতেন আপনার কীর্ত্তিকলাপ?

—বৎস (বুঝলাম যে আমার প্রশ্নে একটু অসন্তুষ্ট হয়েই এই সম্বোধন করছেন), আমি হচ্ছি রতি দেবীর পূজারী এবং নারী হচ্ছে আমার মন্ত্রমালা। জপ করতে করতে আমি এগিয়ে গিয়েছি চিরকাল।

—(মনে মনে) নরকের পথে অবশ্য।

—কি, 'শকড্' হয়ে গেলে না কি?

—না, না, আপনার তথ্যটা শুনি।

—তাই ত' বলছি—তবে তত্ত্বকথা যে তা নয় তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। আমি কাউকে দেখে মুগ্ধ হতাম প্রথম তার মুখখানি দেখে, তার পর তার বাক্-বিদগ্ধতা, তার ব্যক্তিত্ব এ সব আসত। মন দিয়ে আমি ভালবাসতাম, মৃন্ময় ছিল না আমার কোন কাহিনী। প্রেমে আমার ছিল মতি, মাটি মেশাইনি কখনো তাতে।

—তাই যদি হবে তবে এত বার কি করে প্রেমে পড়লেন; এত নারীকে মজালেনই বা কেন?

আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন তিনি এ প্রশ্নে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মুখ-বিবর বড় হয়ে গেল। তিনি

আহত অভিমানের সুরে বললেন—জান না, কি ভাল বই ভালবাসার কি আনন্দ? সব বই-ই এক রকম আনন্দ দেয়, কিন্তু প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্য আছে, স্বকীয়তা আছে। প্রথম মলাটের মুখবন্ধেই আকর্ষণ করে বই, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত না পড়ে দেখলে তা উপভোগ করাই সম্পূর্ণ হয় না। তোমার যেমন বই দেখলেই পড়ে দেখতে ইচ্ছে করে সেই রকম আর কি?

অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করতে লাগলাম এ কথাতে। বই পড়া আমি ছেলেবেলা থেকে ভালবাসি, তার সঙ্গে এমন একটা উপমা দেওয়াতে নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

আমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরেই বোধ হয় তিনি বললেন—দেখ, তোমাদের নীতিবাদীরা সুখ-তৃষ্ণাকে নিন্দাই করে থাকে, কিন্তু কেন জান? নিজেদের সুখী হবার মত সৎসাহস নেই বলে। সুখই যদি না চাইব তবে সারা জীবন ধরে সন্ধান করছি কিসের? অবশ্য তুমি লেমনেড পান করেই সুখী আর আমার শ্যাম্পেন না হলে চলে না। আমি বাসনার বশ, সাধনা সাধ্যে কুলায় না আমার। তা বলে আমার পথটা পাপের হবে কেন?

সঙ্কোচ কেটে আসছিল, বললাম—কেন নয়? এই সান মার্কোর গীর্জায় আসতে খারাপ ও ভাল দু' রকম পথই ত আছে।

পরম প্রশান্ত একটা হাসি হেসে সে বলল—তা আছে, কিন্তু আমার মনে যদি কষ্ট না হয় তাহলে খারাপটা হল কোথায়? আমি যে পথে চলেছি তাতে ত আমার কোন ব্যথা বা বিতৃষ্ণা নেই।

—ব্যডেলিয়ার বলেছেন যে পাপ করছি এ কথা ভাবাতেই একটা সুখ পাওয়া যায়, যেমন ধরুন—অবৈধ প্রেমে।

—তা হতে পারে; কিন্তু আমি জীবনকে ভোগ করি, ভাগ করে পাপ-পুণ্য নিয়ে মাথা ঘামাই না। এই ধর না অষ্ট্রীয়ার রাণী মেরিয়া থেরেসার কথা। উনি ভিয়েনার মত সুন্দর সহরটাকে নষ্টই করে ফেললেন চরিত্ররক্ষীর দল প্রতিষ্ঠা করে। এ কথা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে, ওরা ওদের কাজে যা আনন্দ পেয়েছে, ওদের কাজে ফাঁকি দিয়ে নিজের কাজ হাঁসিল করে আমি তার চেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছি।

সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই আমার—বললাম আমি, পৃথিবীতে চিরকালই সৃষ্টির চেয়ে সংহারে বেশী সুখ পায় লোকে। তার জন্যই যে তা ভাল, তা ত নয়। সমাজ গড়তে লেগেছে হাজার হাজার বছর, ভাঙবার জন্য একটা বিপ্লবই যথেষ্ট।

হেসে ক্যাসানোভা বললেন—তবেই দেখ, বিপ্লবেরই বিক্রম বেশী; তারই পূজা করা উচিত। ভাঙো, ভাঙো—রাঙিয়ে দাও তোমার প্রাণ। ভগবান ত সে জন্যই হৃদয়ে লাল রক্ত দিয়েছেন, শাদা জল নয়। অনুরাগের রঙ দিয়ে রাঙা সে রক্ত, ভালবাসবার জন্য, তাতে ডুবে যাবার জন্য, না না, বরং বলতে পার, তাতে ভেসে-ভেসে বেড়াবার জন্য।

—আপনি শুধু ভেসেই বেড়িয়েছেন সম্ভবত—ভালবাসেননি।

—ভালবাসা কাকে বল তুমি?

—(বিব্রত ভাবে) সে ত সবাই জানে।

—ওঃ, তুমি একনিষ্ঠ প্রেমের কথা বলছ? তা ওই জিনিষটি কি অনেককে ভালবাসার চেয়ে বেশী ভাল? দেখ, এ হৃদয়ে ভালবাসা [illegible] হয়তো গভীর হয়ে একটা স্রোতোধারা সৃষ্টি করবে, না হয় চার দিকে ছড়িয়ে হাজারটা স্রোতে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। আমি যে বিশ্বময় উদার ভাবে ভালবাসা ছড়িয়ে দিয়েছিলাম, তাই একটি মানুষের মধ্যে তাকে সঙ্কীর্ণ করে রাখি কি করে? আমি যে ব্যাকুল হয়ে—চঞ্চল হয়ে চার দিকে অনন্ত প্রেম-তৃষ্ণা নিয়ে ছুটে বেরিয়েছি। কোথাও সে তৃষ্ণা মেটেনি, শান্তি পায়নি, সমাপ্তি পায়নি। আমার ভালবাসা কি তোমাদের চেয়ে কম?

—কবি যাকে বলেছেন!

"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী"

আপনি বোধ হয় সে দার্শনিকতার পিছনে আশ্রয় নিয়েছিলেন?

—না, আমি কারো আশ্রয় নিইনি; আমি নিজেই আশ্রয় দিয়েছি আমার মধ্যে সব কিছু দার্শনিকতাকে, যেগুলি তোমরা পছন্দ কর না। আমার জীবনের ছোট-ছোট দীপবর্ত্তিকার আলো তোমাদের এক আকাশের একমাত্র চন্দ্রমার চেয়ে কম ছিল না। তারা প্রত্যেকেই সার্থক, সম্পূর্ণ এবং সে সম্পূর্ণতাই তাদের সব চেয়ে বড় পরিচয়।

—আপনি বোধ হয় কবি ব্রাউনিংএর ভক্ত; তিনি কোন কাজকেই ছোট মনে করতেন না যদি তা সম্পূর্ণ হয়ে থাকে।

—ব্রাউনিং? তার বহু পূর্ব্বেই আমি এ পৃথিবীতে আমার লীলা সাঙ্গ করেছি।

—আচ্ছা, আপনি কখনো কি সত্যিই ভালবেসেছিলেন? এই আমরা যেমন ভাবে ভালবাসি তেমন ভাবে!

হেসে উঠলেন ক্যাসানোভা। বললেন—অর্থাৎ প্রেমে পরাজিত হয়েছি কি না? কাউকে ভালবেসে হৃদয় হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছি কি না? হ্যাঁ, একবার তা হয়েছিলাম। সে জন্যই আমি অতৃপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখনো। হায়! এত বার জয়ের পরও মাত্র এক বারের পরাজয় এখনো ভুলতে পারলাম না। সে কাহিনীটা তোমার রুচিতে বাধবে না বোধ হয়, কারণ তোমরা চাও হারতে এবং অন্যের হারের খবর জানতে। তবে শোন আমার ভালবাসার কাহিনী। আশ্চর্য্য! আমিও পৃথিবীতে এক জনের কাছেই শুধু পরাজিত হয়েছিলাম, এবং তোমার শুনে ভাল লাগবে যে, সে হারই আবার হৃদয়ে মণিহারের মত বিরাজ করছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। নীল ভূমধ্যসাগরের সুদূর সকরুণতা সান মার্কোর চত্বরের নিকটে—অতি নিকটে এসে অস্তরাগের মধ্যে বিচিত্র হয়ে দেখা দিচ্ছে। সে বর্ণ-বৈচিত্র্যের বিস্তারের মধ্যে ক্যাসানোভার কণ্ঠস্বর ব্যাকুল বিহ্বল শোনাতে লাগল।

সর্পিলাকে আমি সত্যই প্রার্থনা করেছিলাম মনে-প্রাণে। তুমি বিশ্বাস করবে না যুবক, আমি তখন যুবক ছিলাম না কিন্তু যৌবনেও কখনো এত চঞ্চলতা, এত মাদকতা অনুভব করিনি। যৌবনেও কখনো এমন ভাবে এক জনকে সব ভুলে অনুসরণ করিনি।

একটু আঘাত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। বললাম—অস্তরাগ চিরকালই মধ্যাহ্ন-দীপ্তির চেয়ে মাদকতর: কারণ প্রথমে জাগে দেহের দাহ, পরে আসে মনের মত্ততা।

—আঃ, শোন না একটু ধৈর্য্য ধরে; শ্রবণ কর, দর্শন এনো না এখন তুমি।

চুপ করে গেলাম। সত্যই ত; ভদ্রলোক যদি চুপ করে যান তাহলে হয়ত আর কথা কওয়াতেই পারব না।

তিনি বলে চললেন—কন্টিনেন্টে ও ইটালীর মধ্যেও বহু জায়গায় উল্কার মত নারী-রাজ্যের আকাশে উড়লাম; ঈর্ষান্বিত বন্ধুরা বলল—হ্যাঁ, এ সব দেশে জয় সহজ; চেষ্টা কর না একবার ইংলণ্ডে। সে দেশ পরাজিত হয়নি কখনো; সে দেশীয়ারা প্রেমেও পড়ে না কখনো।

আমি রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হলাম। বটে? যুদ্ধে ওরা পরাজিত হয় না সমুদ্রের আড়ালে থাকে বলে, কিন্তু প্রেম-পারাবার ত পারাপার মানে না, সব তীরে—সব ঘাটে হৃদয়-তরণীকে বানচাল করে বেড়ায়। আচ্ছা। বন্ধুদের বিদ্রূপে জেগে উঠলাম। বয়স তখন প্রায় চল্লিশ, কিন্তু চব্বিশের চঞ্চলতা এলো চরণে, ব্যাকুলতা এলো বুকে। ঝাঁপিয়ে পড়লাম নূতন সমুদ্রে।

নিজের মনেই যেন বলে যেতে লাগলেন তিনি স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করে-করে।

—হ্যাঁ—সমুদ্রই বটে। সে দেশে অমিশ্রিত সুরা ছাড়া আর সবই লবণাক্ত আস্বাদে ভরা—সাগরে ঘেরা দেশ, সাগরিক তার লোকগুলি আর সবার সেরা নাগরিকা সর্পিলা হচ্ছে সেখানে সাগরিকা।

প্রায় বলে উঠতে যাচ্ছিলাম—কেন, তিনি কি সেখানকার রাণী না কি? এমন সময় আবার আরম্ভ হল সে কাহিনী।

—অনেক লেডীর সঙ্গেই ত মিশলাম কিন্তু চিনলাম না কাউকে। কারণ ধরা দেয় না কেউ; প্রত্যেকেরই চার দিকে দুস্তর সাগরের ব্যবধান। মনের মধ্যে জমা হয়ে উঠতে লাগল জেদ এবং সর্পিলা হল ওই বিদেশী দ্বীপের প্রতিনিধি ভিন্‌দেশী প্রিয়া।

সে আমায় খোলাখুলি বলল এক দিন—তোমায় আমি হারাতে চাই; নিষ্ঠুর ভাবে নাচাতে চাই। যেমন ভাবে তুমি সব মেয়েদের নিয়ে খেলা করেছ, তেমন ভাবে তোমায় খেলাব। তোমার জয়ের ঔদ্ধত্যকে রূঢ় পরাজয়ে নীচু করে ধূলিসাৎ করে দিব।

শুনে আমি চমকিত হলাম না, কিন্তু চমৎকৃত হলাম। তার মুখরতাকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখলাম। সুন্দরীর দর্পে থাকে দীপ্তি; সে আলোয় যে ঝলমল করছে ঝলসিয়ে দিব কি তাকে রাগের অনলে? অনুরাগের আহুতি দিলাম তাই তাকে তার বদলে। এই যে সদ্যোভিন্ন-যৌবনা কিশোরী পুরুষসিংহের কেশরে অঙ্গুলিচালনা করছে সাহসে তাকে লেহন করব কি করে ক্ষুরধার রসনা দিয়ে? লম্বা রুক্ষ কোটের লাঙ্গুল হেলনে তাকে সস্মিত ভাবে অভিবাদন করলাম তার এই পরোপকার-নিষ্ঠার জন্ত। অনিষ্ট করতে কি পারবে সে আমার? নিষ্ঠা দিয়ে তার নিষ্ঠুর বাণীকে গানে গলিয়ে নিব আমি—বিশ্বনারী-বিজয়ী ক্যাসানোভা।

এর মধ্যেই আমি মুগ্ধ হতে আরম্ভ করলাম এই অবলার সরল সবলতায়, দুঃসাহসী দ্বৈরথ দ্বন্দ্বের আহ্বানে। সে দিন থেকে সুরু তাকে জয় করবার অভিযান।

কিন্তু পারলাম কই? কত প্রেম-নিবেদন করলাম, কত প্রমোদ নিকেতনে নিয়ে গেলাম, বহুমূল্য উপঢৌকনে ঢেকে দিলাম তার শোভন উপবেশন-কক্ষ। তবু তার নাগাল পাই না। না হয় তার মন অনুরক্ত, না হয় দেহ আসক্ত। শুধু ফিরে-ফিরে যাই ভ্রমরের মত গুঞ্জন-ধ্বনি করে; মধু রয়ে গেল অনাস্বাদিত, মাতৃমন্ত্র তার রইল আমার মন্ত্র-শৃঙ্খলিত করে।

হঠাৎ বলে ফেললাম—তবে, মার্জনা করবেন, মুগ্ধ হয়ে গিয়ে আপনি মূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন।

শাণিত ছুরিকার মত তার আঁখিতারকা জ্বলে উঠল। তিনি বললেন—মূর্খ! প্রেমে কি কখনো পড়নি নিজে?

চুপ করে আছি দেখে তিনি আবার বললেন—হ্যাঁ, তা ভালবেসে থাকতে পার কিন্তু ভালবাসাতে যাওনি বোধ হয় কাউকে, তাই বুঝতে পারছ না। আমি চাইনি শুধু ভালবাসতে, শুধু জয় করতে; আমি চেয়েছিলাম জয় করে পরাজিত হতে। তার কাছে যে পরাজয় সে ত জয়ের চেয়ে বড় হত। পরাজয়েই হত আমার চির বিজয়!

হ্যাঁ; তার পর কি হল শোন। আমার সময় নেই বাকী; এখনি ভেনিসের প্রমোদ-কাননগুলিতে শোভা পেতে আরম্ভ করবে কামিনীকুসুমদাম। রজনীগন্ধার সুরভির মত ভোগ করব সে আনন্দ-সম্ভার আমি অদৃশ্যপথে থেকে। সময় আর আমার হাতে বেশী নেই।

জান, এক দিন প্রেম-নিবেদন করতে করতে ব্যর্থ হয়ে অক্ষম ক্রোধে এমন মনে হল যে, যে হাত দু'টি দিয়ে তার চরণতল পর্য্যন্ত স্পর্শ করেছি অনুনয়ে তা দিয়ে তার গলদেশ বেষ্টন করে দিই—আলিঙ্গনে নয়, কণ্ঠরোধ করে হত্যা করার প্রলোভনে।

রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম—সত্যি?

হ্যাঁ—সত্যি। ব্যর্থতার আক্রোশে তাও আমি করতে পারতাম। যদি করতাম তা হলেও ভাল হত। তাহলে তার এমন করে হার হত না।

কেন? কেন আপনার এত হৃদয়ের আকর্ষণ হল তার উপর? আপনার বিজয়-ক্ষেত্র ত ছিল অনন্ত; দেশে দেশে আপনি ত প্রেমের খেলা খেলে বেড়িয়েছেন।

তা বটে। কিন্তু এই এখানে ত আমি তা করতে চাইনি। শোন তার পর কি হল। এক দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে তার বাগানের সাইপ্রেশ গাছগুলির ছায়ার আড়ালে থেকে-থেকে তার ঘরের বারান্দার তলায় এসে দাঁড়ালাম। তার কণ্ঠনিঃসৃত কলোচ্ছ্বাস সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত এসে আমায় আঘাত করল! আমি থমকিয়ে দাঁড়ালাম। এত আনন্দ-কাকলী তার কণ্ঠে কখনো শুনিনি। মানস-চক্ষুতে দেখতে লাগলাম তার প্রফুল্ল হাসির শোভায় সন্ধ্যার অন্ধকার তরল হয়ে উঠছে।

হিংসা হল না কি আপনার?—সকৌতুকে প্রশ্ন করলাম।

হিংসা? তা হিংসা বলতে পার। মনে মনে ভাবলাম, আমি যদি ওই ঘরের দেওয়াল হতাম তাহলে তার হাসির উচ্ছ্বাস এসে আমাতে প্রতিহত হয়ে ফিরত; হতাম যদি তার কবরীর পুষ্পমাল্য প্রত্যুত্তরে দিতাম একটু সৌরভস্রোত তাকে।

বাঃ, এ যে একেবারে 'ওরিয়েণ্টাল' মনোভাব হয়ে গেল।

দেখ, প্রেমের ব্যাপারে ওরিয়েণ্টাল বা 'অকৃসিডেণ্টাল' নেই। প্রেম হচ্ছে নিখিল বিশ্বের সার্বজনীন বস্তু। আমরা তোমাদের মতই ও-জিনিষটি অনুভব করি। তোমরা ভাষায় তাকে প্রকাশ কর, আর আমরা ভাবে তাকে বিকাশ করি, এই যা তফাৎ। তোমরা উপহার দাও রজনীগন্ধা, আমরা দিই গার্ডেনিয়া।

মোট কথা, আপনার হিংসা হয়নি তাহলে?

না; সত্য কথা বলতে কি, কি হয়েছিল তার বর্ণনা করতে পারব না। অনেকক্ষণ তার হাস্যলহরী হৃদয়ে সঞ্চয় করে নিলাম। তার পর [illegible] গোপনে বারান্দার কার্ণিশ [illegible] উঁকি দেখে কি

ম জাম? দূর্বাদলের মধ্যে স্থির স্তিমিত নিশ্চল একটা
র্প! সর্পিলার সুন্দর সবুজ গাত্রাবরণের চারি ধারে বিসর্পিত হয়ে
এক যুবকের দুই বাহু, আলিঙ্গনে বদ্ধ সর্পিলা মুক্তিলাভের
চেষ্টা করতে করতে হাস্যোজ্জ্বল কৌতুকে লুটোপুটি খাচ্ছে,
তার পরম পরিতৃপ্তির আভা। আঃ—চোখ কেন অন্ধ হয়ে
া তখন?

াপনি কি চোখ বন্ধ করে ফেললেন আর বারান্দা থেকে পড়ে
?

াঃ—তুমি কিছুই বোঝ না যুবক! আমি পড়ে গেলাম না,
গেলাম, অনেক উর্দ্ধে, সংসারের হিংসার অনেক উর্দ্ধে উঠে
। মনে মনে ভাবলাম—সর্পিলা আমার সঙ্গে কখনো সুখী
কখনো এত আনন্দে নিজেকে ভুলতে পারেনি। আমি
া অবস্থায় স্বার্থপরের মত নিজেকে তার উপর জোর করে
ত পারি? ওই অপরিচিত যুবকের সাহচর্য্যেই যদি সে সুখী
াক সে সুখী। সে যে সুখী হয়েছে তা ভেবে নিয়েই নিজেকে
রে রাখব, ভাবব তার সুখেই আমার হোক সুখ।

লতে বলতে তার চোখ দু'টি অন্ধকারের মধ্যে তারার মত
আরম্ভ করল। তার দিকে তাকিয়ে মনে একটা বিচিত্র
ত এল। অস্ফুট স্বরে বলে উঠলাম—আহা!

া, না, আহা বলো না। অন্তরালে থেকেই অজ্ঞাতসারে সরে
এই মনে করে সংগোপনে সর্পিলার দিকে একটি চুম্বন ছুঁড়ে
। সুখী হও তুমি সুন্দরী অপরিচিত নবীন যুবকের প্রেমে,
প্রেমিক ক্যাসানোভা আর তোমায় অনুসরণ করে দুঃখ দিবে
বলতে বলতে হঠাৎ পদস্খলন হওয়াতে বারান্দা থেকে নীচে
গেলাম।

চাট লাগেনি ত বেশী?

চাট? ক্রুদ্ধ স্বরে ক্যাসানোভা বললেন—চোট? তা লেগেছিল,
আমার আসুরিক বলবান দেহে নয়, অমৃতের আস্বাদময় মনে।
। আদর্শময় স্বপ্নময় ক্ষমা মরে গেল সে আঘাতে। জেগে
সুপ্ত রক্ত-মাংসের মানব। এক লাফে বারান্দা পার হয়ে এসে
অপরিচিত যুবককে এমন প্রহার দিলাম যে তার চিৎকারে আকৃষ্ট
নগর-প্রহরীরা ছুটে এল আর বিভ্রান্ত সর্পিলা সর্পগতিতে অদৃশ্য
গেল অলক্ষিতে অন্ধকারে—গাঢ় অন্ধকারে আমায় ডুবিয়ে।

ার দিকে তাকে খুঁজতে বের হল সবাই। কোথাও পাওয়া
না তার সন্ধান। সন্ধ্যা কি নেমে এল তার উজ্জ্বল জীবনের
? তমসা নদীর জলে সে কি জুড়াল আমার প্রেম-নিবেদনের
? কি জানি। ভ্রষ্টপুচ্ছ ময়ূরের মত লক্ষ্যভ্রষ্ট মূঢ়ের মত ফিরে
নিজের গৃহে।

রদিন সকালেই ছুটলাম তার বাড়ীতে; দেখি, বহু লোকের
পদে ত্রস্ত ভাবে আনাগোনা চলছে; কথা কয় না কেউ।
। রাত্রেই ফিরে এসেছিল কিন্তু শুয়ে আছে মরণের দুয়ারে;
হওয়া অসম্ভব; ক্ষমা-প্রার্থনার অবকাশও মিলল না।

হায়! নিজের ঘরে স্তিমিতপ্রায় আগুনের আভায় তিমিরাচ্ছন্ন
বসে-বসে ভাবলাম, কেন তাকে এমন ভাবে প্রেম-সংগ্রামে
ান করলাম, কেন রণাঙ্গনে অনুসরণ করলাম তাকে দুর্বার শত্রুর
[illegible]

করার পরই? সে কি প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে আমার উপর নিজে প্রাণদান করে? তার কাছে যে জয় চেয়েছিলাম সে কি এই? তার হাতে যে পরাজয় প্রার্থনা করতাম মনে মনে সে কি এই?

প্রত্যেক দিন তার বাড়ীর দুয়ারে ঘোরা-ফিরা করতাম। প্রত্যেক দিন তার স্বাস্থ্য-সংবাদ ক্রমেই বেশী চিন্তা ও ভীতিজনক হয়ে উঠতে লাগল। প্রেতাত্মার মত ঘুরে বেড়াতে লাগলাম তার বাড়ীর চারি দিকে।

এক দিন অন্ধকারে এক জন লোককে বাড়ী থেকে বের হতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—এই কি ডাক্তার যাচ্ছেন না কি? চাকর উত্তর দিল—ডাক্তার? দিদিমণি ডাক্তারের হাতের বাইরে চলে গেছেন। উনি হচ্ছেন পুরোহিত।

ক'দিন পরে ওর বাড়ী থেকে যেচে খবর পাঠাল যে, সর্পিলার মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকী আছে। আমি যদি সত্যই তার কল্যাণ কামনা কখনো করতে চেয়ে থাকি তাহলে যেন অন্তত এখন গীর্জায় প্রার্থনা করতে চাই।

হায়! এই গীর্জাতেই ত যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাকে নিয়ে, তাকে ছাড়া নয়। তার পরমাত্মীয় হিসাবে, পরমাত্মার জন্য নয়। তাই সেখানে যেতে পারলাম না।

আমার কামনার দাবানলে বেষ্টিতা বনহরিণী সর্পিলা যে দীর্ঘশ্বাস সেতুর উপর থেকে তমসা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার জ্বালা জুড়িয়েছে বলে সন্দেহ করেছিলাম, সে দিন সেই সেতুর উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। মৃত্যুর দুয়ারেও আমি পরাজিতের মত দাঁড়াব না। সব চেয়ে ভাল সান্ধ্য পোষাকটি পরে এসেছিলাম। এক পকেটে দু'টো পিস্তল, অন্য পকেটে যতগুলি নেওয়া সম্ভব ততগুলি গুলী, বুকের মধ্যে একটা করুণ অসহায় স্তব্ধতা। আমার মুক্তি ও আসক্তি-মোচনের একমাত্র পথ আত্মহত্যা।

কিন্তু এমন সময় এসে উপস্থিত হল আমার এক বন্ধু। সে কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে। মুখ দেখেই বোধ হয় সন্দেহ করেছিল মারাত্মক রকমের কিছু গোলমাল। জোর করে নিয়ে গেল একটা রেস্তোরাঁয়। বাধাও দিতে পারি না। যদি আসল উদ্দেশ্য সন্দেহ করে ত বিপদ। আত্মহত্যা করতে পারলে কোন শাস্তিই নেই; কিন্তু চেষ্টা করে বিফল হলে আইনে শাস্তি দেবে। ভয়ে-ভয়ে তার সঙ্গেই যেতে হল। খেতেও হল। তিন দিন কিছু খাইনি; তার পর এই অভিজাত ভোজনশালায় যা খেলাম তাকে উদরোৎসব বলা চলে। উপায় ছিল না; বাহিরের আবরণ ত রাখতে হবে, অন্যথায় আচরণ যে হয়ে উঠবে সন্দেহজনক। সুরাপাত্রের উষ্ণ অন্তরঙ্গতা ক্রমে ক্রমে বুঝিয়ে দিতে লাগল যে, প্রেম আনন্দ থেকেই জন্মায়, আনন্দের জনক নয়।

সুরা ত নয় যেন সুধা; ক্রমে ক্রমে নিজেকে ফিরিয়ে পেতে লাগলাম। মনে এল সাহস, দেহে এল উৎসাহ। বন্ধু যখন আমার মৌন আত্মতন্ময় ভাবকে প্রেমবিহ্বলতা বলে খেপাতে শুরু করল সুরা তখন আমায় দিল প্রেরণা। বললাম—হোঃ, আমি কি প্রেমে পড়েছিলাম না কি? আমি—আমি ত শুধু আমার জয়-মালায় আর একটি ফুল যোগ করবার চেষ্টায় ছিলাম।

মধুর হেসে বন্ধু বলল—তা বলেছ বটে ঠিক। না হলে পারতে [illegible] এই শীতে আর অন্ধকারে টেমস নদীর উপর দীর্ঘশ্বাস সেতুর

উপর দাঁড়িয়ে থাকতে একা-একা। বন্ধু, তুমি বন্ধনে পড়েছ এবার নির্ঘাত; তবে বলে দিচ্ছি, বন্ধুর এ পথ তোমার জন্য নয়। প্রেমে পড়ে কলেজের ছোকরারা ও কবিরা—যারা কখনো পরিণত বয়স্ক হয় না। আর তুমি? তোমার চল্লিশ বছর বয়সে এত জয়ের কাহিনী পিছনে রেখে এ রকম মায়া-মৃগের পিছনে ছোটা তোমার মানায় না।

কাতর—হ্যাঁ, এখনো কাতর বই কি—কাতর স্বরে বললাম—কিন্তু সর্পিলা যে পরপারের পথে চলেছে; সে ত শুধু আমার রাহুর প্রেমের দুর্বার অভিযানের ফলেই।

শ্যাম্পেনের পাত্রটি আবার ভরে দিয়ে সে বলল—তুমি ত চির-কালই মনে মেরেছ; এক জনকে যদি প্রাণে মারার কারণ হয়েই থাক তাতে দুঃখের কি আছে। তুমি ত মৃগয়ার ব্যাধ, কোন্ শরে কাকে হত বা আহত করলে সে খবরে ত তোমার দরকার নেই। যাই হোক্, চল এখন একবার নাচ-ঘরে যাওয়া যাক। লোকে তোমায় বদনাম দিতে সুরু করেছে যে তুমি প্রেমে পড়েছ।

গেলাম তার সঙ্গে নাচ-ঘরে। মরণের সঙ্গে অভিসার হল না বটে কিন্তু চরণের সঙ্গে অভিনয় অর্থাৎ যাকে বলে নাচ—তাও আমার উপভোগ করা হল না। হঠাৎ যেন চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেল; নাচ-ঘরের বাতিগুলিও চোখে যেন নাচতে লাগল; বাজনার তালে তালে মাথাটাও নাচতে লাগল; বিশ্ব-জগৎ নাচের মধ্যে পাগল হয়ে গেল না কি?

ওই ত সর্পিলা নাচছে। লঘু চঞ্চল চরণে যে নাচছে সে ত গুরু মরণ-পথের যাত্রিণী নয়। তবে? তবে? হায়! ও যদি মরে থাকত বা আমিই যদি আত্মহত্যা করতে পারতাম, আর যাই হোক, এমন ভাবে আমার পরাজয় হত না।

কয়েক মিনিট যেন কেমন করে যুগান্তের মত দীর্ঘ ও প্রতীক্ষার পরীক্ষায় অসহ মনে হত লাগল। তার পরই অবশ্য নিজেকে সামলিয়ে নিলাম।

নাচতে নাচতে সবাই আত্মহারা হয়ে উঠছে দেখে আমিও আত্ম-সংবরণ করে নিতে পারলাম। নাচ-ঘরের বাতি তখন চোখে আবার উজ্জ্বল ঠেকছে। একটি মেয়ে নিজে থেকে যেচে আমার সঙ্গে নাচতে চাইল। প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। তার বাহুলগ্ন হয়ে নৃত্য-সাগরে ভাসতে ভাসতে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পাড়ি দিতে আরম্ভ করলাম। নাচতে নাচতে সর্পিলার পাশ ঘেঁষে গেলাম এক বার। তার দীর্ঘ বিসারিত পোষাকের প্রান্তে কি দিয়েছিলাম ঈষৎ আকর্ষণ? উষ্ণ-শিহরণ কি জেগেছিল আমার দেহে তার পার্শ্ব-সঞ্চরণ কালের কবোষ্ণ উত্তাপে?

জানি না। কি হয়েছিল জানি না। কিন্তু সেই সেদিনকার সন্ধ্যায় সবুজ পোষাকের রাশি রাশি তরঙ্গভঙ্গের মাঝখান থেকে একটি শুভ্র আনন—সবুজ পত্রালিকার মধ্যমণি শ্বেত গোলাপের মত মুখ—ভেসে ভেসে দূরে চলে যেতে যেতে একটা ব্যঙ্গে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

সে ব্যঙ্গ বাক্যের চেয়ে বলশালী, বাণের চেয়ে বিষাক্ত মনে হল। বাণবিদ্ধ হরিণের মত টলতে টলতে নৃত্যচ্ছন্দে আবার তার কাছে ভেসে এলাম নৃত্যস্রোতে; মৃদু স্বরে কিন্তু স্বপ্নের মধ্য দিয়ে যেন বলে গেলাম সর্পিলাকে—আমার স্বপ্নের সর্পিলাকে—জয়ের চরম মুহূর্তেই হল তোমার পরম পরাজয়।

কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, যুবক, তার কাছে আমি এই জয় চাইনি। দেশে দেশে যে ভাবে নারীর কাছে জয়মালা পেয়েছি কখনো হেলায়, কখনো খেলায়, সে ভাবের খেলা ত এ ছিল না। আমি যে চেয়েছিলাম হারতে, ব্যাকুল হয়ে বিপুল ভাবে হারতে। তার বদলে এ কি পেলাম জয়? এ জয়ে না আছে জয়ের আনন্দ, না পরাজয়ের বেদনা। একবার যদি দুঃখ পেতাম, তাহলে সে পরাজয়ই আমার চিরজয় হয়ে থাকত।

উদাস উৎসুক দু'টি চোখ ক্যাসানোভার বিষণ্ণ অন্ধকারের মধ্যে সন্ধ্যা-তারার মত জ্বল-জ্বল করে তাকিয়ে রইল। এক বার ভাবলাম যে তার হাত ধরে মিনতি করে বলি, যেন এই পরাজয় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সে বেদনা অনুভব না করে; জয়-পরাজয়ের হিসাবের মধ্যে এ কাহিনী যেন না টেনে আনে; কিন্তু এই চারি ধারের অনন্ত করুণতার মধ্যে ভাষা খুঁজে পেলাম না; মনে হল যেন তাকেও খুঁজে পাচ্ছি না আর।

অদূরে সান মার্কো গীর্জার ঘড়ি ঘণ্টাধ্বনি করে উঠল। হঠাৎ নড়ে-চড়ে জেগে উঠলাম; ক্যাসানোভার কাহিনীর মায়াজাল ছাড়িয়ে আত্মসংবরণ করতে না করতেই বন্ধুদের চীৎকারে সচকিত হয়ে উঠলাম। কাসুন্দি, কাসুন্দি করে ওরা চেঁচিয়ে আমায় খুঁজছে।

দেখ, কাসুন্দি, তোকে নিয়ে পারা গেল না। গণ্ডোলা থেকে হোটেলের ঘাটে নেমে দেখি তুই নেই। খোঁজ খোঁজ, আমাদের কাসুন্দি কোথায় গেল। একবার ভাবলাম, সুবিধা মত একা সটকিয়ে পড়েছে কোন একটা বিশেষ মতলবে; আবার ভাবলাম, যা স্বপ্নবিলাসী ছেলে সান মার্কোতেই বসে হয়ত স্বপ্ন দেখছে। তাই এখানে ছুটে এলাম। যাক্, বাঁচালি।

বন্ধুদের বললাম, ক্যাসানোভার স্বপ্ন-কাহিনী; এত কাছে পেয়েছিলাম তার স্বপ্নময় উপস্থিতি ও প্রাণময় অনুভব যে নিশ্চয়ই গল্পটার মূলে সত্য আছে। ইতিহংস (ইতিহাসে হংস্ অর্থাৎ অনার্স নেওয়ার জন্য এই নাম তাকে দিয়েছি আমরা) বলল—নেহাৎ স্বপ্ন অবশ্য নয় ব্যাপারটা; লা সার্পিল নামে একটি মেয়ের সঙ্গে এ রকম একটা ঘটনার কথা আছে বটে; তবে দেখ, কাসুন্দি, ছোট নীরস একটা ব্যাপারকে কাসুন্দি মাখিয়ে বেশ মুখরোচক করে তুলেছিস দেখছি; দে ওটা কাগজে ছাপিয়ে। তবে নিজের নামে নয়; আমাদের সচ্চরিত্র দেশে লোকে ভুল বুঝতে পারে।

সে কথাটা গৌণ। গুন-গুন্ করে যে কথাটা মনে ধ্বনিত হচ্ছে, তা হচ্ছে এই যে সত্যই কি ক্যাসানোভার অতৃপ্ত আত্মা এই ইটালিয়ান সহরে প্রমোদ-নিশির উৎসবগুলিকে অদৃশ্য ভাবে অংশ নিয়ে উপভোগ করে যায় এমনি করে রোজ রাত্রিতে? আজকের প্রাণ-চঞ্চল লীলাসুন্দর কপোত-কপোতীদের অভিনয় কি অভিনব সাড়া জাগায় তার পরলোকান্তরের আত্মাকে? হৃদয়ের ব্যর্থ বাসনা কি ব্যাকুল করে রাখে পরলোককে যার জন্য নব নব যুগের নব প্রণয়-লীলায় নিজের জয়-পরাজয়ের পুনরাবৃত্তি দেখে যাবার এমন ইচ্ছা হয়? কে জানে?

দুই বন্ধু খাওয়া শেষ করলেন। কাফের জানলা দিয়ে দেখলেন বেলিভার্ড পার্ক একেবারে লোকে লোকারণ্য। তাঁরাও মৃদুমন্দ সের পরশ পেলেন হঠাৎ। এই ক্লান্তিহারী বাতাস উপভোগ ার জন্যে প্যারীর অধিকাংশ লোকই রাত্রে হাওয়া খেতে বের ছ, তারা নিরর্থক ভাবেই ঘুরে বেড়াচেছ এদিক্-ওদিক্। র নীচ দিয়ে নদী বয়ে যাচেছ, জলে পড়েছে চাঁদের আলো, ায় যেন নাইটিংগেল গানও ধরেছে।

ই বন্ধুর মধ্যে এক জন, হেনরী সিমন, দীর্ঘশ্বাস ফেলে গভীর । বলে উঠলেন, "ওঃ, বড্ড তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে পড়ছি । আগে এই রকম রমণীয় সন্ধ্যা বেলায় কি রকম যেন আন্তরিক া পেতাম। আজ খালি অনুতাপ হয় সে-সব দিনের কথা ।।

সিমন এখনো বেশ স্বাস্থ্যবান, মাথা-ভর্তিপূ কাণ্ড টাক। বয়স হয় বছর পঁয়তাল্লিশ হবে।

ার এক জন, পিটার কারনিয়াঁ, ু বেশি বয়স্ক, পাতলা ছিপছিপে বেশ প্রাণবন্ত, উত্তর দিলেন: তকে ভালো করে উপভোগ ার আগেই বুড়ো হয়ে গেলাম । তুমি তো জানো, আমি সদা- া কি রকম হাসি-খুসি নিয়ে তাম, কি রকম স্ফূর্তিবাজ লোক ম আমি। লোক আয়না দেখে তই পারে না যে বয়স আস্তে ঃ এগিয়ে চলেছে শেষ সীমার ়। মুখের চেহারা পালটায় আস্তে আস্তে। আজকে এই র দুঃখ হচেছ যে মানুষ ভীষণ াতাড়ি মারা যায়, জীবনে সব উপভোগ করে যেতে পারে ইচেছ থাকলেও।

মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

"ভেবে দেখো, সব চেয়ে বেশি কষ্ট মেয়েদের, কেন না তাদের ন্দ, শক্তি, জীবন-উৎস, সৌন্দর্য্য তাজা থাকে মাত্র দশটি বছর!

"আমার বুড়ো হয়ে যাবার অবশ্য একটা কারণ আছে, সে কথা বললে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না আমার কথা।

"বিশ্বাস করতাম আমি তরুণ, যদিও তখন বয়স হয়েছিলো শ। কখনো কোন অবসাদ অনুভব করিনি, দিনগুলো আনন্দের ারে রঙীন হয়ে থাকতো সর্ব্বদাই।

'আমার পতন নেমে এলো অত্যন্ত চুপি চুপি, অতি নিষ্ঠুর ভাবে, াসের মধ্যেই আমাকে পঙ্গু করে দিয়ে গেলো।

"বলতে লজ্জা নেই ভাই, এক দিন আমিও প্রেমে পড়লাম অন্য জনের মতোই, তবে চোখ বুজে নয়। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয় দ্রের ধারে প্রায় কুড়ি বছর আগে, মানে যুদ্ধের পরেই। স্নানের । সমুদ্রের ধারের সৌন্দর্য্য হয়তো দেখনি কোন দিন। ঘোড়ার ঃ খুরের মতো একটু খাড়াই ফিয়র্ড জল-দৈত্যের পায়ের মতো । মিশেছে সমুদ্রে। এক দল মেয়ে এসে জুটেছে উত্তর কিনারায়, । ফুল-বাগান বললে ভুল হয়! সূর্য্য মাথার ওপর, রোদ পড়ে সমুদ্র ত্ত হয়েছে। সবাই চটুল, সবাই খুশি। সকলের চোখেই আনন্দের ফোয়ারা। সমুদ্রের ধারে বসে বসে তাদের স্নান দেখতাম। তারা ছোট ছোট ঢেউয়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতো, পরিশ্রমের চাপে তাদের মুখ রাঙা হয়ে উঠতো গোলাপ ফুলের মতো। সমুদ্রের তীরে আরো কেউ কেউ হয়তো ছিলো দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকের দৃষ্টি তাদের পরিপুষ্ট দেহের ওপর।

"এমনি ভাবে প্রথম সেই মেয়েটিকে দেখি। দেখে বলতে কি, বেশ উল্লসিতই হয়ে উঠি, সেও আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে ওঠে। মনে হলো মেয়েটির সঙ্গে আমার যেন জন্ম-জন্মান্তরের আলাপ।

"এমন করে নিজেকে একটা মেয়ের কাছে বিলিয়ে দেওয়া আমার ইতিহাসে এই প্রথম! প্রথম দৃষ্টিতেই সে যেন আমার হৃদয় লুঠ করে নিলো। ভয়ঙ্কর কথা এটা যে এক জন নারীর করকমলে বন্দী হতে চলেছি আমি। এটা যেন একাধারে শান্তি এবং শাস্তি। তার হাসি, তার চাউনি, তার সোনালী চুল, তার মাংসল ঘাড়, তার লোভনীয় মুখ,—সবই যেন পুলক জাগিয়ে তুললো আমার মনে। তার চলনে, বলনে, ব্যবহারে আমি মুগ্ধ—আমাকে সে যাদু ক'রে ফেললো।

"পরে জানলাম সে বিবাহিতা, তার স্বামী প্রতি শনিবারে আসে আর সোমবারে চলে যায়। তবুও মনে হলো, জীবন একটুও অসার নয়, কোন অভিযোগ নেই আমার তার ওপর।

"তার প্রেমে না পড়লে বুঝতাম আমার সৌন্দর্য্যবোধ নেই। তার তারুণ্য আমাকে পাগল করে তুললো। সে যুবতী, মনোহরা, আর সুশ্রী। মেয়েরা যে এতো সুন্দরী হতে পারে, তা আগে জানতাম না। এতো পরিচছন্ন আর আকর্ষণী শক্তি মেয়েদের থাকতে পারে, সে কথা আগে অন্যে বললে কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না। তার গালের খাঁজে যে কি সৌন্দর্য্য তা ভাষায় বলতে পারবো না। গোলাপের মতো গাল, সিঁদুরের মতো ঠোঁট, তিল-ফুলের মতো নাক!

হঠাৎ কাজ পড়ে যাওয়ায় তিন মাস পরে আমাকে আমেরিকা চ'লে আসতে হয়। তাকে দেখতে না পেয়ে আমার অবস্থা হয় মৃতপ্রায়। তার চিন্তাই আমার মনকে পীড়িত করে তুললো সমস্ত সময়। একবার শুধু তাকে দেখবার জন্যে পাগল হয়ে যেতাম। দূরে এসে বুঝতে পারলাম, তার ওপর আমার টানটা কতো তীব্র।

"বছর কয়েক কাটলো, তাকে ভুলতে পারলাম না। তার প্রতিমা সদৃশ মুখখানি আমার ধ্যান হয়ে রইলো। তার কথা চিন্তা করতে করতেই আমার দিন কেটে যেতে লাগলো। মনে হলো আমার এই অনুরাগ খাঁটি, অদর্শনার মুখ ভুলতে বসলেও প্রেম বন্ধ্যা হয়নি। জীবনে যে সত্যিকারের একটি প্রতিমা দেখেছি সেই আনন্দেই আত্মহারা আমি।

"সুদীর্ঘ বারো বছরের পরও তার কথা ভুলতে পারলাম না। কোথা দিয়ে কখন যে বারোটি বছর কেটে গেছে বুঝতে

পারিনি। নিরীহ মুহূর্তের চক্রান্তে মানুষ যে বৃদ্ধ হয়ে পড়ে, তার খোঁজ বোধ হয় রাখে না মানুষ।

"গত বসন্তে ম্যাসিঅস্ন ল্যাফিটিতে এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে খেতে চলেছি, হঠাৎ ট্রেণ ছাড়ার মুখে লম্বা একটি মেয়ে ছোট ছোট কয়েকটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার কামরাতেই উঠে পড়লেন। এতো লম্বা এবং এতো সুন্দরী মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি। মুখটা পূর্ণচন্দ্রের মতো, মাথায় রয়েছে বিবর্ণ টুপি।

"এতোটা ছুটে আসার দরুণ তখনো হাঁপাচ্ছিলেন মেয়েটি। ছোটরা আরাম করে ব'সে গল্প জুড়ে দিয়েছে, অগত্যা আমি কাগজে মন দিলাম।

"গাড়ী যখন এ্যাস্নিয়ার ছাড়লো তখন সহযাত্রিনীটি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করলেন: 'মাপ করবেন, আপনার নাম কি মঁসিয়ে কারনির্যা?'

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, কেন বলুন তো?"

"আমার জবাব শুনে ভদ্রমহিলা মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন আপন মনে। হাসির মধ্যে কোন জড়তা নেই, তবে কেমন যেন বিষণ্ণতা।

—"আমায় চিনতে পারছেন না?"

"দ্বিধায় পড়লাম আমি, মন বলছে এ মুখ নিশ্চয়ই কোথাও দেখেছি। কিন্তু কোথায়? কত দিন আগে? আস্তে আস্তে উত্তর দিলাম: হাঁ, তবে ঠিকমতো চিনতে পারছি না। যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনার নামটা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

"খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে কিছু ভেবে নিয়ে বললেন: সিদেস্ জুলি লফির্ভা।'

"এমন আঘাত আর কখনো খাইনি। কিছুক্ষণের মতো পাথর হয়ে গেলাম। মনে হলো, পায়ের তলা থেকে মাটী দ্রুত সরে যাচ্ছে। এই আমার মানসপ্রিয়া? ঈশ্বর, এর আজ কি রূপ হয়েছে। এ তো সাধারণ এক জন নারী। আমার অবর্তমানে চারটে ছেলে-মেয়ের মা হয়েছে, মেয়েগুলোও হয়েছে ঠিক মায়ের মতো। ছোটরা দেখলাম খুব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

"একে এমন ভাবে দেখব আশা করিনি কোন দিন। প্রচণ্ড একটা আঘাত এসে লাগলো বুকে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবার ইচ্ছে হলো আমার।

"আস্তে আস্তে তার হাতটা ধরলাম, চোখটা অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তার রূপের নিঃস্বতায় কান্না এলো আমার। কোন দিন এর সঙ্গে পরিচয় ছিলো বলে ভাবতেও কষ্টবোধ করতে লাগলাম।

"সে-ও বুঝলো আমার মনের কথা, তাই এক সময় বললো: 'খুব পাল্টে গেছি, না? দেখছো না, মা হয়েছি। জীবন পাল্টে ফেলেছি একেবারে, চিনতে কষ্ট হবেই তোমার। তুমিও তো বহু পাল্টে গেছো। এই বারোটা বছর নিশ্চয়ই খুব আনন্দে কাটিয়েছো তুমি---ওঃ বারোটা বছর। আমার বড় মেয়ের বয়সই হলো দশ।

"তার মেয়েদের দিকে করুণ চোখে তাকালাম। ট্রেনের গতিবেগ মনে হলো হাজার গুণ বেড়ে গেছে। বুকের মধ্যে ঝড় উঠছে---একটা কথাও বলতে পারলাম না, শুধু ছবির মতো চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে রইলাম তার মুখের দিকে তাকিয়ে।" *

* মোপাসাঁর একটি গল্প

রাত তখন ভোর হল

লোকনাথ ভট্টাচার্য

যত বড় আকাঙ্ক্ষা তোমার তত বড় আঘাত তোমায়
পেতেই হবে ভাই, বন্ধু বললেন শক্ত করে আমার
মুঠো চেপে ধরে। বুঝতে পারি না এ কী হাওয়া
এ কি দিন না রাত অথবা প্রদোষ বেলা
আকাশে কি সূর্য অথবা তারায় খেলা
জানা নেই—কাজ নেই জেনে
শুধু বুঝলাম শুধু জানলাম বন্ধু আমার হাত ধরেছেন।

হয়তো তখন কোলাহল ছিল পাশেরই কোনো সরাইখানায়
হয়'তা তার মাতাল গন্ধে বাতাস আবিল হল
তবু কান কিছুই শুনবে না শুধু শুনবে বন্ধুর স্বর
বন্ধু বলছেন, নীরব কেন ভাই?
আর যে পারি না বন্ধু, আমি চললাম, তুমি যা বোঝাও
মন তো তা বোঝে না
সে শুধু ভাবে কোথায় কী ফেলে এলাম
কোথায় যেন আরো কিছু পাওয়া উচিত ছিল

তবে এ সব কী? শুধু আজীবন দুশ্চিন্তার সিঁড়ি বেয়ে
আমি কি কেবলি নামব?
নামবে কেন ভাই?—বন্ধু বললেন, তুমি যে কেবলি উঠবে
এ সত্য তোমাকে বোঝাবার যদি আর কেউ না থাকে
আমি তো আছি।
তোমার এই ওঠার ধাপে ধাপে
তুমি তোমার ইচ্ছাকে কেবলি অতিক্রম করছ
তাই যে মুহূর্তে সফল তুমি সে মুহূর্তে তোমার বেদনা নতুন
এ ক্লান্তির শেষ নেই তো।

তুমি বললে হবে কী? আমি যে নিত্য দেখি
প্রাণ পেল না আশীর্বাদ, তৃষ্ণার্ত হৃদয়
মরুর মাঝখানে কেবলি মরীচিকা দেখল
গেল বিলাস-ব্যসন গেল আহার
গেল জীবনকে জাইয়ে রাখার মত অভিপ্রায়
জ্বলে উঠল লক্ষ গ্লানি রাত্রি কাটল দুঃস্বপ্নে
অবসন্ন চোখ বুকে নিয়ে গুরুভার
কেবলি বাহিরে তাকাল—শুধু প্রতীক্ষায়

...ন্ধু বললেন, সেই তো তোমার প্রেম।

...তাকে তুমি প্রেম বল?
...স যে দুঃখ সে যে মৃত্যু সে যে বিকট সে যে বীভৎস—

...ন্ধু হেসে বললেন, তবু এমনি তোমার প্রেম।

...অধৈর্য হলাম, বললাম—তাতে আমার প্রয়োজন?

...ন্ধু হেসে বললেন, ধীরে বন্ধু ধীরে
...র গান বুকে কান পেতে শোনবার
...চেয়ে তাকে না শোনার চেষ্টা করো না—
...প্রেমে তোমার প্রয়োজন?
...র প্রয়োজন তোমার অস্থি-মজ্জায় তোমার ক্লান্তিতে চোখ বোজায়
...তোমার নবীন আশায় ভোরের সূর্য-প্রণামে
...র প্রয়োজন তোমার প্রয়োজনের সীমা ছাড়াল।
...য প্রাণ মরুতে দেখল মরীচিকা
...য প্রাণ পেল না আশীর্ব্বাদ
...স প্রাণ ভুলে গেছে
...তাকে আশীর্ব্বাদ করার স্পর্দ্ধা রাখে কে
...স যে লক্ষ তারাকে চমকে দিতে পারে
...তাই তোমরা যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর
...তারা মহান
...যারা বিশ্বাস করো না, তারা আরো মহান্।

...তখন বললাম, তবু আমি যে অপরাধী, আমি খুনী
...বারে বারে আমার পথ রঞ্জিত করেছি আমি
...আমারি কামনার রঙে আমারি হিংস্রতার রক্তে?

...ন্ধু হাসলেন, বললেন, লজ্জা দিও না ভাই—
...মি অপরাধ করবে কার কাছে
...তোমার অপরাধ নেবে এমন সাধ্যই বা কার?
...আর বড় এক দিক দেখ তুমি
...এমন দুঃখ কি তুমি কখনো পেয়েছ
...যা তোমায় আনন্দ দেয় না?

...পাইনি? কী তোমার আনন্দ আমি জানি না—
...আমি দেখেছি কুষ্ঠরোগীকে আমি দেখেছি ভিক্ষাজীবীকে
...আমি দেখেছি সেই অসহায় পথিক বালক
...আর্ত্তনাদ করে উঠল
...যখন রাতারাতি অন্ধকারে পথ হল অরণ্য
...মানুষ হল পশু, দেবতার অমৃত-ভাণ্ড
...নিঃশেষ হবার আগে যেটুকু তলানি ছিল আশীর্ব্বাদের
...হঠাৎ বিষবাষ্পে ঘুলিয়ে উঠে তা হল অভিশাপ:
...কী তোমার আনন্দ আমি জানি না
...এরা কী আনন্দ পায় তাও জানি না
...শুধু জানি এরা যখন কেঁদে ওঠে, বলে
...আমি কেন আছি
...আমি তো গেলেই বাঁচি
...তখন আকাশ চোখ বোঁজে বাতাস কথা কয় না
...গাছেরা শিউরে ওঠে।

এবার বন্ধু বললেন: গম্ভীর তাঁর স্বর
যেন বহু দূর থেকে শোনা যাচ্ছে সমুদ্র-স্বনন—
তোমার সমস্ত সংশয় আমি ঘোচাব না ভাই
সমস্ত প্রশ্নের জবাব আমি দেব না,
তা হলে প্রেম হবে ব্যর্থ
পরিচয়ের রূঢ় সম্পূর্ণতায় যাত্রা হবে শেষ।
শুধু এইটুকু জানো ভাই:
তোমার আনন্দ মরে না রোগে ঢাকে না ভোগে
তোমার আনন্দ ধরে না এই
ফুল-গাছ মাটি মানুষের হৃদয়ে
নাম-না-জানা পাখির গানে খোঁজ-না-রাখা ঘাসের শিষে।
আরো তুমি শোনো: তোমার যেখানে কাঁটা
সেখানে সুখ গভীর হল,
সেখানটা টিপেই তোমার আনন্দ
যেখানে ব্যথা তোমার সেখানেই মধুচক্র মুখর হল
মন-মধুপের গুঞ্জরণে।

বন্ধু বলে চললেন, এই অমৃত আস্বাদনের
কত-না উপায় তুমি খুঁজেছ
নিত্য-নতুন করে গড়েছ পেয়ালা নানান্ রঙের
নাম দিয়েছ ধর্ম নাম দিয়েছ সমাজ
আদর করেছ সভ্যতা বলে
তবু তারা ক্ষণভঙ্গুর, তারা আসে যায়, তারা নিত্য নবীন
শাশ্বত সেই আনন্দ—শাশ্বত তোমার প্রাণ।

বন্ধু শেষে বললেন, এইটুকু জানো ভাই
আর বেশী জেনো না
বিশ্বাস কর আমাকে
তার চেয়ে বড় কথা তুমি তোমাতে বিশ্বাস রাখো।

দু'জনে নীরব হলাম। আমার হাত রইল তাঁর হাতে
আমরা দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলেছি
এখন মনে হচ্ছে এটা বুঝি রাত ছিল,
ঐ ভোর হয়ে আসে
একটি-দু'টি পাখি ডাকে।

চাইলাম আকাশের দিকে যে আকাশ জন্ম দিচ্ছে
আরো একটি সকাল
যেন শুনতে পেলাম
যে প্রাণ-মরুতে দেখল মরীচিকা
যে প্রাণ পেল না আশীর্ব্বাদ
সে প্রাণ ভুলে গেছে
তাকে আশীর্ব্বাদ করার স্পর্দ্ধা রাখে কে
সে যে লক্ষ তারাকে চমকে দিতে পারে
তাই তোমরা যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর
তারা মহান
যারা বিশ্বাস কর না, তারা আরো মহান।

অন্তহীন

রণেশ মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর তরুণ কবি ছাত্র প্রবীর দত্ত। বয়স তার বড় জোর একুশ কি বাইশ, কিন্তু কবি হিসাবে তার মনের বনে অনুরাগের রঙ ধরেছে পাতায় পাতায়। তলোয়ারের মত নাকটা, আবেশ-মাখা দু'টি চোখ, ব্রিলিয়ান্টাইন মাখানো লালচে চুলগুলো অযত্নভরে পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া। খুব স্বাস্থ্যবান সে নয়, তবু চাবুকের মত তার দেহটা যেন মেয়েদের মত একটা ছন্দোময় গীতি-কবিতা। এক কথায়, তাকে দেখলেই মনে হয় কবি সে। ছাত্র হিসাবে তার সম্বন্ধে বেশ গর্ব্ব করেই বলা যায় সে ভাল ছেলে। মেয়েরা তাকে পায় সরস আলোচনার খোরাক হিসাবে, অথচ মেয়েদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন সে। কলেজীয় মেয়ে-বন্ধুরা তাকে চায় নিজেদের ভেতরে, কিন্তু চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে থেকে যায় স্পষ্টই একটা সম্ভ্রমভরা ব্যবধান।

সেদিন ছিল কবিগুরুর জন্মবার্ষিকী। সকলে মিলে ধরলে প্রবীরকে একটা কবি-বন্দনা লিখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে। প্রবীর তার কাব্যভাণ্ডার মন্থন করে লিখলো কবি-বন্দনা। সভা-মঞ্চে সেটা পাঠ করবার ভার পড়লো বন্দনা বলে একটি মেয়ের ওপর। সম্প্রতি ভর্ত্তি হয়েছে মেয়েটি। তার সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব মিশে গিয়ে সত্যিই সম্মানের আসন পেয়েছিলো সে বন্ধুদের মধ্যে।

তাকে এক-দেখাতেই বোঝা যায়, যেন অনুরাগী শিল্পদৃষ্টির পূর্ণ পরিচয় জড়িয়ে রয়েছে তার দেহের প্রতি ভঙ্গিমায়—প্রতি ছন্দে। ভাল লাগে মেয়েটিকে দেখতে, কিন্তু ভালবাসবার কল্পনা করবার দুঃসাহস জাগে না কারো মনে। সে যেন চির সৌন্দর্য্যের প্রতীক, আর কলেজ-ছাত্ররা তারই সৌন্দর্য্য-মন্দিরে নিষ্ঠ পূজারী, প্রেমের ভিখারী হবার কামনা ফুল হয়ে ওঠে তার পূজার নৈবেদ্যে। তাই সে অপরূপ।

পড়তে পড়তে বন্দনার গলা কেঁপে-কেঁপে উঠছিলো, সারা দেহে যেন একটা শিহরণের প্রলেপ! "কি মিষ্টি আপনার লেখা, আর কি সুন্দর!" অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় চোখ দু'টো বড় বড় করে বন্দনা বলে প্রবীরকে।

"আপনি কিন্তু বড় বেশী করে বলছেন, যতখানি সৌন্দর্য্য আরোপ করছেন ওর ওপর, অতটা ওর প্রাপ্য কি না সেটা বিচার করবার আছে।" অনুরাগে দুলে ওঠে প্রবীরের দেহ।

"বা রে, আপনার লেখা কি খারাপ হতে পারে?" বন্দনার কণ্ঠে বিস্ময়ের ছোঁয়াচ।

"আপনার অসীম করুণা।" প্রায় মুখস্থের মত বলে যায় প্রবীর। জমে ওঠবার আগেই চন্দন সেন প্রবীরকে টেনে নিয়ে যায় ভেতর। প্রবীরের কবি-কুললজ্জা সত্যিই আজ তাদের বুকে

করেছে, তাই তারা চায় প্রবীরকে নিয়ে একটু মাতামাতি করতে। বসন্তের জ্যোৎস্না উজ্জ্বল, হেমন্তের জ্যোৎস্না সংহত। চন্দনরা বসন্তের জ্যোৎস্না—বন্দনা হেমন্তের।

পরের দিন ট্রামে করে কলেজে চলেছে প্রবীর। মন তার স্বভাবসিদ্ধ উদাস,—ক্লান্ত।

"নমস্কার প্রবীর বাবু!"—পিছনে তাকিয়ে প্রবীর দেখে বন্দনা। "আসুন না এই দিকে, বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।"—বন্দনার সুরে মিনতি ভরে ওঠে কানায় কানায়। প্রবীর নিঃশব্দে গিয়ে বসে বন্দনার পাশে। বন্দনা বলে চলে,—"সেদিন ভাল করে আলাপই হলো না আপনার সঙ্গে। আপনার বন্ধুরা বুঝি খুব ভালবাসে আপনাকে?"

প্রবীর বলে, "বন্ধুরা সাধারণতঃ বন্ধুকে ভালই বেসে থাকে। আর আলাপের কথা বলছেন সে তো হয়েই গেল।"

বন্দনা বলে,—"বার বার আপনাকে আর প্রবীর বাবু বলতে পারি না—'প্রবীরদা বলেই ডাকব? আপত্তি নেই তো?'

"স্বচ্ছন্দে এবং আনন্দের সঙ্গেই উত্তর দেব।" প্রবীর হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে।

বন্দনা খুসিভরে পা দোলাতে থাকে। কলেজে দু'জনে পাশাপাশি বসে বন্ধুদের বাঁকা চোখ উপেক্ষা করেই বন্দনা চায় প্রবীরকে নিকটে, প্রবীর চায় এড়িয়ে যেতে। আরম্ভতে না কি এমনিই হয়, তবে উল্টোই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে।

বিকেল বেলা প্রবীর প্রত্যহই যায় বেড়াতে। আজও তার প্রিয় কবিতার খাতাখানা নিয়ে লেকের ধারে গিয়ে বসে নরম ঘাসের ওপর। তার পর নিজের কবিতাই আবৃত্তি করে চলে মৃদু স্বরে বাতাসের কানে কানে। দিন কয়েক বন্দনা কলেজে আসেনি,—প্রবীরেরও তাই মনটা বড় ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে আজ। দূরে দূরে কয়েকটি তরুণ-তরুণী পায়চারী করছিলো, এবং সুযোগ বুঝে আড়াল খুঁজে সবার চোখ এড়াবারও চেষ্টার ছিল না শেষ। প্রবীর একা, এক মনে পড়ে যাচ্ছিলো,—

"প্রেমময়ী ধরণীর বুকে—
প্রেমহীন একান্ত নিভৃতে……।"

"প্রেমহীন বেদনার কাঠামোকেই তো প্রেমহীন রহস্যঘন রূপ দেওয়া যেতে পারে প্রবীরদা!"

বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে যায় প্রবীর। চকিতে ফিরে দেখলে,—"ওঃ, বন্দনা দেবী!" প্রবীর খাতাখানা বুজিয়ে রাখে।

কলহাস্যে ভেঙ্গে পড়ে বন্দনা বসলো প্রবীরের পাশে। "ওটা কি

ানার মনের কথা প্রবীরদা ? অনেকে তো খেয়ে আবার খাইনি নিজের ঢাক নিজেই পিটিয়ে বেড়ায় !"

বড় বড় চোখ ছ'টো তুলে তাকালো প্রবীর। মুখে একটা কঠিন ার এসে গিয়েছিলো, সেটাকে চেপে রেখে হেসে বললে, "দেখুন বন্দনা ঁ, ভালবাসা জিনিষটার সাধারণ লোকে করে অপব্যবহার, আর া করে খেলার উপকরণ হিসাবে প্রয়োজন মত ব্যবহার। আমি লবাসা বস্তুটিকে অতটা ছোট করে দেখতে চাই না, তাই হয়তো,— শ্রমহীন একান্ত নিভৃত'—তাছাড়া ঘুমন্ত ফুলটিকে জাগিয়ে তুলতে ান মৌমাছিই তো চেষ্টা করেনি এখনও।"

"ক্ষমা কর প্রবীরদা, তোমাকে আঘাত করেছি বলে। তবে রীর ভালবাসাকে অত ছোট করে দেখবার অধিকার তোমার নেই। ানিভেদ কোরো, তাতে তৃপ্তি পাবে। তুমি যদি জানতে······ ামার কাছে আমার শুধু এতটুকু চাইবার আছে,—আমাকে তোমার াগ্য করে নাও, তোমার নিভৃত কুঞ্জের কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণা ব তোমাকে, তুমি অধিকার দাও।" অনুরাগে ফুলে ফুলে ওঠে ন্দনা, হেসে পড়ে প্রায় প্রবীরের ওপর। "জানো প্রবীরদা, জীবনে ই প্রথম, যাকে আমি প্রাণভরে ভালবেসেছি, বল কবি, সরিয়ে েবে না আমাকে !" বন্দনা মুখ ঢেকে ফেলে।

প্রবীর বাক্যহীন, সে ভাবে, এ কি আবেগ এই নারীর ! ় রকম ভাবে কেন চায় এ নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে ! ক মূল্য পেতে চায় তার বদলে ? তার ভালবাসা ? কিন্তু এতই ূল্যবান সে জিনিষ ? সে তো যাচাই করেনি কোন দিন ? াত্র কয়েক দিনের পরিচয়, এরই মধ্যে পরিপূর্ণ করে ভালবাসা ায় না কি কাউকে ? নারীর ভালবাসা তো এত সহজে পাওয়া ায় না শুনেছে। কত গল্পেই তো তার প্রমাণ পাওয়া যায় ! ছ'একটা অবশ্য এই রকম ঘটনার উল্লেখ আছে,—তারা তো ভাগ্যবান ! সে-ও কি তবে তাই ? নারী তো পুরুষকে করে অবিশ্বাস ? তবে ?······সব গোলমাল হয়ে যায় প্রবীরের। বন্দনার পিঠে হাত রেখে বলে, "দেখো বন্দনা, ভালবাসা পাওয়া খুব সহজ, কিন্তু ভালবাসতে পারাটাই কঠিন। পারবে সেটা ?"

বন্দনা ককিয়ে ওঠে, "উঃ কবি, এখনও অবিশ্বাস ! নিজেকে তো শূন্য করেই দিয়েছি তোমায়, এখনও সন্দেহের কালো মেঘ ঘনিয়ে রয়েছে তোমার মনে ?"

প্রবীর বলে চলে, "সন্দেহে নয় বন্দনা, ভুল বুঝো না আমাকে তুমি। বর্তমানে একটা ভুল যদি হয়, ভবিষ্যতে সারা জীবন সেই ভুলের ফসল কাটতে হবে ! সত্যিকারের ভালবাসা যখন গড়ে ওঠে নারী এবং পুরুষের মধ্যে, তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার পরিণাম হয় ব্যর্থতা। বন্দনা, তুমি হয়তো ভাবছো, কি নিষ্ঠুর এই পুরুষ, আর এমন অরসিক যে, পুরুষ হয়েও ভালবাসার বন্যায় বাঁধ দেয় ! সত্যি বন্দনা, ভাল আমি বাসতে জানি, কিন্তু কোনও নারীকে আজও ভালবাসবার সাহস হয়নি, সেটা হয়তো আমার অপরাধ—আমার কবিত্বের কলঙ্ক !"

বন্দনা ভাবে, কি কঠিন এই কবির ভেতরটা ! বলে, "তবে চলি কবি, ভুলে যেও, ক্ষমা কোরো।"

"তা হয় না বন্দনা, আজ তুমি আমাকে যা দিলে, তাই আমার পাথেয়, ভবিষ্যতের পথচারী দেখবে শুধু তোমাকে আর আমাকে, তুমি আমার, স্বেচ্ছার উপহারকে হৃদয় ভরে উপলব্ধি করবার সাহস তুমি আমাকে দাও।" যেন নেশা লেগেছে প্রবীরের।

বন্দনা প্রবীরের হাতখানা নিজের হাতের ভেতর নিয়ে বসে থাকে, বোধ হয় উপলব্ধি করে।

এই ভাবে এগিয়ে চলে প্রবীর এবং বন্দনার স্বপ্নমধুর দিনগুলি। প্রবীর আজকাল প্রায়ই যায় বন্দনাদের বাড়ী। কত কথা ছ'জনে। বন্দনা বলে, "কি সুন্দর তুমি কবি !"

প্রবীর বন্দনার দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে, হঠাৎ গুনগুনিয়ে ওঠে, "যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।"

বন্দনা বলে, "এই পৃথিবীতে একটা জায়গা আছে, যার অমৃত-নির্ঝরের কোলে এলে সব ব্যথা ভুলে যাই।"

প্রবীর বোঝে, তবু না বোঝবার ছল করে বলে, "কোথায় বন্দনা ?"

বন্দনা হেসে ওঠে, "দুষ্টু কবি, কিছু বোঝ না।" বলে প্রবীরের বুকের কাছে এগিয়ে পড়ে আস্তে আস্তে বলে, "এইখানে।" প্রবীরের চোখ বুজে আসে। বন্দনা বলে, "তবু তো ভিক্ষা করে চেয়ে নিয়েছি কিন্তু কি আনন্দ কবি !" প্রবীর সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

* * * *

আজ শরীরটা ভাল নেই প্রবীরের, তাই সে কোথাও বার হয়নি। জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল, কোলের ওপর 'সঞ্চয়িতা'খানা খোলা। পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখে বন্দনার দাদা ! সসম্ভ্রমে উঠে চেয়ার এগিয়ে দেয় প্রবীর।

বন্দনার দাদা বসে পড়ে বললেন, "হ্যালো কবি, তোমার শরীরটা একটু খারাপ মনে হচ্ছে ?" প্রবীর ঘাড় নাড়ে। উনি বলে চলেন, "আগামী বুধবারে বন্দনার বিয়ে, সব ঠিক হয়ে গেছে, তোমাকে তাই বলতে এলুম। এই নাও ইনভিটেশন কার্ডখানা। দেখো, তোমাকে আবার এসে পাকড়াও করে নিয়ে যেতে হবে না তো ? এ ক'দিন ভাল থেকো, শরীর ঠিক হয়ে যাবে। তোমার বন্ধু, তুমিই তো করবে সব ! আচ্ছা, আমি তাহলে এখন, চিয়ারো মাই ওলড পোয়েট।" অকস্মাৎ উঠে চলে যান বন্দনার দাদা।

উঃ, মাথার যন্ত্রণাটা বাড়ছে বড় ! রগ ছ'টো টিপে ধরে প্রবীর, —শিরাগুলো যেন চামড়ার খাপ ফেটে বেরোতে চায় ! কি নিষ্ঠুর সত্য আজ তার ভাগ্যে ফলতে চলেছে ! চিঠির সোনালী অক্ষরগুলো যেন বাঁধানো দাঁতের ঝিলিক্-মারা হাসি। প্রবীর আর ভাবতে পারে না, শুয়ে পড়ে মাথাটা জোর করে টিপে ধরে, হাতড়ে ফেরে নিজেকে ডুবে যাবার পূর্বক্ষণে।

বন্দনার বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের পর প্রবীর আজ এই প্রথম গেল বন্দনাদের বাড়ী। বন্দনা কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করে প্রবীরের—স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় তার। এক সময়ে বন্দনা প্রবীরকে ডেকে নিয়ে যায় তার ঘরে। নিভৃতে পেয়ে প্রবীর বলে, "ভুলতে চেষ্টা কোরছ বন্দনা ?"

জলভরা চোখ ছ'টো তুলে ধরে বন্দনা বলে, "আমি মানুষ তো, পাথর নই তো কবি !"

প্রবীর আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে, বলে, "কিন্তু তুমি বিয়ে করলে কেন বন্দনা ? তোমার বিনা অনুমতিতে তো তোমার

বিয়ে হতে পারতো না। আর বিয়েই যদি করবে, আমাকে তবে ভালবাসলে কেন? জেনে-শুনে আমাকেই তোমার খেলার উপকরণ করলে?"

বন্দনা বলে, "সত্যি কবি, অনুমতি যে কি করে দিয়েছি, তা যদি জানতে! বাবার মৃত্যুকালের অনুরোধ এবং দাদার জিদ্,—শাস্ত্র আর সমাজ মতে বিয়ে করা। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে তো সমাজ এবং শাস্ত্র মানবে না!"

"তা বলে সমাজ-শাস্ত্রের কাছে ভালবাসার হবে পরাজয়?"

বন্দনা ধীরে বলে,—"বাবার অনুরোধ! ভালবাসার জয় ঘোষণা করবে আমার হৃদয়। যে ভুল করেছি কবি, জীবন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, মরণই আমার এখন একমাত্র কাম্য।" ফুকরে ওঠে বন্দনা।

প্রবীর বলে, "তোমার স্বামীকে ভালবাসতে পারনি বন্দনা?"

জবাব আসে, "স্নেহ, মমতা সব কিছুই দিয়েছি উজাড় করে, কিন্তু…"

"এর মধ্যে 'কিন্তু' নেই বন্দনা, নিষ্ঠুর সত্যকেই আজ স্বীকার করে নিতে হবে। পথের পরিচয়কে শেষ করে দাও বন্দনা—আশ্রয় কর দূর-পথের যাত্রীকে,—এই জীবনের পথচারী যাত্রীকে—তোমার স্বামীকে। চলি আমি।"

বন্দনা প্রবীরের হাত দু'টো চেপে ধরে বলে,—"আমাকে ভুল না কবি, আমার বলবার কিছুই নেই।"

* * * *

বোম্বাইয়ের একটা সুন্দর ছোট্ট বাড়ী। তারই একটা ঘরে পীড়িত প্রবীর। প্রবীরের ক'দিন ধরে ভীষণ জ্বর, চন্দন সেবা করছে প্রবীরের, প্রাণ দিয়ে। ডাক্তার বলেছে, আজকের দিনটা ভালয় ভালয় কেটে গেলে তবে জীবনের আশা করা যেতে পারে।

জ্বরের ঘোরে বেসুরে প্রবীর গেয়ে ওঠে,—"বাঁধিনু মিছে ঘর, ভুলের বালুচরে।" এক-এক সময় আরক্ত চোখ মেলে বলে ওঠে, "কে, বন্দনা? সরে যাও, সরে যাও, আমার নিশ্বাস বিষিয়ে গেছে, বাঁচতে চাও তো পালাও।"

বন্দনাকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছে চন্দন। আজই হয়তো এসে পড়তে পারে।

প্রবীর বলে চলে, "ওঃ, কে চন্দন? ভাই, আমার জীবনে এক দিন বসন্ত এসেছিলো, কিন্তু কই? কোথায় গেল? সব মরুভূমি, সব—সব! গাছের পাতা ঝরে গেছে, আমি বোধ হয় বাঁচবো না আর। চন্দন, তোর কাছে আমার একটা অনুরোধ ভাই, আমি মরে গেলে—কে? বন্দনা? উঃ, কি অন্ধকার!"

চন্দন নীরবে আইস্-ব্যাগটা চেপে ধরে—টপ-টপ্ করে ঝরে পড়ে তার কয়েক ফোঁটা চোখের জল।

প্রবীর হঠাৎ খুব শান্ত হয়ে যায়, চন্দনকে বলে, "চন্দন, ভাই, বন্দনার সঙ্গে যদি তোর দেখা হয় তো তাকে বলিস্, 'কবি তোমাকে ভোলেনি, আর বলিস্, যাকে পেয়েছে, তাকেই যেন ভালবাসে, এইটা কবির শেষ অনুরোধ।' আমি জানি, বন্দনা আমার অনুরোধ—আদেশ বলে মানবে।"—হঠাৎ ছটফট করে ওঠে প্রবীর, তার পর চিরশান্ত হয়ে যায়।

চন্দন ছেলে-মানুষের মত প্রবীরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে।

দূরে একটা ট্রেণের বাঁশী বেজে ওঠে। বন্দনা হয়তো আসছে ঐ গাড়ীতে—তার কবি প্রেমিককে দেখতে।…

★

আমি

শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

নর্ত্তনশীলা প্রকৃতির প্রতিনিয়তই ছন্দের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে—কখন শান্তির ধারা প্রবাহমানা, কখনও তাণ্ডব নৃত্যের বিভীষিকা! উভয় অবস্থাই চিত্তের অবস্থানুযায়ী দৃশ্যমান হয়। এই নিত্য পরিবর্ত্তনের মূল একমাত্র চিত্ত, বাহিরে নহে। জড় জগতের বিচিত্র মূর্ত্তি প্রকৃতপক্ষে চিত্তই সৃষ্টি করে। চৈতন্যশীল না থাকিলে কোন জড় বস্তুই অন্যকে আকর্ষণ করে না। চৈতন্য কিন্তু ভাবাতীত ও সাক্ষী মাত্র।

চৈতন্যের পরিবর্ত্তন নাই এবং জড় জগতের পরিবর্ত্তন যদি চৈতন্যের ছায়াপাত ভিন্ন না সম্ভব হয়, তবে এ পরিবর্ত্তন কাহার? চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, কল্পনাচ্ছন্ন চিত্তের পরিবর্ত্তনের ফলে স্থাবর, জঙ্গম বা প্রকৃতির সর্ব্ব বস্তুই কল্পনানুযায়ী মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে। সকল পরিবর্ত্তনের আধার চিত্তই—না চৈতন্যের, না জড় জগতের?

জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারের পার্থক্যে বিভিন্ন মানব এবং জাতি স্ব-স্ব সংস্কারানুযায়ী সংসার ও জাতীয় জীবন গঠন করে। দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এবং পার্থিব উন্নতির জন্য আমরা সদাই আগ্রহান্বিত। কেহ কেহ সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া তাহার ঝঞ্ঝাবাত হইতে দূরে থাকিতে চায়। আদর্শের পার্থক্য থাকিলেও সকল কর্ম্মশীলতার পশ্চাতে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি প্রধান উদ্দেশ্যরূপে অবস্থান করে। বুদ্ধিশক্তির চালনায় নানাবিধ আবিষ্কার, সাংসারিক স্বাচ্ছন্দের এত উপকরণ সত্ত্বেও সুখ সুদূর-পরাহত হয় কেন? ঐশ্বর্য্যসম্ভার যুদ্ধোপকরণ বা পার্থিব—সকল প্রকার বস্তুর সমাবেশ সত্ত্বেও কোন বস্তুই সুখের স্থায়িত্ব সাধন করে না। কত চেষ্টায় গঠিত সংসার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া লোকের শান্তিবিধানের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলের কালিমা সকলের মনকে সন্ত্রস্ত করিয়া ফেলে। অবস্থার এত বৈচিত্র্যের কারণ নির্দ্ধারণ করিবার যত্ন যুগে যুগেই হইয়াছে।

সংস্কারের উপরে এক অব্যক্ত শক্তির লীলা-খেলা চলিতেছে। এক চিৎশক্তিই প্রাকৃতিক সর্বকর্ম্মশীলতার পশ্চাতে বর্ত্তমান, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ইহা বুঝিয়াছেন এবং জগতের মঙ্গলের জন্য সেই সত্য উপলব্ধির উপদেশ দিয়াছেন।

সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের তাড়নায় ভীত হয় না, এইরূপ জীব দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অশান্তির হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য জীবমাত্রেই ব্যস্ত। কিন্তু সেই অশান্তি দূর করিবার চেষ্টা, সংস্কারের পার্থক্যে নানাবিধ হইলেও, শান্তি পাওয়া যায় না। তাহার কারণ আদর্শের ও কর্ম্মের পার্থক্য। সাধনাও সংস্কারানুযায়ী। পথ থাকিলেও প্রকৃত শান্তির পথের পথিক অনেকেই হইতে পারে না।

আর্ত্ত সন্তান যখন জননীর ক্রোড়ে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে, জননী তখনই সন্তানকে ক্রোড়ে লইবার জন্য ধাবিতা হন, নচেৎ নহে। যাহা অশান্তির মূল তাহা হৃদয়ঙ্গম করতঃ আন্তরিকতার সহিত কায়-মনোবাক্যে শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণপরায়ণা সেই জগজ্জননীর

নসিক গতি চালিত করিলেই জগন্মাতা তাঁহার আর্ত্ত সন্তানকে হার ক্রোড়ে তুলিয়া লন। অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া সাধারণ মানব ই শক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না। ফলে, মঙ্গলময়ীর ‍িপাত কদাচিৎ ঘটে। নিজেই দূরে আসিয়া পড়িতেছি। সংসারের নিত্যতা প্রতিদিন উপলব্ধি করিলেও ইহা যে চৈতন্যের লীলাক্ষেত্র ই সত্য জ্ঞানগোচর হয় না।

স্থাবর-জঙ্গম-সর্ব্ব স্থানে একই চৈতন্য সত্তা নিজ পরিচয় দিতেছে। মামি" বা "আমার" এই মিথ্যা জ্ঞানের প্রাবল্যে এই সত্য চিন্তার বকাশই চিত্তে থাকে না। সর্ব্ব কর্ম্মের পশ্চাতে "আমি" এত প ভাবে পরিচয় দেয় যে, চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে চিন্তাধারা সেই মামিত্বের" গণ্ডীর বাহিরে যাইবার শক্তি হারাইয়াছে, সংস্কারের াচিত্র্যে, সংসারের পেষণে জর্জ্জরিত হইলেও সংসারের আধারভূতা ক্তির অস্তিত্বের কথা মুখে বলি মাত্র, কার্য্যতঃ সংসারের উদ্বেলিত রঙ্গে উঠা ও নামা ভিন্ন অধিকাংশ জীবনেই অন্য কিছু ঘটে না। ধারণ জীব সংসারের ভারে নিষ্পেষিত হইলেও, পূর্ব্ব সংস্কারের াবল্যে প্রকৃতপক্ষে সেই নিষ্পেষণই চায়, ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহার হাত ইতে পরিত্রাণের চেষ্টা করে না। কণ্টক চর্ব্বণে ওষ্ঠ রক্তাক্ত হইলেও ষ্ট্র যেমন কণ্টক চর্ব্বণে ব্যগ্র, জীবও তেমনই অমঙ্গলদায়ক সংস্কারের াত হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা করে না। নিজ সংস্কারানুযায়ী কার্য্য রিতেই হইবে, কিন্তু তাহা যে দুঃখদায়ক এ জ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও দুঃখ-াচনের চেষ্টা বিরল। সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেই, গৈরিক সন ধারণেই বা ধর্ম্মধ্বজী হইলেই সেই সুখতারার দৃষ্টিলাভ ঘটে না।

যত অশান্তির স্থান মনে, বাহিরে নহে। প্রকৃত শত্রু অন্তরে, াহিরে নহে; ভগবৎ কৃপায় এই জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সৎগ্রন্থ পাঠ ঃ সাধু-সংসর্গের প্রয়োজন। এই সত্য হৃদয়ঙ্গম হইলেই, শত্রু কোথায় ানিতে পারিলেই, বিধাতার মঙ্গলময় স্পর্শ অনুভূতি হইতে আরম্ভ য়, তাঁহার সিংহদ্বারের অর্গল্ যথাসময়ে খুলিয়া যায়। তখন ংস্কারের সকল অশান্তি দূরীভূত হইতে আরম্ভ হয়, হৃদয়ে বলাধান টে, নতুন দৃষ্টি আসিয়া পড়ে, ও সর্ব্বস্থানে যে এক সচ্চিদানন্দময়ের ারিচয় ঘটিতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়; এবং অসূয়া, হিংসা-দ্বেষাদি দয়কে আর কলুষিত করে না—অন্ততঃ তাহার মাত্রা কমিতে থাকে। ারণ তখন "আমি" ও "আমার" জ্ঞান কমিতে থাকে।

সেই উপলব্ধির প্রতিবন্ধক কি? সেই শত্রুর মূর্ত্তি কিরূপ? ক জীবের এই সর্ব্বনাশ সাধন করিল?

মানব স্ব স্ব কল্পনানুযায়ী জীবনাতিপাত করে। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে ধনী-নির্ধন, সাধু-পাপী সকলেই সময়ে সময়ে নিজের বোঝা ামাইতে চায়। সংসারের সুখ তাহার আকাঙ্ক্ষিত শান্তির মাত্রা পূর্ণ করিতে পারে না—আশা-পূরণের পূর্ব্বেই সংসার-লীলা শেষ হইয়া পড়ে, ও পুঞ্জীভূত বাসনার ভারে অবসন্ন মন লইয়া দেহ ছাড়িয়া চলিয়া াইতে হয়। প্রশ্ন উঠে, জীবমাত্রের অনন্ত সুখের আশা কি কাল্পনিক? অনন্ত কাল হইতে শান্তিপ্রাপ্তির ইচ্ছা কোথা হইতে আসিল? বর্ত্তমান কাল্পনিক বন্ধনে বদ্ধ সঙ্কীর্ণ মন এত সুখের আশা পোষণ করে কেন?

চিত্তের সীমাহীন বাসনা তাহার অসীম প্রসবিতার পরিচয় দিতেছে। চিত্ত তাহার আধার সচ্চিদানন্দের নির্দ্দেশক মাত্র। চিত্তই এই বর্ত্তমান কাল্পনিক "আমিত্বের" স্রষ্টা। চিত্ত বা মনের [illegible]

পৃথক্। সেই প্রকৃত "আমিত্বের" কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই—অহঙ্কার তথায় স্থান পায় না। অহঙ্কার-বিমূঢ় চিত্তই আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। জ্ঞান এরূপ ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া আছে যে তাহার স্রষ্টার চিন্তা লুপ্তপ্রায়। তাহার কল্পিত রূপ লইয়া এত ব্যস্ত, তাহাকে এত সত্য বলিয়া বুঝে যে, তাহার অকল্পিত মূর্ত্তি তাহার বর্ত্তমান জ্ঞানের অতীত।

সকল সময়ে কল্পিত রূপের খুঁটি ধরিয়াই সর্ব্বকর্ম্ম করিতেছি, সেই কারণেই এত কর্ত্তৃত্বাভিমান। সেই অভিমানজাত সর্ব্ব ক্রিয়াই সংসারের সর্ব্ব দুঃখের কারণ। এই "আমিত্বের" স্থিরতা কিছুই নাই, কারণ তাহার ভিত্তি কল্পনা মাত্র। প্রতি মুহূর্ত্তেই এই 'আমির' পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তথাপিও সেই "আমি"কেই অপরিবর্ত্তনীয় মনে করি। এই মনে করা, বর্ত্তমান কল্পনা-জাত মানসিক অবস্থার বা গরজের অবশ্যম্ভাবী ফল।

সর্ব্ব বাসনার সৃষ্টি "দৈহিক সুখে"। প্রকৃত পক্ষে মনকেও "আমি" মনে করি না। আমার "আমি" দেহ। বর্ত্তমান ভ্রান্তজ্ঞানে অপরের "আমি"ও তাহার দেহের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত। যত কিছু স্নেহ, মমতা, প্রেম ইত্যাদি বর্ত্তমান জ্ঞানে ওই দৈহিক আকর্ষণ। দেহ আসে যায়, দেহ লইয়া জীব উৎফুল্ল হয়, তাহার পতনে কাঁদে। অথচ এই আসা-যাওয়ার গতির উপর কোন জীবেরই আধিপত্য নাই; সেই চিন্তা চিত্তে উদীয়মান হইলেই মানব স্থির হইয়া দাঁড়ায়। সেই দিকে মন আকৃষ্ট হইলেই বুঝিতে পারে যে, এই ভাঙ্গা-গড়ার কর্ত্তা সে নহে, তাহা এক অব্যক্ত শক্তির ক্রিয়া-মাত্র। দেহের এই আকর্ষণ জীবের চিত্তকে সম্মোহিত করিয়াছে, এই বুঝিয়াই বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে শুনাইয়াছিলেন :—

"অয়ং তদ্দর্শনদ্বারে দেহো হি পরমার্গলঃ"

বর্ত্তমান জ্ঞানে দেহের কাল্পনিক মূর্ত্তি এবং উপরোক্ত কল্পিত "আমি"র কোন পার্থক্য নাই। সেই জন্য দেহই "আমি" হইয়া বসিয়া আছে। অস্থি-মাংস-সংঘাত এই দেহের প্রকৃত সত্তা কি, বিচার করিলে ক্রমে দেহের আকর্ষণ কমিতে থাকে এবং পরিণামে আর আকর্ষণ থাকে না। সকল দেহের মৃত্যুই যথাসময়ে জ্ঞানে ফুটিয়া ওঠে ও তৎপ্রতি মানসিক আকর্ষণ ঐ উপলব্ধির মাত্রার তারতম্যানুসারে সঙ্কুচিত হইতে থাকে। সেই মানসিক সংস্কারের ঘাঁটিগুলি একে একে আপনা হইতে উঠিয়া পড়ে, কিন্তু তাহাতে মনের লয় হয় না। মানসিক ধারা তখন অন্তর্মুখীন হইয়া উঠে—দেহাভ্যন্তরস্থিত চিৎ সত্তার কথা তখন মনে উদীয়মান হইতে থাকে। আনন্দময় চৈতন্য-সত্তাই তাহার সাধনাকে ফলোন্মুখী করিয়া দেন। তখন মনের রূপের বিচার আরম্ভ হয়, মন শান্তির প্রকৃত আস্বাদ পায়, ও বর্ত্তমান কাল্পনিক "আমিত্বের" প্রকৃত রূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হয়। নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল এই "আমিত্বের" বিচিত্র রূপ এবং তাহার অস্থিরত্ব উপলব্ধি করিতে করিতে তাহার কোনটিই যে "আমি" নয়, এই চিত্তই হৃদয়ঙ্গম করে। তাহার ভিত্তি যে কল্পনা, নিত্য-পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও জ্ঞান তাহাকে স্থির মনে করিয়া বর্ত্তমান কল্পনাজাত "আমিকে" আঁকড়াইয়া বসিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারে। কল্পনাকে কল্পনা বলিয়া বুঝিলে তাহার যেমন অস্তিত্ব থাকে না, সেইরূপ প্রবল কাল্পনিক "আমি"ও বলহীন হইয়া পড়ে। শুদ্ধ চিত্তাকাশে কল্পনারূপ মেঘ যে মাত্রায় ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, চির বর্ত্তমান চিদাদিত্যের জ্যোতিঃ তাহার চিত্তাকাশে সেই মাত্রায় উদ্ভাসিত হইতে থাকেন।

তখনই প্রকৃত শান্তির অবিচ্ছিন্ন ধারায় চিত্ত প্লাবিত হইতে থাকে। মানব যে শান্তিবিধানের জন্য লালায়িত, সেই প্রকৃত শান্তির আস্বাদ পাইয়া ক্ষণভঙ্গুর সুখের মোহে আর প্রতারিত হয় না।

সেই সুখের এ বাদ কে সাধিল? রাজায় রাজায় যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত দ্বেষাদি, পারিবারিক কলহ ইত্যাদি সকল অনিষ্টের মূল বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাদের কেন্দ্রস্থল ঐ "ভ্রান্ত আমি"। স্ব স্ব প্রাধান্য বিস্তারের ইচ্ছা বা কাল্পনিক আমিত্ব-জ্ঞানের প্রাবল্য সকল চিত্তেই তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অহঙ্কারের দর্প, আত্মাভিমান, আভিজাত্যের গরিমা, অভিলাষানুযায়ী বিষয় লাভের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি সকল প্রকার আস্ফালনই স্থূল-সূক্ষ্ম ভাবে ঐ 'আমিত্ব'। মানসিক ভাবের বা কল্পনার পরিবর্ত্তনের সহিত যে 'আমিত্বের' পরিবর্ত্তন প্রতি মুহূর্ত্তেই ঘটে, সেই 'আমিত্বেরই অবস্থানুসারে সকল মানবেরই কর্ম্মপ্রবৃত্তি, এবং সেই 'আমি' যখন যদ্ভাবাপন্ন, তদনুযায়ী প্রতি মানবেরই সংসার প্রতি সম্প্রদায়ের ব্যবহার ও প্রতি রাজ্যের কর্ম্মপ্রেরণা। কিন্তু সেই "আমি" প্রতিনিয়তই অতিশয় চঞ্চল; তাহার কারণ, তাহা অস্তিত্বহীন ও অসত্য হইলেও, কল্পনার প্রভাবে তাহাকে সত্য মনে করি। মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তনজাত কর্ম্মের ফল সংসারের সর্ব্ব অমঙ্গলের চালক হইলেও এই "আমি"র প্রেরণাতেই সর্ব্ব বিষয়ে ধাবিত হই। যুদ্ধের ফলে মহা বিক্রমশালী জাতির অধঃপতন, সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব; সংসারের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি, সকল অশান্তির মধ্যে সেই কাল্পনিক "আমিত্বই" নিজ পরিচয় দিতেছে। সকল অশান্তির মূলে ঐ "আমি" ক্রিয়াশীল। এক সম্প্রদায়ের অন্য সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য বিস্তারের বাসনায় বা সাম্প্রদায়িক "আমিত্বের" গর্ব্বে বর্ত্তমান ঘোর অশান্তির স্রোত বহিয়াছে। সাংসারিক যত কিছু অকল্যাণের মূলে এই "আমিত্বের" বা অভিমানের মূর্ত্তি বর্ত্তমান। এই পরিবর্ত্তনশীল "আমিত্বে" স্থিরবুদ্ধি রাখিয়া অমঙ্গলের উপর অমঙ্গল সৃষ্টি করি। এই অসৎ পুরুষকার মানবকে প্রতিনিয়তই ধ্বংসের পথে আকর্ষণ করে। যাহার মূল নাই, যাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক সেই জন্য নিত্যই চঞ্চল, তাহার প্রেরণায় সর্ব্বকর্ম্ম করিয়া থাকি বলিয়াই অশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া চলিতেছে।

শরীর মানসিক-বৃত্তির ক্রীড়নক মাত্র। মানসিক ভাব যেমন, ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াশীলতাও তদনুযায়ী আভ্যন্তরিক কর্ম্মপ্রেরণার অবর্ত্তমানে দেহের বা কোন ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াশীলতা থাকে না, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মানসিক অবস্থার দিকে বুদ্ধি চালনা করা কর্ত্তব্য। তাহার পরিণাম চিত্তশুদ্ধি। শুদ্ধ চিত্ত-মুকুরেই চিৎ সত্তার প্রতিবিম্বপাত হয়, অন্যত্র নহে। চৈতন্যশক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ বুদ্ধি চিত্তের বৃত্তিবিশেষ। "সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে" এই উক্তি এইজন্যই চণ্ডীতে উল্লিখিত। কিন্তু এই বুদ্ধি বর্ত্তমানে কল্পনাচ্ছন্ন।

যাহা সত্য তাহা কখনই কল্পিত হইতে পারে না। চিৎ সত্তার সহিত কল্পনার কোন সম্পর্ক নাই—তাহা অকল্পিত। অন্তঃকরণকে কল্পনামুক্ত বা ঐ কল্পিত "আমির" হাত হইতে মুক্ত করা উচিত।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বিষয় ঐ কাল্পনিক "আমি"। তাহার প্রকৃত রূপ যে কল্পনা—তাহা যে অসত্য, না বুঝিলে বা সেই কাল্পনিক "আমিত্বকে" সত্য বলিয়া বুঝিয়া কর্ম্ম করিলে, জ্ঞান তাহার ভ্রান্তি কখনই বুঝিবে না। তাহার ফলে, যে শান্তি পাইবার বাসনা প্রতি জীবের অন্তরেই বিরাজ করিতেছে, সেই শান্তি দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইবে। এই "আমিত্বের" তাড়নায় শান্তি কখনও আসিতে পারে না—এই সত্য হৃদয়ঙ্গম না হইলে, ওই ভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা না করিলে, সুখের আশা নাই; কেবল "আমিত্ব"জাত বাসনা ও অভিমানের বোঝা লইয়াই ইহধাম ত্যাগ করিতে হইবে। বর্ত্তমান মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া স্ব স্বরূপ চিনিবার চেষ্টা বা তাহা প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক কি, বিচার করিয়া না জানিলে জীবন অশান্তি ধারার মধ্যেই চলিবে, শান্তি কখনই মিলিবে না। এই "আমি" আস্ফালন করিতে করিতে আপনিই অবসন্ন হইয়া শান্ত হইবে।

"Men are in bondage becouse they have not realised the idea of 'I'."

মহাভারতে—"মম" এই দ্ব্যক্ষর শব্দকে 'মৃত্যু' বলিয়া বর্ণনা আছে:—

"মমেতি চ ভবেন্মৃত্যুর্ন মমেতি চ শাশ্বতম্।" গীতায় আছে—"নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ।"

এই মিথ্যা কাল্পনিক "আমি" এবং তজ্জাত আত্মাভিমানের মধ্যেই থাকিয়া বিচার করিলে, ভুলের উপর ভুলের বোঝা বাড়িবে।

সকল সাধনার উদ্দেশ্য শান্তি। শান্তি চির বিরাজমান। কেবল চিত্তের ভ্রান্ত অবস্থার নিরাকরণ বা শুদ্ধ চিত্ত পুনঃপ্রাপ্তিই প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্য সাধন ঐ "আমি" ভুল না বুঝিলে কখনই সম্ভব হইবে না, শান্তিও ফিরিবে না ও দেহান্তকাল পর্য্যন্ত "আমি" অপমানিত, "আমার দুঃখ" ইত্যাদি চিন্তায় জর্জ্জরিত হইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী ঐ সাধনায় অনেক দূরে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়াই আজ জগৎ তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

কারাগারমুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে হইলে কারাগারের দ্বার কোথায় সর্ব্বপ্রথম স্থির করা উচিত, নচেৎ সর্ব্ব স্থানে অর্গল খুলিবার চেষ্টায় কেবল দেহ ও মন ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়ে, কিন্তু কারাগারের বাইরে যাওয়া যায় না। জীবের এই ভীষণ অবস্থায় "আমি"র বর্ত্তমান রূপ বুঝাইবার জন্যই বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন:—

"যস্যেক্ষিতস্য নো সত্তা নাধারো ন চ কিঞ্চনঃ।
সোঽহমিত্যেব যো যাজ্ঞো ন জানে কুত উত্থিতঃ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন:—"আমি" মোলে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

এই সত্তাহীন কল্পিত "আমাকে" জানিবার প্রবৃত্তিই সেই 'আমির' বিনাশক, এবং সেই প্রবৃত্তিই পরিণামে শুদ্ধচিত্ত মুকুরে 'আমির' প্রকৃত স্বরূপের প্রতিবিম্বপাত করায় তাহার ফল পরম শান্তি লাভ বা মুক্তি।

এই সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিলে এবং "আমিত্বের" ও আত্মাভিমানের মোহে মুগ্ধ হইয়া কার্য্য করিলে শান্তির আশা নাই। সেই জন্য যত অনর্থের নাড়ী ঐ "কাল্পনিক আমিকে" চাপিয়া ধরিতে হইবে। তখন কারাগারের অর্গল আপনিই খুলিয়া যাইবে।

এই "আমিত্ব"-জ্ঞানের সহিত প্রতি জীবের শারীরিক ক্রিয়ার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকে। যেমন জ্ঞান, তদনুযায়ী শারীরিক পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। যেমন শারীরিক ক্রিয়া, তদনুযায়ী জ্ঞানের পরিবর্ত্তনও না হইয়া থাকিতে পারে না। জীব এই জন্য মানসিক ক্রিয়ার পুতুল। এই চিন্তা করিয়া নিজের প্রকৃত মঙ্গল সাধনার জন্য যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। এই সৎ পুরুষকারের ফল—জয় ও শান্তিলাভ, পরাজয় ও অশান্তি নহে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ললিত হাজরা

অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা বাংলার জাতীয় জাগরণে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ...রের নেতৃত্বে 'তত্ত্ববোধিনী' ব্রাহ্ম-সমাজের আন্দোলনের কথাই প্রচার ...ত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই যুগের বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক চিন্তা-নায়কগণ 'তত্ত্ববোধিনীর'র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ...্যাসাগর এবং ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক-...লীর অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ...লেন সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু এবং রামচন্দ্র ...াবাগীশ। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ভাব-...ায় উদ্বুদ্ধ হইয়া অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বাংলার ...ৃতি সম্পর্কে সন্দর্ভ রচনা করিতে লাগিলেন। রাজনারায়ণ বসু ...রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ ও বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়া যাহাতে ...লার জনসাধারণ প্রাচীন যুগের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন তজ্জন্য ...ণপাত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।—(Bipin Chandra Pal ·Memories of My Life&Time, vol. I. p. ...26-227).

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাংলা কাব্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘোর ...দ্রোহের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। "মেঘনাদ বধ" ...াব্য বাংলার শিক্ষিত সমাজে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে। ...ংলা-সাহিত্যের গতানুগতিক ভাবধারা পরিহার করিয়া তিনি ...াব্যে বিদ্রোহের সুর তুলিলেন। এমন কি, ভাষা ও ছন্দেও ...তনের প্রবর্ত্তন করিলেন। তদানীন্তন যুগের রক্ষণশীল সাহিত্যিকগণ ...াহাকে ইতর ভাষায় সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই। ...টিকেও তিনি গতানুগতিক প্রণালী নির্ম্মম ভাবে ছাঁটাই করিয়া ...উরোপীয় ধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটক তাঁহার ...র্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। বাংলা-সাহিত্যে "সনেট"এর প্রবর্ত্তন তিনিই ...রেন। মোটের উপর, মাইকেল মধুসূদন বাংলা-সাহিত্যে বিপ্লব ...ানয়ন করিয়াছিলেন। এক দিকে একঘেয়ে ধারার ছাঁটাই ...বং অন্য দিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের নূতন মূল্য বোধ তাঁহার কাব্যে ...ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের বাংলার জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করণে ...র্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান "নীলদর্পণ"। অত্যাচারী নীল সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ ঘোষণার চিত্রাঙ্কনে তিনি যে নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। অদ্যাবধি বাংলার তথা ভারতের কোন নাট্যকারই এই বিষয়ে দীনবন্ধু মিত্রকে পরাভূত করিতে পারেন নাই। ইতিপূর্ব্বে "নীলদর্পণ" নাটক সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং তাহারই পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

দীনবন্ধু মিত্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসের সাহায্যে বাংলার তরুণ সমাজকে কিরূপ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহাই আমরা আলোচনা করিব। "বন্দে মাতরম্"এর স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ঋণ বাংলা ত দূরের কথা সমগ্র ভারতবর্ষই কোন দিন পরিশোধ করিতে পারিবে না। ইউরোপীয় চিন্তাধারার সহিত সংযোগ ঘটাইয়া বাংলা-সাহিত্যে যে রেনেসাঁ দেখা দিল তাহার মূলে ছিলেন ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক প্রাবন্ধিক এবং সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র। এই রেনেসাঁর মুখপত্র হইল 'বঙ্গদর্শন'। "১৮৭৩-৭৪ সালের মধ্যে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত যোগ দিলেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইতে লাগিল। "ফরাসী এনসাইক্লো-পিডিষ্ট" অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় চিন্তাধারায় এবং ফরাসী সাহিত্যে যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল 'বঙ্গদর্শন' বাংলার সাহিত্য-জগতে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিল।" (Bipin Chandra Pal —Memories of My Life & Times, Vol I, p. 226) বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যালোচনা অনাবশ্যক। বাংলার সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অমর কীর্ত্তি হইল সংস্কৃত-ভারাক্রান্ত বাংলা ভাষা এবং টেকচাঁদ ঠাকুর অনুসৃত অশ্লীল চলতি ভাষার অবসান ঘটাইয়া সহজবোধ্য অথচ সুমার্জ্জিত ভাষার প্রবর্ত্তন। উপন্যাসের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করণে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের পথপ্রদর্শক। ১৮৮২ সালে "আনন্দমঠ" উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদ প্রচার করিলেন। জাতীয় সঙ্গীত "বন্দে মাতরম্" এই উপন্যাসেরই অন্তর্ভুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রই ভারতবাসীকে মাতৃপূজার মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। তিনিই প্রথম স্বদেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করিতে শিখাইলেন। আমাদের জাতীয় জাগরণে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতের স্থান যে কোন শ্রেষ্ঠ নেতার অপেক্ষা বহু ঊর্দ্ধে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্ত গরম-করা কবিতাগুলি বাংলার তরুণ সমাজে স্বদেশ-প্রেমের বন্যা আনিল। "হেমচন্দ্রের আবেগময়ী ভাষায় লিখিত কবিতাগুলি আমাদের তরুণ-মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ইতিপূর্ব্বে কোন কবির এই জাতীয় কবিতা আমাদের অন্তরে রেখাপাত করিতে পারে নাই। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী নূতন শাসনতন্ত্রে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আইন, চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতিতে নব্য-বাংলার সন্তানগণ বৃটিশ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী তরুণদের কথাবার্ত্তায় স্বাধীনতার এবং স্বীয় অধিকারের এক নূতন ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। ফলে দেশে বৃটিশ ও এদেশীয়দের মধ্যে জাতিগত দ্বন্দ্ব দেখা দিল। এই নূতন দ্বন্দ্ব, জাতিগত আত্মসম্মান এবং তীব্র স্বদেশপ্রেমের নূতন যুগে কবি হেমচন্দ্রের আবির্ভাব হয়।" (Bipin Chandra Pal —Memories of My Life & Times, vol I. p. 229)

পাশাপাশি কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম-সমাজ ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সামাজিক সাম্যের এক নূতন বাণী প্রচার করিবার ফলে নব্য-বাংলার শিশু জাতীয়তাবাদের উপর দেখা দিল এক প্রতিক্রিয়া। খৃষ্টান মিশনারীদের সহিত কেশবচন্দ্রের মতবিরোধের কাহিনী বাংলার জনসাধারণ আগ্রহ সহকারে সংবাদপত্রে পাঠ করিতে

লাগিল। অবশেষে তর্কে মিশনারীদের পরাজয়ের বার্ত্তা পাঠ করিয়া বাঙ্গালী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বাঙ্গালীর নিকট ইংরাজের পরাজয় জাতীয় চেতনায় আনিল এক নূতন বাণী। কেশবচন্দ্রের বিলাত ভ্রমণ এবং তথায় তাঁহার সাফল্য বাংলা দেশের জনসাধারণকে জানাইয়া দিল যে, শাসক ইংরাজের নিকট আমরা আর হীন নহি। আমরাও শ্রেষ্ঠ। ইংরাজদের তুলনায় আমরাও যে শ্রেষ্ঠ এই সত্য সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। সমগ্র বাংলা দেশে এক নূতন মানসিক এবং নৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি হইল।

১৮৭৪ সালে আনন্দমোহন বসু কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "র‍্যাংলার" হইয়া ফিরিয়া আসিলে বাংলা দেশে এক অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনা দেখা দিল। ইংরাজের দেশে ইংরাজ ছাত্রদিগকে পরাভূত করিয়া বাংলার ছেলের সাফল্য লাভ আমাদের জাতীয় গৌরবে এক নূতন চাঞ্চল্য আনিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাঙ্গালীর বুক গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবা মাত্রই আনন্দমোহন "কলিকাতা ছাত্রসঙ্ঘ" (Calcutta Student Association) নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ১৮৭৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ "সিভিল সার্ভিস"এ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার আবেদন-নিবেদন মামলা সব-কিছুই করিয়া অবশেষে ব্যর্থকাম হইয়া বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময়ে তিনি কি করিবেন মনস্থ করিতে পারিলেন না। অবশেষে মনস্থ করিলেন যে তিনি "স্বদেশের জন্য কিছু করিবেন।" (Surendranath Banerjee—"A Nation in Making" দ্রষ্টব্য)। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইতিমধ্যে সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া শিক্ষা বিস্তারকল্পে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন নামে (বর্ত্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে বেকার বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বেদনা অনুভব করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে নিজ কলেজের ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক পদে চাকুরী করিতে বলিলেন। সুরেন্দ্রনাথ পিতৃবন্ধুর আদেশ প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া চাকুরী লইলেন। কলিকাতার ছাত্র-সমাজের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ মিলিয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতি ক্ষেত্রে আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বুর্জ্জোয়া রাজনীতিতে ধর্ম্মের প্রভাব ছিল অপরিসীম। বিশেষ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের একাধিপত্যই রাজনীতির প্রধান অঙ্গ ছিল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষই যে ইহার একমাত্র কারণ তাহা আমরা কিছুতেই বলিতে পারি না। বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বলিয়া ভারতবর্ষে কোন কথাই ছিল না। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন যতই প্রবল হইতে থাকে, ততই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত করিয়াছে। ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিত ভারতবর্ষে "মুসলমান রাজত্ব" অধ্যায় একেবারে ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলন। মুসলমান বাদশাহগণ কখনই হিন্দুকে বাদ দিয়া শাসন-কার্য্য পরিচালনা করেন নাই। সামরিক বেসামরিক সব কিছুতেই যে হিন্দুগণ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহার অজস্র প্রমাণ ইতিহাসে আছে। যাহা হউক, আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, পাশ্চাত্যের শিক্ষা-দীক্ষা হিন্দুগণ যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন মুসলমানগণ তাহা গ্রহণ করা ত দূরের কথা, অত্যধিক আগ্রহ সহকারে তাহা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। মোল্লা, মৌলভীদের সঙ্কীর্ণতা, ইসলামের অপব্যাখ্যা, মুসলমান সমাজকে পাশ্চাত্যের সভ্যতা, শিক্ষা, বিজ্ঞান-বিরোধী করিয়া তুলিল। ফলে মুসলমান সমাজ এক অতি সঙ্কীর্ণ পরিবেশে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। হিন্দুগণ কিন্তু পাশ্চাত্যের সভ্যতা, সংস্কৃতির সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে অগ্রসর হইয়া গেল। বৃটিশ-শাসনের এক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতার মূলে রহিয়াছে ইসলামের সঙ্কীর্ণচেতা ভাষ্যকারদের সঙ্কীর্ণতম অপব্যাখ্যা। ব্যক্তিগত কারণে ইসলামের অপব্যাখ্যা যতই করা হইয়াছে ততই ভারতীয় বিশেষ করিয়া বাংলার মুসলমান সমাজের সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে।

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে রাজনারায়ণ বসু এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদের কেন্দ্র করিয়া হিন্দুদের মধ্যে জাতীয় জাগরণ দানা বাঁধিয়া উঠে। ১৮৬১ সালে তিনি মেদিনীপুরে "সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব দি ন্যাশন্যাল গ্লোরী" নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং "সোসাইটি ফর ষ্টিমুলেটিং ন্যাশন্যাল সেন্টিমেন্ট"র পক্ষ হইতে একটি ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন। হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা তাঁহার আন্দোলনের প্রকৃত মর্ম্ম বলিয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। রাজনারায়ণের সহকর্ম্মী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাজনারায়ণের বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা করিতে লাগিলেন এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে হিন্দু রাজাদের কাহিনীর উপর নূতন করিয়া রঙ চড়াইয়া পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। রাজনারায়ণের প্রধান সঙ্গী নবগোপাল মিত্র একটি জাতীয় বিদ্যালয়, একটি জাতীয় পত্রিকা এবং একটি জাতীয় ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রত্যেকটি কাজে ও কথায় "জাতীয়" শব্দ প্রয়োগ করিবার ফলে তৎকালীন বাংলার শিক্ষিত সমাজ তাঁহার নাম দিল "ন্যাশন্যাল মিত্র"। নবগোপাল মিত্র ১৮৬৫ সালে "প্যাট্রিয়ট্‌স্ এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠা করেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিলেন রাজনারায়ণ বসু এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জাতীয় জাগরণে তাঁহাদের অমর অবদান হইল "হিন্দু মেলা"। হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন: "জাতিকে জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করা এবং স্বাবলম্বী করিয়া তোলা এই মেলার একমাত্র উদ্দেশ্য।" বৎসরে একবার করিয়া এই মেলা হইত। বর্ত্তমানে এই ধরণের মেলাকে আমরা প্রদর্শনী বলিয়া থাকি। হিন্দু মেলায় লেখক, শিল্পী ও ব্যায়ামবীরদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইত এবং অন্য দিকে ভারতীয় শিল্পীদের শিল্পকলা, কৃষিজাত পণ্যাদির প্রদর্শনী চলিত। জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করিবার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থাও থাকিত। মনোমোহন বসুর বাংলা ভাষায় স্বদেশী বক্তৃতা এই মেলার অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাজনারায়ণ বসুই সর্ব্বপ্রথম জনসভায় বাংলায় বক্তৃতা দেন। ইতিপূর্ব্বে এবং পরেও আমাদের নেতৃবৃন্দ ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। ফলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই তাঁহাদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ থাকিত। জাতীয় সঙ্গীত এই মেলায় সর্ব্বপ্রথম গীত হয় এবং এই জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইহা ব্যতীত বহু জাতীয় কবিতাও এই মেলায় পাঠ করা হইত। কয়েক বৎসর ধরিয়া "হিন্দু মেলা" কলিকাতায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

কিছু দিন পরে হিন্দু মেলার উদ্যোক্তাদের গোঁড়া হিন্দুয়ানীর

টা শিথিল হয়। হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃস্থাপনের পরিবর্তে মিলিত দু-মুসলমান-শিখ-পার্শী ও জৈনদের আধিপত্য সংস্থাপনের পথে দশী শাসনের কবল হইতে ভারতবর্ষের মুক্তি হইবে এই ধারণা মল। প্রগতিশীল ব্রাহ্ম-সমাজ হিন্দুদের সহিত একত্রিত হইল। ন বর্তমান আকারে রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দিল। কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে ব্রাহ্ম-সমাজই আমাদের নৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। "একদা হ্ম-সমাজ বাংলা দেশে যে প্রগতিশীল আন্দোলন এবং প্রগতিশীল ভঙ্গীর আলোকপ্লুত করিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ কিতে পারে না।···" (Netaji Subhas Chandra Bose—n Indian Pilgrim," P. 17, Chapter III)

মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় চেতনার সূত্রপাত এই যুগেই হয় এই চেতনা এতই দুর্বল ছিল যে, তাহা বলিষ্ঠরূপে প্রকাশিত তে পারে নাই। ওহাবী আন্দোলনের কথা ছাড়িয়া দিলে যাইতে পারে যে, মুসলমানদের মধ্যে আর কোন আন্দোলনই উয়া উঠিতে পারে নাই। নবাব আবদুল লতিফের প্রচেষ্টায় াতীয় মুসলমান সঙ্ঘ" (National Mohammedan Asso-ation) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের তৃত্ব এমন এক জন লোকের হস্তে চলিয়া যায় যে মুসলমান জনসাধারণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আসিতে পারে নাই। এই যুগে মুসলমান জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব না হওয়ায় কোন জাতীয় আন্দোলনও মুসলনদের মধ্যে দেখা দেয় নাই। কোন স্থানেই এক জন বিশিষ্ট লমান নেতার আবির্ভাব হয় নাই। অথচ মুসলমানদের মধ্যে ানরূপ চাঞ্চল্যও দেখা দিল না। অবশেষে ১৮৭৪ সালে স্যার য়দ আহম্মদ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করায় ভাবী যুগের তীয় আন্দোলনে মুসলমানদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ ল। "আমার বিশ্বাস, সমগ্র ভারতবর্ষের জনসংখ্যার অনুপাতে লমানগণ প্রাক্‌-বৃটিশ অথবা বৃটিশ আমলে ভারতীয় জনকল্যাণে শিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে কখনও কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। হিন্দু-লমানের মধ্যে বর্তমানে যে কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে মাদের বর্তমান শাসকের হস্ত রহিয়াছে। আয়ারল্যাণ্ডে ক্যাথলিক-টেষ্ট্যাণ্টদের মধ্যে বৃটিশ শাসক যে কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া খিয়াছে এখানেও তাহারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। প্রাক্‌-বৃটিশ মলের ভারতের রাজনৈতিক সংস্থাকে বৃটিশ শাসক মুসলমান আমল লিয়া আখ্যা দিয়াছে, কিন্তু এই আখ্যা যে অপভাবণের নামান্তর তিহাস তাহা সমর্থন করিবে। দিল্লীর মুঘল বাদশাহদের কথাই রি আর বাংলার মুসলমান নবাবদের কথাই ধরি—তাহাতে আমরা খি যে হিন্দু-মুসলমান একত্রে দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা রিয়াছেন। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারে সম্রাট আকবরের হিন্দু ধান সেনাপতিগণের অবদান অমূল্য।······১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে ন্দু ও মুসলমান বাহাদুর শাহেব নেতৃত্বে একই পতাকাতলে সমবেত ইয়া এবং পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সাধারণ শত্রু বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম রিয়াছে।" (Natajl Subhas Chandra Bose—An ndian Pilgrim, Chapter III, P. 16-17)

রাজনীতি হইতে ধর্মের আধিপত্য অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিবর্তন হয়। সুরেন্দ্রনাথই দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি পরিবর্তন করিলেন। "সুরেন্দ্রনাথ স্বাধীনতার এক নূতন বাণী ও প্রেরণা লইয়া আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার আবেদন ছিল প্রধানতঃ রাজনৈতিক।" (Bipin Chandra Pal—Memories of My Life and Times, Page 234) মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপক হইয়া বাংলার ছাত্র-সমাজ তথা তরুণ-সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ সুরেন্দ্রনাথ লাভ করিলেন। আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা ছাত্র-সঙ্ঘের নিকট সুরেন্দ্রনাথের সংযোগ স্থাপিত হইল। "তদানীন্তন যুগে পুলিশের খাতায় (Govt. Black List যাহাদের নাম উঠিত সমাজে তাহার স্থান মিলিত না। সুরেন্দ্রনাথের অবস্থাও তাহাই ঘটিল কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সুরেন্দ্রনাথকে সমাজের বুকে টানিয়া আনিয়া একটি জাতির নেতৃত্ব করিবার সুযোগ দিলেন।" (Bipin Chandra Pal—Memories of My Life and Times, Page 238) কলিকাতা ছাত্র-সঙ্ঘের উদ্যোগে বাংলার ভাবী জননায়ক সুরেন্দ্রনাথ জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। "পাঞ্জাবে শিখ-শক্তির অভ্যুদয়" এই বিষয়ের উপর সুরেন্দ্রনাথ প্রথম বক্তৃতা দিলেন। "সম্ভবতঃ বক্তৃতার বিষয়বস্তু বৃটিশ ঐতিহাসিক ম্যালকমের 'হিষ্টরী অব দি শিখস্' পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। সুরেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতায় সর্বপ্রথম আমাদের নিকট শিখ আন্দোলনের মূল কথা উপস্থাপিত করিলেন। শিখদের আন্দোলন যে স্বাধীনতার আন্দোলন এবং এই আন্দোলন প্রথমতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের শিখ সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়তঃ; শিখ সম্প্রদায়ের ধর্ম-সম্পর্কীয় ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে পরিচালিত আন্দোলন দমনে মুঘল সম্রাটদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং তৃতীয়তঃ, বৃটিশ শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিখ সম্প্রদায় পরিচালনা করিয়া আসিয়াছে তাহাই সুরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে জানাইয়া দিলেন।···শিখ সম্প্রদায়ের আন্দোলনের বিরুদ্ধে বৃটিশ ইতিহাসকারদের অপপ্রচারের মুখোস খুলিয়া দিয়া সুরেন্দ্রনাথ অগ্নিগর্ভ ভাষায় শিখ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যের ন্যায্যতা স্বীকার করিলেন। প্রকাশ করিলেন, খালসার প্রতি শিখ সম্প্রদায়ের আনুগত্য এবং চিলিয়ানওয়ালা ও গুজরাতে শিখ-শক্তির নিকট বৃটিশের সামরিক শক্তির ভীষণ পরাজয়ের কাহিনী। সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা আমাদের শিশু স্বদেশপ্রেমকে তারুণ্যে রূপান্তরিত করিল এবং আমাদের তরুণ সমাজকে তীব্র বৃটিশ-বিরোধী করিয়া তুলিল।" (Bipin Chandra Pal—Mamories of My Life and Times, p. 242-243) ইতালীর মুক্তি-সংগ্রামের নেতা ম্যাটসিনি এবং তাঁহার "নব্য ইতালী আন্দোলন" সুরেন্দ্রনাথের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ম্যাটসিনি হইলেন সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আদর্শগুরু। বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ ম্যাটসিনির আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে বাংলার বিভিন্ন স্থানে নানা গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয় এবং সুরেন্দ্রনাথ এই ধরণের বহু গুপ্ত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন।

সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বলিবার পূর্বে আমাদিগকে জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত আমাদের নূতন রঙ্গমঞ্চ এবং জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইবে। ১৮৭০ সাল হইতে ১৮৮০ সালের মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন

দিকে যে বিকাশ দেখা দিল তাহাতে আমাদের রঙ্গমঞ্চ এবং জাতীয় সঙ্গীতের অবদান অসামান্য। ইংরাজী শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের প্রত্যেক স্তরে পরিবর্ত্তন দেখা দিল। নূতন সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হইতে লাগিল নূতন নাটক এবং নূতন রঙ্গমঞ্চ। আমাদের নিজস্ব নাটক ছিল এবং সে সংস্কৃত নাটক বিখ্যাত গ্রীক নাটকগুলির সহিত পাল্লা দিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা আমাদের কথিত ভাষা না হওয়ায় তাহার মূল্য কমিয়া যাইতে বাধ্য হইল। বাংলা দেশ নিজস্ব ভাষা লাভ করিয়া সংস্কৃত ভাষাকে কথিত ভাষায় গ্রহণ করিতে পারিল না। ফলে বাংলা দেশ নিজস্ব তাগিদায় বাংলা ভাষায় 'যাত্রা'র প্রচলন করিল। এই সব যাত্রার বিষয়-বস্তু কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থাকে স্থান দিল না। ধর্ম্মই হইল 'যাত্রা'র প্রধান ও একমাত্র উপজীব্য। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময়ে যাত্রার আবির্ভাব হয়। মহাপ্রভুর কীর্ত্তন যাত্রার জন্মদাতা। যাহা হউক, তদানীন্তন যুগে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে উপজীব্য করিয়া নাট্যকারগণ "যাত্রা" রচনা করিতেন। বৈষ্ণব গীতিকাব্য যাত্রার খোরাক যোগাইত। ক্রমশঃ বৈষ্ণব গীতিকাব্য জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মুষ্টিমেয় পেশাদার গায়কের নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং আরও অনেক বৈষ্ণব-কবির প্রাণবন্ত গীতি-কবিতা বাংলার জনসাধারণের নিকট অপরিচিত হইয়া উঠে। অবশেষে অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত "প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ" শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণব কবিদিগের পুনঃ আবির্ভাবের পথ পরিষ্কার করিয়া দিল। মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং বুর্জ্জোয়া ধনতন্ত্রের প্রকাশের ফলে সামন্ত যুগের ধর্ম্মপ্রভাবান্বিত নাটকের পরিবর্ত্তন হয় এবং তৎস্থলে বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর নিজের প্রয়োজনের তাগিদায় ও তাহাদেরই সৃষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন নাটকের সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে। প্রয়োজন হইল রঙ্গমঞ্চের। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালী মহলে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় নাই। যাহা হউক, উত্তর কলিকাতায় "বেঙ্গল থিয়েটার" এবং "ন্যাশন্যাল থিয়েটার" নামক দুইটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইল। নারীর ভূমিকায় যাত্রার ন্যায় পুরুষ অভিনেত্রী অবতীর্ণ হইতে লাগিল। পরে নারীর ভূমিকায় নারী অভিনেতৃ অবতীর্ণ হইতে লাগিল। এই ব্যাপারে নৈতিক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ প্রবল বাধা দিলেন। অবশ্য তাঁহাদের বাধা টিঁকিতে পারিল না নানা কারণে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এখনও পর্য্যন্ত কোন রাজনৈতিক নাটকের অভিনয় হইল না। রাজনৈতিক বিষয়-বস্তু লইয়া নাটকের অভিনয়ে বিলম্ব ঘটিল। এই সময়ে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইলেও সমাজের বুকে ধর্ম্মের রবার ষ্ট্যাম্প লাগাইয়া যে সমস্ত জঘন্য প্রথা চালু ছিল, সেগুলি বিলোপের দিকে তৎকালীন যুবক সম্প্রদায়ের আগ্রহ ছিল প্রবল। সামাজিক কুপ্রথার তীব্র নিন্দা করিয়া যে নাটক মঞ্চস্থ করা হইত তাহার প্রতিই শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়িত। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের পূর্ব্বে যে সামাজিক কু-প্রথা মানুষে মানুষে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারই অবসান বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। নব্য রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া "ভারতমাতা" নামক নাটকের অভিনয় হয়। বিধবা বিবাহ সমর্থন করিয়া এবং কুলীন ব্রাহ্মণদের "বহু বিবাহের" তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বহু নাটক রচিত হয় এবং অভিনীত হয়। দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" বাংলার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পদ। "নীলদর্পণ"ই সর্ব্ব ভারতের প্রথম রাজনৈতিক নাটক। এই নাটকের বিষয়-বস্তু সম্পর্কে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। "নীলদর্পণ"এর পরে দেখা দিল উপেন্দ্রনাথ দাস রচিত "শরৎ-সরোজিনী" ও "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকদ্বয়। ১৮৭৬ সালে তদানীন্তন যুবরাজ এলবার্ট এডওয়ার্ড (পরে ভারত-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারত পরিদর্শনে কলিকাতায় আগমন করিলেন। তৎকালীন কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল এবং সরকারী উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় যুবরাজকে অভিনন্দন করিবার জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের পর্দ্দানশীন মহিলাদের লইয়া একটি "পর্দ্দা পার্টির" আয়োজন করেন। হিন্দু সমাজ এই ব্যাপার লইয়া ভীষণ হৈ-চৈ আরম্ভ করিয়া দেয়। সমগ্র হিন্দু সমাজের ভিত্তির উপর আঘাত হানা হইল। হিন্দু নারী পিতৃ-মাতৃ ও শ্বশুর-কুলের নিকটতম পুরুষ আত্মীয়দের সম্মুখে ব্যতীত অন্য কাহারও সম্মুখে বাহির হইতেন না—তাহাদিগকে বিদেশী ও খৃষ্টান যুবরাজকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে এত বড় অপমান হিন্দু সমাজ সহ্য করিতে পারিল না। এতদ্ব্যতীত ইহা লজ্জাজনক কাণ্ড বলিয়া হিন্দু সমাজ মনে করিল। হিন্দু নারীর পবিত্রতার উপর এত বড় নির্ম্মম আঘাত হিন্দু সমাজ সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। পরে অবশ্য জানা যায় যে, কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মহিলাগণ এই "পর্দ্দা পার্টি"তে যোগদান করেন নাই। পতিতালয় হইতে নারী আনাইয়া জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়কে "পর্দ্দা পার্টি"র ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।* এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উপেন্দ্রনাথ দাশ বিদ্রূপাত্মক নাটকদ্বয় রচনা করেন। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় চলিতে থাকা কালে গভর্ণমেণ্ট নাটকের বিষয়-বস্তু সম্পর্কে অবগত হইলেন। যুবরাজের কলিকাতা আগমনের উপর এই ধরণের বিদ্রূপাত্মক নাটকের প্রকাশ্য অভিনয় আত্মাভিমানী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধারক ও বাহকদের সহ্য হইল না। তৎক্ষণাৎ একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া এই নাটকদ্বয়ের অভিনয় নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং এই সময় হইতেই রঙ্গমঞ্চের উপর পুলিশী সেন্সারের পাকা ব্যবস্থা হইল।

এই সময়ে জাতীয় সঙ্গীতের হিসাব-নিকাশ দেওয়া সম্ভবপর নয়। এই যুগে যে কয়েকখানি জাতীয় সঙ্গীত বাংলার যুব-সমাজকে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহারই হিসাব দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করি। আগ্রার বাঙ্গালী অধিবাসী এবং কবি গোবিন্দ-চন্দ্র রায়ের নিম্নলিখিত সঙ্গীত দুইখানি তরুণ সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল :—

কত কাল পরে বল ভারত রে—
দুঃখ-সাগর সাঁতারি পার হবে ?
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে
পর হাতে দিয়ে ধন-রত্ন সুখে
বহ লৌহ-বিনির্ম্মিত হার বুকে।

পর দীপ-মালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।

এবং

নির্ম্মল পুলিনে বহিছ সদা—
তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও।
যুগ যুগ বাহি প্রবাহ তোমারি
দেখিল কত শত ঘটনা ও।

কবি হেমচন্দ্রের "ভারত সঙ্গীত"এর :

বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত জ্ঞানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

* * * * *

চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

আমাদের জাতীয় জাগরণের প্রথম দিকে এই জাতীয় সঙ্গীতগুলি বাংলার তরুণ-সমাজকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে। সুরেন্দ্রনাথ এবং আনন্দমোহন এই তৈয়ারী ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন।

[ক্রমশঃ।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস

২

সন্তোষ ঘোষ

কংগ্রেস-পূর্বযুগ (১৮৫৮-১৮৮৫)

সিপাহী বিদ্রোহ অবসানের সংগে সংগে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নব অধ্যায় আরম্ভ হইল। এই সময়ে ভারতীয় সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক বিরাট কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিল। সমাজ-সংস্কারে জাতীয় সাহিত্য রচনায়, সংবাদপত্র পরিচালনায়, ও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে, ভারতের এই নবযুগ কর্মমুখর ও প্রাণময় হইয়া উঠিল। নবজাগ্রত ভারতের এই বহুমুখী কর্ম-প্রচেষ্টার নেতৃত্ব করে বাংলা দেশ। বাংলার নেতৃবৃন্দই সর্বপ্রথম সমাজ-সংস্কারে ও শিক্ষা-বিস্তারে ব্রতী হন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, জাতি হিসাবে ভারতবাসীকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্বপ্রথম ভারতীয় সমাজকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে—বিবিধ কুসংস্কার মুক্ত করিয়া সমাজের কাঠামো দৃঢ়তর করিয়া তুলিতে হইবে। রাজা রামমোহনের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ভারতীয় সমাজের পুনর্গঠনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহাদের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা ভারতের জনসাধারণের মধ্যে এক-জাতীয়তাবোধ প্রচারে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের বাণী লইয়া সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার বক্তৃতায় শিক্ষিত ভারতবাসী মুগ্ধ হন। কেশবচন্দ্রের আন্দোলনের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে স্বজাতিপ্রীতি ও ঐক্যবোধ বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে এক দিকে যেরূপ সমাজ-সংস্কারকগণ সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ভিতর দিয়া জন-চিত্তে জাতীয়তাবোধ উন্মেষের চেষ্টা করিতেছিলেন, অন্য দিকে বাংলার সাহিত্যিক ও সাংবাদিকবৃন্দ অগ্নিবর্ষী ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাব প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। ১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহ যখন চলিতেছিল, তখন কবি রঙ্গলাল নির্ভীক কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন :

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়।'

ইহার কিছু দিন পরে ১৮৬০ সালে প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নামক নাটক প্রকাশিত হয়। 'নীলদর্পণে' বাংলার নীলচাষীদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা বর্ণনা করা হয় এবং নীলকর সাহেবের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। মাইকেল মধুসূদন নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ করেন এবং লং সাহেব তাহা প্রকাশ করেন। এই অপরাধে লং সাহেবের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হয়। 'নীলদর্পণ' সে যুগে জনসাধারণের মধ্যে এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ইহার কিছু দিন পরে বাংলা দেশে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার নিবারিত হয়। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই সময়ে তাঁহার 'মেঘনাদবধ' কাব্য প্রকাশ করেন। জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাবের পুষ্টি-সাধনে এই কাব্যটির দানও সামান্য নহে। রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতি বাঙ্গালী সাহিত্যিকবৃন্দ কাব্য ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতীয় ভাবধারার যে স্রোত বহাইতে আরম্ভ করেন, পরবর্ত্তী সময়ে তাহা সুসংহত করিয়া সাগরাভিমুখে পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' কেবল মাত্র সুমধুর সঙ্গীত নহে, ইহা জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্র। পরবর্ত্তী সময়ে এক দিন সমগ্র ভারত এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া ত্যাগ ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়া স্বাধীনতার লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হন।

ভারতে জাতীয় ভাব প্রচারে বাংলার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকগণের অবদানও কম নহে। সিপাহী বিদ্রোহ চলিবার সময় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'হিন্দু পেট্রিয়টে' নির্ভীক ভাবে জনসাধারণের মতামত ব্যক্ত হইতে থাকে। হরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম নীলচাষীদের পক্ষ হইয়া নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদে তীব্র ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। এ জন্য তাঁহাকে লাঞ্ছনা ভোগও করিতে হয়। পরবর্ত্তী যুগে কৃষ্ণদাস পাল বহু দিন ধরিয়া নির্ভীক ভাবে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পরিচালনা করেন। অন্যান্য সাংবাদিকদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, অক্ষয়কুমার দত্ত, মনোমোহন ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, শিশিরকুমার ঘোষ সংবাদপত্রের মারফৎ জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাব প্রচারে বিশেষ সাহায্য করেন।

১৮৬৭ সালে চৈত্র বা হিন্দু মেলা স্থাপন সে যুগের অন্যতম বিশিষ্ট ঘটনা। জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাব প্রচারের জন্যই উক্ত মেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। নবগোপাল মিত্র ছিলেন এই মেলার প্রাণ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই মেলার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই মেলার সম্পাদক। হিন্দু মেলাই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম জাতীয় শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করে। জাতিকে একত্র করা ও আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেওয়াই মেলার

প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দু মেলায় কৃষি, শিল্প, স্ত্রীলোকদের সূচী ও কারুকার্য্য, দেশীয় ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যায়াম প্রভৃতি জাতীয় বিষয় সমূহ প্রদর্শিত হইত। এই মেলায় জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হইত ও জাতীয় সঙ্গীত গীত হইত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মেলা সম্পর্কে লিখিয়াছেন: "সেই সময়ে স্বদেশপ্রেমের সময় না হইলেও আমাদের বাড়ীর সাহায্যে যে হিন্দু মেলা বলিয়া একটি মেলার সৃষ্টি হয়, ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম।" এই মেলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন।

শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। প্রথম দিকে মনোমোহন ঘোষ, মনোমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ লীগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে এঁদের মধ্যে অনেকে লীগ ত্যাগ করেন। শিশিরকুমার 'ইণ্ডিয়া লীগের' মারফৎ ভারতে ভারতীয়গণ কর্তৃক প্রতিনিধিমূলক শাসনের জন্য আন্দোলন করেন। ইণ্ডিয়ান লীগ প্রতিষ্ঠার কিছু দিন পূর্বে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিল সার্ভিস হইতে অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। সিভিল সার্ভিস হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা 'ভারত সভা' স্থাপিত হয়। নিখিল ভারতীয় আদর্শ লইয়াই 'ভারত-সভা' গঠিত হয়। জনমত গঠন, রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতির মধ্যে ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠা, হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি উদ্দেশ্য লইয়াই 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'ভারত সভা' সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিল। সুরেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যে একাধিক বার ভারত ভ্রমণ করিলেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়স কমাইয়া দিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 'ভারত সভা' সংঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি পার্লামেণ্টের সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য 'ভারত সভার' তরফ হইতে ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। ১৮৭৮ সালে লর্ড লিটন 'ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' নামক একটি আইনের সাহায্যে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। ভারতবাসীকে ব্যাপক ভাবে নিরস্ত্র করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড লিটন 'অস্ত্র আইন' নামে আর একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন।

'ভারত সভা' এই দুইটি আইনের বিরুদ্ধেই তীব্র আন্দোলন করেন। লর্ড লিটনের পর লর্ড রিপণ ভারতে বড়লাট হইয়া আসিয়া 'প্রেস অ্যাক্ট' তুলিয়া লন। এই কার্য্যের ফলে তিনি এ দেশে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। সুরেন্দ্রনাথ সেই সময় 'বেঙ্গলী' নামক সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেন। ১৮৮৩ সালে আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথের দুই মাস জেল হয়। ইহাতে সমগ্র ভারতে তীব্র আন্দোলন হয়। 'ভারত সভার' উদ্যোগে ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় একটি 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' বা জাতীয় সম্মেলন আহূত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু সংখ্যক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আগমন করেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় ভিত্তিতে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। এই ভাবে জাতীয়-কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। ভারতের অন্যান্য অংশেও এই সময়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ১৮৭৫ সালে 'পুণা সার্বজনীন সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮১ সালে 'মাদ্রাজ মহাজন সভা' ও ১৮৮৫ সালে 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশন' নামে আর একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।

রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে স্বদেশ-প্রেমিক ভারতীয় নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিবার জন্য যে বহুমুখী কর্ম-প্রচেষ্টার অবতারণা করেন, তাহার বিভিন্ন ধারা নানা খাতে প্রবাহিত হইয়া ভারতীয় জনগণের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিবার জন্য যে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য জনসাধারণ বহু দিন হইতে আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছিল, জাতীয় কংগ্রেসই সেই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন যুগ আরম্ভ হইল। কালক্রমে কংগ্রেসই ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত-প্রতীক হইয়া উঠিল। সমগ্র জাতি কংগ্রেসের নেতৃত্বে দ্রুতগতিতে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

উজ্জীবন

অমিতাভ চৌধুরী

হাজার বছর পরে আমি জাগলাম,
সূর্য্যোতে বাড়ায়ে হাত যে ভিক্ষা মাগলাম,
সে তো স্বপ্ন নয়
আমি মৃত্যুঞ্জয়!

ফসিলের ভীড়ে
আর সঙ্কল্প জটায়ুর নীড়ে
আমার এ প্রাণ,
মৃত্যুর ওপারে দিয়ে করে আরো নূতন সন্ধান।

কিছু নয়, কিছু নয়, সে এক বিস্ময়,
এখনো আকাশ ভেদে নগ-হিমালয়।
প্রাণের মশাল জেলে হোক অঙ্গীকার,
উদ্ধত বহ্নিশিখা করে নি ক' অন্তিম স্বীকার।
এই তো অতীত আমি এ নহে সংশয়,
অনাদি কালের স্রোতে আমি মৃত্যুঞ্জয়।
কালের চরণ-ধ্বনি শুনি অবিরাম
হে সূর্য্য, তোমারে প্রণাম।

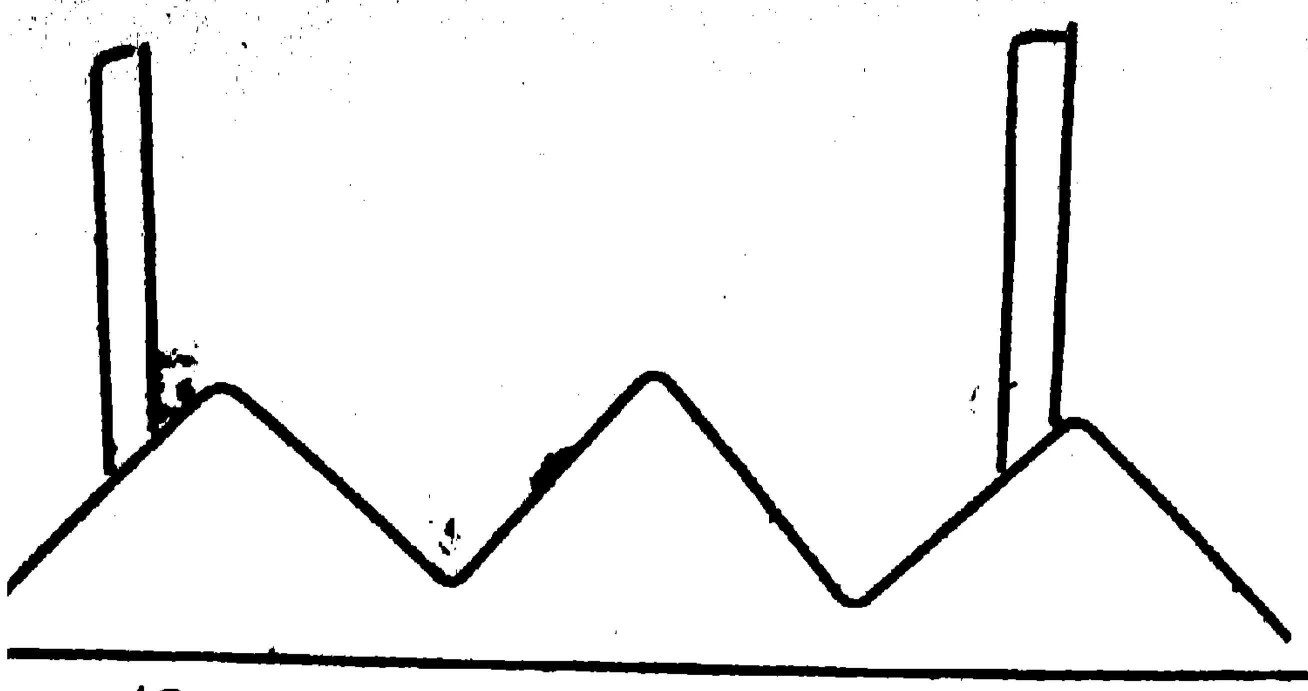

কল-কারখানায় শ্রমিক-সমস্যা

শ্রীমনকুমার সেন

শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পুনঃ পুনঃ বিরোধের ফলে ভারতে শিল্পপণ্যের উৎপাদনে কিরূপ মারাত্মক অবনতি ঘটিয়াছে তাহা আজ আর কাহারও অজানা নহে; বস্তুতঃ, জনসাধারণ তাহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনের দ্রব্য-সামগ্রীর অপ্রতুলতা ও দুর্ম্মূল্য হইতেই এই গুরুতর অবস্থা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছে। অবস্থার এইরূপ দ্রুত অবনতি লক্ষ্য করিয়াই কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গত ডিসেম্বর মাসে মালিক, শ্রমিক ও সরকারী প্রতিনিধিগণ একটি শিল্প-সম্মেলনে সম্মিলিত হন। সম্মেলন একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করেন,—তাহা এই যে, 'যেহেতু শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পূর্ণ সহযোগ এবং মৈত্রী সম্পর্ক বজায় না থাকিলে শিল্প-পণ্যের উৎপাদন সম্ভব নহে' তজ্জন্য আগামী তিন বৎসর কাল সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মঘট, 'লক-আউট' বা অবরোধ বন্ধ রাখিয়া শ্রম-শিল্পে শান্তি বজায় রাখিবার নিমিত্ত শ্রমিক ও মালিক এই উভয় পক্ষকে অনুরোধ জানানো হইতেছে। এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনাও রচিত হয় এবং সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিগণ তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, সম্মেলন-পরবর্ত্তী গত কয়েক মাসের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হয় যে, উক্ত প্রস্তাব আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই এবং তাহার কারণ, প্রস্তাবে বর্ণিত উদ্দেশ্যকে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকিলেও পরিকল্পিত ব্যবস্থায় বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণ কার্য্যকরী ভাবে পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন নাই।

কল-কারখানার শ্রমিকগণ তাহাদের অভাব-অভিযোগ পূরণের নিমিত্ত ধর্ম্মঘটের পন্থা অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন গত ১৯১৯ সাল হইতে। এই বৎসরে ব্যাপক শ্রমিক-বিরোধের উৎপত্তি হয় এবং ইতস্ততঃ বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইতে থাকে। এই সময়ে যে সকল 'ধর্ম্মঘট কমিটি' গঠন করা হয়, উত্তর কালে সেগুলিই 'ট্রেড ইউনিয়ন'রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের বৎসর কয়টিতে শিল্প-ব্যবসায়ের বিস্তৃতি ও ব্যাপক কর্ম্ম-সংস্থান ঘটে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্প-জাত পণ্যের লাভের অঙ্কও স্ফীত হয়। যুদ্ধের অবসানে স্বাভাবিকরূপেই উৎপাদন বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এবং শিল্প-ব্যবসায়ের সঙ্কোচনের ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্ম্মচ্যুত হইয়া পড়ে। ১৯২৪ সালের প্রারম্ভে এই 'মন্দা'র গুরুতর প্রতিক্রিয়া সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। শিল্পপতিগণ শ্রমিকদের মজুরী হ্রাস করেন,এবং বোনাস ও অতিরিক্ত ভাতা প্রভৃতি বাতিল করিয়া দেন। এইরূপে যে অর্থ-সঙ্কটের সৃষ্টি হয় তাহার ফলে পুনঃ পুনঃ শ্রমিক-মালিক বিরোধের উদ্ভব হইতে থাকে। এই সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য যে 'রাজকীয় কমিশন' (Royal Commission on Labour) নিয়োগ করা হয়, তাঁহাদের মতে '১৯১৮—৩০ সালের মধ্যে যতগুলি ধর্ম্মঘট হইয়াছে তাহার প্রায় সকলগুলিই প্রধানতঃ বা সম্পূর্ণরূপেই এই অর্থসঙ্কটজনিত।'

ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট: ১৯২৬

ধর্ম্মঘটের ফলে শ্রমিকগণ একটি ঐক্যবদ্ধ সূত্রে অগ্রসর হইতে থাকেন, এবং ১৯২৬ সালে 'ট্রেড ইউনিয়ন আইন' পাশ হইলে শ্রমিক আন্দোলন প্রভূত শক্তিলাভ করে। ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত এইরূপ ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ৮৭টি এবং ইহাদের সভ্য-সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৮৩ হাজার। গবর্ণমেণ্ট, জনসাধারণ ও মালিকদের মিলিত প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের কতকগুলি ন্যায্য দাবী-দাওয়া পূরণ করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু অত্যল্প কাল পরেই পূর্ব্বের ন্যায় বিরোধ সৃষ্টি হইতে থাকে। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক ভারতে যে আন্দোলন প্রসার লাভ করিতে থাকে, অনিবার্য্যরূপেই তাহার প্রভাব শ্রমিকগণকে অধিকতর সচেতন করিয়া তোলে এবং শ্রমিক আন্দোলনে বৈপ্লবিক ধ্বনি ও নিজস্ব পতাকার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯২৯ সালে 'শ্রমিক বিরোধ আইন' (Trade Disputes Act) পাশ করিয়া 'সহানুভূতিসূচক ধর্ম্মঘট' এবং গবর্ণমেণ্টকে অসঙ্গত উপায়ে নতি স্বীকার করাইবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মঘট অবলম্বন দণ্ডার্হ ঘোষণা করা হয়। ১৯২৮ সালের 'জন-নিরাপত্তা আইন' (Public Safety Bill) ভাইসরয়ের অনুমোদন-প্রাপ্ত হইয়া বামপন্থী শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে থাকে। এই সময়ে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুকূলে জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ প্রকাশ পাইতে থাকে। কিছু কালের মধ্যে সমগ্র ভারতের শ্রমিক আন্দোলন বামপন্থিগণের পরিচালনাধীন হইয়া পড়ে এবং অসন্তোষ বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিক-বিরোধের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অধিকন্তু, আকস্মিক ভাবে গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বিভিন্ন স্থান বিধ্বস্ত হয় এবং অবস্থার জটিলতা সবিশেষ বৃদ্ধি পায়।

শ্রমিকদের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ ও আন্দোলন প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে মিঃ জে, এইচ হুইটলির নেতৃত্বে 'রাজকীয় কমিশন' শ্রমিক-বিরোধ সম্পর্কে তদন্তে নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে শ্রমিক মহলে মতদ্বৈধের সৃষ্টি হয় এবং ভারতের 'ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' দুইটি পৃথক্ দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই দলীয় গোলযোগের জন্য ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত শ্রম-শিল্পে ধর্ম্মঘটের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই।

অতঃপর বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে এবং বামপন্থিগণের পরিচালিত শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সংখ্যাও আবার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৩০—৩৬ সালে শ্রমিক-বিরোধের সংখ্যা ছিল ১০৩৯, আর ১৯৩৭—৩৯ সালেই এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৮৪। সুতরাং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ, বিশেষরূপে বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ এই বিষয়ে তৎপর হইয়া শ্রমিক-বিরোধ নিষ্পত্তির কার্য্যে অগ্রণী হন। তাঁহারা শ্রমিক তদন্ত কমিটিও

নিযুক্ত করেন এবং শ্রমিকদের সুখ-সুবিধার নিমিত্ত উপযুক্ত বিধি-বিধান রচনায় প্রবৃত্ত হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ায় প্রাদেশিক তদন্ত কমিটি সমূহ তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিতে পারেন নাই। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমরের প্রলয়ঙ্কর নিনাদ শ্রুত হয়—অকস্মাৎ সকল দেশের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তা এবং অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইতে থাকে। যুদ্ধোদ্যমের ক্রমবর্দ্ধিত চাহিদার ফলে নূতন নূতন কল-কারখানা ও শিল্প-ব্যবসায়ের পত্তন অথবা পুরাতন কারখানাগুলির প্রসার হইতে থাকে। ১৯৩৯—৪৫ সাল পর্য্যন্ত এই ব্যাপক কর্ম্ম-চাঞ্চল্যে লক্ষ লক্ষ নূতন শ্রমিক কর্ম্মের সন্ধান পায়। সঙ্গে সঙ্গে মজুরী, দুর্ম্মূল্য ভাতা, বোনাস প্রভৃতি বিষয়ে পুনঃ পুনঃ বিরোধেরও উৎপত্তি হইতে থাকে। দ্রব্য-সামগ্রীর মহার্ঘতায় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বহু গুণ বৃদ্ধি পায় এবং দেশের সর্ব্বত্র অতিরিক্ত ভাতা, যুদ্ধকালীন লভ্যাংশের অংশ দাবী প্রভৃতির ভিত্তিতে শ্রমিকগণ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' আরম্ভ করে। উৎপাদন অব্যাহত রাখিয়া যুদ্ধের চাহিদা মিটাইবার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ভারত সরকার ১৯৪২ সালে 'ভারত রক্ষা আইনের' ৮১-এ ধারা জারী করিয়া ধর্ম্মঘট, লক-আউট প্রভৃতি বে-আইনী ঘোষণা করেন এবং তৎস্থলে সালিশীর প্রবর্ত্তন করিয়া শ্রমিক ও মালিকের বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে প্রয়াস পান। ঐ বৎসরের মে মাসে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহও ভারতরক্ষা আইনের এই নূতন ক্ষমতার অধিকার লাভ করেন। যে সকল শিল্প-ব্যবসায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রহিয়াছে তাহাতে বিরোধ এড়াইবার জন্য ১৯৪৫ সালে একটি স্থায়ী সালিশী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হয়। রেলওয়ে, কয়লার খনি, তৈল খনি, প্রধান প্রধান বন্দর সমূহের পরিচালনা এবং অনুরূপ অন্যান্য যে সকল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্বাধীন, তাহাতে এই সালিশীর কার্য্য অনুসৃত হইতে থাকে। এই সালিশী ব্যবস্থায় রহিয়াছেন এক জন চীফ লেবার কমিশনার এবং ডেপুটী লেবার কমিশনার। ইঁহাদের প্রধান দপ্তর নয়াদিল্লীতে অবস্থিত। ইঁহাদের কার্য্যে সহকারী হইতেছেন বোম্বাই, কলিকাতা ও লাহোরস্থিত (বর্ত্তমানে লাহোরের কার্য্যালয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে) রিজিওনাল কমিশনারগণ। ইহা ছাড়া আছেন এক জন ক্যান্টিন ইন্সপেক্টর, নয় জন সালিশী কর্ম্মচারী এবং ৩০ জন লেবার ইনস্পেক্টর। কয়লার খনি ও চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য পৃথক্ সংস্থা রহিয়াছে। এই স্থায়ী সালিশী ব্যবস্থার দ্বারা শ্রমিক-বিরোধ কতটা এড়ানো সম্ভব হইয়াছে, নিম্নলিখিত বিবরণী হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত সালিশী বোর্ড এই সকল মামলা প্রাপ্ত হন:—

মাস	ধর্ম্মঘট ও ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা	আপোষ-নিষ্পত্তির সংখ্যা
১৯৪৬—এপ্রিল	৩৯	২৫
মে	৩৩	২৩
জুন	১৮	১৫
জুলাই	১৯	১৪
আগষ্ট	১০	৯
সেপ্টেম্বর	২৬	২৩
অক্টোবর	২৪	২৪
নভেম্বর	২৪	২২
ডিসেম্বর	৩৩	৩১
১৯৪৭—জানুয়ারী	৪১	৩৮
ফেব্রুয়ারী	৫৬	৪৭
মার্চ্চ (১লা হইতে ১৫ই)	১৬	১১
	৩৩৯	২৮৯

কিন্তু আইনানুযায়ী ব্যবস্থার দ্বারা শ্রম-শিল্পে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না বা হইলেও তাহার সীমা কতটুকু তাহা বিবেচনা করার প্রয়োজন রহিয়াছে। আইনের প্রয়োগ অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির ফলে দেশে কোনও 'আপৎকালীন অবস্থা' বর্ত্তমান না থাকে, তখনও যদি আইনের প্রয়োগ দ্বারা কল-কারখানার উৎপাদন-কার্য্যে শ্রমিককে ও মালিককে নিযুক্ত রাখিতে হয় তাহা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হইতে পারে না। তাছাড়া, শ্রমিক ও মালিক সকল বিরোধের ক্ষেত্রেই বাহিরের সালিশীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে—শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের স্থায়ী নৈকট্য সাধন করিতে হইলে তাহাও অবাঞ্ছনীয়। মালিক, শ্রমিক ও এতদুভয়ের কল্যাণকামী রাষ্ট্র এই নৈতিক দিক্‌টির প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দিলে এবং তদনুযায়ী প্রভাব-প্রচার প্রয়োগ করিলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের তিক্ততার স্থায়ী অবসান ঘটিতে পারে; অবশ্য তৎপূর্ব্বে সকল পক্ষেরই কালোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে।

আগামী কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে মাসিক বসুমতীর পরিবর্ত্তিত সডাক চাঁদার হার

(ভারতীয়)		(বৈদেশিক)	
বার্ষিক	১২৲	বার্ষিক	২৪৲
ষাণ্মাসিক	৭৲	ষাণ্মাসিক	১৪৲

ভারতীয় এবং বৈদেশিক রেজেষ্ট্রী খরচ ৩৲

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

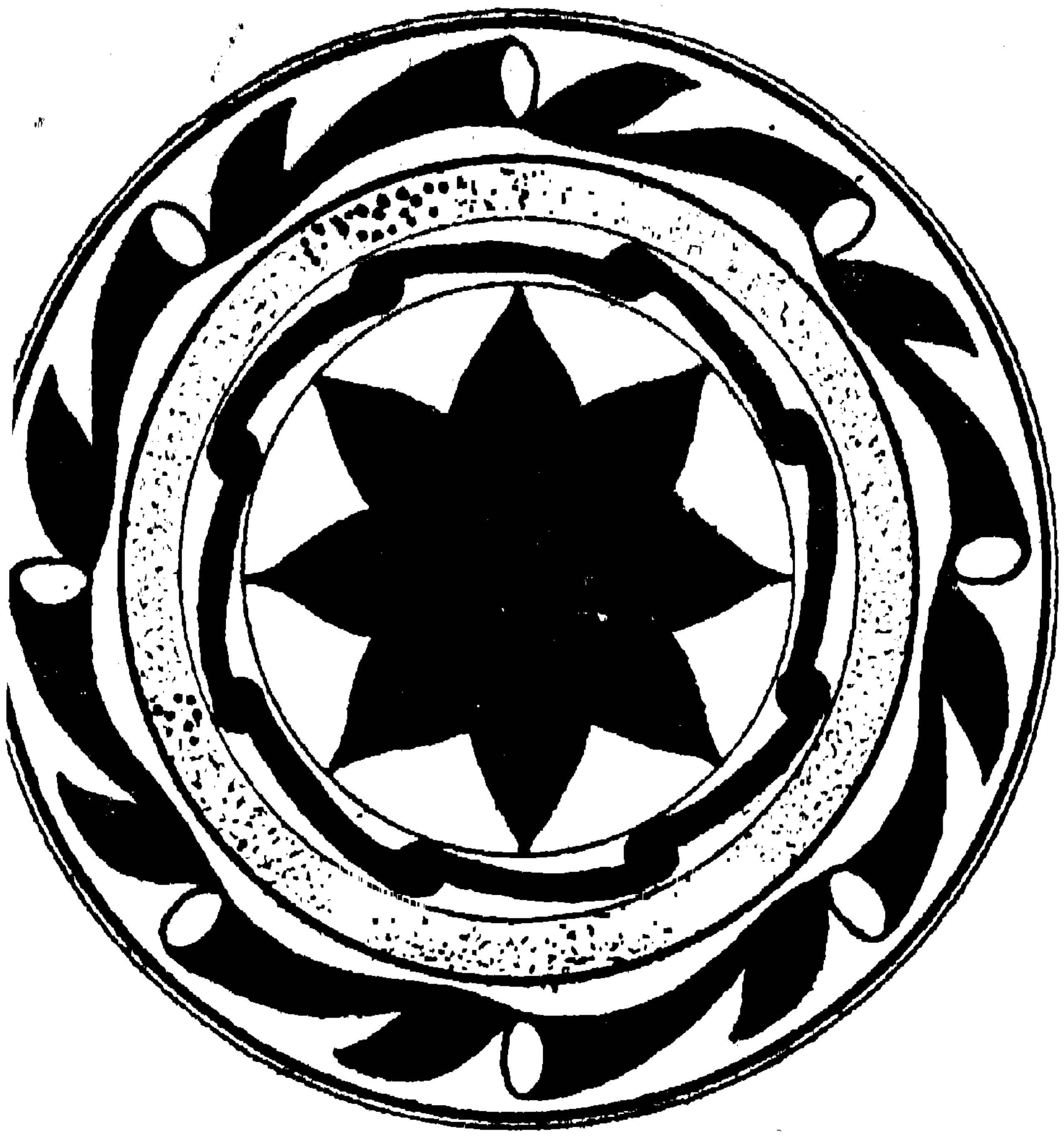

মহাত্মা গান্ধী ও চীনা যুবক

মীরা ঘোষ

মহাত্মা গান্ধীর সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছেন, তাঁহারাই গান্ধীজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। গান্ধীজীর চরিত্র ছিল ইস্পাতের ন্যায় দৃঢ় ও ফুলের মত কোমল। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের বহু কাজের মধ্য দিয়া তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজী পাপকে ঘৃণা করিতেন কিন্তু পাপীকে সংশোধন করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন। গান্ধীজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিয়া কিরূপে এক চীনা যুবকের বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে নিম্নে প্রদত্ত গল্প হইতে তাহা জানা যাইবে।

১৯২৫ সাল। গান্ধীজী তখন কলিকাতায়। ভারতের অন্যতম নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিরক্ষার্থ তিনি প্রথম ভিক্ষাপাত্র হস্তে আবেদন জানান দেশবাসীর নিকট। ঠিক সেই সময়ে একটি চীনা যুবক ভারতে আসে। সেই যুবকটি ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষ—গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের নাম খুব শুনিয়াছিল। সেই জন্য ঐ দুই পুরুষদ্বয়কে দেখিবার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-বিখ্যাত শান্তিনিকেতনে সে আতিথ্য গ্রহণ করে। সাহিত্যে ও কাব্যে যথেষ্ট অনুরাগ ছিল ঐ যুবকটির। তাহার মধ্যে বেশ একটা স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব ছিল, সেই জন্য শান্তিনিকেতনের সকলেই তাহাকে খুব পছন্দ করিতেন। দৈবক্রমে এক অঘটন ঘটিয়া গেল। কিছু দিন পরে সেই যুবকটি জানিতে পারিল যে, শান্তিনিকেতনের অনেকেই তাহাকে গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। ঐ কথা জানিতে পারিয়া যুবকটি খুবই মর্ম্মাহত হইল এবং গান্ধীজীর দর্শন লাভের জন্য তাঁহাকে একটি পত্র লিখিল। গান্ধীজীর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই তখন জীবিত ছিলেন। তিনি যুবকটিকে গান্ধীজীর সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র দিলেন। যুবকটি কলিকাতায় আসিয়া মহামানব গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিলেন। গান্ধীজী যুবকটির সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে যুবকটি সত্যই ভাল, কোনরূপ দুরভিসন্ধি তাহার নাই। সেই জন্য তিনি যুবকটিকে বলিলেন, তিনি স্বয়ং তাহার হইয়া জামিন থাকিবেন এবং তিনি যদি গুরুদেবের নিকট তাহার সম্বন্ধে একটু কিছু লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে আর কেহ তাহাকে অযথা অবিশ্বাস করিবে না। অপরিচিতের প্রতি গান্ধীজীর এই সহানুভূতি দেখিয়া যুবকটি মুগ্ধ হইয়া গেল এবং গান্ধীজীর প্রতি সে আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। যুবকটি শান্তিনিকেতনে যাইতে অসম্মতি জানাইল এবং গান্ধীজীর আশ্রমের স্থান ভিক্ষা করিল। বাপুজী নানা প্রকারে যুবকটিকে বুঝাইলেন যে তাঁহার আশ্রম কষ্টের স্থান, সেখানে আরাম নাই। বাপুজীর আশ্রমে তাহার খুব কষ্ট হইবে, শান্তিনিকেতনে সে অনেক আরামে থাকিতে পারিবে। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁহার অন্তরের যোগাযোগ আছে, কারণ তাহারা সকল দেশের লোককে সাদরে আহ্বান করেন। যুবকটি বলিল, "শান্তিনিকেতনের লোকেরা খুবই ভাল এবং তাহারও শান্তিনিকেতনের আশ্রম খুবই ভাল লাগিয়াছে, এখন সে দিন-কতক তাঁহার আশ্রমে থাকিতে চায়।" অবশেষে যুবকটির বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া বাপুজী তাহাকে অনুমতি দিলেন।

যুবকটির চীনা নাম গান্ধীজীর স্মরণ থাকিত না। সেই জন্য তিনি যুবকটির নাম দেন শান্তি। শান্তি আশ্রমে ছোট ছেলে-মেয়েদের আনন্দের উৎস ছিল। শান্তি সারা দিন আশ্রম বালক-বালিকাদের সহিত নানারূপ খেলাধূলা করিয়া কাটাইয়া দিত।

প্রথমে আশ্রমের রান্নার ভার, জল তুলিবার ভার পড়িল শান্তির উপর। শান্তি আশ্রমের অন্যান্য সকলের ন্যায় চরকা কাটিবার চেষ্টা করিত খুব। এই ভাবে মাস চলিয়া যাইতে লাগিল। শান্তির মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা যাইতে লাগিল। সে কঠিন পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিল। আস্তে আস্তে সে আশ্রমের সকল কাজ শিখিয়া ফেলিল। তখন এমন কোন কাজ রহিল না যাহা শান্তির পক্ষে করা অসম্ভব।

গান্ধীজীর সমস্ত লেখা সে গভীর মনযোগ দিয়া পড়িত এবং তাহা হইতে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিত। হঠাৎ এক দিন দেখা গেল, শান্তি কি যেন তন্ময় হইয়া লিখিতেছে। অজস্র পাতা সে লিখিয়া ফেলিল। লেখা শেষ করিয়া সে আস্তে আস্তে বাপুজীর ঘরে প্রবেশ করিল এবং বলিল,—সে যখন সিঙ্গাপুরে অন্যান্য চীনা যুবকদের সহিত বাস করিত তখন সে বহু অন্যায় কাজ করিয়াছে, সে অহরহ তাহার দুষ্কর্মের জন্য কষ্ট পাইতেছে, তাহার বিশ্বাস, গান্ধীজীই কেবল মাত্র তাহাকে ঐ পাপ হইতে মুক্তিদান করিতে পারেন। সেই জন্য সে ঠিক করিয়াছে, সাক্ষাৎ দেবতা গান্ধীজীকে সাক্ষী রাখিয়া সে দশ দিন উপবাস করিয়া দেহকে পবিত্র করিবে এবং তাহা হইলেই সে পাপ হইতে মুক্তি পাইবে। বাপুজী শান্তির কথা শুনিয়া খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, "আমি দেখিয়াছি তোমার লেখাটি খুবই বড় হইয়াছে। আমাকে প্রথমে সময় করিয়া উহা পড়িতে দাও তার পর তোমার উপবাসের পালা—আমার আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তুমি কোন কিছু করিও না।"

গান্ধীজী তাঁহার সময় মত ঐ লেখাটি পড়িলেন এবং তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মনে বার বার এই কথাই মনে হইতে লাগিল, আশ্রম-বাসে শান্তির কি বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিল—জীবনে সে একটা সত্য পথ খুঁজিয়া পাইল। অন্যায় দুষ্কর্মের জন্য তাহার কি

গভীর অনুতাপ! মুক্তকণ্ঠে ও নিঃসঙ্কোচে সে তাহার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। আত্ম-সংশোধনের জন্য কি ব্যাকুলতা তাহার! প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পবিত্র জীবন যাপনের জন্য সে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। শান্তির এই ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার শক্তি দেখিয়া বাপুজী অভিভূত হইয়া পড়িলেন, শান্তির প্রতি তাহার ভালবাসা আরও গভীরতম হইয়া উঠিল।

বাপুজী শান্তিকে উপবাস করিবার অনুমতি দান করিলেন। কারণ, তিনি বুঝিতে পারিলেন সত্যই শান্তি অনুতাপানলে দগ্ধ, তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা নাই। শান্তি উপবাস আরম্ভ করিল। সে বেশ স্বচ্ছন্দে উহা পালন করিতে লাগিল। কোনরূপ ক্লান্তি ও কষ্টের ভাব তাহার মুখে-চোখে দেখা যাইত না। গান্ধীজী প্রতিদিন এক-বার করিয়া শান্তিকে দেখিতে যাইতেন। ১৫।২০ মিনিট ধরিয়া শান্তি গান্ধীজীর সহিত আলাপ-আলোচনা করিত। দশ দিনের দিন শান্তি তাহার ব্রত উদ্‌যাপন করিল। তাহার সেই পূর্ব্বের লেখাটি আবার সে অন্য একটি পৃষ্ঠায় লিখিল। গান্ধীজী ঐ দ্বিতীয় লেখাটিতে স্বাক্ষর করিলেন। ঐ দ্বিতীয় লেখাটি শান্তির নিকট রহিল। তাহার প্রথম লেখাটি সে গান্ধীজীর নিকট অর্পণ করিল।

গান্ধীজীর আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতিতে শান্তি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। গান্ধীজীর মানবতার সন্ধান সে পাইয়াছিল। সেই জন্য ঐ বিরাট পুরুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া শান্তি মনে শান্তি ও তৃপ্তি পাইল।

কিছু দিন পরে শান্তি তাহার জন্মভূমি চীনে চলিয়া গেল। তথায় সে একটি খবরের কাগজের সম্পাদক হইল, কিন্তু গান্ধীজীর দেওয়া সেই সুন্দর নামটি শান্তি ভুলিতে পারে নাই। শান্তি নামেই সে কাগজটি চালায়। তাহার ইচ্ছা ছিল, জীবনের বাকী দিনগুলি সে গান্ধীবাদ পড়িয়া ও চীনে তাহা প্রচার করিয়া কাটাইবে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারী নায়িকা

শ্রীনীহারকণা মুখোপাধ্যায়

পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসন চলিয়া আসিতেছিল—এত দিনে তাহার অবসান হইয়াছে—ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। নিজের মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য শত শত শহীদ অকুণ্ঠিত চিত্তে সকল প্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় তাঁহারা জীবন দিয়াছেন—তাঁহাদের এই আত্মদানের কাহিনী জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। মৃত্যুভয় তাঁহাদের ছিল না—তাঁহারা জানিতেন যে প্রত্যেকের জীবনেই মৃত্যু অনিবার্য্য—কিন্তু বরণীয় মৃত্যু চিরদিনই অমরতার গৌরবে মহীয়ান্। তাঁহারা সেই গৌরবময় মৃত্যু বরণ করিয়া জাতীয় জীবনে অমর হইয়া রহিলেন। অধীনতা-পাশ হইতে স্বদেশকে মুক্ত করিবার প্রয়াস বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু এ-কথা ভুলিলে চলিবে না যে, এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছিল ১৮৫৭-১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যখন বিদ্রোহী হিন্দু, মুসলমান, মারাঠা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বীরা মিলিত ভাবে দেশের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই অভ্যুত্থান প্রথমে বিদ্রোহের আকারেই প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু তাহাই পরিশেষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। সেই সংগ্রামের নেতৃত্ব ও পরিচালনার ভার ঘটনাচক্রে যে তিন জনের স্কন্ধে পড়িয়াছিল—ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই তাঁহাদের অন্যতমা। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিতে গেলে ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সৈন্যরা কেন বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে জানা দরকার।

যে সময় এই বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল, তখন লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। সেই সময় ভারতের সর্ব্বত্র ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে একটা অশান্তি এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন সৈন্যদিগকে এনফিল্ড রাইফেল নামক নতুন ধরণের বন্দুক প্রদান করা হয়—এই বন্দুকে টোটা বা কার্ত্তুজ ব্যবহৃত হইত। ভারতবর্ষের বহু স্থানে এইরূপ একটা জনপ্রবাদ প্রচলিত হইয়াছিল যে, সরকার বাহাদুর গরু এবং শূকরের চর্ব্বি মিশ্রিত কার্ত্তুজ ব্যবহার করিবার জন্য সিপাহীদিগকে বাধ্য করিয়াছেন। এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হইবার পর প্রথমেই বাংলা দেশে কলিকাতার নিকটস্থ বারাকপুরে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল; কিন্তু প্রকৃত বিদ্রোহ আরম্ভ হইল মীরাট এবং লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে। তার পর বিদ্রোহীরা দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইল। দিল্লীর অধিবাসীদের কিয়দংশ বিদ্রোহী সেনাদের সহিত যোগদান করিয়া দিল্লীর নামমাত্র বাদশাহ বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। এই সকল বিদ্রোহী সিপাহীদের হস্তে অনেক স্থানেই ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষ প্রাণ হারাইয়াছিল। বিদ্রোহীদের কণ্ঠে শোনা গেল—

"দিল্লী চলো ভাইয়া—দিল্লী চলো।"

দেখিতে দেখিতে কাণপুর, মধ্য-ভারত, ঝাঁসী প্রভৃতি দেশেও বিদ্রোহ-বহ্নি ছড়াইয়া পড়িল। সে সময়ে ঝাঁসী ইংরেজের অন্তর্ভুক্ত করদ রাজ্য ছিল। নিজের একমাত্র পুত্র জীবিত না থাকাতে গঙ্গাধর রাও তাঁহার দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি-ভ্রাতার পুত্র দামোদর রাওকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে মহারাজা গঙ্গাধর রাও ইংরাজ সরকারকে তাঁহার পোষ্যপুত্র গ্রহণের বিষয় জানাইলেন এবং ইহাও উল্লেখ করিলেন—যে পর্য্যন্ত বালক দামোদর রাও বয়ঃপ্রাপ্ত না হন, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার সহধর্মিণী মহারাণী লক্ষ্মীবাই তাঁহার হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বড়লাট বাহাদুর গঙ্গাধর রাও ও রাণীর আবেদন মঞ্জুর করিলেন না। সে জন্য গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পর ঝাঁসী ইংরেজ অধিকারে আসিল। রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের জন্য মাসিক মাত্র পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, এই অর্থে রাণীর ব্যয় সঙ্কুলান হইত না। ঝাঁসী হিন্দুরাজ্য—সেখানে গো-বধ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু ইংরাজ প্রভুরা সেখানে এই পুরাতন প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। ইহার পর গবর্ণমেণ্ট হইতে রাণীকে তাঁহার স্বামী গঙ্গাধর রাও কর্ত্তৃক গৃহীত ঋণ-পরিশোধের জন্য আদেশ দেওয়া হয়। কিছু দিন পরে রাণীর মাসিক বৃত্তি হইতে কিয়দংশ হ্রাস করা হইল। এইরূপে সর্ব্ববিধ বিষয়ে কোম্পানীর অনুদার ব্যবহারে রাণীর চিত্ত ক্রমশঃ তিক্ত ও ব্যথিত হইয়া উঠিল। ইংরাজের দুর্ব্ব্যবহারে এক দিন এই পুণ্যবতী মহীয়সী মহিলার হৃদয়েও জ্বলিয়া উঠিল

টাট্কা ও স্বাদু রাখার ব্যবস্থা

পদে পদে সুরক্ষিত রাখা হয় বলেই ব্রুক বণ্ড চা টাট্কা থাকে

সদ্য তোলা চায়ের পাতা থেকে বাগানের কারখানায় তৈরী হয় ব্রুক বণ্ড চা। সযত্নে সংমিশ্রণের পরেই প্যাক করা হয় এবং কোম্পানীর অতুলনীয় সরবরাহ ব্যবস্থায় পৌঁছয় গিয়ে দোকানে দোকানে।

খুচরা বিক্রেতাদের ঘন ঘন মাল সরবরাহ করা হয় শুধু তাদের উপস্থিত দরকার মেটানোর জন্যে।

ব্রুক বণ্ড চা পুরোণ হতে পারে না, কারণ এর সরবরাহে যেমন দেরী হয় না, তেমনি দোকানেও বেশিদিন পড়ে থাকতে পায় না।

এঁর উপরে থাকে অনেকগুলি ক'রে ব্রুক বণ্ড ডিপোর কাজ নিয়ন্ত্রণের ভার। এই সব ডিপো থেকেই খুচরা বিক্রেতাদের চা সরবরাহ করা হয়। আর ব্রুক বণ্ডের ফ্যাক্টরী থেকে এই ডিপোগুলিতে ঘন ঘন চায়ের চালান ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের তত্ত্বাবধানে সুনিশ্চিতরূপে এসে পৌঁছায়। এঁদের সুনিয়ন্ত্রণের ফলে সারা বছরই সর্ব্বজনপ্রিয় টাটকা ব্রুক বণ্ড চা সহজেই পাওয়া যায়।

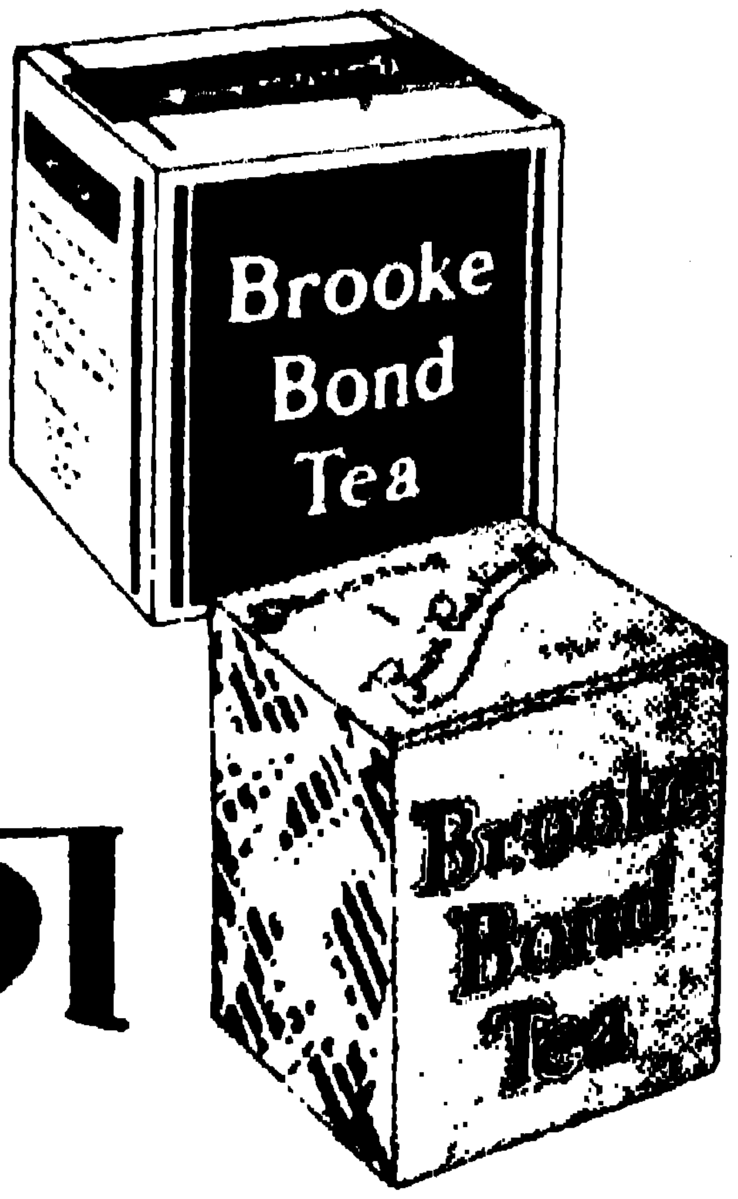

ব্রুক বণ্ড চা

দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি

বিদ্রোহের অনল। লক্ষ্মীবাইয়ের মনের কোণে ইংরেজের প্রতি যে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা এক সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র।

ঠিক এমনি সময়ে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন ঝাঁসীর সেনাদের মধ্যে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেখানকার ইউরোপীয় অধিনায়ক ও অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই উন্মত্ত সিপাহীদের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিয়া রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের মত উত্তেজিত ভাবে দলে দলে আসিয়া ঝাঁসীর রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিল। দলের অধিনায়ক রাণীর নিকট তিন লক্ষ টাকা দাবী করিলেন। অবশেষে একান্ত নিরুপায় হইয়া রাণী তাঁহার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া এক লক্ষ টাকা বিদ্রোহী দলের সর্দ্দারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্রোহীরা টাকা পাইয়া চীৎকার করিতে করিতে দিল্লী অভিমুখে চলিয়া গেল। বিদ্রোহী সিপাহীদের আক্রমণেই ঝাঁসীতে ইংরাজ কোম্পানীর প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে ঘটনাচক্রে পড়িয়া ঝাঁসী রাজ্য সম্পূর্ণরূপে রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের শাসনাধীনে আসিল।

এই সময়ে রাণী তাঁহার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া রাজ্যের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং দেশের সর্ববিধ সংস্কার-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মীবাই যেমন বুদ্ধিমতী ছিলেন, সেইরূপ ছিল তাঁহার প্রত্যেকটি কাজ সুনিপুণ ভাবে সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা। তাঁহার কার্য্যকুশলতা ও কূটবুদ্ধির পরিচয় ইংরাজ রাজপুরুষেরা সম্পূর্ণ ভাবে অবগত ছিলেন। ঝাঁসী রাজ্যের আধিপত্য গ্রহণে রাণীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কুদ্ধ সদাশিব রাও করায়া দুর্গ অধিকার করিয়া নিজেকে ঝাঁসীর রাজা বলিয়া প্রচার করেন। রাণী অসীম সাহসের সহিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সদাশিব রাওয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং অনায়াসে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া ঝাঁসীর দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন।

ব্রিটিশ প্রভাব বিলুপ্ত হইবার পর নিকটবর্ত্তী রাজা ও নবাবেরা ঝাঁসীর রাণীকে অসহায় মনে করিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য বার বার প্রলুব্ধ হন। তাঁহার প্রবল শত্রু ওর্চা রাজ্যের বন্দেলা রাণা তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ নথেখাঁর অধিনায়কত্বে ঝাঁসী বিজয় করিবার জন্য এক বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলে রাণী যে অদ্ভুত সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের নেতৃত্বাধীনে পুরুষ সেনাবাহিনীর সহিত নারীসেনাও রণবেশে সজ্জিতা হইয়া নথেখাঁর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। লক্ষ্মীবাইয়ের অসাধারণ বীরত্বপ্রভাবে শেষ পর্য্যন্ত নথেখাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। এদিকে কর্ত্তব্য-পরায়ণা রাণী তাঁহার এই বিজয়বার্ত্তা গবর্ণর জেনারেলের এজেন্ট কর্ণেল হ্যামিলটনের নিকট প্রেরণ করেন কিন্তু বন্দেলার ধূর্ত্ত কর্ম্মচারিগণ কৌশলে সেই লিপিখানি সংগ্রহ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে রাণীর সম্পর্কে অনেক অসত্য কথা লিখিয়া এজেন্টের নিকট পাঠাইয়া দিল। বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের ফলে কোথায় রাণী দশ মাস কাল ঝাঁসী রাজ্য সংরক্ষণ করিবার জন্য পুরস্কৃত হইবেন—তাহা না হইয়া হইল তাহার বিপরীত।

ইংরাজের অনুপস্থিতি কালে রাণী লক্ষ্মীবাই দশ মাস কাল পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের শাসনকার্য্যে যে নিপুণতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া ধর্ম্মকার্য্য, অধ্যয়ন, পারিবারিক কার্য্য ইত্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। লক্ষ্মীবাই তখন মাত্র তেইশ বৎসর বয়স্কা যুবতী—তিনি ছিলেন সুন্দরী এবং গুণবতী। অশ্বারোহণে ছিল তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র তিনি অশ্বারোহণে পর্য্যটন করিতেন। তিনি প্রকাশ্য দরবারে বিচার-প্রার্থীদের আবেদন ও নিবেদন শুনিতেন এবং সমীপস্থ কর্ম্মচারীদিগকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যথাযোগ্য উপদেশ দিতেন। বিচার-কার্য্যে, শাসন-সংরক্ষণে, সৈন্য-পরিচালনে এবং রাজ্যের সর্বত্র শান্তিবিধানে যেমন ছিল তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা আবার তেমনি তিনি দয়া, দাক্ষিণ্য ও সৌজন্য প্রভৃতি নানাবিধ গুণের আধার ছিলেন। তিনি হতভাগ্য, আহত ও গৃহহারা সৈনিকদিগের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতেন, আহারের জন্য অন্নসত্র খুলিয়া দিতেন। আহতদের চিকিৎসা কালে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতেন এবং সেবা ও অজস্র সান্ত্বনা বাক্যে উৎসাহিত করিয়া তাহাদের দুঃখের লাঘব করিতেন। এক দিকে যেমন ছিল তাঁহার চরিত্রের কঠোরতা, অন্য দিকে ছিল তেমনি তাঁহার চরিত্রের কোমলতা।

রাণীর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার একমাত্র পুত্র দামোদর রাওকে ঝাঁসীর ভাবী উত্তরাধিকারিরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পরিশ্রম ও শাসন-নৈপুণ্যের পুরস্কার দিবেন, কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না। এদিকে ইংরাজ সেনাপতি স্যার হিউ রোজ বিদ্রোহ দমন করিতে ঝাঁসীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময় রাণী কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার নিকট সমুদয় বিষয় বিবৃত করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ইংরাজ সেনাপতির ঔদ্ধত্যপূর্ণ অপমানজনক ব্যবহারে রাণী প্রাণে আঘাত পাইলেন। তিনি আপনাকে যারপর-নাই অপমানিত মনে করিয়া নিজের আত্ম-সম্মান ও রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন; কারণ, অসম্মান অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ—ইহাই ছিল রাণীর মূলমন্ত্র। ইংরাজ চাহিলেন ঝাঁসী দখল করিতে, কিন্তু রাণী লক্ষ্মীবাই দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"মেরি ঝাঁসী দেঙ্গি নেহি।"

২৩শে মার্চ্চ। রাণী ও ইংরেজের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই বিপদের মধ্যে পড়িয়াও সুন্দরী তরুণী লক্ষ্মীবাই কোনরূপে বিচলিত না হইয়া আক্রমণকারীদের আক্রমণ নিবারণের জন্য প্রকৃত বীর-রমণীর ন্যায় সাহস ও নির্ভীকতা প্রদর্শন করেন। ইংরাজের সুসজ্জিত রণনিপুণ সৈন্যবাহিনীর তুলনায় রাণীর সৈন্যসংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। কিন্তু তথাপি ঝাঁসীর রাণীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার দ্বারা প্ররোচিত হইয়া শক্তিশালী ইংরাজের বিরুদ্ধে ঝাঁসীর সৈন্যদল অসাধারণ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এক দিকে প্রজাদের রক্ষণ ও পালন, অপর দিকে যুদ্ধের আয়োজন ও পরিচালন—এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পড়িয়াও রাণী ভীতিবিহ্বলা হইয়া হাল ছাড়িলেন না। এমন কি, ইংরাজ সেনাপতিরা পর্য্যন্ত অকুণ্ঠিত চিত্তে রাণীর বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। এই ভাবে একাদশ দিন পর্য্যন্ত সমান ভাবে যুদ্ধ চলিয়াছিল। কখনও বিজয়িনী হইতেন ঝাঁসীর রাণী—আবার কখনও হইত ইংরাজের জয়। এই সময় বিদ্রোহী দলের নেতা তাঁতিয়া টোপী ঝাঁসীর রাণীকে সাহায্য

"নিমন্ত্রিতেরা সকলেই এসেছেন...

এবার চা খেতে খেতে চলবে খোশগল্প...গল্পের আসর অবশ্য বেশ ভালোভাবেই জমে উঠবে কিন্তু চা খেয়ে তাঁরা নিশ্চয়ই নিরাশ হবেন। তার কারণ গৃহকর্ত্রী চা তৈরি করেছেন একটা ভেজা আর ঠাণ্ডা পট-এ। তিনি হয়তো জানেন না যে ভালো চা করতে হ'লে চা ভেজাবার আগে পটটি বেশ ভালো করে শুকিয়ে গরম করে নিতে হয়।"

আয়েশ-আরামের জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক যখন তখন চা খেয়ে থাকেন। কিন্তু ভালো চায়ের স্বাদ যে কী তা অনেকেই জানেন না। এটা কম দুঃখের কথা নয়। অথচ ভালো চা তৈরি করা কঠিন নয় এবং খরচও তাতে মোটেই বেশি পড়ে না। শুধু পাঁচটি সহজ নিয়ম মেনে চললেই চমৎকার চা তৈরি করা যায়। স্বাদে গন্ধে সবদিক দিয়ে চা-টা ভালো করতে হলে এই নিয়ম ক'টি মনে রাখবেন এবং আপনার বাড়িতে চা করবার সময় সবাই যাতে এগুলো মেনে চলেন সে দিকে নজর রাখবেন।

চা তৈরির পাঁচটি সহজ নিয়ম

১। টাটকা জল ফুটিয়ে, তাজা ফুটন্ত অবস্থায় ব্যবহার করবেন ২। চা ভেজাবার আগে পটটা গরম করে নেবেন ৩। মাথা-পিছু এক চামচ আর ঐ সঙ্গে আর এক চামচ বেশি চা দেবেন ৪। চা-টা তিন থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত ভিজতে দেবেন ৫। কাপে চা ঢালার পর দুধ চিনি মেশাবেন।

ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও তামিল ভাষায় "চা তৈরির খুঁটিনাটি" নামে একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড, ১০১ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় ভাষার উল্লেখ করে চিঠি লিখলেই পুস্তিকাখানা বিনামূল্যে আপনার নামে পাঠানো হবে।

★

খুব ভালো ভালো-তৈরি চা

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

করিবার জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু রণদক্ষ কৌশলী হিউ রোজের আকস্মিক আক্রমণে তাঁতিয়ার অগ্রগামী সৈন্যদল পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়াও রাণী নিরাশ হইলেন না বা তাঁহার উৎসাহ কমিল না। তিনি আত্মসমর্পণ না করিয়া নিজের দেশ, জাতির সম্মান ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত নবীন উদ্যমে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এদিকে কয়েক দিনব্যাপী ভীষণ সংগ্রামের পর যখন রাণী দেখিলেন যে আর কিছুতেই রাজ্য রক্ষা করা যাইতেছে না, তখন একবার আপনার দুর্গের দিকে শেষ দৃষ্টিপাত করিয়া গভীর নিশীথে মাত্র অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ তিনি ঝাঁসীর দুর্গ ত্যাগ করেন।

স্যার হিউ রোজ রাণীকে জীবিতাবস্থায় ধৃত করিবার জন্য লেফটেন্যাণ্ট ওয়াকারকে প্রেরণ করেন; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, রাণীর ভাগ্যে কোন অসম্মান ঘটে নাই। কর্ণেল ওয়াকার বিদ্যুদ্বেগে পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে রাণীর নিকটবর্তী হইলেন, কিন্তু রাণী তৎক্ষণাৎ শাণিত তরবারি দ্বারা ওয়াকারকে আঘাত করেন। ওয়াকার ভূপতিত হইলে রাণী সেই সুযোগে নির্ব্বিঘ্নে কাল্পিতে পৌঁছিলেন এবং বিদ্রোহী দলের অধিনায়ক নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী ও রাও সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন—রাণীর অনুরোধ রক্ষিত হইল। এই সময় রাণী পুরুষের বেশে সজ্জিতা হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা যে কোন রণ-নায়কের পক্ষে গৌরবের বিষয়। কাল্পির যুদ্ধে রাণী যে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেন তাহার তুলনা নাই। কিন্তু রাওসাহেব পলায়ন করায় তাঁহাকেও রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। গর্ব্বিত রাওসাহেব এক জন সামান্য মহিলাকে নেতৃত্ব দিতে এবং তাঁহার নিকট যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন—যদিও পরে তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পরে রাণীর অপূর্ব্ব বীরত্ব-প্রভাবে রাও সাহেব বিজয়-গৌরবে গোয়ালিয়র দুর্গ হস্তগত করেন।

গোয়ালিয়র পতনের সংবাদ অবিলম্বে স্যার হিউ রোজের নিকট পৌঁছিলে, তিনি সসৈন্যে গোয়ালিয়রের দিকে যাত্রা করেন। তাঁহার ন্যায় রণকুশল বীরও কল্পনা করিতে পারেন নাই যে ঝাঁসীর রাণী এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। স্যার-হিউ রোজের সহিত দেশীয় সৈন্যদের মোরারিতে ভীষণ যুদ্ধ হইল। মোরার শীঘ্রই স্যার হিউ রোজের অধিকৃত হইল। এদিকে রাণী লক্ষ্মীবাই রণরঙ্গিণী বেশে বেগবান অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উজ্জ্বল কৃপাণ-হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এই অগণিত ইংরাজ-সেনার পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখা রাণীর পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিতে লাগিল। এই ভাবে তিন দিন ধরিয়া অনবরত যুদ্ধ চলিবার পর রাণীর পক্ষের পরাজয় হইল এবং ইংরাজ পক্ষ জয়ী হইল।

রাণী যখন দেখিলেন যে তাঁহাদের আর জয়ের আশা নাই, তখন একান্ত নিরুপায় হইয়া কতিপয় অনুচর সহ তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইতেই রাণী ইংরাজ-সেনার বেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া গেলেন। এইরূপ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পড়িয়াও এই অসামান্যা তেজস্বিনী মহিলা অদ্ভুত শৌর্য্য ও বীরত্বের সহিত তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া তড়িদ্বেগে ধাবিত হইলেন এবং অন্তিম মুহূর্তেও কতিপয় ইংরাজ অশ্বারোহীর সহিত কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত অসি-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তার পর এক জন ইংরাজ অশ্বারোহীর অসির আঘাতে রাণীর মস্তকের দক্ষিণ ভাগ বিচ্ছিন্ন হইল এবং একটু পরেই রাণীর প্রাণহীন দেহ ধূলায় লুণ্ঠিত হইল—বীর-নারীর শোণিতস্পর্শে ধরণীর ধূলি পবিত্র হইয়া গেল। শত্রুর রক্তে অসি রঞ্জিত করিয়া মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে রাণী লক্ষ্মীবাই পরলোকে মহাপ্রয়াণ করেন। প্রকৃত বীরাঙ্গনার কাম্য-মৃত্যুই তাঁহার ঘটিয়াছিল।

রাণী মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে বলিয়াছিলেন—"আমার দেহ যেন ইংরাজের হাতে পড়িয়া কলঙ্কিত না হয়—আমি জীবনে ও মরণে বিজয়িনী—আমার সেই কথা রক্ষা করো তোমরা।"

সিপাহী বিদ্রোহের যুগে ঝাঁসীর রাণীর এই অনবদ্য বীরত্ব-কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। নৈতিক চরিত্রে বলবতী, কঠোর ব্রতাবলম্বিনী এই ভারত-বীরাঙ্গনা ছিলেন সর্ব্ববিষয়ে প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্না মহীয়সী মহিলা। শৌর্য্যে, বীর্য্যে, পরাক্রমে এই মনস্বিনী নারী সমাজের শীর্ষে আপনার ও নারী জাতির সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভোগ-বাসনা, বিলাস-ব্যসনাদি তাঁহাকে কখনও আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। এই মৃত্যু-বিজয়িনী নারী অমর লোকে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু—"মেরি ঝাঁসী দেঙ্গি নেহি"—বীর রাণীর এই অগ্নিগর্ভ বাণী যুগে যুগে তাঁহার বীরত্বের কাহিনী চিরস্মরণীয় ও চির বরণীয় করিয়া রাখিবে। যে বীর-সম্রাজ্ঞী শতবর্ষ পূর্ব্বে দেশের স্বাধীনতার জন্য ভীষণ সমরানলে আত্মবিসর্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ছিলেন না, তাঁহারই পুণ্য অবদান-কাহিনী যুগে যুগে শুভ স্মরণীয় স্বাধীনতা উৎসবের দিনে বিশ্ববাসীর অন্তরে নব প্রেরণা ও আশার বাণী সঞ্চারিত করিয়া দিবে। রাণীর পুণ্য-নামেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র 'ঝাঁসীর রাণী সৈন্যবাহিনী' গঠন করিয়াছিলেন।

আমায় যদি প্রশ্ন কর

এলেনর রুজভেল্ট

[নানা বিষয়ে প্রশ্ন-সম্বলিত বহু চিঠি পান মিসেস্ রুজভেল্ট। তিনি আমেরিকার মেয়েদের কাগজ 'জার্ণালে'র মারফৎ সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। এখানে উদাহরণ-স্বরূপ কতকগুলি প্রশ্ন ও তার উত্তর তুলে দেওয়া হোল।]

প্রশ্ন :

কুড়ি বছরের বহু তরুণ-তরুণীর মত আমিও স্বামিহীন নিরালা ভবিষ্যতের ভয়াবহতার মুখোমুখি হতে চলেছি। কাউকে ভালবাসবার নেই—নেই কোন জীবন-সাথী। আমরা যারা বিয়ে করি না তাদের নিঃসঙ্গতার ভয়মুক্ত, পরিপূর্ণ, সুখময় জীবন যাপন করতে আপনি কি উপদেশ দেবেন? আপনি কি মনে করেন, অধিক শিক্ষা যা বুদ্ধিধর্মী মানসের ক্ষেত্রে মেয়েদের পুরুষদের উপরের তলায় পৌঁছে দেয় তা ব্যর্থ তাদের জীবনে?

উত্তর :

যে সমস্ত মেয়েরা বিয়ে করে না তাদের আমি ছোটদের নিয়ে মেতে থাকতে উপদেশ দি, তাহলে নিজের সন্তান থাকলে যেমন হোত তেমনি পরের শিশুদের নিয়েও সমান সুখ-শান্তি পাওয়া যেতে পারে। আরো আমি তাদের উপদেশ দেব—তারা যেন সমাজের

এটলান্টিস (ইষ্ট) লিঃ, ২০-১, চেতলা রোড, কলিকাতা

বন্ধন আরো নিবিড় করে তোলে—এমন কোন কাজে উৎসাহ সৃষ্টি করে যা' তাদের বাধ্য-বাধকতার ডোরে বেঁধে রাখবে। তাহলে সময় আর তাদের ঘাড়ে দুর্বহ বোঝার মত চেপে বসবে না—জীবনও মনে হবে না অর্থহীন বিরাট শূন্য।

আমার মতে অধিক শিক্ষা বলে কিছু নেই এবং ভাগ্যক্রমে সাধারণ শিক্ষা জুটেছে বলেই পুরুষদের সঙ্গে পার্থক্যের গণ্ডী টানা যায় না। সুবিধা-সুযোগ পেলে যে কোন চরিত্রবান লোকই সে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। দেখা গেছে, বই-পড়া বিদ্যালাভের সুযোগ পায়নি এমন বহু লোকই যারা পেয়েছে তাদের চেয়ে ঢের বেশী জ্ঞানবান। শিক্ষা যদি পরিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার মত যথেষ্ট বুদ্ধি না যোগায় যাতে গুণাগুণ বোঝবার ক্ষমতা আসে, নিজের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পরের আরো সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার যোগ্যতা যদি না দেয় যার ফলে তাদের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থের অবিরত সংঘর্ষ বাধে—সে ক্ষেত্রে আমাকে বলতেই হবে শিক্ষা ভালর চেয়ে মন্দই করেছে বেশী।

* * * *

প্রশ্ন :

আমার বয়স ষোল। আমার সমস্যা হোল, আমার বাবা-মা এই বয়সের আমোদ-প্রমোদ দেখতে পারেন না। আমি খেলাধূলা পছন্দ করি এবং স্কুলের খেলাধূলা নিয়ে অন্য সহরে যেতে চাই। কিন্তু বাবা-মা এর ঘোর বিরোধী। তাঁদের ইচ্ছে সপ্তাহের ছ'দিনই আমি বাড়ীতে থাকি। রবিবারে চার্চে যাই। বাড়ীতে থাকাও আমি পছন্দ করতুম কিন্তু বাড়ীতেও আমার আমোদ-আহ্লাদের সীমানা বেঁধে দেওয়া। কোন হত্যাকাহিনী সিরিজ পড়া বা রেডিয়ো শোনা নিষেধ। আরো বাবা নিজেই সারা সন্ধ্যা রেডিও আগলে বসে থাকেন। আমি তাহলে কি করব? মা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাব? এ কথাটা তাঁকে কি করে বোঝাব যে আমার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন—বাইরে যেতে আমি ভালবাসি?

উত্তর :

না, আমি যদি তোমার অবস্থায় পড়তুম কখনই মা'র বিরুদ্ধে যেতাম না। আমার মনে হয়, যখন তুমি স্কুলের খেলাধূলা নিয়ে অন্য সহরে যাও তখন তোমাদের অভিভাবিকাকে যদি মা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও তিনি হয়ত তোমায় যেতে দিতে আরো বেশী আগ্রহান্বিত হবেন। হয়ত এক সময় বাবা-মা তোমার সম্পূর্ণ ব্যবহারের জন্য একটি রেডিও কিনে দিতেও পারেন। কিন্তু রহস্য সিরিজ পড়তে না দিয়ে এবং যখন অন্য অনেক কাজ করার আছে তখন রেডিও শোনা বন্ধ করে দিয়ে আমার মতে ভালই করেছেন তাঁরা। তোমাদের বয়সে প্রাত্যহিক করণীয় বহু কাজ আছে। বাবা-মা'র সঙ্গে আলোচনা করে এমন একটি সময় ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে যখন নিজের খেয়াল-খুশী মত চলতে পারবে এবং সে সময় ইচ্ছা মত রেডিও প্রোগ্রামও শুনতে পার। কাদের সঙ্গে তোমরা বাইরে যাচ্ছ অভিভাবকরা জানতে পারলে নিশ্চয়ই তাঁরা তোমার খুশী মনে বাইরে যেতে দেবেন। পড়া, রেডিও শোনা এবং যাদের সঙ্গে মিশবে সেই সঙ্গী নির্বাচনে সুরুচির প্রমাণ পেলে তাঁরা এ সব ব্যাপারে তোমাকে অধিকতর স্বাধীনতা দিতে একটুও কুণ্ঠিত হবেন না।

* * * *

প্রশ্ন :

এক বছরের বেশী হবে আপনার 'মাই ষ্টোরি' পড়েছি। এ সম্বন্ধে আরো জানতে চাই। এ নিয়ে আরো লেখার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর :

আমি এখন আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে ব্যস্ত। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে আশা করি।

* * * *

প্রশ্ন :

উনবিংশ শতাব্দীর যে উদারনৈতিক দল ব্যক্তি-স্বাধীনতা নিয়ে ষ্টেট বা সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে আজকের দিনে তারাই অধিকার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা করছেন। কিন্তু কেন?

উত্তর :

কারণ, আজকের তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীর লোকেরা কম স্বাধীনতা ভোগ করত। ব্যক্তিমাত্রই কতকগুলি মৌলিক অধিকারের দাবী করতে পারে, এ কথা সরকার-পক্ষ স্বীকার করতেন না সেদিন। দাক্ষিণ্য দেখান হোত বটে কিন্তু চিরকালের মত এ-প্রথা উঠিয়ে দেবার কথা তারা কল্পনাও করতে পারতেন না। কিন্তু আজকের দিনে এটা স্বীকৃত যে, সরকারকে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার এমন সতর্ক ভাবে রক্ষা করতে হবে যে সেই দাক্ষিণ্য প্রকাশের সুযোগ কোন মতেই যাতে না ঘটে।

আজকের দিনে উদারনৈতিকরা অধিকার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সরকারের পক্ষে ওকালতি করছেন তার উদ্দেশ্যই হোল আধুনিক কালের জটিল পৃথিবীতে এমন কতকগুলি অধিকার রক্ষা করা যা' জনসাধারণ অতি মৌলিক বলে দাবী করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা দাবী করে থাকি, কর্মপ্রার্থী প্রত্যেককে তার দক্ষতামত কাজ যোগাড় করে দিতে হবে এবং এমন মাহিয়ানা দিতে হবে যাতে তার ও তার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্বাহ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিকদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হোত না—কাজেই সেদিন অধিকার নিয়ন্ত্রণের কোন প্রশ্নই ওঠেনি। অধিকার নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন এসেছে তখনই যখন সভ্যতার জটিলতায় তাদের অপরিহার্যতা অনতিক্রমণীয় হয়ে উঠেছে।

প্রীতি উপহার

কৃষ্ণসুচিত্রা মিত্র

সুপ্রীতিদের বিয়ের তারিখ আজ।

ঠিক তিন বছর আগে সম্পূর্ণ অপরিচিত সুপ্রকাশ তার একটি মাত্র মালার বিনিময়ে সুপ্রীতির সমস্ত কিছু জয় করে নিয়েছে।

সুপ্রীতি মেনেছে পরাজয়। এই পরাজয়ের মাঝে জয়ের চেয়েও বেশী পরিমাণ সাফল্য লুকিয়ে আছে।

সেদিন গোধূলি লগ্নে সে পুরানো দিনের আবেষ্টনী ছেড়ে এসে দাঁড়াল নতুন এক জগতে। সেখানে নূতন আলোর স্পর্শে সব কিছুই রাঙা।

ছোট্ট তাদের সংসার। অভাবের লক্ষ সেখানে নিজের অস্তিত্ব [illegible] না। [illegible]

না। সুপ্রীতির ছোট্ট শান্তির নীড়টি শান্তময় হয়েই থাকে। দর শেষ দিনটিতে সুপ্রকাশ যখন তার সারা মাসের উপার্জন । সুপ্রীতির হাতে তুলে দেয় তখন সুপ্রীতির সুন্দর চোখে নেমে স জল।

এর বেশী তার প্রয়োজন হয় না, কাম্যও নয়।

সুপ্রীতির বাবা মারা গেলে ওর বিমাতার সঙ্গে তার ভাইয়ের টীতে যে কয়েক বৎসর আন্দামানের নির্ব্বাসিত কয়েদীর মত টিয়েছে তা ওর চিরদিন মনে থাকবে।

বৈমাত্রেয় ভাই-বোনগুলির অন্যায় অত্যাচার ও তাদের পরিবার-র্গর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, এ সব থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে সুপ্রকাশ।

দু'খানি ঘরের মাঝে ছোট এক-ফালি বারান্দা। রান্না আর থরুম দু'টি বারান্দার এক ধারে।

এতটুকু জায়গার মধ্যে বাস করেও সুপ্রীতি সুখী, সত্যিই সুখী।

ছোট্ট ঘর দু'টির ওপর সুপ্রীতির অসীম মমতা। মায়ের মত হে নিয়ে বার বার সাজিয়ে তোলে মনের মত করে।

ছোট্ট উনানটি আগুন ধরিয়ে মাঝে মাঝে কিছু নতুন জিনিষ ন্না করে। সুপ্রকাশের পাতে পরিবেশন করে সে চায় প্রশংসা।

মাঝে মাঝে সাধ যায় সুপ্রকাশের অজ্ঞাতে কিছু জিনিষ কিনে ান্না করে সুপ্রকাশকে একেবারে বোকা বানিয়ে দেয়। নীচের াস্তা দিয়ে পসারীর দল গেলেও তাদের আচরণ সম্বন্ধে সন্দিহান য়ে ডাকার সাহস থাকে না।

আজ সত্যিই সুপ্রকাশ বিস্ময়ে অভিভূত হবে। রান্না চড়িয়ে বকাল বেলা সুপ্রীতি বসে বসে ভাবতে থাকে।

খেতে বসেই সুপ্রকাশ চমকে যাবে। ভাবতে বেশ মজা লাগে সুপ্রীতির।

মাংসের কোর্ম্মা, চিংড়ী মাছের মালাই কারী, কাঁচা আমের মিষ্টি চাট্‌নী, মাছের চপ, পেঁয়াজ দিয়ে মুসুর ডাল আর সুপ্রকাশের প্রিয় কয়েকটা তরকারী···

সুপ্রীতি হিসেব করে মনে মনে।

সুপ্রকাশ সত্যিই ভেবে স্থির করতে পারবে না যে সুপ্রীতি এত আয়োজন করলে কি করে?

এক দিন বাজার আনতে ভুল করলে ওর ভাত-ডাল ভিন্ন অন্য তরকারী জুটবে না, সে সুপ্রীতি সুপ্রকাশের সাহায্য ছাড়া এত জিনিষ জোগাড় করলে কোথা থেকে, বেশ ভাববার কথা বৈ কি।

তিন তলার ফ্ল্যাটের চাকর হরিয়াকে দিয়ে সুপ্রীতি এ জিনিষগুলি যোগাড় করেছে, বিনিময়ে সে নিয়েছে একটি টাকা। তাছাড়া, আজই না কি বাজারের সব জিনিষ-পত্রের দাম বেড়ে গেছে। সুপ্রীতি বুঝেছে সব—কিন্তু একটা দিন ত' মোটে।

সুপ্রীতি জানে, সুপ্রকাশ আজ খেতে বসেই আশ্চর্য্য হয়ে তাকে প্রশ্ন করবে—এত সব যোগাড় করলে কোথা থেকে? আলাদীনের পিদ্দীম ঘষে না কি?

হাতের ওপর নেমে-আসা গোলাপী রেশমী শাড়ীটাকে কুঞ্চিত করে কাঁধের ওপর তুলে দেয় সযত্নে।

এই শাড়ীটা গত বছর উপহার দিয়েছে সুপ্রকাশ। মনে পড়ে সেই দিনের ছোট্ট ঘটনাটি।

সেদিনও সুপ্রীতি এমন উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করছিল সুপ্রকাশের ফেরার পথ চেয়ে। যে সুপ্রকাশ বাড়ী ফেরে প্রতিদিন আটটায়—রাত্রি দশটার সময়ও সে ফিরল না। শঙ্কাকুল চিত্তে সে বার বার ঘরে-বাইরে ছোটাছুটি করছিল।

কিছুক্ষণ পরে তার সমস্ত ভাবনা-চিন্তার অবসান করে হাতে একটা কাগজের প্যাকেট নিয়ে ঢুকল সুপ্রকাশ।

প্যাকেটটা সুপ্রীতির কোলে দিয়ে সে বললে, প্রীতির "প্রীতি উপহার", যাও চট করে পরে এস, দেখি আমার পছন্দ কেমন।

অত রাত্রে নূতন শাড়ী পরার কোন সার্থকতা খুঁজে পেলে না সুপ্রীতি। কিন্তু সুপ্রকাশের জিদে সে পরতে বাধ্য হল।

নতুন শাড়ীটা পরে এসে সুপ্রীতি সলজ্জ ভঙ্গীতে একটা প্রণাম করল।

শাড়ীটা বেশী দামী না হলেও সুপ্রীতির গোলাপী দেহের সঙ্গে খুব মানিয়েছিল। প্রণাম করতেই সুপ্রকাশ পরিহাস ভরে হেসে উঠল।

অস্থানে মনুসংহিতাকে টেনে এনে তুমি আয়েষাকে অপমান করলে। সমস্ত কবিত্ব নষ্ট করে দিলে—আচ্ছা আমি যে এত খুঁজে এমন পছন্দসই শাড়ীটি এনে তোমায় আরো সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী করে তুললুম, সে জন্যে কই একটা ধন্যবাদ পর্য্যন্ত দিলে না?

সুপ্রীতি সহাস্যে বললে যদিও লুচি-ভাজার বদলে পাখী হয়ে যাওয়াই আয়েষার পক্ষে সম্মানজনক ছিল, কিন্তু তোমার এ পরী এখন ডানা-কাটা পরী—উড়তে পারবে না। কাজেই মনুসংহিতার মান রাখাই ভাল।

গত বছরের সেই স্মৃতিটা আজ সুপ্রীতির স্পষ্ট মনে পড়ে।

দুই

ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজতেই সুপ্রকাশ কাজ ছেড়ে উঠে পড়ল। তাড়াতাড়ি নেমে এসে ট্রামে চড়ে বসল। খানিকটা পথ গিয়ে হলদে রং-এর একটা বাড়ীর সামনে নেমে পড়ল।

ছাত্র পড়ান শেষ করে সাতটার সময় সে এগিয়ে চলল ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে কলেজ স্ট্রীটে।

সুপ্রকাশের আদেশ মত রাশি রাশি শাড়ী বার করলে দোকানদার।

সমস্ত এড়িয়ে সে সাদার ওপর লাল প্রিন্টেড একটা জর্জেট তুলে নিলে। বেশ মানাবে সুপ্রীতিকে।

—এটার দাম কত?

—ছাপ্পান্ন টাকা নয় আনা তিন পাই সেলস্ ট্যাক্স শুদ্ধ।

—তাহলে একটু পড়েছে—

—আজ্ঞা—

সুপ্রকাশ মুখ তুলে চাইলে পাশের ভদ্রলোকটির দিকে। মনে হল যেন চেনা, কিন্তু···

আবার মুখ তুলে চাইতেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে চোখ মিলে গেল। তিনি বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে সুপ্রকাশের পিঠে একটা থাপ্পড় দিয়ে বললেন—আরে, প্রকাশ যে? গলার স্বরে সুপ্রকাশ চিনতে পারলে।

—তুই মণিশঙ্কর?

—চিনতে ভুল হচ্ছে না কি ?

—নিশ্চয়ই, কত দিন পরে দেখা—তার পর ?

—তখন থেকে মনে হচ্ছে চিনি—তার পর যখন মুখ তুললি—তখন আর একটুও সন্দেহ রইল না। সত্যি, কত দিন পর দেখা! শাড়ী নিচ্ছিস্ না কি? কার? সুপ্রকাশের কাণের কাছে মুখ এনে প্রশ্ন করলে—মানসীর ?

—আঃ মণি, কি হচ্ছে একটু লজ্জা-সরম নেই ?

—দূর, লজ্জা কি আমাদের অলঙ্কার? বল না শুনি ?

—আমার স্ত্রী···

—সত্যি? লুকিয়ে লুকিয়ে শেষটায়···

—তোর কাছে ছাড়া আর কারো কাছে লুকিয়ে নয়। সত্যি কত খোঁজ করলুম তোদের সেই পুরানো বাড়ীতে গিয়ে, কিন্তু কেউই খোঁজ দিতে পারলে না। ছিলি কোথায় ?

—সে অনেক কাহিনী, পরে হবে—তা হঠাৎ শাড়ীর দোকানে ?

—তুই কি মুড়ি বেচতে ঢুকেছিস্ ?

—না, কিন্তু হঠাৎ শাড়ী কেন? ম্যারেজ য্যানিভারসারী না কি ?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই···

—হাউ লাকি আই য়্যাম। যাক্, আজ আর ফাঁকি দিস নে প্রকাশ—খুব দিনে সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

—নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার বন্ধু-স্ত্রী কেমন হলেন? কোন্ রং মানাবে তাঁকে ?

—মানে? ও—না না, ভুল ভুল—বিয়ে করবার সময় পাইনি এখনও। মণিকার জন্যে কিনতে এলুম। মণিকাকে নিশ্চয়ই মনে আছে।

—হ্যাঁ, কিন্তু তুই নিয়ে নে এইবার, নয় ত দেরী হয়ে যাবে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, ওহে, একটা একজোড়া বেনারসী দেখান ত।

বিক্রেতার মুখ লাভের আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বেনারসীর গাঁটরী বার করে। সুপ্রকাশ অনিমেষে চেয়ে থাকে বেনারসীর শাড়ী চোখ-ধাঁধানো রূপে।

সারা গায়ে সোণালী নক্সা করা সবুজ একখানি শাড়ী তুলে নিয়ে সুপ্রকাশকে প্রশ্ন করে মণিশঙ্কর,—এটা কেমন হবে বল ত' ?

সুপ্রকাশ শাড়ীর দাম দেখতে চায় মণিশঙ্কর বাধা দেয়,—আগে দাম কেন? শাড়ীটা কেমন তাই বল না।

—দামে চললেই সব ভাল।

—থাম থাম, অত আধ্যাত্মিক বচন ঝাড়িস নে।

—তোর মত হলে কি বলতুম না কি ?

—থাক না বাপু তোর তত্ত্বকথা—এটাই নি, কি বল ?

এর জোড়া আর একটা দিন—দু'টো জায়গায় দেবেন। কথা শেষ করে মণিশঙ্কর সিগারেট ধরালে। সুপ্রকাশের দিকে এগিয়ে দিলে কেসটা।

—আচ্ছা মণি, এক রকমের দু'টো নিলি? পছন্দ করবে না।

—পছন্দ করবেই, কারণ দু'জনের দু'খামা—কই বিলটা দিন।

সুপ্রকাশ একটু লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সাড়ে চারশো—সাড়ে চারশো—ম'শ, আবার সেলস ট্যাক্স—উঃ!

ওদের সঙ্গে মণি মাত্র একটি বছর পড়েছিল। বড়লোকের [illegible]

হয়ে নিবিড় বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল। সেবার অকৃতকার্য্য হয়ে কলেজ ছেড়ে দেয়—বড়লোকের ছেলে। পড়ার আগ্রহ ছিল না তেমন—দরকারও হয়নি।

—চল। প্যাকেট দু'টো বগলে নিয়ে মণিশঙ্কর উঠে দাঁড়ায়।

—চল। সুপ্রকাশও এগিয়ে আসে।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে প্রশ্ন করে তার পর প্রকাশ, এখন কি করিস্ ?

—চাকরী আর দু'-একটা ট্যুইশনী—তাচ্ছিল্যস্বরে উত্তর দেয়।

—তবে বোধ হয় বেশী নয় আয় ?

—কম যে তাও নয়—তুই কিছু করিস্ ?

—হ্যাঁ, যুদ্ধের বাজারে অনেকগুলো ব্যবসা লাগিয়ে দিয়েছি আর কনট্রাকটারীতেও অনেক পয়সা···

—ভাল, তাই বুঝি বিয়ে করবার ফুরসৎ পাসনি ?

—খানিকটা তাই, কিন্তু তোর মানসীর কি হল ?

—কল্পলোকের মানসী কল্পনাতেই রয়ে গেলেন।

—বাস্তবে এলেন অন্য মানবী—কি ?

—তাই বটে।

—কিন্তু ইনিও কি পূর্ব্ব-পরিচিতা ?

—কেন ?

—নামটা কি বললি যেন? সুপ্রীতি না?—বেশ মিল ভাই, আর মনের মিলও নিশ্চয়ই খুব, না ?

সুপ্রকাশ হেসে উঠল।—হ্যাঁ, আজ পর্য্যন্ত ত তা বজায় আছে।

—প্রার্থনা করি চিরদিনই থাক, আয়—

ফুটপাত ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছে মণিশঙ্করের সাদা গাড়ীখানা।

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল মণিশঙ্কর—প্রকাশ, আজ আমি যেতে পারব না—ভীষণ দেরী হয়ে গেল, মণিকার আজ আশীর্ব্বাদ, একবারে ভুলে গেছি। এই শাড়ীটা বৌদিকে দিস। আমার কার্ডে নাম রইল—আসিস এক দিন এলোমেলো ভাবে কথাগুলো বলে গেল মণিশঙ্কর। গাড়ীর ষ্টার্টের শব্দে সম্বিত ফিরে এলো সুপ্রকাশের।

—এটা মণিকাকে দিস, জানলা গলিয়ে জর্জ্জেট শাড়ীর মোড়কটা মণিশঙ্করের পাশে ফেলে দেয়।

—আচ্ছা। মণিশঙ্করের সাদা গাড়ীটা একটা ঝাঁকুনী দিয়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

কাপড়ের মোড়ক আর নামের কার্ডটা নিয়ে অভিভূতের মতই সুপ্রকাশ ট্রাম-লাইনের ধারে দাঁড়ালো ট্রামের অপেক্ষায়।

তিন

ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুপ্রকাশ ভাবনার জাল বুনে চলে। মণিশঙ্করের উপহারের দামী শাড়ীটা সুপ্রীতিকে মানাবে চমৎকার! অকস্মাৎ চারি দিকে একটা গোলমাল ভরে উঠল।

—এই—এই—গেল—গেল—

সুপ্রকাশের মাথার ভেতরেও একটা ঝড় বয়ে গেল এলোমেলো ভাবে। পিছন থেকে সজোরে একটা ধাক্কা এসে লাগলো। আঘাত বেশী না হলেও গাড়ীটাতেই ভর করে স্থির হয়ে দাঁড়াল সুপ্রকাশ। কালো "প্যাকার্ড" দামী গাড়ী। [illegible]

মহিলাটি সুপ্রকাশকে চলে যেতে দেখে বল্লেন—সুবি—

কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে দাঁড়াল সুপ্রকাশ। সেই মুখ—সেই কণ্ঠস্বর—ও সন্দেহ নেই—শুধু বিস্ময় এনেছেন ওর মাথার উজ্জ্বল বিন্দুর মতই এক ফোঁটা সিন্দূর-রেখা! সুপ্রকাশ আবার ন ফিরে চলতে সুরু করে।

গাড়ীর ভেতর থেকে মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ স্বর ভেসে আসে—শ—সুপ্রকাশ—

এড়াতে পারে না সে আহ্বান। এগিয়ে আসে—কেন?

—কি সর্ব্বনাশ! সুপ্রকাশ—কি সর্ব্বনাশ হচ্ছিল—

—এমন আর বেশী কি? আমাদের জীবনের কতটুকু মূল্য ছে বলে মনে হয়?

—জানি না। উঠে এস, সত্যি ভীষণ ক্লান্ত তুমি—এস।

—না—সুপ্রকাশ উত্তর দেয়।

পরম বিস্ময় ভরে জনতা লক্ষ্য করে রাস্তার এই ঘটনাটুকু দের হাত থেকে—দৃষ্টির রাহু থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সুপ্রকাশ ঠ বসে কালো গাড়ীটার কোলে—মঞ্জুলার পাশে।

—আমার ক্লান্তিটা খুব সাময়িক—ঠিক তোমার সামান্য ক্ষণস্থায়ী ই খেয়ালটুকুর মত। কেন মিছে তুলে আনলে, খেয়াল মিটলে ত মি ছুটে যাব সংগ্রামময় জীবনে—আর তুমিও অদৃশ্য হবে নায় ভর করে—দু'জনে ত আবার ছিটকে যাব দু'দিকে।

সুপ্রকাশ নেমে যেতে চায়। তার ছোট্ট আস্তানাটির সামনে ভিজাত্যের প্রাচুর্য্যবতী রূপসী মঞ্জুলা, আর বিলাসের নিদর্শন ই প্যাকার্ড গাড়ীটি কিছুতেই নিয়ে যেতে পারে না। তার দন্যতাকে ভীষণ আঘাত করবে। তীরে আছড়ে-পড়া ঢেউএর তই সেই আঘাত তরঙ্গ তুলে আঘাত করবে সুপ্রকাশের ন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত।

সুপ্রকাশের বিদ্রূপটি হজম করে মঞ্জুলা। কোন কিছু গ্রাহ্য না রে পরিহাসের ভঙ্গীতে বলে—দোহাই তোমার, ও ইণ্টারেষ্টিং লেকচার থেকে আমায় রেহাই দাও। জানই ত, শুধু লেকচারের জ্বালায় কলেজে আমার বড় বিরক্ত ধরত, আমি যেতুম না।

* —জানি, আর আমার—শুধু বক্তৃতা কেন অনেক কিছু থেকেই রেহাই দিয়েছি তোমায়—বক্তৃতা ভাল লাগছে না? কিন্তু নো মঞ্জুলা দেবি, এক দিন, হ্যাঁ সে দিনটা ছিল বসন্ত পঞ্চমীর গোধূলি সন্ধ্যা···

—আর শুনতে চাই না—

—অনেক বার শুনেছ—একঘেয়ে লাগছে, না? আমার কাছে কিন্তু ওটা রোজই নতুন। শোন শোন একটু—আমাদের সেই মায়ের াকুরমার আমল থেকে শোন। অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত আর সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ত এখন পর্য্যন্ত পুরানো হয়নি। আচ্ছা সংক্ষেপেই বলি, বিরক্ত হচ্ছ? কিন্তু নিরুপায়—একটু শোনই না! সে দিন বসন্ত পঞ্চমীর নতুন বসন্ত আমার যুব-মনের সর্ব্বাঙ্গই রাঙিয়ে দিয়েছিল। প্রফেসর ব্যানার্জ্জীর কাছে আমার আবেদন-পত্র পেশ করতেই তিনি বসতে দিলেন তার চেয়ারটিতে, পিঠ চাপড়ে সোৎসাহে বললেন—ব্রাভো মাই বয়! আপার, আনন্দের বন্য লাগল! তিনি হাসতে হাসতে ছুরিকাঘাত করলেন আমার আশা-লতাটির মূলে। নতুন উদয়ে খুঁজে নেলে দিলেম বাতাসকে হতে—আর দিলেম

পুরো দু'টি ঘণ্টা লেকচার! ওঃ, অসহ্য সেই বৃদ্ধের উপদেশ। বিরক্ত হয়ে বললুম—ধন্যবাদ! তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন—যা বলার তা বলেছি এইমাত্র। উত্তর দিলাম—বুঝেছি। তার পর?

—তার পর মঞ্জুলা, তার পর কি হল?

—একই কথা বার বার পুনরাবৃত্তিতে আমি আনন্দ পাই না।

—আমি পাই যদিও আমারই ঘটল শোচনীয় পরাজয়, তবুও বেশ চমৎকার লাগে।

—ছিঃ, এত ভাবপ্রবণ তুমি! আমি তা জানতুম না—

সুপ্রকাশ হেসে ওঠে, সেইটাই মুস্কিল, নইলে তোমার মত অর্থ-প্রতিপত্তিশালীর মেয়েকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা আমার মত দরিদ্র যুবকের হোত না।

—আজ যদি তোমাকে আমি না দেখতুম তবে কিছুতেই বিশ্বাস করতুম না তুমিই সেই সুপ্রকাশ। মঞ্জুলা বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে।

হঠাৎ সুপ্রকাশের চমক ভাঙ্গে। গাড়ী খোলা ময়দানের ওপর দিয়ে চলেছে দ্রুতবেগে। সুপ্রকাশের গন্তব্য-স্থল ত এদিকে নয়—ঠিক বিপরীত দিকে, কিন্তু তবু চুপ করে থাকে—যাক না যত দূরে খুসী—মাত্র একটি দিনের তরে এই কাছে পাওয়াকে কেন সে তুচ্ছ করবে?

—আমাকে আগের মত দেখলে কি কিছু লাভ হোত? মঞ্জুলার কথার জবাব দেয় সুপ্রকাশ।

—দেখ, তুমি বিয়ে কর সুপ্রকাশ, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। হঠাৎ দার্শনিকের মত পরামর্শ দেয় মঞ্জুলা। সুপ্রকাশ একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ কি করছে সে?

—আমার অনেক দেরী হয়ে গেল মঞ্জু, এবার নামি, শুধু শুধু অনেকটা পথ চলে এলুম।

—শুধু শুধু—দীর্ঘশ্বাস চাপলে মঞ্জুলা। শুধু শুধু তোমায় এতটা পথ আনিনি, আজ তোমাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব, ভয় নেই। পৌঁছে দেব আবার।

সুপ্রকাশ উসখুস করে—সুপ্রীতির কথা মনে পড়ে যায়।

—কিন্তু বড্ড কাজ ছিল যে। কণ্ঠস্বরে দ্বিধা-মাখানো দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ দু'দিকেই সমান—মঞ্জুলা আর সুপ্রীতি-দু'জনকে কেন্দ্র করে মনের ভেতর একটা বেশ দ্বন্দ্ব সুরু হয়। বিবেক বলে—ছিঃ! অন্তরাত্মা জবাব দেবার ভাষা খুঁজে পায় না। শিক্ষা আর কামনার ভেদ এক হয়ে যায়।

—যত কাজই থাক, আজ তোমাকে কিছুতেই ছাড়ছি না—যখন এত দিন পরে দেখা। আপন মনে মঞ্জুলা বলে।

—কেন বল ত? আজ কি? সুস্পষ্ট আগ্রহ জেগে ওঠে ওর স্বরে।

—আজ? আজ থেকে ঠিক এমনি দিনে—একটি বছর আগে আমি যাকে পেলুম সে আমার স্বামী, আমার সমস্ত অতীতের ব্যর্থতা মুছে দিয়ে নতুন করে আঁকলে বর্ত্তমান উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

হঠাৎ যেন একটা চাবুক এসে লাগলো সুপ্রকাশের সুন্দর মুখটায়। অপমানে কালো হয়ে গেল ওর মুখ। ওর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করল না মঞ্জুলা।

—আজ আবার সেদিন এসেছে প্রকাশ—ও কি! কি হল?

মঞ্জুলার দৃষ্টি পড়ল সুপ্রকাশের দিকে।—অসুস্থ বোধ করছ প্রকাশ? স্নেহময়ী বোনের মতই প্রশ্ন করে স্নিগ্ধ কণ্ঠে।

সেই স্নিগ্ধতাকে চূর্ণ করে কঠিন কণ্ঠে সে বলে—না, কিন্তু মঞ্জু, আমাকে বিনা কারণে এত শাস্তি দিয়েও কি সন্তুষ্ট হওনি তুমি? তাই আজ আবার ডেকে এনেছ চূড়ান্ত অপমানের মাঝে?

মঞ্জুলার আবেগরুদ্ধ কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যায়। গোলমাল হয়ে যায় মাথার ভিতর, পরক্ষণেই লজ্জিত হয়—মনে পড়ে, সুপ্রকাশ যে এক দিন এই অধিকার চেয়েছিল—তারও আপত্তি ছিল না, শুধু মাঝ থেকে নিয়তির চক্রান্ত তাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। আগের মত না হোক, মঞ্জুলা এখনও তাকে ভালবাসে—এখনও স্মরণ করে ওর কথা। স্বামীর কথা মঞ্জুর তোলা উচিত হয়নি সুপ্রকাশের সামনে, ভ্রান্তি স্মরণ করে সে অনুতপ্ত হয়ে বলে—আমায় ক্ষমা কর প্রকাশ, তোমাকে অপমান করবার জন্যে আমি নিয়ে আসিনি।

—তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না তা আমি জানি, এখন আর নতুন করে কি দেখাবে? নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করে ওঠে সুপ্রকাশ।

—সুপ্রকাশ! তীব্র স্বরে মঞ্জুলা বলে। একটু চুপ করে থেকে ব্যথিত স্বরে বলে—সুপ্রকাশ!

সুপ্রকাশ নীরবে চেয়ে থাকে অন্ধকার আকাশের দিকে।

—প্রকাশ আমায় ক্ষমা কর। মঞ্জুলা সুপ্রকাশের হাত দু'টি চেপে ধরে। কব্জির হীরার বালা আর অনামিকার হীরার আঙটি দু'টি ঝকমক করে ওঠে।

সুপ্রকাশ ওর হাতটা মঞ্জুলার দিকে বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু কিছু বলার আগেই গাড়ীটা একটা আলোকোজ্জ্বল বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায়।

টালীগঞ্জের নীরব নির্জ্জন এক প্রান্তে চমৎকার বাড়ীটি। চারি দিকে আলো, চারি দিকে লোকজন, অভ্যাগত। মঞ্জুলার গাড়ীটা দাঁড়াতেই ছুটে আসে চাপরাসীর দল। মঞ্জুলা হুকুম দেয় জিনিষ-পত্র নামাতে। নিজে নেমে পড়ে, সুপ্রকাশকে ডাকে, এসো।

—যাই—হাতের প্যাকেটটা সঙ্গে নিয়ে নামে সুপ্রকাশ। এক জন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বলেন—এত দেরী হল কেন মঞ্জু?

সুপ্রকাশ ভাবে—মঞ্জুলা বলে ডাকাই এখন সঙ্গত, মঞ্জু নামটা এখন সকলেই ব্যবহার করছে, আর সুপ্রকাশ হারিয়েছে সে অধিকার।

—এই বন্ধুটিকে রাস্তা থেকে আবিষ্কার করে আনতে আনতে একটু দেরী হল, এর নাম সুপ্রকাশ সেনগুপ্ত আর প্রকাশ, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ ইনি কে?—আমার স্বামী মিঃ চ্যাটার্জ্জী।

ভদ্রলোক করমর্দ্দনের ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে দেন।

সুপ্রকাশ হাত তুলে নমস্কার জানায়।

একটু অপ্রতিভ হয়ে মঞ্জুলার স্বামীও প্রতি-নমস্কার জানায়।

—আপনার সঙ্গে আলাপ করে সুখী হলাম, সুপ্রকাশ বলে।

—"অল সো আই"—মঞ্জুলার স্বামী বলেন—কারণ মঞ্জুর কাছে আমি আপনার কথা সবই শুনেছি, মঞ্জু আপনার প্রতি অত্যন্ত—তা আপনি আসেন না কেন মাঝে মাঝে পুরানো বান্ধবীর গৃহে দয়া করে…

পুরানো স্মৃতির এক তন্ত্রীতে সজোরে নাড়া লাগে মিঃ চ্যাটার্জ্জীর কথায়।

—মাঝে মাঝে না ছাই!—আজই বড্ড আসছিল, নিতান্ত আমার পাল্লায় পড়েছিল তাই। কলকণ্ঠে মঞ্জুলা বলে।

—তাই না কি মিঃ সেনগুপ্ত? "আমার মঞ্জু"র এ গুণটি আছে, সহজে ওর হাত থেকে পালাতে পারে না কেউ। মিঃ চ্যাটার্জ্জী সপ্রশংস দৃষ্টিতে চান মঞ্জুলার দিকে।

—"আমার মঞ্জু!" দীর্ঘশ্বাস গোপন করে সুপ্রকাশ—"কেউই পালাতে পারে না এমনই ওর গুণ"—অথচ সুপ্রকাশ এক দিন ধরা দিতে চেয়েও—

মঞ্জুলার চোখে ধরা পড়ে সুপ্রকাশের হৃদয়ের কথাগুলো।

—এস প্রকাশ, ওখানে অনেকে আছে, এস—মঞ্জুলা আহ্বান জানায়।

বাড়ীর পাশ দিয়ে লাল কাঁকরের সরু রাস্তা। একটু গিয়ে পিছন দিক্‌টা একটা বাগান। সেখানে গোল করে প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছে। চারি দিকে চারটে চেয়ার মাঝে ছোট্ট ছোট্ট টেবিল।

সুপ্রকাশ এক কোণে এসে বসে। মঞ্জুলা উঠে যায় অতিথিদের খোঁজ নিতে। সুপ্রকাশ চুপ করে বসে থাকে।

মঞ্জুলা বেশ বড়-ঘরের বধূ হয়েছে। বর্ত্তমান যুগে চ্যাটার্জ্জী সাহেব নামজাদা ব্যারিষ্টার। ভদ্রলোক ময়লা হলেও কুশ্রী নন।

—এই যে প্রকাশ বাবু! সুপ্রকাশ চমকে মুখ তোলে। ওর অফিসের একটি বাবু—নতুন কাজে এসেছে।

—আপনি?

—আরে আমার ত মা'র পিসতুত ভাইয়ের ছেলে অমরদা—

—আপনি বুঝি তাই আজ তাড়া করছিলেন অফিসে?

—না, অন্য কাজ ছিল।

মঞ্জুলা কাজ সেরে এসে বসে। আবার চলে যায় অন্য কাজে। মঞ্জুলার স্বামী আসেন।

—কি রে, কতক্ষণ এলি?

—একটু আগে দাদা, সুপ্রকাশের অফিসের বাবুটি বলে—তা সুপ্রকাশ বাবু, বৌদি ভাল আছেন ত?

—হ্যাঁ, ভাল আছেন।

—আচ্ছা, আমি যাই ওদিকে একটু—বুঝতেই পারছেন, আমরা একটু টানব-ফুকব—তা গণ্যমান্য ব্যক্তিরা রয়েছেন, এদের সামনে—

—যা না, কে বারণ করছে—অমর বাবু বিরক্ত হয়ে বলেন।

—মঞ্জুলা আবার এসে বসে।

—একটা ভুল করেছ মঞ্জু।

—কি?

—মিসেস সেনগুপ্তকে ধরে আনলে ভাল করতে।

—মিসেস সেনগুপ্ত? মানে প্রকাশের স্ত্রী? তাঁকে পাব কোথায়? কে সে ভাগ্যবতী কোথায় অপেক্ষা করছেন কি করে জানব বল?

—বাড়ীতেই ছিল নিশ্চয়।

—ছিল না কি প্রকাশ? মঞ্জুলার মুখে যেন একটা অস্পষ্ট ছায়া দেখতে পায় প্রকাশ।

—হ্যাঁ, বাড়ীতেই আছে সুপ্রীতি, প্রকাশ বলে।

—সুপ্রীতি, বেশ নামটা। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলেন অমর চ্যাটার্জ্জী।

—প্রকাশ, আমরা কি এত পর হয়ে গেলুম যে বলনি—মঞ্জুলার কণ্ঠ অভিমান ভরা।

অমর বাবু কার আহ্বানে চেয়ার ছেড়ে উঠে যান।

সুপ্রকাশ হাসে—ভুলে যাচ্ছ মঞ্জুলা, সেই বসন্ত পঞ্চমীর গোধূলি সন্ধ্যার পর আজ প্রথম দেখা।

ওদের যখন আলাপ সীমা অতিক্রম করে যায়, সকলেই যখন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে সুপ্রকাশের আঁধার ঘরে মঞ্জুলা স্বর্ণদীপ জ্বালবে, তখনকার সম-সাময়িক পরিচিত কয়েক জন পরিচিত সমবয়সী এসেছে আজকের এই আনন্দের উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে। মঞ্জুলার সঙ্গে সুপ্রকাশকে দেখে ওদের চোখে-মুখে একটা চাপা হাসি ফুটে ওঠে।

মঞ্জুলার নারীসুলভ দৃষ্টি এড়ায় না ওদের এ সাঙ্কেতিক ইঙ্গিত। —এস সুপ্রকাশ, আমায় একটু সাহায্য করবে এস, মঞ্জুলা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—চল।

—কোথায় যাচ্ছ মঞ্জু?

—একটু ওদিকটা দেখে আসি॥

—আচ্ছা যাও,। সুপ্রকাশ বাবু, বান্ধবীকে একটু help করুন। আপ্যায়িতের হাসি হেসে চকিতে সরে যান অমর বাবু।

মঞ্জুলা বাড়ীর পেছন দিকের দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকে। মস্ত হল-ঘর, চমৎকার সাজানো। গৃহস্বামীর রুচিবোধ যে উঁচু-দরের তা একবার চোখ চাইলেই অনুমান করা কষ্টকর নয়। সাদা পাথরের মেঝে। চৌকাঠের পরিবর্তে প্রতি দরজার কাছে সরু কালো পাথরের নক্সা বা আলপনা।

ঘরের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা না করে থাকতে পারলে না সুপ্রকাশ। মাঝখান দিয়ে কালো বর্ডার দেওয়া সাদা পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সিঁড়ির এক ধারে টেলিফোন।

মঞ্জুলা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলে—একটা রিং করে দেব তোমার বাড়ীতে?

—কেন?

—তোমার সুপ্রীতি ভাবছে না?

—তা ভাববে বৈ কি, কিন্তু আমার ফ্ল্যাটে আমার কিংবা অন্য কারুর ফোন নেই।

—ওঃ আচ্ছা, এস।

—তোমায় কি কাজে সাহায্য করতে হবে বল ত মঞ্জু? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে প্রশ্ন করে সুপ্রকাশ।

—কিছু করতে হবে না তোমায়।

—তবে? বিস্মিত হয় সুপ্রকাশ।

—তবে আর কি? ওদের দৃষ্টির কি ইঙ্গিত। এমনিই ডাকলুম।

—ওঃ—সুপ্রকাশ হাসে।

দোতালার একটা ঘরে মঞ্জুলা ঢোকে। একটা সোফার ওপর এলিয়ে পড়ে ক্লান্ত ভাবে। বোস।

চারি দিক নিরীক্ষণ করছিল সুপ্রকাশ। বললে—বসি। কিন্তু না বসে এগিয়ে গেল সামনে লেপ-ঢাকা কালো পিয়ানোটার কাছে।

এটা মঞ্জুলার নিজস্ব। এই পিয়ানোর বুকে আজ সুপ্রকাশের আঙুলের চিহ্ন বিলীন হয়ে গেলেও এক দিন ওর আঙুলের পরশেই মুখর হয়ে উঠত নীরব যন্ত্রটি। আর মুখর হ'ত মঞ্জুলার হৃদয়।

—তোমার স্ত্রী কেমন হল প্রকাশ?

—আমার স্ত্রী? ঠিক আমারই ঘরণী হবার উপযুক্ত।—সুপ্রকাশ ফিরে এসে বসল ওরই পাশের সোফাটায়।

—মঞ্জুলা সোজা হয়ে বসল। আচ্ছা প্রকাশ, তুমি কি বিদ্রূপ ছাড়া সহজ ভাবে কথা বলতে পার না?

মঞ্জুলার শান্ত দৃষ্টিটা বড্ড অস্বস্তিকর বলে মনে হয় সুপ্রকাশের। তবু ওর স্বভাব-সুলভ হাসি হেসে বলে—মঞ্জুলা, নিশ্চয়ই এখন গানগুলো ভুলে যাওনি—শোনাও না একটা।

—তুমিই শোনাও না সুপ্রকাশ, অনেক দিন শুনিনি তোমার গান।

—আমি? সে কি? তোমার স্বামী আর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ কি মনে করবেন বল ত'?

হঠাৎ অমর বাবু ঘরে এসে বললেন—কিছু না, কিছু না—আমাদের এত বেরসিক মনে করিবেন না সুপ্রকাশ বাবু, আমার অথিতিরাও তৃপ্ত হবেন আপনার সঙ্গীতে। কিন্তু একটা অনুরোধ—নীচকার হল-ঘরে আসুন, কারণ এ-ঘরে সবাইকে ধরবে না। পাঁচ মিনিট, আমি ওদের ডাকি আপনি নেমে আসুন। মঞ্জু তুমি ওঁকে আনো, তার পর খাওয়াটা শেষ করে দিই।

অমর বাবুর নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুলাও উঠে দাঁড়ালো, তার পর সেই সাদা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো। অমর বাবু চাকরদের সাহায্যে বাগান থেকে চেয়ারগুলি হল-ঘরে তোলাচ্ছেন। মঞ্জুলাও স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো সাহায্যের অভিলাষে।

ঘরের কোণে আর একটা পিয়ানো, তার পাশে ছোট্ট একটা টেবিল—একটা ফুলদানীতে সাদা রজনীগন্ধার ঝাড়। অমর বাবু মঞ্জুলাকে বললেন—তুমি যাও ওঁকে নিয়ে, আমি এদিক দেখে নেব।

সকলকার দৃষ্টি অতিক্রম করে সুপ্রকাশ বাজনার সামনের আসনটিতে গিয়ে বসল। বাজনার ঢাকনী খুলে পরিচিত একটা সুর বাজায়।

চমকে উঠে মঞ্জুলা, না সু, ওটা না—ওটা বাজিও না। অনুরোধ জানিয়ে সুপ্রকাশের কাছ থেকে সরে গিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসে।

—ভগবান তোমার ওপর সুপ্রসন্ন যে, তোমার মুক্তার মালা এ দীনের কণ্ঠে পড়েনি! সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মঞ্জুলাকে বলেছিল সুপ্রকাশ। মঞ্জুলার চোখে বুঝি একটু অশ্রু!—নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল সুপ্রকাশের মুখে। তার পর পিয়ানোর বুকের ওপর দিয়ে দ্রুত আঙুল চালনা করে সুর ধরল;

ওগো নিঠুর, ওগো নিঠুর, দেখতে পেলে তা কি?
আমার ভুবন ত আজ হল কাঙ্গাল, কিছু ত নাই বাকী—
তার সব ঝরেছে, সব মরেছে
জীর্ণ বসন ঐ পরেছে······

সুপ্রকাশের সুমিষ্ট, দরদ-ভরা গম্ভীর কণ্ঠের গান সকলকে মুগ্ধ করল। এ ভাষা সকলেই জানে, সকলেই এর সুরের সঙ্গে একটু না একটু পরিচিত, কিন্তু সুপ্রকাশের সুললিত কণ্ঠে সকলেই নূতন করে শুনলেন যেন।

সুপ্রকাশের গান শেষ হল, কিন্তু বড় হল-ঘরটাকে কেন্দ্র করে

ওর সুমিষ্ট কণ্ঠ আর গানের একটি কলি বার বার ছুঁয়ে গেল অভ্যাগতদের মুগ্ধ হৃদয়।

অভ্যাগত ব্যক্তিরা অমর বাবুর সঙ্গে উচ্ছ্বসিত স্বরে প্রশংসা করলেন সুপ্রকাশ বাবুর উদাত্ত কণ্ঠস্বরের।

সুপ্রকাশের মনটা যেন তীব্র মাদক দ্রব্যের ঝাঁঝালো প্রভাবে আপনাকে একান্ত ভাবেই তার হাতে সঁপে দিয়েছিল।

কল্পিত নেশার প্রভাবে তার গল্পের কথা খেই হারালো না, উপস্থিত সকলকে সরসতায় অভিভূত করে ছাড়লে। সুরসিক সুপ্রকাশের রসিকতার সাহচর্য্যে অভ্যাগতবৃন্দের খাবার সময় তারা খাদ্যের চেয়ে সুপ্রকাশের বাক্যের প্রতি অধিক মনোযোগ দিল। অমর বাবু খুসী হয়ে উঠলেন সুপ্রকাশের কৃতিত্বে। তার পার্টিটা একা মাৎ করে রাখলেন সুপ্রকাশ বাবু।

গল্প-গুজবের মাঝ দিয়ে সময়টা কতখানি এগিয়ে চললো তা সুপ্রকাশ খেয়াল করেনি। রাত্রি এগারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠলো।

—যাঃ, এত রাত্রি হয়ে গেল, নিশ্চয় লাষ্ট ট্রামটাও ছেড়ে গেছে—না অমর বাবু?

—সে ১০টার সময় চলে গেছে, কিন্তু এত ব্যস্ত কেন? আজ না হয় থেকেই যাবেন—জলে ত আর পড়ে নেই!

—পাগল না কি? সুপ্রকাশের বদলে উত্তর দেয় মঞ্জুলা। থাকবেন কি করে? জলে পড়ে থাকলে সাঁতরে চলে যেতেন। যেতে না সুপ্রকাশ?

—বোধ হয়—স্মিত হাস্যে উত্তর দেয় সুপ্রকাশ। জলে পড়ে থাকার চাইতে দুঃসাহসিক অভিযানে মর্য্যাদা বাড়ে বেশী, কিন্তু এখন সে চিন্তা করবার দরকার নেই।

মিথ্যা কথা!—মঞ্জুলা প্রতিবাদ করে বলে। মিথ্যে কথা বলছ প্রকাশ, তোমার মন পড়ে আছে সেই ছোট্ট ঘরটিতে।

সুপ্রকাশ কিছু বলার আগেই অমর বাবু জবাব দেন—সেটাই ত স্বাভাবিক মঞ্জু, এই দেখ না, আমি হাইকোর্টের অত বড় হলে থাকি, কিন্তু তখন আমার মনটা পড়ে থাকে এই ঘরটার মাঝে।

মঞ্জুলার মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। পরিত্রাণ পাবার জন্য কথা পাল্টিয়ে বলে—আচ্ছা প্রকাশ, তুমি রবি বাবুর ও-গানটা না গেয়ে তোমার নতুন কোন গান শোনালে না কেন? অনেক দিন শুনিনি।

—আপনি কি গান লেখেন না কি?

—শুধু গান? গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গান, কবিতা সব কিছু, গান ত শুনলে আবার আঁকতেও পারে, এ ছাড়া সব চেয়ে বড় গুণ এম-এতে স্কলারশিপ পেয়েছেন। একটু গর্ব্বের সঙ্গে উত্তর দেয় সুপ্রকাশ নয়—মঞ্জুলা।

—যাক, আপনার মত গুণী লোকের বন্ধুত্ব কামনা করি, কিন্তু মঞ্জু, তুমি ত আগে কিছু বলনি? সুপ্রকাশ বাবুর নাম শুনেছি কিন্তু এ সব ত শুনিনি?

—আমার সঙ্গে সুপ্রকাশ লোকটার বন্ধুত্ব ছিল, গুণের সঙ্গে নয় তাই শুধু সেটাই শুনেছ, এবার ত শুনলে?

—সত্যি আপনার এত গুণ জানতুম না।

—আপনি অহেতুক এত প্রশংসা করছেন।

—অহেতুক কেন? এ গুণগুলো নিশ্চয়ই আছে।

—তা—তা আছে, কিন্তু 'কোন গুণ নাহি যার কপালে আগুন' হয়েছে আমার—জানেন, এতগুণ থেকেও আমি অনেকের কাছে নির্গুণ; কারণ অর্থ নেই।

—না—না কি যে বলেন? অর্থ দিয়ে গুণের বিচার যিনি করেন তিনি—তিনি—হাঁ, তিনি মূর্খ!

মঞ্জুলার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে।

সুপ্রকাশ বলতে চায়—আপনার যদি অর্থ না থাকত তবে আমার মত আপনিও হতেন গুণহীন। কিন্তু বলতে পারে না।

—আচ্ছা, একটু বসুন, আমি দেখি ডাক্তার রায়কে পৌঁছে গাড়ী ফিরল কি না, এলেই আপনাকে ছেড়ে দেব ততক্ষণ কষ্ট করে একটু··· বলতে বলতে অমর বাবু উঠে যান।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা চলে যাওয়ার পর ওরা উঠে এসেছিল দোতলার পূর্ব্বোক্ত ঘরটিতে। অমর বাবু চলে যেতেই সুপ্রকাশ মঞ্জুলার সামনে এসে বসল।

—কষ্ট করে কেন আনন্দ করেই—কি বল মঞ্জু? কবির ভাষাকে একটু বদলিয়ে মনের মত করে বলি—'ধন নয় মান নয়—নয় ভালবাসা—শুধু ক'টি ভাষা করেছি আশা'···

মঞ্জুলা সোজা হয়ে বসে প্রশ্ন করল—আচ্ছা প্রকাশ, আজ তোমার কি হয়েছে বল ত? বড্ড বেশী···

—কি? মুখর হয়ে উঠেছি না?

—হাঁ, তাই দেখছি।

—দেবি, যদি ভাষার উৎস ভারতী দেবী সম্মুখে অবতীর্ণ হন, তবে কোন্ কালিদাস মুখরতা ত্যাগ করে মূক হয়ে থাকতে পারে বল দেখি?

মঞ্জুলার রক্তিম মুখ হতে নিঃসৃত হয়—আচ্ছা প্রকাশ, তুমি আজ আমায় এত অপমান করছ কেন বল ত?

—অপমান? মঞ্জু, তোমায় আমি করব অপমান? আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিলুম, কিন্তু এক দিন যখন এ কথাগুলো তোমায় শোনাতুম তখন তুমি খুসী হয়ে···

—প্রকাশ, ভুলে যাচ্ছ অতীত আর বর্ত্তমান, এ দু'টোর অনেক প্রভেদ, সেদিন যা ছিল আজ তা নেই।

—জানি, মানুষ গড়ে আর দেবতা ভাঙেন···

—এ কথা যদি জান, তবে কেন শুধু শুধু সেই পুরানো কথা মনে আনো বল ত?

—মঞ্জু—মঞ্জু, তোমার কি একবারও সেদিনের কথা মনে পড়ে না? সেদিনের জন্যে আপশোষ হয় না?

মঞ্জুলা চুপ করে থাকে।

—বল মঞ্জু—সেদিন তুমি কেন আমার সঙ্গে চলে আসনি?

মঞ্জুলা মৃদু রহস্যের সুরে বলে—হাতটা ধরে আছ যদি সুপ্রীতি এসে দেখে কি অবস্থা হবে তোমার?

মঞ্জুলার হাতটা ছেড়ে দেয়, চকিতে। তার পর উঠে দাঁড়ায় সুপ্রকাশ।—নিষ্ঠুর—না হয় আমার চাইতে অনেক অর্থ আছে তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে, কিন্তু তা বলে এত অহঙ্কার ভাল নয়।

মঞ্জুলা শান্ত স্বরে বলে—কোথায় যাচ্ছ?

—তোমার পাশে। মঞ্জুলার পাশে এসে বসে সুপ্রকাশ।

মঞ্জুলা চকিতে উঠে দাঁড়ায়।—তুমি বোস, আমি দেখি উনি চাথায় আর গাড়ী এসেছে কি না।

সুপ্রকাশ হাসলে।—ভয় পাচ্ছ মঞ্জু?

—ভয়? না, কিন্তু ভরসাও পাচ্ছি না তেমন।

—মেয়ে-চরিত্র বোঝা সত্যই আমাদের কর্ম্ম নয়, আজ ভয় পেয়ে পালাতে চাইছ অথচ কত দিন—

—সে কথা ঠিক যে আমি তোমার সঙ্গে একা অনেক দিন ও অনেক রাত গল্প-আলোচনা-গান করে কাটিয়েছি, কিন্তু সেদিন আর আজ সমান নয়—সেদিন মঞ্জুলা ব্যানার্জ্জী আজ মঞ্জুলা চ্যাটার্জ্জী। প্রকাশ, অতীত আর বর্ত্তমানকে সমান পর্য্যায়ে ফেলে বিচার করতে চেও না, আর তাছাড়া সে সময় তুমি এত বোধ হয় অসংযত ছিলে না। আজ তোমার সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলুম, ইচ্ছা-অনিচ্ছার যে দ্বন্দ্ব চলছে তার চেতনা আজই—তোমাকে না আনলে হয়ত ভালো ছিল।

সুপ্রকাশের শিক্ষিত মনের ওপর সপাৎ করে চাবুক এসে পড়ল যেন। আপন চরিত্রের দুর্ব্বলতা দেখে লজ্জিত হয়ে উঠল।

—কিন্তু তবু সুপ্রকাশ, তুমি আমার অতিথি—আজকের দিন থেকে সমস্ত অতীত ভুলে যাও, আমরা আবার নতুন করে নতুন বন্ধুত্ব স্থাপন করি···

—বোস মঞ্জু, আমার দুর্ব্বলতা ক্ষমা কর। অতীত আর বর্ত্তমানকে একসঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে ভুল করেছি, তোমার কথায় আমি ভুল বুঝতে পেরেছি, আর বুঝতে পেরেছি কেন এই দুর্ব্বলতা। বোস ভয় নেই। মঞ্জুলা বসল আরেকটি সোফায়।

—এর আগে তোমার সঙ্গে অনেক মিশেছি, তখন জানতুম তুমি একান্ত ভাবেই আমার। জান ত', নিজের অধিকার জানলে তার ওপর লোভ কমে যায়। তখন তাই আমার কোন আচরণ অসঙ্গত ছিল না, কিন্তু আজ আমি শুধু মাত্র কয়েক ঘণ্টার অনাহূত অতিথি। প্রতিহিংসার আগুনে আমার বিবেক মুহূর্ত্তের জন্য দগ্ধ হয়ে গিছল। তুমি তাকে বাঁচিয়েছ। ক্ষমা কর মঞ্জু—বল ক্ষমা করেছ।

মঞ্জুলা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে প্রসঙ্গ বদলে বলে—

—তোমার বিয়ে কত দিন হল? বলেছিলে যে—

—বলেছিলুম, কিন্তু দেখলুম, আমার মত দরিদ্রের পক্ষে এ বড্ড বাড়াবাড়ি। তাই—তিন বছর হল আজ থেকে। মঞ্জু, এবার আমার বাড়ী যাবার বন্দোবস্ত করে দাও। এ কি সাড়ে বারোটা। সুপ্রকাশ চঞ্চল হয়ে উঠল।

—এস, দেখি—মঞ্জুলা উঠল।—প্রকাশ, ওটা কি ফেলে যাচ্ছ?

—এটা, এই নাও তোমায় দিলুম—আজকের উপহার।

মঞ্জুলা প্যাকেট খুলে শাড়ীখানি বার করলে। সবুজের ওপর সোনালী জংলা কল্কা পাড়—ইলেকট্রিক আলোয় ঝকঝক করে উঠল।

মঞ্জুলার মনে পড়ল—এ রঙটা সুপ্রকাশের খুব প্রিয়।—কি প্রীতি উপহার?···মঞ্জুলা সহাস্যে বলে।

সুপ্রকাশ চমকে উঠল। দোতলার ফ্ল্যাটে বেচারী সুপ্রীতি সুপ্রকাশের আর প্রীতি উপহারের অপেক্ষা করছে।

ওর ব্যস্ততা দেখে মঞ্জুলা বলে—এস।

নীচে নেমে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যায়। হলঘরের সোফার [illegible]

—কেমন গাড়ী দেখতে এসেছেন দেখছ প্রকাশ। ওগো, এই এই—ওঠ—আঃ ওঠ না—প্রকাশ যে অপেক্ষা করছে। মঞ্জুলা অমর বাবুকে ঠেলা দেয়।

অমর বাবু উঠে দাঁড়ান।

—দাঁড়াও আগে ড্রাইভারকে ডাকাই। সে'ও হয়ত নাক ডাকাচ্ছে—মঞ্জুলা বলে।

—না না, তবে আর তাকে ডেক না। চল, আমরাও ঘুরে আসি, কি বল মঞ্জু?

—এ্যাকসিডেণ্ট করবে না ত?

—পাগল! না না, চল, আসুন প্রকাশ বাবু।

ওরা তিন জনে অন্ধকারের মত কালো গাড়ীটাতে এসে বসল। সুপ্রকাশ আর মঞ্জুলা পিছনে। অমর বাবু ষ্টিয়ারিং ধরে বসলেন।

অন্ধকারের বুক চিরে চোখের মত জ্বলে উঠল দু'টি হেড লাইট। তার পর দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল অন্ধকার ভেদ করে।

চার

ঘড়ির কাঁটাটা যেন আজ সুযোগ বুঝে খোঁড়া হয়ে বসে আছে। দু'ঘণ্টার সময় নিয়ে তবে যেন এক-একটি সংখ্যা অতিক্রম করে চলেছে। অস্বস্তি বোধ করে সুপ্রীতি।

অন্য দিন তার কাজ-কর্ম্ম শেষ না হতেই সুপ্রকাশ এসে পড়ে। সুপ্রকাশ যেদিন কাজ শেষ হবার আগেই আসে সেদিন সুপ্রীতি একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। কোন কাজ করতে দেয় না সুপ্রীতিকে। হয় কোন নূতন লেখা বার করে শোনাবে, নয় ত বিশ্বকবির একখানি বই বার করে আবৃত্তি করবে। সুপ্রীতির এ সব ভালো লাগে না। তার মন পড়ে থাকে রান্না-ঘরের আন্ডুড় আনাজগুলির ওপর, উনুনের ওপর কড়ায় ডাল ফুটছে হয়ত বা পুড়েই গেল—ওর কাণে যায় না সুপ্রকাশের সুললিত আবৃত্তি—

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী।"

সুপ্রকাশ ছন্দ মিলিয়ে আবৃত্তি করে চলে, আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুপ্রীতিকে বসতে হয় শোনার ভাণ করে, মনে মনে হয়ে ওঠে বিরক্ত। কিন্তু যখন গভীর রাত্রে চারি দিকের নিস্তব্ধতার অবসরে এক এক দিন সুপ্রকাশের সঙ্গীত-চেতনা জেগে ওঠে তখন সুপ্রীতির মনে হয়, আরো একটু জোরে যদি গায়···কিন্তু সাহস হয় না—ফ্ল্যাট বাড়ী, অন্য অংশীদাররা বিরক্ত হবেন।

দূর ছাই, কি সব ভাবছি···

রান্না সমস্ত শেষ হয়ে গেছে, তবু কেন সুপ্রকাশ ফেরে না! বারান্দার রেলিংএ ভর দিয়ে ভাবনা-চিন্তার পাখা মেলে দেয় তার মনে······

• • • •

রাত্রি একটা বাজলো। নীচে এসে দাঁড়িয়েছে প্রকাণ্ড কালো মোটর কার। তীব্র আলো তারই তীক্ষ্ণ ধ্বনিতে ওরই অস্তিত্ব ঘোষণা করছে।

গাড়ীর পেছন দিকের দরজা খুলে নামল সুপ্রকাশ। গলায় একটা ফুলের মালা। আর পিছনে পিছনে নামলেন এক সুসজ্জিতা সুন্দরী মহিলা। সামনের দরজা খুলে মহিলাটি নামলে দিয়ে বসল।

—এই আমার বাড়ী মঞ্জু।

—প্রকাশ, আমার ওখানে যেও, বুঝলে, ভুল না, ভাগ্য ভালো যে আজকেই তোমার দর্শন পেয়েছিলুম···

—না না, ভুলব না—নিশ্চয়ই যাব।

—আচ্ছা, ধন্যবাদ, এবার যাও, তোমার সুপ্রীতি দেবীর ঘুম ভাঙ্গাও গে যাও, বেচারী হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

কলকণ্ঠে হেসে উঠলেন মঞ্জুলা দেবী।

ওপর থেকে আশা-ভরা জল-ভরা দৃষ্টি মেলে দেখছে সুপ্রীতি। কে এই মঞ্জু? রাতের অভিসারিকা নয় ত? চালকটিই বা কে? "প্রকাশ যেও" তোমার সুপ্রীতি···কি রকম কথাবার্ত্তা, কি তীব্র শ্লেষ ওর কথার মাঝে···

—আচ্ছা প্রকাশ গুড নাইট, আজকের রাত্রি স্মরণীয় হয়ে থাকবে জীবনে···গুড নাইট।

—তা সত্যি, গুড নাইট।

গাড়ীটা চলে গেল।

সুপ্রকাশ শীষ দিতে দিতে উপরে ওঠে। তার পদধ্বনির শব্দ অনুসরণ করে গণনা করে ক'টা সিঁড়ি অতিক্রম করল। এক··· দুই···উনিশ।

এই বার শেষ।

খট্ খট্ খট্।

এবার সত্যিই দরজা ঠেলছে। সুপ্রীতি দরজা খুলে দেয়। সুপ্রকাশ কৈফিয়ৎএর সুরে বলে—বড্ড রাত্রি হয়ে গেল, ঘুমিয়ে পড়েছিলে না কি? সু!

—না ঘুমাইনি, রাত্তির বেশী হয়নি—সবে একটা।

—রাগ করেছ সু?

—কই? না ত···

—আঃ বাঁচালে। যাক, কাপড়টা ছেড়ে ফেলি এবার—সুপ্রকাশ ঘরে চলে যায়।

সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে সজল চক্ষে সুপ্রীতি দু'জনের আহারের স্থান করে পাশাপাশি।

খাবার সাজিয়ে ঘরে গিয়ে দেখে সুপ্রকাশ গায়ে লেপ টেনে শুয়ে পড়েছে। মায়া লাগলো সুপ্রীতির।

—ওগো, শুলে কেন? খেয়ে নাও, তার পর শুয়ে পড় এসে। খাবার দিয়েছি।

—খাবার—

—হ্যা—খাবে না? এসো—

—আমি খাব না—তুমি খেয়ে নাও। অনেক রাত্রি হল, এখনও তোমার খাওয়া হয়নি?

—মানে?

—এক বন্ধুর বিয়ের দিন ছিল আজ। ছাড়লে না ধরে নিয়ে গেল। খাইয়ে-দাইয়ে পৌঁছে দিলে। খুব ভাল মেয়ে মঞ্জু, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। যাও যাও, খেয়ে এস লক্ষীটি, রাত হয়ে গেল অনেক।

—ও—আচ্ছা। সুপ্রীতির চোখ বেয়ে অজস্র ধারে মুক্তাবিন্দু ঝরে পড়ে মাটিতে। সুপ্রীতি রান্নাঘরে চলে আসে। সুপ্রকাশ পাশ ফিরে শোয়।

সুপ্রীতির চোখের বাঁধ অতিক্রম করে দুকূল ছাপিয়ে বন্যা নেমে আসে।

মঞ্জু—বন্ধু? বন্ধুনীর বিবাহ বার্ষিকী-রাত্রি! একটার সময় এসে জিজ্ঞাসা কোরছ আমার খাওয়া হয়নি—এলোমেলো ভাবে কথাগুলি ভাবে সুপ্রীতি।

গামলায় আবার লুচিগুলো রাখে—তার পর মাংসের বাটি থেকে সমস্তটা ঢেলে দেয় তার ওপরে—ডাল, মালাইকারী, তরকারী, ক্ষীর সমস্ত একত্রে মিশিয়ে দু'হাতে চটকায়।

কিছু নষ্ট হবে না—তার সাধের রান্না কিছু নষ্ট হবে না—সকাল বেলা মার্জ্জার প্রভু সমস্তটা চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় করে খেয়ে ওর রান্নার তারিফ করবে মিউ-মিউ করে। সাধের রান্না···

কর্ম্মযোগী

[দেশকর্ম্মী সুকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে]

উর্ম্মিলা দেবী

জীবনের যত কাজ সাঙ্গ হল কি আজ
পেয়েছ কি তব ভগবানে?
পেয়েছ আঘাত যত দুঃখ বেদনা শত
এখনও কি বিঁধে আছে প্রাণে?
সারাটি জীবন ধরি যত কাজ গেলে করি
পূর্ণতা পেল কি আজ সবই?
কর্ম্মের দিবস শেষে সন্ধ্যা এলো অবশেষে
অস্ত গেল কর্ম্ম-দৃপ্ত রবি—।
বিশাল ও হৃদি-গেহ ভরা ছিল যত স্নেহ
দিয়েছ সবারে প্রাণ ভরে
কর্ত্তব্য করেছ তুমি দেশবাসী, মাতৃভূমি,
দীন দুঃখী সর্ব্বজন তরে—।
তোমারে বুঝিতে কেহ— পেরেছে, পারেনি কেহ
তার তরে ছিল না ত দুখ—
দিয়ে গেছ দুই হাতে দেবার আনন্দে মেতে
দান-সুখে তৃপ্তি ভরা বুক
করে গেছ যাহা তুমি নহ তার ফলকামী
গীতার দৃষ্টান্ত তুমি কর্ম্মযোগী বীর—
তাই তব প্রাণভরা শান্তি রাজে দুঃখ-হরা
কর্ত্তব্যে অটল তুমি সাধনায় ধীর—।
যেখানে গিয়েছ আজ সেখানে কি আছে কাজ
তোমা লাগি চেয়ে আছে পথ—?
পৃথিবীর দেহ ত্যজি অমরায় গেলে আজি
দেবতা পাঠায়ে দিল রথ।
এখনও কি দূরে থেকে আমাদের সুখে-দুখে
পাঠাইবে তব আশীর্ব্বাদ?
সেথা হতে দেখিবে কি প্রাণ দিলে যার লাগি
পূর্ণ যদি হয় সেই সাধ?

হাই সার্কেল

হরিপদ হাজরা

প্রফেসর সুনীল মুখার্জ্জীর বাড়ী—জোর উৎসব, আনন্দের হল্লা চলছে। তাঁর বিয়ের বার্ষিক উৎসব। বাইরে মোটরের ইন দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আধুনিক উগ্র সাজ-গোজে নবাগতাদের বিশ্রাম আনাগোণা চলছে।

সুনীল বাবু মাত্র পঁচাত্তর টাকা মাইনের চাকুরীতে ঢোকেন। আজকাল দু'শো টাকা পান। কিন্তু বাড়ীতে মোটরে ড্রাইভারে রোয়ানে আই, সি, এসও হার মানে। এটা অবশ্য সবাই জানে বাড়ীটি ওঁর বাপ রায় বাহাদুর শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া। শুধু সুনীল বাবু ও তাঁর স্ত্রী সেটা স্বীকার করতে চান না।

দুষ্ট লোকেরা পাঁচ কথা বলে। পাশের যে পোড়ো জমিটা সুনীল বাবুর দুই ভায়ের—শুধু ভিত-গাঁথা হয়েই পড়ে রয়েছে—সেটা দেখিয়ে বলে, 'উদার দেবতুল্য বাপ পেয়ে নাবালক ভাই দু'টোকে পথে বসালে গো! প্রফেসর নামের কলঙ্ক!' আবার কেউ বলে, চোরাবাজারে ভদ্রলোকের না কি যাতায়াত বড্ড বেশী। যাক্ গে, বলা-মুখ আর চলা-পথ কেউ বন্ধ করতে পারে না।

দরজায় একটি কিশোরী মেয়ে ফুলের মালার গোছা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি পাশের বাড়ীতে থাকি। আমার কাকীমার নেমন্তন্ন হয়েছিল। তিনি এঁদের পারিবারিক অনেক কিছুই জানেন। তাই নিজে না এসে আমায় দিয়ে নেমন্তন্ন রক্ষা করেছিলেন। কাকীমার কাছেই শুনেছিলুম, এই প্রফেসরের স্ত্রীর অত্যন্ত দুর্ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে শ্রীকুমার বাবু এই বয়সে নিজের বাড়ী ছাড়তে বাধ্য হন। শ্রীকুমার বাবু রোজগার যথেষ্টই করেছেন—যা কিছু উপার্জ্জন সবই এনে বড় ছেলের হাতে তুলে দিতেন। কারণ, তাঁর স্ত্রী ছিলেন অপ্রকৃতিস্থা। ভদ্রলোকের যথা-সর্ব্বস্ব গ্রাস করেও এদের আশ মেটেনি। শেষে তাঁর পেন্‌সনের টাকাও কমিউট করিয়ে নিজের মেয়ের বিয়ের নামে আত্মসাৎ করেছেন। শেষে তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থের বাড়ী মানে তাঁর শেষ বিশ্রাম-আশ্রয় থেকে তাঁকে সরিয়ে তবে এঁরা নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন। এই সব ভাবতে ভাবতে ওপরে উঠতেই নজর পড়লো প্রফেসরের স্ত্রীর উৎকট সাজের দিকে। ঘোরতর শ্যামবর্ণ বিরাট দেহ। তার ওপর নীলাম্বরী ও চেলি ব্লাউজে তাঁকে আরও অদ্ভুত লাগছে। মাথায় উগ্র আধুনিক সাজে দু'টি খোঁপা—ঠোঁটের লিপষ্টিকের আতিশয্য, রাজশেখর বসুর উক্তি—'ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হো'ক' মনে করিয়ে দেয়। ভুরু কামানো—আই ল্যাস মেক্-আপের সাহায্যে কৃত্রিম ভুরু আঁকা। একেই বিরাট মোটা তার ওপর নূতন তাঁতের সাড়ী পরে তাঁকে একটি মস্ত ধোপার বাড়ীর পুঁটুলী বলে ভুল হচ্ছে।

আমি বোধ হয় একটু তাড়াতাড়ি গিয়ে পড়েছিলুম কিংবা কেন জানি না, তাঁর বিরক্তিটা বড্ড বেশী চোখে ফুটে উঠেছিল। কৃত্রিম হাসি দিয়ে সেটাকে ঢেকে মেমী-টোনে আমায় বললেন—"এসো ভাই রেণু, তোমার কাকীমা বুঝি আর আসতে পারলেন না?" এই তিরিশ বছরের গৃহিণী আমাদের ভাই বলে কিশোরী সাজার চেষ্টায় মনে মনে হাসি পেল। বললুম—"না, কাকীমার আবার রান্নার হাঙ্গামা আছে তো? ঠাকুরটার জ্বর হয়েছে।"

এমন সময় উঠলেন প্রতিমা সেন। বিখ্যাত লোকের মেয়ে, মস্ত ব্যারিষ্টারের স্ত্রী। একটি সুন্দর ভ্যানিটি ব্যাগ প্রফেসরের স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন—"এই নাও ভাই প্রীতি, সামান্য একটু স্মৃতি-চিহ্ন তোমাদের আজকের দিনে।" মহিলাটি সত্যিই খুব ভালো। স্বামী বড় চাকরী করলেও শ্বশুর সাধারণ গৃহস্থই ছিলেন, কিন্তু ভদ্রমহিলা সত্যিকারের আভিজাত্যপূর্ণ বংশের মেয়ে—হাই সার্কেলে মিশেও শ্বশুর-শাশুড়ীকে বাড়ী থেকে দূর করবার চেষ্টা করেননি।

প্রীতি দেবী বললেন—"এবার তুমি একটা গাড়ী কেন প্রতিমাদি, কর্ত্তাটি তো তোমার কম রোজগার কচ্ছেন না!"

প্রতিমা দেবী বলেন—"কোথায় টাকা ভাই? ননদের বিয়ে মাথায় মাথায়। ওঁর ইচ্ছে দেওরটিকে বিলেতে পাঠান।"

কথায় বাধা দিয়ে প্রীতি দেবী বলেন—"ঐ সবই তো মুস্কিল! আমার দেওর গুণধর আজ চার বছর বিলেতে বসে ফুর্ত্তি কচ্ছেন আর ভাই টাকা পাঠিয়ে পাঠিয়ে হায়রাণ।"

কথাটির সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থাকলেও সম্মুখ শান্তিরক্ষার জন্য প্রতিমা দেবী "তা তো সত্যি।" বলে কথা চাপা দেন।

এমন সময় ওঠেন প্রীতি দেবীর বোন গীতি দেবী। একটা রূপার সিঁদুর-কৌটো হাতে দিয়ে বলেন—"বেড়ে আছিস্ তুই প্রীতি! একেবারে স্বয়ং স্বাধীন। তোকে দেখলে হিংসে হয়। আর আমার হয়েছে সব দিকে জ্বালা। কোন সকাল থেকে বেরুব বেরুব কচ্ছি—ছুটি আর মেলে না। তবু তো আজ এখানে আসবো বলে সেই শেষ রাত্রে উঠে কুটনোর পাহাড় নিয়ে বসেছি—গুষ্টী তো কম নয়! নামে বামুন আছে। জল-খাবার দু'বেলা সব এই একা হাতে করতে হয়। এমন কি, মেখে-বেলে অবধি উপকার করবে না। তার ওপর জায়ের কোলের মেয়েটা তো দিন-রাত্রি কাঁদে—তেমনি কাঁদুনে মেয়েও হয়েছে বাপু। ঐ মেয়ে যখন ছ'-মাসের, আমার ঘাড়ে চাপিয়ে ভাসুর-জা গেলেন দার্জ্জিলিংএ। জা-এর সখের তো কমতি নেই। এখন আবার কথায় কথায় বলেন কেন গো বোনের মত স্বাধীন হবার সখ হয়েছে বুঝি? ও-সব ট্যাঁ-ফোঁ এখানে চলবে না।' ভাসুরঝিগুলি তো এক-একটি নবাব-কন্যা—কাকীমা, প্লীজ, দু'কাপ চা পাঠিয়ে দাও না।' আর এক জন বললেন—'দাও না কাকীমা আমার শাড়ীটায়

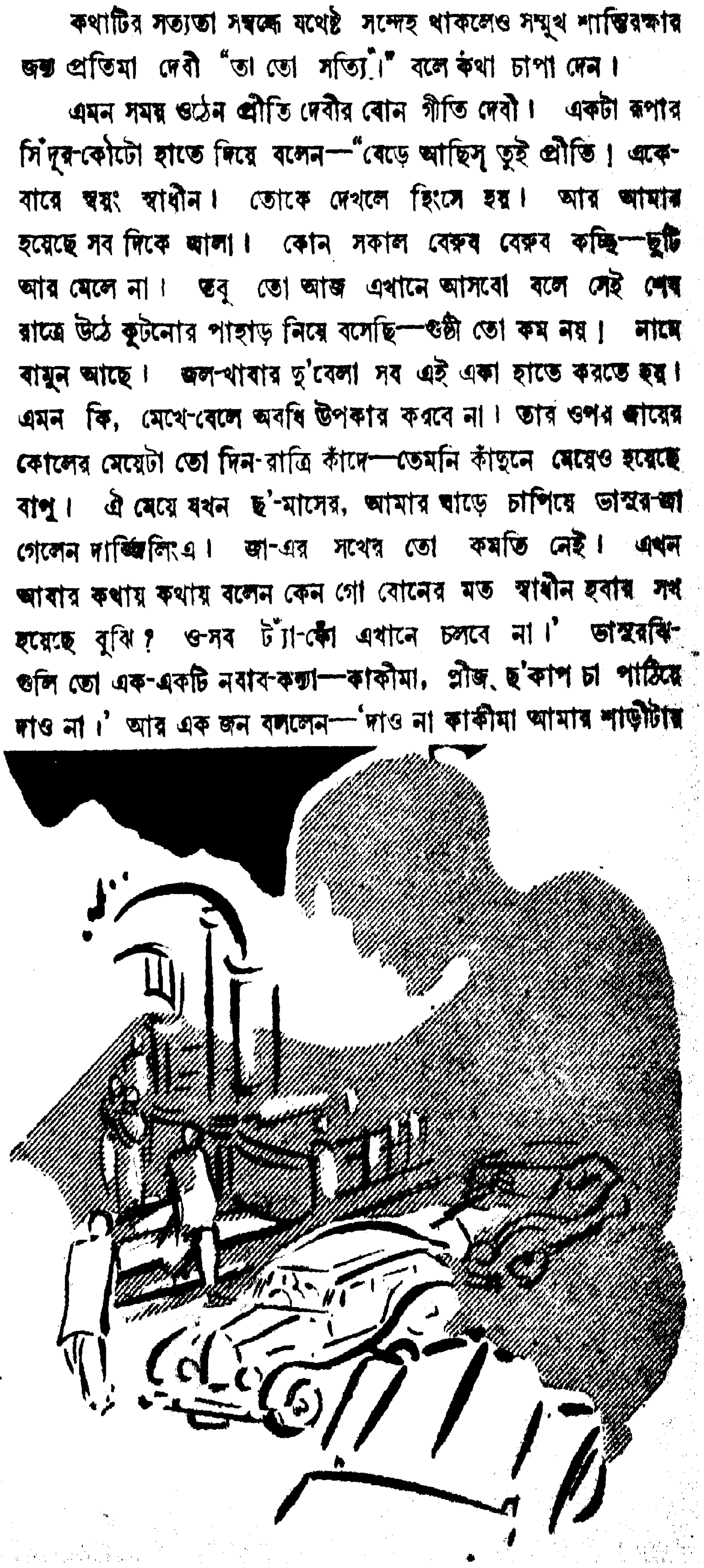

একটু ইস্ত্রি চালিয়ে।' এক-একটি ফ্যাসানের অবতার অথচ ভেতর বলে কোন পদার্থ নেই। ভাসুরপো-বৌটিও হয়েছে তেমনি— 'কাকীমা, আজ আমার গানের রিহার্সাল—মেয়ে রইল দেখবেন।' 'কাকীমা, খোকনের জ্বর হয়েছে—ও আজ আপনার কাছে শোবে নইলে মেয়েটার আবার ছোঁয়াচ লাগবে।' নামে কাকীমা—আসলে যেন বাড়ীর ঝি হয়েছি আমি। ভাসুরপোদের তো কথাই নেই— 'কাকীমা, পাঁচ মিনিটের মধ্যে দু'-কাপ কফি করে ফেল দেখি! আজ বিকেলে একটু পুডিং কোরো, রমেন আর বিদ্যুৎটাকে নেমন্তন্ন করেছি।' যেই বলেছি আজ বিকেলে যে নেমন্তন্ন আছে প্রীতিদের ওখানে—অমনি একেবারে ফোঁস্! 'ওঃ, নেমন্তন্ন তো রোজই আছে—চলে কাশলে বাপের বাড়ীর গোল ফ্যামিলির নেমন্তন্ন; বাপ্ রে, কাকীমাকে একটা কাজ বলার উপায় নেই—যাই মাকে বলি গে কাকীমা পারবে না, ওদের না হয় কফি-হাউসেই নিয়ে গিয়ে খাওয়াবো।' তখন আবার হাতে-পায়ে ধরে ছেলের খোসামোদ করে তাদের পুডিং ডিমের কচুরী খাইয়ে তবে এতক্ষণে ছুটি মিললো। তোর গাড়ী গিয়ে চারটে থেকে দাঁড়িয়েই আছে।" এমন সময় প্রতিমা দেবী উঠে বাথরুমের দিকে যেতেই গীতি দেবী গলাটা একটু নামিয়ে বললেন—"হ্যাঁ রে, তোর শ্বশুরের না কি আজ খুব বাড়াবাড়ি যাচ্ছে? আজ সকালে তোর শ্বশুরের ভাগ্নে এসেছিল—আমাদের বাড়ীতে, আমার ভাসুরপো মন্টুর খুব বন্ধু কি না। বললো—'মামার যা অবস্থা রাত কাটে কি না সন্দেহ।' তার পর আমার দিকে চেয়ে একটু শ্লেষের সুরে বললে—'মেজ-বৌ, খুব সেবাটা কচ্ছে—ভালো বংশের মেয়ে তো?' আমি কি আর বুঝি না আমায় ঠেস দিয়ে কথাটা বলা হল মানে তোমার বোনের মত স্বার্থপর নয়।"

বাথরুম থেকে প্রতিমা দেবী বেরুতেই কথাটা চাপা পড়ে। এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন প্রীতি দেবীর মা ও ভাজেরা। আনন্দ-কলরবে মুমূর্ষু গৃহকর্তার কথা চাপা পড়ে যায়। প্রীতি দেবী বলেন—"হ্যাঁ মা, বাবার শরীরটা না কি খারাপ যাচ্ছে? কেন বল দেখি? আপেলের রসটা বন্ধ করলে কেন? কাল তো তাই শুনে সেই রাতে গাড়ী মার্কেটে পাঠিয়ে আপেল আনাই, তার পর এই বালীগঞ্জ থেকে শ্যামবাজারে পাঠানো। শুধু কুরে রসটুকু করে দেওয়া—তা আর তোমার বৌদের দ্বারা হয়ে ওঠে না?" তিনি যে শ্বশুরের প্রতি কি ব্যবহার করেছেন সে কথা বলে অনর্থক হুলুস্থূল ঘটানোর সাহস ভাজেদের হয় না। তার পর গানে কমিকে গ্রামোফোনে হৈ-হৈ করে—খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ী ফিরতে রাত সাড়ে ন'টা। এসে দেখি দরজায় ডাঃ কে, সি, মল্লিকের গাড়ী—কাকার ছোট ছেলে সান্তু পড়ে গিয়ে কপাল ফেটে রক্তগঙ্গা—কিছুতেই রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। কাকীমা ডাক্তার বাবুর কাছে অনুযোগ করছেন—"কখন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি ডাক্তার বাবু! এতো দেরী করতে হয়?" ডাঃ মল্লিক বললেন—"কি করব বৌদি, এই মাত্র শ্রীকুমার বাবু মারা গেলেন—এই আপনাদের পাশের বাড়ীটা যাঁর। দু'ঘণ্টা তাঁর পাশে বসে। বড় ছেলে তো সর্বস্ব গ্রাস করেই নিশ্চিন্দি—মেজ বিলেতে। ছোট ছেলে তো একবারে পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। আহা, ছেলে মানুষ, বাপ যাবার তো বয়েস হয়নি। সামান্য টেম্পরারি চাকরি করে, বাপের এই কঠিন রোগের চিকিৎসা চালানো আর সারা রাত্রি বাপের পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে। কি সেবা যে করলো বলার নয়! জানি বড় ডাক্তার এনেও কিছু লাভ নেই, তবু দেশশুদ্ধ বড় বড় ডাক্তার এনে জড় করলো। এই যে বড় ছেলের বৌ এতো দুর্ব্যবহার করলো—শ্রীকুমার বাবুর মুখে কখনও কোনও অনুযোগ শুনিনি, ব্যাপারটা সব প্রথম আমিই জেনেছিলুম কি না। সেই যে দু'বছর আগে হঠাৎ ব্লাড-প্রেসার খুব বেড়ে গেলো—সেইটা তো আর কমাতে পারা গেল না। আমার সঙ্গে তো ওঁর ডাক্তার-রোগী সম্পর্কে ছিল না, ঠিক ছেলের মতই ভালোবাসতেন। ওঁকে আনতে কার্মাটারে তো আমিই যাই। কি কাণ্ড করে আন'—মনে হয়েছিল এসে পৌঁছোন কি পৌঁছোন না। এমন বড় ছেলে যে অমন কঠিন রোগ শুনে কার্মাটার তো যায়ই-নি—ষ্টেশনে পর্য্যন্ত যায়নি। আমি তো দেখে অবাক! আর রোগের আর অপরাধ কি, এই ষাট বছর বয়সে দু'বছর ধরে এক বেলা এর বাড়ী—এক বেলা ওর বাড়ী—কখনও কখনও দু'চাকা পাঁউরুটি, কখনও দু'টি খই খেয়ে কাটিয়েছেন। মানী লোক তো—অপরের বাড়ী থাকতেও সম্মানে বাধে। সুনীল বাবু পেন্সনটাও কমিউট করিয়ে নিয়েছিলেন তো? শেষের দিকে আর্থিক অনটনেও বড় কষ্ট পেলেন। যে বৌ শ্বশুরকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় তার প্রতিও কি মমতাই ছিল! সেবার যখন ঐ বৌয়ের অপারেশন হয়, চার দিকে গুলী-গোলা চলছে—সুনীল বাবু যেতে চান না স্ত্রীকে দেখতে, তখন ঐ ষাট বছরের বৃদ্ধ ভবানীপুর থেকে হেঁটে মেডিকেল কলেজে গিয়ে পুত্রবধূকে দেখে এসেছেন। ট্রাম-বাস সব বন্ধ। তখন ১১ দিন অপারেশন হয়ে গিয়েছে প্রীতি দেবীর—রীতিমত আউট অফ্ ডেঞ্জার। কত করে বোঝালুম আমরা। সেই এক কথা—'আমি বুড়ো মানুষ, আমার আবার জীবনের দাম কি?' মনের কষ্টে যে মানুষ মারা যায় তা এই প্রথম দেখলুম। পরশু রাতে আমি পাশে বসে, ডেলিরিয়ামের মধ্যে বলছেন—'এটা কার বাড়ী? কোথায় আছি আমি?' ওটা তো ভাড়া বাড়ী তাই শুনে বললেন—'হায় হায়।' এঁদের এতো দুর্ব্যবহারের পর উইল করেছেন তাতে এঁদের মেয়ের বিয়ে, ছেলের পড়ার খরচ সবই দিয়ে গিয়েছেন—শুধু বলেছিলেন—'সুনীলকে বোলো, শ্রদ্ধাহীন শ্রাদ্ধের প্রহসন যেন ও না করে।' আচ্ছা, উঠি বৌদি—একবার শ্মশানে যেতে হবে—ঐখান থেকেই যেতুম কিন্তু এ পোষাকে যেতে ইচ্ছে হল না বলে একবার ধুতি-চাদর নেবার জন্যে বাড়ী এসে দেখি আপনার লোক বসে! নেহাৎই এক্সিডেন্টের ব্যাপার, নইলে আজ আর কলে বেরুতুম না। অসাধারণ মানুষ ছিলেন, দেশের ও দশের দুর্ভাগ্য তাই অমন অমূল্য প্রাণ অকালে গেলো চলে!"

এমন সময় পাশের বাড়ীতে হৈ-হৈ করে একটা বাস থামলো—এক দল মেয়ে বিচিত্র সাজে শাঁখ বরণ-ডালা ফুলের-মালা নিয়ে গান গাইতে গাইতে নামলো:

—প্রেমের মিলন-দিনে সত্য সাক্ষী যিনি
অন্তরযামী নমি তাঁরে আমি···।

প্রীতি দেবী ও সুনীল বাবু এগিয়ে এলেন এঁদের সম্বর্দ্ধনা করতে। এখন প্রীতি দেবীর পরণে লাল জংলা বেনারসী, গলায় গড়ে-মালা, কপালে চন্দন। এরা ভেতরে যেতেই দেখি, সাইকেলে করে একটি কিশোর ছেলে—খালি-পা রুক্ষ-চুল—এসে নামলো—কেঁদে কেঁদে চোখ টকটকে লাল—গাড়ীটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে দরোয়ানকে বললো—"বাবুকে একবার খবর দিতে পারো?"

বুঝলুম, শ্রীকুমার বাবুর মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে এসেছে ছেলেটি।

ইংরেজী কথা-সাহিত্যের ত্রয়ী

বর্তমান ইংরেজী কথা-সাহিত্যের যে তিন জনকে নিয়ে এই আলোচনা, তাঁদের প্রত্যেকেই সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক; শুধু লেখক নন, তাঁদের তিন জনেরই প্রতিভা সমালোচকদের দরবারে স্বীকৃত এবং সম্মানিত। সমসেট মম্‌, অল্ডাস হক্সলে ও ক্রিষ্টফার ঈসারউড—বিংশ শতকের ইংরেজী সাহিত্যে এঁদের প্রত্যেকেই স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের প্রগতিশীল সাহিত্য-সংসদের পক্ষ থেকে নোবেল প্রাইজ কমিটির কাছে একটা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে এই মর্ম্মে যে, সাহিত্যে এঁদের প্রত্যেকেরই নোবেল প্রাইজ পাবার সময় অনেক কাল আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এই সংসদ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, কেন যে এঁদের কাউকে এ পর্য্যন্ত নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়নি তা ভেবে দেখবার বিষয়। এঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে মমের দাবী সকলের আগে। অবশ্য ইংলণ্ডের এখনকার শ্রেষ্ঠ কবি টি, এস, এলিয়টের নামও এই প্রসঙ্গে উঠেছে, এলিয়টের কবি-প্রতিভা স্বীকৃত এবং সমাদৃত হলেও তিনি খাঁটি ইংলণ্ডীয় নন, যেমন্‌ নন বার্ণার্ড শ'। কাজেই ইংরেজী সাহিত্যিক হিসাবেই মম, হক্সলে ও ইসারউডের সাহিত্য-সৃষ্টি সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ও সংযুক্ত আলোচনা এখানে করা হোলো।

প্রথমে ঔপন্যাসিক মমের কথা বলি। তিয়াত্তর বছরের বলিষ্ঠ দেহ এই মানুষটির লেখনী আজও অক্লান্ত। গত পঞ্চাশ বছর ধরে ইংরেজী কথা-সাহিত্যে তিনি নেতৃত্ব করে আসছেন। তিনি জনপ্রিয় লেখক এই অর্থে যে, তিনি তাঁর নিজের চোখে দেখা বিষয়-বস্তুকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সরল ভাবে এবং সরলতম ভাষায় প্রকাশ করেন। কথা-সাহিত্যের কারবারী হলেও ঠিক যেটুকু বলবার সেইটুকু বলেন অননুকরণীয় ভাষায় এবং ভঙ্গীতে। বাহুল্যতা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মমের জীবন বড় বিচিত্র, যেমন বিচিত্র তাঁর জীবনের উপলব্ধি, অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা। তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা দৈবের দান নয়; সাহিত্যিক তিনি হয়েছেন নিজের একনিষ্ঠ চেষ্টা, যত্ন এবং সাধনায়। সেই সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভও করেছেন অপরিসীম। ১৮৭৪ সালে প্যারীতে তাঁর জন্ম। সেখানে বৃটিশ এম্‌বেসিতে মমের বাবা ছিলেন সলিসিটর। মম্‌ যখন মাত্র আট বছরের তখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয় এবং তার ঠিক দু'বছর বাদে তাঁর বাবা মারা যান। দশ বছর বয়স অবধি মম ইংরেজী ভাষা কিছুমাত্র শেখেননি এবং তার ওপর তিনি ছিলেন তোতলা। পিতৃমাতৃহীন মম্‌ এলেন ইংলণ্ডে তাঁর কাকার কাছে। কাকা ছিলেন এক জন ধর্ম্মযাজক এবং ভাইপোটিও যাতে সেই বৃত্তি অনুসরণ করে তার জন্যে তিনি মম্‌কে তেরো বছর বয়সে ক্যাণ্টারবারীর কিংস্‌ স্কুলে পাঠালেন। পাদ্রীর বৃত্তি মমের পছন্দ হলো না। তাই শেষ পরীক্ষা না দিয়েই তিনি স্কুল ছেড়ে দিলেন। হিসাব-পরীক্ষকের বৃত্তির জন্যে তিনি অন্য একটা স্কুলে ভর্ত্তি হলেন এবং তাতে কৃতকার্য্য হয়ে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। এই সময় তিনি দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলেন এবং চিকিৎসার জন্যে এলেন দক্ষিণফ্রান্সের এক স্বাস্থ্যনিবাসে। সেখানে থেকে রোগমুক্ত হয়ে প্যারিতে এসে চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় মন দিলেন এবং অধ্যয়ন অসমাপ্ত রেখে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এখানে সেণ্ট টমাস হাসপাতালে চিকিৎসা বিদ্যায় মনোনিবেশ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভের এক বছর আগে মমের

অল্ডাস হাক্সলে

প্রথম উপন্যাস "লিজা অব ল্যামবেথ" প্রকাশিত হয়। পাঠকমহলে বইখানি সমাদৃত হলো দেখে মম্‌ অবশেষে সিদ্ধান্ত করলেন যে তিনি লেখকের বৃত্তিই গ্রহণ করবেন। চিকিৎসক মম্‌ লেখক মম্‌ হলেন। প্রথম জীবনে তিনি অবশ্য নাট্যকার হতে চেষ্টা করেন এবং কিছু নাটকও রচনা করেন। এর কিছুকাল বাদে "অব হিউম্যান বণ্ডেজ" নামক বহু খ্যাত উপন্যাস লেখবার পর পাকাপাকি ভাবে ঔপন্যাসিক হিসেবেই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করলেন।

মমের লেখার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ তাঁর অসামান্য পর্য্যবেক্ষণ শক্তি এবং তার সুনিপুণ প্রকাশ। মম অত্যন্ত সহৃদয় প্রকৃতির লেখক। কথা-সাহিত্যে তিনি এক জন রিয়ালিষ্ট কি সিনিক, এ তর্ক আমি তুলতে চাই নে। লোকটির মানস গঠন স্বতন্ত্র রকমের। একটু উদাসী প্রকৃতির, কিন্তু তাই বলে রক্তমাংসের মানুষকে উপেক্ষা করেননি কোনও দিন। আত্মকেন্দ্র বটে, কিন্তু স্বভাবে অকৃতজ্ঞ নন; তীক্ষ্ণদৃষ্টি বটে, কিন্তু শুধু ব্রণান্বেষীই নন। তিনি মানুষের

ইসারউড

ও জগতের নানা নিহিত সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও পূর্ণ সচেতন। তাঁর নিজের জবাববন্দী এই: "আমাকে অনেকে বলেন সিনিক। মানুষ যত খারাপ, আমি না কি তাকে তার চেয়েও খারাপ করে এঁকেছি। আমার মনে হয় না, এ অভিযোগের ভিত্তি আছে। আমি যা করেছি তা এই যে, মানুষের চরিত্রের এমন অনেক গুণাগুণকে বড় করে দেখিয়েছি, যাদেরকে লোকে দেখেও দেখতে চায় না।" (Summing up—৫৮ পৃষ্ঠা)। প্রতিভার চেয়ে বড় কথা হলো সদাশয়তা—এ কথা এ যুগে বলতে পেরেছেন একমাত্র সমসেট মম্। তাঁর এই মনোবৃত্তিকে নিয়ে সমালোচকরা হাসাহাসি করেছেন। কিন্তু তাঁরাও আজ এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, মম্ আমাদের অনেক কিছু দেখতে শিখিয়েছেন। তাঁর মৌলিক চিন্তাশক্তির উজ্জ্বলতায় আমাদের অনেক গতানুগতিকতার পথ তিনি মেরে দিয়েছেন; সকলের ওপর মানুষকে বুঝতে, চিনতে ও জানতে শিখিয়েছেন তাঁর ক্ষুরধার বিশ্লেষণে ও নৈতিকতায়। অসাধারণ তাঁর পর্য্যবেক্ষণ শক্তি। মধ্য-জীবনে যখন তিনি দক্ষিণ সাগর দ্বীপে এবং প্রাচ্য দেশে ঘুরে বেড়াতেন, তখন সৌখীন পর্য্যটকের দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাঁর আশে-পাশের মানুষকে দেখতেন না। দেখতেন সেই স্বচ্ছ চোখ দিয়ে যে চোখের দৃষ্টিশক্তি মাইক্রোস্কোপের চোখকেও হার মানায়। তাই এই মানুষটির চোখ দু'টি সত্যিই অসাধারণ—অতল অবগাহী—যেমন অসাধারণ তাঁর মন। সেই জন্তেই মম্ বলে থাকেন—"দেখতে জানা চাই—"But you must know how to look. And it is not nearly so easy." এই দৃষ্টিশক্তির নিদর্শন মিলবে তাঁর "দি মুন এ্যাণ্ড সিক্স পেন্স," "রেজর্স এজ", "কেকস্ 'এ্যাণ্ড এল্" প্রভৃতি উপন্যাস এবং অজস্র গল্পের বহু ও বিচিত্র চরিত্রের মধ্যে। এই দৃষ্টিশক্তি এবং তার উচ্ছ্বাসবর্জ্জিত প্রকাশ দীর্ঘকাল মমকে কথা-সাহিত্যে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছিল। সমালোচকরা তাঁকে সহ্য করতে পারতেন না এই জন্তেই এবং ঠিক এই কারণেই তাঁর অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম (আজও যে খুব বেশী, তা নয়)। আর্ট-সর্ব্বস্বতাই যে তাঁর জীবনের প্রধান বাণী হয়ে ওঠেনি—তারও মূলে আছে তাঁর এই দৃষ্টিশক্তি। "আর্টের পরিসমাপ্তি সৌন্দর্য্যে নয়, ন্যায়কর্ম্মে—"এমন কথা ইংলণ্ডের আর কোন্ ঔপন্যাসিক বলেছেন আত্মপ্রত্যয়ের ভূমিতে দাঁড়িয়ে? অথচ মম্ এক জন সুদক্ষ সুকুমার শিল্পী এবং গল্পসওয়ার্দি প্রমুখ অনেকের চেয়েই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর শিল্পী। তাঁর উপন্যাসের কথা নাই বা তুললাম। বিংশ শতকে এত উৎকৃষ্ট ছোট গল্প আর কেউ লিখেছেন? এমন চক্ষুষ্মান্ লেখক এ যুগে সত্যিই বিরল। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে ইংলণ্ডের এখনকার প্রসিদ্ধ সমালোচক সিরিল কনোলী তাই বলেন: "As a craftsman, Maugham is simple in his devices, yet subtle in that simplicity; and his hand never fatters or hesitates. And what is striking is the formidable glance of his iceberg eyes that pierces the inner-most part of human mind."—এ উক্তি যে অত্যুক্তি নয় তা মমের বিদগ্ধ পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন।

• • • •

প্রখর চিন্তাশীল এবং প্রিয়দর্শন লেখক অল্ডাস হাক্সলে এখন রীতি-মতো এক জন যানপ্রহী। দক্ষিণ আমেরিকার এক নির্জন পাহাড়ের ওপর অবস্থিত একটি সুন্দর আশ্রমে তিনি এখন বাস করেন। সেখানে সঙ্গী তাঁর স্ত্রী মারিয়া এবং হিন্দু সন্ন্যাসী কৃষ্ণমূর্ত্তি। এখন তাঁর বয়স তিপ্পান্ন বছর। চুলে ঈষৎ পাক ধরেছে। পুরো ছ' ফুট লম্বা এই মানুষটির লেখার দুঃসাহসিকতা এক দিন তাঁর প্রথম যৌবনে ইংলণ্ডের সাহিত্যে একটা সাড়া এনেছিল। তাঁর চেহারায়, বিশেষ মুখে প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট। যে-পরিবারে তাঁর জন্ম, সেই হাক্সলে-পরিবার ইংলণ্ডের একটি প্রসিদ্ধ পরিবার—সে প্রসিদ্ধি জ্ঞানের, বিদ্যার এবং পাণ্ডিত্যের। তাঁর পারিবারিক আভিজাত্য সম্বন্ধে এই কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে: "No British writer, in any period, has had such a formidable literary ancestory as Aldous Huxley." ইংলণ্ডের ভিক্টোরীয় যুগের তিন জন চিন্তানায়কের প্রভাব তাঁর জীবনে অত্যন্ত সুস্পষ্ট—টমাস হেনরী হাক্সলে, ম্যাথু আর্ণল্ড এবং হামফ্রে ওয়ার্ড।

অল্ডাস হাক্সলে কবি, ঔপন্যাসিক এবং প্রাবন্ধিক। ১৮৯৪ সালে তাঁর জন্ম এবং প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছাত্র-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে কিছু কাল কাব্যচর্চ্চা করবার পর হাক্সলে গল্প লেখায় হাত দেন এবং তার পরে উপন্যাসে। তাঁর প্রথম উপন্যাস "ক্রোম ইয়লো" তাঁকে এক জন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের প্রতিষ্ঠা এনে দিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয়ের পটভূমিকায় বিরচিত তাঁর পরবর্ত্তী প্রত্যেকখানা উপন্যাসই (এ্যান্টিক হে, দোজ ব্যারেন লিভস্, পয়েন্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট, ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড প্রভৃতি) চিন্তা-জগতে একটা তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। তার পর সুরু হয় তাঁর ভ্রাম্যমানের জীবন। জীবনের এই অধ্যায়ে তিনি কিছু কাল ভারতবর্ষে এসে এর প্রসিদ্ধ স্থানগুলি পর্য্যটন করেন। ঠিক এই সময়েই তাঁর জীবনে আসে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। সমাজ ও সভ্যতার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং বৈরাগ্য এবং এর পেছনে ছিল বেদান্তদর্শনের প্রভাব। রোঁলা, রাসেল এবং ই, এম, ফরষ্টারের পর হাক্সলেই উল্লেখযোগ্য বিদেশী লেখক যিনি ভারতবর্ষকে ভালোবেসেছেন মনে-প্রাণে। ভারতের সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিকতা যেমন তার প্রভাব বিস্তার করেছে এঁদের প্রত্যেকের মর্ম্মে এবং চিন্তায়, সেই সঙ্গে এ দেশের বৈচিত্র্যেও এঁরা মুগ্ধ। ইংলণ্ডের আর কোনো ঔপন্যাসিক আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমন গভীর ও আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেননি—যেমন করেছেন অল্ডাস হাক্সলে। এই প্রাচ্য-প্রীতি অনেক বিদেশী লেখকের কাছেই একটা নিছক বিলাসিতা, কিন্তু হাক্সলের এই বিষয়ে আন্তরিকতা যে কত গভীর এবং ব্যাপক তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর "পেরিনিয়াল ফিলোজফি" নামক বইখানিতে। "But India—that is above all the place…Nothing is so fascinating as the Indian mind and the Indian intelligence"—এই কথা ইংলণ্ডের আর কোনো ঔপন্যাসিকের মুখ থেকে আমরা আজ পর্য্যন্ত শুনিনি। বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীর ভারতবর্ষের আত্মার মহিমাকে হাক্সলে সত্যিই উপলব্ধি করেছেন বলেই আজ তিনি বৈরাগ্যের উত্তরীয় সম্বল করে আশ্রমবাসী হয়েছেন। লস্ এঞ্জেলসের সেই অনাড়ম্বর আশ্রমে হাক্সলে নিজের

ই সব কাজ-কর্ম্ম করেন—রান্না থেকে বাসন-মাজা পর্য্যন্ত এবং স্ত্রী মারিয়া এ কাজে তাঁর একমাত্র সঙ্গিনী। জীবনে যে চরম তিনি এখন উপলব্ধি করেছেন তাকে তিনি ব্যক্ত করেছেন ভাবে: "I insist that politics are never enough, 1 that the human problem is insoluble unless be attacked simultaneously on all its fronts—e personal front as well as the political, the ligious and philosophical as well as the onomic—"আজকের দিনের ইউরোপ বানপ্রস্থী হক্সলের এই থায় কান দেবে কি না, কে জানে?

*   *   *   *

ইসারউড—সন্ন্যাসী ক্রিষ্টফার ইসারউড সম্পর্কে শুধু এইটুকু গলেই যথেষ্ট যে, প্রত্যেক চিন্তাশীল পাঠকের পক্ষে ইসারউডের চনার সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম পরিচিত হওয়া একটা কর্ত্তব্যের সামিল বং পুনরায় তা অনুশীলন করা অনাবিল আনন্দের বিষয়।

১৯০৪ সালে চেলসায়ারে এক ঐতিহাসিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিবারে সারউডের জন্ম। রেপ্টন এবং কেমব্রিজের তিনি এক জন মেধাবী াত্র ছিলেন। সতেরো বছর বয়সে কেমব্রিজের তিনি স্কলারসিপ লাভ চরেন। তাঁর বাপ-মায়ের ইচ্ছা ছিল, ছেলে এক জন অধ্যাপক হবে। কন্তু শেষ পরীক্ষার সময় প্রশ্নের উত্তর না লিখে কলেজের অধ্যাপকদের ম্বন্ধে রচনা করলেন এক অনবদ্য ছড়া—ফলে কলেজ থেকে তিনি বিতাড়িত হলেন। তার পর ১৯২৮-২৯ সালে লণ্ডনের কিংস কলেজে তিনি ডাক্তারী পড়তে সুরু করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর ভাগ্যে চিকিৎসক হয়ে ওঠা ঘটল না। এ্যানাটমী ও ফিজিওলজীর কণ্টকাবৃত অরণ্য থেকে তিনি এক দিন কণ্টিনেণ্টের পথে পা বাড়ালেন—বাইরের বিশাল পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে।

১৯৩০ সাল। ইসারউড বার্লিনে এলেন। ১৯৩০ সালের বার্লিন। হিটলারের আসন্ন অভ্যুদয় এই সময় বার্লিনে যে প্রাণচাঞ্চল্য, এর ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে যে জাগরণ এনে দিয়েছিল—তার অন্তরালে ক্ষমতালোভী ডিক্টেটরের যে নিরঙ্কুশ চক্রান্ত ধীরে ধীরে অক্টোপাশের দুর্ভেদ্য জাল বুনছিল—নবাগত ইসারউডের চক্ষে সেই বার্লিন আশ্চর্য্য ভাবে প্রতিভাত হল। একটা বিরাট ঐতিহ্যসম্পন্ন জাতির রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ে জুয়ারীর মনোবৃত্তিসম্পন্ন এক অজ্ঞাতকুলশীল অধিনায়ক সদম্ভে যে রকম ছিনিমিনি খেলা সুরু করছিলেন, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাবার সুযোগ পেলেন ইসারউড বার্লিনে এসে। তিনি উদ্বুদ্ধ হলেন এই সময়কার বার্লিনের পটভূমিতে একখানি উপন্যাস রচনা করতে। একটা ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনকে তিনি কথা-সাহিত্যে যে-ভাবে রূপ দিলেন, তার মৌলিকত্ব সমালোচক ও পাঠকদের দৃষ্টি ও প্রশংসা সহজেই আকর্ষণ করল। "মিঃ নোরিস চেঞ্জেস দি ট্রেনস" এবং "গুডবাই টু বার্লিন"—এই দু'খানি বই লিখে ইসারউড এক জন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

মম্

এর আগে তাঁর তিনখানা বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু "মিঃ নোরিস চেঞ্জেস দি ট্রেনস্" প্রকাশিত হবার পর থেকেই ইসারউডের মধ্যে সমালোচকগণ মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন এক জন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীকে আবিষ্কার করেন এবং তাঁর সম্বন্ধে সকলে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তাঁর বার্লিনের গল্পগুলিতে রচনাশৈলীর অনন্যসাধারণতা লক্ষ্য করবার বিষয়। সেই সঙ্গে চরিত্র-চিত্রণের সরস অথচ ট্র্যাজিক ভঙ্গী পাঠকের মন ও চিন্তাকে সহজেই অভিভূত করে।

উপন্যাস ও গল্প ছাড়া, কবি অডেনের সঙ্গে তিনখানা নাটকও ইসারউড লিখেছেন। তাঁর রাজনৈতিক বইখানিও কম প্রসিদ্ধ নয়, সেটির নাম হল "জার্নি টু এ ওয়ার"—এর বক্তব্য বিষয় সমসাময়িক চীনের অন্তর্বিপ্লব। কিন্তু ভারতবাসীর কাছে আজ ইসারউড যে জন্য প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছেন, সে হল গীতার অনুবাদের জন্য। ঠিক অনুবাদ নয়, গীতার প্রত্যেকটা শ্লোকের মর্ম্মবাণীকে তিনি কবিতায় রূপায়িত করে তুলেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের আমেরিকাপ্রবাসী স্বামী প্রভাবানন্দ তাঁকে এই কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। বর্ত্তমানে ইসারউড ক্যালিফর্নিয়ার কাছে একটি আশ্রমে বাস করেন। তাঁর চিন্তায় ও চরিত্রে এসেছে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। সেই পরিবর্ত্তনের স্রোতে ঔপন্যাসিক ইসারউড আজ তলিয়ে গেছেন—বিদগ্ধ পাঠক-সমাজের কাছে এ এক মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ।

আগামী সংখ্যা হইতে মহাস্থবিরের উপন্যাস

- - - - - - - । প্রভাত-সঙ্গীত ।

ছোটদের আসর

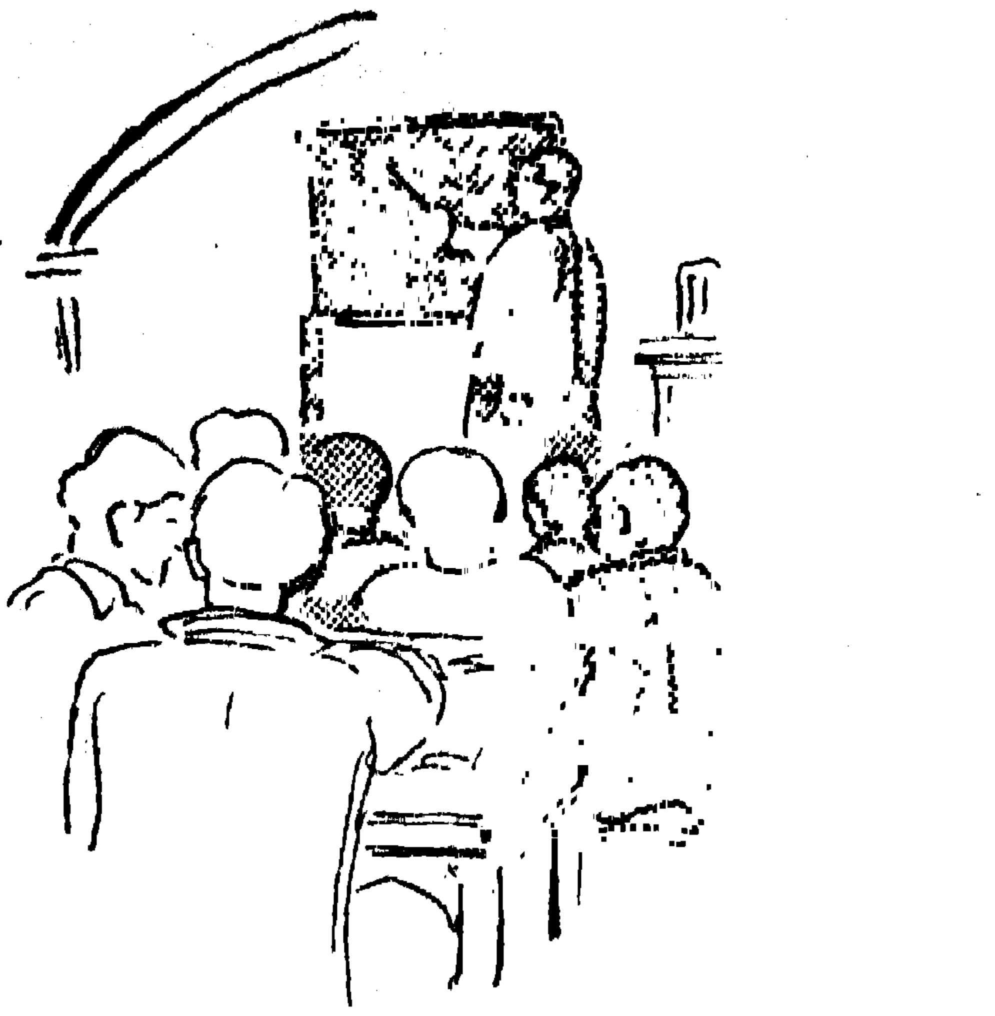

গোলক-ধাঁধা

শ্রীসুব্রতকুমার মহলানবিশ

শ্রীমান্ গোলোকচন্দ্র ধর, ওরফে গোলু, ওরফে গোলক-ধাঁধা ছেলেটি নেহাৎ মন্দ নয়। গোলোক থাকে তার এক বিধবা পিসী ও বাবার সঙ্গে দূর-পশ্চিমে, গোলুর বাবা গোকুল ধর একটি মাইকা ও কয়লা কোম্পানীর কেরাণী হয়ে ১৩২৫ সালে প্রথম এই পশ্চিমে বাস সুরু করেন। মাতৃহীন গোলু তখন শিশু। বাড়ীতে তার বিধবা পিসীই তার দেখাশুনা করতেন। তারা যে জায়গাটায় থাকত, তার নাম ছিল 'মহুয়া'—বোধ করি, মহুয়া গাছের প্রাচুর্য্যের জন্যই! এই জায়গার দৃশ্য অতি মনোরম। এক দিকে গভীর শালবন, অন্য-দিকে উঁচু পাহাড়ে-জমী এবং দূরে একটি ছোট্ট পাহাড়ে-নদী। রেল থেকে নেমে দুই ক্রোশ পথ গেলে এই জায়গায় পৌছান যায়। আগে সেখানে প্রায় কিছুই ছিল না, এখন সেখানে কয়েক ঘর ভদ্রলোকের বাস সুরু হয়েছে এবং সপ্তাহে এক দিন হাটও বসে। তবে সহর বলতে যেটুকু বোঝায়, তা ছিল ষ্টেশনের কাছে, অর্থাৎ সেখানে আরও কয়েক ঘর ভদ্রলোকের বাস ছিল এবং একটি ছোট স্কুল ও একটি ডিস্পেনসারী ছিল।

মহুয়া থেকে আধ মাইলের মধ্যে গোলুর বাবার আপিস। তিনি রোজ দশটায় খেয়ে বেরোতেন এবং কোন দিন সাড়ে পাঁচটা অথবা কোন দিন আরো দেরীতে ফিরতেন। গোলু রোজ দু' ক্রোশের উপর পথ হেঁটে স্কুলে যেত। বাড়ীর কাছাকাছি তার কোন সঙ্গী না থাকাতে তার অভাবটি সে বড়ই বোধ করত। বাড়ীতে তাই তার প্রধান সঙ্গী ছিল কালু বলে একটি প্রকাণ্ড কালো কুকুর। কালুকে গোলু বাচ্চা অবস্থা থেকে পালন করেছিল এবং এই বুনো-প্রকৃতির কুকুরটি একমাত্র গোলুকেই ভালবাসত এবং ভয় করত। কালুর অদ্ভুত বুদ্ধি ছিল। সে গোলুর আদেশ ও সঙ্কেত আশ্চর্য্য রকম বুঝত। এই প্রকাণ্ড কুকুরটি গোলুর গর্ব্বের বিষয় ছিল, কারণ, মাসের পর মাস ধৈর্য্য ধরে সে তাকে নিজের হাতে নানা রকম কাজ করতে শিখিয়েছিল।

গোলু এখন সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ে। পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর জায়গায় থেকে, পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে ও নানা রকম শারীরিক ব্যয়াম করে তার গায়ে অসম্ভব জোর হয়েছিল। শুধু যে তার শারীরিক শক্তি ছিল তা নয়, ছেলেবেলা থেকে একা-একা ঘুরে তার সাহসও খুব হয়েছিল।

এই সময় তার মাথায় নানা প্রকার আজগুবি কল্পনা খেলতে সুরু করে। এর মূল কারণ বোধ হয় কয়েকটি (অপাঠ্য) পুস্তক। গোকুল বাবু মাঝে মাঝে সময় কাটাবার জন্য বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ডিটেক্‌টিভ নভেল ধার করে এনে পড়তেন। গোলু এক দিন ঘটনাক্রমে সেই সব নভেল পড়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। এই বয়সে ছেলেরা যা পায় তাই আগ্রহ করে পড়ে। আমাদের গোলোকচন্দ্রও তাই গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ে তন্ময় হয়ে যেত। যাই হোক, এক দিন হঠাৎ গোকুলচন্দ্রের নজরে পড়ে যাওয়াতে তার নভেল পড়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তার পর থেকেই গোলুর মনে মনে গোয়েন্দা হবার একটি প্রবল ইচ্ছা জন্মায়। গোয়েন্দা-কাহিনীর নায়ক গজেন্দ্র তার আদর্শ পুরুষ হয়ে উঠেছিল। এই সময় হঠাৎ এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে গেল যে গোলু তার মনের সখগুলি মেটাবার সুযোগ পেয়ে গেল।...

গোলুদের বাড়ী সবশুদ্ধ তিনটি পাকা ঘর ছিল। একতলায় দু'টি ও দু'তলায় একটি। একতলার একটি ঘরে গোকুল বাবু থাকতেন ও অন্যটিতে পিসী থাকতেন। গোলু কিছু কাল হোল উপরের ঘরটি দখল করেছিল। এই ঘরটি তার বড়ই প্রিয়। ঘরের এক কোণে একটি তক্তাপোষ ও আর এক কোণে একটি ছোট টেবিল ছিল। এই ঘরের জানালা দিয়ে বহু দূর দেখা যেত। বাড়ীর ভিতর দিকে একটি পাঁচিল-ঘেরা ছোট উঠান ছিল এবং বাড়ীর গায়ে লাগান একটি চাতাল ছিল। এই চাতাল থেকে একটি ছোট সিঁড়ি দিয়ে গোলুর ঘরে যাওয়া যেত।

এক দিন রাত্রে গোকুল বাবু খেতে বসে গল্প করলেন যে, 'টিলাডি' অর্থাৎ ষ্টেশনের কাছের পাড়াতে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মহুয়া থেকে টিলাডি যেতে পথে একটি প্রকাণ্ড মাঠ আছে। সেই মাঠের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড পোড়ো-বাড়ী আছে। এই বাড়ীর অর্দ্ধেক ঘরই ভাঙ্গা। বাড়ীটি এক সময় কয়লা কোম্পানীর সাহেবদের ছিল, কিন্তু বহু দিন পরিত্যক্ত অবস্থায় থেকে এখন পোড়ো-বাড়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যার পর সাহস করে কেউই সেই বাড়ীর কাছে যেত না এবং বাড়ীটার সম্বন্ধে নানা রকম আজগুবি গল্পও রটেছিল। ষ্টেশন-ক্লার্ক রামরতন বাবু এক দিন বাড়ী ফেরবার সময় এই পোড়ো-বাড়ীতে আলো দেখতে পেয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করেন যে, কে বা কারা সেখানে আছে। কিন্তু উত্তরে তিনি শুধু বিকট হাসি ছাড়া আর কিছু শুনতে পাননি। ভয়ে তিনি ছুটে বাড়ী পালিয়ে যান এবং এই ঘটনার পরে আরও অনেকে সেখানে হাসি ও শব্দ শুনতে পায়।

গোকুল বাবু খেতে বসে নানা রকম গল্প করছিলেন আর গোলু নিবিষ্ট মনে তাই শুনছিল। পরের দিন গোলু 'টিলাডি'তে স্থানীয় চৌকিদারদের আখড়ায় গেল। এই আখড়ায় গোলু ছুটীর সময় নিয়মিত কুস্তি লড়ত। এখানে গয়ারাম ছিল গোলুর প্রধান শিক্ষক। গয়ারামের গায়ে যে পরিমাণ শক্তি ছিল, মাথায় সেই পরিমাণ বুদ্ধি ছিল না। গোলুকে দেখে, গয়ারাম সাদর সম্ভাষণের পর জিজ্ঞেস করল যে, গোলু 'পোড়ো-বাড়ীর' গল্প শুনেছে কি না? গোলু ঘাড় নেড়ে বলল যে, সে শুনেছে এবং সে নিজে এই রহস্যের কিনারা করতে চায়। গয়ারাম সভয়ে বলল, "ওসি বাত বোলো না গোলু বাবু, আপনার কি জানের ভয় নেই? সেখানে বারা আউর পিরেত কি আড্ডা।" গোলু দেখল যে, গয়ারাম আগেই ভয় পেয়ে গেছে। যাই হোক, গয়ারামের কাছে বিদায় নিয়ে সে

বার বেরিয়ে পড়ল। চিন্তিত মনে কিছু দূর অগ্রসর হবার পরই সে দেখল যে আকাশে মেঘ করেছে। সুতরাং সে বাড়ীর দিকেই ফিরে চলল। একটু পরেই সে পোড়ো-বাড়ীটার কাছে এসে পড়ল এবং সেটার সামনে দিয়ে যাবার সময় নিস্তব্ধ বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে গোলুর গত রাত্রের কথাগুলি সম্পূর্ণ আজগুবি বলে মনে হোল। গোলু যখন নিজের বাড়ীর কাছে এসেছে তখন দমকা বাতাসের সঙ্গে ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে সুরু করল। গোলু দরজার কড়া নাড়তেই ঘেউ-ঘেউ করে কালু সাড়া দিল এবং দরজা-খোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনের মত সে গোলুর গায়ে লাফিয়ে উঠে আনন্দ জ্ঞাপন করতে লাগল।···

সেদিন রাত্রে খাবার পর গোলু যখন নিজের ঘরে গেছে, তখন খুব জোরে বৃষ্টি নেমেছে। সে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুমাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। খাটের নীচে ঝুঁকে সে দেখল যে কালু নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমোচ্ছে। বাইরে অন্ধকারে বৃষ্টি আর ঝড়ের গর্জ্জন। হঠাৎ তার মনে হোল যে, পায়ের দিকের জানলাটা দিয়ে দূরে পোড়ো-বাড়ীটা দেখা যায়। সে আস্তে আস্তে উঠে জানলাটা একটু ফাঁক করে অন্ধকারে পোড়ো-বাড়ীটা দেখবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। এক-এক বার জলের ঝাপটা এসে তার মুখ-চোখ ভিজে যাচ্ছিল, কিন্তু তবুও জোর করে সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মিনিট এই ভাবে যাবার পর হঠাৎ সে অবাক হয়ে দেখল যে একটা তীব্র আলোর রেখা অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে মিলিয়ে গেল।

এই ভাবে কয়েক মিনিট অন্তর সেই আলোর রেখাটিকে সে আরও কয়েক বার দেখতে পেল। সে একদৃষ্টিতে বাড়ীটার দিকে লক্ষ্য রাখছিল বলে একটা জিনিষ দেখতে পেল না। দূরে একটা লাল আলো কয়েক বার মিট-মিট করে জ্বলে নিবে গেল। গোলু আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও যখন কিছু দেখতে পেল না, তখন এসে শুয়ে পড়ল আর একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন সকালে উঠে গোলু গতরাত্রের ঘটনার কথা বাড়ীতে কাউকে বলল না। স্কুল থেকে ফিরে এসে সে কালুকে সঙ্গে নিয়ে সেই পোড়ো-বাড়ীটার অভিমুখে যাত্রা করল। এই বাড়ীটা ছিল একটু অদ্ভুত ধরণের। আসল বাড়ীটা ঘিরে অনেকগুলি ছোট ঘর ছিল এবং একটা পাঁচিল-ঘেরা বড় উঠান পেরিয়ে আসল বাড়ীটায় ঢুকতে হোত। বাড়ীটার ভিৎ খুব উঁচু ছিল, এবং নীচে অনেক চোরা-কুঠরী ছিল। ভগ্নদশা প্রাপ্ত হবার পর বাড়ীটায় সাপ, ব্যাঙ ও নিশাচর পশুপক্ষীর আড্ডা হয়েছিল।

গোলু মাঠ পেরিয়ে বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ীটা দেখে মনেই হয় না যে সেখানে কারুর বাস আছে। সামনের সব ঘরগুলিই ভাঙ্গা। সূর্য্য তখন বাড়ীর পিছন দিকে হেলে পড়াতে বাড়ীর ভিতরটা একটু অন্ধকার মনে হচ্ছিল। গোলু সাহস করে সামনের ঘরটায় ঢুকল। অন্য সময় হলে কালু আগে ছুটে যায়, কিন্তু আজ সে গোলুর সঙ্গে সঙ্গেই রইল। গোলু সামনের ঘর পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত একটু অন্ধকার একটা মস্ত ঘরে ঢুকল। গোলুকে ঢুকতে দেখে কয়েকটা চামচিকা উড়ে পালাল। গোলু উপর দিকে তাকাতেই, তার পায়ের কাছ দিয়ে কি যেন একটা তাড়াতাড়ি চলে গেল। কালু তেড়ে গেল না, অথবা ধরতে পারল না এমন কি জীব পায়ের কাছ দিয়ে চলে গেল, এই কথা ভাবতে ভাবতে গোলু ভিতরের দিকে পা বাড়াতেই একটা কিচ্-কিচ্ শব্দ শুনে সভয়ে তাকিয়ে দেখে যে প্রকাণ্ড একটা কেউটে সাপ একটা মস্ত ইঁদুর ধরেছে। ইঁদুরটা গোলুদের দেখে, বাইরে পালাতে না পেরে ভিতর দিকে পালাতে গিয়েছিল ও তাইতে সাপের মুখে পড়েছে। চারি দিকে ভাঙ্গা ইটের স্তূপ থাকাতে সেখানে সাপের বাসা হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। গোলু আস্তে আস্তে পেছু হটে কালুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল। সাপটা ইঁদুর গিলতে ব্যস্ত থাকায় তেড়ে এল না। বাইরে এসে গোলু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কুকুর-বাঁধা শিকলটা বার করে কালুর গলায় আটকে দিল—যাতে সে কোথাও ছুটে না যেতে পারে। গোলু মনে মনে ভাবল যে, ভাঙ্গা-বাড়ীর ভিতরে যাবার পথটি যদি এই ভীষণ প্রহরীর পাহারায় থাকে, তাহলে নিশ্চয় কোন প্রাণীই এই পথে যেতে পারে না। গোলু যতই ভাবতে লাগল ততই তার সন্দেহ হতে লাগল। সেদিন অন্ধকার হয়ে যাওয়াতে আর দেরী না করে গোলু বাড়ীর দিকেই ফিরে চলল।

রাত্রে খাওয়ার পর গোলু শুয়ে শুয়ে পোড়ো-বাড়ীর কথাই ভাবছিল। বাড়ীটার সামনের সব ক'টা ঘরই প্রায় ভাঙ্গা অবস্থায় ছিল। এই ক'টা ঘর দিয়েই ভিতরের বড় ঘরটায় যাওয়া যেত এবং ভিতরের উঠানে যেতে হলে এই বড় ঘরটা দিয়ে যেতে হোত। গোলুর মনে হোল যে, ভিতরের বড় ঘরটায় যখন ওই রকম ভীষণ প্রহরী রয়েছে তখন উঠানে এবং ভিতর-বাড়ীতে যাবার নিশ্চয় অন্য কোন গুপ্ত পথ আছে, এবং এই পথে নিশ্চয় নির্ভয়ে যাতায়াত করা যায়। নানা রকম কথা ভাবতে ভাবতে গোলু ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন স্কুলে গিয়ে গোলু তার অন্তরঙ্গ বন্ধু দু'টিকে সব ঘটনা বলার সুযোগ খুঁজতে লাগল। বরেন দাস ও কানাই ঘোষ দু'জনেই গোলুর সহপাঠী। বরেন বয়সের পক্ষে যেমন লম্বা তেমনই চওড়া। গায়ে তার সাঁওতালদের মত শক্তি। কানাই ছিল ছোট-খাট ছিপছিপে চেহারার। গোলুর মনে পড়ল, সে কানাইয়ের হাতে একটা টর্চ্চ বাতি দেখেছিল এক দিন। সে নিজে একটা টর্চ্চের অভাব বড়ই বোধ করছিল। কানাইকে ছুটির পরে সে বললে, "দেখ, তোর টর্চ্চটা আমায় কয়েক দিনের জন্য ধার দিতে পারিস?" কানাই বললে "আগে কি জন্যে বল, তার পর আমি দেব।" গোলু বললে, "আগে তুই দে, পরে সব বলব।" কানাই বললে, "আচ্ছা পাশে আমার বাড়ী থেকে নিয়ে যাস, পরে কিন্তু আমায় সব বলতে হবে।" গোলু চলে যেতে যেতে বললে, "আচ্ছা, তাই নিয়ে যাব।"

সেদিন বাড়ী ফিরে গোলু, যা যা জিনিষ দরকার তারই একটা ফর্দ্দ করে ফেলল। একটা টর্চ্চ, একটা শক্ত লাঠি, একগাছা দড়ি ও একটা বড় ছুরি। কেন যে এই জিনিসগুলি দরকার, তা সে ঠিক করতে পারল না, তবে তার মনে হোল যে এইগুলি ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

সেদিন রাত্রে খেতে বসে গোলু তার বাবাকে পোড়ো-বাড়ী সম্বন্ধে খবর জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন যে, পোড়ো-বাড়ী সম্বন্ধে

নতুন খবর কিছু নেই বটে, তবে তাঁর আপিসের ভূধর বাবুকে হাটের দিনে এক জন সম্পূর্ণ অচেনা লোক ওই পোড়ো-বাড়ী সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল। ভূধর বাবু বললেন যে সেই লোকটির প্রশ্ন করার ভঙ্গীতে তার একটু সন্দেহ হয়, উপরন্তু তিনি কোন কালেই লোকটিকে এই অঞ্চলে দেখেননি। লোকটি যদিও বাঙলা ভাষায় কথা বলেছিল, কিন্তু সে বাঙালী কি না এ বিষয় তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ আছে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে গোলু ভূধর বাবু-কথিত সেই অজানা লোকটির কথা ভাবছিল। সে ভেবে দেখল যে এক জন অজানা লোক—যাকে সে তল্লাটে কেউ কখনও দেখেনি—যখন হঠাৎ পোড়ো-বাড়ী সম্বন্ধে খোঁজ নেয়, তখন সে নিশ্চয় জানতে চায় যে বাড়ীটার সম্বন্ধে কি গুজব রটেছে। তার আরও মনে হোল যে ওই লোকটা নিশ্চয় বাড়ীটার অদ্ভুত ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িত। গোলুর হঠাৎ মনে পড়ল যে গোকুল বাবুর তক্তাপোষের নীচে একটা কাঠের বাক্সে ভাঙ্গা-চোরা জিনিষের সঙ্গে একটা পুরান সাইকেলের ল্যাম্প দেখেছিল। এই ল্যাম্পটি ভবিষ্যতে কত কাজে লাগতে পারে এই ভাবতে ভাবতে গোলু ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই গোলুর মনে পড়ল যে সেদিন রবিবার। গোকুলচন্দ্র সকালে চা-পান শেষ করে বেই বেরোলেন, গোলু অমনি ল্যাম্পের সন্ধানে তার ঘরে ঢুকল। ল্যাম্পটাকে সে খুঁজে বার করল। অনেক দিন পড়ে থেকে মরচে ধরে ময়লা হয়ে গিয়েছিল। গোলু সারা সকাল ল্যাম্পটা পরিষ্কার করল ও সেটার গায়ে কালো আলকাতরা মাখাল। ল্যাম্পটার রং শুকিয়ে গেলে সেটাতে তেল আর পলতে ভরে নিজের ঘরে রেখে দিল। সারা সকাল এই ভাবে কাটিয়ে বিকেল বেলা গোলু কানাইয়ের খোঁজে বেরোল। কিছু দূর যাবার পর সে দেখল যে বিশাল বপু নিয়ে হরদেও বানিয়া তারই দিকে আসছে। টিলাডিতে হরদেওর একটি দোকান ছিল, এছাড়া সে অনেক প্রকার ব্যবসা করত। হরদেও সামান্য ভাবে থাকলেও, গুজব ছিল যে তার অনেক টাকা। গোলুকে দেখে হরদেও দাঁত বার ক'রে জিজ্ঞেস করল, "কি গোলু বাবু খবর কি?" গোলু বললে, "খবরের মধ্যে ত পোড়ো-বাড়ীতে ভূতের আড্ডার মিথ্যা গুজব।" হরদেও দাঁত বার করে ভুঁড়ি দুলিয়ে বললে, "ঝুট নেই—একদম সাচ্ খবর।—হামি দেখেছি, ২।৩ দিন আগে হামি একা ওই বাড়ীকো সামনে দিয়ে ঘর ফিরছি, এমন সময় আঁধারে হাসি শুনে তাকিয়ে দেখি কি ভাঙ্গা-বাড়ীর ছাতে একটা ১৫।২০ হাত লম্বা আদমী গোড় দু'টা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে। তার আঁখ দু'টা চিমনীর মত জ্বলছে। হামি রামনাম করতে করতে জানের ডরে পালিয়ে গেলাম।" গোলু হরদেওর কথায় কান না দিয়ে বললে, "তোমার যদি ভূতের ভয় থাকে তাহলে ওদিকে যেও না, তোমার মত আমার ভূতের ভয় নেই।" গোলু তাড়াতাড়ি চলে গেল। সে যদি পিছন ফিরে তাকাত, তাহলে দেখতে পেত যে হরদেও তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

কানাইয়ের বাড়ী গিয়ে গোলু দেখে, সে একমনে একটা ছেঁড়া ঘুড়ি আঠা দিয়ে জুড়ছে। গোলু যে কখন তার কাছে চলে এসেছে, তা সে টেরই পায়নি। গোলু হেসে বললে, "কি রে, একমনে এত বড় একটা দরকারী কাজ করছিস যে টেরই পেলি না আমি এসেছি?" কানাই অপ্রস্তুত হয়ে, হেসে বললে, "ঘুড়িটা এখন ওড়াব ভাবছিলাম।" গোলু বললে, "নে নে, আর ঘুড়ি ওড়াতে হবে না, চল একবার বরেনের কাছে, দেখি ও কি করছে।"

গোলু আর কানাই বরেনের বাড়ীর দিকে কিছু দূর যাবার পরই দেখে, বরেন একটা মস্ত বাঁশের লাঠি হাতে তাদের দিকে আসছে। বরেনকে দেখে গোলু আর কানাই হেসে উঠল। গোলু বললে, "কি রে, লাঠি হাতে এই সময় চলছিস কোথায়?" বরেন গোলুকে বললে "তোর না একটা লাঠির দরকার আছে বলেছিলি?" গোলু বললে, "হ্যাঁ, দরকার ও আছেই। এখন চল, তিন জনে কোথাও বসে পরামর্শ করা যাক।

তিন বন্ধুতে ষ্টেশনের দিকে চলল। পথে হরদেওর দোকানের সামনে গোলু একবার দাঁড়াল। হরদেও তখন পিছন ফিরে একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। গোলু লক্ষ্য করে দেখল যে কয়েক ডজন খালি কেরাসিনের বোতল নিয়ে হরদেও দর-দস্তুর করছে। এই সময় কানাই গোলুকে চিৎকার করে ডাকতে অন্য লোকটা হঠাৎ ফিরে তাকাল এবং গোলুর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। গোলু তাকে ভাল করে দেখবার আগেই সে চট করে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। গোলুর হঠাৎ মনে পড়ল যে, এই লোকটাকে সে গোকুল বাবুর আপিসে এক দিন দেখেছিল। যাই হোক, তারা তিন জনে আবার পথ চলতে সুরু করল। বরেন বললে, "বাড়ী ফিরে আমার আবার এক্সারসাইজ করতে হবে। আমি আজকাল সন্ধ্যার সময় এক্সারসাইজ করে স্নান করি, সকালের এক্সারসাইজ বাদ দিয়েছি।" কানাই কিছু না বলে থাকতে পারল না। সে বললে, "আমি বাড়ীতে দুটো মোটা দড়ি ঝুলিয়ে রিং বানিয়ে নিয়েছি এবং তাইতে নিয়মিত এক্সারসাইজ করি।" গোলু হেসে বললে, "তাই করতে আরও পাকিয়ে যাচ্ছিস।" বরেনের গায়ে যদিও গোলুর চেয়ে বেশী শক্তি ছিল, কিন্তু সে মনে মনে জানত যে মারামারিতে গোলুর সঙ্গে এঁটে ওঠা শক্ত। গোলুর গায়ে যথেষ্ট জোর ছিল, এ ছাড়া সে অত্যন্ত ক্ষিপ্র ছিল। গল্প করতে করতে তিন বন্ধু ক্রমে ষ্টেশনে এসে পড়ল। কানাইয়ের ইচ্ছামত তিন বন্ধু ষ্টেশন পেরিয়ে কাছেই একটা শাল-বনে ঢুকল। এক জায়গায় কতকগুলি বড় বড় পাথর পড়েছিল, সেইখানে এসে তারা তিন জনে তিনটে বড় পাথরের উপর বসল। গোলু বললে, "কয়েক দিনের মধ্যে যে অনেক ব্যাপার ঘটে গেল তার খবর কিছু রাখিস তোরা?" কানাই বললে, "খবরের মধ্যে ত এক পোড়ো-বাড়ীর খবর, তা-ও এত দিনে পুরান হয়ে গেছে, নতুন কিছু হয়েছে বলেও শুনিনি।" গোলু বরেনকে জিজ্ঞেস করলে, "পোড়ো-বাড়ী সম্বন্ধে তুই কি জানিস?" বরেন হেসে বললে, "ও নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামাইনি, তাছাড়া আমি মনে করি, গুজবকে প্রশ্রয় দিলেই সে বেড়ে যায়।" গোলু গম্ভীর হয়ে বললে, "আমার কিন্তু মনে হয় যে মাথা ঘামানই দরকার, কারণ কেউ মাথা ঘামাবে না জেনে নিয়েই কোন বদমাইস লোক ওখানে কিছু করছে বলে মনে হয়।" গোলুর কথায় কানাইও অবাক হয়ে গেল। গোলু তখন গোড়া থেকে যা যা ঘটেছিল সব বলল। বরেন বললে "এক কাজ করা যাক, চল আমরা সকলে মিলে এক দিন পোড়ো-বাড়ীতে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখি কোথায় কি আছে।" গোলু শুনে বললে, "যতটা সহজ মনে করেছিস, কাজটা তত সহজ নয়। কারণ ভেবে দেখ দিকি আমরা সোজা পথে বাড়ীতে ঢুকতে গেলে মারা পড়তেও পারি।

জই আগে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে অন্য কোন প্রবেশ- আছে কি না। কিন্তু বাড়ীর লোকেরা যদি টের পায়, তাহলে চয় আমাদের বাধা দেবে।" কানাই এই কথায় বললে, "তাহলে পার যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে মনে হয়, দিনের আলো থাকতে আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ সম্ভব নয়। কিন্তু গোলু যে প্রহরীর কথা বলছে, রকম আরও ২।৪টি থাকলে ত আর রক্ষা নেই,—কেবল একটি ত্র উপায় ছাড়া—" কানাই চুপ করাতে বরেন বললে, ঃ রে, চুপ করলি কেন? কি উপায় বল।" কানাই বললে, কেটে করে কয়েকটা বোমা নিয়ে যাওয়া ছাড়া।" বরেন হো হো র হেসে বললে, "বাহবা কানাই!" গোলু বললে, "এতে হাসবার ছুই নেই, উপায় থাকলে তাই করা যেত, তবে আমাদের এখন চিত প্রহরীদের এড়িয়ে চলা।" নানা রকম গল্পে সূর্য্য অস্ত যেতেই ন বন্ধু উঠে দাঁড়াল। তারা সেখান থেকে টিলাডি অভিমুখে ত্রা করল। তারা যখন ষ্টেশনের কাছে এসেছে, তখন দূর থেকেই গালু লক্ষ্য করল যে, কে একটি লোক শেডের নীচে তখনও কাজ রছে। আর একটু কাছে এসে গোলু দেখল, লোকটি দু'টি বড় ঠের 'প্যাকিং কেস'এর উপর আলকাতরা দিয়ে নাম লিখছে। গালু ইচ্ছা করেই লোকটির কাছ ঘেঁসে চলে গেল। লোকটি একমনে াজ করছিল বলে আর তাদের দিকে তাকাল না। গোলু ঐ ল্প সময়ের মধ্যেই দু'টি জিনিষ লক্ষ্য করেছিল। প্রথমটি হচ্ছে যে, সই লোকটি ষ্টেশন-ক্লার্ক রামরতন মল্লিক ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সে াক্সের গায়ে মাত্র ২১ মাইল দূরের একটি ষ্টেশনের নাম লিখছিল। রেন আর কানাই কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করেনি।

তারা ক্রমে পোড়ো-বাড়ীর কাছে এসে গেল। সূর্য্য অস্ত গেলেও তখনও বেশ আলো ছিল। বাড়ীটার চার দিকে অনেকখানি জমি। দূরে জমির পাঁচিল সবই য় ভেঙ্গে পড়েছে। বাড়ীটার সামনে—যেখানে কোন সময় ভিতরে ঢুকবার একটা 'গেট' ছিল, তিন বন্ধুতে সেইখানে এসে দাঁড়াল। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই— চারি দিকে একটা থমথমে ভাব। গোলু লক্ষ্য করল, একটা কাঠ বেড়ালী কাছের একটা গাছ থেকে নেমে এসে সামনের ভাঙ্গা ঘরটার কাছে লেজ উঁচু করে বসল। গোলু মজা দেখবার জন্য একটা ঢিল কুড়িয়ে নিল। কাঠবেড়ালীটা তখন সন্তর্পণে সামনের ঘরটার দিকে যাচ্ছিল। গোলু ঢিলটা টিপ করে কাঠবেড়ালীটার গায়ে ছুঁড়ে মারতেই সেটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বিদ্যুৎবেগে তাদের দিকেই ছুটে এল এবং পাশ কাটিয়ে ছুটে পালাল। গোলু লক্ষ্য করল যে, ঘরটার সামনে ও পাশ দিয়ে পালাবার যথেষ্ট জায়গা থাকতেও কাঠবেড়ালীটা তাদের দিকেই ছুটে এল। বরেন গোলুর কাণ্ড দেখে বললে, "তোর ছেলেমানুষী এখনও গেল না। চল, একবার সামনের ঘরটায় ঢুকে দেখি কি ব্যাপার।" গোলু বরেনের হাত ধরে বললে, "খবরদার, অমন কাজও করিস না, তার চেয়ে চল, আলো থাকতে থাকতে আমরা বাড়ীটা একবার প্রদক্ষিণ করে দেখি।" বরেনের হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে গোলু আগে আগে চলল ও তার পিছনে কানাই ও বরেন চলল। বাড়ীটার চার পাশের জমিতে বড় গাছের মধ্যে দুটো মহুয়া গাছ, একটা জাম গাছ ও গোটা ৪।৫ আম গাছ ছিল। এছাড়া বাকী জমি আতা গাছ, আগাছা ও ঝোপ-ঝাড়ে ভরে গিয়েছিল। গোলু সজাগ হয়ে আগে আগে চলছিল। তারা যখন বাড়ীর পিছন দিকে চলে এসেছে, তখন সন্ধ্যা হতে আর দেরী নেই। গোলু সেই আলোতেই লক্ষ্য করল, একটা পায়ে চলা পথ দূরে চলে গেছে। গোলু সেই পথটি ধরে একটু যেতেই একটা কাচের বড় টুকরা দেখতে পেয়ে তুলে পকেটে ভরল। বরেন হেসে জিজ্ঞেস করল, "কি অমূল্য রত্ন পেলি রে?" গোলু উত্তরে বললে, "পরে দেখিস।" যতক্ষণ তারা এই ভাবে ঘোরাঘুরি করছিল, ততক্ষণ গোলুর মনে হচ্ছিল যে বাড়ীর ভিতর থেকে কারা যেন লুকিয়ে তাদের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করছিল। কানাইয়ের এবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। সে বললে, "কতক্ষণ আর ঘুরবি, এবারে ফিরি চল।" কানাইয়ের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ধপ করে মস্ত একটা ইটের টুকরা এসে কানাইয়ের পায়ের কাছে পড়ল। তিন জনেই চমকে উঠল। কানাই বললে, "আর একটু হলেই মাথাটা গিয়েছিল আর কি!" বরেন বললে, "বাড়ীর ভিতর থেকে কেউ ছুঁড়েছে বলে ত মনে হয় না।" বরেনের কথায় গোলু বলল, "আমি হলপ করে বলতে পারি যে বাড়ীর ভিতর থেকে কেউ ছোঁড়েনি।" কানাই উত্তেজিত ভাবে বলল, "ভারী শয়তান ত— কেন এরকম ইট ছুঁড়বে?" গোলু একটু হেসে বললে, "যদিও আমরা বিনা অনুমতিতে এখানে ঘোরাঘুরি করছি, কিন্তু তবুও এই থেকে দু'টি জিনিষ আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। একটি হচ্ছে, যে ব্যক্তি এই ইট ছুঁড়েছে, সে চায় না যে আমরা এখানে ঘোরাঘুরি করি, এবং অন্যটি হচ্ছে যে, সেই একই ব্যক্তি খুবই শক্তিশালী লোক।" কথা শেষ করে গোলু ইটের টুকরাটা হাতে তুলে নিল। কানাই সেটা দেখে বললে, "ওরে বাবা, এ যে আধখানা ইটেরও উপর।" গোলু তখন কানাই আর বরেনকে, বললে, "দূরে ওই ঝোপের দিকে দেখ; অত দূর থেকে যে এই এত বড় ইটের টুকরা ছুঁড়ে মারতে পারে সে সাধারণ লোক নয়।" বরেন মাথা চুলকে বললে, "তাহলে এখন কি করা যায়?" গোলু বলল, "করবার মধ্যে তাড়াতাড়ি সরে পড়া, তবে সরে পড়বার আগে একটা কাজ কর। এই ইটের টুকরাটা যেখান থেকে এসেছিল, অর্থাৎ ওই ঝোপের পিছনে ছুঁড়ে ফেলে দে।" বরেন একটু অবাক হয়ে ইটের টুকরাটা তুলে নিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে ছুঁড়ে দিল। সকলেরই সন্দেহ ছিল, ইটটা ঝোপ অবধি পৌঁছাবে না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পড়বার সময় ইটটা ঝোপটা পেরিয়েই পড়ল।' গোলু অত্যন্ত খুশী হয়ে বললে, "সাবাস বরেন!" কেন যে গোলু ইটটা ছুঁড়তে বললে, তা না বুঝেই বরেন আর কানাই গোলুর পিছন পিছন চলল এবং বাড়ীর জমি পার হয়ে রাস্তায় এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, কাজেই গোলু বরেনকে বললে, "তোদের বাড়ী একই দিকে, তোরা একসঙ্গেই চলে যা; আজ আর আমি ওদিকে যাব না। কাল সকালে দু'জনে আসিস, একবার হাটে যাওয়া যাবে।" চলে যাবার আগে বরেন হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে, তুই আমাকে ওই ইটটা, ঝোপের ওপাশে আবার ছুঁড়ে ফেলতে বললি কেন?" গোলু একটু হেসে বললে, "আমি যখন বুঝলাম যে ইটটা ঝোপের ও-পাশ থেকে এসেছে, তখনই আমার মনে হোল যে লোকটা আমাদের ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চায়, এবং লোকটা গায়ে অসাধারণ শক্তি রাখে। কাজেই আমাদের এখন উচিত, তাকে জানিয়ে দেওয়া যে ভয় আমরা মোটেই পাইনি এবং আমাদের গায়েও যথেষ্ট জোর আছে। এই দু'টিই সে ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছে; কারণ সে ঝোপের আড়াল থেকে আমাদের

লক্ষ্য করছিল, এবং যখন দেখল যে আমরা ছুটে ত পালাইনি উপরন্তু ইঁটটা ছুঁড়ে তাকে ফেরৎ দিলাম, তখন সে বুঝেছে যে আমরা ভয়ও পাইনি এবং দেহেও যথেষ্ট শক্তি রাখি।" কানাই এতক্ষণ কিছু না বলতে পেয়ে হাঁপিয়ে উঠছিল। সে এবার সুযোগ পেয়ে বললে, "এমন ত' হতে পারে যে ওই লোকটা ইচ্ছা করেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছিল যাতে ঐ অবসরে বাড়ীর ভিতরে অথবা অন্য পাশে কোন কাজ আমাদের অলক্ষিতে সেরে নিতে পারে?" এই শুনে গোলু বলে উঠল, "সাবাস কানাই, আমারও একবার ঐ কথা মনে হয়েছিল; যাই হোক, কাল সকালে সব বিবেচনা করে দেখা যাবে, আজ এই পর্য্যন্ত থাক।" বরেন ও কানাই এক সঙ্গে বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করলে, গোলুও বাড়ী ফিরে গেল। [ক্রমশঃ।

কিশোর পরিষদ

টি, সি, ডেসমণ্ড

(নিউ ইয়র্ক ষ্টেট সিনেটের সদস্য)

[আমেরিকায় 'আদর্শ ব্যবস্থাপক সভার আন্দোলন সাম্প্রতিক হলেও দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। বর্ত্তমানে এগারটি ষ্টেটে আদর্শ ব্যবস্থাপক সভা আছে এবং আমেরিকার নাগরিকেরা আশা করে যে আগামী তিন বছরের মধ্যে আমেরিকার আটচল্লিশটি ষ্টেটেই আইন সভা গড়ে উঠবে। অতি কিশোর বয়স থেকেই ছোটদের মধ্যে গণতান্ত্রিক-বোধ উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে এ আন্দোলন অতি কার্যকরী। এই আদর্শ ব্যবস্থাপক সভাতেই হবে ভবিষ্যতের রাষ্ট্রনেতার জন্ম। অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাদের দেশেও এই রকম আন্দোলন গড়ে তোলার দিন এসেছে। রাষ্ট্রনায়করা এদিকে দৃষ্টি দিলে দেশের অনেক উপকার হবে।]

—'আমি কিশোরদের পক্ষ থেকে বলছি। এ বিল অনুমোদন করতেই হবে'—

নিউ ইয়র্ক ষ্টেট সিনেটের মার্বেল চেম্বারে একটি ষোল বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিল। জিমি ওয়াকার, ফ্রাংক্লিন ডি, রুজভেল্ট প্রমুখ সিনেটররা এক দিন এখান থেকেই প্রথম নাম কিনেছিলেন।

আমার সহসিনেটরদের সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়া দেখে প্রাক্ বিবাহ ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পর্কিত বিল যে পাশ হবেই সে সম্বন্ধে আমার ধারণা বদ্ধমূল হোল।

'ভদ্রমহোদয়গণ!'—আর্ভিং বার্ডসাইয়ের তরুণ কণ্ঠে তখনও ধ্বনিত হচ্ছিল—'প্রতি বছর তের হাজার সিফিলিস-আক্রান্ত মেয়ে-পুরুষকে বিয়ের লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়। এই ব্যবস্থা আপনাদের রদ করা চাই-ই।'

ওয়াই, এম, সি, এ, কর্ত্তৃক সংগঠিত 'আদর্শ ব্যবস্থাপক সভার' সদস্য আর্ভিং একটি সংশোধিত বিলের খসড়া করেছে। বিলটি আমি পড়ে দেখেছি—আমার পছন্দও হয়েছে। এ্যালবানীতে আমি বিলটি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করেছি। গোঁড়া আর অজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা প্রতিকূলতাও সুরু করেছেন। আর্ভিংকে আমি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে বলেছি।

—'আদর্শ ব্যবস্থাপক সভায় বিলটি আমরা সর্ববাদিসম্মতিক্রমে পাশ করেছি।' এই মাত্র ছেলেটিকে সিনেটরদের উদ্দেশ করে বলতে শুনলাম—'বিলটি অনুমোদিত হলে আপনাদের নয় আমাদেরই এই আইনের বাধ্যবাধকতার মধ্যে বিয়ের দরখাস্ত করতে হবে।'

বিলটি সিনেটে পাশ হয়েছে। দশ বছর পরে আজ আমরা বুঝতে পারছি, এর ফলে সহস্র সহস্র যুবক-যুবতীর জীবন চিরন্তন অশান্তি ও দুঃখের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

আমেরিকার এগারটি আদর্শ ব্যবস্থাপক সভায় যে সমস্ত কিশোর কিশোরীদের নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যারা দেশের আইন-কানুন রচনা করার জ্ঞান লাভ করছে আর্ভিং তাদের এক জন। বার বছর আগে নিউইয়র্কে সর্বপ্রথম এই আন্দোলন চালু হয় এবং এখন ষ্টেট থেকে ষ্টেটে এই আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করছে। ইতিমধ্যেই আমাদের হাইস্কুলগুলিতে ওয়াই, এম, সি, এ, কর্ত্তৃক পরিচালিত হি-ওয়াই (কিশোরদের জন্য) ও টি-ওয়াই (কিশোরীদের জন্য) ক্লাবের দু'লক্ষ সদস্যের মধ্যে এ আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছে। আগামী তিন বছরের মধ্যেই আমেরিকার আটচল্লিশটি ষ্টেটের প্রত্যেকটিতে এক-একটি আদর্শ ব্যবস্থাপক সভা গড়ে উঠবে নিশ্চিত আশা করা যায়। আমার মতে দেশকে গণতন্ত্রের দিকে চালিত করার পক্ষে এটি সুষ্ঠ আন্দোলন।

প্রতি বছর হেমন্ত কালে নিউবার্গে আমার অফিস এই সমস্ত কিশোর পরিষদ সভার নব-নির্বাচিত উৎসুক সদস্যদের ভিড়ে সরগরম হয়ে ওঠে।

ন্যানসি হাল্লাস নাম্নী সুশ্রী মেয়েটির কথাই ধরা যাক। তার মিটিংয়ের সাজ হোল নীল জীনের উপর একটি কৌপান সাদা শার্ট। তার চরম লক্ষ্য হোল স্কুলের লাঞ্চের উন্নতিসাধন করা। সে ক্লাশ থেকে ক্লাশে ঘুরে ঘুরে একটি মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে প্রত্যেককে—'কাফেটেরিয়াতে যে লাঞ্চ দেওয়া হয় তোমরা তা পছন্দ কর কি? যদি না কর, কেন কর না?'

স্বল্পমূল্যে স্কুলগুলিতে পুষ্টিকর লাঞ্চ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে সরকারী সাহায্যের জন্য একটি বিলের খসড়া করতে সেও আমার সাহায্য চায়। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে মেয়েটি বলল—"ভারী ত কেকের সঙ্গে একটু ক্যাণ্ডির ছোপ লাগিয়ে দেওয়া হয়! ছোটরা একটুও ভাল খেতে পায় না।'

বহু বছর ধরে এ্যালবানিতে এই রকম একটি বিল আমি নিজেই আইন-সভাতে পাশ করাতে চেষ্টা করেছি। ন্যানসি তার স্কুলের ক্লাব এবং স্থানিক আইন সভার আলোচনা থেকে আসল আইন সভার ভিতর দিয়ে অতি সাফল্যজনক ভাবে বের করে নিয়ে এসেছে বিলটি। ন্যানসির সাক্ষ্য-প্রমাণাদির সাহায্যে আমি স্কুলের লাঞ্চের জন্য পঁচিশ লক্ষ ডলার আইন সভা থেকে পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছি। নিউ ইয়র্কের স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীরা আজ যে দুধ সুপ মাংস তরকারি প্রভৃতি খেতে পায় লাঞ্চের সময় তার জন্য প্রকৃত ধন্যবাদ ন্যানসিরই প্রাপ্য।

হি-ওয়াই আদর্শ ব্যবস্থাপক সভায় পরিকল্পনাটি ওয়াই, এম, সি,-এর এক জন পুরোনো অভিজ্ঞ কর্মী ডুরান নামক ভদ্রলোকের মস্তিষ্ক প্রসূত। আজকাল তিনি বছরের অধিকাংশ সময়ই ষ্টেট থেকে ষ্টেটে কিশোর পরিষদ সভা গড়ে তোলেন—সরকারী কর্মচারী,

বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রধানদের উপদেশ সংগ্রহ করে কিশোর-
[illegible]রী সদস্যদের সাহায্য করেন।

অবশ্য ষ্টেটে ষ্টেটে কার্যপ্রণালী আলাদা আলাদা কিন্তু মূল-
[illegible] সর্বত্র একই। প্রত্যেকটি বিল হি-ওয়াই ক্লাবে আলোচিত
[illegible]ভাটে পাশ করাতে হবে। পাশ-করা বিলটি সহর বা কাউন্টির
[illegible]র্ণ ব্যবস্থাপক সভায় যায়। সেখানে তরুণ প্রতিনিধিরা স্থানীয়
[illegible]সারদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে—সামাজিক ও রাজনৈতিক
[illegible]হাওয়া সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে।

তার পরে বছরে একবার ষ্টেটের রাজধানীতে বিলটি বিধিবদ্ধ
[illegible]বার জন্যে ব্যবস্থাপক সভা বসে। একে 'একদিনকো কিশোর
[illegible]রের' প্রচার অভিনয় বলে অভিহিত করলে ভুল হবে। সমস্ত
[illegible]বেশ রীতিমত উত্তেজনামূলক হয়ে ওঠে। সত্যিকারের গবর্ণর
পরিষদ সদস্যরা ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশ করে বক্তৃতা করেন।
[illegible]লে-মেয়েদের মধ্য থেকেই এক জন গবর্ণর, সভাপতি, যাজক প্রভৃতি
[illegible]র্বাচিত হয়। গবর্ণর তার বাণী পাঠ করার পর তরুণ প্রতিনিধিরা
[illegible]রীতি আইন সভার কাজে লেগে যায়।

এই সমস্ত প্রতিনিধি সভায় যে সব আইনের পাণ্ডুলিপি অনু-
[illegible]দিত হয় তাতেই তরুণদের আদর্শ সুপ্রতিফলিত হয়। কিশোর-
[illegible]শোরীরা উন্নততর শিক্ষাপ্রণালী, শিক্ষকদের জন্য বেশী মাহিনার
[illegible]বী জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করেছে। যৌন-বিজ্ঞান, বিবাহ-বিজ্ঞান,
[illegible]মাটর-চালনা প্রভৃতি বিষয়ে অপরিহার্য অংশের আবশ্যিক পঠন-
[illegible]বস্থারও দাবী জানানো হয়েছে। দুঃস্থ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা যারা
[illegible]র্থের অনটনের জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত তাদের জন্য দরাজ
[illegible]ত্তির ব্যবস্থা চাই। নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সঙ্গে
পরিচয় লাভের জন্য বিদ্যালয়গুলিতে প্রতি দু'বছর অন্তর অন্তর
পুরানো পাঠ্য পুস্তক পাল্টে নতুন পাঠ্য-তালিকার ব্যবস্থা করার দাবী
জানিয়ে জর্জিয়ার আদর্শ ব্যবস্থাপক সভায় একটি আইনের পাণ্ডুলিপিও
উপস্থাপিত করা হয়েছে।

এই ভাবে চারি দিকের পারিপার্শ্বিকে সংস্কারযোগ্য যা-কিছু দেখে
তারা এমন আরো অনেক ব্যাপার আছে। রেষ্টুরেণ্টে উন্নততর
স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, উৎকৃষ্টতর অগ্নি-আইন এবং সামর্থ্য-সাধ্য আরো
বাসস্থানের ব্যবস্থার জন্যও তারা আইনের পাণ্ডুলিপির খসড়া তৈরী
করেছে।

অনেক ষ্টেটের আদর্শ ব্যবস্থাপক সভায় যে সমস্ত বিল অনুমোদিত
হয় প্রকৃত ব্যবস্থা পরিষদে আলোচনার সময় প্রায়ই সেই সব বিলের
বিষয় উল্লেখিত হচ্ছে আজকাল। স্কুলের ব্যায়ামবীরদের জীবনবীমা
ব্যবস্থার বিলের আলোচনার সময় এক জন সিনেটর প্রতিকূলতা করা
মাত্রই তৎক্ষণাৎ আর এক জন প্রতিনিধি উঠে বললেন—'মাননীয়
সদস্য বোধ হয় জানেন না যে তাঁর প্রদেশের হি-ওয়াই পরিষদে
তরুণ প্রতিনিধিরা সর্ববাদিসম্মতিক্রমে বিলটি অনুমোদন করেছেন?'
এর পর সদস্য মহাশয় তাঁর মত বদলাতে বাধ্য হলেন।

গোড়ার দিকে বহু আইন-প্রণেতা তরুণদের এই প্রচেষ্টাকে বিজ্ঞ-
জনোচিত স্মিতহাস্যের দ্বারা উপেক্ষা করতেন, কিন্তু এখন অনেকেই
তাদের রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ থেকে সানন্দে ভাব গ্রহণ করতে দ্বিধা
বোধ করেন না। বস্তুতঃ নিউ ইয়র্ক সিনেট ও এ্যাসেমব্লিতে সদস্যরা
এমন অনেক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন—তরুণ সদস্যরাই যার প্রথম
পথ-প্রদর্শক। সর্বত্র একই রকম ট্রাফিক আইন প্রণয়ন, ষ্টেট-
স্কলারশিপের সংখ্যা বৃদ্ধি, হোটেল ও কক্ষগুলিতে অগ্নি-নিরোধক ব্যবস্থা
সম্পর্কিত আইনের পাণ্ডুলিপি এই সব তরুণদের দ্বারাই পরিকল্পিত।

একটি কি দু'টি ষ্টেটের আদর্শ ব্যবস্থাপক সভার ভোটাধিকারের
বয়স সর্বনিম্ন আঠার বছর ধার্য্য করে বিল পাশ করা হয়েছে। কিন্তু
নিউ জার্সিতে আইন-প্রণেতারা নিজেদের সম্বন্ধে তত সুনিশ্চিত
ছিল না। তুমুল আলোচনা আর বাক্-বিতণ্ডার পর কিশোর সদস্যরা
(বেশীর ভাগের বয়স সতের) এই বিল নিয়ে দুই দলে বিভক্ত হয়ে
পড়ল। সভাপতিকে তখন কাষ্টিং ভোট দিতে হোল। তিনি
বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। অন্যান্য ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা আরো
পরিণত-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে—তাদের মতে আঠার বয়স হলেই
ভোটাধিকার পাবার মত বুদ্ধি পরিপক্ক হয় না।

বর্ণবৈষম্য সম্পর্কে এই তরুণের দল প্রবীণদের তুলনায় ঢের
কম ছেলেমানুষি দেখিয়েছে। মিনেসোটা আদর্শ ব্যবস্থাপক সভায়
দু'জন নিগ্রো, দু'জন চীনা ও এক জন জাপানী-বংশসম্ভূত সদস্য
আছে। নিউ জার্সিতে একটি নিগ্রো ছেলেই শিল্প-প্রতিষ্ঠানে
বর্ণ-বৈষম্য বন্ধের জন্য একটি বিল আনয়ন করেছে। প্রচুর গরম
গরম বক্তৃতার পর প্রকৃত ব্যবস্থাপক সভায় ঐ রকমই একটি বিল
পাশ হয়েছে। আজকে ফেয়ার এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাক্ট (Fair Employment Act) নিয়ে নিউ জার্সি গর্ব করতে পারে বই কি!

এই সমস্ত কিশোর পরিষদ সভার কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করলে
সহজেই প্রতীতি জন্মে যে, আধুনিক যুগের তরুণদের হাতে গণতন্ত্র
সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। গণতান্ত্রিক সরকার সম্বন্ধে তাদের পূর্ণ
বোধ আছে—তার মূল্য জানে তারা এবং তাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা
করবেই।

মাদাম মণ্টেসরি ও শিশু-শিক্ষা

শ্রীহেমেন মল্লিক

১৮৬৯ সালে ইটালীর অন্তর্গত "আনকোণার" (Ancona)
নিকট "চিয়ারভেল"তে (Chiarvalle) বিখ্যাত শিশু-শিক্ষা বিশারদ
"মাদাম মেরিয়া মণ্টেসরি" জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রোমের বিশ্ব-
বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে ১৮৯৪ সালে ডাক্তারী পাশ করেন।
ইটালী দেশের মধ্যে একমাত্র তিনিই সর্বপ্রথম মহিলা ডাক্তার হন।
তাঁহার এই সাফল্যে দেশবাসী তাঁহার সম্বন্ধে উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী
করেন। কিন্তু ডাক্তারী পাশ করার পর মতের হয় পরিবর্ত্তন এবং
তিনি এই ব্যবসা পরিত্যাগ করে শিশু-শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

রোমের কবর-স্থানের নিকট পরিত্যক্ত এক রাস্তার অর্দ্ধ-নির্মিত
সব বাড়ীতে বাস করে তস্কর, কারাগার-মুক্ত কয়েদী এবং এই রকম
সব অপরাধী ব্যক্তি—যাদের সহরের মাঝে নেই কোন্ও বাসস্থান। এই
ভয়াবহ এবং অস্বাস্থ্যকর স্থানটি ক্রমে মিউনিসিপ্যালিটির দ্বারা হয়
বাসোপযোগী সংস্কার এবং প্রার্থীর প্রয়োজন মত সেগুলির বিতরণ।
তার পর একটা বড় বাড়ী নিয়ে একত্র করা হল হাজার হাজার ভবঘুরে
সংসার। মহা সমস্যা উপস্থিত হল এই সব হাজার হাজার সংসারের
শিশুদের নিয়ে। এই সব শিশুদের বাপ-মায়েরা যখন দিনের
অধিকাংশ সময় বাইরে কাটিয়ে দিত দৈনন্দিন জীবন যাপনের

প্রয়োজন মেটাবার জন্ত, তখন শিশুগুলিকে দেখবার থাকত না কেউ। কিন্তু এই শিশুগুলিকে যদি এই ভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কালে এই সংস্কার মুক্ত বাড়ীটি আবার ভরে উঠবে দুষ্ট আবর্জ্জনায়।

এই সব শিশুদের এবং এই সংস্কারমুক্ত পল্লীর স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্ত অনুরোধ করা হল মেরিয়াকে। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং ছোট-বড় পান বারো ঘর সংযুক্ত একটি বাড়ীতে এই সব শিশুদের একত্র রাখার ব্যবস্থা করেন। তিনি এই কাজ শুরু করেন ১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে এবং বাড়ীটির নূতন নামকরণ হয় "কাসে-ডি মেম্বিনো।"

মেরিয়া প্রথমে ফরাসী চিকিৎসক "সেগুঁই"র (Seguin) প্রথামত শিশুশিক্ষা-বিষয়ক গবেষণা করে পেলেন অদ্ভুত ফল। তিনি দেখলেন, এই শিক্ষায় মূর্খ ছেলেরা পর্য্যন্ত স্বাভাবিক ছেলেদের সঙ্গে লেখা-পড়ায় সরকারী পরীক্ষা পাশ করে যাচ্ছে। এই দেখে তিনি ভাবলেন যে, যদি বোকা, মূর্খ ছেলেরা এই শিক্ষায় এত ভাল ফল করে তাহলে স্বাভাবিক-বুদ্ধির ছেলেরা না জানি এর চেয়ে আরও কত ভাল ফল করবে।

স্বাভাবিক-বুদ্ধির শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বে তিনি একবার য়ুরোপের শিশু-শিক্ষা প্রথা ভাল ভাবে দেখেন। সর্ব্বত্র দূষিত বিদ্যাশিক্ষার প্রথা দেখে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে বলেছিলেন যে, বিদ্যালয়ের ক্লাস-ঘরে শিশুদের "পিন্‌বিদ্ধ প্রজাপতির সার করে রেখে" তাদের অচল করে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা দিয়ে তাদের বাঁচতে না দিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। এই সব দেখে তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের নিয়ম-ধারা করলেন বিপরীত। তাঁর নিয়ম হল যে ভদ্রতা, সামাজিকতা এবং ঐক্যের সীমার মধ্যে থেকে যা মন যায় কর। পরে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই উপায়ে ছোট ছোট শিশুরা কত নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা পায় এবং স্বচ্ছন্দে ও আনন্দে একত্রে ঘোরাঘুরি করে কেমন তারা বড়দের মত কাজ করে।

তিনি এর চেয়ে আরও ভাল কাজ করেছিলেন শিক্ষা-বিষয়ক সামগ্রীর উদ্ভাবন করে। তিনি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি যে শিশু-মনের উপযোগী খুব সহজ এবং উপযুক্ত উপায়ের কোন বস্তু দিয়ে তার সাহায্যে শিক্ষা দিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। এই উপায়ে শিক্ষা দিয়ে তিনি দেখলেন যে, শিশুরা প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে এক একটি উদাহরণ তিন-চার বার করে কত অনায়াসে করছে এবং তার পর নূতন কিছু প্রথার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। এই উপায়ে শিক্ষা পেয়ে কত অল্প সময়ে তাদের সুখ, সমৃদ্ধি, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বেড়ে যেতে লাগল। তখন তাদের সামনে যে জিনিষ ধরা গেল, দেখা গেল, তাতেই তাদের আগ্রহ। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেখা গেল যে শিশুদের মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে তাদের ঘর-দোরের পরিবর্ত্তন। ঘরের যাবতীয় আবর্জ্জনা দূর করে দিয়ে সেখানে তারা রাখছে প্রয়োজনীয় সুন্দর সুন্দর জিনিষ। এই সব পরিবর্ত্তন দেখেও কিন্তু তিনি অন্য কোন নূতন শিক্ষা-প্রথা গ্রহণ করেননি। তিনি শিশুদের নিজ নিজ গতির দিকে লক্ষ্য রেখে জানতে পারলেন যে, তাদের যদি স্বচ্ছন্দে তাদের মতে চলতে দেওয়া হয় তাহলে তাদের বুদ্ধি এবং স্বতঃপ্রবৃত্তিতা বৃদ্ধি পায়। এই শাসনবিহীন প্রথা অবলম্বন করে তিনি দেখলেন, সে বছরের শেষে শিশুরা সব ছোট-ছোট চিঠি লেখা-পড়া করতে শিখে গিয়েছে, এই উপায়ে শিক্ষা দিয়ে তাঁর অনেক সুবিধা হয়েছিল। পরে প্রত্যেক শিশুকে পৃথক্ ভাবে তাদের সময়োপযোগী নূতন সামগ্রী দিয়ে ছোট-ছোট পাঠ দিতেন। যখনই যে শিশুর গতি যে দিকে দেখেন তাকে সেই পথেই এগিয়ে চলার খবর দেন। এই উপায়ে শিক্ষার উপকারিতা এই যে, এতে কোন বদ অভ্যাস প্রশ্রয় পায় না।

এই অত্যাশ্চর্য্যের ফল যখন চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন দলে দলে লোক দেশ-বিদেশ থেকে এল বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে। বড়-ছোট সকল শ্রেণীর লোকের কাছেই শিশুরা নির্ভয়ে এবং ভদ্রতার সহিত কথা কয়ে তাদের জিনিষ দেখাতে লাগল। সরকার থেকে তাঁর কাজের জন্য খুব প্রশংসা করা হ'ল এবং দেশ-বিদেশে তাঁর নাম পড়ল ছড়িয়ে, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশ থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল এই প্রথা শিক্ষা করতে এবং সেই থেকেই টিচার্স ট্রেনিং কোর্স'র (Teachers Training Course) হ'ল প্রবর্ত্তন।

হুকুম তামিল

আমিনুর রহমান

বাকিংহাম প্যালেসের নাম নিশ্চয় তোমরা শুনেছ। এটি ইংলণ্ডের রাজার লণ্ডনস্থ বাড়ী। বাড়ী বললে ভুল হবে, কেন না তুমি-আমি বাড়ীতে থাকি কিন্তু রাজা-রাজড়াদের কথাই আলাদা—তাঁরা থাকেন প্রাসাদে। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে এই প্রাসাদ তৈরি করান বাকিংহামের ডিউক জন শেফিল্ড। প্রাসাদটি তৈরি হবার আগে ঐ স্থানটির নাম ছিল মালবারী বাগান। ঐ সময় এই বাগানটির খুব নাম ছিল, এমন চমৎকার সাজান বাগান শীত-প্রধান দেশে বড় একটা দেখা যেত না। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে রাজা তৃতীয় জর্জ্জ বাগান সমেত প্রাসাদটি কিনে নেন মাত্র একুশ হাজার পাউণ্ডে। সেই থেকেই এটা ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদ হয়ে গেল এবং এখনও পর্য্যন্ত আছে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন—বোধ হয় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ হবে—তোমরা না হয় ইতিহাস বইটা খুলে তারিখটা দেখে নিও, কারণ গল্প বলতে বসে হয়ত সঠিক তারিখ না-ও মনে থাকতে পারে। যাহোক, সেই সময় এক দিন সকালে রাণী বাগানে বেড়াতে বেড়াতে এক প্রান্তে গিয়ে দেখেন যে দু'টি সশস্ত্র প্রহরী খানিকটা জায়গা জুড়ে টহল দিচ্ছে। ঐ স্থানে বিশেষ কিছুই নেই অথচ প্রহরীর ব্যবস্থা কি জন্য রয়েছে ঠিক বুঝতে না পেরে রাণী এগিয়ে গিয়ে তাদের, প্রশ্ন করলেন, "তোমরা এখানে কি পাহারা দিচ্ছ?" প্রহরী দুজন জানাল যে তারা শুধু হুকুম তামিল করছে, কেন করছে তা জানা প্রয়োজন মনে করেনি। রাণী আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলেন যে ঐ স্থানটি দিবা-রাত্র পাহারা দেবার ব্যবস্থা আছে এবং পালা ক'রে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী সব সময় মোতায়েম রাখা হয়। মস্ত বড় বাগান, রাণী এ দিকটাতে কোন দিন আসেননি তাই ব্যাপারটা তাঁর নজরে পড়েনি। ঐ স্থানটিতে কি এমন বিশেষত্ব আছে কিম্বা রহস্য আছে যার জন্য এত কড়াকড়ি—চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা, তা জানবার জন্ত রাণীর কৌতূহল হল। তিনি প্রাসাদে ফিরে গিয়ে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে প্রশ্ন করলেন। সে

টুঁ শব্দটিও বলতে পারল না। সৈন্যাধ্যক্ষের ডাক পড়ল। সে বলল যে ঐ স্থানে পাহারা দেবার ব্যবস্থা বহু কাল থেকে চলে আসছে, তবে কবে থেকে এবং কেন তা সে জানে না এবং এ প্রশ্ন এর আগে কেউ কোন দিন তোলেনি।

রাণী সহজে ছাড়বার পাত্রী ছিলেন না। তিনি জেদ্ ধরে বসলেন, তাঁকে জানাতেই হবে কেন বাগানের ঐ কোণে পাহারা দেওয়া হয় এবং ওখানে কিই বা আছে। মহা সমস্যা, রাজপ্রাসাদে আরও পাঁচটা রীতির মত এটাও চলে আসছে; কেউ কোন দিন এ সব নিয়ে মাথা ঘামায়নি। এখন রাণীর এই সব উদ্ভট প্রশ্নের জবাবই বা কেমন করে দেয়? রাজা-রাজড়ারা পূর্ব-পুরুষদের আচার-ব্যবহার কার্য-প্রণালী অনুসরণ করেই রাজকার্য চালিয়ে থাকেন, কেউ কখনও আপত্তি করেন না—কৈফিয়ৎ তলব করেন, না; কিন্তু এই আঠারো বছর বয়স্কা রাণী বড় গোলমাল সুরু করছেন অথচ রাণীর হুকুম অমান্য করাও চলে না। রাজকার্যে যতই গলদ থাকুক না কেন তবু বিলাতের লোক কখনও রাজাকে অসম্মান করে না।

একে একে বড় বড় রাজপুরুষদের ডাক পড়ল, শেষ পর্য্যন্ত প্রধান মন্ত্রীর ডাক পড়ল, কিন্তু কেউই রাণীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাড্‌ষ্টোন এই ব্যপারটাকে ধামা-চাপা দেবার অভিপ্রায়ে মহারাণীকে বললেন যে তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে বাগানের ঐ স্থানে পাহারা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু রাণীর মোটেই তা ইচ্ছা নয়। তিনি তাঁর প্রশ্নের জবাব চান; কার আদেশে, কবে থেকে এবং কি কারণে পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে—এ সব প্রশ্নের সঠিক জবাব যেমন করে হোক এবং যত দিনে হোক দিতেই হবে—ছাড়াছাড়ি নেই। অবশেষে তদন্ত কমিটির বৈঠক বসল। হোয়াইট হল, রাজকার্য ও শাসন পরিচালনার কেন্দ্রীয় অফিস, সেখানে পুরানো নথি-পত্রের জন্য তোলপাড় সুরু হল। একুশ দিন ধরে ক্রমাগত পুরানো কাগজ-পত্র নাড়া-চাড়া করার পর একটা ফাইল পাওয়া গেল যাতে রাণীর প্রশ্নের জবাব আছে।

তদন্ত কমিটি সেই নথি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে প্রধান মন্ত্রী মারফৎ মহারাণীর কাছে যে রিপোর্ট পেশ করলেন তা থেকে জানা গেল যে, রাজা তৃতীয় জর্জ বাকিংহাম প্যালেসটি কেনার পর প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানটির অত্যন্ত যত্ন নিতেন। তোমরা হয়ত জান না যে বিলাতে ঝাউ গাছের কদর খুব বেশী। রাজপ্রাসাদে তখন সবে ছোট্ট একটি ঝাউগাছ বড় হচ্ছে। যাতে পোকা-মাকড় কি পাখীতে গাছটা নষ্ট করে না ফেলে সেই জন্য রাজা ঐ গাছটাকে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেবার ব্যবস্থা করলেন। রাজার খেয়াল—সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হল, পালা করে দু'জন প্রহরী দিবা-রাত্র ঐ গাছ পাহারা দেবে।

তার পর কত রাজা এলো, গেলো, ঝাউ গাছ কবে শুকিয়ে মরে গেছে, কিন্তু হুকুম প্রত্যাহার করবার খেয়াল কারো হয়নি। ঝাউ গাছের চিহ্নমাত্র সেখানে নেই অথচ প্রায় একশ' বছর ধরে ঝাউ গাছ পাহারা দেবার হুকুম তামিল হয়ে আসছে। ভাগ্যিস মহারাণী খোঁজ নিয়েছিলেন নইলে হয়ত আজও অমনি ভাবে পাহারা চলত।

ভাল কি এ কাজটা ?

শ্রীরবিদাস সাহা-রায়

হারাধন মিত্তির ঘোষদের পুকুরে,
ছিপ নিয়ে মাছ ধরে রোজ ভরা দুপুরে।
কোন মাছ নাহি পায়,
বসে থাকে এক ঠাঁয়,
শুধু চোখ-লজ্জায় কাঁদে না সে ডুকুরে।
ঝাঁ-ঝাঁ রোদে মাথা ফাটে রোজ ভরা দুপুরে।

ওপারেতে মাছ ধরে তিনকড়ি শর্ম্মা,
ঝটপট ধরে ফেলে রুই, শোল, গরমা
ক্ষোভে আর হিংসায়,
পিত্তিটা জ্বলে যায়,
হারাধন হয়ে যায় রাগে অগ্নিশর্ম্মা।
বলিহারি তিনকড়ি—কি করিতকর্ম্মা!

আটকালো বড়শীতে সেদিন কি মাছটা,
আহ্লাদে আটখানা, দেখ তার নাচটা!
প্রাণপণে মারে টান,
হারাধন সে যোয়ান,
তাই বলে বল দেখি, ভাল কি এ কাজটা?
উঠে এল বড়শীতে মরা পচা গাছটা!

পত্রগুচ্ছ

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শেষ পত্র

মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব জীবনে ধর্ম্মের নামে বহু অপকর্ম্ম এবং সিংহাসনের লোভে বহু হত্যা করেছেন। নিরপরাধ হিন্দুদের শাস্তি দিয়েছেন মুসলিম রাজ্য বিধর্মীদের ছায়ামুক্ত করার চেষ্টায়। জীবনের সায়াহ্নে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর নির্দ্দিষ্ট পথে তিনি অভীষ্ট লাভ করতে পারেননি। যে রাজ্য নিষ্কণ্টক করতে চেষ্টা করেছেন, তা কণ্টকাকীর্ণ। যে রাজপুত মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল, তারাই ভিত্তি শিথিল করে দিয়েছে ঘরে-বাইরে সর্ব্বত্রই শত্রু।

ঔরঙ্গজেব মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। পুত্রেরা সিংহাসনের আশায় মৃত্যুর জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। পুত্র আজম তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কামবক্সকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছেন। সম্রাটের দৃষ্টির সম্মুখে চলেছে এই নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র! মুঘল সম্রাটরা পুত্রবৎসল, কিন্তু সম্রাট-পুত্রেরা প্রায় সকলেই পিতৃদ্রোহী। একদা যে সম্রাট-পুত্র ঔরঙ্গজেব পিতৃদ্রোহিতা, আত্মীয়-হত্যা ও প্রজা-নিপীড়ন অকুণ্ঠিত চিত্তে করেছিলেন, সেই সম্রাট-পিতা পুত্রের কল্যাণের জন্য অস্থির হলেন। কিন্তু তিনি নিরুপায়। ব্যাকুল হয়ে লিখলেন এই পত্র।]

[শাহজাদা আজমকে]

শাহজাদা আজম,

তোমার শান্তি হোক।

আমার বার্দ্ধক্য এসেছে, আমার দুর্ব্বলতা ক্রমবর্দ্ধমান—আমার অঙ্গ শিথিল হয়ে উঠছে। আমি পৃথিবীতে এসেছিলাম একাকী, চলে যাচ্ছি একাকী। জানি না আমি কে, জানি না আমি কি করেছি। আমার উপবাসের দিনগুলি ভিন্ন সমস্ত দিবসের কর্ম্মধারা আমার জন্য একমাত্র অনুশোচনাই রেখে গেছে। আমার সাম্রাজ্যের শাসনও সুষ্ঠু হয়নি—আমি ত প্রজার মঙ্গল কামনা করিনি।

আমার জীবন—আমার এই মূল্যবান জীবন বিফলে গেল, আমার প্রভু আমার ঘরে এসেছিলেন, আমার অন্ধ নয়ন ত প্রভুর বিভূতি অবলোকন করেনি। জীবন চিরস্থায়ী নয়, অতীত দিনের চিহ্নমাত্রও আজ অবশিষ্ট নাই, ভবিষ্যতের সমস্ত আলো নিবে গেছে।

আমার দেহের উত্তাপ চলে গেছে, রয়েছে শুধু লোল চর্ম্ম, শুষ্ক মাংসপিণ্ড। আমার পুত্র কামবক্স বিজাপুরে—সে আমার অতি নিকট, তুমি তার চেয়ে আমার নিকটতর। প্রিয় পুত্র শাহ আলম বহু দূরে। পৌত্র মহম্মদ আলম আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হিন্দুস্থানে এসে পৌঁচেছে।

আমি ঈশ্বরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি—আমি ভয়ে কম্পমান, আমার সৈন্যগণও আজ আমার মত অসহায়, বিপর্য্যস্ত, ব্যাকুল। সৈন্যরা ধারণা করে না যে, ভগবান আমাদের সঙ্গেই আছেন। আমি পৃথিবীতে কিছু সঙ্গে নিয়ে আসিনি, কিন্তু বিদায়ের সময় আমার পাপের ফল নিয়ে যাচ্ছি। যদিও আল্লাহ্‌র কৃপা ও করুণার উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তবু আমার কর্ম্মফলের চিন্তা থেকে আমি মুক্তি পচ্ছি না। আমি স্বয়ং যখন আমাকে ত্যাগ করে যাচ্ছি, তখন কে আমার সহযাত্রী হবে?

বায়ু অনুকূল কি প্রতিকূল তা জানি না। আমার তরী আমি অজানা সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলাম।

যদিও জানি, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের রক্ষাকর্ত্তা, তবু বৃহত্তর জগতের দৃষ্টিতে আমি আমার পুত্রদের বলব, তারা যেন আল্লাহ্‌র বান্দা এবং মুসলিমদিগকে বিনা দোষে হত্যা না করে।

আমার পৌত্র বিদারবক্সকে আমার বিদায়-আশীর্ব্বাদ জানাবে। আজ আমার চিরবিদায়ের দিনে আমি তাকে দেখতে পেলাম না, তোমার দর্শন আকাঙ্ক্ষা আমার অপূর্ণ রয়ে গেল। যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখাচ্ছে বেগম সাহেবা শোকাকুলা—তাঁর অন্তর্দ্রষ্টা একমাত্র ভগবান। দূরদৃষ্টির অভাব মানুষের নিকট নিরাশাই বহন করে আনে। বিদায়!

—সম্রাটের মোহর

[শাহজাদা কামবক্সকে]

কামবক্স,

আমার পুত্র, আমার হৃৎপিণ্ড! আমার যখন ক্ষমতা ছিল আমি তোমাদের উপদেশ দিয়েছিলাম—আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে। আমি সেই জন্যে চেষ্টাও করেছিলাম যথাসাধ্য; কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা কেউ আমার উপদেশ পালন করনি। আজ আমি মৃত্যুপথযাত্রী—আজও আমার অনুষ্ঠিত পাপের শাস্তি আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। কি আশ্চর্য্য! আমি এই পৃথিবীতে একা এসেছিলাম—আর সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি দুর্ব্বহ পাপের বোঝা। যে দিকেই আমি দৃষ্টিপাত করি, পথস্রষ্টা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোন পথ-প্রদর্শক আমার দৃষ্টিতে আসছে না, আমার সৈন্যদের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা আমার মনকে শঙ্কাকুল ও ভাবাক্রান্ত করে তুলেছে। যদিও আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের রক্ষা করবেন, তবু এই বিষয়ে আমার পুত্রদের অবহিত হওয়া উচিত। যখন আমার শক্তি ছিল, তখনও আমি তাদের রক্ষা করিতে পারিনি, আর আজ আমার নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতাও

াই। এখন আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চলচ্ছক্তিবিহীন। যে নিশ্বাস একবার স্তব্ধ হয়ে গেছে, তার পুনরাগমন অসম্ভব। এই অবস্থায় আমি প্রার্থনা ছাড়া আর কি করতে পারি?···

···আমি তোমাকে ও তোমার সন্তানদের আল্লাহ্‌র-হস্তে সমর্পণ করে যাচ্ছি, আমি ভয়ে কম্পমান। আমি তোমার নিকট চির-বিদায় নিচ্ছি। সাংসারিক মানুষ শঠ, তাদের উপর বিশ্বাস করে কোন কাজ করো না। কাজ করবে অঙ্গুলীর নীরব সঙ্কেত দ্বারা। দারা সেকো নির্ব্বোধের মতন রাজকার্য্য পরিচালনা করেছিল; সুতরাং, সে তার অভীষ্ট লাভ করেনি। সে তার অনুচরদের বেতন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী বর্দ্ধিত করেছিল—কিন্তু প্রয়োজনের সময় সে বেশী বেতন দিতে পারেনি, সুতরাং, সে সফল হতে পারেনি। মোট কথা, তোমার শক্তি অতিক্রম করে কাজ করো না।

আমার যা বক্তব্য তোমাকে বলেছি, এবার তোমার নিকট বিদায় নেব। দেখ, যেন কৃষক ও প্রজাকুল অন্যায় ভাবে ধ্বংস না হয়; দেখো, যেন মুসলমানের রক্তপাত না হয়—অন্যথা আমার উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি অবতরণ করবে। বিদায়!

—সম্রাটের মোহর

['সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শেষ পত্র' শীর্ষক দুইটি পত্র অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী-রচিত 'ঔরঙ্গজেবের অনুশোচনা' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল দৈনিক পত্র "হিন্দুস্থানে"।]

জন মিণ্টনের চিঠি

[১৬৫০ সালে মিণ্টনের বাম চক্ষুটি অন্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। তার পর দ্বিতীয় চক্ষুটিও ক্রমশঃ খারাপের দিকে যায়। এথেন্সবাসী এক সহৃদয় বন্ধুর কাছে জীবনের এই আসন্ন বিপর্যয়ের কথা নীচের চিঠিখানিতে অতি করুণ ভাবে ব্যক্ত করেছেন। মূল চিঠিখানি লাটিন ভাষায় লেখা।]

ওয়েষ্টমিনষ্টার, ২৬শে সেপটেম্বর, ১৬৫৪।

গ্রীক, বিশেষ করে এথেন্সের সাহিত্যের চিরদিনই গোঁড়া ভক্ত আমি। এথেন্স যে এক দিন আমার এই প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উচিত মূল্য দেবে এ বিশ্বাস আমি কোন দিনই পরিহার করিনি। আপনার বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধা লাভে আপনাদের ঐতিহ্যময় সুপ্রাচীন দেশ সেই ভবিষ্যৎ-বাণীকেই সফল করেছে। শুধু লেখার মধ্য দিয়েই আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় এবং আমাদের মধ্যে এত দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও আপনি আমাকে একখানি অতি শিষ্টাচারপূর্ণ পত্র লিখেছেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই হঠাৎ এক দিন আপনি লণ্ডনে এলেন—এসে দেখা করলেন আমার সঙ্গে—যে চোখে দেখতে পায় না। আমার দুঃখ আজ কারুরই মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে না—হয়ত অনেকে অবজ্ঞার চোখেই দেখে। কিন্তু আমার দুঃখ আপনার মনে গভীর সহানুভূতি ও দুশ্চিন্তার রেখাপাত করেছে। দৃষ্টিশক্তি যে এক দিন ফিরে পাবই এ আশা আমায় আপনি কিছুতেই ত্যাগ করতে দেবেন না। প্যারিসে ডাঃ সেভোয় নামক আপনার যে চক্ষুরোগে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার-বন্ধু আছেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে আমার ব্যাধির লক্ষণগুলি জানাবেন কি না জানতে চেয়েছেন। আপনার ইচ্ছায় আমি নিশ্চয়ই বাধা দেব না। এ সুযোগ অবহেলা করার অর্থ হবে হয়ত ঈশ্বর-প্রেরিত সাহায্যকেই প্রত্যাখ্যান করা। প্রায় দশ বছর আগে—যত দূর মনে পড়ছে, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে আর তার সঙ্গে মূত্রাশয়ে ও পেটে ব্যথা। সকালে চিরদিনের অভ্যাস মত পড়াশুনা আরম্ভ করতে বসলেই চোখে ভয়ানক যন্ত্রণা হোত, কিন্তু একটু শারীরিক কসরতের পরই যেন সুস্থবোধ করতাম। যে মোমবাতীর আলোকে পড়তাম তার চারি দিকে রামধনু ঘিরে থাকত। এর কয়েক দিন পর থেকেই বাম চক্ষুর (অন্য চক্ষুটি এর আগেই নষ্ট হয়েছে) দৃষ্টি ক্রমশঃ তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে এল এবং বাম-পার্শ্বের আর কোন-কিছুই দৃষ্টিগোচর হোত না। আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও আমার চারি দিকের দৃশ্য-জগৎ ইতস্ততঃ ঘুরতে থাকে। কেমন একটা নিশ্চল মেঘল বাষ্প কপাল ও কপালের দু'পাশের রগের উপর জমাট বেঁধে আছে—চোখের উপর কেমন একটা তন্দ্রালু জড়তার চাপ অনুভূত হয়—বিশেষ করে দুপুরে খাওয়ার পর থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। আরগোনটিকসে কবি ফিনিয়াস সম্বন্ধে যে উক্তি করা হয়েছে আজ-কাল প্রায়ই তা মনে পড়ে।

বিছানায় শুয়ে যে দিকেই পাশ ফিরতাম আমার নিমীলিত আঁখি-পল্লব থেকে মনে হোত যেন আলোর ঝরণাধারা নেমে আসছে। এখনও যেটুকু দৃষ্টি আছে তাতে এ কথা উল্লেখ না করা অনুচিত হবে আমার পক্ষে। দিন দিন দৃষ্টিশক্তি যতই নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে বর্ণাঢ্যের ঔজ্জ্বল্যও ততই ম্লান হয়ে এসেছে এবং মনে হয়েছে, ভিতর থেকে কেমন একটা শব্দ করে সেই রঙ নির্গত হচ্চে। বর্ত্তমানে সর্বপ্রকার আলোকই নির্বাপিত আমার দৃষ্টিতে। শুধু চারি দিকে একটা তরল অন্ধকার কিংবা বলা যেতে পারে ছাই রং মেশান বাদামীর জালিকাটা আঁধিয়ার। তবু যে নিঃসীম অন্ধকার-সমুদ্রে আমি নিমজ্জিত কালোর চেয়ে শাদার দিকেই যেন তার প্রবণতা। চোখের কোটরে মণি যখন নড়ে-চড়ে, সরু ফাটল দিয়ে আসা আলোকের মত আলোর সূক্ষ্ম কণা মনে হয় প্রবেশ করে চোখে। আপনার ডাক্তার হয়ত আশার ক্ষীণ রশ্মি উদ্দীপিত করতে পারেন কিন্তু আমার এ ব্যাধিকে আমি দুরারোগ্যই মনে করি। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সাবধান করে গেছেন, সকলের জীবনেই এক দিন তিমিরঘন রাত্রি আসবে—সে কথাটা আজকাল প্রায়ই মনে পড়ে। কিন্তু দেবতার অসীম করুণায় সাহিত্য-চর্চা আর বন্ধুজনের প্রীতি-অভিনন্দনের মাঝে দিনগুলি অতিবাহিত হওয়ায় কবরের অন্ধকারের চেয়ে এ অন্ধকার কম পীড়াদায়ক মনে হচ্চে। লেখা আছে—'মানুষ কেবল উদরপূর্ত্তির জন্যই জীবন-ধারণ করে না—ঈশ্বরের মুখ-নিঃসৃত বাণীও তার প্রধান উপজীব্য।' এ কথা যদি সত্য হয় এবং ভগবান যখন মন ও বিবেককে এমন চক্ষুষ্মান্ করে রেখেছেন তখন কেন আমরা দৃষ্টিহীনতার জন্য অনুযোগ করব? ভগবানই যখন মুখের অন্ন যোগাচ্ছেন এবং নিজে হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন, তখন দৃষ্টিহীনতার জন্য শোকের পরিবর্তে আমি আনন্দই করব আর তাই যখন করুণাময়ের অভিপ্রায়। প্রিয় বন্ধু ফিলিরাস, আমার জীবনে যাই ঘটুক না কেন, আমি তোমায় বিদায় জানাচ্ছি তেমনি ধৈর্য ও স্থৈর্যের সঙ্গে যেমন হোত যদি আমার থাকত বন-বেড়ালের চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

ইতি

জন মিল্টন

মাইকেল মধুসূদনের চিঠি

[মধুসূদন পঠদ্দশায় তাঁর বন্ধু বাবু গৌরদাস বসাককে যে সব পত্র লিখেছেন নীচে তার কয়েকখানি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই সমস্ত পত্রে মধুসূদনের বাল্য-প্রেমের প্রগাঢ়তা, তাঁর সাধারণ প্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে তাঁর ছাত্রাবস্থার অনেক ঘটনার কথা জানা যায়। মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতেন রিচার্ডসন সাহেব সেই সময় কিছু দিনের জন্ম ছুটিতে যান এবং কার সাহেব তাঁর স্থলে কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। কোন কারণে তিনি মধুসূদনকে তিরস্কার করলে মধুসূদন অভিমানে কলেজ ত্যাগ করার সংকল্প করেন। নীচের পত্রে তারই আভাস পাওয়া যায়।]

খিদিরপুর, ২৫শে নভেম্বর, ১৮৪২
রাত্রি

প্রিয় বন্ধু,

ডি, এল, আরে'র (ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন) অবর্তমানে কলেজে না যাওয়ার সংকল্প বা অভিপ্রায় সম্বন্ধে এক সময় যে ইংগিত করিয়াছিলাম বোধ হয় মনে আছে। এইবার সেই সংকল্পকে কার্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিতেছি অর্থাৎ যত দিন না ডি, এল, আর ফিরিতেছেন কলেজে যাইব না—তাহা সে যত দিনই হউক না কেন, আমি একটুও মাথা ঘামাই না। কলেজের কয়েক জনকে ভিন্ন যাহারা আমায় ভালবাসে এবং আমি যাহাদের ভালবাসি কাহাকেও আমি সামান্ত মাত্রও পছন্দ করি না—বিশেষতঃ ঐ কারকে (মিঃ কার) আমি ঘৃণা করি ইহাতে আমার কিছুমাত্রও ক্ষতি হইবে না। অবশ্য একটি ক্ষতি হইবে—সে ক্ষতিও বিরাট অর্থাৎ আমি তোমার সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত হইব—যাহা এত গভীর ভাবে আমি কাম্য করি। অনেকটা চাটুবাদের মতই শোনাইতেছে কিন্তু তাহা নয়। ইহা অতীব সত্য কথা। এই বিরাট পৃথিবীতে তোমাকে ছাড়া আর কিছুকেই আমি এমন মূল্য দেই না। তোমার ভিতর আছে যাহা কিছু মহৎ, উদার, নিঃস্বার্থপর, কোমল সকল কিছুই। কি নাই? ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। 'আমাদের এই শয়তানি-পূর্ণ পৃথিবীতে' তোমার মত এমন প্রকৃত বন্ধুত্বপ্রবণ সত্যনিষ্ঠ হৃদয় পাইব স্বপ্নেও আশা করি না। যত দিন বাঁচিব—ভাগ্য পৃথিবীর যেখানেই আমাকে লইয়া যাউক না কেন তোমায় চিরদিন স্মরণ করিব—স্মরণ করিব বন্ধুত্বের কোমলতম মন লইয়া। যখন ইংলণ্ডে যাইব—সেদিন আশা করি আর বেশী দূরে নয় (আগামী শীতে), ইচ্ছা করিতেছি তোমার একখানি তৈলচিত্র সাথে লইয়া যাইব—যাহাই খরচ লাগুক না কেন। ইহার জন্ত পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত বিক্রয় করিতে আমি রাজী আছি—অবশ্য ছোট তৈলচিত্র। এখন রাত্রি দিনের ইহাই আমার একমাত্র চিন্তা। আমাকে ইহা করিতেই হইবে। যদি অবস্থা অনুকূল হয় ইংলণ্ডে যাইবার অগ্রেই একখানা লইব। দেশী বা বিদেশী কোন চিত্রকর জানা থাকিলে আমাকে জানাইও। তোমার একখানি তৈলচিত্র পাইতে আমি বদ্ধপরিকর। ভয় হইতেছে এ সম্বন্ধে অনেক লিখিয়া ফেলিয়াছি। ইহাকে চাটুবাদ মনে করিও না—না—না—না। আগামী রবিবার তোমাদের কবিকে দেখিতে আসিবে কি? যদি এস মতিকে সঙ্গে আনিও। অগ্রে জানাইও যাহাতে তোমার মত সুন্দর অতিথিকে অভ্যর্থনা করিতে প্রস্তুত হইতে পারি। কিন্তু তুমি আসিবে না—ইহা আশা করা বৃথা। তুমি সব করিতে প্রস্তুত কিন্তু আমার পর্ণকুটীর তোমার শ্রীচরণের পদধূলি দ্বারা ধন্ত করিবার তোমার কোনই আগ্রহ নাই। পত্রখানি ইতিমধ্যেই অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। যাহাই হউক, আরো কয়েকটি ছত্র লিখিতেছি। বাবা আগামী কল্য তাঁহার এক মাননীয় বন্ধুর নিকট যাইতেছেন। যাত্রা হইবে না। কলেজে যাইলে মতি, মাধব, বংকুকে আমার কথা বলিও—অবশ্য হ্যাংলারা যদি কলেজে আসে। ভুলিও না। টম মুর লিখিত আমার প্রিয় বাইরণের জীবনী পড়িতেছি—চমৎকার বই। যদি কোন দিন বড় কবি হইতে পারি—ইংলণ্ডে যাইতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারিব—তাহা হইলে তুমিও আমার জীবনী লিখিবে দেখিতে ভারী ইচ্ছা করে।

তোমার অতি প্রিয় বন্ধু
এম, এস, দত্ত

পুনঃ—পত্রের উত্তর সাদরে গৃহীত হইবে।

পুনঃ—জানি উত্তর দিবার যোগ্য কিছু নাই তবুও লিখিও—লিখিও—লিখিও !!!

এম, এস, দত্ত

[মধুসূদন পিতার সঙ্গে তাঁর কোন বন্ধুকে দেখিতে মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকে গিয়েছিলেন। পত্র দু'খানি সেখান থেকে লেখা।]

(১)

তমলুক
২৮শে অক্টোবর, ১৮৪২

প্রিয় গৌরদাস,

তোমায় যে পত্র লিখিয়াছিলাম পাইয়াছ কি? সত্যি বলিতেছি, এই অনিশ্চয়তা অত্যন্ত পীড়াদায়ক—দুঃসহ বিরক্তি ও যাতনাকর। তোমার অবশ্য দোষ নাই। আমি নিজেই তোমাকে চিঠি লিখিতে সতত প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছি। যেমন দেখিয়া আসিয়াছি এখনও কি স্বভাব তেমনি আছে? যদি হৃদয়াবেগ ও অনুভূতির আমূল পরিবর্তন না ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে সদা-সর্বদা তোমায় পত্রাঘাতে জর্জরিত করার অমূলক ভীতি লইয়া মাথা ঘামাইয়া লাভ কি? দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি, অল্প যাহা ইংরেজী শিখিয়াছিলাম তাহার অর্ধেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং আমার কাব্য-প্রতিভাও বিলুপ্ত। এখানে কোন বিষয়ে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু চারি ঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও একটি ছত্র অবধি লিপিবদ্ধ করিতে পারি নাই। হয় আমার কাব্যলক্ষ্মীকে তোমার নিকট রাখিয়া আসিয়াছি আর নয় ত সে পলাতকা। তবে ঘৃণাক্ষরেও এ কথা মনে স্থান দিও না যে 'আমার দিন বিগত'। আমার স্থির বিশ্বাস, তমলুক অর্থাৎ যে স্থান হইতে আমি লিখিতেছি কাব্যলক্ষ্মী তত্র উপস্থিত হইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। কিন্তু একবার কলিকাতায় যাইলে তোমায় কবিতায় ধারা-স্নান করাইয়া দিব। তমলুক হইতে বোধ হয় ইহাই আমার শেষ চিঠি। হয় আজ নয় কাল যাত্রা করিব। আগামী সোমবার কলেজে সাক্ষাৎ হইবে। মনে রাখিও—

চিরবিশ্বস্ত, অতি অনুগত
এম, এস, দত্ত।

(২)

তমলুক

সোমবার

প্রিয় বন্ধু,

গত শুক্রবার তোমাকে একখানা পত্র লিখিয়াছি, আশা করি যথা-সময়ে পাইয়াছ। কল্পনাতীত দ্রুততার সহিত পত্রখানি লিখিত। মনে পড়িতেছে সেই পত্রে লিখিয়াছিলাম—'আজ রাত্রেই যাত্রা করিব' কিন্তু যাত্রা করা হয় নাই। কয়েক দিনের মধ্যেও যে যাওয়া হইয়া উঠিবে তেমন মনে হইতেছে না। জানি আগামী কাল কলেজ খুলিবে। কিন্তু কলিকাতায় উড়িয়া যাইবার ক্ষমতাও আমার নাই। অভিসম্পাত করি সেই মুহূর্তকে যখন পিতার সহিত এই কুৎসিত স্থানে আসিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। কাল তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না জানিয়া নিরতিশয় দুঃখিত। কিন্তু গৌর, একটি মাত্র সান্ত্বনা আমার সম্বল। আমি সেই সমুদ্রের নিকটবর্তী হইয়াছি 'ইংলণ্ডের গৌরবোজ্জ্বল তটরেখার' জন্য যে সমুদ্রবক্ষ এক দিন (আশা করি খুব দূরে নয় সেই দিন) অতিক্রম করিতে হইবে। এই স্থান হইতে সমুদ্র খুব দূরে নয়। কত জাহাজ ইংলণ্ডের পানে যাইতেছে দেখিতে পাইতেছি যাক্, এবার অন্য কথায় আসা যাউক—যে লোকের নিকট হইতে কোন উত্তর পাওয়া যায় না সে রকম লোকের সমীপে পত্র লেখা অতি জঘন্য ব্যাপার। জঘন্য কেন? কেন না, লেখক হয়ত জানিতেই পারে না যে যাহার নিকট পত্র লেখা হইতেছে সে পত্র পাইয়া বিরক্ত না খুশী। কিন্তু গৌর, এই লেখার জন্য তুমি যে বিরক্ত হইতে পার, এই রকম অমূলক ভয় আমি মনে স্থান দিতে পারি না। যদি বিরক্তই হও অন্ততঃ বদান্যতা হিসেবেও তাহা গোপন রাখিও। আমাকে আর পত্র লিখিও না, কারণ আমার থাকা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। বিশ্বাস কর, তোমার নিকট হইতে এত দূরে আসিবার জন্য খুব সুখী।

তোমার দত্ত।

পুনঃ

যদি কোন ভুল হইয়া থাকে ক্ষমা করিও। কারণ, সময়াভাব বশতঃ যাহা লিখিয়াছি দ্বিতীয় বার দেখিবার ফুরসুৎ পাই নাই।

[মধুসূদন ইউরোপ প্রবাসকালে দারুণ আর্থিক বিপর্যয়ে পতিত হয়েছিলেন। বন্ধু-বান্ধব ও হিতৈষীরা—যাঁরা তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অনেকেই শেষে পরাঙ্মুখ হল। এমন কি, মধুসূদন চিঠি লিখলে তাঁরা উত্তর পর্যন্ত দিতেন না। উপায়ান্তর না দেখে মধুসূদন তখন দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রের শরণাপন্ন হলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর স্বাভাবিক মহত্ত্ব ও সহৃদয়তার সহিত যথাসম্ভব সাহায্য করেছিলেন মধুসূদনকে। এই চিঠিগুলি ফ্রান্স থেকে লেখা।]

(১)

ফ্রান্স, ভারসেল্স

২রা জুন, ১৮৬৪

প্রিয় মহাশয়,

আপনি যদি সাধারণ লোক হইতেন এত দিন পত্র না লেখার জন্য আমি ক্ষমাসূচক সুশোভন কথার মুখবন্ধ সহকারে এই পত্র আরম্ভ করিতাম। কিন্তু আপনি তাহা নহেন। আমি জানি দুরবস্থায় পতিত না হইলে কখনই তেমন লোকের দ্বারস্থ হই না যাহাকে আমরা আমাদের শুভার্থী ও বন্ধুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সৎ ও অকপট বলিয়া জানি।

আপনি শুনিলে চমকিত হইবেন, আমার বিশ্বাস, খুব ব্যথিত হইবেন যে, দুই বৎসর পূর্বে যে দৃঢ় ও সবল লোকটি আপনাকে অদম্য হৃদয় লইয়া বিদায় জানাইয়াছিল আজ সে তাহার ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। এবং আমি এই বিপর্যয়ে পতিত হইয়াছি সেই সব লোকের নিষ্ঠুর ও দুর্জ্ঞেয় আচরণে যাহাদের অন্ততঃ এক জনকেও আমি আমার শুভার্থী বলিয়া ভাবিতে গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছি।

কলিকাতা ত্যাগের প্রাক্কালে আমার স্ত্রী ও দুইটি শিশু ওখানে থাকিয়া যায়। আমার এবং আমার পত্তনীদারের মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল যে সে আমার পরিবারবর্গকে মাসিক ১৫০ টাকা প্রদান করিবে। অর্থের একাংশ ওরিয়েণ্টাল ব্যাংকে অগ্রিম জমা দেওয়া হইয়াছিল। সে ১৮৬২ সালের কথা। শ্রীমতী দত্তের প্রতি কিরূপ আচরণ করা হইয়াছে তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিবার ধৈর্য আমার নাই। তাহারা তাহার জীবন এমন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল যে সে শিশু দুইটিকে লইয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৮৬৩ সালের ২রা মে সে ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি ভারতবর্ষ হইতে একটি কপর্দকও পাই নাই। তালুক হইতে প্রাপ্য ১৮৬২ সালের এবং গত ডিসেম্বরের দেয় টাকাও আমার হস্তগত হয় নাই। আমার যে শেষ পত্র লেখা হইয়াছে তাহাও দশ মাস আগেকার ঘটনা। ইহার পর কমপক্ষে আটখানা পত্র লিখিয়াছি কিন্তু এ পর্যন্ত একটি ছত্রও উত্তর আসে নাই।

ভারতবর্ষে যখন আমার প্রাপ্য মুদ্রার পরিমাণ হইয়াছে ৪০০০৲ টাকা তখন আমি ফ্রান্সের জেলে যাইতেছি এবং আমার স্ত্রী-পুত্রকে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় সন্ধান করিতে হইতেছে। গ্রেস ইনের বেঞ্চারদের নিকট ৪৫০ টাকা অগ্রিম লইতে বাধ্য হইয়াছি এবং তাহারা আমাকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করিয়াছে। এই বৎসরে এইবার লইয়া তিনটি টার্ম নষ্ট হইল। মুন্সুর নিকটও আমি ২৫০৲ টাকা ঋণী। পরিশোধে অসামর্থ্য হেতু সে বেচারাও নিঃসন্দেহ দারুণ অসুবিধায় পতিত হইয়াছে।

আপনিই একমাত্র বন্ধু যিনি আমাকে এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। সে ক্ষেত্রেও আপনাকে আপনার বুদ্ধি ও পুরুষোচিত উদ্যমের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। একটি দিনও বৃথা নষ্ট করিবার নাই।

আমার অস্থাবর সম্পত্তি যাহা আছে তাহার বাৎসরিক আয় ১৫০০৲ টাকা। সমস্ত মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে এবং সম্পত্তিতে আমার দাখিলা-স্বত্ব অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। কলিকাতার জমি-বন্ধকী সমিতি শতকরা দশ টাকা হারে টাকা ধার দেয়। কাজেই আপনি আমার জন্য পনের হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। দিগম্বর মিত্র ও বৈদ্যনাথ মিত্র আমার সম্পত্তির আইনানুগ তত্ত্বাবধায়ক। তাহারা নিশ্চিত আপনাকে আবশ্যকীয় কাগজপত্র দিয়া দলিল মুসাবিদা সম্পূর্ণ

কলিকাতায় আমার পাওনা চার হাজার টাকা। এই পত্রপ্রাপ্তি মাত্র আপনি আমাকে অনশনের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই টাকার একাংশ অবিলম্বে পাঠাইয়া দিবেন।

১৫০০০৲ টাকা হইতে অনুগ্রহ পূর্বক এই ঋণগুলির পরিশোধ দিবেন'।

মনমোহন কুণ্ডু	১,৭০০৲
সাগর দত্ত	৮০০৲
আপনার প্রাপ্য	১,০০০৲
মধুসূদন মজুমদার	৫০০৲
মোট	৪,০০০৲ টাকা

এই ভদ্রলোকেরা প্রত্যেকেই আমার বন্ধুস্থানীয়। সুদের জন্য তাঁহারা আমার প্রত্যাগমন কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারেন। তবুও কেহ যদি সুদের জন্য পীড়াপীড়ি করেন, সে ক্ষেত্রে আপনি নিজের বিবেচনা মত কাজ করিবেন। তাহা হইলে আপনি আমাকে ১১,০০০৲ টাকা পাঠাইতে পারিবেন। ইহার মধ্যে ৩০০০৲ টাকা এই মুহূর্তে এবং বাকি অংশ ছয় মাস পরে যাহাতে পাইতে পারি সেই মত ব্যবস্থা করিবেন। ইহাতে একসুচেঞ্জ বাবদ আরো কিছু বাঁচিবে। আগামী অক্টোবরের মধ্যে এই সকল কার্য সমাধা করিতে সক্ষম হইলে আমি আবার গ্রেস ইনে ফিরিয়া যাইব এবং যথাকালে ভারতেও প্রত্যাগমন করিতে পারিব। অন্যথায় আমার ধ্বংস অনিবার্য এবং আমার ধারণা, আপনি কখনই সেরূপ হইতে দিবেন না। আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া এত দিন পর্যন্ত প্রাপ্য টাকা ধরিলে আপনি প্রায় ১৫,০০০৲ টাকা পাঠাইতে পারিবেন যদি না কিয়দংশ ইতিমধ্যেই পাঠাইয়া থাকেন।

আপনাকে যে বিপদগ্রস্ত করিলাম্ তাহার জন্য কি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে? আমি সেরূপ মনে করি না। আপনাকে আমি যতটুকু জানি, তাহাতে সর্বান্তঃকরণ দিয়া এ কথা বিশ্বাস করি যে আপনি আপনার এক জন সুহৃদ্ ও স্বদেশবাসীকে এইরূপ করুণ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দিতে পারিবেন না!

দয়া করিয়া উপরের ঠিকানায় ফ্রান্সে পত্র লিখিবেন। যত দিন না ঈশ্বর এবং ঈশ্বর-অনুগৃহীত আপনি আমার সহায়তা করিবেন ততক্ষণ এই দেশ ত্যাগ করিবার পার্থিব কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

আপনার বিশ্বস্ত
মাইকেল, এম, এস, দত্ত।

পুনঃ

'আমি এত পীড়িত যে নিজে চিঠি লিখিতে পারি নাই। এই জন্য আমার স্ত্রী—তাহার অবস্থা আমার চাইতেও খারাপ—যেমন যেমন বলিয়া দিয়াছি সে মত এই চিঠি লিখিয়াছে। হায় ভগবান, এই সময় আপনি যদি নিকটে অবস্থান করিতেন আপনার কোমল হৃদয় নিশ্চয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

এম, এস, দত্ত।

(২)

ফ্রান্স, মারসেলস
২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪

সহৃদয় সুহৃদ

গত রবিবার ক্ষুদ্র পাঠ-প্রকোষ্ঠে যখন বসিয়াছিলাম আমার দুর্ভাগিনী স্ত্রী কক্ষে প্রবেশ করিয়া সাশ্রু-নয়নে আমায় জানাইল—'ছেলেরা মেলায় যাইতে চায় কিন্তু আমার নিকট মাত্র তিন ফ্রাংক আছে। ভারতীয় মানুষেরা কেন আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতেছে?' আমি বলিলাম—'আজ চিঠি আসার দিন। যে লোকের নিকট আবেদন করিয়াছি আজ নিশ্চিত সেখান হইতে উত্তর পাইব। প্রাচীন মুনি-ঋষিদের মত তাঁহার জ্ঞান ও প্রতিভা, ইংরেজের মত তাঁহার কর্মোদ্যম এবং হৃদয় বঙ্গজননীদের মত অতি কোমল।' আমি ঠিকই বলিয়াছিলাম। এক ঘণ্টা পরে আপনার পত্র ও প্রেরিত ১৫০০৲ টাকা পাইয়াছি। আপনার মত সুমহান্ স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব। পূর্বেকার চিঠিগুলি হইতে আমার দুরবস্থার কিছুটা ধারণা নিশ্চিত পাইয়াছেন। কাজেই আর এ বিষয়ে কিছুই লিখিব না। মনে হয়, এইবার নির্বিঘ্নে বলিতে পারি, যখন আপনার হস্তে পড়িয়াছি তখন আমার দুঃখের দিন বিগত।

আবার আপনাকে জানাইতেছি—আমার সম্পত্তি মর্টগেজ দ্বারা যদি অর্থ-সংগ্রহের ব্যবস্থা না করেন তবে আমার পক্ষে অত্র অবস্থান করা বা ব্যারিষ্টার হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করা অসম্ভব। কারণ, এক বৎসর হইতে চলিল কলিকাতা হইতে একটি কপর্দকও পাই নাই। আমার ঋণও বহু। সে ঋণ পরিশোধের টাকা অবশ্যই চাই। এই লোকগুলি যদি আমার উপর আস্থা রাখিত কখনই এ রকম ঘটিত না। আমরা অমিতব্যয়ী নহি আর আমার সহধর্মিণীও সুগৃহিণী। কিন্তু অর্থ না থাকিলে কি করিব? চাটার্জি আজও আমার নিকট ৩০০৲ টাকা ধারে। কিন্তু এই টাকাতেও কুলাইবে না—আরো অধিক আমার প্রয়োজন।

বিস্তারিত করিয়া বলিতেছি। পূর্বেই লিখিয়াছি, বহু মাস যাবৎ হাতে টাকা পয়সা নাই অথচ এখানে সর্বোত্তম ভাবে বাস করিতে হইবে। আমাদের ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ২৬০০৲ টাকা। আমরা এখন একসঙ্গে আছি; সব কিছু লইয়া মাসে প্রায় ২৫০৲ টাকা খরচ পড়ে। আপনার ১৫০০৲ টাকার সহিত দিগম্বরের ৮০০৲ টাকা যোগ করিলে জুনের শেষ হইতে এ যাবৎ সব-শুদ্ধ মাত্র ২৩০০৲ টাকা আমার হস্তগত হইয়াছে। এই টাকা হইতে ১২০০৲ টাকা মাত্র ঋণ পরিশোধ করিয়াছি। এখনও ১৪০০৲ টাকা ঋণ বাকী। আমার হাতে প্রায় কিছুই নাই বলিলে চলে। কাজেই ৫০০৲ টাকা বা ঐ রকম যাহা প্রতি মাসে লাগে এবং আমার স্ত্রীর প্রসবের খরচ আপনার প্রেরিত টাকা হইতেই মিটাইয়াছি। এখন আমার নিকট মাত্র ৬০০৲ টাকা অবশিষ্ট আছে। লণ্ডনে যাইলে মাসে ৩৫০৲ টাকা খরচ পড়িবে। আগামী জুলাই পর্যন্ত স্ত্রী-পুত্রের সান্নিধ্যচ্যুত হইয়া থাকিতেই হইবে—তাহার পর ফ্রান্সে পুনর্মিলিত হওয়া সম্ভব। কারণ, ইংরেজদের সান্নিধ্যে থাকিয়া ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান-বুদ্ধির [illegible] হয় নাই। কিন্তু ইহার [illegible]

করা সম্ভব হইবে না যদি না আপনি আমার সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া বেশ কিছু টাকা প্রেরণ করেন। তাহা ভিন্ন আমার শিশু-পুত্রদের আমি এখানে রাখিয়া যাইতে চাই, কারণ এই ভাবে যত্র-তত্র ভাসিয়া বেড়াইবার মত বয়স তাহাদের হয় নাই। তাহারা শিক্ষা-দীক্ষায় সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ধাঁচে গড়িয়া উঠে ইহাই আমি চাই।

আপনি যে ১০০০৲ টাকা পাঠাইয়াছেন তাহা বোধ হয় আলিপুর আদালতে আমার জমা দেওয়া টাকা। ফরাসী ব্যাংকের উপর প্রেরিত ড্রাফটের জন্য আপনাকে আর কি ধন্যবাদ দিব। আপনার হৃদয় যে বাঙ্গালী মায়ের মত—এ কথা কি আমি যথার্থ ই অনুমান করি নাই? আর যাহা বলিবার রহিল বারান্তরে বলিব।

আপনার অতি বিশ্বস্ত
মাইকেল, এম, দত্ত।

অস্কার ওয়াইল্ডের চিঠি

[ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অস্কার ওয়াইল্ডের জীবন কবি বায়রণের মতই দুর্ভাগ্য এবং ব্যর্থতার নিদর্শন। জন্মভূমি ইংলণ্ড থেকে দু'জনেই চারিত্রিক দুর্নীতির জন্য নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন। তবু দু'জনেই ইংরেজী সাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তক হিসেবে খ্যাত। বহু-নিন্দিত অস্কার ওয়াইল্ড তাঁর রচনার ভেতর দিয়ে আজও বেঁচে আছেন। শ্লেষাত্মক সংলাপে সিদ্ধহস্ত ওয়াইল্ডের নাটকগুলিতে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোককে লেখা তাঁর চিঠিগুলিও সাহিত্যের মূল্য পেয়েছে। সদ্য কারামুক্তির পর শিল্পী রদেনষ্টিনকে লেখা এই চিঠিতে অস্কার ওয়াইল্ড তাঁর জীবনের একাংশ উদ্ঘাটিত করেছেন।]

হোটেল ডি প্লাজ, জিপে
বুধবার, জুন ১, ১৮৯৭

প্রিয়বন্ধু,

আপনার স্নেহ-সম্ভাষণপূর্ণ চিঠিখানি কাল পেয়ে আমি যে কত আনন্দিত, তা বলতে পারি না। সামনা-সামনি আপনাকে যত সুন্দর, মহৎ ও বন্ধুবৎসল দেখেছি, চিঠিতেও আপনার সৌহার্দ্যের তেমনি উষ্ণ স্পর্শ। এখানে কি অন্ততঃ এক দিনের জন্যেও এসে আমার আয়োজনহীন আতিথ্য গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করতে পারেন না? নৌকাতে করে অনায়াসে আসতে পারেন। এই ছোট সরাইখানাতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। অত্যন্ত আরামদায়ক এই হোটেলটির চার দিকে আছে একটি প্রচ্ছন্ন পরিবেশ। আর কি মুখরোচক ব্যঞ্জনই না তৈরী হয় এখানে যা আস্বাদ না করলে বুঝবেন না। এই হোটেলের তত্ত্বাবধায়ক এক জন উঁচুদরের শিল্পী।

একটা পুরো সীজন এখানে থাকবার ইচ্ছে আছে এবং সেই আসরে নতুন কিছু লিখবার ইচ্ছা আছে। যদি লিখি ত নাটকই লিখবো। প্রিয় বন্ধু, আপনি জেনে সুখী হবেন যে, জেল থেকে আমি তিক্ত জীবন নিয়ে কিম্বা নৈরাশ্যে ভেঙ্গে-পড়া মন নিয়ে ফিরে আসিনি। বরং, এ কথা বললে ঠিক বলা হবে যে, অনেক দিক দিয়ে আমি উপকৃত হয়েছি। সত্যি, কারাদণ্ড ভোগ করে আমি এতটুকু লজ্জিত বা দুঃখিত বা অনুতপ্ত নই। জেলটা অবশ্য খুবই নোংরা যায়গা; কিন্তু ওর চেয়েও নোংরা যায়গায় আমি জীবনে অনেক বার গিয়েছি। কিন্তু আমার যাকিছু লজ্জা তা এই ভেবে যে, এক জন শিল্পীর জীবনে যে কাজ করা উচিত নয় আমি সেই কু-কাজই করেছি। আমি এ কথা বলি না, নীতি-বিগর্হিত কাজ করে আমি মহৎ দোষ করেছি। আমি শুধু বলতে চাই, এক জন শিল্পীর জীবনে ইন্দ্রিয়বশ্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং আলস্য-বিলাস একেবারেই স্থান পেতে পারে না—এগুলো তাঁর জীবনের আদর্শকে এবং সেই আদর্শের অনুভূতিকে ম্লান করে দেয়; তার কল্পনা-শক্তিকে খর্ব করে দেয় এবং তার সূক্ষ্ম রসবোধকে স্থূল জিনিষে ভারাক্রান্ত করে তোলে। এ কথা আজ নিঃসংকোচেই স্বীকার করবো যে সারা জীবন আমি ভুল-পথে চলে এসেছি। আমি তাই জীবনের মহত্তম সুন্দর জিনিষের সন্ধান পাচ্ছিলাম না। এখন মনে হয়, আমার দেহ ও মনের স্বাস্থ্য ভালো, আপনার মত শিল্পীদের বন্ধুত্বে ভাগ্যবান, উদ্দাম জীবন যাপনের আর স্পৃহা নাই। প্রমত্ত বিলাস-ভোগের দুর্ব্বার ক্ষুধা শুধু শরীরকেই জীর্ণ করে না, আত্মাকেও বন্দী করে রাখে—বর্ত্তমানের শান্ত-শিষ্ট নিঃসঙ্গ জীবনে অতীতের পুনরাবৃত্তি হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই আর। এখনো শক্তির যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাই দিয়ে সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করে যাবো। টাকা-পয়সার জন্যে আর চিন্তা করব না, কারণ সম্পদই আমার জীবনের অভিশাপ। অর্থ আমার জীবনে অনর্থ ঘটিয়েছে। সাদাসিধে জীবন যাপন করবো, আর ভালো লিখবো—এই আমার সংকল্প। পাষাণে পাষাণে যে সঙ্গীতের নির্ঝর আপনি সৃষ্টি করেছেন, আপনার সান্নিধ্য পেলে আমি তাতেই অবগাহন করে ধন্য হবো। আপনি ভুলে যাবেন না, আমার জন্যেই রদেনষ্টিন আজ শিল্পী রদেনষ্টিন—সে ইতিহাসের সংবাদ ক'জন জানে?

ইতি—অস্কার ওয়াইল্ড

হিটলারের চিঠি

[নীচের দুর্বিনীত চিঠিখানি বিগত যুদ্ধে হিটলার কর্তৃক বেলজিয়ামের রাজা তৃতীয় লিওপোল্ডকে লেখা। চিঠিখানি রাজার হাতে দেওয়া হয়নি, হিটলারের নির্দেশে এক জন জার্মাণ অফিসার তাঁকে পড়ে শোনান। রাজা লিওপোল্ডের নেতৃত্বে বেলজিয়াম যে নাৎসী বাহিনীকে চরম প্রতিরোধ দেয়নি এবং নাৎসী অধীনে থাকার সময় তিনি যে হিটলারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, এই দুই গুজবের বিরুদ্ধে এই চিঠিখানি একখানি প্রামাণ্য দলিল।

১৯৪২ সালে রাজা লিওপোল্ড যুদ্ধবন্দী হিসাবে যখন অবস্থান করিতেছিলেন তখন বেলজিয়ামবাসীদের বলপূর্বক দাস-মজুর হিসাবে কাজ করিবার জন্য জার্মাণীতে প্রেরণের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানান ফুরারের কাছে। তিনি লিখেছিলেন—আমার দেশ এখন এক অভিনব এবং নির্মম বাধ্যতামূলক শ্রম-ব্যবস্থায় পেষিত। আমার দেশের নারী-পুরুষকে যুদ্ধলিপ্ত জার্মাণীকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বেলজিয়াম ত্যাগ করিতে বাধ্য করান হইতেছে। মেয়েদের অবস্থাই সব থেকে করুণ। কিশোরী মেয়েদের সম্পূর্ণ একাকী বিদেশে প্রেরণ করা হইতেছে—যে দেশ সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এমন কি, যে দেশের ভাষার সহিত তাহারা আদৌ পরিচিত নয়। তাহারা আজ নানা বিপদের সম্মুখীন, যাহার মধ্যে নৈতিক বিপদই অন্যতম। যুদ্ধান্তে পরাজিত জার্মাণী হইতে বহু দলিল-পত্রের সহিত এই চিঠিখানিও উদ্ধার করা হয়।]

আপনাকে যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবার অনুমতি দিয়াছি,

তাহার সুযোগ লইয়া অতি সহজেই আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন যে আপনি যুদ্ধবন্দী। ১৯৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের পত্রে আপনি যে সমস্ত উক্তি করিয়াছেন তাহা এতই মারাত্মক যে সরাসরি সেগুলিকে অগ্রাহ্য করিলেই চরমতম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না।

পত্রোল্লিখিত মত বাধ্যতামূলক শ্রম-ব্যবস্থাকে আপনি 'নির্মম বোঝা,' 'বলপূর্বক কার্যে নিয়োগ,' 'নির্বাসন' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। বলশেভিজিমের বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক বিশ্ব-সংগ্রাম চলিয়াছে সে সম্বন্ধে আপনার জ্ঞানের দুর্জ্ঞেয় অভাব তাহাতেই প্রমাণিত হইয়াছে। বলশেভিজম অপনার দেশের পক্ষেও বিভীষিকার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এই ভয়াবহ ইউরোপীয় যুদ্ধে, যাহার দায়িত্ব মুখ্যতঃ জার্মাণ জাতির স্কন্ধেই পড়িয়াছে—আপনার দেশের এই সামান্যতম সহযোগিতা যে বেলজিয়ামের আত্মরক্ষার প্রাথমিক ব্যবস্থামাত্র তাহাও আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন।

জার্মাণীতে একমাত্র হতভাগ্য বেলজিয়াম কিশোরীরাই নৈতিক বিপদের সম্মুখীন কল্পনা করা এবং নিজের দেশের নারী জাতির নৈতিক শুচিতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস পোষণ করা কেবল আপনার পক্ষেই শোভন। তথাপি এই চরম বিপদ আপনার দেশের পক্ষেও সমান গুরুতর।

১৯৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের পত্রের মত এমন দায়িত্বহীন কাজ করিতে আশা করি ভবিষ্যতে বিরত থাকিবেন এবং আপনার সাম্প্রতিক অবস্থানুযায়ী আচরণ করিবেন। ভবিষ্যতে যদি ইহার বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত হন, যুদ্ধবন্দী হিসাবে বর্তমানে যেখানে অবস্থান করিতেছেন সেখান হইতে আপনাকে বেলজিয়ামের সীমানার বাহিরে অন্যত্র প্রেরণ করিতে বাধ্য হইব।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩

ফুরারের সদর কার্যালয়
এ, হিটলার

বহুমূল্য সম্পদ

আপনার একান্ত প্রিয় কেশকে যে বাঁচায় শুধু তাই নয়, নষ্ট কেশকে পুনরুজ্জীবিত করে, তাকে আপনি বহুমূল্য সম্পদ ছাড়া আর কি বলবেন? শালিমারের "ভৃঙ্গমিন" এমনই একটি সম্পদ। সামান্য অর্থের বিনিময়ে এই অমূল্য কেশতৈল আপনার হাতে ধরা দেবে। "ভৃঙ্গমিন" পুরাপুরি আয়ুর্বেদীয় মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ত বটেই, তাছাড়াও উপকারী ও নির্দ্দোষ গন্ধমাত্রায় সুবাসিত। একই সাথে উপকার আর আরাম······

ভৃঙ্গমিন কিনুন তার বদলে অন্য কিছু নয়।

শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রচারিত

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠাইবেন

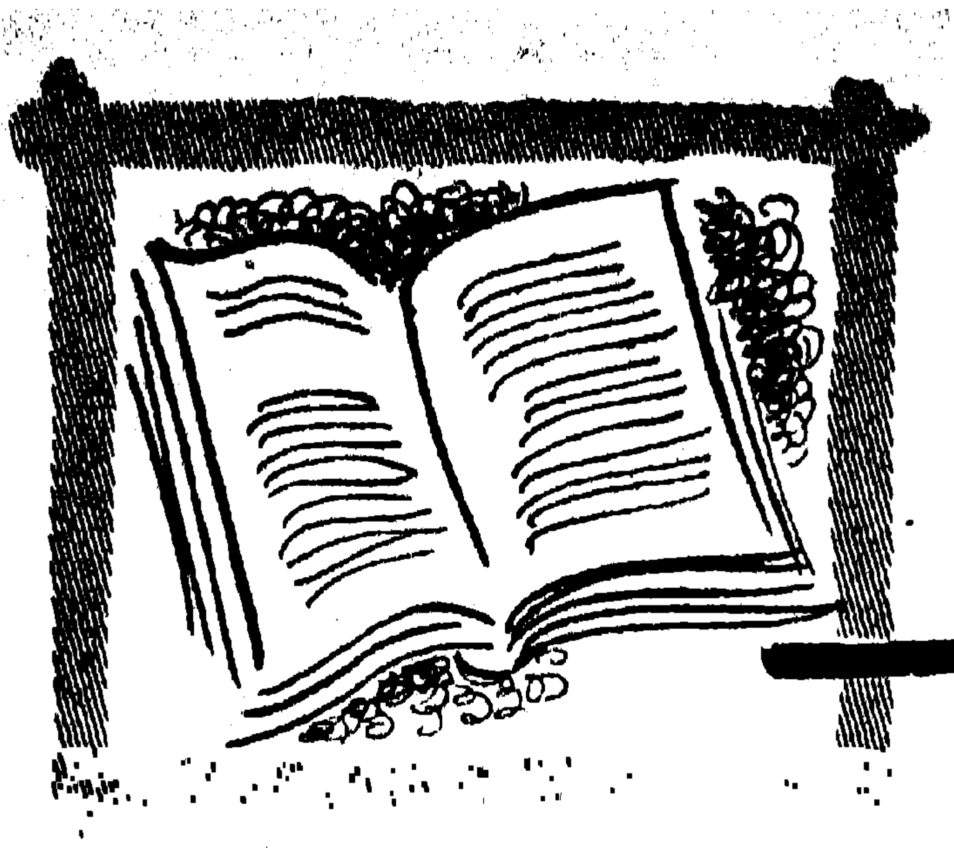

সাহিত্য পরিচয়

বাঙলা নাটক

[চন্দ্রশেখর (নাটক): রসরাজ অমৃতলাল বসু। প্রকাশক: বসুমতী সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।]

বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন বাঙলার অন্যতম নাট্যকার ও অভিনেতা রসরাজ অমৃতলাল বসু। 'চন্দ্রশেখরের' এই নাট্যরূপ অমৃতলাল বহু দিন পূর্ব্বেই দিয়েছিলেন এবং এত দিন তা পাণ্ডুলিপি আকারে অপ্রকাশিতই ছিল। ১৮৯৭ সালে এই নাটকের প্রথম মঞ্চাভিনয় হয় এবং রসরাজ নিজে বেদগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় অভিনয় করেন, ৺তারাসুন্দরী শৈবলিনীর চরিত্রাভিনয় করেন, ৺অক্ষয়কালী কোঙার করেন প্রতাপের অভিনয় এবং বিখ্যাত লাটু বাবু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি আমিয়টের অভিনয়। এই নাট্যাভিনয় আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে কলিকাতা সহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। চাঞ্চল্যটা শুধু কলিকাতার দর্শক-মহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসক ইংরেজকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার যে কল্পনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, সেই কল্পনাকে এমন সার্থক নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অমৃতলাল এবং তাঁর অভিনয়-কলার গুণে তা এমন বাস্তব সত্যরূপে ফুটে উঠেছিল মঞ্চের উপর যে বিদেশী শাসকরা চন্দ্রশেখর নাটকাভিনয় বে-আইনী ঘোষণা না করে পারেনি। চন্দ্রশেখর নাটকের পাণ্ডুলিপি সেই জন্যই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা এত দিন সম্ভব হয়নি। কিছু দিন পূর্ব্বে এই "চন্দ্রশেখর নাটক" নিষেধাজ্ঞার কবল-মুক্ত হয়েছে এবং তার পর বসুমতী সাহিত্য মন্দির তা প্রকাশ করে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 'চন্দ্রশেখর' নাটকের মূল্য ও গুরুত্ব এই ইতিহাসটুকু থেকেই ভাল বোঝা যায়।

বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের বিষয়বস্তু কি এবং তার গুরুত্ব কত তা জানেন না এমন লোক আমাদের দেশে খুব অল্পই আছেন। ১২৮০ (বাং) সাল থেকে ১২৮১ (বাং) সাল পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে 'বঙ্গদর্শনে' "চন্দ্রশেখর" প্রকাশিত হয়। ১২৮২ (বাং) সালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রথম পুস্তকাকারে "চন্দ্রশেখর" প্রকাশ করেন তখন তার মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে "চন্দ্রশেখরের" আরও দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং এই দু'টি সংস্করণেও তিনি অনেক পরিবর্ত্তন করেন। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর "চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মাসিক পত্রিকা থেকে শুরু করে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া পর্য্যন্ত এবং তার পরের প্রত্যেক সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের পরিবর্ত্তন সাধন করেছেন দেখা যায়। তার কারণ কি?

অমৃতলাল বসু

বঙ্কিমচন্দ্রের চিরদিনের বাসনা ছিল, বাঙালীর বীরত্ব ও মহত্ত্বের আদর্শকে উজ্জ্বল করে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক সমাজ-জীবনের মধ্যে সেই আদর্শের সুস্থ ও স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি তিনি বিশেষ দেখতে পাননি। "বিষবৃক্ষ," "ইন্দিরা" ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করে তাঁর রোমাণ্টিক মন ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য হয়েছিল। "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের জন্য ইতিহাসের সাহায্য নেওয়ার খুব বেশী প্রয়োজন ছিল না তাঁর। রমানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, রামচরণ সকলেই তাঁর নিজের মানসসৃষ্ট। ইতিহাসের পশ্চাদ্‌ভূমিতে তাদের সজীব ও সক্রিয় করে তোলার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাসিমের সঙ্গে ইংরেজের সংঘর্ষের কাহিনীকে অবলম্বন করেছিলেন। এখানে রোমান্স রচনার সুযোগও তাঁহার প্রশস্ত হয়ে গেল। সামাজিক প্রতিবেশের মধ্যে প্রতাপ আর শৈবলিনীকে নিয়ে তিনি এতটা অগ্রসর হতে পারতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু রোমান্স হলেও, "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী রোমান্সের হুবহু সাদৃশ্য নেই। উপন্যাসের চরিত্রগুলির মূল ঘাত-প্রতিঘাত দ্বন্দ্বের সঙ্গে সমসাময়িক মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের অনেকটা মিল আছে। "চন্দ্রশেখরের" মূল্য এইখানে।

'চন্দ্রশেখর' অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মন্মথনাথ রায়-চৌধুরী ১৯০৪ খৃঃ অব্দে চন্দ্রশেখরের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন, পরের বছর দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক আর একটি ইংরেজী অনুবাদ করেন। এছাড়া তামিল ভাষায় দু'টি অনুবাদ এবং তেলেগু ভাষায় একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এত দিন পর্য্যন্ত "চন্দ্রশেখরের" কোন উল্লেখযোগ্য নাট্যসংস্করণ ছিল না। সেই দিক দিয়ে রসরাজ অমৃতলালের এই "চন্দ্রশেখর" নাটক একটি অভাব পূর্ণ করবে। ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-সামাজিক নাটকের মিশ্রিত অভিনয়ের সুযোগ "চন্দ্রশেখর" নাটকে যতটা আছে, ততটা অন্য কোন নাটকে দুর্লভ। এখন "চন্দ্রশেখর" যখন নাটকাকারে প্রকাশিত হয়েছে তখন বাঙলার সর্ব্বত্র এবং বাঙলার বাইরে বাঙালীরা স্বচ্ছন্দে এই নাটক উৎসবে অনুষ্ঠানে অভিনয় করতে পারেন এবং করবেন বলে আমরা আশা করতে পারি।

প্রকাশকরা নাটকখানির গোড়াতে যদি একটি 'ভূমিকা' লিখে দিতেন তাহলে ভাল হত। পরবর্ত্তী সংস্করণে আশা করি তাঁরা এই ভূমিকাটি যোগ করে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

বাঙলার নব জাগরণের ইতিহাস

[বাঙলার নবজাগৃতি প্রথম খণ্ড: বিনয় ঘোষ। প্রকাশক: ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে চার টাকা]

অনেক দিন আগে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন: "বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্ম্মী অসার পরপীড়কদের জীবনচরিত মাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি আজও বর্ণে বর্ণে সত্য। বাঙলা দেশের ইতিহাস যে নেই তা নয়, কিন্তু তার প্রায় সবগুলিকেই যদি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'উপন্যাস' অথবা 'পরপীড়কদের জীবনচরিত' মাত্র বলা যায় তাহলে খুব ভুল হয় না। ঘটনা-সংকলন বা ব্যক্তির জীবনচরিত কোন দেশের ও জাতির ইতিহাস নয়। তা না হলেও এই শ্রেণীর ইতিহাসই বাঙলা ভাষায় রচনা করা হয়েছে বেশী। হাণ্টার, ষ্টুয়ার্ট, হিল, মার্শম্যান ইত্যাদি বিদেশীর রচিত ইংরেজী ভাষায় বাঙলার যে সব ইতিহাস আছে তা ঘটনাপঞ্জী অথবা ইংরেজ রাজপুরুষ ও মহাপুরুষদের মহিমা-কীর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের যে সব ইতিহাস আছে তাও অধিকাংশ ইংরাজীতে লেখা এবং তার মধ্যে গবেষণালব্ধ তথ্য যথেষ্ট থাকলেও কোনটাই একটা জাতির জীবনেতিহাস হয়ে ওঠেনি। এই শ্রেণীর অধিকাংশ ইতিহাসই হয় বাঙলার রাজনৈতিক কাহিনী, না হয় বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রভৃতি এই ধরণের ইতিহাসের মাল-মশলা অনেক সংগ্রহ করেছেন এবং গ্রন্থরচনাও করেছেন। বাঙলার ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালীর গবেষণাবৃত্তি জাগিয়ে তুলতে তাঁরা যে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে জন্য সকলেই তাঁদের কাছে ঋণী, বিশেষ ক'রে বাঙলার বর্ত্তমান ও ভাবীযুগের ইতিহাস-রচয়িতারা।

বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতির একখানি বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের অভাব দীর্ঘ দিন ধরে আমরা অনুভব করেছি। বিনয় ঘোষের "বাঙলার নবজাগৃতি" সে-অভাব অনেকাংশে পূর্ণ করবে এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। লেখকের বলিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, অপূর্ব্ব গদ্যভাষা ও প্রকাশনৈপুণ্য, অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসা একত্রে মিলিত হয়ে আলোচ্য গ্রন্থখানিকে একাধারে ইতিহাস ও সাহিত্য হিসাবে সার্থক রচনা করে তুলেছে। প্রত্যেক শ্রেণীর বাঙালীর কাছে যে এ-বই বিশেষ ভাবে সমাদৃত হবে এবং সকলেই যে গ্রন্থকারকে এই শ্রেণীর ইতিহাস রচনার পথপ্রদর্শকরূপে স্বীকার করবেন তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

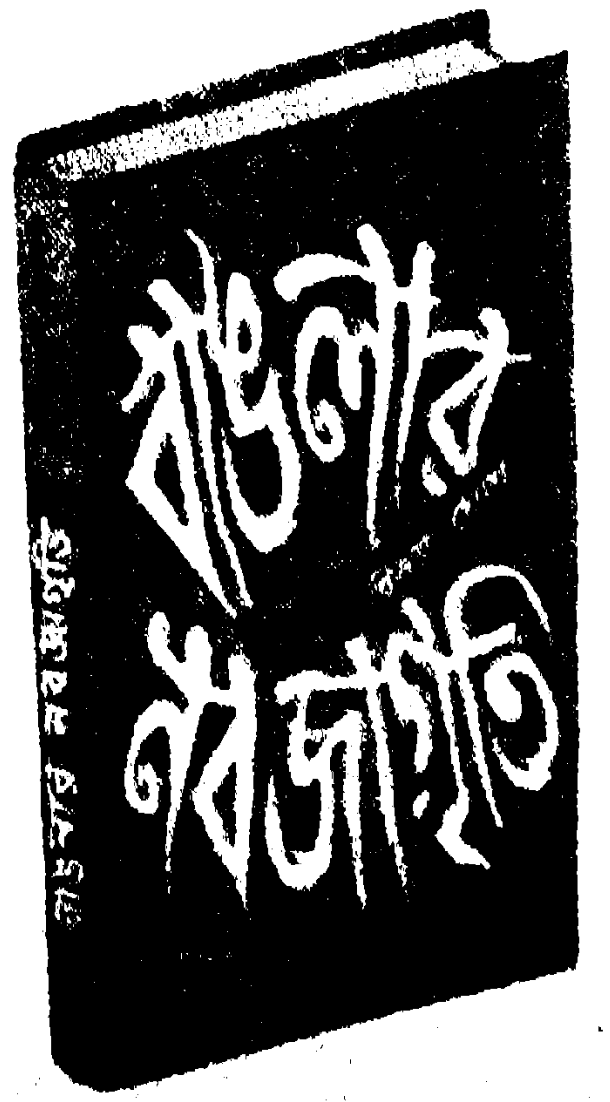

নবজাগৃতির প্রচ্ছদপট

বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হয়েছে ইংরেজ আমল থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে এই নবযুগের সূত্রপাত। বৃটিশ ধনিকতন্ত্রের প্রভাবে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড আঘাতে সর্ব্বপ্রথম এদেশের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, গ্রামে ও নগরে পুরাতন গ্রাম্যসমাজ ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হতে থাকে। এদেশে যন্ত্রপাতি আমদানি হতে থাকে, কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা হয়, যান্ত্রিক যানবাহন সমাজের আত্মকেন্দ্রিকতা ভেঙে দেয়। এই যুগের নতুন জীবনধারা, নতুন সমাজ-ব্যবস্থা, নতুন কর্ম্মতৎপরতার মধ্যে জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যায়। সামন্ততন্ত্রের সুদীর্ঘ জড়তার অন্ধকূপ থেকে মানুষ মুক্তি পায়, মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, বুদ্ধি ও যুক্তি বাস্তব অর্থনীতি ক্ষেত্র থেকে জ্ঞানরাজ্য পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র নিত্য-নতুন অভিযান করে মুক্তডানায় ভর দিয়ে। ইয়োরোপের এই যুগসন্ধিক্ষণকে বা নবযুগকে ঐতিহাসিকরা "রেনেসান্সের যুগ" বলেছেন। বাঙলার এই যুগবিপ্লব বা নবযুগকেও আমরা বাঙলার নবজাগৃতির যুগ বলতে পারি। এই যুগের ধারাবাহিক ইতিহাসই লেখক আলোচ্য গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

"নবজাগৃতিকেন্দ্র কলিকাতা" শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে লেখক কলিকাতা মহানগরীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ থেকে আলোচনা শুরু করেছেন, কারণ নবযুগের অর্থনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র বাঙলার নতুন রাজধানী কলিকাতা। কলিকাতার ইতিহাস কেন্দ্র করে লেখক প্রাচীন যুগের গ্রাম্যসমাজ, নগর ও নাগরিক জীবনের বৈশিষ্ট্য, ইয়োরোপে ও ভারতবর্ষে দাসযুগ, সামন্তযুগ ও বণিক-ধনিকযুগের বিকাশ, বৃটিশযুগের ঘাত-প্রতিঘাত, নবযুগের অর্থনৈতিক রূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করে নবজাগরণের স্বরূপ ও গুরুত্ব কোথায় তার বিশ্লেষণ করেছেন। "বাঙলার নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস" শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক বাঙলার নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য, বাঙলার নতুন জমিদারশ্রেণী, ধনিকশ্রেণী, নতুন বাঙালী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবিশ্রেণী এবং মজুর-শ্রেণীর উদ্ভব, ঐতিহাসিক ভূমিকা ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী কেন হিন্দুপ্রধান, তার সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণও লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। "ইসলাম ও বাঙলার সংস্কৃতি-সমন্বয়" শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত ভারতের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্য, ইসলামের প্রভাবে ভারতের, বিশেষ করে বাঙলার সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ধারা এবং পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির ঘাত প্রতিঘাতে নবযুগের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের বৈপ্লবিক রূপান্তর সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। "নবজাগৃতির ভাববিপ্লব" শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে নবযুগের ভাববিপ্লবের (Ideological revolution) স্বরূপ ও মূল কারণ কি, যন্ত্রযুগের শৈশব কালের ইতিহাস, রেলপথ, বাষ্পীয় শক্তি, প্রিণ্টিং মেশিন, ঘড়ি ও বিভিন্ন উৎপাদন-যন্ত্রের আবিষ্কারের বৈপ্লবিক

গুরুত্ব, বুদ্ধি ও যুক্তির দুঃসাহসিক অভিযান, বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এই সবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া, বাঙলার নবজাগৃতির প্রবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে লেখক আলোচ্য গ্রন্থ শেষ করেছেন। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে ঐতিহাসিক তথ্য-সংকলনে লেখকের সে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও বুদ্ধি দিয়ে সেই তথ্য বিশ্লেষণে তাঁর যে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখা যায়, তা সত্যই আমাদের দেশের চিন্তাশীল লেখক বা ইতিহাস-রচয়িতাদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার ইতিহাসই বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ইতিহাস। এই বৈপ্লবিক যুগসন্ধিক্ষণেই বাঙলার নবজন্ম হয়, বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়। রামমোহন থেকে রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগ পর্য্যন্ত এই নবজাগরণের প্রবাহ বিচিত্র পথে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে। এ যুগের ইতিহাস রচনা করা আদৌ সহজসাধ্য নয়। যে তথ্যনিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনানৈপুণ্য থাকলে এই ইতিহাস রচনা সার্থক হয়ে ওঠে তা লেখকের আছে বলেই "বাঙলার নবজাগৃতি" সার্থক সৃষ্টি হয়েছে। বাঙলার হিন্দু-মুসলমান শিক্ষিত মহলে এ বইয়ের সমাদর হওয়া উচিত এবং প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হিসাবে নিরপেক্ষ আলোচনা ও সমালোচনাও যথেষ্ট পরিমাণে হওয়া উচিত।

বইয়ের ছাপা ও রূপসজ্জার মধ্যে যে সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন প্রকাশকরা, তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাঙলা কাব্য

[অনুপূর্বা : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। প্রকাশক : সমবায় পাবলিশার্স। কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান : বুক ফোরাম, ১২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা]

'রবীন্দ্রোত্তর যুগ', 'আধুনিক যুগ', 'সাম্প্রতিক যুগ' ইত্যাদি বহু যুগের বিশেষণে আধুনিক বাঙলা কাব্যকে বিভূষিত করেছেন কাব্য-সমালোচকরা। কাব্যবিচারে 'আধুনিক' কথাটার কোন একটা সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা কেউ নির্দ্ধারণ করতে পারেননি, করবার চেষ্টা করেছেন মাত্র। আর 'রবীন্দ্রোত্তর' কথাটা যদি রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের জন্মকাল বা কাব্য-রচনা কাল বিচার ক'রে বলা হয় তাহলে তা অনেকের ক্ষেত্রে সত্য হলেও, কাব্যপ্রকৃতি নিয়ে বিচার করলে একেবারেই সত্য হয় না। বাঙলার কবিরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এত তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠে কাব্যবীণার তারে একটা নতুন সুরের ঝঙ্কার তুলবেন, এরকম আশ্চর্য্য কিছু আশা করাও বাতুলতা মাত্র। তাহলেও এ কথা কোন সজাগ কাব্যানুরাগীই অস্বীকার করতে পারেন না যে বাঙলার কাব্যলোকে একটা তুমুল আলোড়ন চলেছে, কাব্যের আঙ্গিক আর উপাদান নিয়ে বাঙলার কবিরা নির্মম ভাবে পরীক্ষা ক'রে [illegible]। '[illegible]' (Mutation) মাত্রই

[illegible]

যেমন স্থায়ী হয় না, নতুন পরীক্ষা মাত্রই যে স্থায়ী হবে এমন কথা কেউ বলবেন না। তাহলেও আধুনিক বাঙলা কাব্যলোকের এই বিক্ষোভ ও আলোড়ন বিক্ষুব্ধ কবি-মানসের ছবি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এ-ও সত্য যে বর্ত্তমান সামাজিক পরিবেশের প্রচণ্ড পরিবর্ত্তনশীলতা গতিশীলতা বিক্ষোভ ও সংঘাতই এর মূল কারণ।

রচনা কালের দিক্ থেকে বিচার করলে যতীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রপরবর্ত্তী যুগের কবি বলা যায় না, কিন্তু কাব্য-প্রকৃতির দিক্ থেকে বিচার করলে তাঁকে নিঃসন্দেহে বাঙলার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবি" বলা যায়। এই উক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা এখানে সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পরিমণ্ডল মূলতঃ রোমান্টিক বা কল্পনাধর্ম্মী আর যতীন্দ্রনাথের রিয়ালিষ্টিক বা বাস্তবধর্ম্মী। রবীন্দ্রনাথের কবিতা শেলীর 'স্কাইলার্কের' মতন, এক ঝাঁক বলাকার মতন। যতীন্দ্রনাথের কবিতা "ভালচার" বা শকুনের মতন, যত উঁচু দিয়েই সে উড়ে যাক না কেন, দৃষ্টি তার নিবদ্ধ থাকে এই মাটির পৃথিবীর ভাগাড়ের দিকেই। নিটোল বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস, সুস্থ মানবত্ববোধ ও জীবনবোধ, সত্যশিবসুন্দরের সর্ব্বত্যাগী সাধনা, এই হ'ল রবীন্দ্রকাব্যের বনিয়াদ। যতীন্দ্র-কাব্যের বনিয়াদি হ'ল অশিব অসুন্দর ও অসত্যের বিরুদ্ধে সমগ্র কবিসত্তার আপোষহীন বিদ্রোহ। তাই "কবি-কাহিনী", "সন্ধ্যা-সঙ্গীত", "প্রভাত-সঙ্গীত" ইত্যাদি থেকে রবীন্দ্রনাথের যাত্রা শুরু, আর যতীন্দ্রনাথের অভিযান শুরু "মরীচিকা", "মরুশিখা", "মরুমায়া" থেকে। স্নিগ্ধ শ্যামল বাঙলা কাব্যে তাই দেখতে পাই যতীন্দ্রনাথ মরুভূমির পর মরুভূমি আমদানি করেছেন। কবি দুঃখ ক'রে "আমার কথার" মধ্যে বলেছেন যে "তবু লোক জোটেনি।" শস্য-শ্যামল স্নিগ্ধ সবুজ বাঙলা দেশে, বন্যা-বাদলের দেশে মরুকবির লোক জোটা কি এতই সহজ? যে বাঙলার কাণে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী থেকে রবীন্দ্রকাব্যের অপূর্ব্ব সুর-ঝঙ্কার পর্য্যন্ত ঝঙ্কৃত হয়েছে, সেই বাঙলার কাণের ভিতর দিয়ে মর্ম্মে মরু-সঙ্গীত পৌছবে কেন?

"আনন্দের সে অগ্নিমূর্তি ভালবেসেছিনু ব'লে
মন উঠেনিকো এই বাংলার শ্যামল স্যাঁতানো কোলে।
জলে ও আগুনে আপোষ করিয়া যে
বোশেখ হেথা আসে,
যার তেজ মোরা মাপি কুপোদকে,
শুকনো ডাঙার ঘাসে,
যে আসে মোদের রন্ধনশালে
ভিজা কাঠে চুলা জ্বালি,
ধুঁয়ার ছলনে কাঁদিয়া আকাশে
মাখাতে মেঘের কালি,
আমে আর জামে ঘামে আর প্রেমে
বৈশাখী সে-জীবন,
অসহ বোধে চিরদিন আমি চেয়েছিনু বর্জ্জন।
বন্ধু জানতো তুমি—
বাংলার ছেলে ভালবেসেছিনু
কেন আমি মরুভূমি।"
([illegible])

যতীন্দ্রনাথের এই পরিচয় বাঙলা দেশ পায়নি, তাঁর এই বিদ্রোহ ও বেদনা বাঙলার লোক মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেনি, তাই শ্যামল বাঙলার কাব্যে এত ক'রে মরুভূমি আমদানী করেও কবির লোক জোটেনি। আজ তাঁর লোক জুটছে, আরও জুটবে। মরুবাংলার আর্ত্তনাদ আজ আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ব'লে কি আমরা বাঙলার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী কবি যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সবেমাত্র সচেতন হ'তে শুরু করেছি? "লোহার ব্যথা" যে কবির অন্তরের ব্যথা তা আমরা এত দিন অনুভব করিনি—

"আগুনের তাপে শাঁড়াসির চাপে আমি চির নিরুপায়,
তবু সগর্বে ভুলিনি ফিরাতে প্রতি হাতুড়ির ঘায়।
যাহা অন্যায়, হোক না প্রবল, করিয়াছি প্রতিবাদ,
আমার বুকের কোমল অংশ, কে বলিল তারে খাদ?
তোমার হস্তে ইস্পাত হ'য়ে সহি' শান, পান, পোড়,
রামের শক্র শ্যামে কাটি যদি, তাহে কিবা সুখ মোর?
তোমার হাতের যন্ত্র যাহারা দিন-রাত মরে খেটে,
না বুঝে চাতুরী নেহাই হাতুড়ি ভাই হয়ে ভায়ে পেটে।"

(মরুশিখা—"লোহার ব্যথা")

কবির এই বিদ্রোহ ও বেদনা, মানুষের প্রতি এই গভীর মমত্ব-বোধ এত সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে তাঁর কাব্যের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে যে তার মধ্যে যে এতটুকু বিলাস, এতটুকু সৌখিনতা, এতটুকু কৃত্রিমতা নেই তা অত্যন্ত সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই বিদ্রোহ-বেদনাবোধ কবির নাড়ীর সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে শীতের সন্ধ্যায় বৃদ্ধ কচি ডাবওয়ালার সামনে তিনি বলছেন—

বেসুরো ধরিনু গান— হায়, হত ভগবান!
মোর ভাগ্যে এ হেন দুর্ভোগ!
অপরের কাব্য-ভালে মিলাও ত কালে কালে
অনুকূল কত-না সুযোগ!
সে-সব কবির বেলা— শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা,
দুয়ারে তরুণী পশারিণী,
তনুদেহ সিক্ত বাস, নয়নে মিনতি-ফাঁস,
ফুল নিয়ে করে বিকিকিনি।
আরো ভাগ্যবান যিনি আসে তাঁর পশারিণী
কোমল করুণ ক্লান্তকায়,
'শয্যা শুভ্র ফেননিভ স্বহস্তে পাতিয়া দিব'
সাধে কবি সমবেদনায়।
এ ভালে তেঁতুল-গোলা— অতি বৃদ্ধ ডাবও'লা!
তাও নহে বৈশাখী দুপুরে;
মিটাতে প্রাক্তন দেনা শীতরাত্রে ডাব কেনা!
তাই কি কাটারি আছে ঘরে?"

(সায়ম্—'কচি ডাব')

যতীন্দ্রনাথের এ-বিদ্রোহ সাধারণ বিদ্রোহ নয়; সখের সৌখিন 'রোমাণ্টিক' বিদ্রোহ নয়। গভীর বেদনা, তার চেয়েও গভীরতর যন্ত্রণা থেকে এই আপোষহীন তিক্ত তীব্র বিদ্রোহ উৎসারিত। যতীন্দ্র-কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাই বিপুল বাধাবন্ধহীন আবেগ-নিগ্রহ; উচ্ছ্বাস ও আবেগপ্রবণতা তাঁর কাব্যধর্ম্ম নয়। তাঁর মানস প্রতিমা তাই অসাধারণ কল্পনার ঐশ্বর্য্যে ঝলমল করে ওঠে না, অভিজাত কল্পনার দৌলতখানায় লালিত হয়ে তাঁর ইমেজগুলি অনন্য-সাধারণ হয় না, অতি-তুচ্ছ অতি-সাধারণ বাস্তব জগৎ থেকেই তাদের উৎপত্তি এবং সেই জন্যই তাদের অসাধারণত্ব একান্ত নিজস্ব। যতীন্দ্র-নাথের এই বিদ্রোহ তাই সার্থক বিদ্রোহ এবং এ-বিদ্রোহ চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙলা-কাব্যের চিরশ্যামলতা মহান প্রেম-উদারতার ধারার বিরুদ্ধে আপোষহীন বিদ্রোহ, পরিপূর্ণ বিদ্রোহ।

যতীন্দ্রনাথকে যাঁরা "দুঃখবাদী" কবি বলেন তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত নই। আমরা বলব, তাঁদের কাব্যোপলব্ধি ব্যর্থ হয়েছে। যতীন্দ্রনাথের কবিসত্তা এবং তাঁর কাব্য-প্রকৃতি কোনটাই তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। হতাশার সুর, ক্লান্তির সুর যে যতীন্দ্র-কাব্যে নেই তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে অমেরুদণ্ডের নাকী-কান্না নেই, অবসাদ বা জড়তার চিহ্ন নেই কোথাও। হতাশার মধ্যেও বিরক্তির ঝাঁঝ আছে, অস্বস্তি আছে, ক্লান্তির মধ্যেও শ্রমক্লান্তের ঘামের তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়। এইটাই সব চেয়ে বড় কথা। জীবনকে তাই কবি কোন দিন অস্বীকার করতে পারেননি, অথবা আধুনিক অনেক কবির মতন তিনি জীবনকেন্দ্রচ্যুত হননি। জীবনকে কেন্দ্র করেই তাঁর হতাশা, তাঁর বিরক্তি, তাঁর বেদনা, তাঁর তিক্ততা, তাঁর বিদ্রোহ। এইটাই যতীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যের যথাযথ সমাদর যে বাঙলা দেশে হয়নি তা আমাদেরই দীনতার জন্য, এ কথা আমাদের লজ্জার সঙ্গেই স্বীকার করা উচিত। 'অনুপূর্বা' কাব্য-সংকলন প্রকাশ করে প্রকাশক যে শুধু কাব্যপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, সাধারণের ও সমঝদারদের মধ্যে তাঁর কাব্যের ন্যায্য সমাদর লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। আন্দাজ ১৩১৭ সাল থেকে ১৩৪৭ সাল পর্য্যন্ত রচিত কবির সমস্ত কবিতার রচনা-কালের যথাসম্ভব আনুপূর্ব্য রক্ষা করেই "অনুপূর্বা" সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাগুলি পূর্বে মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, সায়ম্—এই চারখানি স্বতন্ত্র স্বল্প-প্রচারিত কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। যতীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে প্রকাশক মহাদেব সরকার যে মূল্যবান ভূমিকাটি লিখেছেন তা বিশেষ ভাবে প্রণিধেয়। রবীন্দ্রনাথের "সঞ্চয়িতা" ও "চয়নিকার" মতন যতীন্দ্রনাথের "অনুপূর্বা" বাঙলার ঘরে ঘরে স্থান পাবে না কি?

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা

[প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস: ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক: সিগ্‌নেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলিকাতা। মূল্য ৪৲]

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এক জন স্বার্থত্যাগী অক্লান্ত দেশকর্মী হিসাবে এদেশের সকলের কাছেই সুপরিচিত। কিন্তু তিনি যে এক জন সুপণ্ডিত ও সুলেখক, প্রাত্যহিক রাজনীতির হট্টগোলের মধ্যে সে-খবর হয়ত অনেকেই রাখেন না। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ডাঃ ঘোষের পাণ্ডিত্য যে কত গভীর তা উৎসাহী ও অনুসন্ধানী পাঠকরা আলোচ্য গ্রন্থখানি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন। তাছাড়া, বাঙলা লেখ্য-ভাষার উপর তাঁর অসাধারণ

দমদম জেলে এবং ১৩৫০ সালের শেষে আমেদনগর কোর্টে বন্দী থাকার সময় প্রফুল্লচন্দ্র এই গ্রন্থ রচনা করেন। রাজনৈতিক জীবনের অবিরাম ঝড়-ঝঞ্ঝা ও নানা গুরু দায়িত্বের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অধ্যয়ন গবেষণা ও গ্রন্থরচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু তা হ'লেও আগাগোড়া তাঁর রচনার মধ্যে কোথাও ভাবার স্বচ্ছন্দ-প্রবাহ ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে মনে হয় না, অথবা বিষয়-বস্তুর ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছে ব'লে বোঝা যায় না।

আলোচ্য গ্রন্থে ডাঃ ঘোষ প্রাচীন কাল থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দু-সভ্যতার ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন। বহু ইউরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা করেছেন, এখনও করছেন এবং তাঁদের এই শ্রমসাধ্য গবেষণার ফলে অনেক নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য ভারতীয় ইতিহাসের প্রায়ান্ধকার ক্ষেত্রগুলিতে আলোকসম্পাত করেছে। আজ তাই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আর অনুমানসাপেক্ষ নয়, ইতিহাস লেখবার উপযোগী অনেক মাল-মশলা আজ হাতের কাছেই ভারতবিদ্ ও প্রত্নবিদ্‌দের অনুসন্ধানের ফলে মজুত রয়েছে। ডাঃ ঘোষ আলোচ্য গ্রন্থে কোন মৌলিক গবেষণা করেননি, পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত তথ্যের উপরেই তিনি তাঁর গ্রন্থের কাঠামো রচনা করেছেন। কিন্তু তা হলেও তাতে তাঁর গ্রন্থের এতটুকুও মূল্যহানি হয়নি।

প্রাচীন ভারতের গৌরবকে খর্ব্ব করার অপচেষ্টা অনেক বিদেশী ইতিহাস-লেখক করেছেন। কিন্তু তাঁরা মুষ্টিমেয় এবং তাঁদের পাণ্ডিত্য ও তথ্যনিষ্ঠা কারও কাছে কোন দেশেই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করতে পারেনি। তাঁদের কথা একেবারেই উল্লেখযোগ্য নয়, তার কারণ অধিকাংশ বিদেশী পণ্ডিতদেরই গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে আমরা ভারতবাসীরাই আজ আমাদের নিজেদের সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি, তার বিচিত্র ঐশ্বর্য্যসম্ভার ও ভাবসম্পদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছি। ইয়োরোপীয় পণ্ডিত ও ভারত-বিদ্‌দের মধ্যে জার্মান ও ইংরেজ পণ্ডিতদের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। এই পণ্ডিতদের মধ্যে ম্যাক্সমূলর, জোন্‌স্, উইলসন, কাউয়েল, ডান্‌কান, কোলব্রুক, মুইর, হ্যাভেল, মার্শাল, ম্যাকে, শ্লেগেল, রথ, বিউহ্লার, ভিনটারনিস্, ওল্ডেনবার্গ, ডয়সেন, বেবার, ম্যাকবি, কিলহর্ণ, গ্লাজেনাপ, সেনা, গুরুসে প্রভৃতির দান ভারতবাসী চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করবে। এঁদেরই অনুসন্ধানের পথ ও ধারা অনুসরণ ক'রে যে কয়েক জন ভারতীয় পণ্ডিত প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার, ভগবানলাল ইন্দ্রজী, কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বিদেশী লেখকদের মধ্যে যেমন এক দল আছেন যাঁরা ভারতীয় সভ্যতার 'অন্ধকার' দিক্‌টাকেই ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখেছেন, তেমনি আমাদের দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এক দল তথাকথিত 'ঐতিহাসিক' আছেন, যাঁরা মনে করেন যে "আমাদের দেশে যা হয়েছে এমনটি ছিল না, হবারও নয়" এবং "আজকাল যা কিছু দেখা যায় তার সবই 'ব্যাদে' আছে।" দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, পৃথিবীর ইতিহাস-প্রণেতা দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন যে, রামচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীদের বানরদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা দেখে মনে হয়, সেকালে আর্য্যরা বিজ্ঞানে এত দূর উন্নতিলাভ করেছিল যে তারা বানর প্রভৃতি জন্তুদের সঙ্গে বাক্যালাপ ও ভাবের আদান-প্রদান পর্য্যন্ত করতে পারত। দুর্গাদাসের মতো আরও অনেক "বুদ্ধির বৃহস্পতি" মনে করেন যে, রামায়ণে পুষ্পক রথ আর ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করা প্রাচীন ভারতের উড়ো-জাহাজের অস্তিত্ব প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে। ডাঃ ঘোষ এই ধরণের "ঐতিহাসিক" নন। তাঁর একটা সুস্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত না হলেও, অপাঠ্য বা যুক্তিহীন নয়।

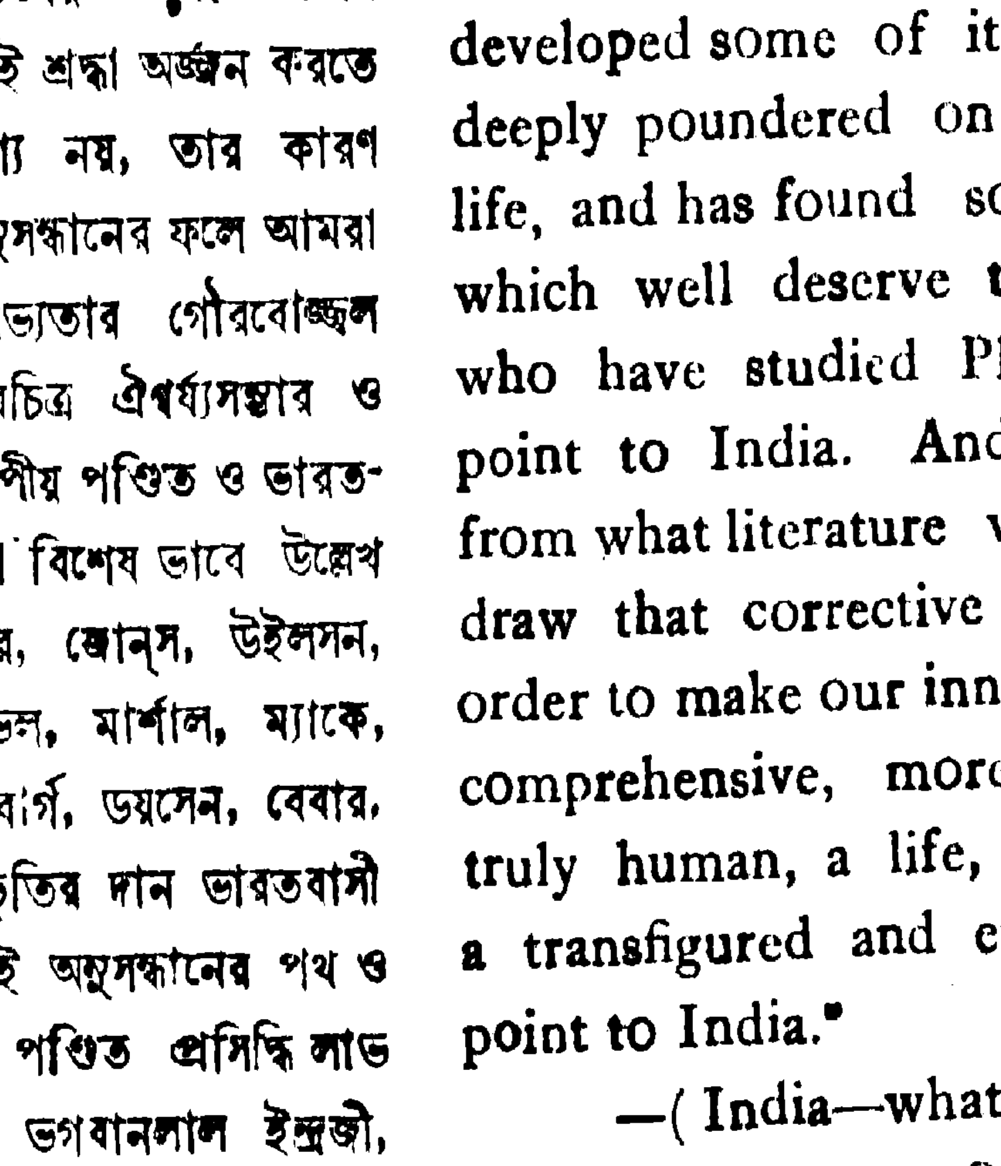

সিন্ধুর মৃৎশিল্প

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ম্যাক্সমূলর ১৮৮২ সালে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power, and beauty that nature can bestow—in some parts a very paradise on earth—I should point to India. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply poundered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant—I should point to India. And if I were to ask myself from what literature we, here in Europe···may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact more truly human, a life, not for this life only, but a transfigured and eternal life—again I should point to India."

—(India—what can it teach us ? Lec. 1.)

প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা, শিক্ষা, রাজকাহিনী ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ম্যাক্সমূলরের এই উক্তি উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছেন। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মহাকবি ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, নাট্যকার শূদ্রক, গল্পলেখক বিষ্ণুশর্ম্মা প্রভৃতিদের সাহিত্যিক গুণাগুণের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মপ্রসঙ্গে বেদ,

উপনিষদ, গীতা, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ এবং বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে ভারতীয় ধর্মের সর্ব্বতোমুখী বিকাশের আভাস দেবার চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি প্রাচীন হিন্দু গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও রসায়নবিদ্যার সাধনা ও গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, পদ্মনাভ, ভাস্করাচার্য্য, বরাহমিহির, নাগার্জ্জুন, সুশ্রুত, চরক প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান সম্বন্ধে লেখকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাও প্রণিধানযোগ্য। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা এই ছয় প্রসিদ্ধ হিন্দু-দর্শনের প্রণেতা যথাক্রমে গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি ও বাদরায়ণ বা ব্যাস। এই ষড়্দর্শন ও তার প্রণেতাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে গ্রন্থকার যে আলোচনা করেছেন তাতে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় যে কোন সাধারণ পাঠকও পেতে পারেন। প্রাগৈতিহাসিক মহেন-জোদড়ো হড়প্পার যুগ থেকে গুপ্তযুগ এবং বাঙলার পাল রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পকলা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের বিকাশ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে তাও শিল্পালোচনার ভূমিকা হিসাবে মূল্যবান। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, মহেনজোদড়ো হড়প্পার সভ্যতা এবং বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার সম্বন্ধে আলোচনাও তথ্যবহুল ও শিক্ষাপ্রদ।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ও তথ্য সংকলন সম্বন্ধে সমালোচনা করার মতো বিশেষ কিছু নেই। ডাঃ ঘোষ প্রত্যেকটি বিষয়ে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এমন একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস-গ্রন্থের বিষয়-বিন্যাসে একটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, শুধু তারই উল্লেখ করব এখানে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রত্যেকটি দিক নিয়ে ডাঃ ঘোষ আলোচনা করেছেন এবং কোন আলোচনার মধ্যেই তাঁর অন্ধ-গোঁড়ামি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়নি। সুস্থমন ও মুক্তবুদ্ধি নিয়েই তিনি এই ইতিহাস আলোচনা করেছেন। কিন্তু এরই মধ্যে "প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা" সম্বন্ধে কোন আলোচনা কেন করা হয়নি, তা যে কোন পাঠকেরই মনে হবে। প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অবস্থা সম্বন্ধে ডাঃ প্রাণনাথ, ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ ঘোষাল, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা গবেষণা ও আলোচনা করেছেন। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উল্লেখ করা হলেও, আলোচ্য গ্রন্থে এই বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থকারের উদাসীনতাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই উদাসীনতা ও উপেক্ষার জন্যই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পরিপূর্ণ ভাবে বিজ্ঞান-সম্মত হয়ে ওঠেনি এবং আলোচ্য ইতিহাস অনেকটাই কাহিনী ও তথ্য সংকলন হয়েছে মাত্র। প্রাচীন ভারতের যে-সভ্যতা সাহিত্য-শিল্পকলা-বিজ্ঞান-দর্শন ইত্যাদির সাধনায় উন্নতির সৌধশিখরে উঠেছিল, পরবর্ত্তী যুগে তার অমন সর্ব্বাঙ্গীন অবনতি হল কি ক'রে? এ-প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর কোন জবাব দেননি গ্রন্থকার। শুধু "ভূমিকার" এক স্থানে—"হিন্দুরা অশেষ চেষ্টা ও সাধনার বলে প্রভূত জ্ঞান অর্জ্জন করেছিল। কালক্রমে তাদের অবনতি ঘটেছে।"—এইটুকু উল্লেখ ছাড়া আর কোথাও কিছু পাওয়া যায় না। আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন: "প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দু-প্রতিভার বিকাশ নানা দিক্ দিয়ে হয়েছিল। মুসলমান বিজয়ের ফলে সে বিকাশের পথ কিছু দিনের জন্য রুদ্ধ হয়।" এ কথা আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রাচীন হিন্দুবিজ্ঞানের নানা দিক্ নিয়ে সারা জীবন গবেষণা করেছেন। তাঁর প্রাচীন "হিন্দু-রসায়নবিদ্যার ইতিহাস" একখানি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। তিনি এই ইতিহাসের মধ্যে বলেছেন যে, বৌদ্ধপরবর্ত্তী যুগে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করল তখন অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটল। যাজক-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মনু প্রভৃতি পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারেরা নতুন নতুন বিধি-নিষেধের নাগপাশে সমগ্র সমাজকে বেঁধে ফেললেন। হতভাগ্য হিন্দু জাতির ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অপরিমিত মনীষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে কুসংস্কারের গোলকধাঁধায় অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করল। এ ছাড়া প্রাচীন ভারতের অচল অটল অপরিবর্ত্তনশীল কঠোর সামন্ততান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের বাস্তব উন্নতি ও প্রগতির প্রেরণাও ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক। এই সব দিক্ দিয়ে কোন আলোচনা বা বিচার-বিশ্লেষণ ডাঃ ঘোষ করেননি। তার কারণ তাঁর একটি কথাতেই অনেকটা বোঝা যায়। ভূমিকায় তিনি বলেছেন—"ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি ধর্ম।" কোন সভ্যতার ভিত্তিই ধর্ম নয়, ভারতীয় সভ্যতারও নয়। সভ্যতার ইতিহাসে ধর্মের বিকাশও একটা দিক্। সভ্যতায় লোকধর্ম্মের দান আছে যথেষ্ট, কিন্তু ধর্ম্ম কোন সভ্যতার ভিত্তি নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্বন্ধে ডাঃ ঘোষ যখন আলোচনা করেছেন তখন এ কথা স্বীকার করতে বোধ হয় তিনি কুণ্ঠিত হবেন না। তা ছাড়া, লোকধর্ম্ম আর শাস্ত্রধর্ম্ম, অর্থাৎ মানবপন্থী ধর্ম্ম আর শাস্ত্রপন্থী ধর্ম্মের মধ্যে কি পার্থক্য নেই? ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কি এই পার্থক্য দেখা যায় না?

এই সব প্রশ্নের উত্তর ডাঃ ঘোষ নিশ্চয়ই খুঁজে পেতেন যদি তিনি প্রাচীন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিস্তৃত আলোচনা করার চেষ্টা করতেন। তা না করার জন্যই পূর্ব্বোক্ত অনেক প্রশ্নই মনে জাগে, যার উত্তর তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অবশ্য এই ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ডাঃ ঘোষের এই "প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস" সে বাঙলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান তা যে কেউ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করবেন। ভারতীয় সভ্যতার সমৃদ্ধি ও বিশিষ্টতা সম্বন্ধে উৎসুক যাঁরা—তাঁরা এই গ্রন্থ পাঠ করে যে বিশেষ লাভবান হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ডাঃ ঘোষের ভাষা ও বাচনভঙ্গী এত প্রত্যক্ষ ও প্রাঞ্জল যে ইতিহাস্খানি রীতিমত সুখপাঠ্য সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থের ছাপা ও সুরুচিপূর্ণ রূপবিন্যাসের জন্য প্রকাশক "সিগনেট প্রেস"কে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গ্রন্থপ্রকাশ যে ভিন্ন জাতের ব্যবসা এবং তা যে সংস্কৃতি ও শিল্পকলারই একটা অঙ্গ, এ-সত্য অনেকেই উপলব্ধি করেন না। "সিগনেট প্রেস" এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। আলোচ্য গ্রন্থের প্রচ্ছদপট ও অন্যান্য রূপসজ্জার চিত্রগুলি সিন্ধু-সভ্যতার মৃৎশিল্পের নানা রকমের নমুনা থেকে গ্রহণ করে তাঁরা যে শুধু সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, গ্রন্থের বিষয়-বস্তুর গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে গ্রন্থসজ্জাকে শিল্পকলার স্তরে উন্নীত করেছেন।

ইংরেজী

ভারতের ইতিহাস

A Survey of Indian History By K. N Panikkar, Published by The National Information ard Publications Ltd., Bombay. Price Rs 7-8.

সর্দ্দার পানিক্কর ইতিহাসের এক জন সুপণ্ডিত। ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখকদের মধ্যে তিনি অন্যতম: মাদ্রাজ ও অক্সফোর্ডে তিনি শিক্ষালাভ করেন, পরে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। 'হিন্দুস্থান টাইম্‌স্' পত্রিকার সম্পাদকও তিনি ছিলেন। পানিক্করের রচিত ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে "Malabar and the Portugeese", "Malabar and the Dutch, "Sriharsha of Kanuj", "Hinduism and the Modern World", "Evolution of Hindu Kingship", "Caste and Democracy" ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক বৃটিশ-যুগ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার বছরের ভারতের ইতিহাসের একটা খসড়া রচনা করেছেন। মাত্র ৩০০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৫০০০ বছরের ইতিহাস লেখা যে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। অনুসন্ধানী পাঠকদের জন্য বিশেষজ্ঞদের রচিত আরও অনেক ভারতের ইতিহাস রয়েছে। গ্রন্থে সর্দ্দার পানিক্কর ভারতীয় ইতিহাসের একটা "Survey" করার চেষ্টা করেছেন সাধারণ পাঠকদের জন্য। কিন্তু এত অল্প পরিসরের মধ্যে পাঁচ হাজার বছরের একটা খসড়া রচনা করাও যে রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাই ভারতীয় ইতিহাসের প্রত্যেকটি যুগের আলোচনায় গ্রন্থকার সমান ভাবে সুবিচার করতে পারেননি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে "ভারতবর্ষের" উৎপত্তি বা সৃষ্টি হ'ল কি ক'রে তার ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বিবরণ এত সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে সাধারণ পাঠকদের কাছে তা মোটেই সহজবোধ্য হবে না। প্রস্তর-যুগ থেকে সিন্ধু-সভ্যতা পর্য্যন্ত ভারতীয় প্রাগৈতিহাসের বিবরণও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়েছে এবং এই যুগের ইতিহাসের তেমন কোন গুরুত্ব নেই ব'লে লেখক যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা-ও আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। বৈদিক যুগের ইতিহাসও এত সংক্ষিপ্ত হয়েছে যে সে যুগ সম্বন্ধে পাঠকের কোন স্পষ্ট ধারণা হতে পারে না। বৈদিক যুগ পর্য্যন্ত এই ইতিহাস (যার গুরুত্ব, আমাদের মতে, অত্যন্ত বেশী) এত সংক্ষেপে লেখক বিস্তৃত না করলেও পারতেন।

মৌর্য্যযুগ ও গুপ্তযুগের ইতিহাস, এক কথায় হিন্দুযুগের ইতিহাস মোটামুটি বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করা হয়েছে। এই যুগের সামাজিক অবস্থা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে রাজকাহিনী আলোচনা করার ফলে বৌদ্ধ ও হিন্দু-সভ্যতার ইতিহাস আলোচ্য গ্রন্থে সুপাঠ্য হয়েছে। ইসলামের আবির্ভাব, ঘাত-প্রতিঘাত এবং তার ফলে ভারতীয় সভ্যতার পরিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে লেখক সংক্ষেপে হলেও সুন্দর ভাবে আলোচনা করেছেন। বৃটিশ-যুগের ইতিহাসও সংক্ষিপ্ত হলেও শিক্ষাপ্রদ হয়েছে।

গোড়াতে যে ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছি, তাছাড়া আলোচ্য গ্রন্থে ভারতীয় ইতিহাসের খসড়া হিসাবে আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ত্রুটি নেই। লেখকের ভাষার ও বর্ণনার গুণে এই ইতিহাস সুখপাঠ্যও হয়েছে। আলোচ্য ইতিহাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইতিহাস রচনার ধারা। এ দেশের ইতিহাস রচনার প্রচলিত ধারা হল, রাজকাহিনী অথবা ঘটনাপঞ্জী রচনার ধারা। পানিক্কর এই প্রচলিত ধারা অনুসরণ না করে সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির বাস্তব পটভূমিতে এই খসড়া-ইতিহাস রচনা করেছেন। এদিক্ দিয়ে তাঁর এই ইতিহাসের একটা বৈজ্ঞানিক মূল্যও আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আগাগোড়া এ-ইতিহাস রচিত না হ'লেও, এই বৈশিষ্ট্যের মূল্যটুকু লেখকের ন্যায্য প্রাপ্য।

উড়কি ধানের মুড়কি

[India on Planning—By A. K. Shaha B. Sc, (Dacca) Aspitant (Moscow) Candidate of science (U. S. S. R.) Published by the Globe Library, 2, Shyama Charan De St, Calcutta—12, Price Rs 7/8/-]

"জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিতে সোভিয়েট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধ্যাপক কে টি, শাহ-র সহিত দীর্ঘদিন কাজ করিয়া ইনি ভারতের সর্ব্বপ্রকার উৎপাদন ব্যবস্থা ও অন্যান্য শিল্প-সংক্রান্ত তথ্যের সহিত পরিচিত হন। সোভিয়েট রুশিয়ার কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা ও জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির জ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত এই পুস্তকখানিতে আমাদের আজিকার সমাজ-ব্যবস্থার সামগ্রিক অগ্রগতির অতি বাস্তব পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পুস্তকখানি সকলেরই পড়িয়া দেখা উচিত।"

—দৈনিক বসুমতী

[Indian Constitutional Documents: Vol I, 1757—1858. Edited by Anil Chandra Banerjee, M. A. P, R. S. Ph. D. Published by A. Mukherjee & Co. 2, College Square, Calcutta, Rs 10/- only]

"In his learned 'Introdution' the editor traces in broad outline the important changes in admini trative and constitutional development from 1600 and 1858. Hardly less important are the notes and references added by him. This volume will remain for a long time an indispensible source—book for the study of constitutional devolopments during the first century of British rule in India."

—Amrita Bazar Patrika.

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

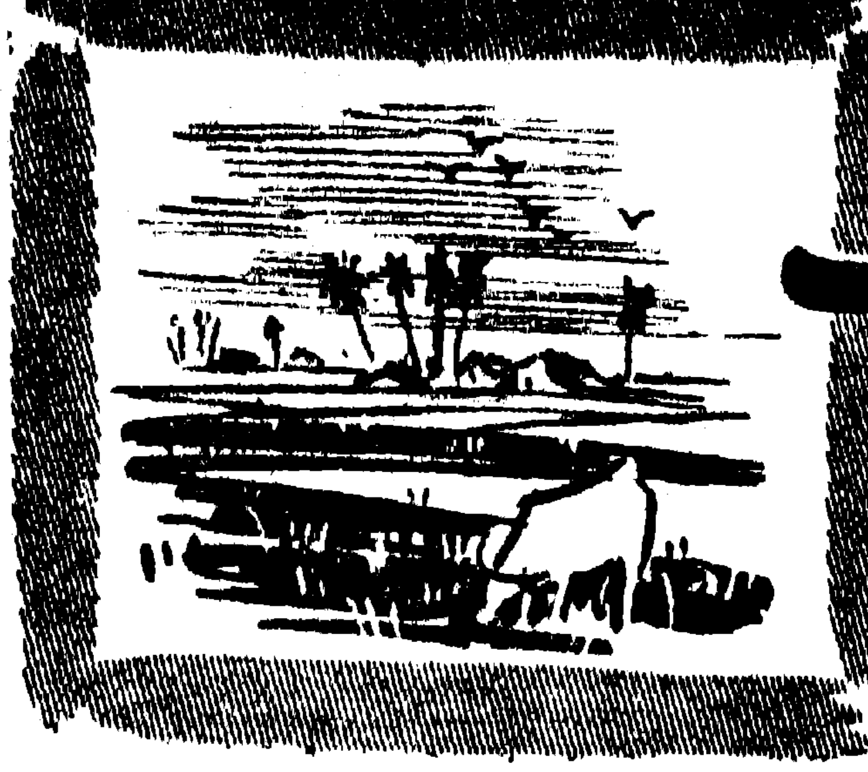

দেশের কথা

'বর্দ্ধমানের কথা' পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায় :—"প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে জামালপুর থানার অন্তর্গত পাড়াতল ডাকঘরের অধীন পাড়াতল গ্রাম নিবাসী শ্রীদাশরথি ঘোষের একখানি ঘর পুড়িয়া যায়। তিনি কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত দাশরথি তা মহাশয়কে ধরিয়া ছয় বাণ্ডিল করগেটের "পারমিট" পাইয়া ঐ ঘরখানি সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করে। কিন্তু কি দুর্জ্ঞেয় কারণে জানি না, বিগত এপ্রিল মাসে সে পুনরায় দ্বিতীয় বার ছয় বাণ্ডিল করগেটের পারমিট পাইল এবং মেমারী বিক্রয়-কেন্দ্র হইতে মাল লইয়া আসিল। উপস্থিত ঐ দ্বিতীয় দফার সম্পূর্ণ ছয় বাণ্ডিল করগেটই তাহার বাড়ীতে অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া আছে—কেউ মাসের পর মাস করগেট মিটিং-এর দিন বন্ধ দুয়ারে ধর্ণা দিয়াও চোখে জল ছাড়া মুখে হাসি আনিতে পারিতেছে না আর কেউ অবলীলাক্রমে পারমিটের উপর পারমিট পাইতেছে ঘরে বসিয়া বিনা প্রয়োজনে। কোথাও বর্ষার জলে স্কুল-ঘর ধ্বসিয়া পড়িয়া যাইতেছে আবার কারো বা ঢেঁকিচালা ছাওয়া হইতেছে পারমিটের করগেটে। (পাড়াতল স্কুল-গৃহ পতনোন্মুখ ও দাশরথি ঘোষের ঢেঁকিচালা করগেটাচ্ছাদিত)। এর বিচার করিবার কি কেউ নাই?" পশ্চিম-বঙ্গের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় এ-বিষয় প্রতিকার করিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তিনি চাউল-সমস্যা লইয়া বিব্রত, কাজেই 'চাল' বা 'চালা'র বিষয় ভাবিবার সময় হইবে কি না জানি না। সিভিল সাপ্লাই বিভাগে এই প্রকার আরো নানা বিচিত্র ব্যাপারের সংবাদ দুষ্ট লোকমুখে প্রচারিত হইতেছে। যথাকালে এই সব সংবাদের প্রতিবাদ সরকারী মহল হইতে না হইলে—লোকে স্বভাবতই ইহা সত্য বলিয়া মনে করিবে। কর্ত্তৃপক্ষ দৃষ্টি দিবেন কি?

* * * *

'প্রদীপ' বলিতেছেন :—"বালিচক, হাউর, পাঁশকুড়া, মেচোদা প্রভৃতি ষ্টেশনে সাময়িক ভাবে কোর্ট বসিত এবং পুলিশ হাওড়াগামী ট্রেণ সমূহ খানাতল্লাসী করিয়া বিনা টিকিটে চাউল লইয়া গমনকারীদের ধৃত করত: সেই কোর্টে সাজা দেওয়াইত। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, গত মে মাস পর্য্যন্ত এইরূপ ৪৩৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল এবং তল্লাস করিয়া তাহাদের নিকট ১৩০০ মণ চাউল উদ্ধার করা হইয়াছে। আসামীদের এই সংখ্যা ও উদ্ধারীকৃত চাউলের পরিমাণ পুলিশ বা রেল-কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে খুব গৌরবজনক বলিতে পারিলেই সুখী হইতাম, কিন্তু প্রথমের দিকে যখন প্রত্যহই প্রায় হাজার মণ চাউল বাহির হইয়া যাইত তখন শেষের দিকে ধর-পাকড়ে অনেকটা কমিলেও পাঁচ মাসে সর্ব্বসমেত মাত্র ১৩০০ মণ বলা সামান্য বলিয়াই মনে হয়। তবে ফল অবশ্য কতকটা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন শুনা যায়, ঐ সব বেআইনী চাউল চালানকারীদের অনেকে দিনের গাড়ী ছাড়িয়া রাত্রের গাড়ীগুলি ব্যবহার করিতেছে। সে সম্বন্ধে পুলিশ ও রেল-কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।" মন্তব্য—নিষ্প্রয়োজন। তবে বর্ত্তমানে চোরা-কারবার এখন প্রায় প্রকাশ্য কারবারে পরিণত হওয়াতেই বোধ হয় পুলিশ হালে পানি পাইতেছে না।

* * * *

'নীহার' মন্তব্য করিতেছেন :—"কাপড় ডিলার নির্ব্বাচন বিভ্রাট—সরকার হইতে বস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিলেও অযথা মূল্য বৃদ্ধির শয়তানী বৃত্তির জন্য সরকারকে বাধ্য হইয়া পুনরায় ঐ নিয়ন্ত্রণের প্রবর্ত্তন করিতে হইতেছে। এ জন্য কাপড়ের ডিলার নির্দ্ধারণের ভার কংগ্রেসের উপর অর্পিত হওয়ায় কংগ্রেস কর্ত্তৃক ডিলার নির্দ্ধারণ করা সত্ত্বেও আবার কোথাও কোথাও উপদল কর্ত্তৃক আর এক নূতন ডিলার নির্দ্ধারণ কার্য্য চলিয়াছে এবং এই নির্দ্ধারণে কোন ব্যক্তিকে ডিলার নিযুক্ত করিলে জনহিতকর অনুষ্ঠানে কত মুনাফা দিতে পারিবেন, তাহা লইয়া একটা দর-কষাকষির কথাও শুনা যাইতেছে এবং কোন কোন ইউনিয়নে ঐ কাণ্ডও হইয়াছে। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কি স্বার্থপরতা নয়? বিদেশী সরকারের আমল হইতে যে ভূত ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে, আজ জাতীয় সরকারের সময়ও যদি তাহা অপসারিত না হয়, তবে আশা কোথায়? আমাদের অসামরিক সরবরাহ-সচিব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় সেদিন সত্য সত্যই বলিয়াছেন যে, প্রধানত: দেশের লোকই এই দুর্গতির জন্য দায়ী। তাঁহার এই উক্তি যে অলীক নহে, বহু ক্ষেত্রেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং যে সরিষার দ্বারা 'ভূত' ভাগানো হইবে, তাহার মধ্যেই যদি ভূত বাসা গাড়িয়া বসে, তবে এই ভূত ভাগানো যাইবে কি উপায়ে, তাহা দেশবাসী সকলেরই বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া কার্য্য করা উচিত।" আমরা আর বলিব কি? এক দিকে রাম অন্য দিকে রাবণ। এখন কোন ক্রমে ভালয় ভালয় নিশ্চিন্ত মনে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিব। ইহার বেশী আর কোন আশা বা বাসনা আমাদের নাই।

* * * *

'দীপিকা' জিজ্ঞাসা করিতেছেন গণতন্ত্র কোথায়?—"আমরা এখন গণতন্ত্রের যুগে স্বাধীনতার স্বর্গসুখ ভোগ করিবার স্বপ্ন দেখিতেছি। বৃটিশ আমলের শেষ অধ্যায়ে আমরা গণতন্ত্রের যে নমুনা পাইয়াছি তাহাতে মনে হয়, এ গণতন্ত্র দেশে না থাকাই মঙ্গল। 'গণ' বলিতে প্রকৃত 'গণর' অস্তিত্ব দেখি না। এ দেশে গণ নাই সুতরাং গণতন্ত্রও নাই বা তাহা আদৌ এখন প্রসারলাভ করিতে সক্ষম নহে। এ দেশের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর, সুতরাং আত্মচেতনাহীন। তাহারা

নিজের ভাগ্য ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ জন্য যে শাসন-পদ্ধতির উপায় নির্দ্ধারণে নিজের বিবেক-বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া শাসনযন্ত্রের সহায়ক হইবে সে ভরসা নাই। কোটি কোটি দেশবাসী পরমুখাপেক্ষী। জমিদার, মহাজন, ব্যবসাদার, গৃহস্থ প্রভৃতির নিকট সর্ব্বদা নানা দায়ে বাধ্য ও বদ্ধ। কাজেই যখন শাসনযন্ত্র গঠনের সময় তাহাদের মতামতের আবশ্যক হয়, তখন তাহারা নির্ব্বিচারে নিজেদের স্বাধীন মত প্রকাশে অক্ষম হয়। বাধ্য-বাধকতার চাপে পড়িয়া ভয়ে সঙ্কোচে নিজ বিবেকের সামান্য শক্তিটুকু হারাইয়া ফেলিয়া অবাঞ্ছিত ব্যক্তির জন্যই ভোট দিয়া থাকে। তার পর সমষ্টিগত ভাবে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির পদানত হইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করে।" এ কথার প্রতিবাদ করিবার কিছু আছে কি? আমরা ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু পাইলাম না, তবে বর্ত্তমানে যাঁহারা 'গণতন্ত্র'-রাজ চালাইতেছেন, তাঁহারা হয়ত কিছু বলিতে পারিবেন।

* * * *

'দীপিকা' আরো বলিতেছেন :—"এখন আবার কংগ্রেস ক্ষমতার মালিক, কাজেই কংগ্রেসের কুকর্ম্মিগণ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের দশের শাসন পরিচালনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে, তাহার ফলে ক্ষুদ্র শাসনকর্ত্তারা ত' ভয়ে ত্রস্ত, পুলিশ পর্য্যন্তও সত্যাসত্য অনুসন্ধানের উৎস ঐখানে পাইতেছে। আক্রোশমূলক কত কাজ এখন অবাধে চলিতেছে। সেই জন্যই বলি, গণতন্ত্রের নাম দিয়া এখন দলবিশেষের স্বার্থসিদ্ধির পালা পড়িয়াছে। এ গণতন্ত্র অপেক্ষা একাধিপত্য ও একনায়কত্ব শতগুণে বাঞ্ছনীয়। এ গণতন্ত্র 'কাঁটালের আমসত্ব'।" উপরি-উক্ত মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই—সর্ব্বসাধারণ এবং ভুক্তভোগী ইহার এই বিষম অভিযোগের সত্যাসত্য বিচার করিবেন। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, 'কথাটা ভাল নয়'।

* * * *

'বীরভূম-বাণী'তে প্রকাশ :—"স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। কিন্তু কোন সমস্যারই তো সমাধান হল না—বরং সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অভাব লেগেই রয়েছে। অন্নাভাব বস্ত্রাভাব, তৈলাভাব, শান্তির অভাব—আরও কত কি? অর্ডিনান্স, বিনা বিচারে আটক আইন, ১৪৪ ধারা, পুলিশের লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস, ব্যয়বাহুল্য, অপব্যয়, দুর্নীতি, চোরাবাজার, পক্ষপাতিত্ব, অনাচার প্রভৃতি ইংরাজ আমলের বহু নিন্দিত জিনিষগুলি বৃদ্ধিই পাইতেছে। তোষণনীতি অধিকতর বাড়িয়াছে। সরকারের বিভাগীয় কাজকর্ম্ম পূর্ব্ব মতই আছে। বর্ষার পর সারের আমদানী, ধান কাটার সময় বীজ ধান আমদানী, প্রভৃতি কৃষি বিভাগের কুখ্যাত ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ বলবৎ আছে। অবশ্য সরকারী বিবৃতি বা বড় বড় বক্তৃতা, বা নূতন নূতন প্ল্যান, স্কীম, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আলোচনাদি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহার কোনটাই কার্য্যকরী হইতেছে না। সকলেই গদী রাখিতে ব্যস্ত। কেহ বা বন্ধুর ত্যক্ত কেন্দ্রে নির্ব্বাচন লাভ করিয়া বন্ধুর কাছে আরও কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হইতেছেন, কেহ বা বিতাড়িত মন্ত্রীকে বড় চাকরী দিয়া ত্যক্ত আসন অধিকারে ব্যস্ত, কেহ বা অবাঙ্গালীর কৃপায় নির্ব্বাচিত। কোটি কোটি লোক কয়েক শত কাপড়-কল মালিকের কাছে হয়ে পড়েছে বিকল। কংগ্রেসীরা বাঁধা পড়েছে তাঁদের কবলে। কংগ্রেসের টাকার দরকার—টাকা আছে কাপড়-কলওয়ালাদের। গঙ্গা মাখিয়া জুতা দানের মত মিল-গান্ধী স্মৃতি-ভাণ্ডারে দিয়া সকল পাপমুক্ত হইতেছেন। তাঁহাদের কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারছেন না। পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুকে পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগে নিষেধ করে বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে যে সব বড় বড় কংগ্রেসীরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পশ্চিম-বঙ্গের প্রতি প্রগাঢ় দরদে পূর্ব্ব-বঙ্গ থেকে কংগ্রেসী সদস্য আমদানী করে গদী ঠিক রাখবার ব্যবস্থা করেছেন তাঁদের নৈতিক বলের প্রশংসা করতে হয়। তাঁহারা কি মনে করেন যে পূর্ব্ব বঙ্গবাসী হিন্দুরা স্বাধীনতা পাইয়াছে এবং তাঁহাদের মুক্তির জন্য কংগ্রেসের আর কিছুই করণীয় নাই?" মন্তব্য করিবার কোন অবকাশ পাইলাম না। কথাগুলি পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিবার মতোও নহে। নেতারা কি বলেন? বলিবার কিছু আছে কি?

* * * *

'মেদিনীপুর-হিতৈষী' জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—"ইহা কি সত্য?—বাবু ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় চারিটি গুদামে আটা-ময়দা ভর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছেন—তাহাদের দুর্গন্ধে না কি কবাট খোলা যায় না, অথচ তাহা বিক্রয় করিবার আদেশ না কি এস, ডি সি অর্থাৎ সিভিল সাপ্লাই কনট্রোলার দেন নাই বলিয়া বাজারে গুজব। ইহা কি সত্য যে ১১৪৬ সালের ময়দা এবং আটা না কি আরও পুরাতন? ইহা কি সত্য—যে এ-হেন ময়দা-আটা পাচার করিবার আদেশ না পাইয়া ধীরেন বাবু না কি সাপ্লাই বিভাগকেই তাঁহার টাকার দায়ী করিতেছেন? মন্তব্য—ইহা যদি সত্য হয়, তবে যুদ্ধের সময়ে ইংরাজের কার্য্য-প্রণালীর অনুকরণ এখনও চলিতেছে। ইংরাজ না খাইতে দিয়া খাদ্যদ্রব্য আটক রাখিয়া পচাইয়া ফেলিয়া দিত এই জন্য যে, খাইতে না পাইলে লোক আহার-চিন্তাতেই মজগুল থাকিবে, তাহার বিরুদ্ধে কেহ বিদ্রোহ করিবে না। এখনও কি সেই কারণ বর্ত্তমান আছে? এ ইঙ্গিতও লোকে না করিবে কেন?" আমাদেরও প্রশ্ন—সত্যই ইহা কি সত্য?

* * * *

'বর্দ্ধমানের কথা' বলিতেছেন :—"দোকান-কর্ম্মচারী সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবগুলি কর্ম্মচারীদের অভাব অভিযোগ বা দাবী পূরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই—ডালপালা মেলিয়া অন্যত্রও গিয়াছে। তাহারা বৃহত্তর বঙ্গের কথা বলিয়াছে, ডাক্তারী শিক্ষার কথা বলিয়াছে কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার কথা, নিজেদের বিশেষ শিক্ষার কথা তাহারা বলে নাই, বর্দ্ধমান জেলার কৃষি উন্নয়ন, শিল্প সম্প্রসারণ সম্বন্ধে তাহারা নীরব। দোকান কর্ম্মচারীরা অধিকারের কথা সু-উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছে—ইহার জন্য পাঁচ-দশটা প্রাণ দিবার কথাও বলিয়াছে, কিন্তু তাহারা বলে নাই জনসাধারণকে চোরাকারবার হইতে বাঁচাইব—দেশকে কালো-বাজারের কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিব। সম্মেলন যদি দোকান কর্ম্মচারিগণকে কর্ত্তব্যের আহ্বান জানাইয়া বলিত—আজ হইতে কোন কর্ম্মচারী চোরাকারবার চালাইতে, অন্যায় লাভ করিতে মালিককে সাহায্য করিবে না, যদি বলিত মিথ্যা হিসাব দিয়া জাতীয় সরকারকে আয়কর প্রভৃতি ন্যায্য কর ফাঁকি দিতে মালিককে সহায়তা করিবে না, তাহা হইলে বুঝিতাম দোকান কর্ম্মচারীরা কর্ত্তব্য পালন করিতেও প্রস্তুত। অধিকার অর্জ্জন ও কর্ত্তব্য পালন একই সঙ্গে করিতে হইবে নতুবা দুষ্ট ক্ষতের ন্যায় দোকান কর্ম্মচারী সমাজদেহে অকল্যাণ সৃষ্টি করিবে।" দোকান কর্ম্মচারী সমিতি সম্বন্ধে আমরাও দু'চার কথা বলিতে পারিতাম, সাক্ষাৎ জ্ঞান হইতে। বর্ত্তমানে এই সমিতিকে তাহাদের দলগত 'কালো-

রঙ্গালয়

আমেরিকা আগে ছিল কেবল লাল-মানুষদের স্বদেশ, তার পর সেখানে গিয়ে সাদা-মানুষরা তাদের এমন ভাবে কোণঠাসা করলে যে তারা "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হয়ে আছে আজ পর্য্যন্ত। সাদা-মানুষরা আবার সঙ্গে করে ধরে নিয়ে গেল কালো-মানুষদের। আগে সেই কালোদের একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল, সাদাদের গোলামী করা। এখন তারা কোন রকমে পায়ের শিকল খুলে ফেলতে পেরেছে বটে, কিন্তু সাদার কাছে আজও কালোর কোন মর্য্যাদাই নেই। তবু মাঝে মাঝে কালোরা ঘুসির জোরে মর্য্যাদা আদায় করে নেয়—যেমন নিয়েছে জ্যাক জনসন ও জো লুইস প্রভৃতি।

কিন্তু কেবল ঘুসির জোরে কেনই বা বলি? সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও নাট্যকলাতেও বিশিষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে আমেরিকান নিগ্রোদের প্রতিভা। কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রেও অধিকাংশ শ্বেত-চর্ম্মধারীই তাদের বাধা দিতে চায় পদে পদে।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিগ্রো গায়িকা মেরিয়ান অ্যাণ্ডারসনের কথা বলতে পারি। মেরিয়ান কেবল আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী নয়, তাঁর সঙ্গীত-নৈপুণ্যও হচ্ছে অসাধারণ। তিনি এমন প্রতিভাশালিনী যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও তাঁর সহধর্ম্মিণী এবং ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী পর্য্যন্ত তাঁর গান শোনবার জন্যে তাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

কিন্তু সাধারণ ইয়াঙ্কিরা তাঁকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। বিখ্যাত প্রমোদ পরিবেশক সলোমন হিউরকের "Impressario" নামক পুস্তকে মেরিয়ানের নির্য্যাতনের বহু কাহিনীই লিপিবদ্ধ আছে। ট্যাক্সিওয়ালারা তাঁকে গাড়ীতে উঠতে দেয়নি, হোটেলওয়ালারা তাঁকে হোটেলে থাকতে দিতে নারাজ এবং থিয়েটারওয়ালাদের ষড়যন্ত্রে কোন রঙ্গালয়ই তিনি ভাড়া পাননি। এক দিন তিনি আহত হয়ে বলেছিলেন, "ঈশ্বরের নিশ্চয় কোন কুসংস্কার নেই, নইলে এক নিগ্রো এমন ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠস্বর লাভ করত না।"

কোথাও ঠাঁই না পেয়ে অবশেষে অনুষ্ঠাতারা মেরিয়ানের গানের আসর বসালেন মুক্ত আকাশের তলায়। আর্ট যে কত বড় ঐন্দ্রজালিক, তখন তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কারণ সেই বিস্তৃত আসরে টিকিট কিনে মেরিয়ানের গান শুনতে এসেছিল পঁচাত্তর হাজার শ্রোতা!

নিগ্রোদের নাট্যনৈপুণ্যও সামান্য নয়। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা অধিকৃত রঙ্গালয়ে শ্রেষ্ঠ নিগ্রো নট-নটীদের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ না হলেও তাঁরা সাধারণত যে সব ভূমিকা পান তা তুচ্ছ বা নগণ্য বলাও চলে। শক্তি থাকলেও শক্তির সদ্ব্যবহার করবার সুযোগ তাঁদের নেই। এই অভাব দূর করবার জন্যে বিখ্যাত নিগ্রো অভিনেতা ফ্রেডারিক ও-নীল আট বৎসর আগে একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার নাম হচ্ছে "আমেরিকান নিগ্রো থিয়েটার।"

সম্প্রদায়ের শিল্পীর সংখ্যা ষাট জন। তাঁরা কেউ মাহিনা নেন না, কিন্তু প্রত্যেকেই পান লাভের অংশ। তাঁদের দ্বারা অভিনীত "Anna Lucasta" নাটকখানি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। আমেরিকায় ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলেছিল তার একটানা অভিনয়। ফ্রেডারিক ও-নীল সম্প্রতি লণ্ডনে এসেছেন।

ইংরেজ-নিগ্রোদের সংগ্রহ করে তিনি লণ্ডনের রঙ্গালয়েও ঐ পালাটি খুলেছেন এবং সেখানেও দর্শকের অভাব হচ্ছে না। কিন্তু কেবল লণ্ডনে নয়, ওখানকার কাজ শেষ হ'লে পর ও-নীল তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে য়ুরোপের অন্যান্য বড় বড় সহরও ঘুরে আসবেন। Anna Lucastaর পর তিনি যে দু'খানি নাটক নির্ব্বাচন করেছেন তার একখানি হচ্ছে Romeo and Juliet।

ও-নীলের মত হচ্ছে, সেক্সপিয়ার এই নাটকের মধ্যে কোথাও দেখাননি কাপুলেটদের সঙ্গে মণ্টাগুদের পারিবারিক বিবাদের আসল কারণ কি? অতএব নাট্যকারের একটি মাত্র কথা না বদলে নিগ্রো প্রয়োগকর্ত্তা কাপুলেটদের ও মণ্টাগুদের পরিচিত করেছেন যথাক্রমে মুর ও ইতালীয়রূপে। তিনি বলেন, "এ জন্য ইতিহাসের মর্য্যাদাও ক্ষুণ্ণ হবে না। কারণ যে সময়ের কথা নিয়ে এই নাটক রচিত, তখন উত্তর-ইতালীতে যে মুরদের একটি বড় উপনিবেশ ছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নেই।"

মুরদের প্রতি ও-নীলের এই পক্ষপাতিতার কারণ বোঝা কঠিন নয়। নিগ্রোদের মত মুররাও কৃষ্ণাঙ্গ। সুতরাং এ-শ্রেণীর ভূমিকায় নিগ্রোরা অভিনয় করলেও রসভঙ্গ হবে না।

কিন্তু সেক্সপিয়ারের মত প্রতিভা যে কেবল সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বলৌকিকই নয়, সার্ব্বকালিকও বটে, তারও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কিছু কাল আগে বিলাতের এক নাট্য-সম্প্রদায় সেক্সপিয়ারের নাটকে বর্ণিত মধ্যযুগের পাত্র-পাত্রীদের আধুনিক যুগের সাজ-পোষাক পরিয়ে মঞ্চের উপরে উপস্থিত করেছিলেন এবং সে অভিনয়ও করেনি রসভঙ্গ।

রঙ্গ-পট

প্রসাদ রায়

বাংলা নাট্য-জগতেও সেক্সপিয়ারের প্রভাব যে কতখানি, আজও তার যথোচিত আলোচনা হয়নি। এখানকার সর্ব্বপ্রধান নাট্যকার গিরিশচন্দ্র স্বয়ং বলেছিলেন: "মহাকবি সেক্সপীরই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলেছি। * * * * বিয়োগান্ত মিলনান্ত নাটক ইউরোপীয় সাহিত্যে, বিশেষ ইংরেজী সাহিত্যে যে রকম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, মহাকবির প্রতিভাদীপ্ত তুলিকায় নাট্যকলায় যে অপূর্ব্ব শ্রী পরিস্ফুট হয়েছে, তা ভবিষ্যতে যিনিই নাটক রচনা করুন তাঁর আদর্শকে তাঁর অনুসরণ করতে হবে।"

গিরিশচন্দ্র নিজে "ম্যাকবেথ" অনুবাদ ক'রে বাংলা দেশে মঞ্চস্থ করেছিলেন। নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন গিরিশচন্দ্রই। সেই অভিনয় দেখে 'ইংলিশম্যান' মত প্রকাশ করেন: "A Bengali Thane of Cowdor is a lively suggestion of incongruity, but the reality is an admirable reproduction of all the conventions of an English stage." বাংলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সু-অভিনীত নাটকখানি সাদরে গ্রহণ করলেও, জনসাধারণের মধ্যে তার বিশেষ আদর হয়নি।

গিরিশচন্দ্র তাই দুঃখ ক'রে বলেছিলেন: "মনে তো করেছিলাম যে ম্যাকবেথের পর ওথেলো, হ্যামলেট, কিং লিয়ার প্রভৃতি অনুবাদ ক'রে অভিনয় করব। কিন্তু যদিও সকলে ম্যাকবেথ নাটকের অনুবাদের প্রশংসা করেছিলেন কিন্তু দর্শকের অভাবে রঙ্গালয়ে অভিনয় সত্বর বন্ধ হ'ল। অথচ অভিনয় বেশ সুন্দর হয়েছিল। কাজে কাজেই থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী প্রভৃতির অনিচ্ছা দেখে আর অনুবাদ করলাম না। ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য না হ'লে আমার হাত-পা বাঁধা। বেশীর ভাগ লোক যায় নাচ দেখতে আর গান শুনতে। থিয়েটারে নাটক দেখতে খুব কম লোকই যায়। বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া এই নাটক সাধারণের উপযোগী হয়নি। শিক্ষিত-সম্প্রদায় একবার দেখে আর বড় বেশী দেখে না।"

কিন্তু তবু বাংলা দেশে সেক্সপিয়ারের নাটক নিয়ে বড় কম নাড়াচাড়া হয়নি। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "Romeo and Juliet" ও "Tempest" নাটক বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথও প্রথম বয়সে হয়েছিলেন সেক্সপিয়ারের দ্বারা প্রভাবান্বিত। তিনিও "ম্যাকবেথ"কে বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা আর পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথও সেক্সপিয়ারের নাটক বাংলায় তর্জ্জমা করেছিলেন এবং আরো কারুর কারুর অনুবাদও দেখেছি ব'লে স্মরণ হচ্ছে।

বাংলা নাট্যজগতের সঙ্গে সেক্সপিয়ারের সম্পর্ক বহু কালের। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারে "জুলিয়াস সিজারে"র ইংরেজী অভিনয় হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের ছাত্ররা সেক্সপিয়ারের একাধিক নাটক অভিনয় করেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দ। মেট্রোপলিটান একাডেমিতে "জুলিয়াস সিজার"।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ। ইংরেজদের "সাঁসুসি রঙ্গালয়"। "ওথেলো" নাটকের নাম-ভূমিকায় বৈষ্ণবচরণ আঢ্য। অন্যান্য নট-নটী ইংরেজ।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দ। ডেভিড হেয়ার একাডেমির ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হয় "মার্চেন্ট অফ ভিনিস"।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ। ওরিএন্টাল সেমিনারীর ছাত্ররা সেক্সপিয়ারের নাটকাবলী অভিনয় করবার জন্যে নাট্যশালা স্থাপন করেন। ওখানে অভিনীত হয় "ওথেলো," "মার্চেন্ট অফ ভিনিস" ও "চতুর্থ হেনরি" প্রভৃতি।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ। প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় "জুলিয়াস সিজার"।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। "হ্যামলেট"। নাম-ভূমিকায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর সহ-অভিনেতা ছিলেন রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন।

তার পর আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ও অনেক বার সেক্সপিয়ারের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং সেই সম্পর্ক আরম্ভ হয় "গ্রেট

মীরা সরকার

বিস্ময়ের পর বিস্ময় ●●● রোমাঞ্চের পর রোমাঞ্চ

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর প্রযোজনায় বসুমিত্রের রহস্যচিত্র

কালোছায়া

ভূমিকায় :

শিপ্রা দেবী
শিশির মিত্র
ধীরাজ ভট্টাচার্য
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
নবদ্বীপ, হরিদাস, নৃপেন্দ্র প্রভৃতি

প্রেক্ষাগৃহের সুখাসনে আয়েস ক'রে দেখবার নয়, আসনে তটস্থ হয়ে বসে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখবার মত রোমহর্ষক ছবি হল 'কালোছায়া'। এ ছবি লিখতে ও তুলতে পারতেন পাঁচকড়ি দে ও দীনেন্দ্রকুমার রায়, কোনান ডয়েল আর এডগার ওয়ালেসের পরামর্শ নিয়ে, কিন্তু তাঁরা কেউই আজ বেঁচে নেই। তাই তাঁদের অভাবে এ ছবি তুলেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

যত কূট ছবি ●●● তত কূট চক্রান্ত

ন্যাসনাল থিয়েটারে"র "রুদ্রপাল" (ম্যাকবেথ) নাটক নিয়ে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে। অনুবাদক ছিলেন হেয়ার স্কুলের হেডমাষ্টার হরলাল রায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ঐখানেই "ওথেলো" খোলা হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে "বীণা থিয়েটার" মঞ্চস্থ করে "ভ্রান্তি বিলাস" (কমেডি অফ এররস্)। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে "মিনার্ভা"য় গিরিশচন্দ্রের "ম্যাকবেথ"। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে "ক্লাসিকে" "হরিরাজ" (হ্যামলেট)। বোধ করি ১৯০১ বা ১৯০২ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ সরকারের আমলে "মিনার্ভা"য় অভিনীত হয় "মধু যামিনী" (এ মিডসামার নাইট্স্ ড্রিম)। ১৯১৪খৃষ্টাব্দে "মিনার্ভা" খোলে "ক্লিওপেট্রা"। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে "ষ্টারে" মঞ্চস্থ হয় "সওদাগর" (মার্চেন্ট অফ ভিনিস)। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে "ষ্টারে" অভিনীত হয় "ওথেলো"।

'জয়যাত্রা' ও অঞ্জনগড়ের নায়িকা সুনন্দা দেবী

গিরিশচন্দ্রের কথা ছেড়ে দিলেও আরো কোন কোন বিখ্যাত বাঙালী নাট্যকারের রচনায় সেক্সপিয়ারের স্পষ্ট প্রভাব আবিষ্কার করা যায়। যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর সাজাহান চরিত্রটি কি অল্পবিস্তর পরিমাণে কিং লিয়রের অনুসরণ করেনি?

সেক্সপিয়ারের নাট্য-জগতে নিগ্রো ও বাঙালী শিল্পীদের আবির্ভাবের কথা বললুম, কিন্তু পার্সীদের কথা এখনো বলা হয়নি। প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। কলকাতার পার্সীদের কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে "কিং লিয়ার" খোলা হয়েছে শুনে কৌতূহলী হয়ে দেখতে গিয়ে ফিরে এসেছিলুম চিরস্মরণীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে। কারণ প্রথমত, "কিং লিয়ার" সেখানে একাই আসর রাখতে পারেনি। "কিং লিয়ারে"র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল নৃত্যগীতপ্রধান একখানি চটুল হাস্যনাট্য এবং অভিনয় চলছিল খানিকটা "কিং লিয়ারে"র ও খানিকটা সেই হাস্যনাট্যের। দ্বিতীয়ত, "কিং লিয়ারে"র পাত্র-পাত্রীরা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করছিলেন নাচের পা ফেলতে ফেলতে! তৃতীয়ত, সর্ব্বশেষে একটি উজ্জ্বল দৃশ্যে "কিং লিয়ার" হয়ে উঠেছিল সুমধুর মিলনান্ত নাটক!

আর একবার ওখানেই দেখতে গিয়েছিলুম "মার্চেন্ট অফ ভিনিসে"র অভিনয়। কিন্তু সে অভিনয়েরও কথা বলা বাহুল্য, তবে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। "মার্চেন্ট অফ ভিনিসে"র একটি দৃশ্যে দেখেছিলুম, নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে একেবারে আধুনিক ষ্টীমার!

চিত্রালয়

যেমন সাধারণ রঙ্গালয়ে, তেমনি চিত্রজগতেও অত্যন্ত বিখ্যাত ও জনপ্রিয় নট-নটীদের জন্যে চিত্রশালার মালিকদের দুর্ভাবনার সীমা থাকে না।

কিন্তু [illegible] শিল্পীদের মধ্যে পার্থক্য বড় কম নয়। মঞ্চের উপরে উঠে সাধারণত কেউ হঠাৎ-নবাবের মত হঠাৎ-নট হয়ে উঠতে পারে না। দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার পর সেখানে উপরে উঠতে হয় ধাপে-ধাপে। শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী ও অহীন্দ্র চৌধুরীর খ্যাতি হঠাৎ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু চিত্রাভিনেতা বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারেন অপেক্ষাকৃত অল্প দিনের মধ্যেই। মঞ্চাভিনেতাকে প্রধানত নির্ভর করতে হয় নিজের শক্তি, সাধনা ও ব্যক্তিত্বের উপরে মঞ্চের উপর। তিনি থাকেন একা এবং সমুজ্জ্বল পাদপ্রদীপের আলোকে তাঁর এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে সংখ্যায় অগণ্য তীক্ষ্ণচক্ষু। কিন্তু চিত্রনট বাহির থেকে সাহায্য পান সর্ব্বদাই। অভিনয়ের সময়ে তিনি ষোলো আনা সাহায্য পান প্রয়োগকর্ত্তা, পরিচালক, আলোক-শিল্পী ও শব্দধর প্রভৃতির কাছ থেকে। চিত্রাভিনয় এক জায়গায় খারাপ হ'লে যতবার খুসি আবার ছবি তোলা যায়। এমনি সব নানান কারণে যে কখনো অভিনয় করেনি সেও প্রথম চিত্রেই আত্মপ্রকাশ করতে পারে সম্পূর্ণ ও পরিপক্ক শিল্পীরূপে। তার দুর্ব্বলতা ও অসম্পূর্ণতা গোপন হয়ে থাকে চিত্রশালার মধ্যেই, বাইরের দর্শকরা ও-সবের কোনই পরিচয় পায় না। পাশ্চাত্য দেশের অনেক পরিচালক এই রকম কাঁচা মাল নিয়ে কাজ করতেই বেশী ভালোবাসেন।

যে কখনো মঞ্চে অভিনয় করেনি অথচ চিত্রাভিনয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে, এ দেশে এমন সব শিল্পীর অভাব নেই। পাদপ্রদীপের আলোকে এসে দাঁড়ালে তাদের অধিকাংশেরই অবস্থা দস্তুরমত কাহিল হয়ে পড়তে পারে।

আসল অভিনেতা দুই-এক দিনে তৈরি হয় না। বাংলা দেশে অনেকেই হয়তো চিত্রশালায় পদার্পণ ক'রেই "শিল্পী" হয়ে পড়েন, কিন্তু আমেরিকার হলিউডে হিসাব নিয়ে দেখা গিয়েছে, ওখানকার চিত্রাভিনেতাদের অধিকাংশই (৮৫.৭ পারসেন্ট) চিত্রশালায় আসবার আগে সাধারণ রঙ্গালয়ে গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন অল্প-বিস্তর।

গোড়াতেই যা বলছিলুম। অত্যন্ত জনপ্রিয় চিত্রশিল্পীদের নিয়ে প্রয়োগকর্ত্তারা বড় বিপদে পড়েন।

ছবিতে দর্শকরা সর্ব্বাগ্রে দেখতে চায় তাদের প্রিয় মুখগুলিকে। নতুন কোন ছবির নাম শুনলেই তারা জিজ্ঞাসা করে, ওর মধ্যে অমুক বা তমুক 'তারকা' আছে কি না?

ছবির মালিক বা প্রয়োগকর্ত্তার কাছে এমন জিজ্ঞাসা কর্ণকটু বলে মনে হয়। তাঁরা চিরদিনই চেয়ে এসেছেন জনসাধারণের মনের মধ্যে নিজেদের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, কিন্তু তাঁদের এ কামনা পূর্ণ হয়নি কোন দিনই। লোকে তাঁদের আমল দেয় না

আগে তারা দেখতে চায় বিশেষ বিশেষ নট-নটীকে। এবং বিপদ হয় এইখানেই। নট-নটীদের যত নাম, তত দাম।

প্রায়ই বিখ্যাত নট-নটীদের অসম্ভব মাহিনার কথা শোনা যায়। কিন্তু সেই অসম্ভবও সম্ভবপর হয় কেবল মাত্র জনতার দাবীর জন্তেই। ছবির মালিকরা খুসি হয়ে অত টাকা দান করেন না, তাঁরা দান করেন বাধ্য হয়েই। কিছু কাল আগে আমেরিকার প্যারামাউণ্ট ও ইউনিভার্সাল চিত্র-সম্প্রদায় ব্যয়সংক্ষেপের জন্তে অতিরিক্ত মোটা মোটা মাহিনার চিত্র-তারকাদের কাজ থেকে জবাব দিয়েছিলেন। অল্প দিন পরেই দেখা গেল, খরচ কমার সঙ্গে সঙ্গে লাভ কমে আসছে যথেষ্ট পরিমাণে। উপরন্তু তাঁদের পরিত্যক্ত তারকাদের সাদরে গ্রহণ করে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ও মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ারের আর্থিক উন্নতির সীমা রইল না।

'জয়যাত্রা'য় সুমিত্রা দেবী

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স সম্প্রদায় শিশু-নটী সির্লে টেম্পলের ছবি দেখিয়ে মোট লাভ করেছিল সাত কোটি টাকারও উপর। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ইউনিভার্সাল সম্প্রদায়কে রক্ষা করে একমাত্র ডিয়েনা ডার্বিনের জনপ্রিয়তাই। সে সময়ে ডার্বিনের বাৎসরিক মাহিনা ছিল কিছু, বেশী ছয় লক্ষ টাকা। ইউনিভার্সাল এই মোটা মাহিনা দিতে কোনই আপত্তি করেননি, কারণ ডার্বিনের কোন ছবি থেকেই নয় লক্ষের চেয়ে কম টাকা লাভ হত না। এবং সেই সময়েই ইউনিভার্সালের কর্তৃপক্ষ মতপ্রকাশ করেছিলেন যে, ডার্বিনের আকর্ষণী-শক্তি এমন অসামান্য যে, নগদ সাড়ে তিন কোটি টাকার বিনিময়েও তাঁকে আমরা ছেড়ে দেব না।

ডেভিড সেল্‌জিক যখন "Gone with the Wind" ছবিখানি তোলবার সংকল্প করেন, তখন জনসাধারণ দাবী করলে রেট বাটলারের ভূমিকায় ক্লার্ক গেবলকে দেখবার জন্তে। সে এমন জোর-দাবী যে তা না মেনে সেল্‌জিকের আর উপায় রইল না। কিন্তু গেবল তখন মেট্রোর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ—বার্ষিক মাহিনা পান নয় লক্ষ টাকারও বেশী। মেট্রোর কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে সেল্‌জিক যথামূল্যের বিনিময়ে গেবলকে ধার চাইলেন। মেট্রোর দল জো পেয়ে এমন অসম্ভব টাকা দাবি ক'রে বসল যা কেউ কোন দিন শোনেনি। দায়ে পড়ে সেলজিককে সেই দাবীই মানতে হল। কিন্তু ফল হল আশাতীত। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ভিতরে "Gone with the Wind" ছবি দেখিয়ে লাভ হয়েছিল প্রায় সাড়ে দশ কোটি টাকা!

কিন্তু যেসব মহা মূল্যবান তারকাকে নিয়ে এমনি টাকার ছিনিমিনি খেলা চলে, তাঁদের ঔজ্জ্বল্য কত দিন স্থায়ী হয়? তিন যুগের মধ্যে দেখলুম কত তারকারই আনাগোনা!

ম্যাক্স লিণ্ডারের নাম আজ ক'জন জানে? জাতে তিনি ছিলেন ফরাসী, সারা পৃথিবীতে হাসির ছবির বাজার তিনি মাৎ করে রেখেছিলেন। চার্লি চ্যাপলিনও তখন পটে এসে দেখা দিয়েছেন, কিন্তু ম্যাক্স লিণ্ডারের কৌতুকাভিনয় ও তাঁর ছবির আখ্যানবস্তু উচ্চতর শ্রেণীর রসিকের কাছে অধিকতর উপভোগ্য। এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে লিণ্ডার যদি চিত্র-জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে সৈনিক-ধর্ম্ম অবলম্বন না করতেন, তাহলে চ্যাপলিন এমন ভাবে বাজার দখল করতে পারতেন ব'লে বিশ্বাস হয় না।

বৃদ্ধ রোনাল্ড কোলম্যান আজও চিত্র-জগতে বিদ্যমান, কিন্তু তিনি দুই যুগ আগেকার কোলম্যানের ছায়া মাত্র। সেদিনকার সেই তরুণ প্রেমিক কোলম্যানের সঙ্গে তরুণী প্রেমিকা ভিলমা ব্যাঙ্কির প্রেমাভিনয় দর্শকদের চিত্ত কতটা চঞ্চল ক'রে তুলত! জন গিলবার্টের সঙ্গে গ্রেটা গার্বোর এবং চার্লস্ ফ্যারেলের সঙ্গে জ্যানেট গেনরের প্রণয়-লীলা আজও আমাদের চিত্রপটে ম্লান হয়নি বটে, কিন্তু চিত্রপটে আর তাঁদের অস্তিত্ব নেই। মেরি পিকফোর্ড, রুডলফ ভ্যালেন্টিনো, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্, পোলা নেগ্রি, মে ওয়েষ্ট—কত আর নাম করব? অধিকাংশেরই আর্ট শুকিয়ে গিয়েছে মরসুমি ফুলের মত।

সম্প্রতি স্যামুয়েল গোল্ডউইন সাহেব মুখ খুলেছেন। তিনি বলেন: "চলচ্চিত্রকে আজ এমন পরম উপভোগ্য করে তুলেছে যে নিছক রোমান্স ছাড়া আর কিছু নয়।" আমাদের কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর চিত্র প্রেরণা সংগ্রহ করেছে রোমান্সেরই ভিতর থেকে। যদিও হলিউড এদিকে আজকাল আর বড় একটা দৃষ্টি দেয় না, কিন্তু তবু আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, অনধিক কালের মধ্যেই রোমান্স আবার চিত্র ও চিত্রজগতে জাগ্রত হয়ে দাবী করবে নিজের জন্তে যথাযোগ্য আসন। আজ আমাদের কাম্য হচ্ছে, আরো কম ধুনখারাপি এবং আরো কিছু চাঁদের আলো।

হুইটিয়ার লিখেছেন: 'রোমান্স হচ্ছে সর্ব্বদাই যুবক।' সেই সঙ্গে আমি বলি, "এবং যৌবন হচ্ছে সর্ব্বদাই রোমান্টিক। ঐ যৌবনের মধ্যেই বিরাজ করছে হলিউডের ভবিষ্যৎ।"

'সীতা' নাটকের নূতন অভিনেতা
ভবানীকিশোর ভাদুড়ী

স্বাধীন ভারতের নব প্রভাতে কয়েকখানি
প্রাণস্পর্শী চিত্র !

১। পি, আর প্রডাকসন্সের

"পরিণীতা"

কাহিনী : শরৎ চট্টোপাধ্যায়
পরিচালনা : পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
রূপায়ণে : সন্ধ্যা, ছবি, জীবেন, প্রমোদ প্রভৃতি।

২। ইউরেকা পিকচার্সের

"স্বামীর ঘর"

কাহিনী : জলধর, চট্টোপাধ্যায়
পরিচালনা : বীরেন ভদ্র
রূপায়ণে : শান্তি গুপ্তা, ধীরাজ, ভানু, রঞ্জিত রায়, নরেশ মিত্র, রমা ব্যানার্জী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, ফণী রায়, বিপিন, কানু প্রভৃতি।

৩। আর্ট ফিল্মসের

"দ্বন্দ্ব"

কাহিনী ও পরিচালনা : হেমেন গুপ্ত
রূপায়ণে : অহীন্দ্র, ছবি, ধীরাজ, জহর, অমিতা, রাজলক্ষ্মী (বড়), মীরা দত্ত, বেলারাণী প্রভৃতি।

৪। চিত্র ভারতীর

"শেষ রক্ষা"

কাহিনী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পরিচালনা : পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
রূপায়ণে : পদ্মা, অমর মল্লিক (এন-টি), জীবেন, রতীন, মনোরঞ্জন, বিজয়া দাশ, প্রভা প্রভৃতি।

৫। কালী ফিল্মসের

"ঋণমুক্তি বা নরমেধ যজ্ঞ"

রূপায়ণে : সন্তোষ সিংহ, শিশুবালা, তিনকড়ি, শরৎ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

৬। এসোসিয়েটেড্ ওরিয়েণ্টাল ফিল্ম প্রডিউসার্সের

"দেশের দাবী"

কাহিনী ও পরিচালনা : সমর ঘোষ
রূপায়ণে : জ্যোৎস্না, সাবিত্রী, প্রভা, ভানু, বিপিন, নিভাননী, নবদ্বীপ প্রভৃতি।

৭। ওরিয়েণ্ট পিকচার্সের

"বিচারক"

কাহিনী ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত
রূপায়ণে : অহীন্দ্র, মনোরঞ্জন, রাজলক্ষ্মী (এন-টি), রাজলক্ষ্মী (ছোট), অলকা, দেবীপ্রসাদ প্রভৃতি।

পরবর্ত্তী আকর্ষণ ঃ

ভারতী চিত্রপীঠের

"দাসী পুত্র"

কাহিনী ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত
রূপায়ণে : অহীন্দ্র, সরযূবালা, শেফালিকা, দীপক, মণিকা ঘোষ প্রভৃতি।

পরিবেশক ঃ কোয়ালিটি ফিল্মস্

৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পেশাদারি অভিনয়

জনৈক পেশাদার

পেশাদারি থিয়েটারের দল স্বভাবতঃই সংখ্যাল্প। তাদের নিয়মিত রিহার্সেল দিতে হয় অভিজ্ঞ ও দক্ষ পরিচালকদের কর্তৃত্বাধীনে। তা ভিন্ন নিয়মিত ভাবে বিচিত্র ভূমিকায় অবতরণ করার ফলে দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে তাঁরা অভিজ্ঞ শিল্পী হয়ে ওঠেন। দেখা যায়, যত অভিজ্ঞতা বাড়ে শিল্পীও তত সহজ ভাবে অভিনয়কে জীবন্ত করে তুলতে পারে। অবশ্য তরুণ নটনটীর পক্ষেও অনেক সময় স্বাভাবিক অভিনয়-শৈলী দেখানো সম্ভব—সে ক্ষেত্রে চরিত্রের সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক মানসের এক নিগূঢ় ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে সহজ ভাবে, সে কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

কিন্তু সৌখীন নাট্যশিল্পীর পক্ষে অভিনয়ে এই সহজিয়া ভাব আনা রীতিমত ভাবনার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিনয়ে কি করতে হবে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকে না ভাবী নট-সূর্যদের।

অভিনয়ের সংজ্ঞা কি? অমুকের অভিনয়-ক্ষমতার দিকে আঙুল বাড়িয়ে সে কথার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়—তা তিনি যত বড়ো অভিনেতাই হোন না কেন। অথচ নতুন চরিত্র-শিল্পীর পক্ষে সর্বদা এই বীজমন্ত্র জপ করা প্রয়োজন—আমি জীবনকে ফুটিয়ে তুলব—আমার নিজের নয় আর এক জনের। সেই জন্য পাদপ্রদীপের সামনে আমি যা বলছি, যা করছি অথবা মুখে যে ভাব এনে ভাবছি তার মধ্যে জীবনের সহজ প্রকাশভঙ্গী থাকা চাই—স্বতঃস্ফূর্ত বাস্তবের ব্যঞ্জনা। জীবনকে ফুটিয়ে তুলব—এই বীজমন্ত্র মনে মনে জপ করছে যে অভিনেতা তার পক্ষে অভিনয়ে এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ সম্ভব করে তোলা একেবারে দুঃসাধ্য নয় মোটেই।

হেনরী আরভিং একবার তার বক্তৃতায় বলেছিলেন—'মনে রাখবেন, অভিনয় আবৃত্তি নয় অভিনয় হোল চরিত্র-চিত্রন।' এই চরিত্র-চিত্রণ কথাটার মধ্যেই রাজ্যের প্রশ্ন থাবা উঁচিয়ে দাঁড়ায়। চরিত্র চিত্রণ অভিনেতার নিজের চরিত্রের নয়—অপরের। তাও শুধু আকৃতিতে বা বাচন-ভংগীতে নয়—নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে পরিবর্তনশীল এক অপরিচিত মানুষকে।

বেতারে যে ধরণের অভিনয় তার মধ্যে বাচন-ভঙ্গীই চরিত্র-সৃজনের মূলাধার। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মাত্র আবৃত্তির পর্যায়ে গিয়ে পড়ে।

এই ধরণের চরিত্র-চিত্রণের বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে এইবারের যুদ্ধে। জেনারেল মণ্টোগোমারির এক জন ডবল ছিলেন যিনি নাগরিক জীবনে এক জন প্রসিদ্ধ অভিনেতাও বটে। ফ্রান্স আক্রমণের কিছু দিন আগে এই ভদ্রলোককে বিমানে জিব্রাল্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জেনারেল সাজিয়ে। সেখানে তিনি গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং জনসাধারণের সম্মুখেও উপস্থিত হন। এই ভাবে জার্মাণদের ভুল বোঝান হয়েছিল যে, জেনারেল জিব্রাল্টার থেকে প্রত্যাগত না হলে আক্রমণ সুরু হতে পারে না। অনেকে বিশ্বাস করেন, শুধু যে জেনারেলের ভূমিকায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন অভিনেতা তা নয়, এই ভাবে পৃথিবীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেও মিত্রপক্ষ সাফল্য লাভ করবার সুযোগ পেয়েছিল।

অঞ্জনগড় চিত্রে পারুল কর

জেনারেলের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন তিনি এক জন জীবন্ত কর্মীকে সাময়িক ভাবে অনুকরণ করেছিলেন কিন্তু পাদ-প্রদীপের সামনে যাকে অভিনেতা অনুকরণ করেন তিনি সব সময় বাস্তব না-ও হতে পারেন। কিন্তু দু'ক্ষেত্রেই অভিনেতাকে সমান নিখুঁত ভাবে চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হয়।

আবৃত্তির আভিধানিক মানে হোল পুনরুচ্চারণের দ্বারা কণ্ঠস্থ করা। অবশ্য অভিনেতা পুনরুচ্চারণের দ্বারাই চরিত্রের কথোপকথন কণ্ঠস্থ করেন এবং জন-সমক্ষে তা আর একবার পুনরুচ্চারিত প্রাণবন্ত অভিনয়ের বাহবা নেন; রাত্রির পর রাত্রি সেই একই কথার মালা বলে বলে অভিনেতার মনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটি নষ্ট হতে বসে—সে কথা সত্যি। কিন্তু তবু শ্রেষ্ঠ নাট্যচালকরা বারে বারে অভিনেতাকে স্মরণ করিয়ে দেন—অভিনয় আবৃত্তি নয়। নূতন অভিনেতার পক্ষে এ বড়ো জটিল ধাঁধা। অথচ যত বার হোক না—প্রত্যেক বারই এক কথা উচ্চারণ করার সময় সেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটি শুধু কণ্ঠে নয় ভঙ্গীতেও প্রকাশ করা প্রয়োজন। শত রজনী কেন সহস্র রজনীর অভিনয়েও অভিনেতাকে সেই স্বতঃউৎসারিত ভাবটি জাগিয়ে তুলতেই হয়—নয় ত অভিনয় সমগ্র ভাবে জমে উঠতে পারে না। দর্শকরা নিরাশ হয়ে মন্তব্য করেন—আজকের অভিনয় যেন প্রাণহীন আবৃত্তি মাত্র। দর্শক বাস্তব-ঘেঁসা সজীব অভিনয় চায়—তোতা-পাখীর মত বুলি আওড়ান চায় না। অভিনেতার মুখের প্রতিটি কথা যেন তার হৃদয়ের সেই মুহূর্তের ভাবের সরব প্রকাশ, এমনি ধারণা হওয়া চাই দর্শকের। অথচ ঠিক এই জিনিষটা ফুটিয়ে তোলা যে কত কষ্টসাধ্য তা যে-কোন অভিজ্ঞ দক্ষ শিল্পীর স্বীকারোক্তি থেকে জানা যেতে পারে। অনেকে ভাবেন যে, অভিনেতারা একই বইয়ের দীর্ঘকাল-ব্যাপী অভিনয় পছন্দ করেন। কেন না একবার মাত্র রিহার্সেল দিয়ে পাঠটুকু তুলে নিতে পারলে এবং একবার পাঠটুকু সড়গড় হয়ে গেলে আর খাটুনির ভাবনা থাকে না। একমাত্র শারীরিক কষ্টটুকু ভোগ করেই রোজগার করা যায়। কিন্তু তা সত্য নয়। দীর্ঘ দিন এক বই চললে অভিনেতার পক্ষে সেই সজীব চরিত্র-চিত্রণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। চরিত্রের ভঙ্গীর সঙ্গে অতি পরিচয় এবং একই বাচনের একঘেয়েমিতে অভিনেতার মনের রোমাঞ্চ মরে যায় এবং সেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটি নিত্য ব্যবহারে ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। তার ফলে অভিনেতার মনোদীপ নিবু-নিবু হয়ে আসতে থাকে।

সত্যিকারের ভাল ছবি দেখবার
দর্শকের অভাব হয় না—

তার প্রমাণ

নন্দরাণীর সংসার

বি, বি, ১৫১৫ **শ্রী** ২-৩০, ৫-৪৫ ও ৯টায়

আলোছায়া (বেলিয়াঘাটা) ও অন্যান্য চিত্রগৃহে
পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলিতেছে।

কাহিনী :

৺যোগেশ চৌধুরী

পরিচালনা : পশুপতি কুণ্ডু

চিত্রনাট্য : এস, আর, সরকার

গীতকার : কবি শৈলেন রায়

সুরকার : গোপেন মল্লিক।

রূপায়ণে

ছবি, অহীন্দ্র, জহর, মিহির, বিমান, হরিধন, প্রদ্যোৎ, আদিত্য, মণি-দাশ, সন্তোষ, রাণীবালা, শান্তি গুপ্তা, বনানী, ছন্দা, গীতশ্রী, বীণা, যমুনা প্রভৃতি

পরিবেশক :

ইষ্টার্ণ টকীজ লিমিটেড
কলিকাতা

নন্দরাণীর সংসার

পরবর্তী চিত্র 'পরশ পাথর' আগতপ্রায়—

স্বাভাবিকত্ব

এ কথা আর একবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়ত নিষ্প্রয়োজন যে স্বাভাবিকত্বই হোল অভিনয়ের প্রাণ ও ধর্ম। জীবনের নক্সা নিয়ে কারবার অভিনেতার এবং সেই নক্সাকে তুলে ধরবার আয়না হোল তার নিজের শরীর ও স্বর।

অনির্ব্বাণ চিত্রে কানন দেবী

অনেকের ধারণা আছে যে, সহজিয়া ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলতে হলে অভিনেতাকে স্বাভাবিক হতে হবে। স্বাভাবিক হতে হবে অঙ্গভঙ্গীতে এবং বাচনে কৃত্রিমতা দোষ বর্জ্জন করতে হবে। কিন্তু এ ধারণা অতি ভ্রান্ত।

অভিনেতা স্বাভাবিক হবেন। 'স্বাভাবিক হতে হলে রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা প্রতি পদক্ষেপে এবং প্রতি বাচন-ভঙ্গীতে নিজের চরিত্র ও নিজের বলার ভঙ্গীকে অজান্তেই প্রকট করে তুলবেন। অথচ অভিনেতার চরিত্রের সঙ্গে হয়ত অভিনীত চরিত্রের আসমান-জমিন ফারাক। এইখানে আবার বাস্তব জীবনের কথা এসে পড়ল। পাদ-প্রদীপের আলো যেই জ্বলল—উঠে গেল যবনিকার ব্যবধান—স্বল্পালোকিত প্রেক্ষাগৃহের অগণিত দর্শকের কৌতূহলী চোখ ও জিঘিৎসু মনের সামনে এসে দাঁড়াল এক জন জীবন্ত মানুষ তার বাস্তব জীবনের সমস্যা নিয়ে। তখন অভিনেতার পক্ষে সব থেকে প্রয়োজন হোল নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি। এবং সেই আত্মবিস্মৃত মানুষটির দেহ-মনকে আশ্রয় করল আর এক জন দ্বিতীয় ব্যক্তি। সেই দ্বিতীয় মানুষটি তখন তার স্বাভাবিক জীবনের সমস্যা নিয়ে আসা-যাওয়া করতে লাগল। কিন্তু আদর্শবাদী আলোচনা ছেড়ে একে একে বৈজ্ঞানিক নিয়মের বিশ্লেষণ করলে ধারণাটা হয়ত আরো স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারবে।

প্রথমতঃ, যদি অভিনেতা স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখতে নিজের স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলেন তাহ'লে দর্শকদের প্রথম সারি অবধিই হয়ত তার কথা পৌঁছোবে না। লাউডার স্পীকের ঠেলায় অভিনেতার নিজের স্বাভাবিকত্ব বাঁচিয়ে রাখাই হয়ে উঠবে দুর্ঘট। অন্ততঃ স্বর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা যে একেবারে অচল তা একটি মাত্র মারাত্মক উদাহরণই আমরা উপলব্ধি করে নিয়েছি। বরং এ ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতাই হোল স্বাভাবিকতা। পার্ট ভাল হোক আর নাই হোক, অভিনেতার কণ্ঠ প্রেক্ষাগৃহের দূরতম কোণে কোণে নাট্যরস-পিপাসু দর্শকদের কানে বাজা চাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৌখীন শিল্পীর পক্ষে এইখানেই ভুল ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক। এবং সেই কারণে প্রথম দিকেই তাকে যে ভাবে অপ্রস্তুত হতে হয় তাতে তার পরবর্ত্তী অভিনয়ও জখম হয়ে যায়। এই সঙ্গে অবশ্য এ কথাও ভুললে চলবে না যে, দূরতম দর্শকের কানে কথা-বার্ত্তা পৌঁছিয়ে দেবার জন্য অভিনেতাকে যেটুকু উচ্চ-কণ্ঠ বার করতে হয় তার মধ্যে যেন অস্বাভাবিক চীৎকার না বেরিয়ে পড়ে। সেইটুকু স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে না পারলে দর্শকদের মেজাজ বজায় থাকার আশা সুদূর-পরাহত। এখানেও তরুণ অভিনেতা আর এক সমস্যার মুখোমুখী হবেন। আলাপ করছেন প্রিয়তমার সঙ্গে নায়ক—প্রত্যেকটি কথা যেমন নিপুণ নাট্যকারের লেখনীতে রসসিক্ত হয়ে আছে সেই কথাগুলিকে সংহত আলাপের কণ্ঠেই বলতে হবে অথচ স্বর উঠবে উচ্চে। এ সমস্যা বটে।

শুধু উচ্চ নাদই নয় দর্শক আরো কিছু আশা করে প্রেক্ষাগৃহে বসে। সে চায়, অভিনেতার মুখের প্রত্যেকটি কথার অর্থ ও সংগতি সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করতে। আমাদের ঘরোয়া আলাপে আমরা উচ্চারণকে তত বেশী প্রাধান্যই দেই না। আবার শ্রোতার যদি কোন কথা ধরতে ভুল হয় অথবা কোন কথা যদি তার কান এড়িয়ে যায়, সহৃদয় ভদ্রলোক মাপ চেয়ে আর একবার বক্তব্যটুকু শুনে নিতে চান। সুতরাং বক্তাকে আর একবার গুছিয়ে সবটুকু বলতে হয়। অভিনেতার কাছে দর্শক দু'রকমেরই সহযোগিতা কামনা করে। প্রথমতঃ, উচ্চ কণ্ঠ এবং দ্বিতীয়তঃ, উচ্চারণের পরিচ্ছন্নতা। অর্থাৎ দর্শককে কথা শোনাতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ভাবও বুঝিয়ে দিতে হবে। এই দু'রকম করতে গিয়ে অভিনয়ে স্বাভাবিকত্ব বলি হয়ে যায়। অথচ স্বাভাবিকত্ব হোল অভিনয়ের প্রাণ।

বসুমিত্রের রোমাঞ্চকর রহস্যনাট্য 'কালো ছায়া' চিত্রে ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

তৃতীয় উপাদান হোল প্রকাশ-ভঙ্গীর স্বাভাবিকতা। এখানেও নানা সমস্যা জট পাকিয়ে ওঠে। অভিনেতার নিজের জীবনে কথা-বলার ভঙ্গী এবং শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ আছে কিন্তু তা করলে হয়ত অভিনীত চরিত্রটির সঙ্গে তা খাপ খাওয়ান চলবে না। কেবল মাত্র সাজ-পোষাকের দ্বারা অভিনেতার চেহারাকে বদল করলেই সব কিছু হোল না—সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু করা দরকার। এবং সে দরকারটুকু হোল নিজের ব্যক্তিত্বকে গলা টিপে ধরে তার অভিনেতাকে প্রয়োগ-কৌশল দেখাতে হবে। অর্থাৎ কৃত্রিম ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে না পারলে অভিনয় জমবে না। অথচ স্বাভাবিকত্বই হোল অভিনয়ের মৌল প্রয়োজন—অভিনয়ের প্রাণস্বরূপ।

— নিউ থিয়েটার্সের অপূর্ব্ব নিবেদন —

অঞ্জনগড়

পরিচালক : বিমল রায়

কাহিনী : সুবোধ ঘোষ

সঙ্গীত : রাইচাঁদ বড়াল

চিত্রশিল্পী : কমল বসু

শব্দযন্ত্রী : বাণী দত্ত

— ভূমিকায় —

সুনন্দা, ৺রাজা গাঙ্গুলী, বিপিন গুপ্ত, কালী সরকার, শঙ্কর সেন, মনোরঞ্জন, ভানু, হীরেন, অমিতা, পারুল, ইন্দু, সুনীল প্রভৃতি

একযোগে : চিত্রা, রূপালী, প্রাচী, ছায়া এবং অন্যান্য সিনেমায় চলিতেছে

নিউ থিয়েটার্সের আগতপ্রায় চিত্র—

মন্ত্রমুগ্ধ

ভূমিকায়—
মীরা সরকার, রেবা বসু, মনোরমা (বড়)
মনোরমা (ছোট); ছবি রায়, রমা নেহরু,
জীবেন বসু, সুনীল দাশগুপ্ত, শক্তিপদ ভাদুড়ী
ইন্দু মুখার্জি প্রভৃতি।

কাহিনী : বনফুল।

পরিচালনা : বিমল রায়।

এবং সুধীশ ঘটক।

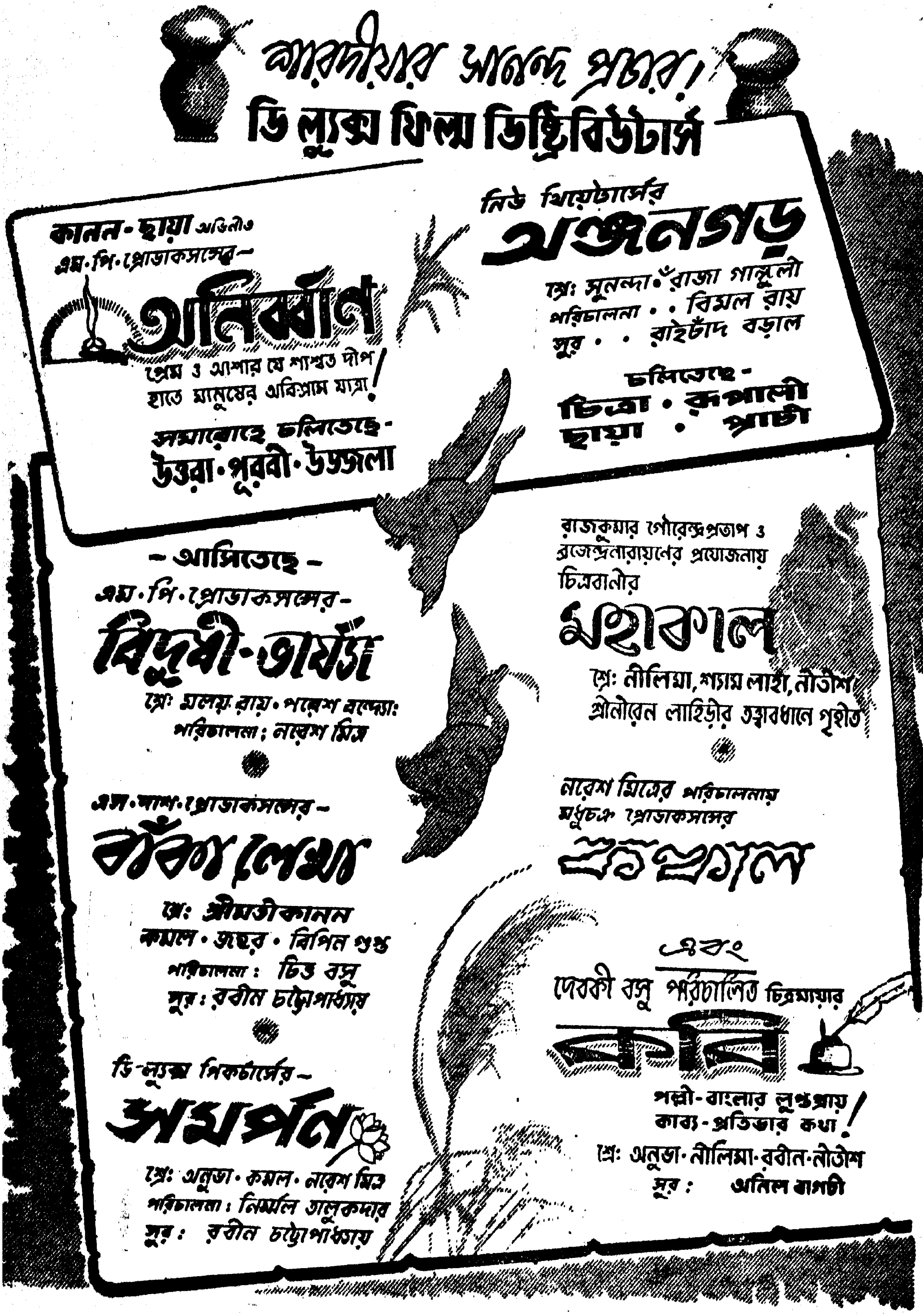

শারদীয়ার সানন্দ প্রচার!
ডি লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স
কানন-ছায়া অভিনীত
এম·পি·প্রোডাকসন্সের—
অনির্ব্বাণ
প্রেম ও আশার যে শাশ্বত দীপ
হাতে মানুষের অবিশ্রাম যাত্রা!
সমারোহে চলিতেছে-
উত্তরা·পূরবী·উজ্জলা
নিউ থিয়েটার্সের
অঞ্জনগড়
শ্রেঃ সুনন্দা·রাজা গাঙ্গুলী
পরিচালনা . . বিমল রায়
সুর . . রাইচাঁদ বড়াল
চলিতেছে-
চিত্রা · রূপালী
ছায়া · প্রাচী
— আসিতেছে —
এম·পি·প্রোডাকসন্সের-
বিদুষী-ভার্য্যা
শ্রেঃ মলয় রায় · পরেশ বন্দ্যোঃ
পরিচালনা ; নরেশ মিত্র
এস·আশ·প্রোডাকসন্সের —
বাঁকা লেখা
শ্রেঃ শ্রীমতীকানন
কমল · জহর · বিপিন গুপ্ত
পরিচালনা : চিত্ত বসু
সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়
ডি-লুক্স পিকচার্সের—
সমর্পণ
শ্রেঃ অনুভা · কমল · নরেশ মিত্র
পরিচালনা : নির্ম্মল তালুকদার
সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়
রাজকুমার গৌরেন্দ্রপ্রতাপ ও
ব্রজেন্দ্রনারায়নের প্রযোজনায়
চিত্রবাণীর
মহাকাল
শ্রেঃ নীলিমা, শ্যাম লাহা, নীতীশ
শ্রীনীরেন লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে গৃহীত
নরেশ মিত্রের পরিচালনায়
মধুচক্র প্রোডাকসন্সের
এবং
দেবকী বসু পরিচালিত চিত্রমায়ার
কবি
পল্লী-বাংলার লুপ্তপ্রায়
কাব্য-প্রতিভার কথা!
শ্রেঃ অনুভা · নীলিমা · রবীন · নীতীশ
সুর : অনিল বাগচী

প্রয়োগ-শিল্পের চরম হোল অভিনয়। এখানে বাস্তব মানুষ নড়ে বসে হেসে কেঁদে জীবনের চলমান লীলাকে রূপায়িত করে তোলে। আর সেই একমাত্র কারণেই শিল্পের মূল বস্তু যা, তা এখানে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠা দরকার। সংযম, সংহত প্রয়োজনা, বিচিত্র রঙ, রস ও ব্যঞ্জনার সমাবেশে একটি নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে দর্শকের চোখের সামনে। কোন একটি বিশেষ দৃশ্যে ঘটনা-স্রোত বেগবান বলে অথবা কোথায় গল্প ভাটায় মন্থর বলে ছবিখানি খণ্ডে খণ্ডে সুন্দর বা ভাল নয়। দর্শক যখন বই দেখা শেষ করলেন—তার মনের মধ্যে একটি সামগ্রিক ভাব ফুটে উঠল। সেই ভাবটিই হোল তার রসতৃষ্ণার রূপ। তার পর বুদ্ধিজীবী মন বিশ্লেষণ সুরু করলে। তখন খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করে সমালোচনা হতে লাগল।

অভিনেতাদের পক্ষে এই সামগ্রিক ভাবটি ফুটিয়ে তোলা প্রথম দরকার। একা কেউ নয়—সকলে মিলে এই ভাবটি ফোটাবার চেষ্টার নামান্তর হোল নাট্য জমানো। এর পিছনে অবশ্য থাকেন নাট্যকার ও পরিচালক। সেই নাটকই জমে উঠেছে বলতে বাধা থাকে না দর্শকদের যখন তারা সমগ্র সময়টুকু নিজেদের ইন্দ্রিয়-গ্রাম, চক্ষু ও কর্ণের উপর কেন্দ্রীভূত করে মন্ত্রমুগ্ধের মত। সেই-খানেই নাটকের চরম স্বার্থকতা। এবং শিল্পের সংজ্ঞায় তখনি তা উত্তীর্ণ। অবশ্য ঘটনাকে শিল্পের স্তরে তুলে ধরবার জন্য নাট্য-কারের দায়িত্ব অনেক বেশী।

বাস্তব জীবনে কোন ঘটনা যখন ঘটে তখন যত বাক্য ব্যয় হয়, নাটকে তাকে দানা বাঁধাতে হয় অনেক স্বল্প কথায়। অথচ সেই স্বল্প কথার মধ্যে শুধু ঘটনাটি স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে গেলেই হয় না—তার মধ্যে দিয়েই চরিত্রগুলির হৃদয় উদ্ঘাটন হওয়াও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নাট্যকারের এই দুরূহ কাজের ফলে দর্শকের পক্ষে হয়ত সব কিছুকে তৎক্ষণাৎ হৃদয়গত করার অসুবিধা ঘটতে পারে। কিন্তু এইখানেই অভিনেতা অভিনেত্রী নাট্যকারের সাহায্যে এসে দাঁড়ান। নাটকের চরিত্রগুলিকে বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ করে তোলার দায়িত্ব নিতে গিয়ে তারা আপন ব্যক্তিত্ব বলিদান দিয়ে এক ভিন্ন মানসের নারী-পুরুষকে তুলে ধরেন দর্শকদের সামনে। সুতরাং শিল্পী কৃত্রিম হতে বাধ্য এখানে। এবং এই কৃত্রিম স্বাভাবিকত্বের মোহ রচনা করতে পারলেই তবেই অভিনেতার যশোভাতি এবং তার বাজার-দর হু-হু বর্ধমান। তা ছাড়া সমস্ত শরীরের ভঙ্গী ও মুখের ব্যঞ্জনা বক্তার বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে তাল রেখে চলা প্রয়োজন। এর দ্বারা শুধু নিজের বক্তব্য নয়—ঘটনার আবর্তে সেই বিশেষ চরিত্রটির মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াও ফুটে ওঠা চাই।

দেখা যায় যে, অধিকাংশ লোকের মুখে চরমতম ঘটনা—যেমন মৃত্যু, হত্যা বা হঠাৎ ঘটা কোন আতংকজনক পরিস্থিতি অতিরিক্ত ভঙ্গী ফুটিয়ে তোলে না। অন্ততঃ যেটুকু তোলে সেটুকু স্বাভাবিক হলেও তা দিয়ে অভিনয়ের কাজ চলে না। সুতরাং অভিনেতাকে মুখে কৃত্রিম ভাব ফুটিয়ে তুলতে হয়। যা মূল ব্যঞ্জনার অতিরঞ্জন এবং যা করার জন্য ভিতর থেকে শক্তি ব্যয় হয় না। এই কৃত্রিমতা এবং আতিশয্য স্বাভাবিকত্বের মূলে কুঠারাঘাত করে। অথচ যৎপরোনাস্তি স্বাভাবিকতাই হোল সব অভিনয়ের প্রাণ। এবং উদীয়মান নট-নটীর পক্ষে এ আর এক প্রধান অন্তরায়। বাচনের উচ্চগ্রাম এবং পরিচ্ছন্নতা এবং সেই সঙ্গে কৃত্রিম ব্যক্তিত্ব বিকাশ করতে পারলেই তবেই অভিনয় সহজ ও জমাট হবে। অথচ এর প্রতি ধাপে স্বতঃ-উৎসারিত স্বাভাবিকতার মৃত্যু বা হত্যা। সৌখীন অভিনয়ে তার পক্ষে এইগুলি হোল দুরারোহ সোপান। এবং নিজের ক্ষমতা ও বুদ্ধি দিয়ে এই সিঁড়ি না ভাঙতে পারলে নটলোকের স্বর্ণ শীর্ষ বাইরেই থেকে যাবে।

সিরাজদ্দৌল্লা নাটকে যিনি সিরাজের পাট করেছেন এবং যিনি গোলাম হোসেনের চরিত্র রূপায়িত করছেন, দু'জনে দুই ভিন্নধর্মী অভিনয় করতে বাধ্য। যদিও চরিত্র দু'টির মৌলিকত্বে আকাশ-পাতাল তফাৎ, তথাপি অভিনয়ের সময় দু'জনকেই সমান কৃত্রিম স্বাভাবিকতা ফুটিয়ে তুলতে হবে। এ সম্বন্ধে পরিচালককে সুরুতেই ধারণা করে নিতে হবে যে কত দূর কৃত্রিমতা ও ব্যক্তিত্ব বলিদানের দ্বারা দু'জন লোক ঐ দু'টি চরিত্রকে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করতে পারবে। লোক-নির্বাচনের সময় এইটুকু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার। অভিনেতাদের দায়িত্ব তার চেয়েও গুরুতর। যে নাট্য-রস সিরাজ ফোটাবে সে নাট্য-রসে গোলাম হোসেনের অপমৃত্যু।

পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক অভিনয়ে বাচন-ভঙ্গীর আর এক বাধা আছে। যেখানে চরিত্রের মুখে বক্তব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাট্যকার বসিয়েছেন সেখানে বাচনের স্বাভাবিকতা প্রথমেই বিপন্ন হয়ে ওঠে। অথচ দেখা গেছে যে, অনেক অভিনেতা সেই ছন্দোবদ্ধ বাণী উচ্চারণ করে অপূর্ব রস জমিয়ে তুলেছেন। ছন্দে কথা বলা অবাস্তব। কোন লোক তা বলে না বা শুনতে অভ্যস্তও নয়। সুতরাং দর্শক যখন—'দাও মাগো সন্তানে বিদায়'—চলে যাই লোকালয় ত্যজি'—শোনে, তখন তার মন বেঁকে বসবার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু বাচনের ভঙ্গীতে সেই ছন্দোবদ্ধ ভাষাকে স্বাভাবিক করে তোলাই হোল আবৃত্তির আর্ট। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অভিনেতা যখন কথা কইছেন—সে কি গদ্যে কি পদ্যে—তার ভঙ্গীতে এইটুকু ফোটা উচিত যে বক্তব্যগুলি সেই মাত্র তার মনে কল্লোল তুলেছে এবং তিনি তা উচ্চারণ করছেন। মুখস্থ করা অথবা পুনরাবৃত্তিতে পুরাতন বাক্য প্রয়োগ করছেন না তিনি। এইটুকু হোল স্বাভাবিকতার দাবী। সেই কারণে আপাততঃ শ্রবণে কটু ও কৃত্রিম হলেও নাটকের ছন্দে গাঁথা সংলাপ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

পড়া-পাগলা, সংসার-অনভিজ্ঞ প্রফেসারের চরিত্রের মধ্যে অনেকখানি কৃত্রিমতা থাকেই। সেটুকু ফোটাবার জন্যে কৃত্রিমতারই প্রথম প্রয়োজন। এবং সেই কৃত্রিমতার দ্বারাই সেই চরিত্রের স্বাভাবিক অভিনয় হতে পারে।

এই ধরণের উদাহরণ বাড়িয়ে দেওয়া যায় অজস্র। বিশেষ করে যারা বহু দিন বহু ধরণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাঁরা এর সঙ্গে আরো একশ' যোগ করতে পারবেন। কিন্তু উদাহরণ বাড়িয়ে গেলে সমস্যায় হয়ত আরো জট পাকিয়ে যাবে বলে আমরা নিরস্ত হলাম।

[ক্রমশঃ

[শীতে উপেক্ষিতা—৫৬৭ পৃষ্ঠার পর]

সন্দেহ হয় যে ইনি শিল্পী। বেশ পরিচ্ছন্ন কিন্তু এককত্বের ছাপ নির্ভুল। ওভার কোটের একটা বোতাম ছিঁড়ে গেছে, সেখানে একটা সেফটি পিন্ ঝুলছে। দেখলেই মনে হয় ইনি মুক্ত, কোনো নির্দিষ্ট ঘাটে বাঁধা নেই এঁর জীবনের তরী। পথে বেরিয়েছেন কিসের সন্ধানে কে জানে। হয়তো কিছুর সন্ধানেই নয়। হয়তো আমারই মতো ; বাইরের আকর্ষণে ততটা নয়, যতটা গৃহের বিকর্ষণে।

কিন্তু এ সমস্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার উপায় ছিল না, বললেম, "হাসপাতালের কাজের পরে এই মূর্তি গড়বার অর্ডার পেয়ে দার্জিলিং এসেছেন বুঝি ?"

"না, না, দার্জিলিং এসেছি অনেক দিন। মূর্তির কথা উঠল তো মাত্র মাস তিনেক আগে। তার আগে ওই জলাপাহাড়ে মাষ্টারি করছিলেম।"

"মাষ্টারি ?"

"হ্যাঁ," ভদ্রলোক হেসে বললেন, "ইংরেজি পড়াতেম। এক জন মাষ্টার ছুটিতে গিয়েছিল, তারই বদলি হয়ে, মাস ছয়েকের জন্যে।"

দার্জিলিঙের প্রায় পাঁচশ' ফিট উপরে জলাপাহাড়ে আছে সেণ্ট পলস্ স্কুল। স্কুলটির খ্যাতি আছে। গোড়াতে ছিল কলকাতায়, ১৮৬৪ সালে চলে আসে এখানে। ভারতশাসনরত ইংরেজদের সন্তানদের শিক্ষার জন্যেই এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা। অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, সেইটেই ছাত্রসংখ্যা সাধারণত পরিমিত রাখে। তার উপর আছে নিয়ম, যাতে শতকরা পঁচিশ জনের বেশী ভারতীয় ছাত্র ভর্তি করা হয় না। স্কুলটির ইংরেজি চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

টমসন বললেন, "ওই যে ছেলেটি বসে আছে ও আমার ছাত্র। নাম মোহন।"

ছেলেটি কাছেই একটা পেন্সিল দিয়ে কী যেন লিখছিল। নিজের নাম শুনে আমাদের দিকে তাকিয়ে ভূতপূর্ব শিক্ষককে দেখে এগিয়ে এলো, "গুড মর্নিং, সার, প্লেজেণ্টলি ওয়র্ম্, ইজনট্ ইট্, সার ?"

"ইয়েস্, কিন্তু আমাকে উঠতেই হবে। আবার কাজ সুরু করতে হবে। তুমি বসে এঁর সঙ্গে কথা বলো।" টমসন যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলেন। ভদ্রলোককে ভালো লাগল।

সব কিছুই ভালো লাগছিল সেই সকালে। ভালো লাগল মোহনকে। কিশোরটি অত্যন্ত সপ্রতিভ কিন্তু দুর্বিনীত নয়। জানে কোথায় আলাপের শেষ ও বাচালতার সুরু। কৈশোরের কৌতূহল আছে, নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সে কৌতূহল স্বাস্থ্যকর। ক্রিকেটের বিশেষ উৎসাহী। চিত্তচাঞ্চল্য নেই চিত্রতারকাদের জীবনকাহিনী নিয়ে।

মোহনের পুরো নাম মোহন কৃপালনী। সিন্ধি। কনগ্রেস প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে আত্মীয়তা নেই, নাম বলেই সেকথা যোগ করল। কারণটা তখনো জানিনে।

মোহনদের দোকান আছে দার্জিলিঙে। দামী কাপড়ের দোকান। এখানে আছে মাস পাঁচেক হোলো। তার আগে ব্যবসা ছিল লাহোরে। মোহন এখন শীতের ছুটীতে জলাপাহাড় থেকে এসেছে মা-বাবার কাছে। মাঝে-মাঝে সে নিজেও চৌরাস্তার দোকানের তদারক করে। পরিবারে কেউই চাকরি করে না। সবারই আছে কোনো না কোনো ব্যবসা। বয়স কম হলেও মোহনের ব্যবসাপ্রীতি মজ্জাগত। চাকরিতে অভিরুচি নেই, বলল সেকথা। কথায়, ব্যবহারে, অভিলাষে—মোহন বাঙালী সমবয়সীদের থেকে সব ব্যাপারেই বিভিন্ন।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "বলুন দেখি, পাঁচ অক্ষরের কথা, যার মানে Kingdom."

বললেম, "Realm হতে পারে।" মোহন ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল করতে সুরু করেছে অল্প কিছু দিন হোলো। উৎসাহ অপরিসীম, কিন্তু অনভিজ্ঞতার জন্যে পারদর্শিতা উল্লেখযোগ্য নয়। আমার এ-বিদ্যায় কিঞ্চিৎ অভ্যাস ছিল, তাই মোহনের সহজ ধাঁধাগুলির উত্তর দিতে কষ্ট হোলো না। মোহন মুগ্ধবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, "আপনি এত সহজে করতে পারেন অথচ উত্তর পাঠান না কেন ? এবারে তো ফার্ষ্ট প্রাইজ কুড়ি হাজার। অনায়াসেই তো আপনি এতগুলি টাকা পেতে পারেন !"

"না, অনায়াসে নয়। এই পাজ্‌ল্‌গুলিতে অসংখ্য অলটারনেটিভ থাকে। ঠিক উত্তরটা নির্ভর করে পাজ্‌ল্‌কর্তার মর্জির উপর, যুক্তির উপর নয়। তাছাড়া প্রাইজ আছে বলেই করতে ভালো লাগে না। আমি মাঝে-মাঝে ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের পাজ্‌ল্ করি। সেটা অনেক ভালো।"

"কিন্তু তাতে তো প্রাইজ নেই।"

"সেইজন্যেই তো করতে ভালো লাগে।"

"বা রে, তাহোলে কী লাভ করে ? মিছিমিছি পরিশ্রম !"

"তুমি যে ক্রিকেট খেলো সেও তো পরিশ্রম। কী পুরস্কার তার আনন্দ ছাড়া ?"

"সে আলাদা, সে তো খেলা !"

"ক্রসওয়ার্ডও তো খেলা। প্রাইজের প্রশ্ন উঠলেই খেলাটা মাটি হয়ে যায়। লাভের আশংকা থাকলেই তো সেটা ব্যবসা হয়ে গেল। তখন সেটা কাজ মনে হয়। ভালো লাগে না।"

মোহন আমার নির্বুদ্ধিতায় হতবাক হোলো। অর্থলাভের সম্ভাবনা থাকলেও যা নিরর্থক তাই নিয়ে সময় নষ্ট করতে মোহন কাউকে দেখেনি এর আগে। আমার কথাকে অবিশ্বাস্য পরিহাস মনে করে বলল, "কিন্তু আমি যে ক্রসওয়ার্ড করছি সেটা করলে তো খেলা আর লাভ দুই-ই একসঙ্গে হতে পারে !"

"মনে হয় হতে পারে, কিন্তু হয় না। দু'টোর মধ্যে বিরোধ আছে। যুক্তি দিয়ে দেখতে গেলে কোনো কারণ নেই ধনী কেন ধার্মিক হতে পারবে না। কিন্তু হয় না। God আর Mammon-এর উপাসনা যেমন একসঙ্গে হয় না, তেমনি আনন্দ আর ব্যবসাও একসঙ্গে হয় না।"

মোহন কী বুঝল সে-ই জানে। চুপ করে রইল। আমি ভাবছিলেম নানা অসংলগ্ন ভাবনা। সমৃদ্ধি কেন সমাধি দেয় আদর্শকে ? শারীরিক বিলাস কেন বিনাশ করে মানসিক সুস্থতা ? কোনো কারণ নেই, কিন্তু একথা অস্বীকার করবারও উপায় নেই যে তাই হয়। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ান থেকে সাধক হয়নি কেউ, তাকে বেছে নিতে হয়েছে কণ্টকের আসন। দারুণ গ্রীষ্মে সে সম্মুখে প্রজ্বলিত করেছে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড, দারুণ শীতে সে সাধনা করতে গেছে হিমমণ্ডলের সর্বোচ্চ শিখরে।

মোহন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ষ্টেটস্‌ম্যান যদি নিয়ে আসি আমাকে দেখিয়ে দেবেন কি করে তার পাজ্‌ল্‌ করতে হয়?"

"সানন্দে।"

দার্জিলিঙে আসা অবধি খবরের কাগজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। ইচ্ছা করেই রাখিনি। চেয়েছিলেম নীচের সব কিছু ভুলে থাকতে। পালিয়ে এসেছিলেম সব কিছু থেকে। কিন্তু পালানো কি যায়? পালানো যায় একটা জায়গা থেকে, একটা লোক থেকে। কিন্তু নিজেরই আরেকটা অংশ থেকে নিষ্কৃতি এত সহজ নয়। শিয়ালদহ ষ্টেশনে শহুরে আমি-কে পরিত্যাগ করে এলেও পোড়াদহতে পৌছে দেখি, হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে অতি পুরাতন ভৃত্য। তা[illegible] নৈসর্গিক স্বর্গ উপভোগ করতে করতেও খবরের কাগজের নাম [illegible] দুর্মর কৌতূহল জাগ্রত হয়ে ওঠে নীচে-ফেলে আসা জগৎটার [illegible] জানতে ইচ্ছে হয়, কোথায় ভূমিকম্প হোলো আর কোথায় বন্যা।

ভূমিকম্প সারা পৃথিবীতে, বন্যা প্রতি মানবের চোখে। [illegible]গজ খুলেই দেখি, মহাত্মাজী অনশন করেছেন। কলকাতার সাম্প্রদায়িকতার দাবাগ্নি নির্বাপিত করে গান্ধীজী যাত্রা করেছিলেন ঘৃণাদগ্ধ পাঞ্জাবের দিকে। তখনো জানতেন না দিল্লীর দাঙ্গার কথা। রাজধানীতে পৌছে আর এগুতে পারলেন না। শিবির স্থাপিত হোলো নয়াদিল্লীতে। যুদ্ধের শিবির নয়, শান্তির শিবির। সমগ্র ভারতবাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন গান্ধীজী একা, জাতীয় অবমাননার অবসান ঘটাবেন আত্মবলি দিয়ে। অগণ্য জনতার হিংস্র মত্ততাকে শান্ত করবেন আত্মঘাতনের মধ্য দিয়ে।

সূর্য তখন মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করেছে। সবটুকু আলো নিঃশেষে মুছে গেছে। ধরণীর বুকে আবার নেমেছে কুয়াশার গাঢ় অন্ধকার। আমার কথা বলবার শক্তি ছিল না।

মোহন বলল, "ক্রস্‌ওয়ার্ড তো শেষের পাতায়। প্রথম পাতায় কী দেখছেন?"

"আজ পারব না ভাই, আরেক দিন দেখিয়ে দেবো। এখন আর কিছু ভালো লাগছে না।"

মোহন কাগজ পড়ে। সে জানতো গান্ধীজীর অনশনের কথা। বোধ হয় ভাবল সেই আলোচনায় আমি উৎসাহী হবো। বলল, "গান্ধীর অনশনের আজ চার দিন হোলো।"

"এ-বয়সে চার দিন মানে চার বছর।"

"কী দরকার ছিল উপোস করবার তাহোলে?"

"তা বটে!" কারো সঙ্গেই তর্ক করবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। অপরিণতমনস্ক কিশোরের সঙ্গে তো নয়ই।

মোহন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, "আই হোপ হী ডাইস্‌। বুড়োর এখন মরাই ভালো।"

মানব জাতির পঞ্চমাংশের স্বাধীনতা দেওয়ার সঙ্গে মহাত্মাজীর কর্তব্যের অবসান হয়েছে, ভারতবর্ষকে দেবার তাঁর আর কিছু নেই, এই সকল অর্বাচীন মতবাদ এর আগেও শুনেছি। কিন্তু এতটুকু শিশুর মুখে এমন স্পষ্ট উক্তি শুনতে হবে এমন আশংকা করিনি। মহাত্মাজীর মৃত্যু কামনা এমন নির্লজ্জ ভাষায় এর আগে আর শুনিনি। বিরক্তিতে আমার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল। ক্রোধ সম্বরণ করে আস্তে বললেম, "তোমার বয়সে সব কিছু বোঝবার কথা নয় এবং যা বোঝো না তা নিয়ে কথা না বলাই ভালো।"

"আমি না হয় বুঝিনে। আমার বাবা তো বোঝেন। তিনিও আজ সকালে এই কথাই বলেছেন। ওরা আমাদের মেরে শেষ করে [illegible] থাকব কাপুরুষের মতো হাত-পা [illegible]।"

মোহনের পিতৃভক্তি প্রশংসনীয়। কিন্তু তর্ক এড়াবার জন্যেই বললেম, "তোমাকে তো মারেনি, তাহালেই হোলো।"

"আমাকে মারেনি কিন্তু আমার বোনকে মেরেছে। চার বছরের ছোটো বোন। আমার দুই ভাইকে মেরেছে। এক পিসীকে মেরেছে।" মোহন [illegible] চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, "আমার দিদিমাকে মেরেছে। [illegible] লাহোরের বাড়ীতে যে ক'জন ছিল সবাইকে মেরেছে।" মোহন ঝর-ঝর করে কাঁদতে লাগল। আমি তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেম।"

মোহনের ক্রোধ মিথ্যা নয়। অস্বাভাবিক নয়। এতটুকু শিশুর ক্ষুদ্র হৃদয়ে এত ক্ষোভ, এত ঘৃণা, এত বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়েছে দেখে মন তিক্ত বিস্ময়ে ভরে ওঠে। কায়েদ-ই-আজম ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ করেছেন, সেটা বৃহৎ ক্ষতি। কিন্তু তিনি এতগুলি সুস্থ মনে এতখানি ঘৃণার সঞ্চার করেছেন, এই শিশুটির সুকুমার হৃদয়ে পর্যন্ত এতখানি হিংস্রতা সঞ্জাত করেছেন যে তাঁর এ-অপরাধের বোধ হয় ক্ষমা নেই। এ-অপরাধ তো শুধু মানবদেহকে ক্লিষ্ট করেনি, মানবাত্মাকে লাঞ্ছিত করেছে।

মোহনের অশ্রুও মিথ্যা নয়। এবং মোহনও একা নয়। অতি সত্য তাদের সকলের দুঃখ। তাদের বেদনা অস্বীকার করিনে। কিন্তু একথাই বা অস্বীকার করি কী করে যে প্রতিহিংসায় তার প্রতিকার নেই? কলকাতার দৃষ্টান্তের কথা স্মরণে ছিল। তবু অবিশ্বাসী মন প্রশ্ন করে একটি মানুষের প্রচেষ্টায় কি সম্ভব হবে এত দুর্বৃত্তের বক্ষ থেকে এত পাশবিকতার নিরসন? বিশ্বাসঘাতকের ছুরিকা কি মানবে বিশ্বাসের বারণ? শান্তির ললিত বাণী কি ব্যর্থ পরিহাসের মতো শোনাবে না? এক পক্ষের নিষ্ক্রিয়তা কি অপর পক্ষের উৎসাহের কারণ হবে না? গান্ধীজী একা কি পারবেন এতগুলি ক্ষুব্ধ হৃদয়ের এতখানি ক্ষোভ ঘোচাতে? এতগুলি আঁখি থেকে এতখানি অশ্রু মোছাতে?

সমস্ত জগৎ সেদিন শংকিত চিত্তে রুদ্ধনিশ্বাসে এই প্রশ্নেরই উত্তর প্রতীক্ষা করছিল।

[ক্রমশঃ

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে নির্মীয়মান শ্রীদুর্গা মূর্তির আলোক-চিত্র মুদ্রিত হল। ছবিতে শিল্পী মণি পালকে মূর্তি নির্মাণ করতে দেখা যাচ্ছে।

নগরবাসী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নানীকে হত্যা করার সোরগোলে মন্দির অপবিত্র করার দিকটা চাপা পড়ে থাকে, ধর্মস্থানের কুৎসিত অপমানের হৈ-চৈএ নানীর মরণ মর্য্যাদা পায় না। কোন্ অন্যায়টা বড় তা নিয়ে অবশ্য বচসা সুরু হবার সুযোগ ঘটে না, ভীড় জমে উঠতে না উঠতে সংঘর্ষ সুরু হয়ে যায়,—পরিকল্পনাটা যাদের তারা সত্যই তৎপর। মানুষকে চিন্তা করার সুযোগ দিলে যে চলবে না এটা তারা ভাল করেই জানে। বেঁচে থাকতে মাকে খেতে না দিক, তার অপমৃত্যুর সংবাদে নাজিম বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ছুটে এসেছে, সাথে-সাথে কিম্বা আগে-পরে এসেছে বস্তি আর বস্তির ওপারের মুসলিমপ্রধান এলাকার অনেকে। বুড়ী মাকে পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখে নাজিম সবে হাঁটু পেতে বসে মায়ের মুখখানা বুঝি উঁচু করতে গিয়েছিল, সোডার বোতলের ঘায়ে মাথা ফেটে গিয়ে তার জীবন্ত তাজা রক্ত ঝরে নানীর চাপ-বাঁধা রক্তে মিশতে থাকে,—শুধু নানীর রক্ত নয়, তাতে নিরীহ একটি গরুর রক্তও মেশান ছিল। এটাও দাঙ্গা চালু করে দেবার প্রাথমিক ঘটনাবলীর অঙ্গ—সোডার বোতল নিয়ে লোক তৈরী হয়েই ছিল। তবে নাজিমের মাথাটাই যে ফাটবে সেটা কেউ ভেবে রাখেনি। কয়েক মিনিটের জন্য তার পর এলোমেলো মারপিট খুন-জখমের চেষ্টা চলতে থাকে, কাপড়ের ভাঁজের আড়াল থেকে ঝকঝকে ছোরা বেরিয়ে এসে রতন সান্ন্যালের পাঁজরে ঢুকে যায়, অ্যাসিডের বালব ফেটে হিন্দু-মুসলমান দু'জাতেরই কয়েক জনের কালো চামড়ার কিছু কিছু ঝলসে জ্বলে-পুড়ে ইংরেজী সাদা চামড়া হয়ে উঠবার প্রতিশ্রুতি জানায়। আচমকা কোথা থেকে অনেকগুলি লাঠি এসে হাড়-পাঁজরা গুঁড়ো করে দিতে থাকে।

নাজিমকে টেনে-হিঁচড়ে তুলে নিয়ে বস্তির দিকের লোকেরা পিছু হটে পালিয়ে যায়, সংখ্যায় তারা কম ছিল। পুলিশ আসে না কেন, সৈন্য? রসময় টেলিফোনের যন্ত্রটায় ঝাঁকি মারে, সাড়া পেয়ে ব্যাকুল ভাবে আহ্বান জানায়, কিন্তু পুলিশও আসে না, সৈন্যও আসে না। জবরদস্ত বৃটিশ-রাজের সৈন্য-পুলিশের কি হয়েছে? ঘরের কোণে খেলার ঝোঁকে সাত বছরের ছেলে বন্দে মাতরম্ বললে তারা যে শুনতে পেয়ে তাকে সায়েস্তা করত।

বহু নিরীহ লোক যখন হতাহত হয়েছে, লুঠপাটের চরম পালা চলছে, সদলবলে এক দল উন্মাদ যখন গিয়ে বস্তিতে সাত-আটটা ঘরে আগুন দিয়েছে, চোরাবাজারে যে পেট্রোলের টানাটানি সেই পেট্রোল রাশি রাশি ঢেলে আগুন দিয়েছে, তখন দিগন্ত কাঁপিয়ে ট্রাকে চেপে মিলিটারী এল। বস্তি তখন দাউ-দাউ জ্বলছে।

জ্বালানির অভাবে উনান ধরে না কাঁকর-মেশানো চাল সিদ্ধ করতে, নানীর রাস্তায় কুড়োনো গোবরের ঘুঁটে চড়া দামে বিকোয়, মানুষের মাথা-গোঁজার ঘর-জ্বালানো আগুন আকাশ লাল করে জ্বলছে। এদিকে পূর্বাকাশে যে সূর্য্য উঠছে তিনি পর্য্যন্ত যেন ম্লান হয়ে গেছেন আগুনের আঁচে আর আলোয়।

গিরীন সচকিত ভাবে গলিতে ঢুকছিল, মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল অবস্থা দেখে। কাল বিকালে যখন আপিসে গিয়েছিল হত্যা আর অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ সম্পাদনা করে পরিবেশন করার কর্তব্য পালনে, খবরের কাগজের আপিসে যখন হানা দিয়েছিল এক দল উন্মাদ, রাত জেগে সাজিয়ে-গুছিয়ে জগতের অসভ্য অসুর আর রাক্ষসের চরম বীভৎসতম যুদ্ধের খবরগুলি মানুষের এবং মালিকের গ্রহণযোগ্য করে পরিবেশনের কর্ত্তব্য পালন করছিল। তার পর কাজের টেবিলে পা গুটিয়ে ঘণ্টা তিনেক যে ঘুমিয়েছিল, তার মধ্যে এ ভাবে বাড়ী ফেরার ইঙ্গিতও ছিল না। জগতে ধ্বংসের ও সৃষ্টির দ্বন্দ্ব চলুক, তার নিজের পাড়া, তার বাড়ী, তার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব-বৌ-ছেলে-মেয়ে নিরাপদে থাকবে, এটা যেন ধরেই নিয়েছিল গিরীন।

হেই শালা, কাঁহা যাতা? পাকড়ো!

লালমুখো বীরপুরুষদের রুচি-রীতি বিচার-বিবেচনা গিরীনের জানা ছিল, সে ভয়ানক ভয়ে কাছা বেসামাল হবার ভাব দেখিয়ে রসময়ের বাড়ীর পাশের এক হাত সরু অন্ধ-গলিতে ঢুকে যায় এবং মিনিট খানেক পরে গলি থেকে বেরিয়ে লালমুখের প্রায় পাশ কাটিয়েই তিনটে বাড়ী পেরিয়ে নিজের বাড়ীতে ঢুকে পড়ে।

কোন্ পথ দিয়ে এলে? নীলিমা জিজ্ঞাসা করে।

রোজ যে পথে আসি।

নীলিমা গালে হাত দেয়।

কেন, ওদিকের গলিটা দিয়ে ঘুরে এলে হত না? খানিকটা নয় দেরীই করতে। ওনারা এসে বীরত্ব দেখাচ্ছেন, যাকে পাচ্ছেন ধরছেন পিটছেন চালান দিচ্ছেন, ওর ভেতর দিয়ে আসবার দরকার?

গিরীন হেসে বলে, তাড়া করেছিল। আমরা ও-সব ট্যাকটিক্‌স জানি। খবরের কাগজের ঘুঘু আমরা। কখন লাগল, কি করে লাগল? কি নিয়ে ঘটনা সুরু হল—

ওরে উমেশ, নীলিমা ডাকে, হেড কম্পোজিটরকে ডাক, মস্ত নিউজ, ডবল হেডলাইন হবে, সাব এডিটর বাবুর নিজের নিউজ!

নীলিমার কাছে মোটামুটি বিবরণ শুনে গিরীন চারি দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে ছাতে যায়। ইতিমধ্যে ছাতে অনেকে এসেছে গিয়েছে, চোখ মেলে চারি দিক চেয়ে দেখেছে, মণি সেই যে ছাতের কোণে আলসে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে আর নড়েনি। বেলা বেড়ে রোদ কড়া হয়েছে, ঘামে গরমে সে সিদ্ধ হচ্ছে, তবু ঠায় দাঁড়িয়ে সে চোখ পেতে রেখেছে পথে, তাকিয়ে থেকেছে আগুন-ধরা বস্তির দিকে। গিরীন কাছে এসে দাঁড়াতে সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

দেখুন কাণ্ড, তপ্ত খোলায় ছিলাম আগুনে এসে পড়লাম! কোথাও কি মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে না? কি আরম্ভ হয়েছে এ সব? দেশশুদ্ধ লোক কি পাগল হয়ে গেল?

উপায় কি বলুন? যারা ধনের মালিক মনের মালিক তারা যদি এই খেলা চান, পাগল করার কল টেপেন, আমাদের পাগল হতে হয়। ওদের হাতেই চাবিকাঠি দিয়ে রেখেছি।

অল্প কয়েক দিনেই মণি এ-সব কথার মর্ম খানিক বুঝতে শিখেছে। সে অস্ফুট স্বরে বলে, কী ভয়ানক!

ভয়ানক তো বটেই। যারা রাজত্ব করে, রাজত্ব যেতে বসলে তারা ভয়ানক কাণ্ডই জুড়ে দেয়। রাজত্বের লোভ চরমে উঠে গেছে, শেষ অবস্থার বিকার কি না!

আচ্ছা, হিন্দু-মুসলমান একটা আপোষ করে ফেলে না কেন? দেশের লোকের দল তো দু'টোই, এটুকু কি বোঝে না নিজেদের মধ্যে একটা মীমাংসা হলেই সব হাঙ্গামা চুকে যায়? দেশটা বাঁচে?

গিরীন মনে মনেও হাসে না। এই সকল ব্যাকুল প্রশ্নের সঙ্গে তার

পরিচয় আছে, এ শুধু মণির একার প্রশ্ন নয়। কত শিক্ষিত বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ বন্ধু রাজনীতির জট খুলতে খুলতে হয়রাণ হয়ে আন্তরিক আপশোষে এই সহজ কথাটায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আপোষ মীমাংসার কত ভিত্তিই তো রয়েছে, সাধারণ মানুষ সাধারণ বুদ্ধিতে পর্য্যন্ত সে ভিত্তি পর্য্যন্ত খুঁজে পায়। সাধারণ লোকের কাছে এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সত্যই বেখাপ্পা, উদ্ভট, অর্থহীন। জগতের সেরা পাকা খেলোয়াড় কোন্ চোখ রাখে জনসাধারণের দিকে, কোন্ চোখ রাখে কংগ্রেস আর লীগের দিকে, কার দিকে কোন্ হাত বাড়ায়, কি খেলা খেলে, কি চাল চালে—এ জটিল ব্যাপার বোঝা সহজ নয়। সাধারণ মানুষ শুধু জানে যে কংগ্রেস আমার বা লীগ আমার, এ জগতে কে একান্ত ভাবে কার জানা যেন এতই সহজ!

কেন মীমাংসা হয় না, দেশটা বাঁচে না? পুরানো পচা অসহায় মানুষের এ প্রশ্ন তাকে পর্য্যন্ত যেন আজ বিচলিত করে। আশ্চর্য্য হয়ে গিরীন আজ প্রথম টের পায় এটা আসলে প্রশ্ন নয়, এ শুধু হৃদয়াবেগ!

আপোষ যদি হবে, বৃটিশ আছে কেন?

ওটাই তো আমি বুঝতে পারি না গিরীন বাবু। সংসারে দু'জনের যদি একটি বড় শত্রু থাকে ওই শত্রুর জন্যই তাদের মিল হয়, এমনি যতই ঝগড়া-ঝাঁটি থাক। এ দেখছি ঠিক উল্টো ব্যাপার, আসল শত্রু কোথায় গেল—নিজেদের মধ্যে শত্রুতা!

কিসের শত্রু? বৃটিশের শত্রু তো নয়!

নয়? বৃটিশ-রাজের শত্রু নয় কংগ্রেস লীগ?

না। বিপক্ষ। হিংসা শত্রুতা এ-সব কংগ্রেস মানে না। লীগ আরও নরম। শত্রু যদি হত আপনার সংসারের ওই নিয়মটাও খাটত, একজোট হয়ে যেত। ইংরেজ এ দেশে বিপক্ষ গড়তে দিয়েছে, শত্রুকে ফাঁসি দিয়েছে—দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছে। আজ সাধারণ লোক নিজেরাই শত্রু হয়ে উঠছে, এখন বিপক্ষরাই ইংরাজের ভরসা। চার দিকে লাখ-লাখ শত্রু মাথা তুলছে, বোম্বেতে নৌ-সেনা বিদ্রোহ করল, সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী মিশন—

সন্ধ্যার বৈঠকে এ-সব কথা মণি কিছু কিছু শুনেছে, অত দূর সে এগোতে চায় না, তার ঘরোয়া হিসাব গুলিয়ে যায়।

এ মারামারি এখন থামাবে কে?

দেশের লোক উদ্যোগী হয়ে থামালেই ভাল হত, তা সেটা বোধ হয় হবে না। লক্ষণ সে রকম নয়, আগুন আরও ছড়াচ্ছে। কর্ত্তাদের মধ্যে একটা মীমাংসা না হলে কিছু হবে মনে হয় না। কে জানে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে অবস্থা। তবে গরীব বেচারী আপনার আমার দফা নিকেশ হবে সেটা বলে দিতে পারি। স্বাধীনতার আশা আপাতত বেশ কিছু কালের জন্য ঘুচে গেল। এত কাল ধরে স্বাধীনতার সংগ্রাম করে এসে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল, যে পথে এত দূর এগোলাম সেই পথ আগুনের প্রাচীর তুলে বন্ধ করে দিলাম—এটাই আমার সব চেয়ে বড় জ্বালা! নইলে হিন্দু-মুসলমান অনেক শো বছর ধরে এ দেশে আছি, আজ নয় কাটাকাটি করে একটা সম্প্রদায় শেষ হয়ে যেতাম, হয় হিন্দু থাকতাম নয় মুসলমান থাকতাম—তাতে আমার এত কষ্ট হত না। রাজনৈতিক সংগ্রাম যে দেশে ধর্ম্মের লড়াই-এ দাঁড়ায় সে দেশের বরাত বড় খারাপ। শেষ পর্য্যন্ত কি হবে আমি জানি না, কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি, দাঙ্গা থামার পরেও দেখা যাবে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসা হয়নি, স্বাধীনতার সমস্যা রয়ে গেছে। আবার আমাদের আদা-জল খেয়ে দু'টো সমস্যারই মীমাংসার জন্য লড়তে হবে, প্রাণ দিতে হবে।

গিরীনের রাত-জাগা চোখে নিজের বিহ্বল চোখ রেখে মণি কৃতজ্ঞ ভাবে বলে, আপনি এমন সহজ ভাবে সব বুঝিয়ে দিতে পারেন!

ওদিকে বস্তির রসদ কমে-আসা ঝিম-ধরা আগুন, নীচে রাস্তায় সশস্ত্র সৈন্যের ঘাঁটি ও টহল, মাথার উপরে মেঘহীন আকাশের দীপ্ত সূর্য্যের খটখটে রোদ, দম-আটকানো গুমোট আর গা-পচানো ঘাম, এর মধ্যে মণির ন্যাকামিতে গিরীন সত্যই চটে যায়। অকারণে মণিকে প্রায় চমকে দিয়ে সে ব্যঙ্গ করে বলে, আমিও তো আপনার মতই বোকা-হাঁদা, পরস্পরের সহজ কথা আমরা তাই সহজে বুঝি।

মণিকে সবাই আঘাত করে, সবাই তার ঘরোয়া মেয়েলী মায়েলী এবং দেশী রকম প্রিয়া-লী হাব-ভাব চাল-চলন আশা-হতাশা আনন্দ-বেদনা তেজ-নম্রতাকে অবজ্ঞা করে, সবাই তার অসীম ঔৎসুক্য অনন্ত জিজ্ঞাসার ব্যাকুলতাকে ন্যাকামি মনে করে চটে যায়। একমাত্র মণি ছাড়া এ-বাড়ীর সবাই যেন দেশের ধন-সম্পদ দুঃখ-দারিদ্র্য আশা-হতাশা আনন্দ-বেদনা ধর্ম-মোক্ষ-কাম ইত্যাদির বিলি-ব্যবস্থা পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ ব্যক্তি, ছেলে-পিলে কুকুর-বেড়াল পর্য্যন্ত। এ দেশে ঘরে ঘরে মণি আছে, দু'-একটা নয়, কোটি কোটি আছে, এই ক্ষোভে যেন প্রণব থেকে নীলিমার ভাই গোলোক পর্য্যন্ত, নীলিমা থেকে বাড়ীর ঝি দুর্গা পর্য্যন্ত মনে মনে সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে আছে। রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি যেহেতু একটা বিশেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেচে সেই হেতু এ দেশে মণির মত বৌ মা মেয়েমানুষের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ ও অন্যায় হয়ে গেছে। দেশে যে শিক্ষা নেই দীক্ষা নেই, সেটাই হল বিদেশী শাসনের কুফল, সুতরাং শিক্ষাহীনা দীক্ষাহীনা মেয়েরা এ দেশের অভিশাপ, ওই কুফলের ধারিকা বাহিকা। দেশের কোটি মা ও-রকম হোক, কোটি মেয়ে কোটি বৌ ও-রকম হোক, হয়েছে বলেই হলে চলবে না আর।

ঘরে গিয়ে মণি বিছানায় আশ্রয় নেয়। ভাবে, বিদ্বান বিদুষী ও বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতীরা ত্যাগে আদর্শে কর্মে প্রেরণায় সারা দেশের ভাগ্য নিয়ে যে গৌরবময় জীবন যাপনের অধিকার পেয়েছে, সে অধিকার থেকে সে বঞ্চিতা হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! সংসারে টুকিটাকি কাজ করে স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাশ অবধি পড়েছে, বিয়ের পর স্বামী চাওয়া মাত্র আলিঙ্গন দিয়েছে, বেঁধেছে বেড়েছে ছেলে-মেয়ে প্রসব করেছে, আবার বেঁধেছে বেড়েছে ছেলেমেয়ে মানুষ করেছে—তার উচিত হয়নি এ-বাড়ীতে আসা। এ-বাড়ীতে সাময়িক ভাবে আশ্রয় লাভের যোগ্যতাও তার নেই, বড় বড় ব্যাপার কিছুই সে বোঝে না। তার উচিত ছিল, দেশের কোটি কোটি মেয়েছেলে যে রান্নাঘরে ভাঁড়ার-ঘরে শোয়ার ঘরে মুখ গুজে আছে তাদের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় খোঁজা।

হ্যাঁ, অন্ধকারের জীব সে, অন্ধকারে থাকাই তার উচিত ছিল। বড় সে ভুল করেছে এই সচেতন আলোর জগতে এসে—এ আলোতে শুধু তার চোখ ঝলসে যায়, সে অন্ধকার দ্যাখে। এ-বাড়ীতে সে শুধু পিছনে পড়ে থাকা অবজ্ঞেয় জীব!

নিজেকে এত ছোট মনে হয় মণির ! গান্ধী জওহরলাল সুভাষের তুলনায় নিজেকে সুশীল যত হেয় যত ছোট মনে করে তার চেয়েও অনেক ছোট। মহাপুরুষদের মহান্ এই দেশ, তাদের মত তুচ্ছ অবজ্ঞেয় অগণিত নরনারী কেন এই দেশে বেঁচে আছে ?

ঘণ্টা দুই পরে প্রণব তার ঘরে আসে। ইতিমধ্যে কয়েক জন এসেছিল খবর নিতে কি হয়েছে জানতে, তাদের মণি গাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাতে বাড়ীতে একটা আবর্ত্ত সৃষ্টি হয়েছে। শুধু বিছানায় শুয়ে পড়ে আর যে ঘরে আসে তাকেই টাকা দিয়ে বাড়ীতে এ রকম একটা আবর্ত্ত সৃষ্টি করতে পেরেছে জানলে, বিশেষতঃ পাড়ায় যখন বস্তি পুড়ছে আর ঘরের সামনে মিলিটারী টহল দিচ্ছে, মণি টের পেত, মোটেই সে তুচ্ছ নয়—অবজ্ঞেয় নয় !

প্রণব বলে, হল কি মণি-বৌদি ?

মণি বলে, বেরোও আমার ঘর থেকে, দূর হয়ে যাও। ইয়ার্কি করেতে এসেছ, না ?

প্রণব এগিয়ে এসে বিছানার পাশে বসে। বসে গায়ের ভেজা ময়লা পাঞ্জাবী আর তার তলায় ছেঁড়া গেঞ্জিটা খোলে, দু'হাতের তালুতে সমস্ত মুখটা একবার ঘষে মেজে নেয়। তার পর হাঁটুর নীচে মণির পায়ে হাত দিয়ে দেখে বলে, কই, জ্বর তো হয়নি ? গা তো বেশ ঠাণ্ডা।

জ্বর হয়েছে কে বলল ?

কেউ বলেনি। শুনলাম তোমার কি যেন হয়েছে, ভয়ানক ছটফট কচ্ছ, সবাইকে ধমকাচ্ছ—

মণি চুপ করে থাকে।

এখন বুঝতে পারছি, আসলে তোমার হয়েছে জ্বালা। তুমি ভাবছ, কি সর্ব্বনাশ, এখানে পালিয়ে এলাম, এখানেও দাঙ্গা ? ভাবতে গিয়ে তোমার সারা জীবনের ক্ষোভটা নাড়া খাচ্ছে, এই বিশ্রী বাস্তব থেকে কি কিছুতে মুক্তি নেই ? কি তুচ্ছ মানুষ, কত অসহায়, জীবনটা কি বিশ্রী ! রাগে-অভিমানে তোমার মেজাজটা গিয়েছে বিগড়ে।

যদি গিয়েই থাকে ? আমার রাগ অভিমান হওয়া কি অকারণ ? আমার মেজাজ বিগড়োতে পারবে না এমন কোন আইন আছে ?

প্রণব আশ্চর্য্য হয়ে জবাব দেয়, আছে বৈ কি। তুমি অকারণে অন্যের উপর রাগ অভিমান করবে কিসের অধিকারে? মেজাজ খারাপ করে কেন তুমি অন্যকে দোষী বানাবে, কেউ তো কোন দোষ করেনি !

আমি যদি নিজের মনে—

নিজের মনে ? অভিমান হল তোমার দশ জনের ওপর, সেটা নিজের মনে হয় কি করে ? তুমি কি বনে একা আছ—গাছ-পালার ওপর রাগ করছ ? দশ জন তোমার মনের মত নয় বলেই তো তোমার জ্বালা ?

মণি চুপ করে থাকে।

প্রণব গলা পালটে বলে, তুমি কি সুধীনের জন্য ভাবনায় পড়েছ ? ছেলেটা বিগড়ে যাবে, বিপদ-আপদ ঘটবে বলে—?

কি আশ্চর্য্য ঠাকুরপো, মণি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে, এখানে এসে থেকে ছেলেমেয়ের কথা আমার খেয়ালই থাকে না ! সুধীনটা সত্যি কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় বল ত ! কি করে ? ছেলে যদি আমার গোল্লায় যায়, আমি তোমায় দুষবো কিন্তু। আশাটার কি হয়েছে ত্যাখো, দু'দণ্ড কাছে থাকে তো আর সারা দিন পাত্তাই নেই। ছেলেমেয়েরা আমায় ত্যাগ করছে না কি ?

তুমিই হয় তো ওদের ত্যাগ করছ। প্রণব হেসে বলে।

সারাটা দিন কোথা দিয়ে কেটে যায় দুঃস্বপ্নের মত, দেহ-মন যেন ভোঁতা হয়ে আসে দুশ্চিন্তা ও হতাশার অবসাদে। সন্ধ্যার পর মণির দেহ-মন এক আশ্চর্য্য বিশ্রামের সুযোগ পায়।

রান্নাঘরে কাজ করতে করতে সরস্বতী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। মণি কলতলায় ছিল, সেইখানে গিয়ে সরস্বতী বমি আরম্ভ করে। চোখের পলকে মণি ভুলে যায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অশান্তি দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এমন ভাবে যে সরস্বতীকে সামলে উঠতে সাহায্য করে, শরীরের এই অবস্থায় বাড়াবাড়ি করার জন্য বকে, বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয় যে মনে হয় একটি অসুস্থ মেয়েকে সেবা করার সুযোগের জন্য তার দেহ-মন যেন উৎকর্ণ হয়েছিল। পাখার বাতাস করতে করতে মায়ের মত সে সরস্বতীকে বকে, মেয়েছেলের এটুকু হিসেব থাকা দরকার। সময় মত খাবে না, আগুনের আঁচে পঞ্চাশ জনের পিণ্ডি রাঁধবে, একটা তোমার বিপদ হতে কতক্ষণ ?

চোখ বুজে শুয়ে শুয়েই সরস্বতী বলে, কিছু হবে না। আমাদের কিছু হয় না।

হয় তো তাই। কারণ, এত বলার পরেও কয়েক মিনিটের মধ্যে সরস্বতী উঠে বসে।

উঠলে কেন আবার ? শুয়ে থাকো না।

কমে গেছে। একটু খবর শুনি গে।

গা গুলিয়ে বমি করে বিছানা নিয়েছিল পোয়াতি মেয়েমানুষ, খবর শোনার তাগিদে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। খবর শোনার এই একটা অদ্ভুত নেশা আছে এ-বাড়ীর মানুষের। সারা দিন প্রাণের ধাক্কায় এই উদ্ভট নগরে এদিক্ ওদিক্ চরে বেড়ায় এ-বাড়ীর মানুষ, এ-পাড়ার মানুষ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মত মহা দাঙ্গাও সে চরে বেড়ানোকে একেবারে বন্ধ করতে পারেনি। পারলে অবশ্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব কিছুই বন্ধ হত সঙ্গে সঙ্গে। যে নগরে কেউ নড়ে-চড়ে না সে নগরে কে দাঙ্গা করে, কে-ই বা চায় স্বাধীনতা, আর কে-ই বা লড়ে নেয় পাকিস্তান। শ্মশানে বা কবরখানায় দাঙ্গাকারীরা ভুলেও উঁকি মারবে না, সেখানে তাদের কোন স্বার্থ নেই। সবাই চরে বেড়াবে, সকলকে মজাসে চরিয়ে নিয়ে বেড়ানোর জন্যই তো এ কারসাজি। এ নগরটা কেন, সারা জগতে তাই।

জীবনের ধাক্কায় দাঙ্গায় উন্মত্ত নগরে সারা দিন চরে বেড়িয়ে সন্ধ্যার সূত্রপাতে তাড়াতাড়ি সবাই বাড়ী ফেরে, সাতটা-সাড়ে সাতটার মধ্যে তপ্ত ডাল-ভাত পেটে পুরে দেয়, যেন মন্বন্তরের জলজ তরল খিচুড়ি-ভোগের আসামী এরা সকলেই। তার পর ছাতে বসে পরস্পরের সঙ্গে খপরা-খপর আদান-প্রদান করে। পাড়ায় দু'-চার জন মেয়ে-পুরুষও আসে। সারা দিন তারা কি দেখেছে কি বুঝেছে কি জেনেছে সাধারণ আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্কের মধ্যে তারই আদান-প্রদান।

পাড়ায় একটা শক্তিশালী শান্তি কমিটি গঠনের কাজে প্রণব ব্যস্ত হয়েছিল। শান্তি কমিটি গড়তেও অবিশ্রান্ত

বাধা-বিঘ্ন-প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়, তবে তার সঙ্গতিটা অনুমানযোগ্য। দাঙ্গা আপনা থেকে অকারণে বাধেনি, যে সক্রিয় শক্তি দাঙ্গা চায় স্বভাবতই শান্তি তার পছন্দসই হতে পারে না। সেদিন সকালের হাঙ্গামায় নানীকে ধরে মোট খুন হয়েছে চার জন, চার জনেই বস্তির লোক। আহত আঠার জন, প্রায় অর্দ্ধেক বস্তির। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, দু'দিক থেকে সংঘর্ষ বাধবার মুখে মাঝখানে আটক-পড়া সত্ত্বেও বস্তির একাংশ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বাধা দিয়ে দাঙ্গা ঠেকাবার চেষ্টা করেছিল, বস্তির উপরেই আঘাতটা পড়েছে বেশী। ভস্মস্তূপের এক দিকে কয়েকটা আগুনে ঝলসানো ধোঁয়ায় বিবর্ণ ঘর ও কয়েকটা ভাল ঘর বস্তির চিহ্ন হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। লুঠপাট হয়েছে প্রচুর—লুঠপাটের হিসাব করতে বসলে সন্দেহ জাগে যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে অথবা এটা বড় রকমের একটা ডাকাতি? বড় ঘটনার পর ছাড়া ছাড়া ভাবে দু'-একটা ছোরা মারা, ইট ও এসিড ছোঁড়ার বিভিন্ন ঘটনা ঘটে চলেছে। উত্তেজনা আকাশে চড়ে আছে, গুজবের পর গুজব ছড়াচ্ছে। বিকাল পাঁচটা থেকে সকাল পাঁচটা অবধি কারফিউ। দিনের বেলা কোন্ রাস্তায় কতটায় কাদের চলা নিরাপদ, কোন্ অংশে বিপদের ভয় আর কোন্ অংশে পদার্পণ মাত্র সুনিশ্চিত মরণ, মোটামুটি নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় দিন কালু প্রণবের সঙ্গে দেখা করে, অন্যত্র। তার কাছে শোনা যায়, দাঙ্গা ঘটাবার এই নূতন পরীক্ষার পরামর্শ ও নানীর ভাগ্যের কথা। একসঙ্গে এক ঘটনায় দু'টি সম্প্রদায়ের লোককেই ক্ষেপিয়ে তোলার বুদ্ধিটার আদি উদ্ভব নাজেরালির মস্তিষ্কে। তার প্রস্তাব ছিল এদিকের এই মন্দির আর ওদিকে বস্তির উত্তর দিকের পাড়ায় যে ছোট মসজিদটি আছে সেটি অপবিত্র করা। ইয়াসিন এটা সংশোধন করে, স্পষ্ট জানায় যে অন্তত একটা খুন চাই, নইলে এদিকের যা অবস্থা তাতে সুফল আশা করা যায় না। সিংহী এতে সায় দেয়, খুনের রক্ত না দেখলে মানুষের মাথায় না কি খুন চড়বে না। তার পর তাদের মধ্যে না কি জোরালো কথা-কাটাকাটি চলে কাকে উৎসর্গের বলি করা হবে তাই নিয়ে। সে কোন্ ধর্ম্মের হবে তাই নিয়ে তর্ক নয়, এ বিষয়ে তাদের এতটুকু মতানৈক্য ছিল না। এদিকে মুসলমানরা একটু দুর্ব্বল, তারা হাঙ্গামা এড়িয়ে গা বাঁচিয়েই চলতে চায়, সুতরাং তাদের ক্ষেপাতেই খুনের তেজী উত্তেজনা দরকার। সিংহী বলেছিল নানীর নাম, ঝগড়া হয় ওই নানীকে নিয়ে। নাজেরালির এক শত্রু আছে, পাড়াতেই থাকে, পাঞ্জাবের এক জন মুসলমান ভদ্রলোক। এ লোকটিকে মেরে ফেলে রাস্তায় ফেলে রাখলে হৈ-চৈ উত্তেজনা বেশী হবে, এ থাকতে বস্তির তুচ্ছ নানীকে কেন? অনেক তর্কের পর শেষ পর্য্যন্ত ইয়াসিনও সিংহীর মতে সায় দিলে নানীকে শেষ করা ঠিক হয়। ইয়াসিন একটা জোরালো যুক্তি দেয়। নাজেরালির শত্রুটিকে কাজে লাগালে উত্তেজনা বেশী হবে বটে, কিন্তু যতই হোক মানুষটার খানিক ওজন আছে, শেষ কালে অন্য দিকে হাঙ্গামা হলে ধাক্কা সামলাবে কে? ওর মধ্যে ইয়াসিন নেই! তার চেয়ে বস্তির তুচ্ছ নানীই ভাল।

কি কুক্ষণেই নানী রেশনের দোকানে সিংহীকে অপমান করেছিল! অন্য সময় অন্য অবস্থায় এ অপমান হজম হয়ে যেত সিংহীর, তুচ্ছ নানীর তুচ্ছ খোঁচা বিকারের উঁচু সুরে বাঁধা তার কর্ম্মবহুল জীবনের মজাদার চিন্তার ফাঁকে কোথায় তলিয়ে যেত। দাঙ্গা বাধাবার প্রস্তুতি সম্পর্কে পরামর্শ করতে গিয়ে নানীর কথাটা হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল। কথাটা ভাবতে বড় মজা লাগল সিংহীর।

এমনি সময় সকালে এক দিন যতীন আচমকা সুশীলকে ডেকে পাঠাল। তার আহ্বান নিয়ে একেবারে তার গাড়ী এসে দাঁড়াল দরজায়।

সুশীল বলল, চালের কথা বলব না কি?

মণি বলল, না। এরা চায় না, আমাদের বাহাদুরী করে দরকার?

অনেক কৌতূহল ও প্রত্যাশা নিয়ে সুশীল লাখপতি বন্ধুর কাছে যায়, অভ্যর্থনা পায় কল্পনাতীত। তাকে বসতে বলে ক্রুদ্ধ গম্ভীর মুখে তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে যতীন ঝাঁঝালো গলায় বলে, তুমি এমন বিশ্বাসঘাতক! এত বড় বজ্জাত তুমি! আমি তোমার উপকার করলাম, তার বদলে তুমি আমার ষোল হাজার টাকার চাল ধরিয়ে দিলে? [ক্রমশঃ

আগামী সংখ্যা থেকে

নূতন উপন্যাস

জন্মদিন

অমলা দেবী

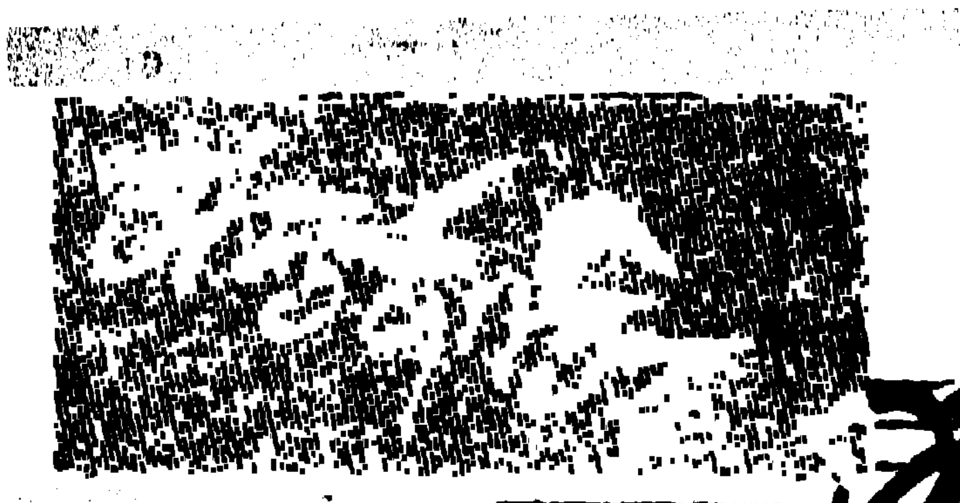

পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

জাতিপুঞ্জের প্যারী সম্মেলন—

২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) মঙ্গলবার প্যারী নগরীর Palaise De Chaillotএ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের তৃতীয় সাধারণ অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবীর ৫৮টি জাতি এই অধিবেশনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। পৃথিবীর ৭০টি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের জন্য সাধারণ পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত হইবে। সাধারণ পরিষদের অধিবেশন ১০ হইতে ১২ সপ্তাহ ধরিয়া চলিবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই অধিবেশনের কর্ম্মসূচী যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাশিয়া এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে মতানৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল সমস্যা যে দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছে, সে-কথাও অনস্বীকার্য্য। গত এক বৎসরে জাতিপুঞ্জ যে-সকল সমস্যার সমাধান করিতে ব্যর্থ হইয়াছে তন্মধ্যে পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণ, অস্ত্র-শস্ত্র হ্রাস করার ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক পুলিশবাহিনী গঠন, প্যালেষ্টাইন, কোরিয়া ও বলকান সমস্যা এবং ভেটো সমস্যা অন্যতম। পরমাণু-শক্তি কমিশন পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। সাধারণ পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে এই সমস্যা লইয়া আলোচনা হইবে। কিন্তু আলোচনার ফল কি হইবে? আমেরিকা যে রাশিয়ার প্রস্তাব মানিয়া লইবে না, সে-কথা নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আমেরিকা ও বৃটেনের উপগ্রহের সংখ্যাই বেশী। সুতরাং সাধারণ পরিষদ যে পরমাণু-শক্তি কমিশনের ব্যর্থতার দায়িত্ব রাশিয়ার ঘাড়ে চাপাইয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিবে, এ-কথা মনে করিলে ভুল হইবে না। ভেটো সমস্যা আর একটি দুর্ভেদ্য সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। যদিও বৃটেন ও আমেরিকা ভেটো ক্ষমতার ব্যবহার কম করে নাই, তথাপি ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়িত্ব রাশিয়ার ঘাড়েই চাপান হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বৃটেন এবং আমেরিকার উপগ্রহের সংখ্যাই বেশী। সংখ্যাধিক্যের জোরে তাহাদের পছন্দমত যে কোন প্রস্তাব তাহারা পাশ করিয়া লইতে সমর্থ। ভেটো ক্ষমতার প্রয়োগ ছাড়া রাশিয়ার আর কোন গত্যন্তর নাই। বর্ত্তমান অধিবেশনে বৃহৎ রাষ্ট্রপঞ্চকের ভেটো ক্ষমতা বিলোপ বা সীমাবদ্ধ করিবার জন্ত জাতিপুঞ্জ সনদের ১০৯ ধারা অনুযায়ী সাধারণ সম্মেলন আহ্বানের ব্যবস্থা হইবে কি? রাশিয়ার মুখপাত্রগণ বহু বার দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিয়াছেন যে, ভেটো ক্ষমতাকে কোনরূপে সীমাবদ্ধ করিতে তাঁহারা রাজী হইবেন না। অন্যান্য রাষ্ট্রশক্তিবর্গ ভেটো ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার জন্ত খুব বেশী জেদ প্রকাশ করিলে জাতিপুঞ্জের সহিত রাশিয়ার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার সম্ভাবনা উপেক্ষার বিষয় হইবে না। রাশিয়া যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাহা হইলে জাতিপুঞ্জসঙ্ঘই যে শুধু দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে তাহা নয়, আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

সাধারণ পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে জার্ম্মাণী ও জাপান সম্পর্কে বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের একমত হওয়ার প্রশ্ন যে বিশেষ স্থান গ্রহণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমস্যারও কোন সমাধান সম্ভব হইবে কি? বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে ফ্রান্স বর্ত্তমানে গুরুতর সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিতেছে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রনায়করা যে বৃটেন ও আমেরিকার নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছেন তাহাতে সন্দেহ না থাকিলেও জার্ম্মাণীর প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁহারা বৃটেন ও আমেরিকার সহিত একমত নহেন। আবার জার্ম্মাণী সম্পর্কে রাশিয়ার মতও তাঁহারা সমর্থন করেন না। তাঁহারা চান জার্ম্মাণীর উপর তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা আরও দৃঢ় করিতে। কিন্তু ফ্রান্স বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে চলিবে তাহাও আশা করা যায় না। জার্ম্মাণীর সমস্যার ক্ষুদ্র সংস্করণ বার্লিন-সমস্যা লইয়াও জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। মস্কো নগরীতে দীর্ঘ সাত সপ্তাহব্যাপী আলোচনার পরেও বার্লিন-সমস্যা সম্বন্ধে কোন কূলকিনারা হয় নাই। হয়ত বার্লিন পরিস্থিতিও সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। কোরিয়া সম্পর্কে রাশিয়া ও আমেরিকার বিরোধ মিটাইবার জন্য জাতিপুঞ্জের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। রাশিয়া ও আমেরিকা কোরিয়ায় তাহাদের অধিকৃত নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সাধারণ পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে এই সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব হইবে কি? রাশিয়া ও আমেরিকা যে নিজ নিজ সুবিধা ছাড়িতে চাহিবে তাহার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। উত্তর আফ্রিকার স্বাধীনতা কমিটি (The Committee for Freedom of North Africa) এই মর্ম্মে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা টিউনিশিয়া-ফরাসী বিরোধটি প্যারীতে নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করিবেন। ফ্রান্স টিউনিশিয়াকে তাহার ন্যায়সঙ্গত সার্ব্বভৌম অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে—টিউনিশিয়ার জাতীয়তাবাদীরা অভিযোগ করিতেছেন। বৃটিশ পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ (British West Indies) হইতে এক দল প্রতিনিধি স্বায়ত্তশাসন দাবী করিবার জন্ত লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের দাবী জাতিপুঞ্জের সমক্ষে উত্থাপন করিবার কথাও চিন্তা করিতেছেন। ঔপনিবেশিক সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য পূর্ব্ব-আফ্রিকা হইতেও এক দল প্রতিনিধি লণ্ডনে যাইবেন। জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ঔপনিবেশিক প্রশ্নও উত্থাপিত হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উপনিবেশগুলি সম্পর্কে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য ১৬টি দেশের ১৬ জন প্রতিনিধি লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই কমিটি সম্পর্কে আমরা স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ এশিয়া ও আফ্রিকার ৭৪টি দেশ শাসন করিতেছে। এই সকল দেশের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের নাই। ট্রাষ্টিশিপ হইয়াছে সাম্রাজ্যের নূতন নাম। সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জ যদি এই ১৪টি দেশের স্বাধীনতা লাভের ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা কিরূপে করা সম্ভব ?

এই অধিবেশনে নূতন সদস্য গ্রহণের প্রশ্ন আবার উত্থাপিত হইবে। সিংহল যে জাতিপুঞ্জের সদস্য হইবার জন্ম আবার আবেদন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। চিলি ইটালীকে জাতিপুঞ্জের সদস্য করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিবে। কিন্তু ফিনল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও আলবানিয়াকে জাতিপুঞ্জের সদস্য করা সম্পর্কে বৃটেন ও আমেরিকা যদি ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করা পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে রাশিয়া সিংহল, ইটালী ও অন্যান্য দেশের সম্পর্কেও ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করা ছাড়িবে না। আর্জেণ্টিনা আবার হয়ত স্পেনকে জাতিপুঞ্জের সদস্য করিবার প্রস্তাব করিবে। আয়ারও সদস্য হওয়ার জন্য পুনরায় আবেদন করিবে। স্পেনকে জাতিপুঞ্জের সদস্য করার সম্ভাবনা খুব কম। তবে আয়ারের আবেদন মঞ্জুর হইতেও পারে। কাশ্মীর কমিশনের রিপোর্ট, দক্ষিণ-আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার শাসন পরিচালন সংক্রান্ত রিপোর্ট, এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা ও ভারতের বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ও সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত ও আলোচিত হইবে। কাশ্মীর কমিশন সম্ভবতঃ কাশ্মীর বিভাগের সুপারিশ করিবে। কিন্তু কি ভারত ও কি পাকিস্তান কেহই কাশ্মীর বিভাগে রাজী হইবে না। ট্রাষ্টীশিপ কাউন্সিলের ব্যাপারও যে আলোচিত হইবে তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নিরাপত্তা পরিষদের ছয় জন অস্থায়ী সদস্য নির্ব্বাচনের ব্যাপারও এই অধিবেশনে উত্থাপিত হইবে। ভারত এই ছয়টি সদস্যপদ ন্যায়সঙ্গত ভৌগোলিক ভিত্তিতে বণ্টন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিবে। ভারতের এবার নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। নিজাম আত্মসমর্পণ এবং তাঁহার প্রতিনিধিমণ্ডলীকে জাতিপুঞ্জে আবেদন উত্থাপন করিতে নিষেধ করিলেও কতগুলি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র হায়দ্রাবাদের প্রশ্নও জাতিপুঞ্জে উত্থাপন করিতে চেষ্টা করিবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের বর্ত্তমান তৃতীয় অধিবেশনে উল্লিখিত এবং আরও অনেক গুরুতর বিষয় উত্থাপিত এবং আলোচিত হইবে। কিন্তু জাতিপুঞ্জ এই সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারিবে কি ? তৃতীয় মহাযুদ্ধের আয়োজনকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্যই যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘকে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে জাতিপুঞ্জের প্রতি বিশ্ববাসী আস্থা রাখিতে পারিবে কি ? গত এক বৎসরের অবস্থা আলোচনা করিলে মনে হয়, সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশনেও রাশিয়া ও পশ্চিমী শক্তির মধ্যে মতানৈক্যই শুধু প্রতিফলিত হইবে মাত্র।

উপনিবেশ ও জাতিপুঞ্জ—

স্বায়ত্তশাসনহীন দেশগুলি সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে বিশেষ কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, জেনেভা সহরে উক্ত কমিটির দশ দিনব্যাপী অধিবেশন গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে শেষ হইয়াছে। পৃথিবীর ৭০টি উপনিবেশের উপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিদর্শন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য রাশিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছিল, কমিটি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কমিটি সিদ্ধান্ত করেন যে, এইরূপ প্রস্তাব তাহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত। ভারত যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিল, তাহার ভিত্তিতে একটি আপোষ প্রস্তাব কমিটি গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে উপনিবেশগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল রিপোর্ট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রেরিত হইবে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য আগামী বৎসর এই কমিটির অনুরূপ কমিটির অধিবেশন হইবে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, একমাত্র মিশর ছাড়া আর কোন দেশ রাশিয়ার প্রস্তাব সমর্থন করে নাই। উপনিবেশগুলি সম্পর্কে যে-সকল রিপোর্ট পাওয়া যাইবে, সেগুলি বিবেচনা করিয়া সাধারণ পরিষদের নিকট রিপোর্ট পেশ করিবার জন্য এই বিশেষ কমিটির স্থায়ী অস্তিত্ব রক্ষা করিতে উপনিবেশের মালিকগণ রাজী হন নাই।

উপনিবেশ সম্পর্কে রাশিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছিল তাহার সার মর্ম্ম এখানে উল্লেখ করা হইল। (১) উপনিবেশগুলিতে স্বায়ত্ত-শাসনের অগ্রগতি সম্বন্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট নিয়মিত ভাবে রিপোর্ট প্রদান করিতে উপনিবেশ সমূহের মালিকগণ বাধ্য থাকিবেন। (২) উপনিবেশগুলির অবস্থা পরিদর্শনের জন্য প্রতি বৎসর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষক প্রেরিত হইবে। (৩) উপনিবেশের জনগণকে জাতিপুঞ্জের বিবেচনার জন্য আবেদন করিবার অধিকার দিতে হইবে। (৪) মালিকগণ উপনিবেশগুলির অর্থ-নৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় যে বিবরণ প্রদান করিবেন তাহার সহিত যুক্ত হইবার জন্য উপনিবেশ হইতে কাহারও ব্যক্তিগত ভাবে প্রেরিত বা স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট প্রেরণের সুবিধা প্রদান করিতে হইবে। যাঁহারা উপনিবেশ সমূহের স্বাধীনতা-কামী তাঁহারা রাশিয়ার এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে আপত্তি করিবার কিছুই দেখিতে পাইবেন না। তবু রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল কেন ?

নিম্নলিখিত ১৬টি রাষ্ট্র লইয়া এই কমিটী গঠিত :—(১) বৃটেন, (২) বেলজিয়ম, (৩) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, (৪) ফ্রান্স, (৫) অষ্ট্রেলিয়া, (৬) ডেনমার্ক, (৭) হল্যাণ্ড, (৮) নিউজিল্যাণ্ড, (৯) রাশিয়া, (১০) ভারত, (১১) চীন, (১২) মিশর, (১৩) সুইডেন, (১৪) কলম্বিয়া, (১৫) কিউবা, (১৬) নিকারাগুয়া। এই ১৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম আটটি এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশ সমূহের মালিক। ইহাদের অধীনে ৭৪টি উপনিবেশ রহিয়াছে। একা বৃটেনেরই উপনিবেশ ৪২টি। এইরূপ ক্ষেত্রে অন্ততঃ ৮টি ভোট রাশিয়ার প্রস্তাবের পক্ষে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাশিয়ার প্রস্তাবের পক্ষে রাশিয়া এবং মিশরের ভোট ছাড়া আর কাহারও ভোট পাওয়া যায় নাই। উপনিবেশ সমূহের মালিকগণ চিরকাল উপনিবেশগুলিকে তাহাদের অধীনে রাখিতে চায় এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিকাংশ দেশই মালিকদেরই সমর্থক।

ইউরোপীয় পার্লামেণ্ট—

ইণ্টারলেইকেনে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় পার্লামেণ্টারী কংগ্রেসের অধিবেশনে গত ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য দশ দফা-সম্বলিত একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। একটি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে সমগ্র ইউরোপকে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। ইউরোপের তেরটি পার্লামেণ্টের দুই শত বেসরকারী সদস্য এই কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন।

১লা সেপ্টেম্বর এই কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। বৃটিশ পার্লামেণ্টের শ্রমিক-সদস্য মিষ্টার আর, ডব্লু, জি, মেক্যে ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পরিকল্পনা উত্থাপন করেন। তিনি প্রথম যে পরিকল্পনা গঠন করিয়াছিলেন তাহা হইতে অনেক বাদ দিয়া এই পরিকল্পনা উপস্থিত করা হয়। তাঁহার মূল পরিকল্পনায় ইউরোপীয় পার্লামেণ্টকে কূটনৈতিক বিভাগ, রক্ষা-ব্যবস্থা, পুলিশ বাহিনী, চলাচল-ব্যবস্থা, জন-স্বাস্থ্য, ইমিগ্রেশন, শুল্ক-ব্যবস্থা এবং মুদ্রা-ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। মূল পরিকল্পনাটি সংশোধিত আকারে উত্থাপিত হইলেও বৃটিশ রক্ষণশীল দল হইতে প্রেরিত প্রতিনিধির উহা পছন্দ হয় নাই। বৃটিশ রক্ষণশীল দল এবং উদারনৈতিক জাতীয় দল ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে এত অধিক ক্ষমতা দেওয়া পছন্দ করেন না। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির একটা শিথিল ইউনিয়নই তাঁহারা পছন্দ করেন। উল্লিখিত পরিকল্পনার প্রতিবাদ বৃটিশ রক্ষণশীল প্রতিনিধি মেজর রবার্ট অধিবেশন হইতে চলিয়া যান।

এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ইউরোপের ১৬টি রাষ্ট্র এবং পশ্চিম জার্ম্মাণী লইয়া একটি ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে এবং ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবার অধিকার থাকিবে। ইউরোপীয় পার্লামেণ্ট সিনেট এবং চেম্বার অব ডেপুটীস্ এই দুইটি পরিষদে বিভক্ত হইবে। এই পার্লামেণ্ট বিভিন্ন রাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত হইবে এবং উভয় পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত একটি পরিষদের হাতে পরিচালন ক্ষমতা (Executive Power) ন্যস্ত থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ভালরূপে গবর্ণমেণ্ট পরিচালনের জন্য এই পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। বিচার-ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের হাতে ন্যস্ত থাকিবে। ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্য শুল্ক এবং সমান শুল্ক প্রবর্ত্তন সম্পর্কে ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারিবেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেণ্টের সম্মতি ব্যতীত কোন রাষ্ট্র বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী বা সামরিক বাহিনী গঠন করিতে পারিবে না। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল রাষ্ট্রের অধিবাসীরাই সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির উপনিবেশ সমূহের সমস্যা তদন্ত করিবার জন্য ইউরোপীয় পার্লামেণ্ট কমিশন গঠন করিবেন। পার্লামেণ্ট নূতন কোন রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন। উভয় পরিষদের সংখ্যাধিক্যের ভোটে শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে।

ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ব্রিঁয়েও এক সময়ে ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা ভাবিয়াছিলেন। বেলজিয়ম ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সরকারী ভাবে উহা সমর্থন করিতেছেন। এই পরিকল্পনা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টেরও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিবার সময় এখনও আসে নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রদত্ত অর্থের বণ্টন লইয়া মাসব্যাপী যেরূপ অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিলে, ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভরসা করা কঠিন। এই অচল অবস্থার সমাধান হইয়া মার্শাল-সাহায্য বিভিন্ন সাহায্য-প্রাপ্ত দেশের মধ্যে বণ্টন করার ব্যবস্থা অবশ্য হইয়াছে। কিন্তু ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র উহা অপেক্ষাও কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করিবে।

চতুর্থ রিপাবলিকের সঙ্কট—

প্রায় ১ বৎসর ৪ মাস পূর্ব্বে যখন মন্ত্রিসভায় কম্যুনিষ্টদের গ্রহণ না করা স্থির হয়, সেই সময় হইতে ফ্রান্সে যে পুনঃ পুনঃ মন্ত্রিত্ব-সঙ্কট দেখা দিতেছে তাহার ফলে চতুর্থ রিপাবলিকের অস্তিত্বই এখন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। গত ২৬শে জুলাই মঃ আন্দ্রে ম্যারী যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন ২৮শে আগষ্ট উক্ত মন্ত্রিসভার পতন হয়। কয়েক দিনের চেষ্টার পর মঃ রবার্ট সুম্যানের প্রধান মন্ত্রিত্বে ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মঃ সুম্যানের ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা। গত জুলাই মাসে তাঁহার প্রথম মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। কিন্তু ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় মন্ত্রিসভারও পতন হয়। অতঃপর রেডিক্যাল দলের নেতা মঃ হেরিয়েট মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহূত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সম্মত না হওয়ায় সোস্যালিষ্ট রেডিক্যাল নেতা মঃ আঁরি কোয়েল মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। গত ১০ই সেপ্টেম্বর ফরাসী নেশন্যাল এসেম্বলীতে ৩৫১—১৯৬ ভোটে তাঁহার প্রধান মন্ত্রিত্ব অনুমোদিত হয়। তাঁহার মন্ত্রিসভা কত দিন স্থায়ী হইবে তাহা বলা কঠিন। ফ্রান্স যেন ক্রমশঃ জেনারেল দ গলের আশা পূর্ণ করিবার পথেই অগ্রসর হইতেছে।

জার্ম্মাণীতে যে অবস্থার মধ্যে হবাইমার রিপাবলিকের পতনে হিটলারের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ফ্রান্সের বর্ত্তমান অবস্থা প্রায় তাহারই অনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে। তৎকালীন জার্ম্মাণীর মত ফ্রান্সেও শ্রমিক-শ্রেণী দ্বিধা-বিভক্ত, সোশ্যালিষ্টরা 'lesser evil' নীতি অনুসরণ করিয়া দক্ষিণ-পন্থীদেরই শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ লোক যে ভাবে হিটলারের নেতৃত্বে সমবেত হইয়াছিল, জেনারেল দ গল তাঁহার জনপ্রিয়তার অভাব সত্ত্বেও সেই অবস্থার দিকেই অগ্রসর হইতেছেন।

অমীমাংসিত বার্লিন-সঙ্কট—

তিন মাস ধরিয়া যে বার্লিন সঙ্কট চলিতেছে তাহার সমাধানের কোন সম্ভাবনা আজিও দেখা যাইতেছে না। ২৪শে জুন রুশ-কর্ত্তৃপক্ষ পশ্চিম-জার্ম্মাণী হইতে বার্লিনে যাওয়া-আসার পথ রুদ্ধ করায় এই সঙ্কট আরম্ভ হইয়াছে। এই সঙ্কট সমাধানের জন্য বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ ৩রা আগষ্ট হইতে সোজাসুজি রুশ-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন। এক সময়ে মস্কো আলোচনা সাফল্য লাভ করিবে বলিয়া সকলের মনেই আশার সঞ্চার হইয়াছিল। মুদ্রা-সমস্যা ও অবরোধ-সমস্যা সমাধানের জন্য জার্ম্মাণীর বৃটিশ, ফরাসী, মার্কিণ এবং রুশ সামরিক গভর্ণর-চতুষ্টয় মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদ-গৃহে (Allied Contról Council building) আলোচনা চালাইতেছিলেন। বার্লিন হইতে ৮ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে দেখা যায়, মতৈক্য হওয়া সম্বন্ধে তখনও প্রবল বাধা বর্ত্তমান। ইতিমধ্যে কম্যুনিষ্টরা বার্লিনে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তাহাও এখানে উল্লেখযোগ্য। [illegible] আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে [illegible] বিক্ষোভ-প্রদর্শনকারীরা দুইবার বার্লিন সিটি-হল হানা [illegible]-এসেম্বলীর অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দেয়। [illegible]

হইতে প্রেরিত ৬ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ঐ তারিখে দুই হাজার হইতে চারি হাজার কম্যুনিষ্ট-পরিচালিত বিক্ষোভ-প্রদর্শনকারী রক্তপতাকা লইয়া এবং আন্তর্জ্জাতিক সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বার্লিন সিটি-হলে হানা দিয়া সিটি-এসেম্বলীর অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে তিন বার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে।

দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা সত্ত্বেও মীমাংসার কোন লক্ষণ দেখা না দেওয়ায় প্যারী নগরীতে সম্মিলিত বৃটিশ, ফ্রান্স এবং মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিব মস্কো হইতে তাঁহাদের প্রতিনিধিদিগকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। রাশিয়ার নিকট নূতন করিয়া পত্র দিবার জন্য তিন জন সদস্য লইয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গের একটি ষ্টাণ্ডিং কমিটিও গঠিত হইয়াছে। প্যারীতে ত্রিশক্তির বৈঠককে ঠিক সম্মেলন হয়ত বলা যায় না। কিন্তু বার্লিন সম্পর্কে কোন মীমাংসা হওয়ার আশা করা যায় কি না, ত্রিশক্তির প্রতিনিধিদের নিকট মঃ মলোটভের শেষ উত্তরের মধ্যে আরও আলোচনা চালাইয়া ফল পাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় কি না, এই বিষয়ে তাঁহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। মলোটভের উক্তি হইতে আলাপ-আলোচনার দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া না কি বুঝা যায় না। কিন্তু বার্লিণ সংক্রান্ত আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হইবে, এইরূপ ভরসা করার মত কোন ইঙ্গিতও না কি তাঁহার উক্তিতে নাই। বস্তুতঃ, আরও আলাপ-আলোচনা চালাইবার দায়িত্ব ত্রিশক্তির উপরেই ন্যস্ত হইয়াছে।

পশ্চিমী শক্তিত্রয় আরও আলোচনা চালাইবেন, না সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বিষয়টি উত্থাপন করিবেন, ইহাই এখন প্রশ্ন। বার্লিন সমস্যা জাতিপুঞ্জের নিকট উপস্থিত করার অর্থ এই দাঁড়াইবে যে, পশ্চিমী নীতি এখনও সুনির্দ্দিষ্ট আকার গ্রহণ করে নাই। প্রকৃত পক্ষে ত্রিশক্তিকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। নিরাপত্তা পরিষদে বার্লিন-সমস্যা উত্থাপিত হইলে রাশিয়া ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে। সাধারণ পরিষদে অবশ্য ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের সমস্যা নাই। কিন্তু কিছু করিবার ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের নাই। 'প্রাভদা' পত্রিকা ইতিপূর্ব্বে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, বার্লিন-সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এলাকার বহির্ভূত। কিন্তু শীতকাল ঘনাইয়া আসিতেছে, সে-কথাও সকলের মনে না পড়িয়া পারিবে না। শীতকালে পশ্চিম-বার্লিনে বিমানযোগে খাদ্য সরবরাহ করা আরও কঠিন হইয়া পড়িবে। রাশিয়ার চাপ আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কাও উপেক্ষার বিষয় নহে। অবশ্য পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের সৈন্য পশ্চিম-বার্লিনে থাকিবেই। কিন্তু বার্লিন সহরটি সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণীর রুশ এলাকার মধ্যে এ-কথাও উপেক্ষার বিষয় নহে।

বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস—

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে মারগেটে (Margate) বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়া গেল তাহাকে স্কারবোরো সম্মেলনের প্রতিধ্বনি বলিলেও খুব বেশী ভুল হয় না। বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলির বর্ত্তমান সদস্য-সংখ্যা ৮০ লক্ষ। যুদ্ধের সময় হইতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্য সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্ব যাঁহাদের হাতে তাঁহারা তাহাদিগকে কোন পথে পরিচালিত করিতেছেন তাহার পরিচয় এ সম্মেলনে বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে। আইন করিয়া মুনাফা নিয়ন্ত্রণের জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা বিপুল সংখ্যাধিক্যের ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু নেতৃস্থানীয় বক্তারা এক দিকে সরকারী নীতি সমর্থন করিয়াছেন আর দিকে দাবী করিয়াছেন কঠোর হস্তে মূল্য হ্রাসের জন্য। চলাচল ও সাধারণ শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী মিঃ ডিয়াকিন বলিয়াছেন, "My members want to see the pound buy a pound's worth of goods." অর্থাৎ 'আমার ইউনিয়নের সদস্যবৃন্দ চান যে, এক পাউণ্ডে যেন এক পাউণ্ড মূল্যের পণ্যই পাওয়া যায়।" শিল্পপতিদের মুনাফা হ্রাস করা হইবে না, শ্রমিকদের মজুরিও কমিবে না অথচ দাম কমিবে, এই অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন হইবে কিরূপে? গবর্ণমেণ্ট যদি মূল্য বৃদ্ধি নিরোধের জন্য কঠোর হস্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই মজুরি বৃদ্ধির জন্য দাবী নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের কোন সার্থকতা আছে কি? মজুরি বৃদ্ধি করিলে শিল্পপতিরাও লাভের হার বৃদ্ধির জন্য দাম বাড়াইবেন। ফলে মজুরি বৃদ্ধিই শুধু অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইবে না, পণ্যের দাম বাড়িয়া বৃটেনের রপ্তানী-বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। উহার প্রতিক্রিয়া বৃটিশ শ্রমিকের পক্ষে বড় সুবিধাজনক হইবে না। এই কারণেই উল্লিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি নিরোধ সম্বন্ধে নিশ্চিত ভরসা নাই বলিয়াই সাহায্য বা 'সাবসিডি' বৃদ্ধি এবং ক্রয়-কর হ্রাস করিয়া শ্রমিকদের ক্রয়শক্তিকে বহাল রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

এই সম্মেলনে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন (W. T. U. C.) সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করা হইয়াছে। বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়নকে সমর্থন করিবার জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা বিপুল সংখ্যাধিক্যে অগ্রাহ্য হইয়াছে। মিঃ ডিয়াকিন বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়নকে সোভিয়েট নীতির একটি অস্ত্র এবং আর একটি প্ল্যাটফরম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু মালয়ে যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন চলিতেছে সে সম্বন্ধে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আমরা সংবাদে দেখিতে পাইলাম না। সম্মেলনে মিঃ ডিয়াকিনের বক্তৃতার মধ্যেই কে এক জন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মালয়ে হাজার হাজার সৈন্য পাঠাইতেছে কাহারা?" তাহার উত্তরে মিঃ ডিয়াকিন বলিয়াছেন, "যেখানেই কম্যুনিষ্ট সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট-দর্শন প্রচার করা সম্ভব সেইখানে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে ডেপুটেশন প্রেরণ করাই বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য।" মালয় সম্বন্ধে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অভিমতের পরিচয় এইখানেই পাওয়া যায়। বৃটিশ শ্রমিকরা যে বৃটিশ পুঁজিপতিদের মতই সাম্রাজ্যবাদী, মালয়ের ব্যাপারে তাহাই কি নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হইতেছে না?

পরলোকে ডক্টর বেনেস—

৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) চেকোশ্লোভাক জাতীয় রাষ্ট্রের অন্যতম স্রষ্টা, চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট ডক্টর এডোয়ার্ড বেনেস তাঁহার সেজিমোভো উস্তি-স্থিত বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পূর্ব্ব-ইউরোপের এক জন বিশিষ্ট বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রবাদীর জীবনাবসান হইল। গত জুন মাসের (১৯৪৮) প্রথম ভাগে দুর্ব্বল স্বাস্থ্য ও চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি হইতে উদ্ভূত সমস্যা সমূহের অজুহাতে তিনি প্রেসিডেণ্টের

পদ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পল্লীর বাসভবনে অবসর জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে চেকোশ্লোভাকিয়ায় অবিমিশ্র কম্যুনিষ্ট মন্ত্রিসভায় ডাঃ জ্যান মাসারিক পররাষ্ট্র-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মার্চ্চ মাসের প্রথম ভাগে ডাঃ মাসারিক অনিদ্রারোগ ও অসুস্থতার জন্য আত্মহত্যা করেন। তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যুতে ডাঃ বেনেসের প্রাণে যে গভীর আঘাত লাগিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাঃ মাসারিকের মৃত্যুর পরেও প্রায় তিন মাস তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পদত্যাগের তিন মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার জীবনাবসান হইল।

১৮৮৪ সালের ২৮শে মে চেকোশ্লোভাকিয়ার কোস্রাণী (Kozrany) গ্রামে ডাঃ বেনেসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতামাতা দরিদ্র ছিলেন বলিয়া কণ্টকাকীর্ণ পথেই তাঁহার জীবনের যাত্রা সুরু হইয়াছিল। ১৯০১ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত তিনি প্র্যাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর হইতেই মাতৃভূমি মুক্তি-সংগ্রামের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। প্রথম বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চেক ও শ্লাভ জাতি অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের নিপীড়নের মধ্যে বাস করিতেছিল। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া অধ্যাপক ডাঃ বেনেস প্রথম মহাযুদ্ধকে জাতীয় মুক্তির একটি ঐতিহাসিক সুযোগ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালের শরৎকালে তিনি তাঁহার রাজনৈতিক গুরুস্থানীয় ডাঃ টমাস মাসারিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পরিকল্পনার কথা তাঁহাকে জানান। ডাঃ টমাস মাসারিকও ঠিক অনুরূপ পরিকল্পনা অনুসারেই কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে মত-বিরোধের কোন অবকাশ ছিল না। উল্লিখিত প্রথম আলোচনার পরেই ডাঃ টমাস মাসারিক সুইজারল্যাণ্ডে চলিয়া যান এবং ডাঃ বেনেস প্র্যাগে থাকিয়া 'মাফিয়া' (Maffia) নামে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। তিনিই ছিলেন ঐ গুপ্ত সমিতির সেক্রেটারী। ডাঃ টমাস মাসারিক চেকোশ্লোভাকিয়ার বাহিরে যে আন্দোলন চালাইতেছিলেন ঐ আন্দোলনের সহিত মাফিয়ার সংযোগ রক্ষা করাই ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। অষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তিনি এড়াইতে পারেন নাই। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার গ্রেফ্‌তার হওয়ার আশঙ্কা যখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, তখন জাল পাশ-পোর্টের সাহায্যে তিনি ফ্রান্সে পলাইয়া যান। যাওয়ার সময় তিনি তাঁহার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারেন নাই। অতঃপর অষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার স্ত্রীকে বন্দী করিয়াছিলেন।

প্যারী নগরীতে চেকোশ্লোভাক নেশন্যাল কাউন্সিল গঠিত হয় এবং ১৯১৬ সাল হইতে ডাঃ বেনেস উহার সেক্রেটারী-জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯১৭ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখে ফ্রান্সের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মঃ ব্রিয়েঁ প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নিকট এক পত্র লিখিয়া জানান যে, চেকোশ্লোভাক জাতির মুক্তি-যুদ্ধের মিত্রপক্ষীয় উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং এই সময় হইতেই ডাঃ মাসারিক ও ডাঃ বেনেসের প্রচেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৯১৮ সালের ১ই আগষ্ট মিত্রশক্তিবর্গ সরকারী ভাবে চেকোশ্লোভাক জাতিকে স্বীকার করেন এবং ১৯১৮ সালের ১৮ই অক্টোবর প্যারী, লণ্ডন এবং ওয়াশিংটন হইতে স্বাধীন চেকোশ্লাভ গবর্ণমেণ্ট গঠনের কথা যুগপৎ ঘোষণা করা হয়। ডাঃ মাসারিক এই স্বাধীন চেকোশ্লাভ গবর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট এবং ডাঃ বেনেস পররাষ্ট্র এবং স্বরাষ্ট্র-সচিব নিযুক্ত হন। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায় এবং যুদ্ধের শেষে স্বাধীন চেকোশ্লাভ গবর্ণমেণ্ট দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চেকোশ্লাভ প্রজাতন্ত্র গঠন করেন। ১৯১৮ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত ডাঃ বেনেস চেকোশ্লোভাকিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব ছিলেন। কেবল মাঝখানে কিছু দিনের জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। জাতীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁহার মর্য্যাদা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বরে বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতার জন্য ডাঃ মাসারিক প্রেসিডেণ্টের পদ পরিত্যাগ করায় ডাঃ বেনেস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। চেকোশ্লাভ পার্লামেণ্টের ৪৪০ ভোটের মধ্যে ৩৪০ ভোট তাঁহার অনুকূলে হইয়াছিল।

১৯৩৩ সালে হিটলার কর্ত্তৃক জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত হওয়ার পর হইতেই ডাঃ বেনেস আক্রমণের বিরুদ্ধে সমগ্র ইউরোপকে সমষ্টিভূত নিরাপত্তার ভিত্তিতে গঠন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। অষ্ট্রীয়া অধিকার করিয়া হিটলার নজর দিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার দিকে। হিটলারের পৃষ্ঠপোষকতায় সুদেতেন জার্ম্মাণদের নেতা হেনলেইন স্বায়ত্তশাসন দাবী করেন। কিন্তু চেক-গবর্ণমেণ্ট যে অধিকার দিতে স্বীকৃত হন তাহা অগ্রাহ্য করা হয়। ১৯৩৮ সালের মে মাসে সীমান্ত প্রদেশে জার্ম্মাণী সৈন্য সমাবেশ করে এবং চেকোশ্লোভাকিয়াও আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে থাকে। আগষ্ট মাসে বৃটেন লর্ড রান্‌সিমেনকে (Lord Runcimen) মধ্যস্থতা করিবার জন্য প্রেরণ করে এবং চেক গবর্ণমেণ্ট আরও বেশী অধিকার দিতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু সুদেতেন জার্ম্মাণদের দাবী আর স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, তাহাদের দাবী জার্ম্মাণীর সহিত সংযুক্ত হওয়ার অধিকারের দাবীতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) তারিখে হিটলার যে বক্তৃতা দেন তাহাতে সুদেতেন জার্ম্মাণদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপকারী রাষ্ট্রগুলির প্রতি হুমকী দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর আপোষের আলোচনা ভাঙ্গিয়া যায় এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর হিটলার বলেন যে, তাঁহার দাবী পূরণ করা না হইলে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করিবেন। চেক গবর্ণমেণ্ট এই দাবী অগ্রাহ্য করিলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। অতঃপর মিঃ চেম্বারলেনের চেষ্টায় ২৯শে সেপ্টেম্বর মিউনিক সম্মেলন আরম্ভ হয়। এবং চেকদের স্বার্থ বলি দিয়া সাময়িক ভাবে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হইয়াছিল। নাৎসী আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিলেন ডাঃ বেনেস। দেশের আরও অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়া নিবারণ করার জন্য ১৯৩৮ সালের ৫ই অক্টোবর ডাঃ বেনেস পদত্যাগ করেন এবং ২২শে অক্টোবর তিনি লণ্ডনে চলিয়া যান। ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাসে চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পূর্ণরূপে নাৎসী-কবলিত হয়।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া ডাঃ বেনেস লণ্ডন হইতে আমেরিকায় গমন করেন। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে আবার তিনি লণ্ডনে ফিরিয়া 'আসেন' এবং সমগ্র

নাৎসী-বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। ১৯৪০ সালের ২১শে জুলাই অস্থায়ী চেক গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয়। ১৯৪৩ সালের নবেম্বর মাসে তিনি মস্কো গমন করেন এবং ১২ই নবেম্বর চেকোস্লাভ-সোভিয়েট চুক্তি সম্পাদিত হয়। চেকোস্লোভাকিয়া নাৎসী-কবল হইতে মুক্ত হওয়ার পর ১৯৪৫ সালের ৩রা এপ্রিল সাড়ে ছয় বৎসর নির্ব্বাসিত জীবন কাটাইয়া ডাঃ বেনেস এবং তাঁহার গবর্ণমেণ্ট স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং পুনরায় চেকোস্লাভ প্রজাতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। নেশন্যাল সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টদের কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট দুই বৎসর পর্য্যন্ত বেশ ভাল ভাবেই পরিচালিত হইয়াছিল। বৃটেন ও ফ্রান্সের বন্ধুত্ব ডাঃ বেনেসের যেমন কাম্য ছিল, তেমনি সোভিয়েট রাশিয়ারও তিনি এক জন গুণগ্রাহী ছিলেন। কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ায় দক্ষিণ-পন্থীদের চক্রান্ত আবিষ্কৃত হওয়ার পর এই কোয়ালিশনের অবসান ঘটে। চেকোস্লোভাকিয়ায় গণতন্ত্রের অস্তিত্ব আছে কি না, সে বিচার করিবে চেকোস্লোভাকিয়ার জনগণ। ডাঃ বেনেস চেকোস্লোভাকিয়ায় এই রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেন নাই। হয় তাঁহার প্রতিবাদ করিবার সুযোগ ছিল না, না হয় এই পরিবর্ত্তনকে অকাম্য বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র এবং কম্যুনিজমের মধ্যে গাঁটছাড়া বাঁধা সম্ভব কি না, অথবা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন পথ আছে কি না, বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে ইহাই প্রধান প্রশ্ন।

কাউণ্ট বার্ণাডোট নিহত—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নিযুক্ত প্যালেষ্টাইনের সালিশ কাউণ্ট ফোক বার্ণাডোট গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ইহুদী এলাকায় যাইবার সময় সামরিক পোষাক-পরিহিত আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন। কাউণ্ট বার্ণাডোট নিহত হওয়ায় আরব-ইহুদী মীমাংসার পক্ষেই শুধু ক্ষতিকর হয় নাই, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। কিন্তু প্রধান প্রশ্ন এই যে, কাহারা তাঁহার আততায়ী? ইহুদী সন্ত্রাসবাদী দল ষ্টার্ণগ্যাঙ্গ কর্ত্তৃক তিনি নিহত হইয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানা না গেলেও এই সন্দেহটাকেই সত্য বলিয়া যে ভাবে প্রচার করা হইতেছে তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইজরাইল গবর্ণমেণ্ট ষ্টার্ণ গ্যাঙ্গ-এর সমস্ত লোককে গ্রেফ্‌তার করিবার জন্য সৈন্যবাহিনীকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এবং প্রয়োজন হইলে গুলী করিবারও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বিস্মিত হইবার বিশেষ কিছুই নাই। ষ্টার্ণগ্যাঙ্গ কর্ত্তৃক কাউণ্ট বার্ণাডোট নিহত হইয়াছেন এই সন্দেহ যে শিশু ইহুদীরাষ্ট্রের প্রতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইজরাইলের বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতগণ না কি ষ্টার্ণগ্যাঙ্গ-এর স্প্রিণ্টার গ্রুপের নিকট হইতে এই মর্ম্মে পত্র পাইয়াছেন যে, যেহেতু বার্ণাডোট বৃটিশের পক্ষে কাজ করিতেন এবং বৃটিশের হুকুম তামিল করিতেছিলেন, সেই জন্য তাঁহারা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছেন। এই পত্র সত্যই ষ্টার্ণগ্যাঙ্গ-এর লিখিত কি না, তাহাও প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। অবশ্য এই হত্যাকাণ্ডের কয়েক দিন পূর্ব্বে গত ১০ই সেপ্টেম্বর ষ্টার্ণগ্যাঙ্গ-এর মুখপত্র 'মিভ্‌রাকে'র (Mivrak) প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কাউণ্ট বার্ণাডোট ইজরাইলে ইহুদীদের প্রবেশ সীমাবদ্ধ করিয়া দিলে জাতিপুঞ্জের পরিদর্শকদিগকে হত্যা করিবার প্ররোচনা দেওয়াই না কি উক্ত পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করিবার দিবার কারণ। সকলের সন্দেহই যখন ষ্টার্ণগ্যাঙ্গ-এর প্রতি পড়িবার সম্ভাবনা সেই সময় ইহুদীদের অনিষ্ট করিতে ইচ্ছুক এইরূপ কেহ এই দুষ্কার্য্য করিয়াছে কি না, তাহাও তদন্ত করিয়া দেখা আবশ্যক।

কাউণ্ট বার্ণাডোট গত ২০শে মে প্যালেষ্টাইনে আরব-ইহুদী বিরোধের মীমাংসার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক সালিশ নিযুক্ত হন। পাঁচ দিন পরে তিনি প্যারী হইতে বিমানযোগে প্যালেষ্টাইনে যাত্রা করেন। ৬ই জুন তারিখে চারি সপ্তাহব্যাপী আরব-ইহুদী যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাব ঘোষিত হয়। কাউণ্ট বার্ণাডোট শান্তি-প্রস্তাবের একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহাতে আরব ও ইহুদী-রাষ্ট্র লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা ছিল। এই খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী জেরুজালেম পড়িয়াছিল আরবদিগের ভাগে। চারি সপ্তাহ পরে পুনরায় লড়াই সুরু হয়। কাউণ্ট বার্ণাডোট বিনা সর্ত্তে আরও দশ দিন যুদ্ধ বন্ধ রাখিতে উভয় পক্ষের নিকট আবেদন করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় গত জুলাই মাসে জাতিপুঞ্জ উভয় পক্ষের নিকট যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ প্রদান করেন এবং তাঁহার চেষ্টাতেই এই নির্দ্দেশ বাস্তবরূপ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল। প্যারী নগরীতে জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তাঁহার প্যালেষ্টাইন সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিল করার কথা ছিল।

সম্রাট নেপোলিয়নের খ্যাতনামা সেনাপতি মার্শাল বার্ণাডোট কাউণ্ট ফক বার্ণাডোটের পূর্ব্বপুরুষ। প্রিন্স অস্কার বার্ণাডোটের তিনি কনিষ্ঠ পুত্র এবং সুইডেনের বর্ত্তমান রাজা গুষ্টভের ভ্রাতুষ্পুত্র। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হইয়াছিল।

প্যালেষ্টাইনে দ্বিতীয় যুদ্ধবিরতি—

কাউণ্ট বার্ণাডোট নিহত হওয়া যে অত্যন্ত শোচনীয় ঘটনা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি নিহত হওয়ার ফলে প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধানে নূতন বাধা বা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা স্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ, তাঁহার মীমাংসার দ্বারা যুদ্ধ-বিরতির সামান্য মাত্রও উন্নতি হইয়াছে তাহা স্বীকার করা অসম্ভব। দ্বিতীয় যুদ্ধ-বিরতি আরম্ভ হওয়ার পরেও পুনঃ পুনঃ আরব-ইহুদী সংঘর্ষ ঘটিতেছে। এই সকল সংঘর্ষ সত্ত্বেও কাউণ্ট বার্ণাডোট আশাপূর্ণ দৃষ্টিতেই প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎকে দর্শন করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রথম যুদ্ধ-বিরতির পর অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়াছে। জেরুজালেমের অবস্থার যাহাতে আরও অবনতি না ঘটে তাহার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কাউণ্ট বার্ণাডোট নিরাপত্তা পরিষদের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। তদনুসারে গত ১১শে আগষ্ট (১৯৪৮) নিরাপত্তা পরিষদ আরব এবং ইহুদী উভয় পক্ষকে সতর্ক করিয়া দিয়া বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও কানাডার যুক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। অবশেষে কাউণ্ট বার্ণাডোট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের প্যারী সম্মেলনে উপস্থিত করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা রচনায় মন দিয়াছিলেন। প্যালেষ্টাইন সমস্যা যেখানে ছিল সেইখানেই রহিয়াছে, ঠিক তাহা নয়; বরং মীমাংসা আরও অধিকতর কঠিন হইয়াছে।

দ্বিতীয় যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব আরবরা একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ

করিতে বাধ্য হইয়াছে। নানা কারণেই দ্বিতীয় যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব তাহাদের গ্রহণ না করিয়া উপায় ছিল না। ১৫ই মে তারিখে (১৯৪৮) আরব রাষ্ট্রসমূহ যখন প্যালেষ্টাইন অভিযান আরম্ভ করে, তখন তাহাদের সৈন্যবাহিনী যে অপ্রতিহত সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহই তাহাদের ছিল না। সদ্যজাত ইহুদী রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি সম্বন্ধেও তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা ছিল। আরবরা মনে করিয়াছিল যে, আরব সৈন্যবাহিনীর অভিযান আরম্ভ হইলেই ইহুদীদের পরাজয় ঘটিবে এবং সমগ্র প্যালেষ্টাইন হইবে আরবদের করতলগত। কিন্তু ১৫ই মে হইতে ১১ই জুন তারিখের প্রথম যুদ্ধ-বিরতি পর্য্যন্ত আরবদের সামরিক অভিযানের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে কি দেখিতে পাওয়া যায়? দেখিতে পাওয়া যায় যে, আরবরা যাহা আশা করিয়াছিল তাহা হয় নাই। অবশ্য ট্রান্সজর্ডানের বৃটিশ অফিসার পরিচালিত আরব লিজিয়ন বিশেষ সামরিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহারা তেল-আবিব ও জেরুজালেমের মধ্যে সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও জলের পাইপ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। তেল-আবিব হইতে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী রামলেহ্ এবং লিড্ডা বিমান-ঘাটিতে সড়কের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ-স্থলে অনিয়মিত মুক্তিবাহিনীর শক্তিও আরব লিজিয়ন বর্দ্ধিত করিয়াছিল। জেরুজালেমের পুরাতন নগরীর ইহুদী-অধ্যুষিত অঞ্চল আরবরা দখল করিয়াছিল এবং ইহুদী-অধ্যুষিত নূতন সহরও চারি দিকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল। দক্ষিণ দিকে মিশরীয় সৈন্য গাজা, বীরসেবা এবং হেব্রন দখল করিয়া নেজেব আক্রমণ করিয়াছিল। তেল-আবিবের ২০ মাইল দক্ষিণে তাহারা ইহুদী সৈন্যদের কাছে প্রবল বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং আর অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় না। ইরাকী সৈন্যরা বিশেষ কিছুই করিতে পারে নাই। জর্ডন নদী বরাবর ইহুদীদের রক্ষা-ব্যবস্থার কাছে তাহারা পাইয়াছিল প্রবল আঘাত। সিরিয়া ও লেবাননের সৈন্যরা গ্যালেলী সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে রাস্-এল-নাকোরার সাগর হইতে সামাখ পর্য্যন্ত সীমান্ত ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকে এবং ইহুদীদের কাছে তাহারা প্রবল আঘাত-প্রাপ্ত হয়। ইহুদীরা লেবানন রাজ্যের ভিতরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিল। সৌদী আরবের সৈন্যরা মিশরীয় সৈন্য ও সিরিয়ার সৈন্যদের সহিত একযোগে যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের যুদ্ধবিস্তার পরিচায়ক কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

আরবদের উল্লিখিত বিজয় সত্ত্বেও প্রথম যুদ্ধ-বিরতির প্রাক্কালে ইহুদীর অবস্থাও অসন্তোষজনক ছিল না। নেজেব তাহাদের হস্তচ্যুত হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ নেজেব কার্য্যকরী ভাবে ইহুদীদের দখলে ছিল না। কিন্তু পশ্চিম গ্যালেলী, আক্রা, জাফা এবং আরব-হাইফা ইহুদীরা দখল করিতে সমর্থ হয়। আরবরা অবশ্য বলিয়া থাকেন যে, যদি প্রথম যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব তাহারা গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে খুব তাড়াতাড়ি তাহারা জয়লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহাদের এই দাবী সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। প্রথম যুদ্ধ-বিরতি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ৯ই জুলাই (১৯৪৮) হইতে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ১৯শে জুলাই তারিখে দ্বিতীয় যুদ্ধ-বিরতি আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে। এই সময়টুকুর মধ্যেই ইহুদীরা রামলেহ্ এবং লিড্ডা দখল করে এবং মিশরীয় সৈন্যবাহিনীকে এমন ভাবে আঘাত করে যে, দ্বিতীয় যুদ্ধ-বিরতি আরম্ভ না হইলে আরবদের পরাজয় ঠেকাইয়া রাখা কঠিন হইত। এই অবস্থায় আরবরা সামরিক শক্তি দ্বারা প্যালেষ্টাইন সমস্যার সমাধান করিতে গিয়াছিল কেন, এই প্রশ্ন স্বতঃই উত্থিত হইয়া থাকে। নিরাশা এবং অসহায় অবস্থার জন্য আরবরা বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছিল তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ১৫ই মে (১৯৪৮) তারিখে প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শেষ হইবে, ইহা জানা কথাই ছিল, অথচ জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের ২৯শে নবেম্বরের (১৯৪৭) প্যালেষ্টাইন বিভাগের প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ কোন সামরিক শক্তির ব্যবস্থা করিলেন না। আরবরা ইহাকে প্যালেষ্টাইন আক্রমণের ইঙ্গিত মনে করিয়া থাকিলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। আরব রাষ্ট্রগুলির নিয়মিত সৈন্যবাহিনী আছে। কিন্তু প্যালেষ্টাইনের ইহুদীদের কোনও সৈন্যবাহিনীই থাকিবার কথা নয়। হাগানা ও ইরগুন ভাই লেউমিকে কিছুতেই নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর মর্য্যাদা দেওয়া যায় না। এই অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদের নীতিই অতি সহজে প্যালেষ্টাইন অধিকার করার আশা আরবদের মনে সঞ্চার করিয়াছিল।

প্যালেষ্টাইনে আরবদের প্রধান বিজয় ছিল পুরাতন জেরুজালেম দখল করা। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধ-বিরতি যখন আরম্ভ হয় তখন পুরাতন জেরুজালেমে আরব লিজিয়নের ব্যূহ ইহুদীরা প্রায় ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জেরুজালেম-তেল-আবিব ফ্রণ্টে আরবদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব সম্বন্ধে আরবরা সে সকল সর্ত্ত আরোপ করিয়াছিল সেগুলি আমরা গত মাসে উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল সর্ত্ত সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, নিরাপত্তা পরিষদ এই সকল সর্ত্ত গ্রাহ্যযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সালিশ কাউণ্ট বার্ণাডোটকে প্রথম যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্তানুসারে মীমাংসার চেষ্টা করিতে নিরাপত্তা পরিষদ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। এই সকল সর্ত্তের মধ্যে একটি প্রধান সর্ত্ত এই যে, যে সকল ইহুদীর সৈন্য-বিভাগে যোগদান করিবার উপযোগী বয়স হইয়াছে তাহাদিগকে বন্দি-শিবিরে আটকাইয়া রাখিতে হইবে। যুদ্ধ-বিরতি যেখানে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সেখানে এই সর্ত্তে ইহুদীরা আপত্তি করিবে ইহা স্বাভাবিক। সালিশ মহাশয়ের পক্ষে এই আপত্তির যৌক্তিকতা অস্বীকার করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট ইহুদীদিগকে প্যালেষ্টাইন প্রবেশে বাধা দিলে সে-সম্বন্ধে সালিশ মহাশয় কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। তিন লক্ষ আরব আশ্রয়প্রার্থীকে ইহুদী-রাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে দিতে ইহুদীদের আপত্তি করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যে-সকল নূতন ইহুদীর আগমন হইবে, তাহাদের জন্য ইহুদী-রাষ্ট্রে স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা করা অবশ্যই প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এই সকল আরব আশ্রয়প্রার্থীরা যে ইহুদী-রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না, তাহার নিশ্চয়তা নাই। ইহুদীরা দাবী করিয়াছে তেল-আবিব-জেরুজালেম সড়ক এবং জলের পাইপ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। কাউণ্ট বার্ণাডোট ইহুদীদের এই দাবী আরবদের দ্বারা মানাইয়া লইতে পারিয়াছিলেন কি? চীন প্রস্তাব করিয়াছিল- যে, যে সকল বিষয়ে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে মতানৈক্য সেই সকল বিষয়ে উভয় পক্ষই অগ্রসর হইয়া অর্দ্ধপথে মীমাংসা করিবে। জাতিপুঞ্জ এই প্রস্তাব

গ্রহণ করেন এবং . কাউণ্ট বার্ণাডোট অন্ধ ভাবে বৃটিশের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা ইহুদীদের আত্মসমর্পণের নামান্তর ছাড়া আর কিছুই হইত না।

কাউণ্ট বার্ণাডোট তাঁহার শান্তি প্রস্তাবে আরবদিগকে জেরুজালেম দিতে চাহিয়াছিলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় জেরুজালেমের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসীই ইহুদী এবং উহার অধিকাংশ অঞ্চলই ইহুদী সৈন্য দ্বারা রক্ষিত। কাউণ্ট বার্ণাডোটের এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার জন্য জাতিপুঞ্জ এক জন শাসক নিযুক্ত করেন। আরবরা পুরাতন জেরুজালেমের জন্য এক জন শাসকের নাম প্রস্তাব করে। এই অবস্থায় ইজরাইল গবর্ণমেণ্ট ইহুদী জেরুজালেমের জন্য ইহুদী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। হাইফা সম্বন্ধে কাউণ্ট বার্ণাডোট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাতে আরবদিগকে এবং আন্তর্জ্জাতিক শক্তিগুলিকে বিশেষ অধিকার দেওয়ার কথা আছে। অথচ এই সহরটি ইহুদীদের কর্তৃত্বাধীনে। ইহাই বর্ত্তমানে প্যালেষ্টাইনের অবস্থা। জাতিপুঞ্জের প্যারী সম্মেলনে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে কি নীতি গৃহীত হয় সকলেই তাহা আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিবে।

চীনের গৃহযুদ্ধ—

চীনের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে যে-সকল সংবাদ প্রকাশিত হয় তাহা হইতে প্রকৃত অবস্থা বিশেষ কিছুই বুঝা যায় না। কিন্তু উত্তর-চীনে জনগণের গবর্ণমেণ্ট বা কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার যে-সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ, উত্তর-চীনের কোনও স্থানে প্রাদেশিক জন-প্রতিনিধি কংগ্রেসের অধিবেশনের পর এই গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। আরও অনেক পূর্ব্বে এই গবর্ণমেণ্ট কেন গঠিত হয় নাই, এই প্রশ্নই বরং জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। গত দেড় বৎসরে চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কম্যুনিষ্টদের সহিত যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। চীনের জাতীয় সৈন্যবাহিনীর বহু-ঘোষিত সাফল্যের সংবাদ সত্ত্বেও ইহা সত্য যে, কার্য্যতঃ সমগ্র মাঞ্চুরিয়া এবং ইয়াংসি নদী পর্য্যন্ত উত্তর-চীনের প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলই চীনা কম্যুনিষ্টদের দখলে। ডাঃ ওয়াং ওয়েন হাও প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পরে আইন-পরিষদ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, উত্তর-চীন ও মাঞ্চুরিয়া দখলের জন্য ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে তাঁহারা রিজার্ভ গঠন করিতেছেন। ডাঃ ওয়াং যখন প্রধান মন্ত্রীর ভার গ্রহণ করেন সেই সময় জেনারেল চিয়াং কাইশেক অনিচ্ছার সহিতই একরূপ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, কিছু দিন পর্য্যন্ত পুনরায় মাঞ্চুরিয়া দখলের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ইয়েলো নদী ও ইয়াংসি নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশগুলি হইতে কম্যুনিষ্টদিগকে বিতাড়ন করিবার অভিপ্রায়ের কথা তিনি বলিয়াছিলেন। ইহার পর চারি মাস পার হইয়া গিয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে ইয়াংসি নদী পর্য্যন্ত উত্তর-চীনের অধিকাংশ অঞ্চল কম্যুনিষ্টদের দখলে চলিয়া গিয়াছে।

মাঞ্চুরিয়ার বৃহত্তম সহর মুকডেন প্রায় এক বৎসর ধরিয়া কম্যুনিষ্টরা অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। মুকডেন ও চ্যাংচুনের সহিত শুধু বিমান-পথেই বহির্জ্জগতের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই অবস্থা কত দিন চলিতে পারিবে তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

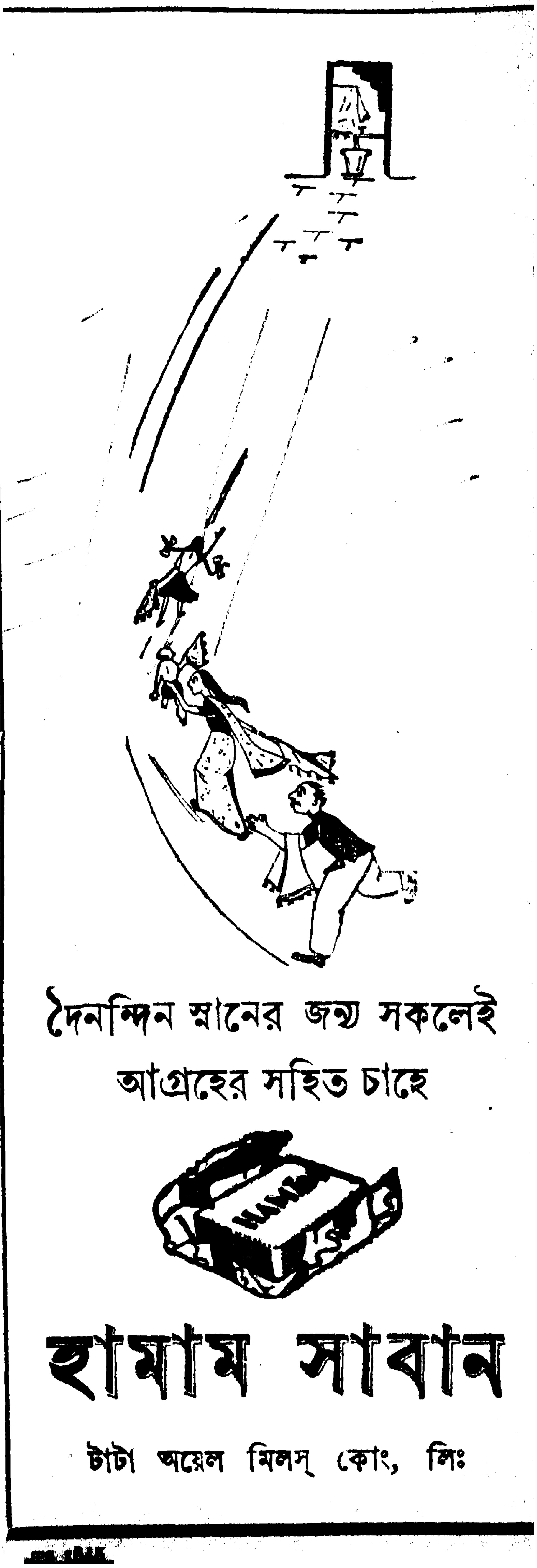

এই দুইটি সহর এবং শানহাইকওয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া চিংচাও পর্য্যন্ত অল্পপরিসর সমুদ্রোপকূল ব্যতীত মাঞ্চুরিয়ার আর সমস্তই কম্যুনিষ্টদের দখলে। চীনের গৃহযুদ্ধের পরিণাম অনুমান করা সম্ভব নহে। জনসাধারণের অসন্তোষ যে কম্যুনিষ্টদের জয়লাভের প্রধান সহায় তাহাতে সন্দেহ নাই। মুদ্রাস্ফীতি চরমে উঠিয়াছে, জনসাধারণের পক্ষে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়-সঙ্কুলান করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। চারি দিকেই উচ্ছৃঙ্খলতা। কম্যুনিষ্টরা আবার ব্যাপক ভাবে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে। চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট টিকিয়া আছে এবং থাকিবেও, কিন্তু দুঃখ-দুর্দ্দশা যাহা কিছু সমস্তই জনসাধারণের।

ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিষ্ট অভ্যুত্থান—

ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্টরা গত ২০শে সেপ্টেম্বর সশস্ত্র বিদ্রোহের পর জাভা প্রদেশ এবং মাদিউন সহরে বিপ্লবী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করায়, ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। হল্যাণ্ডের সহিত ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের কোন আপোষ-মীমাংসা এখনও সম্ভব হয় নাই, হওয়ার কোন সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। জাতিপুঞ্জের সদিচ্ছা কমিটির নেতৃত্বে যুদ্ধ-বিরতি প্রতিপালিত হইতেছে বটে, কিন্তু ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রকে যে অর্থনৈতিক দিক্‌ হইতে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে তাহার কোন প্রতিকারই হয় নাই। সম্প্রতি হল্যাণ্ড এই মর্ম্মে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে যে, প্রজাতন্ত্রের সৈন্যরা সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ডাচ অঞ্চলে হানা দিতেছে। প্রজাতন্ত্রের দিক্‌ হইতে এই অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে হল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে হল্যাণ্ডের সহিত ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের আপোষ-মীমাংসার কোন সুবিধা হইয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। হল্যাণ্ডের রাণী উইলহেলমিনা দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর কন্যা জুলিয়ানার হাতে শাসন-ভার অর্পণ করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। ডাঃ বীল নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে তাঁহাকে বাদ দিয়াই। কিন্তু হল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক নীতিতে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রকে বাদ দিয়াই ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা অবশিষ্ট ডাচ ইষ্ট-ইণ্ডিজ লইয়া অস্থায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের চেষ্টা করিতেছেন।

উল্লিখিত অবস্থার মধ্যে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট অভিযানের পরিণাম কি হইবে তাহা অনুমান করা সহজ নয়। কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রেসিডেণ্ট সোয়েকর্ণের হাতে জরুরী ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। প্রজাতন্ত্রী দলের পুলিশ বাহিনী যোগাকার্ত্তা হইতে ২ শত কম্যুনিষ্টকে গ্রেফতার করিয়াছে। কম্যুনিষ্টদের এই অভ্যুত্থান যে শুধু ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের এলাকাতেই নিবদ্ধ থাকিবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় যদি কম্যুনিষ্টদের অভ্যুত্থান হয়, তাহা হইলে প্রকৃত সংঘর্ষ বাধিবে ডাচ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত।

ব্রহ্মের গৃহযুদ্ধ—

আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কম্যুনিষ্টদের হাতে রেঙ্গুনের পতনাশঙ্কা নিবারিত হওয়ার পর ব্রহ্মদেশের গৃহযুদ্ধের অবস্থা তো শান্ত ভাব ধারণ করে নাই, বরং কারেন বিদ্রোহ গৃহযুদ্ধকে অধিকতর কঠিন ও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। পি-ভি-ওর হোয়াইট ব্যাণ্ড কম্যুনিষ্টদের সহিত যোগ দেওয়ার এবং অনেক সৈন্য সৈন্যবাহিনী ছাড়িয়া কম্যুনিষ্টদের সহিত সহযোগিতা করায় কম্যুনিষ্টদের শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে থাকিন-নু বলিয়াছিলেন যে, কম্যুনিষ্টদের প্রতি জনগণের সহানুভূতি নাই। জনগণ যে কম্যুনিষ্টদের বিরোধী তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না।

ব্রহ্মদেশের ভিতরের অবস্থা কিছুই প্রকাশ করা হয় না। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন ভাবে যেটুকু প্রকাশ করা হয় তাহাতেই কম্যুনিষ্টরা কিরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। জেলাগুলির প্রধান সহর সমূহ সমস্তই ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের দখলে। কিন্তু চারি পাশের পল্লী অঞ্চলের উপর বিশেষ কোন আধিপত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয় বিমান-যোগে। থায়েটমিও ও প্রোম ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট পুনরায় দখল করার সংবাদ হইতে বুঝা যায়, ঐ দুইটি সহর কম্যুনিষ্টরা দখল করিয়াছিল। টৌংগু অঞ্চলেই কম্যুনিষ্টদের প্রধান ঘাটি। মান্দালয়ের উত্তরে শোয়েবো হইতে রেঙ্গুণের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পায়াপেন পর্য্যন্ত একটি এবং পায়াপেন হইতে আরাকানের পালেৎওয়া পর্য্যন্ত আর একটা রেখা কল্পনা করিলে এবং শোয়েবোর সহিত পালেৎওয়ার সংযোগ করিয়া যদি আর একটি রেখা কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে যে ত্রিভুজ পাওয়া যাইবে, ঐ ত্রিভুজের মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল কম্যুনিষ্ট-অভ্যুত্থান দ্বারা সংক্ষুব্ধ।

ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও কারেন নেশন্যাল ইউনিয়নের নেতৃত্বে স্বতন্ত্র কারেন রাজ্য গঠনের আন্দোলনও কিছু দিন ধরিয়া বেশ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে আন্দোলন না বলিয়া বিদ্রোহ বলাই ঠিক। তাহারা মৌলমেন এবং থাটন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। টৌংগু ও যৌবিন জেলার কতক অংশ তাহাদের দখলে। কারেনদের এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকা যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। কারেনরা এমন একটি শক্তিশালী কারেন রাষ্ট্র গঠন করিতে চায় যাহার চারি দিকে শান, চিন, কাচিন এবং অন্যান্য কম্যুনিষ্ট-বিরোধীরা ব্রহ্মের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মদেশের সত্যিকার স্বার্থের জন্য কাজ করিবে এইরূপ লোক লইয়া গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য সমবেত হইবে। 'টাইমসে'র এই মন্তব্যে এই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, কারেনদের এই বিদ্রোহের পিছনে সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানি রহিয়াছে। তবে কারেনদের সকল দল যে কারেন নেশন্যাল ইউনিয়নের স্বতন্ত্র কারেন-রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যের সমর্থক, তাহা মনে হয় না। কিন্তু থাকিন-নু ২১ জন মন্ত্রী লইয়া যে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন তাহাতে কারেন নেশন্যাল ইউনিয়ন দলের কোন সদস্য নাই। শান রাজ্যের মধ্যেও একটা বিক্ষোভের ভাব দেখা গিয়াছিল। সেখানেও সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। এ সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে ২১শে সেপ্টেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ, ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট থাটন ও মৌলমেন পুনরায় দখল করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশের এই গৃহযুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা সম্ভব নয়। আগামী এপ্রিল মাসে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। এই সময়ের মধ্যে ব্রহ্মদেশের সমস্যা আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা আছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আগমনী

আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। আবার শারদীয়া পূজা আসিয়া পড়িল। স্বাধীন ভারতে ইহা দ্বিতীয় দুর্গোৎসব। একে আমরা বহু দিন পরে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, তাহার উপর বৎসরের শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া পূজা আসিয়াছে, কিন্তু তবু আমরা তেমন আনন্দিত হইতে পারিতেছি কই? সানাই-এর সুরে, আগমনী-গানে আকাশ-বাতাস ভরিয়া উঠিতেছে না কেন? কারণ আমাদের জীবনে আনন্দ নাই। বিদেশীদের অত্যাচারে, লাঞ্ছনায় আমরা ছিলাম জর্জ্জরিত। ক্রমাগত অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে আমরা হইয়া পড়িয়াছিলাম অর্দ্ধমৃত। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট আমরা যে উদ্দাম উল্লাসে মাতিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে কিছুটা ছিল স্বাধীন হবার আনন্দ এবং বেশীটা ছিল আবার পেট ভরিয়া খাইতে পরিতে পাইব—সেই আশার হর্ষ। কিন্তু আমাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। দুই বৎসর অপেক্ষা করিয়াও ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে সেরূপ কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে না।

অন্ন-বস্ত্রের অভাব পূর্ব্ব হইতে ভীষণ হইয়াছে। উপরন্তু বাসাভাব এমন প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে যে, গল্পের গাছতলা এখন বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি তো সীমা ছাড়াইয়া গগন ভেদ করিতে বসিয়াছে। বাস্তুহারাদের সমস্যা এখনও সমাধান হয় নাই। পাকিস্তানকে যত বার আমরা প্রেমালিঙ্গন দিতে অগ্রসর হইয়াছি তত বারই গুঁতা খাইয়াছি। কিন্তু প্রেম কমে নাই। বৃটিশ-শক্তি এখনও পরোক্ষ ভাবে আমাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিতেছে এবং যখনই সুবিধা পাইতেছে দংশন করিতেছে অথবা করাইতেছে। অতি সহজে গদীর লোভে ভারত বিভক্ত হইয়াছে। অনর্থক ইতস্ততঃ করিবার ফলে কাশ্মীর ভাগ হইতে বসিয়াছে। আমরা স্বাধীন অথচ বিদেশী শক্তির কথায় আমাদের চলিতে হইবে, এ স্বাধীনতার অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। শিল্পপতি ও শ্রমিকদের বিরোধের অবসান ঘটে নাই। সরকার দুই নৌকায় পা দিয়া এক বেসামাল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। বহু দিন রাজাকার দস্যুদিগের অত্যাচার সহ্য করিয়া, প্রাণ-মান-ধন হারাইয়া যখন হায়দ্রাবাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় নিজেদের রক্ষার চেষ্টায় নিজেরাই তৎপর হইয়া উঠিল তখন ভারতীয় ইউনিয়ন হায়দ্রাবাদ অভিযান আরম্ভ করিলেন। মাত্র চারি দিনের মধ্যেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। আগে এই অভিযান চালাইলে হয়ত এতগুলি লোকের সর্ব্বনাশ হইত না। এই সকল কারণে আমরা ঠিক প্রাণ খুলিয়া আনন্দ করিতে পারিতেছি না। মা আসিতেছেন। সর্ব্বদুঃখহরা, দুর্গতিনাশিনী ইচ্ছা করিলেই আমাদের দুঃখদুর্গতি নাশ করিতে পারেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা যদি স্বেচ্ছায় দুর্গতির বেড়াজাল সৃষ্টি করিয়া রাখি তাহা হইলে কোন্ মুখে দয়াময়ীকে বিপদজাল ছিন্ন করিয়া আমাদের মুক্ত করিতে প্রার্থনা করিব?

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

এত দিন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ার-হোল্ডার্স ব্যাঙ্ক ছিল। এখন ইহার উপর রাষ্ট্রের মালিকানা-স্বত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইতেছে। পূর্ব্বেও এইরূপ প্রচেষ্টার কথা উঠিয়াছিল কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা তখন শেয়ার-হোল্ডার্স ব্যাঙ্ক হওয়ারই পক্ষে ছিলেন। কারণ আগে গবর্ণমেণ্ট ছিল বিদেশী। পরাধীনতার মধ্যে বাস করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর জাতীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠার কোন অর্থ হয় না। তাহাতে ভারতবাসীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ারই আশঙ্কা ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যদিও প্রকৃত পক্ষে জনসাধারণের হাতে আসে নাই, তথাপি আমাদেরই নেতৃবর্গ এখন দেশ শাসন করিতেছেন। কাজেই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দাবী যে শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার অর্থ প্রস্তাবিত বিল অনুসারে এই দাঁড়াইবে যে, শেয়ার-হোল্ডারদের সমস্ত স্বত্ব উপযুক্ত মূল্যে গবর্ণমেণ্ট কিনিয়া লইবেন। তৎসহ কিছু ক্ষতিপূরণও দিবেন। কিন্তু যে হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত বেশী। শেয়ার হোল্ডারগণ যথেষ্ট পরিমাণে লভ্যাংশ পাইয়া আসিতেছেন, কাজেই তাঁহাদিগকে এত অধিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিবার প্রয়োজনেও এত অধিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া অসঙ্গত। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর রাষ্ট্রের মালিকানা-স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে তদ্দারা ভারত গবর্ণমেণ্টের আয় খুব বেশী বাড়িবে না। কিন্তু ক্ষতিপূরণের হার অত্যধিক হওয়ায় ব্যয় বাড়িবে। জাতীয় করণের প্রধান উদ্দেশ্যই হইল এই যে, লাভটা জন কতক অংশীদারের পকেটে না যাইয়া জাতির কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হয় তাহার ব্যবস্থা করা। অত্যধিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থার ফলে জাতীয় করণের এই মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে ব্যবস্থা করা হইতেছে, তাহাতে আমলাতান্ত্রিক আধিপত্যই বাড়িবে। দেশবাসীর বিশেষ কোন উপকার হইবে না।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এখনই প্রকৃত পক্ষে আধা-সরকারী ব্যাঙ্ক। দেশের অর্থ নৈতিক কল্যাণ অনেকখানি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরিচালনার নীতির উপর নির্ভরশীল। ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর দায়িত্ব অর্পিত আছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ সম্পর্কে কিছুই করেন নাই। জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার পর যে কিছু করিবেন, সে ভরসাও আমাদের নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

সঙ্গে সঙ্গে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কও জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা আবশ্যক। কিন্তু ইউরোপীয় মালিকানা-স্বত্বের ব্যাঙ্ক বলিয়াই বোধ হয় কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে কিছু বলেন নাই।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকার

সম্প্রতি কলিকাতায় অর্থনীতিবিদ্‌দের সম্মেলনে অধ্যাপক বিনয়-কুমার সরকার তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন,—"প্রতি-কারের যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে ব্যবসায়ীদের উপর ক্রমোচ্চ হারে কর ধার্য্য করা ও যাঁহারা কর এড়াইয়া যান তাঁহাদের কঠোর শাস্তি বিধান করা। দ্রব্যের চাহিদা ও দ্রব্য ক্রয়নিয়ন্ত্রণ, বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ও দ্রব্যাদির রেশন প্রথায় বণ্টনও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমদানী ও রপ্তানীর নিয়ন্ত্রণের উপর লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। উৎপাদন বৃদ্ধিও আবশ্যক।"

কলিকাতায় যখন এই আলোচনা চলিতেছিল, তখন দিল্লীতে অর্থনীতিবিদরা ভারত সরকারের নিকট যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে—বার্ষিক পাঁচ শত টাকার অধিক কৃষি-আয়ের উপর কর ধার্য্য করিতে হইবে, মুনাফা-করের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে, কোম্পানী সমূহের লভ্যাংশ বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, ডিভিডেণ্ড প্রদানের পর যে অর্থ অবশিষ্ট থাকিবে তাহা আইন করিয়া অকেজো করিয়া ফেলিতে হইবে, যাহাদের বার্ষিক আয় পাঁচ হাজার টাকার উপর তাহাদের বাধ্যতামূলক অর্থসঞ্চয় করাইতে হইবে এবং মুদ্রা সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। সুপারিশের মূল কথা হইল এই যে, লাভের জন্য উৎপাদনের নীতিটা বজায় রাখিয়াও লাভের অংশ কমাইয়া আনিতে হইবে।

এই নীতি চালাইতে গেলে যে শিল্পপতিরা প্রবল বিরোধিতা করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা বলিতেছেন, দেশে আজ অর্থসঙ্কট দেখা দিয়াছে, কারণ গবর্ণমেণ্টের নীতির ফলে শিল্পপতিরা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে উৎসাহ পান নাই। গোড়ার দিকে সরকারী মুখপাত্রেরা সমাজতন্ত্রের কথা বলিয়া ভড়কাইয়া দিয়াছিলেন। পরে অবশ্য দশ বৎসরের মধ্যে শিল্প জাতীয় করণ হইবে না বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু দশ বৎসর অত্যন্ত কম সময়। একটা শিল্প চালু করিতেই তো দশ বৎসর কাটিয়া যায়। সুতরাং আপা-ততঃ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য শিল্প জাতীয় করণের প্রশ্ন পিছাইয়া দিতে হইবে। এই সঙ্গে উৎপাদনের খরচ কমাইবার জন্য, কর্মচারী ছাঁটাই ও বেতন বৃদ্ধি বন্ধ করিবার জন্য সরকারী অনুমোদন চাহিয়াছেন। অনেকে আবার শিল্পের উপর হইতে করভার হ্রাস করার পরামর্শও দিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার ব্যাপারে দেশের শিল্পপতিদের সহিত অর্থনীতিকদের মতের বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট কোন পথ অবলম্বন করিবেন? গবর্ণমেণ্ট যদি শিল্পপতিদের কথা শোনেন, তাহা হইলে সাধারণ লোকের দুরবস্থার অন্ত থাকিবে না। আর যদি সত্যই লোকের দুরবস্থা দূর করিতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে শিল্পপতিরা উৎপাদন বন্ধ করিয়া সরকারী পরিকল্পনা বানচাল করিবার চেষ্টা করিবেন। একমাত্র উপায় প্রধান শিল্প, ব্যাঙ্ক ও পাইকারী ব্যবসা ব্যক্তিগত মালিকদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া সরকারী মালিকানায় আনা।

আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী বিল

ভারতীয় পার্লামেণ্টে আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী বিল গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রধান প্রশ্ন এই যে, আলোচ্য সৈন্যবাহিনী বিল দ্বারা দেশরক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে কি না? পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু বলিয়াছেন যে, এই বিলটি শুধু বিলম্বেই উপাপিত হয় নাই, ৭নং ধারা (এই ধারায় সামরিক কর্ত্তব্য সম্পাদন সম্বন্ধে দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে) বাদে এই বিলটির কোন গুরুত্বই নাই। ভারতীয় পার্লামেণ্টের বিগত অধিবেশনে আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী গঠনের কথা উত্থাপিত হয়। যদি সেই অধিবেশনেই এই বিল গৃহীত হইত তাহা হইলে আরও এক লক্ষ ত্রিশ হাজার ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীর রক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইতে পারিত।

এই বিলের প্রধান ক্রটি এই যে, আঞ্চলিক বাহিনীতে মাত্র এক লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য গ্রহণের বিধান করা হইয়াছে। ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের পক্ষে ইহা মোটেই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। দেশরক্ষা সচিব অবশ্য আশ্বাস দিয়াছেন, নির্দ্ধারিত সৈন্যসংখ্যা গৃহীত হওয়ার পরই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হইবে, কিন্তু কেবল আশ্বাসেই দেশরক্ষা হয় না এবং বিলম্বও হইবে অনর্থক। জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে এবং প্রয়োজন হইলে আঞ্চলিক বাহিনীর সৈন্যদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা বিলে রাখা হইয়াছে। এ জন্য সংখ্যাবৃদ্ধি করাই উচিত নয় কি?

বিলে নগরবাহিনীর কোন উল্লেখ নাই। দেশরক্ষা সচিব তাঁহার সাফাইয়ে বলিয়াছেন যে, আরবান্ ইউনিট থাকিবে না, তাহা নয়। প্রশ্ন, তাহা হইলে বিলে তাহার উল্লেখ নাই কেন? আমাদের সন্দেহ হইতেছে, আরবান্ ইউনিট সম্বন্ধে আমাদের শাসকবর্গ আইনের বিধান হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিতে চান। ফলে কোন নগরে আঞ্চলিক অথবা আরবান্ ইউনিট গঠন না করিলে সরকারকে কেহই কিছু বলিতে পারিবেন না। আঞ্চলিক বাহিনীতে নারীদের নিয়োগের কোন বিধানই করা হয় নাই।

আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী বিল উত্থাপিত করিতে দেশরক্ষা সচিব এক বৎসর বিলম্ব করিয়াছেন। পরে যে বিল উপাপন করিয়াছেন তাহাতে পর্য্যাপ্ত সংখ্যক সৈন্য-গ্রহণের বিধান করা হয় নাই। এই বাহিনীকে আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার কাজ করিতে হইবে। ভারতের সুদীর্ঘ উপকূল-ভাগ রক্ষার জন্য নিয়োজিত হইবে এই বাহিনীই। ইহার উপর প্রয়োজন হইলে এই বাহিনীকে দেশের বাহিরেও প্রেরণ করা হইবে। যখনই নিয়মিত বাহিনী পাওয়া যাইবে, তখনই আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনীকে সরাইয়া আনিতে হইবে, এইরূপ বিধান থাকা উচিত। বস্তুতঃ, আঞ্চলিক বাহিনী নিয়মিতদের মত বেতনভুক্ত স্থায়ী সৈন্যবাহিনী নয়। তাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের জন্য চাকরী, কৃষি অথবা অন্য কাজ করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় তাহাদের বিশেষ কতকগুলি অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু এই অধিকার সম্বন্ধে কোন বিধানই এই বিলে নাই। কতকগুলি বিষয় রুলের উপর নির্ভর করা হইয়াছে। ইহা আদৌ সঙ্গত নয়। আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য অল্প ব্যয়ে দেশরক্ষার ব্যবস্থা করা। সে জন্য যাহারা এই বাহিনীতে ভর্ত্তি হইবে তাহাদের বিশেষ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। কোন কিছু দিয়াই এই বিলকে সন্তোষজনক বলা চলে না।

প্রেস আইন তদন্ত কমিটির সুপারিশ

সংবাদপত্রগুলিতে এবং আইন সভায় পুনঃ পুনঃ দাবী উত্থিত হওয়ায় ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাসে ভারত গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রেস আইন তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটির রিপোর্টে সুপারিশ আশানুরূপ না হইলেও তথ্যপূর্ণ পুস্তক হিসাবে তাহার মূল্য আছে। কমিটিকে কয়েকটি বিষয় বিবেচনার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম, ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশের সংবাদপত্র-মুদ্রণ আইন পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট প্রদান করা। দ্বিতীয়, ভারতীয় গণ-পরিষদ কর্ত্তৃক রচিত মৌলিক অধিকারের সহিত ভারতীয় সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইন সমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তাহার পর্য্যালোচনা করা। তৃতীয়, সেই পর্য্যালোচনার ভিত্তিতে কমিটি যেরূপ সঙ্গত মনে করেন, সেইরূপ ভাবে সংবাদপত্র-মুদ্রণ আইন সংশোধনের সুপারিশ করা। কমিটি তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন গত মে মাসে। কিন্তু ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহের স্বাধীনতার দাবী পূরণ হইতে পারে এমন কোন সুপারিশ কমিটি করেন নাই। তাঁহাদের সুপারিশগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে সংবাদ-পত্র-মুদ্রণ আইনের কঠোরতা সামান্য কিছু হ্রাস পাইবে মাত্র। কিন্তু সুপারিশও যে সবগুলি কার্য্যকরী হইবে এমন ভরসা করিবারও কোন কারণ নাই।

—

অন্ন-বস্ত্র সমস্যা

সাধারণ লোকেরা মোটা ভাত-কাপড় পাইলেই সন্তুষ্ট, কিন্তু তাহাও যদি না মেলে তাহা হইলে দুঃখিত হইয়া বলা স্বাভাবিক যে, স্বাধীন হইয়া এ কি অবস্থা দাঁড়াইল? কর্ত্তারা সেই জন্য বার বার স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে মূর্খের মত এ সব কথা বলা ঠিক নহে। স্বাধীনতার সহিত অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার কি সম্পর্ক? কিন্তু অল্পবুদ্ধি লোকেরা তবু ঐ একই কথা বলিতেছে, অন্নাভাবে মরিয়া গেলে স্বাধীনতা পাইয়া আর লাভটা কি হইল? অবশ্য ভারতের খাদ্য-সচিব শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম হইতে শুরু করিয়া পশ্চিম-বঙ্গের সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন এত দিন ভরসা দিয়াছেন—ভয় নাই, দেশের খাদ্যাবস্থা বেশ ভালই আছে, সরকারী চাউল-সংগ্রহও খুব ভালই চলিতেছে। অথচ ২৮শে ভাদ্র হইতে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে মাথা-পিছু এক সের এগারো ছটাক চাউলের পরিবর্ত্তে এক সের পাঁচ ছটাক করিয়া মিলিতেছে। যা দেওয়া হইতেছিল তাহাই ছিল প্রয়োজন হইতে অনেক কম, এখন যা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আধপেটাও চলে না। অবশ্য চাউলের পরিমাণ কমাইবার সঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার গমজাত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের লোকের পক্ষে সরকারী দোকানের অপূর্ব্ব আটা খাওয়া এবং খাইয়া নিরাময় থাকা অসম্ভব।

কাপড়ের অবস্থাও তদ্রূপ। ভারত গবর্ণমেণ্ট কাপড়ের কলে মজুত কাপড় আটক করিবার পর মাসাধিক কাল কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু কাপড়ের দর এখনও কমে নাই। এই সেদিন বাঙ্গালার মিল-মালিক সমিতির সভাপতি শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, মিলের গুদামগুলিতে প্রচুর কাপড় জমিয়া আছে, সরকার ডেলিভারী লইবার ব্যবস্থা করিতেছেন না। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে মিলগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে এবং হাজার হাজার লোক বেকার হইবে। উত্তরে সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন বলিয়াছেন যে, ইহার জন্য দায়ী মালিকেরা। জুলাই মাসে যে দাম কাপড়ের উপর ছাপিয়া দিয়াছেন তাহা সরকার-নির্দ্দিষ্ট সাময়িক দর অপেক্ষা বেশী। সুতরাং সরকার নূতন দর না ছাপিয়া তো কাপড় বাজারে ছাড়িতে পারেন না। এক মাসেও দর ছাপা হইল না, ওদিকে জনসাধারণের তো লজ্জা নিবারণের উপায় আর থাকিতেছে না। এই দীর্ঘসূত্রতায় লাভবান হইতেছে কেবল ব্যবসায়ীরা! সরকারের কি তাহাই উদ্দেশ্য?

—

পশ্চিম-বঙ্গের দাবী

১৩ই ভাদ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইনষ্টিটিউট হলে বাঙ্গালী সঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব লইয়া বাঙ্গালা, আসাম ও বিহারের মধ্যে যে বিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছে, তাহার বিশ্লেষণ করিলে এই সত্য প্রমাণিত হইবে যে, স্বদেশপ্রীতি তখনই অন্যায় ও অমঙ্গলের হেতু হইয়া উঠে, যখন ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভে সমগ্র দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে আমরা অগ্রাহ্য করিয়া অপর প্রদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবী এবং ঐকান্তিক ইচ্ছাকে তুচ্ছ করিয়া জাতীয়তাবোধের অপমান করি।" পশ্চিম-বঙ্গ তাহার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য বিহারের বাঙ্গালা ভাষা-ভাষী অঞ্চল দাবী করিলেই উহা ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা হইয়া দাঁড়ায়, ভারতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয় এবং জাতীয়তাবোধ ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু বিহার বা আসাম যখন পশ্চিম-বঙ্গের ন্যায্য দাবী অন্যায় করিয়া দাবাইয়া রাখে, তখন উহা প্রাদেশিকতা বলিয়া গণ্য হয় না, এমন কি জাতীয়তাবোধ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। সভাপতি মহাশয় আরও বলিয়াছেন,—"আমাদের পক্ষে এই সত্যটি ভাল করিয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, বাঙ্গালার দাবী যদি বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালীকে তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় করিয়া লইতে হইবে।" স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙ্গালী প্রথম অগ্রগামী হইয়াছে, সংগ্রামের সর্ব্বস্তরেই বাঙ্গালী রহিয়াছে পুরোভাগে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, স্বাধীনতা অর্জ্জিত হওয়ার পর স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। যদি হীন ভাবে আপোষ না করিয়া গৌরবময় সংগ্রামের পথে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইত, তাহা হইলে ভারত বিভক্ত করার প্রয়োজন হইত না, বাঙ্গালীকেও তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কঠিন হইয়া উঠিত। সভাপতি মহাশয় যথার্থ ই বলিয়াছেন—"আজ বাঙ্গালার ন্যায্য দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আমাদের আন্দোলন করিতে হইবে বিহারের অশিক্ষিত চাষী-মজুরদের বিরুদ্ধে নয়, বিহারের জন কতক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে—যাঁহারা আজ বিহার সরকারের নীতি পরিচালিত করিতেছেন।"

বাঙ্গালার এই ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণ করা পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির জন্য আজ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব জনমতকে উপেক্ষা করিয়া ভারত বিভক্ত করিয়াছেন। আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী পশ্চিম-বঙ্গে আসিতেছেন তাঁহাদের বাসস্থানের সংস্থান করিবার প্রধান দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই ব্যাপারে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। বিহারের বাঙ্গালা ভাষা-ভাষী অঞ্চলগুলি পাওয়া গেলে এই সমস্যার সমাধান অনেকখানি সহজ হইবে সন্দেহ নাই। আজ আসামে বাঙ্গালীর স্থান নাই। বিহারে পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালীরা বাস করিতে গেলে তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি কিছুই রক্ষিত হইবে না। বাঙ্গালার দাবী কংগ্রেসের নীতির দ্বারা অনুমোদিত। কিন্তু আজ সেই কংগ্রেসই বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। বাঙ্গালীর বাঁচিয়া থাকিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত হয়ত যুদ্ধই ঘোষণা করিতে হইবে।

উপনির্ব্বাচন

মালদহ-দিনাজপুরের উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় ও শ্যামাপ্রসাদ বর্ম্মণ উভয়েই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সর্ব্বাধিক ভোট পাইয়াছেন শ্রীযুক্ত রায়। কংগ্রেস-মনোনীত শ্রীযুক্ত বর্ম্মণ পাইয়াছেন ১৭·১৮ ভোট এবং কংগ্রেস-দ্রোহী শ্রীযুক্ত রামহরি রায় পাইয়াছেন ১৫৩২৫ ভোট। দুই হাজারেরও কম ভোটের পার্থক্য! কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কি কংগ্রেসের প্রতি লোকের উৎসাহ কমিয়া যাইতেছে?

কাশ্মীর সমস্যা

সম্মিলিত রাষ্ট্র-পরিষদ কর্ত্তৃক নিযুক্ত কাশ্মীর কমিশনের রায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ভারতীয় ও পাকিস্তানীয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের উপদেশ মানিয়া লইবার চার দিনের মধ্যেই উভয় রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইবে। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট প্রথমে বলিয়াছিলেন যে, হানাদার ও কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টের সৈন্যরাই যুদ্ধ করিতেছে। পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের এই যুদ্ধের সহিত কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু পরে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী প্রকাশ্য ভাবেই যুদ্ধে লিপ্ত। কাজেই যুদ্ধ-বিরতির পর পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টকে কাশ্মীর হইতে সমস্ত সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, পাকিস্তানের যে সমস্ত নাগরিক ও উপজাতিদিগের যে সকল হানাদার এখন কাশ্মীরে আছে, তাহাদেরও সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টকেই করিতে হইবে। তাঁহাদের অপসারণ-কার্য্য শেষ হইলে ভারত গভর্ণমেণ্ট নিজেদের অধিকাংশ সৈন্য কাশ্মীর হইতে সরাইয়া লইবেন। পরিশেষে কাশ্মীর পাকিস্তান অথবা ভারতবর্ষ কাহার সহিত যুক্ত হইবে তাহা সেখানকার অধিবাসীরা গণভোট দ্বারা নির্দ্ধারিত করিবেন।

পণ্ডিত জওহরলাল মোটামুটি প্রস্তাবগুলিকে মানিয়া লইয়াছেন। কার্য্য নিবারণের জন্য কেবল কমিশনকে লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন, (১) যেন পাকিস্তান বাহিনী কর্ত্তৃক কাশ্মীর পরিত্যাগের পর যে ভূখণ্ড হইতে পাকিস্তানী বা হানাদারবাহিনী অপসৃত হইবে সেখানে কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত হয়; (২) তথাকথিত আজাদ কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব যেন কোনরূপে স্বীকার করা না হয়; (৩) কাশ্মীরে শান্তিরক্ষার জন্য যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রয়োজন, তাহার সংখ্যা যেন অযথা হ্রাস করা না হয়, এবং (৪) কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ করিবার সময় পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট যেন তাহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে না পারে।

পাকিস্তানের বৈদেশিক মন্ত্রী সার মহম্মদ জাফরুল্লা কিন্তু অন্য সুর গাহিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কাশ্মীরে যুদ্ধ চালানো বা বন্ধ করা পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত নয়। এক মাত্র আজাদ কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টই সে সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে পারেন। অর্থাৎ পাকিস্তান প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধে যোগদান করে নাই ইহা প্রমাণ করা এবং আজাদ কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করা। যদি তাঁহার কথা সত্য বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে কমিশনের তদন্ত মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী কাশ্মীরে যুদ্ধ চালাইতেছে। পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে বৃটিশ অফিসাররা ছিল এ কথাও সার জাফরুল্লা নিছক উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য হইল, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে পাঠান হানাদারেরা কাশ্মীরের যে অংশ অধিকার করিয়া আছে তাহা ত্যাগ না করা।

শেখ আবদুল্লা বহু বার ঘোষণা করিয়াছেন যে, কাশ্মীর কমিশন যে সিদ্ধান্তেই উপনীত হউন না কেন, যত দিন পর্য্যন্ত হানাদারেরা কাশ্মীর ত্যাগ না করিবে, তত দিন পর্য্যন্ত কাশ্মীরের জনসাধারণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইবে না। ভারত গভর্ণমেণ্টও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট একান্ত শান্তিকামী, কিন্তু কাশ্মীর এখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিদেশীর আক্রমণ হইতে কাশ্মীরকে রক্ষা এবং সেখানে শান্তি স্থাপন না করিলে ভারত গবর্ণমেণ্টের আত্মসম্মান রক্ষা করা অসম্ভব।

খসড়া শাসনতন্ত্র

পশ্চিম-বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে ভারতের খসড়া শাসনতন্ত্র আলোচিত হইয়াছে। দুইটি অভিমত বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। এক জন এই খসড়া শাসনতন্ত্রকে গঠনমূলক রাজনৈতিক জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর এক জন বলেন যে, যতখানি যত্ন লইয়া খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা উচিত ছিল, ততখানি যত্ন লওয়া হয় নাই। কেবল জটিলতাই বৃদ্ধি হইয়াছে। সমগ্র ভাবে খসড়ার আরও একটি দিক্ আছে। উহা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র, না কেন্দ্রগত শাসনতন্ত্র? মোটের উপর মনে হয়, ইহা কেন্দ্রগত শাসনতন্ত্র। কেহ কেহ বলেন যে, উন্নয়ন কার্য্য সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করিতে হইলে কেন্দ্রের এইরূপ ক্ষমতা থাকা উচিত। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে প্রদেশগুলির হাতে যেটুকু স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষমতা ছিল, ইহাতে তাহাও নাই।

উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কি, তাহা এখনও জানা যায় নাই। ভারতের খসড়া শাসনতন্ত্রে জনসাধারণের খাওয়া-পরা, শিক্ষা, চাকুরী, বার্দ্ধক্যে পেন্সন প্রভৃতির কথা আছে, রাষ্ট্রের সম্পদ সমতার সহিত বণ্টনের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার জন্য রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব নাই। ভারত 'সার্ব্বভৌম স্বাধীন প্রজাতন্ত্র' হইবে, না 'সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' হইবে ইহাও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। 'স্বাধীন' শব্দটি ব্যবহার করিলে ভারতকে কমনওয়েলথের বাহিরে আসিতে হয়, কিন্তু নেতৃবৃন্দের যেন সে ইচ্ছা নাই। যে সকল নীতি খসড়া

শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাই যদি বহাল থাকে, তাহা হইলে ভারতকে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিবার কোন সার্থকতাই নাই। রাষ্ট্রপাল ও প্রদেশপালের অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তনের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্রের বিরোধী।

শাসনতন্ত্রের ৩ নং ধারায় প্রদেশগুলির সীমানা সংশোধন সম্পর্কে যে বিধান আছে তাহার মধ্যেও গলদ রহিয়াছে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের জন্য যে কমিশন গঠিত হইয়াছে, সেই কমিশনের নিকট পশ্চিম-বঙ্গের দাবী প্রেরিত হয় নাই। নূতন সীমানা নির্দ্ধারণের জন্য আবেদন তখনই গৃহীত হইবে, যখন যে প্রদেশ হইতে ভূখণ্ড কাটিয়া লওয়া হইবে, সেই প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের গরিষ্ঠ সংখ্যা তাহা অনুমোদন করিবেন। অর্থাৎ মানভূম, সিংভূম ইত্যাদির সম্পর্কে পশ্চিম-বঙ্গের দাবীই যথেষ্ট নহে। বিহার ব্যবস্থা পরিষদ যদি দিতে রাজী হন, তবেই কেন্দ্র সে প্রশ্ন কাণে তুলিবেন। এক কথায় তাহা অসম্ভব। অতএব নূতন শাসনতন্ত্র বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই বিহারের বাঙ্গালা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিম-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

গভর্ণর ও প্রধান মন্ত্রী দুই-ই জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। অথচ প্রধান মন্ত্রী অপেক্ষা গভর্ণরকে অনেক বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। দুইটি বিভিন্ন পদের প্রয়োজন কি? হয় গভর্ণরকেই নিজ মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিবার ভার দেওয়া উচিত, সে ক্ষেত্রে প্রধান মন্ত্রীর প্রয়োজন নাই: না হয় প্রধান মন্ত্রীকেই নিজ মন্ত্রিসভা গঠন করিতে দেওয়া হউক, সে ক্ষেত্রে গভর্ণরের কোন প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ গভর্ণরের হাতে এত অধিক ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, তাহাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন একটা পরিহাসের বস্তু হইয়াছে মাত্র। সকল দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যাইতেছে যে, বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণই স্বাধীনতা পাইয়াছেন। জনগণ যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রহিয়া গেল।

হায়দ্রাবাদ

২১শে ভাদ্র রাত্রি ৪ ঘটিকায় হায়দ্রাবাদ রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতীয় বাহিনীর পঞ্চমুখী অভিযান আরম্ভ হয়। হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করা ভিন্ন যে ভারত গভর্ণমেণ্টের আর গত্যন্তর ছিল না, তাহা নিজাম বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজা গোপালাচারীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই বুঝা যায়। রাজাজী নিজাম বাহাদুরকে শান্তিরক্ষার জন্য রাজাকারদিগকে দমন করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। উত্তরে নিজাম লিখিয়াছিলেন যে, রাজ্যের সীমান্তে যে উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, তাহা একটু শান্ত হইলেই তিনি রাজাকারদিগকে দমন করিবেন। সীমান্তে যে অশান্তি তাহা রাজাকারদিগেরই সৃষ্টি, সুতরাং রাজাকারদিগকে দমন করিবার পূর্ব্বে সীমান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এক কথায় শান্তি কামনার ভাণ করিয়া যুদ্ধের জন্য আরও অধিক প্রস্তুত হওয়া। তাই ভারত গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়াই যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে হইল।

চারি দিন যুদ্ধ করিবার পর অতিদর্পী নিজাম ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ৩রা আশ্বিন অপরাহ্ন পাঁচটায় সময় তিনি যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দেন। ভারতীয় সৈন্যের অভিযান আরম্ভ হইলেই যে এইরূপ অবস্থা ঘটিবে তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। ভারত গভর্ণমেণ্ট দৃঢ়তা অবলম্বন করিলে আরও অনেক দিন পূর্ব্বেই নিজাম আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইতেন এবং রাজাকারদের অত্যাচার হইতে হায়দ্রাবাদের অধিবাসীরা বহু পূর্ব্বেই নিষ্কৃতি পাইত। ভারতীয় ইউনিয়নের প্রজাদের উপরেও রাজাকারগণ অত্যাচার করিতে পারিত না।

বৃটিশ সম্রাটের আনুগত্যের পুরস্কার হিসাবে পাকিস্তান সৃষ্টি হইয়াছে। নিজামও আশা করিয়াছিলেন, বৃটিশের পক্ষপুটের আড়ালে থাকিয়া স্বাধীন হায়দ্রাবাদ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই দুরাশার আগুনে ইন্ধন জোগাইতে বৃটিশ টোরীগোষ্ঠী কখনও কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত বাধ্য হইয়াই ভারতের বন্ধন-রজ্জু শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের লোভাতুর দৃষ্টি হায়দ্রাবাদের উপর হইতে কখনও অপসৃত হয় নাই। ভারতের অন্তরদেশে একটা দুষ্টক্ষত সৃষ্টি করিয়া ভারতকে হীনবল করিয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহারা সংযত করিতে পারেন নাই। রাজাকার বাহিনীর সৃষ্টির ইতিহাস এখনও রহস্যাবৃত, কিন্তু এই বাহিনীর কার্য্যকলাপ দেখিলে এই সন্দেহ দৃঢ় হইয়া উঠে যে, পাকিস্তানের মুসলিম লীগের সহিত ইহার একটা নাড়ীর যোগ আছে।

নিজাম এবং নিজামী ফৌজের আত্মসমর্পণের পর মেজর জেনারেল জে, এন, চৌধুরী হায়দ্রাবাদের সামরিক গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন। অবশ্য ইহা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই সাফল্যের সহিত তিন জন বাঙ্গালী বীরের নাম সংযুক্ত রহিয়াছে—মেজর জেনারেল জে, এন, চৌধুরী, মেজর জেনারেল এ, এ, রুদ্র এবং ভাইস এয়ার-মার্শাল এস্, মুখার্জ্জি। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়।

বিলাতের 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' ও পাকিস্তানের 'ডন' পত্রিকা উভয়েরই অভিমত যে, নিজাম আত্মসমর্পণ করিলেও নিরাপত্তা পরিষদে হায়দ্রাবাদের সমস্যা উত্থাপিত এবং আলোচিত হওয়া উচিত। বৃটিশ ও পাকিস্তানের এইরূপ মনের ও মতের মিল আশ্চর্য্যজনক। টোরীগোষ্ঠীর মুখপাত্র 'টাইমস' পত্রিকা বলিয়াছেন, —"নিজাম বাহাদুরকে এখন ভারত গভর্ণমেণ্টের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে বটে, কিন্তু সারা জগৎ ভারতবর্ষকে ন্যায়ের বিধান লঙ্ঘন করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিবে।"

সকল গণ্ডগোলের মূল বীরকেশরী কাশিম রাজভী হায়দ্রাবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এক গুহায় আত্মগোপন করিয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদী সৈন্যরাই তাঁহাকে গুহার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া ভারতীয় ফৌজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

নিজাম বাহাদুর নিরাপত্তা পরিষদে হায়দ্রাবাদ সম্পর্কীয় অভিযোগ বাতিল করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, তাঁহার ভারত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের মুখপাত্র স্যার জাফরুল্লা খাঁর তাহাতে বিলক্ষণ আপত্তি আছে। তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই আদেশ হয়ত নিজাম বাহাদুরের নহে। অপপ্রচার এবং দুর্নীতিরও একটা সীমা আছে। কিন্তু ইনি যেন সকল সীমাই ছাড়াইয়া গিয়াছেন। নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের বিরুদ্ধে হায়দ্রাবাদের

অভিযোগ প্রত্যাহার করার জন্য নিজাম তার প্রেরণ করা সত্ত্বেও নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা হইবে।

হায়দ্রাবাদের ব্যাপার লইয়া যখন ভারতীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ও বৃটেনের নেতৃত্বে প্রবল অপপ্রচার সুরু হইয়াছে, তখন হায়দ্রাবাদের প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করিয়া নিজাম ওসমান আলি হায়দ্রাবাদ বেতার হইতে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। বিলাতের টোরী দলের ঝানু সংবাদপত্রগুলি পাকিস্তানের জাফরুল্লা খাঁ ও লিয়াকৎ আলির সুরে সুর মিলাইয়া সম্প্রতি বিশ্ববাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে যে, হায়দ্রাবাদে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ করা খুবই গর্হিত কার্য্য এবং ইহার ফলে একটি ক্ষুদ্র দেশের উপর অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে। কিন্তু এই সব প্রচারকার্য্য যে একেবারেই ভিত্তিহীন, সে কথা উল্লেখ করিয়া নিজাম তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"আমি পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা যেন স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনরূপ প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত না হন।" কারণ, হায়দ্রাবাদে যে অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে ভারতীয় সৈন্যের হায়দ্রাবাদে প্রবেশ না করিয়া উপায় ছিল না। ভারতীয় সৈন্যের হায়দ্রাবাদে প্রবেশের পূর্ব্বে তথায় যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিজাম বলিয়াছেন—"রাজাকার দল ও লায়েক আলির আট মাসব্যাপী সন্ত্রাসমূলক শাসন আমার উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়া আমাকে অসহায় করিয়া ফেলা হইয়াছিল। কাশিম রাজভীর নেতৃত্বে এই দল হিটলারী পদ্ধতিতে রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া সমাজের সকল স্তরের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে। যে সকল হিন্দু ও মুসলমান ইহাদের বশ্যতা স্বীকার করে নাই, তাহাদের উপরই ইহারা অত্যাচার করিয়াছে। বিশেষ করিয়া হিন্দুদের ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া দিয়াছে এবং লুঠতরাজ করিয়াছে। এই সন্ত্রাসবাদী দল হায়দ্রাবাদে এমন একটা রাজত্ব সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল, যাহাতে কেবল মাত্র মুসলমানদেরই নাগরিক অধিকার থাকিবে।" স্বয়ং নিজাম বাহাদুরের নিকট হইতে হায়দ্রাবাদে সুশাসনের এই বর্ণনা পাঠ করিবার পরও যাহারা হায়দ্রাবাদে ভারতীয় বাহিনীর প্রবেশকে একটা শান্তিপূর্ণ রাজ্যের উপর জুলুম বলিয়া রটনা করিতে পারে—তাহাদের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।

কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষ হইতে নিজামের এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন উঠিবে, সত্য কথাটা আবিষ্কার করিতে নিজামের এত বিলম্ব ঘটিল কেন? হায়দ্রাবাদে যে জনসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার চলিতেছে, এ কথাটা ভারতীয় বাহিনী হায়দ্রাবাদে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে নিজাম বাহাদুর বুঝিতে পারেন নাই কেন? এই প্রশ্নের কৈফিয়ৎ স্বরূপই যেন নিজাম বলিয়াছেন, রাজাকারদের শাসন জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়া তাঁহাকে অসহায় করিয়া ফেলা হইয়াছিল। কিন্তু এই কৈফিয়ৎ কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য? হায়দ্রাবাদের সৈন্য-বাহিনী শেষ পর্য্যন্ত যে নিজামেরই অধীন ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হায়দ্রাবাদের জনসাধারণের উপর রাজাকার দল যখন সংগঠিত ভাবে লুঠতরাজ, খুন-জখম, পাশবিক অত্যাচার চালাইয়াছে, তখন নিজামী ফৌজ যে এক দিনও তাহাদের বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত তো একটিও নাই। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজাকার ও নিজামের সৈন্যরা একই সঙ্গে লুঠপাট চালাইয়াছে, এ কথা হায়দ্রাবাদের যে কোন লোকই ভাল করিয়া জানে। তাহা ছাড়া নিজাম তাঁহার বক্তৃতায় স্বয়ং "আট মাসব্যাপী রাজাকার অত্যাচারের" কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে, আট মাস পূর্ব্বে যে সব অত্যাচার হইয়াছে, তাহার দায়িত্ব অন্ততঃ নিজাম এড়াইয়া যাইতে পারেন না। হায়দ্রাবাদের সহিত ভারতের স্থিতাবস্থা চুক্তি স্বাক্ষরের অন্যতম কারণ ছিল এই যে, নিজাম ওসমান আলি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিতে কিছুতেই সম্মত হন নাই। সে সময় যাহারা হায়দ্রাবাদকে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানে বাধ্য করিবার জন্য প্রজা আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর অত্যন্ত কঠোর ভাবে অত্যাচার চালাইতে নিজাম ও তাঁহার পরামর্শদাতারা কার্পণ্য করেন নাই। হায়দ্রাবাদের উপর নিজামের সৈন্যরা যখন নির্য্যাতন চালাইতেছিল, তখন ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত তুলনা করিয়া নিজাম বলিয়াছিলেন—"ভারতে যখন রক্তপাত হইতেছে, তখন আমার সুশাসনে হায়দ্রাবাদে অটুট শান্তি বিরাজমান।" সুতরাং দেখা যাইতেছে, আজ যাহাকে নিজাম সন্ত্রাসমূলক অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, সেদিন তাঁহার চক্ষে তাহাই অপার শান্তি বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। রাজাকারদের সহিত নিজামও যে হায়দ্রাবাদবাসীদের অসীম দুর্দ্দশা, দুঃখ ও রক্তপাতের জন্য দায়ী, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় কোথায়? ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে এবং অব্যবহিত পরে প্রজা আন্দোলনের কর্ম্মীদের উপর অত্যাচারের জন্য, ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানে অস্বীকার করিয়া সমস্যাকে ঘোরাল করিয়া তুলিবার জন্য নিজামই যে প্রধানতঃ দায়ী, তাহাতে ভুল নাই।

নিজামের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহা লইয়া আজ যখন নয়াদিল্লীতে আলোচনা সুরু হইয়াছে, তখন গদী রক্ষার জন্য নিজে সাধু সাজিবার এই চেষ্টা নিজামের পক্ষে স্বাভাবিক। ভারতীয় ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দও নিজামকে রাজ্যচ্যুত করার পক্ষপাতী নহেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের রাজাদের যে ভাবে মোটা মাহিনা দিয়া পুষিয়া রাখা হইয়াছে—নিজাম ওসমান আলি বা তাঁহার বংশধরদের সেই ভাবে পুষিয়া রাখাই না কি নেতাদের অভিপ্রায়। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, অন্য রাজাদের জিয়াইয়া রাখিবার যেটুকু যুক্তি আছে, নিজামকে রাখিবার পক্ষে সেটুকু যুক্তিও নাই। অন্যান্য রাজারা তবু স্বেচ্ছায় ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়াছেন, কিন্তু নিজাম ভারতের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং শেষে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই এখন কাণমলা খাইয়া ভুল সংশোধনের ভাণ করিতেছেন। আর তাহা ছাড়া নিজামের খেসারত দিবার জন্য হায়দ্রাবাদের হাজার হাজার নর-নারীকে অভূতপূর্ব্ব নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। এই অবস্থায় নিজামের সহিত আপোষের বিন্দুমাত্র ভিত্তি নাই—থাকিতে পারে না। সর্দ্দার প্যাটেল পূর্ব্বে জানাইয়াছেন, হায়দ্রাবাদবাসীদের নির্ব্বাচিত গণ পরিষদ হায়দ্রাবাদের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে প্রাপ্তবয়স্কের গণভোটে হায়দ্রাবাদে রাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন নিজাম-তন্ত্রের ন্যায় অত্যন্ত

প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া হায়দ্রাবাদে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রহসনে পরিণত হইতে বাধ্য।" কিন্তু প্রশ্ন এই, গণভোটের মারফৎ হায়দ্রাবাদে রাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ অধিকার হায়দ্রাবাদবাসীদের দিতে ভারতীয় ইউনিয়নের নেতারা কি প্রস্তুত আছেন? এই সম্পর্কে ভরসা করিবার বিশেষ কারণ আছে বলিয়া মনে করা কঠিন। হায়দ্রাবাদ আক্রমণের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে পণ্ডিত নেহরু নিজামকে যেরূপ অভয় বাণী শুনাইয়াছিলেন, তাহাতে ইতিমধ্যে অসাধারণ কিছু না ঘটিলে হায়দ্রাবাদবাসীরা সে সুযোগ পাইবে কি না সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘটক

টাটা স্বব ডিলার্স (নিয়ন্ত্রিত মাল) কলিকাতা লিঃ-এর চেয়ারম্যান এবং পশ্চিম-বঙ্গীয় লৌহ-ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘটক মহাশয় ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত উপদেষ্টা কমিটির

সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এই ব্যবসায়ের সম্মুখে বর্ত্তমানে যে সকল অসুবিধা দেখা দিয়াছে, তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত ঘটক বিশেষজ্ঞ এবং আশা করা যায় যে, তাঁহার সহযোগিতায় ইস্পাত বণ্টন সম্পর্কীয় বহু সমস্যার সমাধান হইবে।

শ্রীযুক্ত সম্মুখম্ চেট্টির পদত্যাগ

ভারতের অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত সম্মুখম চেট্টিকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। ষ্টার্লিং ব্যালেন্স সম্বন্ধে বিলাতে তিনি যে চুক্তি করিয়াছেন, সাধারণ ভারতবাসী তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল, কিন্তু সরকারী মহল তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনাই জানাইয়াছিল। সুতরাং ইহা পদত্যাগের কারণ নয়। আয়কর অনুসন্ধান কমিটি কার্য্যকালে দেখিলেন যে, দেশের কয়েক জন বিখ্যাত ধনী সরকারকে আয়কর ফাঁকি দিয়াছেন এবং এই সকল ব্যক্তির সহিত শ্রীযুক্ত চেট্টির বিশেষ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। তিনি স্বয়ং ইঁহাদের নাম কমিটির কাগজপত্র হইতে কাটিয়া দিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ভাবার পদত্যাগের সময়ও পারমিট সংক্রান্ত অনেক কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল।

আত্ম-সমর্থন করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত চেট্টি বলিয়াছেন যে, তদন্ত কমিশনের মত না লইয়া কাহারও নাম বাদ দেওয়া চলিবে না, ইহাই ছিল তাঁহার ১লা মার্চ্চ তারিখে আনীত বিলের মূল কথা। কিন্তু তাহা হইলেও ১২ই মার্চ্চ তিনি কয়েক জনের নাম প্রত্যাহার করিয়া কিছু অন্যায় কাজ করেন নাই। কারণ, ঐ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। সুতরাং বিলকে ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট। বলিয়াছেন যে অর্থ-সচিব সন্দেহের উর্দ্ধে। তথাপি অর্থসচিব পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, কারণ লোকের মনে যখন তাঁহার সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়াছে তখন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকা তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন না। ব্যাপারটা আপাত দৃষ্টিতে যত সরল ও উদার মনে হইতেছে, আসলে তাহা নহে। আয়কর ফাঁকি দিবার সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট নাম পেশ করিবার সময় সরকারী দপ্তর নিশ্চয়ই বাছিয়া বাছিয়া কয়েক জনের নাম পাঠান নাই। যাঁহাদের নাম পেশ করা হইয়াছিল তাঁহাদেরও নিশ্চয়ই কোন গলদ পাওয়া গিয়াছিল, নতুবা তাঁহাদের উপর সরকারী দৃষ্টি পড়িবার কারণ ছিল না। দেশের কয়েক জন খ্যাতনামা শিল্পপতির নাম সহসা তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল কেন? চিন্তা করিলেই সন্দেহ জাগে, শিল্পপতিদের সহিত অর্থ-সচিব এবং সেই সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগাযোগ নাই তো?

শ্রীযুক্ত চেট্টি ওটোয়া বৈঠকে ইম্পিরিয়াল চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া আসিয়াছিলেন। ষ্টার্লিং ব্যালেন্স সম্পর্কে যতটা গোলযোগ করা যাইতে পারে করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে এই পদে অধিষ্ঠিত করিবার কারণ কি? তাঁহার ভুলকে সরকারী ভাবে ঢাকা দিবারই বা অপপ্রচেষ্টা কেন? কোথাও যেন কি একটা হীন ব্যাপার রহিয়াছে, যাহার উদ্‌ঘাটন সরকার চাহেন না।

বিচারপতির ডক্টর উপাধি

মনস্বী বিচারপতি এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ বর্ত্তমানে কলিকাতার ছোট আদালতের অন্যতম বিচারক।

তিনি সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল হিন্দু আইনে নিক্ষেপ (Bailment) ডাঃ দাশ বসুমতীর অকৃত্রিম সুহৃৎ। মাসিক বসুমতী তাঁহার অজস্র রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ। তাঁহার অবদানে বঙ্গসাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হউক—ইহাই আমাদের কামনা।

মহম্মদ আলি জিন্না

পাকিস্তান ডোমিনিয়নের গবর্ণর জেনারেল কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না ২৬শে ভাদ্র রাত্রি ১০টা ২৫ মিনিটের সময় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় ভারত বিভক্ত হইয়া মুসলিমদের পৃথক্ রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে পাকিস্তান তাহার স্রষ্টা, তাহার শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক, তাহার শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ্‌কে হারাইয়া মর্ম্মান্তিক বেদনায় মুহ্যমান।

তিনি দ্বৈতজাতি মতবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তানের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং সেই দাবীকে তিনি পূরণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কার্য্যকরী করিবার জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত অন্য কোন পথ তিনি দেখিতে পান নাই। এই পথেই ভারতীয় মুসলিমদের কল্যাণ হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। তাঁহার বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধার, তাঁহার দৃঢ়তা ছিল বিপুল, আইন-ব্যবসার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবহারাজীবী এবং দ্বৈতজাতি মতবাদী ভারতের মুসলমানদের তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ নেতা। এক সময়ে তিনি যে বিশিষ্ট কংগ্রেস-সেবী ছিলেন, এ কথাও আমরা স্মরণ না করিয়া পারি না।

সত্যপ্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

তেলিনীপাড়ার স্বনামখ্যাত জমিদার শ্রীযুত স্বর্গীয় সত্যশান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র ও চন্দননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ সত্যপ্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, গত ২১শে ভাদ্র মঙ্গলবার ভোর সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় মাত্র একুশ বৎসর বয়সে দুরন্ত টাইফয়েড রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রীমান্ এই বৎসরই হুগলী কলেজ হইতে সাফল্যের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল কৃতী ছাত্র ছিলেন তাহা নহে, অমায়িক ব্যবহার এবং দয়ার্দ্র চিত্তের জন্য তিনি সকলেরই স্নেহ ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

জগদীশচন্দ্র সরকার

গত ১২ই আগষ্ট প্রাতে, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন সিটি আর্কিটেক্ট জগদীশচন্দ্র সরকার ৭২ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯১২ সালে তিনি কর্পোরেশনে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় কর্ম্মদক্ষতা ও প্রতিভাবলে ১৯৩৪ খৃঃ সিটি আর্কিটেক্ট পদে উন্নীত হন। তৎপরবর্ত্তী দুই বৎসরের মধ্যে তিনি কর্পোরেশনের স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত হন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

সতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গত ৩রা আগষ্ট অপরাহ্ণে সতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার ২৮ নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় আইন ব্যবসা ব্যতীত বহু শিক্ষা ও জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বহু দিন কলিকাতা সরস্বতী ইনষ্টিট্যুশানের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ২০ বৎসরাধিক স্যার গুরুদাস ইনষ্টিট্যুশানের প্রধান সভ্য এবং বীরনগর পল্লী উন্নয়ন সমিতিরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সদাচারী ও নিরভিমান ব্যক্তি দুর্লভ। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার অমায়িক সরল ব্যবহারে মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। তিনি বহু দরিদ্র ছাত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থে সাহায্য করিতেন এবং গোপনে বহু দরিদ্র পরিবারকে অর্থ সাহায্য করিতেন। মৃত্যুকালে তিনি চার পুত্র, এক কন্যা ও জামাতা ও বহু নাতি-নাতিনী রাখিয়া গিয়াছেন।

সুবর্ণবালা দেবী

কলিকাতার বিশিষ্ট লৌহ-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মেসার্স কে, সি, ঘটক এণ্ড সন্স লিমিটেডের অন্যতম স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় আশুতোষ ঘটক মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী সুবর্ণবালা দেবী প্রায় ৫৯ বৎসর বয়সে ২১শে ভাদ্র সোমবার রাত্রি ১-৪৫ মিনিটে কলিকাতায় ৫/১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি

দুই পুত্র (ঈশানীতোষ ও নির্ব্বাণীতোষ ঘটক), দুই কন্যা, নাতি নাতনী ও বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মশীলা, পরহিতব্রতী ও আদর্শ হিন্দু-রমণী ছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

সুশ্রী হোন

—দুঁরকম পণ্ডস ক্রীমের সাহায্যে

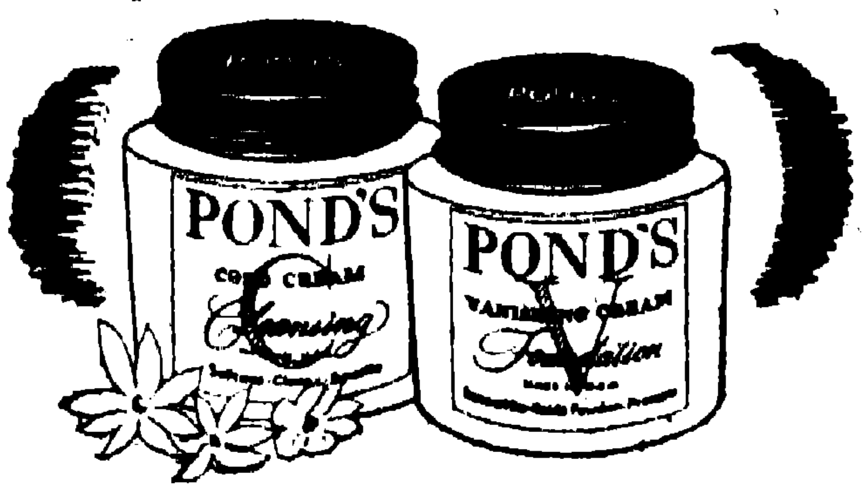

একটিতে পরিষ্কার থাকে!—অপরটিতে সুরক্ষিত রাখে!

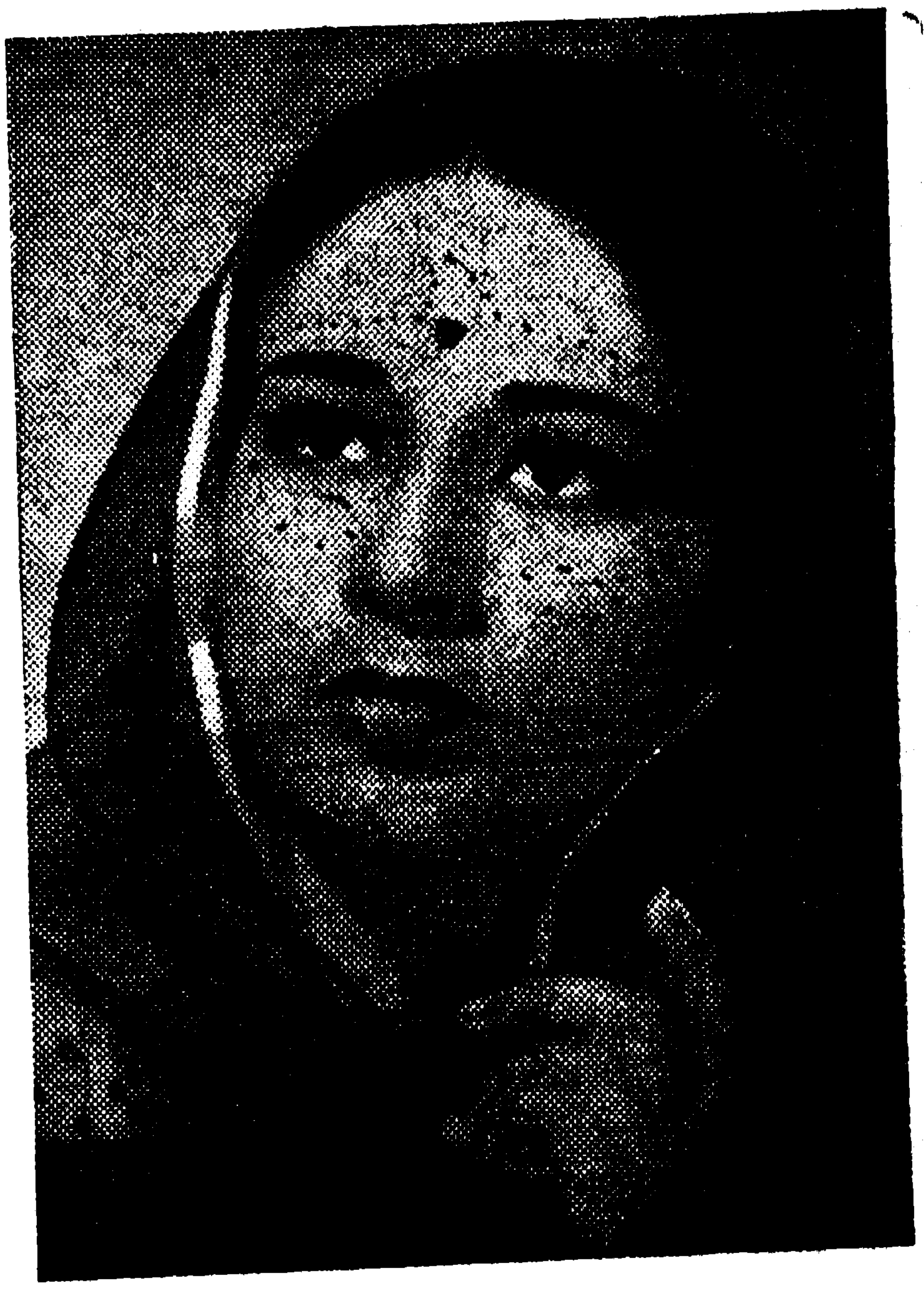

কমনীয় মুখশ্রী পেতে হলে দুটি ক্রীম আপনার মাখা উচিত—দুটিতে ঠিক দুরকম কাজ হবে। প্রথমতঃ, সৌন্দর্য্যচর্চ্চার বেলায় অন্য সব কিছুর আগে চাই পরিচ্ছন্নতা, সুতরাং এমন একটি ক্রীম দরকার যা নানা-প্রকার **তৈলমিশ্রিত** ব'লে লোমকূপের অভ্যন্তরে ঢুকে ময়লা বার ক'রে দেয় ও ত্বক কোমল রাখে — এর জন্য উপযোগী পণ্ডস কোল্ড ক্রীম। দ্বিতীয়তঃ, আর একটি **তৈলশূন্য** ক্রীম চাই যা দিনের বেলায়, অদৃশ্য থেকে ধূলাবালি ও উত্তাপের হাত থেকে ত্বকের কমনীয়তা রক্ষা করে — এর জন্য হলো পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম।

ত্বক পরিষ্কার রাখার জন্য প্রতিদিন রাত্রে পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মাখুন। বেশ খানিকটা ক'রে নিয়ে মুখে ও গলায় বুলিয়ে দিন এবং কিছুক্ষণ মালিশ করার পর বেশ করে মুছে ফেলুন। মাত্র কয়েক দিন এভাবে লাগালে আপনার ত্বক এমন পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হবে যা আগে আর কখনো চোখে পড়েনি!

ত্বক রক্ষা করার জন্য রোজ ভোরে তৈলশূন্য পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন। অল্প ক'রে নিয়ে আস্তে আস্তে মালিশ করলেই দেখতে পাবেন তা মিলিয়ে গেছে। মিলিয়ে গেলেও এই ক্রীম দিনভোর সেখানেই থাকে এবং ধূলিময়লা ও রোদের হাত থেকে মুখের কমনীয়তা রক্ষা করে আর মুখের উপর এনে দেয় রেশমের মতো মসৃণ উজ্জ্বলতা। মেখে পরীক্ষা করে দেখুন!

পণ্ডস

মনে রাখবেন — গ্রীষ্মের তীব্র তাপে ও শীতের ঠাণ্ডায় স্বাভাবিক স্নিগ্ধ পদার্থ শুকিয়ে গিয়ে ত্বক কালো ও কর্কশ হয়ে ওঠে।

এও মনে রাখবেন যে লোমকূপের মধ্যে যৎসামান্য ধূলিবালি জমলেও তাতে চর্মে দাগ পড়ে।

নিয়মিতভাবে প্রতিদিন দু'রকম পণ্ডস ক্রীম মাখলে আপনার মুখশ্রী কমনীয়, উজ্জ্বল ও নিখুঁত হবে এবং সব সময় আপনাকে তরুণ দেখাবে। পণ্ডস-এর দুটি ক্রীম আপনার দৈনন্দিন "সৌন্দর্য্য প্রসাধনের" উপকরণ হোক।

ব্যবসাসংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য — এল, ডি, সেভুর এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ
বোম্বাই ★ কলিকাতা ★ দিল্লী ★ মাদ্রাজ ★ মোডা গোয়া ★ করাচী ★ কলম্বো ★ রেঙ্গুন

আপনার দেশ চায়

ভবিষ্যতের সংস্থান আপনি এখন থেকেই করতে থাকুন। উপার্জ্জনের ক্ষমতা চিরকাল থাকেনা কিন্তু প্রয়োজনের দাবী আজীবন থাকবে। বৃদ্ধ বয়সে আপনি নিজে ও আপনার পরিবারবর্গ দেশের গলগ্রহস্বরূপ যাতে না হন সেজন্য এখন থেকেই কিছু কিছু জমানো আপনার কর্ত্তব্য। সুতরাং সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে সর্ব্বপ্রকার বীমার বৃহত্তম যে প্রতিষ্ঠান, এ বিষয়ে তার পরামর্শ নিন।

অধিকৃত মূলধন	৬,০০,০০,০০০৲
গৃহীত	৩,৫৬,০৫,০০০৲
আদায়ী	৭১,২১,০০০৲
মোট তহবিল	১০,৪১,৪২,০০০৲
মোট সম্পত্তি	১২,৭৪,৩৭,০০০৲
মোট দাবী দেওয়া হইয়াছে অন্ততঃ	১৪,০০,০০,০০০৲
চলতি জীবনবীমার পরিমাণ অন্ততঃ	৪০,০০,০০,০০০৲

নিউ ইণ্ডিয়া
এস্যুরেন্স কোঃ লিঃ

জীবন ● অগ্নি ● নৌ ● দুর্ঘটনা

প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বীমার দায় গ্রহণ করে।

হেড অফিস: বোম্বাই কলিকাতা অফিস: ৯, নেতাজী সুভাষ রোড

জামশেদপুর, পাটনা, শিলং, জলপাইগুড়ি, ঢাকা, করাচী, প্রভৃতি স্থানে অফিস আছে।

বাঙ্গালার চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই এই বই দুইখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

ছদ্মনামী লেখকের

পথের ধূলো উপন্যাস

৯৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫৵০ মাত্র

রবীন্দ্রনাথের কল্পনা, শরৎচন্দ্রের ভাষা ও বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শের বিরাট সমাবেশ। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের সকরুণ দৃশ্য। রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির স্বাধীন ও বিশদ সমালোচনা।—বাঙ্গালী খুঁজে পাবে তার পথ চিন্তায় শক্তি ও কর্ম্মে ভক্তি।

ছদ্মনামী লেখকের

অর্ঘ্য গীতিকাব্য

১৬৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৵০ মাত্র।

যাহারা গীতাঞ্জলি পড়িয়াছেন তাহাদের এই পুস্তকখানিও পড়িতে অনুরোধ করি।

কৈলাস সাহিত্য কুঠির

১৬৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

[illegible]

পূজোর আগেই বেরোবে

নবেন্দু ঘোষের

সর্ব্বাধুনিক ও বহু প্রশংসিত গল্প-সংগ্রহ

কান্না

বহু-বিচিত্র পটভূমির ওপর আঁকা হয়েছে নানা স্তরের মানুষকে যার আলো আঁধারে মেশানো জীবনে আছে—সুখের পাশে দুঃখ আর হাসির পাশে কান্না। এই ত জীবনের রূপ, কিন্তু সমাজে আর রাষ্ট্রে যখন ক্ষয় দেখা দেয়, তখন হাসির চেয়ে কান্নাটাই বড় হয়ে ওঠে। শক্তিশালী লেখকের কালীকলম সেই কাহিনীই শোনাবেন এই গ্রন্থে।

দাম দুই টাকা।

—পূজোর পরে বেরোবে—

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের—গল্প-সংগ্রহ

নবেন্দু ঘোষের—উপন্যাস, শান্তি রায়ের—উপন্যাস

প্রধান পরিবেশক—গ্রন্থালয়

২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানি বাজার (দ্বিতল) কলিকাতা।

সমস্ত সম্ভ্রান্ত বইয়ের দোকানে পাওয়া যাবে।

প্রকাশক—ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স

[illegible]

উপহারের সেরা বই

বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকর্ম্মী কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—

সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র

চার অধ্যায়ে সমাপ্ত ঘটনা-বহুল "বিপ্লবী জীবন"-এর সুবৃহৎ ইতিহাস। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য ৬৲

শিশু-সাহিত্যিক শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত—

কিশোরদের বিশ্বকবি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর জীবন-কথা। মূল্য ২৲

সুভাষিণী দেবী ও উপেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রণীত

কাটিং ও সূচি-শিল্প শিক্ষা

(তৃতীয় সংস্করণ) মূল্য—২।০

নালন্দা প্রেস

১৫৯-১৬০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

মোপাসাঁর গল্পঃ—

দশ খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে!

প্রথম খণ্ড ২৫শে বৈশাখ বেরিয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড পূজোর আগেই বেরুবে।

সম্পাদক—সলিল সেনগুপ্ত

প্রতি খণ্ডের মূল্য—দু'টাকা বারো আনা।

সমস্ত পুস্তকের দোকানে পাওয়া যাবে।

নন্দা পাবলিশিং হাউস্

সেনোলা

রে ডি ও

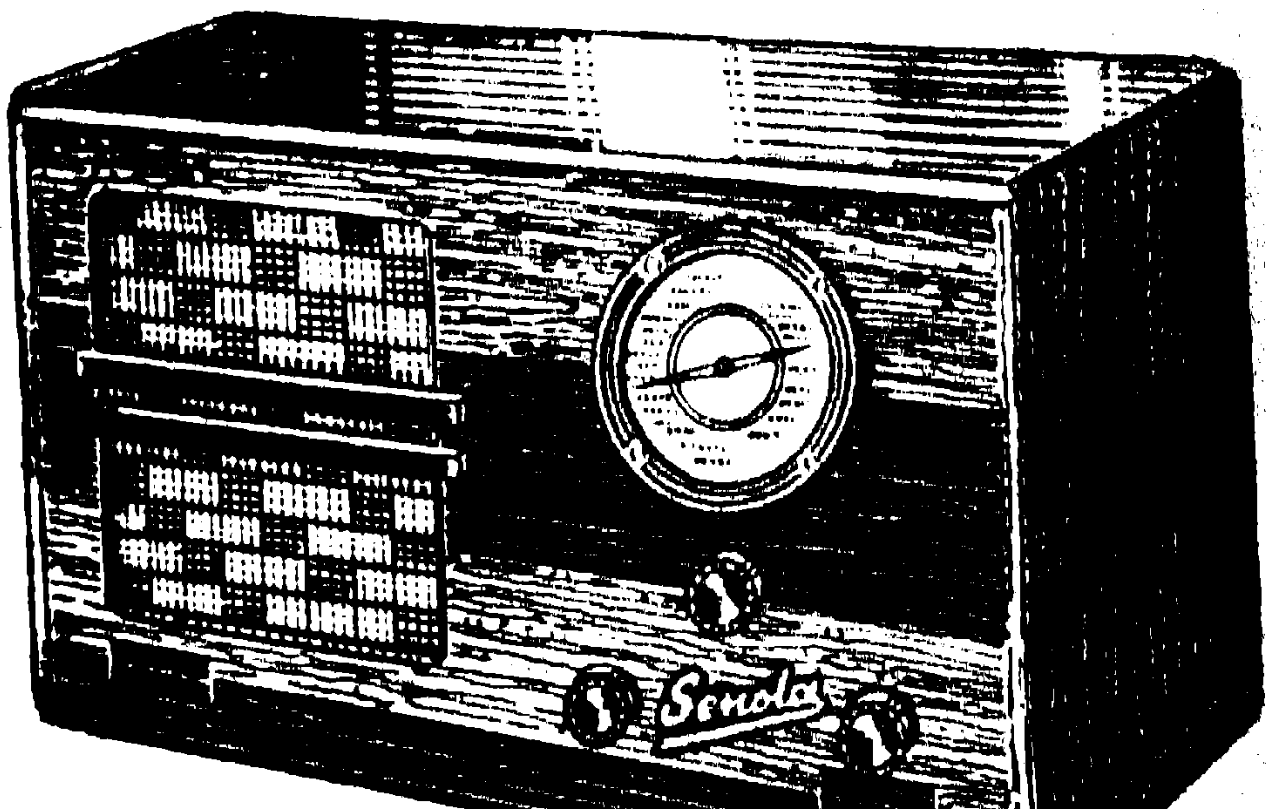

সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত

- ডি. সি. মেন সেট্ ১২০৲
  (স্থানীয় বেতার বার্ত্তার জন্য)
- এ.সি/ডি.সি. মেন সেট ১৫০৲
  (স্থানীয় বেতার বার্ত্তার জন্য)
- ড্রাই ব্যাটারী সেট্ ২০০৲
  (২০০ মাইলের মধ্যে কার্য্যকরী)

অল ইণ্ডিয়া ড্রাই ব্যাটারী সেট ৩০০৲
(ভারতের যাবতীয় বেতার কেন্দ্র হইতে প্রচারিত প্রোগ্রাম পাওয়া যায়।)

- অল ওয়েভ ড্রাই ব্যাটারী সেট্ ৪০০৲
  (সারা ভারতের এবং বৈদেশিক সর্ট-ওয়েভ ষ্টেশনের বেতারবার্ত্তা সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করে
  (ব্যাটারী ৩০৲ অতিরিক্ত)

রেডিওর যাবতীয় পার্টস্ ও সাজ-সরঞ্জাম এবং রেডিও-ব্যাটারী স্বল্পমূল্যে আমাদের দোকানে পাইবেন।

এন, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স

২১ নং চৌরঙ্গী রোড (লিণ্ডসে ষ্ট্রীট জংসন)
১১ নং এসপ্লানেড ইষ্ট (গুপ্ত বিল্ডিংস)
৫৩ নং সেন্ট্রাল এভিনিউ (বহুবাজার ষ্ট্রীট জংসন)
ক লি কা তা

সেই আদিকাল থেকে.....

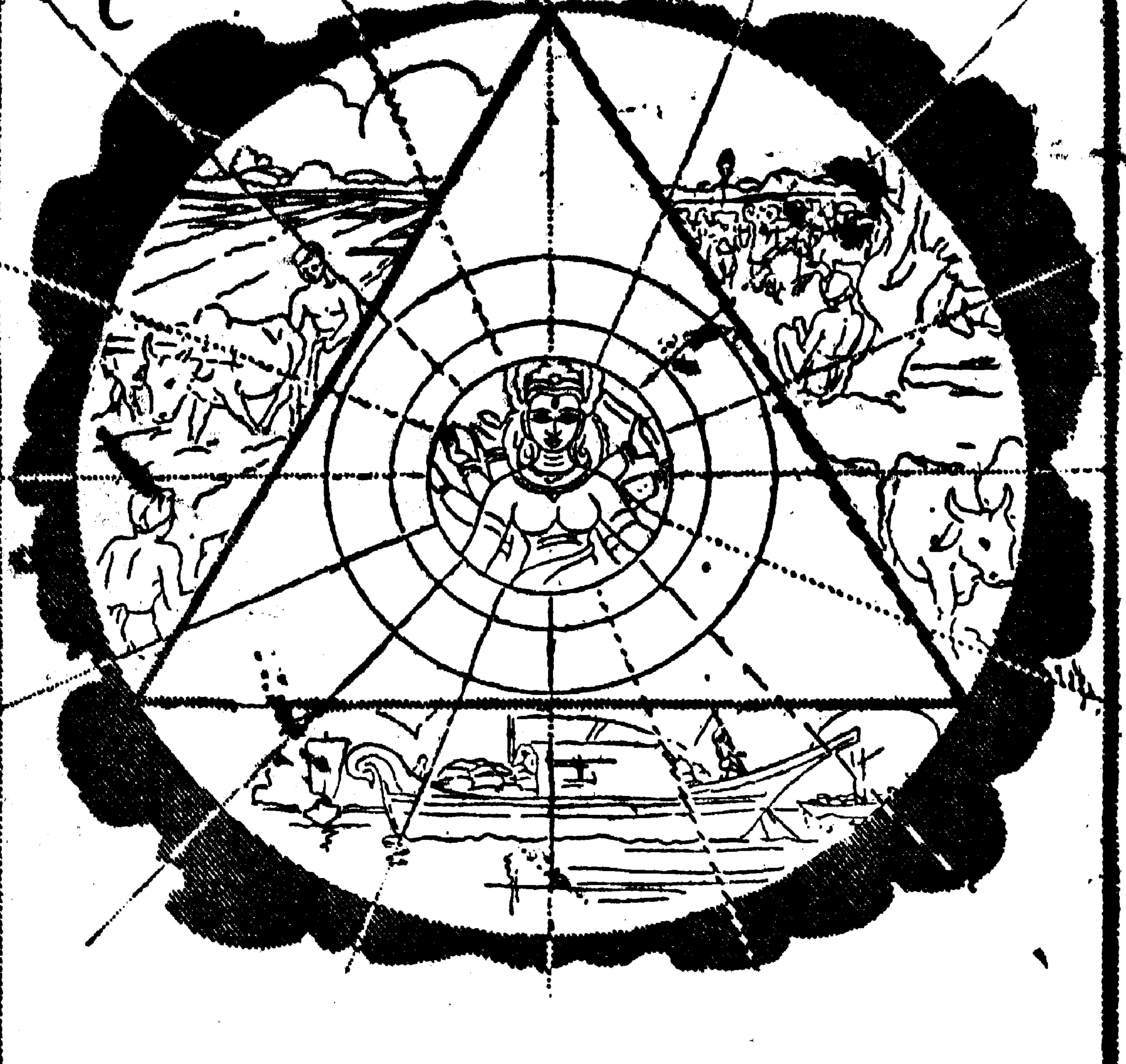

আদিকাল থেকেই মানুষ উপলব্ধি করে এসেছে যে, তার জীবিকানির্বাহের পক্ষে অপরিহার্য্য যা-কিছু, তা সমস্তই সৃষ্টিবিধাত্রী আদ্যাশক্তির প্রকাশ। তাইতো চণ্ডীর মধ্যে মহামায়ার স্তুতিপরায়ণ দেবকুলের মুখে উচ্চারিত হয়েছে "ভবভাবনায় বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্রী" — হে দেবী তুমি বিশ্বের পরিপালনের নিমিত্ত (কৃষি-পশুপালন — বাণিজ্য — প্রভৃতি) বৃত্তিরূপা, তুমি সর্বজগতের পরমদুঃখবিনাশিনী। এই মহামন্ত্রের আলোকেই যেন আমরা জীবিকানুসরণে চিরদিন পথ খুঁজে পাই, এ-সত্যই আমাদের অনুক্ষণ স্মরণ করিয়ে দেয় "বৃত্তিই ঈশ্বর"।

এম, এল, বসু এণ্ড কোং লিঃ

লক্ষ্মীবিলাস হাউস কলিকাতা

—অন্নদা মুনশী

এই মুখখানি

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৭শ বর্ষ—আশ্বিন : ১৩৫৫ সাল

১ম খণ্ড : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

নব্যভারত

প্রবন্ধটি শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিক 'নব্যভারত' নামক মাসিক পত্রিকার প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত। ইহাতে নব্যভারত পত্রিকাটির কথা বলিতে গিয়া 'নব্যভারত'-এর সমাজ ও মনস্তত্ত্ব লইয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠ ১২৯০ সালে নব্যভারত সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আজও কি তাহা প্রযোজ্য নহে?

ভারত-ইতিহাস লেখকগণ কলম ধরিয়া লিখুন—১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রাচীন ভারত 'নব্যভারত' নামে অভিহিত হইল। পৃথিবীর যদি বুঝিবার শক্তি থাকে, তবে পৃথিবী বুঝিবে—প্রকৃত পক্ষেই ভারত বর্ত্তমান সময়ে 'নব্যভারত' নামে পৃথিবীর কাহিনীতে আখ্যাত হইয়াছে। একি অহঙ্কারের কথা? যাঁহারা বিদ্রূপপ্রিয়—উপহাস করাই যাঁহাদিগের স্বভাব,—তাঁহারা একথা বলিবেন, তাহা জানি; তাঁহাদিগকে একথা বলিতে দেও। দরিদ্রের কুটিরে যখন নব সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এবং সেই দরিদ্র যখন আহ্লাদ সহকারে সেই সংবাদ দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতে যায়,—তখন ধনি-জগৎ যে তাহাকে বাতুল বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু দরিদ্রের কি আহ্লাদ করিবার কিছুই নাই? নিবিষ্টচিত্তে ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারেন—দরিদ্রেরও আহ্লাদ করিবার বস্তু আছে—দরিদ্রের জন্যও পৃথিবীতে সুখ রহিয়াছে, দরিদ্রও সত্য কথা বলিতে অধিকারী। প্রাচীন ভারতের নব জীবনের নূতন সংবাদ প্রচার করিতে কতিপয় দরিদ্র লোক অগ্রসর হইয়াছেন—লোকে ঠাট্টা করিবে, উপহাস করিবে, আশ্চর্য্য কি? সত্য কাহিনী প্রচার করিবার সময় বাধা বিঘ্ন স্মরণ করিয়া যে নিরস্ত থাকে, সে মূর্খ। প্রাচীন ভারত 'নব্যভারত' বেশে জগতের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন. আমরা একথা বলিব—কাহারও কথা শুনিব না। ইতিহাস-লেখকগণও সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, কলম ধরিয়া এই কথা স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠার লিখিয়া রাখিবেনই রাখিবেন।

কি—ভারত নূতন? প্রাচীন ভারত আবার নূতন হইল? বৃদ্ধও কি যুবকে পরিণত হইতে পারে? এ কি শাস্ত্র? পুনর্জ্জন্মে কি তবে বিশ্বাস করিতে হইবে? প্রাচীন ভারত আরও প্রাচীন হইলেন, না পুনঃ নবীনত্বে পরিণত হইলেন? আমরা বলি, এ সকলি সম্ভব। জড়জগৎ হইতে প্রাণি-জগৎ পর্য্যন্ত সকলেরই উত্থান ও পতন আছে। বৃক্ষের পুরাতন পত্র ঝরিয়া পড়ে—আবার নূতন পত্র শাখা-প্রশাখাকে শোভিত করে;—মনুষ্যের নিস্তেজ ও মলিন অঙ্গও এক সময়ে সতেজে কত শোভা ধারণ করে। একবার মনুষ্য নীতি সম্বন্ধে হীন হয়—পতিত হয়—আবার উজ্জ্বলবর্ণে শোভিত হয়—সুনীতিতে ভূষিত হয়। এই মর্ত্ত্যজগতে এমন লোকের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না, যে একবার পতিত হইয়া না উঠিয়াছে,—একবার মরিয়া যে না বাঁচিয়াছে। মনুষ্য একবার মরে, আবার বাঁচে; একবার বৃদ্ধ হয়, আবার নবীন হয়—আবার নব রসে পূর্ণ হয়। মনুষ্য সম্বন্ধে যাহা, দেশ সম্বন্ধেও তাহা, ইহার একটুও ব্যতিক্রম নাই। পৃথিবীর অবিশ্রান্ত গতিতে ঘূর্ণায়মান হইতে হইতে কোন দেশ ডুবিতেছে, কোন দেশ উঠিতেছে,—কোন দেশের মৃত্যু হইতেছে,—কোন দেশের পুনর্জ্জন্ম লাভ হইতেছে। কালের অনন্ত লীলায় একবার যে দেশ মৃত্যুমুখে পড়িয়াছিল, সে দেশ সময়ে আবার জীবন লাভ করিতেছে। এই প্রকার জন্ম মৃত্যু যেন পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ফিরিতেছে। একবার ইটালীর উত্থান, আবার পতন, আবার উত্থান। ইতিহাসে যাহা ইটালী সম্বন্ধে ঘটিয়াছে—ইতিহাসে তাহাই

ভেভাগ্য ভারত সম্বন্ধে ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতের স্মৃতি নব্যভারতের এক সম্পত্তি বিশেষ বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতের আর কি আছে? সকলেই জানেন—কিছুই নাই। সে গার্গী নাই, সে খনা নাই, সে লীলাবতী নাই, সে সাবিত্রী নাই, সে যুধিষ্ঠির নাই, সে ভীম নাই, সে রামচন্দ্র নাই, সে কণিষ্ক নাই, সে চার্ব্বাক নাই, সে কালিদাস নাই, সে আর্য্যভট্ট নাই, সে বরাহমিহির নাই,—সে কালের আশা ভরসা কিছুই নাই। কিছুই নাই—ভারতের পূর্ব্বকাহিনী স্বপ্ন হইয়া অতীত কালের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে;—সে কালের কোন বস্তুর সহিত এক্ষণকার আর সাদৃশ্য নাই। সহস্র বৎসর স্তব স্তুতি করিলেও আর সে সকল ফিরিবে না। সে ভ্রান্ত, যে আজও সেই সকল মায়াময় স্বপ্ন ভারতবর্ষে—এই হিন্দুস্থানে বর্ত্তমান শতাব্দীতে দেখিয়া ভুলিতেছে। সে কালের কিছুই নাই। স্মৃতি লইয়া পূজা করিতে চাও, কর, কিন্তু ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিবেই দিবে যে, সে কালের কিছুই নাই। ভারতের পূর্ব্বের সকলই কালের অনন্ত সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে—কিছুই নাই। ভারতের পূর্ব্ব জীবনী-শক্তি যখন একেবারে বিলুপ্ত হইল, যখন একে একে সকল রত্ন ভারত-বক্ষকে শূন্য করিয়া পলায়ন করিল, তখন ইতিহাস-লেখকগণ শোকার্ত্ত হৃদয়ে চক্ষের জলের দ্বারা ইতিহাসে লিখিলেন—ভারত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সেই হইতে ভারতগগন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল,—সেই ভীষণ বিভীষিকাময় অন্ধকারে হীনচেতা পশু সকল দলে দলে বিচরণ করিতে লাগিল;—কেহ কাহাকে দেখে না,—কেহ কাহাকে চেনে না;—এই প্রকারে ভারত কতকাল মৃত্যুতে পড়িয়া রহিল। ভারতের দুর্দ্দশার সে কাহিনী কেবা বলিতে পারে, কেবা শুনিতে জানে? সেই সময়ে মৃত ভারতের ইতিহাস আর কেহ লিখিল না। কত শত বৎসর চলিয়া গেল—দরিদ্র ভারত যে মৃত সেই মৃত। সকলের আশার দীপ একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া গেল—ভারত আবার জীবন পাইবে, এ আশা আর কাহারও হৃদয়ে স্থান পাইল না।

আমরা ভারতের সেই অতীত কাহিনী সকল স্মরণ করিয়া আজ চক্ষের জলে ভাসিতেছি—সকল ঘটনা লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে না;—সকল কথা ব্যক্ত করিতে হৃদয় অগ্রসর হইতেছে না। এই মরুভূমিতে আবার সরসী সৃজিত হইবে,—অন্ধকার গৃহে আবার উজ্জ্বল আলোক শোভা পাইবে—ভারতে আবার সূর্য্য উদিত হইবে, এ চিন্তা তখন কাহারও মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস এই সময়ে কি দেখিল? সবিস্ময়ে জগৎ দেখিল—ধীরে ধীরে ভারত-গগনে আবার নবীন সূর্য্য উদিত হইতেছে। ভারত অন্ধকারে আবার দীপ জ্বলিতেছে দেখিয়া সেই সময়ে পৃথিবী কলরব করিয়া উঠিল। ভারত তখন ঐ আলোকের মর্ম্ম কিছুই বুঝে নাই—ভারতের তখন বুঝিবার শক্তি ছিল না। ভারত-ভূমির সেই সূর্য্যোদয়ের কাল ইংরাজ রাজত্বের সময় হইতে গণনা করা যায়। যে কারণেই হউক, ইংরাজ ভারতকে উদ্ধার করিলেন,—ভারতকে জীবিত করিলেন। তার পর কি হইল?—সূর্য্য ধীরে ধীরে গগনে উঠিতে লাগিল; যে জাতি শত শত বৎসর অন্ধকারে বাস করিবা চক্ষুর জ্যোতি হারাইয়াছিল, সেই জাতির আলোক সহ্য হইল না,—তাহারা কলরব করিয়া উঠিল,—অত্যাচার—অবিচার—অধীনতা, এই প্রকার কত কর্কশ ধ্বনি আকাশে তুলিতে লাগিল। ইংরাজ রাজত্বকে দুঃখের বলিতে চাও বল, কিন্তু ভাই নিশ্চয় জানিও, ঐ সূর্য্য কখনও এত শীঘ্র ভারত-গগনে উদিত হইত না, যদি ইংরাজ ভারতে পদার্পণ না করিত। যা'ক সে কথায় আজ প্রয়োজন নাই। সূর্য্য ভারতকে আলোকিত করিবার জন্য আসিয়াছিল—আলোকিত করিল। ভারতের সকলে তখন মুখ চেনাচিনি করিতে লাগিল—'জয় ভারতের জয়' এই শব্দ চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইতে লাগিল,—পূর্ব্ব স্মৃতি হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল,—কেহ বক্ষে আঘাত করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল,—কেহ ক্রন্দন করিতে লাগিল,—কেহ ইংরাজকে তাড়াইবার জন্য অলীক আশার স্বপ্ন দেখিয়া সময় কাটাইতে লাগিল। কিন্তু এ সময়ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না,—সৌভাগ্যবশতঃ শিক্ষার সহিত ভারতের উষ্ণ রক্ত একটু শীতল হইল,—ভারতবাসী স্বাভাবিক কোমলভাবে পূর্ণ হইতে লাগিলেন। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে ভারত জীবন পাইলেন; কেবল জীবন নহে, শক্তি পাইলেন;—ভাল মন্দ বুঝিবার জ্ঞান জন্মিল,—নীতির আদর বুঝিলেন। ভারত তখন ইংরাজকে নমস্কার করিতে শিখিলেন,—ভারতের মস্তক নত হইল। এই সময়ে আমরা ভারতকে 'নব্যভারত' বলিয়া অভিহিত করিলাম,—পৃথিবীর সভ্য, অসভ্য অসংখ্য জাতি এই সময়ে ভারতকে একবাক্যে 'নব্যভারত' বলিয়া ব্যাখ্যা করিল।

কেহ কেহ বলিতে পারেন—সেই প্রাচীন ভারতই যে এই, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ চাও?—ঐ হিমালয় অদ্যাবধি মস্তক উত্তোলন করিয়া—আপন বক্ষে স্মৃতির চিহ্ন সকল অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া তোমার কথার উত্তর দিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে;—ঐ আর্য্যাবর্ত্ত রহিয়াছে,—ঐ গঙ্গা যমুনা রহিয়াছে,—ঐ অযোধ্যা রহিয়াছে। আর কি চাও?—ঐ দেখ, ভারতবাসীর হৃদয়ে, সহৃদয়তার উজ্জ্বল অক্ষরে প্রাচীন ভারতের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে,—দেখ, ধর্ম্ম-প্রধান প্রাচীন ভারতের দয়া ধর্ম্ম কি প্রকারে নব্যভারতের হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, দেখ, ঐ স্তূপাকারে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকল 'নব্যভারতের' ভাষার শোভা সৌন্দর্য্য কি প্রকারে বৃদ্ধি করিতেছে,—ভাষার মূলে কি প্রকার শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। সে ভ্রান্ত, যে প্রাচীন ভারতের অসংখ্য অসংখ্য প্রমাণ পাইয়াও তাহাকে তুচ্ছ করে—এবং প্রাচীন ভারত যে নব ভূষণে ভূষিত হইয়া পৃথিবীর চক্ষুকে আকৃষ্ট করিতেছে, তাহা সে অস্বীকার করে। ভারত-ইতিহাসের গূঢ় অভ্রান্ত সত্য সকলকে যে অস্বীকার করিল, তাহার কি বিড়ম্বনা!!

প্রাচীন ভারতের সহিত নূতন ভারতের কি প্রভেদ, একথার আলোচনায় আমরা অদ্য প্রবৃত্ত হইব না। প্রাচীন ভারত শ্রেষ্ঠ, কি 'নব্যভারত' শ্রেষ্ঠ, সে বিষয় লইয়াও তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। আমরা এই মাত্র বলি, সে সময়ের ভাল সেই সময়েই ভাল লাগিয়াছে—আর এ সময়ের ভাল এ সময়েই ভাল লাগিতেছে। কিন্তু একটী কথা আমরা এস্থলে বলিব, সে সময়ে বাহুবলে যাহা সংসিদ্ধ হইত, এ সময়ে বুদ্ধিবলে ও জ্ঞানবলে তাহা সংসাধিত হইবে, আশা হইতেছে। 'নব্যভারত' এখন বুঝিতে পারিতেছেন—নীতিবলের ন্যায় পৃথিবীতে আর বল নাই, পাপের ন্যায় আর ভয়ানক শত্রু নাই। 'নব্যভারত' আর কি বুঝিতে পারিতেছেন?—বুঝিতেছেন, একতাই মানবের মহাশক্তি,—প্রেম একতার

নীতি ও পুণ্য একতার প্রাণ,—বুঝিতেছেন—এক সময়ে পৃথিবী হইতে পাশব শক্তির আদর উঠিয়া যাইবে,—নীতির আদর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে ;—শোণিতপাত—অত্যাচার—হিংসার চরমফল যুদ্ধবিগ্রহ এক সময়ে পৃথিবী হইতে পলায়ন করিবে ! ইহা বুঝিয়া নব্যভারত দিন দিন সেই বলে বলীয়ান হইতেছেন। অনেকে মনে করিয়া থাকেন, 'নব্যভারত' ও 'নব্য ইটালী' একই প্রকার। আমরা বলি 'নব্যভারত' ও 'নব্য ইটালী' এক প্রকার নহে। 'নব্য ইটালীতে' নীতির আদর থাকিলেও অস্ত্রের সহিত একেবারে ইহার সম্বন্ধ রহিত হয় নাই—কিন্তু অস্ত্রের সহিত 'নব্যভারতের' কোন সম্পর্ক নাই,—'নব্যভারত' একমাত্র নীতি ও পুণ্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পৃথিবীর চক্ষুকে আকৃষ্ট করিতেছেন। 'নব্যভারত' শরীরের বলের আদর দিন দিন বিস্মৃত হইয়া জ্ঞানবলে ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইতেছেন। 'নব্য ইটালীর' আবার পতন হইতে পারে,—আবার অত্যাচার আসিয়া ইহাকে আক্রমণ করিতে পারে ; কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই, 'নব্য-ভারত' যদি অটলভাবে আপন লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে পারেন, তবে ইহার সে পতনের আর সম্ভাবনা নাই। ম্যাট্সিনি 'নব্য ইটালীর' অধিনেতা ছিলেন—স্বয়ং ঈশ্বর 'নব্য ভারতের' নেতা। পতন ভারত হইতে কতদূরে, একবার কল্পনা কর। নির্ব্বোধ ভারতবাসী ! কেন বালকের ন্যায় ম্যাট্সিনির অভ্যুত্থান কামনা করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতেছ ? সময়ের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগদীশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া একবার মা ভৈঃ মা ভৈঃ রবে 'নব্য ভারতের' সেবা কর দেখি, নীতি পাও কি না, শক্তি পাও কি না, একতা পাও কি না।

'নব্যভারত' নব বেশে দেশে নব যুদ্ধ ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; এই সময়ে যদি কেহ অগ্রসর হইয়া 'নব্যভারতের' গুপ্ত অস্ত্র কি, এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমরা তাহাকে নির্ভয়-চিত্তে বলিব—নব্যভারতের এক হস্তে পবিত্রতা, অন্য হস্তে উদারতা—মস্তিষ্কে জ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তা, হৃদয়ে প্রেম,—আর সমস্ত শরীরে ওতপ্রোত ভাবে মানবের রাজা স্বয়ং ঈশ্বর অধিষ্ঠিত। 'নব্য ভারতের' শক্তির পরিমাণ কে করিতে অগ্রসর হইবে ? ভারতের পূর্ব্ব স্মৃতি ভারতকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে—ঈশ্বর বিশ্বাসই সকল শক্তির মূল। ভারতবর্ষের যাহারা এই মন্ত্র অস্বীকার করিল—তাহারাই পাপে ডুবিল—অত্যাচারে মরিল—পৃথিবীতে কলঙ্কের পূতিগন্ধযুক্ত নিশান তুলিয়া রাখিয়া অপসৃত হইল। 'নব্যভারতে' যদি এ প্রকার লোক থাকেন, তবে 'নব্যভারত' সতর্কভাবে, যত্ন সহকারে, প্রেমের দ্বারা তাহাদিগকে আবার লক্ষ্য পথে আনিবেন, একজনকেও অন্য পথে যাইতে দিবেন না। 'নব্যভারত' জানেন, শরীরের এক অঙ্গের পতনে অন্য অঙ্গের বল হ্রাস হয়। 'নব্যভারতের' হৃদয়ে ও মনে ঘৃণা থাকিবে না, অহঙ্কার থাকিবে না ;—উদারভাবে বিনীত অন্তরে 'নব্যভারত' সকলের সেবা করিবেন। ঠাট্টায় 'নব্যভারত' বিচলিত হইবেন না, নিন্দায় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবেন না,—গুপ্ত মন্ত্র সাধনে রত থাকিলে পৃথিবীর সকলকে তুচ্ছ করিতে পারিবেন। 'নব্যভারত' জানেন, অন্তরে বাহিরে এক থাকাই মহত্ত্ব—কপটতা সর্ব্বনাশের মূল,—যেখানে অন্তরে কিছু নাই, সেখানে বাহিরে আচ্ছাদন দিয়া ঢাকিয়া জগতের প্রশংসা পাইলেই উন্নতি লাভ করা যায় না। নব্যভারতের আর কি লক্ষ্য আছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ে জগতের নিকট অপ্রকাশিত থাকাই ভাল ; বৃথা আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই।

অনেকে মনে করিতে পারেন, 'নব্যভারতের' ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইল কেন ? যে দেশে বহু ভাষা প্রচলিত, সে দেশে ইহার এক ভাষা হইল কেন ? একথার উত্তর এই—বাঙ্গালা ভাষাই 'নব্যভারতের' ভাষা—আজ না হইলেও কালে হইবে। ভাই, তুমি ইংরাজি ভাষার উন্নতির চেষ্টায় রত হইয়া দিন দিন উন্নত হইতেছ, তোমার নাম সংবাদপত্রে বিঘোষিত হইতেছে, তুমি কি আত্মাভিমানকে বিসর্জ্জন দিয়া কখনও বাঙ্গালা ভাষার গভীরতা অনুভব করিয়াছ—ইহার উন্নতির পরীক্ষা করিয়াছ—আর ভারতের সমস্ত ভাষার হীনাবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ ? যদি তোমার পক্ষে এসকল সম্ভব হইয়া থাকে, তবে তুমি ভাই দরিদ্রের এই কথাটাকে স্মরণ করিয়া রাখ,—বাঙ্গালা ভাষাই কালে সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হইবে। যে হিন্দুস্থানী বাঙ্গালীর সহিত একত্রে ছয় মাস কালযাপন করিয়াছে, সে হিন্দুস্থানী আর বাঙ্গালীর সহিত হিন্দিতে কথা কহিতে ভালবাসে না। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ভারতের এমন স্থান নাই, যেখানে বাঙ্গালীর গমন হয় নাই ; সুতরাং ভারতের এমন স্থান নাই, যেখানে কোন না কোন লোক একটু বাঙ্গালা না জানে। তারপর বাঙ্গালা যে ভাষা হইতে উৎপন্ন, ভারতের আর প্রায় সমস্ত ভাষাই সেই মূল সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন ; না হইলেও মূলের সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে। এই কারণে সহজ জ্ঞানে বুঝা যায়, বাঙ্গালা ভাষা কালে ভারতের ভাষা হইবে। জাতীয় ভাষা ভিন্ন কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে না ; ভারতের সেই পরিমাণে উন্নতি হইবে, যে পরিমাণে ভাষার উন্নতি হইবে। এক দেশে বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলে যেমন একতা অসম্ভব, একদেশে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকিলেও সেইরূপ একতা অসম্ভব। প্রাচীন ভারতে এক সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল বলিয়াই ভারতের হৃদয়ে হৃদয়ে মিল ছিল। এক প্রকার স্বর, এক প্রকার অভাব, এক প্রকার ধর্ম্ম, এক প্রকার ভাষা—এ সকলই একতার জন্য চাই। যাঁহারা বলেন, ইংরাজ-শাসনে সমস্ত ভারত শাসিত, এক শাসনাধীন সকলের অভাবই এক প্রকার, অতএব ভারতের একতার জন্য ধর্ম্ম, ভাষা প্রভৃতির একতা চাই নাই ; পৃথিবীর ইতিহাস তাহাদের এ কথাকে নিতান্ত অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। সুতরাং আমরা আর এই কথার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে চাহি না। একতার মূল কি, এ সম্বন্ধে ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাস, ও ভাষা-জগতের ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে উদাহরণ দিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবে এ কথা আমরা বলি না যে, পৃথিবীর কোন দেশেই এ সত্য অপ্রমাণীকৃত হয় নাই। এক ধর্ম্ম এবং এক ভাষা প্রচলিত হওয়া সময়-সাপেক্ষ বটে, কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ কার্য্য একদিনে সম্পন্ন হয় ? যাঁহারা মানবজাতির অভ্যুদয়ের মূল ইতিহাস নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন—এক ধর্ম্ম, এক ভাষা ভিন্ন কখনও কোন দেশে এক-হৃদয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যদি ভারতে ইহা অসম্ভব হয়, তবে ভারতে একতাও অসম্ভব। এক খৃষ্টধর্ম্ম ও ইংরাজি ভাষা পৃথিবীর অসংখ্য জাতিকে কি প্রকারে একতাসূত্রে বাঁধিতেছে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। যাঁহারা জাতীয় ভাষার উন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল রাজনীতির অনুসরণ করিয়া

পরানুকরণে রত আছেন, তাঁহাদিগকে আমরা পণ্ডশ্রমে রত দেখিয়া সময়ে সময়ে অশ্রুপাত করিয়া থাকি। আমরা বলি, ভারতে ভাষার একতা এবং ধর্ম্মের একতা সময়-সাপেক্ষ হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে; যদি অসম্ভব হইত, তবে ভারতকে আজ আমরা 'নব্য-ভারত' নামে অভিহিত করিতে প্রয়াস পাইতাম না। কেহ কেহ মনে করেন, ইংরাজি ভাষাই কালে ভারতের ভাষা হইবে; ইহা মনে করিয়া অসংখ্য ভারতসন্তান ইংরাজির সেবায় জীবন ক্ষয় করিতেছেন,—ঐ ভাষার কাল্পনিক অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতে-ছেন। ইহারা জানেন না, জাতীয় ভাষা ভিন্ন কোন ভাষা হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না, হৃদয়স্পর্শী ভাষা না হইলে ছোট বড় সকলের তাহা ভাল লাগে না,—সকলে তাহা গ্রহণ করে না। অসংখ্য নর নারী যে ভাষা গ্রহণ না করিল, সে ভাষাও কি জাতীয় ভাষা—একতার ভাষা হইতে পারে? এই জন্য আমরা বলি ইংরাজি ভাষা, নব্যভারতের শিক্ষার যন্ত্র হইলেও, হৃদয়স্পর্শী—একতার মধ্যবিন্দু হইবে না। এই জন্য আমরা মনে করিয়া থাকি, যাঁহারা ইংরাজির উন্নতির চর্চ্চায় রত আছেন, তাঁহারা কেবলই ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপ করিতেছেন। এই কাল্পনিক একতার কাল্পনিক পথ পরিত্যাগ করিয়া ইঁহারা যদি জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধনে রত হইতেন, তবে ভারতের কত অভাব দূর হইত। বাঙ্গালা ভাষা অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে, এই ভাষাই যে কালে ভারতের ভাষা হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়েই বাঙ্গালা ভাষার কোন কোন পুস্তক ভারতের অন্যান্য ভাষায় রূপান্তরিত হইতেছে। কেবল অনুবাদে যখন লোকের তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইবে না, তখন এই ভাষা শিক্ষা করিতে সকলেরই রুচি হইবে। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা কালে কেবল বঙ্গ-দেশেই ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে না;—ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইবে। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন ভারতে একতা অসম্ভব। এই জন্য 'নব্যভারতের' ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইল, কালে এই হৃদয়স্পর্শী ভাষা ভারতের নরনারী সকলের হৃদয়কেই স্পর্শ করিবে,—কালে সকলের মুখেই এই এক ভাষা শ্রুত হইবে। 'নব্য-ভারতের' এই অভিনব ভাষা ভারতকে সজীব করিবে—এক করিবে, প্রাণে প্রাণে মিলাইবে।

আর একটি কথা বলা হইলেই আমাদের বক্তব্য শেষ হয়। 'নব্যভারতের' কাল দশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ধরা যায় কি না? আমরা বলি, তাহা যায় না। যখন সুপ্তোত্থিত ভারতবাসী ইংরাজকে অন্তরে অন্তরে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার কামনা করিত, মুখে 'ভারতজয় ভারতজয়' গান করিয়া সুখ পাইত, বিদ্যাশিক্ষাকে চাকুরী বা দাসত্বের কেন্দ্র বলিয়া তাহার অনুসরণ করিত, স্ত্রীশিক্ষাকে ঘৃণা করিত, বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষাকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত, পরানুকরণে জীবনকে ডুবাইয়া সুখী হইত, ধর্ম্মের নামে উপহাস না করিয়া জলগ্রহণ করিত না, একজন আর এক-জনকে কাঁদিতে দেখিলে হাস্য সংবরণ করিতে পারিত না, ভারত-বাসী দেশহিতৈষী নাম গ্রহণ করিত কেবল যশমানের জন্য, পরোপকার করিত ইংরাজের কৃপা পাইবার জন্য—এবং ভাই ভাই কাটাকাটি করিয়া মরিত, সে সময়কে 'নব্যভারতের' কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে আর ভারতের সে সময় নাই, এক্ষণে ভারত জাতীয় ভাবের ও জাতীয় ভাষার আদর শিখিতেছেন,—এক হৃদয়ের দুঃখে অন্য হৃদয় কাঁদিতেছে; জাতিভেদকে সর্ব্ব-নাশের মূল বলিয়া বুঝিতেছেন, স্বাধীনতার আদর বুঝিতেছেন, জ্ঞানের মর্য্যাদা ও বিদ্যার জন্য বিদ্যার আদর করিতে শিখিতেছেন। আর মুখে 'জয় ভারতের জয়' বলিয়া ইংরাজকে তাড়াইতে ভারত-বাসীর ইচ্ছা নাই;—এক্ষণ ভারতবাসী বুঝিতেছেন—আরও অনেক-কাল ইংরাজের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। ভারতবাসী এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার আদর বুঝিতেছেন, ধর্ম্মের নামে আর উপহাস করিতে ইচ্ছা নাই,—কাহারও কৃপা পাইবার জন্য বা যশের জন্য পরোপকার করাকে ঘৃণার কার্য্য বলিয়া বুঝিতেছেন। এক্ষণে বিদ্যা শিখিয়া ভারতবাসী দেশের উপকার করিতে ধাবিত হইতেছেন;—বিলাত হইতে শিক্ষালাভ করিয়া ভারতে আসিয়া জাতীয় ভাব ও ভাষার উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। এই সময়ে ভারতের যে কি এক অপরূপ শোভা হইয়াছে, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। এই অভিনব সময়কেই আমরা 'নব্যভারতের' সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। স্বায়ত্ত-শাসনের আন্দোলনে ভারত দেখাইয়াছেন, ভারত রাজনীতি চায়,—ভারত একতার জন্য উৎসুক। ফৌজদারী কার্য্যবিধির বিল সম্বন্ধীয় আন্দোলনে ভারত দেখিয়াছেন, ভারতকে আর পদতলে রাখিতে উদারচেতা ইংরাজগণের ইচ্ছা নাই,—ভারতও নানারূপে দেখাইয়া-ছেন ভারত আর বিভিন্ন নাই—একের সুখে অন্যের হৃদয় ফুল্ল হয়, একের দুঃখে অন্যের হৃদয় ব্যথিত হয়। ভাষার আদরের সহিত সংবাদপত্রের আদর বাড়িতেছে, ভারত আলস্য পরিহার করিয়া কার্য্যদক্ষ হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রজা ভূম্যধিকারীর বিলের আন্দোলনে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণীকৃত হইয়াছে, ভারতে দুঃখী প্রজাদের জন্য কাঁদিবার অনেক লোক আছে। আরও অসংখ্য কারণে আমরা উদারচেতা মহামতি লর্ড রিপণের শাসন কালকেই 'নব্যভারতের' কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। ইঁহার ন্যায় উদারনৈতিক শাসনকর্ত্তা আর কখনও ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই। ইনিই যেন ভারতকে নবভূষণে সাজাইয়া তুলিতেছেন।

'নব্যভারত' সুসময়ে পৃথিবীর নিকট পরিচিত হইলেন,—কত কাল ইহার রাজত্ব থাকিবে, ঈশ্বরই জানেন। 'নব্যভারতের' উন্নতিতে যাঁহারা আনন্দিত হন, তাঁহারা অবশ্য 'নব্যভারতে'র উন্নতির জন্য প্রাণপণ করিবেন। ইহার অবনতিতে যাঁহারা আনন্দিত হন, তাঁহারা অবশ্য ইহার অনিষ্টের চেষ্টা করিবেন। 'নব্যভারত' সুখেও অধীর হইবেন না, দুঃখেও বিষণ্ণ হইবেন না। ধীরচিত্তে বীরের ন্যায় 'নব্যভারত' কর্ত্তব্য সাধনে রত থাকিবেন। সত্য পৃথিবীতে জয়যুক্ত হইবেই হইবে। 'নব্যভারত' যদি সত্য প্রচার করিতে পারেন, তবে কেহই সে সত্যের অপলাপ করিতে পারিবে না। মিথ্যা জগতে কখনও স্থায়ী হইবে না, সুতরাং নব্যভারত যদি মিথ্যা প্রচার করেন, তবে তাহাও কেহ ধরিয়া স্থায়ী করিতে পারিবে না। বন্ধু বান্ধব সকলে 'নব্যভারতকে' আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহাদের ও ঈশ্বরের কৃপা মস্তকে ধারণ করিয়া উদারভাবে 'নব্য-ভারত' জগতে সত্য প্রচারে রত থাকুক। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, স্বাধীনতা, পবিত্রতা ও উদারতা ইহার মূলমন্ত্র হউক,;—একতা—শান্তি এবং সাম্য ইহার চরম লক্ষ্য হউক।

—নব্যভারত, : ১০।

মহাশক্তি,—প্রেম একতায় [illegible]

বিম্ববতী

(রূপকথা)

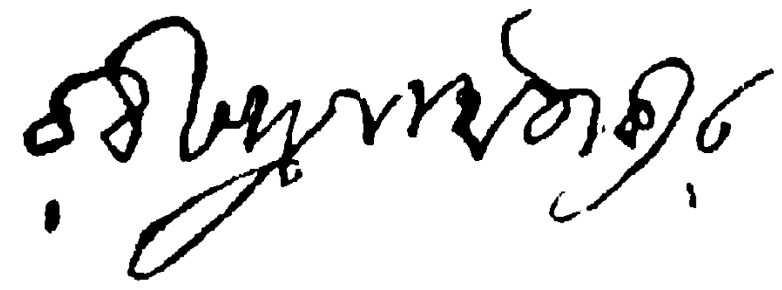

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বহু-পরিচিত 'বিম্ববতী' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'সাধনা' মাসিক পত্রিকার 'প্রথম বর্ষে। ১২৯৮ সালে 'সাধনা' প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সাধনায়' প্রকাশিত উক্ত বিখ্যাত কবিতাটির অপর এক বৈশিষ্ট্য ছিল শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত কবিতার চিত্ররূপ। বিস্ময়ের বিষয়, অবনীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র কুড়ি আর রবীন্দ্রনাথের একত্রিশ। আমরা এখানে মূল কবিতা ও অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত দুইটি দৃশ্যই পুনর্মুদ্রিত করলাম.

"যতনে সাজিল রাণী, বাঁধিল কবরী
নব ঘন স্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে। তার পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি' আনিল বাহিরে
মায়াময় কনক দর্পণ। মন্ত্র পড়ি'
শুধাইল তারে—কহ মোরে সত্য করি'
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে!
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ,
দেখিয়া বিদারি' গেল মহিষীর বুক—
রাজকন্যা বিম্ববতী সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে!
তার পর দিন রাণী প্রবালের হার
পরিল গলায়। খুলি' দিল কেশভার
আজানুচুম্বিত। গোলাপী অঞ্চলখানি,
লজ্জার আভাসসম, বক্ষে দিল টানি'।

স্মবর্ণ মুকুর রাখি কোলের উপরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি’—কহ সত্য করে’
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।
দর্পণে উঠিল ফুটে সেই মুখশশি।
কাঁপিয়া কহিল রাণী, “অগ্নিসম জ্বালা—
পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা,
তবু মরিল না জ্বলে’ সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।”

তার পরদিনে,—আবার রুধিল দ্বার
শয়নমন্দিরে। পরিল মুক্তার হার,
ভালে সিন্দুরের টিপ, নয়নে কাজল,
রক্তাম্বর পট্টবাস, সোনার আঁচল।
শুধাইল দর্পণেরে—“কহ সত্য করি’
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি সুন্দরী।”
উজ্জ্বল কনক পটে ফুটিয়া উঠিল
সেই হাসিমাখা মুখ। হিংসায় লুটিল
রাণী শয্যার উপরে। কহিল কাঁদিয়া—
বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাঁধিয়া,
এখনো সে মরিল না সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে।

তার পর দিনে,—আবার সাজিল সুখে
নব অলঙ্কারে ; বিরচিল হাসিমুখে
কবরী নূতন ছাঁদে বাঁকাইল গ্রীবা।
পরিল যতন করি' নব রৌদ্রবিভা
নব পীতবাস। দর্পণ সম্মুখে ধরে'
শুধাইল মন্ত্র পড়ি'—"সত্য কহ মোরে
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।"
সেই হাসি সেই মুখ উঠিল বিকশি'
মোহন মুকুরে। রাণী কহিল জ্বলিয়া—
"বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,
তবুও সে মরিল না সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।"

তার পর দিনে রাণী কনক রতনে
খচিত করিল তনু অনেক যতনে।
দর্পণেরে শুধাইল বহু দর্পভরে—
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ কার বল্ সত্য করে'।
দুইটি সুন্দর মুখ দেখা দিল হাসি'
রাজপুত্র রাজকন্যা দোঁহে পাশাপাশি
বিবাহের বেশে।—অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত
রাণীরে দংশিল যেন বৃশ্চিকের মত।
চীৎকারি' কহিল রাণী কর হানি' বুকে,
মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুখে
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।

ঘষিতে লাগিল রাণী কনক মুকুর
বালু দিয়ে—প্রতিবিম্ব নাহি হল দূর।
মসী লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না।
অগ্নি দিল, তবুও ত গলিল না সোনা।
আছাড়ি' ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে
ভাঙ্গিল না সে মায়া-দর্পণ। ভূমিতলে
চকিতে পড়িল রাণী, টুটি' গেল প্রাণ ;—
সর্ব্বাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জ্বলিতে ; ভূমে পড়ি' তারি পাশে
কনক দর্পণে দুটি হাসিমুখ হাসে।
বিম্ববতী, মহিষীর সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।"

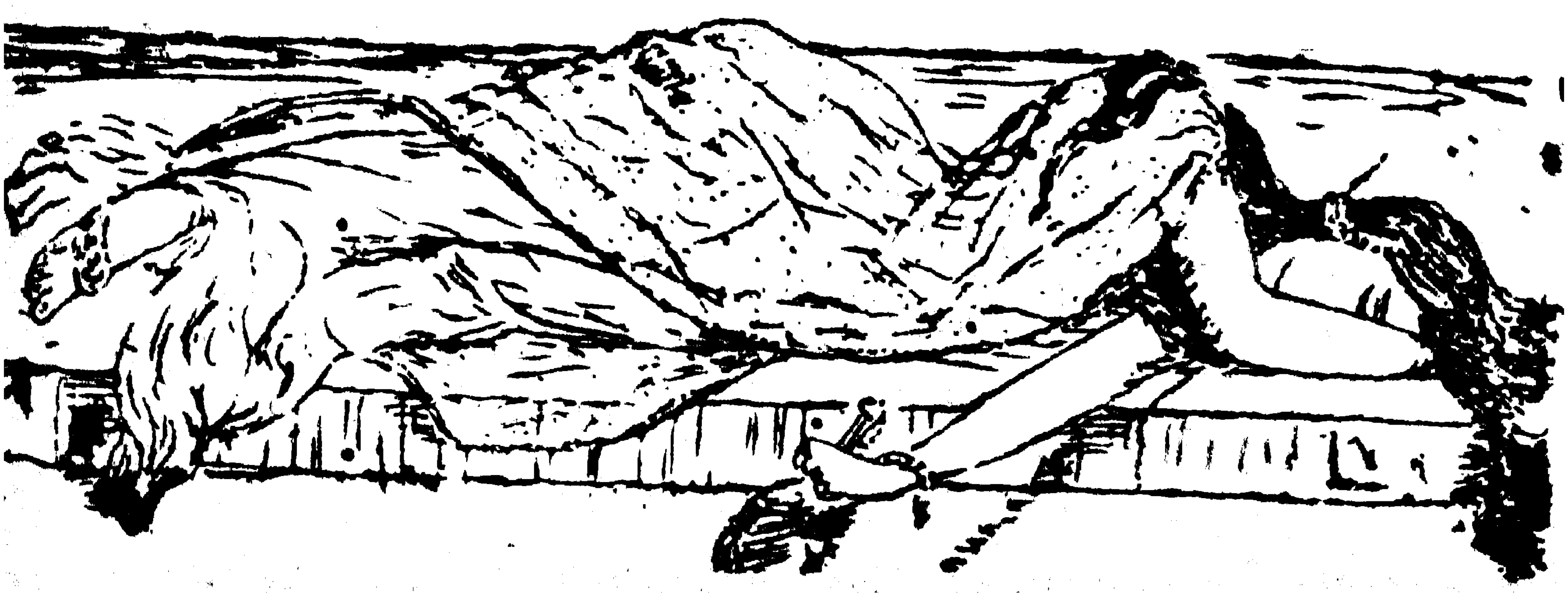

কলিকাতার দুর্গোৎসব

সেকাল আর একাল

কালপেঁচা

প্রায় ১০০ বছর আগে কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে "হুতোমপ্যাঁচা" তাঁর নক্সার মধ্যে "কলিকাতার বারোইয়ারী পূজো," "দুর্গোৎসব," "বাবুদের দুর্গোৎসব" ইত্যাদি কথাচিত্র এঁকেছিলেন। এবারের কলকাতার স্বাধীন দেশের বারোয়ারী পূজো দেখে হুতোমপ্যাঁচার নক্সার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলাম। একশ' বছর আগে হুতোম যা লিখেছিলেন, আজও তা হুবহু মিলে যায় দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। এই একটা শতাব্দী সাঁতরে পার হয়ে এলাম আমরা, অথচ একটুও পরিবর্ত্তন হ'ল না আমাদের। বাস্তবিকই আশ্চর্য্য আমাদের প্রতিরোধ-শক্তি! যা কিছু ভাল, যা কিছু মহান্, উদার এবং মনুষ্যজীবোচিত, তা আমরা অত্যন্ত সহজেই হাসিমুখে বর্জ্জন করতে পারি, তার বিরুদ্ধে আমাদের দুর্জ্জয় দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ-শক্তি গ'ড়ে তুলতে পারি। অন্ততঃ এবারের কলকাতার দুর্গোৎসব দেখে তাই মনে হ'ল। মানুষ যে কতটা অমানুষ হতে পারে এবং তার জন্যে যে কত সাধ্য-সাধনা করতে পারে তা ১৩৫৫ সনের বারোয়ারী পূজোয় কলকাতা শহরে যা দেখলাম তা জীবনে ভুলব না কোন দিন। তার মধ্যে আবার আমাদের "স্বাধীন" হওয়ার কথাটা বার-বার মনে হয়েছে। স্বচক্ষে দেখলাম, সত্যিই আমরা "স্বাধীন" হয়েছি, যে বলবে "স্বাধীন" হইনি আমরা, তার ঊর্দ্ধতন চোদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত পেশাদার মিথ্যাবাদী। "স্বাধীন" যদি না হতাম আমরা, তা হ'লে আমাদের ভেতরের সমস্ত জঘন্য পাশবিক প্রবৃত্তির এমন স্বাধীন শিকল-ছেড়া উন্মত্ত উৎসব (শুধু উৎসব নয়, "ধর্ম্মোৎসব") কি দেখতে পেতাম?

আমাদের "স্বাধীন" হওয়ার পরিচয়টা অবশ্য আগে থেকেই আমরা পাচ্ছিলাম। যখন দেখলাম, এ-দেশের নেড়াবুনেরা পর্য্যন্ত কীত্তুনে হয়ে উঠলো, জলঢোঁড়ারা পর্য্যন্ত রাতারাতি কালকেউটে আর গোখরো হয়ে উঠলো, সাতপুরুষের সনাতন "খচ্চর" (Mule) আর "গর্দ্দভরা" সব বিত্তার দিগ্‌গজ আর বুদ্ধির বৃহস্পতি হয়ে উঠলো, তখনই বেশ হাড়ে-হাড়ে মালুম হ'ল যে আমরা "স্বাধীন" হয়েছি। ভারত মহাসাগর মন্থন ক'রে এমন "লোভ আর হিংসার" হলাহল তুলতে স্বর্গের দেবতারাও পারতেন না কোন কালে। স্বাধীন দেশের পুঁজিবাদী চোরাকারবারীরা কয়েক দিনের মধ্যেই কোটি কোটি টাকার মুনাফা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন, "লোভ" নামক রিপু যদি একবার "স্বাধীন" হয় তাহ'লে কি নৈরাকার কাণ্ডই না সে করতে পারে! দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা যাঁরা হলেন তাঁরাও ডাণ্ডাবাজি ক'রে দেখিয়ে দিলেন, ডাণ্ডা যদি স্বাধীন ভাবে ঘোরানো যায় তাহ'লে মাথার খুলি নিয়ে কি ভয়ানক ডাণ্ডা-গুলি খেলাই না খেলা যেতে পারে! এবারের পূজোতেও তাই আমরা অনেকেই দেখিয়ে দিলাম, পূজো যদি স্বাধীন পূজো হয়, উৎসব যদি স্বাধীন উৎসব হয়, তাহ'লে এই কলকাতার মতন বিরাট মহানগরীকেও আমরা পুরাণ-বর্ণিত "মহানরকে" পরিণত করতে পারি।

"হুতোমপ্যাঁচা" আর "কালপেঁচার" যুগ

হুতোমপ্যাঁচার দুর্গোৎসব, আর কালপ্যাঁচার দুর্গোৎসবে মূলতঃ বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সামান্য যে পার্থক্যটুকু দেখা যায় তা বাইরের সাজ-পোষাকের পার্থক্য, চেহারার পার্থক্য। হুতোমের যুগে, কৃষ্ণনগরের কারিগরেরা কুমোরটুলি ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে ব'সে যেত, রং-করা পাটের চুল, তবলকীর মালা, অসুরের টিন-পেতলের ঢাল-তলোয়ার, প্রতিমার রঙিন কাপড় ইত্যাদি বিক্রী করত। দর্জ্জি, ফিরিওয়ালা, আতরওয়ালা, যাত্রার ও খেমটায় দালালরা শহরের চার কোণে ঘুরে বেড়াত। আজও এ-সবের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। কৃষ্ণনগরের কারিগরেরা এ বছরেও এসেছিল, তবে তাদের বাপ-ঠাকুরদার মতো কারিগরি তাদের জানা নেই। দর্জ্জি, ফিরিওয়ালারা এ বছরেও ঘুরে বেড়িয়েছে অনেক। তবে জাত-ফিরিওয়ালাদের এবারে আর বিশেষ পথে পথে ঘুরতে দেখা যায়নি, তারা সব "হকার্স কর্ণারে" বাজার খুলে বসেছিল। রাস্তার ফিরি-ওয়ালাদের মধ্যে এবার অনেক পূর্ব্ববঙ্গের ভদ্রলোক বাস্তুহারাদের কাপড় চোপড় ফিরি করতে দেখা গেছে। কিন্তু যে-সব মধ্যবিত্ত পাড়ায় পাড়ায় তাঁরা ফিরি ক'রে বেড়িয়েছেন, সে-সব পাড়ায় এ-বছর একেবারেই কোন কেনা-কাটার হিড়িক তো ছিলই না, মেজাজ পর্য্যন্ত ছিল না। অনভিজ্ঞ ভদ্রলোক বাস্তুহারার "ঢাকাই শান্তিপুরে কাপড় চাই" ডাক শুনে কৌতূহলী ক্রেতাদের ভিড় করতে দেখেছি, কিন্তু সেটা কেনা-কাটার জন্যে আদৌ নয়, সুযোগ পেয়ে পূর্ব্ববঙ্গীয়কে দু'একটা পশ্চিমবঙ্গীয় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্যে। পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে তাল দিয়ে ঘরের মা-বোনেরা পর্য্যন্ত যে কতটা হৃদয়হীন ও তামাসাবাজ হয়ে উঠেছেন তা এবারের পূজোয় বাস্তুহারা ফিরিওয়ালাদের প্রতি তাঁদের আচরণ দেখেই বোঝা গেছে। বিহারী ফিরিওয়ালাদের কড়া-কড়া সাফ জবাবের কাছে যাঁরা দেশী কুত্তার মতো লেজ গুটিয়ে থাকেন, তাঁদেরই দেখেছি, বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনার মতো বাস্তুহারা বাঙালী ফিরিওয়ালাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে, তর্জ্জন-গর্জ্জন করতে, চোখ-রাঙাতে। হুতোম-যুগের ফিরিওয়ালা-দের একটা পেশাগত সম্মান ও মর্য্যাদা ছিল। আজকের দিনে দেখলাম, বাঙালী সেই আত্মমর্য্যাদাবোধ পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়েছে। শক্তের ভক্ত, দুষ্টের ক্রীতদাস হয়েছি আজ আমরা। নেড়ী কুকুরের স্বভাব এমন হুবহু নকল করতে বাঙালীর মতো আর কোন জাতকে দেখা যায় না। "প্রাদেশিকতা" প্রীচ করছি না, স্বজাতি-মর্য্যাদার কথা বলছি।

উৎসব, না, উন্মত্ততা?

'দুর্গোৎসব' প্রসঙ্গে হুতোম লিখছেন: "কোনখানে দাঙ্গা, কোনখানে খুন, কোথাও সিঁদচুরি, কোনখানে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছ থেকে দু' ভরি রূপো গাঁটকাটায় কেটে নিয়েছে; কোথাও মাগীর নাক থেকে নথটা ছিঁড়ে নিয়েছে; পাহারাওয়ালারা শশব্যস্ত, পুলিস বদমাইস পোরা, চোরেরা পূজোর মরশুমে দেদার কারবার ফলাও কচ্চে, 'লাগে তাক্ না লাগে তুকো, কিনি তো হাতি লুঠি তো ভাণ্ডার' তাদের জপমন্ত্র হয়েচে···।" এ হ'ল একশ' বছর আগেকার কথা।

একশ' বছর পরে 'দুর্গোৎসবের' এই সব উপসর্গ একটিও লোপ পায়নি, হাজার গুণ বেশী বিকট ও বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করেছে মাত্র।

একশ' বছর আগে যা হঠাৎ-বড়মানুষ, অথবা ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা শহুরে বাবুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, আজ তা বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রায় সমস্ত স্তরের নর-নারীকে স্পর্শ করেছে। উৎসবটাকে যদি জাতীয় সংস্কৃতির একটা প্রধান অঙ্গ হিসেবে ধরা যায়, তাহলে নিঃসংশয়ে বলতে হয়, ব্যাধিগ্রস্ত জাতীয় সংস্কৃতির আজ ঘোর বিকারের দিন এসেছে। তাই সমাজের মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণতা, লুচ্চামি, ইতরামি আজ ব্যাপক মূর্ত্তি ধারণ করেছে।

হুতোম সে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-জখম, চুরি-চামারির কথা বলেছেন, এবারের দুর্গাপূজোয় কালপ্যাঁচা তা যথেষ্ট দেখেছে। উল্লেখযোগ্য হ'ল, এ বছরে বারোয়ারী পূজোর সংখ্যাবৃদ্ধি। অনেকে মন্তব্য করেছেন, এটা না কি শুভ লক্ষণ, জাতির প্রাণ-চাঞ্চল্যের লক্ষণ। কিন্তু বদ্ধ পাগল এবং পাঁড় বদমাইস ছাড়া সকলেই স্বীকার করবেন যে বারোয়ারী পূজোর সংখ্যাবৃদ্ধির মধ্যে জাতীয় জীবনীশক্তির কোন পরিচয় নেই, পৈশাচিক শক্তির অপচয়ের পরিচয় আছে মাত্র। হিসেব করলে দেখা যাবে, প্রত্যেক বছরে বারোয়ারী পূজোর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। তার কারণ, দলাদলিটা আমাদের মধ্যে ক্রমেই বাড়ছে, চুরির ভাগ-বখরা নিয়ে খেয়োখেয়ি বাড়ছে; আগে যে দলাদলি রেষারেষিটা পাড়ায় পাড়ায় ছিল, সেটা ক্রমে একই পাড়ার মধ্যে মাথা-চাড়া দিচ্ছে। তাই একই পাড়ার উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিম কোণে এবারে পূজো হয়েছে এবং তার সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হয়েছে। এটাও আমাদের "স্বাধীন" হওয়ার আর একটা মোক্ষম প্রমাণ। "স্বাধীন" হয়েছি বলেই আজ দলাদলি ও কামড়াকামড়িটা চরমে উঠেছে, তাই বারোয়ারী পূজো এবারে প্রত্যেক ফুটপাথে, পার্কে পার্কে হয়েছে। এটা জীবনীশক্তির শুভ লক্ষণ নয়, জাতীয় অপমৃত্যুর অশুভ লক্ষণ।

হুতোমের যুগে বাইজী নাচ, খেম্‌টা নাচ, খেউড়, হাফ-আখড়াই ও তরজা গানের রেওয়াজ ছিল খুব বেশী। এখন আর সে সব নাচওয়ালী খেম্‌টাওয়ালীও নেই, গায়েনরাও নেই। যাত্রা-থিয়েটার কলকাতায় এবার অনেক হয়েছে অবশ্য, এমন কি দু'-এক জায়গায় তরজা গানও হয়েছে, সে খবরও পেয়েছি। তবে এখন আর এ সবের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। রাস্তা-ঘাটে, বাসে-ট্রামে, উৎসব-মণ্ডপে যে-সব ভদ্রবেশী "স্বাধীন" নর-নারীর জমায়েত হয় তাতেই সকলের সমস্ত প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়ে যায়। হুতোম মেয়েদের নথ ছিঁড়ে নেবার কথা বলেছেন। কালপ্যাঁচা মেয়েদের কানের ঝুমকো আর কানবালা ছেঁড়ার অনেক কাহিনী জানে। তাছাড়া মেয়েদের চিমটি কাটা, খামচে খাবলে নেওয়া, দলাই-মলাই করা ইত্যাদি নিয়ে গোলমাল হয়নি এমন কোন বারোইয়ারি তলা বোধ হয় একটিও নেই। এই ব্যাপার উপলক্ষ ক'রে মা দুর্গার খাঁড়া নিয়ে পর্য্যন্ত অনেক পাড়ায় তুমুল মারামারি হয়ে গেছে। "পুরুষ" ও "নারী" সকলেই সমান স্বাধীন, সমান বেপরওয়া, সুতরাং এক শ্রেণীর ঘাড়ে দোষ চাপানো যায় না। মাঝখানে পড়ে ভদ্র মেয়ে-পুরুষদের অনেক জায়গায় বেইজ্জৎ হ'তে দেখেছি। আবার এ-ও দেখেছি, যে-জায়গায় যত বেশী দলন-মর্দ্দন, খাম্‌চানো-খাবলানোর ব্যাপার হয়েছে, যত বেশী কানবালা ছেঁড়া আর খোঁপা খুলে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে, সেইখানেই তত বেশী দল বেঁধে ঘটা ক'রে ভদ্রবেশী মেয়েরা ভিড় ক'রে গেছেন, কোথাও স্বাধীন ভাবে, কোথাও পুরুষ-লাইসেন্স বগলে ক'রে। এবারের বারোয়ারী পূজোর এই বৈশিষ্ট্যটাই উল্লেখযোগ্য। যৌনবিকারের এ রকম বীভৎস তাণ্ডব সচরাচর দেখা যায় না। অবদমিত পশুপ্রবৃত্তিগুলো পূজোর ক'দিন শহরে যেন মত্ত হাতীর মতো নেচে বেড়িয়েছে।

বাঙালীদের প্রতি আবেদন

হাজার হাজার বাস্তুহারা পরিবার যখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে, শহরের হাজার হাজার বেকার মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরে যখন দু'বেলার অন্নের সংস্থান নেই, তখন আমরা "বারোয়ারী দুর্গোৎসবের" নামে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়িয়েছি, আর আমাদের অবদমিত বিকারগ্রস্ত পশুপ্রবৃত্তিগুলোকে চরিতার্থ করেছি। আমাদের মতো এমন নির্লজ্জ বেহায়া নির্ব্বুদ্ধি জাত পৃথিবীতে আর ক'টা আছে জানি নে। একশ' বছর আগে হুতোম "বাবুদের দুর্গোৎসব" দেখে বঙ্গবাসীর প্রতি মনের দুঃখে যে কয়েকটা কথা নিবেদন করেছিলেন, কালপ্যাঁচাও আজ তাই করছে। হুতোম বলেছিলেন:

"হা বঙ্গবাসিগণ! তোমরা এইরূপেই আপনাদিগকে সভ্য বলে পরিচয় দিয়ে থাক! যাঁদের ধর্ম্মকর্ম্ম এইরূপ, যাঁদের আমোদ-প্রমোদের প্রণালী এই, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এইরূপ হিপক্রিট, তাঁরা আবার সভ্য ব'লে পরিচয় দেন!...আপনাদের জাতির গৌরব করেন! তোমাদের মধ্যে যাঁরা প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁরা বাহিরে হরিনামের ভাণ দেখিয়ে গোপনে যাবতীয় ঘৃণিত কর্ম্মে আসক্ত হয়ে থাকেন; আর যাঁরা নব্য সম্প্রদায়, তাঁরা তো...মদ মুরগী খেয়ে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের ন্যায়, প্রথম কাকের দল, শেষে ময়ূরের দল হতেও চ্যুত হচ্চেন। এ সকল দেখে শুনেও কি তোমাদের মনে একটু লজ্জা বা ঘৃণার উদয় হয় না? তোমরা লেখাপড়া শিখে কোথায় স্বদেশের উন্নতি করবে, না মদ মুরগী খেয়ে 'টুপ-ভুজঙ্গ' হয়ে বঙ্গমাতার মুখে চূণকালি দিচ্চ! এই সকল গুণেই কি তোমরা উচ্চ পদ প্রার্থনা কর? এই ক্ষমতাতেই কি আপনাদিগকে রাজ্যশাসনের উপযুক্ত জ্ঞান কর?...অতএব তোমাদিগকে ধিক্! তোমাদের প্রকৃতিকে ধিক্! অনুষ্ঠানকে ধিক্!..." (হুতোমপ্যাঁচার নক্শা)।

★

“বাঙলার

শুরু থেকেই [illegible] হতে শুরু হয়েছে। বাঙলা সাহিত্যে বাঙালীর বিশিষ্টতার প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। যে সাহিত্যে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সন্ধান নেই তা যে আদপেই সাহিত্য হয় না সাহিত্যিকরা ছাড়া এত দরদ দিয়ে কে আর বুঝলো!

আচারে, ব্যবহারে ও পোষাক-পরিচ্ছদে বাঙলা ও বাঙালীর গৌরব আজ লুপ্ত হতে বসেছে। অদূর ভবিষ্যতে বাঙালী জাতির লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে সামান্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে যাওয়া যদিও আজ হাস্যকর পরিহাস ব্যতীত আর কিছুই নয়, তথাপি অনেক দুঃখে কাঁচি ফেলে আজ কলম ধরেছি। সত্যি কথা বলতে কি, কলম আমি ধরতেই জানি না। কসুর মাফ করবেন হুজুরের দল।

কলকাতা—সর্ব্বনাশের মূলকেন্দ্র

আমি এক জন মেটিয়াবুরুজের সামান্য দর্জ্জি। কাঁচি, কল আর সুতোর জালে জট পাকিয়ে আছি গত ত্রিশ বছর ধরে। আদার ব্যাপারী হয়ে সাহিত্যের আলোচনা করতে বসিনি মশাই, পেটের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে সাহিত্যের দরবারে এসে জমায়েৎ হয়েছি। নিদ্রিত সিংহের নিদ্রাভঙ্গের দাওয়াই অনেকে জানেন, কলকতার নিদ্রিত বাঙালীর ঘুম ভাঙানোর কি যে উপায় তার কোন হদিস জানেন কেউ? নিরুপায় হয়ে কিছু করতে না পেরে কলকাতাকে হুতোমপ্যাঁচার ভাষায় আর একবার বন্দনা করি—“আজব সহর কলকাতা।

রাঁড়ী বাড়ী জুড়ী গাড়ী মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমাইসির ফাঁদ পাতা।”

তবুও এই বক বিড়াল আর বদমায়েসির ডিপো কলকাতা শহরকে বাঙলার শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র বলে অভিহিত করা হয়! কলকাতায় একবার বে-বিষয় ও বস্তুর প্রচলন হয় সারা বাঙলা দেশে না কি তারই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়! কলকাতার বাবুরা যা করেন বাঙলার যুবসম্প্রদায় চক্ষু মুদিত ক'রে না কি তাঁদেরই অনুকরণ করেন। কলকাতার চালু ফ্যাশন না কি সারা বাঙলা দেশটাকে চালু করে রাখে। তবুও কলকাতার বাবুদের “বাঙালী বাবু” বলতে আমি দ্বিধা ও সঙ্কোচ বোধ করি আর শহর কলকাতাকে বাঙলার কৃষ্টির উৎসমূল বলতেও আমি দস্তুরমত লজ্জিত হই। কারণ, কলকাতায় আজ বাঙালী বাবুদের কোন খাতির ও প্রতিপত্তি নেই। আসলে যাঁরা আজ গদীয়ান তাঁরা ভাঙ্গা বাঙলা বলতে পারেন বটে, পৈত্রিক পরিচয়ে দ্বারবঙ্গ ও পাটলীপুত্রের নাম করেন। তাছাড়া এ-কথাও হলপ ক'রে বলছি, কলকাতায় যে ফ্যাশন প্রথম প্রচলিত হয় তাতে বাঙালীত্বের কোন চিহ্ন কোন কালে ছিল না, আজও নেই। হুতোমপ্যাঁচার ভাষায় সে যুগের বাঙালী ব্রকোদর (বৃকোদর) বাবুদের বর্ণনা শুনুন: “* * * বাবুর ট্যাসেল দেওয়া টুপী, পাইনাপোলের চাপকান, পেটি ও সিল্কের রুমাল, গলায় চুলের গার্ডচেন; অথচ থাকবার ঘর নাই, মাসীর বাড়ী অন্ন লুসেন, ঠাকুর-বাড়ী শোন, আর সেনেদের বাড়ী বসবার আড্ডা। পেট ভ'রে জল খাবার পয়সা নাই, অথচ দেশের রিফরমেশনের জন্যে রাত্রে ঘুম হয় না (মশারির অভাবও ঘুম না হবার একটি প্রধান কারণ)।”

কলকাতার মধ্যবিত্ত অভাবী গৃহস্থ বাবুদের এই হালের পর 'ইঙ্গ বাঙালীদের' প্রসঙ্গে হুতোমপ্যাঁচা বলছেন: “* * * বাবু বড় হিন্দু—একাদশী-হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোস, উত্থানও

নির্জ্জলা ক'রে থাকেন; বাবুর মেজাজ গবির। সৌখীনের রাজা। ১২১১ সালে সাবরবন্ সাহেবের নিকট তিন মাস মাত্র ইংরেজী লেখা-পড়া শিখেছিলেন; সেই সম্বলেই এত দিন চলচে—সর্ব্বদা পোষাক ও টুপী প'রে থাকেন; (টুপীটি এমনি হেলিয়ে পরা হয়ে থাকে যে বাবুর ডান কান আছে কি না হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হয়); লক্ষ্ণৌ ফ্যাশানে (বাইজীর ভেড়ুয়ার মত) চুড়িদার পায়জামা, বামজামা, কোমরে দোপাটা ও মাথায় বাঁকা টুপী; তাঁর মনোমত পোষাক।”

এই মনোমত পোষাকের লিষ্টির মধ্যে বাঙালীত্বের নিদর্শন কৈ? এত কথায় কাজ কি, আজকের লেখা-পড়া-জানা কালেজী বাবুদের (বাঙলাকে মাতৃভাষা করিতে হইবেই বলিয়া যাঁহারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন) পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে একবার দৃক্‌পাত করলেও দেখা যাবে।—মাথার চুল অ্যালবার্ট কাটা, চোখে অ্যামেরিকান ফ্রেমের চশমা, মুখে বার্ডসাই, পরনে হাওয়াইয়ান সার্ট ও প্যাণ্টলুন, হাতে রিষ্ট-ওয়াচ, পায়ে কাবলি জুতা। ভাগ্যক্রমে মামা আর জামাইবাবুরা গদীতে থাকলে এ'রা ঠেলায় পড়ে খদ্দর ধারণ ক'রে চাকরী করেন। আরও কথঞ্চিৎ সৌভাগ্য থাকলে মামার জোরে দিল্লীর সেক্রেটেরিয়েটে যান। কাশ্মীরী পণ্ডিত আর মাদ্রাজী মূর্খদের পায়ে তৈল দেওয়ার অভ্যাস করেন। আর কি করেন? ঘুষ লন, জাত খুইয়ে এটা-সেটা আহার ও পান করেন, সস্ত্রীক ডিনারে পার্টিতে গিয়ে বাঙলার মান ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেন। এরোপ্লেনে ওড়েন। লালদীঘির পার্লামেণ্ট থেকে রাস্তার রক-পালিস-করা বাবুদের আজ সব শিয়ালের 'এক রা'! কেউ বলেন—কাজের খাতিরে প্যাণ্টলুন পরিধান করি, কেউ লাজে বলতে পারেন না যে কাজিন দেবীর কথায় এই পোষাক ধারণ করেছি।

সুতরাং, জাতির মজ্জাগত অধিকার স্বাধীন হয়েছি বলেই কী ত্যাগ করব? ইংরেজ আমাদের ত্যাগ ক'রে চলে গেছে ব'লে আমরাও তাদের চাল-চলন আদব-কায়দা ত্যাগ করব তার কি মানে আছে?

ঠিক সে-যুগের 'ইয়ং বাঙালী' বাবুদের মতই এ যুগের স্মার্ট বাবুদের দৌলতে কলকাতার শহর আজও গুলজার হয়ে আছে। ক্যাসানোভা থেকে কমলা কাফে, গ্রেট ইষ্টার্ণ থেকে মা কালী মার্কা দেশী সরাপের দোকান, মেট্রো থেকে মতিমহল আর টালা থেকে টালিগঞ্জের সর্ব্বত্র এই স্মার্ট বাবুদের দেখতে পাওয়া যায়। কথায় তুবড়ীতে ভূরি-ভূরি গুল ঝাড়ছেন এবং জীপ আর কাজিনদের পাশে নিয়ে শহর গুলজার ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যাঁদের কাজিন জোটেনি তাঁরা পরের স্ত্রীর দিকে আড়চোখে হানা দিচ্ছেন। তাঁদের সতীত্ব-রক্ষার অজুহাতে ট্রামে-বাসে লড়াই করছেন, আর কথায় কথায় স্বাধীন হওয়ার বড়াই করছেন। সুতরাং এই ধরণের বারোইয়ারী বাবুদের যে-কলকাতায় বাস তা যে আবার রুচি ও কৃষ্টির মূলকেন্দ্র হতে পারে, তা যেন বরদাস্ত করা যায় না। কলকাতার পাঁচ-মিশেলী ফ্যাশনও তাই বাঙালীর জাতীয় ফ্যাশন কখনও নয়। তখনও ছিল না, আজও নেই। তাই বলছিলাম, কলকাতা শিক্ষা ও কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল নয়, সর্ব্বনাশের মূলকেন্দ্র।

এবার পুজার ফ্যাশন

'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি' কথাটি বলতে যারা গর্ব্ব অনুভব করেন আমি তাদের দলে নেই। এ-বিষয়ে বাঙালী মেয়েদের রুচির উল্লেখ

প্রথমেই করতে হয়। অলঙ্কারের দিক্ দিয়ে আধুনিক কবিদের মত তাঁরা আবার সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করছেন—পাঁচ বছর আগে নিরা-ভরণা থেকে যাঁরা প্রিয়জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন আজ তাঁরাই ঠাকুমা দিদিমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তাঁদেরই রুচির অনুকরণ করতে বসেছেন। আশার কথা সন্দেহ নেই। বাঙালী মেয়েদের দেখলে যদি ডিনার পার্টি আর সিনেমার নায়িকাদের মনে না প'ড়ে আমাদের ঠাকুমা দিদিমাদের মনে পড়ে, তা হলে বদ্‌রুচির পরিচয় নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না। এলিস সাহেবের Exhibitionism-এর বৃত্তি অঙ্গপ্রকাশক ব্লাউজ সেমিজ পরেই শুধু যে প্রকাশ করতে হবে তার কি মানে আছে? বাঙালী মেয়েরা যদি পারেন তো দেখান না ভারী ভারী ওজনের সেই কানবালা, স্বর্ণচূড়, চন্দ্রহার আর ঝুমকো, সাতনরী, ঝাপটা! শাড়ীর আঁচল যথাস্থানে থাক্ না, তাকে স্থানচ্যুত করলে কেউ কেউ খুশী হতে পারেন, সকলের মন হয়তো তা চায় না।

কলকাতার মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবার পূজায় বেশ লক্ষ্যণীয় হয়েছিল। লজ্জাহীনতার চরম পর্য্যায়ে নেমে কলকাতার কয়েক সম্প্রদায়ের মেয়েরা এবার যে-সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করলেন তাতে বাঙালী নারীর সম্মান যথার্থ ই রক্ষিত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই! পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, বারোইয়ারী তলার পিঠের কাপড় ফেলে দিয়ে যে দৃশ্য তাঁরা দেখালেন, তাতে তাঁদের কানে তুলো আর পিঠে কুলো বাঁধা আছে বলেই ধারণা হয়। নির্লজ্জতা, বাচালতা যদি পোষাক-পরিচ্ছদ ও কথাবার্ত্তায় প্রকাশ পায়, আর তাই যদি ফ্যাশনে রূপান্তরিত হয়ে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তা হলে 'লজ্জা নারীর ভূষণ' কথাটি স্মরণ ক'রে সুন্দরবনে পালানো ব্যতীত আর কোন পথ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, কলকাতার রক-পালিস-করাবাবুরা আর গরাদ-রেলিঙ-পালিস-করা মেয়েরা যদি ফ্যাশনের জন্মদাতা আর গর্ভধারিণী হতে পারতেন তা হলে আর কথা ছিল না। 'ফ্যাশন' কথাটির পরিপূর্ণতার জন্য যে সংযম ও রুচির প্রয়োজন তা কলকাতার এই দুই দলের একেবারেই নেই। আর তাই কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালীর নেই কোন সর্ব্বজনীন ফ্যাশন, পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নেই। জলসা-ঘর আর নাইট-ক্লাব ভোগ্য হওয়ার সৌভাগ্য সকলের থাকে না, ট্যাসেল দেওয়া টুপী, গলার গার্ডচেন, ঝাপটা, সাতনরী কিংবা গ্যাবার্ডিন, ব্রোকেট, ব্রোচ প্রভৃতি ভোগ্য-বস্তুও সকলে চোখে দেখতে পায় না। অথচ সকলে যে বস্তুকে গ্রহণ করতে পারলো না তাও কস্মিন্ কালে 'ফ্যাশন' হতে পারে না। ফ্যাশন চিরকাল সর্ব্বজনীন।

এবারের ফ্যাশন দেখতে তাই কলকাতার সর্ব্বজনীন বারোইয়ারী-তলার আনাচে কানাচে ঘোরা ফেরা করেছি। হাতে কাজ নেই, ঘরে মাল নেই, পকেটে নেই পয়সা, মনে নেই আনন্দ। এলোমেলো ঘোরা ফেরা ক'রে চরণ দু'টি ক্লান্ত ও দেহ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। দেশপ্রিয় পার্কের এক কোণে বসে বসে চীনে বাদাম দাঁতে কাটছি। দূরে পূজামণ্ডপ লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা উৎরে গেছে কখন, চারি দিকে বিজলী আলো জ্বলছে। হাওয়াইয়ান সার্ট আর পাৎলুন-পরা বাবুরা এই ফাঁকে যে যার কেটে পড়ছেন—হয়তো কাজিন দেবীর কাছে টাইম দেওয়া আছে! মধ্যে মধ্যে মাইক্রোফোনের গান বদল হচ্ছে। শ্যামা-সঙ্গীত শুনছেন এক দল, কেউ শুনছেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত, কেউ সিনেমা-সঙ্গীত। পম্পিয়া এসেন্সের গন্ধ বইতে শুরু করেছে, থেকে থেকে ইভনিং ইন প্যারী। পার্কের এখান-সেখান থেকে সাড়ে বত্রিশ-ভাজা, গ্যাস-বেলুন, কাগজের ফুলওয়ালারা চিৎকার ক'রে উঠছে। কিশোর-কিশোরীর দল নেচে উঠছে তা শুনে। সপ্তমীর রাত্রি হাস্যে-লাস্যে যেন মশগুল হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা লাভের পর শারদীয়া উৎসবে শহর কলকাতার কী মাইফেলী মেজাজ! সর্ব্বহারা বাস্তুহারার দল হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে। যা দেখছে তাতেই অবাক। এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। একেবারে আমার কাছাকাছি এসে ব্যস্ত হয়ে বললেন,—আপনি দেখেছেন মশাই?

চমকে উঠেছিলাম প্রথমে। বললাম,—কি দেখেছি? কাকে দেখেছি? ভদ্রলোক মাটিতে বসে গলা নামিয়ে ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বললেন,—সেই মেয়ে দু'টিকে? এদিক্ দিয়ে যেতে দেখেছেন?

বিস্মিত হলাম।—হারিয়ে ফেলেছেন বুঝি? কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম।—আপনার আত্মীয়? তা নিশ্চিন্ত হয়ে যে বসে পড়লেন? খুঁজে দেখুন!

ভদ্রলোক হাসলেন, অর্থহীন হাসি। বললেন—অনেক খুঁজেছি! সেই বাগবাজার থেকে বালিগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বারোয়ারীতলায় খুঁজেছি! যাদেরই দেখছি মনে হয়েছে যেন তারা দু'জন! সেই মাদ্রাজী জামা আর শাড়ী! কাছে গিয়ে দেখছি, না তারা নয়, অন্য কারা!

এতক্ষণে বুঝলাম ভদ্রলোকের কথার তাৎপর্য্য। এবার পূজায় বাঙালী মেয়েদের সর্ব্বজনীন ফ্যাশনের বিভ্রাটে পড়েছেন। ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলাম,—কোথায় চললেন?

অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে বললেন,—যাই, খুঁজতে যাই। কথার শেষে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন মুহূর্ত্তের মধ্যে।

আমিও উঠে পড়লাম মনের দুঃখে। হাতে কাজ নেই, মনেও নেই আনন্দ। সেলাই-কলে মরচে ধরে গেছে। বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। আমিও যেদিকে তাকাই দেখতে পাই সেই মাদ্রাজী জামা আর মাদ্রাজী শাড়ী ৮ চলির জামা কল্পনা শাড়ী! এবার পূজায় আমাদের অন্ন মারা গেছে। তাই অনেক দুঃখে মনে মনে শরৎ বসুর ভাষায় বললাম,—Go back, Rajagopalachari! Go back!

তাই বলছিলাম, কলকাতার ফ্যাশন এত দিনে সর্ব্বজনীন হয়ে উঠলেও বাঙালীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পোষাক আদপেই হয়ে ওঠেনি। ইডেন উদ্যানের একজিবিসনের পর থেকে একজিবিসনইজম্'এর চরম হয়েছে, কিন্তু বাঙালী মেয়েরা কৈ দেশী কিছু দেখাচ্ছেন? সেকালের অলঙ্কার-প্রীতি আর মদ্রদেশীয় পোষাক—কলকাতার ফ্যাশনে কি চিরকাল ভেজাল! হাওয়াইয়ান সার্ট আর পাৎলুন—আলালের ঘরের দুলাল!

দোহাই বঙ্গদেশবাসি, রক-পালিস ও রেলিঙ-পালিস-করা মেয়ে-ছেলেদের ফ্যাশন তোমরা কখনও চোখেও দেখো না—তোমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। বরং একটা স্বদেশী রক্ষা হোক তাতে যথার্থ দেশের কাজ হবে—আমাদের মত অধমদের দু'মুঠো অন্ন জুটবে।

আমার পূজার বাজার

ঘুঘু

"দাদু, এবার পূজোর কিন্তু আমার শাড়ী চাই।"

চায়ের পেয়ালা হইতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমার ত্রয়োদশী নাতনীটি বঙ্কিম গ্রীবা হইয়া টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাসিয়া বলিলাম—"তা চাই বই কি দিদি, শাড়ী নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু ফ্রকে তোমার অরুচি ধরল কেন দিদি!"

ঘাড় নাড়িয়া নাতনী উত্তর করিল—"ও-সব আমি কিছু বুঝি না, এবার শাড়ী পরে পূজো দেখতে যাব।"

আরজী মঞ্জুর হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহই বোধ হয় তাহার ছিল না, তাই আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ত্রস্তা হরিণীর মত লঘু পাদক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু আমাকে ডুবাইয়া গেল চিন্তার অকূল সমুদ্রে। তাই তো, পূজার বাজার করিবার সময় যে আসিয়া পড়িয়াছে! সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়রা পূজা সম্পর্কে যে সকল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে এই আশ্বাসই তাঁহারা দিয়াছেন যে, পূজার আনন্দের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য হইলেও সকল দুঃখ-দৈন্যের বেদনা আমরা ভুলিতে পারিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই যে আমার সম্মুখে মহা সমস্যা—পূজার বাজার! দুঃখ-দৈন্য ভুলিবার উপায় কি? গত বৎসরের তুলনায় এবার জিনিষ-পত্রের দাম এত বেশী বাড়িয়াছে যে দৈনন্দিন সংসার খরচ চালানই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, পূজার বাজার করিবার মত সংস্থান কোথায়?

"বাবা!"

হঠাৎ চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম, ছোট নাতিটিকে কোলে লইয়া বৌমা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বৌমা বলিলেন, "বাবা, ঝি বলে গেল, মিহি শাড়ী না হলে সে নেবে না।"

তাই তো, সমস্যা চারি দিকেই! আমার মুখের দিকে চাহিয়া বৌমা বোধ হয় আমার মনের ভাবটা বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন, বলিলেন, "বাবা, আমার জন্য এবার আর শাড়ী কিনতে হবে না।"

বৌমা বোধ হয় ভাবিলেন, ইহাতেই সব সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। সমাধান না হইলেও মনে মনে দুঃখ অনুভব না করিয়া পারিলাম না। কি বলিব তাই ভাবিতেছি, এমন সময় খুড়তুতো ভাই আসিয়া বলিল, "কি দাদা, বৌমার সঙ্গে পূজোর বাজারের ফর্দ্দ নিয়ে আলোচনা করছো বুঝি?"

বলিলাম, "কতকটা তাই বটে, তবে ফর্দ্দটা হচ্ছে পূজোর বাজার কতটা না করে চলে তারই।"

"তোমার আবার পূজোর বাজারের ভাবনা কি? মেয়ে নেই, কাজেই মেয়ের বাড়ী তত্ত্ব পাঠানোও নেই। নাতনীর বিয়েরও দেরী আছে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে আমার! ভেবেছিলুম, মেয়ের বাড়ীতে তত্ত্বের জিনিষ পাঠাবার বদলে টাকা পাঠিয়েই কাজ সারবো। একশো টাকা পাঠিয়েছিলুম। কিন্তু বেয়ান টাকা ফেরৎ পাঠিয়েছেন, জানিয়েছেন, তত্ত্বের জিনিষ পাঠাতে হবে, ফর্দ্দও দিয়েছেন একটা।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ফর্দ্দটা শুনি তো একবার।"

খুড়তুতো ভাই বলিল—"সে এক মহাভারত—বেয়ানের জন্য গরদ, জামাইয়ের জন্য ফরাসডাঙ্গার ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী, মেয়ে আর মেয়ের দুই জায়ের প্রত্যেকের জন্যে একখানা করে 'মানে না মানা' শাড়ী, নাতির জন্য কোট-প্যাণ্ট, আরও অনেক কিছু···"

"কি করবে ঠিক করলে?"

"কি আর করবো, যা ফর্দ্দ—আড়াইশো টাকার কম কিছুতেই পার পাওয়া যাবে না। কাজেই তত্ত্ব আর পাঠানো হবে না। মেয়েকে এর জন্য অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হবে, কিন্তু উপায় কি?"

তত্ত্বের কথা শুনিয়া বৌমার মুখখানাও ম্লান হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কোথায় লাগিয়াছে বুঝিতে কষ্ট হইল না, বলিলাম, "তুমি দু'দিকেই ঠকলে বৌমা! আমার কাছ থেকে পূজার কাপড় তুমি নিজেই নিতে চাইলে না, আর আমি তোমার বাবাকে জানিয়েছি, এবার তিনি যেন পূজোর তত্ত্ব না পাঠান।"

মুহূর্ত্তে বৌমার মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার চোখটি চক্‌চক্ করিতেছিল—বোধ হয় চোখের জলেই।

* * *

বিকালে নাতনী ও দুই নাতি লইয়া পূজার বাজার করিতে বাহির হইলাম। পনের-কুড়ি দিন আগে এক বন্ধুর সঙ্গে তিন-চারি দিন আমার বাজারে বাহির হইতে হইয়াছিল। তখন দোকান-গুলিতে তেমন ভীড় দেখি নাই। সাধারণতঃ পূজার এক মাস দেড় মাস পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতায় পূজার বাজার জমিয়া উঠে। এই ভীড়টা হইত মফঃস্বলের ক্রেতাদের—বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবসায়ীদের এবং কতকটা পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবসায়ীরা পূজার মাসাধিক কাল পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে কাপড়ের চালান নিয়া তাঁহাদের দোকান সাজাইতেন মফঃস্বলের ক্রেতাদের জন্য। এবার তাহাদের অভাবটা কলিকাতার বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা যে বিশেষ ভাবেই অনুভব করিয়াছেন, বাজারের অবস্থা দেখিয়া আমিও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চবিত্ত মধ্যশ্রেণীর অনেক লোকও কলিকাতায় আসিয়া পূজার বাজার করিতেন। এবার তাহারাও আসেন নাই। চাকরী-বাকরী উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের বহু লোক কলিকাতায় বাস করেন। প্রতি বৎসরই পূজার বন্ধে বাড়ী যাইবার সময় পূজার জামা-কাপড় ইত্যাদি কলিকাতা হইতেই কিনিয়া লইয়া যাইতেন। এবার পূজা উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের খুব কম লোকই বাড়ী গিয়াছেন এবং যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারাও শুল্ক-সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের জন্য কলিকাতা হইতে জামা-কাপড় লইয়া যাইতে পারেন নাই। পূজার দুই-তিন দিন পূর্ব্বে নাতি-নাতনীকে লইয়া পূজার বাজার করিতে বাহির হইয়া দেখিলাম, দোকানে দোকানে ভীড় মন্দ জমে নাই।

নাতনীটি ত্রয়োদশী হইলেও ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ে। তার পর সাংবাদিকের নাতনী। বাড়ীতে রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতির কচকচি শুনিতে শুনিতে কতকটা ইঁচড়ে পাকিয়া গিয়াছিল। ভীড়ের জন্য কয়েকটি দোকানে প্রবেশ করিতে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া নাতনী বলিল, "দাদু, আজ সকালেই ছোট দাদুমণি যে বলিয়াছিল এবার পূজোর দোকানে খদ্দেরের ভীড় জমে নাই?"

কি উত্তর দিব? বলিলাম, "বুঝলে না দিদি, কোলকাতার লোক ৬০ লক্ষেরও উপর হয়েছে। কেউ কেউ বলেন প্রায় ৮০ লক্ষ। সংখ্যাটা যাই হোক, গতবারের চেয়ে অনেক বেশী লোক কোলকাতায় আছে। সেই তুলনায় ভীড় বাড়ে নাই। তা ছাড়া—"

বলিতে বলিতে একটা বেশ বড় দোকানে প্রবেশ করিলাম। নাতনী নিজেই ফরমাইস করিল—"শাড়ী দেখান তো।"

অন্য খরিদ্দারের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে বিক্রেতাটি একবার ফ্রক-পরা আমার নাতনীটির দিকে আর একবার আমার দিকে চাহিয়া আমাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দামের মধ্যে চাই।"

এবার নাতনীও আমার মুখের দিকে চাহিল। নিজের দারিদ্র্যকে যথাসম্ভব ক্ষুণ্ণ না করিয়া বলিলাম—"এই কম দামের মধ্যেই।"

কম দামের যে-সব শাড়ী আসিল সেগুলির কোনটা ৪০৲ টাকা, কোনটা ৪৫৲ টাকা, কোনটা ৫০৲ টাকা, আমার সাধ্যের অতীত। আরও কম দামের যখন চাহিলাম, তখন আমার প্রতি বিক্রেতার আগ্রহ একেবারেই কমিয়া গেল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। দেখিলাম, বিক্রেতারা সকলেই আমাদের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের প্রতি তাঁহাদের আগ্রহ, তাঁদের অনেকেই দেখিলাম, ৬০।৭০ টাকা দামের কম কোন শাড়ী কিনেন নাই।

নাতনীটি আমার হাতে টান দিয়া বলিল, "চল দাদু এখান থেকে।" পথে বাহির হইয়া বলিলাম, "বুঝলে দিদি, এবার পূজায় ভীড় জমাচ্ছে কারা ?"

"বুঝলাম বৈ কি দাদু, তোমার ভাষায় যাঁরা বুর্জোয়া এবার শুধু তাঁদেরই ভীড়।"

হাসিয়া বলিলাম, "দূর পাগলী, ও-কথা বলতে নেই। তোমার দাদু যে গরীব তা তো লোকে বুঝবে না, ভাববে বুঝি কম্যুনিষ্ট। আসল কথা কি জানো দিদি, দামী শাড়ী-জামার বাজারই এবার জমেছে।"

এক দোকানে ২৪।২৫৲ টাকা দামের শাড়ীও দেখাইল। কিন্তু তাহাও কিনিবার ক্ষমতা আমার নেই। বিক্রেতা শাড়ীগুলি গুছাইতে গুছাইতে বলিল, "মিলের শাড়ী কিনুন গে মশাই।"

সে দিনের জন্য শাড়ী কেনা মুলতুবী রাখিয়া দুই নাতির জন্য হাফপ্যাণ্ট ও হাফসার্ট কিনিলাম। হাফসার্ট, হাফপ্যাণ্ট, ফ্রক, ব্লাউজ, সায়া প্রভৃতি কাটা কাপড়ের প্রাচুর্য্য মন্দ নয়। দাম অবশ্য বাড়িয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় প্রায় শতকরা ২৫৲ টাকা বেশী। এইগুলির বিক্রয় প্রায় গত বৎসরের সমানই হইয়াছে। কম হইলে শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগের বেশী কম নয়। যেমন করিয়াই হউক, ছোট ছেলেমেয়েদের পূজার কাপড় না দিলে চলে না।

দুইখানা ধুতি, বিধবা কাকীমার জন্য একখানা সাদা ধুতি এবং ঝিয়ের জন্য একখানা মিলের শাড়ী না কিনিলেই নয়। অসামরিক সরবরাহ সচিব শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বক্তৃতা হইতে জানিয়াছিলাম, ৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ৫২০০ গাঁইট মূল্যাঙ্কিত কাপড় কলিকাতার বাজারে এবং ১০২২ গাঁইট মূল্যাঙ্কিত কাপড় বিভিন্ন জেলায় প্রেরিত হইয়াছে। তা ছাড়া আরও ২ হাজার গাঁইট কাপড় বাজারে ছাড়া হওয়ার কথাও তিনি বলিয়াছেন। কাজেই অনেক ভরসা লইয়াই বাজারে বাহির হইলাম। বহু দোকান ঘুরিলাম, কিন্তু মিহি কাপড় পাইলাম না।

অনেক দোকান ঘুরিয়া শ্রান্ত দেহে ও ক্লান্ত মনে ধীরে ধীরে ফুটপাথের ভীড় অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। হাবলুর সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখিয়াই বলিল, "ঠাকুরদাও বাজারে বেরিয়েছেন।"

হাসিয়া বলিলাম, 'না বেরিয়ে উপায় কি। কিন্তু এত মাটি কাটিয়াও যে কোহিনুর মিলিল না।"

"কোহিনুরটা কি ঠাকুর দা।"

"তাও বুঝলে না ভাই, মিহি ধুতি।"

হাবলু এক গাল হাসিয়া বলিল, "যা বলেছেন ঠাকুরদা, কোহিনুরই বটে!" বলিতে বলিতে বগলের পুঁটলিটা একবার হাত দিয়া নাড়িল। "বুঝলেন, দোকানের মালিকের যাঁরা বিশেষ পরিচিত বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, তাঁরাই মিহি ধুতি শাড়ী পেয়েছেন। তাও কি দাম জানেন ? ছাপ-মারা আছে ১২৷৵০ আনা, কিন্তু ১৮৲ টাকা জোড়ার কম কিছুতেই দেয় না।"

মিহি কাপড়ের আশা ছাড়িয়া সুশীল সুবোধ বালকের মত যাহা পাওয়া যায়, তাহারই জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মূল্যাঙ্কিত-বিহীন মোটা ধুতি-শাড়ী কিছু কিছু পাওয়া গেল। দাম ১০৲ টাকা জোড়া ধুতির ১৫৲ টাকা। অনেক ধুতি-শাড়ী দেখিলাম, মূল্যের ছাপের উপর কালির ছাপ মারিয়া উহাকে নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে। দাম প্রায় শতকরা ৩০৲ টাকা বেশী। যেখানে নিয়ন্ত্রিত দরে কাপড় পাওয়া যায় সেখানে সুদীর্ঘ লাইন।

* * * *

নাতনীর শাড়ীর জন্য ষষ্ঠীর দিন আবার বাহির হইতে হইল। দশ দোকান ঘুরিয়াও একটা পছন্দমত জিনিষ পাওয়া যায় নাই—বিশেষ করিয়া আমাদের গরীব লোকের কিনিবার উপযোগী দামে। 'এই আছে মশাই, আর কিছু নেই, নিতে হলে এরই মধ্যে পছন্দ করে নিতে হবে,'—এ কথা প্রায় সব দোকানেই শুনেছি। এই অবস্থা অবশ্য আমার মত নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণীর সাধ্যায়ত্ত দামের জিনিষ সম্বন্ধেই। ৬০।৭০৲ টাকা বা ১০০।১৫০৲ টাকা দামের শাড়ীর ভেরাইটি মন্দ ছিল না। ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি। হঠাৎ নাতনীটি বলিয়া উঠিল, "যাই বল দাদু, এবার পূজোয় ২০।২৫৲ আর ৪০।৫০৲ টাকা দামের শাড়ী কিন্তু খুব বিক্রি হয়েছে।" শাড়ীর ব্যাপারে মেয়েদের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা খুব বেশী। তাহার কথা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। বস্তুতঃ শাড়ী বিক্রি হয়ত শতকরা ত্রিশ ভাগ কম হইয়াছে। কিন্তু দাম বৃদ্ধির জন্য বরং বেশী হইয়াছে। কাহারা কিনিয়াছে এই শাড়ী ? বাজার ঘুরিয়া মনে হইল, এই নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণীর একটা বিরাট অংশ পূজার বাজারে খুব সামান্য পরিমাণ জামা-কাপড়ই কিনিয়াছেন। নিজের অসুবিধা দিয়াই বুঝি, গত বারের মত এবার পূজার বাজার করিতে গেলে, অবশিষ্ট মাসের বাজার-খরচ চলিবে না।

কোন দোকানই দেখা বড় বাকী ছিল না। যে দুই-একটা বাদ পড়িয়াছিল, নাতনীকে লইয়া তাহাই একবার দেখিলাম। দামের মধ্যে শাড়ী মিলে তো পছন্দ হয় না, আবার পছন্দমত যা শাড়ী পাওয়া যায় তাহার দাম আমার সাধ্যাতীত। নাতনীর জন্য একটা পছন্দমত শাড়ী কিনিয়া দিতে পারিতেছি না, এই দুঃখ আমাকে মর্ম্মান্তিক ভাবেই পীড়িত করিতেছিল। আমার মুখের দিকে চাহিয়া নাতনীর বোধ হয় তাহা বুঝিতে বাকী ছিল না। হঠাৎ শাড়ী পছন্দ করা ছাড়িয়া আমার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, "থাক্ গে দাদু, এবারের পূজোয় আমার শাড়ী নাই বা হলো।"

আমার হাত ধরিয়া টানিয়া নাতনী যখন দোকানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন পূজা-মণ্ডপে বোধনের বাজনা বাজিতেছে।

শরৎকালে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ফসলের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। তার প্রধান কারণ অবশ্য কোন সাহিত্যিক প্রেরণা নয়, বাজার-দর। এই সময় বাংলা দেশের দুর্গা পূজো উপলক্ষে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের ব্যবসায়ীদের মধ্যে "পূজা সংখ্যা" বা "শারদীয়া সংখ্যা" নামে এক বিচিত্র রচনা-সংকলন প্রকাশের হিড়িক প'ড়ে যায় প্রধানতঃ বিজ্ঞাপনের জন্যে। পণ্য-ব্যবসায়ীরা পূজোর জন্যে বিজ্ঞাপনের একটা স্পেশাল বাজেট ক'রে রাখেন, পত্রিকা ব্যবসায়ীরা সেই বাজেটের সদ্ব্যবহার করেন এবং সাহিত্যিক ও লেখকরা এই মরশুমে কিছু কামিয়ে নেবার জন্যে কলম কামড়ে-চিবিয়ে কুঁতে-মুতে যা প'রেন তাই লেখেন। এইটাই বাংলার তথাকথিত "শারদীয় সাহিত্যের" অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ-বছরেও এই বৈশিষ্ট্য একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

সম্পাদকের দায়িত্ব

যে-কোন পত্রিকার "বিশেষ সংখ্যা" সম্পাদনা করার একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। সম্পাদকের বিদ্যা-বুদ্ধি থাকা তো দরকারই, তার চেয়েও বেশী থাকা দরকার সাহিত্যবোধ এবং রুচিবোধ। বাংলা দেশের অধিকাংশ পত্রিকা-সম্পাদকের এই সাহিত্য ও শিল্প-রুচিবোধ একেবারে নেই বললেও ভুল হয় না। কয়েক বছর আগে পর্য্যন্ত বাংলা পত্রিকার "শারদীয়া সংখ্যাগুলি" পঞ্জিকার আকারে, পঞ্জিকার সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে বাজারে বেরুত আর চাকুরে বাবুরা বৌ-ছেলে-মেয়ের ব্লাউস শায়া-সেমিজ-ফ্রকের সঙ্গে দু'-একখানা পাঁচমেরী পূজো সংখ্যা কিনে নিয়ে গৃহাভিমুখে যাত্রা করতেন পূজোর ছুটি কাটাবার জন্যে। অর্থাৎ আগে "শারদীয়া সংখ্যার" শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করত নীরেট দৈহিক ওজনের উপর, রুচি শ্রী সৌন্দর্য্য ও সুসাহিত্য পরিবেশনের কোন বালাই ছিল না বলা চলে। সজনীকান্ত দাসের শারদীয়া "আনন্দবাজার পত্রিকা" সম্পাদনায় কৃতিত্বলাভের পর ১৩৫০ সনে, "যুগান্তর" পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার সম্পাদনায় বিনয় ঘোষ সর্ব্বপ্রথম যুগান্তর আনেন বলা চলে। সাহিত্যবিচার-বুদ্ধি ও শিল্পরুচিবোধ সজাগ থাকলে, দৃষ্টিভঙ্গী বলিষ্ঠ হ'লে সাহিত্য পত্রের সম্পাদনা কতটা উচ্চস্তরে উঠতে পারে, বিনয় ঘোষ তা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন। এ-যুগের এক জন অন্যতম বলিষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে ন'ন শুধু, সম্পাদক হিসাবেও তাঁর এই নতুন অবদান সকলেই স্বীকার করবেন। তার পর থেকেই বাংলা পত্রিকা-সম্পাদনার গতানুগতিক স্থূলরুচিসম্পন্ন ধারায় একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন এসেছে বললে ভুল হয় না।

কিন্তু তা হ'লেও এই পরিবর্ত্তন স্থায়ী হয়নি বা পরিণতিলাভ করেনি দেখা যায়। তার প্রধান কারণ, পত্রিকার সম্পাদকদের মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর বলিষ্ঠ সাহিত্যিকের শোচনীয় অভাব। এ-বছরের শারদীয়া সংখ্যার সম্পাদনায় নতুনত্বের চিহ্ন তেমন পাওয়া যায় না। একমাত্র দেখা যায়, "বসুমতী রজত জয়ন্তী সংখ্যা" ও "শারদীয়া বসুমতী"র সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটক, বয়সে তরুণ হলেও, পক্ষপাত-শূন্য সাহিত্য-বিচার-বুদ্ধি, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, সুস্থ সচেতন সুতীক্ষ্ণ শিল্পরুচিবোধ নিয়ে সম্পাদনার ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন। প্রাণতোষ ঘটক তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে এক জন অত্যন্ত বলিষ্ঠ লেখক। কিন্তু সম্পাদক হিসাবে তিনি ইতিমধ্যে যে প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন তা অনন্যসাধারণ বললেও আদৌ অত্যুক্তি হয় না। "বসুমতী রজত জয়ন্তী সংখ্যার" মধ্যে তিনি আশ্চর্য্য সম্পাদনশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। শুধু এই রজত জয়ন্তী সংখ্যার জন্যেই তিনি স্থায়ী কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। এছাড়া এ-বছরের সমস্ত "শারদীয়া সংখ্যাগুলির" মধ্যে প্রাণতোষ ঘটক-সম্পাদিত "শারদীয়া বসুমতী" রচনা-সম্ভারে, শিল্প-সৌষ্ঠবে ও রূপ-পরিকল্পনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হয়েছে বলা চলে। এমন পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিসম্পন্ন পত্রিকা আর কোনটাই হয়নি। অনেক দিন পরে অবশ্য বিনয় ঘোষ "শারদীয় সংবাদ" পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন এবং এ-বছর যে-কেউ এই পত্রিকা দেখেছেন তিনিই স্বীকার করবেন, বলিষ্ঠ সম্পাদকীয়-প্রতিভা সাহিত্যপত্রের উৎকৃষ্টতার জন্য কতটা আবশ্যক। এছাড়া, "শারদীয় দেশ" পত্রিকার সম্পাদনার কথাও উল্লেখ করা উচিত। রচনা সংকলনে "দেশ" পত্রিকার কোন অভিনবত্ব না থাকলেও, সম্পাদনায় ও রূপসজ্জায় যথেষ্ট রুচিবোধের পরিচয় আছে।

এ-বছরের শারদীয়া সংখ্যাগুলির মধ্যে রচনায় ও রূপসজ্জায় নিকৃষ্ট স্তরের নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করতে হয় "পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা" ও "স্বরাজ" পত্রিকার। গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকার মধ্যেও বোধ হয় এর চেয়ে পঠিতব্য ও দ্রষ্টব্য বিষয় অনেক বেশী আছে। গতানুগতিকতার অন্যতম দৃষ্টান্ত হ'ল "আনন্দবাজার পত্রিকা" ও "যুগান্তর" শারদীয়া সংখ্যা—এঁরা দু'জনেই আজ-কাল শুধু পুরনো নামের জোরে আর স্থূলদেহের ওজনে বাজারে বিকোচ্ছেন।

নতুন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকার মধ্যে অনেকগুলির সম্পাদনা সত্যই প্রশংসনীয়। তার মধ্যে বিশেষত্বের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল—"দ্বন্দ্ব", "মধ্যবিত্ত", "অগ্রণী" ও "সাহিত্যপত্র"। এঁদের পুঁজিপাটা বেশী নেই, বাহুল্য বা বাহ্যাড়ম্বরও নেই, কিন্তু প্রত্যেকেই স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। এঁদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আমরা আরও অনেক কিছু আশা করব। নিরাভরণ বেশে সুসমৃদ্ধ সাহিত্য-পরিবেশনের গৌরবময় ঐতিহ্য "মাসিক বসুমতী", "শনিবারের চিঠি", "বিশ্বভারতী পত্রিকা" ও "পরিচয়" আজও যে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন—এটাও আজকের দিনে কম আশার কথা নয়।

পত্রিকার রূপসজ্জা

পত্রিকার রূপসজ্জা ও রূপ-পরিকল্পনার সার্থকতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পত্রিকা-সম্পাদকের শিল্পবোধের উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে কোন সাহিত্য-পত্রিকার শিল্প-সম্পাদক (Art Editor) ব'লে কিছু নেই, তাই আজও সমস্ত দায়িত্বটা প্রায় সম্পাদককেই বহন করতে হয়। কিন্তু সম্পাদকের শিল্পবোধ থাকলেও, শিল্পী যদি শক্তিমান না হন, তাঁর যদি সাহিত্যবোধ না থাকে তাহ'লে সাহিত্য-পত্রিকার রূপসজ্জা কিছুতেই রুচিসম্মত করা সম্ভব নয়। এ-বছরের শারদীয় সংখ্যাগুলিকে যে-সব শিল্পী চিত্রিত করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েক জন অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিভাবান্ শিল্পীর পরিচয় আমরা পেয়েছি। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় গোপাল ঘোষ, মাখন দত্তগুপ্ত, সূর্য্য রায়, শৈল চক্রবর্ত্তী ও কালীকিঙ্করের। এবারের অনেক শারদীয়া সংখ্যা এঁদের তুলির ঐশ্বর্য্যে অনেক বেশী সমৃদ্ধ

এবারের শারদীয়া সাহিত্য, ১৩৫৫

হয়েছে সাহিত্য-রচনার তুলনায়। এছাড়া অক্ষরকলাও (Art of Lettering) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ-বছরে তরুণ শিল্পী খালেদ চৌধুরী ও বাণীকুমার অক্ষরকলায় তাঁদের প্রতিভার যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে যে-কেউ তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হবেন। ব্যঙ্গচিত্রে রেবতীভূষণের শক্তির পরিচয় এবার স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে এবং তাতে অন্ততঃ এইটুকু আশা করা যায় যে, "কাফি খাঁ" গুরুফে "পিসিয়েলের" একঘেয়েমি থেকে খানিকটা আমরা মুক্তি পাব।

সুসাহিত্যের অভাব

বাংলা সাহিত্যে যে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে মহামারীও দেখা দিয়েছে তা এ-বছরের শারদীয় সাহিত্য পড়লেই বেশ বোঝা যায়। মহামারীটা হ'ল রাজনৈতিক। এত দিন প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের মধ্যে একটা আদর্শগত দ্বন্দ্ব চলছিল, এবারে সেই দ্বন্দ্ব ও বিরোধটা অনেক বেশী তীব্র ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহামারীর মতো রাজনৈতিক ব্যাধি সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে। একথা অবশ্য বলছি না যে, রাজনীতি বর্জ্জন করতেই হবে সাহিত্যে। জীবনে যা বর্জ্জন করা যায় না তা সাহিত্যে কি ক'রে বর্জ্জন করা সম্ভব হবে? তবে ময়দানের লাঠালাঠি আর বক্তৃতা মঞ্চের হাত ছোড়াছুড়িটা যদি গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে অত্যন্ত বিসদৃশ ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে তাহ'লে তাকে সাহিত্য-মর্য্যাদা দিতে রুচিতে বাধে। এ-বছরের শারদীয়া সংখ্যায় যে তিনটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে "আনন্দবাজার পত্রিকায়" প্রকাশিত বনফুলের "মানদণ্ড" উপন্যাসখানি পড়লে এই উক্তির তাৎপর্য্য যে-কেউ উপলব্ধি করতে পারবেন। বনফুলের মতো এক জন প্রবীণ শক্তিশালী সাহিত্যিকের জানা উচিত ছিল যে, কথাসাহিত্যে সব সময় রাজনৈতিক বা দার্শনিক বিদ্যা জাহির করা যায় না, করা বুদ্ধিমানের কাজও নয়। তারাশঙ্করের "তিমির-তীর্থ" উপন্যাস ('স্বরাজ' পত্রিকায়) পড়লে মনে হয় তাঁর কিছু দিন বিশ্রাম নেবার সময় এসেছে। "অভিযান" পত্রিকায় তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম কিস্তি পড়লে তাঁর দৈহিক ও মানসিক অবসাদ সম্বন্ধে সন্দেহের আর কোন অবকাশই থাকে না। ভাল গায়ক যাঁরা, তাঁরা যেমন আসরে গান শুরু করতে জানেন, তেমনি শেষ করতেও জানেন। আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের এই বোধশক্তি নেই। সাহিত্যের আসর থেকে আজ অনেকেরই বিদায় নেবার সময় হয়েছে, কিন্তু তাঁদের সে হুঁশ নেই। উপন্যাসের মধ্যে অচিন্ত্যকুমারের "একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী" (শারদীয়া বসুমতী) সহজ সাবলীল ঝরঝরে রচনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য। উপন্যাস হিসাবে কোন অভিনবত্ব না থাকলেও অচিন্ত্যকুমারের রচনার মুন্সীয়ানার জন্যে উপন্যাসটি সুখপাঠ্য হয়েছে। ছোট গল্পের মধ্যে এ-বছর প্রেমেন্দ্র মিত্রের "আয়না" (পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ছোট বকুলপুরের যাত্রী" (শারদীয় সংবাদ) ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অনেক লিখেছেন, কোন পত্রিকাই বাদ দেননি এবং প্রাণে যা এসেছে তাই লিখেছেন। সাহিত্য-সৃষ্টির চেয়ে পয়সা কামাবার এবং সর্ব্বঘটে কাঁঠালি কলা সাজার একটা অদম্য প্রয়াসের প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর এই সাহিত্যাভিযান থেকে। কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক-নিষ্ঠা সম্বন্ধে আজ সন্দেহ জাগার অনেক কারণ ঘটেছে। নবেন্দু ঘোষের গল্প লেখা অনতিবিলম্বে ছাড়া উচিত, মনের দুঃখে গল্প না লিখেও আরও যে অনেক ভাল কাজ করা যায় এ-কথা তাঁর জানা উচিত। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য অনেক দিন পরে গল্প লিখতে আবার আরম্ভ করেছেন, কিন্তু তাঁর আগেকার ক্ষমতার বিশেষ কোন পরিচয় এবারে অন্ততঃ আমরা পাইনি। গল্পের চেয়ে এ-বছরের রসরচনাগুলি অনেক বেশী ভাল হয়েছে দেখা যায়। নন্দীভৃঙ্গীর রচনাগুলি (শারদীয়া বসুমতী, অরণি, যুগান্তর) অন্যান্য বছরের তুলনায় এ-বছর অনেক জোরালো হয়েছে। প্রমথনাথ বিশী, রমাপদ চৌধুরী ও আশাপূর্ণা দেবীর রস-রচনাও (শারদীয়া বসুমতী) বেশ ভাল হয়েছে। মারীচের "রামরাজ্য—সেকাল ও একাল" (শারদীয়া বসুমতী) উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গরচনা। এছাড়া বিনয় ঘোষের "বাবুপুরাণ" ("মধ্যবিত্ত" পত্রিকা) এবং মনী ভৌমিকের "কার্য্যকারণ" (শারদীয় সংবাদ) এ-বছরের শক্তিশালী ব্যঙ্গ-রচনা হিসাবে উল্লেখ করতে হয়। ব্যঙ্গকাব্যের মধ্যে বনফুলের "ভাবী মন্ত্রীর অবশ্যম্ভাবী বক্তৃতা" (শারদীয়া বসুমতী) এবং বিমলচন্দ্র ঘোষের "পঞ্চভূতের পাঁচালী" (শারদীয় সংবাদ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা।

কবিতা এ-বছর যা প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশই অপাঠ্য। বুদ্ধদেব বসু ও জীবনানন্দ দাশ (শারদীয়া বসুমতী) যে দু'-একটি কবিতা লিখেছেন তা রোমাণ্টিক ও মিষ্টিক হলেও ভাল কবিতা। বিষ্ণু দে এ-বছর এমন ভাবে বানচাল হয়ে গেলেন কেন? তরুণ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনেক দিন পরে এ-বছরে কয়েকটি কবিতা লিখেছেন এবং তাঁর প্রত্যেকটি কবিতা (শারদীয় সংবাদ, পরিচয়, অরণি, অগ্রণী) আশ্চর্য্য সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কবিতার ক্ষেত্রে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, গোপাল ভৌমিক প্রভৃতি কয়েক জনের এখনও অনধিকার প্রবেশ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত।

বাংলা দেশে কবি, ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখকদের মতো তথাকথিত "অরিজিন্যাল" ও "ক্রিয়েটিভ" লেখক প্রতিদিন ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠলেও, চিন্তাশীল শক্তিশালী প্রবন্ধ-লেখকের অভাব অত্যন্ত বেশী। এ-বছরের প্রবন্ধ-লেখকদের মধ্যে ডাঃ সুশীলকুমার দে (আনন্দবাজার পত্রিকা), ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী (বিশ্বভারতী পত্রিকা), গোপাল হালদার (পরিচয়) যোগেশচন্দ্র বাগল (শারদীয়া আনন্দবাজার) এবং বিনয় ঘোষের (শারদীয় সংবাদ ও অরণি) নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্রের "ভদ্রলোক মজুর" রচনাটিও (শারদীয় সংবাদ) সুরচিত ও সুচিন্তিত রচনা হিসাবে উল্লেখ করা উচিত।

১৩৫৫ সনের শারদীয় বাংলা সাহিত্যের এই হ'ল মোটামুটি খসড়া পরিচয়।

এ বছরের শারদীয়া বিজ্ঞাপন

শিল্পপ্রচারণী

বিজ্ঞাপন হ'ল মালিকের মালবিক্রীর প্রতিনিধি বা "সেল্‌সম্যান"। এ কথাটা বিজ্ঞাপনদাতারা, অর্থাৎ পণ্যের মালিকরা জেনেও জানেন না বলে মনে হয়। তা যদি জানতেন তাহ'লে বিজ্ঞাপনের মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁরা আরও অনেক বেশী সচেতন হতেন। মালিকরা যখন তাঁদের জিনিসের কাটতির জন্যে কোন "সেল্‌সম্যান" নিযুক্ত করেন তখন নিশ্চয়ই যাকে-তাকে করেন না। মনে করুন, প্রসাধনের সামগ্রী বাজারে চালু করার জন্যে যদি কেউ "সেল্‌সম্যান" চান তাহ'লে এ্যাপ্লায়েড কেমিষ্ট্রীতে বিশেষজ্ঞ এক জন ভারিক্কি মেজাজের লোক সে কাজে বহাল করলে তাঁকে আফশোস করতে হবে। কারণ কেমিষ্ট্রীতে পাণ্ডিত্য প্রসাধন দ্রব্যের সেল্‌সম্যানের অন্যতম গুণ হিসেবে গণ্য না করলেও চলে। সেল্‌সম্যান যিনি হবেন তাঁর সর্বপ্রথম "স্মার্ট" হওয়া দরকার, কুণ্ঠা ও জড়তার ভাব যদি তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে তাহ'লে তিনি এ কাজের যোগ্য ব্যক্তি কিছুতেই হতে পারবেন না। স্মার্ট তাঁকে হতেই হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে অতিরিক্ত স্মার্ট হ'লে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ স্মার্ট সেল্‌সম্যান বলতে ফাজিল-ফক্কোড় বাচাল সেল্‌সম্যান বুঝায় না। কোন্ ব্যক্তির কাছে কি কথা বলতে হবে, কতটা কথা বলতে হবে এবং কি ভাবে বলতে হবে, সেটা স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা ক'রে যিনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় কার্যক্ষেত্রে দিতে পারেন, তিনিই সার্থক সেল্‌সম্যান হতে পারেন। এ ছাড়া, সেল্‌সম্যানের পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে আরম্ভ করে আচার ব্যবহার স্বভাব পর্যন্ত যদি সাধারণ মানুষের মনের মতন না হয় তাহ'লে যে তাঁর দ্বারা কোন কাজই হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। পোশাক-পরিচ্ছদ যত দূর সম্ভব রুচিসম্মত ও পরিচ্ছন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়, আচার-ব্যবহার ও স্বভাবের মধ্যে শিষ্টতা, মিষ্টতা ও শালীনতাবোধ বেশী পরিমাণে থাকাই কাম্য। পোশাক-পরিচ্ছদে বা ব্যবহারের মধ্যে যদি উগ্রতা বা কষ্ট-কল্পিত উদ্ভটত্ব প্রকাশ পায় তাহ'লে কোন জিনিস সম্বন্ধে লেকচার শোনার আগেই যে কোন সুস্থ লোকের হাড়-পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে উঠবে সেই সেল্‌সম্যানকে দেখে। অনেকে বলবেন, তাহ'লে তো "তানসেন গুলি" বা "আশ্চর্য্য মলম" চলতি ট্রেনে একেবারেই বিক্রী হ'ত না এবং পাড়ায় পাড়ায় ঘুঙুরপরা ক্লাউনবেশী চোঙাফোঁকা নকুলদানা বিক্রেতাকে দেখেও ছেলেপিলের ভীড় জমত না। এ কথার উত্তর হ'ল, তানসেন গুলি বা নকুলদানা যারা এই ভাবে বিক্রী করে তারা জানে জিনিষের বস্তুটা তাদের কি রকম, এবং তাতে তাদের পেট চলাও দায় হয়। যে জিনিসের কোন রকম বাজারী চাহিদা হবার কোন সম্ভাবনা নেই তাকে কিছুটা চালিয়ে নিজের পেটটা চালু রাখার জন্যেই এই শ্রেণীর ক্লাউন-সেল্‌সম্যানের আবির্ভাব। লোকে চারটে পয়সা দিয়ে একটা আশ্চর্য্য মলম কেনে, মলমের আশ্চর্য্য গুণের জন্যেও নয়, অথবা বিক্রেতার আশ্চর্য্য প্রচার-পটুতার জন্যেও নয়, পেটের দায়ে মানুষ যে সার্কাসের ক্লাউনও হ'তে পারে তারই প্রত্যক্ষ পরিচয়ে আশ্চর্য্য হয়ে। কলকাতায় যাঁরা থাকেন তাঁরা কলেজ ষ্ট্রীট অঞ্চলের "Help me, Sir!" ব্যক্তিটিকে নিশ্চয়ই এক-আধ বার দেখেছেন। কত দিন আমি নিজের চোখে দেখেছি, লোকে পয়সা দিয়ে তার কাছ থেকে পান কিনে দূরে ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে। ট্রেনের আশ্চর্য্য মলম থেকে কলেজ ষ্ট্রীটের দু'খিলি পান পর্যন্ত এই "Help me, Sir" ব্যাপার, "Salesmanship" নয়। পণ্যের মালিক যদি মনে করেন যে ক্রেতাদের কাছে তাঁর পণ্য-প্রচারের অর্থ হ'ল "Help me, Sir" আবেদন, তাহ'লে বলার কিছু নেই। কিন্তু সেল্‌সম্যানশিপ নিশ্চয়ই তা নয়, এবং সেল্‌সম্যানকেও তাই কিছুতেই "ক্লাউন" ভাবতে পারা যায় না।

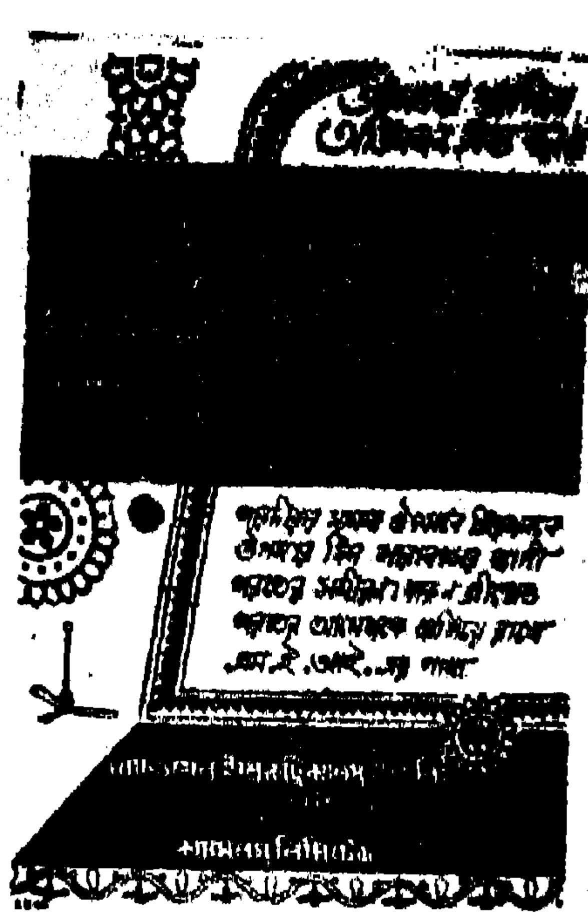

ক্যাসেলস্ লিঃ

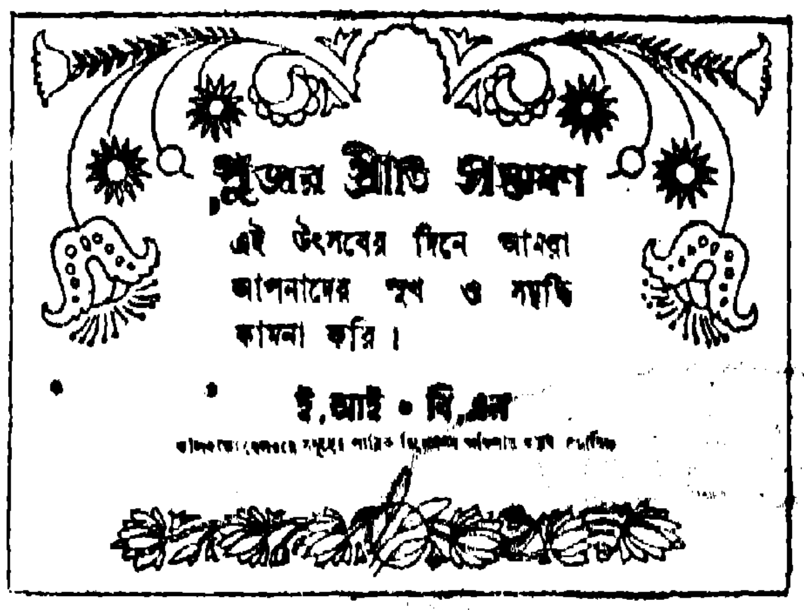

ই আই—বি, এন

বিজ্ঞাপনটা হ'ল মালিকের সেল্‌সম্যান, এবং ভাল বিজ্ঞাপনেরও ভাল সেল্‌সম্যানের প্রত্যেকটি গুণ থাকা দরকার। ভাল 'বিজ্ঞাপন' প্রথমত "স্মার্ট" বা "এ্যাট্রাকটিভ" হবে, যত দূর সম্ভব ভদ্র, শিষ্ট ও সুরুচিসম্মত হবে, কোন রকম উগ্রতা বা "ওভার স্মার্টনেস্" তার মধ্যে থাকবে না। [illegible] ভাল সেল্‌সম্যানের পোশাক ও চেহারা যেমন মনোরম হওয়া বাঞ্ছনীয়, তেমনি ভাল বিজ্ঞাপনের বহিরঙ্গসজ্জা দৃষ্টিপ্রিয় হওয়া একান্ত কাম্য। তাই বিজ্ঞাপন-কলা সম্বন্ধে এক জন বিশেষজ্ঞ বলেছেন: "The Advertisement is the manufactuer's Salesman, and its physical dress should be in keeping with the presentability he could expect of his representative."—(Frank H. Young, Director, American-Academy of Art).

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

পুজোর বাংলা বিজ্ঞাপন

এ বছরে পূজোর বাংলা বিজ্ঞাপনগুলি দেখলে এ কথা সবার আগে মনে পড়ে। "বিজ্ঞাপনটা" যে তাঁদের "সেলস্‌ম্যান", এ-সম্বন্ধে অধিকাংশ বিজ্ঞাপনদাতাই সচেতন নন। অথচ তাঁরা যথেষ্ট পয়সা খরচ করেছেন এবং করেন। তবু এই চেতনাটুকু না থাকার দরুণ তাঁদের অর্থের অপচয় হয়েছে বললেও ভুল হয় না। কোন পত্রিকার পৃষ্ঠাতে এ কথা বলা হ'চ্ছে দেখে অনেকে হয়ত বিস্মিত হবেন, কারণ তাঁদের ধারণা যে "বিজ্ঞাপন" যত দৃষ্টিকটুই হ'ক না কেন তা নিয়ে সমালোচনা করা ঠিক নয়, যেহেতু বিজ্ঞাপনদাতারা পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক এবং পত্রিকার মালিককে পয়সা দেন। কিন্তু আমাদের ধারণা ঠিক উল্টো। বিজ্ঞাপনদাতারা পত্রিকার মালিকের পৃষ্ঠপোষক বলেই প্রত্যেক পত্রিকার এটা প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত বিজ্ঞাপনের সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করা। আমাদের দেশে, অত্যন্ত দুঃখের কথা, আজও এই আলোচনার রীতি প্রচলিত হয়নি। ইউরোপে ও আমেরিকায় এটা অত্যন্ত বেশী প্রচলিত। ও-সব দেশের যে-কোন উচ্চ শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত পত্রিকার মালিকেরা নিজেদের একটা "প্রচার-বিভাগ" বা "ষ্টুডিও" রাখেন। বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপনের "কপি" বা "ব্লক" পাঠালে সোজা সেটাকে প্রেসে ছাপতে দেওয়া হয় না। পত্রিকার প্রচার-বিভাগ থেকে সেটাকে পরীক্ষা করে দেখা হয়, সামান্য অদল-বদল ক'রে যদি কোন "কপি" আরও সুন্দর ও সার্থক করা যায় তাও তাঁরা ক'রে দেন অথবা "সাজেশান" দিয়ে আবার বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে পাঠিয়ে দেন, তার পর সেটা ছাপা হয়। বিজ্ঞাপন-দাতাদের কাছ থেকে কোন রকমে পয়সা মারা যাঁদের উদ্দেশ্য তাঁরা এ-কাজ করার প্রয়োজন বোধ না করতেও পারেন। কিন্তু যাঁরা মনে করেন যে বিজ্ঞাপনদাতারা যে হেতু পয়সা দেন, সেই জন্য তাঁদেরও দেখা উচিত যাতে বিজ্ঞাপনদাতারাও দু'টো পয়সা পান, তাঁরা 'বিজ্ঞাপন' নিয়ে আলোচনা করবেনই। যে হাঁস ডিম পাড়ে তাকে একেবারে খেয়ে ফেলার ব্যবস্থা না করে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা উচিত নয় কি? অবশ্য এ কথা ঠিক যে আজকাল অনেক "পাবলিসিটি ষ্টুডিও" হয়েছে, তাঁরাই বিজ্ঞাপনদাতাদের সমস্ত কাজকর্ম্ম করেন। কিন্তু সমস্ত পাবলিসিটি ষ্টুডিও একই স্তরের নয়, সকলেরই সুদক্ষ শক্তিশালী শিল্পী বা "লে-আউট"-বিশেষজ্ঞ নেই, সুতরাং তাঁদের সমালোচনা করাটাও অন্যায় নয়। তাছাড়া, এমন হাজার হাজার মধ্য শ্রেণীর এবং ছোট ব্যবসাদার আছেন যাঁরা পাবলিসিটি ষ্টুডিওর দ্বারস্থ হতে পারেন না, অথবা উপযুক্ত বেতন দিয়ে পাবলিসিটি অফিসারও রাখতে পারেন না, নিজেরাই কোন রকমে কপি তৈরী করে পাঠিয়ে দেন। এ কথা সব সময় মনে রাখা উচিত যে, ব্যবসাক্ষেত্রে এঁদের সংখ্যাই বেশী এবং পত্রিকার "বিজ্ঞাপনের আয়" এঁদের কাছ থেকে অল্প অল্প ক'রে নিয়ে সব চেয়ে বেশী পরিমাণে সংগৃহীত হয়, অথচ এঁরাই অবহেলিত হন অত্যন্ত বেশী। এঁদের জন্য প্রধানতঃ বিলেত ও আমেরিকার প্রত্যেক ভাল পত্রিকার নিজের ষ্টুডিও বা "আর্ট এডিটার" থাকে। আমাদের দেশে এ-সম্বন্ধে পত্রিকা-পরিচালকেরা কবে সচেতন হবেন? অনেক ছোট-মাঝারি বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রায়ই অভিযোগ করতে শোনা যায় যে যথেষ্ট জনপ্রিয় পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিয়েও তাঁরা তেমন "সাড়া" (Response) পান না। কারণটা অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, পত্রিকা জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের বিজ্ঞাপনটি যেহেতু "জনপ্রিয়" বা "দৃষ্টিপ্রিয়" হয় না, সেই জন্যই তা পাঠক-ক্রেতাদের নজরে পড়ে না এবং তাঁরা ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যান।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

সিকি পৃষ্ঠা ও আধ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন

মুশকিল হ'চ্ছে ছোট ও মাঝারি বিজ্ঞাপন-দাতাদের নিয়ে। অর্থাৎ যাঁরা সিকি পৃষ্ঠা, আধ পৃষ্ঠা, এক কলাম, আধ কলাম ইত্যাদি সাইজের বিজ্ঞাপন দেন তাঁদের সমস্যাটাই সবচেয়ে জটিল। এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপনদাতাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলব। একটা কোন "পত্রিকা" ধরেই আলোচনা করলে সুবিধা হয় এবং তার জন্যে এ বছরের "শারদীয়া বসুমতী" (১৩৫৫) বেছে নিচ্ছি। এর মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাঁরা অন্যান্য অধিকাংশ পত্রিকাতেও বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। এবং আকারেও যেহেতু "শারদীয়া বসুমতী" প্রামাণ্য পত্রিকা, সেই জন্য বিজ্ঞাপনের সাইজেরও বিশেষ কোন পার্থক্য কোথাও হবে ব'লে মনে হয় না। মোটামুটি সমস্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার ছোট বিজ্ঞাপন-দাতাদের সম্বন্ধে আলোচনা "শারদীয়া বসুমতীর" মারফতেই হবে ব'লে মনে হয়।

ছোট সাইজের বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্রিকা সম্বন্ধে বিশেষ হুঁশিয়ার থাকা প্রয়োজন। তাঁদের প্রথম মনে রাখা উচিত যে, একই পৃষ্ঠায় আরও অনেক বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তাঁর বিজ্ঞাপনও থাকবে। সিকি পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন যাঁরা দেবেন তাঁদের ভাবা উচিত যে চারটে সিকি পৃষ্ঠার, অথবা একটা আধপৃষ্ঠা আর দু'টো

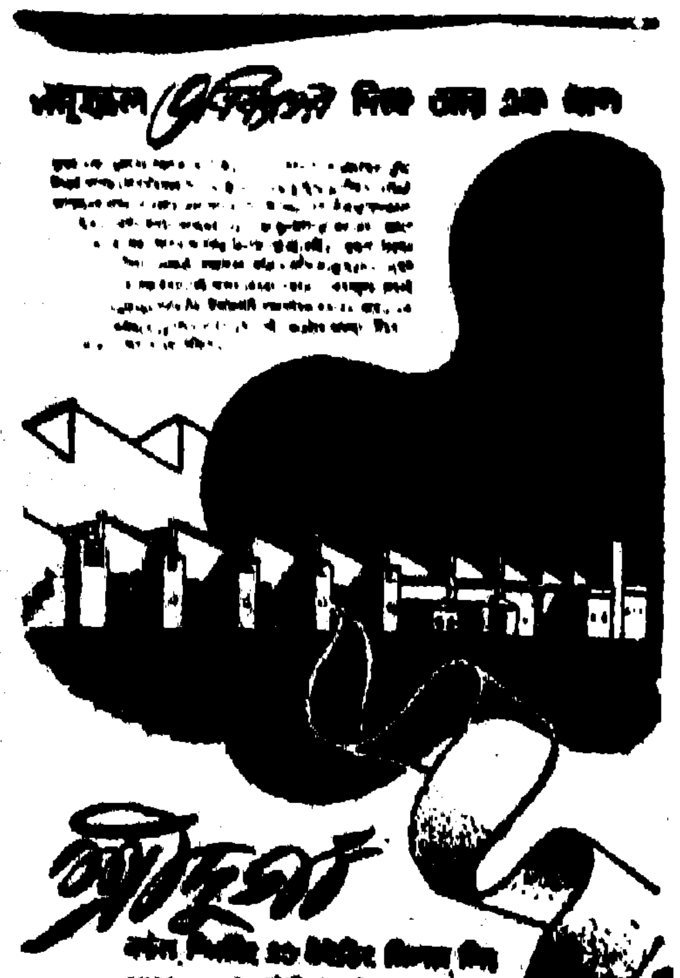

শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ

সিকি-পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন সাজিয়ে পূরো এক পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন ছাপা হবে। আধ পৃষ্ঠা, এক কলাম, আধ কলাম বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও তাই। পাঠ্য বস্তুর সঙ্গে যাঁরা একাই প্রকাশিত হতে চান তাঁদের সমস্যাও কম নয়। প্রথমতঃ, পাঠ্য বস্তু চারি দিক থেকে এসে ভীড় করবে, এবং তার সঙ্গে "illustration" বা ছবিও থাকতে পারে। সুতরাং পূরো এক পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন যাঁরা না দেবেন তাঁদের সকলেরই কম-বেশী একই সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে। সমস্যাটা হ'ল, অন্যান্য বিজ্ঞাপন এবং পাঠ্য-বস্তু ও চিত্র থেকে নিজের ছোট বিজ্ঞাপনটিকে "স্বতন্ত্র" (isolate) করা। ছোট বিজ্ঞাপনের এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সব চেয়ে বড় সমস্যা। এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে সবার আগে বিজ্ঞাপনের "জায়গা" (space) সম্বন্ধে চেতনা থাকা দরকার। সিকি পৃষ্ঠার বা আধ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনদাতারা তাঁদের সবটুকু জায়গা জুড়ে কপি তৈরী ক'রে যদি মনে করেন যে পত্রিকার কাছ থেকে বিজ্ঞাপন-মূল্য কড়ায়-গণ্ডায় আদায় ক'রে নিলেন, তাহ'লে মারাত্মক ভুল করবেন। বর্ডার বা রুল দিয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের সীমানা টেনে রাখতে পারেন, কেউ তার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করবে না। তার পর তার মধ্যে বিজ্ঞপ্তিটুকু যদি তাঁরা চারি দিকে খানিকটা "সাদা জায়গা" (white space) ছেড়ে দিয়ে সাজিয়ে দেন তা'হলে স্বচ্ছন্দে সেটা অন্যান্য বিজ্ঞাপনের গাত্রস্পর্শ না করেও একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এবং সহজেই পাঠক-ক্রেতার নজরে পড়তে পারে। তা না করে সকলেই জ্ঞাতব্য তথ্য আর পাঠ্য দিয়ে বা ব্লক দিয়ে যদি সমস্ত জায়গাটা জুড়ে থাকেন, তা'হলে ঠাসাঠাসি আর ভিড়ের চাপে সকলের ব্লক, পাঠ্য-বস্তু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, কারও কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না, ক্রেতাদের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয় না। ভিড়ের মধ্যে ব্যক্তির যেমন ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য থাকে না, তেমনি বিজ্ঞাপনেরও অস্তিত্ব থাকে না। এই "সাদা জায়গার" গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞাপনদাতা সচেতন নন, তাঁদের ধারণা যেটুকু জায়গা পাওয়া যায় তা জ্ঞাতব্য বিষয় দিয়ে আগাগোড়া ঠেসে দেওয়া উচিত। তাতে বিজ্ঞাপন একেবারে খোঁড়া হয়ে যায়। পত্রিকার মালিকরা এদিক্‌ দিয়ে বিশেষ কিছুই করতে পারে না, কারণ সমস্ত ছোট বিজ্ঞাপন কোন পত্রিকার পক্ষেই "স্বতন্ত্র" ভাবে ছাপা সম্ভবপর নয়। বেশী বা বিশেষ মূল্যের বিনিময়ে কয়েকটি হয়ত তাঁরা "স্বতন্ত্র" ছাপার ব্যবস্থা করতে পারেন, তাও সেখানে আবার পত্রিকার পাঠ্য বস্তু ছবি ইত্যাদির সমস্যা রয়েছে। সুতরাং ছোট বিজ্ঞপন মাত্রই চারি দিকে পরিমিত "সাদা জায়গা" ছেড়ে দিয়ে "স্বতন্ত্র" করার ব্যবস্থা করা উচিত। এই সাধারণ নিয়মটির অসাধারণ গুরুত্ব সম্বন্ধে ছোট বিজ্ঞাপনদাতাদের অত্যন্ত সচেতন থাকা দরকার। "সাদা জায়গা" ছাড়া সম্বন্ধেও কয়েকটি নিয়ম আছে যা জানা উচিত। বিজ্ঞাপনের দু'টো পাশে (side) সমান জায়গা থাকবে, আর মাথার উপরে (top) যতটা জায়গা ছাড়া হবে, নীচের দিকে (bottom) অন্ততঃ তার দেড় গুণ জায়গা অবশ্যই ছাড়া দরকার। তা না হ'লে বিজ্ঞাপন "তলা-ভারি" (Bottom-heavy) হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, এবং সেটা সাধারণতঃ অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। এইটুকু মনে রাখলেই অনেক কাজ হয় এবং ছোট বিজ্ঞাপনদাতারা অনেক বেশী উপকৃতও হতে পারেন।

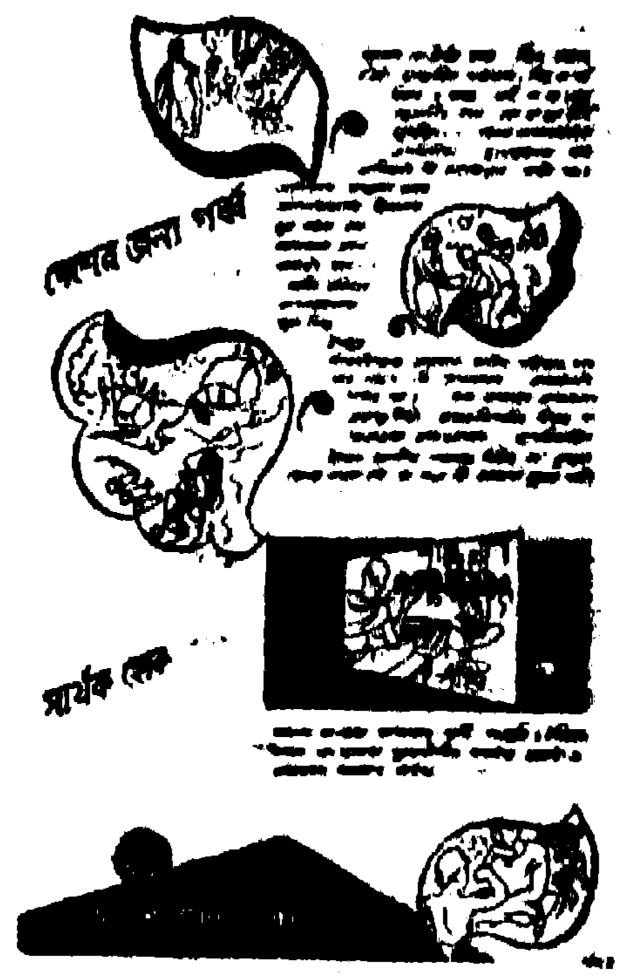

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ

"শারদীয়া বসুমতীর" ছোট বিজ্ঞাপনদাতারা সকলে এ-নিয়ম পালন করেননি ব'লে তাঁদের বিজ্ঞাপন যতটা সার্থক (effective) হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। প্রথমতঃ সূচীপত্রের তলায় যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাঁদের অনেকেই লক্ষ্য করলেই এটা বুঝতে পারবেন। "শারদীয়া বসুমতীর" ১২২ পৃষ্ঠার যে চারটি সিকি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন আছে তার প্রত্যেকটি অতিরিক্ত বক্তব্যের ভারে নড়া-চড়ার শক্তি তো হারিয়ে ফেলেছেই, স্বতন্ত্র সত্তা পর্য্যন্ত তাদের হারিয়ে গেছে। কুকার ইন্‌সিওরেন্স যন্ত্রপাতি সব একাকার হয়ে গেছে। অথচ বক্তব্য একটু অল্প ক'রে চারি দিকে খানিকটা "সাদা জায়গা' ছেড়ে দিলে, চারটে কেন আটটা বিজ্ঞাপন এক পৃষ্ঠায় সাজিয়ে দিলেও ক্ষতি হত না। ১২৪ পৃষ্ঠায় যে দু'টি সিকি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন আছে তাতে এই নিয়ম মোটামুটি রক্ষা করা হয়েছে ব'লে তা অনেক বেশী সার্থক হয়েছে। ১৩২ পৃষ্ঠার ও ১৩৩ পৃষ্ঠার "ডবল কলাম" বিজ্ঞাপন দু'টিও এই কারণে সার্থক হয়েছে অনেক বেশী। ছোট বিজ্ঞাপনদাতাদের তাই "সাদা জায়গা" সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী সচেতন থাকা দরকার। সেই জন্যই পত্রিকার বিজ্ঞাপনে "সাদা জায়গার" গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত শিল্পী যে মন্তব্য করেছেন তা প্রত্যেক বিজ্ঞাপনদাতার ও প্রচারশিল্পীর মনে রাখা উচিত। "সাদা জায়গা" সম্বন্ধে মিঃ ইয়ং বলেছেন :

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স

"For attentive value, white space is as powerful as solid black. The layout man should realise that white space is one of the most valuable materials with which he has to work, and perhaps no one has so many uses."

এম, এল বসু এণ্ড কোং লিঃ

'শারদীয়া বসুমতীর' ছোট বিজ্ঞাপনের মধ্যে লে-আউট ও পরিকল্পনার দিক্ থেকে উল্লেখযোগ্য হ'ল, "ই, আই ও বি, এন রেলওয়ে" "লিষ্টার এ্যান্টিসেপটিক্স্" ও "ক্যাসেলস্ লিঃ"। রেলওয়ের বিজ্ঞাপনটি আধ পৃষ্ঠার হলেও অল্প কথা এবং "সাদা জায়গা" থাকার জন্তে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছে। "লিষ্টারের" আধ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনটির পরিকল্পনা ভাল, কিন্তু আরও অনেক ভাল হ'ত যদি "পাঠ্য-বস্তুর" টাইপটা স্মল পাইকার এবং লোগোটাইপটা হস্তাক্ষরে আরও বোল্ড ক'রে দেওয়া হ'ত। "ক্যাসেলসের" বিজ্ঞাপনটিতেও যথেষ্ট সুরুচির পরিচয় আছে। উপর-নীচে আরও একটু "স্পেস্" নিয়ে রুল দিয়ে যদি বিজ্ঞাপনটি সাজানো হ'ত তাহ'লে বিজ্ঞাপনটা খুলত অনেক বেশী। এই জন্তই বলেছি যে ছোট বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের মোট "স্পেসের" দিকে লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞপ্তির বিষয় তৈরী করা উচিত।

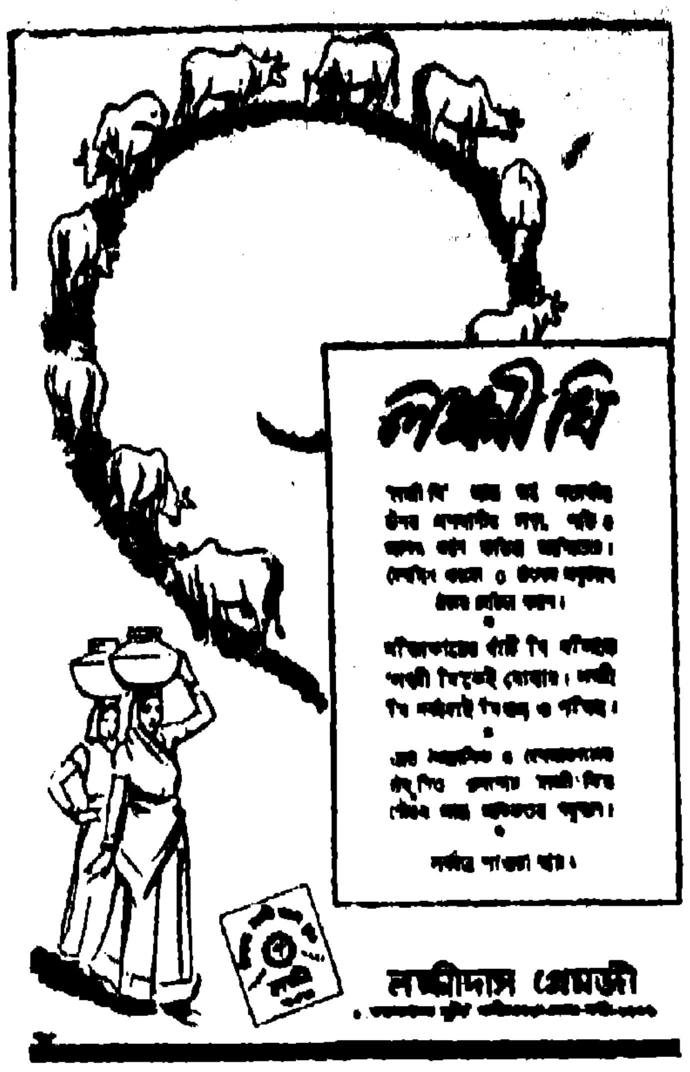

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

বড় "ফুলপেজ" বা পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন

পত্রিকাতে "ফুলপেজ" বিজ্ঞাপনের আঙ্গিক বিন্যাসের যেমন সুযোগ আছে তেমন আর কারও নেই। স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সমস্যা ফুলপেজীদের অনেক কম হলেও একেবারেই যে নেই তা নয়। পাশের পৃষ্ঠার পাঠ্য-বস্তু ও চিত্রের সমস্যা থেকেই যায়। তাছাড়া, ডান-বাঁর সমস্যাও আছে। ফুলপেজ বিজ্ঞাপনের আঙ্গিক বিন্যাস সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলা উচিত। পূরো এক পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনের যদি বক্তব্য বিষয় ঠেসে দেওয়া হয় তাহ'লে তা পাশের পৃষ্ঠার পত্রিকার পাঠ্য-বস্তুর সঙ্গে মিশে গিয়ে তার বিশিষ্টতা সহজেই হারিয়ে ফেলতে পারে। সুতরাং এখানেও সেই চারি দিকে পরিমিত "সাদা জায়গা" ছাড়ার প্রশ্ন আসে। তাছাড়া, যদি ছবি পাঠ্য-বিষয় দিয়ে বিজ্ঞাপন তৈরী করা হয় তাহ'লে ডান দিক্ ও বাঁ দিকের পৃষ্ঠা সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত। বাঁ দিকে যাঁরা ফুলপেজ বিজ্ঞাপন দেবেন তাঁদের বিজ্ঞাপনের ছবি যদি থাকে সেটা বাঁ দিকে এবং ডান দিকের পৃষ্ঠায় যাঁরা দেবেন তাঁদের ডান দিকে থাকা বাঞ্ছনীয়, তাহ'লে পত্রিকার ছবির সঙ্গে কোন রকমে "clash" করার সম্ভাবনা থাকে না। এই কথা মনে রেখেই "লে-আউট"-শিল্পীর বিজ্ঞাপনের কপি তৈরী করা উচিত এবং কপি প্রেসে দেবার সময় বিশেষ নির্দ্দেশও দেওয়া দরকার। মোটামুটি এই নিয়ম মেনে বিজ্ঞাপনের ছবির সঙ্গে "Text", "Caption" ও "Logotype"এর যদি সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় তাহ'লে ফুলপেজ বিজ্ঞাপন বেশ সার্থক ও সুন্দর হতে পারে।

এ বছরের শারদীয়া "ফুলপেজ" বিজ্ঞাপন অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশী সুন্দর ও সার্থক হয়েছে ব'লে মনে হয়। আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনদাতারা ও প্রচারশিল্পীরা বিজ্ঞাপনের আঙ্গিক বিন্যাস সম্বন্ধে যে যথেষ্ট সজাগ হয়েছেন তা "শারদীয়া বসুমতীর" কয়েকটি ফুলপেজ বিজ্ঞাপনের নমুনা দেখলেই বোঝা যায়। প্রথমে চতুর্থ কভারের "লক্ষ্মী ঘির" বিজ্ঞাপনটি দেখলেই বোঝা যায় যে বিজ্ঞাপনের লে-আউটের কতটা উন্নতি হয়েছে। এছাড়া "শ্রীদুর্গা কটন মিল", "সি, কে, সেন", "হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর", "ওরিয়েণ্টাল মেটাল", "এম্, এল, বসু", "হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স", "রায় ব্রাদার্স" প্রভৃতি কয়েকটি বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে। শ্রীদুর্গা, সি, কে, সেন, হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর, হিন্দুস্থান, রায় ব্রাদার্স, ওরিয়েণ্টাল মেটাল ও এম, এল, বসু—প্রত্যেকটি বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনার মধ্যে এমন ভাবে সঙ্গতি রক্ষা করা হয়েছে যা সচরাচর বাংলা বিজ্ঞাপনে হয় না। প্রত্যেকটি বিজ্ঞাপনই ডান দিকের পৃষ্ঠার বিশেষ উপযোগী এবং শারদীয়া বসুমতীতে ডান দিকেই ছাপা হয়েছে। কেবল "শ্রীদুর্গা কটন মিলে"র বিজ্ঞাপনটি যদি আকারে চারি দিকে আর আধ ইঞ্চি আন্দাজ ছোট হত তাহলে আরও অনেক বেশী effective হত বলে মনে হয়। আবার তাই বলছি, প্রত্যেক বিজ্ঞাপনদাতার ও প্রচারশিল্পীর "white space" সম্বন্ধে আরও অনেক বেশী সজাগ হওয়া দরকার। "সাদা জায়গা"র সদ্ব্যবহার যদি বিজ্ঞাপনের চারি দিকে ঠিক প্রয়োজন মতন করা যায় তাহ'লে সেটা "ফ্লাডলাইটের" কাজ করে, সমস্ত বিজ্ঞাপনটা তারই গুণে আলোকিত হয়ে ঝলমল করে চোখের সামনে। এ কথাটা সবার আগে সব সময় মনে রাখা উচিত। *

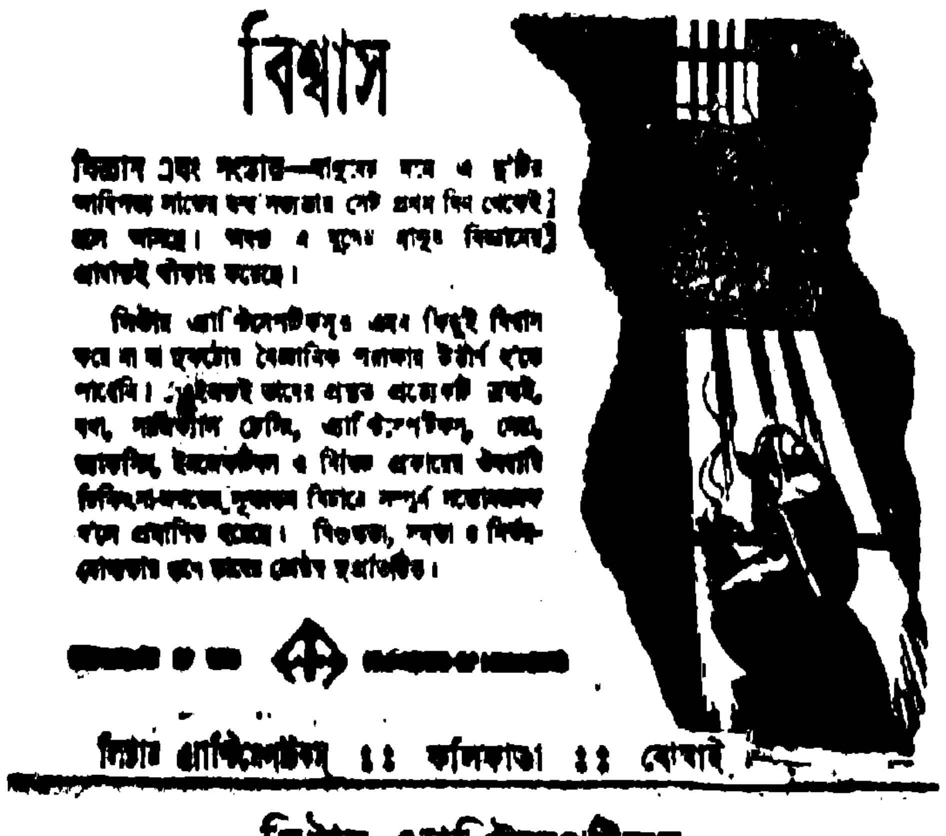

লিষ্টার এ্যান্টিসেপটিকস

* এই প্রবন্ধে বিজ্ঞাপনের ক্ষুদ্রাকার প্রতিলিপি ব্যবহার করার জন্য মেসার্স ডি, জে, কেমার এণ্ড কোং লিঃ, ক্যালকাটা পাবলিসিটি সার্ভিস, নিউ ইণ্ডিয়া পাবলিসিটি, প্রিমিয়ার পাবলিসিটি সার্ভিস, ভারতী পাবলিসিটি সার্ভিস, সার্ভিস এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সী, লাকি এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সী, অ্যালকা এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সী, মীনা পাবলিসিটি, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স ও কলিকাতা রেলওয়ে সমূহের পাবলিক রিলেসনস অফিসের সৌজন্য স্বীকার করি।

পত্রগুচ্ছ

নেপোলিয়ানের চিঠি

[ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজয়ের পর নেপোলিয়ান ফ্রান্সের সিংহাসন ত্যাগ করেন। দেশবাসীর অকৃত্রিম ভালবাসা ও পূর্ণ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও কয়েক জন সহকর্মীর হীন ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁকে এই পরাজয় মেনে নিতে হয়েছিল। এর পর তিনি বৃটিশ আইনের ছায়াতলে আশ্রয়ের আশায় স্বেচ্ছায় ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। বৃটিশ শাসকবৃন্দের মিথ্যা আশ্বাসে প্রলুব্ধ হয়ে নেপোলিয়ান 'বেলোরো ফোন' নামক জাহাজে পদার্পণ করা মাত্রই বন্দী হন এবং সেই অবস্থাতেই তাঁকে 'সেন্ট হেলেনা'তে প্রেরণ করা হয়। নেপোলিয়ান বৃটিশ-প্রজা ছিলেন না এবং ইংলণ্ডের আইনভুক্ত এলাকাতেও নেপোলিয়ান কর্তৃক কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়নি। কাজেই ইংরেজের আইন তাঁর ক্ষেত্রে প্রযুজ্য ছিল না। ইংলণ্ডের জনসমাজ ও সংবাদপত্র তখন এই হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সুরু করে। এই রকম অবস্থায় সুবিচারের আশায় এক জন ইংরেজ আইনজ্ঞের উপদেশে সম্রাট নেপোলিয়ান বৃটিশ সরকারকে এই তেজোদৃপ্ত চিঠিখানি পাঠিয়েছিলেন।]

১

আমার প্রতি যে অন্যায় করা হইয়াছে এবং আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়া আমার পবিত্রতম অধিকারে যে-ভাবে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, ঈশ্বর ও মানবতার নামে আমি তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। আমি স্বেচ্ছায় 'বেলোরো ফোনে' আসিয়াছি। আমি বন্দী নই—আমি ইংলণ্ডের রাজ-অতিথি। জাহাজের ক্যাপ্টেনের প্রস্তাবক্রমেই আমি এ স্থানে আসিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, আমাকে এবং আমার ইচ্ছা হইলে আমার অনুচরবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আদিষ্ট হইয়াছেন। ইংলণ্ডের আইনের ছায়াতলে আশ্রয় লইবার মানসে আমি পূর্ণবিশ্বাসে অগ্রসর হইয়াছিলাম। 'বেলোরো ফোনে' পদার্পণ করা মাত্রই বৃটিশ জাতির আতিথ্য পাইবার অধিকারী আমি। যদি সরকার 'বেলোরো ফোনের' ক্যাপ্টেনকে আমাকে স্বাগতম্ জানাইবার অধিকার দিয়া শুধু একটি ষড়যন্ত্রের জাল পাতিবার সংকল্প করিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিব, ইহার দ্বারা জাহাজের সম্মান ক্ষুণ্ণ এবং বৃটিশের জাতীয় পতাকার অবমাননা করা হইয়াছে মাত্র। যদি এই অন্যায় চরমরূপে প্রকটিত করা হয় তাহা হইলে ইংরেজ জাতি ভবিষ্যতে স্বাধীনতা, ধর্মাধিকরণ ও সততার মিথ্যা বড়াই করিবে। 'বেলোরো ফোনের' এই আতিথেয়তায় বৃটিশ জাতির বিশ্বাসের মর্য্যাদা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইবে। আমি পৃথিবীর ইতিহাসের নামে আবেদন করিতেছি। ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে—যে-শত্রু দীর্ঘ কুড়ি বৎসর বৃটিশ জাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছে, ভাগ্য-বিপর্যয়ের দিনে স্বেচ্ছায় সে তাহাদের আইনের ছায়াতলে আশ্রয় যাচ্ঞা করিয়াছে। তাহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ইহার চেয়ে এত-বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে? কিন্তু ইংলণ্ড এই মহানুভবতার কি ভাবে উত্তর দিল? শত্রুর নিকট আতিথ্যের হস্ত প্রসারিত করিবার ছল করা হইল এবং শত্রু পূর্ণবিশ্বাসে আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করার আয়োজন করা হইল।

নেপোলিয়ান।

সমুদ্রবক্ষে 'বেলেরো ফোন' জাহাজ, ৪ঠা আগষ্ট; ১৮১৫

[নেপোলিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যস্ততা, রণ-কোলাহল, কামানের গর্জন ও আহতের আর্ত্তনাদের মাঝখানে থেকেও প্রিয়তমা মহিষীর কথা মুহূর্তের জন্য বিস্মিত হতেন না। প্রায় প্রতিদিনই তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে নিয়মিত জোসেফিনকে চিঠি লিখতেন। অবশ্য চিঠিগুলি খুব সংক্ষিপ্ত হোত। কিন্তু এই চিঠিগুলি পড়লে দেখা যায়, নেপোলিয়নের অতুল শৌর্য-বীর্য অপেক্ষা তাঁর স্নেহ-মমতা প্রেম প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিগুলিও কোন অংশেই কম প্রবল ছিল না। * * *

নেপোলিয়ান তখন পোল্যাণ্ডে। পোল্যাণ্ডের উষর প্রদেশেও স্বামিস্ত্রীর মান-অভিমানের পালা চলেছে। প্রত্যহ, নেপোলিয়ান জোসেফিনকে দু'খানি করে পত্র লেখেন।]

পোসেন, ৩রা ডিসেম্বর, ১৮০৬, মধ্যাহ্ন।

তোমার ২৬শে তারিখের চিঠি পেয়েছি। চিঠিতে দু'টো জিনিষ লক্ষ্য করলাম। তুমি লিখেছ, আমি তোমার চিঠি পড়ি না। এ রকম কল্পনা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। এ রকম অন্যায় ধারণার জন্য আমি তোমার প্রশংসা করতে পারি না। তুমি আরো লিখেছ, এই অবহেলা অন্য কারুর মূর্তি-ধ্যানের ফল। তবুও তুমি বলতে চাও তুমি আমার প্রতি একটুও সন্দিহান নও। আমি বহু দিন ধরে লক্ষ্য করে আসছি—যে রাগ করেছে সেই 'আমি রাগিনি' বলে সবাইকে বোঝাতে চায়, ভয় পেয়েছে যে সেই বলে—'কই, ভয় পাইনি ত।' কাজেই আমার প্রতি তোমার সন্দেহ ধরা পড়ে গেছে। আমি খুশী হয়েছি এতে। কিন্তু এ ব্যাপারে তোমার মস্ত ভুল হয়েছে। ঐটি ছাড়া আর সব কথাই আমি ভাবি। পোল্যাণ্ডের মরু-প্রান্তরে

সুন্দরীর স্বপ্ন দেখার সুযোগ কমই মেলে। এখানকার অভিজাতদের জন্য কাল একটি নাচের ব্যবস্থা করেছিলাম। অনেক রূপসীর সমাগমও হয়েছিল। কেউ কেউ খুব জমকাল সাজগোজ করে এসেছিল—কেউ বা অতি সাধারণ ধরণের। তবুও প্যারিসের ফ্যাশান ত বটে। বিদায় প্রিয়ে। ভাল আছি।

একান্ত তোমারই

নেপোলিয়ন

২

পোসেন, ৩রা ডিসেম্বর ৬ পি. এম্।

২৭শে নভেম্বরের চিঠি পেয়েছি। চিঠি পড়ে এইটুকু বুঝলাম যে তোমার মুণ্ডুটি বিলকুল ঘুরে গেছে। কবিবাক্য মনে পড়ে—

রমণীর প্রেম—জলন্ত পাবক-শিখা

শান্ত হও দেবি। তোমায় ত লিখেছি, আমি পোল্যাণ্ডে আছি এবং আমাদের শীতাবাস স্থাপিত হওয়া মাত্রই তোমাকে নিয়ে আসব এখানে। আরো কয়েক দিন অপেক্ষা করতেই হবে। যত বড় হওয়া যায় ততই কাজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। তোমার চিঠির উত্তাপে এটুকুও প্রমাণিত হোল যে, তোমরা সুন্দরীরা 'কোন বাধা নাহি মান'। আমার কথা বল যদি, আমি ত ক্রীতদাস মাত্র। আমার মনিবের আমার প্রতি একটুও দয়া নেই। কাজই আমার মনিব। বিদায় প্রিয়ে। সুখী হও। যাঁর কথা বলতে চেয়েছিলাম তিনি মাদাম ল—। সবাই তিরস্কার করছে তাঁকে। আমার মতে মহিলাটি বড্ড প্রগল্‌ভা। তাঁর কথাবার্তা ভারী অসঙ্গতিপূর্ণ।

একান্ত তোমারই

নেপোলিয়ান।

তারিখ না দিয়ে নেপোলিয়ান এই চিঠিখানি লিখেছিলেন জোসেফিনকে। বীর নেপোলিয়ান কি ভাবে অভিমানিনী পত্নীর মানভঞ্জন করতেন এটি তার একটি চমৎকার নিদর্শন।

৩

প্রিয়ে। তোমার ২০শে জানুয়ারী তারিখের চিঠি পড়ে মনে বড় ব্যথা পেয়েছি। এ বড়ই দুঃখের। হৃদয়ে আত্মত্যাগের অনুভূতি না থাকলে কি যে বিপদ হয় তাই দেখছি। তুমি বল, তোমার সুখই তোমার গৌরব। এ ত উদারতার লক্ষণ নয়। বলা উচিত, অন্যের সুখেই আমার গৌরব। এ-ও দাম্পত্য বিধিমত হোল না। তবে বল, আমার স্বামীর সুখেই আমার গৌরব। কিন্তু তা-ও আবার মাতৃসুলভ হোল না। বলতে হবে, আমার সন্তানের সুখেই আমি গৌরবান্বিতা। কিন্তু অন্যেরা, তোমার স্বামী, তোমার সন্তানেরা একটু গৌরব ছাড়া যদি সুখ না পায়, ছি-ছি করো না। সে খুব লোভের হবে। জোসেফিন, তোমার হৃদয় বড় সুন্দর কিন্তু তোমার যুক্তি সারবান্ নয়। তোমার অনুভূতির প্রশংসা করি কিন্তু তোমার চিন্তার শৃংখলার অভাব আছে।

যাক্। ছিদ্র অন্বেষণ এই পর্যন্ত। মন প্রফুল্ল রাখো—ভাগ্যে যা ঘটে তাই নিয়ে খুশী থাকতে হবে। তবে শোকার্ত হৃদয়ে চোখের জলে অদৃষ্টকে মেনে নিও না—প্রফুল্ল হৃদয়ে, কিছুটা সন্তোষের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে ভাগ্যের সঙ্গে। আজ রাত্রেই অগ্রগামী সৈন্যদলের সঙ্গে ছুটতে হবে।

নেপোলিয়ান।

জোসেফিনের চিঠি

[অষ্ট্রিয়ার রাজপুত্রীকে সাম্রাজ্ঞী হিসেবে গ্রহণ করায় জোসেফিনকে তাঁর এত দিনের সম্মানিত আসন থেকে চিরবিদায় নিতে হোল। জোসেফিন এই ভাগ্য-বিপর্যয়কে অতি শান্ত ভাবে গ্রহণ করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ান নববধূকে নিয়ে প্যারিসে ফিরে আসার তিন সপ্তাহের মধ্যেই তিনি নেপোলিয়ানকে যে মর্মস্পর্শী চিঠিখানা লিখেছিলেন তাতেই তাঁর শোকার্ত হৃদয়ের বেদনা অতি স্বচ্ছ ভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।]

নেভা, ১৯শে এপ্রিল, ১৮১০

১

মালমাইসনে ফিরে আসবার সম্রাটের অনুমতি আমি পুত্র মারফৎ পেয়েছি। এই অনুগ্রহে আমার উৎকণ্ঠা, এমন কি আপনার দীর্ঘ নৈঃশব্দ্য যে শংকার ভাব এনেছিল মনে, বহুলাংশে তা অপসৃত হয়েছে। ভয় হয়েছিল আপনার স্মৃতির রাজ্য থেকে বুঝি আমার চির-নির্বাসন ঘটেছে। কাজেই আজ আর আমি তত দুঃখিত নই—এমন কি, এই অবস্থায় যতটুকু হওয়া সম্ভবপর ততটুকুই সুখী আমি। সম্রাটের কোন আপত্তি নেই যখন এই মাসের শেষেই মালমাইসনে ফিরে আসব। তবে এ-ও ঠিক যে, আমার আর আমার পার্শ্বচরদের স্বাস্থ্যের জন্য যদি নেভার বাড়ীর সংস্কারের প্রয়োজন না থাকত তাহলে সম্রাটের এই অনুমতিতে আশু বিশেষ উপকৃত হতাম না। মাত্র কিছু দিনের জন্যই আমি মালমাইসনে থাকব। তার পর আবার আমি সম্রাটের নিকট হতে দূরে—বহু দূরে চলে যাব। মালমাইসনে যখন থাকব, সম্রাট নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এমন ভাবে আমি বাস করব যেন প্যারিস থেকে শত-সহস্র যোজন দূরে আছি আমি। আমার পক্ষে এ বিরাট আত্মত্যাগ এবং যতই দিন যাচ্ছে এর অসীম গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করছি। যাই হোক, যেমন হওয়া উচিত তেমনিই হবে—এ আত্মত্যাগ হবে সম্পূর্ণ আমারই। আমার দুঃখে সম্রাটকে কখনও অসুখী হতে দেব না। নিরন্তর আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, সম্রাট সুখে থাকুন। এ বিষয়ে সম্রাটের যাতে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে তার জন্য আমি সম্রাটের নতুন অবস্থান্তরের প্রতি সর্বদা সম্মান দেখাব। নিঃশব্দেই হবে শ্রদ্ধার্ঘ্য অঞ্জলি। অতীতে আমার প্রতি সম্রাট যে ভালবাসা পোষণ করতেন তার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে এর আর নতুন কোন প্রমাণ আমি যাচ্‌ঞা করব না। সম্রাটের ন্যায়পরায়ণতা ও হৃদয়ের অনুশাসনের প্রতীক্ষায় দিন গুণব। একটি মাত্র অনুগ্রহ আমি ভিক্ষা করছি: সম্রাটের স্মৃতির রাজ্যে এখনও যে আমার একটুও স্থান আছে এবং বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার আজও যে আমি সেখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছি, মাঝে মাঝে আমার এবং আমায় ঘিরে যারা থাকে তাদের মনে এই বিশ্বাসটুকু উৎপাদনের জন্য সম্রাট যেন কৃপা করে একটা কিছু করেন। আমার জীবনের সব চেয়ে প্রিয়ধন—সম্রাটের সুখের কিঞ্চিৎ মাত্র অপচয় না ঘটিয়েও এই কৌশল যাই হোক না কেন আমার দুঃখের অনেকাংশ লাঘব করবে।

২

নেপোলিয়ান উপরের চিঠিখানির যে উত্তর দিয়েছিলেন তা পাঠ করে জোসেফিন এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে কোন মতেই আর হৃদয়াবেগকে রুদ্ধ করে রাখতে পারেননি। নীচের তারিখহীন চিঠিখানি তারই স্বীকারোক্তি।

আপনাকে শতকোটি ধন্যবাদ যে আপনি আজও আমাকে বিস্মৃত হননি। আমার ছেলের হাত দিয়ে পেয়েছি আপনার চিঠি। কী আগ্রহ নিয়ে পড়েছি চিঠিখানা। পড়তে অনেক সময় লেগেছে, কারণ ওর প্রতিটি কথা কাঁদিয়েছে আমায়। কিন্তু এই চোখের জল অতি মধুর। আমার হৃদয়ের বোঝা সম্পূর্ণ হাল্কা হয়ে গেছে আর চিরদিনই এমনি থাকবে। মানুষের এমন কতকগুলি আবেগ আছে যা জীবনেরই সামিল এবং একমাত্র জীবনের সঙ্গেই তারা ছেড়ে যায় আমাদের। আমার ১১শে তারিখের পত্র আপনার মনে ব্যথা দিয়েছে জেনে বড় হতাশ হলাম। আজ আর সে চিঠির সব কথা সম্পূর্ণ মনে নেই। কিন্তু অত্যন্ত বেদনাদায়ক আবেগের তাড়নায় লিখেছিলাম সে চিঠিখানা। আপনার নৈঃশব্দে গভীর মর্মবেদনায় পীড়িত হয়ে লেখা সে চিঠি। মালমাইসন ছেড়ে আসবার সময় চিঠি দিয়েছিলাম আপনাকে। তার পর কত বার চিঠি লেখার ইচ্ছা হয়েছে। আপনার নৈঃশব্দের কারণ আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। হয়ত আমার একখানা চিঠির দ্বারাই সেখানে অনধিকার প্রবেশ করা হোত। আপনার চিঠি আমার হৃদয় জুড়িয়ে দিয়েছে। আপনি সুখী হউন। সুখী হউন—যেমন হওয়া উচিত। এ আমার সমস্ত হৃদয়ের কথা। আমার প্রাপ্য সুখ আপনি এই মাত্র আমায় দিয়েছেন এবং এর যথোচিত মূল্যাবধারণ করি। আমার প্রতি আপনার শ্রদ্ধার চেয়ে এমন মূল্যবান আর কিছু নেই। বিদায় বন্ধু। চিরদিনের যেমন তেমনি মধুর ভালবাসা ও ধন্যবাদ জানাই।

জোসেফিন।

মার্ক টোয়াইনের চিঠি

[প্রিয় লিভির সঙ্গে মার্ক টোয়াইনের পূর্বরাগের পরিণতি হয়েছিল শুভ পরিণয়ে। লিভির কাছ থেকে যখনই দূরে গেছেন মার্ক টোয়াইন প্রায় প্রতিদিনই অন্তত একখানা, কখনো বা দিনে চারখানা পর্যন্ত চিঠি লিখেছেন তাকে। এমন কি বাড়ীতে থাকলেও চিঠি লেখা বন্ধ হোত না। কখনো প্রাতরাশের ট্রেতে থাকত এক টুকরো লিপি, কখনো বা যাওয়া-আসার ফাঁকে দীর্ঘ চিঠির তাড়া হাতে গুজে দিতেন প্রিয়ার। বিয়ের সতের বছর পরে ১৮৮৫ সালের ২৭শে নভেম্বর প্রিয়তমার চত্বারিংশৎ জন্মদিনে মার্ক টোয়াইন নীচের এই চিঠিখানি লিখেছিলেন।]

জীবনের যাত্রাপথের আর একটি প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছেছি আমরা। যেখান থেকে যাত্রার সুরু সেখান থেকে আজ দূরে—বহু দূরে এসে পড়েছি। কিন্তু পিছনে ফিরে অতীতের দিকে তাকালে ভেসে ওঠে এক মনোরম দৃশ্যপট—আজো যার উপত্যকা সবুজে ঘন, মাঠ-প্রান্তর কুসুমে আকীর্ণ, আজো যেখানে পাহাড়শ্রেণী দূরে মধুর স্মৃতির ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় অঘোর ঘুমে অচেতন। এরাই আমাদের যাত্রাপথের প্রিয় সহচর—এদের সাহচর্য কানে শোনার আশায় বাণী, বিমণ্ডিত করে রাখে মন অপূর্ব মাধুর্য-সুষমায়। হিসেবের কষ্টিপাথরে এদের মূল্য নিরূপিত করা যায় না। এরা পথের বোঝা কত হাল্কা করে। এখন অস্তাচলের দিকে আমাদের মুখ, কিন্তু এরা রয়েছে আমাদের নিত্য-সহচর—এরা আমাদের হাত ধরে টেনে রাখে পিছনে, বিলম্বিত করে চলার গতি। আমাদের প্রেম আজো একটু পরিম্লান হয়নি,—দিন দিন গভীর হতে গভীরতর হচ্ছে। আমাদের চলার পথের দু'পাশে আজো থাকবে ফুল আর সবুজে-ভরা মাঠ, অতীত প্রত্যূষের ম্লানায়মান স্নিগ্ধ আলোর মত মধুর সান্ধ্য দীপ-শিখা।

কবিগুরুর চিঠি

(প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত)

ঔ

কল্যাণীয়েষু

আমারি দোষ। শরৎ চাটুজ্জে একটা নতুন কাগজ বের করে তাতে আমাকে সমালোচনা লিখ্‌তে অনুরোধ করছিলেন। তার জবাবে আমি তাঁকে বলেছিলুম যে, আজকাল আমার লেখায় উৎসাহ একেবারে ছুটে গেছে, এমন কি, সবুজ পত্রে লেখাও আমার আর চলচে না। এর থেকেই কথাটা নিশ্চয় উঠেচে। সত্যিই আমার কেমন লেখা সম্বন্ধে জড়তা এসেচে। বারে বারে এই কথাই কেবল মনে হয় আমাদের দেশের পাঠক লেখকদের উপর আজকাল অত্যন্ত বেশি মুরুব্বিয়ানা করে। আমাদের যখন বয়স অল্প ছিল বঙ্কিমবাবুদের প্রতি আমাদের মনের ভাব ঠিক উল্টো ছিল। এমনতর পাঠক-সমাজের কাছে লিখ্‌তে কোনো মতেই গা লাগে না। এর ফল হয় এই যে, নিজের ভিতরে যতটা পূর্ণতা আছে বাইরে তার প্রকাশের পথ অনেকটা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। কেননা বাইরে থেকে আদায় করে নেবার ব্যবস্থা না থাক্‌লে ইচ্ছা থাক্‌লেও দেওয়া যায় না—মন ত আমাদের সম্পূর্ণ নিজের বশ নয়—আমাদের নিজের যা সম্পদ আছে তা দিতে গেলে ভিতর বাহিরের যোগে সেটা ঘটতে পারে। এই সকল কারণে, এবং হয়ত অন্য নানা কারণও আছে, আমার কেবলি দূরে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। মনে মনে কেবলি জিনিসপত্র প্যাক্ করচি, এবং টাইম টেব্‌ল দেখচি—এমন অবস্থায় মনটাকে কলমের ঘানিতে জুড়ে দেওয়া ভারি শক্ত হয়। আজকাল কবিতা লেখায় হাত দিয়েছিলুম, তারও দেখচি ইষ্টিম্ ফুরিয়ে আসচে। এই রকম মানসিক উড়ুক্ষুতা রোগের একমাত্র ওষুধ হচ্চে খুব ভরপুর বেগে একেবারে উড়ে যাওয়া। চেষ্টা ত করচি, কিন্তু আজকাল পথও চারদিকে বন্ধ, আবার পাথেয়ও তথৈব চ। সেইজন্য দিনরাত কেবল চলি-চলিই করচি অথচ চলা হচ্চে না, সেইটেতে ক্ষতি হচ্চে। যাই হোক আপাতত তোমাকে একটা কবিতা পাঠাই তার পরে গদ্য একটা লেখবার চেষ্টা করব। ইতি ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোকচিত্র

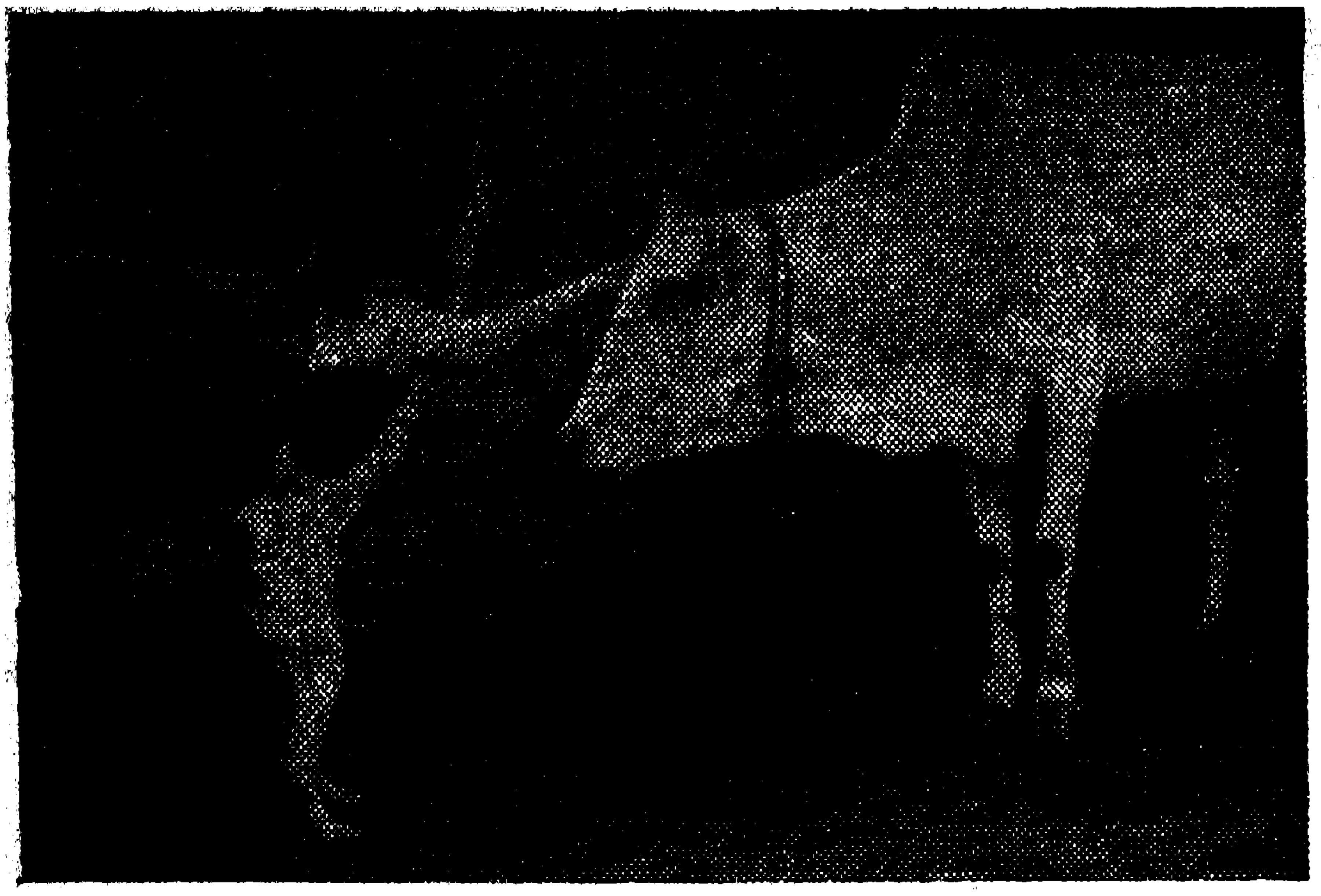

পরকীয়া —সুশান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেম

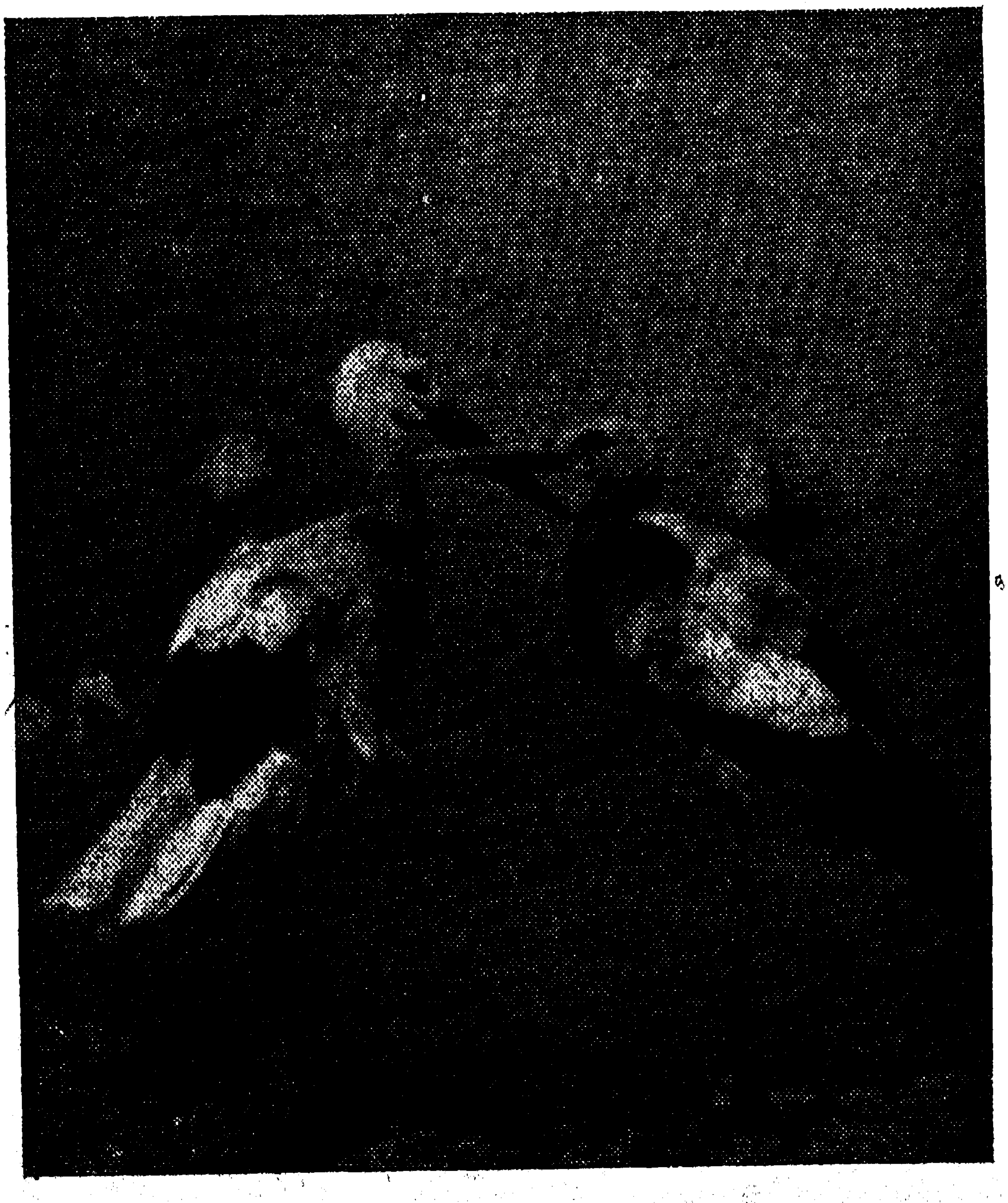

স্বকীয়া

—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

—নির্মলকুমার দত্ত

—বিজয়েন্দ্রকুমার সিংহ

—সনৎকুমার বসাক

—দেবু বসু

—প্রতিমা সে

শিশু-মঙ্গল

অনুরূপা দেবী

একটি জিনিষ বাপ-মায়েরা প্রায়ই ভুল করিয়া থাকেন। ছেলের-ছেলেয় বিবাদ ঘটিলে কখন কখন সেটা তাহাদিগের অভিভাবকদিগের মধ্যেও শোচনীয় ভাবে বিস্তৃতি

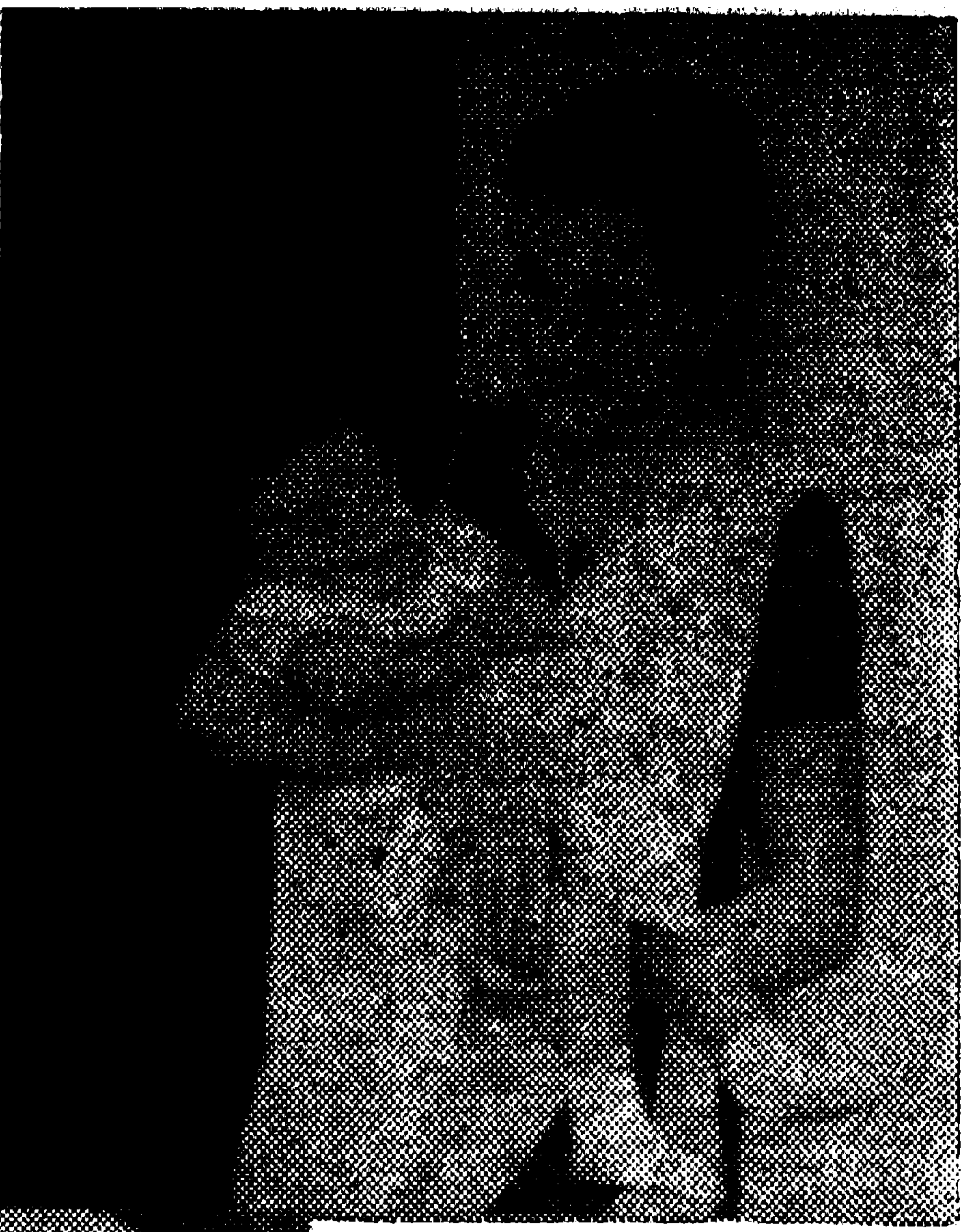

—উষারঞ্জন রায়

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

বৌ জিনিষটার প্রতি ছোট হইতেই একটা প্রবল লোভ জাত হইয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ বৌটি যে তাহার বরের পায়ে তেল দিবার দাসী, এবং তাহা যে চুড়া বাঁশী বজায় থাকিলেই শত শত সংখ্যায় পাওয়াও সম্ভব, এই উচ্ছৃঙ্খল স্বার্থান্ধ শিক্ষা শুধু নারী-মর্য্যাদারই নহে, পুরুষের আত্ম-মর্য্যাদারও ইহা অপমানকর। এগুলি ছেলে-ভুলান ছড়া হইতে উঠিয়া যাওয়াই সঙ্গত। আবার ঠাকুরমা দিদিমা শ্রেণীর লোকরা একটি ফুটফুটে ছেলেমেয়ে দেখলেই তাহাদের বর-বধূ সম্পর্ক পাতাইয়া দিয়া বসেন, সেই অদূরদর্শিতার ফলটি সর্ব্বথা ভাল বলিয়া আমি মনে করি না। শিশুজীবনে ছেলেদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ সমস্তই উচ্চাভিমুখী তৈয়ারী করিয়া দেওয়া মা-বাপের কর্ত্তব্য। ভীষ্মের ত্যাগ; কর্ণ, একলব্যের আত্মোন্নতি; অর্জ্জুনের বীর্য্যবত্তা; পৃথ্বীরাজ, প্রতাপসিংহ, প্রতাপাদিত্যাদির 'বীরত্ব কাহিনী'; শতমন্যু, বাদল প্রভৃতির

লাভ করিতে দেখা যায়। অথচ ছেলেদের ঝগড়ায় একটুখানি ধৈর্য্য ধরিয়া দোষানুসন্ধান পূর্ব্বক সুবিচার করিয়া দিলে অতি সহজেই তাহা নিবৃত্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব-সখ্য পুনঃ-সংস্থাপিত হইতে পারে। ছোটদের কোন কাযকেই বড় করিয়া লইতে নাই; ইহা দ্বারা কলহ-প্রিয়তা ও দলাদলির অভ্যাস তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়।

আর একটা জিনিষ আমাদের সমাজের বড়ই ক্ষতিকর হইয়া আছে। আমাদের দেশে "রাঙা বউ এনে দেবো পায়ে তেল দিতে।" 'বেঁচে থাকুক চুড়া বাঁশী, রুক্ত শত মিলবে দাসী।' ইত্যাদি রূপ শৈশব-শিক্ষার ফল সর্ব্বদাই বিষময় হইতে দেখা যায়। এমনি ত

দেশের জন্য আত্মত্যাগ; ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির ভগবদ্‌ভক্তি, এই সকলই তাহাদের সম্মুখে আদর্শরূপে ধরিতে হইবে। কারণ, বার বার বলিয়াছি এবং আবারও বলিব যে, শৈশব-শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা, শৈশবের আদর্শই চিরজীবনের আদর্শ, শৈশবের আশ্রয়ই চিরদিনের আশ্রয়, শত বর্ষেও ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় না, কখনও তাহা হইতে পারে না, আর শিশুর সেই শৈশব-শিক্ষয়িত্রীই তাহাদের মা। ইহার উপরেই আজ সমগ্র জাতীয় উন্নতি অবনতি— ইহার উপরেই আজ জাতীয় জীবন-মরণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে।

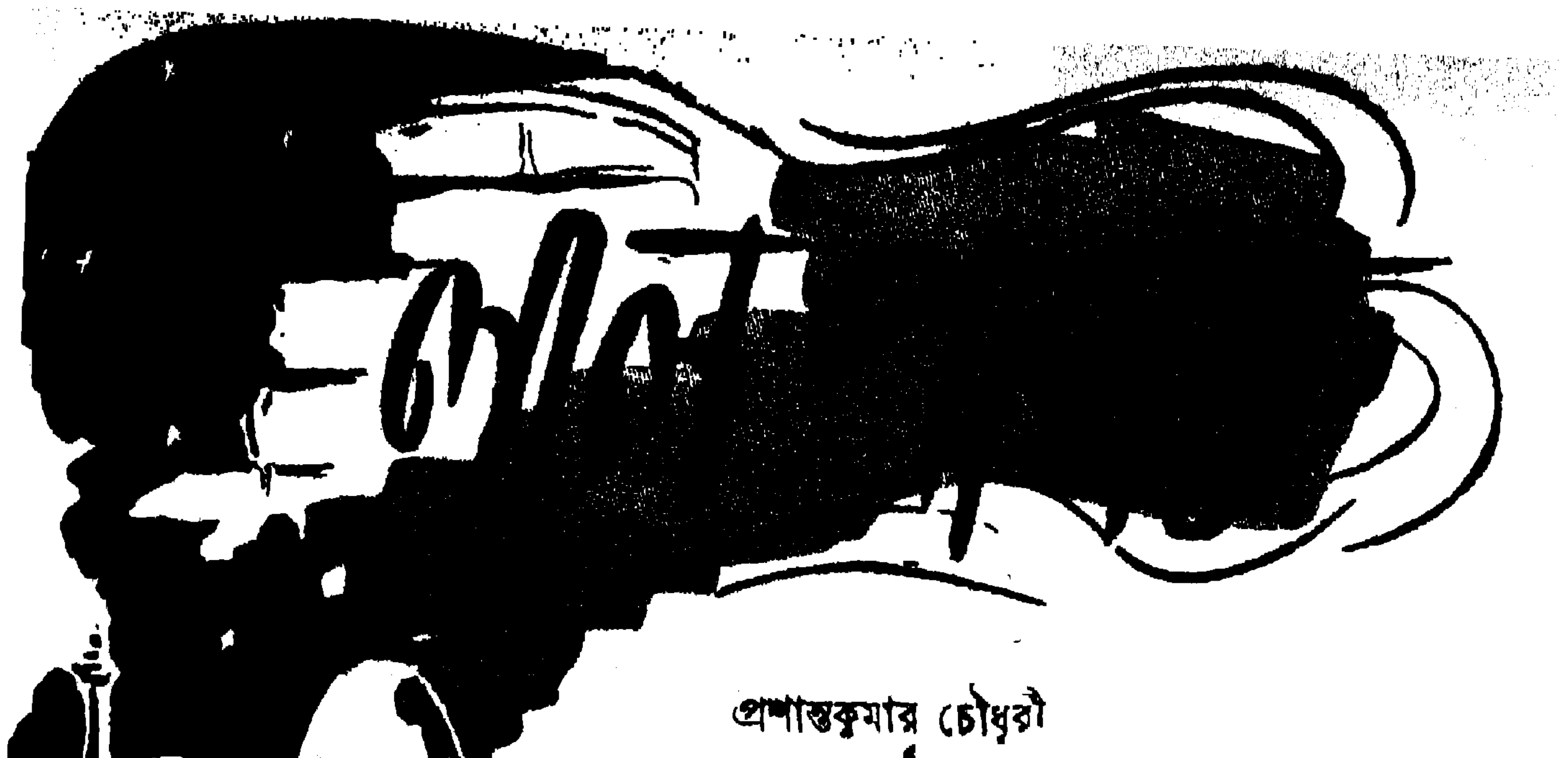

প্রশান্তকুমার চৌধুরী

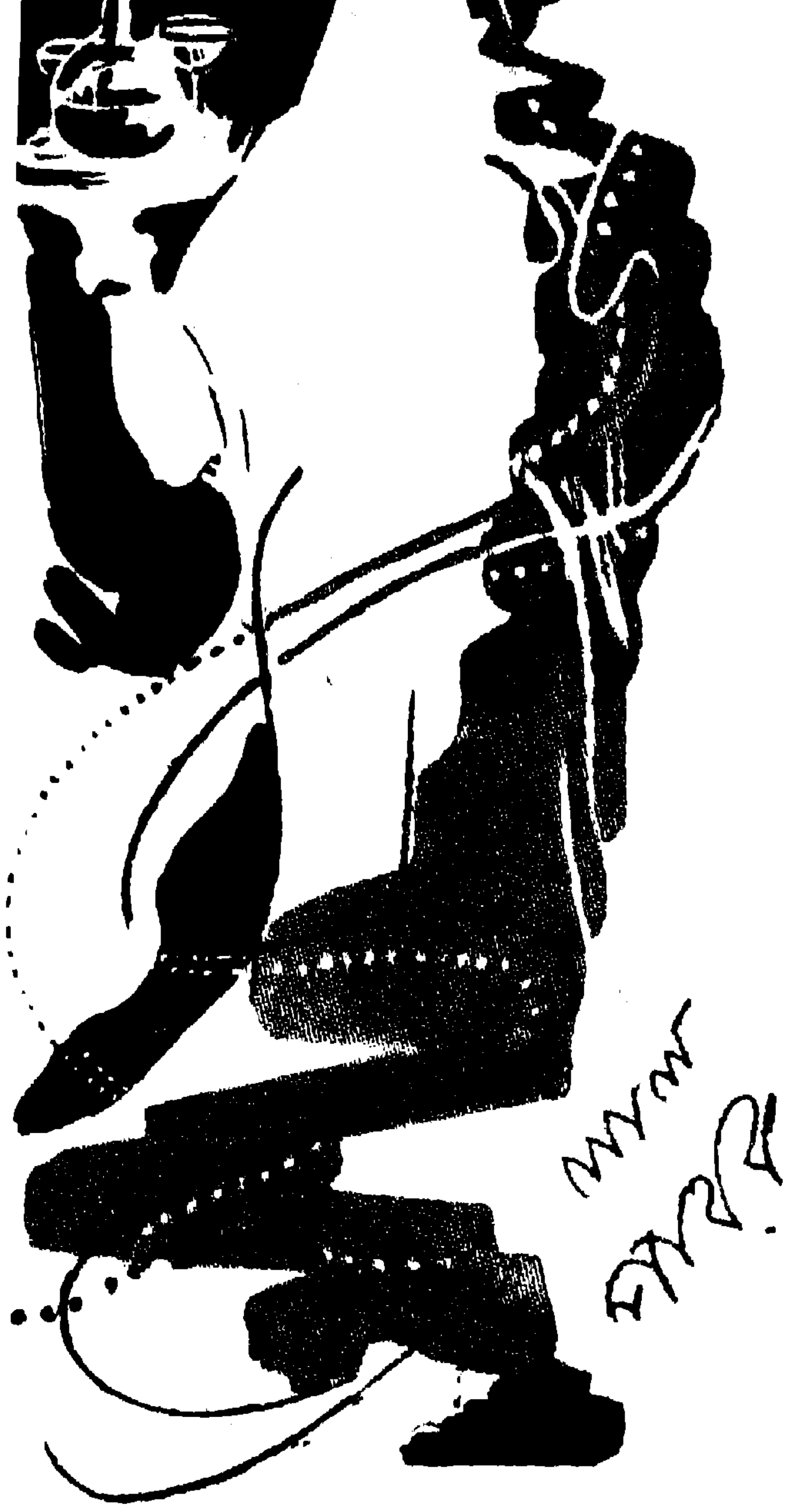

তরুণ ব্যারিষ্টার মিঃ রসিদ্ তার ড্রইং-রুমে ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারের ধোঁয়া ছাড়ছে। কানপুরের রুক্ষ পথটাকে ধুলোয় অন্ধকার করে দিয়ে একটা মোটর চলে গেল। মিঃ রসিদ্ হাত বাড়িয়ে জানলার সার্সিটা ভেজিয়ে দিলে। শীতটাও এবারে বেশ জাঁকিয়ে পড়বে বলেই বোধ হচ্ছে। রসিদ্ কাচের গ্লাসে আরে, এক আউন্স 'হোয়াইট লেবেল' ঢেলে চুমুক দিলে একটা। তার পর অলস ভাবে ডাকের চিঠিগুলোর খাম ছিঁড়তে লাগলো ছুরি দিয়ে। একটা চিঠি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পাঠ কোরে রসিদ্ নিজের চিঠি লেখবার কাগজ টেনে নিয়ে খস্‌খস্ কোরে লিখে চললো—মিঃ আনোয়ার, বহুৎ বহুৎ ধন্যবাদ আপনার এই নিমন্ত্রণের জন্য। চিরকাল কানপুরে মানুষ হয়েও ফতেপুরসিক্রি দেখা হয়নি আজও, এটা সত্যিই লজ্জা এবং দুঃখের কথা। দু-এক দিনের মধ্যেই আপনাকে বিরক্ত করতে যাচ্ছি। আশা করি, নার্গিস্ ভালই আছে। আপনার শরীর কেমন? বন্দুক নিয়ে যেতে নিশ্চয়ই আমার ভুল হবে না। নার্গিস্‌কে আমার ভালবাসা দেবেন, আপনি আমার প্রীতি-নমস্কার নেবেন।

আপনার বিশ্বস্ত

রসিদ্ আলি

• • • •

এই তরুণ ব্যারিষ্টার বিদেশের পাঠ সাঙ্গ কোরে প্রথম যেদিন কানপুর ষ্টেশনে ফিরে এসেছিল, সেদিন সে আশা করেছিল সমবেত অভ্যর্থনাকারীদের [illegible] মধ্যে প্রথমেই নজরে পড়বে সে—যার কাল চোখের নজরে আছে হরিণীর চঞ্চলতা, নাম যার নার্গিস্।

নার্গিস্‌কে খুঁজছো রসিদ্?—তরুণ ব্যারিষ্টারের কাকা এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন :—তার যে সাদি হয়ে গেছে গেল হপ্তায়। আনোয়ারকে মনে পড়ে তোমার? সেই যে চকের পশ্চিম দিকে জহরতের দোকান যার? বয়েসটা একটু বেশি হল বটে, কিন্তু টাকার কুমীর, লোকও ভাল। নার্গিস্‌কে ওর ভয়ানক চোখে লেগে গেছলো কি না, তাই। নৈলে নার্গিসের কি আর অমন বনেদী ঘরে পড়বার কথা?

অভ্যর্থনাকারীদের দল থেকে কে যেন এগিয়ে এসে ব্যারিষ্টার রসিদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিল। কে এক জন একটা মানপত্র লিখে এনে পড়েও ছিল যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। রসিদের কানে কিন্তু কিছুই পৌঁছয়নি। তার সমস্ত শ্রবণেন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করেছিল তখন একটি মাত্র কথা—'নার্গিসের সাদি হয়ে গেছে গেল হপ্তায়!'

কিছু দিন পরের কথা। রসিদ্ তার জানলার ধারে অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ চোখে পড়লো নার্গিস্‌দের বাড়ীর দরজায় প্রকাণ্ড একটা কাল মোটর-কার এসে দাঁড়ালো। মোটরের ভেতরটা পুরু বনাৎ-এর পর্দা দিয়ে ঘেরা। জরির উর্দিপরা ড্রাইভার গাড়ী থেকে নেমে মোটরের দরজা খুলে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালো। ভেতর থেকে ঝক্‌মকে সাটিনের বোরখা-ঢাকা একটি নারী নেমে এসে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

নার্গিস্ এল!—রসিদ্ আর্সির সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় বুরুশ্ চালালে দু-তিন বার, তার পর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

রসিদ্ এসেছে!—নার্গিস্ শুনলো তার মার মুখ থেকে। ভাই-বোনদের হাতে সে তখন খেলনা বিতরণ করছিল। খবরটা শুনেই বাইরের ড্রইং-রুমের দিকে ছুটলো। রসিদ্ তখন গল্প করছে নার্গিসের বাবার সঙ্গে। দৌড়ে এসে দরজার পর্দাটা দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে নার্গিস্ এসে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে।

নার্গিস্!

রসিদ্!

কিছুক্ষণ দুজনেই নির্ব্বাক্। নিস্তব্ধতা ভাঙলো নার্গিস্। আঙুল নেড়ে রসিদ্‌কে বললে—এসো। তার পর ওরা দুজনে চলে গেল নার্গিস্‌দের পেছনের বাগানের দিক্‌টায়।

ঘণ্টাখানেক পরে ওরা ফিরে এল ঘরে। ঘরে ঢুকেই আব্দারের সুরে নার্গিস্ বললে—বাবা, রসিদের সঙ্গে বিকেলে গাড়ী কোরে একটু বেড়িয়ে আসবো? ওর নতুন গাড়ী আমার চড়াই হয়নি যে!

বাপকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বললে,—আমার শ্বশুরবাড়ীর কথা ভাবছো তো তুমি? অতো কেউ দেখতেই পাবে না। তাছাড়া তারা পর্দানসীন বলে বাপের বাড়ীতে এসেও আমি বেড়াতে পারবো না? তার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে

বললে—তাহলে বিকেলে কিন্তু বেরোচ্ছি, যঁ্যা? রসিদ, ঠিক চারটের সময় গাড়ী বের কোরো কিন্তু।

বিকেলে ওরা বেরিয়ে পড়ে। গাড়ী চালায় রসিদ্, পাশে বসে নার্গিস্। কতো কথা হয় ওদের। ছেলেবেলার, বিলেতের, শ্বশুরবাড়ীর। উদ্দেশ্যহীন ভাবে গাড়ী ওদের ছুটেই চলে। কানপুরের প্রান্তে একটা হোটেলের সামনে গাড়ী থেকে নেমে ওরা ঢুকে যায় হোটেলের ভেতর।

আধ ঘণ্টা পরে আবার ওদের দেখতে পাওয়া যায়। হাত ধরাধরি কোরে ওরা বেরিয়ে আসছে হোটেল থেকে। কি একটা কথায় নার্গিস হো-হো কোরে হেসে ওঠে বেশ জোরেই। রসিদ ঠাট্টা কোরে বলে—উঁহু, অত জোরে তোমাকে হাসতে নেই নার্গিস; মনে রেখ, তুমি কানপুরের এক বনেদী মুসলমান পরিবারের পর্দানসীন বৌ। তার পর দু'জনেই হো-হো কোরে হেসে ওঠে। গাড়ীর কাছে এসেই দরজা খুলে ধোরে রসিদ বিরাট এক কুর্ণিশ কোরে বলে—'আইয়ে বেগম সাহেবা, গোলাম খাড়া হায় আপকে লিয়ে।' নার্গিস খিল্‌-খিল্ কোরে হেসে উঠে বলে—'বান্দা, তোমার ব্যবহারে বহুৎ সন্তুষ্ট হয়েছি আমি, কি ইনাম চাই বলো?' রসিদ বলে—'বেগম সাহেবার মেহেরবাণী, আগে তিনি গাড়ীতে উঠুন, তার পর গোলাম আর্জি পেশ করবে।'

নার্গিস ছুটে এসে গাড়ীর পা-দানীতে পা দিয়েই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে। মুহূর্ত্তের মধ্যে তার সর্ব্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যায় যেন! মুখখানা ওর রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে নিমেষেই!

গাড়ীর ভেতর অন্ধকারে বসে আছেন নার্গিসের স্বামী আনোয়ার!

আনোয়ার স্মিত কণ্ঠে বলেন,—কি হোল নার্গিস, শরীরটা কি খারাপ লাগছে? এসো, ভেতরে উঠে এসো। মিঃ রসিদ, অবাক্ হয়ে গেছেন নিশ্চয়ই আমাকে এ ভাবে আপনারই গাড়ীতে বসে থাকতে দেখে? কিন্তু এমন ভাবে ছাড়া আপনার সঙ্গে আলাপ করবার কোন উপায়ই ছিল না যে। আপনি তো আর গেলেন না কোন দিন আমার গরীবখানায়, তাই আমিই এলাম আপনার গাড়ীতে। আসুন, একসঙ্গে বেড়ানো যাক্ কিছুক্ষণ।

অদ্ভুত মানুষ এই আনোয়ার। নার্গিস্ আর রসিদ ভেবেছিল কিছু একটা কেলেঙ্কারী ব্যাপার করবে বুঝি সে। কিন্তু ঠিক তার উল্টো। আনোয়ার বরং অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তেই রসিদকে বললেন—দেখুন, ব্যবসার দায়ে দোকানেই থাকতে হয় বেশিক্ষণ। যাবেন মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে, নার্গিস্ তাতে খুশীই হবে।

এর পর থেকে আনোয়ারের প্রাসাদের ভেতরকার মহলের কার্পেট-বিছানো প্রশস্ত ঘরটিতে প্রায়ই নার্গিস্ আর রসিদ্‌কে দেখা যেতে লাগলো। আনোয়ার ব্যস্ত থাকে দোকানের কাজে।

এমনি ভাবে মাস চার-পাঁচ কাটবার পর হঠাৎ এক দিন রসিদ্ আনোয়ারের বাড়ী গিয়ে শুনলে, ভোরের ট্রেণে নার্গিস্‌কে নিয়ে আনোয়ার কোথায় বেড়াতে চলে গেছেন।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই নার্গিস্‌কে নিয়ে কোথায় গেল আনোয়ার? এই কথাই ক'দিন ধোরে ক্রমাগত ভাবছিল রসিদ্। এমন সময় আজ আনোয়ারের চিঠি এলো—ফতেপুরসিক্রিতে রসিদ্‌কে তাঁর আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে। সে কথা গল্পের শুরুতেই বলা হয়েছে।

দিন চারেক হোল ফতেপুরসিক্রিতে এসেছে রসিদ্। সেদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে আনোয়ার বললেন,—চাঁদনী রাতে ফতেপুরসিক্রির কেল্লা দেখেননি তো মিঃ রসিদ্? রসিদ্ চায়ের পেয়ালায় চামচ দোলাতে দোলাতে বললে—চাঁদনী রাতে তাজমহল দেখবার প্রসিদ্ধিই তো শুনেছি। ফতেপুরসিক্রির কেল্লা···

বাধা দিয়ে আনোয়ার বললেন—চাঁদিনী রাতে দেখবার কথা কখনও কোথাও শোনেননি, এই তো? কিন্তু আমি বলছি, চাঁদনী রাতে এই ফতেপুরসিক্রির পরিত্যক্ত বিরাট ফোর্ট যে না দেখেছে, সে এর কিছুই দেখেনি। সকালে—বিকেলে—দুপুরে এর হাত-পা-গলা-মাথা-চুল-দাঁত-নোখ সবই দেখতে পায় লোকে। কিন্তু এর হৃদয়? তার হদিস্ মেলে রাত্রে। চাঁদনী রাতে এর পঞ্চ্‌মহলের তলাকার বিরাট চত্বরের ওপর বসলে শুনতে পাওয়া যায় এর বুকফাটা চাপা কান্না, এর ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস, এর শরাব্‌-জড়িত প্রণয়-প্রলাপ!—যতো অসি-ঝঞ্ঝনা, যতো নূপুর-নিক্কণ, যতো প্রেমগুঞ্জন, যতো নিষ্ঠুর গোপন-মন্ত্রণা এর পাথরের খাঁজে-খাঁজে নিঃশব্দ হয়ে আছে—চাঁদনী রাতে তারা সবাই একে একে বেরিয়ে আসে, কথা কয়, কাঁদে, গান গায়, নাচে, তলোয়ারে শাণ দেয়।

মিঃ রসিদ্ টেবিলে চাপড় মেরে বলে উঠলো,—ব্যবস্থা করুন কবে যাবেন, আমি তৈরী।

আনোয়ার বললেন—কাল রাত্রেই।

* * *

পরদিন রাত্রে ফতেপুরসিক্রির জনহীন বিরাট প্রাঙ্গণে দীর্ঘ ছায়া ফেলতে ফেলতে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল আনোয়ার আর রসিদ্‌কে। পঞ্চ্‌মহলের গুম্বুজগুলো আলো-আঁধারে কেমন যেন হাল্কা বলে মনে হচ্ছে। যেন হাওয়া লেগে দুলছে একটু একটু। ওধারে 'বুলন্দ দরোয়াজা'র খিলেনে খিলেনে চাম্‌চিকের ঝটাপটি। এধারে সেলিমচিস্তির কবরের সম্মুখের বিরাট উঠোনের একধারে কুঁকড়িয়ে শুয়ে একটা কুকুর থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠছে শীতে।

চলতে চলতে রসিদ্ বললে—আচ্ছা মিঃ আনোয়ার, আপনি হঠাৎ আমাকে বন্দুক সঙ্গে নিতে বললেন কেন বলুন তো?

আনোয়ার কেমন যেন থম্‌থমে গলায় বললেন—আত্মরক্ষার জন্যে।

—আত্মরক্ষা? এখানে জানোয়ার বেরোয় বলে তো শুনিনি?

তেমনি থম্‌থমে গলায় আনোয়ার বললেন—জানোয়ার নয় মিঃ রসিদ্। কতো অতৃপ্ত হৃদয় কতো বাসনা-কামনা নিয়ে এইখানেই অসময়ে থেমে গেছে, কতো নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়ে গেছে এখানকার অন্ধকূপে—চাঁদনী রাতে সেই সব অশরীরী আত্মারা······!

হো-হো কোরে হেসে উঠে রসিদ্ বললে,—ভূত? বিশ্বাস করেন? আর ভূতই যদি আসে, বন্দুকে কি হবে?

তেমনি আড়ষ্ট কণ্ঠে আনোয়ার বললেন—হাসবেন না মিঃ রসিদ্। প্রথম যেবার চাঁদনী রাতে আমি এখানে আসি, তখন্ আমার সঙ্গে ছিলেন গজন্‌ভি সাহেব। এমনি এক রাত্রে দেওয়ান্‌-ই-খাসের পাশ দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি, হঠাৎ ওধারে দেখতে পেলুম একটি দীর্ঘকায় কাফ্রী ক্রীতদাস···হাতে-পায়ে তার লোহার শিকল···মুখটার ঠিক মাঝখানে কে যেন ধারালো তলোয়ারের কোপ, বসিয়ে দিয়েছে··· গাঢ় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সেই গভীর ক্ষত থেকে···দেহের তলায়

দিক্‌টা অন্ধকারে যেন বেমালুম মিশে গেছে···ক্রীতদাসটি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। গজনভি সাহেবকে নাড়া দিয়ে বললুম—'দেখতে পাচ্ছেন?' গজনভি সাহেব বললেন,—'কী?' আমার গলা দিয়ে তখন স্বর বেরুচ্ছে না। বললাম—'কে ঐ কাফ্রী ক্রীতদাস?' গজনভি সাহেব সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন—'ফায়ার'। পর পর তিনটে গুলী ছুঁড়লুম। তার পর থতমত হয়ে দেখলুম, ছায়া-মূর্ত্তি কোথায় মিলিয়ে গেছে! জিজ্ঞেস করলুম—'গজনভি সাহেব, আপনি দেখতে পেয়েছিলেন তো?'

গজনভি বললেন—'না'। বললুম—'তবে গুলী করতে বললেন যে?' গজনভি বললেন—'তাছাড়া উপায় কি ছিল বলো? যাকে তুমি দেখলে, গুলী তাদের গায়ে লাগে না বটে, কিন্তু তোমার বুকে কতোখানি সাহস এনে দিল বল তো?'

রসিদ্ বললে—আপনিও কি ঐ জন্যেই আমাকে বন্দুক আনতে বললেন আজ মিঃ আনোয়ার?

—হ্যাঁ।

—আমার বুকে কিন্তু বন্দুক না ছুঁড়েও সাহস থাকে।

আনোয়ার শুধু বললে—তাই যেন থাকে মিঃ রসিদ্।

কথা কইতে কইতে এগিয়ে চলছিল ওরা। একটি একটি কোরে প্রত্যেকটি দ্রষ্টব্য স্থানের ঐতিহাসিক মূল্য বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন আনোয়ার। কেমন কোরে সম্রাট্ আকবর ফতেপুরসিক্রিতে উঠিয়ে আনলেন তাঁর রাজধানী, কেমন কোরে কতো কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় কোরে গড়ে উঠলো ফতেপুরসিক্রির এই বিরাট কেল্লা, তার পর কেমন কোরে দারুণ জলকষ্টে এই সাধের ইন্দ্রপুরীকে মরুভূমির বুকে ফেলে রেখে রাজ্যপাট নিয়ে আবার সবাইকে ফিরে যেতে হল আগ্রায়, সব কিছুই জেনে নিচ্ছিল রসিদ্।

যোধাবাঈ-মহলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ছোট-খাটো গোলাকার পাথর-বাঁধানো বেদীর দিকে রসিদের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরে আনোয়ার বললেন,—এই বেদীর মধ্যে চোখে পড়ছে কিছু?

—কৈ না তো।

—বেদীর উপরকার সমস্ত পাথরগুলিই সাদা, তার মাঝে হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে ঐ দু'টো লাল পাথর দেখতে পাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—সাদা পাথরের মাঝখানে হঠাৎ ঐ লাল পাথর দু'টো কেন বসলো, কে বসালো জানেন? শুনবেন ঐ লাল পাথর দু'টোর ইতিহাস? কিন্তু তার আগে আসুন ওধারটায় গিয়ে বসা যাক্।

অনেকটা এগিয়ে ওরা দু'জনে হিরণ-মিনারের তলায় এসে পৌঁছলো। মিনারের গায়ে বসালো বড়ো-বড়ো হাতির দাঁতগুলোর ছায়া মিনারের সর্ব্বাঙ্গে বিচিত্র একটা চোখ-ধাঁধানো হিজিবিজির সৃষ্টি করেছে। অতীতে হাতীর লড়াই হতো এইখানে। বিচারক বসতেন ঐ মিনারের চূড়োয়। পরাজিত হস্তীর দাঁত দু'টো উপ্‌ড়ে নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হোত ঐ মিনারের গায়ে। বর্ত্তমানে এর আশে-পাশে কেবল ভগ্নস্তূপ আর এবড়ো-খেবড়ো মাটি। খানিকটা দূরে অনেকগুলি কবরের সারিকে ঘিরে ছোট-খাটো একটা জঙ্গল মাথা চাড়া দিয়েছে, একটা বড়ো চট্‌কা গাছ একরাশ ডাল-পালা ছড়িয়ে জায়গাটাকে অন্ধকার করে রেখেছে।

আনোয়ার ও রসিদ্ এসে বসলো হিরণ-মিনারের পাথরের চত্বরের ওপর। রসিদ্ বললে—এবার তাহলে সুরু হোক্ সেই লাল পাথরের গল্প।

আনোয়ার কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগটা থেকে একটা মিনে-করা রূপোর সুর্ম্মাদানী বের কোরে বললেন,—তার আগে আসুন চোখে একটু সুর্ম্মা লাগিয়ে নেওয়া যাক্। পাগলামী ভাবছেন?—নিজের সাদা চোখ দিয়ে ফতেপুরসিক্রিকে তো অনেকক্ষণ দেখলেন, এবারে নবাবী-চোখ দিয়ে একটু দেখুন। নবাবরা সুর্ম্মা দিতেন চোখে।

হো-হো কোরে হেসে রসিদ্ বললে,—বহুৎ আচ্ছা। আপনাকে আজ কিন্তু বেশ লাগছে মিঃ আনোয়ার।

সুর্ম্মা পরানো শেষ হতেই ব্যাগ থেকে ছোট একটি আতরের শিশি বের হল। চাঁদের আলোয় কাটগ্লাসের শিশিটা ঝকঝকিয়ে উঠলো একবার। দু'জনের গোঁফের প্রান্তে আতর ছোঁয়ানো হল, দু'-টুকরো তুলোর গুলি আতরে ভিজিয়ে দু'জনের কানে গোঁজা হল।

রসিদ্ হেসে বললে—আবহাওয়াটা এবার যেন নবাবী-নবাবী মনে হচ্ছে বটে!

আনোয়ার বললেন—এখনো একটু বাকি আছে মিঃ রসিদ্!—তার পর ব্যাগের ভেতর থেকে একটা ছিপি-আঁটা বোতল আর দু'টো ছোট কাচের গ্লাস বের কোরে মৃদু হেসে বললেন,—সঙ্গে শরাবের বোতলও এনেছি।

* * *

শরাবের চতুর্থ গ্লাসে যখন চুমুক দিলে রসিদ্, লাল পাথরের গল্পটা তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। ডান হাতে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বাঁ-হাতে ঠোঁট মুছে রসিদ বললে—তার পর?

আনোয়ার বলে যেতে লাগলো,···সেই সৈনিক যুবকটি ক'দিন থেকেই লক্ষ্য করলো, সাকিনা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে সব সময়। বাঁদী-মহলে খোঁজ নিতে গেলেই শোনে, হয় তার বেগম-মহলে কাজের চাপ, না হয় ভীষণ মাথার যন্ত্রণা, না হয় গত কাল রাত্রের নাচের মজলিসে অধিক রাত্রি-জাগরণে ঘুমিয়ে পড়েছে অবেলায়।

সৈনিক যুবকটি ভাবে—সাকিনা আজকাল তার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন করছে? আজ সাত দিন সাকিনার সঙ্গে দেখা হল না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় যথারীতি বাঁদী-মহলের পেছনের বাগানের ঝাউ গাছের তলায় বৃথাই অপেক্ষা করেছে সে সাকিনার জন্যে। সাকিনার এই ভাবান্তরের কোন কারণই খুঁজে পায় না সৈনিক।

সেদিনও প্রতিদিনের মতোই সে ঝাউ গাছের নিচে বসে অন্যমনস্ক ভাবে ঘাস ছিঁড়ছে আঙুল দিয়ে, হঠাৎ ওপাশের একটা ঝাউয়ের ঝোপ থেকে ভেসে এল সাকিনার কণ্ঠ। সাকিনা কাকে যেন বলছে—'এ বাঁদী হুজুরের নাগরার ধূলির যোগ্যা নয়। তবু যে তার প্রতি হুজুরের কৃপাদৃষ্টি পড়েছে, সে হুজুরেরই মেহেরবাণী, আর সাকিনা বাঁদীর নসিবের জোর।' পুরুষ-কণ্ঠটি বললে—'চোখে তোমার গোলাপের হীরার দ্যুতি সাকিনা।' সাকিনা সলজ্জ কণ্ঠে বললে—'সে-ও হুজুরেরই নজরের গুণে।' পুরুষ-কণ্ঠটি বললে—'তাহলে আজ রাতে যোধাবাঈ-মহলের দক্ষিণ চত্বরে পাথরের বেদীর কাছে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো, মনে থাকে যেন।' সাকিনা বললে—'শুধু হাতে যাব না

কিন্তু এ-বাঁদী, ওমর-খেয়ামের সাকীর মতো শরাবের পাত্র নিয়েই যাবে হুজুর।' হুজুর বললেন—'সাবাস্।' সাকিনা নম্র কণ্ঠে বললে—'বেগম-মহলে এ-হাতের তৈরী শরাবের সামান্য কিছু সুখ্যাতি আছে হুজুর, সেটা সত্যি কি না হুজুরের কাছ থেকেই শোনা যাবে আজ।' হুজুর হেসে উঠে বললেন—'মঞ্জুর।'

ঝাউ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সৈনিক যুবকটির রক্ত গরম হয়ে উঠলো। নাঃ, এ অসহ্য। বিশ্বাসঘাতিকা সাকিনা!···কিন্তু দেখতে হবে ঐ হুজুরটি কে? সৈনিক ঝাউ গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে রইল। কিছুক্ষণ বাদেই যখন সাকিনার সেই প্রেম-প্রার্থীটি চলে গেলেন আতরের খুসবু উড়িয়ে, সৈনিক বিস্ফারিত চোখে দেখলো তিনি বাদশার উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ওমরাহদেরই এক জন!

রাত্রে সেই বেদীর কাছে ওমরাহ অপেক্ষা করছেন। দূরে দেখা গেল, জরির চুমকি-বসানো পাৎলা সাদা ওড়না জড়িয়ে সাকিনা আসছে। হাতে তার শরাবের পাত্র, কোমল দুটি পায়ের মখমলের ছোট চটিজোড়া ক্ষীণ একটু শব্দ করছে পাথরের বুকে। সাকিনা আসছে···সাকিনা আসছে। হঠাৎ নিশীথ রাত্রের নিস্তব্ধতার বুক চিরে দড়াম্—দড়াম্ কোরে দু'টো বন্দুকের শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র একটা আর্ত্তনাদ কোরে সাকিনার হাল্কা দেহটা ছিট্‌কে পড়লো পাথরের ওপর। সেই ওমরাহটি অবাক্ হয়ে দেখলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে ওদিকের একটা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটি সৈনিক।

এই অবধি বলেই আনোয়ার আর এক গ্লাস শরাব তুলে ধরলো রসিদের দিকে। শরাবের গ্লাসে চুমুক দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে রসিদ বললে—'তার পর?' সেই প্রচণ্ড শীতেও তার তখন ঘাম হচ্ছে।

আনোয়ার আবার সুরু করলেন—মরবার সময় সাকিনা বলে যে, সে বিশ্বাসঘাতিকা নয়। ওমরাহের অত্যাচারের ভয়েই সাকিনা এ ক'দিন তার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। মিথ্যা প্রেমের অভিনয় কোরে আজ সে শরাবের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে এনেছিল ওমরাহকে এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্তেই।···

রসিদের দু'পাশের রগ দু'টো তখন দপদপ করছে। উত্তেজিত কণ্ঠে বললে—তার পর?

—তার পর নিশীথ রাত্রের বুক চিরে আরো একবার বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। সৈনিকের বন্দুক থেকে আরো একবার ধোঁয়া উঠতে লাগলো। সৈনিক আত্মহত্যা করলো।

—তার পর?

—ঐ যে ঐ বেদীর ওপর দু'টো লাল পাথর দেখলে, ও-দু'টো ঐ ওমরাহই বসাবার বন্দোবস্ত করেছিলেন ওদের দু'জনের প্রেমকে স্মরণীয় কোরে রাখবার জন্তে।

* * * *

লাল পাথরের গল্প এইখানেই শেষ হল। অনেকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থেকে রসিদ্ হঠাৎ শরাবের খালি গ্লাসটা তুলে ধোরে বললে, —আর একটু শরাব, মিঃ আনোয়ার।

শরাবের নেশায় বুঁদ্ হয়ে রসিদ চেয়ে রইল অনতিদূরের কবরগুলোর দিকে।

কবরগুলোর পাশ থেকে সাদা ধোঁয়ার মতো ওটা কি উঠছে? ···ধোঁয়া?···নারীমূর্ত্তি। জরির চুমকি বসানো পাৎলা মসলিনের ওড়না···তলা দিয়ে রেশমের জামাটা চক্‌চক্ করছে···। হাতে ওটা কি ওর? শরাবের পাত্র!···কে ও?

রসিদ্ ভীত কণ্ঠে বললে—মিঃ আনোয়ার, দেখতে পাচ্ছেন ঐ নারীমূর্ত্তিকে?···আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে ও। দেখতে পাচ্ছেন?

—না।

—কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি মিঃ আনোয়ার। ঐ তো সে আসছে···সাকিনা আসছে···মিঃ আনোয়ার?

আনোয়ার দাঁতে দাঁত চেপে শুধু বললেন,—ফায়ার!

দড়াম্-দড়াম্-দড়াম্! নিশীথ রাতের বুক চিরে রসিদের বন্দুক গর্জ্জে উঠলো। কিন্তু অশরীরী নারীমূর্ত্তি অমন আর্ত্তনাদ কোরে ছিট্‌কে পড়লো কেন? অশরীরীর আর্ত্তনাদ! সে কেমন কোরে হয়? ও কার আর্ত্তনাদ?—কে?—কে?—কে তুমি?

স্খলিত পায়ে টলতে টলতে এগিয়ে যায় রসিদ্।

ভূ-লুণ্ঠিতা নারীমূর্ত্তির মুখের দিকে হেঁট হয়ে তাকিয়ে রসিদের মনে হোল, সমস্ত হিরণ-মিনারটা বুঝি চুরমার হয়ে তার মাথায় ভেঙ্গে পড়লো!···

···নার্গিস্! নার্গিস্ তুমি! এমন অদ্ভুত বেশে, এখানে, এত রাতে, কাউকে না বোলে শরাবের পাত্র নিয়ে তুমি কেন এসেছিলে? কেন?—কেন?—বলো নার্গিস্, বলো!

নার্গিসের মুখের শেষ কথাটি শোনবার জন্তে রসিদ্‌কে ঘিরে ফতেপুরসিক্রির পাষাণ-কেল্লাও বুঝি সে রাত্রে হেঁট হয়ে নার্গিসের মুখের কাছে কান পেতে দাঁড়ালো। কি একটা বলতে গেল যেন নার্গিস্, কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রিনীর অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে চাপা দিয়ে দূর থেকে আনোয়ারের অট্টহাস্য ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগলো ফতেপুরসিক্রির গম্বুজে গম্বুজে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে। সে হাসিকেও ছাপিয়ে রসিদের হাতের বন্দুক আর একবার গর্জ্জন করে উঠলো।

আত্মহত্যা করা ছাড়া রসিদের উপায় ছিল কি?

বিষয়ীর ঈশ্বর

"কিন্তু দৃঢ় হ'তে হ'বে; ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকৃতে হবে। বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জান? যেমন খুড়ী জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা কর্‌বার সময় পরস্পর বলে, 'আমার ঈশ্বরের দিব্য'। আর যেমন কোন ফিট্ বাবু, পান চিবুতে চিবুতে, হাতে (stick) ক'রে, বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে;—'ঈশ্বর কি beautiful ফুল করেছেন!' কিন্তু এ বিষয়ীর ভাব ক্ষণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে। একটার উপর দৃঢ় হ'তে হবে। ডুব দাও। না দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ন পাওয়া যায় না। জলের উপর কেবল ভাসলে পাওয়া যায় না।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

এবার পূজায়

পাকিস্তান

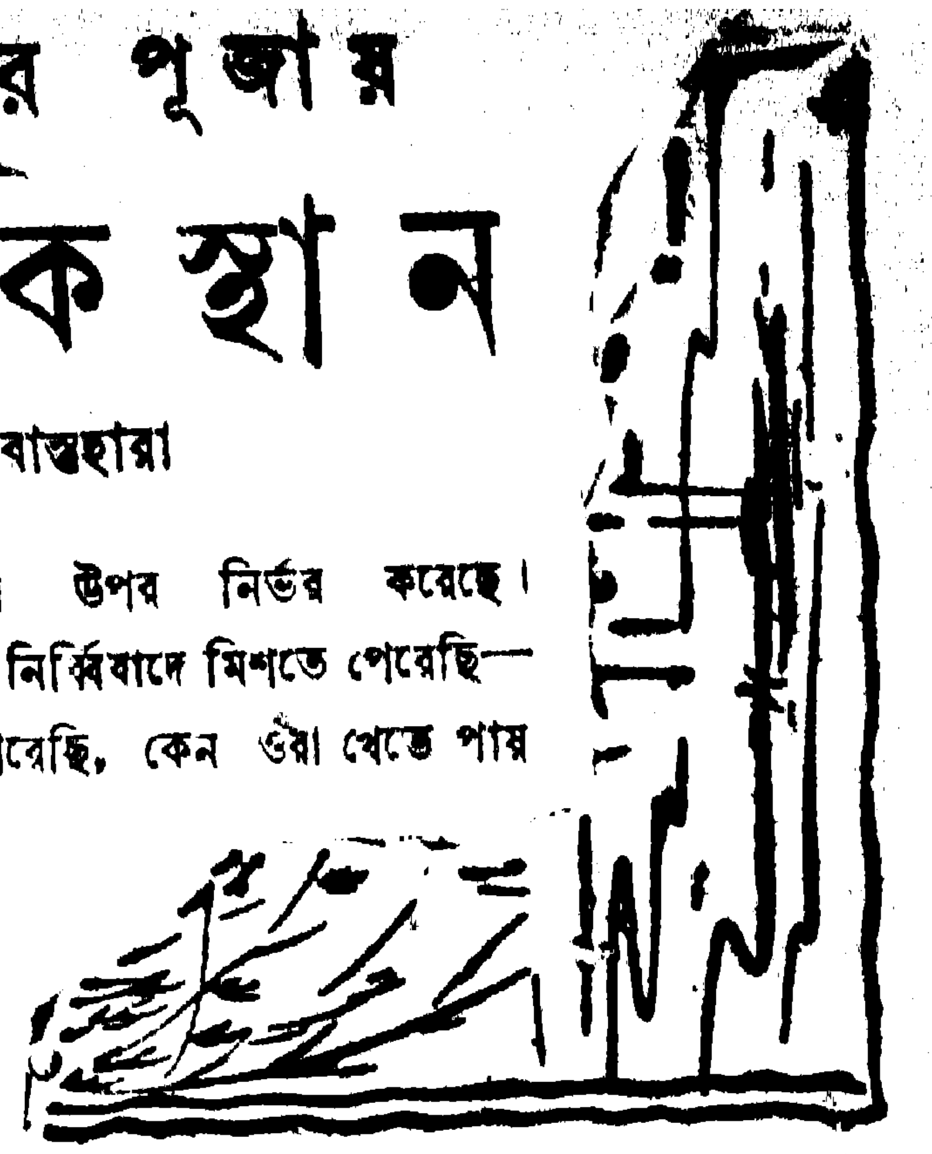

বাস্তুহারা

আজ সে দেশ পাকিস্তান। আমার জন্মভূমি। চল্লিশ বছর আগে দিয়েছিল প্রেরণা। প্রেরণা বন্ধনমুক্তির। মনে বনে কোনে, তার প্রতি নগর ও পল্লীতে আমাদের মৃত্যুস্পর্দ্ধী— "মায়ের জন্য বলি প্রাণে" বলে তিলে তিলে গড়ে তোলা হয়েছিল। 'সুবর্ণমণ্ডিতা সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমায়' হিন্দুয়ানী আমরা দেখিনি। দেখেছি গরীব চাষী, মজুর, শিল্পী আর অস্পৃশ্য অনুন্নতদের প্রাণমূর্ত্তি।

বঙ্কিম কল্পনা করেছিলেন, "একদিন দেখিব দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণধারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে বাণী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।" কল্পনার অবসর আমাদের ছিল না। কাল-সমুদ্র তাড়িত মথিত করবার জন্য আমরা দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়েছিলাম—পূজা পূজা, খেলার জন্যে নয়, আপনাদের অন্তরে ও পেশীতে শক্তি সঞ্চয়ের আর প্রাণহীন মানুষ নামধেয়দের মান ও হুস্ স্থাপনের জন্যে।

কিন্তু সেদিন থেকেই ওরা বাধা দিয়েছিল। ইংরেজ—মূর্খ, অত্যাচারী। আমাদের নাগালই পায়নি। স্বয়ংসিদ্ধ নেতারাও পাননি। তাঁরা ছিলেন ইংরেজের খোসামোদে আর আপনাদের বচন আস্ফালনে ব্যস্ত। কেউ আপনাদের শক্তিহীনতা উপলব্ধি করে অলৌকিক শক্তির সহায়তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

পদ্মার ওপারের দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশা আমাদের প্রেরণা দিয়েছিল। আমরা তাদের জন্যেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—'বাপ-মা, ভাই-বোন, বাড়ী-ঘর এ সবের আকর্ষণে আমি আবদ্ধ হব না, কোন প্রকার ওজর আপত্তি না করে পরিচালকের আদেশ অনুসারে মণ্ডলের সব কার্য্য পালন করব। চাঞ্চল্য ও চপলতা ত্যাগ করে শান্তি ও সংযত ভাবে আমি সব কাজ সম্পাদন করব।'

কত পূজা এসেছে—কত পূজা চলে গেছে। জন্ম-সংস্কারবশে দণ্ড-বৎ যে আমরা করিনি তা নয়—শ্বেত ছাগ-বলির ঘোষণায় উল্লাসও যে না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু এ উল্লাস ম্লান হয়েছিল। বয়স তখন ৭।৮ বছর। আমাদের অঞ্চল মুসলমান-প্রধান, ওদের মধ্যেই আমাদের বৈপ্লবিক শিক্ষা। ওদের ভাঙ্গা চালা, ওদের মেরুদণ্ডস্পর্শী উদর, ওদের ব্যাধি, অনাহার আমাদের পাগল করত।

লর্ড মিণ্টোর "a possible counter poise to Congress aims"—আমাদের অন্নদাতা বাপ-মার মাত্র নয়, সহকর্মীদেরও আত্মীয়-স্বজনকে যখন বিপন্ন করল, তখন আমাদের আয়ুধ সজ্জিত হবার সুযোগ মিলেছিল—মাত্র গুণ্ডা মারবার জন্যে নয়, গুণ্ডার নিয়োক্তাদেরও শায়েস্তা করতে।

বোধ হয় ১৩১৪ সাল। পূজারই সময়। মুসলমান গুণ্ডা ও গুণ্ডা-প্ররোচিত জনসাধারণ উন্মাদের মত হিন্দুদের আক্রমণ করছে। প্রত্যহ হাট লুঠ, ঘরে আগুন। মনে আছে, ভয়ার্ত্ত ও মা-বোনদের তত্ত্বাবধানে আমাদেরও সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। তবু দেখেছি, সেই শিশু-বয়সে চোখের সামনে—বেইজ্জত করেছে মেয়েদের। দেখেছি, ওরা প্রতিমা ভেঙেছে আমাদের চোখের সামনে। আমাদের রাগ হয়েছে—বড়রা আমাদের এগিয়ে যেতে দেয়নি।

লাঠি আর পিস্তল নিয়ে আমরাও যেমনই গিয়ে দাঁড়িয়েছি বাস্তু ভিটার সামনে আর মা-বোনদের পাশে—অমনি অসুররা ভয়ে পালিয়েছে। অন্য দিকে 'ওয়াহ, গুরুজি কি ফতে' ধ্বনি জাতের নামে বজ্জাতির উৎপাটন করেছে। যারা ছুরি ও লাঠি উঠিয়েছিল তাদেরই রোশনাইয়ের পাশে—বন্যা-বিপন্ন, দুর্ভিক্ষ-তাড়িত কঙ্কালের পাশে আমাদের দেখে ওরা লজ্জা পেয়েছে। ওরা আমাদের বিশ্বাস করেছে—আমাদের উপর নির্ভর করেছে। ওদের সঙ্গে আমরা নির্ব্বিবাদে মিশতে পেরেছি—ওদের বুঝাতে পেরেছি, কেন ওরা খেতে পায় না; কেন ওরা নিত্য মরে।

নয়া ভারতকে প্রেরণা দিচ্ছিলেন স্বামীজী। তিনি তখন ইউরোপে। সে আজ ৫২ বছর আগের কথা। এমনি পূজার সময়। বাংলার জনসাধারণ তখনও মরছে। পদ্মার ওপারে চালের দর তখন নেমেছে টাকায় পনের সের থেকে পাঁচ সেরে। সেদিনকার সে বুভুক্ষুর মূর্ত্ত প্রেরণা পরের ২০ বছর বিপ্লবীদের গণ-সংগঠনে যে কাজে লেগেছিল তা আজ মনে না থাকবারই কথা।

গ্রাণ্টের ডেসপ্যাচ থেকে বঙ্কিমের মন্বন্তরের ছবি—'মা যাহা হইয়াছেন মূর্ত্তি।' কিন্তু সেদিন বিপ্লবীদের মহাপূজার এক অদ্ভুত মাতৃমূর্ত্তি আমাদের অন্তর জুড়ে বসেছিল—

চারটি শীর্ণ সন্তান নিয়ে অভাগিনী জননী দাঁড়িয়ে। স্বামী কলেরায় মরেছে। যা-কিছু ছিল সব বিক্রী করেছে মা। আর কানা-কড়ি নেই। তাই বাচ্চাদের নিয়ে একা দাঁড়িয়েছিল পথে। কিন্তু আর না পেরে জ্বালা জুড়িয়েছে। বাচ্চাগুলো মরা মা'র চার পাশে ক্ষিদের চোটে ঘুরছে। একটা বাচ্চার বয়স ছয়। মিশনারী জিজ্ঞেস করে—

—বাপ?

—মরেছে—ওলাউঠায়।

—মা?

—মরেছে—না খেয়ে।

—তুই?

—তিন দিন খাইনি।

এ মা সেদিনও আনন্দমঠের পৃষ্ঠায়। 'বন্দে মাতরম্' আওয়াজের বদলে কংগ্রেসের নেতারা সেদিন কলকাতায় বিভম জোয়ার কাটাচ্ছিলেন হিপ্‌-হিপ্‌-হুররে রবে। হিন্দু সেদিন মত্ত—বিলেত-ফেরত বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির থেকে তাড়াতে। আর মোছলমান মত্ত নয়া নবাব সলিমুল্লার ইঙ্গিতে মা-বোনকে বেইজ্জত করতে।

আমরা তা রোধ করেছি সবল মুষ্টিতে—অকুতোভয়ে মহাবীর্য্যে। বিপ্লবীদের মহানায়ক আশা দিচ্ছিলেন—মা'র প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবেই তোমাদের দিয়ে—উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—"One vision I see clear as life before me, that the Ancient Mother has awakened once more, sitting on hir throne rejuvenated, more glorious than ever"—আমরা তা বিশ্বাস করেছিলাম। বিশ্বাস করেছিলাম বলে পদ্মার

তটে তটে হিন্দু ও মুসলমান নর ও নারী আমাদের প্রেরণা দিচ্ছিল। ওরা আমাদের হাতিয়ার খেলা শেখাল, ওদের সুখ-দুঃখের কাহিনী বলে আমাদের পাগল করল। মজা-নদীর দু'ধারে অরণ্যে পরিণত ওদের ক্ষেতি গাঁগুলোর রূপ বদলে দেব বলে স্পর্দ্ধা আমাদেরও হয়েছিল বৈ কি!

তার পর?

ইংরেজের শেকল! ঠাণ্ডি গারদে কত রাত কেটে যায়। গভীর নিশীথে পিঞ্জরের কয়েদীরা সুর করে রোল কল করে যায়—এক দো তিন চার···আর আমরা ভাবি আর কাঁদি। ডাকি মাকে। প্রাণ মন্থন করে প্রার্থনা জানাই—

কারাপাষাণ-ভেদি জাগো! নারায়ণ!

হুঁ! নারায়ণ জেগেছিল। কারা-প্রাচীর ভেঙ্গে আমাদেরই আহ্বানে দলে দলে হিন্দু ও মুসলমান বেরিয়ে এসেছিল সুশৃঙ্খল পাদক্ষেপে—হাতে নিয়ে হাতিয়ার। ইংরেজ তাদের সম্মুখীন হতে গেছল, পারেনি। আমাদেরই আহ্বানে ঐ পদ্মার তটে তটে কৃষাণরা মাথা তুলেছিল। কুঠিয়াল ইংরেজ মাত্র নয়, আমাদের কংগ্রেসী নেতারাও চমকে গেছল।

আজ কৃত্রিম মহাপূজার অভিনয়ের দিনে সে সব কথা মনে পড়ে স্বতঃই।

তার পর কেটে যায় ২৫ বছর। উন্নত বাংলার জনসাধারণের দিকে আর কেউ চাইল না। জাতের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা ক্রমে বেড়ে চলে। ফিউডাল লর্ডদের প্রেতরা শত সরিকে বিভক্ত বাস্তুভিটার ভাঙা মণ্ডপে মাটির পুতুল পূজো করে এসেছে কোন মতে। কিন্তু আমার বৃত্তিহীন নবশাক সম্প্রদায়, ভূমিহীন মুসলমান চাষী তাতে যোগ দিতে পারেনি।

আবার ওদের ডাকবার সময় এসেছিল ইংরেজ চলে যাবার পর। ওরা আমাদের বিশ্বাস কিন্তু আর করল না। নতুন রাষ্ট্র পেয়েছে বলছে দুঃখে-কষ্টে চাষীর এই রাষ্ট্র কায়েম করে ওরা দানা-পানির সুব্যবস্থা করবে আশা করছে।

তাই আবার দেখতে গেছলাম। শিউলি তেমনি ফুটে ফুটে চণ্ডীমণ্ডপগুলোর পাশের গাছতলা সাদা করে ফেলেছে। মণ্ডপে পূজারীও নেই; প্রতিমাও নেই। রাজধানী শ্মশান। যারা পূজো করত তারা পালিয়েছে। ঢাকায় প্রায় দু'শো প্রতিমার পূজো হ'ত। এবার ৫০টাও হবে না, সর্ব্বজনীন ত নেই-ই। পূজোর ছুটিতে সবাই গাঁয়ে ফেরে, এবার যেন কালা-অশৌচ! যে সব যায়গায় ভয়ে ভয়ে পূজা হয়েছে, সেখানে ২।১ জন কোন মতে গিয়ে কোন রকমে দায় সেরে এসেছে। বিক্রমপুরের গ্রামগুলোতে প্রায় হিন্দু নেই। নশঙ্কর গাঁয়ের সর্ব্বজনীন পুজোয় মুসলমানরাও পূজা-ঘরে প্রবেশ করেছিল। উয়ারীর পুজোয়, আরও দুই-একটি বড় পুজোয়, ময়মনসিংএর আঠারবাড়ীর পূজোয় মুসলমানরা হিন্দুদের অভিভাবক মনে করে পূজোর তত্ত্বাবধান করেছে।

এই একই অবস্থা প্রায় সব জায়গায়। পদ্মার তটবর্ত্তী সহরগুলোয় সারা রাত যে বাইচ খেলা হত আর তটে তটে যে মেলা বসত, তা হতেই মনে হত শারদীয়া উৎসব রাঢ়ের উৎসব নয়। সেই একশ' হাতি ছিপ আর একশ' বৈঠার যুগপৎ 'ঝুপ'—আর মুসলমান ও নমঃশূদ্র জোয়ানদের নৌ-প্রতিযোগিতা—ভারতের কোথাও তা কল্পনাও করতে পারে না। তার সাথে বঙ্গের ঢাকীর বিরাট ঢাকের রকম রকমের বোলের প্রাণ-মাতান ধ্বনি—এ ছিল আমাদের কিশোর জীবনের মহা আনন্দ। এবার তার চিহ্ন কোথাও দেখলাম না। সন্ধ্যার আগেই অনুৎসাহ—শোকার্ত্ত পূজকদের পুলিশ-পাহারায় শোভাযাত্রা—সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিসর্জ্জন।

আর বিসর্জ্জনের পর? নীরবে সজল নয়নে কোলাকুলি। বাস্তুজননীর দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলা। তার পর তালা-চাবি লাগিয়ে ভিটা-ত্যাগ। যারা থাকে তারা কথা বলে না। জননী-ভগিনীরা দিনেই থাকে শঙ্কায়, সন্ধ্যা হলেই ত্রাস।

১৯১৬তে যা হয়েছিল, ১৯২৪শে যা হয়েছিল, তেমনি এবারও ওরা অবশিষ্ট প্রতি পরিবার থেকে ব্যাপক ভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কিশোর জোয়ানদের। একটু ধনী যারা, তাদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। হাটে পণ্য নেই, হাঁড়িতে অন্ন নেই, রাতে বাতি জ্বলে না—কেরোসিন মিলে না, দেশলাই বার পয়সা, সরষের তেল সাড়ে ৪ টাকা সের। যারা সংস্থান করতে পারছে তারা পুঁটলি-পাটলা গুটিয়ে ভিটে ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করছে। যারা পারছে না, তাদের ঘরে ঢুকে ওরা তল্লাস করছে হাতিয়ারের—অপবাদ দিচ্ছে, এরা পঞ্চম-বাহিনী। অনেক জায়গায় এমন অবস্থাও দেখলাম, যেখানে হিঁদুরা বলছে, এর চাইতে মুসলমান হওয়াও ভাল। ঢাকার কেরাণীগঞ্জ থানার সুভড্যার জেলেদের ঘর-বাড়ী লুঠে নিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাদের প্রায় ১৫০ জন ঢাকায় সরকারী কুড়ে বেঁধে রেখেছিল। বিজয়া দশমীর দিন পুলিশ এসে কুড়েগুলো ভেঙ্গে ফেলে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে।

তবু বলতে হচ্ছে আরামে আছি। যাদের জন্যে এ জন্মটা আমরা বিলিয়ে দিয়েছিলাম, তাদের আর আমরা বাঁচাতে পারছি না। তারা আজও দেয় প্রেরণা। কিন্তু পেশী আজ শিথিল—দেহ ও মন অতি-ক্লান্ত—পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন কল্পনাতীত! সেকালের ভারত আমাদের ঘেন্না করত, একালের ভারতও আমাদের ঘেন্না করছে। নয়া কিশোর মাথা তুলছে না। অন্ন আজ তুচ্ছ, পতাকা বড়। মানুষ হয়ে যারা আজ রাষ্ট্রের গদিতে বসেছে আমাদেরই শবসাধনায়, তারা আমাদের আদর্শকে সন্দেহ করছে।

তবু আজ যারা পদ্মার তটের বুকে পড়ে আছে, আর পড়ে মার খাচ্ছে, হয়ত তারাই জয়ী হবে। ব্যস্ত হলে চলবে না।

আশ্চর্য্য অভ্যর্থনা

ব্যবহার বশতঃ নানাবিধ কুৎসিত ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির নিকটে সমাদরণীয় হইয়াছে। নিম্নলিখিত আচরণ যাহা আমাদিগগের পক্ষে ব্যঙ্গ বোধ হইবেক তাহা তিব্বত জাতি মধ্যে সুসভ্যাচরণ রূপে গণ্য হইয়া থাকে। পাদরি হক সাহেব তাঁহার রচিত "চীন ও তাহার দেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত" গ্রন্থে লেখেন যে "উত্তর তিব্বত দেশীয় মনুষ্যেরা পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে অভ্যর্থনা বিধায়ে উভয়েই বাম হস্তে আপন আপন বাম কর্ণ ধারণ করত দক্ষিণ হস্তে মস্তক কণ্ডুয়ন করে, ও আপন আপন জিহ্বা নিস্কৃত করিয়া পরস্পর দেখায়।—বিবিধার্থ-সংগ্রহ, ৪র্থ সংখ্যা।

রাস্তার ধারেই পড়বার ঘর। সেই ঘরের রাস্তার দিকের দু'টো জানলা খুলে আমরা দুই ভাই বসে আছি—পথের দিকে চোখ ও মন খুলে। একটু আগেই শিশি-বোতল বিক্রিওয়ালার কাছে এক সের ষ্টেটসম্যান পত্রিকা দু-আনায় বেচে দু'-পয়সায় দু'টা কালো জাম কিনে এক-এক জন তিনটে করে খেয়ে দেহ ও মন পরিতৃপ্ত। এ কালো জাম গাছে ফলে না, ফলে ময়রার দোকানের এক রকম ছানার পান্তুয়া-গোছের জিনিষ। পান্তুয়াকে একটু বেশী ভেজে ওপরটা কালো করে রসে চোবানো হয়—আজকাল সে দ্রব্যটির আর দেখা পাওয়া যায় না।

বাকি দু'টো পয়সা হাতে নিয়ে বসে আছি—লজঞ্চুসওয়ালাকে দিতে হবে, তার কাছে ধার করে লজঞ্চুস খাওয়া হয়েছে। ধারের কথা জানতে পারলে বাড়ীতে একেবারে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

রাস্তার ধারে বসে আছি—গ্রীষ্মের দুপুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে। বাড়ীতে গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম চুকে গেছে। মা-রা সব ঘরে গিয়ে শুয়েছেন। দুপুর বেলা একটু শব্দ কোথাও হবার জো নেই—রাতে ঘুম হোক্ বা না হোক, দিনে ঘুমের ব্যাঘাত হলে অনর্থ হবে। আমাদের চলা-ফেরা, অকার্য ও কার্যালাপে একটু শব্দ হলেই তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় অথচ পার্শ্বে শায়িত শিশুর চীৎকারে পাড়ার লোক বিরক্ত হয়ে গাল পাড়তে থাকে তবুও তাঁদের নিদ্রা ভাঙে না। আমাদের অপরাধে ঘুম ছুটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ইস্কুলের কর্তৃপক্ষকে অভিসম্পাত দিতে থাকেন—গর্মির ছুটির জন্য। বোধ হয়, তার ফলেই ইস্কুল-মাষ্টারদের দুঃখ-দুর্দশা আজও ঘুচলো না।

রাস্তার দিকে চেয়ে বসে আছি দুই ভাইয়ে—ঐ অনাথের মা বুড়ী স্নান করে ভিজে-কাপড়ে চলে যাচ্ছে। অনাথের মাকে পাড়ার ছেলে-বুড়ো সবাই চেনে। এ পাড়ায় প্রায় সব বাড়ীতেই সে কাজ করেছে, প্রায় পঞ্চাশ বছর এ পাড়াতেই তার কাটল। কোমর ভেঙে গিয়েছে তবুও আজও তাকে খেটে খেতে হচ্ছে। তার বাড়ী সেই গড়পারের কোন বস্তীর মধ্যে। এখন গিয়ে সে রান্না-বান্না করে খাবে, তার পরে আবার বেলা চারটে বাজতে না বাজতে কাজে এসে লাগতে হবে। আবার রাত্রি আটটা-ন'টায় বাড়ীতে গিয়ে রান্না করে খেয়ে-দেয়ে শোবে। অনাথের মা বলে সবাই তা'কে ডাকে বটে, কিন্তু অনাথ তার ছেলে নয়—তার এক বোন-পোকে সে মানুষ করেছিল, তার নাম ছিল অনাথ। সে-ও মরে গেছে শৈশবে, পঞ্চাশ বছর আগে. কিন্তু আজও লোকে তাকে অনাথের মা বলে ডাকে।

অনাথের মা কিছু দিন আমাদের বাড়ীতেও কাজ করেছিল, কিন্তু কাজের ঠেলায় পালাতে পথ পায়নি। সে সময়ে অনাথের অনেক গল্প সে আমাদের কাছে বলত। কেমন সুন্দর দেখতে ছিল সে, সে তাকে মা বলে ডাকৃত—সেই ডাক এখনো তার কানে লেগে রয়েছে। এক দিন রাতে তার জ্বর হয়েছিল—রাত দুপুরে অনাথ তার গায়ে হাত দিয়ে বলেছিল—মা, তোর জ্বর হয়েছে।

অনাথ সম্বন্ধে এই গল্পটি অনেক বার সে আমাদের কাছে করেছে আর প্রতিবারেই তার চক্ষু সজল হয়েছে, গলা ধরে গিয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগে মরে-যাওয়া অচেনা অনাথের দুঃখে আমাদেরও কণ্ঠরোধ হয়েছে, আমাদের গল্পের আসর ভেঙে গিয়েছে।

অনাথের মা চলে গেল। বসে আছি লজঞ্চুসওয়ালার আশায়। দু-পয়সা শোধ দিয়ে আবার দু'-পয়সার লজঞ্চুস খাব—ঐ যায় রিপুকর্ম্মওয়ালা—রোগা, একেবারে হাড়গোড় বার করা, সুরে পড়া। সুরে গোঁঙিয়ে গোঁঙিয়ে চলে যায় রি-পু-কম-মও, দূর থেকে শুনতে লাগে যেন—কি-কু-ম্-মও।

দূরে গলির মোড়ে লজঞ্চুসওয়ালার পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ল্যাঞ্চেনচুস্—ল্যাঞ্চস—

তড়াক্ করে বেরিয়ে গিয়ে রকে দাঁড়ান গেল। লজঞ্চুসওয়ালা কাছে আসতেই ইসারায় তাকে ডেকে আমরা ভেতরে ঢুকে গেলুম। আমাদের দ্বিপ্রাহরিক গৃহবিধির সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। সে বাড়ীর সামনে এসে হাঁক-ডাক থামিয়ে কিছুক্ষণ এদিক্-ওদিক্ দেখে টপ্ করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে পা টিপে-টিপে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকৃত, আমরা দরজাটা বন্ধ করে দিতুম। এত সাবধানতার কারণ এই যে, কোনো রকম শব্দ হলে ওপরওয়ালাদের ঘুম ভেঙে যাবে—যার ফলে আমাদের নানান অসুবিধা, এমন কি বিপদ-আপদ ঘটবার সম্ভাবনাও ছিল। ঘরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে দেনা-পাওনার কথা হোতো, তার পরে লজঞ্চুস খেতে খেতে গল্প চলত। বলা বাহুল্য, এক ভাগ লজঞ্চুস তারও প্রাপ্য ছিল। সব দিনই তাকে ভেতরে আনবার সুবিধা হোতো না, মধ্যে মধ্যে রাস্তা থেকেই তাকে বিদেয় দিতে হোতো।

এই লজঞ্চুসওয়ালা ছিল আমাদের বন্ধু। আমাদের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক ব্যবধান ছিল বটে, কিন্তু এই মিলনের সৌত্য করেছিল আমাদের কৈশোর আর তার দিকে ছিল প্রাণৈশ্বর্য।

সে ছিল মুসলমান। বিহারের কোন এক জেলায় তাদের বাড়ী ছিল, কিন্তু দেশের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই—অনেক দিন থেকে তারা ব্যারাকপুরে বাস করছে। তার আপনার জন বলতে কেউ নেই। তার বড় বোনের স্বামী ব্যারাকপুরের কাছে কোন এক কলে কুলীগিরি করে, সেই সূত্রেই ওখানে বাস। বড় বোনও বেঁচে নেই, ভাগনীপতি আবার বিয়ে করেছে, এ বৌয়ের ছেলেপুলেও হয়েছে। ঐখানেই সে থাকে, কারণ, তাদের ওপরে মায়া পড়ে গিয়েছে, ছাড়তে পারে না। বছরের মধ্যে কয়েক মাস সে-ও কলে কাজ করে। বাকী কয়েক মাস লজঞ্চুস বিক্রি করে কলকাতায়। রোজ বেলা ন'টা-দশটার সময়ে ট্রেণে চড়ে আসে এখানে আর রাতের ট্রেণে ফিরে যায়। রামবাগানে কোথায় দিশি লজঞ্চুসের কারখানা আছে, সেখান থেকে পাইকারী দরে মাল খরিদ করে।

তার নাম ছিল মুখিয়া। মুখিয়া মানে সর্দার। কিন্তু পৃথিবীর

প্রভাত-সঙ্গীত

মহাস্থবির

কোনো দেশের মনুষ্য জাতি অথবা সম্প্রদায়ের সর্দার হবার মতন গুণ বা চেহারা তার ছিল না। অবিশ্যি এ জন্ত তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। মানুষের নাম অতি অল্প ক্ষেত্রেই গুণবাচক হয়ে থাকে। দেখা যায়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নামের গুণাবলীর সঙ্গে মানুষের অহি-নকুল সম্পর্ক দাঁড়াতে থাকে। নামকরণ সংস্কারটি মানুষের মৃত্যুর পরই হওয়া উচিত।

আমরা তখন বালক হলেও মুখিয়ার চাইতে মাথায় উঁচু ছিলুম। বামনের মতন মুখখানা অস্বাভাবিক রকমের বড় হলেও তাকে ঠিক বামন বলা চলত না। তার রং ছিল কালো। কিন্তু বাপ রে, সে কি কালো! ডান দিকের মাথার মাঝখান থেকে আরম্ভ করে একেবারে চিবুক অবধি পোড়া! এতখানি জায়গা একেবারে মসৃণ ও চকচকে এবং তার মাঝে মাঝে সাদা দাগ, ধবলের মতন—অমাবস্যার অন্ধকার আকাশে যেন তারা ঝকঝক্ করছে। পুড়ে যাওয়ার ফলে ডান চোখের কোণটা যেন টেনে ধরা হয়েছে গোছের, আর চোখের তলার দিকের লালটা বেরিয়ে এসেছে—যেন দগদগে ঘা। ডান দিকে মাথায় চুল, ভুরু, গোঁফ কিংবা দাড়ি এক গাছিও নেই। বাঁ দিকের মাথায় চুল এবং ভুরু আছে বটে, কিন্তু দাড়ি এখানে দু'টি ওখানে চারটি—গোঁফও সেই রকম। এক দিক্‌কার দাড়ি-গোঁফ চেঁচে ফেলে তাকে ভদ্র হতে বললেই সে তার সেই কয়েক গাছা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলত—ওরে বাবা, তা হয় না—আমি নেমাজী লোক, দাড়ি ফেলতে পারি কখনো? বয়স ছিল তার ত্রিশের ওপর। একবার কল্পনা করুন সেই চেহারাখানা। কিন্তু সেই কুৎসিতের মধ্যে বাস করত একটি সুন্দর প্রাণ।

মুখিয়া মাসে প্রায় পনেরো-ষোলো টাকা রোজগার করত, কিন্তু তা থেকে নিজের সম্ভোগের জন্ত একটি পয়সাও খরচ করত না, সব ভগিনীপতির হাতে তুলে দিত। সে বলত—ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েগুলোকে বড় ভালবাসি তাই তাদের ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারি না। নইলে এত বড় দুনিয়ায় কি থাকবার জায়গার অভাব আছে?

অথচ তারা তার নিজের বোনের ছেলেপিলে নয়। তার ভগিনীপতির দ্বিতীয়া স্ত্রীও তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত না। সে মুখিয়াকে 'পোড়ারমুখো' বলে ডাকত।

আমরা বলতুম—তুই কিছু বলতে পারিস্ না!

মুখিয়া বলত—কি আর বলব! সত্যিই তো আমার মুখ পোড়া!

এই সবের জন্ত তাকে আমাদের বড় ভাল লাগত ও পরে সেই আকর্ষণ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। তার সঙ্গে কেমন করে বিচ্ছেদ হোলো সেই কাহিনীটাই বলি।

আমাদের সেই দ্বিপ্রাহরিক আড্ডাটা সেবার গরমের ছুটির সময় খুবই জমে উঠেছিল। মুখিয়া ছাড়াও লজঞ্চুসের লোভে লোভে পাড়ার আরও দু'টি তিনটি ছেলে এসে রোজ জমতে লাগল সেখানে। বাড়ীর কেউ জানে না, খুবই সন্তর্পণে আড্ডাধারীরা যাওয়া-আসা করে। আমরা দুই ভাই বাড়ীর মধ্যে উচ্চহাসির জন্ত কুখ্যাত ছিলুম, কিন্তু আড্ডা ধরা পড়বার ভয়ে সে সময়টা আমরা প্রাণপণে হাসি সামলে রাখতুম। একটি ছেলে ছিল, সে ভারি মজার মজার সব গল্প ও কাহিনী বলতে পারত। সেই বয়সেই গল্প বলবার বেশ একটা চাল সে আয়ত্ত করেছিল। মাঝে মাঝে তার গল্প শুনে হাসি সামলাতে না পেরে আমরা মুখে কাপড় ঠেসে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে প্রাণ খুলে হেসে আসতুম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, সে নিজে একটুও হাসত না বরং আমাদের মুখের দিকে এমন জিজ্ঞাসু ভাবে চাইত যে মনে হোতো সে বলছে চায়—কি রে, হাস্‌চিস কেন—এতে হাসবার কি আছে রে?

মুখিয়া ভাঙা-ভাঙা বাংলা জানত বটে, কিন্তু সব কথার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সে সব সময়ে ধরতে পারত না—আমাদের হাসতে দেখে সে হাসবার চেষ্টা করত মাত্র।

সেদিন সেই ছেলেটি একটা মজার গল্প বেশ জমিয়ে বলছিল, এমন সময় গল্পের মাঝখানেই হঠাৎ মুখিয়া তারস্বরে চীৎকার করে উঠল—ঠিক বাচ্ছা গাধার মতন।

হঠাৎ তার সেই চীৎকার শুনে আমরা তো ভড়কেই গেলুম কিন্তু একটু পরেই টের পাওয়া গেল যে সেটা তার হাসি।

হাসি আর থামে না। আমরা যত বলি, এই মুখিয়া, চুপ কর—চুপ কর ভাই, মা উঠে পড়বেন—

আর চুপ কর! একটা দম দেওয়া কলের মতন মুখিয়া সেই ভাবে গাধার ডাক ছেড়ে চলল। হাসির সময় তার মুখের চেহারা হয়ে উঠল একেবারে বীভৎস। তার মুখের সেই পোড়া দিক্‌টা কি রকম কুঁকড়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়া চোখটা যেন আরও ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল। কিছুতেই তাকে থামাতে পারি না। ওদিকে মা'র ঘরের দরজা খুলল, তাকে তাড়াতে চেষ্টা করতে লাগলুম কিন্তু কে কার কথা শোনে! হাসির ধমকে সে-সব কথা সে বুঝতেই পারলে না। ইতিমধ্যে মা এসে আমাদের দরজা খুলে দাঁড়াতেই মুখিয়ার হাসি গেল থেমে। হাসি থাম্‌ল বটে কিন্তু মুখখানার অবস্থা সেই রকমই বেঁকে-চুরে তুবড়ে রইল।

মা বোধ হয় প্রথমে মুখিয়াকে দেখতে পাননি। ঘরে ঢুকে সেদিকে চোখ পড়তেই তাকে দেখে চম্‌কে—এটা কে রে! বলে এক পা পিছিয়ে গেলেন।

মুখিয়া ততক্ষণে তার লজঞ্চুসের ডালাটা সামলে নিয়ে মাকে ছোট একটা সেলাম করে সরে পড়ল—তার পেছন পেছন পাড়ার অন্ত দু'টি ছেলেও সরে পড়ল। হাঙ্গামার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্ত আমরাও তখনকার মতন চিলের ছাতে উঠে আত্মগোপন করলুম।

বাবা আপিস থেকে ফেরবার পর বিকেলে একটা খোলা বারান্দায় মাদুর পেতে রোজই আমাদের এক পারিবারিক বৈঠক বসত। বাড়ীতে কয়েক জন মহিলা থাকতেন, তাঁরা আমাদের সংসারেরই লোক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের মুখের ওপরে চোপরা করা অথবা প্রকাশ্যে তাঁদের সম্বন্ধে কোনো রকম অসম্মানকর মন্তব্য করলে আমাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হোতো। প্রাত্যহিক এই পারিবারিক সভায় তাঁরাও উপস্থিত থাকতেন। এইখানে প্রতিদিনই—বাবা আপিসে চলে যাবার পর এতক্ষণ পর্যন্ত—অর্থাৎ যতক্ষণ আমরা তাঁর চোখের আড়ালে ছিলুম—আমরা কি করেছি, অর্থাৎ কেমন ভাবে দিন কাটিয়েছি, তার একটা কৈফিয়ৎ পেশ করতে হোতো। বলা বাহুল্য, রোজই আমরা বলতুম, এগারোটা থেকে চারটে অবধি লেখাপড়া করেছি—প্রমাণ-স্বরূপ, হাতের লেখা,

অঙ্ক কষা প্রভৃতি তিনি রোজই নিয়ম মত দেখে তাতে সই করে দিতেন।

সেদিন আসরে ডাকের ধরণ দেখেই বুঝতে পারলুম, আজ বরাতে কিছু দক্ষিণা আছে।

আসরে উপস্থিত হতেই বাবা গম্ভীর সুরে বললেন—বোসো।

একটু নিরাপদ ব্যবধানেই গুটি-সুটি হ'য়ে বসে পড়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই সনাতন প্রশ্ন—আজ তুপুরে কি কি করলে?

যদিও জানতুম যে, আজ তুপুরের কাহিনী বেশ পল্লবিত হয়েই তার কানে পৌঁছেচে তবুও বুক ঠুকে সেই সনাতন উত্তরই দিয়ে চললুম—এগারোটা থেকে পৌনে বারটা অবধি অঙ্ক কষেছি, পৌনে বারোটা থেকে পৌনে একটা অবধি ভূগোল পড়েছি, পৌনে একটা থেকে একটা অবধি ম্যাপ দেখেছি—

আর বেশী অগ্রসর হবার আগেই একটি মহিলা বলে উঠলেন—ম্যাপ দেখেছ না ছাই দেখেছ!

তার পরে বাবার দিকে চেয়ে তিনি বলতে লাগলেন—সারা দিন খালি হুল্লোড়, হাসি, আড্ডা, গল্প এই তো চলে দেখছি, পড়ে কখন তা তো জানি না।

সঙ্গে সঙ্গে আর এক জন সুরু করলেন—তুপুর বেলা ওদের অত্যাচারে চোখের পাতাটি বোজবার যো আছে! হৈ-হৈ চলেইছে!

আর এক জন মন্তব্য করলেন—এই বয়সে এত বন্ধুই বা এদের জোটে কি ক'রে তাই ভাবি। রাজ্যের লোকের সঙ্গে গলাগলি!

এবারে মা বললেন—আর সে সব বন্ধুর চেহারাই বা কি!

বাবা বললেন—সারা দিন হি হি হি হি আর হো হো হো হো ক'রে ক'রে নিজেদের যে রকম চেহারা হয়েছে, বন্ধু-বান্ধবও তো জুটবে সেই মেকদারের—

যা হোক্, সেদিনকার সভায় ঠিক হয়ে গেল যে তুপুর বেলা আমাদের সায়েস্তা রাখবার এক জন জবরদস্ত শিক্ষক রাখা হবে, আর সকাল-সন্ধ্যের জন্য বাবা তো আছেনই। তাঁর সন্ধানে এমন লোক আছে এ কথা তিনি সভাক্ষেত্রে প্রকাশ করলেন।

পরের দিন তুপুর বেলায় আড্ডায় তুঃসংবাদটি প্রকাশ করা গেল। মুখিয়াকে বললুম—বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে একবার তু'বার 'ল্যাবেঞ্চুস' বলে হাঁক দিলেই আমরা বেরিয়ে আসব।

দিন তুই বাদে আমরা তুপুরের মাষ্টার মশায়কে দেখলুম। আফিস থেকে ফেরবার সময় বাবা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। বেশ চেহারা, দিব্যি ভদ্র অমায়িক ভাব। আমাদের তুই ভাইয়ের গাল টিপে-টিপে আদর ক'রে বললেন—এরা তো বেশ ছেলে! আপনি যে রকম বললেন দেখে তো তা মনে হয় না।

বাবা একটু হেসে বললেন—এক একটি বর্ণচোরা। তু'-দিনেই পরিচয় পাবেন।

ঠিক হয়ে গেল কাল তুপুর থেকেই তিনি আমাদের গুরুভার গ্রহণ করবেন।

সেদিন রাত্রি বেলা আমাদের পড়াতে-পড়াতে বাবা বললেন—আমি মাষ্টার মশায়কে বলে দিয়েছি, তোমাদের প্রাণে মেরে ফেললেও আমি তাঁকে কিছু বলব না, অতএব সাবধান হয়ে চোলো।

প্রাণধারণের উপকরণগুলির তুর্মূল্যতার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ জিনিষটি আজকাল যে রকম সুলভ হয়ে উঠেছে সে যুগে তা ছিল না, কাজেই আত্মরক্ষার তাগাদায় সাবধান হবারই সংকল্প করতে লাগলুম মনে মনে।

ছুটির সময় তুপুর বেলা এই রকম সাজার ব্যবস্থা হওয়ায় আমরা বাড়ীশুদ্ধ সবার ওপরে হাড় চটে গেলুম; আমরা যে রকম সন্তর্পণে কথা বলতুম, চলতুম এবং যে রকম সাবধানতার সঙ্গে দরজা খোলা ও বন্ধ করা হোতো তাতে কারুরই কখনো ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া উচিত নয়। অবিশ্যি এক দিন মুখিয়া তার অদ্ভুত হাসি হেসে সবাইকে চমকে দিয়েছিল স্বীকার করি। অদ্ভুত রসে চমক লেগেই থাকে—সেটা তাঁরা সহজেই উপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তা না ক'রে বাড়ীশুদ্ধ সকলেই একবাক্যে রায় দিলেন যে তুপুর বেলা আমাদের অত্যাচারে কোনো দিনই তাঁরা ঘুমুতে পারেন না! কি ক'রে তাঁদের সেই আরামের দ্বিপ্রাহরিক সুখস্বপ্নটির ব্যাঘাত জন্মাতে পারা যায়, তারই পরামর্শ আঁটতে লাগলুম তুই ভাইয়ে।

পরের দিন তুপুর বেলা এগারোটা বাজতে না বাজতে মাষ্টার মশায় এসে হাজির হলেন। এগারোটা থেকে চারটে অবধি কবে কখন কি পড়া বা লেখা হবে প্রথমেই তার একটা রুটিন তৈরী হোলো, তার পরে আসল পড়া সুরু হোলো।

পড়তে লাগলুম মনে মনে। কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থেকে মাষ্টার মশায় বললেন—চেঁচিয়ে পড়, তা না হোলে আমি বুঝব কি ক'রে যে তোমরা পড়ছ না ফাঁকি দিচ্ছ। চেঁচিয়ে পড়ার আর একটা মস্ত সুবিধা এই যে, যা পড়বে সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ হয়ে যাবে।

ব্যস্! আর বলতে হোলো না, সঙ্গে সঙ্গে হদিশ লেগে গেল। সেই থেকে সুরু ক'রে বেলা চারটে অবধি আমরা এমন চেঁচিয়ে পড়লুম যে বাড়ীশুদ্ধ লোকের ঘুম তো দূরের কথা, ডাকাত পড়েছে মনে ক'রে কুকুরগুলো পর্যন্ত ঘেউ ঘেউ ক'রে ওপর-নীচ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

যথাসময় মাষ্টার মশায় চলে গেলেন। তাঁর মুখ দেখে বেশ বুঝতে পারা গেল যে আমাদের পড়া মুখস্থ করার আগ্রহটি তিনি ভালো ভাবে গ্রহণ করেননি।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দেখলুম, সবারই মুখ বেশ গম্ভীর—বুঝলুম ওষুধ লেগেছে।

দিন কতক এই রকম চলল—কিন্তু কাঁহাতক রোজ পাঁচ ঘণ্টা ক'রে চেঁচানো যায়, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পেটে ও কোঁকে ব্যথা ধরে গেল। তার ওপরে দিনে ঘুমানো যাদের অভ্যেস, তারা ইঞ্জিন তৈরির কারখানায় পড়েও দিব্যি ঘুম লাগাতে পারে, তু'-এক দিন একটু কষ্ট হয় মাত্র।

বাড়ীতে দিন কয়েক মিস্ত্রি খেটেছিল। উদ্‌বৃত্ত বিলিতী মাটি বালি, চুণ ইত্যাদি বাড়ীর এক জায়গায় যত্ন ক'রে রেখে দেওয়া হয়েছিল, ভবিষ্যতের জন্য। এর কাছেই মিস্ত্রিদের ছোট-বড় কর্ণিক ইত্যাদি সব জড় করা ছিল। মিস্ত্রিদের কাজ ও সরঞ্জাম দেখতে দেখতে আমাদের স্থপতি-প্রতিভা মাথা-চাড়া দিলেন—ঠিক করা গেল, একটি ছোট বাড়ী তৈরি করতে হবে।

ক'দিন ধরে ছোট-বড় দেশলাইয়ের মধ্যে এঁটেল মাটি পুরে সেগুলোকে রোদে শুকিয়ে একরাশ ইট ও টালি তৈরি করা হোলো। এক দিন রাত্রে আমাদের শোবার ঘরের এক কোণে মেজে খুঁড়ে বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করা গেল। সকাল বেলা বাড়ীর চারি দিকে

লোক-জন চলাফেরা ইত্যাদি নানা ব্যাঘাতে কাজ তেমন অগ্রসর হোলো না। ঠিক হোলো দুপুর বেলা পড়বার সময় এক-একবার এক এক জন ক'রে উঠে এসে কাজ করা যাবে।

যথা-সময়ে মাষ্টার মশায় এলেন। ওপরওয়ালীরা সব শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করবার পর আমি উঠে গিয়ে আধ ঘণ্টাটাক কাজ ক'রে ফিরে এলুম। ভায়া উঠে গেল তার পর, সে ফিরল প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে। এই রকম ক'রে দু'জনে বার দু'-তিন গিয়ে কাজ করা গেল। মনে হোলো, এই রেটে কাজ চালাতে পারলে পরের দিনেই একতলার কাজটা শেষ হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু হায় রে পরের দিন! সেদিনটায় তিথি-নক্ষত্রের যে কি সমাবেশ ছিল তা আজও ভাবি।

সেদিন মাষ্টার মশায় এসে বসতে না বসতে আমি উঠে গেলুম, কারণ সিমেণ্টটা মাখা হয়েছিল, দেরী হোলে আবার শুকিয়ে যাবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে একখানা বই হাতে নিয়ে ফিরে এলুম—অর্থাৎ মাষ্টার মশায় যেন মনে করে বই খুঁজতে দেরী হয়েছে। আমি কিছুক্ষণ বসতে না বসতে ভায়া উঠে গেল ও প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে এসে গুটিগুটি নিজের জায়গায় গিয়ে বসতে যাচ্ছে এমন সময় মাষ্টার চেঁচিয়ে উঠলেন ইংরেজীতে—You boy, come here.

ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে আমরা ভড়কে গেলুম। মাষ্টার মশায় আমাকেও ডাক ছাড়লেন ইংরেজীতে, ঐ সুরেই।

আমরা দু'-জনে তাঁর কাছে গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়ালুম। তিনি বললেন—কাল থেকে দেখছি পড়তে পড়তে উঠে যাচ্ছ—কোথায় যাও—এঁ্যা—

এই বলে, আমাদের উত্তরের জন্য আর অপেক্ষা না ক'রেই দু'-জনের মাথায় টাঁই-টাঁই ক'রে কয়েকটি শ্রীগাঁট্টা জমিয়ে দিলেন। উঃ, মাথা একেবারে চিড়্‌বিড়িয়ে গেল। যে কখনো মারে না তার হাতের আঘাতে লাগে বেশী, কারণ দেহ ও দেহাতীত দু'-জায়গাতে লাগে সে আঘাত।

যা হোক্, মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে তো নিজের জায়গায় এসে বসলুম। মাষ্টার মশায়ের রাগ তখনো পড়েনি। তিনি গর্জে-গর্জে বলতে লাগলেন—চারটের আগে এখান থেকে এক পা নড়েছ কি দেখবে মজা।

ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা সামনে খোলা পড়েছিল। মাথার যন্ত্রণায় মনে হোতে লাগল সমস্ত ভারতবর্ষের বুক জুড়ে সর্ষের ক্ষেত ভরে উঠেছে।

মাষ্টার মশায় আবার গর্জে উঠলেন—তোমাদের বাবা যে তোমাদের 'বর্ণচোরা' নাম দিয়েছেন তা ঠিকই দিয়েছেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনি।

নামকরণ করার ব্যাপারে বাবার প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের কোনো সন্দেহই ছিল না, কারণ আমাদের নামের জোড়া সেদিন জগতে দুর্লভ ছিল, আজও সুলভ নয়। তাই সেদিক দিয়ে না গিয়ে ভাবতে লাগলুম, পৃথিবীর অনেক লোকই বর্ণচোরা—যেমন আপনি একটি।

নানা রকম আবোল-তাবোল চিন্তা পাক খাচ্ছে মগজের মধ্যে, এমন সময় গলির মোড়ে আওয়াজ হোলো—ল্যা—বেন—চুওওস্—

মুখিয়ার কাছে এক পয়সা দু'-পয়সা ক'রে নেবার প্রায় চার আনা ধার হয়ে গিয়েছিল। ক'দিন থেকে পয়সার জন্য তাগাদা করায় সেদিন তাকে নিশ্চয় দিয়ে দেবার কথা ছিল—পয়সার জোগাড়ও হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কি ক'রে উঠে গিয়ে তাকে পয়সা দেওয়া যায়! ওদিকে মুখিয়া হাঁকতে হাঁকতে বাড়ীর সামনে এসে সাঙ্কেতিক ডাক ছাড়লে—ল্যাওনচোস্!

আমাদের ভাবান্তর দেখে মাষ্টার মশায়ের সজাগ দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হ'য়ে উঠল। ওদিকে মুখিয়া আরও দু'-তিন বার অতি বিনীত ভাবে ল্যাবেন-চোস্—ল্যাওনচোস্ বলে হঠাৎ বীরদর্পে চোওওস্ বলে এমন একটা হাঁক ছাড়লে যে দেশকালপাত্র ভুলে আমরা দু'জনেই হেসে ফেল্লুম।

আমাদের হাসতে দেখে মাষ্টার মশায় রেগে উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—হাসছ কেন?

ঠিক সেই মুখে ছুঁচোবাজীর চালে মুখিয়া আর এক হাঁক ছাড়লে—চোই ওঁই ওঁই ওঁই ও ও ওস্।

ব্যস্, আর যায় কোথায়! আর হাসি চাপা সম্ভব হোলো না, এবার আমরা জোরে হেসে উঠলুম।

আমাদের ধৃষ্টতা দেখে মষ্টার মশায় বললেন—আচ্ছা, তোমাদের কাঁদিয়ে ছাড়ছি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের ওপর এলোধাপাড়ি কীল, চড়, গাঁট্টা পড়তে লাগল। আমাদেরও কি রকম রোখ চেপে গেল—মাষ্টার মশায় যতই মারুন না কেন কিছুতেই হাসি থামাব না।

ওদিকে সেদিন যেন মুখিয়ার প্রতিভা খুলে গেল। সে অদ্ভুত রকমারি বাঁটকর্ত্তবে 'ল্যাবেঞ্চুস' শব্দটি হাঁকতে শুরু করে দিলে। মোট কথা, লজঞ্চুস্ চুষে চুষে উপভোগ করার বাণীমূর্ত্তি সে ফুটিয়ে তুলতে লাগল সেই তৃতীয় প্রহরের রোদে পথে দাঁড়িয়ে।

এদিকে মাষ্টার মশায় দুই হাতে বাজনা বাজাচ্ছেন আমাদের ওপর—চটাচট, পটাপট। মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে একই সঙ্গীত—কাঁদিয়ে তবে ছাড়ব। আর আমরা কাঁদতে কাঁদতে উচ্চস্বরে হেসে চলেছি হা হা, হো হো, হি হি—

এই অভূতপূর্ব কনসার্টের শব্দে বাড়ীর সবার দিবানিদ্রা ছুটে গেল, তাঁরা দুদ্দাড় ক'রে এক রকম ছুটেই নীচে নেমে আসতে লাগলেন। কিন্তু তখন দু-পক্ষই অর্ধক্ষিপ্ত। তাঁদের দেখে মাষ্টার মশায়ও হাত থাম্যলেন। আমরাও আগের মতনই হাসতে থাকলুম।

ইতিমধ্যে মা এসে ঘরে ঢুকলেন—উভয় পক্ষেরই ইজ্জৎ বাঁচল। মাকে দেখে মাষ্টার মশায় ও আমরা থেমে গেলুম। মা আমাদের বলতে লাগলেন—তোমরা বড় বাড় বেড়েছ! আচ্ছা হচ্ছে তোমাদের—

মা আরও কিছু যেন বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বাইরে একটা গোলমাল শুনতে পাওয়া গেল। অনেক লোকের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ও মধ্যে মধ্যে মুখিয়ার কান্নার আওয়াজ পাওয়া যেতে লাগল। অন্য সময় হোলে আমরা ছুটে বেরিয়ে যেতুম, কিন্তু মাথার ওপরে অত-বড় একটা অপরাধের বোঝা থাকায় তখনকার মতন উত্থান-শক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল।

গোলমাল উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। হঠাৎ যেন তারই মধ্যে বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। কি রকম হোলো তাই ভাবছি, এমন সময় মনে পড়ল আজ যে শনিবার।

আবার বাবার আওয়াজ ছোটে—মা আমাদের বললেন—দেখ তো, কি হয়েছে ?

বলা মাত্র তড়াক ক'রে বেরিয়ে গেলুম। বাইরে গিয়ে দেখি, সে এক বিরাট ব্যাপার! রাজ্যের লোক দাঁড়িয়েছে মুখিয়াকে ঘিরে। তার লজঞ্চুস রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে, কাঠের কাণা-উঁচু ডালাটাও এক দিকে পড়ে রয়েছে। মুখিয়ার হাত-পা ও মুখের স্থানে স্থানে ছ'ড়ে গিয়েছে—দু'চোখ দিয়ে জল ঝরছে, কিন্তু কান্নার শব্দ হচ্ছে না। করুণ সে দৃশ্য দেখে আমাদের চোখে জল বেরিয়ে এল। সেখানকার তর্কাতর্কি শুনে ব্যাপারটি যা বুঝলুম তা হচ্ছে এই—

পাড়ার গুটিকয়েক লোক ছিলেন বেকার। মুখিয়া না কি প্রতিদিন বীভৎস হুঙ্কার ছেড়ে তাঁদের দিবানিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়। এত দিন তাঁরা নীরবে তার এই অত্যাচার সহ্য ক'রে আসছিলেন, কিন্তু আজ না কি খুবই বাড়াবাড়ি করায় নিতান্ত সহ্য করতে না পেরে অসময়ে স্বপ্নাগার ছেড়ে এই রোদে তাঁরা বেরিয়ে পড়েছেন তাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে। অধ্যাপনার কার্যটি প্রায় সুসম্পূর্ণ হ'য়ে এসেছিল, এমন সময় বাবা এসে তাঁদের হাত থেকে মুখিয়াকে উদ্ধার করেছেন—এই সময় আমরা গিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

বাবা বলতে লাগলেন—ছি ছি, আপনারা কি মানুষ! এই পঙ্গুকে ধরে তিন-চার জনে মিলে মারতে একটু মায়া হোলো না আপনাদের ?

তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললে—মশায়, আপনি যা রাগী, আপনি হোলে মেরেই ফেলতেন ওকে।

বাবা চুপ করে আছেন দেখে আর এক ব্যক্তি বললে—আপনিও তো মশায় আচ্ছা লোক! পাড়ার লোকে একটা কাজ না হয় করেই ফেলেছে। আপনি কোথায় সেটা চেপে যাবেন, না উল্টে ওর হয়ে লড়াই শুরু করেছেন! আশ্চর্য!

তিনি কোনো জবাব দেবার আগেই আর এক জন বলে উঠল—ছেলেদের বন্ধু যে!

ভীড়ের লোকেরা হো-হো করে হেসে উঠল।

বাবা আর তাদের কথার কোনো উত্তর দেবার চেষ্টা না করে ছেলেদের বন্ধুর রূপখানি দেখতে লাগলেন। রূপ-তরাস কেটে গেলে মুখিয়ার একখানা হাত ধরে তাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

মুখিয়ার অবস্থা দেখে বাড়ীর সবাই দুঃখ করতে লাগলেন। মা তাকে জেরা করলেন—তুই এ বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে অমন করে চেঁচাচ্ছিলি কেন ?

তার পরে আমাদের দু'জনকে দেখিয়ে বললেন—নিশ্চয় এদের ডাকছিলি! বল, তোর কোনো ভয় নেই।

মুখিয়া বললে—চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চেঁচানোই আমার অভ্যেস—ওদের ডাকবার আমার কি দরকার!

মা বললেন—আমি জানি, এরা তোর কাছে ধার ক'রে লজঞ্চুস খায়—এদের কাছে কিছু কি পাবি ?

সঙ্গে সঙ্গে মুখিয়া প্রবল ভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—না না না, কিছু পাব না—ওরা আর ধারে খায় না।

এক গ্লাস জল চেয়ে নিয়ে খেয়ে মুখিয়া তার শূন্য ডালাটা বগলে নিয়ে চলে গেল।

মুখিয়া চলে যাবার পর এই ব্যাপার নিয়ে বাড়ীর সকলেই আলোচনা করতে লাগলেন। বাবা ও মাষ্টার মশাই দু'জনেই এই নিয়ে অনেক কথা বললেন। বাবা বললেন—কেউ কাকেও ধরে মারছে, এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারি না। বিশেষ করে সে ব্যক্তি যখন উল্টে মারতে পারবে না।

মাষ্টার মশায়ও দেখলুম এ বিষয়ে বাবার সঙ্গে একেবারে একমত।

সেদিন দিবানিদ্রার ব্যাঘাতের জন্য যাঁরা মুখিয়ার অঙ্গে ব্যথা দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই দিবানিদ্রা থেকে গভীরতর নিদ্রায় অপসৃত হয়েছেন—জানি না, আজও নিদ্রা ভেঙেছে কি না। মাষ্টার মশায় কিন্তু পরদিন থেকে আর এলেন না। সে জন্য দুঃখ নেই, কারণ মাষ্টারের অভাব জীবনে কোনো দিনই ভোগ করতে হয়নি, কিন্তু মুখিয়া আর এল না, যার অভাবে মনের একটা জায়গা আজও খালি হয়ে আছে।

[ক্রমশঃ।

এক দিন ছিলে তুমি

মৃণালকান্তি দাশ

যে প্রাণপুষ্পের মধু মৃত্যু এসে গেছে পান করে,
পুরানো পাতার মত যে দিন হাওয়ায় গেছে ঝরে
ইতস্তত বহু দূর দিক্‌হারা দক্ষিণে, উত্তরে—
বৈশাখের রৌদ্ররাগে ফুরায়েছে যে ফাল্গুন, ফুলের প্রহর—

জ্যোৎস্না, চাঁদ, নীল রাত, নক্ষত্র, নির্ঝর ভোরের আলোর।
সে দিনের পরিপূর্ণ গানখানি, রামধনু বর্ণ, মধু, মায়া
এখন তাহারা কোন বিগত দিনের গর্ভে ঝিমলিন ছায়া।
সেই সব আজ শুধু ছায়ার শরীর,—কোন দূর স্মৃতি বিস্মৃতির:

এক দিন ছিলে তুমি, অনুভব করিতেছি আজিকে তোমারে—
নিভন্ত প্রাণের রাতে, হৃদয়ের নির্জন তিমিরে॥

লোক-জন চলাফেরা ইত্যাদি নানা ব্যাঘাতে কাজ তেমন অগ্রসর হোলো না। ঠিক হোলো দুপুর বেলা পড়বার সময় এক-একবার এক এক জন ক'রে উঠে এসে কাজ করা যাবে।

যথা-সময়ে মাষ্টার মশায় এলেন। ওপরওয়ালীরা সব শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করবার পর আমি উঠে গিয়ে আধ ঘন্টাটাক কাজ ক'রে ফিরে এলুম। ভায়া উঠে গেল তার পর, সে ফিরল প্রায় ঘন্টাখানেক কাটিয়ে। এই রকম ক'রে দু'জনে বার দু'-তিন গিয়ে কাজ করা গেল। মনে হোলো, এই রেটে কাজ চালাতে পারলে পরের দিনেই একতলার কাজটা শেষ হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু হায় রে পরের দিন! সেদিনটায় তিথি-নক্ষত্রের যে কি সমাবেশ ছিল তা আজও ভাবি।

সেদিন মাষ্টার মশায় এসে বসতে না বসতে আমি উঠে গেলুম, কারণ সিমেন্টটা মাখা হয়েছিল, দেরী হোলে আবার শুকিয়ে যাবে। প্রায় ঘন্টাখানেক কাটিয়ে একখানা বই হাতে নিয়ে ফিরে এলুম—অর্থাৎ মাষ্টার মশায় যেন মনে করে বই খুঁজতে দেরী হয়েছে। আমি কিছুক্ষণ বসতে না বসতে ভায়া উঠে গেল ও প্রায় ঘন্টাখানেক কাটিয়ে এসে গুটি-গুটি নিজের জায়গায় গিয়ে বসতে যাচ্ছে এমন সময় মাষ্টার চেঁচিয়ে উঠলেন ইংরেজীতে—You boy, come here.

ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে আমরা ভড়কে গেলুম। মাষ্টার মশায় আমাকেও ডাক ছাড়লেন ইংরেজীতে, ঐ সুরেই।

আমরা দু'-জনে তাঁর কাছে গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়ালুম। তিনি বললেন—কাল থেকে দেখছি পড়তে পড়তে উঠে যাচ্ছ—কোথায় যাও—এ্যাঁ—

এই বলে, আমাদের উত্তরের জন্য আর অপেক্ষা না ক'রেই দু'-জনের মাথায় টাঁই-টাঁই ক'রে কয়েকটি গাঁট্টা জমিয়ে দিলেন। উঃ, মাথা একেবারে চিড়বিড়িয়ে গেল। যে কখনো মারে না তার হাতের আঘাতে লাগে বেশী, কারণ দেহ ও দেহাতীত দু'-জায়গাতে লাগে সে আঘাত।

যা হোক্, মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে তো নিজের জায়গায় এসে বসলুম। মাষ্টার মশায়ের রাগ তখনো পড়েনি। তিনি গর্জে-গর্জে বলতে লাগলেন—চারটের আগে এখান থেকে এক পা নড়েছ কি দেখবে মজা।

ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা সামনে খোলা পড়েছিল। মাথার যন্ত্রণায় মনে হোতে লাগল সমস্ত ভারতবর্ষের বুক জুড়ে সর্ষের ক্ষেত ভরে উঠেছে।

মাষ্টার মশায় আবার গর্জে উঠলেন—তোমাদের বাবা যে তোমাদের 'বর্ণচোরা' নাম দিয়েছেন তা ঠিকই দিয়েছেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনি।

নামকরণ করার ব্যাপারে বাবার প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের কোনো সন্দেহই ছিল না, কারণ আমাদের নামের জোড়া সেদিন জগতে দুর্লভ ছিল, আজও সুলভ নয়। তাই সেদিক্ দিয়ে না গিয়ে ভাবতে লাগলুম, পৃথিবীর অনেক লোকই বর্ণচোরা—যেমন আপনি একটি।

নানা রকম আবোল-তাবোল চিন্তা পাক খাচ্ছে মগজের মধ্যে, এমন সময় গলির মোড়ে আওয়াজ হোলো—ল্যা—বেন—চুওওস্—

মুখিয়ার কাছে এক পয়সা দু'-পয়সা ক'রে সেখার প্রায় চার আনা ধার হয়ে গিয়েছিল। ক'দিন থেকে পয়সার জন্য তাগাদা করায় সেদিন তাকে নিশ্চয় দিয়ে দেবার কথা ছিল—পয়সার জোগাড়ও হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কি ক'রে উঠে গিয়ে তাকে পয়সা দেওয়া যায়! ওদিকে মুখিয়া হাঁকতে হাঁকতে বাড়ীর সামনে এসে সাঙ্কেতিক ডাক ছাড়লে—ল্যাওনচোস্!

আমাদের ভাবান্তর দেখে মাষ্টার মশায়ের সজাগ দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হ'য়ে উঠল। ওদিকে মুখিয়া আরও দু'-তিন বার অতি বিনীত ভাবে ল্যাবেন-চোস্—ল্যাওনচোস্ বলে হঠাৎ বীরদর্পে চোওওস্ বলে এমন একটা হাঁক ছাড়লে যে দেশকালপাত্র ভুলে আমরা দু'জনেই হেসে ফেললুম।

আমাদের হাসতে দেখে মাষ্টার মশায় রেগে উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—হাসছ কেন?

ঠিক সেই মুখে ছুঁচোবাজীর চালে মুখিয়া আর এক হাঁক ছাড়লে—চোই ওঁই ওঁই ওঁই ও ও ওস্।

ব্যস্, আর যায় কোথায়! আর হাসি চাপা সম্ভব হোলো না, এবার আমরা জোরে হেসে উঠলুম।

আমাদের ধৃষ্টতা দেখে মাষ্টার মশায় বললেন—আচ্ছা, তোমাদের কাঁদিয়ে ছাড়ছি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের ওপর এলোপাথাড়ি কীল, চড়, গাঁট্টা পড়তে লাগল। আমাদেরও কি রকম রোখ চেপে গেল—মাষ্টার মশায় যতই মারুন না কেন কিছুতেই হাসি থামাব না।

ওদিকে সেদিন যেন মুখিয়ার প্রতিভা খুলে গেল। সে অদ্ভুত রকমারী বাঁটকর্ত্তবে 'ল্যাবেঞ্চুস' শব্দটি হাঁকতে শুরু করে দিলে। মোট কথা, লজঞ্চুস্ চুষে চুষে উপভোগ করার বাণীমূর্ত্তি সে ফুটিয়ে তুলতে লাগল সেই তৃতীয় প্রহরের রোদে পথে দাঁড়িয়ে।

এদিকে মাষ্টার মশায় দুই হাতে বাজনা বাজাচ্ছেন আমাদের ওপর—চটাচট, পটাপট। মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে একই সঙ্গীত—কাঁদিয়ে তবে ছাড়ব। আর আমরা কাঁদতে কাঁদতে উচ্চস্বরে হেসে চলেছি হা হা, হো হো, হি হি—

এই অভূতপূর্ব কনসার্টের শব্দে বাড়ীর সবার দিবানিদ্রা ছুটে গেল, তাঁরা দুদ্দাড় ক'রে এক রকম ছুটেই নীচে নেমে আসতে লাগলেন। কিন্তু তখন দু-পক্ষই অর্দ্ধক্ষিপ্ত। তাঁদের দেখে মাষ্টার মশায়ও হাত থামালেন। আমরাও আগের মতনই হাসতে থাকলুম।

ইতিমধ্যে মা এসে ঘরে ঢুকলেন—উভয় পক্ষেরই ইজ্জৎ বাঁচল। মাকে দেখে মাষ্টার মশায় ও আমরা থেমে গেলুম। মা আমাদের বলতে লাগলেন—তোমরা বড় বাড় বেড়েছ! আচ্ছা হচ্ছে তোমাদের—

মা আরও কিছু যেন বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বাইরে একটা গোলমাল শুনতে পাওয়া গেল। অনেক লোকের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ও মধ্যে মধ্যে মুখিয়ার কান্নার আওয়াজ পাওয়া যেতে লাগল। অন্য সময় হোলে আমরা ছুটে বেরিয়ে যেতুম, কিন্তু মাথার ওপরে অত-বড় একটা অপরাধের বোঝা থাকায় তখনকার মতন উত্থান-শক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল।

গোলমাল উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। হঠাৎ যেন তারই মধ্যে বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। কি রকম হোলো তাই ভাবছি, এমন সময় মনে পড়ল আজ যে শনিবার!

আবার বাবার আওয়াজ ছোটে—মা আমাদের বললেন—দেখ তো, কি হয়েছে ?

বলা মাত্র তড়াক ক'রে বেরিয়ে গেলুম। বাইরে গিয়ে দেখি, সে এক বিরাট ব্যাপার! রাজ্যের লোক দাঁড়িয়েছে মুখিয়াকে ঘিরে। তার লজঞ্চুস রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে, কাঠের কাণা-উঁচু ডালাটাও এক দিকে পড়ে রয়েছে। মুখিয়ার হাত-পা ও মুখের স্থানে স্থানে ছ'ড়ে গিয়েছে—দু'চোখ দিয়ে জল ঝরছে, কিন্তু কান্নার শব্দ হচ্ছে না। করুণ সে দৃশ্য দেখে আমাদের চোখে জল বেরিয়ে এল। সেখানকার তর্কাতর্কি শুনে ব্যাপারটি যা বুঝলুম তা হচ্ছে এই—

পাড়ার গুটিকয়েক লোক ছিলেন বেকার। মুখিয়া না কি প্রতিদিন বীভৎস হুঙ্কার ছেড়ে তাঁদের দিবানিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়। এত দিন তাঁরা নীরবে তার এই অত্যাচার সহ্য ক'রে আসছিলেন, কিন্তু আজ না কি খুবই বাড়াবাড়ি করায় নিতান্ত সহ্য করতে না পেরে অসময়ে শয়নাগার ছেড়ে এই রোদে তাঁরা বেরিয়ে পড়েছেন তাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে। অধ্যাপনার কার্যটি প্রায় সুসম্পূর্ণ হ'য়ে এসেছিল, এমন সময় বাবা এসে তাঁদের হাত থেকে মুখিয়াকে উদ্ধার করেছেন—এই সময় আমরা গিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

বাবা বলতে লাগলেন—ছি ছি, আপনারা কি মানুষ! এই পঙ্গুকে ধরে তিন-চার জনে মিলে মারতে একটু মায়া হোলো না আপনাদের ?

তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললে—মশায়, আপনি যা রাগী, আপনি হোলে মেরেই ফেলতেন ওকে।

বাবা চুপ করে আছেন দেখে আর এক ব্যক্তি বললে—আপনিও তো মশায় আচ্ছা লোক! পাড়ার লোকে একটা কাজ না হয় করেই ফেলেছে। আপনি কোথায় সেটা চেপে যাবেন, না উল্টে ওর হয়ে লড়াই শুরু করেছেন! আশ্চর্য!

তিনি কোনো জবাব দেবার আগেই আর এক জন বলে উঠল—ছেলেদের বন্ধু যে!

ভীড়ের লোকেরা হো-হো করে হেসে উঠল।

বাবা আর তাদের কথার কোনো উত্তর দেবার চেষ্টা না করে ছেলেদের বন্ধুর রূপখানি দেখতে লাগলেন। রূপ-তরাস কেটে গেলে মুখিয়ার একখানা হাত ধরে তাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

মুখিয়ার অবস্থা দেখে বাড়ীর সবাই দুঃখ করতে লাগলেন। মা তাকে জেরা করলেন—তুই এ বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে অমন করে চেঁচাচ্ছিলি কেন ?

তার পরে আমাদের দু'জনকে দেখিয়ে বললেন—নিশ্চয় এদের ডাকছিলি! বল, তোর কোনো ভয় নেই।

মুখিয়া বললে—চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চেঁচানোই আমার অভ্যেস—ওদের ডাকবার আমার কি দরকার!

মা বললেন—আমি জানি, এরা তোর কাছে ধার ক'রে লজঞ্চুস খায়—এদের কাছে কিছু কি পাবি ?

সঙ্গে সঙ্গে মুখিয়া প্রবল ভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—না না না, কিছু পাব না—ওরা আর ধারে খায় না।

এক গ্লাস জল চেয়ে নিয়ে খেয়ে মুখিয়া তার শূন্য ডালাটা বগলে নিয়ে চলে গেল।

মুখিয়া চলে যাবার পর এই ব্যাপার নিয়ে বাড়ীর সকলেই আলোচনা করতে লাগলেন। বাবা ও মাষ্টার মশাই দু'জনেই এই নিয়ে অনেক কথা বললেন। বাবা বললেন—কেউ কারুকে ধরে মারছে, এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারি না। বিশেষ করে সে ব্যক্তি যখন উল্টে মারতে পারবে না।

মাষ্টার মশায়ও দেখলুম এ বিষয়ে বাবার সঙ্গে একেবারে একমত।

সেদিন দিবানিদ্রার ব্যাঘাতের জন্য যাঁরা মুখিয়ার অঙ্গে ব্যথা দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই দিবানিদ্রা থেকে গভীরতর নিদ্রায় অপসৃত হয়েছেন—জানি না, আজও নিদ্রা ভেঙেছে কি না। মাষ্টার মশায় কিন্তু পরদিন থেকে আর এলেন না। সে জন্য দুঃখ নেই, কারণ মাষ্টারের অভাব জীবনে কোনো দিনই ভোগ করতে হয়নি, কিন্তু মুখিয়া আর এল না, যার অভাবে মনের একটা জায়গা আজও খালি হয়ে আছে।

[ক্রমশঃ।

এক দিন ছিলে তুমি

মৃণালকান্তি দাশ

যে প্রাণপুষ্পের মধু মৃত্যু এসে গেছে পান করে,
পুরানো পাতার মত যে দিন হাওয়ায় গেছে ঝরে
ইতস্তত বহু দূর দিক্‌হারা দক্ষিণে, উত্তরে—
বৈশাখের রৌদ্ররাগে ফুরায়েছে যে ফাল্গুন, ফুলের প্রহর—
জ্যোৎস্না, চাঁদ, নীল রাত, নক্ষত্র, নির্ঝর ভোরের আলোয়!
সে দিনের পরিপূর্ণ গানখানি, রামধনু বর্ণ, মধু, মায়া
এখন তাহারা কোন বিগত দিনের গর্ভে বিমলিন ছায়া!
সেই সব আজ শুধু ছায়ার শরীর,—কোন দূর স্মৃতি বিস্মৃতির:

এক দিন ছিলে তুমি, অনুভব করিতেছি আজিকে তোমারে—
নিদ্রাহীন প্রাণের রাতে, হৃদয়ের নির্জন তিমিরে॥

নগরবাসী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুশীলের হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে ওঠে, তার মুখ শুকিয়ে যায়। খাঁটি বিবেক হয়তো মানুষকে নির্ভয় করে, কিন্তু কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধ করেনি বলেই বিবেক কারো খাঁটি হয় না। ধনীর পা ধরে তুলবার চেষ্টায় যে এত কাল কাটাল ধনী বন্ধুর মিথ্যা সন্দেহে অবিচলিত থাকার সাহস সে কোথায় পাবে? সুশীল সভয়ে বলে, আমি তো কিছুই জানি নে ভাই!

ভাখো, আমরাও ভাত খাই। শুধু ভাত খাই না, চোরা বাজারে চাল বেচে ভাত খাই।

—কি বলছ তুমি? আমাকে বিশ্বাস কর না?

যতীন তীব্র দৃষ্টিতে তাকায়।—এত কাল তোমার টিকিটি দেখতে পাইনি কখনো, হঠাৎ তুমি উদয় হলে দু'মণ চালের জন্ম। আমার কাছে কেউ দু'মণ চালের জন্ম আসে? তখনি সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, ছুতো করে গুদোম দেখে রাশিয়ার এজেন্টগুলোকে লেলিয়ে দেবার মতলবে তুমি এসেছো। লেখাপড়া শিখেছ, কলেজে পড়াও, এমন বিশ্বাসঘাতক বজ্জাত স্পাই তুমি হতে পার কে তা ভেবেছিল। আমি বরং মনে মনে হেসে ভেবেছিলাম, তেমনি হাবাগোবা ভাল-মানুষটিই রয়ে গেছ তুমি।

এ রকম চাঁছাপোঁছা গালাগালি সুশীলের সহ্য হয় না, ক্ষোভে অপমানে তার মুখ বাদামী হয়ে যায়। একটু ঘুরিয়ে একটু মার্জিত ভাবে গম্ভীর অবজ্ঞার সঙ্গে এই একই ঘৃণা আর ভর্ৎসনা প্রকাশ করে যতীন তাকে কেবল মর্মাহত নয় একেবারে মরমে মেরে ফেলতে পারত। চোরা-কারবারীদের বাড়াবাড়িতে ক্ষেপে গিয়ে পাড়ার লোক যা করেছে তার সঙ্গে সুশীলের সত্যই যে কোন সংশ্রব ছিল না, তার চোরা-চালের গুদাম ধরিয়ে দিতে গুদামের একটা নেংটি ইঁদুরের ভূমিকাটুকুও যে তার ছিল না, কিছুই তাতে আসত-যেত না। এত দিন কিছুই হয়নি, আচমকা সে সামান্ত চালের খোঁজে উদয় হবার পরেই তার বিশ হাজার টাকার চাল ধরা পড়ে গেছে বলে যতীন তাকে সন্দেহ করে, এতেই তার আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা সুরু হয়ে যেত। তারও তো সেই যুক্তি-সর্বস্ব মন যাতে প্রকৃত সত্য-মিথ্যার চেয়ে যুক্তি বড়। নীতিগত বিচারে তার দোষ না থাক, ওই নীতিটাই যে এখন যতীনের অনুমোদন-সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে!

তার মুখ দেখে যতীন সুখ পায়। সে আবার বলে, ছি! ছি! কত বড় নীচ কত বড় ছ্যাঁচোড় হলে বন্ধুর সঙ্গে এমন করতে পারে!

এবার আর সইতে না পেরে সুশীল চশমা খুলে হাতে নিয়ে মাথায় একটা ঝাঁকি দেয়—ক্লাশে ছেলেদের বে-আইনী বেয়াদপিতে ধৈর্যও ফুরিয়ে গেলে এমনি ভাবে আগে চোখের চশমাটি সামলে ক্রোধ প্রকাশ করা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

তুমি চাষা বনে গেছ যতীন! তুমি ছোটলোক হয়ে গেছ!

সুশীলের ভাবান্তর দেখে যতীন সত্যই একটু ভড়কে গিয়েছিল! টেবিল থেকে পেপার-ওয়েটটা তুলে যদি ছুঁড়েই মারে? সে একটু নরম সুরে বলে, তুমি কি বলতে চাও—?

নিশ্চয় বলতে চাই, একশো বার বলতে চাই আমার কোন দোষ নেই, আমি কিছু করিনি। একবার শুনতে হয় তো আমার কথাটা? এমন কি হতে পারে না যে, অ্যাকসিডেন্টালি আমি ঠিক এই সময়ে চালের জন্ম এসেছি, তোমার গুদোমের খবর আগেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল? কিছু না জেনে-শুনে এমন অভদ্রের মত তুমি আমায় গালাগালি দেবে!

এ প্রায় মেয়েলি অভিমান। যতীন মজা পায়। আরও একটু নরম সুরে বলে, তা হতে পারে, তুমি ইচ্ছে করে হয়তো করনি। কোথায় চাল পেয়েছো বলে বেড়িয়েছিলে তো?

না। কাউকে বলিনি।

এটা মিছে কথা, মণিকে সে সব কথাই বলেছে, চালের গুদাম যে গলিতে তার নামটা পর্য্যন্ত। কিন্তু মণি তো 'কেউ' নয়, সে ধর্মপত্নী। মুখে যাই বলুক, মনে সুশীলের খটকা লেগেছে। বেশ একটা তোলপাড় উঠেছে। মণিই কি তবে বলে বেড়িয়েছে? অথবা হয়তো মণির কোন দোষ নেই; নিজে থেকে সে কিছুই ফাঁস করেনি, প্রণয়ী কৌশলে তার কাছে সব জেনে নিয়েছে যে এ বাজারে এত চাল সুশীল কোথায় বাগাল? ওদের অসাধ্য কিছু নেই। পরের আধ ঘণ্টা সময় এই সিদ্ধান্তটাই তার মনে পাক খেয়ে বেড়াতে বেড়াতে প্রায় বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে যায়।

যতীন কেমন নরম হয়ে গেছে। যেমন হঠাৎ বন্ধুকে দোষী সাব্যস্ত করে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিয়েছিল, তেমনি হঠাৎ যেন সে বিশ্বাস করেছে তার দোষ নেই। তাই বলে ক্ষমা কি চায় যতীন, দুঃখ প্রকাশ করে? ও-সব তার জবরদস্ত লোকের জন্ম, বড় নেতা লাট-বেলাটের জন্ম তোলা থাকে। তাদের গাল দেওয়া দূরে থাক, কড়া কথা বলার স্বপ্নও অবশ্য ভাখে না যতীন। সুশীলের মত যে সব মানুষকে সে খুশী হলে জুতো মারে, ভুল করে জুতো মারার জন্ম তাদের কাছে অনুতপ্ত হওয়া তার ধাতে নেই।

সে করে কি, চা আর খাবার আনতে হুকুম দেয়। তাতেই গলে জল হয়ে যায় সুশীল। খাবার খেয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে একাগ্র গভীর চিন্তায় মুখ-চোখ কুঁচকে বলে, ভাখো যতীন, একটা কথা ভাবছি। যে রিক্সায় চাল নিয়ে গিয়েছিলাম, সেই রিক্সাওলাটা হয়তো বজ্জাতি করেছে।

যতীন মুচকে হাসে।

সস্তা সিরিজের ডিটেকটিভ বই পড় বুঝি খুব?

মোটেই না।

সুশীল আহত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তবে ধন ও শক্তির মালিকদের আঘাতে আহত হওয়া তার চিরদিনের অভ্যাস। অল্পেই সামলে নিয়ে বলে, খুব বেশী রকম ক্ষতি হয়েছে ভাই?

যতীন নাক সিঁটকে বলে, বিশ-বাইশ হাজারের মাল গেছে বয়ে গেছে। গুদোমটা গিয়ে অসুবিধা হল। কি আর হবে, ঠিক করে নেব সব।

তোমার তো কোন ভয় নেই? তোমাকে তো ধরবে না? এই কথাটা ভেবেই আমার এমন খারাপ লাগছে। তোমায় যদি অ্যারেষ্ট করে, জেলে দেয়—

কে অ্যারেষ্ট করবে? কে জেলে দেবে?

তাই বলছিলাম। সুশীল হঠাৎ বোকার মত হাসে।

যতীন বলে আর কথা।

প্রণব আজ কাল কি করছে? সিনেমায় গিয়েছে শুনলাম? ডিরেক্ট করে না অ্যাক্টিং করে?

কিছুই করে না। আড্ডা মেরে বেড়ায়।

বাড়ীতেই তো ওর বিরাট আড্ডা। কংগ্রেস-লীগ আর গান্ধী-জিন্নার মিলনের ভাঁটিখানা গড়ছে, না কি বল?

না না, মাঝে মাঝে ও-সব কথা বলে, বেশীর ভাগ কথা হয় দেশের কুলি-মজুর চাষা-ভুষা নিয়ে। কি যে ওরা বলাবলি করে আমি ভাল বুঝিনে।

দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, পরতে পাচ্ছে না।

ওটা রোজ বলে।

সেদিন আরও কিছুক্ষণ এমনি ভাসা-ভাসা আলাপ চলে। সুশীল মনে অস্বস্তি নিয়ে বাড়ী ফেরে। যতীনের অবিশ্বাস যে দূর হয়েছে, এতেও কেমন সুখ পায় না। বিদায় দেবার সময় যতীন বলেছে, কাল-পরশু আরেক বার এসো।

মণিকে সব কথা খুলে বলতে সাহস হয় না, অনেক কথাই গোপন করে যায়। মোটামুটি বিবরণ শুনে সুশীলের প্রশ্নের জবাবে মণি বলে, আমি? আমি কেন বলতে যাব? ও-সব কথাই তোলেনি কেউ! তবে—

চিন্তায় মুখ কালো হয়ে আসে মণির, দাঁড়াও, ঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস করছি।

না না, সর্বনাশ!

তুমি থামো। আর যাই হোক, ঠাকুরপো মিছে কথা কইবে না।

প্রণবকে সে বলে, ঠাকুরপো, ওই যে চাল আনিয়েছিলাম, কে দিল কোন ঠিকানা থেকে এল এ সব জানতে চাওনি। কিন্তু রিক্স-ওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে বা অন্য রকমে খোঁজ নিয়ে তোমরা কি চালের গুদাম ধরিয়ে দিয়েছ?

—কানাই দত্ত লেনের ব্যাপারটার কথা বলছ? না। আমি কাগজে পড়ে প্রথমে জেনেছি। কিন্তু কেন বল ত? তোমাদের অংশ ছিল না কি?

—উনি যেদিন চাল আনলেন, পরদিন গুদামটা ধরা পড়ল। ওঁর বন্ধু ওঁকে সন্দেহ করছে।

সন্দেহ করাই ওদের বাতিক। জগৎশুদ্ধ লোককে শত্রু ভাবতে হয়, তাই বন্ধুকেও সন্দেহ না করে পারে না। কিন্তু ভদ্রলোকের ক্ষতিটা হল কোথায়?

ক্ষতি হয়নি?

কিসের ক্ষতি? একটা দলিল বাগিয়েছে, ফুরিয়ে গেছে। কিছু বে-আইনী কাজ হয়নি, অনেক দিন থেকে ওখানে প্রকাশ্য ভাবে আইনসঙ্গত ভাবে ওর চালের গুদাম। চালের মস্ত এজেন্ট তো। ঘুষ-টুষ দিতে কিছু খসে থাকতে পারে, সে-সব ওদের গায়ে লাগে না।

সুশীল আশ্চর্য্য হয়ে বলে, ব্যাপার মিটে গেছে?

গেছে বৈ কি। মুস্কিল তো ওইখানে। আইনমতে যে গুদাম করতে পার, সেই চোরা গুদাম করে। চোরা গুদাম কাগজ-পত্রে খাঁটি করতে পাঁচ মিনিটও লাগে না।

আর দুটো কথা এমন খাঁখালো শোনায় যে সুশীল অপরাধীর মত উসখুস্ করে। মণি খানিকক্ষণ চুপ করে বলে, এবার বুঝতে পারছি ঠাকুরপো, পেটের জন্য সবার সঙ্গে ব্ল্যাক মার্কেটে চাল কেনার সঙ্গে ওই দু'মণ চাল আনার তফাৎ কি ছিল?

প্রণব সায় দিয়ে বলে, বুঝতে চাইলে আজকাল অনেক কিছুই বোঝা যায়। অনেক পাপ অনেক অন্যায়ের আগে তবু একটা নীতিধর্মের লোকদেখানো কোটিং থাকত, আজকাল স্পষ্ট উলঙ্গ ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এ হল ফ্যাসিষ্ট ধর্মের প্রভাব। অনেক কিছুই এখন শুধু ফাঁকি দিয়ে ধোঁকা দিয়ে করতে চায় না, গায়ের জোরে দাবড়ানি দিয়ে মানিয়ে নেয়।

এ-সব কথা সুশীলের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে। মণি কিছু কিছু বুঝতে পারে, তার অনুভূতির গভীরতা দিয়ে।

অন্যায়ের গোপন ও নগ্ন রূপ? জীবনের আড়াল করা আর উলঙ্গ ব্যভিচার? তা ঠিক! এমন ভাবে মুখোস খুলে লোভ হিংসা অনাচার অবিচার বীভৎসরূপে প্রকট হয়ে উঠেছে, হত্যা লুণ্ঠন বঞ্চনাকারীর সঙ্গে আপোষকারী আত্মীয়তার এমন বর্ব্বর চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়েছে ভক্তিভাজন মানুষেরও, যে নিজের সমস্ত বিশ্বাস আর ধারণা সম্পর্কে নিজেরই মনে খট্‌কা লেগে যায়! কিসে কি হয়, কেন কি হয় ভাল করে না বুঝেও এই কথাটা বড় হয়ে উঠেছে, এত যে বড় বড় বিশ্বাস আর বদ্ধমূল ধারণা চোখের সামনে ভেঙ্গে পড়তে দেখা গেল, অন্য সব ধারণা বিশ্বাসগুলিও যে সেই পর্য্যায়ের নয়, কে তা বলতে পারে?

আশা আর ভরসা, এই তো সম্বল ছিল। অপ্রাপ্যের আবর্জ্জনায় ভরে উঠে নোংরা হয়ে উঠেছে জীবন, লক্ষ বার আত্মহত্যা ঘটেছে আশার, তবু শেষ পর্য্যন্ত এইটুকু ভরসা যে যেটুকু আছে যেটুকু পাওয়া যায় ততটুকু আজও রইল, ভবিষ্যতেও থাকবে। এই অবলম্বনও শেষ হয়ে গেছে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই-ই অনিশ্চিত, অন্ধকার। প্রচণ্ড দুঃখ দুর্ভোগ ক্রমাগত নাড়া দিয়ে দিয়েই যেন শুধু আজ সচেতন করে রাখতে পারে, তুমি মানুষ, তুমি জীবন্ত মানুষ—তোমার প্রাণ-ধারণটাই তোমার বিচিত্র জীবন! দুর্ভোগের মধ্যে ডুবে থেকেই যেন নতুন করে আবার সব জানতে বুঝতে সাধ যায়।

তাই, পরদিন আবার যতীনের কাছ থেকে ঘুরে এসে সুশীল যখন একটা সুসংবাদ দেয় যে যতীন তাদের একেবারে নিরাপদ অঞ্চলে আশ্রয় পাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে বলেছে, তখন প্রথমটা আগ্রহে প্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেও পরক্ষণে মণি ঝিমিয়ে যায়।

বলে, থাক গে। আজ এখানে কাল ওখানে আর ছুটোছুটি করতে পারি না। কত পালিয়ে বেড়াব?

এই বিপদের মধ্যে থাকবে?

অ্যাদ্দিন তো আছি? আর সবাই তো থাকবে?

সে উপায় ছিল না বলে, কি করা। ভাল পাড়ায় গিয়ে থাকার সুযোগ যখন পাচ্ছি, কেন যাব না?

দু'জনে কলহ বেধে যায়, নতুন রকমের কলহ। ঝগড়া-ঝাঁটি তাদের আগেও হয়েছে, এমন জোরালোও হয়েছে যে এক বেলা খাওয়া বন্ধ, কথা বন্ধও ঘটেছে তার ফলে। নিরীহ এবং মণির একান্ত

রাত্রি-শেষ

সব্যসাচী সেন

রাত্রির গম্ভীর ঘড়ি বাজে। তারার দোলকে দোলে স্বর্গের পাহারা।
উড়ো পাখি ছায়া ফেলে কাক-জ্যোৎস্নালোকে
মিলায় গভীর শূন্যে। নীলকান্ত মণি বলয়িত
স্বপ্নপ্রেমমুক্তিরস-পিপাসিত দিগন্তের চাঁদ। নিঃসঙ্গ নিথর
প্রহরের সিঁড়ি বেয়ে রাত্রির মন্দির গর্ভতলে
জ্যোৎস্নার অতলে ডুবু ডুবু।
ডুবু ডুবু মগ্ন-মন মন্থর ঘুমের তন্দ্রাবেশে
নিবিড় চুম্বন চায় কার ?
যুগ যুগ প্রতীক্ষিত আতপ্ত অধীর আলিঙ্গন
শিহরায় নিশিগন্ধা কুসুমের ঘ্রাণে
কেশবতী নায়িকার যৌবন-লাবণ্যে ঢল ঢল
উচ্ছল চঞ্চল ছন্দে। তবু সে কোথায় ?
কোথায় কোথায় তার কামনার তনু-দীপাধার
নীল শূন্যে শুভ্র চাঁদে কোথা সে ? কোথায় ?
হীরাজ্বলা পাহাড়ের নীরব সত্তায়। রোমাঞ্চিত রাত্রির মুকুটে
অগনিত রৌপ্য শুভ্র নক্ষত্রের শিখায় শিখায়
কোথা সে কোথায় ?

তুমি বলেছিলে আসবে সবাই ঘুমালে
প্রাণ-পদ্মের মৃণালে
তুমি বলেছিলে চাঁদ ডুবে গেলে
শেষ রজনীতে সংসার ফেলে
নীল জ্যোৎস্নায় হংস-মিথুন অলস পক্ষ ভাসালে
তুমি বলেছিলে আসবে আকাশ ঘুমালে।
তোমার তনুতে মহাপৃথিবীর আদিম ছন্দ জাগালে
আঁখিতে কাজল লাগায়ে
যে মায়া-কাজলে অন্তর তলে
সহস্রশিখা মায়া-দীপ জ্বলে। প্রেমের স্বপ্নলোকে
যেথায় যেথায় শরীরি স্বপ্ন কামনার নির্মোকে।
তুমি বলেছিলে সংসার ফেলে
শেষ রজনীতে চাঁদ ডুবে গেলে
চির প্রত্যাশা মিটাবে আমার নির্জন অভিসারে
তুমি বলেছিলে আসবেই চুপিসাড়ে।

রাত কেটে গেল তবুও এলে না তুমি
কাক-জ্যোৎস্নায় মূর্চ্ছিত তাই বিবশ স্বপ্ন ভূমি
ভোরের আলোয় শ্যাম আঙিনায় ধূসর কুয়াশা ঘেরা
শেষ অঘ্রান হাই তোলে ঘুম ভেঙে
তোমার ললাটে চন্দনলেখা মুছে গেছে চুম্বনে
পূবের জানালা ধরে
তুমি চেয়ে আছো দিগন্ত পানে। প্রবাল-শৈল শিরে
মহা পৃথিবীর প্রাণ-স্পন্দন কাঁপে
তুমি এসে ঘুম ভাঙালে আমার
সুদীর্ঘতম প্রেম-সাধনার শেষে
প্রাণপদ্মের স্বর্ণ-মৃণালে জ্বালালে সৌরশিখা
তুমি নও প্রিয়ে স্বপ্নের মরীচিকা।

বশম্বদ হলেও শাস্ত্রোক্ত দাম্পত্য কলহে সুশীলকে অপটু দেখা যায়নি। আজ একটা নূতন তীব্রতা, নতুন তিক্ততা দেখা দেয় তাদের মতান্তরে। এত দিন যত মত-বিরোধ ঘটেছে সব ছিল একাভিমুখী দু'টি মতের তুচ্ছ অমিল, দু'টি মতেই তারা এবং তাদের সংসারটাই বড়, দু'টি মতেই কাজ হয়, শুধু কারটা খাটবে বেছে নেওয়ার ঝগড়া। আজ যেন দু'মুখী মনের বিপরীত স্বার্থের সংঘাত বেধেছে তাদের মধ্যে, ঘরোয়া সীমানা ছাড়িয়ে গিয়ে বড় হয়ে উঠেছে ভেদ।

সুশীলের মত মানুষ সে যেন গালাগালি দেবার ভঙ্গিতে বলে, মাথা বিগড়ে গেছে তোমার, শয়তানি কুবুদ্ধি ঢুকেছে মাথায়! বুড়ো বয়সে ঢং শিখেছ!

তীব্র জ্বালাভরা চোখে তাকিয়ে মণি ঝেঝে বলে, ভীরু কাপুরুষ অপদার্থ তুমি, তুমি ঢং দেখবে না? মানুষ তো নও, কত কি তুমি দেখবে!

যতীন বালীগঞ্জে ছোট একটি ফ্ল্যাট তাদের দিতে চেয়েছে এ সৌভাগ্য এক দিন তাদের উল্লসিত করে দিত, জল্পনা-কল্পনার অন্ত থাকত না, আজ ওই নিয়েই পরস্পরকে তারা প্রথম ঘৃণার আঘাত হানল, ফাটল ধরে আলগা হয়ে গেল এত দিনের সম্পর্কের ভিত্তি।

ভোলানাথের বৈঠকখানাটি প্রথমে স্থির করা হলেও এ বাড়ীটিই পাড়ার শান্তি কমিটি গড়বার আসল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারই প্রতিবাদে সুবোধ সিংহের ইঙ্গিতে একদিন রাত তিনটের সময় গুণ্ডা দলের হানা দেবার চেষ্টা হয়। ইতিমধ্যে শান্তি কমিটি অনেকটা সুগঠিত ভাবে গড়ে না উঠলে সেদিন সত্যই বিপদ ঘটতে পারত।

এই আক্রমণের সুযোগে পরদিন সকালে সুশীল অনেকটা নরম সুরে মণির কাছে আবার বালীগঞ্জের নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার আবেদন জানায়। সত্যই আবেদন জানায়, চিরদিন যেমন জানিয়েছে।

আমি যাব না। ইচ্ছে হলে তুমি যেতে পার।

আমি যাব না, তুমি যেতে পার! এমন অনায়াসে মণি যে এমন কথা বলতে পারে কে কল্পনা করেছিল? শুধু কথা শুনে নয়, মণির চোখ-মুখ দেখে মনে হয় সে যেন মায়া-মমতা ভুলে গেছে।

সহরের অসংখ্য মানুষের রসুইঘর নেই, একটি উনান জ্বালাবার ঠাঁই নেই, রান্না করে খাবার সম্বল বা সময় নেই। মেস, হোটেল, রেস্তোরাঁ, চা-খানা, খাবারের দোকান, চিঁড়ে-মুড়ির দোকান থেকে ফলমূল ছাতু-লঙ্কার ফিরিওলা পর্য্যন্ত খাদ্য সরবরাহের বিচিত্র ব্যবস্থা। সখের বা সখ-ধর্মী প্রয়োজনের সাহেবী খানা যে প্রকাণ্ড ঝকঝকে হোটেলগুলিতে, তারই সামনা-সামনি রাস্তার অপর দিকে ময়দানের গাছতলায় হয়তো এক জন বসেছে ছাতুর ধামা নিয়ে। তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে ও সস্তায় পেট ভরাবে গরীব মজুর, মাজায়-ঘষায় ঝকঝকে পিতল-কাঁসার থালায় ছাতু মেপে নিয়ে জল দিয়ে মেখে সে পেটে চালান করে দিল, তার পর মুখে ঢালল এক ঘটি জল। থালাটি ছাতুওলার, জলও সেই দেয়। [ক্রমশঃ।

শীতে উপেক্ষিতা

"রঞ্জন"

ছয়

কায়িক পরিশ্রম সম্বন্ধে আমার মনোভাব স্পার্টান নয়। বরং কিছুটা চৈনিক বলতে পারি। স্বেদস্নাত কলেবরে ধনিদলকে টেনিস খেলতে দেখলে আমিও গল্পের সেই চীনা কুলির মতো ভাবি: এদের নিশ্চয়ই বেশ পয়সা আছে, তবু কেন এমন কৃপণ এরা? অল্প কিছু পয়সা খরচ করলেই অনায়াসে কয়েক জন লোক ভাড়া করে তাদের দিয়েই খেলাতে পারে! তাই আমি শেষ যে-বল দিয়ে ফুটবল খেলেছি তা ফুটবল নয়, প্রত্যাখ্যাত টেনিস বল; শেষ যেবার ক্রিকেট খেলেছি তার ষ্টাম্প এবং বেল ছিল কয়েকখানি ইট মাত্র, উইকেট নয়। আমি স্যাণ্ডো নই, সেটা বিস্ময়কর নয়। কিন্তু যা শুনলে হয়তো স্বয়ং স্যাণ্ডোর মূর্চ্ছা ও পতন ঘটতো তা হচ্ছে এই যে স্যাণ্ডো হবার ক্ষীণতম অভিলাষও নেই আমার মনে।

কিন্তু জায়গার গুণ আছে। কলকাতায় আমি লায়ন্স রেঞ্জ থেকে জি, পি, ও, হেঁটে যেতে হলে হাঁপিয়ে উঠি, অথচ, এই দার্জিলিঙে এসে প্রতিদিন যে রবার্টসন্ রোড থেকে ম্যাল্ হয়ে বার্চ হিল্ পর্যন্ত ধাবন করছি, একেবারে অযথা, এমন কি গল্প, বলের সন্ধানে পর্যন্ত নয়, তাতে এতটুকু ক্লান্ত বোধ করিনে। বরং প্রফুল্ল বোধ করি। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই একটা আছে, অন্ততঃ মনোবৈজ্ঞানিক, কিন্তু আমার তা নিয়ে অহেতুক কৌতূহল নেই। আমি এত দূর যে হাঁটতে পারি তাইতেই নিজেকে অভিনন্দন জানিয়ে খুশি থাকি।

একাধারে তৃতীয় দিন এই অসাধ্য সাধন করে আপন ক্ষমতায় চমৎকৃত হয়ে বার্চ হিলে বিশ্রাম উপভোগ করছিলেম। অন্যান্য ঋতুর কথা জানিনে কিন্তু এখন, জানুয়ারীর শেষার্ধে, এই জায়গাটা একেবারেই নির্জন। প্রাণী বলতে আমি এবং শ্রীরামচন্দ্রের শতাধিক অনুচর ছাড়া আর কারো সাড়া নেই। উপরে নীচে চার-দিকে ঘিরে শুধু রয়েছে নানা রকমের গাছপালা। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের মতে তাদের নিশ্চয়ই প্রাণ আছে কিন্তু তারা আমার সঙ্গে কথা কয় না। কইলেও তারা যে-ভাষায় কথা কয় তা আমি শুনতে পাইনে। আমি না উদ্ভিদ্‌বিদ্, না কবি। বৃক্ষ তাই আমার কাছে বৃক্ষই, নিগূঢ় কোনো তত্ত্বের অভিব্যক্তি নয়। অনায়াসেই তাই জন্তুকে প্রাণবান মানি, কিন্তু বৃক্ষকে নয়।

সেদিন অভিনন্দনের একটা অতিরিক্ত কারণ ছিল। পদব্রজে পর্বতারোহণের চাইতেও দুঃসাহসিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেম। অশ্বারোহণ করেছিলেম। শৌর্য নিয়ে সাধারণত দম্ভ করিনে কিন্তু সত্যের খাতিরে এখানে সবিনয়ে যোগ করতেই হবে যে সে-ঘোড়াটির নাম ছিল "অ্যাটম্ বম্"।

বি-এ পাশ করে টুপি মাথায় এবং বিয়ে করে টোপর মাথায় ছবি তোলার যেমন প্রায় অলংঘনীয় একটা বিধান আছে, তেমনি দার্জিলিঙে এসে ঘোড়ায় চড়ে সঙ্গীর ক্যামেরার সম্মুখীন হয়নি এমন ব্যক্তির সংখ্যা বেশি নয়। সাধারণ বাঙালীর পক্ষে ঘোড়ায় চড়া দৈনন্দিন অভ্যাস নয়, দুর্লভ অভিজ্ঞতা। সেই অপরূপ দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য যাদের হয়নি তাদের সকল অবিশ্বাস ভঞ্জন করবার জন্যেই এই প্রতিকৃতির ব্যবস্থা। ক্যামেরা না কি মিথ্যা বলে না।

আমার ছবি তোলবার মতো কেউ কোথাও ছিল না। থাকলে

আমার ঘোড়ায় চড়াই হোতো না। অশ্বারোহণে আমার অপরিসীম কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে গেলে বাহনের কাছ থেকে লেপলজ্জা গোপন করবার উপায় নেই, কিন্তু তার আরও সাক্ষী রাখব এমন দুঃসাহসী আমি নই।

বড়যন্ত্রটা সুরু হয়েছিল আমার দার্জিলিঙে পৌঁছোবার পরের প্রথম প্রভাত থেকেই। রোজই সকালে ম্যালে এসে বসবার একটু পরেই কয়েক জন ছেলে আমাকে ঘিরে ধরে বলে, "রাইডিং সার?" সায়েব প্রতিবারই সবিনয়ে বলেছে, "নো, থ্যাংক্স্"। কিন্তু ওরা দমেনি। এই বালক সহিসদের অধ্যবসায় বীমার দালালদের অনুকরণ-যোগ্য। একবার বারণ করে দিলেও কিছুক্ষণ পরে এসে বলে, "ফার্স্ট ক্লাস ওয়ান্ হর্স, সার, খরো ব্রেড।" অশ্ব-সমাজের কৌলীন্যে আমার কৌতূহল উদ্দীপিত হয় না দেখেও ওরা নিরাশ হয় না। আবার কিছুক্ষণ পরে এসে বলে, "ইউ ভেরি গুড হর্সম্যান, সার।" একমাত্র চক্ষু দ্বারা দর্শন ব্যতীত ঘোড়ার সঙ্গে যার আর কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই তার সম্বন্ধে এমন অসত্য অতিশয়োক্তি অশ্বকুলের বোধগম্য হলে তাদের অট্টহাস্যের কারণ হোতো।

আমিও জানতেম যে সেই বালক সহিসের স্তুতি একেবারেই মিথ্যা। কিন্তু তবু, প্রশংসা তো! আর প্রলোভন জয় করা বড়ো শক্ত। মানব-চরিত্রের বহুবিধ দুর্বলতার মধ্যে এইটেকে জয় করাই বোধ হয় সব চাইতে দুরূহ। নিন্দায় বিচলিত হয় না এমন লোক কদাচিৎ থাকে, প্রশংসায় পুলকিত হয় না এমন কেউ নেই। সে-পুলক এমন একটা মোহ বিস্তার করে যে তখন সকল পরিমিতবোধের ঘটে অবসান। প্রশংসার প্ররোচনায় তখন স্বীয় প্রতিভার নির্দেশ ও অবজ্ঞা করে গুণিজন পর্যন্ত নিজেদের নিয়োজিত করেন এমন কাজে যাতে তাঁদের দক্ষতা নেই। গায়ক দিলীপকুমার তখন উপন্যাস রচনা করেন, লেখক তারাশঙ্কর ফ্যাসি-বিরোধী বিবৃতি প্রচার করেন এবং ডাক্তার বিধান রায় রাজনীতি করেন। কিন্তু তাতে সমৃদ্ধ হয় না, দেশও উপকৃত হয় না।

আর সব আবেদন-নিবেদন তাই উপেক্ষা করতে পেরেছিলেম কিন্তু সহিস বালক যখন আমাকে ভেরি গুড হর্সম্যান আখ্যা দিল তখন আর লোভ বুদ্ধির বাধা মানল না। দেবদূতগণ যেখানে পদ-সম্বরণ করতো, আমি সেখানে ঝাঁপ দিলেম। বললেম, "বাবো, কিন্তু তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে ঘোড়াকে ধরে রেখে।" ভেরি গুড হর্সম্যানের মুখে এমন করুণ স্বীকারোক্তি শুনে সহিস বিস্মিত হোলো না। আমার অনুরোধে রাজি হোলো। আর পশ্চাদপসরণের পথ রইল না।

অচিরেই আবিষ্কার করলেম যে অন্যান্য আরো অনেক বিপদের মতো অশ্বারোহণের ভয়াবহতাও বহুলাংশে নির্ভর করে দূরত্বের উপর। কাছে এলে দেখা যায় যে বিভীষিকা অনেকখানি মিলিয়ে গেছে, রোদ উঠলে কুয়াশার মতো। অ্যাটম বম্বের ভীতিপ্রদ নামের অধিকারী জন্তুটি আসলে নিতান্তই নিরীহ। শীতে বেচারী আড়ষ্ট হয়ে আছে। এমন জানোয়ারের কাঁধে চাপতে মায়া হয়, অন্তত হওয়াই উচিত। কিন্তু এমন আবহরা না হলে আমার যে ঘোড়ায় চড়াই হয় না।

ভয়ে ভয়ে এবং ভয় গোপন করতে করতে ঘোড়ার পৃষ্ঠে আসীন হলেম। লাগামের কোন দিক কী ভাবে টানলে অশ্বের মস্তিষ্কে কী বার্তা বাহিত হয় তার কিছুই জানিনে, তাই লাগাম এমন ভাবে ধরে রইলেম যেন ঘোড়া জানতেই না পারে আমার কী উদ্দেশ্য। সহিস তার জিহ্বা ও চঞ্চুযুগলের সংযোগে অদ্ভুত একটা ধ্বনি করতেই ঘোড়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকল। সে গতি কোনো শামুকের মনেও ঈর্ষার উদ্রেক করতো না। স্লো-মোশন্ ছবি দেখতে যেমন হাসি পায়, আমি তেমনি কৌতুক বোধ করছিলেম।

লয়েড বটানিক গার্ডেন, মুজিয়ম, লেবং রেস্‌কোর্স, মনাস্টেরি, অবজার্ভেটরি ইত্যাদি নানা দর্শনীয় স্থানের উল্লেখ করে সহিস জিজ্ঞাসা করল আমি কোথায় যাবো। আমি বললেম বার্চ হিল্।

বার্চ হিল এবং জলাপাহাড়ের অরণ্য অঞ্চল ছাড়া পুরানো দার্জিলিঙের বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট নেই। এখান থেকে সমস্ত গাছপালা সমূলে ধ্বংস করে তৈরী হয়নি সুদৃশ্য বাগান বা মানুষের আবাসের যোগ্য বাসস্থান। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক রক্ষিত এই পার্কে তাই এখনো আছে অসংখ্য রকমারি গাছ, আছে বহু শ্যাওলা-পড়া জায়গা আর ছায়ায় ঢাকা পথ। উপরে উঠবার ও নীচে নামবার পথটা ঘোরানো, স্পাইর্যাল সিঁড়ির মতো। অনেকগুলি বাঁক আছে যেখান থেকে অল্প দূরে কেউ আসছে কি না তাও দেখবার উপায় নেই। অনেকগুলি জায়গা আছে যেখানে বসে থাকলে কারো সাধ্য নেই খুঁজে বের করে। বার্চ হিল পলাতকের স্বর্গ।

ঘোড়ায় চড়া শেষ করে এমনি একটা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিলেম। এই রকম জায়গাতেই আমি ভালো বোধ করি, যেখানে আমার সঙ্গী আমিই। আমার চরিত্রের এই ব্যাধিটা আর কিছুতেই সারল না। অপরিচিত বা অর্ধ-পরিচিতদের মধ্যে অনেকে পারেন নিজেদের পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে। আমি পারিনে। আমি একা থাকতে পারি। পারি বিশেষ এ কজনের সান্নিধ্যে সময় সম্বন্ধে বিস্মৃত হতে, পারিনে অর্ধ-পরিচিতদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনান্তরিক হাসির অন্তরালে লৌকিকতার বিনিময় করতে। তাই আবার একা থাকতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটা সিগারেট ধরালেম এবং মনে আবৃত্তি করতে থাকলেম:

Just—
Watch the smoke rings rise in the air.
You'll find your share
Of memories there.

এই তো হোলো বিপদ। স্মৃতি থেকে পলায়ন করতে পারিনে। ফ্রান্সিস টমসনের সেই হাউণ্ড অব্ হেভেনের মতো স্মৃতি আমাকে অনুসরণ করছে প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্ত। সকল চক্ষুর অন্তরালে দার্জিলিং বার্চ হিলের এই নিভৃততম কোণে এসেও সেই স্মৃতি থেকে নিষ্কৃতি নেই। অল্প কিছু দিন পূর্বেও যার চিন্তা ছিল অপরিসীম আনন্দের উৎস আজ তার কথা মনে হলেই হৃদয় দগ্ধ করে শুধু সেই বেদনাদায়ক স্মৃতির স্ফুলিঙ্গগুলি যারা প্রলাপে জড়ানো স্বপ্নময় মুহূর্তগুলির তুলনায় সংখ্যায় নগণ্য, কিন্তু পরবর্তী তিক্ততার মধ্যে কোথায় তারা হারিয়ে গেছে! ব্যথা দিয়ে শেষে যা কয়েছিল, শুধু তাই মনে রইল; তার আগের সহস্র সুমধুর কথা কোন্ বিস্মৃতির অতলে মিলিয়ে গেল!

জোর করে মনকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলেম। পকেট থেকে পাঠ্য কিছু বের করে তাইতে নিয়োজিত করতে চাইলেম মনকে। যে বইটা বেরুলো সেটা লম্বা একটা রোমহর্ষক। অপ-সাহিত্যের

এ-পাথায় আমার ক্ষতি নেই, কিন্তু বইটা খুলতেই আত্মচিন্তাক্লিষ্ট মনটা অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেল, হাওয়া যেমন করে মেঘকে উড়িয়ে দেয়। সেদিন ঘুম ষ্টেশনে শিখা এই বইটা সেই হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে আমার হাতে পুরে দিয়েছিল। আমাকে ঠিকানা জানাবার জন্যে।

সত্যি, পুরো দু'টো দিন শিখা এবং আমি একই জায়গায় রয়েছি, দু'জনের দেখা হওয়া এত সহজসাধ্য, অপর পক্ষের নিমন্ত্রণও রয়েছে, তবু দেখা করার কথা মনে হয়নি। মাত্র তিন বছর আগেও এমন অবস্থা অভাবনীয় ছিল। তখন শিখার সঙ্গে একটু দেখা করবার জন্যে কী না করতে পারতেম? কী না দিতে পারতেম? শেষ দিন ক'টার কথাও মনে পড়ছে। বিচক্ষণা শিখা তখন মোহমুক্ত। আমাকে এড়াতে পারলে বাঁচে। আমাকে আর তার প্রয়োজন ছিল না। এদিকে আমি তখন দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের মতো অসহায়। উঃ, কী অসহ্য যন্ত্রণায় সেই দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে। জীবনকে মনে হয়েছিল অর্থহীন, পৃথিবীকে প্রাণহীন। একমাত্র শিখার হৃদয়হীনতা আমার ভুবন থেকে সেদিন সব আলো নিঃশেষে মুছে দিয়েছিল।

আর আজ! হাসি পেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই কান্না পেল এই কথা ভেবে—আজ যার চিন্তা আমার শয়ন, জাগরণ, সমগ্র সত্তা এমন মর্মান্তিক ভাবে আচ্ছন্ন করে আছে সে-ও কি একদিন এই শিখারই পর্যায়ে পর্যবসিত হবে? একদা শিখার বেলা শেষ, সেথায় তোমারও অন্ত? ভেদ নাহি লেশ? আজকের যে বেদনা সে গভীর, কিন্তু এ বেদনা যে পরম রমণীয়; এ-বেদনাতে যে পুলক লাগে গায়ে। না ভগবান, আর যাই করো, এইটে করো না। বিয়োগান্ত নাটকের পঞ্চমাংকে নিষ্ঠুর হত্যার শাস্তি দাও আমাকে, কিন্তু প্রহসনের নায়ক করো না!

নাঃ, আবার সেই বিভীষিকাময়ী চিন্তাগুলি মনের মধ্যে ভীড় করছে। শিখার দেওয়া বইটা হাতে করে উঠে পড়লেম। একা থাকায় এই বিপদ। যাবো কি শিখার কাছে একবার? কী জন্যে? যে-আগুন নিবে গেছে এখন তাইতে ফুঁ দিলে আগুন আর জ্বলবে না—শুধু ছাই উড়বে আর ধোঁয়ায় চোখে আসবে জল। যাবো কি? না, যাবো না?

মিষ্টার হাইণ্ড শেষ পর্যন্ত স্থির করল। বার্চ হিল থেকে নামতে শুরু করলেম।

বেশী দূর যেতে হোলো না। একটু অগ্রসর হতেই দূরে দেখলেম এক অশ্বারূঢ়া মহিলাকে। আমার দৃষ্টিশক্তি নিখুঁত নয়। চশমার কাচ পুরু, কিন্তু স্বাভাবিক দৃষ্টি থেকে আমি চিরতরে বঞ্চিত। দূরের জিনিস যা ঠিক ভাবে দেখতে পাই তার অর্ধেকটা চোখের কাজ, বাকিটা অনুমিতি। কিন্তু যে বীরাঙ্গনাকে অশ্বপৃষ্ঠে দেখলেম তিনি যে শিখাই তাতে সন্দেহ ছিল না। ভুল করিনি।

কাছে আসতেই শিখা ঘোড়া থেকে নামল। আমি তার সপ্রতিভ, স্বাভাবিক গতিভঙ্গী দেখে মুগ্ধ হলেম। ঠিক সেই শিখাই আছে। এখন দেখলে বোঝবারও উপায় নেই বিবাহের মতো বৃহৎ একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে শিখার উপর দিয়ে। সাধারণত বাঙালী মেয়েদের বিবাহের সঙ্গেই ঘটে একটা অসাধারণ পরিবর্তন। বিবাহের পূর্বে যিনি হাস্যময়ী চঞ্চলা থাকেন, পরে তাঁকে দেখলে ক্যাথলিক নান বলে ভুল হয়। আর লজ্জাশীলা কুমারীগণ বিবাহের কিছু দিনের মধ্যে নানা শারীর প্রক্রিয়া নিয়ে এমন প্রকাশ্য আলোচনা করেন যে রুচিশীল ব্যক্তির পক্ষে শোনা দায়। শিখা কিন্তু শিখাই আছে।

শিখা নিঃশব্দে কাছের একটা গাছের গায়ে তার বাহনকে বাঁধল। আমি চুপ করে রইলেম। ঘোড়ায় চড়া ইত্যাদি এই সমস্ত বীরত্বব্যঞ্জক কাজগুলি শিখা এমন সহজ এফিসিয়েন্সির সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে যে মনে হয় এগুলি যেন তার দৈনন্দিন কর্ম-বিধির অন্তর্ভুক্ত। একটি মাত্র কথাও না বলে শিখার নীরব নেতৃত্বের নির্দেশে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দু'জনে গিয়ে বসলেম একটা বিরাট গাছের তলায়। নিভৃতে বসবার পক্ষে এমন জায়গা পৃথিবীতে দুর্লভ।

শিখা জানে কী ভাবে কথা বলতে হয়। বাঙলা ছবির সংলাপ যে একেবারে অবাস্তব নয় তা একমাত্র শিখার কথা শুনলেই বিশ্বাস করা যায়। ওর ভাষায় আছে অস্পষ্ট একটা সাহিত্যিকতার আভাস। কণ্ঠে আছে ভাবগর্ভ গভীরতা। জানে কখন কী বলতে হয়। তার চেয়েও বিস্ময়কর, জানে কখন কিছু না বললেই সব চেয়ে বেশী বলা হয়।

বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকবার পরে শিখা অন্য দিক থেকে তার উদাস দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, আমাদের গেছে যে দিন, একেবারেই কি গেছে, কিছুই কি নেই বাকি?"

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটা আমিই একদিন শিখাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেম। একদিন সেই উদ্ধৃতিটা আমারই উপর এমন ভাবে প্রয়োগ করা হবে সেদিন মনে উদয় হয়নি এমন আশংকা। বিস্ময় গোপন করে অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেম, "রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।"

"ওটা তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা।"

"তোমার প্রশ্নেরই মতো।"

"কিন্তু আমার প্রশ্নটা আমারই ছিল, ভাষাটা শুধু কবির।"

"আমার উত্তরটাও যে তাই নয় তাই বা জানলে কী করে?"

শিখা এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু অসীম তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। অনায়াসেই বিস্ময় গোপন করে বলল, "কবিতাটার পরের লাইনগুলি ভুলে গেছ বোধ হয়। তোমার উত্তরের পরের লাইনেই আছে উত্তরদাতার আত্মজিজ্ঞাসা, 'খটকা লাগল, কী জানি বানিয়ে বললেম না কি!' তোমার তেমন কোনো সন্দেহ জাগেনি তো?" শিখা জানে শ্লেষকে কী করে হাসিতে ঢেকে সহনীয় করতে হয়।

"এত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হোলো কি ঝগড়া করবার জন্যে?"

আমি শিখার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললেম, "ঝগড়া রেখে তার চেয়ে ভালো কথা বলো। যা বলতে তোমার ভালো লাগবে, শুনতে আমার।"

শিখা খুশি হোলো। বলল, "আচ্ছা, আমাদের সেই একসঙ্গে কাটানো দিনগুলি তোমার মনে আছে?"

"মনে থাকলেও তোমার মুখ থেকে আবার শুনতে ভালো লাগবে।"

"আমার সব চেয়ে স্পষ্ট মনে আছে সাতাশে ডিসেম্বরের সন্ধ্যাটার কথা। মনে আছে তোমার?" শিখা আরো একটু কাছে সরে এলো, "খুব শীত ছিল। তুমি তোমার গরম কোট খুলে আমাকে পরিয়ে দিলে আর আমি খুলে তোমাকে দিলুম আমার স্কার্ফ?"

"হ্যাঁ, মনে আছে। সেদিন কী করে তাড়াতাড়ি সরকারদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেম আমরা দু'জনে মনে আছে তোমার?"

"হ্যাঁ। তুমি তো আমি না বলা পর্যন্ত বুঝতে পারোনি।" দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠলেম। সেদিনের সেই অভিজ্ঞতা যেন পুনর্বার উপভোগ করলেম। শিখা আবার বলতে থাকল, "আমি ওদের বাড়ি গিয়েই সবাইকে লুকিয়ে সুযোগ মতো সবগুলি ঘড়িকে দিলুম দেড় ঘণ্টা ফাষ্ট করে। জানতুম যে ন'টার আগে কিছুতেই উঠতে দেবে না। তার পর আর তোমার সঙ্গে বেড়াবার সময় থাকবে কতটুকু? তাই তো ঐ চুরি করতে হোলো।"

"কিন্তু পরদিন তো ধরা পড়ে গেলে।"

"তার আগে তোমার কাছে ধরা দিয়েছিলেম, তাই ক্ষোভ ছিল না একটুও।" শিখার কথা বলার সেই মধুর চাতুরী আজো অক্ষুণ্ণ আছে।

আমার শুনতে ভালো লাগছিল। হোক মিথ্যা, হোক অভিনয়।

এমনি আরো অনেক মধুর কাহিনীর কুশল বর্ণনা করল শিখা। সে সকল কাহিনীর নায়িকার কী মনে হচ্ছিল জানিনে কিন্তু নায়কের কৌতুকের সীমা ছিল না। নিজেকে সেই সব ছেলেমানুষীর দৃশ্যে পুনরায় মনশ্চক্ষে দেখে নিজেকে মনে হোলো চরম নির্বোধ বলে। নির্বুদ্ধিতা—কিন্তু মধুর। জাগ্রৎ বুদ্ধি নিয়ে কে কবে প্রেমে পড়েছে?

শিখা কিছুক্ষণ পরে বলল, "কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি আমায় কিছুতেই বুঝলে না। বাকি জীবনের জন্যে পাথেয় হয়ে রইল শুধু ভুল-বোঝা।" শিখা জানে কণ্ঠে কী করে করুণ রস সিঞ্চন করতে হয়।

"এ-আলোচনাটা যদি তুললেই, শিখা, তাহোলে বলি, আমি তোমায় ভুল বুঝিনি।"

"ভুল বোঝা নয় তো কী? তুমি সবাইকে বলেছ যে আমি আমার সুবিধে মতো তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি।"

"সবাইকে কেন, কাউকেই আমি অমন কথা বলিনি, কিন্তু," একটু থেমে যোগ করলেম, "কিন্তু যদি বলতেম তাহোলে মিথ্যা বলা হোতো না।"

"আজো কি তুমি তাই মনে করো?" রাগে শিখার সাহিত্যিক মুখোসের অনেকখানি খসে পড়ল।

"তা জেনে আর কী হবে? আগেই বলেছি, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না।"

"ঝগড়া করতে আমারও নিশ্চয়ই ভালো লাগে না। কিন্তু তোমার ভুল-বোঝা ভাঙব বলেই ঘুমে তোমার সঙ্গে দেখা হতেই এখানে আবার দেখা করতে বলেছিলুম।"

"আমি ভুল বুঝলেম কি ঠিক বুঝলেম তাতে কী এসে-যায় তোমার? তিন বছর আগে জানুয়ারী মাসে যার পালা শেষ করে দিয়েছ আজ তার ময়না-তদন্ত করে কী লাভ হবে কার?"

"লাভ-ক্ষতির কথা নয়। তুমি সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়াই ভুল বুঝেছিলে।"

"হবেও বা।"

"তোমার ওই কথা এড়িয়ে যাওয়ার ফন্দি আমার অজানা নয়।"

এই অপ্রীতিকর আলোচনায় আমার রুচি ছিল না। নিশ্চয় জানতেম আমি কোথাও ভুল বুঝিনি। আমি যা জানতেম তার কোনো কিছুই শিখারও অজানা ছিল না। বিরোধ তো ঘটনা নিয়ে নয়, তার ব্যাখ্যা নিয়ে। ঘটনা নিতান্তই সাধারণ। শিখার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল এক বন্ধুর বাড়িতে। তার পর আরো কিছু দিন সেখানেই দেখা হয়। তারও পরে বাইরে—সিনেমায়, লেকে, ময়দানে। ক্রমে ঘনিষ্ঠ হই। তখন রোজ দেখা হোতো, নয়তো টেলিফোনে কথা। শিখার আত্মীয়দের আপত্তি হয়নি। Euphemistically, ওদের বাড়িকে এদিক্ থেকে উদারই বলতে হবে। মাঝে দিন দুই দেখা হয়নি। টেলিফোনও নয়। তৃতীয় দিন গিয়ে দেখি শিখা বাড়ি নেই। শিখার দিদির অভ্যর্থনার শীতলতা থেকেই কম্পিতবক্ষে অনুমান করেছিলেম। তার দিন সাতেক পরেই হলদে চিঠি পেয়েছিলেম, সঙ্গে ছিল শিখার চিঠি। কী লিখেছিল তার সব কথা মনে নেই। কিন্তু বেশ মনে আছে যে সে চিঠিতে যত মূল্যবান উপদেশ ছিল, তাঁর পুত্রের কাছে লিখিত পত্রগুচ্ছের মধ্যে লর্ড চেষ্টারফিল্ডও এত নীতিকথা লিখতে পারেননি। শিখা লিখেছিল, আমি যেন অযথা শোক না করি, আমি যেন আমার অমূল্য জীবন এ জন্যে নষ্ট না করি, আমি যেন আমার স্নেহপরায়ণ পরিবারবর্গের কথা বিস্মৃত না হই, আমি যেন আমার প্রতিভার এবং কর্তব্যের পথ থেকে কখনো বিচ্যুত না হই, ইত্যাদি, ইত্যাদি। শিখা যা করেছে তা ছাড়া তার উপায় ছিল না, আমার বন্ধুত্ব সে কখনো ভুলবে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আরো মনে আছে, সর্বশেষে 'পুনশ্চ' দিয়ে লিখেছিল, আমি যেন চিঠিটা পড়েই ছিঁড়ে ফেলি। অত আবেগের মধ্যেও এই বিচক্ষণ ব্যবস্থাটির কথা বিস্মৃত হয়নি শিখা।

আমার মনে একটুও সন্দেহ ছিল না এ সবই শিখার মনে ছিল। কিন্তু এগুলির সঙ্গে তার বর্তমান জীবনের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়। তাই তার স্মৃতিতে অতীতের ঘটনাগুলিকে নতুন করে সাজাতে হয়েছে। পরন্তু, এবং তার চাইতেও বেশী নিজেকে বোঝাতে হয়েছে যে সে যা করেছিল তাই স্বাভাবিক এবং আমার উপর বিন্দুমাত্র অন্যায় করা হয়নি। আমি যে আঘাত পেয়েছি সে আমারই দোষ। গোড়াতে হয়তো এ কথাটা শিখার নিজেকে বোঝাতে নিজের সঙ্গে তর্ক করতে হয়েছে সত্যের সঙ্গে। কিন্তু ক্রমে নিয়ত পুনরাবৃত্তির দ্বারা এখন তা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। আমি যে এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছিনে এবং স্বীকার করছিনে, শিখার তাতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বলল, "তুমি আগাগোড়াই ভুল বুঝেছ। কে কখন কী মনে করে বসে থাকবে আমি তো আর সে জন্যে দায়ী হতে পারিনে।"

"তুমি দায়ী এমন কথা কি বলেছি কখনো?"

"বলোনি, কিন্তু মনে করেছ।"

"আগেই বলেছি, মনে করলেই বা তোমার কী আসে যায়?"

"সে কথা হচ্ছে না।" শিখা হঠাৎ গলার স্বর একেবারে নামিয়ে করুণ কণ্ঠে বলল, "অবশ্য দোষ আমারই। কেন আমি—?"

আমি বিব্রত বোধ করলেম। শিখার কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেম, "না, না, তোমার দোষ কী? আমারই দোষ।"

শিখা কিছুতেই মানবে না। বারে বারেই বলতে থাকল যে দোষটা তারই। দোষ বলতে যে আমি এক কথা বুঝছিলেম এবং শিখা আর, তা একটু পরে বোঝা গেল। শিখা বলল, "আমারই দোষ। লোকের ভালো করলে সে যে পরে সেজন্যে দোষ দেবে একথা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। গোড়া থেকেই আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ভদ্র, ভালো ব্যবহার কারো সঙ্গে করলে তার মনে যে এত কথার উদয় হতে পারে এমন কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। সামান্য বন্ধুত্বের যে এমন গুরুতর অর্থ করবে তুমি এ আমি একবারও ভাবিনি।"

"আবার অন্যায় করছ, শিখা। তোমার আমার যে সম্বন্ধ ছিল তার দু'টো নাম নেই। তা নিয়ে দ্বিমতেরও অবকাশ ছিল না। তুমি আপন বিবেচনা অনুযায়ী তা অস্বীকার করেছ। সে জন্যে তোমাকে দোষ দিইনি, আজো দেব না।"

"মোটেই নয়। তুমি আমার দাদার বন্ধু ছিলে। সেই চোখেই বরাবর তোমাকে দেখেছি।"

"দাদার মতো, না?" আমি হাস্য সম্বরণ করতে পারছিলেম না।

"না, দাদার বন্ধুর মতো। একা ছিলে, বিশেষ কারো সঙ্গে পরিচয় ছিল না, বিশেষ কোথাও যাওয়ার ছিল না, তাই আমাদের বাড়িতে আসতে, আমি হেসে তোমার সঙ্গে কথা কয়েছি। তোমার অনেকগুলি নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় আমার কম্প্যানি দিয়ে আতিথেয়তা করেছি। এই তো আমার দোষ!"

"এইটে কেন, কোনোটাই তোমার দোষ নয়। সবটাই আমার দোষ।"

"তোমার ভদ্রতা রাখো। তুমি নিশ্চয় মনে করো আমার দোষ।"

"প্রেমে পড়া তো আমি কখনোই দোষের মনে করিনে।"

এটা শিখা আশা করেনি। হঠাৎ কী বলবে ভেবে পেল না। বাঙলা প্রেম কথাটাতেই কোথায় যেন একটা অবৈধতার আভাস আছে। বৈধ ভাবে বিবাহিত শিখা দেবীর কান এ কথাটায় অভ্যস্ত নয়। তাই চমকে উঠেছিল। একটু পরেই আত্মসম্বরণ করে শিখা তার সেই পুরানো মোহিনী হাসি দিয়ে শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে বলল, "সেইটেই তো তোমার ভুল। ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রেম ছাড়া আর কোনো সম্বন্ধ হতে পারে বলেই জানো না তুমি।"

"হতে পারে, না-ও হতে পারে। কিন্তু সে প্রশ্ন অবান্তর। আমরা তো সাধারণ ভাবে নর-নারীর সম্পর্ক নিয়ে অ্যাকাডেমিক আলোচনা করছিনে। বিশেষ একটি দৃষ্টান্তের কথা বলছি।"

কণ্ঠে আরো একটু শ্লেষ দিয়ে শিখা বলল, "তাহোলে তুমি ঠিক ভেবে বসে আছো যে আমি তোমার প্রেমে পড়েছিলুম।" শিখা জোরে হেসে উঠল।

আমি বললেম, "আমার বেলা হয়ে গেছে। এবারে অনুমতি দাও তো উঠব।" আমি শিখার হাসিতে বিচলিত হইনি, কেন না জানতেম যে আমি উত্তর দিতে পারি ইচ্ছা করলেই। কিন্তু শিখাকে আমার অপমান করবার ইচ্ছা ছিল না। আমার নৈঃশব্দ্য ও উত্থানেচ্ছায় শিখার বোধ হয় করুণার উদ্রেক হোলো। বলল, "বসো আরেকটু।"

বসলেম। শিখা আবার অনেক ভালো কথা বলে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু, যে দেশলাইয়ের কাঠি একবার জ্বলে নিবে গেছে তা কি আবার জ্বলে?

আমি শিখার পাশেই বসেছিলেম, কিন্তু তার সব কথা ভালো করে শুনেছিলেম না। ভাবছিলেম শিখার অপরিসীম আত্ম-প্রবঞ্চনার কথা। হঠাৎ শিখা প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, তুমি কী করে মনে করলে যে আমি তোমার প্রেমে পড়েছি?"

এবারে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, বললেম, "দেখো শিখা, আমি যদি মনে করে থাকি যে তুমি আমার প্রেমে পড়েছিলে তবে তোমার আমার কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

"মানে?"

"মানে খুশি হওয়া উচিত।"

"কেন!"

"কারণ, তাহোলে I took the most charitable view of what you did. জানো শিখা, কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, এরা সব ষড়যন্ত্র করে প্রেমের এমন একটা মহীয়সী ছবি এঁকেছে যে এর জন্যে অনেক অপরাধ ক্ষমা করা হয়। অনেক কাজ যা সাধারণত গর্হিত বলে স্বীকৃত, উপন্যাসে দেখবে তার মুখর সমর্থন, কেন না সে কাজের উৎস ছিল ব্যর্থ বা সার্থক প্রেম। কাব্যে দেখবে বহু অবৈধতার সুললিত ব্যাখ্যান ও জয়গান—কারণ একই, প্রেম। এ জন্যে অন্যান্য অপরাধ তো সামান্য কথা, হত্যার পর্যন্ত ক্ষমা আছে। তুমি আর আমি সেই প্রলাপমুখর দিনগুলিতে যা করেছি কঠোর সমাজনীতিতে তার সমর্থন নেই। তোমার আমার অন্তরঙ্গতার কথাই মনে করো। আজ যদি তোমার কথা অনুযায়ী সেগুলির এই বিচার করি যে তার সব কিছুই অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক পক্ষের প্রেমহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে তাহোলে তোমার সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতে হয় সেটা কি শুনতে ভালো লাগবে তোমার?"

"কী বলো।"

"না, বললে কুৎসিত শোনাবে। তুমি জানো নিষ্প্রেম অন্তরঙ্গতার সঙ্গে পৃথিবীর প্রাচীনতম জীবিকার প্রভেদ নিতান্তই সামান্য। কী হবে তার নাম করে? তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ ছিল তা তুমি নিজ হাতে শেষ করে দিয়েছ। ভালোই করেছ হয়তো। তর্ক করব না তা নিয়ে। তবে কি জানো, যদি কখনো নিজের মনের মধ্যে সে-অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করো তাহোলে অন্তত নিজের কাছে এইটে স্বীকার করাই বুদ্ধিমতীর কাজ হবে যে তুমি প্রেমে পড়েছিলে। সেইটেই তোমার সব চেয়ে ভালো ডিফেন্স।"

এবারে শিখার বলার পালা যে তার সময় হয়েছে এবং তাকে উঠতেই হবে। আমি বাধা দিলেম না।

[ক্রমশঃ।

জীবন-যুদ্ধে সহজে পিছু হটার লোক না বিপ্রপদ।

তিনি সন্ধ্যার কিছু আগে গন্তব্য ষ্টেশনে নেমে একখানা খামের চেষ্টা করেন। তখন পোষ্ট অফিস আর খোলা নেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের নিকট থেকে চেয়ে-চিন্তে নেওয়া ছাড়া এখন আর উপায় কি? কিন্তু তাও পাওয়া যায় না। পত্রখানা জরুরী, লিখতেই হবে। বাড়ীতে সমস্ত সংবাদ জানালে ইমাম, নিতাই এবং অন্যান্য সকলে মিলে বুঝে সুস্থির করতে পারবে। তালুকটা খরিদ করতেই হবে। লাভের জন্য নয়, লোভের জন্যও নয়—এখন জিদের জন্যই করতে হবে অর্থব্যয়। জিদ-জমিন-জেনানা এই নিয়ে তো পুরুষে পুরুষে সংগ্রাম।

শিবচরের গয়নার নৌকা ছাড়বে—একটা মাঝি ঘা দেয় চামড়ার 'নাগরাটায়'। 'নাগরা'র শব্দে একটা সতর্কতার ধ্বনি ছড়িয়ে যায় অনেক দূরে। কূলের যাত্রীরা সচকিত হয়ে ওঠে। তাড়া-হুড়ো করে যে যার খাদ্য বিছানা বাক্স নিয়ে নৌকায় এসে জড়ো হয়। কারুর অর্দ্ধেক খাওয়ার ফলের খণ্ডটা জলে বিসর্জন দিয়ে আসা ছাড়া উপায় থাকে না। বিপ্রপদও উঠে একপাশে এসে বসেন। নৌকাখানা একশো কি সোয়াশো হাত লম্বা—যেন নদীর বুকে একখানা ভাসান বাড়ী। কত দড়ি-কাছি নোংগর-বৈঠা-দাঁড়। কেমন সুশৃঙ্খল করে সাজান বয়রা বাঁশের লাগি, চিকণ গাব-রঙান গুণের দাড়িগুলো। কত বাঁশ-বাখারী দিয়ে ছৈইটা নিপুণ হাতে বাঁধা! পয়সা ব্যয় করে সার্থক করেছে বটে। ষ্টীমারের আসবাব সাজ-সজ্জা দেখলে হকচকিয়ে যেতে হয়—কিন্তু গয়নার নৌকায় উঠলে বিপ্রপদকে মোহিত করে। একটা গ্রাম্য শিল্প-চাতুর্যের ছন্দ দেখতে পান নৌকাখানার সর্বাংশে।

হুঁকো-কল্কী তামাক-টিকা পিছনের খোপে যাত্রীদের জন্য গুছিয়ে রাখা হয়েছে। ঐদিকেই মাঝিদের খাবার-স্থান—পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ আসছে। তার পরই তেল-কুচকুচে প্রকাণ্ড একটা আস্ত গাছের হাল—দড়ি দিয়ে শক্ত করে একটা খুঁটোর সঙ্গে বাঁধা। অমনি করে না বাঁধলে ঝড়-তুফানে, ঝাপ্টা বাতাসে নৌকা আয়ত্তে রাখা যায় না। ঐটাই নৌকার প্রাণ!

কপিকল ঘুরিয়ে যেমনি প্রকাণ্ড পাল তোলা হলো মাস্তুলের মাথায় অমনি একটা ঝাঁকুনী দিয়ে নৌকা ছুটল তরতরিয়ে। কোথায় লাগে এর তুলনায় চিল! যাত্রীরা একটা ধাক্কা খেয়ে টাল সামলে নিয়ে যে যার জায়গা মত বসে থাকে। কেউ চেয়ে থাকে বাইরের দিকে, অনেকে আবার ওদিকে চাইতে পারে না।

না বুঝেই যেন ভুল করলে মাঝিরা—কিন্তু ভুলটা হলো মারাত্মক রকমের। চৈত্র মাস, এখন পলকে আকাশে কাল-বোশেখীর সঞ্চার হয়। ও কি? একটা বিদ্যুৎ চিলিক মেরে যায় কে যেন কাকের ডিম ছড়িয়ে দিয়েছে বায়ু-কোণে। কী কালি—ওদিকে আর চাওয়া যায় না। সুস্পষ্ট একটা ত্রাসের ভাব ফুটে ওঠে যাত্রীদের মুখে। তারা বুঝল নদীপথে সন্ধ্যা-সমাগমে মূর্ত্তিমতী বিভীষিকা এসে যেন দাঁড়াল বায়ু-কোণে। হঠাৎ হাওয়া থেমে গিয়ে ঘুরে উঠল কালিলেপা মেঘলা কোণে। চিলিক্ মারল আরোও গোটা কয়েক। তার পর ছুটল হাওয়া, বিষম হাওয়া—বেদম করে দিল মাঝিকে।

'আসমান জমিন পানি' মাঝি মনে মনে বলে, 'আল্লা না রাখলে এ বাতাসে নাও সামলান যাবে না।'

কালো জল নৃত্যরত সাপের মত আকাশে ছোবল মারছে। এপার ওপার দেখা যায় না। নৌকাটা কাৎ হয়ে এক ঢলক জল গলুই বেয়ে ওঠে। যাত্রীরা চমকে তাকায়।

'সামাল, সামাল—কেউ যেন নড়ে না জায়গা ছেড়ে।' নৌকা উড়ে যাচ্ছে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একবার উঠছে, ঢেউয়ের খাদে আবার ডুবছে—আবার উঠছে ঢেউয়ের মাথায়। তুফান—শুধু বিষম তুফান। তাকান যায় না বাইরে দিকে।

বিপ্রপদ দেখেন যে হাল-বাঁধা খুঁটোটা মড়-মড়িয়ে ভেঙে যাচ্ছে। মাঝি চীৎকার করে ওঠে। আর বুঝি রক্ষা নাই। ভিতরের মানুষ-গুলো হাঁউ-মাঁউ করে ওঠে। কেউ বা ইষ্টনাম স্মরণ করে। বিপ্র-পদ ছুটে যান। তাঁর শিরায় শিরায় শক্তিপ্রবাহ খেলে যায়। তিনি চট্ করে একটা বয়রা বাঁশের দাঁড়ের হাতল ভেঙে বসিয়ে দেন খুঁটো-টার পাশে। মাঝি প্রাণপণে চেপে ধরে হাল। তবু বুঝি পারবে না—পারবে না কিছুতেই রুখতে। হাল বিগড়ে পাল বেসামাল হয়ে নৌকা ডুববে মাঝ-নদীতে! বিপ্রপদ একটা দড়ি টেনে এনে শক্ত করে হালটাকে খুঁটোটার সাথে বাঁধেন। 'এবার আমার হাতে দাও।'

ক্লান্ত মাঝি অবাক্ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকে। পাখীর মত উড়ে চলে নৌকা। জলের ছাটের ঝাপটায় যাত্রীরা ভিজে যায়। জলখোপ থেকে দুজন মাল্লায় জলডুবি চালায়। বিপ্রপদর প্রথম যৌবন আবার ফিরে এসেছে যেন। তিনি ঐরাবতের মত জড়িয়ে ধরেছেন হাল।

নৌকা ছুটছে হু-হু করে এগিয়ে। আসছে ঢেউ ভাঙছে গায় তবু চল্‌ছে ফুঁপিয়ে! আবার একটা দমকা এলো। চুরমার হয়ে গেল তুফানের মাথা! এতো সাংঘাতিক ঢেউ! এই মাথা-ভাঙা ঢেউয়ে দিশা রাখা অতি সুকঠিন। বিপ্রপদর আশংকা হয়, কিন্তু নিরাশ

দক্ষিণের বিল

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

হওয়ার মানুষ না তিনি। দমকা ক্ষেপুনীটা যাওয়া মাত্র বিপ্রপদ বলে ওঠেন, 'ভয় নেই, ভয় নেই। ঐ কূল দেখাচ্ছে।' কোথায় কূল—কোথায় কিনারা! এ তো শুধু আশা দেওয়া, সতেজ রাখা মানুষের মন। আবার ঝাঁকুনি, আবার ক্ষেপুনী, আবার দুরন্ত হাওয়া। মাস্তুল না ভাঙ্গে, পাল না ছেঁড়ে—হুঁসিয়ার, হুঁসিয়ার! তুফানের দাপটে যেন চিরে যাবে নৌকার তলিটা। ঈশ্বর ভরসা নইলে আর ভরসা নেই মানুষের। বিপ্রপদ স্থিরচিত্তে হাল সামলে থাকেন। তুফানে খাদে খাদে নিয়ে চলেন নৌকা। এত বড় গয়নাখানাও যেন মনে হয় মোচার খোলা—এ নিয়ে খেলছে এক দুরন্ত রাক্ষসী।

ক্রমে যেন থেমে আসে ঝড়। মাঝিরা বলে যে কূল দেখাচ্ছে—ঐ তো পশ্চিম পাড়। কিন্তু নৌকা তো এখন কূলে নেওয়া যাবে না। তাহলে পাড় ধ্বসে এখনই নৌকার ওপর পড়বে। এ কি?—আবার সোঁ-সোঁ শব্দে গর্জে এলো বাতাস! আবার ঢসকে ঢসকে জল! এবার যাত্রীরা যেন ভেঙ্গে পড়ে—আর্তনাদে। বিপ্রপদ ভাবেন, শক্তিগড়ের বন্ধু-পরিবারের মতই তিনি আজ এই পথিক-পরিবারের ভাগ্য-নিয়ন্তা। আজ তাঁকে দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও এদের রক্ষা করতে হবে, পূর্ণ করতে হবে ক্ষয়-ক্ষতি। তিনি আবার অশ্বাস দেন।…

দর্-দর্ করে ঘাম ছুটছে। তবু বিপ্রপদ আজ স্থির। মাঝি-মাল্লারা মনে মনে এ-বাবুকে ওস্তাদ বলে মেনে নেয়। হঠাৎ একটা গাছ মড়মড়িয়ে ভেঙে পড়ে মাস্তুলের ওপর! নৌকাটাও তখনি এসে ঠেলে ওঠে একটা বালির চরে। ঝর-ঝর করে বৃষ্টি নামে—শুভ লক্ষণ। হাওয়া মন্থর হয়ে আসে। আর কোনও আশঙ্কা নেই দেখে বিপ্রপদ হাল ছেড়ে দিয়ে নৌকার গলুইয়ের দিকে এগিয়ে যান। গাছ না, গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়েছে—তাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি হবে না। মাঝিরা সহজে সরিয়ে ফেলতে পারবে।

চরে বসে জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়—জল না ভরলে এ নৌকা নামবে না এখান থেকে। তার পর যাবে গয়না ঘাটে।

বিপ্রপদর জন্য পাঁচ-সাতটা লণ্ঠন ও লোক-জন এসে ঘাটে বসেছিল। তারা তাঁকে দেখা মাত্রই সেলাম দেয়। তিনি নৌকা ছেড়ে যখন ওপরে ওঠেন তখন রাত কম হয়নি। তাঁকে উঠতে দেখে যাত্রী ও মাঝিরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানায়।

বাসায় এসে তিনি আহারান্তে চিঠিপত্র লিখতে বসেন। সব কথা খুলে লেখেন এবং হুঁশিয়ার হয়ে টাকা-পয়সার টোপ ফেলতে বলেন। অগাধ জলের মাছ, যেন ছুটে না পালায়।

তিনি শয্যা গ্রহণ করে ঝড়ের চিন্তা করেন—কি দুর্দান্ত ঝড়। আবার সব শান্ত হয়ে গেল। আকাশ এখন জ্যোৎস্নায় ভরা, ঝল-মল করছে আলো। তাঁর জীবনটাও তো অমনি ধারা চলেছে। তিনি এখনও ঝড় কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এখনও তাঁর অর্থ চাই, মান চাই, চাই গৌরবোজ্জল ভবিষ্যৎ। স্থিরচিত্তে সে সাধনা তাঁকে করতে হবে—করতে হবে বলেই তিনি দেশের মায়া মাটির মায়া কাটিয়ে এখানে এসেছেন। তিনি তাঁর জীবনে জ্যোৎস্নার জোয়ার আনবেন—তখন অর্থের ফুল ফুটবে, খ্যাতির সৌরভ ছুটবে।

বিপ্রপদ সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে চুপ করে আরাম অনুভব করেন।

১৭

এবার সদর থেকে কড়া হুকুম এসেছে যেন একটা টাকাও প্রজাদের কাছে বকেয়া থাকে না। যে নেহাৎ না দেবে তার ভিটামাটি উৎসন্ন করে দিতে হবে। ভয় দেখিয়ে জোর করে যে কোনও ভাবে টাকা আদায় করা চাই। বাবুদের মধ্যে কে কে যেন বিলেত যাবেন খরচ জোগাড় করতে হবে। নায়েব-মুহুরীদেরও তো দু'পয়সা কামাই করা দরকার—নইলে তারা খাবে কি! তারা প্রজাওয়ারি হিসেবের মধ্যে যারা অল্প খাজনা দেয় তাদের নাম লিষ্টিভুক্ত করে পেয়াদা পাঠায়, হৈ-চৈ করে খুব—মার-ধরও চলে, কিন্তু তাতে আসলে পয়সার কাজ হয় না। মনিবের তহবিল প্রায় শূন্য পড়েই থাকে। বড় বড় প্রজারা ঘুষ দেয়—তারা থাকে ঘুষের আবডালে লুকিয়ে। বিপ্রপদ সব খাতা-পত্তর খুলে, রাত জেগে, নায়েব মুহুরীর কারসাজি ধরে ফেলেন। ফলে তারা গালিমন্দ শোনে—শুনে, কানে জল যায়। তখন অন্তরালে লুকান জীবগুলো ধরা পড়ে। কড়কড়িয়ে টাকা আদায় হতে থাকে। খাজাঞ্চীর খাটুনী বাড়ে, বাবুদের তহবিল ভারী হয়। বিপ্রপদরও পেট ভরে। সপ্তাহে দু'বার সিন্দুক বোঝাই হয়ে টাকা সদরে চালান হতে থাকে।

সেদিন কার যেন একটা গরু এনে কাছারীতে বাঁধল। গরুর মালিক সভয়ে করজোড় করে এসে দাঁড়াল। কিন্তু নায়েব কাজে ব্যস্ত ওদিকে নজর নেই তার। বেচারী কিছু বলতেও পারে না, করজোড়ও খুলতে পারে না—ঠায় জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। নাকে এসে কয়েকটা মাছি পড়ছে, কখনও কানে, ভীষণ বিরক্ত! সে এ-পাশ ও-পাশ মুখ ঘুরাচ্ছে তবু হারামজাদা মাছি পালায় না। উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে এসে বসে। সে করজোড়ও খুলতে সাহস পায় না, যদি সেই মুহূর্তে বেটা বদমেজাজী নায়েব ওর দিকে চোখ ফেরায়। অতএব সে দাঁড়িয়ে নাক-কান সংকুচিত ও প্রসারিত করতে চেষ্টা করে।

ভাগ্যক্রমে সেই সময় বোধ হয় হরগৌরী সেই পথ দিয়ে অন্তরীক্ষে যাচ্ছিলেন। তাঁদের আশীর্ব্বাদে ও গরুর পুরুষকারে বন্ধনরজ্জু শিথিল হয়। গৃহপালিত জীবটা বারান্দা থেকে গৃহে প্রবেশ করে। সুমুখে নায়েবকে পেয়েই তার সলোম দেহটা চাটতে আরম্ভ করে দেয়। ক্রমে দেহ ছেড়ে দাড়ি। হয়ত ওটা তাকে এক জাতীয় জীব বলে ভ্রম করে। নায়েব চুপ করে আরামে কার যেন সর্বনাশের মুশাবিদা করছিল।

এমন সময় বিপ্রপদ কাছারী ঘরে ঢুকেই অবাক্। 'ও কি নায়েব মশাই, ও কি? গরুতে চাটে বাঘের গাল—শিবচর কাছারীর বাঘ! অবাক্ করলেন যে! বুড়ো হয়েছেন বলে এত অপমান?'

তড়াক করে উঠেই নায়েব লাগিয়ে দেন একটা লাইন-টানা রোলারের বাড়ি। বাড়িটা অপমানের অনুপাত মত জোরেই পড়ে। বেচারী গরুটা হাম্বা-যা-যা করে ওঠে।

এবার ওটার মনিবের পালা।

বিপ্রপদ বললেন, 'তুমি কি চাও হে বাপু?'

'আমি—আমি—দু'সন খাজনা আমার বকেয়া…মাত্র দু'সন ঐ একটা গরু।'

বিপ্রপদ সব বুঝতে পারেন। 'তোমার বাড়ী কত দূর?'

'এই তো নিকটেই।'

'তুমি একটু দুধ-টুধ দিতে পারো ?'

'কেন পারব না বাবু, খুব পারি—এক্ষুনি দুইয়ে দিতে পারি। দেবো এক্ষুনি ? এই শ্যামা !'

গরুটা আবার একটা শব্দ করে—অর্থাৎ অসময়ে তার ওলান টনটন্ ক'রলেও মনিবের জন্য সে যে-কোনও দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে রাজী।

'কাকে দিতে হবে হুজুর দুইয়ে?' একটা পাত্রের সন্ধান ক'রতে থাকে লোকটা।

বিপ্রপদ বলেন, 'আমাদের শিবচরের বাবু বুড়ো হয়েছেন—গলিত নখ-দন্ত, পলিত কেশ—এখন আর মাছ-মাংস খেতে পারেন না, হবিষ্যান্নভোজী, তুমি এক সের করে রোজ দুধ দিতে পার না ? তোমার বছর খাজনা কত ?'

'ছ পয়সা।'

'মাত্র ! এর জন্য তুমি ভাবো ? তুমি নিতান্ত বোকা। রোজ এক সের করে দুধ দিলে তিনশো বাট সের কি কিছু বেশী হয় বছর—তোমারও ভার কমে। উনিও হাল্কা হন—বকেয়া খাজনার জের টানতে হয় না।'

কর্মচারীর দল মুখ টিপে-টিপে হাসে।

'তুমি এখন যাও হে বাপু। কাল কি আজ বিকালে তোমার বাড়ী যাবো, একটু দুধ-টুধ জোগাড় রেখো।'

বিপ্রপদ মুচকে একটু হাসেন। লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'তুমি এখন দাঁড়িয়ে থেকো না—যাও, আমাদের কাজ আছে।'

লোকটা গরুটাকে নিয়ে বিদায় হয়। যাওয়ার সময় সর্বাগ্রে প্রণাম করে নায়েবকে—তার পর অন্যান্য সকলকে।

'নায়েব মশাই শক্তের ভক্ত, নরমের যম। তা না হলে তিন আমার জন্য অগ্রিম একটা গরু ক্রোক !'

নায়েব আর মাথা তুলতে পারে না।

সন্ধ্যার সময় বাস্তবিকই বিপ্রপদ বেড়াতে বেড়াতে গরুওয়ালার বাড়ী যান। সংগে কাউকে নেন না। তাকে দেখেই গরুওয়ালার আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া। মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়। শিবচর কাছারীর ম্যানেজার, যম যাকে দেখলেও ভয় পায়—তিনি সশরীরে তার দ্বারে।

ও কেঁদে ফেলে। 'হুজুর, আমার একটি মাত্র মা-মরা মেয়ে, আমাকে ধরে নিলে ও মরেই যাবে। আমি আজ দুধটুকু দিয়ে আসব ভেবেছিলাম, কিন্তু মেয়েটা কখন যেন বেচে চাল কিনে এনেছে। কাল থেকে আর আমার ভুল হবে না।'

ওর কান্না দেখে বিপ্রপদ কি যে বলবেন কি যে না বলবেন, তা ঠিক করতে পারেন না। 'ভয় নেই তোমার, তোমার কাছে কেউ দুধ চাইতে আসেনি। সকাল বেলা আমি ঠাট্টা করে বলেছি। তুমি কেঁদ না হে, কেঁদ না।'

একখানা ভেরর বন্দ খড়ের ঘর। চার আনা কি পাঁচ আনার মেটে বাসন, ক'খানা ছেঁড়া কাঁথা ও খান দু'-তিন পুরোন কাপড় নিয়ে একটা সংসার। আয়ের জিনিষ ঐ গরুটার দুধ। ওদের মত প্রজার দু'-দশ টাকা জমামি হ'লে হয় কি ? সদরে এ সব নিয়ে জানাস যাবে না—কারণ শেয়ারওয়ালারা শাসন চায়, শৈথিল্য পছন্দ করে না। তারা ঠিক ধনি-দরিদ্র বুঝতে চায় না—এ সব স্থানীয় কর্মচারীদেরই বোঝা দরকার।

ফেরবার পথে বিপ্রপদ ভাবেন : তিনিও তো তালুক কিনবেন। তাঁরও প্রজার মধ্যে এমনি অন্নহীন, কত আশ্রয়হীন প্রজা থাকবে—তাদের বেলা তিনি কি ব্যবস্থা করবেন ? তাঁর কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও তো কত নালিশ কত অনুযোগ শোনা যাবে। কত প্রজারা রাত কাটাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে। তিনি আর মুনাফার টাকা কয়টা ঘরে তুলবেন না। যা লাভ হয় ওদের হিতার্থে ব্যয় করে দেবেন। নিজের সংসার নিজেই খেটে চালাবেন। তালুক থাকবে সম্মান ও খ্যাতির জন্য। দরিদ্র সাধারণের অন্তর থেকে স্বতস্ফূর্ত সম্মান ও খ্যাতিই তাঁর কাম্য।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর গ্রাম্য নির্জ্জন পথ দিয়ে চলতে ও'র ভালই লাগছে। এ ক'দিন আর মাটির সংগে পরিচয় হয়নি। বদ্ধ ঘরে বসে বসেই সময় কেটেছে। ধূলোগুলো উড়ে এসে জুতো-জোড়ায় একটা প্রলেপ পড়িয়ে দিচ্ছে। গাছ-পালাগুলো চোখে লাগছে বড় সুন্দর। সারি সারি নধর নারকেল-সুপারি গাছ, তার ভিতর দিয়ে চলেছে পথ,—সেই পথের দু'পাশে আম জাম খেজুর রয়েছে সাজিয়ে। বাগানের ভিতর স্যাঁতসেঁতে জায়গাগুলোও বাদ যায়নি—সেখানে অজস্র আনারসের গাছ। তার আশে-পাশে কেয়া ঝোপ। ঢেঁকির লতা কখন বড় গাছগুলোকে জড়িয়ে ধরেছে, নয় তো 'এড়িয়ে গেছে। কোথাও বা অজস্র গাছে সহস্র কাঁটা শানিয়ে রেখেছে। ও'র বাগানগুলোও তো এমনি পূর্ণ। কোনটা ছোট, কোনটা বড়। বাড়ী থাকতে নিজের হাতেই যত্ন করেন। সারে জলে তারা বেড়ে উঠেছে। একবার দেখতে ইচ্ছা করে নতুন কলমগুলো এত দিনে কত বড় হলো। রোজই একটু একটু করে বাড়ে, দু'-চারটে পাতা মেলে। বিকাল বেলা জল দিলে ওদের সবুজ হাসি খোলে। ওরা যেন কি বিপ্রপদকে বলতে চায়। বোবা ভাষা, বোবা চাহনিতে কত যে ব্যঞ্জনা তা শুধু তিনিই বোঝেন। বাড়ীর জন্য সহসা মন ব্যাকুল হয়। অমরেশ কমলকামিনী সেবা সকলে এক সাথে ও'র মনের বাগানের গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে এসে দাঁড়ায়। অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে থাকেন বিপ্রপদ। সকলের শেষে আসে বড় মেয়েরা—হাত-ধরাধরি করে অর্দ্ধবৃত্তাকারে। তারা হাসে, গান গায়, করতালি দিয়ে নাচে। তার পর ওরা শ্যাম সন্ধ্যার তরল আঁধারে বাগানের গহনেই মিলিয়ে যায়। বিপ্রপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

বিপ্রপদ কাছারীতে ফিরে সকল চিঠি ঠেলে রেখে বাড়ীর চিঠিটা খুলে পড়তে বসেন। মৃদু আলোটা উসকে দিয়ে দেখেন একগাদা চিঠি খামের ভিতর। সকলেই লিখেছে। সেবা শুধু লিখতে পারেনি—একটা কচি হাতের ছাপ পাঠিয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা কসরৎ করে, অনেক অকার-ইকার যোগ-বিয়োগ করে বিপ্রপদ চিঠি পড়া শেষ করেন। বাবাকে সকলের দেখতে ইচ্ছা করে, কবে পর্যন্ত তিনি বাড়ী ফিরবেন তাই সকলে জানতে চেয়েছে। এই গেল ছেলে-মেয়েদের কথা। বুড়োদের কথা : ইসলাম মিঞারা দু'-এক দিনের মধ্যে সেন মশাইর সাথে দেখা করে সংবাদ জানাবে। একখানা খামের একেবারে দাম তুলে নেওয়া হয়েছে। পাকা-কাঁচা নানা রকমের

[৭১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

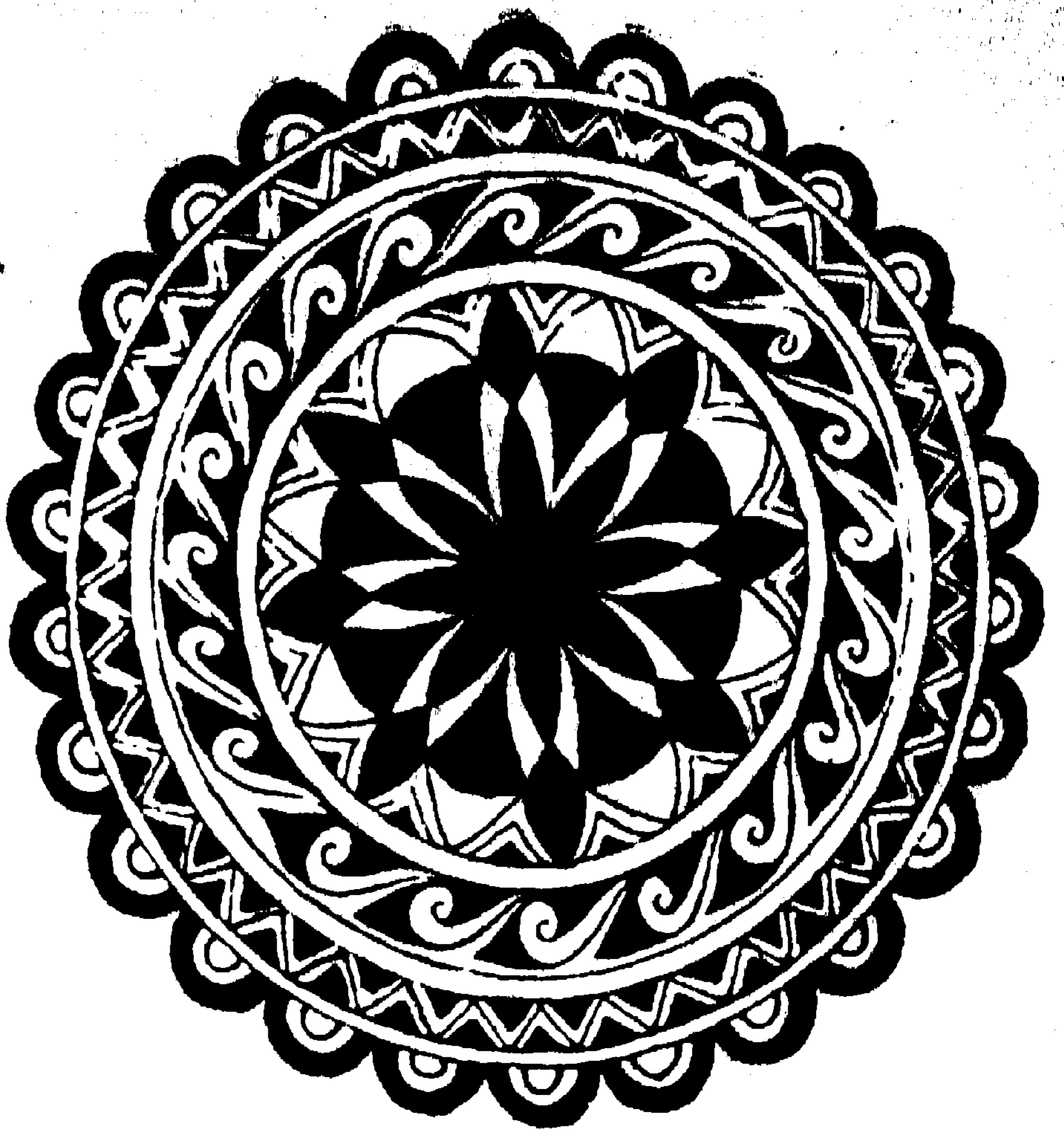

এবার কলিকাতার পূজা

(মাসিক বসুমতী'র নিজস্ব প্রতিনিধি লিখিত)

থামে থামে জ্বলে উঠল হাজার ওয়াটের বিজলী বাতি—লাল, নীল, ধূসর। জ্বলে উঠল মঞ্চের পাদপ্রদীপ। চোখ-ধাঁধানো আলোর বন্যা ভেদ করে ভেসে উঠল কয়েকটি কৃত্রিম পর্বতশ্রেণী। গোলাপ ফুলের মালা গলায় দিয়ে রূপোর কাঁচি হাতে মাননীয় অতিথি এসে কেটে দিলেন রেশমের ফিতা। সকলে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি দিয়ে উঠল—"বন্দে মাতরম্"। উদ্বোধন হল একটি সর্বজনীন দুর্গা-মণ্ডপের।

এমনি সর্বজনীন দুর্গাপূজো এবার কলকাতায় হয়েছে ১ শত এবং এবারের পূজোয় সেইটাই সব চেয়েও বড় বৈশিষ্ট। প্রত্যেক সর্বজনীনে যদি গড়ে ২ হাজার টাকা করে খরচ হয়ে থাকে, তাহলে মোট খরচের পরিমাণ ১৮ লক্ষ টাকা। এই ১ শত সর্বজনীন ছাড়াও বিভিন্ন নাগরিকের গৃহে আর ৪ শ' পূজো হয়েছে, তাতে আরও ৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বলে ধরে নিলে এবার শুধু পূজো বাবদ কলকাতায় মোট খরচের পরিমাণ২৫ লক্ষ টাকা। বলা বাহুল্য, টাকাটা কলকাতার ৫০ লক্ষাধিক নাগরিকের পকেট থেকেই আদায় হয়েছে। দুর্গাপূজোর আনন্দ-উৎসবের জন্য প্রত্যেক নাগরিক গড়ে ৮ আনা করে দিয়েছেন।

কলকাতার এই ৫০ লক্ষ নাগরিকের হিসাব থেকে কয়েক জন ধনী ব্যবসায়ী (অধিকাংশই বড়বাজার অঞ্চলের অধিবাসী), বড় চাকুরিয়া, উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং জমীদারদের বাদ দিলে যাঁরা বাকী থাকেন তাঁরা হয় নিম্ন-মধ্যবিত্ত (কেরাণী, সাংবাদিক, ছোট দোকানদার, অধ্যাপক, শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক ইত্যাদি) না হয় মজুর শ্রেণীর লোক। নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মজুর শ্রেণীর মধ্যে কোন ধনবৈষম্য নেই, আছে সংস্কৃতি-বৈষম্য। নিম্ন-মধ্যবিত্তদের পেছনে গোলদীঘির ছাপ থাকে আর বাইরে বেরুনোর সময় তাঁরা একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরোন। তাঁদের রুচি মার্জিত এবং চালচলন কৃত্রিম। মজুর শ্রেণীর মধ্যে এর অনেক গুণেরই অভাব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে শেষোক্ত দুই শ্রেণীর মানুষের জীবন যে কি রকম অসহনীয় হয়ে উঠেছে, তা বোঝাবার জন্য বসুমতীর পাতা খরচ করবার প্রয়োজন নেই। মুদ্রাস্ফীতি, চোরাবাজার, মুনাফাবাজী এবং দুর্নীতির চাপে পড়ে সারা বাঙলা দেশেরই আজ ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা! তার ওপর আপোষ-নীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে দেশবিভাগের সৌজন্যে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা। বিনা রক্তপাতে দেশ স্বাধীন করতে গিয়ে পাঞ্জাব এবং বাঙলায় কত লক্ষ নর-নারী-শিশুর জীবন-নৈবেদ্য ধরে দিতে হয়েছে তার হিসাবও সকলেই রাখেন।

২০ লক্ষ লোকের সহর কলকাতায় আজ ৫০ লক্ষ লোক কি ভাবে বাস করছেন, তাও বুঝিয়ে বলতে হয় না। আমরা সকলেই ভুক্তভোগী। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চেয়েও বর্ণনা নিশ্চয়ই বেশী স্বাভাবিক হবে না। দালালদের ঘুষ দিয়ে, বাড়ীওয়ালাদের কল্পনাতীত অঙ্কের সেলামী দিয়ে বহু মাসের চেষ্টার পর একখানা মাত্র ঘর সংগ্রহ করে সেখানেই হয়ত বাস করছেন এক ডজন পরিবার। যাত্রা-দলের মত ঢালা বিছানায় হয়ত শুয়ে আছেন পিতা, পুত্রবধূ, পুত্র, কন্যা, জামাতা এবং অনূঢ়া কন্যা। লজ্জা নেই, সম্ভ্রম নেই, শালীনতা-বোধ নেই। ঘর ভেঙেছে, মন ভেঙেছে, স্বাস্থ্য তো চিরদিনই ভাঙা। স্বাস্থ্যরক্ষার কোন্ উপাদানটি তাঁদের আয়ত্তের অধীন? আহার নেই, স্থিতি নেই, বর্ত্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই—আছে কেবল দিগন্তবিস্তৃত জমাট তমসা, অনিশ্চয়তা এবং ক্ষয়। এত লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা সত্ত্বেও শরতের হাওয়া গায়ে লাগলেই বাঙালীর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মরা গাঙে আবার উৎসাহ, উদ্দীপনা, আনন্দের বান ডাকে—বুক ভরে উঠে প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, মায়া, মমতায়। তাই এই ১৯৪৮ সালের মুদ্রা-স্ফীতি, অভাব-অনটন, অকাল-মৃত্যু এবং বন্যার মধ্যে যখন সব ছাপিয়ে আগমনীর সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল, তখন কলকাতার ৫০ লক্ষাধিক নাগরিক সাময়িক ভাবে তাঁদের অতীত-বর্ত্তমান ভুলে শারদোৎসবের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। পাড়ায়-পাড়ায় ছেলেরা বেরুলো চাঁদার খাতা হাতে করে। কুমারটুলীর শিল্পীরা প্রতিমা গড়বার জন্য কাঠামো তৈরী করতে লেগে গেলেন। ডেকরেটর আর মাইকওয়ালারা নিজেদের সাজ-সরঞ্জাম গোছাতে লাগল। ধনি-দরিদ্র নির্বিশেষে "পূজোর পোষাক" যোগাড় করতে লাগলেন। ভীড় জমে উঠল কমলালয় ষ্টোর্সে, কলেজ ষ্ট্রীট বাজারে আর আর্মি নেভী-স্টোরে। দোকানে দোকানে স্বচ্ছ শো-কেসে ঝলমলিয়ে উঠল রঙ-বেরঙী সাড়ী-ব্লাউসের বাহার। সাহিত্যিক-শিল্পীরা তাঁদের অর্ঘ্য সাজাতে লাগলেন বিভিন্ন পত্রিকার পূজা-সংখ্যা মারফৎ। হাটে, বাজারে, অলিতে-গলিতে পূজার ধুম লেগে গেল। কলকাতার ৫০ লক্ষ নাগরিক বাৎসরিক আনন্দ আয়োজনের জন্য ব্যয় করলেন ২৫ লক্ষ টাকা। হিসাবী বুদ্ধিমানরা বললেন, "ক্ষণিক আনন্দের জন্য এত অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন ছিল কি? ২৫ লক্ষ টাকা তুলে একটা হাসপাতাল করা চলত, একটা প্রথম শ্রেণীর গবেষণাগার হত, আরও

না জানি কত 'সংকাজ' হত! কয়েকটি পূজা-মণ্ডপকে কেন্দ্র করে কয়েক দিন হৈ-চৈ করে শক্তি ব্যয় করে কি পরমার্থ লাভ হল?" তাদের বুদ্ধিমত্তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে দূর থেকে বিদায় নেওয়াই ভাল। তাঁরা তাদের বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে সারা জীবন ধরে লাভ-লোকসান ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ করুন, আমরা তাঁদের দলে নই।

শারদোৎসবে নতুন পোষাক পরে সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতা বিনিময় করা বাঙলা দেশের প্রাচীন রীতি। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের ভাগ্যেই এবার নতুন পোষাক জোটেনি। কারণ, অধিকাংশ লোকেরই "দিন আনি দিন খাই" গোছের অবস্থা। "পূজোর বাজারে" যোগ দেবার মত উদ্বৃত্ত অর্থ কারও হাতেই ছিল না। তার উপর কাপড়-চোপড়ের বাজার-দর ছিল সাধারণ লোকের আয়ত্তের বাইরে। সত্যি কথা বলতে কি, পূজোর বাজার এবার ভাল জমতে পারেনি। বিভিন্ন দোকানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, অন্যান্য বছরের তুলনায় বিক্রয় নেহাৎ মন্দ হয়নি, কিন্তু কলকাতার লোকসংখ্যার তুলনায় বিক্রয়ের পরিমাণ নিতান্তই কম ছিল। এক পাতলা রবারের রঙচঙে বেলুন ছাড়া আর কিছুই গরম পিঠার মত বিক্রয় হয়নি। মহালয়ার আগে পর্যন্ত দোকানে দোকানে তেমন ভীড় জমেনি। মহালয়ার দিন থেকেই আসল "পূজোর বাজার" সুরু হয়। অন্যান্য বার পূজোর ছুটীতে কলকাতার জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ কলকাতার বাইরে চলে যেতেন। পূর্ববঙ্গগামী যাত্রীর সংখ্যাই ছিল বেশী। উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং ধনীরা যেতেন পুরী, দার্জিলিং-এ হাওয়া বদলাতে। এবার পূর্ববঙ্গগামী যাত্রীর সংখ্যা নগণ্য। বায়ুসেবীদের সংখ্যাও অত্যন্ত কম ছিল, কারণ রেল কোম্পানী এই সমস্ত অতিরিক্ত যাত্রীদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করতে নারাজ হন।

প্রতিমা নির্মাণ এবং প্রতিমা ও মণ্ডপ সাজানোর ব্যাপারে এবার নানা বৈচিত্র দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ সর্বজনীন মণ্ডপেই দেখা গেছে, প্রত্যেক দেবতা পৃথক্ ভাবে এক-একটি পাহাড়ে স্থান গ্রহণ করেছেন। মা দুর্গার একান্নবর্তী সংসারে এই ভাঙনের মধ্যে কেউ কেউ বাঙলার তথা বিশ্বের সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করেছেন।

এক সর্বজনীনে প্রতিমাকে কালো রঙে রঞ্জিত করা হয়। উদ্যোক্তাদের অক্ষম অন্তর্দাহের এই অপূর্ব বিকাশ দেখে রাষ্ট্রনায়কদের কেউ কেউ মর্মদাহ লাভ করেছেন বলে জানা গেল। এর ভিতরে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ছিল কি না কে বলতে পারে? কয়েক জায়গায় পূর্ববঙ্গের বাস্তহারারা সর্বজনীন পূজোর আয়োজন করেছিলেন।

পূজোর ক'দিন কলকাতায় যে বিরাট আনন্দোচ্ছ্বাসের ঢেউ উঠেছিল, তা বর্ণনার অতীত। বুকে পাথর চাপা দিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে কলকাতার লক্ষ লক্ষ নর-নারী-শিশু তাঁদের গৃহ নামক অন্ধকারাচ্ছন্ন স্যাঁৎসেঁতে গুহা ছেড়ে রাজপথে দাঁড়িয়ে মুক্ত বায়ু সেবন করেছিলেন পূজোর ক'দিন রাত্রে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও পরিচ্ছন্ন সাজে সজ্জিতা পুরনারীরা দল বেঁধে অসঙ্কোচে পাড়ায় পাড়ায় প্রতিমা দেখে বেড়িয়েছেন। লক্ষ লক্ষ নারীর এই বিরাট সমাবেশ কলকাতার ইতিহাসে অভূতপূর্ব। পূজোর ক'দিন রাত্রে রঙ-বেরঙের জমকালো সাজ-পোষাক-পরা কলহাস্যমুখরিতা মেয়েরা পুরুষদের সমস্ত স্মার্টনেস ম্লান করে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করেছেন। স্বেচ্ছাসেবকদের সুষ্ঠু ব্যবস্থায় কোন পূজা-মণ্ডপেই বিশৃঙ্খলা দেখা যায়নি। বৈকাল থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত রাজপথে কেবল নর-নারী-শিশুর মিছিল দেখা গেছে।

কিন্তু উচ্ছ্বাস কেবল উচ্ছ্বাসই। তার পেছনে সত্যিকার কোন জোর নেই।

অপেক্ষাকৃত নির্জন ওয়েলসলির সর্বজনীনের মণ্ডপের বাইরে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট টানছিলাম। কাছাকাছি এসে দাঁড়াল একটি তরুণ-তরুণী। আবছা আলোয় তাদের চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম না, শুধু শুনতে পেলাম তাদের কথোপকথন।

—এমন ভাবে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে ভাবতে পারিনি।—মেয়েটি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আরম্ভ করল।

—তোমায় আবিষ্কারের আশা নিয়েই তো ঘুরে বেড়াচ্ছি কয়েক মাস ধরে। কিন্তু এ তোমার কি শ্রী হয়েছে নীলা! ঢাকা থেকে যখন আস, তখন···

—থাক থাক। জানো, আমাদের কি সর্বনাশ হয়ে গেছে? ছোট ভাই মারা গেছে ক্যাম্পে, মা শয্যাশায়ী, বাবার অবস্থাও খারাপ। অচল সংসার চালাবার জন্য পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে টেলিফোনে চাকরী নিয়েছি। তোমরা কোথায় আছ সুরঞ্জন? তোমার মা বাবা?···

তাদের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে মাইকে রেকর্ড বেজে উঠল "আমায় সকল রকমে কাঙালী করেছ গর্ব করিতে চুর"। বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল। চোখের সামনে ভেসে উঠল কঠোর বাস্তব। পূজোর ক'দিনে শিয়ালদহ রেল-ষ্টেশনে আশ্রয়প্রার্থীদের সাতটি শিশু কলেরায় মারা গেছে। লক্ষ লক্ষ লোক যারা এক দিন জ্ঞানে-গরিমায়, শিক্ষা-দীক্ষায়-সংস্কৃতিতে একটা জাতকে অগ্রগতির আলোক দেখিয়েছিল, তারা আজ জীব-জন্তুর মত এসে পরের অনুগ্রহজীবী হয়ে বাস করছে বিভিন্ন ক্যাম্পে, ক্ষয় হচ্ছে তিলে তিলে। এমনি কত সুরঞ্জন আর নীলার পৃথিবীতে স্বর্গ রচনার চিরবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতার বিরাট শূন্যে বুদ্বুদের মত বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কে তার খোঁজ রাখবে?

খালি বাজতে লাগল কানে, "আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ"। ১৯৪৩ সালে ৪০ লক্ষ নরনারীর প্রাণের আহুতি পেয়ে যে কাঙালপণার আগুন জ্বলে উঠেছিল, তারই লেলিহান শিখা আজ সমগ্র বাঙলা দেশকে গ্রাস করতে উদ্যত। এই অনন্ত অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে কে আমাদের বাঁচাবে? অসুরবিনাশিনী মহামায়ার অলৌকিক শক্তিতে আস্থা রাখতে পারি কি? সন্দেহ হয়। যুগ যুগ ধরে অলৌকিক শক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি? এবার আমাদের মুক্তিদাতা বোধ হয় ভগবান নয়, মাটির মানুষ।

★

বসুমতী

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জলবায়ুর দোষে ও কীটাদির উৎপাতে এদেশে পুরাতন কাগজপত্র বেশী দিন টিকে না, তাহার উপর পূর্ব্বপুরুষের কার্য্যকলাপের নিদর্শনগুলি সযত্নে রক্ষা করিবার আগ্রহ আমাদের নাই বলিলেই চলে। এই দুই কারণে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা সম্বন্ধেও কোন দলিলপত্র বা পুস্তকাদি অনেক প্রসিদ্ধ বাঙালী-পরিবারে এখন আর বড় দেখা যায় না।

'সাপ্তাহিক বসুমতী' : সংবাদপত্র জগতে 'বসুমতী'র নাম সুপরিচিত। পরলোকগত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় ইহা গত শতাব্দীর শেষভাগে সাপ্তাহিক-পত্ররূপে জন্মলাভ করে। কিন্তু পুরাতন সংখ্যাগুলি অপ্রাপ্য হওয়ায় ইহার জন্মকাল নির্ণয় করা গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কিন্তু ব্যাপারটি দুরূহ হইলেও একেবারে অসাধ্য নহে। আমি এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাই নিবেদন করিব।

সাপ্তাহিক বসুমতী যে ১৩০৩ সালে বিদ্যমান ছিল, অগ্রে তাহার দুইটি প্রমাণ দিতেছি :

(১) 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১ম বর্ষের সাপ্তাহিক বসুমতীর উপহার-স্বরূপ ১৩০৩ সালে 'অতুল-গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ' মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন।

(২) সরকারী রিপোর্টে আমি ৬ অক্টোবর ১৮৯৬ (আশ্বিন ১৩০৩, মহালয়া) তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীর উল্লেখ দেখিয়াছি।

১৩০৩ সালের আশ্বিন মাসে সাপ্তাহিক বসুমতী বিদ্যমান ছিল সত্য, কিন্তু ঠিক কোন তারিখে ইহা সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে, তাহা জানিবার জন্য মন কৌতূহলী হয়। সুখের বিষয়, ইহার নির্দ্ধারণের সূত্রও মিলিয়াছে :

সাপ্তাহিক বসুমতী ২৩শ বর্ষে পদার্পণ করিলে সত্যচরণ মিত্র সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'প্রতিবাসী' ১৭ই ভাদ্র ১৩২৫ তারিখে লিখিয়াছেন :—

> "নব্যবঙ্গের সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'বসুমতী' বিগত ২৫শে শ্রাবণ, ২৩ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।"

ইহা হইতে ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যা সাপ্তাহিক 'বসুমতী'র প্রকাশকাল—২৫ শ্রাবণ ১৩০৩, শনিবার (৮ আগষ্ট ১৮৯৬) পাওয়া যাইতেছে। আমার মনে হয়, ইহাই 'বসুমতী'র জন্ম-তারিখ।

প্রথমাবস্থায় প্রসিদ্ধ গীতিনাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'বসুমতী'র সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

'দৈনিক বসুমতী' : শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত দৈনিক বসুমতীতে লিখিয়াছেন :—"সাপ্তাহিক বসুমতী পরে ১৩২০ সালে যখন দৈনিকে রূপান্তরিত হয়, তখন ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়" (দু'চার কথা, ৫ চৈত্র ১৩৫৪)।

'মাসিক বসুমতী' : ১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসে, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সম্পাদকত্বে, 'মাসিক বসুমতী' প্রথমে প্রকাশিত হয়। পরে শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদক হন এবং ইহার পর সতীশচন্দ্র একা সম্পাদক হন। ১৩৫১ সালের বৈশাখ হইতে সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদক নিযুক্ত হন। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "পত্র-সূচনায়" এইরূপ লিখিত হয় :—

> "আমরা যথাসাধ্য সাহিত্যের সহায়তায় দেশের সেবা করিবার জন্য এই পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি।...আজকাল রাজনৈতিক সমস্যাই দেশের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা—দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি রাজনৈতিক উন্নতি সাপেক্ষ। সেই জন্য আমরা রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করিব। বিজ্ঞানের কথা—শিল্প-বাণিজ্যের কথা—ঐতিহাসিক কথা—কৃষি প্রভৃতির উন্নতির আলোচনা—সামাজিক সমস্যার আলোচনা—এই পত্রিকায় থাকিবে। আর পাঠকদিগের চিত্তবিনোদন করিবার উদ্দেশ্যে গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি ইহাতে প্রকাশিত হইবে। যাহাতে ইহার চিত্রসম্পদ প্রবন্ধগৌরবের উপযোগী হয়,' সেদিকেও আমরা দৃষ্টি রাখিব। এই সঙ্কল্প লইয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।"

'মাসিক বসুমতী' এখনও সগৌরবে চলিতেছে।

'বার্ষিক বসুমতী' : ১৩৩২, ১৩৩৩ ও ১৩৩৪ সালে শারদীয়া পূজার সময় 'বার্ষিক বসুমতী'র তিনটি সংখ্যা স্বতন্ত্র ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। বহু খ্যাতনামা লেখকের রচনা এগুলির কলেবর পূর্ণ করিয়াছিল। 'বার্ষিক বসুমতী' পুনঃ প্রচারিত হওয়া উচিত।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ললিত হাজরা

১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ আনন্দমোহন বসু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহায্যে "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" নামক সঙ্ঘ গঠন করিলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সঙ্ঘের প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" বা "ভারত সভা"র পূর্ব্বেকার দুইটি সভা সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। ১৮৪৩ সালে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ইন্ বেঙ্গল" নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়—"ভারতীয় প্রজাদের প্রত্যেক শ্রেণীর স্বার্থ, অধিকার এবং উন্নয়নের ব্যবস্থাকল্পে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল।" ১৮৫১ সালে এই সমিতি "বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন"এর সহিত মিলিত হইয়া যায় এবং ১৮৫২ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টের নিকট এক সুদীর্ঘ দরখাস্তে ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব প্রথা, ভারতীয় শিল্পীদের প্রতি সুবিচার, শিক্ষার বিস্তার, সরকারী উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ প্রভৃতি দাবী করিয়া জানাইল, "সদাশয় বৃটিশ সরকারের সাহচর্য্য লাভ করিয়া তাহারা যে উন্নতির আশা করিয়াছিল তাহা সম্ভব হয় নাই।...ভারতে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্ভাব্যরূপে জনগণের মনোভাব ব্যক্ত করিবার সুযোগ দিতে হইবে।" এই সমিতির সহিত "বেঙ্গল ল্যাণ্ড-হোল্ডারস্ সোসাইটি"ও মিশিয়া যায়। মোটের উপর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, উক্ত সমিতিগুলি জনসাধারণের উন্নতিকল্পে বড় গালভরা বুলিই প্রচার করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে জমিদারের স্বার্থরক্ষাই তাহাদের একমাত্র ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত সমিতিগুলির সদস্যদের চাঁদার পরিমাণ এত অধিক করা হইয়াছিল যে কেবল মাত্র বিত্তশালী জমিদারগণই তাহাদের সদস্য হইতে পারিতেন। জনসাধারণ ত দূরের কথা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাহাতে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবেশ করিয়া নিজেদের দাবী-দাওয়া লইয়া আলোচনা করিতে না পারে তজ্জন্যই সদস্যদের চাঁদার পরিমাণ অত্যধিক করা হইয়াছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারতীয় বাহকদের বিরোধিতা করিয়া সুরেন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের অনুগামী লইয়া এই "ভারত সভা" প্রতিষ্ঠা করিলেন। জনমত গঠন করিবার উদ্দেশ্যে "ভারতসভা" প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণ যাহাতে দলে দলে এই সভায় যোগদান করিতে পারে তজ্জন্য চাঁদার হার অত্যন্ত স্বল্প করা হইল। বাংলার বিভিন্ন জেলায় "ভারত সভার" শাখা স্থাপিত হওয়ার পরে সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষে "ভারত সভার" বাণী বহন করিয়া লইয়া গেলেন। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ তাহার সভার মুখপাত্র হিসাবে 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনী "নেশন ইন মেকিং"এ লিখিয়াছেন যে, "বেঙ্গলী" পত্রিকাই সর্ব্বপ্রথম রয়টার'এর সার্ভিস্এর গ্রাহক হয়। ইতিমধ্যে জনমত বৃটিশবিরোধী হইয়া উঠিলে ভারত গবর্ণমেণ্ট অত্যাচারের পন্থা অনুসরণ করিল। ১৮৭৮ সালে ভারত গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ তহবিলের অর্থ আফগান যুদ্ধে নিয়োগ করায় সমগ্র দেশে প্রবল হৈ-চৈ আরম্ভ হয়। এই হৈ-চৈ দমন করিবার জন্য ভারত সরকার নির্মম অত্যাচারের নীতি প্রয়োগ করিল। এই বৎসরেই দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের জন্য প্রয়োগ করা হইল কালা কানুন "প্রেস্ এ্যাক্ট" এবং ভারতীয়দের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া জারী হইল "আর্ম্মস্ এ্যাক্ট"। 'বেঙ্গলী' পত্রিকার উপর বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করিতে বিলম্ব ঘটিল না। সুরেন্দ্রনাথকে এক আপত্তিজনক প্রবন্ধ লেখার অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত করা হইল। মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক মিঃ জাষ্টিস্ নরিস, কোন এক মামলায় হিন্দুধর্ম্মের দেবতাদের উপর কটাক্ষপাত করিয়া মামলার রায় প্রদান করিবার এক সংবাদ 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সংবাদের উপর মন্তব্য করিয়া 'বেঙ্গলী' পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়: "জেফরীস্ এবং স্ক্রগস্‌এর আমলের কথা যদি তাঁহার স্মরণ না থাকে তাহা হইলে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, আমরা এমন এক জন বিচারক পাইয়াছি যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারকের অযোগ্য।..." এই মন্তব্য প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথের উপর এক সমন জারী করা হইল।—"সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় আদালত অবমাননার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথের দুই মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল।" (Bipin Chandra Pal—Memories of My Life & Times)। "আদালতের রায় বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা ও ছাত্রবৃন্দ আদালতে হৈ-চৈ বাধাইয়া দিলেন। এই বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে ছাত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। এই আশুতোষ পরে কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সলার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।"—(Surendra Nath Banerjea—"A Nation in Making")। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে এক চাঞ্চল্য দেখা দিল। যাহা হউক, সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডে যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি বিদেশে ভারত সভার শাখা স্থাপিত হইয়া গেল। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "ভারত সভা" জমিদারবিরোধী ছিল। ১৮৮৩ সালে ভারত সভা কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করিল। আনন্দমোহন বসু এই সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বাংলার বহু প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। আনন্দমোহন তাঁহার অভিভাষণে ঘোষণা করিলেন যে, এই সম্মেলন জাতীয় পার্লামেন্টের প্রথম অধ্যায়। প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠনের, অস্ত্র আইনের অবসানের, সিভিল সার্ভিসের সংস্কারের এবং টেক্‌নিক্যাল্ শিক্ষার দাবী করিয়া এই সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারত সভার জনপ্রিয়তা এবং ভারত সভার নেতা সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনকে পল্লী অঞ্চলে কৃষকের সভা আহ্বান করিয়া অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদিগকে দণ্ডায়মান হইতে উপদেশ দিতে দেখিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিল। কৃষক সম্প্রদায়কে ভারত সভার আধিপত্য-মুক্ত করিবার মানসে জমিদারদিগকে না চটাইয়া

১৮৮৩ সালে "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন" পাশ করিবার কথা কাউন্সিলে লর্ড রিপণ ঘোষণা করিলেন। এই আইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাউন্সিলে লর্ড রিপণ বলিলেন: "...আমরা এক বন্দোবস্ত করিতে যাইতেছি। এই বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ নিজেদের অর্জিত সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবেন না। আবার অন্য দিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় তালুকদার, রায়ত এবং কৃষকদিগকে তাহাদের স্বার্থরক্ষার্থে ব্যবস্থা করিবার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি আমরা বহু দিন ধরিয়া অবহেলা করিয়া যে নিস্ক্রিয়তার পরিচয় দিয়াছি তাহার অবসান ঘটাইয়া আমরা কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইতেছি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় রায়তের যে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল তাহাকে সেই পর্য্যায়ে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নীত করিতে চাহি এবং বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা যে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে তাহা আমরা বিশ্বাস করি।"—(Selections from papers relating to the Bengal Tenancy Act, 1885—পৃ: 140-141)। এই ভাষণে প্রজাস্বত্ব আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা প্রকাশিত হইয়াছে এবং "বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা একান্ত আবশ্যক" ইহার তাৎপর্য্য যে কি তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। জমিদারদিগকে অভয় দান করা হইয়াছে আবার কৃষকদিগকে ছিটে-ফোঁটা অধিকার দেওয়া হইয়াছে। জমিদারদের প্রতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্ত্তন হইল না। নব্য জাতীয়তাবাদ যাহাতে পল্লী অঞ্চলে সম্প্রসারিত না হয় তজ্জন্য এই ব্যবস্থা করা হইল। ১৮২৯ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম্ বেন্টিঙ্ক-এর নীতি: "ভারতে জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে তাহার বিরুদ্ধে যদি আমাদিগকে কোন শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় তাহা হইলে আমি বলিতে পারি যে যাবতীয় ব্যর্থতা সত্ত্বেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভারতে যে সব জমিদারের সৃষ্টি হইয়াছে তাহারাই আমাদের পক্ষ হইয়া বিদ্রোহ দমন করিবে, কারণ তাহারা জানে, বৃটিশ ডোমিনিয়নের নিরাপত্তার উপর তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে।" —(A. B. Keith.—"Speeches and Documents on India Policy 1750—1921", Vol. I পৃ: 215)। এই নীতি এখনও কার্য্যকরী থাকিল। ভারত সভার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র পুনরায় আরম্ভ হইল। ১৮৮৪ সালে প্রজাস্বত্ব আইন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের প্রবর্ত্তন করিয়া এবং লর্ড লিটনের ঘৃণ্য সংবাদপত্র দমন আইনের অবসান ঘটাইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার কূটনৈতিক চাল দিল। এক আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ইহাতেও শান্তি পাইল না। এই আসন্ন বিপ্লব হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে অন্য কিছু করা আবশ্যক ভাবিয়া সন্ত্রাসমূলক নীতির পরিবর্ত্তে এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজন অনুভব করিল। এলান্ অক্টেভিয়ান্ হিউম নামক জনৈক বৃটিশ কর্ম্মচারী সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। হিউম সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময়ে পুলিশের বহু গোপনীয় দলিল ও রিপোর্ট আলোচনা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে এক বৃটিশ-বিরোধী অসন্তোষ প্রবলাকারে দেখা দিয়াছে এবং বৃটিশ শাসনকে উৎখাত করিবার জন্য বহু স্থানে গুপ্ত সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিপর্য্যয়ের মুখ হইতে সাম্রাজ্য রক্ষার্থে হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কার্য্য সুরু করিয়া দিলেন। এই উদ্দেশ্যের পশ্চাতে যে সরকারী ষড়যন্ত্র ছিল তাহা বুঝিতে অবশ্য কষ্ট বিলম্ব হইবে না। "বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের ক্রমবর্দ্ধমান অসহযোগিতা এবং জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি ভারতে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের আসন কণ্টকময় করিয়া তুলিতেছে—এই সম্পর্কীয় সাবধান-বাণী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে বন্ধুবান্ধবগণ উচ্চারণ করিতে লাগিল এবং হিউমকে পত্র দিয়া জানাইতে লাগিল।" —(স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ—"এ্যালান্ অক্টেভিয়ান হিউম, ফাদার অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস"—পৃ: ৫০)। "১৮৫৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই কয়েক বৎসর ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘোর দুর্দ্দিন গিয়াছে। ইংরাজ কর্ম্মচারীদের মধ্যে একমাত্র হিউমই আসন্ন সর্ব্বনাশের বীভৎসতা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এবং ধ্বংসের হাত হইতে সাম্রাজ্য রক্ষার চেষ্টাও করিয়াছিলেন।... পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষকে ওয়াকিবহাল করিবার জন্য হিউম সিমলা ছুটিলেন। সম্ভবত: নূতন বড়লাট লর্ড ডাফরিণ তাঁহার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে প্রাক্তন বড়লাটের নীতি পরিত্যাগ করিলেন এবং হিউমকে কংগ্রেস সংগঠনে উৎসাহ দান করিলেন। নিখিল ভারতব্যাপী আন্দোলনের পরিস্থিতি দেখা দিয়াছিল। যে কোন কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষিত সমাজ নূতন আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে পারে এবং এই আন্দোলনের মধ্যে আপামর জনসাধারণ ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল।..."—(এ্যাণ্ডুরুজ এ্যাণ্ড মুখার্জ্জি—"রাইজ এ্যাণ্ড গ্রোথ অব দি কংগ্রেস ইন ইণ্ডিয়া"—পৃ: ১২৮-১২৯)। "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে প্রকৃত পক্ষে ভারতের বড়লাট মারকুইস অব ডাফরিণ এ্যাণ্ড আভার সৃষ্টি এই সত্য অনেকের নিকট সম্ভবত: একটি সংবাদ হিসাবে পরিবেশিত হইবে। ১৮৮৪ সালে মি: এ, ও, হিউম্ মনস্থ করিলেন যে, বৎসরান্তে একবার ভারতের নামজাদা রাজনীতিবিদদের এক সভায় একত্রিত করিয়া ভারতীয় সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিবার সুযোগ করিয়া দিতে পারিলে দেশের পক্ষে মঙ্গল হইবে। এই আলোচনা যে রাজনীতি বর্জ্জিত হইবে ইহাই ছিল তাঁহার কাম্য।...এই ব্যাপারে লর্ড ডাফরিণ যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিছু দিন যাবৎ এই সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া তিনি মি: হিউমকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাকে নিজের মতামত বলিলেন। মি: হিউমের প্রস্তাব বিশেষ ফলবতী হইবে না দেখিয়া তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, ইংলণ্ডের ন্যায় এ দেশে সরকারের বিরোধী পক্ষ বলিয়া কোন দলই নাই। সুতরাং শাসক ও শাসিত উভয়েরই হিতার্থে—ভারতীয় রাজনীতির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে বৎসরান্তে একবার একটি সভায় মিলিত হইবার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে এবং এই সভায় শাসন-কার্য্যে সরকারের গলদ কোথায় দেখা দিয়াছে এবং শাসন-কার্য্য উন্নততর করিতে হইলে কি কি পন্থা অনুসরণ করা যায় সে সম্পর্কে তাঁহারা পরামর্শ দিবেন। তিনি প্রস্তাবে আরও বলিলেন যে, এই ধরণের বাৎসরিক সভায় কোন প্রাদেশিক গবর্ণর সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন না, কারণ, তাঁহার উপস্থিতিতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ মনের

কথা ব্যক্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিবেন। মিঃ হিউম্‌ লর্ড ডাফরিণের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া লইয়া কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও অন্যান্য স্থানের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের সম্মুখে তাঁহার নিজের এবং লর্ড ডাফরিণের পরিকল্পনাদ্বয় উপস্থাপিত করিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ লর্ড ডাফরিণের পরিকল্পনাটি স্বীকার করিয়া লইলেন। অবশেষে উক্ত নেতৃবৃন্দ পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করিবার জন্য লাগিয়া গেলেন। লর্ড ডাফরিণ এই ব্যাপারে মিঃ হিউমকে একটি সর্ত্ত পালন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং সেই সর্ত্তটি ছিল—লর্ড ডাফরিণ যত দিন এই দেশে থাকিবেন তত দিন যেন তাঁহার নামটি প্রকাশিত না হয়।" —(ডবলু, সি, ব্যানার্জ্জী—"ইনট্রোডাক্‌সন টু ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স")। "বাংলার জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের ভারত সভার দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সবান্ধব হিউম বোম্বাই নগরীতে সভা আহ্বান করিলেন। বাংলার বিশিষ্ট আইন-ব্যবসায়ী ডবলু, সি, ব্যানার্জ্জীকে এই সভার সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইলেও সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন ও অন্যান্য 'বিদ্রোহী'দের এই সভায় যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইল না।"—(অমিত সেন—"নোটস অন বেঙ্গল রেনেশাঁ"—পৃঃ ৪৮) ১৮৮৬ সালে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে বাংলার জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে আর সম্মেলনের বাহিরে রাখা সম্ভব হইল না। বাংলার জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে কংগ্রেসের মধ্যে না লইবার কারণ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বৃটিশ-ভক্ত নেতৃবৃন্দের এবং উগ্রপন্থীদের মধ্যে একটি ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া বৃটিশ-ভক্তদের মতামতকে জনগণ-সমর্থিত মতামত বলিয়া গ্রহণ করাই ছিল লর্ড ডাফরিণের আসল উদ্দেশ্য। লর্ড ডাফরিণ তাঁহার উদ্দেশ্য গোপন করিয়া রাখেন নাই। ১৮৮৬ সালে অর্থাৎ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পর-বৎসরেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে তাঁহার বক্তৃতায় তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিলেন: "ভারতবর্ষের মত দেশে নিরাপদে ইউরোপীয় প্রথায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলিতে দেওয়া যায় না। বিভিন্ন আন্দোলনের ফলে যে সব দাবী উত্থাপিত হইয়াছে সেগুলি সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া তৎসম্পর্কে ঘোষণা করিয়া জানাইয়া দিতে হইবে যে, আগামী দশ অথবা পনের বৎসরের মধ্যে ভারতীয় সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের সময় সুবিধাগুলি ভারতীয়গণ লাভ করিবে। ইতিমধ্যে জনসভা এবং ঐ সভায় উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

"উগ্র-পন্থীদের দাবীগুলির কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইতেছে যে, অগ্রগামী দলের দাবীগুলি বিপজ্জনক নহে। শুধু তাই নয়—এই দাবীগুলির মধ্যে বিশেষ কিছুই নাই।···কর্ম্মঠ ও আত্মসম্মানী বহু ভারতীয়ের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে এবং তাঁহাদের ব্যবহারে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তাঁহাদের সহযোগিতা এবং আনুগত্যের উপর আমরা পূর্ণমাত্রায় নির্ভর করিতে পারি। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সরকারের সমর্থনে বহু আইন যাহা আমাদিগকে বলপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হইতেছে, সেগুলি জনপ্রিয় হইয়া উঠিবে এবং সরকারকে জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হইবে না।"—(স্যার এ্যালফ্রেড লায়াল—"লাইফ অব দি মারকুইস অব ডাফরিণ এ্যাণ্ড আভা" ; Vol II, পৃঃ ১৫১-১৫২)। সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহনকে মিঃ হিউম সম্মেলনে কেন আহ্বান করেন নাই তাহার প্রকৃত কারণ হইল ইহাই। হিউমের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ও দ্বিতীয় সম্মেলনে লর্ড ডাফরিণের বক্তৃতা মত কার্য্য হইয়া গেল। পূর্ণ মাত্রায় সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া নয়টি প্রস্তাব এই সম্মেলনে গৃহীত হয়। এইগুলির মধ্যে শাসনবিধি সংস্কারের অনুরোধ করা হয় এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক দাবী পূরণের জন্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কয়েক জন নির্ব্বাচিত সদস্য গ্রহণের অনুরোধ জানান হয়।

১৮৮৬ সালে পুরাতন জাতীয় সম্মেলন এবং হিউমের জাতীয় কংগ্রেস একত্রিত হইয়া যায়। ইহার ফলে এই প্রথম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দল হইতে প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে যোগদান করেন। কলিকাতায় এই সর্ব্বপ্রথম অভ্যর্থনা সমিতির সৃষ্টি হয় এবং সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

১৮৮৭ সালে মাদ্রাজ সম্মেলনে কংগ্রেসের প্রভূত জনপ্রিয়তা দেখা দিল। অভ্যর্থনা সমিতির প্রয়োজনীয় অর্থ জনসাধারণের নিকট হইতে আসিল। কংগ্রেস জনসাধারণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে দেখিয়া সরকারী মহল অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সরকার তাহাতে প্রকাশ্যে বাধা প্রদান করিল।

কংগ্রেসকে গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে বাংলার নেতৃবৃন্দের দান অসামান্য। দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দকে প্রস্তাবের খসড়া প্রণয়ন করিতে দেখিয়া বাংলার তরুণ নেতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন। মাদ্রাজ সম্মেলনে অর্থাৎ ১৮৮৭ সালে বিপিনচন্দ্র পাল এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে বিষয়-নির্ব্বাচনী কমিটি গঠন করিতে বাধ্য করান। তখন হইতেই প্রকাশ্য সম্মেলনের জন্য প্রস্তাবগুলির খসড়া বিষয়-নির্ব্বাচনী কমিটি কর্ত্তৃক রচিত হইয়া আসিতেছে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া অতীতের বহু কাহিনী হয়ত বাদ পড়িয়াছে। এ জন্য দুঃখিত। তবুও যত দূর সম্ভব রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়াছি। এই বিশ্লেষণের মধ্যে বাংলা দেশের অনেক ঘটনা অনিচ্ছায় বাদ পড়িয়াছে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনের তাগিদায় হইয়াছিল তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস যে বাংলার নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক হইতে পারে নাই সে কাহিনী পরের ঘটনা। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সে কাহিনী বিবৃত করিবার সুযোগ নাই।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস

সন্তোষ ঘোষ

(কংগ্রেস যুগ,—১৮৮৫—১৯০৫)

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এক জন ইংরাজ সিভিলিয়ান—হিউম সাহেব। হিউম সাহেব এই কার্য্যে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফরিণেরও অনুমোদন লাভ করিয়াছিলেন। হিউম সাহেব ভারতবাসীর কল্যাণকামী ছিলেন, ইহা সত্য; কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার

মূলে ছিল ভারতে ইংরাজ-শাসনের স্থায়িত্ববৃদ্ধির মনোভাব। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতে ইংরাজ-শাসনের প্রায় অবসান ঘটিয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হইবার কিছু দিন পর হইতে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুনরায় পুঞ্জীভূত হইতে আরম্ভ করে। এই পুঞ্জীভূত অসন্তোষ যাহাতে বিদ্রোহের আকার ধারণ না করিয়া নিয়মতান্ত্রিক পথ ধরিয়া চলে, ভারতের তদানীন্তন ইংরাজ শাসক-সম্প্রদায় সে জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া হিউম সাহেব সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতে ইংরাজ-শাসনের স্থায়িত্ববৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদে কংগ্রেস কালক্রমে বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কংগ্রেসের এই ভবিষ্যৎ বৈপ্লবিক রূপের কথা চিন্তা করিয়া লর্ড ডাফরিণ পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় বোম্বাই সহরে ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। পুণা সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার কথা ছিল, কিন্তু অধিবেশনের নির্দিষ্ট তারিখের কিছু দিন পূর্বে পুণায় প্লেগ আরম্ভ হওয়ায় বোম্বাই-এ অধিবেশন করিবার সিদ্ধান্ত করা হয়। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সবশুদ্ধ ৭২ জন প্রতিনিধি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদান করেন। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করিয়া এবং দেশের শাসন-সংস্কার দাবী করিয়া কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবে একটি রয়াল কমিশন নিযুক্ত করিয়া ভারত শাসন সম্পর্কে অনুসন্ধান দাবী করা হয়। অন্যান্য প্রস্তাবে সৈন্যব্যয় হ্রাস, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের উচ্চতম বয়স বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবী করা হয়। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়, পরবর্তী কয়েকটি অধিবেশনে অল্পাধিক পরিমাণে সেই দাবী সমূহেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে জনসভা প্রভৃতির সাহায্যে কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি জনপ্রিয় করার চেষ্টা করা হয়। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হইল কলিকাতায়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দাদাভাই নৌরজী। এই অধিবেশনে দাদাভাই নৌরজী সর্বপ্রথম কংগ্রেসকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া বর্ণনা করেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে চারি শতাধিক প্রতিনিধি কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান করেন। এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ইংরাজ শাসন সম্পর্কে শিক্ষিত ভারতবাসীর মত ব্যক্ত করিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, "We live not under a national Government but under a foreign beauracracy, our foreign rulers are foreigners by birth, religion, language and habits—by everything that divides humanity into different sections. They cannot possibly dive into our hearts. They cannot ascertain our wants, our feelings and our aspirations."

১৮৮৭ সালে বদরুদ্দীন তায়েবজীর সভাপতিত্বে মাদ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হয়। তৃতীয় অধিবেশনে ছয় শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। এইরূপে কংগ্রেস ক্রমশঃ ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে থাকে।

কংগ্রেসের প্রথম যুগকে আবেদন-নিবেদনের যুগ বলা চলিতে পারে। প্রথম কয়েক বৎসর ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শাসক সম্প্রদায়ের গোচরে আনাই ছিল কংগ্রেসের প্রধান কার্য্য। নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলন করিয়া ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার লক্ষ্য লইয়াই সে যুগের কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনা করিতেন। প্রথম দুই-এক বৎসর কংগ্রেস ভারতের বৃটিশ শাসক সম্প্রদায়ের সুনজরে ছিল। খুব শীঘ্রই বিদেশী শাসকগণ কংগ্রেসকে সন্দেহ ও ভয়ের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন এবং ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে লর্ড ডাফরিণ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ভারতের বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য বলিয়া বর্ণনা করেন এবং কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন। ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন ও শাসন-কার্য্যে অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ, ইহাই ছিল কংগ্রেসের প্রথম যুগের প্রধান দাবী। এই দাবী পূরণের জন্য কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ ভারতে জনমত গঠনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং বিলাতেও আন্দোলন সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিদল বিলাতে গমন করেন এবং ভারতের দাবী সম্পর্কে ইংলণ্ডের জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করিবার চেষ্টা করেন। কংগ্রেসের কয়েকটি দাবী আংশিক ভাবে গৃহীতও হয়। কংগ্রেস ক্রমশঃ শক্তি অর্জন করিতে থাকে। কংগ্রেসের আদর্শ ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকতর ভিত্তিতে প্রচার হইতে থাকে। ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জন বড়লাট হইয়া ভারতে আগমন করেন। তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীল শাসন কার্য্যের ফলে ভারতের সর্বত্র বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। তিনি কংগ্রেসের উপর খুব বিরূপ ছিলেন। ১৯০০ সালের ১৮ই নবেম্বর তারিখে তিনি ভারত-সচিবকে এক পত্রে লেখেন, "আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, শীঘ্রই কংগ্রেসের পতন ঘটিবে। ভারতে অবস্থিতি কালে কংগ্রেসের বিলোপ সাধন করা আমার অন্যতম প্রধান অভিপ্রায়।" লর্ড কার্জনের স্বৈরতান্ত্রিক কার্য্যকলাপের প্রতিবাদ করিয়া কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ লর্ড কার্জনের স্বৈরতান্ত্রিক কার্য্যাবলীর সক্রিয় প্রতিবাদ করার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ১৯০১ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এবারকার কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত ছিলেন। ১৯০২ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল আমেদাবাদ সহরে। সভাপতি হিসাবে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "স্বাধীনতার জয়-পতাকা এক দিনেই উত্তোলন করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। এ জন্য দীর্ঘকাল অবিশ্রান্ত সাধনার প্রয়োজন।"

১৯০৫ সালের শেষ দিকে লর্ড কার্জন কার্য্যে ইস্তফা দিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যান। যাইবার পূর্বে তিনি বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিয়া যান। বাঙলা দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করার ফলে বাঙলা দেশে যে বিরাট আন্দোলন হয়, তাহাই 'বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন' নামে প্রখ্যাত। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ হইয়া যায়।

সমগ্র দেশে এক নূতন জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। দেশের স্বাধীনতার জন্য অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিবাদের জন্য দেশের জনসাধারণ সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করে। বিপ্লবমুখীন জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে কংগ্রেস দ্রুতগতিতে বৈপ্লবিক গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। [ক্রমশঃ।

হিরণময়ী

শ্রীশান্তি পাল

রজনীর পুরী প্রান্তে উষা দেখা দিল
আনত-যৌবনা এক লাবণ্য-লতিকা,
মহুয়া-মদির গন্ধে অলি চঞ্চলিল
ত্রিকূটের তুঙ্গ শিরে জ্বলে বহ্নি-শিখা !
একচক্র রথ ছুটে কনক-লাঞ্ছিত,
নিশীথের ঊর্ণাজাল ছিঁড়ে কুটি-কুটি,—
সুপ্তোত্থিতা একা তন্বী ধরণী-বাঞ্ছিত,
ঢল ঢল ছল ছল চারুনেত্র দু'টি।

পাহাড়ের শীর্ণ পথ ধীরে অনুসরি
উঠিতেছি পায় পায় অভ্রভেদি শিরে,
শাল-পলাশের বনে পথ ভুল করি'
জুড়াই প্রাণের জ্বালা ময়ূরাক্ষী-নীরে।
প্রেমের রহস্য-কথা কহি কানে কানে,—
গুঞ্জরিত মধুকরে ;—মত্ত মধুপানে ;—
অরণ্যের মর্ম্ম ভেদি গিরি-তট ধরি'
ওই বুঝি আসে মোর ধ্যানের ঈশ্বরী।

এসো এসো কাছে এসো, ব'স শিলা 'পরে
ব'লে যাও অকুণ্ঠিতা সেদিনের কথা,—
প্রিয়ারূপে জন্মান্তরে ছিলে কা'র ঘরে ?
পুলক-বেদনা ল'য়ে,—অয়ি স্বর্ণলতা !
কোথায় লুকায়ে ছিলে কেমনে কি বেশে,
কোন্ মায়া-পুরী মাঝে বিস্মৃতির দেশে ?
একান্তে শুনায়ে যাও আলোকের বাণী
চির মিলনের গান যৌবনের বাণী !

এ কি তব চতুরালি,—এ কি তব প্রেম,
এ কি তব ভালবাসা,—এ কি অভিমান !
সুপ্তিলীন চিত্ততীরে নিকষিত হেম,—
প্রকাশিয়া চারুকান্তি এ কি রে প্রয়াণ !
অরুণ-বরণা অয়ি আলোক-বসনা
রূপের মিছনি দিয়া এ কি জাল বোনা !
উদ্ভাসিয়া পূর্ব্বাশার নক্ষত্রাভনীমা
কোথা যাও ফেলি মোরে স্বপন-প্রতিমা ?

ওগো মোর জীবনের লীলা-সহচরী
বিরহের সুধা-পাত্র এক হস্তে ধরি'—
আর হস্তে লিখে যাও পাষাণের গায়ে
আজিকার দিনে যত ব্যথা বাজে পায়ে !
সন্ধানী পথিক দল যদি আসে কেহ
অর্থ তা'রা করি লবে যা আছে দুর্জ্ঞেয় ;
যৌবন-পীড়িত বক্ষে অনাগত দিনে
দিগন্তের প্রান্ত শেষে পথ লবে চিনে !

• • •

ভাস্করের দীপ্ত জ্যোতি হ'য়ে আসে ক্ষীণ,
উঠিয়াছে ইন্দ্রধনু অর্দ্ধচক্রাকারে—
রেণু রেণু স্বর্ণবৃষ্টি নীলারণ্য পারে,
গৈরিকের রসে ভেজা নভ উদাসীন !
যাদুকর মন্ত্র জপে বসি' একাসনে,—
আধ-নিমীলিত আঁখি ; বিরহ-ব্যথিত ;
বিহ্বল কেশের গন্ধ উড়িছে বিজনে,—
গন্ধ তা'র ভেসে আসে চির অভীপ্সিত !

নির্ব্বিকার সর্ব্ব অঙ্গ প্রেম-রস-সার,—
ক্ষণে ক্ষণে জেগে ওঠে মূর্ত্তিখানি কা'র ?
হেরিতেছি ডাহুয়ার শালতরু ছায়ে,—
হেলাইয়া গ্রীবাখানি অলক্তক পায়ে,
অসংশয়ে আসে বালা বন-পথ ধরি'—
দাবদগ্ধ দিন শেষে উড়ায়ে উত্তরী ;
শ্যামস্নিগ্ধ ছায়াঘন নির্ঝরিণী কূলে,
মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকি ত্রিভুবন ভুলে !

ঝিল্লীমন্দ্র-মুখরিত ধূসর প্রান্তরে,
রাখাল ফিরিছে একা গোচারণ হ'তে ;—
কচিৎ একটি পাখী দূর বনান্তরে,
নীড়ের লাগিয়া নামে ভাসি' বায়ু-স্রোতে।
ধ্যান-মৌন গিরি-তটে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
নিবিড় নির্জ্জন এক বকুলেরি তলে,
একা আমি ব'সে আছি ; হেরি তন্দ্রপ্রায়,—
অতীতের পদপ্রান্তে স্মৃতি-দীপিকা জ্বলে !

ত্রিলোক মন্থন করি' পাইনু যে মণি
কৌস্তুভ রতন এক,—লাবণ্যের খনি !
চঞ্চল উল্লাস ভরে যেই গলে পরি
কাটে মোর মর্ম্মতল অহি-রূপ ধরি' !
অমৃতের মধুভাণ্ড পূর্ণ বিষে ভরা
মত্ত অলি সম ধাই,—ধূলিময়ী ধরা
সকৌতুকে চেয়ে থাকে, আঁখি অচপল,
তিমিরের খেয়া চলে, বুকে নামে ঢল !

কত দিন, কত সন্ধ্যা, কত শ্রান্ত নিশা
কেটে গেছে নাহি জানি ; নাহি পাই দিশা,
ঘুরিতেছি ক্লান্তিহীন, দেশ-দেশান্তরে,—
রৌদ্র-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝা-বাত্যা ল'য়ে শির 'পরে,
উন্মত্ত পথিক এক ;—ডাহুয়া চূড়ার
আবার আসিনু ফিরে গোধূলি বেলায় ;
অপরাহ্ণ বেলা শেষে কে ডাকিল মোরে—
"আয় আয় এইখানে সর্ব্বহারা ওরে" !

ওগো মোর জীবনের মানস-প্রতিমা,
রহস্যের অধিনেত্রী রুদ্র বহ্নি-শিখা,—
সুদূর গগনচারী আশা-নীহারিকা
তোমার অস্তিত্ব খুঁজি ;—হারায়েছি সীমা !
সায়াহ্নের হৈমীশস্য দুলাইয়া শিরে
কোন্ পুরুরবা সাথে যাও একা ফিরে ?
বিদায়-পাণ্ডুর বুকে রেখে গেলে খেদ
সহিতে পারি না সখি পরম বিচ্ছেদ !

আর একবার এসো ভুবন ভুলায়ে,
পারিজাত মাল্য গলে দুকূল দুলায়ে ;
তন্বী শ্যাম ছটা তব দিগন্তের শেষে
গোধূলির মত্ত লাগি কেমনে সে বেশে,
দেখিতে বাসনা মোর ; সব যাই ভুলে,—
কি বিচিত্র বর্ণ-আভা ! আঁখি ঘুরে ঢুলে—
সান্ধ্য-বায়ু-অর্জ্জরিত—শ্যামল সন্ধ্যা ;
যোগনিদ্রালীন হও তুমি চিরন্তনা !

"মাসিক বসুমতীর" এক জন সুশিক্ষিত পাঠক এই সমালোচনা লিখিয়াছেন। তিনি বাঙলা দেশের এক জন সুপরিচিত সুলেখক। কিন্তু আমাদের এক জন প্রবীণ পাঠক হিসাবে যেহেতু তিনি এই সমালোচনা লিখিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহার পরিচয় গোপন রাখাই সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। পাঠক হিসাবেই তাঁহার পরিচয় থাকুক, ইহাই লেখকের ইচ্ছা, আমাদেরও।

বাঙালীর বসুমতী

সুবোধ পাঠক

"মাসিক বসুমতীর" রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে। সাতাশ বছর তার বয়স হ'ল। এই সাতাশ বছর ধ'রে "মাসিক বসুমতী" যাঁরা নিয়মিত পড়ছেন, যাঁরা এই দীর্ঘ সাতাশটা বছরের তিন শত মাস ডাক-পিয়নের প্রতীক্ষায় কাটিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আমিও এক জন। এর মধ্যে দেশের উপর দিয়ে কত ঝড় ব'য়ে গেছে, দেশের লোকের জীবনধারার কত পরিবর্তন হয়েছে তা ভাবা যায় না। বসুমতীরও যে পরিবর্ত্তন হয়নি তা নয়। অনেক ঝড়-ঝাপ্টা উত্থান-পতনের বন্ধুর পথে "মাসিক বসুমতী" দৃঢ়পদে স্থিরচিত্তে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছে। এই লক্ষ্য তার কি, এবং এই লক্ষ্যের দিকে কতখানি সে এগিয়ে গেছে তার একটা হিসাব-নিকাশ করার প্রয়োজন আছে আজ।

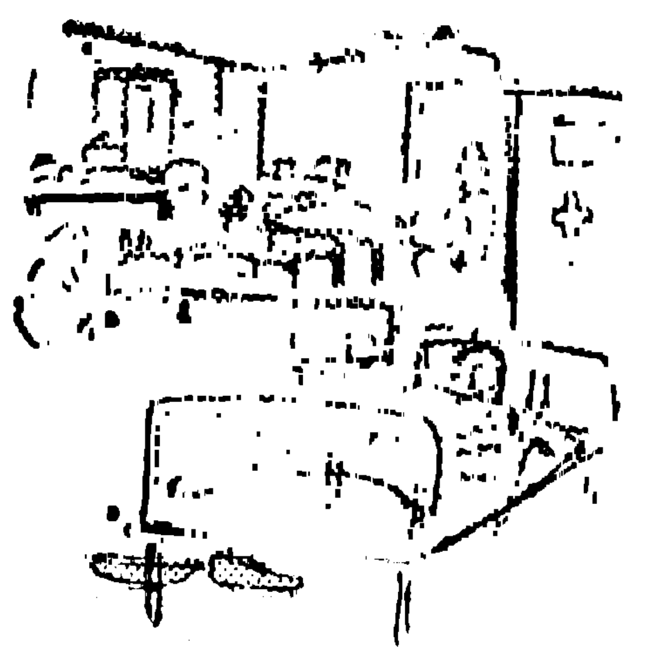

হাসপাতাল

সাহিত্যের সমৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার ও জ্ঞানের বিস্তার যার চলার পথের অন্যতম লক্ষ্য, তার সেই লক্ষ্য কতখানি চরিতার্থ হ'ল-না-হ'ল তার আবার হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন কি? জমার অঙ্কে কত নামল আর খরচ হয়ে গেল কত তার খতিয়ান সাহিত্য-পত্রিকার করতেই হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। না করাটাই প্রচলিত প্রথা এবং পাঠক-মহল থেকে কোন দিন তা দাবী করাও হয় না। কিন্তু বসুমতীর ক্ষেত্রে এই প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম হওয়া স্বাভাবিক। হিসাব-নিকাশটাও পাঠকমহল থেকে হওয়া উচিত, কারণ, তা না হ'লে তাতে গলদ থাকার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। বাঙলা দেশের সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে বসুমতীর দান এবং সেই দানের মূল্য নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা পাঠক-গোষ্ঠীর তরফ থেকেই তাই হওয়া উচিত।

কেন হওয়া উচিত, সে-সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ নেই। উচিত এই জন্য যে, "মাসিক বসুমতী" কেবল সাহিত্য-পত্রিকা নয়। তা যদি হ'ত তাহ'লে তার প্রয়োজন এত বেশী থাকত না। "বসুমতী" আজ একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং বাঙলা দেশের মধ্যে বসুমতীকে নিঃসন্দেহে অন্যতম শিক্ষা ও সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। শত্রু-মিত্র কেউ এ কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান মুখপত্র হিসাবেই "মাসিক বসুমতীর" পরিচয়। তারই বার্ত্তা চারি দিকে বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে "মাসিক বসুমতী" সুনাম ও লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে। লোকপ্রিয়তা যদি স্থায়ী হয় এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তাহ'লে তাকে স্বল্পবুদ্ধি বিকৃতরুচি জনতার সমাদর বলা যায় না। অনেকে এই কথা ব'লে "বসুমতীর" আলোচনা সুরু এবং শেষ করেন। তাঁদের জানা উচিত, সাহিত্যের সস্তা আসর জমিয়ে অথবা চালাকির দ্বারা সাহিত্যের ঠিকাদারী ক'রে "বসুমতীর" লোকপ্রিয়তা কিছুতেই অর্জ্জন করা যায় না। "মাসিক বসুমতী" আমার কাছে প্রিয়, আমার মতন হাজার হাজার পাঠক-পাঠিকার কাছে হয়ত আরও বেশী প্রিয়। তার কারণ নিশ্চয়ই আমাদের রুচিবিকার বা মনোবিকার

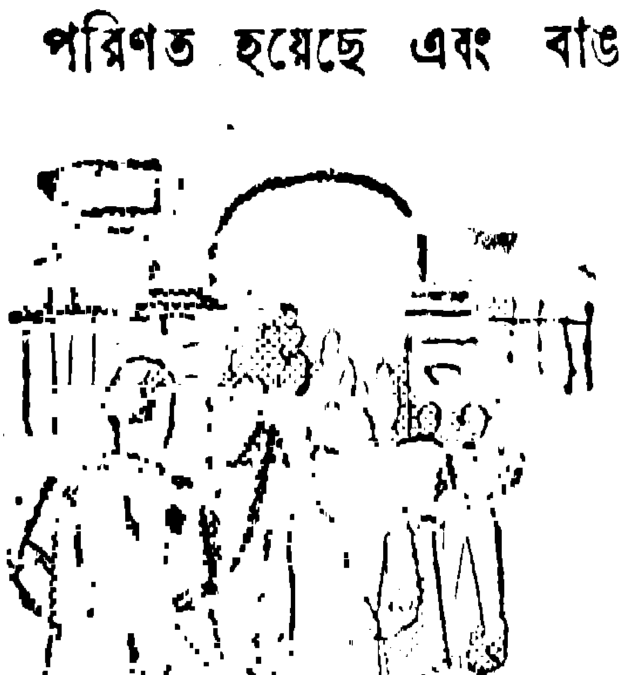

কলেজ

মাদ্রাসা

মহারাণী

নয়। দেশের সাধারণ পাঠক-মহলের যে রুচির বালাই নেই এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে যে তারা উপাদেয় ভোজ্যের মতন মনে করে, এ কথা মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। স্বীকার করি, প্রাকৃত জনের শিল্পকলার মধ্যে আধুনিক প্রকাশভঙ্গিমার কোন বাহাদুরি বিশেষ নেই, কিন্তু তাই ব'লে লোকশিল্পকে যেমন অপাংক্তেয় ও অস্পৃশ্য বলা ভুল, তেমনি "মাসিক বসুমতীর" লোকপ্রিয়তাকে জনতার রুচিহীনতার পরিচয় বলাও ভুল।

বাঙলা মাসিক পত্রিকার ঐতিহ্য

কোথায় এবং কত দূর পর্য্যন্ত "মাসিক বসুমতীর" লোকপ্রিয়তার মূল কারণ রয়েছে তা অনুসন্ধান করতে হ'লে বাঙলা মাসিক পত্রিকার ধারাবাহিক ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। বাঙলা মাসিক পত্রিকার শতাব্দীব্যাপী ঐতিহ্য সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে "মাসিক বসুমতীর" প্রসারের ইতিবৃত্ত আজগুবি রূপকথা ব'লে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

বাঙলা মাসিক পত্রিকার একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, যা বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের মাসিক পত্রিকার নেই। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই বাঙলা মাসিক পত্রিকার জন্ম। পাশ্চাত্য ভাবধারা ও শিক্ষা সংস্কৃতির সংস্পর্শে যখন বাঙলা দেশে উনবিংশ শতাব্দী থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নব জাগরণের সূত্রপাত হয়, তখনই "মাসিক পত্রিকা" ভূমিষ্ঠ হয়। বাঙলা গদ্যভাষা, বাঙলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জন্ম হয় এই সময় একই সঙ্গে। তার পর বাঙলা গদ্যভাষা হামাগুড়ি দিয়েছে, হাঁটি-হাঁটি-পা-পা ক'রে চলতে শিখেছে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে, নবযুগের পুনরুজ্জীবিত ও রূপান্তরিত শিক্ষা-সংস্কৃতির বাহন ও মাধ্যম হয়েছে। এই বাঙলা গদ্যভাষাকে লালন-পালন করেছে বাঙলা সাময়িক পত্র। দৈনিক সংবাদপত্র যখন ছাপাখানার অসুবিধার জন্য প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব ছিল বলা চলে, তখন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকাই যে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান বাহন হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। প্রধানতঃ বাঙলা মাসিক পত্রিকার কোলেই বাঙলা সাহিত্য আশৈশব লালিত হয়েছে দেখা যায়। বাঙলা উপাখ্যানের ভিতর দিয়ে বাঙলা উপন্যাস, বাঙলা প্রবন্ধ-সাহিত্য, আধুনিক বাঙলা কবিতা, সব কিছুরই জন্ম হয়েছে বাঙলা সাময়িক পত্রিকার গর্ভে, এবং তার মধ্যে বাঙলা মাসিক পত্রিকার ভূমিকা অন্যতম। বাঙলা মাসিকের আদি যুগের এই আদর্শ-গৌরব, এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পুষ্টির উত্তরাধিকার আধুনিক যুগে ক'খানা মাসিক পত্রিকা বহন করছে জানি না, তবে তাদের সংখ্যা যে অত্যন্ত অল্প তা আজ বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। আধুনিক মাসিক পত্রিকার বাইরের প্রসাধনটাই বোধ হয় অগ্রগতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বিষয়-ঐশ্বর্য্য, আদর্শ-গৌরব ও উদারতা সে যুগের মাসিক পত্রের মতন এ যুগের মুদ্রণ-প্রসাধন-পটু কোন মাসিকের আছে কি না সন্দেহ। মুষ্টিমেয় যে কয়েকখানা মাসিক পত্র আজও সেই ঐতিহ্য বহন ক'রে এগিয়ে চলেছে তাদের মধ্যে "মাসিক বসুমতী" আজ পর্য্যন্ত অন্যতম বললে বেশী বলা হয় না।

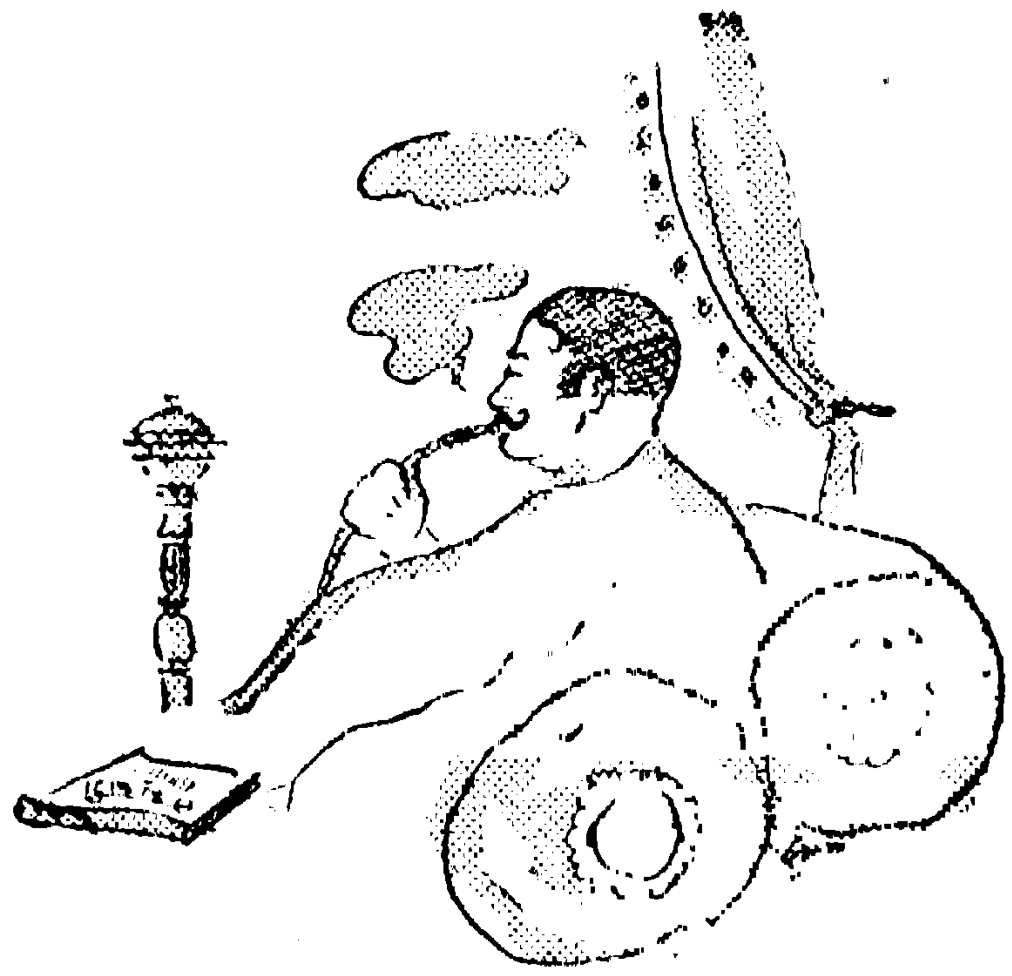

জমিদার

ছোটরাণী

"দিগদর্শন" থেকে "বঙ্গদর্শন"

বাঙলা দেশে বাঙলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র "দিগদর্শন"। "দিগদর্শন" মাসিক পত্রিকা। "দিগদর্শন" ১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। জন ক্লার্ক মার্শম্যান এই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। "দিগদর্শন" থেকে "বঙ্গদর্শন" পর্য্যন্ত বাঙলা মাসিক পত্রিকার নামের তালিকাটি দেখলেই তার ক্রমবিকাশের ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কারণ পত্রিকার আদর্শ, বিষয়-বস্তু ও

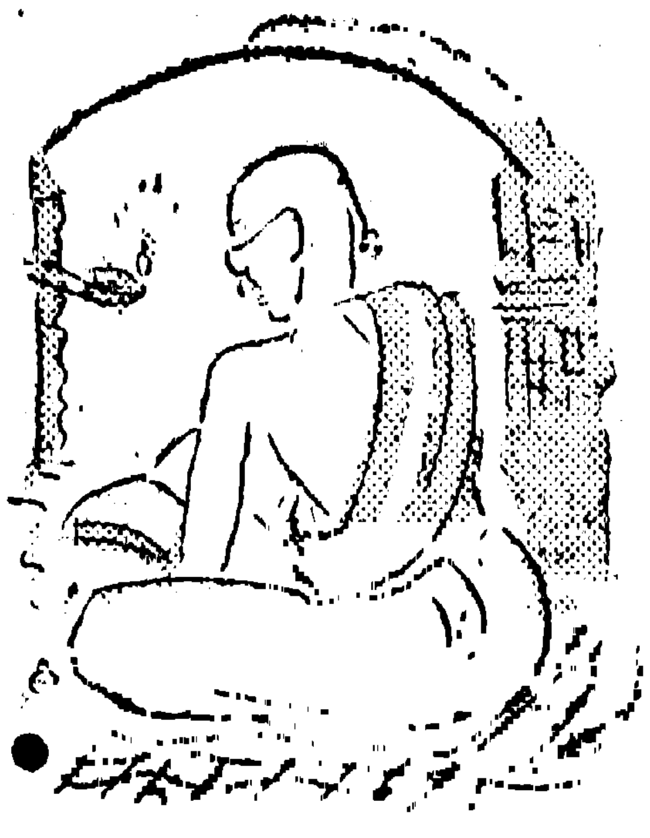

পণ্ডিত মহাশয়

ভাবধারা পত্রিকার নামের মধ্যেই সে যুগে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠত। তালিকার মধ্যে হয়ত দু'-একটি মাসিক পত্রিকার নাম বাদ যেতে পারে, কিন্তু মোটামুটি এই তালিকাই সম্পূর্ণ বলা যেতে পারে :

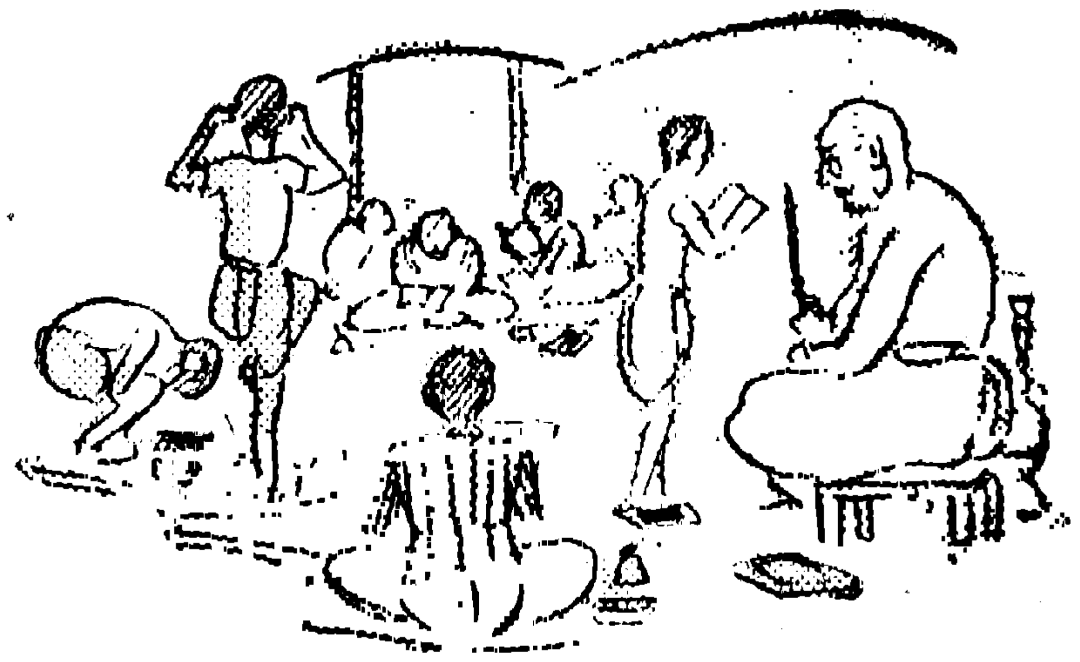

পাঠশালা

১৮১৮ : দিগ্‌দর্শন
১৮১৯ : গস্‌পেল ম্যাগাজীন
১৮২১ : পশ্বাবলী
১৮২২ : খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি
১৮৩১ : জ্ঞানোদয়
১৮৩২ : বিজ্ঞানসেবধি
১৮৩২ : জ্ঞানসিন্ধুতরঙ্গ
১৮৩৫ : সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়
১৮৪০ : আয়ুর্ব্বেদ-দর্পণঃ
১৮৪২ : বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর
১৮৪২ : বিদ্যাদর্শন
১৮৪৩ : মঙ্গলোপাখ্যান
১৮৪৩ : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
১৮৪৬ : সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা
১৮৪৬ : জগদ্বন্ধু
১৮৪৭ : উপদেশক
১৮৪৭ : দুর্জ্জন দমন মহানবমী
১৮৪৭ : হিন্দুধর্ম্মচন্দ্রোদয়
১৮৪৭ : হিন্দুবন্ধু
১৮৪৮ : জ্ঞানচন্দ্রোদয়
১৮৪৯ : সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা
১৮৪৯ : কৌস্তুভ কিরণ
১৮৫০ : দূরবীক্ষণিকা
১৮৫০ : ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা
১৮৫০ : সত্যার্ণব
১৮৫০ : সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা
১৮৫১ : মেদিনীপুর ও হিজলী অঞ্চলের অধ্যক্ষ
১৮৫১ : বিবিধার্থ-সংগ্রহ
১৮৫২ : জ্ঞানারুণোদয়
১৮৫৩ : ধর্ম্মরাজ
১৮৫৩ : বিদ্যাদর্পণ
১৮৫৩ : সুলভ পত্রিকা
১৮৫৩ : ছোট জাগুলিয়া হিতৈষি মাসিক পত্রিকা
১৮৫৩ : চিকিৎসা-রত্নাকর
১৮৫৪ : রসার্ণব
১৮৫৪ : মাসিক পত্রিকা
১৮৫৪ : প্রকৃত মুদ্গর
১৮৫৫ : সিদ্ধান্তদর্পণ
১৮৫৫ : বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা
১৮৫৫ : সর্ব্বার্থপূর্ণচন্দ্র
১৮৫৬ : মর্ম্ম ধুরন্ধর ; সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা ; সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশিকা।
১৮৫৭ : বিজ্ঞানমিহিরোদয় ; সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা ; লোকলোচন চন্দ্রিকা।

টোল

১৮৫৮ : রচনা-রত্নাবলি ; হিতৈষিণী পত্রিকা ; কলিকাতা পত্রিকা।
১৮৫৯ : হিতবিলাসিনী পত্রিকা ভারতবর্ষীয় সভা।
১৮৬০ : সত্যপ্রদীপ ; জ্ঞান-চন্দ্রিকা ; কবিতাকুসুমাবলী ; মনোরঞ্জিকা ; নব্য ব্যবহার সংহিতা ; রাজপুর পত্রিকা ; বিজ্ঞান-কৌমুদী ; ত্রিপুরা জ্ঞান-প্রসারিণী ; সংস্কার সংশোধনী।
১৮৬১ : শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তিকৌমুদী পত্রিকা ; গদ্যপ্রসূন ; গদ্য মাসিক।
১৮৬২ : শুভকরী পত্রিকা ; চিত্তরঞ্জিকা ; অমাবস্যা ; অবকাশরঞ্জিকা।
১৮৬৩ : রহস্য-সন্দর্ভ ; গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা ; অবোধবন্ধু ; সাহিত্য সংক্রান্তি ; বামাবোধিনী পত্রিকা ; উদ্যোগবিধায়িনী।
১৮৬৪ : রচনাবলী ; কাব্যপ্রকাশ ; পাবনাদর্পণ ; শিক্ষাদর্পণ ; ধর্ম্ম-প্রচারিণী ; ধর্ম্মতত্ত্ব ; পরিদর্শন

নায়েব মহাশয়

কুলবধূ

হোস্টেলে

১৮৬৫ : সত্যান্বেষণ ; বিদ্যোন্নতিসাধিনী ;
হিন্দুরঞ্জিকা।
১৮৬৭ : তত্ত্ববিকাশিনী
পল্লীবিজ্ঞান
প্রত্নকম্রনন্দিনী
অবকাশবন্ধু
নব পত্রিকা
১৮৭২ : বঙ্গদর্শন

পত্রিকার নামের বাহার থেকেই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাসিক পত্রিকা বলতে আজকাল আমরা সাধারণত যা বুঝে থাকি, সে যুগে তা বোঝাত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অধিকাংশ সাময়িক পত্রের মতন মাসিক পত্রিকাও সংবাদ পরিবেশনের কাজ করত। ছাপাখানার শৈশব কালে এইটাই স্বাভাবিক, ইয়োরোপের ইতিহাসেও তাই দেখা যায়। আমাদের দেশে মোগল বাদশাহদের আমলে প্রত্যেক প্রদেশে এবং বড় বড় শহরে চর থাকত। এই চরেরা স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ ক'রে কখনও মাসে একবার, কখনও বা প্রতি সপ্তাহে তাঁদের লিখে পাঠাত। গোপনীয় রাজকীয় সংবাদ না থাকলে এই সব চিঠি রাজ-দরবারে প্রকাশ্যে পড়া হ'ত, সেখান থেকে লোকের মুখে-মুখে সমাজের নানা স্তরের লোকের মধ্যে সেই সংবাদ প্রচারিত হ'ত। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারাও নিজ-নিজ সংবাদলেখক "ওয়াকেয়া-নবিশ" রাখতেন। এই সব সংবাদলিপির নাম ছিল "আখ্‌বার"। এই ছিল সংবাদ পরিবেশনের অবস্থা। সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র রাজসভায় বন্দী হয়ে ছিল, পুঁথির পাণ্ডুলিপি সমাজের সর্ব্বসাধারণের কাছে পৌঁছত না।

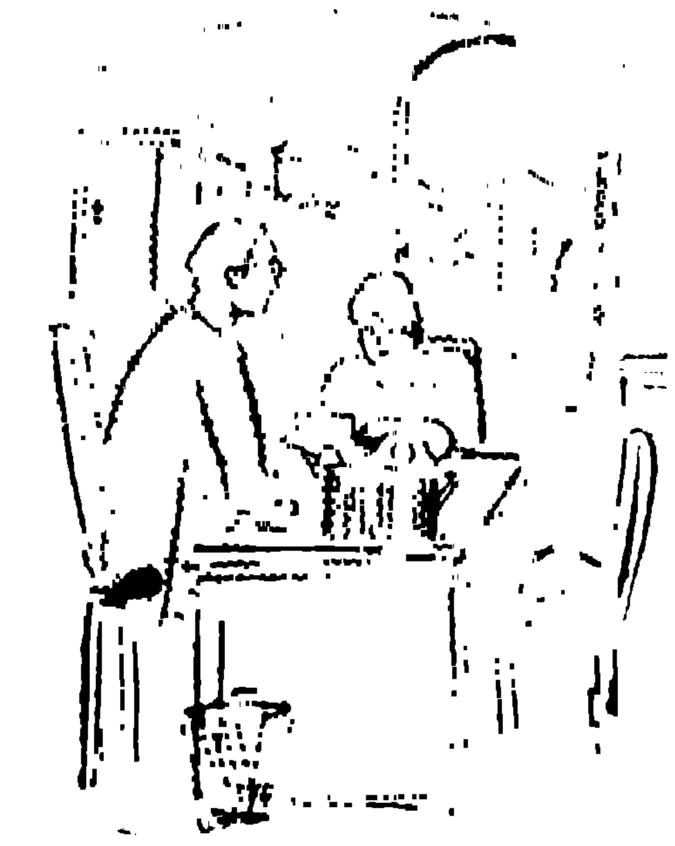

সম্পাদক

ইংরেজ-আমলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বাঙলা দেশে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হ'ল। জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ শুরু হ'ল, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র প্রকাশ তারই একটা দিক। সংবাদপত্রের চেয়ে সাময়িক পত্রের সংখ্যা খুব বেশী। সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিপুষ্টিসাধন থেকে সংবাদ বিতরণ পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় এই সব সাময়িক পত্রে স্থান পেত। বাঙলার প্রথম মাসিক "দিগ্‌দর্শন" পত্রিকার প্রথম ভাগের বিষয়-সূচী থেকে এ সম্বন্ধে একটা ধারণা হতে পারে :

'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সূচী

আমেরিকার দর্শন বিষয়।
হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ।
হিন্দুস্থানের বাণিজ্য।
বলুনদ্বারা সাদ্‌লর সাহেবের আকাশগমন।
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিবরণ।
শঙ্কর তরঙ্গের কথা।

ব্যারিষ্টার

চা-বাগান

১৮১৮ সনের প্রথম বাঙলা সাময়িক পত্রিকার আলোচ্য বিষয়-বস্তুর গাম্ভীর্য্য ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে আজকের সাময়িক পত্রিকারও তুলনা হয় না। এই গাম্ভীর্য্য ও বৈচিত্র্য যে সমস্ত সাময়িক পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ছিল তা নিশ্চয়ই নয়। ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে পত্রিকাই বেশী, অন্যান্য পত্রিকার বিষয়ের সঙ্কীর্ণতাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু 'দিগ্‌দর্শন', 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটার "বিদ্যাদর্শন"', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ,' 'রহস্য-সন্দর্ভ' ও 'বঙ্গদর্শনের' মতন মাসিক পত্রিকা

সিষ্টার

বাঙলা ভাষায় আজকালও বিশেষ নেই। এই সব পত্রিকায় শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি সমস্ত বিষয় নিয়মিত আলোচিত হ'ত এবং বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নব জাগরণের দীক্ষা-গুরুরা, উদ্‌যোগী নেতারা আলোচনায় যোগ দিতেন। পত্রিকাগুলির স্পষ্টবাদিতা ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে আজকালকার পত্রিকার চরিত্রহীনতার তুলনা করলে যে কেউ লজ্জিত হবেন। তাছাড়া সেকালে মাসিক পত্রিকার আর এক ধরণের যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা আজকাল প্রায় দেখাই যায় না। পশুপক্ষী, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ বিষয়ের আলোচনার জন্য বাঙলা ভাষায় 'পশ্বাবলী', 'বিজ্ঞানসেবধি', 'বিজ্ঞানমিহিরোদয়,' 'বিজ্ঞান-কৌমুদী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই জাতীয় পত্রিকার অস্তিত্ব নেই বললেও বিশেষ ভুল বলা হয় না।

পাদ্রী

"বঙ্গদর্শন" থেকে "মাসিক বসুমতী"

দিগ্‌দর্শন, বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থসংগ্রহ, রহস্য-সন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা এক-একটি সাংস্কৃতিক পর্ব্বান্তরের প্রতীক বলা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার প্রকাশের মধ্যে এই যুগের ভাবধারার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছিল বলা চলে। বঙ্গদর্শনের পরে 'প্রচার', 'আর্য্যদর্শন', 'বান্ধব' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' একটা বিশেষ ধারার প্রবর্ত্তন করেছিল, কিন্তু 'বঙ্গদর্শনের' প্রভাবের মতন এর কোনটাই ব্যাপক ও স্থায়ী হতে পারেনি। এমন কি তার পরেও ভারতী, প্রবাসী, মানসী, ভারতবর্ষ, সাহিত্য, নব্য ভারত প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাও আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদর্শনের মতন একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেনি, যদিও বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এই সব পত্রিকার অবদান সামান্য নয়। "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার পত্র-সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যে আদর্শের ও সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন তা একনিষ্ঠ ভাবে সার্থক ক'রে তুলতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তাঁর সেই আদর্শ এত উদার, মহৎ এবং প্রগতিশীল যে আজও যে কোন মাসিক পত্রিকা তার আধুনিকতা বজায় রেখেও তারই পুনরাবৃত্তি করতে পারে। কিন্তু আদর্শ ও সঙ্কল্প ঘোষণা করা এক জিনিস, এবং সেই আদর্শ সার্থক ক'রে তোলার নিষ্ঠা ও উত্তম স্বতন্ত্র জিনিস। গত পঁচিশ বছরের "মাসিক বসুমতীর" বিষয়-সূচী ও লেখক-গোষ্ঠীর পর্য্যালোচনা করলে এ কথা আজ নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও "বঙ্গদর্শনের" উত্তরাধিকার "মাসিক বসুমতীই" অবিচলিত-চিত্তে বহন করার চেষ্টা করেছে এবং অনেকটা সার্থকও হয়েছে। ১২৭৯ সনের বৈশাখে "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার পত্র-সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন :

লেঃ কর্ণেল

"আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। যত্ন করিব, এই মাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ত্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।...আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা পাঠোপযোগী হইলে আদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গলসাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থ যত্ন পাইব বলিয়া, কেহ এরূপ বিবেচনা করিবে না যে, আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা সাধনে মনোযোগ করিব না।

রায় বাহাদুর

সাহিত্যিক

যাহাতে এই পত্র সর্ব্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না...। যদি এই পত্রের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন সঙ্কল্প না করিতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ বৃথা কার্য্য মনে করিতাম।

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন, কিছুই সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণ শিক্ষার মূল। সে কথা আমরা স্মরণ রাখিব।

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব।"

"বঙ্গদর্শন" পত্রিকার সঙ্কল্প-বাক্য বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, সুশিক্ষিত বাঙালীর পাঠোপযোগী রচনার প্রকাশ করাই পত্রিকার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ, বাঙলার কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের, অর্থাৎ আজকাল আমরা যাঁদের বুদ্ধিজীবী বলি তাঁদের, মুখপত্র হয়ে, তাঁদেরই বার্ত্তা বহন ক'রে, তাঁদের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিয়ে, "বঙ্গদর্শন" বাঙলা দেশে জ্ঞানের প্রচার করবে। কোন বিশেষ গোষ্ঠীর-বা দলের পক্ষপাতিত্ব "বঙ্গদর্শন" করবে না এবং কোন সম্প্রদায়বিশেষের মুখপত্রও হবে না—এ কথা তখনকার দিনে বলা এবং কাজে পরিণত করা যে কতখানি মানসিক বলিষ্ঠতা ও আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া তা আজ আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি। এ যুগের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতার কথা বাদ দিলেও, কোন মাসিক পত্রিকাকেই নিজস্ব দল বা গোষ্ঠীর গণ্ডী-বহির্ভূত বলা যায় না, এবং কারও উদারতা বা বলিষ্ঠতা ব'লে কিছুই নেই। এই দিক দিয়ে "মাসিক বসুমতী" নিঃসন্দেহে "বঙ্গদর্শনের" আদর্শের উত্তরাধিকারী ব'লে আজও নিজের পরিচয় দিতে পারে। বাইরের সমাজের সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ যে "মাসিক বসুমতীকে" কলুষিত করেনি তা নয়। পঁচিশ বছরের পাঠক হিসাবে সে কথা অস্বীকার করলে আমার দিক থেকে সত্যের অপলাপ করা হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই "মাসিক বসুমতীর" পৃষ্ঠায় তো দেখেছি, প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী প্রমথ চৌধুরীর বাঙলা-সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে সুচিন্তিত প্রবন্ধসমষ্টি এবং বাঙলার অদ্বিতীয় মুসলমান কবি নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

বিশপ

অন্যান্য কৃতবিদ্য মুসলমান লেখকদের রচনাও 'মাসিক বসুমতীর' পৃষ্ঠায় হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনার পাশে স্থান পেয়েছে। এই উদারতা যে-পত্রিকার বরাবর ছিল তাকে সাম্প্রদায়িকতা-দোষে দুষ্ট বলা যায় কি? হিন্দুই হ'ন আর মুসলমানই হ'ন, সুশিক্ষিত বাঙালীর পাঠোপযোগী সুলিখিত রচনা প্রকাশ করতে "মাসিক বসুমতী" কোন দিন কুণ্ঠিত হয়নি, আজও হয় না। কিন্তু তার চেয়েও "মাসিক বসুমতীর" বড় পরিচয় হ'ল তার গোষ্ঠী ও দলনিরপেক্ষতা। এই দলাদলিমুক্ত গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতাই বোধ হয় "মাসিক বসুমতীর" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। রক্ষণশীল বা প্রগতিশীল যাই হোক, বাঙলা দেশে আজ এমন একখানিও মাসিক পত্রিকা আছে কি না সন্দেহ, দলাদলির ঊর্দ্ধে রচনার উৎকৃষ্টতা যাচাই ক'রে তাকে প্রকাশ ও প্রচার করা যার উদ্দেশ্য। "মাসিক বসুমতী" সে-বৈশিষ্ট্য গোড়া থেকে আজ পর্য্যন্ত বজায় রেখেছে। তাই প্রাচীন লেখকদের পাশাপাশি নবীন লেখকদের এমন অদ্ভুত সমাবেশ আর অন্য কোন পত্রিকায় আজও দেখা যায় না। প্রাচীন রক্ষণশীল ভাবধারা ও শাস্ত্রালোচনার পাশে এমন বৈপ্লবিক ভাবধারা ও মতবাদের প্রচার আর অন্য কোন পত্রিকাকে করতে দেখা যায় না। এই উদারতাই সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান উপজীব্য। "মাসিক

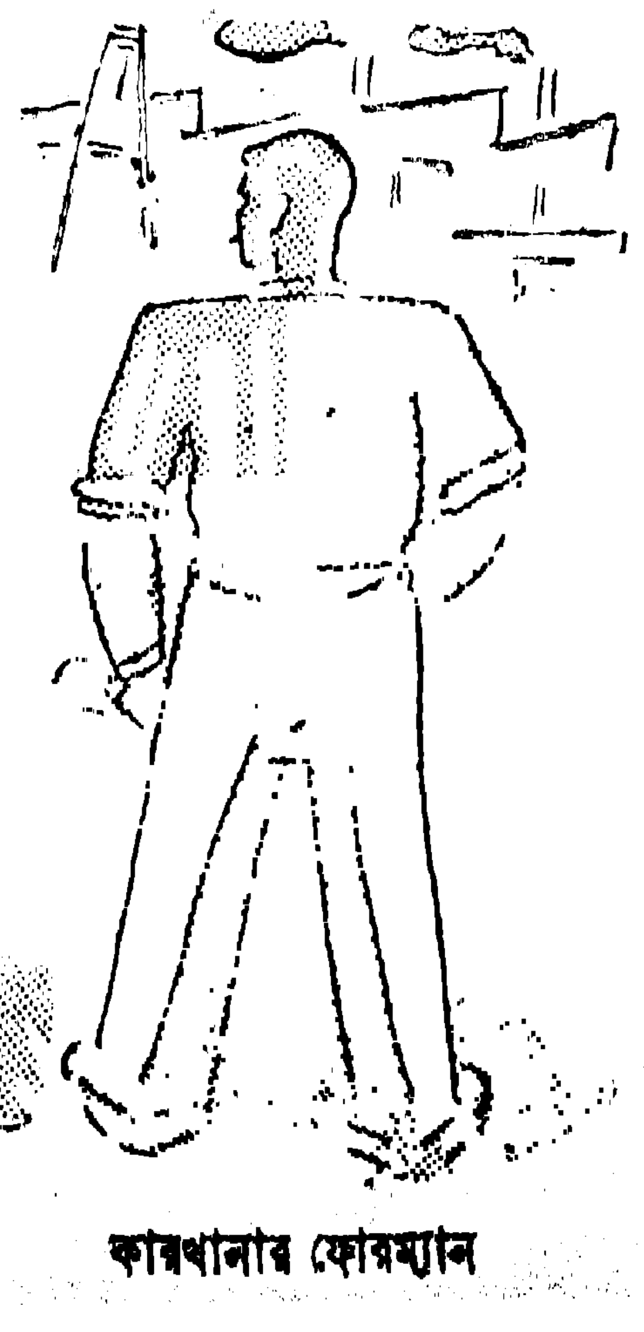

কারখানার ফোরম্যান

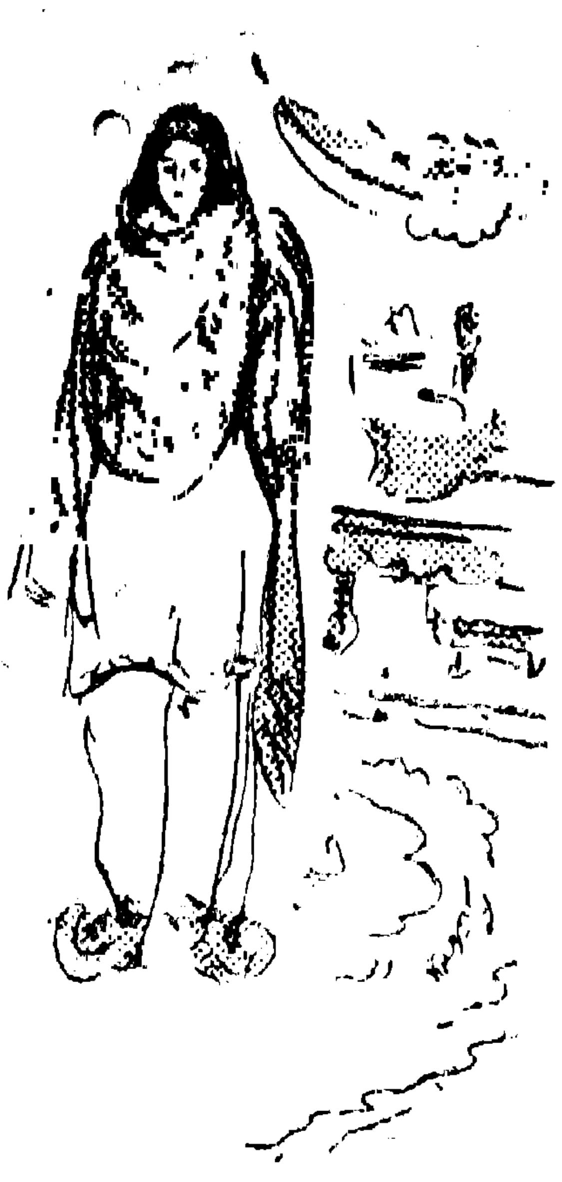

বেগম সাহেবা

"বসুমতীর" প্রত্যেকটি সংখ্যা যেমন আমাদের দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির পুরাতন আদর্শ ও ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তেমনি নতুন ভাবধারা প্রকাশ ক'রে, নতুন ভাবসম্পদ পরিবেশন ক'রে সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাণধর্ম্ম প্রগতিশীলতাকেও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয় না। এই দিক দিয়ে "মাসিক বসুমতী" বাঙলা সাময়িক পত্রের গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ব'লে নিশ্চয়ই দাবী করতে পারে।

"বঙ্গদর্শন" পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র পত্র-সূচনাতে এ কথাও বলেছেন যে পত্রিকা "সর্ব্বজনপাঠ্য" হবে। সর্ব্বসাধারণের উন্নতি যাতে হয় না, তার দ্বারা কারও উন্নতিই হয় না। পরবর্ত্তী কালের মাসিক পত্রিকার মধ্যে "মাসিক বসুমতীর" মতন আর কোন পত্রিকা এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়নি। বাঙলার চিরদিনের উপেক্ষিতা নারীসমাজ, বাঙলার স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের পাঠোপযোগী বিচিত্র রচনাসম্ভার নিয়ে "মাসিক বসুমতী" প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যাদের "আপামর সাধারণ" বলেছেন তাদের কাছে তাই সব চেয়ে প্রিয় হয়েছে "মাসিক বসুমতী"। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের কাছে বসুমতীর তাই এত আদর এবং বাঙলার গৃহকোণে নির্ব্বাসিতা মা-বোনেদের কাছে "মাসিক বসুমতী" রামায়ণ-মহাভারতের মতন অপরিহার্য্য সঙ্গী।

তাই ব'লে যে "মাসিক বসুমতী" সস্তা সাহিত্য পরিবেশন ক'রে দেশের লোকের সাংস্কৃতিক রুচি-বিকৃতির সহায়তা করছে তা নয়। "মাসিক বসুমতী" সম্বন্ধে এই অভিযোগ অনেক রুচিবাগীশকেই করতে শুনেছি। কিন্তু এই অভিযোগ যদি মেনে নিতে হয় তাহ'লে কোন মাসিক পত্রিকা, এমন কি ব্রাহ্মগন্ধী রুচিনীতিশুচিবায়ুগ্রস্ত পত্রিকাও এই অভিযোগ থেকে মুক্তি দাবী করতে পারে না। "মাসিক বসুমতীর" গোয়েন্দার কাহিনী বা চমকপ্রদ প্রেমের গল্প উপন্যাস যে অনিষ্ট করতে পারেনি তার চেয়ে অনেক বেশী অনিষ্ট করেছে রুচিবাগীশ পত্রিকার ছদ্মবেশী আধুনিকতা। কিন্তু সে তর্কের এখানে প্রয়োজন নেই। "মাসিক বসুমতীর" প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমবর্দ্ধমান লোকপ্রিয়তা এই অভিযোগকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে রুচিহীনতা ও চমকপ্রদতার পরিচয় দিয়েছে "মাসিক বসুমতী" মধ্যে মধ্যে, কিন্তু একটা মূলত উদ্দেশ্যরূপে তাকে প্রশ্রয় দেয়নি কোন দিন। তা যদি দিত তাহ'লে আজ "মাসিক বসুমতী" বাঙলার রুচিবান কৃতবিদ্য সম্প্রদায় থেকে আপামর সাধারণের কাছে পর্য্যন্ত এত প্রিয় হ'ত না, এবং সমান মর্য্যাদালাভ করত না। সেই গোঁড়ামি বা সঙ্কীর্ণতা, সেই দীনতা ও চরিত্রহীনতা তার কোন দিনই ছিল না। তাই "মাসিক বসুমতীর" পৃষ্ঠায় পঞ্চানন তর্করত্ন, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ-প্রমুখ পণ্ডিতদের শাস্ত্রালোচনার পাশে এ যুগের অন্যতম ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা প্রকাশিত হয়েছে, উপনিষদের দর্শনতত্ত্বের পাশে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আধুনিক রসায়নবিদ্যার বৈজ্ঞানিক আলোচনা স্থান পেয়েছে, শিল্পী হেমেন্দ্র মজুমদারের পাশে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসুও রয়েছেন। কথা-সাহিত্যেও দেখতে পাই, দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দার কাহিনীর সঙ্গে আধুনিক যুগের অন্যতম কথাশিল্পী শৈলজানন্দের শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল বস্তুবাদী রচনা "কয়লা-কুঠি" প্রকাশিত হয়েছে। রসরাজ অমৃতলাল, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ, লোকশিল্পী মুকুন্দদাস এই "মাসিক বসুমতী"র পৃষ্ঠায় দেখা দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। কবি কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস রায়ের সঙ্গে বাঙলার নব যুগের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল স্বচ্ছন্দে এসে দাঁড়িয়েছেন পাশাপাশি। এই অদ্ভুত সমাবেশ ও সমন্বয়সাধন "মাসিক বসুমতীর" পক্ষে সহজেই সম্ভব হয়েছে, কারণ মাসিক বসুমতীর দলীয় অনুদারতা অথবা তথাকথিত আদর্শানুগত্যের নামে গোঁড়ামি ব'লে কোন দিন কিছু ছিল না।

আপামর সাধারণের প্রিয় পত্রিকা হ'তে গিয়ে বসুমতী কোন দিন বঙ্কিমচন্দ্রের এই মূল্যবান কথাটিও ভুলে যায়নি, "যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণ শিক্ষার মূল।" এই মূল্যবান কথার তাৎপর্য্য "মাসিক বসুমতী" যে উপলব্ধি করেছিল তাতে কোন ভুল নেই। প্রাচীন ও নবীন, গোঁড়া ও প্রগতিশীল, হাল্কা ও গম্ভীর সর্ব্ব শ্রেণীর কৃতবিদ্য লেখকদের

বার্ম্মা দেশ

বিচিত্র সমাবেশ থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। সস্তা ও হাল্‌কা বিষয়, যা সহজেই সুরুচির প্রশ্রয় দিতে পারে, তা যে "মাসিক বসুমতীর" পৃষ্ঠায় পরিবেশিত হয়নি তা নয়, হয়েছে। কিন্তু "মাসিক বসুমতীর" লেখা ও লেখকদের বিচার ক'রে বলা যায়, এই সস্তা বিষয় পরিবেশন কেবল হাতছানি আর প্রলোভন মাত্র, পত্রিকার নীতি নয়। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার ক'রে বলা দরকার। যে দেশে দুর্নীতি, কুসংস্কার, কুশিক্ষা ও অন্ধ গোঁড়ামি সাধারণ মানুষের অস্থি-মজ্জায় পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছে, সে দেশের মানুষের কাছে হঠাৎ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরে নীতিকথা, শাস্ত্রকথা, সুসাহিত্য ও সুশিক্ষার উচ্চাদর্শ প্রচার করতে গেলে তা অরণ্যে গলা ফাটিয়ে রোদন করার সামিল হবে। তাদের নেশার খোরাক যুগিয়ে, লোভ দেখিয়ে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে সুশিক্ষা, সুসাহিত্য ও সুচিন্তার প্রশস্ত রাজপথের উপর এনে দাঁড় করাতে হবে। তা না হলে সাহিত্যের মজলিস এ দেশের চণ্ডীমণ্ডপ পর্য্যন্ত, অন্দর-মহলের হেঁসেল ঘর-পর্য্যন্ত কোন দিনই জমবে না, শিক্ষার আলোকও জ্বলবে না। এ কথা "বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের" প্রতিষ্ঠাতারা যেমন ভাবে বুঝেছিলেন, ঠিক তেমন আন্তরিক ভাবে আর কেউ বোঝেন নি। বাঙলা দেশে তাই "বঙ্গবাসী"র মতন আদর্শ সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানও মরে গিয়েছে, কিন্তু বেঁচে আছে "বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির" আর তারই শ্রেষ্ঠ মুখপত্র "মাসিক বসুমতী"।

"মাসিক বসুমতী"র পাঠকগোষ্ঠী

এই বারে "মাসিক বসুমতীর" পাঠক-গোষ্ঠী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা ক'রে প্রবন্ধ শেষ করা যাক। পাঠক-গোষ্ঠীর বিস্তারিত পরিচয় ও সামাজিক বিশ্লেষণ ভিন্ন কোন মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও লোকপ্রিয়তার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে পত্রিকার পাঠক-গোষ্ঠীর সামাজিক বিশ্লেষণের রীতি নেই। ইয়োরোপে ও আমেরিকায় এই রীতি আছে ব'লে সেখানে জনমত ও জনরুচির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। যাই হোক, এখানে "মাসিক বসুমতী"র পাঠক-গোষ্ঠীর যে সামাজিক বিশ্লেষণ করা হবে তা একেবারে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সঠিক না হলেও, মোটামুটি নির্ভরযোগ্য। "মাসিক বসুমতীর" গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পাঠক-পাঠিকার যেটুকু পরিচয় আমি যোগাড় করতে পেরেছি তার সামাজিক বিশ্লেষণ করলে পাঠকগোষ্ঠীকে মোটামুটি এই ভাবে ভাগ করা যায় :

(ক)

জমিদার
বধূরাণী
বড়রাণী, মেজরাণী, ছোটরাণী
বেগম সাহেবা
ষ্টেটের ম্যানেজার
নায়েব
(বড় তরফ, মধ্যম তরফ, ছোট তরফ)
কারখানার ম্যানেজার

(খ)

রায়বাহাদুর, রায়সাহেব
লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল
ডাক্তার
অধ্যক্ষ, অধ্যাপক
উকিল, ব্যারিষ্টার
সরকারী অমাত্যবর্গ
সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী
(দিল্লী, সিমলা ইত্যাদি)
সরকারী কর্ম্মচারী
পণ্ডিত, শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক
সিভিলিয়ান শ্রেণী
সম্পাদক

(গ)

সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ান :
সাধারণ প্রতিষ্ঠান,
কৃষি, কর্ম্মচারী ইউ-
নিয়ন, নারীসঙ্ঘ,
যুবসঙ্ঘ, দাতব্য
প্রতিষ্ঠান, প্রবাসী বাঙালী
ক্লাব, ভারতের বাইরে
বিদেশের বাঙালী ক্লাব,
বাবুদের ক্লাব ইত্যাদি।
স্কুল, কলেজ, টোল, মাদ্রাসা
হাসপাতাল
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান
সাহিত্যসঙ্ঘ

(ঘ)

কনভেন্টের সিষ্টাররা
মিশনের পাদরিরা
বাঙালী পাদরিরা

(ঙ)

ইংলণ্ড ও আমেরিকার
বিদেশী পাঠক

এই হ'ল "মাসিক বসুমতীর" পাঠকগোষ্ঠীর মোটামুটি সামাজিক পরিচয়। ক-শ্রেণীর পাঠকগোষ্ঠী বাঙলা দেশের অবস্থাপন্ন অভিজাতশ্রেণী। বাঙলা দেশের ধনিক জমিদার, নবাব এবং সেই জমিদার-পরিবার ও নবাব-বাড়ীর বধূরাণী বেগম সাহেবা থেকে আরম্ভ ক'রে ম্যানেজার, নায়েব আমলারা পর্য্যন্ত "মাসিক বসুমতীর" পাঠক। জমিদার ও নবাবদের হাজারদুয়ারী প্রাসাদের নির্জ্জন অন্তঃপুরে সেখানে বড় মেজ ছোট তরফের বউরাণীরা থাকেন এবং যেখানে সূর্য্যকিরণ পর্য্যন্ত সহজে উঁকি-ঝুঁকি দিতে পারে না সেখানে কোন দিন কোন মাসিক পত্রিকা প্রবেশাধিকার পেয়েছে কি না তা গবেষণার বিষয়। তবে "মাসিক বসুমতী" যে সহজেই সেই সব প্রাসাদের অন্তঃপুরে অসূর্য্যম্পশ্যাদের অন্তর পর্য্যন্ত স্পর্শ করতে পেরেছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। ম্যানেজার নায়েব গোমস্তাদের গৃহিণীরা যে বধূরাণীদের পাঠাভ্যাস অনুকরণ করতে ছাড়েননি, তাও বেশ অনুমান করা যায়। বধূরাণী ও বেগম সাহেবারা বিশাল অট্টালিকার নিরালা কক্ষে ফেনশুভ্র শয্যায় বিলাসী অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে "মাসিক বসুমতী"র পাতার পর পাতা যখন চোখ বুলিয়ে যেতেন, ম্যানেজার ও নায়েব গোমস্তাদের গৃহিণীরা তখন নিশ্চয় দ্বিপ্রহরের পড়শিনীদের গাল-গল্পের মজলিসে নিজেদের বিদ্যা ও আধুনিকতার বড়াই করতেন "মাসিক বসুমতীর" গল্প শুনিয়ে। শুধু সেকালের জমিদার-পরিবারে নয়, একালের কারখানার মালিক ও ম্যানেজাররাও "মাসিক বসুমতীর" পাঠক ছিলেন দেখা যায়। যন্ত্রপাতি ও কল-কারখানার ঘর্ঘরানির মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যস্ততা ও হিসাবনিকাশের মধ্যেও "মাসিক বসুমতী"তে মনোনিবেশ করার মতন যথেষ্ট খোরাক তাঁরাও পেতেন। বঙ্কিমচন্দ্র যাঁদের "কৃতবিদ্য" বলেছেন, খ-শ্রেণীর পাঠক-গোষ্ঠী হ'লেন বাঙলার সেই সুশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। এঁরা সবাই আধুনিক যুগের প্রতিনিধি এবং এদেশে আধুনিকতা ও সামাজিক নব জাগরণের অগ্রদূত। সিভিলিয়ান ও সিমলা দিল্লীর অমাত্যদের থেকে শুরু ক'রে অধ্যাপক, উকিল, ব্যারিষ্টার, সম্পাদক, ডাক্তার, কেরাণী, শিক্ষক সকলেই "মাসিক বসুমতীর" নিয়মিত পাঠক। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "সুশিক্ষিত বাঙালীর পাঠোপযোগী" না হ'লে "মাসিক বসুমতীর" এই শ্রেণীর নিয়মিত পাঠক-গোষ্ঠী কখনই গড়ে উঠত না। গ-শ্রেণীতে যে সব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, নারীসঙ্ঘ, যুবসঙ্ঘ, বাবুক্লাব, সাহিত্যসঙ্ঘ ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায় তাদের মধ্যবর্ত্তিতায় "মাসিক বসুমতী" অভিজাত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্তর ভেদ ক'রে সাধারণ ও নিম্নমধ্যবিত্তের স্তরে নেমে এসে লোকপ্রিয় হয়েছে বোঝা যায়। এছাড়া "মাসিক বসুমতীর" প্রতিপত্তি যে কত দূর বিস্তৃত তা বিদেশী পাঠকদের পরিচয় থেকেই জানা যায়। রাজা-বাদশাহের প্রাসাদ থেকে সিভিলিয়ান, উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তারের আধুনিক ড্রয়িং-রুমে বিহার ক'রে "মাসিক বসুমতী" সাধারণ ক্লাব ও সঙ্ঘের মারফত সর্ব্বজনপাঠ্য ও প্রিয় হয়েছে এবং দেখা গিয়েছে যে শেষ পর্য্যন্ত কনভেণ্ট ও গির্জ্জার পবিত্র নীরবতাকে মুখরিত ক'রে বিদেশে পর্য্যন্ত যাত্রা করেছে। সেখানে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে বিদেশের বাঙালীদের ক্লাবে "মাসিক বসুমতী" তো পৌঁছেছেই, এমন কি একেবারে বিদেশী বাঙলা জানা পাঠকদেরও মন জয় করতে তার বিশেষ কষ্ট হয়নি। "মাসিক বসুমতী" আজ তাই বাঙালীর বসুমতী, বাঙলার বসুমতী।

বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার পত্র-সূচনার পুনরুল্লেখ ক'রে প্রবন্ধ শেষ করি। "বঙ্গদর্শন" সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন: "বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের (কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের) বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক।" "মাসিক বসুমতী" বাঙলার কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের এই বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় যদি না দিত, তাহ'লে বাঙলার সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে এবং বাঙলার বাইরের বাঙালী অবাঙালীদের মধ্যে তার এই প্রভাব বিস্তার করা কিছুতেই সম্ভব হ'ত না, হ'লেও তা এ রকম স্থায়ী হ'ত না অথবা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত না। বঙ্কিমচন্দ্র আরও একটা সবচেয়ে মূল্যবান কথা বলেছিলেন, "যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম তাহা সকলেই পড়িতে চাহে"। "মাসিক বসুমতী" এ কথার তাৎপর্য্য যদি না বুঝত এবং তাকে কাজে পরিণত না করত তাহ'লে তার লোকপ্রিয়তা সমাজের সমস্ত স্তরের মধ্যে এমন ছড়িয়ে পড়ত না। এই আদর্শ, এই উদারতা ও বলিষ্ঠতা আজ পর্য্যন্ত "মাসিক বসুমতীকে" বাঁচিয়ে রেখেছে এবং আশা করা যায়, ভবিষ্যতেও রাখবে। বাঙলার সংস্কৃতির ইতিহাসে "মাসিক বসুমতীর" "দান কেউই তাই সামান্য বলবেন না, এবং বাঙালীরা চিরদিন, যেখানেই থাকুন, মাসিক বসুমতীকে" বাঙালীর "বসুমতী" ব'লে মনে করবেন, ভালবাসবেন, তার উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করবেন।

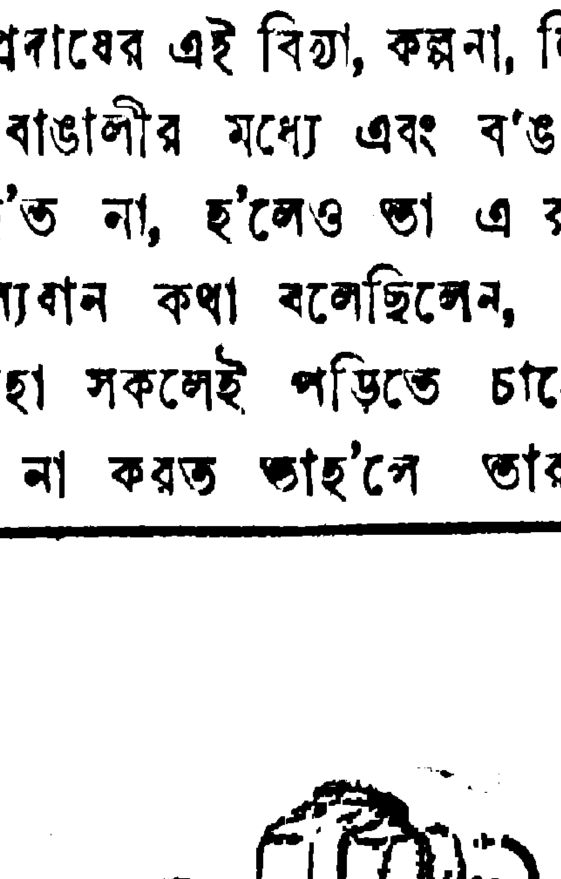

ডাক্তার

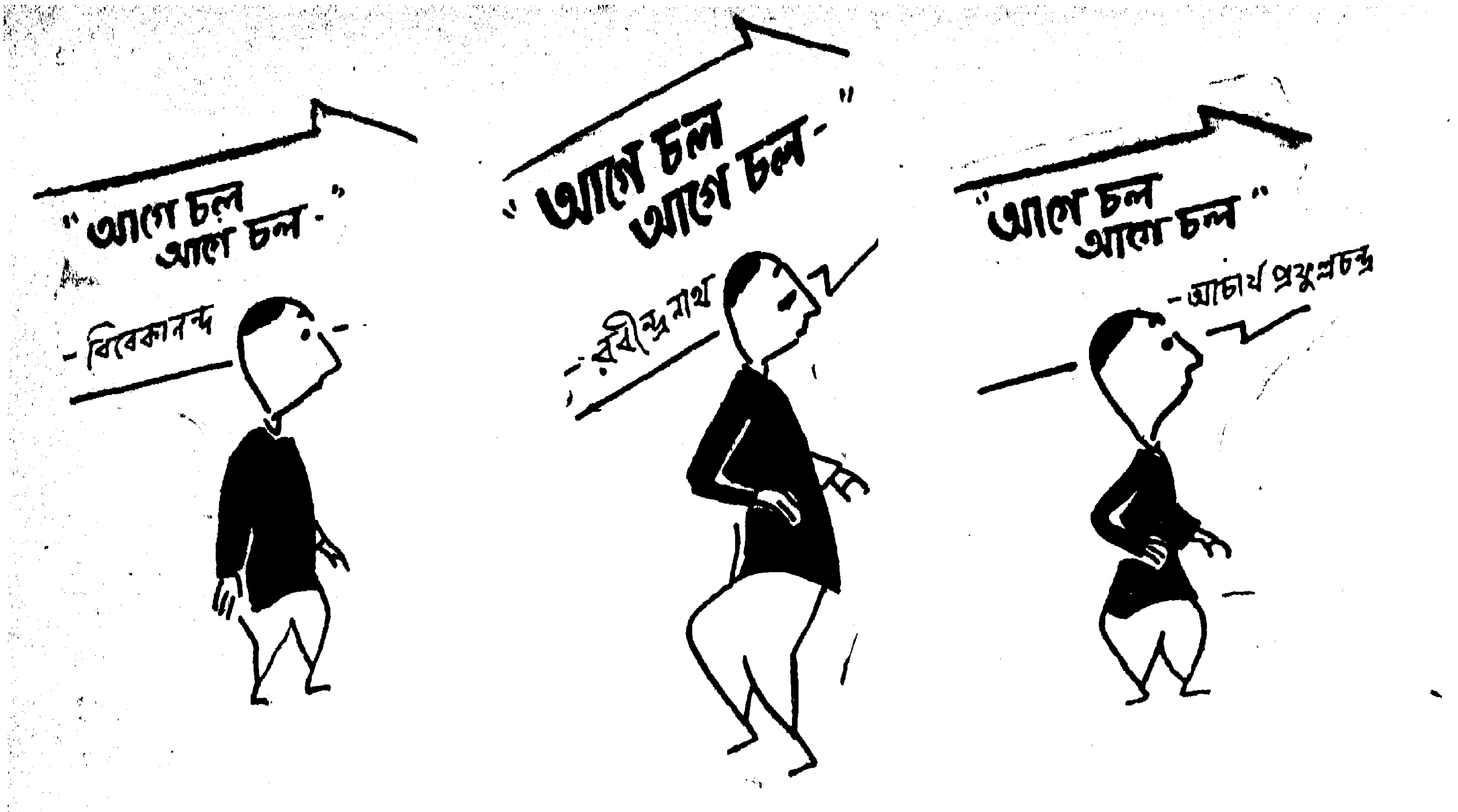

প্রচার ও

বর্ত্তমান যুগে প্রচার-পদ্ধতির বহুল প্রসার এবং উন্নতি হইয়াছে, প্রচার-কার্য্যকে বিশেষ এক প্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ করা হইয়াছে, এ-কথা বলা অন্যায় হইবে না। ব্যবসায়ী হলে হাজার বৎসর পূর্ব্বেও কোন না কোন ভাবে প্রচার-কার্য্য প্রচলিত ছিল এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। সে-কালে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিও যেমন বর্ত্তমান অপেক্ষা বহু ভাবে এবং গুণে নিম্নস্তরের ছিল, তেমনি বিজ্ঞাপন বিষয়েও তাহারা সরল এবং সহজবোধ্য পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিত। বলা বাহুল্য, জ্ঞানবুদ্ধি বলিতে আমি ব্যবসা-সংক্রান্ত জ্ঞানবুদ্ধির কথাই বলিতেছি, অন্য কোন বিষয়ে নহে। পূর্ব্বকালে ব্যবসায়ী তাহার বাণিজ্য-সম্ভার এবং পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য ব্যক্তিগত আবেদনের সহায়করূপে সামান্য পরিমাণে কিছু কিছু প্রচার বা 'বিজ্ঞাপনের' সাহায্য গ্রহণ করিত। সেই কালে বিজ্ঞাপন অপেক্ষা—'ব্যক্তিগত আবেদনের' মূল্য অধিক বলিয়া বিবেচিত হইত। নানা প্রকার চিহ্ন বা 'সাইন' দ্বারা পণ্য-প্রতিষ্ঠানে ক্রেতা টানিবার উপায় বহু শতাব্দি পূর্ব্বেও পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই প্রচলিত ছিল। চিহ্ন বা 'সাইন' দেখিয়া ক্রেতা পণ্য-প্রতিষ্ঠানে আগমন করিলে পর ব্যবসায়ী বা তাহার নিযুক্ত কর্ম্মচারী দ্রব্য বা পণ্য-বিশেষের গুণাবলী মুখে বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া পণ্য বিক্রয়ের চেষ্টা করিত। বিশেষ চিহ্ন বা সাইন পণ্য-প্রতিষ্ঠানে কেবল মাত্র ক্রেতাকে আকর্ষণ করিবার উপায়রূপেই ব্যবহৃত হইত। কাজেই ব্যক্তিগত আবেদনের মূল্যই বেশী ছিল ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বর্ত্তমানে 'সেলস্‌ম্যানসিপ' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, পূর্ব্বকালে ব্যবসায়ী মহলে তাহার প্রচলন যে সামান্য পরিমাণে ছিল, তাহার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার পদ্ধতি এবং প্রয়োগ অবশ্যই ভিন্নপ্রকার ছিল।

পূর্ব্বকালে প্রায় সকল দেশেই যে-প্রকার হাট-বাজার বসিত, তাহাকে বর্ত্তমানের 'মার্কেট' বা রাজপথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দোকান বা পণ্য-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে কোনক্রমেই তুলনা করা যাইতে পারে না। হাট এখনও পৃথিবীর নানা দেশে, বিশেষ করিয়া প্রাচ্যদেশ-গুলিতে বসে এবং এই সকল হাটের ধারা এবং বিক্রয় পদ্ধতিও প্রায় সেই পূর্ব্বকালের হাটের মতই রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে বিশেষ বিশেষ হাটে বা মেলাতে লোকে এবং ব্যবসায়ীরা বিশেষ বিশেষ পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয় করিতে যাইত। এই সকল হাট বা মেলার 'বিজ্ঞাপন' লোকের মুখে-মুখেই দেশ-দেশান্তরে প্রচারিত হইত। এই প্রচারের জন্য বিশেষ করিয়া প্রচারক নিয়োগের প্রয়োজন ঘটিত না। ব্যবসায়ীদের ইহার জন্য কোন প্রকার খরচও করিতে হইত না। কোন্ সময় কোথাকার কোন্ মেলা বা হাটে কোন্ পণ্য বিশেষ ভাবে পাওয়া যাইবে—তাহাও মুখে মুখে দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িত। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে সে সকল বিখ্যাত হাট বা বাৎসরিক মেলা বসে, তাহার প্রচার-কার্য্য ঐ সকল হাটের ব্যবসায়ীরা করে না—করে রেল, ষ্টীমার প্রভৃতি কোম্পানী। খানিকটা সরকারী ভাবেও করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, রেল বা ষ্টীমার কোম্পানী নিছক প্রেমের জন্য এই প্রচার চালান না। মেলা বা হাটে লোক-সমাগম যত বেশী হইবে, তাহাদের লাভের অঙ্কও হইবে তত বেশী। এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা মেলা বা হাটের প্রচার করেন। সরকার হইতে যে প্রচার-কার্য্য করা হয়, তাহাও লাভের আশায়। হাট বা মেলার খাজনা এবং অন্যান্য প্রকারে দেয় রাজকরের পরিমাণ নেহাৎ কম হয় না।

বিগত যুগের পণ্য-প্রচারকাহিনীর বিশেষ কোন আলোচনার অবকাশ কম। এ বিষয় অধিক কিছু বলিতে গেলে ইউরোপের কথাই বেশী করিয়া বলিতে হয়। কারণ, আমাদের দেশে লোক-সমাজে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য যে প্রচেষ্টা ছিল, তাহার শতাংশের এক

—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত

প্রচার-পদ্ধতি

অংশও ব্যবসায় বা পণ্য-প্রচারের জন্য নিয়োজিত হইত না। প্রাচীন ভারতের শত শত শিলালিপিগুলিকে প্রচার বলিয়া অবশ্যই ধরিতে হইবে। কিন্তু তাহা একান্ত ভাবে ধর্ম্ম বা তৎকালীন রাজা এবং সম্রাটদের অনুশাসন প্রচার মাত্র। আমার আলোচনা এবং নিবন্ধের সহিত ধর্ম্ম-প্রচারের কোন সম্বন্ধ নাই। কাজেই প্রাচীন ভারতে প্রচার বা বিজ্ঞাপন বলিয়া কোন বস্তু ছিল না, এ-কথা বলিলে পাঠক বুঝিবেন আমি কেবল মাত্র ব্যবসায় এবং পণ্য-প্রচারের কথাই বলিতেছি।

আমার যত দূর জানা আছে তাহাতে মনে হয়, ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গ জাতিদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ব্যবসায়-সংক্রান্ত কোন প্রকার প্রচার বা 'জাননী' বিদ্যার প্রচলন ছিল না। শ্বেতাঙ্গদের আসিবার পূর্ব্বে ভারতের বিখ্যাত পণ্যদ্রব্যগুলির প্রচার ভ্রমণকারীদের মৌখিক এবং লিখিত বর্ণনার মধ্য দিয়াই হইত। অনেক সময় ভ্রমণকারীরা ঐ সকল পণ্যের নমুনা সঙ্গে লইয়া যাইতেন, যেমন মসলীন, কার্পেট, তাঁতের বহুপ্রকার বস্ত্রাদি, রূপার বাসন, লাক্ষা-নির্ম্মিত দ্রব্য ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ভাবে ভারতীয় বিবিধ পণ্য-সামগ্রীর খ্যাতি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। দেশীয় ভ্রমণকারীরাও এক স্থানের পণ্য অন্য স্থানে বহু কষ্ট করিয়া বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইতেন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে পৌঁছিতে যদিও বৎসরাধিক কাল সময় লাগিত, তাহা সত্ত্বেও ঢাকার পণ্যদ্রব্য বোম্বাই এবং মাদ্রাজের পণ্যদ্রব্য লাহোরে এক দিন না এক দিন অবশ্যই পৌঁছিত। বিদেশী ভ্রমণকারীদের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া এবং নমুনা দেখিয়া বিদেশী ব্যবসায়ীর দল ক্রমে ভারত ছাইয়া ফেলিল এবং এই সকল ব্যবসায়ীদের দ্বারাই ভারতের পণ্য ক্রমে পৃথিবীখ্যাত হইয়াছিল। ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং পণ্য-নির্ম্মাতাদের সাক্ষাৎ ভাবে নিজ পণ্যের জন্য কোন প্রকার 'প্রচার-কার্য্য' চালাইতে বা 'জাননী' বিদ্যার পরিচয় দিতে হয় নাই, তাহার কোন প্রয়োজনও ঘটে নাই। গতকালে ভারতবর্ষে ব্যবসায়ে কোন প্রকার অযথা প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকাতে প্রচার বা বিজ্ঞাপনের কথাও হয়ত ব্যবসায়ী মহলে কাহারো মনে হয় নাই, ইহাও ধরা যাইতে পারে।

প্রাচ্য দেশের লোকদের ব্যবসায়-বুদ্ধি আমাদের দেশের লোকদের অপেক্ষা প্রখর, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। সেই কারণে প্রথম হইতেই তাহারা নিজেদের ব্যবসায় প্রসার এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিবার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকে। এই চিন্তার ফলে তাহারা এমন নানা উপায় এবং ব্যবসায় পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়, প্রচার বা 'জাননী-বিদ্যা' যাহার একটি বিশেষ অঙ্গ বা হাতিয়ার বলিয়া প্রমাণিত হয়। প্রথম দিকে প্রচার অত্যন্ত সোজা এবং সহজ হইলেও, যেমন ভাটিখানার সামনে মদের পিপা ঝুলান, কামারের দোকানের দরজায় কোদাল টাঙ্গান, কাপড়ের দোকানের সামনে বিশেষ কোন প্রকার জামা-কাপড় প্রদর্শন, ছুতারের দোকানের দরজার মাথায় লাঙ্গল বা অন্য কোন প্রকার প্রত্যহ-ব্যবহার্য্য কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দ্রব্য রাখা, ক্রমে প্রচার-পদ্ধতির উন্নতি এবং 'বৈজ্ঞানিক' ক্রম-বিকাশ হইতে থাকে। এই ক্রম-বিকাশ গত শতাব্দির শেষ দিকেও তেমন প্রখর বা দ্রষ্টব্য হয় নাই। বর্ত্তমান শতাব্দির প্রথম হইতেই প্রচার-কার্য্য এবং বিজ্ঞাপনী-পদ্ধতি একটি বিশেষ 'বিজ্ঞান' বলিয়া পরিচিত লাভ করে। ইহাদের ব্যবসায় বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়াও শিল্পপতিগণ ক্রমশঃ স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এমন কি, বহু শিল্পপতি এবং বিখ্যাত ব্যবসায়ী, ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে ব্যক্তিগত আবেদন অপেক্ষা প্রচার এবং বিজ্ঞাপনের মূল্য বহু গুণে অধিক বলিয়া মনে করেন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও ইহা বহু ভাবে প্রমাণিত হয় এবং এখনও হইতেছে। গত কয়েক বৎসর হইতে বিবিধ প্রকার প্রচার-কার্য্য এবং বিজ্ঞাপনে মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট সহায়তা গ্রহণ করা হইতেছে। পণ্যবিশেষের প্রচার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে স্থান-বিশেষের জনগণের মানসিক বৃত্তি, প্রবৃত্তি এবং রুচির বিষয়ে সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ইহা হয়ত তেমন ভাবে হয় না, কিন্তু মার্কিণ রাষ্ট্রে প্রাক্-প্রচার-তথ্য সংগ্রহ একটি অতি আবশ্যকীয় কার্য্য। কোন এক বিশেষ স্থানে দ্রব্য বা পণ্যবিশেষের প্রচার-পদ্ধতির মান কি হইবে, তাহা সেই বিশেষ স্থানের বাসিন্দাদের শিক্ষা এবং বিদ্যাবুদ্ধির মানের উপরেই বহুল পরিমাণে নির্ভর করিবে। কারণ, এই সামঞ্জস্য না ঘটাইতে পারিলে প্রচার-কার্য্য ফলপ্রদ হইতে পারে না। সহজ বুদ্ধিতে মানুষ যদি বিশেষ কোন এক প্রচার-পদ্ধতি এবং বিজ্ঞাপনে সঠিক মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহা হইলে প্রচারের প্রাথমিক উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে।

পুলিশ-ক্যাম্পের মধ্যে অস্থির পদে পায়চারী করেন দারোগা অবনীমোহন। ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে তার। কতগুলি কিলবিল কুটিল রেখায় নিষ্ঠুর মুখটা বীভৎস দেখায়।

ভূমিকম্পের পর বিধ্বস্ত ধরিত্রীর মত শান্ত দেখায় এলাকাটা। ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে ধ্বংসস্তূপ—পুড়ে-যাওয়া ঘর-বাড়ীর রিক্ত কাঠামো, ঝলসে যাওয়া বাদামী গাছ। বিস্তীর্ণ রিক্ত ধানক্ষেত ধূ ধূ করে। আল বেয়ে মানুষের পায়ে চলার পথ সাদা হয়ে তকতক করে। একটা বোবা নিঃসঙ্গতায় থমকে থাকে গ্রাম-প্রান্তর।

একটা নেড়ী কুকুর এসেছে কোথা থেকে আর চিৎকার করছে অকারণ। একটা কিছু করা দরকার। কেস থেকে হঠাৎ রিভলবারটা টেনে বার করেন অবনীমোহন। আর অবনীমোহনের লক্ষ্য অব্যর্থ তাই কুকুরটা আর শব্দ করবে না কোন দিন।

অপদার্থের দল। দাঁতে দাঁত চেপে হঠাৎ বলে ওঠেন অবনীমোহন। বন্দুক কেড়ে রেখে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বিদেয় করে দিতে হয় সবগুলিকে।

কিন্তু ওদেরই বা কি দোষ! কখন্ কোথা দিয়ে আক্রমণ আসবে অবনীমোহনই কি তা কল্পনা করতে পারেন? রাত্রির অন্ধকারে কখন্ ক্যাম্পে আগুন ধরে উঠবে, কখন্ কোথা দিয়ে একটা বিষাক্ত তীর এসে লুটিয়ে দেবে এক জন বন্দুকধারী সিপাইকে—কার সাধ্যি তা আগে থেকে বলতে পারে? আক্রমণের পর অবশ্য বে-পরোয়া গুলী ছোড়া হয় চারি দিকে। কিন্তু গুলী লাগল কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল তাই কি বোঝবার উপায় আছে? মৃতদেহগুলি কোথায় লুকিয়ে ফেলে, কোথায় কোন্ ঝোপের মধ্যে পুঁতে রাখে—কে তার সন্ধান দেবে?

অস্থির পদে পায়চারী করেন অবনীমোহন। অপদার্থের দল। বেরিয়েছে তো আর পাত্তা নই। A bunch of cowards। হয়ত অবনীমোহনের চোখের আড়ালে গিয়ে সিদ্ধি গুলছে শালারা!···

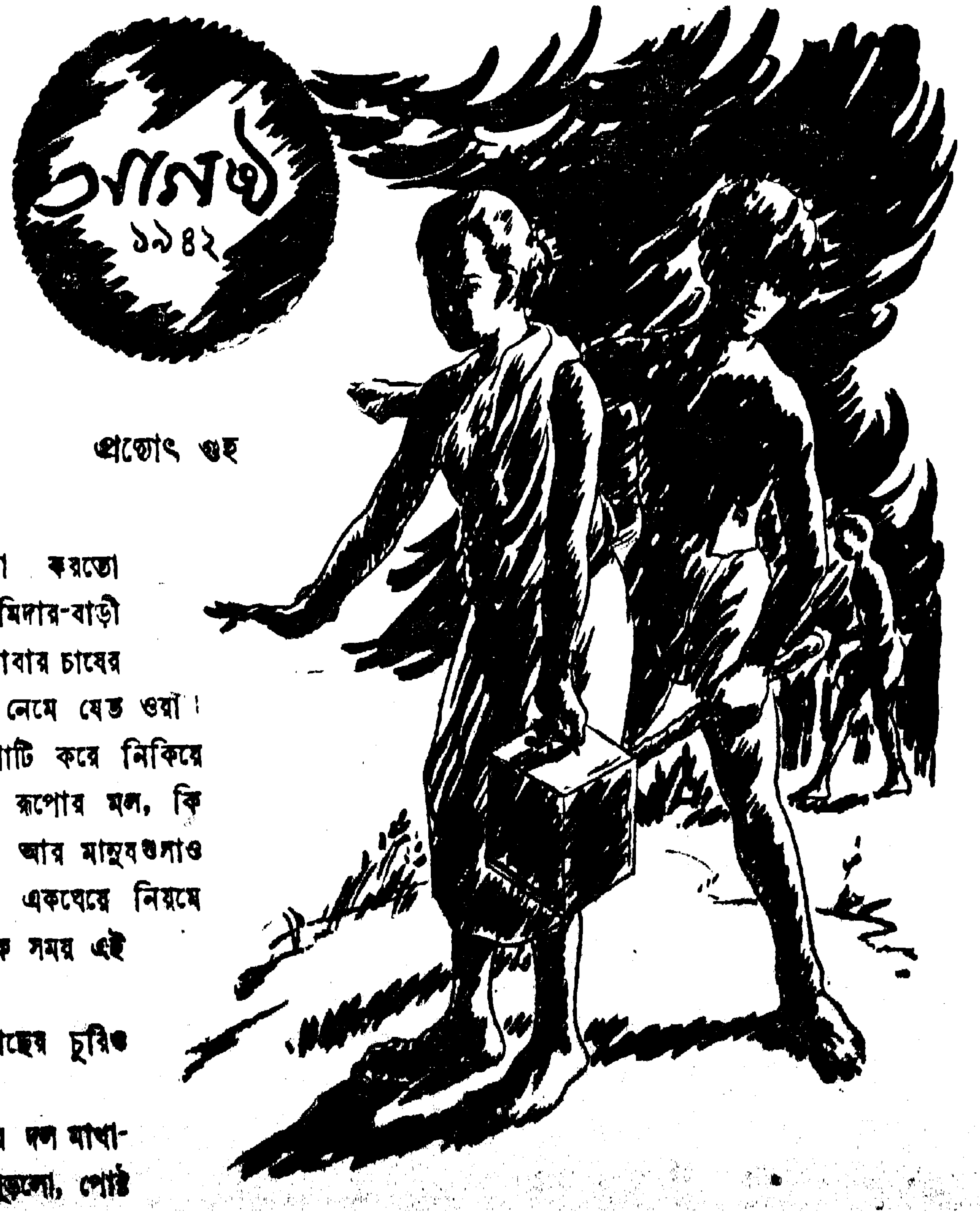

প্রদ্যোৎ গুহ

বেশ ছিল মানুষগুলো। অবনীমোহনের কড়া শাসনে শিরদাঁড়া নিচু করে বেড়াত সবাই। মাঠে চাষ দিত, চণ্ডীমণ্ডপে জটলা করতো এলোমেলো ভাবে। তার পর ফসল উঠলে জমিদার-বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতো। আবার চাষের সময় এলে একটা অস্থির উৎসাহে হাল নিয়ে মাঠে নেমে যেত ওরা। স্বপ্নের জাল বুনতো, শূন্য গোলা মাটি দিয়ে পরিপাটি করে নিকিয়ে দিত মেয়েরা। রাত্রে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে রূপোর মল, কি নাকছাবি, কি নীল শাড়ীর বায়না ধরতো। আর মানুষগুলাও প্রতিশ্রুতি দিতে কার্পণ্য করতো না। এমনি একঘেয়ে নিয়মে গড়িয়ে গড়িয়ে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলি। এক-এক সময় এই এক-ঘেয়েমী অসহ্য মনে হত অবনীমোহনের।

বৈচিত্র্যহীন জীবন। একটা ভারী গোছের চুরিও কদাচিৎ যদি ঘটে, তাকেই ভাগ্য বলতে হবে।

কিন্তু হঠাৎ এক দিন এই সর্ব্বংসহ বাসুকির দল মাথা-চাড়া দিল আর আগুন জ্বলে উঠলো। থানা পুড়লো, পোষ্ট অফিস পুড়লো—পাশাপাশি পনের-বিশটা গাঁ থেকে ইংরেজী সাম্রাজ্য-বাদের অতি পুরাতন চিহ্নগুলি বিলীন হয়ে গেল। তার পর সেই ভস্মস্তূপের ওপর ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিল কর্কশ চওড়া হাতে। আর তার পর একটা অস্পষ্ট কম্পিত আবেগে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো ওরা—মুক্ত স্বাধীন। কোন রকমে, একবস্ত্রে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দারোগা অবনীমোহন।

কেউ বলে দেয়নি, তবু ওরা মনে মনে অনুভব করলো এই দিগন্তবিসারী ফসলের সোনা, এই মাটি, এই পৃথিবীর অকৃপণ আলো-বাতাস এ সব কিছুর ওপরই তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঠের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে থাকে ঈশান। চোখ জুড়িয়ে যায়। রুক্ষ কঠিন মুখটা যেন অপত্য-স্নেহে কোমল হয়ে আসে।

পথ দিয়ে আসছিল রসিক, ঈশানকে অমন সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলো:

আরে কেও, ঈশান না—অমন নিঝুম মেরে দাঁড়িয়ে আছ ক্যানে?

দেখতেছি; কেমন লজ্জিত ভাবে হাসে ঈশান—এই জমি-জমা সব আমাদের হয়ে গেল; তার পর একটা কম্পিত আবেগে ফেটে পড়ে মানুষটা।

বোঁচা বোঁচা মাস ছয়েকের শিশুটাকে মাই দিতে দিতে স্বপ্নালু ভাবে তাকিয়ে থাকে রাধা। ঐ উধাও মাঠের ওপর দিয়ে এক দিন এ গাঁয়ে এসেছিল রাধা।

অল্প কিছু জমি-জমা ছিল, আর ছিল শক্ত সবল বাহু ঈশানের। স্বপ্ন ঘনিয়ে এসেছিল ওদের জীবনে—ঈশানের রুক্ষ কঠিন মুখে লেগেছিল কেমন একটা পরিতৃপ্ত প্রসন্নতার ছাপ। একটা অভাব শুধু পীড়া দিত, একটা শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করত ঘর-বাড়ী। কত কবচ মাদুলী, কত তুক্‌তাক্—তবে না বাঁজা দুর্নাম ঘুচলো রাধার।

ঘোলাটে হলুদ রঙ লেগেছে ধানের ক্ষেতে—আর স্বপ্নের ছোঁয়া লেগেছে মানুষগুলোর জীবনে।

কিন্তু চুপ করে বসে থাকার লোক নন অবনীমোহন। ওরা আসছে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে। তৈমুরের খোঁড়া পায়ের দাগ পড়ছে গ্রামে-প্রান্তরে।

রুক্ষ নোংরা মানুষগুলো আবার জটলা করলো, তামাক খেলো, কাশল আর চিৎকার করলো এলোমেলো ভাবে। তার পর আধ-পাকা ধান কেটে এনে আগুন লাগিয়ে দিল থমথমে গম্ভীর মুখে।

কিছু থয়ে যাব আটকুড়ের বেটাদের জন্য—মুখে ছাই মুমুন্দিদের!

ধানের স্তূপ সামনে নিয়ে গুম হয়ে বসে থাকে ঈশান।

বসে আছিস যে, আগুন দে—এসে পড়বে যে ওয়ারা।

তার পর ঈশানের হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে নিজেই আগুন লাগিয়ে দিল রাধা।

যা, পুড়ে গেল!

একটা ফাটা আর্ত্তনাদের মত শোনাল ঈশানের কণ্ঠস্বর। পুড়ে গেল, পুড়ে ছাই হয়ে গেল ওদের সযত্ন-লালিত স্বপ্ন-সম্ভাবনা। আর ইতস্তত ছড়িয়ে থাকল ভস্ম-স্তূপ।

তার পর সুরু হয় হিংস্র শ্বাপদের মনুষ্য-শিকার। পরিত্যক্ত ঘর-বাড়ীতে আগুন জ্বলে, শেষে মানুষ খুঁজে না পেয়ে গুলী চালাতে থাকে ঝোপঝাড় লক্ষ্য করে।

একটা গুলী এসে লেগেছিল রাধার কোলের ছেলেটার পিঠে। ঝোপের আড়ালে কালো কালো স্তব্ধ মুখগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছু করবার নেই—শুধু হাতে তো বন্দুকের মহড়া নেওয়া যায় না।

কুকুরগুলো—দাঁতে দাঁত চেপে পেছন থেকে কে এক জন বলে ওঠে।

আর চারি দিকের আবহাওয়াটা কেমন অপ্রাকৃত হয়ে থমথম করে। অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে দূরের পুলিস-ক্যাম্পের আলোগুলো মিটমিট করে জোনাকীর মত। জনমানবহীন ভূতুড়ে গাঁ একটা দম আটকে আসা নিস্তব্ধতায় মূর্চ্ছিত হয়ে থাকে।

দূরে ভারী বুটের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—ফিরে আসছে টহলদার বাহিনী।

হুজৌর এক আদমী কো পাকাড় লাতা—

দূর থেকে একটা লোককে হিঁচড়ে টেনে আনতে দেখে সুসংবাদটা বড়বাবুকে না জানিয়ে থাকতে পারে না ক্যাম্পের পাহারাদার সিপাই।

কিন্তু আসামী একটা বোকা-বোকা চাষী মেয়ে। হাবিলদার জানাল, পা-টিপে-টিপে ক্যাম্পের দিকে আসছিল মেয়েটা। হাতে ছিল কেরোসিনে ভেজানো ন্যাকড়া আর দেশলাই।

হুঃ, কি করতে আসছিলি এদিকে? হাবিলদার অবধি ভয় খেয়ে যায় এমনি ভাবে হুংকার দিয়ে উঠলেন অবনীমোহন।

আগুন দিবার চাইছিলাম ক্যাম্পে...আর—শান্ত অবিচল ভাবে জবাব দিল মেয়েটা।

আগুন দিবার চাইছিলাম...হঠাৎ যেন সব রক্ত মাথায় চড়ে যেতে চাচ্ছে অবনীমোহনের। গুলী করে ওর ঐ নোংরা খুলিটা উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করলেও উদ্যত ক্রোধ চেপে জিজ্ঞাসা করলেন: কি নাম তোর?

রাধা।

রাধা! ভেংচে উঠলেন অবনীমোহন, কেষ্টরা সব কোথায় গেল তোর?

হিঃ হিঃ করে হেসে ওঠে হাবিলদারটা। বড়বাবুর রসিকতা উপভোগ করেছে সে।

চোপ রও শালা—খ্যাপা কুকুরের মত হঠাৎ খেঁকিয়ে ওঠেন অবনীমোহন। তার পর মেয়েটার হাতটা মুচড়ে ধরেন অবনীমোহন।

গাঁয়ের লোক সব কোথায় গেছে?

জানি না।

জানি না—ঠাস করে একটা চড় পড়ল মেয়েটার মুখে। এবার চোখে কয়েক ফোঁটা জল দেখা গেল মেয়েটার—আশান্বিত হলেন অবনীমোহন।

কোথায় গেছে লোক সব?

জানি না।

বলবি না তুই—দে তো শালীকে উলঙ্গ করে।

মেয়েছেলে হুজুর—পেছন থেকে কে এক জন একটা ক্ষীণ মন্তব্য করে।

দয়ার অবতারটি কে—এদিকে নিয়ে আয় তো বেটাকে। শালা কত দিন ঢুকেছে পুলিস লাইনে?

দু'হাতে কাপড়টা চেপে রাখার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা করলো মেয়েটা।

নিজেকে পরাজিত মনে হচ্ছে অবনীমোহনের। ভদ্রলোক হলে কথা ছিল না—একটা সামান্য চাষী মেয়ে। একটা কিছু করা দরকার—খুন চড়ে যাচ্ছে অবনীমোহনের।

বলবি না? এই হাবিলদার ইস্‌কো বাহার লে যাও—সওয়াল করো।

জঙ্গলের মধ্যে স্তব্ধ কঠিন মুখে বসেছিল ওরা। শেষে এক সময় গিয়ে রক্তাক্ত নগ্ন মৃতদেহটা টেনে নিয়ে এলো। অন্ধকারের মধ্যে ত্রস্ত নিঃশব্দে মা আর ছেলেকে পুঁতে রাখল একসঙ্গে। একটু মাটি উঁচু করে রাখল—স্মারক-চিহ্ন।

প্রতিবিধান হবে এয়ার—হবে, হবে,—জানাড়ীর মত কে এক জন সান্ত্বনা দিল।

নিরর্থক একটা বিনিদ্র রাত কাটল অবনীমোহনের।

এই শালা উল্লু। হঠাৎ ক্রুদ্ধ হুংকারে চমকে ওঠে হাবিলদারটা। আপনা কোম্পানী লে'কর তামাম জঙ্গল ঢুড়কে দেখো।

বোকা বোকা মুখ করে বেরিয়ে যায় হাবিলদার। বাইরে ভারী বুটের সার দিয়ে দাঁড়ানোর আওয়াজ পাওয়া যায়—টেন্‌শন্।

তার পর চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে সশস্ত্র দলটা।

একটী নিমন্ত্রণ

মোড় ফিরতে গিয়ে রাস্তাটার হাঁটুটা এখানে ভেঙে গেছে। যেন ভাঙা হাঁটুর সমবেদনায় সামনে থেকে একটা রাস্তা ছুটে এসে থমকে গেছে—মোড়টা তে-মাথা হয়ে গেছে।

রাস্তাটার বাঁকে ত্রিভুজাকৃতি খানিকটা ফাঁকা মাঠ। মাঠের কিনারায় রাস্তা ছুঁয়ে একটা বৃদ্ধ কৃষ্ণচূড়ার গাছ। প্রতি বছর চৈত্র-বৈশাখ মাসে গাছটার মাথায় রক্ত জমাট হয়ে ওঠে। পাড়ার পুজা-পার্বণে মাঠটার ওপর সামিয়ানা ওঠে। তা' ছাড়া বছরের বেশীর ভাগ সময় মটর-মেকানিকদের কারখানার আটচালার কাজে লাগে: ভাঙা মাডগার্ড, ফাটা টায়ার, মরচে-ধরা নাট্-বল্টু, ষ্টিয়ারিং-এর ভাঙা হাণ্ডল, মণ-দরে-কেনা মান্ধাতা আমলের মটরকারের হাড়-পাঁজরা বার-করা খোলস প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জন্তুর বোবা দেহাবশেষের মত। এক পাশে সরিয়ে-রাখা ঐ জগদ্দল মটরখানা পাড়ার ছোট ছেলেদের 'ট্রেনিং কার'—তেল না-খাওয়া, ষ্টার্ট না-নেওয়া গাড়ীটা ছেলেদের দাপাদাপিতে সময় সময় নড়ে ওঠে, জং-ধরা চাকায় ঘূর্ণন-আবর্তন বুঝি বা সুরু হয়। কোন কোন দিন নির্জন খাঁ-খাঁ দুপুর যখন কুকুরের জিভে হাঁফ ফেলে তখন পাড়ার কয়েক জন অসম-সাহসিক অর্বাচীন গাড়ীটাকে পিছন থেকে ঠেলে রাস্তায় নামাতে চেষ্টা করে। কারখানার মালিক-মেকানিক হৈ-হৈ করে ওঠে, তাড়াবার আগেই ছেলেগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। মটর গাড়ীর তেলে রাস্তার ধুলোয় কারখানা-মালিকের গায়ের জামাটা এমন দেখায় যেন তাতে জামাটাই ঘেমে উঠেছে।···

তিন মাথায় তিন রকম নামকরণ, তিন রকমের বাড়ী-ঘর-দোর। মাঠের ওপর সব বাড়ীগুলো সেকেলে দাঁত-ভাঙা চিরুণীর মত। মাঠের ওপারে মোড়ের ডাইনে-বাঁয়ে ফ্ল্যাট ও বাগান-ঘেরা বনেদী অট্টালিকা। ফ্ল্যাট বাড়ীটার মাথায় বাঁশের ডগায় রোদ-বৃষ্টি খাওয়া বিবর্ণ জাতীয় পতাকা। খাড়া বাড়ীটার চাঁদিতে পেলেস্তারার পদ্ম-কোরকের মাঝখানে সন-তারিখের সংখ্যাগুলোয় সবুজ শেওলার ফেণা ধরেছে: সন ১৩৪১, ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা ফ্যাকাশে চোখে জারান মাছের মত ঘরবার করে—ছোট ছোট ঢাকা-বারান্দা থেকে নীচের রাস্তার দিকে যখন চেয়ে থাকে তখন মনে হয়, এই বুঝি লাফিয়ে পড়ে! অপর দিকে বাগান-ঘেরা বাড়ীটার রাস্তার দিকের অংশ কৃষ্ণচূড়ার ডাল-পালার ফাঁকে দেখা যায় ছায়া-ছবির মত—আশ-পাশের স্পর্শ বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ওপর অংশে বাড়ীটার টানা বারান্দা, আবক্ষ রেলিং দেওয়া, দিনের বেশীর ভাগ সময় রেলিং-এর ওপর কাক বসে, রাস্তার দিকে মুখ করে ডানা আর ল্যাজ ফাঁক করে ডাকাডাকি করে। ওপর-নীচে সৌখিন পর্দা-ঢাকা সব কটা জানালা-দরজা নিয়মিত সকাল সন্ধ্যা হাট করে খুলে দেওয়া হয়। মাঠের ওপর একতলা প্রথম বাড়ীটাই হিমাংশুদের। বাড়ীটা রাস্তা-খাওয়া ধুলো-খাওয়া। কবে এক দিন পথচারীর বেহায়া কটাক্ষে সরম পেয়ে এ বাড়ীর জানালায় ছেঁড়া শাড়ীর ঘোমটা উঠেছিল। পাড়ের ফাঁসির মুখে পর্দার গলিত অংশটা আজো হাওয়ায় ওড়ে। জানালাটা বেহায়া চোখে রাস্তার ওপর চেয়ে থাকে।

হিমাংশু যখন-তখন জানালায় এসে দাঁড়ায়। খোপে বন্ধ পারাবতের চোখে হিমাংশু বাগান-ঘেরা বাড়ীটা সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। ঘুম ভাঙলে দেখা যায়, বাড়ীটার ওপর-নীচে সব দরজা-জানালাগুলো কখন খোলা হয়ে গেছে, বারান্দার এক কোণে যেখানে অপরাজিতার দেহবল্লরী তৃণরজ্জু আশ্রয় করে ঘনঘোর হয়ে উঠেছে, সেখানে একটা মেয়ে রেলিং-এ বুক চেপে নীচে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। অরুণোদয়ের প্রথম স্পর্শে বাড়ীটা ঝলমল করছে। চেয়ে থাকতে থাকতে হিমাংশুর কখনো কখনো মনে হয়, মেয়েটার চাহনি বাড়ীটার দরজা-জানালার উদয়-অস্ত চাওয়ার মত নিরর্থক, বোবা! তবু মেয়েটি নিয়মিত বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। তবু হিমাংশু প্রত্যহ সে চাহনির অর্থ খুঁজতে চেষ্টা করে। বিশেষ সময়ে বিশেষ ভঙ্গিতে মেয়েটির রেলিং ধরে দাঁড়ান লক্ষ্য করে আনন্দ-বেদনার সঙ্গে হঠাৎ শো-কেসে সাজান বড় পুতুলের কথা মনে পড়ে—চিত্রার্পিত। নিজের অজান্তে হিমাংশু আকৃষ্ট হয়। যত বার বাড়ীটার দিকে চায় তত বার নিজেকে নানা প্রশ্ন করে হিমাংশু: ও-বাড়ীর মানুষগুলো কেমন? ওরা কি খুব অহঙ্কারী? আশ-পাশের পড়শীদের সম্বন্ধে ওদের ধারণা কি? মেয়েটি কাউকে ভালোবাসে না কি, তাই রোজ এসে বারান্দায় দাঁড়ায় ছবির মত? ও-বাড়ীর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা হয় না কোন দিন?

অপরিচয়ের দুরন্ত উৎসুক কৌতূহলে বেদনা আনে।

* * *

নিজের মনে কোথায় যেন একটু লুকোচুরি আরম্ভ হয়। হিমাংশু যেন একটু সজাগ হয়েই থাকে। অসতর্ক মুহূর্তে মালতী নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়ায় গা ঘেঁসে। হিমাংশু আপত্তি করে না, একটু যেন সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। বাইরের দিকে চেয়ে দু'জনেই চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ। মালতী চেয়ে থাকার এই নিরর্থকতায় অসহ্য বোধ করে। উসখুস করে কথা আরম্ভ করে: ফ্ল্যাট বাড়ীতে লোকে যে কি করে বাস করে কে জানে—কোন রাখ-ঢাক নেই?

হিমাংশু কোন সাড়া-শব্দ করে না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আমরা কিন্তু বেশ আছি—পুরনো হোক, দিব্যি একানে বাড়ী পেয়েছি! মালতী আর দাঁড়াতে পারে না, কোন একটা কাজ মনে পড়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে এসে স্বামীর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলে, এ-পাড়ার ঐ বাড়ীটাই খুব সুন্দর—কি বড় বড় জানালা-দরজা!

মালতীর কণ্ঠস্বরের ঔৎসুক্য চোখ বাড়িয়ে দেবার মত। সত্যিই বাড়ীটা দেখবার মত—অপরাজিতার ঘন ছায়ায় বারান্দার কোণে ও-বাড়ীর মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে। এরা দু'জনেই দেখেছে: গালার ছাঁচে সোনার লেখা—মেয়েটাকে আজ বড় সুন্দর দেখাচ্ছে!

মালতী জিগ্যেস করে, এ-পাড়ার ওরাই বুঝি খুব বড় লোক?

হিমাংশু আলগোছা উত্তর দেয়, মনে তো হয় তাই।

হঠাৎ যেন মালতী আর কোন কথা খুঁজে পায় না। স্বামীর জবাবটা থতমত খাইয়ে দেবার মত। কি মনে করে নিজের

মনেই বলে, মেয়েটার আর কোন কাজকর্ম নেই। খালি দেখ, সেজে-গুজে বেহায়ার মত রাস্তার দিকে চেয়ে আছে—রাত-দিন কি যে দেখে?

হিমাংশু তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মালতী জিগ্যেস করে, আচ্ছা, মেয়েটা কি দেখে বল দিকি?

হঠাৎ হিমাংশুর মনে হয়, মালতী তার সম্বন্ধে ঐ রকম একটা প্রশ্ন করতে পারে না বলেই ও-বাড়ীর সৌখিন, সুন্দরী মেয়েটির দ্রষ্টব্যের কথা জিগ্যেস করছে—বারান্দায় দাঁড়ানর উদ্দেশ্যটা জানতে চাইছে। মালতী কি তাকে সন্দেহ করে? মেয়েটির বারান্দায় দাঁড়ানর সঙ্গে হিমাংশুর জানালায় দাঁড়ানর কোন যোগাযোগ আছে না কি? যদি সন্দেহ করেও, কি সন্দেহ করেছে মালতী?

জানালা থেকে সরে এসে হিমাংশু ঘরের ভিতর চেয়ারে বসে। মালতী কিন্তু জানালায় দাঁড়িয়েই থাকে। দু'জনের কেউ-ই কথা বলে না। ও-বাড়ীর মেয়েটি চিত্রার্পিতের মত ঠায় বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্তে তে-মাথার সমস্ত মুখরতা যেন স্তব্ধ হ'য়ে যায়। একটা ভারি গাড়ী আছাড় খাওয়ার কাৎরানি অনুরণিত হয়ে স্তব্ধতাটাকে ভারি করে রাখে। হঠাৎ মুখ ঘসে দেওয়ার মত আশপাশের বাড়ীগুলো ক্ষত-বিক্ষত, বিবর্ণ দেখায়। মাঠের ওপর জং-ধরা মান্ধাতা আমলের মটর গাড়ীটার ওপর একটা ছেঁড়া ত্রিপল ঢাকা দেওয়া। সাড়ী-ছেড়া পর্দাটা বাতাসের মুখে অযথা দুলতে থাকে।

চুপ করে থাকাটা যেন আরো আপত্তিকর মনে হয়। হঠাৎ নীরব হয়ে মালতী অবোধ্য একটা সন্দেহকে যেন খুঁচিয়ে তুলেছে, নিঃশব্দ বাচনিকতায় একটা কিসের বোঝা-পড়া ক'রতে চাইছে।

নিজের দৃষ্টির ভাবার্থে ও-বাড়ীর মেয়েটির দৃষ্টি-শূন্যতার কি অর্থ করেছে মালতী, স্পষ্ট করে বলুক না। আর মেয়েটি রোজ বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি দেখে তা হিমাংশু কি জানে! হিমাংশু মনে করতে পারে না, মেয়েটি কোন দিন চোখ তুলে এ-বাড়ীর জানালায় চেয়েছে কি না।

জানালায় দাঁড়িয়ে যখন-তখন তুমিই বা কি দেখ? গম্ভীর ভাবে হিমাংশু প্রশ্ন করে।

মালতী জবাব দিতে পারে না। জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বামীর মুখের ওপর চেয়ে থাকে। মরা মাছের চোখের মত দৃষ্টিহীন সে চাহনি। হিমাংশুর মনে হয়, হয়তো কিছু না-ভেবেই মালতী ও-প্রশ্ন করেছিল—মেয়েটিকে নিয়ে স্বামীর সম্বন্ধে ও-বেচারা কোনই সন্দেহ করে না হয়তো! মিছিমিছি হিমাংশুই একটা মানসিকতার সৃষ্টি করেছে। জানালার বাইরে স্বামীর চোখকে আটকে রাখবার উদ্দেশ্য মালতীর হয়তো নয়।

সহজ হয়ে মালতী বলে বসে: অমন বেহায়ার মত দাঁড়িয়ে থাকার কি মানে হয়! পাড়ার ছেলেগুলোর মাথা খাবে কোন্ দিন! বাপ-মা বিয়ে দিলেই পারে।

মালতীর দুশ্চিন্তার কারণ তা হলে পাড়ার হৃদয়সর্বস্ব ছেলে-গুলো! তবু কেন জানি না, হিমাংশুর সন্দেহের নিরসন হয় না! চেয়ার থেকে উঠে এসে মালতীর পাশে দাঁড়িয়ে হিমাংশু দেখলে: ও-বাড়ীর মেয়েটি কখন্ সরে গেছে। তে-মাথা রাস্তার মোড়টা চড়া রদ্দুরে ভাজা-ভাজা হচ্ছে—ধারে-কাছে কোন উৎসুক হৃদয়-সর্বস্ব ছেলে দাঁড়িয়ে নেই! বৃদ্ধ কৃষ্ণচূড়ার তলায় পাগলা বুড়ি ইট-পাতা উঁনুনে খড়কুটো জেলে ধোঁয়ার আবর্ত্ত সৃষ্টি করেছে।···

* * * *

কাচের পাত্রে জল ধরে রাখার মত চাঁদের আলোয় চারি দিক্ টল্-টল্ করছে। সন্ত রঙ-করা বড় বাড়ীটায় মোম গলার মত জ্যোৎস্না ঝরে ঝরে পড়ছে। কৃষ্ণচূড়ার নিষ্কম্প পাতাগুলো ভিজে-ভিজে মনে হয়। তে-মাথা রাস্তায় ছায়াতে-ছবিতে নির্বাক্-বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আছে।

বোধ হয় একটু গুমোটও করেছে আজ। হিমাংশু বিছানা ছেড়ে জানালায় বসে। রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে বাইরেটা—জ্যোৎস্নালোকিত বাড়ীটা কোথায় কবে যেন দেখা কোন মনোরম স্মৃতির অস্পষ্ট রূপ। অপরাজিতায় শাখায়িত দেহলতা ছায়াচ্ছন্ন। হিমাংশুর চোখ দু'টো উৎসুক হয়ে জেগে থাকে—ঘুম-ভাঙা রাতে অভূতপূর্ব সম্ভাবনার কথা মনে হয়। ও-বাড়ীর অপরাজিতার ছায়ান্ধকারে বারান্দার কোণে কোন ছায়ামূর্তি নড়া-চড়া করছে না কি? এই নিস্তব্ধ চন্দ্রালোকে হিমাংশু

প্রভাত দেবসরকার

ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না ? ভিতরটা তো অসহ্য গরম। জেগে উঠে স্বামীকে পাশে না-দেখে মালতী কি কোন সন্দেহ করবে ?

মালতীরও গরম হয়। কখন নিঃশব্দে উঠে এসে স্বামীর পাশে বসে। জিগ্যেস করে, আজ বড্ড গরম হচ্ছে, না ?

জবাব না-দিয়েও গরম লাগাটা বোঝান যায়। হিমাংশু চুপ করে থাকে।

হঠাৎ আশ্চর্য্য হবার মত মালতী বলে, আজ কেমন জ্যোৎস্না হয়েচে দেখ, ঝিরঝিরি দিয়ে পড়চে ! বাইরেটা কি চমৎকার দেখাচ্ছে !

মালতীকে হঠাৎ বড় রসিকা বলে মনে হয়। মালতীর মুখে আজ নতুন কথা শুনছে যেন। চাঁদের আলোয় মেয়েমানুষের মাথা বড় একটা খারাপ হয় না, হিমাংশু জানে। ভেবে পায় না মালতীর কথায় কি জবাব দেবে—জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মনে মনে একটু যেন বিরক্তও হয়। কিছু না বলে উঠে এসে বিছানায় শোবার চেষ্টা করে।

বাইরের দিকে চেয়ে জানালার কপাটে ঠেস দিয়ে মালতী দাঁড়িয়ে থাকে। স্বামীর জ্যোৎস্না ভাল না-লাগার কারণটা বুঝতে পারে না।

বাইরে চাঁদের আলো ঠায় নষ্ট হতে থাকে, রাস্তার হাইড্রান্টের মুখে ঝাঁঝরি বেয়ে চাপা কলের ঘোলা জল একটানা সুর করে পড়ে। বাতিদানে বাতি পুড়ে যাওয়ার মত প্রহর শেষ হয়ে যায়।

হঠাৎ মালতী হৈ-হৈ করে ওঠে: শীগ্‌গির এদিকে এস—দেখে যাও, এস এস !

উত্তেজনায় মালতীর কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে। বাইরে যা ঘটছে তা যেন ওর বহু দিনের প্রতীক্ষিত আকাঙ্ক্ষিত। মালতী ডাকের ওপর ডাক দেয়: এস, এস লক্ষ্মীটি, শীগ্‌গির !

ডাকের তাড়ায় হিমাংশুকে বিছানা ছেড়ে উঠে আসতে হয়। জানালায় দাঁড়িয়ে হিমাংশুর মনে হ'লো, হঠাৎ চাঁদের আলো নিবে গেল না কি ? আশে-পাশে যত বাড়ী ছিল সব বাড়ী থেকে আলো ঠিকরে এসে রাস্তার মোড়টাকে ভ্রূকুটি করছে, দিনের বেলার মত রাস্তাটার হাড়-পাঁজরা দেখা যাচ্ছে। বড় বাড়ীর সমস্ত ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। বুড়ো কৃষ্ণচূড়ার মাথার ওপর বায়স দম্পতী জেগে উঠে একক কলরব সুরু করেছে। বোধ হয় একটা চুরির চেষ্টা হয়েছিল। চেষ্টাটা আপাততঃ ব্যর্থ হয়েছে বলেই মনে হয়: বড় বাড়ীর তলায় পাড়ার বহু লোক জড় হয়ে হৈ-হৈ করছে, সমবেত কণ্ঠস্বরে বিজলী আলোর প্রখরতায় বড় বাড়ীর রহস্য যেন ফাঁস হয়ে গেছে—বড় ম্যাড়মেড়ে দেখাচ্ছে এখন বাড়ীটা।

মালতীর মুখে-চোখে একটা খুশী-খুশী ভাব। হিমাংশুর মুখের দিকে চেয়ে বললে, কি গো, বুঝতে পারলে না কিছু ?

হিমাংশু কিছু একটা বোঝবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেটা কি বলবার আগেই মালতী বলে, চেয়ে দেখ, অপরাজিতার ঐখানে চোখ দাও। এবার বুঝতে পারলে ? ভাল করে দেখ !

বোঝবার মধ্যে একটা ভূরে সাড়ী মোটা দড়ির মত বাড়ীটার রেলিং থেকে নীচে রাস্তায় নেমে এসেছে, দেখা যায়। মনে হয়, সাড়ীটা পাকিয়ে ফেলে চোরকে ওপরে ওঠাবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু উপস্থিত চোর কোথায়, চোরাই মালই বা কই ? আর পালান চোরকে নিয়ে রাত দুপুরে এত হৈ-চৈ করে লাভই বা কি ?

হিমাংশু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে হয়তো।

মালতী মুখ টিপে বলে, মেয়েটাই পাজি ! মা গো মা, বাপের জন্মে কখনো শুনিনি এমন কথা, সাড়ী ফেলে কেউ ভাব করে !

মালতী হেসে সব কথা স্পষ্ট বলতে পারে না—পেটে-মুখে মানুষটা কেমন যেন করতে থাকে। আর তাও যা বলে হিমাংশুর বিশ্বাস হয় না। পাড়ার ছেলে অনাদি এমন দুঃসাহসের কাজ করবে ? সত্যিই কি সে সাড়ী-পাকান ধরে মেয়েটার ঘরে উঠতে চেষ্টা করেছিল ? এইটুকু সময়ের মধ্যে মালতীই বা এত কথা জানল কি করে ? ব্যাপারটা বড় মামুলী মনে হয় হিমাংশুর।

তখনো মালতী বলছে, ঐ যে গো লক্কা-মার্কা ছেলেটা, অনাদি ! মা গো মা, পাড়ার মধ্যে একটা কেলেঙ্কারী ! চলাঢলির একটা সীমা আছে, দিন-রাত বারান্দায় দাঁড়ানর ফল !

সাড়ীর দড়ির কথা বলে আর মালতী হেসে ডুকরে ওঠে। হিমাংশু ভেবে পায় না এ ব্যাপারে মালতীর এত আগ্রহ কেন, এত খুশীই বা সে হয় কি করে। চোর ধরা পড়ার ব্যাপারটা মালতীর আগাগোড়া মন-গড়া হতে পারে তো।

ধক্ করে হিমাংশুর মনে হয়, স্বামীকে নিয়ে একটা নিদারুণ দুর্ভাবনার হাত থেকে বেঁচে গেছে বলেই মালতী আজ এতো আনন্দ করছে। ঐ অনাদির মত সে কি একটা দুঃসাহসের কাজ করতে পারে না কোন দিন ? মালতী কি হিমাংশুকে ধরতে পেরেছে ?

* * * *

মালতীর কথাই ঠিক। অনাদির কাজটা সত্যিই নিন্দনীয়। ক'দিন ধরে এই ব্যাপারের ছি-ছিটা রসিয়ে রসিয়ে পাড়ায় হতে থাকে। বড় বাড়ীর গাম্ভীর্য্য এরা ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। অনাদি পূর্ব্বের মতই চলাফেরা করে—পাড়ার ইতর-ভদ্রও যেন তাকে নিঃশব্দে বাহাদুর বলে সমর্থন করছে।

জানালায় দাঁড়ালে মেয়েটিকে আর দেখা যায় না। বড় বাড়ীর উপর-নীচে নিয়মিত দরজা-জানালা হাট করে খুলে দেওয়া হয়। কখনো কখনো কৃষ্ণচূড়া গাছের বায়স-দম্পতী উড়ে এসে বারান্দার রেলিংএর ওপর বসে ল্যাজ কাঁক করে অযথা হাঁক-ডাক সুরু করে। কখনো বা বায়সটা চোখ দু'টো আধ-বোজা করে ঘাড় কাৎ করে থাকে—পাশে গা-ঘেঁসে বসা বায়সী ঠোঁট দিয়ে মাথার পোকা বেছে সুড়সুড়ি দেয়। আরামে বায়সের চোখের সাদা পর্দ্দাটা নেমে আসে।

জানালার বাইরে হিমাংশুর দৃষ্টিটা সোজা অনেক দূরে গিয়ে ঝাপসা হয়ে আসে: একটা তিন-চারতলা বাড়ীতে বাঁশের মাচায় অস্পষ্ট ক'টা ছায়া-মূর্ত্তি ওঠা-নামা করছে—বাড়ীটায় বোধ হয় রঙ করা হচ্ছে।...

মালতী আজ পরিপাটি করে সেজেছে। বেশ-বাসে বয়েস কমানর ইচ্ছেটাই বাচনিক হয়ে উঠেছে। না, দরকার মত মালতী সাজতে জানে। হিমাংশুর খেয়াল, হয়: আজ তাদের নিমন্ত্রণ। লক্কা-মার্কা অনাদির সঙ্গে বড় বাড়ীর সৌখিন মেয়েটির বিয়ে। পাড়ার

সকলেরই নিমন্ত্রণ হয়েছে ! বড় বাড়ীর কর্ত্তা নিজে এসে প্রত্যেককে বলে গেছেন, সামাজিকতা করেছেন । কারো কোন ক্ষোভ থাকবার আর কথা নয় ।

একটু আগে থাকতে প্রস্তুত হয়ে মালতী এসে তাড়া দিলে : কই, এখনো তুমি ওঠোনি ? নাও ওঠ—ওঠ, শীগ্‌গির নাও ! .

হিমাংশু ওঠবার কোন গা করলে না । কেন উঠবে যেন বুঝতে পারছে না ।

ঘুমন্ত মানুষকে ঠেলে জাগানর মত করে মালতী ফের তাড়া দিলে, এখনো উঠলে না ? কি, তুমি নেমন্তন্ন যাবে না ? কি গো !

হিমাংশুর জানালার বাইরে মোড়ের মাথায় বড় বাড়ীটার আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁশের মাচা বাঁধা—ত্রিপলে সামিয়ানায় বাড়ীটা একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে ।

বাইরে চোখ রেখে হিমাংশু বললে, না, বড়লোকের বাড়ী সবাই মিলে যাওয়াটা ভাল দেখায় না । তুমিই যাও !

এ কথায় আর মালতী কি উত্তর দেবে ? বড় বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় স্বামীর আজকের ব্যবহারটা । আজ ও-বাড়ী নেমন্তন্ন না গিয়ে কি যে মান বাড়বে, মালতী বুঝতে পারে না । কিছুক্ষণ সেজে-গুজে ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে থেকে মালতী বেরিয়ে যায় ।

বিয়ে-বাড়ীর সানাই-এর পোঁ-টা শুধু শোনা যাচ্ছে একঘেয়ে একটানা । রাস্তার দিকে বারান্দার রেলিং-এ অনেকগুলো লাল-নীল ইলেক্‌ট্রিক আলো লাগান হয়েছে—সন্ধ্যের সময় জ্বালা হবে, রাতের অন্ধকারে বাড়ীটাকে চোখের ওপর তুলে ধরবার জন্যে দু'পাশ থেকে দু'টো বড় সার্চ লাইটও বসান আছে—বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরখ ক'রতে একবার আলো দু'টো জ্বালা হয়েছিল, এখনো নেবান হয়নি—দিনের আলোয় মিট্‌-মিট্‌ করছে ।

হিমাংশুর চোখ পড়ল : বারান্দার কোণে অপরাজিতার লতাগুল্মের ঝাড়টাকে টেনে-ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে ! বাঁশের ভারা বাঁধবার সুবিধের জন্যে বোধ হয় !

☆

বরষা-মঙ্গল

নির্ম্মলাবালা দেবী

আতপ-তাপে তাপিত ধরা,
চাতক-মুখে বেদনা ভরা
তৃষিত-কাতর আবেদন !—
এস হে রাজ ! নীরদ-রথে
আসুক নেমে বিমান-পথে
জীবন-ভরণ-বরষণ !

পূরব বায়ু করুণা ঝরা
শ্যামল স্নেহে এসেছে ত্বরা
পুলকি ধরণী হরষণে ।
তোরণ নভে বিজুরী জ্বালা,
দোদুল দুলে বলাকা-মালা ;
মাদল-মন্দ্র গরজনে ।

কানন সভা সবুজ ঢালা,
নাচিছে লতা, ময়ূর-মালা ;
উৎসব আজি নীপবনে ।
শণের বনে কনক দুলে,
মুরছে মায়া তিলের ফুলে ;
অশোক আকুল গুঞ্জরণে ।

নিলাজ নদী বাঁধন-হারা
তোমারে চাহি পাগল-পারা
কি গান গাহে যে আনমনে !
দাদুরী গায় বিজয় গান,
কৃষাণ-বধূ সজল প্রাণ,
করুণ নয়নে দিন গ'ণে ।

এস হে এস বরষা-রাজ
পিনাক তুলি হানিয়া বাজ
দানব-দুখেরে কর তল !
অশনহীন, বসন-হারা,
শোষণ-দীন, পীড়ন-সারা ;
শরণ মাগিয়া কৃষীকুল !

জন্মদিন

শ্রীঅমলা দেবী

রাত্রি প্রায় ন'টা। গাঙ্গুলী মশায়ের বৈঠকখানায় পরামর্শ-সভা বসিয়াছে। একটা চৌকীর উপরে ধূলি-ধূসর শতরঞ্চি পাতা। তাহার উপরে দেওয়াল ঘেঁসিয়া বসিয়া আছেন গাঙ্গুলী মশায়; একটু দূরে তাঁহার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে—স্কুলের হেড-পণ্ডিত মহেশ ভট্‌চায, আর, স্কুলের মাষ্টার বিনয় বাঁড়ুজ্জে। সকলেই হেঁটমুখে চিন্তামগ্ন। চিন্তার গভীর বলীরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে সকলের কপালে। জ্যৈষ্ঠ মাস। ঘরের ভিতরে গুমোট গরম। হাতের কাছেই তিনটা হাত-পাখা রহিয়াছে। কিন্তু সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। অজস্র ঘামিতে ঘামিতে তাঁহারা একটি জটিল সমস্যার সমাধান সন্ধানে নিবিষ্ট। একটু দূরে, স্কুলের হেড-মাষ্টার মশায় হাত-পাখার বাতাস খাইতে খাইতে খবরের কাগজ পড়িতেছেন।

চিন্তার বিষয় আগামী ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেক্‌শান। প্রতিপক্ষ রাধানাথ এখন হইতেই তোড়-জোড় সুরু করিয়া দিয়াছে। অবশ্য 'তোড়-জোড়'এর অভাব কোন দিন তার থাকে নাই। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সুবিধা করিতে পারে নাই। সদাশয় ইংরাজদের রাজত্বে হাকিমরা ছিলেন দয়ার অবতার। রীতিমত তোয়াজ করিতে পারিলে, যথা-মাত্রা রাজানুগত্য দেখাইতে পারিলে, তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভ করা দুঃসাধ্য ছিল না। তা'ছাড়া তাঁহারা নিমকহারামী করিতেন না। পুকুরের মাছ, বাগানের কলার কাঁদি, খাটি ঘৃত-ভাণ্ড, যেমন বিমল হাস্য-বিকসিত মুখে গ্রহণ করিতেন, তেমনি সুপ্রসন্ন চিত্তে, দরাজ হাতে অনুগ্রহ দান করিতেন। বিশ্বাসভাজন লোকদের উপরে তাঁহাদের নেক-নজরের কোন দিন বৈলক্ষণ্য ঘটিত না। আজকাল আবহাওয়া অন্যরূপ। কংগ্রেসী লোকেদের হাতে আসিয়াছে রাজ্য-শাসনের ভার। এই লোকগুলা মোটেই সুবিধার নয়। যেমন মোটা ক্যাটকেটে খদ্দর ইহাদের পরনে, তেমনই ক্যাটকেটে ইহাদের কথাবার্ত্তা ও আচরণ। যা' বলে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে, বিন্দুমাত্র খাতির করিয়া বলে না। জেল খাটিয়া খাটিয়া ইহাদের মেজাজ এমন কড়া হইয়া উঠিয়াছে, বিন্দুমাত্র ত্রুটি পাইলে কাহাকেও জেলে পাঠাইতে ইহাদের বাধে না। তা'ছাড়া, ইংরাজ-রাজত্বে ভক্তিমান প্রজা বলিয়া যাহাদের সুনাম ছিল, তাহাদের ইহারা রীতিমত সন্দেহের চক্ষে দেখে। ইহারা বুঝে না—যে কুকুর একবার পোষ মানিয়াছে, সে বরাবরই পোষ মানিবে—প্রভু যেই হোক। এই বিচারবুদ্ধিহীন, হিতাহিত-বোধশূন্য, মাথা-ফোলা লোকগুলার আওতায় পড়িয়া কাঁচা হাকিমদের তো কথাই নাই, পাকা হাকিমরাও হকচকিয়া গিয়াছেন।

কথায়-বার্ত্তায়, চাল-চলনে, কাজে-কর্ম্মে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহারা। তা'ছাড়া খদ্দর-ভীতি ভয়ঙ্কর। রামা-শ্যামা খদ্দর পরিয়া সামনে দাঁড়াইয়া কথার উপর কথা দিলেও টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করেন না। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, ইঁহারা শাক্ত-মত ছাড়িয়া দিয়া রাতারাতি বৈষ্ণব হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহাদের কাছে পুরাতন আমলের লোকদের কোন সুবিধা হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

গাঙ্গুলী মশায় আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। হঠাৎ একটু আশার আলো দেখিতে পাইয়াছেন। আজ সকালে এস-ডি-ও সাহেব আসিয়াছিলেন। এ জেলায় ছিলেন আগে। গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও ছিল যথেষ্ট। এবারে আসিয়া যেন চিনিতেই পারিলেন না। অথচ রাধানাথের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিলেন যেন কত দিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। রাধানাথের মত ভণ্ড, কূট-কৌশলী লোক তো দুনিয়ায় বেশী নাই। কংগ্রেসী আমল হওয়া অবধি খদ্দর পরা সুরু করিয়াছে—খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবী, মায় টুপী পর্য্যন্ত। খদ্দর যেন গায়ের চামড়া করিয়া তুলিয়াছে হতভাগা। যেন আজন্ম পরিয়া আসিয়াছে এমনই ভাব। তা'ছাড়া সুবিধা হইয়াছে তাহার। তার এক মামাতো ভাই কংগ্রেসের লোক। বার-দুই জেলে গিয়াছিল। সেই এখন জেলার এক জন মাতব্বর ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া হাকিমরা না কি কোন কাজ করেন না। ইহাকেই মুরুব্বি ধরিয়া রাধানাথ ইলেক্‌শান কাটাইয়া উঠিবে ভাবিয়াছে। এই লোকটি হাকিমের সঙ্গে আসিয়াছিল। রাধানাথ তো তার গা ঘেঁসিয়া চলিতে লাগিল। তিনি তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া পিছনে রহিলেন। হাকিম কংগ্রেসী লোকটির সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। রাধানাথও তাহাতে ফোড়ন দিতে লাগিল। অথচ হাকিম মহাশয় একবার পিছন ফিরিয়া তাঁহার দিকে তাকাইলেন না পর্য্যন্ত। ইউনিয়ন বোর্ডের আফিসে আসিয়া তিনি খাতা-পত্র পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রয়োজনে

একটি কথাও বলিলেন না। অথচ রাধানাথের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা পর্য্যন্ত করিলেন। মনটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল তাঁহার। সাহেবের সম্বন্ধে অত্যন্ত হীন ধারণা হইয়াছিল। এত মাছ, ঘি, কলা ও সরু চাল খাওয়াইয়াও, মাত্র খদ্দর না পরার অপরাধে, যে লোক এক জনকে এমন করিয়া ভুলিয়া যাইতে পারে, সে হাকিম হইলেও ভাল লোক নয়। কিন্তু পরে ভুল ভাঙ্গিল গাঙ্গুলী মশায়ের। রাধানাথ তাহার আত্মীয়কে বাড়ীতে লইয়া গেল। লোকটি আফিস হইতে বাহিরে পা দিবা মাত্র সাহেবের ভাবান্তর ঘটিল, ঠিক সেই আগের দিনের ভাব। হাত-পা ছড়াইয়া বসিয়া এক গাল হাসিয়া কহিলেন—তার পর গাঙ্গুলী মশায়, কি খবর আপনার? গাঙ্গুলী মশায় অনুযোগের স্বরে কহিলেন—চিনতেই পারলেন না, সার! সাহেব বলিয়াছিলেন—খুব চিনেছি, মশায়! আপনাকে চিনব না! আপনার বাগানের কানাই-বাঁশী কলা, পুকুরের রুই মাছ, আর চাষের রামশাল চাল কি সহজে ভোলা যায়? তবে কি জানেন—দিন-কাল বড় খারাপ। ঐ লোকগুলো টিকটিকির মত পিছনে পিছনে ঘুরছে; একটু কিছু ইতর-বিশেষ দেখলেই জানিয়ে দেবে উপরে। তখন চাকরী নিয়ে হয়তো টানাটানি করতে করতে প্রাণান্ত হতে হবে—সক্ষোভে বলিয়াছিলেন—সরকারী চাকরী আর পোষাচ্ছে না মশায়! আর দু' বছর মাত্র আছে। কোন রকমে কাটিয়ে দিয়ে ভালয়-ভালয় পেন্সনটি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচি।

গাঙ্গুলী মশায় ইলেকশানের কথাটা পাড়িলেন। সাহেব কহিলেন—খদ্দর পরেছেন কই?

গাঙ্গুলী মশায় সবিনয়ে কহিলেন—সব কেনা আছে সার। ভারী গরম বলে পরতে পারিনি। সর্ব্বাঙ্গে ঘামাচি হয়েছে কি না। তবে একটু শীত পড়লেই পরব।

সাহেব হাসিয়া কহিলেন—তাই পরবেন। ইলেকশানের কিছু দিন আগে থাকতে পরলেই চলবে। কিন্তু—আপনার মুরুব্বি কই? দেখলেন তো, কি রকম জবর মুরুব্বি। আপনার আছে কেউ তেমন? ওর চেয়েও একটু বেশী জবর হলেই ভাল হয়।

গাঙ্গুলী মশায় সবিনয়ে নিবেদন করিলেন—আজ্ঞে, আছে হুজুর! তবে এখানে থাকে না, কলকাতায় থাকে।

সোৎসাহে সাহেব কহিলেন—কে বলুন তো?

গাঙ্গুলী মশায় নাম করতেই সাহেব একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন—আরে! শ্যামলাল বাবু আপনার আত্মীয়! বলেন কি? তিনি তো মস্ত লোক। মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঠা-বসা তাঁর। দু'-দিন পরে হয়তো মন্ত্রী হয়ে যেতে পারেন। শ্যামলাল বাবু যদি আপনার জন্যে চেষ্টা করেন তো কিছু ভাবনা নাই আপনার।

এস, ডি, ও সাহেবের মুখে এ রকম আশার কথা শুনিয়া গাঙ্গুলী মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। হাস্য-বিকশিত মুখে কহিলেন—তাকে কি আসতে লিখব, হুজুর?

সাহেব কহিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—দেখুন, এক কাজ করুন। শ্যামলাল বাবু আসুন। আপনি কোন একটা উপলক্ষ করে আমাদের জন কয়েককে এখানে ডাকুন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকেও। তিনি লোক ভাল। আমি বলে-কয়ে তাঁকে নিয়ে আসতে পারব। আপনি কিন্তু বেশ ভাল করে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি দেখে যান শ্যামলাল বাবু আপনার আত্মীয়, তাহলে আসছে ইলেকশানে বোর্ডের প্রেসিডেন্টশিপ আপনার কেউ ঠেকাতে পারবেন না।

এখন চিন্তা হইতেছে উপলক্ষ লইয়া। সকলে সেই চিন্তায় একেবারে সমাধিস্থ হইয়া গিয়াছেন।

মহেশ ভট্টচায সহসা চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া সশব্দে এক টিপ নস্য লইল। গাঙ্গুলী মশায় ও বিনয় মাষ্টার সচেতন হইয়া উঠিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল। ভট্টচায কোঁচার খুঁটে নাক মুছিয়া কহিল—পুষ্যিপুত্তুর নেন—বেশ ধুমধাম করে—

মহেশের অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে। একটিকে কোন মতে গাঙ্গুলীর ঘাড়ে চাপাইতে পারিলে তার ভার কিঞ্চিৎ লঘু হয়।

বিনয় মাষ্টার কহিল—যেমন টোলো বুদ্ধি!

ভট্টচায বিনয়ের দিকে জ্বলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল—বুদ্ধিটা খারাপ নয়, যাদের ঘটে বুদ্ধি আছে তারা ঠিক বুঝবে। যদি, গাঙ্গুলী মশায়ের বয়স তো কম হয়নি। এখন থেকে ব্যবস্থা করার তো দরকার।

সমস্বরে প্রশ্ন হইল—কিসের ব্যবস্থা?

—সম্পত্তির। এত বড় সম্পত্তি—সব তো বেহাত হয়ে যাবে। পাঁচ জামাই মিলে লাঠালাঠি করে, মামলা-মোকদ্দমা করে সব তছনছ করে দেবে। একটি নিজস্ব ছেলে থাকলে কেউ আর দাঁত ফোটাতে পারবে না।

বিনয় কহিল—তাহলে পুষ্যিপুত্তুর নেওয়া কেন? বিয়ে করাই ভাল।

বিনয়ের বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে। পার্টিশানের হিড়িকে তিনটি অবিবাহিতা, অভিভাবকহীনা, শ্যালিকা সম্প্রতি তাহার স্কন্ধে ভর করিয়াছে। তাহাদের একটিকে কোন মতে গাঙ্গুলীর স্কন্ধে চাপাইতে পারিলে তাহারও ভারের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়।

পণ্ডিত কহিল—বুদ্ধিটি বেশ! বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা! জ্বরের রোগীর আমড়া খাওয়ার ব্যবস্থা! দু'দিনে সাবাড় হয়ে যাবেন যে! তা ছাড়া তেমন পাত্রীই বা কোথায়?

বিনয় কহিল—পুষ্যিপুত্তুর নিলেই যে সে পোষ মানবে তার মানে কি? তা ছাড়া তেমন ছেলেই বা কোথায়?

পণ্ডিত কহিল—ছেলে পাওয়া শক্ত হবে না। সদ্বংশের ছেলে, নেহাৎ কচি—

বিনয় কহিল—পাত্রী পাওয়াও শক্ত হবে না। সদ্বংশের, বেশ ডাগর-ডোগর, মানান-সই—

গাঙ্গুলী মশায় ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া ইহাদের বাগ্-বিতণ্ডা শুনিতেছিলেন। বিনয়ের প্রস্তাবটি তাঁহার বেশ মনে লাগিতেছিল। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করা একেবারে অসম্ভব। কারণ, গৃহিণী তাঁহার এখনও বাঁচিয়া আছেন এবং তাঁহার মত বুদ্ধি-বিবেচনাহীন, বদ্‌মেজাজী মেয়েমানুষ সংসারে বেশী নাই। তা ছাড়া ঐ যে লোকটি নিশ্চিন্ত ও নিবিষ্ট মনে খবরের কাগজ পড়িতেছে, ও গৃহিণীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। ওর মারফত কথাটা যদি কোন মতে গৃহিণীর কাণে পৌঁছে, তাহা হইলে তিনি নিজে নাজেহাল হইবেনই। তা'ছাড়া সব ব্যাপারটা হয়তো পণ্ড হইয়া যাইবে। গাঙ্গুলী মশায় আড় চোখে মাষ্টারের মুখের চেহারাটা একবার দেখিয়া লইলেন।

মুখ [illegible] হাসিতেছে না কি! শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিলেন—কি সব বাজে তর্ক করছ তোমরা? ও সব ছেড়ে দাও। হেড-মাষ্টারকে কহিলেন—কি হে নাতি, তুমি একটা কিছু বল—

হেড-মাষ্টার খবরের কাগজটা সরাইয়া রাখিয়া কহিলেন—আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা করে রেখেছি।

গাঙ্গুলী মশাই সাগ্রহে কহিলেন—কি বল দেখি?

মাষ্টার কহিলেন—আজকাল দেশের যাঁরা গুণী ও জ্ঞানী, দেশ ও দশের উপকারে যাঁরা যত্নবান, তাঁদের 'জন্মতিথি' উৎসব করে সকলে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানায়। আপনি তো অনেক দিন ধরে গ্রামের অনেক উপকার করেছেন, স্কুল, লাইব্রেরী, রাস্তা-ঘাটের সংস্কার, সব বিষয়েই আমরা আপনার সাহায্য সব সময়ে পেয়েছি। কাজেই আমাদেরও আপনাকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। আমার ইচ্ছা, আমরা সবাই মিলে আপনার 'জন্মতিথি' উৎসব করব। এতে দু'কাজই হবে। আপনার প্রতি আমাদের সম্মান দেখানো হবে; হাকিমরাও আপনার কাজের পরিচয় পাবেন এবং আমরা সারা গ্রামের লোক আপনাকে কতটা শ্রদ্ধা করি, তা বুঝতে পারবেন। এতে আপনার কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে সুবিধা হবে।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—কথাটা মন্দ নয় ভায়া? তবে গাঁয়ের লোক রাজী হবে কি? জানো তো সবাইকার মনের ভাব! আর বছর দেখো হারামজাদা বাগ্‌দীদের নাচিয়ে কি কাণ্ডটাই করালে।

এ গ্রামে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে বাগ্‌দীরা মনসা পূজা করে। বিসর্জ্জনের দিন তাহারা সং বাহির করে। নানা রকমের সাজ-সজ্জা করিয়া তাহারা ভদ্রলোকদের পাড়ায় যায়, ঘরে ঘরে নাচ দেখাইয়া, গান শুনাইয়া পয়সা আদায় করে, সেই পয়সায় মদ খায়। অশিক্ষিত লোকদের সহজ নিরাবিল আনন্দ। কাহারও নিন্দা থাকে না, কুৎসা থাকে না। বর্ত্তমান জীবনযাত্রাপ্রণালীর বৈচিত্র্য ও জটিলতা তাহাদের মনে যে প্রতিচ্ছায়া ফেলে, তাহাই সহজ ভাবে তাহারা নাচে-গানে প্রকাশ করে। কিন্তু গত বৎসর ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। গত বৎসর গাঙ্গুলী মশায় পুষ্করিণী-সংস্কার বিভাগ হইতে টাকা আদায় করিয়া গ্রামের দুইটি পুষ্করিণীর সংস্কার করিয়াছিলেন।

দুই-চারি জন ছোট-খাটো অংশীদার বাদ দিলে পুষ্করিণী দুইটি এক রকম তাহারই। তা' ছাড়া অনেকের অর্থাৎ রাধানাথের দলের লোকদের বিশ্বাস ইহাতে তিনি মোটা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাই ইঙ্গিত করিয়া গত বৎসর সং বাহির হইয়াছিল। ঘটনা উপযোগী গানও কে রচনা করিয়া দিয়াছিল। পরে প্রকাশ পাইয়াছিল যে ইহা রাধানাথেরই কীর্ত্তি।

সকলে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—সত্যি।

পণ্ডিত কহিল—তার চেয়ে পোষ্যপুত্র নেওয়াই ভাল, এতে ঝগড়া দেওয়া চলবে না।

বিনয় কহিল—বিয়েই যুক্তিযুক্ত—এমন যায়গায় পাত্রী যে সেখানেও ঝগড়া দেওয়া চলবে না।

গাঙ্গুলী মশায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন—ভারী ফ্যাসাদে লোক তোমরা! একটা বিপদ না বাধিয়ে ছাড়বে না দেখছি! বলছি, ও-সব কথা বাদ দাও। হেড-মাষ্টারকে কহিলেন—ভায়া, তুমি যে কিছু বলছ না?

মাষ্টার কহিল—গত বৎসর বাগ্‌দীদের রাধানাথ হাত করেছিল। ওদের মনসা-মেলা সারিয়ে দিয়েছিল, ছাইয়ে দিয়েছিল। তাই বাগ্‌দীরা ওর কথা মত কাজ করেছিল। তবে ওদের হাত করা শক্ত হবে না। ওদের ভারী ইচ্ছে মনসা-মেলার মেজেটি সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো। আমার কাছে এসেছিল ক'দিনই আপনাকে বলবার জন্যে।

গাঙ্গুলী মশায় তীক্ষ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—আমার কাছে কেন, রেধোর কাছে যাক্।

হেড-মাষ্টার কহিল—তা তো যাবেই—আপনি যদি কিছু না করেন। তবে আমার মনে হয়, ওদের জন্য কিছু খরচ করা ভাল।

গাঙ্গুলী মশায় শুষ্ক স্বরে কহিলেন—কত খরচ?

মাষ্টার কহিল—কত আর খরচ? বস্তা দুই সিমেণ্ট হলেই হয়ে যাবে। সব শুদ্ধ পঞ্চাশ টাকার বেশী খরচ হবে না।

গাঙ্গুলী মশায় চুপ করিয়া রহিলেন।

হেড-মাষ্টার কহিল—গাঁয়ের ছোকরাদেরও হাত করতে হবে। তাও শক্ত হবে না। লাইব্রেরীর জন্যে শ'খানেক টাকার বই কিনে দিলেই ওরা আপনার জন্যে যা বলবেন করবে।

গাঙ্গুলী মশায় করুণ কণ্ঠে কহিলেন—তুমি যে প্রায় দু'শো টাকার ধাক্কায় ফেললে ভায়া! তার উপর খাওয়ানো-দাওয়ানোর খরচ!

মাষ্টার কহিলেন—কিন্তু ফলটি বিবেচনা করুন। বাগ্‌দীদের কীর্ত্তনের দলটি যখন প্রশেসান করে আপনার গুণ-কীর্ত্তন করতে করতে সভাতে আপনাকে নিয়ে যাবে, তখন কি রকম একটা 'এফেক্ট' হবে বলুন দেখি? হাকিমরা বুঝবে, শুধু ভদ্রলোকদের উপরেই নয়, দুর্গত জনদের উপরেও আপনার কতটা প্রভাব। আজকাল দেশের শাসনকর্ত্তাদের দুর্গত জনদের উপরে ভারী দরদ। তারা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে এমন লোক চান, যারা তাদের উপর দরদী।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—ছোকরাগুলো কি করবে?

—তারাই তো সব করবে। সভা সাজাবে, গান করবে, তরুণদের পক্ষ থেকে মানপত্র দেবে, হামেশা আপনার জয়ধ্বনি করবে, তা' ছাড়া আসল কাজ—প্রতিপক্ষদের দাবিয়ে রাখবে। ওরা দলে থাকলে রাধানাথের দল টঁ্যা-ফোঁ করতে পারবে না।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—সত্যি? যা বলেছ—

হেড-মাষ্টার কহিলেন—স্কুলের পক্ষ থেকে মানপত্র দেব আমি; গ্রামের পক্ষ থেকে দেবেন পণ্ডিত মশায়; ইউনিয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে মানপত্র দেবার ব্যবস্থা করতে হবে; তবে তা শক্ত হবে না, ইউনিয়ন বোর্ডে যখন আমাদের দল ভারী।

গাঙ্গুলী মশায় চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

পণ্ডিত কহিল—জন্মদিন করা আজকালকার ফ্যাসান বটে—তবে পাড়াগাঁয়ে ও-সব মানায় না।

হেড-মাষ্টার কহিলেন—মানাবে না কেন? পাড়াগাঁয়ে যদি মানুষের মত মানুষ জন্মাতে পারে তো তার জন্মদিনও হতে পারে।

বিনয় মাষ্টার সমর্থন করিয়া কহিল—সত্যি। বানিয়ে বানিয়ে নাটক-নাটিকা লিখে যারা নাম করেছে [illegible] মধ্যে গাঙ্গুলী মশায়ের

মত মানুষ ক'জন আছে? যদি তাদের 'জন্মদিন' হতে পারে, গাঙ্গুলী মশায়ের একশ' বার পারে। হোক জন্মদিন, আমি অন্ততঃ এর সাফল্যের জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা করব। গ্রামের নারীদের পক্ষ থেকে মানপত্র দেবার ব্যবস্থা করব। তারা ওঁকে উলুধ্বনি করে, মাল্য-চন্দন দিয়ে বরণ করবে।

পণ্ডিত মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—মাল্যদানটা করবে কে?

বিনয় কহিল—কেন আমার বড় শালী। রীতিমত স্কুলে-পড়া মেয়ে; সহরে থাকত, এ সব ব্যাপারে ওস্তাদ; মানপত্রও ও পড়বে।

পণ্ডিত কহিল—ও ধাড়ী মেয়েকে দিয়ে মালা পরানো ভাল নয়। লোকে ছিঃ ছিঃ করবে। তার চেয়ে একটি ছোট ফুটফুটে সুন্দর ছেলেকে দিয়ে পরানোটাই ভাল হবে। আমার ছোট ছেলেটা দেখতে-শুনতে বেশ; তেমনই চটপটে—ওই পারবে।

হেড-মাষ্টার কহিলেন—ও-সব বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে পরে। এখন কথা হচ্ছে, জন্মদিন উৎসবটির আয়োজন সুরু করতে হবে কাল থেকেই। বেশী দেরি করা চলবে না। এদিকের সব ব্যবস্থা, সহরে গিয়ে হাকিমদের নিমন্ত্রণ করা, মানপত্র লেখা ও ছাপানো, আরও অন্যান্য ব্যবস্থা—আমাদের মধ্যে ভাগাভাগি করে ফেলতে হবে। কিন্তু হৈ-চৈ চলবে না—কারও কাছে কোন কথা ফাঁস করা চলবে না। যেন রাধানাথের দল কোন কথা আগে থাকতে জানতে না পারে—বলিয়া হেড-মাষ্টার বিশেষ করিয়া পণ্ডিতের দিকে তাকাইলেন।

পণ্ডিত কহিল—নিশ্চয়! নিশ্চয়! তা আবার করে! এত বড় গুরুতর একটা কাজ!

২

জন্মদিন উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। আয়োজন অবশ্য প্রকাশ্য ভাবেই হইতেছে, কিন্তু উদ্দেশ্যটা গোপন রাখা হইয়াছে। ছোকরারা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। গাঙ্গুলী মশায় লাইব্রেরীর জন্য একশ' টাকা দিয়াছেন। শুধু তাহাতেই হয় নাই। ঘর মেরামত প্রভৃতির জন্ত আরও পঞ্চাশ টাকা দিতে হইয়াছে। গাঙ্গুলী মশায় খুঁৎ-খুঁৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাষ্টার বুঝাইয়াছেন—কাজে নামিতে গেলে প্রত্যেক পদে দ্বিধা করিলে চলিবে না। সাফল্যের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া দৃঢ় পদে অগ্রসর হইতে হইবে। লাইব্রেরী-ঘর মেরামত আরম্ভ হইয়াছে। লোকের কাছে প্রচার করা হইতেছে—লাইব্রেরীর বার্ষিকী উৎসবের জন্তই এই আয়োজন। বাগ্‌দীদের মনসা-মেলাটির মেজে বাঁধানোর ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। গ্রামের এক জন তরুণ কবি দুইটি গান রচনা করিয়াছে। তাহাতে গাঙ্গুলী মশায়ের এত অত্যধিক পরিমাণে প্রশংসা করা হইয়াছে যে তাহা শুনিয়া গাঙ্গুলী মশায়ও এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়—ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছেন। তথাপি মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি যে আজীবন গ্রামের মঙ্গল-সাধনের জন্ত চেষ্টা করিয়াছেন ইহা মিথ্যা নহে। অবশ্য নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ ভাবে অনবহিত ছিলেন (যদিও গান দুইটিতে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নিঃস্বার্থ পরোপকারব্রতী বলিয়া কীর্ত্তিত করা হইয়াছে) তাহা নহে; তবে রাধানাথের মত তাহাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। তা' ছাড়া, নিজের প্রশংসা শোনার মধ্যে একটা মাদকতা আছে। শুনিতে শুনিতে মনে নেশা লাগে। বার বার শুনিতে ইচ্ছা হয়। যেমন ভালো ফটোগ্রাফারের হাতে তোলা নিজের ছবি বার বার দেখিতে ইচ্ছা হয় তেমনই। যে জীবনকে খণ্ড খণ্ড ভাবে পথে ছড়াইয়া আসা হইয়াছে, তাহারই সমাবিষ্ট, সমগ্র রূপ দেখিয়া সার্থকতার আনন্দে মন ভরিয়া উঠে। জীবনকে আরও সুন্দর ভাবে যাপন করিবার জন্ত মনের মধ্যে সঙ্কল্প জাগে।

বিনয় মাষ্টার 'গাঙ্গুলী মহাশয় প্রশস্তি'—নাম দিয়া একটি লম্বা কবিতা লিখিয়াছে। তাহাতে গাঙ্গুলী মহাশয়ের নানা গুণাবলীর সঙ্গে তাঁহার চির-তারুণ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং তাঁহার দীর্ঘ জীবনের জন্ত মঙ্গলময় বিভুর কাছে প্রার্থনা জানানো হইয়াছে। মহেশ ভট্‌চায সংস্কৃতে একটি কবিতা লিখিয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিজের পুত্র নাই বলিয়া তিনি গ্রামের সমস্ত ছেলেদের নিজের পুত্র বলিয়া জ্ঞান করেন; অচিরে তিনি পুত্রবান হইয়া দীর্ঘজীবন সুখে যাপন করুন। শুনিয়া গাঙ্গুলী মশায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বলিয়াছেন—ও-সব কথা আবার লেখা কেন? লোকে হাসবে যে? বিশেষ করে আবার রেখো! কত রকম কদর্থ করবে—

মাষ্টার বলিয়াছেন—সংস্কৃত কেউ বুঝবে না। পণ্ডিত মশায় যখন কষ্ট করে লিখেছেন, থাক্।

এমনই করিয়া দিন কয়েক কাটিয়া গেল। এক দিন বিনয় মাষ্টার আসিয়া গোপনে গাঙ্গুলী মশায়কে বলিল—আমার ওখানে একটি বার যেতে হবে যে।

গাঙ্গুলী মশায় মনে-মনে প্রলুব্ধ হইয়া উঠিলেন। ডাগর-ডোগর মেয়েটির কথা বিনয়ের মুখে অনেক বার শুনিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত চোখে দেখা ঘটিয়া উঠে নাই। কহিলেন—কেন বল দেখি?

—রেবতীভূষণ ঘোষ

বিনয় কহিল—আমার লেখা কবিতাটি তো মিনুই পড়বে। ক'দিন ধরে অভ্যেস করেছে। আপনাকে একটি বার শোনাবে—

গাঙ্গুলী মশায় অন্তরের আগ্রহ সবলে চাপিয়া নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিলেন—আমাকে আবার কেন? আমি তো এ সব বুঝি না। মাষ্টারকে ডেকে নিয়ে যাও বরং। ও সব বোঝে।

বিনয় কহিল—ওর কাছে লজ্জা করবে মিনুর—

গাঙ্গুলী মশায় হাসিয়া কহিলেন—আর আমার কাছে করবে না?

—না, না, আপনার কাছে আবার লজ্জা কি?

গাঙ্গুলী মশায় ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিলেন—তা বটে! বুড়িয়ে মরতে যাচ্ছি, আমার কাছে ছেলে মানুষ মেয়েদের লজ্জা করবার দরকার কি?

'হিতে বিপরীত' ঘটিবার উপক্রম দেখিয়া বিনয় শঙ্কিত হইয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি কহিল—না, না, তার জন্যে নয়। মানে, আপনার সঙ্গে বিয়ের কথা, মানে, আমার স্ত্রী তো ঠারে-ঠোরে বলেছেন কি না। তা' ছাড়া ছেলে মানুষ নয় যে; আমার স্ত্রীর চেয়ে দু'বছরের ছোট, আমার স্ত্রীর এখন বত্রিশ চলছে—

গাঙ্গুলী মশায় কৃত্রিম অনুযোগের স্বরে কহিলেন—তোমার স্ত্রী অন্যায় করেছেন। যা অসম্ভব তাই বলে মিছেমিছি বেচারার মন খারাপ করে দেওয়া!

—বিনয় কহিল—মন খারাপ হবে কেন? আপনার সঙ্গে বিয়ে হলে বর্তে যাবে—

গাঙ্গুলী মশায় ত্রস্ত কণ্ঠে কহিলেন—না, না, ও-সব কথা আর আলোচনা কোরো না। ঠাট্টা করেও না! বাড়ীতে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে আছে সব। তারা অত সব বুঝবে না। পাঁচ কাণ করে একটা কেলেঙ্কারী ঘটিয়ে বসবে।

বিনয় কহিল—ছেলে-মেয়েদের সামনে ও-সব কথা কেউ বলে না কি! গোপনে বলে। আপনার নাম সব অনেক শুনেছে কি না! আমার স্ত্রী তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ!—দিন-রাত বলে অমন মানুষ হয় না! হবেই না বা কেন। কত দিক দিয়ে কত সাহায্য আপনার কাছে পেয়েছি বলুন দেখি? এখনও পাচ্ছি। আপনার বাগানের তরী-তরকারী পুকুরের মাছ তো দিনই খাচ্ছি। আপনার ঋণ শুধবার জন্যে যদি প্রাণ দিতে হয়তো আমরা প্রস্তুত। শেষ দিকটায় বিনয়ের কণ্ঠ আবেগে গদ্‌গদ হইয়া উঠিল।

বিনয়ের কথাগুলি শুনিতে ভাল লাগিল গাঙ্গুলী মশায়ের। অনেকের অনেক উপকার করিয়াছেন তিনি, কিন্তু এমন করিয়া স্বীকার করে না কেউ।

বিনয় কহিল—মিনু বলেছে ও-রকম লোকের পায়ে স্থান পাই তো স্বর্গে যাব, দিদি। গৌরী শিবকে বিয়ে করবার জন্যে তপস্যা করেছিলেন; বল তো আমিও তপস্যায় বসে যাই।

গাঙ্গুলী মশায় সবিস্ময়ে কহিলেন—বল কি? বলেছে ও-সব কথা! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ফিকে হাসি হাসিয়া কহিলেন—কিন্তু ভায়া, শিবের তো আমার মত জাঁদরেল প্রথম পক্ষ ছিল না, থাকলে গৌরীর তপস্যা বার করে দিত!

বিনয় কহিল—বলেন কি? মা কালীর মত রণ-রঙ্গিণী মেয়ে তপস্যায় বসে হন, আর আপনার গিন্নী বশ হবেন না? ওঁকে ও হাত করে নেবে দেখবেন। এমন মেয়ে—

গাঙ্গুলী মশায় চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বিনয় কহিল—কখন যাবেন? আজ সন্ধ্যেয় তো? সেই বেশ হবে।

গাঙ্গুলী মশায় চিন্তিত মুখে কহিলেন—একলা যাওয়াটা কি ভাল হবে? মাষ্টার কি ভাববে। তার চেয়ে এক কাজ কর ভায়া! মাষ্টারকেও একবার বলে যাও।

বিনয় কহিল—মাষ্টার মশায়কেও বলতে হবে? একটু ভাবিয়া কহিল—তাই বলে যাই। মিনুকে বলে দেব মাষ্টার মহাশয়ের কাছে লজ্জা না করতে—

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—লজ্জা করলে চলবে কেন? আমাদের কাছেই যদি লজ্জা করেন তো সভায় পড়বেন কি করে, এঁ্যা?

বিনয় কহিল—সে পড়বে ঠিক। অভ্যাস আছে যে। সহরের মেয়ে কি না। তবে কি জানেন, ওর ধারণা মাষ্টার মশায় ভিতরের ব্যাপারটা জানেন হয়তো। তাই লজ্জা—

গাঙ্গুলী মশায় সন্দিগ্ধ স্বরে কহিলেন—ভিতরের ব্যাপার আবার কি?

—আপনার সঙ্গে বিয়ের কথা।

গাঙ্গুলী মশায় ঈষৎ বিরক্তির সহিত কহিলেন—ও-সব কথা বাদ দাও—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠেই কহিলেন—আমার গিন্নীর মিষ্টি-মিষ্টি কথা শুনেছ আর হাসি-খুশী ভাবটাই দেখেছ, কিন্তু মেজাজ খারাপ হলে উনি যে কি হয়ে ওঠেন দেখনি তো! উনি বেঁচে থাকতে ওটা অসম্ভব। যাক গে, আর অন্যান্য ব্যবস্থা সব করেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার স্ত্রী সব ব্যবস্থা করেছেন। উনি থাকবেন, আমার বোন থাকবে, মিনু আর আমার আরও দু' শালী থাকবে, এই পাঁচ জনে মিলে উলুধ্বনি করে, শাঁখ বাজিয়ে, খৈ ছড়াতে ছড়াতে আপনাকে সভায় আবাহন করে নিয়ে যাবে, তার পর মিনু মালা-চন্দন দিয়ে আপনাকে বরণ করবে।

গাঙ্গুলী মশাই কহিলেন—সভাতে মেয়েদেরও বসবার ব্যবস্থা হবে না কি?

বিনয় কহিল—নিশ্চয় হবে। হেড-মাষ্টার মশায় বলেছেন, এক পাশে কতকটা যায়গা চিক দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হবে।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—শুধু চিক দিয়ে কেন? বেশ বড় করে বেড়া দিয়ে দাও না। কেউ যেন ডিঙ্গোতে না পারে—

বিনয় কহিল—ভলান্টিয়ার থাকবে। কেউ মেয়েদের ওখানে যেতে পারবে না।

—যদি মেয়েরা আসে?

বিনয় ঘাবড়াইয়া গেল। পুরুষদের মাঝে আসিয়া ঢুকিবে—এমন মেয়ে গাঁয়ে কেউ আছে না কি?

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—আমার গিন্নী যদি সভায় থাকেন, আর ঐ সব চোখে দেখেন তো চিক্‌-ফিক্‌ ঠেলে ভিতরে ঢুকে আমাকে টেনে বার করে নিয়ে যাবেন।

বিনয় সবিস্ময়ে কহিল—বলেন কি?

গাঙ্গুলী মশায় শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন—হ্যাঁ, রেগে গেলে সব পারেন উনি। কাজেই মেয়েদের জন্যে কোন ব্যবস্থা করে কাজ নাই ভায়া! আমাদের উদ্দেশ্য তো হাকিমদের সব দেখানো-শোনানো? তা ওঁরা থাকলেই হবে। [ক্রমশঃ।

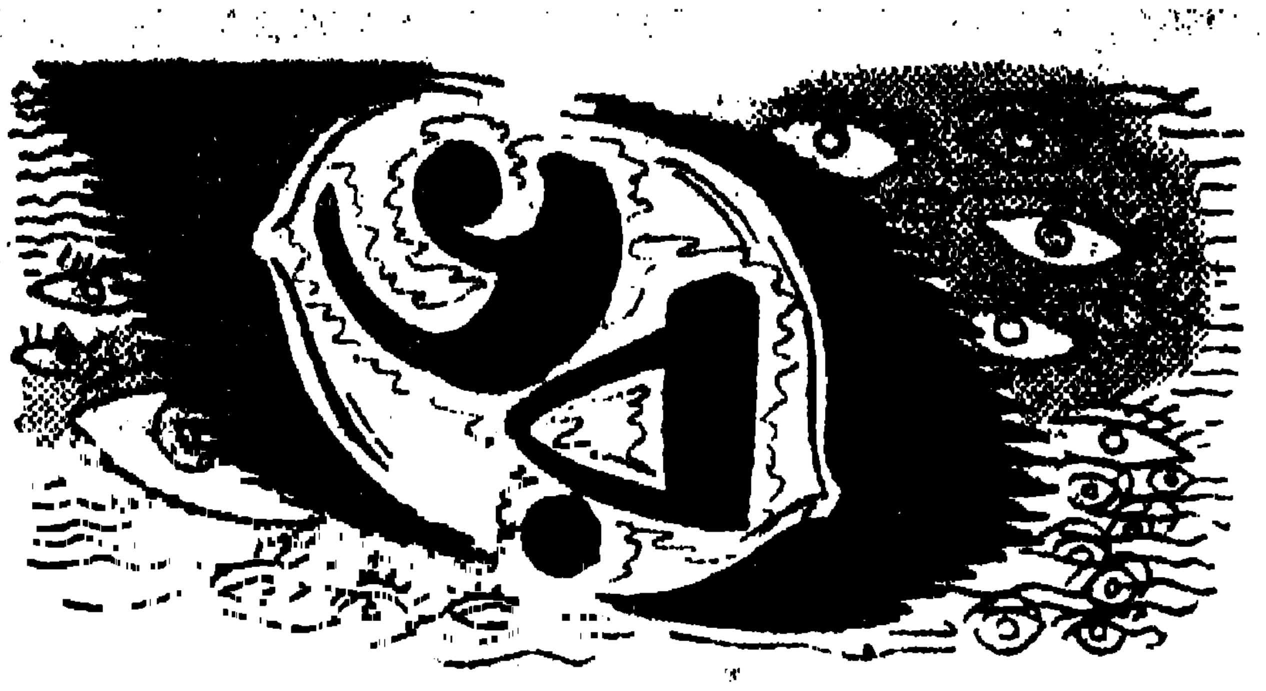

বিজন ভট্টাচার্য

মুকুন্দ মালাকারের আইবুড়ো বোন আজুরীর কাঁধে ভর নামিয়াছে।

অসুখ নাই বিসুখ নাই সমর্থ বয়সের দামড়া মাগী, তিনটা বাঘে খাইতে পারিবে না এমনই গতোর, হঠাৎ কথা বলিতে বলিতে সেই যে কাটা কলাগাছের মত কুয়োতলায় ভাঙিয়া পড়িল হাত-পা ছড়াইয়া আর উঠিবার নামটি নাই। আজ পাঁচ দিন। মুখে হুঁ না কোন বাক্যি নাই আজুরীর।

চোখ তাকাইয়া নাক ডাকায় আজুরী। কোন সময় হাসে, কোন সময় কাঁদে। কিছুই কিন্তু সজ্ঞানে নয়। উল্টা-পাল্টা রূপ দেখিয়া কেমন যেন একটু বিদ্‌ঘুটে লাগে সচেতন মনে। মনে হয়, শরীর ও মনের কোথায় যেন আজুরীর অসাড় হইয়া যাইতেছে চুপিসাড়ে।

মালাকার-বউ লক্ষ্মীর পায়ের তলাটা শির-শির করিয়া ওঠে আজুরীর চোখে চোখ মিলাইয়া। গলাটা ঢিলেঢালা মনে হয়। পাঁজরার এক ফালি পেশী থর-থর করিয়া কাঁপিয়া ডিঙি মারিয়া ওঠে বুকের মাঝখানে। কোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া লক্ষ্মী স্বামীকে বলে, মেয়ের লক্ষণ আমি ভাল বুঝি নে, তুমি ওঝা ডাকো।

মালাকার কোন সাড়া দেয় না। ড্যাবড্যেবে চোখ করিয়া সে শুধু লক্ষ্মীর দিকে তাকাইয়া থাকে। চিন্তা-পারাবারের কূল-কিনারা নাই। জীবন-সংগ্রামে শতেক সামাজিক শত্রুর চোট সামলাইয়া আবার আধিভৌতিক অদৃশ্য শত্রুর তাল সে যে কি করিয়া সামলাইবে, এই কথাই সে আকাশ-পাতাল ঠোঁট করিয়া ভাবে।

মালাকারের এই হাবাগোবা গোবেচারী ভাব লক্ষ্মীর কিন্তু ভাল লাগে না। মনে হয়, মরদটা যেন মুহূর্তে মাদী হইয়া গিয়াছে দুর্বিপাকের ধমক খাইয়া।

তিড়বিড় করিয়া ওঠে লক্ষ্মী অস্বস্তিতে। কাঁকালের মেটে কলসীর জল ছলকে পড়ে মাটিতে। সশব্দে কলসীটা বারান্দায় নামাইয়াই লক্ষ্মী ঘুরিয়া দাঁড়ায় মালাকারের দিকে: কি, ব্যাপার কি!

দেমাকী বউয়ের শ্যামা মায়ের ঠমক। যে লক্ষ্মী সেই কালী! গুরুর চরণ স্মরণ করিয়া মালাকার বারান্দা হইতে উঠানে ঠ্যাং নামাইয়া দেয়। পিছমোড়া দুইখানা হাত কোমরের কাপড়ের ভিতর ঢুকাইয়া উঠানে পায়চারি করে আর বলে, ওঝা ডাকতে বলছো কিন্তু ডেকেই বা হবে কি? হয়েছে দেবতার ভর, কালীতলায় পূজো মানত কর, বুড়ো শিবের মাথায় দুধ দাও, পেঁচো-পেঁচীর দোর-ধরুণীদের ডেকে এনে সেবা-যত্ন করাও, ভর করেছেন যিনি তিনি চলে যাবেন তুষ্ট হয়ে। ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে খামখা বিবাদ রেখে কি কোন লা[illegible] আছে!

বিশ্বাস হয় না লক্ষ্মীর মালাকারের কথা। অথচ পোলা কথার নজির দেখাইয়া সোয়ামীর মুখের উপর একটা পাল্টা কটু জবাব দিতেও কুণ্ঠা আসে। একটু ভাবিয়া বলে, তা ঠিক, তবে ভাব তোমার গিয়ে অপদেবতারাও তো একরকম দেবতা। ঝাড়-ফুঁ না করলি কি তেনারা যাবে? যে দেবতার যে নৈবিদ্যি।

বিয়ে-থা পাল-পার্ব্বণের মাস। খাটিয়া-পিটিয়া দুইটা পয়সা হয় যদি তো এই মাসেই। বিঘ্ন ঘটিল। এমন বিঘ্ন যে এড়াইবার পথ নাই। এদিকে এক জোড়া বিয়ের মুকুট আর কপালির বায়না লইয়া খাইয়া বসিয়া আছে, সোলায় এ পর্য্যন্ত ছুরি ধরিতে পারিল না। সামনে হাট-বার। চার কদম আর একটি পাখীওয়ালা খান-আষ্টেক খাঁচা বানাইতে পারিলে কাজের কাজ হইত। এখন সবই পণ্ড হইতে চলিল। ভাবিয়া থই পায় না মালাকার কি দিয়া কি করিবে। পায়চারি করিতে করিতে উঠানের ডালিম গাছের কয়টা পাতা ছিঁড়িয়া মালাকার কাজে গিয়া বসে।

ভর লক্ষ্মী আগে দেখিয়াছিল এক খুব ছোটবেলায়। ভাল করিয়া মনেও নাই তাহার আজ সব কথা। চোখ বুঁজিয়া খানিকক্ষণ ভাবিবার পর শুধু একটি ছবিই অস্পষ্ট ভাবে তার মনে পড়ে, তাহার বিধবা পিসীমা মাটির দাওয়ার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মাথা কুটিতেছেন; আর সধবা-বিধবা মিলাইয়া জনা কয়েক স্ত্রীলোক ভরগ্রস্তা পিসীমাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। পিসীমার মুখের কথাটারই না কি তখন মূল্য অনেক। সকলেরই বিশ্বাস, বুড়ী যাহা বলিবে তাহাই ফলিবে। সত্য মিথ্যা লক্ষ্মী জানে না। তবে দেখিয়া-শুনিয়া ভর সম্বন্ধে ধারণাটা তাহার এই রকমই।

কিন্তু আজুরীর বেলায় তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া খটকা লাগিয়াছে লক্ষ্মীর মনে। এ ভর ঠিক ভর না। অন্য কিছু। ধারণাটা বদ্ধমূল হইতে চলিয়াছে আবার কালিদাসীর বাঁকা হাসির খোঁচা খাইবার পর হইতেই। ননদিনীর ভরের খবর শুনিয়া কালিদাসী সাদা মনে আসিয়াছিল নিজের মনেরই একটা সংশয় নিরসন করিতে। পাপ মনে আসে নাই। আজুরীর ভাব-সাব দেখিয়া সে-ও রা বাক্যি না কাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এ-কথা সে-কথা বলিয়া। সংশয় কি আর এমনি আসে মনে! দেবতাই যদি ভর করিবে আজুরীকে তো মালাকার-বাড়ী এতক্ষণ তীর্থক্ষেত্রের সামিল হইত। আশ-পাশের দুই-দশটা গ্রামের লোক সিধা লইয়া আসিয়া আজুরীর পায়ের কাছে ধর্ণা দিয়া পড়িত। মুখে মুখে নাম সঙ্কীর্ত্তন হইত অহর্নিশি। অতি ভালবাসে বলিয়াই হয়তো লক্ষ্মীর মনে হয়, বোন আজুরীর সম্পর্কে মালাকার মোহান্ধ। আর নয় তো আদ্যোপান্ত সব কথা জানিয়া-শুনিয়াই বোকা সাজিয়া আছে স্বেচ্ছায়। মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই অবশ্য সব সমস্যার সামাধান হইয়া যায়, কিন্তু প্রশ্নটা আবার এমনই ঠোঁটকাটার মত হইয়া পড়ে যে দুই চোখের চামড়া থাকিতে পরাণ ধরিয়া জিজ্ঞাসাও করা যায় না। তের পাপে মরণ-দশা হয় মানুষের। লক্ষ্মীরও যেন তাহাই হইয়াছে।

বাঁশকাঠির উপর সোলার বাঁদর নাচাইয়া রং তুলি দিয়া চক্ষুদান করিতেছিল মালাকার। হঠাৎ লক্ষ্মী আসিয়া হলুদ রংএর খুলিটা পা দিয়া উল্টাইয়া দিল। তাম্বুল-রুয়া ঠোঁট দুইখানির ভিতর ছোপধরা ক'য়েকটা সাদা দাঁত ভাঙিয়া বলিল, বাওন খাওয়াবার ব্যবস্থা করব আমি, পূজো দেব মানত করব আমি, ওঝা ডাকপো—সে-ও আমি, আর তুমি শুধু বসে-বসে ভাত নাড়বা আর হুঁকো সমাজে পেট পুরে-পুরে খাবা, কেমন? আজুরী আবার সোহাগের সুর—[illegible]

করে না বুলতি। এদিকে পথে ঘাটে আমি তো কান পাততি পারি নে। কলকতা কি আমার!

এমনিতে সাত চড়ে রা কাড়ে না মালাকার। কিন্তু রং-এর কাজের সময় ব্যাঘাত ঘটাইলে মুকুন্দর আর মাথার ঠিক থাকে না। মেজাজে আগুন ধরিয়া যায়। রাগ চণ্ডাল। লক্ষ্মীর চুলের মুঠি ধরিয়া তখন কঁৎ-কঁৎ করিয়া লাথি মারিতেও মালাকারের পা এতটুকু কাঁপে না।

কিন্তু এবার মালাকার বড় জোর সামলাইয়া গেল। 'কিসির কলক রে মাগী—বলিয়াই লক্ষ্মীর পায়ের গোছটা থাবা মারিয়া ধরিয়াই কেন যেন ছাড়িয়া দিল আচমকা। অবরুদ্ধ আক্ষেপ তখন গিয়া পড়িল সোলার হনুমানগুলির উপর। বাঁশের কলগুলিকে দুই হাতে মট-মট করিয়া ভাঙিয়া সোলার তাড়াগুলিকে লাথি মারিয়া সব উঠানে ফেলিয়া দিল। তার পর সেই পাখী-বসানো শোলার থাঁচা —রীতিমত মেহনতের কাজ—সেই থাঁচা দুই পায়ে মাড়াইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল উন্মাদের মত।

আলা বাড়িল লক্ষ্মীর। পায়ের গোছ ধরিয়া টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া পিঠে দুই চারিটা লাথি মারিলেও সমানে সমানে যাইত। অন্তর্দাহনের কিছুই ঘটিত না। কিন্তু যে অঘটন ঘটিয়া গেল তাহা নেহাৎই একতরফা! মুখ ভার করিয়া ইহার পর আর দাঁতে দাঁত লাগাইয়া পড়িয়া আদর কাড়িবার অবকাশ থাকিল না।

সাত-পাঁচ ভাবিয়া লক্ষ্মী ছুটিল ভিঁটেকপালীর মাঠের দিকে। মালাকার তখন মাথা-ভাঙা আমতলা—লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া জেলা-বোর্ডের রাস্তার দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। বাবরি চুলগুলি হইয়াছে শিবের জটা—প্রতি পদক্ষেপে মাথার উপর সাপের মত নাচিতেছে।

খুব চটিয়াছে মালাকার। হয়তো সাড়াই দিবে না ডাকিলে। মঙ্গলবার—হাট-বার। চরি দিকে হাটুরিয়াদের ত্রস্ত আনাগোনা। গৃহস্থের বৌ হইয়া আর আগাইয়া যাওয়া চলে না। লক্ষ্মী ভিঁটে-কপালীর মাঠের শেষ প্রান্ত হইতে লজ্জার মাথা খাইয়া চেঁচাইয়া ডাকে, যে শুনছো, এই যে। খোলামেলা তেপান্তরের মাঠ। বাতাসের ঝাপটায় লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর শিমুল তুলার মতই টুকরা হইয়া উড়িয়া গেল। মালাকারের কানে গেল না। লক্ষ্মী অগত্যা ফট-ফট শব্দে জোর জোর কয়েকটা হাততালি বাজাইল। পরিচিত সাংকেতিক আহ্বান—কানে গেলেই মালাকার হয়তো মুখ ঘুরাইবে। কিন্তু এবারও মালাকার ফিরিয়া তাকাইল না। স্বামীলোক—গুরুজন ব্যক্তি, গরু-ছাগল না যে ফাঁকা মাঠে কুক্ ছাড়িয়া ডাকিয়া লক্ষ্মী মালাকারের দৃষ্টি ফিরাইবে! তার পর চলনের যে কদম তাহাতে ডাক শুনিলেই যে মালাকার ফিরিয়া আসিবে এমন ভরসা নাই। উপায় না দেখিয়া লক্ষ্মী ফিরিয়া আসে। ক্ষোভ আর অভিমানে দুইখানি চরণ সর্বংসহা বসুধার পিঠের উপর চাপড় মারিয়া চলে।

এদিকে আজুরীর হাব-ভাবের কোন কিন্তু বৈলক্ষণ্য নাই। সুখ-দুঃখ সমান জ্ঞান করিয়া ঢেঁকিশালের বারান্দায় সে ঠিক তেমনই পড়িয়া আছে। বদলাইয়াছে শুধু চোখটা। বাছুরের চোখের মত ডাগর হইয়া ছল-ছল করিতেছে।

লক্ষ্মী আস্তে আস্তে কাছে গিয়া বসে আজুরীর। গা-টা যেন ঠাণ্ডা পাথর। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আজ ছয় দিন ছয় রাত পার হইয়া সাত দিনের দিন পড়িল। লক্ষ্মী ভাবে, পাষাণ হইয়া যাইবে না তো আজুরী? কথাটা মনে করিতেই সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া ওঠে আজুরীর। চোখ বুঁজিয়া ওলাইচণ্ডীতলা সোয়া পাঁচ আনার লুটের মানত করে সে।

—বৌ।

যেই মানত সেই ফল। চমকে ওঠে লক্ষ্মী! আজুরী কথা বলিতেছে!

—বৌ রে!

দুই আঁচলে চাপিয়া ধরে লক্ষ্মী আজুরীর মাথাটা। মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলে, ঠাকুরঝি!—এই তো আমি, তুই কি বলতি চাচ্ছিস বল। তোর যা মনে নেয় তাই বল। আমি থাকতি তোর কোন ভয় নেই। আর কষ্ট পাস্ নে। আমি সহ্য করতি পারি নে।

বাঙ্ময় হইয়া ওঠে মুহূর্তে আজুরীর সারা মুখখানা। তবু মুখে কথা সরে না। শুধু নীচের বিম্বোষ্ঠটি নিদারুণ একটা আবেগে থর-থর করিয়া কাঁপে।

অব্যক্ত যাতনার মূক অভিব্যক্তি যে দেখে তারও কষ্ট হয়। ত্রস্ত হাতে আজুরীর মাথা-মুখ সাপটাইয়া লক্ষ্মী ধরা-গলায় বলে, ঠাকুরঝি, তুই থির হ। দু'খান পায়ে পড়িছি তোর তুই এট্টু থির হ, ধৈর্য্য ধর। আমারে বুঝতি দে।

ডাঙায়-তোলা মাছের মত হঠাৎ ধড়ফড় করিয়া ওঠে আজুরীর সারা দেহ। অদৃশ্য বেদনার একটি তীব্র অঙ্কুশ দাঁত টিপিয়া সহ্য করে আজুরী।

ঠাকুরঝি : চীৎকার করিয়া ওঠে লক্ষ্মী ভয়ে।

আজুরী কথা কয় না। চোখ তাকাইয়া কান পাতিয়া শোনে। বেদনার একটা কালো ছায়া জলভরা মেঘের মতই আজুরীর মুখখানির উপর হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া যায়। যেন এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে মুখের উপর। ঘামিয়া গিয়াছে আজুরীর গোটা কপালটা। মুখানন এখন বেশ পরিচ্ছন্ন। ধোয়া আকাশের মত। মুখে কথা নাই। শুধু দুইটি সজল চোখ লক্ষ্মীর দিকে থির হইয়া জাগে।

সমব্যথিতের বেদনা ঝন্‌-ঝন করিয়া ওঠে লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বরে, ঠাকুরঝি!—স্বার্থপরের মত শুধু কেঁদেই গেলি। অপরের দিকি ফিরে চেয়ে দেখলি নে—এই কথাই বলি। কাঁদিয়া ফেলে লক্ষ্মী।

চোখের জল গঙ্গাজল। দুইটা কথা যদি ভরসা করিয়া লক্ষ্মীকে বলিতে হয় তো এখনই। আর হয়তো সময় পাওয়া যাইবে না।

সরু সরু দুই হাতে রক্তের বাঁধ বাঁধিয়া নেয় আজুরী। লক্ষ্মীর মুখখানা কানের কাছে টানিয়া নামাইয়া আস্তে আস্তে বলে, বৌ রে!—আমাকে ধরেছে ভূতে। সতী-সাবিত্রী সমান তুই বৌ, তোর কানে কথাটা বলতেও শেল বেঁধে আমার বুকি। তবু মা জননীর সামিল তুই বৌ, তুই ছাড়া আমার আর কেউ নাই। বলি শোন, গত কার্ত্তিক মাসে—মালাকার দাদার সোণার টুপী নিয়ে আমি যখন হাটখোলার রাস্তায় ফিরি করতি যেতাম···তখন··· দাদার হাতে তখন এট্টা পয়সা নেই···সংসার চলে না এমনিই অবস্থা···তুই তো সবই জানিস···তখন···আমাকে টাকা দিত রাক্কসটা···সেই যে মোটাপানা ঘোষবাবু···আর বলতি পারিনে বৌ তুই আমারে মেরে ফেল···আলকুশীর বিষ বেঁটে দে আমি খেয়ে জুড়োই।

ছোট-খাটো সুন্দর আজুরী পাখীর মত লক্ষ্মীর কোলের ভিতর থর-থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। লক্ষ্মী কোন কথা বলে না। শুধু গভীর একটা মমতায় আজুরীকে বুকে চাপিয়া ধরে। কানে কানে বলে, ভয় করিস নে ঠাকুরঝি, আমি আছি।

—তুই থাকিস। আজুরী চোখ বুঁজিল।

আজুরীর দেহ বেড়িয়া লক্ষ্মী বিস্তার করিয়া বসে তার বরাভয়ের পক্ষপুটচ্ছায়া ভয়চকিত ঈগল-মাতার মত। বেটা-পুত নাই—ননদিনীর মাতৃত্বটা যেন মায়াগর্ভের মতই লক্ষ্মীকে পাইয়া বসিয়াছে।

* * * *

বিকালের দিকে মালাকার বাড়ী ফিরিল। পরিশ্রান্ত চেহারা, উস্কোখুস্কো চুল, এক হাঁটু কাদা,—সঙ্গে এক বৃদ্ধ গুণীন। এত দিনের ঘটনা-রটনার যা হয় একটা আজই মীমাংসা হইয়া যাইবে। পাড়ার লোকেও ভিড় করিয়া আসিয়াছে গুণীনের পিছু-পিছু।

এই সেই চরসমস্তিপুরের যশস্বী রামনাথ ওঝা। লোকটা ভূতসিদ্ধ তান্ত্রিক যোগী। ডাকিলে লক্ষ টাকা দিলেও আসে না, আবার আসিবার হইলে এমনিই আসে। ফুটা আদলাও গ্রহণ করে না। দরিদ্র হালের ছোট-খাটো লোকটার এমনি প্রতাপ।

রামনাথ ওঝা আসিয়াছে। আশপাশের তিনখানা গ্রামে এ একটা মহা সংবাদ। পাড়ার ছেলে-বউরা তো যাত্রা দেখার মত দাড়িয়া-গুড়িয়া আসিয়া মালাকার-বাড়ীর দুইখানি দোচালা ঘরের

চূড়ান্ত রায় সাব্যস্ত করিবেন, এমন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও মালাকার-বাড়ীতে পায়ের ধুলা দিয়াছেন। আসিয়াছেন বিপ্রদাস ঠাকুর, গ্রামের প্রতিভূ স্থানীয় বেণীমাধব ঘোষ, কাছারীর তহশীলদার মোহিনী বাবু, সিধু ভট্‌চায, হারাণ মিত্তির, প্রসন্ন মালাকার প্রভৃতি নামী ভদ্রজন। বিনা নোটীশেই আগ বাড়াইয়া আসিয়াছেন ইঁহারা। কাজেই মুকুন্দ মালাকার ইঁহাদের যথোচিত সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিতে পারে নাই। তাড়াতাড়িতে পশ্চিম ঘরের দাওয়া খালি করিয়া শুধু মাদুর বিছাইয়া দিয়াছে। বিপ্রদাস ঠাকুর আর বেণী ঘোষের জন্ত পাড়িয়া দিয়াছে দুইখানা জলচৌকি। সারা দিনের পরিশ্রমের পর মুখে হাসি টানিয়া সভক্তি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে করিতে পিঠের শিরদাঁড়াটাই বুঝি ভাঙিয়া যায় মালাকারের।

বিপ্রদাস ঠাকুর অভয় দিয়া বলেন, এদিকে ব্যস্ত হয়ো না মালাকার, তুমি রামনাথের কাজে যোগান দাও গে। আমরা ঠিক আছি।

পিছনেই আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়াছিলেন বেণী ঘোষ। বিপ্রদাস ঠাকুরের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, ও হুঁকো-কোলকের ব্যবস্থার জন্তে অন্ত লোক আছে, তুমি ওদিকে যাও। অনুষ্ঠানে যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে।

সিধু ভট্‌চাযের মুখ চুলকাইতেছিল। সে বলিল, বিঘ্ন অবশ্য জোর করে না ঘটালে ঘটবার কোন কারণ থাকবে না। কেন না রামনাথ ওঝা অভ্রান্ত। মুনি-ঋষিরা পর্য্যন্ত এ কথা মানে।

হারাণ মিত্তির খুক্ করিয়া হাসিয়া খুঁটে মুখ মুছিল। প্রসন্ন মালাকার, সিধু ভট্‌চাযের মুখের দিকে তাকাইয়া অর্থপূর্ণ ভাবে মাথা ঘুরাইতে লাগিল।

কথাটা বেণী ঘোষের দিকে ভট্‌চাযের একটু ঘুরাইয়া ছাড়া। বুঝিতে কাহারো অসুবিধা হইল না।

ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছে সিধু ভট্‌চায। ফোঁস করিয়া উঠিলেন বেণী ঘোষ। ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া গুরুগম্ভীর ভাবে শূন্যে ধমকাইয়া উঠিলেন, এখানে বিঘ্ন সৃষ্টি করবার জন্তে কেউ-ই উপস্থিত হননি। যদি কারো জানা না থাকে কথাটা তো জেনে নিন!

বজ্রকঠিন ফক্কা গেরোর মতই বেণী ঘোষের হুঁসিয়ারী ভীরুকে না সমঝাইয়া উল্লসিত করিয়া তুলিল বালখিল্যদের। সিধু ভট্‌চাযেরই হাতের একটা অকালপক্ক ছোঁড়া আবার বিপ্রদাস ঠাকুরের চোখের সামনে ছেঁড়া চটিটা উল্টাইয়া রাখিল। বেণী ঘোষের কানে গেল, দেব-দেবীর নামের সঙ্গে নারদ নামটির ছন্দে আবৃত্তি চলিতেছে পিছন দিকে।

সূত্রপাতেই অশান্তির আভাস পাইয়া বিব্রত বোধ করিলেন বিপ্রদাস ঠাকুর। ভ্রূ কুঁচকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সিধু ভটচাযকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বড্ড বাহুল্য হচ্ছে বলে মনে করছো না কি সিধু?

বৃদ্ধ বিপ্রদাসের প্রতি সকলেই সশ্রদ্ধ। সিধু ভটচায দূর হইতে হাত জোড় করিয়া হাসিয়া ছোট একটি নমস্কারে অবনত হইয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে বালখিল্যের দলও হাত-মুখ গুটাইয়া

হারাণ বিড়ির লাঠি দিয়া উল্টা চটিটা সোজা করিয়া বলিল, কই এবার সুরু হোক বাঘের খেলা। ছেলের দল গোল করিসনি।

আধময়লা একখানা সাদা চাদরে মাথা-মুখ ঢাকিয়া ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়াছিল রামনাথ ওঝা চেকিশালের বারান্দায়। পাশেই আজুরীকে কোলে করিয়া বসিয়াছিল মালাকার-বৌ লক্ষ্মী। রামনাথের নিকট আত্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা অকপটে স্বীকার করিতে তাহার এতটুকু দ্বিধা হয় নাই।

রামনাথ বলিয়াছে, ইষ্ট বই অনিষ্ট করে না আমার তন্ত্র। ভোলা মহেশ্বরের জটা-ধোয়া জল এই আমি ছিটিয়ে দিলাম তোমার মাথায়। মনের অগোচরেও কোন কথা পুষে রেখো না। তা হলে সেই কথাই কালসাপ হয়ে আজুরীরে দংশাবে। আর রক্ষে হবে না। সত্যি কথা কয়া যাও ফটকে বাবা; তবে জানবা আমি রামনাথ রামেরও নাথ—বাবার বাবা হরের দয়া আমার মাথায়···ইষ্ট বই অনিষ্ট করি নে জীবের।

রামনাথের কথায় ভরসা করিবার অবকাশ ছিল। সুতরাং লক্ষ্মী কোন কথাই গোপন করে নাই।

এইবার সুরু হয় রামনাথ ওঝার মন্ত্র-তন্ত্র। সমাগত ভদ্রজন, বিশেষ করিয়া বিপ্রদাস ঠাকুর আর বেণী ঘোষের সম্মতি লইয়া আসরে নামিল রামনাথ। রহস্যের কালো যবনিকা একটু পরেই উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে শতচক্ষুর সম্মুখে। অধীর আগ্রহে সকলেই স্থির হইয়া বসিল। বিপ্রদাস ঠাকুর এতক্ষণ পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিলেন। এখন গুটাইয়া লইলেন জলচৌকির উপর। এখন শুধু নিরীক্ষণের পালা। চৈতন্যের সমস্ত শক্তিটাকে শিখার মত চোখে উস্কাইয়া দিয়া শুধু তন্ত্রের মাহাত্ম্য অবলোকন করা।

বেণী ঘোষের দৃষ্টি বিপ্রদাস ঠাকুরের কাঁধ ডিঙ্গাইয়া রামনাথ ওঝার দিকে নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

ইষ্টদেব স্মরণ করিয়া রামনাথ ওঝা প্রথমে প্রস্তাবনা শেষ করিল। তার পর দিক্-বন্ধন করিয়া আজুরীর চারি দিকে গণ্ডী দিল। এক রামনাথ ভিন্ন আজুরীর উপর এখন আর অন্য কোন আধিভৌতিক শক্তির প্রভাব বিস্তার সম্ভব নহে। পঞ্চভূত এখন রামনাথের করায়ত্ত। এক নিশ্বাসে আবৃত্তি করিয়া গেল রামনাথ :

ছেড়ে দে পথের মাথা
কব তোর আত্মির কথা,
আউলা বায়ে বাসনা পাই,
মানুষ কি
গরু হোক,
ভুচর কিংবা
খেচর হোক
কারো সম্বন্ধে এড়াএড়ি নাই।

পর-পর কয়েকটা ফুঁ পাড়িয়া নিশ্বাস আটকাইয়া রহিল রামনাথ। পায়ের রক্ত লাফাইয়া উঠিল রামনাথের মাথায়। কপালের দুই দিকের শিরা টঙ্কার দিয়া ফুলিয়া উঠিল। চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল রক্তোচ্ছ্বাসে। ক্রমেই রামনাথ যেন বাঘ হইয়া উঠিতেছে। এমনই দাপট।

কিছুক্ষণ খিম্ ধরিয়া থাকিয়াই রামনাথ আজুরীর আপাদমস্তক তিন বার ফুঁ পাড়িয়া ঝাড়িল। তার পর চক্ষের নিমিষে এক লাফে কয়েক হাত পিছাইয়া মাটি কামড়াইয়া ধরিল। সকলে তো থ! করে কি রামনাথ!

কামড় সে বিষম কামড়। মাথা-মুখ গুঁজিয়া দুই পাটি বড় বড় দাঁত দিয়া যেন শিকার ধরিয়াছে রামনাথ। মাঝে মাঝে আবার ঝাঁকুনি দিতেছে দস্তুর আক্রোশে। ভূতসিদ্ধ তান্ত্রিক রামনাথের অপার্থিব প্রক্রিয়া সব। সাধারণ মানুষ কি বুঝিবে!

নাক তুলিয়া নিরুদ্ধ নিশ্বাসে তাকাইয়া আছেন বিপ্রদাস ঠাকুর। পঞ্চেন্দ্রিয় উৎকর্ণ। স্বতঃস্রাবী মুখের লালা নীচের শুষ্কণীটিকে রসসিক্ত করিয়া পড়িবার অপেক্ষায় একটি মুক্তাফল হইয়া ঝুলিতেছে। তবু খেয়াল নাই।

বেণী ঘোষ বিস্মিত হইয়া গিয়াছে রামনাথের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া। সত্যই জীবনের বহু ক্ষয়ক্ষতির তালিকায়, রামনাথের এই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা না থাকাটা একটা অপূরণীয় লোকসানের মতই হইয়া থাকিত। তবু এখন তো সবে আরম্ভ। প্রস্তাবনা শেষ করিয়া শুধু একবার একটি ঝাড়ান দিয়াছে মাত্র।

বেণী ঘোষের চোখটা যেন পাথরের। নিস্পন্দ অপলক। সিধু ভট্চাযের দল একেবারে ঠাণ্ডা। রামনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে তাহাদের সমস্ত জল্পনা-কল্পনা। ছেলে-বউ-মেয়ে-মরদ কাঁরো মুখে একটা কথা নাই।

কয়েকটি মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইয়া যায়। হঠাৎ হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে আজুরী। কাঁদে আর বলে, উরি বাবা-রে, আমারে ছেড়ে দে তুই—আমি মলাম।

মন্ত্র ক্রিয়া করিতেছে অব্যর্থ ভাবে। আপাত দৃষ্টিতে আজুরীই কাঁদিতেছে বটে, আসলে কিন্তু বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে সেই ভর-করা দানব রামনাথের নখ-দন্তের আক্রমণে।

উঠানের ধূলা নস্যের মত করিয়া দুই আঙুলের টিপে তুলিয়া রামনাথ বলিয়া ওঠে :

কার্ত্তিক গণেশ হাই আমলা
যে বিষ্ণু সেই বিসমিল্লা
সাক্ষী করে এ মামলা
শোনরে কানে এক মোল্লা,
পক্ষপাত
পক্ষাঘাত।
সত্য বই মিথ্যা নাই
হরকালীর ভরসা পাই।
যে দেখে আর যে শোনে
কিংবা মনে অনুমানে,
মান্তি ভিক্
স্বীকার ঠিক্।

বার-বার তিন বার আজুরীর দেহে ঝাড়-ফুঁ করিয়া রামনাথ শিয়রে গিয়া বসিল টিপ ধরিয়া। মালাকারকে ডাকিয়া বলিল, কালো পাথরের বাটি ক'রে খানিকটা সরষের তেল আন।

হাঁটু গাড়িয়া মালাকার এতক্ষণ নলচিতার মত দাওয়ার এক

কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ঘটনা এখন লোকলজ্জা-ভয়ের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। নিষ্ঠুর বিধান আর একটু পরেই অনিবার্য্য ভাবে খাঁড়ার মত আসিয়া পড়িবে তাহার মাথায়। তবু দুঃখের চেয়ে মালাকারের শরীরে এখন রাগের মাত্রাটাই বেশী। রাগ বিশ্ব-সংসারের উপর। সকলেই আজ যেন তাহার শত্রু হইয়া গোটা বাড়ীটা অবরোধ করিয়া ফেলিয়াছে। হিংস্র একটা আক্রোশ থাকিয়া থাকিয়া চক্‌চক্ করিয়া ওঠে মালাকারের চোখে।

লক্ষীর ঘরে এক বাটি তেলের সংস্থান ছিল না। কিন্তু তাহাতে আটকাইল না। চোখের পলকে এক বাটি তেলের জায়গায় তিন বাড়ী হইতে তিন বাটি তেল আসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ বিরামের পরই আবার আসর জমিয়া উঠিল দেখিতে দেখিতে। কৌতূহলী ছেলেমেয়ের দল আগ্রহের আতিশয্যে দুই দিক্ হইতে চাপিয়া পড়িয়াছিল তেলের বাটির উপর। সিধু ভটচাযের ধমক খাইয়া তাহারা আবার যথাস্থানে সরিয়া গেল। সাময়িক বিরতির ফাঁকে বর্ষীয়ান ও প্রবীণদের মধ্যে মাথা ঘুরাইয়া আর চোখ টিপিয়া এতক্ষণ যে সাংকেতিক আলোচনা চলিতেছিল রামনাথ ওঝা উঠিয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাও স্তব্ধ হইয়া গেল।

মালিকুল সাঁই আল্লাআলির দোহাই পাড়িয়া রামনাথ ওঝা লাফাইয়া উঠিল ঢেঁকিশালের বারান্দায়। চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে গুণীনের। কোথাও যেন বাহুল্য শব্দ নাই। রামনাথের কটাক্ষে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে।

দুই ঠোঁটে মন্ত্র আওড়াইয়া রামনাথ এতক্ষণে মাটির টিপটি জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়া বলিল," হে সজ্জন !—হরের দয়ায় মন্ত্রপূত এই মাটি এখন আমি গুরুর নাম স্মরণ করে তৈলপাত্রে ছেড়ে দেবো। পঞ্চভূতের সানুগ্রহে এই মাটির মায়া তখন তৈলাধারে ধরবে কায়া। ভূতাদি প্রেত, নিসুপ্ত কি জাগ্রত—তা সে আকাশেই বাসা বাঁধুক আর মাটিতেই বিচরণ করুক দেখবেন বাঁধা পড়েছে ঐ তৈলাধারে। আমি হলাম হরের পেয়াদা। প্রকৃত আসামী হাজির করে দেওয়াই আমার কাজ। তার পর বিচার—সে আপনারা করবেন। বলেছি—পক্ষপাত পক্ষাঘাত, এমন-তেমন হলে দেবাদিদেব সেই ক্ষ্যাপা ত্রিশূলীর তৃতীয় নয়নের পাবক-রোষ কেউ-ই এড়াতে পারবেন না।

পঞ্চভূতের জনমদাতা বাপের বাবা হরা
তিন নয়নে জেগে আছেন সাক্ষীসাবুদ খাড়া,
ইষ্ট ছাড়া দৃষ্টি যিনি দেবেন বাঁকা চোখে
ঠিকরে আগুন ত্রিনয়নের মরবে সে জন ধুঁকে।

ছড়া কাটিয়া দুই গালে ডম্বরু বাজাইয়া উঠিল রামনাথ গম্ভীরে। যে শুনিল তাহার বুকের ভিতরটাও গুর-গুর করিয়া উঠিল শঙ্কায়। কে জানে, ভূতসিদ্ধ তান্ত্রিক রামনাথ তাহাদিগকে আজ কি পরীক্ষায় ফেলিবে! অনেকেরই এখন মনে হইতে লাগিল, ঘটা করিয়া আগে-ভাগে আসিয়া আসর না জমাইলেই ভাল হইত।

পূর্ব্বাদেব সাক্ষী করিয়া সব কাজ নিষ্পন্ন করিতে হইবে। রামনাথ আস্তে আস্তে আগাইয়া গিয়া মন্ত্রপূত মাটির টিপটি সযত্নরক্ষিত তৈলাধারে গুঁড়-গুঁড়া করিয়া ছিটাইয়া দিল। তার পর তেত্রিশ কোটি দেবতার শুভেচ্ছা গোটা অনুষ্ঠানের মাথায় টানিয়া অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের চরণ-বন্দনা করিল।

বদ্ধকৃতাঞ্জলিপুট তান্ত্রিক রামনাথের সে এক অপূর্ব্ব ভক্তিগাথা। মনে মনে সকলেই মাথা নোয়াইয়া দিল রামনাথের চরণে।

কিছুক্ষণ পরে রামনাথ ধ্যান ভাঙিয়া চোখ খোলে। আজুরীর কপালে খানিকটা গোলা সিঁদুর লেপিয়া দিয়া বলে, একটা দানবে ধরেছে মা-লক্ষীরে বাবুরা। তৈলাধারের দিকে চেয়ে এইবার আপনারা বিধান দেবেন আসুন।

রামনাথের কথায় সকলেই নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল বটে, কিন্তু তৈলাধারের দিকে আগাইয়া যাইতে সকলেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সুকঠিন কর্ত্তব্যের আহ্বানে হালকা কৌতূহলের আতিশয্য এখন আর নাই বলিলেই চলে।

বিপ্রদাস ঠাকুর ঢোক গিলিয়া বেণী ঘোষের হাঁটুতে ঠেলা মারিয়া বলেন, যান দেখুন বিচার করুন গিয়ে।

রাসভারী বেণী ঘোষ সহজে বিচলিত হইবার পাত্র নহে। খ্যাক্-খ্যাক্ করিয়া হাসিয়া বলে, আপনি থাকতে······যা হয় একটা দেখে-শুনে সাব্যস্ত করে দিন।

পিছনেই বসিয়াছিল সিধু ভটচায। কর্ত্তব্যের গুরুত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়া বেণী ঘোষকে শুনাইয়া বলে, 'যা হয় একটা সাব্যস্ত' করাটা কি নেহ্য হবে!

'যা হয় একটা সাব্যস্ত' কথাটাতে সত্য অপলাপের. যে কিছু মাত্র ইঙ্গিত করা হয় নাই বেণী ঘোষ হয় তো সেই কথাটাই জোর-গলায় বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় মিত্তির-গিন্নী "এ কি দেখলাম যে হারাণ" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন। কপালের উপর দুই চোখ ঠেলিয়া উঠিল মিত্তির-গিন্নীর।

শত চেষ্টা করিয়াও কৌতূহল চাপিতে পারে নাই বুড়ী। হঠাৎ তেলের বাটির উপর নজর পড়িয়া গিয়াছে।

সিধু ভট্‌চাযের পিছনেই বসিয়াছিল হারাণ মিত্তির। চীৎকার শুনিয়া সে এক লাফে বেণী ঘোষের মাথা ডিঙাইয়া বৃদ্ধা মা-কে আগলাইয়া ধরিল, কি হয়েছে কি মা ?

বৃদ্ধার মুখে কথা জোয়ায় না। ফোকলা মুখের ভিতর হইতে অনর্গল একটা ছি ছি শব্দ তুবড়ির মত বাহির হইতে থাকে।

দুর্নিরীক্ষ্য বন্যার অস্পষ্ট বাঁধ অনিরুদ্ধ কৌতূহলোচ্ছ্বাসে কুটার মতো ভাসিয়া যায় মুহূর্ত্তে। দেখিতে দেখিতে শত চক্ষু উপুড় হইয়া পড়ে তৈলাধারের উপর। বিপ্রদাস ঠাকুর ছুটিয়া গিয়া চক্ষুকে মাথাটা হারাণ মিত্তিরের কাঁধের পাশ দিয়া গুঁজিয়া দিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। সিধু ভটচায চেঁচাইয়া বলে, একবার দেখুন পণ্ডিত মশাই আছেন কোথায়! কোন সমাজের মাথা হ'য়ে আছেন একবার দেখে যান চোখ খুলে। একেবারে হৈ-চৈ বাধাইয়া দিল চীৎকার করিয়া সিধু ভটচায।

বার-বার তিন বার—তৈলাধারের উপর মুখ ঝুঁকিয়া দেখিয়া বিপ্রদাস ঠাকুর সিধু ভটচাযের ঘাড়ে হাত দিয়া সরিয়া দাঁড়ান। মাটিটাই হয়তো তাঁহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছিল।

এত উদ্দীপনা এত উৎসাহ কিন্তু তৈলাধারের দিকে তাকাইবার পর হইতেই সকলে যেন কেমন হতভম্ব হইয়া যাইতেছে। খটকা লাগে বেণী ঘোষের। কেমন যেন একলা-একলা মনে হয় হঠাৎ। বিশেষ করিয়া সিধু ভটচাযের সহিত বিপ্রদাসের যোগাযোগটা তাঁহার আদৌ ভাল লাগে না।

সামাজিক প্রতিষ্ঠার দাপট অমনি চাড় দিয়া ওঠে বেণী ঘোষের মাথায়। বিপ্রদাস হইতে সিধু ভটচায পর্যন্ত সমস্ত মানুষগুলাকে মনে হয় নগণ্য—ছোট-ছোট। এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত আলোচনার কেন্দ্রগুলি মনে হয় গরু-বাছুরের জটলা। হাসি পায় বেণী ঘোষের।

দূরে ঢেঁকিশালের বারান্দায় মালাকার গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ বেণী ঘোষকে সামনে দেখিয়া সে উঠানে নামিয়া আসিল। করজোড়ে বলিল, এইবার তা ইনি আপনারা যা হয় একটা আদেশ করুন বিচার করে। আমি আর কি বলব।

বেণী ঘোষের কথায় ক্ষুব্ধ অভিমানের ঝন্‌ঝনা বাজে: আমি আর দেখে কি করবো? ঐ তো ওঁরাই দেখলেন, ওঁরাই শুনলেন…

আপ্যায়ন করিয়া ডাকিয়া দেখান হয় নাই—সেই অভিমানে কর্ণমূল লাল হইয়া ওঠে বেণী ঘোষের।

ছুটিয়া আসেন বিপ্রদাস ঠাকুর বেণী ঘোষের গলা শুনিয়া। বাধ্যবাধকতার শতসূত্রে বাঁধা এই যজমানী জীবন বেণী ঘোষের রোষভাগে মুহূর্তে বিকল হইয়া যাইতে পারে। বুড়া শিবমন্দিরের সেবাইতিটা গেলেই তো জগৎ অন্ধকার। অথচ সত্য ঘটনা বিকৃত করিয়া কোনক্রমেই বেণী ঘোষের মনতোষণের অবকাশ নাই—জীবন বিপন্ন হইবে ত্রিশূলীর কটাক্ষে। মহা মুস্কিল বিপ্রদাস ঠাকুরের।

বেণী ঘোষই আগে কথা পাড়ে: তা হ'লে বিচার করে সাব্যস্ত করে দিন একটা। গরীব মানুষ…রায় আর কতক্ষণ ঝুলিয়ে রাখবেন!

গাছে তুলিয়া মই কাড়িয়া লইতে সিধু ভটচায সিদ্ধহস্ত। হঠাৎ আলোচনার সূত্র ধরিয়া রৈ-রাই করিয়া চেঁচাইয়া বলে, বাঃ, তা কি করে হয়। ঘোষ মশাই না দেখলে রায় সম্পর্কে কোন কথাই উঠতে পারে না। ঘোষ মশাই আর পণ্ডিত মশাই—এঁরাই তো বলবেন। আমরা তো ফালতু। চুলের উপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি ঠেকাইয়া নিজেকে এমন অকিঞ্চিৎকর করিয়া তোলে সিধু ভটচায যে বেণী ঘোষ খুশী না হইয়া পারেন না।

সিধু ভটচাযের কথা শুনিয়া বিপ্রদাস ঠাকুরও হাউ-মাউ করিয়া চেঁচাইয়া বলেন, না সে তো অবশ্যই, ঘোষ মশাই না দেখলে…

না চাহিতেই শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে চারি দিক্ হইতে এই অনকুণ্ঠ আনুগত্যের স্বীকৃতি বেণী ঘোষের অন্তর রসাপ্লুত করিয়া তোলে। এক গাল হাসিয়া বলে, দেখতে বলছেন দেখছি। তবে প্রত্যক্ষ সত্য যা তা তো আপনারাও দেখলেন। আপনাদের কথাই আমাদের কথা।…কই, কোথায় তৈলাধার?

হর্ষ দুঃখ কৌতুক—যুগপৎ অনেকগুলি ভাবের সংমিশ্রণে পিছনে দাঁড়াইয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল হারাণ মিস্তির। এত বড় নাটকীয় ঘটনা জীবনে সে আর কখনও দেখে নাই। রুদ্ধ নিশ্বাসে সে শুধু নিরীক্ষণ করিতে লাগিল বেণী ঘোষকে।

বিপ্রদাস ঠাকুরের মুখে কথা নাই। তিনি শুধু সিধু ভটচাযের মুখের দিকে তাকাইয়া বার বার বিহ্বল হইয়া পড়িতেছেন।

ঘটনা এখন একটা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অনিবার্য্য গতিতে আগাইয়া যাইতেছে। অভিনেতা সিধু ভটচায এখন সেই নেশায় মাতাল হইয়া টলিতেছে। বিমূঢ় বিপ্রদাসকে আশ্বস্ত করিবার মত এখন আর তাহার মেজাজ নাই। গুরুগম্ভীর পরিস্থিতির মাঝখানে বিপ্রদাস ঠাকুরের হাতে সজোরে একটা চাপ মারিয়া সে বলিয়া ওঠে, কি করছেন, সরে যান আপনি এখান থেকে।

সামনেই মন্ত্রপূত সেই তৈলাধার। ভূতসিদ্ধ রামনাথ ওঝার তান্ত্রিক ক্ষমতার অপূর্ব্ব স্বাক্ষর ঝিম ধরিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া আছে কালো পাথরের বাটিতে। বেণী ঘোষ ঝুঁকিয়া তাকান।

অনিরুদ্ধ আবেগ হঠাৎ হারাণ মিস্তিরের নাভিস্থল হইতে ফাটা শঙ্খের আওয়াজে ঠেলিয়া বাহির হয়, আই রে সিধু…

আনন্দে নয়, আচমকা ভয় পাইয়াই শিহরিয়া উঠিল, সে শব্দ যার কানে গেল।

নির্ভয় শুধু বেণী ঘোষ। চোরা খাদে পা ফেলিয়া বেণী ঘোষ এখন মদমত্ত ঐরাবত। লজ্জা আর ক্ষোভে প্রকাণ্ড বনিয়াদী মুখখানা তাহার রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। মাথাটা ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে অপমানে। পলাইবার পথ নাই। নিথর একটা স্তব্ধতার গুমোট যেন অবরোধের প্রাচীর তুলিয়া ধরিয়াছে তাহার চার দিকে। সহস্র কণ্ঠ তাহার কানে-কানে যেন একটা কথাই বার বার বলিতেছে, বিচার চাই বিচার চাই।

কারো মুখে টুঁ শব্দটি নাই। অস্বাভাবিক রকম থমথমে একটা অবস্থা যেন বুক চাপিয়া ধরিয়াছে প্রত্যেকটি মানুষের। এমন সময় দৈব আর মানুষী শক্তির বিরুদ্ধে বেণী ঘোষ হঠাৎ দানবের চীৎকার করিয়া উঠিল, আমি মানি না তোমাদের বিচার, যাও।

আসুরিক পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল বেণী ঘোষ।

রামনাথ ওঝা ঢেঁকিশালের বারান্দায় এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ফোঁস করিয়া লাফাইয়া উঠিল আল-কেউটের মত। ধ্বক্-ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল তান্ত্রিকের দুইটা চোখ।

সকলেই দেখিল, বিদ্যুৎএর মতই একখানি আগুন বন্-বন্ করিয়া বেণী ঘোষকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া গেল।

সিধু ভটচাযের কৌতূহল অপরিসীম। ত্রস্ত পায়ে আগাইয়া গিয়া সে দেখিতে লাগিল আগুনটা ঠিক বেণী ঘোষের গায়ে লাগে কি না।

পলাতকা

শ্রীশিশির সেনগুপ্ত

বহু দিন পরে রজত লাহিড়ীর চিঠি পেল যুথিকা।—'কেমন আছো? আশা করি রজতকে ভোলোনি! সত্যিই কলকাতায় যাচ্ছি। তোমাদের বাসাটা চিনে যেতে পারব না। হয়ত বা সে বাসাতে নেই-ই তোমরা। সাতই তারিখে বিকেল পাঁচটায় এসপ্লানেডের ট্রাম-ছাউনীর নীচে দাঁড়িয়ে থাকো যদি খুব খুশী হব। দেখা হওয়া চাই-ই।'

এ চিঠি এসেছিল দুপুরে। যুথিকা যখন ফিরল স্কুল থেকে তখন সন্ধ্যা হব-হব। আজ সারা দিন তার বড় খাটুনি গিয়েছে। ক্লাস নিতে হয়েছে পাঁচটা—তার পর মিটিং ছিল। সে সব শেষ করতে বেলা পড়ে এল। তার পর বাদুড়-ঝোলা ট্রামের আশা ছেড়ে দিয়ে হেঁটেই রওনা হোল যুথিকা। সারা শরীর ঘামে টস-টস করছে। মাথার ভেতর যেন চরকী ঘুরছে, বন-বন—বন-বন। মুখের চেহারাটা পানের দোকানের আয়নায় দেখে যুথিকা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

বাড়ীতে ঢুকেই যুথিকা প্রথমে কল-ঘরে গিয়ে ঢুকল। ভালো করে গা না ধুয়ে সে স্থির হতে পারছে না।

কল-ঘরে জলের শব্দ হতেই মায়ের গলা পেল সে। 'কে রে, যুথি এসেছিস না কি?'

গুন-গুন করে গান গাইছিল যুথিকা—মায়ের সাড়ায় জবাব দিল না সে।

অনেকক্ষণ ধরে শরীর জুড়োতে লাগল যুথিকা। ঠাণ্ডা হয়েছে গা। জলের ধারায় যেন সারা দিনের ক্লেদ ধুয়ে-মুছে গেল, শুধু শরীর থেকেই নয়—মন থেকেও। আরাম করে একটা নিশ্বাস নিলে সে। আঃ, কি আরাম! একটা আয়না যদি থাকত কল-ঘরে। স্নানের আনন্দ আরো কত বেশী করে পাওয়া যেত। মৃদু হাসল যুথিকা। আয়না! শখ বৈ কি। স্নানের বালতিটা ফুটো হয়ে গিয়েছে। ছড়-ছড় করে জল পড়ছে।—ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ছোট দরজাটি বন্ধ করে দিলে আর নিজেকে চেনা যায় না। দেওয়ালগুলি জল লেগে লেগে নোণা ধরে গেছে। মাথার উপর ঝুল আর মাকড়সা। আরসোলারা ঘোরাঘুরি করে। তাদের কেমন একটা গা-ঘিন-ঘিন করা গন্ধ।

যুথিকা ভিজে কাপড়ে বেরিয়ে এল। তার পর নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিলে। ভাইটি এখনও খেলে ফেরেনি। তার বই-পত্তর ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে বিছানার ধারে।

ভায়ের কথা মনে হতেই যুথিকার মুখটা ভারী হয়ে গেল। আজ রাত্রে সে রবিকে ধমকাবে। দরকার হলে মারবে। মা যাই বলুক—কিছুতেই সে তাকে ছাড়বে না। সকাল বেলা সে পরিষ্কার দেখেছে বারো বছরের ভাই রবি সাহাদের ছেলেটার সঙ্গে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। ও যদি উচ্ছন্নে যায় এ সংসার কে আর ধরে থাকবে।

বারো বছরের রবি মানুষ হয়ে এক দিন তাদের সংসারকে বাঁচাবে এ আশা করে যুথিকা। বড়দা এখন থেকেই যে সুর ভাঁজছেন তাতে আর বেশী দিন তার ভরসা করে না যুথিকা। শুধু মাকে আর ছোট ভাইকে বোনের রোজগারের ভরসায় ফেলে রেখে গেলে হয়ত সম্ভ্রম হানি হবে তাই তিনি এখনো টিকে আছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি ক আর চিরকাল সকলের সঙ্গে এমনি দুঃখের ভাত ভাগ করে খেতে রাজী নন।

দরজায় ধাক্কা দিয়ে মা ডাকলেন তাকে। 'কই রে যুথি, তোর হোল না এখনও।' যুথির ততক্ষণে সারা হয়ে গেছে। সময় একটু বেশীই লেগেছে। তার দোষটাই বা কি। শাড়ীগুলো গুছিয়ে পরতে আজকাল বড়ো সময় লাগে। ফাটাফুটি ঢাকা দিয়ে সামনে গায়ের উপর ছড়িয়ে দিতে বড্ডো টানাটানি পড়ে যায়। ছিঁড়েও আসছে সব কাপড়গুলো।

মা তাকে দেখেই আহ্লাদে আটখানা হলেন। বললেন—'বাঁচলুম বাবা! এত দিনে ছেলের যে মনে পড়েছে এই না ভাগ্যি!'

যুথি ত অবাক। 'সে আবার কে? কার মনে পড়ল?'

মা বললেন—'রজত চিঠি লিখেছে রে। তোকে কাল ছাউনিতে দাঁড়িয়ে থাকতে লিখেছে।' বলে মা তার হাতে

চিঠিখানা দিলেন—'নে, পড়ে দেখ—আর কাল বাপু একটু সকাল করে ছুটি নিয়ে গিয়ে ঠিক দাঁড়াস। সে আবার না ফিরে যায়।'

খামখানা হাতে নিল যুথি। ঘরের হ্যারিকেনের আলোর পাশে গিয়ে বসে সে চিঠি খুলল। নীল কাগজখানা মাটিতে বিছিয়ে তার ওপর হুমড়ি খেয়ে বসে পড়তে লাগল যুথি। আর তার মনের সমুদ্রে অজস্র তরঙ্গ-ভঙ্গে কতো হারাণো ঘটনার উত্থান-পতন হতে লাগল।

ছোট্ট, একটুখানি চিঠি লিখেছে রজত। হাতের লেখা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে। তা হবে না-ই বা কেন? সাহেব হয়েছে সে আজকাল। বাংলায় কি আর দরদ আছে?

ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই। যুথিকার কাঁদতে ইচ্ছে হোল একবার। ভুলে যাওয়া বড় সহজ কি না সংসারে? যে শূন্য হাতে থাকে সে ভোলে না। যার চারি পাশে ঐশ্বর্য জমে উঠতে থাকে সেই বরং মনে রাখতে পারে না সব। তুমি যদি না ভুলে থাকো—আমি ভুলিই বা কি করে? ভাবতে পারলে?

বৌদি পিছনে দাঁড়িয়ে বললে—'কি লো কন্যে, রাজপুত্তুরের চিঠি নিয়ে যে একেবারে উন্মন হয়ে গিয়েছ!'

ধড়মড় করে উঠে বসল যুথিকা। 'কি যে ঠাট্টা কর তোমরা। কোন মানে-মাথা নেই।'

ঠোঁট বেঁকিয়ে বৌদি বললে—'ও-সবের বাপু আমরা সত্যিই কিছু বুঝি না। সমাজে দাঁড়িয়ে আরো পাঁচটা মেয়ের মত বাপ-মায়ের পছন্দ-করা বরের গলায় মালা দিয়েছি—তোমাদের মত গন্ধর্ব বিয়ে কাকে বলে তা জানিও না—জানতেও চাইও না বাবা কোন দিন।'

মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল যুথিকা। বৌদির গলার তিক্ততায় তার মনের অমৃতটুকু বিষিয়ে উঠল। একটা তেমনি ধরণের জবাব দিতে গিয়েও সে থেমে গেল। ভিতরের থেকে কে যেন তার গলা চেপে ধরল।

বৌদি বললেন—'তা আজ কি খাবার-দাবার সব বন্ধ না কি? ঐ চিঠির বাক্যি গিলে কি পেট ভরছে না কি ঠাকুরঝির।'

যুথিকা শুধু বললে—'আমি যাচ্ছি বৌদি? তুমি এগোও।'

বৌদি চলে গেলে অনেকক্ষণ বসে বসে এলোমেলো কি সব ভাবলে যুথিকা। অসংলগ্ন সব চিন্তা মনের আনাচে কানাচে চোরাবালি হতে সরীসৃপের মত আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। তাদের কোনটায় সে শিহরিত হোল, কোনটায় বা সে লজ্জায় মুখ ঢাকলে।

মা বৌদি সবাই তার চিঠি খুলে পড়েছেন। ট্রাম-ছাউনির কাছে গিয়ে ঠিক সময়ে দাঁড়াবার কথা মা-ই প্রথম বলেছিলেন মনে পড়ল। রজতের চিঠি এসেছে এ আনন্দ সংবাদে তখন আর ও-সব কথা খেয়ালই করেনি সে। এখন এই অনধিকারের কুৎসিত চেহারাটায় তার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল।

চায়ের দু'টি বাটি হাতে করে মা এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন—'যুথি, চা'টা খেয়ে একটু জিরিয়ে বস দেখি। রজত এলে তাকে কি করে আপ্যায়িত করা যাবে একটু বলাবলি করে নি।'

চায়ের বাটি মায়ের হাত থেকে নিয়ে যুথি থিতিয়ে বসল। তার পর বললে—'তুমি আমার চিঠি খুলেছ কেন মা?'

—'তাতে হয়েছে কি? কে তোমায় চিঠি দিচ্ছে সেটা আমার জানা দরকার নয়? আইবুড়ো সোমথ মেয়ে, যে-সে তোমায় চিঠি দেবে না কি?'

আজ সন্ধ্যায় কিছুতেই নিজের মস্তিষ্কের সুস্থতা হারাবে না এ পণ যেন করেছিল যুথিকা। তাই তেমনি কোমল কণ্ঠেই বললে—'তাই বলে খুলবে?'

—'তুমি কোথায় কার সঙ্গে কি করছ, সেটা আমাদের জানার এক্তিয়ার নেই বুঝি? তুমি একটা কাণ্ড করে শেষে লোক হাসাবে, এ হতে দেবো আমি জ্যান্ত থাকতে? তোর বাপ থাকলে তাহলে সাত জুতো মারত তোর মুখে।'

একটুখানি বাঁকা পথে গেলেই এরা কতো কটু আর নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে তাই ভাবলে বুঝি যুথি। তার পর বললে—'থাক্ তাহলে, রজত আসবে এই তোমার ধারণা ত মা?'

মা একগাল হাসলেন—'আসবে বই কি। তার মাসিমার খবর নিতে আসবে না? তাছাড়া তোর বাপ দেখে যেতে পারেনি, কিন্তু আমি দেখে যাবো বৈ কি। রজত কি না করেছে আমাদের জন্যে? তুই ত সব জানিস।'

—'মা'—বৌদির গলা পেল যুথিকা। দ্রুত পায়ে আসছে বৌদি—হাতের চুড়ি খন-খন করে বাজছে।

'কি হোল?'—মায়ের গলা যেন ঝিমোনো।

—'এক কৌটা চিনি থাকতে দেবেন না বাড়ীতে? কাল এক-পো চিনি আনিয়েছি—এরি মধ্যে সাবাড় করে বসে আছেন?'

—'আমি বুঝি ডেলা-ডেলা চিনি খাচ্ছি, না? মুখপুড়ী বৌয়ের কথা শোন। আর যদি খেয়েই থাকি তোমার তাতে কি বৌমা? আমার সংসারে আমি চিনি খাই—চাল খাই—তোমার তাতে কি? আর কাল সকালে বেশী করে চিনি চা আনিয়ে রেখো—রজত আমার বড্ডো চা খায়।'

বৌদিও মনের ঝাল মেটালেন—'রজত চা খায়—তার চা-চিনি যোগাবে তার মায়ের চেয়ে মাসী বড়ো। আমি তার সামনেই বেরুতে চাই না। কোথাকার না কোথাকার একটা ছোকরা—আকালের দিনে হাত উপুড় করেছিল আপনাদের সংসারে—তার জন্যে দরদে আর বাঁচি না!'

—'তুমি রজতকে নিয়ে কোন কথা বলো না বৌমা। তুমি তার কি জান—কি জান শুনি না?'

বৌদি জ্বলে উঠলেন—'দেখিনি বলে কি কানে শুনিনি না কি? সবই জানি। বলতে গেলে এখুনি ত কাঁদতে বসবেন পা ছড়িয়ে। তাই কোন কথা কই না।'

'বল—বল না—কি জান? কি জান বল না—তোমার বড্ড বাড় বেড়েছে। বলো—বলো কি জান? আমার মাথার দিব্যি দিলাম—বলো না কি শুনেছ—কি জেনেছ?'

—'সোমথ মেয়ে এগিয়ে দিয়ে সংসারের রাহা-খরচ আদায় করেছিলেন আবার কি? এমন জানলে আমার বাবা খোড়াই আমাকে দিতেন আপনাদের ঘরে। সেই রজতকে আবার মুখ দেখাতে পারবে ত ঠাকুরঝি?'

মুহূর্তে কি যেন একটা ঘটে গেল। চায়ের বাটিটা মায়ের হাত থেকে ঠিকরে গিয়ে লাগল বৌদির কপালে। কাটল কি কাটল কিছুই দেখতে পেল না যুথি। শুধু তার বিশ্বভুবন অন্ধকার করে একটা কালো ঢেউ গর্জে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর সেই তরঙ্গের ধাক্কায় কখন যেন অচেতন হয়ে গেল সে।

'বৌদি !'

আবার মৃদু কণ্ঠে ডাকলে যুথি—'বৌদি !'

দেয়ালে ঠেস দিয়ে বৌদি বসেছিলেন। কপালের ক্ষত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে—সেখানে কিছুটা রক্ত জমে আছে।

কাপড়ে রক্তের দাগ।

—'তুমি মুখটা ধুয়ে ফেল বৌদি—ওটুকু আমি বেঁধে দি।'

—'থাক—তুমি আর কষ্ট করো না ঠাকুরঝি। তোমার দাদা আসুন, এর একটা ফয়সালা হয়ে যাক।'

—'দাদা ? তুমি দাদাকে ও-কথা বলতে পারবে বৌদি ?'

বৌদি তেমনি শান্ত সুরে বললেন,—'আমায় বলতে হবে না—তোমার মা-ই আগে বলবেন।'

—'আমি মা'র মুখ চাপা দেবো। তুমি শুধু একটু মিথ্যা বানিয়ে বলো।'

—'সত্যি-মিথ্যে জানি না। জিজ্ঞেস করলে স্বামীকে সত্যি কথা বলাই আমার ধর্ম।'

—'তবে তাই হোক'—বলে যুথি উঠে এসে নিজের ঘরে বসল।

রবি এসে ঘরে ঢুকল। দিদিকে দেখে বললে—'বড় ক্ষিদে পেয়েছে—আমায় খেতে দাও।'

—'আমি দিতে পারব না। মা'র কাছে যা।'

ঝড়ের সমস্ত ঝাপটাটুকু ধুয়ে-মুছে একেবারে পরিষ্কার করে দেবার পণ যুথির। আজ ও কিছুতেই হার মানবে না।

রবি ততক্ষণে মার কাছে গিয়ে তম্বি করছে—'দেবে 'কি দেবে না বলে দাও—আমার ক্ষিদে পেয়েছে।'

মা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'চুলোয় যা—চুলোয় যা হারামজাদা।' কিন্তু রবি ছাড়বার পাত্র নয়—চেঁচামেচি সুরু করে দিল। তখন মা উঠে তাকে দুড়দাড় করে পিটতে সুরু করলেন—'হারামজাদা—অলপ্পেয়ে ছেলে! মর না—মর না। কেন তোদের আমি গরভে ধরেছিলাম। তোরা বৌ-চলানো পুরুষ—ঘরের কথা সেই ত আবার কাল সাপের কানে ফিসফিসিয়ে বলবি।'

যুথি দৌড়ে উঠে এল। রবিকে বুক দিয়ে আড়াল করে বসল। মা তাকে দেখে বললেন—'যা যা—যার সঙ্গে হয় চলে যা না। তোর বাপ যদি তোর চলানির পয়সায় ওষুধ খেয়ে থাকে—যদি খেয়ে থাকে সে যেন নরকে পচে। আর তোর দাদা! সে কম নেশা করেছে রজতের পয়সায় ? সে পয়সায় যেন তার কাল ধরে।'

রবিকে বুকের ভেতর আড়াল করে যুথি বসে রইল। মা কখন সরে গেছেন—তাও টের পায়নি সে। এখন তার কান্নার গোঙানি কানে আসছে।

রাত সরছে।

দাদা এলেন। বৌয়ের কপালের ক্ষত দেখে রাগারাগি করলেন প্রথমটা। সব শুনল যুথি। আর মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল যে সে যেন মরে যায়। তার সম্ভ্রম নিয়ে আবার যদি কুৎসিত ঝগড়া বেধে ওঠে মায়ে-বেটায়, শাশুড়ী-বৌতে—তাহলে সে জানবে ভগবান নেই। কোথাও নেই। কোন দিন ছিল না।

কিন্তু দাদা অদ্ভুত ভাবে শান্ত হয়ে রইলেন। বৌদিই তাকে ঠাণ্ডা করেছেন। ছুটি হাত জোড় করে যুথি এক বিরাট শূন্যতাকে প্রণাম করলে। কি যে বললে তা সে নিজেই জানলে না।

সমস্ত বাড়ীটা নিঝুম হয়ে পড়ে আছে। আজ কেউ খায়নি। মার খেয়ে অবধি রবি সেই যে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছে যুথির কোলে আদরেই আর সাড়া দেয়নি।

রবির গায়ে হাত দিয়ে যুথি শুয়ে শুয়ে এক অন্ধকার জগতে হাতড়ে বেড়াতে লাগল। তাকে ঘিরে চারি পাশে ঝম-ঝম অন্ধকার। কোথাও আলো নেই—দয়াহীন, মমতাহীন, আশ্রয়হীন এক নিষ্ঠুর অন্ধকার যেন তার বুকের উপর জগদ্দলের মত বসে রইল। আর একটুখানি আলোর জন্যে যুথি আকুলি-বিকুলি করতে লাগল।

তার পর এক সময় সেই অন্ধকার যেন পাতলা হয়ে এল। একটা টিম-টিম আলো সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন কার চোখের স্নিগ্ধ আলোর জ্যোতি অনির্বাণ ভাবে জ্বলতে লাগল।

রজত! কতক্ষণ বাদে তবে যুথির স্মৃতির পটে রজত এসে দাঁড়াল। কেমন যেন আধ-চেনা-চেনা লাগছে রজতের চেহারা।

রজতের কথা মনে হতেই যুথির বাবার কথা মনে পড়ল। বাবার চোখে কি যে নিরীহ ভীরু চাউনি ছিল। যেন সবেতেই হার মানছেন—যেন দুনিয়ার কোথাও তার নিজের জমি নেই।

দাদার বন্ধু ছিল রজত। দাদাই তাকে পরিবারে এনে পরিচিত করে দিয়েছিলেন। তখন যুথি কলেজে মাত্র ঢুকেছে।

'দিদি!'

রবির কাঁপা গলায় যুথি চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি গা ফিরিয়ে বললে—'কি রে?'

—'মা কেন আমায় মারবে?'

—'তুমি দুষ্টুমি করলে তোমায় মারবে না? তুমি সাহাদের ছেলের সঙ্গে বিড়ি টানছিলে কেন?'

দিদির বুকের ভেতর মুখ গুঁজে রবি চুপটি করে পড়ে রইল।

যুথি তখন ভাইকে আদর করে বলতে লাগল—'তুই ভালো ছেলে হবি ত রবি—নইলে আমাদের কত দুঃখু হবে বল ত?'

কতক্ষণ রবি চুপ করে রইল। তার পর ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে—'দাদা জুতো মারবে কথায় কথায়—মা বলবে, হারামজাদা মর না। তোমাদের দুঃখু ঘোচাতে আমার বয়ে গেছে। আর একটু বড়ো হয়ে আমি যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাব। কারুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না।'

—'তাই ভালো। তোরা সবাই চলে যাস। দুই ভায়েতে চলে যাস। আমি আর মা ভিক্ষে করে চালিয়ে যাব যত দিন পারি। তাতে তোদের বেশ মুখ উঁচু হবে ত?'

তার পর দু' ভাই বোন আবার চুপ-চাপ হয়ে গেল।

আবার একটা অন্ধকার দেয়াল আড়াল করে দাঁড়াল যুথির দৃষ্টি।

দাদা সিগারেট চেয়ে চেয়ে খেত। দোকানে গিয়ে চপ-কাটলেট খেয়ে আসত। সিনেমা-থিয়েটারে সঙ্গী হোত রজতের। তখন দাদা ছিল বেকার। এক পয়সা রোজগার ছিল না।

বাবা সেই রিটায়ার হয়েছেন। সংসারে আয় তখন একেবারে শূন্যের পাতায়। অথচ খরচ কত সংসারে।

সত্ত ঘুম-ভাঙা একটি কিশোরীর মনে যদি রেখাই পড়ে থাকে তাতে কি দোষ ছিল কিছু? সেদিন ত কোন অন্যায় ছিল না তার মধ্যে—কোন লোভ-প্রতারণার পিচ্ছিলতা। পৃথিবীকে ভালো লাগার আলোর চোখ ছিল স্নিগ্ধপ্রভ। তখন কে জানত, আলোর

আড়ালে সংসারের কোটরে কোটরে বাস করে পাপ? হিস-হিস করে চক্র বেড়ায় বীভৎস সাপ?

পাঁচটি বছর পরে আজ সেই পাপ ফণা তুলে তাকে ভয় দেখিয়েছে। ছোবল মেরে তার সমস্ত জীবনকে বিষিয়ে দিয়েছে।

এক সময় ঘুম তাকে মুক্তি দিলে। যুথির দু'টি ক্লান্ত চোখ ভরে ঘুমের বিভোরতা এল জোয়ারের মত। ভাসিয়ে নিলে তাকে ক্লেদ থেকে—নোংরামি থেকে—বেঁচে থাকার তিক্ত বিড়ম্বনা থেকে।

ভোর বেলা স্বপ্ন দেখলে যুথি। ট্রাম-ছাউনির কাছে দাঁড়িয়ে আছে রজত। পুরো বৈমানিকের সাজ। দুই কাঁধে দু'টি ঈগলের প্রতীক। পা থেকে মাথা অবধি গাঢ় নীল ভারী পোষাক। চেহারাটা আরো যেন ভারিক্কি হয়েছে। ধুতি-পাঞ্জাবীর চেনা রজতকে যেন ডাকতেই সাহস হচ্ছে না।

কিন্তু রজত এগিয়ে এসে যুথির লজ্জা ভাঙলে।

—'তাহলে তুমি এলে? চিঠি পেয়েছিলে ত? পেয়েছিলে নিশ্চয়ই—নইলে কি আর এসেছ?'

—'এক নিশ্বাসে এত কথার জবাব দেওয়া যায় না কি? দাঁড়াও, একটু দেখতে দাও। দু' দণ্ড ভাবতে দাও।'

কিন্তু রজতের আর তর সয় না। 'বাঃ—কথা কইছ না যে? এ্যাদ্দিন বাদে দেখা—চল ট্যাক্সি করি।'

যুথির আর ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই। একটা অশরীরী যাদুতে যেন সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে।

—'কোথায় যাবে বল? রজতের দুরাসন্ন প্রত্যাশা। সে প্রত্যাশা কিসের?

সহসা যুথিকা যেন আত্মহারা হয়ে গেল। রজতের কোলে উপুড় হয়ে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

—'কি হোল যুথি?'

—'তুমি আমায় নিয়ে পালিয়ে চল। আমায় বাঁচাও সংসারের হাত থেকে।'

রজত হাসল—'সংসারের হাত থেকে? বটে! তবে তাই চলো।'

কপালে চিন-চিন করে ঘাম হচ্ছে। ব্লাউজটা গায়ে রাখা যাচ্ছে না। ঘুম ভাঙতেই কি যে অস্বস্তি হতে লাগল।

রবির গা থেকে কখন হাত সরে গিয়েছিল। বালিশে মুখ গুঁজে কি বিশ্রী স্বপ্ন দেখলে সে। ভালো করে চোখ চাইলে যুথি ফর্সা হয়ে এসেছে পূবে।

সতেরো বছরের মন তার মরে গেছে কখন তা সে জানতেও পায়নি এক বছরে। আজ বাইশ বছরে তাতে পচন সুরু হয়েছে বুঝি।

সকাল বেলা দরজা খুলে বেরোতেই প্রথমে দাদার সামনাসামনি পড়ে গেল সে। অথচ এইটুকুই ভয় ছিল তার—ভয় ছিল তার সব থেকে বেশী। ইস্কুলে তাড়াতাড়ি যেতে হবে বলে সে সকাল সকাল পালাবে মনস্থ করে রেখেছিল। তার পর স্কুল সেরে আড্ডা দেবে কোন শিক্ষয়িত্রী বান্ধবীর বাড়ী। সেখান থেকে ফিরবে সন্ধ্যা ঘেঁসে।

তাহলে রজত? রজতকে আর সে দেখা দেয়? এতোতেও যদি তার জ্ঞানচক্ষু না ফুটে থাকে তবে আর কি! এর পরও যে অভাগী তার পিছনে ধাওয়া করবে তার যেন মরণ-দশা ঘটে।

—'হ্যাঁরে যুথি, আজ না কি রজত আসবে লিখেছে?'

নিস্পৃহ কণ্ঠে যুথি বললে—'দয়া করে লিখেছে।'

দাদা যেন আপন মনেই বললেন—'ওঃ, কত দিন পরে ওর সঙ্গে দেখা হবে। ছেলেটা কিন্তু ছিল বেশ। হাবা-গোবা গোছের। কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল ছোঁড়াটা। কখন আসবে রে? আজ একটু সকাল সকাল ফিরতে হবে।'

—'তুমি বরং এসপ্লানেডে গিয়ে অপেক্ষা করো না তার জন্যে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে।'

—'হ্যাঁ—আমি গেলে আবার চলে? তোকে লিখেছে তুই যাবি। আমায় তো আর লিখেনি।

—'আমার যাবার সময় হবে না বোধ হয়।'

যুথিকার গলার ঔদাসীন্যে দাদা একেবার গভীর করে তাকালেন তার দিকে। তার পর ঈষৎ শ্লেষ মিশিয়ে বললেন—'যাবি—যাবি। নিজের পায়ে কুড়ুল মারবি এমন বোকা মেয়ে তুই নস।'

আবার সেই অন্ধকারটা যুথিকাকে তাড়া করে এল। বললে—'তুমিও এ কথা বললে দাদা? বলতে পারলে এত বড় মিথ্যে কথাটা?'

তার কাঁধ চাপড়ে দাদা আবার বললেন—'সংসারটা কাজ গুছিয়ে নেবার জায়গা। না নিলে মরবি—পস্তাবি। বাস ঠিক সময় মত। আমারও দরকার আছে তার সঙ্গে। সামনে পূজোটা আসছে। তোদের সংসারে চালতে চালতে আমি একেবারে ফতুর হয়ে যাচ্ছি তো?'

—'তার মানে তাকে বাড়ীতে এনে একটা নোংরামি না করলে তোমাদের কারুর ভাল লাগছে না, এই ত? তার ঋণ সেই ভাবেই তোমরা শুধতে চাও—তাই না?'

তার দাদার মুখে এক বিচিত্র হাসি দেখতে পেলে যুথিকা। 'জানিস রে খুকী, স্বার্থপর হই আর যা হই অমানুষ নয় তোর দাদা। সাংসারিক জীব আমরা, আমাদের জন্যে তুই কেন দুঃখু পাবি? তুই ত লেখাপড়া শিখেছিস?'

এই সকাল বেলা দাদার মুখের কথায় কি যে ভালো লাগল যুথিকার। তার মনের কালো কালো পুঞ্জীভূত মেঘ যেন দাদার ঈশান কোণের ঝড়ের তাড়ায় কোথায় উড়ে চলে গেল—আর তাদের কোন দিশা রইল না।

—'বাস কিন্তু—ভুলিসনি।'—বলে দাদা কল-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

যাব—যাব। যুথিকার মনের ভেতর মাদলের তালে বাজতে লাগল দু'টি কথা।—যাবো—যাবো।

সারা সকাল সে উঠতে-বসতে নাইতে-খেতে সাজতে-গুজতে খালি শোনাতে লাগল নিজের মনকে—যাবো—যাবো।

কাল সন্ধ্যেবেলা যা হয়ে গেছে তা দুঃস্বপ্ন। দাদাকে সে যা ভাবে তা সত্যি নয়। মানুষ চেনা বড়ো শক্ত। তা সে রক্তের সম্বন্ধ হোক নাই বা কেন?

মা কথা কইলেন না তার সঙ্গে সারা সকাল ধরে। কিন্তু বৌদি তাকে আদর করলে।

—'কাল সারা রাত মাথার কটকটানিতে ঘুমুতে পারিনি ভাই ঠাকুরঝি। কি যে ক্ষ্যাপা রাগ হয়ে গেল কাল। এখন যন্ত্রণায় মরছি। তোমার দাদাও ত ছাড়ালো কৈফিয়ৎ। হলে নাই

বা কেন—পুরুষ মানুষ, খেটে-খুটে এলো অফিস থেকে। হাসিমুখ করে না দেখা দিলে একটা তিতিভাব আসতেই পারে তার মনে।'

—'তুমি কি বললে বৌদি ?

—'বললাম, ঠাকুরঝির সঙ্গে হাডুডু খেলতে গিয়ে পড়ে মাথা ফাটিয়েছি।'

হেসে বললে যুথি—'তাতে দাদা কি বললেন ?'

যুথিকার বাহুতে চিমটি কেটে মধুর হাসি হাসলেন বৌদি—বললেন 'কি গো ঠাকুরঝি—কি করলেন বলো।'

'যাঃ' বলে যুথি স্নানের জন্য প্রস্তুত হলো। খেয়ে-দেয়ে বেরুচ্ছে যখন যুথি তার পথ রোধ করে দাঁড়ালেন বৌদি। বললেন—'ছিঃ এ কি সাজ ?'

—'কেন বৌদি ?'

—'ঘরে এস'—বলে বৌদি তাকে ঘরে ডেকে নিলেন।

তার পর যুথিকার বিভ্রান্ত দৃষ্টির সামনে আঙুল তুলে বললেন—'সাজতে বলছি না আমি। তবে অনেক দিন পরে প্রথম দেখা হবে—একটু ছিমছাম হয়ে যাওয়াটা কি ভাল নয় ?'

—কিন্তু ইস্কুলে সবাই কি ভাববে বলো ত ?

—'বলবে নেমন্তন্ন যাবে।'

সুতরাং আত্মসমর্পণ করলে যুথিকা বৌদির কাছে। বৌদি তাকে নিজের একখানা পাতলা দুধ-শাদা শাড়ী দিলেন। গায়ে পরতে দিলেন ভয়েলের জামা। হাতে-মুখে একটু সাবান মাখিয়ে দিলেন। তার পর বললেন—'জানি না বাবা, তোমাদের আজকালকার মেয়েদের সাজের ঢঙ কি। চুলটা হাতে জড়িয়ে কাঁধের শিওরে রেখে দিও বাপু! তোমার ও-চুল নিয়ে এখন বসলে আমার বেলা পুইয়ে যাবে।'

যুথি একবার দেয়ালে ঝোলানো আয়নার দিকে তাকালে। অভিসারিণীর মত দেখাচ্ছে না কি তাকে ? সাজে-গোজে যতই মানান হোক—তবু কেমন যেন এলোমেলো ছড়িয়ে আছে সর্বাঙ্গে। সেটুকু তার চোখে পড়বেই।

মধুর মন নিয়ে যুথি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রোজকার মত মা'র পায়ে প্রণাম করে সে ইস্কুলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। মুখ ফেরানোই ছিল মায়ের। যুথি শুধু শুনলে তার পিছনে মা বললেন—'বোকা মেয়ে।'

মায়ের কথায় আর সে সাড়া দিলে না।

পিরিয়ডের পর পিরিয়ড এগিয়ে চলল একটানা। তার মধ্যে ভাববার অবকাশ নেই—একটু হাঁফ ছাড়ার অবধি সময় পাওয়া যায় না। ইতিহাসের নানা যুগে রয়েছে মেয়েরা। কোন শ্রেণী পড়ছে কনিষ্কের পর ভারতবর্ষের অন্ধকারময় যুগ—কেউ পড়ছে ইংলণ্ডের স্বেচ্ছাচারী রাজাদের কীর্তি-কাহিনী।

মধ্যে একটা পিরিয়ড ছুটি ছিল। সে সময়টুকুও জিরোতে পারলে না সে। বাংলার একটা ক্লাস নিতে হোল তাকে।

যাক্, শেষে ছুটির ঘণ্টা পড়ল।

যুথি আর অপেক্ষা করলে না। সোজা বেরিয়ে পড়ল এস্‌প্ল্যানেডের ট্রাম-ছাউনির উদ্দেশ্যে। রজত যদি কথা ঠিক রাখে তাহলে যুথি গিয়েই ধরতে পারবে তাকে। আর সামরিক শৃংখলায় আবদ্ধ রজত কথার ঠিক রাখবে বই কি!

ট্রামে উঠে বসল যুথি। চলো—চলো। এগিয়ে চলো—পালিয়ে চলো।

তাই বলে সংসার থেকে পালিয়ে নয়।

সংসার থেকে পালিয়ে। ভোর রাত্রের দুঃস্বপ্নের কথা মনে পড়ল যুথির। আর সেই দিনের বেলা তার সমস্ত সত্তা রী-রী করে উঠল। রজতকে নিয়ে পালিয়ে সে কি আবার সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তেই আটকা পড়বে না ? কি করে অমন স্বপ্ন দেখল সে ? তার অবচেতন মন কি কুশ্রী মানসকেই না বহন করছে।

ভাবতে ভাবতে ট্রাম-ছাউনি পৌঁছে গেল যুথি। নিরালা দেখে একটি জায়গা বেছে সে দাঁড়াল রজতের প্রতীক্ষায়। হয়ত রজত আসবে মিলিটারী পোষাকে। হয়ত হাত ধরে দাঁড়ালেও যুথি তাকে চিনে নিতে পারবে না।

বোকা মেয়ে! তার পিঠের কাছে মায়ের গলা শুনতে পেল যেন সে। বোকা কিসে ? সেজেছে বলে ? বৌদির সঙ্গে ভাব করেছে বলে ? দাদাকে বিশ্বাস করেছে বলে ?

ধীরে ধীরে যুথির মনে সেই ধূসরতা নেমে এল। মন নীচ সন্দেহে দুলতে লাগল। হয়ত যুথিকাকে মাঝে রেখে দাদা তাকে আরো বেশী করে শোষণ করবে। জানতেও পারবে না যুথি। হয়ত দাদা বৌদি মিলে সেই ষড়যন্ত্রই করেছে। নইলে অত-বড় কথার পর বৌদি তাকে সাজাতে বসবে কেন ?

মা আর রবিকে ভাসিয়ে দেবে না কি সে নিজের সুখের জন্যে!

কি একটা অস্বস্তি হতে লাগল যুথির মনে। বিপরীত তরঙ্গের ধাক্কায় ধাক্কায় তার ক্লান্ত মন ভেঙে পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে শরীরও যেন শ্লথ হয়ে এল।

ঠিক সেই সময় ট্যাক্সি থেকে নামল রজত। ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা সেই পুরোনো রজত। ঠিক তেমনি। ঠিক তেমনি।

আর একটা তরস্ত ভয়ে যুথিকা কেঁপে উঠল। তার পর সারা শরীর ঝাঁকিয়ে মুখ ফিরিয়ে দৌড়লো উল্টো দিকে।

তার পিছনে সহস্র কণ্ঠে মায়ের কথা প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল। বোকা মেয়ে! বোকা মেয়ে!

ভূকম্পনের উৎস নির্ণয়

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস

ভূমিকম্পের মত ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় পৃথিবীতে আর দু'টি নেই। বন্যাও ভূমিকম্পের চেয়ে কিছু কম নয়, তবে বন্যা পৃথিবীর সর্ব্বত্র হয় না। যেখানে বিরাট জলরাশি আছে তারই আশ-পাশে বন্যা হয়। ভূমিকম্পের প্রকোপ সর্ব্বত্রই দেখা যায়। কোন বিরাট জলরাশির তীরবর্ত্তী ভূখণ্ডে ভূমিকম্প হলে সে জলরাশিও তার প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারে না। জল-বক্ষে প্রথমে ওঠে উত্তাল তরঙ্গরাশি, তার পর তা বিরাট আকারে বন্যার সৃষ্টি করে সমস্ত আশ-পাশ ধ্বংস করে দেয়।

গাছের শেকড় যেমন মূল থেকে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, ভূগর্ভেও তেমনি একটি মূল কেন্দ্র হতে বহু শেকড় বার হয়ে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মাটীর ঐ শেকড়ের ভেতর দিয়ে তীব্র বিদ্যুৎ-শিহরণের মত তীব্রবেগে ভূকম্পন ছুটে চলে দূর-দূরান্তরে, আর সেই সঙ্গে ওঠে শত-সহস্র নর-নারী, জীব-জন্তুর আর্ত্তনাদ; কড়-কড় শব্দে ভেঙে পড়ে অট্টালিকা, মন্দির, গীর্জ্জা; মাটী ফেটে বেরিয়ে পড়ে বড় বড় ফাটল। ফাটলের ভেতর থেকে বেরোয় উত্তপ্ত জল। আহত ও নিহত জীব-জন্তুর তপ্ত রক্তে রাঙা হয়ে ওঠে ভূকম্পনের ধ্বংসলীলার পথ। কয়েকটি মুহূর্ত্তের মধ্যেই মানুষের শত-সহস্র বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যায় একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে। ইটালীর ভিসুভিয়স্, আইস্‌ল্যাণ্ডের হেক্‌লা, জাপানের ফুজি প্রভৃতি আগ্নেয়গিরির দেশে বন্যা-প্রপীড়িত পূর্ব্ববঙ্গের মত ভূমিকম্প নিত্যই লেগে আছে। আগ্নেয়গিরির সঙ্গে মাটীর শেকড়ের যোগ থাকে, এই কারণে অগ্ন্যুৎপাতের তারতম্যে এই সব অঞ্চলে নিত্যই ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভূমিকম্প ঘটে থাকে। যেমন মজবুত বাঁধ দিয়ে বন্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে, বৈজ্ঞানিকরা আজ ভূমিকম্প প্রতিরোধেরও তেমনি একটা উপায় আবিষ্কার করেছেন। কীট-দষ্ট দাঁতকে সমূলে উৎপাটন করে দন্তরোগ নিরাময় করার মত মাটীর দুষ্ট শেকড়কে নির্ম্মূল করে তুলে ফেলে দিলে, দেখা গেছে সে অঞ্চলে আর আদৌ ভূমিকম্প হয় না। ভূমিকম্পের মূল কেন্দ্রটি (EPicentre) নির্ণয় করে সাধারণতঃ সেটিকে উৎখাত করে দেওয়া হয়।

ভূমিকম্পের মূল কেন্দ্র নির্ণয় :—

ভূকম্পনের উৎস নির্ণয়ের পেছনে একটু ইতিহাস আছে। ১৮৯১ সালে জাপানে উপর্য্যুপরি কতকগুলি প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়ে যায়। সেই সময় তরুণ জাপানী বৈজ্ঞানিক ফুসাকিচী ওমোরী (Fusakichi Omori) জাপানের ইম্পিরিয়াল ইউনিভারসিটি থেকে সদ্য ভূকম্পন বিদ্যায় গ্রাজুয়েট হয়ে আসেন। ভূকম্পনের ধ্বংসলীলা দেখে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন, বড় বড় পাথরের দীপাধার, যাকে জাপানী ভাষায় বলা হয় 'সিবুমী' (Shibumi)-গুলি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। পর্য্যবেক্ষণ করে হঠাৎ তাঁর মনে হলো, ভারি দীপাধারগুলি নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেও তাদের অধিকাংশই যেন পড়েছে বিশেষ একটা দিকে। এতে তিনি একটি অতি মূল্যবান ইঙ্গিত পেলেন। তাঁর মনে হলো, ভূপতিত দীপাধারগুলি সঙ্কেত করছে,—কোন্ পথ ধরে ভূকম্পনের তরঙ্গগুলি ছুটেছে। তাঁর মনে হলো, ভূকম্পনের গতিপথ খুব সম্ভবতঃ পতিত সিবুমীগুলির সঙ্গে সমান্তরাল হবে। যদি তাই হয়, তাহলে ভূকম্পন-বিধ্বস্ত অঞ্চলের বিভিন্ন দিকে পতিত দীপাধারগুলির সমান্তরাল কতকগুলি রেখা অঙ্কন করলে, ঐ রেখাগুলি গিয়ে যে বিন্দুতে পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হবে, সেইটাই হবে ভূকম্পনের মূল কেন্দ্র। তিনি প্রথমে একখানি মানচিত্রের ওপর সমস্ত দীপাধারগুলির পতনের দিক্ অঙ্কন করলেন, তার পর তাদের পতনের দিকের সমান্তরাল করে কতকগুলি রেখা টানলেন। সেই রেখাগুলি মানচিত্রের যে বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদন করলে সেইটাকেই তিনি ঐ ভূকম্পনের মূল কেন্দ্র বলে স্থির করলেন। পর্য্যবেক্ষকরা ওমোরীর মানচিত্রে প্রাপ্ত বিন্দুটির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন যে, সেই অংশের ধ্বংসলীলার দৃশ্যই সব চেয়ে বেশী ভয়ঙ্কর। ফুসাকিচী ওমোরী এই উপায়ে বিশ্ববিখ্যাত "মিনো-ওয়ারী" ভূমিকম্পের উৎস সন্ধানে কৃতকার্য্য হলে, তাঁর এই 'থিওরী' ভূ-বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে গৃহীত হয়। তাঁর এই থিওরী অবলম্বন করে আজকের ভূকম্পন-বিশারদরা ভূমিকম্পের পর গুরুভার স্তম্ভ-জাতীয় বস্তুর পতনের দিক্ নির্ণয় করে ভূকম্পনের মূল কেন্দ্র আবিষ্কার করে থাকেন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের পর ফুসাকিচী ওমোরী-প্রদর্শিত প্রথায় বিভিন্ন গোরস্থানের ভারি পাথরের স্তম্ভ-জাতীয় বস্তুর পতনের দিক্ নির্ণয় করে লস্ এ্যাঞ্জেলিসের পার্শ্ববর্ত্তী কম্পটন সহরের নিচে ঐ ভূকম্পনের মূল কেন্দ্র পাওয়া যায়। ডক্টর টমাস্ ক্লিমেণ্টস্ এই কেন্দ্র আবিষ্কার করেন। এই কাজের জন্যে তাঁকে বিধ্বস্ত অঞ্চলের চৌদ্দটি গোরস্থানে পরিভ্রমণ করতে হয়। ঐ অঞ্চলের ইতিহাস অনুশীলন করে পরে জানা যায়, বহু বার কম্পটন সহরে অনেক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়ে গেছে। কম্পটন সহর সম্বন্ধে মন্তব্য করে তখন তিনি লিখলেন,—"The fault-line under the Compton area, was marked for ever as a potential destroyer."

সাইজমোগ্রাফ :—

মান-মন্দিরে যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্পের তীব্রতা, দূরত্ব ও উৎস নির্ণীত হয় তার নাম সাইজমোগ্রাফ। বৈজ্ঞানিক 'ম্লাইন' (Mline) ও বৈজ্ঞানিক 'স' (Shaw) নামক দু'জন বিশ্ব-বিখ্যাত ভূকম্পন-বিশারদের মস্তিষ্ক হতে এই যন্ত্রের উদ্ভব; তাই এর নাম হয়েছে "ম্লাইন-স-সাইজ্‌মোগ্রাফ" (Mline-Shaw-Serismograph).

ভূকম্পন-অনুলেখক যন্ত্রটি অতি সূক্ষ্ম হলেও তার পরিকল্পনা আদৌ কঠিন নয়। প্রথমে বেশ গভীর করে মাটী খনন করে তার ওপর কংক্রিট্ করে একটি মঞ্চ নির্মাণ করা হয়। তার পর ঐ মঞ্চের ওপর বেশ মজবুত করে 'লম্ব' ভাবে একটি ইস্পাতের সুদৃঢ় দণ্ড বসান হয়। ঐ দণ্ডের গায়ে মাটীর সঙ্গে সমান্তরাল আর একটি দণ্ড সংযোগ করা হয়। দ্বিতীয় দণ্ডটি এমন ভাবে লাগান হয় যাতে প্রথম দণ্ডটি সামান্য আন্দোলিত হলেই সেটি 'পেণ্ডুলামের' মত মুক্ত ভাবে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হতে পারে। মাটীতে কম্পনের সূত্রপাত হবা মাত্র দ্বিতীয় দণ্ডটি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হতে থাকে। ঐ দণ্ডের প্রান্তে একটি অতি সূক্ষ্ম সূচ লাগান থাকে। সূচটি আলতো ভাবে পড়ে থাকে একটি ঘূর্ণনশীল 'ড্রামের' ভূষো-পরান কাগজের ওপর। সূচীবাহক বাহুটি সঞ্চালিত হবা মাত্র সূচটি কাগজের গায়ের ভূষোর ওপর আঁচড় কাটতে সুরু করে। ড্রামটি ঘূর্ণনশীল হওয়ায় সূচ আঁচড় কাটার সঙ্গে সঙ্গে আঁচড় কাটা অংশ সূচের নিচে থেকে সরে যায় এবং ভূকম্পনের স্বাক্ষরটি ঐ ড্রামের কাগজের ওপর পরিষ্কার ভাবে লেখা হয়ে যায়। প্রত্যেক মান-মন্দিরে ভূমিকম্পের দিক্-নির্ণয়ের জন্যে একসঙ্গে এমনি দু'টি করে যন্ত্র লাগান থাকে। একটি উত্তর-দক্ষিণমুখো ও অপরটি পূর্ব্ব-পশ্চিমমুখো। এমনি দু'টি সাইজমোগ্রাফ যুগপৎ কাজ করায়, ভূমিকম্প যে দিকেই হোক না কেন তা ঠিক একটি না একটি ড্রামে অনুলিখিত হয়ে যাবেই। ড্রাম দু'টির সঙ্গে ঘড়ি সংযুক্ত থাকায় ড্রাম দু'টির কাগজের গায় সময়ও লেখা হয়ে যায়।

ভূকম্পনের তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য :—

প্রত্যেক ভূমিকম্পে তিন রকমের তরঙ্গ দেখা যায়; (১) প্রাথমিক, (২) মাধ্যমিক, ও (৩) চরম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তরঙ্গ পৃথিবীর অভ্যন্তরের স্তর দিয়ে ছুটে আসে; চরম তরঙ্গটি পৃথিবীর দীর্ঘতম পথ ধরে পৃথিবীর একেবারে ওপরের স্তর দিয়ে আসে। এই তরঙ্গটির গতি প্রায় সর্ব্বদাই স্থির। এই তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে চার 'কিলোমিটার' পরিমাণ হিসাবে ছোটে। প্রধাবিত তরঙ্গের গতি হিসেব করে এবং এক একটি তরঙ্গ কত কত সেকেণ্ড পর পর এসে পৌছচ্ছে, তা জানা গেলে তার থেকে কত দূরের কোন্ স্থানে ভূকম্পের সূত্রপাত হয়েছে তা অনায়াসেই সঠিক ভাবে বলা যায়।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভূকম্পন-বিশারদদ্বয় :—

মিষ্টার জে, জে, স (J. J. Shaw) হলেন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূকম্পনবিশারদ। তিনি দীর্ঘ আটত্রিশ বছর যাবৎ ভূকম্পনের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে চলেছেন। পশ্চিম ব্রোমউইচে মাটীর নিচে একটি মদ রাখবার ঘরে তাঁর বিজ্ঞানাগার। ঘরখানি অন্ধকার, সেঁতো, চতুর্দ্দিকে ধূলো, মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ; এদিকে-ওদিকে ছড়ান মদের বোতল; তারই মাঝে বসান তাঁর নিজের আবিষ্কৃত বিশ্বের সূক্ষ্মতম সাইজমোগ্রাফ্‌টি। সেইখান থেকে তিনি, কোনও ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই "ফ্লড-কাষ্ট" করে সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষদের জানিয়ে দেন—অমুক জায়গায় এত বেজে এত মিনিট এত সেকেণ্ডে একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়ে গেল।

মিষ্টার জে, ম্লাইন্ (J. Mline) আর এক জন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভূকম্পনবিশারদ। তিনি টোকিয়ো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভূকম্পন বিষয়ের অধ্যাপক। সুদীর্ঘ কাল ধরে তিনি জাপানের বহু শত ভূকম্পন প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এ বিষয়ে বহু প্রকার যন্ত্রপাতিও নির্মাণ করেছেন। এখন তিনিও মিষ্টার স-র মত আইল-অব-ওয়াইট' (Isle of Wight) নিউপোর্টের নিকটস্থ সাইড্ নামক এক জনমানবহীন স্থানে একটি গবেষণাগার স্থাপন করেছেন। সেই নিভৃত গবেষণাগারে একাই তিনি ভূকম্পন বিষয়ে গবেষণা করে চলেছেন।

একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের সূচনা :—

ভূকম্পনবিশারদ মিষ্টার 'স' এক জায়গায় বলেছেন,—"আমার একটি নিজস্ব বেতার-যন্ত্র ছিল। এক রাত্রে হঠাৎ ভূকম্পন-যন্ত্রে এক ভূকম্পনের স্বাক্ষর সুরু হলো। আমি ঘোষণা করলুম,—একটি ভয়ঙ্কর ভূকম্পনের সূচনা হচ্ছে।

"তার কয়েক মিনিট পরেই এক জন আগন্তুক আমার দরজায় এসে উপস্থিত। তিনি আমার ঘোষণা শুনে আমার গবেষণাগার খুঁজতে খুঁজতে আসছেন। আমি কি ভাবে ভূকম্পন নির্ণয় করি, তিনি নিজের চোখে তা দেখতে এসেছেন। আমি তাঁকে ভূকম্পন-অনুলেখক যন্ত্রের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাতে লাগলুম; তখন আমার সাইজমোগ্রাফের কাঁটা দু'টি বিদ্যুৎবেগে ভূমিকম্পের স্বাক্ষর লিখে চলেছে। দেখতে দেখতে প্রাথমিক তরঙ্গ রেকর্ড করা হয়ে গেল। এর কয়েক মিনিট পরেই সুরু হলো মাধ্যমিক তরঙ্গ রেকর্ড করা। প্রাথমিক কম্পন অতি মৃদু। একখানি মাল-বোঝাই লরি চলে গেলে কাছের মাটীতে যেমন কম্পন অনুভূত হয়, এ কম্পন ঠিক তেমনি। সাইজমোগ্রাফের ড্রামে প্রাথমিক কম্পনের রেকর্ডগুলি ছোট ছোট আঁচড় দিয়ে লিখিত হয়। মাধ্যমিক কম্পনের তরঙ্গ ড্রামের ওপর আরও বড় বড় আঁচড় কাটে। চরম তরঙ্গের রেকর্ড এত বড় হয় যে আগের দু'রকম তরঙ্গের সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না। শেষ তরঙ্গটি এসে পৌছুতে অনেক দেরি লাগে। এ ক্ষেত্রে শেষ তরঙ্গটি প্রায় তিন কোয়ার্টার পরে এসে পৌছুল।"

রাত্রে অনেক সময়ই মিষ্টার 'স'র ভয় হয়—তাঁর সাইজমোগ্রাফটি থেমে যায়নি ত? তিনি ঘুমের মাঝে উঠে প্রায়ই আলো জেলে যন্ত্রটি পরীক্ষা করে দেখেন। সে রাত্রেও তেমনি দেখতে এসে আলো জেলেই তাঁর চোখে পড়ল হঠাৎ সাইজমোগ্রাফের কাঁটা দুলতে সুরু হলো। জীবনে তিনি চোখের ওপর ভূমিকম্পের সূত্রপাত হতে এই প্রথম দেখলেন। প্রাথমিক তরঙ্গের পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে সর্ব্বশেষ তরঙ্গটি এসে পৌছুল। দু'টি তরঙ্গের মধ্যে এর চেয়ে বেশী সময়ের পার্থক্য আর হতে পারে না। এর থেকে অনুমিত হয়, যেখানে সেই ভূকম্পন হয়ে গেল সে স্থানটি মিষ্টার 'স'র গবেষণাগারের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত অর্থাৎ নিউজিল্যাণ্ডে। পরের দিন পৃথিবীর বিখ্যাত পত্রিকাগুলির শিরোনামাতে মোটা হরফে ছাপা হয়ে বেরুল,—

"গত রাত্রে নিউজিল্যাণ্ডে পৃথিবীর প্রচণ্ডতম ভূমিকম্প হয়ে গেছে। ভূকম্পনবিশারদ মিষ্টার জে, জে, 'স' এই ভূকম্পনটি প্রথম প্রত্যক্ষ করেন।"

"I was the first man in Britain to know of the terrible Newzealand earth-quake, which next morning, was the topic of a million breakfasc table"—J. J. shaw.

পৃথিবীতে ভূমিকম্পের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক ডক্টর এ, এম্, হেরণ (A. M. Heron) সিমলা হতে এক বেতার বক্তৃতায় বলেন,—পৃথিবীতে ভূমিকম্পের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। মাটির ওপরের স্তরে কল-কারখানা, বাড়ী, যান-বাহনের চাপ অসমান ভাবে প্রতিনিয়ত মাটির ওপর পড়ায় ভূপৃষ্ঠে কতকগুলি ফাটল-রেখার সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণেই পৃথিবীতে ভূকম্পনের প্রকোপও দিন দিন বেড়ে চলেছে।

গড় পড়তায় সারা পৃথিবীতে বছরে ২,৭৫০,০০০ লোক ভূমিকম্পে মারা যায়। প্রত্যেক বছরে পৃথিবীতে প্রায় চারশ' ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। গড় পড়তায় সাড়ে চার থেকে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর এক একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। গত তিন শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে চলেছে।

দামোদরগুপ্ত প্রণীত

কুট্টনী মত

অনুবাদক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

[১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ পিটারসন ক্যাম্বের শান্তিনাথ মন্দিরের পুঁথিশালায় আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত 'কুট্টনীমতে'র একটি পুঁথি প্রাপ্ত হন। পুঁথিটি খণ্ডিত এবং তাহার নাম ছিল 'শম্ভলীমতম্'। তাহার পর জয়পুর মহারাজের আশ্রিত মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ আরো দুইখানি জীর্ণ পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই তিনখানি পুঁথি অবলম্বন করিয়া খৃষ্টীয় ১৮৮৭ অব্দে বোম্বায়ের নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত 'কাব্যমালা'র তৃতীয় গুচ্ছকে ইহা প্রকাশিত হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বর্গত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে যান। সেইখানে বঙ্গীয় অক্ষরে লিখিত কুট্টনীমতের একখানি সম্পূর্ণ পুঁথি প্রাপ্ত হন। এই পুঁথির নকলের তারিখ ২৯২ নেবার অব্দ অর্থাৎ ১১৭২ খৃষ্টাব্দ। ইহা অপেক্ষা পুরাতন বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই পুঁথিটি এখন 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গলে'র সম্পত্তি ও তাহার পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে স্বর্গীয় পণ্ডিত তনুস্বখরাম ত্রিপাঠী কুট্টনীমতের একটি সম্পূর্ণ ও সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করেন। ইনি এশিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথি ও অন্যান্য পুঁথি এবং কাব্যমালার মুদ্রিত পুস্তক দৃষ্টে এই সংস্করণটি প্রকাশিত করেন এবং স্বয়ং 'রস-দীপিকা' নাম্নী টীকা সংযোজিত করেন। তাহার পর স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের এক কাশ্মীরী ছাত্র শ্রীমধুসূদন কৌল এশিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথিটি সম্পাদন করিয়া দিলে বহু কাল পরে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ইহা 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গলেই' Bibliotheca Indica গ্রন্থমালার অন্তর্গত হইয়া প্রকাশিত হয়।

আমরা তিনটি মুদ্রিত সংস্করণ দৃষ্টে এই অনুবাদ করিয়াছি, এক্ষণে কবি ও কাব্য সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দিতেছি—

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষার্ধে কবি দামোদরগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। কর্কোট-বংশীয় নৃপতি মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় বিনয়াদিত্য যখন কাশ্মীরের সিংহাসনে (খৃ ৭৭৯—৮১৩) তখন ইনি তাঁহার মধ্য মন্ত্রী ছিলেন। দামোদরগুপ্তের রচনা-ভংগী অতি সুন্দর—অলংকার ও শব্দ-সম্পদে ইহা অপূর্ব। পরবর্ত্তী বহু কবি ও সুভাষিতকার দামোদরের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'কুট্টনীমত' ব্যতীত সম্ভবতঃ ইনি অন্তত আরও একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার নামে উদ্ধৃত বহু শ্লোক এই কাব্যে দেখিতে পাই। এই কাব্যটি 'কামসূত্রে'র 'বৈশিক' অধিকরণ অবলম্বনে রচিত। সুললিত কাব্যের ভিতর দিয়া কবি দেখাইতে চান, কিরূপে চতুর গণিকাগণ ছলা-কলা, কৌশল প্রভৃতির সাহায্যে দুর্বলচিত্ত যুবকদিগের সর্বস্ব হরণ করিয়া তাহাদিগকে সর্বনাশের পথে টানিয়া লইয়া যায়। কাব্যশেষে কবি বলিয়াছেন—

"কাব্যমিদং যঃ শৃণুতে সম্যক্‌কাব্যার্থপালনেনাসৌ।
নো বঞ্চ্যতে কদাচিদ্‌বিটবেশ্যাধূর্তকুট্টনীভিরিতি।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই কাব্য শুনিয়া তাহার উপদেশ মত কার্য করে সে কখনও বিট, বেশ্যা, ধূর্ত ও কুট্টনীগণের দ্বারা বঞ্চিত হয় না]

অনুরক্তা কামিনীর কটাক্ষে যাঁহার বাস, রতির শতদল সদৃশ মুখে যিনি ভ্রমরের ন্যায় চুম্বনরত সেই মনোভবের জয় হউক। (১)

হে সজ্জনবৃন্দ, দোষ সমূহ উপেক্ষা করতঃ যে লেশমাত্র গুণ ইহাতে আছে তাহাতে মনঃসন্নিবেশ করিয়া দামোদরগুপ্ত রচিত এই "কুট্টনীমত" শ্রবণ করুন। (২)

সমস্ত পৃথিবীর ভূষণ-স্বরূপা ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য্যশালিনী এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বান জনগণ দ্বারা অধ্যুষিতা বারাণসী নামে এক নগরী আছে। সেই স্থানের এমনি মহিমা যে তথাকার জীবগণ আসক্তি সহকারে সেই সমস্ত ঐশ্বর্য উপভোগ করিলেও তাহাদিগের পক্ষে শশধরখণ্ডবিভূষিত (মহাদেবের) দেহসাযুজ্যলাভ দুষ্প্রাপ্য

নহে। তথাকার বারনারীগণ চন্দ্র (১)-বিভূষিত দেহ, বিভূতি-শালিনী (২) ও বিশিষ্ট ভুজঙ্গ(৩) সমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পশুপতির তনু-তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তথায় অত্যুচ্চ দেবায়তনগুলির শিখরে বিচিত্র পতাকা সমূহ বায়ুভরে আন্দোলিত হওয়ায় আকাশ মঞ্জরিত উদ্যানের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। অবলাগণ অবিরত (ইতস্ততঃ) সঞ্চরণ করায় তাঁহাদিগের চরণতলের অলক্তকরাগে রঞ্জিত হইয়া তথাকার ধরাতল স্থলকমলবনের শোভা ধারণ করিয়া থাকে। তাহার চতুর্দিকের বায়ুমণ্ডল রমণীগণের অলংকার-ঝংকারে এইরূপ মুখরিত হইয়া থাকে যে অধ্যয়নরত ছাত্রগণের পাঠস্খলন আচার্যগণ (শুনিতে না পাওয়ায়) সংশোধন করিয়া দিতে পারেন না। (৩—৮)

বিন্ধ্যাটবী যেরূপ মত্তবারণসমাকীর্ণ সেইরূপ বারাণসী নগরী মত্তবারণ(৪) সমূহ দ্বারা শোভিত এবং কৃষ্ণপক্ষের রজনীর আকাশ যেরূপ উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত সেইরূপ সেই নগরী সুধা-ধবলিত গৃহ সমূহ দ্বারা সুসাজ্জিত*। ছন্দঃশাস্ত্র যেরূপ যতি (৫) ও গণ (৬) রূপ গুণালংকৃত সেইরূপ বারাণসী নগরী যতিগণের(৭) গুণরাশি দ্বারা নিত্য প্রসিদ্ধ। বনপংক্তি যেরূপ তরুসমাচ্ছন্ন উহাও সেইরূপ প্রাকার-বেষ্টিতা† তুরুষ্কবাহিনী যেরূপ বহুলগন্ধর্বা (৮) তথায় সেইরূপ বহু গন্ধর্ব (৯) বাস করিয়া থাকে। (৯-১০)

তথায় (সকলেই কুলীন) কেবল তারাসমূহ অ-কুলীন (১০)। সেখানে (কেহই দোষযুক্ত নহে) কেবল পেচকগণ সর্বদা দোষ (১১) ভালবাসে। সে স্থানে (মনুষ্যগণ বৃত্ত (১২) ভংগ করে না) কেবল গদ্যেই বৃত্ত (১৩) ভংগ হইয়া থাকে। অক্ষক্রীড়ায় ব্যতীত পরগৃহ রোধ (১৪) তথায় অজ্ঞাত। সেই স্থানে তপস্বিগণই কেবল শূল ধারণ করিয়া থাকেন (অন্যথা শূলরোগ তথায় নাই)। সেই স্থান কেবল মাত্র বৈয়াকরণগণ ধাতু লইয়া বিবাদ করেন (অন্যথা স্বর্ণাদি ধাতু সম্বন্ধে কোন বাদ-বিসম্বাদ (১৫) নাই।) তথায় (দুর্বলের উপর কেহ বল-প্রয়োগ করে না) কেবল সুরতকালেই অবলাগণকে আক্রমণ করা হইয়া থাকে (১৬)। তথায় হস্তিগণ মদচ্যুতি কালে দানচ্ছেদ (১৭) করিয়া থাকে (অন্যথা দাতাগণ দানচ্ছেদ (১৮) করেন না)। তথায় কেবল মাত্র সূর্যই তীব্রকর (অন্যথা রাজকর তীব্র (১৯) নহে)।

১ স্বর্ণালঙ্কার। ২ ঐশ্বর্য। ৩ বিট, নাগর।

৪ প্রাসাদ-অলিন্দ। * মূলে আছে 'প্রোজ্জ্বল ধিষ্ণোপ-শোভিতা'। 'ধিষ্ণ' অর্থে এক পক্ষে 'নক্ষত্র' অন্য পক্ষে 'গৃহ' এবং 'প্রোজ্জ্বল' একপক্ষে 'উজ্জ্বল কিরণযুক্ত' অন্যপক্ষে 'উত্তমরূপে সুধা-ধবলিত' বা চুণকাম করা। ৫ ছেদ। ৬ মগন প্রভৃতি অষ্টগণ। ৭ সন্ন্যাসিগণ। † মূলে আছে 'সশালা'। 'শাল' অর্থে এক পক্ষে 'বৃক্ষ' অন্য পক্ষে 'প্রাকার'।

৮ গন্ধর্ব = অশ্ব ; বহুলগন্ধর্বা = যথায় অশ্বারোহী সেনার প্রাচুর্য। ৯ গায়ক। ১০ কু = ভূমি ; অকুলীন—ভূমিসংলগ্ন নহে। ১১ রাত্রি। ১২ সদাচার। ১৩ ছন্দঃ। ১৪ পাশাখেলায় যুগ্ম শারী বা ঘুঁটি দ্বারা প্রতিপক্ষের গৃহ বন্ধ করা। ১৫ মূলে আছে 'পরবেদিষু যত্র ধাতুবাদিত্বম্' ; পরবেদি = বৈয়াকরণ। ১৬ মূলে আছে সুরতেষ-বলাক্রমণম্' অবল = দুর্বল ; অবলা = স্ত্রীলোক। ১৭ মদোদক-ক্ষরণ। ১৮ দানকার্যে অত্যাহানি। ১৯ দুঃসহ।

তথায় সুহৃদ্গণের হৃদয়ের অবিবেক (২০) দৃষ্ট হয় (অন্যথা কোন অবিবেক (২১) নাই)। তথায় যোগিগণ কেবল দণ্ডগ্রহণ করে (অন্যথা দোষ করিয়া কেহ রাজদ্বারে দণ্ড গ্রহণ করে না)। তথায় কেবল (ব্যাকরণের) প্রগৃহ্য সংজ্ঞায় সন্ধিচ্ছেদ (২১) হয় (নচেৎ তস্করগণ সন্ধিচ্ছেদ করে না)। ছন্দের প্রস্তারবিধিতেই কেবল গুরুসকল বক্ররেখা দ্বারা জ্ঞাপিত হয় (নচেৎ তথায় ব্রাহ্মণাদি গুরু সকলের অনার্জবস্থিতি (২২) নাই) *। তথায় বীণায় পরিবাদ (২৩) ব্যবহৃত হয় (অন্যথা কোন পরিবাদ নাই)। তথায় দ্বিজগৃহেই কেবল অপ্রসন্নতা (২৪) (অন্যথা কোথাও অপ্রসন্নতা নাই)। (১১—১৪)

তথায় যেরূপ সৎকবি রচিত দৃশ্যকাব্যে অনুরূপ বৃত্ত ঘটনা (২৫) হয় সেইরূপ লোকের মধ্যেও অনুরূপ বৃত্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় রমণীর বচনে ও কাব্যে মাধুর্যের বিকাশ (২৬) দেখা যায়। তথায় উপবনবীথিতে যেরূপ তমালপত্র পড়িয়া থাকে সেইরূপ যুবতীর বদনে তমালপত্র (২৭) অংকিত হইয়া থকে। তথায় তন্ত্রী-বাদ্যে ও সুরতকলহে উভয় ক্ষেত্রেই নখরপ্রহারের ধ্বনি শ্রুত হয় †।

অমরাবতী যেরূপ নন্দন বন দ্বারা শোভিতা, বিবুধ-(২৮) সমূহ দ্বারা অধ্যুষিতা এবং নাকবাহিনী (২৯) দ্বারা সেবিতা সেইরূপ সেই বারাণসী নগরী বিবুধ (৩০) গণদ্বারা অধ্যুষিতা ও নাকবাহিনী (৩১)-দ্বারা সেবিতা হইয়া বিশ্বস্রষ্টার নির্মিত জগতের অপর অমরাবতীর ন্যায় বিরাজমানা। (১৫—১৭)

তথায় মনসিজের শরীরিণী শক্তির ন্যায় বেশ্যাকুলের ভূষণ-স্বরূপা মালতী নাম্নী এক বাররামা বাস করিত। গরুড়কে দেখিয়া যেরূপ বিলাসিনী (৩২) নাগিনীগণের হৃদয়-শোক জাগিয়া উঠে তাহাকে দেখিয়াও সেইরূপ বিলাসিনীগণ ঈর্ষাকুলিত হইয়া উঠিত। হিমালয়-দুহিতা (পার্বতী) যেরূপ ঈশ্বরের (৩৩) হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন সে সেইরূপ ধনেশ্বরদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিত। (সমুদ্র-মন্থন সময়ে) মন্দর পর্বত যেরূপ ভোগী (৩৪) রূপ নেত্র (৩৫) দ্বারা সংসক্ত

২০ অভিন্নতা। ২১ প্রমাদাদি।

২১ এক পক্ষে 'ঈদূদেদ্ দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্' অর্থাৎ দ্বিবচন-নিষ্পন্ন ঈ-কারান্ত, উ-কারান্ত এবং এ-কারান্ত পদের সহিত পরবর্তী পদের সন্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও সন্ধি হয় না এই অর্থে 'সন্ধিচ্ছেদ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ; অপর পক্ষে 'সিঁধকাটা'। ২২ অসরল অবস্থা, অস্বাচ্ছন্দ্য। * ছন্দের গুরুলঘু বুঝাইতে এইরূপ (—) বক্র ও সরল রেখা ব্যবহৃত হয় ইহাকে প্রস্তারবিধি বলে। ২৩ 'পরিবাদ' এক পক্ষে জোয়ারি অন্যর পক্ষে 'অপবাদ'। ২৪ 'প্রসন্ন' অর্থে সুরা সুতরাং 'অপ্রসন্নতা' অর্থে সুরার অভাব। ২৫ অতীত চরিত্রের বা ঘটনার অনুরূপ অভিনয় ; অন্য পক্ষে 'একই প্রকার বৃত্ত' অর্থাৎ একই রূপ ব্যবহার যথা গুরুপূজা, ঘৃণা, শৌচ, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও হিত-প্রবর্তন। ২৬ মাধুর্য এক পক্ষে 'সরসতা'। অন্য পক্ষে কাব্যগুণ ২৭ 'তিলক-বিশেষ' †। তন্ত্রীবাদ্যে (string instrument) নখ দ্বারা তারে আঘাত করায় রণন বা ঝংকার শ্রুত হয় সেইরূপ কামাতুর নায়ক-নায়িকা সুরতকালে যে নখাঘাত করে তাহাতে চটচটা ধ্বনি উত্থিত হয়।

২৮ দেব। ২৯ দেবসেনা। ৩০ পণ্ডিত। ৩১ গংগা। ৩২ 'বিল' অর্থাৎ গর্তে বাস করে। ৩৩ মহাদেব। ৩৪ 'ভোগী' অর্থে সর্প অর্থাৎ শেষ নাগ। ৩৫ মন্থনরজ্জু।

(৩৬) ছিল সেইরূপ (সর্বদা) ভোগিগণের নেত্র তাহার প্রতি সংসক্ত থাকিত। অন্ধকাসুরের দেহ যেরূপ (শিবের) শূলের উপর রক্ষিত ছিল সেও সেইরূপ শূলদিগের (৩৭) শীর্ষস্থানীয়া ছিল। সে ছিল চারু ভাবণের বসতি, লীলার আলয়, প্রেমের স্থিতি, পরিহাসের ভূমি এবং বক্রোক্তির আবাসস্থল। (১৮—২১)

একদা সে তাহার ধবলালয়ের পৃষ্ঠদেশে অবস্থানকালে তাহার চিন্তানুরূপ নিম্নলিখিত আর্যাটি কে যেন গাহিতেছে শুনিতে পাইল,

"দাও ফেলে দূরে হে বারবনিতা
যৌবন আর রূপের মদ
শেখ সযতনে কৌশল সেই
কামিগণ হয় যাহাতে বধ।"

ইহা শুনিয়া বিপুলজঙ্ঘা মালতী মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিল, "ঐ সজ্জন এই আর্যাটি পাঠ করিয়া আমাকে মিত্রের ন্যায় অতি উপযুক্ত উপদেশই দান করিয়াছেন, অতএব সকল সংসার বিষয়ে বিকরালা—যাহার দ্বারে বিলাসী পুরুষগণ দিবারাত্রি পড়িয়া আছে—তাহার নিকট গিয়া পরামর্শ লইব।" এই মনে করিয়া সে সৌধশিখর হইতে দ্রুত অবতরণ করিয়া সহচরীগণ-পরিবৃতা হইয়া বিকরালার গৃহে গমন করিল। (২২—২৬)

বিকরালা বৃদ্ধা—তাহার অধিকাংশ দন্তই পড়িয়া গিয়াছিল, যে-কয়টি অবশিষ্ট ছিল তাহাও বাহির হইয়া আসিয়াছিল, গণ্ড শুষ্ক হইয়া হনুদেশ প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল; নাসিকার অগ্রভাগ স্থূল ও বিস্তৃত; কুচদ্বয় শুষ্ক হওয়ায় চুচুকদ্বয় উৎকট হইয়া কুচস্থানের নির্দেশ করিতেছিল; শরীরের চর্ম শিথিল, চক্ষু দুইটি কোটরগত ও রক্তবর্ণ এবং ভূষণহীন কর্ণপালী ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মস্তকের অধিকাংশ কেশই উঠিয়া গিয়াছিল কেবল মাত্র কয়েকটি পক্ককেশ অবশিষ্ট ছিল; দেহের শিরা সকল প্রকট এবং গ্রীবা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পরিধানে ধৌত বস্ত্র ও উত্তরীয়, গলদেশে সূত্র-বিলম্বিত বহুবিধ ঔষধি ও মণি, শীর্ণ অংগুলীতে সুবর্ণ অংগুরীয়। সে গণিকাগণের দ্বারা পরিবৃতা হইয়া বেত্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া কামিগণ যে সকল উপহার প্রদান করিয়াছিল তাহা দেখিতেছিল।(২৭—৩০)

মালতী বিকরালার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন করতঃ প্রণাম করিয়া তাহার কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহাকে বসিবার জন্য আসন দিল।(৩১)

অনন্তর (যাহারা আসিয়াছিল তাহারা কার্য্যসিদ্ধি অন্তে চলিয়া গেলে) অবসর পাইয়া মালতী আসন হইতে উঠিয়া করজোড়ে সবিনয়ে বিকরালাকে বলিল:

"আপনার বুদ্ধি-কৌশলে পড়িয়া নিশ্চিতই হরি তাঁহার কৌস্তভ, সূর্য তাঁহার রথাশ্বসকল, ইন্দ্র তাঁহার ঐরাবত এবং কুবের তাঁহার ধন-ভাণ্ডার হারাইতে পারেন। যে সকল কামুক লোক এক্ষণে হৃত-বৈভব হইয়া জীর্ণ বস্ত্রে দেহাবরণ করিয়া অন্নসত্রে ভোজন করিতেছে তাহারা আপনার বুদ্ধি-কৌশলের এইরূপই প্রশংসা করিয়া থাকে। আপনারই উপদেশের ফলে ধনবর্মা সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নর্মদার পাদযুগলে সকল সম্পদ সমর্পণ করতঃ তাহার চরণতলে পড়িয়া আছে। সামন্তদত্তের মধ্যম পুত্র নরদত্ত পিতৃগৃহ ধনশূন্য করিয়া মদনসেনার শরণাগত হইয়া তাহার প্রীতি বিধানের চেষ্টা করিতেছে। ভট্টপুত্র নরসিংহের প্রতি মঞ্জরী লীলাভরে তাহার চরণযুগল অগ্রসর করিয়া দিলে সে দুই হস্তে ধীরে ধীরে তাহা সংবাহন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করে। ভবদেব দীক্ষিতের পুত্র শুভদেব নিঃসম্বল হইয়া ভর্ৎসিত হইয়াও কেশবসেনার গৃহদ্বার পরিত্যাগ করে না এবং অন্যান্য সাধারণ বেশ্যাগণও কামীদিগকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগকে কপর্দকশূন্য করিয়াছে। অথচ আমি হীনকুলজাত, গুণহীন, রোগী এবং কুৎসিত পুরুষগণকেও অতিশয় প্রীতি প্রদর্শন করিয়া সেবা করি। মাতঃ, কি করিব, পোড়া বিধাতা বাম, সেই জন্য নিজ দেহ সাজাইয়া রাখিয়াও ইষ্টলাভ করিতে পারিতেছি না। অতএব মাতঃ, আমার ভজনার উপযুক্ত কাহারা, তাহাদের কি নাম এবং তাহাদের বেশ ও কার্য কিরূপ ও কিরূপে তাহাদিগকে কামশরজালে আবদ্ধ করা যায় তাহার উপায় আমাকে বলিয়া দিন।"(৩২—৪২)

সুন্দরী মালতী এইরূপ বলিলে বিকরালা তাহার পৃষ্ঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া মধুর বাক্যে তাহাকে বলিল:

"সুন্দরি, দহ্যমান কামের দেহনির্গত ধূমরেখার ন্যায় তোমার এই কেশভার কামিগণকে (অনায়াসে) বশীভূত করিতে পারে; কৃশোদরি, মধুর স্মিতহাস্যসহকারে ঈষৎ ভ্রূভংগের সহিত বিভ্রমের আধারস্বরূপ তোমার অসামান্য নয়নভংগী ধৈর্যশীল ব্যক্তিদিগকে অধীর করিয়া দেয়। তোমার এই বদনকান্তির কথা শ্রবণ মাত্রই কামিগণের মন নিশ্চিতই মদনাকুল হইয়া থাকে (না জানি দেখিলে কি হইবে)। তড়িদ্দামসমকান্তি তোমার এই দশন-পংক্তি পুরুষের মনে নিশ্চয়ই মদন-দাহ-বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে। লীলাবতি, কোকিলধ্বনি-নিন্দিত তোমার এই বচনবিলাস সমস্ত ভুজংগগণকে (৩৮) আকর্ষণোপযোগী সিদ্ধমন্ত্রোচ্চারণের ন্যায়। হে বিলাসবতি, মকর-কেতনের নিবাসস্বরূপ তোমার এই বিশাল কুচযুগল ভোগিগণের ভোগসাধনের উপায়—ইহা ব্যতীত অপর উপায় ব্যর্থ। হে বরোরু, তোমার এই বাহুযুগল মৃণালের ন্যায় সুন্দর—হে সুতনু, ইহা সুবর্ণবলয় শোভিত হইয়া কাহার না মদনোৎপাদন করে? কন্দর্পকে আদেশ করিতে পটু* তোমার এই মধ্যদেশ এত কৃশ তথাপি বিশালদেহ ব্যক্তিকেও ইহা মন্মথের দশমী দশায় লইয়া যাইতে পারে। মনসিজের ধনুর্গুণের ন্যায় তোমার এই রোমাবলী যুবক-গণকে স্মরবাণবিদ্ধ করিয়া বিহ্বল করিয়া ফেলে। হে করভোরু, সুবর্ণের ন্যায় কান্তি এবং শিলাতলের ন্যায় বিশাল তোমার এই জঘন তরুণগণকে বশীকরণ এবং যতিগণের সংযম ভংগ করিতে পারে। বল দেখি সুন্দরি, তোমার এই রম্ভাকাণ্ডের ন্যায় (শীতল ও) মনোহর ঊরুযুগল স্পর্শে কাহার না মদনজ্বরতাপ নিবারণ করিতে ইচ্ছা করে? তোমার যৌবন কল্পতরুর সহিত যুক্ত এই কনকলতার মত সুগোল জংঘাযুগলের মিলনে কে এ জগতে

৩৬ আবদ্ধ। ৩৭ গণিকাসমূহ।

৩৮ ভুজংগ = 'বিট' ও পক্ষে 'সর্প'। সুতরাং এই শ্লোকের অর্থ—"মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সর্পবৈদ্যগণ যেরূপ সর্প সকল আকর্ষণ করিয়া আনে সেইরূপ তোমার কোকিলনিন্দিত বচনচাতুর্যে সকল 'বিট'গণ আকৃষ্ট হয়।" * 'কন্দর্পাদেশকরণ চতুর' ইহার প্রকৃত অর্থ কন্দর্পকে উদ্দীপ্ত করিতে পটু অর্থাৎ যাহার দর্শনে লোকের মদনোদ্দীপিত হয়।

কামফল প্রাপ্তির ইচ্ছা না করে ? স্থলকমলিনীর শোভাকেও পরাজিত করিতে সক্ষম, দাড়িমরাগনির্জিত তোমার এই রক্তিম চরণকমলযুগল কাহার না মনে আনন্দ দান করে ? লীলাবতি, তোমার এই ললিত গমনভংগী গজেন্দ্রকেও লজ্জা দেয়, হংসকেও উপহাস করে—ইহা যুবকদিগের হৃদয় মন্থন করিতে পারে। এতৎসত্বেও যদি তোমার কৌতূহল হইয়া থাকে হে ক্ষীণকটি, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর আমি যাহা জানি তোমাকে বলিতেছি—" (৪৩—৫৮)

"হে সুতনু, যদি অতুল সম্পদ নিজ করতলগত করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে প্রথমে রাজকর্মচারী ভট্টের পুত্রকে অতি সাবধানে বশীভূত কর। এই ভট্টপুত্র চিন্তামণি নিকটবর্ত্তী গ্রামেই বাস করে ; তাহার পিতা সর্ব্বদা রাজধানীতে বাস করায় সে নিজেই নিজের অভিভাবক ; সুতরাং বৎসে, চেষ্টা করিলে সে (সহজেই) আকৃষ্ট হইবে। হে চারুহাসিনি, যাহাতে সে সত্বরই বসন্তসখার কুসুমশরের লক্ষীভূত হয় (সেই জন্য) তাহার বেশ ও আচরণ কিরূপ তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর—" (৫৯—৬১)

"তাহার মস্তকের কেশ পঞ্চাংগুলী পরিমাণ দীর্ঘ এবং তাহাতে স্থূল শিখা বর্তমান, তাহাতে দীর্ঘ শ্রবণযুক্ত (৩৯) করাতের ন্যায় দন্তপংক্তিসমন্বিত কংকতিকা (৪০) সন্নিবিষ্ট। অংগুলীতে অংগুরীয়, কণ্ঠে সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্র, গাত্র কুংকুমচূর্ণ দ্বারা পরিস্পৃষ্ট হইয়া সর্বাংগ ঈষৎ পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে *। সুবর্ণসূত্রনির্ম্মিত কুসুমদাম বিলম্বিত গলশোভাযুক্ত, সিক্থ দ্বারা সিক্ত, শিহ্লক দ্বারা রঞ্জিত এবং লৌহপট্টিকাসমন্বিত পাদুকা তাহার চরণে (৪১)। তাহার বিস্তৃত কেশ নানা বর্ণে গ্রথিত উজ্জ্বল বর্ণের প্রান্তভাগসমন্বিত সূত্র দ্বারা সংযত (৪২)। কর্ণের এক অংশে 'দন্তবীটক' অপর অংশে 'সীসপত্রক' (নামক অলংকার)। পরিধানে তাহার উজ্জ্বল সুবর্ণসূত্র-নির্মিত প্রান্তবিশিষ্ট (৪৩) কুংকুমবৎ পীতবর্ণের বস্ত্র।" (৬২-৬৬)

"কণ্ঠে স্থূলতর কাচবর্তকের মালা (৪৪) পরিহিত, কুরবক পুষ্পরাগে নখ রঞ্জিত করিয়া শংখবলয়শোভিত হস্ত, অল্পবয়স্ক তাম্বূলকরংকবাহী তাহার অনুগমন করিয়া তাহার সেবা করে। সে (সদলে) শ্রেষ্ঠি-বণিক্-বিট-কিতব-পরিপূর্ণ বিশাল রংগশালার মধ্যে রংগশালাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক স্থাপিত কয়েকটি চর্ম্মরজ্জু নির্মিত আসনের† উপর বসিয়া থাকে। পাঁচ-ছয় জন যথাতথভাষী মদোদ্ধতপ্রকৃতি অনুজীবী কটিদেশে তরবারি ধারণ করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া থাকে। চতুরতর কোন সেবক তাহাকে 'পৃষ্ঠদেশ' অর্পণ করিলে সে তাহাতে পূর্বদেহাংশ এলাইয়া দিয়া মুখমধ্যস্থিত তাম্বূল দ্বারা গণ্ড স্ফীত করিয়া হস্তে একটি পাণ ধারণ করিয়া থাকে। অকারণে ভাবসহকারে ভ্রূ উন্নত করিয়া কবিতার মত করিয়া কোন গাথা অশুদ্ধ ভাবে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে। বিস্ময়ে মাথা নাড়িতে নাড়িতে রসাবেগে পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তিগণকে হস্ত দ্বারা তাড়না করিয়া অপরের রসালাপ শ্রবণ করিতে করিতে 'কি বিশ্রী, সাধু' ইত্যাদি মন্তব্যে আলাপের মধ্যে অন্তরায় সৃজন করে। 'পিতা গোপনে অসন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে অথবা রাজা পিতাকে এই কথা বলিয়াছিলেন' এইরূপ উক্তি দ্বারা রাজার সহিত তাহার পিতার প্রণয় ও বিশ্বাসের কথা জানাইতে চাহে। পত্রচ্ছেদ্য (৪৫) কৌশল জানিয়া বা না জানিয়া সর্বদা হস্তে পত্রকর্তরী (৪৬) ধারণ করিয়া জনসমাজে জানাইতে চাহে যে সে সেই কলায় দক্ষ"। (৬৭—৭৪)

" 'ভট্টপুত্র ব্রহ্মোক্ত নাট্যশাস্ত্রে, সংগীতে, মুরজ প্রভৃতি বাদনে নারদাদিকেও পরাজিত করেন। বসু, নন্দ, চিত্রক, দণ্ডক প্রভৃতি (পরিক্রম মণ্ডলে) (৪৭), মুক্তায়ুধ (৪৮) চালনায়, অসি ছুরিকা প্রভৃতি শস্ত্রপ্রয়োগে ইঁহার এত নৈপুণ্য যে পরশুরামও নিত্য তাঁহার ভার্গবত্ব ত্যাগ করেন। ইনি কামশাস্ত্রে এমনি পণ্ডিত যে বাৎস্যায়নও ইঁহার কাছে বোকা হইয়া যান, দণ্ডকাচার্য দূরে পড়িয়া থাকেন, রাজপুত্রও (৪৯) পশুতুল্য গণ্য হন। যে রাধাসুত কর্ণ চাহিবা মাত্র সযত্নে (সহজাত) কবচ কাটিয়া দিয়াছিলেন তিনিও ইঁহার অবিচিন্তিত অর্থবর্ষণের ও ত্যাগের নিকট উপহাসের পাত্র হইয়া পড়েন *। পলায়নপর মৃগের প্রতিও যে সিংহ বিক্রম প্রদর্শন করে তাহার শৌর্য ভট্টপুত্রকে লজ্জা দেয়। ইনি মৃগয়ায় আনন্দ পান বটে, চললক্ষ্যভেদে ইঁহার কৃতিত্বও আছে কিন্তু পিতার (অসন্তুষ্টির) ভয়ে ভট্টপুত্র মৃগয়া-ক্রীড়া করেন না ইহা সহজেই অনুমেয় †। এইরূপ নিজ সেবকগণ কর্তৃক কথিত রমণীয় বচনে পরিতুষ্ট হইয়া মনে মনে আনন্দিত মুখে বলিতে থাকেন—'ইহারা আমার শ্লাঘা করিতেছে'।" (৭৫—৮১)

'কোন কোন্ প্রস্থান (৫০) তাহার জানা আছে, কোন্ নর্তকী শ্রেষ্ঠা, শিঙ্গটকে (৫১) কোন্ নর্তকী কোহল ও ভরতাদি কথিত ক্রিয়ার সহিত নৃত্য করিতে পারে, লয়, ধেন্নুকরচিত তাল বা প্রেংখনাদি বিষয়ে তাহার কিরূপ জ্ঞান আছে' নৃত্যোপদেশককে সযত্নে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করে। কণ্ঠ হইতে ফুলের মালা লইয়া নর্তকীকে দান করে। যখন-তখন তাম্বূল দান করিয়া সাধুবাদ করে। 'হস্তসঞ্চালন, গাত্রসংস্থিতি, লালিত্য, উদ্বহন (৫২), পার্শ্ব-বলিত (৫৩) এই সকল বিষয়ে ইঁহার এত বিশুদ্ধতা ও চাতুর্য দেখিয়া মনে হইতেছে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝি ইহারই সৃষ্টি। ভাব, রস ও অভিনব ভংগীর পৃথক্ পৃথক্ অভিব্যক্তি এবং বিচিত্র পরিক্রমে (৫৪) এ রম্ভাকেও পরাজয় করিতে পারে সাধারণ মর্ত্যের নর্তকী তো ছার!' নৃত্যের প্রত্যেক বিরামের সময় নৃত্যে তন্ময় হইয়া সে কেবল মাত্র তাল গুনিয়া (কারণ, কৌশলাদি বুঝিবার সামর্থ্য তাহার নাই) অবিরত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নর্তকীর এইরূপ প্রশংসা করিয়া থাকে।" (৮২—৮৭)

[ক্রমশঃ।

---

৩৯ শ্রবণ = হাতল। ৪০ চিরুণী। * তনুসুখরামের সংস্করণের অনুসারে—"···গাত্রকুংকুমচূর্ণ দ্বারা পরিস্পৃষ্ট এবং পরিধানে ঈষৎ পীতবর্ণ বসন।'

৪১ জরির ফুল তোলা সাজ (instep) যুক্ত, মোম ভিজান, গুগ্‌গুল দ্বারা রং-করা লোহার নাল বাঁধান জুতা তাহার পায়ে। ৪২ বর্তমানে রমণীগণ যেরূপ tassel ব্যবহার করে। ৪৩ জরি-পাড়। ৪৪ পুঁথির (beads) মালা। † তনুসুখরাম সং—"একত্র আবদ্ধ বৃহৎ কাষ্ঠবেদীর উপর।"

৪৫ পত্র কাটিয়া তিলকাদি নির্মাণের কলা। ৪৬ ছোট কাঁচি। ৪৭ দ্বন্দ্বযুদ্ধের পাঁয়তাড়া। ৪৮ শর, ভল্লাদি নিক্ষেপ। ৪৯ প্রাচীন কামশাস্ত্রকার।* এই শ্লোকটি R. A. S. B সং বা 'কাব্যমালা' সংএ নাই। † এই দুই শ্লোকে ভট্টপুত্রের মৃগয়ায় অক্ষমতা চাটুকারগণ কিরূপ কৌশল করিয়া গোপন করিতেছে অথচ ব্যক্ত করিতেছে তাহা দেখান হইতেছে। ৫১ নৃত্যগীতপ্রধান নাটক। ৫২ Carriage. ৫৩ Side movement. ৫৪ Dancing movement.

যোগে ব্যায়ামবিদ্যা

শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যোগবিদ্যার প্রবর্ত্তন হয়েছিল।

তাম্রযুগে (খৃঃ-পূঃ ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে) ভারতীয়গণ যোগাভ্যাস করতেন। খৃঃ পূঃ ২১৮০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় যোগবিদ্যা মিশরে প্রচারিত হয়েছিল। যোগের সুপরিচিত পদ্মাসন এবং আরও কতকগুলি আসন মিশরীয় নৃত্যের অঙ্গীভূত হয়েছিল। বৈদিক যুগে এবং তৎপরে যোগাচার্য্যগণের দ্বারা যোগের প্রগতি ভারতে অব্যাহত ভাবে চলেছিল।

নব জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত মানবতত্ত্বের উপর যোগবিদ্যা সুপ্রতিষ্ঠিত। দেহাতীত বস্তুর সত্তা যোগে স্বীকৃত হয়েছে। রাসায়নিক, ঐন্দ্রিয়ক এবং সংবিদাতীত মানব-সত্তা শারীর-শাস্ত্রের সীমাবহির্ভূত হলেও যোগবিদ্যার্জ্জনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এখানেই মানুষের প্রকৃত মানবত্ব এবং মহত্বের বীজ নিহিত। যখন মানবের এই অজ্ঞাত অংশস্থ সুপ্ত শক্তির জাগরণ হয় তখনই মানব মহাপুরুষে পরিণত হয়। আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং নানা প্রকার অতীন্দ্রিয় কার্য্যাবলী মানবের এই অজ্ঞাত অংশেরই বহির্বিকাশ। পক্ষান্তরে এই অংশের অপুষ্টাবস্থায় মানব হয়ে পড়ে দানব। কল্পিত দেবতার প্রীতি উদ্দেশ্যে তৎবেদীমূলে অনুষ্ঠিত নরমেধ যজ্ঞের রক্ত পুনঃ পুনঃ পান করেও তাদের তৃপ্তি হয় না, কারণ তাদের বাসনা ও চেষ্টা সীমাশূন্য স্বার্থপরতা ও হীনতা-রঞ্জিত।

ডক্টর কোন্‌ষ্টান্‌টিনে ফোন একোনোমো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মানুষ যে কেবল মাত্র প্রকটিত মনোবৃত্তির উন্নতি সাধনেই তৃপ্ত থাকবে তা নয়, ভবিষ্যতে সে নূতন চিন্তাশক্তির বিকাশ করতে সমর্থ হবে। মস্তিষ্কের ক্রমিক উন্নতি-পদ্ধতি এবং মস্তিষ্কস্থ অসাধারণাংশের উন্নতি বিধানকে তিনি "ক্রমোন্নতি-শীল মস্তিষ্ক ক্রিয়া" এই সংজ্ঞা দিয়েছেন। বস্তুতঃ শরীরস্থ কোষ সমূহের মধ্যে যে অসাধারণ শক্তি নিহিত আছে তাহা যদিও সাধারণাবস্থায় সুপ্ত, কিন্তু বিশেষাবস্থায় তাহা বাস্তবরূপ ধারণক্ষম। প্রকৃতপক্ষে মানুষ বাস্তব ও সম্ভাব্য ক্রিয়াশক্তির সমবায়ে গঠিত। সম্ভাব্য শক্তি বাস্তব শক্তির ন্যায় সত্য এবং বিশেষাবস্থায় তাহা অভিব্যক্ত হয়। ইন্দ্রিয় সহায় ব্যতীত বহির্জগতের জ্ঞানলাভ এবং নানা প্রকার অতীন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ, এমন কি শারীর পরিণাম নিরোধ ও শূন্যোত্থান এ সমস্তই সম্ভবপর। যোগাচার্য্যগণ দেখিয়েছেন যে, বহু অসাধারণ সুপ্ত শক্তিনিচয়কে উদ্বুদ্ধ করা এবং সাধারণ শক্তির হ্রাস ব্যক্ত করা যাইতে পারে।

সাধু হরিদাসের প্রতিপাদন

কতকগুলি পর্ব্বপদী প্রাণী শারীর পরিণাম সাময়িক ভাবে নিরোধ করে প্রচ্ছন্ন জীবনাবস্থায় অবস্থান করতে পারে, কিন্তু সাধারণ ভাবে মানুষের পক্ষে এই ধরণের অস্তিত্ব অসম্ভব, কারণ মানব শারীর পরিণাম নিরোধ অথবা হ্রাস সাধন করিতে অপারগ। ইহা অনুমিত হয় যে শারীর পরিণামের সাময়িক নিরোধ দেহের উপর সুদূরপ্রসারী ফল উৎপাদন করতে পারে। নানা সুপ্ত শক্তির জাগরণ, অতি দীর্ঘ জীবন লাভ, দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়, এবং অন্যান্য অনন্যসাধারণ শারীর মানস শক্তির বিকাশ ইহার সহিত জড়িত বলে মনে হয়। যোগীরা বলেন যে, শারীর পরিণাম নিরোধ করা যেতে পারে। এই অসম্ভব কার্য্যের একটা বিবরণ দেওয়া যাচ্ছেঃ—

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সাধু হরিদাস নামে জনৈক যোগী পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা মহারাজা রণজিৎ সিংহ, রাজসভাসদবর্গ এবং কতিপয় ইংরাজ ও ফরাসী ভদ্রমহোদয়গণের সমক্ষে ৪০ দিন ভূগর্ভে প্রোথিতাবস্থায় থাকার ক্রিয়া দেখান। প্যারীর জেনারেল ভায়নটায়া, কর্ণেল সার সি, এম, ওয়েড এবং কয়েক জন বৈদেশিক চিকিৎসকও উপস্থিত ছিলেন। যোগী একটি বিশেষ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নাসারন্ধ্রদ্বয় এবং কর্ণকুহরদ্বয় মোম দ্বারা বন্ধ করা হল। যোগী জিহ্বা উল্টাইয়া স্বর-যন্ত্রদ্বারও বন্ধ করলেন, তার পর তাঁকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে একটা কাঠের বাক্সের ভিতর রাখা হল এবং তাহা বন্ধ করা হল। মহারাজা নিজে তাতে দৃঢ় তালা লাগাইয়া দিলেন। বাক্সের কয়েক স্থানে মহারাজার নামাঙ্কিত শীলমোহর করা হল। তৎপর বাক্সটিকে প্রোথিত করে যব বপন করা হল, স্থানটিকে প্রাচীর বেষ্টিত করা হল এবং প্রাচীর-দ্বার সুরক্ষিত করা হল। চত্বারিংশ দিবসে বাক্সটি ভূগর্ভ হতে তোলা হল এবং খোলা হল। দেখা গেল যে, যোগী প্রথমে যে আসন অবলম্বন করেছিলেন তাতেই অবস্থান করছেন। এক জন চিকিৎসক যোগীর শরীর পরীক্ষা করে দেখলেন। পরীক্ষায় দেখা গেল যে, তাঁহার হৃদয়-ক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ, শরীর কঠিন এবং শীতল। কেবল মাত্র মস্তকে তাপ অনুভূত হয়েছিল। আর একটি কৌতূহলজনক ব্যাপার এই যে, প্রোথিত হবার দিনে যোগী মুণ্ডিত-মস্তক হয়েছিলেন, কিন্তু সমাধি হতে উত্তোলনের সময় দেখা গেল যে তাঁর গণ্ডদেশে কোন কেশ জন্মে নাই। যাহা হউক, তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে যান।

যোগীর এই ক্রিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করে যে, মানুষ শ্বাসযন্ত্রকে ইচ্ছানুরূপ করতে পারে, শ্বাসকর্ম্মকে দীর্ঘ দিন নিরোধ করতে পারে, হৃদয়ের স্পন্দন দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত বন্ধ রাখা যায়, এবং শারীর কোষ সমূহের ক্রিয়াও নিরুদ্ধ করা যায়।

মাদ্রাজের ব্রহ্ম নামক এক যোগী সম্প্রতি হৃদয়-স্পন্দন এবং নাড়ীর গতি বন্ধ করতে এবং এক ঘণ্টারও অধিক কাল কুম্ভক করতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি বলেন যে, তাঁর গুরু কর্ত্তিত ধমনীর রক্ত বন্ধ করতে পারেন।

শূন্যোত্থান

যোগীরা বলেন যে, যখন প্রাণায়াম দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হয়ে মূলাধার হতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হতে থাকেন, তখন সেই ঊর্দ্ধগামী শক্তির বলে যোগীর শরীর ভূমি হতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হতে পারে। মাদ্রাজস্থ তিনিভেলি নামক স্থানের সুব্বায়া পল্লভার নামক এক যোগী সম্প্রতি এই ক্রিয়া প্রদর্শন করেছেন। তিনি একটি বস্ত্রাচ্ছাদিত যষ্টির উপর এক হাতে সামান্য মাত্র ভর রেখে তাঁহার সমস্ত দেহকে শূন্যে শয়নাবস্থায় প্রায় ৪ মিনিট কাল রাখতে সমর্থ হয়েছেন। তৎপরে তিনি ঐরূপ শয়নাবস্থায় থেকে যষ্টির উপরিভাগ হতে তলদেশ পর্য্যন্ত—যাহার দূরত্ব প্রায় দুই হাত—৫ মিনিটের মধ্যে নেমে আসতে পারেন। ঐ সময় যোগী সমাধি অবস্থায় থাকেন এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর এরূপ আড়ষ্ট ও কঠিন হয় যে

পুরাতন
গিয়ে নতুন এল
EVEREADY
Fresh Power
BRIGHTER LIGHT
LONGER LIFE
নতুনের জন্য
লক্ষ্য রাখুন
EVEREADY
TRADE-MARK
ফ্ল্যাশলাইট ব্যাটারী
ন্যাশনাল কার্বন কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুত

চার পাঁচ জন লোকেও কোন অঙ্গ বাঁকাতে পারে না। ক্রিয়ার পর তাঁহার অঙ্গ মর্দন করা এবং মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালা হয়। ইহার পর তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

যোগে শারীর শিক্ষা

এখন বুঝতে পারা যায়, কেন যোগীরা আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, কেন তাঁহারা আধ্যাত্মিক সাধনাকে সর্ব্বপ্রকার কর্মচেষ্টার উপরে স্থান দেন। কিন্তু তত্রাচ তাঁহারা মনুষ্যের শারীরিক প্রকৃতি অবহেলা করতে বলেন নাই। যোগীরা দেখেছেন যে, আধ্যাত্মিক এবং মানসিক ব্যাপারের সহিত শারীর ব্যাপার অবিচ্ছিন্নরূপে সম্বন্ধযুক্ত, যদিও বর্ত্তমানে এই সম্বন্ধের বিষয় ভাল জানা নাই। মানবের অজ্ঞাত সত্তা শরীরাভ্যন্তরে এবং দেহাতীতরূপে অবস্থিত হয়ে শারীর যন্ত্রের মধ্য দিয়ে নানা শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই অশরীরী সত্তার প্রথম জ্ঞানগম্য আত্মরূপ হচ্ছে সংজ্ঞান মন। এই মন কেবল মাত্র যে শারীর-তন্ত্রের অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ তাহা নহে, পরন্তু ইহা শারীর গতির সীমা অতিক্রম করেও অবস্থান করছে। শারীর মনের উপর যে নানা প্রকার চিহ্ন অঙ্কিত করতে পারে, তাহা মনের উপর শারীর পরিবর্ত্তনের প্রভাব দ্বারা প্রমাণিত হয়। অপর পক্ষে শরীরও মানস ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। কারণ দেখা গিয়াছে যে, চিন্তার দ্বারা শারীর-তন্ত্রের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। মানস-ক্রিয়া কেবল মাত্র মনের উপরই নির্ভর করে না। উপরন্তু মস্তিষ্ক-কোষসমূহ, অন্তরস্রাবী গ্রন্থিনিচয়, শোণিত, আভ্যন্তরীণ যন্ত্র সকল এবং পেশী সমূহের উপরও নির্ভরশীল। যোগীরা শারীর শিক্ষায় আধ্যাত্মিক বিজয় লাভের রক্ষাকবচের সন্ধান পেয়েছেন। শারীর দৌর্ব্বল্য আধ্যাত্মিক ও মানসিক শক্তিলাভের অনুকূল নয়। নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য শারীর সংযমের প্রয়োজন হয়।

মনের ক্রিয়াকলাপ মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য সমস্ত যন্ত্র—যাহা রক্ত ও নালীকা দ্বারা মস্তিষ্কে প্রতিভাত হয়—তাদের উপর নির্ভর করে। কার্য্য সম্পাদনের দিক থেকে মাংসপেশীগুলি মস্তিষ্কের অংশস্বরূপ। সুনিয়ন্ত্রিত পৈশিক চেষ্টা দ্বারা আমরা মস্তিষ্ক ও শারীর-রস সমূহকে এবং তাহাদের দ্বারা মনকে প্রভাবান্বিত করতে পারি। যোগিগণ-প্রবর্ত্তিত ব্যায়ামবিদ্যায় উক্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া সন্নিবেশিত হয়েছে। যোগে প্রকৃতপক্ষে শারীর শিক্ষার অর্থকে সংপ্রসারিত করা হয়েছে। যোগে ব্যায়াম শারীর সাধনের সহিত চিত্ত ও ভাব সাধনের পদ্ধতিরূপে পরিণত হয়েছে।

যোগবিভাগ

যোগ প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত :—মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগ। সমস্ত যোগেই শারীর শিক্ষার উপদেশ আছে। দেহ-শুদ্ধির জন্য মন্ত্রযোগে স্নান-পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে। ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য এবং বারুণ-স্নান বিশেষ ভাবে শারীর-স্বাস্থ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। ভৌম-স্নান অর্থে বিশুদ্ধ মৃত্তিকার দ্বারা শরীর মর্দন। আগ্নেয় স্নান অর্থে বাষ্প-স্নান এবং সূর্য্যকিরণ সেবন। খোলা গায়ে মুক্ত বাতাস লাগানকে বায়ব্য স্নান বলে। বারি-স্নানকে বারুণ স্নান বলে। অতি প্রাচীন কালেই যোগীরা এই সকল স্নানের উপকারিতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

লয়যোগের স্থুল ক্রিয়া ও সূক্ষ্ম ক্রিয়া শারীর শিক্ষার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। আসন ও মুদ্রা স্থুল ক্রিয়ার অন্তর্গত। প্রাণায়ামকেই সূক্ষ্ম ক্রিয়া বলে। এইগুলি যোগোক্ত ব্যায়ামের অন্তর্গত। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি রাজযোগের প্রধান অঙ্গ। এই অঙ্গগুলির প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক মোক্ষ ও বিভূতি লাভ। যাহা হউক, এইগুলি উপযুক্ত ভাবে পরিবর্ত্তিত করে শারীর শিক্ষার অঙ্গরূপে পরিণত করা যায়। এই মানস ব্যায়াম তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—কোন প্রকার স্থিরাসনে ধ্যানাভ্যাস; প্রাণায়ামের সহিত ধ্যানাভ্যাস; এবং ঐচ্ছিক শৈথিল্য করণাভ্যাস।

হঠযোগ

হঠযোগেই বিশেষ ভাবে ব্যায়ামবিদ্যা উপদিষ্ট হয়েছে। ষট্কর্ম্ম, আসন, মুদ্রা এবং প্রাণায়ামই হঠযোগোক্ত ব্যায়ামবিদ্যার প্রধান অঙ্গ। ষট্কর্ম্ম হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত শোধন প্রণালী। ইহা দ্বারা মল নিষ্কাষিত হয়ে নির্ম্মল দেহ লাভ হয়। ইহা একটি অন্তর-ধৌতির পদ্ধতি। ইহার নিম্নোক্ত অঙ্গগুলিই প্রধান :—

১। নেতি (সূত্রদ্বারা নাসাভ্যন্তর মার্জ্জন)
২। ব্যুৎক্রম কপালভাতি (নাসাগ্রমণিকা বারি ধৌতি)
৩। শীৎক্রেম কপালভাতি (নাসাগ্রমণিকা বারি ধৌতি)
৪। দণ্ড ধৌতি (দণ্ড দ্বারা অন্ননালিকা মার্জ্জন)
৫। বমন ধৌতি বা গজকরণী (আমাশয়ের বারি ধৌতি)
৬। বাসো ধৌতি (বস্ত্র দ্বারা আমাশয়ের মার্জ্জন)
৭। বস্তি (বৃহদন্ত্রের বারি ধৌতি)
৮। মূল শোধন (অঙ্গুলির দ্বারা পায়ু ঘর্ষণ)
৯। বারি সার (মহাস্রোতের বারি স্নান)

আসন ও মুদ্রা দ্বারা পেশী নিচয় এবং তদ্দ্বারা আভ্যন্তরীণ যন্ত্র-সমূহ, অন্তরস্রাবী গ্রন্থিনিচয় এবং নাড়ীতন্ত্রকে প্রভাবান্বিত করা যায়। প্রাণায়াম যোগের শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যায়াম। প্রাণায়াম দ্বারা শরীরের অশেষ মঙ্গল বিধান করা যায়। এই স্বাস্থ্যপ্রদ ফল ব্যতীত ইহার সুদূরপ্রসারী ফল আছে। নাড়ীতন্ত্র এবং চিত্তকে সংযত এবং দৃঢ় করিবার ইহা একটি শারীর-বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী। ইহা মনে করবার কারণ আছে যে ইহার দ্বারা নাড়ীতন্ত্রের পুনর্গঠন ও শক্তি বৃদ্ধি করা যায়।

★

দুগ্ধ

জাতির স্বাস্থ্যগঠনের উপাদান

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য মানুষের খাদ্যের একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ। ভারতবর্ষের পক্ষে একথা বিশেষভাবে উপযোগী, কারণ এদেশে নিরামিষাশীর সংখ্যা যথেষ্ট। গো-মহিষ প্রভৃতিকে যদি স্বাস্থ্যানুকূল অবস্থায় বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পালন করা যায় তবেই তারা বেশি পরিমাণে ভালো দুধ দিতে পারে। উৎকৃষ্ট দুধ জাতির স্বাস্থ্যোন্নতির সহায়।

গোয়ালের মেঝে মসৃণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক হওয়া আবশ্যক। এসব মেঝে এমনভাবে নির্মাণ করা চাই যাতে চোনা, গোবর প্রভৃতি সহজেই সরে যেতে পারে—জমাট হয়ে যেন জীবাণু জন্মাতে না পায়। জলের নাদা ও খড়ের গাদাও মজবুত ও টেকসই হওয়া উচিত।

দালান তৈরীর উপকরণ কংক্রিটের অনেক গুণ। কংক্রিটের মেঝেতে এসমস্ত সুবিধাই পাওয়া যায়, তাছাড়া আগুনের দিক থেকেও তা নিরাপদ।

এ বিষয়ে কোনরূপ সহায়তা আবশ্যক হলে সিমেণ্ট মার্কেটিং কোম্পানী অব ইণ্ডিয়ার বিশেষ প্রতিষ্ঠান কংক্রিট এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করুন।

সিমেণ্ট মার্কেটিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ

গোলাবাড়ীতে সিমেণ্ট কংক্রিট ব্যবহারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় চিঠি লিখুন—কংক্রিট এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া, ভিক্টোরিয়া হাউস, কলিকাতা।

FREE SER VICE C.A.I.

বর্ণচেতনা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেবেলা থেকে ঠাকুমা-ঠাকুরমার কাছে গল্পচ্ছলে আমরা শুনে আসছি সূর্যদেব না কি সাতটা ঘোড়ায়-টানা রথে চড়ে প্রাতর্ভ্রমণ শুরু করেন,—ঘরে ফিরতে তাঁর সন্ধ্যে হয়ে যায়। সেই সাতটা ঘোড়ার না কি আবার সাত রকমের রঙ।

কথাটা কিন্তু সত্যি। সূর্যরশ্মি বিশ্লেষণ করে আমরা পাই সাতটা রঙ—যেগুলো একসঙ্গে মিশে গিয়ে আমাদের চোখে সাদা হয়ে গিয়েছে। এই রঙেরা আমাদের চোখে ধরা পড়ে বৃষ্টির পর যখন আকাশ জুড়ে জলকণারা ছড়িয়ে থাকে—আর তারি কুয়াটিকা ভেদ করে আসে সূর্যের আলো; আমরা দেখি আকাশে এক বিচিত্র সাত রঙের ধনুক। ঐ রামধনু যে সাত রঙের সমাবেশ, সূর্যের আলো সেই সাত রঙের মিশ্রণ ছাড়া আর কিছু নয়। এই সাতটা রঙ হচ্ছে :—বেগনি (Violet), নীলাম্বিত বা নীলাভ বেগনি (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হলদে (Yellow) কমলা (রক্তাম্বিত বা লোহিতাভ হলদে, (Orange) এবং লাল (Red)।

আমরা আরো জানি, এবং যাঁরা ফোটো তোলেন তাঁরা আরো ভালো করেই জানেন যে ফোটো খুব সুন্দর আর সফল করে তুলতে হলে কাচপুট বা Lens-এর মুখে ফোটোর বিষয়-বস্তু এবং প্রতিফলিত আলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নানা রকম রঙের কাচ (যাদের বলা হয় Filters) লাগিয়ে নিলে ফল ভালো পাওয়া যায়। এর কারণ হচ্ছে, ঐ রঙীন কাচগুলো নিজের নিজের রঙ অনুযায়ী কোনো একটা রঙকে দ্বিগুণিত করে দেয় বা কোনো একটা রঙকে প্রতিরোধ করে (Filter নাম থেকেই এই আভাস পাওয়া যায়—আলোকে ছেঁকে তোলা—পরিস্রুত রশ্মি)।

কিন্তু এ সব হোল বিজ্ঞানের কথা। দৃশ্য অথবা অদৃশ্য রঙের এই যে প্রভাব এবং প্রকৃতি, এর সঙ্গে কি কেবল মাত্র বাইরের জগতেরই সম্পর্ক? আমাদের মানসিক জগতের ওপর রঙের কি কোনো প্রভাব আছে? কোনো একটা বিশেষ রঙের প্রভাবে আমাদের জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটা কি সম্ভব?

আমরা সকলেই জানি যে আলো না পেলে গাছ মরে যায়। আবার কোনো একটা বিশেষ রঙের বিশেষ প্রয়োগে বৃক্ষবিশেষকে সবিশেষ উন্নত করাও সম্ভব। আমরা আরো জেনেছি, দৃশ্য আলোর পশ্চাতে যে অতি-বেগনি বা Ultra-violet রশ্মি, তা আমাদের স্বাস্থ্যের প্রভূত সহায়ক, কেবলমাত্র ঐ রশ্মির—ঐ অদৃশ্য রঙের প্রয়োগে স্বাস্থ্যের গতি ফিরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ঐ যে সাতটি রঙ এবং তার বিভাগে বা সংমিশ্রণে আরো যে অনেক রকম রঙের সংস্রবে আমরা আসি, জানি না বলে আমরা বুঝি না—এ সব রঙ আমাদের ওপর কি প্রভাব রেখে গেলো; আমরা টেরও পাই না—কিন্তু আমাদের মানসিক বিকাশের মূলে তাদেরও কিছু অংশ থেকে যায়।

আমাদের প্রত্যেকেরই একটা না একটা বিশেষ রঙের দিকে ঝোঁক থাকে, যেমন জীবনের বিশেষ বিশেষ দিকে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকমের আকর্ষণ থাকে। ঐ আকর্ষণ বা প্রবণতার বিভিন্ন তার মূলে আমাদের সামাজিক, পারিপার্শ্বিক, পারিবারিক, আধি-ভৌতিক, আধিদৈবিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানা রকম কারণ থাকে। মানসিক কতকগুলি বিশেষ কারণও আছে; তার মধ্যে রঙের প্রভাবও অন্যতম।

কথাটা শুনতে আশ্চর্য্য লাগে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই কথাটা আর অস্বীকার করা যায় না। দু'-চারটা অতি স্বাভাবিক জিনিষ নিয়েই বিবেচনা করে দেখা যাক। সাদা রঙটা আমাদের জীবনে অপরিহার্য্য; আমরা যেন সাদা রঙের সংস্পর্শে একটা স্বাভাবিক সরলতা, সঙ্কোচহীনতা বা সর্বজনীনতার আভাষ পাই। অন্যায় কাজটা সাদা আলোয় করতে আমাদের বাধে, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে হয়ত সহজেই সেটা করে ফেলা যায়। গেরুয়া রঙ হোল পথের রঙ; তার মধ্যে যেন একটা উদাসীনতার ভাব আছে। মাটির কথা—ধুলোর কথা ভাবলে আমাদের মন উন্মনা হয়ে ওঠে না কি? এই জন্যই বৈরাগী বরণ করে নিয়েছে গেরুয়া রঙ,—পথই যে তার চিরদিনের সঙ্গী। সবুজ রঙটা যেন চিরনূতন। প্রতি বছর যখন গাছে গাছে দেখা দেয় নতুন পাতা, মন যেন আমাদের মুক্ত হয়ে যায়। সবুজের সংস্পর্শে যেন আমরা প্রাণ পাই—পাই প্রেরণা। আর এরই পাশে আরেকটা রঙ এসে দাঁড়ায় বা আমাদের মনে একটা অদ্ভুতময় উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়। সে হচ্ছে লাল রঙ। নতুন পাতার সাথে সাথে পলাশে শিমূলে যেন আগুন ধরে যায়; আপনাকে আমাদের ভালো লাগে, জগৎকে ভালো লাগে।

এক-একটা রঙ চোখে দেখলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে আমাদের মনে বালক-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে এক-একটা ভাবের উদয় হয়। শিশুরা লাল রঙ দেখলেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এর কারণ, লাল রঙটা খুব গভীর রঙ, হঠাৎ চোখে লেগে যায় খুব। ঐ রঙের রশ্মিগুলি চোখের শিরায় শিরায় ধাক্কা দিয়ে উত্তেজিত করে তোলে। এই কম্পনের বেগ এক-একটা রঙে এক এক রকম। সব চেয়ে কম ধাক্কা দেয় কালো রঙ। রঙ প্রতিফলিত হয়ে ইথর-তরঙ্গে যে কম্পনের সৃষ্টি করে তাতেও এক রকমের শব্দ হয়। এর সাহায্যে কানের কাছে নিয়ে ধরলে অন্ধেরা কোন্ জিনিষের কি রঙ বলে দিতে পারে।

সাধারণতঃ আমাদের মনের ওপর কোন্ রঙ কি কি ধরণের ক্রিয়া করে বা কি জাতীয় প্রভাব বিস্তার করে, গবেষণার ফলে তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। নীল-লোহিত বা Magenta রঙ আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীতে এমন একটা অলস আমেজের ভাব এনে দেয় যাতে আমরা বেশ স্বচ্ছন্দ বা আরাম বোধ করি। বেগনি বা Violet রঙ আমাদের মনে এনে দেয় অবসাদ, আমরা যেন এর সংস্পর্শে কেমন বিষণ্ণ বোধ করি। হলদে রঙ আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীতে একটা নাড়া দিয়ে যেন জাগিয়ে তোলে (stimulates our nerves), আমরা এর সংস্রবে যেন উত্তেজিত বা উদ্দীপিত বোধ করি। লাল রঙটা খুব গভীর হওয়াতে আমাদের দৃষ্টিপথের ওপর একটা স্পন্দন দিয়ে যায়, আমাদের শিরা-উপশিরায় আর অনুভূতিতে এনে দেয় একটা কম্পনময় উত্তেজনা। হয়তো এই কারণেই বিপদের সঙ্কেতটা হোল লাল। রেলওয়ে বিভাগকে প্রথম প্রথম এই বিশেষ রঙ ব্যবহার নিয়ে অনেক মাথা ঘামাতে হয়েছিল। নীল রঙের সংস্পর্শে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী শান্ত হয়, এবং ফলে আমাদের সজীবতা (vitality) নিস্তেজ আসে। পরীক্ষ

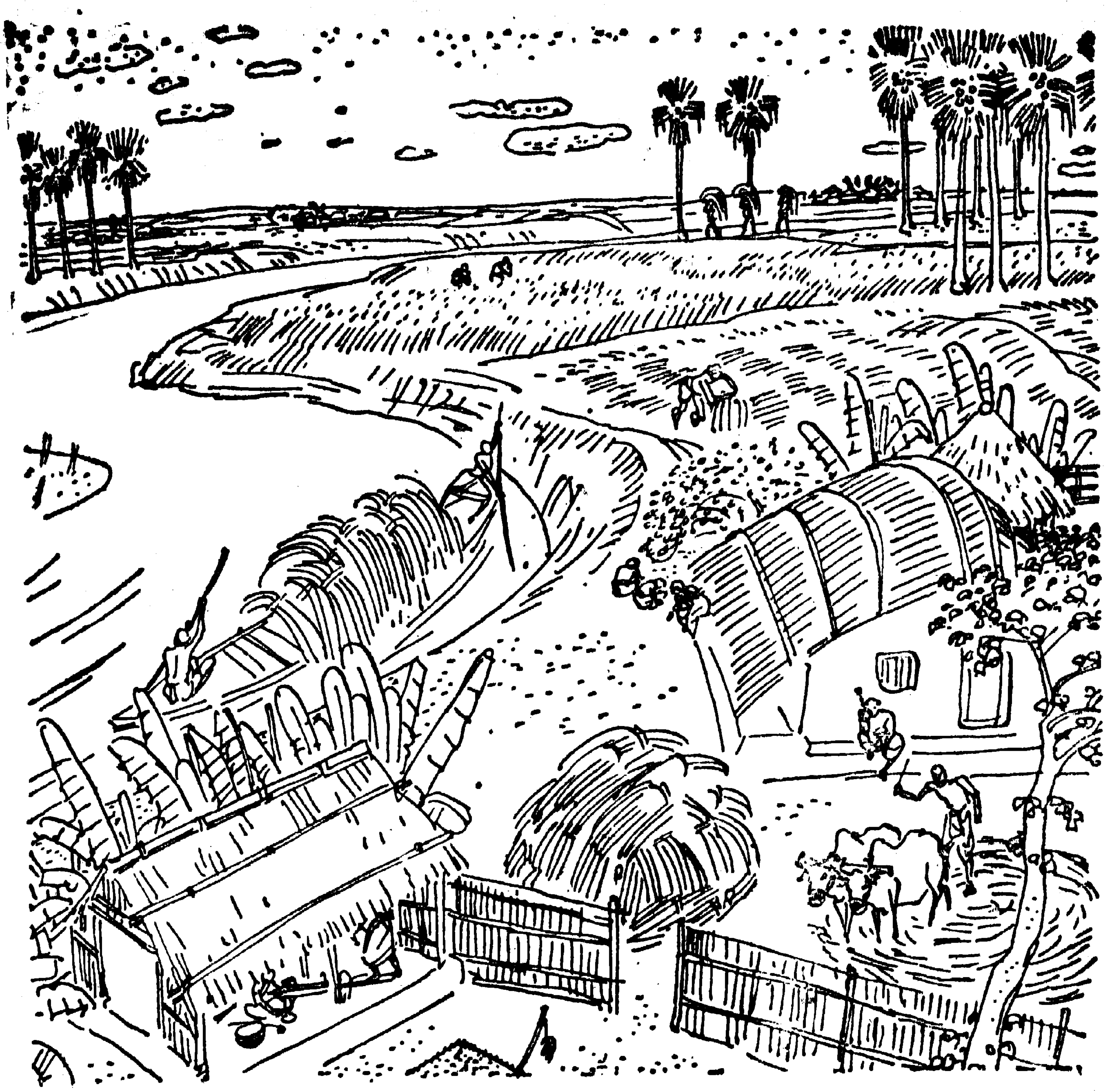

শরৎ

বাদলধারা শেষ হয়ে গেল। স্বচ্ছ নীল আকাশে ভেসে চলেছে রাশি রাশি শাদা মেঘ, নীচে বয়ে চলেছে শান্ত নদীর নির্মল জলরেখা। আলো-ঝলমল পথে শরৎ নেমে এলো, বেজে উঠলো আগমনীর বাঁশিটি। মানুষ সাড়া দিয়েছে তার আহ্বানে, তাকে বরণ করে নিয়েছে অফুরান নৃত্য গীতের উচ্ছলতায়। নগরে, গ্রামে, সর্বত্র আজ আনন্দের আসর বসেছে। উষ্ণ চায়ের মিষ্টি গন্ধে উৎসবের মুহূর্তগুলি ভরে উঠেছে কানায় কানায়।

চা

সব সময়েই চলে

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শন্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

করে দেখা গেছে যে কোনো কোনো বীজের থেকে অঙ্কুর বেরোতে সাদা আলোতে যেখানে আট দিন লাগে, নীল রঙের কাচের আড়ালে রাখলে দু'দিনেই তা ফুটে বেরোয়। কৃষ্ণাভ বা ঘোর লাল রঙ (purple) না কি নিদ্রার সহায়তা করে। ১৯২৮ সালে আমেরিকায় কোনও ফুটবল শিক্ষা কেন্দ্রের বিশ্রাম করবার বা সাজ-গোজ করবার ঘরটি নীল রঙে এবং খেলাধূলা সম্পর্কে কথাবার্তা বলার বা শিক্ষা দেবার ঘরটি লাল রঙে রঞ্জিত করা হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নীল এবং ঘোর লাল রঙের কাচ জানালায় লাগানোর রীতি স্বাস্থ্যকর বলে মনে করা হোত।

পুরাকালে আবেগ বা ভাবধারাকে (emotions) বিশেষ বিশেষ রঙে সূচিত করা হত। এর মধ্যে লক্ষ্যণীয় যে, অনেক ক্ষেত্রে একই রঙে সম্পূর্ণ বিপরীত দুই ভাব প্রকাশ পেত; আবার একই রঙের সামান্য তারতম্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব সূচিত হোত। যেমন, আগেই বলা হয়েছে, নীল-লোহিত (magenta) রঙ আমাদের প্রমোদিত বা স্বচ্ছন্দ করে তোলে; কিন্তু অনেক সময়ে ঐ রঙ দিয়েই প্রকাশ করা হোত দৃঢ়তার ভাব। লাল রঙে সাহসিকতা বা কর্ম-কুশলতার প্রকাশ; আবার অরাজকতা বা রক্তলোলুপতার চিহ্নও ছিল লাল। খাঁটি হলদে রঙে গৌরব, উৎকর্ষ, প্রফুল্লতা, উৎসাহ, সমৃদ্ধি সৌভাগ্য—এই সব বোঝাতো; কিন্তু খাঁটি হলদে না হয়ে এরই নানা রকম রূপান্তরে বোঝাতো ভীরুতা, স্বাস্থ্যহীনতা অথবা ব্যক্তিত্বের অভাব। ঘোর রক্তবর্ণ (purple) ছিল শৌর্য বীর্য ঐশ্বর্য বা মহত্ত্বের চিহ্ন; আবার অনেক সময়ে ঐ একই রঙের ব্যবহারে ফুটে উঠতো রিপুগত উত্তেজনা (passions), দুঃখ ক্লেশ, কিম্বা একটা রহস্যজনক অবস্থার (mystery) আভাস।

কিন্তু একই রঙে কি করে সম্পূর্ণ বিপরীত দুই ভাবের প্রকাশ সম্ভব হোল সেটা গবেষণার বিষয়। মনে হয়, এর মূল কারণ রুচিভেদ। অষ্টাদশ বা তৎপূর্ব শতকে মানুষের রুচি যেমন ছিলো এখন আর তেমনটি নেই। আবার দেশভেদেও রুচিভেদ হয়ে থাকে। শীতের দেশের লোকের পোষাক যেমন অনিবার্য কারণে গরম দেশের থেকে আলাদা, রুচির বেলাতেও তেমনি পার্থক্য খুবই স্বাভাবিক। অনুসন্ধান করলে হয়তো দেখা যাবে যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা বা স্বাজাতিক চিহ্নের বর্ণগত বৈষম্যের মূলে ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও রয়েছে রঙ সম্বন্ধে তাদের পৃথক্ পছন্দ-অপছন্দ-বোধ। এবং দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে রঙ সম্বন্ধে এই বিশেষ রুচির যোগাযোগও অবিচ্ছেদ্য।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে দেবদেবীর রূপ-বর্ণনা এবং পূজা-পদ্ধতির মধ্যে রঙ সম্বন্ধেও যে উল্লেখ এবং নির্দেশ থাকে, তার তাৎপর্য ভিত্তিহীন নয়। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপের মধ্যে রূপ-পরিকল্পনাও তিন রকম; প্রত্যূষে রক্তিমাভ, দ্বিপ্রহরে নীলাভ, এবং সন্ধ্যায় শ্বেত। রূপ-কল্পনাতেও তেমনি প্রভেদ,—কিশোরী, যুবতী এবং বৃদ্ধা। কিশোরীর চাঞ্চল্য এবং প্রীতিমুগ্ধ ভাব ফুটে ওঠে না কি রক্তিম রঙে? যুবতীর স্নিগ্ধ এবং ধরিত্রী প্রেমের স্পন্দন কি নেই নীল রঙের মধ্যে? প্রৌঢ় প্রশান্তি কি ফুটে ওঠে না শুভ্রতার মাধ্যমে?...তান্ত্রিক শাস্ত্রেও এই একই জিনিষ দেখা যায়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই পূজাবিধির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে রঙের ব্যবহার;—যেমন ভাবে হিংসা-ক্রোধ ইত্যাদির সাথে যোগ রেখে মানুষের মন, তথা হাবভাব চাল-চলনের হয় পরিবর্তন। তন্ত্রপূজায় শান্ত, পুষ্টি, মোক্ষ, বশীকরণ, আকর্ষণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষ, উচাটন, মারণ প্রভৃতির সাধনায় বিভিন্ন আসন, উপচার ইত্যাদির সঙ্গে সাধকের পরিধেয় বস্ত্রের রঙের বিভিন্নতারও নির্দেশ আছে। পূজ্য দেবদেবীর বর্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বিধান। শান্ত, পুষ্টি ও মোক্ষের ক্ষেত্রে শুভ্রবর্ণ; বশীকরণ, আকর্ষণ ও স্তম্ভনে পীত বর্ণ; বিদ্বেষে স্বচ্ছ বা মিশ্র-বর্ণ এবং উচাটন ও মারণে যথাক্রমে কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ ও ঘোর রক্তবর্ণ। কল্পনা এবং প্রেরণার সাহায্যে পূজ্য বিষয়-বস্তুর এবং তার ফলাফলের একটি যোগসূত্র এই রঙগুলির ব্যবহারের মধ্যে ফুটে ওঠে।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকারগণও বহু দিন আগে প্রত্যেকটি রস এবং তার প্রকাশের সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের সঙ্গতি বা যোগাযোগের কথা লিখে গেছেন। তাঁদের মতে মুখ্য ভক্তিরস পাঁচ রকমের;—শান্ত, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর (বা উজ্জ্বল)। শান্তরসের প্রকাশে শ্বেতবর্ণ, প্রীতিরসে বিচিত্র (বা মিশ্র) বর্ণ; সখ্যে লাল; বাৎসল্যে সোনালি এবং মধুর-রসের প্রকাশে ঘোর অথবা উজ্জ্বল রঙের সম্বন্ধ নির্ণীত হয়েছে। সাত রকমের গৌণ রসের বেলাতেও তেমনি; যেমন—হাস্যরসে পাণ্ডুর রঙ, অদ্ভুতরসে পিঙ্গল বা তামাটে রঙ, বীররসে গৌর বা পীতবর্ণ, করুণ রসের বেলায় ধূসর বা ধোঁয়াটে রঙ, রৌদ্ররসে গাঢ় লাল রঙ এবং ভয়ানক ও বীভৎস রসের প্রকাশ যথাক্রমে কালো এবং (ঘোর) নীল রঙের ব্যবহারে। এমন কি, যুগাবতারদের রঙ সম্বন্ধেও উল্লেখ দেখা যায়—যার থেকে বিভিন্ন যুগ এবং অবতারদের প্রকৃতি সম্বন্ধেও আভাস পাই। সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে শ্যামবর্ণ এবং কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ।"

আধুনিক কালে মনোবৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের বিশ্লেষণের মধ্যে অবচেতন মনের ওপর নানা রকম রঙের প্রভাব এবং প্রাধান্যের আবিষ্কারও স্বীকার করেছেন। মানসিক বিশ্লেষণের সাহায্যে কার মনে কোন্ রঙের কি প্রভাব তা বার করে নিয়ে তাঁরা বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এ বিষয়ে আমেরিকার বিখ্যাত চিকিৎসক ও মনোবৈজ্ঞানিক ডাঃ ওয়ারথ্যামের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মনোবিকারগ্রস্ত রোগীকে নানা রকম রঙের নানা রকম ঢঙের কতকগুলো পদার্থ দিয়ে সেগুলির সাহায্যে তাকে নিজের ইচ্ছামত রঙ সাজিয়ে নক্সা তৈরী করতে বলা হয়। এই নক্সায় ব্যবহৃত রঙের ওপর ভিত্তি করে রোগী কি ধরণের লোক বা তার বিকারের মূলে কোন্ বৃত্তি আছে তা জানা যায়। যেমন ধরুন—যার অবচেতন মনে খুনের, প্রতিশোধের বা রক্তপিপাসার প্রবৃত্তি আছে তার নক্সায় গাঢ় বা ঘোর রঙ—বিশেষ করে টকটকে লাল রঙের প্রাধান্য দেখা যায়। শুধু রঙ ব্যবহারেই নয়, নক্সার বিচিত্রতায়ও তার মনোবৃত্তি ধরা পড়ে। যারা অদ্ভুত প্রকৃতির, তাদের নক্সার ধরণও অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক হয়।

লণ্ডনে Blackfriars Bridge-এ একদা আত্মহত্যার হার বড় বেশী ছিল। বর্ণবিদ্ (colourist) এসে বললেন, এর জন্য দায়ী সেতুর ঐ মিটমিটে কালো রঙ। রঙটা দেখলে যেন একটা অবসাদ, একটা বিষাদ এসে মনকে আচ্ছন্ন করে দিতে চায়; সেই জন্যই আত্মনাশেচ্ছু ব্যক্তির এখানে এলেই আত্মহত্যার ইচ্ছা বেড়ে যেত। নতুন করে ঐ সেতুকে তখন

প্রসবকালে দুষ্ট-জীবাণুর সংক্রমণ
সম্পর্কে আমরা তখন ডাক্তারের কথা শুনেছিলাম বলে আজ আনন্দ হয়।
দুষ্ট জীবাণুর সংক্রমণ সব সময়ই বিপজ্জনক, ঘরে তাই 'ডেটল' রাখবেন
অত ব্যস্ত হবেন না — স্বাভাবিকভাবে যা হওয়ার হতে দিন — আমাদের কাজ তার পরে
ফুটফুটে একটি খোকা হয়েছে আপনার — 'ডেটল'-এর গুণে খোকার ও আপনার স্ত্রীর আর কোন ভয়ের কারণ নেই
আমি সমস্ত প্রসূতিকেই নিরাপদে প্রসবের জন্য 'ডেটল'-এর উপর নির্ভর করতে বলি, তাছাড়া ঘরেও সব সময় 'ডেটল' রাখতে বলি
এ কথা ডাক্তার বলেন
'DETTOL'
এটলান্টিস (ইষ্ট) লিঃ, ২০-১, চেতলা রোড, কলিকাতা

উজ্জ্বল সবুজ রঙে রঞ্জিত করা হয়। তার ফলে আত্মহত্যার হার কিছু পূর্ব অনুপাতে এক-তৃতীয়াংশের থেকেও কমে গেলো।

সম্প্রতি দেখা গেছে যে রাস্তাগুলোকে যদি সাধারণ পিচ রঙের বদলে গাঁদাফুলের রঙে (marigold) অথবা অনুজ্জ্বল কমলা রঙে (dull orange) রঞ্জিত করা যায় তবে দুর্ঘটনা ঘটবার ভয় অনেক কমে যাবে। কারণ, সূর্যের কিম্বা চলতি গাড়ীর আলো সাধারণ রাস্তার চেয়ে এতে চল্লিশ শতাংশ হিসেবে কম প্রতিফলিত হবে,—যার ফলে পথ-চলতি লোকজন বেশ ভালো করে দেখা যাবে।

চোখের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি বই ছাপাতে হয় তাহলে সাদার ওপর কালো হরফের বদলে সামান্য হলদে রঙের কাগজের ওপর ধূসর (grey) রঙের হরফ ছাপানো উচিত। হলদের ওপর কালো রঙটা সব চেয়ে বেশী খোলে, কিন্তু কড়া বলে বেশীক্ষণ সহ্য করা যায় না।

আজকাল বিলিয়ার্ড খেলার টেবিলে না কি সবুজের বদলে লাল মদের মতো রঙ (claret colour) ব্যবহার করা হচ্ছে। এই রঙ না কি বেশী দিন স্থায়ী হয়, কারণ এর ওপর ব্যবহারজনিত ছাপ পড়ে কম।

দেখা গেছে, জাহাজের যে-অংশটা জলের নিচে থাকে তাতে চিরাচরিত প্রথায় কালো রঙ না দিয়ে যদি উজ্জ্বল গোলাপী (pink), হলদে, সবুজ, সাদা প্রভৃতি হাল্কা রঙ দেওয়া যায় তবে জাহাজের খোল অনেক বেশী দিন টেকে। কারণ, এই সব রঙে শ্যাওলা বা শামুক প্রভৃতি জলজ প্রাণী আকৃষ্ট হয় কম।

এই সব বিষয় থেকেই বোঝা যায়, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে নানাবিধ রঙের নানান রকম আধিপত্য অপরিহার্য। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। প্রকৃতির ভেতর অসংখ্য রঙের সমাবেশ,—মানুষের মনও রঙদার; মানুষ সেখানেই মানুষ। রঙের যাদুতে প্রাণীরাও বিমোহিত হয়। আমাদের বর্ণ-সচেতনা জৈব-চেতনার একেবারে গোড়ার কথা, মজ্জার ভেতর রুচির সঙ্গে সে জড়িয়ে আছে। রঙ-চঙে জিনিষ দেখলেই শিশু পুলকিত হয়ে ওঠে। এমন লোক খুব কমই আছেন যিনি কোনো একটি বিশেষ রঙের শাড়ীতে স্ত্রীকে বেশী সুন্দর না দেখেন। আজকাল ছায়া-ছবির প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখনোর আগে পর্দার ওপর নানা রকম রঙ খেলানো হয়। এর পেছনে একটা বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে, এতে রঙের পরিবর্তন দেখতে চোখ অভ্যস্ত হয়,—চোখের স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা ভালো।

কিন্তু কোনো একটি বিশেষ রঙকে সর্বজনীনতা দেওয়া যায় না। এ-কথা জোর করে বলা চলে না যে 'অমুক' রঙটা সকলেরই ভালো লাগবে। প্রত্যেক মানুষের মন ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে গঠিত, রুচিও বিভিন্ন। হয়তো কোনো একটা বিশেষ রঙকে নির্দিষ্ট একটা বিষয়ের মানদণ্ডরূপে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু তাতে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত বা জাতিগত পছন্দ অপছন্দ থাকে বা কমে না। জাপানের বাজারে লাল রঙের গাড়ী বিক্রী করা সম্ভব নয়, কেন না, লাল রঙটা সেখানে ডাকঘর এবং অগ্নি-নির্বাপকদের ব্যবহৃত গাড়ীর রঙ। চীন দেশে সাদা রং শোকের চিহ্ন, বিলেতে কালো রঙ। ভারতেও শোকের প্রকাশে সাদা রঙের ব্যবহারই চলে আসছে, যেমন বিধবাদের পোষাক। চীনে একদা কোনো এক পেট্রোল কোম্পানি তাদের প্রত্যেকটি বিক্রয়কেন্দ্র সাদা রঙে সুন্দর করে সাজাতে গিয়ে খুবই বিপদে পড়েছিলো; বেচারাদের ধারে-কাছেও কোনো খদ্দের ঘেঁসেনি। সকলে ভেবেছিলো তাদের বুঝি খুব একটা দুঃখের কারণ ঘটেছে। অবশেষে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তারা আবার রঙ পাল্টায়।

আরেকটি ব্যাপার থেকে বোঝা যাবে, বাইরের রঙ আমাদের মনের ওপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে। আমেরিকার কোনো এক ব্যবসায়ী তার স্ত্রী-কর্মচারীদের টিফিনের জন্য একটি আলাদা ঘর তৈরী করে দেয়। কিন্তু কর্মীদের কাছ থেকে ক্রমাগত নালিশ আসতে লাগলো ঘরটা না কি বেজায় ঠাণ্ডা। অথচ উত্তাপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সাহায্যে ঘরটিকে যথারীতি গরম রাখবার ব্যবস্থা ছিলো। অনেক রকমের অনেক ব্যবস্থা করা হোল, তবু নালিশ থামে না। ঘরটা না কি হিমের মতো ঠাণ্ডা—ভেতরে ঢুকলেই মনটা দমে যায়। অবশেষে এক জন বর্ণতত্ত্ববিদ্ (colourist) এসে দেখলেন যে ঘরের দেয়ালগুলির রঙ কেমন একটা ফিকে নীল ধরণের, এমন কি চেয়ার-টেবিলের ঢাকনা-গুলোরও ঐ একই রঙ। তাঁর পরামর্শ মতো তখন ঐ রঙ বদলিয়ে ঘরের দেয়াল, চেয়ার-টেবিলের ঢাকনা, কুশন সব কমলা রঙের করে দেওয়া হোল। তার পর থেকে নালিশও বন্ধ হয়ে গেলো।

আজকালকার ফ্যাশানের যুগে ব্যবসায়ীরা তো রঙের ব্যবহার নিয়ে রীতিমতো মাথা ঘামাতে শুরু করেছে। সিনেমার দৌলতে নতুন ধরণের নতুন গড়নের নতুন নতুন রঙের শাড়ী-ব্লাউজ যে কতো গৃহস্থের ঘরে হুজুগের হাওয়া এনে দিয়েছে, কতো চায়ের কাপেই যে ঝড় উঠেছে, উদাহরণ-স্বরূপ তার ভুক্তভোগী বোধ হয় আর খুঁজে বার করতে হবে না। য়ুরোপে আমেরিকাতে এ-ব্যাপারটা রীতিমতো জটিল। কে কোন জলসায় কোন ডিজাইনের গাউন পরে এলো, কোন চায়ের আসরে কে কি রঙের পোষাক পরলো, তা নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলে। ফ্যাশান প্রবর্তনের কেন্দ্র হচ্ছে প্যারিস। আজ যে রঙটি বা যে ঢঙটি প্যারিসে চালু, সেটি কতো তাড়াতাড়ি আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পাঠিয়ে ব্যবসায়ে লাভ করা যায় তা নিয়ে ফ্যাশান-ব্যবসায়ীদের মধ্যেও চলেছে প্রতি-যোগিতা। ঠিক মতো রঙের সূত্রটি (formula) বা মিশ্রণটি (combination) অবিলম্বে নিজ নিজ ব্যবসাকেন্দ্রে বা এজেন্টদের কাছে বেতারযোগে পাঠানোর জন্য এক রকম যন্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে, যার সাহায্যে কুড়ি সেকেণ্ডের মধ্যেই সেটিকে পৌঁছে দেওয়া চলে। তৎপর-ব্যবসায়ী তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সেই রঙের পোষাক অন্যান্য প্রতিযোগিদের আগেই বাজারে ছড়িয়ে দিতে পারে।

আমাদের আহারের গোলমালে কিম্বা শারীরিক অসুস্থতার জন্য যেমন আমাদের মানসিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়, তেমনি পরিবর্তন কোনো বিরক্তিকর রঙের সাহায্যেও ঘটতে পারে। আমরা হয়তো সব সময়ে কারণটা ঠিক ধরতে পারি না, কিন্তু আমাদের খাবার, শোবার বা বসবার ঘরে যদি ঠিক মতো রঙটি ব্যবহার করা হয় তাহলে আমাদের মন অনেক স্বচ্ছন্দ-বোধ করবে। এই জন্যই প্রকৃতিতে এত বিচিত্র রঙের সমাবেশ। প্রকৃতির কোলে আমার দেওয়ার আড়ালে আছে পছন্দ মতো রঙের কাছে আমাদের গোপনতম চেতনার আত্মনিবেদন; যাকে বলা যেতে পারে অবচেতন বর্ণচেতনা।

তোমায় দিলাম

অনাথ চট্টোপাধ্যায়

তোমায় দেবার মত কি যে আছে ভেবে তা পাই না।
পুকুরের পাড়ে বসে ভাবি—খালি ভাবি,
এদিকে প্রহরে প্রহরে চাঁদ ওঠে মাথার ওপরে।
জলের বুকেতে জমা কালো ছায়াটা তো
সরে সরে পাড়েতে দাঁড়ায়।
শিরশিরে ভিজে বাতাসের একটু আমেজে
মনটাও দুলে দুলে ওঠে।
এমন রাতেতে যদি আসতে এখানে
চুলগুলো উড়ে উড়ে পড়তো চিবুকে।
আর আমি তোমার চোখেতে চেয়ে নীরব ভাষায়
বলতাম জমে থাকা কত—কত—কথা॥
বড় ভাল হত।

থাক্ গে আসনি তুমি
তাই, দাঁড়ালাম ফুলে-ভরা শিউলি তলায়।
ছিঁড়লাম কিছু ফুল কিছু ঝরে পড়লো মাটিতে।
তার পর ব্যথার নিশ্বাস
সেইখানে ফেলে রেখে ফিরলাম আমি।

কালকে সকালে শিউলি কুড়োতে এসে যদি পায় তবে
ফুল থেকে শুনে নিও এ প্রাণের কথা
আর জেনো শিশিরের জল
আমার হতাশা ভরা গোপন কান্নার
ঠিক প্রতিচ্ছবি।
এইটুকু দিলাম তোমায়।

[দক্ষিণের বিল—১৩৬ পৃষ্ঠার পর]

চিঠি। তিনি যাত্রে আর নিজের কোনও কাজে মন দিতে পারেন না। এক একখানা করে সব চিঠির জবাব লেখেন। কাউকে তিনি বঞ্চিত করেন না, এমন কি সেবাকেও। পত্রের উত্তর লিখে তিনি একটা তৃপ্তি বোধ করেন।

সকাল বেলা উঠে আবার কাছারীর কাজে মন দিতে হয়। কিন্তু মন কিছুতেই কাজে বসতে চায় না। বাড়ীর জন্য প্রাণ আকুল হ'য়ে ওঠে। দক্ষিণের বিলের কথা মনে পড়ে। সেখানে যেতে হবে, কত কি যে করতে হবে! নিতাই ইমাম তার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। তিনি দেশে না গেলে জমি দখল হবে না। এবার দেশে আউসের বীজ বুনে চারা তুলে নিয়ে বিলে লাগাতে হবে। সারি দিয়ে নুয়ে নুয়ে কৃষাণেরা রুয়ে যাবে, গান গাবে—বর্ষা আসবে পশলায় পশলায়। একবার ভিজে যাবে, আবার শুকাবে ওদের দেহ। সারা দিন ভরে খাটছে, তবু তারা হাসছে—প্রাণখোলা হাসি। কিন্তু বিপ্রপদ তো হাসতে পারেন না। হাসলে গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়—অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা মানবে কেন? রাইওৎ প্রজাই বা শাসনে থাকবে কেন? হুজুর হবে শুধু শাসন—মানুষকে পীড়ন। উনি একটা যন্ত্রবিশেষ। ওর ভিতর দিয়ে যেন কতগুলো টাকা তৈরী হয়ে চালান হচ্ছে সদরে। তার পর সেখান থেকে আরও কত দূরে যাবে কে জানে! যাবে হয়ত পাত্রীর কোনও রাঙা ঠোঁটের দাম দিতে—নয়তো যাবে লণ্ডনের কোনও টুকটুকে মেয়েকে ঘর থেকে বের করে আনতে। বাংলা দেশের তাজা রক্ত, চাষীর রক্ত নিংড়ে পাঠাবেন বিপ্রপদ, চুষে নেবে, ফেলে-ছড়িয়ে খাবেন বিদেশী বিবিরা! পাঁচশালা নয়, দশশালা নয়—এ সব বাবুদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। পৈত্রিক ক্ষয় রোগ—অক্ষয় হ'য়ে রয়েছে জমিদার বাবুদের ঘরে।

এ কাজে আর মন বসে না—ছুটি চান বিপ্রপদ। চান ফিরে যেতে নিজ গৃহে নিজ পরিবারে। কিন্তু ফিরে গেলে তার সংসার চলবে কি করে? কত যে ব্যয়বহুল কাজ পড়ে আছে তার তো অন্ত নেই! সেগুলো সংকুলন হবে কি করে? অতএব আরও কিছু দিন ওঁকে চাকুরী করতে হবে। ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। ওঁর মন ভেঙে পড়ে। উনি কি যূপকাষ্ঠে বাঁধা বলির পশু? ওঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কি থাকতে হবে বাঁধা? এ ভাবে আর কত কাল কাটবে?

উনি চান মুক্তি—উদার অসীম মুক্তি। কেউ কি ওকে বলে দিতে পারে কোন পথে গেলে মুক্তি পাবেন? এ হুজুরের অভিনয়, গোলামীর পালা ওঁকে ছাড়তে হবে, কাটতে হবে মোহের বাঁধন। এর চেয়ে নিজের জমি একখানার পর একখানা নিজেই করবেন চাষ সাথে সাথে নিতাই ও ইমাম চালাবে লাঙল। তার পর ছড়াবেন সহস্র সহস্র ধান্যের বীজ। সেগুলি ওঁদের মনের খুশীর মত সরস মাটির স্নিগ্ধতায় অংকুরিত হয়ে চাইবে প্রভাতী আলোর দিকে। মায়ের বুকে শিশু যেমন দিন দিন পলে পলে বাড়ে, মাটির বুকে তেমনি দিন দিন পলে পলে বাড়বে নবীন ধান্য।

আষাঢ়ে ঘন সবুজের ঢেউ—কার্ত্তিকে ওদের বুকে আশার সঞ্চার—পৌষে ভূমিষ্ঠ হবে সোণালী ফসল। ওঁরা বুকে জড়িয়ে কেটে তুলবেন আঙিনায়, ভরে রাখবেন গোলা—তার পর সারা বছর স্বচ্ছন্দ নিরালা। কাজ কি ওর গোলামীতে? এক কথাই নানা ভাবে ঘুরে-ফিরে মনে আসে। দক্ষিণের বিল ওঁকে পাগল করেছে—উন্মাদ করেছে ওঁর মন।

তিনি আবার ছুটির দরখাস্ত করেন।

সদর থেকে কয়েক দিন বাদে উত্তর আসে—

'আপনি পুরাতন কর্ম্মচারী, নূতন একটা কাছারীর ভার আপনার উপর ন্যস্ত। যদিও আপনার কার্য্য প্রসংশনীয় বটে, তবুও আপনি এক্ষণে ছুটি পাইবেন না।'

বিপ্রপদ রেগে ওঠেন। কিন্তু তাতে লাভ কি! হঠাৎ চাকুরী ছাড়ার সাহস তাঁর বুকে কোথায়? তিনি নীরবে অপমান সহ্য করে কাজ করে যান। বাস্তবিক যে চাকরীতে তাঁর ঐশ্বর্য্যের সূচনা, সে চাকরীর মোহও কম না। তা ছাড়ার মত অবস্থা এখনও তাঁর হয়নি। যখন হবে তখন বুঝে-সুঝে একটা কিছু করা যাবে।

একটা পেয়াদা এসে সেলাম দিয়ে বলে, 'হুজুর, যারা কাছারী-বাড়ীর পুকুর কাটতে এসেছে, তাদের দু'দলের মধ্যে একটা হাংগামা বেধেছে—কথা শুনছে না, একটা খুনোখুনি হতে পারে।'

বিপ্রপদ মহা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'চলো।' [ক্রমশঃ।

পুরুষরা কি মানুষ?

ইডা লুপিনো

[অ্যামেরিকার ছায়াছবি মারফৎ ইডা লুপিনোর নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। অভিনেত্রী হিসাবে ইডার প্রতিভা আজ স্বীকৃত। পিতার নাম তিনি যথার্থই রক্ষা করেছেন।]

পুরুষদের মানুষ বলে কে? অন্তত আমি তো বলি না। এই ধরুন না, তাদের সাধারণ জীবনযাত্রা প্রণালীটাই কত অসম্ভব রকমের সহজ। পুরুষ ছাড়া রাত্রে শুতে যাবার সময়কার চাকচিক্য ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আর কে সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে বলুন? ঘুম থেকে উঠেই সামান্য অবিন্যস্ত চুলের উপর চিরুণী চালিয়ে দাড়ি কামাবার সরল কর্ত্তব্যটুকু সমাপন করেই তার কাজ হচ্ছে তাড়াতাড়ি পোষাক পরে সকাল আটটার সময় প্রাতর্ভোজনে বসা। ভাবলে আমার কাঁপুনি ধরে যায়। সকাল আটটার সময় নিশ্চয়ই কোন মেয়ে সামাজিক হয়ে উঠতে পারে না।

মেয়েরা বুঝতে পারে না বটে, কিন্তু আমাদের দেউলে করে দেবার একটা সুসংগঠিত চক্রান্ত আছে পুরুষদের। নতুন নতুন ফ্যাসানের কথা মেয়েরা আগে চিন্তা করে কি? নিশ্চয়ই নয়! পুরুষরা কিন্তু গত বছরের ডবল ব্রেষ্ট চতুর্ভুজ কোটটি জড়িয়েই নিজেকে ভীষণ সুসজ্জিত মনে করে নতুন ফ্যাসানের কথা চিন্তা করেছে। পুরুষরা কখনও নিজেদের ষ্টাইল বদলাবার কথা ভাবে কি? আমি বলব, তারা তা করে না। তারা বড্ড বেশী স্মার্ট।

একটি হ্যাট পরলেই প্রায় সব পুরুষকেই চমৎকার দেখায়। কিন্তু আমি যখন একটি মস্তকাবরণ কেনবার জন্য অকস্মাৎ উন্মাদনী প্রেরণা অনুভব করি তখন কি হয় বলুন তো? মনের আনন্দে গুন-গুন করে তাললয়বিশুদ্ধ গান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরে আসি আর ভাবি, এর চেয়েও চমৎকার মস্তকাবরণ আর কোন মেয়ে চোখেও দেখেনি। রাত্রে 'তাকিয়ে দেখ—কেমন মানিয়েছে'-গোছের আবহাওয়া সৃষ্টি করে সেটা মাথার পরে বার বার আয়নার দিকে ঘুরে-ফিরে তাকাই। তার পর ভদ্রলোক কথা না বলে আমার দিকে শুধু একবার দৃষ্টি ফেরান। আমার চমৎকার হ্যাটটি চায়ের বাটিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, নিজের দম্ভস্ফীতি হয়েছে বলে মনে হয় এবং সারা সন্ধ্যাটা হয়ে যায় পরিপাটী রকমের বিশ্রী।

কোন পুরুষ-বন্ধু আমায় কোন বিশেষ উৎসবে আমন্ত্রণ করলে আমি যখন তাঁকে প্রশ্ন করি—"আচ্ছা বলুন তো, উৎসবে কোন্ পোষাক পরে গেলে আমায় মানাবে?" তিনি উদাসীন ভাবে জবাব দেন—"যা হোক একটা কিছু ছোটখাট পরে যাবেন।" তখন নব্বই লক্ষ গাউন-বোঝাই বাক্স নিয়ে আমায় ভাবতে বসতে হয়। অন্য মেয়েরা কি পোষাক পরে আসবে তাই আন্দাজ করতে চেষ্টা করি, আন্দাজটা সব সময়ই হয় ভুল। তখন আবার ঘর-বোঝাই ভোজের পোষাক-পরা লোকের সামনে আমায় ব্যাখ্যা করতে হয়, কেন আমি ককটেল স্যুট পরে এসেছি, আমার সঙ্গী পুরুষ ভদ্রলোকটির কথা বলছেন? আ-হা! আপনাকে ধন্যবাদ, ঘননীল স্যুটেই তাঁকে চমৎকার দেখাচ্ছে।

কোন পুরুষ যখন নির্দিষ্ট সময়ে কোন মেয়ে-বন্ধুর কাছে আসেন তখন একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ফিটফাট ফুলবাবুটি হয়ে আসেন। ভাবেন মেয়ে-বন্ধুটিও একেবারে তৈরী হয়ে বসে আছে। তার ঠিক দশ মিনিট আগে হয়ত মেয়েটি কাজ সেরে বাড়ী ফিরেছে। নিজের চেহারা লোকের সামনে প্রকাশ করতে তখনও তার এক ঘণ্টা কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন। ভাবুন তো অবস্থাটা? আমার কিন্তু ভারি ভাল লাগে পুরুষদের এই ব্যবহারটি। আবার ধরুন, পুরুষটি হয়ত নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে এসেছেন। মেয়েটি তৈরী হয়ে আধ ঘণ্টা ধরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল···আঃ! তখন অবস্থাটা কি দাঁড়ায় বলুন তো? নিশ্চই ভাবছেন, পুরুষটির আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়বেন। আজ্ঞে না, মোটেই তা হয় না। মানসিক উদ্বেগ নিয়ে এই আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার ফলে মেয়েটির চেহারায় যে ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠেছিল, সেটা মুছে ফেলে বাইরে বেরুতে আরও ২০ মিনিটের প্রয়োজন হবে। এই বিলম্বের সমস্ত দোষটাই অবশ্য পড়বে মেয়েটির ঘাড়ে।

শাদা চুলে পুরুষদের যে বৈশিষ্ট্য দান করে, সেটা আমি ভারি ভালবাসি। কিন্তু কোন মেয়ে যখন দুঃসাহস দেখিয়ে নিজের পাকা চুল প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হন না, তখন কয়েক জন ছাড়া অধিকাংশ লোকই মন্তব্য করেন, "ইনি যে একেবারে বুড়িয়ে গেছেন।" এমন মন্তব্য করা নিশ্চয়ই অনুচিত।

সান্ধ্য পোষাকই আমার সব চেয়ে প্রিয়। এ ক্ষেত্রেও পুরুষরা মেয়েদের অর্থনৈতিক ভাবে দেউলিয়া করবার জন্য উন্মুখ। ভদ্রলোক যদি পুরুষ-প্রজাপতি না হন এবং প্রত্যেক রাত্রেই যথারীতি বেশভূষা করেন, তাহলে তাঁর সব চেয়ে কম পোষাক হচ্ছে: একটি ভোজের স্যুট, দু'টি ড্রেস শার্ট, এক জোড়া কালো জুতো, দু'জোড়া

কালো মোজা, এক সেট কব্জি-বন্ধ এবং দু'টি কালো টাই। কিন্তু মেয়েদের কি চাই বলুন তো ? এক জন অভিনেত্রী হিসাবে আমি বলতে পারি যে, একই সান্ধ্য পোষাক পরে একবারের বেশী দু'বার নিজেকে প্রকাশ করতে আমি সাহস পাই না। কিন্তু আমার মনে হয়, পুরুষদের আমি কিছুটা বোকা বানাতে পেরেছি। আমি আমার পোষাকটা এমন ওলটপালট করে পরি, পুরুষরা বুঝতেই পারে না যে একই পোষাক আমি দু'বার পরছি।

পোষাক-পরিচ্ছদে জুতোর স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হাই-হিল জুতো আমার পছন্দ নয়। অনেক চেষ্টা করে পাতলা হিল এবং পাতলা সোল লাগান এক জোড়া জুতো আমি যোগাড় করেছিলাম। পরতে পরতে ছিঁড়ে ফেলেছি। হাই-হিল জুতো আবিষ্কার করল কে ? পুরুষ ! মেয়েদের দেহাকৃতি খারাপ দেখান ছাড়া হাই-হিল জুতোর আর কি সার্থকতা আছে ? এক জোড়া কব্জি-বন্ধের জন্য পুরুষরা ৫ থেকে ৫০০ ডলার খরচ করতে পারে, কিন্তু মেয়েরা একই অলঙ্কার বার বার পরতে পারে না, কেন-না, একই কানের দুল, ব্রেসলেট, গলার হার এবং ক্লিপ সব পোষাকের সঙ্গে মানায় না। অলঙ্কারের ব্যাপারটি বেশ একটু অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি।

ফার-কোটের কথাই ধরুন। ফার-কোটের জন্য মেয়েদের প্রচুর টাকা ব্যয় করতে হয়। নতুন ফ্যাসানের ধুয়ো উঠলেই আপনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। আপনার বাক্সে হয়ত দুনিয়ার সেরা গাউনটি তোলা রয়েছে, কিন্তু তা হলে হবে কি, সেটার গায়ে পুরোনো গন্ধ লেগে গেছে। আর কি সেটা আপনি পরবেন ? আমি জানি আপনি কি করবেন, জানলা গলিয়ে ফেলে দেবেন আপনার ফারটিকে, কিন্তু লুপিনো তা করে না।

একটি পুরুষের কথা বলি। তাঁর মতামতের উপর আমার ভারি শ্রদ্ধা। তিনি আমায় সাবধান করে বলেছিলেন যে, আমি যেন তাঁর সামনে কখনও লম্বা স্কার্ট পরে না দেখা দি। তিনি বলেন যে, মেয়েদের ভাল পা খারাপ পা নিয়ে পুরুষরা মোটেই মাথা ঘামায় না। আমি অলস, মিতব্যয়ী এবং ফ্যাসনের নতুন ধরণটার প্রতি বিরূপ বলে তাঁর উক্তি শুনে মনের আনন্দে আত্মসন্তুষ্ট হয়ে বসেছিলাম। আমার এই বে-পরোয়া ভাবটি এক দিনের জন্য স্থায়ী ছিল। পরদিনই তিনি এসে বললেন, "লম্বা ঘোরানো স্কার্ট-পরা একটি মেয়েকে আজ দেখলাম, আমার মনে হয় জিনিষটি তোমাকেও বেশ মানাবে।" আর যাবে কোথায়। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম। বাক্স-বোঝাই করে কিনে আনলাম নতুন ঘোরানো স্কার্টের এক বোঝা। যখন কোন পুরুষ "অপর" একটি মেয়েকে কোন একটি বিশেষ পোষাকে দেখেছেন, তখনই পোষাকের দোকান অভিমুখে ছুটতে সুরু করুন। বুদ্ধিমতী মেয়েরা পুরুষদের খুশী করবার জন্যই সাজ-পোষাক করে, অন্য মেয়েকে খুশী করবার জন্য নয়। এর থেকেই চমৎকার প্রমাণ হয়, তাঁরা আমাদের কি রকম বজ্রমুষ্টিতে পুরে রেখেছেন।

পুরুষরা যে মানুষ নয়, তার একটি প্রমাণ হচ্ছে এই যে, মেয়েদের মত তারা আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয় না। কোন জলো্যর পার্টির পরের দিন সকালে বেচারীদের কেউ বলতে আসে না, "গত রাতে আপনাকে এত চমৎকার দেখাচ্ছিল !" তাঁরা কখনও ভুল উপলব্ধি পায় না। পুরুষরা কিছুই খেয়াল করে না। তাদের মন সব সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মগ্ন থাকে।

পুরুষরা বাড়ী ফিরে ছাইদানীটিকে পরিষ্কার অবস্থায় দেখলে অথবা ভাল একটি ভোজ পেলে, সেগুলোকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে করে। কিন্তু পুরুষের এই ব্যবহারে উপেক্ষা আবিষ্কার করে অনেক মেয়েই হিষ্টিরিয়া বাধিয়ে ফেলবে—একটা নীরস জানোয়ার। কিন্তু এই নীরস ব্যক্তিটি যদি সরস হয়ে স্ত্রীর জন্য একটি নতুন ছাইদানী কিনে আনে, অথবা তাকে নিয়ে রেস্তোরায় যায় তা হলেই ব্যাপারটাকে সে তার জীবনের মস্ত বড় ঘটনা বলে মনে করে। মেয়েদের সম্বন্ধে প্রধান কথাই হচ্ছে, ছোট জিনিষকে তারা বড় করে দেখে। পুরুষরা সব সময়ই আমাদের বোকা বানাচ্ছে।

আমার মনে হয়, মনোমুগ্ধকারিতায় তারা আমাদের শতকরা ৩০ জনকে টেক্কা দেয়। পুরুষরা মনোমুগ্ধকর হাত চাইলে সব কিছুই পেতে পারে। মেয়েরাও পুরুষদের মত আকর্ষণীয় এবং তাদের চেয়েও অনেক বেশী স্মার্ট হতে পারে কিন্তু পুরুষের ধার তারা পাবে না, কারণ মেয়েরা পুরুষদের মত নিষ্ঠাবতী হতে পারে—এ কথা কেউ বিশ্বাস করে না। কথায় বলে, মেয়েদের মন !

বন্ধুত্বের কথা যদি বলেন, তাহলে জানবেন পুরুষরাই মেয়েদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। সম্পর্ক যদি রোমান্সের না হয়, তাহলে জানবেন, আপনার পুরুষ-বন্ধু আপনার মেয়ে-বন্ধুর চেয়ে অনেক ভাল। আপনার গোপন কথা নিয়ে তিনি কখনও খোসগল্প করে বেড়াবেন না এবং আপনার বিপদে সব সময়েই তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন।

বিমর্ষ অবস্থাতেও পুরুষরা কখনও আত্মবিস্মৃত হয় না। পুরুষরা যে কোন বিমর্ষ পুরুষের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে পারে কিন্তু কোন বিমর্ষ মেয়ের সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্য তারা কথা বলতে রাজি নয়। মেয়েরা বিমর্ষ মেয়ে দেখলে এক মাইল দূরে ছুটে পালাবে, কিন্তু বহু কষ্টে হাসি টেনে এনে বিমর্ষ পুরুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দ্বিধা করবে না।

পুরুষের স্বার্থপরতা এত প্রত্যক্ষ যে, সে স্বার্থপরতা যে করে হোক স্বীকার করে সয়ে যেতে হয়। মেয়েরা উদ্দেশ্য সাধনের (সাধারণত বিবাহ) আগে পর্যন্ত স্বার্থপরতা গোপন করে রাখে। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের পরমুহূর্তেই মেয়েরা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্বার্থপরতার ব্যাপারে পুরুষরা এত অকপট এবং স্পষ্ট যে বিস্মিত হতে হয়। পুরুষরা—বিশেষ করে বিশিষ্ট অবিবাহিত পুরুষরা ভীষণ রকমের করিৎকর্মা লোক। কি অক্লান্ত ভাবে তারা ঘর-সংসার রক্ষণাবেক্ষণ করে লক্ষ্য করবেন। সব সময়েই প্রত্যেকটি জিনিষ একেবারে ফিট-ফাট ছিমছাম। এই অদ্ভুত জীবেরা শোবার ঘরে বসেই অপার্থিব খাবার রান্না করতে পারে। তাদের রান্না এমন চমৎকার হয় যে, মেয়েদের সমস্ত 'নারীত্ব' এক মুহূর্তে তারা হরণ করে নেয়, ঠিক যেমন ট্রাউজার পরে কোন কোন মেয়ে পুরুষদের পুরুষত্বের উপর আক্রমণ চালায়। অবশ্য মেয়েদের এই প্রচেষ্টা একেবারেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, কিন্তু "নারীত্ব" অপহরণকারী যে কোন প্রথম শ্রেণীর এ্যামেচার পুরুষ পাচক নারীর কাছ থেকেই প্রশংসা আদায় করে তবে ছাড়ে।

অবিবাহিত পুরুষরা যে ভাবে জীবনযাত্রায় কুৎসিত খুঁটিনাটি কাজ যথারীতি করে যায়, তাতে আমার আতঙ্ক লাগে।

ধোপা-বাড়ীতে কাপড় পাঠান, কাপড়-জামা ইস্ত্রি করা, বাজার করা, চুল ছাঁটা,—এ সব তারা নিখুঁত ভাবে সুসম্পন্ন করে। বড়দিনের বাজারটাও তারা অনায়াসে শেষ করে। সত্যি কথা বলতে কি, এ সব ব্যাপারে তারাও ঠিক মেয়েদের মতই অসুবিধায় পড়ে, কিন্তু এ নিয়ে তারা চেঁচামেচি করে না। কোন পুরুষ সুন্দর ভাবে বাস করতে চাইলে ঘর-দুয়ার ভাল করে সাজায়, ফুলগুলোকে ঠিক জায়গায় সাজিয়ে রাখে। চারি দিকে একটা মনোরম আমেজের সৃষ্টি করে, কিন্তু কোন অবিবাহিতা মেয়ের পক্ষে তেমনি আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হলে ডেকরেটরকে (নির্ঘাৎ পুরুষ) অন্ততঃ দ্বিগুণ মূল্য ধরে দিতে হয়।

এবার অভিনেতাদের কথায় আসা যাক। পুরুষরা ১০ মিনিটের মধ্যে ৯ মিনিট সেটে ঘোরা-ফেরা করে দশম মিনিটে একখানা প্যানম কেক ঘষে মুহূর্তেই একেবারে তৈরী হয়ে পড়েন। আর আমার মত সামান্য মেয়েদের দুর্দশাটা একবার বুঝুন। ভোর থেকে কেশ-সজ্জা, প্রসাধন, পোষাক-পরিচ্ছদ—এই সব ব্যাপার নিয়ে আমি যখন মাথা কোটাকুটি করছি তখন 'তিনি' হয়ত স্বার্থপরের মত নিশ্চিন্ত আরামে বিছানায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। সুটিংএর শেষে তিনি মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ালেই ব্যাস। তিনি একেবারে ছিমছাম ফিটফাট ফুল-বাবুটি বনে গেলেন। ইচ্ছে করলে ষ্টুডিও থেকে সোজা তিনি ডিনার টেবলে গিয়ে হাজির হতে পারেন। একটুও বে-মানান হবে না। ম্যাগাজিনে আপনারা পুরুষ অভিনেতাদের যে ছবি দেখেন, সে সব ছবি তোলবার জন্ত তাদের একটুও কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি। নিজেদের পুরুষত্ব প্রকাশের জন্য সার্টের কলার ধরে সামান্ত একটু টেনেই তাঁরা ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়ান। কিন্তু ক্যামেরার সামনে মুখ তুলে দাঁড়াবার আগে মেয়েদের অন্তত কয়েক ঘণ্টা লাগে সাজ-সজ্জা ঠিক করতে। মেয়েদের সাজ-সজ্জা এবং প্রসাধন করতে যে সময় লাগে ততটুকু সময়ে পুরুষদের একটা পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি এঁকে ফেলা যায়।

প্রসাধন দ্রব্যের প্রস্তুতকারক কারা? অধিকাংশই পুরুষ। আমি লিপষ্টীক ঘৃণা করি, কারণ লিপষ্টীকে রুমাল, কাপ সব কিছুতে দাগ পড়ে যায়। এই উঁচু স্তরের জীবেরা দাগ-নিবারক লিপষ্টীক আবিষ্কার করে না কেন? ক্রিম, লোসন, কাজল, পাউডার এই সব তথাকথিত সৌন্দর্যসাথী না থাকলে মেয়েদের কি আরও ভাল দেখাত না? নিশ্চয়ই দেখাত এবং তাহলে মেয়েরা বাহির-বিশ্বে মনোযোগ দিয়ে মনের খোরাক যোগাবার মত অনেক সময় হাতে পেত। পুরুষরা আর তাহলে এ ব্যাপারে একচেটিয়া সুযোগ ভোগ করত না। পুরুষরা এই সমস্ত সীমাহীন, অপ্রয়োজনীয় রীতিনীতি বর্জন করে তারা বেশ স্বচ্ছন্দে আছে। আমি যতক্ষণে গত সপ্তাহে দেখা ছবিটার নাম মনে করবার চেষ্টা করছি, ততক্ষণে পুরুষ ভদ্রলোকটি ১৯২৪ সালে দেখা ছবি এবং তার নায়ক-নায়িকার নাম পর্যন্ত করে দিতে পারেন। আমি পারি না কেন? কারণ আমি মানুষ এবং পুরুষদের আমি মানুষ মনে করি না।

অঙ্কের ব্যাপারে আসুন। কোন মেয়ের সিগ্রেট ধরাতে ধরাতেই যে-কোন পুরুষ ব্রীজ খেলার হিসাব জুড়তে পারেন। একবারও তার হিসাবে ভুল হয় না কেন? যখন কোন পুরুষ আমায় ব্রীজ খেলার হিসাব জুড়তে বলেন, তখনই হঠাৎ আমার খেয়াল হয় যে, আমায় একটা টেলিফোন করবার কথা আছে। তখন আমি ফোনের নম্বর ঠিক আছে কি না তাই চিন্তা করতে থাকি।

আমি জানি, যে কোন পুরুষই একটা পাধার টুপি মাথায় পরে বেড়াতে পারে, মাথার উপর ভর করে আকাশের দিকে পা তুলে দিতে পারে। মেয়ে-পুরুষ সকলেই তাতে হেসে বলবে, "লোকটা বেশ মজার।" মেয়েরা এমন করতে পারে কি? পুরুষদের ছল-ছুতো সহজেই লোকে ভুলে যায়, কিন্তু মেয়েরা একটু ছল-ছুতো করলে তার আর রক্ষা নেই। পুরুষরা যে কোন সময় একাই যত্র-তত্র যেতে পারে। তারা লড়াইয়ে, রেস খেলায়, ফুটবল খেলায়, এবং ভোজ-সভায় একাই যেতে পারে। পেছুটানবিহীন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে কোন পুরুষই পার্টির পরম সম্পদ। যে সমস্ত পুরুষ পার্টিতে মেয়ে আনার কষ্ট স্বীকার করেছেন, তাঁদের সঙ্গ ভাব জমিয়ে এই ভদ্রলোকটি যে-কোন মেয়ের সঙ্গে যা খুশী নাচতে পারেন। সঙ্গিবিহীন কোন মেয়ে সেই পার্টিতে গেলে ঘরের অন্ত মানুষের দৃষ্টি এড়িয়েই সব সময় তাকে কাটাতে হয়।

বাইরে বেড়াতে যাবার প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, পুরুষরা দু' সপ্তাহের জন্ত বাইরে গেলে গোটাকতক সার্ট, দাড়ি কামাবার যন্ত্রপাতি, টুথব্রাস, সাঁতারের পোষাক, এবং কয়েকটি টাই নিয়েই তাঁরা যেতে পারেন। আমাদের চাই সকালের পোষাক, দুপুরের পোষাক, বিকালের পোষাক, সান্ধ্য পোষাক ইত্যাদি। তা ছাড়া সুসজ্জিতা চাকচিক্যময়ী সুন্দরী হলে তার আরও জামা, প্রসাধন এবং সাজ-পোষাকের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জিনিষ তাকে বয়ে বেড়াতে হয়।

পুরুষের চেহারা যতই রোদে-পোড়া জলে-ভেজা হোক না কেন, তাদের সময় সময় খেলোয়াড়সুলভ তেজস্বী এবং চমৎকার দেখায়। দিনের শেষে আমার চেহারাটি কি রকম দাঁড়ায় বলুন তো? একেবারে গলদা চিংড়ির মত লাল, কুঁকড়ে যাওয়া অধর এবং নোণা হাওয়ায় উস্কো-খুস্কো হয়ে যাওয়া চুল—আমি ইডা লুপিনো। ওঃ! প্রকৃতি আমাদের প্রতি কত নিষ্ঠুর!

আমার মনে হয়, পুরুষরা পশু, আধা ভগবান এবং অত্যন্ত উঁচু স্তরের জীব। আমার মনে হয়, তাদের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার জন্ত আমরাই দায়ী।

সেই জন্তই পুরুষদের আমি ভালবাসি—তারা সত্যিই মানুষ নয়।

আশার সাগরতীরে

শ্রীমতী নিশারাণী দেবী

ডাক্তার ঘোষের ল্যাবরেটারীতে বসে কথা হচ্ছিল দু'জনে। প্রবীর ও সুধী। এক জন ডাঃ ঘোষের প্রিয়তম ছাত্র, অপরটি ডাঃ ঘোষের শ্যালিকা-কন্যা। সুধী বিদ্রূপের স্বরেই বললে—জানি বলবেন, বাবার মুখের ওপর না বলতে পারলুম না, তাই। কিন্তু দু'দিন আগেও পাঁচ বছরের মধ্যে কিছুতেই বিয়ে করবো না বলেও একেবারে হৈ-হৈ কোরে যাকে বলে রাজকন্যে আর রাজত্ব নিয়ে টোপর পরে ফিরলেন?

কথাটা সত্যিই। প্রবীরের বিয়ে করবার ইচ্ছেটা ছিল না। ডাক্তারী পাশ করে কি একটা রিসার্চ করছিল। পিতা অবনীনাথের

একমাত্র পুত্র সে। বাবার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারেনি। না দেখে ঠকেওনি কিন্তু সে। নববধূ পরমা সত্যই পরমাসুন্দরী।

পরমা পিতৃমাতৃহীনা। ধনী দিদিমা ও দাদুর শিবরাত্রির সল্‌তে। প্রচুর আদরে, পর্য্যাপ্ত সুখ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যেই প্রতিপালিতা।—অবনীনাথ পুত্রবধূকে পেয়ে কন্যার শূন্য-স্থান ভরিয়ে তুললেন। প্রবীরেরও এমন অসামান্যা রূপবতীকে বধূরূপে পেয়ে খুশীর আর অন্ত নেই।

ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটলো। ডাঃ ঘোষ কিছু দিন থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। প্রবীর রোজই দেখা করতে যায়। ক্রমেই বাড়ছে অসুখটা। প্রবীর ও সুশী উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। হঠাৎ এক দিন মুমূর্ষু ডাঃ ঘোষ সুশীকে সরিয়ে দিয়ে প্রবীরকে গোটা-কতক গোপনীয় কথা বলবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সুশী বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। প্রবীর ডাঃ ঘোষের শয্যার পার্শ্বে এসে বসে। হাঁফাতে হাঁফাতে উত্তেজিত কণ্ঠে ডাঃ ঘোষ যা বলেন, তার সার মর্ম্ম হল এই যে—সুশীর জন্ম-বৃত্তান্ত কলঙ্কময়। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেবচরিত্র ডাঃ ঘোষের আকস্মিক পতনের ইতিহাস। স্খলিতা বিধবা শ্যালিকার প্ররোচনায়···।—ডাঃ ঘোষের শেষ সাধ, সুশীর ভার যেন প্রবীর নেয়, সুপাত্র দেখে যেন তার বিয়ে দেয়।

মৃত্যুপথযাত্রী অধ্যাপকের শেষ সাধ পূর্ণ করতে প্রবীর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং তারই ফলে তার নব-বিবাহিত জীবনে আসে ভুল বোঝাবুঝির কালো মেঘ।

ছোট্ট একটি ফ্ল্যাটে সুশীর থাকবার ব্যবস্থা হয়। প্রবীর রোজ তার খবরাখবর নেয়। এতগুলি ব্যাপার ঘটে যায় প্রবীরের বিয়ের কয়েক দিনের ভেতরেই। ফলে নব-বিবাহের অনেক ছোট-খাটো অনুষ্ঠানেই প্রবীরের অনুপস্থিতি ঘটে এবং সেটা সকলের চোখেই কেমন বিসদৃশ লাগে, বিশেষ কোরে পরমার দিদিমার চোখে, এবং তার চেয়েও বিশেষ কোরে পরমার চোখে।

প্রবীর মাঝে মাঝে অনুভব করে যে স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য হয়তো তার করা হচ্ছে না, কিন্তু ডাঃ ঘোষের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার আগে তার ছুটি নেই। তাছাড়া পরমার কাছ থেকেও তেমন কোন আহ্বানও তো সে পায় না। তাকে কাছে পাবার জন্যে পরমার আগ্রহটাও তো সে টের পায় না তেমন! তবে কি···?

পরমা অনুভব করে স্বামীর ঔদাসীন্য। তবে কি আমায় মনে ধরেনি ওঁর? ধনীর আদরিণী দৌহিত্রী। চিরকাল আদরে মানুষ। আব্দার জানাবার আগেই সব-কিছু পেয়েছে সে। তাই স্বামীর আদরটাও সে আব্দার জানাবার আগেই পেতে চায়।

ঘটনাচক্রে এমনি কোরেই দু'টি নিষ্পাপ তরুণ-হৃদয় দু'জনের কাছ থেকে দূরে দূরে সরে যায়।

সুশী ছাড়াও আর একটা দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়েছে প্রবীরের। দুঃস্থদের সেবা, বিনা পারিশ্রমিকে বস্তিবাসীদের রোগের চিকিৎসা করা। ফলে অধিকাংশ দিনই তার বাড়ী ফিরতে রাত হয়, সকালেও অর্দ্ধেক দিন বাড়ীতে খাওয়া হয় না। সন্দেহটা আরো গাঢ় হয়ে ওঠে সকলের মনে। সন্দেহটা চরম আকার ধারণ করে সেই দিন, যেদিন নিখিলের কাছ থেকে প্রবীরের পিতা অবনীনাথের কাছে একটি গোপনীয় চিঠি এসে হাজির হয়।

এই নিখিল হচ্ছে প্রবীরের সহপাঠী এবং ডাঃ ঘোষের অন্যতম ছাত্র। সুশীর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল প্রবীরেরই মতো। সুশীর ফ্ল্যাটে সে প্রায়ই আসতো। সুশীকে নিয়ে মাঝে-মাঝে বেড়াতে যেতো, হোটেলে ডিনার খাইয়ে আনতো, সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতো। ক্রমে সুশীর সঙ্গে নিখিলের ঘনিষ্ঠতা এমন অবস্থায় এসে পৌঁছল, যখন প্রবীরকে বলতেই হল,—নিখিল তুমি সুশীকে বিয়ে কর।—নিখিল অক্লেশে উড়িয়ে দিলে প্রস্তাব। বললে,—পাগল হয়েছ? উত্তেজিত হয়ে প্রবীর নিখিলকে অত্যন্ত কটু ভাষায় ভৎর্সনা করে তাড়িয়ে দিলে সুশীর ফ্ল্যাট থেকে।

প্রতিশোধ নিলে নিখিল অত্যন্ত হীন উপায়ে। এই মর্ম্মে প্রবীরের পিতার কাছে চিঠি দিলে যে,—প্রবীর সুশী নাম্নী একটি মেয়ের প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে। তারই কাছে থাকে সে দিনের অধিকাংশ সময়। তার গহনা গড়াতেই প্রবীরের ডাক্তারী রোজগারের সবটাই ব্যয় হয়ে যায়।

প্রবীর সেদিন বাড়ী ফিরতেই অবনীনাথ বললেন,—সুশী মেয়েটির কুসঙ্গ থেকে তুমি যদি মুক্ত না হতে পারো, তাহলে······। বাকীটা বলবার আগেই প্রবীর দুঃখে-রাগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বাবা সুশীর নাম জানলেন কি কোরে? তবে কি পরমা এই হীন সন্দেহের কথা বলেছে বাবার কাছে? নিশ্চয়ই তাই। পরমার কাছে ছাড়া বাড়ীর আর কারুর কাছে তো সুশীর কথা বলিনি আমি। ছি ছি, পরমা আমাকে এতখানি হীন মনে করে? আমার কথায় তার বিশ্বাস নেই এতটুকু?—অভিমানে প্রবীর সেই দিনই নাম লেখালো সেবা-কার্য্যের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে। চলে গেল বাংলার পল্লী অঞ্চলে দরিদ্রদের সেবা-কার্য্যে। পরমা এর বিন্দুবিসর্গও টের পেল না। শুধু বুঝলে তার প্রতি প্রবীরের এতটুকু মোহ নেই, এতটুকু ভালবাসা নেই। বুকটা তার পুড়ে খাক্ হয়ে যেতে লাগলো।

সেখানেও কিন্তু মন টিঁকলো না প্রবীরের। পরমার পবিত্র সুন্দর মুখটি কেবল তার চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে। ফিরে এল কলকাতায় সুশীর ফ্ল্যাটে। রাত তখন গভীর। সুশী এত রাতে প্রবীরকে দেখে অবাক্। এমন নির্জ্জনে প্রবীরকে একান্ত কাছে পেয়ে সে প্রবীরকে নিবেদন করলো তার অনেক দিনের সঞ্চিত প্রেম। সুশীর লালসায় শিউরে উঠলো প্রবীর। ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। সটান চলে গেল তার শৈশবের বন্ধু শিশিরের কাছে। শ্রমিক আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা সে। আসন্ন একটা ধর্ম্মঘট সম্পর্কে প্ল্যান করছিল কয়েক জন কর্ম্মীর সঙ্গে। হঠাৎ প্রবীরকে কড়া নাড়তে দেখে অবাক্ হয়ে গেল। বললে—আয়, আয়, হঠাৎ যে?

শিশিরের কাছ থেকে কাগজ চেয়ে নিয়ে প্রবীর তখনই রেঙ্গুনে ডাঃ ঘোষের পুত্র নির্ম্মলকে একটা চিঠি লিখে সুশীর আচরণ জানিয়ে, অনুরোধ করলে তাকে রেঙ্গুনে নিয়ে যেতে। এমন অবস্থায় সুশীর ভার নিতে সে অক্ষম। কিছু দিনের মধ্যেই নির্ম্মল এসে সুশীকে নিয়ে গেল, এবং প্রবীর নিজের হৃদয়ের দুঃখ ভোলবার জন্যে শিশিরদের শ্রমিক আন্দোলনে ভাসিয়ে দিলে নিজেকে। কয়েক দিন পরেই খবরের কাগজে প্রবীরের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের খবর বের হল। শিউরে উঠলেন পিতা অবনীনাথ, মূর্চ্ছিতা হল পরমা। পরমার মূর্চ্ছা ভাঙলো, কিন্তু অবনীনাথের শিহরণ থামলো না। থামলো যখন, তখন তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের কাজও থেমে গেছে। পিতার পারলৌকিক কাজের জন্যে প্রবীর কয়েক দিনের ছুটি পেয়েছিল। আবার ফিরে যাবার সময় পরমার খবরাখবর নেবার জন্যে শিশিরকে বন্ধু [illegible] অনুরোধ জানিয়ে

গেল। স্বামি-স্ত্রীর মনের মেঘ যখন এমনি ভাবেই কেটে গেল, ঠিক তখনই হল তাদের এক বছরের বিচ্ছেদ। বিধাতার এ কি পরিহাস!

জয়ন্ত প্রায়ই আসে। খবরাখবর নেয়, কিন্তু সাংসারিক খবরের চেয়ে পরমার মনের খবরের প্রতিই যেন তার আগ্রহ বেশী। কথায় কথায় বার বার জয়ন্ত এই কথাই পরমাকে মনে করিয়ে দিতে চায় যে, প্রবীরের সঙ্গে সম্বন্ধ হবার পূর্ব্বে তার সঙ্গেই পরমার সম্বন্ধ হয়েছিল।

দিন এগিয়ে যায়। ক্রমে প্রবীরের মুক্তির দিন এগিয়ে আসে। কাল তার মুক্তির দিন। জয়ন্ত বিকেলে এসে নিমন্ত্রণ জানায় পরমাকে সিনেমা যাবার। এর আগেও বহু বার নিমন্ত্রণ জানিয়েছে জয়ন্ত। প্রতিবারই নানা ছুতায় প্রত্যাখ্যান করেছে পরমা। আজ খুশীর আনন্দে হঠাৎ সে রাজী হয়ে বসলো।

কিন্তু এ কি? জয়ন্তর গাড়ী এ কোন্ দিকে যাচ্ছে? জয়ন্তর চোখে-মুখে ও কিসের পৈশাচিক অভিব্যক্তি? প্রকাণ্ড একটা বাগান-বাড়ীর দরজায় থামলো গাড়ী। পরমা বন্দিনী হল দোতলার একটি ঘরে। ফুকরে কেঁদে উঠলো পরমা। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসেছে। একটি বৃদ্ধ চাকর পরমার ঘরে ঢুকলো চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। পরমা কেঁদে পড়লো তার পায়ে ধরে বললে নিজের সব কথা। বললে,—আমায় বাঁচাও তুমি, ভগবান তোমার ভাল কোরবেন।

প্রবীর বড়ো আশা করেছিল, মুক্তির দিন তার জন্যে মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে পরমা জেল-ফটকের বাইরে। কিন্তু পরমার দেখা না পেয়ে মনটা তার আবার বিষিয়ে উঠলো। বাড়ী ফিরে ঠাকুর-চাকরের কাছে শুনলে কাল বিকেলে পরমা জয়ন্তর সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গেছে, এখনও ফেরেনি। কাল বিকেলে বেরিয়েছে, আর এখন সকাল সাতটা, এখনো ফিরলো না সে। ঘৃণায় সর্ব্বশরীর বিষিয়ে ওঠে প্রবীরের। অথচ এই পরমার কথা ভেবেই সে একটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে। ছিঃ—

প্রবীর চিঠি লেখে,—'পরমা, তোমাকে সকল বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে গেলাম। ফিরবো না আর কোন দিন তোমার বিলাসের ব্যাঘাত ঘটাতে।—প্রবীর।'

চিঠিটা টেবিলের ওপর রেখে উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ দেখে দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে পরমা এবং তার পেছনেই একটি বৃদ্ধ।

পরমা দৌড়ে এসে প্রবীরের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। কান্নায় ভাসিয়ে দেয় তার পা-দু'টো। বৃদ্ধ সবিস্তারে জানায় জয়ন্তর কুকীর্ত্তির কথা। প্রবীর চিঠিটাকে কুচি-কুচি কোরে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। পাশের বাড়ীর রেডিয়োতে শানাই-এর আলাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শিশুর বৈশিষ্ট্য

সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকেই চিন্তা করেন, ভাবেন কি ভাবে শিশুটিকে একেবারে শৈশব থেকেই ঠিক ভাবে গড়ে তোলা যায়। এ কথা সত্যি, এ বিষয় সকলেরই ভেবে দেখা প্রয়োজন। কেন না, জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গল-অমঙ্গল শিশুর মনের গঠন-প্রণালীর উপরেই নির্ভর করে। শিশু-মনের গঠন-প্রণালীর বিচিত্র ব্যাপারগুলি যত জানা যায় আশ্চর্য্য হতে হয়। সহজেই কিন্তু শিশুকে জানা যায় না। শিশুকে জানতে হলে তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেই ভাল ভাবে পরিচিত হতে হয়। সম্ভবতঃ শিশুর বৈশিষ্ট্যই রবীন্দ্রনাথকে তার প্রতি এত আকৃষ্ট করেছিল। শিশু ভোলানাথে তারই কিছু আভাষ পাওয়া যায়। শিশু তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিনিয়ত কত অসংখ্য জিনিষ গ্রহণ করে ও বর্জ্জন করে তার ইয়ত্তা নাই। তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গ্রহণ ও বর্জ্জনের মধ্য দিয়ে সে পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই সম্পর্ক গড়ে তোলার সময় শিশু তার বৈশিষ্ট্যের ওপরেই নির্ভর করে। এই সময় কত অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তি কল্পনা শিশুর মনকে ভুলিয়ে রাখে আর তারই সঙ্গে লুকিয়ে থাকে—ক্রোধ ঘৃণা ভয় ভালবাসা মনের আবেগে অদ্ভুত আকর্ষণগুলি। প্রবল আকাঙ্খার ক্ষুদ্র-বৃহৎ অসংখ্য আশার ভাঙা-গড়ার খেলা। শিশুর এই মন-রাজ্য এক আজব দেশ-বিশেষ। কল্পনায় শিশু এই আজব দেশ গড়ে তোলে ও সেইখানেই বসবাস করতে চায়। সেখানে সে নিজেই হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা হয়ে বসে থাকে। অদ্ভুত এই আজব দেশের সম্রাট হিসেবেই সে অগ্রসর হতে থাকে। কোন যায়গায় বাধা পেলেই সে ক্ষুণ্ণ হয়—সম্রাট হিসেবে সে অনেক কিছু আশা করে। সেখানে বাধা পেলেই সে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে পড়ে—বাধা পাবার কোনই কারণ সে খুঁজে পায় না। কারণ, আশা করাটা তার পক্ষে স্বাভাবিক। না পাওয়াটাই যেন অস্বাভাবিক। এই কারণেই অনেক সময় দেখা যায়, শিশু মায়ের কোলে শুয়ে চাঁদ দেখতে দেখতে হঠাৎ মায়ের কাছে আধ-আধ ভাবে বলে ওঠে—"মা, আমার একটা চাঁদ দেবে?" মাকে আদেশ করে বা ভুলিয়ে সামান্য চাঁদ নেওয়া তাও মাত্র একটি সে ত কিছুই নয়। শৈশবের প্রতিটি মূহূর্ত্তে মায়ের একাগ্র নিঃস্বার্থ ও সম্পূর্ণ সর্ত্তহীন অপরিসীম স্নেহের আকাঙ্ক্ষা শিশুর মনে থাকে। কিন্তু মায়ের বিপদ ক্রমেই ঘনিয়ে আসে। শিশু তার ধারণার উপরে নির্ভর করে যখন তার আকাঙ্খিত বিষয়-বস্তু লাভ করতে পারে না—সে ক্রোধে ও অভিমানে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করে। কান্নায় সে তার ব্যর্থতা প্রকাশ করে। এই ক্রোধ যদি কোন কারণে একটু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় তাহলে দেখা যায়, শিশুর আকস্মিক বিষয়টি কোন রকমে তার কাছে উপস্থিত করা সম্ভব হলেও অনেক সময় জিনিষটি সে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তার এই ক্রোধ-প্রকাশের কারণ অতি রহস্যজনক, কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুর ক্রোধ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ থেকে তার ভয়ের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সে মনে করে, এই অস্বাচ্ছন্দ্য থেকেই তার মৃত্যু ঘটতে পারে। ভয় থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্যই তাকে একটা বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হয়। সে যাকে উপস্থিত পায় তার মধ্যে ভয়কে চালান্ ক'রে নির্ব্বাসিত করার চেষ্টা হয়। যে ব্যক্তির মধ্যে অথবা যে বিষয়-বস্তুর মধ্যে ভয় নির্ব্বাসিত হয় সে ব্যক্তি বা বিষয়-বস্তু তখন শিশুর কাছে ভীতিজনক হয়ে ওঠে। যদি কোন ব্যক্তি এই রকম ভীতিজনক হ'য়ে ওঠে, তখন তার কাছ থেকে কোন জিনিষ নিতেও শিশু ভীত হয়, কারণ সেই জিনিষটিও তার কাছে ভীতিজনক হয়ে পড়ে।

এই জন্য শিশু যখন স্তন্য পান করতে না পেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় ও কান্নাকাটি করে এবং তার পরে তার মা যখন স্তন্য পান করাতে আসেন তখন শিশু অনেক সময় স্তন্য পান করতে চায় না। অনেকে এই সময় শিশুকে আদরের স্থলে একটু শাসন করেন। কিন্তু এই সময় শিশু যথেষ্ট আদর না পেলে তা ভয় দূর হয় না, খাদ্য সম্বন্ধেও

তার নানা রকম বিকৃত ধারণা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব—এমন কি শিশুর হজম শক্তির গুরুতর ক্ষতি হওয়া সম্ভব। এরি সঙ্গে মনে মনে মায়ের প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হয়ে থাকে। এক দিকে মায়ের প্রতি যদি প্রবল ভালবাসা থাকে ও অপর দিকে যদি প্রবল ক্রোধের সৃষ্টি হয় তাহলে মনের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। এ কথা জানা দরকার শিশু কিন্তু যে কোন লোককে মায়ের স্থানে বসাতে পারে, প্রথমে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়-বস্তুকেও মায়ের স্থানে বসিয়ে নেয়। কেবল যে মায়ের স্থানে বসিয়ে শিশু নিষ্ক্রিয় থাকে তা নয়—কল্পনায় তাকে স্তনযুক্ত করে নেয় অথবা তাকে স্তন বলেই মনে করে। এ ভাবে মনে করার কি কারণ সে কথাই বলছি। শিশু স্তন্য পান ক'রে মনে করে মায়ের শরীরটা স্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। তার পর পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়-বস্তুকে সে স্তন হিসাবেই দেখে এই জন্যই যে কোন বিষয়-বস্তু তার আয়ত্তের মধ্যে এলেই সে সোজা সেটি মুখের মধ্যে এনে ফেলার চেষ্টা করে। যেহেতু মায়ের কাছে ক্ষিদের সময় তৃপ্ত হওয়া যায় ক্ষিদের কষ্ট পেলেই শিশু বিশেষ ভাবে তখন যে জিনিষ বা ব্যক্তিকে সামনে পায় তাকে মা হিসেবেই বিবেচনা করে। কেবল ক্ষিদের সময় ছাড়াও যত ভাবে শিশু কষ্ট বা অভাব অনুভব করে শিশুর বিবেচনায় সে সমস্তই সুখাদ্যের সাহায্যে মিটে যেতে পারে। এই কারণে কেবল মায়ের ব্যবহারের মধ্য দিয়েই যে শিশুর মন গড়ে ওঠে তা নয়। পরিবেশের প্রভাবের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী পরিমাণেই থাকে। যে প্রকারেই হোক, ঘৃণা ও ভালবাসা এই দুই বিপরীত মনোভাবের কোন রকমে দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি হলেই শিশু এই দ্বন্দ্বকে চেতন মন থেকে অবচেতন মনে নির্ব্বাসন ক'রে দ্বন্দ্ব-কলহের হাত থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে। পূর্ণ-বয়সে এক দিন যদি কোন উপায়ে এই নির্ব্বাসিত দ্বন্দ্ব পুনরায় চেতন মনে এসে উপস্থিত হয় তখন নানা রকম মানসিক রোগ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। মায়ের কাছে অর্থাৎ মা অথবা মায়ের স্থানীয় বলে শিশু যাকে মেনে নেয় তার কাছে শিশু যথেষ্ট স্নেহ আকাঙ্ক্ষা করে এ কথা বলেছি। ঐ স্নেহ আশানুযায়ী না পেলে শিশুর মনে কি রকম বিপর্য্যয় ঘটে ও তার পরিণতির বিষয় শুনলেন। এইবার ঐ স্নেহ লাভ করার পর শিশুর মনের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে পরিচিত হওয়া যাক। কি ভাবে সেই পরিবর্ত্তন আসে? পরিবর্ত্তনের বিচিত্র কৌশল একটু খুলে বলি। শিশুর প্রতি যদি স্বাভাবিক ভালবাসা প্রকাশ করা যায় অর্থাৎ শিশুর ভালবাসার বিষয়-বস্তু তাকে যদি দেওয়া যায় তাহলে যে ব্যক্তি তাকে ভালবাসার বিষয়-বস্তু দিয়ে থাকে তাকেও শিশু ক্রমে সেই ভালবাসার বিষয়-বস্তুর দোষগুণযুক্ত মনে করে। যদি কোন শিশুকে কোন ব্যক্তি রোজ সন্দেশ খাওয়ায় তাহলে সেই লোকটিকে শিশু সন্দেশের তৈরী বলেই মনে করে। অর্থাৎ সেই লোকটিকে সে জ্যান্ত সন্দেশ হিসেবেই দেখে ও মনে করে, লোকটিকে ভক্ষণ করতে পারলে ঠিক সন্দেশের মতই লাগত। কেবল এই খানেই সন্দেশের গুণ শেষ হয় না—নিজে সন্দেশ খেয়ে নিজেকেও সন্দেশের মত সুস্বাদু মনে করে। শিশু যাকে ভালবেসে উঠতে পারে তাকে শরীর ও মনের বাইরে রাখতে চায় না। শিশুর বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এইটের গুরুত্ব খুবই বেশী এ কথা জানা দরকার। সে মনে করে সে যাকে ভালবাসে তাকে আত্মস্থ ক'রে সে তারই মতন হয়ে গেছে। শিশু যখন তার বাবা ও মাকে ভালবাসে তখন সে বাবা ও মায়ের সঙ্গে একীভূত হবার কল্পনা করে নিজেই একাধারে বাবা ও মায়ের স্থান অধিকার করে। বাবা ও মায়ের দোষ-গুণ সব কিছু শিশু নিজস্ব করে নেয়।

শিশুর সঙ্গে ব্যবহারে যাঁরা বাবা ও মায়ের স্থান অধিকার করেন শিশু তাঁদের বাবা ও মা হিসেবেই বিবেচনা করে। বাবা ও মা অথবা তাদের স্থানীয় যাঁরা, তাঁরা যদি রুক্ষ ভাবে ব্যবহার করেন ও চিরাচরিত অভ্যাসগত বিষয়গুলি নিয়ে অত্যন্ত গর্ব্ব করেন, ন্যায়-অন্যায়ের কথা ব'লে অত্যন্ত দৃঢ়তা প্রকাশ করেন ও গোঁড়া ধর্ম্মান্ধতার নজির দিয়ে প্রতিটি যুক্তির অবতারণা করেন, তাহলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে শিশু বাবা ও মায়ের সঙ্গে একীভূত হয়ে নিজেকে কল্পনায় ঐ রকম কঠোর বিচারকের সম্মুখীন করে ও তার নিজের মনে চরম অন্যায় বোধের সৃষ্টি হয়। এই রকম গুরুতর অন্যায় বোধের সৃষ্টি হ'লে শিশুর পক্ষে ভাবী কালে উন্নতির পথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। অতি বড় আদর্শ যা শিশু ভাল ভাবে আয়ত্তে আনতে পারে না, চিন্তায় আনাও সম্ভব নয়, এমন আদর্শ শিশুর সামনে উপস্থিত করলেও অনুরূপ বিপদ থাকে। মা বাবা ভাই বোন যে পরিবেশ সৃষ্টি করেন ও পরবর্ত্তী কালে শিক্ষক ও বাবু-মহলের যে প্রভাব শিশুর মনে বিস্তার করে তারই উপরে অনেকাংশে শিশুর ভাবী জীবনের পূর্ণতা বা অপূর্ণতা নির্ভর করে। শিশুর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের সাহায্যে তাকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

মায়ের পূজা

আরতি গোস্বামী

হে মাতঃ! তব পূজন লাগি এনেছি পুষ্প তুলিয়া,
ভুলিব—আমি সকল বেদন, আজিকে যাব ভুলিয়া।
বছর পরে এসেছ ঘরে—আজকে কি কেউ হিসাব করে?
চরণ-তটে অঞ্জলি দে, অঞ্চল তোর ভরিয়া,
তুলিব আমি সকল বেদন আজিকে যাব ভুলিয়া।

হাসিব—যতই মম অন্তরেতে জাগুক হাহাকার,
কান্না-হাসি মিলায়ে আজি করিব একাকার।
চক্ষে যদি অশ্রু ঝরে—তবু হাসব আমি হাসব ওরে—
বলব—"মা গো, দেখছ না কি সুখের চারি ধার"
(আমি) এমনি কোরেই কান্না-হাসি কোরবো একাকার।

হয়ত ইহা কোরতে বুকে রক্ত আমার ঝরবে—
ফুলের সাজি তাই হয়ত রক্ত-রঙে ভরবে,
শুভ্র ফুলে রক্ত দেখি—মা যদি কন—"ওরে এ কি?"
উত্তরে তার বলব হাসি—"এ কি চিনতে তুমি পারবে?
ধরার এ এক নূতন জবা চিনতে তুমি নারবে।"

ভুলিব—এমনি করেই যাব আমি দুঃখ আমার ভুলিয়া—
সহায়তা কোরবে এতে দোয়েল-শ্যামা-পাপিয়া,
ওদের মধু কুহুস্বরে দুঃখ কি আর থাকতে পারে?
শিউলি ফুলে অঞ্জলি দে মায়ের চরণ ভরিয়া—
তোমার পূজা লাগিয়া মাতা এনেছি জবা তুলিয়া।

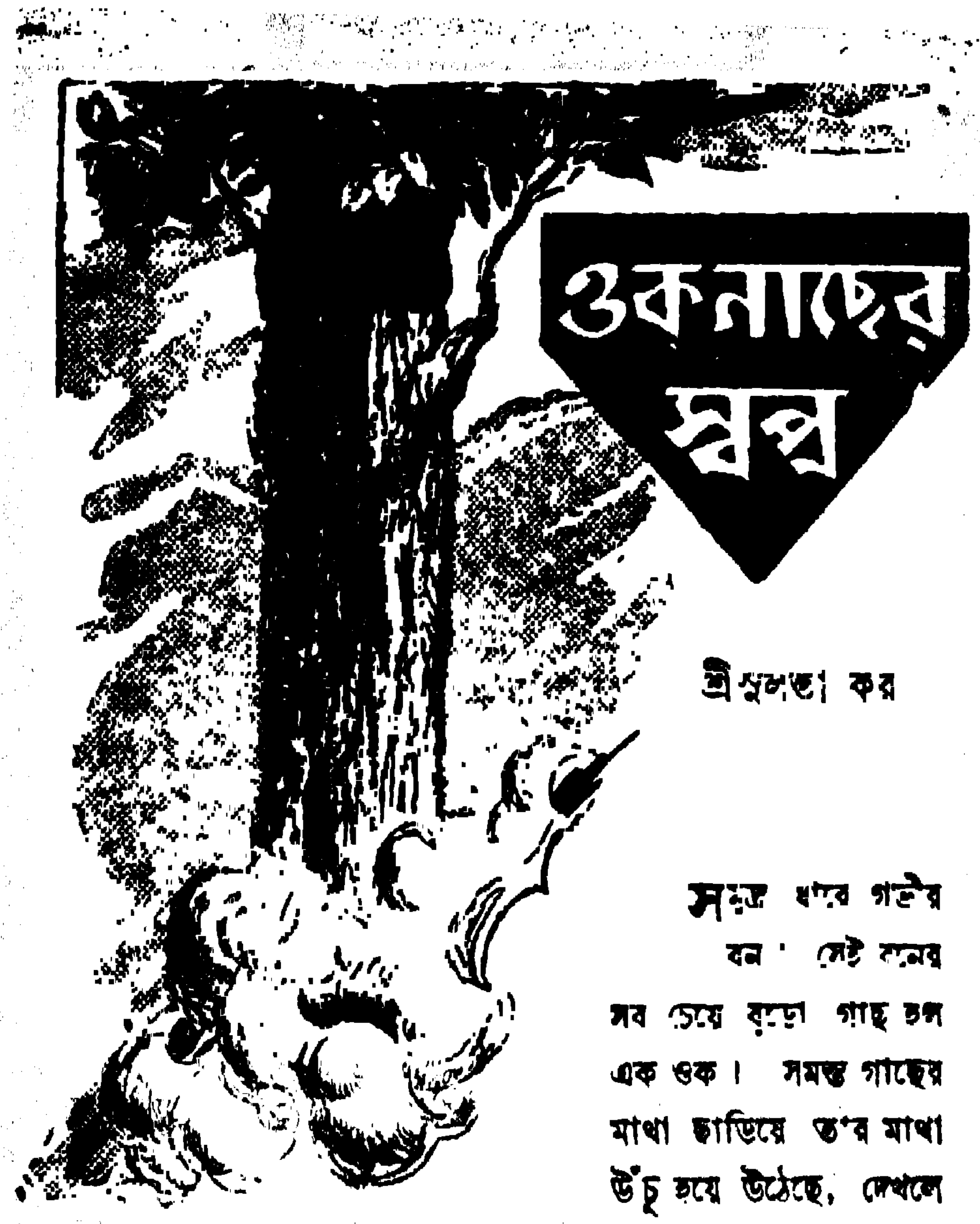

ওকগাছের স্বপ্ন

শ্রীসুলতা কর

সমুদ্র ধারে গভীর বন। সেই বনের সব চেয়ে বুড়ো গাছ হল এক ওক। সমস্ত গাছের মাথা ছাড়িয়ে তা'র মাথা উঁচু হয়ে উঠেছে, দেখলে মনে হয় যেন মেঘেদের ছুঁয়ে আকাশে মিশে যাচ্ছে। এত উঁচু তার মাথা যে সমুদ্রের বহু দূর থেকে তাকে দেখা যেত। ঝড়ের, দুর্য্যোগের রাতে সে ছিল জাহাজদের প্রিয় বন্ধু।

ঝড়ের রাতে জাহাজের নাবিকেরা কত দিন ধরে তাকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছে—"ওই দেখা যাচ্ছে বুড়ো ওক গাছকে, এইবার আমরা ঝড় কাটিয়ে তীরে উঠব।"

কত দিন ধরে কত জনকে সে আশ্রয় আর আনন্দ দিচ্ছে সে খবর সে নিজে রাখত না। তার উঁচু ডালের ভিতরে কাঠঠোকরারা বাসা বেঁধে সুখে ঘর করত, তার সবুজ পাতায় ভরা নীচের ডালে দুলতে দুলতে কোকিলরা গান করত, শীতের আগে দলে-দলে সারসরা এসে তার মাঝের ডালে বাসা বেঁধে কাটিয়ে যেত।

এমনি ভাবে বছরের পর বছর কাটত। এখন তার বয়স ঠিক তিনশো পঁয়ষট্টি বছর হয়েছে। কিন্তু তার পক্ষে এটা এমন কিছু বেশী বয়স নয়। কত গ্রীষ্মের দুপুর, বসন্তের সন্ধ্যা, বর্ষার রাত কেটে যেত, ওক গাছ জেগে জেগে সময় কাটাত। এ সব ঋতুই তার কাছে একটি দিনের সমান। কিন্তু যতই শীত কাল কাছে এগিয়ে আসত ওক গাছেরও চোখে ঘুম জড়িয়ে ধরত। শীতকাল হল তার শান্ত ঘুমের রাত। শীতের কনকনে ঝড় ওকের শুকনো পাতা খসিয়ে দিতে দিতে বলত—"দিন ফুরাল বন্ধু, ঘুমাও ঘুমাও। আমি তোমায় দোলা দেব, ঘুম পাড়াব। আমার তাণ্ডব দোলা লেগে তোমার শাখা মড়মড় করছে বটে, পাতা ঝরে পড়ছে বটে, কিন্তু এই যে ঘুম আমি তোমায় এনে দিচ্ছি, এ তোমার কত উপকার করছে বল দেখি। সারা বছর জেগে কাজ করে যত শ্রান্তি জমেছিল সব কেটে যাচ্ছে। মেঘদের আমি ডেকে এনেছি, তারা তুষার-বৃষ্টি করবে। তোমার সারা গায়ে সাদা তুষারের একখানি চাদর বিছিয়ে দেব। তার তলায় শুয়ে তুমি আরামে ঘুমাবে। শান্ত ঘুম তোমার চোখ জুড়ে আসুক, সুন্দর স্বপ্ন তোমার রাত মধুর করুক।"

ঝড়ের রুদ্র দোলায় দুলতে দুলতে, ঘুমপাড়ানী গান শুনতে শুনতে ওক গাছ অগাধে ঘুমিয়ে পড়ল। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ঘুমের ভিতর দিয়ে কেটে যেত। এক বছর খৃষ্টোৎসবের পুণ্য রাতে ওক গাছ ঘুমাতে ঘুমাতে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখল। এত সৌন্দর্য্যভরা, আনন্দময় স্বপ্ন সে তার জীবনের কোন রাতেই দেখেনি। সে যে স্বপ্নটি দেখল সেটি এই রকম—খৃষ্টোৎসবের পবিত্র এক দিন। খৃষ্টোৎসবের দিন অথচ শীত কাল নয়। বরফ পড়ছে না, কোথাও অন্ধকার নাই। আকাশ ভরে সোনালী আলো ঝরে পড়ছে, সূর্য্যের প্রখর দীপ্তিতে চার দিক ঝলমল করছে। প্রত্যেক গির্জ্জা থেকে পূজার ঘণ্টার মিষ্টি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। চার দিকে উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে। বড়লোক, গরীব, ছেলে, বুড়ো সবাই হাসছে, আনন্দ করছে।

ওক গাছের সমস্ত জীবন ভরে যে সব সুন্দর সুন্দর ঘটনা ঘটেছে, এইবার সে সব এক এক করে ছবির মত স্বপ্নের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগল। সে দেখতে লাগল—এক দল বীর যোদ্ধা তার তলা দিয়ে তেজস্বী ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলেছে। তাদের পাশে ঘোড়ার পিঠে পরমা সুন্দরী রাজকন্যারা বসে রয়েছে। এই সব রাজকন্যাদের যোদ্ধারা শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করেছে। সূর্য্যের প্রখর আলোয় যোদ্ধাদের ঝলমলে পোষাক, হাতের শাণিত তলোয়ার, মাথার সোনার শিরস্ত্রাণ ঝকমক করে উঠছে। রূপসী রাজকন্যাদের অপূর্ব্ব রূপ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। দেখতে দেখতে যোদ্ধার দল কোথায় মিলিয়ে গেল। এবার এল তেজস্বী কালো ঘোড়ার খুরে খুরে আগুনের হল্কা ছুটিয়ে এক দল ভবঘুরে বেদুইন। ওক গাছের তলায় তারা নেমে পড়ল। রাশ রাশ তাঁবু মাটিতে পেতে ফেলল। কুকুর, ছাগল চার দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বোরখা-ঢাকা সুন্দরী বেদুইন মেয়েরা গান গেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমুদে পুরুষেরা ওক গাছের ডালে ডালে শিঙ্গা ঝুলিয়ে রাখল। জন কতক বেদুইন অপূর্ব্ব বন্য সুরে শিঙ্গা বাজাতে লাগল। কি ফূর্ত্তিতে ভরা রাতই না তারা তার তলায় কাটাতে লাগল। বন্য-জীবনের স্বাধীন অনাবিল আনন্দধারা। ওক গাছের ডালে ডালেও সেই আনন্দের ছোঁওয়া লাগতে লাগল। খানিক বাদে এ দৃশ্য মিলিয়ে গেল।

স্বপ্নের ভিতর এই সব সুখের দৃশ্য দেখতে দেখতে ওক গাছের মনে হতে লাগল যেন সে আর বুড়ো নয়, নবযৌবন তার ফিরে এসেছে। তার মনে হতে লাগল, যেন সে স্বর্গে পৌঁছে গেছে। তার মাথা মেঘের উপর উঠে গেছে। অনেক নীচে দিয়ে সাদা মেঘরা ভেসে চলেছে। দেখে মনে হচ্ছে, সাদা সারস পাখীর দল বুঝি উড়ে চলেছে। দেখতে দেখতে ওক গাছের প্রত্যেকটি সবুজ পাতার এক অদ্ভুত দৃষ্টি-ক্ষমতা এসে গেল। যে সব দৃশ্য মানুষ কখনও দেখেনি, ওক গাছের পাতারা সেই সব দৃশ্য দেখতে লাগল।

দেখতে লাগল—হঠাৎ দিনের আলো ম্লান হয়ে গেল। আকাশ তারায় তারায় ভরে উঠল। কি স্নিগ্ধ তাদের জ্যোতি আর কি অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য। তারাদের স্নিগ্ধতার দিকে চেয়ে চেয়ে ওক গাছের পাতাদের মনে হতে লাগল, যেন তারা দেখতে পাচ্ছে

তাদের পরিচিত "অতি কোমল, অতি স্নিগ্ধ কতকগুলি চোখের আলো। এ চোখের আলোগুলিকে তারা দেখেছে ছোট ছেলেদের চোখে, যারা কত দিন ওক গাছের তলায় ছুটাছুটি করে খেলা করেছে, আর দেখেছে কবিদের চোখে, যারা তার তলায় বসে উদাস হয়ে কত দুপুর কবিতা পড়ে কাটিয়েছে। স্বর্গের পবিত্র হাওয়ায় সর্ব্বাঙ্গ মেলে দিয়ে ওক গাছ স্বর্গের আরও কত সুন্দর দৃশ্য দেখতে লাগল। এত আনন্দ এত সুখ সে পেল যে তার মনে হতে লাগল, যেন সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না।

কিন্তু একটু পরে এক ম্লান বিষাদের সুর তার মনের কোণে জেগে উঠল। তার মনে প্রবল এক ইচ্ছা হল, এমন তীব্র ইচ্ছা—কিছুতেই যাকে দমন করা যায় না। সে চাইল—তার এত দিনের বাসভূমির প্রত্যেকটি গাছ বড়-ছোট সবাই; প্রত্যেকটি ফুল, প্রত্যেকটি ঝোপ এমন কি পায়ের তলার ঘাস পর্য্যন্ত স্বর্গের এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখুক। সে যে সুখ, যে আনন্দ অনুভব করছে, তার সঙ্গীরা সবাই সেই আনন্দ অনুভব করুক। তা নইলে তার সুখের পূর্ণতা কোথায়? একমনে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল— "ভগবান আমাকে যে সুখ দিলে, সবাইকে সেই সুখ দাও, নইলে আমি কোন আনন্দ পাব না।"

একমনে ওক গাছ চোখ বুজে প্রার্থনা করছে, এমন সময় হঠাৎ ফুলের গন্ধে বাতাস ভরে গেল, কানের কাছে কোকিল মিষ্টি সুরে গান গেয়ে উঠল। চমকে চেয়ে ওক দেখল, ভগবান তার প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। তার সঙ্গে সমস্ত বনভূমি পৃথিবী ছাড়িয়ে মেঘের রাজ্য পার হয়ে স্বর্গের কোলে এসে পৌঁছেচে। বড়-ছোট সব গাছেরা উপরে উঠেছে, ছোট-ছোট ঝোপেরাও বাদ পড়েনি।' রঙ্গীন অসংখ্য ফুলেরা আকাশের কোলে শোভা ছড়িয়ে দুলছে। শুধু গাছেরা কেন—বনভূমির সমস্ত কীট-পতঙ্গও উপরে উঠে এসেছে। সবুজ ফড়িং হাল্কা ডানা নেড়ে আলোয় আলোয় উড়ে বেড়াচ্ছে। রঙ্গীন প্রজাপতিরা স্বর্গের ফুলে ফুলে মধুপান করছে। সকলের আনন্দের গানে স্বর্গ ভরে উঠেছে।

"কিন্তু ঘাসের ছোট নীল ফুলটি কোথায়? নদীর কোলে মাথা নীচু করে যে নিজেকে লুকিয়ে রাখত? আর সেই আগাছার ঝোপ, সবাই যাকে তাচ্ছিল্য করত? তারা কি এখানে আসেনি?"

"এই যে আমরা এখানে, এই যে আমরা।" হাসতে হাসতে তারা ওক গাছের পাশ থেকে বলে উঠল।

"কিন্তু গত বছর যারা ঝরে পড়ে গেছে, সেই সব শুকনো গোলাপের দল? পাইন গাছের পাতারা তারা কি এখানে আসবে না, এত সুন্দর দৃশ্য দেখবে না?"

"এই যে আমরা এসেছি—এই যে আমরা দেখছি।" বলতে বলতে ঝরে-যাওয়া গোলাপেরা তাজা হয়ে উঠল, মরে-যাওয়া পাইন গাছ সবুজ হয়ে উঠল আকাশের কোলে।

ওক গাছ হাসিমুখে বলল—"ওঃ, কি আনন্দ! সবাইকে আমি পাশে পেয়েছি। সবাই আমার সঙ্গে সুখ ভোগ করছে। ছোট, বড় কেউ বাদ যায়নি। এত সুখ ভাবাই যায় না। কি করে এত সুখ সম্ভব হ'ল?"

স্বর্গের কোল থেকে দেবদূতেরা উত্তর দিল,—"পৃথিবীতে এত সুখ সম্ভব হয় না। এত সুখ পাওয়া যায় স্বর্গে। সাধু, পুণ্যাত্মারা যারা কেবল নিজের সুখ চায় না, সবায়ের মঙ্গল, সবায়ের সুখ চায় কেবল তারাই স্বর্গে এসে এই সুখ পায়। তুমি সবায়ের মঙ্গল চেয়েছ, তাই তুমি এত সুখ পেলে। সাধু পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে এক রাজ্যে চলে এলে।"

দেবদূতদের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওক গাছ অনুভব করল তার প্রত্যেকটি শিকড় যেন মাটির কঠিন বাঁধন থেকে খসে যাচ্ছে। মাটির লৌহ-গ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। ওক গাছের মন শান্তিতে তৃপ্তিতে ভরে উঠতে লাগল, বলল—"এখন আর কোন শিকলই আমাকে মাটিতে বাঁধতে পারবে না। আলোর জগতে আনন্দের জগতে আমি উড়ে যাব। চলে যাব ভগবানের কাছে। পাশে থাকবে আমার সব প্রিয়জন। ছোট-বড় সবাই, যাদের আমি পৃথিবীতে ভালবেসেছি।"

—খৃষ্টোৎসবের রাতে এই স্বপ্নটি দেখল বুড়ো ওক গাছ। যখন সে স্বপ্ন দেখছে ঠিক সেই সময় জল-স্থল কাঁপিয়ে প্রচণ্ড ঝড় উঠল। সমুদ্রের ঢেউয়েরা গর্জ্জন করতে করতে বিরাট আকার ধারণ করে তীরের দিকে ছুটে আসতে লাগল। ক্রমেই ঝড়ের বেগ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ ঝড়ের এক অতি তীব্র আঘাতে ওক গাছ কেঁপে উঠল। দেখতে দেখতে তার সব শিকড়গুলি পটপট শব্দে ছিঁড়ে গেল, বিশাল ওক মাটিতে শুয়ে পড়ল। তার তিনশো পঁয়ষট্টি বছরের জীবনের সমাপ্তি ঘটল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যখন সে স্বপ্ন দেখছে যে মাটির বাঁধন ছিঁড়ে সে স্বর্গে উড়ে চলেছে। দুর্য্যোগ-ভরা রাত কাটল। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের গর্জ্জন থেমে গেল। খৃষ্টোৎসবের শান্ত প্রভাতে সূর্য্যের প্রসন্ন জ্যোতি চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেক গীর্জ্জা থেকে উৎসবের আনন্দ-ধ্বনি নিয়ে ঘণ্টা বেজে উঠল। ধনী, গরীব সকলেরই ঘর থেকে ভগবানের আনন্দ-গান শোনা যেতে লাগল। সমুদ্রের উপর দিয়ে একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ তীরের দিকে এগিয়ে এল। সারা রাত ঝড়ের সঙ্গে সে যুদ্ধ করেছে, তার চিহ্ন তার সর্ব্বাঙ্গে রয়েছে। কিন্তু আজ সকালে সে নতুন পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। নাবিকেরা নতুন পোষাক পরে হাসিমুখে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। দূর থেকে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে এক নাবিক বলল—"কই আমাদের জমির নিশানা, সেই প্রিয় ওক গাছটিকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল, প্রিয়বন্ধু কোথায় গেল? কিন্তু ওক গাছকে দেখা গেল না। জাহাজ তীরে ভিড়ল। যাত্রীরা, নাবিকেরা লাফিয়ে নামল, দেখল—তাদের প্রিয়বন্ধু ওক গাছ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

যাত্রীরা সবাই সজল নয়নে ওক গাছকে ঘিরে দাঁড়াল। নাবিকেরা বলল—"কত দিনের প্রিয়বন্ধু তুমি! তুমুল ঝড়ের রাতে কত নাবিক কত যাত্রী তোমায় দেখে ঘরের খবর পেয়েছে, জীবনের খবর পেয়েছে। মৃত্যুকে ভুলেছে। তোমার স্মৃতি আমাদের মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে। এস বন্ধুরা, শুভ খৃষ্টোৎসবের দিনে আমাদের প্রিয়বন্ধু ওক গাছের আত্মার উদ্দেশ্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।"

তারা সবাই মিলে ওক গাছকে ঘিরে যীশু খৃষ্টের গুণগান করতে লাগল। সে গান দূরে স্বর্গে ওক গাছের কানে পৌঁছল। পৃথিবীর ভালবাসা, ভগবানের আশীর্ব্বাদ তাকে বিহ্বল করে তুলল।

(বিদেশী গল্পের ছায়া)

হাড়-আল্‌সে হেকো

মনোজ সান্যাল

অনেক, অনেক দিন আগে—কত দিন আগে আর কোথায় তা' আমার ঠিক মনে নেই—এক জন লোক বাস করতো। নাম তার হেকো। কিন্তু সবাই তাকে ডাকতো 'হাড়-আল্‌সে হেকো' বলে। কারণ যে কোন কাজকেই সে এড়িয়ে চলতো বাঘের মত ভয় ক'রে। আর সেই আল্‌সেমির জন্যে বেচারীকে কত দিনই না না খেয়ে কাটাতে হোত।

শেষ কালে না খেয়ে-খেয়ে ভারী বিরক্ত ধ'রে গেল তার। ঠিক করলো বুড়ো জারবাটুর কাছে যাবে। জারবাটু খুব পণ্ডিত লোক; যাদু বিদ্যেও জানে। লোকে বলে, সে না কি মানুষের বরাত বদলে দিতে পারে।

হাঁটতে হাঁটতে বহু কষ্টে হেকো গিয়ে হাজির হোল জারবাটুর বাড়ীতে। গিয়ে টুপি খুলে দাঁড়িয়ে রইলো দোর-গোড়ায়। জারবাটু তো তাকে দেখে অবাক্! 'আরে! হাড়-আল্‌সে হেকো যে! এখনও বেঁচে আছো? ভেবেছিলাম কুঁড়েমির জন্যে এত দিন তুমি কবে টেঁসে গেছ।'

'এখনও কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছি।' জবাব দিলে হেকো।

'তা' আমার কাছে কি মনে ক'রে?

'আপনাকে দিয়ে আমার বরাতটা একবার বদলে নেবো। উপোস আর আমার ভাল লাগছে না।'

মোটা ভুরুর নীচ থেকে জারবাটু একবার তাকালে হেকোর দিকে। তার পর বললে,—'দেখছি তুমি ভুলে গেছ,—লোকে কথায় বলে: ভাঁড়ে যা জমাবে খেটে, তাতে যাবে সুখে কেটে। কিন্তু যদি না খাটো তাহোলে বরাতে উপোস ছাড়া আর কি জুটবে? এই রকমই তো লেখা আছে আমাদের বরাতের শাস্ত্রে।'

'কিন্তু উপোস যে আর আমার সহ্য হয় না! না খেটে রোজ পেট ভ'রে খেতে চাই।'

'বলিহারি তোমার বুদ্ধি! জান না, কষ্ট না ক'রলে কেষ্ট মেলে না? তুমি তো দিব্বি সারা দিন শুয়ে শুয়ে আকাশের কাক গোণ।'

কিন্তু হেকো কিছুতেই শোনে না। সে একেবারে নাছোড়-বান্দা। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টুপিতে হাত বুলোয় আর কেবলই কাকুতি-মিনতি করে জারবাটুকে।

শেষে জারবাটু রেগে উঠলো। বললে,—'আচ্ছা বেশ, তাই হবে। আমি তোমায় একটা বর দিচ্ছি,—যদিও তুমি তার যোগ্য নও। যাও, বাড়ী ফিরে যাও। গিয়ে অপেক্ষা কর প্রথম পর্ব-দিনের জন্যে। পরবের ঠিক আগের রাত্তিরে খুব ঝড় হবে। কিন্তু খবরদার, ঘুমিও না যেন! জেগে বসে থাকবে। যেমনি আকাশে বিদ্যুৎ চমকাবে অমনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। দ্বিতীয় বার বিদ্যুৎ চমকালে দ্বিতীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তৃতীয় বার চমকালে তোমার তৃতীয় আর শেষ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। কিন্তু হোলে কি হবে, তুমি যা বোকা, নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু চেয়ে বসবে যাতে আমার বরে তোমার কোনই উপকার হবে না।'

বর পেয়ে হেকোর আনন্দ আর ধরে না। জারবাটুকে ধন্যবাদ দিয়ে রওনা হোলো বাড়ীর দিকে।

পরবের আগের রাত্তিরে হেকো তার কুঁড়ে ঘরের চৌকাঠে বসে বসে ঝড়ের অপেক্ষা করতে লাগলো। যত বার হাই ওঠে তত বার সে চোখ ডলে, পাছে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে বলে।

ইতিমধ্যে গাঢ় কালো মেঘ ধীরে ধীরে নেমে এলো পাহাড়ের মাথা থেকে। উত্তুরে হাওয়া উঠলো সনসনিয়ে, আর বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা পড়লো মাটিতে। আর দেরী নেই! যে কোন মুহূর্ত্তেই বাজ ডাকতে পারে।

হেকো অমনি ভাবতে বসলো কি বর সে চাইবে। ভাবতে যাবে ঠিক এমনি সময় পেটটা তার কামড়ে উঠলো। এতই পেট কামড়াতে লাগলো যে বর চাইবার কথা সে ভুলেই গেল।

'বেছে বেছে এই কি পেট কামড়াবার সময়! উচ্ছন্নে যাক পেট!' বললে সে রাগে বিড়বিড়িয়ে। 'এমন পেট না থাকাই ভালো!'

কড়-কড়-কড়াৎ······বাজ কড়কড়িয়ে উঠলো। বিদ্যুৎ চিক-মিকিয়ে গেল। ব্যস, হেকো চেয়ে দেখে তার পেট আর নেই!

কোটের নীচে হাত দিল,—কিন্তু কোথায় পেট! শুধু মেরু-দণ্ডের হাড়খানা পড়ে আছে চামড়ার নীচে। ভয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো। 'আরে! আরে! এ কি হোল! পেট ছাড়া বাঁচবো কি করে? এর চেয়ে বরং পেটটা বড় হোলেই ভালো হোত।'

যেই এ কথা বলা সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চিকমিকিয়ে উঠলো। হেকো ওমনি চেয়ে দেখে তার পেট ফুলছে, ক্রমশঃই বড় হোচ্ছে। আর সে কি পেট! বিরাট এক জয়ঢাক! পেটের ভারে বেচারী আর দাঁড়াতেই পারলে না। হুড়মুড়িয়ে মাটিতে পড়ে গোঁঙাতে লাগলো,—'ওরে বাপ রে! এত বড় পেট নিয়ে কি বাঁচা যায়! এর চেয়ে আগের মত পেটই ভালো।'

ঠিক এই সময় তৃতীয় বার আকাশে বিদ্যুৎ চিক্‌মিকিয়ে গেল, বাজ ডেকে উঠ্‌লো—হেকো ওম্‌নি আবার যে হেকো ছিল সেই হেকোই হয়ে গেল।

এতে ভারী রেগে গেল হেকো। নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়ে ছুট্‌লো আবার জারবাটুর কাছে।

যেতে যেতে রাস্তায় এক নেকড়ে বাঘের সঙ্গে তার দেখা। নেকড়েটা বুড়ো, রোগা লিক্‌লিকে,—এত রোগা যে বুকের হাড়গুলো একটা একটা করে গোণা যায়। হেকোর পথ আট্‌কে দাঁড়িয়ে নেকড়ে জিজ্ঞাসা করলে—'কি হে হেকো! এত হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছ?'

ভয়ে ঠক্‌ঠকিয়ে উঠলো হেকো। কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লে—'দোহাই নেকড়ে ভাই, আমায় যেতে দাও। পণ্ডিত জারবাটুর কাছে যাচ্ছি আমার অদৃষ্টের কথা বলতে।'

'বেশ তবে বন্ধুর মত কাজ কর', বল্‌লে নেকড়ে। 'জারবাটুকে আমার কথাটাও এক বার জিজ্ঞাসা করো—আমার কি করা উচিত। কেন আমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছি, আর কেনই বা খেয়ে পেট ভরে না? কিন্তু খবরদার! যদি জিজ্ঞাসা করতে ভোল, তাহোলে কিন্তু তোমায় ঘাড় আমি মট্‌কাবো!'

'আচ্ছা ভাই, ভুলবো না', এই বলে হেকো আবার ছুট্‌ দিল।

ছুটতে ছুটতে পা-দু'টো টনটনিয়ে উঠ্‌লো। তাই সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো। দাঁড়িয়ে চারি দিকে তাকাতে তাকাতে দেখে, রাস্তার ধারেই একটা লম্বা, ঝাঁকড়া আপেল গাছ—টুকটুকে আপেলে ভরা। দেখে তার ভারী লোভ হোল। গাছতলায় গিয়ে বেশ বড় দেখে একটা আপেল কুড়লো। তার পর এক কামড় খেয়েই চেঁচিয়ে উঠ্‌লো,—'আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ! এ যে একেবারে বিষের চেয়েও তেতো!'

হেকোর কথা শুনে আপেল গাছের পাতা মরমরিয়ে উঠলো দুঃখে। সবুজ পাতার চোখ থেকে ঝরঝরিয়ে জল পড়তে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে ব'ল্‌লে আপেল গাছ—'দেখছো তো ভাই, আমায় কি লাঞ্ছনা সইতে হয়? যে আমার আপেল খায় সেই আমায় গালাগাল দেয়। অথচ আমার ভারী সখ, ক্লান্ত পথিকদের আপেল খাইয়ে সেবা করা। ভাই হেকো, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আমার এ রোগের একটা বিহিত কর।'

'আচ্ছা বেশ, জারবাটুকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করবো', এই বলে হেকো আবার ছুটতে লাগলো।

ছুটতে ছুটতে তার প্রায় দম বন্ধ হয়ে এলো। শেষে দূরে দেখা গেল জারবাটুর বা়ী। কিন্তু হঠাৎ তার ভারী তেষ্টা পেল। গাছের ফাঁকে একটা নদী দেখে সেই দিকে ছুটে গেল। গিয়ে হেঁট হয়ে নদীর টলটলে জলে মুখ লাগালো। কিন্তু ও মা! হেকো দেখে যে জলের ঠিক নীচেই বিরাট একটা মাছ প্রকাণ্ড হাঁ করে শুয়ে আছে। তার চোখ দু'টো ঠিকরে পড়ছে, নিশ্বাস পড়ছে সাঁই সাঁই করে,—কিন্তু হাঁ আর কিছুতেই বন্ধ করতে পারছে না।

মা'ছটা হেকোকে দেখে আনন্দে ল্যাজ দিয়ে জল ছিটোতে ছিটোতে বললে,—"ভাই বন্ধু হেকো, আমার একটা উপকার করবে? কুড়ি বছর ধরে আমার এ হাঁ-মুখ আর বন্ধ ক'রতে পারছি না!"

'সবুর কর। জারবাটু হয়তো এর কারণ জানে,—এই বলে হেকো আবার ছুট দিল।

শেষ কালে হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হোল জারবাটুর বাড়ীতে। জারবাটু তখন তার ঘরের চৌকাঠে বসে ভুরু কুঁচকে বিরাট মোটা একখানা বই পড়ছিল। মুখ তুলে হেকোকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করলে,—'কি হে, আবার আমার কাছে কেন?'

'বেশ লোক যা হোক!' ব'ললে হেকো রাগে-দুঃখে। 'কেন আমাকে ঠকালেন? আমার তিনটে ইচ্ছে পূর্ণ করবেন বললেন, কিন্তু আসল সময়েই লাগিয়ে দিলেন পেট-কামড়ানি! যদি সত্যই কিছু দিতে চান তবে কেন মিছেমিছি এই গরীব বেচারীর সঙ্গে মজা করছেন?'

'তা হোলে এখনও তুমি না খেটেই পেট ভরে খেতে চাও, কি বল?' জিজ্ঞাসা করলে জারবাটু। 'বেশ, এবার তোমায় আমি বিরাট ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দেবো। কিন্তু জানি, তা' থেকেও তুমি কিছু লাভ করতে পারবে না।'

'আরে না মা, দেখবেন এবার আমি আগের চেয়েও চালাক হব।' জবাব দিলে হেকো মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করে।

'এখানে আসবার পথে কি কাউকে তুমি দেখেছিলে?' প্রশ্ন করলে জারবাট দুষ্টু-দুষ্টু হেসে।

'হ্যা, দেখেছিলাম বৈ কি!' বললে হেকো আনন্দে চট্‌পটিয়ে। 'আসবার পথে এক তরতারিয়াল্‌ নদীতে প্রকাণ্ড এক মাছকে দেখলাম। মাছ বেচারী কুড়ি বছর ধরে হাঁ করেই আছে, মুখ আর কিছুতেই বন্ধ করতে পারে না। বলুন তো, কিসে তার এই ব্যাধি সারে?'

'একটা খু-ব দামী মুক্তো—সাত সাগরের সেরা মুক্তো—তার জিবের নীচে আটকে আছে। সেটা তুলে ফেললেই সে আবার মুখ বন্ধ করতে পারবে। যাক্‌, আর কি দেখেছিলে?'

'আর একটা সুন্দর আপেল গাছ দেখেছিলাম। তার আপেলগুলো টুকটুকে লাল, কিন্তু একেবারে বিষের চেয়েও তেতো। আপেল গাছ আমায় অনেক করে বলে দিয়েছে আপনাকে তার ব্যাধির কারণ জিজ্ঞাসা করতে।'

'আপেল গাছটার শেকড়ের নীচে গুপ্তধন লুকোনো আছে। সেটা খুঁড়ে বার করলেই তার আপেল আবার মধুর চেয়েও মিষ্টি হয়ে উঠবে'—বল্‌লে জারবাটু। 'যাও, এবার সরে পড়। আমি বড্ড ক্লান্ত।'

'আসবার সময় এক বুড়ো নেকড়ের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল', বল্‌তে লাগলো হেকো,—'যতই সে খায় কিছুতেই আর তার পেট ভরে না, আর দিনকে দিন সে রোগা হয়ে যাচ্ছে। বলুন না কিসে তার এই রোগ সারে?'

হেকোর প্রশ্নে জারবাটু হাস্‌লো,—আগের চেয়ে আরও দুষ্টু দুষ্টু হাসি। তার পর ঝপাং করে বইটা বন্ধ করে বল্‌লে,—'যাও, তোমাকে আমি বেশ বুঝে নিয়েছি। নেকড়েকে গিয়ে বল যে, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বোকা আর কুঁড়ে লোককে খেলেই তার পেট ভরবে। সব রোগ সেরে যাবে।'

জারবাটুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হেকো রওনা হোল বাড়ীর দিকে আনন্দে ডগমগিয়ে। তরতরিয়াল্‌ নদীর কাছে আসতেই মাছ তাকে জিজ্ঞাসা করলে,—'কি হে, জারবাটু কি বললে?'

'বল্‌লে তোমার জিবের নীচে একটা দামী মুক্তো আটকে আছে। সেটা তুলে ফেল্‌লেই তোমার রো'গ সেরে যাবে।'

'তাহোলে দাও না ভাই রোগটা সারিয়ে'—বললে মাছ মিনতি করে 'আর তার বদলে সেই দামী মুক্তোটা নাও।'

কিন্তু হেকো তাকে ব'ললে চাল মেরে,—'ইস্‌। কেন আমি তোমার মুখে হাত দিয়ে হাত ময়লা করবো? জারবাটু আমায় মস্ত ঐশ্বর্য্য দিচ্ছে। তোমার সঙ্গে বকবার আমার সময় নেই!' এই ব'লে সে চ'লে গেল মুখ ঘুরিয়ে।

আপেল গাছের কাছে এলে আপেল গাছ জিজ্ঞাসা করলে, —'কি হে, জারবাটু কি বল্‌লে?'

'বল্‌লে যে তোমার শেকড়ের নীচে গুপ্তধন আছে। সেটা খুঁড়ে বার করলেই তোমার আপেল আবার মধুর চেয়েও মিষ্টি হবে।'

'তাহোলে ভাই দাও না আমার রোগটা সারিয়ে'—বল্‌লে আপেল গাছ মিনতি করে—'আর তার বদলে গুপ্তধন নাও।'

'ইস্‌! কেন শুধু শুধু মাটি খুঁড়ে হাতে ফোস্কা পড়াব?' বল্‌লে হেকো নাক-মুখ বেঁকিয়ে—'জারবাটু আমায় মস্ত ঐশ্বর্য্য দিচ্ছে।'

আপেল গাছ যেমন ছিল তেমনি তেতো আপেল নিয়েই পড়ে রইলো। হেকো এগিয়ে চল্‌লো হনহনিয়ে। যেতে যেতে দেখে

রাস্তার ঠিক মাঝখানে শুয়ে আছে নেকড়ে বুড়ো। নাকটা থাবার ওপর রেখে পড়ে আছে তারই অপেক্ষায়।

'কি হে হেকো, জারবাটু আমার রোগের কি ওষুধ বললে? বল, নইলে তোমায় এখুনি খেয়ে ফেলবো।'

হেকো আর উপায়ান্তর না দেখে বসে পড়লো নেকড়ের পাশে। বসে নেকড়েকে সব বললে যাওয়ার পথে যা যা সে দেখেছিল আর জারবাটু যা যা তাকে বলেছিল।

'তাহোলে জারবাটু বলেছে যে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বোকা আর কুঁড়ে লোককে খেলেই আমার রোগ সেরে যাবে,—কি বল?'

'হ্যাঁ'—বললে হেকো।

শুনে নেকড়ে হাঁ করে বেশ একখানা বাদশাই হাই তুলে বললে,—'তাহোলে তো বন্ধু, তোমার সময় ফুরিয়ে এসেছে।'

এই না বলেই নেকড়ে লাফিয়ে পড়লো হেকোর ঘাড়ে। তার পর তাকে গিলে ফেললে টুপ করে।

আর এই ভাবেই প্রাণ হারালো হাড়-আলসে হেকো, তার নিজের বোকামির জন্যে।

জর্জিয়ার রূপকথা

জ্যান্তো মা কালি

হেমেন্দ্রকুমার রায়

(সত্য কাহিনী)

মনে হচ্ছে গত শতাব্দীর শেষের দিকের কথা। সীমান্তের বাসিন্দাদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ চলছে। আমি তখন বালক। পিতা-মাতার সঙ্গে বাস করি রাওলপিণ্ডি সহরে।

আমাদের বাসার সঙ্গে সংলগ্ন ছিল পাঠানদের একটি পল্লী। ছাদে উঠলেই তাদের অন্দর-মহলে পর্য্যন্ত নজর চলত। সেখানে লেগে থাকত নিত্য-নূতন হাঙ্গামা। ঝগড়া-মারামারির তো কথাই নেই, খুনোখুনিও হ'ত যখন-তখন।

বাবা বলতেন, "হাতে কাজ না থাকলে বাঙালীরা করে খুড়োর গঙ্গাযাত্রা, আর পাঠানরা করে মানুষ খুন।"

এটা অত্যুক্তি কি না জানি না, কিন্তু ও-অঞ্চলের মানুষদের প্রকৃতি ছিল সত্য সত্যই অত্যন্ত অশান্ত। এক দিন বাবার সঙ্গে ওখানকার প্রধান বাজারে গিয়েছি। কোথাও কিছু নেই, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত জাগল বিষম গণ্ডগোল। চারি দিকে চ্যাচামেচি, ছুটোছুটি এবং বন্ধ হয়ে যেতে লাগল দোকানের পর দোকান। ব্যাপার কি? না এক দল পাঠান বা আফ্রিদী আচমকা বাজারে এসে লুঠ-পাট শুরু করেছে। তারা নিরস্ত্র ছিল ব'লে কেউ তাদের সন্দেহ করেনি। কিন্তু হঠাৎ তারা আখের দোকানের উপর হানা দিয়ে মোটা মোটা ইক্ষুদণ্ড হস্তগত করে। তার পর সেই মিষ্ট ইক্ষুদণ্ডগুলোই পরিণত হয় মারাত্মক অস্ত্রে। ইক্ষুর দ্বারা কেল্লা ফতে, অবাক্ কারখানা।

কিন্তু রাওলপিণ্ডিতে কেবল মুসলমান নয়, বাস করত অনেক হিন্দুও। তাদেরও দেহ ছিল বেশ লম্বা-চওড়া ও বলিষ্ঠ। জলবায়ুর গুণে একই ভারতের এক এক দেশের লোকের চেহারা ও প্রকৃতি হয়েছে এক এক রকম। ওখানকার হিন্দুদেরও প্রকৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদের তুলনায় ছিল বেশ খানিকটা উগ্র।

কিন্তু সংস্কারের দিক্ দিয়ে ভারতের সব হিন্দুরই স্বভাব বোধ হয় এক রকম।

বোধ করি ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর আগে এক দিন শুনলুম, কলকাতার কাঁসারিপাড়ার একখানি দেবী-প্রতিমা হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে! দিকে দিকে মহা হৈ-চৈ প'ড়ে যায়, দলে দলে লোক সাগ্রহে যাত্রা করে প্রতিমা দর্শন করবার জন্যে এবং ফিরে এসে সাক্ষ্য দেয় সত্য সত্যই মাটির প্রতিমার মধ্যে হয়েছে জীবন-সঞ্চার! লোকের ভীড় আরো বেড়ে ওঠে, প্রতিমার সামনে পড়ে রাশি রাশি সিকি, আধুলী, টাকা! দিন কয়েক পরে কিন্তু জীবন্ত প্রতিমার আর দেখা পাওয়া গেল না।

রাওলপিণ্ডিতেও আমি দেখেছিলুম জীবন্ত প্রতিমা নয়, জীবন্ত মা কালিকে। সেই কাঠগোঁয়ার পাঠানদের মুলুকে জীবন্ত দেবীর আবির্ভাব!

গুজব উঠল, জ্যান্তো কালি আজ সহরে আসবেন! তখন বয়স ছিল অল্প, গুজবটা শুনে বিস্মিত হলুম বটে, কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারলুম না।

মা-বাবার গুরুদেব পণ্ডিত বিদ্যাধরজী তখন আমাদের বাসাতেই থাকেন। তিনি জাতিতে ছিলেন রাঠোর, কিন্তু বাংলা জানতেন। আমরা ভাই-বোনরা তাঁকে 'দাদামশাই' ব'লে ডাকতুম।

আমি আবদার ধ'রে বললুম, "দাদামশাই, জ্যান্তো কালি দেখব।"

তিনি সায় দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, বেটা।"

যে রাস্তা দিয়ে জ্যান্তো কালির আসবার কথা, পণ্ডিতজীর সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির হলুম যথাসময়ে।

রাজপথে বিপুল জনতা। প্রত্যেক লোকেরই মুখে-চোখে প্রদীপ্ত কৌতূহল! ভীড় ঠেলে এগুতে এগুতে দম যেন বেরিয়ে যাবার মত হ'ল।

ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পরেই জনতার ভিতরে উঠল জয়-জয় রব! জ্যান্তো কালি আসছেন!

একখানা উচ্চাসন বহন ক'রে চলেছে কয়েক জন বলবান লোক এবং উচ্চাসনের উপরে ব'সে আছে একটি দশ-এগারো বছরের মেয়ে।

মেয়েটির গায়ের রং কালির মতই কালো বটে, কিন্তু কালির মত সে জিভ বার ক'রে নেই ব'লে মনে মনে কিছু হতাশ হলুম। দিকে দিকে প'ড়ে গেল ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করবার ধূম। পণ্ডিতজীর দিকে তাকালুম, তাঁর মুখে মৃদু মৃদু হাসি। তিনি প্রণাম করলেন না দেখে আমিও করলুম না।

তার পর কয়েক দিন ধ'রে গোটা সহরটা জ্যান্তো কালিকে নিয়ে যেন ক্ষেপে উঠল দস্তুরমত! জ্যান্তো কালি ছাড়া আর কারুর কথাই শোনা যায় না। জ্যান্তো কালির আস্তানায় গিয়ে ধর্ণা দেয় বড় বড় ঘরের পুরুষ আর নারী। টাকা-পয়সা পড়ে ঝমাঝম্!

পণ্ডিতজী বললেন, "চল বেটা, আর একবার কালিকে দেখে আসি।"

মা-ও যেতে চাইলেন।

পণ্ডিতজী বললেন, "না।"

বাবা বললেন, "রাবিস।"

আমারও মনের ভিতরে কালি-ভক্তির মাত্রা পেলুম না। পণ্ডিতজীর সঙ্গে চললুম যেন মজার তামাসা দেখতে।

মজাই দেখলুম বটে। মস্ত একখানা দোতলা বাড়ী, উপরে-নীচে গিজ্‌-গিজ্‌ করছে লোক। দোতলায় একটা লম্বা-চওড়া দালান পার হয়ে প্রকাণ্ড একখানা ঘর। ভিতরে ব'সে আছে লোকের পর লোক। কেউ মেঝের উপরে দণ্ডবৎ লম্বমান, কেউ করছে উচ্চকণ্ঠে স্তোত্রপাঠ, এক জায়গায় জ্বলছে হোমাগ্নি।

বেদীর উপরে দাঁড়িয়ে আছে জ্যান্তো কালির মূর্ত্তি। ভাবহীন মুখ। কালি-প্রতিমার ভঙ্গিতে এক হাত উপর দিকে এবং এক হাত নীচের দিকে। আজও জিভ বার করা নেই দেখে ক্ষুণ্ণ হলুম মনে মনে।

জ্যান্তো কালির বাঁয়ে ও ডাইনে মাটির উপরে বিষণ্ণ মুখে বসে আছে দু'জন পুরুষ। দেখলেই বোধ হয় যেন তারা কোন যন্ত্রণাভোগ করছে।

শুধালুম, "ওরা কারা ?"

পণ্ডিতজী বললেন, "ওরা নিজেদের জিভ কেটে দেবীকে উপহার দিয়েছে।"

—"কেন দাদামশাই ?"

—"দেবীকে খুশী করবার জন্যে।"

—"কিন্তু দেবী কি খুশী হবেন ?"

—"দেবীই জানেন। কিন্তু ওরা জানে, দেবীর বরে ওরা আবার নতুন জিভ পাবে।"

* * * *

জ্যান্তো মা কালির দৌলতে বাজার গরম হয়ে রইল আরো দিন পনেরো।

তার পর জীবন্ত দেবী অদৃশ্য হলেন আচম্বিতে।

তিনি কোথা থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং অন্তর্হিতই বা হলেন কোথায়, কেউ সে খবর জানেন না। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদেরও টিকি দেখতে পাওয়া গেল না। তবে এইটুকু খবর পাওয়া গেল যে, সহরের বাসিন্দাদের কাছ থেকে তারা আদায় করতে পেরেছিল বেশ কয়েক হাজার টাকা।

আরো জানা গেল, নিজেদের জিহ্বা বলি দিয়ে যে লোক দু'টি অতি-ভক্তির চূড়ান্ত নমুনা দেখিয়েছিল, তাদের আর নতুন জিভ গজিয়ে ওঠেনি। সবাই দেখলে মজা, কিন্তু মজল কেবল তারাই।

এত কাল পরেও সেই দুই নির্বোধ বেচারার কাতর মুখ আমি ভুলতে পারিনি।

তিনটি মজার ঘটনা

শ্রীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

এইমাত্র স্কুল ছুটি হয়েছে। একদল ছেলে ছুটে চলেছে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট বেয়ে হৈ-হৈ করতে করতে। খানিকটা এগুতে রাস্তার পাশে একটা ছোট ভীড় দেখে কৌতুহলী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ছেলের দল। এবং ওর মধ্যেরই একটি কমবয়সী ছেলে একে ঠেলে—তাকে মাড়িয়ে—ওর ঠ্যাংএর তলা দিয়ে একেবারে সুমুখে—ঘটনার কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হোল। ব্যাপার কিছুই না—এক পাদ্রী সাহেব তাঁর গলার রগ ফুলিয়ে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করছিলেন। তখনকার দিনে যেমন করা হোত রাস্তার মোড়ে-মোড়ে। পাদ্রী তখন বলছিলেন : এই যে তোমাদের ভগবান, কালী বল—কৃষ্ণ বল—ইহাদের যদি আমি গালি দিই ইহারা আমার কী করিতে পারে ? এই বলে তিনি একটা অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে উঠলেন এবং তার পর কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বললেন : দেখিলে তো আমার কিছুই হইল না। যে স্কুলের ছেলেটি ঠেলে-ঠুলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, পাদ্রীর কথা শুনে তার পা' থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলতে লাগল রাগে আর উত্তেজনায়। দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে সেও বলল : আমি যদি তোমাদের ঠাকুরকে গালি দিই—তোমাদের ঠাকুর গাধা, তোমাদের ঠাকুর পাঁঠা—তবে সেই বা আমার কী করতে পারে ? হকচকিয়ে গেলেন পাদ্রী সাহেব। উপস্থিত সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ঐটুকু বয়সেই যুক্তি দ্বারা নিজের ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের ভেতর। বড় হয়ে যুক্তি-তর্ক দ্বারা বিশ্বের দরবারে তাঁর হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার অমর কাহিনী ত তোমরা সবাই জানো।

* * * *

ছেলেমানুষি ঘোচবার মত বয়স হয়েছে। ছেলেমানুষিটুকু যায়নি তবুও। ঠিক করল ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে হবে। ঠাকুরকে যে বড় বলে, মাটি আর টাকা তাঁর কাছে সমান—টাকা পয়সার প্রতি তাঁর কোনও আসক্তি নেই। দেখা যাক্‌ পরীক্ষা করে তা কেমন সত্যি। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ঠাকুরের জন্য বিছানা পাতা রয়েছে। ধবধবে সাদা বকের পালকের মত বিছানা। ছেলেটি এসে সবার অলক্ষ্যে তার মধ্যে একটি টাকা গুঁজে রেখে দে ছুট। খানিক বাদে খেয়ে-দেয়ে এসে সেই বিছানায় বসেই তো ঠাকুর চেঁচাতে সুরু করলেন : জ্বলে গেল, জ্বলে গেল। যেন তিনি আগুনের উপর বসেছেন। আশে-পাশে যে সমস্ত ভক্তের দল ছিল তারা সব দৌড়ে এলো : কী হয়েছে, কী হয়েছে। বিছানার ওপর যখন কিছুই দেখা গেল না তখন সবাই মিলে বিছানা তুলে চাদর-তোষক ঝাড়তে সুরু করল, কিসে জ্বলে যাচ্ছে। এবং ঝাড়তে ঝাড়তে বেরিয়ে পড়ল সেই টাকাটি। টাকাটি তুলে আবার বিছানা করা হোল। ঠাকুর নির্ব্বিবাদে উঠে শুলেন তার ওপর।

খানিক বাদে সেই ছেলেটি গুটি-গুটি এসে এদিক্‌-ওদিক্‌ তাকিয়ে একেবারে পা চেপে ধরল ঠাকুরের : ঠাকুর আমিই রেখেছিলাম টাকাটা তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য। কেঁদে ফেললেন বিবেকানন্দ। পরমহংসদেব বললেন না কিছুই। মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন শুধু চোখ বুজে।

* * * *

সবে সন্ন্যাসী হয়েছেন একটি যুবক, গৈরিক বসনে সজ্জিত, চলেছেন কাশীর একটা বনের পাশ দিয়ে। কাশী তখনও এখনকার মত সহর হয়নি। প্রায় জায়গায়ই ছিল বন-জঙ্গল। খানিকটা যেতে এক দল বানর তাঁর ঐ বিচিত্র বেশ-ভূষা দেখে তেড়ে এলো ধ্যাক্‌-ধ্যাক্‌ করে। ভয়ে সন্ন্যাসী দৌড় দিলেন উল্টোমুখো হয়ে। এখন হয়েছে কী, বনের ভেতর থেকে যুবক সন্ন্যাসীর এই দুর্গতি লক্ষ্য করছিলেন আর এক জন প্রবীণ সাধু। তিনি সন্ন্যাসীকে ডেকে বললেন : পালাচ্ছিস্‌ কেন রে ? রুখে দাঁড়া। যুবক রুখে দাঁড়ালেন। ল্যাজ গুটিয়ে চলে গেল বানরের দল যে যার গাছে-গাছে।

পরবর্ত্তী জীবনে যত অন্যায় আর পাপ তাঁর সুমুখে তেড়ে এসেছে ঐ বানরের দলের মত সব জায়গায়ই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বিবেকানন্দ। এ ত তোমাদের অজানা নয়।

গোলকধাঁধা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীসুজিতকুমার মহলানবিশ

পরের দিন সকালে জলযোগের পর গোলু যখন তার ঘরে ছোট্ট একটা পকেট-খাতায় কি সব লিখছে, সেই সময় বরেন আর কানাই উপস্থিত হোল। তাদের দেখে গোলু বল্ল, "আয় আয়, তোদের অপেক্ষাতেই ছিলাম।" বরেন আর কানাই দু'জনেই আরাম করে গোলুর খাটে বসল। বরেন গোলুকে বল্ল, "দেখ, সমস্ত ব্যাপারটাই যেন আজগুবি বলে ঠেকছে; তুই একটু ভাল ভাবে আমায় সব বুঝিয়ে বল ত।" কানাই অমনি বলে উঠল, "বরেনের মাথায় না ঢুকিয়ে দিলে সহজে কি বোঝে?" বরেন রেগে বল্ল, "তুই থাম ত; তোর বুদ্ধির জোরে অঙ্কে ত কেবল গোল্লা পাস।" গোলু তাড়াতাড়ি বল্ল, "অঙ্কের বিদ্যা দু'জনেরই জানা আছে, এখন মন দিয়ে আমার কথা শোন্।" তক্তাপোষের উপর ভাল করে বসে, গোলু সুরু করল, "কাল যখন আমরা হরদেওর দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম, হরদেও অনেকগুলো কেরাসিনের বোতল নিয়ে একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছে। লোকটাকে আমি আগে দু'-এক বার বাবার আপিসে দেখেছি। হরদেওর দোকানের ভিতর যেটুকু দেখা যাচ্ছিল, সেখানেও প্রচুর কেরাসিনের বোতল দেখলাম। এখন কথা হচ্ছে এই যে, এত বোতল নিয়ে ও করে কি?" বরেন বল্ল, "এ ত সোজা কথা, ও কেরাসিন তেল বিক্রী করে।" গোলু বল্ল, "তা কথা সম্ভব বটে, তবে সাধারণতঃ যারা তেল বিক্রী করে, তারা অত বোতল না রেখে বড় বড় টিনে কেরাসিন তেল রাখে, এবং যারা খুচরা তেল কেনে, তারা নিজেদের বোতল আনে। কিন্তু কাল তোরাও দেখেছিস যে ক্রেতা বলতে একটি লোক ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না। যাই হোক, ধরেই নিলাম যে ও কেরাসিন তেল বিক্রী করে। কিন্তু কাল তোরা বোধ হয় লক্ষ্য করেছিলি যে, আমি একটা কাচের টুকরা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম" গোলু উঠে পাশের টেবিল থেকে ভাঙ্গা কাচের টুকরাটা এনে কানাই ও বরেনকে দেখাল। সেটা একটা কাল রংয়ের বোতলের তলার অংশ। বরেন ও কানাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, "আরে, এ যে কেরাসিনের ভাঙ্গা বোতল।" গোলু তখন বল্ল, "কেরাসিনের ভাঙ্গা বোতল এই পোড়ো বাড়ীর জমিতে পড়ে থাকা বিচিত্র নয়, তবে আমার মনে হয় যে এর সঙ্গে অন্যান্য অনেক ব্যাপারের যোগ থাকতে পারে। যাই হোক, যত দিন না আমরা বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে পারি, তত দিন কিছুই বোঝা যাবে না।" কানাই জিজ্ঞেস করল, "কবে তাহলে ওই বাড়ীর ভিতরে ঢোকা যায়?" বরেন আস্ফালন করে বলল "আজই চল।" গোলু বলল, "আপাততঃ চল একবার হাটের দিকে। তোদের সঙ্গে পয়সা-টয়সা কিছু আছে?" কানাই তাড়াতাড়ি বলল, "খরচের কথা উঠলেই কিন্তু বরেনের সাহস উড়ে যাবে।" "যা যা, ফাজলামী করিস না" বলে বরেন পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছ'টা পয়সা বার করল। বরেনের দেখাদেখি কানাইও পকেট থেকে দু' আনা বার করল। গোলু তাই দেখে বলল, "ওতেই হবে, কারণ আমার কাছেও কিছু আছে।" তিন জনেই তক্তাপোষ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গোলু একবার শিষ দিতেই তক্তাপোষের নীচে থেকে কালু লাফিয়ে বেরিয়ে এল। কানাই ত চমকেই গিয়েছিল। কালু কানাই ও বরেনের গা ও জুতো ভাল করে শুঁকে ল্যাজ নেড়ে আনন্দ জ্ঞাপন করল। কানাই বলল, "তোর এই কুকুরটাকে দেখলে ভয় লাগে,—দিন দিন যেন আরও বড় হচ্ছে।" গোলু বলল, "কালুটা আশ্চর্য্য লোক চেনে। লোক যদি ভাল হয়, তাহলে সে বুড়োই হোক আর ছোঁড়াই হোক গায়ে আঁচড়টি দেয় না, অথচ দরকার হলে ঘেউ-ঘেউ করে, ভয় দেখাতে ছাড়ে না।" বরেন জিজ্ঞেস করল, "ও কখনও কাউকে কামড়েছে?" "তা, কামড়েছে বই কি"—বলে হেসে গোলু সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ও তার পিছন পিছন বরেন ও কানাই নেমে গেল। তারা তিন জন বাইরে এসে হাটের পথ ধরল। কিছু দূর যাবার পরই পথে অনেক চেনা লোকের সঙ্গে তাদের দেখা হোল। হাটে পৌঁছে তারা দেখল যে তখনও লোকের ভীড় মোটেই হয়নি। তিন জনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ গোলু দূরে হরদেওকে দেখতে পেল। হরদেও গোলুকে দেখতে পায়নি। সে কিছু কিনতে এসেছে কি না বোঝা গেল না, তবে তার সঙ্গে একটি লোক ছিল। গোলু হঠাৎ বরেন আর কানাইকে বলল, "তোরা এখানে একটু দাঁড়া, আমি একবার চট করে ঘুরে আসি।" কানাই আর বরেন ততক্ষণ কাল জাম কিনতে ব্যস্ত! তারা গোলুর স্বভাব জানত, কাজেই বলল, "যা, গোয়েন্দাগিরি করে আয়, আমরা এখানে আছি।" গোলু লোকের আড়াল দিয়ে এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল, যেখান থেকে হরদেওর সঙ্গীটিকে ভাল করে দেখা যায়। হরদেও গোলুর দিকে পিছন ফিরে ছিল, কাজেই সে গোলুকে দেখতে পায়নি। গোলু ভাল করে হরদেওর সঙ্গীটিকে দেখল। লোকটি লম্বা ও বলিষ্ঠ; গায়ে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী, পরনে দামী ধুতি এবং পায়ে দামী এলবার্ট জুতো। যদিও তার কাপড় খুব পরিষ্কার ছিল না, কিন্তু তবুও বোঝা যাচ্ছিল যে লোকটি খুব সৌখীন। লোকটি যে বাঙ্গালী নয়, তাও গোলু বুঝতে পারল তার কথাবার্ত্তা শুনে। তার আঙুলে একটা মস্ত হীরে বসান আঙটি ছিল। যাই হোক, গোলু বুঝল যে লোকটি শুধু সৌখীন নয়, সম্ভবতঃ পয়সাওয়ালা লোক। গোলু লোকটিকে ভাল করে দেখে চিনে রাখল। হরদেও ইতিমধ্যে অন্য দিকে চলে যাওয়াতে গোলুও তার বন্ধুদের কাছে ফিরে গেল। কানাই আর বরেন ততক্ষণে কাল জাম খেয়ে মুখ কাল করে ফেলেছে। গোলুকে দেখে বরেন জিজ্ঞেস করল, "এই যে গোয়েন্দা মশায়, নতুন কিছু রহস্যের সন্ধান পেলেন?" গোলু মনের মত কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় পিছন থেকে, "এই যো, গোলু বাবু"—বলে বিরাট হুঙ্কার শুনে গোলু পিছন ফিরে দেখে গয়ারাম সেখানে এসেছে। টিলাডিতে পুলিশ বলতে কিছুই ছিল না। তবে দরকারী কাজ সব স্থানীয় চৌকিদাররাই করত। গয়ারামকে দেখে গোলু খুসী হয়ে বলল, "দেখ গয়ারাম, এখানে আমরা লাঠি কিনতে এসেছি; তিনটে ভাল বাঁশের লাঠি দরকার।" গয়ারাম দাঁত বার করে বলল, "ভাল লাঠি এখানে মিলবে কি কোরে গোলু বাবু; দরকার হোয় ত আমি তৈয়ার করে দিতে পারি, তবে মজুরী মিলনা চাই ত।" গোলু বলল, "তুমি তিনটে ভাল পাকা বাঁশের লাঠি আমাদের তৈরী করে দাও, তোমার মজুরী যা লাগে আমরা দেব।" গয়ারাম খুশী হয়ে বলল, "হাঁ, জরুর বানিয়ে দিব।"

[illegible] পরলক্ষর [illegible] এখন শক্ত দড়ি যোগাড় করে রাখা দরকার [illegible] আর বরেনকে দড়ির সন্ধান করতে বলল। দড়ির দরকার শুনে কানাই বলল, "আমার বাড়ীতে খানিকটা খুব শক্ত আর মোটা দড়ি পড়ে আছে— যেটা আপাততঃ কোন কাজে লাগছে না। কারণ তুল করে জল তোলবার জন্ম দু'বার দড়ি কেনা হয়েছিল।" বরেন বলল, "তাহলে ত ভালই হোল, দড়ি যখন যোগাড় হয়েছে—" বরেনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কানাই বলল, "তোকে ফাঁসি দিলেই হয়, গাছের ত অভাব নেই।" কানাই এই ভাবে বরেনকে চটাতে ভালবাসত। গোলু হো-হো করে হেসে ফেলাতে বরেন ভয়নক চটে গেল। শেষে গোলু অনেক কষ্টে তাকে ঠাণ্ডা করল। বরেনের একটা গুণ ছিল যে সে বেশীক্ষণ রেগে থাকতে পারত না।

হাট থেকে তিন বন্ধুতে যখন গোলুর বাড়ীতে ফিরল, তখন বেলা হয়ে গেছে। কানাই ও বরেনকে ঘরে বসিয়ে গোলু নীচে থেকে তিন গ্লাস ঠাণ্ডা জল ও তিনটে মোয়া নিয়ে এল। তিন বন্ধুতে খেতে খেতে গল্প সুরু হোল। গোলু বলল, "যত দিন যাচ্ছে তত কিন্তু আমার এই ব্যাপারটি জটিল ঠেকছে। যাই হোক, আজ বিকেলে আমরা একবার ডিসপেনসারীতে যাব একটা ওষুধ কিনতে।" বরেন আর কানাই অবাক্ হয়ে গোলুর কথা শুনছিল। গোলু যে পড়ার বই ছাড়া অন্য দরকারী বই পড়ত না, তা নয়। সে হাতের কাছে গল্পের বই ছাড়াও যা ভাল বই পেত, পড়ত। এর মধ্যে সে গোকুল বাবুর কাছ থেকে একটা 'প্রাথমিক চিকিৎসা'র বই পড়ে ফেলেছিল। সে হঠাৎ বরেনকে জিজ্ঞেস করল "আচ্ছা, ওই পোড়ো-বাড়ীতে গিয়ে যদি কাউকে সাপে কামড়ায়, তাহলে তুই কি করবি?" বরেন মাথা চুলকে বলল, "কেন, সাপটাকে মেরে ফেলব।" কানাই হো-হো করে হেসে বলল, "সাপটাকে ত মারবি আর ততক্ষণে যাকে কামড়েছে তার ত দফা নিকেশ হবে!" বরেন অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "ও, হ্যাঁ, একটা ওঝা ডাকতে হবে।" গোলু হাসি চেপে বলল, "এ-সব ওঝা-টোঝার কর্ম্ম নয়। মন দিয়ে শোন, কি করা দরকার। সাপ যেখানে কামড়ায় তার একটু উপরে শক্ত করে কয়েকটা বাঁধন দিতে হয়। এই বাঁধন দেওয়ার উদ্দেশ্য হোল, যাতে বিষ রক্তের সঙ্গে না ছড়াতে পারে। তার পর একটা ছুরি দিয়ে ক্ষতের উপরে, পাশে ও নীচে বেশ করে চিরে দিয়ে 'পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটে'র দানাগুলি ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হয়।" কানাই জিজ্ঞেস করল, "যে কোন সাপে কামড়ালেই কি তাই করতে হয়, না সাপ-বিশেষে ভিন্ন ব্যবস্থা আছে?" গোলু খুসী হয়ে বলল, "সাপে কামড়ানোর জন্য যে ইনজেক্শন আছে সেগুলো অবশ্য বিশেষ সাপে অনুযায়ী ব্যবহার হয়।" কানাই বলল, "তার মানে, কি জাতীয় সাপে কামড়েছে, জানা দরকার।" গোলু বলল, "হ্যাঁ, কতকটা তাই, কারণ বিষাক্ত সাপকে সাধারণতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। একটি শ্রেণীকে "কলুব্রাইন" অথবা ফণা-ধরা সাপ বলা হয় এবং অন্যটিকে "ভাইপার" অথবা বোড়া জাতীয় সাপ বলা হয়, যারা ফণা ধরে না। তবে যে শ্রেণীর সাপেই কামড়াক, বাঁধন এবং পারম্যাঙ্গানেট দেওয়া নিশ্চয় দরকার।"

কথায় কথায় বেলা হয়ে গেছে দেখে কানাই ও বরেন বাড়ী ফেরবার জন্য উঠে দাঁড়াল। "তোদের একটা জিনিষ দেখাই" বলে গোলু টেবিলের কোণা থেকে সাইকেলের ল্যাম্পটা এনে তাদের দেখাল। কানাই বলল, "খুব ভালই হোল, কারণ অনেকক্ষণ আলো জ্বালিয়ে রাখতে হলে টর্চ্চে সুবিধা হয় না।" গোলু বলল, "সবটা কাল রং দিয়েছি, কারণ অন্ধকারে জ্বালালে, শুধু আলোটুকু ছাড়া বাকী অংশ দেখা যাবে না।"

যাই হোক, কানাই ও বরেন বিদায় নিলে, গোলু স্নান করতে গেল। [ক্রমশঃ।

নদী-পারে

শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী

ঐ যে দূরে দেখছো নদী—তাহার ওপারে
যাও যদি তো দেখতে পাবে তোমার দু'ধারে
সোনার রোদে হাসছে যেন খামার-ভরা ধান,—
দুলছে যেন তন্দ্রা-ভরে,—গাইছে রোদের গান!

তাদের মিঠে গন্ধে সেথা ভুবনটি ভরপুর,
শুনতে পাবে সকাল-সাঁঝে শালিক-ফিঙের সুর:
আকাশ জুড়ে অনেক দূরে উড়ছে সেথা চিল,
চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে একটি-দু'টি বিল।

ঐখানেতে ছায়ায় ঢাকা একটি ছোট গ্রাম,—
গরীব চাষার বস্তি ও যে—'সাতপুরিয়া' নাম;
মাটী-মায়ের দুলাল—ওরা চাষার ছেলের দল,—
জানে না কোনো কপটতা, শেখেনি কোনো ছল……

তোমার মনের গোপন কোণে যে ব্যথাটি আছে
জুড়িয়ে যাবে—যাও যদি, ভাই, ওই ওদেরই কাছে।

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

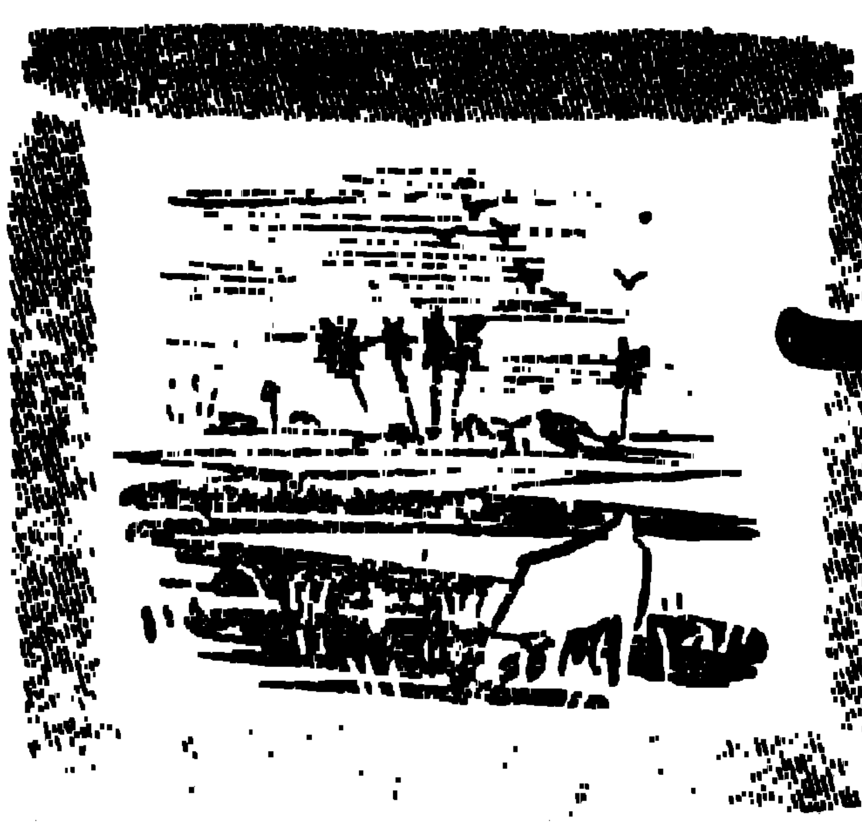

দেশের কথা

'পল্লীবাসী'র কথা হইলেও শহরবাসীর কাছেও হয়ত যুক্তিযুক্ত মনে হইবে।—"প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় না দিয়াও এ কথা এখন স্পষ্ট করিয়াই বলিতে হইবে যে, বাঙালীর জীবিকা সংস্থানে বাংলা সরকারের সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব রহিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী বিহার, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশে তাহারা বাঙালী দেখিলেই খেদাইতে সুরু করিবে, আর আমরা ভোজপুরী পুলিসের তাঁবে বসিয়া উড়িয়ার তৈয়ারী ফুলুরী-বেগুনী খাইয়া ঝিমাইতে থাকিব—এই অসামঞ্জস্যের প্রতিকার করিতে হইবে। দোকানে দোকানে যে গণেশ বসানো থাকে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য এ দেশের দোকানদারেরা এক এক উড়িয়া ঠাকুরকে মাসিক ।॰ হইতে ১৲ পর্য্যন্ত বোকাদণ্ড দিয়া থাকেন। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি দৈব-পৈত্র্য কার্য্যে নিমন্ত্রিতগণের তৃপ্তিসাধনের সমগ্র ভারই এই ঔড্রপুঙ্গবদিগের উপর ন্যস্ত থাকিবেই। মেস, হোটেলের তো কথাই নাই, বহু গৃহস্থ-পরিবারেরও দগ্ধ উদর পরিপূরণের দ্রব্য নির্ম্মাণ, কারখানার যাবতীয় দায়িত্বভার কটক, বালেশ্বর, গঞ্জাম হইতে আমদানীকৃত এই সকল অপূর্ব্ব কারিগরগণের হস্তেই সম্পূর্ণ ন্যস্ত করিয়া আভিজাত্যের ভাণ করিবার একটা মৃত্যুমুখী ফ্যাসান্ এখনও দেশ হইতে আদৌ লোপ পায় নাই। এক ভার গঙ্গাজল ।৶॰, কলের জল ।॰ আনা, এক মণ কয়লা ।৶॰ আনা—পান-দোক্তার খরচ বাদে এ সমস্তই উৎকল-সৌন্দর্য্যে তৈলহরিদ্রা লেপনার্থ মাসান্তে মণিঅর্ডারযোগে প্রেরিত হইয়া থাকে। উড়িষ্যাবন্ধু বিশ্বনাথ দাস প্রভৃতি তাই না আজ নিশ্চিন্ত চিত্তে বাঙ্গালী যাহাতে প্রাদেশিকতা-দোষদুষ্ট হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য সাবধান করিয়া দিতেছেন। বিহারবাসীরাও ঠিক এই ভাবেই নানা পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বাংলার অর্থ প্রতি মাসে বিহারে মণিঅর্ডার করিতেছে। অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, বহু অফিসের কেরাণী-বাবুকে দারোয়ানের কাছেই হাত পাতিতে হয়। সুদ গ্রহণ ব্যাপারে উহারা কাবুলীওয়ালার মাসতুতো ভাই বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালীকে ঠেঙ্গাইয়া টিট্ রাখিবার জন্য ইংরাজ বিহারী পুলিশ বাহাল করিয়াছিল। সেই প্রথা কিন্তু এখনও চলিতেছে। হঠাৎ সব বদ্লানো যায় না, সত্য, কিন্তু এদিকে অতঃপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কথাটা তুলিলাম এই জন্য যে, সম্প্রতি যে ৩॰ নং ও ৩১ নং বাঙ্গালী পল্টন লওয়া হইয়াছে, তাহা নামে বাঙ্গালী হইলেও উহাতে শতকরা ৬॰ জন গুর্খা লওয়া হইয়াছে।"

*   *   *   *

তাহার পর 'পল্লীবাসী' মন্তব্য করিতেছেন :—"মোট কথা, যে সব ক্ষেত্রে ইংরাজ বাঙ্গালীকে বঞ্চিত রাখিয়াছিল, সেই সব ক্ষেত্রেই সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালীকে বসাইতে হইবে। বাড়তি লোক দরকার হয় তখন অন্য প্রদেশের লোক লওয়া চলিতে পারে। ড্রাইভারীতে শিখ, কেরাণীগিরিতে মান্দ্রাজী, এই ভাবে নানা দিক্ দিয়া বাঙ্গালীর জীবিকা বন্ধ হইয়া আছে। ব্যবসাক্ষেত্রে মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পাঞ্জাবী, বোম্বেওয়ালা। এই সবই বদ্লাইয়া বাঙ্গালীর স্থান সর্ব্বাগ্রে করিয়া দিতে হইবে। বাঙ্গালীরা এ-সব দিকে আন্দোলন না করিয়া শুধু সস্তায় 'শ্লোগান' দিয়া বেড়াইতেছে। জীবিকার পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে কোন আগ্রহ দেখি না। আত্মঘাতী আর কাহাকে বলে?" উপরিউক্ত ধরণের কথা আমরাও বহুবার বলিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও বলিব। কিন্তু যাহাদের জন্য এত মাথা-ব্যথা, এ-বিষয়ে তাহারা সেই বাঙ্গালী যুবকের দল কি করিতেছে? স্বাধীনতা লাভের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহাদের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া আর কোন প্রকার প্রাণ-চাঞ্চল্য চোখে পড়ে নাই বলিলেই চলে। এ কথা সত্য যে, এক দল যুবক আছেন, যাঁহারা দেশের জন্য, জাতির জন্য, সর্ব্বপ্রকার কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত। "কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা কত? দেশের নিয়মভঙ্গকারী এবং বাজে-কাজে-উৎসাহী যুবকদের দমন করিয়া তাহাদের শক্তিকে মঙ্গল-পথে প্রবাহিত করিবার জন্য তাঁহারা সংঘবদ্ধ ভাবে আজ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন বা করিতেছেন? বাঙ্গলাকে সত্য সত্যই বাঙ্গালীর করিবার জন্য তাঁহারা কতটুকু চেষ্টা করিতেছেন?

*   *   *   *

যুক্তিযুক্ত কথা :—"বঙ্গভঙ্গের পরে ইংরাজ জোর করিয়া বাংলার যে কয়টি জেলাকে বিহারের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন, আজ বাঙ্গালী তাহা ফিরাইয়া লইতে চায়। বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা কমাইয়া ভবিষ্যতের সর্ব্বনাশের বীজ বপন দেখিয়া অনেকে তখনই শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ভাঙা বাংলা জোড়া লাগার আনন্দে তখন সকলে ব্যাপারটা তত তলাইয়া দেখেন নাই। ইংরাজের ঐ চক্রান্তের ফলেই যে বাংলা দেশে লীগের "ক্রট মেজরিটি" ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা করিতে পারিয়াছে, আজ তাহার জন্য হা-হুতাশ করিয়া লাভ নাই। কিন্তু, ভুল সংশোধন করিতেই হইবে। র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার ফলে পশ্চিম-বাংলার প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহার প্রতীকার করিতে হইলে, বিহারভুক্ত বাংলার ঐ সকল স্থান এখনই ফিরাইয়া দিতে হইবে। সুখের বিষয়, বাঙ্গালী এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন। গণপরিষদের বাঙ্গালী সভ্যগণ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি ও বঙ্গীয় পরিষদের সদস্যগণ সকলেই আজ একসুরে এই দাবী উঠাইয়াছেন। এই দাবী আজ সর্ব্বত্র প্রবল করিয়া তুলিতে পারিলে তাহাকে দাবাইয়া দেওয়া নিতান্ত সহজ হইবে না।"—সত্য কথা, কিন্তু বাঙ্গলার এই দাবী প্রবল

হইতে প্র... প্রবলতর হইতে প্রবলতম করিবার জন্য কাজে কতটুকু হইতেছে? পশ্চিম-বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায় এ বিষয় কি করিতেছেন জানিতে ইচ্ছা হয়। কিছু কাল পূর্ব্বে বিহারী মন্ত্রিমণ্ডলীকে একখানি আবেদন-পত্র ডাঃ রায় প্রেরণ করেন। কিন্তু জবাবে 'খোট্টাই চড়' খাইবার পর আর কিছু করা তিনি বোধ হয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই। সময় কম। ধলভূম মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙ্গালী বিতাড়ন এবং খোট্টাকরণ ক্রিয়াকর্ম্ম প্রবল ভাবে চলিতেছে। এই সময় যদি সমগ্র বাঙ্গলা সমবেত ভাবে শেষ চেষ্টা না করে, তাহা হইতে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর নাম ভারত হইতে অতি অল্পকাল মধ্যে বিলুপ্ত হইবে।

*　*　*　*

'মেদিনীপুর-হিতৈষী' বলিতেছেন: "শিষ্য সংগ্রহ···ঠাকুরের জন্মোৎসব মেদিনীপুরে হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য হার্ডিঞ্জ স্কুল ও মিউনিসিপ্যালিটীর বালিকা বিদ্যালয় কয়েক দিন বন্ধ রাখিয়া আগন্তুকদিগের স্থান দেওয়া হইয়াছিল। এখন শুনিতেছি, ঠাকুরের শিষ্য সংগ্রহের জন্য দালাল লাগিয়াছে। আর এক গৌড়ীয় মঠ মেদিনীর বুকে জাঁকিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে। গৌড়ীয় মঠের সেবকদিগের ন্যায় ইঁহাদেরও মোহিনী মন্ত্র আছে তাহা জানিয়া কর্ত্তাগণ সাবধান হউন।" সমস্যাটি প্রায় সমগ্র বাঙ্গলার। বিশেষ কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উৎসবাদির জন্য বিদ্যালয়-ভবনগুলিকে এমন ভাবে কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া 'দান' করা আমরা সমর্থন করি না। নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে ধর্ম্মকার্য্য এবং উৎসব করার স্বাধীনতা সকলেরই আছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা যখন অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে বাধা জন্মায় বা জন্মাইবার চেষ্টা করে, তখন তাহাতে অবশ্যই আপত্তি করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কোন ঠাকুর বা কোন মঠের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে কোন বিদ্বেষ বা হিংসা-ভাব আমাদের নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও ইহা এখন দেখিতে হইবে, কোন ঠাকুর বা কোন মঠ দেশের সত্যকার কোন হিত করিতেছেন, না, কেবল নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গোষ্ঠীবৃদ্ধি মাত্র করিয়া অর্থসাফল্য বৃদ্ধি করিতেছেন? সরকারী ভাবে দেশের এই সকল ব্যাপারের একটা তদন্ত হওয়া প্রয়োজন—বিধি-নিষেধও কার্য্যকরী করিবার সময় বোধ হয় হইয়াছে।

*　*　*　*

'দামোদরে' প্রকাশ:—"গত ২৮শে ভাদ্র সোমবার মানকর রাইপুর-নিবাসী শ্রীকালীকুমার রায়ের বৃদ্ধা মাতা (৮০) পরলোক গমন করেন। স্থানীয় প্রতিবাসিগণ বিনা প্রায়শ্চিত্তে শবদাহ করিতে অস্বীকার করে—অন্যথায় ৫০৲ টাকা দিলে তাঁহারা কোনরূপে যাইতে পারেন। কালীকুমার বাবু গত বৈশাখ মাসে খৃষ্টান হইতে শুদ্ধি হইয়া হিন্দুসম্প্রদায়-ভুক্ত হন। ঐ সময় হিন্দু মিলন-মন্দিরের অনুষ্ঠিত এক যজ্ঞ ও হিন্দু সম্মিলন হয়। ভারত সেবাশ্রমসংঘের প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দজী মহারাজ স্বয়ং শুদ্ধিকার্য্য করেন; ঐ দিনই সভাস্থলে তাঁহার ৩০০০ হাজার লোককে তিনি কন্যাসাহায্যে প্রসাদ বিতরণ করেন। বিপন্ন হইয়া কালীকুমার বাবু হিন্দু মিলন-মন্দিরের শরণাপন্ন হইলে মানকর পল্লী-মঙ্গল সমিতি হিন্দু মিলন-মন্দির অপেরা থিয়েটার পার্টি প্রভৃতির সভ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গিয়া মহা সমারোহে তাঁহার মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন।" সংবাদ সামান্য হইলেও ইহাতে চিন্তার বহু কথা রহিয়াছে। 'সমাজের' অত্যাচার হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কথা বর্ত্তমানে আমরা শহরে বসিয়া হয়ত চিন্তা করিতে পারি না। কিন্তু বাঙ্গলার গ্রামাঞ্চলের অবস্থা এখনও 'মধ্য'-যুগের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। এদিকে দেশকর্ম্মী এবং কংগ্রেসী সরকারের বহু কাজ করিবার রহিয়াছে। সরকার বাহাদুর হয়ত নানা বৃহত্তর সমস্যা সমাধান করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন, কাজেই এ-বিষয়ে জনগণকেই অবহিত হইতে হইবে। গ্রামগুলিকে আলোকিত করিতে না পারিলে শহরগুলি বাঁচিবে কয় দিন?

*　*　*

জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশিত 'স্পষ্ট কথা' পাঠে জানা যায়:—"আমরা অতি দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি যে ডুয়ার্সের পেট্রোল-পাম্পগুলি দুর্নীতির চরম সীমায় উঠিয়াছে। পাম্পে তৈল থাকা সত্ত্বেও কুপন দিয়া তৈল পাওয়া যায় না; অথচ লোক-বিশেষে বিনা কুপনে যথেষ্ট তৈল দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিষয়ে কোন প্রতিবাদ করিলে পাম্পওয়ালারা বলেন, 'আমরা তৈল দিব না—যাহা খুসী করিতে পারেন'। এই সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের করণীয় কিছু আছে কি না তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।" এ বিষয় কলিকাতার অবস্থা কি—তাহা, অবশ্য মোটরবিহারী এবং অধিকারিগণ বলিতে পারেন। কিন্তু আমরা যতটুকু খবর রাখি তাহাতে বলিতে পারি যে প্রাদেশিক সরকারের আস্তানা এই কলিকাতা শহরে বিনা কুপনেও যথেষ্ট পেট্রল লোকে পাইতেছে, অবশ্য মূল্য বেশ কিছু বেশী দিয়া। এই অনাচার কোন কালেও বন্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেবল পেট্রল নহে, লোহা, লক্কড়, সিমেন্ট এবং অন্যান্য বহু সামগ্রী সম্বন্ধে একই মন্তব্য করা যায়! অনিয়ম-অনাচার বন্ধ করিতে যে-সকল কর্ম্মচারী সামান্য চেষ্টা করেন, তাঁহারা গোপন-হস্তের নির্দ্দেশে বিভাগান্তরে বদলী হইয়া যান হঠাৎ—এমন খবরও আমাদের জানা আছে! অতএব জলপাইগুড়িবাসীদের বেশী দুঃখ করিবার এমন কোন কারণ ঘটে নাই, এই কথা চিন্তা করিয়া তাঁহারা মনে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা বোধ করিতে পারেন।

*　*　*　*

'মফস্বল পত্রিকা' মন্তব্য করিতেছেন:—"নদীয়া জেলার দক্ষিণ সদর মহকুমা হাকিম সম্প্রতি নবদ্বীপ থানার স্বরূপগঞ্জ পানশীলা ইউনিয়নের কংগ্রেস সম্পাদক সতীভূষণের উপর নিরাপত্তা আইনের বিধান জারী করিয়াছেন। কংগ্রেস সম্পাদকের উপর এই নিরাপত্তা অর্ডিনান্স প্রয়োগ হওয়ার ফলে, মফস্বলে গঠনকর্ম্মে রত বহু কংগ্রেস কর্ম্মীর মনে যে জননিরাপত্তা আইনের ব্যাপক অপপ্রয়োগের সম্পর্কে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, এ কথা বলিতে আমরা বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন-সচিব শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার পরিষদ-কক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন, পূর্ব্বে এই আইনের অপপ্রয়োগ হয় নাই এবং আশ্বাস দিয়াছেন যে ভবিষ্যতেও হইবে না। কিন্তু প্রথম যখন জন-নিরাপত্তা আইন পরিষদে পেশ করা হয়, তদানীন্তন মন্ত্রিসভা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে এই আইন দল-বিশেষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইবে না, কেবল মাত্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হইবে। আমাদের

সৌভাগ্য যে, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ত মনোভাব অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে, হায়দরাবাদের ঘটনা তাহার প্রমাণ। অবশ্য এ জন্য জননিরাপত্তা আইনের কোন প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুই-একটি চুনো-পুঁটির পুচ্ছ ধরিয়া টানাটানি করা ছাড়া, গভীর জলে সঞ্চরণশীল কয়টি রাঘব বোয়াল সমাজবিরোধী চোরাকারবারীকে জননিরাপত্তা আইনের জালে আটকাইয়াছেন তাহা জনসাধারণকে জানাইবেন কি? পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি জননিরাপত্তা বিলের উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করিতেন, সমাজদ্রোহীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে পশ্চিম-বাংলার লক্ষ লক্ষ জন-সাধারণের দুর্দ্দশা এমন চরমে উঠিত না এবং কম্যুনিষ্টদের পক্ষেও জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশাকে 'মন্ত্রোর ইঙ্গিতে' কাজে লাগাইবার সুযোগ ঘটিত না—পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সাদা কথাটি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?" আশা করি, আমাদের মাননীয় আইন-সচিব উপরিউক্ত মন্তব্যের জবাবে কিছু প্রতিমন্তব্য করিবেন। বর্ত্তমানে আমরাও কোন মন্তব্য করিব না, কারণ, তাহা হয়ত বাঙ্গলার বর্ত্তমান শাসকদের কাছে বিশেষ রুচিকর হইবে না। ব্যক্তিগত ভয়ও আছে।

* * * *

'বীরভূম বার্ত্তা' বলিতেছেন :—"শুনিতে পাই, দেশের লোকের জন্য গভর্ণমেণ্ট কাপড়, লোহা, টিন, সিমেণ্ট এ সবই প্রচুর পরিমাণে দিয়া থাকেন কিন্তু লোকে তাহা দেখিতেও পায় না। কে বা তাহারা লইয়া উধাও হইয়া যায়! প্রশ্ন জাগে—যাঁহারা এই কালোবাজারের কর্ম্মকর্তা তাঁহারা কোন্ দলীয়? যাহারা নগ্ন দেহে অথবা জীর্ণ বসনে কল-কারখানায় অথবা ক্ষেতে গিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আসে তাহারা, না যাঁহারা গাড়ীতে চড়িয়া সরকারী দপ্তরখানার আসন অলঙ্কৃত করেন তাঁহাদেরই সগোত্রীয়? এমন অনেক সহৃদয় ব্যক্তি এখনও আছেন যাঁহারা গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত না করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে গেলে আর এক দল উন্নতশীর্ষ লোকের সহিত মুখোমুখী হইয়া যায় তাহারা ইহা সহ্য করিতে পারে না। আঘাত করিয়া ভূতলশায়ী করিবার জন্য ছুটিয়া আসেন। তখন লড়াই অনিবার্য্য হইয়া ওঠে। ইহাকেই নাম দেওয়া হয় ঘরোয়া যুদ্ধ বা Civil War এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যই হৌক অথবা জগতের কল্যাণের জন্যই হৌক, জনগণের নিজের পায়ে দাঁড়ানটা বন্ধ করিতেই হয়। এবার বিশ্ব জুড়িয়া স্বতসর্ব্বস্বের দল নিজের পায়ে দাঁড়াইবার উদ্যোগ করিতেছে বলিয়াই না কি আর একটি বিশ্বযুদ্ধের আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়ায়।" বর্ত্তমান কর্ত্তারা বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এই বার্ত্তা 'ক্রেণ্ডলি ও চয়্যারিং' না 'থে ট্'। অবশ্যই স্বীকার করিব 'বীরভূম বার্ত্তা' যাহা বলিতেছেন তাহা যুক্তিযুক্ত এবং আমরাও হাড়ে হাড়ে ইহা অনুভব করিতেছি।

* * * *

'মাহিষ্য সমাজ' পত্রিকা বলিতেছেন :—"হাওড়া জেলার ঘাটতি অঞ্চলে চাউল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নাই, কিন্তু অভাবগ্রস্ত নরনারী যারা নিছক পেটের দায়ে মেদিনীপুরের বাড়তি অঞ্চল থেকে চাউল ও ধান্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন তাদের হাজতে প্রেরণের ব্যবস্থাটা পাকাই হ'য়েছে। গোপীগঞ্জ বাজারে দুর্নীতি দমনের দায়িত্বসহ যে সরকারী কর্ম্মচারীকে নিয়োগ করা হ'য়েছে বৃদ্ধা বিধবা আর অপ্রাপ্ত-বয়স্ক শিশুও তাঁর শিকারের বস্তু হ'য়েছে শুনে লজ্জিত হ'তে হয়। রাষ্ট্র-পরিচালকগণ হাওয়ায় উড়ে আর হাওয়া গাড়ীতে চড়ে দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করার লম্বা লম্বা পরিকল্পনা করছেন, কিন্তু গাঁয়ের অন্নবস্ত্রহীন গেঁয়ো মানুষগুলো কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে একটু পায়ে হেঁটে খোঁজ নিলে সন্তোত্তর পুরুষের বরাত জোর মনে করে তারা ধন্য হ'বে।" এ-বিষয় আমরা কোন নূতন মন্তব্য করিব না। সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মাননীয় প্রফুল্ল সেন এবং তাঁহার প্রিয় দুই জন নিকটতম সহকারীর উপরেই এ-কার্য্যের ভার ন্যস্ত করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। কিন্তু silence যেখানে golden সেখানে মাননীয় ব্যক্তিরা vocal হইবেন কি? হওয়া উচিত নহে!

* * * *

'মাহিষ্য সমাজ' আরো বলিতেছেন :—"পূর্ব্ব-পাকিস্থান থেকে যে সব বাস্তুত্যাগী পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন সরকার তাঁদের পুনর্বসতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, সুবিধার শতকরা ১০ ভাগ পূর্ব্বে আসা পূর্ব্ববঙ্গীয়রা ভোগ করছেন। সত্যি যাঁরা অভাবগ্রস্ত হ'য়ে বাস্তু হারিয়ে এসেছেন তাঁরা 'কোথায় কি করতে' হ'বে—তোষামোদের তৈল মর্দ্দনে কাকে বা কাহাদিগকে খুশী করতে হ'বে এ সবের 'খাঁৎঘুঁৎ' না জানায় বিশেষ কিছুই পাচ্ছেন না।" এ কথা আমরা সমর্থন করিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রকাশ করিতেছি যে, আজন্ম কলিকাতাবাসী কোন কোন ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গের 'বাস্তুত্যাগী—দুর্গত' বলিয়া নাম লিখাইয়া ট্যাক্সি এবং বাসের লাইসেন্স লাভও করিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ জানিয়া শুনিয়া এ-দান করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। তবে অনুসন্ধান করিতে দোষ কি? সরকারী দপ্তরের কর্ম্মচারীরা সকলেই যুধিষ্ঠির নহেন, এ-কথাও মিথ্যা নহে!

প্রচ্ছদপট

পত্রিকা প্রকাশে এবার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ার দরুণ রঙ্গপট ও সাহিত্য-পরিচয় বিভাগে বিস্তারিত আলোচনা দেওয়ার সুযোগ হইল না। আগামী সংখ্যা হইতে পুনরায় নিয়মিত প্রকাশিত হইবে। এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটের আলোকচিত্র শিল্পী তরুণ চট্টোপাধ্যায়।

এবার পূজার বাজার

সত্যদর্শী

পুজো সর্ব্বত্রই এসেছিল। বারোয়ারী পূজা-মণ্ডপে এসেছিল লাউড স্পীকারের অষ্টপ্রহর চিৎকারে, স্কুল-কলেজে এসেছিল ফাঁকা বেঞ্চির হাঁফ ছাড়ায়, আফিসে এসেছিল বড় সাহেবের রক্তচক্ষুকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, ট্রেণে এসেছিল বাদুড়-ঝোলায়, দোকানে এসেছিল গুদোম সাবাড় কোরে, গেরস্থর ঘরে এসেছিল পকেট সাবাড় কোরে;—চলে যখন গেল, দেখা গেল কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বাঁশ পোঁতার গর্ত্তগুলো হাঁ কোরে আছে;—সে ঘা আজও শুকোয়নি। গেরস্থদের পকেটের ঘায়েও মলম পড়েনি আজো!

সিনেমা থিয়েটারের পাড়াতেও এসেছিল পুজো। নতুন শাড়ীর খস্‌খসানি আর নতুন জুতোর মচমচানি পুজোর মণ্ডপের চেয়ে ঐ পাড়াতেই যেন বেশি কোরে শোনা গেছিল!

পুজোয় নতুন পোষাক পরার প্রথাটা মানুষের বেলায় যেমন, সিনেমা-থিয়েটারের বেলাতেও ঠিক তেমনি। নতুন ছবির পোষাক পরে সেজেছিল শহরের প্রধান প্রধান অনেকগুলি চিত্রগৃহ। কিন্তু নতুন জুতো পরে কেউ যেমন গট্‌গট্‌ কোরে হাঁটে আর কারুকে বা ফোস্কার দায়ে খোঁড়াতে হয় ক্রমাগত, সিনেমার বেলায় তারও ব্যতিক্রম হয়নি।

কোন চিত্রগৃহ যখন নতুন ছবির পোষাক প'রে বুকে চতুর্দ্দশ সপ্তাহের নোটিশ ঝুলিয়ে গট্‌মট্‌ কোরে চলেছে, কেউ বা তখন প্রথম সপ্তাহের নোটিশের আড়ালে খুঁড়িয়েছে ক্রমাগত!

তাই বলছিলাম, পুজো সিনেমার মহল্লাতেও এসেছিল।

রঙ্গমঞ্চের পাড়াটা নেহাৎই দরিদ্রের পাড়া আজকাল। গরীব ঘরের ছেলেদের পুরোনো জুতো তাপ্‌পি দিয়ে ঘসে ঘসে পালিশ কোরে চলার মতো রঙ্গালয়গুলোও সেই আদ্যিকালের কর্ণার্জ্জুন, কেদার রায়, সুদামা, সীতা, বঙ্গে বর্গী নাটকগুলোকেই তাপ্‌পি দিয়ে আর বুরুশ ঘষে কাজ চালিয়েছে। ও-মহল্লায় পুজোটা এসেছিল নেহাৎই গরীবিয়ানা চালে।

কলকাতার প্রত্যেকটি রঙ্গালয়ই পুরোনো নাটকগুলির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে অভিনেতৃ-সম্মেলনটা বেশ চটকদার করবার চেষ্টা করেছিলেন। মঞ্চের প্রত্যেকটি নাম-করা অভিনেতা অভিনেত্রীকেই কোন-না-কোন রঙ্গমঞ্চে দেখা গিয়েছিল। সম্পদহীন বনেদী ঘরের কর্ত্তাদের মতো ছেঁড়া কাপড়ে চুমুট করা আর রিপু-করা পুরোনো আদ্দির পাঞ্জাবীর হাতায় 'গিলে' করার প্রচেষ্টা আর কি!

পুজোর ক'দিন সহরের প্রধান সড়কগুলোর ধারে যে সব বাড়ী, তাদের দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টারের ঘাড়াঘাড়ি। নেমন্তন্ন বাড়ীর বারান্দায় নিমন্ত্রিত আত্মীয়াদের ভিজে শাড়ী—সায়া—ব্লাউজের মতোই একটার ওপরে একটা। কোনোটাই রোদ্দুর পায় না ভালো কোরে, কোনোটাই শুকোয় না সবখানি।

এমনি একটি বাড়ীর দেয়ালে সিনেমা-থিয়েটারের পোষ্টারগুলো ঘাড়াঘাড়ি কোরে আর পাশাপাশি হয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত মজাদার কথা শুনিয়েছে।

ছেদোর ধারের একটা বাড়ীর দেয়ালে পড়া গেল—'বাংলার মেয়ে চরিত্রহীন!'

চট কোরে চটে উঠবেন না যেন! মিস্ মেয়োর উক্তির এমন নির্লজ্জ সমর্থন করেছে দু'টি পৃথক সিনেমা এবং থিয়েটারের পোষ্টার। পাশাপাশি থেকেই তারা এই বিপত্তি ঘটিয়েছে। একটি হচ্ছে কোনো এক সিনেমায় 'বাংলার মেয়ে' প্রদর্শিত হচ্ছে, তারই খবর; অন্যটিতে কোনো এক রঙ্গালয়ে 'চরিত্রহীন' অভিনীত হচ্ছে, তারই সংবাদ। পাশাপাশি আট্‌কে থেকে এরা কী কাণ্ডই করেছে বলুন দিকি!

কিন্তু এর চেয়েও বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার করেছে আর একটি বাড়ীর দেয়ালের পোষ্টারগুলো। সহরের আর এক প্রান্তের একটি বাড়ীর দেয়ালে দেখা গেল, পোষ্টারগুলো পাশাপাশি থেকে আরো একটি স্ক্যাণ্ডালাস্ খবর শুনিয়েছে উদ্গ্রীব পথচারীদের। সে-দেয়ালে লেখা আছে—'তাইতো বিপ্রদাস, কাশীনাথ বিন্দুর ছেলে?' কাশীনাথ নামক ব্যক্তিটি যে বিন্দু নাম্নী কারুর পুত্র, এই অজ্ঞাত গোপন রহস্যটি যে-পোষ্টারগুলো নির্ম্মম ভাবে ফাঁস কোরে দিয়েছে, তার কোনোটি থিয়েটারের, কোনোটি বা সিনেমার। কিন্তু এমন মতলোব কোরে পাশাপাশি থাকতে তাদের কে বলেছিল বলুন তো?

পুজোর বাজারে মই-সিঁড়ি ঘাড়ে কোরে আর আঠার বালতি হাতে নিয়ে সিনেমা-থিয়েটারের কুলীগুলোই আমাদের সঙ্গে পুজোর রসিকতা কোরে গেল না তো!

পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ—

গত ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) প্যারী নগরীতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শরৎকালীন অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। এক মাসেরও অধিক হইয়াছে এই অধিবেশন চলিতেছে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কোন সমস্যারই কোন সমাধান করা এ-পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। বস্তুতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোন অধিবেশনই বর্ত্তমান অধিবেশনের মত এত ধীর-মন্থর গতিতে চলে নাই। হয়ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কোন আলোচনাই এই অধিবেশনে হওয়া সম্ভব হইবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশ্নটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য্যসূচীতে স্থান পাইয়াছে। প্যারী অধিবেশনে যে এই প্রশ্ন আলোচিত হইবে সে-সম্বন্ধে ভরসা করার মত কিছুই দেখা যাইতেছে না। সম্ভবতঃ নবেম্বর মাসের শেষ ভাগে কাশ্মীর সমস্যা লইয়া পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হইবে। জাতিপুঞ্জের কাশ্মীর কমিশন জেনেভায় বসিয়া তাঁহাদের রিপোর্টকে শেষ রূপ দেওয়ার কাজে ব্যস্ত আছেন। যত দূর শোনা যায়, তাঁহাদের রিপোর্ট তৈয়ারীর কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং এই রিপোর্ট সম্বন্ধে যতটুকু জানা যাইতেছে, এই রিপোর্ট ভারতের পক্ষে মোটেই অনুকূল হইবে না। হায়দ্রাবাদ সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশনে আর উত্থাপিত হইবে না বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই সমস্যা যাহাতে আবার উত্থাপিত ও আলোচিত হয়, পাকিস্থান তাহার জন্য কোন চেষ্টাই বাকী রাখিতেছে না। ভারতের দিক্ হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটি সমস্যা বাদে আন্তর্জ্জাতিক দিক্ হইতে গুরুতর সমস্যাগুলিরও সমাধানের কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি যে প্যারী অধিবেশনের প্রতি নিবদ্ধ রহিয়াছে, বিশ্ববাসী যে আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার সহিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা ও বিতর্ক লক্ষ্য করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ চারি দিকেই যে তৃতীয় মহাসমরের কথা শোনা যাইতেছে, প্যারী অধিবেশন এই যুদ্ধাশঙ্কা দূর করিয়া বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করিতে পারিবে কি? আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর গতি ভবিষ্যতে কোন্ পথে প্রবাহিত হইবে তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্যারী সম্মেলনে, ইহাই অনেকের বিশ্বাস।

বার্লিন-সঙ্কটের দুর্য্যোগের মধ্যে এই সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত বার্লিন-সঙ্কট সমাধানের প্রয়াস ব্যর্থই হইয়াছে। এই অধিবেশনের অবশিষ্ট কালের মধ্যে বার্লিন সঙ্কটের সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? পরমাণু বোমা সমস্যা, অস্ত্রসজ্জা হ্রাস করার সমস্যা এ-পর্য্যন্ত অমীমাংসিতই রহিয়াছে। প্যারী অধিবেশনের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব কি? উপনিবেশ-সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব, [illegible]? প্যালেষ্টাইন সমস্যাকে মুলতুবী রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে। ক্ষুদ্র পরিষদের (Little Assembly) অস্তিত্ব বজায় রাখা হইবে কি না, তাহা লইয়াও আলোচনা হইবে। ক্ষুদ্র পরিষদ গঠিত হওয়ার পর হইতে রাশিয়া এবং পূর্ব্ব-ইউরোপের অন্যান্য শক্তিবর্গ উহাকে বর্জ্জন করিয়াছে। তার পর আছে ভেটো সমস্যা। এই সকল সমস্যা লইয়া যে সকল আলোচনা হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, সেগুলির মধ্যে রাশিয়ার সহিত পশ্চিমী শক্তিবর্গের যে বিরোধ পরিস্ফুট দেখা যায়, তাহা এখন পর্য্যন্তও মীমাংসার অযোগ্য বলিয়াই মনে হইতেছে। শুধু কি তাই? এই বিরোধের মধ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অস্তিত্বই বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব মিঃ মার্শাল বলিয়াছেন, "This persistent refusal of a small minority to contribute to the accomplishment of our agreed purposes is a matter of profound concern." অর্থাৎ 'আমাদের সর্ব্বসম্মত উদ্দেশ্য সমূহ কার্য্যকরী করিতে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু দল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অস্বীকৃত হওয়ায় একটি গভীর উদ্বেগের বিষয় হইয়াছে।' তাঁহার এই উক্তি যে রাশিয়াকে লক্ষ্য করিয়াই তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না। মিঃ মার্শাল অবশ্য বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে বিরোধ চলিতেছে তাহাকে বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাই, কিন্তু মৌলিক নীতিগুলি সম্পর্কে তাঁহারা কোন আপোষ করিবেন না। এই মৌলিক নীতিগুলি কি তাহা যেমন অত্যন্ত অস্পষ্ট, তেমনি এই উক্তির মধ্যে একটা হুমকী যে অনুক্ত রহিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। মিঃ মার্শাল যাহা উহ্য রাখিয়াছেন মিঃ বেভিন তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে মিঃ বেভিন বলিয়াছেন, "Russia alone would be responsible if atom warefare burst upon the world." 'পৃথিবীর বুকে পরমাণু-যুদ্ধ যদি বাধিয়া উঠে, তাহা হইলে একমাত্র রাশিয়াই উহার জন্য দায়ী হইবে।' পরমাণু বোমার ভয় দেখাইয়া রাশিয়াকে কাবু করিবার এই চেষ্টা এ-পর্য্যন্ত সফল হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে গত ১লা অক্টোবর রাশিয়ার সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ভিশিনস্কি পরমাণু বোমার রহস্য একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই করায়ত্ত এইরূপ ধারণাকে ভ্রান্ত ধারণা (illusion) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

পশ্চিমী শক্তিবর্গ শুধু পরমাণু বোমার উপরেই নির্ভর করিয়া বসিয়া নাই। পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়ন বৃটিশের নেতৃত্বেই গঠিত হইয়াছে। বৃটিশের নেতৃত্বে বৃটিশ কমনওয়েলথকে করা হইয়াছে সংহত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্যান-আমেরিকান সংহতি গঠিত হইয়াছে। এই প্যান-আমেরিকান সংহতির সহিত পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংযোগ বিধানের জন্য আটলান্টিক পরিষদ গঠনের আয়োজন চলিতেছে। ইহার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বৃটিশ কমনওয়েলথ, প্যান-আমেরিকান

বাজী রেখে বন্ধুদের দেখাবার মত ছবি

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর প্রযোজনায় বসুমিত্রের রহস্যচিত্র

কালোছায়া

ভূমিকায়

শিপ্রা দেবী — শিশির মিত্র
ধীরাজ ভট্টা — গুরুদাস বন্দ্যো
নবদ্বীপ হালদার — শ্যাম লাহা
হরিদাস চট্টো — নৃপেন্দ্র মিত্র

প্রভৃতি

রচনা ও পরিচালনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সঙ্গীত : অমিয়কান্তি

বাজী রেখে বন্ধুদের দেখাবার মত ছবি হল 'কালোছায়া' অথচ যাতে বাজী হারবার ভয় নেই। আপনার বন্ধু যত বড় বুদ্ধিমান ধুরন্ধর হোন 'কালোছায়া' চিত্রের কাহিনীর পরিণতি কল্পনা করা তাঁর সাধ্যের অতীত, স্বপ্নেরও অতীত। অতীতে এ রকম ছবি বাংলাদেশে তোলা হয়নি, ভারতবর্ষেও নয়। একমাত্র বিদেশে তোলা রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা চিত্রের সঙ্গেই 'কালোছায়া'র কাহিনীর তুলনা চলতে পারে।

পরিবেশক : গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

এসোসিয়েশন মিলিয়া একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, একই মার্কিণ-যুক্ত-রাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি বৃহৎ রাষ্ট্রগোষ্ঠী গঠন করা হইতেছে। তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর রহিল কি? ইটালী ও পর্ত্তুগাল পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের সম্ভাবনা উপেক্ষার বিষয় নয়। স্পেনকেই যে বাদ দেওয়া হইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কুয়োমিণ্টাং চীন যে মার্কিণ নেতৃত্বাধীনেই চলিবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। জাপান ও কোরিয়ার রাজনৈতিক কোন অস্তিত্বই নাই। মালয়, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার কথা কিছু না বলাই ভাল। ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট বৃটিশের সহযোগিতা করিয়াই চলিবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, মার্কিন নেতৃত্বে রাশিয়া ও পূর্ব্ব-ইউরোপের কয়েকটি দেশ বাদে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র এক-জোট বাঁধিয়াছে। সুতরাং সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের আর সার্থকতা কোথায়?

এই জোট-বাঁধা যে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং মার্কিণ নেতৃত্বের নির্দ্দেশ ছাড়া এই সকল রাষ্ট্র যে চলিতে অসমর্থ তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্যারী অধিবেশন ১০ই ডিসেম্বর তারিখে মুলতুবী রাখিবার জন্য এবং ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে পুনরায় অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা হইবে। ২রা নবেম্বর তারিখে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনই যে ইহার কারণ, তাহাও সকলেরই স্বীকৃত। ২রা নবেম্বর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন হইলেও ১৯৪৯ সালের ২০শে জানুয়ারীর পূর্ব্বে নূতন প্রেসিডেণ্ট কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন্ না। মার্কিণ রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে এই মধ্যবর্ত্তী সময়কে 'Lame Duck' বলিয়া অভিহিত করা হয়। আমাদের এই প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হইবে তখন নির্ব্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইয়া যাইবে। মিঃ ডিউইর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনাই বেশী। কাজেই মার্কিণ রাষ্ট্রনীতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্যারী অধিবেশনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ ডিউই নির্ব্বাচিত হইলে ডাঃ জন ফষ্টার ডুলেস মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সচিব হইবেন। ডাঃ ডুলেসের সহিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আলোচনা এই জন্যই বিশেষ অর্থপূর্ণ। সাধারণ পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী রাখা হইলেও নিউইয়র্কে রাজনৈতিক কমিটির অধিবেশন চলিতে থাকিবে। অর্থাৎ রাজনৈতিক কমিটিকেই পূর্ণ অধিবেশনে রূপান্তরিত করা হইবে। প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বিশেষ অধিবেশনের সময়েও তাহাই করা হইয়াছিল।

বার্লিন-সঙ্কট ও নিরাপত্তা পরিষদ—

গত ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পৃথক্ পৃথক্ নোটে বার্লিনসমস্যা নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করেন। অবশ্য সকলেরই নোটের বক্তব্য একরূপ। ২৭শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) অনুরূপ নোট রুশ গবর্ণমেণ্টকেও প্রদান করা হইয়াছে। ৪ঠা অক্টোবর নিরাপত্তা পরিষদে এ সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইলে রাশিয়ার সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব মঃ ভিসিনস্কি বলেন যে, বার্লিন সম্পর্কে আলোচনা করিবার আইনসঙ্গত অধিকার নিরাপত্তা পরিষদের নাই। তিনি আরও বলেন যে, বার্লিন অবরোধ করা হয় নাই (there was 'no blockade')। ৫ই অক্টোবর ৯ – ২ ভোটে নিরাপত্তা পরিষদে বার্লিন সমস্যা আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে মঃ ভিসিনস্কি এবং ইউক্রেইনের প্রতিনিধি মঃ মনুলস্কি জানান যে, এই আলোচনায় তাঁহারা অংশ গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু পরের দিন আলোচনার সময় তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হন। অতঃপর নয় দিন ধরিয়া ছয়টি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র একটি আপোষের ফরমূলা বাহির করিতে ব্যর্থ-চেষ্টা করেন। অতঃপর ছয়টি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাব মানিয়া লইতে তাহাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু রাশিয়া ভেটো প্রদান করায় (২৫শে অক্টোবর) সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে।

এই ব্যর্থতার দায়িত্ব অবশ্যই রাশিয়ার ঘাড়েই চাপান হইবে। কিন্তু বার্লিন-সঙ্কটের মূলে যে জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি-সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয়ের অস্বীকৃতি, পশ্চিম-জার্ম্মাণী গঠনের আয়োজন এবং পশ্চিম-বার্লিনে পৃথক্ মুদ্রা প্রচলন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, নিরপেক্ষ ষড়রাষ্ট্র সত্যই নিরপেক্ষ কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। জার্ম্মাণীতে মুদ্রা প্রচলন সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ এবং পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের আহ্বান বার্লিন অবরোধ তুলিয়া দেওয়ার সাপেক্ষ করায় রাশিয়া এ প্রস্তাবে রাজী হয় নাই।

পরমাণু বোমা সমস্যা—

পরমাণু বোমা সমস্যার সমাধানেরও কোন পথ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। রাশিয়া একটি আপোষমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল। এই প্রস্তাবে একই সঙ্গে পরমাণু বোমাগুলি ধ্বংস করা এবং আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়োগ করার কথা আছে। কিন্তু গত ২০শে অক্টোবর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে। কমিটি অতঃপর পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি আন্তর্জ্জাতিক সন্ধির খসড়া রচনার জন্য এটমিক এনার্জ্জি কমিশনকে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। অধিকাংশ পশ্চিমী প্রতিনিধি এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ব-ইউরোপের ছয়টি রাষ্ট্র উহার বিরোধিতা করিয়াছেন। এই সকল সমর্থক প্রতিনিধি প্রথমে কানাডার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেই বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। এই প্রস্তাবে এটমিক কমিশনের কাজ স্থগিত রাখার কথা ছিল এবং উহা গৃহীত হইলে সাধারণ পরিষদকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করিতে হইত। অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের প্রচেষ্টায় আলোচনার দ্বার খোলা রাখিবার জন্য বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা উল্লিখিত প্রস্তাবে রাজী হইয়াছে। অবশ্য এই প্রস্তাবও কানাডাই উপস্থিত করে। পরবর্ত্তী সাধারণ অধিবেশনের পূর্ব্বেই এটমিক এনার্জ্জি কমিশনকে তাঁহাদের রিপোর্ট সাধারণ পরিষদে দাখিল করিতে হইবে।

ত্রিশ মাস ধরিয়া আলোচনার পরেও পরমাণু শক্তি সম্বন্ধে কোন মীমাংসা হয় নাই। আমেরিকা যদি পরমাণু শক্তির উপর একাধিপত্য বজায় রাখিতে চায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতেও মীমাংসার কোন আশা দেখা যায় না।

উপনিবেশ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঔপনিবেশিক এবং ট্রাষ্টিশিপ কাউন্সিলে রাশিয়া এই মর্ম্মে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল যে, উপনিবেশগুলিতে

রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে উপনিবেশের আটটি মালিক-রাষ্ট্রকে প্রতি বৎসর বার্ষিক রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বেলজিয়ম এই প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধিতা করে। রাশিয়ার প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়াছে, কিন্তু ভারত যে প্রস্তাব উত্থাপন করে তাহা গৃহীত হয়। ভারতের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, কোন উপনিবেশ যখন আর অ-স্বায়ত্ত-শাসিত থাকিবে না, তখন তাহার মালিককে ঐ উপনিবেশের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট দাখিল করিতে হইবে। এই প্রস্তাব অনুসারে কোন উপনিবেশের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে কোনও বার্ষিক বিবরণ ঔপনিবেশিক শক্তিকে দাখিল করিতে হইবে না। বৃটিশ প্রতিনিধি এই প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট দিতে বিরত ছিলেন এবং বলিয়াছেন যে, বৃটেন এই প্রস্তাব মানিবে না এবং সাধারণ পরিষদে যদি এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা হইলেও এই প্রস্তাবের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে বৃটেন কি দৃষ্টিতে দেখে, ইহারই মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সাম্রাজ্য রক্ষার উপায় তাহাতেও সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, জাতিপুঞ্জ সনদের একাদশ অধ্যায়টি পর্য্যালোচনা করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রাশিয়ার প্রস্তাবের বিরোধিতার সময় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রেরা এই অধ্যায়েরই দোহাই দিয়াছিল।

প্যালেষ্টাইন ও জাতিপুঞ্জ—

প্যালেষ্টাইনে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য যে যুদ্ধ বিরতি চলিতে পারে না, আরব ও ইহুদীদের মধ্যে পুনরায় সংঘর্ষ আরম্ভ

আপনার একান্ত প্রিয় কেশকে যে বাঁচায় শুধু তাই নয়, নষ্ট কেশকে পুনরুজ্জীবিত করে, তাকে আপনি বহুমূল্য সম্পদ ছাড়া আর কি বলবেন? শালিমারের 'ভৃঙ্গমিন' এমনই একটি সম্পদ। সামান্য অর্থের বিনিময়ে এই অমূল্য কেশতৈল আপনারই হাতে ধরা দেবে। "ভৃঙ্গমিন" পুরাপুরি আয়ুর্ব্বেদীয় মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ত বটেই, তাছাড়াও উপকারী ও নির্দ্দোষ গন্ধ-মাত্রায় সুবাসিত। একই সাথে উপকার আর আরাম······

ভৃঙ্গমিন কিনুন তার বদলে অন্য কিছু নয়।

শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রচারিত

হওয়াতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে মনস্থির করিতে পারেন নাই, আলোচনার অবস্থা হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে। গত ১৫ই অক্টোবর রাজনৈতিক কমিটিতে প্যালেষ্টাইন সমস্যা যখন জরুরী আলোচ্য বিষয় হিসাবে উত্থাপিত হইল, তখন দেখা গেল, কোন সদস্যই কোন কথা বলিতে রাজী নহেন। অতঃপর নিরাপত্তা পরিষদে ১১শে অক্টোবর তারিখে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। একটি প্রস্তাবে নেগেভ অঞ্চলে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য আরব ও ইহুদীদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষকদিগকে প্যালেষ্টাইনের সর্ব্বত্র নিরাপদে যাতায়াত করিতে দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গৃহীত হইয়াছে দ্বিতীয় প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে যে বিশেষ কিছু ফল হইয়াছে তাহা যেমন বুঝা যাইতেছে না, তেমনি প্যালেষ্টাইন সমস্যার আলোচনা মুলতুবী রাখিবার প্রয়াসও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

নেগেভ অঞ্চল লইয়াই বর্ত্তমানে প্যালেষ্টাইনে প্রধান সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই অঞ্চলটি প্যালেষ্টাইনের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। প্যালেষ্টাইনের ভূ-ভাগের অর্দ্ধেকই নেগেভ অঞ্চল হইলেও উহার অধিকাংশই মরুভূমি। ১৯৪৭ সালের নবেম্বর মাসে জাতিপুঞ্জ সম্মেলনে প্যালেষ্টাইন বিভাগ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে নেগেভ অঞ্চল ইহুদীদিগকে এবং গ্যালেলী আরবদিগকে দেওয়া হইয়াছে। কাউণ্ট বার্ণাডোটের রচিত পরিকল্পনায় ইহুদীদিগকে গ্যালেলী এবং আরবদিগকে নেগেভ দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহুদীরা অবশ্য গ্যালেলী দখল করিয়া বসিয়াছে, কিন্তু নেগেভ অঞ্চল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাব অনুসারে তাহাদের প্রাপ্য। একমাত্র মিশরী সৈন্যবাহিনীই নেগেভ অঞ্চলে আছে। ইজরাইল গবর্ণমেণ্টের সৈন্যবাহিনী তাহাদের পূর্ব্ব অবস্থান স্থানে ফিরিয়া না গেলে, মিশর যুদ্ধ বন্ধ করিতে পারে না, ইহাই মিশরের যুক্তি। ইজরাইল গবর্ণমেণ্টের কথা এই যে, নেগেভে মিশরের চলাচল এবং ঐ অঞ্চলের ইহুদীদের বাসস্থান সমূহের উপর মিশরীদের আক্রমণ যদি জাতিপুঞ্জ বন্ধ না করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব নয়। নেগেভের যে সকল ইহুদী অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে সেগুলির সহিত সংযোগ বিধান করাই ইজরাইল গবর্ণমেণ্টের সৈন্য প্রেরণের উদ্দেশ্য।

কাউণ্ট বার্ণাডোটের পরিকল্পনায় এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, প্যালেষ্টাইনের অ-ইহুদী অঞ্চলগুলি ট্রান্সজর্ডানের সহিত সংযুক্ত হইবে। কিন্তু নেগেভ অঞ্চল মিশরের সংলগ্ন। নেগেভ অঞ্চল আত্মভূত করিবার অভিপ্রায় যে মিশরের নাই তাহা বলা যায় না।

কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন—

সম্প্রতি লণ্ডনে বৃটিশ কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের যে সম্মেলন হইয়া গেল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে উহার তাৎপর্য্য বিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য। ১১ই অক্টোবর (১৯৪৮) এই সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং এই সম্মেলন সমাপ্ত হইয়াছে ২২শে অক্টোবর। এই সম্মেলনের অধিবেশন প্রকাশ্যে হয় নাই। কাজেই কর্ত্তৃপক্ষ এই সম্মেলনের আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে যে-টুকু জানিতে দিয়াছেন তাহা ছাড়া এ-সম্পর্কে বিশ্ববাসীর আর কিছুই জানিবার উপায় নাই। সম্মেলনের সর্ব্বশেষ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পরে চারি পৃষ্ঠাব্যাপী এক ইস্তাহারে সম্মেলনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও আমাদের কাছে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তই শুধু নয়, অপূর্ণ বলিয়াও মনে হইতেছে। তাই বলিয়া এই বিবরণ আমাদের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। প্রকাশিত ইস্তাহারের আলোকে এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সমূহের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিবার পূর্ব্বে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আয়ার এই সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয় নাই, কিন্তু রোডেশিয়া আমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিল। ব্রহ্মদেশ বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে বলিয়া তাহারও অবশ্য নিমন্ত্রণ হয় নাই। ক্যানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, রোডেশিয়া, ভারত, পাকিস্থান ও সিংহলের প্রধান মন্ত্রী এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

ইস্তাহারে 'বৃটিশ কমনওয়েলথ' কথাটির পরিবর্ত্তে শুধু 'কমনওয়েলথ' কথাটি ব্যবহৃত হওয়ায় বিলাতের রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষক মহল না কি উহাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থব্যঞ্জক বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সম্মেলনের কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত বা স্থিরীকৃত নীতির ফলে 'বৃটিশ' কথাটি বাদ দেওয়া হয় নাই। উক্ত অধিবেশনে অনুসৃত নীতির নিখুঁৎ প্রতিরূপ হিসাবেই বৃটিশ শব্দটি বর্জ্জন করা হইয়াছে, ইহা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এই অনুসৃত নীতি কি, তাহা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখিবার নীতির কথাও আমাদের অজ্ঞাত নয়। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বিশ্ব-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার সময় কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট মতৈক্য দেখা গিয়াছে এবং মূলতঃ বিশ্ব-শান্তির উপায় হিসাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য সমূহের উপর এবং উহার কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী করিতে তাঁহাদের দৃঢ়তার উপর বিশ্ব-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। বিশ্ব-শান্তিরক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ থাকা সত্ত্বেও কমনওয়েলথের প্রয়োজনীয়তা কি, আপাতদৃষ্টিতে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব বলিয়া মান হইতে পারে। বোধ হয়, সেই জন্যই ইস্তাহারে প্রদত্ত বিবরণে এ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, কম্যুনিজমের বিপদ কি ভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব তাহাই ছিল আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়। ইস্তাহারের এই অংশটি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই সম্মেলনের দৃষ্টিতে কম্যুনিজম শুধু গুরুতর বিপদই নয়, প্রাচ্যে ইহার বিস্তারের লক্ষণগুলি বিভীষিকারূপে গণ্য হইয়াছে। ইউরোপে কম্যুনিজমকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন করা হইয়াছে। বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজীয়াম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবুর্গ এই ইউনিয়নের সদস্য। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে :—There was general agreement that this association of the U. K with her European neighbours (Western Union) was in accordance with the interest of the other members of the Common-welth, the U N and the promotion of the world peace" অর্থাৎ 'ইউরোপীয় প্রতিবেশীদের (পশ্চিমী

ইউনিয়ন) সহিত বৃটিশ যুক্তরাজ্যের সংশ্লিষ্ট হওয়া কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্যদের স্বার্থরক্ষা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং বিশ্ব-শান্তি রক্ষার নীতি অনুযায়ীই হইয়াছে বলিয়া সকলে একমত হইয়াছেন। এই একমত হওয়ার তাৎপর্য্য কি? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে রাশিয়া কম্যুনিষ্ট দেশ। বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্যগণ কি মিঃ চার্চ্চিলের মত ইহাই চান যে, রাশিয়ার কম্যুনিষ্টরা কম্যুনিজমের প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাস বর্জ্জন করিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গের নির্দ্দেশ মানিয়া চলুক নতুবা পরমাণু বোমা দ্বারা বিশ্বশান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। ইহা ব্যতীত উল্লিখিত একমত হওয়ার আর কি অর্থ হইতে পারে?

পশ্চিমী ইউনিয়নে নেতৃত্ব করিবে বৃটেন। এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। বৃটেনের নেতৃত্ব করার অর্থ—পররাষ্ট্র-নীতি, অর্থনীতি এবং দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবুর্গ বৃটেনের নীতি ও নির্দ্দেশ অনুসারেই পরিচালিত হইবে। আবার কমনওয়েলথেও যে বৃটেন নেতৃত্ব করিবে, তাহাও অবিসংবাদিতরূপে সত্য। কাজেই পররাষ্ট্র-নীতি, অর্থনীতি ও দেশ-রক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে কমনওয়েলথের দেশগুলিও পশ্চিমী ইউনিয়নের নীতিই অনুসরণ করিবে। পশ্চিমী ইউনিয়ন এবং বৃটিশ কমন-ওয়েলথের নেতা বৃটেন যে একান্ত ভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল, তাহাও কাহারও অজানা পাই। সুতরাং সর্ব্বশেষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, পশ্চিমী ইউনিয়ন এবং বৃটিশ কমনওয়েলথও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এবং উহারই নীতি ও নির্দ্দেশ অনুসারে পরিচালিত হইবে। আজ গণতন্ত্র ও কম্যুনিজমের মধ্যে যে সংঘাত শান্তি বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা আসলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। রাশিয়া কম্যুনিষ্ট দেশ না হইয়া ধনতান্ত্রিক দেশ হইলেও এই বিরোধ যে অবশ্যম্ভাবী হইত তাহাতেও সন্দেহ নাই। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে বিরোধ পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক দিন ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে। কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমী ইউনিয়নের সহিত বৃটিশ কমনওয়েলথকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ করা, তাহা বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। ভারতও যে এই ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক চক্রান্তের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িল, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় আছে কি?

গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে বিশ্বশান্তি রক্ষা করার সম্মিলিত আদর্শই কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের সকল সদস্য গ্রহণ করিয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকা, পাকিস্থান এবং সিংহলের সহিত ভারতের যে সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বিশ্বমানবের সম্মুখে এই কমনওয়েলথ যে কোন আশার আলোক প্রজ্বালিত করিতে পারিবে সে-সম্বন্ধে কোন ভরসা আমরা করিতে পারিতেছি না। অথচ শোনা যাইতেছে যে, পণ্ডিত নেহরু না কি ভারতকে কমনওয়েলথের মধ্যে রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ফেলিয়াছেন। ভারতীয় গণ-পরিষদ কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বের হুকুম অমান্য করিতে পারিবে না, এই ভরসাতেই যে তিনি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকার পরিণাম সম্বন্ধে যে কেহই অবহিত হইতেছেন না, ইহা সত্যই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, যদি সত্যই যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, তাহা হইলে মিঃ চার্চ্চিলই আবার বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী হইবেন, এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভারতের স্বাধীনতার প্রতি মিঃ চার্চ্চিলের মনোভাব কাহারও অজানা নাই। সুতরাং তৃতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগে ভারতকে আবার অধীনতার জালে জড়াইবার চেষ্টা চলিবে, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর যে নিপীড়ন চলিয়াছে, তাহার কোন প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্যান্য দলের সহিত সমমর্য্যাদাসম্পন্ন, এ কথা স্বীকার করা যায় না। পাকিস্থানের সহিত ভারতের সম্পর্কও কম কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করিবে না। মিঃ এটলী পণ্ডিত নেহরু ও মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁয়ের মধ্যে যে গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করাই ছিল তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বৈঠকের ফল কি হইয়াছে তাহা আমরা জানি না। কিন্তু কাশ্মীর বিভক্ত হওয়ার আশঙ্কা ক্রমেই দৃঢ় হইতেছে। ভারত কি তাহা মানিয়া লইবে? বৃটিশের চাপে না মানিয়া হয়ত উপায় থাকিবে না। পাকিস্থানী সৈন্যবাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছে, এই স্বীকৃতির পরও বৃটিশের পাকিস্থান-প্রীতি বৃটিশ কমনওয়েলথে ভারতের অবস্থা কি অসহনীয় হইয়াই উঠিবে না? ইঙ্গ-মার্কিণ ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধে ভারত নিরপেক্ষ থাকিবে বলিয়া পণ্ডিত নেহরু যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভারত কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিলে তাহা আর সম্ভব হইবে না। কমনওয়েলথের প্রত্যেকটি দেশই তাহার নীতি নির্দ্ধারণের ব্যাপারে কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশের সহিত আলোচনা করিবে বলিয়া ইস্তাহারে বলা হইয়াছে। বৃটিশের নেতৃত্বে এবং নির্দ্দেশেই কার্য্যতঃ এই সকল নীতি গৃহীত হইবে বলিয়া উল্লিখিত ঘোষণা আমাদের কাছে অর্থহীন বলিয়াই মনে হইতেছে। এই পথে স্বাধীনতা, ন্যায়নীতি এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার ভিত্তিতে স্থায়ী শান্তি গঠিত হইবার সম্ভাবনা আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

মিঃ চার্চ্চিলের হুঙ্কার—

গত ৯ই অক্টোবর উত্তর-ওয়েলসের ল্যাণ্ডাডনোতে বৃটিশ রক্ষণশীল দলের বার্ষিক সম্মেলনের উপসংহার উপলক্ষে মিঃ চার্চ্চিল যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা আসলে তৃতীয় মহাযুদ্ধের আবাহন-মন্ত্র ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। তাঁহার এই বক্তৃতা প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী চার্চ্চিলের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৯১৯-২০ সালে বল-শেভিক বিপ্লবকে ধ্বংস করিয়া রাশিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবার যে-কোন প্রয়াসই যে শুধু তাঁহার সমর্থন লাভ করিয়াছিল তাহা নয়, বৃটিশের অর্থে এইরূপ প্রচেষ্টার জন্য উস্কানী দেওয়ারও তিনি সমর্থক ছিলেন। তিনি মনে করেন যে, দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের শেষভাগে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী যদি বার্লিনে এবং মার্কিণ সাঁজোয়া বাহিনী যদি প্রাগে প্রবেশ করিত, তাহা হইলেই বুদ্ধি-মানের কাজ হইত। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। আজ তাহার জন্য মিঃ চার্চ্চিলের খেদোক্তিতে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। তাই সম্মেলনের সদস্যবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্বমূলক মীমাংসা হইতে পারে, এইরূপ মিথ্যা আশা আমি আপনাদের মনে সঞ্চার করিব না।"

রাশিয়ার সহিত সম্ভাব্য যে কোন মীমাংসাই তাঁহার দৃষ্টিতে কৃত্রিম ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি মনে করেন, "মূল বিপদ এবং বিরোধ থাকিয়াই যাইবে।" কাজেই তৃতীয় মহাযুদ্ধ তাহার 'বিষাদময় রূপ লইয়া নিকটবর্ত্তী হইতেছে' (remoreselessly approaching), ইহাই তিনি শুধু দেখিতে পাইতেছেন। পাছে কেহ তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করে, সেই আশঙ্কায় তিনি বলিয়াছেন, "If it were not for the stocks of atomic bombs now in the trusteeship of the U. S. A. there would be no means of stopping the subjugation of Western Europe by communist machination backed by Russian armies and enforced by political police." অর্থাৎ 'যদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পরমাণু বোমা মজুত না থাকিত, তাহা হইতে রুশ সৈন্যবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং রাজনৈতিক পুলিশের সাহায্যে কম্যুনিষ্ট কৌশলের দ্বারা পশ্চিম-ইউরোপ অধিকৃত হওয়া নিবারণ করিবার কোন উপায় থাকিত না।' শুধু তাই নয়। মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন, "Nothing stands between Europe to-day and complete subjugation to communist tyranny but the atomic bomb in American possession." অর্থাৎ 'আমেরিকার কাছে পরমাণু-বোমা আছে বলিয়াই কম্যুনিষ্ট স্বৈরাচারিতা ইউরোপ দখল করিতে পারে নাই।'

মিঃ চার্চ্চিলের দৃষ্টিতে বলশেভিক রাশিয়া ইতিমধ্যেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াছে এবং ইউরোপে তাহার সৈন্য-সংখ্যা অন্য সকল দেশের একত্রিত সৈন্য-সংখ্যা অপেক্ষাও বেশী। কাজেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, মজুত পরমাণু বোমা নষ্ট করিয়া ফেলিলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বমানবের স্বাধীনতা ধ্বংসের অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে এ কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া যেমন নিষ্প্রয়োজন, তেমনি মিঃ চার্চ্চিলের দৃষ্টিতে বিশ্বমানবের স্বাধীনতার অর্থ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের এশিয়া ও আফ্রিকার সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখা ছাড়া আর কিছুই নয়। মিঃ চার্চ্চিলের কূটনীতির একটা প্রধান গুণ এই যে, তিনি সত্য কথা সহজ ভাষায় বলিতে ভালবাসেন। রাশিয়া সম্বন্ধে বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যাহা অন্তরের খাঁটি কথা, মিঃ চার্চ্চিল তাহাই সোজা কথায় বলিয়া ফেলিয়াছেন।

চতুর্থ রিপাবলিকের সঙ্কট—

ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঃ কোয়েল গত ১ই অক্টোবর এক বেতার বক্তৃতায় ফ্রান্সের বর্ত্তমান ধর্ম্মঘট সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, উহা বিদ্রোহের আকার ধারণ করিতেছে (assuming the shape of an insurrection)। ফ্রান্সের ধর্ম্মঘটের অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহাকে অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে হয় না। শুধু শ্রমিক ধর্ম্মঘট দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কি না, তাহাতে অবশ্যই সন্দেহ আছে। কিন্তু পরিণামে উহা যে বিদ্রোহের আকার ধারণ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। গত ৩রা অক্টোবর (১৯৪৮) ফ্রান্সের খনি-মজুরেরা ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে এবং ধর্ম্মঘট শুধু খনি-মজুরদের মধ্যেই আবদ্ধ নাই। ফ্রান্সের খনিগুলি ন্যাশনেলাইজড শিল্প। এই ন্যাশনেলাইজড শিল্পকে যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে পরিচালনের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহারই প্রতিবাদে এই ধর্ম্মঘট। মাইনস্ ফেডারেশন কর্ত্তৃক এই ধর্ম্মঘট আহূত হইয়াছে। এই ফেডারেশন কম্যুনিষ্ট-পরিচালিত জেনারেল লেবার কন্‌ফেডারেশনের সহিত সংযুক্ত। এই ধর্ম্মঘটের জন্য কম্যুনিষ্টদের উপর যতই দোষারোপ করা যাউক না কেন, দুর্ম্মূল্যতার জন্য ফ্রান্সের শ্রমিকরা যে তাহাদের বর্ত্তমান মজুরি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে না, সে-কথাও অনস্বীকার্য্য। ফ্রান্সের স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নগুলি অর্থাৎ Force Ouvriere এবং ক্রিশ্চিয়ান ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই ধর্ম্মঘট প্রশমনের ব্যাপারে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহাদের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহারা শ্রমিকদের ক্রয়শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হওয়া নিরোধের উদ্দেশ্যে মূল্যনিয়ন্ত্রণের জন্য গবর্ণমেণ্টকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট কিছুই করিতেছেন না।

কম্যুনিষ্টরা ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা হইতে বিতাড়িত হওয়ার পর হইতেই ফ্রান্সে এই অশান্ত অবস্থা দেখা দিয়াছে। ফ্রান্সের বর্ত্তমান জাতীয় পরিষদ বিভিন্ন দলের মধ্যে কম্যুনিষ্টরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহাদিগকে বাদ দিয়া স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন এবং মূল্যস্ফীতি নিরোধের কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ কিছুতেই সম্ভব নয়। সেই জন্য কম্যুনিষ্ট দলকে পুনরায় গবর্ণমেণ্টে গ্রহণের জন্য একটা আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু জেনারেল দ্য গল হুমকী দিয়া বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্টদের গ্রহণ করা হইলে যে-কোন উপায়েই হউক—বে-আইনী উপায় হইলেও তিনি ক্ষমতা দখল করিবেন। তাঁহার এই হুমকীকে শূন্যগর্ভ বলিয়া অনেকেই মনে করেন না। দ্য গলের পক্ষে আছে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সেনাবিভাগ এবং উত্তর-আফ্রিকা। আভ্যন্তরীণ বিভাগের মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায়ই জানাইয়াছেন যে, সেনা-বিভাগের অধিনায়কবর্গ জেনারেল দ্য গলের ভ্রমণের সময় মোটর, পেট্রল এবং রক্ষী দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ সাহায্য দান বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলে সামরিক অধিনায়কবর্গ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

উত্তর-আফ্রিকায় দ্য গলের প্রভাবের কথাও মাঝে-মাঝে শোনা যায়। সম্প্রতি আলজিরিয়ায় দ্য গলের নেতৃত্বে পৃথক্ একটি গবর্ণমেণ্ট গঠনের যে ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই ষড়যন্ত্রের সহিত ১৯৩৬ সালের ফ্রাঙ্কোর ষড়যন্ত্রের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কেনারী দ্বীপপুঞ্জ এবং স্পেনিশ মরোক্কো হইতে জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করিয়াছিলেন। দ্য গল ঐরূপ কোন চেষ্টা করিলে উহার পরিণাম কি হইবে, তাহা অনুমানের বিষয় নয়। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ফ্রান্সের ঘটনাবলী কোন আকার ধারণ করিবে, তাহাও অনুমান করা কঠিন। ফ্রান্স খনিমজুরদের সহিত সৈন্যদের সংঘর্ষের এবং দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধের পরিণাম সমগ্র ইউরোপে যে সুদূরপ্রসারী হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পশ্চিম-ইউরোপের সেনানীমণ্ডলী—

বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবুর্গ কর্ত্তৃক স্থায়ী সামরিক প্রতিষ্ঠান গঠন পশ্চিম ইউনিয়ন গঠনের অবশ্যম্ভাবী

পরিণতি। পশ্চিম ইউনিয়ন দেশরক্ষা পরিষদের যে সেনানীমণ্ডলী বা কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাহার চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহিনী সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারী। পশ্চিম-ইউরোপের স্থলবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন জেনারেল দ্য তাসিঞ্ (ফ্রান্স)। ভাইস এডমিরাল রবার্ট জ্যাক্সি (ফ্রান্স) নৌবহর প্রতিনিধি হিসাবে পশ্চিম-ইউরোপের ফ্লাগ-অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন এবং এয়ার মার্শাল স্যার জেমস রব (বৃটেন) নিযুক্ত হইয়াছেন পশ্চিম-ইউরোপের প্রধান বিমান সেনাপতি। বেনেলুক্স দেশত্রয়ের সেনা নায়করা সেনানী-মণ্ডলীতে অবস্থান করিবেন মাত্র। যিনি সেনানীমণ্ডলীর চেয়ারম্যান তিনি হইবেন পশ্চিম ইউনিয়নের যৌথ দেশরক্ষা ব্যবস্থার সর্ব্বাধিনায়ক। বৃটেন সর্ব্বাধিনায়কত্বের মর্য্যাদা লাভ করায় জন্যই বোধ হয় স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদ দেওয়া হইয়াছে ফ্রান্সকে। সর্ব্বাধিনায়কত্বের পদ ছাড়া বৃটেনকে দেওয়া হইয়াছে বিমান বাহিনীর সেনাপতির পদ। পশ্চিম-ইউরোপের জন্য এই সম্মিলিত কম্যাণ্ড গঠিত হওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কর্ম্মচারীরা না কি আনন্দিত হইয়াছেন। এই যৌথ দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে অর্থ সাহায্য দিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জল্পনা-কল্পনাও চলিতেছে। আমেরিকা যে অর্থ সাহায্য করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত এই রক্ষা-ব্যবস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও যোগদান করিবে। কিন্তু কি ভাবে যোগদান করিবে ইহাই প্রশ্ন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডাকে পশ্চিম-ইউরোপের সহিত সংযুক্ত করিয়া একটি আটলাণ্টিক রাষ্ট্র-পরিষদ গঠনের আলোচনাও চলিতেছে। এই সমস্তই যে তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তৃতীয় মহাযুদ্ধ যে রাশিয়ার সহিত সমস্ত পশ্চিমী রাষ্ট্রের যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই হইবে না, সে-কথা স্পষ্ট করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

আয়ারের সমস্যা—

আয়ার এক্সটারনেল এফেয়ারস্ এক্ট বাতিল করিবার জন্য যে আয়োজন করিয়াছে তাহা সম্পন্ন হইলে বৃটেনের সহিত তাহার ক্ষীণ সম্পর্কও আর থাকিবে না। অবশ্য এইরূপ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেও বৃটেন ও কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশের সহিত তাহার সম্পর্ক বজায় রাখিবার কি ব্যবস্থা করা সম্ভব তাহার জন্য উপায় চিন্তা করা হইতেছে। বৃটিশ মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে মিঃ এটলী এবং কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে উঁহাদের প্রধান মন্ত্রিদ্বয় যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বুঝায়, সামাজিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আয়ারের সহযোগিতা বিচ্ছিন্ন হইবে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সহযোগিতার ফরমূলা যে আবিষ্কৃত হইবে তাহাতেও সন্দেহ নেই। আন্তঃ-আমেরিকা ইউনিয়ন এইরূপ সহযোগিতার একটা দৃষ্টান্ত বটে।

বিভক্ত আয়র্লণ্ডকে আবার জোড়া লাগাইবার জন্যও চেষ্টা চলিতেছে। বিভাগের পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডে ৩২টি কাউণ্টি ছিল। তন্মধ্যে ২৬টি কাউণ্টি লইয়া পৃথক আয়ার রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ছয়টি কাউণ্টি লইয়া উত্তর-আয়র্লণ্ড গঠিত। এই ছয়টি কাউণ্টি লইয়া সমগ্র আলষ্টার নয়। আলষ্টারের কতক অংশ আয়ারের মধ্যেও পড়িয়াছে। বিভক্ত আয়র্লণ্ড আবার যদি জোড়া লাগে, তাহা হইলে ইতিহাসে এক নূতন ঘটনা সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই।

চীনের ভবিষ্যৎ—

চীনের জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রেসিডেণ্ট চিয়াং কাইশেক বলিয়াছেন, কম্যুনিজমই চীনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু। সামরিক পরিস্থিতি চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যেরূপ প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কম্যুনিজমকে যে তিনি চীনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু বলিয়া মনে করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। গত কয়েক মাস ধরিয়াই কম্যুনিষ্ট আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগ হইতেই এই তীব্রতা বৃদ্ধির নূতন স্তর আরম্ভ হয় এবং মাঞ্চুরিয়ার করিডরে মার্কিণ বিশেষজ্ঞ দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়। চীনা জাতীয় সরকারের পক্ষে বড় পরাজয় চীনা কম্যুনিষ্ট ফৌজ কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী চ্যাংচুন অধিকার। চ্যাংচুনের পতন অপেক্ষাও চীনা জাতীয় সরকারের ৬০তম এবং ৭ম সৈন্যবাহিনীর কম্যুনিষ্টদের নিকট আত্মসমর্পণের গুরুত্ব অনেক বেশী। এই দুইটি সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ চীনা জাতীয় সরকারের সৈন্যবিভাগে যে নৈতিক দুর্ব্বলতা সৃষ্টি করিবে তাহা-ই হইবে বেশী গুরুতর। চ্যাংচুন পতনের কয়েক দিন পূর্ব্বে শাণ্টুং প্রদেশের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলস্থ গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দর চেফু কম্যুনিষ্টরা দখল করিয়াছে। মুকডেনের পতনও আসন্ন।

চীনের গৃহযুদ্ধের অবস্থা যতটুকু বুঝা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় চীনদেশ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার আর বড় বেশী বাকী নাই। কম্যুনিষ্ট পার্টির সত্যিকার অভিপ্রায় কিছুই জানা যায় না। এপর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট অভিযানের গতিপ্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, দক্ষিণে ইয়েলো নদী পর্য্যন্ত অধিকার-বিস্তার করাই তাহাদের অভিপ্রায়। তাহাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে চীনদেশের উত্তর অঞ্চল কম্যুনিষ্ট চীন এবং দক্ষিণ অঞ্চল কুয়োমিণ্টাং চীন এই দুই সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে চীনদেশ বিভক্ত হইয়া পড়িবে। ইহার পরেও উত্তর চীনের মধ্যে সংঘর্ষ যে বন্ধ হইবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? এ দিকে মার্কিণ-রাষ্ট্রে এইরূপ আশঙ্কা সৃষ্টি হইয়াছে যে, চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় আর কয়েক মাসের বেশী টিকিবে না।

ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা—

ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বর্ত্তমানে কি রূপ? কম্যুনিষ্টদের অভ্যুত্থানের ফলে একই সময়ে বহু স্থানে যে গোলযোগ দেখা দেয়, ব্রহ্ম সরকার তাহা অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। অবশ্য এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট এবং সুসংবদ্ধ সংবাদ পাওয়া না গেলেও গত আগষ্ট মাসে এবং সেপ্টেম্বর মাসে অবস্থা যেরূপ অতিশয় গুরুতর হইয়াছিল, তাহা কতক পরিমাণে প্রশমিত করিতে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট যে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কম্যুনিষ্ট অভ্যুত্থান সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করার সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই। এই সমস্যার সমাধান করাও বড় সহজ হইবে না। গত ৩০শে আগষ্ট (১৯৪৮) থাটোন জেলায় যে কারেণ বিদ্রোহ সুরু হয় তাহাও দমন করা সম্ভব হইয়াছে। গত ১১ই অক্টোবরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু কারেণ ন্যাশনাল ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টের সহিত নূতন একটি চুক্তি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কারেণ-বিদ্রোহের মূল কারণ সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। কারেণ-বিদ্রোহের মূলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনা আছে, অনেকেই এইরূপ সন্দেহ

করিয়াছেন। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট এইরূপ অভিযোগ করিয়াছেন যে, কর্ণেল জন ক্রোমারটি টুলক কলিকাতা হইতে এই বিদ্রোহ সংগঠন করেন। লণ্ডন হইতে কর্ণেল টুলক গত ১৩ই অক্টোবর যে বিবৃতি দেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, কারেণ-বিদ্রোহের সহিত নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান গত আঠার মাস যাবৎ কলিকাতায় রহিয়াছে। তবে তিনিই উহার পরিচালক, এ কথা কর্ণেল টুলক অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, কারেণরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াকে কম্যুনিষ্টদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিম-বঙ্গের স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুত কিরণ-শঙ্কর রায় বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় ঐরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব তিনি অবগত নহেন।

ব্রহ্মদেশের ব্যবস্থা পরিষদে ভূমি জাতীয় করণ বিল পাশ হওয়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ব্রহ্মদেশের ভূমি যে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইবে, তাহা ব্রহ্ম শাসনতন্ত্র হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশই না কি এই বিলের বিরোধী। কিন্তু তাঁহাদের প্রধান আপত্তি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও উহা নির্দ্ধারণের প্রণালী লইয়া। চেট্টিয়ারগণ ব্রহ্মদেশের আবাদী জমিতে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা নিয়োগ করিয়াছেন। ইহারা ভারতীয়। ১৯৪১ সালে ব্রহ্মদেশের ধানের জমির শতকরা ২৫ ভাগ ইহাদের দখলে ছিল। তাঁহারা তাঁহাদের অভিযোগ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র—

ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই বুঝা যাই-তেছে না। ডাচ লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর জেনারেল ডাঃ ভ্যানমুকের পদত্যাগ আকস্মিক বটে, কিন্তু তাঁহার পদত্যাগে ইন্দোনেশিয়া প্রজা-তন্ত্রের কোন সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। হল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বীল ডাঃ ভ্যানমুকের স্থলাভিষিক্ত হওয়াতেও আশা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রকে বাদ দিয়াই ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজে অন্তর্ব্বর্ত্তী ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট গঠনের আয়োজন করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শুভেচ্ছা কমিটির কোন আপোষ-প্রস্তাবই হল্যাণ্ড গ্রহণ করে নাই। কাজেই শুভেচ্ছা কমিটির মার্কিণ প্রতিনিধি বর্ত্তমানে মীমাংসার চেষ্টা সম্বন্ধেও কিছু ভরসা করা সম্ভব নয়।

প্রায় এক মাস পূর্ব্বে ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্টদের এক অভ্যুত্থান হয়। ডাঃ হাতার গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রায় দমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। কিন্তু কম্যুনিষ্ট অভ্যুত্থান যে সম্পূর্ণরূপে দমিত হইয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। প্রকাশ, কম্যুনিষ্ট প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট মুসো এবং প্রধান মন্ত্রী ডাঃ আমীর সরীফুদ্দিন জাভার জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

মানুষের গতিপথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা যখন অলঙ্ঘনীয় বাধার সৃষ্টি করে—বেদনায় ও অবসাদে জীবন যখন বিষময় হয়ে ওঠে—ছন্দহীন হয়ে যায় যখন তার প্রতিটি মুহূর্ত্ত—সংসার যখন শুধুই তিক্ততায় আর রিক্ততায় পরিপূর্ণ বলে মনে হয়—তখন কে দেবে জীবনকে আবার মধুময় করে? কে ফিরিয়ে আনবে সংসারের শান্তি—হাসি—আনন্দ যা আছে শুধু বাঙ্গালীর সংসারেই? এই সব প্রশ্নগুলির উত্তর দেবে নন্দরাণীর সংসার—আর দেবে—ছবি দেখে যে আনন্দ আপনি কখনও পাননি!

—শ্রেষ্ঠাংশে—
অহীন্দ্র, ছবি, জহর, মিহির, রাণীবালা, শান্তিগুপ্তা, বনানী, ছন্দা, গীতশ্রী

উদয়ন
শেওড়াফুলি

মীনা
পাণিহাটী

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন

নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম ট্যাণ্ডন অপেক্ষা মাত্র ১৫০ ভোট বেশী পাইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। ডাঃ পট্টভি পাইয়াছেন ১১১৭ ভোট এবং শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন পাইয়াছেন ১০৪৭ ভোট। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গ হইতে ডাঃ পট্টভি পাইয়াছেন ৭২ ভোট এবং যুক্তপ্রদেশ হইতে ১২৯ ভোট। শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন পশ্চিমবঙ্গ হইতে পাইয়াছেন ১৮১ ভোট এবং যুক্তপ্রদেশ হইতে ৩২২ ভোট। এই দুইটি প্রদেশই স্বাধীনতা-সংগ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আত্মত্যাগ করিয়াছে।

এই নির্ব্বাচনের কথা লিখিতে গিয়া ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে-বার নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বিপুল ভোটে হারিয়া গিয়াছিলেন। যে সকল অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা সর্ব্বজনবিদিত—পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বের সুপারিশ ও ক্যানভাসিং সত্ত্বেও ডাঃ পট্টভি এত অধিক ভোটে হারিয়াছিলেন যে তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলাই চলে না। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন। ভারতের রাষ্ট্রশক্তি এখন কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বের হাতে। এই অবস্থায় প্রেসিডেণ্ট পদের বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল ব্যক্তিগত নয়, আদর্শগত পার্থক্য লইয়া। কংগ্রেসের মধ্যে যাঁহারা গোঁড়া দক্ষিণপন্থী, ডাঃ পট্টভি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বৃহৎ নেতৃত্বের নির্দ্দেশ নির্ব্বিচারে পালন করাই তাঁহার আদর্শ। সুতরাং বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডনকে অনেকে হিন্দুভাবাপন্ন মনে করেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা তাঁহার বিরুদ্ধে। তিনি নির্ব্বাচিত হইলে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেস ত্যাগ করিবেন বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল তাহা মিথ্যা হইলেও শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন যে ঠিক ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া নহেন, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

আগামী জয়পুর কংগ্রেসে প্রায় ৬৩০০ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করিবেন। ইঁহারাই প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের ভোটদাতা। ভোটের সংখ্যা দেখিয়া বুঝা যায় যে, প্রতিনিধিরা প্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত। এই ভোটদানই তাঁহাদের মতবাদের পরিচায়ক।

কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্ব বলিতে বর্ত্তমানে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং সম্ভবতঃ ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকেও বুঝায়। তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারেই কংগ্রেসের সকল কার্য্য পরিচালিত হয়। সুতরাং প্রেসিডেণ্ট তাঁহাদের দলের লোক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্টও কংগ্রেসী। এ ক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট ও কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের মধ্যে মতভেদ হইলে মুস্কিল। এই কারণে আচার্য্য কৃপালনী পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহারও এই অবস্থাই হইত। ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া নির্ব্বাচিত হওয়াতে অশোভন মতভেদের আর আশঙ্কা রহিল না। কিন্তু কংগ্রেসের প্রায় অর্দ্ধেক প্রতিনিধি বৃহৎ নেতৃত্বের তথা কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টের নীতি সমর্থন করেন না, তাহাও এই নির্ব্বাচনে পরিস্ফুট হইল।

মাহে ও ভারত সরকার

ভারতের অন্যতম ফরাসী উপনিবেশ মাহেতে জনসাধারণ ফরাসী সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লইবার পর শাসন-ভার ভারত সরকারকে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। কিন্তু ভারত সরকার এই অনুরোধ রক্ষা করিতে এখনও অগ্রসর হন নাই। নিরপেক্ষতার হেতু বোধ হয় আন্তর্জ্জাতিক নীতি। ইউ, এন, ও, বড় জোর গণভোটের কথা তুলিতে পারেন। কিন্তু যেখানে জনসাধারণ কোন সরকারকে চাহে না, এবং গণ-বিদ্রোহের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়, সেখানে নূতন করিয়া গণভোটের আবশ্যকতা কোথায়? ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা কি মিথ্যা প্রচার করিবে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে গিয়া যদি ভারত সরকার ও নেতারা জনসাধারণের ইচ্ছার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করেন, তবে দেশ শাসন করাই তো অসম্ভব হইয়া পড়ে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে ভারতের জনগণ সংগ্রাম করিতেছেন। আজ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে ভারতের জনগণ যে সংগ্রাম চালাইতেছেন তাহার মর্য্যাদা না দেওয়ার অর্থ সাম্রাজ্যবাদ সমর্থন করা।

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ

মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ সম্পর্কে ঘোষণার গোড়াতেই সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—"প্রথমতঃ, গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, যোগ্যতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সরকারী ব্যয় হ্রাস করার সর্ব্ববিধ চেষ্টা করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্যমূল্য আর যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, সে জন্য সমবেত ভাবে অবিলম্বে চেষ্টা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, যত অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব দ্রব্যমূল্য ন্যায়সঙ্গত ভাবে হ্রাস করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।" তিনটি উদ্দেশ্যই সাধু, কিন্তু কেমন করিয়া এগুলি কার্য্যে পরিণত করা হইবে তাহাই প্রশ্ন। বড় বড় সরকারী নেতা ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন কমাইয়া, পুলিশের জন্য খরচের বহর কমাইয়া গভর্ণমেণ্ট যদি ব্যয়-সঙ্কোচের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে জনসাধারণের শ্রদ্ধা পাইতেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন কথা চিন্তা করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের লইয়া যে কমিটি গঠিত হইবে, তাঁহারা বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির মধ্যে কোনটি আপাততঃ স্থগিত রাখা যাইতে পারে, তাহাই

বিবেচনা করিবেন। ইহার উপর কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও মাদকদ্রব্য বর্জ্জনের জন্য কোন অর্থ সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে না। অর্থাৎ এই দুইটি পরিকল্পনা মুদ্রাস্ফীতি রোধের দোহাই দিয়া শেষ অবধি ধামা-চাপা দেওয়া হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। এক কথায় মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ ও ব্যয়-সঙ্কোচ মানে জনসাধারণের কল্যাণকর ব্যবস্থাগুলিকে বলি দেওয়া। "টপহেভী" সরকারের প্রকৃত অপব্যয় নিবারণ নহে। অথচ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমাদের নিজেদের হাতে!

সরকারী আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কৃষি আয়কর বসাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। উত্তরাধিকার বিলের আলোচনা দ্রুত শেষ করিবার কথা বলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অতিরিক্ত মুনাফাকরের যে অংশ সরকারের নিকট জমা আছে এবং যে অংশ প্রত্যর্পণ করিবার সময় হইয়াছে, তাহা আরও তিন বৎসর প্রত্যর্পণ না করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সঙ্গে অল্প সঞ্চয় আন্দোলন জোরদার এবং লোভনীয় করিবার জন্য পোষ্ট অফিস মারফৎ অধিকতর সুবিধা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারত সরকার বলিয়াছেন,—"কল-কারখানার ক্ষয়পূরণ কাণ্ডকে আরও অধিক পরিমাণে আয়কর হইতে রেহাই দেওয়া হইবে। নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য আয়কর দিতে হইবে না। কাঁচা মাল ও যন্ত্রপাতি আমদানীর উপর বাণিজ্য-শুল্ক হ্রাস করা হইবে। যাঁহারা যন্ত্রপাতি আনিবেন, তাঁহাদের অতিরিক্ত মুনাফা-কর প্রত্যর্পণ করিতে আপত্তি থাকিবে না।" যখন বাজেটে ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারী আয় বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক, ঠিক সেই সময় দেশের ধনিক শ্রেণীকে তোষণ করিবার জন্য ভারত সরকার এই ভাবে আয়ের পথ রুদ্ধ করিতে বসিয়াছেন।

অল্পবিত্তদের ধনসঞ্চয়ের যে পরিকল্পনা ভারত সরকার করিয়াছেন, তাহাতে সরকারী তহবিল খুব বেশী পূর্ণ হইবে না। সরকারী ঋণ-ভাণ্ডার চিরকাল ধনিক শ্রেণীর প্রদত্ত অর্থেই পূর্ণ হয়, আর ঠিক এই জন্যই ধনীরা গত বার অসহযোগিতা করায় সরকারী ঋণের পরিকল্পনা বানচাল হইয়া গিয়াছিল। মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য সরকার কেবল উৎপাদন বৃদ্ধির কথাই ভাবিয়াছেন, এবং উৎসাহ দিবার জন্য আয়কর রেহাই ঘুষ দিয়া শিল্পপতিদের তুষ্ট করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু কেবল উৎপাদন বৃদ্ধি হইলেই মূল্য কমে না। বস্তুত পক্ষে জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধির জন্য দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি ও পাইকারী কারবারী দল যে দায়ী, এ সত্য অত্যন্ত নির্ম্মম ভাবে গত এক বৎসরে প্রমাণিত হইয়া গেলেও ভারত সরকার তাহা দেখিয়াও দেখেন নাই। ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে, কেরোসিন, লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট প্রভৃতির উন্নততর বণ্টন ব্যবস্থা করা হইবে এবং চিনির দর হ্রাস সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে। কিন্তু এই তথাকথিত বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বিশেষ লাভ হইবে কি? এই ব্যবস্থার পাশাপাশি চোরাকারবার অবাধেই চলিতে থাকে, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। মূল্যবৃদ্ধির পাপ-চক্রও রোধ হইবে না। আসল কথা, জিনিষপত্রের উৎপাদনের যন্ত্রগুলির উপর যত দিন একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্ব থাকিবে, তত দিন উৎপাদনের হিসাব কষিয়া তাহারা নিয়ন্ত্রণকে প্রহসনে পরিণত করিতে এবং চোরা-কারবারে মুনাফা লাভ করিতে তাহারা কসুর করিবে না। দেখা যাইতেছে, মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য শিল্পপতিরা যে সুপারিশ করিয়াছিলেন, ভারত সরকার তাহাই গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের স্বার্থ একেবারেই ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছেন।

বাস্তুহারা

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা যে দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছেন তাহা সকলেই জানেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা যে কিরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িতেছেন তাহাও বলিবার প্রয়োজন নাই। নিজ বাস্তুভিটা কেহ সখ করিয়া ছাড়িয়া আসে না—শত অসুবিধা সত্ত্বেও প্রাণপণে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। নেহাৎ নিরুপায় হইলেই বাস্তুত্যাগ করে। এই কারণ যে কি তাহার উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যখন কেহ এই সত্যকে ধামা-চাপা দিবার চেষ্টা করে তখন সত্যই অসহনীয় লাগে। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা মৌলানা আক্রাম খাঁর মতে সেখানকার হিন্দুরা চলিয়া আসিতেছেন না। ইহা কেবল হিন্দু নেতাদের প্রচার-কার্য্যের নাটকীয় অতিরঞ্জন। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু-বালিকাদের জোর করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের যুবকদের সহিত বিবাহ দেওয়া হইতেছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, মৌলানা সাহেব তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে হিন্দুদের গৃহে যে সকল খানাতল্লাস হইয়াছে, মৌলানার দৃষ্টিতে তাহাও নাটকীয় অতিরঞ্জন। মানুষ নিজের মাপকাটি দিয়াই সকলকে বিচার করে। তাহা না হইলে এই সকল ঘটনার পরও তিনি বলিতে পারেন যে, হিন্দুরা তথায় অত্যন্ত সুখে ও শান্তিতে বাস করিতেছে! বাস্তুত্যাগ করার কথা প্রচার-কার্য্যের নাটকীয় অতিরঞ্জন মাত্র। এবার পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের পূজা যেরূপ শান্তিপূর্ণ ভাবে হইয়াছে, বঙ্গবিভাগের পূর্ব্বে কখনও তাহা হয় নাই। অথচ আমরা জানি, শতকরা আশীটা পূজা বন্ধ ছিল এবং পূজার আমোদ-আহ্লাদ, আনন্দ-উৎসব কিছুই হয় নাই। শিয়ালদহ ষ্টেশনে আগত পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীরা যে কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, তাহা করুণ ও মর্ম্মান্তিক। সরকারী বিবৃতি বরং কমাইয়াই দেওয়া হয়। অতিরঞ্জন তাহাতে একেবারেই থাকে না।

এই প্রসঙ্গে মিঃ সামসুদ্দীন আমেদের বিবৃতির কথাও আমরা স্মরণ না করিয়া পারি না। তাঁহার মতে চাউল, কাপড় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির জন্য হিন্দুরা পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। মুসলিম লীগ, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড এবং বর্ত্তমানে আনছার-বাহিনী পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে যে ভীতি সঞ্চার করিতেছে সে কথা উল্লেখ করা তিনি নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। এ স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মিঃ সামসুদ্দীন আহমদ পূর্ব্বে জাতীয়তাবাদী ছিলেন। সেই জন্যই তিনি এখন নূতন লীগপন্থী হইয়া উগ্র আকার ধারণ করিয়াছেন। তবুও তিনি মৌলানা সাহেবের মত নির্লজ্জ মিথ্যা ভাষণ এবং হিন্দু নেতাদের উপর দায়িত্বহীন উক্তির দোষারোপ করেন নাই। মৌলানা সাহেব লীগ নেতাদের মধ্যে উগ্রতম এবং হিন্দুবিদ্বেষে ভরপুর। বোধ হয়, পূর্ব্বে বর্ণশ্রেষ্ঠ হিন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই এই প্রতিক্রিয়া।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের অর্থ ও শিল্পসচিব চৌধুরী হামিদুল হক

বলিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে এক জনও পশ্চিমবঙ্গে আসেন নাই। তবে জীবিকার সন্ধানে কেহ কেহ আসিয়া থাকিতে পারেন। কলিকাতার পথে-ঘাটে যাহাদের দেখি, শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাঁহারা ভীড় করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা কি সকলেই মায়া মাত্র, বাস্তব অস্তিত্ব নাই? যাঁহারা সরকারী আশ্রয়কেন্দ্রে জমায়েৎ হইয়াছেন, তাঁহারা কি পশ্চিমবঙ্গেরই লোক? পূর্ব্ব-পাকিস্থান গভর্ণমেণ্টের দুর্নাম রটাইবার জন্যই কি এইরূপ করিতেছেন? দুই-তিন বৎসরের শিশু-সন্তান কোলে যে সকল স্ত্রীলোক শিয়ালদহ ষ্টেশনে বসিয়া আছেন, তাঁহারা কি নিজের ও সন্তানদের চাকুরীর সন্ধানে এখানে আসিয়াছেন? এই ধরণের প্রলাপ উক্তি সম্পর্কে আলোচনা করাও লজ্জার বিষয়। পূর্ব্ব-পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট বাস্তুহারাদের কথা অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু আমরা তো পারি না। চোখের সামনে আশ্রয়প্রার্থীদের দুরবস্থা দেখিতেছি। ভারত সরকার কি করিতেছেন তাহাই বিবেচ্য। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেস যখন ভারত বিভক্তি মানিয়া লইয়াছে তখন পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের পক্ষে সোজাসুজি পাকিস্থানী বনিয়া গিয়া সেখানকার মুসলমানদের প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পাশাপাশি বাস করাই যুক্তিসঙ্গত, পাকিস্থানী কর্ত্তৃপক্ষের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি বশতঃ আপাতত যদি হিন্দুদের কিঞ্চিৎ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা নীরবে সহ্য করিতে হইবে। আজ না হয় কাল সেই সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা উদারতায় পরিণত হইতে বাধ্য। মোট কথা, পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিও না। রাজকোষ শূন্য। কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ ও আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাগুলি লইয়া আমরা ভয়ানক ব্যস্ত। এই সকল তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া আমাদের বিরক্ত ও বিব্রত করিও না।

সরকারের এই বিবৃতিতেই কি সমস্যার সমাধান হইয়া গেল? কোন সাহসে হিন্দুরা সেখানে থাকিবেন? পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু নেতারা যদি প্রথমেই রণে ভঙ্গ দিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া হাজির না হইতেন, তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণ আপনাদিগকে এত অসহায় বোধ করিতেন না। ভারত সরকার পাকিস্থানী গভর্ণমেণ্টের সহিত জনগণকে ভুলাইবার জন্য একটা আন্তঃ-ডোমিনিয়ন চুক্তি করিলেন বটে, কিন্তু পাকিস্থানী গভর্ণমেণ্ট তাহার এক কানা কড়িও মূল্য দিল না। ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলিয়া দিল।

তাহা হইলে উপায়? পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের পক্ষে বাস অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে তাঁহাদের জন্য স্থানাভাব। রাজকোষে অর্থাভাব। এই সমস্যার কি কোন সমাধানই নাই? চুক্তি যুক্তি কিছুতেই সুফল হয় নাই। পাকিস্থানে যদি হিন্দুদের স্থান না হয় তাহা হইলে সর্ব্ব সঙ্কোচ দূর করিয়া পাকিস্থানের কিয়দংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী ভারত গভর্ণমেণ্টকে উত্থাপন করিতে হইবে।

টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অগ্নিকাণ্ড

কলিকাতার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অকস্মাৎ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে শুধু যে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে সাময়িক অচল অবস্থার সৃষ্টির উপক্রম হইয়াছে, তাহা নহে, ভবিষ্যতে টেলিফোন সংখ্যা বৃদ্ধির এবং টেলিফোন ব্যবস্থাকে উন্নত করিবার পরিকল্পনাও অনেক অংশে ব্যাহত হইবে বলিয়া মনে হয়। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১৭০০ টেলিফোন কনেকশান ভস্মীভূত হইয়াছে, ৫০ লক্ষ হইতে কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, ক্লাইভ ষ্ট্রীট অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য টেলিফোন বন্ধ হওয়াতে নিদারুণ অসুবিধাগ্রস্ত হইয়াছে। এমন কি, কেন্দ্রীয় পুলিশ-ঘাঁটি লালবাজারও টেলিফোন যোগাযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন। ক্ষয়-ক্ষতি ও অসুবিধার পরিমাণ এই সামান্য বিবরণ হইতেই অনুমান করা যায়। অগ্নিকাণ্ডের কারণ কি, তাহা এখনও জানা যায় নাই। সমস্ত ক্ষতি-পূরণ করিতে না কি দুই তিন বৎসর সময় লাগিবে। যাহাই হোক, এত বড় একটা দুর্ঘটনায় কোন প্রাণহানি ঘটে নাই, ইহাই সুসংবাদ।

পাকিস্তানীদের সীমান্তে হানা

কেবল মাত্র ভারতীয় ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্তে গণ্ডগোল করিয়াই যে পাকিস্তান বীরবৃন্দ তুষ্ট নহেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিছু দিন ধরিয়া পাকিস্তানী সৈন্যরা পশ্চিম-পাকিস্থান হইতে পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের উপর হানা দিতেছিল। এবার পূর্ব্ববঙ্গ হইতে তাহারা আসামের উপর হানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই হানাদারদের কাজ শুধু সীমান্তের অপর পারে নীরিহ অধিবাসীদের উপর গুলীচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারা ভারতের অধিবাসীদিগকে পাকিস্থানেও টানিয়া লইয়া গিয়াছে। এই ভাবে হানাদারী চালাইবার সঙ্গে অনেক পাকিস্থানী লীগভক্ত আসামের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কাশ্মীর সংগ্রামের এক বৎসর

পাকিস্তানের অনুপ্রেরণায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় আক্রমণকারী বিভিন্ন দল ১৯৪৭ সালের ২২শে অক্টোবর কাশ্মীর ও জম্মু সীমান্ত পার হইয়া একাধিক স্থানে আক্রমণ করিল। তাহাদের প্রধান লক্ষ্য শ্রীনগর অধিকার করিবার জন্য আক্রমণকারী দলের প্রধান বাহিনী ডোমেল-বারামুলা রাস্তা ধরিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। আক্রমণকারীরা শ্রীনগরের পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্র মহুরা নামক স্থানটি অধিকার করিয়া লইল এবং রাজধানী শ্রীনগরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করিল। এইবার বারামুলা ও শ্রীনগরের পতনের আশঙ্কা দেখা দিল। ২৫শে অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা ভারত সরকারের নিকট সামরিক সাহায্য চাহিয়া এবং ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিতে চাহিয়া এক জরুরী আবেদন প্রেরণ করিলেন। পরবর্ত্তী দিবস মহারাজা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন এবং ভারত সরকার শ্রীনগরে সৈন্য পাঠাইবার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২৭শে অক্টোবর লেঃ কর্ণেল ডি আর রায়ের অধীনে তিন কোম্পানী সৈন্যসহ এক দল সৈন্য বিমানযোগে শ্রীনগর গমন করে। শ্রীনগর পৌছিয়া কর্ণেল রায় উভয়-সঙ্কটে পড়িলেন। তাহাকে তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ ততক্ষণে শত্রু বারামুলা পৌছিয়া গিয়াছে। উহা সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া লইতে পারিলে সমগ্র শ্রীনগর উপত্যকা শত্রুর নিকট উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে। শত্রু যদি একবার শ্রীনগর উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া ছড়াইয়া পড়িতে পারে, তবে সব শেষ হইয়া যাইবে। তিনি মাত্র

এক কোম্পানী সৈন্য লইয়া বারামুলায় শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তিনি পশ্চাৎভাগ রক্ষার জন্য এক কোম্পানী এবং বিমান-ঘাঁটি পাহারা দিবার জন্য আর এক কোম্পানী সৈন্য রাখিয়া গেলেন। কর্ণেল রায়ের আক্রমণের ফলে শত্রু ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল—কর্ণেল রায়ের সৈন্যদলেও বহু হতাহত হইল। অবশেষে শত্রু-সৈন্যের সংখ্যাধিক্যের দরুণ কর্ণেল রায় পর্য্যুদস্ত ও স্বয়ং নিহত হইলেন। আক্রমণকারীরা পুনরায় সুগঠিত হইবার পূর্ব্বেই পর্য্যাপ্ত সংখ্যক সৈন্য বিমানযোগে শ্রীনগর প্রেরিত হইল। প্রথম ভারতীয় সৈন্যদল শ্রীনগর অবতরণ করিবার দ্বাদশ দিন পরে ৭ই নভেম্বর প্রত্যূষে ভারতীয় সৈন্যদল আক্রমণাত্মক অংশ গ্রহণ করিল। শ্রীনগর হইতে মাত্র ৪ মাইল দূরে শত্রু-সেনার সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। ১২ ঘণ্টা পর শত্রুদল বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিল। ৮ই নভেম্বর অপরাহ্নে শ্রীনগর উপত্যকার প্রবেশ-পথ বারামুলা পুনর্দখল করিয়া শ্রীনগর নিরাপদ করা হইল। ১৪ই নভেম্বরের মধ্যে শত্রুদলকে তাড়া করিয়া শ্রীনগরের ৬৫ মাইল দূরে উরি পর্য্যন্ত বিতাড়িত করা হইল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ১২ মাস পরে আজও শত্রু সেখানেই আছে—তাহার অগ্রসরের সকল প্রয়াসই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে সুদূর উত্তরাঞ্চলে গিলগিট নামক স্থানে পাকিস্তানী-তাবাপন্ন আক্রমণকারিগণ সেখানকার শাসন-কর্ত্তাকে কারারুদ্ধ করিয়া নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা চালু করে। প্রায় ছয় মাস কাল শ্রীনগর হইতে ঐ স্থানে যাতায়াত করা চলিত না। আবহাওয়া ভাল থাকিলে কেবল মাত্র খচ্চরের সাহায্যেই ঐ স্থানে যাতায়াত করা চলিত। ভারতীয় সৈন্যগণ পূর্ব্ব হইতে কাশ্মীর ও জম্বুতে ব্যস্ত ছিল। তাহারা গিলগিট একেবারে ছাড়িয়া আসিবার সিদ্ধান্ত করে। হানাদারগণ উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত লাডাকস্থানে সামরিক অভিযান চালাইবার জন্য গিলগিট স্থানটিকে সামরিক কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া তুলে। গত ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে আমাদের সৈন্যগণ নৌশেরা হইতে সংগ্রাম চালাইয়া কট ও কামান গোশাগালা নামক শত্রুদের দুইটি সুরক্ষিত ঘাঁটী দখল করে। উহার পাঁচ দিন পরে কাশ্মীরের বৃহত্তম সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শত্রুগণ ৬ হাজার সৈন্য লইয়া নৌশেরার উপর তিন দিক্ দিয়া আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করে। সে সময় পরলোকগত ব্রিগেডিয়ার ওসমান ভারতীয় সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন। তার পর হানাদারদের দৃষ্টি সুচেতগড়, রণবীর সিংপুরা ও সবকঠুয়ার উপর পতিত হয়। তাহারা পাঠানকোট-জম্মু রাস্তায় আমাদের সরবরাহ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভারতীয় বাহিনী তৎপরতার সহিত আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করায় এই আপদ বিদূরিত হইয়া যায়। ভারতীয় সৈন্যগণ ১৮ই মার্চ্চ তারিখে নৌশেরায় সাফল্য লাভ করিবার পর ঝানগড় পুনরধিকার করে।

গ্রীষ্মকালে বরফ গলিতে আরম্ভ করিলে উরি এলাকায় যুদ্ধের গতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তখন উরি-মহুরা রাস্তার উত্তর ও দক্ষিণের অবরুদ্ধ অঞ্চল হইতে শত্রুদিগকে বিতাড়িত করাই আমাদের সৈন্যদের প্রধান কার্য্য ছিল। সালামবাদ হইতে প্রথমে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হয়। তার পর ভারতীয় সৈন্য গ্রীষ্মকালীন অভিযান আরম্ভ করে। হাণ্ডওয়ারা হইতে অভিযান আরম্ভ হয়। উহার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে এক দল সৈন্য টিথোয়াল অধিকার করে। আর এক দল সৈন্য উরি হইতে ডোমেল রোড ধরিয়া উপরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। শত্রুদের প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও আমাদের সৈন্য গত ১২ই এপ্রিল তারিখে রাজৌরী অধিকার করে। রাজৌরীর পূর্ব্ব দিকে তিনটি বড় বড় গর্ত্তে তাহারা বহু অমুসলমান স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুদের মৃতদেহ আবিষ্কার করে। যাহারা পঙ্গু অবস্থায় কোন প্রকারে বাঁচিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতে হানাদারদের অত্যাচারের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। পুঞ্চ এলাকায় ভারতীয় সৈন্যগণ তাহাদের অবস্থান সুদৃঢ় করিয়া লইয়া শত্রুদিগকে হটাইয়া দেওয়ার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল। পুঞ্চ সহরের খাদ্য-সমস্যা দূর করিবার জন্য ভারতীয় সৈন্যগণ নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সে সময় ঐ সহরে বহু আশ্রয়প্রার্থী ছিল। কাশ্মীর উপত্যকার চারি দিকে ভারতীয় সৈন্যের লৌহচক্র ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া হানাদারগণ লাডাক নামক বৌদ্ধ প্রদেশে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়। যাইবার পথে তাহারা বহু বৌদ্ধ বিহার অপবিত্র ও লুণ্ঠন করিয়া যায়। তাহারা স্কার্দুতে ১৪ই আগষ্ট তারিখে রাজ্যের সৈন্যবাহিনীকে পরাভূত করে এবং লে অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ভারতীয় বাহিনী তৎক্ষণাৎ রাজ্যের সৈন্য-বাহিনীর সহিত মিলিত হইবার সিদ্ধান্ত করে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম ভারতীয় সৈন্যদল লে সহরে প্রবেশ করে। জুন মাসে রাজকীয় ভারতীয় বিমান বাহিনী হিমালয় অঞ্চলের ২৩ হাজার ফুট উপর দিয়া উড়িয়া লে সহরে অবতরণ করে।

গত জুলাই মাসের প্রথমে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের কাশ্মীর কমিশন ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। যাহাতে অবস্থা-সঙ্কট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য কমিশনের সদস্যগণ ভারত ও পাকিস্তানের গভর্ণমেণ্টদিগকে অনুরোধ করেন। পাকিস্তান তাঁহাদের অনুরোধে কর্ণপাত করে নাই। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের আবেদনে সাড়া দেন। শীতাগমের সঙ্গে সঙ্গে জম্মু প্রদেশে প্রচণ্ড সংগ্রামের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয়। পুঞ্চের চতুর্দ্দিকে বাগ ও মীরপুরে শত্রু আক্রমণের জন্য মরিয়া হইয়া প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে সমুচিত অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য ভারতীয় বাহিনীও প্রস্তুত।

পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র দৈনিক বসুমতীর প্রবেশ নিষিদ্ধ

পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের এক প্রেস নোটে প্রকাশ, পূর্ব্ববঙ্গ সরকার গত ২১শে অক্টোবর হইতে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র 'দৈনিক বসুমতী'র প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, জন-নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই এরূপ করা হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গ সরকার পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত বাঙ্গালা সাপ্তাহিক "নয়া দুনিয়া"র প্রবেশও গত ২১শে অক্টোবর হইতে নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৭শ বর্ষ—কার্ত্তিক : ১৩৫৫ সাল

২য় খণ্ড : ১ম সংখ্যা

কলিকালের কোন্ ভক্তি ?

'ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে।' তেমন ব্যাকুল হয়ে ডাকতে পারলে তাঁর দেখা দিতেই হবে।

সে দিন তোমায় যা বল্লুম—ভক্তির মানে কি—না কায়মনবাক্যে তাঁর ভজনা। কায় ;—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কাণে তাঁর ভাগবত শোনা, নাম গুণ কীর্ত্তন শোনা ; চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন—অর্থাৎ সর্ব্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ তাঁর স্তব-স্তুতি, তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন, এই সব করা।

কলিতে নারদীয় ভক্তি—সর্ব্বদা তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন করা। যাদের সময় নাই, তারা যেন সন্ধ্যা সকালে হাততালি দিয়ে একমনে হরিবোল হরিবোল ব'লে তাঁর ভজনা করে।

ভক্তির আমিতে অহঙ্কার হয় না। এ আমিতে অজ্ঞান করে না ; বরং ঈশ্বর লাভ করিয়ে দেয়। এ আমি আমির মধ্যে নয়। যেমন হিংচে শাক শাকের মধ্যে নয় ; অন্য শাকে অসুখ হয় ; কিন্তু হিংচে শাক খেলে পিত্তনাশ হয় ; উল্টে উপকার হয় ; মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয় ; অন্য মিষ্ট খেলে অপকার হয়, মিছরি খেলে অম্বল নাশ হয়।

নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি পাকলে ভাব হয়। ভাব ঘনীভূত হলে মহাভাব হয়। সর্ব্বশেষে প্রেম।

প্রেম রজ্জুর স্বরূপ। প্রেম হলে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন, আর পালাতে পারেন না। সামান্য জীবের ভাব পর্য্যন্ত হয়। ঈশ্বরকোটী না হলে মহাভাব প্রেম হয় না। চৈতন্যদেবের হয়েছিল।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

সৌন্দর্য্য ও প্রেম

(সৌন্দর্য্য ও প্রেম-রচনার কয়েকটি ছিন্ন অংশ)

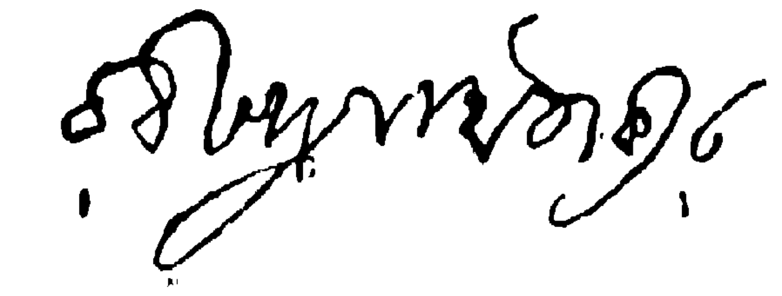

সৌন্দর্য্য বিশ্বপ্রেমী

যে সুন্দর, কেবল যে তাহার নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে তাহা নয়;—সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য সমস্ত জগতের সঙ্গে। সৌন্দর্য্য জগতের অনুকূল। কদর্য্যতা সয়তানের দলভুক্ত। সে বিদ্রোহী। সে যে টিঁকিয়া থাকে সে কেবল মাত্র গায়ের জোরে। তাও সে থাকিত না, কারণ, কতটুকুই বা তাহার গায়ের জোর; কিন্তু প্রকৃতি তাহা হইতেও বুঝি সৌন্দর্য্য অভিব্যক্ত করিবেন।

* * *

মনের মিল

জগতের সাধারণের সহিত সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্য ঐক্য আছে। জগতের সর্ব্বত্রই তাহার তুলনা তাহার দোসর মেলে। এই জন্য সৌন্দর্য্যকে সকলের ভাল লাগে। সৌন্দর্য্য যদি একেবারেই নূতন হইত, খাপছাড়া হইত, হঠাৎ-বাবুর মত একটা কিম্ভূত পদার্থ হইত, তাহা হইলে কি তাহাকে আর কাহারো ভাল লাগিত?

আমাদের মনের মধ্যেই এমন একটা জিনিষ আছে, সৌন্দর্য্যের সহিত যাহার অত্যন্ত ঐক্য হয়। এই জন্য সৌন্দর্য্যকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমার "মিত্র" বলিয়া মনে হয়। জগতে আমরা "সদৃশকে" খুঁজিয়া বেড়াই। যথার্থ সদৃশকে দেখিলেই হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ডাকিয়া আনে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেমন আমাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাই, এমন আর কোথায়? সৌন্দর্য্যকে দেখিলেই তাহাকে আমাদের "মনের মত" বলিয়া মনে হয় কেন? সেই আমাদের মনের সঙ্গে ঠিক মেলে, কদর্য্যতার সঙ্গে আমাদের মনের মিল হয় না।

আমরা সকলেই যদি কিছু না কিছু সুন্দর হইতাম, তাহা হইলে সুন্দর ভালবাসিতাম না।

* * *

আমরা সুন্দর

প্রকৃত কথা এই যে আমরা বাহিরে যেমনই হই না কেন, আমরা বাস্তবিকই সুন্দর, সেই জন্য সৌন্দর্য্যের সহিতই আমাদের যথার্থ ঐক্য দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য-চেতনা সকলের কিছু সমান নয়। যাহার হৃদয়ে যত সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছে, সে ততই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে। সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার নিজের ঐক্য ততই সে বুঝিতে পারে, ও ততই সে আনন্দ লাভ করে। আমি যে ফুল এত ভালবাসি তাহার কারণ আর কিছু নয়, ফুলের সহিত আমার হৃদয়ের গূঢ় একটি ঐক্য আছে—আমার মনে হয় ও একই কথা, যে সৌন্দর্য্য ফুল হইয়া ফুটিয়াছে, সেই সৌন্দর্য্যই অবস্থাভেদে আমার হৃদয় হইয়া বিকশিত হইয়াছে; সেই জন্য ফুলও আমার হৃদয় চাহিতেছে, আমিও ফুলকে আমার হৃদয়ের মধ্যে চাহিতেছি। মনের মধ্যে একটি বিলাপ উঠিতেছে—যে, আমরা এক পরিবারের লোক, তবে কেন অবস্থান্তর নামক দেয়ালের আড়ালে পর হইয়া বাস করিতেছি; কেন পরস্পরকে সর্ব্বতোভাবে পাইতেছি না?

* * * *

সুন্দর সুন্দর করে

সুন্দর আপনি সুন্দর এবং অন্যকে সুন্দর করে। কারণ, সৌন্দর্য্য হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত করিয়া দেয়, এবং প্রেমেই মানুষকে সুন্দর করিয়া তুলে। শারীরিক সৌন্দর্য্যও প্রেমে যেমন দীপ্তি পায় এমন আর কিছুতে না। মানুষের মিলনে যেমন প্রেম আছে, পশুদের মিলনে তেমন প্রেম নাই, এই জন্য বোধ করি পশুদের অপেক্ষা মানুষের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুটতর। যে মানুষ ও যে জাতি পাশব, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, সে মানুষের ও সে জাতির মুখশ্রী সুন্দর হইতে পারে না। দেখা যাইতেছে, দয়ায় সুন্দর করে, প্রেমে সুন্দর করে, হিংসায় ঘৃণায় নিষ্ঠুরতায় সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়। জগতের অনুকূলতাচরণ করিলে সুন্দর হইয়া উঠি ও প্রতিকূলতা করিলে জগৎ আমাদের গালে কদর্য্যতার চূণকালী মাখাইয়া তাহার রাজপথে

ছাড়িয়া দেয়, আমাদিগকে কেহ সমাদর করিয়া আশ্রয় দেয় না।

*　*　*　*

সত্যং শিবং সুন্দরম্

সত্য কেবল মাত্র হওয়া, শিব থাকা, সুন্দর ভাল করিয়া থাকা। সত্য শিব না হইলে থাকিতে পারে না, বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অসত্য হইয়া যায়। শিব আপনার শিবত্বের প্রভাবে অবশেষে সুন্দর হইয়া উঠে। সত্য আমাদিগকে জন্ম দেয়, শিব আমাদিগকে বলপূর্ব্বক বাঁচাইয়া রাখে, সুন্দর আমাদিগকে আনন্দ দিয়া আমাদের স্বেচ্ছার সহিত বাঁচাইয়া রাখে। মনুষ্য-জীবনে সত্য, কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান শিব, প্রেম সুন্দর। বিজ্ঞান সত্য, দর্শন শিব, কাব্য সুন্দর।

*　*　*　*

লক্ষ্মী

লক্ষ্মী, তুমি শ্রী, তুমি সৌন্দর্য্য, আইস, তুমি আমাদের হৃদয়-কমলাসনে অধিষ্ঠান কর। তুমি যাহার হৃদয়ে বিরাজ কর, তাহার আর দারিদ্র্য-ভয় নাই; জগতের সর্ব্বত্রই তাহার ঐশ্বর্য্য। যাহারা লক্ষ্মীছাড়া, তাহারা হৃদয়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ পোষণ করিয়া টাকার থলি ও স্থূল উদর বহন করিয়া বেড়ায়। তাহারা অতিশয় দরিদ্র, তাহারা মরুভূমিতে বাস করে; তাহাদের বাসস্থানে ঘাস জন্মায় না, তরুলতা নাই, বসন্ত আসে না।

তুমি বিষ্ণুর গেহিনী। জগতের সর্ব্বত্র তোমার মাতৃস্নেহ। তুমি এই জগতের শীর্ণ কঠিন কঙ্কাল প্রফুল্ল কোমল সৌন্দর্য্যের দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছ। তোমার মধুর করুণ বাণীর দ্বারা জগৎ পরিবারের বিরোধ বিদ্বেষ দূর করিতেছ। তুমি জননী কি না, তাই তুমি শাসন হিংসা ঈর্ষ্যা দেখিতে পার না। তুমি বিশ্ব-চরাচরকে তোমার বিকশিত কমলদলের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া অনুপম সুগন্ধে মগ্ন করিয়া রাখিতে চাও। সেই সুগন্ধ এখনি পাইতেছি; অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে বলিতেছি, "কোথায় গো! সেই রাঙা চরণ দুখানি আমার হৃদয়ের মধ্যে একবার স্থাপন কর, তোমার স্নেহ-হস্তের কোমল স্পর্শে আমার হৃদয়ের পাষাণ-কঠিনতা দূর কর। তোমার চরণ-রেণুর সুগন্ধে সুবাসিত হইয়া আমার হৃদয়ের পুষ্পগুলি তোমার জগতে তোমার সুগন্ধ দান করিতে থাকুক।"

এই যে, তোমার পদ্মবনের গন্ধ কোথা হইতে জগতে ভাসিয়া পৌঁছিয়াছে। চরাচর উন্মত্ত হইয়া মধুকরের মত দল বাঁধিয়া গুন্-গুন্ গান করিতে করিতে সুনীল আকাশে চারি দিক হইতে উড়িয়া চলিয়াছে।

—ভারতী, আষাঢ়, ১২৯১

সার এলিজা ইম্পে

[ইনি সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন, হেষ্টিংসএর বন্ধু, অপবিচারে
ইনিই মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ দেন]

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নাইট তুমি?
　　বলতে ঘৃণায় জিহ্বা নাহি সরে,
　　এমন নিঠুর ব্যঙ্গ কি কেউ করে?
বিচারপতি? একেবারে বিচার-বুদ্ধি-হীন
　　মন ও মনোবৃত্তি কি মলিন!
'জেফ্রি' তোমার স্বগোত্রীয়, নরপশুর দল—
　　কলঙ্কিত করলে ভূমণ্ডল।
লিখ্‌লে অতি-পক্ষপাতে দুষ্ট তোমার মন
　　'রায়' না বিয়োগান্ত প্রহসন?

সুপ্রিম আদালতের তুমি সুপ্রিম কলঙ্ক
　　মূর্ত্ত পাপ ও নির্লজ্জ দম্ভ!
　　(মূর্ত্ত পাপ ও নির্লজ্জ দম্ভ)
নাই মহারাজ নন্দকুমার, তুমিও আজ নাই
　　তোমার পচা গন্ধ শুধু পাই।
দুই জনাতে কতই প্রভেদ—বুঝবে যে হোক কেহ
　　কতই খাটো! কতই তুমি হেয়!
ইতিহাসের পাতায় তোমার নামের অপচার
　　জগৎবাসীর নামায় যে থুৎকার।

গ্রন্থ চিত্রণে

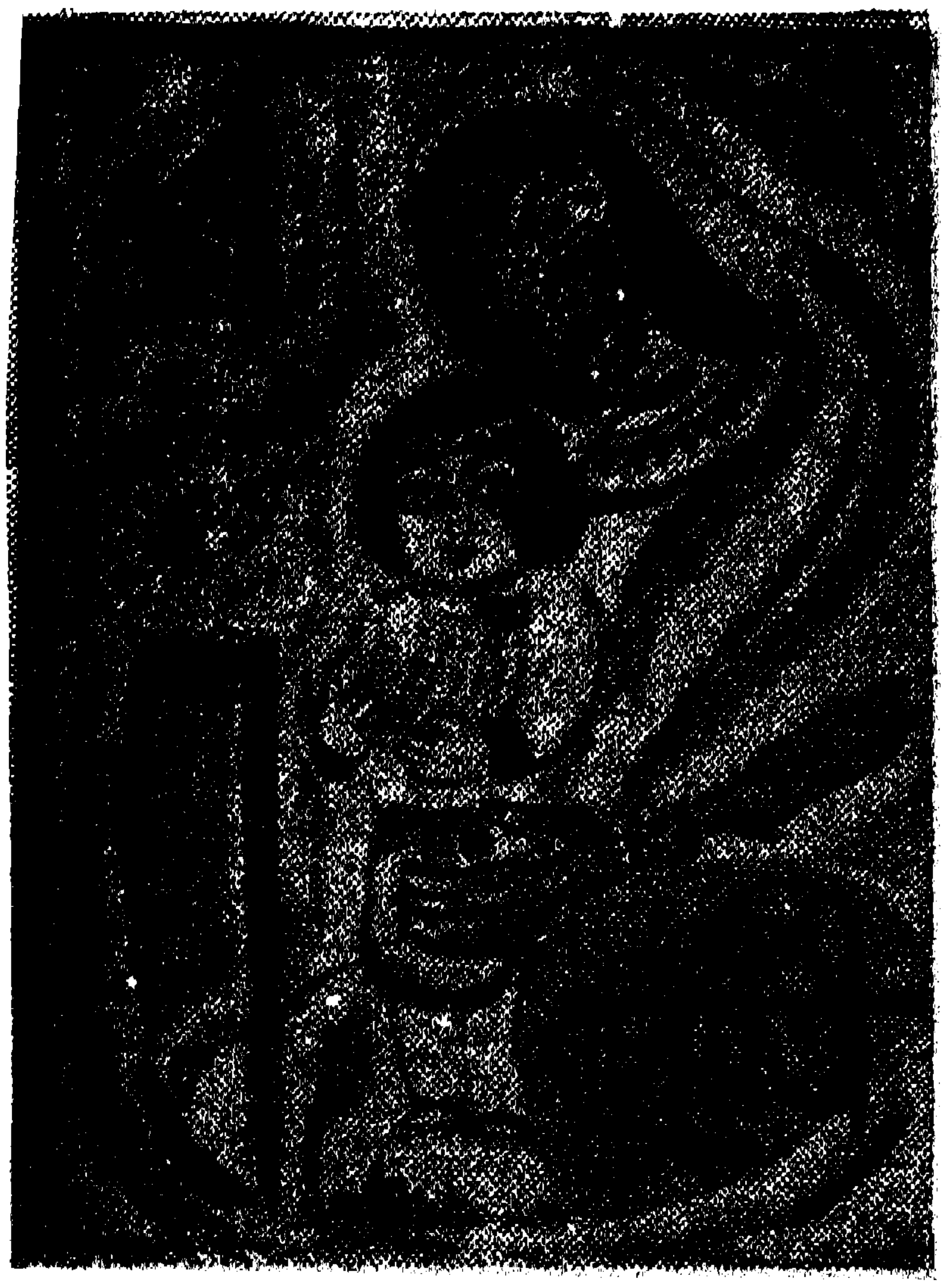

হাজার হাজার বছর আগে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই যে ভারতীয় চিত্রকলার বিকাশ শুরু হয়েছে তার প্রমাণ আজ প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধানের ফলে যথেষ্ট পাওয়া গেছে। মহেঞ্জদড়ো-হড়প্পার চিত্রমূর্তি থেকে ভারতীয় চিত্রকলার বয়স খৃষ্ট-পূর্ব্ব তিন হাজার বছর পর্য্যন্ত টানতেও কোন বাধা নেই। মাটির নানা রকম ভাণ্ড পাত্র থেকে শুরু করে পাথরের ফলকে খোদাই করা লতাপাতা জন্তু-জানোয়ারের ছবি দেখলেই বোঝা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতন আমাদের এই ভারতবর্ষেও মানুষ আদিম কাল থেকেই প্রত্যক্ষ বাহ্য প্রকৃতিকে রঙে রূপায়িত করতে চেয়েছে। আদিকালের এই প্রত্যক্ষ রূপায়ণ পরে "চিত্রকলায়" (Art of Painting) পরিণতি লাভ করেছে।

চিত্রকলা-শাস্ত্রের প্রমাণ

ভারতীয় চিত্রকলার প্রাচীনত্ব অনেকটা প্রাচীন চিত্রকলা-শাস্ত্র থেকেও অনুমান করা সহজ হয়। বাৎস্যায়নের "কামসূত্রের" মধ্যে বলা হয়েছে যে চৌষট্টি কলার মধ্যে চিত্রকলা অন্যতম এবং এই চিত্রকলার চর্চা প্রাচীন ভারতে নারীদের রীতিমত করতে হত। এছাড়া প্রাচীন পুরাণ-গ্রন্থ "বিষ্ণুধর্ম্ম-মহাপুরাণে" প্রায় আটটি অধ্যায় জুড়ে কেবল চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের আলোচনা করা হয়েছে। এই "বিষ্ণুধর্ম্ম-মহাপুরাণ" ডাঃ বূ্যলরের মতে চতুর্থ খৃষ্টাব্দে রচিত। এর মধ্যে "রঙ" (Colours) সম্বন্ধে অধ্যায়টি ভরতের "নাট্যশাস্ত্র" থেকে একেবারে হুবহু নকল করা হয়েছে দেখা যায়। তা ছাড়া "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর" গ্রন্থের অনেক জায়গায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে চিত্রকলার এই সব সূত্রগুলি প্রাচীন কলা-শাস্ত্রবিদ্‌দের প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই স্বীকৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, "বিষ্ণুধর্ম্ম-মহাপুরাণ" বা "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর" রচনার পূর্ব্বেও কয়েক জন কলাশাস্ত্রবিদ্ চিত্রকলা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং সেগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থ। অবশ্য এই সব প্রাচীনতম চিত্রকলা-শাস্ত্রের কোন চিহ্ন আজও পাওয়া যায়নি, যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর" উল্লেখযোগ্য। এই "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর" গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের আলোচ্য বিষয় হল "চিত্রকলা", এবং রচনা-কাল সপ্তম খৃষ্টাব্দ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ও চিত্রকলা

পুরাণবিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত করেছেন, "বিষ্ণুধর্ম্ম-পুরাণ" চতুর্থ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্দ্ধে রচিত। এ কথা আগেই বলেছি। চিত্রকলা সম্বন্ধে "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে" যে ভাবে আলোচনা ও সমালোচনা করা হয়েছে তা থেকে এইটুকু অন্ততঃ স্পষ্ট বোঝা যায় যে ভারতীয় চিত্রকলার পূর্ণ বিকাশ না হ'লে এত উচ্চ শ্রেণীর চিত্রকলা-শাস্ত্র কলাবিদ্‌দের দ্বারা রচনা করা সম্ভব হ'ত না। চিত্রকলা সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য এখানে আমরা "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর" থেকে উদ্‌ধৃত করে দেব। পুরাণকার বলছেন :

"সকল কলার শ্রেষ্ঠ হল চিত্রকলা। ধর্ম্ম, আনন্দ, ঐশ্বর্য্য এবং মুক্তির প্রতীক চিত্রকলা।"

"বাতাসের গতির তালে তালে পরিবর্তনশীল তরঙ্গ, অগ্নিশিখা ধোঁয়া ও উড়ন্ত মেঘের রূপ যিনি চিত্রে রূপায়িত করতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী।"

—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর (৪৩) ২৮ ও ৩৮

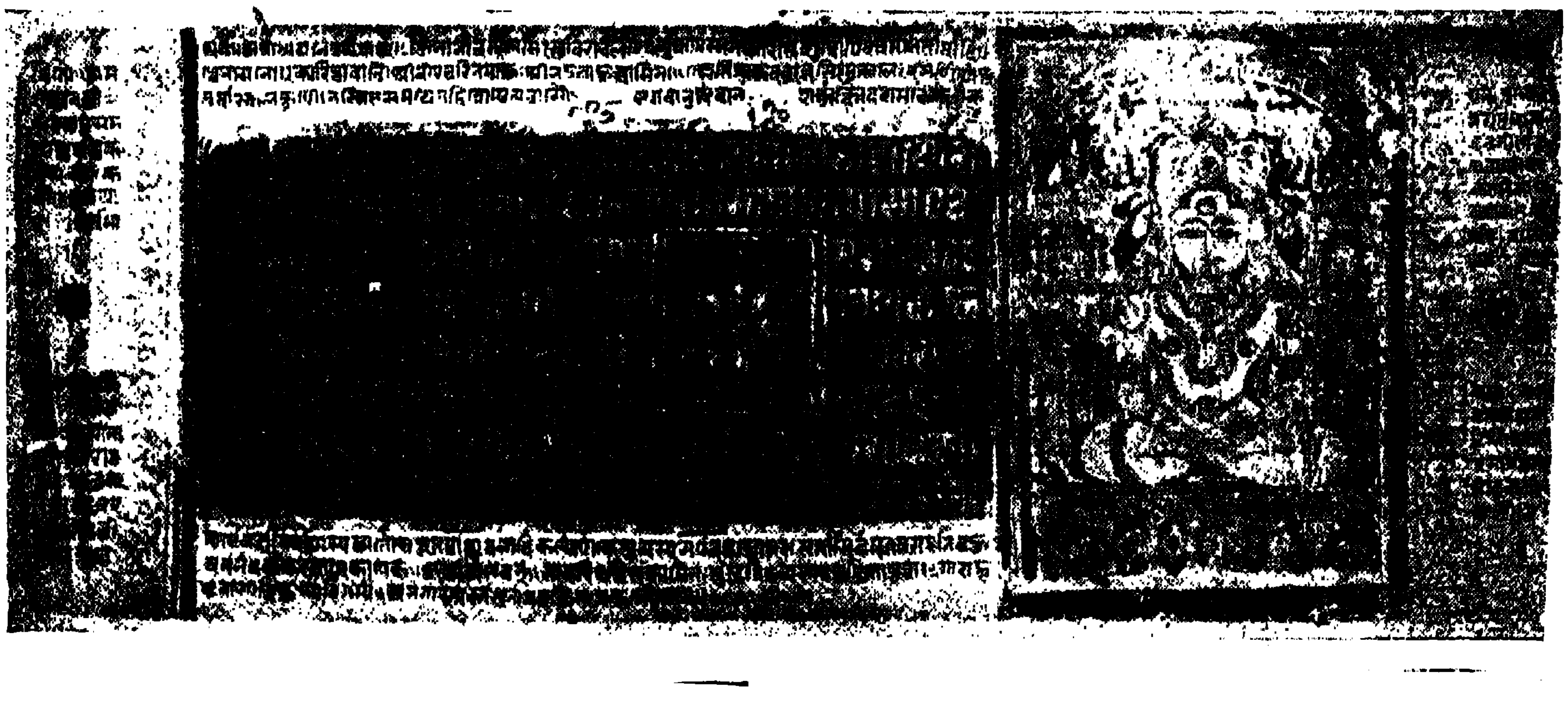

ভারতীয় চিত্রকলার বিকাশ

রূপানন্দ গুপ্ত

"শিল্পী যাঁরা তাঁরা চিত্রের রেখার বিচার করেন, কলা-রসিক যাঁরা তাঁরা বর্তনার (display of light and shade) নারীরা অলঙ্কার পারিপাট্যের এবং লোকসাধারণ বর্ণাঢ্যতার বিচার করেন।"

এখানে পরিষ্কার বলা হচ্ছে যে শক্তিশালী প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী যিনি, তিনি প্রত্যক্ষ প্রকৃতি ও জীবনকেই যে চিত্ররূপ দিতে সক্ষম হবেন তা নয়, তাঁর তুলির আগায় বাত্যাহত তরঙ্গের নৃত্য, অগ্নি-শিখার কম্পন, ধোঁয়ার অস্পষ্টতা এবং উড়ন্ত মেঘের গতি পর্য্যন্ত ধরা পড়বে। চিত্রকলার বিচার ও রসাস্বাদন প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে শিল্পী যাঁরা তাঁরা যে-কোন চিত্রের রেখার গতি বিচার করবেন এবং তাই দিয়ে সেই চিত্রের উৎকৃষ্টতা যাচাই করবে। যাঁরা কলা-রসিক তাঁরা উপভোগ করবেন চিত্রের বর্তনা অথবা আলো-ছায়ার খেলা। নারীরা মোহিত হবেন চিত্রের অলঙ্করণে (Ornamentation) এবং প্রাকৃত জনের কাছে বর্ণাঢ্যতারই (Richness of colours) আবেদন হবে সব চেয়ে বেশী।

এছাড়া "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে" চিত্রকে সাধারণ ভাবে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে :

সত্য (true to life)
বৈণিক (lyrical)
নাগর (common)
মিশ্র (mixed)

প্রত্যক্ষ জীবনের সুসমঞ্জস চিত্রায়ণকে "সত্য চিত্র" বলে। "বৈণিক চিত্রের" বিশেষত্ব হল গীতিধর্ম্মিতা, অর্থাৎ কল্পনা-ঐশ্বর্য্যই তার অন্যতম গুণ। "নাগর চিত্র" সাধারণ নাগরিকের উপভোগ্য, সুতরাং সূক্ষ্মতার চেয়ে স্থূলতাই কতকটা তার বৈশিষ্ট্য। "মিশ্র চিত্র" হল এই তিনের গুণসমন্বয় (৪১ অধ্যায়, ১—১৫)। মূর্ত্তিচিত্রের (figures) বিভিন্ন ভঙ্গিমাকে (Positions) নয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

ঋজ্বাগত (Front view)
অনৃজু (Back view)
সাচীকৃতশরীর (Bent, profile view)
অর্দ্ধবিলোচন (Face in profile, body in three quarter profile)
পার্শ্বাগত (Side view)
পরাবৃত্ত (Head and shoulder belt turned backwards)
পৃষ্ঠাগত (Back view, upper body partly visible in profile)
পরিবৃত্ত (Body sharply turned back from waist upwards)
সমানত (Back view, squatting position, body bent) (৩৯ অধ্যায়, ১—২২)

খড়্গবন্ধ—(উপরে)
হলবন্ধ (নীচে—বামে)
পদ্মবন্ধ—(নীচে—ডাইনে)

কাব্যপ্রকাশ

খড়্গবন্ধঃ।

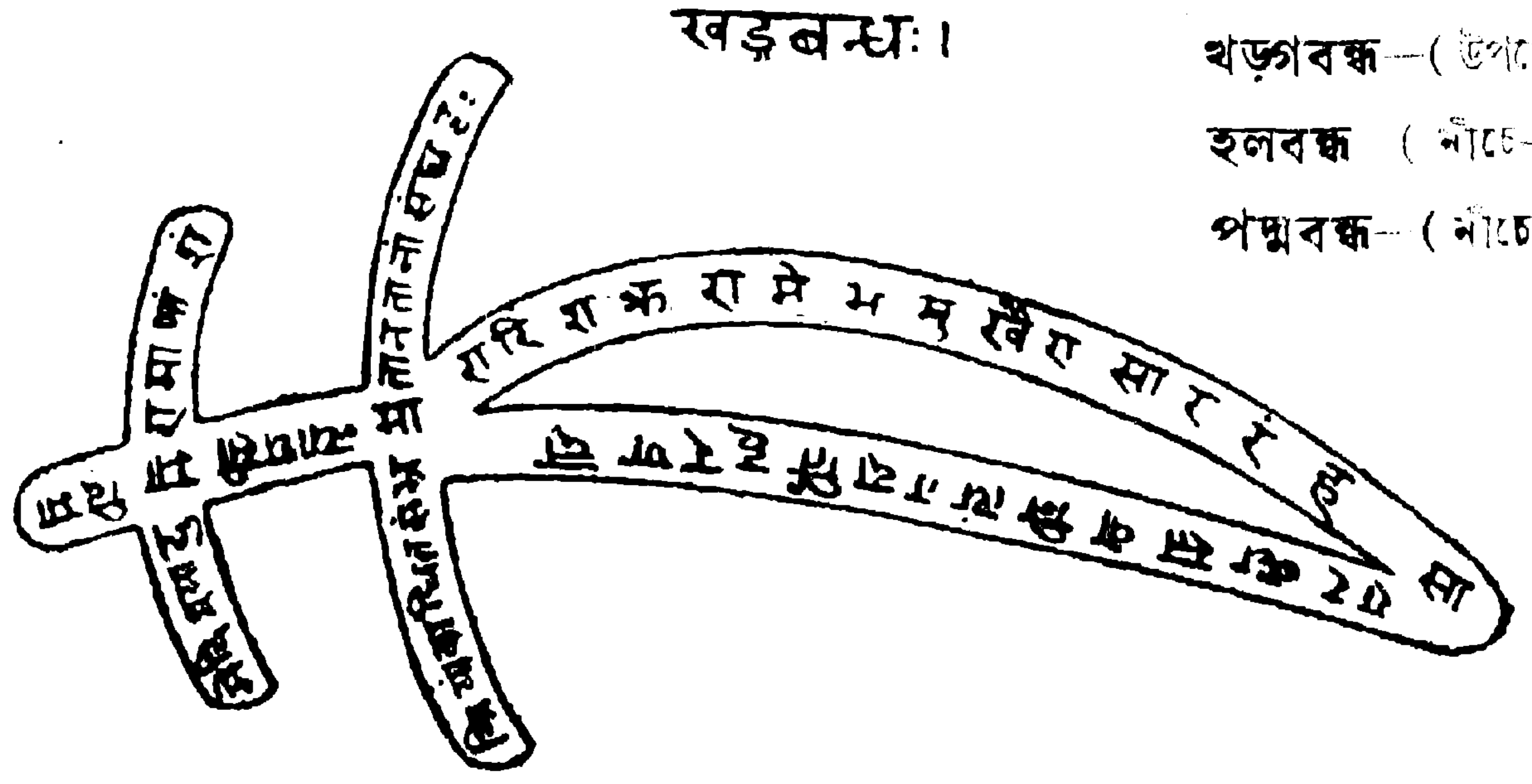

হলবন্ধঃ।

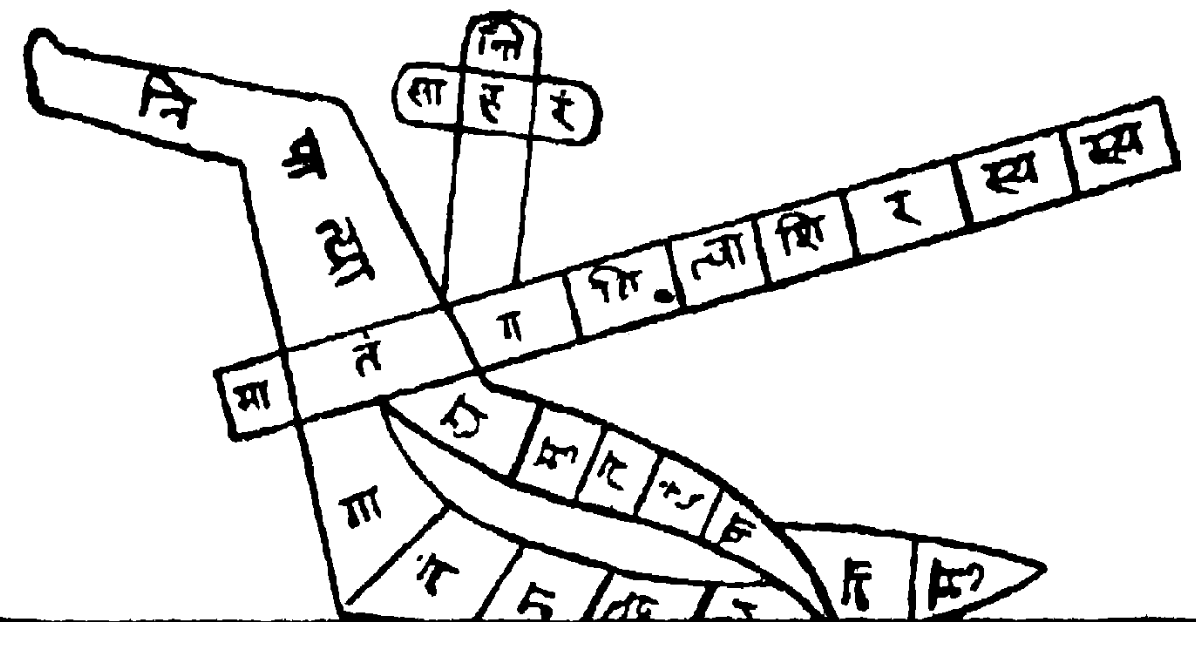

পদ্মবন্ধঃ।

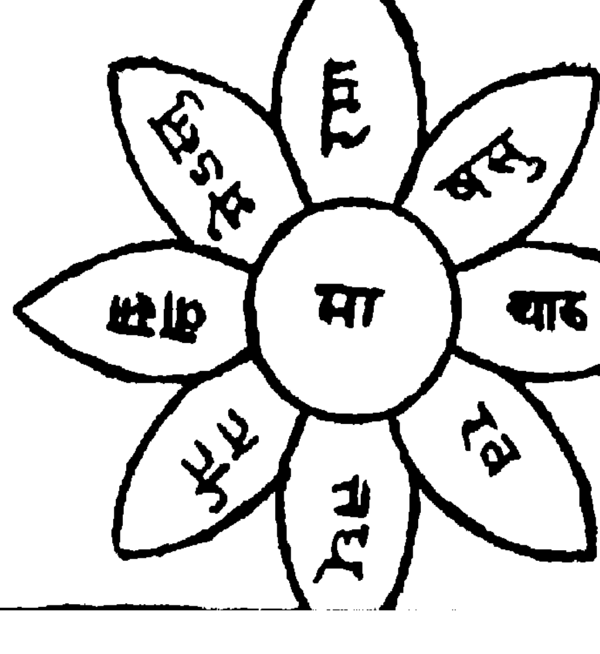

সাহিত্যদর্পণ

চিত্রাবলী

"শালিভদ্রমহামুনিচরিত" গ্রন্থের চিত্র

এর পর আরও তের রকমের মূর্ত্তি-ভঙ্গিমার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেগুলি যে পরবর্ত্তী কালের প্রক্ষেপ তা বুঝতে আদৌ কষ্ট হয় না। মূর্ত্তির এই বিভিন্ন ভঙ্গিমার রূপায়ণের পরিপ্রেক্ষিত (Perspective) সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, চিত্রশিল্পী "ক্ষয়" "বৃদ্ধি" (Fore-shortening) ও "প্রমাণ" (Proportion)—এই তিন কৌশলের সাহায্যে বা দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে মূর্ত্তির এই ভঙ্গিমা-বৈচিত্র্যকে চিত্ররূপ দিতে পারেন। বিশেষ করে, চিত্রের বর্তনা (Shading) সম্বন্ধে যে নির্দেশ এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে তা পড়লে বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হতে হয়। বর্তনা সম্বন্ধে, অর্থাৎ চিত্রে আলো-ছায়ার রূপভেদ ফুটিয়ে তোলা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে শিল্পীরা প্রধানতঃ তিনটি পদ্ধতির সাহায্যে এই কাজ করতে স্বচ্ছন্দেই করতে পারেন :

পত্রজ্ঞ (Cross line)
ঐরিক (Stumping)
বিন্দুজ (Dotting)

(৪১ অধ্যায়)

বর্ণ-বৈচিত্র্য ও বর্ণসংযোজনা সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। যাই হোক্, মোটামুটি আলোচনার এই ধারা থেকেই বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতে চিত্রকলার চর্চ্চার রীতিমত উন্নতি হয়েছিল। তা যদি না হত তাহ'লে চিত্রকলা সম্বন্ধে এই শ্রেণীর তত্ত্বকথা লিপিবদ্ধ করা কিছুতেই সম্ভব হত না। "বিষ্ণুপুরাণের" রচনা-কাল চতুর্থ খৃষ্টাব্দ বলেই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, কিন্তু এই পুরাণের চিত্রকলা বিষয়ক অংশের রচনা-কাল তাঁরা সপ্তম খৃষ্টাব্দ বলে ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ অজন্তার শেষ যুগের সমসাময়িক রচনা হল এই চিত্রকলাশাস্ত্র।

গ্রন্থচিত্রণ (Book-illustrations)

ভারতীয় চিত্রকলার মতনই ভারতীয় গ্রন্থচিত্রণ (Book-iilustrations) প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে। চিত্রকলার সমবয়স্ক যে গ্রন্থচিত্রণ তাতেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ কথা ভাবাই যায় না যে, চিত্রকলার যখন এ রকম আশ্চর্য্য চর্চ্চা ও বিকাশ হয়েছে এ দেশে তখন গ্রন্থচিত্রণ একেবারেই প্রচলিত হয়নি। ইতিহাস, পুরাণ, শাস্ত্র, কাব্য ইত্যাদি চিত্রিত করার প্রয়োজনও নিশ্চয়ই রচয়িতা-শিল্পীরা অনুভব করেছিলেন। ভূর্জ্জপত্র, তালপত্র অথবা কাগজ, যাতেই পুরাণ, শাস্ত্র, কাব্য ইত্যাদির পাণ্ডুলিপি রচিত হ'ক না কেন, প্রত্যেকটাতেই চিত্র-শিল্পীদের পক্ষে চিত্ররূপ দেওয়া সম্ভবপর। বিশেষ করে, কাগজের প্রচলনের পর থেকে গ্রন্থচিত্রণের প্রচলনও যে রীতিমত হয়েছে তাতে সন্দেহ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। অত্যন্ত প্রাচীন কাল থেকেই যে এই ভারতবর্ষে গ্রন্থচিত্রণ প্রচলিত ছিল তা আজও এ দেশের জ্যোতিষীদের (Astrologers) কোষ্ঠীরচনা (Horoscope) থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। কাশ্মীরের জ্যোতিষীরা, এমন কি অন্যান্য প্রদেশের জ্যোতিষীরাও কোষ্ঠীরচনার সময় গ্রহ-উপগ্রহের রঙিন চিত্র নিজেরাই আঁকেন। তাই যদি হয় তাহ'লে আজ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন যুগে রচিত সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, ফার্সী, উর্দ্দু ইত্যাদি ভাষায় চিত্রিত পাণ্ডুলিপি (Illustrated Manuscripts) খুঁজে পাওয়াও বিচিত্র নয়।

ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামীর মতন কোন কোন পণ্ডিত বলেন, "Indian art has never developed book-illustrations as such" এবং যদিও বা এক-আধটা গ্রন্থচিত্রণের নমুনা এখানে-সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়, "the illustrations take the form of square panels applied to the page with-out organic relation to the text."—(Dr Coomer-swamy : Catalogue of the Indian Collections in the Museum of Fine Art, Boston)। অর্থাৎ ডাঃ কুমারস্বামী বলেন, প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলায় গ্রন্থ-চিত্রণের বিশেষ কোন দান নেই। চিত্রিত পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে খুব সামান্যই পাওয়া যায়। যা-ও বা পাওয়া যায় তার মধ্যে চিত্রের সঙ্গে বিষয়বস্তুর কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিশেষ দেখা যায় না। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তার চিত্ররূপ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। ডাঃ কুমারস্বামীর এই অভিমত ডাঃ হীরানন্দ শাস্ত্রী

প্রমুখ পণ্ডিতেরা যথার্থ ও সঙ্গত বলে বিবেচনা করেন না (ডাঃ হীরানন্দ শাস্ত্রীর "Indian Pictorial Art as developed in Book-illustration" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। এ কথা ঠিক অবশ্য যে "কল্পসূত্রের" মতন গ্রন্থে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী ও নৃত্যের যে চিত্ররূপ দেখা যায় তা ভরতের "নাট্যশাস্ত্রেরই" উপযোগী, "কল্পসূত্রের" বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাই বলে প্রাচীন সমস্ত পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থের চিত্রের ক্ষেত্রে এই উক্তি প্রযোজ্য নয়। প্রাচীন সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, ফার্সী, উর্দ্দু ভাষায় রচিত চিত্রিত পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থের অভাব ভারতবর্ষে নেই এবং এই সব পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থের চিত্রগুলি বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রক্ষা করেই অঙ্কিত। এক কথায় বলা যায়, চিত্রগুলি বিষয়বস্তুরই চিত্ররূপ। "শ্রৌত শাস্ত্রের" যজ্ঞের বেদী ও উৎসর্গের দ্রব্যাদির যে চিত্র, "চরকসংহিতার" অস্ত্রোপচারের সরঞ্জামের যে চিত্র, বিভিন্ন "শিল্পশাস্ত্রের" মধ্যে মারণাস্ত্রাদির যে চিত্র, চক্রব্যূহ দুর্গ-প্রাকার প্রাসাদ ইত্যাদির যে চিত্র, তা নিশ্চয়ই গ্রন্থের বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এছাড়া প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র, কাব্য-নাটক, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতগীতা, গীতগোবিন্দ, কামশাস্ত্র অনঙ্গরঙ্গ, শিল্পশাস্ত্র ইত্যাদিতে যে প্রচুর চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায় তা বিচ্ছিন্ন বা প্রক্ষিপ্ত মনে করার কোন কারণ নেই।

প্রাচীন ভারতের চিত্রকাব্য

প্রাচীন ভারতের চিত্রকাব্যগুলিই গ্রন্থচিত্রণের সব চেয়ে বড় নিদর্শন। "পদ্ম" "খড়্গ" ইত্যাদি বিভিন্ন "বন্ধে" কি ভাবে কাব্য রচনা হবে এবং আবৃত্তি করা হবে তা চিত্রিত করে প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বুঝিয়ে দিতেন। এই ভাবে চিত্রের দ্বারা পাঠকদের কাব্যপাঠের নির্দ্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করতেন। বিশ্বনাথ-রচিত "সাহিত্যদর্পণ" তার একটা অন্যতম নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

রামায়ণ, মহাভারতের চিত্রিত পাণ্ডুলিপি আজও ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন গ্রন্থাগারে রয়েছে। রামায়ণ মহাভারতের এই চিত্রগুলি আদৌ বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত বা প্রক্ষিপ্ত চিত্র নয়, মহাকাব্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বরোদার "ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউটে" ভাগবতগীতার দশম অধ্যায়ের একটি অতি সুন্দর চিত্রিত পাণ্ডুলিপি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। ভাগবতগীতার এই চিত্রগুলি মুঘল-রীতিতে আঁকা এবং কলাকুশলতাও তার মধ্যে যথেষ্ট আছে। "গীতগোবিন্দের" চিত্রিত পাণ্ডুলিপিও পাওয়া গেছে, তার মধ্যে দু'টি পাণ্ডুলিপিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি উড়িষ্যা থেকে পাওয়া গেছে, তালপত্রে লেখা ও আঁকা, আর একটি কাশ্মীর থেকে পাওয়া গেছে, কাগজে লেখা ও আঁকা। কামশাস্ত্রের কয়েকটি পাণ্ডুলিপিও চিত্রিত আকারে পাওয়া গেছে, তার মধ্যে "অনঙ্গরঙ্গ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও তান্ত্রিক শাস্ত্রের চিত্রিত পাণ্ডুলিপিও অনেক পাওয়া গেছে, যার মধ্যে দেবদেবীর ধ্যানমূর্ত্তি, কুণ্ডলিনী পদ্ধতি ও বিভিন্ন "মুদ্রার" চিত্ররূপগুলির উল্লেখ না করে উপায় নেই। চিত্রিত জৈন

"ভাগবতপুরাণের" চিত্রিত পৃষ্ঠা

ভাগবতগীতার একটি চিত্রিত পৃষ্ঠা

পাণ্ডুলিপির মধ্যে ভদ্রবাহুর "কল্পসূত্র" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভদ্রবাহু মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক। এই "কল্পসূত্র" গ্রন্থের কয়েকটি চিত্রিত সংস্করণ আজ খুঁজে পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন যেটি তার রচনা-কাল সংবৎ ১১২৫ বলে অনুমান করা হয়। এর মধ্যে মহাবীর ও অন্যান্য তীর্থঙ্করদের জীবন-বৃত্তান্ত কাব্যে ও চিত্রে রূপায়িত করা হয়েছে। শোনা যায়, বিখ্যাত জৈন-সম্রাট কুমারপাল তাঁর গুরু হেমচন্দ্র সূরির আদেশে এই পাণ্ডুলিপির কয়েকটি কপি স্বর্ণাক্ষরে লিখে বিলি করেছিলেন।

প্রাচীন চিত্রিত হিন্দী ও উর্দ্দু গ্রন্থ

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি ভাষায় রচিত প্রাচীন চিত্রিত পাণ্ডুলিপি আমাদের দেশে আজ অনেক খুঁজে পাওয়া গেছে। তা'ছাড়াও চিত্রিত হিন্দী ও উর্দ্দু গ্রন্থ যা পাওয়া গেছে তা থেকে গ্রন্থচিত্রণের ঐতিহাসিক ধারার একটা সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। তুলসীদাসের 'রামায়ণের' চিত্রিত পাণ্ডুলিপি আজও বারাণসীর রাজার কাছে রয়েছে। এই চিত্রিত পাণ্ডুলিপি থেকেই নাগরী-প্রচারণী সভা তুলসীদাসের রামায়ণের চিত্রিত সংস্করণ ছেপে প্রকাশ করেছিলেন। এই

"কল্পসূত্রের" একটি চিত্রিত পৃষ্ঠা

অনুসরণ

সময় সোম

জীবনে জীবনে তোমার আমন্ত্রণ,
শত শতাব্দী লাখো ঠিকানার
তোমার অন্বেষণ।
কত বালুচরে পাশাপাশি বসে
গড়ে গেছি খেলা-ঘর,
কত ময়ূরের কেকা রব শুনে
কাটানো দ্বিপ্রহর,
ধান্যশীর্ষে সোনালী আলোকে পরস্পরের হাসি
দেখেছি আমরা,—
বলে গেছি ওগো তোমাকেই ভালবাসি।
তাই তো এবার পাঠাই তোমায়
সারা জীবনের ডাক,
তোমার-আমার গানেতে বন্ধু
পৃথিবী সুর মিলাক।

মনে পড়ে প্রিয়া—
সেদিনের সেই রক্ত-পিপাসু দিন—
অসি-ঝঙ্কার : পৃথিবী অর্ব্বাচীন,
ঝড়ের রাত্রি : গর্জ্জমান সিন্ধু : ছিন্ন পাল,
মাঝি দিশাহারা : ঘূর্ণি : ভগ্ন হাল ;
ভীত-কম্পিত যাত্রীর মাঝে
আমরা দু'জনে প্রিয়া—
স্বপ্ন দেখেছি—এলো ঘুম-ভাঙানিয়া,
কত রোমাঞ্চ : চকিত চাহনি : কত না গুঞ্জরণ
উগ্র-মধুর-অলস আলিঙ্গন ?—
মনে পড়ে না কি—
আমি তো ভুলিনি সজীব স্বপ্নজাল।
প্রতিদ্বন্দ্বী ?—
কেউ নেই প্রিয়া তোমাকে করে আড়াল !!

অনন্ত কাল তোমার প্রেমেতে আমি যে জাতিস্মর,—
ঠিকানা চাও তো দিতে পারি—
কবে কোথায়
বেঁধেছি ঘর,—
কোন উপবনে
অভিসারিকার হয়েছে পদার্পণ,
কোন সে কবরী চম্পক যূথী মাল্য সমর্পণ,—
সব মনে আছে (!)—
যদিও এবার উপবনে খরতাপ,
বন্ধ্যা বসুন্ধরার বুকেতে শোনায় সব—
প্রলাপ ;
জানি এ কথাটি
পরম সত্য : আজিও সন্ধ্যা বেলা :—
মনে হয় যেন তোমার দু'চোখে
মৃদু জ্যোৎস্নার খেলা
তেমনি চলেছে,—
তুমি বসে বাতায়নে
খুঁজিছ আমায় নীরবে সঙ্গোপনে।

মহা কাব্যের চিত্রগুলির সঙ্গে কাব্যবস্তুর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া মোগল যুগের "আকবরনামা" "শাহনামা" ইত্যাদি চিত্রিত রচনার কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আর একখানি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে সম্প্রতি, যার নাম হল "শালিভদ্রমহামুনিচরিত"। এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপিখানি কলিকাতার শেঠ বাহাদুর সিংজীর কাছে পাওয়া গিয়েছিল। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে এই পাণ্ডুলিপি রচিত। রচয়িতার নাম পণ্ডিত লাবণ্যকীর্ত্তি. সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। পাণ্ডুলিপির চিত্রশিল্পী হলেন আকবর ও জাহাঙ্গীরের দরবারের বিখ্যাত শিল্পী শালিবাহন। সমস্ত কাহিনীটি এই পাণ্ডুলিপিতে কাব্যে ও চিত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। ডাঃ হীরানন্দ শাস্ত্রী তাই বলেছেন : "What other proof is needed to show that the pictorial art in India developed in book-illustration as well ?" (পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ)।

বাস্তবিকই তাই। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে গ্রন্থচিত্রণের কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না বলে ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা সত্য ব'লে কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। গ্রন্থচিত্রণের মধ্যে দিয়েও যে প্রাচীন ভারতে চিত্রকলার উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আজ পাওয়া গেছে। সুতরাং গ্রন্থচিত্রণ আধুনিক নয়, রীতিমত প্রাচীন। ভারতের চিত্রকলার ইতিহাসে এই গ্রন্থচিত্রণের একটা স্বতন্ত্র ঐতিহ্য আছে, ধারা আছে। ভারতীয় চিত্রকলার সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশে তার একটা বিশেষ অবদানও আছে। চিত্রকলার বিষয়বস্তু ও আজিকের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আজ এ দেশে গ্রন্থচিত্রণের যথেষ্ট উন্নতি হলেও, এই প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত তো নয়ই, বরং তার জন্য গর্ব্ববোধ করা উচিত।

নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশনের এক শাখায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিচরণ করিবার স্থান পাইয়াছে, ইহাতে আমার আন্তরিক সন্তোষ জানাই। আধুনিক ভারত ভাষা ও ভারত-সাহিত্যের মধ্যে বাংলার যে একটি সুনির্দিষ্ট স্থান আছে, এইরূপ গ্রহণের দ্বারা হয়তো তাহা স্বীকারের প্রয়োজন ছিল। 'পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্'—পুরাতন হইলেই কাব্য শ্রদ্ধার বস্তু হয় না, নূতনের মধ্যেও এমন কিছু থাকিতে পারে যাহা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে—প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন ইহা কয়েক বৎসর ধরিয়া কার্যত স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। এমন কি, আধুনিক ভারত-ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের বিষয়রূপেই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন, তাছাড়া যেখানে যেখানে অধিবেশন হইয়াছে সেখানে সেখানে প্রতিবেশী সাহিত্যের প্রতিও অনুরাগের ও সম্ভ্রমের দৃষ্টি দিয়াছেন, অথচ পাটনার অধিবেশন ভিন্ন এ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এত দিন দৃষ্টি পড়ে নাই, দৃষ্টি পড়িবার উপলক্ষই হয় নাই। আমি জানি, পণ্ডিত-সমাজে সকলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রীতিমান, অত্র প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্তিতে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন, বাংলা-সাহিত্যের এক জন সামান্য সেবক হিসাবে আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইবার এই সুযোগ পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

মিথিলার এই জ্ঞানযজ্ঞে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আমন্ত্রণ তো হইবেই। শুধু ভৌগোলিক সংস্থানের জন্য, পঞ্চ গৌড়ের অন্যতম বলিয়া, সেন বংশের রাজাদের অধিকার-ভুক্তিতে সমবদ্ধ বলিয়া, অথবা প্রতিবেশী সূত্রে আবদ্ধ থাকার কথা বলিতেছি না। শুধু "দ্বারবঙ্গের" কথাও নহে—আত্মায় আত্মায় যোগও যে আছে, বৌদ্ধ চর্যাপদের ভাষায়, বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলীতে, গোবিন্দদাস ওঝার পদ-সংগ্রহে, বিদ্যাপতির পুরুষ পরীক্ষায় বাঙ্গালী ও মৈথিলী একই রস-গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছে। বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলী আজ আর মিথিলার হৃদয়ের বস্তু নহে, তাঁহার শৈব পদাবলী, সমাজের অন্তঃপুরিকাদের কণ্ঠে নানা পার্বণে গীত নানাবিধ গান শুনিতে পাই ইহাই না কি মিথিলার আদরের বস্তু, মিথিলা ইহারই পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। দ্বারভাঙ্গার স্বর্গীয় অধীশ্বর মহারাজা রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর তদানীন্তন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রকে একখানি মৈথিল পুঁথি উপহার দেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বিদ্যাপতির সংস্করণ প্রকাশে যত্নবান হন। এদিকে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ভাগলপুর অঞ্চলে কৈশোর কাল কাটাইয়া মিথিলার প্রাদেশিক ভাষায় পটুতা লাভ করেন, এবং বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্করণে হাত দেন। নগেন্দ্র বাবুর সঙ্কলিত ও সম্পাদিত এবং দ্বারভাঙ্গা নরেশের ব্যয়ে মুদ্রিত 'বিদ্যাপতি ঠাকুরাক পদাবলী' প্রকাশিত হয় ১৯১০ খৃঃ অব্দে এবং ইহাও লক্ষ্য করা উচিত যে, বাঙ্গালীর ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে উহা প্রকাশিত হয়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের নামও এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক বলিয়া স্মরণীয়। কল্পনা-চক্ষে ইহাও দেখা সম্ভব যে, বাংলার রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কৈশোরে কি ভাবে বিদ্যাপতির পদাবলীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হন—বাংলায় ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী অনুকরণ বটে, কিন্তু অনুকরণ তো অনুপ্রাণনেরই একটি রূপ মাত্র। কলেজ অফ ফোর্ট উইলিয়ম বিদ্যাপতির পুরুষ পরীক্ষা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করাইয়া বাংলা ভাষায় গদ্য-সাহিত্য রচনা প্রচেষ্টার ধারা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। মৈথিলী সাহিত্যে রত্নোদ্ধারের চেষ্টার ইতিহাসে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। নেপালে তিনি যখন সংস্কৃত পুঁথি খুঁজিবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় কতকগুলি মৈথিলী ভাষায় লিখিত পুঁথিও উদ্ধার করেন; তাহার সহযোগীর চেষ্টায় পরে তাহার মধ্য হইতে একটি প্রকাশের ব্যবস্থা হয়, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পণ্ডিত বাবুয়া মিশ্রের সহযোগিতায় ইহার সম্পাদন করেন, এই পুস্তকের নামই 'বর্ণ-রত্নাকর'।

আরও ব্যাপক ভাবে বাঙ্গালীর মৈথিলী চর্চার কথা বলি, ২৮ বৎসর পূর্বে স্যর আশুতোষ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারত-ভাষা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন, তখন অন্যান্য ভাষার মত মৈথিলী ভাষা ও সাহিত্যও পড়াইবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করেন। বহু বাঙ্গালী ছাত্র এই আটাইশ বৎসর ধরিয়া মৈথিলী ভাষা ও সাহিত্য শিখিয়াছে, কারণ মৈথিলী তাহারা সহজে শিখিতে পারে। ডক্টর সুকুমার সেন বিরচিত 'বিদ্যাপতি গোষ্ঠী'-কথা মৈথিলী কাব্য-সাহিত্যের পরিচয় দানে বঙ্গের সহিত মিথিলার শুভ মিলনের যুগকে পুনরায় উজ্জ্বল করিয়া আমাদের সামনে ধরিয়াছে। লিপি হিসাবেও বঙ্গের ও মিথিলার এক কালে আদান-প্রদান চলিয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন। হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের দশম অধিবেশনে এখনও তাহার পরিচয় আছে। মজঃফরপুরের নন্দকিশোর দাস মিথিলায় মৈথিলদের চেয়ে হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা কয়েক জন বেশি, এ কথা বলিতে গিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে মিথিলার লিপির সহিত বাংলা লিপির মিল ছিল বেশী, এমন কি মিথিলা লিপি হইতে বাংলা লিপি হইয়াছে না বাংলা লিপি হইতে মিথিলা তাহার লিপি পাইয়াছে ইহা লইয়া গবেষণা চলিতে পারে, স্থির করিয়া বলা কঠিন। নবদ্বীপের বিদ্যার্থীরা ন্যায় পড়িতে আসিয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে লিপি আমদানি করিয়াছেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না বলিয়া তিনি মনে করিতেন। যাহা হউক, বাংলা দেশে মৈথিলীর চর্চা কি ভাবে বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহার একটা সামান্য আভাষ উপরে দিলাম, মৈথিলী পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরূপ চর্চা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহার কোন পরিচয় দিতে পারিলাম না, আশা করি, মিথিলার কোনও বিদ্বান লেখক এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞাত করাইবেন।

আমাদের পরস্পর সম্ভাষণের মধ্যে আজ এই কথাই বেশী করিয়া মনে পড়ে—ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,

সুখ্যাত না হইলেও অনেক পরিমাণে বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবেরই কথা। রামমোহন রায় হইতে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত যে ভাবধারা এবং যে রসোত্তীর্ণ রূপ বাংলা সাহিত্যকে এক অভিনব কান্তি প্রদান করিয়াছে, সাধারণ দৃষ্টিতে ভারতীয় সাহিত্যে তাহার ছায়া পড়িলেও, বাংলা-সাহিত্যে তাহার মাধ্যমে বিশেষ করিয়া যে বৈচিত্র্য আসিয়াছিল, অন্য কোন সাহিত্যে সেরূপ কিছু সম্ভব হয় নাই, একথা নিঃসংকোচে বলা চলে। বর্তমান যুগের বাংলা সাহিত্যের এই উজ্জ্বল বর্ণ কি শুধু ইংরাজী সাহিত্যে সংস্পর্শজনিত, না স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অর্জিত? যদি ইংরাজী-সাহিত্যের সংস্পর্শ জনিতই হয়, তবে ইংরাজ চলিয়া যাইতেই কি সে মহিমার মুকুট খসিয়া পড়িবে? আর যদি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অর্জিত হয়, তবে ত আমাদের ভাবনার কিছুই নাই। যে শক্তি বা উপাদান এত দিন আমাদের সাহিত্যকে বিকশিত করিয়াছে, সুন্দর করিয়াছে, তাহা এখনও করিবে, তাহার ক্রিয়া ত শেষ হয় নাই। বাহিরের প্রভাব কিছু আর চির দিন থাকে না, কিন্তু অন্তরের আলো ত অনির্বাণ, মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের কাব্যে, বৈষ্ণব কান্ত পদাবলীর মধুস্যন্দী ভাষায়, ভারতচন্দ্রের চাঁচাছোলা পরিপাটী পদবন্ধে যে সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্যই কি রূপান্তরিত হইয়াছে মধুসূদনের ওজস্বিনী ভাষায়, বঙ্কিমচন্দ্রের বহু শতাব্দীর যবনিকা অপসারিত করিয়া ঐতিহাসিক জীবনের পুনর্গঠনে, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্ররূপিণী প্রকৃতির নব নব সৌন্দর্য উন্মেষণে ও অভিনব অধ্যাত্মদৃষ্টিতে? পাশ্চাত্য দৃষ্টি ও পাশ্চাত্য প্রকাশভঙ্গি যতটুকু আসিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যে মিশিয়াছে ততটুকু তো আমরা আয়ত্ত করিয়াই লইয়াছি, তাহা তো আমাদের চিন্তাধারার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, ইচ্ছা করিলেই এখন আর তাহা বর্জন করিতে পারি না। আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে ইংরাজ বিদায় লইয়াছে, কিন্তু রাখিয়া গিয়াছে ভাব-জগতে তাহার চিহ্ন, তাই এই যুগসঙ্কটে, এই ভাবসম্মেলনের দিনে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে, এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ, এই ঐতিহাসিক দৃষ্টি, সনেট, আধুনিক নাট্যরূপ—এ সব কি দু'দিন বাদে ইংরাজী ভাষার মতই আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িবে, এবং তাহার চেয়েও গুরুতর প্রশ্ন—তখন বাংলা সাহিত্যের এখন যে গৌরব করি তাহা কি আর থাকিবে না? তাহা কি নিতান্তই ইতিহাসের কথা হইয়া দাঁড়াইবে? বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এরূপ গুরুতর প্রশ্ন করিবার সময় আসিয়াছে, এ সব প্রশ্নে জল্পনার ভাব খানিকটা থাকিলেও ইহারা আর নিতান্ত অলীক নহে—পরিবেশের সঙ্গে বর্তমান সাহিত্যের গুণাগুণ যে বিশেষ ভাবে জড়িত। এখনই ত এরূপ প্রশ্ন করিবার সময় আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া আমরা যাহারা বাংলা সম্বন্ধে শ্লাঘা করি, তাহাদের পক্ষে। তাই এখন আমাদের বর্তমানের কৃতিত্ব ও ভবিষ্যতের আয়োজন, দুই-ই বিশেষ করিয়া হিসাব করিতে হইবে।

ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন; রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। কিন্তু রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে যাহাই হউক—হিন্দীই হউক অথবা হিন্দী-হিন্দুস্থানীই হউক, বিধান-পরিষদের সদস্যগণ তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিবেন, প্রাদেশিক ভাষার গৌরব খর্ব করার কথা ইহাতে আসে না। প্রত্যেক প্রদেশে তাহার নিজস্ব ভাষাই প্রধান, বাংলা ভাষার ও বাংলা সাহিত্যের স্থান বাংলা দেশে নির্ণীত হইবে মাতৃভাষা বলিয়া। বাংলার বাহিরে, ভারতবর্ষের মধ্যে, অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার তুলনায় তাহার স্থান নিরূপিত হইবে ভোটের আধিক্য নয়, তাহার গুণগত উৎকর্ষের ও সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা বিচার করিয়া। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে হিন্দী কথা-সাহিত্যের যশস্বী লেখক প্রেমচন্দ লিখিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে শুধু বাঙ্গালী বলিয়া ধরিলে ঠিক হইবে না, তাঁহারা কোনও এক প্রদেশের একচেটিয়া সম্পত্তি নহেন, তাঁহারা যে সমগ্র ভারতের সম্পত্তি। এই গুণগত উৎকর্ষ কি কখনও সাধনা করিয়া সৃষ্টি করিতে পারা যায়? The wind blowith where it listeth. প্রতিভার আগুন কোথায় জ্বলিয়া ওঠে, তাহার হিসাব তো শেষ পর্যন্ত আমরা খতাইয়া বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের হাতে ভুবন পরিচালনের ভার না থাকিলেও আমাদের পরিবেশ তো আমরা সাধ্যমত সৃষ্টি করিতে পারি—আর যদি নিজের নিজের পরিবেশ সক্রিয় ভাবে যথাসম্ভব সৃষ্টি করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের সাধ্যমত অগ্রসর হইতেও পারি। একটা মাপকাঠি ধরা যাক। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়াছিল ১১৪১ সালে। সেই অনবদ্য সৃষ্টির রক্তিম রাগে আমাদের সাহিত্য-জগৎ এখনও দীপ্তিমান, তথাপি এখন এই কয় বৎসরের মধ্যে দেশে কি বিপুল পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে—আর্থিক অস্বস্তির দিক দিয়া, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দিক দিয়া জোড়া বাংলা ভাঙ্গার দিক দিয়া ইংরাজ চলিয়া গিয়া দেশের আকার অমনি বদলাইয়া গিয়াছে, আমরা এখনও অনুভব করিতে পারিতেছি না। একটা যুগই শেষ হইয়া গিয়াছে, নূতন যুগ যেন আবির্ভূত হইয়াছে, আমাদের কাছে ইহাদের পটভূমিকা বিস্তৃত হইয়া নাই, গুটাইয়া আছে, পরিপ্রেক্ষিত আমাদের সংকীর্ণ, সেই কারণে পুরাতনের অবসান ও নূতনের আবির্ভাব আমরা যেন এখনও ভাল করিয়া অনুধাবন করিতেই পারি না। তথাপি গুরুতর পরিবর্তনের পথ যেন আপনা-আপনি প্রস্তুত হইয়া যাইতেছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যে যে জীবনীশক্তি নিহিত আছে এই কয় বৎসরের মধ্যে তাহার পরিচয়ও তো আমরা পাইয়াছি—জাগরী উপন্যাসের বিষয় উপস্থাপনের অভিনব আঙ্গিকের মধ্যে যাযাবরের দৃষ্টিপাতের ভঙ্গীতে, অভ্যুদয়ের গীতিকথকতার দৃপ্ত মাধ্যমে বাঙ্গালী বুঝিয়াছে ও বুঝাইয়াছে যে, এ সাহিত্যে চর্বিত চর্বণের যুগ এখনও আসে নাই, এখনও নূতন বিষয়-বস্তু চিন্তা করিবার, দেখিবার ও ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিবার ক্ষমতা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আছে। অতীতের ধারা তো আমাদের বর্তমানে আছেই, তাহার সন্ততি তো চলিয়াছেই—সঙ্গে সঙ্গে নব নব সুরে নব রাগিণী গাহিবার ক্ষমতাও সে হারায় নাই। তারাশঙ্কর, সুবোধ ঘোষ, বিভূতিভূষণ, মাণিক বাঁড়ুজ্যে ও বনফুল, ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে নূতন লেখকের দল, যাঁহারা অল্প পরিচিত ছিলেন তাঁহারা হইলেন সুপরিচিত, যাঁহারা ছিলেন অপরিচিত তাঁহারা হইয়া উঠিলেন জনপ্রিয়। এরূপ পরিবর্তন ত অবশ্যম্ভাবী—জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া তবে না জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে। বাংলা দেশে নাটক কেন অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করে না অনেক সমালোচককে এরূপ প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছি, এবং উত্তরও আসিয়াছে পরাধীন দেশের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাই ইহার কারণ—শুধু নাটকে নয়, সাহিত্যের অন্য বিভাগেও

এই সব বাধা এত দিন ছিল, তবে নাটকের সম্বন্ধেই এই বাধা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। বাঙ্গালী এখন নূতন পথ খুঁজিয়া পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহিত্যরূপও নূতন ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিবে, ইহাই হইবে স্বাভাবিক। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও ইহা ছাড়াইয়া নয়। তবে এই কথাই বলিতে চাই যে, এরূপ আশা পোষণ করার পক্ষে কারণও আছে যথেষ্ট।

প্রাদেশিক ভাষায় গৌরব যে বাড়িবে স্যর আশুতোষ যেন তাহা পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিকল্পনার আর একবার পুনরাবৃত্তি করি। এম-এ, পরীক্ষায় আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিখিতে হইলে একটি প্রধান বা মুখ্য ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রাদেশিক ভাষাও শিখিতে হইবে: বাঙ্গালীকে শুধু বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত খুঁটি-নাটি শিখিলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে অন্ত এক ভাষাও—হিন্দী, উড়িয়া, আসামী, মৈথিলী, যাহাই হউক না কেন—শিখিতে হইবে। তেমনি যাহারা মৈথিল ভাষা মুখ্যত অধ্যয়ন করিবে তাহাদিগকে বাংলা হিন্দী গুজরাতী মারাঠী উর্দ্দু যাহা হউক একটা শিখিতে হইবে। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এইরূপে আমরা এমন এক দল কর্মী পাইব যাহারা নিজেদের ভাষা ও সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ জ্ঞান তো লাভ করিবেই—সঙ্গে সঙ্গে অন্ত এক ভাষার সম্বন্ধেও যাহা কিছু জানিবার তাহা জানিবে। তাহারা অন্ত প্রদেশ হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু সংগ্রহ করিয়া নিজেদের ভাষায় প্রবেশ করিতে পারিবে এবং নিজেদের ভাষায় যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহা অন্ত ভাষাভাষীদের নিকট পরিবেশন করিতেও পারিবে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি বাঙ্গালীকে ডাক দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "এস সাহিত্যিক, এস বঙ্গ-ভারতীর একনিষ্ঠ সাধক, এস ভাই বাঙ্গালী, আমরা ভারতবর্ষের খণ্ড খণ্ড সাহিত্য-রাজ্যগুলি এক করিয়া এক বিরাট সাহিত্য-সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। তুমি-আমি চলিয়া যাইব, আরও কত আসিবে কত যাইবে, কিন্তু যদি এই ভারতব্যাপী একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া যাইতে পারি—অথবা ইহার বিন্দুমাত্র আনুকূল্যও করিয়া যাইতে পারি, আমাদের মর-জীবন সার্থক হইবে।" এই ভাবে তিনি যে বাঙ্গালীকে দিয়া নূতন ভারতীয় সাহিত্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, আমরা আজ তাহার কিছু করিতে না পারিলেও ভাবিয়া দেখিতে পারি যে, আজ ২৮ বৎসর হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু ছাত্র-ছাত্রী গুজরাতী মারাঠী তামিল তেলেগু কানাড়ী মলয়ালী সিংহলী আরও কত কি পড়িয়া গিয়াছে, পরীক্ষাও পাশ করিয়াছে—কোথায় তাহাদের কৃতিত্ব! আজ তো তাহাদেরই অগ্রণী হইবার কথা। আমাদের এই বিরাট দেশের বিভিন্ন অংশে যে সাহিত্য আছে, আমরা এখনও তাহার পরিমাণ তো দূরের কথা, অস্তিত্বও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। যদি কোন প্রাদেশিক ভাষায় বিশেষ জ্ঞাতব্য কিছু না-ই থাকে, তাহা হইলেও সেই প্রদেশের বা সেই অঞ্চলের অধিবাসীর সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের জন্ত, তাহাদের রুচি ও চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্ত, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করা ও বিভিন্ন সাহিত্যের সন্ধান রাখা আজ চারি দিক হইতে আহত জাতীয় ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্তও দরকার হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার মাধ্যমে কি আমরা বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের ইতিহাস ও বিভিন্ন দেশের ভাষা শিক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারি না? বাংলার পক্ষে এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা এমন কিছু কঠিন কাজ নহে। কথাও নূতন নহে; নববিধানে কেশবচন্দ্র যখন ভক্তদের এক-একটি ভাষা শিখিয়া সে ভাষায় রচিত ধর্মশাস্ত্র শিখিতে বলেন, ও বাংলায় তাহার অনুবাদ করিতে বলেন, তখন তো এই কাজেরই গোড়া পত্তন হয়। 'প্রবাসী' পত্রিকার ২য় বর্ষের সংখ্যায় এই সাধনারই সূত্রপাত হইয়াছিল। হংস পত্রিকা প্রকাশ, আন্তর্জাতিক পি, ই, এন্ এর ভারতীয় শাখা ও তাহার বঙ্গীয় প্রশাখার দীর্ঘচ্ছন্দে প্রগতি, ভারতীয় সাহিত্য পরিষদের গঠন সমস্তই ইহার ভিত্তি প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। আমাদের একমাত্র বলিবার আছে যে, 'ভিৎ তো কাটা হইয়াছে, ইমারত কই?' বাঙ্গালীর পক্ষে এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করা, ইহাকে প্রাণবন্ত করা, এমন কিছু অসম্ভব বা কঠিন কথা নহে। প্রয়োজন হইল, আমাদের জ্ঞান ও কর্মকে সংহত করিয়া তাহাকে রূপ দেওয়ার। ইংরাজী India Penএর দ্বারা যে কাজ ইংরাজীর মাধ্যমে করা সুকঠিন, বাংলা ভাষার মাধ্যমে তাহা সুষ্ঠু ভাবে করিতে পারা কত সহজ! ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি বাংলায় একত্র করানো এবং তাঁহাদের দিয়া ভারত-সাহিত্যের পরিচয় দেওয়ানো বিশ্ববিদ্যালয় তো সহজেই করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। সামান্ত কয়েক জন লেখকের সমবায়েও তাহা সম্ভব। ত্রৈমাসিকী পত্রিকার দ্বারা বাংলা ভাষায় তাহার প্রচার এবং বিভিন্ন ভাষার প্রবেশক, পাঠমালা ও ইতিকথা রচনা ব্যয়বহুল হইবারও কথা নয়।

এই সম্পর্কে আমাদের দেশে প্রতিযোগিতামূলক পুরস্কার সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলি। বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার জন্ত পুরস্কার দেওয়ার রীতি বহু কাল পূর্বে, ইংরাজী আমলেই, প্রায় এক শত বৎসর পূর্বেও প্রচলিত ছিল। পূর্বে সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ধনপতি, রাজা-মহারাজের দল, মুসলমানী আমলে উদার চরিত নবাব-বাদশাহেরাও সাহিত্যিকদের কবিদের উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজকাল রসজ্ঞ গণপতির উপর সাহিত্যিকদের উৎসাহ দেওয়ার ভার পড়িয়াছে। সরকারী খেতাব ও মাসিক বৃত্তি ইংরেজ সরকারও দিয়াছেন, তাহা গণনার মধ্যে মানিলাম না। সাধারণের পক্ষ হইতে রবীন্দ্র-স্মৃতি, শরৎ-স্মৃতি, গিরীশ-স্মৃতি রক্ষার আয়োজন হইতেছে। সরস অর্থনৈতিক রচনার কৃতী অধ্যাপক অনাথগোপাল সেনের স্মৃতিরক্ষার জন্ত কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘ যে সামান্ত আয়োজন করিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য—তাঁহারা অনাথ বাবুর লেখার বিষয় ও সরসতার অনুরূপ লেখা বৎসর বৎসর পুরস্কার দ্বারা গ্রহণ করিবেন, পূর্ব হইতেই বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, এই কাজ দশ বৎসর চলিবে। ইহাতে দেশের চিন্তাশক্তি বাড়িবে, ও নূতন লেখক উপযোগিতা অর্জন করিবেন, এই হইল তাঁহাদের বিশ্বাস। গিরীশ স্মৃতি দ্বারা নাট্য-সাহিত্যে সমালোচনার ভাণ্ডার কতখানি পুষ্ট হইতেছে, তাহা এ পর্যন্ত গিরীশ-স্মৃতির আয়োজনে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি একত্র করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। শরৎ-স্মৃতি ও রবীন্দ্র-স্মৃতি সম্পর্কে শুধু বাংলা ভাষা নয়, ভারতবর্ষের আধুনিক সকল ভাষার মধ্যে প্রতিযোগিতার যে কথা হইতেছে, তাহাতে আমাদের সর্বভারতীয় দৃষ্টি যে ফুটিতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ ও সমালোচনা প্রকাশ হইতে থাকিবে, আশা করিতে

পারি। মনন-সাহিত্যের এরূপ পুরস্কার এত দিন আমাদের দেশে ভাবনার অতীত ছিল। এখন দেশের কর্মীদের ও চিন্তানায়কদের এদিকে দৃষ্টি দিতে দেখিয়া মনে হয়, বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার পুষ্ট করিবার এই প্রয়াস সার্থক হইবে, এবং বিভিন্ন বিভাগে বাঙ্গালীর নব নব জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনুরূপ পারিতোষিকের আয়োজন কোথায় কোথায় হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া, পুরস্কৃত উপযুক্ত সন্দর্ভের বাংলায় অনুবাদের চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়, ইহাও জোর করিয়া বলিতে পারি। কে জানে, নব যুগের সাহিত্যে অগ্রসর হইবার পথে ইহাই হইতে পারে প্রথম সোপান।

বাংলা ভাষার উপযোগিতা বাড়াইবার আর একটা দিক আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় সম্প্রতি আলোচনা করিয়াছেন গত আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে তাহার বাংলা "বাঙ্গলা নবলিপি" প্রবন্ধে। যাঁহারা বলেন সব লালে লাল হো যায়গা—সর্বত্র রোমক লিপি প্রচলিত হউক—তাঁহারা অবশ্য প্রাচীন লিপি সমূলে নাশ করিতে চাহিবেন কিন্তু যাঁহারা বঙ্গলিপির সংরক্ষণে যত্নবান তাঁহাদের মধ্যে সংস্কারের ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। অবশ্য সংস্কার অর্থে বুঝিতে হইবে, পুরাতনের কাঠামো একেবারে বর্জন না করিয়া তাহাকে আবশ্যক মত পরিবর্তিত করিয়া রক্ষা করার কথা। পুরাতনের সংরক্ষণ অথচ নবীনের প্রতিষ্ঠা, প্রাচীন ও নবীনের এই সামঞ্জস্য কি করিয়া হয়? সকল লিপি সম্বন্ধেই এই প্রশ্ন। অথচ নিত্য প্রয়োজনের চাহিদা মিটাইতে নিত্য নূতন কিছু উদ্ভাবনের কথা ওঠে। প্রথম বাংলা বই বাংলা দেশে ছাপা হইবার পর, শ্রীরামপুরের মিশনরিরা, বটতলার ছাপাখানার কর্তারা, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সকলেই প্রয়োজন মত ছাপাখানার টাইপ বদলাইয়াছেন ও বাড়াইয়াছেন। ১৬ বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকার দেখাইয়াছিলেন (প্রবাসী, ১৩৩১, পৌষ)। বাঙ্গালা কেসে বিভিন্ন প্রকারের টাইপের সংখ্যা ৫৬৩, আর ইংরাজী কেসে ১৬০, অর্থাৎ ইংরাজী কেস অপেক্ষা বাঙ্গালা কেসের টাইপ-সংখ্যা সাড়ে তিন গুণ বেশী। এ বিষয়ের চর্চা যে সাহিত্যের তথা মুদ্রণকার্যের উন্নতির পক্ষে বিশেষ আবশ্যক, তাহা সাহিত্য-সমাজের মহারথ ও মহামহোপাধ্যায়গণ ভুলিয়াও ভাবেন না—এই বলিয়া অজয় বাবু দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পরে এত দিনের মধ্যে বানানের সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকটি নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করেন। সে নিয়ম কেহ কেহ মানিয়া চলেন, সকলে চলেন না, কারণ আমাদের এখনও ফরাসী একাডেমির মত ভাষার কঠোর নিয়মানুবর্তিতা নাই, থাকা যে সর্বথা বাঞ্ছনীয় এ কথাও অবশ্য স্বীকার করি না। 'আনন্দবাজারে'র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার বাংলা লিনোটাইপের পথ প্রস্তুত করিয়া বর্ণ ও লিপির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কার্যত দেখাইয়াছেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় চল্লিশ বৎসর পরে আজ নব্বই বৎসরের উপকণ্ঠে আসিয়া নূতন করিয়া বাংলা বর্ণলিপি সংস্কারের আলোচনা করিয়াছেন—অক্ষর-যোজনার দোষ, যুক্তাক্ষরের অস্পষ্টতা, সংযুক্তাক্ষরের সম্পূর্ণ নূতন কলেবর, বাংলা লিপিকে এ সকল দোষ হইতে মুক্ত করিবার উপায় চিন্তা করিয়া যে সমাধানে আসিয়াছেন, তাহা আমাদের সকলের পক্ষেই চিন্তনীয়। নবলিপির সম্বন্ধে তিনি দাবী করিয়াছেন, যে শিশু দুই বৎসরের কালে প্রচলিত লিপি পড়িতে ও লিখিতে পারে না, সে নবলিপি তিন মাসে পড়িতে পারিবে, এবং ছাপাখানায় বর্তমানে ব্যবহৃত অন্তত ১৬৮ অক্ষরের টাইপের পরিবর্তে ৬৮টি টাইপ রাখিলেই কাজ চলিয়া যাইবে। এছাড়া তিনি যে সব চিহ্নের তালিকা দিয়াছেন (কমা, সেমিকোলন, প্রভৃতির নাম তিনি দিয়াছেন কলা, কলাবিন্দু) তাহাদের সংখ্যাও ৩৪, এই সকল সুবিধার মূল্য কম নহে। শিক্ষা, সাহিত্য, মুদ্রণকার্য—পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে চলিবে না। যদি ভাষার বাধা দূর করা যায়, সাহিত্যের সৃষ্টি করিবার শক্তি সহজে কাজ করিতে পারিবে, চিন্তাও স্পষ্ট হইবে, প্রকাশভঙ্গীও হইবে জোরালো। এই তো হইল আমাদের বাঙ্গালীদের দিক হইতে বিবেচনা করার ব্যাপার। অন্য দিক দিয়াও দেখিবার আছে। সম্প্রতি বঙ্গদেশবাসী অবাঙ্গালীদের মধ্যে বাংলা-ভাষার আদর নূতন করিয়া দেখা দিতেছে—প্রাদেশিকতার দোষ বর্জন করিবার জন্যই হউক আর যে কারণেই হউক, বাংলা প্রবাসীরা বাংলা দেশকে স্বদেশ ও বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে আগ্রহ দেখাইতেছেন, ঠিক এ সময়ে সাহিত্যিকেরা ও ভাষাবিদেরা প্রয়োজন মত লিপি-সংস্কারে সম্মত হইলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য রাষ্ট্রভাষার গৌরবময় আসন না পাইয়াও অম্লান গৌরবে বিরাজ করিবে; তাহার মহিমা ম্লান হইবার কোন আশঙ্কাই থাকিবে না। অক্ষর-সংখ্যা তিন ভাগের এক ভাগে নামাইলে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বাংলা আর মোটেই কঠিন বলিয়া মনে হইবে না। দেশে বিদ্যার বিস্তার সহজসাধ্য হইলে সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের গৌরব নিশ্চয়ই বর্ধিত হইবে, প্রসারও হইবে। হয়তো আমাদের রক্ষণশীল মন প্রথমটায় এই ধরণের প্রস্তাবে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিবে, কিছুতেই অভ্যস্ত পথ ছাড়িয়া অন্য ধারা বাহিয়া চলিতে চাহিবে না, কিন্তু বাংলা বানানের নিয়মে অশেষ রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও যেমন পরিবর্তন আসিয়াছে, অন্তত এক শ্রেণীর লেখকের অভ্যাসে, তেমনি লিপি-সংস্কারের চেষ্টাও নিকট ভবিষ্যতে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে—কে জানে, আমাদের অনাস্বাদিত-পূর্ব স্বাধীনতার। পরিবেশে এরূপ সংস্কার সহজ হইয়াও উঠিতে পারে। সাহিত্যসেবীর পক্ষে এই সংস্কারের প্রস্তাব মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। ভারতীয় অন্যান্য ভাষাতেও অনুরূপ চেষ্টা চলিতেছে। রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি কয়েক বৎসর হইল নানা প্রকার পরিবর্তন করিয়া দেখিতেছেন, প্রথম শিক্ষার্থীর ভার কতটা লঘু করিতে পারা যায়। গান্ধীজীর প্রভাবে গুজরাতী সাহিত্যিকরাও লিপি-সংস্কার পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। দক্ষিণে তামিল ভাষাতেও কালোপযোগী লিপি পরিবর্তনের কথা লেখকেরা ভাবিতেছেন। পণ্ডিত জওয়াহরলাল কাল বলিয়াছেন—No nation's problems can be isolated—কোন জাতির সমস্যাই বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। নানা বিষয়ে বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের সমস্যা সাধারণ, সমাধানও একই ধারা অনুসরণ করিবার কথা। ভারতবাসীর একজাতীয়ত্ব এই দিক দিয়া সন্তোষজনক ভাবেই প্রমাণ করা যায়।

ভবিষ্যতের সাহিত্য যে কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে চিন্তাশীল অনেক মনীষীই কল্পনার ছবি আঁকিয়াছেন। প্রায় আশী বৎসর পূর্বে এমিয়েলও আঁকিয়াছিলেন ভবিষ্যতের ছবি ;—" ফরাসী সমালোচক

টেইন (Taine) লিখিত ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়িয়া তিনি বলিয়াছিলেন—ভবিষ্যতের সাহিত্যের রূপ হয়তো আমেরিকান ঢং-এরই হইবে—গ্রীক আর্ট হইতে যত দূর সম্ভব অন্য রকমের; তাহা আমাদের জীবনের অনুভূতি না দিয়া শিখাইবে বীজগণিত, চিত্র বা মূর্ত্তি না দিয়া দিবে ফরমূলা বা যন্ত্র, অ্যাপোলোর দিব্য উন্মাদনার পরিবর্ত্তে বীক্ষণাগারের চুল্লীর বাষ্প। চিন্তার আনন্দের স্থান গ্রহণ করিবে প্রাণহীন সৃষ্টি, আর আমরা দেখিতে পাইব কেমন করিয়া বিজ্ঞান কবিতার গায়ের চামড়া উঠাইয়া কবিতার মৃত্যু ঘটায়, তাহার দেহ ব্যবচ্ছেদ করে।"

কিন্তু বিজ্ঞান যে সাহিত্যের পরিপন্থী নয়, আমাদের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দরের লেখায় তাহা বহু বার প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, এবং ভবিষ্যতের বাংলা ভাষায় যে বিজ্ঞানের সার্থক সৃষ্টির বিপুল সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে নিত্যই তাহার প্রমাণ পাইতেছি। "জ্ঞান ও বিজ্ঞানের" পাতায় পাতায় নূতন লেখকদের কথা বলিবার সহজ সরল ভঙ্গী তাহার প্রমাণ দেয়। এ কথা অবশ্য দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করিব যে, আমাদের দেশে প্রাথমিক বিজ্ঞানের জ্ঞান পরিবেশন করিবার যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, আজও তাহা কথামাত্রই রহিয়া গিয়াছে, সে কথা অনুযায়ী কাজ তো হয় নাই। যেদিন বাঙ্গালার শিক্ষার সত্যকার বিজ্ঞানের স্থান থাকিবে সেদিন সমৃদ্ধ ও সহজ চিত্ত-সম্পদের অধিকারী বাঙ্গালীর মন কখনই বিজ্ঞানের অন্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন থাকিবে না, বিজ্ঞানের শিক্ষা তাহাকে বাস্তব ও অতীন্দ্রিয় উভয় জগতেই অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতে শিখাইবে; তাহার ভিত্তি থাকিবে স্থূল মাটির উপরে, কিন্তু মন থাকিবে বিশ্ব পরিব্যাপ্ত, তাহার মাথা ভেদ করিয়া উঠিবে দূরপ্রসারী নীল আকাশের চন্দ্রাতপকে বিদেশী ভাষার চাপ যে আমাদের হৃদয়ের উৎসকে কতখানি রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এই অল্পকালের মধ্যে তাহার আভাষ পাইয়াছি; মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে তাহা আরও স্পষ্ট হইবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর কল্যাণ সাধন করুক, ইহা প্রার্থনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

সন্ধ্যাভৈরবী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

জীবনের পথে খালি কুড়িয়েছি ধূলো ও কাঁকর,
নিজের হুকুমে আমি সখ ক'রে নিজের চাকর।
পথ-শেষে এসে যবে ছাড়িয়াছি যত-কিছু আশা—
ধূলিপটে এ কি বাণী—লেখা কার সোনার আখর।

* * *

সোনার অক্ষরে আঁকা বাণী ক্রমে হ'ল মূর্ত্তিমান,
দাঁড়াল সম্মুখে মোর আজন্মের কলস্বপ্নগান।
কণ্ঠে বাজাইয়া বেণু বলিল সে, "হতাশ পথিক।
এসেছ যেদিক থেকে, সেই দিকে কর গো প্রস্থান।"

* * *

"কি আছে সেখানে দেবি? নাই কোন নূতন বিস্ময়।
পরিচিত, পুরাতন—রূপ, রস, গন্ধ সমুদয়।"
হাত দু'টি ধ'রে মোর ছন্দে বলে স্বপনপ্রতিমা—
"ফিরে চল ওগো বন্ধু। সেথা নিত্য নব সূর্য্যোদয়।"

* * *

সূর্য্যাস্ত-প্রদেশ ছাড়ি ফিরি ফের পূর্ব্বাচল পানে।
মানসী বান্ধবী এসে কাছে মোর কহে কাণে কাণে:
"তোমার অন্তরে বন্ধু, থাক্ চিরজীবন্ত প্রভাত,
বদ্ধ কভু হোয়ো নাকো অন্ধকার সন্ধ্যার শ্মশানে।"

শীতে উপেক্ষিতা

"রঞ্জন"

সাত

সমগ্র বিশ্ব পান্থশালা কি না জানিনে—ধর্মশালা যে নয় তা জানি—কিন্তু দার্জিলিংকে মুসাফিরখানা বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। এত হোটেল বোধ হয় এদেশে আর কোথাও নেই। কলকাতায় প্রায় প্রত্যেক পঞ্চম দোকানই যেমন ভাতুড়ে ভ্যালি চায়ের দোকান এবং প্রত্যেক দশম আপিসই অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, দার্জিলিঙেও তেমনি হোটেল আছে কয়েক বাড়ী পরে পরেই। সেগুলির বেশীর ভাগেরই অবস্থিতি মনোরম ও ব্যবস্থা সুষ্ঠু। সেগুলিতে বাস করা শাস্তি নয়, স্বস্তি। সেখানে অবস্থান গৃহ থেকে নির্বাসন নয়, আকাঙ্ক্ষিত পলায়ন। অতিথি এখানে অবাঞ্ছিত, অনাহূত নয়; আমন্ত্রিত।

সদ্য স্বাধীন ভারতের উন্নয়ন সাধনের জন্যে চাই প্রচুর বিদেশী মুদ্রা। আমাদের হাতে তার পরিমাণ পরিমিত, আয়ের পন্থাও অগণিত নয়। ষ্টার্লিং এলাকায় আমরা বন্দী। তার বাইরে আমাদের কিনতে হয় আজকের জন্য খানা, কালকের জন্য কল-কারখানা। কিন্তু কিনব কী দিয়ে? হাতে পয়সা নেই বললে ঠিক হবে না। পয়সা আছে। এমন কি পাউণ্ডও আছে—রিজার্ভ ব্যাংকে না হলেও ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডে। কিন্তু চাই যে ডলার। ডলারের দেশে পাঠাবার মতো পয়সা আমাদের বেশী নেই।

বিদেশী মুদ্রা অর্জন করবার একটা উপায় হচ্ছে পরদেশীকে আমাদের ঘাটে ভিড়া লাগিয়ে পান খেয়ে যেতে প্রলুব্ধ করা। এই টুরিষ্ট ট্রেড এখন বৃটেন শুরু করেছে পরম উৎসাহে। তারও আমাদেরই অবস্থা—ডলার নেই। আমাদের সরকারও টুরিষ্ট ট্রেড সম্বন্ধে সমান উৎসাহী। ভারতের ইতিহাস এদিক থেকে আমাদের পরম সম্পদ। কিন্তু তবু পরদেশীর মন ভোলাতে পারছি কই আমরা? রেল-ষ্টীমারে যাতায়াতের অসহ্য অসুবিধা যে হারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তা থেকে ভ্রমণবিলাসীর পক্ষে উৎসাহ সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। রেলওয়ে রিফ্রেসমেণ্ট রুম এবং ডাইনিং কার থেকে পানীয় নির্বাসন করে নৈতিক সংস্কার সাধনের যে ব্যবস্থা হয়েছে তা থেকেও বিদেশীর ভ্রমণপিপাসা দুর্দমনীয় হয়ে উঠবার কথা নয়। এ সমস্ত আনুষঙ্গিক অসুবিধার কথা উপেক্ষা করলেও ভারতের ভ্রমণ উদ্যোগের প্রধানতম অন্তরায় আমাদের হোটেল-ব্যবস্থা, অর্থাৎ অব্যবস্থা। কয়েকটা প্রাদেশিক রাজধানীর গুটিকয় হোটেলের কথা বাদ দিলে তার বাইরে আবাসযোগ্য একটা হোটেল মেলা ভার। হোটেল নাম ধরে যেগুলি আছে সেগুলি হয় জেল নয় হাজত। কোনো কোনোটা বা দান্তের মহাকাব্যের প্রথমাংশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই অবস্থার জন্য দায়ী আমাদের চরিত্রগত স্থাণুতা: এই স্থাণুতার ফল আমাদের দেশব্যাপী হোটেলহীনতা।

দার্জিলিঙের অন্যান্য অনেক কিছুর মতো তার হোটেল-ব্যবস্থাও এই সাধারণ ভারতীয় নিয়মের ব্যতিক্রম। মরশুমী অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য ছোটো বড়ো মাঝারি যত হোটেল আছে তার অধিকাংশই ব্যবস্থাপন্ন। অবস্থাপন্নদের জন্য আছে মাউণ্ট এভারেষ্ট, উইণ্ডামিয়ার ইত্যাদি। মাথা-পিছু সেখানে দৈনিক দক্ষিণা পঁচিশের

কাছাকাছি। তার নীচের স্তরের জন্য আছে বেলভিউ, সেন্ট্রাল, সুইস্, ইত্যাদি।

হোটেলগুলির দক্ষিণাও কিন্তু দার্জিলিঙের আবহাওয়ারই মতো পরিবর্তনশীল। শরতে আর বসন্তে যখন জনসমাগম হয় সর্বাধিক তখন মূল্য থাকে শীর্ষে। শীতে আর বর্ষায় বিমুখ অতিথির পকেটের তুষ্টিবিধানের জন্য দক্ষিণার হ্রাস হয়—কলকাতায় যেমন ছিল ট্রামের চাপ, মিডল্ড ফেয়ার। কিন্তু সব হোটেল আবার সারা বছর খোলা থাকে না। বেশীর ভাগই মরশুমী ফুলের মতো নির্দিষ্ট ঋতুতে দ্বার খোলে, চোখ মেলে। কুসুমের মাস শেষ হলে নীরবে বিদায় নেয়।

শরতে আর বসন্তে কিন্তু এই হোটেলগুলিতে প্রতিযোগিতার অন্ত থাকে না। প্রতিযোগিতা শুধু হোটেলের মালিকদের মধ্যে নয়, সেগুলির অতিথিদের মধ্যেও। সে প্রতিযোগিতা ব্যবসাগত নয়, শ্রেণীগত। মাউন্ট এভারেস্টের কৌলীন্য নেই স্নো-ভিউ বা হিল-ভিউ হোটেলে। অক্টোবরে বা এপ্রিলে তাই ম্যালে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে মাউন্ট এভারেস্টবাসিনী মিত্রজায়া বসুজায়াকে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে বসুজায়া উত্তর দেন, "আর বোলো না ভাই, আমি সেই জুলাই মাস থেকে বলছি যে আগে থেকে লিখে জায়গা রিজার্ভ করো। কিছু না হোক হাজার বার বলেছি। ওর না কি সময়ই হয় না। শেষ মুহূর্তে এসে আর কোথাও জায়গা না পেয়ে নিরুপায় হয়ে উঠতে হয়েছে—এ।" সম্ভাব্যতার দিক থেকে বসুজায়ার উক্তি নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্য নয়, কিন্তু বিশ্বাস করে না কেউ এমন কথা। একথা বসুজায়ারও অজ্ঞাত নয়, কিন্তু তবু বলতে হয়। মিত্রজায়াকেও তাঁর অবিশ্বাস গোপন করতে হয় স্মিত হাস্যের অন্তরালে।

এমন অজস্র হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় মরশুমী দার্জিলিঙে, কেন না সেখানে ভ্রমণের জন্যেই তো শুধু যাওয়া হয় না, যাওয়া হয় সামাজিক রীতির অসংখ্য আইনের প্রতি অন্ধ আনুগত্যে। ইংরেজিতে ওরা যাকে বলে জোন্‌সদের সঙ্গে সমান তালে চলা, এ বুঝি তারই স্বদেশী সংস্করণ। মিষ্টার মিত্র গেলে মিষ্টার বসুকে যেতেই হবে এমন ধ্রুব নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু মিসেস্ বসু এমন একটা গুরুতর বিষয়ে মিসেস্ মিত্রের কাছে পরাজয় স্বীকার করবেন একথা উচ্চারণ করবার মতো হঠকারিতা যার আছে ঈশ্বর তার সহায় হোন।

পুরুষে পুরুষে বৈষম্যের বিভিন্ন মান আছে। পরস্পরের উৎকর্ষ অপকর্ষের প্রসঙ্গও সেখানে অবান্তর নয়। মিষ্টার দত্তর সঙ্গে মিষ্টার সেনের যে প্রভেদ তা প্রধানত এই যে প্রথম জন ক্লাস ওয়ান অফিসার আর দ্বিতীয় জন ক্লাস টু। মিসেস্ দত্তর সঙ্গে কিন্তু মিসেস্ সেনের এমন সুস্পষ্ট প্রভেদ নেই। এ দু'য়ের প্রতিযোগিতায় তাই অন্যান্য প্রসঙ্গের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

তাই হয়তো দত্ত এবং সেনকে ম্যালে দিনের পর দিন দেখা যাবে একই পুরানো রিপু-করা ফ্ল্যানেল আর টুইডে যদিও দত্তজায়ার বেলায় একই শাড়ীতে একাধিক আবির্ভাব একেবারেই অভাবনীয়। তাদেরও দু'জনের মধ্যে সাম্য নেই, কিন্তু তাঁদের বিরোধে বেশভূষার মূল্যটা চরম বিচার নয়। দত্ত সেনকে পরাস্ত করতে পারেন চাকরিতে, খেলায়, খ্যাতিতে। সেনের উপর দত্তর যে শ্রেষ্ঠত্ব তা আপন ক্ষমতার দ্বারা অর্জনসাধ্য। এ দু'য়ের দ্বন্দ্বের ফলাফল নির্ধারিত হয় পরস্পরের কর্মক্ষমতার দ্বারা। সাধারণ্যে পুরুষকে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয় তার শৌর্য দিয়ে কিম্বা তার মেধা দিয়ে। এ-সংগ্রামে কোনো না কোনো একটা রকমের শক্তি চাই এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সে শক্তি নিজের হতে হয়—ধার করা চলে না।

বৈচিত্র্য-প্রীতির জন্যেই হোক বা অন্যতর কোনো উদ্দেশ্যসাধন মানসেই হোক, প্রকৃতি অবলাকে বঞ্চিত করেছে এই শক্তি থেকে। তার শক্তি মোহিনী শক্তি; বিশেষ বয়সে, সুনির্ধারিত প্রয়োজনে তার সার্থকতা এবং তার সবটুকুই কেবলমাত্র পুরুষের পরে প্রযোজ্য। কোনো মেয়ে সর্বস্ব বিলিয়ে দেবে না তার কোনো স্বজাতীয়ার রূপমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে। বরং ঈর্ষাবিষাক্ত কটাক্ষপাতে রূপশালিনীকে ভস্মীভূত করবার চেষ্টার ত্রুটি করেন না তাঁর বান্ধবীবাহিনী।

একমাত্র দেহসৌন্দর্য ব্যতীত মেয়েদের মধ্যে একের সঙ্গে অপরের পার্থক্যের পরিসর নিতান্তই সংকীর্ণ। তাই তাদের মধ্যে দৈনন্দিন সামান্যতার ঊর্ধ্বে প্রতিযোগিতার অবকাশ এত অল্প। সরোজিনী-বিজয়লক্ষ্মীদের কথা বাদ দিলে অধিকাংশ নারীরই সামাজিক জীবনে স্থান নির্ধারিত হয় প্রথমে পিতৃকুলের কল্যাণে এবং পরে পতিদেবতার সাফল্যে বা অসাফল্যে। তাই তাদের মান আগলে রাখতে হয় অনুক্ষণ অন্তহীন যত্নভরে। ময়ূর পারে তার পুচ্ছকে তুচ্ছজ্ঞান করতে। আত্মবিশ্বাসহীন বায়সের সে সাহস আসবে কোত্থেকে?

চামড়ার তলায় কর্ণেল-পত্নী ও জুডি ও' গ্রেডি যে অভিন্না ভগিনী, এই আত্মীয়তা অস্বীকার করতে কর্ণেলপত্নীর তাই প্রতি পদক্ষেপে জুডিকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে তিনি যাঁর স্কন্ধলগ্না তাঁর স্কন্ধে একটি ক্রাউন ও দু'টি তারা শোভা পায়। স্বামীর য়ুনিফর্ম পরিধান করে বাইরে বেরুবার উপায় নেই, সব সফল স্বামীর আবার য়ুনিফর্মও নেই। কর্ণেল-পত্নীর মহিমার প্রত্যক্ষ উদ্ভাসনের জন্যে তাই উদ্ভাবন করতে হয়েছে অন্যান্য পন্থা যাতে কখনোই তাঁকে জুডির জুড়ি বলে ভুল না হয়। যে-প্রভেদের অস্তিত্বই নেই তাকে প্রত্যক্ষ করা প্রতিভাসাপেক্ষ।

এই দুর্লভ ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার অনুশীলন করতে হয় মিত্র-জায়ার। তাই তন্দ্রা নাহি আর চক্ষে তাঁর—তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা, সদা আন্দোলন। মিসেস্ সেন বুঝি মাদুরা থেকে নতুন রকমের একটা শাড়ী আনিয়েছে? তারও দূরে কোথাও থেকে আরো নতুন একটা কিছু না আনা পর্যন্ত মিত্রজায়ার নিদ্রার ঘটল নির্বাসন। মিসেস্ ঘোষ বুঝি প্রাচীন উৎকল থেকে উদ্ধার করেছে আধুনিক গৃহসজ্জার নবীন কি উপকরণ! মিত্রজায়াকে তৎক্ষণাৎ দূত প্রেরণ করতে হয় মোহন-জোদারোর, আরো প্রাচীন কিছুর সন্ধানে। তাঁর উদ্দেশ্যটা যে একেবারেই অবিমিশ্র ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা এমন বললে পুরো সত্য বলা হবে না।

নিয়ত পরিবর্তনশীল এই ফ্যাশানের অবিরাম প্রতিযোগিতায় অগ্রভাগে থাকতে হলে প্রখরতম দৃষ্টি রাখতে হয় পরিচ্ছদের উপর। সেদিক থেকে দার্জিলিঙের মতো প্রদর্শনীক্ষেত্র ভারতে দুর্লভ। হেমন্তের শেষে সন্ন্যাসী শীত হিমগিরি ফেলে নিচে নেমে এসে হয়তো বিচ্ছেদভারে বনচ্ছায়ারে বিধুর করে এবং ঝরা-পাতায় ঝড় উড়িয়ে যাহা কিছু ম্লান বিগত জীর্ণ, দিকে দিকে দেয় করি বিকীর্ণ। কিন্তু প্রকৃতির যেখানে শেষ, সেইখানেই তো আর্টের শুরু। প্রকৃতির

যখন নিরাভরণ বৈধব্যের শুভ্রতার সাজ খসাবার পালা, মানবীর সাজ পরবার সেইটেই প্রশস্ততম ক্ষণ।

পরিচ্ছদ-রচনার পক্ষে গ্রীষ্মের চাইতে প্রতিকূল ঋতু আর নেই। প্রখর তপন-তাপে ঘরের বাইরে পা বাড়ানো মানে পা পোড়ানো। তখন কে যাবে বেরুতে বেড়াবার জন্তে? আর বাইরেই যদি না যাওয়া গেল, তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা? নির্বাক বহ্নি যখন শুধু মাত্র অন্তরে দহে না, দেহেও, তখন অঙ্গে সামান্যতম আবরণ ধারণ করাই প্রাণান্তকর ক্লান্তি। তার উপর আবার বিলাসের বাহুল্য বোঝাই করবার উৎসাহ থাকে না কারো। গরমের পরে আবার যদি থাকে কলকাতার হিউমিডিটি, তাহোলে পোষাক করতে গায়ে ঝরে ঘাম, আর চোখে জল।

সমতলবাসিনী তাই সারা বছর ধরে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকেন দার্জিলিং আরোহণের প্রতীক্ষিত অবসরের পানে। তখন ডাক পড়ে দর্জির, দোর খোলে ওয়ার্ডরোবের। বেরিয়ে আসে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্রতর বস্ত্রের সম্ভার—ম্যালের বেঞ্চিতে বসে বিস্ফারিত নেত্রে গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

ইংরেজিতে যাকে 'ফিগার' বলে, ভারতীয়দের সৌন্দর্যের সেটাই ঠিক forte নয়। ব্যায়ামের স্বল্পতা এবং নিদ্রা ও আহারের অকৃপণতার কল্যাণে বেশীর ভাগ ভারতীয়ই মেদ-বাহুল্যে বিব্রত হয় জীবন-মধ্যাহ্নের অনেকগুলি প্রহর আগে। তাই প্রসাধনকারিণীর প্রধান সমস্যা প্রকাশন নয়, লুক্কায়ন; উদ্ঘাটন নয়, অচ্ছাদন।

দার্জিলিঙের শীত এদিক থেকে কুশল রূপায়ণের পরম সহায়। তবু এমন কথা বলা চলবে না যে শৈলবিহারিণীগণ প্রত্যেকেই এই সহজ সত্যটা স্বীকার করেন। প্রকৃতিদত্ত সুযোগ হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করে বিদেশিনীদের অনুকরণে তাঁরা যে পরিধেয় নির্বাচন করেন তাতে না থাকে ভূগোলের মান, না রুচির। অধুনা যেটার প্রচলন ভয়াবহ বেগে প্রসার লাভ করেছে তার নাম 'শ্ল্যাক্স্'—ট্রাউজারসের স্ত্রী-সংস্করণ। লালিত্য-বিরহিত এই পোষাকটায় সুন্দরীর রূপ বৃদ্ধি পায় না, অসুন্দরীর অকিঞ্চিৎকরতা মুখরা হয়ে লজ্জা বাড়ায় মাত্র।

রূপগ্রহণে আমি আপোষবিহীন অদ্বৈতবাদী নই। কবির মতো সর্বশেষের গানটি আমার কেবল মাত্র কল্যাণী গ্রামবধূর জন্যই রিজার্ভড্ নেই: হলিউডের গড়া ডিভান শায়িতা রূপসীরাও আমার মুগ্ধদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত নয়। মেঘলা দিনে কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ দেখে আমার হৃদয় যেমন ময়ূরের মতো নাচে, তেমনি আলোকোদ্ভাসিত ব্রডওয়ের প্রশস্ত পথেও সৌন্দর্যের সন্ধান পেলে আমার হৃদয়ে পুলকের অকুলান ঘটবে এমন আশংকা করিনে। কিন্তু অর্থনীতির মতো রূপায়ণেও আমি টেরিটোরিয়াল ডিভিশনে বিশ্বাসী। মাদাম্ চিয়াং কাইশেককে শাড়ি-পরিহিতা দেখে মুগ্ধ না হলেও ক্ষুব্ধ হইনে; কিন্তু রুসেং কোলবেয়ারকে বেনারসী-বিভূষিতা দেখলে নিতান্তই লাঞ্ছিত বোধ করি, যেমন লাঞ্ছিত বোধ করি শ্ল্যাক্স্ভূষিতা মিত্রজায়ার আবির্ভাবে।

সাধারণ ভাবে এ কথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে পাশ্চাত্য সৌন্দর্যের প্রধানতম সম্পদ হচ্ছে তার Glamour আর আমাদের মেয়েদের গৌরব হচ্ছে তাদের Grace। ওরা ওদের উদ্ধত ঔজ্জ্বল্য দিয়ে চোখকে ধাঁধায়, এরা এদের স্নিগ্ধ লাবণ্য দিয়ে নয়নকে তৃপ্ত করে। সৌধসৌধে অনেক ম্যান্সন্ আছে। তাই বুঝতে পারিনে লালিত্যের রাজ্যের সম্রাজ্ঞী মিত্রজায়া কেন ঔজ্জ্বল্যের কক্ষে ভিখারিণী হতে যান!

কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁর পক্ষে রূপচর্চাটা শুধু মাত্র কলাবিচারসাপেক্ষ নয়। শ্রেণী-বিভাগের প্রশ্নটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পরিচ্ছদের দুর্মূল্যতায় আর ঔজ্জ্বল্যে সারা বিশ্বকে এ-কথাটা উচ্চৈঃস্বরেই জানাতে হবে যে ঐশ্বর্যের দ্বন্দ্বে মিত্রজায়া কারো লজ্জানাই কুড়িয়ে নিতে দ্বিধা করবেন না।

কিন্তু মিত্রজায়া তাঁর প্রথম উদ্দীপনাকে দ্বিতীয় চিন্তার পরিণতি থেকে সজোরে রোধ না করলে বোধ হয় উপলব্ধি করতে পারতেন যে কিঞ্চিৎ দ্বিধাই সমীচীন হোতো। মিষ্টার মিত্রের সমৃদ্ধির বৃদ্ধির জন্যে নয়, মিত্রজায়ার নিজেরই সম্মান রক্ষার জন্য।

প্রাচীন সমাজে গৃহকর্ত্রীর একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। গৃহমধ্যে তাঁর অস্তিত্বের সার্থকতা কেবল মাত্র শোভাবর্ধনেই নিবদ্ধ ছিল না। সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগ করে অসংখ্য পারিবারিক কর্তব্য সাধন করে তিনি পুনরায় যখন শয্যাগৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন রাত্রি আর কিশোরী থাকত না। পরিবার পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অংশ ছিল সর্বতোভাবে সক্রিয়—কেবল মাত্র দীন জনের কুটীরে নয়, ধনিজনের ভৃত্যসংকুল প্রাসাদেও। গৃহকর্ত্রীর অপরিসীম ব্যক্তিত্ব পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকতো প্রতি গৃহের নিপুণ পরিচ্ছন্নতায় আর সুস্পষ্ট শুচিতায়। তাঁর কাজ শুধু প্রদর্শন ছিল না। এমন কি শুধু মাত্র পরিদর্শনও নয়। তিনি প্রতিটি কাজে নিয়োজিত করতেন নিজের হাত। আমাদের সকলের মনে মা-ঠাকুমার যে ছবি আছে তা এই ছবি। গৃহকর্ত্রী তখন বাইরে গিয়ে অর্থ উপার্জন করতেন না কিন্তু সংসার-পরিচালনায় তাঁর কাজ ছিল ফুল-টাইম্ জব।

এদেশের আধুনিকাদের কিন্তু এমন দাবী করবার অধিকার নেই একেবারেই। তাঁদের গৃহকর্মের জন্যে আছে দাসদাসী, শিশু-পরিচর্যার জন্যে আয়া, অন্যান্য কাজের জন্যে অন্যান্য লোক। পরিবার-পরিচালনের কাজে আজকের গৃহকর্ত্রী ঠিক কতটা কাজ করেন তার পরিমাপ করলে টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাবে তার যা মজুরি নির্ধারিত হবে তা দিয়ে গৃহকর্ত্রীর একটি বেলার প্রসাধনেরও খরচ উঠবে না।

কিন্তু আজ যদি মিত্রজায়াকে বলি, ঠিক কিসের বিনিময়ে তিনি মিত্রার্জিত অর্থের অপব্যয়ের অধিকার লাভ করেছেন তাহ'লে মিত্রজায়া শিউরে উঠবেন।

নেপালী মেয়েরা কিন্তু এ-অপবাদ সহ্য করবে না কোন মতেই। কর্মিষ্ঠতায় ও কর্মক্ষমতায় ওরা নেপালী পুরুষদের সমকক্ষ নয়, অগ্রণী। হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, সর্বত্রই দেখা যায় নেপালী মেয়েদের অসাধারণ কর্তৃত্ব এবং অসাধারণ আত্মনির্ভরতা। শুনেছি, এমন পরিবারও বিরল নয় যেখানে স্ত্রীর উপার্জনেই পরিবারের অন্নসংস্থান হয় এবং স্বামীই অলংকাররূপে শোভা পান। নেপালীদের মধ্যে তাই সিভ্যালরাস্ পৌরুষবোধটা ঠিক সার্বজনীন নয়। 'তোমার বসে থাকা, আমার চলাচল'—এটা স্ত্রীর প্রতি নেপালী পুরুষের উক্তি নয়। তিনি বরং প্রায়শই তূষ্ণীম্ভূত হয়ে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে বলেন, "কেই ফিকর গরনু পড়্দেই না—যো হুনছা দেখা জালা!"

মূল নেপালী উক্তি সমেত স্থানীয় আচারের পরিচয় দান

করছিলেন মিসেস্ রায়, আমার বাসার 'কাঞ্চনজঙ্ঘা কর্ণারের' একচ্ছত্র পরিচালিকা। এটা ঠিক হোটেলও নয়, বাড়ীও নয়। অতিথি এখানে উভয়েরই সুবিধা ভোগ করতে পারেন। একা থাকতে চাইলে নিঃসংগতায় বাধা দেবে না কেউ। নিঃসংগ বোধ করলে মিসেস্ রায়ের হাস্যময়ী উপস্থিতিতে শূন্যতা বোধের নিরসন হয়।

রায় মশাই বেশীর ভাগ সময়েই বাইরে থাকেন। অতিথির অভাব-অভিযোগ শোনা এবং তার প্রতিকারের ভার তাই মিসেস্ রায়েরই। তাছাড়া ভাষাগত অসুবিধার জন্যও তাঁকেই অতিথি এবং ভৃত্যদের মধ্যে Liaison-য় কাজ করতে হয়। কেউ গরম জল চাইলে মিসেস্ রায় তৎক্ষণাৎ মৃদু কিন্তু গম্ভীর কণ্ঠে "কাঞ্চা" বলে সম্বোধন করে নেপালী ভাষায় আদেশ করেন।

নেপালী ভাষায় অনর্গল কথোপকথনে মিসেস্ রায়ের অদ্ভুত প্রথম দিনই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেম, "আপনি এত চমৎকার নেপালী শিখলেন কি করে?"

মিসেস্ রায় উত্তর দেবার আগেই মিষ্টার রায় বললেন, "কিছু নয়। খুবই সোজা ভাষা। বাঙলার সঙ্গে অনেক মিল আছে। আপনি যদি মাস তিনেক থাকেন তো আপনিও অনায়াসে শিখে ফেলবেন।" ইত্যাদি।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা' বাংলোটা বৃহৎ নয়। নিজেদের জন্যে একটি মাত্র ঘর রেখে বাকী চারটে তৈরী করেছেন দক্ষিণাদাতা অতিথিদের জন্য। সীজনে ঘরগুলো বড়ো একটা খালি থাকে না, কখনো-কখনো বা উপচে পড়ে। কিন্তু এখন আমি ছাড়া অন্য অতিথি আর নেই। তাই পৌঁছোবার কিছুক্ষণ পরে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি আমার বাক্স-বিছানা সব কিছু খুলে জিনিস-পত্তর বের করে দু'টো পাশাপাশি ঘরে সুন্দর সুবিন্যস্ত ভাবে সাজানো রয়েছে। বিদেশে এমন পরিপাটী ব্যবস্থা আমি নিজে কখনোই করে নিতে পারতেম না! এই সব ব্যবস্থায় যে নিঃসন্দেহে 'ফেমিনিন্ টাচ' ছিল তা অন্ধেরও বুঝতে বাকী থাকে না।

মিসেস রায় একটু পরেই এসে বললেন, "কি? ঘর দু'টো পছন্দ হয়েছে তো?"

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে বললেন, "চলুন, খাবার দেয়া হয়েছে।"

আমি শীতে কাঁপতে কাঁপতে আয়নার সামনে হাত দিয়ে অবাধ্য কেশরাশি নিয়ে উদ্ব্যস্ত আছি দেখে মিসেস রায় হাসছিলেন। চিরুণী আনতে যে ভুল হয়ে গেছে এই কথাটা স্বীকার করতে সংকোচের সীমা ছিল না।

মিসেস রায় তেমনি হাসতে হাসতে বললেন, "দাঁড়ান, এখনি একটা কাংগো এনে দিচ্ছি আপনাকে।"

কাংগো? সে কী জিনিস? অন্তর্হিতা মিসেস রায়ের পুনরাবির্ভাবে বোঝা গেল যে তা চিরুণীর চাইতে ভয়াবহ কিছু নয়। কিন্তু কাংগো কেন? চিরুণী নয় কেন? কে জানে!

খাবার-ঘরে গিয়ে দেখা গেল রায় নেই সেখানে। জিজ্ঞাসায় জানলেম যে রায় কাজে গেছেন, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। এই অনুপস্থিতি যে রীতিই, ব্যতিক্রম নয়, তা দিন কয়েকের অবস্থিতিতে স্পষ্ট হোলো।

আমার জীবনটা ঠিক শিশুদের অভিনয়োপযোগী একেবারে স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত নাটক নয়। কিন্তু মিসেস রায়ের প্রিসিডেন্ট নেই আমার অভিজ্ঞতায়। মহিলার আতিথেয়তায় যে নির্ভুল প্রতিভার পরিচয় আছে তা নিখুঁত ভাবে এফিসিয়েন্ট—সামান্যতম অপব্যয়ের বিরুদ্ধে তাঁর উদ্যত তর্জনীকে ভৃত্যরা ভয় করে—কিন্তু এই দক্ষতাকে আচ্ছন্ন করে আছে তাঁর সুমধুর ব্যবহার। তার মধ্যে স্নিগ্ধ আন্তরিকতার আভাস আছে কিন্তু অত্যধিক অন্তরঙ্গতা নেই। তা শুষ্ক ভদ্রতাই শুধু নয়, কিন্তু আর্দ্র আদর দ্বারাও সে আপ্যায়ন জর্জরিত হয়নি। মহিলার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে গ্রেস্ এবং ডিগনিটির। তাঁর গ্রেস অতিথিদের হৃদয় আকৃষ্ট করে। কিন্তু তাঁর ডিগনিটি রায়কে ক্লিষ্ট করে।

এই ক্লেশ গোপন করতে রায়ের চেষ্টার ত্রুটি নেই। আগন্তুকের সম্মুখে ওদের দু'জনের ব্যবহারে সামান্যতম সন্দেহেরও কারণ হয় না যে ওরাই বিশ্বের আদর্শ-দম্পতি নয়। রায়কে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর আসে, "তাই তো, তা আপনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু মিসেস্‌কে একবার জিগেস করা যাক, কি বলেন? হে হে, তাঁর মতটার খোঁজ নেয়া যাক, হে হে।" এটা যে রুটিন কনসাল্টেশন নয়—বরং ফর ফেভার অব অর্ডারস—তা বোঝা যায় এই থেকেই যে রায়-গৃহিণী কখনো অনুরূপ আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন না। তাঁর ডিসীশন সর্বদা জিহ্বাগ্রে। এই দ্বিধাহীন আত্ম-প্রত্যয়ের উৎস যে কী সে তথ্য পরে একদিন প্রকাশিত হোলো।

সেদিন সকালে শীতের দার্জিলিঙে আলোর আভাসটুকুও ছিল না কোনো দিকে। সূর্য ছিল নিরুদ্দেশ। আকাশে কোথাও তার খোঁজ না পেয়েই বুঝি মেঘগুলি নেমে এসেছিল মাটির কাছাকাছি। সঙ্গে এনেছিল এক রাশি দুর্ভেদ্য কুয়াশা। আমি আমার শয্যা থেকে এক মুহূর্তের জন্য গলা বাড়িয়ে জানালার বাইরের রূপহীন, রসহীন, অন্তহীন নকল সন্ধ্যার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে তৎক্ষণাৎ আবার লেপের তলায় অন্তর্হিত হয়েছিলেম। যে-দিনের দিন হয়ে দেখা দেবার সাহস নেই, কাজ নেই অমন দিনকে 'সুপ্রভাত' বলে লজ্জা দিয়ে।

দরজায় আঘাতের উত্তরে 'কাম ইন' বলার আহ্বানে যিনি প্রবেশ করলেন তিনি রায়-গৃহিণী। এটা যে একেবারে অপ্রত্যাশিত তা নয়। কিন্তু আশাতীত ছিল তাঁর সেদিন সকালের রূপ।

মিসেস রায়কে অসামান্যা সুন্দরী বললে অতিরঞ্জন হবে, যদিও সৌন্দর্যের প্রথম পরীক্ষায়—গাত্রবর্ণে—তিনি অত্যন্ত সসম্মানেই উত্তীর্ণ হবেন। তাঁর বর্ণ শুধু সাদা অর্থে ফর্সা নয়, তার সঙ্গে মেশানো আছে রামধনুর আরো অনেকগুলি রঙ। একটু হাসলেই তারা খেলায় মাতে মিসেস রায়ের আনন ভরে।

সেদিন কিন্তু তাঁর মুখে হাসির আভাসটুকুও ছিল না কোনোখানে। চুল ছিল এলোমেলো, স্ফীত চোখে ছাপ ছিল পূর্বরাত্রির নিদ্রা-হীনতার। গায়ের উপর হেলাভরে ফেলা ছিল ফারের ওভারকোট। শূন্যগর্ভ হাতা দু'টো দু'দিকে দুলছিল অসহায়ভাবে। দুঃখ মানবের চরিত্রকে উন্নত করে কি না জানিনে, কিন্তু বেদনা যে অনেক সময় নারীর রূপকে গাম্ভীর্যমণ্ডিত করে ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য দান করে তার প্রমাণ সে সকালের মিসেস রায়।

"আচ্ছা, রায় কি আপনাকে কিছু বলেছে? কাল বিকেলে?" নানা মামুলি আলাপের মধ্যে অকস্মাৎ মিসেস রায় প্রশ্ন করলেন।

রায় অত্যন্তই সাধারণ একটি নিরীহ ব্যক্তি। উল্লেখযোগ্য বা স্মরণীয় কোনো উক্তি তাঁর কাছে কখনোই শুনেছি বলে মনে করতে পারলেম না, পূর্বদিনের বিকালে তো নয়ই। রায় ভালো লোক, তার সম্বন্ধে আর কিছু বলার নেই। মিসেস রায়ের প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে বিমূঢ় ভাবে পাল্টা প্রশ্ন করলেম, "কি সম্বন্ধে বলুন তো?"

মিসেস রায় চুপ করে রইলেন। তাঁর মুখে ছিল দুশ্চিন্তার ছাপ, কিন্তু শুধু দুশ্চিন্তার নয়। কেন বলতে পারব না, কিন্তু তাঁকে দেখে আমার মনে সন্দেহ রইল না যে বেশ গুরুতর একটা কিছু হয়েছে। কিন্তু জানতেম যে জিজ্ঞাসায় কৌতূহলের প্রশমন হবে না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে মিসেস রায় উঠে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর চোখ ছিল বাইরে। যেখানে দৃষ্টি নিষ্ফল। কাকে উদ্দেশ করে জানি না, বাইরের অন্ধ-বধির কুয়াশাকে না আমাকে, মিসেস রায় বললেন, "সেই কাল বিকেলে যে বেরিয়েছে, এখনো ফেরেনি।"

বাক্যটির, এবং কার্যটির, কর্তা যে রায়ই তাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমি কী করতে পারি ভেবে পেলেম না। সাধারণত তিনি কোথায় যান, এরকম বাইরে থাকা স্বাভাবিক কি না, ইত্যাদি মামুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে মিসেস রায়ের ধৈর্যচ্যুতি ঘটালেম কিন্তু তাঁর চিন্তার লাঘব হোলো না একটুও।

হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন, "না, না, না। সে সব কিছু নয়। আমি জানি ও আর ফিরবে না।"

ফিরবে না? কেন? কিছুই বুঝতে পারলেম না। কোনো কিছু বলার না থাকলে কোন কিছু না বলাই যে সব চেয়ে ভালো তা আমিও জানি কিন্তু তখন মনে ছিল না। একান্ত নির্বোধের মতো বললেম, "তা—তা হোলে তো বড়োই মুস্কিলের কথা।"

"মুস্কিল? কার? আমার কথা ভাবছেন? আমার একটুও মুস্কিল হবে না," মধুরা মিসেস রায়ের কণ্ঠে যে এমন হিংস্রতা নিহিত ছিল জানতেম না, "তবে, তবে ওর একটু মুস্কিল হবে হয় তো।" দাঁতে ঠোঁট কামড়ে যোগ করলেন, "এবং তাতে আমি খুশী বৈ দুঃখিত হবো না।" মিসেস রায় দ্রুতপদে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি নির্বোধ-বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে রইলেম।

বিকালের দিকে আবার যখন মিসেস রায়ের সঙ্গে দেখা হোলো সকালের ক্রোধ তখন শান্ত হয়েছে। ধুলো উড়িয়ে ঝোড়ো হাওয়া স্তব্ধ হয়েছে, বর্ষণের পালা এবার; অপমানাহত উষ্মা তখন অভিমানে পরিণত হয়েছে।

কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই মিসেস রায় বললেন, "রায় যখন নেই, আপনি নিশ্চয়ই এখানে আর থাকবেন না?"

কথাটা যে আমারও মনে হয়নি তা নয়। নিজের দুঃখের অন্ত নেই, অপরের বেদনা দিয়ে বোঝা বাড়াবার আর ইচ্ছা ছিল না। সকাল থেকেই অজুহাত উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিলেম; কিন্তু মিসেস রায় নিজেই যখন সেই প্রসঙ্গের উত্থাপন করে নিষ্ক্রমণের পথ এত সহজ করে দিলেন তখন কিছুতেই পারলেম না সেই সুযোগ গ্রহণ করতে। একটু ইতস্তত করে বললেম, "না, না, এখনি যে যেতে হবে এমন কি কথা আছে?"

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সকালের সেই দৃপ্তা রমণী করুণ, অসহায় মিনতির সুরে বললেন, "সত্যি থাকবেন আপনি আমার এখানে?"

আমি কী বলেছিলেম মনে নেই। ভয়ানক বীরত্বব্যঞ্জক কিছু নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু মিসেস রায়ের মনে তখন বোধ হয় ভাসমান খড়ের টুকুরোও অপরিসীম ভরসার সঞ্চার করতো।

কিছুক্ষণ পরে পাণ্ডুর হাসির স্নিগ্ধতায় বললেন, "কাল থেকে মনটা বড়ো খারাপ হয়ে আছে। একটু বেড়াতে বেরুবেন এখন? আমার তৈরী হতে দু' মিনিটের বেশী লাগবে না।"

উপায় ছিল না এমন অনুরোধ উপেক্ষা করবার। ইচ্ছাও ছিল না। মনে একেবারেই ভয় ছিল না বললে মিথ্যা বলা হবে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী ভয় ছিল মিসেস রায়ের কাছে এবং নিজের কাছে ভীরু বলে প্রতিপন্ন হবার। ইতিহাসের বহু দুঃসাহসিক কীর্তির উৎস অবিমিশ্র ভীরুতা।

কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারাবৃত শীতল রাত্রির মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে কিছুই না জেনে অত্যন্ত অল্পপরিচিত দু'জন একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লেম দার্জিলিঙের জনহীন পথে।

"কে জানে কি ছিল বিধাতার মনে।" [ক্রমশঃ

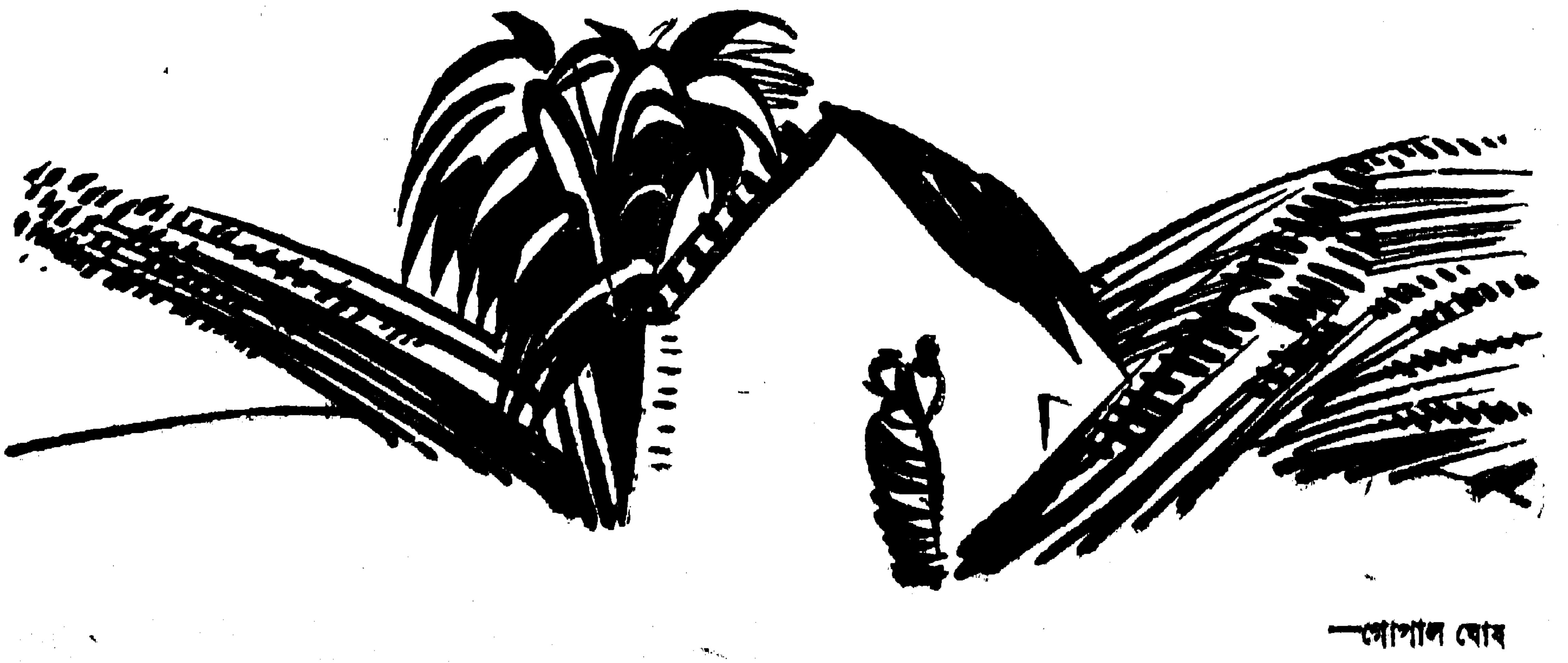

—গোপাল ঘোষ

ক্লোরোফরম

শ্রীনক্ষত্র গুপ্ত

ট্যাক্সি থেকে মুখ বের করে হাত নাড়ে। অভ্যাস—অথবা অমনি।

একসঙ্গেই পড়ত। দু'বছর······হতে পারে বছর তিনেক আগে। হয়েছিল জানা-শুনা, মেলা-মেশা—একটু যেন কেমন মাখা-মাখি। ওকে রাণী করে সাজিয়ে দেখবার সাধও যে মনে না উঠেছিল তা নয়। হেনা কিন্তু সাফ জবাব দিয়েছিল। আবার কিন্তু এক দিন হেনাই আকারে-ইঙ্গিতে জানিয়েছিল, তার চাই পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট্ট বাংলো, সে বাংলোয় ঘিরে এক-ফালি সবুজ লনের বেল্ট, আর সে সবুজ আস্তরণের প্রান্তে লাল-হলুদ মরশুমী ফুলের বেষ্টনী—কচি-কলাপাতা রংএর শাড়ীর রঙ্গীন আঁচলের মত। ময়দানে খেলবে ফুটফুটে এক জোড়া খোকা···সে বলেছিল খোকা, অমল বলেছিল খুকু। এ-নিয়ে মিষ্টি একটু মনান্তরও হয়ে গেছিল।

হেনার না কি ফেটে-পড়া রূপ। ছেলেরা তাই বলত। অমলের রূপের বালাই নেই। বিদ্যের চকচকে চাপরাশ দেখে হেনার হয়ত আরদালীর প্রয়োজন হয়েছিল। কালো কষ্টি-পাথরের একটা বিরাট দৈত্য। দরাজ বুকের রোমারণ্য আর রোমশ বাহুর লৌহ-পেশীর আবেষ্টনের বুভুক্ষা হয়ত বা তার হয়েছিল। তাই নিমরাজী হচ্ছিল ক্রমে। আবার ক্রমেই হয়ে পড়েছিল গররাজী। যদি মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—হুঁ, তাতে আনন্দ কি নিরানন্দ ও তা স্থিরই করে উঠতে পারছিল না। মন থেকে অমলের অহমিকা মাথা তুলে বলেছিল—হেনাকে বিয়ে? হতেই পারে না। মনের শাসন তাকে মানতে হয়েছিল।

এর পরও হেনা এসেছে গায়ে পড়ে পিরীতের খেলা করতে—তার কোলের পাপির সঙ্গে যেমন খেলে থাকে হয়ত তেমনি খেলা। অমলের মন তাতে বাধা দিতে হুকুম দিয়েছে—বলেছে—ঢংইলা স্ত্রীলোকটাকে ঘৃণা করতে।······

ট্যাক্সি থেকে চাঁদবদন বের করে হাত নাড়ে—আবার বদনখানিও সরিয়ে নেয়—হাড়ম্যানের হাতও।

······প্রেম? ঘরকন্না? মানে দাসখত। ওর আরদালী হওয়া। দাও। আরও দাও।

ট্যাক্সিতে বসে এক রকম চেঁচিয়েই বলে—'দেব না!' ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে চেয়ে নেয়।

······ভেতর থেকে কিন্তু কে যেন দিতে চায় সব। আবার কে যেন তার সারা অস্তিত্বটার উপর কর্তৃত্ব করে হুকুম চালিয়ে বলে—'না-না, হতে পারে না।' সে হুকুমে দাতাটি মাথা লুকোয়। অন্তর হেসে ওঠে হা-হা করে, অদৃশ্য তর্জনী হেলিয়ে বলে—দুর্ব্বলতা। ভুল!

তবু মন বুঝে না, দুর্ব্বলতাই বা কি ভুলই বা কোথায়। অমল বিচার করে সিদ্ধান্ত করে দুর্ব্বলতার হয় কোন মানেই নেই, না হয় ভেতরের এমন এক গভীর তলদেশে ওর ঠাঁই যে জোর করে তাকে চেপে রাখলেও ফাঁক পেলেই উঁকি দেয়—আর সে অবগুণ্ঠনের ফাঁকে হেনার মুখখানি দেখতে ইচ্ছ করে·····

এলিয়ে পড়ে গাড়ীতে। মন এলিয়ে পড়ে হতাশ হয়ে। পাশব পেশীগুলোও নেতিয়ে পড়ে।

পৃথিবীও না কি এমনি নেতিয়ে পড়ছে ক্রমে। ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। অনন্তের দরিয়ায় ক্ষুদে একরত্তি পৃথিবী ত একটা বিন্দুর বিন্দু। তারই মধ্যে আবার অমলের প্রাণ। দুনিয়াই যদি গেল ঠাণ্ডা মেরে, তার প্রাণটাও যে পড়বে নেতিয়ে আর হিমিয়ে তার আর আশ্চর্য্য কি। ক্ষুদে দুনিয়ার অদৃশ্য কেন্দ্র-কণা ঘিরে একটা ইলেকট্রন যেন অহরহ স্পন্দিত হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে—শূন্যে ছিট্‌কে পড়তেই বা কতক্ষণ।

এই ত বলে তোমাদের কেমিষ্ট্রি আর ফিজিক্স, আর অ্যাষ্ট্রনমি।

তবু চেষ্টা কেন? তবু কেন বেঁচে থাকা?

না বেঁচে যে থাকা যায় না। বাঁচার সাথে না বাঁচার যে পাল্লা চলেছে অমলও যে তাতে যোগ দিয়েছে···

উঃ, কি ঠাণ্ডা। পৃথিবী জমতে বাধ্য। আলোয়ানটা অমল এক হাত দিয়ে জড়িয়ে নেয়।

তবু শীত! শীতের উল্টো গ্রীষ্ম। ঠাণ্ডার উল্টো গরম। তাপ প্রতিক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়। শীতে প্রতিক্রিয়ার বিলম্ব। তাপেই আরাম!

একটা জঙ্গুলে ছবি দেখতে গেছল অমল আর হেনা। বুনোদের নাচনার যাদু-সুরে প্রেক্ষা-কক্ষের উত্তাপ রীতিমত বেড়ে গেছল। হেনার সুরভি শাড়ীর আঁচল বার-বার অমলের স্কন্ধে স্পন্দিত হয়ে বার-বার জানিয়ে দিচ্ছিল, তার সম্মতি আছে। তার পর এক দিন লেকের সন্ধ্যায় গগনের হাজারো দীপের রোসনাইএ অমল দেখেছে তার মুখ—চেখেছে দুষ্ট-দুষ্ট হাসি—হাসিতে আবেদন—আবেদনে মৃদু-মৃদু উল্লাস আর মৃদু দুঃখ। দেখেছে—লেকের প্রশান্ত জলরাশি সহসা সচল হয়ে ধীর-মন্থরে বয়ে চলেছে।

বৈজ্ঞানিক এরও একটা ব্যাখ্যা হয়ত দেবে। তারা ব্যাখ্যা করে থাকে সব-কিছুরই। খেয়াল-খুশি সব-কিছুরই ব্যাখ্যা ওদের ঝুলি খুঁজলে মিলবে।

তবু অমলের সারা মন জুড়ে হেনা। ভাবনা-প্রবাহের সুরুতে হেনা। সে স্রোত এলোমেলো ভাবে শত স্রোতে ঘুরে-ফিরে আবার মিলে-মিশে ফিরে আসে হেনায়···

ট্যাক্সি থামে হাসপাতালের গেটে। অমল এক হাতে মনি-ব্যাগটা কোন মতে খুলে একটা কি দু'টো—কত টাকার কে জানে—নোট এগিয়ে দিয়ে নেমে পড়ে। ড্রাইভার সেলাম জানায়। অমল ফিরে চায়—"সেলাম কি হে। তুমি যা আমিও সেই। একই প্ল্যানে বাঁধা। তোমার ট্যাক্সির সঙ্গে আমার যন্ত্রের ফারাক এই যে, ওটা বিগড়োয় কম—আর"—হেসে ব্যাণ্ডেজ করা-হাত দেখিয়ে বলে—আমার হামেসাই। ডাক্তার বাবুরা ত ভাই-ই বলে। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি নে। তুমি কর?

এক নার্স সামনে পড়ে। মেয়েটি মুগ্ধ হয়ে চায়। জিজ্ঞেস করে—'কি নাম বলব?'

'নাম? হেনা।'

আপনার নাম?

ঠিকই ত, আমার নাম—বলুন সেন—অমল সেন।

ঘরে একখানা বড় আরসি। ডাক্তার দাঁড়িয়ে দেখছেন আপনাকেই। বিস্তীর্ণ বক্ষ। তাঁর ধারণা, তাঁর প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ বাহু ও বিস্তীর্ণ বক্ষ দেখে রোগীদের আস্থা হয়। ডাক্তার তাই মাঝে-মাঝে আপনাকে দেখে নিয়ে আপন কেরামতিতে আস্থা ফিরিয়ে আনেন।

ডাক্তার বললেন—'আপনার এক্সরে প্লেট দেখেছি মিঃ সেন। চিন্তার কিছুই নেই। কনুয়ের জোড় একটু ঠিকঠাক করে দিতে হবে। একটু অজ্ঞান করতে হতে পারে। সে কিছু না। একটু ঘ্রাণ—তার পর নিদ্রা—তার পর বিস্মরণ।

এ লোকগুলোর মনে সংশয়-সন্দেহের বালাই নেই। মেহগনি টেবিলটার মত ওদের মন যেমন শক্ত, তেমনি নিস্পৃহ, নিশ্চিন্ত, নিঃসংশয়। ঘন নীল রংএর দেওয়ালের রেখাচিত্রের মতই এদের মর্য্যাদা। এদের চলন-চালন খেলোয়াড়দের মতই সহজ ও স্বচ্ছন্দ। ভগবানকে ভয় করে বোধ হয়। রাজভক্তও সম্ভবতঃ। ঘরে রূপসী স্ত্রী সম্ভবতঃ ওদের গরবে গরবিনী। সহকর্মী ডাক্তাররাও বুঝি মনে করে বেশ লোক। দেখেই মনে হয়; নির্ভর করা চলে,—মনে হয়, ওর কাজ ও ভালই বুঝে।

অমল ভাবে—মানুষকে ওরা টেবিলে ফেলে অজ্ঞান করে তার হাড় টানাটানি—মাংস ছেঁড়া-ছেড়ি করে—ত্বক্ মাংস ভেদ করে রক্ত চুইয়ে পড়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। তার পর শোণিতধারা বন্ধ করে দেয় চকিতে। ক্ষমতার তারিফ করতে হবে বৈ কি?

ডাক্তার চকচকে দাঁত দু'পাটি বিকশিত করে হেসে বলে—'ভয় কিছুই নেই।' একটু থেমে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলে—'দু'বছরে দু'হাজার সাত শত—একটা কেসের কোনটি ব্যর্থ হয়নি।'

অমল পকেট থেকে একটা দেশলাই-বাক্স বের করে, আবার তা পকেটে রেখে দেয়।

…অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। শত শত রোগী এসে ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইতে কইতে যেন মরে পড়ে থাকে অপারেশন টেবিলে, তার পর ফিরে পায় প্রাণ—আবার বলে কথা—ফিরে যায় ঘরে—ভয়-সংশয়ে অপেক্ষমান তাদের স্ত্রীর চোখগুলো সজল ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'এত কি ভাবছেন?'

অমল ভাবে—আলাপ বন্ধ করা চলবে না। ডাক্তার হাসে। 'কথা? মোটেই না—একটু ঘ্রাণ—তার পর নিদ্রা—তার পর বিস্মরণ।'

সত্যি ত লোকটাকে ঘৃণা করা চলে না। ঘৃণা হয় কখন? জীবন সম্বন্ধে যে সব বাতিল থিওরীর কথা কেতাবে পড়ে গেছে, সেগুলোর ব্যর্থতা দেখেই হয় ঘৃণা। উদ্দেশ্য, গতি, রূপ, আদর্শ—এ সবের নিশ্চয় মানে আছে…

অপারেশন টেবিলে উঠতে উঠতে ভাবে—জীবন জটিল যন্ত্র মাত্র নয়—আরও কিছু।

ওরা অমলের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গোণে—হয়তো বা শোনে। হেসে ফেলে বলে—'কি বলে?'

ওরা তার নাকের উপর মুখোস পরিয়ে দিয়ে বলে—'লাগছে না ত?'

অমল মাথা নেড়ে জানায়, না।

'বেশ! এইবার একটু নিশ্বেস টেনে নিয়ে ছেড়ে দিন। তার পর ঘুম!'

তার পর ঘুম! অমল ভাবে—তার পর আরাম, সব ভুলে যাওয়া! কিন্তু না ভুলে কি পারা যায় না?

নিশ্বাস টেনে নেয়।

কি মিষ্টি গন্ধ! রিমঝিম—রিমঝিম, তালে তালে নাচে হেনা বেগুনী আলোয় অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে।

ইচ্ছে হয় মুখোসটা খুলে নিক! একটু বাতাস! বিস্তীর্ণ জলরাশির ও-পার থেকে ভেসে আসে ঝিরঝিরে হাওয়া। ঝিরঝির করে ব্যজন করে যায়, বলে যায়, নাও! নাও! নাও! নাও! দেখতে দেখতে হেনা হাওয়া হয়ে বয়ে আসে, আর বয়ে যায় কুলু-কুলু প্রবাহিত বিস্তীর্ণ জলরাশির বুকের উপর দিয়ে। ইচ্ছে হয় হাতছানি দিয়ে ডাকে। হাত ওঠে না। পা দু'টো ভারি, ছুটে যেতে চায়, পারে না। নিজেই কিন্তু ফিরে এসে সর্ব্বাঙ্গে চুমু খেয়ে যায়। সে চুম্বনের শিহরণে পেশীগুলো আরামে অলস হয়ে এলিয়ে পড়ে। পায়ের তলা থেকে খুনসুরি দিতে দিতে ওর চাপাস্পর্শ ওঠে পা থেকে উপরে—আরও উপরে। মন নাচে পাগলা বাউলের ঘূর্ণী নাচ—পাকে-পাকে ঘুরে-ঘুরে। নাচে সে-ও চঞ্চল অঞ্চলের বেষ্টনী রচে। কি আনন্দ। এ কী আনন্দ!……

হঠাৎ তিনটে খুদে সাপ গালের উপর পাক জড়াতে চায়। সাপ নয় মুখোসের রবারের ব্যাণ্ড। জ্ঞান ঠিকই আছে তা হলে!

কিন্তু, ও কি! তাকে যে উড়িয়ে নিয়ে গেল! চক্রাকারে ঘোরে শূন্য। সে অনন্ত ঘূর্ণায়মান শূন্যে অমল যেন ত্রিশঙ্কু হয়ে ঝুলছে। তার সর্ব্বাঙ্গের সকল ছিদ্র দিয়ে প্রাণ চুইয়ে চুইয়ে বেরিয়ে আসে।

তবে মৃত্যু?

অমল পুরানো কথা ফিরে ভাবতে চায়। কত সমস্যার সমাধান হয়নি—ব্রহ্মাণ্ডের হেঁয়ালী—জীবনের অর্থ—ভগবান দার্শনিক, না যাদুকর! হঠাৎ উত্তর মিলে যায়। সরল সোজা সমাধান—'হেসে নাও!' কি সুন্দর উত্তর—হাস!

যে শেকল অমলকে নিয়ে মহাশূন্যে ঝুলছিল তা ভয়ঙ্কর হেসে ওঠে! প্রাণখোলা হাসি। এই ত ভগবানের বর! ওরা কাঁদে। বোকা! গোপন রহস্য ত কেউ জানে না—তাই কেঁদে মরে মূর্খরা। সে রহস্য কে-ই বা জানে? কি আশ্চর্য্য!

কিন্তু এ সত্য দুনিয়াতে বয়ে কে নিয়ে যাবে? অমল ত মরেছে। জীবনের এই গুপ্ত তথ্য আজ মাত্র অমলের কাছেই প্রকাশিত। এ সত্য সাথে নিয়েই সে চিতায় উঠবে। পৃথিবীর মুক্তির প্রাণ-ভোমরা আজ যে অমলের করায়ত্ত, সেই অমলকেই ওরা যে হত্যা করেছে! পরম তত্ত্বের ও-পার পর্য্যন্ত ওরা কারণকে তাড়া করে নিয়ে যেতে চায়—ওরা জড়কে ভেঙে-[illegible] উড়িয়ে খোঁজে কি-যেন-কি—ওরা টেষ্টটিউবে; প্রাণে সৃষ্টি ক[illegible] চায়। এমন দিন আসবে, যেদিন সূর্য্য ঠাণ্ডা মেরে গিয়ে ভ্রূকুটি-কুটিল শুকনো কটাক্ষ করবে, আর তুহিন-জমাট পৃথিবীর উপর মানুষগুলো নিষ্ফল গবেষণা প্রাণহীন পাষাণে পরিণত হবে। কি ভয়ঙ্কর! কি বীভৎস! অমল ভাবে, সে একবার শেষ চেষ্টা করে পৃথিবীর এ সব নরনারীকে বুঝিয়ে দিবে—কে তাদের হত্যা করেছে—তাদের শেষ আশাও নির্ম্মূল করেছে।

কিন্তু অমল? সে ত মরেছে। বেঁচে থাকলে সে সবাইকে মৃত্যুর সত্য-কাহিনী যে কি তা বলতে পারত। বলতে পারত—মৃত্যু সব চাইতে প্রচণ্ড তামাসা—পরম উপহাস।

অমলের হাসি পায়। হাসি চেপে রাখা আর যায় না। হাসির তরঙ্গে তার উদরের পেশীগুলো আন্দোলিত হতে থাকে। অদম্য উল্লাসে তার দুই পাশ কম্পিত হতে থাকে। কম্পন ও

ান্দোলনে যে শেকলে অমল ঝুলছিল তা যায় ছিঁড়ে। অমল হাশূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

ডাঃ বিভূতি বললেন—'শীগ্‌গির বজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ও'র ন্ত হাসি কেন বুঝি না।'

সার্জ্জেন রায় চৌধুরী বললেন—'জ্ঞান ফিরলে কিছু বলতে ারবে না। স্বপ্ন এরা মনে রাখতে পারে না। বড় আশ্চর্য্য!'

অমলের অট্টহাস্যের শেষ প্রতিধ্বনি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। া দেখে, খাড়া এক পাহাড় বয়ে উঠছে। মৃত্যুর মানেই বা কি, ত্যুর কারণই বা কি তারই সন্ধানের অভিযান। অমল সন্ধান করে ার তথ্য। মরণের প্রক্রিয়াটা মন্দ না, বেশ নাগরদোলার দোলন লক। কিন্তু মৃত্যু কি তা ত বুঝা যায় না, মাথা ঘুলিয়ে দেয়। চে থাকতেও সমস্যার পর সমস্যা—মৃত্যুর দক্ষিণ দ্বারেও সেই মস্যার পর সমস্যা পেছু ছাড়েনি। মরণের অধিবাস প্রক্রিয়া চলতে ঝট্ করে যে অণু-মুহূর্ত্তে মৃত্যু-সংস্কার হয়ে গেল, আর তার াশ লাইটে জীবনের গোপন রহস্যের হ'ল মুহূর্ত্ত-প্রকাশ—তা যদি নে রাখতে পারত অমল! অমল খাড়া পাহাড় বয়ে ওঠে আর াবে—হতে পারে জীবন মানেই মরণ, সমস্যাও হয়ত এক, সমাধানও য়ত একই···

অনেকে পাহাড়ে ওঠা-নামা করছে। প্রত্যেকের পরনে জটিল চিন্তার াক-একটা বোরখা। এক জন আর এক জনকে দেখতে পাচ্ছে না।

এক স্ত্রীলোক। চুলগুলো সব সাদা। একটা পাথরের উপর বসে াঠি দিয়ে ভুঁইয়ের উপর তার খোকার ছবি আঁকছে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে অমলের মনে হল, যেন তার মা। চোখাচোখি হল, চিনতে পারল না। মাথা তুলে অমল দেখল, পাহাড়ের উপরে বসে হেনা খেলনার ইট দিয়ে ইমারৎ রচনা করছে, আর খেলা-ঘর তৈরি বা মাত্র একখানা হাত কোত্থেকে এসে সব ভেঙ্গে দিয়ে যাচ্ছে। ্দাস শ্বাস ফেলে হেনা আবার নতুন করে ঘর বাঁধতে চেষ্টা করে। অমল চেঁচিয়ে ডাকে—হেনা! ঠোঁট নড়ে, আওয়াজ বের হয় না। চইতে পারে, শোনে না কেউ! ভয় হয়! তাড়াতাড়ি পাহাড় য়ে অমল উঠে যায়।

পাহাড়ের সোনালী চূড়া। ঐ কি জীবন? আর ঐ নীচে, েখানে সে মৃত্যু-রহস্যের সন্ধান করে ঘোরাফেরা করছিল, ঐ কি মৃত্যু?

পাহাড়ের জঙ্ঘা ঘিরে এক বনানী। ছোট একটা নদী পার লেই বন। অমল দেখলে, নদীতে জল থমকে আছে। বনের াঝখানে একটা জায়গা পরিষ্কার—সেখানে এক মন্দির। মন্দিরে কতে ইতস্তত: করে, তবু প্রবেশ করতেই কানে যায় কার যেন ীর্ঘশ্বাস! কে? চার দিকে চায়। কেউ না ত?

আরও চলে এগিয়ে। এক জায়গায় কতকগুলো লোক উত্তেজিত য়ে কি সব আলোচনা করছে।

এক জন বললে—ও যদি পাহাড়ের উপরে যেয়ে থাকতেও না ায়, নীচে গিয়ে মরতেও না চায়, তাহলে ওকে শেষ করে ফেল!

লোকটা দেখতে যেন শুকনো কাঠ—তপস্বী-টপস্বী হবে!

এক জন বললে—সংশয় বরদাস্ত করবার মত ক্ষমতা ওর নেই।

সবাই বলে ওঠে—ও ত খালি একটা ছবির ধুলোবিলা শুকনো ালির উপর।

মন্দিরের এক থাম থেকে আর এক থামে হতাশ করে বেড়ায় একটা দীর্ঘশ্বাস—অশরীরী অথচ বাস্তব—মর্ম্ম-ছেঁড়া চাপা কান্না। কার শাসনে কে যেন মুখে কাপড় গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নিঃশব্দে কেঁপে-কেঁপে কেঁদে যায়।

লোকগুলোও শোনে। ওদেরও মায়া? বলে—'ও ফিরবে, ফিরে আর একবার দেখবে।'

অমল দেখে—সে কান্নাকে ওরা ধরে-বেঁধে মন্দির থেকে বের করে নিয়ে যায়। ইচ্ছে হয় পেছু নেয়। নৌকায় দেহখানা রেখে ওরা নদী পেরোয়। অমল দেখে, নদীর অলসঘন থমকা জল নিতান্ত অনিচ্ছায় বিরক্ত হয়ে একটু যেন আড়মোড়া ভাঙে। পেছন ফিরে দেখে হেনা। ঘর বানানো শেষ করেছে। অমল পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়। হেনা কি সুন্দর! কী সুন্দর হেনা!

ইচ্ছে হয় ফিরে যায় তার কাছে। কিন্তু মন্দিরের ঐ মুদ্দা-ফরাসগুলো তারও দেহখানি নিয়ে যে নীচে নেমে যায়! তার বড় আদরের দেহ—অনেক দিন ধরে তার পেশীর সযত্ন কলা-স্থাপনকেই বা কি করে ছাড়া চলে?

কেমন একটা অদ্ভূত হট্টগোল ওর কানে। মনে হয় কিছু দেখা যাচ্ছে না চোখে, আবার বেশ দেখাও যাচ্ছে। দেখে, তার দেহটা নিয়ে একটা বাড়ীর লম্বা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। বারান্দার শেষ প্রান্তে এসে সর্দ্দার-গোছের লোকটা একটা দ্বারে দেয় ঘা। দোর খোলে। ওরা দেহটাকে ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের উপর রেখে তার উপর সাদা একখানা চাদর বিছিয়ে দেয়। দু'জন থাকে, আর সবাই চলে যায়। যে দু'জন রইল তাদের এক জন দেহখানার মুখের উপর থেকে কি যেন সরিয়ে দেয়। অমল চেয়ে দেখে, তার দেহ উঠে বসে চার দিকে চেয়ে কি যেন—কাকে যেন খোঁজে।

হাত দিয়ে চোখ দু'টো একবার ভাল করে রগড়ে নেয়। বেশ একটা জোর নিশ্বাসও টেনে নেয়। স্পষ্ট দেখে দেহটা অমলের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়।

সার্জ্জন রায় চৌধুরীর হাতখানি চেপে ধরে অমল চেঁচিয়ে বলে—'কিন্তু হেনা! হেনা কোথায় বল—বলতে হবে।'

সার্জ্জন বললেন—'বেশ! সব ঠিক।'

লজ্জিত হয়ে বলে—'মাপ করবেন, কোথায় আছি ঠিক বুঝতে পারিনি। মনে হচ্ছিল আপনি···নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছিলাম! হাঁ, ঠিকই স্বপ্ন। আপনি ছিলেন একটা মন্দিরে আর···এক মিনিট··· একটু ভেবে নিই···সব মনে পড়বে।'

হো-হো করে হেসে উঠে রায়-চৌধুরী বললেন—স্বপন, স্বপন। ও নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না···ভাবলেও মনে হবে না, কখনো কারু হয় না!—দেখি, নাড়ুন তো পা-খানা।

অমল নড়ায় তার পা।

"কিন্তু ডাক্তার! পাহাড়ে কেউ ছিল।···কোন হাঙ্গামা করিনি ত? মানে—"

'একটুও না। বেহুঁস হবার সময় হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছিলেন—কিন্তু অন্তরের সে অদ্ভূত আনন্দের কথা আর যে মনে হবে না এই ত দুঃখ। *

---

* অনেক দিন আগে লণ্ডনের ত্রৈমাসিক পত্রিকা "লাইফ এণ্ড লেটার্স" প্রকাশিত হিউ এক্টনীর "আণ্ডার এনেসথেটিক" গল্প থেকে।

স্বাধীনতার স্বরূপ

গণেশচন্দ্র ঘোষ

ভারত স্বাধীন হয়েছে। দেশে-বিদেশে অনবরত ঢাক পেটানো হচ্ছে ভারত স্বাধীন হয়েছে—ভারতবাসীরা এখন স্বাধীন, আর এমন ভাবে স্বাধীনতা এসেছে যেভাবে কোন কালে কোন দেশে আসে নাই—একেবারে সহজ সরল অহিংস ভাবে। কিন্তু তবু লোকে বুঝতে পারছে না কোথায় সেই স্বাধীনতা—কোথায় সেই স্বাধীনতার আনন্দ যা পাবার জন্য দেশবাসী আকুল আগ্রহে অধীর হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেস জোর করে বোঝাতে চেষ্টা করছে, তবু লোকে বুঝছে না। লোকগুলো কি বোকা! ডাক্তার এসে রোগীকে পরীক্ষা করে বলছেন তার পেটে ব্যথা নাই; তবুও রোগী বলছে তার পেটে বড় ব্যথা; সে যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে। রোগীর কি ধৃষ্টতা!

লোকের দুর্ভাগ্য, তারা বুঝে উঠতে পারছে না কংগ্রেসের এই বহু-বিঘোষিত স্বাধীনতার মধুর আস্বাদ; তারা কেবল তিক্ত স্বাদই পাচ্ছে। তারা দেখছে রোগ সেরে গেছে; কিন্তু রোগী আর বেঁচে নাই। ভারত স্বাধীন হয়েছে; কিন্তু ভারত আর সে ভারত নাই—তার সে দেহ নাই, সে রূপ নাই, সে প্রাণ নাই; সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তার বুকের ওপর দিয়ে রক্তের স্রোত বয়ে গেছে—অহিংস উপায়ে। তারা শুনছে তারা স্বাধীন হয়েছে; কিন্তু তাদের পেটে অন্ন নাই, দেহে বস্ত্র নাই, রোগে-শোকে জরাজীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, নানারূপে নিপীড়িত, নির্যাতিত হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে ভাই-বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন সব বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে—এমন ভাবে তাঁ'দিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে যে তারা যে ভারতবাসী তা বলবারও তাদের অধিকার নাই—তারা একেবারে ভিন্নদেশী হয়ে পড়েছে; তাদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধন ক্রমশঃ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে; কত লোক দেশহারা, বাস্তুহারা হয়ে কোথাও আশ্রয় পাচ্ছে না, মাথা গোঁজবার জায়গা পাচ্ছে না: অথচ তাদের কোন দোষ নাই। তাই দেশবাসীরা অবাক হয়ে গেছে—তারা বুঝতে পারছে না এই স্বাধীনতার মর্ম, এর আনন্দ। আর যাঁরা এই স্বাধীনতা এনেছেন তাঁরা আর এদিকে তাকাচ্ছেন না, তাঁরা নিজের নিজের ও দলের স্বার্থ নিয়ে নিজেরা নিজেরা রেষারেষি কামড়া-কামড়ি করছেন।

দেশের লোক বুঝে উঠতে পারছে না কি করে এই অপ্রীতিকর, অবাঞ্ছিত, অপ্রত্যাশিত অবস্থা সম্ভবপর হলো। কংগ্রেস জিন্না সাহেবের দোরে বার-বার ধন্না দিয়ে এবং ইংরেজের প্রীতি ও বন্ধুতায় মুগ্ধ হয়ে যে স্বাধীনতা এনেছে সেই বৃটেনের আঁচল-ঢাকা স্বাধীনতা অনেক পূর্বেই আসতে পারতো এবং তার জন্য এতো মূল্য দিতে হতো না, দেশকে এতো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে হতো না। ইংরেজ নিজে যে কাজ করতে সাহস করে নাই, কংগ্রেসকে দিয়ে সে সেই কাজ করিয়েছে। তাই দেশের লোক আজ জানতে চায়, কি করে এই অবস্থা কংগ্রেস আনতে বাধ্য হলো। বরাবর কংগ্রেস দেশবাসীকে বলে এসেছে—আশ্বাস দিয়ে এসেছে সে অখণ্ড ভারত চায়—ভারত-খণ্ডন সে সমর্থন করবে না, দুই জাতিবাদ সে মানে না। তাই দেশবাসী কংগ্রেসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে বড় আশ্বাস উৎসুক হয়ে তার ওপরেই নির্ভর করেছিল। কিন্তু কংগ্রেস তার কথা রাখে নাই; দেশবাসীর সেই বিশ্বাস সে ভঙ্গ করেছে। যদি ভারত-খণ্ডন সমর্থন করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, তাহলেও দেশবাসীদের একবার জিজ্ঞাসা করা এবং তাদের মত নেওয়া উচিত ছিল। তা' না করে, সব বিষয় ঠিকঠাক না করে ভারত-খণ্ডনে রাজী হওয়া কি কংগ্রেসের উচিত হয়েছে? আর যদি ভাগাভাগি করতেই হলো তখন এতো তাড়াতাড়ি না করে ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপারটা সব ভাল করে ঠিক করে নিয়ে, সমস্যা সব মিটিয়ে নিয়ে তার পর অহিংস ভাবে পৃথক্ হলেই তো হতো। তাহ'লে তো এতো অনর্থের সৃষ্টি হতো না; এতো হত্যাকাণ্ড, নারীহরণ, নারীধর্ষণ প্রভৃতি পৈশাচিক ব্যাপার সংঘটিত হতো না; বোধ হয় মহাত্মা গান্ধীকেও এ ভাবে প্রাণ হারাতে হতো না; আর সীমা-নির্ধারণ সমস্যা, লোকাপসরণ সমস্যা, কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি নানারূপ সমস্যা নিয়ে এতো বিব্রত হতে ও অশান্তি ভোগ করতেও হতো না। না হয় দু'-বৎসর পরেই স্বাধীনতা আসতো। দু'শো বৎসর যখন সইতে পারা গেল তখন আর দুই বৎসর কি সইতে পারা যেতো না। কিন্তু তা না করে দেশকে অন্ধকারে রেখে সাত তাড়াতাড়ি সবটাতে কংগ্রেস রাজী হয়ে গেল। যে স্বাধীনতা ১৯৪৮ সালে আসবার কথা ছিল সেটা এক বৎসর আগেই এসে উপস্থিত হলো! কংগ্রেস দুই জাতিবাদ মেনে নিলো। আজ যদি দেশের লোক বলে যে, কংগ্রেসের স্বার্থান্ধতা এবং ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার মোহ এতই প্রবল হয়েছিল যে সে আর নিজেকে সামলাতে পারলো না, তা'হলে দেশের লোককে দোষ দেওয়া চলে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, সব প্রলোভন দমন করা যায় কিন্তু প্রতিষ্ঠার মোহ দমন করা বড়ই কঠিন। আর কংগ্রেস যখন দেখলো ক্ষমতাটা তার নিজের হাতেই আসছে। আজ আবার কংগ্রেস বলছে দুই জাতিবাদ সে মানে না। এ হেঁয়ালি বোঝা কঠিন।

ইংরেজ অভিজ্ঞ সুচতুর খেলোয়াড়। ছিপে মাছ শিকার করতে সে খুব ওস্তাদ। সে জানে কোথায় কি রকম চার ফেলতে হয়, কোন মাছকে কি রকম টোপ দিতে হয়। সেই ভাবেই সে বড় বড় রুই-কাতলাকে শিকার করবার ব্যবস্থা করেছিল। সে যখন দেখলো, বড় মাছ মুখের ভিতর টোপ নিয়েছে তখন আর মুহূর্তমাত্র দেরী না করে ঠিক মতো টান মেরেছে—দেরি করলে হয়তো টোপ ছেড়ে দিতে পারে। কাজেই এক বৎসর আগেই সে তার যাওয়া ঠিক করলো। তার কাজ হাঁসিল হয়েছে, আর কি সে দেরী করতে পারে! কংগ্রেস টোপ মুখে নিয়ে আটকা পড়ে গেলো। এখন ইংরেজ তাকে নিয়ে বেশ খেলাচ্ছে। এই তো ইংরেজের কাজ। যেখানে সে গেছে সেখানেই সে এই ফন্দিই করেছে। যেখান থেকে তাকে চলে আসতে হয়েছে সেখানেই সে ভাল করে গোলযোগ বাধিয়ে রেখে এসেছে। কংগ্রেসের কর্ণধাররা এ সব নিশ্চয়ই জানতেন এবং ভুক্তভোগীরা তাঁ'দিকে সাবধানও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রলোভন বড়ই কঠিন; তাঁরা সামলাতে পারলেন না। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী অ্যাটলি সাহেব তো বলেছিলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠরা যদি একমত না হতে পারে তাহ'লে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতেই শাসন-ভার দিয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। অবশ্য এর ভিতরেও তাঁদের অনেক প্যাঁচ ছিল।

যা হোক, কংগ্রেসের নেতারা আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁরা ইংরেজের প্ররোচনায় এবং মুসলিম লীগের direct actionএ ভীত হয়ে দেশের অজ্ঞ সব মুসলিম ও অমুসলিম

দলের আশ্বাস ও সাহায্য উপেক্ষা ক'রে জিন্না সাহেবের কাছেই মাথা নত করলেন। যা হবার তা হলো—ভারত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হলো। দেশে অশান্তি আরও বেড়ে চললো। কংগ্রেসের জয়, অহিংসার জয় দেশে-বিদেশে ঘোষিত হলো। ইংল্যাণ্ড কংগ্রেসকে বাহবা দিতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মাসতুতো ভাই, তার দুস্কর্মী, পৃথিবীর বড় সাম্রাজ্যবাদী, অমানুষিক নৃশংস ভাবে জাপান ধ্বংসকারী, অ্যাটম বোম ভীতিপ্রদর্শনকারী আমেরিকা ও তাদের তাঁবেদাররাও খুব বাহবা দিল। এরা সকলে তো বাহবা দিবেই, তাদের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়েছে। তবু যেটুকু বাকী আছে সেটা কষিয়ে নিতে হবে তো—কাশ্মীর হায়দ্রাবাদ জুনাগড় ইত্যাদি সমস্যা জটিল করে তুলে তৃতীয় মহাসমরে তাদের সুবিধার জন্য ? এদের বাহবায় স্ফীত হয়ে এদের উপদেশ মতো কংগ্রেসের বড়কর্তারা প্রবল ভাবে দেশ শাসন করতে লেগে গেছেন। সরকারী কাজকর্ম যতো সব কংগ্রেসীদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছে ও হচ্ছে। কংগ্রেসীরা দেশসেবা ছেড়ে আত্মসেবায় মেতে গেছেন। স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ, দুর্নীতি, অবিচার, অনাচার, উগ্র প্রাদেশিকতা কংগ্রেসের ভিতরে প্রবেশ করে দেশের শাসনযন্ত্রকেও বিষাক্ত করে তুলেছে। শাসনযন্ত্রের কর্ণধাররাও যেন এ বিষ থেকে মুক্ত থাকতে পারছেন না। ক্রমশঃ সমস্ত দেশই এই বিষে জর্জরিত হয়ে উঠছে। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহ'লে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। দেশের এই অবস্থার জন্য কংগ্রেসই দায়ী। তাই আজ দেশ কংগ্রেসের কাছেই জানতে চায়, কেন এই অবস্থা হলো ? এখন এর প্রতিকার কি ? কংগ্রেসের উচিত সব বিষয় দেশকে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া।

কংগ্রেসের ভিতরে এই দুর্নীতি যদি চলতেই থাকে তাহ'লে তার ভবিষ্যৎও ভালো হতে পারে না। কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা বেড়ে গেলেই তার উন্নতি হবে না। কংগ্রেসের ভিতর প্রবেশ করলে স্বার্থসিদ্ধির সুবিধা হবে বলে অনেকে সভ্য হচ্ছেন। দু'দিন সখ ক'রে জেলে থেকে এসে অনেকে এখন দেশসেবার পুরস্কারের জন্য অতিশয় ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। এতে দেশসেবা অপেক্ষা আত্মসেবাই বেশী হবে ; দেশ ক্রমশঃ অবনতির দিকেই যাবে। নানা কারণে দেশের লোক কংগ্রেসের ওপর ক্রমশঃ তাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাচ্ছে। কংগ্রেসের ওপর তারা যেন আর ভরসা করে থাকতে পারছে না।

আজ রাষ্ট্র-নায়করা, কংগ্রেস-নায়করা স্থিরচিত্তে বিবেকের দিকে তাকিয়ে ভাল করে ভেবে দেখুন তাঁরা কি করছেন—এবং এখন কি করা উচিত। এখন কংগ্রেস তার দুর্নীতি দূর করে আন্তরিক সেবা ও যত্ন দ্বারা দেশের অবস্থা ও রূপ উন্নত ও সুন্দর করতে চেষ্টা করুক। স্বাধীনতা এসেছে বলে শুধু চিৎকার করলে হবে না। জোর করে স্বাধীনতার আনন্দ লোকের মনে প্রবেশ করাবার চেষ্টা করলে লোকের মন আরও তিক্ত হয়ে উঠবে ! আন্তরিক দেশসেবা, সুনীতি, সুবিচার, সুশাসন দ্বারা দেশে স্বচ্ছলতা, সুখ, শান্তি, স্বচ্ছন্দতা এনে লোকের মনের ক্ষত আরোগ্য করে তা'দিকে আনন্দ দিতে হবে। তখন তারা বুঝবে স্বাধীনতার স্বরূপ, সুখ ও আনন্দ কি।

রাস্তা

হরপ্রসাদ মিত্র

আকাশ হাজার মেঘের গুল্মে ঢাকা যেন দূর মাঠ
তারই মাঝে নীল একটি সরল রেখা।
—সে ইশারা চেনে গুপ্ত, সুপ্ত মন।
হে নীল রাস্তা ! তোমার দু'ধারে উদাস মেঘের বন !

দূরে সুষুপ্ত তাল-তমালের চরে
কাঠ-ঠোকরার ঠোঁটের ঠোকরে মরা পাতা শুধু ঝরে
সেই প্রেরণায় আর এক শিল্পী রং দিয়ে পলে পলে
কতো পট এঁকে ছিঁড়ে ফেলে দেয় জলে।

কালো মাটি হাসে চিরায়ুষ্মতী, সুদতী, অপরাজিতা
কখনো ফোটায় মিলনের ফুল কখনো জ্বালায় চিতা।

রাস্তা তোমার বণিকভূতিক শহরে
দেহ-মন বাড়ে এখানে কেবল বহরে।
দৈর্ঘ্য অপরিচিত গভীরতা অযাচিত
শূন্যের ধ্যান সুদূরে নির্বাসিত।
ত্রিকালদর্শী ভূষণ্ডী বাঁধা পিঞ্জরে
সোনায়—কাদায় মিশিয়ে পঙ্গু—দিন ঝরে।

যুগে যুগে খোলো নতুন পান্থশালা,
নতুন বিছানা বিছিয়ে দোলাও নতুন ফুলের মালা
মনে মনে চলে নতুন চিত্রকলা
সনাতন কথা অচিন কণ্ঠে বলা।

সে নয় স্থবির ইটের আরামাবাস
রাস্তা, তোমার তর্জনী মোছে নিমেষে শাসন-পাশ।
জীবনে জীবনে নব জাতকের চলা লক্ষ পায়ের দোলা—
সেই গৈরিকে, সেই পদাঘাত মেখে
প্রশ্নের মতো তোমার চিকণ চিহ্ন গিয়েছে বেঁকে।

নীচে এই ছোটো আড়ালে, বেড়ায় ঢাকা
সোনায়—কাদায় মাখা
অতৃপ্ত দেশ সময়ের কোণঠাসা।
কবন্ধ শোক, কুবের দীপ্তি—আশা আর জিজ্ঞাসা !

হে নীল রাস্তা ! এবার তোমার
যুগের ঢাকনি খোলো।
মেঘের পর্দা তোলো।
খুলে মেলে ধরো সৃষ্টির চির ক্রান্তিক্ষেত্র নীল,
হোক সে সরল, হোক্ সে বিসর্পিল !
ক্লীব অধিকার-বেষ্টনী নও,
কখনো তাসের সম্রাট নও তুমি
না হয় মেঘের গুল্মে খচিত হয়েছে শূন্য ভূমি !
হে নীল রাস্তা ! শাশ্বত নির্দেশে
এ বিলম্বিত গ্লানির পর্দা তোলো
যুগের ঢাকনি খোলো।

—সুনীলকুমার গুপ্ত

ভাব এবং অভাব

—অহিভূষণ রুদ্র

"মৃত্তিকার হে বীর সন্তান
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে......"

—রবীন্দ্রনাথ

—গোপীনাথ সাহা

"অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ;
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।"

—রবীন্দ্রনাথ

ফুলওয়ালী —কেশবলাল দত্ত

যৌবনের ডাক —শ্রীসমর

পত্রগুচ্ছ

জর্জ বার্ণাড শ'র চিঠি

[জীবনীকার ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসকে লেখা শ'র দু'টি চিঠি]

ম্যালভার্ণ

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

প্রিয় ফ্রাঙ্ক হ্যারিস,

তুমি জানতে চেয়েছ যে বিত্তশালী কেমন লাগে। সে ত তোমার নিজেরই জানা উচিত। কারণ এই মুহূর্তে যদি কোটিপতি না হও, একটি বিকেল অথবা একটি পূরো সপ্তাহ অথবা জনশ্রুতি যদি সত্য হয়, হয়ত একটি বৎসর তুমি তা ছিলে যে সময় পার্ক লেনের মহিলাকে বিবাহ করে তুমি স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তি ব্যাণ্ডলফ চার্চিল ও এডোয়ার্ড সপ্তের সঙ্গে প্রণয়ে ব্যয় করেছিলে। আর সত্য কথা বলতে কি, বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আমি ধনবান লোক নই। ইংলণ্ড এবং আমেরিকা উভয় দেশেই আমার উপার্জ্জন থেকে ট্যাক্স সার-ট্যাক্স আদায় করা হয়। মাঝে-মাঝে যখন আমার আয় দাঁড়ায় বিশ হাজার পাউণ্ড, তখনও মূলধন ও তার আয় দু'য়ের উপরই ট্যাক্স ও সার-ট্যাক্স আদায়ের পর কি অবস্থা দাঁড়ায়? আমার স্ত্রীর স্থাবর সম্পত্তি এবং আমার নিজের আয় মিলিয়ে আমাদের বাৎসরিক আয় পাঁচ থেকে দশ হাজার পাউণ্ড। তাও সব খরচ হয় না। আসলে আমি এত ব্যস্ত মানুষ যে অর্থব্যয়ের বিলাসিতা করতে পারি না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমার আছে এবং কিছুই আমার ছিল না এবং দু'য়ের পার্থক্য আমার কাছে তুচ্ছই। আমি সেই শ্রেণীর মানুষ যাদের চোখে অর্থই হোল নিরাপত্তা এবং ছোট-ছোট অবিচার থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায়। সমাজ যদি আমাকে উভয়বিধ সুবিধে দিত আমি আমার সমস্ত অর্থ জানলার বাইরে নিক্ষেপ করতাম, কেন না ধন-সম্পত্তির তদারক করা এক ঝামেলা এবং ধন-সম্পত্তি পরগাছা ও ঈর্ষাকে প্রশ্রয় দেয়। করুণা, প্রাচুর্য ও পৃষ্ঠকতা এ-সব আমি ঘৃণা করি। কোন লোককে টাকা দিয়ে যখন আমি সাহায্য করি যেন সে-ও যত আন্তরিকতায় আমায় ঘৃণা করে আমিও তত ঘৃণা করি তাকে।

বিশ্বস্ত

জি. বি. এস।

২

ম্যালভার্ণ

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

প্রিয় ফ্রাঙ্ক হ্যারিস,

একটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে, তোমার লেখা আমার জীবনী প্রামাণ্য এবং সেই গ্রন্থে আমার লেখা পনেরো হাজার শব্দ আছে। আমি তাদের লিখে দিয়েছি যে হেণ্ডারসন-কৃত জীবনী ভিন্ন আমার কোন জীবনী প্রামাণ্য নয় এবং তোমারটি বিশেষরূপেই নিন্দনীয়। তুমি যদি আমার লেখা একটি কথাও ব্যবহার করো আমি আইনের আশ্রয় নেব। তোমার লেখা বই আমি তোমার জন্য লিখে দেব না। গ্রন্থকার হিসেবে তুমি কেমন লেখ তার উপরই তোমার যশ নির্ভর করছে এবং আমার ঔৎসুক্যও সেইটুকুতে সীমাবদ্ধ। নিজের সম্বন্ধে আমি যা লিখেছি এবং এক দিন যা প্রকাশ করার অভিপ্রায় আমার, তার কোন কোন অংশ তোমায় আমি দেখতে দিয়েছি। কারণ, আমার জীবনী লেখাই যদি তোমার জিদ হয়, সে ক্ষেত্রে আমার সম্বন্ধে তোমার ভাল ভাবে জানতে হতে পারে। তবু বক্তব্য বিষয়টি তোমার স্বভঙ্গীতেই প্রকাশ করা ভাল, আমার ভঙ্গীতে নয়। গ্রন্থকার আমিই একথা বোঝাতে পারলে যে কোন নির্বোধই সে বই প্রকাশে প্রকাশককে রাজী করাতে পারে এবং প্রকাশকও সেই ধারণায় তা বিক্রয় করতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে যত সমালোচক সব ত আমাকে ঘিরেই কলরব করবে, আর নামে মাত্র জীবনীকারটি সেই দস্যুতার বখরা ভিন্ন আর কিছুই পাবে না। আমার লেখা পনের হাজার শব্দ এবং জীবনীর প্রামাণ্যতা এই উভয় বিজ্ঞপ্তিই প্রকাশ্যতার

করতে হবে তোমার প্রকাশককে। আমার আত্ম-পরিচয় থেকে একটি 'বাক্য ব্যবহার না করেও ওয়াইল্ডের জীবনীর সমতুল্য আর একখানি মূল্যবান জীবনী রচনা করার ক্ষমতা তোমার নিজেরই আছে এবং তোমায় সে কাজে ব্রতী করার জন্য আমি সাধ্যমত সব শক্তিই প্রয়োগ করব। তোমার লেখা ওয়াইল্ডের জীবনীতে একটিও প্রমাণ নেই যে তুমি তাঁর রচনার একটি কথাও কখনো পড়েছ এবং তুমি যখন আমার লেখার শতকরা তিন ভাগের বেশী নিশ্চয়ই পড়নি তখন সাহিত্যিককে নয় মানুষটিকে রূপায়িত করার জন্য তোমার আস্থা রাখতেই হবে নিজের ক্ষমতার উপর। শ' এবং হ্যারিস বীভৎসরূপে অঙ্গাঙ্গী হয়ে অবস্থান করছে এর চেয়ে দানবীয় কল্পনা করতে পারি না আমি। তা ভিন্ন তোমার গ্রন্থ বর্তমান কালের একটি প্রবন্ধ জাতীয় হওয়া সমীচীন এবং তার মধ্যে বিভিন্ন মানুষের ভীড় থাকাই উচিত হবে। সেই ধরণের বস্তুই তুমি লিখতে পারবে আর যদি সত্যি কুশলতার সঙ্গে তা পার তবে তোমার লাইফ এ্যাণ্ড লাভস প্রসঙ্গ চাপা দেওয়া চলবে। মৃত্যু পবিত্র পরিবেশেই বাঞ্ছনীয়, হয়ত সব মধ্যেও তুমি উন্নাসিকতার ছাপ দেখতে পাবে।

বিশ্বস্ত

জি, বি, এস।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চিঠি

[মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কেবল বাংলার নয় সারা ভারতের পূজনীয়। লেখক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক হিসেবে চিরকাল তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁর মেঘদূত ব্যাখ্যা, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভারত-মহিমা প্রভৃতি পুস্তক, বিভিন্ন অভিভাষণাদি ও নানা সম্পাদিত গ্রন্থ সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত তাঁর আজীবন সম্পর্ক ছিল এবং পরিষদের উন্নতির জন্য বহু অমূল্য কাজ করে গেছেন তিনি।

ব্যক্তিগত জীবনে শাস্ত্রী মহাশয় পরম রসিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রসিকতা ছিল অন্তঃসলিলা। গণপতি সরকার মহাশয় একদা তাঁকে এক জন পণ্ডিত দিতে অনুরোধ জানাইলে তিনি পণ্ডিত আশুতোষ তর্কতীর্থ মহাশয়কে এই পত্রখানি সমেত গণপতি বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন।]

২৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট

কলিকাতা, ২৭ জুলাই, ১৯১৭

প্রিয় গণপতি বাবু,

তোমাকে যে পোষ্টকার্ড লিখিয়াছি তাহাতেই তোমার প্রার্থিত সকল সংবাদ লিখিয়া দিয়াছি। উৎকল ভদ্রলোকটি শিলালিপির প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু দুরূহ শব্দগুলির অর্থোদ্ধার করিতে কিছু সময় লাগিবে জানাইয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় তোমার নিকট যাইতেছেন। তুমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছ বলিয়া তাঁহাকে তোমার নিকট পাঠাইলাম। তিনি অতি সজ্জন ব্যক্তি। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, সংস্কৃত সাহিত্য ও ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি আছে। তাঁহার মতবাদ, অভিমত এবং হিন্দুধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অতি গভীর। ইঁহাকে পাইলে সকল দিক্ দিয়া উপকৃত হইবে। অনাশ্রিতা ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতা—কাজেই তিনি তোমার নিকট যাইতেছেন।

শুভার্থী

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২

২৬, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট

কলিকাতা, ৩১ এপ্রিল, ১৯৩১

কল্যাণবরেষু,

গণপতি বাবু, তোমার দাদার সইওয়ালা তোমার মেয়ের বিবাহের পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত হইলাম। একে তোমার মেয়ে আবার ৺ক্ষুদিরাম বসুর ছেলে—দুই আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র। দু'জনের মিলনে মণিকাঞ্চন যোগ হউক এই আমি ৺স্থানে নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছি। ১৮৭৪ সালে সুদূর রাঢ়ে এক দুর্গম জায়গায় ক্ষুদিরাম বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। তাহার পর আমাদের এ পর্য্যন্ত বরাবর প্রীতি ছিল। প্রীতি খুব ঘন হউক আর না হউক, পরোক্ষে উভয়েই উভয়ের হিত আকাঙ্ক্ষা করিতাম। তাহার পুত্রটি দীর্ঘজীবী হউক আর তোমার মেয়েটির এয়োত্, বাড়ুক ও হাতের নোয়া ক্ষয় হইয়া যাউক। আমি যাইতে পারিলাম না তাহাতে দুঃখ নাই, মনটা বিবাহের ক্ষেত্রেই ওদিন পড়িয়া থাকিবে।

শুভার্থী,

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

লর্ড কার্জনের চিঠি

[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অধ্যাপক ম্যাকডোনেল সাহেবের সহিত উত্তর-ভারত পরিভ্রমণের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন। এই সময় পুরাতত্ত্ব বিভাগীয় প্রাচীন দ্রব্য-সংগ্রহশালা, প্রত্নতত্ত্বের খনন-কার্য, মন্দির ও নানা পুঁথি প্রভৃতি পরীক্ষা করতে হয়েছিল তাঁকে। এই সময় তিনি ম্যাক্সমূলার-স্মৃতিভবনের জন্য কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য বৈদিক পুঁথিও সংগ্রহ করেন। ইহা ছাড়া আরো প্রায় সাত হাজার পুঁথি সংগৃহীত হয়েছিল। নেপালের মহারাজা এগুলি অক্সফোর্ডের বোডলিয়ান পুস্তকাগারে দান করেন। এই সম্পর্কে ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড কার্জন তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে নীচের পত্রখানি লিখেছিলেন।]

১, কর্লটন হাউস

সাউথ ওয়েষ্ট টেরাস,

৫ই জানুয়ারী, ১৯১০

প্রিয় মহাশয়,

নেপালের মহারাজা স্যার চন্দ্রসামসের জং কর্তৃক বোডলিয়ান পুস্তকাগারে প্রদত্ত সংস্কৃত পুঁথির অপূর্ব সংগ্রহটি ক্রয়, তাহাদের তালিকা প্রণয়ন ও ইংলণ্ডে প্রেরণের সুচারু ব্যবস্থার দ্বারা আপনি

যে অমূল্য কাজ করিয়াছেন অক্সফোর্ডে থাকা-কালীন আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছি। আপনার পাণ্ডিত্য, শুভেচ্ছা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের গুণে আপনি যে মহৎ কাজ করিয়াছেন ভারতের প্রাক্তন বড়লাট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার হিসাবে আমি তাহার জন্য আপনাকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ দিতেছি।

নব বৎসরের শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন। ভারতে আপনাদের মত বিদ্বজ্জনের অভাব কখনো না যেন অনুভূত হয়।

আপনার বিশ্বস্ত
কার্জ্জন অফ কেডলষ্টন

বেথুনের চিঠি

[বাল্যকাল হতে ইংরেজী সাহিত্যের অনুশীলন দ্বারা মধুসূদন ইংরেজী সাহিত্যের এক জন গভীর মর্ম্মজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ঠিক তেমনি ভাবেই মাতৃভাষাকে তিনি অবহেলা ও ঘৃণার চক্ষেই দেখতেন। জে, ই, ডি, বেথুন তখন গভর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থা-সচিব এবং শিক্ষা-সংসদের সভাপতি। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর দরদ। তিনি এ দেশের ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারের অকৃত্রিম চেষ্টা করেছিলেন। গৌরদাস বসাকের অনুরোধে মধুসূদন তাঁকে এক কপি 'ক্যাপটিভ্ লেডি' উপহার পাঠালে তিনি প্রত্যুত্তরে গৌরদাস বসাককে নীচের এই চিঠিখানি লিখেছিলেন। বাংলা ভাষার প্রতি বেথুনের অনুরাগের জীবন্ত সাক্ষর এটি।]

চৌরঙ্গী

২০শে জুলাই, ১৮৪৯

মহাশয়,

আপনার বন্ধুর কাব্য-পুস্তক উপহারটির জন্য তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ জানাইবেন। সেই উপহারের প্রতিদান স্বরূপ তাঁহার স্বদেশ-বাসীর অনেককেই ইতিমধ্যে আমি যে উপদেশ দিয়াছি অর্থাৎ ইংরেজী কবিতা রচনার পরিবর্ত্তে তাঁহারা তাঁহাদের সময় আরো মূল্যবান কাজে নিয়োজিত করিতে পারেন—সে-উপদেশ আপনার মারফৎ তাহার মনেও মুদ্রিত করিবার এই সুযোগ গ্রহণ অত্যন্ত অভব্য কাজ হইতেছে বোধ হয়। ইংরেজী সাহিত্যে পারদর্শিতার পরিচয় এবং সাময়িক অনুশীলন হিসেবে এই প্রকার রচনার অনুমোদন করা যাইতে পারে কিন্তু ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন দ্বারা তিনি যে মার্জ্জিত রুচি ও পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা যদি নিজের মাতৃভাষায় শ্রী ও কবিতার সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে নিয়োজিত করেন—অবশ্য কবিতা রচনাই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয়—তাহা হইলে তাঁহার স্বদেশের মহত্তর উপকার সাধন করা হইবে এবং তিনি নিজেও অক্ষয় যশলাভের আরো উত্তম সুযোগ পাইবেন।

আমি যত দূর জানিতে পারিয়াছি, আপনাদের বাংলা সাহিত্য অতি অমার্জ্জিত ও অশ্লীলতা-দুষ্ট। এক জন উচ্চাভিলাষী কবির পক্ষে তাঁহার স্বদেশবাসিগণকে নিজ ভাষায় মহত্তর সৃষ্টি-কার্যে পথ প্রদর্শন অপেক্ষা আর চারুতর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পারে না। এমন কি অনুবাদের দ্বারাও তিনি উপকার করিতে পারেন। এই ভাবেই ইউরোপের বেশীর ভাগ দেশের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

আপনার অনুগত ভৃত্য
জে, ই, ডি, বেথুন

মাইকেলের বাংলা চিঠি

[মধুসূদনের পত্র-সংখ্যা অতি বিপুল এবং বেশীর ভাগ চিঠিই ইংরেজীতে লেখা। তাই মাতৃভাষায় লেখা মধুসূদনের চিঠির নিদর্শন হিসেবে নীচের এই চিঠিখানি উদ্ধৃত করা গেল। মধুসূদন তখন য়ুরোপে। বাবু মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের পিতা পরলোক গমন করেছেন। মধুসূদন মনোমোহন বাবুর মাতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য য়ুরোপ থেকে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন।]

শ্রীচরণকমলেষু,

জেঠা মহাশয়ের স্বর্গপ্রাপ্তি সংবাদে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি তাহা পত্রে লেখা বাহুল্য। সংবাদ পাইবা মাত্রই আমার স্ত্রী ও আমি প্রিয়বর মনোমোহনের বাসায় যাইয়া, তাঁহাকে এ বাটীতে আনিয়া সাধ্যানুসারে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টায় আছি। আপনি তন্নিমিত্তে উৎকণ্ঠিতা হইবেন না। আপনি পরম জ্ঞানবতী, সুতরাং ইহা কখনই আপনার নিকট অবিদিত নহে যে, এরূপ তীক্ষ্ণ শর-স্বরূপ শোক এ সংসারে সর্ব্বদাই মানবকুলের হৃদয় বিদ্ধ করে। পিতৃচরণ-

দর্শন-সুখ প্রিয়বর যে আর এ পৃথিবীতে লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি নিতান্ত মুহ্যমান। এ দাসেরও আশালতা ছিন্ন হইল। ভাবিয়াছিলাম যে, কৃতকার্য্য হইয়া দুই ভাই একত্রে দেশে ফিরিয়া যাইব, এবং আমি কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত নির্ব্বাণ স্নেহাগ্নি পুনর্ব্বার পদ-সেবা করিয়া প্রজ্বলিত করিব। কিন্তু এ আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। এক্ষণে আপনি স্মরণপথে রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে চরিতার্থ হইব। প্রিয়বর তার-পথে কলিকাতায় যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহা বোধ করি পাইয়া থাকিবেন। তিনি এ দেশ হইতে অতি ত্বরায় ফিরিয়া যাইবার চেষ্টায় আছেন। যত দিন এখানে থাকেন, তাঁহার মনের বেদনা লঘুতর করিতে কোন মতেই অমনোযোগী হইব না। নিবেদনমিতি।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
দাস মধুসূদন দত্তস্য

শিল্পদৃষ্টিতে স্থানমাহাত্ম্য

শুভেন্দু ঘোষ

জ্যাকব এপ্‌ষ্টাইন বিলাতের এক জন নামী ভাস্কর। তাঁর কাজের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণে তাঁর শিল্পের সমাদর করে, তবু তাঁর তৈরি মূর্তি তিনি কোনো প্রদর্শনী-গৃহে পাঠাতে চান না। তাঁর ধারণা, ঘরের রুদ্ধ হাওয়ায় অস্বাভাবিক আলোতে ওগুলোর প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে, ওগুলো নির্জীব হয়ে পড়ে। ওদের পরিচয় পেতে হলে ওদের দেখতে হবে খোলা হাওয়ায়, আকাশের নীচে। তাঁর কাজ যাতে সর্ব-সাধারণ দেখবার সুযোগ পায় তার জন্যে সেগুলো পৌরসভা ব্যাটার্সি পার্কে তাঁর এবং আরও কয়েক জন বড় ভাস্করের গড়া মূর্তি সাজানোর ব্যবস্থা করেছেন।

সংবাদটা বেরিয়েছে 'শিল্পীর অদ্ভুত খেয়াল' এই শিরোনামায়। সত্যিই কি এটা শিল্পীর একটা খেয়াল মাত্র? তাঁর ধারণা কি সত্যিই অমূলক?

সাধারণ ভাবে এ-কথা আমরা সকলেই বোধ হয় বিনা আপত্তিতে মেনে নিতে রাজি আছি যে, সব জিনিষ সব জায়গায় মানায় না। সব-কিছুরই একটা 'যথাস্থান' আছে—যেখানে তার পূর্ণ সার্থকতা।

'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।' বনের বাইরেও বন্যের একটা সৌন্দর্য্য থাকতে পারে, মায়ের কোল ছাড়াও শিশুর সৌন্দর্য্য আমাদের মনোহরণ করতে পারে, তবু সে সৌন্দর্য্যে কোথায় যেন খুঁৎ থেকে যায়, তার সার্থকতা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এর কারণ কি?

মায়ের কোলে শুয়ে শিশুর প্রকৃতি, শিশু কোলে নিয়ে মায়ের প্রকৃতি যেমনটা ছাড়া পায় অন্য যে-কোনো অবস্থায় তেমনটি হওয়া অসম্ভব। শিল্পের মধ্যেও যদি প্রকৃতির এই গূঢ় লীলার ছন্দ ধরা না পড়ে তবে সে শিল্প নিরর্থক। এপ্‌ষ্টাইন যদি বলেন, খোলা আকাশের নীচে, মুক্ত বায়ুতে আমার গড়া মূর্তিগুলোর যথাস্থান, সেখানেই তাদের অর্থ ফুটে উঠতে পারে, তাহলে তাঁকে খেয়ালী বলা চলে কি?

বস্তুতঃ, কোনো ভাস্কর্য্যের কাজ ঘরে রাখা হবে কি মাঠে রাখা হবে, এ সমস্যা হচ্ছে একান্ত ভাবে এই ধনিক যুগের। শিল্পও এ-যুগে পণ্যমাত্রে পরিণত হয়েছে। ঘরে বসে ভাস্কর মূর্তি গড়ছেন, সে মূর্তি কে ব্যবহার করবে, কে কিনবে কিছুই জানা নাই, ধনিক যুগের আগে পর্য্যন্ত এ রকমটা কোনো দেশের শিল্পের ইতিহাসে কখনও দেখা যায়নি। সেকালে শিল্পসৃষ্টি করা হত শিল্পসৃষ্টি করার জন্যেই নয়, একটা তাগিদে—একটা বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে; অমুক রাজার জন্যে তৈরি হবে এই দেব-মূর্তিটা, অমুক গ্রামের নদীর বাঁকে যে মন্দির আছে তাতে প্রতিষ্ঠিত হবে এই মূর্তিটা—এ সমস্তই শিল্পীর কাজ সুরু করার আগে থেকেই জানা থাকত শিল্পীর। শিল্পরচনায় এই জানার মূল্য কম নয়। এ কথার মানে এ নয় যে, রাজার কাজটা করার সময় বেশী যত্ন নেওয়া হত আর গ্রাম্য মন্দিরের জন্যে মূর্তি গড়তে গিয়ে শিল্পী কোনো রকম হেলা-ফেলা করত। তার মানে হচ্ছে:

"It is, in fact, well-known that the construction of the fire-altar is a veiled personal sacrifiee. The sacrificer dies, and it is only upon this condition that he reaches heaven. At the same time, this is only a temporary derah, and th altar, identified with the sacrificer, is his substitute. We freely recognise an analogous significance in the identification of the king with the Buddha, and in particular in the manufacture of statues in which the fusion of the personalities is materially effected.…The king gives himself to the Buddha, projects his personality into him, at the same time that his natural body becomes the earthly trace of its divine model."—(M. Mus.)

অর্থাৎ বৈদিক অগ্নিবেদী ছিল হোতার আত্মোৎসর্গের রূপক মাত্র। হোতা মৃত্যুবরণ করতেন, এই ভাবে স্বর্গে পৌছুতেন তিনি। মৃত্যুটা অবশ্য হত অস্থায়ী, হোতাস্বরূপ ঐ যজ্ঞবেদীটার যা হবার সব হত। বৌদ্ধযুগে বুদ্ধমূর্তি তৈরি করার সময় ঐ ভাবে রাজা আর বুদ্ধের একাত্মতা কল্পনা করে মূর্তি গড়া হত। রাজা বুদ্ধের নিকট আত্মনিবেদন করতেন, রাজার ব্যক্তিত্ব লীন হত বুদ্ধে, রাজার দেহ দৈব আদর্শের পার্থিব চিহ্ন হিসাবে কল্পিত হত।

মোট কথা হচ্ছে, সে যুগে যার জন্যে মূর্তি গড়া হচ্ছে আর যে শিল্পী গড়ছে—এই দুই জনকেই মূর্তিনির্মাণের কাজে অবহিত হতে হত। গ্রাম্য মন্দিরের জন্যে মূর্তি গড়ার সময় শুধু শিল্পী নয় গ্রামের লোকের শ্রদ্ধার আবহাওয়া অনুপ্রবিষ্ট হত ঐ মূর্তির মধ্যে।

প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি। আমরা বলছিলাম, শিল্প পণ্যে পরিণত হওয়ার আগে শিল্পীর সৃষ্টি কোথায় সার্থক হবে তা নির্ধারিত থাকত। রবীন্দ্রনাথের গানের মত তাকে 'যথাস্থান' বাছতে হত না; 'কোন্‌খানে তোর স্থান' জিজ্ঞাসা করার কোনো প্রয়োজন হত না সেকালের শিল্পকাজকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, খোলা হাওয়ায় মূর্তি রেখানোটা এপ্‌ষ্টাইনের নিছক খেয়াল না হতেও পারে। উদার আকাশের নীচে স্থান পাবার জন্যেই হয়তো সেগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলোর সৃষ্টিপ্রেরণার মধ্যে হয়তো খোলা হাওয়া আর উদার আকাশেরও ক্রিয়া ছিল।

যাক্‌, এপ্‌ষ্টাইনের হয়ে ওকালতি করার বা তাঁর খেয়ালী হওয়ার অপবাদ মোচনের জন্যে এ প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। তাঁর—এ যুগের পক্ষে—অ-সাধারণ ধারণাটার প্রসঙ্গ তুলে শিল্পের—বিশেষ করে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের একটা উপেক্ষিত দিকের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

আমরা ভারতীয়রা—স্থান-মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করি। প্রতি স্থানের যে একটা আত্মা আছে, যার জন্যে তার সঙ্গে আমরা একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বোধ করি, এ কথা আমরা জানি! গ্রামদেবতা, গ্রামে অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রভৃতি দেবীমূর্তি স্থাপন করে আমরা গ্রামের আত্মাকেই একটা রূপ দিয়ে এসেছি। এই রূপ-কল্পনা মোটেই কারও খেয়াল-খুশি মত করা হয়নি। গ্রামদেবতার রূপ হচ্ছে শিল্পীর তথা গ্রামবাসীদের চিত্তে ধৃত গ্রাম-আত্মারই শিল্পরূপ—একক এবং অনিবার্য্য শিল্পরূপ। শুধু আমাদের দেশেই নয়, সর্বদেশেই, শিল্পের আদি পরিচয় হচ্ছে ধর্মের অঙ্গহিসাবে। গান বলো, নাচ বলো, ছবি বা মূর্তি বলো, গৃহ-নির্মাণ বলো, সকলেরই সঙ্গে ছিল ধর্মের গভীর যোগ। মানুষ যখনই তার বিরাট স্বরূপের পরিচয়

পেয়েছে তখনই সেই পরিচয় রাখতে চেয়েছে শিল্পের মধ্যে ধরে—এ চাওয়াটা এবং এই সৃষ্টিটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

মানুষকে যা বিশ্বের সব-কিছুর সঙ্গে ঐক্যবোধ দিতে পারে তাই হল তার আত্মা; এই আত্মার প্রকাশ হল শিল্পে। মানুষ হিমালয়ের তুষারশুভ্র রূপ দেখে তদ্‌গত হয়েছে, হিমালয়ের মধ্যে অনুভব করেছে নিজের বিরাট রূপকে, তাই হিমালয়কে মহাদেবের মূর্তিতে কল্পনা করে নিজের বিরাট রূপকেই হিমালয়-চূড়ায় মন্দির গড়ে স্থাপন করেছে। এই ভাবেই হয়েছে ভারতের তীর্থে তীর্থে মন্দিরের, দেবতার উদ্‌ভব। তীর্থে গিয়ে ঐ সব মন্দির আর দেবতা-মূর্ত্তি দেখে যদি মানুষ ঐ স্থানের মাহাত্ম্য বোধ না করতে পারে, ঐ স্থানের রূপে তদ্‌গত না হতে পারে তাহলে তার তীর্থে যাওয়া বৃথা। নিজের আত্মার বিরাটত্ব অনুভব করার জন্যেই নিজেকে প্রাত্যহিক জীবনের উর্দ্ধে তোলার জন্যেই তো তীর্থযাত্রা, নইলে তার অর্থ কি?

বস্তুর বিশ্বরূপ দেখা মানুষের ভাগ্যে বড় ঘটে না। একটা বিশেষ স্থানে, একটা বিশেষ কালে, একটা বিশেষ 'আবহাওয়ার' মধ্যে বস্তুর বিশেষ একটা রূপই শিল্পীর চিত্তে ধরা পড়ে। সে রূপকে যথাযথ ভাবে শিল্পে ধরে দিতে হলে শিল্পীকে ঐ স্থান, কাল, ঐরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হয়। কাব্যে এ-সব করা যত সহজ, ভাস্কর্য্যে বা স্থাপত্যে তা নয়। ভাস্কর্য্যে বা স্থাপত্যে এই জন্যেই স্থানের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। সূর্য্য-মন্দির কোনার্কেই সম্ভব ছিল—এমনটা আর বোধ হয় কোথাও নয়, সেখানকার সমুদ্রকূলে সূর্য্যের যে মাহাত্ম্য অনুভূত হয়, এমনটা আর কোথায়? শান্তিনিকেতনের লালচে কাঁকর-ভরা মাঠে শ্রীরামকিঙ্কর কিঙ্করের তৈরী একটা সাঁওতাল-মূর্ত্তি আছে। বাঁ কাঁধে বিরাটকায় এক মূর্ত্তি, তার পিছনে একটা কুকুর। ঐটাকে ঠিক ঐ স্থানেই তার পূর্ণ অর্থে, তার পূর্ণ গৌরবে দেখা যায়। কলকাতার, এমন কি ঐ শান্তি-নিকেতনেরই কোনো আর্ট-গ্যালারিতে ওকে গুঁজে দিলে ওর যে দম বন্ধ হয়ে যাবে, এটা যে কেউ বুঝতে পারে। দাক্ষিণাত্যে, এক পাহাড়ের উপর মন্দিরের পাশে গাছপালার নীচে রয়েছে একটা হনুমানের প্রস্তর-মূর্ত্তি। ঐ পরিবেশ ছাড়া উক্ত জীবটার মহিমা পূর্ণ ভাবে যে ধরা পড়ত না, এটা যাঁদের কিছুমাত্র রসবোধ আছে তাঁরাই বুঝবেন! দক্ষিণ-ভারতেই একটা পাহাড়ের গায়ে বিরাট শিবমূর্ত্তি খোদাই করা হয়েছে—ওটা পাহাড়ের দৈব রূপের প্রতীক হয়েছে। শুধু পাহাড়ের অঙ্গ বলে নয়, পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঐ মূর্ত্তিটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও, অন্য যে কোনো স্থানে ঐ শিবমূর্ত্তির অর্থ ফুটতে পারত না। স্থাপত্য সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে।

মানুষ বাড়ী-ঘর তৈরি করে, মন্দির তৈরি করে, সহর তৈরি করে থাকবার জন্যে। তৈরি করার সময় সে শুধু থাকার সুবিধাই বিবেচনা করে না, তার বাড়ী-ঘর সহরকে সুন্দর করার কথাও ভাবে। জীবন ধারণের জন্যে একান্ত ভাবে যা প্রয়োজন তার বেশী চাওয়া হল মানবধর্ম, মানুষ সব ব্যাপারেই তার জীব-ধর্মকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। এই জন্যে মানুষ বাড়ী তৈরি করে, সহর তৈরি করে নিছক প্রয়োজনে নয়, শুধু রৌদ্র-বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে নয়, নিজেকে গৃহ-নির্মাণের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্যেও বটে। সেকালে সমাজে ছিল unaninaty—একপ্রাণতা, একটা নির্দিষ্ট 'ছক' মত বাড়ী তৈরি হত, সহর তৈরি হত। একালে বিশেষ করে সহরগুলোয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলে বাড়ী তৈরি হয় মালিকের খুশি মত। একটা বাড়ীর সঙ্গে পাশের বাড়ীর সঙ্গতি রইল কি না, ঐ স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশে বাড়ীটা মানায় কি না, একথা বিচার করার কোনো প্রয়োজন মানুষ যেন বোধ করে না আর। প্রধানতঃ ধন-গত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ ফুটে ওঠে আমাদের গৃহ নির্মাণে। সমাজের মধ্যে যে শ্রেণীগত বিভেদ আজ রূঢ় ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে আমাদের গৃহ ও সহর-নির্মাণে তারই প্রতিফলন হচ্ছে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রশ্ন সেখানে ওঠে না,, চাপা পড়ে যায়। আগে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ, তার পরে আসে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার কথা। তবু, মানুষ যেখানেই প্রকৃতিস্থ, সেখানেই গৃহ বা সহর-নির্মাণের সময় প্রকৃতির সহযোগিতা দেখা যাবেই। হিমালয়ের সানুদেশে তিব্বতী গ্রামের কথা পড়েছি কোন এক এভারেষ্ট অভিযাত্রীর বইয়ে—তার ছবিও দেখেছি। যে গ্রামের রূপের বৈশিষ্ট্য মুগ্ধ করেছে লেখককে, তিনি হিমালয় অঞ্চলের সাধারণ রূপের সঙ্গে গ্রামের এবং গ্রামের বাড়ীগুলোর পরিপূর্ণ সঙ্গতির কথা বলেছেন। অত দূর যাবার দরকার হত না, আমাদের বাংলা দেশের সাধারণ রূপের সঙ্গে আমাদের বহু গ্রামের রূপের এখনও একটা অদ্ভুত সঙ্গতি দেখা যায়, যার ফলে গ্রামগুলোর সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে বিদেশ থেকে আসার পর আমাদের চোখে; বিদেশীদের চোখে তো বটেই।

দামোদরগুপ্ত প্রণীত

কুট্টনী মত

অনুবাদক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ভদ্রে, ভট্টতনয়ের প্রায় এইরূপ বেশভূষা ও আচার-ব্যবহার, সুতরাং তাহাকে মদনের ফাঁদে ফেলিতে তোমাকে যাহা করিতে হইবে তাহা বলিতেছি—

চতুরা, প্রগল্‌ভা, পরের মন বুঝিবার কৌশল জানে ও বক্রোক্তিতে পটু এইরূপ একটি দূতী সযত্নে তাহার নিকট পাঠাইয়া দাও। সুন্দরি, সে অবসর বুঝিয়া ভট্টপুত্রকে তাম্বুল ও পুষ্প দান করিয়া কামোদ্দীপক বাক্যে এইরূপ বলিবে—

"বাররমণীগণ শিক্ষা-কৌশলে নটীর ন্যায় চাটুবাক্য, অনুরাগ, প্রণয়, অভিমান, বিরহজনিত শোকার্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। যোগিগণের ন্যায় গণিকাগণ বৃদ্ধ ও যুবা, হীনকুলজাত ও সৎকুলজাত, রোগযুক্ত ও স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পায় না। পণ্যবধূগণ পূর্বে যথেষ্ট শোষণ করা সত্ত্বেও, (পূর্ব-প্রণয়ী) অল্পবিত্তা-বশিষ্ট ব্যক্তি সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে তাহার একমাত্র সম্বল পরিধেয় বস্ত্রখানির প্রতিও লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। সেই জন্য বেশ-বিলাসবতীগণ(১) দৃঢ়চিত্ত পুরুষের সম্মুখে 'আমার সহস্র জন্মের অর্জিত পুণ্যসমূহ আজ সুফল দান করিল, কারণ আপনার নয়নাভিরাম মূর্তি আমার লোচনপথবর্তী হইয়াছে, এইরূপ ভাবে কামব্যথা প্রকাশ করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া থাকে।" [৮৮—৯৫]

"কেবল, ধৈর্যরূপ আভরণ-পরিত্যক্তা,(২) দুরাশার আগুনে দগ্ধা আমার সখী নিজের নগণ্যতার কথা বিচার না করিয়াই আমাকে প্রণোদিত করায় আমি আপনাকে বলিতেছি—

"হে রমণীবল্লভ, মালতী আপনাকে মনে মনে ভজনা করায় পূর্ব হইতেই আপনি তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরে যখন তাহার লোচন-গোচর হইলেন তখন হইতে সে কুসুমধন্বার বাণের লক্ষ্যীভূতা হইয়া পড়িয়াছে।—কখন তাহার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে, কখনও বা কামাগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার জন্য বেদনার অবস্থা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, কোন সময়ে তাহার দেহ কম্পিত হইতেছে, কখনও আবার ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিতেছে। কখন তাহার হাস্যলোপ হইতেছে,(৩) কখন সে ধীর ভাব ধারণ করিতেছে, কখনও বা উচ্চৈস্বরে রোদন করিতেছে, কখন গান গাহিতেছে, কখনও আবার মৌনাবলম্বন করিয়া আছে। কখন পালংকে, কখন পরিজনের অংকে, কখনও বা ভূতলে, কিংবা কখন অনঙ্গসন্তপ্ত হইয়া কিশলয়রচিত শয্যায় অথবা জলে গিয়া শুইয়া পড়িতেছে।"

"হে সুভগ, (কর্পূর-চন্দনাদিতে দেহ লিপ্ত করিয়া) কখনও সে কর্দমলিপ্তগাত্রা মহিষীর ন্যায় কখন বা মৃণাল-বলয় পরিধান করিয়া (মৃণাল সমূহ মধ্যে বিচরণশীলা) হংসীর ন্যায় কখনও বা ময়ূরীর ন্যায় (বিটরূপ) ভুজঙ্গের প্রতি সে বিদ্বিষ্টা হইয়া উঠিতেছে। কদলী, চম্পক, চন্দন,(৪) পংকজ, জল, হার, কর্পূর অথবা সুন্দর চন্দ্রকান্তমণি কিছুতেই তাহার মদনহুতাশন প্রশমিত হইতেছে না।

'দূর কর সখি কর্পূর, দূর কর হার, কমলে কি প্রয়োজন, কাজ নাই সখি মৃণালে,' দিবানিশি সেই বালা এই রকম (প্রলাপ) বলিতেছে। কল্পনায় আপনার সান্নিধ্য অনুভব করিয়া অন্তরে প্রফুল্ল হইয়া আপনাকে বাহুপাশে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিতে গিয়া যখন নিজ ভুজ-পীড়নে তাহার জ্ঞান হইতেছে তখন সে বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়া পড়িতেছে। কুসুম-সুবাসিত পবন, পিকের কূজন, ভৃঙ্গশ্রেণীর গুঞ্জন এই সকল দ্রব্য বিধি যেন তাহার বিনাশের জন্যই একত্রিত করিয়াছেন। প্রবল মকরকেতু কর্তৃক সেই অবলা এক্ষণে এই দশায় আনীত হইয়াছে, তাহাকে রক্ষা করুন। শুভজন্মাগণ বিপদে পতিত ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেন।" [৯৬-১০৬]

"প্রায়শঃ প্রার্থিগণ যাহা বলে তাহা যথার্থ বলিয়া গৃহীত হয় না, তথাপি ধৃষ্টতা সহকারে আমি মালতীর গুণের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি (দয়া করিয়া) শ্রবণ করুন—

"অতনু তাঁহার কুসুম-ধনু আস্ফালন করিলে যে কুসুম-রজঃ পতিত হইয়া থাকে, নিশ্চয়ই বিধাতা তাহা সংগ্রহ করিয়া সেই সুগাত্রীকে নির্মান করিয়াছেন। মালতীর দেহলাবণ্য ফণীন্দ্রভূষণ শিবের দেহার্ধের সহিত সতত-লগ্ন পার্বতীর দেহের লাবণ্যকে উপহাস করে, কারণ, তাহার লাবণ্যের কোন অংশই লুপ্ত হয় নাই (তাহা সম্পূর্ণ)। শশধরের বিম্বের অর্ধেক যেরূপ রাহুর বদনের ছায়ার দ্বারা আবৃত হয়, ভ্রমরপুঞ্জের ন্যায় নীল কুটিল অলকাবলী তাহার ললাট আবৃত করায় তাহার (বদন-চন্দ্রমার)ও সেইরূপ শোভা। হে হৃদয়প্রিয়, সরসিজের শোভা অস্থির (অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী) এবং শশীর মণ্ডলে কোন বিভ্রম নাই সুতরাং মালতীর বদন (যাহার শোভা স্থির এবং বিভ্রম-বিভাসিত)এর সহিত কাহার তুলনা হইতে পারে? তাহার চক্ষুর্দ্বয়ের উপর অলি (কমল ভ্রমে কিছুক্ষণ) উড়িয়া সৌগন্ধে-পার্থক্য বুঝিতে পারিয়া কর্ণস্থিত কমলে গিয়া বসে—সময়-বিশেষে নির্গুণতা হিতকারী হইয়া থাকে। সহজাত অরুণিমাসম্পন্ন জিত-বন্ধুজীব-রুচি(৫) "তাহার অধরে যে অলক্তকবিন্যাস তাহা তাহার প্রসাধন-লীলা(৬)। বিচিত্র তাহার বলিসবলিত মধ্যদেশের কৃশতা! বিধাতার দ্বারা বিহিত এই তনুতাকে কোন মহতী শক্তিই অপনীত করিতে পারে না। আরও যে তাহার মদনের আবাসস্থলরূপ

---

(১) বেশই যাহার বিলাস অর্থাৎ কলাকৌশলহীনা সাধারণ বেশ্যা। (২) ধৈর্যহীনা, অধৈর্য। (৩) রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণে পাঠ আছে "মুহুরবিজ্ঞাবিত কার্শ্যা" এবং কাব্যমালায় সংস্করণে পাঠ আছে "দূরবিজ্ঞাবিত কার্শ্যা" আমরা তনুসুখরামের সংস্করণের পাঠ "মুহুরবিজ্ঞাবিত হাস্যা" পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। (৪) তনুসুখরামের সংস্করণে 'চম্পক চন্দন'এর পরিবর্তে 'চন্দন পংক' আছে।

(৫) বন্ধুজীব বা বাঁধুলি ফুলের রক্তবর্ণকে পরাজিত করিয়া যাহার শোভা। (৬) অর্থাৎ তাহার সহজাত রক্তিম অধরে আর অলক্তক-বিন্যাসের প্রয়োজন নাই, সে যে তাহা করে তাহা কেবল প্রসাধন-লীলা মাত্র।

অতিবিশাল নিতম্ব আছে তাহা কপিলমুনিরও দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারে। সেই রম্ভাবপুর(৭) রম্ভাকাণ্ডের ন্যায় উরুযুগল দেখিলে মকরধ্বজও সহসা নিজের কুসুমশায়কের লক্ষ্যীভূত হইয়া পড়িবেন। সেই জঘনভারালসগমনা মালতী) মনোহর শরজন্মা (কার্ত্তিকেয়)র লোচনপথে পতিত হয় নাই বলিয়াই তাঁহার ব্রহ্মচর্য অক্ষুন্ন ছিল। পঞ্চবাণের সর্বস্ব-স্বরূপা তাহাকে যদি কোন মতে মধুসূদন দেখিতে পান তাহা হইলে তাঁহার বক্ষলগ্না লক্ষ্মীকে বৃথায় ভার বহন করিতেছেন বলিয়া মনে করিবেন। যদি সে কোন ক্রমে হরের দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই তাঁহার দেহের দক্ষিণ ভাগ অধিকার করিয়া ত্রিভুবনকে শিবরহিত করিয়া ফেলিবে(৮)। তাহার সেইরূপ অসামান্যরমণীসুলভ সৌন্দর্য সৃজন করিতে করিতে বিধাতা যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা কাকতালীয়ের ন্যায় (আকস্মিক ঘটনা) বলিয়া মনে করি। সহজাত বিলাসের নিকেতন তাহার দেহ স্বর্গরাজ (দেবেন্দ্র) যদি ভাল করিয়া না দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে আমার মনে হয়, তাঁহার সহস্র চক্ষু থাকিলেও তাহা বিফল। সংসারের সারভূতা মালতী যতক্ষণ ধরায় বিচরণ করে ততক্ষণ হে মনসিজ, তোমার কুসুম-ধনুর জ্যা শিথিল করিয়া দাও, বাণসকল তূণীরে তুলিয়া রাখ(৯)। বাৎস্যায়ন, 'মদনোদয়' গ্রন্থের প্রণেতা, দত্তক, বিটপুত্র ও রাজপুত্র প্রভৃতি কামশাস্ত্রকারগণ যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন তাহা সমস্তই স্বভাবতঃই তাহার মানসগোচর হইয়া আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্র, বিশাখিলের কলাশাস্ত্র, দত্তিলের সংগীতশাস্ত্র, বৃক্ষায়ুর্বেদ, চিত্রকলা, সূচীশিল্প, পত্রচ্ছেদ্যবিধান, ভ্রমকর্ম(১০), পুস্তকর্ম(১১), পাকশাস্ত্র প্রভৃতিতে এবং আতোদ্য বাদ্যাদিতে(১২), নৃত্যে ও গীতে তাহার যে কৌশল তাহা সর্পরাজ (শেষনাগ) তাঁহার সহস্র বদনেও বলিতে পারেন কি না সন্দেহ। স্খলিতোত্থিত বিস্রস্তবসনা রতিলালসমানসা(১৩) মালতী সহসা নির্জনে যাহার বক্ষলগ্না হয় সে ব্যক্তি পুণ্যবান,। রতিরসরভসের আস্ফালনে চঞ্চল বলয়ধ্বনি মিশ্রিত তাহার তৎকালোচিত রতকূজিত যাহার শ্রুতিপথে পতিত হয় সে অল্প পুণ্যবান, নহে। [১০৭—১২৭]

হে শুভমধ্যে,(১৪) এইরূপ বলা সত্ত্বেও যদি সে উদাসীন থাকে তাহা হইলে দূতী তাহাকে কোপপ্রকাশ করিয়া এইরূপ বলিবে—

"কি এমন আপনার সৌভাগ্যের অহংকার, কি এমন রমণীয় যৌবন-লাবণ্যের দর্প যে, আপনা হইতেই প্রেম নিবেদন করিতেছে যে মালতী, তাহাকে গ্রাহ্যই করিতেছেন না? ধনবান, সৎকুলজাত বা প্রশস্ত শাস্ত্রবিদ্ ব্যক্তিগণকে যে নগণ্য বলিয়া মনে করে সে কি না আপনার জন্য ক্লেশ পাইতেছে, অপাত্রে নিবেশিত তাহার অনুরাগকে ধিক্! তীব্রকর সূর্যের প্রতি কমলিনীর ন্যায় ভস্মাচ্ছাদিত শম্ভুশিরের প্রতি শশিকলার ন্যায় পশুতুল্য আপনার প্রতি অনুরক্তা তাহার কথা ভাবিয়া (দুঃখে) আমি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছি। অসরল, নীরস, কঠিন, দুর্গ্রহ, কর্কশ খদির বৃক্ষকে মালতীলতা যখন আশ্রয় করে তখন অসরল-প্রকৃতি, প্রীতিবিবর্জিত, কঠোর-হৃদয়, যুক্তি দ্বারা অনুকূল করিতে দুঃসাধ্য, রুক্ষ-প্রকৃতি আপনাকে ভালবাসিয়া মালতী যে মালতীলতার নামোচিত আচরণ করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? ইহাতে দোষই বা কি দিব। অসামঞ্জস্যের জন্যই এই বৈলক্ষ্যের কারণ হইয়াছে(১৫), স্বাধীনা(১৬) হওয়া সত্ত্বেও মৃণালিনীকে কাক পরিত্যাগ করে (ভক্ষণ করে না)। হে সুভগ, আমি আপনাকে নিষ্ঠুর বাক্য বলিলাম বলিয়া দুঃখ করিবেন না, অনুরক্তা তরুণীর সুহৃদ্ যদি পরুষবাক্য বলে যুবকদিগের তাহা আভরণ-স্বরূপ। সেই সুগাত্রী রমণীয়া হইলেও চন্দ্রসংযুক্তা জ্যোৎস্নার ন্যায়, কংসারির কণ্ঠস্থিত বনমালার(১৭) ন্যায়, বসন্তবল্লভ মদনের কুসুমশরাসন লতিকার ন্যায়, হলধরের মদলীলার ন্যায়, স্তনযুগলের মধ্যস্থ হারলতার ন্যায় আপনার সহিত সঙ্গতা হইয়া আরও রমণীয়া হউক। কি আর বেশী বলিব, যদি নিখিল তরুণকুলের শিরোদেশে চরণস্থাপন করিতে বাঞ্ছা করেন তাহা হইলে এই প্রেমোজ্জ্বল স্ত্রীরত্নটিকে শীঘ্র অংকে ধারণ করুন। [১২৮—১৩৭]

অনন্তর তাহার (এই সকল) বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি ভট্টপুত্রের মদন উদ্দীপিত হয় তাহা হইলে সে যখন তোমার গৃহে উপস্থিত হইবে তখন তুমি এইরূপ করিবে—

দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে ও প্রণাম করিয়া নিজের আসনটিতে তাহাকে বসিতে দিবে, বস্ত্রাঞ্চল দিয়া তাহার পদদ্বয় পুঁছিয়া দিবে। অযত্নপ্রকাশিত কক্ষ, উদর, বাহুমূল ও কুচযুগল নায়ককে ঝটিতি ঈষৎ প্রদর্শন করিয়া ত্বরায় তাহার দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া যাইবে। [১৩৮—১৪০]

অনন্তর, হে গুরুজঘনে, তাহাকে পর্যংকসজ্জিত, দীপোজ্জ্বল কুসুম ও ধূপবাসে সুবাসিত বাসকাগারে প্রবেশ করাইয়া তোমার মাতা (১৮) অবতারণাদিপূর্বক এই সকল বাক্যবিশেষে যত্নসহকারে অভিনন্দন করিবে—

"আজ আশীর্বাদ সফল হইল, ইষ্টদেবতাগণ পরিতুষ্ট হইয়া কল্যাণরূপ অলংকার দ্বারা এই গৃহ অলংকৃত করিয়াছেন। অনুরূপ পাত্র সংঘটন করিয়া আজ বহুকাল পরে কুসুমেষুর শরাসন আকর্ষণ সফল হইয়াছে। সকল গণিকাগণের শিরে চরণবিন্যাস করিয়া এক্ষণে আমার সুভগা বৎসা সৌভাগ্য-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিক। (কেবল মাত্র) পুত্রজন্মে যাহারা সন্তুষ্ট তাহাদিগকে ধিক্, দুহিতাগণই প্রশংসনীয়, কারণ, তাহাদেরই সম্বন্ধহেতু আপনার ন্যায় জামাতা

---

(৭) অপ্সরা রম্ভার সুগঠিত দেহের মত যাহার দেহ রম্ভাকাণ্ড—কদলীকাণ্ড। (৮) শিবের দেহের বামার্ধ পার্বতী অধিকার করিয়াছেন এখন দক্ষিণার্ধ মালতী অধিকার করিলে শিবের নিজস্ব দেহ বলিয়া কিছু থাকিবে না, সুতরাং ত্রিভুবন শিবরহিত হইবে। (৯) কারণ তাহার কোন আবশ্যক নাই, মালতীই ফুলশরের কায করিবে। (১০) ইন্দ্রজাল অথবা যানাদি চালন-বিধি। (১১) কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, চর্ম অথবা ধাতুনির্মিত পুত্তলিকা নির্মাণ-কৌশল। (১২) বীণা, মুরজ, বংশী ও কাংস্য এই চতুর্বিধ বাদ্য। (১৩) ইহাতে রতির আবেগে নায়িকার স্বয়ং অভিসার সূচনা করিতেছে, ইহা কামুকের সার্বজাতিক সৌভাগ্য। (১৪) সুন্দর মধ্যদেশ যাহার।

(১৫) আমা হইতে অধিক গুণবতী এই মনে করিয়া গ্রহণ করিতে লজ্জা বা কুণ্ঠা হইতেছে। (১৬) মৃণালপক্ষে 'অরক্ষিত,' মালতী পক্ষে 'স্বেচ্ছাধীনা'। (১৭) "আপাদপঙ্ক্ত যা মালা বনমালেতি সা মতা" অথবা "পত্রপুষ্পময়ী মালা বনমালা প্রকীর্তিতা"। (১৮) জননী অথবা মাতৃস্থানীয়া বৃদ্ধ ... ন্যায় পালন করিয়াছে।

লাভ হয়। আপনার ন্যায় ব্যক্তি যদিও দৃঢ়পরিচয়(১৯), ও গুণজ্ঞ হইয়া থাকেন এবং উচিত পাত্রকে সম্মান করিয়া থাকেন তথাপি দুহিতৃস্নেহবশতঃ আমার অন্তরের আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি। নিজ হইতে আপনাতে অনুরক্তা মালতীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম, দেখিবেন বেচারী(২০) যাহাতে আপনার অপ্রিয় কার্য করিয়া দুঃখের কারণ না হয় সেইরূপ করিবেন।" [১৪১-১৪৮]

কোমল, ধৌত ও ধূপাদি দ্বারা সুরভিত বসন ও সূক্ষ্ম কারুকার্য-সমন্বিত মহার্ঘ্য(২১) ভূষণাদি পরিধান করিয়া যথেষ্ট ধূপবর্তি(২২) পান করিয়া হে সুতনু, তুমি কান্তের পার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া সস্নেহে, সলজ্জে, সাধ্বস সহকারে(২৩), সস্পৃহ ভাবে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, ঈষৎ দেহ-লাবণ্য দর্শন করাইয়া মধ্যে মধ্যে দু'-একটি পরিহাসসূচক বাক্য বলিয়া তাহার সহিত নর্মালাপ করিবে। মাতা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলে, পরিজনবর্গ বাসকস্থান পরিত্যাগ করিলে যখন কান্ত বিলাসের উপক্রম করিবে তখন কিছুক্ষণ তাহার প্রতিকূলাচরণ করিবে। রতিযুদ্ধের অভিলাষ করিয়া সে যখন তোমাকে আনন্দে তাহার নিকট আকর্ষণ করিবে তখন কুট্টমিত(২৪) আচরণ করিবে, কিঞ্চিৎ অঙ্গসংকোচ করিবে। বৎসে, সুরত-বিধির আরম্ভে ক্রমে মদনাবেগ প্রদর্শন করিয়া নিঃশংকে অর্কপটে অঙ্গাদি সমর্পণ করিবে। সে তোমার দেহের যে যে অংশে আঘাত করিতে(২৫), দেখিতে বা নখরেখাংকিত(২৬) করিতে ইচ্ছা করিবে তুমি আবেগ-সহকারে তাহা প্রকাশ করিবে ও আগাইয়া দিবে। দংশন(২৭) করিলে ব্যথাসূচক হুংকার করিবে, (স্তনাদি) মর্দন করিলে(২৮) বিবিধ কণ্ঠশব্দ করিবে, নখাঘাত করিলে সীৎকার করিবে, আঘাত করিলে সুস্পষ্ট নূপুরশিঞ্জনের ন্যায় শব্দ করিবে(২৯)। পুরুষের রাগ বৃদ্ধির জন্য শ্রমজনিত ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পুলক-রোমাঞ্চিত দেহে সকল অবয়ব খিন্ন করিতে করিতে বিক্ষেপ করিবে(৩০)। হে কলকণ্ঠি, উপযুক্ত সময়ে(৩১) রসাবেগে তুমি কোকিল, লাবক(৩২), হংস, পারাবত ও অশ্বের(৩৩) ন্যায় বিরুত প্রকাশ করিবে। 'না—না, অত জোরে পীড়ন ক'রো না। নিষ্ঠুর, একটু ছেড়ে দাও। আমি আর পারছি না—' এইরূপ ভাবে অস্ফুটাক্ষরে গদ্‌গদ কণ্ঠে নায়ককে অনুরোধ করিবে। কামুকের অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিয়া সুরতকালে অনুরাগ, আনুকূল্য, বামতা, প্রগল্‌ভতা এবং অসামর্থ্য প্রদর্শন করিবে। রতাবেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে (বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা) অসংগতি, অশ্লীলতা, অধৈর্য ও অবিনয়সূচক ব্যবহার আচরণ করিবে(৩৪)। নায়কের কার্য সমাপ্ত হইলে মধ্যকৃত সকল উপেক্ষা করতঃ নিমীলিত নেত্রে নিরুৎসাহ হইয়া শিথিলীকৃত অবয়বে পড়িয়া থাকিবে। মোহভাব অপনীত হইলে ত্বরায় নিতম্ব আবরণ করিবে খিন্নাঙ্গতা দেখাইয়া সলজ্জ মৃদুহাস্যে খেদালস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে। [১৪৯—১৬২]

রতাভিযোগ সমাপ্ত হইলে, নির্জন স্থানে গিয়া জলস্পর্শ করিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করতঃ কিছুক্ষণ আসনে উপবেশন করিয়া কেশসংযমান্তে তাম্বূলাদি উপযুক্ত মুখবাস গ্রহণ করিয়া শয্যায় আরোহণ করিবে এবং রমণের কণ্ঠ রভসভরে দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রণয়-সহকারে এইরূপ বলিবে—

"ভট্টপুত্র, তুমি নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রীকে খুব ভালবাস, সেই জন্য তাহার প্রতি অনুরক্ত-হৃদয়, তুমি অপর নারীর আলিঙ্গনে নির্মল পরিতুষ্টি লাভ করিতে পার না। সফল তাহার জন্ম, সে-ই সকল নারীগণ হইতে বাঞ্ছনীয়া, সার্থক তাহার গৌরী আরাধনা, সার্থক তাহার সৌভাগ্যজনক তপস্যা। নিশ্চয়ই সে বহুগুণবতী এবং যে বংশে তাহার জন্ম শ্লাঘনীয় সেই বংশ, বহু পুণ্যফলে সে তোমার বিবাহিতা পত্নী হইয়াছে। নরকাসুরবৈরী নারায়ণের বক্ষ হইতে যেমন লক্ষ্মী কখনও বিচ্যুতা হন না তেমনি (পিতৃ ও মাতৃ) উভয় কুলের ভূষণস্বরূপা সেই বরারোহা পুণ্যবতী তোমার বক্ষলগ্না হইয়া থাকুক। তুমি কেবল মাত্র কৌতুকভরে যে সকল রমণীর প্রতি তোমার কুবলয়সন্নিভ লোচনের দৃষ্টিপাত করিয়া থাক তাহারাও আপনাদিগকে যথার্থ সুন্দরী মনে করিয়া এত হর্ষোৎফুল্ল হয় যে তাহাদিগের আনন্দ যেন তাহাদিগের দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। তরল-বুদ্ধিশালিনী রমণী প্রিয়ের প্রণয় অতি অল্প হইলেও প্রায়শঃ তাহা লইয়া বড়াই করে, তাই আমি নিজ মঙ্গলের জন্য তোমাকে এই অনুরোধ করিতেছি—[১৬৩—১৭০]

---

(১৯) চঞ্চল নহে অর্থাৎ এক জনকে ছাড়িয়া অপরে অনুরক্ত হয় না। (২০) মূলে 'বরাকী' শব্দ আছে। (২১) মূলে 'অপ্রাম্য' শব্দ আছে। (২২) মুখ সুবাসিত করিবার জন্য বর্তমান কালের 'বিড়ি' প্রভৃতির ন্যায় সুগন্ধি মশলায় প্রস্তুত ধূপবর্তি বা ধূম্রবর্তি। (২৩) সম্ভ্রমের সহিত। (২৪) কেশ স্তনাদি গ্রহণ করিলে সুখে অন্তরে হৃষ্ট হইয়া মুখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া মস্তক ও হস্ত বিধূনন করাকে বলে 'কুট্টমিত'। (২৫) স্কন্ধদ্বয়, শির, স্তনান্তর, পৃষ্ঠ, জঘন ও পার্শ্ব আঘাত বা প্রহণনস্থান। (২৬) কক্ষদ্বয়, কণ্ঠ, কপোলদ্বয়, নাভি, শ্রোণি, কুচদ্বয়, ভগস্কন্ধ ও কর্ণমূল নখাঘাতের স্থান। (২৭) কক্ষ, উদর, স্তনযুগ, কপোল ও কণ্ঠ ইহাই দন্তপীড়ন স্থান। (২৮) দেহের মাংসল স্থান, যথা, বাহু, কুচ, উরু, নিতম্ব, পার্শ্ব, নিম্নোদর, জঘন প্রভৃতি মর্দন স্থান। (২৯) কামশাস্ত্রে হিংকৃত, স্তনিত, স্যুৎকৃত, দূৎকৃত, ফুৎকৃত কূজিত ও রুদিত প্রভৃতি সীৎকারের বর্ণনা আছে। (৩০) wriggling। (৩১) বাৎস্যায়ন কামসূত্রে কোন্ সময়ে কিরূপ বিরুত করিতে হয় তাহা বলিয়াছেন [কাঃ সূঃ ২।৭।১৩-২০]। (৩২) 'লাওকা'পক্ষী (Perdix chinesis)। (৩৩) অশ্বের ন্যায় বিরুত করার কথা অন্য কোন কামশাস্ত্রে পাই নাই। কবি এ ক্ষেত্রে চণ্ডবেগা নায়িকার রাগকালে চণ্ডনায়ক কর্তৃক দৃঢ় নিপীড়নে মুখ হইতে নির্গত 'হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ' এইরূপ শব্দকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

(৩৪) রতির আবেগে স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা তরুণীগণ যে সকল অসঙ্গত বা অনুচিত আচরণ করে, অশ্লীল বাক্য বলে, অধৈর্য প্রকাশ করে বা অবিনীত বা অসভ্যতা আচরণ করে তাহা নিন্দনীয় নহে বরং সুখাবহ।

উলুখড়

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

বচন সিং ভাবতেই পারে না, কি করে সে ছ'শ মাইল পথ পার হয়ে দিবা-রাত্রি পায়ে হেঁটে দিল্লী এসে পৌঁছল। এগার দিন পথ চলার পর যেদিন অমৃতসহর পৌঁচেছিল, সেদিনকার কথা ভুলতে পারেনি। মৃত্যুর কালো ছায়া সারা দলটাকে ঘিরে রেখেছিল কোন প্রেতাত্মার মত। সেদিন দূর হতে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের চূড়া আকাশের গায়ে রোদের আভায় ঝকঝক করতে দেখে দূর হয়ে গেল মন হতে মৃত্যুর স্তব্ধ নিশ্চল রূপ—সারা মনের হাহাকার, কত প্রিয়জনকে হারাবার জমাট ব্যথা। নিজেকে বোধ হয় সব চেয়ে বেশী ভালবাসে মানুষ। না হলে মা, ছোট ভাই গুরুদিৎ—কত পরিচিত কত সুখ-দুঃখময় দিনের সঙ্গী তার সাথী···চোখের সামনে ভেসে তাদের মৃত্যুকাতর মলিন চাহনি—তাদের অসহায় ভাষাহীন আর্ত্তনাদ সব ভুলে গিয়ে বাঁচবার আনন্দে এগার দিনে পথশ্রমক্লান্ত যাযাবর বচন সিং ছেঁড়া কুর্তার ফাঁক হতে রক্তাক্ত হাতটা আকাশের দিকে তুলে আর সকলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আনন্দধ্বনি করেছিল—

—"ওয়া গুরুজি কি ফতে।"

দলে দলে আশ্রয়প্রার্থীরা আসছে দূর নৌসেরা—জালালপুর—জলালপুর—কসুর এমন কি ডেরাইসমাইল—ডেরাগাজি আরও কত দূর হতে, কেউ দশ দিন—বিশ দিন পায়দল আসছে। মাইলের পর মাইল লম্বা যাত্রিদল স্ত্রী-পুরুষ-বৃদ্ধ সকলেই কোন রকমে জরাজীর্ণ পরিশ্রান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে পালিয়ে আসছে। পিছনে পড়ে রইল কত জানে না—কত সঙ্গী নিঃশেষ হয়ে গেল মৃত্যুর বুকে তাদেরই সামনে। ভয়ে দু'হাতে চোখ বুজে সে দৃশ্য না দেখবারই চেষ্টা করছিল তারা। মনে মনে ব্যাকুল প্রার্থনা—এ দিন যেন তাদের জীবনে না আসে।

সেদিনগুলো কোন অতীতের লেখা দুঃস্বপ্নের মত গেঁথে আছে বচন সিংএর জীবনের সঙ্গে। সেগুলোকে ভুলতেই পারবে না সে, যা তাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে তা'দিকে সে চিরদিনই মনে রাখবে।

দুপুরের অসহ্য রোদে দিল্লীর সারা আকাশ-বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে গরম বাতাসের হলকা সারা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে যায়, ইণ্ডিয়া গেটের নীচে বিশাল পাথরের তৈরী ফটকটার পাশেই নীল কেরাসিন কাঠের বাক্সে ছোট-ছোট খোপ তৈরি করে লেমনেড-সোডার বোতলগুলো বসিয়ে সরবতের দোকান সাজিয়েছে বচন সিং—জীবিকা এখন এই-ই।

রোজ বেলা দশটার সময় পাণ্ডবকেল্লা হতে ছোট্ট গাড়ীখানা ঠেলতে ঠেলতে আসে বচন সিং, শাহাজাহান রোড হয়ে ধীর-মন্থর গতিতে এগিয়ে আসে ইণ্ডিয়া গেটের দিকে, গাড়ীখানা গেটে উঠবার সিঁড়ির পাশে দাঁড় করিয়ে কাছেই ঝিল হতে কয়েক বালতি জল এনে চারি দিকে একটু পরিষ্কার করে দোকান সাজায়। নিজে এক গেলাস জলে দু'-এক টুকরো বরফ দিয়ে বেশ একটু খেয়ে আয়েস ক'রে বসল। আজ প্রায় মাসখানেক ধরে চলে আসছে—এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ক্লান্ত দুপুর বেলা জনসমাগম কমে যায়। টুরিস্ট দলও এই [illegible] 'দু'এর মত' বার হয় না—দু'-এক জন সোয়ারী সাইকেল থামিয়ে চোখের গগলস খুলে দু'-এক গেলাস লেমনেডের অর্ডার দেয়। নয়ত একখানা গাড়ী সশব্দে থেমে গিয়ে কিছু সওদা করে আবার বার হয়ে যায়।

নীরবে বসে থাকে বচন সিং, প্রশস্ত রাস্তাটা দু'পাশে ঘাসের বুক চিরে চলে গেছে, দূরে সোজা গিয়েই উঠে গেছে আরাবল্লীর রিজ, গভর্ণমেন্ট হাউসের চূড়াটা বিশাল প্রাসাদের গাম্ভীর্য্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—দু'পাশে সেক্রেটারিয়েট—স্বাধীন ভারতের কর্ম্ম-ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্রশালা। এ পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে হস্তিনাপুরের কোন পৌরাণিক যুগের ধ্বংসাবশেষ। কালো-কালো বিশাল পাথরগুলো আজও আকাশচুম্বী দুর্গ-প্রাকারের কল্পনা এনে দেয়। এক দিকে সুদূর অতীত, অন্য দিকে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। মাঝখানে নির্ব্বাক্ বচন সিং,—যেন স্বপ্ন দেখে কোন অতীতের।

প্রথম যখন এল সে দিল্লীতে, ঠাঁই নাই তার কোথাও। দিল্লী যেন ইষ্টিশানের বাইরে টাঙ্গা-শেডের নীচে পড়ে থাকত। দিল্লীর মোহ তার কর্ম্মচঞ্চল জীবনযাত্রা সর্বহারা মনের মাঝে ধীরে ধীরে বিস্মৃতির প্রলেপ এনে দিল। অনুভব করল বচন তার নিজের অস্তিত্ব—তাকে বাঁচতে হবে। খাবার সংস্থান করতে হবে।···

দিন-রাত ঘুরে বেড়ায় সারা দিল্লীতে। নিরাশ্রয় সে···আপন বলতে যার সারা পৃথিবীতে কেউ নাই, টাঙ্গাওয়ালাই বোনে গেল, রাতে পড়ে থাকে টাঙ্গা-শেডের নীচে।···

মাঝে-মাঝে অতীতের কথা মনে আসে।···দু'চোখ জলে ঝাপ্সা হয়ে যায়।

···ঝিলামের ধারে মিরফি টিলার উপর গাঁও। গাঁয়ের চারি দিকে গোল পাঁচীরের বাইরে ঝিলামের ধারে ত্রিশ বিঘা ক্ষেতি—তিনটা ভইসা। কাজল-কালো জলরাশির পাশে সবুজ ক্ষেতি, নরম পলির উপর শীতের প্রারম্ভে লকলকে হয়ে ওঠে যব-গম-বাজরার চারা। চানার পুষ্টলো গাছগুলো বৈকালের হিমেল বাতাসে ঝিলমিল করে কোন্ অজানা দেশের স্বপ্ন দেখে।

—'ভেইয়া—ভেইয়া।'

ছোট ভাই গুরুদিতের ডাকে ফিরে চাইল বচন সিং। বেলা হয়ে গেছে অনেক, টিলার পাশ দিয়ে বর্ত্তন হাতে নেমে আসছে বুড়ী মা রোটি নিয়ে। খাবার সময় হয়ে গেছে, বচন ভইসাগুলোকে ছেড়ে দিয়ে নদীর জলে স্নান করতে নামল। মোষগুলোও কর্দ্দমাক্ত কলেবরে নদীর জল তোলপাড় করে তুলতে লাগল।

স্নানের পরেই আহার, জমির আলের উপর দুই ভাইন বসে পড়ে, রোটি সবজি আর দহি—সারা দিন পরিশ্রমের পর তাই যেন অমৃত বোধ হয় বচনের।

খাওয়ার পর নিম গাছের নীচে পাগড়িটা বিছিয়ে একটু গা গড়িয়ে নিতে যাবে—পাশের ক্ষেত থেকে বেড়া ডিঙ্গিয়ে আসে মিঠ্, বচনের ঘুমন্ত দেহটাকে ঠেলে উঠিয়ে দেয়—"এ্যাই! এ্যাই!"

ধড়মড় করে উঠে বসল বচন, মিঠুর হাতে কলকেটা···

"লেও, পি লেও।"

"নেহি" ঘাড় নাড়ে বচন! গুরু গোবিন্দ সিংএর শিষ্য তারা, তামাক খাওয়া নিষেধ।

"হোড় বে—হট্ তুমি।

মিঠু কিছুই মানে না, তার কথাবার্ত্তাই এমনি, গম বেচতে গিয়ে সোনার [illegible] দিয়ে মাথায় চুল-দাড়ি সব কামিয়ে [illegible]

বাঙ্গালী বাবু বনে চলে এসেছিল,—কি মারটাই না মেরেছিল ওর বাবা ! সারা গাঁয়ে ওর চুল-দাড়ি কামানর জন্ত কত গোলমাল—শেষ কালে ওর বাবা মোহন্তের অস্থলে বেশ কিছু দণ্ড দিয়ে চাপা দিয়েছিল ব্যাপারটা।

ও-সব দিকে মিঠ্ঠুর খেয়াল নাই। ইত্যবসরে আরও বেশ ক'টা টান দিয়ে কলকেটা নিঃশেষ করে দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়তে ছাড়তে বলে, "আরে—সাথী তুসে বোলায়া !"

"সাথী ! কেঁউ ?" নামটা শুনেই চমকে উঠে বসে বচন, পাশের ছুপড়ির গুরুদয়ালের মেয়ে। তাকে ঘিরে কোন অবচেতন মনে বচনের রচিত হয় কোন কল্প-জগৎ। তার কালো ডাগর চোখের মাঝে ঝিলামের মতই কোন সুদূর হিমালয়ের অজানা মায়া—দেহে ঝিলামের মতই কোন চঞ্চল যৌবন-স্রোত।

মিঠ্ঠুর ধাক্কাতে চমকে ওঠে বচন—"খামোস্ কিঁউ বে ?"

সত্যিই তার দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে গেছে মিঠ্ঠুর কাছে। নইলে চুপ করে গেল কেন সে হঠাৎ ! দূরে গাঁয়ের দিকে চেয়ে দেখে, সত্যিই সাথী ছাগলগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে। সালোয়ার পাঞ্জাবীর উপর আধ-ময়লা জাফরাণী রংএর ওড়নাটা বাতাসে দোল খায়।···

রাত্রি ঘনিয়ে আসে আকাশে-আকাশে। শীতের কনকনে হাওয়া হিমালয়ের জমাট তুষারকে ঘনতর করে তোলে। সারা পশ্চিম-পাঞ্জাবের সমভূমিতে ফসলের ইসারা; লকলকে গমের পুষ্ট শিষে সোনার মৃত্তিকার সফলতার সংবাদ, সোনালী শিষে ছেয়ে গেছে দিক্ হতে দিগন্ত। শীতের কুহেলি তখনও বিদায় নেয়নি। দূরে ক্যাম্পবেল-পুরের বাগিচায় পীচ গাছগুলোর ঝরা পাতায় শূন্যতার আভাষ, মকরৌল লতার শিষে শিষে বসন্তের আগমনী।

রাতের বেলায় সব ঢেকে যায়, জেগে থাকে শুধু আকাশের তারা আর একফালি চাঁদ। মৃত্তিকার বুকে ছন্দ তুলে ঘুরে বেড়ায় ঝিলামের তীরে-তীরে ধনেশ পাখীর দল।

ঘুম আসে না বচনের। বাইরে পায়চারি করছিল, একটা পাথরের উপর বসে কি সব ভাবতে থাকে আকাশ-পাতাল। হঠাৎ পিছনে কার পায়ের শব্দ পেয়েই চমকে যায়। সাথী পা টিপে-টিপে আসছে।

একটু বিস্মিতই হয়ে যায় বচন সিং। গুরুদয়াল মেয়ের সাদীর সব আয়োজনই করেছে। বচপণ হয়ে গেছে। ফসল উঠলেই বান্দাগড়ের জোতদার লগনের সঙ্গেই বিয়ে হবে। বর হিসেবে বেশ ভালই। আশা করেছিল বচন, হয়ত তাদের দু'জনেই একসঙ্গে থাকতে পাবে সারা জীবন ! সে আর সাথী, কিন্তু বাদ সাধল গুরুদয়ালই, একটি মাত্র মেয়ে তার—এত টাকা দিয়ে তার খাই মিটোতে বচন পাবে কোথা।

জোতদার লগন সিং পয়সাওলা লোক। দু'-পাঁচশো টাকা তার কাছে কিছুই নয়। গুরুদয়ালের সমস্ত চাওয়াই সে মিটিয়েছে।

বচনের সম্বল কোথা ? মা বলেছিল, জমি বিক্রী করেও বিয়ে দেবে বচনের ওই সাথীর সঙ্গে ! কিন্তু আপত্তি করেছিল বচনই। জমি বিক্রী করে জরু কেনবার সামর্থ্য তার নাই. সারা পাঞ্জাবে ভাল মেয়ে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা, টাকা যাদের আছে তারাই ভাল মেয়ে কিনতে পাবে—যাদের নাই তাদের আশা দুরাশা।

···কথা কয় না বচন। মুখ ফিরিয়া বসে থাকে। সাথী জোর করে তার মুখে গুঁজে দেয় একটা পেস্তার লাড্ডু ! তার হাতটা সরিয়ে দেয় বচন।

বেশ ভুরভুরে গন্ধ, গাজিয়াবাদী আতরের খোসবু ! সাথীর কথাটা শুনেই চমকে ওঠে বচন।

—"ক্যা মালুম, বান্দাগড়কা কোন বান্দা নে ভেজা হ্যায়।" শ্বশুর-বাড়ী হতে 'দেয়াৎ' পাঠিয়েছে দই-লাড্ডু, আর তাই তাকে খাওয়াতে এসেছে সাথী নিজে। সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে বচনের—"ওহি লাড্ডু খিলানে আয়া হামকো, তেরি সরম নেহি আতি ? হট্—"

জোর করে সাথীকে সরিয়ে দিল বচন। লজ্জা লাগে না—শোনান হচ্ছে হবু শ্বশুর-বাড়ী হতে ভেট্ পাঠিয়াছে আর সেই লাড্ডু খাওয়াতে এসেছে তাকে। মেয়েরা এত বেহায়াও হতে পারে।

এ কি ! দূরে সাথীর দিকে চেয়েই অবাক্ হয়ে যায় বচন। কাঁদছে সে। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে ছেলেমানুষের মত কাঁদছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তার মুখটা তুলে ধরল। টানা-টানা ডাগর কালো চোখের কোলে টলটলে মুক্তার মত আঁখিতারা দু'টো চিকমিক করছে অস্পষ্ট তারার আলোয়। টিকলো নাকের মাঝে দীর্ঘ আয়ত চোখ-দু'টোয় কি যেন গভীর ব্যর্থতার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। আদর করে আরও কাছে টেনে নেয় তাকে বচন—"আরে রোতি কিঁউ ?"

কথার জবাব দেয় না সাথী। নীরবে কাঁদতে থাকে, বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বচন। সারা শরীরে তার কি এক অজানা শিহরণ, এত কাছে এ ভাবে সাথীকে কোন দিনই পায়নি সে। রাতের নিবিড় মায়া যেন সব কিছু ভুলিয়ে দেয় তাকে। দু'টো ডাগর কালো চোখে কি যেন রংএর নেশা—আরও কাছে টেনে নেয় বচন সাথীকে।

আবেশে সাথীর দু'চোখের পাতা ভেয়ে আসে। নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে বচন। রাতের আকাশ তারার রোশনাইতে ওঠে শিউরে, পাঞ্জাবের কঠিন শিলালিপিতে এক নিশীথ রাতে কোন যুবক-যুবতীর ক্ষণিকের মিলন-কাব্য তার স্থায়িত্ব কি কালের বুকে বিন্দুমাত্র রইবে কোন দিন !···কে জানে ?

ফসল উঠে গেছে। অঙ্গনে রাশি-রাশি গম-বাজরার স্তূপ। মাড়াই চলেছে। সোনালী দানা-দানা গমের আঁচলা—বুড়ী অনুভব করে এর প্রতিটি কণা তার ছেলে বনে আর গুরুদিত্তের জমাট রক্তকণিকা।

গুরুদয়াল পরম উৎসাহেই মেয়ের বিয়ের উদ্যোগ করতে শুরু করেছে। মোহন্তের অস্থলে প্রায়ই পরামর্শের জন্ত যায়,—পাগড়ীর ফাঁক হতে তাঁর পায়ের কাছে নামিয়ে দেয় সিদ্ধির পুটুলি।

এমনি এক নিস্তব্ধ দিনে বৈশাখীর ঝড় উঠল। আকাশে ঘনিয়ে এলো কালো পুঞ্জীভূত মেঘাড়ম্বর। পাঞ্জাবের কালো মৃত্তিকায়—ঝিলাম—শতদ্রু—বিপাশা—চন্দ্রভাগার তীরে তীরে উঠল হিংসার করাল ছায়া, রাঙ্গা হয়ে গেল মৃত্তিকার বুক। ওয়াজিরিবাদ—ডেরাগাজি—দোমেলের গিরিবর্ত্ম পার হয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাহির হয়ে এল কোন তাইমুরের প্রেতাত্মা—পশ্চিম-পাঞ্জাবের নগরে প্রান্তরে। প্রধূমিত বহ্নি সৃষ্টি করল মহা দাবানলের। গ্রাম-গ্রামান্তরে কত সংসার পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কত জনপদ পরিণত হল শ্মশানে। বান্দাগড়-মরকি টিলাও বাদ গেল না।

নিশীথ রাত্রে অশ্বারোহী দস্যুদলের অতর্কিত আক্রমণে জেগে উঠল গ্রামবাসীরা। টিলাটার চার পাশে কাদের অট্টহাসি ! রাতের

আঁধার মশালের আলোয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে। উঠল ঝিলামের কালো জল রাঙা হয়ে উঠল কাদের রক্তে। আকাশের কোলে-কোলে আগুনের লেলিহান শিখা। দূর-দিগন্তে কাদের আর্ত কোলাহল-ছেয়ে ফেলল দূর ক্রন্দসী।

সকাল হয়ে এল। মরফি টিলার পূর্বপ্রান্তে নিম গাছটার ফাঁকে উঠল সকালের আলো-রেখা। পড়ে রয়েছে গ্রামখানার ধ্বংসাবশেষ। এখানে-ওখানে আগুনের ধূমায়িত চিহ্ন, গাঁয়ের পাচীর ভেঙ্গে পড়েছে কুঁড়ি আর দাঁড়িয়ে নাই। পুড়ে কালো হয়ে গেছে, আহত মৃতের ভীড় গ্রামের পথে-পথে।

স্বপ্ন দেখছে না কি বচন।

সত্য এত নিষ্ঠুর কঠোর হতে পারে ভাবেনি। চোখের সামনে মাকে দেখে চিনতে পারে না। বুড়ীর মুখটা কালো হয়ে গেছে। সারা দেহে ঝলসান দাগ। শেষু হয়ে তার সব কিছু আস্ত নেই। গুরুদিত্তের মাথায় চোট লেগেছে। সারা গ্রামে হাহাকার—কে কাকে সান্ত্বনা দেবে! গুরুদয়াল সিংএর মৃতদেহটা চেনাই যায় না। আজ সাথী বাবাকে হারাল! কান্না যেন জমাট পাথর বনে গেছে।

বাকী যারা রইল—জীবনের কঠিনতর কোন বিপদের মুখোমুখী হবার জন্তই রয়ে গেল। কানে আসে দলবদ্ধ ভাবে নিষ্ঠুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কাহিনী। এক মুঠো দানা নেই—কতক লুঠ হয়ে গেছে। বাকী যা ছিল সব আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ নির্বাক্ জনতা নীরবে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে—কোন বজ্র নেমে আসে তারই প্রতীক্ষায়।

এক দিন—দু'দিন—তিন দিন! দীর্ঘ প্রান্তর রাত্রেই অতিক্রম করে তারা এসে পড়েছে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে। বাড়ী ছেড়ে—গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। দূরে রাস্তার বাঁক হতে শেষ বারের মত চেয়ে দেখে তারা···তাদের জন্মভূমি—মা—মাটি সব কিছু ছেড়ে চলে আসতে হল তাদের, আর হয়ত কোন দিনই পায়ের ছাপ পড়বে না ওখানে! দূর হতে প্রণাম জানায় তারা বিদেহী পূর্বপুরুষদের আত্মাকে।

দু চোখে নেমে আসে জলধারা।

"কিথে যাউ?"

সাথীর কথায় চমকে ওঠে বচন। তারা যাবে কোথায়—কোন্ দিকে? কেন? তা জানে না—বাঁচতে হলে চলে যেতে হবে এখান হতে তাই জানে!

"চলো ভুসি!"

···কোথায় যেতে হবে জানে না, ছিন্ন-ভিন্ন জনতা চলেছে শাহ্নের দিকে।

রাত্রি ঘনিয়ে আসে। দু'পাশে দেখা যায় আগুনের শিখা—কাদের আর্তনাদ—ভীত জনতার সারি, মোট-পুটুলি-তালাই বগলে করে চলে আসছে গ্রাম ছেড়ে।

দুপুরের কড়া রোদে পাঞ্জাবের রুক্ষ প্রান্তরের বুক চিরে আসছে যাত্রিদল, ক্লান্ত—পাংশু—বিবর্ণ চেহারা! চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ! রাত্রি কাটে দীর্ঘ প্রান্তরের মাঝে অর্দ্ধঘুমন্ত অবস্থায়। শীতের বাতাস এরই মধ্যে বইতে সুরু করেছে—রাত্রি নিবিড়তর হয়ে আসে, চারি দিকে আগুন জেলে ক্লান্ত জনতা বসে থাকে—প্রহর গণনা করে—চোখে তাদের ঘুম নাই। ব্যাকুল হয়ে চেয়ে থাকে পূব আকাশের দিকে—কখন আসবে রাত্রির তোরণ-দ্বারে সূর্য্য-সারথির স্বর্ণরথ—তারি প্রতীক্ষায়।

আর্তনাদ করে গুরুদিৎ! মাথার ঘাটা ক'দিন বিনা চিকিৎসায় পরিশ্রমে বেশ বেড়ে গেছে ধুলো-বালি লেগে। ফুলে বিকৃত হয়ে গেছে সারা মুখ-চোখ! ময়লা পাগড়ীর ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে পুঁজ! হাঁটতে পারেনি, তাকে এক রকম কাঁধে করেই বয়ে এনেছে অনেকটা পথ! হাত-পা টন-টন করছে বচনের।

—"ভেইয়া!" অশ্রুসজল নয়নে চেয়ে থাকে বচন ভাইয়ের দিকে।

জীবনের চৌদ্দ বৎসর আগে হতে দেখে আসছে তাকে। একই রক্তকণিকা প্রবাহিত তার দেহে। একই মাতৃস্তন্য পুষ্ট করেছে। যন্ত্রণায় সারা শরীর মুচড়ে ওঠে গুরুদিত্তের। চোখের ঘা-টায় বোধ হয় 'ম্যাসেট' হয়ে গেছে—পচে গন্ধ ছাড়ছে।

পাশে বসে সাথী। করবার কিছু নেই। তার চোখে জলধারা। চোখের সামনে ধীরে-ধীরে হিমশীতল মৃত্যুকে নেমে আসতে আগে সে কখনও দেখেনি। নিশ্চল হয়ে আসছে গুরুদিত্তের দেহ। চোখের সামনে ঘনিয়ে আসে রাত্রির জমাট অন্ধকার।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। শেষ হয়ে আসছে গুরুদিত্তের জীবন-প্রদীপ। চোখের সামনে বাবা-মা-ভাইকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিল বচন, নীরবে দাঁড়িয়ে দেখল শুধু দর্শকের মত, করবার তার কিছুই নাই।

কাল সকালে যাত্রা করবে যাত্রিদল, রাতের আঁধারে কোন নাম-না-জানা এক পথের ধারে সব কিছু শেষ হয়ে গেল গুরুদিত্তের। কোথায় জন্মেছিল—ভিখারীর মত মরল কোথায়!

ছোট ছেলের মত ফুঁপিয়ে কাঁদে বচন, সাথীর দু'চোখে জলধারা। রাত্রি শেষ হয়ে এল, দুঃখের আঁধার রাত্রির পর প্রভাত-সূর্য্য দেখা দিল, কিন্তু গুরুদিৎ আর ফিরে আসবে না। সে আজ কোন্ অচেনা পথের যাত্রী—বাঁচবার জন্য ভীত পলাতক যাত্রী সে নয়, নব জনমের আলোকতীর্থ-যাত্রী সে।

"পাইজী, একঠো লেমনেড, ঘ্যাদা বরফ দেনা।"

কার ডাকে চিন্তাজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, লোকটা একটু বিস্মিত হয়েই চেয়ে থাকে বচনের দিকে। ও জানে না, বচনের অন্তরের স্তরে স্তরে কত না-বলা ব্যথা গুমরে ওঠে। ওরা জানে না সব হারিয়ে মা—মাটি হতে ভিখারীর মত বার হয়ে এসেছে, তাঁদের বেদনা কোনখানে!

"লিজিয়ে"—লেমনেড একটা খুলে বরফ দিয়ে তার হাতে দিল, লোকটাও তিন আনা পয়সা দিয়ে সাইকেল হাঁকিয়ে অদৃশ্য হল আকবর রোডের দিকে।

দুর্গম পথ!······সে রাত্রি পার হয়ে গেল। আরও দু'টো দিন! ···পথের বাঁকে নোতুন পথের রেখা, পায়ে চলা পথ চলে গেছে দিল্লীর দিকে। আর কত দূর? এ পথের শেষ হবে কবে?

দু'ধারে বীভৎস দৃশ্য! চোখ যেন আর দেখতে চায় না। ভিখিরীর মত বার হয়ে যেতে পারলে বাঁচবে তারা। আজ দুনিয়ায় তারা দু'টি প্রাণী—সাথী আর সে। দু'জনে ঘর বাঁধবে, নিজ হৃদয়ের দেওয়া-নেওয়া তাদের দুঃখ জগতে সান্ত্বনা আনবে।

যারা গেল তারা যাক। এ নিয়ে দুঃখ করে মনের বোঝা বাড়িয়ে লাভ নাই।

সোনাপুর পার হয়ে আসছে তারা, মাইলের পর মাইল লম্বা ভীড়—জনতার শোভা। রাত্রি নেমে এসেছে—আর এক দিনের পথ পার হতে পারলেই পূর্ব-পাঞ্জাব···দিল্লী অনেক কাছে।

আগত রাত্রির অন্ধকারে রাস্তার পাশে প্রান্তরের মাঝে জনতা 'সামান' খুলে সামান্য আটা, মকাই বার করে কোন রকমে খাবার যোগাড় করে।

আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে বচন। একা—একা সে বিশাল পৃথিবীতে। বাবা! বাবাকে মনে পড়ে না। মেসোপটেমিয়া—ইরাকের মরুভূমিতে কোথায় হারিয়ে গেছে গত মহাযুদ্ধে! বুদ্ধা মা—গুরুদিৎ তার চোখের সামনে বিদায় নিয়েছে পৃথিবী হতে কোন্ গহন তিমিরাচ্ছন্ন দেশে! একা পড়ে রইল সে। আকাশে ঝিকমিক করে তারার দল! অন্ধকারের মধ্যে কনকনে হাওয়ায় লালাভ আগুন রাতের আঁধার ঘনতর করে তোলে। দূরে—দিগন্তের বুকে আকাশজোড়া জমাট অন্ধকার! কে যেন গোঙাচ্ছে! কার হয়ত বা শেষ দিন ঘনিয়ে এল! একা ধীরে-ধীরে মৃত্যুকে বরণ করতে হবে বন্ধুহীন···বন্ধুর এই যাত্রাপথে। আগেকার যাত্রিদল চলে যাবে তাকে ফেলে রেখে! একটা চাপা কান্নার স্বর নিস্তব্ধ রাতের আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে।

—"রোটি খাসা—?"

পিছন ফিরে দেখল সাথী ডাকছে। সামান্য আটা ছিল তাই দিয়ে বানিয়েছে খান-দুয়েক পোড়া রুটি। সারা দিনের সেই খাবার, ভাগাভাগি করে কোন রকমে তাই খেয়ে থাকবে দু'জনে।

পাশের একটি মেয়ে ছোট দু'টো ছেলেকে উড়ানী পেতে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছিল, সাথীকে জিজ্ঞাসা করে বচনকে দেখিয়ে—"উয়ো কৌন হ্যায় তুমহারি?"

ডাগর কালো চোখে কি যেন না-বলা বাণী। মেয়েটি যেন কি বুঝে নেয়। মলিন হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে রহস্য-ভরা কণ্ঠে—"সরমাতি কিঁউ?"

সাথী লজ্জায় মুখ নামায়। কথাটা বচনের কানেও গেছে। আজকের সাথীর দেওয়া পরিচয়ে সে একটু বিস্মিতও হয়। কোন সম্বন্ধই তাদের ছিল না—নেইও। আজ নিজে থেকে সাথীর এই আত্ম-নিবেদন তার মনকে নাড়া দেয়।

প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম নাই বচনের। আকাশের দিকে চেয়ে পড়ে আছে। মাথায় কার হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে ওঠে সাথী!

"নিদ্ আবেঁহে?

"নেহি"—ঘুম নাই তার চোখে!

বলে ওঠে বচন—"ঝুট কিঁউ বোলা উস্‌কো?"

মিথ্যা—মিথ্যা নয়। সাথী আজ চায় এক জনকে, বচনেরও সব-হারানোর ব্যথা ভুলিয়ে দিতে পারে এমন এক জনকে চাই। তাই সাথী আজ হতেই পরিচয় দিয়েছে তারা স্বামি স্ত্রী।

এত দুঃখ-বিপদেও বচন যেন কোন নির্ভর খুঁজে পায়। তারা সব-হারানোর ব্যথা ভুলবে দু'জনে দু'জনকে পেয়ে। তারার রোশনী চিকমিক করে সাথীর ডাগর কালো চোখের কোলে-কোলে নেমে আসে শান্তির প্রলেপ।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় কাদের কোলাহলে। আকাশ-বাতাস মথিত করে শোনা যায় চীৎকার।

—"ওয়া গুরুজি কি ফতে!" ও-পাশে দিগন্ত লাল হয়ে গেছে আগুনের আভায়। কারা যেন আসছে দল বেঁধে, সারা শরীরে বচনের এক অভূতপূর্ব শিহরণ. সাথী ভয়ে মুখ লুকোয় তার বুকে।

বিগত এক রাত্রের সেই নিষ্ঠুরতা চোখের সামনে ভেসে ওঠে বচনের। সেই আর্তনাদ, সেই পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা! ছেলেমেয়েদের আর্তনাদ! কাদের পৈশাচিক অট্টহাসি, চোখের সামনে দেখছে মানবতার নিষ্ঠুর লীলা! কোন বিজাতীয় আনন্দ সেই বর্বরদের চোখে! সাথী ভয়ে কাঁপছে বচনের বুকে মুখ লুকিয়ে। হঠাৎ পিছন হতে কে যেন সাথীকে ধরে টানছে। আর্তনাদ করে জড়িয়ে ধরে সাথী বচনকে।

সারা শরীরে সমস্ত রক্ত যেন শিহরণ জাগায় তন্ত্রী-তন্ত্রীতে! সমস্ত শক্তি একত্রিত করে হাতের লাঠিটা দিয়ে আঘাত করে বচন, লোকটা আর্তনাদ করে পড়ে যায়। একটা উন্মত্ত কোলাহল, অতর্কিত আক্রমণে ভীত আশ্রয়প্রার্থী দল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে রাতের আঁধারে। আকাশে-বাতাসে তাদের আর্তনাদ! বচনের চোখের সামনে জমাট অন্ধকার—মাথায় একটা আঘাত পেয়েই ছিটকে পড়ে সে দূরে। রক্তাক্ত হয়ে ওঠে কঠিন মৃত্তিকা। আর্তনাদ করে ওঠে সাথী। নিজেকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই সে করতে পারে না।

অন্ধকারে মিলিয়ে গেল আক্রমণকারীর দল। পড়ে রইল রাতের আঁধারে বিপর্যস্ত আশ্রয়প্রার্থীরা, রক্তাক্ত হয়ে গেছে কঠিন মৃত্তিকা। কাদের আর্তনাদ আকাশ-বাতাস ছেয়ে ফেলেছে। লুণ্ঠনকারীর দল মহানন্দে চলেছে রাতের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, জ্ঞান ফিরে আসে সাথীর!···কারা যেন একটা গাড়ীতে ফেলে নিয়ে চলেছে তাকে! একা নয় সে—আরও অনেকেই আছে।

রাতের বাতাসে ক্রমশঃ জ্ঞান ফিরে আসে বচনের। মাটিতে পড়ে-পড়েই শুনতে পায় কাদের আর্তনাদ। রাস্তার উপর কতকগুলো জোরালো সার্চ-লাইটের আলো। কোন রকমে ডাক দেয় বচন—"সাথী—সাথী—"

কোন সাড়া-শব্দই নাই। তার পর! তার পর আর জানে না বচন!

জ্ঞান ফেরে? চারি দিক্ চেয়ে বুঝতে পারে না এ কোথায় সে এসেছে। খাট—পরিষ্কার বিছানা,—নীচে লাল কম্বলের উপর শুয়ে রয়েছে—মাথায় তার ব্যাণ্ডেজ। শূন্যদৃষ্টিতে চারি দিক কাকে যেন খুঁজতে থাকে।

"সাথী—সাথী!" সামনে দিয়ে এক জন নার্স যাচ্ছিল, ফিরে চেয়েই আবার চলতে থাকে সে। হতাশ হয়ে বিছানায় পড়ে রইল সে।

ক্রমশঃ স্মরণে আসে সেই রাত্রিতে আহত হবার পর মিলিটারী সাহায্যে তাঁদিকে আনা হয় অমৃতসর জেনারেল হস্‌পিটালে! সাথী কোথায় জানে না সে! কোন খোঁজই পায়নি তার। আজও ভুলতে পারে না বচন সেই রাত্রির আত্ম-নিবেদনের কথা,

কালো ডাগর চোখের আঁখি-তারায় সে দেখেছিল, কোন এক নিঃস্ব নারী-হৃদয়ের ভালবাসা—কার সব-হারানোর ব্যথা-বিধুর মনের প্রতিচ্ছবি। কে জানে সাথী কোথায়, জীবনে আর তাকে দেখতে পাবে কি না।

* * * *

হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গে, এ কি! কখন বেলা পাঁচটা বেজেছে জানে না বচন। কি সব ভাবনায় সারাটা দিন কেটে গেল, দূরে আরাবল্লীর রিজে জমেছে গাড়ীর ভীড়। নয়াদিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় অফিস-ফেরতা বাবুদের সীমা-সংখ্যাহীন সাইকেলের সমারোহ। পথচারীর চেয়ে তারই সংখ্যা বেশী।

এমনি এক পড়ন্ত বেলায় দিল্লী মেন ইষ্টিশানে সাধারণ এক দরিদ্র আশ্রয়প্রার্থীদের ভীড়ে মিশে নেমেছিল সে-ও। কোথায় ঠাঁই নাই—বাইরে টাঙ্গা-শেডের নীচেই ঘুমিয়েছিল! যমুনার ধারে ঘাস কেটে এনে বেচত। এক রাত্রিতে এক টাঙ্গার ঘোড়ার নীচে পড়তে পড়তেই বেঁচে গিয়েছিল! তার ঘুমন্ত দেহটাকে পা দিয়ে ঠেলে তুলে চীৎকার করে হিন্দীতে গালাগাল দেয় শেঠজী—"কৌন সে বুদ্ধু রে? হঠ যানা—নেহি ত মার পানা 'মু' লাল কর দেনা!"

কথাটা শুনে থমকে দাঁড়ায় বচন, জবাব দেবে কি না ভাবছে, পরক্ষণেই অনুভব করে সে ত ভিখারীর সামিল। জুতো মেরে তার মুখ লাল করে দেবার অধিকার তাদের হয়ত আছে! পথে আসবার সময় ওরা মাথায় লাঠি মেরে সারা গা রাঙ্গা করে দিয়েছিল—এরা মুখে জুতো মেরে লাল করে দেবে! কে যে আপন—কে যে পর ভাবতেই পারে না বচন।

পাণ্ডব-কিল্লাতে যেদিন আশ্রয় পেল কি আনন্দ। মাথার উপর একটু ছেঁড়া তাঁবু—চারি পাশে ঘেরা, কি আরাম—সাথীর কথা মনে পড়ে—কত আনন্দই না তার হত আজ।

প্রথম সে দেখতে গিয়েছিল ইণ্ডিয়া গেট, বিশাল তোরণ লাল-পাথরের তৈরি কোন সুনিপুণ শিল্পীর কত বৎসরের পরিশ্রম! বিগত মহাযুদ্ধে ভারতীয় যারা মৃত্যুবরণ করেছিল তাহাদেরই নাম খোদাই করা আছে এর সারা গায়ে। সন্ধানী চোখ মেলে খুঁজতে থাকে বচন!···তার বাবাও ত গিয়েছিল মেসোপোটেমিয়ার কোন মরুপ্রান্তরে—আর ফিরে আসেনি।

অসংখ্য নামের মধ্যে হঠাৎ খুঁজে পায়···

'৩৪৭ ডোগরা রেজিমেণ্ট! কয়েকটা নামের নীচেই হঠাৎ তার চোখটা আটকে যায়। হ্যাঁ—ওই ত! চোখ দু'টো মুছে ভাল করে পড়তে থাকে! হ্যাঁ—

১২৪৭ হাবিলদার গুরুনাম সিং!

তার বাবা, অস্পষ্ট মনে পড়ে বাবাকে। তার বাবা নিহত ঐ বীরদের অন্যতম। এই কীর্তি-স্তম্ভে তারও একটু অধিকার আছে। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকে বচন।

সে আজ কয়েক মাস আগেকার কথা। তার পর হতেই সরবতের দোকান দিয়েছে ঠেলা গাড়ীতে এইখানে! তার বাবা কি জানতে পেরেছে তার মৃত্তিকায় তার সন্তানের কোন ঠাঁই-ই নাই! তার স্ত্রী-পুত্র-আজ মৃত! এক জন মাত্র রয়েছে তাদের স্মৃতির বোঝা বইতে!

মাসের পর মাস ধরে রোজই আসে বচন এইখানে। কি যেন এক অপূর্ব সান্ত্বনা খুঁজে পায় সে!

সাথীর কথা ভুলতে পারেনি আজও। প্রায়ই মনে পড়ে তাকে, কে জানে কোথায় কি ভাবে আছে সে।

সেদিন কি একটা পর্ব-দিন। অনেক ভ্রমণকারীর ভীড় জমেছে ইণ্ডিয়া গেটের নীচে। কেউ কেউ উপরেও যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মুখ তুলে বাবার নামটা দেখে নেয় বচন। শোনাবে কি—ওই তার বাবা—সে-ও এদের এক জন?

লজ্জা লাগে। আবার সরবৎ তৈরী করতে থাকে। হঠাৎ একখানা গাড়ী গেটের ওদিকে সশব্দে ব্রেক কষল। নেমে আসে একটি ছেলে ও মেয়ে। দামী স্যুট-ফেল্টহ্যাট, পিছনের মেয়েটিকে দেখেই চমকে ওঠে বচন।

—সাথি!

সামনে সাপ দেখলেও বোধ হয় এতখানি আশ্চর্য্য হত না বচন। সাথী। আজও বেঁচে আছে সে—সরবতের দোকান দিচ্ছে। বচন আশ্চর্য্য হয়ে গেছে। সারা দেহে সাথীর যৌবনের উদ্দাম জলস্রোত। সিল্কের সালোয়ার পাঞ্জাবী ওড়না—চোখে আজও সেই গভীর মায়া।

থমকে দাঁড়িয়েছে সাথী, এগিয়ে আসছে বচন।

—"তু হিঁয়া ক্যায়সে আয়ি?"

সঙ্গের ছেলেটি সাথীকে দাঁড়িয়ে সরবৎওয়ালার সঙ্গে আলাপ করতে দেখে তাগাদা দেয়—"দের কিঁউ।"

—"আয়ি হু"—চলে গেল সাথী, স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে বচন। "পায়ের নীচে জমাট পাথর যেন সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। কানে আসে ছেলেটির প্রশ্নে উত্তর দিচ্ছে সাথী সিঁড়িতে উঠতে উঠতে—ওদের গাঁয়ের একটি ছেলে ওই সরবৎওয়ালা।

সে রাতের কথা ভোলেনি বচন। অন্ধকারে তারাকিনী রাত্রিতে প্রান্তরের মাঝে আশ্রয়প্রার্থী জনতার মাঝে সেদিন যে নারী স্বীকার করেছিল তাকে স্বামিরূপে, আজ বিলাস-বৈভবের বাহুল্যে সেই নারীই অস্বীকার করে গেল তাদের পরিচয়,—অস্বীকার করে গেল তাকে—যে প্রাণ দিয়েও ওর সম্মান রাখবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিল।

ধীরে ধীরে আবার কাজে মন দেয় বচন: সারা মাথাটা ঘুরছে, এক গেলাস জল খেয়ে একটু সামলে নেয়।

জীবনে যে সবুজ জায়গাটুকু এত দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিল আজ তা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সুখে থাক সাথী, কাউকে অভিশাপ দেবে না সে। ভাল-ঘরের ঘরণী হোক—তার হিংসা করবার কিছুই নাই।

এ ভুল ধারণা তার ভেঙ্গে যায়, কয়েক দিন পরেই। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পুরোনো দিল্লী হতে নয়াদিল্লীর দিকে। হাউসকাফীর ঘন-ঘিঞ্জী বসতি—দু'পাশে রাস্তা অন্ধকার-করা বাড়ীগুলোতে কত কৌতূহলী মুখ। পাশের গলিটার মধ্যে হঠাৎ গ্যাসপোষ্টের নীচে একটা চেনা-মুখ দেখেই থমকে দাঁড়াল! হ্যাঁ—সত্যিই ত সাথী।

মুখ-চোখে উচ্ছৃঙ্খলতার পাশব চিহ্ন। চোখের নীচে কালিমাকে পাউডার রুজ দিয়ে ঢেকে নেহাৎ সাধারণ আরও পাঁচ জন দেহ-পসারিণীর মতই দাঁড়িয়ে রয়েছে সাথী! প্রয়োজনের তাগিদে তাকে

'দৈনিক বসুমতী'

'শনিবারের চিঠি'তে (চৈত্র, ১৩৫৪) সাপ্তাহিক 'বসুমতী'র জন্ম-তারিখ লইয়া যখন আলোচনা করি, তখন 'দৈনিক বসুমতী' সম্বন্ধেও যে অনুরূপ গোল থাকিতে পারে, ইহা ভাবিয়া দেখি নাই। এ-সম্বন্ধে দুই প্রতিষ্ঠাবান্ সাংবাদিকের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

(১) শ্রীঅমল হোমের মতে :—1914: 'Basumati, Bengali Daily, started with Hemendra Prasad Ghosh as Editer."

(২) শ্রীযুত হোমের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত 'দৈনিক বসুমতী'তে (৫ চৈত্র, ১৩৫৪) এইরূপ লেখেন :—"সাপ্তাহিক বসুমতী পরে ১৩২০ সালে যখন 'দৈনিকে রূপান্তরিত হয়, তখন ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।" অর্থাৎ উপেন্দ্রবাবুর মতে সাপ্তাহিক 'বসুমতী' দৈনিক বসুমতী'তে পরিণত হয়, এবং ইহার প্রথম সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ নহেন,—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

'দৈনিক বসুমতী'র পুরাতন ফাইল বিদ্যমান থাকিলে এই পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তির নিষ্পত্তি সহজ হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তবুও ইহার জন্মকাল নির্ণয় করা একেবারে দুঃসাধ্য নহে। 'বসুমতী'র কর্ণধার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে 'দৈনিক বসুমতী'র জন্মকাল-নির্ণয়ের সূত্র মিলিতেছে। তিনি লেখেন :—

"প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় এবং যত্নে 'দৈনিক বসুমতী' জন্মগ্রহণ করে। এ বিষয়ে স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অপেক্ষা সতীশচন্দ্রের উৎসাহ অনেক অধিক ছিল। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পরদিনই উপেন্দ্রবাবু আমার নিকট 'সাপ্তাহিক' বসুমতী'র একখানা দৈনিক সংস্করণ বাহির করিবার প্রস্তাব করেন। কতকগুলি বিশিষ্ট কারণে আমি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি নাই। কিন্তু সতীশবাবু নাছোড়বান্দা। তিনি বলিলেন যে, তিনি ঐ সকল অসুবিধা দূর করিয়া দিবেন। শেষে যুদ্ধ বাধিবার দুই দিন পরেই আমি এবং শ্রীযুত দুর্গানাথ ঘোষাল কাব্যতীর্থ উভয়ে বর্ত্তমান 'দৈনিক বসুমতী' প্রথম বাহির করি।" ('মাসিক বসুমতী,' বৈশাখ ১৩৫১, পৃ ৭)

স্পষ্ট জানা যাইতেছে, "যুদ্ধ বাধিবার দুই দিন পরেই" অর্থাৎ ৬ই আগষ্ট ১৯১৪ (২১ শ্রাবণ, ১৩২১) 'বসুমতী'র একটি দৈনিক সংস্করণ—সাপ্তাহিক সংস্করণ ছাড়া—প্রকাশিত হয়। 'দৈনিক বসুমতী'র জন্মকাল সম্বন্ধে শশিভূষণের উক্তি একটি স্মরণীয় ঘটনার সহিত জড়িত, এই কারণে সাল-তারিখের ভুল না হইবারই কথা। প্রকৃতপক্ষে 'দৈনিক বসুমতী' ১৯১৪ সনের আগষ্ট (শ্রাবণ, ১৩২১) মাসেই যে প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার আর একটি প্রমাণ দিতেছি।

বঙ্গীয় রাজসরকার দেশীয় সংবাদপত্রের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সংবাদপত্রে জনমত কিরূপ প্রতিফলিত হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য সরকারী মহলে প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া রিপোর্ট প্রস্তুত হইত। এই রিপোর্টে থাকিত সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয় অংশের সঙ্কলন এবং বাংলা দেশের সমুদায় সংবাদপত্রের (মাসিক পত্রাদিও বাদ পড়িত না) নামধাম, সম্পাদকের নাম ও বয়স। ১৯১৪ সনের ১৫ই আগষ্টের রিপোর্টে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র উল্লেখ আছে, 'দৈনিক বসুমতী'র নামগন্ধ নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী ২২এ আগষ্টের রিপোর্টে সংবাদপত্রের নাম-তালিকায় পাইতেছি :—

Additions to, and alterations in, the list of Vernacular Newspapers as it stood on 1st March 1914:

... ...

Basumati—Daily.

শেষ পর্য্যন্ত জানা গেল, ১৯১৪ সনের আগষ্ট মাসে (১৩২১ সালের শ্রাবণ মাসে—১৩২০ সালে নহে) 'দৈনিক বসুমতী' জন্মলাভ করে, ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এবং ইহার সহিত সাপ্তাহিক বসুমতীর কোন সম্বন্ধ ছিল না।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[শনিবারের চিঠি হইতে]

শেষ পর্য্যন্ত এই জঘন্য ঘৃণ্য পথেই আসতে হয়েছে। তাই বোধ হয় সে দিন তাকে ঠিকানাও বলেনি নিজের।

ধীরে ধীরে সরে এল বচন। আজ রাগ-অভিমান নয়, সাথীর জন্য দুঃখ হয়। ঠাঁই পেলে এ পথে আসত না সে। আজ ফেরার পথ নাই।

রাত্রি নেমে এসেছে। একা পথটা দিয়ে আসছে বচন। দূরে ফিরোজ শাহ কোটলার কালো গম্বুজের গায়ে জমাট রাতের অন্ধকার, এ আঁধারে পথের দিশা নাই। সে মা-মাটি হতে বিতাড়িত। ভাই—মা—বন্ধু কেউই নাই! সাথী—সেও আজ সর্বহারা। ঝড় বয়ে গেল তাদের জীবনে, ঝড়ের বেগে ঝরা-পাতার মতই ছিটকে পড়ল তারা কে কোন দিকে!

* * * *

চারি দিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। মাঠটা জনশূন্য হয়ে গেছে। ইণ্ডিয়া গেটের দারোয়ান পাথরের জাফরি-দেওয়া কপাটটা তালাবন্ধ করে কখন চলে গেছে। ধীরে ধীরে দোকান গুটোতে থাকে বচন। লেমনেডের বোতল-বালতি—সব পুরে গাড়ীখানা ঠেলতে ঠেলতে পাণ্ডব কিল্লার দিকে এগিয়ে চলে। সেদিনের মত কাজ শেষ।

দূরে আকাশের কোলে অস্পষ্ট অন্ধকারে বিশাল কালো-কালো পাথরগুলো আকাশের গায়ে কোন্ স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করেছে! নির্জন রাস্তাটা দিয়ে চলেছে বচন! তার বাবা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিল, স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে!

হাজার-হাজার—লাখ-লাখ আজকের রাষ্ট্রনৈতিক ঝড়ে উলু-খড়ের মত যারা উড়ে গেল আকাশে-আকাশে—কোন স্মৃতিস্তম্ভ রচনা হবে না তাদের জন্য! কেউ স্মরণেও আনবে না তাদের! মহাকালের বুকে চিরদিন অজ্ঞাত—অখ্যাত রয়ে যাবে তারা!

গৃহহারা—সর্বহারা—একটি নয়—দু'টি নয়! লাখো-লাখো তারা কোন্ আশায় বেঁচে থাকবে জানে না! তবু তারা বাঁচতে চাইবে—অজ্ঞাত সহস্র সহস্র দর্শকের মাঝে তারাও দু'চোখ মেলে চেয়ে থাকবে প্রভাতের নূতন সূর্য্যের আশায়, তিমির রাত্রির প্রহর গণনা করে ভারতের পার্বত্য-বন্ধুর প্রান্তরে-প্রান্তরে—কুরুক্ষেত্র—পাণিপথ—ভরতপুর—পাণ্ডব কেল্লায়···আরও কত নাম না-জানা হাজারো জায়গা হতে পূব-আকাশের পানে!

এগিয়ে চলে পরিশ্রান্ত বচন সিং। সন্ধ্যা নেমে আসছে···নয়া-দিল্লীর প্রাসাদশীর্ষে···ইণ্ডিয়া গেটের অভ্র-চূড়ায়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠাইতে হয়

সাহিত্য পরিচয়

কবি টি, এস, এলিয়ট

এ বছর সাহিত্যের "নোবেল প্রাইজ" পেয়েছেন টি, এস্, এলিয়ট (T. S. Eliot)। বাংলা দেশের মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের বাইরে এলিয়ট খুব বেশী পরিচিত বলে মনে হয় না। পরিচিত না হবারও কারণ আছে। প্রথম ও প্রধান কারণ হ'ল, এলিয়ট কবি। গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিকের জনপ্রিয়তা যতটা সুলভ ও সহজলভ্য, কবি ও সমালোচকের জনপ্রিয়তা আদৌ তা নয়। তাছাড়া টি, এস, এলিয়ট সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য কবিতা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লেখেননি। এলিয়টের কাব্য প্রধানতঃ মননধর্মী, আপাতপাঠে তা রীতিমত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং এলিয়ট যদি কাব্যসাধনায় জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রে না থাকেন তাহলে আশ্চর্য্য হবার বিশেষ কিছুই নেই। ইংলণ্ডের কবি এলিয়ট তাঁর নিজের দেশেই আজও তেমন সুপরিচিত নন। মিল্টন, ওয়ার্ডস্বার্থ, শেলী, কীট্স, এমন কি কবি ইয়েটসের যে জনপ্রিয়তা ছিল এক সময় তা-ও এলিয়টের ভাগ্যে আজও জোটেনি। তাতে অবশ্য একথা সব সময় অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় না যে এলিয়ট শক্তিশালী কবি প্রতিভাবান নন। সাময়িক সস্তা "জনপ্রিয়তা", প্রতিভা যাচাই করার নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড যদি হয় তাহলে সব দেশের "তৃতীয় শ্রেণীর" লেখকদের(?), কেবল লেখার ওজনের দিক দিয়ে বিচার করে শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ব'লে জাহির করতে হয়। কিন্তু কোন কালে হয়নি, আজও হয় না। সস্তা "যৌন-সাহিত্য" অথবা গাঁজাখুরি "রোমাঞ্চ সিরিজ" যাঁরা প্রচুর পরিমাণে লেখেন বা লিখেছেন "গাটার প্রেস" এবং "গাটার টেস্ট" পরিপূর্ণ করাই যাঁদের কাম্য, তাঁরাই তাহলে তাঁদের "জনপ্রিয়তার" জন্যে "শ্রেষ্ঠ প্রতিভা"রূপে প্রতিপন্ন হতেন। সুতরাং "জনপ্রিয়তা" কথাটা প্রয়োগ করা যত সহজ, ব্যাখ্যা করা তত সহজ নয়। অবশ্য এ কথা বলা যায় না যে "জনপ্রিয়তা" কথার অর্থ "স্থূলবুদ্ধি জনতার হাততালি' বা 'আহা মরি' ধ্বনি"। জনসাধারণ বাস্তবিকই কোন দিনই স্থূলবুদ্ধি নয়, তাদের সহজ প্রবৃত্তি যথেষ্ট সুস্থ এবং স্বাভাবিক বোধশক্তি অত্যন্ত প্রখর। কিন্তু বিকৃতরুচি বক্রচিন্তারা যেমন জনসাধারণ নয়, তেমনি অনেক শ্রেণীর সাহিত্য "মনপ্রিয়" হলেও "জনপ্রিয়" নয়। যাই হোক্, এলিয়ট এই বিকৃত অর্থেই "জনপ্রিয়" নন। না হলেও তাঁর খ্যাতি আজ বিশ্বব্যাপী এবং তাঁর অনন্যসাধারণ কাব্যপ্রতিভা আজ সর্ব্ববাদিসম্মত।

এলিয়টের জীবনদর্শন, কাব্যবস্তু ও কাব্যভঙ্গী আধুনিক যুগোপযোগী বা যুগধর্ম্মী কি না তা নিয়ে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে। এলিয়টের কাব্যের ক্রমিক বিকাশ ও পরিণতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে এখানে আমরা আলোচনা করব। কিন্তু তা করার আগে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার। এলিয়টের কাব্যের যে পরিণতি আজ আমরা দেখছি তা নিশ্চিত যুগধর্ম্মপরিপন্থী। কবি যদি মানুষের জীবনের অফুরন্ত প্রেরণার প্রতিমূর্ত্তি হন, কবির কাব্য যদি মানব জাতির ভবিষ্যতের দিগ্দর্শন হয়, যদি সাময়িক দুর্ণাবর্ত্তের মধ্যে থেকেও কবির কাব্যতরী আত্মরতি, আত্মবিলাপ বা আত্মবিলোপের মহাসমুদ্রে ভরাডুবি না হয়, কবিই যদি মানুষের ও সমাজের জীবনবিধাতা হন, তাহলে নিঃসংশয়ে বলতে হয়, জীবনে বা কাব্যে কোথাও এলিয়ট সেই কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। এক মহাযুদ্ধ থেকে আর এক মহাযুদ্ধের মধ্যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ঘূর্ণাবর্ত্তে দিগ্ভ্রষ্ট হয়ে, এলিয়ট দলছুট বিচ্ছিন্ন হংসবলাকার মতো আত্মবিলাপের করুণ সুর আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত ক'রে, তাঁর মানস-দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছেন। তবু এলিয়ট আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, এ কথা কোন সাহিত্য-রসিকের অস্বীকার করবার উপায় নেই।

প্রথম মহাযুদ্ধের কবি এলিয়ট

১৯১৪—১৯১৮ সালের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের দাবানলে মানুষের অনেক পুরাতন জীর্ণ ধারণা, অনেক দীর্ঘকালের সস্নেহে লালিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, সব ভস্মীভূত হয়ে গেল। হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসার বন্যপ্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে মানুষ যে কি ভয়ঙ্কর আত্মঘাতী হানাহানিতে সভ্যতার সমস্ত কিছু অর্জ্জিত সম্পদ

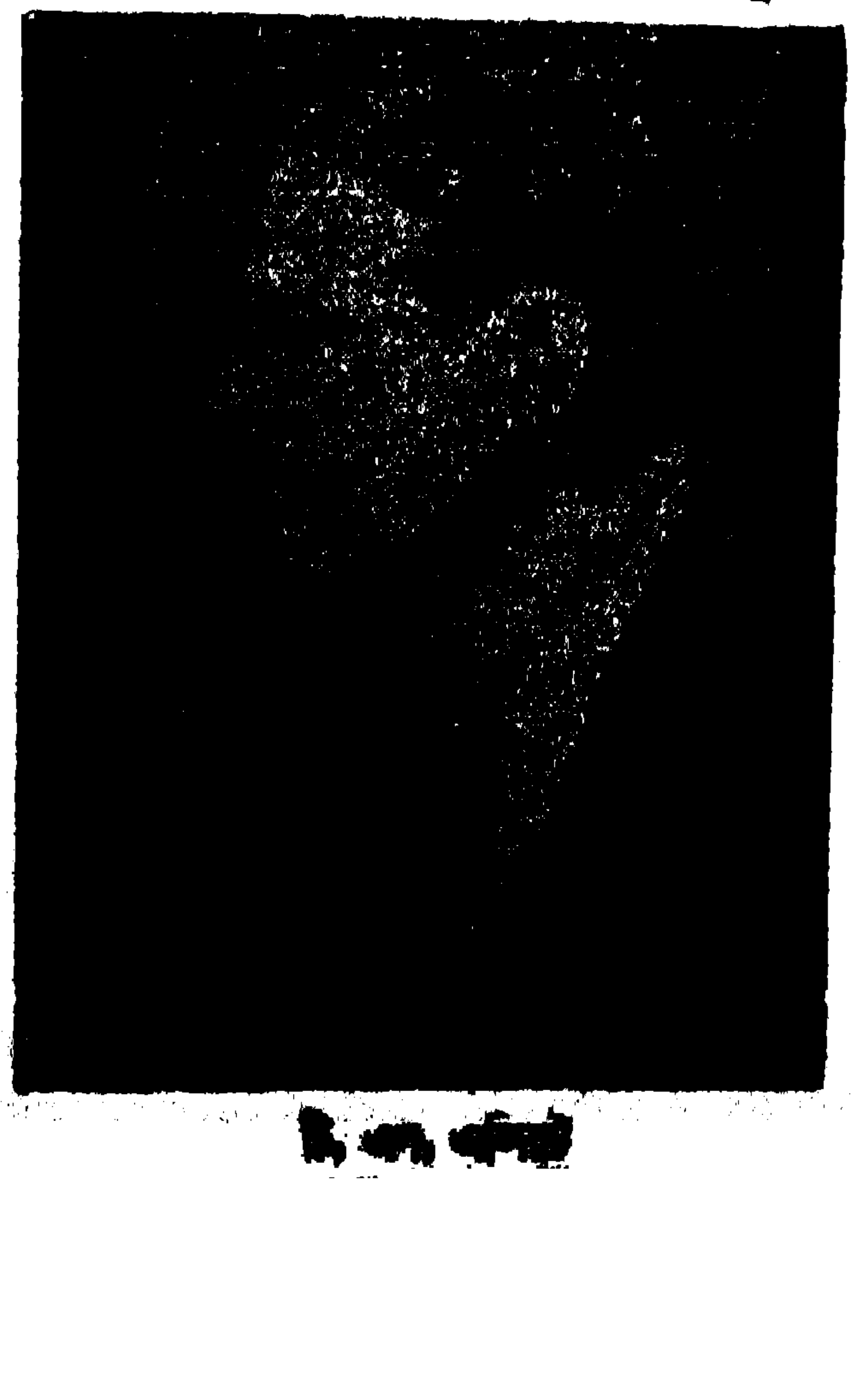

টি, এস, এলিয়ট

উৎসর্গ করার জন্তে ব্যাকুল হতে পারে, প্রথম বিশ্বগ্রাসী মহাযুদ্ধে তা প্রমাণ হয়ে গেল। মুষ্টিমেয় লোভীর এই উদ্ধত স্পর্দ্ধা ও প্রচণ্ড অন্যায়ের যূপকাষ্ঠে নিরীহ নিরপরাধ মানুষ শুধু যে আত্মবলি দিয়েই ক্ষান্ত রইল তা নয়, তারা বিদ্রোহ করল এই নরমেধ যজ্ঞের হোতাদের বিরুদ্ধে। বিপ্লব হ'ল রুশিয়ায়, বিপ্লব হ'ল ইয়োরোপের দেশে দেশে। রুশিয়ার বিপ্লবের সাফল্যে মানুষের ঝাপ্‌সা দৃষ্টিপথে যেমন এক নতুন আদর্শের সূর্য্যোদয় হ'ল, ব্যর্থ ক্লিষ্ট পীড়িতের অন্তরে যেমন এক নতুন আশার বাণী অনুরণিত হয়ে উঠলো, ইয়োরোপে বা অন্ত কোথাও তা হ'ল না। স্পর্দ্ধিত রাজশক্তির নিষ্ঠুর চক্রান্তে বিপ্লব সেখানে ব্যর্থ হল। অবসাদ, ব্যর্থতা ও গভীর নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবে গেল ইয়োরোপ। সত্য, ন্যায়নিষ্ঠা, সুবিচার, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা ইত্যাদির যে রঙিন গোলাপী স্বপ্ন দীর্ঘ দিন ইয়োরোপের মানুষকে স্বপ্নচারীর মতো চালিত করেছে জীবনের পথে, তার স্বপ্নসৌধ ভেঙে পড়ল পথের ধুলোয় তাসের খেলাঘরের মতো। দৃষ্টি কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেল, সামনে আর কিছুই রইল না। আশা-আকাঙ্ক্ষার শ্যামল ক্ষেত্র পড়ে রইল পরিত্যক্ত পোড়া মাঠের মতো। আশ-পাশে রইল কামনা-বাসনার পর্ব্বতপ্রমাণ ভগ্নস্তূপ, মোলায়েম মনভোলানো কথা আর আদর্শের চূর্ণ হাড়পাঁজর, জীর্ণ কঙ্কাল। সামনে রইল ইতিহাসের আঁকা-বাঁকা পথের প্রান্তে ব্যর্থতা নৈরাশ্য দীর্ঘশ্বাস আর নিরবচ্ছিন্ন অবসাদের দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি।

মরুভূমির এই অসীম শূন্যতা ও ভীষণ হাহাকারই সেদিন চরম সত্য হয়ে উঠলো ইয়োরোপের এক শ্রেণীর চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের কাছে। বাস্তব আশার বাণী শোনবার কোন প্রেরণা তাঁরা তখনকার পরিবেশের মধ্যে খুঁজে পেলেন না। প্রাণ-প্রাচুর্য্যের অপূর্ব্ব কলতানে জীবনের জয়গান বা বন্দনা-গান গাইবার কোন অদম্য ইচ্ছা জাগল না তাঁদের মনে। এই সময় আবার বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে দেখা দিলেন বার্গসন (Bergson) ও ফ্রয়েড (Freud)। অবচেতন মনের অতল গহ্বরে ডুব দিয়ে লুকানো মাণিকের সন্ধানে ইয়োরোপের চিন্তানায়কদের অভিযান শুরু হ'ল। বাইরের দৃশ্যমান জগৎ নয়, মনোজগৎ তার চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক বেশী স্থায়ী সত্যরূপে প্রতিভাত হ'ল। পরিত্রাণের (Escape) খিড়কি দরজা খুলে গেল। চার দিকে যখন মানব-সভ্যতার কঙ্কালাকীর্ণ পোড়ো জমি পড়ে রইল, সোনার ফসল ফলার কোন আশাও আর রইল না, যখন মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা এক অপূর্ব্ব রহস্যাবৃত অন্তর্জগতের সন্ধান দিলেন এবং দিয়ে বললেন যে সেইটাই বৃহত্তর সত্য, তখন তো রঙ্গমঞ্চ পরিষ্কার। ইয়োরোপের শিল্পীরা যাঁরা এই সময় মঞ্চের উপর অবতীর্ণ হলেন তাঁদের মধ্যে ইংলণ্ডের কবি এলিয়ট অন্যতম।

টি, এস, এলিয়টের বিশ্ববিখ্যাত কাব্য "The Waste Land" বা "পোড়ো জমি" এই সময় প্রকাশিত হল, ১৯২২ সালে। "ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডকে" প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগের মহাকাব্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর কোন কবিতা যদি এলিয়ট না লিখতেন তাহলেও এই একটি মাত্র কবিতার জন্যেও তিনি এ যুগের এক জন শ্রেষ্ঠ কবি" বলে স্বীকৃত হতেন। যেজগতে, যে-সমাজ [illegible] দিকে [illegible] যে [illegible] ছিন্নভিন্ন জীবনের ভগ্নস্তূপের উপর বসে ইয়োরোপ তথা সারা পৃথিবীর মানুষ আজও সভ্যতার বড়াই করছে, যে-নীতি ও ন্যায়বিচারের দোহাই দিয়ে দুর্নীতি আর ব্যভিচারের বন্যা নেমে এসেছে সমাজে, তথাপি কপটতা শঠতা আর প্রতারণাই যে অস্তগামী যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এলিয়ট তাঁর কাব্যে সেই অস্তগামী যুগের সেই জীর্ণ সমাজ ও সভ্যতার, সেই ছদ্মবেশী নীতি রুচি ও সাধুতার, সেই ধ্বংসোন্মুখ সভ্যতার পোড়ো জমির গান গেয়েছেন। তার মধ্যে তিনি দেখেছেন, মানুষ তার দুর্ভেদ্য আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, হারিয়ে ফেলেছে জীবনের বলিষ্ঠ চলার ছন্দ, চলার মন্ত্র এবং চলার লক্ষ্য। ফিরিয়ে আনতে হবে সেই বিশ্বাস, সেই ছন্দ, সেই মন্ত্র, সেই লক্ষ্য, তবেই আবার এই "পোড়ো জমি"তে সোনার ফসল ফলবে, সভ্যতার এই নিস্তব্ধ গোরস্থান আবার জীবনের কল-কোলাহলে মুখর হয়ে উঠবে, পুনরুত্থান (Resurrection) হবে মানুষের। কবি এলিয়ট বলছেন:

What are the roots that clutch, what branches
grow
Out of this stony rubbish ? Son of man,
You cannot say or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket
no relief,
And the dry stone no sound of water……
(The Waste Land)

অর্থাৎ আশে-পাশের এই পাথরের ভগ্নস্তূপে শিকড় গজিয়ে উঠবে কোথায় বলতে পারো, কোথা দিয়ে শাখা মেলবে নতুন জীবন? হায় অমৃতের পুত্র মানুষ! তোমরা তা জান না। তোমরা জান আর চেন কেবল ভাঙা-চোরা জীবনের কতকগুলো টুকরো ছবি, তারই ওপর সূর্য্যের আলো চিক্‌চিক্ করে। শুকিয়ে যাওয়া গাছের তলায় ছায়া কোথায়, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে কোথায় শান্তি! শুকনো নীরেট পাথরের গায়ে কোথা থেকে শুনবে জলের কলকলানি!'

তার পরেই কবি বলছেন:

Here one can neither stand nor lie nor sit
There is not even silence in the mountains
But dry sterile thunder without rain
There is not even solitude in the mountains
But red sullen faces sneer and snarl
From doors of mud-cracked houses
If there were water.
(The Waste Land)

অর্থাৎ এই শুকনো পার্ব্বত্য অঞ্চলে বসা যায় না, দাঁড়ানো যায় না, শোয়া যায় না। এখানে এই পাহাড়েও শান্তি নেই, আছে শুধু বৃষ্টিহীন কঠিন মেঘগর্জ্জন। এখানে এই পাহাড়ে নির্জ্জনতাই বা কোথায়? আছে কেবল আরক্ত গভীর মুখের বিক্ষোভ আর

চাপা গজরানি, ভেঙ্গে-পড়া মাটির ঘরের দরজার ফাঁকে ফাঁকে। একটু যদি জল থাকত কোথাও—

পাথর ও পাহাড় হ'ল এখানে নৈরাশ্যের প্রতীক, জল হ'ল আশার প্রতীক। পাহাড় হ'ল মৃত্যুর ও ধ্বংসের প্রতিমূর্তি, জল হ'ল জীবন ও প্রাচুর্য্যের প্রতীক। তাই "ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড" কাব্যের গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত যে "Rock" "Mountain", "Stone" আর "Water" কথার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়, তা হ'ল কবির আশা-নিরাশার মানসিক দ্বন্দ্বের পরিচায়ক। এই দ্বন্দ্ব চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর এই কাব্যের মধ্যে :

If there were rock
And also water
And water
A Spring
A pool among the rock
If there were the sound of water only
... ...
Drip drop drop drip drop drop drop
But there is no water

(The Waste Land)

ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার জঘন্য পরিবেশের ভিতর দিয়ে, আশা-নিরাশা জীবন-মৃত্যু বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কঠোর অন্তর্দ্বন্দ্বের বাঁকাচোরা ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্ত ছন্দে "ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড" কাব্যের পরিণতি হয়েছে ঔপনিষদিক সত্যের উপলব্ধির মধ্যে। কবি মানুষের জীবনে শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখতে চান, আত্মা ও প্রাণৈশ্বর্য্যের পুনরাবির্ভাব চান। কিন্তু শান্তির মূলমন্ত্র কোথায়, কে সেই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করবে মানুষকে, উর্ব্বর করে তুলবে এই অনুর্ব্বর "পোড়ো জমিকে"? কবি বলছেন :

These fragments I have shored against my ruins
Why then He fit you···
Datta. Dayadhvam. Damyata,
Shantih Shantih Shantih,

(The Waste Land)

"বৃহদারণ্যক উপনিষদে" দেখতে পাই, প্রজাপতির তিন সন্তান—দেবতা, মানুষ ও অসুর। তাঁরা একে একে প্রজাপতির কাছে উপদেশ চাইলেন। দেবতাদের কাছে প্রজাপতি "দ" অক্ষর উচ্চারণ ক'রে বললেন, কি বুঝলে বল? দেবতারা বললেন, "দাম্যত—দান্ত হও"। প্রজাপতি বললেন, ঠিক বুঝেছ। মানুষের প্রশ্নের উত্তরেও প্রজাপতি "দ" অক্ষর উচ্চারণ ক'রে বললেন, কি বুঝলে? মানুষ বলল, "দত্ত—দান কর।" প্রজাপতি বললেন, ঠিক বুঝেছ। অসুরদের কাছেও "দ" উচ্চারণ করে প্রজাপতি বললেন, কি বুঝলে? অসুররা বললে, "দয়ধ্বম্—দয়া কর"। প্রজাপতি বললেন, ঠিক বুঝেছ। মেঘগর্জ্জন সব সময় যেন এই দৈববাক্যই প্রতিধ্বনিত করছে "দ" "দ" "দ"—"দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্"—"দান্ত হও, দান কর, দয়া কর।" দম, দান ও দয়া—এই তিনটিই হল দেবতা, মানুষ ও অসুরের, সকলের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। এই শিক্ষাই ইংলণ্ডের কবি এলিয়ট ভারতের ঔপনিষদিক যুগ থেকে গ্রহণ করলেন—

দত্ত দয়ধ্বম্ দাম্যত
শান্তি শান্তি শান্তি

দান কর, দয়া কর, দান্ত হও,—তাহ'লেই শান্তি আসবে।

ভারতের এই প্রাচীন ঋষিবাণী এক দিন বাংলার রবীন্দ্রনাথ সংশয়াকুল পাশ্চাত্ত্য সমাজকে শুনিয়েছিলেন, আজ কবি এলিয়ট শোনাচ্ছেন। এ-বাণী নতুন নয়, ভারতবাসীর কাছে তো নয়ই। জীবনের সমস্ত সত্যের এই হ'ল সারমর্ম।

এলিয়টের কাব্যের পরিণতি

রবীন্দ্রনাথের "নোবেল প্রাইজ" পাওয়া আর এলিয়টের "নোবেল প্রাইজ" পাওয়ার কারণ হয়ত একই। কাব্য-প্রতিভার মধ্যে দু'জনের পার্থক্য থাকলেও, এলিয়টের কাব্যবাণী আজ রবীন্দ্রনাথেরই অতীতের প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রচণ্ড গতিশীলতা তাঁকে জীবনের এই শ্রেষ্ঠ ঔপনিষদিক আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার দিকে টেনে আনছিল, "নবজাতক" আর "জন্মদিনে" বিশ্বকবি আবার নতুন ক'রে জন্ম নিচ্ছিলেন। রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমপরিণতি ঘটছিল জীবনের বাস্তব উপলব্ধির মধ্যে। এলিয়টের কাব্য উপনিষদ থেকে পুরাতন ক্যাথলিক গির্জ্জার গম্বুজ অতিক্রম ক'রে মহাশূন্যতার স্পষ্টতায় ডানা বিস্তার করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে তাঁর যে "Four Quartets" প্রকাশিত হয়েছে (Burnt Norton, East Coker, The Dry Salvages, Little Gidding), তার মধ্যেই তাঁর কাব্যের এই পরিণতি অত্যন্ত স্পষ্ট। আজ চরম আত্ম-সমাধির মধ্যে এলিয়টের কাব্যসমাধি ঘটেছে। যে ব্যাকুলতা, অস্থিরতা এক দিন তাঁর "ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড" কাব্যের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, আজ তা শান্ত সমাধিস্থ হয়ে গেছে। তাই মনে হয়, যদি "নোবেল প্রাইজই" তাঁকে দেওয়া হ'ল তাহলে এখন কেন এবং এত দেরীতে কেন?

এলিয়টের গ্রন্থাবলী

কাব্য ও নাটক :

Prufrock and other observations ;
The Waste Land, Sweeny Agonistes ;
Ariel Poems, The Rock, A pageant play ;
Old Possum's Book of Practical Cats ;
The Family Reunion, Burnt Norton ;
East Coker ; Dry Salvages, Little Gidding ;
Murder in the Cathedral.

প্রবন্ধ ও সমালোচনা :

Selected Essays ; Essays Ancient and Modern ; Elizabethan Essays ; The use of poetry and the use of criticism ; The Idea of a Chritian Society ; After Strange Gods ; Points of View ; Thoughts after Lambeth ; Homage to John Dryden.

ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস

৪

সন্তোষ ঘোষ

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-৬)

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে বাঙ্গালী জাতির অবদান অসামান্য। বাংলা দেশেই সর্ব্বপ্রথম জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয় এবং বাংলার নেতৃবৃন্দই সমগ্র ভারতে জাতীয় ভাব প্রচারের কার্য্যে অগ্রণী হন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার সাহিত্যিক চিন্তানায়ক ও নেতৃবৃন্দ দেশের গতানুগতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এক যুগান্তরকারী বিপ্লব আনয়ন করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণ বাংলার জনসাধারণের চিত্তে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিবার জন্ত লেখনী ধারণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি চিন্তানায়ক ও সমাজ-সংস্কারকগণ বাংলার সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবযুগ আনয়নের জন্ত সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী প্রভাবে বাংলার জনচিত্ত দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠে। বাংলার নেতৃবৃন্দ নির্ভীক ভাবে বৃটিশ সরকারের ভারত শাসন-নীতির সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন। কংগ্রেসের প্রথম যুগে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনায় বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব অনস্বীকার্য্য। নবজাগ্রত ঐক্যবদ্ধ বাংলার প্রাণশক্তি দর্শনে বৃটিশ সরকার শঙ্কিত হইয়া উঠেন। বাংলার প্রাণশক্তিকে বিনষ্ট করিবার জন্ত এবং বাঙ্গালী জাতিকে চিরদিনের জন্ত দুর্বল করিয়া দিবার জন্ত বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিবার আয়োজন করা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার যুবক-সম্প্রদায় ভারতবর্ষকে অধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্ত চরম পন্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করিতে থাকেন। সেই সময়ে লর্ড কার্জন ছিলেন ভারতের বড়লাট। বাংলার নেতৃবৃন্দ তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীল শাসন-ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চরম পর্য্যায়ে উঠে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করেন। তাহার এই স্বৈরতান্ত্রিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সক্রিয় কার্য্যকরী প্রতিবাদ করেন বাংলার পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি লর্ড কার্জনের নির্দেশ মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন এবং সরকারী সাহায্য ব্যতীতই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য চালাইয়া যাইতে মনস্থ করেন। এই বিরোধ উপলক্ষে স্যার আশুতোষ যে অনন্যসাধারণ তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা প্রদর্শন করেন, তাহা পরাধীন জাতির চিত্তে নূতন ভাব ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। লর্ড কার্জন একটি সরকারী প্রস্তাবে বড় বড় সরকারী চাকুরীতে অধিক সংখ্যক ইউরোপীয় নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করেন। এই প্রসংগে তিনি ভারতীয়দের উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদ পূর্ণ করার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লর্ড কার্জনের এই প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯০৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে লর্ড কার্জন এশিয়াবাসীদের মিথ্যাবাদী, অসাধু ও কপট বলিয়া অভিহিত করেন লর্ড কার্জনের এই উক্তিতে সমগ্র ভারতে তীব্র বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। সিষ্টার নিবেদিতা সমাবর্ত্তন সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি লর্ড কার্জনের উক্তিতে বিশেষ ভাবে ব্যথিত হন। লর্ড কার্জন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত নিজেই যে মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা প্রদর্শনের জন্ত তিনি কার্জন-রচিত 'Problems of the Far East' গ্রন্থের অংশ-বিশেষের প্রতি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কোরিয়ার পররাষ্ট্র দপ্তরের সভাপতির অনুগ্রহ-ভাজন হইবার জন্ত লর্ড কার্জন কোরিয়াতে কিরূপ ভাবে অসত্য ও চাটুকারিতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, "Problems of the Far East" গ্রন্থের উক্ত অংশে তিনি নিজেই তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় "Problems of the For East" গ্রন্থের উক্ত অংশ এবং কার্জনের সমাবর্ত্তন বক্তৃতার আপত্তিকর অংশ পাশাপাশি উদ্‌ধৃত করিয়া দেখান হয়। লর্ড কার্জন নিজে কি চরিত্রের লোক তাহার পরিচয় পাইয়া জনসাধারণ কার্জনের দাম্ভিক ও নির্লজ্জ উক্তির মূল্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন। টাউন হলের সভায় সুরেন্দ্রনাথও লর্ড কার্জনের এই উক্তির সুতীব্র সমালোচনা করেন।

এই সকল নানা কারণে লর্ড কার্জন প্রগতিশীল, স্বদেশহিতৈষী বাঙ্গালীদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া ঝুনা সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন মনে করেন যে, বাঙ্গালীদের সংহত শক্তি ও ঐক্যবোধকে আঘাত করা প্রয়োজন। পদত্যাগ করিয়া ভারত-ত্যাগের পূর্বে তিনি বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া যান। বহু দিন হইতেই গবর্ণমেন্ট বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিবার প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছিলেন। ১৮৯৬ সালে আসামের চীফ কমিশনর স্যার উইলিয়ম ওয়ার্ড ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলা দুইটিকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট বিবরণী পেশ করেন, কিন্তু তখন কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকেন। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রস্তাবিত ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে রিজলি সাহেবের পত্র প্রকাশিত হয়। সমগ্র দেশে এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। লর্ড কার্জন স্বয়ং পূর্ব-বাংলার জেলা সমূহে ভ্রমণ করেন এবং ঐ সকল জেলার প্রতিপত্তিশালী লোকদের নিকট বাংলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করার সুফল বর্ণনা করেন। তিনি নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত পূর্ব-বাংলার মুসলমানদের স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করেন। ১৯০৫ সালের ৯ই জুলাই তারিখে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কিত সরকারী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। রাজসাহী বিভাগ, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ এবং পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য আসামের চীফ কমিশনরের প্রদেশের সহিত যুক্ত করিয়া একটি নূতন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। বাংলার ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধের অগ্রগতি রুদ্ধ করার জন্ত এবং ভারতের রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে বাংলার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করার জন্ত লর্ড কার্জন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করেন। লর্ড কার্জনের অন্ত উদ্দেশ্য ছিল বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব নষ্ট করাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পূর্ব-বাংলায় সফর-কালে লর্ড কার্জন মুসলমানদের এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে নবগঠিত প্রদেশে মুসলমানদের প্রাধান্ত হইবে। লর্ড

কার্জনের এই প্রচারকার্য্যে সাধারণ ভাবে পূর্ব-বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই তারিখে বাংলার জনসাধারণ জানিতে পারিল যে ভারত-সচিব বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ কার্য্যে সম্মতিদান করিয়াছেন। বঙ্গভঙ্গের সংবাদ শ্রবণে বাংলা দেশে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, বাংলার ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। মৃত্যুপণ করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতি বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রোধ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইল। বহু দিন হইতে বৃটিশ শাসন ও শোষণের ফলে বাংলার নবজাগ্রত জনচিত্তে যে ক্ষোভ ও তিক্ততা জমা হইয়া উঠিয়াছিল, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া তাহা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সহস্র ধারায় প্রবাহিত হইল। বাংলার সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যোগদান করিলেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের জনসাধারণ সহানুভূতি ও ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত এই আন্দোলনের সাফল্য কামনা করিতে লাগিলেন। কংগ্রেস সরকারী ভাবে এই আন্দোলন পরিচালনা না করিলেও বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সক্রিয় ভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। বঙ্গভঙ্গের সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর রবীন্দ্রনাথ নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে' লিখিলেন, "বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, এ কথা আমরা কোন মতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আমরা সচেতন ভাবে অনুভব করিব যে, বাঙ্গলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পূর্ব-পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোত সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে। জননীর বাম-দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাঙ্গালীর সন্তানকে পালন করিয়াছে। আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্রমূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।"

আন্দোলনকে কার্য্যকরী ও সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্ম বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রস্তাব দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। জনসাধারণ আগ্রহ সহকারে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল। স্বদেশী যুগের অন্যতম প্রধান নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র সর্বপ্রথম এই প্রস্তাব দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করেন। তিনি তাঁহার 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় দেশবাসীকে নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্ম অনুরোধ জানাইলেন,—"আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্ম মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা অতঃপর দেশজাত দ্রব্য পাইলে কোন বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না। এই কার্য্য করিতে যদি কোন আর্থিক বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব। আমরা এইরূপ কার্য্য কেবল নিজেরাই করিয়া ক্ষান্ত হইব না, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য লোকদিগকেও এইরূপ করাইবার জন্ম যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের এই শুভ সংকল্পে সহায় হউন।"

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ করিয়াই ভারতে আবার নূতন করিয়া বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য দেশী শিল্প প্রসার লাভ করিল। কান্ত-কবি রজনীকান্ত দেশবাসীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিলেন:

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নে রে ভাই।
দীন দুখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই,
পরের জিনিষ কিনবো না, যদি মায়ের ঘরের জিনিষ পাই।"

বাংলার পথে-প্রান্তরে কবির এই গান ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বাংলার সর্বত্র—ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, মৈমনসিংহে জনসভায় বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জনমত অভিব্যক্ত হইল। বাংলার জনসাধারণ বৃটিশ-দ্রব্য বয়কটের প্রস্তাব কার্য্যকরী ভাবে গ্রহণ করিলেন। কলিকাতার টাউন হলে এক বিরাট জনসভায় বিলাতী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনকে পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইল। এই সভায় উক্ত প্রস্তাব উপাপন করিলেন 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদক বিখ্যাত জননায়ক নরেন্দ্রনাথ সেন। গবর্ণমেণ্ট মুসলমান সম্প্রদায়কে এই আন্দোলন হইতে দূরে রাখিবার জন্ম প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। মুসলমান জনসাধারণ দলে দলে সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিল। ঢাকার নবাবের ভ্রাতা আকাতুল্লা বাহাদুর, ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল, মৌলবী আবুল কাসেম, আবুল হোসেন প্রভৃতি বিশিষ্ট মুসলমান নেতৃবৃন্দ আন্দোলন সমর্থন করিলেন। দেশীয় খৃষ্টান সমাজও আন্দোলনকে সক্রিয় ভাবে সমর্থন করিতে লাগিলেন। বাংলার যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি সক্রিয় ভাবে কোন দিন রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান করেন নাই, তাঁহারাও এই আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, কাশিমবাজার ও ময়মনসিংহের মহারাজা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন। এই প্রসঙ্গে গোপালকৃষ্ণ গোখলে লিখিয়াছেন,—"যে সব ব্যক্তি সাধারণতঃ রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে দূরে থাকেন এবং যাঁহারা কর্তৃপক্ষকে বিপদগ্রস্ত করিবার জন্ম কখনও কোন কথা বলেন না, তাঁহারও কর্তব্যের অনুরোধে এই বিপর্য্যয় হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্ম যথাশক্তি সাহায্য করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে ব্যবচ্ছেদ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন। যদি এই সকল ব্যক্তির মতামত তাচ্ছিল্যের সহিত অগ্রাহ্য করা হয়, যদি সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর সহিত যুক্ত বিতাড়িত পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হয়, জগতে যে-কোন দেশে সম্মান পাইবার উপযুক্ত এই সকল ব্যক্তিকে নিজ দেশে তাহাদের অপমানজনক অসহায় অবস্থার কথা উপলব্ধি করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে আমি বলিব যে জনস্বার্থের খাতিরে আমলাতন্ত্রের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশা ত্যাগ করিতে হইবে।" লোকমান্য তিলক বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ও নূতন ভাবধারাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করিলেন।

[ক্রমশঃ

সন্ধ্যাসূর্য

উইলিয়ম্ ফকনার

এখনকার জেফারসনের সোমবার সপ্তাহের অন্যান্য দিনের মতোই সাধারণ। ইট দিয়ে রাস্তা বাঁধানো হচ্ছে, টেলিফোন আর ইলেকট্রিক কোম্পানীরা রাস্তার দু'পাশের ছায়াচ্ছন্ন গাছগুলো কেটে পরিষ্কার করছে,—ওক, ম্যাপল, আর এলম্ গাছগুলো বিদায় নিচ্ছে লোহার থামগুলোকে জায়গা দেবার জন্যে, গাছের বদলে আজকাল থামগুলোর ওপরেই রক্তশূন্য আঙুর বোলে। আমাদের ধোপার দোকানের কাপড় নেবার দিন সোমবার। সকাল বেলা থেকেই কাপড়ের মোটগুলো মোটরে করে নিয়ে যাওয়া হয়। এক সপ্তাহ ধরে জমে-ওঠা কালো ময়লা কাপড়-ভর্তি মোটরগুলো রাস্তা দিয়ে বিশ্রী শব্দ তুলে ছুটে চলে যায়, এমন কি নিগ্রো মেয়েরাও, যারা পুরনো প্রথা অনুসারে সায়েবদের কাপড় কাচে, তারাও মোটরে করে কাপড় নিয়ে আসে আবার দিয়ে যায়।

কিন্তু পনের বছর আগে যে কোন সোমবার সকালে শান্ত নির্জন ধূলি-ধূসরিত রাস্তা নিগ্রো মেয়েতে ভর্তি থাকতো, তাদের মাথায় থাকতো কাপড়ের বিরাট বোঝা—চাদরে কাপড়গুলো বেঁধে তুলোর বস্তার মতো মাথায় বসিয়ে, হাত দিয়ে না ধরেই সেগুলো সায়েবদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে, আবার কালো কাপড়ের রাশ নিয়ে ফিরতো নিজেদের আস্তানায়।

ন্যান্সির মাথাতেও থাকতো এমনি একটা বিরাট মোট, মোটটার ওপরে চাপাতো কালো একটা টুপি, যা কেবল শীত আর গ্রীষ্মকালেই থাকতো তার মাথায়। লম্বাটে গাল-বসা করুণ মুখখানি, সামনের কতকগুলো দাঁত নেই। আমরা প্রায়ই তার পেছনে ধাওয়া করতাম তার মাথার অদ্ভুত কায়দা দেখবার জন্যে। চলবার সময় তার টুপিটা নড়তো না পর্যন্ত। খাল পেরিয়ে ঢালু পথে ওঠবার সময়ও তার মাথা থাকতো স্থির—মাথার বোঝাটা থাকতো পাহাড়ের মতোই নিশ্চল। তার পরে এক-পা এক-পা করে সে সামনে এগিয়ে যেতো।

ধোপানীদের স্বামীরা কখনো কখনো স্ত্রীদের বদলে কাপড় দিতে বা আনতে গেলেও ন্যান্সির হয়ে জেসাস্ কোন দিন কোথাও যায়নি, এমন কি বাবা বললেও, বা ডিলসের অসুখ করলেও না। ন্যান্সিকেই ফিরে এসে আবার আমাদের জন্যে রাঁধা-বাড়া করতে হতো। প্রায়ই আমরা তাকে সকালের খাবার রাঁধবার জন্যে তার বাড়ীতে বলতে যেতাম। খালের ধারে থাকতাম দাঁড়িয়ে, কেন না, বাবা জেসাসের সঙ্গে কোন রকম গণ্ডগোল করতে বারণ করতেন—ছোটখাট কালো মতো লোকটি, মুখে ক্ষুরে-কাটা ক্ষতচিহ্ন,—সেখান থেকেই আমরা ঢিল ছুঁড়তাম যতক্ষণ না সে বাইরে বেরিয়ে আসতো।

—"কী, মনে করেছো কি তোমরা—ঘরটা কি ভেঙে ফেলবে না কি?" ন্যান্সি বিরক্ত হয়ে চেঁচায়,—এই ক্ষুদে শয়তানের দল, তোমরা কি ভেবেছো শুনি?"

—"বাবা বলে দিয়েছেন তোমাকে আমাদের বাড়ীতে সকালের খাবার রাঁধতে", ক্যাডি বলে ওঠে,—"আধ ঘণ্টা আগে আমাদের বলেছেন সুতরাং আর এক মিনিটও দেরী কোরো না যেন।"

—"আমি রাঁধতে জানি না যাও," ন্যান্সি বলে ওঠে, "আমি এখন বাজী ফেলে বলতে পারি তুমি মদ খেয়েছো", জেসন বলে, "বাবাও তো বলেন তুমি মদ খাও, খাও না ন্যান্সি?"

—"কে বললে যে আমি মদ খাই?" ন্যান্সি ঝাঁঝিয়ে ওঠে, "আমি এমনিই শুতে যাচ্ছি।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ঘর-বাড়ী তছনছ করে দিয়ে আমরা ফিরলাম। শেষ পর্যন্ত যখন সে আমাদের বাড়ী এলো তখন ইস্কুলের বেলা হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, যেদিন তাকে ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ার পাদ্রী মিষ্টার স্টোভালের সামনে দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন মদের নেশায় ন্যান্সি বলেছিল: "কখন আমার কাপড়-কাচার পয়সা দেবে সায়েব? কখন আমার কাপড়-কাচার পয়সা দেবে? এতো দিন ধরে তো মাত্র এক সেন্ট দিয়েছো—"

মিষ্টার স্টোভাল তাকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিয়েছিলেন, কিন্তু তখনো সে বিড়-বিড় করে বলছিল: "কখন আমার পয়সা দেবে সায়েব—কখন আমার পয়সা দেবে···"

মিষ্টার স্টোভাল তখন জুতোর গোড়ালী-শুদ্ধ এক লাথি তার মুখে বসিয়ে দিয়েছিলেন। ন্যান্সি লুটিয়ে পড়েছিলো রাস্তায় ধুলোয়, কিন্তু তবুও তার মুখে হাসি। মুখ ফিরিয়ে খানিকটা রক্তমাখা থুথু ফেলবার সময় কয়েকটা ভাঙা দাঁতও বেরিয়ে এসেছিলো মুখ থেকে।—"এতো দিনে তো মাত্র এক সেন্ট দিলে···" অদ্ভুত কাটা-কাটা সুরে সে বলেছিলো কথা ক'টি।

এই হলো তার দাঁত হারাবার ইতিহাস। সেদিন সকলের মুখেই ছিলো এই ন্যান্সি আর স্টোভালের আলোচনা। সেদিন জেলের ধার দিয়ে রাত্রে যাবার সময় সবাই শুনেছিলো ন্যান্সির মনের খুশী-ভরা গান। সবাই দেখেছিল, ন্যান্সি গরাদে ধরে গান গাইছে আর জেলের কর্তা প্রাণপণে তাকে থামাবার চেষ্টা করছে—

সারা দিন কেউ তাকে থামাতে পারেনি। হঠাৎ ওপরতলা থেকে ভারী একটা শব্দ কানে যাওয়ায় জেল-কর্তা গিয়ে দেখে, স্যাম্বি জানলার গরাদে থেকে ঝুলছে। জেসাস তখন বলেছিলো: 'এটা মাতাল নয়, কোকেনখোর।' কেন না মদ খেয়ে কোন নিগ্রোই আত্মহত্যা করে না, পুরো দমে কোকেন খেলে নিগ্রোরা তখন না কি আর নিগ্রোই থাকে না। জেলার দড়ি কেটে তাকে সুস্থ করে তোলার পর বেদম প্রহার দেয়। স্যাম্বি নিজের পোষাক দিয়েই উদ্বন্ধনে মরবার চেষ্টা করে, কেন না যখন তাকে ধরা হয়েছিল তখন নিজের গায়ের পোষাক ছাড়া তার কাছে আর কিছু ছিল না। শব্দ শুনে জেলার ছুটে এসে দেখেছিল, স্যাম্বি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে জানলার গরাদে থেকে ঝুলছে, তার পেটটা তখন বেলুনের মত ফুলে উঠেছে।

ডিলসে অসুস্থ হয়ে পড়ায় স্যাম্বিই আমাদের রান্না-বান্না করছিল। তখনই আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, তার পোষাকের তলায় যেন ফোলা ফোলা কি। জেসাসও ছিলো রান্নাঘরে স্টোভের ধারে বসে; তার মুখের কাটা দাগটা যেন ময়লা দড়ির মতো দেখতে লাগছিলো, হঠাৎ বলে উঠলো, "স্যাম্বির কাপড়ের তলায় তরমুজের মতো কি যেন একটা রয়েছে?"

—"তোমার বাগান দিয়ে তো আসিনি"—স্যাম্বি ঝংকার দিলো।

—"কিসের বাগান?" ক্যাডি প্রশ্ন করে।

—"ওটা যদি একবার বার করো তো আমি দু'ফাঁক করে দিতে পারি—" জেসাস্ রসিকতা করে উঠলো।

—"আঃ, ছোট ছেলে-পুলেদের সামনে কি যা-তা বকছো?"—স্যাম্বি বললে, "তুমি কাজে যাওনি? তোমাকে কি মিষ্টার জেসন্ রান্নাঘরে বসে ছেলেদের সামনে ফষ্টি-নষ্টি করবার জন্যে রেখেছেন না কি, হ্যাঁ?"

—"তরমুজের কথা কি বললে?" ক্যাডি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে।

—"আমি সায়েবদের রান্নাঘরে আসতেও চাই না", জেসাস বলে, "তারাই তো আমাকে আসবার জন্য বলে। সায়েবরা ইচ্ছে করলেই আমাদের বাড়ী যেতে পারে, বারণ করবার বা বাধা দেবার আইন নেই, কিন্তু তারা আমাদের ইচ্ছেমত যে-কোন সময়ে লাথি মেরে তাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে।"

ডিলসে তখনো অসুস্থ, বাবা জেসাসকে আমাদের বাড়ী থেকে চলে যেতে বললেন। এর অনেক দিন পরে এক দিন রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা লাইব্রেরী ঘরে এসে বসেছি, মা জিজ্ঞেস্ করলেন, "স্যাম্বির সব কাজ-কম্ম সারা হলো? অনেকক্ষণ তো সময় গেলো, শেষ হয়েছে বলেই মনে হয়।"

উত্তরে বাবা বললেন, "কোয়েন্টিনকে পাঠাও না দেখতে। যাও তো, দেখে এসো স্যাম্বির কাজ শেষ হলো কি না, শেষ হলে তাকে বোলো, এখন সে বাড়ী যেতে পারে।"

আমি রান্নাঘরে গেলাম। স্যাম্বির বাসন-মাজা, আগুন নেভানো সব কাজ শেষ। একটা চেয়ারে সে তখন বসে। আমি যেতেই পরিপূর্ণ চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো।

—"মা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব কাজ কি শেষ হয়ে

—"হ্যাঁ," স্যাম্বি ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দেয়। তখনও সে তাকিয়ে আমার দিকে।

—"কি হয়েছে তোমার?" আমি জিজ্ঞেস করি, "কি হলো কি?"

—"আমি যে নিগ্রো," স্যাম্বি কাতর কণ্ঠে বলে, "সেটা তো আমার দোষ নয়।" নেভানো উনুনের পাশের চেয়ারে বসে আমার দিকে সে তাকিয়েই থাকে। আমি আমার লাইব্রেরীতে ফিরে এলাম তার ভাবগতিক দেখে। রান্নাঘরের কাজ সব শেষ, খাবার আর কেউ বাকী নেই।

—"কি, হয়ে গেছে?" যাওয়া মাত্র মা জিজ্ঞেস করেন।

—"হ্যাঁ মা।"

—"কি করছে সে?"

—"কিছু না, বসে আছে শুধু।"

—"যাই, গিয়ে দেখে আসি," বাবা বললেন।

ক্যাডি বললো, "স্যাম্বি হয়তো জেসাসের জন্যে অপেক্ষা করছে, তার সঙ্গেই ফিরবে বোধ হয়।"

—"জেসাস তো নেই," আমি বললাম, "স্যাম্বিই বলছিল, এক দিন সকালে উঠে সে যেন কোথায় পালিয়ে গেছে বাড়ী থেকে। সে মেম্ফিস্-এ গেছে বলেই স্যাম্বির বিশ্বাস, হয়তো কিছু দিনের জন্যে শ্রীঘর থেকে ঘুরে আসতে গেছে।"

—"স্যাম্বির কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে বেচারা মুক্তিই পেয়েছে বলতে হবে। আমারও মনে হয়, লোকটা ওখানেই গেছে।" বাবা বললেন।

—"স্যাম্বি তাহ'লে বোধ হয় চোখে অন্ধকার দেখছে," জেসন বললো।

—"তুমিও বোধ হয় সেই সঙ্গে?" ক্যাডি টিপ্পনী কাটে।

—"না, আমি কেন?" জেসন উত্তর দেয় পিঠ-পিঠ।

—"উল্লুক কোথাকার!" ক্যাডি হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে।

—"চুপ করো তো তোমরা," মা ধমকে ওঠেন। বাবা ফিরে এসে মাকে বললেন,—"আমি স্যাম্বির সঙ্গে একটু যাচ্ছি। ও বলছে, জেসাস না কি আবার ফিরে এসেছে।"

মা প্রশ্ন করলেন, "তাকে ফিরে আসতে দেখেছে নাকি স্যাম্বি?"

—"না, জন কয়েক নিগ্রো ওকে খবর দিয়েছে। আমার বেশী দেরী হবে না ফিরতে।"

—"স্যাম্বিকে বাড়ী পৌঁছে দিতে যাবে আমাকে ফেলেই?" অনুযোগের সুরে মা বলেন, "আমার চেয়ে কি তার নিরাপত্তার বেশী দরকার?"

—"আমি যাবো আর আসবো," বাবা সান্ত্বনা দেন মাকে।

—"একটা নিগ্রোর জন্যে আমাদের সবাইকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে তুমি যাবে মনে করেছো?"

ক্যাডি বায়না ধরলো,—"আমিও তোমার সঙ্গে যাবো বাবা।"

—"তুমি শুধু শুধু গিয়ে কি করবে?"

—"আমিও যাবো বাবা," জেসন ধরে।

—"জেসন্!" মা ধমকে ওঠেন। এর পর মায়ের সঙ্গে বাবার কথা-কাটাকাটি চলতে লাগলো। মা যা ভালোবাসেন না তাই

হবে। আমি জানতাম মায়ের কাছে আমাকেই থাকতে হবে, কাজেই আমি চুপ করেছিলাম, বাবাও কিছু বলেননি আমাকে। আমিই বড়। আমার বয়স নয়, ক্যাডির সাত, আর জেসনের পাঁচ।

—"আঃ, বলছিই তো বেশী দেরী করবো না," বাবা বিরক্ত হয়ে ওঠেন এবার।

ড্যাল্সি তার টুপিটা মাথায় বসিয়ে নিলো, আমরা সবাই গলিতে এসে নামলাম।

—"জেসাস্ আমাকে খুব ভালবাসে," ড্যাল্সি হঠাৎ স্তব্ধতা ভাঙে, "যদি সে দু'ডলার পায় তো আমাকে এক ডলার দেয়।"

গলি দিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা।

—"এই ভাবে আমরা যদি ঠিক মতো চালিয়ে নিতে পারতাম তাহ'লে তো বেশ ভালই হোত," ড্যাল্সি বলে চলে। গলির সবটাই ভীষণ অন্ধকার।

—"একলা এখানে এলে জেসন্ খুব ভয় পেয়ে যেতো", ক্যাডি বললো।

সঙ্গে সঙ্গে জেসন্ প্রতিবাদ করে উঠলো, "কক্ষনো না।"

—"র‍্যাশেল খুড়ি তার সঙ্গে কিছু করেনি তো?" বাবা বললেন আশঙ্কা ভরে। র‍্যাশেল খুড়ি বৃদ্ধা, মাথার সব ক'টা চুলই পেকে গেছে, ড্যাল্সির বাড়ীর কাছেই একলা থাকে সে। দরজায় দাঁড়িয়ে সারা দিন পাইপ ফোঁকে। লোকে তাকে বলে জুবার মা, কখনো সে তা স্বীকার করে, আবার কখনো অবজ্ঞায় উড়িয়ে দেয়।

—"নিশ্চয়ই তুমিই তাহ'লে কিছু করেছো," ক্যাডি জোর দিয়ে বললে, "তুমি ক্রলির চেয়ে বদমায়েস, টিপির চেয়ে পাজী, এমন কি ঐ কালা নিগ্রোগুলোর চাইতেও বেশী শয়তান।"

—"তার সঙ্গে কারো কোন গণ্ডগোলই হয়নি", ড্যাল্সি বলে আনমনে, "সে বলতো আমিই না কি তাকে উত্তেজিত করে শয়তান করে তুলতাম, আবার আমিই না কি শুধু তাকে পারতাম ঠাণ্ডা করতে।"

—"আচ্ছা, সে তো এখন চলেই গেছে", বাবা বললেন, "এখন আর তোমার তো ভয় পাবার কিছু নেই, শাদা মানুষগুলোকে এখন একটু একলা থাকতে দাও।"

—"শাদা মানুষগুলোকে একলা থাকতে দাও কি?" ক্যাডি প্রশ্ন তুললো, "একলা থাকতে দেবে কি করে?"

—" সে কোথাও যেতো না", ড্যাল্সি আনমনা হয়ে পড়ে, "আমিই কেবল তাকে বুঝতাম, আর এই গলির ভেতর এখন যেন তাকে আরও বুঝতে পারছি কিছু! — — বলবার সময় সবটাই শেষ করতো না, প্রায়ই চুপ করে থাকতো। তাকে দেখছি না, হয়তো আর কখনোই তার কাটা দাগওয়ালা মুখ দেখতেও পাবো না। ক্ষত শুধু তার মুখেই নেই, জামার ভেতরও তার বহু ক্ষতচিহ্ন লুকোনো আছে।"

—"যদি অন্য ভাবে ব্যবহার করতে তো আজ আর এ সব কিছুই হোত না", বাবা ধীরে ধীরে ড্যাল্সিকে বললেন। "সে এখন হয়তো সেন্টলুই-এ, হয়তো অন্য কাউকে এতো দিন বিয়ে করে তোমাকে ভুলেছে।"

—"তাই যদি করে থাকে তাহ'লে [illegible] ভালো হবে না," ড্যাল্সি ভীষণ রেগে উঠলো, "সেখানে গিয়ে আমি তার জীবন দুর্বিসহ করে তুলবো, তার মাথা কেটে, তার হাত কেটে, পেটটা ফেড়ে ফেলে ধাক্কা মেরে—"

—"চুপ করো", বাবা তাকে থামিয়ে দেন।

—"কার পেট ছিঁড়ে দেবে ড্যাল্সি?" ক্যাডি ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

—"আমি তো দুষ্টুমি করি না", জেসন ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। "আমি তো আস্তে আস্তে ভালো ভাবেই চলছি।"

—" ওঃ", ক্যাডি টিপ্পনী কাটে সঙ্গে সঙ্গে, "আমরা না থাকলে তোমাকে আর যেতে হোত না।"

ডিলসে তখনো ভালো হয়ে ওঠেনি, তাই আমরা ড্যাল্সিকে রাত্রে এগিয়ে দিতাম। আমাদের কাণ্ড দেখে এক দিন মা প্রশ্ন করলেন, "এমন করে আর কতো দিন চলবে বলো তো? একটা ভীতু নিগ্রোকে এগিয়ে দিতে গিয়ে যে, আমাকেই এতো বড় বাড়ীতে একলা ফেলে রেখে যাচ্ছো।"

তাই রান্নাঘরে ড্যাল্সির শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা অদ্ভুত শব্দে হঠাৎ এক রাত্রে আমাদের ঘুম ভেঙে গেলো। কোন গান বা কান্নার শব্দ নয়, শব্দটা আসছে অন্ধকার সিঁড়ির দিক থেকে। মায়ের ঘরে আলো জ্বললো, বাবাকে নেমে যেতে শুনলাম হলের দিকে। পেছনের সিঁড়ি বেয়ে আমি আর ক্যাডিও এসে হাজির হলাম হলে। মেঝে কনকন্ করছে ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডায় পায়ের আঙুলগুলো বেঁকে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই শব্দ শুনতে লাগলাম। গানের মতো শুনতে হলেও আওয়াজটা গানের নয়, এ রকম শব্দ শুধু নিগ্রোরাই করতে পারে জানি।

তার পর এক সময় বন্ধ হয়ে গেলো শব্দটা, বাবা চলে গেলেন। আমরা উঠে গেলাম সিঁড়ির মাথায়। হঠাৎ আবার শব্দ আরম্ভ হলো সিঁড়িতে, তবে খুব জোরে নয়। দেখলাম, ড্যাল্সি সিঁড়ি থেকে বিস্ফারিত চোখে বেড়ালের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নেমে আসতে আসতে শুনলাম আবার সে শব্দ আরম্ভ করেছে, রান্নাঘর থেকে বাবা পিস্তল নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। ড্যাল্সির বিছানা-পত্র নীচে নিয়ে আসা হোল।

এবার আমাদের ঘরে তার বিছানা পাতা হোল। মায়ের ঘরের বাতি নেবার পর আমরা আবার ড্যাল্সির সেই রকম চোখ দেখলাম। "ড্যাল্সি!" ক্যাডি চুপি-চুপি ডাকে, "ঘুমিয়ে পড়লে না কি ড্যাল্সি?"

ড্যাল্সিও আস্তে আস্তে কি যেন বললো, হ্যাঁ, কি না, ঠিক বোঝা গেল না। কিছুই যেন হয়নি, কেউ যেন নেই সেখানে, এমনি উদাস ভাবে লক্ষ্য করছে সিঁড়ির পথটা চিত্রার্পিতের মতো, যেন চোখ বুঁজে সূর্যকে অনুভব করছে। "জেসাস্," ড্যাল্সি বিড়বিড় করে উঠলো। "কি বলছো?" ক্যাডি হন্তদন্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে, "সেই কি রান্নাঘরে আসবার চেষ্টা করেছিল?"

ড্যাল্সি টেনে-টেনে দীর্ঘ করে ডাকলো আবার, "জে-সা-া-স্!" কথাটা মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে এলো যেন দেশলাইয়ের বারুদ বা মোমবাতির শিখার মতো।

—"আমাদের দেখতে পাচ্ছো ড্যাল্সি?" ক্যাডি আবার আস্তে আস্তে ডাকে, "আমাদের দেখতে পাচ্ছো?"

—"আমি যে নিগ্রো", স্যাল্লি কথা বলে এবার, "ভগবান, হা ভগবান!"

—"নিগ্রো কি স্যাল্লি?"

—"আমি নরকের কীট", স্যাল্লি ক্লিষ্ট স্বরে বলে, "যেখান থেকে এসেছি সেইখানে যেতে আর আমার দেরী নেই।"

স্যাল্লি কফি খাচ্ছে চুমুকে চুমুকে। দু'হাতে কাপটা ধরে কফি খেতে খেতে আবার সেই রকম শব্দ করছে সে। শব্দ করছে, আর কাপ থেকে ছলকে ছলকে কফি ছিটকে পড়ছে হাতে, জামায়, পোশাকে। আমাদের দিকে তাকিয়ে হাঁটুর ওপর দুই কনুই রেখে, হাত দু'টি দিয়ে কাপটি ধরে রয়েছে সে। ভিজে কাপটার ফাঁক দিয়ে আমাদের দেখছে আর চেঁচাচ্ছে।

—"স্যাল্লিকে দেখে", জেসন বললে, "স্যাল্লি, আর আমাদের রান্না করতে হবে না, ডিলসে.তো সেরে উঠেছে এবার।"

—"তুমি থামো তো বাপু", ডিলসে কড়া সুরে ধমকে উঠলো।

আমাদের দিকে সেই রকম ভাবে তাকিয়ে কাপটা ধরে একটানা শব্দ করেই চলেছে স্যাল্লি। এ যেন এক জনে তাকিয়ে আছে, আর শব্দ করছে অন্যে, তার হাবভাবে এমনিই মনে হচ্ছিলো আমাদের।

—"তুমি মার্শালকে ফোন করবে নাকি?" ডিলসে প্রশ্ন করলো। স্যাল্লি তখন একটু থেমেছে, লম্বা বাদামী হাতে তখনো কফির কাপ। চেষ্টা করলে খানিকটা গেলবার, কিন্তু কাপটা হঠাৎ উল্টে গিয়ে জামা-কাপড়ই নোঙরা করে দিলো কেবল, মেঝেতে নামিয়ে রাখলো পেয়ালাটাকে। এগিয়ে এলো জেসন ব্যাপার কি দেখতে।

—"এ আমি খেতে পারছি না," স্যাল্লি হতাশ কণ্ঠে অনুনয় জানায়, "আর খেলেও গলার নীচে নামছে না কিছুতেই।"

"এখন নীচের ঘরে যাও তুমি," ডিলসে বললো, "ফ্রণী বিছানা-পত্র ঠিকঠাক করে দেবে, আর আমিও এলাম বলে।"

"কোন নিগ্রোই তাকে থামাতে পারবে না।" স্যাল্লির কণ্ঠে হতাশা ঝরে পড়ে।

"আমি তো নিগ্রো নই," জেসন প্রতিবাদ জানায়, "আমি কি নিগ্রো, ডিলসে?"

"জানি না, যাও।" ডিলসে বিরক্ত হয়ে স্যাল্লির দিকে মুখ ফেরায়। "আমি কিন্তু তা মনে করি না। তাহ'লে কি করতে চাও এখন?"

স্যাল্লি তাকালো আমাদের দিকে, চোখ তার চঞ্চল, হাতে একটুও সময় নেই বলে যেন ভয়ও পেয়েছে। একই সঙ্গে আমাদের তিন জনের দিকেই সে অদ্ভুত ভাবে তাকাতে লাগলো বার-বার।

—"তোমাদের ঘরে যেদিন ছিলাম আমি, তোমরা তো দেখেছো," স্যাল্লি বলতে লাগলো, "কতো সকালে উঠে আমরা সবাই কেমন খেলেছিলাম।" সেদিন তার বিছানায় আমরা খুব খেলা করেছিলাম বটে বাবা বিছানা থেকে না-ওঠা পর্যন্ত, এমন কি খাবার আগে পর্যন্ত চলেছিলো সে খেলা। "মাকে বলে এসো, আজ রাত্রেও তোমরা এখানে শোবে। কোন বিছানা-পত্তরের দরকার নেই, আজও আবার বেশ মজা করে খেলা যাবে।" সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ক্যাডি চললো মায়ের কাছে, জেসনও।

মা ঝংকার দিয়ে বললেন, "না, বাড়ীটাকে আমি নিগ্রোর শয়ন-মন্দির করে তুলতে পারবো না।" জেসন কান্না জুড়ে দিলো, ধমক দিয়ে মা বললেন, "এমনি অসভ্যতা করলে তোমাকে তিন দিন একদম জল খেতে দেওয়া হবে না।" জেসনও আবদার ধরলো, যদি ডিলসে তাকে 'চকোলেট-কেক' তৈরী করে দেয়, তবেই সে এখুনি থামবে। বাবাও ছিলেন সেখানে।

—"এ সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত করছো না তুমিও?" মা বললেন, "তাহ'লে অফিসারগুলোকেই বা রাখা হয়েছে কি জন্যে?"

—"জুবাকে স্যাল্লি এতো ভয় করে কেন মা?" ক্যাডি মাকে প্রশ্ন করলো,—"তুমিও কি বাবাকে ওমনি ভয় করো?"

—"তারাই বা কি করবে বলো?" বাবা বলতে লাগলেন, "স্যাল্লিই যদি তাকে দেখতে না পায় তাহ'লে অফিসাররা তাকে কোথায় খুঁজবে?"

—"তাহ'লে স্যাল্লিই বা শুধু শুধু এতো ভয় পাচ্ছে কেন?" মাও প্রশ্ন করেন সঙ্গে সঙ্গে।

বাবা জানান, "স্যাল্লি বলছে, সে এখানেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে, আজ রাত্রে হয়তো সে আসতেও পারে।"

—"আমরাও তো খাজনা দিই।" মায়ের গলায় শ্লেষ, "আমি এই পেল্লায় বাড়ীতে একলা থাকবো, আর তুমি যাবে ঐ একটা নিগ্রো মেয়েকে পৌঁছে দিতে?"

—"তুমি তো জানো, আমিও কম বিপদের মধ্যে নেই," বাবা জানান।

"ডিলসে চকোলেট-কেক তৈরী করে দিলে তো আমি থামবো বলেছি।" কাঁদতে কাঁদতেই জেসন আবার মনে করিয়ে দেয়। মা আমাদের সেখান থেকে যেতে বললেন। আর বাবা ভীষণ রেগে বলে উঠলেন, জেসন কেক পাবে কি না তা তিনি জানেন না, তবে তার কপালে যে সাংঘাতিক কিছু আছে এ ঠিক।

আমরা রান্নাঘরে ফিরে এসে স্যাল্লিকে সব কথা জানালাম। ক্যাডি বললো, "জানো, বাবা বলছিলো বাড়ীতে তালা বন্ধ করে থাকলে তোমার কিছু হবে না। কিসের কি হবে না স্যাল্লি? জুবা কি তোমার ওপর ক্ষেপে গেছে না কি?" স্যাল্লির হাতে কফির কাপ, হাঁটুর মাঝে দু'হাত দিয়ে ধরে আছে সে, তাকিয়ে আছে কাপের মধ্যে। "কি এমন হয়েছিলো স্যাল্লি যে জুবা তোমার ওপর চটে গেলো?" ক্যাডিটা এতো জ্বালাতন করে! স্যাল্লি কোন জবাব না দিয়ে কাপটা মেঝেতে নামিয়ে রাখলো, কাৎ হয়ে তার থেকে খানিকটা কফি গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে। হঠাৎ আবার তার মুখ থেকে সেই অস্বাভাবিক আওয়াজ বেরুতে লাগলো! আমরা হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে!

—"এখন," ডিলসে তাকে সান্ত্বনা দেয়, "এ-সব বাজে দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলো দেখি। নিজেকে একটু সামলাবার চেষ্টা করো। এখানে খানিকটা বিশ্রাম করে তোমাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি চলো।" ডিলসে চলে গেলো বাইরে।

স্যাল্লির দিকে তাকালাম আমরা। তার ঘাড়টা মাঝে মাঝে কেঁপে-কেঁপে উঠছে, কিন্তু আর সেই শব্দটা কই আর বেরুচ্ছে না মুখ থেকে। আমরা সবাই মিলে আবার জিজ্ঞেস করি: "জুবা তোমার কি করবে স্যাল্লি? সে তো এখানে নেই, তবে তোমার কিসের ভয়?"

ন্যান্সি শুধু শান্ত দু'টি চোখ তুলে তাকায়। "সে-রাত্রে আমরা সবাই মিলে কেমন ফুর্তি করেছিলাম, না?"

—"আমি করিনি," জেসন বললো হঠাৎ, "আমি তো সেদিন কোন ফুর্তিই করিনি।"

—"তুমি যে ঘুমুচ্ছিলে," ক্যাডি মনে করিয়ে দেয় তাকে, "তুমি তো ছিলেই না সেখানে।"

—"আজকে আমার বাড়ীতে চলো, সেদিনকার চেয়েও বেশী ফুর্তি হবে," ন্যান্সি বললো।

—"মা যে আমাদের যেতে দেবেন না," আমি বললাম, "অনেক দেরী হয়ে যাবে।"

—"তাঁকে আর বিরক্ত করতে হবে না," ন্যান্সি বলে, "কাল সকালে বললেই চলবে। কিছুই বলবেন না আমার বাড়ী গেলে।"

—"আমাদের যেতেই দেবেন না," আবার বলি আমি।

—"তাহ'লে থাক," ভয়ে ভয়ে ন্যান্সি বলে, "এখন আর জিজ্ঞেস করে কাজ নেই।"

—"তিনিও যেতে দেবেন না আর আমরাও বলতে পারবো না," ক্যাডি স্পষ্ট কথা জানিয়ে দেয়।

—"তোমরা সবাই মিলে গেলে আমি বরঞ্চ জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি," জেসন বললে।

—"ভারী ভালো হয় তাহ'লে, খুব মজা হবে দেখো," ন্যান্সি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, "একবার না হয় যাও তুমি। কোন ভয় নেই।'

—"না, ভয় আমি করি না। মাকে না বলেও যেতে পারি।" ক্যাডি বললো, "তবে ভয় শুধু জেসনকে, শেষ কালে যদি বলে দেয় মাকে?"

—"না, না, আমি কোন কথা বলবো না", জেসন তাড়াতাড়ি বলে উঠলো।

—"হ্যাঁ গো মশাই, শেষ কালে তুমিই সব ভেস্তে দেবে।" ক্যাডি বক্রোক্তি করে তাহাকে।

—"কিছুতেই না", লাফিয়ে ওঠে জেসন উত্তেজনায়।

—"আমার সংগে যেতে ভয় করবে তোমার জেসন?" ন্যান্সি জিজ্ঞেস করলো।

ক্যাডি বললো, "গলিটা ভারী অন্ধকার, আমরা মাঠের দিকের দরজা দিয়ে যাবো, ন্যান্সি। তা না হলে কিছু একটা লাফিয়ে উঠলেই জেসন কাঠ হয়ে যাবে ভয়ে।"

—"আজ্ঞে না", জেসনও প্রতিবাদ করে সজোরে। আমরা গলি দিয়ে এগোচ্ছি, আর ন্যান্সি জোরে জোরে গল্প করছে।

—"অতো জোরে জোরে কথা বলছো কেন ন্যান্সি?" ক্যাডি প্রশ্ন করে তাকে।

—"কে, আমি?" ন্যান্সি উত্তরে বলে, "শোন ছেলের কথা, আমি না কি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছি!"

—"ঠিক বক্তৃতা দেওয়ার মতো কথা বলছো তুমি," ক্যাডি বললো। "তোমার ভাব ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে, বাবাও যেন এখানেই কোথাও আছেন।"

—"কে, আমি বুঝি বড্ড জোরে কথা বলছি মিষ্টার জেসন?" হেসে হেসে ন্যান্সি বললো।

—"দেখ ভাই, ন্যান্সি জেসনকে মিষ্টার বললো।" ক্যাডি আশ্চর্য হয়ে যায়।

—"বলো দেখি এবার, তোমরা কেমন করে কথা বলছো?" ন্যান্সি উল্টে প্রশ্ন করে।

—"কৈ, আমরা তো জোরে জোরে কথা বলছি না", ক্যাডি উত্তর দেয়, "তুমিই বরঞ্চ বাবার মতো—"

—"চুপ", ন্যান্সি হঠাৎ থামিয়ে দেয় তাদের। "একটু থামো তো মিষ্টার জেসন্।"

—"ন্যান্সি, জেসন্‌কে বার-বার মিষ্টার বলছো কেন?"

—"চুপ।" ন্যান্সি আবার থামিয়ে দেয় তাদের। খালের যেখানটায় সে তারের বেড়া পেরিয়ে হেঁটে পার হয়, সেইখানেই ন্যান্সি জোরে জোরে কথা বলছিলো লক্ষ্য করলাম। তার পর আমরা ন্যান্সির বাড়ী এসে পড়লাম। তাড়াতাড়ি সে দরজা খুলে ফেললো। বাড়ীর গন্ধটা ঠিক যেন প্রদীপের মতো, আর ন্যান্সির গন্ধটা পলতের মতো, পরস্পরের গন্ধের জন্যেই যেন এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলো আবহাওয়া। আলোটা জ্বালিয়ে সে হুড়কো দিয়ে দিলো দরজায়। তার পর আমাদের দিকে তাকিয়ে গল্প ফেঁদে বসলো।

—"এখন আমরা করবো কি?" ক্যাডি প্রশ্ন করে।

—"কি করতে চাও শুনি?" ন্যান্সি জানতে চায়।

—"মজা করবে বলে আমাদের তো ডেকে এনেছো তুমি?" ক্যাডি মনে করিয়ে দেয়।

—"ন্যান্সির বাড়ীতে কিসের যেন একটা গন্ধ বেরুচ্ছে," জেসন বললো নাক সিঁটকে, "আমি এখানে থাকতে চাই না, আমি বাড়ী যাবো।"

—"যাও তাহ'লে," ক্যাডি নির্বিকার চিত্তে উত্তর দেয়।

—"একলা যাবো কি করে?"

—"এখুনি আমরা একটা মজা করবো জেসন," ন্যান্সি স্তোক দেয়।

—"কেমন করে? "ক্যাডি কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

ন্যান্সি দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো, সেখান থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো শূন্যদৃষ্টিতে, সে যেন কত দূরে চলে গেছে।

—"কি করতে চাও বলো তো?" কেটে কেটে বলে কথা ক'টি ন্যান্সি।

—"আমাদের একটা গপ্পো বলো তুমি," ক্যাডি ধরে বসে, "গপ্পো বলবে?"

—"হ্যাঁ।"

—"তাহ'লে বলো।"

"—তুমি কোন গপ্পো জানো?" ক্যাডি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসে।

—"হ্যাঁ," ন্যান্সি জবাব দেয়, "নিশ্চয়ই জানি।"

উনুনটার সামনে একটা চেয়ার টেনে সে বসে পড়ে। আগুন জ্বলছে, ঘরটা গরম হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে, অথচ এতো আগুনের কোন প্রয়োজনই নেই। ন্যান্সি গল্প আরম্ভ করলো এবার। চোখের সঙ্গে সমতা রেখে এগিয়ে চললো গল্পের কাহিনী। তার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে অন্য কেউ। কোথায় নেমে গেছে তার কণ্ঠস্বর, অন্য কোথাও চলে গেছে ন্যান্সির মন। মনে হচ্ছে, বাইরে

থেকে আসছে তার কথাগুলো ভেসে। কাপড়ের বোঝা মাথায় নিয়ে বেড়া পার হতে হতে যেন সে কথা বলছে—"খালের মধ্যে দিয়ে রাণী আসছে, আর একটা শয়তান যেন কোথায় লুকিয়ে আছে খারে-পাশে। খালের ভিতর দিয়ে যেতে-যেতে রাণী বললো, "এই খালটা যদি কোন রকমে পার হয়ে যেতে পারি—"

"কোন্ খালটা ?" গল্পের মাঝখানেই ক্যাডি প্রশ্ন করে বসে, "সেই খালের মধ্যে রাণী গেলো কেন ?"

—বাড়ী যাবার জন্যে," ন্যান্সি তাদের বুঝিয়ে বলে, "সেই খালটা পেরিয়েই যে রাণীর বাড়ী।"

"রাণী বাড়ী যাচ্ছে কেন একলা ?" ক্যাডির মনে তবুও প্রশ্ন।

কথা বন্ধ করে ন্যান্সি আবার আমাদের দিকে তাকালো। জেসন ছোট বলে প্যান্টের বাইরে থেকে পা দু'টো ছড়িয়ে বসে আছে। "এটা আবার একটা গল্প হলো না কি ?" মুখ ভার করে সে বলে, "আমি বাড়ী ফিরে যাবো।"

—"আমারো মনে হয় সেই ভালো।" ক্যাডি উঠে পড়ে বললো, "বাড়ী রেখে বলতে পারি, বাবা-মা আমাদের জন্যে বসে আছেন।" কথাগুলো বলে সে দরজার দিকে পা বাড়ালো।

"না", তাড়াতাড়ি উঠে এসে ন্যান্সি বাধা দেয়, "দরজা খুলো না।" ক্যাডি পাশ কাটিয়ে সোঁ করে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু খিলে হাত দিলো না।

—"কেন খুলবো না বলো তো ?" ক্যাডি বললো।

—"আলোর কাছে চলো বলছি", ন্যান্সি মিনতি করে, "এখুনি চলে যেও না তোমরা, লক্ষ্মীটি।"

—"আমি বাড়ী যাবো", জেসন জোর ধরে এবার। "আমি বলে দেবো সব।"

—"আর একটা গল্প বলবো তোমাকে", ন্যান্সি তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করে। বাতির কাছে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ক্যাডির দিকে তাকায়। দৃষ্টি তার স্থির শান্ত, যেন নাকের ওপর কাঠি রেখে তার দিকে নিশানা করে তাকিয়ে আছে লক্ষ্যভেদ করতে।

—"শুনতে চাই না তোমার বাজে গল্প" জেসন ছিটকে উঠে। "তোমার গল্পে লাথি মারি আমি।"

—"এটা খুব ভালো গল্প", ন্যান্সি প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করে। "আগেরটার চেয়ে অ-নে-ক ভালো।"

—"কিসের গল্প ?" ক্যাডি জিজ্ঞেস করে ঠাণ্ডা হয়ে। ন্যান্সি আলোর পাশে দাঁড়িয়ে তার লম্বা বাদামী হাত দিয়ে আলোটা নাড়া-চাড়া করে থামকা।

—"আলোতে হাত দিয়েছো", আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে ক্যাডি, "গরম লাগছে না তোমার ?"

আলোর ওপর আর একবার হাত দিয়ে আস্তে আস্তে হাতটা সরিয়ে নেয়। হাত দু'টো যেন শিরা-উপশিরা দিয়ে কব্জির সঙ্গে বাঁধা।

—"তার চেয়ে অন্য কিছু করো একটা।" ক্যাডি পরামর্শ দেয়।

—"আমি বাড়ী যাবো", জেসনের সেই এক কথা।

—"খানিকটা কেক আছে ঘরে।" ন্যান্সি ক্যাডির দিকে তাকালো, তার পর জেসনের দিকে, তার পর আমার দিকে, সব শেষে আবার ক্যাডির দিকে।

—"কেক আমি খাই না", জেসন বললো, "আমি লজেন্স খাবো।"

ন্যান্সি তার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে বললো, "তাহ'লে 'পপার'টা একটু ধরো।"

—"বেশ। 'পপার' ধরতে দিলে থাকতে পারি আমি।" জেসন বললো, "ক্যাডিটা ধরতে পারে না, ওকে ধরতে দিলে আমি থাকবো না।"

ন্যান্সি আগুন জ্বালাতে লাগলো। "দেখো, দেখো, ন্যান্সি আগুনে হাত দিচ্ছে", ক্যাডির গলায় বিস্ময়। "কি করছো তুমি ন্যান্সি ?"

—"কেক তৈরী করবো", ন্যান্সি উত্তর দেয়। "কিছু তৈরী করা যাক কি বল ?" তার পর খাটের তলা থেকে ভাঙা পপারটা টেনে বের করলো ধূলো ঝেড়ে। ভাঙা দেখেই জেসন কান্না জুড়ে দিলো জোরে। "চাই না আমি কেক খেতে"—

—"যেমন করেই হোক, আমরা বাড়ী চলে যাবো", ক্যাডিও বেঁকে বসে। "চলে এসো কোয়েন্টিন্।"

—"দাঁড়াও", ন্যান্সি বললে, "একটুখানি দাঁড়াও, সব ঠিক করে দিচ্ছি। আমাকে তোমরা শুধু একটুখানি সাহায্য করো।"

—"আমরা পারবো না", ক্যাডি বললো, "অনেক দেরী হয়ে গেছে আজ।"

"তুমি একটু সাহায্য করো জেসন", ন্যান্সি অনুনয় করে জেসনকে, "তুমি একটু আমাকে সাহায্য করবে না ?"

—"না", জেসন স্পষ্ট গলায় জানিয়ে দেয়। "আমি বাড়ী যাবো ওদের সংগে।"

—"চুপ", ন্যান্সি হঠাৎ ফিস-ফিস করে বলে, "চুপ, একটুখানি থেকে দেখো আমি কি করি। দেখবে এটাকে আবার নতুন করে দেবো, তখন তুমিও 'কেক' সেঁকতে পারবে।" কথা বলতে বলতে ন্যান্সি সেটাকে একটা 'তার' দিয়ে বাঁধতে থাকে।

—"বাজে হলো", ক্যাডি মন্তব্য করে।

—"এতেই হবে।" ধরা-গলায় ন্যান্সি জবাব দেয়। "এবার আমাকে একটু সাহায্য করো।" আমরা কেকগুলো তার হাতে দিতে লাগলাম আর সে আগুনে সেঁকতে লাগলো।

—"এ সব তো কেক হচ্ছে না", জেসন আবার বেঁকে বসলো। "আমি বাড়ী যাবো—"

—"একটু দাঁড়াও না", ন্যান্সি আবার তাকে থামাবার চেষ্টা করে "দেখো না, টপ-টপ করে কেমন হচ্ছে, তোমার মজা লাগছে না ?" ন্যান্সি বসেছে বাতির কাছ ঘেঁসে। বাতিটা দপ-দপ করে জ্বলে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে শুধু।

—"আলোটা একটু কমিয়ে দাও না ?" আমি বলি।

—"ঠিক আছে", ন্যান্সি বললো, "কালি পরিষ্কার করে দিলেই চলবে। একটু সবুর করো, এক মিনিটের মধ্যেই কেক তৈরী হয়ে যাবে।"

—"বিশ্বাস হয় না যে এক মিনিটের মধ্যেই সব হয়ে যাবে" ক্যাডি অবিশ্বাস ভরে বললো, "এবার আমাদের বাড়ী ফিরতেই হবে। মা বাবা এতক্ষণ খুব ভাবছেন —"

—"না, না", স্ক্যান্সি বলে উঠলো। "আর তৈরী হলো বলে। ডিলসে মাকে বলবে'খন যে তোমরা আমার সংগে এসেছো। তোমাদের বাড়ীতে তো বহু দিন থেকেই চাকরী করছি, আমার বাড়ীতে থাকলে তাঁরা ভাববেন না। একটু বসো, সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

এই সময় জেসনের চোখে ধোঁয়া লাগায় সে কেঁদে 'পপার'টা দিলো আগুনের মধ্যে ফেলে। ভিজে একটা কম্বল এনে স্ক্যান্সি তাঁর মুখ মুছিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তার কান্না থামলো না।

—"চুপ করো লক্ষ্মীটি", স্ক্যান্সি তাকে থামাবার চেষ্টা করে। কিন্তু চুপ করার নামও করে না সে। ক্যাডি আগুন থেকে পপারটা তুলে নেয় সন্তর্পণে। "এঃ, সব ক'টা কেকই পুড়ে গেছে দেখছি, ক্যাডির দুঃখ হয়, "আরো কিছু কেক করা দরকার দেখছি স্ক্যান্সি।"

স্ক্যান্সি অনেকক্ষণ ক্যাডির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় 'পপার'টা খুলে কালো কালো পোড়া কেকগুলোর ওপরের ছাই মুছতে থাকে লম্বা লম্বা বাদামী হাত দিয়ে।

—"আর কিছু আছে না কি ওতে ?" ক্যাডি আবার প্রশ্ন করে।

—"এই দেখো না, এগুলো এখনো পোড়েনি, আমাদের খাওয়ার মতো—"

—"আমি বাড়ী যাবো স্ক্যান্সি," জেসনের বায়না আরো জোর হয়ে ওঠে, "মাকে সব কথা বলে দেবো আমি।"

—"চুপ," ক্যাডি তাকে থামিয়ে দিলো। দেখলাম, ইতিমধ্যেই স্ক্যান্সি দরজার দিকে তাকিয়েছে স্তব্ধ হয়ে। "কেউ যেন আসছে মনে হচ্ছে ?" ক্যাডির মুখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা।

আবার স্ক্যান্সির মুখ দিয়ে সেই শব্দ বেরিয়ে আসে। 'কোলের ওপর কনুই রেখে আস্তে আস্তে শব্দ করতে করতে এবার হঠাৎ তার মুখ বেয়ে বড়-বড় ফোঁটায় ঘাম ঝরে পড়ে। গাল বেয়ে মুক্তোর মতো চকচকে ঘামের ফোঁটা অবিশ্রান্ত ধারায় ঝরে পড়ছে।

—"স্ক্যান্সি, তুমি কি কাঁদছো ?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

—"না, না, কাঁদবো কেন ?" স্ক্যান্সি চোখ বুজে উত্তর দেয়। "আমি কাঁদিনি তো, কিন্তু কে আসছে বল তো এত রাত্রে ?"

—"কি করে জানবো," ক্যাডি উত্তর দেয়। তার পর দরজার কাছে গিয়ে দেখতে থাকে সুতীক্ষ্ণ ভাবে।

—"এবার আমরা বাড়ী চলে যাবো," হঠাৎ খুশী-ভরা গলায় চীৎকার করে ওঠে সে, "বাবা এসে গেছেন।"

—"আমি বাবাকে সব কথা বলে দেবো," জেসন নেচে ওঠে যেন, "তোমরা সবাই মিলে আমাকে টেনে এনেছো এখানে।"

এখনো স্ক্যান্সির মুখ বেয়ে তেমনি করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে, এবার সে চেয়ারে গিয়ে বসলো আস্তে আস্তে। "শোন, তোমার বাবাকে বলবে যে আমরা একটু খেলা করতে এসেছিলাম এখানে। বলবে, কাল সকালে তোমরা বাড়ী যাবে। আমিও যাবো তোমাদের সংগেই, আমি মেঝেতে গিয়েই শোব, কোন বিছানা-পত্রের দরকার নেই। আমরা সবাই একসংগে মজা করে শোব, আচ্ছা ?"

—"আমি সব কথা বলে দেবো," জেসন বলেই চলে, "তুমি [illegible] আমার চোখে ধোঁয়া দিয়ে দিয়েছো।"

বাবা এসে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। স্ক্যান্সি চেয়ার ছেড়ে উঠলো না। "বলো ওঁকে," স্ক্যান্সি সূত্র ধরিয়ে দিতে চায়।

—"ক্যাডি এখানে আমাদের টেনে এনেছে বাবা", জেসন এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে, "আমি আসতে চাইনি মোটেই।"

বাবা আগুনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। স্ক্যান্সি তাকিয়ে রইলো তাঁর মুখের দিকে।

—"র‍্যাশেল খুড়ীর বাড়ী গিয়ে থাকতে পারোনি ?" ধমকের সুরে বললেন বাবা। স্ক্যান্সি তখনো হাঁ করে তাকিয়ে। হাত দু'টো কোলে গোঁজা। "সে তো এখানে নেই", বাবা বললেন, "তুমি বোধ হয় তার আত্মাকেই দেখে থাকবে।"

—"খালের মধ্যে আছে সে," স্ক্যান্সি বললো। "এই কাছের খালটায় সে লুকিয়ে আছে।"

—"বোকা কোথাকার !" বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন এবার। স্ক্যান্সির মুখের দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করেন, "তুমি ঠিক জানো ?"

—"প্রমাণ পেয়েছি আমি," স্ক্যান্সি বললো।

—"কি প্রমাণ ?"

—"এইটে পেয়েছি। বাড়ীর ভেতর পড়েছিলো এটা। এটা শুয়োরের হাড় ; আলোতে দেখুন এখনো রক্ত-মাংস লেগে আছে। সে বাইরে কোথাও আছে। আপনারা বেরিয়ে গেলেই আমি মারা পড়বো।"

—"কে মারা পড়বে ?" ক্যাডি বললো।

—"আমি মিথ্যে কথা বলিনি।" জেসন নিজেকে সত্যবাদী বলে জাহির করতে ব্যস্ত হয়।

—"চুপ করো," বাবা আবার ধমকে ওঠেন।

—"সে এতক্ষণ বাইরেই ছিলো," স্ক্যান্সি বলে, "এই খানিকক্ষণ আগেও জানলা দিয়ে উঁকি মারছিলো, আপনাদের চলে যাবার অপেক্ষা করছে শুধু। আপনারা না থাকলে আমি আর বাঁচবো না।"

—"আমি কি করবো তার ?" বাবা বলে ওঠেন, "দরজায় তালা দাও, চলো তোমাকে র‍্যাশেল খুড়ীর বাড়ীতে রেখে আসি।"

—"তাতে কিছুই হবে না।"

—"তাহ'লে কি করতে চাও শুনি ?"

—"আমি কি করে বলবো বলুন," স্ক্যান্সি হতাশায় ভেঙে পড়ে, "আমি কিছু ভাবতে পারছি না।"

—"কি বলছো তুমি স্ক্যান্সি ?" ক্যাডি মাঝখানেই প্রশ্ন করে।

—"কিছু না," বাবা বললেন।

—"ক্যাডি আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে।" জেসন পুনরুক্তি করে আগের কথা।

—"র‍্যাশেল খুড়ীর বাড়ীই চলো বরং," বাবা উপদেশ দেন।

—"তাতে কোন সুবিধে হবে বলে মনে হয় না," স্ক্যান্সি বললো। আগুনের সামনে বসে মনের আবেগে হাঁটু দু'টো চেপে ধরে বসে থাকে সে।

—"আরে মলো যা", বাবা আরো রেগে যান ওর নির্লিপ্ততা দেখে, "চলো তোমাকে রেখে আসি, আমাদের যে শোবার সময় হয়ে গেলো।"

—"আপনাদের সংগে আমিও যাবো।" ন্যান্সির গলায় অজস্র আকুতি। "না হলে আমি মারা পড়বো। লভলেডীর কাছে আমার কিছু টাকা জমা আছে—"

মিঃ লভলেডী হচ্ছে এক জন নোঙরা, যাচ্ছেতাই লোক, নিগ্রোদের ইন্সিওরেন্সের দালাল। প্রতি শনিবার সকালে ১৫ সেণ্ট করে আদায় করার জন্যে তাদের বাড়ী-বাড়ী ঘুরে বেড়ায়। হোটেলে সে আর তার স্ত্রী থাকতো। এক দিন সকালে দেখা গেল, স্ত্রীটি আত্মহত্যা করেছে। স্ত্রী মরার পর লভলেডী তার ছোট মেয়েটিকে নিয়ে কোথায় যেন চলে যায়। কিছু দিন থেকে সহরের রাস্তায় আবার তাকে দেখা যাচ্ছে, শনিবারে শনিবারে আবার সে টাকা আদায় করে বেড়াচ্ছে।

জেসনকে কাঁধে তুলে নিয়ে বাবা আমাদের ডাকলেন। আমরা এগিয়ে গেলাম দরজা দিয়ে। ন্যান্সি তখনও আগুনের কাছে তেমনি নিশ্চল হয়ে বসে।

—"দরজার খিলটা লাগিয়ে দাও ন্যান্সি।" যাবার সময় বাবা বলে গেলেন। তবুও ন্যান্সি এতটুকু নড়লো না, আমাদের দিকে ফিরে তাকালোও না একবার। আমরা এগিয়ে চললাম, তখনও ন্যান্সি দরজাটা খোলা রেখেই বসে আছে।

"বাবা", ক্যাডি জিজ্ঞেস করলো উৎসুক হয়ে, "ন্যান্সি অন্ধকারকে অতো ভয় করে কেন? জুবা ওর কি করবে?"

—"জুবা তো নেই এখানে", জেসন মুরুব্বিয়ানা করে বলে।

—"না", বাবাও বললেন, "সে এখানে নেই, কোথাও চলে গেছে।"

—"তবে যে সে বলছিলো খালের মধ্যে জুবা লুকিয়ে বসে আছে?" ক্যাডি আবার ফ্যাকড়া তোলে। আমরা খালটা লক্ষ্য করতে-করতে চলেছি। যেখানটা ঢালু হয়ে আঙুর ক্ষেতের দিকে চলে গেছে, সেখানটা দিয়ে আমরা আবার উঠতে লাগলাম।

—"কে আবার বসে থাকবে খালের মধ্যে?" বাবা জোর দিয়ে বলেন। চাঁদ উঠেছে আকাশে। খালটা আধা অন্ধকার, থমথমে স্তব্ধতা সেখানে জমাট বেঁধে রয়েছে। "যদি সে এখানে লুকিয়ে থাকে তাহ'লে আমাদের দেখতে পাবে বাবা?" ক্যাডি জিজ্ঞেস করে ভয়ে ভয়ে।

—"তুমিই তো আমাকে জোর করে এখানে এনেছো," বাবার কাঁধ থেকে জেসন বলে ওঠে, "আমি তো আসতেই চাইনি।"

খালটা নির্জন, শূন্য। আমরা কোথাও জুবাকে দেখতে পেলাম না। খোলা দরজা দিয়ে ন্যান্সিকেও আর ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। তবুও খাল পার হতে হতে তার সেই অস্বাভাবিক শব্দটা কানে আসছে। জেসন বাবার মাথার কাছে চুপটি করে বসে।

খাল পেরিয়ে আমরা ন্যান্সির জীবনবৃত্ত থেকে দূরে সরে এসেছি। এখনো খোলা দরজায় বাতি জ্বেলে সে অপেক্ষা করছে কার। আমাদের মধ্যে ব্যবধান পড়েছে একটা খালের। সাদা মানুষ ক'টি চলেছে এগিয়ে, একটা ধাক্কা খেয়ে কালো মানুষদের সংগে তাদের জীবন হয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন।

—"কে এখন আমাদের কাপড় কাচবে বাবা?" আমি জিজ্ঞেস করি।

—"আমি তো নিগ্রো নই," কাঁধের ওপর থেকে জেসন বলে ওঠে।

—"তুমি নিগ্রোদের চেয়েও অদ্ভুত," ক্যাডি তাকে বলে, "তুমি একটা বাচাল। পাশ থেকে যদি একটা কিছু লাফিয়ে পড়ে তখন বোঝা যাবে তুমি নিগ্রোদের চেয়েও অপদার্থ।"

—"আজ্ঞে না," জেসন প্রতিবাদ তোলে।

—"তুমি খালি কাঁদতেই আছো," ক্যাডি শ্লেষের সংগে বললো।

—"ক্যাডি!" বাবা এবার ধমক দেন।

—"কখনো না," জেসন বকুনী খেয়েও থামে না।

—"ছিঁচকাঁদুনে উল্লুক কোথাকার," ক্যাডিও ঝলসে ওঠে।

—"আঃ!" বাবা আরো বিরক্ত হন।

অনুবাদ : মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

জটায়ুর আত্মকথা

অনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমরা জটায়ু পাখী
আমাদের ঝরে পড়া আশা
সীতা বলে মনে হয় তাকে।
অনার্য রাবণ
যাকে নিয়ে পাড়ি দেয় আকাশ-পথেতে
নিঃশব্দে পুষ্পক রথে মেঘের আড়ালে।
তাই যেই আশা ভাঙ্গে
আমরাও ঘুম থেকে উঠে
বিবশ পাখাটা নেড়ে সুরু করি রণ,
প্রবল আঘাত পেয়ে
ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ে তো পালক।
টোপে-টোপে রক্ত পড়ে মাটি আর গাছের পাতায়
যেমন বিকেলে রোদ
নদীটার জল ছুঁয়ে যায়
আর যায় ছুঁয়ে
গাছের আওতা-পড়া স্যাঁতসেঁতে মাটি।
দুর্বল নিস্তেজ ঠোঁটে কামড়ের দাগ
এঁকে দিই ঘৃণিতের দেহে।
তারও শাণ দেওয়া ঝকঝকে উলংগ কৃপাণে
আমাদের দেহগুলো ক্ষতে ভরে ওঠে।
তার পর গতায়ু প্রাণেতে
নেমে এসে ঢলে পড়ি নিঝুম মাটিতে।
বন্দিনী সীতাকে
নিয়ে যায় চোখের আড়ালে।
এখানেই শেষ নয়, এর পরো
হয়েছে আরেক অংকে নাটকের অদ্ভুত সমাপ্তি,
আমাদের মৃত্যুর ইংগিতে
নির্বিঘ্নে এগিয়ে যাবে লক্ষণ ও রাম
আমরা জটায়ু পাখী প্রাণ দিয়ে যাই
তোমাদের বুকে-বুকে বেঁচে রব বলে।

জন-জাগরণের অগ্রদূত বিবেকানন্দ

স্বামী পূর্ণানন্দ

মূর্ছিত ভারত

শত শত শতাব্দী ধরে পশ্চিম ও উত্তর থেকে ছুটে এসেছিল যত নব জাগ্রত, ভোগলুব্ধ, উন্মত্ত মানুষের প্লাবন এই ভারতের প্রশান্ত বুকে। ঐ সব পশুধর্মী হিংস্র মানুষের সহস্র বৎসরব্যাপী অবিরাম আঘাতে ও সর্ব্ববিধ অত্যাচারে জর্জরিত ভারতের মহান্ আত্মা পড়েছিল সম্বিতহারা বিরাট কুম্ভকর্ণরূপে।

কিন্তু মূর্ছিত ভারত মরেনি। পাশবিক অত্যাচারের বিষাক্ত সকল আঘাত বুক পেতে গ্রহণ করে ভারতের চিরসহিষ্ণু অন্তর-দেবতা বিষপায়ী মহেশের মতই কিছু কাল আচ্ছন্ন হয়েছিল মাত্র। বিধাতার নিগূঢ় ইচ্ছায় এই ভারত চিরদিনই জগতের সকল জাতিকে মানব-জীবনের চরম সার্থকতা লাভের ইঙ্গিত দান করেছে, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দিয়েছে।

ভবিষ্যতেও যে ভারতকেই সমগ্র মানবের পথের সন্ধান দিতে হবে তারই প্রমাণস্বরূপে নিখিল বিশ্বের ভোগ-বাসনার ধূম্রজাল-কলঙ্কিত আবেষ্টনের মধ্যে এই ভারতে, বিশেষ করে এই বাংলার বুকে, সহসা জ্বলে উঠলো এক মহা শক্তিশালী জ্যোতিষ্ক মণ্ডল,—রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, তিলক ও লাজপৎ, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি রূপে।

এই জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের কেন্দ্রপতিরূপে ভবিষ্যতের পথে নব চেতনার অরুণরশ্মি বিকীর্ণ করতে প্রদীপ্ত প্রভাত-সূর্যের মতই দেখা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এবং বিশ্বমানবতার অভ্রান্ত অগ্রদূতরূপে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

বিশ্ব-শিল্পীর অভাবনীয় কৌশলেই কোন অজানা কাল হতে অবিরাম চলেছে বিরাট বিশ্বের ভাঙা-গড়ার খেলা। যে যন্ত্র দিয়ে তিনি জগতকে ভাঙেন ও গড়েন, তাকেও বিরাট শক্তি দিয়ে ঐ বিশ্ব শিল্পীই সময় মত পাঠিয়ে দেন এই জগতের মাঝে। এ যে নিছক কল্পনা নয় মানুষের, তারই প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিমগ্ন দৃষ্টিতে অতীত ও ভবিষ্যতের আভাসপূর্ণ দৈব চিত্রদর্শনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সে দিন দেখিয়েছিলেন, সৃষ্টি-রহস্যের শেষ স্তরে অখণ্ডের জ্যোতির্ময় লোক; সকল জ্ঞানের ও শক্তির আধার সাত জন জ্যোতিদেহধারী বিরাট ঋষিকে। আর দেখেছিলেন, ঐ জ্যোতি-সমুদ্রে জ্যোতির্ময় শিশুর প্রেমমূর্ত্তি। যাঁর অপরূপ হাস্যমধুর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে জ্ঞানপ্রবুদ্ধ ঋষি—এই জগতে নেমে আসার সহাস মৌন সম্মতি দিয়েছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনেও শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হন। এবং ঐ সমাধি অবস্থাতেই চিনতে পারেন, এই নরেন্দ্রনাথই সেই জ্ঞানপ্রদীপ্ত জ্যোতির্ময় ঋষি। আর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই সেই—অগ্রবর্তী জ্যোতির্ময় অখণ্ড রাজ্যের প্রেমময় শিশু।

মুসলমান গর্ব্ব খর্ব্ব করে ইংরেজ সেদিন ভারতের বুকে উড়িয়ে দিয়েছে পাশ্চাত্যের নব জাগ্রত দুর্ব্বার শক্তির রক্ত পতাকা। বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট ভারতের নব রাজধানী কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহামিলন নাটকের অভিনব রঙ্গমঞ্চ। ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় সমাজ—ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সভ্যতায় জোয়ার ভাটার খরপ্রবাহে সৃষ্ট হয়েছে ভয়াবহ ঘূর্ণি। চারিদিকে জেগে উঠেছে নূতন ও পুরাতনপন্থীর কণ্ঠে কণ্ঠে গর্ব্ববিদারি অন্ধ ও তিক্ত গর্জন।

এমনি বিভ্রান্তকারী যবনিকার অন্তরালে, সবার অলক্ষ্যে নেমে এলেন সেই জ্যোতির্ময় জ্ঞানী ঋষি—নরেন্দ্রনাথ—বিবেকানন্দরূপে। কলিকাতায় বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরী দেবীর কোল আলো করে দেবদুর্লভ শিশু নরেন্দ্রনাথ দেখা দিলেন ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারীর অখ্যাত অজ্ঞাত শুভ দিনে।

স্বপ্নভঙ্গ

বিরাট সম্ভাবনাময় জীবন-প্রবাহ মহৎ হতে মহত্তর পথেই চির প্রবাহিত। নরেন্দ্রনাথের শৈশব ও বাল্যের ধূলো খেলাও শেষ হলো অনন্তসাধারণ ভাবের মধ্য দিয়েই। পূজোর খেলায়,—সন্ন্যাসী সাজে—ধ্যান ও উপাসনার খেলায়,—অনন্তের গুণগানে,—মহানন্দময় পবিত্র ক্রীড়া-কোলাহলে,—আশৈশব সংগঠন ও নেতৃত্বের খেলায়; এবং জ্ঞানার্জনের অপরিসীম ধৈর্য্য ও উৎসাহেই ভেসে গেল তাঁর সেই কৈশোর ও যৌবনের সোনালী দিনগুলি। জগৎ-নিয়ামক রাজশক্তির বিজয়-তিলক যাঁর কপালে প্রজ্জ্বলন্ত, বসুন্ধরায় সৌভাগ্য-শ্বেতহস্তী সোনার সিংহাসন পিঠে নিয়ে আপনি তাঁকে খুঁজে বেড়ায়!

বিদ্যালয়ে—জ্ঞানার্জনে এত সফলতা, বন্ধু-পরিচিত সমাজে এত যে সমাদর—নেতৃত্ব, ধনী পিতা-মাতার ঘরে এত যে সুখ-সম্ভোগ,—সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী ব্রাহ্ম-মন্দিরের এত যে উপাসনা—আদর্শবাদ, কিন্তু প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত স্থায়ী সে আনন্দ কোথায়?—শান্তি কোথায়? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কি এক অভাবের জ্বালা যে অন্তরে বেড়েই চলেছে। নরেন্দ্রনাথ স্থির হতে পারেন না। অধীর নরেন্দ্রনাথের অন্তরে যেন থেকে থেকেই ভেসে আসে কোন সুদূর বাঁশরীর এক বিশ্ব-প্লাবী সঙ্গীত,—"জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, ওরে উথলি উঠেছে বারি, ওরে প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।" কে যেন সদাই তাঁর কানে কানে বলে—"নরেন্দ্রনাথের জীবন সংসারের চলতি সাধারণ জীবন নয়। এ জগতে তাঁকে অনেক বিরাট কর্ম্ম করতে হবে। জগতে স্থায়ী মহা কল্যাণ করবার শক্তি দিয়েই তাঁকে পাঠিয়েছেন বিশ্বদেবতা।"

মহাসিন্ধু ও মহাকাশ

অবিরাম অন্তরের প্রেরণা এবং বাইরের নৈরাশ্য নরেন্দ্রনাথকে করে তুললো অধীর অশান্ত,—আপন গন্ধে অন্ধ কস্তুরী মৃগের মত। এই আবেগভরেই নরেন্দ্রনাথ ছুটে চলেছেন নিয়ত সম্ভব ও অসম্ভবের পানে। খ্যাত ও মহতের সন্ধান পেলেই ছুটে গিয়ে তাঁর ক্ষুধার্ত্ত অন্তর-আধারকে তুলে ধরছেন অমৃতে পূর্ণ করে নেবার আশায়। এমনি করেই সেদিনের বিখ্যাত সাধক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে, ফিরে এলেন ব্যর্থতার আঘাত নিয়ে।

তবুও নিরাশ হলেন না। মধুলুব্ধ অস্থির পতঙ্গের মতই নরেন্দ্রনাথ সন্ধান করতে লাগলেন, কোথায় রয়েছে তাঁর সহস্র-কোটা, বুক-ভরা মধু, সুবাসতামোদি সহস্রদল সেই পদ্ম।

১৮৮১ সালের নভেম্বরের শুভ সন্ধ্যায় নরেন্দ্রনাথের আশৈশব আকুল আগ্রহের প্রথম সফলতা লাভ হলো কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে, এক আনন্দ সম্মেলনের ভেতর দিয়ে। সেই দৈব সম্মেলনে সম্বর্দ্ধিত শ্রীরামকৃষ্ণ দেবদুর্লভকান্তি নরেন্দ্রের অমর কণ্ঠে "মন চল নিজ নিকেতনে"র সুরে—ভাবে—ও রসের অপূর্ব্ব পরিবেশে, এক নিমেষেই চিনে নিলেন, তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের লীলা-সহচরকে, ভবিষ্যৎ বিবেকানন্দকে। আনন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। মুছে গেল তাঁর অন্তর থেকে,—দু'চোখ থেকে, এই পার্থিব জন-সমাবেশের ছবি। দ্বিধাশূন্য কণ্ঠে, আনন্দাশ্রুপূর্ণ ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ গেয়ে উঠলেন, নরেন্দ্রনাথের সামনে এক অভাবনীয় স্তুতি-গাথা ;—"হে ঋষি, হে নররূপী নারায়ণ, আমি জানি, জগৎ-কল্যাণের জন্য তুমি আবার এসেছ এই ধরার ধূলায় !"

বিস্ময়ে সঙ্কোচে হতবাক্ নরেন্দ্র তবু কিছুই বুঝতে পারলেন না। তবু যেন তাঁর মনে হোলো,—"পরাণ পুরে গেল, হরষে হোলো ভোর !···প্রভাত হোলো যেই, কী জানি হোলো এ কি ! আকাশ পানে চাই, কি জানি কারে দেখি !···"

তবু এই স্তব-স্তুতিতেই সব তো শেষ হবার নয়। এ যে সূচনা মাত্র। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে তাঁর কথা নিয়ে গেলেন, দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে যেতেই হবে।

আপনভোলা নরেন্দ্রনাথ ভুলবার চেষ্টা করেও শ্রীরামকৃষ্ণকে ভুলে থাকতে পারলেন না। যেতেই হোলো তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে। ক্রমে উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রেম গভীর হয়ে এলো। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমপূর্ণ মহাশক্তির স্পর্শে, মহান্ আধার নরেন্দ্রনাথের প্রচণ্ড শক্তিধর অন্তর-দেবতাও ধীরে ধীরে স্বরূপে জাগ্রত হয়ে উঠলেন।

দক্ষিণেশ্বরের এবং যদু মল্লিকের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশী স্পর্শে নরেন্দ্রনাথ ভগবৎ-শক্তির অপূর্ব্ব দর্শন ও অনুভূতি লাভ করে বিস্ময়ে আনন্দে বিভোর হলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সঙ্গেই মেনে নিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর অদৃষ্ট-পরিচালক হৃদয়-দেবতা বলে। আর ঐ মন্দিরের মাকে জানলেন জগতের সর্ব্বশক্তির ও সকল ঘটনার মূল বলে।

কত কাল এই পীড়িত ভারতের তপস্যা-মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ ধ্যানগম্ভীর মহাকাশরূপে, গ্রহ-নক্ষত্ররূপী সদাজাগ্রত দৃষ্টি মেলে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন তাঁর প্রিয়তম চির অশান্ত মহাসিন্ধুরূপী অন্তরঙ্গ নরেন্দ্রনাথের জন্য। প্রমত্ত সিন্ধু সে দৃষ্টি, সে আহ্বান দেখেও দেখেনি,—শুনেও শোনেনি এত দিন। কিন্তু লগ্ন যখন এলো, তখনি চির-দুরন্ত নীল সিন্ধুর আনন্দোদ্বেল বাহুতরঙ্গ প্রসারিত হোলো চির প্রশান্ত মেঘমালাশোভী নিঃসীম নীলিমার কোমল কণ্ঠালিঙ্গনের সপ্রেম আগ্রহে।

প্রদীপ হতে প্রদীপে

১৮৮১ থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যে এই দু'টি যুগ-প্রবর্ত্তক মহান্ আত্মার মিলন সম্পূর্ণ হোলো জগতের নব তীর্থ ঐ দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুরের বাগান-বাড়ীতে। দক্ষিণেশ্বরের নিভৃত নিবাসে আপন সাধন-সঙ্গী করে পরম স্নেহভরে নরেন্দ্রনাথকে সকল সাধন-প্রণালী, এবং আত্মবিকাশের সকল শ্রেষ্ঠ পন্থাই শিখিয়ে দিলেন ; বুঝিয়ে দিলেন।

কিন্তু, কোন শ্রেয়োলাভের চেষ্টাই কঠোর পরীক্ষা ভিন্ন পরিপূর্ণ সফলতায় মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে না। নরেন্দ্রনাথের এই গুরু-লাভ ও অপূর্ব্ব সাধন-শিক্ষারও পরীক্ষার সময় এসে উপস্থিত হোলো অতি নিষ্ঠুররূপেই।

তখন নরেন্দ্রনাথের বি-এ ডিগ্রি লাভের পাঠ শেষ হয়েছে মাত্র। আকস্মিক পিতৃবিয়োগে এবং দারুণ অর্থাভাবে পারিবারিক ধ্বংস অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে। কোমলপ্রাণ, আত্মীয়বৎসল, নরেন্দ্রনাথ পরিবার-পরিজনের রক্ষায় অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠছেন। বার-বার আশাভঙ্গে, অর্থলাভের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ভগবানে বিশ্বাস পর্য্যন্ত শিথিল হয়ে এলো। তখন উপায়ান্তর না দেখে পাগলের মতই তিনি ছুটে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে গুরুর চরণপ্রান্তে।

গুরুর রহস্যপূর্ণ হাসিমুখের নির্দ্দেশ পেলেন। নরেন্দ্রনাথও মা ভবতারিণীর পায়ে প্রার্থনা করতে গেলেন ইহকালের সুখৈশ্বর্য্য, আকাঙ্ক্ষিত ধনসম্পদ। কিন্তু তিন বারের চেষ্টাতেও আত্মভোলা আজন্ম-বৈরাগী নরেন্দ্রনাথ প্রার্থনা করে এলেন, "মা, আমায় বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, ভক্তি দাও, জ্ঞান দাও। নিয়ত যাতে তোমার দর্শন পাই, এমনি করে দাও মা !"

এমনি করেই ভোলানাথের ভুল ভেঙ্গে গেল। তিনি বুঝলেন, সংসার তাঁর নয়। সংসারীর পথও তাঁর পথ নয়। তাঁর মহান জীবন একমাত্র মায়ের পূজার জন্য, জগতের কল্যাণের জন্যই সৃষ্ট !

দিন চলে যায়। কারু দিনই এক ভাবে থাকে না। ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-লীলার গোণা দিনও ফুরিয়ে এলো। দেহান্তকারী কঠিন ব্যাধি তাঁকে শয্যাশায়ী করে দিল। সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তেরা শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরের বাগান-বাড়ীতে একত্রে প্রাণপণ সেবায় নিযুক্ত হলেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে বিদায়ের দিন অতি দ্রুতই ঘনিয়ে এলো।

আর দেরী নেই দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ এক দিন প্রিয়তম নরেন্দ্রকে ডেকে সামনে বসালেন। অন্য সবাইকে সরিয়ে দিলেন ঘর থেকে। কিন্তু কোনো কথাই হোল না। নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, নির্ব্বাক্ শ্রীরামকৃষ্ণের দুই চোখে শুধু উষ্ণ অশ্রুই ঝরে পড়ছে। আর বিদ্যুৎ-শিখার মত এক তীব্র জ্যোতিরেখা শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ থেকে নরেন্দ্রনাথের শরীরে প্রবেশ করছে।

নরেন্দ্রনাথও ভয়ে-বিস্ময়ে নিস্পন্দ নীরব। সহসা শ্রীরামকৃষ্ণ ক্ষীণ কণ্ঠে সাশ্রু-ভাষায় বলে উঠলেন, "নরেন, আজ তোকে আমার সাধন-সর্ব্বস্ব দান করে ফতুর হলাম। এই শক্তির বলেই জগতে তোকে বিরাট কল্যাণ সাধন ক'রে যেতে হবে। কাজ শেষ হলেই আবার তুই ফিরে যেতে পারবি।"

এমনি করেই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-প্রদীপের আগুন দিয়ে নরেন্দ্র-নাথের জীবন-দীপকে জ্বালিয়ে দেওয়ার কাজ শেষ হোলো ১৮৮৬ সালের ১৭ই আগষ্ট।

অনন্তের আহ্বান

গুরুর দেহান্তে, গভীর বিচ্ছেদ-বেদনার আঘাতে ঘনীভূত হয়ে উঠলো বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি গুরুভাইদের প্রেমের আকর্ষণ। এবং প্রবল হয়ে উঠলো তাঁদের সাধন-প্রচেষ্টা বরাহনগরের অস্থায়ী মঠে। এই সাধনাই যে হবে নবীন সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ভিত্তিভূমি, তা দূরদর্শী বিবেকানন্দ ভাল করেই বুঝে ছিলেন।

কিন্তু, সমগ্র বিশ্বের দেবতা যাঁকে হাত বাড়িয়ে ডাকছেন—জগতের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে, নিখিল নর-সমাজের দুঃখের বোঝা মাথায় তুলে নিতে, সে কি আপন মুক্তিসাধনার নিভৃত গুহায় লুকিয়ে থাকতে পারে? তাই ১৮৮৮ খৃঃ সহসা এক দিন এক কৌপিন, উত্তরীয়, দীর্ঘ দণ্ড, ও কমণ্ডলু মাত্র সম্বল করে পথের ডাকে মুক্ত আকাশের তলে এসে দাঁড়ালেন পরিব্রাজক বিবেকানন্দ!

সমগ্র উত্তর-ভারত, বোম্বাই প্রদেশ হয়ে কুমারিকা দর্শন করে ছদ্মনামধারী ভ্রাম্যমান বিবেকানন্দ এসে দাঁড়ালেন মান্দ্রাজের যুব-সমাজের মাঝখানে। আলোয়ার ও ক্ষেত্রীর মহারাজা এবং বিশেষ ভাবে শিক্ষিত যুবকবৃন্দ দিশেহারা হয়ে পড়লো এক নূতন আশায় ও আনন্দে—বিবেকানন্দের দীপ্ত জীবনের সংস্পর্শে এসে। আর নিজের বুকে জ্বালিয়ে নিয়ে এলেন সমগ্র ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের চরম দুঃখ ও দুর্দ্দশার মর্ম্মদাহী অগ্নি-জ্বালা।

সবার শেষে হায়দরাবাদে এসেই তাঁর কানে এলো আমেরিকার ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের কথা। মানবপ্রেমী বিবেকানন্দ দরিদ্র ভারতের দুঃখে পাগল হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন, "আমি যাব আমেরিকা ও য়ুরোপের শক্তিধরদের ঐ মহাসম্মেলনে। আমি তাঁদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাবো এই মহান্ ভারতের দুঃখী মানুষদের দুর্দশা মোচনের জন্য।" বিঘ্ন-বিপদের সকল আশঙ্কা অগ্রাহ্য করে দুর্দ্দমনীয় বিবেকানন্দ মান্দ্রাজের আলাসিঙ্গা ও ক্ষেত্রীর মহারাজের সহায়তায়, ১৮৯৩ খৃঃ ৩১শে মে, তাঁর জীবন-তরী ভাসিয়ে দিলেন, কূলহারা মহাসিন্ধুর তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বুকে!

বিশ্ব-বিজয়

সিংহল ছেড়ে, চীন ও জাপানের নবোদিত সৌভাগ্যের আলোয় নয়ন-মন ভরে নিয়ে, দীর্ঘ তিন মাস পরে রিক্তহস্তে চিকাগোর বুকে এসে দাঁড়ালেন অজ্ঞাত কুলশীল, অদ্ভুত বেশধারী 'কৃষ্ণকায়' বিবেকানন্দ!

যে জগন্মাতার স্নেহে সার্থক হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনা, যে মায়ের পায়ে সঁপে দিয়ে গেলেন তাঁর প্রিয়তম বিবেকানন্দকে, সেই মাতৃশক্তিই অলৌকিক রূপে প্রকাশিত হোলো আমেরিকার ও য়ুরোপের নারী-সমাজের ভেতর দিয়ে।

ঐ মাতৃজাতির প্রভাবেই বিবেকানন্দ পেলেন রাজসিক ভোজ্য, সুখের আশ্রয় ও দুর্লভ সৌভাগ্য। ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের দুর্লঙ্ঘ্য দ্বার আপনিই মুক্ত হোলো মহা সহিষ্ণু বীর বিবেকানন্দের সামনে। অবিলম্বে সমগ্র আমেরিকায় বিঘোষিত হোলো বিবেকানন্দের বিজয়বার্ত্তা। 'দি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ডে' প্রচারিত হোলো—"নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, বিবেকানন্দই মহাসম্মেলনের শ্রেষ্ঠ বক্তা। তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছে, মহাজ্ঞানী ভারতীয়দের কাছে এ দেশ থেকে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠানো কি মুর্খতা!" ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সেই মহা বিজয়েরই প্রতিধ্বনি উঠলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিমত্ত ইংরেজের রাজধানী ইংলণ্ডে।

জয়মাল্য

আমেরিকায় ও য়ুরোপে বেদান্তের উদার ও মহান ধর্ম্মমত প্রচার করে; সকল ধর্ম্মের সমন্বয়ে এক বিরাট বিশ্ব-মানবতার সম্ভাবনাকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করে; ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে আমেরিকা ও য়ুরোপের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে; রাজযোগ—জ্ঞানযোগ—কর্ম্মযোগ ও দেববাণীর প্রচারের ফলে অগণিত গুণগ্রাহী আমেরিকাবাসী ও ইংলণ্ডীয় বন্ধু, হিতৈষী ও ভক্তের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও শুভেচ্ছা নিয়ে; শ্রীমতী ক্রিশ্চিনা, সেভিয়ার দম্পতি, শ্রীমতী ম্যাকুলিয়ড, শ্রীযুক্ত গুড উইন্ ও ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতির মত এক দল দেবচরিত্র সাধক কর্ম্মযোগী সঙ্গে বিবেকানন্দ ফিরে এলেন আবার এই ভারতের বুকে বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মতই, ১৮৯৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

দীর্ঘ তিন বৎসর পরে বিশ্ববিজয়ী বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ঘরে ফেরার এই মহা আনন্দবার্ত্তা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎগতিতে। সিংহল থেকে হিমাচল পর্যন্ত কেঁপে উঠলো তাঁর জয়গানে। সমগ্র ভারতের নব আশা ও আনন্দ-চঞ্চল জাগ্রত জাতির অকৃত্রিম ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পুষ্পাঞ্জলি তাঁর কণ্ঠকে শোভিত, ভারাক্রান্ত করে তুললো। বৈদান্তিক-কেশরী বিবেকানন্দ অভিনব জাতীয় চেতনাময় অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন সমগ্র ভারতকে। "ভারতে বিবেকানন্দ" বা "Colombo to Almora" গ্রন্থ আজিও সেই অভূতপূর্ব্ব বিজয়োৎসবের উজ্জ্বল ইতিহাসকেই বহন করছে।

বিদায়ের অশ্রুলেখা

বিজয়োৎসব শেষ হতে-না-হতেই আবার বিবেকানন্দের অবিরাম কর্ম্ম-প্রবাহ ছুটে চললো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শে ভারতকে নতুন করে গড়ে তোলার দুর্দ্দমনীয় আশায়। ১৮৯৭ খৃঃ রামকৃষ্ণ মিশন, এবং ১৮৯৮ খৃঃ বর্ত্তমানের এই বিশাল বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ হোলো। সঙ্গে সঙ্গে খোলা হোল নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়। এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে প্রচারিত হোলো উদ্বোধন, প্রবুদ্ধ ভারত, ও বেদান্ত-কেশরী প্রভৃতি মাসিকপত্র।

কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের অবিরাম কর্ম্মক্লান্তি, উপযুক্ত আহার-নিদ্রার অভাব ও দারুণ মানসিক ক্লেশ, ঐ অত্যুজ্জ্বল বিরাট হৈমশৃঙ্গতুল্য জীবনকেও উনচল্লিশ বৎসরেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। কোন চিকিৎসায় বা দেশভ্রমণেই ঐ নিঃশেষিত জীবন-প্রদীপ আর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো না। নির্ব্বাণের সকল চিহ্নই অতি দ্রুত দেখা দিল। বিবেকানন্দ স্পষ্টই বুঝলেন, পারে যাবার আর দেরী নেই।

তাঁর রুগ্ন কাতর কণ্ঠে ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো বিদায়-বেলার সেই অশ্রুমাখা বাণী,—"যাই, মা, যাই। তোমার স্নেহময় বুকে ক'রে যেখানে আমায় নিয়ে চলেছ, সেই শব্দহীন, অস্পষ্ট, অজ্ঞাত, অপূর্ব্ব রাজ্যে……আমি যাব…।"

আর ভারতের যুব-সমাজের হাতে দিয়ে গেলেন তাঁর বুকের অগ্নি-অক্ষরে লেখা দান-পত্র,—"হে তরুণগণ, তোমাদের কাছে আমি উত্তরাধিকার হিসাবে দিয়ে যাচ্ছি, অজ্ঞ, অসহায়, নিপীড়িত ভারতের জন্য আমার প্রাণের জ্বালা।"

তার পর, ১৯০২ খৃঃ ৪ জুলাই, ভারতের নব জাগ্রত, আনন্দ-মুখর অঙ্গনে নৈরাশ্যের ঘনান্ধকার ছড়িয়ে দিয়ে নির্ব্বাপিত হোলো ঐ অতুলনীয় রত্নদীপ। সে অন্ধকারে শুধু জেগে রইল ধ্রুবতারার মত—এক—অভিনব বেদবাণী—

"জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥"

শিক্ষা-দীক্ষা—শিক্ষকতা

জীবনানন্দ দাশ

খুব ভালোবেসে যে শিক্ষকতার কাজ নিয়েছিলাম এক দিন তা বলতে পারব না, শিক্ষকতায় লিপ্ত হয়ে থাকতে যে খুব ভালো লেগেছিল তাও নয়। তবে ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরিয়ে কি করব কোন্ কাজ নেব স্থির করতে করতে অনুভব করেছিলাম শিক্ষকতার—কলেজের মাষ্টারীর দিকেই আমার ঝোঁক বেশী। যেই সুযোগ এল—সুযোগ সেদিন বেশ খানিকটা তাড়াতাড়িই পাওয়া গিয়েছিল—কলকাতার একটি প্রাইভেট কলেজে খুব কম মাইনেতে—আজকাল পে-কমিশন নিয়ে সরকারী অফিসের দপ্তরীরা যা পায় তার চেয়ে কম পারিশ্রমিকে—চাকরী নিয়েছিলাম। তবে তখনকার দিনে টাকার কেনা-কাটার শক্তি আজকের চেয়ে বেশী ছিল। তার পর কয়েকটা প্রাইভেট কলেজে কাজ করেছি। ইস্কুলের মাষ্টাররা তো নিশ্চয়ই—বাংলা দেশের অধিকাংশ বেসরকারী কলেজের বেশীর ভাগ অধ্যাপকেরাই যা মাইনে পায় তাতে মনে হয়, আমাদের দেশের পরিচালকদের কোনো আস্থা ও শ্রদ্ধা নেই শিক্ষায় ওঁ শিক্ষকদের ওপর। অনেক বেসরকারী কলেজের শিক্ষকেরা মোটামুটি গভর্ণমেণ্ট অফিসের লোয়ার ডিভিসনের কেরাণীদের মত মাইনে পায় কিংবা তার চেয়েও কম। তবে গভর্ণমেণ্টের কেরাণীদের মাইনের একটা গ্রেড বা হার ঠিক করা আছে, প্রোমোশনের পথ আছে, চাকরীর নিশ্চয়তা আছে, পেনসন আছে; প্রায় কোনো প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদেরই এ-সব কোনো সুবিধা নেই। গভর্ণমেণ্টের আপার ডিভিশনের কেরাণীদের অবস্থা প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদের চেয়ে ঢের ভালো—অধিকাংশ কমার্শ্যাল ফার্মের কেরাণীদের একটা বিশেষ বড় সংখ্যার অবস্থা কলেজের প্রফেসরদের চেয়ে সচ্ছল, এবং ক্ষুদ্র অপর একটি শ্রেণীর সংস্থান প্রফেসরদের চেয়ে অনেক ভালো। প্রাইভেট ইস্কুলের মাষ্টারদের দশা প্রফেসরদের চেয়েও খারাপ—উপরোক্ত কেরাণীদের চেয়ে বেশী খারাপ।

আমি কেরাণীদের সঙ্গে প্রফেসরদের তুলনা করলাম এই জন্যে যে, আমাদের দেশে অনেকেরই মনে একটা ধারণা আছে, তথাকথিত ভদ্রসাধারণদের ভেতর কেরাণীরাই সব চেয়ে বেশী আর্থিক অবিচার সহ্য করে আসছে—বৃটিশ শাসনের গোড়ার দিক্ থেকে। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। গভর্ণমেণ্টের ও ধনিক অফিসগুলোর ওপরের—এমন কি মাঝামাঝি দিকের কেরাণীরা যে ধরণের মাইনে, বোনাস ও অন্য দু'-চার রকম সুবিধে পায়, বাঁধা-ধরা পথে তাদের ভবিষ্যৎ আর্থিক উন্নতির যত বেশী সহজ সুযোগ ও সুবিধে রয়ে গেছে প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদের তা নেই। গভর্ণমেণ্টের ও ভালো এমন কি, কোনো কোনো চলনসই কমার্শ্যাল অফিসগুলোতেও কেরাণীদের মাইনের একটা গ্রেড রয়েছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাইনে বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই সেদিন পর্য্যন্তও প্রায় কোনো প্রাইভেট কলেজেই প্রফেসরদের মাইনের বিশেষ কোনো ধরা-ছোঁয়া গ্রেড ছিল না; এক-এক জন প্রফেসর একই মাইনেতে পাঁচ-সাত-আট-দশ বছর—হয়তো আরো বেশী সময় কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু একই কলেজের অন্য দু'-চার-পাঁচ জন প্রফেসরের মাইনে সেই সময়ের মধ্যে হয়তো কিছু কিছু বেড়েছে। কাজেই গ্রেড বলে কোনো জিনিষের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়নি। কোনো প্রতিষ্ঠানের একই শ্রেণীর চাকুরেদের—ধরা যাক [illegible] দের যদি একটা গ্রেড ঠিক করা থাকে তাহ'লে কোনো কোনো ফোরম্যানদের ক্ষেত্রে সে গ্রেড আট-দশ বছরেও কাজ করবে না, বাকী দু'-চার জনের বেলায় দু'-এক বছর অন্তর চালু হতে থাকবে—কোনো ফ্যাক্টরি বা প্রতিষ্ঠানে এ রকম নিয়ম আছে কি না জানি না। কোনো ফ্যাক্টরি কি মনে করে এই চারটে ফোরম্যান গ্রাধারের মত, আর ঐ চারটে ফোরম্যানের মত, অতএব এদের মাইনের বেলা একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাক,—কারু কারু জন্যে একটা আবছায়া গ্রেড থাকুক ফ্যাক্টরির কর্ত্তাদের খুশী মতো, আর অন্যদের জন্যে কোনো গ্রেডেরই দরকার নেই—একই বেতনে আট-দশ—বেশী বছর তাদের আটকে রাখা হোক? কোনো ফ্যাক্টরিতে কি এ রকম অব্যবস্থা চলে কিংবা সরকারী বা ভালো সদাগরী অফিসের কেরাণীদের ব্যাপারে? না, তা চলে না। কিন্তু প্রাইভেট কলেজে এ রকম অনিয়ম চলেছে। এর জন্যে কাকে দায়ী করা যাবে সেইটেই ভাববার কথা। ইংরেজদের নিজেদের দেশে ইস্কুল-কলেজের মাষ্টারদের বেলা এ রকম অনাচার ঘটে বলে মনে হয় না, আমাদের চেয়ে ওদের পরিচালনা সহানুভূতি, সুনিয়ন্ত্রণ ও শ্রদ্ধা—এমন কি ইস্কুল-কলেজের ব্যাপারেও ঢের বেশী সক্রিয়, সফল। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা-দীক্ষা ও শিক্ষকদের ব্যাপার নিয়ে বৃটিশরা মাথা ঘামায়নি, আমাদের দেশে নিজের লোকেরাই যা করবার নিজেদের রুচি ও শক্তি অনুসারে করেছে। আমাদের দেশের প্রাইভেট কলেজের শিক্ষকদের মাইনে, গ্রেডের অভাব, কিংবা যে যে কলেজে গ্রেড আছে সেখানে সেগুলোর অদ্ভুত প্রয়োগ—আমাদের নিজেদেরই দুর্ব্বলতার প্রমাণ, অধ্যাপকেরা চোখ বুজে শিক্ষা দেওয়া জিনিষটাকে টাকাকড়ির সঙ্গে জড়িত করতে না চেয়ে (এ অপলক অন্তঃপ্রেরণা শুকিয়ে এসেছে প্রায়) অধ্যাপনার ও অধ্যয়নের খানিকটা কম-বেশী স্বপ্নসবল আত্মরতির ভেতর নিমগ্ন থেকে দেশের কর্ত্তাদের এই বিমুখতা অনেক দিন থেকে ক্ষমা করে এসেছে। কিন্তু টাকার মূল্য এমন দুঃসহ ভাবে কমে গেছে যে টাকা-কড়ি সম্বন্ধে কলেজ-ইস্কুলের মাষ্টারও সজাগ না হয়ে পারছে না।

আজকের এ লেখায় আমি প্রাইভেট কলেজের মাষ্টারদের সম্বন্ধেই বলছি; বলা বাহুল্য, প্রাইভেট ইস্কুলের মাষ্টারদের অবস্থা এ সব প্রফেসরদের চেয়েও খারাপ। দু'-একটি কলেজ ছাড়া খুব সম্ভব কোনো প্রাইভেট কলেজেই প্রফেসরদের মাইনের কোনো গ্রেড ছিল না। যেখানে ছিল সেখানেও সে জিনিষ কি রকম অশুদ্ধভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা বলেছি। আজকাল অবিশ্যি কোনো কোনো প্রাইভেট কলেজে প্রফেসরদের মাইনের একটা মাপ-জোঁক ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চালের মণ যখন চার পাঁচ টাকা ছিল, এক জোড়া জুতার দাম চার-পাঁচ টাকা, দু'-তিন টাকায় এক জোড়া ধুতি পাওয়া যেত—তখনই সত্তর-আশি টাকা থেকে সুরু করে প্রফেসরদের মাইনের উচ্চতম বৃদ্ধি—দেড়শো, একশো পঁচাত্তর টাকা অত্যন্ত নিদারুণ ভাবে আপত্তিজনক ছিল, কিন্তু আজকালকার ত্রিশ-চল্লিশ টাকার চালের বাজারেও দেখছি যাদের গ্রেডের ব্যবস্থা আছে সে সব অধিকাংশ প্রাইভেট কলেজেই সেই কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার মাইনের কোনো উনিশ-বিশ নেই

প্রফেসররা কি খাচ্ছে তাহ'লে ? কি পরছে ? সবাই গ্রেডও পাচ্ছে না ; সব কলেজে গ্রেড নেই ; যারা গ্রেড পাচ্ছে তাদের অবস্থাও এ রকম। কলেজের গভর্ণিং বডিগুলোর উকীলরা হাজার-বারোশো টাকা (কেউ কেউ আরো বেশী, হাইকোর্টের উকিল, জজের বরাদ্দ) মাসে মাসে পেলেও কলেজের প্রফেসরকে যে গোড়াতে একশো টাকার বেশী বেতন দেওয়া যেতে পারে না এবং চুল সাদা হয়ে গেলে মরবার আগে একশো পঁচাত্তর বড় জোর দু'শো দেওয়া চলে—এ সম্বন্ধে তাঁদের বিবেক এত পরিচ্ছন্ন যে, সত্যিই তাঁদের কোন দোষ দেয়া যায় না। মনের অগোচরে কোনো পাপ নেই—তাদের মসৃণ মুখের দিকে তাকিয়ে সে সম্বন্ধে ভুল বুঝবার কোনো সম্ভাবনা নেই। একশো টাকার আকচায় প্রফেসর নিযুক্ত হচ্ছে—এই উনিশশো আটচল্লিশেও কয়েক দিন আগে একটা বিজ্ঞাপন দেখছিলাম—ইকনমিক্স্ ইত্যাদির জন্যে ফার্স্ট ক্লাস এম-এ চাওয়া হচ্ছে, অধ্যাপক হিসেবে কিছু অভিজ্ঞতাও থাকা চাই, মাইনে—একশো টাকা, খুব সম্ভব বছরে কি দু'বছরে পাঁচ টাকা বাড়বে (পরিষ্কার নির্দ্ধারণ নেই) ;—দেড়শো টাকায় এফিশ্যেন্সি বার। কোনো বিশুদ্ধ শিক্ষক ছাড়া এরকম প্রলোভনে ইকনমিক্সের কোনো ফার্স্ট ক্লাস এম-এ ভুলবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তবুও না ভুললে প্রফেসর-মৃগয়ার এ রকম বা এর চেয়েও খারাপ বিজ্ঞাপন আজো চার দিক্ থেকে নিরবচ্ছিন্ন বর্ষিত হচ্ছে কেন ? সেদিন কলকাতার একটা বড় কলেজে কয়েক জন প্রফেসরের দরকার হয়ে পড়েছিল ; মাইনে কি রকম দেওয়া হবে বিজ্ঞাপনে সেটা জানানো হয়নি। প্রায়ই জানানো হয় না, কখনো কখনো আবেদনকারীকে জানিয়ে দিতে হয় সে ন্যূনতম কত নিতে রাজী আছে (মাছের বাজারে অবিশ্যি চার টাকা সাড়ে চার টাকা সের বেঁধে দেওয়া আছে, কোনো উকীল বা জষ্টিসও সেটাকে ন্যূনতম করতে পারেনি), কিংবা বিজ্ঞাপনে জানিয়ে দেওয়া হয় যে প্রফেসরকে (নিযুক্ত করা হলে) গুণ অনুসারে মাইনে দেওয়া হবে (গুণ খুব সম্ভব ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি ও অভিজ্ঞতা, আরো কিছু আছে)। শুনেছি, কলকাতার সেই বড় কলেজে সম্প্রতি এক জন অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন, তিনি ফার্স্ট ক্লাস এম-এ, বয়স পঞ্চাশ আন্দাজ, ইতিপূর্ব্বে বাংলার বাইরে কোনো ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছিলেন—মাইনে সাড়ে চারশো টাকা হয়েছিল, কিন্তু সে জায়গা পাকিস্থানের এলেকায় চলে যাওয়ায় তিনি কলকাতার কলেজে কাজ নিলেন। এই অধ্যাপককে ১৩৫৲ টাকা মাইনেতে নিযুক্ত করা হয়েছে। নিযুক্ত করেছে অবিশ্যি গভর্ণিং বডি, নিযুক্ত হয়েছেন প্রফেসর নিজে। কেন নিযুক্ত হতে গেলেন ? অসহায় শিক্ষক, অন্য কোনো উপায় নেই বলে ?

কলেজের শিক্ষকরা কি করে এতদূর অসহায় হল ? তাদের নিজেদের দোষ কতখানি ? তাদের টিচার্স এসোসিয়েশন আছে, কিন্তু সেখানে কি হয় সে সম্বন্ধে আমার বিশেষ পরিষ্কার ধারণা নেই, হয়তো অনেক ভালো কাজ হয়। আশা করি, শিক্ষকদের এদিককার ক্রমাগত নিষ্ফলতা শেষ করে দেবার মত কোনো সৎ সফল উপায় স্থির করছেন তাঁরা। কলকাতার বড় কলেজে ভদ্রলোকটি একশো পঁয়ত্রিশ টাকায় প্রফেসরি পেলেন। তিনি ফার্স্ট ক্লাস—পঁচিশ ত্রিশ বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। কলকাতার অন্য কোনো প্রাইভেট কলেজে একশো পঁয়ত্রিশের চেয়ে বেশী পেতে পারতেন হয়তো—অন্ততঃ দেড়শো পেতেন আশা করা যায়। কিন্তু দেড়শো একশো পঁয়ত্রিশ টাকা তো এক জন মুটেও পায় আজকাল। ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ পাশ, ফেল, হুঁশিয়ার ছেলেরা কলকাতায় দু'-চার বছর ঘুরে একটু জমিয়ে নিতে পারলে তিনশো-চারশো টাকায় সংসার অবলীলায় চালিয়ে নেয়। কিন্তু ও-রকম সব আব-হাওয়ায় পথে প্রফেসর যাবেন না বলে তাঁকে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে বুঝ দেবার রকমটা সমাজের কোনো শুভানুধ্যায়ীর কাছেই খুব straight বলে মনে হবে না।

ইউনিভার্সিটির থেকে বছর বছর যে সব আনকোরা ফার্স্ট ক্লাস বেরিয়ে আসে তারা অল্প-বিস্তর অভিজ্ঞ হলে একশো-সোয়াশো টাকায় (কলেজে) নিযুক্ত হচ্ছে ; আরো বেশী অভিজ্ঞতা থাকলে আরো একটু বেশী মাইনেতে সুরু করতে দেওয়া হয়—মাইনে বাড়তে বাড়তে একশো পঁচাত্তর, দু'শো কি দু'শো পঁচিশ কিংবা কোনো লক্ষীমন্ত কলেজে আড়াইশো অবধি হতে পারে। কিন্তু মাইনে বাড়বে কি ধারায় ? হয়তো বছরে পাঁচ টাকা কিংবা দু'বছর অন্তর দশ টাকা হিসেবে। ফার্স্ট ক্লাস এম-এ না হলে আজকাল কলেজে মাষ্টারী পাওয়া কঠিন। ফার্স্ট ক্লাস এম-এ হলেও ওপরে যা বিবৃত করেছি, প্রাইভেট কলেজের সে সব বাঁধা-ধরা মাইনের চেয়ে বেশী কিছু পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। ফার্স্ট ক্লাস এম-এ হলেই যে সেকেণ্ড ক্লাসের চেয়ে বেশী বিদ্বান বা কুশলী শিক্ষক হতে পারে আমি তা' বিশ্বাস করি না। আমি নিজে কয়েকটি কলেজে অনেক রকম অধ্যাপকের কাছে পড়েছি। সেকেণ্ড ক্লাস ডিগ্রির ভালো শিক্ষকরা ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রিওলা ভালো শিক্ষকদের চেয়ে কোনো অংশেই খারাপ নন—প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ তো অনেক ফার্স্ট ক্লাসের চেয়েই ভালো পড়াতেন, এবং এ বিষয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ বা অধ্যাপক ঘোষ একা ছিলেন না, অন্য কলেজেও এ জিনিষের রকম-ফের দেখেছি। ইউনিভার্সিটিতে যে রকম ধরণের পরীক্ষা প্রচলিত আছে এবং পরীক্ষকেরা যে নিয়মে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস ধার্য্য করেন তাতে স্মৃতিশক্তি—কলিত স্মৃতিশক্তির ওপরই জোর দেওয়া হয় বেশী—শুদ্ধ চেতনা ও সৃজনী শক্তিকে কোণঠাসা করে। প্রায়ই ইংরেজি বাংলা ইত্যাদি সাহিত্যের ফার্স্ট ক্লাস এম-একে উত্তর-জীবনে সাহিত্যস্রষ্টা এমন কি সৎসাহিত্য-সমালোচক হিসেবেও কোথাও দেখা যায় না ; দরকারী নোট দিয়ে ভালো প্রফেসর হিসাবে গণ্য হবার শক্তি বা ইচ্ছা ছাড়া রচনা বা আলোচনার দিক্ দিয়ে সাহিত্যে কোনো গভীরতর অন্তঃপ্রবেশের নিদর্শন পাওয়া যায় না তাঁদের জীবনে। সে যা হোক, তাঁরা সাহিত্যের অধ্যাপক (সাহিত্যিক নন), ধান ভানতে শিবের গান না গেয়ে তাঁরা মাষ্টারী করেন এবং আমাদের কলেজগুলোর রুচি ও চাহিদা অনুসারে খুব সম্ভব ভালো মাষ্টারীই করেন। ভালো মাষ্টারী করবার শক্তি থাকলেও সেকেণ্ড ক্লাস এম-এর পক্ষে আজকাল কলেজে কাজ পাওয়া শক্ত। নিতান্ত কপালের জোরে কলেজে প্রফেসরি পেলেও মাইনের দিক দিয়ে তার অবস্থা ফার্স্ট ক্লাস এম-এর চেয়ে খারাপ। সেকেণ্ড ক্লাস এম-এ সত্তর-আশি টাকা মাইনেতেও কলেজে ঢোকে—তার চেয়ে কমেও ; টাকা-কড়ি ও পদমর্য্যাদার দিক্ দিয়ে সে ফার্স্ট ক্লাসের চেয়ে বিপন্ন। ফার্স্ট ক্লাসের চেয়ে ভালো পড়াতে পারলেও

সেটা স্বীকৃত হতে চায় না, বেশী অভিজ্ঞতা থাকলেও তাকে ডিঙিয়ে নতুন ফার্ষ্ট ক্লাসকে উঁচু পদ ও বেশী মাইনে দেওয়া হয়; কলকাতার চেয়ে এ জিনিষ মফঃস্বলেই হয়তো বেশী চলে। এ ছাড়া উপায়ও নেই হয়তো? ইউনিভার্সিটি নিজে ঠিক করে দিয়েছে কে কোন ক্লাস। সেটা তাদের কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে ঠিক হয়ে গেছে। এর পর সমস্ত জীবন ভরে আর কোনো ক্রমবিকাশ নেই? মানুষ আঠারো-কুড়ি বছর পর্য্যন্ত বাড়ে, তার পর আর কোনো বাড় নেই শরীরের, মনের বেলাও সেইটেই ঠিক? টাকা-কড়ি পদমর্যাদা ইত্যাদি সব কিছুর দিক দিয়ে কোনো সেকেণ্ড ক্লাস এম-এরই আজকাল আর কলেজে কাজের চেষ্টা করা উচিত নয়। কচিৎ সে কাজ সে পাবে। আত্মীয়তা বন্ধুতার সূত্রে কিংবা বিশেষ খোসামুদি করে পেতে হবে—পাওয়ার পর শেষ দিন পর্য্যন্ত খোসামুদি করতে হবে। এটা কোনো দিক্ দিয়েই ভালো নয়। কিন্তু খোসামুদি করেও সাংসারিক সুবিধা বড় একটা পাওয়া যাবে না, ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এদেরই অবস্থা খারাপ, সেকেণ্ড ক্লাস প্রফেসরের আরো খারাপ। পাকিস্থানের কোনো কলেজে কুড়ি-পঁচিশ বছর কাজ করলেও কলকাতায় কলেজে কাজ খালি হলে অল্প-বেশী পুরোনো বা আনকোরা ফার্ষ্ট ক্লাস নেওয়া হয়—অভিজ্ঞ সেকেণ্ড ক্লাসকে না নিয়ে। খুব ভালো অভিজ্ঞ সেকেণ্ড ক্লাসও নিদারুণ ভাবে উপেক্ষিত—কলকাতার বা উপকণ্ঠের কলেজী চাকরীর বাজারে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোথাও কাজ করতে ভালো না লাগলেও কোনো সেকেণ্ড ক্লাস এম-এরই এখন আর কলেজে কাজ নেওয়া উচিত নয়। অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকলেও—গভর্ণমেণ্টের কলেজ বা প্রাইভেট কলেজগুলো সত্যিই তাকে চায় না—যদি না সে খিড়কী দিয়ে ঢুকতে পারে। সেটা খুব নিন্দিত পথ—যে মানুষ অধ্যাপক হতে যাচ্ছে তার পক্ষে। ও-সব পথ তার নয়। যে সব সেকেণ্ড ক্লাস ডিগ্রিওলা প্রফেসর কুড়ি-পঁচিশ-ত্রিশ বছর অধ্যাপনা করেছেন, কিন্তু এখন বাস্তভিটা থেকে ছিটকে পড়ে নিশ্চয়তা ও ছন্দ হারিয়ে পশ্চিম বাংলার পথে-ঘাটে ফিরছেন—কোনো কলেজে স্থান পাচ্ছেন না, তাঁরা শেষ পর্য্যন্ত কি করবেন ভাবনার বিষয়।

পনেরো-কুড়ি বছর আগে আমরা মাইনের জন্যে গ্রাহ্য করতাম না বড় একটা, কলেজে কাজ পেলেই হত, মাইনে নিয়ে যে অবিচার হচ্ছে মাঝে মাঝে সেটা হৃদয়ঙ্গম হলেও সে সম্বন্ধে কোনো ভালো ব্যবস্থার আশা ও চেষ্টা করা ভারতকে স্বাধীন করার চেয়েও কঠিন মনে হত। কে মাইনে বাড়িয়ে দেবে? যতটা অন্ততঃ সুবিচার সম্ভব সেই অনুপাতে মাইনের হার কে ঠিক করে দেবে? কোনো এক জনের বা এক পক্ষের কাজে বিশেষ কিছু হত না—সকলের সম্মিলিত শুভার্থী চেষ্টায় সুফল পাওয়া যেত খুব সম্ভব। কিন্তু কোন দিক্ দিয়েই চেষ্টা হয়নি, বড় একটা চেষ্টা করবার যে ইচ্ছা আছে তাও এক-আধটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোথাও যে দেখেছি বা অনুভব করেছি তা মনে পড়ছে না। আর্থিক দিক্ দিয়ে প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরেরা কলেজগুলোর সেই সূত্রপাতের দিন থেকেই এ রকম অবহেলিত হয়ে আসছে। যে কারণেই হোক না কেন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কোন দিনও প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদের দিকে ফিরে তাকায়নি। ফিরে যে তাকায়নি—শিক্ষার সৎ সংগঠন ও বিস্তারের জন্যে এবং কলেজের প্রফেসরদেরও রাষ্ট্রের অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্মী হিসাবে গ্রহণ করবার জন্যে বৃটিশদের ভেতরে যে কঠিন বিমুখতা ছাড়া আর কিছুই নেই, এ নিয়ে (যারা মাষ্টার নয়) দেশের সব শিক্ষিত ও স্বচ্ছল সাধারণ মাথা ঘামাবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেছিলেন বলে জানা নেই। যত দিন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদের দেশে রাজ্য সাম্রাজ্যের কাজ ক'রে গেছে, আমাদের দেশের শিক্ষিত ভদ্রসাধারণ সব ছেড়ে দিয়ে দেশকে স্বাধীন করবার একমাত্র ব্রত নিয়ে যে ব্যাপৃত রয়েছিলেন এ কথা বলতে পারা যায় না। তাঁরা গভর্ণমেণ্টের সব রকম প্রতিষ্ঠানে বড় বড় কাজ করেছেন—ব্রিটিশের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করেছেন—আইন-সভায় নতুন নতুন আইন প্রণয়ন, বেআইন বাতিলের চেষ্টা করেছেন, মন্ত্রিত্ব করেছেন, বৃটিশকে পরামর্শ দিয়েছেন, অনেক কাজই করেছেন, সব কিছুতেই সফল হননি বটে, কিন্তু নানা রকম ব্যাপারে অল্প-বিস্তর সফলতা পেয়েছেন। কিন্তু ইস্কুলের মাষ্টারদের হয়ে তাঁরা কোনো দিন আপ্রাণ লড়েছেন বলে জানি না। প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদের সাংসারিক অসচ্ছলতার নমুনা অহরহ চোখে পড়েছে তাঁদের, টাকা-কড়ির অভাবে কলেজের শিক্ষকদের সামাজিক মর্য্যাদাও যেখানে-সেখানে ক্ষয়িত খণ্ডিত হতে দেখেছেন তাঁরা। কিন্তু দেশের প্রাইভেট কলেজগুলোকে সুনিয়ন্ত্রিত করে সে সব কলেজের শিক্ষকদের বেতন একটা সুমাত্রায় উত্তীর্ণ করে দেওয়ার একান্ত চেষ্টা কোনো দিনই তাঁরা করেননি। করলেই যে তৎক্ষণাৎ অনেক-খানি সফলতা পাওয়া যেত তা নয়, কিন্তু চেষ্টা করলেই আমাদের এ সব কল্যাণকৃৎ দেশবাসীরা স্বচ্ছ বিবেকে আমাদের বলতে পারতেন যে, তাঁদের নিজেদের কোনো ত্রুটি বা উদাসীনতা ছিল না—তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন খুব ব্যাপক ভাবে, অনেক দিন ধরে—কিন্তু ইংরেজ প্রধানদের সঙ্গে পেরে উঠলেন না বলে প্রাইভেট ইস্কুল-কলেজের কোনো সুরাহা করতে পারলেন না তাঁরা। আমাদের সে সব কৃতি কর্ম্মা শুভার্থী দেশবাসীরা অনেকেই আজ মৃত, কিন্তু তাঁদের উত্তরবর্ত্তীদের হাতে তাঁদের সেই ঐতিহ্য তো আজো চলছে দেখছি। ইংরেজরা এদেশে থাকতে সত্তর-আশি টাকা থেকে সুরু করে উচ্চতম দেড়শো-দু'শোর ভেতরে প্রাইভেট কলেজের এক-এক জন প্রফেসরের প্রাপ্য নির্দ্ধারিত হয়েছে, উকীল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা গভর্ণমেণ্টের বা ভালো কমার্শ্যাল ফার্মের অফিসারদের সঙ্গে প্রফেসরের বেতনের কোনো তুলনা চলেনি, চলেছে কেরাণীদের সঙ্গে—লোয়ার ডিভিশনের কিংবা সাদাসিদে মার্কেনটাইল ফার্মের। তুলনায় সরকারী লোয়ার ডিভিশনের কেরাণীরা জিতেছে, তাদের পেনসন আছে, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড আছে, তারা আপার ডিভিশনে চলে যেতে পারে, কোনো ইচ্ছাময় ম্যানেজিং কমিটির রুচি-অরুচি সহ্য করতে হয় না তাদের, তাদের চাকরীর নিশ্চয়তা আছে, গুণ, অধ্যবসায় থাকলে গভর্ণমেণ্টের উচ্চতম ডিপার্টমেণ্টে উঠে যেতে বাধা নেই তাদের, ত্রিশ টাকা বেতনে সুরু করে তিন হাজার টাকায় পৌঁছুনো অসম্ভব ছিল না সে সব জায়গায়, কিন্তু সাহিত্য ইকনমিকস্ বিজ্ঞান দর্শন পড়িয়ে চুল পেকে গেলেও প্রফেসরকে দেড়শো-দু'শো টাকার বেশী কিছু মঞ্জুর করবে বৃটিশ আমলে আমাদের দেশী উকীল ব্যারিষ্টার জজ অফিসার মন্ত্রী—কেউই এ রকম অপ্রাসঙ্গিক কথা ভাববার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা কলেজের ম্যানেজিং কমিটি (গভর্ণিং বডি) চালিয়েছেন—আইন পরিষদ,

হাইকোর্ট, মন্ত্রিসভা, চেম্বার অব কমার্স ও। আরো কত কিছু দেখেছেন ও শুনেছেন, তদারক করেছেন, সুপারিশ করেছেন, প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদেরও মাঝে মাঝে বলেছেন: টাকা দিয়ে কি করবেন? আপনারা প্রফেসর—এই আপনাদের পক্ষে যথেষ্ট সম্মানের জিনিষ।

ফলে অধ্যাপকেরা টাকাও পাননি, সম্মানও পাননি। টাকা ছাড়া এদেশে সম্মান পাওয়া যায় না। বিদ্যার জন্যে যাদের কাছে অকৃত্রিম মর্য্যাদা পাওয়া যেত এক সময়, তারাও কৃত্রিম হয়ে উঠছে। টাকা-কড়ি বা বিদ্যা কোনো কিছুর জন্যেই কোনো রকম রবাহুত সম্মান প্রফেসরের কাম্যও নয়। সম্মান নয়—অধ্যাপনা বিশেষ করে অধ্যয়নের ভেতর আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে তার সচ্ছল বিলাসের কোণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বিশুদ্ধ ও তাৎপর্য্য-গভীর করবার যে পথ খুঁজে পাওয়া যায়—অধ্যাপক যতই তার নিজের পরিধির ভেতর সনির্ব্বন্ধ হতে থাকবে—এ পথ ততই তার কাছে সৎ মনে হবে—নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াবে। আমি বলতে চাই না যে, শুধু বই পড়ে মানুষের সব রকম বিকাশ বা কোনো রকম মহৎ বিকাশই পুরোপুরি সম্ভব হয়, কিন্তু আমাদের রুচি অনুভূতির সুপরিণতির পথে বুঝে-শুনে অধ্যয়ন করার একটা বিশেষ মূল্য আছে—সচেতন মন নিয়ে মানুষের সমাজে অনেকখানি মেলামেশার যেমন একটা বিশ্রুত মূল্য আছে। অধ্যাপকের জীবনে বেছে বই পড়বার এবং হয়তো কিছু লিখবার এই যে প্রেরণা ও পদ্ধতি তৈরি হতে থাকে—যা ক্রমে অধ্যাপকীয় স্বভাবে পরিণত হয় তার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে—সম্মান নয়—এই জিনিষটাই তার অল্প বেতনের বিসদৃশ সংসারে তার নিজের সুশৃঙ্খল পৃথিবীকে প্রতিষ্ঠিত করে। আমি জানি, আমাদের বাংলা দেশে অন্ততঃ অনেক কলেজের অনেক অধ্যাপকই পড়াশুনো করতে চান না—বাকী অনেকে পড়তে ইচ্ছুক, কিন্তু সুযোগ পান না। মফঃস্বলে ভালো লাইব্রেরী নেই—সুযোগ সুবিধা কম; কিন্তু যেটুকু আছে তাও অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয় না। কলকাতায় সুযোগ আছে, খুব বেশী যে কাজে লাগানো হয় মনে হয় না। সে যা হোক, যে কোনো নিজের কাজে তৃপ্ত অধ্যাপককে বই, পত্র, পত্রিকা, জর্ণাল ইত্যাদির জন্যে কৌতূহলী হয়ে থাকতে হয়, পৃথিবীর পুরোনো বইগুলোর মর্ম সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হয়, নতুন বইয়ের খোঁজ রাখতে হয়—যত দূর সম্ভব শ্রেষ্ঠ বইগুলো পড়ে দেখতে হয়—কেউ তাকে কাণে টানছে বলে নয়—ভালোবাসার তাগিদে। সত্যিই জ্ঞানকে সে ভালোবাসে, কিন্তু অনেক তথাকথিত অধ্যাপকই নিজের কাজে তৃপ্ত নয় আজকাল আর, সুযোগ পেলেই অন্য পথে চলে যাচ্ছে—বেশী টাকার কাজে; যাদের শক্তি-সুযোগে কুলিয়ে উঠছে না তারা মুষড়ে পড়ছে যেন, প্রাইভেট কলেজে দিনগত পাপক্ষয় করছে এই রকম তাদের ভাব। কিন্তু যে কোনো নিজের কাজে সমাহিত অধ্যাপককে ভাঙিয়ে অন্য লাইনে নিয়ে যাওয়া কঠিন—টাকার প্রলোভনেও তিনি অধ্যাপনা অধ্যয়ন ছেড়ে অন্য কোনো 'বড়' চাকরীতে যাবেন না। এঁদেরই নাম শিক্ষক। বাংলা দেশে এক সময় এ রকম সুধী আত্মস্থ শিক্ষকের বেশ সুসমাবেশ ছিল, দিনের পর দিন তা কমে যাচ্ছে। অধ্যাপক হিসেবে সমাজের কাছে কোনো উল্লেখযোগ্য সম্মান আমাদের দেশের প্রাইভেট কলেজের বেশির ভাগ প্রফেসরই কোনো দিন পাননি। এ সমাজে টাকার গৌরবের কাছে অন্য কোনো কিছুর উজ্জ্বলতা দাঁড়াতে পারে না। প্রফেসর তাঁর শূন্য পকেট নিয়ে কি জ্ঞানের প্রমাণ দিতে পারবেন? সে শূন্য কুম্ভের ঠনঠনানি দেশ শুনতে যাবে কেন? প্রফেসরের হাতে টাকা আসতে থাকলে তিনি কলেজ ছেড়ে দিয়ে চেম্বার অব কমার্সের চাঁই হয়ে দাঁড়াবেন, তখন তাঁর কথাবার্ত্তার জ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানের মূল্য বেড়ে যাবে ঢের—তাঁর আগেকার দিনের নিরাসক্ত মূল্যজ্ঞান ও জ্ঞানের স্পৃহা হৃদয়হীন ভাবে নষ্ট হয়ে যেতে থাকলেও। আমাদের সমাজে শতাব্দীতে টাকার এই মানে, জ্ঞানের এই মানে। সম্মান নয়—টাকাও নয়—একটা জিনিষ ছিল শুধু এত দিন পর্য্যন্ত প্রাইভেট কলেজের খাঁটি প্রফেসরদের নিজেদের কাজকর্ম আবহ নিয়ে একটা চরিতার্থতার চেতনা। কিন্তু সে জিনিষ গত কয়েক বছরের বিশৃঙ্খলা অনটন অন্ধকারের মধ্যে একেবারে উৎসন্ন হয়ে যাচ্ছে—অন্তিম অবলম্বনের মত প্রফেসরদের হাতে কিছুই শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে থাকবে বলে মনে হচ্ছে না।

নিজের কাজে তৃপ্ত প্রাইভেট কলেজের প্রফেসররা আজকাল ডোডোর মতন দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চালের মণ যখন চার টাকা পাঁচ টাকা ছিল এবং অন্যান্য দরকারী জিনিষের দাম ঐ রকমই আয়ত্তের ভেতরে, তখন কলেজ ও দেশের মালিকেরা পরিচালকেরা প্রফেসরকে নিজের রুচি ও বিবেকসম্মত কাজের ভেতর নিবিষ্ট রেখে তার পাওনার ব্যাপারে তার সঙ্গে যে পরিহাস করছে সে সম্বন্ধে প্রফেসরের চেতনা সজাগ থাকলেও সে চেতনাকে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করবার কোনো প্রয়োজন ছিল না তার। খাওয়া-পরার জিনিষের দাম বেশী ছিল না, সংসারে আর্থিক (সাচ্ছল্য না হোক) স্বাধীনতা এবং যেটুকু না হলে নয় সে পরিচ্ছন্নতা ও ভদ্রতা বজায় রাখা মোটামুটি সম্ভব ছিল। কিন্তু জিনিষ-পত্রের দাম চার-পাঁচ গুণ বেড়ে গেছে এখন। এ রকম খাপছাড়া দিনকালে প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদের বেতন সম্পর্কে দেশের পরিচালকদের চেতনা যে নেই তা নয়; আছে। সদিচ্ছা আছে, কিন্তু ফণ্ড নেই; কোটি কোটি টাকার নোট বাজারে ছেড়ে কাগজও থাকছে না আর, কোটি কোটি টাকার কাগজের নোট বানাতে হচ্ছে আবার তাই; এই সব সদিচ্ছা আছে, কিন্তু এ পথে চলে প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদের জন্যে কোনো ফণ্ড থাকছে না গভর্ণমেন্টের হাতে। ব্যাপারটা এই রকম।

পৃথিবীর টাকা-কড়ি কাড়াকাড়ির ব্যাপারে উত্তেজিত হওয়া যাদের স্বভাব, তাদের পক্ষে আত্মদান করে শিক্ষকতা করা সম্ভব নয়। যে কোনো নিজের কাজে নিবিষ্ট অধ্যাপকই ও-রকম উত্তেজনার উত্তাপের পৃথিবীর থেকে স্বভাবতই এক দূরে স'রে থাকে যে, ঠিক তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে সত্য সার্থক শিক্ষকতার কাজ চলে না। কারণ শিক্ষকতাই একমাত্র কাজ—আমার মনে হয়, আজকের পৃথিবীর সব রকম কাজের ভেতরে যা সব চেয়ে অচল ও স্থির ধীর মনের অভিনিবেশ দাবী করে। জোর করে নয়, নিজেদের রুচি ও স্বভাবের মর্য্যাদায় এ দাবী সংশিক্ষকেরা মিটিয়ে আসছিলেন অনেক দিন। কলকাতার মত বড় শহরের অনুপাতে এখানে এ সব মাষ্টার-প্রফেসরদের

সংখ্যা কম ছিল বটে, মফঃস্বলের ছোট ছোট জায়গায় বেশী ছিল। এই সব শিক্ষকদের আশ্চর্য্য আত্ম-সমাহিতির বলয়ের ভেতরে এসে প্রাইভেট ইস্কুল-কলেজের শিক্ষকদের প্রায় সকলেই খুব বেশী বেগ না পেয়ে স্থির করে ফেলতে পারত : ভেসে বেড়াব না, ছেলেদের শিক্ষা-দীক্ষার কাজ নিয়ে থাকব, এতে মাইনে কম বটে, মাইনে কম বলেই লোক-সমাজে সম্মানও কম—কিন্তু টাকা ও টাকার সম্মানের শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের নিজেদের অন্ততঃ সমর্থন নেই। অধ্যাপনায় অবকাশ আছে, ছেলেদের শেখাবার পথ কেটে দেবার পরে নিজেদেরও পড়বার লিখবার চিন্তা করবার সুযোগ আছে, সে সুযোগকে গ্রহণ করা চলে।

আজকাল যখন টাকা ও রিরংসার পথে ক্রমেই বেশী করে অগ্রসর হতে না পারলে কেউ কাউকে সভ্য ও সুখী মনে করতে সত্যিই দ্বিধা বোধ করে, তখন পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে ঐ সব অবলুপ্তপ্রায় অধ্যাপক ও শিক্ষকদের মত যদি কয়েক জন মানুষ টাকা ও লালসার কান ঘেঁষে না চ'লে সুস্থিরতা আবিষ্কার করতে পারে কিছু পরিমাণে এবং সভ্যতাও, তাহ'লে তাদের কি আমরা সংরাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে গণ্য করব, না বন্ধু হিসেবে? কিন্তু যে রকম ভাবে বড় ব্যবসাকে আরো স্ফীত হতে দেওয়া হচ্ছে, সদাগর ও সরকারের সুখী অফিসারেরা নাম-ডাকে মৃগয়ায় আরো দোর্দ্দণ্ড সুখী হয়ে উঠছে, যে রকম ভাবে প্রাইভেট ইস্কুল-কলেজের শিক্ষকেরা ভাতে-কাপড়ে নিঃশেষ হতে চলেছে, তাতে মনে হয়, এই সব শিক্ষকদের দিয়ে রাষ্ট্রের সত্যিই কোনো হিত হয় বিবেচিত হ'লে খুব সম্ভব এ রকম গ্লানি সম্ভব হত না।

★

পাশের পড়া

নির্ম্মলকান্তি চক্রবর্ত্তী

দু'টি বছর পড়ার পরে সেদিন চৈত্র মাস,
দাদার মনে জাগ্‌ল আশা করবে বি-এ পাশ।
আমায় ডেকে বলে দিলেন, শোন নিমু শোন,
দেখো যেন আজ থেকে আর গোল হয় না কোন।
পাশের ঘরে পড়ব আমি ডিস্‌টার্ব না হয়।
পাশের-পড়া মনে রেখো ছেলে-খেলা নয়।

দিন-রাত্তির চলল পড়া এক-শো মাইল গতি।
বই ছাড়া আর নাইকো দাদার লক্ষ্য কারো প্রতি।
মুখ শুকোলো দাঁত বেরোলো রুক্ষ হল কেশ।
ছিঁড়ল জামা হারায় চটি মলিন হল বেশ।
চশমা গেল অসাবধানে নিব ভাঙলো পেনে,
ঘড়ির কাচ আর আস্ত না রয় জং ধরল চেনে।
তবু পড়ার ত্রুটি কিছু একটুও না ঘটে,
লোকে দেখে বলে ছেলের পাশের-পড়া বটে।

রান্না-ঘরে মহা ফ্যাসাদ,—ডিম খাবে না দাদা।
ইলিশ মাছে কাঁচকলা আর কলাই ডালে আদা।
কালীঘাটে মানোত মানা গঙ্গাজলে স্নান।
গণৎকারকে হাত-দেখানো দীন-গরীবে দান।
সবই চলে পুরো দমে কোথাও না রয় ফাঁকি
যোগ-যাগ-হোম-জপ-তপ আর কিছু না রয় বাকী।

ঠাকুর দিল রান্না ছেড়ে স্বস্ত্যয়নে মন।
চাকররা সব বাবুর লাগি প্রার্থনা-মগন।
নাপিত-ধোপার মুখ দেখে না কভু মনের ভুলে।
দাড়ী-গোঁফে ঢাকল বদন জট পাকালো চুলে।
শিতলার পায় মাথা নোয়ায় কালীরে দেয় ডাক।
ত্রিশ কোটি দেব-দেবতা বিস্ময়ে নির্ব্বাক।

অবশেষে পরীক্ষার আর দু'দিন যখন বাকী।
তখন দাদা পড়ল জ্বরে চল্‌ল না আর ফাঁকি।
মাথা-ধরা অতি প্রবল জ্বরের বেগও বেশী।
সকল বাধা কাটিয়ে এসে ঠেকল শেষাশেষি।
কভু দেখে হল্‌, কোশ্চেন, কাগজ, কলম, কালী,
কভু পেপার-সেটারকে দেয় বেদম গালাগালি।
বরফ-জল আর পাখা নিয়ে বোনটি বসে পাশে
দুর্ভাবনায় চিন্তায় তার পরাণ কাঁপে ত্রাসে।
ডাক্তার এলো বদ্যি এলো ওষুধ শিশি শিশি।
কিছুতে আর কিছু না হয় এ রোগী কোন দেশী।

পরীক্ষার দিন সকাল বেলা বিষম হুলুস্থুল।
দেখছে দাদা হলঘর আর বলছে কেবল ভুল।
জ্ঞান হারাল জ্বরের বেগে আত্মজনের ত্রাস,—
হায় রে দাদার পড়া-শুনা হায় রে বি-এ পাশ।

কাছারীর পূর্ব দিকে একটা পুকুর কাটা হচ্ছে। নোয়াখালী থেকে এসেছে দু'দল কৃষাণ। তাদের ঠিকা দেওয়া হয়েছে। তারা উভয় পক্ষ ভীষণ উত্তেজিত—গাল-মন্দ-বচসা চলছে। একটা মেয়েমানুষ হয়েছে তাদের তর্কের বিষয়। বিষয়টি সজীব, কিন্তু তাকে টানতে টানতে একেবারে নির্জীব করে ফেলা হয়েছে। দু'খানা হাত ধরে দু'দিক থেকে সে কি টান! হাত দু'খানা এখন তার ছিঁড়ে যাবে বুঝি! উচিত তাকে কারুর এখন রক্ষা করা। মেয়েলোকটি মধ্যবয়সী। রোগা হাত, রোগা দেহ, মুখে শুধু একটুখানি মিষ্টি আভা। দু'টো তাজা যোয়ানের সবল আকর্ষণে সে একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছে। উভয় পক্ষের ভাষা এমনিতেই বোঝা দায়, এখন দোভাষীতেও অর্থ উদ্ধার করা কঠিন। বিশেষ করে অশ্লীল বাক্যগুলোর। ঘটনাটা পরে শোনা যাবে, এখন দরকার মেয়েটাকে উদ্ধার করা। এখনও ওকে ছাড়িয়ে না দিলে ওর অবস্থা আরও শোচনীয় হবে—প্রায় বিবস্ত্র হওয়ার জোগাড়।

বিপ্রপদ সহজেই সব বোঝেন। মেয়েটার জন্যই কাজ-কর্ম্ম বন্ধ, কোদাল নিয়ে আস্ফালন—একবার রুখে রুখে এগোন, আবার কি বুঝে যেন কয়েক কদম পিছোন। দু'দলই সমান তালে ঝগড়া করে যাচ্ছে। একটি কৃষাণও নিরপেক্ষ নেই।

তিনি থামতে বলেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ক্রমশঃ অবস্থা সংগীন হয়ে ওঠে। স্ত্রীলোকটি এক পক্ষের টানে পড়ে গেল মস্ত বড় একটা শুকনা মাটির ঢেলার ওপর। তৎক্ষণাৎ আর এক পক্ষ টেনে তুলল তাকে। তার কপালটা কেটে রক্ত ঝরছে। পুকুর-পাড়ে দাঁড়িয়ে সকলে স্তম্ভিত হয়ে দেখছে। পেয়াদা পাইক বা অন্য কেউ কিছু বলছে না। মানুষ যে কুকুরের মত কলহ করতে পারে তা বিপ্রপদর জানা ছিল না। ঘটনাটা আর একটু ঘোরাল হতেই তিনি বিদ্যুতের মত জ্বলে ওঠেন। কিন্তু এতে অবস্থার উন্নতি না হয়ে আর একটু খারাপের দিকেই গেল। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—ফিরে দাঁড়ায় বিপ্রপদর বিরুদ্ধে।

কে যেন পিছন থেকে বলে, 'ওরা ছোটলোক, ভীষণ দুর্দান্ত—ফিরে আসুন বাবু।'

বিপ্রপদ ভীরু লোক নন। তিনি কেন ফিরবেন ন্যায্য কাজে? কাপড়টা কোমরে জড়িয়ে হঠাৎ লাফিয়ে পড়েন এক জনের হাত থেকে একটা লাঠি টেনে নিয়ে। চরকীর মত লাঠি ঘুরছে, ওরা পালাচ্ছে কুকুরের মত। বাজের মত ছোঁ মেরে অর্দ্ধনগ্ন মেয়েটাকে নিয়ে তিনি ঘুরে আসেন পুকুর-পাড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব ঠাণ্ডা। দৈহিক শক্তির কাছে ষাঁড়ের গোঁ লুটিয়ে পড়ে। মজুরগুলো এখন হাতজোড় করে এসে দাঁড়ায়—বিচার চাই। একটা পেয়াদার জিম্মায় ঐ মেয়েটাকে দিয়ে, তিনি কাছারী-বাড়ীর দিকে নিজের জামা-কাপড় বদলাতে যান—এ-ও বলে যান, বিকালে বিচার হবে।

কাছারী-বাড়ীর খোলা স্থানটায় বিচার-সভা বসেছে। প্রায় দু'-তিন শো লোক জমা হয়েছে। বিচারক বিপ্রপদই স্বয়ং। এখানে তাঁর সম্মান এক জন জেলার জজের চেয়েও বেশী।

এক জন দোভাষী উভয় পক্ষের কথা বুঝিয়ে দেবে বলে খাড়া হয়েছে। মানুষটা বুড়ো কিন্তু দেখতে অনেকটা ছুঁচোর মত। দাড়ি-গোঁপের বেশী বালাই নেই।

মেয়েলোকটি বিপ্রপদর নিকটে এক পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তার আশ-পাশ থেকে বার বার ভীড় সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার মুখখানা দেখলে মনে হয় যেন এতগুলো লোকের সুমুখেই তাকে অস্ত্রোপচার করা হবে।

বাদী-বিবাদী দু'দল দাঁড়িয়েছে দু'ভাগে ভাগ হয়ে। সকলেরই জোড় হাত—কাঁচু-মাঁচু চেহারা! ওরা টাক্-খাওয়া ঘুঘু। সময় বুঝে চলতে ওস্তাদ।

বিপ্রপদ ভাবেন: চাকরী করে মানুষ শুধু পয়সার জন্য, গৌরবের জন্যও বটে। এতে মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে, পঙ্গু করে রাখে তার নিজস্ব সত্তা। তাঁর মোহ কাটাতে হবে। সোজা কথায় গোলামীর জাঁকজমকে তাঁকে আর ভুলিয়ে রাখতে পারবে না কিছুতেই। তিনি বাঁধন কাটবেন। এই যে পেয়াদা পাইক কর্ম্মচারী, নায়েব গোমস্তা মুহুরী, পাল্কী ঘোড়া কোষ নৌকা—এ সকলই মাকাল ফলের রঙিন প্রলেপ। রঙের আভায় তিনি আর ভুলবেন না।

কৌতূহলী জনতা নিয়ে মুস্কিল হয়েছে। তাই বার বার কটু ও উগ্র কথায় ভীড় সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

'এখন বলো ঘটনাটা, সকলে শুনুক।'

দোভাষী বলে, 'হুজুর, প্রথম পক্ষ বলছে, ঐ মেয়েটা গত বছর ওদের ছাউনীতে ছিল—তখন ওরা কাজ করত পশ্চিমে কোন এক সহরে, দ্বিতীয় পক্ষের সাথে।'

'সহরটার নাম কি?'

'বলছে ওদের মনে নেই—ওরা মুখ্যু লোক।'

'এ তো বড় আশ্চর্য! এতগুলো লোকের ভিতর এক জনও নাম জানে না?'

'না।'

এ-দল ও-দলের মুখের দিকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করে।

'আচ্ছা বেশ!' বিপ্রপদর সন্দেহ হয় যে এর ভিতর একটা রহস্য আছে। 'তার পর বলে যাও।'

দক্ষিণের বিল

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

'প্রথম পক্ষের খুঁদি সেখ ওকে না কি নিকে করে এনেছে একটা ছোট ছেলে সমেত। তার আগেও না কি ওর কতগুলো ছেলেমেয়ে হয়েছে—সেগুলো যাদের ঘর করেছে, তাদের ঘরেই রয়ে গেছে।'

জনতার ভিতর একটা চাপা বিদ্রূপের হাসি শোনা যায়।

'এর আগে ক'বার ঘর ভেঙেছে?'

দোভাষী জিজ্ঞাসা করে মেয়েটাকে, 'ক'বার? বল না ক' ফির?'

মেয়েটা ধীরে ধীরে ওর কানে কি যেন জবাব দেয়। 'হুজুর ছ-সাত ফির—বেশীও হতে পারে।'

'বলো কি!'

দোভাষী সকলকে তাক্ লাগাবার জন্য একটু মুন্সীয়ানা করে বলে, 'ঘর ভেঙেছে, আর বাচ্চা ফেলে এসেছে!'

বিপ্রপদ মন্তব্য করেন, 'হুঁ। তার পর?'

'কি করবে হুজুর, পেটের জ্বালা বড় বিষম জ্বালা। সে জ্বালার কাছে ছেলেমেয়ের বালাই নেই। ওর মা ওকে বার না তের বছর বয়সে প্রথম বিক্রি করে কোন এক কসাইর কাছে। কাজ ফুরিয়ে গেলে সে ওকে মেহেরবাণী করে জবাই না করে বেচে দেয় কোন কুলীদের কাছে। তার পর কেবল হাত ঘুরেছে। কাজ ফুরিয়েছে, আর হাত ঘুরেছে। নেমন্তন্ন-বাড়ীর এঁটো পাতার মত কত কুকুরে যে চেটেছে তার কোন ঠিক-ঠাক নেই। ছানাগুলোরও কি বাপের ঠিক আছে হুজুর—ও নিজেই কি ঠিক রাখতে পেরেছে কিছু! তাই যখন যার ঘাড়ে যেমন সুবিধা ফেলে পালিয়েছে। এ সব আমি ওর কাছে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে বলছি। একটি কথাও মিথ্যা বা বানাই নয়।'

এতক্ষণ মেয়েটাও হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিল—সে কাঁপতে থাকে।

বিপ্রপদ তাকে ইসারায় বসতে বলেন। সে মাটিতেই বসে পড়ে।

একটু আগের বিদ্রূপমুখর জনতা কেন যেন চুপ করে উৎকর্ণ হয়ে রইল। সমাজে অধঃপতিতা এই নারী, নিদারুণ ব্যভিচারে এর যৌবন গতপ্রায়, লক্ষ গ্লানির চিহ্ন এর প্রতি অংশে—তবু আর যেন কেউ একে কোনও ইংগিত করতে সাহস পায় না। সকলেই কেমন যেন একটা সংকোচে ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে।

স্তব্ধতা ভাঙেন বিপ্রপদ। 'তার পর দ্বিতীয় পক্ষ কি বলছে?'

'হুজুর, দ্বিতীয় পক্ষ বলেছে: প্রথম পক্ষের জবানবন্দী শেষ হলে ওরা ওদের কথা বলবে।'

'তা ঠিক, তাই ভাল।' বিপ্রপদ একটু যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। প্রথম পক্ষের আর বলার কি আছে?'

'দ্বিতীয় পক্ষের ঝুমু সেখ না কি চুরি করে এনেছে প্রথম পক্ষের ছাউনী থেকে। সেই নিয়েই ঝগড়া! খুঁদির নিকার স্ত্রীকে কোন্ আইনের বলে ঝুমু জোর করে রাখবে?'

দ্বিতীয় পক্ষ তখনি জবাব দেয়, অবশ্য দোভাষীর মারফতে। 'কে বললে চুরি করে এসেছে ঝুমু? সে-ই ঠিক ওকে নিকে করে এনেছে এক খান্‌কির কাছ থেকে—অর্থাৎ এক বেশ্যার কাছ থেকে। খুঁদির কথা মিথ্যা।'

'না হুজুর, ঝমুই না কি মিথ্যা বলছে, খুঁদির কথা একেবারে খাঁটি।'

ব্যাপারটা সকলের কাছে বড়ই ঘোরাল হয়ে ওঠে।

বিপ্রপদ জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রথম পক্ষ কেন ওকে দাবী করছে তার কি কোনও কারণ দেখাতে পারে ঝুমু—ঐ দ্বিতীয় পক্ষের লোকটা?'

দোভাষী বলে, 'পারে।'

'কি কারণ?'

'প্রথম পক্ষের ওই খুঁদি সেখের বৌটা আর এই মেয়েলোকটা না কি দেখতে অনেকটা এক রকম। সেই বৌটাতে না কি ওর অরুচি ধরেছে—এখন ফাঁকে-চক্কোরে নতুন একটা চেখে দেখতে চায়। ও কি কম হারামী! বেশ একটা জটিল মামলা দাঁড়াল হুজুর। এরা কেউ সহজ লোক নয়। হাইকোর্টের উকিলের মাথা খায়।'

'সেই বৌটা আর এই মেয়েলোকটা সত্যিই কি দেখতে এক রকম? এ কথা তো বিশ্বাস করা যায় না।'

'একটা আছে, আর একটা এখানে নেই—আছে না কি দেশে, দু'টোকে তো একত্র করা যাবে না, তখন আর যাচাই হবে কি করে? এ প্রমাণ অগ্রাহ্য। হুজুরের কি মত?'

অগ্রাহ্য তো বটেই। ঝুমু সেখ ওকে না কি নিকে করে এনেছে এক বেশ্যার কাছ থেকে? তার ঠিকানা কি? নামই বা কি?'

'নাম রামতারা—থাকে রতনপুর বন্দরে।'

'বেশ্যাটা হিন্দু আর এরা মুসলমান! ভাল মজা!'

'মজা নয় হুজুর—এমন নতুন কিছুও না। আসলে এ-লোকগুলো হিন্দুও না, মুসলমানও না। যখন যেমন তখন তেমন করে জীবন কাটায়। এরা নামাজ-রোজাও করে না, সন্ধ্যাহ্নিকেরও ধার ধারে না। নামের শেষে একটা সেখ কি তারা দিয়েই কিছুই ধরে নেওয়া চলে না। এরা এটাও মানে না, ওটাও করে না। এমন লোক যে কত আছে সংসারে!'

'রতনপুর থেকে যে বিয়ে করে এনেছে, তার কোনও প্রমাণ দিতে পারবে ঝুমু? কোনও সাক্ষী-সাবুদ আছে?'

দ্বিতীয় পক্ষের ঝুমু সেখ বলে, 'আলবৎ আছে, এই যে চোথা।'

'গরু-বাছুর না কি যে চোথা দেখাচ্ছ?'

'গরু আর জরু সমান হুজুর—চোথা তো লাগবেই, নইলে হারিয়ে গেলে, পালিয়ে এলে ধরবে কিসের জোরে?'

প্রথম পক্ষের খুঁদি সেখ প্রতিবাদ করে, 'ও মিথ্যা চোথা!'

দোভাষী ওদের মত ক'রে পরিষ্কার বাংলায় কথাগুলো তর্জমা করে দেয়। কখন বলে জোরে, কখন ধীরে—যেমন যেখানে প্রয়োজন। কিন্তু তাতে যেন বিষয়টা জড়িয়ে যাচ্ছে, পরিষ্কার হচ্ছে না।

বিপ্রপদ বিব্রত হয়ে পড়েন। এতগুলো লোকের সামনে একটা সুবিচার করে ন্যায় না দিতে পারলে বড়ই লজ্জাজনক। চাকরির জীবনে তিনি এমন কঠিন পরীক্ষায় কখনও পড়েননি। তিনি চোথাখানা হাতে নেড়ে-চেড়ে চিন্তা করতে থাকেন। কাগজটাও অযত্নে রক্ষিত—পেন্সিলের লেখা, একটা অক্ষরও বোঝা যায় না। হয়ত সাদা একটা পুরোন কাগজ না কি তাই বা কে জানে! এ-সব লোকের পক্ষে কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব নয়। এবার একবার মেয়েটাকে জেরা করে দেখা যাক। ও আবার কোন্ রহস্যের অবতারণা করে কে জানে!

'এখন মেয়েলোকটা কি বলে, ওর নাম কি?'

সকলকে যেন একটু আশ্চর্য্য করে দিয়ে সহজ বাংলায় মেয়েটি জবাব দেয়, 'হুজুর, আমার নাম আসমানতারা ?'

'তুমি এমন বাংলা শিখলে কোথায় ।'

'ছোটবেলায় আমার মা আমাকে নিয়ে ক'লকাতায় আসে—আমি সেখানে অনেক দিন ছিলাম ।'

'আসমানতারা, আশা করি, তুমি আমার কাছে সত্য ছাড়া মিথ্যা কিছু বলবে না—যদি মিথ্যা বলো তবে তোমারই ক্ষতি হবে। ঠিক দোষীকে যদি না ধরতে পারি তবে সাজা দেব কাকে ?'

'হুজুর, আমি আপনার কাছে জেনে-শুনে মিথ্যে বলব না ।'

'এদের দু'জনের মধ্যে কার কথা সত্য ? প্রথম পক্ষের খুঁদির না দ্বিতীয় পক্ষের ঝুমুর ? কে তোমাকে বাস্তবিক নিকা করে এনেছে ?'

আবার সকলকে আশ্চর্য্য করে দিয়ে আসমানতারা জবাব দেয়, 'এদের দু'জনের এক জনকেও আমি চিনি নে হুজুর। আমাকে—'

'চুপ করো।' বিপ্রপদ ক্রুদ্ধ হয়ে তীব্র কণ্ঠে বলেন, 'সবগুলোই মিথ্যাবাদী—এদের দলসমেত চালান দিয়ে দেবো থানায় ।'

জনতাও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। 'তাই করুন হুজুর, তাই করুন। দেখবেন, থানায় গেলে মারের চোটে কথা আদায় হয়ে যাবে।' কেউ কেউ বলে, 'ও মাগীও কি কম! সাত-ভাতারে খান্‌কি বলবে আবার সত্যি কথা ? ওকেই আগে চাবকান দরকার '

'এই, তোমরা চুপ করো। তোমরাই যদি বিচার করো তবে আমি এখানে বসেছি কেন ? যা-তা কেউ বললে তাকে এক্ষুণি শিক্ষা দিয়ে দেবো। চুপ সব।'

আবার ভীড়টা ঠাণ্ডা হয়। বিপ্রপদ চেয়ে দেখেন, আসমানতারার মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ওর মুখের ব্যঞ্জনার মধ্যে তিনি যেন কোন ছল-চাতুরী খুঁজে পান না। খুঁদি এবং ঝুমু সেখের দলকে একটু প্রফুল্ল বলেই মনে হয়। এত সময় জেরার পরও রহস্য শিথিল হাওয়া তো দূরের কথা, আরও জটিল হয়ে উঠল! এখন কি প্রশ্ন করবেন ?

আসমানতারা বলে, 'হুজুর মা-বাপ—আমি সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলছি নে।'

'ওদের কেউকে চেন না তবে তুমি এখানে এলে কি করে—এমন ঠায়-ঠিকানায় ওরা তোমাকে দাবীই বা করছে কি করে ?'

অবশেষে রহস্য ভেদ করে দেয় আসমানতারা। ও এইমাত্র জানে, ওকে আমতলার ছাউনী থেকে রাত্রে এরা চুরি করে এনেছে দু'দলে মিলে। ওর এখন যে বাস্তবিক স্বামী—ওকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে কোথায় তাড়ি না ধেনো-মদ খেতে গিয়েছিল। ওর জ্ঞান হলে দেখে যে, ও এদের ছাউনীতে শোয়া। দু'পক্ষের লোকই গিয়েছিল—কিন্তু ওকে কে আগে প্রথম ব্যবহার করবে তাই নিয়েই বচসা। রাত্রের বচসা দিনে ঝগড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। আসমানতারা ধীরে ধীরে থেমে থেমে কখন মাটির দিকে চেয়ে কখনও বা আকাশের দিকে চোখ ফিরিয়ে সব কথা বলে যায়।

ক্ষণিকের জন্ত বিপ্রপদ নীরব হয়ে থাকেন।

সভাটাও স্তব্ধ হয়ে থাকে। কেউ খুন-জখম হয়নি, বিচারে কারুর ফাঁসীর হুকুমও কেউ দেয়নি—তবু সকলে যেন স্তম্ভিত হয়ে কালহরণ করে।

বিপ্রপদ ভাবেন : মানুষের একটা ক্লান্ত দেহ নিয়ে মানুষে মানুষে কুকুরের মত ধস্তাধস্তি! 'আসমানতারা, তুমি কোনও প্রমাণ দেখাতে পারো ?' এ কথাটা তিনি নিতান্ত অনিচ্ছারই 'আইনের খাতিরে জিজ্ঞাসা করেন।'

'কিসের প্রমাণ হুজুর ?'

'তোমাকে যে আমতলার ছাউনী থেকে আনা হয়েছে।'

'সেখানে আমার একটা দুধের ছেলে আছে।'

বিপ্রপদ পেয়াদাদের ঝুমু ও খুঁদিকে এবং বেছে-বেছে ওদের মধ্যের মোড়লদের আটক করে রাখতে বলেন। এখন মিথ্যা মামলাও ওরা সাজাতে পারে! আসমানতারার কথা সত্য বলে প্রমাণ হলে ওদের থানায় চালান দেওয়া হবে।

ঘোড়ার পিঠে তখনই আমতলা লোক যায়। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসে—সংবাদ সত্য। প্রমাণস্বরূপ ছেলেটাকে নিয়ে তার বাপ আসছে হেঁটে।

কিছু সময় পরেই সে এসে উপস্থিত হয়। ছোট ছেলেটা অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে মার কোলে। মার বুক ঠাণ্ডা হয়।

বিপ্রপদ যেন একটা মহা দায় থেকে উদ্ধার পেলেন—তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলেন, 'এখন তুমি তোমার স্বামীর সাথে যাও।'

'না, আমি তা যাব না হুজুর।'

'কেন ?'

সভার মধ্যেই মেয়েলোকটা বিপ্রপদর পায়ের ওপর পড়ে কাঁদতে থাকে। সে কিছুতেই যাবে না তার সাথে। সে এখানেই থাকবে হুজুরের কাছে। দু'টো ভাত-পাত কুড়িয়ে খাবে। ওর গতরে আর সয় না। ওর গতর ক্ষ'য়ে গেছে অসৎ ব্যবহারে। সাত-আটটা স্বামী ওকে চেখেছে, ওর আর স্বামীর সখ নেই! ও আর যাবে না, কিছুতেই যাবে না। ও হুজুরের পায়ের তলায়ই পড়ে থাকবে।

বিপ্রপদ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত তাকাতে থাকেন চারি দিকে।

একটা স্পষ্ট গুঞ্জন শোনা যায়, 'হুজুরেরই বিহিত করা উচিত।'

অগত্যা বিপ্রপদ আসমানতারাকে স্থান দেন। স্বামীটা বোকার মত ফিরে যায়—কিছু বলতেও সাহস পায় না।

আসমানতারাকে একটা ঘর ঠিক করে তাকে সাবধানে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। পরে যা হোক চিন্তা করে একটা ব্যবস্থা করা যাবে। সেদিনের সভা এখানেই শেষ হয়।

ভালই হলো বিপ্রপদর। কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসর-বিনোদনের একটা সুযোগ জুটল। আসমানতারাকে যে ঘরখানা দেওয়া হয়েছিল, সেখানায় বেশী দিন তার পক্ষে থাকা অসম্ভব। তার আব্রু রক্ষা হয় না। তার জন্ম একখানা পৃথক্ ঘর চাই। রান্নাঘরেরও একটা ভাল ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাকে একটা কাজও দিতে হবে। বিপ্রপদর হৃদয়ে বড় আঘাত লেগেছে আসমানতারার জন্ত। কিশোর বয়স থেকে অত্যাচার ও ব্যভিচারে ওর হৃদয়-মন জর্জরিত। ওর নারী-জীবনের কোনও কামনাই সার্থক

হয়নি। তাই অতি সহজেই স্বামীর সংগ ত্যাগ করতে পারল। বছরের পর বছর ও যাদের সন্তান ধারণ করেছে, তারা ওকে শুধু কামনার যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করেছে। তাই ওর এত ঘৃণা দাম্পত্য জীবনে। ওর অংগে-অংগে দাগ রয়ে গেছে লাঞ্ছনার। বিপ্রপদ দেখবে, ওর জন্য কিছু করা যায় কি না। যারা এমনি দুর্বিসহ জীবন ধারণ করে দিন কাটাচ্ছে—তাদের প্রতিচ্ছবি যেন ঐ আসমানতারা।

বিপ্রপদ ওর জন্য যে ঘরের ব্যবস্থা করলেন—তার পাশ দিয়েই নিত্য দু'বেলা তাঁর যাতায়াত। আসমানতারা ওঁকে দেখলেই জড়োসড়ো হয়ে বলে, 'সেলাম হুজুর।'

বিপ্রপদ কখনও হাত তুলে কখনও বা শুধু একটা আঙুল তুলে প্রত্যভিবাদন করে চলে যান।

কোলের ছেলেটা বিপ্রপদকে আসতে দেখলেই তাড়াতাড়ি গিয়ে মা'র কোলে লুকায়। তার পর সেখান থেকে একটা ভীরু বানর-শিশুর মত চেয়ে থাকে। কি যেন বলে ওর মা'র কাছে। আসমানতারাও গায় হাত বুলিয়ে কি যেন বুঝিয়ে দিতে থাকে—ও চুপ করে শোনে।

ধীরে ধীরে নিত্য দু'বেলা ওঁকে দেখে ছেলেটার ভয় ভাঙে। ও ওর মার সাথে সাথে বলে, 'সেলাম হুজুর।'

বিপ্রপদ এবার না হেসে থাকতে পারেন না। তিনিও প্রতি উত্তরে বলেন, 'সেলাম হুজুর।'

ছেলেটা খিল-খিল করে হাসে। দেখতে বেশ দেখায়। ওর মায়ের মুখের ছাপ ওর মুখে।

বিপ্রপদর দু'-এক দিন ইচ্ছা হয়, ওর অভাব-অভিযোগের কথা জানতে—ওর আসবাব-বিছানা মাদুর ঠিক মত কিনে দেওয়া হয়েছে কি না। কিন্তু লজ্জা হয় এই তুচ্ছ মেয়েলোকটার সাথে আলাপ করতে। ওর জামা-কাপড় আছে কি না তাও ঐ এক কারণেই জানা হয় না। ওর জন্য বেশী দরদ দেখানই মানে তাঁর সম্মানের বিশেষ ক্ষতি।

কিন্তু ছেলেটা ধীরে ধীরে আলাপ জমায়, 'সেলাম দাদু।'

ওর সাহস দেখে বিপ্রপদ অবাক্ হন—আবার মনে-মনে সন্তুষ্টও হন। কিন্তু একটু পরেই আবার ঘৃণায় তাঁর মন তিক্ত হয়ে ওঠে। নাম-গোত্রহীন ওটা কার ছেলে! ওর মা একটা বেশ্যারও অধম। তারই পেটের ছেলে ওঁকে কি সাহসে দাদু বলে ডাকছে? আবার ভাবেন: ছেলেটা তো তার জন্মের জন্য দায়ী না। তবে তাকে ঘৃণা করার কোনই তো হেতু নেই। ওর মাকেই বা তুচ্ছ করে লাভ কি? যে নিজের বিগত জীবনের জন্য দায়ী নয়, তাকে অবহেলা করা বিবেক ও বিচারবিরুদ্ধ। ও সমাজে অচল, কিন্তু বাস্তবিক ভাবতে গেলে ওকে তো অচলও বলা চলে না। ও হিন্দু কি মুসলমান তাতে কিছু এসে যায় না—ও বিরাট মনুষ্য সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশ। রুগ্ন হলেও ওকে নিরাময় করে নেওয়া ন্যায়সংগত।

'আসমানতারা, তুমি বসে না থেকে কাছারী-বাড়ীটা ধোয়া-মোছা করলেও তো পারো। একেবারে বসে-বসে দিন কি কাটে?'

'হুজুর, আমাকে দেখিয়ে দিলেই তো পারি।'

পরের দিন কাছারী-বাড়ীটা অনেক পরিষ্কার দেখায়। ছেলেটাকে কোলে নিয়ে নিয়েই ও কাজ করে যায়। এ সব কাজ ওর গায়েই লাগে না। পুকুর কাটতে, মাটি-বোঝাই ঝুড়ি টানতে যে পরিশ্রম তার তুলনায় এ আর কি খাটুনী! সে উঠানটা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে। ঝুড়ি-ঝুড়ি গাছের পাতা কুড়িয়ে এক স্থানে জমা করে রাখে। কাঠের বদলে পাতা দিয়ে রান্না করা যাবে। ছোট ছেলেটা কচি আমগুলো কুড়িয়ে খায়। বিপ্রপদর আশংকা হয় ছেলেটার অসুখ হবে। ও যে একটা সাধারণ কৃষাণের ছেলে সে কথা তিনি ভুলেই যান। ওর মা দেখে কিছু গ্রাহ্যই করে না। সে বরঞ্চ কোল থেকে নামিয়ে একটু রেহাই পায়। কত আর কোলে কোলে রাখতে ইচ্ছা করে!

ক'দিনের মধ্যেই কাছারী-বাড়ীর শ্রী ফিরে যায়—দেখতে দেখতে উঠানটারও শ্রী ফেরে। আসমানতারা ঐ সংগে বিপ্রপদর ঘর দু'খানাও বেশ করে পরিষ্কার করে আসে। আল্‌না টেবিলের নীচের ময়লাগুলোও দূর হয়। প্রথম প্রথম আসমানতারার ভয়-ভয় করে বিপ্রপদর ঘরের কাজ করতে—শেষে ভয় কমে—সহজ হয় সকল কাজ। কাপড় গুছায়, জুতো সাফ করে, বিছানা ঝাড়ে, এটা ওটা ঠিক করে রাখে।

বিপ্রপদ সকলই লক্ষ্য করেন। সময় সময় দু'-একটা প্রশ্নও করেন। আসমানতারাও উত্তর দেয়। তিনি বুঝতে পারেন মেয়েটার বেশ বুদ্ধি আছে। কাজ-কর্ম্মও নোংরা নয়। ও যে অজ্ঞাতকুলশীলা তা ক্রমশঃ সকলেই ভুলে যায়—এমন কি বিপ্রপদও।

এখন সময় সময় দু'-একটা ফাই-ফরমাসও করা হয় আসমানতারাকে। সে অতি সযত্নে তা করে যায়। এমনি ক'রে সে অল্প দিনের মধ্যেই কাছারী-বাড়ীর এক জন হয়ে ওঠে। ওকে না পেলে অনেকেরই অসুবিধা হয় এখন। দোষ-ত্রুটি হলে এখন ওকে মাঝে-মাঝে কৈফিয়ৎও দিতে হয়। লোমশ নায়েব মশাই ওকে খুবই পছন্দ করে। তামাক সেজে দিতে ওর জুড়ি না কি আর কেউ নেই ভূভারতে। ঘন-ঘন তামাক চাইলেও ও কক্ষনো কল্কীতে এমন করে তামাক ঠেঁসে ভরে না যাতে লোমশের টানতে অসুবিধা হয়। আজকাল ও যেন একটু খুশী মনেই চলে-ফেরে। দেখলে মনে হয়, ও যেন নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে। ওর স্বাস্থ্যও ফিরছে দিন-দিন। কঠোর শীতের পর যেমন বসন্ত আসে, তেমনি একটু-একটু করে ওর দেহে ফাগুনের প্রলেপ লাগছে। এ সব দেখে বিপ্রপদর খুবই আনন্দ হয়। এর ভিতর তাঁর দান রয়েছে। ওই যে একটু পাতলা রক্ত জমেছে ওর ঠোঁটে, হাড়ে লেগেছে মাংস—নির্ভয়ে বিচরণ করছে ওর ছেলেকে নিয়ে এই কাছারী-বাড়ীটায়—এর অন্তরালে রয়েছে কার কৃতিত্ব? তিনি চেয়ে-চেয়ে দেখেন এবং মনে-মনে স্ফীত হন। প্রথম দিনের সে ভীতিবিহ্বল চাহনি যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে। কত স্বাধীনতা যেন এসেছে ওর প্রাণে।

এক-এক দিন ওর বিগত জীবনের কাহিনী জানতে ইচ্ছা করে বিপ্রপদর। কিন্তু কতখানি মর্ম্মস্পর্শী না জানি হবে তাই তাঁর জিজ্ঞাসা করতে ভয় হয়। পাছে তার এ জীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে তাই তিনি কৌতূহল দমন করেন।

কেন জানি ক'দিন আসমানতারাকে দেখা যায় না।

ঘরগুলো আবর্জনা জমে নোংরা হয়ে ওঠে। আম-পাতায় কাছারী-বাড়ীর উঠানটা ভরে যায়। লোমশ নায়েব ডাকাডাকি করেও তামাক পায় না সময় মত।

কিন্তু বিপ্রপদর ঘর দু'খানা প্রথম দু'-তিন দিন আসমানতারা কোনও রকমে এসে পরিষ্কার করে গেছে। পরে তাও বন্ধ করতে হয়। ওর ছেলেকে ছেড়ে বের হওয়াই অসম্ভব।

বিপ্রপদ খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে আসমানতারার ছেলেটার অসুখ। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে দেখতে যান। এ আবার কি বিপদ! ছেলেটার ভীষণ জ্বর। ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময় কেমন করে যেন ঠাণ্ডা লেগেছে। বিছানায় প'ড়ে ছেলেটা হাঁপাচ্ছে। অসুখ এর মধ্যেই যে আকার ধারণ করেছে তা গুরুতর। ওঁকে খবর না দেওয়ার জন্য আসমানতারাকে মন্দ বলেন। তখনই ডাক্তার কি কবিরাজ যা পাওয়া যায় তাই আনতে লোক পাঠান হয়। কিছুক্ষণ পরেই লোক ফিরে আসে। ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে এক জন কবিরাজ আছে, সেও বাড়ী নেই। তখনই পাঁচ সাত মাইল দূরে ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠান হয়।

ক'ঘণ্টা পরেই ডাক্তার আসে—পাশ-করা ডাক্তার। ঔষধপত্র নিয়ম মত দেওয়া হয়। বিপ্রপদও নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু সন্ধ্যার সময় অসুখ ক্রমে বেশীর দিকে যাচ্ছে বলে মনে হয়। তিনি আবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

সেই রাত্রেই আবার ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠান হয়।

বিপ্রপদ ভেবেছিলেন: এই ছেলেটা একটু বড় হলে লেখা-পড়া শিখিয়ে একটু মানুষ করবেন। ও আসমানতারার জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট লাঘব করবে। স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দেবে মা'র বুকে। ওর দিকে চেয়ে আসমানতারা সব ভুলে যাবে। কিন্তু বিধাতা বুঝি বিবাদী। কি আর করবেন বিপ্রপদ। তবু চেষ্টা-যত্ন করে দেখবেন।

সময় মত ডাক্তার আসে আবার। ঔষধপত্র অদল-বদল হয়। রাত্রে আর ডাক্তারকে যেতে দেওয়া হয় না। ভোরের দিকে রোগী একটু ভাল বোধ করে। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যই—নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত। ছেলেটা মারা যায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বিপ্রপদ উঠে পড়েন। আশা চোরাবালি! কখন যে কে তার কবলে পড়বে বলা যায় না। আসমান-তারার ভবিষ্যৎ ভেবে বিপ্রপদ যথেষ্ট দমে যান। এ বন্ধনহীনা রমণীর উপায় হবে কি?

ছেলেটার জন্য কফিন এলো—একটু দামী কফিনই এলো বিপ্রপদর চেষ্টায়। সুগন্ধি আতর নতুন কাপড় যা-যা প্রয়োজন কিছুই বাদ গেল না। ওকে কবর দেওয়া হলো কাছারী-বাড়ীর পশ্চিম সীমানায় —ডালিম-বাগে।

যে সব চেয়ে বেশী খাটল, সব চেয়ে বেশী প্রবোধ দিল আসমান-তারাকে সে হচ্ছে কনিষ্ঠ পেয়াদা মোবারক। বয়স তার ওর প্রায় সমান সমান, দেখতে-শুনতে মন্দ না—একটু লেখা-পড়াও শিখেছে। লোকে বলে ওর অবস্থাও ভাল—ও গৃহস্থও ভাল। সংসারে ওর মা ছাড়া কেউ নেই—কিন্তু হাল লাঙল গরু বাছুর সবই আছে।

আসমানতারা ধীরে ধীরে কাজে মন দেয়। ক্রমে ওর শোক পাতলা হয়। এক কাজ বারবার ক'রে করে। কোনও দোষ-ত্রুটি রাখে না। ওর সময় এতটুকুও নষ্ট হ'তে পারে না। ওর এ খাটুনী অনেকের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। বিপ্রপদ স্বস্তি-বোধ করেন। যাক, এক ভাবে তো দিন ওর কাটছে। এ ভাবেই কাটুক যে ক'দিন কাটে। কিন্তু তার পর কি হবে তা তিনি ভেবেই পান না। যদি তিনি ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে যান তখন ঐ নিরাশ্রয়া মেয়েটা কার আশ্রয়ে থাকবে? কে নেবে ওর শ্লীলতা রক্ষার ভার? এ একটা গুরুতর সমস্যা। ছেলেটা বেঁচে থাকলে ওটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে তিনি রেহাই পেতেন—এখন আজীবন ওকে টানতে হবে, তার চেয়েও অসুবিধা—আগলাতে হবে। হীনতা এবং দীনতাই ওর সব চেয়ে বড় শত্রু। ও দু'টোর সুযোগ অনেকেই গ্রহণ করতে চাইবে। ওর কাছে আর বিয়ের কথাও বলা যাবে না। দাম্পত্য জীবনে ওর আর কোনও বিশ্বাস নেই। কখনও যে ফিরবে সে আশাও সুদূর-পরাহত। তখন বিপ্রপদ মানুষের কথায় মাথা পেতে এখন এমন দায়ে ঠেকলেন!

আসমানতারার রূপ আছে, বয়সও আছে—যদি ওর ইচ্ছা থাকে তবে বিপ্রপদ ওর একটা ভাল বিয়েও দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সে প্রস্তাব ওর কাছে কে করবে? এমন দুঃসাহস কার আছে?

তার চেয়ে এক কাজ করলে মন্দ হয় না। ওকে এক জন বুড়ো-গোছের মৌলভী রেখে লেখাপড়া শেখালে মন্দ হয় না। ওরও সময় কাটবে মনটাও সুস্থ হবে।

বিপ্রপদ এক দিন এক জন মৌলভী জোগাড় করে বলেন, 'আশমান, তুমি লেখা-পড়া শেখো। মুসলমানের মেয়ে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ো, দিল ঠাণ্ডা হবে।'

আসমান সম্মতি জানায়।

সেই থেকে বিপ্রপদ আসমানতারার ঝাড়া-পোঁছার কাজ বন্ধ করে দেন। ওকে চলতে বলেন আব্রু মত। ও একাগ্র মনে মেধাবী ছাত্রীর মত লেখা-পড়া করে যায়। এতটুকুও সময় নষ্ট করে না। কিন্তু একটা কাজ সে কিছুতেই ছাড়তে পারে না। কখনও কোন সময় গিয়ে যেন বিপ্রপদর ঘর জামা জুতো সব কিছু পরিষ্কার করে আসে। বিপ্রপদ সস্নেহে তিরস্কার করেন। কিন্তু সে তিরস্কার আসমান শোনে না। সে সব প্রলোভন ত্যাগ করেছে, কিন্তু এটুকু সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। বিপ্রপদ খুশী হন—খুশী হন এই ভেবে, মেয়ে যদি পিতার পরিচর্যা করে, করুক না—তাতে দোষের কি-ই বা আছে!

মৌলভীটি স্বল্পভাষী ধর্ম্মভীরু। সে সুললিত কণ্ঠে কোরাণের ব্যাখ্যা করে, আসমান কান পেতে শোনে। দু'-এক সপ্তাহ সে হাঁ করে শোনে, কিছুই বুঝতে পারে না। তার পর একটু একটু করে আস্বাদ পায় বুঝতেও পারে বেশ। ও যেন এক নতুন জগতে প্রবেশ করল। সেখানে সকলে শান্ত নিরীহ খোদার দিকে চেয়ে আছে। সেদিকে চেয়ে-চেয়েই তাদের দিন কাটে। ও যত শোনে তত ওর মন ভরে যায়। বিপ্রপদ দিন-দিন লক্ষ্য করেন, আস-মানের মুখে-চোখে প্রগাঢ় শান্তির ছায়া পড়ছে, ওর জীবনে আসছে নব চেতনা। ও কোন ঘৃণ্য সমাজ থেকে ক্লেদ-পংক ঠেলে যে এখানে এসেছে তা এখন ওকে দেখলে কে বলতে পারে? ওর

শিক্ষা সার্থক হচ্ছে, ওর অজু করার ভংগি, ওর ঘুরে-ঘুরে নামাজ পড়ার প্রণালী বিপ্রপদর কাছে অপূর্ব বলে মনে হয়। কি অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটল এই মেয়েটার একটা জীবনে।

এক দিন আসমান অভিযোগ করে। অভিযোগটা গুরুতরই বটে। শুনে বিপ্রপদ রেগে আগুন। কি এত বড় দুর্নীতি প্রশ্রয় পাবে? বর্দ্ধিত হবে তাঁর আমলে এই কাছারীতে? সামান্য একটা পেয়াদার এই সাহস! সে না কি যখন-তখন চেয়ে থাকে আসমানের দিকে কুকুরের মত? তবে আর পৃথক্ বন্দোবস্তে লাভ হল কি? ওঁর মেয়ের তুল্য আসমানতারা—তাকে অপমান! পর্দা আব্রু সকলি গেল বিফলে! আচ্ছা, আসুক গাঁয়ের তাগাদা থেকে ফিরে। জুতিয়ে লম্বা করে দেবেন বিপ্রপদ!

আসমান খুশী হয় সব শুনে।

নালিশটা মোবারকের বিরুদ্ধে।......

একটু বেশী রাত্রেই মোবারক কাছারীতে ফেরে।

'হুজুর ডেকেছেন তোমাকে।' সংবাদটা জানায় বংশী দারওয়ান।

মোবারক ভয়ে এতটুকু হয়ে যায়। এ রকম ডাক তো কত দিন পড়ে, কিন্তু আজকের ডাক যেন স্বতন্ত্র মনে হয়। তবু না গিয়ে উপায় নেই।

মোবারক সেলাম দিয়ে দাঁড়াইতেই বিপ্রপদ বলে ওঠেন, 'তোমার সাথে কথা আছে, দাঁড়াও—হাতের কাজ শেষ করে নি।'

এর পর ওর গলাটাই বোধ হয় কাটা যাবে এমনি ভাবে ও তটস্থ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

বিপ্রপদর হাতের কাজ সারা হতে বেশীক্ষণ লাগে না। তিনি ভেবে দেখেছেন, রাগের মাথায় বেশী চেঁচামেচি করে লাভ নেই, তাতে আসমানতারারই দুর্নাম হবে। মোবারককে কেউ দোষ বলবে না। স্ত্রীলোকটাই নষ্ট, এই কথাই সকলে বিশ্বাস করবে—এত দিনের চেষ্টা-যত্ন সব হবে বৃথা।

মোবারক মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিপ্রপদ ওকে ধীরে ধীরে উপদেশের ছলে তিরস্কার করে যান। বুঝিয়ে দেন যে, এ সব অত্যন্ত গর্হিত। তার পর মোলায়েম করে সামান্য একটা পেয়াদার কাছে বলেন, 'তোমারও তো মা-বোন আছে মোবারক, তাদের সাথে যেমন করে বাস করো, তেমনি ভাবে এখানেও তোমার চলা উচিত। তুমি যদি নিজে না বোঝ অন্যে কি পারবে তোমাকে বোঝাতে! এই যে মেয়েটা এখানে রয়েছে, এর ভাল-মন্দের জন্য তোমরা কেউ এতটুকুও দায়ী নও, শুধু আমারই দায়িত্ব—যদি এই কথাই মনে-মনে ভেবে থাকো তা হলে আমার আর কিছু বলার নেই। তোমার উঠতি বয়স, একটু লেখা-পড়া জানো, বেশ চালাক-চতুরও আছ—চাকরীতে উন্নতির খুবই আশা তোমার রয়েছে, একটা বদ্-খেয়ালে তা' কি তোমার নষ্ট করা ভাল? লোকে বলবে কি?'

'হুজুর, আমাকে আর বলবেন না—এ-যাত্রা মাপ করুন, আপনি বাপ সমতুল।' মোবারকের কণ্ঠ অনুশোচনায় রুদ্ধ হয়ে আসে।

বিপ্রপদ আর কিছু বলেন না। ও ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

তিনি যেন নিষ্কৃতি পান।

এর পর রীতিমত কাছারীর কাজ-কাম চলতে থাকে। আসমানতারারও পড়া-শুনা চলে। কোনও গোলমাল নেই। সদরের হুকুম আসে, বিপ্রপদ তা তামিল করেন। মফঃস্বলে যান, কাছারীর কাগজ-পত্র দেখেন—গতানুগতিক ভাবেই সব চলতে থাকে। তবে সময় সময় আসমানের ছেলেটার কথা মনে পড়ে, বেশী করে মনে আলোড়ন আনে যখন ডালিম-বাগটার পথ দিয়ে যাতায়াত করেন।

হঠাৎ এক দিন মফঃস্বল থেকে ঘুরে এসে সংবাদ পান: আসমানতারা নেই, সে মোবারকের সাথে পালিয়েছে।

'কি, পালিয়েছে!' বিপ্রপদ তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। কিন্তু পর-মুহূর্তে ভাবেন, ভালই হয়েছে। তিনি আজ সকল দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলেন। তিনি আজ বাস্তবিকই নিশ্চিন্ত! তাই প্রাণ খুলে হেসে ওঠেন।

[ক্রমশঃ

চাওয়া ও পাওয়া

দিলীপ দে-চৌধুরী

প্রথম কথাই তার—'কই,
খুব তো দিলেন প'ড়তে আমাকে বই!'
—'ওই যাঃ! ভুলে গেছি একেবারে—
নানান্ কাজেতে এ-ধারে ও-ধারে
প'ড়েছি জানেন এমনি এ ঝালাতনে
কিছুই থাকে না মনে:
লজ্জিত আমি, ছিঃ ছিঃ!'
—'কেন আর মিছিমিছি—
লজ্জার কথা তোলা
স্বভাবই যাদের ভোলা
লজ্জা কী আছে বলুন তাদের এটাতে?'

সত্যিই তাই—লজ্জা কী আছে এটাতে—
ক'টা চাওয়া কার
নিঃশেষে আর
পেয়েছি জীবনে যেটাতে!

যুগাবতারগণ ও গান্ধীজী

শ্রীশতদল বিশ্বাস

১

যুগে যুগে হয়েছে জগতে অবতারগণের আবির্ভাব। তাঁরা এসেছেন মানব জাতির কল্যাণ সাধন করতে।

জগৎবাসী যখনই ভুলে যায় তার সৃষ্টিকর্তাকে, যখনই মন্দের হয় জয়, মানব যখন পাপ-পঙ্কে ডুবতে থাকে, তখনই ভগবান পাঠান এই যুগাবতার মহামানবগণকে। তাঁরা বিপথগামী নিমজ্জমান্ মানব-জাতিকে আবার টেনে তোলেন উপরে তাই এঁরা মানব জাতির প্রতি ভগবানের প্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন,—তাঁর শ্রেষ্ঠতম দান।—এঁরা দেখিয়ে দেন মানব-জাতিকে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ কি।—এঁরা দেখিয়ে দেন যে পথ—সে পথ সত্যের, জ্যোতির ও মঙ্গলের সন্ধান জানিয়ে দেয় তাই মানুষ আবার ফিরে পায় তার লুপ্তপ্রায় মনুষ্যত্ব তার পশুত্বের উপর জয় লাভ ক'রে; মানুষ অনুপ্রেরণা পায় তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ করতে। জগদ্বিখ্যাত সত্যাশ্রয়ী সক্রেটিস্ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করতে নিজের প্রাণ অম্লান মুখে বলি দিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষেও জন্মেছেন—এই সব মহাপুরুষদের মধ্যে কয়েক জন। ইতিহাসের পাতা মনে মনে ওল্‌টালে কার না স্মরণ হয় বুদ্ধদেবের কথা? আর সেই সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক আর এক মহামানবের—জৈনধর্ম-প্রবর্ত্তক 'জৈন' মহাবীরের কথা?

মহাবীরের আবির্ভাব হয়, বৈদিক যুগের শেষ ভাগে; এই সময় উত্তর-ভারতের অথবা ঐতিহাসিক ভাষায় আর্য্যাবর্ত্তের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।

এই যে ঘোর অশান্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিল বৈদিক যুগের শেষ ভাগে ব্রাহ্মণগণ যখন ধর্মের নামে নানারূপ অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হলেন ও নিম্নবর্ণগণ যখন তাঁদের অত্যাচারে অস্থির হয়ে উঠলেন বৈদিক ধর্মের উপর বীতরাগ হয়ে, যখন তাঁরা প্রকৃত ধর্মের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন—যে ধর্ম শিক্ষা দেবে মানুষকে তার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করতে, সেই সময় হল এক যুগাবতারের আভির্ভাব— তিনি 'জিন্' মহাবীর, 'জয়ী' মহাবীর, 'আত্মজয়ী' মহাবীর। জৈনধর্ম প্রবর্ত্তকদের মধ্যে তিনি অন্যতম ও পার্শ্বনাথের ন্যায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

পার্শ্বনাথের প্রবর্ত্তিত ধর্মের মূলমন্ত্র "চতুর্যাম" নামে বিখ্যাত। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য এবং অপ্রতিগ্রহ এই চারিটির সাধন চতুর্যাম" নামে অভিহিত হয়। তার পর মহাবীর "জিতেন্দ্রিয়তা" এই চারিটি মূলমন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করেন।

মহাবীরের ধর্মে সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার নাই, জাতিভেদও তাঁরা মানতেন না। 'আত্মজয়ী' পুরুষই 'নির্বাণ' বা মোক্ষ লাভ করে এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। অহিংসা ও ইন্দ্রিয় জয়ই ধর্মাচরণের একমাত্র পথ এই ছিল তাঁদের ধারণা।

মহাবীরের সমসাময়িক বুদ্ধদেব তৎকালীন উচ্ছৃঙ্খল বিলাস-বিভোর জগতে এলেন ত্যাগের মন্ত্র নিয়ে।

পরবর্ত্তী কালে তাঁর প্রচারিত ধর্ম—বৌদ্ধধর্ম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ও অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়লেও গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ছিল খুবই সহজ ও সরল। জৈনদের মত তিনিও বেদের অপৌরুষেয়তা, জাতিভেদ এবং ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন না। জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে কামনা-বাসনাই মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে এবং মানুষ এক জন্মের কর্মফলানুযায়ী পরজন্মে নানারূপ দুঃখ ভোগ করে,—সুতরাং কামনা-বাসনা বিনাশ করে চিত্তশুদ্ধিই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। এই মোক্ষই 'নির্বাণ' অর্থাৎ বাসনা হতে মুক্তি।

শুদ্ধচিত্ত যিনি তিনি কখনও কোনরূপ অধর্মাচরণ করতে পারেন না এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। ধর্মের নামে অনাচার, জীবহত্যা, ব্রাহ্মণত্বের অধিকারে নিম্নবর্ণের উপর অত্যাচার—এই সব অমানুষিক নৃশংসতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেছিলেন অহিংসার মন্ত্র। যেখানে হিংসা নাই সেখানে পীড়ন নাই, অত্যাচার নাই, অধর্মাচরণ নাই, হত্যাও নাই। হিংসাই সকল অনর্থের মূল, সুতরাং অহিংসার ব্রত না নিলে মানুষের মুক্তি নাই, জগতেও শান্তির কোনই সম্ভাবনা নাই।

ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের ও ধর্মের অবনতির প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ, জনসাধারণের কল্যাণার্থে এই দুই মহান্ ধর্মমতের প্রবর্ত্তন হয়।

বৈদিক যুগের শেষভাগে হিন্দুধর্মের যেরূপ অবনতি হয়েছিল, দু' হাজার বছর পূর্বে প্যালেষ্টাইনে য়ীহুদিগণ সেইরূপ ধর্মের প্রকৃত নির্দেশ ত্যাগ করে বাহ্যিক আড়ম্বর, যাগযজ্ঞ লোক-দেখান দীর্ঘ প্রার্থনা, আচার-বিচার প্রভৃতি বাহ্যিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের ন্যায় ফরিশী ও ধর্মযাজকেরা করগ্রাহী ও পরজাতিদের অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখত, তাদের উপর নানারূপ অত্যাচার করত, আর ধর্মের দোহাই দিয়ে নানা অধর্মাচরণ করত। য়ীহুদি জাতির এই ঘোরতর অবনতি সত্ত্বেও তাদের প্রতি তাঁর অসীম প্রেমের নিদর্শন দেখালেন তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুখৃষ্টকে জগতে পাঠিয়ে। খৃষ্ট এলেন স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করে—জন্মগ্রহণ করলেন দরিদ্র সূত্রধরের ঘরে। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনিও ধর্মপ্রচার আরম্ভ করলেন। সে এক অপূর্ব ধর্ম—প্রেমের, ক্ষমার ধর্ম। তিনি মিশলেন একেবারে সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে। যাদের করত সকলে ঘৃণা তাদের তিনি ভালবাসলেন নিজের ভাই-এর মত। তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হলেন তিনি। রোগীকে দিলেন আরোগ্যদান—দুঃখীর নয়ন-জল দিলেন মুছিয়ে—বুভুক্ষুর মুখে দিলেন অন্ন তুলে—করুণার গলে গিয়ে মৃতকেও করলেন জীবন দান।

যীশুখৃষ্ট তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন ভণ্ডামি না করতে—অকপট হতে। তাদের শাস্ত্রে নিষেধ আছে বিশ্রাম করে কোন কাজ করতে। যীশুখৃষ্ট তাদের শিক্ষা দিলেন শাস্ত্রবিধি আক্ষরিক ভাবে পালন না করে তার প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করতে। বার বার বলেছেন তিনি—বাস্তবতঃ শাস্ত্রবিধি আক্ষরিক ভাবে পালন করে মনের ভিতর কুচিন্তা পোষণ করা অপেক্ষা বরং শুদ্ধচিত্তে বিশুদ্ধ বিবেকে অপরের কল্যাণার্থে শাস্ত্রনির্দেশ অমান্য করাও বাঞ্ছনীয়। জোর গলায় বলেছেন তিনি—"মানুষ শাস্ত্রের জন্য সৃষ্ট হয়নি শাস্ত্রই হয়েছে মানুষের জন্য।" শুধু নিম্নজাতি নিম্ন বর্ণের লোকেদেরই তিনি নেননি কাছে টেনে—পাপী-তাপীও যখন পরিতাপানলে চিত্তশুদ্ধি করে এসেছে ছুটে তাঁর কাছে, তিনি তাকেও টেনে নিয়েছেন কাছে। যীশুখৃষ্ট বার বার জনসাধারণকে বলেছেন—ভগবান তোমার টাকাকড়ি ধনরত্ন কিছুই চান না, চান শুধু তোমার হৃদয়খানি···তাঁকে ভালবাস। কিন্তু তাঁকে ভালবাসতে হলে আগে তোমায় ভালবাসতে হবে মনুষ্য মাত্রকে। তোমার মতই রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ—যে তোমারই মত সুখ-দুঃখ অনুভব করে, তার দুঃখ-ব্যথা যদি বুঝতে

না পার, তাকে যদি ভালবাসতে না পার, তা'হলে কেমন করে পারবে সেই অদৃশ্য ভগবানকে ভালবাসতে? নারায়ণকে ভালবাস যদি তবে আগে ভালবাসবে নর-নারায়ণকে।

বড় কঠোর আদেশ! ভগবানকে ভালবাসা তো সহজ নয়। আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে বিরোধ মনোমালিন্য হলে সহজে পারা যায় না তাকে ক্ষমা করতে মন খুলে—তা শত্রুকে! কিন্তু কঠোর হলেও যে এ আদেশ পালন করা একেবারে অসম্ভব নয় তা দেখিয়েছেন মহাত্মা গান্ধী তাঁর নিজের জীবনে।'

মহাত্মা গান্ধী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, শত্রুকে ক্ষমা করা, তাকে ভালবাসা ব্যতীত জগতে শান্তির—মানব জাতির কল্যাণের আর কোন পন্থা নেই। তাই তাঁর এই ধ্রুব বিশ্বাসের নির্দেশ মত চলেছিলেন তিনি, প্রচার করেছিলেন তার মত জনগণ সম্মুখে। পরকে ভালবাসা ও শত্রুকে ক্ষমা করা মানে নিজের 'আমিত্ব'কে বলি দেওয়া। 'অহম্'এর আস্থা আর থাকবে না মনের কোণেও—'আমিত্ব' ও 'স্বামিত্ব' করতে হবে ত্যাগ নিজেকে নিঃস্ব—শূন্য করে দিতে হবে বিলিয়ে পরের কল্যাণার্থে। এ যে বড় কঠোর নির্দেশ—দু'হাজার বছর পূর্বে তাই যেমন য়ীহুদিগণ হত্যা করেছিল প্রেমের অবতার যীশু খৃষ্টকে আজ তেমনই হত্যা করলুম আমরা মহাত্মাজীকে। হায় রে আত্ম-সর্বস্ব মানুষ, বুঝলে না তুমি প্রেমের মহিমা—ক্ষমার মহত্ব! বধ করলে তাই তুমি সেই প্রেমের অবতারকে।

মহাত্মা গান্ধীর ভারতবাসীর মুক্তির জন্য আবির্ভাব হল—যখন ভারতবাসী প্রায় দেড় শত বছর ধরে বিদেশীর দাসত্ব করে করে হারিয়ে ফেলেছিল তার আত্মমর্যাদা জ্ঞান—হারিয়ে ফেলেছিল তার মনুষ্যত্ব।

২

ভারতের ভাগ্যাকাশের মহা সন্ধিক্ষণে আবির্ভাব হল মহাত্মা গান্ধীর। পুণ্যবতী জননীর নিকট তিনি লাভ করেছিলেন প্রবল ধর্মানুরাগ, অবিচলিত সত্যানুরাগ ছিল তাঁর ভগবানদত্ত নিজস্ব মহা গুণ।

যে জননীর মুখখানির স্মৃতি সম্বল করে বিদেশে কাটিয়েছেন তিনি দীর্ঘ প্রবাসকাল; স্বদেশে ফিরে সেই অতি প্রিয় মুখখানি দেখবার আর অবকাশ পেলেন না তিনি। গভীর শোকে তবুও তিনি ভেঙ্গে পড়লেন না মানসিক স্থৈর্য ও শক্তির প্রভাবে। তাঁর জননীর স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করল তাঁর দেশ-মাতৃকা।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় কার্যানুরোধে গিয়ে নিজ দেশবাসী এবং কৃষ্ণকায় জাতি মাত্রেরই শ্বেতকায় প্রভুদের নিকট অকথ্য নির্যাতন ভোগ দেখে জেগে উঠেছিল তাঁর প্রাণে দেশাত্মবোধ। কৃষ্ণকায়দের আত্মসম্মান-বোধ ও আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান জাগিয়ে তুললেন তিনি। নিরস্ত্র একাকী তিনি সশস্ত্র বিদেশীর সম্মুখীন হয়েছিলেন মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য।

কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকায় গান্ধীজী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন—"সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই" তাই তিনি অস্পৃশ্যতাকে হিন্দুধর্মের জঘন্যতম কলঙ্ক বলে মনে করতেন। শৈশব কাল হতে তিনি অস্পৃশ্যতার সমর্থন করতে চাইতেন না। অনুন্নত সম্প্রদায়ের উপর উচ্চবর্ণের সামাজিক অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি আরও বলেছেন—"বিদেশী গবর্ণমেণ্টকে আমরা বলি তাহারা অত্যাচারী, কিন্তু এমন কোন্ অত্যাচার, এমন কোন্ অনাচার বিদেশী গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপর করিয়াছেন, যাহা আমরা আমাদের স্বদেশবাসী—আমাদের স্বজাতির উপরেই প্রয়োগ করি নাই?"···অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি অনুকম্পায় তাঁর চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। ভারতবাসীকে যেমন তিনি চেয়েছিলেন বিদেশীর পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করতে তেমনিই তিনি চেয়েছিলেন অনুন্নত সম্প্রদায়কে স্বদেশবাসী উচ্চবর্ণের অত্যাচারের হাত হতে মুক্ত করতে। একাধারে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন—বিদেশীর উৎপীড়নের ও সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। দেশ-প্রেমিক হলেও তিনি দেশবাসীর ত্রুটি সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন না। গোড়ার গলদ মুক্ত করতে তিনি সম্মার্জনী ধরেছিলেন, কিন্তু শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি লাঠিগাছিও উত্তোলিত করেননি।—সত্যাশ্রয়ী গান্ধীর স্থির বিশ্বাস ছিল সত্যের আশ্রয় নিলে, সত্যের পথ ধরলে জয় অবশ্যম্ভাবী তাই বিদেশীর বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান তিনি "সত্যাগ্রহ" নামে অভিহিত করলেন। এত বড় অস্ত্র ধরলেন তিনি বিদেশীর বিরুদ্ধে যে তাকে হার মানতেই হল। 'এ্যাটম বম্বে'র শক্তিও আজ এর কাছে পরাজিত। তাই ভাবি, আজ মহাত্মা মানব-জাতির চক্ষে তাঁর কোন্ কীর্ত্তির জন্য অমর হবেন? রাষ্ট্রীয় জগতে ভারতবর্ষকে পরাধীনতার পাশ হতে মুক্ত করবার জন্য? না—ধর্ম-জগতে ভারতবাসীকে তার আভ্যন্তরিক দুর্নীতির পাপ-পাশ হতে মুক্ত করবার প্রচেষ্টার জন্য?···

যুগে যুগে যে মহাপুরুষ মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করতে—সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের অমরকীর্তি সমগ্র মানব-জাতির মর্মে মর্মাক্ষরে রয়েছে গাঁথা। মহাত্মা গান্ধী তাঁদের সকলের প্রচেষ্টার অনুধাবন করেছেন নিজের জীবনে। সক্রেটাসের মতই তিনি সত্যাশ্রয়ী—জৈনদের মতই 'অহিংসার' ব্রত তিনি করেছিলেন বরণ—বৌদ্ধদের কাম্য 'নির্বাণ' তিনি লাভ করেছিলেন কামনা-বাসনা ত্যাগ করে চিত্ত শুদ্ধি করে।' তবু সংসারধর্ম তিনি পালন করেছিলেন। সংসার-ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন—জগৎকে দেখিয়েছিলেন সংসারী মানবও কেমন করে পারে সংসারের মধ্যে থেকেও সন্ন্যাসের অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে। গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত এই মহাধর্ম সাধারণের কল্যাণার্থে, তাদের প্রতি তাঁর অসীম প্রেম, করুণা ও সহানুভূতি ব্যক্ত হয়েছে তাই তাঁর প্রচারিত অপূর্ব ধর্মে,—প্রেমের ধর্মে, ত্যাগের ধর্মে, ক্ষমার ধর্মে, যার তুলনা হয় শুধুই খৃষ্ট-প্রবর্ত্তিত মহান্ প্রেমের ধর্মের সঙ্গে—যে ধর্মের অনুধাবনে মানব পায় অমৃতের সন্ধান, চির-জ্যোতির সন্ধান, অসীম আনন্দের সন্ধান, অনন্ত জীবনের সন্ধান।

★

জন্মদিন

শ্রীঅমলা দেবী

৩

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় হেড-মাষ্টারকে সঙ্গে লইয়া গাঙ্গুলী মশায় বিনয় মাষ্টারের বাড়ী গেলেন। বিনয় আপ্যায়ন সহকারে তাঁহাদের বৈঠকখানায় বসাইয়া কহিল—"সব ঠিক আছে। একটু গা-টা ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিচ্ছে। আপনাদের সামনে বেরোতে হবে কি না—" বলিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। মাষ্টার মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

গাঙ্গুলী মশায় সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—"হাসছ যে?"

মাষ্টার কহিলেন—"না, না, হাসিনি তো। হাসব কেন? হাসবার কি আছে এতে—" বলিয়া গম্ভীর হইয়া উঠিলেন।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"ও-বেলায় বিনয় বললে অনেক করে একবার শুনে যেতে। হাকিম-টাকিমদের সামনে যা'-তা' পড়লে তো চলবে না! তা'ছাড়া মেয়েমানুষ। একবার দেখে দেওয়া দরকার। আমি বললাম, আমি কিছু তো বুঝি না। মাষ্টারকেও সঙ্গে নাও। ও যদি পছন্দ করে তো কোন ভয় নাই।"

কিছুক্ষণ পরে বিনয় আসিয়া দুই জনকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেল। বাড়ীটি ছোট, মাটীর—খড়ে ছাওয়া, সামনে অপ্রশস্ত বারান্দা, তার পরেই পাশাপাশি দুইটি কুঠ্‌রী। ডান পাশের কুঠ্‌রীতে তাহাদের বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঘরে ঢুকিতেই ডান দিকের দেওয়াল ঘেঁসিয়া পাশাপাশি দুইটি আসন পাতা, প্রত্যেকটি আসনের সামনে রেকাবীতে খান-চার লুচি, আলু-ভাজা, দু'টি রসগোল্লা, এক পাশে এক গ্লাস জল, আর এক পাশে এক কাপ চা।

দুই জনেই বলিয়া উঠিলেন—"ও-সব আবার কি?"

বিনয় সবিনয়ে কহিল—"কত ভাগ্যে আমার মত অভাজনের বাড়ীতে আপনাদের মত লোকের পায়ের ধুলো পড়েছে। একটু মিষ্টি-মুখ করাব না?"

মাষ্টার কহিলেন—"তা' বেশ করেছেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটা—"

বিনয় কহিল—"খেয়ে নিন। তার পর চা খেতে-খেতে শুনবেন।"

বাড়ীর উঠানের দিক্ হইতে অনেকগুলি মেয়ের চাপা কথা-বার্তা ও হাসির শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। মাঝে-মাঝে একটি কোমল কণ্ঠের তর্জ্জন। তার পরেই মিলিত কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত হাসি। সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছাসকে সবলে দমন। বাড়ীর ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েগুলি যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া সাজিয়া-গুজিয়া ঘরটার ও-পাশটায় সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়-ভরা চোখে ইঁহাদের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বহু দিনের কথা মনে পড়িল গাঙ্গুলী মশায়ের। উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়স। কুলীন বামুনের ছেলে। অনেক যায়গা হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে। কোনটি বাবার পছন্দ হইতেছে তো ঠাকুরদাদার হইতেছে না; আর যদি দু'জনেরই পছন্দ হইতেছে তো মায়ের পাঁচশ' রকমের বায়নাক্কার দাপটে তলাইয়া যাইতেছে। এদিকে একটি নোলক-পরা কিশোরীকে বাহুপাশে বাঁধিবার জন্য তাঁহার প্রাণ হাহাকার সুরু করিয়াছে। পূজার পরেই মামার বাড়ী গিয়াছিলেন গাঙ্গুলী মশায়। এক দিন বড় মামী বলিলেন, আমার ছোট ভাইঝিটি দেখতে-শুনতে খাসা, বাছা! বৌ করবার মত মেয়ে; বিয়ে করবি তো বল, তোর মামাকে দিয়ে তোর ঠাকুরদাকে চিঠি লেখাই। তাঁহার বুকটা ময়ূরের মত পেখম ধরিয়া নাচিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পরম ঔদাস্যের সহিত বলিয়াছিলেন, আমাকে বলে কি হবে মামী? ওদের চিঠি লেখাও। মামী বলিলেন, তা তো লেখাবই, বাছা! তবে তুই আগে একবারটি দেখ, তোর যদি পছন্দ হয়তো চিঠি লেখানোর ব্যবস্থা করব। মেয়েটিকে দেখানো হইয়াছিল তাঁহাকে। বারো বৎসরের কিশোরী মেয়ে, চাপা ফুলের মত রং, পরনে নীলাম্বরী শাড়ী; নতমুখে আসিয়া তাঁহার হাতে দুইটি পান দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। মেয়েটিকে ভারী পছন্দ হইয়াছিল তাঁহার, কিন্তু মেয়ের বাপ ভঙ্গ-কুলীন বলিয়া বিবাহ হয় নাই। ওদিকে মা, বাবা ও ঠাকুরদাদার ত্র্যহস্পর্শ ঘনিয়া গেল; ফলে গৃহিণী তাঁহার ঘাড়ে চাপিলেন।

সশব্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন গাঙ্গুলী মশায়। মনে হইল, বয়স অনেক বেশী হইয়া গিয়াছে। সে-দিনের যে আবেগের চাপ অবলীলাক্রমে হৃদয় বহন করিয়াছিল, পুরাতন বয়লারের মত এখন সে চাপ সহ্য করিতে পারিবে না। রসগোল্লা দুইটি শেষ

করিয়া গেলাস হইতে আলগোছে কতকটা জল গিলিয়া বাকী জলটাতে মাথার সামনেটা ও রগ দুইটা ভিজাইয়া লইলেন।

বিনয় কহিল—"চা খাবেন না ?"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"না, ভায়া! ভারী গরম।"

বিনয়ের শ্যালিকা অবিলম্বে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হইল। বয়স বিনয় বাড়াইয়া বলে নাই। ত্রিশ তো বটেই—দু'-এক বৎসর বেশীও হইতে পারে। লম্বা, দোহারা চেহারা; কালো রং; পরনে ছাই-রংএর বুটিদার ঢাকাই শাড়ী; ফিকে সবুজ রংএর ব্লাউস। শাড়ীর আঁচলটি গলায় বেড়ানো। মাথায় এলো খোঁপা। মুখখানি শান্ত, গম্ভীর। ধীর-পদে আসিয়া যুক্তহস্তে নমস্কার করিয়া আনত নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনয় সাহস দিয়া কহিল—"লজ্জা কি, পড়।"

মেয়েটি এক খণ্ড কাগজে-লেখা গাঙ্গুলী-প্রশস্তি ধীর ভাবে, সুস্পষ্ট কণ্ঠে পড়িয়া গেল এবং শেষ হইবা মাত্র আর একবার নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মেয়েটি বাহিরে যাইবা মাত্র সমবেত নারীকণ্ঠে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইল।

গাঙ্গুলী মশায় সশঙ্কে কহিলেন—"ও আবার কি ?"

বিনয় কহিল—"মেয়েরা কেমন করে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করে আপনাকে আবাহন করবে, তাই শুনিয়ে দিল আর কি।"

মাষ্টার মশায় গম্ভীর মুখে কহিলেন—"মাল্য-চন্দন দিয়ে বরণটারও রিহার্সেল হবে না কি ?"

গাঙ্গুলী মশায় সন্ত্রস্ত ভাবে কহিলেন—"না, না, ভায়া, ও সব থাক।"

গাঙ্গুলী মশায় তাড়াতাড়ি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"বেশ হয়েছে, বলে দিও মেয়েটিকে; কি হে মাষ্টার, ভাল হয়নি ?"

মাষ্টার মশায় কহিলেন—"খুব ভাল হয়েছে। যেমন মিষ্টি গলার স্বর, তেমনি স্পষ্ট উচ্চারণ। পাঠটিও বেশ ধীর ভাবে করেছেন। বেশ ভাল হয়েছে, বলে দেবেন ওঁকে। খুব ভাল লেগেছে আমার, গাঙ্গুলী মশায়েরও—"

তিন জনে বাহিরে আসিলেন। রাস্তায় নামিয়া গাঙ্গুলী মশায় বাড়ীটার চালের দিকে তাকাইয়া কহিলেন—"ঘরের চালটা গেছে যে হে! এ বছর না ছাওয়ালেই নয়।"

বিনয় কহিল—"সেদিনের ঝড়ে সব উড়িয়ে নিয়ে গেছে; আর দেরী করলে চলবে না; বৃষ্টি হলেই ভিজতে হবে বাড়ীর সবাইকে।"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"না না, দেরী কিসের? ব্যবস্থা করে দেব। প্রফুল্লর বাড়ীর অবস্থা কি ?" বিনয়, ওর এ বছরটা চলে যাবে—"

এই বাড়ী দুইটি গাঙ্গুলী মশায়েরই সম্পত্তি। এ-পাড়ায় আগে ঘর-কয়েক রাজপুত বাস করিত। তাদের অবস্থা ভালই ছিল। কিন্তু রাজপুতদের স্বাভাবিক অমিতব্যয়িতার জন্য অবস্থা তাহাদের খারাপ হইয়া আসে। গাঙ্গুলী মশায়ের কাছে অনেক টাকা দেনা করে। দুর্ভিক্ষের বৎসরে জমি-জমা, ঘর-বাড়ী গাঙ্গুলীর মশায়ের হাতে সঁপিয়া দিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

যে বাড়ীগুলির জরাজীর্ণ অবস্থা ছিল—বর্ষায়, বাদলে পড়িয়া গিয়াছে। কেবল দুইটি বাড়ী বাসযোগ্য ছিল বলিয়া গাঙ্গুলী মশায় মেরামত করিয়া লইয়াছেন। এবং গ্রাম হইতে একটু দূরে হইলেও স্কুলের খুব কাছে বলিয়া, স্কুলের দুই জন শিক্ষককে নাম-মাত্র ভাড়ায় বাস করিতে দিয়াছেন।

বিনয়ের কাছে বিদায় লইয়া গাঙ্গুলী মশায় দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিলেন। মুখে কোন কথা নাই। অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাব। মাষ্টার মশায়ও নীরবে পাশে-পাশে চলিতে লাগিলেন। মাঝে-মাঝে গাঙ্গুলী মশায়ের দিকে তাকাইয়া তাঁহার মানসিক অবস্থাটা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাস্তায় লোক-জন নাই। সারা গ্রামটি সারা দিনের কর্ম্মব্যস্ততার পর বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে যেন। দূরে বাউরীপাড়া হইতে সমবেত কণ্ঠে গান ও খোলের শব্দ কানে আসিতেছে। গাঙ্গুলী মশায়ের প্রশস্তি গানটি রপ্ত করিতেছে সম্ভবতঃ।

অনেকক্ষণ পরে গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"মেয়েটিকে বড় দুঃখী বলে মনে হল, না ?"

মাষ্টার কহিলেন—"হুঁ—"

—"হবেই তো! এত বয়স হ'ল বিয়ে হয়নি। পরের দয়ায় বেঁচে থাকা তো ?"

—"সত্যি!"

—"তা' বয়স কত হবে বলে মনে হল ?—"

—"ত্রিশ তো বটেই—"

—"আমারও তাই মনে হয়। বিনয় মিথ্যে বলেনি—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, স্বাস্থ্যটিও ভাল। ডাক্তার-বদ্যির জন্যে পয়সা খরচ করতে হবে না ওর স্বামীকে।"

মাষ্টার কহিলেন—"তা' বটে। অবশ্য যদি বিয়ে হয়—"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"বিয়ে হবে না কেন? একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে।"

মাষ্টার মনে-মনে হাসিয়া কহিলেন—"ওর উপযুক্ত পাত্র কই এ গ্রামে? কোন ছোকরার ঘাড়ে তো চাপানো চলবে না। বেশ একটু ভারী বয়সের বর না হলে মানাবে না ওকে।"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"তা তো বটেই! ত্রিশ-বত্রিশ যদি বয়স হয় তো আরও দশ বছর যোগ কর; চল্লিশ-বিয়াল্লিশের পাত্র চাই, নিদেন পঞ্চাশ পর্য্যন্ত—"

—"অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষ হওয়া চাই। তা' সে-রকমও তো গাঁয়ে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। প্রথম পক্ষগুলি তো সবারই জল-জ্যান্ত বেঁচে!"

নাভি-শ্বাস ফেলিয়া গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"তা' সত্যি।"

মাষ্টার কহিলেন—"আপনার মামাতো-ভাইয়ের ছেলেকে আসতে চিঠি লিখেছেন ?"

—"লিখেছি তো।"

—"তিনি তো বিয়ে করেননি এখন পর্য্যন্ত।"

—"না।"

—"তাঁর বয়স কত হবে ?"

—"তা' চল্লিশের কাছাকাছি হবে বৈ কি।"

—"তাঁকে একবার বিয়ের জন্যে ধরলে হয় না? আর তো জেলে যেতে হবে না ওঁদের। এবার একটা ভাল কাজ-টাজ বাগিয়ে বে'-থা করে সংসার করলেই পারেন।"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"ও কেন ঐ মেয়েকে বিয়ে করতে যাবে? কলকাতায় থাকে। কংগ্রেসের নাম-করা লোক। কত বড় কাজ পাবে। সাহেব বলছিলেন, মন্ত্রীই হয়ে যেতে পারে হয়তো। কলকাতার কত বড়-ঘরের ভাল-ভাল মেয়ে ওকে বিয়ে করবার জন্যে ঝুলোঝুলি সুরু করে দিয়েছে দেখ গে।"

—"তা' হ'লেও একটা গরীব অসহায় মেয়ের সদ্গতি ওঁরা ছাড়া কে করবে? আমার মনে হয়—"

গাঙ্গুলী মশায় বাধা দিয়া কহিলেন—"ও-সব আশা ছাড়, ভায়া! দেশোদ্ধার করেছে বলে যে সে একটা মেয়েকে সারা জীবন ঘাড়ে করে বয়ে বেড়াবে, সে লোক ওরা নয়।"

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন।

বাড়ীর কাছে আসিয়া গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"আজকার ব্যাপারটা আর কাউকে বলে কাজ নাই। কি বল? কে কি ভাববে। দরকার কি।"

মাষ্টার কহিলেন—"কি দরকার! বলব না কাউকে।"

৪

দিন-দুই পরে প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী হেড-মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিল। হেড-মাষ্টার-গৃহিণী আপ্যায়ন করিয়া তাহাকে বসাইলেন। দু'-চার কথার পরে প্রফুল্লর স্ত্রী কথাটা পাড়িল—"আপনার কর্ত্তাটি যে সেদিন আমাদের পাড়াতে গিয়েছিলেন—"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী কহিলেন—"কেন?"

—"আমাদের বিনয় বাবুর এক-পাল শালী এসেছে কি না! বেশ ডাগর-ডোগর সবগুলিই—বড়টি তো আমাদের বয়সী—"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—"বিনয় বাবুর শালীরা এসেছে তো উনি ছুটবেন কেন?"

প্রফুল্লর স্ত্রী কহিল—"না, না—উনি একা যাননি। গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন।"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী নীরস কণ্ঠে কহিলেন—"গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গেই বা যাবেন কেন?"

প্রফুল্লর স্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল—"ও মা! আপনি তা' হলে কিচ্ছু জানেন না?"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিলেন—"না তো! আমাকে কিছু বলেননি—"

প্রফুল্লর স্ত্রী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—"গাঙ্গুলী বুড়োর যে জন্মদিন!"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন—"সে আবার কি! বাহাত্তুরে বুড়ো! মরবার দিন ঘনিয়ে আসছে—ওর আবার জন্মদিন! ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদেরই তো জন্মদিন হয়। দিন, তিথি দেখে, নতুন কাপড় পরিয়ে পরমান্ন খাওয়ানো হয়—"

প্রফুল্লর স্ত্রী লেখা-পড়া-জানা মেয়ে, সহরের অনেক খবর রাখে। কহিল—"আজকালকার রেওয়াজ, দিদি! বড় বড় লোকদের—জোয়ানই হোক, বুড়োই হোক, সবাই মিলে 'জন্মদিন' করে। সভা-সমিতি হয়, গান-বাজনা হয়, বক্তৃতা হয়, যুবতী মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে, উলু দিয়ে, চন্দনের ফোঁটা পরায়, গলায় মালা দেয়—"

—"তাই না কি? কি জানি, ভাই। পাড়াগেঁয়ে মানুষ! গাঙ্গুলী বুড়োর জন্যেও ঐ সব ব্যবস্থা হচ্ছে না কি? তা' হলে মালা-চন্দন দিচ্ছে কে?"

প্রফুল্লর স্ত্রী মুচকি হাসিয়া কহিল—"বিনয় বাবুর বড় শালী দেবে।"

—"বল কি! ঐ ধাড়ী মেয়েটা সভায় দাঁড়িয়ে বুড়োকে মালা পরাবে?"

—"তাতে আর লজ্জা কি, দিদি! গাঁ-শুদ্ধ লোকের সামনে এক দিন মালা পরাতে হবে যখন—"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী সোৎসুক কণ্ঠে কহিলেন—"তার মানে?"

প্রফুল্লর স্ত্রী চোখ মটকাইয়া কহিল—"মেয়েটাকে যে বুড়ো বিয়ে করবে। দিন মাছ-তরকারী যাচ্ছে—নূতন করে ঘর-ছাওয়া হচ্ছে—"

হেড-মাষ্টারের স্ত্রী গভীর বিস্ময়ের সহিত কহিলেন—"বল কি! সত্যি?"

—"হ্যাঁ। উনি বলছিলেন 'জন্মদিন' চুকে যাবার পর বুড়ীকে কাশী পাঠিয়ে দিয়ে বুড়ো বিয়ে করবে।"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"বুড়ী যদি না যেতে চায়?"

—"না যায় তো মার খেয়ে মরবে। যা' দশা-সই মেয়ে, ওর হাতের গোটা কয়েক কিল খেলে বুড়ীকে উঠে দাঁড়াতে হবে না।"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন—"ছিঃ ছিঃ, এই কাণ্ড! আর উনি এর মধ্যে আছেন? আসুন আজ একবার বাড়ীতে, মজাটা দেখাচ্ছি। আর বুড়ীর কাছেও যাব আজ। বলে দিয়ে আসব সব। আর বলে দেব পই-পই করে—বাড়ী থেকে এক-পা নড়বেন না। আচ্ছা, গাঁয়ের ছোকরারা এ কথা শুনেছে?"

—"ওদের যে টাকা দিয়ে বশ করেছে। তা' ছাড়া ভিতরের কথা আর কেউ জানে না—এক আপনার কর্ত্তা আর বিনয় বাবু ছাড়া—"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী রাগত কণ্ঠে কহিলেন—"আসুন একবার তিনি—এ-সবের মধ্যে থাকা আমি বার করব। আর গাঙ্গুলী-দিদিমাকে বলে বুড়োকেও ঢিট্ করবার ব্যবস্থা করব—"

সেই দিন রাত্রে হেড-মাষ্টার বাড়ী ফিরিবা মাত্র তাঁহার গৃহিণী কহিলেন—"হ্যাঁ গা, তোমার বয়স কত হল?"

হেড-মাষ্টার সবিস্ময়ে কহিলেন—"কেন বল দেখি? বয়স নিয়ে কি হবে?"

গৃহিণী একদৃষ্টে তাঁহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হেড-মাষ্টার অস্বস্তির সহিত কহিলেন—"ও কি হচ্ছে! এমন প্যাট-প্যাট করে তাকিয়ে দেখছ কি? কখনও দেখনি না কি আমাকে?"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী শ্লেষের স্বরে কহিলেন—"ভাল করে দেখছি গো! বয়স তোমার বাড়ছে, না, কমছে—"

মাষ্টার কহিলেন—"বয়স বাড়বে না তো কি কমবে? খোস খেলিয়া বাড়ছে, তোমারও—"

—"আমার তো বাড়ছেই। কিন্তু তোমার শুনছি কমছে। ছুকরী মেয়েদের পিছনে ছুটোছুটি সুরু করেছ।"

হেড-মাষ্টার সভয়ে কহিলেন—"ও-সব আবার কি কথা?"

—"হ্যাঁ গো! শুনলাম্ যে! যে নিজের চোখে দেখেছে, সে বলে গেল যে। গাঁয়ে এতক্ষণ ঢি-ঢি পড়ে গেছে দেখ গে। যে আমাকে বলে গেল, সে কি এতক্ষণ গাঁয়ের সবাইকে বলতে বাকী রেখেছে?"

—"কার কাছে যা'-তা' শুনেছ। ও সব বাজে কথা—"

এবার গৃহিণী দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন—"বাজে কথা নয়। স্বচক্ষে দেখেছে—"

হেড-মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন।

গৃহিণী কহিলেন, "কথা বল না যে? ব্যাপার কি বল দেখি? বিনয় মাষ্টারের বাড়ীতে এত আনাগোনা করছ কেন? কোন একটি শালীকে ঘরে আনবার মতলব আছে না কি?"

হেড-মাষ্টার কহিলেন—"ছিঃ ছিঃ, ও-সব কি কথা? ছোট বোনের মত সব—"

—"আনাগোনাটা সত্যি তা' হলে?"

—"আনাগোনা নয়, এক দিন গিয়েছিলাম গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে। মেয়েটির একটি কবিতা পাঠ শুনবার জন্তে—"

—"হঠাৎ মেয়েটির কবিতা পাঠ করবার সখ হ'ল কেন? আর তা' শুনবার জন্তে তোমাদের ডাক পড়ল কেন?"

গৃহিণীর সন্দেহ-ভঞ্জনার্থে মাষ্টারকে 'জন্মদিন' উৎসবের কথাটা বলিতে হইল। শুনিয়া গৃহিণী কহিলেন—"বুড়োর আবার 'জন্মদিন' করা কি জন্তে?"

—"ভাল ভাল লোকেদের 'জন্মদিন' করার রেওয়াজ হয়েছে আজ-কাল।"

—"রেওয়াজ তো অনেক দিন থেকেই হয়েছে। হঠাৎ এখনই তোমাদের খেয়াল হ'ল কেন?"

—"গাঙ্গুলী মশায়ের বয়স হয়েছে। কবে মারা যাবেন। আমাদের কর্ত্তব্য তো করে ফেলাই ভাল।"

—"বেশ, কর্ত্তব্য যদি হয় তো কর গে। কিন্তু ঐ মেয়েটিকে ওর মধ্যে টানছ কেন?"

—"টানা আবার কি! বিনয় বাবু বললেন, ওঁর শালী লেখাপড়া-জানা মেয়ে—সভা-সমিতিতে অনেক বার কবিতা পড়েছে—"

—"কবিতা-টবিতা পড়বার দরকার কি? জন্মদিনে তো শুনি লোকে ভাল পরে, ভাল খায়-দায়—"

মাষ্টার মুরুব্বিয়ানার স্বরে কহিলেন—"আরে, এ সব নিয়ম! এটা তো আর ঘরোয়া ব্যাপার নয়। মেয়ে-পুরুষ সবাই মিলে এক জন শ্রদ্ধের লোককে শ্রদ্ধা জানানো। তিনি যা' করেছেন তা' স্মরণ করা, বর্ণনা করা, তিনি যেন আরও অনেক দিন বেঁচে থেকে আরও ভাল কাজ করতে পারেন, তার জন্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা।"

গৃহিণী কহিলেন—"সভার মধ্যে মেয়েটা না কি বুড়োর গলায় মালা পরাবে?"

—"হ্যাঁ, পরাবেই তো। ওটাও নিয়ম। সভার মধ্যে তাঁকে সাদরে আবাহন করে নিয়ে গিয়ে মাল্য-চন্দন দিয়ে তাঁকে বরণ করতে হবে। তা' ও-কাজ তো মেয়েমানুষ ছাড়া হয় না।"

—"যুবতী মেয়েমানুষ ছাড়া বল।"

—"তা' আবার কি? তুমি রাজী হও তো তোমাকে দিয়েই মালা দেওয়ার ব্যবস্থা করব।"

গৃহিণী তীক্ষ্ণ স্বরে কহিলেন—"মরণ আমার! আমার কি দায় পড়েছে?"

—"তবে ও-সব কথা বলছ কেন?"

গৃহিণী গম্ভীর হইয়া কহিলেন—"আমি যা'-যা' শুনেছি—সব মিলে গেল। তা'হলে বাকী খবরটাও নিশ্চয় সত্যি।"

মাষ্টার সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—"কি খবর?"

গৃহিণী কহিলেন—"গাঙ্গুলী বুড়ো না কি মেয়েটাকে বিয়ে করবে?"

মাষ্টার বলিয়া উঠিলেন—"পাগল! কে তোমাকে ও-সব কথা বলে গেছে বল দেখি? প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী বুঝি?"

গৃহিণী চুপ করিয়া রহিলেন।

মাষ্টার সক্ষোভে কহিলেন—"প্রফুল্লরা এই সব রটিয়ে বেড়াচ্ছে? ওদের ভাল লোক বলে জানতাম—"

গৃহিণী ব্যঙ্গের স্বরে কহিলেন—"তোমাদের দলের লোক বলে জানতে বুঝি? কথাটা ফাঁস করে দিয়েছে বলে রাগ হচ্ছে?"

—"দলাদলি আবার কি, গাঙ্গুলী মশায়ের জন্মদিন উৎসব করবার সঙ্কল্প করেছি আমরা। পাছে রাধানাথ আগে থাকতে খবর পেয়ে কাজটা পণ্ড করে দেয়, এই ভয়ে খবরটা গোপন রাখতে বলে দিয়েছিলাম সবাইকে। প্রফুল্ল বিনয়ের কাছ থেকে খবরটা জানতে পেয়ে ঢাক পিটিতে সুরু করে দিয়েছে।"

গৃহিণী কহিলেন—"ভালই তো করেছে। ঐ জন্মদিনের ছুতো করে গাঙ্গুলী বুড়োর যে ঐ মেয়েটার সঙ্গে বে দেবে আর বুড়ীকে পথে বসাবে তা' হবে না।" ভর্ৎসনার স্বরে কহিলেন—"বুড়ী তোমাকে এত স্নেহ করেন, এত বিশ্বাস করেন, তার জন্তে কি এতটুকু কৃতজ্ঞতা নাই তোমার? গাঙ্গুলী-দিদিমাকে সব বলে দেব কাল।"

মাষ্টার সন্ত্রস্ত ভাবে কহিলেন—"বলছি যে ও-সব মিথ্যে কথা! এ নিয়ে হৈ-চৈ কোরো না। গাঙ্গুলী-দিদিমাকে কিছু বলতে যেও না। আমাকে বিশ্বাস কর, আমি থাকতে ও-সব কিছু হবে না।"

—"তোমাকে বিশ্বাস কি? তুমিই তো বুড়োটাকে সঙ্গে করে মেয়েটার কাছে নিয়ে গিয়েছিলে।"

—"তাতে কি হয়েছে! কবিতাটি কেমন পড়ে—শুনতে গিয়েছিলাম দু'জনে। মেয়ে দেখতে তো যাইনি।"

—"সেইটাই ভিতরে ভিতরে উদ্দেশ্য ছিল।"

মাষ্টার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"আসল কথা কি জান, ওখানে যাবার আগে গাঙ্গুলী মশায়ের মনের ভাব কি ছিল জানি না, তবে মেয়েটাকে দেখার পরে একটু ইচ্ছে হয়েছে। তা' দোষ তো নাই, এত বড় সম্পত্তি, ছেলে নাই। তার উপরে গাঙ্গুলী দিদিমার ঐ মেজাজ!"

গৃহিণী তীক্ষ্ণ স্বরে কহিলেন—"দোষ নাই? এতগুলো মেয়ে জামাই

এক পাল নাতি-নাতনী রয়েছে, তাতেও সম্পত্তির জন্যে বুড়োর ভাবনা? আর ঝগড়া! কোন সংসারে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর ঝগড়া না হয়? তা' বলে স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে স্বামী বিয়ে করতে ছুটবে? আমাকেও দেখছি মুখে ওলোপ দিয়ে থাকতে হবে। না হ'লে তুমিও হয়তো কোন দিন—"

মাষ্টার বাধা দিয়া কহিলেন—"কি যে সব বাজে কথা বল।"

গৃহিণী তীক্ষ্ণ স্বরে জবাব দিলেন—"বাজে কথা আবার কি? তোমারও তো ঐ রকম মতি গতি দেখতে পাচ্ছি। দেখ, ও-সব জন্মদিন-টিন বন্ধ কর। না হলে গাঙ্গুলী-দিদিমাকে বলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেব।"

মাষ্টার সশঙ্কে কহিলেন—"না না, ও-সব করতে যেও না। সব পণ্ড হয়ে যাবে তা'হলে। আসছে ইলেক্শানে তা'হলে পাত্তা পাওয়া যাবে না। রাধানাথই বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হয়ে যাবে।"

আসল ব্যাপারটা গৃহিণীর কাছে খুলিয়া বলিতে হইল মাষ্টার মশায়কে—"আসছে ইলেক্শানে ইউনিয়ন বোর্ডটা আবার হাতে পেতে আগে থাকতে হাকিমদের তোয়াজ করার দরকার। গাঙ্গুলী মশায়ের গুণগ্রাম, কার্য্যকলাপ তাদের কাছে প্রচার করার দরকার। জন্মদিনটা উপলক্ষ করে তাই করা হবে। গাঙ্গুলী মশায়ের মনে মনে যা'-ই ইচ্ছা হয়ে থাক্, আমি থাকতে কিছু হতে দেব না। তুমি হৈ-চৈ কোরো না। চুপ করে থেকে সব দেখ। যদি কিছু ফ্যাসাদ হয় তো তখন বোলো।"

গৃহিণী কহিলেন—"ফ্যাসাদ হয়ে গেলে আর বলে লাভ কি?"

মাষ্টার দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—"কিছু হবে না। যদি দেখি তেমন কিছু হবার উপক্রম হয়েছে তখন তোমাকে বলে দেব। তুমি গাঙ্গুলী-দিদিমাকে সাবধান করে দেবে। কিন্তু এখন কিছু বলতে যেও না।"

৫

দিন-দুই পরে। গাঙ্গুলী মশায় বাড়ীতে ছিলেন। পিয়ন আসিয়া খান-দুই চিঠি দিয়া গেল। গৃহিণী কহিলেন—"কার চিঠি এল গা?"

একে একে চিঠিগুলা দেখিয়া গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"একটি আমাদের শ্যামলালের।"

গৃহিণী ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিলেন—"শ্যামলাল আবার কে?"

গাঙ্গুলী মশায় বিস্ময়-প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"আমাদের শ্যামকে চেনো না? আমার বড় মামার ছেলে—পটলা।"

গৃহিণী এতক্ষণে চিনিতে পারিলেন। কহিলেন—"সেই বাউণ্ডুলে ছোঁড়াটা? লেখা-পড়া শিখে, চাকরী-বাকরী, বে-থা না করে সারা জীবনটা হৈ-হৈ করে কাটালে।"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"ও-সব কথা বোলো না, গিন্নি। আজকাল সে মস্ত লোক—দু'দিন পরে মন্ত্রী হবে।"

গৃহিণী সবিস্ময়ে কহিলেন—"তাই না কি?"

—"হ্যাঁ গো। সত্যি। ইংরেজ তো আর নাই। ওরাই এখন দেশের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। এখানে আসবে লিখেছে—"

—"হঠাৎ এখানে আসছে কেন?"

—"আপনার লোক, আসবে না?"

গৃহিণী ব্যঙ্গের স্বরে কহিলেন—"আপনার লোক তো বরাবরই ছিল গো। সে-বছর যখন আসতে চেয়েছিল, তুমি বারণ করে দিলে। মিথ্যে করে লিখলে—এখানে ভয়ঙ্কর কলেরা হচ্ছে, এসো না।"

—"তখন এক রকম দিন ছিল। ওরা ছিল ইংরেজের শত্রু। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে জানলে সাহেবরা—তাদের দেখাদেখি দেশী হাকিমরাও মারমুখী হয়ে উঠত। ওরা কোথাও গেলে পুলিশ পিছনে লাগত, যার বাড়ী যেত তাকে পর্য্যন্ত নাস্তানাবুদ করত। সে সব দিন বদলে গেছে, গিন্নি। ও যদি এখন আমার বাড়ীতে আসে, দারোগা বাবু দিন দশ বার আমার বাড়ী আনাগোনা করবে। এমন একটা লোকের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আছে জানলে হাকিমরা পর্য্যন্ত আমাকে খাতির করতে সুরু করবে।"

হঠাৎ গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন—"ও কি নিজে হতে আসছে?"

গাঙ্গুলী মশায় ঢোক গিলিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ, এক রকম নিজে থেকে বৈ কি। মানে, আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। রেখোটা ওর সেই কংগ্রেসী মামাতো ভাইটাকে মুরুব্বি ধরে বড় বাড়াবাড়ি করছে কি না। ইউনিয়ন বোর্ডটা হাতে করে গাঁয়ের সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টা করছে। তাই সবাই বললে—আপনার যখন এমন এক জন নিজের লোক রয়েছে, তখন একবার এখানে আসতে লিখুন। উনি একবার এলেও অনেক কাজ হবে। কিন্তু কি চমৎকার ছেলে দেখেছ শ্যামলাল, চিঠি পাবা মাত্র লিখছে—যাব।"

হঠাৎ গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন—"হ্যাঁ গা। সবাই বলছে, তুমি না কি দানছত্র খুলেছ?"

—"মানে? সে আবার কি?"

—মুঠো-মুঠো টাকা খরচ করে বাগ্দীদের মনসামেলা সারিয়ে দিয়েছ—ছোকরাদের লাইবিরেরীর বই কিনে দিয়েছ?"

—"কে বললে তোমায় ও-সব কথা?"

গৃহিণী অনুযোগের স্বরে কহিলেন—"গাঁয়ের সবাই তো জানে, আমি ছাড়া। আমার কথা অবশ্যি আলাদা। দু'টি ভাত—দু'খানা কাপড় পাচ্ছি, এই ঢের। স্বামী যে কোথায় কি করে তা' জানবার আমার কি অধিকার? সারা জীবন কুকুর-বেড়ালের মতই কাটল।"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"ও-সব আমার টাকা নয়। লোকে বললে কি হবে। ও বোর্ডের টাকা।"

—"তবে লোকে বলে কেন?"

—"বললে কার মুখে হাত চাপা দেব?"

গৃহিণী দুই ঠোঁট চাপিয়া গাঙ্গুলী মশায়ের দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন—"তোমার টাকা নয় তো? বেশ, বলে দিই লোককে ঐ কথা?"

—"পাগল না কি! লোকে যদি একটু প্রশংসা করে তো তাতে তোমার কি? স্বামীর একটু প্রশংসা সহ্যই কর না কষ্ট করে—" বলিয়া আর একটি চিঠিতে দৃষ্টি সংযোগ করিলেন।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওটা আবার কার চিঠি?"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"বেয়াই লিখেছেন, কাশী থেকে।"

গৃহিণী সাগ্রহে কহিলেন—"বেয়াই লিখেছেন? কি লিখেছেন?"

গাঙ্গুলী মশায় চিঠিটা পড়িতে লাগিলেন। কথার জবাব দিলেন না। গৃহিণী আগ্রহাকুল চক্ষে তাকাইয়া রহিলেন।

চিঠি পড়া শেষ করিয়া গাঙ্গুলী মশায় সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"আমাদের কি আর সে অদৃষ্ট হবে?"

গৃহিণী কহিলেন—"কি লিখেছেন ?"

—"বেয়াই লিখছেন, আমাদের দু'জনকে সেখানে যেতে। বেশ বড় একটি বাড়ী পেয়েছেন। কাছেই গুরুদেবের আশ্রম। দু'পা দূরে মা-গঙ্গা। নিত্যি গঙ্গাস্নান করছেন, আর গুরুদেবের উপদেশামৃত পান করছেন। গ্রামে আর ফিরতে ইচ্ছে নাই। যত দিন বাঁচবেন ঐখানেই থেকে যাবেন দু'জনে।"

গৃহিণী কহিলেন—"বেশ করছেন। কি আর হবে সংসারের ঝামেলা সহ্য করে। ছেলে-বৌ যখন উপযুক্ত হয়েছে।"

বেয়াই লোক ভাল, বেয়ান কিন্তু ভারী দজ্জাল। মেয়েকে তাঁহার অনেক হেনস্তা সহ্য করতে হয়। ভগবান সুমতি দিয়াছেন উঁহাদের। সুমতি বজায় থাকিলে মেয়ে তাঁহার সংসারের কর্ত্রী হইবে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গৃহিণী কহিলেন—"বেশ কপাল করে এসেছে দু'জনে। বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণতলে থাকবে, দিন দু'বেলা ওঁর দর্শন পাবে, চন্নামেত্ত খেতে পাবে, আর মরে গেলে শিবলোকে ঠাঁই পাবে!"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"কাশীবাস করতে চাও তো ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি; বেয়াই-বেয়ান যখন রয়েছেন ওখানে।"

—"কুটুমের বাড়ীতে গিয়ে থাকব না কি? অভাগ্যি!"

—"না না, কুটুমের বাড়ীতে কেন? একটা বাড়ী ভাড়া করব—সেখানে থাকবে।"

গৃহিণী কহিলেন—"আর তুমি?"

—"আমিও থাকব। তবে আমার তো একটানা-থাকা চলবে না। মাঝে-মাঝে গাঁয়ে এসে সব দেখে-শুনে যেতে হবে।"

—"তখন আমি একা থাকব বুঝি?"

—"একা থাকবে কেন গো। যে-কোন একটা মেয়ে গিয়ে কাছে থাকবে।"

গৃহিণী চিন্তিত মুখে কহিলেন—"তা' হলে মন্দ হয় না। আমিও ইচ্ছা হয় তো দু'-এক বার তোমার সঙ্গে আসতে পারি।" একটু ভাবিয়া কহিলেন—"বেয়াই যখন বলেছেন, তখন চল তো একবার। যদি ভাল লাগে, তখন ও-সব ব্যবস্থা হবে।"

গাঙ্গুলী মশায়ের মাথার মধ্যে একটি মতলব ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতে লাগিল। কাশী গিয়া, খুঁজিয়া-পাতিয়া একটি পছন্দসই গুরুদেব বাহির করিয়া, যদি সস্ত্রীক শিষ্যত্ব গ্রহণ করা যায়, এবং গুরুদেব যদি—সংসার বিষ-ভাণ্ড স্বরূপ, স্বামী, পুত্র-কন্যা-আত্মীয়-স্বজন কেউ আপনার নয়, ভগবচ্চরণই চরম ও পরম আশ্রয়, দিবারাত্র গুরুসেবা ও গুরু-উপদেশ শ্রবণ জীব-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভের এক মাত্র উপায়—ইত্যাদি সারগর্ভ উপদেশ বর্ষণ করিয়া শিষ্যাটির মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার করিতে পারেন, তাহা হইলে গুরুদেবের হেপাজতে গৃহিণীকে রাখিয়া, মাসে মোটা প্রণামীর প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি গ্রামে ফিরিয়া আসিতে ও নূতন করিয়া সংসারযাত্রা শুরু করিতে পারিবেন।

গৃহিণী কহিলেন—"কি অত ভাবছ গো?"

গাঙ্গুলী মশায় এক মুহূর্তে চিন্তার জাল গুটাইয়া ফেলিলেন; কহিলেন—"ভাবছি—সেই ভাল। কি হবে আর এই সংসারের জড়িয়ে থেকে? অনেক দিন তো হ'ল। এবার সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে তীর্থে গিয়ে দিবারাত্র ভগবানের নাম করাই ভাল। পৃথিবীতে কেউ কারও আপনার নয়, গিন্নি! সব দু'দিনের পথ-চলার সঙ্গী; এক মাত্র আপনার তিনিই"—বলিয়া ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন।

গৃহিণীর হঠাৎ মনে হইল—সত্যিই তো! দু'দিনের পরিচয়, চোখ বুজিলে কেউ কারও নয়। হঠাৎ মন খারাপ হইয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"সত্যি!"

সেদিন রাত্রে বিনয়কে একা পাইয়া গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"মেয়েটিকে ভারী শান্ত মনে হল।"

বিনয় কহিল—"একেবারে নিরীহ, গোবেচারী। সাত চড়ে রা নাই। তা' ছাড়া ভারী কাজের। ও এখানে আসা অবধি গিন্নীকে নড়ে বসতে হয় না।"

—"দেখে মনে হল তাই। যাক গে ও-কথা। কবিতাটা রোজ অভ্যেস করছে তো?"

—"নিশ্চয়! ওর জন্যে আপনার চিন্তা নাই। ঠিক পারবে। বলছিল, সে দিন বেশ ভাল হয়নি। আর এক দিন শোনাবে আপনাকে—" একটু হাসিয়া কহিল—"মানে কি জানেন, মাষ্টার মশায়ের কাছে একটু লজ্জা করছিল, আপনি বলবেন, তা'হলে সভায় পড়বে কি করে? সভায় অনেক লোক হলেও অনেকখানি যায়গা, কাজেই সেখানে এক রকম। আর, ঘরের চারটি দেওয়ালের মধ্যে, কম লোকের সামনেও, অন্য রকম। বলছিল, আপনার কাছে যেমন লজ্জা করে না, ওঁর কাছেও তেমনই। সভাতেও তো আপনারা কাছে থাকবেন—"

বিনয়ের কথাগুলি গাঙ্গুলী মশায়ের ভারী মিষ্ট লাগিতেছিল—তথাপি কথার স্রোতকে ঘুরাইয়া দিবার জন্য কহিলেন—"আর তো বেশী দিন নাই। মাষ্টার সহরে গেছে সব ব্যবস্থা করতে। আমাদের শ্যামলালেরও চিঠি পেয়েছি—আগে আসতে পারবে না, ঠিক দিনটিতে আসবে। এই ক'টা দিন ভালয়-ভালয় কাটলে হয়। ওরা বোধ হয় আসল খবরটা জানতে পারেনি—নয়?"

বিনয় কহিল—"তা' ঠিক বলা যায় না।"

—গাঙ্গুলী মশায় সচকিত ভাবে কহিলেন—"মানে?"

—"মানে, আমাদের দলের মধ্যে একটি বিভীষণ আছেন কি না—"

সাগ্রহে গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"কে?"

—"আমাদের প্রফুল্ল বাবু। আপনি যে দয়া করে আমার বাড়ী এক দিন পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন, আমার শালী কবিতা পড়বে, আমার বাড়ীর মেয়েরা আপনার কাজটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, এতে ওরা স্বামি-স্ত্রী দু'জনেই সুখী হতে পারছে না। এমন কি, আমাদের পণ্ডিত মশায় পর্য্যন্ত—"

গাঙ্গুলী মশায় সবিস্ময়ে কহিলেন—"বল কি? ভট্চাযও ঐ দলে না কি?"

—"আমার তো তাই মনে হল। আজ সকালে জিজ্ঞেসা করলাম, 'কি পণ্ডিত মশায়, কবিতা পড়বেন তো?' বললে—'না। সংস্কৃত কেউ বুঝবে-টুঝবে না। তা ছাড়া ছেলেটাও পড়তে পারবে না বলে মনে হচ্ছে'।"

গাঙ্গুলী কহিলেন—"ছেলে মানুষ আবার ঐ কটমটে ভাষা পড়তে পারে না কি? নিজেই পড়লে পারে—"

অনার্য সংস্কৃত সাহিত্য

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন শাস্ত্রী

মানব-সভ্যতার উষায় ভারতীয় আর্য্য-প্রতিভার অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে গীতিস্রোত বিশ্বভুবন প্লাবিত করিয়াছিল, তাহা এখনও আমাদের চরম ও পরম সম্পদ্‌রূপে বিরাজিত আছে। তখন উষার আলোক উদ্ভিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্নান-শুচি দম্পতি অগ্নিগৃহে অগ্নিদেবকে উদ্‌বোধিত করিয়া 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন। সে যুগের উপদেষ্টা সকলকে ডাকিয়া বলিতেন, 'অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা উঠ, জাগরিত হও, সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ কর'। সে যুগের জ্ঞানার্থী বলিত, 'যে জ্ঞানে অমৃতের সন্ধান পাইয়া মানুষ অমরত্ব লাভ না করিতে পারে তাহাতে প্রয়োজন কি?' সে যুগের সত্যদ্রষ্টা বলিতেন, 'নিবিড় অন্ধকারের পর-পারে অবস্থিত সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের আমি সন্ধান পাইয়াছি, তিনি এক, অদ্বিতীয়—বিদ্বান্‌গণ বিভিন্ন নামে তাঁহাকে অভিহিত করিয়া থাকেন, সেই অদ্বিতীয় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ জলে, স্থলে, আকাশে, ওষধি-সমূহে, বিশ্বভুবনের সর্ব্বত্র ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান, তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত'। অন্তরের কোন্ প্রেরণা তাঁহাদের সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের দিকে চালিত করিত, কোন্ সাধনায় তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিতেন তাহা আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু সৌর-কিরণের ন্যায় তাঁহাদের যে সঙ্গীত দিগ্‌বিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়াছে, নিরানন্দ অপসারণ করিয়া আনন্দের নির্ঝর খুলিয়া দিয়াছে তাহা আমরা ভুলি নাই; যাঁহারা সেই গান করিতেন, দূরতম অতীতের অন্ধকার ভেদ করিয়াও তাঁহাদের তেজোদীপ্ত, আনন্দপ্লাবিত, জ্ঞানালোকে উদ্‌ভাসিত অপূর্ব্ব মুখশ্রী এখনও আমাদের কল্পনা-নয়নের সমক্ষে দিব্য জ্যোতি বিকিরণ করিতেছে।

বৈদিক ঋষিগণের প্রতিভা সূর্য্যের ন্যায়, তাহা উদিত হইয়া যুগপৎ জল স্থল আকাশ সমুদ্র পর্ব্বত অরণ্যানী প্রকাশিত করিয়াছে, সে প্রতিভার নাম বিশ্বতশ্চক্ষু—যাহা কিছু মহৎ সকলই তাহা প্রকাশিত করিয়াছে—কেবল অন্ধকারের গর্ভ হইতে তাহা জগৎকে আলোকের রাজ্যে টানিয়া বাহির করে নাই, যাহা কিছু বিচ্ছিন্ন তাহাকে এক করিয়া মহত্ত্ব অর্পণ করিয়াছে—অল্পকে ভূমার মহিমা দান করিয়া সকল সঙ্কীর্ণতার অবসান ঘটাইয়াছে। এই সূর্য্য যখন মধ্যাকাশে, তখন আমাদের দেশে নানাবিধ দর্শন, চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। সূর্য্য কাহারও উৎসাহে, কাহারও প্ররোচনায় বা কাহারও সাহায্যে উদিত হয় না—বিশ্ব-প্রকৃতির আন্তরিক প্রেরণা হইতেই তাহার উদ্ভব, আর্য বিজ্ঞানমাত্রের সম্বন্ধেই এই উক্তি প্রযোজ্য। বিশুদ্ধ অন্তরের প্রবল প্রেরণা হইতেই এই সকলের উদ্ভব। আমাদের গৌরবের যাহা কিছু মুখ্য অবলম্বন তাহা এই আর্যপ্রতিভা। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি, কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন, ন্যায়-ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, নাট্যশাস্ত্রকার ভরত, চিকিৎসা-শাস্ত্রকার চরক ও সুশ্রুত আর্যপ্রতিভা সূর্য্যের অস্তগমনের সময়ের ঋষি, ইঁহারা প্রদোষ সময় অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের পরেই আর্যসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। সূর্য্য অস্তমিত হইবার সময়ে অগ্নিতে তাহার তেজ সংক্রমিত করিয়া যান, এই অগ্নিকে ইন্ধনদানে ও নানা প্রচেষ্টায় রক্ষা করিতে হয়। আর্যপ্রতিভা-রবির অস্তগমনের পর যাঁহারা আমাদের গৌরবের বাহক ও ধারক তাঁহারা সযত্নে এই অগ্নি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ইহা তপোবনের সভ্যতা নহে, নাগরিক সভ্যতা। প্রদীপ্ত সূর্যের প্রকাশে যে বিশাল জগৎ এক হইয়া উদ্‌ভাসিত ছিল তাহা তখন অন্ধকারের আক্রমণে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সাগর, পর্ব্বত ও অরণ্যানীময় বিশাল দৃশ্যপটের স্থান ছোট ও বড় নানা মার্গসঙ্কুল নানা প্রকার অট্টালিকা ও প্রাসাদে সুশোভিত বিশাল নগরী গ্রহণ করিয়াছে, এ যুগের প্রতিভা সেই সকল পথের প্রান্তে, মধ্যে ও নানা স্থানে বিশাল আলোক-স্তম্ভের ন্যায় শোভমান—ইহার দীপ্তি আছে, বৈচিত্র্য আছে, সৌন্দর্য্য আছে—কিন্তু সে মহত্ত্ব নাই।

অনার্য যুগে ভাস, শূদ্রক, কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি ও বাণভট্ট সাহিত্যে; শবর, কুমারিল, শঙ্কর, রামানুজ, গঙ্গেশ ও রঘুনাথ দর্শনে; বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, আর্য্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে; এবং ইঁহাদেরই সমধর্ম্মা আরও শত শত মনীষী আপনাদের প্রতিভা-রশ্মি বিকিরণ করিয়া ভারতভূমি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেই নমস্য, কিন্তু আর্যপ্রতিভার সহিত ইঁহাদের তুলনা চলে না। সত্য বটে, বাল্মীকি ও ব্যাস আপনাদের কবি এবং রামায়ণ মহাভারতকে কাব্য নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এ-কথা খুবই সত্য যে, মহাভারত মহাকাব্য হইলে রঘুবংশ মহাকাব্য নহে, এবং রঘুবংশ যদি মহাকাব্য হয় তবে মহাভারত মহাকাব্য নহে। শ্রুতির যুগের প্রতি লক্ষ্য নিবন্ধ রাখিয়াই

জন্মদিন

—"আমিও তো তাই বললাম। তো বললে—'সে কি কারও ভাল লাগবে? বুড়ো মদ্দর পড়া আর যুবতী মেয়েমানুষের পড়া আকাশ-পাতাল ফারাক্! আসল কথা কি জানেন—হিংসে হয়েছে। ওর মতলব তো জানেন—সেই বিচ্ছু শয়তান ছেলেটাকে আপনার ঘাড়ে চাপানো!"

"পাগল না কি! ঐ ডাংপিটে ছেলেকে কেউ পুষ্যিপুত্তুর নেয়? ওর জ্বালায় বাগানের একটা ফল সোয়াস্তিতে খাবার জো নাই। তা' ছাড়া পুষ্যিপুত্তুর নিতে যাব কেন?"

বিনয় সোৎসাহে সায় দিল—"নিশ্চয়। কি দরকার!"

গাঙ্গুলী কহিলেন—"দেখ হে, তোমার তো পুষ্যি অনেকগুলি বেড়েছে দেখছি। মাইনেতে কুলোচ্ছে না নিশ্চয়?"

বিনয় কহিল—"মাইনেতে তো কখনই কুলোয় না। আপনাদের দয়ায় কোন রকমে—"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"তা' এক কাজ কর। স্কুল কমিটির কাছে একটা দরখাস্ত কর। কয়েকটি 'রিফিউজি' তো ঘাড়ে চেপেছে—সে কথাটাও উল্লেখ করবে। মাষ্টারকেও একবার বলে রাখবে। দেখি, যদি একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

[ক্রমশঃ

সবিনয়ে ব্যাসদেব মহাভারতকে কাব্য বলিয়া পরিচিত করিয়া গিয়াছেন, রঘুবংশের ন্যায় গ্রন্থও যে পরবর্ত্তী কালে এই নামেই আত্মপরিচয় দিবে ত্রিকালজ্ঞ হইয়াও তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। ব্যাসদেবের মহাভারত কাব্য হইলেও উহা আমাদের নিকট কাব্য নহে, সমুদ্র জলাশয় তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু জলাশয় বলিলে বাপী, কূপ, তড়াগই আমাদের মনে পড়ে—সে ক্ষেত্রে সমুদ্রের কথা আমরা ভাবিতেই পারি না। আমাদের নিকট রঘুবংশই কাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত নহে। কালিদাস ইহা জানিতেন, কাজেই রঘুবংশের প্রারম্ভে তিনি যে বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কেবল শিষ্টাচারের জন্যই নহে। হলায়ুধ ভট্ট ভারবির প্রশংসা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"দিবা দীপা ইব ভান্তি যস্যাগ্রে কবয়োঽপরে" যাহার সম্মুখে অন্যান্য কবিরা দিবা-দীপের ন্যায় নিষ্প্রভ—আর্ষ ও অনার্ষ কাব্য সম্বন্ধে তুলনা করিতে গেলে এই কথা আরও জোরের সহিত বলা চলে। শব্দচয়নে, সঙ্গীতের ঝঙ্কারে, রসমাধুর্য্যে, ভাবগাম্ভীর্য্যে এবং সকল বিষয়ে নিপুণ পরিমার্জ্জনার সৌষ্ঠবে কালিদাস প্রভৃতির রচনা অনুপম—সকল বিষয়ে উক্ত নিপুণ পরিমার্জ্জনা রামায়ণ ও মহাভারতে নাই। চতুর্দ্দিকে মর্ম্মর শিলা-সোপানে আবদ্ধ, তীরে নানাবিধ কুসুমপাদপে শোভিত স্বচ্ছ সুপেয় জলে পরিপূর্ণ রাজসরোবর অথবা আলোকস্তম্ভমণ্ডিত নানা পথে বিভক্ত, আয়তন ও উচ্চতার সাম্যে সমৃদ্ধ, নানাবিধ ফল ও পুষ্পের পাদপে শোভিত, বাপী ও তড়াগে রমণীয় রাজোদ্যানের শোভা যে অতুলনীয় ইহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু কোনও বাতুলও তাহাদের সমুদ্র বা হিমালয়-প্রস্থের সহিত তুলনা করিবে না। রুক্ষতায়, ঔদ্ধত্যে, সৌন্দর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, সরসতায়, নীরসতায়, ভীষণতায় ও কমনীয়তায়—এক কথায় আপনার অতুলনীয় মহত্ত্বে তাহারা পরিপূর্ণ,—সংসারে তাহাদের উপমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কালিদাস প্রভৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা বশতঃ এই সকল কথা বলিতেছি না—মার্জ্জিত ও সুনিপুণ রচনায় তাঁহারা অসাধারণ; বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সংস্কৃত-সাহিত্যে অনুরাগী অনেক পাঠকই কালিদাস প্রভৃতির রচনায় এত মুগ্ধ যে আর্ষ সাহিত্যের প্রতি তাহাদের দৃষ্টিই পড়ে না—অথচ ভারতীয় আর্য্যদের সাহিত্য-প্রতিভা বুঝিতে গেলে আর্ষ সাহিত্যের আলোচনা অপরিহার্য্য। কালিদাস প্রভৃতির সাহিত্য আলোচনা করিতে হইলে তাহার জন্য একটা প্রস্তুতি চাই—সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তি, সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি ও সূক্ষ্ম মননশক্তি সেই প্রস্তুতি। আর সাহিত্য আলোচনার জন্যও একটা প্রস্তুতি চাই—মহৎ—বিশাল—উদার ও গম্ভীরকে ধারণা করিবার শিক্ষাই সেই প্রস্তুতি। যাঁহারা বীণার সূক্ষ্ম নিক্কণ ও কলধ্বনি ব্যতীত অন্য ধ্বনির মূল্য স্বীকার করেন না, সমুদ্রের কলরোলে ও উন্মত্ত গর্জ্জনে যাঁহারা সঙ্গীতের মাধুর্য্য খুঁজিয়া পান না, আর্ষ সাহিত্য আলোচনা করিলে তাঁহাদের নিরাশ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

ব্যাকরণ সাহিত্য নহে, তথাপি অনার্য যুগের সাহিত্য আলোচনা করিতে হইলে আগেই ব্যাকরণের কথা বলিতে হয়। ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ, বেদ-পুরুষের 'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্', সুতরাং বৈদিক সাহিত্যের আলোচনায়ও যে ব্যাকরণকে একটা উচ্চাসন দেওয়া হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। এত সমাদর থাকা সত্ত্বেও বৈদিক যুগে ব্যাকরণের যে স্বরূপ কি ছিল তাহা বলা কঠিন। বৈদিক সাহিত্য ব্যাকরণের দ্বারা নিয়মিত নহে, বরং বৈদিক সাহিত্য দ্বারাই ব্যাকরণ নিয়মিত। পরবর্ত্তী কালে পাণিনি যে ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন তাহার একটা উদ্দেশ্য বেদকে রক্ষা করা। বেদে যে কথাটি যেমন আছে শত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াও তাহার অন্যথা করিবার উপায় নাই, যেমন তেমনই রাখিতে হইবে। বৈদিক প্রয়োগ দেখিয়া বৈদিক ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে—ব্যাকরণের নিয়ম স্মরণ করিয়া বেদ রচনা করা হয় নাই। সেকালে ব্যাকরণ বলিতে পাণিনির ব্যাকরণের ন্যায় কোন গ্রন্থকে বুঝাইত কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। কারণ, ব্যাকরণ শব্দের অর্থই পৃথক্‌করণ বা বিশ্লেষণ, শব্দ ও ধাতুর সহিত বিভক্তি যোগে পদনির্মাণ, অথবা আরও বিশদ করিয়া বলিতে হইলে পদ-সমূহকে শব্দ ও বিভক্তি এবং ধাতু ও বিভক্তি অনুসারে বিশ্লেষণ, শব্দ-প্রকৃতি ও তদ্ধিত প্রত্যয় এবং ধাতু-প্রকৃতি ও কৃৎপ্রত্যয় ভেদে শব্দের বিশ্লেষণ—ইহাই ব্যাকরণের মুখ্য কার্য্য। ধাতু, শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদের মধ্যে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত হিসাবে উচ্চারণ নির্ণয়ও ব্যাকরণের কাজ, ইহা ব্যতীত আর যাহা কিছু তাহা ব্যাকরণের বিষয় নহে। পাণিনি আর্ষ ব্যাকরণ হইলেও ইহাতে কিন্তু উক্ত বিষয় সকল ব্যতীত আরও অনেক কিছু আছে। কুমারিল ভট্ট কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণকেও বেদাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার কথা—"পাণিনীয়াদিবু হি বেদস্বরূপবর্জ্জিতানি পদান্যেব সংস্কৃত্য সংস্কৃত্যোঽংস্বজ্যন্তে। প্রাতিশাখ্যেঃ পুনঃ বেদসংহিতাধ্যয়নানুগত স্বরসন্ধিপ্রযতিবিবৃত্তি পূর্ব্বাঙ্গপরাঙ্গাত্তনুসরণাদ্ বেদাঙ্গত্বমাবিষ্কৃতম্।" (তন্ত্রবার্ত্তিক ১।৩।২১)। অর্থাৎ বেদে অব্যবহৃত কথার সংস্কার করিয়াই পাণিনি প্রভৃতির ব্যাকরণের বহুলাংশ রচিত। বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে স্বরপ্রক্রিয়া, যতিনির্ণয়, যতিবিচ্ছেদ, প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ক যে সকল জ্ঞান প্রয়োজন প্রাতিশাখ্য সমূহেই তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং বেদাঙ্গ ব্যাকরণ বলিতে প্রাতিশাখ্য সমূহকেই বুঝায়। পাণিনির ব্যাকরণে জ্ঞাপক বিধি বলিতে যাহা বুঝায় তাহার মধ্যে অনেক স্থলে পাণিনির বহু স্ববিরোধী কথার সন্ধান পাওয়া যায়—অনেক স্থলেই পূর্ব্বে এক বিধান করিয়া পরে স্বয়ং তিনিই তাহার লঙ্ঘন করিয়াছেন, এই জন্য কুমারিল এক স্থানে পাণিনিকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন, "অশ্বারূঢ়াঃ স্বয়মশ্বান বিস্মরন্তি হৃচেতসঃ" ঘোড়ায় চড়িয়া পাগলেই ঘোড়ার কথা ভুলিয়া যায়। বৈদিক সমাজে পাণিনির এই তো প্রতিষ্ঠা, আর্ষ সাহিত্যেও তাহার প্রতিষ্ঠা দৃঢ় নহে। রামায়ণ-মহাভারতের সময়ে বোধ হয় পাণিনির ন্যায় সুসংবদ্ধ ব্যাকরণের অভাব ছিল, তখন কথ্য ভাষাও সংস্কৃত ছিল। একে ত সুসংবদ্ধ ব্যাকরণের অভাব, তাহার উপর বাল্মীকি ও ব্যাসের ন্যায় কবি—যাঁহাদের উক্তিই ব্যাকরণের নিয়ামক, কাজেই রামায়ণ প্রভৃতিতে এমন অনেক প্রয়োগই পাওয়া যায় প্রচলিত ব্যাকরণের মতে যাহাদের সমর্থন চলে না, প্রায়ই আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া ইহাদের সম্মান রক্ষা করিতে হয়। অনার্য যুগের কথ্য ভাষা সংস্কৃত নহে—কাজেই সে যুগের লোকদের ব্যাকরণের প্রতি ভক্তি অসীম। যাঁহারা স্থানে স্থানে প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন তাঁহাদের পণ্ডিত-সমাজের ভ্রূকুটি সহ্য করিতে হইয়াছে। এ যুগের 'বাপী ব্যাকরণের' শোভা পাইয়া থাকেন, ব্যাকরণের নিয়ম-লঙ্ঘন চ্যুত সংস্কৃতি—ইহা এক প্রকার অশিষ্টতা। সত্য বটে, "যুগে যুগে ব্যাকরণান্তরং"

বলিয়া পণ্ডিত সমাজে একটা কথা আছে, কিট্‌সূত্রের সঞ্জীবনী টীকায় টীকাকার জয়কৃষ্ণও "নিয়তকালাশ্চ স্মৃতয়ো ব্যবস্থাহেতবঃ" ব্যাকরণ প্রভৃতি স্মৃতিও কালানুসারে ব্যবস্থাপিত—কৈয়টের এই মত উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিও তাঁহাদের নিজ নিজ সময়ে যাহা প্রচলিত দেখিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন, এবং পাণিনি প্রভৃতির গ্রন্থ আলোচনায় তাহার যথেষ্ট পরিচয়ও পাওয়া যায়,—তথাপি পতঞ্জলি শেষ পর্য্যন্ত যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন পরবর্ত্তী কালে তাহা লঙ্ঘন করিয়া কেহই নূতন পথে চলিবার সাহস করেন নাই। প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষার ব্যাকরণ লক্ষ্য করিয়া যদি যুগে যুগে ব্যাকরণান্তরের কথা বলা হইয়া থাকে তবে অবশ্য পৃথক্ কথা, কিন্তু তাহা ব্যতীত যুগে যুগে বিভিন্ন ব্যাকরণের দ্বারা সংস্কৃত-সাহিত্য শাসিত হইয়াছে ইহার কোনও দৃঢ় প্রমাণ নাই। দুই-একটি বিষয়ে অনার্য যুগের সাহিত্যিক পাণিনির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই, পাণিনিতে আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ সংজ্ঞা দুইটি যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, অথবা লঙ্, লুঙ্ ও লিট্ বিভক্তির ব্যবহারের জন্য যে নিয়ম করা হইয়াছে সাহিত্যিকেরা তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই, বহু পণ্ডিতের মতেই পাণিনির ব্যাকরণের ন্যায় ব্যাকরণ ছিল বলিয়াই সংস্কৃত ভাষার কেবল উন্নতিই হয় নাই—উহা রক্ষা পাইয়াছে। কেহ কেহ আবার ইহার বিরোধী মতও পোষণ করেন; তাঁহাদের মতে পাণিনির ব্যাকরণের ন্যায় কঠিন শৃঙ্খলের বন্ধন না থাকিলে স্বাধীন ভাবে সংস্কৃত-সাহিত্য আরও উন্নতি করিতে পারিত। এ-সম্বন্ধে বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। মধ্যে বৌদ্ধ সাহিত্যিকেরা পাণিনিকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন ভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে গাথা ভাষা বলিয়া একটা ভাষা বা অপভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। ললিতবিস্তর প্রভৃতি সে ভাষার দুই-একখানা বইও আছে। বুদ্ধদেবের পবিত্র জীবন-কাহিনী না হইলে মাত্র ভাষা বা কাব্য-সৌন্দর্য্যের জন্য কত লোকে ললিতবিস্তর পড়িত জানি না, কিন্তু যে কারণেই হউক, এই স্বাধীন বা উচ্ছৃঙ্খল ভাষা চলে নাই। পক্ষান্তরে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত পাণিনি ব্যাকরণের ব্যাখ্যামূলক বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া পাণিনিকেই সমর্থন করিয়াছেন। বৈদিক সমাজের পণ্ডিতেরা কিন্তু এই কঠিন শৃঙ্খলকে মালতীমালায় পরিণত করিয়া লইয়াছেন। শৃঙ্খলকে পুষ্পদামে পরিবর্ত্তিত করিতে তাঁহাদের যে উৎকট সাধনা করিতে হইয়াছে তাহার বিবরণ বিস্ময়কর। প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে সেই উৎকট সাধনার একটু পরিচয় দিব।

ভট্টিকাব্য রচনা সম্বন্ধে প্রবাদ সুবিখ্যাত। প্রবাদটি সত্য বা মিথ্যা যাহাই হউক, কবি কাব্যের মধ্যে যে ব্যাকরণকে অতি-মাত্রায় স্থান দিয়াছেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ব্যাকরণের আতিশয্য থাকিলেও ভট্টিকাব্য কাব্য। বহু ছন্দঃ ও পূর্ব্বে অপ্রচলিত অলঙ্কারের ব্যবহারে তাহা সমুজ্জ্বল, কোথাও প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনে কবিত্ব, কোথাও রাজনীতির সূক্ষ্ম আলোচনায় গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এমন কাব্যও আছে যাহার নিকট ভট্টিকেও হার মানিতে হয়। আনুমানিক খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর কবি ভট্টভীমের 'রাবণার্জ্জুনীয়' কাব্য ইহার উদাহরণ-স্থল। কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় রাবণ ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সংঘর্ষ ও তাহাতে রাবণের লাঞ্ছনাজনক পরাজয়, কিন্তু কাব্যের উদ্দেশ্য ব্যাকরণের সূত্রসমূহের উদাহরণ প্রদর্শন। কবি পাণিনির ব্যাকরণের প্রথম সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটি সূত্রের উল্লেখ করিয়া তাহার পোষণকল্পে উদাহরণ-সমন্বিত শ্লোকের পর শ্লোকে কাব্য রচনা করিয়া চলিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এ ক্ষেত্রে কাব্য যেরূপ হইবার কথা তাহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্টই হইয়াছে। এ-হেন কাব্যেও কবি রসিকতার পরিচয়দানে কার্পণ্য করেন নাই। ক্রিয়ার আতিশয্যমূলক বা পৌনঃপুন্যমূলক যঙন্ত পদের উদাহরণ প্রসঙ্গে তিনি স্ত্রী-পুরুষের সম্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন—যেন উক্ত বিষয় বর্ণনার জন্যই যঙন্ত ক্রিয়াগুলি পৃথক্ করিয়া বাছিয়া রাখিয়াছিলেন। বাসুদেব কবি-বিরচিত 'বাসুদেব-বিজয়' কাব্য ইহার আর একটি উদাহরণ, এই কাব্যেও কবি ভট্টভীমের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। কবি কাব্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, ধাতুরূপগুলির উদাহরণ বাকী ছিল। কবির সতীর্থগণ 'ধাতুকাব্য' নামে পৃথক্ কাব্য রচনা করিয়া তাহাও পূরণ করিয়াছেন। ভট্টভীম ও বাসুদেবের সগোত্র বহু কবি আছেন, পাণিনির ন্যায় বিশাল ব্যাকরণের উপর এরূপ কাব্যরচনা উৎকট সাধনা নহে কি? লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই উৎকট সাধনার মধ্যে পাণিনির ব্যাকরণের বৈদিক অংশ অবহেলিত হইয়াছে—অবশ্য লৌকিক ভাষায় নরাঃ দেবাঃ ইত্যাদির পরিবর্ত্তে নরাসঃ দেবাসঃ ইত্যাদি উদাহরণ দেওয়াও চলিত না। যে কারণেই হউক, পাণিনির পরে বৈদিক ভাষার চর্চ্চা ক্রমেই উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। পাণিনি বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ যেটুকু রাখিয়া গিয়াছেন উব্বট সায়ণ প্রভৃতি পরবর্ত্তী বেদব্যাখ্যাতাদের তাহাই প্রধান অবলম্বন হইলেও কুমারিল প্রভৃতির ন্যায় বৈদিকনিষ্ঠ পণ্ডিতদের নিকট তিনি যথেষ্ট মর্য্যাদা পান নাই। উত্তরকালের বৈয়াকরণগণ পাণিনির এই অমর্য্যাদার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন বৈদিক ব্যাকরণের মোটে আলোচনা না করিয়া। কুমারিল পাণিনি ব্যাকরণে লৌকিক ভাষার শব্দবাহুল্য দেখিয়া তাহার বেদাঙ্গত্ব স্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাহার ছয়-সাত শত বৎসর পূর্ব্বে কাতন্ত্র ব্যাকরণকার আচার্য্য শর্ব্ববর্ম্মা বৈদিক শব্দ সাধনের জন্য কোন সূত্র প্রণয়ন না করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে এক কথায় বলিয়াছেন, 'লোকোপচারাদ্‌গ্রহণসিদ্ধিঃ'—বেদের অধিকাংশ শব্দই তো লৌকিক ভাষায় প্রচলিত, যদি তাহাদের ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি জানা যায় তবে অবশিষ্ট অল্প কয়েকটা শব্দ লইয়া বিশেষ কোন বাধা হইবে না—বেদের অধিকাংশ শব্দই যখন লৌকিক ভাষায় ব্যবহৃত, তখন লৌকিক ভাষার ব্যাকরণই বা বেদাঙ্গ হইবে না কেন? বৈদিক শব্দ কয়েকটা লোকোপচার বশতঃই সিদ্ধ হইবে—নরাঃ স্থানে নরাসঃ হয় ইহা জানিয়া লইতে কত আর পরিশ্রম হইবে? পাণিনি আর্য ব্যাকরণ—ইহা ভারতীয় মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান, অনার্য যুগে বহু ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের আদর্শ পাণিনি; নূতন মত বা নূতন পথ কেহই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

আর্যযুগের পর কথ্য ভাষা সংস্কৃত ছিল না, অথচ সাহিত্যের ভাষা প্রধানতঃ ছিল সংস্কৃত। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই এই ভাষাটি আয়ত্ত করিবার ও প্রায় মাতৃভাষার ন্যায় সহজসাধ্য করিবার চেষ্টা করিতে হইত। এই কার্য্যে সে সময়ের পণ্ডিতেরা যে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহারও প্রচুর প্রমাণ আছে। তবে ইহা স্বীকার করিতে বাধা নাই যে, ব্যাকরণশুদ্ধ ভাষা শিক্ষার চেষ্টায় তাহাদের যে পরিশ্রম

করিতে হইত তাহার ফলে মৌলিক কোনও চিন্তা করিবার শক্তি অনেকটা হ্রাস পাইত। সংস্কৃত এ-যুগে কাহারও পক্ষে সহজ ছিল না; বহু আয়াসের ফলে তাহা অর্জন করিতে হইত, সুতরাং তাহা ছিল কৃত্রিম। এই কৃত্রিমতার ফল সুদূরপ্রসারী, ইহার ফলে এই যুগের অধিকাংশ সৃষ্টিই কৃত্রিম। পণ্ডিতদের ভাষায় কৃত্রিম শব্দটায় গ্লানি অপেক্ষা গৌরব অনেক বেশী—যাহা ক্রিয়া দ্বারা নিবৃত্ত তাহাই কৃত্রিম। পাখী আকাশে উড়িতে পারে ইহাতে তাহার গৌরবের কিছুই নাই, কিন্তু কল-কৌশলে মানুষ যে আকাশে উড়িতে পারে তাহাই তাহার গৌরবের। কৃত্রিমতায় যথেষ্ট কলা-কৌশলের প্রয়োজন। এই জন্যই দেখিতে পাই, রামায়ণ ও মহাভারতের সহজ সংস্কৃতে কলা-কৌশল ও বুদ্ধির কসরৎ খুবই কম, কিন্তু তাহা জীবনী-শক্তিতে ভরপুর; পড়িলেই মনে হয়, একটা জীবন্ত জাতির সাক্ষাৎ পাইয়াছি। পক্ষান্তরে আর্ষ যুগের পরের কৃত্রিম সংস্কৃতে এই কলা-কৌশলটাই চক্ষে বেশী পড়ে—তাহার জীবনী-শক্তি স্তরে স্তরে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে। এ যুগটা প্রধানতঃ টীকা-ভাষ্যের যুগ—কবির মধ্যে কালিদাস, ভবভূতি ও শূদ্রক প্রভৃতি দুই-চারি জন, দার্শনিকের মধ্যে শঙ্কর, উদয়ন, গঙ্গেশ, রঘুনাথ প্রভৃতি কয়েক জন ও এই যুগের প্রধান জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতদের বাদ দিলে অবশিষ্টের অনেকেই মৌলিকতার কোন দাবী করিতে পারেন না। অবশ্য টীকা-ভাষ্যে পাণ্ডিত্যের অবধি নাই, স্থানে স্থানে নূতন কথাও আছে, কিন্তু তথাপি তাহা মূল নহে। এক বৈশেষিক দর্শনের বহু ভাষ্য থাকিতে পারে—কিন্তু কণাদ যেমন একটা বিশেষ পদার্থ স্বীকার করিয়া চিন্তার ক্ষেত্রে একটা নূতন জিনিষ আনিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা তাহা পারেন নাই। বিশেষ পদার্থটিকেই তাঁহারা ভাল করিয়া বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। এই যুগের পণ্ডিতেরা অগ্নিহোত্রী—আর্ষ যুগের আগুন তাহারা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের চেষ্টায় মূল শাখা পল্লব পুষ্প ও ফলে সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা না থাকিলে আমরা হয়তো মূলেরও সন্ধান পাইতাম না; কিন্তু তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে যে আর্য যুগের প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা স্বর্গীয় অগ্নি, সূর্য্য ও বিদ্যুতের উপাসনা করিতেন ও অনার্য যুগের মনীষীরা সেই অগ্নির তেজে দীপ্ত ভৌম অগ্নিরই উপাসনা করিতেন—তথাপি তাঁহারাও যে অগ্নিহোত্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

কৃত্রিমতার কথা কিছু বলিতেছি। অগ্নিপুরাণের অন্তর্গত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রাচীনতা স্বীকার না করিলে বলিতে হয় যে আর্য যুগে সাহিত্য ছিল, সাহিত্যশাস্ত্র ছিল না। ভরতের নাট্যশাস্ত্র আর্য যুগের সন্ধ্যায় রচিত। নাট্যশাস্ত্রে অবশ্য ছন্দঃ অলঙ্কার প্রভৃতি সম্বন্ধেও সুন্দর আলোচনা আছে, তথাপি রূপক ব্যতীত সাহিত্যের অন্য বিভাগ সম্বন্ধে ভরত এক প্রকার নীরব। কবি কালিদাসের পরবর্ত্তী দণ্ডী দশকুমারচরিতের লেখক হইলেও প্রধানতঃ তিনি আলঙ্কারিক, ভামহও বোধ হয় তাঁহার সমসাময়িক। দণ্ডী কাব্য, মহাকাব্য, কথা, আখ্যান প্রভৃতি সাহিত্যের নানাবিধ ভাগ করিলেন। দণ্ডীর পূর্ব্বে কথা আখ্যান প্রভৃতি শব্দগুলির সাহিত্যে যথেষ্ট প্রয়োগ ছিল, কিন্তু সংজ্ঞা শব্দ হিসাবে তাহাদের ব্যবহার ছিল না। ইহার পূর্ব্বে অর্থাৎ আর্য যুগে সাহিত্যের এইরূপ ভেদ বিশেষ প্রচলিত ছিল না। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দেখিতে পাই যে, তখন রচনার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া রচনা দেবতা, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, সর্প, ঋষি, মহর্ষি বা ঋষিপুত্র ইঁহাদের কাহার হওয়া সম্ভব তাহা নির্ণয় করা হইত; বিষয়বস্তু, ভাষা ও ভাব দেখিয়াই রচনার এইরূপ ভেদ করা হইত। দণ্ডী কাব্য প্রভৃতির যে সংজ্ঞা নির্ণয় করিলেন, মনে হয় কালিদাসাদির গ্রন্থ দেখিয়াই তিনি তাহা করিয়াছিলেন। তখন সাহিত্যক্ষেত্রে কলা-কৌশলের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে, নিত্য-নূতন সাহিত্য দেখা দিতেছে, কিন্তু তাহাদের নাম নাই। দণ্ডী এই সকল নবজাত শিশুদের নামকরণ করিয়া সকলের নিকট তাহাদের পরিচয় দিলেন। কালিদাসের রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবে যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহার বিবরণ দিয়া তিনি মহাকাব্যের সংজ্ঞা করিলেন, এইরূপ বৃহৎকথা প্রভৃতি দেখিয়া কোনও কোনও বিভাগের নাম হইল। ভামহ ছিলেন দণ্ডীর প্রতিদ্বন্দ্বী, দণ্ডী স্বভাবোক্তির ভক্ত, ভামহ স্বভাবোক্তিকে গ্রাহ্যই করেন না এইরূপ আরও অনেক বিষয়ে। দণ্ডী মহাকাব্যের লক্ষণ নির্ণয় করিতে যাইয়া কি থাকা উচিত তাহার এক বিস্তৃত তালিকা দিয়াছেন, ভামহের তালিকা অত বিস্তৃত নহে। মহাকাব্য সম্বন্ধে তিনি প্রথম যাহা বলিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট—

সর্গবন্ধো মহাকাব্যঃ মহতাং চ মহচ্চ যৎ।
অগ্রাম্যশব্দমর্থ্যং চ সালঙ্কারং সদাশ্রয়ম্।
(কাব্যালঙ্কার (১।২০)

মহাকাব্য সর্গবন্ধ, ইহা আকারে বিশাল ও ইহার বিষয়বস্তু মহৎ। ইহাতে অর্থবান্ অগ্রাম্য শব্দ থাকিবে এবং ইহা অলঙ্কার-ভূষিত ও উত্তম বস্তু বা ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইবে। মাত্র এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া মহাকাব্য রচিত হইলে কবির যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকিত, কিন্তু পরবর্ত্তী কবিগণ ইহার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া দণ্ডীকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। এই অনুসরণের ফল অনেক ক্ষেত্রে অদ্ভুত হইয়াছে। ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্যের নায়ক—তপস্বী ও ব্রহ্মচারী অর্জ্জুন; বিষয়বস্তু—বিরোধ ও যুদ্ধ। এই কাব্যে পান গোষ্ঠী প্রভৃতির বর্ণনা অবান্তর, কিন্তু মহাকাব্যের লক্ষণের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে যাইয়া কবিকে তাহাও করিতে হইয়াছে। দণ্ডী অলঙ্কারের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন—পরবর্ত্তী কালে এই আলোচনা আরও প্রসার লাভ করিয়াছে। শব্দালঙ্কারের মধ্যে নানা প্রকার যমক ও অনুপ্রাসের ব্যবহারেও তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। পরবর্ত্তী কবিগণ এই সকল অলঙ্কার লইয়া খুব বেশী মত্ত হইয়াছেন, কাব্য সালঙ্কার হওয়া চাই, সুতরাং শ্লোকে শ্লোকে অলঙ্কার, এক-একটি শ্লোকে দু'-তিন প্রকারের অলঙ্কার। এই চেষ্টার ফলে সন্দেশে ক্রমেই যে ছানা অপেক্ষা চিনির ভাগ বেশী হইয়া ক্রমে কাব্য বাবা তারকেশ্বরের ওলায় পরিণত হইতেছে, কবিগণ মত্ততা বশতই তাহা লক্ষ্য করেন নাই। ছিল ব্যাকরণ, আসিল অলঙ্কার, শব্দালঙ্কার যমক ও অনুপ্রাসে একটু ইন্দ্রজালও আছে, ইহার উপর আছে সংস্কৃত ভাষার প্রতি বর্ণের পৃথক্ অর্থ ও এক শব্দের বিবিধ অর্থ। কলা-কৌশলই যাঁহাদের প্রধান অবলম্বন তাঁহারা এ সুযোগ ছাড়িবেন কেন? ভারবির ন্যায় কবিও শ্লোক রচনা করিলেন—

"দেবা কানি নিকাবাদে বাহিকাস্ব স্ব কাহিতা।
কাকারে ভভরে কাকা নিস্বভব্যব্যভস্বনি।"

প্রত্যেক চরণ অনুলোম ও প্রতিলোম যে ভাবে ইচ্ছা পড়িলে একই হইবে। রসিকেরা ভাবিলেন, ইহা কি কাব্য না হেঁয়ালি,

পণ্ডিতেরা কিন্তু খুসীই হইলেন। কাব্যে এই পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের চেষ্টা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে—এ কালের মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ পর্য্যন্ত এই পাণ্ডিত্যের তরঙ্গে আসিয়া পৌছিয়াছে। সুবন্ধু প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এমন কাব্য রচনা করিব যাহার প্রত্যেকটি পদের দুইটি করিয়া অর্থ হয়। তাহার দেখাদেখি এ রোগও সংক্রামক হইয়া পড়িল, কবিরাজ কবি এমন কাব্য রচনা করিলেন যাহার প্রতি শ্লোকের পাণ্ডবদের ও রাঘবদের সম্বন্ধে পৃথক্ অর্থ হয়—একাধারে রামায়ণ ও মহাভারত। হরদত্ত রাঘব নৈষধীয় রচনা করিয়াও অনুরূপ কৌশল দেখাইয়াছেন। সন্ধ্যাকরনন্দী তাঁহার রামচরিতে যদি এইরূপ কৌশল দেখাইতে না যাইতেন তাহা হইলে হয়ত পালবংশের রাজত্বের শেষের দিকের ইতিহাসটা আমাদের নিকট আরও স্পষ্ট হইত। কোনও কোনও কবি আবার বিলোম কাব্য রচনা করিয়া এই শ্রেণীর কৌশলের আরও নিপুণ পরিচয় দিয়াছেন, উদাহরণ-স্বরূপ সূর্য্যক কবির রামকৃষ্ণ-বিলোম কাব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার প্রতি শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তি প্রথম পংক্তির বিলোম অর্থাৎ ডান দিক্ হইতে বাম দিকে পাঠ। কাব্যের প্রথম শ্লোকটি এই—

তং ভূসুতামুক্তিমুদারহাসং বন্দে যতো ভব্যভবং দয়াশ্রীঃ।
শ্রীযাদবং ভব্যভ-তোয়দেবং সংহারদামুক্তিমুতাসুভূতং।

প্রথম পংক্তির অর্থ—যিনি ভূমিজা সীতাকে (রাবণের হস্ত হইতে) মুক্তিদান করিয়াছিলেন, (নিতান্ত বিপদে পড়িয়াও) যাঁহার হাস্য সকল সময়েই অতি উদার, যাঁহার জন্ম অতি পবিত্র এবং দয়া ও শ্রী যাহা হইতে উদ্ভূত সেই রামচন্দ্রকে বন্দনা করি। দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ—যিনি মঙ্গলময় রশ্মিযুক্ত (ভব্যভ) সূর্য্য এবং চন্দ্রকে (তোয়) প্রকাশ করিয়া থাকেন, যিনি সংহারদাত্রী পূতনারও মোক্ষ বিধান করিয়াছিলেন, এমন কি যিনি সকলের প্রাণস্বরূপ সেই শ্রীযদুনন্দনকে বন্দনা করি। কোনও কবি এরূপ দুরূহ পথে প্রয়াণ না করিয়া অপেক্ষাকৃত সুগম পথে আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। জৈন কবি শ্রীবিক্রম নেমিদূত কাব্যের প্রতি শ্লোকের চতুর্থ চরণ কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের এক একটি শ্লোকের চতুর্থ চরণ দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। একটি শ্লোক হইতেই তাহার কৌশল প্রতীয়মান হইবে। নেমিদূতের প্রথম শ্লোক এই—

প্রাণিত্রাণপ্রবণহৃদয়ো বন্ধুবর্গং সমগ্রং
হিত্বা ভোগান্ সহ পরিজনৈরুগ্রসেনাত্মজাং চ।
শ্রীমান্ নেমির্বিষয়বিমুখো মোক্ষকামশ্চকার
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু।

উদাহরণ বাড়াইয়া লাভ নাই। বিহ্লন কবি ও চোর কবির কাব্য সুবিখ্যাত, একই শ্লোকের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা—প্রিয়া-সঙ্গমের স্মৃতি ও ইষ্টদেবতার স্তব। ভক্তিরসাত্মক স্তোত্রগুলি পর্য্যন্ত এই জাতীয় কলা-কৌশল ও পাণ্ডিত্যের আস্ফালন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। মহিম্নস্তবটি সাহিত্যের আকারে একটি রত্নবিশেষ, পণ্ডিতেরা তাহারও শিব ও বিষ্ণুপক্ষে দুই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের আশ্রয়ে এই শ্লোকে স্তুতি ও নিন্দা অনেকে করিয়াছেন। কবি নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের আনন্দসাগর স্তবটি একটি উৎকৃষ্ট স্তব। স্তুতি করিতে যাইয়া কবি বলিয়াছেন—

ভক্তিস্তু কা যদি ভবেদ্ রতিভাবভেদ-
স্তৎকেবলাম্বয়িতয়া বিফলৈব ভক্তিঃ।

অর্থাৎ—ভক্তি কি ? ভক্তি যদি অনুরাগ-বিশেষই হয় তাহা হইলে তোমার কেবলান্বয়িত্ব (সর্ব্বব্যাপিত্ব) প্রযুক্ত তাহাও বৃথা, কেন না, যে কোনও ব্যক্তিকে ভালবাসিলে ত তোমাকেই ভালবাসা হয়। কবি স্তবের মধ্যেও ন্যায়শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ কেবলান্বয়ী কথাটি ব্যবহার করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই, এইরূপ এই স্তবটির মধ্যে কোথাও বেদান্ত, কোথাও সাংখ্য, কোথাও বা শব্দবিদ্যার পাণ্ডিত্যের উৎকট উদাহরণ রহিয়াছে।

বলা বাহুল্য, কেবল অনুকরণপ্রিয়তা, কলা-কৌশলে নৈপুণ্য বা উৎকট পাণ্ডিত্য হইতে কোনও মহৎ বস্তুর সৃষ্টি হইতে পারে না। তারের উপর নৃত্য চলিতে পারে কিন্তু বসবাসের উপযোগী গৃহনির্ম্মাণ করা চলে না। আর্য-প্রতিভার সূর্য্য অস্তমিত হইলে বহু খদ্যোতই নভোমণ্ডল আলোকিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। কেহ করিয়াছেন কেবল অনুকরণ, ভাস বাসবদত্তা ও উদয়ন-চরিত্র অবলম্বনে মনোরম রূপক রচনা করিয়াছেন, তাহার পর সালঙ্কার সুললিত বাণীতে কয়েক শত বৎসর ধরিয়া নাট্যকারেরা সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে কেবল তাহার ও কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের অনুকরণ করিয়া চলিয়াছেন। স্থান-কাল-পাত্র ভিন্ন কিন্তু সেই উদয়ন, সেই অগ্নিমিত্র—তাহাদের লালসা ও সেই লালসা নির্বাপণের জন্য যৌবনভারখিন্না, মৃগচক্ষুচিত্তা, মৃগুগাত্রী, নিরাশ্রয়া কতগুলি সুন্দরী। এই অনুকরণ সহজ, কিন্তু শকুন্তলার অনুকরণ অত সহজ নহে। সংস্কৃত ভাষার অতুলনীয় নাটক মৃচ্ছকটিক বা মুদ্রারাক্ষসের অনুকরণও সহজ নহে। কেবল পাণ্ডিত্য সম্বল লইয়া মুরারি মিশ্র ভবভূতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়াছেন, কিন্তু হৃদয়ের বিভূতি না থাকিলে কেবল শব্দশাস্ত্রে ও অলঙ্কারশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের দ্বারা উত্তররামচরিতের কবিকে পরাজয় করা যায় না, ইহা তিনি জানিতেন না। অন্তঃকরণ বিশেষ মার্জ্জিত ও রসসিক্ত না হইলে কালিদাসকে ও সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্ম অনুভূতি না থাকিলে বাণভট্টকে পরাজয় করা সহজ নহে। কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রক ও বাণভট্ট প্রভৃতি অনার্য ভারতের উজ্জ্বল বৈদ্যুত আলোক—ইঁহারা এই যুগের শ্রেষ্ঠ অগ্নিহোত্রী।

অনার্য যুগের একটা গৌরব এই যে, ইহা বৈচিত্র্যের যুগ। গদ্য ও পদ্য-সাহিত্য এই যুগে নানা ভাগে বিশ্লিষ্ট হইয়া বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। উদয়ন প্রভৃতি দার্শনিক হইলেও তাঁহাদের রচনা সাহিত্যক্ষেত্রেও উৎকৃষ্ট নিবন্ধের স্থান গ্রহণ করিতে পারে, পূর্ব্বে এ-শ্রেণীর রচনা ছিল না। খণ্ডকাব্যের মধ্যেও ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের বিচিত্র উপাদানে অল্প আয়তনের মধ্যে নারায়ণ ভট্টের স্বাহাসুধাকরম্ ও শ্রীকৃষ্ণ কবির তারাশশাঙ্কম্‌এর মত আখ্যান কবিতা এই যুগেই রচিত হইয়াছে। বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যে এই জাতীয় কবিতা একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। মৃচ্ছকটিকের ন্যায় নাটকের অনুকরণ সম্ভব না হইলেও বহু কবি ভাণজাতীয় রূপকের মধ্যে সমাজের এক এক দিকের নিখুঁত ও সুন্দর চিত্র দিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য জানিতে হইলে আর্য-প্রতিভা যেমনই শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করা প্রয়োজন এই সকল কবিতা, কাব্য ও তাহাদের কবিদের সহিতও তেমনই প্রীতির সম্বন্ধ রক্ষা করা উচিত।

প্রভাত-সঙ্গীত

মহাস্থবির

বাতায়নে

২

রাস্তা-ধারের জানলায় বসে আছি—পথ ক্রমেই জনবিরল হ'য়ে উঠছে, বেরিয়েছে দুপুর বেলাবার যত ফেরিওয়ালার দল। এ সময় অধিকাংশ বাড়ীরই বাবুদের দল বাড়ীতে থাকে না—মেয়েদের কাছে জিনিষ বিক্রি করা সহজ।

ঐ যায় চুড়িওয়ালা—বেলোয়ারি চুড়ি চাইয়া—বালা চাইয়া—খেলনা চাইয়া—

তখনকার দিনে সব বাড়ীরই রাস্তার দিকের বারান্দায় নীল কাপড়ে মোড়া চিক ঝুলত। রাস্তায় চলা, ট্রামে-বাসে চড়া, কিংবা বাজার করবার ছলে সকাল থেকে দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে সঙ্গের পুরুষ জীবগুলিকে নিমখুন ক'রে সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরে ঘণ্টা দু'য়েক হুল্লোড় ক'রে কল-ঘরে ঢোকবার রীতি বা সাহস তখনকার মেয়েদের ছিল না।

চুড়িওয়ালা হেঁকে চলেছে সুর করে—এক বাড়ীর ওপরকার বারান্দার চিক্ ফাঁক ক'রে সরু-গলায় কে যেন ডাকলে—চুড়িয়ালা!

চুড়িওয়ালার সজাগ কান নারীকণ্ঠের এই ক্ষীণ আহ্বানের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হ'য়ে থাকে।

সে থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কোন্ বাড়ী গো?

—এই যে, এই বাড়ী।

সদর দরজা খুলে গেল। চুড়িওয়ালা বাড়ীর মধ্যে ঢুকল—তার পেছন পেছন পাড়ার একপাল ছোট ছেলেও ঢুকে পড়ল।

চুড়িওয়ালা উঠোনে তার সেই বিরাট বোঁচকা নামিয়ে একখানা চারচৌকো পিচবোর্ডের টুকরো দিয়ে হাওয়া খেতে লাগল আর ইতিমধ্যে বাড়ীতে যত মেয়ে আছে তারা একে একে চুড়িওয়ালার সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল—বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী, কিশোরী, বালিকা, শিশু—গৃহিণী, দাসী, কন্যা, বৌ—সধবা, বিধবা, পতি-সোহাগিনী বা পতিপরিত্যক্তা কেউ বাদ গেলেন না।

চুড়িওয়ালা তার বোচকার বাঁধন খুলে ফেললে। ওপরেই নানা রকমের খেলনা, বাঁশী, চকচকে ফুলদানী ইত্যাদি মনোহারী জিনিষ। দেখামাত্র ছেলেদের মধ্যে আন্দোলন শুরু হোলো—তারা সবাই মিলে সশব্দে এই জিনিসগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ও নিজেদের অভিজ্ঞতা জাহির করতে লাগল। এরই মধ্যে মেয়েদের চুড়ি দেখানো আরম্ভ হোলো।

এই চুড়িওয়ালারা প্রায়ই ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান। কথা-বার্ত্তা ছিল মিষ্টি, মুখে একেবারে মধু মাখানো যাকে বলে। তাদের অমানুষিক তিতিক্ষা আজকের দিনে যে কোন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দুর্ল্লভ। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তারা সংসারে কোন্ মহিলার স্থান কোথায় তা বুঝে নিয়ে বড়মা, ছোটমা, বৌমা, দিদিমণি, খুকুমণি প্রভৃতি ডাক শুরু করে দিত। তার পরে সেই মেয়ে-সভায় চুড়ি পছন্দ করানো—ঝাঁকা-মুটের পক্ষে অতি জটিল রকমের অপারেশন করাও বোধ হয় তার চাইতে সোজা। একটা দৃষ্টান্ত দিই—

পাঁচ জন মহিলা ও একটি ছোট মেয়ে হয়ত চুড়ি পরবে। প্রথমে ছোট মেয়েটির চুড়ি পছন্দের পালা। পঁচিশ রকমের চুড়ি দেখাবার পর এক রকম চুড়ি পছন্দ হোলো। মনে আর কিছুতেই বসে না। চুড়িওয়ালা বার-দু'য়েক তার বোচকা বেঁধে ফেল্লে। শেষ কালে সব ঠিক হয়ে যাবার পর চুড়ি পরাতে যাচ্ছে, এমন সময় এক জন বলে উঠলেন যে, তাঁর মামার বাড়ীর পাড়ায় একজনদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে সে বাড়ীর একটি ছোট মেয়ের হাতে দু'গাছি চুড়ি দেখেছিলেন—আহা, সে একেবারে চোখ জুড়িয়ে যায়।

চুড়িওয়ালাকে সেই চুড়ির বিবরণ শুনিয়ে বলা হল—সেই রকম চুড়ি দেখাও।

চুড়িওয়ালা অতি বিনীত ভাবে বললে—না মা, সে রকম চুড়ি আমার কাছে আজ নেই, বলেন তো এনে দিতে পারি।

খুকুর মা এই সুযোগে খুকুকে ফাঁকি দেবার তালে তাকে বললেন—তোকে ভাল চুড়ি পরে এনে দেবে, আজ আর চুড়ি পরিস্নি।

খুকু অমনি পোঁ ধরলে। সকলে মিলে তাকে বোঝাতে লাগলেন যে অচিরেই তার জন্য এমন ভাল চুড়ি আসবে যে সে রকমটি আর কারুর হাতেই দেখতে পাওয়া যায় না।

বাক্যটির ব্যঙ্গার্থ ধরে ফেলে খুকুমণি তার সুর আর এক গ্রাম উঁচে তুলে দিলে। খুকীর মা আর সহ্য করতে না পেরে রেগে তাকে দিলেন ঘা দু'-তিন। কিন্তু খুকু তো আর খোকা নয়! যে-পাপ থেকে তাকে নিবৃত্তি করবার চেষ্টা করা হচ্ছে সে-পাপে সহজাত অধিকার নিয়েই যে সে জন্মেছে—সে থামবে কেন! একটা মহা হট্ট-গোলের পর সাব্যস্ত হোলো, আচ্ছা তা হোলে ঐ চুড়িই খুকীকে পরিয়ে দেওয়া হোক।

খুকীর বেলাতেই যদি এই হয় তা হোলে খুকীর মা, খুড়ী, জেঠি-দের ব্যাপারটা সহজেই অনুমেয়।

এর পরে চুড়ি পরবার পালা। সে এক লাঠালাঠি ফাটাফাটি ব্যাপার! কারণ, সকলেই চান যে চুড়ি হাতের কব্জিতে একেবারে সেঁটে বসে যাবে। তাঁদের অধিকাংশের কব্জিতেই যে ছোট মেয়েদের মল সেঁটে বসে যাবার অধিকার রাখে, এক সোনার চুড়ি গড়াবার সময় ছাড়া সে খবরটা তাঁরা প্রায় একেবারে ভুলেই যেতেন। সেই গুণ-ছুঁচের ছ্যাঁদায় জাহাজের কাছি ঢুকাবার কসরৎ বালক-মহলে খুবই উপভোগ্য ছিল।

এত কাণ্ডের পর, বোধহয় ঘণ্টা দেড়েক বাদে চুড়িওয়ালা এক বাড়ী থেকে মুক্তি পেল। এত ক'রে তারা লাভ করত কি ক'রে তাই ভাবি—কারণ পরাতে পরাতে চুড়ি ভেঙে গেলে তা চুড়ি-ওয়ালার যেত—বোধ হয় চুড়ি পরানোটুকুই ছিল তাদের লাভ।

চলেছে ফেরিওয়ালা এক-এক জন এক এক সুরে হেঁকে—

আমাদের মগজে চিত্রবাহার তরঙ্গ তুলে। বাসনওয়ালা চলেছে, তারা হাঁকে না—বাজায়। রকমারী বাজনা সে—গিন্নিরা শুনেই বলে দিতে পারতেন, কার কাছে কি ধরণের বাসন পাওয়া যায়। ঐ যায় বেদের মেয়ে, পিঠে পোঁটলা বাঁধা। ক্ষীণ দেহযষ্টি কিন্তু তীক্ষ্ণ চীৎকার ক'রে ভারতের রাজধানীর বুকের ওপর দিয়ে ঘোষণা করতে করতে চলেছে—ব্যাত ভালো করি—দাঁতের পোকা বের করি—এমন মন্ত্র ঝাড়বে যে দাঁতের পোকার বাবা তো দূরের কথা তাদের তিন কূলে যে যেখানে আছে পিল্‌-পিল্‌ করে বেরিয়ে আসতে পথ পাবে না। শুনতুম, ওরা না কি আরও অনেক সাংঘাতিক রকমের তুক-তাক্‌ ঝাড়-ফুক মন্ত্র-তন্ত্র জানে, কিন্তু ছাড়ে না।

ঐ আসে মাড়োয়ারী কাপড়ওয়ালা—রামশিঙের মতন আওয়াজে পাড়া কাঁপিয়ে—একটি—য়াকায়—তিন খা—না কাপড় —একৃথি—য়ানা ফাউ ! ! !

টাকায় চার খানা ধুতি। হোক না কেন সে পাঁচ-হাতি। আজ যে একখানা রুমালের দাম পাঁচ সিকে। কিন্তু আশ্চর্য্য! সেদিনও মাতব্বরদের মুখে শুনেছিলুম—কি দুর্দিনই না পড়েছে। দুর্দিনের জয়ডঙ্কা কালের বুকে চিরদনই বেজে চলেছে। মানুষ রাজ্য জয় করবার কৌশল শিখেছে বটে, কিন্তু দুর্দিনের কাছে তাকে চিরকাল হার মানতে হয়েছে।

এই দুপুরের যাত্রীদের মধ্যে আর এক জনের কথা মনে পড়েছে—সে ছিল ভিখারী, অন্ধ ভিখারী। খুব লম্বা-চওড়া ও হৃষ্টপুষ্ট চেহারা ছিল তার—বিশেষ কোরে পা দু'খানা ছিল তার অদ্ভুত। অত বড় লম্বা-চওড়া ও শক্তিব্যঞ্জক পা পালোয়ানদের মধ্যেও দুর্লভ। ডান হাতে তার মাথা সমান উঁচু একটা মোটা বাঁশের লাঠি ঝুলত আর বাঁ হাতে ঝুলত একটা রোগা কালো মতন প্যাংলা মেয়ে।

অন্ধ আবার গান গাইত। যেমন ছিল তার বিরাট দেহ, তেমনি ছিল তার কণ্ঠস্বর। উঃ, সে যেমন গম্ভীর, তেমনি কর্কশ ও তীক্ষ্ণ। কিন্তু গাইয়ে হওয়ার পক্ষে এতগুলি প্রতিকূল গুণাবলীর সমাবেশ সত্ত্বেও তার গান পড়শীদের বুকে করুণার প্রস্রবণ ছুটিয়ে দিত, এমনি দরদ ছিল তাতে।

অন্ধ গান গেয়ে চলেছে কর্কশ কণ্ঠে, কিন্তু তার সমস্ত অক্ষমতা ভেদ ক'রে হৃদয়-বেদনা শতধা উৎসারিত হচ্ছে।

অন্ধ গান গেয়ে চলেছে, সে গান নিশ্চয় তার নিজের রচনা নয়। চমৎকার গান—অন্ততঃ সে সময় খুবই ভাল লাগত। আজ সে গানের কথা ও সুর স্মৃতি থেকে মুছে গেলেও ভাবটা মনে আছে।

অন্ধ গান গেয়ে চলেছে—অন্ধের যা কষ্ট তা ধৃতরাষ্ট্রই জানেন আর জানেন সেই অন্ধ মুনি—তিন যুগের ব্যথায় ঢল নামল স্তব্ধ দুপুরের বুকে! গান গেয়ে চলতে চলতে এক জায়গায় এসে অন্ধ দাঁড়িয়ে বললে—মা জননী, অন্ধকে একটি পয়সা দিন।

সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়েটা পিঁ-পিঁ শব্দে টেনে টেনে সুর ক'রে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে—মা গো, দয়া ক'রে অন্ধকে একটি পয়সা দিন।

হয়ত কোনো গৃহস্থবধূ তাকে একটা পয়সা কিংবা কেউ-ই কিছু দিলে না। অন্ধ কিছুক্ষণ চেঁচামেচি ক'রে আবার ফিরলে সামনের দিকে, আবার সুরু হোলো সেই গান আবার সুরু হোলো তার যাত্রা।

অন্ধ গান গেয়ে চলেছে—আমি শুনেছি মাথার ওপরে না কি আকাশ আছে, তার রং না কি নীল। রাত্রিবেলা না কি আকাশে ঝকঝকে সব তারা ফোটে, সে দৃশ্য না কি খুব সুন্দর। কিন্তু নীল বা ঝকঝকে কাকে বলে তা আমি জানি না—আমি যে অন্ধ!

তার সেই নিদারুণ অভিযোগ আমাদের অন্তরে যে তরঙ্গ তুলত তা একমাত্র বালক-মনেই সম্ভব।

অন্ধ গেয়ে চলল—শুনেছি না কি গাছে নানারকম ফুল হয়, বিচিত্র তাদের রং ও রূপ। সেখানে না কি প্রজাপতি ওড়ে, তাদের রং ও রূপ বিচিত্রতর। হায়! আমি যে অন্ধ, আমার কিছুই দেখা হোলো না।

তার গানের মধ্যে একটা কথা বিশেষ ক'রে মনে আছে, সেটা শাশ্বত সত্য। প্রত্যেক লোকই জীবনে তা হয়ত বহু বার উপলব্ধি করেছেন। সে কথাটি হচ্ছে—আঁখি নেই বিধি দিলি আঁখিজল—

এই অন্ধের সঙ্গে ছেলেবেলার আর একটি স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আমাদের বাড়ীর প্রায় সামনেই একজনেরা থাকত। ভাড়াটে বাড়ী হলেও বেশ বড় বাড়ী, অবস্থা সচ্ছল ছিল তাঁদের। ছেলেরা দু'জন কলেজে পড়ত আর দু'জন চাকরী করত। বাড়ীর কর্ত্তা ভাল চাকরী করতেন—চোগা-চাপকান পরে দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভাড়াটে গাড়ী চড়ে রোজ আপিসে যাওয়া-আসা করতেন। এ ছাড়া দেশে জমি-জমা ছিল এবং সেখান থেকে আমদানীও মন্দ ছিল না। সেখান থেকে প্রায় তরি-তরকারী ও ফল-মূল আসত এবং বাড়ীর গিন্নি পাড়ার প্রায় সব বাড়ীতেই সে সব জিনিষ বিতরণ করতেন। তাঁদের বাড়ীতে ছোট ছেলেপিলে কেউ ছিল না বটে, কিন্তু গিন্নির মেজাজ ও ব্যবহারটি এমন মধুর ছিল যে পাড়ার অধিকাংশ ছোট ছেলে ও মেয়েদের আড্ডা ছিল সেখানে। বাড়ীর কর্ত্তা ও ছেলেরা সকলেই ছোটদের ওপরে খুবই সদয় ছিলেন। কর্ত্তা মাঝে-মাঝে ছেলেদের চার নম্বরের ফুটবল কিনে দিতেন—বিকেলে তাঁদের বড় উঠোনে আমরা খেলতুম। পাড়ার প্রায় সব ছেলেই এখানে যাতায়াত করলেও আমরা দু'-ভাই এদের ভারি প্রিয়পাত্র ছিলুম, বোধ হয় সামনা-সামনি বাড়ী থাকায়।

কিছু দিন পরে বাড়ীর বড় ছেলের বিয়ে হোলো। বিয়ে, বৌভাত প্রভৃতি সেরে তাঁরা দেশ থেকে ফিরে এলেন। আমরা বৌ দেখলুম, জমিদারের মেয়ে, রং খুব ফর্শা না হোলেও বেশ দেখতে—বছর চোদ্দ-পনেরো হবে। চমৎকার হাসি-হাসি মুখ, টানা-টানা চোখ। বিদেশে শ্বশুরবাড়ীতে এসে তখনকার দিনে মেয়েরা যে-রকম কান্নাকাটি করত তার সে-রকম কোন বালাই ছিলই না, বরং আমাদের মতন এতগুলি বাচ্ছা দেওর পেয়ে সে বেশ খুশীই হোয়ে উঠল। কনে-বৌ অবস্থাতেই সে এক দিন গাছ-কোমর বেঁধে আমাদের সঙ্গে উঠোনে নেমে পড়ল ফুটবল খেলতে। কিন্তু সে ঐ এক দিনই, খুব সম্ভব তার শাশুড়ী বারণ করে দিয়েছিলেন। তবে অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে সমানে ঝগড়া করে ড্যাংগুলি খেলেছে।

যা হোক, ঐটুকু মেয়ে—আমাদের চাইতে আর কতই বা বড় ছিল সে, সেই এক পাল ছেলেকে সে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছিল। এমনি ছিল তার আকর্ষী শক্তি। মুখের কথা খসবার আগেই আমরা তার কাজ ক'রে

দিতুম। বৌদির কোনো দুঃখই ছিল না, অন্তত আমরা বুঝতে পারতুম না—তবে বাড়ী থেকে একলা বেরিয়ে নিজের ইচ্ছামত এর-তার বাড়ীতে ঘুরে-ঘুরে, গল্প করা অর্থাৎ মনের সুখে পাড়া বেড়াতে পারে না বলে মাঝে-মাঝে আমাদের কাছে চাপা দুঃখ প্রকাশ করত।

এক দিন দুপুর বেলা আমরা দু'-ভাই এই রকম জানলায় বসে আছি, দূরে অন্ধ ভিখারীর গান শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, মুখ তুলতেই চোখ পড়ল, বৌদি বারান্দায় চিক্ ফাঁক করে দূরে অন্ধকে দেখবার চেষ্টা করছে। অন্ধ তাদের বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই সে বারান্দা থেকে সরে গেল।

একটু বাদেই দেখলুম, বৌদি তাদের সদর দরজা খুলে গলা বাড়িয়ে রাস্তার দু'-দিকে দেখতে লাগল—লোক-জন কেউ কোথাও আছে কি না! গ্রীষ্মের দুপুর, রাস্তায় লোক-জন নেই, খাঁ-খাঁ করছে—একমাত্র সেই ভিখারী ও তার হস্তলগ্ন কন্যা ছাড়া।

ভিখারী বাড়ীর সামনে বরাবর আসতেই বৌদি দরজা খুলে বেরিয়ে টপ্ ক'রে তাদের বাড়ীর রকে উঠে পড়ল। রকের ঠিক নীচেই একবারে ভিতের গা-ঘেঁষে হাত-দুই চওড়া একটা নর্দমা ছিল—সে সময়ে শহরে অনেক রাস্তাতেই দু'পাশের বাড়ীর গা দিয়ে এই রকম খোলা নর্দমা থাকত।

দেখলুম, বৌদি বিনা আয়াসে একটি লম্ফে একেবারে নর্দমা টপ্‌কে রাস্তায় পড়ল। তার পরে ভিখারীর হাতে পয়সা দিয়েই, মারলে দৌড় বাড়ীর দিকে।

ভিখারীর আশীর্ব্বাণী তখনো শেষ হয়নি—দরজার সামনেই আমের খোসায় পা পড়ে বৌদি সশব্দে আছাড় খেল, সেই নর্দ্দমা-ঢাকা পাথরের ওপরে।

ভিখারী গান গাইতে গাইতে চলে গেল। আমরা দেখছি, বৌদি আর ওঠে না। দু'-একবার ঘেঁষ্‌ড়ে ঘেঁষ্‌ড়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রে এলিয়ে পড়ল।

আমরা ছুটে বেরিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু আমাদের সাধ্য কি যে তাকে তুলি! শেষকালে কোনো রকমে হেঁচ্‌ড়ে—টেনে তাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলুম।

বৌদি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগ্‌ল, কিন্তু কিছুতেই দাঁড়াতে কিংবা চলতে পারলে না—কাঁদতে কাঁদতে আমাদের বল্‌লে—কোনো রকমে আমাকে ঘরে নিয়ে চল।

দুই ভাই তার দুই হাত ধরে ছেঁচ্‌ড়াতে ছেঁচ্‌ড়াতে ওপরে নিয়ে গিয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলুম। যন্ত্রণার চোটে দেখতে দেখতে তার মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। আমরা তার কষ্ট দেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তার শাশুড়ীকে ডাকবার উপক্রম করছি দেখে সে বললে—এখন যা, বিকেলে আসিস্—কারুকে কিছু বলিস্‌নি যেন!

বিকেলে সেখানে যাওয়া হয়নি। সন্ধ্যা বেলা মা বললেন—ও-বাড়ীর বৌমার কি হয়েছে, দু'দু'জন ডাক্তার এল।

পরের দিন বিকেলে বৌদিকে দেখতে গেলুম। এক দিনেই তার চেহারা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। শুনলুম, কল-ঘরে পড়ে গিয়ে তার পায়ের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছে, কাল সকালে অজ্ঞান ক'রে হাড় জোড়া লাগানো হবে।

একটু নিরালা হ'তেই বৌদি আমাদের বললে—একটা কথা বলব, রাখবি ভাই?

—নিশ্চয় রাখব।

—আমি এদের বলেছি যে কল-ঘরে পা পিছলে পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে। ভিকিরিকে পয়সা দিতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলুম জানতে পারলে এরা আর আমায় আস্ত রাখবে না। লক্ষ্মী ভাই, তোরা কারুকে কিছু বলিস নে যেন।

পরদুঃখকাতরতা তখনকার দিনেও গুণ বলেই বিবেচিত হোতো, কিন্তু পরদুঃখে কাতর হয়ে বৌ-মানুষের রাস্তায় বেরিয়ে যাওয়া অমার্জ্জনীয় ছিল।

বৌদির পায়ে কাঠ বসিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হলো বটে, কিন্তু অসুখ তার আর সারল না। দিনে দিনে নানা উপসর্গ জুটে অবস্থা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠতে লাগল। দেশ থেকে তার বাপ-মা এলেন, সায়েব ডাক্তারও এল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। দু'দিনের জন্য এসে সবাইকে আপন ক'রে, পাড়াশুদ্ধ ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে এক দিন সে চলে গেল।

বিশ্বাস ক'রে এক দিন সে আমাকে যে-ঋণে আবদ্ধ করেছিল আজ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সেই ঋণ শোধ করলুম।

[ক্রমশঃ

প্রতিসরণ

অরুণ বাগচী

পৃথিবীকে আকাশ দাও—নীলাকাশ, অতৃপ্তির নীল সমুদ্রে
অবগাহনের সুখ;
আকাশকে বিত্তবান্ কর রক্তসূর্যে, কালো মেঘে আলোর
চমক লাগুক্;
জোয়ার আনো মহাশূন্যের মরা গাঙে, শুক্‌নো গাছে ফুল ফুটুক্।

তুমি-আমি নইলে স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন, সৃষ্টি সৃষ্টির ভ্রম;
প্রাণের পর্দায় পর্দায় বেঁচে থাকা মৃত্যুর ব্যতিক্রম।
মননের অনুপস্থিতিতে সেই তুমি-আমি-পূর্ণ-বয়স্ক বিকৃতায় পঙ্গুতায়

মনন চাই, উদ্ধত তরবারির দীপ্তিলিপ্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ফসল—
সমুদ্র স্বননে যার উদ্ভাসিত নগ্নরূপ উচ্ছল,
নইলে প্রাণের অংকুর শুধুই সম্ভাবনার ছল।

প্রতিভার চাষ কর, ক্ষুরধার প্রতিভার চাষ:
ভালো লাগা, ভালোবাসা অনেকই তো চেখে চেখে
কেটেছে মাস;
দয়া করে আজ তুমি আশ্বাস আনো, আনো বোঝা-বোঝানোর

ঝরা পালক

কানাই সামন্ত

এক

স্রষ্টা যিনি, সার্থক যাঁর নাম, সেই কবি লোক-লোকান্তরের অধিপতি। প্রথম ও পরম স্বর্গ অন্তরে, যেখানে কবি ও কবির অন্তর্যামী একত্র বিরাজ করছেন। সেই গূঢ়তম লোকে অপরিসীম আনন্দ, অলৌকিক চেতনা, সমাহিত শক্তি। আমি ও তুমির প্রেমে শান্ত সমুদ্রে সহসা অমিত আনন্দ উন্মথিত হয়ে ওঠে, আর তারই নিরন্তর বীচি-বিক্ষোভ মণ্ডলাকারে লোক হতে লোকান্তরে বিসর্পিত হয়ে অবশেষে অসীমে হারিয়ে যায়।

একান্ত ধ্যানে কবির যে চক্ষু দু'টি মুদ্রিত ছিল তা বাইরের জগতে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতেই, আনন্দময়ী কোন্ নারীমূর্তির প্রথম দর্শনেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, আর বিস্ময়ে বলে: তোমার হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির!—কথা বলে না, দুটি সলজ্জ অর্ধনিমীলিত চক্ষুতে অপরূপ হাসি হাসে; সত্য বটে এই রমণী অন্তর থেকেই বাইরে এসেছে, আর তন্ময় ভাবুককেও অন্তর থেকে বাইরে টেনে এনেছে; অন্তরে যা অসীম আনন্দ আর বিশ্বভুবনে যা অনির্বচনীয়া মায়া, সেই উভয়েরই সম্পূর্ণ প্রতিমা এই। চোখ মেলে একে যদি খুঁজে না পায় তবে কবি কবিই হতে পারে না; এ জীবনে পথের ধুলায় খ্যাপা-পাগল সেজে বসে থাকা ভিন্ন তার আর উপায় নেই। কিন্তু একে যদি পায়, কাছের পাওয়াই নয়, নাই বা সে রাতে রাতে নিভৃত গৃহকোণের দীপটি জ্বেলে দিল, নাই বা তার হাসিতে প্রতি প্রভাতে নির্ধনের স্পৃহনীয় দৈন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, দূরের চোখের দেখাতেও যদি পায়, অম্লান স্মরণের ভাস্বর পটে যদি আঁকা থাকে, তবে তাইতেই নব জীবনের সূত্রপাত।

অন্তরে যে প্রেমলীলা অন্তর্যামীর সঙ্গে বাইরেও তাই; একটি অপরটির প্রতিভা। আর, এই প্রেমেই সমস্ত সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য হয়ে ওঠে, নিত্য নবীন হয়ে ওঠে। সমস্ত সংসারকে, সংসারের সকল জীবন আর জীবনের সমুদয় ঘটনাকে নূতন ভাবে উপলব্ধি করা যায়—যেন সে জগৎ নয়, নূতন জগতে নূতন ক'রে জন্মলাভ হয়। দশ দিকে অরণ্য-পর্বত, নদ-নদী-তড়াগ, অকূল সিন্ধু, অনন্ত তুষার, আকাশের বিপুল প্রসারে ষড়্‌ঋতুর পরিক্রমণ, আলো-অন্ধকার, সূর্য-চন্দ্র-তারা—যারা চিরদিন জড় মৃত বাণীহীন হয়েছিল, সে সবই সহসা প্রাণ পেয়ে নড়ে ওঠে। দেখা যায়, একই সত্তায় নিখিলের সকল সত্তার অনুপম রহস্য নিহিত; অন্তরের তারে যে সঙ্গীত বাজছে বিশ্বময় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে তারই রেশ জাগছে। অন্তরে অসীম জীবনের একটি পরিপূর্ণ

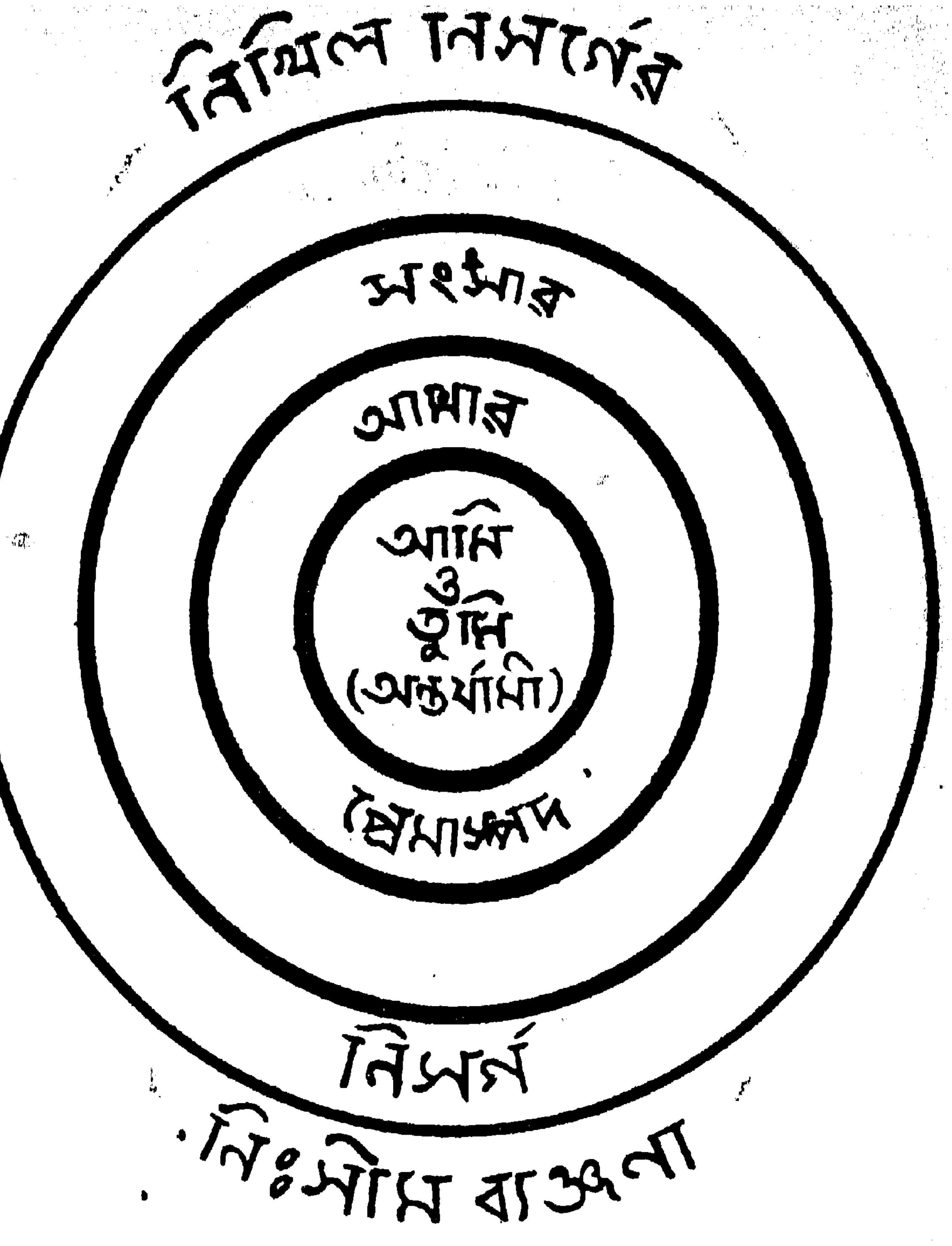

কাব্যসৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান

বাণী জাগছে—ওঁ; সর্বভূত তাতেই সায় দিয়ে জপছে—ওঁ ওঁ। (১) অন্তরেও তল নেই, বাইরেও সীমা নেই।

আপনার সৃষ্টি দিয়ে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে কবি মানুষ-সাধারণের সুগোচর করে। মানুষ বললে: এই যে জগৎ, এই জীবন, আমায় বুঝিয়ে দাও, দেখিয়ে দাও। দার্শনিকের ও বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা তাই নানা দিকে নানা ভাবে সচেষ্ট হল। অনেক প্রশ্ন; অনেক সংশয়; অনেক সমস্যা; অনেক তর্ক-বিতর্ক; অনেক সিদ্ধান্ত-শিখরে পৌছুবার দুরূহ প্রয়াস যা এক জন যদিও বলে অটল, স্থির, আর এক জনের যুক্তিঘাতে টলে উঠতে দেরী হয় না। কবি বলে: রোসো। আমি তো জানি আনন্দকে আনন্দ দিয়েই বুঝতে হয়, ভবকে বুঝতে হয় অনুভব দিয়ে, নিখিলজীবনকে পাই আমি নিজের এই সীমাবদ্ধ জীবনেই। অতএব সৃষ্টিকে আমি সৃষ্টি দিয়ে বোঝাব। আমি রূপরচনা করি, তুমি দেখো; আমি গান গাই, তুমি তোমার প্রাণের বীণা-যন্ত্রে তারগুলো সযত্নে বেঁধে নিয়ো। আনন্দে ও সুরে সকল রহস্যই নিঃশেষে ধরা দেবে, ফুলের গোপনে মধু যেমন ভরে ওঠে চুপি-চুপি।

কবির বাণীতে অন্তরের চিররুদ্ধ দেউল-দ্বার খুলে গেল; মাটির ঘরে দু'টি মানব-মানবীতে মিলে প্রতিদিনের ঘরকন্নার কাজ যা কিছু,

(১) রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন, ওঁ এই প্রণব হচ্ছে নিখিল-সৃষ্টির মূলীভূত পরমা স্বীকৃতির অনাহত ধ্বনি ও মন্ত্রবীজ।

তাই চিরদিনের স্বর্গের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; সংসারে যে অসংখ্য নর-নারীর মুখ চিনি, মর্ম জানি নে—যাদের সঙ্গে প্রয়োজনের বাঁধনে মিলি, ঐক্যের উপলব্ধিতে বা আনন্দের বেদনায় নয়—তাদেরও জানলেম, তাদেরও চিনলেম, ভালোবাসলেম, এ জীবনে তাদের আবির্ভাব সত্য হল ; নিখিল ভুবন কথা কয়ে উঠল, নেচে উঠল, গেয়ে উঠল, নিখিল নিসর্গের শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ভোলা মনকে ভুলিয়ে কোথা যে নিয়ে গেল কিছুতে তার ঠিকানা পাই নে, যতক্ষণ না আবার চোখ বুজে ডুব দিই আপন অন্তরে, রসের রসাতলে, আর কী অরূপরতনের অঙ্গস্পর্শ ক'রে বলি : এই গো এই।

দুই

সময়ে সময়ে মনকে জিজ্ঞাসা করি, রূপরচনা করে কী ফল? সূচনাতেই বলে রাখি, যে মন এই প্রশ্ন করে আর যে মন এর সদুত্তর খোঁজে, উভয়ের কোনোটিই কবি-মন নয়। দিনে দিনে ফুল ফোটানো যেমন ফুল গাছের স্বভাব, বেশভূষণের কথা ভুলে গিয়ে ধূলিধূসর দিগম্বর সেজে খেলা করা যেমন শিশুর সহজ প্রবৃত্তি, অন্ধকার দূর করা যেমন আলোর কাজ, তেমনি রূপরচনা করাই রূপকার বা কবির ধর্ম। কেন, কী হবে, এ-সব কথায় তার প্রয়োজন কৈ? রূপরচনার দ্বারাই সে নিজেকে বিকাশিত করে—প্রকাশিত করে, রূপরচনাতেই তার সব হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আহ্লাদ। কবির নিজের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট, অর্থাৎ ষোলো আনার উপরে সতেরো আনা লাভ। আর, কবির রচনা যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁদের পক্ষেও, যে নয় তা বলতে পারি নে। কারণ কবির সঙ্গদোষে তাঁরাও কবিরই সাধর্ম্য লাভ করেন, কিন্তু তাঁদের দার্শনিক মন জিজ্ঞাসু মন, কিছু কালের জন্য মুখ বুজে অন্তরালে সরে বসলেও চিরকাল হয়তো মূক থাকে না, কিম্বা নেপথ্যেও থাকতে রাজী হয় না, তখনই এই সমস্ত প্রশ্ন ওঠে : রূপরচনা ক'রে কী ফল? তাতে কার কী হিত হয়?

যদি বলি, হিত কারো কিছুই হয় না কিছুই হয় না, কখনোই হবার নয়, কিন্তু কবির কাব্য-সৃষ্টিতে কবির নিজেরও মুক্তি আর রসিকেরও মুক্তি(২)—কথা শুনে কেউ চমকে উঠবেন না। মুক্তিসাধনা সন্ন্যাসী-বৈরাগীরই একচেটে নয়। মুক্তিতে প্রয়োজন সকলেরই, অতএব সকলেই মুক্তি সাধে আপন প্রকৃতি অনুসারে আপনার প্রণালীতে। বৈরাগ্যের হয়তো একটা মুক্তি আছে, কিন্তু অনুরাগের ও কল্পনার তা থেকেও বহু গুণে মহীয়সী মুক্তি আছে জেনো। তা যার-পর-নেই শ্রেয়: বলেই যার-পর-নেই সহজ, আর যার-পর-নেই দুরূহ তার সাধনা।

নিজের ক্ষুদ্র জীবনে, সীমাবদ্ধ দেহে-মনে, সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বে আবদ্ধ থাকি বলেই তো যত দুঃখ আমাদের, যত হীনতা। বুদ্ধদেব না কি উপলব্ধি করেছিলেন, বাসনাই জীবের মোহবন্ধ অর্থাৎ তার দুঃখের হেতু, তার মুক্তির প্রতিবন্ধক। বাসনা তখনই সম্ভব হয় যখন নিজের বা নিজের জীবনের পরিধি, সাধনা ভাবনা বেদনার ক্ষেত্রে, যথেষ্ট ছোটো ক'রে রাখি। নইলে যতই নিজেকে অন্য অনেকের জীবনে বা অসীম জীবনে প্রসারিত করে দিই, নিজের সীমানা মুছে মুছে দিই, অথবা নিজেকে ভুলতে থাকি, বাসনার বশে বা লোভীর মতো ক'রে চাওয়া-পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। মনে হতে পারে, অনুরাগের ও বাসনার আকর্ষণ এক দিকে, উভয়ে মানুষকে একই ভাবে গড়ে তোলে। বস্তুত: তা নয়। অনুরাগে যে বাসনার মিশ্রণ থাকতে পারে না, আবার ভাগ্যক্রমে বা অজানা স্বর্গের অচেনা দেবতার প্রসাদে বাসনাও যে অনুরাগ হয়ে ওঠে না, এমন বলি না—না হলে বিল্বমঙ্গলের কাহিনী তো মিথ্যা বলতে হয়—তবুও মানুষের জীবনে অনুরাগ এক, বাসনা ভিন্ন। বাসনা টানতে চায় সবকে নিজের পানে, সবই করতে চায় নিজে আত্মসাৎ। প্রেম সর্বত্রই নিজেকে বিলোতে চায়, হয়ে উঠতে চায় সর্বময়। বাসনা যা কিছু চায়, যা কিছু পায়, তাতে তার ক্ষুদ্রতা কখনো ঘোচে না ; এবং জড়-চেতন নির্বিশেষে তার সমুদয় কেড়ে-নেওয়া জিনিষ, আগলে রাখা জিনিষ, শেষ পর্যন্ত বিষম বোঝা হয়েই তাকে পীড়িত করতে থাকে। জড় তো জড়ই বটে, চেতনার জিনিষও তার কাছে অচেতন, যে জন্যে মানুষকে আক্ষেপ করতে হয়েছে—

'নিরখি কোলের কাছে
মৃৎপিণ্ড পড়িয়া আছে,
দেবতারে ভেঙে ভেঙে করেছি খেলনা।'

প্রেম চোখ মেলে যা-কিছু দেখে তাতেই মুগ্ধ হয়, সেখানেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে, নিজে তাই হয়ে যায় বা তাই হয়ে যেতে চায়। আপনার চৈতন্য দিয়ে সে জড়কেও উদ্ভাসিত ক'রে তোলে, তাকেও চৈতন্যময় বলেই উপলব্ধি করে। অবশেষে আনন্দের ও চেতনার লোকে সকল সীমা হারিয়ে যায়।

সুতরাং প্রেমের ও বাসনার বিভিন্ন প্রকৃতি, বিপরীত মুখেই গতি।

কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার, বিশুদ্ধ প্রেম বা অবিমিশ্র বাসনা সংসারে দেখা যায় না। অন্য কথায়, এ সংসারে প্রেমের ও বাসনার বিভিন্ন প্রবৃত্তি (tendency) যেমন চোখে পড়ে, তেমন চোখে পড়ে না কখনোই প্রেমের বা বাসনার একান্ত পরিপূর্ণতা বা শেষ পরিণাম। কাজেই প্রবৃত্তি বা প্রবণতা দিয়েই বিচার করতে হয়।

ভাবুক, কবি, প্রেমিক যেমন পরস্পরের নিকট-আত্মীয়—কল্পনা, অনুভূতি, অনুরাগ, দৃষ্টি তেমনি এক গোত্রের জিনিষ। একই মানুষ যেমন জীবন-বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে আর বিভিন্ন ছন্দে ভাবুক, কবি বা প্রেমিক নামে পরিচিত ; চেতনার একই ক্রিয়া বা ক্রীড়া তেমনি বিভিন্ন বেশে বিভিন্ন অবস্থায় কল্পনা, অনুভূতি, অনুরাগ দৃষ্টি, আরো কত কী নামে অভিহিত হয়। তন্মধ্যে অনুরাগের কথাই এতক্ষণ বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে, সুতরাং অনুরাগীর স্বধর্ম যে কী তাই হয়তো কিছুটা পরিস্ফুট হয়েছে। কবির স্বধর্মও প্রায় ঐ। প্রেমিক যেমন ভালোবাসে আপন প্রেয়সী নারীকে, বন্ধুকে বা পথের পথিককেও—যেমন ক'রে অনুভব করে আর সত্তায় প্রবেশ করে তাদের—কবি তেমনি কল্পনার যোগে সর্বত্র স্বচ্ছন্দগতি। চরমে প্রেমিকের প্রেমও হয়ে ওঠে দৃষ্টি, কবির কল্পনাও তাই। প্রেম বা কল্পনার বিষয় সেই অলৌকিক আদিম দৃষ্টিতে অন্তরে-বাহিরে উদ্ভাসিত হয়ে

(২) সামাজিক বা অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলছি না, তা হলে তো বিশেষ লোকহিত হত।

উঠে, অন্তর-বাহিরের কোনো রহস্যই অগোচর থাকে না তার, কারণ এই দৃষ্টিতেই যে আলো, এই দৃষ্টিতেই আনন্দ, এই দৃষ্টিতেই হওয়া। কবি বা প্রেমিক যা দেখে তাই হয়ে যায়।

বৈরাগী বা সন্ন্যাসীর দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনভঙ্গী অন্য রূপ। তাঁদের মুক্তিও তাই ভিন্ন। কবি বা প্রেমীর মুক্তি সবকে আলিঙ্গন ক'রে; আর সন্ন্যাসীর মুক্তি সবকে ত্যাগ ক'রে,—বর্জন ক'রে। সন্ন্যাসী যখন তাঁর ঈপ্সিত মোক্ষ-কামনায় বলছেন নেতি-নেতি, কবিপ্রেমিক তখন আহ্লাদে গেয়ে উঠেছেন ইতি-ইতি। কোন্ কথা, কোন্ মুক্তি বড়ো তা-ও কি বলে দিতে হবে? এই মাত্র বলতে পারি যে, যে বলে এই, যে বলে ইতি, নিখিলের সর্বত্র যে প্রেম দেয়—পূজা দেয়—ও, তার মুক্তিই তো ভাগবত মুক্তি। কারণ, ভগবানও তো ঠিক এমনি ভাবে তাঁর অনাদি অনন্ত সৃজনলীলায় খুশী হয়ে মুক্ত হয়ে রয়েছেন; তাঁর মুক্তি লোকে লোকে, তাঁর মুক্তি রূপে রূপে, তাঁর মুক্তি অদৃশ্য প্রাণ-জাহ্নবীর সহস্র ধারায় জীবনের সুদৃশ্য কুমুদ-কহ্লার শতদল সহস্রদল হয়ে তরঙ্গে-তরঙ্গে দিবানিশি নাচে। সেই যে লীলাময় ভগবান, কবি ও প্রেমিক তাঁরই ভক্ত, তাঁরই সখা, তাঁরই সঙ্গী, শিশুসম তাঁরই অনুকারী।

বিষয়ী বা কামুক আমাদের থেকে যত দূরে, বৈরাগী সন্ন্যাসী তার চেয়ে অধিক দূরে। ওরা নিজেদের অপরিসীম তামসিক মোহে চেতনাকেও সর্বত্র সর্বপ্রকারে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে শেষ পর্যন্ত নিছক জড়ের উপাসনায় জড় হবার পথেই চলে। এরা সৃষ্টিকে স্বীকার করে না, রূপকে স্বীকার করে না, বিশ্বসংসার বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে নিরাকার নির্গুণ নির্বিশেষ চেতনায় লীন হতে চায়। আমরা কিন্তু অমৃতের মূর্তি চাই, চেতনার লীলা ভালোবাসি। আমরা তনুকে বাদ দিয়ে প্রাণকে দেখি নে। প্রাণকে বাদ দিয়ে তনুও কি দেখা যায়? তাই তো আমাদের জীবনে আর আমাদের উপলব্ধিতে, লব্ধ ও অলব্ধ, মর্ত ও স্বর্গ, মানব ও দেবতা মিলে মিশে এক ও অভিন্ন। আর সকলের আকাঙ্ক্ষা অভেদে ভেদ কল্পনা ক'রে ধাবিত হয় নানা বিরুদ্ধ ও বিপরীত মুখে। আমরা চাই প্রতি পদে নিখিলের সমগ্রতাকে মিলিয়ে মিলিয়ে, কবি-ভাবুক প্রেমিক-শিল্পী সখা ও সুহৃৎ সকলে মিলে নিত্যের পরিক্রমা দিই নৃত্যচ্ছন্দে। আমরা সহজিয়া; আমাদের সাধনা সকলের চেয়ে কঠিন, ব্যর্থতাও স্পৃহনীয়।

এসো কবি, এসো রূপকার, রূপের ভুবন দেখিয়ে দাও; যুগ-যুগান্তরের যাত্রীদের জন্যে নিখিলের সকল দ্বার-বাতায়ন উন্মুক্ত ক'রে দাও। আমরা ত্রিভুবনের সর্বত্র প্রবেশ করব। আমাদের কল্পনা মুক্ত, আমাদের অনুরাগ মুক্ত; আমরা তোমায় প্রসাদে নিখিল জগতের নিখিল জীবনেই স্বয়ং হারিয়ে গিয়ে যকে পেলাম।

শীতে

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

নিস্তেজ শীতের রোদ, নিরুত্তাপ বসে আছি ঘরে।
হিমসিক্ত হ্রস্ব দিন, ভিতরে তুষার-গলা শীত,
অরণ্য-নিবিড় নীড়ে সঙ্কুচিত পাখীরা স্তম্ভিত,
শিশির-নিষিক্ত মাটি,—হৃদয় উত্তাপ খুঁজে মরে।
বিদ্যুত দমকা হাওয়া উদ্দামতা আনে অভ্যন্তরে।
কুয়াশা-ধূসর সূর্য মুহ্যমান, স্তিমিত অতীত,
উত্তপ্ত হৃদয় কোনো মনে পড়ে, গ্রীষ্মের সঙ্গীত,
আজ এ মধ্যাহ্ন-বেলা নিরুত্তেজ, মন উষ্ণ করে।

কোথায় হিমানী নদী, উত্তাল পাহাড়ী-ঝর্ণা কাঁপে?
জানালায়, বাতায়নে প্রকম্পিত লক্ষ হিম-কণা,
কাঁপিছে পীতাভ রৌদ্র অনভ্যস্ত শীতের প্রতাপে,
আমারো হৃদয়ে কাঁপে দুর্নিবার বৈশাখী কামনা।

নিরুত্তেজ বসে আছি, মধ্যাহ্ন শীতের বেলা কাটে।
একটুকু অগ্নুত্তাপ নেই ভূমি ভিতরে ও মাঠে।

কবি-গানের কবি ও গান

মুস্তাফা নূর-উল্ ইসলাম

কবি-গানের ইতিকথায় ঐতিহাসিক বিবর্তনের সূত্র টানতে হলে আমাদের পেছিয়ে যেতে হবে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি। যখন ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে, স্বাধীন বাংলার মসনদের উপরে আসীন হয়েছে বণিকের মানদণ্ড শাসনের রাজদণ্ডরূপে, বৈদেশিক শাসন ও শোষণের পেষণে দেশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা পাল্টে গিয়ে ঔপনিবেশিক সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম হচ্ছে—এমনি যুগ-সন্ধিক্ষণের পরিবেশে নাগরিক সভ্যতা থেকে বহু দূরে গ্রামাঞ্চলের চণ্ডীমণ্ডপে, যাত্রার আসরে কিষাণদের অবসর-বিনোদনের জন্য সমাজিক ও ধর্মীয় উৎসব-ব্যসনের অন্যতম অপরিহার্য অংগ হিসেবে কবি-গানের গোড়াপত্তন হয়। মোটামুটি ভাবে ১৭৬০ খৃঃ অঃ থেকে ১৮৩০ খৃঃ অঃ পর্যন্ত এই সত্তর বৎসর কাল কবিওয়ালাদের মাতামাতি গোটা বাংগালী জাতটাকে মাতিয়ে এবং তাতিয়ে রেখেছিল স্বাভাবিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং খাঁটী স্বাদেশিকতার ছাপ থাকায় কবি-গানের ইতিহাস আরও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারত কিন্তু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর অভিনব সমাজ-ব্যবস্থার দরুণ, নতুন করে গজিয়ে-ওঠা 'ইয়ং-বেংগলের' অত্যাচারের দরুণ এবং বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রভাবের চাপে এ দীর্ঘতা সম্ভাবনার আকার না পেয়ে হ্রস্বত্বেই কুঁকড়ে মরে যায়।

বাংগালী জাতের একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হচ্ছে 'আবেগ-প্রবণতা'। 'বোধ' আর 'যুক্তিজ্ঞান' থেকে বহু দূরে অনুভূতির, 'আবেগের' বিস্তিখেলাতেই এ জাত রস পায়। তাই এ দেশের জাতীয় সাহিত্যও হয়ে পড়েছে প্রধানতঃ গীতিধর্মী। গানের ভেতর দিয়েই বাংলা সাহিত্য-ভারতী ভূমিষ্ঠা হয়েছেন। চর্য্যাগান, পদাবলীর গান, পুরাণ ও মংগলকাব্যের পালা গান ইত্যাদি চলে এসেছে সেই দশম শতাব্দী থেকে ভারতচন্দ্রের যুগ অবধি নাচ, গান আর ছড়ার ভেতর দিয়ে। অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ে দেশ জুড়ে একটা ওলট-পালট সংঘটিত হলেও তা হয়েছিল ওপরতলায় নবাব, উজীর, সেনাপতি, জমিদার, বণিক এদের চত্বরে—সমাজের নীচুতলায় সে আলোড়নের ঢেউ পৌঁছায়নি। তাই দেখা যায়, দেশের এমন যুগ-সন্ধিক্ষণেও মুর্শিদাবাদ বা কোলকাতা বা কাটোয়া থেকে সুদূর পাড়াগাঁয়ে দিনান্তের কঠোর পরিশ্রমের পর সমানে চলত যাত্রা, পাঁচালী, ছড়া গানের চর্চা। এবং এই ভাবেই বাংগালী জাতের গীতিস্পৃহা, রস-আস্বাদন আকাংখা তুষ্ট হত। কবিওয়ালাদের উদ্ভব হল উক্ত স্পৃহার তাগিদেই এমনি ধরণের যুগে। ঝঞ্চা এবং বাত্যাবিক্ষুব্ধ সে যুগ চিন্তাশীলতার বিকাশের অনুকূল ছিল না, প্রতিভা চর্চার আবহাওয়াও ছিল না তখন। তখন জন-সমাজের চাহিদা ছিল কেবল সংগীতের জন্য। এ চাহিদা মেটাতে এগিয়ে এলেন কবিওয়ালার দল। তাই এ-যুগের ইতিহাস কবি-গানের ইতিকথায় পূর্ণ।

কোন রকম সংগা নির্ধারণ করে কবি-গানকে সে সংগার ছকে ফেলা মুস্কিল। সঠিক ভাবে বলাও যায় না কবি-গান কাকে বলে। সাধারণতঃ বিভিন্ন সময়ে চলিত খেউড়, পাঁচালী, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, টপ, কীর্ত্তন, টপ্পা, দাঁড়া-কবিগান, কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদি কবি-গান নামে খ্যাত। আর মুষ্টিমেয় জনাকয়েক ছাড়া কবিওয়ালারা প্রায়ই হচ্ছেন অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত গেঁয়ো স্বভাবকবি। 'কবি ও কবি-গান' সম্পর্কে ধারণাটা পরিষ্কার করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের উক্তি তুলে দেয়া হল: "ইংরেজের নূতন সৃষ্টি রাজধানীতে (কলিকাতা) পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থুলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্য-রস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয় জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্য-রস চাহিত না।

"কবির দল তাহাদের সেই অভাব পূর্ণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহারা পূর্ব্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমানে চটক মিশাইয়া, তাহাদের ছন্দোবন্ধ সৌন্দর্য্য সমস্ত ভাঙ্গিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া অত্যন্ত লঘু স্বরে চারি জোড়া ঢোল ও চারিখানি কাঁশি সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কেবল গান শুনিবার এবং ভাবরস সম্ভোগ করিবার যে সুখ তাহাতেই তখনকার সভ্যগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না—তাহার মধ্যে লড়াই এবং হার-জিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যক ছিল। সরস্বতীর বীণার তারেও ঝন-ঝন শব্দে ঝংকার দিতে হইবে আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক্-ঠক্ শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে। নূতন হঠাৎ-রাজার মনোরঞ্জনার্থে এই এক অপূর্ব নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি হইল।"

মোটামুটি ভাবে কবি-গান রচিত হত সাধারণ (লোক-সাহিত্য) লোকদের জন্যে, যাদের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সর্বসাধারণ' নামক 'হঠাৎ-রাজা'। কোম্পানীর রাজ-দরবার দেশ-শোষণের একটা কারখানাবিশেষ ছিল। আবার এ-দেশীয় যাঁদেরকে আশা করা যেত দেশের সংস্কৃতি-চর্চ্চার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে, সেই সব নব গঠিত ঔপনিবেশিক সমাজের মুকুটমণিরাও দিনে দিনে হয়ে পড়তে লাগলেন রাজশক্তির পদলেহকের পর্য্যায়ভুক্ত ব্যক্তি ও পরিবার গত স্বার্থের নেশায়। তাই অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক এবং সমর্থকের অভাবে জাতীয় সংস্কৃতি ক্রমেই আশ্রয় খুঁজতে শুরু করল সমাজের নীচুতলার দিকে। এবং শেষ অবধি দেখা গেল, জন-সাধারণ ছাড়া কবি-গানের শ্রোতা এবং সমঝদার অভিজাত শ্রেণীর কাউকে পাওয়া যায় না। কিন্তু মুস্কিল হল এই যে, এই সব অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত শ্রোতার আসরে উপযুক্ত সমালোচক বা উপযুক্ত সমঝদারের অভাব ঘটল। ফলে কবি-গানের চর্চ্চা হয়ে দাঁড়াল গতানুগতিক; বিষয়-বস্তুর উৎকর্ষতায় শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করা সম্ভব হত না বলে বিষয়-বস্তুও নামতে লাগল অপকর্ষতার দিকে। এবং শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, যেমন শ্রোতা তেমনি কবিওয়ালা এসে জুটে গেছেন। সঠিক ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, খুব কম কবিই ছিলেন যথার্থ শিক্ষিত, মনীষাসম্পন্ন এবং চমকপ্রদ প্রতিভার অধিকারী। নতুন কিছু উদ্ভাবন করবার মত মগজ আর প্রচেষ্টা প্রায় কারুরই ছিল না বলা যেতে পারে। কারণ, উপযুক্ত সমালোচনা, উৎসাহ এবং সমর্থন ছিল না মোটেই। আসরে দেখা যেত একটা মূক জনতা সাময়িক চিত্তবিনোদনের জন্যে কবিওয়ালা সম্বন্ধে পূর্বকৃত একটা অন্ধ ধারণার মূঢ়তায় 'স্থির' হয়ে বসে আছে। তারা 'সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত,...সাহিত্য-রস চাহিত না।'

উত্তেজনার ফেনা কেটে গেলেই 'যথা পূর্বম্ তথা পরম্' অবস্থা। তাই বলছিলাম, তীক্ষ্ণ সমালোচক, সমঝদার এবং উৎসাহদাতার অভাবে হরু ঠাকুর, রাম বসু, রাসু, নৃসিংহ প্রমুখ ছাড়া আর কেউই 'মান' (standard) পর্য্যন্ত উঠতে পারেননি। সুতরাং দেখা যায়, সমষ্টিগত ভাবে কবি-গানের চর্চ্চা ও সাধনায় কবিওয়ালারা উল্লেখযোগ্য ভাবে এগিয়ে যেতে পারেননি। পরন্তু দেখা যায়, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ইংরেজী কালচারের জোয়ারে তাঁরা তলিয়ে যান বিস্মৃতির অতলতায়।

কবি-গান বলতে সাধারণ ভাবে আমাদের মনে এর বিষয়-বস্তুর অপকর্ষতা এবং কবিওয়ালা ও শ্রোতা-সাধারণের রুচিজ্ঞান সম্বন্ধে হীন ধারণার উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু এমনও দিন ছিল যখন কবি-গানের বিষয়-বস্তু ছিল উচ্চাংগের এবং তার ভেতরে ধর্মীয় দর্শনের বেশ একটা ঠাঁই ছিল। সেটা হচ্ছে কবি-গানের গোড়ার যুগ। অপস্রিয়মান বৈষ্ণব-যুগে যখন শাক্ত-সাহিত্য ক্লাসিক পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছিল তখন কবিওয়ালারা তাঁদের রচনায় রাধাকৃষ্ণের 'বিরহ' কিংবা 'সখীসংবাদ' তৎকালীন সাহিত্যসৃষ্টির এই সব পুরানো ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরেন। অবিশ্যি এটা ঠিক যে কবিওয়ালারা বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের উত্তরাধিকারী ছিলেন না। কিন্তু তবু তাঁদের রচনায় বৈষ্ণব কবিতার মূল ভাবের (মান, মাথুর, গোষ্ঠ ইত্যাদি) অনুকরণ এবং বৈষ্ণব কবিতার রচনাশৈলীর একটা ছাপ ধরা পড়ে। যেমন নিতাই বৈরাগীর একটা পদ :

শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
নহে কেন অঙ্গ অবশো হইলো,
সুধা বরিষিলো শ্রবণে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। খুব কম কবিওয়ালাই ছিলেন সংগীত-রচনার কলায় (art) বিশেষজ্ঞ। অথচ গেঁয়ো অশিক্ষিত বড় জোর অর্ধশিক্ষিত সাধারণ কবিওয়ালাদের রচনায় বৈষ্ণব পদসমূহের মূল ভাব এবং রচনাশৈলী কেমন করে অবিকৃত প্রভাব বিস্তার করেছিল? এর জবাবে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, এই সব কবিদের ছন্দোবদ্ধ আকারে ছড়া এবং গান-রচনার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। আর তার সংগে মিশেছিল সাহিত্যিক যুগ-প্রভাব। কারণ তত দিনে 'Baisnab poetry had been reduced almost to a mechanic art; its eonceptions had become stereotyped and its language conventional.—(ডাঃ সুশীলকুমার দে)

কিন্তু সাধারণ ভাবে এ-কথা বললেও বৈষ্ণব কবিতার সংগে সম্পর্কিত হিসাবে বিচার করতে গেলে রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রমুখের মৌলিকত্ব, প্রতিভার উৎকর্ষতা উপেক্ষা করা যায় না। এঁদের রচনায় বৈষ্ণব কবিতার মাল-মশলার সন্ধান পাওয়া গেলেও এঁরা স্বকীয়তা এবং প্রতিভার মৌলিকত্বের বলে রচনায় স্বাভাবিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততার দিক থেকে বৈষ্ণব-প্রভাবের বাইরে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছেন। দু'-একটা নমুনা এ সম্পর্কে দেওয়া গেল :

মান করে মান রাখতে পারিনে।
আমি যে দিকে ফিরে চাই,
সেই দিকেই দেখতে পাই,
সজল আঁখি জলধরবরণে।
অতএব অভিমান মনে করিনে।
আমি কৃষ্ণপ্রাণা রাধা,
কৃষ্ণপ্রেমডোরে প্রাণ বাঁধা,
হেরি ঐ কালরূপ সদা।
হৃদয়-মাঝে শ্যাম বিরাজে
বহে প্রেমধারা দু'নয়নে।—(রাম বসু)

পিরীতি নাহি গোপনে থাকে।
শুন লো সজনি, বলি তোমাকে।
শুনেছ কখন জলন্ত আগুন
'বসনে বন্ধন রাখে।
প্রতিপদের চাঁদ হরিষে বিষাদ,
নয়নে না দেখে উদয় লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদ কিঞ্চিত প্রকাশ,
তৃতীয়ের চাঁদ জগতে দেখে।
—('বিরহ' হইতে উদ্ধৃত—হরু ঠাকুর)

মাত্র সত্তর বছরের মধ্যে কবি-গান সাহিত্য হিসেবে কতটা উৎকর্ষতার পথে এগিয়ে গিয়েছে, আবার কতটা নেমে গিয়েছে অপকর্ষতার পথে তার বিচার-বিশ্লেষণ হল। এবার দেখতে চাই, এই সত্তর বছরের মধ্যে কবি-গান এমন কি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে যার ফলে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে এর একটা স্থান নির্দ্দেশ করা হয়েছে। কবি-গানের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বাংলা দেশ আর বাংগালীর সমাজের নাড়ীর সংগে কবি-গান একেবারে মিশ খেয়ে গেছে। তৎকালীন বাংগালী সমাজের দৈনান্দিন হাসি-কান্নার ইতিহাস —সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব-আনন্দের ছবি কবি-গানের ছত্রে ছত্রে দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছে। 'বিরহ' এবং 'আগমনী' সংগীতগুলি—বিশেষ করে রাম বসু—এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। ধর্মপ্রবণ বাংগালীর সামাজিক জীবনের প্রতিটি অনুভূতির সংগে সূক্ষ্ম কারু-কৌশলতার মারফৎ তার ধর্মীয় অনুষ্ঠান একাংগীভূত হয়ে রেখায়িত হয়েছে কবি-গানের ছন্দ-ঝংকারে। যেমন বলা যেতে পারে, 'মেনকা' এবং 'উমাকে' নিয়ে রচিত 'আগমনী' গীত। বাংগালী-ঘরের প্রতিটি মাতা আর কন্যার মধ্যকার স্নেহ-বাৎসল্যরসাশ্রিত অনুভূতিটি 'মেনকা-উমা' কাহিনীর সমগোত্রীয়। বিস্তৃততর ভাবেও গণ-মানসের সংগে কবি-গানের অদ্ভুত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দৃষ্ট হয়। তৎকালীন বাংলা দেশের গণ-সংস্কৃতি আশ্চর্য্য ভাবে রূপ নিয়েছে কবিওয়ালাদের রচনায়। নওয়াব, বাদশা, রাজা, জমিদার এবং সমাজের অভিজাত শ্রেণীর আওতা থেকে সরে আসাতে উৎসাহ, সমর্থন, সমালোচনা এবং সাহায্যের অভাবে কবিওয়ালাদের রচনার, বিষয়বস্তুর, রচনাশৈলীর উৎকর্ষতার পারদমান নেমে গেছে এটা ঠিক, কিন্তু তার ফলে পরোক্ষ ভাবে এঁদের সৃষ্ট গানে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই অংকিত হয়েছে বাংলার অগণিত কিষাণ সাধারণের অন্তরের আকৃতি, ব্যথা, বেদনা, আনন্দের ইতিহাস।

মানুষ ও জান্তব প্রবৃত্তি

অতীশ্বর সেন

ক্রমবিবর্ত্তনের পথে মানুষ আজ বহুল অগ্রসর। নতুন কোন শরীরাংশ উদ্ভবের তাহার আর সম্ভাবনা নাই। সাধারণ স্বাস্থ্য কিন্তু হইবে আরও উন্নত; কারণ সে আজ পাইয়াছে পুষ্টিকর খাদ্য ও দুরারোগ্য রোগের ঔষধ। অস্ত্র-চিকিৎসার নানা কৌশল সে আয়ত্তে আনিয়াছে। অন্ততঃ তাহার মানসিক শক্তিগুলি প্রকাশ করিবার আরও সুযোগ সে পাইবে। ব্যক্তিগত ও জাতিগত হিসাবে উন্নতি হইবে মানুষের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক অবস্থার। ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষের সভ্যতা ও তাহার দর্শনযোগ্য ব্যবস্থা এবং রীতি-নীতি কখনও বা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, কখনও বা পিছাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সকল সময়েই থাকিয়া গিয়াছে লাভ। তাহার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে অসম্ভব, কিন্তু মানুষকে অগ্রসর হইতে হইবে বহু দূর। সৌভাগ্য বশতঃ মানব-মস্তিষ্কের নূতন নূতন উন্নতি সময় কখনও রোধ করিতে পারিবে না। তাহা চিরকাল সম্ভব।

পাখীরা দিনের শেষে নিজেদের বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। ক্ষুদ্র গায়ক পাখী গৃহস্থের দুয়ারে বাসা বাঁধে, শীতে তাহারা কোথায় যেন চলিয়া যায় কিন্তু পরের বসন্তে আবার তাহারা সেখানে ফিরিয়া আসে। সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার পাখীরা দক্ষিণের দিকে সমুদ্রের উপর দিয়া হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে, কিন্তু তাহারা তাহাদের পথ হারায় না। বার্ত্তাবাহী কপোত বাক্সের ভিতর বন্দী হইয়া, দুরন্ত যাত্রার প্রথমটা ঠিক পায় না, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য সে ঘুরিয়া নির্ভুল ভাবে স্বস্থানে ফিরিতে থাকে। বাতাসে যখন তৃণদল আন্দোলিত হয়, যাহা কিছু দর্শনীয় পথের সন্ধান কোথায় মিলাইয়া যায়, তবু মৌমাছি তাহার পথের সন্ধান পায়—মৌচাকে ফিরিয়া আসে। গৃহের এই আকর্ষণ মানুষের মধ্যেও আছে। কিন্তু তাহার শক্তি নানা জীবের তুলনায় ক্ষীণ—নানাবিধ যন্ত্র সাহায্যে তাহার এই শক্তি সে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের চক্ষু কতটা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ন্যায় তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আমরা জানিতে পারিয়াছি, ঈগল ও শকুনির চক্ষু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মত। এখানেও মানুষ তাহার আবিষ্কৃত যন্ত্র সাহায্যে প্রকৃতি নয়, জান্তব শক্তিকে পরাজিত করিয়াছে। তাহার দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে আকাশের ক্ষীণ নীহারিকাপুঞ্জকে সে দেখিতে পায়, তাহার যন্ত্রশক্তি তাহার স্বভাবলব্ধ দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা কুড়ি লক্ষগুণ বেশী। মানুষ আজ আনবিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে অদৃশ্য জীবাণুদের দেখিতেছে, এমন কি যে সকল জীবাণু সাধারণ জীবাণুদের খাইয়া ফেলে, তাহারাও বাদ যায় নাই।

—

অন্ধকার রাত্রে বৃদ্ধ ভারবাহী অশ্বকে একাকী ছাড়িয়া দিলেও সে পথ চিনিয়া লইতে ভুল করে না। তাহার দৃষ্টিশক্তি বোধ হয় বিশেষ উজ্জ্বল নহে, তবু সে চক্ষু দিয়া পথের ও চতুষ্পার্শ্বের তাপের তারতম্য অনুভব করে। তাহার চক্ষু তাপবাহী আলোকরশ্মি দ্বারা সামান্য পীড়িত হয়। অন্ধকার রাত্রে অপেক্ষাকৃত শীতল প্রান্তরের উপর দিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল মুষিকদের পেচক দেখিতে পায়। আলোক দিয়া আমরা রাত্রিকে দিবালোকে পরিণত করিতে পারি।

চক্ষুর অক্ষিগোলক পশ্চাদ্বর্ত্তী ঝিল্লীর উপর চিত্র প্রক্ষেপন করে, চক্ষুর মাংসপেশী ঐ গোলকটিকে ঠিক দর্শন-কেন্দ্রে আনিতে পারে। এই ছায়াপট নয়টি স্তর দিয়া তৈরী। পাতলা কাগজ অপেক্ষা এক-একটি স্তর বেশী ঘন নয়। সকলকার ভিতরের স্তরটি হইতেছে সরল ও বক্রকোণ মাংসসূত্র দিয়া নির্ম্মিত, ইহার ভিতরে তিন কোটি সরল সূত্র ও ত্রিশ লক্ষ কোণ আছে। তাহারা পরস্পর এবং অক্ষি-গোলকের সহিত সংযুক্ত কিন্তু অদ্ভুত ভাবে তাহারা বাহিরের দিকে থাকে না, ভিতরের দিকে থাকে। কাচ-গোলকের মধ্য দিয়া কোন মানুষকে দেখিলে দেখা যাইবে তাহার পদদ্বয় উপরে ও মস্তক নীচে রহিয়াছে, বামের শরীরাংশগুলি ডাইনে দেখা যাইবে। এই বিকৃত দর্শন চিত্রের শোধন করিয়াছে প্রকৃতি, কোন্ উপায়ে তাহা আগেই জানিতে পারিয়া। এই শোধন ঘটিয়াছে, লক্ষ লক্ষ স্নায়ুসূত্রের ভিতর দিয়া। এই সকল স্নায়ুসূত্র মস্তিষ্কের সহিত সুসংবদ্ধ ভাবে জড়িত। তাই আমরা চক্ষু দিয়া কোন চিত্রের প্রকৃত রূপই দেখি। আমাদের দর্শন-ক্ষমতা প্রকৃতি তাপরশ্মি হইতে আলোকরশ্মিতে আনিয়া দিয়াছে—তাই চক্ষু নানা বর্ণের আলোতে চঞ্চল। সেই জন্যই আমরা পৃথিবীর রঙীন ছবি দেখিতে পাই। চক্ষু-গোলকের নানা অংশ ঘনত্বে বিভিন্ন, তাই সকল আলোকরশ্মিই সঠিক দর্শন-কেন্দ্রে আসে। কাচের মত সমঘনত্ব পূর্ণ পদার্থে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। অক্ষিগোলক, সরল ও বক্র মাংসসূত্র, স্নায়ু,—সকলের মধ্যেই আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা বর্ত্তমান। তাহা না হইলে, প্রকৃতির রূপ এত সুন্দর ভাবে আমাদের চক্ষুতে পড়িত না। ইহা কি আশ্চর্য্য নয়, শরীরের কোন একটি যন্ত্রের বিশেষ অংশ অপরাপর অংশের প্রয়োজন জানিতে পারে?

যে শামুক আমরা খাই তাহাদের ঠিক আমাদের মত সুন্দর অনেকগুলি চক্ষু আছে—তাহার প্রত্যেক উজ্জ্বল চক্ষুটিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছুরক দর্পণের সাহায্যে দৃশ্যমান প্রত্যেক পদার্থই সঠিক ভাবে দেখিতে সাহায্য করে। এই সকল আলোক-বিচ্ছুরক দর্পণ মানুষের চক্ষুতে নাই। ইহারা শামুকের ভিতর, মানুষের ন্যায় উন্নত মস্তিষ্কের অভাব সত্ত্বেও গঠিত হইয়াছিল। জীবজন্তুর চক্ষু, দুই হইতে কয়েক সহস্র এবং প্রত্যেকটিই বিভিন্ন। এই অসংখ্য চক্ষু নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রকৃতি কোন্ দর্শন বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়াছিল—কোন অদৃশ্য শক্তির সাহায্য কোথাও না কোথাও সে পাইয়াছিল নির্ভুল ভাবে।

ফুলের রঙ আছে, তাহা দেখিয়া আমরা আকৃষ্ট হই। মৌমাছিরা তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। তাহারা আকৃষ্ট হয় আলট্রাভায়োলেট আলোকরশ্মিতে, তাহার আরও সুন্দর রঙে। যে রশ্মি আমাদের দৃষ্টিশক্তির বাহিরে, সে আলোকের মধ্যে যে আনন্দ ও উৎসাহ নিহিত আছে, তাহা মানুষ সবে মাত্র অনুভব করিতে শিখিয়াছে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে মানুষের উদ্ভাবনা কৌশল অদৃশ্য আলোকরশ্মির এই সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে সাহায্য করিবে। সুদূরবর্ত্তী তারকার তাপরশ্মি ও তাহার শক্তির পরিমাণ করিতে মানুষ আজ সমর্থ।

কর্ম্মী মৌমাছি, শিশু মৌমাছিদের জন্মগ্রহণ সময়ে মৌচাকের মধ্যে বিভিন্ন আকারের কক্ষ নির্ম্মাণ করে। কর্ম্মীদের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ, অলস পুরুষ মৌমাছির জন্য বৃহৎ কক্ষ ও রাণী মৌমাছির জন্য বিশেষ আকারের কক্ষ নির্ম্মিত হয়। রাণী মৌমাছি অসম্পূর্ণ ডিম্ব প্রসব করে পুরুষদের ঘরে। ভবিষ্যৎ রাণী মৌমাছিদের ঘরে তাহারা সম্পূর্ণ ডিম্ব প্রসব করে। স্ত্রী মৌমাছি হইতে কর্ম্মীদের উদ্ভব। সে নূতন বংশধরদের আগমন পূর্ব্ব হইতেই আশা করিয়া মধু এবং পুষ্পরেণু চর্ব্বণ করিয়া, খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য তৈরী হয়। পুরুষ

এবং স্ত্রী মৌমাছির গঠন সময়ের একটি বিশেষ পর্য্যায়ে তাহারা খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক করা বন্ধ রাখে—কেবল মাত্র মধু ও পুষ্পরেণু শিশু মৌমাছিদের খাওয়াইতে থাকে। যে সকল স্ত্রী মৌমাছি এই সকল খাদ্য ভক্ষণ করে, তাহারা কর্ম্মী মৌমাছিতে রূপান্তরিত হয়।

রাণীদের ঘরে, স্ত্রী মৌমাছিদের চর্ব্বিত ও পরিপাক করা খাদ্য খাওয়ানো চলিতে থাকে। এইরূপে বিশেষ ভাবে আদরে ও যত্নে প্রতিপালিত স্ত্রী মৌমাছিরা শেষে রাণী মৌমাছি হইয়া দাঁড়ায়। তাহারাই কেবল সম্পূর্ণ ডিম্ব প্রসব করিতে পারে। এইরূপ ভাবে মৌমাছিদের জন্ম রচনায় মধ্যে বিশেষ কক্ষ, বিশেষ ডিম্ব প্রসবের প্রবর্ত্তন আছে এবং খাদ্যের সহিত অবয়ব পরিবর্ত্তনের অদ্ভুত সম্পর্ক সকলের চক্ষেই প্রতীয়মান হইবে। শরীরের সহিত খাদ্য সম্পর্কের আবিষ্কার, সম্ভাবনা এবং কার্য্যে নিয়োগের সহিত মৌমাছিরা পরিচিত। মৌমাছিদের সামাজিক জীবনের জন্য এই পরিবর্ত্তন-গুলির প্রয়োজন আছে। এই দক্ষতা ও জ্ঞান মৌমাছিদের সামাজিক জীবন আরম্ভ হইবার পর হইতে নিশ্চয় আসিয়াছে—তাহা নিশ্চয় মৌমাছিদের শরীরের গঠন-কৌশল অথবা বাঁচিয়া থাকার সহিত সংযুক্ত নয়। খাদ্যের সহিত অবস্থা পরিবর্ত্তন লইয়া মৌমাছি-দের এই জ্ঞান, আপাতদৃষ্টিতে মানুষের বহু আয়াসলব্ধ খাদ্য-বিজ্ঞানকে পরাজিত করিয়াছে।

কোন জন্তু চলিয়া গেলে কুকুর তাহার অনুসন্ধানকারী নাসিকার সাহায্যে তাহা অনুভব করে। স্বাভাবিক ঘ্রাণশক্তি অপেক্ষা উচ্চ কোন শক্তি বা যন্ত্র মানুষ আজও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। ইহাকে সাহায্য করিবার কোন শক্তি আজও মানুষের নাই। অতি ক্ষুদ্র বস্তুকেও আমাদের ঘ্রাণশক্তি আবিষ্কার করিতে পারে। কেমন করিয়া আমরা বলিতে পারি যে এক গন্ধ হইতে আমরা সকলে একই রকম অনুভব করি? প্রকৃত পক্ষে আমরা তাহা কখনও পারি না। স্বাদও আমাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন। দর্শন, ঘ্রাণ ও স্বাদের এই বিভিন্নতা বংশগত; ইহা কি আশ্চর্য্য নয়?

যে সকল শব্দ আমরা শুনিতে পাই না, সকল জন্তুতেই তাহা শুনিতে পায়। আমাদের স্বাভাবিক শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতা তাহাদের তুলনায় কত তুচ্ছ। মানুষ আজ যন্ত্রপাতির দ্বারা তাহার শ্রবণ-শক্তির উন্নতি করিয়াছে। কয়েক মাইল দূরে মাছি উড়িবার শব্দ সে আজ যন্ত্রপাতির দ্বারা শুনিতে পায়;—যন্ত্রপাতির দ্বারা শূন্যাগত আলোকরশ্মির আঘাতও লিপিবদ্ধ করে।

জলের মধ্যে এক রকম মাকড়শা আছে, তাহারা বেলুনের মত জাল তৈরী করে এবং জলের নীচে কোন প্রস্তরখণ্ড অথবা মৃত উদ্ভিদ-কাণ্ডের সহিত তাহাকে সংযুক্ত করিয়া রাখে। তাহার পর অদ্ভুত ভাবে সে একটি জলবুদ্‌বুদ তাহার শরীরের লোমের ভিতর বন্দী করিয়া জলের নীচ দিয়া বেলুনের ভিতর ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে বেলুনটি স্ফীত হইয়া উঠে। সে তখন তাহার ভিতর ডিম্ব প্রসব করে। তাহার সন্তানেরা বহিরাক্রমণ হইতে এইরূপে মুক্ত থাকে। এই মাকড়শার জালের মধ্যে অসামান্য পূর্ত্তবিদ্যা, অপরিসীম বুদ্ধি ও বায়ুবিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না কি? হয়ত ঘটনাক্রমেই মাকড়শা সন্তানদের রক্ষা করিবার জন্য এই জ্ঞান লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাই কি এই মাকড়শার কার্য্যপ্রণালীর সত্য পরিচয়?

[illegible] বৎসর সমুদ্রে কাটায়, তাহার পর সে

তাহার পরিচিত নদীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এমন কি, নদীর যে শাখায় বা প্রশাখায় তাহার জন্ম হইয়াছিল, নদীর তীর ধরিয়া সেখানে ফিরিয়া আসিতে তাহার একটুও ভুল হয় না। কি করিয়া সে নির্ভুল দিক্‌নির্ণয় করে? নদীর যে শাখার যে অংশে তাহার জন্ম হইয়াছিল, তাহার ব্যাকুল আগ্রহ তাহাকে সেখানে পৌঁছিতে সাহায্য করে; পলাতক সালমন শেষে নিজের নদী অংশে গিয়া শান্ত হয়। ইল মৎস্যের গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন সমস্যা আরও দুরূহ। এই দুরন্ত জীবেরা বড় হইয়া পুষ্করিণী হ্রদ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়, নদী সকল স্থান হইতেই—যাহারা ইয়োরোপের, তাহারা হাজার হাজার মাইল সমুদ্র-তলদেশ অতিক্রম করিয়া—দক্ষিণে বারমুডার গভীর জলের নীচে পলায়ন করে। সেখানে তাহারা অণ্ড প্রসব করে—শেষে সকলেরই মৃত্যু হয়। শিশু ইলের দল সমুদ্রের গভীর জলের নীচে খেলিয়া বেড়ায়। কোথায় তাহারা তাহাদের বলিয়া দিবার কেহ নাই। কি করিয়া তাহারা যেন টের পায়, কোন অজ্ঞাত তীরভূমি হইতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সেখানে আসিয়াছিল। ক্রমে সেই অজ্ঞাত লক্ষ্য অভিমুখে তাহারা চলিতে আরম্ভ করে। কি অজ্ঞাত প্রবৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া তাহারা নদ, নদী, হ্রদ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের তীরে আসিয়া উপস্থিত হয়, শেষে প্রতি জলাশয়ই ইল মৎস্যে ভরিয়া যায়। তাহারা আসে মহাসমুদ্রের পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গরাশি উত্তীর্ণ হইয়া, তাহারা ঝড়, জোয়ার-ভাটা, প্রতি তীরভূমির তরঙ্গাভিঘাত অতিক্রম করিয়া শেষে জয়ী হয়। তাহার পর তাহারা বাড়িতে থাকে। যখন ইলেরা পূর্ণ যৌবন লাভ করে, প্রকৃতির এক অজ্ঞাত রহস্যাবৃত নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাহারা পুনরায় সমুদ্রাভিমুখে দলে দলে ধাবিত হয়—ইল-জীবনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। কোথা হইতে আসে এই নির্দ্দেশ? আমেরিকার কোন ইলকে ইয়োরোপের কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। অথবা ইয়োরোপের কোন ইলকে আমেরিকায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ইয়োরোপে ইলদের শুধু বড় হইতে এক বৎসর বেশী সময় লাগে বোধ হয় ইহাদের যাত্রাপথ দীর্ঘতর বলিয়া। যে অণু-পরমাণু লইয়া ইলএর শরীর গঠিত তাহাদের কি কোন দিক্‌জ্ঞান বা ইচ্ছাশক্তি আছে?

জন্তুদের মধ্যে বেতার-বার্ত্তার প্রচলন আছে। কাদাখোঁচা পাখীকে উড়িতে কে না প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিয়াছে? তাহার উড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কত পাখীই না সূর্য্যালোকে উড়িতে আরম্ভ করে।

উন্মুক্ত বাতায়নের প্রবেশ-পথে স্ত্রী-পতঙ্গকে রাখিয়া দিলে সে কোন উদ্দেশ্যশীল বার্ত্তা বাহিরে প্রেরণ করে। চারি দিক্ হইতে পুরুষ-পতঙ্গেরা সে আহ্বান শুনিতে পায়। নানা দুর্গন্ধ রাসায়নিক দ্রব্য রাখিয়া দিলেও তাহারা সেখানে আসিয়া জোটে। এই ক্ষুদ্র পতঙ্গদের দেহে কোথাও কি বেতারকেন্দ্র আছে? পুরুষ পতঙ্গদের শুণ্ডের মধ্যে কি বেতার-বার্ত্তা গ্রহণ করিবার কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র থাকে? স্ত্রী-পতঙ্গ কি ইথরে তরঙ্গ তোলে, আর পুরুষ-পতঙ্গ সেই তরঙ্গাভিঘাত গ্রহণ করিয়া চঞ্চল হয়? গঙ্গা-ফড়িং তাহার পায়ে পায়ে অথবা পাখায় পাখায় ঘর্ষণ করে, নিঃস্তব্ধ রাত্রিতে তাহার শব্দ আধ মাইল দূর হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। ষোল হাজার ঘণ বাতাসকে আন্দোলিত করিয়া সে তাহার সঙ্গীকে আহ্বান করে। পতঙ্গ-কুমারী বাহ্যতঃ নিঃশব্দে আপনার কার্য্য করে কিন্তু তাহার কার্য্য সুসম্পন্নই হয়। বেতার-বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে

বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করিতেন যে কুমারী-পতঙ্গের দেহের গন্ধেই পুরুষ-পতঙ্গেরা আকৃষ্ট হয়। দেহের গন্ধ পুরুষ-পতঙ্গকে আকর্ষণ করিবার জন্য বহু দূর পর্যটন করে। পুরুষ পতঙ্গকে এই গন্ধ ঘ্রাণ করিয়া, তাহা কোন দিক হইতে আসিতেছে, জানিতে হয়। বহু যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানুষ এইরূপ বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এক দিন হয়ত আসিবে, মানুষ নিকটে উপস্থিত না থাকিয়াও তাহাদের প্রিয়তমাদের দূর হইতে ডাকিবে, প্রেয়সীরাও তাহাদের ডাকে সাড়া দিবে। কোন বাধা, কোন প্রাচীর তাহাদের প্রেমবার্তার আদান-প্রদানকে বাধা দিতে পারিবে না। বর্তমান টেলিফোন ও বেতার-যন্ত্র মানুষের যন্ত্র-বিজ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্কার, তাহাদের সাহায্যে মানুষ সদ্য সদ্য সংবাদের আদান-প্রদান করে, কিন্তু মানুষকে কোন বিশেষ স্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। যত দিন না মানুষ প্রত্যেকে এক একটি বেতার-কেন্দ্রের উদ্ভব মস্তিষ্ক সাহায্যে করিতে পারিবে, তত দিন ক্ষুদ্র পতঙ্গের এই স্বাভাবিক শক্তি তাহার হিংসার বিষয় হইয়া থাকিবে।

উদ্ভিদেরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য আপনাদের অজ্ঞাতে কত সাহায্যই না প্রকৃতি হইতে লয়। কীট-পতঙ্গ পুষ্পরেণু ফুলে ফুলে ছড়াইয়া দেয়, বাতাস ও সঞ্চরণশীল প্রতি প্রাণীই তাহাদের বীজ জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে চতুর্দ্দিকে বিস্তার করে। এই প্রাণীদের তালিকা হইতে শক্তিশালী মানুষও বাদ পড়ে না। মানুষের বৃদ্ধি প্রকৃতির উন্নতি বিধান করিয়াছে, প্রকৃতিও তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিতে ছাড়ে নাই। সংখ্যায় সে এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সে চাষবাস করিতে বাধ্য, তাহাকে ভূমিকর্ষণ, বপন, শস্য সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। নানা বীজ দ্বারা নূতন নূতন উদ্ভিদের উৎপাদন, বিনাশ ও শাখা-প্রশাখা দ্বারা নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি সকল কাজই তাহাকে করিতে হয়। এই কাজগুলি বন্ধ করিলে সে অনাহারে মরিবে—সভ্যতার মৃত্যু হইবে—পৃথিবী জনমানবশূন্য মহাপ্রান্তরে পরিণত হইবে।

পক্ষী-শাবকদের তাহাদের বাসা হইতে লইয়া আসিয়া পিঞ্জরে আবদ্ধ করিলেও, কালে তাহারা নিজ জাতি অনুযায়ী বাসা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিবে। বংশগত অভ্যাস ও প্রবৃত্তির জন্ম অতীতের রহস্যে আবৃত। এই সকল কার্য্যধারা কি একটি ঘটনার ফল? বা কেহ তাহাদের কোন বুদ্ধিশালী শক্তির দ্বারা সংগ্রহ করিয়াছে? এই বংশগত অভ্যাস হইতেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির শক্তি ও উত্তেজনা উপলব্ধি হইবে। পৃথিবীর মধ্যে আজ পর্য্যন্ত যত জীবন্ত প্রাণী বিচরণ করিয়াছে, তাহাদের বিবেচনা-শক্তি মানুষের এই শক্তির নিকট পরাজয় মানিয়াছে। প্রয়োজন অনুযায়ী গঠন ও ধ্বংস—তাহার ফলেই মানুষ আজ জয়ী হইয়া বাঁচিয়া আছে। তাহার এই পরিবর্তন-সামঞ্জস্য বহুদূর অগ্রসর। কেবল মাত্র মানুষই সংখ্যার ব্যবহার করিতে সমর্থ। যদি কোন কীট বা পতঙ্গ কোন দিন মানুষের ভাষায় কথা বলিতে পারে এবং যদি বা সে জানিতে পারে, তাহার কতগুলি পা আছে, কোন দিন সে বলিতে পারিবে না, তাহার এবং সঙ্গীদের সকলের মিলিয়া কতগুলি মোট পা আছে। তাহা বলিতে বিবেচনা-শক্তির প্রয়োজন। মানুষ ব্যতীত তাহা কাহারও নাই।

অনেক জীবই চিংড়ি মাছের মত; তাহাদের একটি দাঁড়া ভাঙ্গিয়া গেলে, জীবকোষ উত্তেজিত করিয়া ও শরীরের কতকগুলি কার্য্যপ্রণালীর শক্তি বৃদ্ধি করিয়া আবিষ্কার করে, তাহাদের দেহের কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তদনুযায়ী তাহারা তাহাদের পুনর্গঠন করে। গঠন শেষ হইয়া গেলে জীবকোষেরা তাহাদের কার্য্য বন্ধ করে। তাহারা কেমন করিয়া বুঝিতে পারে তাহাদের কার্য্য বন্ধ করিবার সময় আসিয়াছে? পরিষ্কার জলের বহুপদ কীট নিজেদের দুই অংশে ভাগ করিয়া যে কোন একটি হইতে নিজেদের পুনরায় গঠন করিতে পারে। কেঁচোর মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলে নূতন একটি মস্তকের উদ্ভব হয়। ক্ষত আরোগ্য করিবার ব্যবস্থা আমরা করিতে পারি, কিন্তু কোন দিন কি আমাদের চিকিৎসকেরা জীবকোষদের উত্তেজিত করিয়া নূতন হস্ত, নূতন মাংস, নূতন অস্থি, নূতন নখ ও উত্তেজক স্নায়ু নির্ম্মাণ করিতে পারিবে? একটি অদ্ভুত বিষয় পুনর্গঠন-রহস্যের উপর আলোকপাত করিবে। জীবকোষদের গঠনকালে যদি তাহাদের বিভক্ত করিয়া দেওয়া যায়, প্রত্যেকে এক-একটি করিয়া নূতন জীবকোষ গঠন করিতে পারে। এই প্রকারের যমজ প্রাণীর সৃষ্টি ইহাদেরই কার্য্য। প্রতি জীবকোষই অল্প বয়সে এক একটি সম্পূর্ণ প্রাণী। আমরা প্রতি জীবকোষে আমাদেরই প্রকৃতি।

আমাদের বর্তমান জ্ঞানের বাহিরে প্রকৃতির দর্শন ও স্পর্শন শক্তির বহু অদ্ভুত বিষয় আছে, তাহাতে বোঝা যায় মানুষের শিক্ষা করিবার বিষয় কত বেশী। যত দিন না মানুষ নূতন নূতন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিবে অথবা যন্ত্র সাহায্যে প্রাণীদের ব্যক্তিগত বিশেষ বিশেষ শক্তির অধিকারী হইবে, তত দিন তাহার সম্মুখে বহু দূর বিস্তৃত পথ পড়িয়া আছে। তাহাকে এক দিন এই দুর্গম বিস্তীর্ণ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। প্রতি জান্তব-শক্তি যাহা আমাদের নাই, তাহা যেন আমাদের বুদ্ধি, শক্তি ও অহঙ্কারকে উপহাস করিতেছে। যত দিন না আমরা তাহার উত্তর দিতে পারিব তত দিন আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। আমাদের অসম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ জ্ঞান দিয়া আমরা কোন বিষয়ের প্রকৃত তথ্য কোন দিন জানিতে পারিব না। যত দিন না মানুষ প্রতি জান্তব-শক্তির অধিকারী হইবে, তত দিন সে উপলব্ধি করিতে পারিবে না প্রকৃতির বিধানের সঙ্গে জান্তব-জীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক। অনন্তের—অসম্পূর্ণ ব্যতীত সম্পূর্ণ কল্পনা বা আলোচনা করিতে সে কোন দিন সমর্থ হইবে না। আমাদের নবায়ত্ত শক্তিগুলির অপব্যবহার আমাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞানেরই পরিচয়। যে অমূল্য আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের মুষ্টিমেয় মহাঋষি অতীতে জানিতে পারিয়াছিলেন, বর্তমানের ভোগলালসা-লুব্ধ মানুষের মধ্যে সবে মাত্র তাহার বিকাশ হইতেছে। পার্থিব মস্তিষ্কে অনন্তের আলোকপাত সবে মাত্র সুরু হইয়াছে। মানুষের আত্মঘাতী ভুলগুলি কেবল মাত্র শিশুকালের দুর্ঘটনা। অতীত অনন্ত দিয়া মানুষের সময়ের পরিমাপ করা যায়, সুদূর ভবিষ্যৎ একটি ঘড়ির কাঁটার একটি শব্দ মাত্র! আমাদের আত্মা অতীত ও ভবিষ্যতের সহিত নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট।

বার্লিন সহরে

শ্রীমতিলাল দাশ

সুইডেন হইতে রাত সাড়ে চারিটার সময় জার্ম্মাণীর উপকূলে পৌছিলাম। জার্ম্মাণীর তৃতীয় শ্রেণীতে কাঠের বেঞ্চ, গদি-দেওয়া গাড়ী চড়িবার পর ইহাতে চলিতে কষ্ট লাগে। রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই, তাই কাঠের বেঞ্চের উপরই খানিক ঘুমাইয়া লইলাম।

বিদেশ বিভূঁই, টাকা পয়সা জিনিষ-পত্র নিয়া চলিতেছি। তাই শঙ্কাশীল চিত্ত, ঘুম সহজে আসিতে চায় না।

ভোরের আলো ফুটিতে ঘুম ভাঙ্গিল। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বার্লিনে আগমনের আশায় উদ্‌গ্রীব রহিলাম। বেলা আটটায় বার্লিনে পৌছিলাম। অচেনা সহর, বন্ধুও কেহ আসে নাই। তাই অশরণের শরণ 'ক্লোকরুমে' স্যুটকেশ রাখিয়া বাসে করিয়া কুকের আফিসে চলিলাম। কুকের অফিস হইতে হিন্দুস্থান হাউসের সন্ধান লইলাম। গুপ্ত নামক এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক এক জন য়ুরোপীয় মহিলাকে বিবাহ করিয়া জার্ম্মাণীতে আছেন—তাহারই স্থাপিত প্রতিষ্ঠান।

এখানে শুনিলাম, ডাঃ ভাগনার আমার বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, টেলিফোনে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। ফোনে কথাবার্ত্তা বলিতে আমি তেমন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি না—বোধ হয় অনভ্যাস।

গুপ্তর ওখানে স্থান না থাকায় গুপ্ত নিকটবর্ত্তী পাঁসিও ওতয়বায় নামক স্থানে স্থান করিয়া দিলেন। বুড়ী গৃহকর্ত্রী—স্থান নির্ব্বাচন করিয়া জিনিষ আনিতে চলিলাম। জিনিষ আনিয়া পাঁসিওতে বসিয়া কয়েকখানি চিঠি লিখিলাম। তার পর বিকালের চা-পানের জন্য হিন্দুস্থান হাউসে গেলাম। কয়েক জন বাঙ্গালীর সঙ্গে আলাপ হইল।

তার পর এখানকার ভারতীয় ছাত্রদের সংঘে গেলাম। কর্ম্মকর্ত্তা মুখার্জ্জি বলিলেন—যে আমার পোষাক কেতাদুরস্ত নয়। বিদ্রূপ নয়, বন্ধুর সদুপদেশ। সদুপদেশ মানিয়া চলিব না এমন ধৃষ্টতা নাই, তবে 'স্মার্ট' সাজিতে মানুষ যে দুশ্চিন্তা সময় ও অর্থব্যয় করে তাহা কখনই আমার ধাতুসহ নহে। ফিটফাট সাজিতে অভ্যাস প্রয়োজন—সে সতর্ক অভ্যাস যাহাদের তাহাদের নমস্কার করি, কিন্তু এ বিষয়ে আমার একান্ত ঢিলেঢালা বাঙালী-স্বভাব। বন্ধুদের অনুরোধে স্থির হইল যে, আগামী বুধবারে এই ছাত্র-সংঘে 'গীতার বাণী' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিব। হিন্দুস্থান হাউসে ফিরিয়া মাছ, ডাল, দই ও ভাত দিয়া নৈশভোজন সমাপ্ত করিলাম, রান্না ভাল নয়। বিদেশের বড় বড় সহরে ভারতীয় খাদ্যের আয়োজন করিয়া হোটেল চালাইলে বোধ হয় বিশেষ অর্থাগমের সম্ভাবনা। এ বিষয়ে দেশের দুঃসাহসীদের লক্ষ্য করা উচিত।

২৯শে নবেম্বর রবিবার। জার্ম্মাণ পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসা সর্ব্বজনবিদিত—১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মাত্র বার্লিনে একটি কলা-ভবন ছিল, বর্ত্তমানে ১৮টি আছে। আমি প্রথমে বার্লিনের ন্যাশানাল গ্যালারিতে। উন্টার ডেন লিণ্ডেন বার্লিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রথ্যা—এই রাজপথ ১৯৭ ফুট বিস্তৃত—ইহার এক দিকে টিয়ারগার্টেন। লণ্ডনের যেমন হাইড পার্ক, প্যারির যেমন বয় ডি বুলোঁ—বার্লিনের তেমনই এই শোভন পুরোদ্যান। অন্য দিকে শ্লোষ। ন্যাশানাল গ্যালারির দু'টি অংশ। যে দ্বীপে বার্লিনের অধিকাংশ যাদুঘরগুলি অবস্থিত তাহাকে মিউজিয়াম আইল্যাণ্ড বলে—প্রাচীনটি সেখানে অবস্থিত—নূতন চিত্রশিল্প সংগ্রহ উন্টার ডেন লিণ্ডেনে অবস্থিত—এটা পূর্ব্বে জার্ম্মাণ যুবরাজের প্রাসাদ ছিল। প্রাসাদের অপর পারে জার্ম্মাণ যুদ্ধোপকরণ-ভবন। চিত্রশালায় উনবিংশ শতকের শিল্পীদের বিখ্যাত চিত্রাবলীর সংগ্রহ বর্ত্তমান।

চিত্রশালা দেখিয়া যুদ্ধোপকরণ-ভবনে গেলাম—ইহার জার্ম্মাণ নাম জিউগহাস—এখানে মানুষকে মারিবার জন্য মানুষের যে উদ্যম ও উদ্ভাবন তাহার বিরাট পরিচয় মেলে।

তার পর শ্লোষ মিউজিয়াম ও 'ডোম' দেখিলাম। এই দুইটি বাড়ী জার্ম্মাণ স্থাপত্য-শিল্পের অপূর্ব্ব উদাহরণ। ডোমের সম্মুখে মনুমেন্টের পাশে দাঁড়াইয়া দেড় মার্ক দিয়া চারখানি ছবি তুলিলাম। তার পর একটি রেস্তরায় আহার করিলাম। এক জন অপরিচিত জার্ম্মাণ কেরাণী এক টেবিলে বসিলেন। তিনি পরিচারককে আমার বাঞ্ছিত দ্রব্যের কথা বুঝাইয়া দিলেন।

আহারের পরে ইহার পরিচয় মত টেম্পলহফে ডাঃ ভাগনারের সন্ধানে চলিলাম। তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপক। তিনি বাংলা সম্বন্ধে যে-সব বই লিখিয়াছেন তাহা আমাকে দেখাইলেন। অধ্যাপক ভাগনার কতকগুলি বাংলা গল্প জার্ম্মাণীতে অনুবাদ করিতেছিলেন। আমাকে কয়েকটি স্থানের ইংরেজী অনুবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। এই সন্ধ্যায় তিনি বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক জন বিদেশীর অভিজ্ঞতালব্ধ এই সব মতামত চিত্তাকর্ষক হইত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ডায়েরীতে তাহার কোনই সারাংশ লিখিত নাই।

৩০শে নবেম্বর, সোমবার। সকালে উঠিয়া প্রথমে কুকের আফিসে গেলাম। তার পর প্রাসিয়ান লাইব্রেরী দেখিতে গেলাম। বৃটিশ মিউজিয়াম পাঠাগারের তুলনায় ইহা কিছু নয়। তার পর ইহাদের পার্লামেণ্ট রাইখষ্টাগ দেখিতে চলিলাম। বাড়ীটির একাংশ আগুনে পুড়িয়া গিয়াছিল—সেটি নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা হইতেছে। ইহার নিকটেই বিসমার্কের স্মৃতিস্তম্ভ। বিসমার্ক নব্য জার্ম্মাণীর স্রষ্টা—জার্ম্মাণ জাতি তাহার ঋণ ভুলিতে পারে না। সেখান হইতে টিয়ারগার্টেনের ভিতর Column of victory দেখিলাম—বিজয়-তোরণ দেখিয়া পুলিস-ফোর্টের সন্ধানে চলিলাম। বৃষ্টি পড়িতেছিল, ভিজিতে ভিজিতে পুলিস-ফোর্টে চলিলাম। সেখানকার ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া বাসায় ফিরিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়

জপ্পের ওখানে আহার করিয়া বাসায় আসিয়া পোষাক বদলাইয়া প্লানেটেরিয়াম দেখিতে গেলাম। এটি চমৎকার জিনিষ—সমস্ত আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের সত্যকার রূপ দেখায়, তাহাতে জ্যোতিষের জ্ঞান বেশ পরিস্ফুট ও বোধগম্য হয়। কেবল বিজ্ঞানের আবেদন লোকপ্রিয় হইবে না ভাবিয়া ইহার সঙ্গে ছায়াচিত্রের অভিনয়ের ব্যবস্থা আছে। বাঘে ও মানুষে মিতালির একটি ছবি দেখাইল—প্রেমের দ্বন্দ্বের পাশে বেশ লাগিল।

সেখান হইতে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিলাম। জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় জাতি-গঠনের মন্দির। ছাত্রেরাই ভবিষ্যৎ গড়ে, তাই সত্যের উপাসনায় মিলিত সাধকদিগের মিলন-ক্ষেত্র সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার প্রশ্রয় দেয়। শিক্ষা এখানে মুখস্থ-বিদ্যা নয়। জাতির চেতনার সহিত তাহার সকল রকমে নাড়ীর সংযোগ থাকে। শিক্ষার পূর্ব্বে গবেষণার স্থান দেওয়া হইয়াছে।

আমি চণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। খুব অধিক লোক-সমাগম হয় নাই। জন পঞ্চাশ লোক—অধ্যাপক ভাগনার পরিচয় করিয়া দিলে আমি প্রবন্ধটি পড়িলাম। প্রবন্ধ পাঠের পর কয়েক জন কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। তার পর ডাঃ ভাগনার ও শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী বক্তৃতা করিলেন। পরকীয়া তত্ত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উপস্থিত জার্ম্মাণ শ্রোতাদের বোধগম্য হইতেছিল না। ফিরিবার পথে Haus vater land নামক প্রতিষ্ঠানে ইহাদের নৈশ জীবনের আনন্দ-ভাণ্ডার ছবি দেখিলাম। ভোগের আয়োজন, কিন্তু ইহাকে নিন্দা করিব সে দুঃসাহস নাই।

১লা ডিসেম্বর, মঙ্গলবার। সকালে উঠিয়া আমার বাসার নিকট-বর্ত্তী Bahuhof ২০ হইতে পটসডাম অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বার্লিন সহরে রেলওয়ে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা আছে—সহরের সীমানার মধ্যেই ১৪৮টি ষ্টেশন আছে। বৈদ্যুতিক গাড়ী সহর ও সহরতলীকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে; তাহা ছাড়া অন্তর্ভৌম গাড়ী আছে। মেট্রোপলিটান ও সুবারবন রেলপথের গাড়ীতে চড়িলাম। খানিক দূর আসিয়া Charlottenburg ষ্টেশন পড়িল। পথে গুরুনেওয়াল্ডের বনভূমি পড়িল।

পটসডাম ফ্রেডারিক দি গ্রেটের নির্ম্মিত সহর। এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছিলাম। পটসডাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। ইতিহাস ও শিল্পকলা ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থাপত্য নগরটির একটি বিশেষ রূপ দিয়েছে। পটসডাম রেল-ষ্টেশন হইতে নামিয়া ট্রামে চড়িয়া সাঁসুচি প্রাসাদে। সাঁসুচি উদ্যানের মধ্যে এই প্রাসাদটিকে খুব সুন্দর দেখায়। ১৭৪৫ হইতে ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রেডারিক এই প্রাসাদ Rococo রীতিতে নির্ম্মাণ করেন। সাঁসুচি পার্ক বিস্তৃত পরিসর, তাহার মধ্যে একটি ফোয়ারা আছে—ফোয়ারার জল খুব উঁচুতে ওঠে। সাঁসুচি প্রাসাদে চমৎকার চিত্রশালা আছে। টিকিট কাটিয়া অন্য কয়েক জনের সঙ্গে মর্ম্মর প্রস্তরের দালান, সঙ্গীতশালা, পাঠাগার, ফ্রেডারিকের মৃত্যু-কক্ষ দেখিলাম। বাহির হইয়া ভগ্ন উইণ্ড-মিলের পাশ দিয়া Orangerieschloss দেখিতে চলিলাম। একটি জার্ম্মাণ তরুণী ও তাহার মা চলিতেছিল। মেয়েটি অল্প ইংরাজি জানে, তাহার সাহায্যে অপরিচিত পথে চলা অনেকটা সুবিধা হইল। ইহার মধ্যে র‍্যাফেল-কক্ষ আছে। কিন্তু এই চিত্রভবন দেখিবার সুবিধা হইল না—কারণ বনভূমির মধ্য দিয়া একা যাত্রা করার সুবিধা হইবে না ভাবিয়া তরুণী ও তাহার মাতার সহযাত্রী হইলাম। দ্বিতীয় উইলিয়াম এই প্রাসাদ স্থাপন করেন। ইহাতে না-না বিদেশীয় তরুলতার সংগ্রহ আছে। বাহির হইতে তাহার উপর চোখ বুলাইয়া লইলাম। খানিক দূর চলিবার পর বুড়ী অন্য পথ ধরিল। বোধ হইল সে তাহার তরুণী কন্যাকে এক জন কালো লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে দিতে চায় না—তখন একাকীই নূতন প্রাসাদের চূড়া দেখিয়া চলিলাম। নূতন প্রাসাদ ১৭৬৮ হইতে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হয়—ইহাতে ২০০ কক্ষ আছে। মর্ম্মর কক্ষ এবং Grotto Hall ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। সেখান হইতে রাজার নগর-ভবন Stadschloss দেখিলাম। ফ্রেডারিক এখানে বাস করিতেন।

চতুর্থ উইলিয়ামের বাস-ভবন Charlottenhof দেখিয়া গেলাম। ফিরিবার পথে সেণ্ট নিকোলাসের গির্জ্জা দেখিতে নামিলাম। বিখ্যাত স্থপতি সিঙ্কেলের নির্ম্মিত প্রাচীন রীতিতে গঠিত এই গির্জ্জার দরজা বন্ধ থাকায় দেখা গেল না। তার পর ফিরিবার পথে একটি দোকান হইতে কিছু ফল কিনিয়া লইলাম। রাস্তার পাশে ভূগর্ভে দোকান—তার পর কাস্তিয়া উইলহেলম সেতু পার হইয়া ষ্টেসনে আসিলাম। বিকালেই বাসায় ফিরিলাম।

সন্ধ্যায় খানিক রাজকীয় নাট্যমন্দিরে অপেরা দেখিতে চলিলাম। সাড়ে ৬টায় আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু টিকিট করিবার সময় বুঝিতে না পারিয়া এক ঘণ্টা পরে গেলাম। রাত বারটা পর্য্যন্ত অভিনয় দেখিলাম। ভাষা না জানায় গল্প-ভাগ কিছুই বুঝিলাম না, তবে দৃশ্যপট, সাজসজ্জা খুব চমৎকার লাগিল। রাত্রে বাসে করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

২রা ডিসেম্বর, বুধবার। বার্লিনের কলাভবনগুলি লোক-প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আজ সেগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। প্রথমে পারগেমাস মিউজিয়াম দেখিলাম। এই কলাভবনে জার্ম্মাণ অধ্যবসায় ও কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। কার্ল হিউম্যান নামক এক জন ইঞ্জিনিয়ার ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এশিয়া-মাইনরে কাজ করিবার সময় এই সমস্ত মর্ম্মর-খচিত মূর্ত্তি নষ্ট হইতে দেখিয়া কিনিয়া দেশে পাঠান। তাহার পর খনন করিয়া গ্রীক স্থাপত্যের এই সমস্ত

উদ্যান

অপূর্ব্ব নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীক ভাস্করের সৌন্দর্য্য বোধ ছিল অপরিসীম, মৃত প্রস্তরে প্রাণ সঞ্চার করিবার গোপন বিদ্যা তাহাদের ছিল। Altar-Hall নামক কক্ষে এই সব সমতল পাথরে ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলির মাধুর্য্য সত্যই দর্শক চিত্তকে মোহিত করে। দেবাসুরের দ্বন্দ্ব মুখর ছন্দে যে সব শিল্পীরা আঁকিয়াছিল তাহারা আমাদের নমস্ত। মূর্ত্তিগুলি যেন জীবন্ত মনে হয়। জার্ম্মাণ-পণ্ডিতেরা গ্রীক উপাসনায় প্রাচীন রীতি-নীতি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া এগুলি সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন। গ্রীক সভ্যতা য়ুরোপকে সুন্দরের মন্ত্র পড়ায়, এই কলাভবন দেখিলে সেই মন্ত্রের অপূর্ব্ব প্রভাব ক্ষণিকের জন্য দর্শকের চিত্তেও সঞ্চারিত হয়।

এখান হইতে Kaiser Friedrich Museum দেখিতে চলিলাম। ইহার চিত্র-সংগ্রহ খুব বিরাট, তাহাতে সর্ব্ব-যুগের ইতালীয় ও ডাচ শিল্পীদের জগদ্বিখ্যাত ছবিগুলি আছে। তাহা ছাড়া খৃষ্টান সভ্যতার প্রথম যুগের, ইসলামিক ও বাইজানটানি চিত্রের সমাবেশ আছে।

এখান হইতে সেতুর উপর দিয়া জার্ম্মাণ মিউজিয়ামে গেলাম। কলাভবনগুলি দেখিয়া একটি নিরামিষ ভোজনালয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজন করিলাম। খাওয়াটি চমৎকার লাগিল। আলু ও কপি সিদ্ধ, ঘি মাখিয়া রুটির সঙ্গে চর্ব্বণ করা গেল। নিরামিষ তরকারির সুপ এবং চিঁড়ে-দই খাওয়া গেল। এখান হইতে একটি ছায়া-ছবি দেখিতে গেলাম। নূতনত্ব কিছুই নাই।

সন্ধ্যার সময় গাঙ্গুলি-পরিবারে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। গাঙ্গুলি-গৃহিণী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পরিবারের আওতা কাটাইয়া এখানে বেশ দৃপ্ত ভাবে চলিতে শিখিয়াছেন। গাঙ্গুলি-গৃহিণী তাঁহার সাত-আট বৎসরের একটি ছোট মেয়েকে বিলাতী কায়দায় ভিন্ন ঘরে শোয়াইতে অভ্যস্ত করাইয়াছেন। এ জিনিষটি আমার ভালই লাগিল। আমাদের দেশে ছেলেমেয়েরা মায়ের আঁচল ধরিয়া মানুষ হয় বলিয়া কঠোর জীবন-সংগ্রামে পরনির্ভরতা কখনও ছাড়িতে পারে না। কিন্তু য়ুরোপে নবাগত শিশু প্রথম দিন হইতেই স্বকীয় স্বতন্ত্র সত্তার অনুভূতি পাইতে শেখে, তাই ব্যক্তিমানব হইয়া দাঁড়াইতে বাধে না—সে সর্ব্বদা আত্ম-নির্ভর—কিন্তু আমাদের নিরালম্ব নিরাশ্রয় হইয়া এক পা চলাও সহজ নহে।

পর্য্যাপ্ত ও পরিতৃপ্ত ভোজন-শেষে এখানকার ছাত্রদের মিলন-সংঘে প্রবন্ধ পড়িতে চলিলাম। গাঙ্গুলি-দম্পতী সঙ্গে চলিলেন। বড় রাস্তার উপর হিন্দুস্থান ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন—ভারতের নানা দেশের ছাত্রেরা এখানে জটলা করে। ছাত্রী নাই বলিলেই হয়। অল্প কয়েক জন জার্ম্মাণ দর্শক ছিল। The Message of the Gita নামক একটি প্রবন্ধ ইংরেজী ভাষায় পড়িলাম—শ্রোতারা নীরবে শুনিলেন। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে প্রশ্নবাণের বর্ষণে জর্জ্জরিত হইলাম। এক জন প্রশ্ন করিলেন—গীতার ধর্ম্ম ও চৈতন্যের ধর্ম্মের সামঞ্জস্য কোথায়? বলিলাম—গীতায় যে ভক্তি-ধর্ম্ম ছিল পুষ্পিত,

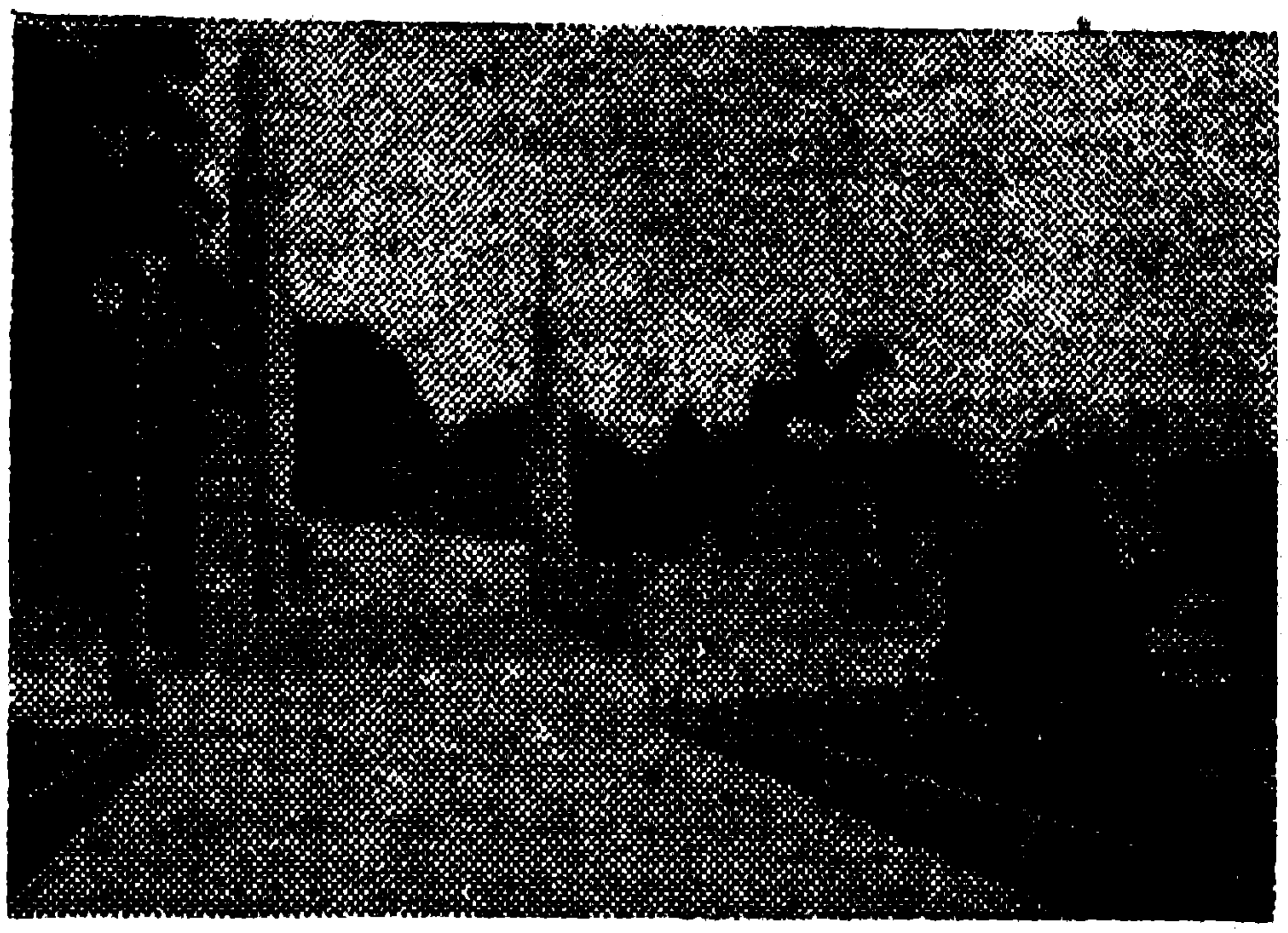

পথ

চৈতন্যে প্রেমধর্ম্মের বন্যায় তাহা ফলবান হইয়া উঠিয়াছে। চৈতন্যের অশ্রু-সজল আর্ত্তি য়ুরোপীয় শ্রোতারা বোধগম্য করিতে পারে না। গীতায় কর্ম্মের আহ্বানকে তাহারা বেশ সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে। অপরে প্রশ্ন করিলেন—গীতার প্রভাব ভারতবর্ষের চিন্তাধারায় বর্ত্তমানে কি কাজ করিবে? বলিলাম—এ প্রশ্ন অত্যন্ত ব্যাপক—ভারতবর্ষের যে নব জাগরণের উদ্দীপনা, গীতা হইতে তাহা শক্তি ও উৎসাহ লাভ করিবে। অপরে প্রশ্ন করিলেন—গীতায় সত্য আদর্শ কি? বলিলাম—গীতা যুদ্ধের আহ্বান করে না—নিষ্কাম ভাবে নিস্পৃহ চিত্তে কর্ম্ম করিবার বাণী গীতার গুরুতরতম কথা।

রাত্রি এগারটায় বাসায় ফিরিলাম। কয়েক জন সদ্য-পরিচিত বন্ধু বাসার পথ দেখাইয়া দিয়া চলিলেন। পরদিন প্রাহায় যাইতে হইবে তাই তাহাদের সহিত বহুক্ষণ গল্প-গুজব করা সম্ভব হইল না।

বার্লিন আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। জার্ম্মাণ-চরিত্রে একটি দৃঢ়তা আছে—যে দৃঢ়তার পরিচয় পাই তাহা অধ্যাপকমণ্ডলীর অমানুষ অধ্যবসায়ের মাঝে—তাহার সৈন্যদের অবিচল নিষ্ঠায়। কিন্তু দার্ঢ্যই তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়, তাহাদের অন্তরের সহজ কমনীয়তা মুগ্ধ করে। যত্র-তত্র এই সুমধুর শালীনতার পরিচয় পাইয়াছি।

"মনোবৃত্তি সকল যে অবস্থায় পরিণত হইলে পুণ্যকর্ম্ম, তাহার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ স্বতঃ নিষ্পাদিত হইতে থাকে, পরলোক থাকিলে তাহাই পরলোকে শুভদায়ক বলিলে কথা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। পরলোক থাকুক বা না থাকুক, ইহলোকে তাহাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু কেবল তাহাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যেমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির চেষ্টা কর্ম্ম এবং যেমন সে-সকলগুলি সম্যক্ মার্জ্জিত ও উন্নত হইলে, স্বভাবতঃ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকার কার্য্য নহে—জ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়া। কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির সেইরূপ অনুশীলন জীবের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য।" —বঙ্কিমচন্দ্র

বিপজ্জনক এ্যাডভেঞ্চার

বীরেন দাশ

জুহু সমুদ্রসৈকতে নির্জ্জন বাংলোর দোতলার একটা ঘরে মিটমিট করে একটি মোমবাতি জ্বলছিল। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে, মোমবাতিটি একটি সত্যমৃত লাশের শিয়রের কাছে একখানি বুক-সেলফে রাখা হয়েছে। লাশটির গলা অবধি সাদা থান কাপড়ে ঢাকা। অনাবৃত মুখখানি দেখে মনে হয়, লোকটি বহু দিন কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিল। লাশের পায়ের দিকে একখানি শূন্য আরাম-কেদারা ছাড়া ঘরটিতে আর কোন আসবাব-পত্র নেই। সমুদ্রের দিকের জানালা দু'টি আধ-ভেজানো।

দূরে জুহু চার্চ্চের ঘড়িতে ঢং-ঢং করে রাত বারোটা বাজল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খট করে ঘরের সুমুখের দুয়ার খুলে গেল। আবছায়া অন্ধকারে জনৈক যুবক ঘরে প্রবেশ করতেই পেছন থেকে খটাং করে দরজা বন্ধ হল। ধীর, শান্ত পদক্ষেপে যুবক লাশের সামনে এসে দাঁড়াল। সত্যমড়ার গায়ের দুর্গন্ধ লাগল ওর নাকে। যুবক একটুখানি কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে জানালায় সরে এল। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিয়ে ঢেউগুলো থেকে থেকে বেলাভূমিতে সশব্দে আছড়ে পড়ছিল। রাত্রির সমুদ্রের অপরূপ বেশ। এ রূপ মনের গহন দেশ নাড়া দেয়।

অচিন্ত্য অবশ্য কবি নয়। কবিতা সে কোন কালেই লেখেনি। ঘরের চার পাশে একবার সে চোখ বুলিয়ে নিল। আজকার রাত তাকে মড়ার সাথে কাটাতে হবে। চেষ্টা করলেও এ-ঘর থেকে বেরোবার উপায় নেই অচিন্ত্যের। কারণ দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

জীবনে অচিন্ত্য অনেক মড়া পুড়িয়েছে। সাহসী বলে চিরকালই সে বন্ধু-বান্ধবের বাহবা পেয়ে এসেছে।

আস্তে আস্তে সে আরাম-কেদারায় এসে বসল। আড়চোখে সে লাশটির দিকে তাকাল বারেক। লাশটি সত্যমৃত সন্দেহ নাই। সমুখে সেলফের উপর মোমবাতির পরমায়ু দ্রুত ক্ষয়ে আসছে। অচিন্ত্য কি ভেবে মোমবাতিটি নিবিয়ে দিয়ে নিজের পকেটে রাখলে। কি জানি হয়ত পরে দরকার হতে পারে। অন্ধকারে আরাম-কেদারায় চুপ-চাপ বসে রইল অচিন্ত্য।

বাজী ধরে কত বার সে সত্যমড়া পোড়ানো শ্মশানে বসে অমাবস্যার রাত কাটিয়েছে। আর এ ত ঘরের ভেতর। না, অচিন্ত্য ভয় পাবার ছেলে নয়। যারা অচিন্ত্যকে জানে তারাই স্বীকার করে। ভয় কাকে বলে অচিন্ত্য জানে না। সবল, সুস্থ, সংস্কার-মুক্ত মন কিসের ভয় করবে—কেন ভয় করবে? অন্ধকারে বসে বসে অনেক কথাই ভাবছিল অচিন্ত্য। বোম্বেতে সে নতুন এসেছে। এসে উঠেছে এক অপরিচিত হোটেলে। সেখান থেকে সময় তাকে টেনে বার করলে। কথায় বলে, ঢেঁকির স্বর্গে গেলেও সুখ নেই। বোম্বে এসেও অচিন্ত্য বাজী রাখতে বাধ্য হল!

আধ-খোলা জানালা দিয়ে সমুদ্রের হাওয়া ঘরের ভেতর আসছে। অচিন্ত্য হয়ত ঘুমিয়েই পড়ত। সহসা মড়ার খাটের নীচ থেকে মৃদু শব্দ ভেসে আসতেই অচিন্ত্য মাথা তুলে উঠে বসল। এ-ও কি সম্ভব? কিন্তু ঘরের কোণে পায়ের শব্দ যে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। আশ্চর্য্য! শেষকালে কি অচিন্ত্যও ভয় পেয়ে কল্পনা করতে শুরু করল! অথচ সজ্ঞানে যা সে শুনতে পাচ্ছে, কল্পনা বলে তা কেমন করেই বা উড়িয়ে দেয়া যায়। অচিন্ত্যর মাথাটা কেমন ঝিম্‌ঝিম করতে লাগল। মনে হচ্ছে, বুকে কে যেন পাথর চাপা দিয়েছে। নিশ্বাস নিতে এত কষ্ট হচ্ছে তার।

আসলে অচিন্ত্য নিশ্বাস বন্ধ করে শব্দটা শুনছিল। বারেক জোরে নিশ্বাস ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল। এ রকম দুর্ব্বলতা, তার জীবনে এই প্রথম। নিজের উপর বিরক্তিতে মন ভরে গেল। অন্ধকার ঘরে অচিন্ত্য পায়চারি করতে লাগল। হয়ত ইঁদুরই এতক্ষণ শব্দ তুলছিল। অচিন্ত্য মনে মনে স্থির করল, পায়চারি করেই রাত কাটিয়ে দেবে।

সহসা বুক-সেলফে ধাক্কা লাগতেই অচিন্ত্য থমকে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি মোমবাতি জ্বালিয়ে সে মড়ার দিকে তাকাল। যত দূর মনে পড়ে, সেলফটা মড়ার মাথার দিকে ছিল। কি ভোলা মন! অচিন্ত্য বিড়-বিড় করে বলল, নিজেই কখন সেলফটা এ-পাশে সরিয়ে রেখেছে, খেয়াল নেই।

আসবাব-পত্রহীন ঘরখানির চার দিকে একবার তাকিয়ে অচিন্ত্য দরজার কাছে এগিয়ে গেল। দরজাটা ঠিক তেমনি বাইরে থেকে বন্ধ। অনেক টানাটানি করেও সে বন্ধ-দুয়ার খুলতে পারলে না। কি ভেবে অচিন্ত্য ভেতর থেকে ছিটকিনি খুলে দিল।

আরাম-কেদারায় ফিরে এসে সে মোমবাতি নিবিয়ে দিল। যে মরে গেছে তাকে কিসের ভয়! অচিন্ত্য হাই তুলতে তুলতে ভাবলে। মস্তিষ্কহীন নির্ব্বোধরাই মড়ার ভয়ে মরে। মড়াকে ভয় করবার মূঢ়তা অচিন্ত্যর কখনো ছিল না, আজো নেই।

—হুম্-হুম্! শব্দটা বোধ করি ঘরের ছাদ থেকে আসছে। অচিন্ত্য কান সজাগ করে শুনলে। শব্দটা কিসের? না, ও কিছু না। মড়াকে ভয়! বাজী রেখে আজ সে মড়ার সাথে রাত কাটাচ্ছে। ভূত-প্রেত বলে কিছু আছে, অচিন্ত্য কখনো স্বীকার করেনি। মানুষ মরে গেলেই তার সব কিছু শেষ হয়ে যায়, এ ত জানা কথাই।

নিজেকে সে নানা সময় নানা ভাবে যাচাই করে দেখেছে। মনের ভেতর কোন খাদ, কোন কুসংস্কার তার নেই। কিন্তু আশ্চর্য্য! যতই সে ভাবছে, একটা অজ্ঞাত ভয়ে ততই সে মুষড়ে পড়ছে। কিসের ভয়? কাকে ভয়। বিশেষ আজকের বাজীর উপর যখন তার মান-সম্ভ্রম নির্ভর করছে। সহসা মৃদু অথচ স্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনে অচিন্ত্যর চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। নিশ্বাস বন্ধ করে সে

শুনতে লাগল। অদ্ভুত! অনেক দূর থেকে পায়ের শব্দ ক্রমেই তার দিকে এগিয়ে আসছে।

মনের ভুল? স্বপ্ন? ভয়? না—এ সত্যিকার পায়ের শব্দ।

*　　*　　*

সান্তাক্রুজের একটা ছোট মেসে প্রাত্যহিক সান্ধ্য-বৈঠক বসেছে।

ঘরটিতে তিন জন যুবক বসে তাস খেলছিল। সমর, অমর ও দেশপাণ্ডে—তিন জনই ডাক্তারী পড়ে। তাস আজ তেমন জমছে না।

ওদের পাশের ফ্ল্যাটে আজ একটা লোক আত্মহত্যা করেছে। ঐ নিয়েই জল্পনা-কল্পনা চলছিল।

দেশপাণ্ডে বললে: তাহ'লে অমর, লোকটার প্রেতাত্মা নিশ্চয়ই পাশের ফ্ল্যাটে ঘুরে বেড়াবে, কি বল?

অমর বললে: ভূত-প্রেত সত্যি সত্যিই আছে কি না জানি নে, কিন্তু ভূতের চেয়েও অদ্ভুত, সংস্কার চিরকালই মানুষের মনে আছে, ও থাকবে।

সমর বললে: কিন্তু এমন লোক আমি দেখেছি, সত্যিই যার ভৌতিক সংস্কার নেই।

দেশপাণ্ডে বললে: অসম্ভব। আমি কত কত সাহসী লোক দেখেছি, শবের কাছে রাত্রে একা থাকতে সাহস পায় না।

সমর হেসে বললে: কিন্তু আগে যার কথা বলেছি, সে পারে। বাজী রেখে সে অমাবস্যার রাত শ্মশানে বসে কাটিয়ে দিয়েছে।

দেশপাণ্ডে তাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। পায়চারি করে বললে; এ নিয়ে আমি তোমার সাথে এক হাজার টাকা বাজী রাখতে প্রস্তুত। সর্ত্ত এই যে, ওকে মড়ার ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হবে সারা রাত। ঘরটিতে আলো জ্বালাবার কোন ব্যবস্থা থাকবে না। আর,—তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে শুতে পারবেন না।

সমর বললে: এক হাজার টাকা! কিন্তু আমি আগেই বলে দিচ্ছি, বাজী তুমি হারবে।

দেশপাণ্ডে বললে: হাজার টাকা দেশপাণ্ডের কাছে কিছু না, আশা করি, সে-কথা তুমি ভোলনি। কিন্তু তোমার বন্ধুর শারীরিক ও মানসিক কোন বিকার ঘটলে আমি দায়ী হব না, মনে থাকে যেন।

সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত। সমর বললে; কিন্তু মড়া পাবে কোথায়?

অমর চুপ করে এতক্ষণ শুনছিল। বললে: মড়ার ভাবনা কি? আমিই মড়া সাজব'খন। তোমার বন্ধুটা দেখতে কেমন হে?

সমর বললে: বলিষ্ঠ দোহারা চেহারা। যেন এখানকার লোক না, ক'দিনের জন্য বোম্বে বেড়াতে—

অমরের মুখের দিকে তাকিয়ে সমর সহসা থেমে গেল। বললে: তোমার চেহারার সাথে অচিন্ত্যর চেহারার অনেকটা সাদৃশ্য আছে দেখছি।

এর পরের দৃশ্য আমরা দেখেছি।

*　　*　　*　　*

শেষ রাতে দেশপাণ্ডে বেড-সুইচ টিপতেই সমর বিছানায় উঠে বসে বললে: তুমিও জেগে আছ।

দেশপাণ্ডে বললে: বাজীর কথা ভেবে ঘুম পাচ্ছে না বুঝি?

সমর হেসে বললে: ভয় নেই তোমার। বাজী জিতলেও অচিন্ত্য টাকা নেবে না।

দেশপাণ্ডে এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বললে: তুমি জান, টাকাই বড় কথা নয়। একটা কথা ভেবে আমি অশান্তি বোধ করছি সমর। তোমার বন্ধু যদি এমন তাচ্ছিল্য ভরে আমার সাথে কথা না কইত, এ-বাজী আমি রাখতাম না। এখন আমার মনে হচ্ছে, জীবন-মরণ সমস্যায় এমন একটা বাজী রাখা আমাদের অন্যায় হয়েছে।

সমর বললে: হ্যাঁ তা-ও ঠিক। কিন্তু কি আর হতে পারে? অচিন্ত্য যদি সত্যিই ঘাবড়ে যায়, অমর সোজা শয্যা থেকে উঠে এসে ওকে সব বুঝিয়ে বললেই—

বাধা দিয়ে দেশপাণ্ডে বললে: অমর শয্যা থেকে উঠে এলে স্বভাবতই অচিন্ত্য তাকে প্রেতাত্মা মনে করবে। তখন,—

সহসা টেবিলে টাইমপিসের দিকে তাকিয়ে দেশপাণ্ডে এক লাফে বিছানা ছেড়ে নীচে নামল। বললে: চারটে বাজল। আর দেরী করা যায় না। এস, বেরিয়ে এস।

পরক্ষণেই কার নিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল জুহুর দিকে। খানিক দূরে গাড়ী রেখে তারা বাংলোটার দিকে দ্রুত হাঁটতে লাগল। যেতে যেতে দেশপাণ্ডে বললে, মড়াকে জীবিত দেখে অচিন্ত্য যদি হার্টফেল করেই মারা যায়। কে জানে কি অনর্থই না ঘটল।

সমর বললে: আমি ঠিক উল্টোটাই ভাবছি। অমরকে সত্যি সত্যিই না সে মেরে ফেলে।

বাংলোটার সামনে আসতেই তারা দেখলে, আশে-পাশের সব ক'টি বাংলোর আলো জ্বলছে। গেটের ভেতর জনতার ভয়ার্ত্ত কোলাহল শোনা গেল।

একজন ভদ্রলোক বাইরের দিকে ছুটছিল। তাদের দেখে থমকে দাঁড়াল। বললে: হ্যাঁ মশাই, এখানে ডাক্তার কোথায় পাওয়া যায়, জানেন?

ব্যাপার কি? দেশপাণ্ডে শুধাল।

ভেতরে যেয়েই দেখুন না। বলতে বলতে লোকটা বেরিয়ে গেল।

দেশপাণ্ডে সমরকে চুপি-চুপি বললে:, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে!

সমর উত্তর দিল না। দু'জনে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। উপরে উঠে দেখলে, দরজা খোলা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক দল লোক কোলাহল করছে। বারান্দার মতই ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। ভেতর থেকে পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। কে যেন পাগলের মত ঘরের ভেতর দাপাদাপি করছে।

দেশপাণ্ডে সমরকে বললে: এখানে দাঁড়ানো নিরাপদ না। চল, পালাই।

সমর বললে: আমরা ডাক্তার। এখনো হয়ত কিছু করা যায়।

কিন্তু,—দেশপাণ্ডে বললে।

বাংলোর মেন-সুইচটা কোথায় সমর জানত। বাঁ-দিকে বারান্দায় একটুখানি যেয়ে সে সুইচ খুলে দিল। বারান্দায় আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু ঘরের ভেতরকার আলো জ্বলল না। সমরের মনে পড়ল, বিকালবেলা বালব খুলে নেওয়া হয়েছিল।

পরক্ষণেই দরজার জনতা আর্ত্ত চীৎকার করে যে যেদিকে পারে ছুটল। আলোয় অচিন্ত্য পালাবার পথ খুঁজে পেয়েছে। দরজার সামনে মুহূর্ত্তের ভগ্নাংশ সে থমকে দাঁড়াল। সমর ও দেশপাণ্ডে

দেখতে পেল, তার চুলের রং শণের মত সাদা, গায়ের সার্ট ছেঁড়া। কপাল ঘর্মাক্ত। সমর কাছেই দাঁড়িয়েছিল, বললে: এ কি করলে অচিন্ত্য!

দেশপাণ্ডে সমরের হাতে চাপ দিয়ে বললে: চুপ কর সমর!

অচিন্ত্য বোধ হয় শুনতে পেলে না। তিন-চার জন লোক খুব সম্ভব বাধা দেবার জন্য সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিল। শিকারী বাঘের মত অচিন্ত্য তাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, নিজের পথ করে নিয়ে সিঁড়ির নীচে অদৃশ্য হল।

একটু বাদে পুলিস-অফিসার ও ডাক্তার টর্চ্চের তীব্র আলো ফেলে উপরে উঠে এলেন। ঘরের ভেতর শয্যায় শায়িত অমরের লাশটি পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন: ঘণ্টা দুই আগে এর অপমৃত্যু হয়েছে। শব মর্গে পাঠানো হোক।

পুলিশ-অফিসারের টর্চ্চের আলো জনতার উপর পড়তেই তারা ছুটে পালাল। টর্চ্চের আলোয় দেখা গেল, দেশপাণ্ডে ও সমর জনতার আগে আগে ছুটে পালাচ্ছে।

মোটরে সেলফ ষ্টার্ট দিয়ে দেশপাণ্ডে বললে: যা ভয় করেছিলাম তাই ঘটল।

সমর বললে: শেষ পর্য্যন্ত অচিন্ত্য অমরকে হত্যা করল।

বাড়ী এসে দেশপাণ্ডে বললে: সমর, আমাদের স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না। দিন কতক বায়ু-পরিবর্ত্তনে গেলে কেমন হয়।

সমর বললে: আমিও সে কথা ভাবছিলাম।

দেশপাণ্ডে বললে: ভাবাভাবির সময় নেই সমর। আজই,—সন্ধ্যায়, ফ্রণ্টিয়ার মেইলে আমরা শ্রীনগর যাচ্ছি।

সমর মাথা নেড়ে সায় দিল।

* * * *

দু'বছর বাদে রাঁচির এক পার্কে দুই বন্ধু একখানি বেঞ্চিতে বসে গল্প করছিল। ওপাশ থেকে জনৈক ভদ্রলোক আড়চোখে এদের দেখছিল।

গোলকধাঁধা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীসুজিতকুমার মহলানবিশ

পরের দিন খেতে বসে গোকুল বাবু গল্প করলেন যে, তাঁদের আপিসের বড় সাহেবের বাংলো থেকে অনেক জিনিষ-পত্র চুরি হয়ে গেছে। এই সাহেব বদলী হয়ে সম্প্রতি এসেছেন, এঁর নাম টমসন। জিনিষ-পত্র চুরি যাওয়াতে সাহেব ভীষণ ক্ষেপে আছেন, এবং ভবিষ্যতে যাতে শীঘ্রই এখানে থানা ও আদালতের সৃষ্টি হয় তার চেষ্টা করছেন।

গোলু এই সময় জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বাবা, পোড়ো-বাড়ী সম্বন্ধে আর কিছু শুনলে?"

গোকুল বাবু বললেন, "হাঁ, আপিসে এই নিয়ে এর মধ্যে অনেক কথা হয়ে গেছে, তবে সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনায় আমরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি। কয়লা-খাদের নীচে এর মধ্যে পর-পর দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, এবং ঘটেছে সম্পূর্ণ কুলীদের নিজেদের দোষে। তারা নেশা করে সেখানে নেমে মারা পড়েছে।"

গোলু জিজ্ঞেস করল, "তারা নেশা করবার জিনিষ পায় কোথায়?"

গোকুল বাবু বললেন, "লুকিয়ে একটু-আধটু মদ চোলাই চলে এবং সেটা কিছুতেই বন্ধ করা যায় না।"

গোলু জিজ্ঞেস করল, "নতুন সাহেবের দরকারী জিনিষপত্র কে সাপ্লাই করে?"

গোকুল বাবু বললেন "তা ত জানি না, তবে আমার মনে হয়, হরদেও অনেক জিনিষ সাপ্লাই করে, কারণ, সাহেবের খানসামাটা প্রায়ই হরদেওর সঙ্গে ঘোরে এবং হরদেও মাঝে-মাঝে সাহেবের বাংলোতে যায়।"

গোলুর মুখের ভাব দেখে মনে হোল, সে যেন একটা প্রশ্নের মীমাংসা করতে পেরেছে। সে বলল, "সাহেবের বাংলোতে অত চুরি হয়ে গেল তার জন্য সাহেব সাবধান হয়নি?"

গোকুল বাবু বললেন, সাবধানের মধ্যে এক ষণ্ডামার্কা দরোয়ান রেখেছে এবং শুনলাম সে না কি যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিক, খুব সাহসী ও বলবান।"

গোলু শুনে বলল, "তাহলে ওই লোকটাকেই আমি দেখেছি, —বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, আর সাহেবের খানসামার সঙ্গে গল্প করছিল।"

গোকুল বাবু আহার সেরে বেরিয়ে গেলেন আর গোলুও স্কুলের পথ ধরল। স্কুল থেকে ফিরে, জলখাবার খেয়ে গোলু নিজের ঘরে অপেক্ষা করছে, এমন সময় বরেন আর কানাই উপস্থিত হোল। বরেন এসেই গোলুর খাটে শুয়ে পড়ে বলল, "শীগ্‌গির এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দে, গরমে আর তেষ্টায় প্রাণ গেল।"

কানাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "দু'গেলাস।"

গোলু হেসে জল আনতে নীচে গেল ও ফিরে এসে দেখে, বরেন পাঞ্জাবী খুলে খালি-গায়ে শুয়ে আছে। বরেনের পেশীবহুল নিটোল দেহ দেখে গোলু তারিফ না করে পারল না। বরেনের ঘাড়ে হাত রেখে গোলু বলল, "ষাঁড়ের মত ঘাড়খানা করেছিস, বলি কুস্তি লড়া ছেড়ে দিয়েছিস্ না কি?"

বরেন উঠে বসে বলে, "দূর হোগ্‌গে, কুস্তি-টুস্তি আর পোষায় না। যাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরব সে কুস্তি জানুক আর না জানুক তার নিস্তার নেই।"

কানাই হেসে বলল, "তাই ত আমার সঙ্গে হেঁটে পারলি না।"

বরেন রেগে বলে "তোর ফড়িংয়ের মত হাল্কা শরীর, তাই লাফিয়ে চলিস, আমার এই ভারী শরীর নিয়ে তোর সঙ্গে পারব কেন?"

গোলু কানাই আর বরেনকে তাড়া দিয়ে বলল, "চল চল, আর দেরী করিস্ না, একবার ডিসপেন্‌সারীতে যেতে হবে।"

বরেনকে শেষ পর্য্যন্ত পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে উঠতে হোল।

তিন বন্ধুতে যখন হরদেওর দোকানের সামনে এসেছে, তখন গোলু হঠাৎ দাঁড়িয়ে বাড়ীটা ভাল করে দেখতে সুরু করল। তার দেখাদেখি বরেন এবং কানাইকেও দাঁড়াতে হোল। হরদেওর এইটাই ছিল দোকান ও থাকার বাড়ী। একতলায় পাশাপাশি দু'টি পাকা ঘর ও পাকা ঘরের দু'পাশে দু'খানি লম্বা খোলার ঘর। ভিতর দিকে উঁচু পাঁচিল-তোলা উঠান এবং দু'তলায় একখানি ঘর। খোলার ঘরটাতে সে কয়লা বিক্রী করত এবং

হেমন্তের কুহেলি গুণ্ঠনতলে

হেমন্ত ঋতু একদিকে নিয়ে আসে প্রাচুর্য্যের পসরা,—ক্ষেত্র-লক্ষ্মীর দান শস্য-সম্পদ, অন্যদিকে নিয়ে আসে রিক্ততার আহ্বান,—আসন্ন শীতের আভাষ।

এই হঠাৎ ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানুষের শরীরকে খাপ খাওয়াবার জন্যে সব চেয়ে পরিশ্রম করতে হয় লিভারকে, তাই লিভার সম্পূর্ণ সুস্থ ও শক্তিশালী না থাকলে এ সময়ে নানা রোগের আক্রমণ অনিবার্য্য।

কুমারেশ উদরাময়, অজীর্ণ প্রভৃতি লিভার ও পেটের সকল পীড়া নিশ্চিতরূপে আরোগ্য ত করেই—সেই সঙ্গে লিভারকে শক্তিশালী ক'রে অন্য রোগের আক্রমণও প্রতিরোধ করে।

কুমারেশ

দি ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ্চ এণ্ড কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ

কুমারেশ হাউস

শালকিয়া : : হাওড়া

অঞ্চলটিতে মুদীর দোকান ছিল। হরদেও বোধ হয় বাড়ী ছিল না, কারণ তার দোকানপাট সব বন্ধ ছিল। গোলু কিন্তু এক দৃষ্টিতে উপরের ঘরটার দিকে তাকিয়ে ছিল। উপরের ঘরটির জানলা-দরজা সব বন্ধ। গোলু কানাইকে জিজ্ঞেস করল, "তোর কি মনে হয় যে, এই ঘরটা থেকে আমার ঘরটা দেখা যায়, অথবা আমার ঘর থেকে এই ঘরটা দেখা যায়?"

কানাই বলল, "নীচে থেকে বলা শক্ত, কারণ সামনে গাছের আড়াল পড়ছে, তবে উপরের ঘর থেকে হয়ত দেখা যায়।"

গোলু খানিকক্ষণ মনে মনে দিক্ নির্ণয় করে নিলে, তার পর বলল, "চল এবার।" পথে যেতে-যেতে গোলু বলল, "দেখ বরেন, এক দিন এই হরদেওর বাড়ী আর দোকান সব খুঁজে দেখতে হবে,—পারবি?"

বরেন বলল, "পারব না কেন?"

ডিস্পেনসারীতে পৌঁছে গোলু খানিকটা পারম্যাঙ্গানেট কিনল। বরেন জিজ্ঞেস করল, "এ কি আমাদের সর্ব্বদা সঙ্গে রাখতে হবে?"

গোলু বলল, "রাখতে পারলে ভাল হয়। ডিস্পেনসারী থেকে বেরিয়ে তারা কানাইয়ের ইচ্ছামত গয়ারামের আড্ডার দিকে চলল। গয়ারাম আড্ডায় ছিল। সে কানাই ও গোলুকে অভিবাদন জানাল, কিন্তু বরেনকে বিশেষ কিছু বলল না। ইদানিং বরেনের সঙ্গে কুস্তিতে হেরে যাওয়াটাই বোধ হয় তার এই উদাসীনতার কারণ। সে ঘরের কোণ থেকে তিনটে পাকা বাঁশের লাঠি এনে গোলুর হাতে দিল এবং কি ভাবে সেগুলোতে তেল লাগিয়ে রোদে রাখতে হবে, সে বিষয়ও হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিল। যাই হোক, গয়ারামের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ক্রমে টমসন সাহেবের কথা উঠল। গয়ারাম বলল, "সাহেব বহুৎ জবরদস্ত, আউর উনকা নয়া দারোয়ান ভি বহুৎ হুঁসিয়ার আদমী।"

গোলু প্রশ্নে প্রশ্নে জানতে পারল যে, সেই দরোয়ানের নাম বিষণলাল। দেশ কোথায় কেউ জানে না। সে হিন্দী, উর্দ্দ এবং দেহাতি—তিনটে ভাষাতেই কথা বলতে পারে এবং আগে পল্টনে সিপাহী ছিল। সব শুনে গোলুর মনে হোল যে, সাহেবের দরোয়ান বেশ মিশুক লোক। যাই হোক, গয়ারামের আড্ডা থেকে তিন বন্ধু বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে পোড়ো-বাড়ীর সামনে উপস্থিত হোল। গোলু অভ্যাস মত একবার দাঁড়িয়ে বাড়ীটা ভাল করে দেখতে সুরু করল।

বরেন বলল, "ভিতরে যাবি ত চল, রোজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে কি দেখিস্?"

গোলু কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ দেখে যে, একটা লোক আড়াল থেকে হঠাৎ তাদের সামনে চলে এসেছে। লোকটা বোধ হয় বাড়ীটা প্রদক্ষিণ করছিল। যাই হোক, গোলুদের দেখে সে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে, কাছে এসে সেলাম করল। গোলু হিন্দীতে বলল, তাকে এ অঞ্চলে সে নতুন দেখছে এবং জিজ্ঞেস করল যে, কোথায় থাকে। সে হিন্দীতে জবাব দিল, যে তার নাম বিষণলাল এবং সে টমসন সাহেবের দরোয়ান। এই দিক্ দিয়ে সে যাচ্ছিল, আম গাছে প্রচুর আম দেখে কয়েকটা আম নিতে ঢুকেছিল। গোলুও হেসে তাকে বলল যে সে বেশ করেছে, কারণ এই গাছের আম সচরাচর কেউ নেয় না, কেবল বাদুড় ও কাঠবেড়ালীতে খায় অথবা পড়ে নষ্ট হয়।

বিষণলাল গোলুকে বলল, "আপ লোক বাংলামে বাতচিত করিয়ে, হামভি বাংলা বোল শেখতে। হাম পঁচিশ বরষ বাংলা মুলুকমে কাম কিয়া।"

গোলু তখন হেসে তাকে বলল যে তাই হবে। তারা সেখানে আর সময় নষ্ট না করে আবার চলতে শুরু করল এবং বিষণলালও তাদের সঙ্গে চলল। কিছু দূর যাবার পরই তারা দেখল যে, টমসন সাহেবের খানসামা তাদের দিকে আসছে। বিষণলালকে দেখেই খানসামা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল যে, সে এতক্ষণ কোথায় ছিল এবং তাকে সকলে খুঁজছে। যাই হোক, খানসামা ও বিষণলাল দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেলে, গোলু কানাইকে বলল, "আমার কিন্তু মনে হয় না যে, সাহেব সত্যই বিষণকে ডাকছে, এ খানসামাটার চালাকী। ও নিজে বোধ হয় বেরোতে চায়।"

কানাই বলল, "এমন ত হতে পারে যে, বিষণলাল যেখানে ঘোরাঘুরি করছিল, সেখানে ঘোরাঘুরি করাটা কোন লোক অপছন্দ করছে।"

গোলু বলল, "সাবাস, তাও হতে পারে।"

তিন জনে বেড়াতে বেড়াতে গোলুর বাড়ীতে ফিরে এল। কানাই বলল, "স্কুল ছুটি না হলে কোন দিকেই মন দেওয়া যাবে না।"

বরেন বলল, "আর ত একটি দিনের মামলা।"

গোলু বলল, "আপাতত চল আমার ঘরে একটু বসা যাক্।" দুই বন্ধুকে ঘরে বসিয়ে গোলু একটা থালায় প্রচুর মুড়ি তেল-নুণ দিয়ে মেখে, তিনটে কাঁচা লঙ্কা নিয়ে উপরে এল। মুড়ি দেখে বরেনের আগেই জিভে জল এসে গেছে। সে শুয়েছিল, গোলু ঘরে ঢুকতেই ধড়মড় করে উঠে বসল। কানাই বলল, "বরেনটার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, একাই সবটা শেষ করবে।"

গোলু থালাটা তক্তাপোষের উপর রাখতেই বরেন বিরাট এক হাত বাড়িয়ে এক-মুঠ মুড়ি মুখে পূরল। গোলুও তক্তাপোষে বসে মুড়ি খেতে সুরু করল। বরেন বলল, "নানা গণ্ডগোলে পড়ে আমার এক্সারসাইজ হচ্ছে না, এবার ছুটিতে ভাল করে করতে হবে।"

কানাই বলল "হ্যাঁ, এই গরমে আর বেশী এক্সারসাইজ করলে তোর মাথায় মগজের বদলে মাসেল গজাবে।"

বরেন চটে বলল, "থাক্ থাক্, তোকে আর বেশী কথা বলতে হবে না, তোর মগজ দিয়ে ত ঘুঁটে দেওয়া ছাড়া আর কিছু কাজ হবে না?"

গোলু এবার হেসে ফেলল। সে বলল "এখন যা বলছি মন দিয়ে শোন, নয়ত বুঝতে পারবি না।"

কানাই খেতে খেতে বলল, "তুই বলে যা না, আমরা শুনছি।"

গোলু বলল, "গোড়া থেকে ঘটনাগুলি পর পর ভেবে দেখলে, দেখা যায় যে, এতগুলি লোক এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে যে, কে কোন কাজের জন্য দায়ী বোঝা শক্ত। প্রথমেই ধর, হরদেওর কার্য্যকলাপ, সে গোড়াতেই পোড়ো বাড়ী সম্বন্ধে আমায় ভয় দেখাতে চেষ্টা করেছিল। তার পর ধর, এক জন অচেনা লোকের ভূষণ বাবুর কাছে পোড়ো-বাড়ীর খোঁজ নেওয়াটাও আশ্চর্য্য। এর পরে হরদেওর বোতল নিয়ে সন্দেহজনক আচরণ ও সেই সঙ্গে তার [illegible] অদ্ভুত ধরণ-ধারণ। তার পর সাহেবের খানসামা ও

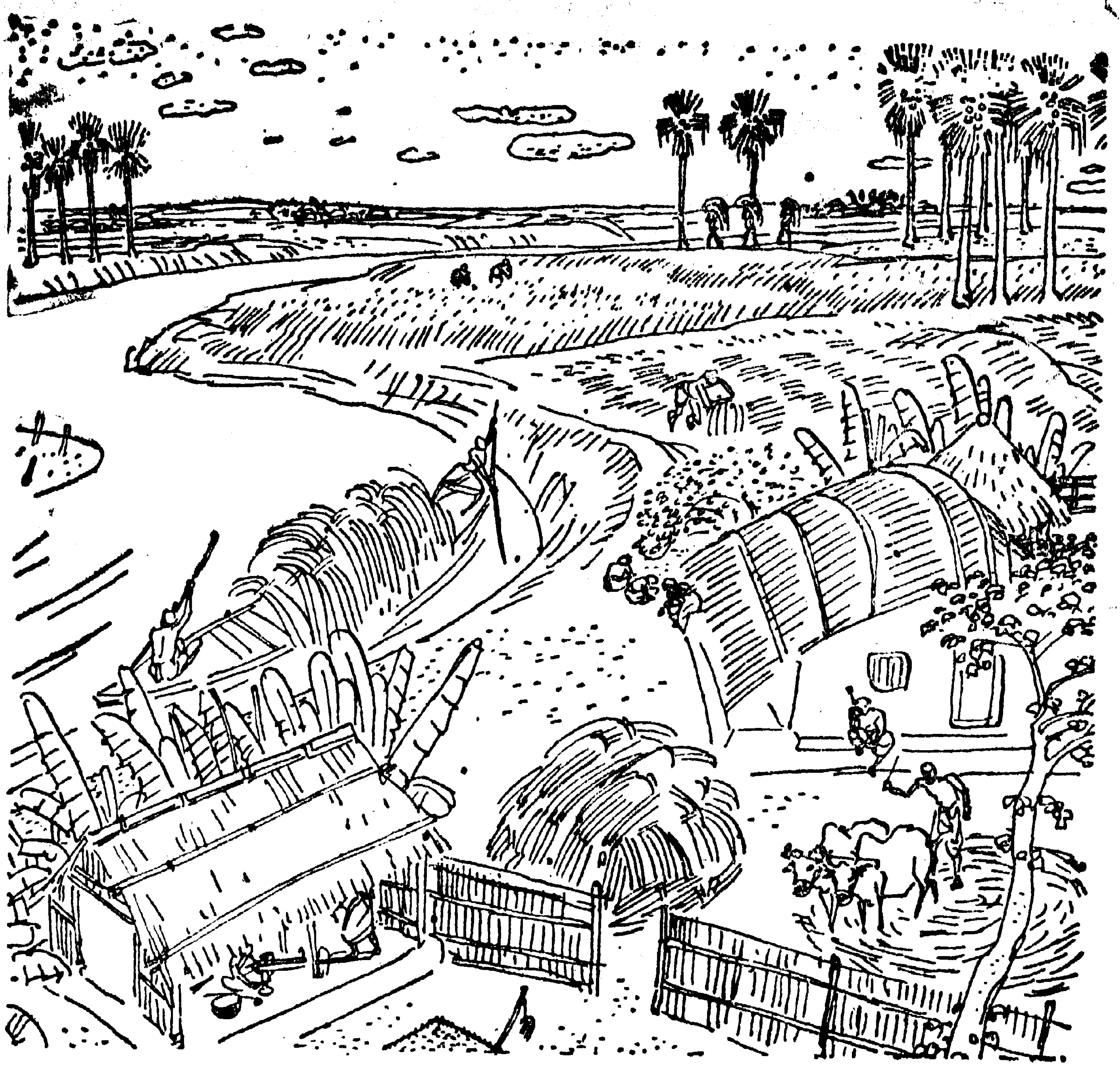

শরৎ

বাদলধারা শেষ হয়ে গেল। স্বচ্ছ নীল আকাশে ভেসে চলেছে রাশি রাশি সাদা মেঘ, নীচে বয়ে চলেছে শান্ত নদীর নির্মল জলরেখা। আলো-ঝলমল পথে শরৎ নেমে এলো, বেজে উঠলো আগমনীর বাঁশিটি। মানুষ সাড়া দিয়েছে তার আহ্বানে, তাকে বরণ করে নিয়েছে অফুরান নৃত্য গীতের উচ্ছলতায়। নগরে, গ্রামে, সর্বত্র আজ আনন্দের আসর বসেছে। উষ্ণ চায়ের মিষ্টি গন্ধে উৎসবের মুহূর্তগুলি ভরে উঠেছে কানায় কানায়।

চা

সব সময়েই চলে

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্সন্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

বিমলালের সন্দেহ জনক গতিবিধি।"

গোলু চুপ করতেই কানাই জিজ্ঞেস করল, "এখন তাহলে আমাদের কি করা উচিত ?"

গোলু বলল, "এত শীগ্‌গির কিছু বলা শক্ত, আরও কিছু দিন অপেক্ষা করলে হয়ত ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার হবে। তাছাড়া আমি আরও দু'-একটা খবর জানতে চাই, যেমন টমসন সাহেবের বাড়ী সেদিন কি জিনিষ চুরি গেছে এবং চোর কোন্ ঘরে ঢুকেছিল।"

কানাই বলল, "এ খবর তুই গয়ারামের কাছে পাবি, কারণ তার সঙ্গে খানসামাটার বেশ জানা-শোনা আছে।"

গোলু বলল, "ঠিক বলেছিস, কালই গয়ারামটাকে ধরতে হবে।"

এই ভাবে নানা কথাবার্তার পর সভা ভঙ্গ হোল।

সেদিন রাত্রে খেতে বসে গোকুল বাবু একটা অদ্ভুত খবর শোনালেন। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, তাঁদের আপিসে বিহারী বলে একটা লোক আছে। সেই লোকটা কুলীদের হিসাব রাখে, অর্থাৎ কত জন কুলী আছে, কার কত মাইনা, কত জন কাজে আসে, কোথায় থাকে, কি চায় ইত্যাদি। এ ছাড়া মঙ্গলু ব'লে এক জন কুলীর সর্দার আছে। এই মঙ্গলুর কথা সব কুলীই মানত এবং তার মেজাজ ও শক্তির জন্য সব কুলীই তাকে ভয় করে চলত। ইদানিং কয়েক দিন ধরে মঙ্গলুর মেজাজ যেন একটু বেশী খারাপ হয়েছিল। কুলীদের গালাগাল দেওয়া, এমন কি মার-ধর করার কথাও কানে এসেছে। গত কাল হরদেও কি কাজে আপিসে এসেছিল এবং বিহারীর সঙ্গে তার অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়। পরে বিহারী মঙ্গলুকে ডেকে আনে ও মঙ্গলুর সঙ্গে হরদেও দু'-একটা কথা বলবার পরই মঙ্গলু হরদেওর গলা ধরে মাটিতে ফেলে দেয় ও গালাগাল দেয়। এই ব্যাপারে খুব একটা হৈ-চৈ পড়ে যায়, এবং মঙ্গলুও সেখান থেকে সরে পড়ে। গোকুল বাবুর কাছে এই সকল খবর শুনে গোলুর মনে হোল যে, সমস্ত ব্যাপারটি আরও জটিল হয়ে গেল।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে গোলু অনেকক্ষণ এই সব কথা ভাবতে লাগল। হঠাৎ একটা নাম মনে পড়ে যাওয়াতে সে অস্ফুট স্বরে 'ডিহিরি' বলে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। টিলাডি থেকে ২১ মাইল দূরের ষ্টেশনের নাম ডিহিরি।

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙ্গেই গোলুর মনে পড়ল যে, স্কুলে ছুটি হয়ে গেছে। আনন্দে একটা চীৎকার করতেই খাটের নীচে থেকে কালু বেরিয়ে এল এবং দু'পায়ে ভর রেখে খাটের উপর উঠে গোলুর নাকটা চেটে দিল। গোলু হো-হো করে হেসে, কালুর গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, "তুই ছাড়া আমার মনের কথা কেউ টের পায় না।"

কালু এ কথায় ল্যাজ নেড়ে সায় দিল।

সকাল বেলা চা-পান করতে করতে গোকুল বাবু গোলুকে বললেন, "কি রে, তোর ত ছুটি হয়ে গেছে।"

গোলু বলল, "হ্যাঁ, ছুটিও হয়েছে এবং ছুটির কার্য্য-তালিকাও ঠিক হয়ে গেছে।"

গোকুল বাবু হেসে বললেন, "কি রকম ?"

গোকুল বাবু তাঁর এই মাতৃহীন ছেলেটিকে যে শুধু আদর ভালবাসতেন তা নয়, তিনি কখনও তাকে অকারণ তিরস্কার অথবা অতিরিক্ত শাসন করেননি।

গোলু সংক্ষেপে গোকুল বাবুকে বুঝিয়ে দিল, সে এবং তার দুই বন্ধু মিলে পোড়ো-বাড়ীর রহস্যের কিনারা করতে চায়।

গোকুল বাবু হেসে বললেন, "যা খুসী করো তবে সাবধানে থেকো আর কোন গণ্ডগোলের মধ্যে যেও না।"—তিনি গোলুর নির্ম্মল ও নির্ভীক মনের পরিচয় জানতেন, কাজেই নিশ্চিন্ত ছিলেন।

[ক্রমশঃ

চিঁড়ের নওলা

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুপ্ত

শনিবারের হাফ ছুটি। বাড়ী ফেরার পথে ইস্কুলের ছেলেরা আবিষ্কার করলে গোবিন্দকে। দিব্যি মজাদারী গল্পবাজ লোক। তারা তো এই চায়। অতএব গোবিন্দ গল্প শুরু করলে :

অনেক দিনের কথা। বয়স তখন অল্প। পাড়ায় থাকতেন যদু বাবু। বুড়ো থুথ্‌ড়ো। পাঁকাটির মত চেহারা। শণের নুড়ো তাঁর চুল,—দাড়ি ছিল এক-মুখ, হাত-খানিক লম্বা—সাদা, ভেড়ার লোমের মত কোঁকড়া কোঁকড়া। চোখে সব সময় একটা নীল চশমা—চার কোণা তার কাঁচ। মুখের ভিতর দু'পাটি দাঁতের অল্পই ছিল অবশিষ্ট। পাশের কষে মাত্র পাঁচটি, সামনে ওপরে দু'টি, নীচে দু'টি—নড়বড়ে সব শুদ্ধ ন'টি। রেগে-মেগে কথা কইতে গেলে দাঁতে দাঁত আটকে সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। আজব রকমের স্বভাব সে বুড়োর। কৃপণের হদ্দ। সকাল-বিকাল—দু'বেলা দু'পয়সার মাত্র চিঁড়ে এনে ভিজিয়ে রেখে তাই খান। ন'টি দাঁতে চিঁড়ে চিবানোর কাহিনীটি লোক-মুখে সবিস্তারে প্রচার হয়ে পড়ে, সবাই তাঁর নাম রাখলে—চিঁড়ের নওলা।

সকালে চিঁড়ের নওলার নাম কেউ নিত না। তাস খেলতে খেলতেও ভুল করে কেউ নিয়ে ফেললে সেদিন যে কপালে তার ভাত জুটবে না, হাঁড়ি যে ফাটবেই—তখনই তা নিশ্চিত জেনে নিত। ঐ কৃপণের নাম নিলে কখনও ভাত জোটে !

পাড়ার সবাই গুলি খেলতাম। সেখানে কেবল যদু বুড়োর নামটি ছড়ায় গেঁথে পড়া চলতো। গাব্‌তে গুলি পিলোতে হবে, সেই সময়ে তার চেষ্টা আমরা এক নিমিষে ব্যর্থ করে দিতাম—মাথার ওপর ডান হাতখানি রেখে আঙুলগুলো নাড়িয়ে নাড়িয়ে সুর করে বলতাম :

যদু বুড়ো, যদু বুড়ো—ফক্কি
এই দানটি হয় যেন গো ফক্কি !

বার বার তাড়াতাড়ি এই মন্ত্রটি পড়া চলতো অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে। আর যায় কোথায় ! সাক্ষাৎ ফল ! যদু বুড়োর কৃপায় সে দানটি ফক্কি তো হতই, সময় সময় গুলিটা যে কোথায় কাঁটা-ঝোপে বা জঙ্গলে গিয়ে পড়তো খুঁজতে খুঁজতে গলদঘর্ম্ম। আর আমাদের সে কি হৈ-চৈ ! যদু বুড়ো থাকতে ভাবনা ! যার গুলি হারাতো সে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারতো না। রেগে-মেগে আগুন হয়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসতো।—ও নাম নিলে খেলবো না বলে দিতাম,—দিতামই খেলতো না।

কে শোনে তার শাসানী। আমরা আরো মজা পেতাম। সুর করে চেঁচাতাম :

গুলি কোথায় গুলি কোথায়, চিড়ের নওলা।
গোবর্ধন দেবে খেতে গুড় ও কলা।

চিড়ের সঙ্গে গুড় কলা হলে চিড়ের নওলার সে এক মজা ভোজ।

ছেলেটির নাম গোবর্ধন; সে মারমুখী হয়ে দৌড়তো, কিন্তু আমরা দলে ভারী—পারবে কেন!

চিড়ের নওলা যত্ন বুড়োর অনেক কাণ্ড-কারখানাই লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়।

বলে উক্তি মূল পত্তনে চেনা যায়। যত্ন যে ভবিষ্যতে একটা কেউ-কেটা হবে, সকলের মুখে মুখে কীর্তি-কলাপ এই ভাবে ছড়িয়ে পড়বে, তা ছোট বেলাতেই না কি ধরা পড়েছিল দু'-একটি ঘটনায়।

এক দিন দুপুর বেলা যত্ন বাইরের দালানে বসে আছে। একটি লোক কলা বেচতে যাচ্ছিল। কলা চাই—কলা—গম্ভীর ভাবে যত্ন ডাক দিলে, এই—শোন্ এদিকে—

কলাওলা এলো।

বেশ ভারিক্কি চালে যত্ন জিজ্ঞেস করলে, দর কি?

বাবু, পৌনে পাঁচ আনায় বারো।

ধ্যাৎ—পৌনে পাঁচ আনা—পৌনে পাঁচ আনা আবার কি?

তবে কত দেবেন, আপনিই বলুন।

বলে দিচ্ছি বাবা, ভদ্রলোকের এক কথা—ও পৌনে পাঁচ আনা-টাঁচ আনা দিতে পারবো না। পুরো পাঁচ আনায় দিবি তো দে!

কলাওলা তো অবাক। তাকে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যত্নর হয়তো বা কিছু সন্দেহ হয়—আচ্ছা, আচ্ছা, না হয় আর দু'টো পয়সাই বেশী পাবি।

কলাওলা পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে প-এ-আকার!

এই ব্যাপারটাই পরে হয়তো যত্ন বাবুকে হিসেবী—ক্রমশঃ কৃপণ হতে শিখিয়েছে।

ইস্কুলেও যত্নর নাম ছিল বেশ। তার বুদ্ধি দেখে মাষ্টার মশাইদেরও সময় সময় তাক লেগে যেত।

তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র যত্ন। বাংলার শিক্ষক হরিসাধন বাবু ছেলেদের খুব যত্ন নিয়ে পড়াতেন; তাঁর মত যত্ন সচরাচর বোধ করি কোন শিক্ষকই নেন না। তিনি একবার ঠিক করলেন, ক্লাসে সপ্তাহে সপ্তাহে রচনা লেখার পরীক্ষা হবে কি শনিবার দিন, কেন না, রচনা ভাল না লিখতে পারলে কিছুতেই না কি বড় হওয়া যায় না। যত্নর প্রতি সব শিক্ষকেরই দৃষ্টি ছিল একটু বেশী। হরিসাধন বাবু জিজ্ঞেস করলেন, কি রকম যত্ন, তোমার মত কি?

যত্ন আস্তে আস্তে উঠে বললে, মত তো তাই, কিন্তু না পারলে—

না—না, চেষ্টা করবে—ক্রমেই ভাল হবে। চেষ্টায় কি না হয়।

তা হলে হবে, বলে যত্ন ভাল ছেলেটির মত বসে পড়ে।

প্রথম সপ্তাহের প্রশ্ন ব্ল্যাক বোর্ডে লিখে দিলেন হরিসাধন বাবু—ঘোটকের রচনা লেখ।

যত্ন তাড়াতাড়ি খাতা তুলে নিল লেখবার জন্য। কিন্তু, ঘোটক—ঘোটক মানে কি? যত্ন পেন্সিল ঠোঁটে রেখে ভাবতে বসে ঘোটক মানে!

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। হরিসাধন বাবু বললেন, কি ভাবছ, যত্ন?

যত্ন সসম্ভ্রমে উঠে জানালে, লিখছি স্যার—ভেবে ভেবে।

ভাল—ভাল। বলে হরিসাধন বাবু চলে গেলেন।

ভেবে ভেবে যত্ন যা লিখেছিল, সে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। তার কিছুটা প্রবাদের মত প্রচার হয়ে পড়েছে। শোন।

বিয়ের সময় বাড়ীতে ঘোটক আসে। দিদির বিয়ের সময় এক জন এসেছিল। সে নিজে যেমন ভূতের মত কালো, তেমনি দুর্গন্ধ আর ময়লা তার জামা-কাপড়। গলায় একটা চাদর ছিল। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ঘোটক দেখতে মোটেই সুশ্রী নয়। ঘোটক আমাদেরই মত মানুষ হলেও বড় নোংরা।

তবে ঘোটক মানুষের খুব উপকারী। যে মেয়ের বিয়ে সহজে হয় না, ঘোটক তাদের বিয়ের বন্দোবস্ত তাড়াতাড়ি করে দেয়।

হরিসাধন বাবু ক্লাশে পড়ে পড়ে শোনাতে লাগলেন যত্নর রচনাটি। শেষ হলে যত্নকে ডেকে বললেন, ঘোটক মানে কি?

ঘোটক মানে—মানে স্যার,—দিদির বিয়ের সময়—

থাম।

ধকুনিতে সে আরো ঘাবড়ে যায়।

আমি তো লোকটাকে তখন জিজ্ঞেস করেছিলেম। সেই তো বললে, সে ঘোটক—

হরিসাধন বাবু বুঝিয়ে বলেন, ঘোটক নয় সে—ঘটক—ঘটক বুঝলি। ঘ—ট—আর 'ক'।

আচ্ছা। বলেই ভ্যাঁ—!

হরিসাধন বাবু তাকে বাইরে এনে একটি ঘোড়া দেখিয়ে বলেন, ঐ—ঐ ঘোটক!

ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে ঠোঁট বেঁকিয়ে যত্ন বলে, ও—ওটা তো ঘোড়া?

ক্লাসের সব ছেলে হোঃ-হোঃ করে হেসে উঠলো।

বলা বাহুল্য, এর পর যত্নর বেশী দূর আর পড়া-শুনো এগোয়নি।

বহু পরের কথা। তখন যত্ন আর যত্ন নয়—যত্ন বাবু।

দেখা গেল, হঠাৎ এক দিন ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে পাড়ায়-পাড়ায়—বাড়ী-বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কি—কি!—কয়েকটি ছেলে-মেয়ে তাঁকে ছেঁকে ধরলো।—বলতেই হবে ব্যাপারখানা।

যত্ন বাবু হেসে হেসে বললেন, কাল ছেলের বিয়ে, বৌভাত, বুঝলি? তোদেরও নেমন্তন্ন রইলো।

নেমন্তন্ন!—কানে কানে সবাই বলাবলি করতে লাগলো।—খাওয়াবে—ঐ চিড়ের নওলা!

হাসছিস যে বড়!—যত্ন বুড়ো ধমক দেন।

হাসবো না! বা-রে—খাবার কথা শুনলে কার না আনন্দ হয়। কি কি খাওয়াবেন?

দই, সন্দেশ, লুচি, রাবড়ি—আলুর দম—যা চাইবি। আসবি—কেমন?

সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

হন্‌-হন্‌ করে আর এক জনের বাড়ী গেলেন যদু বাবু—তার পর আর এক জনের—

যদু বুড়োর মুখের পানে না তাকিয়ে সবাই গুনে গেল। নাম করলেই অনর্থ, মুখ দেখলে কত কি না!,

বিয়ে-বাড়ী। হৈ-চৈ—গোলমাল। তুমুল ব্যাপার। লোক গিস্‌-গিস করছে। ছেলে-মেয়ে নাচছে—গাইছে—লাফাচ্ছে। সে এক মহোৎসব।

খাওয়ার সময়। যদু বাবুর খোঁজ পড়লো। যদু বাবু কৈ?

আর যদু বাবু!

খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ। বাড়ী-ঘর, আনাচে-কানাচে সমস্ত তন্নাট খোঁজা হোল, যদু বাবু কৈ! আর খাওয়াবার বন্দোবস্ত কোথায়—কোথায় বা ভিয়েন, কোথায় বা কি!

দলে দলে লোক উন্মত্তের মত ছুটলো এদিক-ওদিক-সেদিক। রেগে সবাই আগুন। চিঁড়ের নওলাকে একবার পেলে হয়!

একটি ছেলে ছোট একটি হাঁড়ি নিয়ে আসছিল। পথে ভীড় দেখে বললে, ব্যাপার কি?

যদু বুড়োর খবর কিছু জানো? চিঁড়ের নওলা।

ছেলেটি বললে, হাঁ—হ্যাঁ, তিনিই তো পাঠালেন এক সের রসগোল্লা দিয়ে। বলে দিয়েছেন, ততক্ষণে পরিবেশন হতে থাক।

সকলে এবার ক্ষেপে উঠলো। এক সের রসগোল্লা তিনশো লোকের মধ্যে পরিবেশন। কোথায় সে চিঁড়ের নওলা! পাজি—ছুঁচো কোথাকার. নেমন্তন্ন করে ন্যাকামো!

ছেলেটি বুঝলে অবস্থা সুবিধের নয়। বললে, ঐ দিকে তো কোথায় গেলেন।

সবাই ছুটলো। যেমন কোরে হোক খুঁজে বার করতেই হবে—চিঁড়ের নওলাকে আজ চিঁড়ে-চেপ্টা করে তবে ছাড়া!

খোঁজ চলেছে। হঠাৎ হারু দৌড়তে দৌড়তে এসে চেঁচিয়ে উঠলো, পেয়েছি—পেয়েছি—

কোথায়?

আস্তে আস্তে চলে এসো—এদিকে—

হারুর পিছনে চললো বিরাট দল।

বক্সীদের পচা পুকুর। তার মধ্যে গলা ডুবিয়ে যদু কৃপণ দিব্বি দাঁড়িয়ে আছে!

হারু উত্তেজিত হয়ে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। যদু বুড়ো প্রমাদ গণলেন। হাত জোড় করে মিনতি জানান, পায়ে পড়ি তোমাদের। আর এমনটি হবে না—

কে শোনে!

হারু তাঁর হাতের গামছাটা ছিনিয়ে নিয়ে গলায় বেশ করে না জড়িয়ে দু'হাতে হিড়-হিড় করে যদু বুড়োকে টেনে আনলে ওপরে।

তার পরের ব্যাপার অতীব ভয়ঙ্কর। প্রহারের পর প্রহার—যাকে বলে তুলো-ধোনা। দাঁত খিঁচিয়ে হারু বলে, বড্ড খরচ হয়ে গেছে এক সের রসগোল্লায়—না, তাই গায়ের জ্বালা, সেই জ্বালা জুড়োতে পুকুর-জল—হুঁঃ!—বলে শক্ত করে গামছাটায় এক টান মারলে!—

এরও অনেক পরের কথা।

পুজোর সময়। কার্পণ্যের চরম করে ছাড়লেন যদু বাবু।

বিজয়ার দিনটি ছেলেদের কাছে পরম ভক্ত—স্মরণীয়। প্রতিমা ভাসানের পর শান্তিজল নেওয়া হলে তারা দল বেঁধে প্রত্যেকের বাড়ী যায় যথাযোগ্য নমস্কার কোলাকুলির পর মিষ্টিমুখ করতে।

যদু বাবু আগের দিন ছেলেদের ডেকে বললেন, আমাকে ভুলিসনি, বাছারা। আমার ওখানেও আসবি।

বটেই তো—বটেই তো! সমস্বরে সকলে সম্মতি জানায়!—সেদিন সকলের সঙ্গেই যে দেখা করতে হয়!

খুশী-মনে যদু বাবু বাড়ী ফিরলেন।

বিজয়ার রাত। দল বেঁধে ছেলেরা এ-বাড়ী সে-বাড়ী—সব বাড়ী ঘুরলো একে একে। পেটে তাদের আর ধরে না। খুব খেয়েছে সবাই। এবার কলরব করতে করতে চললো চিঁড়ের নওলা যদু বাবুর বাড়ী।

পথে যেতে যেতে এক জন বললে, কি আর দেবে কেপ্পণ।

আর এক জন প্রতিবাদ করে বলে, জানিস, নেমন্তন্ন করেছেন বিশেষ করে।

কে এক জন বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে বললে, ঘোড়ার ডিম! সব জানা আছে। নেমন্তন্ন করে তো এক-গলা জলে ডুব মারে!

হৈ-হৈ করে যদু বাবুর বাড়ীর সামনে সব হাজির। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন যদু বাবু।—এসো-এসো! তোমাদের জন্যেই তো এই আলো জ্বালিয়ে বসে আছি। এসো!

উৎসাহ-ভরে সবাই ঢুকে পড়লো। যদু বাবু যখন এমন আদর করে ডেকে নিলেন ভেতরে, এবার সরেশ ব্যবস্থা হয়েছে। উল্লসিত হয়ে বড় চৌকিটার উপর বসে পড়লো সবাই।

যদু বাবু হাসিমুখে বলেন, বস বাবা, বস। আজ মিষ্টিমুখ একটু করতে হয়।

কয়েক জন বলে উঠলো, পেটে আর জায়গা নাই, যদু বাবু।

কেউ কেউ ঢেকুর তুলে জানিয়ে দিল।

যদু বাবু বললেন, তাই কি হয়! শাস্ত্রের নিয়ম। বস!—তিনি ভিতরে চলে গেলেন।

তাহ'লে ব্যবস্থা ভালই হয়েছে। চিঁড়ের নওলা তবে এক-হাত দেখিয়ে দেবেন! তাদের মধ্যে জোর আলোচনা চলতে থাকে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই যদু বুড়ো ফিরে এলেন। কোথায় খাবার—কোথায় কি! এক বালতি জল ও কয়েকটি গেলাস তাঁর হাতে!

ঘাবড়ে গেল ওরা। শুধু জল খাওয়াবে না কি!

নাও বাবা, নাও—শুরু করে দাও—বলে যদু বাবু এক জনের হাতে এক গেলাস জল তুলে দিলেন।—মিষ্টিমুখের জন্যে, গরীব মানুষ জানোই তো—এই সামান্য ব্যবস্থা, বলে তিনি উপরের দিকে তর্জনী তুলে দেখান।

আঙুল অনুসরণ করে সবিস্ময়ে সবাই দেখলে, সরু একগাছা সূতো দিয়ে কড়িকাঠের কাছ বরাবর নাগালের বাইরে ঝুলছে একখানি জিলাপি!

—ঐটা দেখে-দেখে এক-এক গেলাস জল খাও। অর্ধেক তো খেয়ে এসেছ—তাই ভাবলাম, প্রাণের আর অর্ধেক—নাও। জলটা ইঁদারার, খুব ঠাণ্ডা! বলতে বলতে আর এক গেলাস জল তুলে ধরলেন যদু বাবু।

আর দাঁড়ালো না কেউ। সকলে চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে গেল। এক জন বললে, গ্লাস ছুঁড়ে মাথাটা ফাটাতে পারলে.

কাজের কাজ হত। হাসতে হাসতে আর এক জন বললে, ও গ্লাসও তেমনি ; টিনের—পটপটে, মারলে মাথা কাটে না।

তারা ক্ষেপে উঠলো। এর প্রতিশোধ নেওয়া দরকার। এত বড় অপমান—অমন বছরকার দিনে !

একটা উপায় স্থির হতেও দেরী হল না।

কালী পূজার দিন। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। দু'টি ছেলে—চারু আর বেণী পরামর্শ করে বসে রইলো একটি গাছের মাথায় ; গাছটি যদু বুড়োর বাড়ীর ঠিক সামনেই।

অনেক রাত। পুজো-বাড়ী থেকে প্রসাদ পেয়ে যদু বুড়ো ঠুক-ঠুক বাড়ী ফিরছে কালী—কালী—কালী—ভক্তি-গদগদ স্বরে উচ্চারণ করতে করতে।

ঝপাস—

ঠিক যদু বাবুর কাঁধের উপর লাফিয়ে পড়লো চারু।

ভয়ে যদু বাবু গোঁ-গোঁ করে পড়ে গেলেন। বেণীও ইত্যবসরে গাছ থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে—মুখোস-পরা বিকট মূর্তি। যদু বুড়োর লম্বা দাড়িটা এক হাতে ধরে, আর এক হাত বাড়িয়ে নাকি সুরে বলে, দে—এক্ষুনি একপোটা টাকা দে—

ভয়ে যদু বাবু কেঁচোটি। কিন্তু টাকার মায়া যে প্রাণের চেয়েও বেশী।

চারু তাঁর পিঠে চেপেই আছে, সমানে আঁচড়াচ্ছে—কামড়াচ্ছে।

শেষে যদু বাবু অতিষ্ঠ হয়ে ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়েন। দোষ যে দোষ—সব দোষ।

আগে দে—

কৃপণের থলি সব সময় সঙ্গেই থাকে। একপোটা টাকা বার করে দিয়ে তবে রেহাই।

যদু বাবুর ছেলে গোলমাল শুনে ততক্ষণে আলো হাতে হাজির হয়েছে। চারু, বেণী মুখোস খুলে ফেলেছে। তাদের চিনতে পেরেই যদু বাবু টাকার শোকে চেঁচিয়ে ওঠেন, দে—দে শয়তানেরা—আমার টাকা—

খটাস—দাঁতে দাঁতে আটকে গিয়ে বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার।

চারু বললে, এক গ্লাস জল এনে দে চট করে—নয় তো মরবে না কি !

বেণী ছুটে গিয়ে ইঁদারার জল এক গ্লাস নিয়ে আসে।—এটুকু খেয়ে নিন। ইঁদারার জল—খুব ঠাণ্ডা !

তাঁর সঙ্গে চালাকি ! যদু বাবু কট-মট করে তাকান, কিন্তু নিরুপায় ! হাঁপাতে হাঁপাতে জল গিলতে লাগলেন।

জল খাওয়া হল, কিন্তু যদু বাবু হাঁ করেই রইলেন। বেণী খাওয়া নেবার জন্ম বুঝি !

বেণী ও চারু দেখে, না, তা নয়। সর্বনাশ হয়েছে। চিঁড়ের কলোর মাত্র আটটি দাঁত যে ! আর একটি গেল কোথায় !

যদু বাবু উত্তেজনায় কথা বলতে পারছিলেন না। হাত দিয়ে কেবল দেখিয়ে দিলেন।

অর্থাৎ, দাঁতটা ভেঙে জলের সঙ্গে বেমালুম পেটের মধ্যে চলে গেছে !

* * * *

ইতি। যদু বাবুর প্রথম দাঁত-হারানোর কথা।—বলে গোবিন্দ দাস দিল।

মাথা যাদের বেঠিক নয়

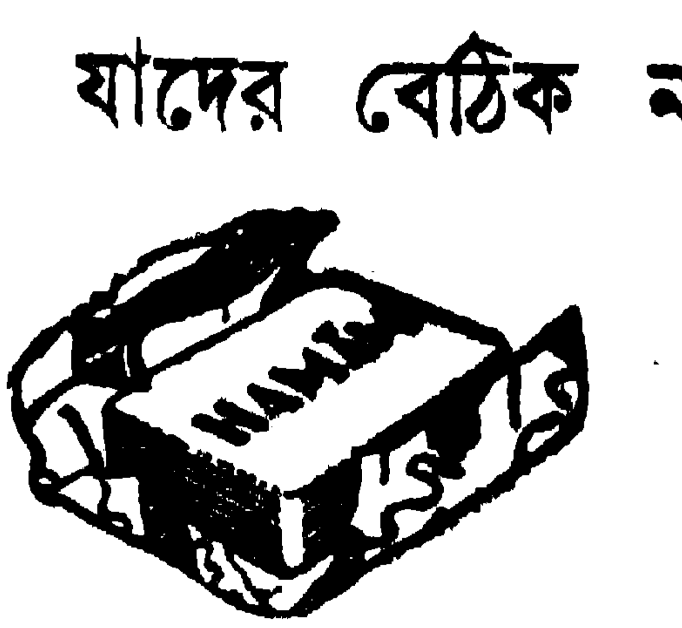

হামাম সাবান

টাটা অয়েল মিলস্ কোং, লিঃ

সমুদ্র-স্রোত

শ্রীহৃষিকেশ রায়

ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ এক বিশাল অবিচ্ছিন্ন জলরাশির দ্বারা আবৃত। এই জলভাগ সমগ্র ভূ-গোলকের শতকরা ৭১ ভাগ এবং অবশিষ্ট ২৯ ভাগ মাত্র স্থল। স্থলভাগ যেমন সর্বত্র সমতল নয়,—পর্বতাদি বিরাজিত, সেইরূপ সমুদ্রের তলদেশের গভীরতারও তারতম্য আছে। এমন কি পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশিখরের উচ্চতম অপেক্ষা ইহা অধিক। অবিচ্ছিন্ন হইলেও, বিভিন্ন স্থানে এই জলরাশির বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে এবং তাহাদিগকে মহাসাগর বলে।

আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূল হইতে এশিয়ার পূর্ব উপকূল পর্যন্ত ১০ হাজার মাইল বিস্তৃত বিশাল জলভাগে (পৃথিবীর সমগ্র জলভাগের অর্ধাংশ) কোনরূপ ঝড়-তুফান না দেখিয়া বিখ্যাত নাবিক ম্যাজিলান ইহার নাম দেন প্রশান্ত মহাসাগর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বড়ই অশান্ত। উত্তরে এশিয়া, পশ্চিমে আফ্রিকা, দক্ষিণে কুমেরু বৃত্ত, পূর্বে পলিনেশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া—এই চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থিত ভারত মহাসাগর। আমেরিকার পূর্বে এবং ইউরোপ ও আফ্রিকার পশ্চিমে ৩০০০ মাইল বিস্তৃত শ্রেষ্ঠ মহাসাগর আটলান্টিক। আয়তনে প্রশান্ত মহাসাগরের অর্ধেক হইলেও, ইহার উভয় তীরবর্তী আধুনিক সভ্যতাদীপ্ত সমৃদ্ধ দেশ ও বিখ্যাত বন্দর সমূহ ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে। সুমেরু ও কুমেরু বৃত্তদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত যথাক্রমে সুমেরু ও কুমেরু মহাসাগর। বৎসরের অধিকাংশ সময়েই শেষোক্ত মহাসাগর দুইটি বরফে আবৃত থাকে।

পঞ্চ মহাসমুদ্রের এই যে ১৪ কোটি বর্গমাইল বিস্তৃত অসীম জলরাশি, মুহূর্তের জন্যও ইহা স্থির নয়। অবিরত প্রবল বায়ুপ্রবাহ তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া এই জলরাশিকে আলোড়িত করে। তরঙ্গে অবশ্য জলরাশি স্থানান্তরিত হয় না, এক স্থানে থাকিয়াই উঠা-নামা করে। জোয়ার-ভাটার জন্য সমুদ্রের জল এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়। এই দুই প্রকার আলোড়ন ব্যতীত বায়ুপ্রবাহ, পৃথিবীর আবর্তন গতি, লাবণ্যের অনুপাতে সমুদ্রজলের ঘনত্বের তারতম্য, সমুদ্রজলের বাষ্পীভবন প্রভৃতি নানা কারণে সমুদ্রজলে আর এক প্রকার গতি আছে। ইহাই সমুদ্র-স্রোত। বায়ুপ্রবাহের ন্যায় সমুদ্র-স্রোতও ফেরেল সূত্রের* অনুগামী। কিন্তু স্থলভাগের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলে, ইহার গতিপথের পরিবর্তন হয়।

প্রধান প্রধান সমুদ্রস্রোত এবং নিয়ত বায়ু † প্রবাহ, উভয়ের গতিপথের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিলে ইহাই পরিস্ফুট হয় যে, প্রবাহ প্রধানতঃ সমুদ্রস্রোতের নিয়ামক।

বিষুবরেখার উত্তরে উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু সমুদ্রের যে অংশ দিয়া প্রবাহিত হয়, দেখা যায় যে, সে অংশে সমুদ্র-স্রোতও উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হইতেছে এবং বিষুবরেখা অতিক্রম না করিয়া পশ্চিমাভিমুখী হয়। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া এই স্রোত উত্তর-পূর্ব দিকে যায় ও কর্কটক্রান্তি অতিক্রম করিয়া প্রত্যায়ন বায়ুপ্রভাবে সেই দিকেই প্রবাহিত হয়। মেরুদেশীয় বায়ু যেমন উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হয়, সমুদ্রস্রোতও ঐ অঞ্চলে প্রায় সেই পথেই চলে। আয়ন বায়ু, প্রত্যায়ন বায়ু ও মেরুদেশীয় বায়ুপ্রবাহের প্রভাব বিষুবরেখার দক্ষিণে সমুদ্রস্রোতের উপরেও সমভাবেই বর্তমান। বায়ুপ্রবাহের

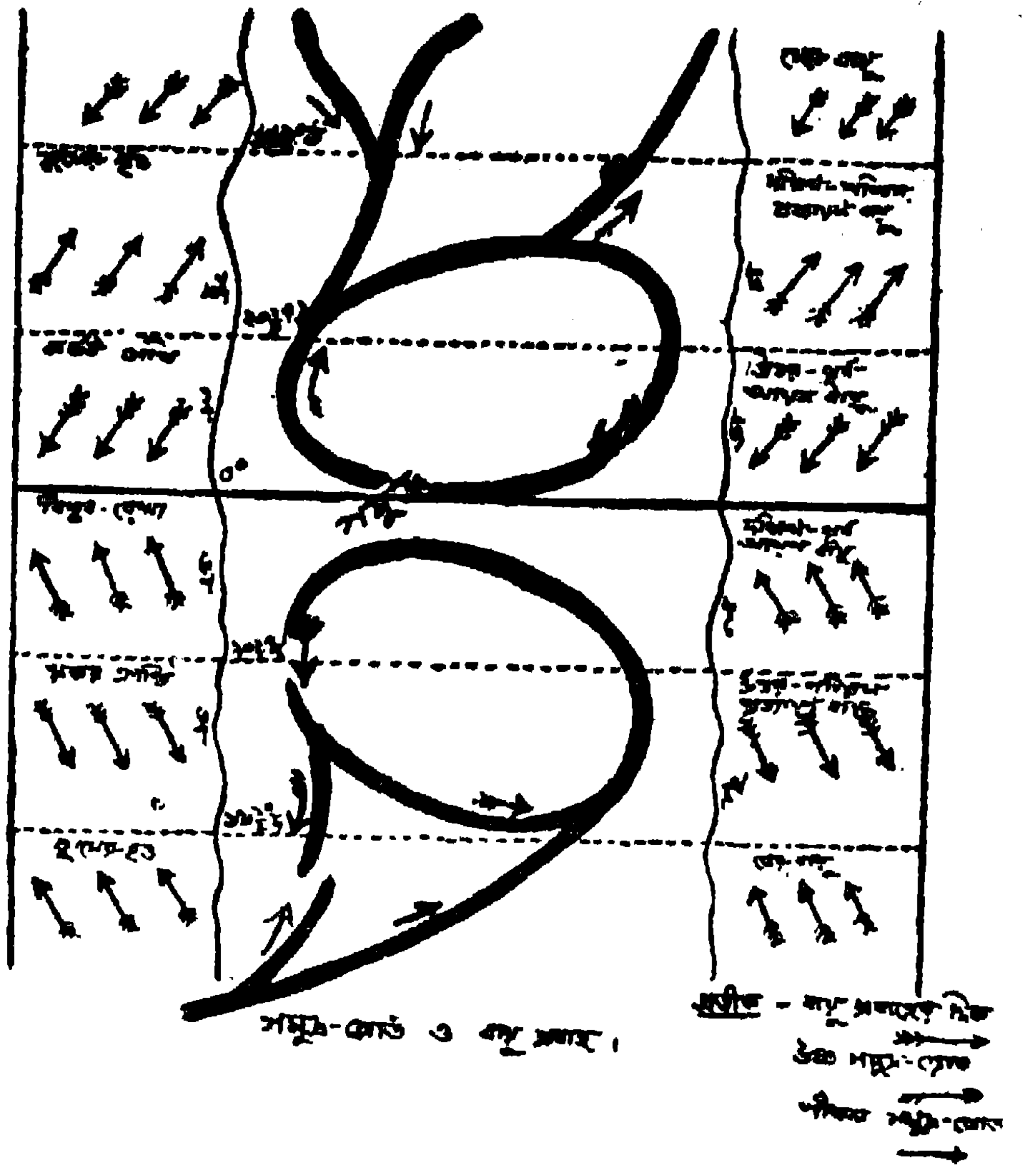

সমুদ্র-স্রোত ও বায়ু প্রবাহ।

ন্যায় সমুদ্রস্রোতের এই যে উত্তর-পূর্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিম ও অন্যান্য বক্রগতি, ইহা পৃথিবীর পশ্চিম হইতে পূর্বে আবর্তন গতির ফল। ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুপ্রবাহের গতির যে পরিবর্তন, সমুদ্রস্রোতও সে প্রভাব হইতে মুক্ত নয়।

সমুদ্র-জল স্বভাবতই লবণাক্ত। এই জলে শতকরা সাড়ে ৩ ভাগ লবণজাতীয় বিভিন্ন পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় বর্তমান। কিন্তু বাষ্পীভবন, নদ-নদীর প্রবাহ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির তারতম্যের উপর সমুদ্র-জলের লাবণ্যতার হার নির্ভর করে। ভূমধ্যসাগরে দ্রুত বাষ্পীভবন হয় এবং নদনদী ইহাতে বেশী আসিয়া পতিত না হওয়ায় জিব্রাল্টার প্রণালীর নিকট ইহার লাবণ্যতার হার শতকরা ৩।০ অপেক্ষা বেশী (শতকরা ৩·৬৫) এবং পূর্ব দিকে যত অগ্রসর হওয়া যায়, এই হার ততই বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৩·৯ হয়। লাবণ্যতার এই হ্রাস-বৃদ্ধিতে জলের আপেক্ষিক গুরুত্বেরও তারতম্য হয়। সেই জন্য দেখা যায় যে, জিব্রাল্টার প্রণালীতে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে ভূমধ্য সাগরের উপরিভাগে একটি এবং নিম্নে বিপরীতমুখী অপর একটি স্রোত আটলান্টিকের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। শেষোক্ত নিম্নগামী স্রোতের লাবণ্যতা উপরিভাগের স্রোত অপেক্ষা বেশী। আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে এই উভয় প্রকার স্রোতবাহিত জ

---

* ফেরেল সূত্র (Ferrel's law)—পৃথিবীর আবর্তনের গতি নিরক্ষ রেখায় সর্বাপেক্ষা অধিক, ঘণ্টায় প্রায় ১০০০ মাইল। যত উত্তর বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, এই গতি ততই কম। পৃথিবী স্বীয় মেরুরেখার উপর পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে আবর্তন করে। এই দুই কারণে পৃথিবীর উপর গতিশীল পদার্থের গতি বিক্ষেপ হয়। ফলে মেরুপ্রদেশ হইতে বিষুবরেখার দিকে বা বিষুবরেখা হইতে মেরুপ্রদেশের দিকে বায়ুপ্রবাহ বা জলপ্রবাহের গতির দিক উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বাঁকিয়া যায়।

† নিয়ত বায়ু (Constant wind)—আয়ন বায়ু (Trade winds), প্রত্যায়ন বায়ু (Anti-trade winds) এবং মেরু-

তাহাদের জলের লাবণতার তারতম্য। অপর পক্ষে কৃষ্ণসাগরে বাষ্পীভবন কম এবং দানিয়ুব, নিষ্টার, নিপার, ডন প্রভৃতি নদী ইহাতে পতিত হওয়ায় ইহার লাবণতার হ্রাস, তথা জলের ঘনত্ব কম। ফলে কৃষ্ণসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরের দিকে উপরিভাগে এবং নিম্নপ্রবাহী স্রোত ভূমধ্যসাগর হইতে কৃষ্ণসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়। বাল্টিক সাগর-স্রোতের কারণও ঠিক কৃষ্ণসাগরের অনুরূপ। লাবণতার হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য সমুদ্রে যে স্রোত সৃষ্ট, বদ্ধ-সমুদ্রেই ইহা কার্যকরী, মুক্ত-সমুদ্রে ইহার প্রভাব বিশেষ লক্ষিত হয় না।

সূর্য ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত তাপের আধার। সূর্যতাপে যেমন বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি, সমুদ্রস্রোতও সেইরূপ তাপের তারতম্যের উপর আংশিক নির্ভর করে। গ্রীষ্মমণ্ডলে সূর্য প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয়, কিন্তু যতই উত্তর বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, ততই তির্যকভাবে সূর্যকিরণ ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। সে জন্য গ্রীষ্মমণ্ডলে সমুদ্রের জল যেরূপ উত্তাপ পায় (গড় উষ্ণতা ৮০° ফা), তাহার উত্তর বা দক্ষিণের সমুদ্র জল সে পরিমাণ উত্তাপ পায় না (মেরুপ্রদেশের গড় উষ্ণতা ২৮° ফা)। তাপে পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া যায়। এই কারণে গ্রীষ্মমণ্ডলের সমুদ্র-জল সূর্যকিরণে উত্তপ্ত ও আয়তনে বর্ধিত হইয়া লঘুতর হয় এবং মেরুপ্রদেশের দিকে বহিয়া যায়। আবার মেরুপ্রদেশের শীতল ও ঘন জলরাশি সেই স্থান পূরণের জন্য সমুদ্রের গভীর অংশ দিয়া উষ্ণমণ্ডলের দিকে প্রবাহিত হয়। জল তাপের ভাল পরিবাহক নয়; সে জন্য উপরের জলরাশি উত্তপ্ত হইলেও নিম্নের জলরাশিতে তাপের কোন পার্থক্য হয় না। গ্রীষ্মমণ্ডল হইতে মেরুপ্রদেশের দিকে প্রবাহিত স্রোতের জল উষ্ণ বলিয়া ইহাকে উষ্ণ স্রোত এবং মেরুপ্রদেশ হইতে প্রবাহিত স্রোতকে শীতল স্রোত বলে। উষ্ণ ও শীতল স্রোত-প্রবাহ পরীক্ষাগারে নিম্নবর্ণিত উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

একটি পাত্রে জল লইলাম। পাত্রের এক পার্শ্বে জলের উপর এক খণ্ড বরফ ঝুলাইয়া দিলাম। অপর পার্শ্বে একটি লৌহদণ্ডকে এরূপ ভাবে রাখিলাম যে, ইহার কিয়দংশ জলে এবং অবশিষ্টাংশ পাত্রের বাহিরে থাকে। লৌহদণ্ডকে উত্তপ্ত করায় ইহার নিকটস্থ জলের আয়তন বর্ধিত হইবে এবং উচ্চতাও অধিক হইবে, কিন্তু যে পার্শ্বে বরফ আছে সে পার্শ্বে জলের উচ্চতা কম হওয়ায় উষ্ণ জল বরফের দিকে যাইবে এবং স্রোতের সৃষ্টি হইবে। উত্তপ্ত জলে যদি কিছু রং ঢালিয়া দেওয়া যায়, স্রোতের গতি স্পষ্ট দেখা যাইবে। শীতল জলের উপর উষ্ণ জল আসায় শীতল জল নিম্নপ্রবাহী হইয়া উষ্ণতর স্থানের দিকে প্রবাহিত হইবে। পাত্রের উভয় পার্শ্বে যতক্ষণ এইরূপ উষ্ণতার তারতম্য থাকিবে, স্রোতও ততক্ষণ বহিবে। এক্ষণে উত্তপ্ত অংশকে বিষুবরেখা ও শীতল অংশকে মেরুপ্রদেশ কল্পনা করা যাইতে পারে।

সমুদ্রের কোন কোন অংশে উষ্ণতার আধিক্যে বাষ্পীভবন ক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হওয়ায়, সে স্থানে জলের অভাব পূরণের জন্য উহার পার্শ্ববর্তী স্থানের শীতল জলরাশি প্রবাহিত হইয়া আসে। ইহাতেও সমুদ্রে স্রোত উৎপন্ন হয়। আবার গভীরতার তারতম্যেও জলের উষ্ণতার বৈষম্য হয় এবং বায়ুপ্রবাহ ইহার সমতা রক্ষার চেষ্টা করে। এ জন্য দেখা যায় যে, একই অক্ষাংশে যে দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে সেখানকার জলের উষ্ণতা অপেক্ষা ইহার বিপরীত দিকের জলের উষ্ণতা অধিক।

এই সমস্ত সাধারণ নিয়মের অনুগামী হইয়া প্রধান প্রধান সমুদ্র স্রোতগুলি প্রায় একই গতিপথে প্রবাহিত হইতেছে। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবাধীন ভারত মহাসাগরীয় স্রোতে গতির কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। স্রোতের গতিপথ নির্ণয় করিবার জন্য উপকূলবর্তী বিভিন্ন স্থান হইতে শূন্য বোতল বা কাষ্ঠখণ্ড ভাসান হয় এবং তাহারা যে পথে অগ্রসর হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়া মানচিত্রে রেখাঙ্কন দ্বারা স্রোতের গতিপথ দেখান হয়।

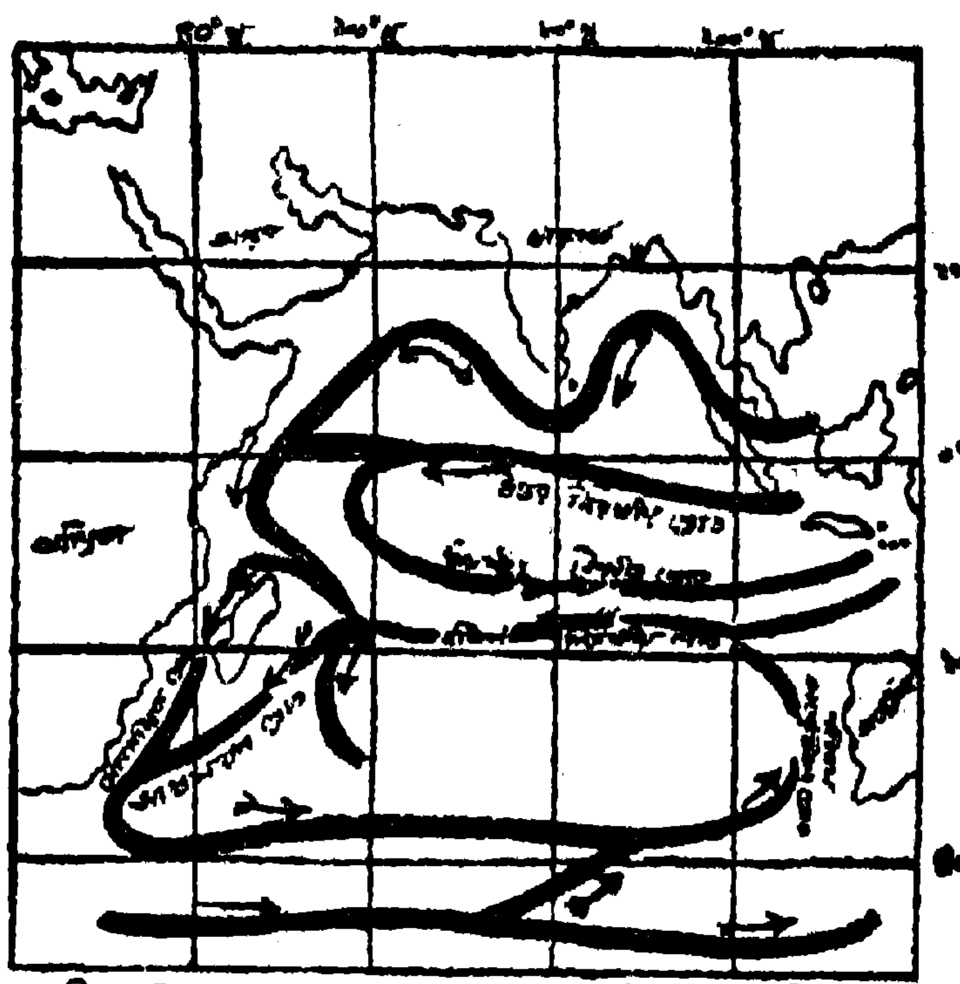

নিরক্ষীয় ও ভারত মহাসাগরীয় স্রোত, উষ্ণ স্রোত ও শীতল স্রোত

আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতের মোটামুটি দুইটি প্রধান ভাগ—বিষুবরেখার উত্তরে—উত্তর নিরক্ষীয় এবং দক্ষিণে—দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত। আয়ন বায়ুতাড়িত এই দুই স্রোত পশ্চিমাভিমুখে আমেরিকার পূর্ব উপকূল পর্যন্ত যায়; দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতটি সেণ্ট রক অন্তরীপে বাধা পাইয়া দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়; একটি শাখা ব্রেজিল-স্রোত নামে ব্রেজিলের উপকূল দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্বাভিমুখী হয় ও পুনরায় কুমেরু স্রোতের সহিত মিশে। এই মিলিত স্রোত বেঙ্গুয়েলা-স্রোত নামে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল বাহিয়া দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিশিয়াছে। অপর শাখাটি ক্যারিব সাগর অতিক্রম করিয়া মেক্সিকো উপসাগরে ও ফ্লোরিডা প্রণালী পার হইয়া উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিশিয়াছে। এই মিলিত স্রোত উত্তর-পূর্ব দিকে উপসাগরীয় স্রোত নামে প্রবাহিত হয়। উপসাগরীয় স্রোতের বিস্তার প্রায় ৪০ মাইল, গতিবেগ ঘণ্টায় ৫ মাইল এবং জলের উষ্ণতা ৮৫° ফারেনহাইট। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া প্রত্যায়ন বায়ুর তাড়নে এই স্রোত তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখা গ্রীনলণ্ডের পশ্চিম উপকূল দিয়া উত্তরে গিয়াছে, মধ্যেরটি উত্তর আটলান্টিক স্রোত (উপসাগরীয় স্রোত নামে অধিক পরিচিত) নামে বৃটিশ-দ্বীপপুঞ্জ ও নরওয়ের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া উত্তর সাগরে মিশিয়াছে। অপর শাখাটি ক্যানারী-স্রোত নামে পর্তুগাল ও আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূল দিয়া উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিশিয়াছে। উত্তর-আটলান্টিক স্রোতটি বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন করে ও পশ্চিম উপকূলে প্রচুর বৃষ্টি দান করে এবং এই স্রোতের উষ্ণতার প্রভাবে বৃটিশ-দ্বীপপুঞ্জ ও নরওয়ের বন্দর-

গুলি বরফমুক্ত থাকিয়া বাণিজ্যের সহায়তা করে। শেষোক্ত স্রোতটি (পরে যাহা ক্যানারি-স্রোত নামে পরিচিত) একটি প্রকাণ্ড জলাবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার অভ্যন্তরস্থ জলরাশিতে কোন স্রোত না থাকায় এখানে শৈবাল, কাষ্ঠ, জঞ্জালাদি জমিয়া থাকে। ইহাকে শৈবাল-সাগর (Sargasso Sea) বলে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের এই স্রোতগুলি উষ্ণ স্রোত। আয়ন বায়ু-তাড়িত উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের জন্য আফ্রিকা ও আমেরিকার উপকূলে জলের উচ্চতা একই সমতলে নয়—আমেরিকার উপকূলে জলের উচ্চতা আফ্রিকার উপকূল অপেক্ষা অধিক। বায়ুমণ্ডলস্থ নিরক্ষীয় শান্ত বলয়ে কোন বায়ুপ্রবাহ না থাকায় দুই স্রোতের মধ্যে একটি বিপরীতমুখী স্রোতের (Counter Equatorial Current) সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সুমেরু মহাসাগর হইতে দুইটি দক্ষিণবাহী শীতল স্রোত —একটি গ্রীণল্যাণ্ডের পূর্ব পার্শ্ব দিয়া, অপরটি বেফিন-বে দিয়া, প্রবাহিত হইয়াছে। ইহারা ল্যাব্রাডর উপকূলে মিলিত হইয়া শীতল ল্যাব্রাডর-স্রোত নামে আমেরিকার পূর্ব উপকূল বাহিয়া নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের সহিত মিলিয়াছে। গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের ন্যায় এই উভয় স্রোতের মিলন-ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সীমারেখা দেখা যায়। ল্যাব্রাডর-স্রোতের জল শীতল ও সবুজ এবং উপসাগরীয় স্রোতের জল উষ্ণ ও নীল। ল্যাব্রাডর-স্রোত এই মিলনক্ষেত্রে হিমপ্রাচীর (cold wall)রূপে বহিয়া যায়। সুমেরু মহাসাগর হইতে যে সকল হিমশৈল (Iceberg) শীতল স্রোতের সহিত ভাসিয়া আসে, তাহারা নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের উপকূলে উষ্ণ স্রোতের সংস্পর্শে আসিয়া গলিয়া যায় ও গ্রাবরেখার (Moraine) বালি সঞ্চিত হইয়া মগ্ন চড়ার (Sand bank) সৃষ্টি করে। এইরূপে ৩৭,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত Grand bank নামক বিশাল মৎস্য-শিকারক্ষেত্রের সৃষ্টি। উভয় স্রোতের মিলনে তাপের পার্থক্যহেতু নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট প্রায়ই কুয়াসা ও ঝড় হয়। এইরূপ কুয়াসাচ্ছন্ন এক রাত্রিতে শীতল স্রোত বাহিত হিমশৈলের সংঘাতে বিখ্যাত টাইটানিক নামক জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছিল। কুমেরু মহাসাগর হইতেও ঐরূপ শীতল স্রোত প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ-আমেরিকার দক্ষিণাংশে আসিয়া ইহা দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটি শাখা উত্তরাভিমুখী হইয়া ফকল্যাণ্ড-স্রোত নামে ব্রেজিল-স্রোতের সহিত মিশিয়াছে; অপরটি আফ্রিকার উপকূলে বেঙ্গুয়েলা-স্রোতের সহিত মিশিয়াছে। সুমেরু ও কুমেরু মহাসাগর হইতে প্রবাহিত শীতল স্রোতের জলে লাবণতা কম, সে জন্য প্রথমে ইহারা সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়া প্রবাহিত। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া যখন উষ্ণ স্রোতের সহিত মিশে, তখন উষ্ণ জলের ঘনত্ব অপেক্ষা শীতলতার জন্য ইহাদের জলের ঘনত্ব বেশী হয়। এই কারণে ইহারা নিম্নাভিমুখী হইয়া নিম্নপ্রবাহী হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত আটলাণ্টিক মহাসাগরীয় স্রোতের প্রায় অনুরূপ। তটভূমির ভগ্নতার জন্য স্রোতের গতিপথ কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে। উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত পশ্চিমাভিমুখে গিয়া উত্তর দিকে জাপানের পার্শ্ব দিয়া কুরোসিও বা জাপান-স্রোত নামে প্রবাহিত হইয়াছে। অনেক উচ্চতর অক্ষাংশে অবস্থিত হইলেও জাপানের জলবায়ু উষ্ণতর —কুরোসিও-স্রোতের একটি ক্ষুদ্র শাখা জাপানের পশ্চিম দিয়া জাপান সাগরে গিয়াছে। সে জন্য জাপানের পশ্চিম পার্শ্বও অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। পশ্চিম বায়ু-তাড়িত এই স্রোত প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া, এক অংশ বৃটিশ-কলম্বিয়ার পার্শ্ব দিয়া উত্তরে প্রবাহিত হয়, এবং অপর অংশ দক্ষিণে আসিয়া পুনরায় দক্ষিণ-নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিশে। এইরূপে উত্তর-প্রশান্তমহাসাগরেও একটি শৈবাল-সাগরের সৃষ্টি হইয়াছে। সুমেরু মহাসাগর হইতে আগত শীতল স্রোত বেরিং প্রণালী অতিক্রম করিয়া কামচাটকা উপদ্বীপের দক্ষিণে কুরোসিও-স্রোতের সহিত মিশিয়া ল্যাব্রাডর-স্রোতের ন্যায় কুয়াসা এবং টাইফুনের সৃষ্টি করে। ইহা ছাড়া অতি শীতল বেরিং-স্রোতের জন্য কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ, সাথালিন ও হোকাইদো দ্বীপে প্রবল শৈত্য অনুভূত হয় ও বৎসরে কয়েক মাস এ সকল অঞ্চল বরফাবৃত থাকে। পশ্চিমা বায়ু তাড়িত শীতল কুমেরু স্রোত দক্ষিণ-আমেরিকার পশ্চিম উপকূল দিয়া পেরু বা হামবোল্ট-স্রোত নামে প্রবাহিত হয় ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিশিয়া পশ্চিমাভিমুখে ৮০০০ মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এবং তিনটি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখা নিউ সাউথ ওয়েলস-স্রোত নামে অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল অতিক্রম করিয়া পুনরায় কুমেরু স্রোতের সহিত মিলিত হয়; এক শাখা অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর ভাগ দিয়া ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে এবং অবশিষ্ট শাখা উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হয়। দক্ষিণ-প্রশান্তমহাসাগরে বহু দ্বীপের অবস্থান হেতু দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতটি পশ্চিম উপকূলে পৌঁছিবার পূর্বে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় এবং পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে পুনরায় কুমেরু স্রোতের সহিত মিশিয়া পেরু-স্রোতের সৃষ্টি করে।

বায়ুপ্রবাহের সহিত সমুদ্রস্রোতের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা ভারতমহাসাগরীয় স্রোতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মৌসুমী বায়ু-প্রভাবে উত্তর-ভারতমহাসাগরীয় স্রোত মৌসুমী বায়ুর গতির সহিত নিজ গতিপথেরও পরিবর্তন করে। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতমহাসাগরীয় স্রোত অন্য দুই মহাসাগরীয় স্রোতের দক্ষিণাংশের অনুরূপ। ভারত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে প্রবাহিত শীতল কুমেরু স্রোতের অন্যতম শাখা পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়া স্রোত নামে অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল বাহিয়া উত্তরে অগ্রসর হয় এবং উত্তর-অষ্ট্রেলিয়া দিয়া প্রবাহিত

এক

নীচের গোলমাল ক্রমশঃ নেমে আসছিল। এতক্ষণ ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার গোলমাল, আরো ছোটদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে নানা রকমের বায়না, ঝি, চাকর, ঠাকুরের মধ্যে মন-কষাকষির সুস্পষ্ট কোলাহল এবং বাবুদের সান্ধ্য মজলিসে নানা বিষয়ের মতামত প্রকাশ বাড়ীটিকে সরগরম করে রেখেছিল।

সুরুচি এ বাড়ীর মেয়ে—বৌ নয়। এতক্ষণ নিজেকে বাড়ীর এই নানা বিষয়ের গোলমালের মধ্যে ছড়িয়ে রাখলেও এখন তার মনের মধ্যে কিছু আগের কোনো ছায়াপাত করছিল না—সে নিজেকে একেবারে সরিয়ে নিয়ে এসেছে নিজের মনের একান্ত সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য। দিনের উজ্জ্বল আলোর মধ্যেকার কর্ম্মব্যাপৃতা, হাস্য-পরিহাস-ময়ী সুরুচির সঙ্গে রাতের আঁধারের মৌন, অলস সুরুচির মোটেই মিল হয় না। অন্ধকার তার খুব ভাল লাগে, অন্ধকারের মধ্যে সে নিজের জীবনের প্রতিরূপটি ঠিক দেখতে পায়—অন্ধকারেরও ভাষা আছে, ধ্বনি আছে ; সে একলা হলেই কান পেতে সেই ধ্বনি শোনে, তাহার সাথে নিজের ভাষা-বিনিময় করে।

যে গোলমালের রেশটুকু এতক্ষণ পাওয়া যাচ্ছিল, তাও থেমে গেল। আলোগুলি সব গেল নিবে—এইবার অন্ধকার আরো প্রকট হয়ে উঠলো।

সুরুচি বসে আছে একই ভাবে। ভাদ্রের শেষ, গরম আছে বেশ, তাই জানালা-দরজা সবই খোলা আছে ; একটু পরেই সে উঠে দরজাটি বন্ধ করবে। গরমের জন্য বিকেলে স্নান করায় রাশীকৃত চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে রয়েছে। পরনে মোটা লাল-পাড় শাড়ী, হাতে সধবার লক্ষণ একগাছি করে শাঁখা—সধবার আর কোন চিহ্নই সে ধারণ করে না, কিন্তু এইতেই যেন সে দীপ্ত অগ্নিশিখা। যেখান দিয়ে সে চলে যায়, চেয়ে না দেখে কেউ পারে না। বাড়ীর সকলেই তাকে যথেষ্ট সমীহ করে বোঝা যায়, কিন্তু তার উপরেও আরো একটু কিছু করে মনে মনে—সেটা সোজা ভাষায় অনুকম্পা বলা যায়। সুরুচি যেমন বুদ্ধিমতী—সে-ও এটা বোঝে ; কিন্তু তার প্রকাশ নাই—সে নির্ব্বিকার।

ঘরের আলোটা একবার জ্বলে উঠেই নিবে গেল। সুরুচিও একবার চোখ ফিরিয়ে দেখে আবার জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে চেয়ে রইলো।

ঘরে যে ঢুকেছিল সে তারই একমাত্র ছেলে দীপক। ছেলেরও মায়ের মত স্বভাব। যত কথা তার, সবই তার এই মা'টির সঙ্গে। মায়ের মনের সঙ্গে ছেলের মনের এত মিল ছিল যে একের মনের আলো-ছায়া অন্যের মনেও দর্পণের মত ফুটে উঠতো।

দীপক বিছানায় শুয়ে পড়লো। সুরুচি তার সুগঠিত আঙুলগুলি দিয়ে তার মাথার চুলগুলি চিরে দিচ্ছিল। সারা দিনের পরে এইটুকু পাওয়া এবং দেওয়া তাদের মা-ছেলের নিত্যকারের অভ্যাস। কথা দু'জনেরই মুখে ছিল না—সুরুচি তার আঙুলগুলির ভিতর দিয়ে মাতৃস্নেহের বিমল ধারা ছেলের মাথায় ঢেলে দিচ্ছিল আর দীপক সেই স্নেহধারা মনে-প্রাণে অনুভব করে শক্তিসঞ্চার করে নিচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে সুরুচি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "আজও কি ভোর বেলা তোকে এগিয়ে দিতে হবে?"

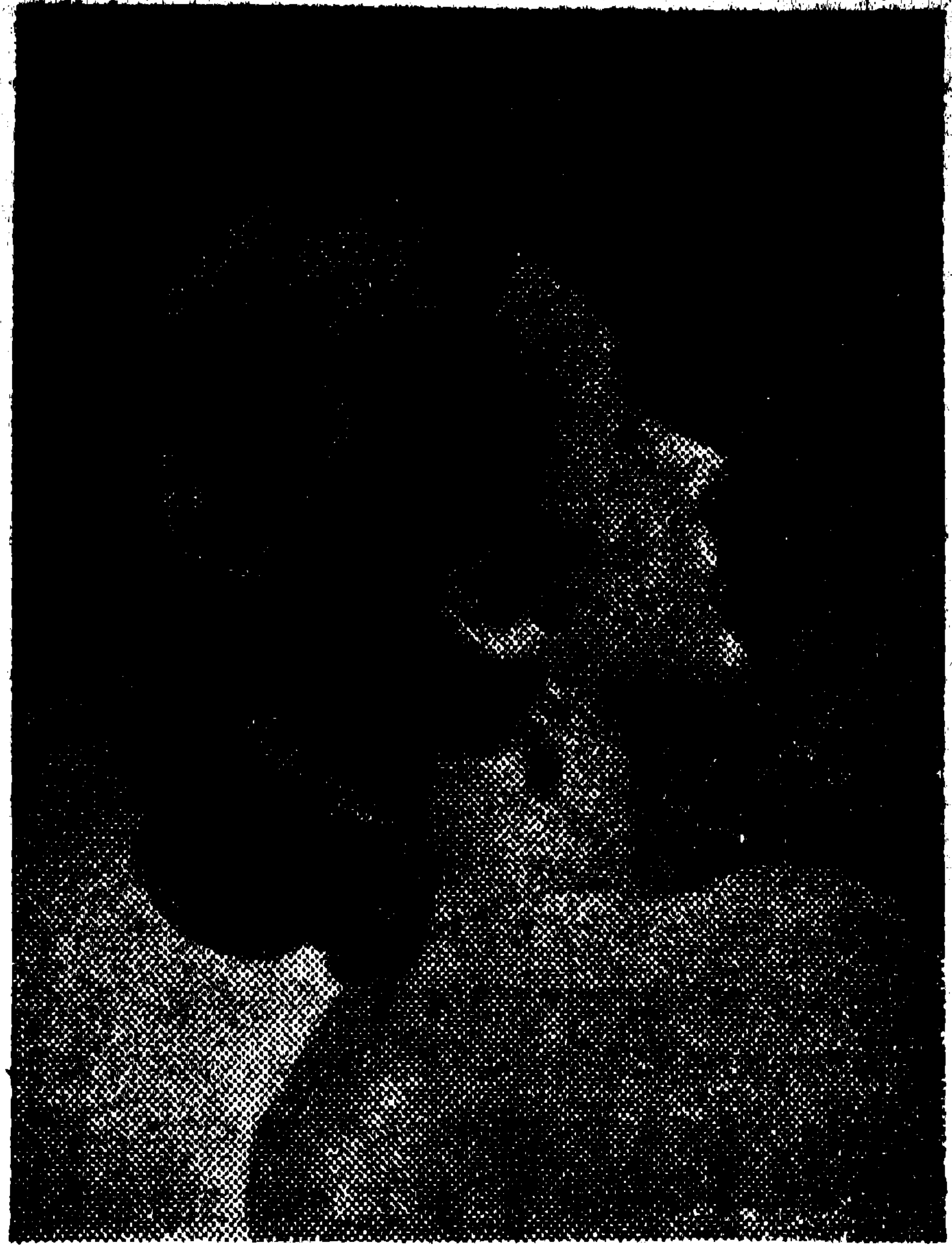

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

মায়ের আর একখানা হাত টেনে নিয়ে তার উপর মুখ রেখে দীপক বললে, "হ্যাঁ মা। তোমার ভোরের ঘুমটুকু আমার জন্য এ ক'দিন নষ্ট হবেই, আমি আবার যা ঘুমকাতুরে ডেকে না দিলে হয়তো সময় মত উঠতেই পারবো না।"

সুরুচি হাসলো নীরবে—ভাবলে, তার কত রাত্রি যে একেবারে বিনিদ্র কেটে যায় তার খবর পাশে থেকেও দীপক জানতে পারে না, তাই আসন্ন পরীক্ষার পড়ার জন্য তাকে ভোরে ডেকে দিতে হবে—মায়ের কর্ম্মক্লান্ত বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটবে ভেবে সঙ্কুচিত হচ্ছে। সন্তানেরা কি বোঝে মায়েরা অতন্দ্র মন নিয়ে তাদের কল্যাণ চিন্তা করেই যায়।

মা ও ছেলে, দু'জনেই দু'জনের চিন্তায় ডুবে-গিয়েছিল। ছেলের আসন্ন পরীক্ষার চিন্তা—কারণ তার ভবিষ্যৎ এর ফলাফলের উপর নির্ভর করছে। আর মায়ের? সুরুচি ভাবছিল, দীপক যদি ভাল ভাবে পাশ করে যায় তাহ'লে তার মনের এত দিনের যে একটি আশা গোপনে অঙ্কুরিত হয়ে রয়েছে সেটিকে প্রকাশ করে ফেলবে।

হঠাৎ চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে সুরুচি বললে, "তুই ঘুমিয়ে পড় দীপু, আমি ঠিক সময়ে তোকে ডেকে তুলব।—" বলে সে-ও শুয়ে পড়লো, ঘুম তার তখুনি এলো না—এলো-মেলো কত কি চিন্তার জালে জট পড়ে পড়ে এক সময়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

সব চাওয়া মোর যদি হলো ভুল

[redacted] রায়চৌধুরী

দুই

এ বিবাহ-ব্যাপার এই কাহিনীর অঙ্গ—তার পূর্বকথা কিন্তু এমন সুপ্রশান্ত ছিল না।

জীবেন চৌধুরী হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে সবে ফিরেছেন কলকাতায়—কলকাতার সমাজে তাঁকে নিয়ে রীতিমত একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়ে গিয়েছে। অবিবাহিতা মেয়েদের চেয়ে তাদের মায়েদের মধ্যেই যেন তাঁকে নিয়ে রেষারেষির ভাবটা বেশী চলছিল। কার বাড়ীর পার্টিতে তিনি কতক্ষণ সময় কাটান, এটা যেন গুরুতর ব্যাপার হয়ে পড়ছিল তাঁদের কাছে। চৌধুরীর কিন্তু এ-সব দিকে কোন লক্ষ্য ছিল না—বহু দিন পরে দেশে ফিরে একটা হাল্কা আনন্দে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে সুরুচির সংস্কৃত মনটি ধাক্কা দিয়ে গেল।

সুরুচির বাবা কমলকৃষ্ণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্ত্রীর প্ররোচনায় সামাজিক দু'-একটা ব্যাপারে জীবেনের সাথে সামান্য পরিচিত হলেও তাকে যে কোনও প্রকারে জামাতা করে নেবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। স্ত্রী অসীমা এই নিয়ে অনুযোগ তুললেই তিনি তাঁকে একটি কথায় থামিয়ে দিতেন, বলতেন—"যোগাযোগ হলে আপনিই হবে। এই নিয়ে আমি একটা 'মণ্ডলী' তৈরী করতে পারব না।"

সুরুচি বাপ-মায়ের একটি মাত্র মেয়ে আর তাঁদের সবগুলি সন্তান ছেলে। এ ক্ষেত্রে দাদাদের চেয়ে আদর-আবদার তার বাড়ীতে বেশীই ছিল। ছোট বেলায় দাদাদের সঙ্গে 'মানুষ' হয়ে তার মধ্যে মেয়েলীপনার চেয়ে পুরুষ-ভাব বেশী ফুটে উঠেছিল, ফলে স্বাধীন মতামত প্রকাশ তার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। সাঁতার থেকে আরম্ভ করে ঘোড়ায় চড়া পর্য্যন্ত সব বিষয়েই সে দাদাদের সঙ্গে যোগ দিত।

ভগবানের ইচ্ছায়ই হোক বা সুরুচির মায়ের ইচ্ছাশক্তির জোরেই হোক, জীবেন চৌধুরী এই তেজস্বিনী মেয়েটিকে কমলকৃষ্ণের কাছে চেয়ে বসলেন। সুরুচিকে যতই দেখছিলেন ততই তিনি স্থির করে ফেলছিলেন যে তাঁর এই বেপরোয়া জীবনের লাগামটি যদি কড়া-হাতে কেউ ধরতে পারে তো সে এই মেয়েটিই পারবে।

বলা বাহুল্য যে, সুরুচি সম্বন্ধে মনস্থির করতে কমলকৃষ্ণের কিছু মাত্র দেরী হলো না—যেন সব ঠিক করাই ছিল, শুধু একটা কথার অপেক্ষা—শুভ লগ্নে বিবাহিতা হয়ে সুরুচি স্বামীর সঙ্গে তাঁর কর্মস্থল সুদূর দাক্ষিণাত্যে চলে গেল।

জীবনের পূর্ণতার যেটুকু বাকী ছিল স্বামী তা এনে দিলেন। দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন জীবনযাত্রা, চলা-ফেরার সহজ সরল দৃঢ়তা সুরুচির মনকে আরো সতেজ করে তুললো—এর ওপর স্বামীর স্নেহ মিশে একটি মধুর লালিত্য তাকে ঘিরে রইলো।

মাসের প্রথমে জীবেন তাকে তার অধ্যাপনার মূল্য এনে দিয়ে বললে, "এই আমার বর্ষা এবং সর্ব্বস্ব।"

বেশ সপ্রতিভ ভাবেই সুরুচি সেই টাকাগুলি একটি একটি করে গুণে বললে, "এ তো অনেক টাকা—এত কি হবে?"

হাসতে হাসতে জীবেন বললে, "তোমার, খাওয়া-পরা এবং খেয়াল-খুশীর খরচের মূল্য—[illegible]" ... বা জাপানের ...

অনুমান করে সুরুচি বললে ... এত টাকা লাগবে না আর তোমার টাকায় আমার খেয়াল মিটবে কেন? আমি নিজেই রোজগার করতে পারি। দক্ষিণী মেয়েরা—"

বাধা দিয়ে জীবেন বললে, "থাক্—আমি স্বীকার করছি যে তোমার দক্ষিণী মেয়েরা ও তুমি সবই পারো।"

দিন এমনি হালকা হাওয়ায় উড়ে যায়—একটানা দু'বছর দাক্ষিণাত্যে কাটিয়ে সুরুচি আবার কিছু দিনের জন্য তার পুরানো আবেষ্টনীতে ফিরে এলো সন্তান-জন্ম-সম্ভাবনা নিয়ে।

যথাসময়ে এলো সন্তান,—পুত্র। টেলিগ্রামে খবর পেয়ে জীবেন চলে এলো কলকাতায় সুরুচির কাছে। কয়েক দিন কাটিয়ে তার ফিরে যাওয়ার সময় হলো। যাওয়ার আগে সে সুরুচিকে বললে, "এবার আমি একা যাচ্ছি, মাস দুই পরে আবার আসবো তখন আর একা ফিরব না—ভাল করে সেরে উঠো। আর হ্যাঁ—এটার জন্য কি-সব দরকার হতে পারে—আমি জানি না ঠিক—তার জন্যে এটা রেখে দেও।" বলে একটা নোটের বাণ্ডিল সুরুচির বিছানার ওপর ফেলে দিলে। যেতে যেতে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে সে বললে, "হ্যাঁ, ওর নামও একটা আমি ঠিক করেছি—'দীপক নারায়ণ' বা 'প্রদীপ'—যেটা তোমার পছন্দ হয়।"

মৃদু হেসে সুরুচি বললে, "প্রদীপও নয়—নারায়ণও নয়—শুধু 'দীপক' ওর নাম থাক্।"

"মেয়ে হলে কিন্তু "রাগিণী" নাম রাখতাম বলে জীবেন আর একবার সুরুচিকে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠার তাগিদ দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

তিন

দীপককে নিয়ে যথাসময়ে সুরুচি ফিরে এলো। ফিরে এসে দেখলো, প্রফেসর জীবেন চৌধুরীর পারিবারিক মোহ ও মাধুর্য্য অনেক পরিমাণে কমে এসেছে। আর এই দু'টির জায়গায় 'নামের মোহ' ও ধনী হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্থান নিয়েছে। দিন-রাত জ্ঞান নাই, আহার-নিদ্রার স্থিরতা নাই, স্ত্রী-পুত্র মনে স্থান পায় না—প্রফেসর তার 'ফরমুলা' আবিষ্কারেই মত্ত।

চাকরকে জিজ্ঞাসা করে জানলো যে ল্যাবোরেটরী ঘর থেকে সাহেব দু'এক বার দু'-তিন দিন পরেও বেরিয়েছেন—তাদের ওপর হুকুম দেওয়া আছে যে তাঁর খাবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে ওরা যেন খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়। একটার পর একটা খাবার ওরা দিয়ে আসে—পরের খাবারটা দেওয়ার সময় প্রায়ই দেখে আগেরটা খাওয়া হয়নি। দু'-এক বার বলেও কোন ফল হয়নি—সাহেব এমন রাগ করেন। এইবার তো 'মায়িজী' এসেছেন—যদি বলে বলে সাহেবকে খাওয়াতে পারেন। মনিব 'উপবাসী' থাকলে খাওয়ায় কারই বা সুখ লাগে?

অনেক দিনের পুরানো চাকর—তার কাছে সুরুচি বসে বসে জিজ্ঞাসা করে অনেক কথা শুনলো। ইতিমধ্যেই সে তার কর্ত্তব্য স্থির করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ল্যাবোরেটরীতে ঢুকে পড়লো।

ঘরে ঢুকে সুরুচিও বাক্যহারা ও নিমেষহারা হয়ে চেয়ে রইলো। বৈজ্ঞানিকের সাধনা-ক্ষেত্রে এর আগে এমন করে ঢুকবার সুবিধা তার হয়নি। কত রকমের, কত আকারের কত রংয়ের জিনিসপত্র যে প্রকাণ্ড লম্বা টেবিলটিতে জায়গা নিয়েছে তার সংখ্যা নাই। টেবিলটির ওপরে হাতে মাথা রেখে চৌধুরী প্রোফেসর [illegible]

টাট্‌কা রাখার পেছনে আছে প্রচেষ্টা

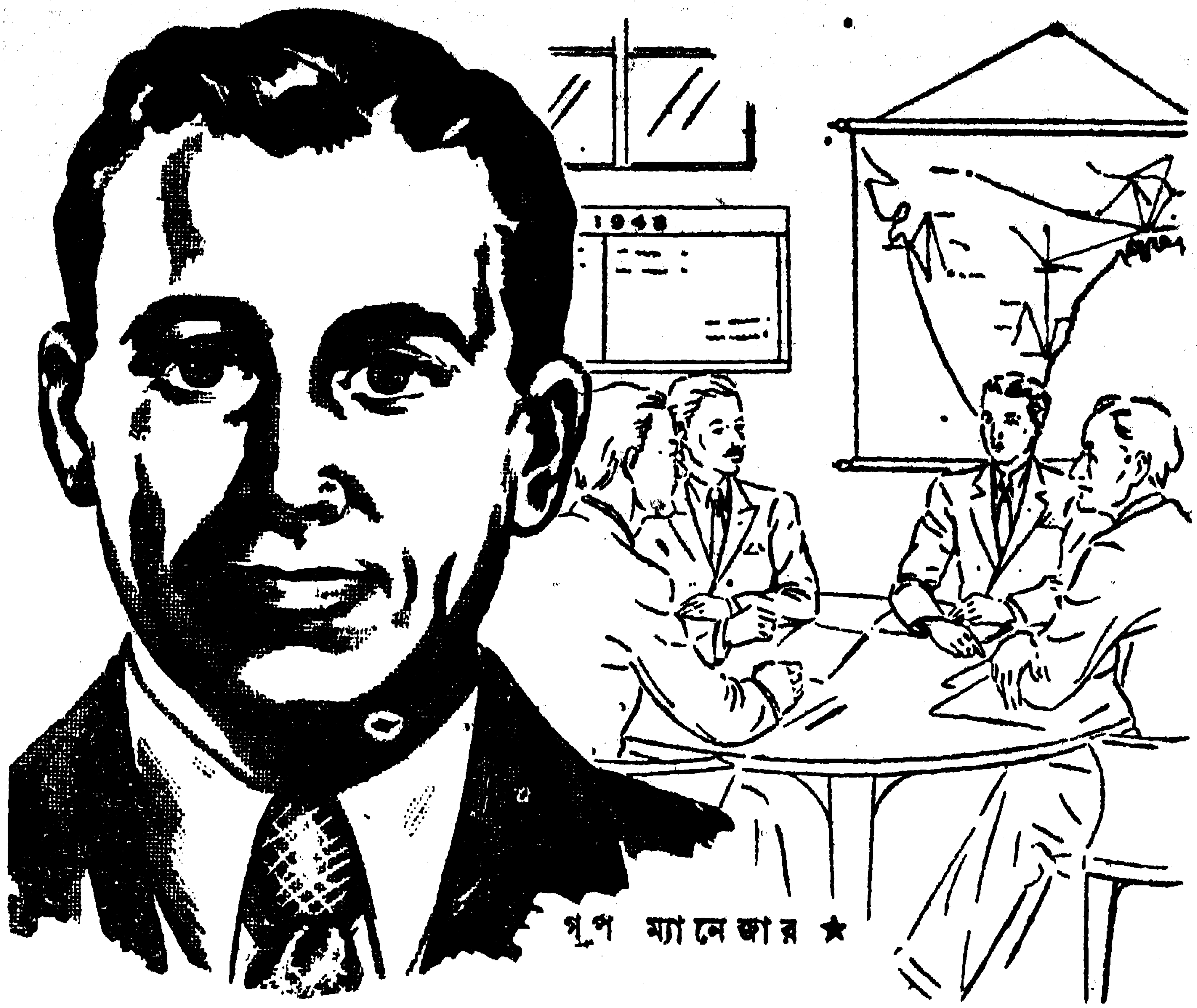

এঁর কাজ হচ্ছে ব্রুক বণ্ড-এর হেড অফিসের
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে একসঙ্গে অনেক-
গুলো শাখা অফিসের মধ্যে কাজের সমন্বয় রক্ষা করা।
নিয়মিতভাবে সরবরাহ এসে পৌঁছানো বেশীর ভাগ এঁর
নির্দ্দেশের উপরই নির্ভর করে। ব্রুক বণ্ড-এর নিজস্ব সরবরাহ
প্রতিষ্ঠানের ইনি একজন দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মী; এঁরই উদ্যোগে
ক্রেতার হাতে এসে পৌঁছয় স্বাদে ও গন্ধে ভরপুর,
টাট্‌কা ব্রুক বণ্ড চা।

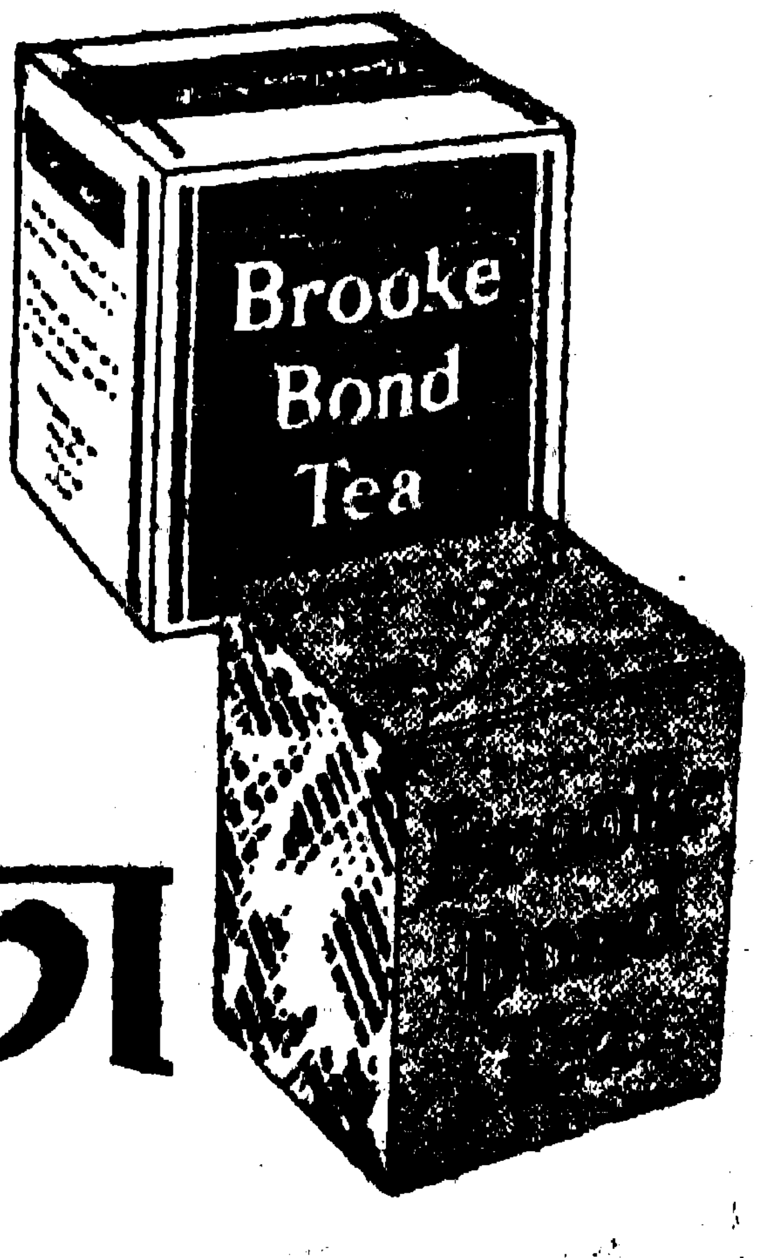

ব্রুক বণ্ড চা

দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি

ধীর-পায়ে কাছে গিয়ে সুরুচি বললে, "আমি এসেছি।" তার মৃদুস্বর চৌধুরীর কানে গেল না। সুরুচি এবারে তার রুক্ষ অগোছালো চুলগুলি গুছিয়ে দিতে দিতে আবার বললে, "আমি এসেছি।"

সুরুচির আঙুলের ছোঁওয়ায় প্রফেসার যেন চেতনা পেয়ে জেগে উঠলো; বললে, "এসো এসো রুচি—আমি হয়তো ঠিক এই জিনিসটাই চাইছিলাম—কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না।"

চার দিকে ছড়ানো টেষ্ট টিউব, যন্ত্রপাতি, তারই এক ধারে সকালের খাবার অভুক্ত পড়ে রয়েছে—ঘরের এক দিকে পুরোনো একখানা কৌচের ওপর একটা ময়লা ওয়াড় দেওয়া বালিশ ও ততোধিক ময়লা বেড-কভার পড়ে আছে। উপরের শোওয়ার ঘরে চমৎকার পুরু গদীর ওপর নরম বিছানা পাতা পড়েই থাকে—সে ঘরে যাওয়ার বা শোওয়ার সময় সব দিন হয় না। সুরুচির হাত চৌধুরীর মাথায় সমভাবেই চললেও মন তার অনেক কিছু দেখছিল।

প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে জীবেন বললে—"এইবার থামো রুচি, আর বেশীক্ষণ হলেই আমি আরামে ডুবে যাব—আমার সাধনা, আমার একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি যাও—আমাকে আমার কাজে ডুবে যেতে দেও।"

সুরুচি বললে, "কিন্তু এমন করে সাধনা করলে যে শরীর নষ্ট হবে, তখন তো আর কোন কিছুই করতে পারবে না। আমি তোমাকে আমার চোখের সামনে এমন করে নষ্ট হতে দেব না। চলো, এখন একটু বিশ্রাম করে নেবে। আমি শুনলাম যে তোমার খাওয়া-শোওয়া কোন কিছুরই স্থিরতা নেই। আমার কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু দীপুর ভবিষ্যৎ কি তুমি এমনি করে নষ্ট করে দিতে চাও?"

অর্থহীন শূন্যদৃষ্টিতে প্রফেসর কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো, পরে বললে, "না, তা চাই না—দেখো ওকে আমি কত বড় বৈজ্ঞানিক করে আনব, কত কি যে অনাবিষ্কৃত হয়ে আছে তার কতটুকুই বা আমি জানি! এক জীবনে এই সাধনা শেষ হবে না—জন্ম-জন্ম ধরে সাধনা করলে যদি কিছু হয়। মহাসাগরের তীরে বসে শুধু পাথর কুড়িয়ে যাচ্ছি, সাগরের ভিতরে যে কি আছে জানি না।"

দরজার কাছে শিশু-কণ্ঠের কলধ্বনি শোনা গেল, সুরুচি দীপককে নিয়ে ফিরে এলো—জীবেন তার দিকে চেয়ে বললে, "আমার বড় ইচ্ছা, আমি যদি না পারি, তুমি একে বৈজ্ঞানিক করে তুলো।"

মাস-দুই পরে রাত্রে ঘুম ভেঙে সুরুচি দেখলে বিছানায় স্বামী নাই—মাথার মধ্যে তার দ্রুত একটা প্রবাহের সঞ্চার হলো। চৌধুরী এসে নিজের খাটে শুয়ে পড়লে সে তো নিজেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে—তবে!

দ্রুত-পায়ে সে নীচে নেমে গেল—ল্যাবোরেটারী থেকে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে—অতি উজ্জ্বল আলো। ঘরের দরজা ঠেলে দেখলে ভিতর থেকে বন্ধ। কি করবে ঠিক করতে না পেরে চাকরকে ডেকে ঘরে ঢুকবার অন্য দরজা যেটি শুধু বাহিরে থেকেই বন্ধ করা যায়—সেইটি খুলে দিতে বললে।

ঘরে ঢুকে সুরুচি দেখলে, সামনের টেবিলে দু'টি হাত ছড়িয়ে দিয়ে চৌধুরী কেমন এক অদ্ভুত ভাবে ঘুমিয়ে আছে। [illegible] তার [illegible]—কি ঘুম এ! 'মরা-ঘুম' নয় তো!

[illegible]

নিশ্বাস ফেলে চাকরকে বললে—"সাহেবকে এই কৌচে শুইয়ে দিয়ে তুমি ডাক্তারকে খবর দাও।" তার মনে তখন কি যে হচ্ছিল তা বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল না।

চাকর বাহিরে চলে যাওয়ার পরে [illegible] একা অসুস্থ স্বামী নিয়ে বসে থাকতে থাকতে টেবিল-ভরা শিশি, ঔষধ, আরক ও টিউব এবং নানা রকমের যন্ত্রপাতির দিকে চেয়ে তার চোখের কোণে জল জমলো।

ডাক্তার এলেন এবং যথারীতি পরীক্ষা করে যে রিপোর্ট দিলেন তা শুনে সুরুচির পাথরের মত শক্ত মনখানাও নিমেষে ভেঙে পড়বার মত হলো।—সর্ব্বাঙ্গব্যাপী পক্ষাঘাত—ভাল তো হয়ই না।—শুশ্রূষা এবং ভাল খাওয়া-দাওয়ার গুণে যে ক'দিন বেঁচে থাকে, জড়ের মতোই হয়ে থাকে। সুরুচির চোখের জলের বিরাম থাকলো না।

চার

আর একটি বার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে সুরু হলো। সুখের নীড়টি ভেঙে দিয়ে, তার সকল চিহ্ন লুপ্ত করে দিয়ে সুরুচি ছোট্ট দীপক এবং অসুস্থ, অর্দ্ধ-চেতন স্বামী নিয়ে একাই ফিরে চললো কলকাতায়। এ পর্য্যন্ত নিজের এত বড় বিপদের কথা সে আপনার জন কা'কেও জানায়নি—হয়তো তাদের কাছে পেলে তার অনেক দিকে সুবিধা হতো, কিন্তু তাদের সহানুভূতির ছোঁওয়া পেয়ে সে নিজে হয়তো ভেঙে পড়তো। সঙ্গে একটি মাত্র ডাক্তার আর সব সে একাই—

কলকাতায় পৌঁছে তার প্রথম কাজ হলো হাসপাতাল খুঁজে সেখানে চৌধুরীকে আজীবন রাখবার ব্যবস্থা করা। ডাক্তারের সহায়তায় সে-কাজ সহজেই হয়ে গেল। এতক্ষণ সুরুচি বেশ শক্তই ছিল, কিন্তু সারা জীবনের মত স্বামীকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দিয়ে ফিরে আসা তার পক্ষে সহজ হলো না। বিছানার উপরে পড়ে আছে চৌধুরী, জীবিত কি মৃত বুঝবার যো নাই—চলে আসার সময়ে কোন কথাও তাকে বলা যাবে না—প্রাণ আছে, অথচ প্রাণবানের মত কিছুই নয়—এ কি দুর্দ্দৈব! সুরুচির চোখে আবার জল এসে পড়লো। মনে এলো—বিজ্ঞানের কি একাগ্র সাধনাই যে এই লোকটির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো!

সুরুচির সঙ্গের ডাক্তারটি মাদ্রাজী—অতি ভদ্র এবং সজ্জন। বললেন, "চলুন মিসেস্ চৌধুরী, আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।" শূন্যতায় ভরা চোখ দু'টি তুলে সুরুচি বললে, "আপনি আমার জন্য অনেক করলেন আর আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না—এ পথটুকু আমি একাই যেতে পারব।"

বাধা দিয়ে ডাক্তার বললেন, "তা হয় না মিসেস চৌধুরী, আমি ডাক্তার হলেও মানুষ—এ পর্য্যন্ত আপনার মনের যা পরিচয় পেয়েছি তাতে আমি অবাক্ হয়ে গিয়েছি—কেবলই ভাবছি যে নিজের এই বিপদে আপনি একা—কি করে এমন অটল হয়ে রয়েছেন।"

সুরুচির মন আর পারছিল না—সে যেন মোহগ্রস্তের মত হয়ে পড়ছিল। আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ীর ঠিকানাটি বলে দিয়ে সে আগেই গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলো। ছোট্ট দীপক তার আধো-আধো বুলিতে কত অনর্গল কথাই যে বলে গেল সে-সব কিছুই তার কানে পৌঁছালো না।

[illegible] বাড়ীর [illegible] গাড়ী ঢুকতে [illegible] নিজেই এগিয়ে [illegible]

করছিলেন। দরজা খুলে ডাক্তার আগেই নামলেন—পিছনে স্থরুচি নেমে এলো।

হঠাৎ স্থরুচিকে দেখে কমলকৃষ্ণ অবাক্ হয়ে গেলেন—স্তম্ভিত হলেন তার রুক্ষ বেশ-বাস দেখে। চশমার মধ্যে দিয়ে স্তিমিত চোখ দু'টি যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে দেখলেন, নাঃ, সিঁথির আগায় সিঁদুরের লালিমা তো দেখা যায়! তবে?

স্থরুচি ততক্ষণে তাঁর দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েছে—তার কেবলই ভয় হচ্ছিল যে স্নেহময় পিতার সম্ভাষণে সে বুঝি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারবে না।

ভিতর-বাড়ীতে তখন সন্ধ্যার সমাগমে কাজ-কর্মের সমারোহ পড়ে গিয়েছে। বৌএরা এবং মা অসীমা রান্না, ভাঁড়ার ও খাবার-ঘরের তদারকে ব্যস্ত—ছেলেমেয়েদের কোলাহল মাঝে-মাঝে সব ছাপিয়ে উঠছে, এর মধ্যে স্থরুচি গিয়ে দাঁড়াতেই অসীমা নিজের চোখকে হঠাৎ বিশ্বাস করে উঠতে পারলেন না।

"এ কি খুকী?—খবর-বাদ কিছু নেই—হঠাৎ অসময়ে কি করে এলি? দীপু কই?"

স্থরুচির এতক্ষণের যত্নের বাঁধ আর বাধা মানলো না। মায়ের গলা জড়িয়ে ছোট মেয়ের মত কাঁধে মাথা রেখে বললে, "মা, ওর সর্ব্বাঙ্গব্যাপী পক্ষাঘাত হয়েছিল—হাসপাতালে এইমাত্র রেখে তোমার কাছেই ফিরে এলাম।" "চোখ দিয়ে তার এইবার টপ-টপ করে জল পড়ছিল।

চারি দিকে সকলে ভীড় করে দাঁড়িয়ে—অসীমা মেয়ের কথায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন—অবুঝ শিশুর দলও কি একটা বিপদপাতের আশঙ্কায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে ছোট্ট দীপককে কোলে নিয়ে কমলকৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন—স্ত্রীর কোলে তাকে দিয়ে স্থরুচিকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে তিনি শুধু বলে যেতে লাগলেন, "মা খুকি, তুই এত শক্ত হলি কি করে? আমাকে তো তুই কিছু জানালি না!"

একে, দুয়ে সকলেই জানলো এবং বুঝলো যে, স্থরুচির সুখের দিন চিরদিনের মতই অস্ত গিয়েছে—এখন শুধু ক্ষীণ অস্তলেখার মত ম্লান আলোটুকু মাত্র ভরসা।

কমলকৃষ্ণ এই দুর্ঘটনাকে সহজ ভাবে নিতে পারেননি—ঈশ্বরে বিশ্বাসী মন তাঁর বিদ্রোহ না করে একেবারে ভেঙে পড়লো আর অসীমা একটি দিন জামাইকে দেখে এসে সেই যে শয্যা নিলেন আর উঠলেন না। স্বামি-স্ত্রী তাঁরা অল্পদিনের ব্যবধানে লোকান্তরিত হলেন।

ধীরে কালস্রোত গড়িয়ে চললো। স্থরুচি অসীম ধৈর্য্য নিয়ে দীপককে মানুষ করার আশায় ভায়েদের কাছে রয়ে গেল আর বৈজ্ঞানিক জীবেন চৌধুরী, অতি সাধারণ মানুষের চেয়েও জড়তা-ভরা মন ও দেহ নিয়ে হাসপাতালে রইলেন।

পাঁচ

সকালের আলো সবে মাত্র দেখা দিয়েছে—দীপককে ভোরের সুখ-নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিয়ে স্থরুচি নিত্যকার মতো গৃহকর্মে চলে গিয়েছে। নীচে থেকে সজীব গৃহস্থালীর অস্পষ্ট কোলাহল ভেসে আসছিল—তিন-তলার একটি ছোট ঘরে দীপক তার শেষ পরীক্ষার পড়া একমনে করছিল।

সব দিন ক'টি ভাল ভাবে কেটে গিয়েছে, আজকের দিনটি পরীক্ষা দিয়ে এলে তবে ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারবে দীপক; সামনে বই রেখে এই সবই ভাবছিল—এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপরেই তার ভবিষ্যৎ জীবন অনেকটা নির্ভর করছে। বাবাকে মনে পড়ে না—মাকে দেখে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের মূর্ত্তি—মুখে মৃদু হাসিটি লেগেই আছে, এই তো গেল দিবসের পরিচিতা মা—রাত্রে এই মাকেই সে দেখে অন্য মূর্ত্তিতে। সে জানে যে সেই রূপই তার মায়ের আসল রূপ। কত আশায় বুক বেঁধে মা যে তার পরীক্ষার ফলটির জন্য চেয়ে আছেন তা সে জানে। মায়ের এই ইচ্ছা সে অপূর্ণ রাখবে না। দীপক বই টেনে নিয়ে বসলো—দেখলো কিছুই পড়া হয়নি—বেশীর ভাগ যা পড়েছিল তা যেন সবই ভুলে যাচ্ছে মনে হলো। পর-পর মাস দুইএর অনিয়ম ও অনিদ্রায় মাথা যেন গোলমাল হয়ে যেতে লাগলো। বই রেখে দিয়ে দীপক ঘরময় পায়চারী করতে লাগলো।

বেলা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত ছেলের কোন খবর না পেয়ে স্থরুচি উপরে উঠে এলো; দেখলো বই খোলা পড়ে—খোলা ছাদে দীপক ঘুরে বেড়াচ্ছে—উন্মনা হয়ে। দৃষ্টি বিভ্রান্ত, পদক্ষেপ অসম। কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে সে ডাকলো, "খোকা!"

দীপকের কাছ থেকে কোনো সাড়া এলো না। রৌদ্রভরা ছাদে অসম পদক্ষেপে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে তো বেড়াচ্ছেই। স্থরুচি এবার যেন ভয়ে ভয়ে, অন্যে না শোনে, এমন স্বরে ডাকলো, "খোকা—দীপু!"

দীপক দ্রুত-পায়ে মায়ের কাছ পর্য্যন্ত এলো—আরক্ত চোখ দু'টি তুলে জিজ্ঞাসা করলো, "টেলিমেকাস্ কে? পিনেলোপী কে?"

ছেলের মুখের এই দু'টি কথাতেই স্থরুচি চম্কে উঠলো—এ কি?—বিজ্ঞানের ছাত্র—টেলিমেকাস বা পিনেলোপীর আখ্যান নিয়ে কি করবে? তবে কি এ-সব জ্ঞানলোপ হওয়ার লক্ষণ? উচ্চ আশা মনে নিয়ে বেশী পড়ে শেষে এই কি তার পরিণতি? স্থরুচির নিজের মাথাও যেন শূন্য মনে হতে লাগলো।

বেলা বেড়ে চললো, কিন্তু অন্য দিনের মত দীপক আজ এখনো প্রণাম করতে এলো না দেখে স্থরুচির বড় দাদা ধীরে ধীরে তার সন্ধানে পড়ার ঘরে এসে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে তাঁর বাক্য-লোপ হয়ে গেল। দেখলেন যে ছাদভরা রৌদ্রের মাঝে দীপক অবিশ্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তার দিকে অপলক চোখে স্থরুচি চেয়ে আছে। শিষ্ট, শান্ত, সুবোধ ছেলের একটি রাত্রের মধ্যে কি হলো, তা তিনি বুঝতে পারলেন না—শুধু বুঝলেন, ধীরে ধীরে উন্মাদের সকল লক্ষণই ফুটে উঠছে। আদরিণী বোনটির কথা ভেবে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন।

হঠাৎ দীপক সকলকে চমকিত করে উচ্চকণ্ঠে গেয়ে উঠলো "—আমি ঢের সয়েছি, আর তো সবো না।" এর আগে বাড়ীতে কেউ তার উঁচু স্বরই শোনেনি।

সজন বাবু—স্থরুচির দাদার কেবলই মনে হতে লাগলো, ভগবানের এ কি বিচার? যার জীবনের মুকুল প্রস্ফুটিত হতে না হতে শুকিয়ে এসেছিল, ফুলের মেলা যার জীবনে হলো না, তার জীবন নিয়ে এ কি নিষ্ঠুর প্রহসন? কাছে এসে বোনের হাতটি ধরে তিনি তাকে নিয়ে যেতে স্থরুচি বাঁধ-ভাঙা সজীব ...

বললে, "দাদা, দীপু কি আবার পাগল হয়ে গেল ? আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না দাদা ! ওঃ ভগবান ! শেষ আশার বর্তিকাকে এমনি করে নিবিয়ে দিলে ?"

নীচে অবিরত টেলিফোন বেজে চলছিল—খবর শোনা গেল, "হাসপাতালে এইমাত্র জীবনে চৌধুরী মারা গেলেন—তাঁর দেহের সৎকার সম্বন্ধে তাঁরা উপদেশ চান।"

সজনী বাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন—সুরুচির ভাগ্য দেখে। উপরের ঘরে দীপকের মুখে তখন অনর্গল যে গান এবং বক্তৃতা চলেছে সে-সব কথার কোন যুক্তি বা অর্থ হয় না।

সুরুচিকে কিছু না বলেই তিনি হাসপাতালে চলে গেলেন। দিনের প্রখর আলোর মধ্যে সুরুচির চোখে বিশ্বের অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

চিন্তা

প্রীতি নন্দর

পিছনের দিনগুলি অন্ধকারে কুয়াশার মতো
মনের গভীরে ফেরে নিরুদ্বেগে দৃষ্টি অগোচরে,
ধীরে ধীরে মুছে যায় বাসনার কালো কালি যতো,
পুঞ্জ পুঞ্জ ক্লান্তি জমে রজনীর দুষ্ট স্বপ্ন ভ'রে।

জীবনের যতো চাওয়া কি জানি কি অর্থ ছিল তার,
কি এসেছে কি আসেনি সে হিসাব হয়নি তো ঠিক,
আজিও সে রচিতেছে নিজ হাতে নিজ কারাগার
পথে পথে জমে রাত্রি, ঊর্ধ্বশ্বাসে ফেরে দিগ্বিদিক্।

চপল চোখের দিঠি যৌবনের উচ্ছসিত হিয়া
অ-ধরার মায়ামন্ত্রে অকারণে জাগে ও ঘুমায়,
নিভৃতের পুষ্পগুলি প্রাণ-বাষ্পে পড়ে মুরছিয়া
দিগন্তের নীল প্রান্তে অতন্দ্রিত পলক হারায়।

চাহিতেছে অর্থশূন্য বিড়ম্বিত লুব্ধ রূপগুলি
রেখাপাত করিবারে অসীমের পটভূমিকায়।
বিফল সঞ্চয় যত স্মৃতির পসরা পরে তুলি,
স্তূপ বাঁধে মন্থরতা সায়াহ্নের অস্পষ্ট ছায়ায়।

অন্দরে বাঁধি বন্দনা তিন লোকে

বাণী মজুমদার

হিন্দু সমাজে শূদ্র ও নারীর স্থান সমপর্য্যায়ী। যতই ওরা চেঁচাক না কেন যে, নারী শক্তির অবতার, ঘরের চার দেওয়ালের মাঝখানে তারা অস্থিপঞ্জরসর্বস্ব হয়েই থাকে,—দশপ্রহরণধারিণীদের হাতে মাত্র সম্মার্জনী ও বেড়ী-খুন্তীই থেকে যায়। যতই ওরা জোর-গলায় হেঁকে বেড়ায় নারী সহধর্মিণী—পাপের পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও তারা স্ত্রীকে চায় গঙ্গাজলে ধোওয়া নির্মল চরিত্রবতী হতে।

৺অজয় ভট্টাচার্য্যের 'তুমি' কবিতায় এ দু'টি লাইন অনেক মনে পড়ে :—"প্রবীর শক্তি বাঁধে নারীর অর্জ্জন অপমান,
অন্দরে বাঁধি বন্দনা তিন লোকে।"

তাই আজ নারী বাস্তব জীবনে অপদস্থ থেকে পুরুষের মুখে দেবীত্বের আখ্যা পেতে চায় না।

সমাজবাদ ভারতীয় হিন্দু সমাজে অচল তার হিন্দু-সংস্কৃতির সনাতনত্ব ও নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে। এ নৈতিকতা আধুনিক পরিস্থিতির মাঝখানে হিন্দু স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধে কত দূর প্রযোজ্য তাই আলোচনা করতে চাই।

প্রাগৈতিহাসিক আদিম যুগের মাতৃসত্তা যুগ হয়তো এখনকার নারীর মনে বিস্ময়কর অবিশ্বাসই জোগায়, কিন্তু এক দিন ছিল যে-দিন নারী বেতস লতার মত পেলবদেহী ছিল না—পাথুরে প্রহরণে তার পেশীবহুল হাত মেরেছে বহু বন্য পশু—তার আশ্রিত পরিবারকে পিতা, পুত্র, স্বামী, ভাই সবাইকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছে।

আজও—যুগ-যুগ ধরে যে পরিবর্তনের মাঝখান দিয়ে নারীজাতি ক্রমে অবনতির সোপান বেয়ে নেমে এসেছে—আধুনিক সভ্যতার কীট তারই শক্তিতে—ভিতে ঘুণ ধরিয়েছে সব চেয়ে বেশী : আজও এই ভারতবর্ষে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে স্ত্রীজাতির স্থান বেশ উঁচুতে পাই। দাক্ষিণাত্যে মাতৃপ্রধান সমাজ আজও জীবিত—আর্থিক ও সামাজিক স্থান পুরুষ থেকে নারীর অনেক উঁচুতে। সম্পত্তির উপর মেয়েদেরই বেশী অধিকার। পৈত্রিক সম্পত্তি মেয়েরা পায়। তিব্বতেও এই মাতৃপ্রধান সমাজ হওয়ার দরুণ সেখানকার স্থাবর সম্পত্তি ধ্বংস থেকে অনেক প্রকারে বেঁচে যায়। এই সব সমাজে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না। প্রাচীন স্মৃতি ও বাৎসায়নের সূত্রে দাক্ষিণাত্যের এই মাতৃপ্রধান সমাজের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু কোথায়ও এর উল্লেখ নাই যে, মাতৃপ্রধান সমাজের দরুণ সেখানে কামপ্রধান বিশৃঙ্খলতা বেশী। এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে, স্ত্রীর আর্থিক ও সামাজিক স্বাধীনতার দরুণ ভারতীয় সমাজে কোথায়ও নৈতিক বিশৃঙ্খলতা ও অবনতি আসেনি।

বৌদ্ধ-সাহিত্যে স্ত্রীজাতির বিষয় যা-কিছু বর্ণিত আছে তাতেও প্রমাণিত হয় না যে তারা সামাজিক স্বাধীনতা পেয়ে উৎসন্ন গিয়েছে। জাতকে ভিক্ষুণীদের বিষয়ে যা-কিছু আলোচনা হয়েছে, তা তখনকার পরাধীনতা ও অনুন্নত অবস্থার জন্যই নারীর সেই অধঃপতন ঘটেছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমত আর্থিক পরাধীনতা ও সামাজিক হতে বাঁচবার জন্যই অনেক নারী ভিক্ষুণী হয়ে যেত। তার থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, নারীর নৈতিক অবনতির কারণ তার আর্থিক ও সামাজিক পরাধীনতাই।

এর পরেই এলো ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতি আর হিন্দু স্ত্রীজাতির উপর চরম কুঠারাঘাতের যুগ। ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতির আচার-বিচার সম্বন্ধীয় প্রধান বই 'মনুস্মৃতি'—যার শতকরা পনেরোটি শ্লোকই স্ত্রীজাতির বিষয়ে। পুষ্যমিত্রের সময়কেই ব্রাহ্মণবাদের পুনরুত্থান যুগ বলে ধরা হয় এবং এই সময়েই মনু-স্মৃতি শেষ বার সঙ্কলন করা হয়। এ হলো ব্রাহ্মণ-প্রতিক্রান্তির যুগ। ডাঃ জায়সোয়াল তাঁর 'মনু এণ্ড যাজ্ঞবল্ক্যে' লিখেছেন যে, বৌদ্ধদের দ্বারা প্রচারিত সমাজ উন্নয়নের প্রত্যেক নিয়মই কঠোর ভাবে পালটে দেওয়া হয় এই সময়ে। এঁদেরই অনুশাসনে স্ত্রী ও শূদ্র সমপর্য্যায়ী হয়ে সমাজের সব চেয়ে নিপীড়িত ও বঞ্চিত সম্প্রদায় হয়ে রইলো।

[illegible]

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

দেশের কথা

বরিশালের 'নকীব' বলিতেছেন : "পূর্ব্ব-পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের সম্মুখে আজ প্রধানতম সমস্যা হইতেছে খাদ্য-সমস্যা। গত কয়েক সপ্তাহ হইতে পূর্ব্ব-পাকিস্তানে বিভিন্ন স্থানে চালের অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতির ও তজ্জন্য অনাহার উপবাসের সংবাদ আমরা পাইতেছিলাম। বাংলার শস্যভাণ্ডার বরিশালেও চালের দর পঞ্চাশে চড়িয়াছিল। আসন্ন দুর্ভিক্ষের ভয়ে সন্ত্রস্ত জনসাধারণ ও রাজপথে দুই-একটি করিয়া অনাহারী দুর্গতদের দেখা পাইয়া আমরা পঞ্চাশ সনের স্মৃতি স্মরণ করিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তবে আশার কথা, চালের দর ক্রমেই নামিতেছে। খোদার মর্জ্জি বর্ত্তমানে বাজারে ৪৫৲।৪৬৲ টাকায় সুপার-ফাইন চালই পাওয়া যাইতেছে।" ফাইন! ৪৫৲।৪৬৲ টাকা মণ-দরে চাউল ক্রয় করা তাহা হইলে পাকিস্তানীদের পক্ষে সহজসাধ্য ব্যাপার! আমরাই কেবল গরীব।

* * *

তাহার পর নকীবের মন্তব্য : খাদ্য-সগ্রহ ব্যাপারে শুধু সরকার নন, আমরা বে-সরকারী জনসাধারণের সদিচ্ছা ও পাকিস্তান-প্রীতির কাছে ও আল্লার ওয়াস্তে আবেদন জানাইতেছি—আপনারা যদি পাকিস্তানকে এক বিন্দু মহাব্বত করেন, সত্যি সত্যি পাকিস্তানের কামিয়াব লাভে আপনাদের যদি বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকে—তবে আশু খাদ্য-সংকটে পাকিস্তানের ইজ্জত রক্ষার্থে আপনারা সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ বরণে প্রস্তুত হৌন। সমস্ত প্রকার লোভ, মোহ, দুর্ব্বলতাকে পরিহার করিয়া কায়েদে আজমের স্মৃতি ও পাকিস্তানের ভবিষ্যৎকে স্মরণ করিয়া আপনাদের বাড়তি শস্য সরকারের হাতে অর্পণ করুন। এই ব্যাপারে ভয়ের কিছু নাই, আপনার বৎসরের খোরাকী শেষে যে শস্য বাড়তি থাকিবে আপনাদের দুর্গত মা, বোন, ভাইদের মুখে অন্ন যোগাইতেই উহা ব্যবহৃত হইবে। কোন প্রকার অসাধু উদ্দেশ্যে এক কণা চালও যদি আপনারা ষ্টক করিয়া রাখেন উহাই হইবে পাকিস্তানের প্রতি আপনাদের সর্ব্বাপেক্ষা চরম বিশ্বাসঘাতকতা।" এ বিষয়ে আমরাও একমত। তবে কাজে কিছু হইবে কি?

* * *

'আমার দেশ' বলিতেছেন : দিনের পর দিন মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দুর্বহ হয়ে উঠছে। বাজারে যাও মাছ প্রতি—সের ৩৲, আলু প্রতি সের ৸৵৹, বেগুন প্রতি সের ।৹, গাওয়া ঘৃত প্রতি সের ১১৲, মাখন প্রতি সের ৫।৹, দুগ্ধ প্রতি সের ১৲, সরিষা তৈল প্রতি সের ২৵৹, দ্রব্যমূল্য অগ্নিবৎ হওয়ার ফলে এক শ্রেণীর লোক ভিন্ন অন্যান্যদের ক্রয়-ক্ষমতা কমে গেছে। খাঁটি জিনিষের

গেছে। হোয়াইট অয়েল, বাদাম তৈল, উদ্ভিজ্জ তেলে বাজার ছেয়ে গেছে। বাজারে এক প্রকার ঘি পাওয়া যায়, যার প্রতি সের ২৸৹, ৩৲। খাবারের দোকানে যে সব লুচি, কচুরী, সিঙ্গাড়া, নিমকী, পানতোয়া সাজান থাকে ঐগুলি এই ঘি থেকে তৈরী। এই সব খাদ্য-অখাদ্য ভক্ষণের ফলে জাতির জীবনীশক্তি কমে যাচ্ছে। জেলায় জেলায় জেলাবোর্ড আছে। মিউনিসিপ্যালিটি আছে। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীরাও রয়েছে কিন্তু ভেজাল তাড়ানর জন্য কখনও হাত উঠছে না। সব যেন উদাসীন ভাব! স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কথাই ধরা যাক, তারা এই সহরের করদাতাদের জন্য কতটুকু কি ব্যবস্থা করেছেন? শীত এসেছে, মানুষের জামা কাপড়ের অভাব। চাষী-বাসী এক রকম নগ্নগাত্রেই পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। বস্ত্রের বাজার আজও অস্বাভাবিক, একখানি ধুতি চাদরের দাম ৮৲, ঔষধ-পত্রও দুর্মূল্য, এই অবস্থায় মানুষের জীবন তিক্ত হয়ে উঠেছে। এর উপর কালোবাজারের চোরাকারবারীর লোভ আজও প্রশমিত হয় নাই। এ রোগের প্রতিকার কত দিনে হবে কে জানে? অন্নবস্ত্র-স্বাস্থ্যহীন জাতির অসহায় অবস্থার কথা ভাবলে শ্মশান-বৈরাগ্য আসে। এ সব কথা বহু লিখেছি, বহু জানিয়েছি, কিন্তু কর্তাদের কর্ণ-রন্ধ্রের ফুটো কি আছে, যে শুনতে পাবেন? চক্ষু আজ অন্ধ। যে-দিকেই চাও স্বার্থপরতায় যেন এক প্রতিযোগিতা চলেছে, পরস্পরকে ঠকিয়ে কে কত টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে তুলতে পারে। হতভাগ্যেরা বুঝছে না যে, তারা এমনি করে সারা দেশটাকে শ্মশানের পথে টেনে নিয়ে চলেছে। হায়! মূর্খের দল বুঝে না জাতিকে ধ্বংসের পথে পাঠিয়ে সঞ্চিত অর্থ আগলে যখের অভিনয় করে লাভ কি!" সবই বুঝিলাম, কিন্তু এতো লিখিয়াই বা লাভ কি হইবে? বহু বার একই কথা আমরাও বলিয়াছি, কিন্তু কোনো ফল দর্শন এখনো হয় নাই।

* * * *

পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত 'মুক্তি' লিখিতেছেন : "ভোটার তালিকা প্রণয়ন ব্যাপারে বহু গ্রাম হইতে বহু অভিযোগ আমাদের নিকট আসিতেছে, তাহার দু'-একটি আমরা 'মুক্তি'তেও প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি হুড়া থানার চাকলতা গ্রাম হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে উক্ত গ্রামের শ্রীনন্দলাল পৈতুণ্ডি ও শ্রীকালোবরণ চক্রবর্ত্তীকে ভোটার তালিকা প্রণয়নে নিযুক্ত করা হয় ও তাহাদের হিন্দী ফরম দেওয়া হয়। তাহারা হিন্দী না জানার দরুণ ফরম পূরণ করিয়া কাজ করিতে অসমর্থ হন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের বিরুদ্ধে কেন ফৌজদারী আইনে মামলা করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার

এস, ডি, ওর আদালতে উক্ত নোটিশের উত্তর দান প্রসঙ্গে জানান যে তাহারা হিন্দী ভাষায় ফরম পূরণ করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। বাংলা ভাষায় ফরম দিলে তাহাদের কোন আপত্তি নাই। এস, ডি, ও, সেই ব্যবস্থা করেন এবং মামলা আর আনা হয় না। বিষয়টি আপাত দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইলেও উপেক্ষণীয় নয়। ভাষা বিষয়ে যে সব অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার বিরোধিতা যাহারা করিতেছে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা অজুহাতে তাহাদের উপর মামলা দায়ের করিবার ব্যবস্থা করা এই জিলায় একটা সাধারণ রেওয়াজ হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীনন্দলাল পৈতুণ্ডী ও শ্রীকালোবরণ চক্রবর্ত্তীর উপর নোটিশ সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। তবে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ পথ অবলম্বন করিয়া ভুল করিতেছেন। প্রলোভনের দ্বারা কিছু সুবিধাবাদীদের কাজে লাগাইলেও পীড়নের চেষ্টা দ্বারা এই জিলার কর্ম্মীদের দাবাইবার চেষ্টায় কোন দিনই সাফল্য আসিবে না।" বিহার হইলে বাঙ্গালী বিতাড়নের অন্যতম পন্থা ভালই করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি, বহু 'সাবালক' বাঙ্গালী ভোটার তালিকা হইতে বিচিত্র কায়দায় ছাঁটাই হইয়া গিয়াছে—ক্রমে আরো হইবে। মন্তব্য করিবার আর কিছুই নাই।

* * * *

'বর্দ্ধমানের কথায়' প্রকাশ: "আমরা সংবাদ পাইলাম, কোন কোন আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে কমিউনিষ্ট পার্টিভুক্ত বা ইহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি শিবিরগুলিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে যাওয়া-আসা আরম্ভ করিয়াছে। কংগ্রেস ও কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে মনোভাব সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে কি করিয়া সাময়িক সহানুভূতি অর্জন করা যায় তাহা ইহাদের জানা আছে। দাবী যৌক্তিক হোক আর অযৌক্তিক হোক দাবী যাহারা করে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিলেই তাহাদের প্রিয় হওয়া যায়; এমন কি নেতা হওয়াও যায়। ইহারা এই পথ ধরিয়াই চলিতেছে—কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এই দিকে পড়িবে কি?" সত্যি? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, দুর্গত-শিবিরে কোন প্রকার অভিযোগ করিবার প্রকৃত কোন কারণ নাই। যত দোষ এই সকল কমিউনিষ্টদেরই! ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে, আগামী বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়া যদি অজন্মা হয়, তাহা হইলে তাহাও এই কমিউনিষ্টদের দোষেই হইবে! কমিউনিষ্ট ঠাণ্ডা করিবার জন্য যে-কোনো ডাণ্ডাই হ্যাণ্ডি বলিয়া মনে হয়!

* * * *

এ-দিকে 'গণবার্ত্তা' বলেন: "বহরমপুর সহরের নিকটবর্তী বলরামপুর গ্রামে একটি আশ্রয়প্রার্থী শিবির খোলা হইয়াছে। উক্ত শিবিরে প্রায় দশ হাজার আশ্রয়প্রার্থীকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এইখানে শিবির অর্থে কয়েকটি তাঁবু মাত্র। ঘরের উপর কোন আচ্ছাদন নাই। বৃষ্টির সময় জল আর কাদায় আশ্রয়প্রার্থীদের দুর্দশার অন্ত থাকে না। পানীয় জল ও পায়খানার দুরবস্থা অবর্ণনীয়। ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গবর্ণমেন্ট মাথা-পিছু যৎসামান্য বরাদ্দ করিয়াছেন। তাহাও আবার না কি শীঘ্রই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। রেড-ক্রশ সোসাইটি হইতে শিশুদের জন্য দুধ বিলি করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাও নাম মাত্র। উপযুক্ত আহার ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভাবে এই বিরাট জনসমষ্টি দিন দিন সর্বনাশের দিকে আগাইয়া যাইতেছে।" এ-বিষয় যখন কোনো সরকারী প্রতিবাদে দেখি নাই তখন অভিযোগ সত্য বলিয়া মনে করিব কি? কতকগুলি দুর্গত ক্যাম্প আমাদের দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। দুর্গতাবাসগুলি সম্বন্ধে কেবল এই কথাই বলিতে চাই যে, গরু-মহিষও এমন স্থানে কিছু দিন বাস করিলে হয় মরিয়া যাইবে, আর না হয় ক্ষেপিয়া গিয়া গুঁতাগুঁতি করিয়া শিবির তছনছ করিয়া দিবে। ইহার বেশী আর কিছু বলিবার নাই।

* * * *

তাহার পর বর্দ্ধমানের 'দৃষ্টি'র দৃষ্টিতে কি পড়িয়াছে দেখুন: "আসানসোল মহকুমার বিভিন্ন আশ্রয়-শিবিরে ১৬।১৭ হাজার আশ্রয়প্রার্থী সরকারী তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। কয়েকটি শিবিরে ভীষণ ভাবে নানা জাতীয় রোগ দেখা দিয়াছে। চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা অতীব শোচনীয়। পরিধেয় বস্ত্রের বিশেষ অভাব। বস্ত্রাভাবে মা-বোনেদের বাহির হওয়া সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বণ্টন ব্যবস্থাও অসন্তোষজনক। অবিলম্বে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বসতি বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।" 'দৃষ্টি'র দৃষ্টি আকর্ষণ চেষ্টার সমর্থন করি। কিন্তু এত দূরে কর্ত্তাদের দৃষ্টি সহজে পড়িবে না। ঘরের কাছের ক্যাম্পগুলির প্রতিও যথোচিত দৃষ্টি তাহাদের পড়ে নাই।

* * * *

চুঁচুড়ার 'সমাধান' খাদ্যশস্য সমাধান প্রবন্ধে বলিতেছেন: "বৃষ্টি কাহারও সুবিধা বোঝে না বা মানুষ অনাহারে মরিয়া গেলেও কিছু যায়-আসে না বৃষ্টির—কিন্তু মানুষ অনাহারে মরিতে চাহে না এবং সেই জন্যই নানারূপ চেষ্টা করিয়া খাদ্য ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করে। এই জেলায় খন্যান গ্রামের নিকট কয়েকটি বড় বালির খাদ হইতে বালি উঠাইয়া চালান হইতেছে। বালি উঠাইবার জন্য খাদগুলি জলশূন্য করিবার জন্য কলের দ্বারা জল উঠাইয়া মাঠে ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং সেই জলের সাহায্যে চাষীগণ যথাসময়ে ধানের চাষ করিয়া ভাল ফসল পায় এবং তাড়াহুড়া করার প্রয়োজন হয় না। এই জেলায় সর্ব্বত্রই জমির অল্প নীচেই ১০।১২ ফুট হইতে ২০।২৫ ফুটের মধ্যে বালির স্তর সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় এবং সে স্তরে জলও প্রচুর পাওয়া যায়। যে সমস্ত মাঠে ছেঁচের পুষ্করিণী আছে তাহা মজিয়া গিয়াছে এবং তাহা হইতে জল লইয়া ২।৪ বিঘা আবাদ করিতে জল ফুরাইয়া যায় তাহা ছাড়া সাধারণ ডোঙ্গায় খরচ অত্যন্ত বেশী হয়। একমাত্র উপায় কলের দ্বারা জল সেচের ব্যবস্থা করা। এক একটি মাঠে সর্ব্বোচ্চ স্থানে মোটা নলের কূপ তৈয়ারী করিয়া পাম্প দ্বারা জল উত্তোলনের ব্যবস্থা করিলে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন হয়। যদি বৈশাখ মাসে আবাদের জল পাওয়া যায় তাহা হইলে অনেক জমিতে আউস এবং আমন ২ বার ধান উৎপন্ন হইতে পারে এবং কার্য্যতঃ খাদ্যশস্য যোগানের প্রভূত উন্নতি হইবে। ঐ সকল নলকূপগুলি বেশী গভীর হওয়ার প্রয়োজন হয় না এবং তৈয়ারী করিতে অসম্ভব বেশী খরচ হইবে না। কলের পাম্পের দামও অত্যধিক নহে। প্রতি বিঘা জমিতে যে পরিমাণ বেশী ফসল নিশ্চিত উৎপন্ন হইবে তাহার মূল্যে একটি মাঠের উপযোগী নলকূপ ইত্যাদির খরচ এক বৎসরের মধ্যেই পরিশোধিত হইয়া লাভ হইবে।" সরকারী কৃষি বিভাগের এক

বেসরকারী দেশকর্মীদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি। সংগঠনমূলক পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় বোধ হয় সরকারের এখন হইতে পারে।

●　　●　　●　　●

'বীরভূম বাণী' বলিতেছেন : "বীরভূম জিলার এগার লক্ষ লোকের বাস। এখানে আছে একটি প্রধান পোষ্ট অফিস সিউড়ীতে। তার অধীনে সাব অফিস মাত্র ১২টি, শাখা পোষ্ট অফিস সমগ্র জেলায় মাত্র ৭১টি, নূতন অস্থায়ী অফিস খোলা হয়েছে মাত্র ৩টি; তার দুইটি বোধ হয় সিউড়ীতে। সব শুদ্ধ একটা জেলায় মাত্র ৮৫টি পোষ্ট অফিস। এক একটা থানায় গড়ে ৬টি পোষ্ট অফিস। এর মধ্যে পশ্চাৎবর্ত্তী থানাও আছে, যথা, ইলামবাজার মহম্মদবাজারের মত থানা। এ সব থানায় একটি পোষ্ট অফিসের অধীনে প্রায় শত খানেক গ্রাম আছে। অধিকাংশ গ্রামে ডাক-পিওন যাওয়ার বিট সপ্তাহে এক দিন, তাও পিওন সব সপ্তাহে যায় না। সহরের বাবুদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা বহু হচ্ছে, পল্লীর জন্য কতটা প্রাণ সত্যি কাঁদচে তা এই থেকে বোঝা যায়। পল্লীবাসীর দৈনিক সংবাদপত্র নেবার উপায় নাই—সপ্তাহে এক দিন বা দুই দিন বিট। বহির্জগতের সঙ্গে পল্লীর যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা আদৌ নাই।" এ-অভিযোগ কেবল বীরভূমের নহে। কতকাংশে বাঁকুড়া জেলারও। কর্তৃপক্ষ দয়া করিয়া চেষ্টা করিবেন—যাহাতে গ্রামবাসী সপ্তাহে অন্তত দেড় বার ডাক-হরকরার মুখ দেখিতে পায়।

●　　●　　●　　●

'দৃষ্টি' সাপ্তাহিক মন্তব্য করিতেছেন : "বর্দ্ধমান জেলার হাসপাতাল সম্বন্ধে নানারূপ অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। রোগী হাসপাতালে গৃহীত না হইলে অথবা গৃহীত হওয়ার পর উপযুক্ত চিকিৎসা শুশ্রূষা ও পথ্যের সুযোগ না পাইলে হাসপাতালের মর্য্যাদা আদৌ রক্ষিত হয় না। হাসপাতালের দৈনন্দিন পরিচালনার ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত তাঁহাদের আচরণ সময় সময় কত দূর অবিবেচনা-প্রসূত ও নির্মম হয়, জামালপুরের যে রোগিণী হাসপাতাল হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া বাস-ষ্ট্যাণ্ডে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন তাঁহার কথা ভাবিলে ইহা বুঝা যায়। ধরিয়া লইলাম যে রোগে আক্রান্ত হইয়া রোগিণী হাসপাতালের শরণার্থী হইয়াছিলেন সে রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা হাসপাতালে নাই। কিন্তু আর্ত্ত হিসাবে হাসপাতালের ন্যায্য সাময়িক সাহায্য পাইবার যে দাবী ছিল কোন্ অধিকারবলে ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক তাঁহাকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন তাহা তিনি সাধারণকে জানাইবেন কি?" তাহা হইলে দোষী কেবল মাত্র কলিকাতার হাসপাতালগুলিই নয়? একবার তদন্ত করিয়া দেখা দরকার, হাসপাতালগুলিতেও বর্ণচোরা সাম্যবাদীরা প্রবেশ করিয়াছে কি না। তাহা না হইলে সামান্য ব্যাপার লইয়া এত সোরগোল কেন?

●　　●　　●　　●

'সাধারণতন্ত্রী'র বক্তব্য : "বাস্তত্যাগী আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি সরকারের দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা আমরা যথেষ্টই শুনেছি। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানিয়েছেন, এক মাসের বেশী আর তাঁরা খাবার যোগান দিতে পারবেন না। ভারত খণ্ডিত হওয়ার ফলে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য যারা ভারত ডোমিনিয়নে আসতে বাধ্য হচ্ছে তাদের প্রতি সরকারের এরূপ আচরণ ক্ষমার অযোগ্য। কারণ নেতাদের জন্যই আজ তাদের এই দুর্দশা। যারা চোদ্দ-পুরুষের ভিটেমাটী ত্যাগ কোরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আসছে তারা এই আশায় আসছে যে জাতীয় সরকারের আমলে ভারত ডোমিনিয়নে তারা অন্তত পেটের ভাত পাবে এবং সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারবে। এদের আশ্রয় দেবার, অর্থ সাহায্য করবার এবং জীবিকার ব্যবস্থা কোরে দেবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকারেরই। কিন্তু সরকার মরুভূমিতে কয়েক ফোঁটা জল সিঞ্চন ছাড়া আর কিছুই করছেন না। বাস্তত্যাগীদের সম্পর্কে কোন কার্য্যকরী পরিকল্পনা আজও পর্য্যন্ত গৃহীত হোল না। সরকারের এই উদাসীনতার ফলে হাজার হাজার মানুষ কুকুর-বেড়ালের মত পথে-মাঠে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। এক দিকে আশ্রয়প্রার্থীদের যখন এই অবস্থা অন্য দিকে তখন কেন্দ্রীয় সরকার নূতন দিল্লীতে গণপরিষদের সদস্যদের থাকবার জন্য ১০ লক্ষ টাকা খরচ কোরে প্রাসাদ তৈরী করছেন। জনস্বার্থে পরিচালিত যে কোন সরকারের পক্ষে এরূপ কাজ অপরাধতুল্য। অথচ বাস্তত্যাগী সমস্যা যে সমাধানের অতীত তা নয়। শহরে এবং শহরের আশে-পাশে এখনও বহু খালি বাড়ী পড়ে আছে। এমন অনেক বাড়ীও আছে যেগুলির সমস্তটা ব্যবহার হয় না। বড়লোকদের বাগানবাড়ীগুলি তো ঠায় দাঁড়িয়েই আছে। এগুলি সরকার বাস্তহারাদের জন্য দখল করছেন না কেন? তাছাড়া শহর থেকে দূরে যে সমস্ত বিস্তীর্ণ মাঠ ও প্রান্তর পড়ে আছে, সেখানে অল্প খরচে গৃহনির্ম্মাণের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। তাই বা হয় না কেন? এই ভাবে তো আশ্রয়ের প্রশ্নের মীমাংসা হোতে পারে। এইবার জীবিকার প্রশ্ন। প্রত্যেক কর্মক্ষম পুরুষ ও নারীকে শিল্পক্ষেত্রে অথবা কৃষিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অর্থসাহায্য বা ঋণদান করা যেতে পারে। এখনও পল্লী অঞ্চলে বহু জনশূন্য গ্রাম ও অনাবাদী জমি পড়ে আছে। সে জায়গাগুলি জঙ্গলে ভরে যাচ্ছে। ম্যালেরিয়াপীড়িত জঙ্গলাকীর্ণ সেই সব স্থানগুলি সংস্কার কোরে হাজার হাজার বাস্তহারাকে ঘর-সংসার পেতে বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তাতে পল্লীগুলিও মানুষে ভরে ওঠে এবং নবাগতদের চেষ্টায় গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীণ সংস্কার ও উন্নতিও হয়।" আমাদেরই কথা। বহু বার এই কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন ফললাভও হয় নাই। তবুও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

●　　●　　●　　●

★

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

মিঃ ট্রুম্যান প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত—

গত ২রা নবেম্বর (১৯৪৮) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন-পর্ব্ব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং সমস্ত রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণীকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী মিঃ হ্যারি এস ট্রুম্যান প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই নির্ব্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী মিঃ টমাস ই ডিউই-র সহিতই তাঁহার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। মিঃ ট্রুম্যান ২,২২,৮৮,৫১১ ভোট পাইয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং মিঃ ডিউই পাইয়াছেন ২,০৪,২০,০৬৫ ভোট। এই দুই জন ব্যতীত বিভিন্ন দল কর্ত্তৃক আরও ৯ জন প্রার্থী প্রেসিডেন্ট-পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রোগ্রেসিভ দলের প্রার্থী মিঃ হেনরী এ ওয়ালেস এবং ষ্টেটস্-রাইটস্ দলের (States-Rights) মিঃ জে ষ্ট্রম থারমণ্ডের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মিঃ ওয়ালেস অন্ততঃ এক কোটি ভোট পাইবেন বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পাইয়াছেন মাত্র ১০,৩০,৭৮১ ভোট। মিঃ ওয়ালেস পূর্ব্বে রিপাবলিকান দলভুক্ত ছিলেন এবং পরে হইয়াছিলেন নিউ ডিল ডেমোক্র্যাট (New Deal Democrat)। মার্কিণ গৃহযুদ্ধের পর এই সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণীরা (Southerners) প্রেসিডেন্ট-পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পৃথক্ প্রার্থিরূপে মিঃ থারমণ্ডকে মনোনীত করিয়াছিলেন। তিনি ৮,৬৪,৩০৩ ভোটের বেশী পান নাই। উল্লিখিত চার জন ব্যতীত প্রেসিডেন্ট-পদের জন্য নিম্নলিখিত আরও সাত জন প্রার্থী ছিলেন: (১) সোস্যালিষ্ট দলের মিঃ নরম্যান টমাস, (২) প্রোহিবিশন বা মদ্যপান নিবারণী দলের ডাঃ ক্লড এ ওয়াটসন, (৩) সমাজতন্ত্রী শ্রমিক দলের মিঃ এডওয়ার্ড এ থেইচার্ট, (৪) সোস্যালিষ্ট ওয়ার্কার দলের মিঃ ফারেল ডবস্, (৫) নিরামিষভোজী (Vegetarian) দলের মিঃ জন ম্যাক্সেল, (৬) গ্রীন ব্যাক দলের (Greenback) দলের মিঃ জন জী স্কট এবং (৬) ক্রিশ্চিয়ান নেশনাল দলের মিঃ জেরাল্ড এল কে স্মিথ।

শুধু ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থীই প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হন নাই, মার্কিণ সিনেট এবং প্রতিনিধি পরিষদেও ডেমোক্র্যাটিক দল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। ১৯৪৬ সালের নবেম্বর হইতে উভয় পরিষদেই রিপাবলিকান দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। বস্তুতঃ, ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনে সিনেট এবং প্রতিনিধি পরিষদ উভয় পরিষদেই রিপাবলিকান দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় অনেকের মনেই এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ১৯৪৮ সালের নির্ব্বাচনে রিপাবলিকান দলই ক্ষমতা লাভ করিবে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নির্ব্বাচকমণ্ডলী এই ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন। সিনেটে ডেমোক্র্যাটিক দল ৫২টি আসন এবং রিপাবলিকান দল ৪১টি আসন দখল করিতে পারিয়াছেন। প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটিক দল দখল করিয়াছেন ২৫০টি আসন এবং রিপাবলিকান দল ১৮৪টি আসন দখল করিয়াছেন এবং শ্রমিক দল ১টি আসন পাইয়াছেন। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সিনেটের ৩৩টি আসনের জন্য অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক এক-তৃতীয়াংশ আসনের জন্য এবং প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসনের প্রায় সবগুলির জন্যই নির্ব্বাচন হইয়াছিল।

ডেমোক্র্যাটিক দলের বিশেষ করিয়া মিঃ ট্রুম্যানের এই জয়লাভ প্রায় সকলের কাছেই অপ্রত্যাশিতই ছিল। রিপাবলিকান দলের বিশেষ করিয়া মিঃ ডিউইর জয়লাভ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহই ছিল না। রাজনৈতিক পণ্ডিতরা সকলেই মিঃ ট্রুম্যানের হারিয়া যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীই করিয়াছিলেন। মিঃ ট্রুম্যান এবং ডেমোক্র্যাটিক দলের জয়লাভ সকল রাজনৈতিক পণ্ডিতদিগকে বোকা বানাইয়া ছাড়িয়াছে, অথবা এ-কথাও বলিতে পারা যায় যে, রাজনৈতিক পণ্ডিতরা নির্ব্বাচক-মণ্ডলীকে ধোঁকা দিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া নিজেরাই বোকা বনিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যাহা কেহই অনুমান করে নাই তাহা সম্ভব হইল কিরূপে? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত জনমত কি, সে সম্বন্ধে কেহই অনুমান করিতে পারে নাই কেন? মিঃ ডিউই এবং রিপাবলিকান দলের জয় সম্পর্কে কোন সন্দেহই রিপাবলিকান দল করে নাই। জয় সম্বন্ধে রিপাবলিকান দলের অতিমাত্রায় নিশ্চিন্ততাই মিঃ ট্রুম্যানের জয়লাভ করিবার কারণ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ১৯৪৫ সালের ১২ই এপ্রিল অপ্রত্যাশিত ভাবে মিঃ রুজভেল্টের আকস্মিক মৃত্যুতে মিঃ ট্রুম্যান প্রেসিডেন্ট হন। তাঁহার প্রেসিডেন্ট হওয়াটা দৈবাৎ ঘটিয়াছে, বিশেষতঃ প্রেসিডেন্টের পদ পাওয়ার পর মিঃ ট্রুম্যানের ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তায় কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, ডেমোক্র্যাটিক দল ষোল বৎসর ধরিয়া ক্ষমতা অধিকার করিয়া রহিয়াছেন; কাজেই নির্ব্বাচক-মণ্ডলী এবার শাসকের পরিবর্ত্তন করিবেন, এইরূপ একটা দৃঢ় ধারণাও জন্মিয়াছিল। এই অবস্থায় রিপাবলিকান দল তাঁহাদের জয় অবধারিত বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন। ইহাই রিপাবলিকান দলের পরাজয়ের কারণ, এ-কথা স্বীকার করা খুব কঠিন। এই নির্ব্বাচনে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ ভোটদাতা ভোট দিয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, যত সংখ্যক ভোটদাতা ভোট দিবেন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভোটদাতা ভোট দিয়াছিলেন। এই সকল অতিরিক্ত ভোটদাতাদের কোন দলবিশেষের প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত এই সকল ভোট-দাতাই মিঃ ট্রুম্যানকে সমর্থন করিয়াছেন। এই ফ্লোটিং ভোটই মিঃ ট্রুম্যানের জয়লাভের কারণ বলিয়া কেহ কেহ যে মনে করেন না তাহাও নয়। ইহা আংশিক কারণ হইলে হইতেও পারে। কিন্তু মিঃ ট্রুম্যান এবং ডেমোক্র্যাটিক দলের জয়লাভ করিবার প্রকৃত কারণ তাঁহাদের পররাষ্ট্র-নীতি ও আভ্যন্তরীণ নীতির মধ্যেই সন্ধান করা আবশ্যক।

মিঃ ডিউই মিঃ ট্রুম্যানের বিরুদ্ধে রুশ তোষণ-নীতির অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। নির্ব্বাচনের প্রাক্কালেও মিঃ ট্রুম্যান

রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা চালাইবার জন্য প্রধান বিচারপতি ভিনসনকে পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন। মিঃ মার্শাল বাধা দেওয়াতেই তাহা সম্ভব হয় নাই। মার্কিণ ভোটদাতারা রুশ তোষণ-নীতি সমর্থন করিলে মিঃ ওয়ালেসকেই তাঁহারা ভোট দিতেন, মিঃ ট্রুম্যানকে নয়। মিঃ ট্রুম্যানের রাশিয়ার সম্প্রসারণ নিরোধের নীতি মার্কিণ ভোটদাতারা ভালরূপে অবগত আছেন। হয়ত রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ বাধিবার মুহূর্ত্ত দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসুক, ইহাও তাঁহারা চান না। কম্যুনিজম নিরোধে মিঃ ডিউইর যোগ্যতা মিঃ ট্রুম্যান অপেক্ষা বেশী, এ কথা প্রচার করা হইলেও কম্যুনিজম নিরোধ করা সম্বন্ধে ডেমোক্রাটিক দল ও রিপাবলিকান দলের মধ্যে আসলে নীতিগত কোন পার্থক্য নাই। আভ্যন্তরীণ নীতির দিক দিয়া শ্রমিক নীতির কথাই প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বড় বড় শ্রমিক ধর্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য মিঃ ট্রুম্যান আদালতের নির্দ্দেশ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রেলওয়ে শ্রমিকরা ধর্মঘট করিতে উদ্যত হইলে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকীও তিনি দিয়াছিলেন। কিন্তু . পাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস কর্ত্তৃক ট্যাফ্‌ট-হার্টলি বিল পাশ হওয়ার কথা শ্রমিকরা বিস্মৃত হইতে পারে না। শ্রমিক-নেতারা এই বিলকে 'ক্রীতদাস আইন' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান উক্ত শ্রমিক বিলে ভেটো প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভেটো নাকচ করিয়া মার্কিণ কংগ্রেস উক্ত বিল পাশ করেন। সুতরাং রিপাবলিকানদের হাতে ক্ষমতা গেলে শ্রমিকদের অবস্থা কি হইবে, তাহা শ্রমিকরা বিবেচনা না করিয়া পারে নাই। সুতরাং এ-এফ-এল এবং সি-আই-ও এই দুইটি শ্রমিক দলই মিঃ ট্রুম্যানকে সমর্থন করিয়াছিল। মার্কিণ কৃষকরা সাধারণতঃ রিপাবলিকান দলেরই সমর্থক। কিন্তু কিছু দিন হইল, শস্যের দর নির্দ্ধারিত নিম্নতম মূল্যেরও কম হইয়া যায় এবং মিঃ ট্রুম্যান স্পষ্ট ভাবেই জানান যে, কংগ্রেস শস্যসঞ্চয় পরিকল্পনার ব্যয় নাকচ করাতেই নিম্নতম মূল্য কার্য্যকরী হয় নাই। এই অবস্থায় মার্কিণ কৃষকরাও মিঃ ট্রুম্যানকে সমর্থন করিয়া থাকিলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নীতির মধ্যে নিয়ন্ত্রণ সমস্যা একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ১৯৪৬ সনের শেষ ভাগে মিঃ ট্রুম্যানই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়াছিলেন। তথাপি ইহাও সত্য যে, মূল্য-বৃদ্ধি, মজুরি-বৃদ্ধি এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফল মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের জন্য কোন না কোন রকম নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, মিঃ ট্রুম্যান ইহার উপর বিশেষ জোর দিয়া আসিতেছেন। এই সকল কারণ মিলিত হইয়াই যে মিঃ ট্রুম্যান এবং ডেমোক্রাটিক দলকে জয়ী করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মিঃ ট্রুম্যান মিঃ ডিউই অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক ১৮ লক্ষ ভোট বেশী পাইয়াছেন। অর্থাৎ ভোটদাতারা প্রায় সমান দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন বলিলে খুব বেশী ভুল বলা হয় না।

মিঃ ট্রুম্যানের এই জয়কে কেহ কেহ তাঁহার ব্যক্তিগত জয়, এবং কেহ কেহ ডেমোক্রাটিক পার্টির জয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যাহাই হউক, এখন আর তিনি দৈবাৎ প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন এ কথা বলা চলিবে না। কংগ্রেসে তাঁহারই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কাজেই দৃঢ়তার সহিতই তিনি তাঁহার নীতি কার্য্যকরী করিবার সুযোগ পাইবেন। মিঃ থারমণ্ডের পরাজয় হওয়ায় নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে তাঁহার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য ডেক্সিক্রাটদের (Dixiecrat) মতামত জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রয়োজন হইবে না। সব দিক দিয়াই অনুকূল অবস্থার মধ্যে মার্কিণ প্রেসিডেন্টরূপে তাঁহার নূতন কার্য্যকাল আরম্ভ হইবে। রাশিয়ার সহিত নূতন করিয়া আলোচনা চালাইবার চেষ্টা তিনি করিবেন কি? মস্কো হইতে এইরূপ প্রচার করা হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং মিঃ ষ্ট্যালিনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা বিশেষ ভাবেই কাম্য। মিঃ মার্শাল উহাকে প্রচারকার্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মিঃ ট্রুম্যানের বিরুদ্ধে রুশ তোষণ-নীতির অভিযোগ সত্ত্বেও রাশিয়ার সহিত কোন মীমাংসায় তিনি আন্তরিকতার সহিত অগ্রসর হইবেন, ইহা আশা করা কঠিন। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর গতি যেমন চলিতেছিল, মিঃ ট্রুম্যানের নির্ব্বাচনের পরেও ঠিক তেমনিই চলিতে থাকিবে। আগামী ২০শে জানুয়ারী মিঃ মার্শাল পদত্যাগ করিবেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। মিঃ ট্রুম্যানের নির্ব্বাচিত হওয়ার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নীতিতে যে পরিবর্ত্তনই হউক, পররাষ্ট্র নীতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

জাপ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার—

আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইবুনেলে জাপ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় গত ১০ই নবেম্বর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। এগার জন বিচারপতি লইয়া এই ট্রাইবুনেল গঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে তিন জন বিচারপতি স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশ বিচারপতিদের রায়ে জেনারেল হিদেকি তোজো-প্রমুখ সাত জন জাপ যুদ্ধাপরাধীর প্রতি ফাঁসীর আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, ১৬ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, এক জন ২০ বৎসর এবং অপর এক জনের প্রতি সাত বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতীয় বিচারপতি ডক্টর রাধাবিনোদ পাল অধিকাংশের রায়ের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহার স্বতন্ত্র রায়ে তিনি দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অভিযোগের প্রত্যেকটি দফায় প্রত্যেক আসামীকে নির্দ্দোষ ঘোষণা করা উচিত এবং তাঁহাদিগকে সমস্ত অভিযোগ হইতে মুক্তি দেওয়া উচিত। ট্রাইবুনেলের ফরাসী বিচারপতি মঃ বেরনার তাঁহার স্বতন্ত্র রায়ে বলিয়াছেন যে, দণ্ডিত জেনারেল হিদেকি তোজো এবং অপর ২৪ জন অভিযুক্ত নেতা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্র। তিনি সকলকে বে-কসুর খালাস প্রদানের সুপারিশ করিয়া বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ ঘোষণার প্রধান নায়ককেই অভিযুক্ত করা হয় নাই। জাপ-সম্রাট্ হিরোহিতোর বিচারের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। হল্যাণ্ডের বিচারপতি ডাঃ বি, ভি, রোলিং তাঁহার স্বতন্ত্র রায়ে ৩ জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ সমর্থন করিয়াছেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের মধ্যে তাকাজুমি ওকা, কেনরো সাতো এবং হিরোশি ওশিমা এই কয়েক জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কোকি হিরোতা, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত তনরোকো হাতা, কোইচি কিদো, ২০ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত শিগেনোরি

তোজো এবং ৭ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত মমরো শিগেমিৎসুকে মুক্তি দেওয়া উচিত। ট্রাইবুনেলের প্রেসিডেণ্ট অষ্ট্রেলিয়াবাসী বিচারপতি স্যার উইলিয়ম ওয়েব স্বতন্ত্র মতপ্রকাশী রায়গুলি আদালতে পঠিত হইতে দেন নাই। অধিকাংশের রায়ে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং যুদ্ধারম্ভের জন্ত জেনারেল তোজোই প্রধানতঃ দায়ী। ট্রাইবুনেলের প্রেসিডেণ্ট স্যার উইলিয়ম ওয়েব জাপ-সম্রাট্ হিরোহিতোকে 'যুদ্ধাপরাধের নেতা' (Leader in crime) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

১৯৪৫ সালের ২৬শে জুলাই তারিখের পটসডাম ঘোষণা এবং ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বরের আত্মসমর্পণ পত্র (Instrument of Surrender) অনুযায়ী সুদূর প্রাচ্যে প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের ন্যায় ও দ্রুত বিচার এবং শাস্তি প্রদানের জন্ত উল্লিখিত আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইবুনেল গঠিত হয়। জাপানের রাজধানী টোকিও সহরে ১৯৪৬ সালের ২৯শে এপ্রিল জাপ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আরম্ভ হয় এবং প্রকাশ্য বিচারকার্য্য শেষ হয় ১৯৪৮ সালের ১৬ই এপ্রিল। অতঃপর অধিকাংশের রায় তৈয়ারী হইতে প্রায় সাত মাস লাগিয়াছে। বিচার শেষ হইতে আড়াই বৎসরের অধিক সময় ব্যয়িত হওয়াকে দ্রুত বিচার বলা যায় না, সে কথা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। নুরেমবুর্গে জার্ম্মাণীর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য্য শেষ হইতেও ১১ মাসের বেশী সময় লাগে নাই। বিচারকার্য্য দ্রুত সম্পন্ন হয় নাই, কিন্তু ন্যায়বিচার হইয়াছে কি? ন্যায়বিচার হইয়াছে কি না এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ত ইতিহাসই প্রদান করিবে, তাই বলিয়া এই প্রশ্নকে এখনও আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। এই বিচার-প্রহসনের মধ্যে ন্যায়বিচার করিবার আগ্রহ অপেক্ষা প্রতিশোধ গ্রহণের আগ্রহই যে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা স্বতন্ত্র মতপ্রকাশী রায় আদালতে পঠিত হইতে না দেওয়ার মধ্যেই বুঝিতে পারা যায়। এই পৃথক্ রায় তিনটি বিশ্ববাসীর নিকট প্রকাশিত হইতে বাধা নাই, কিন্তু ট্রাইবুনেলের প্রকাশ্য এজলাসে তাহা পঠিত হইতে দেওয়া হইল না। অভিযুক্ত ও দণ্ডিত জাপনেতাদের পক্ষ হইতে ঐ তিনটি রায় আদালতে পঠিত হইবার জন্ত দরখাস্ত করা হইলে ট্রাইবুনেল প্রতিবাদী পক্ষের বক্তব্য শুনিতে পর্য্যন্ত অস্বীকৃত হন। বৃটিশ ও মার্কিণ আদালতে প্রতিকূল এবং অনুকূল উভয়বিধ রায়ই পঠিত হইবার বিধান আছে। বিজেতা জাতিবর্গ পরাজিত জাতির নেতাদের বিচার করিতে বসিয়াছিলেন বলিয়াই ন্যায়বিচারের অন্যতম মৌলিক বিধান এই ভাবে লঙ্ঘন করা সম্ভব হইয়াছে। অবশ্য এই দণ্ডাদেশ সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্ত করিবেন জেনারেল ম্যাক আর্থার—মিত্রপক্ষীয় মিশনের প্রধানদের সহিত পরামর্শ করিয়া। রয়টারের সংবাদে আরও প্রকাশ যে, এই আলোচনার ফলে গুরুদণ্ডাদেশগুলির অন্ততঃ কয়েকটি হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। স্যার উইলিয়ম ওয়েব না কি এইরূপ মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন অপরাধীরই প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত নহে। কিন্তু এইরূপ বিচারের এবং দণ্ডপ্রদানের ন্যায্যতা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না।

মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষীয় কৌঁসুলী এই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের জন্ত জাপান যে চক্রান্ত বা পরিকল্পনা করিয়াছিল তাহার উদ্দেশ্য ছিল প্রতিবেশী রাজ্যগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উহা একটি অপরাধ। তাই যদি হয়, তবে বৃটেন, আমেরিকা, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স সকলেই এই অপরাধে জাপান অপেক্ষাও অধিকতর অপরাধী। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উহা সত্যই অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় কি? পরাজিত জাতির নেতাদের বিচারে ন্যায়বিচারের স্থান সত্যই কি আছে? ডাঃ রাধাবিনোদ পাল তাঁহার স্বতন্ত্র রায়ে এই প্রশ্ন দুইটি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ডাঃ পাল তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন, "The name of Justice should not be allowed to be invoked only for the prolongation of pursuit of vindictive retaliation." অর্থাৎ 'প্রতিশোধমূলক প্রতিহিংসার কার্য্যকলাপকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্ত ন্যায়বিচারের নাম উল্লেখ করা সঙ্গত নহে।' বস্তুতঃ, জাপ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার-ব্যবস্থার মধ্যে ন্যায়বিচারের কোন স্থান নাই। কিন্তু জাপান প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে তাহার অধীনে আনিতে চাহিয়াছিল বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছিল, তাহা সত্য হইলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় কি? ডাঃ পাল তাঁহার মন্তব্য করিয়াছেন, "এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত গৃহীত পন্থা আইনসঙ্গত কি না সেই প্রশ্ন বাদ দিলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উদ্দেশ্যটি এখনও পর্য্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বে-আইনী বা অপরাধজনক বলিয়া গণ্য হয় নাই।" যুদ্ধাপরাধের বিচারে প্রধান প্রশ্ন জাপ নেতারাই যুদ্ধাপরাধে মুখ্য অপরাধী কি না? ডাঃ পাল মন্তব্য করিয়াছেন, "We may not altogether ignore the possibility that perhaps responsibility did not lie only with defeated leaders." অর্থাৎ 'শুধু পরাজিত নেতারাই দায়ী নহেন, এই সম্ভাবনা আমরা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারি না।" তাঁহার এই মন্তব্যের মধ্যে যে তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে তাহাতে ঐতিহাসিক ঘটনাই প্রতিফলিত হইয়াছে। যুদ্ধের উদ্দেশ্যে জাপানের মানসিক প্রস্তুতির জন্ত যে প্রধানতঃ অষ্ট্রেলিয়া এবং বিশেষ করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইলিয়ম মরিস হিউজেস দায়ী, সে কথাও ডাঃ পাল উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণতঃ বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে যেরূপ মোকর্দ্দমা হয়, যুদ্ধাপরাধের বিচার সেরূপ নহে। যে পক্ষে ন্যায় এবং ধর্ম্ম সেই পক্ষই যুদ্ধে জয়লাভ করে, তাহাও নয়। শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি, দীর্ঘ দিন যুদ্ধ চালাইবার ক্ষমতা প্রভৃতি যুদ্ধ জয়ের কারণ। কিন্তু প্রত্যেক বিজেতাই দাবী করিয়া থাকেন ন্যায় তাহারই পক্ষে। হিটলারের জার্ম্মাণী এবং জাপান জয়লাভ করিলে তাহারাও এই কথাই বলিত এবং যুদ্ধাপরাধের বিচারে পক্ষের উলট-পালট হইয়া যাইত মাত্র।

মুকডেনের পতন—

গত ২রা নবেম্বর (১৯৪৮) চীনা কম্যুনিষ্ট বাহিনী কর্ত্তৃক মুকডেন অধিকৃত হওয়ায় সমগ্র মাঞ্চুরিয়া তো কম্যুনিষ্টদের অধিকারে আসিলই, চীনের গৃহযুদ্ধেরও আরম্ভ হইল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নূতন পর্য্যায়ে। মুকডেন পতনের পরেই ৩রা নবেম্বর ওংওয়েন হাওয়ের প্রধান মন্ত্রিত্বে গঠিত চীনের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ একযোগে পদত্যাগ করেন। পরে অবশ্য অর্থসচিব ব্যতীত অন্যান্য সকল মন্ত্রীকে পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু

মার্শাল চিয়াং কাইশেক যে কিরূপ গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছেন, এই ঘটনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। সাংহাই হইতে এই মর্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, কম্যুনিষ্ট ও সরকারী বাহিনীর মধ্যে আট দফা শান্তি-চুক্তি লইয়া এক আলোচনা চলিতেছে। চিয়াং কাইশেককে চীন ত্যাগ করিয়া খুব সম্ভবতঃ আমেরিকায় চলিয়া যাইতে হইবে এবং চীনে উভয় পক্ষের সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে, ইহাই না কি ছিল এই আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ৮ই নবেম্বর জেনারেল চিয়াং কাইশেক এক ঘোষণায় শান্তি-প্রস্তাবের কথা অস্বীকার করিয়া বলেন যে, চীন হইতে কম্যুনিষ্টদের সম্পূর্ণরূপে বিলোপের জন্য তাঁহার গবর্ণমেণ্ট দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তিনি মনে করেন যে, কম্যুনিষ্টদের বিলোপ সাধন করিতে আট বৎসর লাগিবে। মাঞ্চুরিয়া কম্যুনিষ্টদের হস্তগত হওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন যে, মাঞ্চুরিয়া হস্তচ্যুত হওয়া অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এক বিপুল সামরিক ব্যয়ভার হইতে মুক্তি পাইল।

জেনারেল চিয়াং কাইশেক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদ পোষণ করিলেও সামরিক দিক হইতে কুয়োমিণ্টাং-এর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। নানকিং এবং সাংহাই পর্য্যন্ত আজ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রাশিয়া কম্যুনিষ্টদিগকে সাহায্য করিতেছে তাহার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু আমেরিকা প্রকাশ্য ভাবেই চীনের জাতীয় সরকারকে সাহায্য করিতেছে। আমেরিকার সাহায্য সত্ত্বেও কম্যুনিষ্টদের নিকট চীনা জাতীয় গবর্ণমেণ্টের ক্রমাগত পরাজয় কি তাৎপর্য্যপূর্ণ নহে? ১৯৪৬ সালে মিঃ মার্শাল প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে চীনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। চিয়াং কাইশেক এবং কম্যুনিষ্টদের মধ্যে একটা মীমাংসা করার চেষ্টা করিবার জন্যই তিনি চীনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি দেশে ফিরিয়া প্রেসিডেণ্টের নিকট যে রিপোর্ট প্রদান করেন তাহাতে শুধু কম্যুনিষ্টদেরই নয় কুয়োমিণ্টাং দলেরও কঠোর নিন্দা করা হইয়াছে। অতঃপর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের খাস-প্রতিনিধি লেঃ জেনারেল ওয়েডমেয়ার চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রদত্ত সাহায্য কি ভাবে ব্যয়িত হয় তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য যে-সকল বিশেষজ্ঞ চীনে গিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, এই সাহায্যের বহুলাংশ অপব্যয়িত হইয়াছে। অর্থ সাহায্য যদি শুধু চোরা-কারবারীদিগকেই পরিপুষ্ট করে, তাহা হইলে চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট জনগণের সমর্থন পাইবে কিরূপে? চীনের জনসাধারণের সহিত জাতীয় গবর্ণমেণ্টের কোন সংস্পর্শ মাত্র নাই। সমর উপকরণ দ্বারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে সাহায্য করে, সৈন্যরা কম্যুনিষ্টদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে উহা কম্যুনিষ্টদের হস্তগত হয়। গবর্ণমেণ্ট দুর্নীতিপরায়ণ। কৃষক শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট। সৈন্যবাহিনীও সুশিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত নহে। এই অবস্থায় মার্কিণ সাহায্য যত বেশীই হউক, কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

আমেরিকা যদি মার্কিণ সৈন্য কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টকে রক্ষা করিবার জন্য পাঠায় এবং সাহায্যকৃত অর্থ নিজের তত্ত্বাবধানে ব্যয় করে, তাহা হইলে হয়ত কম্যুনিষ্টদিগকে পরাজিত করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু মার্কিণ সৈন্য চিয়াং কাইশেককে সাহায্য করিতে আসিলেই যে তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইভাট-লাই যুক্ত আবেদন—

বার্লিন-সঙ্কট সমাধানের জন্য তথাকথিত ছয়টি নিরপেক্ষ শক্তি (আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, কানাডা, চীনা, কলোম্বিয়া ও সিরিয়া) কর্ত্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে রাশিয়া ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করার পর নিরাপত্তা পরিষদে বার্লিন-সমস্যার গতি কি হইবে তাহা কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়। গত ১৩ই নবেম্বর (১৯৪৮) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি ডাঃ এইচ, ভি, ইভাট এবং সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ ট্রাইগভি লাই মিঃ এটলী, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান, মঃ কুইলি এবং মঃ ষ্ট্যালিনের নিকট এক যুক্ত আবেদন প্রেরণ করিয়া বার্লিন-সমস্যা সমাধানের জন্য ডাঃ ব্রামুগলিয়ার প্রচেষ্টায় সহিত সহযোগিতা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তাঁহাদের আবেদনে গত ২২শে অক্টোবর (১৯৪৮) তারিখে জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে গৃহীত মেক্সিকোর প্রস্তাবের কথাও উল্লেখ করা হয়। এই প্রস্তাবে বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গকে তাঁহাদের সমস্ত বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। বৃহৎ শক্তিচতুষ্টয় ইভাট-লাই যুক্ত আবেদনের যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে কোন নূতনত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পৃথক্ পৃথক্ উত্তর দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের উত্তরগুলির মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁহাদের মূল বক্তব্য এই যে, রাশিয়ার ভেটোই জার্ম্মাণ-সমস্যা সম্পর্কে আরও আলোচনা চালাইবার পক্ষে প্রধান বাধা। দ্বিতীয়তঃ, বার্লিন অবরোধ প্রত্যাহৃত হইলেই বার্লিন ও জার্ম্মাণী সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে তাঁহারা আলোচনা চালাইতে প্রস্তুত। তাঁহারা আরও জানাইয়াছেন, বার্লিন-সমস্যা নিরাপত্তা পরিষদের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। রাশিয়ার উত্তরে বার্লিনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং সমগ্র জার্ম্মাণ-সমস্যা বিবেচনার জন্য পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন আহ্বানের এবং পারস্পরিক সম্বন্ধের উন্নতিবিধানের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হইয়াছে। রাশিয়ার উত্তরে আরও বলা হইয়াছে যে, বার্লিন-সমস্যা সমাধানের জন্য গত ৩০শে আগষ্ট (১৯৪৮) বার্লিনের সর্ব্বাধিনায়কদের সভায় মীমাংসার ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবার জন্য সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ৩রা অক্টোবর তারিখে এক পত্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্সকে জানাইয়াছেন।

ডাঃ ইভাট এবং মঃ লাই চতুঃশক্তির জবাবের উত্তরে একটি নূতন আবেদন জানাইয়া এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, একমত হওয়ার জন্য তাঁহারা আরও চেষ্টা করিবেন। কিন্তু এই আবেদনের ফল কি হইবে তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। যদি স্বীকার করিয়াই লওয়া যায় যে, বার্লিন-সমস্যা সমগ্র জার্ম্মাণ-সমস্যা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা হইলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, বার্লিন-সমস্যা

সৃষ্টি হইল কেন? পশ্চিমী শক্তিবর্গ পশ্চিম-বার্লিনে পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্তন করাতেই যে বার্লিন-সমস্যার সূত্রপাত হইয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রাশিয়া চায় যে, বার্লিন অবরোধ প্রত্যাহার এবং সমগ্র বার্লিনে রুশ-অধিকৃত অঞ্চলের মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্তন একই সঙ্গে করিতে হইবে। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিত্রয় দাবী করেন যে, প্রথমে বার্লিন অবরোধ প্রত্যাহার করিতে হইবে, তার পর সমগ্র বার্লিন রুশ-অধিকৃত অঞ্চলের মুদ্রা প্রবর্তনের প্রশ্ন লইয়া আলোচনা আরম্ভ করা হইবে। তথাকথিত নিরপেক্ষ ষড়-শক্তির প্রস্তাব পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের দাবী অনুযায়ীই রচিত হয়। কাজেই এই ষড়-শক্তিকে নিরপেক্ষ বলা যায় কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। অতীতে রাশিয়ার সংবাদপত্র সমূহ ডাঃ ইভাটকে যুদ্ধের প্ররোচনা-দাতা (Warmonger) বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন এবং মঃ লাইয়ের বিরুদ্ধে কর্তব্য কার্য্য সম্পাদনে পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগও করা হইয়াছিল। তথাপি রাশিয়া তাঁহাদের মীমাংসার চেষ্টার প্রশংসাই করিয়াছে।

মীমাংসা সম্বন্ধে ডাঃ ইভাট এবং মঃ লাই যে কি জন্য আশাবাদ পোষণ করেন তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু কমাণ্ডার কিং-হল (King-Hall) তাঁহার সাম্প্রতিক পত্রে (News letter) পূর্ণচ্ছেদ দিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি লিখিয়াছেন যে, পশ্চিমী শক্তিবর্গ আগামী বসন্ত কালে রাশিয়ার সহিত সংঘর্ষ বাধিবে বলিয়া আশা করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, এই সময়ের মধ্যে আটলান্টিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়া যাইবে এবং তাঁহারা ৫০ ডিভিশন সৈন্য সমাবেশ করিতে পারিবেন বলিয়া ভরসা করেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি প্রবর্তন করা হইয়াছে। আগামী বসন্ত কালের মধ্যে অভিযান চালাইবার উপযোগী সৈন্যবাহিনী গড়িয়া উঠিবে বলিয়াও আশা প্রকাশ করা হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও অতি দ্রুত টেরিটোরিয়েল বাহিনী গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। চীনে, কাশ্মীরে, প্যালেষ্টাইনে এবং গ্রীসে তো যুদ্ধ চলিতেছেই। ইন্দোনেশিয়া ও কোরিয়ার অবস্থা বাহ্যতঃ শান্ত হইলেও ভিতরে ভিতরে অশান্তি ধূমায়িত হইতেছে। ব্রহ্মদেশ ও মালয়েও গৃহযুদ্ধ চলিতেছে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধের কথা বাদ দিলেও রাশিয়ার সহিত পশ্চিমী শক্তিবর্গের যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলিতেছে তাহা সশস্ত্র সংঘর্ষে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নহে। রাশিয়ার আশঙ্কা, তাহার উপর পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত হইতেছে, এবং ক্রমশঃ রাশিয়ার অধিকতর নিকটে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঘাঁটি স্থাপন করিতেছে। আর আমেরিকা মনে করিতেছে, কম্যুনিজম মতবাদ দিয়া রাশিয়া সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়া তাহাদের তাঁবে আনিতে চায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসভা সম্পূর্ণরূপে আমেরিকার দ্বারা প্রভাবিত। কাজেই মুখে সকলেই শান্তির কথা বলিলেও, সাধারণ মানুষ কোন ভরসা করিতে পারিতেছে না।

রুঢ় অঞ্চলের সমস্যা—

রুঢ় অঞ্চলের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিকল্পনা গঠনের জন্য গত ১১ই নবেম্বর (১৯৪৮) লণ্ডনে ষড়শক্তির সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, গত জুন মাসে ষড়শক্তির লণ্ডন-সম্মেলনে উৎপাদিত কয়লা, কোক এবং ইস্পাতের জার্ম্মাণীতে ব্যবহার এবং রপ্তানির পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক কর্তৃত্ব-শক্তি গঠিত হয়। কিন্তু আলোচ্য সম্মেলনে প্রধান সমস্যা দেখা দিয়াছে পশ্চিম জার্ম্মাণীর কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পগুলি জার্ম্মাণদের হাতে সমর্পণ করিতে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত করা যায়। গত ১০ই নবেম্বর বৃটিশ ও মার্কিণ কর্তৃপক্ষ ফ্রাঙ্ক-ফোর্ট হইতে ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম জার্ম্মাণীর কয়লা, ইস্পাত ও লৌহশিল্পগুলি জার্ম্মাণদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। এই সকল শিল্প ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইবে কি রাষ্ট্রের সম্পত্তি হইবে, তাহা স্থির করিবার ভার জনসাধারণের হাতে দেওয়া হইবে। কোন ব্যক্তিবিশেষ যাহাতে অধিক সংখ্যক শিল্পের মালিক না হয় এবং নাৎসীদের সহিত সংশ্লিষ্ট পূর্ব্ব-মালিকরা যাহাতে কোন কারখানা ফিরিয়া না পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। এই ঘোষণায় ফ্রান্স খুব উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের আশা ছিল, রূঢ়ের খনি ও শিল্পগুলির স্বত্ব কোন না কোন আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের হাতে অর্পিত হইবে অথবা সন্ধিসর্ত্তে এমন ব্যবস্থা হইবে যাহাতে ঐগুলির মালিকানা স্বত্ব অনভিপ্রেত লোকের হাতে যাইবে না।

রুঢ় অঞ্চল জার্ম্মাণীর অস্ত্রাগার বলিয়া কথিত। এই অঞ্চলের খনি ও শিল্পগুলির মালিকানা-স্বত্ব জার্ম্মাণদের হাতে গেলে জার্ম্মাণী আবার সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া ফ্রান্সের নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে, ফ্রান্স এই আশঙ্কা উপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু এ সম্পর্কে নিষ্ফল প্রতিবাদ ছাড়া ফ্রান্স আর কিছু করিতে পারিবে না, এ সম্পর্কে বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই অবহিত আছে। রুঢ় অঞ্চলের খনি ও শিল্প সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা ফ্রান্সের অভিমত জানিতে চাহবা শিষ্টাচারের মান করিয়া থাকিলেও বিস্ময়ের বিষয় হয় না। সম্ভবতঃ, ১৯৩৫ সালে যে ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌ-চুক্তি হইয়াছিল ফ্রান্স তাহার বিরুদ্ধ-বিসর্জন জানিতে পারে নাই। ফ্রান্স রুঢ় অঞ্চলকে জার্ম্মাণী হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার দাবীই প্রথমে করিয়াছিল। কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গের সহিত মতৈক্য রক্ষা করিবার জন্য এই দাবী সে পরিত্যাগ করে। জুন মাসে লণ্ডনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদে তাহা অনুমোদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার পক্ষে ২১৭ ভোট এবং বিপক্ষে ২৮১ ভোট হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, রুঢ় অঞ্চল সম্বন্ধে ফ্রান্সের সকল দলই একমত। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন মনে করে যে, পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে বাদ দিয়া মার্শাল-পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করিতে পারে না। সম্ভবতঃ, নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর হইতে পশ্চিম জার্ম্মাণী অতি দ্রুত অনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির পথে অগ্রসর হইতেছে। রুঢ় অঞ্চল সম্বন্ধে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে অপরিবর্ত্তনীয় তাহাও অপ্রকাশ নাই। কি উদ্দেশ্যে এই নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং উহার পরিণাম কি হইতে পারে তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ।

১৮৭০ সাল হইতে দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম পর্য্যন্ত ফ্রান্সে তিন বার জার্ম্মাণ সৈন্য প্রবেশ করিয়াছে। কাজেই জার্ম্মাণীকে যত দূর সম্ভব দুর্ব্বল করিয়া রাখাই যে ফ্রান্সের উদ্দেশ্য হইবে, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠনের যে দাবী উঠিয়াছে, তাহা উপেক্ষা করা অসম্ভব।

পশ্চিম-জার্মাণীর দাবী এই যে, মিত্রশক্তিবর্গের সৈন্যবাহিনী যদি জার্মাণী পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সমগ্র জার্মাণী যাহাতে কম্যুনিষ্টদের নিয়ন্ত্রণাধীনে না যায় তাহার জন্য পূর্ব্ব-জার্মাণী দখল করিবার মত শক্তিশালী জার্মাণ সৈন্যবাহিনী প্রয়োজন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মিত্রশক্তিবর্গ জার্মাণী পরিত্যাগ করিলেই এই সৈন্যবাহিনী জার্মাণীর রুশ-অধিকৃত অঞ্চল দখল করিয়া বসিবে। রাশিয়া বিনা যুদ্ধে পূর্ব্ব-জার্মাণী হাত ছাড়া হইতে দিবে, মিত্রশক্তি তাহা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না। এই নবগঠিত জার্মাণ বাহিনীর কাছে রাশিয়া অবলীলাক্রমে হারিয়া যাইবে, তাহাও মনে করা কঠিন। তবে পশ্চিম-জার্মাণীকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'বাফারষ্টেট' হিসাবে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় যে বৃটেন এবং আমেরিকার আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রূঢ় অঞ্চলের খনি ও শিল্পগুলির মালিকানা-স্বত্ব এবং পরিচালন-ক্ষমতা জার্মাণদের হাতে আসিলে উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন-ব্যবস্থার উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কার্য্যকরী রাখা খুব কঠিন হইয়া পড়িবে। তাছাড়া পশ্চিম-জার্মাণীর সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ যে পশ্চিমমুখী হইবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? বস্তুতঃ জার্মাণী সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিণ নীতি আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিলে, উপেক্ষার বিষয় হইবে না।

প্যালেষ্টাইন সমস্যা—

১১শে নবেম্বর তারিখের (১৯৪৮) রয়টার সংবাদে প্রকাশ, ইহুদীরা নিরাপত্তা পরিষদের নিকট তাঁহাদের উত্তরে যুদ্ধ বন্ধ করিতে এবং অবিলম্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনা আরম্ভ করিতে রাজী হইয়াছেন। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, নেগেভ অঞ্চল হইতে সৈন্য অপসারণের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের নির্দ্দেশ প্রতিপালন করিতেও তাঁহারা ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। প্যালেষ্টাইনের অস্থায়ী সালীশ ডাঃ বাঞ্চে ইহাতে খুবই খুশী হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু গত ১৮ই নবেম্বর ইজরাইল রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী ডেভিড বেন গুরিয়ন ষ্টেট কাউন্সিলে বলিয়াছেন যে, ইহুদী সৈন্যবাহিনী কিছুতেই দক্ষিণ-প্যালেষ্টাইনের নেগেভে নূতন ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ইহুদী সৈন্য মিশরের আক্রমণ হইতে নেগেভ রক্ষা করিবার জন্য ১৪ই অক্টোবরের পূর্ব্বে যেখানে ছিল তাহারা সেইখানেই আসিবে। তাছাড়া মিশরের আক্রমণ হইতে তাহারা জেরুজালেম রক্ষা করিবে। হাইফা হইতে ১১শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, ইজরাইল গবর্ণমেণ্ট নিরাপত্তা পরিষদের নিকট এক টেলিগ্রামে জানাইয়াছেন যে, যে-সকল সৈন্য ১৪ই অক্টোবরের পর নেগেভে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদিগকে সরাইয়া আনিতে তাঁহারা রাজী আছেন। কিন্তু ঐ তারিখের পূর্ব্বে ইহুদী পল্লী রক্ষা করিবার জন্য যে-সকল সৈন্য সেখানে প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদিগকে ঐ স্থানে রাখার অধিকার পরিত্যাগ করিতে তাঁহারা রাজী নহেন। এই সকল সংবাদ হইতে ইজরাইল গবর্ণমেণ্ট কতটুকু কি রাজী হইয়াছেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। তেমনি সিরিয়ার পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ মোসেন বারাজী দামাস্কাসে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সরাসরি ভাবে অথবা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের মারফৎ সিরিয়া এবং অন্যান্য আরবরাষ্ট্র ইহুদীদের সহিত আলোচনা চালাইতে অস্বীকার করিয়াছেন। আরব লীগ সচিবালয়ের জন্য বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আলোচনা চালাইতে সম্মত আছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি তাহাও অস্বীকার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অস্থায়ী সালীশ ডাঃ বাঞ্চে যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন।

ডাঃ বাঞ্চের পরিকল্পনায় নেগেভ হইতে পাঁচ দিনের মধ্যে ইহুদী সৈন্য সরাইয়া আনিবার নির্দ্দেশ দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু আরবদিগকে সৈন্য অপসারণ করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিবার কোন কথা নাই। তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী উক্ত অঞ্চল জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে, কিন্তু বীরসেবা সহরটি আরবদিগকে ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাব আছে। নিরাপত্তা পরিষদের সাত জনের বিশেষ কমিটি গত ১৩ই নবেম্বর এই পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। জাতিপুঞ্জের ১৯৪৭ সালের ২৯শে নবেম্বর তারিখের প্রস্তাবে নেগেভ ইহুদীদিগকে দেওয়া হইয়াছে। ১৫ই মে'র (১৯৪৮) পর মিশর জোর করিয়া এই অঞ্চল দখল করে এবং ইহুদীরা অক্টোবর মাসে সাত দিনব্যাপী যুদ্ধে এই অঞ্চল তাহাদের দখলে আনিয়াছে। ডাঃ বাঞ্চের পরিকল্পনার মধ্যে সামরিক দিক হইতে বাস্তব অবস্থার প্রতি আদৌ লক্ষ্য করা হয় নাই। ডাঃ বাঞ্চের সহিত প্যালেষ্টাইনে জাতিপুঞ্জের প্রধান পর্য্যবেক্ষক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল রিলের (Gen. Riley) যে গুরুতর মতভেদ রহিয়াছে তাহাও বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। জেনারেল রিলে অস্থায়ী সালীশকে জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধ-বিরতির কোন সার্থকতাই আর নাই এবং নেগেভে ১৪ই অক্টোবর তারিখের অবস্থার ভিত্তিতে নিরাপত্তা পরিষদের শাস্তিমূলক প্রস্তাব (Sanctions resolution) কার্য্যকরী করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইনের সামরিক পরিস্থিতির উপর এখন ইহুদীদের একাধিপত্য বর্ত্তমান। ইহুদীরা ইচ্ছা করিলে এখন সমগ্র প্যালেষ্টাইনই দখল করিতে পারে। জেনারেল রিলে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৪ই অক্টোবর তারিখের অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়ার চেষ্টার ফল নৈরাশ্যজনক হইবে। জেনারেল রিলের এই অভিমতের পর ডাঃ ব্যাঞ্চের পরিকল্পনাকে ইহুদীদের প্রতি তাঁহার বিরূপ মনোভাবের ফল ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কাউণ্ট বার্ণাডোট ইহুদী সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা নিহত হইয়াছেন বলিয়া কথিত। সেই কাউণ্ট বার্ণাডোটের আসনে তিনি বসিয়াছেন। এই অবস্থায় সালিশের নিরপেক্ষ মনোভাব তাঁহার নিকট প্রত্যাশা করা কঠিন।

বার্ণাডোট-পরিকল্পনা সম্বন্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিমত এখন পর্য্যন্ত অস্পষ্ট হইয়াই রহিয়াছে। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে মিঃ মার্শাল উহা একরূপ অনুমোদনই করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁহার প্রাক্‌নির্ব্বাচন বক্তৃতায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভাগ পরিকল্পনাই সমর্থন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নেগেভ ইহুদীদের প্রাপ্য। যে সময় মিঃ মার্শাল বার্ণাডোট-পরিকল্পনা সমর্থন করিয়াছিলেন সেই সময় কেহই আশা করে নাই যে, মিঃ ট্রুম্যান পুনরায় প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবেন এবং ডেমোক্রাটিক দল জয়লাভ করিবে। গত ১৮ই নবেম্বর প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বৃটেন এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে। এই প্রস্তাবে প্যালেষ্টাইনের আরব-অধিকৃত অঞ্চল ট্রান্সজর্ডানের হাতে দিবার সুপারিশ করা হইয়াছে এবং কাউণ্ট বার্ণাডোটের পরিকল্পনা অনুযায়ী আরবদিগকে নেগেভ

এবং দক্ষিণ-পশ্চিম গ্যালিলী ইহুদীদিগকে দেওয়ার এবং জেরুজালেমকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিবার কথা আছে। প্যালেষ্টাইনের মোট আয়তন ১০০০০ বর্গ-মাইল। বার্ণাডোটের পরিকল্পনায় মাত্র ২০০০ বর্গ মাইল ইহুদীদিগকে দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহুদীরা যে তাহাদের কষ্টার্জ্জিত স্থান ছাড়িয়া দিবে ইহা আশা করা কঠিন।

পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণ—

গত ৪ঠা নবেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে রাশিয়ার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া পরমাণু-শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। ৪০টি রাষ্ট্র এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে এবং চারিটি রাষ্ট্র অনুপস্থিত ছিল। এই প্রস্তাবটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথমতঃ, পরমাণু-শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 'বারুচ' পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। গত ৩০ মাস ধরিয়া সম্পূর্ণ অচল অবস্থার উদ্ভব হইলেও পরমাণু-শক্তি কমিশনকে কাজ চালাইয়া যাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাই প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশ। প্রস্তাবের তৃতীয় অংশে ছয়টি রাষ্ট্র লইয়া একটি কমিটি গঠনের কথা আছে। বৃহৎ রাষ্ট্রপঞ্চক এবং কানাডা এই ছয়টি রাষ্ট্র লইয়া এই কমিটি গঠিত হইবে এবং রাশিয়া তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত আছে কি না তাহা বুঝিবার জন্য আগামী বৎসরে এই কমিটির অধিবেশন হইবে এবং সাধারণ পরিষদের আগামী অধিবেশনে এই কমিটিকে রাশিয়ার মনোভাব সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করিতে হইবে। রাশিয়া এই প্রস্তাবকে আমেরিকার পরমাণু-শক্তির একচেটিয়া অধিকার অর্জ্জনের প্রয়াস বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

জাতিপুঞ্জের প্যারী অধিবেশন—

দুই মাস হইল প্যারী নগরীতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশন চলিতেছে। কিন্তু কোন বিষয়ে কোন সমাধান এ পর্য্যন্ত হয় নাই। সম্মুখে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন ছিল বলিয়াই বোধ হয় প্রথম দিকে কাজ তেমন অগ্রসর হয় নাই। ইহার কারণ নূতন করিয়া এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। প্রেসিডেণ্ট টুম্যান নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না, রিপাবলিকান দল ক্ষমতা লাভ করিবে এবং তাহার ফলে আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির এমন পরিবর্ত্তন হইবে যাহাতে রাশিয়ার সহিত মীমাংসার চেষ্টা বাদ দিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হইবে, এই সকল ধারণাই হয়ত প্রথম দিকের শিথিলতার কারণ। এই সকল ধারণার একটিও সত্যে পরিণত হয় নাই। কিন্তু ১০ই ডিসেম্বর যদি অধিবেশন শেষ করিতে হয়, তাহা হইলে অতঃপর দ্রুত কাজ শেষ করা প্রয়োজন। সেই জন্যই গত ১৫ই নবেম্বর সাধারণ পরিষদের পূর্ণ অধিবেশনে দ্বিতীয় আর একটি রাজনৈতিক কমিটি গঠন করা হয়। রাজনৈতিক কমিটির সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ এগারটি সমস্যা সমাধানের জন্য রহিয়াছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি আচরণ, কোরিয়ার ভবিষ্যৎ, গ্রীস, স্পেন এবং ইটালীর প্রাক্তন উপনিবেশ সমূহের ভবিষ্যৎ এই পাঁচটি বিষয় মূল রাজনৈতিক কমিটিতে আলোচনা করা হইবে। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি বিষয় দ্বিতীয় এডহক্ রাজনৈতিক কমিটিতে আলোচিত হইবে। ইহাতেও ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ হইবে কি না, তাহা অনুমান করা কঠিন।

উল্লিখিত পাঁচটি বিষয় ব্যতীত দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার সমস্যাও বড় কম কঠিন নয়। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে অঙ্গীভূত করিতে দক্ষিণ-আফ্রিকার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সম্বন্ধে ট্রাষ্টিশিপের খসড়া দাখিল করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দক্ষিণ-আফ্রিকাকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই নির্দ্দেশ এ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়াই চলিয়া আসিতেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার শাসন পরিচালনা সম্পর্কে দক্ষিণ-আফ্রিকার সর্ব্বশেষ রিপোর্ট পর্য্যালোচনা করিয়া ট্রাষ্টিশিপ কাউন্সিল ট্রাষ্টিশিপ কমিটির নিকট রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসীদের ভোটাধিকার নাই, তাহারা সরকারী চাকুরী পাইতে অধিকারী নহে, শাসন পরিষদগুলিতে এবং শাসন পরিচালন ব্যবস্থায় তাহাদের কোন প্রতিনিধি নাই। রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, যদিও দক্ষিণ আফ্রিকা দাবী করিয়াছে যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বর্দ্ধিত সমৃদ্ধির অংশ আফ্রিকানরাও পাইয়াছে, তথাপি এই বর্দ্ধিত সমৃদ্ধির কি পরিমাণ অংশ আফ্রিকানরা পাইয়াছে প্রদত্ত বিবরণ হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কাউন্সিল তাঁহাদের রিপোর্টে মন্তব্য করিয়াছেন যে, নীতির দিক হইতে কোনও জাতিকে একঘরে করিয়া রাখিবার (social segregation) তাঁহারা বিরোধী এবং এইরূপ একঘরে করিয়া রাখিবার যে কারণই প্রদর্শন করা হউক না কেন, তাহা দূর করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। ৮ই নবেম্বর তারিখে ট্রাষ্টিশিপ কমিটির অধিবেশনে ট্রাষ্টিশিপ কাউন্সিলের রিপোর্ট বিবেচনা করিবার জন্য সাধারণ পরিষদকে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গত ১০ই নবেম্বর ট্রাষ্টিশিপ কমিটিতে দক্ষিণ-আফ্রিকার অধিবাসীরা ট্রাষ্টিশিপের বিরোধী কি না এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত হইতে চায় কি না সে-সম্বন্ধে তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটি নিরপেক্ষ কমিশন প্রেরণ করিবার জন্য ভারতের পক্ষ হইতে দাবী উত্থাপন করা হয়। বৃটেনের পক্ষ হইতে কমনওয়েলথ রিলেশনের সহকারী সেক্রেটারী মিঃ গর্ডন ওয়াকার বলেন যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সম্বন্ধে ট্রাষ্টিশিপ চুক্তি দাখিল করিতে দক্ষিণ-আফ্রিকা বাধ্য নয়। তিনি আরও বলেন যে, বৃটেন কয়েকটি ট্রাষ্টিশিপ চুক্তি দাখিল করিয়াছে বটে, কিন্তু বৃটেন উহা দাখিল করিতে আইনতঃ বাধ্য ছিল না এবং ঐগুলি দাখিল করিতে বৃটেনকে কখনও আইনতঃ বাধ্য করাও হয় নাই। আমেরিকার অভিমত এই যে, ভারতের প্রস্তাবিত মত কোন কমিশন প্রেরণ করিবার অধিকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নাই। সুতরাং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ভাগ্যে কি লিখিত আছে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রতিনিধি মিঃ লাউ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে দক্ষিণ-আফ্রিকার অঙ্গীভূত করিতে চান না, তাঁহারা চান উভয়ের সম্পর্ককে নিবিড়তর করিতে। এই নিবিড়তর সম্পর্ক যে কিরূপ মধুর তাহা প্রত্যেক পরাধীন দেশের অধিবাসীই জানে। মিঃ লাউ ভারতের যুক্তির কোন উত্তর দিতে পারেন নাই, কিন্তু ভারতকে গালাগালি করিতে তিনি কসুর করেন নাই। ভারতে যে বিপুল সামাজিক বৈষম্য আছে তিনি তাহারই উল্লেখ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ম্যালান গত ১৬ই নবেম্বর প্রিটোরিয়ায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা অঙ্গীভূত

করিতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং কিছুতেই অছিগিরির চুক্তি তাঁহারা দাখিল করিবেন না। তাহার পূর্ব্বেই উঁহারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিত্যাগ করিবেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন যাহা করিতে বলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহাই করিয়া থাকে। কখনও বৃটেন ও আমেরিকার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় না। এই দুইটি বৃহৎ শক্তির একমাত্র অসুবিধার স্থল হইয়াছে নিরাপত্তা পরিষদ। আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। গত ১৭ই নবেম্বর ক্ষুদ্র (minor) রাজনৈতিক কমিটিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাশিয়ার প্রতিনিধি মঃ মালিক 'ক্ষুদ্র পরিষদ' সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশনের মধ্যবর্ত্তী সময়ে কাজ চালাইবার জন্য স্থায়ী অন্তর্ব্বর্ত্তী কমিটি বা ক্ষুদ্র পরিষদ গঠনের দায়িত্ব উক্ত 'ক্ষুদ্র' রাজনৈতিক কমিটির হাতে অর্পিত হইয়াছে। রাশিয়ার প্রতিনিধি এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইন, গ্রীস, ইটালীর উপনিবেশ এবং কোরিয়ার সমস্যা 'ক্ষুদ্র পরিষদে' উত্থাপন করিয়া নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো এড়াইয়া চলাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, নিরাপত্তা পরিষদ যে-সকল বিষয় সাধারণ পরিষদের নিকট প্রেরণ করিবেন সেগুলিও আলোচনা করিবার অধিকার ক্ষুদ্র পরিষদকে দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সুতরাং কার্য্যতঃ ক্ষুদ্র পরিষদকে নিরাপত্তা পরিষদের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। রাশিয়ার প্রতিবাদে যে কোন ফল হইবে সে-সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছুই নাই।

গ্রীসের সমস্যা—

সুদীর্ঘ আলোচনার পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটি গত ১০ই নবেম্বর গ্রীসের সমস্যা সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গ্রীসের গরিলা বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া এবং আলবেনিয়ার তীব্র নিন্দা করিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গ ও চীন যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল তাহা ৪৮—৬ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ফ্রান্স ও অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষ হইতে রুশ প্রতিনিধিদের নিকট গ্রীস সংক্রান্ত অচল অবস্থার সমাধানের জন্য অষ্ট্রেলিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার সহিত বৃহৎ শক্তি-চতুষ্টয়ের এক গোপন আলোচনার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। যুগোস্লাভিয়ার প্রতিনিধি ডাঃ বেবলার বলেন যে, পরে তাঁহাকে জানান হইয়াছিল যে, রাজনৈতিক কমিটিতে গ্রীস সংক্রান্ত চতুঃশক্তির প্রস্তাবের ভোট গৃহীত হওয়ার পূর্ব্বে আমেরিকা ও ফ্রান্সের প্রতিনিধি ঐরূপ আলোচনায় যোগদান করিবেন না। রাজনৈতিক কমিটিতে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ঐরূপ গোপন আলোচনার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না। উক্ত প্রস্তাবে যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া এবং আলবেনিয়াকে রাজকোসের সৈন্যবাহিনীকে সাহায্যদান বন্ধ করিতে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রীসের সহিত সহযোগিতা করিতে বলা হইয়াছে। প্রস্তাবে বিশেষ কমিটিকে পর্য্যবেক্ষণ চালাইয়া যাইতে এবং রিপোর্ট প্রদান করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে; এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ গ্রীসের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রিপোর্ট প্রদানের জন্য ১১ জন সদস্য লইয়া এক কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ঘটনা-স্থল পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং মে মাসে এই কমিটির রিপোর্ট প্রস্তুত হয়। এগার জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন সদস্য গ্রীসের উত্তর দিকস্থ তিনটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে গ্রীসের গরিলা যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন। কিন্তু ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও কলম্বিয়া উক্ত ছয় জন সদস্যের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতে পারে নাই। রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড উক্ত অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করে। অতঃপর নিরাপত্তা পরিষদে আলবেনিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও বুলগেরিয়াকে গ্রীসের গরিলা যুদ্ধের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়া অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা প্রস্তাব উত্থাপন করে। রাশিয়া এই প্রস্তাবে ভেটো প্রদান করিলে উহা সাধারণ পরিষদে প্রেরিত হয় এবং সাধারণ পরিষদ ১৯৪৭ সালের ১৩ই অক্টোবর এই বিশেষ কমিটি গঠন করেন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এই বিশেষ কমিটি তদন্ত-কার্য্য আরম্ভ করেন এবং গত মে মাসে (১৯৪৮) তাঁহাদের রিপোর্ট লেখার কাজ আরম্ভ হয়। অষ্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, চীন, ফ্রান্স, মেক্সিকো, নেদারল্যাণ্ডস, পাকিস্তান, বৃটিশ যুক্তরাজ্য এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই বিশেষ কমিটির সদস্য।

গ্রীসের সমস্যা সম্পর্কে রাশিয়ারও একটি প্রস্তাব ছিল। উক্ত প্রস্তাবের এক অংশে গ্রীস হইতে সমস্ত বিদেশী সৈন্য এবং বিদেশী সামরিক ব্যক্তিবর্গকে অপসারিত করিবার এবং বিশেষ কমিটি বাতিল করিয়া দিবার দাবী করা হয়। প্রস্তাবের এই অংশ ৩৮—৭ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। এগার জন সদস্য ভোট দেন নাই। প্রস্তাবের আর এক অংশে গ্রীসকে বুলগেরিয়া ও আলবেনিয়ার সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই অংশ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবের অপর এক অংশে সীমান্ত সংক্রান্ত মীমাংসার জন্য এক দিকে গ্রীস এবং অপর দিকে যুগোস্লাভিয়া বুলগেরিয়া ও আলবেনিয়াকে আলোচনা বৈঠক আহ্বান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। প্রস্তাবের এই অংশও ভোটে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত প্রস্তাবের যে অংশে বলা হইয়াছে যে, গ্রীসের অবস্থা গত বৎসর অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়াছে এবং বৈদেশিক হস্তক্ষেপেই ইহার জন্য দায়ী, ঐ অংশ অগ্রাহ্য হইয়াছে।

বৃটিশ ও মার্কিণ সামরিক ও আর্থিক সাহায্যই বর্ত্তমান গ্রীক গবর্ণমেণ্টকে গ্রীসের জনসাধারণের উপর চাপাইয়া রাখিয়াছে। বস্তুতঃ, আমেরিকার সামরিক, শাসন পরিচালন সংক্রান্ত, এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন মিশনই বর্ত্তমানে গ্রীসের গবর্ণমেণ্ট পরিচালনা করিতেছে বলিয়া ভিশিনস্কী যে অভিযোগ করিয়াছেন, কি আমেরিকা, কি বৃটেন কেহই তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন নাই। খণ্ডন করিবার উপায় তাহাদের ছিল না। কাজেই শুধু যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও আলবেনিয়াকে দোষ দিয়া লাভ কি? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৃটেন ও আমেরিকা গ্রীসের সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে আলোচনা করিতে একটুকুও লজ্জা বোধ করে নাই।

রঙ্গ-পট

আমাদের দেশের চলচ্চিত্র-শিল্পের বয়স বড় কম হ'ল না। এখন আর তাকে শিশু ব'লে অগ্রাহ্য বা তার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে মার্জনা করা চলে না। অন্যান্য দেশের মত এ দেশেও জাতীয় জীবনের মধ্যে দিন-কে-দিন বেড়ে উঠছে তার প্রভাব।

কিছু কাল আগেও আর্টের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের আভিজাত্য বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনেকেই স্বীকার করতে চাইত না। কিন্তু প্রতীচ্যের কয়েকটি দেশে চলচ্চিত্রের অভাবিত অভিব্যক্তি দেখে আজ বিরুদ্ধবাদীদেরও মুখ বন্ধ হয়েছে। খুব উচ্চশ্রেণীর মনেরও খোরাক সে আজ জোগাতে পারে। চলচ্চিত্রের নট-নটীরা কোন্ স্তরের শিল্পী তা নিয়ে এখনো প্রশ্ন বা তর্ক উঠতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন দিক দিয়ে সমগ্র ভাবে বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে যে, অর্দ্ধ শতাব্দী আগে যা ছিল একটা বিস্ময়কর খেলনা মাত্র, আর্টের জগতে নিজের জন্যে স্বতন্ত্র আসন দাবি করবার অধিকার আজ তার হয়েছে।

কিন্তু বাংলা দেশের বালক-বালিকাদের এবং বিশেষ ক'রে যুবক-যুবতীদের খেলা-ঘরে যে চলচ্চিত্রের পরম আদর, তার মধ্যে যথার্থ আর্টের প্রকাশ আছে কতটুকু? এখানে মাঝে মাঝে হঠাৎ অপেক্ষাকৃত ভালো ছবির সঙ্গে পরিচয় যে হয় না এমন কথা বলছি না। কিন্তু তেমন সব ছবির সংখ্যা গোণা যায় আঙুলের ডগায়। একটি মাত্র কোকিল প্রকাশ করতে পারে না বসন্তের সৌন্দর্য্যোৎসব।

প্রতীচ্য থেকে ছবির পর ছবি এ দেশে আসছে, ভারতের দর্শকরা দলে দলে তাদের দেখতে যাচ্ছে এবং দেখে অভিভূত হচ্ছে, প্রশংসা করছে। কিন্তু সাগরের ওপারে যাত্রা করবার শক্তি ও সাহস আছে ক'খানি দেশী ছবির?

তার্কিক হালে পানি না পেয়ে মাথা নেড়ে বলবেন, "দেশী ছবি ওরা বুঝবে কেমন ক'রে? ওরা কি এ দেশের ভাষা জানে?"

কিন্তু ভাষা জানা আর না-জানাটাই বড় কথা নয়। কথা কইতে শেখবার পর থেকে ছবির সর্ব্বজনীনতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে আংশিক ভাবেই—সমগ্র ভাবে নয়। কলকাতায় সব ছবিঘরে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে, বিলাতী সবাক চিত্র দেখে যারা খুব ভাবে উপভোগ করছে, তাদের মধ্যে আছে ইংরেজী ভাষায় অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত বহু ব্যক্তি—এমন কি একেবারে নিরক্ষর লোকও।

ভাষার কথা ছেড়ে দিন। সাগরপারে গেলে দেশী ছবির দারিদ্র্য প্রকাশ পাবে নানান্ দিক দিয়ে। গল্পের দারিদ্র্য, চিত্র-দারিদ্র্য, নাট্যের দারিদ্র্য, আলোকচিত্রের দারিদ্র্য, শব্দগ্রহণের দারিদ্র্য, অভিনয়ের দারিদ্র্য, দৃশ্য-সজ্জার দারিদ্র্য, পরিচালনার ...

অথচ দেশী ছবি আজ শিশু নয়,—সে এসে দাঁড়িয়েছে যৌবন-সীমানার মধ্যে।

এই অপরিসীম দারিদ্র্যের কারণ কি?

একটা বড় কারণ তো দেখতে পাচ্ছি, অনুকরণপ্রিয়তা।

আর্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হচ্ছে, সৃষ্টি। যে নব নব উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় দিতে পারে না, যে সৃজনক্ষম নয়, আর্ট হিসাবে সে ব্যর্থ, একেবারেই ব্যর্থ।

বাংলা তথা ভারতের চিত্রকলার প্রথম যুগে এ দেশের চিত্রকররা ছবি আঁকা শিখতেন বিলাতের দিকে তাকিয়ে। কেউ কেউ আবার শেখবার জন্যে বিলাতেও ছুটতেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এক জন অবনীন্দ্রনাথ বা এক জন নন্দলালও আত্মপ্রকাশ করেননি। তাঁদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বড় জোর রাজা রবিবর্ম্মার শক্তি—ভারতকে দেখাতে গিয়েও যা দেখাতে পারেনি ভারতের আত্মা।

এক সময়ে এদেশে রবিবর্ম্মার কি জনপ্রিয়তাই ছিল! বাংলা মাসিক পত্রিকার সম্পাদকরাও (যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে হঠাৎ প্রাচ্য চিত্রকলার গোঁড়া ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন) রবিবর্ম্মার ছবি প্রকাশ করবার সুযোগ পেলে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। একখানি ছবি দেখেছিলুম, "গঙ্গাবতরণ"। বিলাতী ঢঙে-দেখা আঁকা নিসর্গ-দৃশ্যের মাঝখানে কোমরে দুই হাত দিয়ে যেন থিয়েটারের নায়কের মতন নাটকীয় এবং বিকৃত ভঙ্গিতে দুই পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে শিব ইন্দ্র-পক্ষ ঊর্দ্ধমুখে মস্তকের উপরে ধারণ করছেন গঙ্গার ধারা। ছবি দেখে চারি দিকে উঠল প্রশংসার হৈ-চৈ, কিন্তু কেউ তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলে না যে, এখানে হিন্দু দেবতাটির পরিকল্পনা আমদানি করা হয়েছে অহিন্দু দেবতাদেরই শিল্পশালা থেকে।

সেই রবিবর্ম্মা এবং তাঁর আর্টের সঙ্গে যথার্থ ললিতকলার কোনই সম্পর্ক ছিল না, তাই শিল্পসমাজে তাঁর প্রসঙ্গ নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায় না। ভারতে স্বাধীন ও নিজস্ব চিত্রকলার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভূমিকা শেষ করে রবিবর্ম্মাকে প্রস্থান করতে হয়েছে নাট্যমঞ্চের বাইরে। কারণ তিনি সৃষ্টি করেননি, করেছিলেন অনুকরণ।

আমাদের চলচ্চিত্র-শিল্পেরও অবস্থা হয়েছে ঐ রকম। সে পদে পদে তালে-বেতালে করতে চাইছে সাধারণত হলিউডি ছবির অনুসরণ, অথচ ললিতকলার ক্ষেত্রে আজ ও-সব ছবির বাজারদর খুব চড়া নয়। কিন্তু ভারতের মাটিতে হলিউডি প্যাঁচ কষলে বড় জোর লোক-চক্ষে ধোঁকা চলে, কলাবিদদের প্রসন্ন পাওয়া যায় না কিছুতে ... [illegible]

পাঁচ এসে জানিয়ে দেখা হচ্ছে মন্তরে। খালি কি প্যাঁচ! হলিউডের প্রায় সব রকম 'টেকনিক'ই আমাদের দেশী ছবির ভিতরে আবিষ্কার করা কঠিন হবে না। ওখানকার চিত্রকাহিনীও আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে বেমালুম চুরি করবার চেষ্টা হয়। এই সেদিন দেখলুম, বাংলা দেশের এক জন নামজাদা ঔপন্যাসিকও বিলাতী চিত্রকাহিনীকে নিজের ব'লে পরিচিত করতে লজ্জিত হননি।

কোন কোন বাংলা ছবিতে অতি-আধুনিক গৃহসজ্জা দেখে চমৎকৃত হয়েছি। সে সব ঘরের ভিতরে গেলে কিছুতেই মনে হবে না যে, আমরা স্বদেশে বাস করছি। বহু অতি-আধুনিক সম্রান্ত বাঙালীর বাড়ীর ভিতরে যাবার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু কোথাও অমন সব গৃহসজ্জা দেখবার সৌভাগ্য হয়নি! বুঝতে বাকি থাকে না যে, ঐ সব ঘরের এবং সাজসজ্জারও পরিকল্পনা এসেছে বিলাতী চিত্র-ভাণ্ডার থেকে।

গল্প আছে, এক হঠাৎ-ধনী মাড়োয়ারি আধুনিক আদর্শে নিজের বৈঠকখানার দেওয়াল চিত্রবিচিত্র করবার জন্যে জনৈক শিল্পীকে নিযুক্ত করলে। কয়েক দিন পরে নিজের কাজ শেষ করে শিল্পী মাড়োয়ারিকে এনে দেখালে। মাড়োয়ারি দেখে-শুনে বললে, "সব তো ভালো হয়েছে বাবু, কিন্তু হনুমানজী কৈ?" শিল্পী বিস্মিত হয়ে শুধোলে, "হনুমানজীর ঠাঁই এখানে কোথায়?" মাড়োয়ারি বললে, "হনুমানজীকে ঠাঁই দিতে হবেই বাবু। তিনি না থাকলে এ ঘর মানাবে না।" তাই হ'ল। ঘরের এক দেওয়ালের মাঝখানে বিরাজ করতে লাগল হনুমানজীর মূর্তি।

আমাদের কোন কোন চিত্রনির্মাতারও হয়েছে ঐ মাড়োয়ারির মত। বিলাতী ছবিতে যা তাঁদের চোখে লাগবে, উদ্ভট হ'লেও এবং খাপ না খেলেও বাংলার ঘরোয়া ছবির যেখানে-সেখানে তাকে এনে বসিয়ে না দিয়ে তাঁরা ছাড়বেন না।

বহু দিন পরে একখানি ছবি দেখে আনন্দ উপভোগ করেছিলুম এবং তা হচ্ছে উদয়শঙ্করের "কল্পনা" বা "Fantasy"। ছবিখানির মধ্যে যে উদ্ভটতা সৃষ্টি করা হয়েছে তা চিত্রকরের স্বেচ্ছাকৃত। ছবিটি একেবারে নিখুঁৎ বলতে চাই না। কিন্তু ওর প্রধান গৌরব হচ্ছে উদয়শঙ্করের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং কল্পনাশক্তির পরিচয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাশ্চাত্য দেশে গেলেও ঐ ছবিখানি প্রচুর প্রশস্তি অর্জন করবে, কারণ ওর মধ্যে নেই বিলাতী ছবির অক্ষম অনুকরণ।

হাঁ, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং কল্পনাশক্তি। আর্টকে সৃজনক্ষম ও শ্রেষ্ঠ ক'রে তুলতে পারে কেবল ঐ দু'টি দুর্লভ গুণই।

দেশী ছবি আর শিশু নয়। স্বাধীন ভারতবর্ষ আজ নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, আমাদের চলচ্চিত্রকেও তাই করতে হবে। সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও চিত্রকলায় বাঙালীর সৃষ্টিমুখী মন করছে নব নব সৃষ্টি, আমাদের চলচ্চিত্রেও তা সম্ভবপর হবে না কেন?

পেশাদার অভিনয়

[পূর্বানুবৃত্তির পর]

জনৈক পেশাদার

চরিত্র-চিত্রণের সময় যে কৃত্রিমতা অভিনয়কে বস্তুশূন্য, সারহীন ও প্রাণহীন করে সে সম্বন্ধে আমরা গত সংখ্যায় আলোচনা করেছি।

এর পর আমরা বাচনের রীতিকে নিয়ে আলোচনা শুরু করব। কেন না, বাচন-ভঙ্গীই হোল চরিত্র পরিস্ফুটনের সর্বোত্তম হাতিয়ার এবং যে অভিনেতার এই হাতিয়ার নিপুণ নয় তার পক্ষে অভিনেতার জীবনের সর্বোচ্চ গৌরবের অধিকারী হওয়ার আশা দুরাশা মাত্র।

শুদ্ধ বাচনের জন্য অভিনেতার থাকা প্রয়োজন সংযত কণ্ঠ ও সেই কণ্ঠের মধুর স্বনন। লোকে কথায় বলে, অমুক লোকের থিয়েটারী চঙ বেশ আছে, কিন্তু থিয়েটারী গলা নেই। সত্যিই, থিয়েটারী গলা নেই বলে যে কতো প্রতিভাবান শিল্পীকে অকালে অভিনয়-গগন থেকে বিদায় নিতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

অথচ আশ্চর্য এই যে, সত্যিকার থিয়েটারী গলা কচিৎ দু'-এক জনের কণ্ঠেই শোনা যায়। আর দুর্লভ বলেই লোকে বলে—ও ঈশ্বরের দান। বেগবান, গম্ভীর অথচ সংযত, ধ্বনিপ্রধান কণ্ঠের আবৃত্তি যখন কড়ি-কোমলের পর্দায় ঘা দিয়ে আমাদের দুটি কানে মধুবর্ষণ করতে থাকে তখন স্বভাবতঃই মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে এবং আমরা সেই মধুবর্ষণ শোনার জন্য এমন ব্যগ্র আগ্রহে কান পাতি যে আমাদের অজ্ঞাতসারেই অভিনেতার চরিত্র-চিত্রণ আমাদের মন হরণ করে। এর চেয়ে বড়ো জিত আর অভিনেতার পক্ষে কিছু নেই। বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই এই দুর্লভ কণ্ঠ-মাধুর্যের অধিকারী।

কিন্তু ঈশ্বরের দান যখন সকল মানুষের মধ্যে বণ্টিত নয় তখন দুঃখ নিয়ে আফশোষ করে কোন লাভ নেই। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও পরিচালকবর্গ এই কথা বলে তরুণ অভিনেতাদের উৎসাহিত করেন যে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে অনুশীলনের দ্বারা তারাও সেই কণ্ঠস্বরের অধিকারী হতে পারে। অবশ্য এর জন্য রীতিমত শিক্ষাই হোল প্রথম এবং প্রধান কথা।

মানুষের কণ্ঠদেশ এবং স্বরোৎপাদন কৌশল সম্বন্ধে এখানে বৈজ্ঞানিক আলোচনার অবতারণা করলে হয়ত অনেকেই তা খুশি মনে গ্রহণ করতে পারবেন না, সেই কারণে আমরা তা থেকে বিরত

'বাঁকা লেখা' চিত্রে কানন দেবী

বলায়। কেবল এইটুকু উল্লেখ করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি যে, চেষ্টাকৃত পেশী-সঞ্চালনের দ্বারা আমরা যখন স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরকে চীৎকারে রূপান্তরিত করি তখন যে কেবল কণ্ঠের মাধুর্যকে অতিক্রম করি তা নয়, নানা জটিল রোগের জটিলতাও সৃষ্টি করি তার দ্বারা। অনেক লোকের ধারণা থাকে যে, চেষ্টার দ্বারা কণ্ঠের পেশীগুলিকে অধিক মাত্রায় ক্রিয়াশীল করতে পারলেই উচ্চ স্বর নির্গত হতে পারবে। কিন্তু সে ধারণা একান্ত ভ্রান্ত। অভিনেতা যদি মনে রাখেন যে কণ্ঠ-মাধুর্য এবং স্বরের ক্ষেপণই তাঁর অভিনয়-জীবনের সর্বোত্তম ক্যাপিটাল এবং একবার তা হারালে তিনি সম্পূর্ণরূপেই দেউলে হয়ে পড়বেন তা হলে এই ভাবে তিনি কণ্ঠকে পরিশ্রান্ত না করে বরং বিপরীত ভাবে তাকে যথাসম্ভব আরাম দেবারই চেষ্টা করবেন। মূলতঃ, কণ্ঠকে আরাম দেওয়াই অভিনেতার প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত এবং বিশেষজ্ঞদের মতে এই আরামই সু-অভিনয়ের ভিত্তি।

কণ্ঠ হোল কাপেস জাতীয়, যার সুড়ঙ্গ-পথ বেয়ে ধ্বনি নির্গত হয়। অবথা পেশী-সঞ্চালনের ফলে সেই কণ্ঠ-সুড়ঙ্গ সঙ্কুচিত হয় এবং নিশ্বাসের সহজ সভ্যতায় যে শব্দোচ্চারণ স্বাভাবিক তা বিকৃত হয়ে পড়ে। অনভ্যস্ত কণ্ঠের চীৎকারে এই স্বরবিকৃতি হামেশাই আমাদের কর্ণপীড়ার কারণ হয়ে ওঠে এবং প্রেক্ষাগৃহ থেকে আমাদের নাট্যরস-পিপাসু মনকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়।

কণ্ঠস্বরকে উচ্চগ্রামে তোলার জন্য এক অভিনব উপায়ের কথা আবিষ্কার করেছেন তাঁরা। চীৎকার করে প্রেক্ষাগৃহের প্রান্ত থেকে প্রান্ত ধ্বনিত করে তোলার অপচেষ্টার কথা বিস্তৃত হয়ে অভিনেতাকে এই ছোট উপদেশটুকু মনে রাখতে হবে সব সময়। তিনি যখন পার্শ্ববর্তী চরিত্রের সঙ্গে আলাপ করবেন তিনি এমন ভাবে কথা বলবেন যেন নিকটবর্তী মানুষটির কান আছে হলের শেষ প্রান্তে। উদাহরণটি আরো বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করলে এই রকম দাঁড়াবে। ধরে নেওয়া যাক, দুই বন্ধু হলের এক কোণে বসে নিম্নকণ্ঠে কথা কইছিলেন, এমন সময় উভয়ের পরিচিত এক বন্ধু এসে দাঁড়িয়েছেন হলের দূরতম প্রান্তে। তখন এক জন সোৎসাহে অতিথিকে আহ্বান করলেন—এসো, এসো। অতি নিম্নকণ্ঠের আলাপের মধ্যে বন্ধুটিকে আহ্বান করে স্বর-নিক্ষেপ করা হোল। বন্ধুটি সে কথা শুনে আনন্দিত মুখে এগিয়ে আসতে লাগলেন। অথচ এই উচ্চকণ্ঠের স্বরনিক্ষেপের জন্য কোন অতিরিক্ত চেষ্টা করতে হোল না এবং তা করার জন্য কোন পীড়াদায়ক চিৎকারও এলো না মনে।

হলিউড তারকা—না—চীনামাটীর বাসন?

সম্প্রতি বৃটিশ মন্ত্রী হার্বার্ট মরিসনের সঙ্গে হলিউডের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ইনগ্রিড বার্গম্যানের এক চিত্তাকর্ষক আলাপ-আলোচনা হয়। "আণ্ডার ক্যাপ্রিকর্ণ" ছবির স্যুটিং-এর সময় সম্প্রতি হার্বার্ট মরিসন মেট্রো গোল্ডউইনের ষ্টুডিওতে আমন্ত্রিত হন। ষ্টুডিওর সেটিং-এ গিয়ে তিনি বার্গম্যানকে অপরূপ সাজে দেখতে পান। সাদ্ধ্য পোষাক পরা, চুলে গোলাপ গোঁজা বার্গম্যান তখন খালি পায়ে সবে মাত্র একটা দৃশ্য শেষ করছেন। দেখে মরিসনের অদ্ভুত লাগে। পরে চায়ের আসরে বার্গম্যানের সঙ্গে তাঁর অনেকক্ষণ আলাপ হয়। মরিসন ১৯৩৬ সালে একবার হলিউডে এসেছিলেন। তিনি বলেন যে, হলিউডের তারকাদের পোর্সিলেনের আসবাবের মত অত্যন্ত সযত্ন সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। বার্গম্যান তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, "আপনি ভুল করছেন মিঃ মরিসন, হলিউড তারকাদের চীনামাটীর বাসনের মত ব্যবহার করা হয়।" এ নিয়ে চায়ের আসরে হাসির ধুম পড়ে যায়।

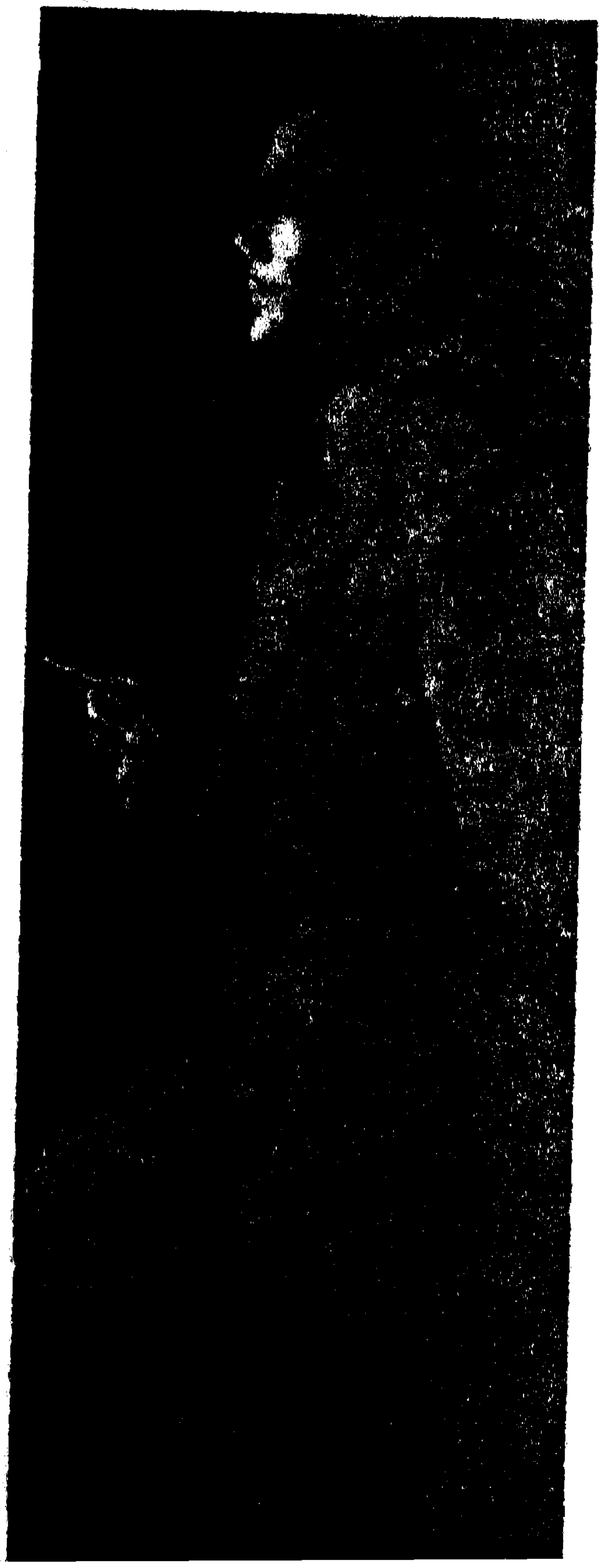

● প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত বসুমিত্রের ময়ূরপঙ্খ চিত্রের কয়েকটি দৃশ্যে নীরাজ, শিপ্রা ও শিশির মিত্র। ছবিটি কলিকাতা ও মফস্বলের বিভিন্ন চিত্রগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করেছে।

বাঁকা লেখা

কর্তব্যে উৎসর্গীকৃত এক নারীর বঞ্চিত যৌবনে
প্রণয়ের প্রলয়ের মর্মস্পর্শী ইতিহাস !

বাঁকা লেখা

শুক্রবার, ২৬শে নভেম্বর হইতে

উত্তরা, পূরবী ও উজ্জ্বলায় !

হলিউড

সিনেমা-জগতের মানুষেরা এক আশ্চর্য জীবন যাপন করেন যার সম্বন্ধে লোকের ধারণা অস্পষ্ট। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই [illegible] মধ্যে অভিরঞ্জন প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অনভিজ্ঞ লোকেরা [illegible] জমিয়ে তোলার জন্য নানা গল্প আবিষ্কার করে এবং সেগুলি [illegible] পরিবেশন করে আসর জমিয়ে তোলে। সম্ভবতঃ সিনেমা-[illegible] মধ্যে হলিউড সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা অতিমাত্রায় [illegible]। হলিউড নাম শুনলেই সিনেমা-জগতের নরনারী উল্লাসিক [illegible] ওঠেন। অবশ্য তার অনেক কারণ।

একথা খুবই সত্য, যেখানে অর্থ, বিলাস ও বাহ্যাড়ম্বরই [illegible] একমাত্র মাপকাঠি সেখানে নানা ব্যতিক্রম গড়ে ওঠেই। শুধু [illegible]নীতি পদে পদে ব্যাহত হবার সংশয় ঘটে। সামাজিক [illegible]-নিষেধের শাসন যেখানে প্রবল নয় সেখানে অসংযম স্বতঃস্ফূর্ত [illegible] সুযোগ নেয়। কিন্তু তথাপি এ কথা হয়ত জোরের সঙ্গেই [illegible] চলে যে, হলিউডের সমাজে যে জীবন-নীতি চালু তা পৃথিবীর [illegible] দেশে কোনো কালে কোনো সমাজে পূর্বে ঘটেনি এ কথা [illegible] নয়।

হলিউডে বাস করে নানা শ্রেণীর নরনারীরা তার মধ্যে শ্রমিক, [illegible], প্রযোজক, শিল্পী এবং বিজ্ঞানকর্মীরা প্রধান। তা ছিন্ন যারা [illegible] তারা কোন না কোন কারণে এদের সঙ্গেই ভাগ্য জড়িয়ে [illegible]। অর্থাৎ এ কলোনীতে কোন ফালতু লোক নেই, কেবল [illegible] চাকুরীপ্রার্থী বেকাররা ছাড়া। অবশ্য তারাও সংখ্যায় কম নয়।

একই পরিবেশের মধ্যে যারা বৎসরের পর বৎসর এক কৃত্রিম [illegible] যাপনে বাধ্য হয়, তাদের মধ্যে হাঁফ ছাড়ার সুযোগ আসে [illegible]। সর্বদা এক চিন্তায় যাদের মন পরিপূর্ণ তারা স্বভাবতঃই হাল্কা [illegible] অবসর যাপন করার চেষ্টা করে। হলিউডের সমাজ সেই [illegible]-বিনোদনের এক কৌতুককর পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছে।

[illegible] বেনেট একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, হলিউডে [illegible] করে পার যারা চলচ্চিত্র শিল্প সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ে [illegible] প্রমাণ করতে পারে। এ কথা যে কত সত্য তার [illegible] হোক, হলিউডের পার্টিতেই সিনেমার কাহিনী নিয়ে বয়ানবি[illegible], [illegible] ব্যক্তিকে [illegible] হবে নতুন [illegible] দেওয়া হয়, বড়ো বড়ো মাতব্বর [illegible] প্রতিযোগিতায় [illegible]।

এ ধারণা কিন্তু যথার্থ নয়। যদিও হলিউডের নীতিকে বাঁচাবার পক্ষে এ যুক্তি [illegible]। একদা যে অসংযত স্রোত হলিউডের আব-হাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলেছিল আজ তার গন্ধটুকুই বেঁচে আছে মাত্র। আজকের দিনে অনেক ফেন ধুয়ে গেছে। যেটুকু পড়ে আছে তার মধ্যে রোমান্সের চেয়ে ট্র্যাজেডীর চেহারাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাইরের দর্শক তাই হতাশ হয়ে যান।

হলিউডের সমাজে ছোট ছোট কেন্দ্রই হোল প্রাণবিন্দু। আতিথেয়তা সেই প্রাণকে সঞ্জীবিত করে। ভালো আহার্য, ছোট ছোট জলসা, মদ আর সিনেমারই গল্প সেই সব ছোট ছোট পার্টির একমাত্র প্রয়োজনীয়। যাঁরা কোন রেলওয়ে কলোনীতে বাস করেছেন তাঁরাই জানেন যে, সেখানে কাজের পর যখন ছোট ছোট দল অবসর যাপন করতে বসে, অর্থাৎ গানের আড্ডা জমায়, তাসের আড্ডা জমায়, গাল-গল্পের আড্ডা জমায়, তখন গানের চেয়ে, তাসের চেয়ে, অন্য ধরণের গল্পের চেয়ে অফিসের গল্পই হয়ে ওঠে প্রধান। দলাদলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কিছুটা অস্বাভাবিকতা প্রবেশ করে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে। হলিউড এই রকমেরই এক কলোনী এবং কলোনী-জীবনের দোষ-গুণ তার মজ্জায় মজ্জায় গ্রথিত হয়ে গেছে।

সময় যাদের ঘাড়ের ওপর বোঝা হয়ে ওঠে তাদের পক্ষে প্রতিদিন সেই সময়টুকুর মত আহ্লাদজনক কিছু নেই। বাধ্য হয়ে তারা উদ্ভাবন করে নূতন নূতন কৌশল সেই দুর্বিষহ বোঝার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য।

যেমন আছো তেমনি এসো। সুন্দর একটি খেয়াল ও খেলা। যে কোন সময়ে নিমন্ত্রণ-পত্র গিয়ে পৌঁছোল ঘরে ঘরে। এখনি উপস্থিত হোন অমুকের বাড়ীতে। সাজ বদলের সময় নেই। শরীর মার্জনার সময় নেই, সময় আছে শুধু হেঁটে যাবার অথবা গাড়ী করে সময় মত উপস্থিত হবার। পর্দায় যে মেয়ে পুরুষের চোখে মোহিনী, সে হয়ত সদ্য ঘুম-ভাঙা অবিন্যস্ত চেহারায় রাত্রির সাজেই এসে উপস্থিত। কোন পুরুষ দাড়ী কামাচ্ছিল, অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থাতেই সে এসে পড়ল। অন্যান্য শিল্পী ও পরিচালকরাও বিচিত্র সব অবস্থায় ও সাজে হাজির। তার পর হৈ-হুল্লোড়। বিচিত্র বেশের আজব কাণ্ড।

রবার্ট টেলর একবার একটি অভিনয়-প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেছিলেন। শিল্পীরা তাদের শিশু বয়সের ছবি এনে জমা দিয়েছিল। তার পর চিনে নেওয়ার প্রতিযোগিতা। এতে কিছু সময় কাটে বটে—কিন্তু এরও শেষ আছে।

অনেকেই শিল্পি জীবনের অতিরিক্ত আরো কিছু পেয়েছেন। তার বাবা পার্টিতে তাদের দাম বাড়ে।

হারপো মার্কস, হ্যারি জেমস এঁরা হোলেন যাদুকর। তাদের খেলা দেখিয়ে যে কোন আসরে এঁরা নাম কেনেন। [illegible] পিয়ানোয় [illegible] খেলায় নিপুণা। মাথায় এক গ্লাস জল রেখে [illegible]

পঁচিশ বছর বয়সে এই প্রথম

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর প্রযোজনায় বসুমিত্রের রহস্যচিত্র

কালোছায়া

ভূমিকায়

শিপ্রা দেবী   শিশির মিত্র
ধীরাজ ভট্টা   গুরুদাস বন্দ্যো
নবদ্বীপ হালদার   শ্যাম লাহা
হরিদাস চট্টো   নৃপেন্দ্র মিত্র
প্রভৃতি

রচনা ও পরিচালনা

বাংলা চলচ্চিত্রের বয়স পঁচিশ বছর হতে চলল এবং 'কালোছায়া' চিত্র নিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের সংখ্যাও দাঁড়াল আড়াইশোর উপর। এর মধ্যে সামাজিক ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, নৃত্যগীতমুখর, হাস্যরসাত্মক প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের চিত্র রয়েছে। রহস্যচিত্র তোলবার চেষ্টাও এর মধ্যে কয়েকবার হয়েছে, কিন্তু সত্যিকার রহস্যচিত্র হিসাবে প্রথম উৎরাল 'কালোছায়া'-ই, ছবি দেখতে বসে যার শেষ পরিণতির জন্য ছবির শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত

এ ছাড়া আছে পার্টি দেওয়ার নূতন নূতন ঢঙ। পয়সা খরচের নিত্য-নূতন সুযোগ। বড় হোটেল ভাড়া নিয়ে তাকে সবশুদ্ধ আলিবাবার গুহায় রূপান্তরিত করে তার মধ্যে হৈ-চৈ করা। বড়ো বড়ো নৌকা ভাড়া করে প্রমোদ-বিলাস করা। এতে যে পরিমাণ খরচ হয় এক এক বারে তাতে মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম। ব্যাসিল র‍্যাথবোন ও তার স্ত্রী এ বিষয়ে খুবই অগ্রণী ও সাহসী।

এই সব পার্টিতে গৃহস্বামী যত খরচ করেন, তার চেয়ে খুব কম করেন না নিমন্ত্রিতেরা। এক এক পার্টিতে উপস্থিত হবার জন্য শিল্পীরা নতুন নতুন ফ্যাসানের পোষাক তৈরী করান। আর সাজ ও ফ্যাসানই হোল হলিউডের প্রেরণা। কোন কোন পার্টিতে ইতিহাসের সম্রাটদের সাজে উপস্থিত হবার নির্দেশ থাকে। সেই সব পার্টিতে চটকদার নিমন্ত্রিতদের দেখে দর্শকের মনে হাস্যরসের যোগান হয়। এক জন রিপোর্টার একবার বলেছিলেন যে, হলিউডের রীতি-নীতি ও খেয়াল দেখলে শিশু-জগতের কথা মনে হয়। ছোট ছেলেমেয়েরা যেন মজার খেলা খেলছে রাজা-রাণী সেজে। অথচ এই সব জাঁকজমক ও চটকদার প্রমোদ প্রোগাম কোনটিই নূতন নয়। সবই পুনরাবৃত্তি মাত্র।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই রাজাকে কেন্দ্র করে অভিজাত শ্রেণীর এই ধরণের বিলাস ও খেয়ালীপণার ঐতিহাসিক বিবরণী আছে। এক দিন রাজরক্তে ও নীলরক্তে যা মানাত আজ তার চিন্তাও মানুষের কাছে দুঃস্বপ্ন। কিন্তু এই আজব কলোনীতে সেই অতীত দিনের দুঃস্বপ্নকে বাস্তব করবার এক সাধনা চলেছে অবিশ্রান্ত ভাবে। আর সেই জন্যেই হলিউডের বিলাস ও আড়ম্বর এক চরম ট্রাজেডী মাত্র।

মদ হোল এই সব অবসর যাপনের প্রধান হাতিয়ার। বেটি ডেভিস একবার বলেছিলেন যে, হলিউডে আসার আগে তিনি কখনো মদ খাননি। কিন্তু হলিউডে বাস করতে গেলে মদ না খেলে অসামাজিকতার দুর্নাম রটে।

হলিউডেও শ্রেণিবৈষম্য প্রবল। এখানকার রাত্রি সেই শ্রেণিগত সমাজকে ঘিরে আবর্তিত হয়। অর্থই হোল কৌলিন্যের পরিচয় ও মাপকাঠি। এক-এক জন কর্তৃত্বশালী ধনীকে ঘিরে এক-একটি গোষ্ঠি গড়ে চলে। পার্টিতেও সেই কৌলীন্য বজায় রেখে নিমন্ত্রণ-লিপি বিতরিত হয়। নীচুতলার লোক উঁচুতলায় পাত্তা পায় না। মধ্যবিত্তরা উচ্চ স্তরের দিকে উন্মুখ কিন্তু তাদের পা ধরে টানে নিম্নমধ্যবিত্তরা।

শিল্পীদেরও নিজস্ব ছোট ছোট সম্প্রদায় আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশভেদে এই সম্প্রদায়ভেদ। ব্রিটিশ কলোনীর নেতৃত্ব করেন রোনাল্ড কোলম্যান, সি. অব্রে স্মিথ প্রভৃতিরা। কেলটিকদের প্রধান হলেন জেমস ক্যাগনি, স্পেন্সার ট্রেসি। অস্ট্রেলিয়ান দল পরি চালনা করেন জেনেট ম্যাকডোনাল্ড। তা ছাড়াও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী যাদের তাদের শিবিরে আছেন মার্লিন ডিট্রিচ, কনস্টান্স বেনেট প্রভৃতিরা। রাজনৈতিক দল আছে, তাদের সর্দার মেলভিন ডগলাস। তা ভিন্ন অর্থের আভিজাত্যে প্রযোজক ও পরিচালকদের মধ্যে স্পষ্ট শ্রেণিবিভেদ।

হোটেল, রেস্তোঁরা ও নাচঘরেও এই কৌলীন্য ও দুর্গ প্রবল।

মানুষের গতিপথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা যখন অলঙ্ঘনীয় বাধার সৃষ্টি করে—বেদনায় ও অবসাদে জীবন যখন বিষময় হয়ে ওঠে—ছন্দহীন হয়ে যায় যখন তার প্রতিটি মুহূর্ত—সংসার যখন শুধুই তিক্ততায় আর রিক্ততায় পরিপূর্ণ বলে মনে হয়—তখন কে দেবে জীবনকে আবার মধুময় করে? কে ফিরিয়ে আনবে সংসারের শান্তি—হাসি—আনন্দ যা আছে শুধু বাঙ্গালীর সংসারেই?

১০ম সপ্তাহ

নৈহাটী সিনেমা • শ্রীদুর্গা
(নৈহাটী) (চন্দননগর)

অরোরা • গৌরী টকীজ
(মেদিনীপুর) (উত্তরপাড়া ৪-১২-৪৮ হইতে)

ওয়েলিংটন্
(আসন্ন, ৩-১২-৪৮ হইতে)

এই সব প্রশ্নগুলির উত্তর দেবে—আর দেবে
ছবি দেখে যে আনন্দ আপনি কখনও পাননি!

পরিবেশক : ইষ্টার্ণ টকীজ লিমিটেড, কলিকাতা।

ডলার যার মাসিক আয় সেও জুয়ায় পাঁচ ডলারের পুরস্কার পেয়ে এমন হৈ-চৈ করে ওঠে যেন সে চাঁদ হাতে পেয়েছে। তা ছাড়া অন্য ধরণের জুয়া তো আছেই।

আর এই সব হোটেল, পার্টি ও নাচঘর হোল হলিউড রমণীদের নিশ্বাসের বায়ু। সারা দিন মুখ বুজে থাকতে হয় তাদের, সাজ পোষাক আর বাজার তাদের কোন প্রাধান্য দিতে পারে না। এই সব পার্টিতে তারা হাঁফ ছাড়ে, তাদের দায়িত্বহীন কর্মহীন দিন-রাত্রির একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি পায়। নিজেদের ফ্যাসানের নিপুণতা দেখাবার প্রতিযোগিতায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। যারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তাদের প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে রূপালী পর্দা, পত্রিকা, ফটোগ্রাফার। কিন্তু এই সব শিল্পী, পরিচালক ও প্রযোজকদের বনিতাদের কে প্রচার করে? সুতরাং তারা নিজেরাই সে দায়িত্ব নেয়। ফটোগ্রাফারদের খুশী করে তারা সর্বোত্তম সাজে ফটো তুলিয়ে পত্রিকা অফিসে হানা দেয়। নানা ভাবে আত্মপ্রচারের সুযোগ নেয়। তা নইলে তারা বাঁচে কি করে। জুয়ার আড্ডায় এদের নিত্য যাওয়া-আসা। ছোট ছোট পার্টিতে এদের বিশেষ আমোদের ব্যবস্থা।

তা ভিন্ন এদের সব থেকে বড়ো দায়িত্ব হোল নিজেদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য পার্টি দেওয়া। সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন লেখকরা, আসেন মাতব্বর প্রযোজক ও পরিচালকরা, আসেন যোগাযোগের দালালরা। সেইখানে তাদের খুশী করতে পারলে স্বামীর আয় ও যশের জন্য আর ভাবনা থাকে না।

স্বামী দৈনিক আটায় মধ্যে চোদ্দ ঘণ্টা ইুডিয়োতে রক্ত জল করে যে অর্থ পান, তার ওজন দেখাবার দায়িত্ব থাকে স্ত্রীর কাঁধে। আর হলিউডের সহধর্মিণীরা সে দায়িত্ব সানন্দে পালন করেন। দোকানে, রেস্তে, নাচঘরে সাজে-পোষাকে এবং বিলাসিতায় তারা যে কোন রাণীকেই হার মানাতে পারেন।

আর সবার উপরে সাজের বিলাসিতা ও নূতনত্ব। মানুষের আদিম বৃত্তি এখানে পূর্ণত্ব লাভ করেছে। হলিউডের ধারণা, মেয়ে এমনি মেয়ে, পুরুষকে ভগবান পুরুষই সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু মেয়ে মানুষ মহিলা হয় বেশ‍াবরণে, পুরুষ ভদ্রলোক হয় ফ্যাসানে। এর জন্য নীতি ও রুচিকে বারে বারে বদলে নিতে হয়, মেনেও নিতে হয়।

বিরাট কিছু করব, তাজ্জব কিছু দেখাব, অভূতপূর্ব আড়ম্বরে চমকে দেব, এ সব ধারণা ধীরে ধীরে হলিউড থেকে সরে যাচ্ছে। অসংযত জীবনের ঘূর্ণি শান্ত হচ্ছে আইনের শৃঙ্খলে, রুচির প্রভাবে। মুভি কলোনী শুধু সামাজিকতায় থিতিয়ে বসবার কঠিন প্রয়াস করছে। কিন্তু সে কি সহজ কথা। হলিউডের কাঁধের উপর শুদ্ধতা সিন্দবাদের বৃদ্ধের মত চেপে বসে আছে। তা থেকে নিষ্কৃতি না পেলে সে সহজ জীবন পাবে না। আর যত দিন তা না পাচ্ছে তত দিন, পৃথিবীর লোকের উদাসিকতা যাবে না হলিউডের কথায়। তত দিন হলিউড আত্মসম্মানশীল সম্ভ্রান্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কলোনী বলে পরিচিত হতে পারবে না।

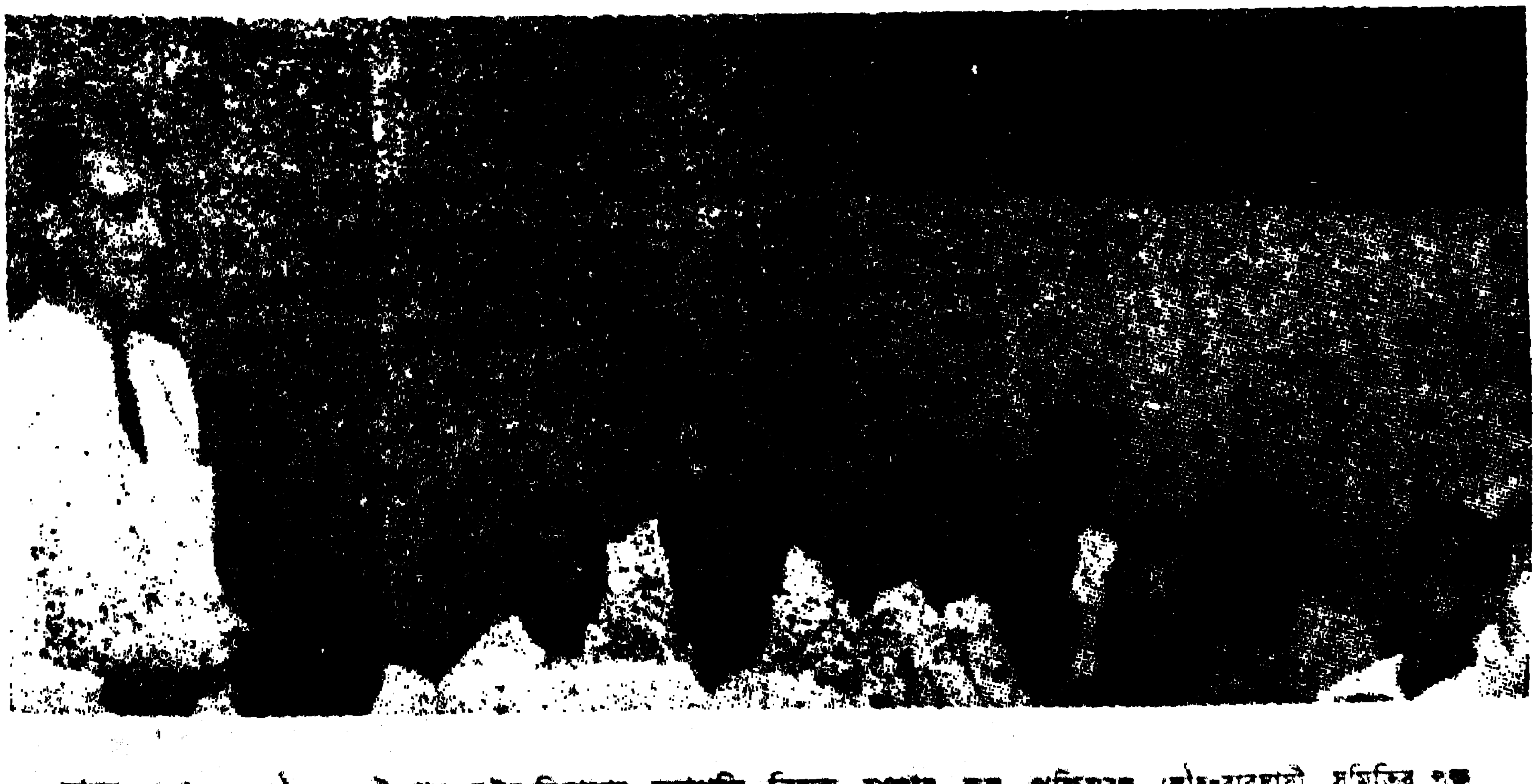

ভারত-সরকারের লৌহ ও ইস্পাত বণ্টন-বিভাগের সভাপতি নিযুক্ত হওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ লৌহ-ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে স্তর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়কে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, তাহাতে তিনি লৌহ ও ইস্পাত সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। ছবিতে শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীভবতোষ ঘটক (সভাপতি), মিঃ স্পুনার, মিঃ সেট্না, শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র ঘোষ (সহ সভাপতি), পুলিশ কমিশনার এস. এন. চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাইতেছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র

১৮ই কার্ত্তিক ভারতীয় গণ-পরিষদের অধিবেশনে খসড়া শাসনতন্ত্র উত্থাপিত করিয়া শাসনতন্ত্র প্রয়োগকারী কমিটির সভাপতি ডাঃ আম্বেদকর খসড়া শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যা করেন। গণ-পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকার রক্ষা কমিটি, যুক্তরাষ্ট্র শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী কমিটি প্রভৃতি বিভিন্ন কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া এই খসড়া শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে। বিভিন্ন কমিটি যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বের নির্দ্দেশ অনুযায়ীই করা হইয়াছে। কাজেই ডাঃ আম্বেদকরের নিজের রচিত এবং কংগ্রেস-অনুমোদিত খসড়া শাসনতন্ত্রকে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিবেন তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার মতে ইহা কি যুদ্ধের, কি শান্তির সময়, সর্ব্বাবস্থাতেই প্রযোজ্য এবং দেশকে সংহত রাখিবার উপযোগী। তিনি বলিয়াছেন,—"নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে যদি কখনও দেশের শান্তি ও ঐক্য ব্যাহত হয়, তাহা হইলে আমি বলিতে বাধ্য যে, শাসনতন্ত্র খারাপ বলিয়া ঐরূপ বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইবে না, মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়াই উহা ঘটিবে।" এই কথার প্যাঁচে শাসনতন্ত্রকে খারাপ বলিবার পথ বন্ধ হইয়া গেল। তাঁহার এই উক্তির মধ্যে গণ-পরিষদের সদস্যগণ বাদে আর সমস্ত দেশবাসীর উপরেই কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। "মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ" এই দোহাই দিয়া দলবিশেষের ডিক্টেটরশিপ চিরস্থায়ী করিবার জন্য দেশের উপর এইরূপ শাসনতন্ত্র চাপাইবার চেষ্টা কেবল অশান্তির বীজই বপন করিবে।

ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে প্রথমেই একটা কথা বলা প্রয়োজন। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে এই গণ-পরিষদ গঠিত হয় নাই। ইহা ভারতের শতকরা ১৩ জনের প্রতিনিধি মাত্র। সুতরাং এই গণ-পরিষদের রচিত শাসনতন্ত্র ভারতের নির্ব্বাচকমণ্ডলী গ্রহণ করেন কি না, তাহা নির্দ্ধারণের বিধান থাকা উচিত। প্রতিনিধিমূলক দুর্ব্বলতাকে ঢাকিবার জন্যই বোধ হয় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভোটদাতার মধ্যে পার্থক্যের কথা ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাই শুধু ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইবেন, এইরূপ অব্যর্থ ব্যবস্থা করা কিরূপে সম্ভব, তাহা লইয়াও তিনি মাথা ঘামাইতেছেন। উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মূল নীতিকেই কি কৌশলে এড়াইয়া শুধু কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বের মনোমত লোককে নির্ব্বাচনে জয়ী করিবার উপযোগী ব্যবস্থা করা? জনগণের প্রতি যাঁহাদের এত অবিশ্বাস, তাঁহাদের দ্বারা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনা করা যে সম্ভবপর নয়, খসড়া শাসনতন্ত্রে তাহা সুস্পষ্ট। এমন কি, গণ-পরিষদে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্পর্কে সাম্প্রতিক বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তও গণতন্ত্রসম্মত নহে। মহীশূর, বরোদা, যোধপুর, জয়পুর, কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি বড় বড় রাজ্যের নৃপতিদিগকে ৪১ জন প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার দেওয়া সম্পর্কে না কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ছয়টি দেশীয় রাজ্য ইউনিয়নের রাজপ্রমুখকে ২৪ জন সদস্য মনোনয়নের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। যে সকল দেশীয় রাজ্য প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, ঐ ঐ প্রদেশের গবর্ণর সদস্য মনোনয়ন করিবেন। সোজা কথায়, বৃহৎ নেতৃত্বের অভিপ্রায়ে চলিবেন, দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে সেইরূপ প্রতিনিধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের জনগণের কথা বিবেচনা করা হয় নাই।

যদিও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতেই এই শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে, তথাপি ইহাতে এমন কতকগুলি গুরুতর ত্রুটি আছে, যাহার ফলে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার কার্য্যতঃ ব্যর্থই হইবে। কেন্দ্রে উচ্চতন এবং নিম্নতন দুই পরিষদের প্রস্তাব এই সকল ত্রুটির অন্যতম। যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে জরুরী ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাবও অন্যতম গুরুতর ত্রুটি। প্রস্তাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইবে। তার পর আছে মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন। কতকগুলি মৌলিক অধিকারকে আদালতে গ্রহণযোগ্য না করায় জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে।

একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং ইউনিটারী শাসনতন্ত্র কিরূপ হওয়া সম্ভব, ডাঃ আম্বেদকর তাহারই দৃষ্টান্তরূপে ভারতের খসড়া শাসনতন্ত্রকে দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিচার-ব্যবস্থা, মৌলিক বিধানগুলির ঐক্য এবং সমগ্র ভারতের জন্য একই সিভিল সার্ভিস—এই তিনটি উপায় গ্রহণ করিয়া উল্লিখিত অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু প্রদেশগুলির হাতে যে কোন ক্ষমতা কার্য্যত রাখা হয় নাই, এই প্রসঙ্গে তিনি তাহা উল্লেখ করেন নাই। খসড়া শাসনতন্ত্রটি বৃটিশ আমলের ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অতি নিকৃষ্ট নকল ছাড়া আর কিছুই নয়। ডাঃ আম্বেদকর বলিয়াছেন যে, যে সকল ধারা ভারত শাসন আইন হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেগুলি শাসন-ব্যবস্থা পরিচালন সংক্রান্ত এবং যদিও ঐগুলি শাসনতন্ত্রে স্থান না পাওয়াই উচিত ছিল বলিয়া তিনি মনে করেন, তথাপি শাসনতন্ত্র বিকৃত হওয়ার আশঙ্কায় জন্য তিনি উহা সমর্থন করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"জনসাধারণকে যদি মনে-প্রাণে শাসনতন্ত্র মানিয়া চলিতে দেখা যায়, তাহা হইলেই শুধু শাসনতন্ত্র হইতে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনবিধি বাদ দেওয়ার ঝুঁকি লইয়া উহা আইন-সভার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।" এই উক্তির মধ্যে তাঁহার সুদৃঢ় ফ্যাসিষ্ট মনোভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট। তিনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, শাসনতন্ত্রের জন্য জনসাধারণ নয়, জনসাধারণের জন্যই শাসনতন্ত্র।

সমগ্র শাসনতন্ত্রের মধ্যে ডাঃ আম্বেদকর মাত্র একটি ত্রুটি লক্ষ্য

করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, কেন্দ্রের সহিত দেশীয় রাজ্যগুলি এবং কেন্দ্রের সহিত প্রদেশ-সমূহের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে, তাহা সুখকর নহে। সুখকর না হইলেও তিনি আশা করিতেছেন যে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই পার্থক্য বিলোপ হইবে। অবশ্য আশা না করিয়া তাঁহার উপায় নাই। কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বের পক্ষপুটে দেশীয় নৃপতিগণ আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইঁহারা ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষক, এখন কংগ্রেসকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাখিবার প্রধান স্তম্ভ।

আলোচনার সূত্রপাতে সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য শেঠ দামোদর-স্বরূপ একটি সংশোধন প্রস্তাবে বলিয়াছিলেন,—"স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র ভারতীয় নরনারীর ইচ্ছার ভিত্তিতে রচিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমান গণ-পরিষদ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে রচিত হয় নাই। এই অবস্থায় গণ-পরিষদ মনে করেন যে, ইহা ভারতীয় ইউনিয়নের পার্লামেণ্টরূপে কার্য্য চালাইয়া যাইবে এবং প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে একটি নূতন গণ-পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।" ইহা দেশবাসীর মতেরই প্রতিধ্বনি। বলা বাহুল্য যে, এই প্রস্তাব বাতিল হইয়াছে, কারণ এই গণ-পরিষদে কংগ্রেসী সদস্যদের সংখ্যাই প্রবল, এবং কংগ্রেস জনসাধারণকে উপেক্ষা করিয়াই কার্য্য চালাইতে বদ্ধপরিকর। ইহাই কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতি। গণতন্ত্র ও প্রগতিবিরোধী অসংখ্য ব্যবস্থাকে আজ জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দিয়া বলা হইতেছে,—"গণ-পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করিও না, দেশনেতাদের কথা মানিয়া লও।" আর এই ব্যবস্থা মানিতে না চাহিলে জনসাধারণকে দমন করিবার সমস্ত আয়োজনই তথাকথিত গণ-পরিষদ করিয়াছেন।

সংশোধিত তৃতীয় ধারা

ভাষার ভিত্তিতে বৃটিশ আমলের প্রদেশগুলির সীমা পুনর্নির্দ্ধারণের জন্য বাঙ্গালা ও অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশের দাবী বানচাল করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় নেতারা যে কিরূপ জঘন্য ষড়যন্ত্র সুরু করিয়াছেন গণ-পরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্রের উপর ডাঃ আম্বেদকরের তৃতীয় নম্বর ধারাটির সংশোধন প্রস্তাবই তাহার নিদর্শন। মূল খসড়ায় ছিল যে, ভারত পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা কোন ষ্টেটের অংশবিশেষ পৃথক্ করিয়া অথবা দুই বা অধিক ষ্টেট একত্র করিয়া কিংবা কয়েকটি ষ্টেটের অংশ লইয়া একটি নূতন ষ্টেট গঠন করিতে পারিবেন; কোন ষ্টেটের আয়তন বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবেন এবং নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নাম দিতে পারিবেন। তবে ভারত গবর্ণমেণ্ট ছাড়া আর কেহ পার্লামেণ্টে এরূপ আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিতে পারিবেন না। অধিকন্তু, ভারত সরকারও ইচ্ছামত যখন-তখন কিছু করিতে পারিবেন না। কোন ষ্টেটের যে এলাকা পৃথক্ হইতে বা উহার বাহিরে যাইতে চাইবে, সেই এলাকার স্থানীয় আইন সভার যে সকল প্রতিনিধি থাকিবেন, তাঁহাদের অধিকাংশ একমত হইয়া যদি ভারতের রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন করেন কিম্বা যে ষ্টেটের সীমানা অথবা নাম প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপি দ্বারা প্রভাবিত হইবে, সেই ষ্টেটের আইন-সভা যদি সমর্থনসূচক প্রস্তাব পেশ করেন, তবেই ভারত সরকার পার্লামেণ্টে আইন প্রণয়নের প্রস্তাব পেশ করিতে পারিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ পরিষদ যথেষ্ট আগ্রহের সহিত তিন নম্বর ধারার আলোচনা করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, নূতন প্রদেশ গঠন, বর্ত্তমান প্রদেশগুলির সীমানা পরিবর্ত্তন, নাম পরিবর্ত্তন ও নূতন নামকরণ এবং আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধির অবাধ অধিকার এক মাত্র ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের উপরই ন্যস্ত করা উচিত।

পূর্ব্বোক্ত ধারাতে ও ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের সম্ভাবনা অনেকখানি খর্ব্ব করা হইয়াছিল। কারণ এই ধারা অনুসারে আপনা হইতেই বিহারের বাঙ্গালী অঞ্চলগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিবার কোন কথাই ছিল না। বিহারের বাঙ্গালী অঞ্চলের অধিবাসীদের ইচ্ছা থাকিলেও রাষ্ট্রপতি মহাশয়ের অনিচ্ছাতে বাঙ্গালার দাবী ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। কিন্তু তবু সামান্য ক্ষীণ আশা ছিল, যদি রাষ্ট্রপতি মহাশয় সুবিবেচক হন। সেই আশার রেখাটিকেও মুছিয়া দিবার জন্য ডাঃ আম্বেদকরের সংশোধন প্রস্তাব। তাহাতে বলা হইয়াছে,—"ভারতের অন্তর্ভুক্ত কোন অঞ্চলের সীমা পুনর্নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভারতীয় পার্লামেণ্টে উত্থাপিত করিবার পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্টকে (রাষ্ট্রপতিকে) এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক আইন সভার মতামত গ্রহণ করিতে হইবে। দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রেও প্রেসিডেণ্টকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অভিমত গ্রহণ করিতে হইবে।" গণ-পরিষদে শতকরা ১৩ জন দেশবাসীর প্রতিনিধিদের ভোটে এই সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের ফল যে কিরূপ 'শোচনীয় হইবে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ণ হইবে এবং তাঁহারা হইবেন শক্তিহীন। 'গণতন্ত্রের অর্থই সংখ্যাগুরুদের শাসন' এই স্লোগানের আড়ালে বিরাজ করিতেছে স্বৈরাচার। যে সকল প্রতিশ্রুতির দোহাই দিয়া কংগ্রেস আজিকার শক্তি ও পোজিশন অর্জ্জন করিয়াছেন এখন ক্ষমতা হাতে পাইয়া সেগুলি বিসর্জ্জন দিতেছেন। আসল কথা, বৃটিশ আমলের শাসন শোষণ, সব-কিছুরই ঠাট কংগ্রেস সরকার আজ বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর। তাই ভাষাগত প্রদেশ গঠনের দাবীকে অন্যান্য অনেক প্রতিশ্রুতির মত দাবাইয়া রাখিতে চান। স্বাধীনতার স্বরূপ দেখিয়া জনসাধারণের ভীত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

পূর্ব্বাচল প্রদেশ

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি কংগ্রেস এত দিন স্বীকার করিয়া আসিলেও আজ সেই নীতি কার্য্যে পরিণত করিতে না চাওয়ার ফলে ভারতের বহু প্রদেশেই অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার ফলে ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে অভাগা বাঙ্গালীরাই যে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিহারের বাঙ্গালীদের দুরবস্থা যে আজ কতখানি তাহা সকলেরই ভাল করিয়া জানা আছে। কিন্তু এই দুরবস্থা কেবল বিহারেই সীমাবদ্ধ নহে। পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী আসামেও বাঙ্গালী-দের একঘরে করিবার জন্য সরকারী ও বে-সরকারী ভাবে প্রবল চেষ্টা শুরু হইয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সকল বাঙ্গালী আসামে বসবাস করিতেছেন, আসামের উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের আসামের লোক বলিয়া আসাম সরকার স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। ছাত্রবৃত্তি ও সরকারী চাকুরীতে অসমীয়া

ভাষা না জানিলে বাঙ্গালীদের বিতাড়ন করিবার গোপন ও প্রকাশ্য চেষ্টার নিদর্শন প্রায়ই আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

এই অবস্থায় আসামের বাঙ্গালা-ভাষাভাষী জনসাধারণ যে বাঙ্গালীদের লইয়া স্বতন্ত্র একটি সীমান্ত প্রদেশ গঠনের দাবী তুলিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। শ্রীহট্ট, কাছাড়, মণিপুর, ত্রিপুরা, লুসাই ও গারো পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চল লইয়া একটি পূর্ব্বাচল প্রদেশ গঠন করিবার জন্য গণ-পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান হইয়াছে। বস্তুতঃ পক্ষে বাঙ্গালা-ভাষাভাষী যে সকল অঞ্চল আজ আসামের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে—ভাষা, সংস্কৃতি বা ইতিহাসের কোন দিক্ দিয়াই সেগুলিকে আসামের মধ্যে পূরিয়া দিবার বিন্দুমাত্র যৌক্তিকতা নাই। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালীকে ভয় করিতেন এবং সর্ব্ব রকমে পঙ্গু করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী চাল চালিবার জন্য তাঁহারা যে অপকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, কংগ্রেসের উর্দ্ধতন নেতৃবৃন্দ যদি তাহাই আঁকড়াইয়া থাকেন, তবে পুরাতন আমলের সহিত নূতন আমলের পার্থক্য কোথায়? গারো, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় অঞ্চলে পাহাড়ীরাই প্রধান অধিবাসী হইলেও ঐ অঞ্চলগুলিকে আসামের সহিত যুক্ত রাখিবার কোন হেতুই নাই, কারণ ঐ স্থানে বাঙ্গালীদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে বারো হাজারের কাছাকাছি হইলেও অসমীয়াদের সংখ্যা ছয় হাজারেরও কম। লুসাই পাহাড়ের অবস্থাও অনুরূপ। এই অবস্থায় কংগ্রেসের ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতিকে কার্য্যকরী করিতে হইলে গোয়ালপাড়া ও গারো পাহাড়কে পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিয়া খাসিয়া, জয়ন্তীয়া পাহাড় অঞ্চল, কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, লুসাই পাহাড় ও মণিপুর লইয়া একটা পৃথক্ সীমান্ত প্রদেশ গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। ভারতের সীমান্ত অঞ্চল সুদৃঢ় করার কাজে এই নূতন প্রদেশ অনেকখানি সাহায্য করিবে। সর্দ্দার প্যাটেল এই পরিকল্পনার ঘোর বিরোধী। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, উক্ত অঞ্চল সমূহ আসামের সহিতই সংযুক্ত থাকিবে। আত্মরক্ষার তাগিদেই আসামের বাঙ্গালীদের এই দাবী লইয়া প্রচণ্ড আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবার পূর্ব্বেই আন্দোলন প্রচণ্ড আকার ধারণ না করিলে দাবী পূরণ হইবার সম্ভাবনা অল্প।

ভারত কি কমনওয়েলথে থাকিবে?

আমাদের নেতৃবর্গ এত দিন বলিয়া আসিয়াছেন যে, ভারত বৃটিশের সহিত সম্পর্কশূন্য স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হইবে। কংগ্রেসের প্রস্তাবেও তাহাই আছে। জনগণও তাহাই চায়। বৃহৎ নেতৃত্ব কংগ্রেসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। জনমতকেও শান্ত রাখা প্রয়োজন। তাই আবার যখন বৃটেন তথা বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত তাহার শেষ ক্ষীণ সম্পর্কটুকুও ছিন্ন করিল, তখন বৃহৎ নেতৃত্ব ভারতকে বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে রাখিবার জন্য পথ সন্ধানে ব্যস্ত। অবশ্য এখন পর্য্যন্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র একটি ডোমিনিয়ন ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে, কমনওয়েলথ প্রধান-মন্ত্রী সম্মেলনে ভারতকে কমনওয়েলথে রাখিবার বিশেষ চেষ্টা হইবে। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত নেহরু দেশবাসীর কাছে বলিলেন যে, তিনি কোন বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়া আসেন নাই। অথচ আজ ভারত-কমনওয়েলথ সম্পর্ক বিষয়ে একটি খসড়া ফরমূলার অস্তিত্বের কথা শোনা যাইতেছে। লণ্ডনে বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ এটলী, সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এবং কোন কোন ডোমিনিয়ন রাজনীতিকদের সহিত পণ্ডিত নেহরুর আলোচনার ফলেই না কি এই খসড়া ফরমূলা রচিত হইয়াছে। পণ্ডিতজী তাঁহার অন্যান্য সহযোগীদের ইহা গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং আলাপ-আলোচনার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে না-কি বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ এটলীকে রীতিমত ওয়াকিবহাল রাখা হইতেছে।

এই খসড়া ফরমূলা সম্পর্কে যেটুকু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, দুইটি বিকল্প প্রস্তাব আছে। প্রথম, পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিয়া বৃটেনের সহিত একটি সন্ধি করা। দ্বিতীয়, কমনওয়েলথের সহিত সম্বন্ধ বজায় রাখিবার জন্য দ্বৈত নাগরিক অধিকার প্রবর্ত্তন করা। দ্বৈত নাগরিক অধিকার বলিতে বুঝায় যে, কমনওয়েলথের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরা নিজ নিজ নাগরিক হিসাবে যেমন প্রাথমিক মর্য্যাদা লাভ করিবেন, তেমনি বৃহত্তর রাষ্ট্রসঙ্ঘ কমনওয়েলথের এক জন হিসাবে সাধারণ মর্য্যাদার অধিকারী হইবেন। ইউ-এন-ওতে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সম্পর্কে ভারতের মর্য্যাদা যে ভাবে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে, তাহার পর আর মর্য্যাদার কথা না বলাই ভাল।

বিলাতে যাইয়া পণ্ডিত নেহরু বহু স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়াছেন। তাহাতে গলিয়া গিয়া তিনি এইরূপ প্রস্তাব করিতেছেন, তাহা চিন্তা করা বোধ হয় ঠিক হইবে না। তবে কি কমনওয়েলথে থাকিবার জন্য তাঁহার উপর চাপ দেওয়া হইয়াছে। বৃটিশ আবার ভারত জয়ের চেষ্টা করিবে এ-কথা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। পাকিস্তান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার হুমকীর দ্বারা চাপ দেওয়া যাইতে পারে। বৃটিশের প্রিয়পাত্র পাকিস্তান যে বৃটিশের কথামত চলিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। তাছাড়া কম্যুনিজম ভীতির চাপ দেওয়াও অসম্ভব নয়। চীনে কম্যুনিষ্ট-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার জোগাড় চলিতেছে। মালয়, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া সর্ব্বত্রই কম্যুনিষ্ট অভ্যুত্থান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারত যে শীঘ্রই কম্যুনিষ্ট-বেষ্টিত হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কা রহিয়াছে। রাষ্ট্রনায়করা বিলক্ষণ ভীত হইয়া পড়িয়াছেন ভারতও শেষে কম্যুনিষ্ট না হইয়া যায়। এই অবস্থায় ভারত একমাত্র বৃটেনের দিকেই সাহায্যের জন্য তাকাইতে পারে। ইহার অর্থ, উক্ত সাম্রাজ্যবাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন। ভারতের সম্মুখে আজ উভয় সঙ্কট। এক দিকে কম্যুনিজম, অপর দিকে সাম্রাজ্যবাদ। নেতাদের ইচ্ছা কম্যুনিজমের ভয়ে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপুটে আশ্রয় লওয়া। একমাত্র বৃটিশ-সম্পর্কশূন্য স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই ভারত এই উভয় সঙ্কট এড়াইতে পারে, ইহাই জনগণের ধারণা ও বিশ্বাস।

সর্দ্দারজীর সত্যভাষণ

জন্মদিবস উপলক্ষে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন,—"পুঁজিবাদ ধ্বংস করার যে সব কথা উঠিয়াছে, তাহাতে আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। গভর্ণমেণ্ট পুঁজিপতিদের শত্রু নহেন। পুঁজিবাদ লোপ করিলে যদি দেশের মঙ্গল হইত বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিত, তবে আমিই সর্ব্বপ্রথম পুঁজিবাদ লোপ

করিতে বলিতাম। কিন্তু পুঁজিবাদ বিলোপে দেশের কল্যাণ হইবে না।" এমন স্পষ্ট ভাবে কংগ্রেসের ধনিক তোষণ-নীতির কথা সর্দারজী ছাড়া আর কে ঘোষণা করিতে পারিতেন ?

সর্দার প্যাটেল আরও বলিয়াছেন,—"শ্রমিক, মালিক, কর্ম্মচারী, ধনি-দরিদ্র সকলকেই উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আমরা যে পথে চলিয়াছি, সেই পথেই যদি চলিতে থাকি, তবে ভারতের ধ্বংস অনিবার্য্য।" সর্দারজী যে একটি সত্য কথা স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ। মুদ্রাস্ফীতি, চোরাবাজার প্রভৃতিই যে দেশের দুরবস্থার হেতু, তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। মিল-মালিকদের উদ্দেশ্যে এমন কথাও তিনি বলিয়াছেন,—"অতিলাভের জন্য আপনাদের উপর যে দোষারোপ করা হয়, আপনারা তাহার দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না।" শুধু এখনই নহে, ইতিপূর্ব্বেও ভারত সরকারের নেতারা কাপড়ের চোরাবাজার করিয়া দেশের লোকের রক্ত নিঙড়াইয়া কোটি কোটি টাকা লাভ করিবার জন্য শিল্প-মালিকদের অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন, স্বেচ্ছায় উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যাহত করিবার জন্য কল-কারখানার অধিপতিরা যে চেষ্টা করিতেছেন, সরকারের রেল বিভাগের বিবৃতিতে সে কথা গোপন করা হয় নাই। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান শোচনীয় দুরবস্থার জন্য তাঁহাদের সায়েস্তা করিবার জন্য সর্দারজী ও তাঁহার গবর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ? তাঁহার বক্তৃতায় তো তোষণ ও সহানুভূতিই প্রকাশ পায়।

বাস্তহারাদের পুনর্ব্বসতি সমস্যা

৬ই অগ্রহায়ণ ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। গত এপ্রিল মাসে উভয় ডোমিনিয়নের সংখ্যালঘুদের প্রাণ ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলনে এক চুক্তি হইয়াছিল। পাকিস্তান ঐ চুক্তির একটি সর্ত্তও পালন করে নাই। যদি পালন করিত তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দুরা ভিটামাটি ছাড়িয়া এই ভাবে চলিয়া আসিত না। কাজেই কলিকাতা চুক্তি কত দূর কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিবার জন্য সম্মেলনের নূতন করিয়া কার্য্যতঃ কোন সার্থকতা নাই। পাকিস্তানী নেতাদের কার্য্যকলাপ ও ভারতের বিরুদ্ধে নির্জ্জলা মিথ্যা প্রচার দেখিয়া তাঁহাদের কোন প্রতিশ্রুতির উপরই নির্ভর করা চলে না। ২৫ লক্ষের অধিক হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসা সত্ত্বেও পূর্ব্ববঙ্গের এক জন দায়িত্বশীল মন্ত্রী যেখানে বলিতে পারেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের একটি হিন্দুও বাস্তত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় নাই, সেখানে আলোচনা বৃথা।

অবস্থা ক্রমশঃ যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে শুধু পাকিস্তান হইতে হিন্দুদের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ আর কত দিন চলিতে পারে, ইহা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের স্থান পশ্চিমবঙ্গে সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী গবর্ণমেণ্ট সমূহের মনোভাবও বাঙ্গালী-বিমুখ। সেদিক্ দিয়া কোন সাহায্যের ভরসা নাই। নয়া দিল্লীর রাজনৈতিক মহল মনে করিতেছেন যে, হয়ত শীঘ্রই এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হইবে, যখন পাকিস্তানকে ভারতবাসী মুসলমানকে গ্রহণ করিতে হইবে, না হয় তো বাস্তত্যাগী হিন্দুদের বসবাসের জন্য পাকিস্তানের কতকগুলি অঞ্চল ভারতকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই সমস্যা সমাধান করিতে হইলে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের কতক অঞ্চল, বিশেষ করিয়া সমগ্র নদীয়া, খুলনা ও যশোহর জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি বিশেষ বিশেষ অপ্রীতিকর ঘটনার উল্লেখ করিয়া পাকিস্তানী হিন্দুদের বাস্তত্যাগের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বিবরণের কোন অংশ যে অসত্য বা অতিরঞ্জিত, তাহা বলিবার সাহস পাকিস্তানী গবর্ণমেণ্টের হয় নাই। পাকিস্তান গণ-সমিতির নেতারাও বাস্তত্যাগের কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, একে তো শাসন ব্যাপারে হিন্দুদের কোন প্রতিনিধি নাই; তাহার উপর ব্যাপক ভাবে হিন্দুদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। অকারণে বিশিষ্ট হিন্দুদের ঘর-বাড়ী রেকুইজিশন করা হইতেছে এবং উদ্বাস্তু বসবাসের কোনরূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে না। বিহার হইতে আগত মুসলমানরা জোর করিয়া হিন্দুদের ঘর-বাড়ী দখল করিতেছে, অথচ কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না। ব্যবসা-বাণিজ্যে পক্ষপাতিত্ব করা হইতেছে। সরকারী শিক্ষানীতি অমুসলমানের সংস্কৃতির ঐতিহ্যের বিরোধী। কয়েকটি এলাকায় সমাজ-বিরোধী কার্য্যকলাপ চলিতেছে এবং কর্ত্তৃপক্ষ তাহা আয়ত্তে আনিতে পারিতেছেন না। এই সমাজ-বিরোধী কার্য্য-কলাপগুলির স্বরূপ যে কি, তাহা পাকিস্তান গণ-সমিতির নেতারা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই, তবে শুনিতে পাওয়া যায় যে, কোন হিন্দুই বয়স্থা কন্যা লইয়া মুসলমানদের মধ্যে বাস করা সম্ভব বলিয়া মনে করেন না। হিন্দুদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষা মুসলমান যুবকদের মধ্যে দেখা দিয়াছে। ইহার পর হিন্দুরা যে পাকিস্তান ত্যাগ করিতে চাহিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

অথচ পাকিস্তানী কর্ত্তারা বলিতেছেন যে, হয়তো কয়েক জন হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সে জন্য পাকিস্তানী কর্ত্তৃপক্ষের অথবা কর্ম্মচারীদের কোনরূপ দায়িত্ব নাই। দোষ হিন্দুদের নিজেদেরই। পাকিস্তান সৃষ্টির পরেই সমস্ত হিন্দু কর্ম্মচারী পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন, ভারতীয় নেতারা পাকিস্তানের হিন্দুদের দুর্গতি সম্বন্ধে কাল্পনিক চিত্র-সম্বলিত বিবৃতি প্রচার করিতে লাগিলেন। পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোথাও না কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মুসলমানদের উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। কাজেই পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা বাস্ত ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে আরম্ভ করিলেন। চমৎকার যুক্তি! ইহার পর আর বলিবার কিছুই নাই।

পূর্ব্ববঙ্গ সরকার বাস্তত্যাগ সম্পর্কে যে প্রেস-নোট প্রকাশ করিয়াছেন তাহার উপসংহারে বলা হইয়াছে,—"পরস্পরের প্রতি দোষারোপের সময় ইহা নহে। চিন্তানুসন্ধান এবং আন্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্পর্কের উন্নতি বিধানের জন্য যুক্ত-কর্ম্মপন্থা গ্রহণই বর্ত্তমান সময়ের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপার।" ইহার একমাত্র সহজ ও সরল অর্থ এই যে, উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে সম্প্রীতির অভাবের জন্যই পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা বাস্তত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। ভারতীয় ডোমিনিয়নের সংখ্যালঘুরা নিরাপদে, নির্ভীক ভাবে এবং সুখে-শান্তিতে বাস করিতেছেন। কেহই ভারতীয় ডোমিনিয়ন ছাড়িয়া পাকিস্তানে যাওয়ার কল্পনাও করিতেছেন না। বাস্তত্যাগ করিয়া আসিতেছে শুধু পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা। ইহার অর্থ কি অত্যন্ত স্পষ্ট নহে ? সহযোগী ইত্তেফাক

লিখিয়াছেন,—"কিন্তু পূর্ব্ব-বাংলা সরকারের আলোচ্য প্রেস-নোটে প্রদর্শিত দুইটি কারণের দিকে আমরা উভয় সরকারের এবং উভয় রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারিতেছি না।" এই দুইটি কারণের একটি পূর্ব্ববঙ্গের নেতাদের পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসা এবং অপরটি উভয় বাঙ্গালার মধ্যে যাত্রী ও মাল-চলাচলের বিধি-নিষেধ আরোপ। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা নিপীড়িত হইয়া বাস্তুত্যাগ করিতেছে, এই আসল কারণটি বাদে আর যত কিছু অসম্ভব বা অসংলগ্ন ঘটনা বা ব্যাপারকে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে পূর্ব্ববঙ্গ সরকার ও 'ইত্তেহাদে'র আপত্তি নাই।

সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের সম্পর্কে ভারত সরকার কিছুটা মাথা ঘামাইতেছেন। অবশ্য এখনও কোন সমাধান ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই। বহু পূর্ব্বেই তাঁহাদের এ বিষয়ে তৎপর হওয়া উচিত ছিল, কারণ এই অবস্থার জন্য প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্বই দায়ী। এই সম্পর্কে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছেন, —"পাকিস্তানের কর্ত্তারা যদি পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত হিন্দুকে তাড়াইয়া দিতে চান, তাহা হইলে ঐ সমস্ত বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বসতির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ভূমি পাকিস্তানকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।" সংখ্যা হিসাবে বাঙ্গালার মুসলমানেরা যতটুকু অংশ দাবী করিতে পারিতেন, র‍্যাডক্লিফ সাহেবের কৃপায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক জমি পাইয়াছেন। এখন যদি আবার পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সমস্ত হিন্দুকে তাড়াইয়া দেওয়াই তাঁহাদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত হিন্দুদের বাসোপযোগী জমিও তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের পুনর্ব্বসতি বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় ও পূর্ব্ব-পাকিস্তানের দুই-এক জন কংগ্রেসী নেতা পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের শত লাঞ্ছনা সহ করিয়াও পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ভারত সরকারের নিকট হইতেও এইরূপ উপদেশ মিলিয়াছে। কিন্তু সে উপদেশ অনুসারে কাজ করিবার বেশী লোক পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এখন সকলেই অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। সর্দ্দারজী বলিয়াছেন যে, বাস্তুহারাদের পাকিস্তানের কিয়দংশ দাবী করা উচিত এবং ইহার জন্য যাহা কিছু করা প্রয়োজন তাহা করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন।

পাঞ্জাবে অধিবাসী-বিনিময় কংগ্রেসকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ইহা বেশ বুঝিয়াছেন যে, কংগ্রেসী নেতারা অধিবাসী-বিনিময়ের প্রস্তাব কিছুতেই করিবেন না। ভারতে মুসলমানরা সগর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া বিচরণ করিতেছে। কাজেই ভারত গবর্ণমেন্ট চাপে পড়িয়া অধিবাসী বিনিময়ের প্রস্তাব করিলেও পাকিস্তান তাহাতে রাজী হইবে না, কারণ ভারতে মুসলমানরা সম্পূর্ণ নিরাপদে বাস করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় পূর্ব্ববঙ্গের এক কোটি পঁচিশ লক্ষ হিন্দু ভারতে চলিয়া গেলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর গুরুতর আঘাত লাগিবে। সুতরাং ভারত গবর্ণমেন্ট তথা কংগ্রেসী নেতারা ইহা পছন্দ করিবেন না। পাকিস্তানী নেতারা ইহাও বুঝেন যে, পশ্চিম-পাঞ্জাবের পুনরাবৃত্তি পূর্ব্ববঙ্গে ঘটিলে ভারতে তাহার প্রতিক্রিয়া পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের মত হওয়া উপেক্ষার বিষয় নয়। এই সকল কারণেই পূর্ব্ববঙ্গে পশ্চিম-পাঞ্জাবের পুনরাবৃত্তি ঘটে নাই। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম এবং কৌশলপূর্ণ উপায়ে হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলিতেছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, এই ভাবে চাপ দিয়া ধীরে ধীরে হিন্দুদিগকে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা। এই জন্য হিন্দু মেয়েদের বিবাহ করিবার জন্য মুসলমান যুবকদের এত উৎসাহ। সমস্তই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ফল।

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন সাহেব যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই—"হিন্দুরা যে দলে দলে পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার জন্য পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেন্টের কোনরূপ দায়িত্বই নাই; এবং বাস্তুত্যাগ বন্ধ করাও পূর্ব্ববঙ্গের গবর্ণমেন্টের সাধ্যাতীত। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে সমস্ত হিন্দু-নেতা পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই মিছামিছি চীৎকার করিয়া সকলকে জানাইয়া দিতেছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে বাস করা হিন্দুদের পক্ষে আদৌ নিরাপদ নহে। তাঁহাদের চীৎকার শুনিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের মনে অযথা আতঙ্কের সঞ্চার হইতেছে এবং তাঁহারা তাড়াতাড়ি সব ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের দিকে ছুটিতেছেন। এইরূপ করিবার কারণ আসন্ন নির্ব্বাচনে জয়লাভ করাই এই সকল নেতার লক্ষ্য। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা নিশ্চয়ই পূর্ব্ববঙ্গের নেতাদের ভোট দিবেন; এই ভোটের সাহায্যে তাঁহারা সদলবলে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট দখল করিয়া ফেলিবেন।" পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের সহিত পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের বিরোধ বাধাইবার কৌশল হিসাবে এই যুক্তির যে মূল্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নুরুল আমিন সাহেব সম্ভবতঃ ভুলিয়া গিয়াছেন যে, নির্ব্বাচনের এখনও বিলম্ব আছে এবং পূর্ব্ববঙ্গের সব হিন্দুও যদি পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসেন তাহা হইলেও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু অপেক্ষা সংখ্যাধিক্য লাভ করার কোন সম্ভাবনাই তাঁহাদের নাই।

নুরুল আমিন সাহেব বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব্ববঙ্গে একটিও দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় নাই। কথাটি সত্য, কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছাড়া হিন্দুদের নিপীড়িত করিবার আরও যে সহস্র উপায় আছে, তাহাও তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশেষ সরকারী প্রয়োজনের অজুহাতে গবর্ণমেন্ট যদি বিশিষ্ট হিন্দুদিগকে দুই দিনের নোটীশে তাঁহাদের পৈত্রিক ভিটা ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য করেন, নিরাপত্তার দোহাই দিয়া কেবল হিন্দুদেরই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লন, পূর্ব্বে যে সকল স্থানে কস্মিন্ কালেও গো-হত্যা করা হইত না, সেই সকল স্থানে যদি গো-হত্যার ধুম পড়িয়া যায়, মুসলমানেরা যদি বিনা বাধায় হিন্দুদের জমি হইতে ধান কাটিয়া লইয়া যায়, তাহাদের গরু-বাছুর চুরি করিয়া খাইয়া ফেলে, গাছ হইতে ফল পাড়িয়া আত্মসাৎ করে, মুসলমান যুবকেরা যদি হিন্দু স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহাদের সহিত মধুর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে এবং পুলিসে সংবাদ দিয়াও যদি এই সমস্ত ব্যাপারের প্রতিকার না হয়, তাহা হইলে হিন্দুর যে সসম্মানে পাকিস্তানে বাস করিবার কোন উপায়ই থাকে না, তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি নিশ্চয়ই পূর্ব্ব-পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের আছে।

বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বসতির জন্য পাকিস্তানের কয়েকটি অঞ্চল ভারত গবর্ণমেন্ট দাবী করিতে পারেন, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের

মুখে এই কথা শুনিয়া নুরুল আমিন সাহেব ক্রোধে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়াছেন। তিনি বীরদর্পে ঘোষণা করিয়াছেন,—"পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সহস্র সহস্র মুসলমান সর্ব্বস্বার্থ ত্যাগ করিয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে তাহারা মুসলমানদের এই স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।" তাঁহার মতে পাকিস্তান যদি মুসলমানদের স্বদেশ হয়, এবং হিন্দু ও মুসলমান যদি পৃথক্ নেশন হয় তাহা হইলে পাকিস্তান হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই দেশ, নুরুল আমিন সাহেবের এ কথা বলিবার সার্থকতা কি? পাকিস্তান অর্জ্জনের জন্য মুসলমানদের ত্যাগ স্বীকারের কথা না তোলাই ভাল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃপা হইতে ইহার উৎপত্তি; এবং ইহা অর্জ্জনের জন্য দুই-এক স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইয়া হিন্দুহত্যা করা ভিন্ন মুসলমান নেতারা আর যে কি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে পাকিস্তান হইতে হিন্দু বিতাড়ন করিতে তাঁহারা যে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না, তাহা আমরা স্বীকার করি।

যাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছিল, যাঁহারা বহু দিন ধরিয়া প্রচার করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক্ নেশন এবং সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করিয়াও উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে এক রাষ্ট্রের ভিতর বাস করা সম্ভবপর নয়, জনাব সহীদ সোরাউর্দ্দী তাঁহাদেরই মধ্যে অন্যতম। তাঁহার প্রধান মন্ত্রিত্ব কালে কলিকাতার কুখ্যাত ১৬ই আগষ্ট আজও নাগরিকদের মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করে। এত করিয়াও তিনি পাকিস্তানে কলিকা পান নাই, আজ তাঁহাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইয়াই বাস করিতে হইতেছে। হঠাৎ তিনি পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের কর্ত্তৃপক্ষ আবার একটি বৈঠক বসাইবেন শুনিয়া তিনি উল্লসিত হইয়া বলিয়াছেন,—"আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, অন্যত্র যাহাই ঘটুক না কেন, পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের গায়ে আমরা আঁচড় লাগিতে দিব না। বাঙ্গালার উভয় অংশকেই আমাদের নিরাপদ রাখিতে হইবে।" পূর্ব্ববঙ্গ পাকিস্তানের একটি প্রদেশ মাত্র এবং পাকিস্তানের কর্ত্তারা যে নীতি অনুসরণ করিবেন পূর্ব্ববঙ্গের কর্ত্তৃপক্ষকেও সেই নীতি অনুসরণ করিয়াই চলিতে হইবে কাজেই পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট দুইটির মধ্যে যতক্ষণ প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত না হয়, ততক্ষণ পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার স্বতন্ত্র মীমাংসা অসম্ভব সোরাউর্দ্দী সাহেব বলিয়াছেন,—"উভয় ডোমিনিয়নে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করুক, ইহাই আমাদের কাম্য। আমরা যেন লোক-বিনিময় বা নূতন করিয়া সীমা নির্দ্ধারণের কথা তুলিয়া গণ্ডগোল সৃষ্টি না করি।" পশ্চিম-পাকিস্তানে লোক-বিনিময়ের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, এবং পূর্ব্ব-পাকিস্তানে উহা এখন প্রবল বেগে চলিতেছে। আমরা সোরাউর্দ্দী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, উভয় ডোমিনিয়নে হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে পাশাপাশি প্রীতিপূর্ণ ভাবে বাস করা যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে পাকিস্তান সৃষ্টি করিবার অথবা বজায় রাখিবার সার্থকতা কি? পাকিস্তানের কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণই আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। হিন্দুরা যাহাতে পূর্ব্ব-পাকিস্তানে নিরাপদে ও সসম্মানে বাস করিতে পারে, সে ব্যবস্থাও তাঁহারা করিতেছেন না। তাই বাধ্য হইয়াই পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতে হইতেছে।

বাস্তুহারাদের সমস্যার কোন সমাধানই এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। এক কোটি পঁচিশ লক্ষ হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর গুরুতর আঘাত লাগিবে সন্দেহ নাই। তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে কি করিয়া সম্ভব? স্থান কোথায়? এই জন্যই মানভূম, সিংভূম, পূর্ণিয়া ইত্যাদি জেলা পশ্চিমবঙ্গের একান্ত প্রয়োজন। কংগ্রেসের স্বীকৃত নীতি অনুসারে ভাষামূলক প্রদেশ গঠন করিলে এইগুলি পাওয়া যাইত এবং বাস্তুহারাদের বসতি-সমস্যা কিছুটা সমাধান হইত। কিন্তু সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল মনে করেন যে, বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বসতি সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ভাষামূলক প্রদেশ গঠনের কথা স্থগিত রাখা উচিত। কেন—তাহা তিনি বলেন নাই। কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্বেরও এই মত। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গকে কোন

বরোদা রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান ও পশ্চিম-বাংলার অস্থায়ী গভর্ণর স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এখন অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার আবাসগৃহে এক ঘরোয়া-বৈঠকে এই ছবিটি তোলা হয়। স্যর ব্রজেন্দ্রলাল (মধ্যে) লেডী প্রতিমা মিত্র (বামে) ও শ্রীযুত ভবতোষ ঘটক মহাশয়কে (ডাইনে) দেখা যাইতেছে।

ভূমি দেওয়া হইবে না। ভারত গবর্ণমেণ্টই যখন ভূমি দিতে অস্বীকৃত, তখন পূর্ব্ব-পাকিস্তান ভূমি দিতে যে রাজী হইবে তাহা আশা করা যায় না। সুতরাং এই সমস্যার সমাধানের মাত্র একটি পথই খোলা আছে। পাকিস্তানের বিলুপ্তিই এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, ভারত গবর্ণমেণ্ট কি পাকিস্তানের বিলুপ্তি ঘটাইতে পারেন ?

সুখের বিষয়, নব-নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবীকে স্বীকার করিয়াছেন। কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের মত এই সমস্যাটিকে দূরে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। ১৬ই নবেম্বর দিল্লীর এক সম্বর্দ্ধনা সভায় তিনি বলিয়াছেন,—"ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী খুবই যুক্তিসঙ্গত। এই দাবী অবশ্যই মানিয়া লওয়া উচিত। বৃটিশ সরকার তাঁহাদের সুবিধার জন্য অন্যায় ভাবে যে সকল কৃত্রিম সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদেরই পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।" কিন্তু খসড়া শাসনতন্ত্রে সীমানা রদ-বদলের জন্য যে রকম ধারা নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাঙ্গালার দাবীকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্যই এত তোড়-জোড়। সুতরাং শেষ অবধি বাঙ্গালার ভাগ্যে মানভূম, সিংভূম, পূর্ণিয়া ইত্যাদি লাভ হইবে বলিয়া আশা হয় না।

পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অবস্থা নিজ চক্ষে দেখিবার জন্য স্বয়ং লিয়াকৎ আলি খাঁ সেখানে গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে সংখ্যালঘুদের কিছু সুবিধা অথবা সমস্যার আংশিক সমাধানও হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি কয়েকটি বক্তৃতায়, পাকিস্তান যে ইসলামী রাজ্য তাহা বেশ জোরের সহিতই বুঝাইয়া দিয়াছেন। সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, বহিরাক্রমণ হইতে পাকিস্তান রক্ষা করাই এখন আমাদের উদ্দেশ্য। অন্ন-বস্ত্রের চেয়ে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনই অধিক। উক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আমাদের মনে হয়।

কলিকাতায় মহরম

২৭শে কার্ত্তিক শনিবার, মহরমের শোভাযাত্রা উপলক্ষে কলিকাতায় যে অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহা যেমন অপ্রীতিকর তেমনই শোচনীয়। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট সংখ্যালঘুদের সর্ব্বপ্রকার অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান। পুলিশের ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা অবগত আছি যে, মহরমপর্ব্ব যাহাতে সুষ্ঠুভাবে এবং সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয় পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট তাহার সুব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই অবস্থায় মহরমের মিছিল উপলক্ষে যে গোলযোগ ঘটিয়া গেল, তাহাকে শুধু অপ্রত্যাশিত ও শোচনীয় বলিলেই যথেষ্ট হয় না। পুলিশ অবশ্য অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনিতে সমর্থ হয় এবং উচ্ছৃঙ্খলতা ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ পায় নাই।

সরকারী বিজ্ঞপ্তির এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, এই গোলমাল কাহারা আরম্ভ করে তাহা সঠিক করিয়া বলা সম্ভব নয়। তবে উচ্ছৃঙ্খল লোকেরাই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট গোলযোগকারীদিগকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টকে দোষ দেওয়া যায় না। বিপুল জনতার মধ্যে গুণ্ডার দল সাধারণতই হাঙ্গামা করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে কোনরূপ হাঙ্গামা না হয় তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহারা এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য দায়ী, তাহারা যে গণতান্ত্রিক লৌকিক রাষ্ট্র হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার জন্যই ইহা করিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহারা কাহারা ? এই সেদিনের কথা, পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে অলীক অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘুদের উপর উৎপীড়ন চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা নিঃসংশয় ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। ঠিক তাহার পরেই মহরম উপলক্ষে এই গোলযোগ কি তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়াই মনে হয় না ? গোলযোগ পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের ভুয়া অভিযোগের একটা দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রয়াস কি না, তৎসম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র সচিবকে আমরা বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাইতেছি।

ষ্টীমার দুর্ঘটনা

২রা অগ্রহায়ণ প্রাতে পাটনা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ষ্টীমার-ঘাটের নিকট গঙ্গা নদীতে "নারায়ণী" ষ্টীমার ডুবির ফলে অন্ততঃ পাঁচ শতাধিক ব্যক্তির প্রাণহানি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ষ্টীমারখানি শোনপুর মেলা হইতে যাত্রী ও গবাদি পশু লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় উল্টাইয়া যায়। কর্ত্তৃপক্ষ ষ্টীমার ভাঙ্গিয়া মৃতদেহ বাহির করিবার আদেশ দিয়াছেন।

পরলোকে নরেন্দ্রনাথ শেঠ

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ ১৮৭৮ সালে কলিকাতার খ্যাতনামা শেঠ-বসাক সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন। নগরীতে সর্ব্বপ্রথম যে সকল সম্প্রদায় বসতি স্থাপন করেন, এই সম্প্রদায় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। নরেন্দ্রনাথ ১৮৯৭ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তৎপরে আইন পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া হাইকোর্টের এডভোকেট হন। ১৯০৫-৬ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়, তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের নীতি প্রচার করিতে থাকেন। দেশের সর্ব্বত্র জাতীয় সঙ্গীত "বন্দে মাতরম্" প্রচার করার জন্য তৎকালে যে বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায় গঠিত হয় তিনি তাহার অন্যতম সংগঠক ছিলেন। ১৯১৬ সালে কলিকাতায় রাজনৈতিক এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইলে নরেন্দ্রনাথকে নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত সন্দ্বীপের এক সর্পসঙ্কুল স্থানে অন্তরীণ রাখা হয় এবং এই স্থানে আটক থাকার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাঁহাকে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে আটক রাখা হয়। সম্ভবতঃ তিনিই উক্ত রেগুলেশন অনুসারে ধৃত তৃতীয় রাজবন্দী ছিলেন। ১৯১৯ সালে মুক্তিলাভ করিয়া মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের প্রাক্কালে তিনি পুনরায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসেবার কার্য্যে ব্রতী হন। কিছু কাল হইতে তিনি বাতব্যাধি ও রক্তের চাপবৃদ্ধির জন্য কষ্ট পাইতেছিলেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর সহসা তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন এবং প্রায় পক্ষকাল পরে ২১শে আশ্বিন রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকার সময় পরলোক গমন করেন।

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৭শ বর্ষ—অগ্রহায়ণ : ১৩৫৫ সাল

২য় খণ্ড : ২য় সংখ্যা

"রাধিকা বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রেমময়ী। যোগমায়ার ভিতরে তিন গুণই আছে—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। শ্রীমতীর ভিতর বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বই আর কিছু নাই। সচ্চিদানন্দকে যদি ভালবাস্‌তে শিখতে হয় তা হলে রাধিকার কাছে শেখা যায়। সচ্চিদানন্দ নিজে রসাস্বাদন করবার জন্য রাধিকার সৃষ্টি করেছেন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের অঙ্গ থেকে রাধা বেরিয়েছেন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই 'আধার' আর তিনি নিজেই শ্রীমতীরূপে 'আধেয়'—নিজের রস আস্বাদন কর্ত্তে—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দকে ভালবেসে আনন্দ সম্ভোগ কর্ত্তে।"

"শ্রীমতীর মহাভাব হতো। সখীরা কেহ ছুঁতে গেলে অন্য সখী বল্‌ত—কৃষ্ণবিলাসের অঙ্গ ছুঁস্‌নি, ওঁর দেহমধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস কচ্চেন। ঈশ্বর অনুভব না হলে ভাব বা মহাভাব হয় না। গভীর জল থেকে মাছ এলে জলটা নড়ে, তেমন মাছ হলে জল তোলপাড় করে। তাই ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। আহা! গোপীদের কি অনুরাগ। তমাল দেখে একেবারে প্রেমোন্মাদ! শ্রীমতীর এরূপ বিরহানল যে চক্ষের জল সে আগুনের ঝাঁজে শুকিয়ে যেত—জল হতে হতে বাষ্প হয়ে উড়ে যেত। কখন কখন তাঁর ভাব কেউ টের পেত না। সায়ের দীঘিতে হাতী নাম্‌লে কেউ টের পায় না। আহা! সেই প্রেমের এক বিন্দু যদি কারু হয়! কি অনুরাগ! কি ভালবাসা! শুধু ষোল আনা অনুরাগ নয়—পাঁচ সিকে পাঁচ আনা! এর নাম প্রেমোন্মাদ! ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কাম-ক্রোধাদি থাকে না। গোপীদের ঐ অবস্থা হয়েছিল,—কৃষ্ণে অনুরাগ। শ্রীমতী যখন বললেন,—আমি কৃষ্ণময় দেখ্‌ছি; সখীরা বল্‌লে,—কৈ আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না, তুমি কি প্রলাপ বক্‌চো? শ্রীমতী বল্‌লেন,—সখী! অনুরাগ-অঞ্জন চোখে মাখো তা হলে তাঁকে দেখ্‌তে পাবে। শ্রীমতীর মহাভাব! গোপীপ্রেমে কোন কামনা নাই। ঠিক ভক্ত যে, সে কোন কামনা করে না—কেবল শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করে, কোন শক্তি কি সিদ্ধাই কিছু চায় না।"

"গোপীদের ভালবাসা—পরকীয়া রতি। কৃষ্ণের জন্য গোপীদের প্রেমোন্মাদ হয়েছিল। নিজের স্বামীর জন্য অত হয় না। যদি থোচ্‌ ধর যে তাঁকে দেখি নাই, তাঁর উপর কেমন করে গোপীদের মত টান হবে? তা শুন্‌লেও সে টান হয়—'না জেনে নাম শুনে কানে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হলো'।"

"প্রেমোন্মাদ হলে সর্ব্বভূতে সাক্ষাৎকার হয়। গোপীরা সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিল। কৃষ্ণময় দেখেছিল। বলেছিল,—আমিই কৃষ্ণ! তখন উন্মাদ অবস্থা। গাছ দেখে বলে, এরা তপস্বী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান কচ্চে। তৃণ দেখে বলে,—শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করে ঐ দেখ পৃথিবীর রোমাঞ্চ হয়েছে! মেঘ দেখে,—নীলবসন দেখে,—চিত্রপট দেখে শ্রীমতীর কৃষ্ণের উদ্দীপন হতো। তিনি এ-সব দেখে উন্মত্তের ন্যায় কোথায় কৃষ্ণ! বলে ব্যাকুল হতেন। শ্রীমতীর প্রেম—কৃষ্ণ সুখে সুখী,—তুমি সুখে থাক আমার যাই হোক্‌! গোপীদের এই বড় উচ্চ ভাব।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মধুর ভাব সাধন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

"কি অবস্থা গেছে! হরগৌরী ভাবে কত দিন ছিলাম। আবার কত দিন রাধাকৃষ্ণ ভাবে থাক্‌তাম—ঐরূপ সর্ব্বদা দর্শন হতো। কখন সীতারামের ভাবে। রাধার ভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর্ত্তাম; সীতার ভাবে রাম রাম কর্ত্তাম! সীতারামকে রাত-দিন চিন্তা কর্ত্তাম, আর সীতারাম রূপ দর্শন হতো।"

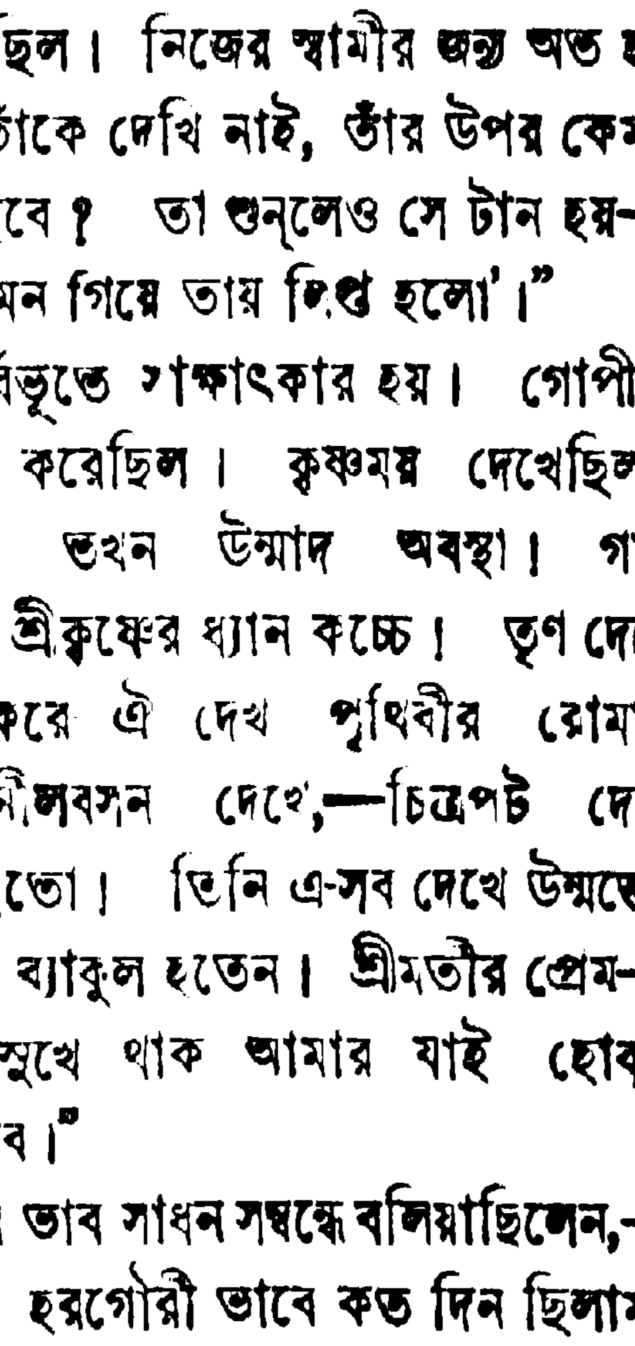

দেশের অবস্থা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাঞ্জাব-অত্যাচার উপলক্ষে বছর দেড়েক পূর্বে এক দিন যখন দেশব্যাপী আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তখন আমরা আকাশ-জোড়া চীৎকারে চেয়েছিলাম স্বরাজ। মহাত্মাজীর জয়-জয়কার গলা ফাটিয়ে দিগ্বিদিকে প্রচার করে বলেছিলাম স্বরাজ চাই-ই চাই। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং স্বরাজ ব্যতিরেকে কোন অন্যায়েরই কোন দিন প্রতিবিধান করতে পারব না। কথাটা যে মূলত সত্য, এ বোধ করি কেহই অস্বীকার করতে পারে না। বাস্তবিকই স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার, ভারতবর্ষের শাসন-ভার ভারতবর্ষীয়দের হাতেই থাকা চাই এবং এ দায়িত্ব থেকে যে-কেউ তাদের বঞ্চিত রাখে, সে-ই অন্যায়কারী। এ সবই সত্য। কিন্তু এমনি আরও তো একটা কথা আছে, যাকে স্বীকার না করে পথ নেই,—সে হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। Right এবং duty এই দু'টো অনুপূরক শব্দ তো সমস্ত আইনের গোড়ার কথা। সকল দেশের সামাজিক বিধানে একটা ছাড়া যে আর একটা মুহূর্ত দাঁড়াতে পারে না, এ তো অবিসংবাদী সত্য। কেবল আমাদের দেশেই কি এই বিশ্ব-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে? স্বরাজ বা স্বাধীনতা যদি আমাদের জন্মস্বত্ব হয়, ঠিক ততখানি কর্তব্যের দায়ী হয়েও তো আমরা মাতৃগর্ভ থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়েছি। একটাকে এড়িয়ে আর একটা পাব এত বড় অন্যায়—অসংগত দাবী, এত বড় পাগলামী আর তো কিছু হতেই পারে না। ঘটনাক্রমে কেবল মাত্র ভারতবর্ষীয় হয়ে জন্মেছি বলেই ভারতের স্বাধীনতা আমাদের চাই, এ কথাও কোন মতেই সত্য হতে পারে না। এবং এ প্রার্থনা ইংরেজ কেন, স্বয়ং বিধাতাপুরুষও বোধ করি মঞ্জুর করতে পারেন না। এই সত্য, এই সনাতন বিধি, এই চির-নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা আজ সমস্ত হৃদয় দিয়ে হৃদয়ংগম করার দিন আমাদের এসেছে। একে ফাঁকি দিয়ে স্বাধীনতার অধিকার শুধু আমরা কেন, পৃথিবীতে কেউ কখনো পায়নি, পায় না এবং আমার বিশ্বাস, কোন দিন কখনো কেউ পেতে পারে না। কর্তব্যহীন অধিকার অনধিকারের সমান। অথচ, এই যদি আমাদের ঈপ্সিত বস্তু হয়, প্রার্থনার এই অদ্ভুত ধারা যদি আমরা সত্যই গ্রহণ করে থাকি, তা হলে নিশ্চয় বলছি আমি, কেবল মাত্র সমস্বরে বন্দে মাতরম্ ও মহাত্মার জয়ধ্বনিতে গলা চিরে আমাদের রক্তই বার হবে, পরাধীনতার জগদ্দল শিলা তাতে সূচ্যগ্র ভূমিও নড়ে বসবে না। কাজ করব না, মূল্য দেব না, অথচ জিনিস পাওয়া চাই—এ হলে হয়তো সুবিধে হয়, কিন্তু সংসারে তা হয় না এবং আমার বিশ্বাস, হলে মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বাড়ে। অথচ মূল্যহীন এ ভিক্ষার চাওয়াকেই আমরা সার করেছি।

বছর দেড়েক ঘুরে-ঘুরে নিজের চোখেই আমাকে অনেক দেখতে হয়েছে এবং একটুখানি অবিনয়ে অপবাদ নিয়েও বলতে হচ্ছে, বুড়ো হলেও চিরদিনের অভ্যাসে এ চোখের দৃষ্টি আমার আজও একেবারে ঝাপসা হয়ে যায়নি। যা'-যা' দেখেছি (অন্তত এই হাবড়া জেলায় যা' দেখেছি) তা' নিছক এই ভিক্ষায় চাওয়া, দাম না-দিয়ে চাওয়া, ফাঁকি দিয়ে চাওয়া। মানুষের কাজকর্ম, লোক-লৌকিকতা, আহার-বিহার, আমোদ-আহ্লাদ, সর্বপ্রকারের সুখ-সুবিধের কোথাও যেন ত্রুটি না ঘটে, পান থেকে এক বিন্দু চূণ পর্যন্ত না খসতে পায়—তার পরে স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, চরকা বল, খদ্দর বল, মায় ইংরেজকে ভারত সমুদ্র উত্তীর্ণ করে দিয়ে আসা পর্যন্ত বল, যা-হয় তা হোক্, কোন আপত্তি নেই। আপত্তি তাদের না থাকতে পারে, কিন্তু ইংরেজের আছে। শতকরা পঁচানব্বই জন লোকের এই হাস্যাস্পদ চাওয়াটাকে সে যদি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে ভারতবাসী স্বরাজ চায় না,—সে কি এত বড়ই মিথ্যা কথা বলে? যে ইংরাজ পৃথিবীব্যাপী রাজত্ব বিস্তার করেছে, দেশের জন্যে প্রাণ দিতে যে এক নিমেষ দ্বিধা করে না, যে স্বাধীনতার স্বরূপ জানে, এবং পরাধীনতার লোহার শিকল মজবুত করে তৈরি করবার কৌশল যার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না,—তাকে কি কেবল ফাঁকি দিয়ে, চোখ রাঙিয়ে, গলায় এবং কলমে গালি গালাজ করে, তার ত্রুটি ও বিচ্যুতির অজস্র প্রমাণ ছাপার অক্ষরে সংগ্রহ করে, তাকে লজ্জা দিয়েই এত বড় বস্তু পাওয়া যাবে? এ প্রশ্ন তো সকল দ্বন্দ্বের অতীত করে প্রমাণিত হয়ে গেছে। এই লজ্জাস্কর বাক্যের সাধনায় কেবল লজ্জাই বেড়ে উঠবে, সিদ্ধিলাভ কদাচ ঘটবে না।

আত্মবঞ্চনা অনেক করা গেছে, আর তাতে উত্তম নেই। জড়ের মত নিশ্চল হয়ে জন্মগত অধিকারের দাবী জানাতেও আর যেমন স্বর ফোটে না, পরের মুখে তত্ত্ব-কথা শোনবার ধৈর্যও আর আমার নেই। আমি নিশ্চয় জানি, স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার যদি কারও থাকে, তো সে মনুষ্যত্বের, মানুষের নয়। অন্ধকারের মাঝে আলোকের জন্মগত অধিকার আছে দৃষ্টিশিখার, দীপের নয়। নিবানো প্রদীপের এই দাবী তুলে হাঙ্গামা করতে যাওয়া অনর্থক নয়, অপরাধ,—সকল দাবী-দাওয়া উত্থাপনের আগে এ-কথা ভুলে গেলে কেবল ইংরেজ নয়, পৃথিবীশুদ্ধ লোক আমোদ অনুভব করবে।

মহাত্মাজী আজ কারাগারে। তাঁর কারাবাসের প্রথম দিকে মারামারি কাটাকাটি বেধে গেল না, সমস্ত ভারতবর্ষ স্তব্ধ হয়ে রইল। দেশের লোকে সগর্বে বললে, এ শুধু মহাত্মাজীর শিক্ষার ফল; Anglo-Indian কাগজওয়ালারা হেসে জবাব দিলে এ শুধু নিছক indifference। আমার কিন্তু এ বিবাদে কোন পক্ষকেই প্রতিবাদ করতে মন সরে না। মনে হয়, যদি হয়েও থাকে তো দেশের লোকের এতে গর্বের বস্তু কি আছে? Organised violence করবার আমাদের শক্তি নেই, প্রবৃত্তি নেই, সুযোগ নেই। আর হঠাৎ violence? সে তো কেবল একটা আকস্মিকতার ফল। এই যে আমরা এতগুলি ভদ্র ব্যক্তি একত্র হয়েছি, উপদ্রব করা আমাদের কারও ব্যবসা নয়, ইচ্ছাও নয়, অথচ এ কথাও তো কেউ জোর করে বলতে পারি নে, আমাদের বাড়ী ফেরবার পথটুকুর মাঝেই হঠাৎ কিছু একটা বাধিয়ে দিতে না পারি। সঙ্গে সঙ্গে মস্ত ফ্যাসাদ বেধে যাওয়াও অসম্ভব নয়। বাধেনি সে ভালই এবং আমিও একে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে চাই নে; কিন্তু এ নিয়ে দাপাদাপি করে বেড়ানোরও হেতু নেই। একেই মস্ত কৃতিত্ব বলে সান্ত্বনা করতে যাওয়া আত্ম-বঞ্চনা; আর indifference? এ কথায় যদি তারা ইঙ্গিত করে থাকে যে, দেশের লোকের বুকে গভীর ব্যথা বাজেনি, তো তার বড় মিছে কথা আর হতেই পারে না। ব্যথা আমাদের মর্মান্তিক হয়েই বেজেছে; কিন্তু তাকে নিঃশব্দে সহ্য করাই আমাদের স্বভাব, প্রতিকারের কল্পনা আমাদের মনেই আসে না।

প্রিয়তম পরমাত্মীয় কাউকে যমে নিলে শোকার্ত মন যেমন

উপায়হীন বেদনায় কাঁদতে থাকে অথচ যা অবশ্যম্ভাবী তার বিরুদ্ধে হাত নেই এই বলে মনকে বুঝিয়ে আবার খাওয়া-পরা, আমোদ-আহ্লাদ, হাসি-তামাসা, কাজ-কর্ম যথারীতি পূর্বের মতই চলতে থাকে, মহাত্মাজীর সম্বন্ধেও দেশের লোকের মনোভাব প্রায় তেমনি। তাদের রাগ গিয়ে পড়ল জজ সাহেবের ওপর; কেউ বললে, তার প্রশংসা-বাক্য শুধু ভণ্ডামি, কেউ বললে, তার দু'বছর জেল দেওয়া উচিত ছিল, কেউ বললে, বড় জোর তিন বছর, কেউ বললে, না, চার বছর। কিন্তু ছ'বছর জেল যখন হল তখন আর উপায় কি? এখন গবর্ণমেণ্ট যদি দয়া করে কিছু আগে ছাড়েন তবেই হয়। কিন্তু এই ভেবে তিনি জেলে যাননি। তাঁর একান্ত মনের আশা ছিল, হোক না জেল ছ'বছর, হোক না জেল দশ বছর,—তাঁকে মুক্ত করা তো তাঁর দেশের লোকেরই হাতে। যেদিন তারা চাইবে, তার একটা দিন বেশি কেউ তাঁকে জেলে ধরে রাখতে পারবে না, তা সে গবর্ণমেণ্ট যতই কেন না শক্তিশালী হন। কিন্তু যে আশা তাঁর একার ছিল, সমস্ত দেশের লোকের সে ভরসা করতে সাহস হ'ল না। তাদের অর্থোপার্জন থেকে শুরু করে আহার-নিদ্রা অব্যাহত চলতে লাগল, তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে কোথাও এতটুকু বিঘ্ন হল না। শুধু তিনি ও তাঁর পঁচিশ হাজার সহকর্মী দেশের কাজে দেশের জেলেই পচতে লাগলেন। প্রতিবিধান করবে কি, এত-বড় হীনতায় লজ্জা বোধ করবার শক্তি পর্যন্ত যেন এদের চলে গেছে। এরা বুদ্ধিমান, বুদ্ধির বিড়ম্বনায় ছুতো তুলেছে non-violence কি সম্ভব? Non-co-operation কি চলে? গান্ধিজীর movement কি practical? তাই তো আমরা—কিন্তু কে

এদের বুঝিয়ে দেবে, কোন movement কিছু নয়, যে move করে সেই মানুষই সব। যে মানুষ, তার কাছে co-operation, non-co-operation, violence, non-violence—এর যে কোন একটাই স্বাধীনতা দিতে পারে। শুধু যে ভীরু, যে দুর্ব্বল, যে মৃত, তার কাছে ভিক্ষে ছাড়া আর কোন পথই উন্মুক্ত নেই। সুতরাং এ কথা কিছুতেই সত্য নয়, non-co-operation পন্থা দেশে অচল, মুক্তির পথ সেদিকে যায়নি। অন্তত, এখনো এক দল লোক আছে—তা সংখ্যায় যতই অল্প হোক্—যারা সমস্ত অন্তর দিয়ে একে আজও বিশ্বাস করে। এরা কারা জানেন? এক দিন যারা মহাত্মাজীর ব্যাকুল আহ্বানে স্বদেশব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছিল—উকিল তার ওকালতি ছেড়ে, শিক্ষক তার শিক্ষকতা ছেড়ে, বিদ্যার্থী তার বিদ্যালয় ছেড়ে চারি দিকে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, যাঁদের অধিকাংশই আজ কারাগারে—এঁরা তাদেরই অবশিষ্টাংশ। দেশের কল্যাণে, আমার কল্যাণে, সমস্ত নরনারীর কল্যাণে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছিল, সেই দেশের লোক আজ তাদের কি দাঁড় করিয়েছে জানেন? আজ তারা সম্মানহীন, প্রতিষ্ঠাহীন, লাঞ্ছিত ভিক্ষুকের দল। তাদের মলিন বাস, তারা গৃহহীন, তারা মুষ্টিভিক্ষায় জীবন-যাপন করে, যৎসামান্য তেল-নুনের পয়সার জন্যে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইতে বাধ্য হয়। অথচ স্বেচ্ছায় যে সমস্ত ত্যাগ করে এসেছে, কতটুকুতে তার প্রয়োজন, সে প্রয়োজন সমস্ত দেশের কাছে কতই না অকিঞ্চিৎকর। এইটুকু সে সম্মানে সংগ্রহ করতে পারে না; মাত্র এইটুকুর জন্যে তার অসুবিধের অন্ত নেই। অথচ এরাই আজও অন্তরে স্বরাজের আসন এবং দেশের বাহিরে সমস্ত ভারতের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পতাকা বহন করে বেড়াচ্ছে। আশার প্রদীপ—তা সে যতই ক্ষীণ হোক্, আজও এদেরই হাতে। এদের নির্যাতনের কাহিনী সংবাদপত্রে পাতায় পাতায়, কিন্তু সে কতটুকু—যে অব্যক্ত লাঞ্ছনা এদের লোকের কাছেই সহ্য করতে হয়? মহাত্মাজীর আন্দোলন থাক্ বা যাক্, এদের অশ্রদ্ধেয় করে আনবার, দীনহীন ব্যর্থ করে তোলবার, মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত দেশের লোককে এক দিন করতেই হবে, যদি ন্যায় ও সত্যকার বিধি-বিধান কোথাও কোনখানে থাকে।

হাওড়া জেলার পক্ষ থেকে আজ যদি আমি মুক্তকণ্ঠে বলি, অন্তত এ জেলার লোকে স্বরাজ চায় না, তার তীব্র প্রতিবাদ হবে। কাগজে কাগজে আমাকে অনেক কটূক্তি, অনেক গালাগালি শুনতে হবে। কিন্তু তবুও এ কথা সত্য—কেউ কিছু করব না, কোন সুবিধে, কোন সাহায্য কিছুই দেব না,—আমার বাঁধা-ধরা সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার এক তিল বাইরে যেতে পারব না,—আমার টাকার ওপর টাকা, গাড়ির ওপর গাড়ি, আমার দোতলার ওপর তেতলা এবং তার ওপর চৌতলা অবারিত এবং অব্যাহত ভাবে উঠতে থাক—কেবল এই গোটা-কতক বুদ্ধিভ্রষ্ট লক্ষ্মীছাড়া লোক না-খেয়ে না-দেয়ে খালি গায়ে, খালি পায়ে ঘুরে ঘুরে যদি স্বরাজ এনে দিতে পারে তো ঠিক—তখন না হয় তাকে ধীরে-সুস্থে চোখ বুজে পরম আরামে রসগোল্লার মত চিবোনো যাবে। কিন্তু এমন কাণ্ড কোথাও হয় না। আসল কথা, এরা বিশ্বাস করতেই পারে না, স্বরাজ না কি আবার কখনও হতে পারে, তার জন্যে না কি আবার চেষ্টা করা যেতে পারে। কি হবে তাঁতে, কি হবে চরকায়, কি হবে দেশাত্মবোধের চর্চায়? নিবোনো দীপশিখার মত মনুষ্যত্ব ধুয়ে-মুছে গেছে। একমাত্র হাত পেতে ভিক্ষের চেষ্টা ছাড়া কি হবে অপর কিছুতে? একটা নমুনা দিই—

সেদিন নারী কর্ম্মমন্দির থেকে জন-দুই মহিলা ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে নিয়ে দুর্য্যোগের মধ্যেই আমরা অঞ্চলে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ভাবলাম, ঋষিতুল্য সর্ব্বদেশপূজ্য ব্যক্তিটিকে সঙ্গে নেওয়ায় এ-যাত্রা আমার সুযাত্রা হবে। হয়েও ছিল। বন্দে মাতরম্ ও মহাত্মার ও তাঁর নিজের প্রবল জয়ধ্বনির কোন অভাব ঘটেনি এবং ওই রোগা মনুষ্যটিকে স্থানীয় রায়-বাহাদুরের ভাঙা তাঞ্জামের মধ্যে সবলে প্রবেশ করানোরও আন্তরিক ও একান্ত উদ্যম হয়েছিল। কিন্তু তার পরের ইতিহাস সংক্ষেপে এইরূপ—আমাদের যাতায়াতের ব্যয় হল টাকা পঞ্চাশ, ঝড়ে-জলে আমাদের তত্ত্বাবধান করে বেড়াতে পুলিশেরও খরচা হয়ে গেল বোধ হয় এমনি একটা কিছু। বর্দ্ধিষ্ণু স্থান, উকিল, মোক্তার ও বহু ধনশালী ব্যক্তির বাস—অতএব স্থানীয় তাঁত ও চরকার উন্নতিকল্পে চাঁদা প্রতিশ্রুত হ'ল তিন টাকা পাঁচ আনা। আর রায় মহাশয় বহু অনুসন্ধানে আবিষ্কার করলেন, জন-দুই উকিল বিলিতি কাপড় কেনেন না, এবং এক জন তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করলেন ভবিষ্যতে তিনি আর কিনবেন না। ফেরবার পথে প্রফুল্লচন্দ্র প্রফুল্ল হয়ে আমার কানে-কানে বললেন, "হ্যাঁ, জেলাটা উন্নতিশীল বটে! আর একটু লেগে থাকুন, Civil disobedience বোধ হয় আপনারাই declare করতে পারবেন।"

আর জনসাধারণ? সে তো সর্বথা ভদ্রলোকেরই অনুসন্ধান করে। এ চিত্র দুঃখের চিত্র, বেদনার ইতিহাস, অন্ধকারের ছবি। কিন্তু এই কি শেষ কথা? এই অবস্থাই কি এ-জেলার লোক নীরবে শিরোধার্য করে নেবে? কারও কোন কথা, কোন প্রতিষ্ঠা, কোন কর্ত্তব্যই কি দেখা দেবে না? যারা দেশের সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছে, যারা কোন প্রতিকূল অবস্থাকেই স্বীকার করতে চায় না, যারা Government-এর কাছেও পরাভব স্বীকার করেনি, তারা কি শেষে দেশের লোকের কাছেই হার মেনে ফিরে যাবে? আপনারা কি কোন সংবাদই নেবেন না?

আমার এক আশা—সংসারে সমস্ত শক্তিই তরঙ্গগতিতে অগ্রসর হয়। তাই তার উত্থান-পতন আছে, চলার বেগে যে আজ নিচে পড়েছে, কাল সেই আবার ওপরে উঠবে, নইলে চলা তার সম্পূর্ণ হবে না। পাহাড় গতিহীন, নিশ্চল—তাই তার শিখরদেশ এক স্থানে উঁচু হয়েই থাকে, নামতে হয় না। কিন্তু বায়ু-তাড়িত সমুদ্রের তরঙ্গের সে ব্যবস্থা নয়—তার ওঠা-পড়া আছে; সে তার লজ্জার হেতু নয়, সেই তার গতির চিহ্ন, তার শক্তির ধারা। সে কেবল উঁচু হয়েই থাকতে চায়; যখন জমে, বরফ হয়ে ওঠে। তেমনি আমাদের এ-ও যদি একটা movement হয়, পরাধীন দেশে একটা অভিনব গতিবেগ হয়, তা হলে ওঠা-নামার আইন একেও মেনে নিতে হবে, নইলে চলতেই পারবে না।

নারায়ণ, শ্রাবণ, ১৩২৯

★

শ্রমণ রায়োকোয়ান

সৈয়দ মুজতবা আলি

বাস্তুবাড়ী আমূল ভস্মীভূত হওয়ার পরমুহূর্তেই ক্ষতির পরিমাণটা ঠিক কত দূর হয়েছে অনুমান করা যায় না। যেমন যেমন দিন যায়, এটা ওটা সেটার প্রয়োজন হয় তখন গৃহস্থ আস্তে আস্তে বুঝতে পারে তার ক্ষতিটা কত দিক্ দিয়ে তাকে পঙ্গু করে দিয়ে গিয়েছে।

ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে। আগুন নিবেছে বলে উপস্থিত আমরা সকলেই ভারী খুশী কিন্তু ক্ষতির খতিয়ান নেবার সময়ও আসন্ন। যত শীঘ্র আমরা এ-কাজটা আরম্ভ করি ততই মঙ্গল।

ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পের যে ক্ষতি হয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অহরহ সচেতন হচ্ছি কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যলোকে আমাদের যে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন এখনো আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি। অথচ নূতন করে সব কিছু গড়তে হলে যে আত্মবিশ্বাস, আত্মাভিমানের প্রয়োজন হয় তার মূল উৎস সংস্কৃতি এবং বৈদগ্ধ্যলোকে। হটেন্টটদের মত রাষ্ট্রস্থাপনা করাই যদি আমাদের আদর্শ হয় তবে আমাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির কোনো প্রকার অনুসন্ধান করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই কিন্তু যদি আর পাঁচটা সর্বাঙ্গসুন্দর রাষ্ট্রের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবার বাসনা আমাদের মনে থাকে তবে সে প্রচেষ্টা 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।'

আত্মাভিমান জাগ্রত করার অন্যতম প্রধান পন্থা, জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে সে-ও এক দিন উত্তমর্ণ ছিল, ব্যাপক অর্থে সেও মহাজনরূপে বহু দেশে সুপরিচিত ছিল।

কোন্ দেশ কার কাছে কতটা ঋণী, সে তথ্যানুসন্ধান ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হয় গত শতাব্দীতে। ভৌগোলিক অন্তরায় যেমন যেমন বিজ্ঞানের সাহায্যে লঙ্ঘন করা সহজ হতে লাগল, একের অন্যের ইতিহাস পড়বার সুযোগও তেমনি বাড়তে লাগল। কিন্তু সে-সময়ে আমরা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত, ইংরেজের সম্মোহন মন্ত্রের অচৈতন্য অবস্থায় তখন সে যা বলেছে আমরা তাই বলেছি, সে যা করতে বলেছে তাই করেছি।

আমাদের কাছে কে কে ঋণী সে-কথা বলার প্রয়োজন ইংরেজ অনুভব করেনি, আমরা যে তার কাছে কত দিক্ দিয়ে ঋণী সে কথাটাই সে আমাদের কানের কাছে অহরহ ঢ্যাঁটরা পিটিয়ে বলেছে। কিন্তু যেহেতু ইংরেজ ছাড়া আরো দু'-চারটে জাত পৃথিবীতে আছে, এবং ইংরেজই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভুবনবরেণ্য মহাজন জাতি এ-কথা স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত নয়, এমন কি ইংরেজ যার উপর রাজত্ব করেছে সে যে এক দিন বহু দিক্ দিয়ে ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশী সভ্য ছিল সে-কথাটা প্রচার করতেও তাদের বাধে না। বিশেষ করে ফরাসী এবং জর্মন এই কর্মটি পরমানন্দে করে থাকে। কোনো নিরপেক্ষ ইংরেজ পণ্ডিত কখনো জন্মাননি এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু অনুভূতির সঙ্গে দরদ দিয়ে ভারতবাসীকে 'তোমরা ছোট জাত নও' এ-কথাটি বলতে ইংরেজের চিরকালই বেধেছে।

তাই উনবিংশ শতাব্দীতে যদিও আমরা খবর পেলুম যে চীন ও জাপানের বহু লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধধর্ম চীন ও জাপানের আত্মবিকাশে বহু দিক্ দিয়ে যুগ-যুগ ধরে সাহায্য করেছে, তবু, সেই জ্ঞানের ভেতর দিয়ে আমরা এঁদের সঙ্গে নূতন কোনো যোগসূত্র স্থাপনা করতে পারলুম না। এখন সময় এসেছে, চীন ও জাপান যে-রকম এ-দেশে এসেই বৌদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে অধিকতর সংখ্যায় আসবে ঠিক তেমনি আমাদেরও খবর নিতে হবে চীন এবং জাপানের উর্বর ভূমিতে আমাদের বোধিবৃক্ষ পাপী-তাপীকে কি পরিমাণ ছায়া দান করেছে।

এবং এ-কথাও ভুললে চলবে না যে প্রাচ্যলোকে যে তিনটি ভূখণ্ড কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে যশ অর্জন করেছে তারা চীন, ভারতবর্ষ ও আরবভূমি। এবং শুধু যে ভৌগোলিক হিসাবে ভারতবর্ষ আরব ও চীন ভূখণ্ডের ঠিক মাঝখানে তা নয়, সংস্কৃতি সভ্যতার দিক্ থেকেও আমরা এই দুই ভূখণ্ডের সঙ্গমস্থলে আছি। এক দিকে মুসলমান ধর্ম ও সভ্যতা এ-দেশে এসে আমাদের শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ করেছে, আবার আমাদের বৌদ্ধধর্মের ভেতর দিয়ে আমরা চীন-জাপানের সঙ্গে সংযুক্ত। কাজেই ভারতবাসীর পক্ষে আর্য হয়েও এক দিক্ যেমন সেমিতি (আরব) জগতের সঙ্গে তার ভাবের আদান-প্রদান চলে, তেমনি চীন-জাপানের (মঙ্গোল) শিল্পকলা চিন্তাধারার সঙ্গেও সে যুক্ত হতে পারে। অথচ চীন আরব একে অন্যকে চেনে না।

তাই পূর্ব-ভূখণ্ডে যে নবজীবন সঞ্চারের সূচনা দেখা যাচ্ছে, তার কেন্দ্রস্থল গ্রহণ করবে ভারতবর্ষ। (ব্যবসা-বাণিজ্যের দৃষ্টিবিন্দু থেকে আমাদের লক্ষপতিরা এ তথ্যটি বেশ কিছু দিন হল হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছেন—জাপান হাট থেকে সরে যেতেই অহমদাবাদ ডাইনে পারস্য-আরব বাঁয়ে জাভা-সুমাত্রাতে কাপড় পাঠাতে আরম্ভ করেছে)। ভৌগোলিক ও কৃষ্টিজাত উভয় সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যদি আপন আসন গ্রহণ না করে তবে দোষ ভগবানের নয়।

উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, আমাদের মৌলভী মৌলানারা আরবী-ফারসী জানেন। এঁরা এত দিন সুযোগ পাননি—এখন আশা করতে পারি, আমাদের ইতিহাস লিখনের সময় তাঁরা 'আরবকে ভারতের দান' অধ্যায়টি লিখে দেবেন ও যন্ত্রশিল্পকলা মোগল নামে পরিচিত তার মধ্যে ভারতীয় ও ইরাণি-তুর্কী কিরূপে মিশ্রিত হয়েছে সে বিবরণও লিপিবদ্ধ করবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা চীন এবং জাপানের ভাষা জানি নে। [বিশ্বভারতীর 'চীনা-ভবনের' দ্বার ভালো করে খুলতে হবে, এবং এই চীনা-ভবনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে চীনা সভ্যতার অধ্যয়ন আলোচনা আরম্ভ করতে হবে।]

জাপান সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল এতই কম যে জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই। [তাই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র বীরভদ্র রাও চিত্র যখন তাঁর 'শিল্পী' কাগজে জাপানে সংগৃহীত ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন প্রকাশ করেন তখন অল্প পাঠকই সেগুলো পড়েন। বিশ্বভারতীর আরেক প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ হরিচরণ সাত বৎসর জাপানে থেকে অতি উত্তম জাপানী ভাষা শিখে এসেছেন। সে-ভাষা শেখাবার জন্য তাঁর উৎসাহের অন্ত নেই—তাঁর স্ত্রীও জাপানী মহিলা—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো বিদ্যার্থী তাঁর কাছে উপস্থিত হয়নি।]

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ-লেখক জাপানী ভাষা জানে না। কিন্তু তার বিশ্বাস, জাপান সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কৌতূহল জাগাবার জন্ম ইংরিজি এবং অন্যান্য ভাষায় লেখা বই দিয়ে যতটা সম্ভবপর ততটা কাজ আরম্ভ করে দেওয়া উচিত। জাপানী ছাড়া অন্য ভাষা থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধে ভুল থাকার সম্ভাবনা প্রচুর, তাই প্রবন্ধ-লেখক গোড়ার থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে।

ভারতবর্ষীয় যে-সংস্কৃতি চীন এবং জাপানে প্রসার লাভ করেছে সে-সংস্কৃতি প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষীয় তথা চৈনিক বৌদ্ধধর্ম ও জাপানী বৌদ্ধধর্ম এক জিনিস নয়—তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের এক প্রধান নীতি এই যে, প্রত্যেক ধর্মই প্রসার এবং বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বাতাবরণের ভেতর নূতন নূতন রূপ ধারণ করে। জেরুজালেমের খৃষ্টধর্ম ও প্যারিসের খৃষ্টধর্ম এক জিনিস নয়, মিশরী মুসলিম ও বাঙালী মুসলিমে প্রচুর পার্থক্য।

জাপানে যে-বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছে সে-ধর্মও দুই দিক থেকে চর্চা করতে হবে। প্রথমতঃ, জাপানীতে অনূদিত ও লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ,—এ কর্ম করবেন পণ্ডিতেরা, এবং এঁদের কাজ প্রধানতঃ গবেষণামূলক হবে বলে এর ভেতর সাহিত্য-রস থাকার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়তঃ, জাপানী শ্রমণ-সাধু-সন্তদের জীবনী-পাঠ। আমার বিশ্বাস, উপযুক্ত লেখকের হাতে পড়লে সে-সব জীবনী নিয়ে বাঙলায় উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে। অধ্যাপক য়াকব ফিশারের লেখা বৌদ্ধ শ্রমণ রায়োকোয়ানের জীবনী পড়ে আমার এ-বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। অধ্যাপক ফিশার জাতে জর্মন, রায়োকোয়ান জাপানী ছিলেন,—কিন্তু শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বইখানি লেখা হয়েছে বলে সার্থক সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে। পুস্তকখানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার সামান্য কিছু কাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল বলে এ-দেশে প্রচার এবং প্রসার লাভ করতে পারেনি। বইখানি ইংরিজিতে লেখা, নাম Dew-drops on a Lotus Leaf. আর কিছু না হোক নামটি আমাদের কাছে অচেনা নয়, 'নলিনীদলগতজলমতিতরলং' বাক্যটি আমাদের মোহাবস্থায়ও আমরা ভুলতে পারিনি। শঙ্করাচার্য যখন 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' আখ্যায় নিন্দিত হয়েছেন তখন হয়ত জীবনকে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় দেখার উপমাটাও তিনি বৌদ্ধধর্ম থেকে নিয়েছেন।

বহু মানবের হিয়ার পরশ পেয়ে
বহু মানবের মাঝখানে বেঁধে ঘর
—খাটে, খেলে যারা মধুর স্বপ্ন দেখে—
থাকিতে আমার নেই তো অরুচি কোনো।
তবুও এ-কথা স্বীকার করিব আমি,
উপত্যকার নির্জনতার মাঝে
—শীতল শান্তি অসীম ছন্দে ভরা—
সেইখানে মম জীবন আনন্দঘন।

শ্রমণ রায়োকোয়ানের এই ক্ষুদ্র কবিতাটি দিয়ে অধ্যাপক ফিশার তাঁর রায়োকোয়ান-চরিত্রের অবতরণিকা আরম্ভ করেছেন।

ফিশার বলেন: রায়োকোয়ানের আমলের বড় জাগিরদার মাকিনো তাঁর চরিত্রের খ্যাতি শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে শ্রমণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। তাঁর বাসনা হয়েছিল, শ্রমণের কাছ থেকে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করবেন।

মাকিনোর দূত রায়োকোয়ানের কুঁড়ে-ঘরে পৌঁছবার পূর্বেই গ্রামের লোক খবর পেয়ে গিয়েছিল যে স্বয়ং মাকিনো রায়কোয়ানের কাছে দূত পাঠাচ্ছেন। খবর শুনে সবাই অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কুটীরের চার দিকের জমি বাগান সব কিছু পরিষ্কার করে দিল।

রায়োকোয়ান ভিনয়োগাঁয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন কুঁড়েঘরের চতুর্দিক সম্পূর্ণ সাফ! মাকিনোর দূত তখনো এসে পৌঁছয়নি। রায়োকোয়ানের দুই চোখ জলে ভরে গেল, বললেন, "হায়, হায়, এরা সব কি কাণ্ডটাই না করেছে। আমার সব চেয়ে আত্মীয় বন্ধু ছিল ঝিঁঝিঁ পোকার দল। এই নির্জনতায় তারাই আমাকে গান শোনাত। তাদের বাসা ভেঙে ফেলা হয়েছে, হায়, তাদের মিষ্টি গান আমি আবার শুনব কবে, কে জানে?"

রায়োকোয়ান বিলাপ করছেন, এমন সময় দূত এসে নিমন্ত্রণ-পত্র নিবেদন করল।

শোকাতুর শ্রমণ উত্তর না দিয়ে একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখে দূতকে দিলেন,

আমার ক্ষুদ্র কুটিরের চারি পাশে,
বেঁধেছিল বাসা ঝরা পাতা দলে দলে—
নৃত্যচটুল, নিত্য দিনের আমার নর্ম-সখা
কোথা গেল সব? আমার আতুর হিয়া
সান্ত্বনা নাহি মানে।
হায় বলো মোর কি হবে উপায় এবে
জ্বলে গিয়ে তারা করিত যে মোর সেবা,
এখন করিবে কেবা?

ফিশার বলেন, দূত বুঝতে পারল নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

আমরা বলি, তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? আমাদের কবি, জাপানের কবি এবং ঝরা পাতার স্থান তো জাগীরদারের প্রাসাদ-কাননে হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন:

'ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে।' *

ফিশার বলেন, এই জাপানী শ্রমণ, কবি, দার্শনিক এবং খুশ-খৎকে † তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান।

রায়োকোয়ান বহু বৎসর ধরে জাপানের কাব্যরসিক এবং তত্ত্বান্বেষিগণের মধ্যে সুপরিচিত, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছড়ায় মাত্র বৎসর ত্রিশ পূর্বে। যে-প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রব্রজ্যাভূমিতে তিনি কিংবদন্তীর ভেতর দিয়ে এখনো জীবিত আছেন। ফিশারের গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখতে গিয়ে রাজবৈদ্য তাৎসুকিচি ইরিসওয়া বলেন, "আমার পিতামহী মারা যান ১৮৮৭ সনে। তিনি যৌবনে রায়োকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আমাকে বলেছেন।"

* শেলির 'What if my leaves are falling' ভিন্ন অনুভূতিজাত, ঈষৎ দম্ভপ্রসূত।

† Calligrapher ইকোয়াল সুদর্শন লিপিকর।

রায়োকোয়ানের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮১১ সনে প্রকাশিত এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায়। স্বয়ং হকুসাইসে পুস্তকের জন্য ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। তার প্রায় পঁচিশ বৎসর পর রায়োকোয়ানের প্রিয়া শিষ্যা ভিক্ষুণী তাইশিন রায়োকোয়ানের কবিতা থেকে 'পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু' নাম দিয়ে একটি চয়নিকা প্রকাশ করেন। রায়োকোয়ানকে কবি হিসাবে বিখ্যাত করার জন্য ভিক্ষুণী তাইশিন এ চয়নিকা প্রকাশ করেননি। তিনিই রায়োকোয়ানকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চেনবার সুযোগ পেয়েছিলেন সব চেয়ে বেশী—আর যে পাঁচ জন রায়োকোয়ানকে চিনতেন, তাঁদের ধারণা ছিল তিনি কেমন যেন একটু বেখাপ্পা, খামখেয়ালি ধরণের লোক, যদিও শ্রমণ হিসাবে তিনি অনিন্দনীয়। এমন কি রায়োকোয়ানের বিশিষ্ট ভক্তেরাও তাঁকে ঠিক চিনতে পারেননি। তাঁদের কাছেও তিনি অজ্ঞেয়, অমর্ত্য সাধক হয়ে চিরকাল প্রহেলিকা রূপ নিয়ে দেখা দিতেন। একমাত্র ভিক্ষুণী তাইশিনই রায়োকোয়ানের হৃদয়ের সত্য পরিচয় পেয়েছিলেন; চয়নিকা প্রকাশ করার সময় তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সর্বসাধারণ যেন রায়োকোয়ানের কবিতার ভিতর দিয়ে তাঁর মহানুভব হৃদয়ের পরিচয় পায়।

এ-মানুষটিকে চেনা কারো পক্ষেই খুব সহজ ছিল না। তিনি সমস্ত জীবন কাটিয়াছিলেন কবিতা লিখে, ফুল কুড়িয়ে আর ছেলেদের সঙ্গে গ্রামের রাস্তার উপর খেলাধুলো করে। তাতেই না কি পেতেন তিনি সব চেয়ে বেশী আনন্দ। খেলার সাথী না পেলে তিনি মাঠে, বনের ভেতর আপন মনে খেলে যেতেন। ছোট-ছোট পাখী তখন তাঁর শরীরের উপর এসে বসলে তিনি ভারী খুশী হয়ে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন। যখন ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়তেন, মদ পেলে খেতে কসুর করতেন না, আর নাচের দলের সঙ্গে দেখা হলে সমস্ত বিকেল সন্ধ্যা তাদেরি সঙ্গে ফূর্তি করে কাটিয়ে দিতেন।

বসন্ত-প্রাতে বাহিরিনু ঘর হতে
ভিক্ষার লাগি চলেছি ভাণ্ড ধরে—
হেরি মাঠ-ভরা নাচে ফুলদল
নাচে পথ-ঘাট ভরে।
দাঁড়াইনু আমি এক লহমার তরে
কথা কিছু ক'ব বলে
ও মা, এ কি দেখি! সমস্ত দিন
কি করে যে গেছে চলে!

এই আপন-ভোলা লোকটির সঙ্গে যখন আর তার সংসার-বিমুখ শ্রমণদের তুলনা করা যায় তখনই ধরা পড়ে শ্রমণ-নিন্দিত প্রকৃতির সঙ্গে এঁর কবিজনসুলভ গভীর আত্মীয়তা-বোধ। এই 'সর্বং দুঃখং, সর্বং ক্ষণিকম্' জগতের প্রবাহমান ঘটনাবলীকে তিনি আর পাঁচ জন শ্রমণের মত বৈরাগ্য ও বিরক্তির সঙ্গে অবহেলা করছেন না, আবার সৌন্দর্য-বিলাসী কবিদের মত চাঁদের আলো আর মেঘের মায়াকেও আঁকড়ে ধরতে গিয়ে অযথা শোকাতুর হচ্ছেন না। বেদনা-বোধ যে রায়োকোয়ানের ছিল না তা নয়—তাঁর কবিতার প্রতি ছত্রে ধরা পড়ে তাঁর স্পর্শকাতর হৃদয় কত অল্পতেই সাড়া দিচ্ছে—কিন্তু সমস্ত কবিতার ভেতর দিয়ে তাঁর এমন একটি সংহত ধ্যানদৃষ্টি দেখতে পাই যার মূল নিশ্চয়ই বৌদ্ধধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের অন্তস্তল থেকে আপন প্রাণশক্তি সঞ্চয় করছে।

অথচ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা বলে গিয়েছেন, তিনি কখনো কাউকে আপন ধর্মে দীক্ষা দেবার জন্য চেষ্টা করেননি, অন্যান্য শ্রমণের মত বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেননি।

তাই এই লোকটিকে বুঝতে জাপানেরও সময় লেগেছে। ফিশার বলেন, ১৯১৮ সনে শ্রীযুত সোমা গায়োফু কর্তৃক 'তাইগু রায়োকোয়ান' পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্র জাপানে এই শ্রমণের নাম ছড়িয়ে পড়ে।

আজ তাঁর খ্যাতি শুধু আপন প্রদেশে, আপনি প্রব্রজ্যা-ভূমিতে সীমাবদ্ধ নয়। জাপানের সর্বত্রই তাঁর জীবন, ধর্মমত, কাব্য এবং চিন্তাধারা জানবার জন্য বিপুল আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

সেই উত্তেজনা, সেই আগ্রহ বিদেশী শিক্ষক যাকব ফিশারকেও স্পর্শ করেছে। দীর্ঘ আড়াই বৎসর একাগ্র তপস্যার ফলে তিনি যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তার কল্যাণে আমরাও রায়োকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। উপরে উল্লিখিত রায়োকোয়ানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত সোমা গায়োফু ফিশারের গ্রন্থকে সপ্রেম আশীর্বাদ করেছেন, এবং এ-কথাও বলেছেন যে ফিশারই একমাত্র ইয়োরোপীয় যিনি শ্রমণ রায়োকোয়ানের মর্মস্থলে পৌঁছতে পেরেছেন।

[ক্রমশঃ

স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস

"You young men of Bengal! Do not look up to the rich and great man who have money. The poor did all the great and gigantic works of the world."

—Swami Vivekananda.

"Bengal has come forward as Saviour of India."

—Aurobindo Ghose.

যুগ-যাত্রী

কংগ্রেস যা চেয়েছিল ৬'এ, তা পেয়েছে ৪৬-এ। ৬-এ কংগ্রেসের সভ্য স্থবিরদের মুখে—অন্ততঃ যে স্বরাজের দাবী করতে হয়েছিল, তার ব্যাখ্যা ছিল "Self Government or Swaraj like that of the United Kingdom or the Colonies" বৃটেন ও তার উপনিবেশ রাজ্যগুলো যেমন স্বায়ত্ত-শাসন ভোগ করে তেমনি স্বরাজ।

এ দাবীর মন্ত্রদাতা মার্কুইস অব ডাফরিণ এণ্ড আলভা। তার প্রেরণায় সেকালের ইংরেজ-ভক্ত, ইংরেজী শিক্ষিত ও ইংরেজ-গতপ্রাণ গুটিকয়েক বরেণ্য ভারতবাসী, এক দল ইংরেজ আর এংলো ইণ্ডিয়ানের নেতৃত্বে ইংরেজের দরবারে ইংরেজী শিক্ষিতদের অর্থ ও পদমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্ম বচন, আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল।

ইংরেজের এ প্রেরণা যেমন ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূত্রপাত করেনি, মুষ্টিমেয় ইংরেজ-প্রত্যাদৃষ্ট, স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ও স্বপদকামী ভারতবাসীকেও এ স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুস্পর্দ্ধী সৈনিক আহরণ করতে হয়নি।

কিন্তু ভারতের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের উপর সহসা ইংরেজদের এই প্রেম উথলে উঠেছিল কেন? কেন উঠেছিল জানতে গিয়ে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রামের আভাষ আমরা পাই।

ইংরেজ আমাদের জাতীয় কৃষ্টি নষ্ট করছিল, ধর্ম্মপ্রচারের নামে নারী-নির্য্যাতন করছিল, ঘর ভাঙ্গছিল, শিল্পজাত পণ্য চালু করে আমাদের উটজ শিল্পীদের বৃত্তিহীন করছিল, কৃষকদের উপর নির্ম্মম পীড়ন করছিল, ভারতবাসীকে কুকুর-বিড়ালের চাইতেও ঘৃণা করছিল, ঘর ভেঙ্গে মানুষ চুরি করে কুলি বানাচ্ছিল, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঝগড়া বাধিয়ে দিচ্ছিল। ওরা দুর্ভিক্ষের সুযোগে ভারতবাসীকে ধর্ম্মচ্যুত করেছে, মম্বন্তর আর মহামারীর সুযোগে দৈন্যকে অসহ্য করে তুলেছে। ওদের শাসনে সাধারণ মানুষগুলো বিদ্যা পায়নি, অর্থ পায়নি, কাম্যও লাভ করেনি, লাভ করেছে কালে ও অকালে মোক্ষ।

ভারতে ইউরোপের অধীনতা আরম্ভ ১৪৯৮, ১৭ই মে—সেই দিন থেকে "Indian goods and curios began to enter Europe through the agency of the Portuguese and the Venetians." ভারত-হরণ ষড়যন্ত্র হল এর প্রায় একশ' বছর পর যখন লণ্ডনের ব্যবসায়ীরা ভারতের ধন লুণ্ঠনের জন্য এক সওদাগরী সঙ্ঘ গড়ে রাজার সনদ পেল—আর তার কয় বছর পরে বেওয়ারিশ বাংলার জনসাধারণের শোণিত শোষণের জন্যে আর একটা বিদেশী বাদশা ইংরেজকে বেপরোয়া লুঠের ছাড়পত্র দিল।

তার পর কত কাণ্ড হয়েছে। বাংলায় ওরা এ-সময়ে যে মাৎস্যন্যায়ের উদ্ভব করেছিল আর শোষিত-শোণিত মানুষগুলোর উপর কৃত্রিম মম্বন্তর স্থাপিত করে অর্থনীতি ষড়যন্ত্রের যে অদ্ভুত ওস্তাদি দেখিয়েছিল, স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীজ সেই দিন উপ্ত হয়েছিল। জালিয়াৎ ক্লাইভের পর বাংলার জনসাধারণের ধন-প্রাণ অবিরাম ৩০ বছর ধরে হরণ করে ইউরোপের শিল্প মহাবিপ্লবে ইংরেজ আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, আর বিনিময়ে ভারতকে দিয়েছিল দুর্ভিক্ষ। ১৭৭০-এর এই গণহত্যায় তিন ভাগের এক ভাগ বাঙ্গালী নিশ্চিহ্ন হয়েছিল বলেই এই দস্যুদলের বিরুদ্ধে উত্থানের প্রথম আয়োজনের ভার বাংলাকেই নিতে হয়েছিল। উত্থানের এই আয়োজনের আভাষ মাত্র পেয়েই কার্ল মার্কস বলেছিলেন, "ইংরেজের বাংলা অধিকারের ফলে যে গণ-উত্থানের আভাষ পাওয়া গেছল এশিয়া-খণ্ডে তা সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ("The greatest and to speak the truth the only social revolution ever heard of in Asia") বর্ত্তমান ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল হয়তো বা একটু ঠাট্টা করেই বলেছেন—"Bengal can take pride in the fact that she helped greatly in giving birth to the industrial revolution in England" ইংলণ্ডের শ্রমশিল্প বিপ্লবের জন্মদানে বাংলা যথেষ্ট সাহায্য করেছিল বলে গর্ব্ব করতে পারে। ইঙ্গিত বেদনাদায়ক হলেও সত্য।

গণ-দুঃখ মোচনের জন্য কেউ তখন আঙ্গুল ওঠায়নি। মধ্যবিত্ত ও ধনী সম্প্রদায় তখন প্রভু-বদলের সুযোগ নিচ্ছিল। অপহৃত-প্রভুত্ব রাজন্যরা যেমন ক্ষুব্ধ হয়েছিল, তেমনি ক্ষুব্ধ হয়েছিল হডসনের গুলীতে দিল্লীতে শেষ বাদশাহ-পরিবারকে কুকুর-বিড়ালের মত হত্যা করতে দেখে মুসলমান সৈনিকরা, পেশোয়াদের চিৎপাবন মন্ত্রিত্ববিলোপ হবার ফলে তেমনি বিদ্রোহও হয়েছিল উমাজী নায়কের নেতৃত্বে। বিপন্ন ও মরিয়া জনসাধারণের উত্থান-ধ্বনি তখন সমগ্র উত্তর-ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তারা প্রচার করতে লেগেছিল ইংরেজ রাজত্বের খতম হয়েছে, ওদের সাবাড় কর। উত্তর-বাংলায় কৃষাণ বিদ্রোহ আর বাংলার ঘাটবাল অঞ্চলগুলোর চুয়াড় বিদ্রোহ এইখানে প্রথমে করে আত্মপ্রকাশ, দক্ষিণ-বাংলার এ উত্থানে জনসাধারণকে সাহায্য করে বাংলার রবিনহুড, বিশ্বনাথ বাবু, মনোহর প্রভৃতির ন্যায় মৃত্যু-স্পর্দ্ধী দল। কুবের নদীর উভয় তটে দাঁড়িয়ে লেফটেন্যান্ট গবর্ণর গ্র্যাণ্টের প্রতি ৭০ হাজার নরনারী যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল, তাতে ইংরেজের বুকে বেশ ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। তার পর, যাকে

বলা হয়েছে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম—সেপাই বিদ্রোহ। তারও উদ্ভব বাংলা দেশে। ঐতিহাসিক কার্তুজের হেতু-নির্দ্দেশ করেছিল মাত্র, বাস্তব কারণ নির্দ্দেশ করেনি। ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ে যে তার রাইফেল উত্থিত করে চীৎকার করে বলেছিল—"ওঠ! ওঠ! তোরা, সাদা আদমিগুলোকে গুলী করে মার", সে আহ্বান যে মাত্র সেপাইদের জন্য না, তা সে যুগের নীল-বিদ্রোহের ইতিহাস যে ভাল করে আলোচনা করেছে সে-ই বুঝবে।

কংগ্রেসের জন্মদাতা এলান অক্টেভিয়াস হিউম এমন প্রমাণ পেয়েছিলেন যে ধর্মগুরুরা গণবিপ্লবের আয়োজন করছেন। হিউম জানতেন, "The hatred was already there and required to be assuaged"—স্যার ওয়েডার বার্ণ কিন্তু জানিয়েছিলেন "শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ঘৃণা করো না। চাষী জনসাধারণ হতাশ হয়ে পড়েছে। বিক্ষুব্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় এই চাষীদের শক্তিসঞ্চার করে সংগঠিত করে ফেলতে পারে।"

রাজা রামমোহন ইংরেজের অত্যাচারী শাসন আর জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ অবস্থার কথা জানতেন, তাই তিনি আশা করেছিলেন যে, পাশ্চাত্য প্রভাবে জনসাধারণের সাধারণ ও রাজনৈতিক জ্ঞান তথা কলা-বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ হলে তারা তাদের অবস্থার অপকর্ষকারী অন্যায় ও অত্যাচারী ব্যবস্থার প্রতিরোধ করবে। হয়ত এতে একশ' বছর লাগবে। লেগেছিলও তাই।

উইলিয়ম য়্যাডামের রিপোর্টে জনসাধারণের অবস্থার কথা জানা গেছল। তিনি লর্ড বেণ্টিঙ্ককে জানিয়েছিলেন, জনসাধারণের যেমন মনোভাব, তাতে মনে হচ্ছে বিনা সংগ্রামে ও নির্ব্বিকারে কালই হয়ত মুনিব বদল করে ফেলবে।

এই বিক্ষুব্ধ ও বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত জনসাধারণকে বাঁধে রাখবার জন্য ইংরেজ সেকালের শিক্ষিত বরেণ্য পুরুষদের সাহায্য নিয়েছিল আর কালা-ইংরেজ সৃষ্টি করবার জন্য শিক্ষানীতির প্রবর্ত্তন করেছিল।

এই শিক্ষানীতির প্রভাব প্রাথমিক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ যেমন রোধ করতে পারেনি তেমনই তারা জনসাধারণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ইংরেজের সব আচরণের সমর্থনও করতে পারেনি। কেশবচন্দ্র অবশ্য মনে করতেন যে, ইংরেজ ভারতের অস্থি এ-কথা তাঁকে জানাতে হয়েছে—

"Those days are gone by never to return when men thought of holding India at the point of the bayonet."

১৮৮৫ থেকে ইংরেজ যেমন এক দিকে কংগ্রেসের নেতাদের মারফৎ বৃটিশ সরকারের কৃপা-বলিষ্ঠ এক দল নেতার সৃষ্টি করে মুমুক্ষু জাতির মুক্তির প্রচেষ্টা দমন করতে চেষ্টা করেছিল, অন্য দিকে তেমনি ফরাসী বিপ্লব ও মার্কিণ স্বাধীনতা সংগ্রাম, বুয়ার যুদ্ধ তথা রুশ-জাপ যুদ্ধের প্রেরণায় জনসাধারণের মুক্তির দায়িত্ব নিয়ে ভারতের নওজোয়ানরা কংগ্রেসের আস্ফালন তুচ্ছ করে প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হতে লেগেছিল।

ইংরেজ এই বিপ্লবী যুব-আন্দোলন এড়াবার চেষ্টা করেও পারেনি। এ আন্দোলনের নেতা ইংরেজের মোহমুক্ত শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের মহানায়ক স্বামী বিবেকানন্দ। উচ্চবর্ণ ও সমাজের উচ্চশ্রেণীর নেতৃত্বকে তুচ্ছ করে এমন নূতন ভারতের তিনি সন্ধান দিয়েছিলেন যে ভারত বেরুবে লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে—জেলে মালো, মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, ঝোড়-জঙ্গল-পাহাড়-পর্ব্বত থেকে নূতন ভারতের সন্ধান করবার জন্য কর্ম্মীদের প্রতি তাঁর নির্দ্দেশ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ ভাবে বাংলার জোয়ানদের আহ্বান করে বলেছিলেন—"We know to our shame that most of the real evils for which the foreign races abuse the Hindu nation, are only owing to us. But glory unto God, we have been fully awakened to it, and with his blessings, we will not only cleanse ourselves, but help the whole of India to attain the ideals"···বাংলার দরিদ্র যুব-সাধারণকে আহ্বান করে তিনি বলেছিলেন—"You young men of Bengal; do not look up to the rich and greatmen who have money. The poor did all the great and gigantic work of the world."

বাংলার জোয়ান যে সেদিন গোটা বাংলাকে, বাংলার প্রতি গ্রাম, প্রতি নগর, প্রতি গৃহ, প্রতি পথ, নদী, গিরি-বনানীকে স্বাধীনতার যজ্ঞশালায় পরিণত করেছিল, তার প্রেরণা নিশ্চয় সেকালের কংগ্রেস দেয়নি, দিয়েছিল এই Cyclonic Hindu. ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেই বাল-কিশোর নব যুবদলের প্রতি উপদেশ ছিল—"Be and make—let this be our motto. Say not, man is a sinner. Tell him he is God." প্রথমে তারা নিজে যে ভাবে তৈরী হয়েছিল আর দেশকে যে ভাবে তৈরী করেছিল তার তুলনা পৃথিবীর কোন মহাজাতির জাগরণের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। পণ্ডিত জওহরলালও স্বীকার করেছেন, এরা more aggressive and defiant ছিল, কংগ্রেসের নেতা ও প্রতিনিধিদের চাইতে আন্তরিকতা, শক্তি, সংখ্যায় এরা অনেক বেশী ছিল। কংগ্রেসের পদমর্য্যাদাকামী ইংরেজ-স্তাবকস্থবিরদের কাছেও এরা যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল, স্বয়ং ইংরেজ সরকারের কাছেও তেমনি ছিল ত্রাসস্বরূপ। এদের যেমন দেহ ও মনে সর্ব্বতোভাবে মহৎ ভয়স্বরূপ ও প্রাণ পর্য্যন্ত বলিদানের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল, অমনি ভারতে ও ভারতের বাইরে পরাধীনতার কু-ফল সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্য চালান হয়েছিল বিশেষজ্ঞদের পাঠিয়ে। কংগ্রেসের মহানায়ক সুরেন্দ্রনাথ জনসাধারণের দুর্দ্দশার কথা জানতেন, কিন্তু এ-ও জানতেন যে তাঁর কংগ্রেসের মারফতে গণ-জাগরণ হবার নয়। তাই তিনি নব-জাতির কাছে আবেদনে জানিয়েছিলেন—"It is for you to give voice to the voiceless, strength to the weak and the suffering. How many of you are prepared to go from village to village and to communicate to the ryots the glad tidings of their political redemption? I call upon you to take up this work." (১৮৮৩ খৃঃ) সুরেন্দ্রনাথ যে নেতৃ-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, কংগ্রেস সৃষ্টির পর সে সম্প্রদায় অন্ততঃ গণ-সংগঠনের বাস্তব কার্য্য আরম্ভ করবেন এ আশা দেশ করেছিল। করে হতাশও হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে নবীন ভারতকে ঘোষণা করতে হয়েছিল—এখানে কংগ্রেস ও লণ্ডনে সেই কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটি দুই-ই তিথারী প্রতিষ্ঠান। ভিক্ষায়

নতুন নাম আমরা দিয়েছি: নাম দিয়েছি 'এজিটেশন'। কিন্তু এজিটেশন সত্যিকার দেশপ্রেমের পরীক্ষা নয়। (বিপিন পাল)।

সুরেন্দ্রনাথ আপনাদের নির্বীর্য্যতা অনুভব করে গণ-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করবার জন্ত যাদের কাছে আবেদন করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যাদের প্রেরণা দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দ যাদের প্রাথমিক নেতৃত্ব করেছিলেন ১৯০২ থেকে ১৯২১ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তারাই মুক্তি-সংগ্রাম চালিয়েছে, আর সমস্ত সংগ্রামেরও নেতৃত্ব করেছে বাংলা। বাংলার বিপ্লবী যুবশক্তি প্রতি প্রদেশে গিয়ে তরুণ সম্প্রদায়কে সেদিন আহ্বান করে বলেছিল—"There is a creed in India to day which calls itself Nationalism, a creed which has come to you from Bengal···Bengal has come forward as a saviour of India."

এর পর স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেসের আর কোন স্থান নাই। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত যুব-বিপ্লবীদের সংগঠন ও সন্ত্রাস প্রচেষ্টায় ইংরেজকে তখন আত্মরক্ষা করে চলতে হয়েছিল। কংগ্রেস প্রথম মহাযুদ্ধের কিছুমাত্র সুযোগ নেয়নি, কিন্তু এরা নিয়েছিল এদেশে ও বিদেশে। কংগ্রেসের নেতারা তখনও রেজোলিউসনের খেলাতেই মত্ত। আর এরা তত পেশোয়ার থেকে গোয়ালপাড়া আর হিমাচল থেকে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত মহা উত্থানের দাবাগ্নি প্রজ্বলিত করতে। ইংরেজ তাদের সঙ্গে লড়েছে ও মরেছে। জনসাধারণ তাদের সমর্থন করেছে ও তাদেরই জন্ত জালিয়ানওয়ালায় হত্যাকাণ্ড। তাদেরই জন্ত জনসাধারণের চাপে পড়ে কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও কর্মনীতি বদলে ফেলতে হয়েছে গান্ধীজীর পরিচালনে।

গান্ধীজীর দেবশক্তি অসুরশক্তিকে পরাজিত করতে পারেনি। কারণ প্রহারক্লিষ্ট জনসাধারণ দেহের বেদনাও যেমন ভুলতে পারেনি, তেমনি যারা প্রত্যক্ষ ভাবে তাদের নেতৃত্ব করছিল গত ২০ বছরের যুব-সংগঠক ও বিপ্লবীরা, তারাও তেমনি আপনার প্রতিহিংসা নেবার পথ পরিহার করতে বিন্দুমাত্র সম্মতি হয়নি। গণশক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তারা নব সংগঠিত কংগ্রেসে যোগ দিয়ে শিক্ষিত ও সুবিধাবাদীদের হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিতে চেয়েছিল।

১৯২১-২২-এর পরে যার যাবার উদার আন্দোলন যখন ব্যর্থ হল তখন কংগ্রেসের নেতাদের কেউ বললেন, ইংরেজকে তা'র আইন সভার ঢুকে জব্দ কর কেউ বললেন, সুতো কেটে সেই সুতোর অর্থনৈতিক চাপে কাবু করে ওকে বাগ মানাও। ২১-এর ৩১শে ডিসেম্বরে স্বরাজ না পেয়ে বিপ্লবী যুবশক্তি কংগ্রেস গণ-নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও অপর অপর পন্থা অনুবর্তন করে পূর্ণ স্বাধীনতা অধিকার করবার আয়োজনে মন দিয়েছিল। গণ-সমর্থনে নব নব বিপ্লবী দল কংগ্রেসেও যেমন প্রভাব বিস্তার করছিল, কংগ্রেসের বাইরেও তেমনি নিজস্ব কর্মগণ্ডী প্রসারিত করছিল। ১৯২৮-এও গান্ধীজী "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস" প্রার্থনা করলেন। লর্ড আরউইনও বললেন তাই-ই পাবে, আজ না হয় কাল। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী গান্ধীজী তখনও মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু গণ ও যুবশক্তির প্রভাব সেদিন যে অদ্ভুত গণ-অভিযান হয়েছিল, আর তার পাশে যে বিপ্লবী সশস্ত্র প্রচেষ্টা চলেছিল, বাংলার দান ছিল তাতে সব চাইতে বেশী। গণ-শক্তির সঙ্গে বৈপ্লবিক সংগঠন তখন আগামী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নেবার জন্ত বিপুল আয়োজন করছে। "বিজয় বা মৃত্যু" ধ্বনি তুলে যেমন গান্ধীজীর শান্ত অহিংস অভিযান শুরু হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বিপ্লবীদের অশান্ত নাসিক গর্জে উঠেছিল চট্টলে। বিপ্লবী ও অধৈর্য্য জনসাধারণের এ প্রভাবের কাছে কংগ্রেসের প্রাথমিক যুগের শুরুবাদী ধনিক-প্রভাবান্বিত নেতৃবৃন্দের হার মানতে হয়েছিল। তারা কূট-কৌশলে বিপ্লবী দলে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করেছিল। জনসাধারণ এ কৌশল ধরে ফেলেছিল। তারা বুঝেছিল যে কংগ্রেসের কর্মকাণ্ডহীন বচন-সর্বস্ব হুমকীতে ভড়কে যাবে না ইংরেজ। তাই তারা নিজস্ব পথ নিয়েছিল। লাজপত রায়ের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিল বিপ্লবীরা লাহোরে পুলিশ ইনস্পেক্টর সণ্ডার্সকে হত্যা করে। দিল্লীর পরিষদ-কক্ষে সেদিন বোমা গর্জনের সঙ্গে অপ্রতিরোধ্য মহাবিপ্লবের জয়ধ্বনি উঠেছিল—ইনক্লাব জিন্দাবাদ। যতীন দাস অনশনে মৃত্যু বরণ করে সেদিন প্রত্যেক ভারতবাসী যুবকের বুকে যে আগুন জালিয়েছিল, সে উদ্দীপনার কাছে কংগ্রেসের আস্ফালন স্তিমিত হয়েছিল। টেরেন্স ম্যাকস্যুইনীর পরিবার এ মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ভারতের নতুন জাতকে জানিয়েছিল—"Family of Terence Mc Swiney have heard with grief and pride of the death of Jatin Das. Freedom will come." গান্ধীজীকে এই যুববীরের আত্মত্যাগ সম্বন্ধে মৌনী হয়ে থাকতে দেখে দেশ সেদিন অবাক্ হয়ে গেছল।

কিন্তু যুব-জগন্নাথের হয়েছিল নিদ্রাভঙ্গ। ভারতময় তখন শ্রমিক সংগঠন—ছাত্র আন্দোলন সর্বত্র। নেতা জওহরলাল, নেতা সুভাষচন্দ্র, নেতা পণ্ডিত মালবীয়।

কাজেই গণবিক্ষোভ হয়েছিল আসন্ন। গান্ধীজী তা বুঝতে পেরেছিলেন। কাজেই ৩০-এর বিপ্লব সুরু করতে হয়েছিল। ইংরেজ এ বিপ্লব দমন করতে চেয়েছিল বলপ্রয়োগে। ইংরেজ ভেঙেছিল সহস্র গণশির—বিপ্লবীরা তার প্রতিশোধও নিয়েছিল। শোলাপুরের জনসাধারণ ইংরেজের হাত থেকে সহর কেড়ে নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। মহাবিপ্লবে—আর বিপ্লবের ধূম ক্রমে দাবাগ্নিতে পরিণত হচ্ছে দেখে ইংরেজও সেদিন আপোষ করতে চেয়েছিল। কংগ্রেসের সভ্য-স্থবিররাও ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করতে রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু পূর্ব-ভারতের সঙ্গে নয়।

চলছে আরউইন-গান্ধী চুক্তি সর্তের আলোচনা যুদ্ধ-বিরতি ঘোষিত হয়েছে। স্বাধীনতা—অন্ততঃ পক্ষে গান্ধীজীর ভাষায়—"Substance of Independence" বুঝি অধিগত হয়। অবিপ্লবী সাধারণ সেনাপতি ও নেতা গান্ধীজীকে দেবতার অধিক দিল সম্মান। হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল, যুদ্ধ-বিরতির চুক্তির সর্ত ভেঙে ২৩শে মার্চ্চ রাতে যুব-মহানেতা সর্দার ভগৎ সিং ও তার কমরেডদের গোপনে হত্যা করা হয়েছে ফাঁসীর মঞ্চে। গান্ধীজীকে বিক্ষুব্ধ জোয়ানরা অভিমান করে সেদিন কাল ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিল। এর আট বছর আগে সহীদ গোপীনাথের যে প্রস্তাবে গান্ধীজী দেশবন্ধুকে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদান করতে পারেননি, সেই প্রস্তাবের ভাষাতেই ভগৎ সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয়েছিল স্বয়ং গান্ধীকে। বিপ্লবীর যুবশক্তিকে শান্ত করবার জন্ত মূলগত দাবীর প্রস্তাব ওঠান হয়েছিল। কিন্তু নিখিল ভারত নওজোয়ান ভারত সভা ওতে সন্তুষ্ট না হয়ে প্রায় কংগ্রেস ত্যাগেরই মনস্থ করেছিল।

তবু এদের এড়িয়েই ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের হয়েছিল আপোষ। গান্ধীজী মুসলমানদের মুক্তির আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু বিপ্লবীদের

নয়। তাই বিপ্লবীদের জানাতে হয়েছিল ইংরেজকে যে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আপোষ-সর্ত তারা মানতে প্রস্তুত নয়, ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে সত্যিকার যদি আপোষ করতে চাও তাহ'লে বিপ্লবী দলের সঙ্গে পৃথক্ কথাবার্ত্তা বলতে হবে। দেশবন্ধুর শেষ দিনের আশার অনুবর্ত্তন করে সে দিন মডারেট নেতাদের সাথে কংগ্রেসের নেতারাও, এমন কি পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণাকারী লাহোর কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল পর্য্যন্ত (নিতান্ত অনিচ্ছা থাকলেও) ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনে সম্মত হয়ে বিবৃতি সই করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র, ডাঃ কিচলু, বিহারের আবদুল বারি—আয়র্ল্যাণ্ডের সিন-ফিন পার্টির নীতির অনুবর্ত্তন করে এর বিরোধিতা করেছিলেন। সাধ করে নেতারা লর্ড আরউইনের দরবারে দৌড়েছিলেন, বামপন্থীরা বোমা মেরে আরউইনের ট্রেণ ধ্বংস করতেও চেষ্টা করেছিল। ট্রেণ অবশ্য ভাঙেনি, নেতাদেরও মন ভেঙে গেছল হতাশ হয়ে ফিরে। কাজেই লাহোরে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীও যেমন উঠেছিল, তার সঙ্গে আরউইনের মহানুভবতার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদও দেওয়া হয়েছিল।

বৃটেনের বড় উকিল চার্চ্চিল ত সাফ বলেই দিয়েছিল—আজ হোক, কাল হোক, গান্ধী আর কংগ্রেসের দাবীকে চূর্ণ করে দিতে হবেই। পরিষ্কার বলে দিয়েছিল—"I did not contemplate India having the same constitutional rights and system as Canada in any period which we can foresee···

তবু ওঁরা গেছলেন গোল টেবিলে, বিপ্লবী ভারত সংগ্রাম রাখছিল চালিয়ে। সীমান্তে লাল কোর্ত্তা দল, যুক্তপ্রদেশে কৃষাণ দল, বাংলায় সন্ত্রাসবাদীর তাদের কর্ত্তব্য করছিল। ইংরেজও ছেড়ে কথা কয়নি, গুলী করেছে, অর্ডিন্যান্স করেছে। দিল্লী-চুক্তি খেলাপ করেছে। '৩২ সাল সুরু হতে না হতেই চার্চ্চিলের সাকরেদ উইলিংডন যেমন প্রয়োগ করেছে চণ্ডনীতি—কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের জনসাধারণও করেছে প্রচণ্ড সংগ্রাম। প্রথম চার মাসে ওরা বন্দী করেছিল প্রায় ৮০ হাজার ওরা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলামে বিক্রী করেছিল, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেছিল। যেমন অত্যাচার, জবাবও তেমনি অকাট্য। বোনদেরও লড়াইএ নামতে হয়েছিল। প্রীতিলতার নেতৃত্বে বিপ্লবীরা পাহাড়তলি ইনষ্টিটুটে ইংরেজদের উপর গুলী চালিয়েছিল, বাংলার গবর্ণরের উপর গুলী চালিয়ে বীণা দাস ঘোষণা করেছিলেন—সরকার যে সব অত্যাচার করছে তাতে আমার মত অবলাও বল পেয়েছে।

কিন্তু গান্ধীজী সেদিন পুণা-চুক্তি উপলক্ষ করে যে উপোষ আরম্ভ করেছিলেন, তার প্রভাবে বামপন্থীদের সব আন্দোলন ও সংগ্রাম বন্ধ করতে তিনি বাধ্য করেছিলেন। এই সুযোগে ইংরেজরা কৌশলে গণ-বিপ্লবকে ভেঙ্গে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল। এক অবসরপ্রাপ্ত বৃটিশ রাজপুরুষের প্রভাবে মুসলমান ছাত্ররা Seperate Nation নীতি কার্য্যকরী করবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশ ভাগের প্ল্যান তৈরী করছিল। (জিন্না কিন্তু তখন বলেছিলেন, এদের পাকিস্তান পরিকল্পনা "only a students' scheme") মিলন-বৈঠক—২ নং গোল-টেবিল ৩ নং গোলটেবিলে আপোষের আয়োজন চলছিল। ডাঃ আনসারী-প্রমুখ নেতারা নতুন স্বরাজ্য দল গড়িয়ে তুলে ইংরেজের দান কাজে লাগাবার অজুহাতে স্বরাজী দলের গান্ধীজীর ও বিপ্লবীর প্রভাব খণ্ড করবার আয়োজনে মন

দিয়েছিলেন। ওরা 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' সম্বন্ধে কংগ্রেসকে নিরপেক্ষ থাকতে বাধ্য করেছিল। এর পর যখন নয়া শাসন-বিধান এল তখন ফিরে গেল ১১৭০-এর মডারেট আদর্শে অথবা ১৯২৪এর স্বরাজ্য দলের কর্ম্মপদ্ধতিতে। দূরদর্শী গান্ধীজী বামপন্থীদের কর্ম্মনীতি যেমন ব্যর্থ হবে মনে করেছিলেন, নিয়মতন্ত্রপন্থী কংগ্রেস নেতাদেরও কর্ম্মনীতি তেমনি ব্যর্থ হবে মনে করেছিলেন। তাই হিন্দু গণশক্তি উদ্বুদ্ধ করবার জন্য অস্পৃশ্যতা নিবারণের আন্দোলনে জোর দিয়েছিলেন। ইংরেজ এ সময় কংগ্রেস থেকে মুসলমান দলকে যেমন বিচ্যুত করতে সমর্থ হয়েছিল, তেমনি সোস্যালিষ্ট পার্টি গড়ে কংগ্রেসকে শক্তিহীন করতেও সমর্থ হয়েছিল। তার পর এল মহাযুদ্ধ। ইংরেজ চাইল কংগ্রেসের সাহায্য। কংগ্রেস দাবী করল—"Immediate declaration of the full independence of India"। বড়লাট লিনলিথগো বললে—নামঞ্জুর। সে মুসলমানদের উস্কে দিতে লাগল। অবস্থা দেখে বিপ্লবীরা সজ্ঘবদ্ধ হল। তাদের এ লড়াইএরও সুযোগ নিতেই হবে। তারা ত্রিপুরী কংগ্রেসের ভাদের দাবী ঘোষণা করল। সুভাষচন্দ্রের ভাষায় কংগ্রেসের 'Old guard'রা নিয়মতন্ত্রের পথে এগুতে লাগলেন। সংগ্রামের—মহাসংগ্রামের সুযোগ এসেছিল ৪২-এ। ইংরেজ সেদিন বিপন্ন। চার্চ্চিল কেঁদে ফেলেছে। বঙ্গোপসাগর প্রায় জাপানের দখলে। ভারত আক্রমণ আসন্ন। "At this juncture Mr, Churchill stressed the ability of the Japanese to overrun a large part of India and to conduct air raids on defenceless Indian cities." বিপ্লবীরা এ-খবর রাখত। বিপ্লবীরা বললে—এইবার আঘাত কর। Old Guardরা তখনও বললে, দেশের সব দল অহিংস নয়—মনে ও কাজে। বিপ্লবীরা গান্ধীজীকে বলল—"We peldge our unconditional support in the event of the fight being resumed" ওরা কথা কইল না। কিন্তু যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে? হতাশ হয়ে সুভাষচন্দ্রকে পালিয়ে গিয়ে ভারতের বাইরের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিতে হয়েছিল। হতাশ হয়ে কংগ্রেসকেও হাঁকতে হয়েছিল—ইংরেজ হটু যাও। অহিংস নেতাদের পিঁজরায় পূরে ইংরেজ সেদিন ভেবেছিল প্রাণ-বন্যায় বাঁধ দিবে। পারেনি। '৪২-এর মহা বিপ্লব এসেছিল ভারতের ভিতরে আর ভারতের বাইরে। ডাক দিয়েছিল ভারতের জনসাধারণ আর যুবশক্তি—ডাক দিয়েছিল আজাদ হিন্দ দল।

তারা হুঙ্কার করেছে—লড়ব না হয় মরব। তারা হুঙ্কার করেছে "চলো দিল্লী।" ওরা মরে ভারতে প্রতিষ্ঠিত করেছে প্রাণ। ভারতের প্রাণ-পুরুষ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যে মহামন্ত্রে যুবভারতকে সঞ্জীবিত করেছিল, সে মন্ত্রসাধন ফলপ্রসূ হয়েছে। অধিবাস মন্ত্র-নিনাদ "বন্দে মাতরম্"—তার সাধন চলছিল ২৫ বছর—সাধনমন্ত্র ধ্বনি "ইনক্লাব জিন্দাবাদ", এর সাধন কাল দ্বাদশ বৎসর, এ ধ্বনি দিয়ে জেগে উঠেছে নওজোয়ান গণশক্তি—আর উদ্যাপন মন্ত্র "জয় হিন্দ!" এ মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে লাল কেল্লায়—এ মন্ত্র প্রয়োগ করেই কংগ্রেসের সাদ-হাবিয়রা আপনাদের আয়ত্ত ঔপনিবেশিক অধিকার প্রাপ্ত করেছে। কিন্তু এ মন্ত্রসাধন আজও সমাপ্ত হয়নি—হবে না ভারতীয় জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত।

জয় হিন্দ।

পত্রগুচ্ছ

শেলীর চিঠি

মিলান, ১০ই এপ্রিল, ১৮১৮

প্রিয় পিকক,

তোমার আমার মধ্যে সময়ের ব্যবধানও যে এত তা আমার ধারণার অতীত ছিল। তোমার দু' তারিখের লেখা চিঠি এইমাত্র পেলাম আর ঐ একই দিনের লেখা আমার চিঠি তুমি কবে যে পাবে জানি না। তুমি এখনো মারলোতে থাকতে বাধ্য হয়েছ শুনে ভারী দুঃখিত হলাম। কিছুটা সামাজিকতা করতেই হয় সংসারে, বিশেষ করে এবার গ্রীষ্মে যখন তোমার সঙ্গে ইতালীতে দেখাই হচ্ছে না। মনে মনে কত বার মারলো ঘুরে আসি। আমার জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ হোল, একবার যা জানা হয়ে যায় আর তার কথা ভুলতে পারি না। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে বেড়াতে গিয়েছ, হঠাৎ প্রয়োজনের তাগিদে জায়গাটি ছাড়ার কথা ভাব—দেখবে ছাড়তে পারবে না। সে লেগে থাকবে তোমার সঙ্গে। নানা স্মৃতি যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তেমন সম্ভাবনাপূর্ণ মনে হয়নি কোন দিন, যেন তোমার পলায়নের প্রতিশোধ নেয় এই ভাবে। সময় পালটায়, জায়গারও বদল হয়, অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও এক দিন খসে যায়। কিন্তু তবু যা ছিল তা একেবারে বন্ধ্যা, প্রাণহীন বলে বোধ হয় না। এই সঙ্গে 'নাইটমেয়ার এ্যাবির' উপর একটি আলোচনা পাঠালাম।

শেষ তোমায় যে চিঠি লিখেছি তার পর এক দিন বাড়ীর সন্ধানে কোমোতে গিয়েছিলাম। কীলার্নের আরবাটাস দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া এই হ্রদটির মত এমন অপূর্ব সৌন্দর্যময় আর কিছুই চোখে পড়েনি এ পর্যন্ত। দীর্ঘ অপ্রশস্ত হ্রদটি পাহাড়-অরণ্য ডিঙিয়ে আসা বিরাট স্রোতস্বতীর মত দেখতে অনেকটা। আমরা নৌকা করে কোমো সহর থেকে ট্রেমেজিনা নামক একটি গ্রামে গিয়েছিলাম। এবং সেখান থেকে হ্রদের বিভিন্ন দৃশ্য দেখেছি। কোমো আর এই গ্রামটি, বরং বলা চলে গ্রামপুঞ্জের মাঝে চেষ্টনাটের বনানী-সমাকীর্ণ দীর্ঘ শৈলশ্রেণী প্রসারিত। এ চেষ্টনাট খাওয়া চলে এবং খাদ্যাভাবের সময় এখানকার লোকেরা সত্যিই এ চেষ্টনাট খায়। কোথাও কোথাও চেষ্টনাট গাছগুলি ধূসর ডালপালাগুলি নিয়ে হ্রদের বুকে ছায়া ফেলেছে। তবে সাধারণতঃ হ্রদের তীর পাহারা দেয় লরেল, বে, মার্টল, বুনো ডুমুর আর অলিভ। অলিভ গাছগুলি পাহাড়ের ফাটলে জন্মায়, গুহামুখে ঝুঁকে থাকে আর জলপ্রপাতের ঝলমলানিতে উজ্জ্বল সংকীর্ণ গভীর উপত্যকার ছায়া সঞ্চারিত করে। এ সব ছাড়াও আরো অনেক কুসুমিত চত্বাংশে ঢালুয়ায় পাহাড়ে যাদের নাম আমি জানি না। আরো উঁচুতে গাঢ় বনের পটভূমিকায় গ্রামের গীর্জার গম্বুজগুলি শ্বেত দেখায়। আরো দূরে দক্ষিণে পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে এসেছে হ্রদের জলে। অবশ্য এদিককার পাহাড়গুলি অপেক্ষাকৃত উঁচুও এবং কতকগুলির চূড়া সব সময় তুষারমণ্ডিত থাকে। কিন্তু এই উঁচু পাহাড় আর হ্রদের মাঝে আছে আর এক দল নীচু পাহাড়ের শ্রেণী—সেখানেও উপত্যকা, গুহা বা ফাটলের অভাব নেই। যেখানে একটি গুহার ভিতর দিয়ে আর একটি গুহায় যাওয়া যায় ঠিক ইভ্রা আর পায়নাসাসের গীর্জার মত। এখানে দ্রাক্ষা-ক্ষেত, অলিভ, কমলালেবু আর ডুমুর গাছের আবাদী জমি আছে। গাছগুলি ফলভারে এমন নত হয়ে পড়েছে যে গাছে পাতার চেয়ে ফলের সংখ্যাই বেশী মনে হবে। হ্রদের এই তীরভাগ জুড়ে নিরবচ্ছিন্ন একটি গ্রাম। মিলানের ধনী ব্যক্তিদের অনেকেরই এখানে বাংলো আছে। এখানে সংস্কৃতি আর প্রাকৃতিক মাধুর্যের এমন নিবিড় সংযোগ ঘটেছে যে ঠিক কোথায় তাদের সীমারেখা বোঝাই যায় না। কিন্তু এদের মধ্যে সুন্দরতম হোল ভিলা প্লিনিয়ানা। নামটি এসেছে ভিলাটির প্রাঙ্গণের একটি প্রস্রবণের নাম থেকে। প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর এর উৎস-মুখ দিয়ে জল উৎসারিত হয়। প্লিনিই প্রথম প্রস্রবণটির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। একদা এই ভিলাটি একটি চমৎকার প্রাসাদ ছিল কিন্তু আজ অর্ধেকেরও বেশী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এটিকেই আমরা সংগ্রহের চেষ্টায় আছি। একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি খাড়াইয়ের পাদদেশে হ্রদের তলা থেকে ওঠা টেরাসের উপর বাড়ীটি নির্মিত। সামনে বাগান। সমদূরবর্তী স্তম্ভশ্রেণী থেকেই দৃশ্যপট সব চেয়ে অপূর্ব আর তেমনি নয়নমুগ্ধকর। এক পাশে তরঙ্গায়িত শৈলমালা এবং ঠিক মাথার উপর সাইপ্রাস গাছের বিস্ময়কর উচ্চতা নিয়ে আকাশের বুক যেন বিদীর্ণ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর মনে হবে যেন মাথার উপরের মেঘপুঞ্জ থেকে উত্থিত এক বিপুলায়তন জলপ্রপাত বনভূমির দ্বারা খণ্ডিত হয়ে শত-সহস্র ধারায় এসে হ্রদে পতিত হচ্ছে। বিপরীত পার্শ্বেও পর্বতশ্রেণী আর শ্বেত পালখচিত নীল হ্রদের পরিসরতা। প্লিনিয়ানার প্রকোষ্ঠগুলি বিশাল বটে, কিন্তু অতি প্রাচীন ধরণের আর বিশ্রী ভাবে সাজান গুছান। হ্রদের বুকে ঝুঁকে পড়া আর লরেলের ছায়াচ্ছন্ন টেরাসগুলিও সুন্দর। কোন মতে আমরা দু'দিন ছিলাম। এখন মিলানে ফিরে এসেছি। একটি বাড়ী সম্বন্ধে কথাবার্তা চলছে।

কোমো আর মিলানের দূরত্ব আঠার মাইল। ক্যাথিড্রাল থেকেও কোমোর পর্বতশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়।

ক্যাথিড্র্যালটি শিল্পকলার একটি অপূর্ব নিদর্শন। শ্বেত মর্মর-প্রস্তরে আগাগোড়া নির্মিত—ছুঁচোল গম্বুজগুলি খুব উঁচু উঁচু আর সূক্ষ্ম কারুশিল্প ও ভাস্কর্যের চূড়ান্ত বিকাশ দেখা যায় তাতে। এই উত্তুঙ্গ চূড়া-খচিত নীরেট নীল, ইতালীর আকাশের নিঃসীম উদারতা, রাতে চাঁদের আলোয় তারার ঝলমলানি এমন এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে যে কোন স্থাপত্য-শিল্প তেমন করতে পারে বলে আমি কল্পনাও করতে পারি না। গীর্জার ভেতরটাও তেমনি মহিমান্বিত এবং এখানেই যা কিছু পার্থিব তার আভাস পাওয়া যায় মাত্র। চিত্রিত বড় বড় কাচাভরণ, বিরাট বিরাট স্তম্ভশ্রেণী, স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা সুপ্রাচীন মূর্তি, পেতলের বেদীর পাশে কালো চন্দ্রাতপের নীচে রৌপ্য-প্রদীপগুলি সারা ক্ষণ অনির্বাণ জ্বলতে থাকে, গম্বুজের গায়ে মারবেলের কারুকার্য—সব মিলে এক মহিমাময় সমাধিস্তম্ভের ভাব জাগায়। বেদীর পিছন দিকে একটি মাত্র স্থান আছে যেখানে দিনের আলো নিষ্প্রভ আর হলদে দেখায়। এইখানে এই নিরালাতে বসে আমি দান্তের কাব্য পড়ি।

এবারকার গ্রীষ্ম এবং আগামী বছর আমি নির্দিষ্ট করে রেখেছি টাসোর পাগলামি নিয়ে একটি ট্রাজেডি লিখব বলে। আমার ধারণা, ঠিকমত লিখতে পারলে বেশ কবিত্বময় আর নাটকীয় করে তোলা যাবে। কিন্তু তুমি হয়ত বলবে যে আমার নাটকীয় প্রতিভা নেই। এক হিসেবে তা খুবই সত্যি কিন্তু নাটকীয় প্রতিভা ছাড়াই যে এক জন কত ভাল নাটক লিখতে পারে সেইটে দেখাব আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। অন্ততঃ বায়রনের চেয়ে ভাল কবিতা হবে—শেক্সপিয়রের চেয়ে সুরুচিপূর্ণ। তুমি ত রোডোডাফন সম্বন্ধে আমায় কিছু লেখনি। এটি অপূর্ব সাফল্য আনবে আমার বিশ্বাস। পি, বি, এস

বিদ্যাসাগরের চিঠি

[শিক্ষা-বিভাগের তরুণ সিভিলিয়ান ডাইরেক্টার গর্ডন ইয়ংয়ের সহিত মতভেদ হেতু পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর এই চিঠিখানি লিখে চাকরীতে ইস্তাফা দেন। তাঁর প্রিয় বন্ধু তৎকালীন বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের সনির্বন্ধ অনুরোধেও তিনি তাঁর মতের পরিবর্তন করেননি।]

মাননীয় ডাব্লিউ গর্ডন ইয়ং

শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টার মহাশয়ের সমীপেষু

মহাশয়,

যে গুরু কর্তব্যভার আমার উপর ন্যস্ত আছে তাহা সম্পাদনের জন্য যে অবিশ্রান্ত মানসিক পরিশ্রম করিতে হইতেছে তাহাতে এক্ষণে আমার সাধারণ স্বাস্থ্য এত গুরুতর ভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে যে আমি বঙ্গের মাননীয় লেফটেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সমীপে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিতে বাধ্য হইয়াছি।

২। আমি অনুভব করিতেছি যে যথাযথ ভাবে কর্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত যে গভীর মনোযোগের একান্ত প্রয়োজন তাহা আমি আর বিনিয়োগ করিতে পারিতেছি না। আমার বিশ্রামের প্রয়োজন। আমার ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির জন্য এবং সাধারণের স্বার্থরক্ষার পক্ষে অবসর গ্রহণের দ্বারাই একমাত্র সে-বিশ্রাম আমি লাভ করিতে পারিব।

৩। যে মুহূর্তে স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইব সেই মুহূর্ত হইতে আমার সমস্ত সময় ও মনোযোগ আমি বঙ্গভাষায় প্রয়োজনীয় পুস্তক রচনায় ও সংকলন প্রকাশে নিযুক্ত করিব, ইহাই মনস্থ করিয়াছি। স্বদেশ-বাসীর শিক্ষা ও জ্ঞান-প্রসারের সহিত আমার প্রত্যক্ষ সরকারী সম্পর্ক যদিও থাকিতেছে না তথাপি আমি আশা করি যে আমার জীবনের অবশিষ্ট বৎসরগুলি সেই মহান্ ও পবিত্র ব্রত সম্পাদনে নিয়োজিত থাকিবে এবং কেবল মাত্র মৃত্যুর দ্বারাই যেন আমার গভীর ও একান্ত আগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৪। এই গুরুতর কার্যে প্রবৃত্ত হইবার আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণও বিদ্যমান। তন্মধ্যে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা

লোপ এবং বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সহিত আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতির অভাবই প্রধান। অথচ বিবেকসম্পন্ন কর্মচারীর পক্ষে এই দুইটিই অপরিহার্য।

৫। প্রথমোক্ত কারণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, অবসর সময়ে অপেক্ষাকৃত স্বল্প কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া আমি পূর্বের তুলনায় অধিকতর সাফল্যের সহিত কাজ করিতে পারিব। এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে এবংবিধ কার্য আমার পক্ষে অতি গুরুতর, বিশেষ করিয়া এখনও যে নিজের পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের স্থায়ী কোন বন্দোবস্ত করিতে পারে নাই। দপ্তরের দুর্বহ ও সুকঠিন কর্তব্যের সহিত সম্পর্কচ্ছেদনে আর বিলম্ব করিলে ভগ্নস্বাস্থ্য ইহার অন্তরায় হইয়া উঠিবে বলিয়া আমি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি।

৬। দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, সরকারের উপর আমার মতবাদ জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়ার আমার কোন অধিকার নাই। কিন্তু যাঁহাদের অধীনে আমরা কাজ করি তাঁহাদের নিকট হইতে কাজে যে আমার আর মন নাই এ কথা গোপন করিতে আমি অক্ষম। ইহাতে আমার কর্মকুশলতা নষ্ট হইয়াছে এবং হইতে বাধ্য। আর অধিক আমি বলিতে চাহি না। কারণ আমার মতে বিবেকসম্পন্ন কর্মচারীর পক্ষে নিয়োজিত কর্মে হৃদয়ানুরাগ অপরিহার্য।

৭। এই পূর্ণ তৃপ্তি লইয়া আমি অবসর গ্রহণ করিতেছি যে আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত আমি যথা-কর্তব্য সম্পাদনে সতত একাগ্রতার সহিত চেষ্টা করিয়াছি। এবং আমি বিশ্বাস করি, সরকারের নিকট হইতে সর্বদা আমি যে অবিচলিত দয়া, প্রশ্রয় এবং প্রভাবিত সর্ব-

ও সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন নিশ্চয়ই আমার পক্ষে কুণ্ঠার পরিচায়ক হইবে না। সসম্মানে নিবেদন ইতি—

সংস্কৃত কলেজ
৪ঠা আগষ্ট, ১৮৫৮

আপনার অতি বিনম্র ভৃত্য
ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।

[ঈশ্বরচন্দ্রের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় সরকারের ছোট কর্মসচিব কর্তৃক শিক্ষা-অধিকর্তাকে লিখিত ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখের ১৫৬৬ নং পত্রের সারমর্ম।]

ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া আমি আপনার বিগত ১৮ই অগষ্ট তারিখের (অজ্ঞাত নথিপত্র সহ) ২০১৭ নং পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছি এবং প্রত্যুত্তরে জানাইতেছি যে লেফটেনান্ট বাহাদুর আপনার সুপারিশ মত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও অতিরিক্ত স্কুল-পরিদর্শক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিতেছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, পণ্ডিত মহাশয় কিঞ্চিৎ দৃঢ়চিত্ততার সহিত কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে উচিত বোধ করিতেছেন, বিশেষতঃ যখন তিনি তাঁহার অসন্তোষের সঙ্গত কারণ দর্শাইতে সক্ষম হন নাই। তথাপি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে জানাইবেন যে দেশীয় লোকদের শিক্ষা-ব্যাপারে তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী ঐকান্তিক কার্য্যের জন্য তিনি সরকারের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

(অবিকল প্রতিলিপি)

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সমীপেষু—

স্বাক্ষরিত : ডব্লু. ডি. গর্ডন, ইয়ং
শিক্ষা-অধিকর্তা

সারা বার্ণাডের চিঠি

[সারা বার্ণাডের নাম আজ ভুলে গেছে পৃথিবীর রসিক-সমাজ। অথচ এক দিন ছিল যখন সেই মেয়েটির নামোচ্চারণে তিনটি মহাদেশের লোক উন্মত্ত হয়ে উঠত। নৃত্যগীত-টায়লী সারা ছিলেন সমসাময়িক রঙ্গজগতের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্ঞী।

১৮৪৪ সালে প্যারিসে সারার জন্ম, লালিত হয়েছিলেন কনভেন্টে। যৌবনে রঙ্গালয়ের জৌলুসকে সারা জয় করেছিলেন তার অতুলনীয় স্মৃতিশক্তি আর সুধাময় কণ্ঠের দ্বারা। কবি, নাট্যকার, 'ফেডোরা'র লেখক সারডাউয়ের প্রতি সারা গভীর ভাবে আসক্ত ছিলেন। আর ফেডোরা ত সারাকেই উদ্দেশ্য করে লেখা। প্যারিসের একটি কাফেতে হঠাৎ দেখা হয়েছিল দু'জনের এবং প্রথম দর্শনেই সারা সারডাউয়ের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। এর পর সারার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে উঠল সারডাউকে জয় করা এবং তিনি তা করেছিলেন। সারডাউকে সারা বহু উচ্ছাসময় প্রেমপত্র লিখেছেন। সেই মধুর পত্রগুলি তাদের মৃত্যুর পর সংগ্রহ করে প্রকাশিত করা হয়েছে।

ষোড়শ বছর বয়সে সারার একটি পা বিকল হয়ে যায় এবং সেই খোঁড়া পা নিয়েই তিনি ইউরোপ আমেরিকা তোলপাড় করে বেড়িয়েছিলেন। মৃত্যুর কিছু কাল আগে সারা শর্যায় শুয়েও অভিনয় করেছিলেন। মৃত্যুর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে সারার উত্তেজনামুখর গৌরবময় জীবনের চির অবসান ঘটে। সারা—রঙ্গ-জগতে সারা অসামান্যা উর্বশী।]

আজ রাতে তুমি কোথায়? মাত্র এক ঘণ্টা আগে তোমার দুটি চোখের—নিঃস্ব মুহূর্তে—আশা করেছিলাম আজ তুমি আমার

তোমার বিহনে প্যারিস তো মৃতপুরী। তোমায় যখন জানতাম না তখন প্যারিস ছিল প্যারিস—মর্ত্তের অলকা। কিন্তু এখন প্যারিস ত পরিত্যক্ত জনহীন বিরাট মরুভূমি। বাহুহীন দেয়াল-ঘড়ির বুকের মত নিষ্প্রাণ।

তোমার জানার আগে আমার স্মৃতির মণিকোঠায় যত ছবি জমা ছিল আজ তারা সব কোথায় মুছে মুছে গেছে। আজ আছে শুধু আমাদের দু'জনের মিলনের অমর মুহূর্তগুলি।

এখন তোমায় ছেড়ে থাকা কঠিন আমার পক্ষে। তোমার মুখের কথা অতি কটু হলেও জগতের সব জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়ে নিবিড় সুখে ভরিয়ে তুলবে আমার জীবন। আমার শিরা সে তোমার বুকে ভালবাসার রসে সঞ্জীবিত, তোমার মধুবাণীর দোলনায় তারা নিরত ধীর কম্পিত। আলো-হাওয়ার মত আজ তারা একান্ত আমার পক্ষে।

খাদ্যের মত তাদের জন্যও বুভুক্ষিত আমি—তৃষ্ণার্ত্ত আমি। দুর্দ্দম সে তৃষ্ণা। তোমার মুখের কথাই আমার প্রাণবস্তু। তোমার নিশ্বাস আমার জীবন-সুধা। তুমি আমার জীবনের সব। ইতি—

তোমার সারা

পুপুদিদিকে লেখা দাদামশায়ের চিঠি

বিশ্বভারতী কর্তৃক সংকলিত চিঠিপত্র (৪র্থ খণ্ড) থেকে সংগৃহীত।

পুপুদিদি ঁ শান্তিনিকেতন

তুমি ভয় করেছ তোমার হাঁসগুলো আমার জানলার কাছে চেঁচামেচি ক'রে আমার লেখাপড়ার ব্যাঘাত করে। এমন সন্দেহ কোরো না। তুমি ছড়ি হাতে ওদের যে রকম সাবধানে মানুষ করেছ অভদ্রতা করা ওদের পক্ষে অসম্ভব। ওরা আমাকে যথোচিত সম্মান করে যথেষ্ট দূরে থাকে। তা ছাড়া তোমার গাঙ্গুলি মশায়ের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ওদের কর্ম্ম নয়। তোমার স্নেহদা পিসি পূর্ণিমা পিসি প্রায় তোমার হাঁসদের মতই ভদ্র,—মাঝে মাঝে দেখা দেয়, কথাবার্ত্তা কয় না। হাঁসদের চেয়ে এক হিসেবে ভালো—প্রায় কিছু না কিছু মিষ্টি তৈরী করে। খুব চেষ্টা করি খেতে, সব সময়ে পেরে উঠি নে। সেদিন একটা লাড্ডু বানিয়েছিল, ভেবেছিলুম অ্যাবিসিনিয়ার পাঠিয়ে দেব কামানের গোলা করবার জন্যে। কিন্তু সুধাকান্ত বাহাদুরী করে সেটা খেলে, প্রায় তার চোখ বেরিয়ে গিয়েছিল। একটু থিয়েটার মশান দিলে আমিও সাহস করে মুখে দিতে পারতুম—কিন্তু ও বৌমার খরচ বাঁচাচ্ছে—তিনি ফিরে এসে দেখবেন ভাঁড়ারে তাঁর থিয়েটার কিছু লোকসান হয়নি। তোমার বাবা ব্যস্ত আছেন প্রতিদিন পিকনিক করতে এবং মাছ ধরতে গিয়ে মাছ না ধরতে। আমি রোজই পিকনিক করি আমার খাবার ঘরটাতে—আর কাউকে যোগ দিতে ডাকি এমন আয়োজন নেই। ইতি ২৫।১০।৩৫

দাদা মশায়

এক

জিওগ্রাফির বইয়ের পাতা উল্টাতেই চোখে পড়ল ভাঁজ-করা এক টুকরো নীল কাগজ, যার শিরোনামায় লীলার নাম। সারা শরীর জ্বলে গেল, কান দু'টো গরম হয়ে উঠল লীলার। অনুপমের চিঠি, সন্দেহ নেই। এই নিয়ে বুঝি তিনবার হল। লোকটার স্পর্ধাও তো কম নয়!

আড়-চোখে লীলা একবার তাকিয়ে দেখল, রুবি দেখেছে কি না। রুবি তখন ভূগোলের অঙ্কের জটিলতায় নিমগ্ন। গ্রীণউইচ শূন্য আর কলকাতা প্রায় নব্বই। গ্রীণউইচে যখন সকাল সাতটা, কলকাতায় তখন ক'টা লীলাদি?

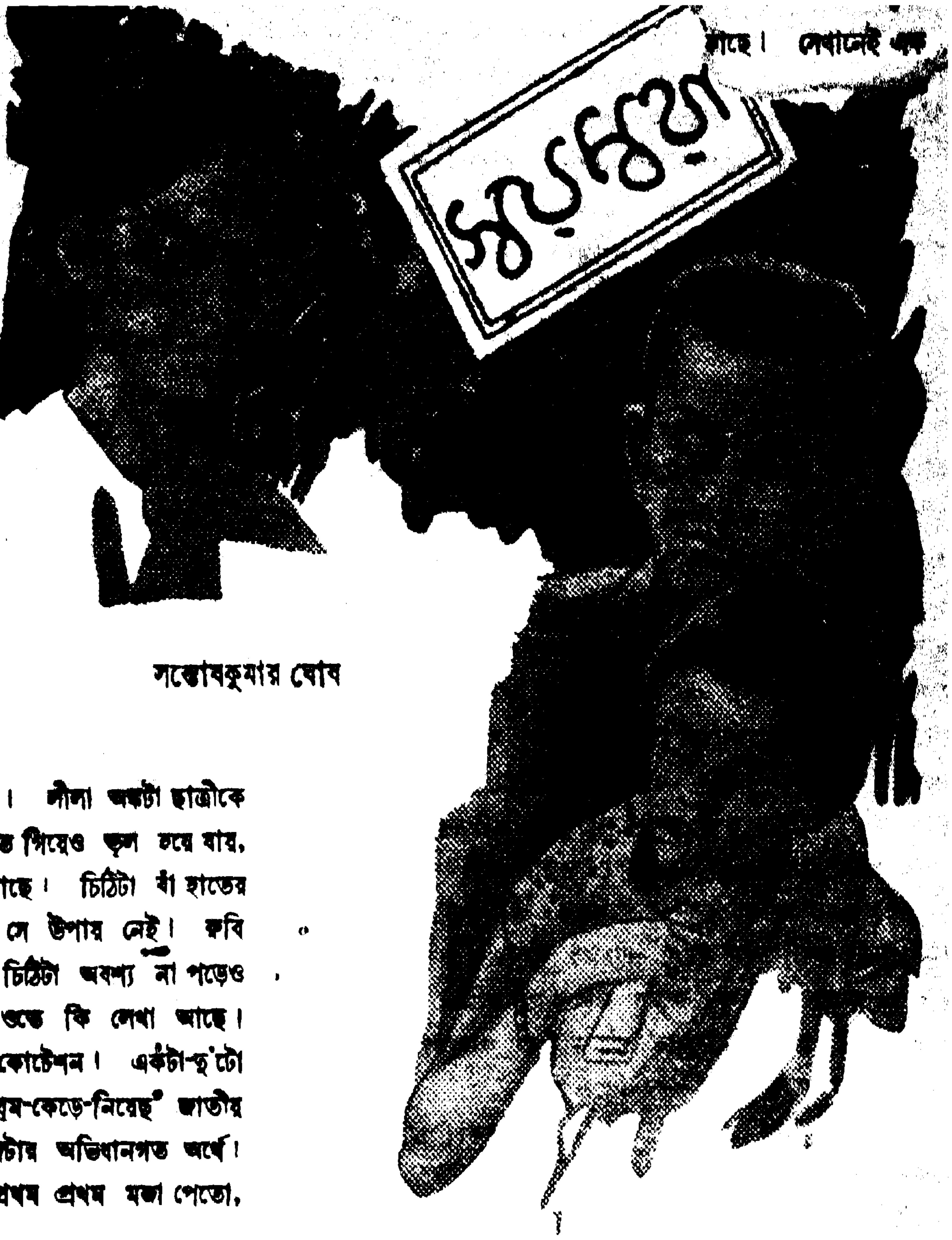

স্বয়ম্বরা

সন্তোষকুমার ঘোষ

কেন, তুমি বার করতে পারছ না। লীলা অঙ্কটা ছাত্রীকে আরেক বার বুঝিয়ে দিলে। কিন্তু বোঝাতে গিয়েও ভুল হয়ে যায়, একটা অস্বস্তি কাঁটার মতো মনে বিঁধে আছে। চিঠিটা বাঁ হাতের মুঠোতেই রইলো। ব্যাগ খুলে যে রাখবে সে উপায় নেই। রুবি হ্যাবলেবে বোকা চোখে তাকিয়ে আছে। চিঠিটা অবশ্য না পড়েও ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া চলে। লীলা জানে ওতে কি লেখা আছে। দু'-চার ছত্র কবিতা, তাও আবার ভুল কোটেশন। একটা-দু'টো বানান ভুল। আর, "তুমি-আমার-ঘুম-কেড়ে-নিয়েছ" জাতীয় খানিকটা অজ-বিলাপ। অবশ্য অজ শব্দটার অভিধানগত অর্থে। এ সব ন্যাকামি তো লীলা কম দেখল না—প্রথম প্রথম মজা পেতো, এখন শুধু গা জ্বলে।

দরজার বাইরে পর্দার নিচে দিয়ে দু'খানি পা তখন থেকে ঘুর-ঘুর করছে। খুক-খুক কাশি—ঠিক অপ্রয়োজনীয় নয়—শোনা যাচ্ছে। লোকটা কি ভীরু। মেরুদণ্ড বলে কিছু ওর নেই না কি! সাহস থাকে তো আসুক না। এসে বসুক। এটা তো ওর দিদির বাড়ী। ভাগ্নীকে পড়ানোয় লীলা ফাঁকি দিচ্ছে কি না সেটা লক্ষ্য করবার অধিকার তো ওর আছেই।

আর যেমন চরিত্র তেমনি চেহারা। রোগা টিঙ্‌টিঙ্‌ করছে, ঠেলা দিলে বুঝি পড়ে যাবে। নির্ঘাৎ ডিসপেপসিয়ায় ভুগছে। নিষ্প্রভ চোখ দু'টির নির্বুদ্ধিতা উঁচু পাওয়ারের লেন্‌স্‌ দিয়েও ঢাকতে পারেনি। কথা বলতে এলেই কুঁজো হয়ে যায়, যেন কুর্নিশ করছে; কপালের শিরটা মাঝে-মাঝে চেপে ধরে, যেন স্বাস্থ্যহীনতাই বাহাদুরি। এই মূঢ়কে কে বোঝাবে দুর্বলতার অভিনয় করে বড়ো জোর অনুকম্পার উদ্রেক করা চলে, কিন্তু ভালোবাসা কেড়ে নিতে হলে চাই সাহস আর বলিষ্ঠতা,—শরীরের এবং চরিত্রের। আধো-আধো বুলি শুনলে মনে একমাত্র মাতৃভাব আসে, তার বেশী কিছু না।

পড়ানো শেষ হল। খাতাটা গুছিয়ে লীলা উঠে দাঁড়ালো। নীচু হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলে শাড়ীর কুঁচিটা ঠিক আছে কি না। তার পর বারান্দায় বেরিয়ে এলো। এদিক-ওদিক এক[illegible]

তাকালো কৌতূহল বশেই; তার পর সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। শেষ ধাপ অবধি পৌঁছেছে, এমন সময় পেছনে খুক-খুক কাশির শব্দ শোনা গেল।

ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে যাচ্ছিল, এবার মিহি—মার্জিত গলা কানে এলো, 'শুনছেন।'

ঘুরে দাঁড়ালো লীলা।—'কি বলুন।'

বেশী দূর নামতে সাহস করেনি অনুপম, গোটা-পাঁচেক ধাপ ওপরে, সিঁড়িটা যেখানে বেঁকেছে, সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কী রোগা আর হ'লদে! এক ফোঁটা মাংস নেই, এক ফোঁটা নেই রক্ত। একটু কাঁপছেও বুঝি নার্ভাস হয়ে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

—'আমার ইয়ে, আমার চিঠিটা পেয়েছেন?'

—'পেয়েছি।' লীলা হেসে ফেলল রকম-সকম দেখে, মাষ্টারনী মুখোসটা আর বজায় রাখা সম্ভব হল না।—'কিন্তু জিওগ্রাফির বই তো ডাকবাক্স নয়।'

প্রশ্রয় পাওয়া জীব-বিশেষের মতো অনুপম কোঁচা দোলাতে দোলাতে নেমে এলো আরো তিন-চার ধাপ। মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে মিঠি-মিঠি হেসে বললে, 'সব ডাকই কি ডাকবাক্সের মারফৎ পৌঁছয়, না পাঠানো চলে?'

[illegible]

শু সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানান...ঠি দেবার সাহস নেই ?'—বলবে ভেবেছিল। কিন্তু কথাটাকে একটু কোমল করে বললে, 'হাতে দিতে পারেন না ?'

অনুপম হয়ত ভাবলে, এ-ও প্রশ্রয়। লীলা ওকে অভয়ে উৎসাহ দিচ্ছে। যে দু'ধাপ বাকী ছিল, সে দু'ধাপও নেমে এলো। চকচকে গাল দু'টো। একটু আগেই কামিয়েছে বুঝি। বেফিসেবি স্নো মেখেছে। নির্মূল-শ্মশ্রু চোয়াল আরো তোবড়ানো মনে হচ্ছে। লীলাকে ছুঁতে সাহস করলে না অনুপম, ধরা-ধরা গলায় শুধু বললে, 'অভয় দিচ্ছেন ?'

লীলা ধমক দিলে, 'সোজা হয়ে দাঁড়ান অনুপম বাবু। আপনার আগের চিঠি দু'টোও পেয়েছিলাম। কিন্তু তা নিয়ে কোন হৈ-চৈ করিনি এই জন্ত যে তা হলে এই ট্যুইশনিটা ছাড়তে হত। আজো করতাম না। কিন্তু আপনি ডাকাডাকি করেই সমস্ত অনর্থ ঘটালেন। গোটা কতক শক্ত কথা বলছি, মনে কিছু করবেন না। আপনার গোড়াতেই ভুল হয়ে গেছে অনুপম বাবু !'—একটু থেমে, শান্ত, ঠাণ্ডা-গলায় লীলা ফের বলতে শুরু করল, 'আপনি দিদির বাসায় পরম সুখে আছেন, খেয়ে, গড়িয়ে, সন্ধ্যায় বাঁশী বাজিয়েও হাতে বাড়তি যে সময়টুকু থাকে সেটুকু প্রেম করে কাটাতে চান। ভুলে যান যে আমার কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গরীবের মেয়ে, কোন রকমে পাশ করেছি, দুপুরে ইস্কুলে চাকরি করি। এর ওপরেও যদি রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বাড়ী-বাড়ী পড়াতে যাই, সেটা প্রেম করতে নয়, প্রেমের কথা শুনতে নয়। সংসারে উপরি ক'টা টাকা আনবার জন্তে। আমার ওপর কত জনের ভার আছে জানেন ? মা, বাবা, ছোট তিন বোন,—নাবালক দু' ভাই। আমাকে ভালবাসেন বলছেন। পারবেন এদের ভার নিতে ?'

অনুপমের গলা ক্ষীণতর হয়ে এলো, 'একটা চাকরির কথা চলেছে, সেটা ঠিক হলেই—'

চিঠিখানা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে লীলা বললে, 'আগে ঠিক হোক, তার পর এ-সব দেবেন। আরো একটা কথা আপনাকে বলি। এ-সব চিঠি-ফিঠি দেবেন না। কিছু বলার থাকে সোজাসুজি এসে বলবার সাহস অর্জন করুন। এই সব আশে-পাশে ঘুর-ঘুর করা, শুনিয়ে-শুনিয়ে গুন্-গুন্ করে গান গাওয়া, ন্যাকামি-ভর্তি কবিতা কোট্ করে চিঠি পাঠানো, এ-সব ছাড়ুন। এতে মেয়েদের মন পাওয়া যায় না। পড়েননি, বলহীনের পক্ষে কিছুই লভ্য নয় ?'

অনুপমের বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে লীলা বুঝি ঈষৎ করুণা বোধ করল। কিন্তু প্রয়োজন ছিল এই অপ্রিয় সত্য-ভাষণের। দুঃখ যদি পায় পা'ক্। একটা দুঃখের ভেতর দিয়েও শিক্ষা হোক। এমন ভুল যেন আর না করে, পুরুষ না হয়েও স্ত্রীলোকের প্রণয়-প্রার্থনার তো ভুল।

রাস্তায় এসে লীলা দেখল এরি মধ্যে বেশ বেলা হয়েছে। যখন পড়াতে এসেছিল তখন সকালের ভোর-রোদ পা টিপে-টিপে পাশের উঁচু বাড়ীটার ছাদ থেকে এ বাড়ীর ছাদে সবে লাফিয়ে পড়েছে !' তার পর এতক্ষণ ধরে কেবল গড়িয়ে নেমেছে, আর ছড়িয়ে পড়েছে। জানালার পর্দায়, কম্পাউণ্ডের করবী আর কৃষ্ণচূড়ার পাতায়, শিশির-ভেজা ঘাসের শীষে-শীষে। কব্জির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে... সময় দেখল, সাড়ে আটটা। ইস্কুলের সময় প্রায়

বাসায় ফিরে যখন পোষাকি জামা-কাপড় বদলাবার উপক্রম করছিল, মা বললেন, 'বাইরের ঘরে তোর জন্তে কে বসে আছে।'

আমার জন্তে ? লীলা বিস্মিত হল। কে আবার এসেছে এত সকালে ! অন্ততঃ অনুপমই আবার আসেনি তো ! কিন্তু এত শীগ্‌গির পৌঁছবেই বা কি করে ? তেল মাখবে বলে খোঁপাটা খুলে ফেলেছিল, আবার আলগা করে চুলগুলো গ্রন্থিবদ্ধ করতে হল। কতকটা অন্তমনস্ক ভাবেই চিরুণী বুলিয়ে নিলে কপাল আর কানের কাছে।

বাইরের ঘরে এসে যাকে দেখল, তাতে মনে হ'ল এত সবের প্রয়োজন ছিল না। নিতান্তই এক জন ক্যানভাসার। এর আগেও দু' এক বার এসেছে লীলার কাছে। নিব্, কলম, পেন্সিল, চক, ব্লটিং আর কাগজের ব্যবসা করে লোকটা। তা ছাড়া ওর বুঝি নিজেরি কি একটা কালি আছে। লীলাদের ইস্কুলের কন্ট্রাক্টটা নেবে বলে ওকে এসে ধরেছে। লীলারই এক সহপাঠিনীর কি রকম আত্মীয় হয় বুঝি। প্রথম দিন তার কাছ থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছিল।

ডান হাতের কনুইটা টেবিলের ওপর, বাঁ হাতটা নীচে ঝুলানো, লোকটাকে কুণ্ঠিত, জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকতে দেখে লীলার মায়া হল।

'নমস্কার।' লীলাকে ঢুকতে দেখে লোকটা উঠে দাঁড়ালো।

'নমস্কার।' গম্ভীর কণ্ঠে বললে মাষ্টারণী-মানান গলায়, যেন চিনতে পারেনি এমন ভাব করলে।

'আমি মিত্র অর্ডার সাপ্লায়ার্সকে রিপ্রেজেন্ট করছি। স্মরজিৎ মিত্র।' ব্যাগ খুলে কার্ড বার করে দিলে লীলাকে। 'এর আগেও তো আমি এসেছি !'

কথা বলছে না তো খই ভাজছে, এই ক্যানভাসার জাতীয় লোকগুলো এমন চালিয়াৎ হয় ! করিস তো বাবা পেন্সিল-কাঁচি-ছুরি ফিরি, অথচ পোষাকের পারিপাট্য দেখলে মনে হবে একটা প্রিন্স কিম্বা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ম্যাগ্‌নেট হবে বুঝি। টুপি-ট্রাউজার-সার্ট-কোট-কলারের ষোড়শোপচার আয়োজন আছে ঠিক।

লীলার অনুমতি নিয়ে লোকটা সিগারেট ধরালে একটা ; আগুনটা ধরালে এক আশ্চর্য কৌশলে, শুধু মাত্র ডান হাতে। এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'নাউ টু বিজনেস। আমি ফেয়ার ফিল্ড চাই, ফেভার নয়। আমাদের ক্লেশমারিজাগুলোর স্যাম্পল আপনার কাছে দিয়ে যাই, বাজারের আর পাঁচটা জিনিষের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। জানেন মিস্ সোম, আমি ডিজঅনেষ্টি বিশ্বাস করি না। এই যে ফার্মটা গড়ে তুলেছি,—মিত্র অর্ডার সাপ্লায়ার্স—এটা আমারি এন্টারপ্রাইজে তৈরী। ক্যাপিটাল সামান্ত যা-কিছু তাও আমার।'

একবার কইতে শুরু করলে থামতে চায় না ! গলার স্বরও কি আশ্চর্য ভারি লোকটার, অল্প-অল্প ঠাণ্ডা লাগলে যেমন হয়। কথা বলতে বলতে টেবিলে একটা চাপড় মেরেছিল, আস্তেই অবশ্য, তবু টেবিলটা যেন এখনো থর-থর করে কাঁপছে। কি মোটা-মোটা আঙুল, বাহুমূল, কব্জি আর কনুইয়ের বেড়-এ বোধ হয় কোন তফাৎ নেই।

বেলা হয়ে যাচ্ছিল। লীলা বললে, 'আবার বাসায় এসে তো

ঘাবিধে হবে না, এ-সব ব্যাপার হেড্ মিস্ট্রেসের হাতে। ইস্কুলে আসবেন, ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।'

—'আশা দিচ্ছেন ?'

—'চেষ্টা করে দেখতে পারি।' লীলা সংক্ষেপে বললে।

স্মরজিৎ মিত্র উঠে দাঁড়ালো। কড়কড়ে ইস্ত্রি, পুরো-হাতা সার্ট ; বাঁ হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছে ট্রাউজারের পকেটে। চকচকে নতুন পয়সার মতো তামাটে মুখ। স্বাস্থ্যের এতটা উজ্জ্বলতা না থাকলে কালোই বলা যেতো।

—'এক দিন তবে আপনার স্কুলে যাচ্ছি।' শেষ বারের মতো মাথাটা ঝঁকিয়ে স্মরজিৎ চলে গেল। চৌকাঠ পেরিয়ে রাস্তায় নামলো। তার পর ফিরে একবার বাড়ীটাকে দেখে নিয়ে আবার সোজা এগিয়ে গেল। লোকটা পা ফেলছে জোরে জোরে, দূরে দূরে। ওর চলায়-ফেরায়-কথায়, এমন কি উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, সিগারেট ধরানোয়, কোথায় একটা অস্বাভাবিকতা আছে, চোখে সেটা বেঁধে, কিন্তু বোঝা যায় না, কেন ?

পরদিন সকালে যখন ছাত্রী পড়াতে গেল, তখন লীলা ঈষৎ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। কালকের সকালের বিশ্রী ঘটনাটা ভুলতে পারেনি। অনুপম আজ আর চিঠি দিতে সাহস করবে না ঠিক, কিন্তু কে জানে হয়ত ওর দিদিকে কিছু বলে থাকবে। ও-সব প্যানপেনে ছেলেদের অসাধ্য কিছু নেই। নিজের কীর্তি-কাহিনী চেপে গিয়ে হয়ত দিদিকে বলেছে, মাষ্টারণীটা ওকে অবোধ মেষশিশু পেয়ে ঘাড় মটকানোর মতলবে ছিল ইত্যাদি। ছাত্রীর মাও কি ভাইয়ের কথা অবিশ্বাস করতে পারবেন, লীলাকে ছাড়িয়ে দেবেন। নতুন টীচার আসবে রুবির জন্যে। আবার দিন কতক তাকেও চিঠি লেখালিখি করবে অনুপম (পুরনো চিঠিগুলোর নকল রেখে দিয়ে থাকে যদি, তা হলে তো কোন মেহনতই নেই), তার পর ? হয়তো বা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। কিম্বা নতুন টীচারটা পটেও যেতে পারে বা। সিঁড়ির মুখেই দেখা হল অনুপমের সঙ্গে। মুখোমুখি পড়ে গিয়ে বুকটা একবার কেঁপে গেল লীলার, আজ আবার কি হয়, কে জানে। কিন্তু অনুপম ওকে দেখে গম্ভীর মুখে এক পাশে সরে দাঁড়ালো, কোন কথা বললে না। লীলা খানিকটা স্বস্তি পেল।

এর পরে রুবিও যখন রোজকার মতো খাতা-পেনসিল নিয়ে ঘরে ঢুকলো, এমন কি রুবির মাও একবার ঘরে এসে স্মিত মুখে কুশল প্রশ্ন করে গেলেন, তখন আর সংশয়মাত্র রইলো না যে অনুপম কিছু বলেনি।

এর পরে আরো দু'-তিন দিন অনুপমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আরো যেন হ'লদে হয়ে গেছে অনুপম, এ ক'দিনে চোয়াল যেন আরো চুপসে গেছে। ভেবেছিল, অনুপম ওকে কিছু বলবে ; কিন্তু লক্ষ্য করল, ওকে দেখলেই অনুপম গম্ভীর মুখে সরে যায়, স্পষ্ট বোঝা যায়, এড়াতে চায়।

ক'দিন পরে অনুপমকে আর দেখতেই পেল না। এক দিন, দু'দিন, তিন দিন কেটে গেল। শেষে লীলাই এক দিন কৌতূহলী হয়ে ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মামাকে যে দেখছি নে ?'

রুবি বললে, 'ও মা, জানেন না বুঝি। মামা এখান থেকে চলে গেছে।'

—'চলে গেছে ? কোথায় ?'

—'কানপুরে। আমার এক মাসিমার কাছে। সেখানেই এক ফ্যাক্টরিতে কাজ পেয়েছে, শুনেছি।'

লীলা বললে, 'ও।'

জানালার বাইরে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্কও হয়ে গেল। নিছক চাকরির জন্যেই লোকটা কানপুর গেছে এ কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না। আঘাতটা ভুলতেই গেছে। কেবল মাত্র তার জন্যেই একটা লোক দেশান্তরী হয়েছে, এ কথা ভেবে লীলার মনটা যেন খারাপ হয়ে গেল।

দুই

বিজনেস করছে অথচ লোকটার সামান্য কাণ্ডজ্ঞানও নেই। এসেছে যখন শেষ ঘণ্টাটিও বেজে গেছে। চক-মাখা হাত ধুয়ে লীলা ছাতা আর বই হাতে নিয়ে তৈরি হয়েছে বাড়ী যাবে বলে, এমন সময় বেয়ারা নিয়ে এলো ভিজিটিং কার্ড। এ কার্ড লীলার ব্যাগের মধ্যে আরো খান-দুই আছে। 'মিত্র অর্ডার সাপ্লায়ার্স, রিপ্রেজেন্টেড বাই এস, মিত্র।' পরিষ্কার স্বাক্ষর করেছে : এস-আই-টি-আর-এ। ইঙ্গবঙ্গীয় মিটার হয়নি, এই ঢের।

নীচে নেমে এসে লীলা ধমকের সুরে বললে, 'আচ্ছা, এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি ব্যবসা করবেন ? আপনাকে কি এখন আসতে বলেছি ? চারটে বেজে গেছে, হেড মিস্ট্রেস চলে গেছেন কখন—'

'তাতে কি হয়েছে ?' ঈষৎ স্মিত, কতকটা অপ্রতিভ মুখে স্মরজিৎ উঠে দাঁড়ালো। 'আরেক দিন না হয় আসবো।'

পাশাপাশি গেট অবধি এলো ওরা। লীলা বললে, 'বিবেচনার অভাবে আজ আপনার শুধু পরিশ্রমই সার হল।'

'শুধু পরিশ্রমই নয়।' স্মরজিৎ একটু হেসে বললে, 'পারিশ্রমিকও তো কিছু পেলাম মনে হচ্ছে।'

লীলা সামান্য চমকে উঠলো। সহজ, স্বাভাবিক গলায় একেবারে সোজাসুজি কথা বলছে লোকটা। বাঁকা গলি-ঘুঁজি চেনে না। ট্রাউজারের পকেটে বাঁ হাত রেখে পাশাপাশি একেবারে সটান হেঁটে যাচ্ছে। কোথাও কুণ্ঠা নেই। সেদিনও মনে হয়েছিল, আজো মনে হল, লোকটার সপ্রতিভতা আছে, কিন্তু সেটা যেন অতিপ্রকট।

'আপনি কোন্ দিকে যাবেন ?' জিজ্ঞাসা করলে স্মরজিৎ।

—'বাসায়। আপনি ?'

—'ঠিক নেই।'

লীলা বললে, 'আচ্ছা, তা হলে চলি।'

—'চলবেন ?' লোকটা এক মুহূর্ত যেন একটু ইতস্তত করল, তার পর বললে, 'চলুন তবে। আমিও এদিকেই যাবো।'

কিছু বলাও যায় না। রাস্তা তার একার নয়। তবু পাশাপাশি হেঁটে যেতে লীলা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিল। ট্রামে-বাসেও এ সময় বড়ো ভীড়। একটা রিক্সা দেখে লীলা এক মুহূর্ত দাঁড়ালো। কিন্তু স্মরজিৎও দাঁড়িয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

—'রিক্সা করবেন ? উঠুন না। অনেকখানি তো পথ।'

—'না, না।' কুণ্ঠিত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো লীলা, প্রায় চীৎকারের মতো শোনালো, এক রিক্সায় ওঠার চেয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া ভালো।

খানিকটা গিয়ে স্মরজিৎ প্রস্তাব করল, 'একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক, কি বলেন? সেই কখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন।'

একবার রিক্সায় ওঠার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, চা খেতে অস্বীকার করবার শক্তি লীলার ছিল না। এই লোকটার না-বুঝ আবদারের মধ্যেও কোথায় যেন একটা দুর্নিবার দাবী আছে, প্রশ্রয় না দিয়ে উপায় নেই। নিজে যেচে এসে আলাপ করেছে, পাশাপাশি চলেছে, একে ফেরাতে হলেও কিছু দিয়ে তবে ফেরাতে হয়।

চা খেতে-খেতে স্মরজিৎ ওর জীবনের কাহিনী শোনালে। চমকপ্রদ কিছু নয়। প্রায় সবটাই মামুলি। লেখা-পড়া বেশী দূর হয়নি। মা-বাবাকে ছোট বেলাই হারিয়েছে। মামা-বাড়ী থেকে কোন রকমে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। আর বেশি দূর পড়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবু কলকাতা পালিয়ে এসেছিল, এক বস্ত্রে, দু'আনা সম্বল করে। পড়া-শুনার সুবিধে কিছু করতে পারেনি। কিন্তু ভাগ্যক্রমে চাকরি পেয়েছিল। আর সে কত রকমের চাকরি। মুদি-দোকানে,—শুধু খোরাকি আর দু'টাকা পেতো। সেই থেকে এক দপ্তরীখানায়, দপ্তরীখানা থেকে বইয়ের দোকানে। বইয়ের দোকান থেকে—'

লীলার মুখের দিকে চেয়ে স্মরজিৎ বললে, 'থাক, এত কথা শোনবার আপনার ধৈর্য থাকবে না।' পকেট থেকে সিগারেট বার করে ফস্ করে ধরালো, এবং লীলা লক্ষ্য করল, সেই আশ্চর্য উপায়ে, ডান হাতে।

স্মরজিৎ ফের বলতে শুরু করলে, 'এটুকু শুধু জেনে রাখুন, দিন কতক এক রেলওয়ে লেভেল ক্রশিংয়ের গুমটি-ঘরেও কাজ করেছি—সেখানেই বাঁ হাতটা কাটা যায়।'

—'কাটা যায়?' সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল লীলা।

—'কাটা যায়।' কথাটার পুনরুক্তি করল স্মরজিৎ। 'দেখছেন না, আমার বাঁ হাত নেই।' প্যান্টের পকেট থেকে হাতটা বার করে, সার্টের আস্তিন গুটিয়ে টেবিলের ওপর রাখল স্মরজিৎ। কনুই থেকে কব্জি অবধি একখানা কাঠ শুধু, তার পর ইস্পাতের পাঁচটা আঙুল তীক্ষ্ণভাবে এগিয়ে এসে দৃষ্টি বিদ্ধ করছে।

লীলা শিউরে উঠল একবার, এবং সেটা স্মরজিতের কাছে গোপন রইলো না।

—'ভয় পেলেন?' আস্তিনটা আবার টেনে দিয়ে হাতটা পকেটে পুরে দিয়ে স্মরজিৎ জিজ্ঞাসা করলে।

লীলা অপ্রতিভ ভাবে বললে, 'না। তার পরে বলুন।'

এতক্ষণে বুঝি বোঝা যাচ্ছে লোকটাকে। ওর একটা অঙ্গ নেই, সেইটে ঢাকতেই এতটা স্মার্টনেসের অভিনয় করতে হয়, চটপটে ভাব দেখাতে হয়। এমন যে স্বাস্থ্য, সার্টের নিচে স্ফুরিত পেশীর ইঙ্গিত, সব কেমন মেকি মনে হল লীলার। ওর চোখ দু'টির তীব্র ঔজ্জ্বল্যের নিচেও একটা দৈন্য লুকানো আছে, যা দুঃখও করে, করুণাও আনে।

রাস্তায় নেমে স্মরজিৎ বললে, 'এখনো আমার সংগ্রাম শেষ হয়নি। এখনো ভালো করে দাঁড়াতেই পারছি না। বাজার খারাপ। আমার স্টক কম, খুচরো কারবার, আমার কোটেশনও একটু চড়াই হয়, বড়ো-বড়ো ব্যবসাদারদের মতো কম মার্জিনে তো ছাড়তে পারি না। আর আমাদের দেশে দেশপ্রীতি সব মুখে-মুখে, বিলিতি জিনিষ পেলে কেউ দিশী জিনিষ ছোঁয় না। তবে হাল ছাড়িনি। দমদমের ওদিকে ছোট একটা বাসা নিয়ে আছি। কালিটা আমার নিজের। তা ছাড়া ছোট-খাটো দু'-একটা টয়লেটের উপচারের ফরমূলা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছি। এ থেকে বড়ো একটা পারফিউমারি আমি গড়ে তুলবোই। আপনারাও রইলেন, দেখবেন একটু-আধটু।'

লীলা প্রতিশ্রুতি দিলে দেখবে।

বাসার কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। স্মরজিৎ বললে, 'চলি তাহ'লে, নমস্কার। শীগ্‌গিরি এক দিন আপনার ইস্কুলে যাবো।'

—'নমস্কার,' বললে লীলা। কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো পেছন ফিরে। সেই উদ্ধত চলবার ভঙ্গি। পকেটে একটা হাত ঢোকানো কিন্তু সে রকম বিসদৃশ বোধ হল না। একটা হাত নিয়ে অদৃষ্টের সঙ্গে যুঝছে লোকটা, ভাবতেও ভালো লাগলো। আঘা[ত] আছে, কিন্তু পরাজয় নেই। ভিক্ষা নেই, তবু প্রাপ্য আদায়ে[র] প্রতিশ্রুতি আছে। আবার দীর্ঘ পদক্ষেপে শুধু দৃঢ়তাই নে[ই] একটু কাঁপা-কাঁপা অসহায়তাও আছে যেন। হয় লোকটা[কে] ভালো লাগবে না, ওর আলাপচারিতাকে যেচে এসে ভাব কর[বার] মতো মনে হবে, নয় ত ওর সবটুকু ভালো লাগবে,—চলা-ফে[রা] আলাপ, এমন কি প্যান্টের পকেটে লুকানো হাত নিয়ে অ[ং]যে মানুষ, তাকে।

হেড মিস্ট্রেসকে আগেই বলে রেখেছিল, স্মরজিৎ নি[জে] এর পর এক দিন এসে আলাপ করে গেল। কিছু-কিছু জিনিষ হেড মিস্ট্রেস সেদিনই নিলেন, প্রায় কুড়ি টাকার মতো। এ ছাড়া মাসে প্রায় টাকা পঞ্চাশের মতো জিনিষ নিতে পারবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। সামনেই টার্মিন্যাল পরীক্ষা। সে জন্যে খাতার কাগজও চাই।

সেদিন খুব খুশি-খুশি দেখালো স্মরজিতকে। রাস্তায় এসে লীলাকে বললে, 'আমার সত্যি খুব উপকার করেছেন।'

কুণ্ঠিত হয়ে লীলা বললে, 'এ আর কি। এতে আপনার এমন কতোই বা থাকবে।'

স্মরজিৎ বললে, 'দশ পার্সেন্টের ওপর; তা ছাড়া কালিটা আমার, ওটাতে তো ফিফ্‌টি পারসেন্ট। অবশ্য টাকার অঙ্কই শুধু নয়—'

আবার উচ্ছ্বাসের মুখে কি বলে বসে ঠিক নেই, লীলা তাড়াতাড়ি বললে, 'আর বেশী দূর যাবো না, টিফিনের পর আমার আবার ক্লাশ আছে।'

—'এই পার্কটায় তবে একটু বসি চলুন।'

দুপুরের দিকে পার্কটা এমনিই নির্জন। এক কোণে কতগুলো লোক তাস খেলছে। চিনেবাদামওয়ালা ঝিমুচ্ছে এক কোণে, চাকরির জন্যে হাঁটাহাঁটি করে হয়রান দু'-চার জন ছায়ার নিচে বেঞ্চের ওপর ঘুমিয়ে। যত্ন করে লাগানো সৌখিন ফ্লাওয়ারগুলোও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে, যে রোদ সকালে ওদের ফুটিয়েছিল, সেই এখন সব রস টেনে শুকিয়ে দিতে চাইছে।

ঘাসের ওপর বসল দু'জনে। খানিকক্ষণ কোন কথা হল না। স্মরজিৎ একটু পরে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা বাক্স বার ক[রে] বললে, 'হাত পাতুন।'

কঠিন হয়ে উঠছিল লীলার মুখ। বললে, 'এ আবার কি ?'

—'খুলেই দেখুন না।'

স্পর্ধার সীমা নেই। কী উপহার এনেছে দেখ। ছোট্ট শিশিতে এসেন্স, একটা কৌটোয় স্নো কিম্বা ক্রীম হবে বুঝি। যেমন রুচি, তেমনি সাহস।

—'কিনে এনেছেন তো ?'

স্মরজিৎ বললে, 'কিনে আনিনি। আমার নিজের হাতে তৈরি; সে দিন আপনাকে বলেছিলুম না ফরমূলার কথা ? তাই থেকে এই হয়েছে। প্রথম তৈরি জিনিষ আপনাকেই দিলাম দু'টো। কিছু অন্যায় হয়েছে ?'

'অন্যায় ?' খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে লীলার মুখ।—'আপনি নিজের হাতে তৈরি করেছেন, সত্যি ?' কৌটো খুলে নাকের কাছে এনে প্রাণ ভরে টেনে নিলে গন্ধ।—'তবে এবার আপনার ফার্ম পুরোদস্তুর পারফিউমারি হয়ে গেল।'

—'হলই তো।' উৎসাহ পেয়ে স্মরজিতেরও মুখ খুলে গেল, 'অবিশ্যি বাজারে চালাতে এখনো কিছু বেগ পেতে হবে, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির খরচাও কম নয়। আপনি অবিশ্যি আপনার চেনা-শোনা, মেয়ে-মহলে বলে দিতে পারবেন—'

—'পারবোই তো।' বললে লীলা।

—'আমার আরো ইচ্ছে আছে', স্মরজিৎ বলে গেল, 'একটা সুগন্ধি তেলের ফরমূলাও পেয়েছি। এ ছাড়া পাউডার, আলতা, এমন কি সাবান পর্যন্ত···আমার স্বপ্নের কূল-কিনারা নেই, লীলা দেবি।'

তার পর লীলার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'যাবেন এক দিন আমার বাসায়, নিজে চোখে দেখে আসতে পারতেন সব; আমার ল্যাবরেটরি। সামান্যই আয়োজন, কিন্তু একটা বৃহৎ পরিণতির সূচনা দেখতে পেতেন।'

—'আপনার বাসায় ?' বিস্মিত, ভীরু-ভীরু গলায় লীলা জিজ্ঞাসা করল,—'আর কে আছেন ?'—প্রশ্নটা নিজের কানেই অর্থহীন, অতি-সাবধানী, বোকা-বোকা শোনালো।

—'আমার এক পিসীমা আছেন।' বললে স্মরজিৎ। তার পর লীলার মুখের দিকে চেয়ে ওর প্রশ্নটার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললে,—'ভয় নেই, স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত বাড়ীতে আপনাকে নিয়ে যাবার নিমন্ত্রণ করব, এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন এখনও হইনি।'

লজ্জিত মুখে লীলা বললে. 'সে জন্যে নয়, সে কথা ভেবে বলিনি। আমার আবার রবিবার ছাড়া ছুটি নেই কি না, অন্য দিন সকালে টিউশনি, দুপুরে স্কুল—'

—'বেশ, তবে রবিবারেই যাবেন।' বললে স্মরজিৎ।

লীলা সম্মতি দিল, কিন্তু রবিবার মানে যে একেবারে পরের রবিবার, তখন বুঝতে পারেনি।

খেয়ে উঠে একটু গড়িয়ে নেবে ভেবেছিল, ঠিক এমন সময় স্মরজিৎ এসে হাজির।

—'চলুন।'

—'বাঃ রে, কোথায় ?'

—'মনে নেই ? আজ আমার ওখানে যাবেন কথা দিয়েছিলেন।'

—'দিয়েছিলাম বুঝি ? কি আশ্চর্য দেখুন', লীলা বললে 'একেবারে মনে নেই। যেতেই হবে ?'

জিজ্ঞাসা করে স্মরজিতের মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝল এ প্রশ্ন একেবারে নিরর্থক, যেতে হবেই, এসেছে যখন।

—'একটু বসুন, তৈরী হয়ে নিই।'

তৈরী হতে সেদিন সময় লীলার কিছু বেশীই লাগল। ঘণ্টা-খানেক আগেই স্নান করেছে তবু আরেক বার সাবান দিয়ে মুখ ধুতে হ'ল। পোষাকের বাহুল্য কোন দিনই ছিল না, না ছিল সখ, না সামর্থ্য। আজ মনে হ'ল, বাইরের বেরুবার উপযোগী জামা-কাপড় আর দু'-একটা বেশী থাকলে কিছু ক্ষতি হত না।

শ্যামবাজারে বাস বদল করতে হ'ল। পেরিয়ে গেল বেল-গাছিয়ার পুল, তার পর যশোর রোড। কী মসৃণ পথ! শহরতলীর এদিকটাতে লীলা কখনো আসেনি। কয়েকটা বড়-বড় কারখানা পেরিয়ে এরোড্রাম, তার পর থেকেই গ্রামের ছোপ লাগল। রাস্তার দু'পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিশু, শিরীষ, বট, অশথ। কচিৎ কৃষ্ণচূড়া। ঝাউ আর দেবদারু। অসংস্কৃত মাথা গ্রামীণের মতো পলাশ। লাল আর সবুজ, মাঝখান দিয়ে পথ, গির্জার খিলানের মতো। দু'ধারের মাঠের মাঝে-মাঝে অসম্পূর্ণ ইটের পাঁজা।

—'এসে গেছি। আসুন নামি।'

স্মরজিতের কথায় চমক ভাঙলো।

—'এখানেই ?'

—'আবার কতো দূরে। বারাসত যেতে চান না কি ?'

যশোর রোড থেকে ছোট একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে এসে মাঠের রাস্তা। 'আপনার হয়ত চলতে অসুবিধে হবে', স্মরজিৎ বলল।

—'কিছু মাত্র না। আমার বেশ ভালোই লাগছে।'

কানের পাশ দিয়ে শোঁ-শোঁ হাওয়া। প্রান্তরের একটা নিজস্ব সুর আছে, লীলা ভাবলে। এটা বুঝি নিয়ত প্রবহমান হাওয়ার শব্দ, যা কখনো ফুরোয় না। দূরের গাছগুলোর একটি পাতাও নড়ছে না, তবু কানের কাছে এই গুন্-গুন্ এলো কোথা থেকে।

খানিকটা এগোতেই আবার লোকালয় পড়ল। শহরের সঙ্গে এর বৈসাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। শহরের বাড়ীগুলো একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠেছে, কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে। আর এখানে এক-একটি জায়গায় কতগুলো কুঁড়ে ঘর একসঙ্গে জড়ো-সড়ো হয়ে আছে, একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। গাছের ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার। নিজের পায়ের শব্দে নিজেরই চমক লাগে। আম, জাম, আমলকী, কমরাঙা আর জামরুল। পাতায় পাতায় পাখীর কলস্বর।

—'আমার বাসা। একটু দেখে আসবেন, বাঁশের মাচাটা বড্ড দোলে।'

এতক্ষণ যেন স্বপ্ন দেখছিল, এবার লীলা ফিরে এলো বাস্তবে। খান-তিনেক ছোট-বড়ো ঘর, একটার দাওয়া পাকা, বাকি দু'টোই কাঁচা। জানালা বন্ধ থাকায় ঘরটা যেন স্যাঁতসেঁতে লাগছিল, স্মরজিৎ খুলে দিল। তার পর ডাকল, 'পিসীমা, পিসীমা!'

পিসীমা আসতেই লীলা খানিকটা ইতস্তত করে প্রণামই করল। স্মরজিৎ বললে, 'আপনারা গল্প করুন বসে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।'

পিসীমা বললেন, 'তোমার কথা আমি ওর কাছে অনেক বার শুনেছি। তুমি ওর জন্য অনেক করেছ।'

লীলা কুণ্ঠিত হয়ে প্রতিবাদ জানালে। স্বরজিৎ ফিরে এসে বললে 'আসুন, আমার ল্যাবরেটারি দেখবেন।'

গোটা-কতক কাচের নল, খালি শিশি আর বড়ো বোতলে মিলিয়ে ডজন কয়েক, এরই নাম স্বরজিৎ দিয়েছে ল্যাবরেটরি? মুহূর্তে লীলার সব উৎসাহ যেন নিবে এলো। একে ভিত্তি করে উঠে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দুরাশা ছাড়া আর কি! চেয়ে দেখল, আশা-দীপ্ত চোখে স্বরজিৎ তার দিকেই তাকিয়ে। লজ্জিত হয়ে পড়ল লীলা। বললে, 'বাঃ, বেশ তো!'

আর অমনি খুশি হয়ে উঠলো স্বরজিৎ। 'আপনি এনকারেজ করছেন?' অনর্গল কথা বলে গেল। দু'-একটা প্রিপেয়ারেশনের তাৎপর্যও বুঝিয়ে দিলে সংক্ষেপে। 'আপনার মনে হয় না এর পসিবলিটি প্রচুর। আরো যখন বড়ো হবে, তখন একটা কারখানা করব। সামনের এই জমি আর জলাটা কিনে নেবো।'

ভিজে মাটির গন্ধ আসছে নাকে। শীতের বেলা গড়িয়ে এলো। ঘরখানা অন্ধকার-প্রায়। একটা হাত ঘুরিয়ে স্বরজিৎ বিশদ ব্যাখ্যা করছে, কাটা হাতটা অসতর্ক ভাবে ঝুলছে এখন। আর স্বরজিতের ভবিষ্যতের স্বপ্ন-দেখা চোখ দু'টো চুরুটের আগুনের মতো জ্বলছে।

হঠাৎ কেমন শিউরে উঠলো লীলা। শরীরটা ছম-ছম করে উঠলো। বললে, 'চলুন যাই।'

—'এখুনি যাবেন?' স্বরজিৎ একটু যেন দমে গেল।

—'চলুন তবে।'

পিসীমা ইতিমধ্যে চা তৈরি করেছিল: খেয়ে আর লীলা বসল না।

—'এসো মাঝে-মাঝে।' পিসীমা এগিয়ে দিতে এসেছিলেন, তাঁর কণ্ঠে অনুনয়ের সঙ্গে কাতরতাও ধ্বনিত হ'ল, মনে হ'ল লীলার।

—'আসব,' লীলা বললে। যদিও সে ইতিমধ্যেই স্থির করেছিল, আর কোন দিন আসবে না। পিসীমার কণ্ঠের সঙ্গ-ব্যাকুল কাতরতা থেকে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় স্বরজিৎদের আত্মীয়-বন্ধু বেশি নেই। নির্বান্ধব পুরীতে পিসীমা আছেন একলাই, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। লীলাই হয়ত এ বাড়ীতে প্রথম অতিথি।

তিন

সেদিন বাড়ী ফিরে পোষাক বদলাতে বদলাতে লীলা নিজেকে প্রশ্ন করেছিল, তার এই আকস্মিক আশাভঙ্গের হেতুটা কি। কি দেখবে বলে আশা করে গিয়েছিল, কি দেখতে পায়নি। সন্দেহ নেই, দূর থেকে স্বরজিতের বিচিত্র ব্যক্তিত্ব ওর মনে সামান্য একটু রঙীন অনুভূতি এনে দিয়েছিল, এই লোকটি অদৃষ্টের সঙ্গে এক হাতে পাঞ্জা কষছে,—চিত্রটি সম্ভ্রম এনেছিল মনে, সেই সম্ভ্রম থেকে এসেছে কৌতূহল, যাকে খেয়ালও বলা যায়। কিন্তু কাছে এসে বিকলাঙ্গ জীবনের স্বরূপ দেখে বুঝি স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে। দূর থেকে মনে হয়েছিল, ফিকে রঙীন, কাছে গিয়ে দেখল রক্তের মতো গাঢ় লাল। সভয়ে পিছিয়ে এসেছে, পালিয়ে বেঁচেছে। খসে-খসে পড়া মাটির দেয়াল, স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটি, সমস্ত উঠোন ভরে হাঁস-মুর্গী-পায়রার সদৃচ্ছ বিচরণ। দূর থেকে বাহবা দেওয়া চলে, কাছে এসে অংশীদার

চা ঢালতে ঢালতে পিসীমা গল্প করছিলেন, ওঁকেও বেরুতে হয়, স্বরজিতের তৈরি জিনিষ নিয়ে। 'বুড়ো মানুষ, পেরে উঠি নে। একটুতে হাঁপিয়ে পড়ি। আমার কাছ থেকে কেউ জিনিষ কিনতেও চায় না—' আক্ষেপ করে বলেছিলেন।

শুনতে শুনতে ঠোঁটের কাছে চায়ের বাটি বিষিয়ে উঠেছিল। পিসীমা বুড়ো মানুষ, ক্যানভাসার হিসেবে অযোগ্য, তাই কি স্বরজিৎ তাকে এখানে এনেছে? ওকেও তার বণিক্-বৃত্তির জোয়ালে জুড়ে দিতে চায় না কি এই রকম একটা সন্দেহ এসেছিল মনে।

চলে আসবার আগেও স্বরজিৎ বলেছে, 'এখুনি যাবেন? বাড়ীর পেছনে একটা পোলট্রি করেছি, দেখে যাবেন না?'

—'না।'

—'আর ছোট একটা বাগানও করেছি, এ থেকে পরে হয়ত নার্সারি চলতে পারে একটা। তবে একলা মানুষ', স্বরজিৎ হেসে বলেছিল, 'তাতে আবার একটা মোটে হাত, সব পেরে উঠি নে।'

'তাই বুঝি আমাকে এনেছেন', রূঢ় এই প্রশ্নটা এসেছিল জিহ্বাগ্রে, কিন্তু লীলা নিজেকে সংবরণ করেছে।

মনে-মনে স্থির করলে লীলা, আর কখনো দমদমে যাবে না। কি কাজ স্বরজিতের সঙ্গে এত মাথামাথির, কত দিনেরই বা চেনা! কালি, নিব, পেনসিল বিক্রি করতে এসেছিল, লীলার সাহায্য চেয়েছিল, সে সাহায্য তো লীলা যথাসাধ্য করেছে। এর চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা মারাত্মক হবে। প্রথমত লীলা কাউকে বিয়েই করবে না,—মা-বাবা-ভাই-বোনের এই গোটা সংসারটার বোঝা তার ঘাড়ে।' বিয়ে যদি কখনো করতেই হয়, তবে এমন কাউকে করবে, যে সঙ্গতিপন্ন, অন্ততঃ এই সংসারটার দায়িত্বও নিতে পারবে। স্বরজিৎ নিজেই টলমল করছে—

চিন্তার রাশ টেনে দিলে লীলা। এ সব কথা উঠছে কেন? স্বরজিৎ তো কখনো আভাসও দেয়নি। লীলার কাছে সহানুভূতি পেয়েছিল, হয়ত জীবনের প্রথম সহানুভূতি, তাই উৎসাহ নিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় গিয়েছিল, হয়ত আর কোন কথা স্বরজিৎ নিজেই ভাবেনি। আর এমন পাগলের দুরাশা কি স্বরজিতের হবে?

ঠিক দু'দিন পরে স্কুলে ঢোকবার সময় গেটের সমুখে স্বরজিৎকে পায়চারি করতে দেখে লীলা জ্বলে উঠলো। বাঁ হাতটা পকেটে, ডান হাতে ব্যাগ, ঠোঁটে সিগারেট, কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরছে দেখ। মেয়ে-স্কুলের সামনে, কোন কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে। নিশ্চয়ই কোন অভিসন্ধি আছে।

—'আজ আবার এসেছেন কেন?' সামনে গিয়ে রূঢ় কণ্ঠেই লীলা জিজ্ঞাসা করল,—'আপনাকে তো হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, জিনিষ কিনিয়েও দিয়েছি, আর কী চাই?'

বিস্ময়ে, অপমানে একেবারে শাদা দেখাল স্বরজিতের মুখ। 'আর?' অস্ফুট, নীরস কণ্ঠে বলল, 'আর কিছু চাই না। আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু সেদিনকার পেমেন্টটা এখনো কিছু বাকি আছে—'

আরো কি কি কঠিন কথা বলবে বলে লীলা স্থির করে রেখেছিল কিন্তু পেমেন্টের কথা শুনে যেন একটু চমকে গেল। পেমেন্ট শুধু টাকা চাইতেই লোকটা এসেছে না কি। 'আসুন' বলে স্বরজিৎকে নিয়ে গেল একাউন্টেন্টের কাছে। লিখিয়ে দিল চেক।

চেকটা নিয়ে স্মরজিৎ আর দাঁড়ালো না। শুধু একটা নমস্কার ব্যস্ত করে রাস্তায় গিয়ে নামলো। একটু এগিয়ে ষ্টপেজের ধারে ট্রামের অপেক্ষা করতে লাগল। ট্রাম এলো প্রায় বোঝাই হয়ে। ষ্টপেজে দাঁড়ালো কি দাঁড়ালো না ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল স্মরজিৎ, লীলার মনে হল, পড়ে যাচ্ছিল, হাতল ধরে কোন রকমে সামলে নিলো। আহা, একখানা মোটে হাত!

একটু আগেই অভদ্র ব্যবহার করেছে সে জন্যে মনে-মনে অনুতপ্ত হল লীলা। হয়ত সত্যিই ওর টাকার দরকার, পেমেণ্টের জন্যেই এসেছিল, শুধু পেমেণ্টের জন্যেই!

পরের রবিবার যখন দমদমের বাসে নিজে থেকেই চড়ে বসল, তখন লীলাও কম বিস্মিত হয়নি। নিজেকে বোঝালে, গত সপ্তাহে যে অপমান করেছি তার জন্যে মার্জনা চাইতে যাচ্ছি। এ শুধু 'ভদ্রতাবোধের' তাগিদ। কর্তব্য।

দু-এক বার ভুল করে রাস্তা সে চিনে বার করলও ঠিক। বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে স্মরজিৎ একটা বই পড়ছিল, লীলাকে দেখে ওর মুখে যে উজ্জ্বলতা ফুটে উঠলো সেটুকু গোপন করতে চেষ্টাও করল না। বইখানা মুড়ে রাখল চেয়ারের হাতলে। চেঁচিয়ে ডাকলো, 'পিসীমা, ও পিসীমা, দেখে যাও কে এসেছে।'

স্মিত মুখে পিসীমাও এসে দাঁড়ালেন দরজায়। 'এসো, মা, এসো।'

লীলা লক্ষ্য করল, সে এলেই এরা দু'জনেই কেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। মৃতকল্প আবহাওয়ায় যেন স্পন্দন লাগে। বাইরের থকে কেউ যে এত দূরে কষ্ট করে এসেছে, ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এই জন্যেই বুঝি পিসীমা কৃতজ্ঞ বোধ করেন। নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত লোকের চিত্ত যেমন দিগন্তে শাদা পালের চিহ্নটুকু দেখা গেলেও উদ্বেগ হয়ে ওঠে।

নিজের কাছে নিজেকেই কেমন অপরাধী মনে হতে লাগল লীলার। এরা তো কই জিজ্ঞাসা করল না, কেন এসেছ। কোন কৈফিয়ৎ চাওয়া নেই, অভিযোগ নেই, এসেছে যে এতেই খুশি।

পিসীমা বুঝি কালির বড়িতে ষ্ট্যাম্প দিচ্ছিলেন, অল্প অল্প কালি লেগেছে তাঁর কাপড়ে, ঘাম মুছতে গিয়ে কাপালেও। সেখানে গিয়ে লীলা বসে পড়ল।—'আমিও ষ্ট্যাম্প লাগাবো, পিসীমা।'

'পিসীমা' সম্বোধনে নতুন একটা সম্পর্কের ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়ে উঠল, সেটা লীলার কানেও ধরা পড়ল। চোখে-মুখে অকারণেই রক্ত ছড়িয়ে গেল।—'এ তো সহজ কাজ।'

—'তোমাদের কাছে সহজ বাছা, কিন্তু আমরা এই পেরে উঠি নে।'

ঘুরে-ঘুরে সেদিন স্মরজিতের বাগান দেখলে লীলা। পোল্ট্রিও। আপাততঃ হাঁস-মুর্গী সব ডজন খানেক করে আছে, স্মরজিৎ বললে। শেয়ালে নিয়ে যায়, ঠিক মত দেখা-শুনা হয় না তো। তবু যখন ডিম দেবে—রোজ যদি দু'ডজন করে পাওয়া যায়, তবে বাজারে ডিম এখন দু'-আনা করে—

—'থাক, অতো হিসেব করতে হবে না।' লীলা হেসে বললে। 'কেবল লাভের কথা ভাবলে চলে না, লোকসানের জন্যেও তৈরী থাকতে হয়।'

—'সে তো আছিই।' অন্য দিকে চেয়ে স্মরজিৎ আস্তে আস্তে বললে।

কিছুক্ষণ থেকে মৃদু ও মধুর একটা সৌরভ পাচ্ছিলো:—'কিসের গন্ধ বলুন তো?'

পেছন দিকে তাকিয়ে স্মরজিৎ বললে, 'নেবু-ফুলের।'

—'এমন চমৎকার?'

স্মরজিৎ একটা পাতা ছিঁড়ে আঙুলে অল্প একটু চটকে লীলার নাকের সুমুখে ধরলো: 'দেখুন দিকি। এত দিন নেবু খেয়েছেন, নেবু গাছ চেনেন না বুঝি?'

ঘুরে ঘুরে স্মরজিৎ ওর বাগান দেখালে। গোটা-কতক ফুল তুলে বেঁধে দিলে তোড়া করে। রোদ এরি মধ্যে কখন নিস্তেজ হয়ে এসেছে। সীমানার বাইরের ক্ষেত থেকে অর্ধপক্ক রবিশস্যের ঘ্রাণ আসছে হাওয়ায়। সে হাওয়ায় ঠাণ্ডার অবসাদময় আমেজ। পায়ের নীচে নরম মখমলের মতো ঘাসের ওপর খইয়ের মতো ফুল ছড়ানো। মাথার ওপর কখন থেকে একঘেয়ে গুন্-গুন্ শোনা যাচ্ছে। কী? না মৌমাছি চাক বাঁধছে।

বাসে তেমন ভীড় নেই, তবু স্মরজিৎ যখন প্রথম দু'টো বাস ছেড়ে দিতে বললে, লীলা আপত্তি করলে না। শীতের পড়ন্ত বেলার আলস্যটুকুর ছোঁওয়া লেগেছে মনেও।

দমদমে গেল পরের রবিবারেও। তার পরের রবিবারও বাদ গেল না। ক্রমশঃ কি রবিবারেই। ছুটির দিন এলেই কি একটা দুর্বার আকর্ষণ বোধ করে। প্রথমটা অস্বস্তি, ক্রমশঃ অস্থিরতা অথচ কারণ বোঝা যায় না। অথচ শেষ পর্যন্ত প্রতিবারেই দেখা যায় দমদমের বাসে উঠে বসেছে।

গিয়ে যে খুব ভালো লাগে তা-ও নয়। কিন্তু খারাপও তো লাগে না। কী যেন একটা যাদু আছে বন্ধুর অসমতল মাঠের, রবিশস্যের আঘ্রাণের, নিঃসঙ্গ ঘুঘু-কণ্ঠের, লেবুপাতার মিষ্টি-মধুর সৌরভের। একখানা হাত শুধু দূরেই ঠেলে দেয় না, একটা রহস্যময় পদ্ধতিতে কাছেও টানে। সেই ছমছমে ঠাণ্ডা প্রায়ান্ধকার ঘরটায় ঢুকলে শরীরটা শিউরে ওঠে সত্যি, রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু রোমাঞ্চ তো শুধু ভয়েই হয় না।

নিজেকে ক্রমশঃ একটা জালে জড়িয়ে ফেলছে লীলা, স্পষ্ট বুঝতে পারে। এদের দ্বৈত সংগ্রামের সঙ্গে অলক্ষ্যে কবে নিজেও যুক্ত হয়ে পড়েছে। অথচ সে বুঝি এটা চায়নি। স্মরজিতের তৈরি প্রসাধন-উপচার নিয়ে নিজের পরিচিত মহলে ইতিমধ্যেই দু-চার বার গেছে; সাফল্যও, আশানুরূপ না হোক, পেয়েছে। পাঁচ টাকার জিনিষও যেদিন চালাতে পেরেছে সেদিন আনন্দ হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে পড়েছে। আবার কখনো কখনো স্মরজিতের প্রতি অকারণেই সমস্ত চিত্ত বিরূপ হয়ে উঠেছে। কঠিন আঘাত করতে চেয়েছে এই মানুষটিকে। আবার পরক্ষণেই হয়ত নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়েছে। দোষ তো স্মরজিতের নয়। এ দ্বন্দ্ব লীলার মনের। নিজের রুচি আর অন্ধ আকর্ষণের সংঘাত। নিজের সঙ্গেই ক্লান্তিকর এক লুকোচুরি।

আবার নেশাও। জানে না ভবিষ্যৎ কী, জানে পরিণাম রমণীয় নয়। কিন্তু তবু রাশ টানতে পারে না। এই সব অস্বস্তিকর চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেই বুঝি লীলা সে সপ্তাহে খুব প্রাণপণ

খাটলে। ইতিমধ্যেই অবসর পেয়েছে, মিত্র কোম্পানীর মাল নিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরেছে। সাফল্যও হয়েছে আশাতীত। পিসীমা যা পারেন না, এমন কি স্বরজিৎও নয়, তা লীলাকে দিয়ে যেন অনায়াসেই হয়। তার কাছ থেকে জিনিষ রাখতে দোকানদারদের বিশেষ আপত্তি হয় না। কথা-বার্তায় লীলা স্মার্ট, আর লোকে তো বলে চেহারাটা এখন পর্যন্ত ভালোই। রবিবার গিয়ে স্বরজিৎকে হিসাব দিতেই স্বরজিৎ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।—'বলেন কি? হাজার টাকা? হাজার টাকার অর্ডার এক হপ্তায়? বুঝেছি, আর বেশি বাকি নেই, আমার সংগ্রামের দিন শেষ হয়ে এসেছে।'

—'আমি জানি মা যখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন আর কোন ভাবনা নেই। মা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।' পিসীমা পাশের ঘরে চা করতে চলে গেলেন।

সেদিন বহুক্ষণ ধরে ওরা কারবারের উন্নতি সম্পর্কে পরামর্শ-পরিকল্পনা করলে। ল্যাবরেটরি ঘরটাকে আর একটু সম্প্রসারিত করতে হবে। খবরের কাগজের মারফৎ প্রচার-ব্যবস্থারও সময় এসেছে। দু'জনে মিলে ওরা বিজ্ঞাপনের কপিও মুসাবিদা করলে একটা। আর,—আর দরকার হয় তো লোক রাখতে হবে আরো দু'-একটা।

—'এক জন লোক তো রেখেইছি,' স্বরজিৎ ঈষৎ হেসে বললে, 'তবে পার্ট টাইম, এই যা। আসে আর চলে যায়। তাকে চিরকাল ধরে রাখা যায় না। কিন্তু যদি যেতো। কি বলেন মিস্ সোম?'

লীলার মুখের সমস্ত রক্ত অন্তর্হিত হয়েছে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও যেন স্তব্ধ। কিছু দিন থেকেই এই কঠিন মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করেছে, ভয় করেছে, দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে। সেই মুহূর্ত এলো আজ, শীতের এই দ্রুত ক্ষীয়মাণ দিনান্তে। কি উত্তর দেবে। ওর নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়াই যে এখনো শেষ হয়নি।

এগিয়ে এসে স্বরজিৎ ওর কাঁধে ওর শক্ত ডান হাতখানা রাখলে। —'আমি জানি লীলা, এ প্রশ্নের জবাব এত সহজে দেওয়া যায় না। আমি তোমাকে সময় দিলাম। সব দিক্ ভেবে তুমি এক দিন, দু'দিন,—সাত দিন পরেই না হয় জবাব দিয়ো। আমার সবই তো তুমি জানো। আমার দিক্ থেকে তো জানাবার কিছু নেই—'

শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো। কঠিন একটা প্রয়াসে নিজের সমস্ত সত্তাকে ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো লীলা। 'আমি পরে আবার আসব' ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে পারলো শুধু।

পরে? কিন্তু কত পরে লীলা? সাগ্রহে স্বরজিৎ জিজ্ঞাসা করেছে, কিন্তু জবাব পায়নি। লীলা দ্রুত পায়ে চলে এসেছে গেট খুলে সদর রাস্তায়, তার পর মুগুরি কলাইয়ের ক্ষেত আর পাখীর কাকলি পেছনে ফেলে শ্যামবাজারের বাসে।

চার

দিন দুই বাদে এক দিন সকালে পড়াতে গিয়ে দেখল, বাইরের ঘরের সোফায় বসে কে খবরের কাগজ পড়ছে। ভঙ্গিটা মনে হল চেনে, কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারলো না। পড়াতে পড়াতে এক সময় রুবিকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের বাইরের ঘরে নতুন এক জন লোক দেখলাম রুবি, কে বলো তো।'

—'নতুন লোক?' ভ্রূ কুঁচকে বললে রুবি, 'নতুন আবার কোথায়। ওঃ, আপনি মামা বাবুর কথা বলছেন? জানেন লীলাদি, মামা বাবু আবার এসেছে।'

মামা বাবু? এক মুহূর্ত ভাবল লীলা। অনুপম এসেছে তা হলে। চিনতে তবে পেরেছিল ঠিক। কিন্তু অনুপমের স্বাস্থ্য এত ভালো হল কবে থেকে। ওর পায়ের শব্দে কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে একবার তাকিয়ে পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। টকটকে ফর্সা মুখ, গাল দু'টি বেশ ভরা-ভরা। গেঞ্জিতে ঢাকা চওড়া বুক। এই যদি অনুপম হয় তবে আশ্চর্য রূপান্তর তো!

লীলার একবার জানতে সাধ হল, অনুপমের সে সব পাগলামি এখনো আছে কি না। কিন্তু রুবিকে সে সব কথা জিজ্ঞাসা করা চলে না। ভুল বানান আর কোটেশনে ভর্তি চিঠিগুলোর কথা মনে পড়ে হাসি পেলো।

রুবি বললে, 'জানেন লীলাদি, মামা অনেক টাকা করেছে। এখান থেকে কানপুর গিয়েছিল, সেখান থেকে পালামৌ। সেখানে কনট্রাক্টারি করে না-কি বড়োলোক হয়েছে।'

পড়াতে পড়াতে লীলা দু'-চার বার দরজার দিকে তাকিয়েছিল। চটি-পরা দু'টি পা পর্দার নিচে ঘুর-ঘুর করছে দেখতে পাবে আশা করেছিল কি না বলা যায় না। কিন্তু অনুপমের আর কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। হয়ত এখনো ওর মনে লজ্জা আছে। হয়তো, হয়তো, ভুলেই গেছে। লীলা আবার পড়ানোয় মনোনিবেশ করল।

লন পেরিয়ে গেট খুলেছে, ছাতাটাও খুলতে যাবে, এমন সময় পেছন থেকে কানে এলো, 'শুনুন।'

লীলা ফিরে তাকালো। অনুপম।

হাফ-সার্ট আর ট্রাউজার। মুখে ফাল্গুনের সকালের নাতি-উষ্ণ রোদ। অনুপম নমস্কার করলে, 'চিনতে পারছেন?'

লীলা যন্ত্রচালিতের মত প্রতি-নমস্কার করল, কিন্তু কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। যাকে মাস কয়েক আগে ধমকে দিয়েছিল, বেত্রাহত কুকুরের মতো যে সমুখ থেকে চলে গিয়েছিল মাথা নীচু করে, এ যেন সে নয়।

অনুপম দু'পা এগিয়ে এলো। 'আপনি সে সব কথা ভুলতে পারেননি দেখছি। এক সময় যে সব ছেলেমানুষি করেছি, তার জন্যে আন্তরিক মার্জনা চাইছি লীলা দেবি!' একটু হেসে অনুপম আবার বলল, 'তা ছাড়া সে সময় আপনি আমাকে শাসন করে ভালোই করেছিলেন। নইলে হয়তো আমার চৈতন্য হ'ত না। জীবনে মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগই পেতাম না।'

লীলা তাকিয়ে দেখল, অনুপম মানুষ হয়েছে সত্যি। স্বাস্থ্য তো আশ্চর্য রকম ফিরিয়ে ফেলেছে। দাঁড়াবার ভঙ্গিতেও একটা আত্মপ্রত্যয়ের ঋজুতা। কণ্ঠস্বরেও সেদিনকার সেই ভিখারি আকৃতির স্পর্শ মাত্র নেই। পরিচ্ছদেও বেশ রুচির পরিচয় আছে অনুপমের। সার্টের হাতা থেমেছে কনুই অবধি, তার নিচে—বাঁ হাতটার সুপুষ্ট মণিবন্ধে সুদৃশ্য হাত-ঘড়িটির ব্যাণ্ড ভারি সুন্দর মানিয়েছে। সেদিকে চেয়ে লীলার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে অনুপম একবার নিজের বাঁ হাতটার দিকে তাকালো, তার পর হাত-ঘড়িটার দিকে। কুণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি দেখছেন বলুন তো ঘড়িটার? সময় ভুল আছে?

লীলা অপ্রতিভ হয়ে বললে, 'না।' দৃষ্টি সরিয়ে নিলে। সে তো হাত-ঘড়িটা দেখছিল না, ওর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল অনুপমের বাঁ হাতটার দিকে, যার ফর্সা দীর্ঘ আঙুলগুলো এখন ক্লান্ত ভাবে কপালের ওপর ঝুঁকে-পড়া চুলগুলির মধ্যে বিচরণ করছে।

অনুপম বললে, 'আপনাকে আমার আর মোটে একটি অনুরোধ করতেই বাকী আছে লীলা দেবি। সেদিনকার সব দোষ-ত্রুটি ভুলে যান। আমরা তো বন্ধুও হতে পারি?'

এবারেও কোন জবাব দিতে পারলো না। ঘাড় নেড়ে, সম্মতি জ্ঞাপন করলে।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরতে কিছু দেরি হয়েছিল। মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে, দমদম বুঝি?' লীলা কোন জবাব দিলে না, মা আপন-মনেই বলে চললেন, 'কি-যে শুরু করেছিস, তুইই জানিস। ওই হাত-কাটা স্বরজিতের সঙ্গে কিসের এত মেলা-মেশা। পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলতে শুরু করেছে। ও ছোঁড়ার নিজেরই চাল-চুলোর ঠিক নেই। ওকে ব্যবসায়ে সাহায্য করেছিস, ইস্কুলে ওর জিনিষ নিচ্ছিস, ভালো কথা। ওখানেই তো ফুরিয়ে গেল। এর পরও আসে কেন? ওর সঙ্গে নিজের জীবনটাকে জড়ালে তুই তো সুখী হবিই না, এ দারিদ্র্যও ঘুচবে না, মাঝখান থেকে আমরাও না খেয়ে মরব। তোর ওপরই তো সব নির্ভর করেছে মা।'

মা আরো সন্নিহিত হয়ে এলেন। নীচু-গলায় বললেন, 'একটা কথা বলব লিলি, ভেবে-চিন্তে জবাব দিবি। তুই যে বাড়ী পড়াস না, সে বাড়ীর গিন্নী আজ দুপুরে এসেছিলেন। ভারি আলাপী মানুষ। এত বড়োলোক অথচ অহংকার নেই। কথায় কথায় বললেন, ওর এক ভাই আছে। দেখতে-শুনতে ভালো, ভালো পয়সাও আছে। কথার ভাবে বুঝলাম,-তোকে ওঁদের খুব পছন্দ। এখন তুই যদি মত করিস—'

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মা বললেন, 'কি, জবাব দিচ্ছিস না যে?'

ক্লান্ত-গলায় লীলা বললে, 'আমি আবার কি দেখবো মা? তোমার যা ইচ্ছে তাই করো।'

মা কাছে টেনে নিলেন মেয়েকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এই তো লক্ষ্মি! তোর ভালোর জন্যই বলা। বয়স পেরিয়ে যেতে বসেছে, তোকে দেখলে আমার দুঃখু হয় না ভাবছিস্? এ বিয়ে হলে দেখবি কত সুখী হবি। আমাদের সংসারটাও একটা আশ্রয় পেয়ে দাঁড়াতে পারবে। আর যদি ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে তোর জীবন জড়াস্—'

কিন্তু মা'র কথাটার পুনরাবৃত্তি করবার প্রয়োজন ছিল না। লীলা স্থির করে ফেলেছে। স্বরজিতের সঙ্গে ওর জীবন আর জড়াবে না। স্বরজিতের প্রশ্নের জবাব স্থির হয়ে গেছে। সংসারের কথা ভেবেছে লীলা, নিজের কথাও ভেবেছে, আর সংশয় নেই।

তবু যখন পরদিন স্বরজিৎকে শেষ জবাব দিতে গেল, পা দু'টো বার বার কাঁপল লীলার। বেলা শেষের ম্রিয়মাণ রোদে রবিশস্যের ক্ষেতের সবুজও আজ কেমন স্তিমিত। ওর পায়ের শব্দে একটা কাঠবিড়ালি পালিয়ে গেল আমলকি গাছের ডালে। হেলে-পড়া খেজুর গাছের সুদীর্ঘ পাতাগুলো বিঁধছে পত্র-পাতায়। বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে শোনা যাচ্ছে অলক্ষ্য, একক ঘুঘুর একঘেয়ে কণ্ঠ।

স্বরজিৎ বাইরে বসে নেই। শোবার ঘরেও তাকে দেখা গেল না। কাছাকাছি কোথাও আছে ভেবে লীলা একটু বসল। অন্যমনস্ক ভাবে টুল থেকে একটা পত্রিকা টেনে নিতেই মেঝেয় ঠক করে একটা শব্দ হল। ত্রস্ত হয়ে নিচের দিকে তাকাতেই লীলার দৃষ্টি স্থির, সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে গেল। নুয়ে পড়ে সেটাকে তুলে যথাস্থানে রাখবে এমন শক্তিও নেই।

স্বরজিতের কাঠের বাঁ হাতটা। স্যাঁতসেঁতে, স্বল্পালোক ঘরের ভিজে মাটির ওপর গড়িয়ে পড়েছে। এই পরিত্যক্ত ঘরে আর কেউ নেই, শুধু সে আর নিঃস্পন্দ একখানি কাঠের হাত, ভাবতেই আরেক বার কেঁপে উঠলো লীলা। হৃৎপিণ্ড ধক্‌ধক্ করতে লাগল, অথচ উঠবে যে, ছুটে যে পালাবে, সে সামর্থ্যও নেই, পক্ষাহত প্রত্যঙ্গগুলোকে এই ঘরের মৃত আবেষ্টনীর সঙ্গে কে যেন কঠিন, নির্মম হাতে বেঁধে রেখেছে।

স্বরজিৎ ঘরে ঢুকলো একটু পরেই। খালি গা, চুলগুলো ভিজে, কাঁধে গামছা। স্নান করে এলো বোঝা যায়।

ওকে দেখে স্বরজিৎ একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। 'কতোক্ষণ থেকে বসে আছো···আছেন। আজ ফিরতে দেরি হয়েছিল, তাই অবেলায়—। পিসীমা আবার গেছেন দক্ষিণেশ্বরে।'

ঝুঁকে পড়ে টুলের ওপর কি যেন খুঁজলো স্বরজিৎ, তার পর এদিক্-ওদিক্ তাকাতেই মেঝেয় চোখ পড়ল। কুড়িয়ে নিলো কাঠের হাতখানা। গামছা দিয়ে যেন কতকটা স্নেহে মুছে ফেললে মাটি।

লীলা কাঠ হয়ে বসে বসে দেখল সব।

—'একটু বসুন, এখুনি আসছি' বলে, স্বরজিৎ আড়ালে চলে গেল। ফিরে যখন এলো, তখন পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো, বাঁ হাতটা অভ্যস্ত রীতিতে পকেটে।

তক্তপোষের ওপর লীলার কাছ ঘেঁষেই বসল স্বরজিৎ। —'তার পর লীলা, আমার সেদিনকার প্রশ্নের জবাব ঠিক করে এসেছ?'

লীলার ঠোঁট দু'টো একবার কেঁপে উঠলো, কোন কথা ফুটলো না। আরো কাছে এসে ওর কাঁধের ওপর ডান হাতটা রাখল স্বরজিৎ।—'জানি তোমার লজ্জা করছে। থাক, তোমাকে মুখ ফুটে আর বলতে হবে না। ফিরে যখন এসেছ, তখনই তোমার উত্তর আমি অনুমান করে নিয়েছি।'

লীলার একখানা হিম হাত স্বরজিৎ ওর হাতের মধ্যে টেনে নিলে। লীলার সারা শরীর আরেক বার কেঁপে উঠলো। আর অপেক্ষা করা চলে না। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। সমস্ত শক্তিকে অধরোষ্ঠে কেন্দ্রীভূত করে লীলা ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করলে, 'ফিরে আসিনি ফিরে যেতে এসেছি।'

নির্বোধ দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত লীলার দিকে চেয়ে রইলো স্বরজিৎ। ওর হাত থেকে লীলার হাতটা শিথিল হয়ে খসে পড়ল। লীলার কথার যেন মানে বুঝতে পারেনি, এমন ভাবে রক্তহীন মুখে শুধু বললে, 'ফিরে যেতে এসেছ!'

উঠে দাঁড়ালো লীলা। 'হ্যাঁ। ভেবে দেখলুম, হয় না। পারবো না, আমি পারবো না।'

অস্ফুট গলায় স্বরজিৎ বললে, 'পারবে না ?'

—'না'। লীলা চৌকাঠ পর্য্যন্ত এগিয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণ স্বরজিৎও উঠে দাঁড়িয়েছে। টলতে টলতে এগিয়ে এসেছে দরজা অবধি। 'পারবে না ? কিন্তু কেন। কেন। কেন।'

যে হাতটা ক্ষণকাল আগে কোমল হয়ে লীলার কাঁধ স্পর্শ করেছিল, সেই হাতটাই অকস্মাৎ কঠিন ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে; প্রচণ্ড বেগে ঝাঁকুনি দিচ্ছে লীলাকে, আর ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করছে, 'কেন, কেন, কেন। কেন তবে এসেছিলেন ? এক দিন নয়, দু'দিন নয়, এক বার নয়, দু'বার নয়, বার বার ? কেন। কেন দিনের পর দিন এসে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, কাজের সহায়তা করেছেন। কোন মমতা যদি ছিল না, তবে কেন আমাকে ভুল বোঝবার সুযোগ দিলেন ? এ কি শুধু কৌতূহল ? শুধু দয়া ?'

মাথা নীচু করে লীলা দাঁতে ঠোঁট চেপে আত্মসংবরণ করলে। বললে, 'হ্যাঁ। শুধু কৌতূহল। শুধুই দয়া।'

ধীরে ধীরে লীলা এগিয়ে গেল। চাক থেকে উড়ে আসা দু'-একটা মৌমাছি উড়ছে ইতস্তত। বাতাসে মৃদু গন্ধ, কে জানে হয়ত নেবুফুলের। আকাশে সূর্য্যের শেষ আলোয় দু'-একটি চিল এখনো ডানা-না-কাঁপানো সাঁতার দিচ্ছে। পথের ধারের পুকুরের পানায় চুপ করে বসে আছে দু'-একটি বক। আর সরু শাদা সিঁথির মতো পথ ফসল-ধোঁয়া মাঠ পাড়ি দিয়ে দূরের অশথ-বটের ছায়ায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তার পরেই ঝাপসা, তার পরেই অন্ধকার।

এই দীর্ঘ পথ ওকে একলা পাড়ি দিতে হবে ভাবতেই লীলার পা দু'টো অবশ হয়ে এলো! হাঁটুতে যেন জোর নেই। চলতে গেলে লাউয়ের লতায় পা জড়িয়ে যায়, ফণি-মনসার কাঁটা আঁচল আঁকড়ে ধরে। এই নিরালোক, নিরানন্দ পরিবেশ তাকে কঠিন মায়ায় ঘিরেছে, বেঁধেছে দুশ্ছেদ্য মোহে। এই তমসা থেকে কেউ যদি তাকে হাত ধরে জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ করে দিতে পারে, দিক। কিন্তু একা এই ক্লান্ত পথ পাড়ি দেবার কথা ভাবতেই লীলা ভয় পেল! অন্ত দিন ওর সঙ্গে থাকতো স্বরজিৎ। আর আজ—লীলা পেছনে ফিরে তাকালো।

চৌকাঠে হাত রেখে স্বরজিৎ কাঠের পুতুলের মতো তখনো দাঁড়িয়ে। অবসন্ন ভঙ্গিতে চৌকাঠটা ধরে আছে, পাংশু মুখখানা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর।

হঠাৎ দ্রুত পদশব্দ শুনতে পেয়ে চকিত হয়ে তাকালো স্বরজিৎ।

লীলা ফিরে আসছে।

প্রায় ছুটে এসে লীলা ওর পায়ের কাছে, মাটিতে ধপ করে বসে পড়ল। শিথিল আঁচল পড়ল লুটিয়ে। ওকে আস্তে আস্তে তুলল স্বরজিৎ, গভীর মমতায় কাছে টেনে নিলে। মোমের মতো শাদা দু'খানি আকুল হাত কখন জড়িয়ে গেছে গলায়। বুকের ওপর সিক্ত পদ্ম দু'টি চোখের স্পর্শ। কান পাতলে শোনা যায় একটি দ্রুতশ্বাস, স্পন্দিত হৃদয়ের ওঠা-পড়া। আর পরম আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে কাঁধের কাছে খোঁপা-খোলা শ্রান্ত একটি মাথা এলানো। ধীরে ধীরে সেই মুখখানি স্বরজিৎ তুলে ধরল। ফিরে যেতে পারেনি! ফিরে এসেছে।

স্বপ্ন-প্রাসাদ

সমর সোম

কৃপণ পৃথিবী তোমায় আমি তো জানি,
তবুও আজিকে বাড়াই দু'-হাতখানি।
দেখেছি রয়েছে—
মিথ্যা প্রবঞ্চনা,
ক্ষয়-ক্ষতি আর ভাবনার জাল বোনা,
এরই মাঝে কিছু চাই!
বল না পৃথিবী—
রিক্ত রাত্রি কেমনে একা কাটাই।
শূন্যতা মাঝে বাঁচার মন্ত্র কিছু-না-কিছুই আছে,
তাই হাত পেতে—দাঁড়াই তোমার কাছে।

স্বপ্ন-প্রাসাদ সংকেত করে
অবলুণ্ঠিত জ্যোৎস্না-জাল,—
শূন্যতা আর ব্যর্থতা সব করে আড়াল;
স্বপ্ন-প্রাসাদে পরিত্রাণ
মিলবে পৃথিবী—জানি যে মিলবে
সুরহারা প্রাণ গাইবে গান।
এখানে বন্ধ্যা মাটির বেদনা
ফসল ওখানে ঢেকেছে ঠিক,
এখানের শত চড়াই ওখানে নেমে গেছে
জানি হাসে পথিক,
মগ্ন গাছ ঝরা পাতার কামনা
পূর্ণ হয়েছে—
জেগেছে দোল,
দখিণা বাতাস দিয়েছে কোল।

যে ফুল এখানে পারেনি ফুটিতে:
যে পাখী হয়েছে নিরুদ্দেশ,—
সে পাখী ফিরেছে সে ফুল ফুটেছে
বর্ণ-গন্ধে রূপ অশেষ;
আমায় কোর না অস্বীকার,
একবার শুধু দাতা হও তুমি
দাও চাবী আমি খুলব দ্বার!

তোমার শাসনে যে প্রিয়া ফেলছে
নিশিদিন শুধু দীর্ঘশ্বাস,
মিলতে পারেনি—ঘটেছে চরম সর্বনাশ,
স্বপ্ন-প্রাসাদে—
সে অভিসারিকা
একা চলে আসে হাতে দীপশিখা,
মিলন-কুঞ্জ আয়োজন শেষে
আমারে চায়!

বল না পৃথিবী
কেউ কি এখানে তব কাছ থেকে কিছু না পায়?—
জল-ভরা চোখে শুধু তাকায়?

বাজার (আমিষ) —ননী পাত্র

আলোক চিত্র

বাজার (নিরামিষ) —মণিকান্ত গুহ

নেশা

(নারী)

—ক, খ, গ

যাত্রা

(পর্ব্বতদেশ)

—সুদেব হরলালকা

যাত্রা (নিরুদ্দেশ)

—রামকিঙ্কর সিংহ

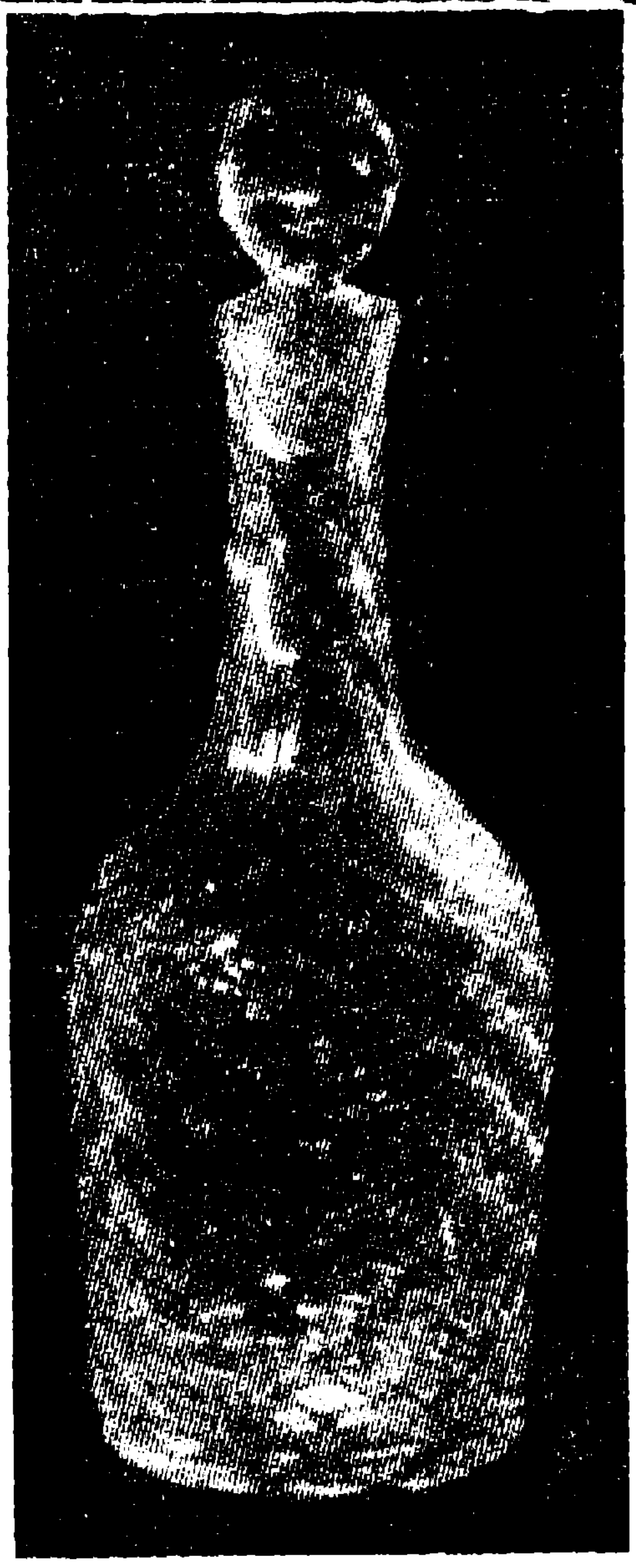

নেশা
(পুরুষ)

—ক, খ, গ

নেতাজী আসছেন —বসুমতী

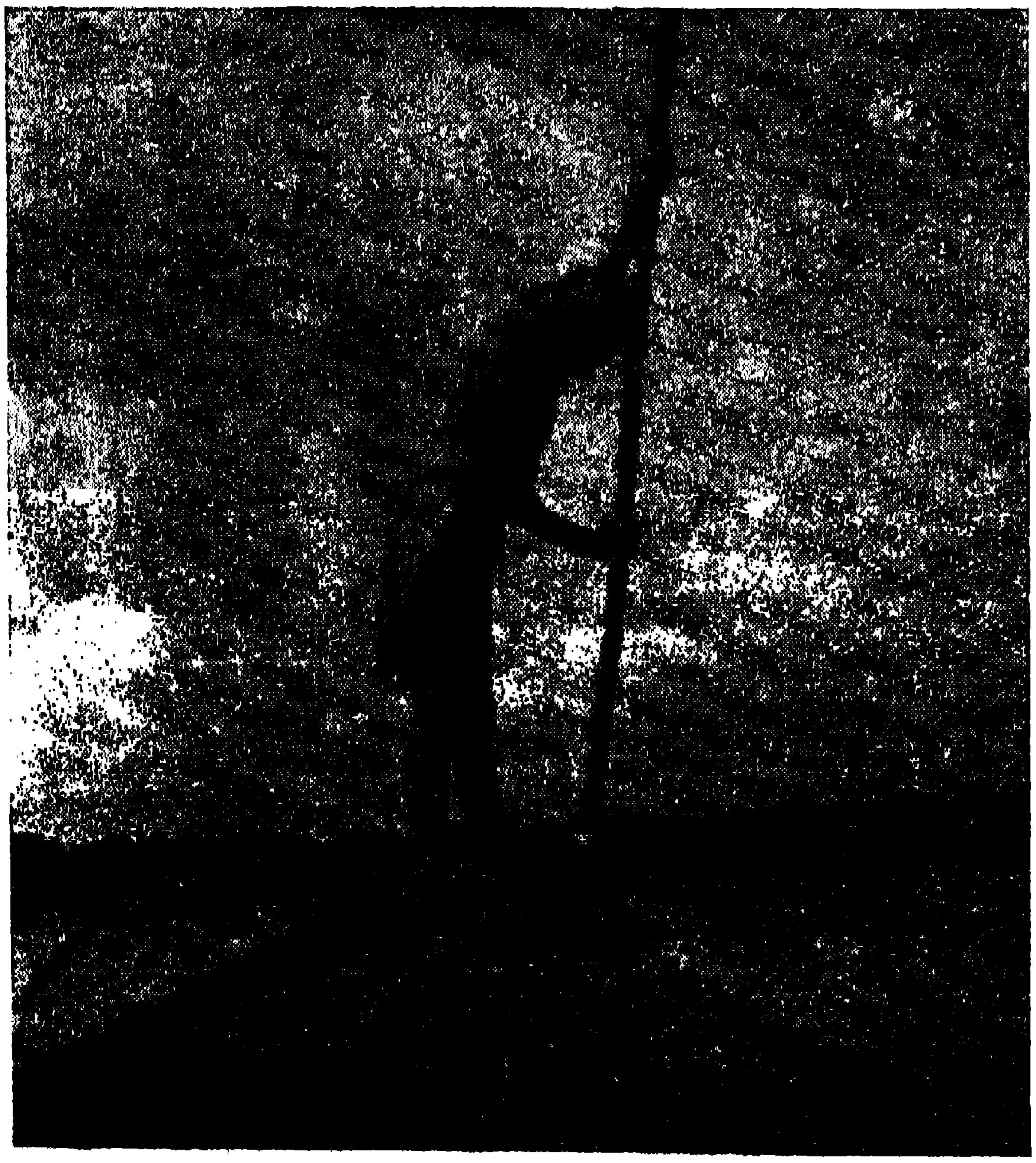

কর্ণধার

—প্রকাশচন্দ্র দাস

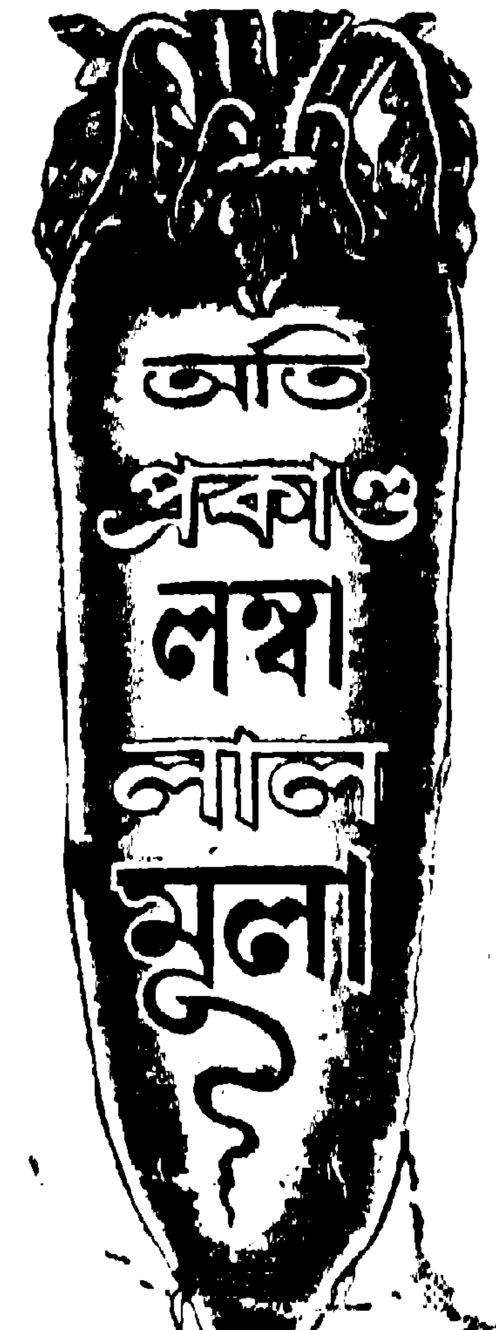

শক্তি সিন্ধু রসায়ন

পাঁজির বিজ্ঞাপন ও বাঙ্গালী সমাজ

শিল্পপ্রচারণী

পাঁজিতে যে কী জঘন্য আর কুৎসিত বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ প্রকাশিত হয় তারই নিদর্শন-স্বরূপ কয়েকটি চিত্র ও অক্ষর-কলা এখানে মুদ্রিত হল। পঞ্জিকা ব্যবসায়ীরা কোথা থেকে এ সকল বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেন আমাদের জানা নেই, নতুবা উক্ত বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে আমরা সৌজন্য স্বীকার করিতাম।

পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপনদাতাদের জানা উচিত, বিজ্ঞাপনের একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে এবং সেটা অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্ব। অনেক সময় তাঁরা এটা ভুলে যান এবং মনে করেন, ব্যবসাদার হিসাবে তাঁদের যে-কোন পণ্য যেমন ভাবে খুশী বিজ্ঞাপিত করার ব্যক্তিগত অধিকার আছে। তা অবশ্য আছে। তাঁদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্নই উঠত না, যদি তাঁদের বিজ্ঞাপনটা একান্ত ব্যক্তিগত জীবনকেই কেন্দ্র করে থাকত। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য তা নয়। "বিজ্ঞাপন" কথাটাই "জ্ঞাপন" কথা থেকে এসেছে এবং জ্ঞাপনের অর্থই হল অন্যদের জানানো। সুতরাং "বিজ্ঞাপনটা" কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সামাজিক ব্যাপারও। সামাজিক ব্যাপার বলেই প্রত্যেক সামাজিক জীবের অধিকার আছে "বিজ্ঞাপন" সম্বন্ধে আলোচনা ও সমালোচনা করার। সমাজের কল্যাণ, সমাজের সুনীতি ও সুরুচিবোধ "বিজ্ঞাপনের" সঙ্গে এমন প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত যে সমাজবিজ্ঞানী হিসাবেও "বিজ্ঞাপনের" সমালোচনা করা প্রয়োজন। কলারসিক হিসাবেও "বিজ্ঞাপনের" আঙ্গিক ও মাধ্যম নিয়ে আলোচনা রীতিমত হওয়া উচিত, তা না হলে শিল্পকলার স্তরে বিজ্ঞাপনের ক্রমোন্নতি সম্ভব নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়-বস্তু (Content) এবং বিজ্ঞাপনের আঙ্গিক (Technique)—দু'টোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা নিয়ে প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানী ও শিল্প-সমালোচকের চিন্তা করা উচিত, আলোচনা করা উচিত।

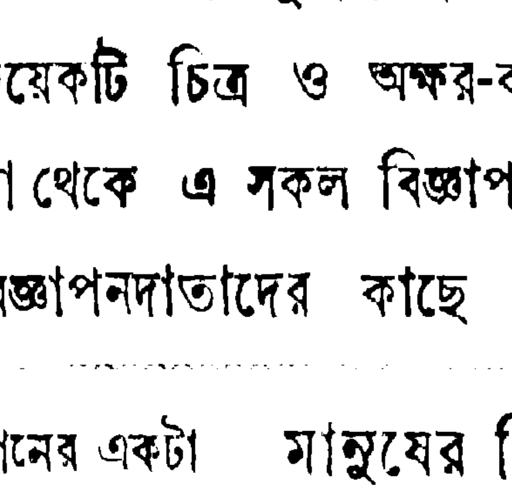

বিজ্ঞাপনের আঙ্গিক নিয়ে নানা ভাবে নানা স্তরের আলোচনা চলতে পারে। মিশ্রকলা (Mixed Art) হিসাবে বিজ্ঞাপনের স্থান বর্তমান সমাজে নিঃসন্দেহে অনেক উঁচুতে। ভবিষ্যৎ সমাজে পণ্য ও মুনাফার প্রতিযোগিতা যখন থাকবে না, তখন হয়ত এই "বিজ্ঞাপনের" অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনও থাকবে না। কিন্তু সেই "ভবিষ্যৎ" যত দিন না ভূমিষ্ঠ হচ্ছে তত দিন "বিজ্ঞাপনের" মাহাত্ম্য অস্বীকার করা অর্থহীন। তত দিন অন্তত এই লক্ষ্যটা থাকা দরকার যে "বিজ্ঞাপন" যেন বাস্তবিকই মিশ্রকলার স্তরে ওঠে, মানুষের শিল্পকলাবোধ ও রুচিবোধ যেন বিজ্ঞাপনের দ্বারা গড়ে ওঠে, এবং বিজ্ঞাপনের ফলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ অকল্যাণ যেন না হয়। বিজ্ঞাপনদাতারা যদি আজ এই লক্ষ্যটুকুর প্রতি নিষ্ঠা রাখেন তাহলে অনেক দুর্নীতি, অনেক কুশিক্ষা ও কুরুচির কবল থেকে আমাদের এই সমাজ অন্তত আংশিক ভাবেও মুক্ত হতে পারে।

পাঁজির প্রতিপত্তি

এ-কথাটার গূঢ় তাৎপর্য্য আমাদের আলোচ্য বিষয় থেকেই সকলেই বুঝতে পারবেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই যে বাংলার পাঁজি বাংলার প্রত্যেক পরিবারের অপরিহার্য্য সঙ্গী। বাংলা দেশে লিখতে-পড়তে জানা এমন কোন হিন্দু-পরিবার নেই যাঁর ঘরে বাংলার পাঁজি নেই। শহর নগর থেকে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত পাঁজির একচ্ছত্র প্রতিপত্তি শতাব্দীব্যাপী সুপ্রতিষ্ঠিত। পাঁজি ছাড়া বাংলার হিন্দুরা একটুও নড়া-চড়া করেন না, এক পা-ও এগোন না পিছোন না। হাঁচি কাশি জন্ম প্রেম বিবাহ অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্য—সবই পাঁজির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়! বাংলার হিন্দুর পারিবারিক জীবনের একমাত্র পরিচালক পাঁজিকেই বলা চলে। অনেক পরিবারে রামায়ণ, মহাভারত নেই, গীতা, ভাগবত, চণ্ডীও নেই, কিন্তু পাঁজি নিশ্চয়ই আছে। পাঁজি হাতে করে মাতৃগর্ভ থেকে আমরা জন্মগ্রহণ করি, পাঁজি বুকে করে জীবনের পথে হামা-গুড়ি দেওয়া থেকে সোজা হয়ে চলতে শিখি,—পাঁজি বগলে করে প্রেমে পড়ি,—বিয়ে করি,—ছেলেমেয়ের বাপ-মা হই,—বাঁচি মরি,—পাঁজি মাথায় করে হোঁচট খাই—দৌড়ে চলি,—বাদশা বনি,—ফকির হই,

—মামলা করি আর মিতে পাতাই। আমাদের জীবনের এ-হেন সর্ব্বশক্তিমান "ভগবান" যে পাঁজি তাকে স্বচক্ষে সকলেই প্রায় দেখেছেন। পাঁজির মতন এমন কুৎসিত "ভগবান" বোধ হয় ২০০ বছরের ছাপাখানার ইতিহাসে কোন দিন চর্মচক্ষে উদিত হয়নি। "গলিত ধবল কুষ্ঠ রোগীকেও" মেশিনে-ছাপা পাঁজির সঙ্গে তুলনা করলে "নবকুমার" বলা চলে। পাঁজির আকৃতির বিকৃতি বাংলা ভাষায় কেন, বোধ হয় আন্তর্জ্জাতিক ভাষা "এস্‌পারান্টোতেও" বর্ণনা করা যায় না, পৃথিবীর কোন ভাষারই সাধ্য নেই তা প্রকাশ করার। সে-কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। পাঁজির আর একটা বীভৎসতম দিক লক্ষ্য করেছেন কি?

পাঁজির বিজ্ঞাপনের প্রধান বিষয়বস্তু

পাঁজির "বিজ্ঞাপনের" দিকের কথা বলছি। পাঁজির পণ্ডিত মণ্ডলী, শুভদিনের নির্ঘণ্ট, 'হরপার্ব্বতী সংবাদ' ও 'রবি রাজা বুধো মন্ত্রী'র কদর্য্য ছবি পর্য্যন্ত পৌঁছানোর আগে যে বীভৎস বিজ্ঞাপনের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা ঠেলে ভেতরের ও বাইরের চেহারা কেউ ভাল করে দেখেছেন কি? দেখেছেন সকলেই, চিন্তাও করেছেন অনেকে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বোবা হয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছেন। ভেবেছেন, পাঁজির ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ কি? কিন্তু বোবা হয়ে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেন, তাই বলছি।

পাঁজির বিজ্ঞাপনের শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যায়, মোটামুটি তিন শ্রেণীর বিজ্ঞাপনই তার মধ্যে প্রধান। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞাপন হল, ফলফুল, লতাপাতা, শাক-সব্‌জী ও গাছ-গাছড়ার বিজ্ঞাপন, অর্থাৎ নার্সারীর বিজ্ঞাপন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞাপন হল, ওষুধ-পত্তর, সালসা, রসায়ন, তেল-মালিশ ইত্যাদি যাবতীয় মধ্যযুগের কবিরাজী হাকিমী য়ুনানী দাওয়াইয়ের বিজ্ঞাপন এবং তার সঙ্গে জাদুকরী সব বিধান-ব্যবস্থার ফিরিস্তি। তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞাপন হল, বিকৃত যৌন সম্পর্কিত নানা বিষয়ের, প্রেমে পড়া, বশীভূত করা থেকে শুরু করে পৌরুষ ও নারীত্বের পুনর্বিকাশ পর্য্যন্ত সব। এর সঙ্গে যৌন-সাহিত্যও আছে। এই বিকৃত যৌন-সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনের সঙ্গে আছে জাদুমন্ত্র, তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, তাবিচ-মাদুলি-কবচ, সম্মোহন-বিদ্যা ইত্যাদি নানা রকমের বর্ব্বর যুগের ভুতুড়ে ব্যাপারের বিজ্ঞাপন। জাদুকরী উপায়ে হঠাৎ ধনী হওয়া এবং বিত্তলাভ করার ব্যাপারও তার মধ্যে অন্যতম।

প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞাপন, অর্থাৎ নার্সারীর বিজ্ঞাপনগুলি ভালই, পাঁজিতে প্রচারিত হওয়ার প্রয়োজনও আছে তার। কারণ, শহরের লোকের কাছে যতটা না হোক, গ্রামের লোকের কাছে পাঁজি হল নিত্যসঙ্গী। চাষবাসের গুরুত্ব গ্রামের লোকের কাছে খুব বেশী। সুতরাং ভাল বীজের, ভাল গাছের সন্ধান পাওয়া তাদের সত্যিই দরকার। এদিক দিয়ে পাঁজির মারফৎ তারা যে উপকৃত হয় তাতে কোন সন্দেহই নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞাপনেও বিশেষ আপত্তি থাকার কোন

কারণ থাকত না, যদি বিজ্ঞাপনদাতারা আয়ুর্বেদ বা হাকিমী শাস্ত্রের পণ্ডিত হতেন এবং ভেষজবিদ্যার অনুশীলন করে ওষুধ-পত্তর, সালসা ও রসায়নাদি তৈরী করতেন। দুঃখের বিষয়, পাঁজির কবিরাজ ও হাকিম বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে তাঁরা যে অধিকাংশই কবিরাজ বা হাকিম তা নন, আয়ুর্ব্বেদ বা হাকিমী বিদ্যার সঙ্গে অনেকের বর্ণপরিচয়ও হয়নি। তাঁরা সব হাতুড়ে পাষণ্ড, বনের গাছ-গাছড়া শিকড় নিংড়ে ব্যবসা করাই তাঁদের লক্ষ্য। ব্যবসার সুযোগ সব চেয়ে বেশী তাঁদের পাঁজির ভিতর দিয়ে, কারণ অজ্ঞ, অশিক্ষিত কুসংস্কারগ্রস্ত জনসাধারণের কাছে তাঁদের এই হাতুড়ে-বিদ্যার ভৌতিক শক্তির খেলা দেখানো যত সহজ, অন্যত্র ততটা সহজ নয়। তাই তাঁরা পাঁজির পৃষ্ঠায় ভীড় করে থাকেন। অজ্ঞ মানুষের সস্তা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এমন অপূর্ব্ব সুযোগ আর কোথায় বা পাবেন তাঁরা? এমন কোন দৈনিক সংবাদপত্র নেই, পাঁজির জনপ্রিয়তাকে যে হার মানাতে পারে। পাঁজির মতন মাধ্যম বাংলা দেশে দ্বিতীয়টি নেই। সুতরাং দেশের যত নরহত্যাকারী হাতুড়েদের বিজ্ঞাপনের ভীড় হয় পাঁজির পৃষ্ঠায়, এবং এমন কোন দুরারোগ্য ব্যাধিও দেখা যায় না যা এঁদের পাচন-পিল-রসায়নে না সেরে যায়। পাঁজির দাওয়াই সবই প্রায় ভৌতিক ব্যাপার। ভেষজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে তার অহি-নকুল সম্বন্ধ। এই হল দ্বিতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞাপন। তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞাপনগুলিই সব চেয়ে বেশী মারাত্মক।

বাংলার বাইরে থেকেই বাংলার ঘর ভাঙছে

তৃতীয় শ্রেণীর যৌন, জাদু ও সম্মোহন-বিদ্যা সম্পর্কিত কুৎসিত বিজ্ঞাপনগুলির সংখ্যাই পাঁজির মধ্যে সব চেয়ে বেশী। আর একটা বিষয় একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে বিজ্ঞাপন-দাতারা অধিকাংশই বাংলার বাইরের ব্যবসায়ী। বাংলার বাইরেই এই সব সমাজবিরোধী পিশাচ ব্যবসায়ীদের প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্র। যদিও এই শ্রেণীর বাঙালী ব্যবসায়ী যে নেই তা নয়। কলকাতার মতন আধুনিক মহানগরীর মধ্যেই তাঁরা দিব্যি ব্যবসা জমিয়ে বসে আছেন। অনেকে আবার নবদ্বীপ অঞ্চলেও বসবাস করছেন। পাঁজির পৃষ্ঠা থেকেই তাঁদের পরিচয় পাওয়া যায়। ঠিকানা পাওয়া যায়। কিন্তু কলকাতাতেও এই শ্রেণীর ব্যবসাদারদের মধ্যে দেখা যায় অধিকাংশই অবাঙালী। অনেকে হয় ত বলবেন, লেখক এই কথা বলে প্রাদেশিকতার বিষ ছড়াতে চাইছেন। কিন্তু লেখক প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতার ধারও ধারেন না এবং অনেক মহাপ্রাণ মহানুভব ব্যক্তির মতন তিনিও সামাজিক উদারতার বড়াই করতে পারেন। এখানে শুধু বাস্তব তথ্য উদ্‌ঘাটন করা হচ্ছে মাত্র এবং সেই তথ্যোদ্‌ঘাটনের ফলে যদি কোন তত্ত্ব (Theory) তৈরী হয় তাহলে লেখক নিরুপায়।

তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবসাদারদের প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : লাহোর, লক্ষ্ণৌ, সিমলা, হোসিয়ারপুর, দিল্লী, জলন্ধর সিটি ইত্যাদি।

যে সব আজব আয়না, আঙটি, বশীকরণ-মন্ত্র মাহুলি, কবচ, মুহব্বত কি ডোরি (প্রেমের দড়ি), ফুলাদি বটিকা, হবুবে মোমসেক (নারী-মোহন বটিকা), তেলায়ে দারাজী, লক্ষ্মী যন্ত্র, শাহনশাহী ক্রীম, কোকশাস্ত্র ইত্যাদি দ্রব্যের বিজ্ঞাপন এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপনদাতারা দেন, ঐন্দ্রজালিক তার দ্রব্যগুণ বিশ্লেষণ করলে কি পাওয়া যায়?

১। গুপ্ত অঙ্গে লাগালে পুরুষের শক্তি বিদ্যুতের মত সঞ্চারিত হয়।

২। ব্যবসা, চাকুরী, মামলা মোকর্দ্দমা, লটারী, পরীক্ষা, মারামারি ইত্যাদিতে জয়লাভ হয়।

৩। মরা মানুষ বাঁচানো যায়।

৪। রাণী থেকে বৌরাণী, মেথরাণী পর্য্যন্ত যে কোন নারীর প্রেমে পড়া যায়,—তাদের পাষাণ হৃদয়কে মোমবাতির মতো জ্বালিয়ে গলিয়ে ফেলা যায়।

৫। বুড়ীকে তরুণী আর পাকা বুড়োকে কাঁচা তরুণ করা যায়।

৬। অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়, পাহাড়-পর্ব্বত সাগর-নদী হেঁটে পার হওয়া থেকে বন্ধ্যা নারীর গর্ভ পর্য্যন্ত সবই অতি সহজে করা সম্ভব হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞাপিত দ্রব্যগুলির এই হল দ্রব্যগুণ। কেবল যে মলম মাহুলি আয়না আঙটি দড়ি ঘড়ি প্রভৃতি দ্রব্যই বিজ্ঞাপিত হয় তাই নয়, এই সব দ্রব্যের গুণমহিমা কীর্ত্তন করে যে বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করা হয়েছে তারও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এ-সাহিত্য সোজা সুলভ সাহিত্য নয়, কেউ সখ করে এর নামকরণ করেছেন "Pick-me-up" পুস্তকাবলী এবং বলেছেন এগুলি না কি "পাঠক জগতে অভিনব বিক্রমান সৃষ্টি করিয়াছে। পুস্তকগুলি হু-হু করিয়া বিক্রয় হইতেছে"। এ-হেন পুস্তকের বিষয়-বস্তু কি? নাম দেখলেই মালুম হবে—

১। ভারতীয় কুমারীদের স্বীকারোক্তি; ২। ভারতীয় কুমারীদের সত্য ঘটনামূলক প্রেমকাহিনী; ৩। শিক্ষয়িত্রীর ব্যক্তিগত জীবন; ৪। হরিজন কুমারীদের স্বীকারোক্তি; ৫। লজ্জাহীনা; ৬। কলেজে শিক্ষিতা কুমারীর আত্মকাহিনী; ৭। প্রেমের দস্যু; ৮। নারী-জীবনের রহস্য; ৯। পাপীর কাহিনী—ইত্যাদি।

আমেরিকা আজ এই ব্যবসায়ের গুরু

এই সব দ্রব্য এবং তার দ্রব্যগুণ, এই সব ব্যবসাদার আজও সভ্য সমাজে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এর চেয়ে তাজ্জব ব্যাপার আর কিছুই নেই। কিন্তু সব চেয়ে তাজ্জব ব্যাপার হল, বিজ্ঞান টেক্‌নোলজি ও আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আশ্চর্য্য দেশ আমেরিকা আজ এই বর্ব্বর যুগের ভুতুড়েবিদ্যা হাতুড়ে-বিদ্যা জাদুবিদ্যা ও সম্মোহন চর্চ্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। আমাদের দেশের এই সব ভুতুড়ে হাতুড়েদের, এই সব বর্ব্বর জাদুকরদের ব্যবসায়ের দীক্ষাগুরু আজ আমেরিকা। পাঁজির বিজ্ঞাপনের মধ্যে এটা সব চেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয়। তার কয়েকটা মাত্র নমুনা দিচ্ছি ১৩৫৪ সালের "গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা" থেকে :

১। "আমেরিকার আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন দ্বারা মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়।"

২। আজব আয়না—"এই আয়না বিখ্যাত আমেরিকান সমিতির (American Hypnotic Association)এর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য সৃষ্টি এবং সম্মোহন বিজ্ঞানের নিয়মানুসারেই ইহা প্রস্তুত করা হইয়াছে।"

৩। "আমেরিকান অটোম্যাটিক।"

৪। "আমেরিকার আধুনিক আবিষ্কার—পুরুষত্বহানি ও স্বাস্থ্যহীনতায় 'মেল ডেভেলপারই' বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আবিষ্কৃত নিশ্চিত ফলপ্রদ শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা।"

এই হল "এটম বোমার" বাক্য-নবাব আমেরিকানদের "আধুনিক আবিষ্কারের" কয়েকটি মাত্র নমুনা।

"ডিমেনসিয়া প্রিকক্স"—সামাজিক দিবাস্বপ্নব্যাধি

সকলের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক—সুসভ্য বিজ্ঞানসমৃদ্ধ দেশ আমেরিকায় এই জাতীয় ভুতুড়ে-বিদ্যার প্রাধান্য কেন? এর উত্তর হল, সভ্য দেশ আমেরিকা যে সমাজ গড়ে তুলেছে সেই সমাজে টেক্‌নোলজির পাশাপাশি হিপ্‌নোটিজম, ম্যাজিক ইত্যাদির প্রচলন হওয়া স্বাভাবিক। যে বিকটাকার ধনতান্ত্রিক স্কাইস্ক্রেপার গড়ে তুলেছে আজ আমেরিকা, আমরা শুধু তার দিকেই ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে চেয়ে থাকি। আমেরিকার ডলারের বন্যায় ভেসে গিয়ে আমরা ভাবি আমেরিকার কি ঐশ্বর্য্য, কি দৌলত? কিন্তু আমেরিকার স্কাইস্ক্রেপার, আমেরিকার ধনদৌলত, আমেরিকার কল-কারখানা যন্ত্রপাতি, এ-সব হল আমেরিকার অতি নগণ্য মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর, কয়েক জন মাত্র ডলার-দানবের কুক্ষিগত। তার জন্যেই আমেরিকার বিজ্ঞান, আমেরিকার টেক্‌নিক। বিজ্ঞানের লক্ষ্য সেখানে মারণাস্ত্রের উন্নতি, ব্যাপক ধ্বংসলীলার কৌশল আয়ত্ত করা। এই মুষ্টিমেয় ডলার-সম্রাটদের বাইরের যে আমেরিকান সমাজ তার চেহারা আমাদের এদেশের সমাজের চেয়ে খুব বেশী উন্নত নয়। একমাত্র গায়ের রঙের তফাৎ ছাড়া তাদের সঙ্গে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা মনোবৃত্তি ইত্যাদির অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। সাধারণ মানুষের বাসনা-কামনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার কোন সুযোগ নেই আমেরিকায়। জীবনের প্রত্যেক পদে পদে তাদের ব্যর্থতা। তাদের জন্ম ব্যর্থ, প্রেম ব্যর্থ, অর্থের অভাব, চাকুরী নেই, বেকার। সুতরাং ধর্ম্ম আর কুসংস্কার আজও আমেরিকায় জাঁকিয়ে বসে আছে। আর আমেরিকার সাধারণ ব্যর্থ মানুষ, পীড়িত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার একমাত্র উপায়স্বরূপ সেখানে রয়েছে দিবাস্বপ্ন

(Delusious)। আমেরিকার সাধারণ মানুষ এই ভয়াবহ দিবাস্বপ্ন-ব্যাধিগ্রস্ত। শুধু আমেরিকার নয়, ভেদ-বৈষম্য যে-সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং বনিয়াদ, সেই সমাজের সাধারণ মানুষের এই অবস্থা। আমাদের ভারতবর্ষেরও তাই। ভারতবর্ষে যেমন তাই জাদুমন্ত্র, গুপ্তবিদ্যা, তাকতুক, ঝাড়ফুঁক, সম্মোহনবিদ্যা ইত্যাদির প্রাধান্য আজও আছে, আমেরিকাতেও তার সাধনা কম হয় না। এটমিক গবেষণার পাশেই "আজব আয়নার" বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমেরিকাতে আজও হয়। বর্ব্বর যুগের এই সব গুপ্তবিদ্যা ও জাদুমন্ত্রের প্রশ্রয় দেন আমেরিকার শাসকশ্রেণী তাঁদের নিজেদের স্বার্থে। দেশের জনসাধারণকে সুশিক্ষা দেওয়ার যাঁদের ক্ষমতা নেই, তাদের অন্নবস্ত্র যুগিয়ে নানা বাসনা-কামনা চরিতার্থ করার সুযোগ দেবার যাঁদের শক্তি নেই, তাঁদের সম্মোহনবিদ্যার প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া উপায় কি? আফিম খেয়েও তো লোক সব ভুলে থাকে। সেই রকম যদি "আজব আয়নার" দৌলতে লোকে তাদের জীবনের সব কামনা চরিতার্থ করতে পারে, যদি উচ্ছৃঙ্খল সমাজের কঙ্কালসার মানুষ "ইলেক্‌ট্রিক সলিউশনের" সাহায্যে তাদের লুপ্ত পৌরুষ উদ্ধার করতে পারে তাহলে তো আমেরিকার শোষকশ্রেণী নিশ্চিন্তে আরও কিছু দিন তাদের হাড়মজ্জা শুষতে পারে।

এক কথায় বলা চলে, এই শ্রেণীর জাদু ও সম্মোহনবিদ্যা সেই সব সমাজেই জাঁকিয়ে বসে থাকে, যে-সমাজের সাধারণ মানুষ ব্যর্থ ও পীড়িত, যাদের কবচ মাদুলি দড়ি ঘড়ি ও লক্ষ্মীযন্ত্র ছাড়া জীবনের কামনা চরিতার্থ করার আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই বর্ত্তমান সমাজে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এদের বলা হয় "Dementia Preacx" রুগী। "ডিমেন্‌সিয়া প্রিকক্স" কি?

"Dementia Preacox comes on very frequently in consequence of some defeat in meeting the world of reality, a business catastrophe, a frustrated love affair, or some other cataclysm in patient's life. Unable to face reality, he withdraws into an imaginary world in which his wishes may be fulfilled."

(Abnormal Psychology: Edited by G. Murphy. see Intro. XXIX.)

আমেরিকায় আজ এই দিবাস্বপ্নরুগীর অন্ত নেই, আমাদের দেশে তো কথাই নেই। সুতরাং আমেরিকার হিপ্‌নোটিক এসোসিয়েশনের মতন আমাদের দেশের সাধু-সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক, যাদুকর এবং ক্রিমিনাল ব্যবসাদাররাও বেঁচে আছে, ব্যবসাও তাদের ভালই চলছে। দেশের সাধারণ অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এই সব ব্যবসাদারদের খপ্পরে পড়ে প্রতিদিন ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, হতাশা জড়তা ও অবসাদের ঘোর অন্ধকারে আত্মহত্যা করছে।

পাঁজির বিজ্ঞাপনের শ্রী

যেমন পাঁজির বিজ্ঞাপনের বিষয়-বস্তু, তেমনি তার শ্রী। ভাল বিজ্ঞাপন যা-ও বা কিছু থাকে তার কদাকার চেহারা দেখলে আৎকে উঠতে হয়। নার্সারীর বিজ্ঞাপনে বড় বড় মূলোর চেহারা না দিলেই কি চলে না? আর সালসা রসায়নাদি বিজ্ঞাপনে পালোয়ানদের চেহারা দেখলে কারও ঐ অমৃতসুধা পান করে পালোয়ান হবার ইচ্ছে হবে না। স্বাস্থ্যের ইঙ্গিত আরও সুস্থভাবে দেওয়া চলে। আর "Female Beauty Round the World", "নারীর নগ্ন ছবি", "প্রেমে পড়া ও বশ করা বিজ্ঞাপন-চিত্র" যা পাঁজির পাতায় ফলাও করে ছাপা হয়, তার ফলাফল কি? প্রত্যেক পরিবারেই ছোট ছেলেমেয়েরা আছে, বয়স্কা অবিবাহিতা ও সদ্য বিবাহিতরা আছে, বাপ মা ভাই বোন আছে। পাঁজির এই বিজ্ঞাপনের শ্রী এবং বিষয়-বস্তুর কথা স্মরণ রেখে ভেবে দেখুন, পাঁজি সকলের হাতে দেওয়া যায় কি? না দিলেও দেখা যায় প্রত্যেক ঘরে-ঘরে ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে মেয়েরা, দিনের বেলা শুয়ে-শুয়ে একমনে পাঁজি পড়ে। কি পড়ে তারা? পণ্ডিতদের জ্যোতিষ গণনার কথা নয়, বিজ্ঞাপন নার্সারীর বিজ্ঞাপন নয়, এই সব আজব আয়না, কোকশাস্ত্র প্রেমের দড়ির বিজ্ঞাপন। তার সামাজিক ও পারিবারিক ফলাফলের কথা যে কেউ সহজেই কল্পনা করতে পারেন।

রাষ্ট্রনেতা ও সমাজনেতাদের দায়িত্ব

আজ আমাদের "স্বাধীন জাতীয় সরকার" সমাজের সুশিক্ষা ও সুনীতির জন্য অনেক পরিকল্পনা করছেন শুনতে পাই। চলচ্চিত্রে তাঁরা চুম্বন নিষিদ্ধ করেছেন, কোন রকম অশোভন ছবি তাঁরা বরদাস্ত করবেন না বলেছেন। ভাল কথা। কিন্তু সিনেমা যারা জীবনেও দেখেনি, এ-রকম লক্ষ লক্ষ দেশের লোক পাঁজি নিয়মিত দেখে ও পড়ে। তাদের ভবিষ্যৎ কি? জাতীয় নেতারা, সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষীরা উত্তর দেবেন কি? বুনিয়াদী শিক্ষার (Basic Education) বড়-বড় বুলি আমরা রোজই শুনছি। কিন্তু শহরে ছেলেমেয়েদের বুনিয়াদী শিক্ষা রাস্তা-ঘাটের কুৎসিত সাইনবোর্ড বিজ্ঞাপন থেকে শুরু হয়, আর ঘরে তাদের বুনিয়াদী শিক্ষার পত্তন হয় পাঁজি থেকে। ঘরের পাঁজি থেকে বাইরের রাস্তার কুৎসিত অশ্লীল বিজ্ঞাপনের মারফৎ যে বুনিয়াদী শিক্ষা আমাদের সমাজে চালু রয়েছে তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলার, কোন আইন জারী করার এবং তাকে সমাজবিরোধী দণ্ডনীয় অপরাধ বলে রাষ্ট্রিক ঘোষণা করার সময় হয়নি কি আজও? শিশুরাষ্ট্রের বুনিয়াদী শিক্ষা যদি পাঁজির পাতায় হয় তাহলে সে শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবতেও যে ভয় হয়!

বাংলা দেশের প্রচার-পদ্ধতি

দীনেশ দত্ত (বার্মা শেল)

বাংলা দেশে পুকুরঘাটে বা 'বাবুদের' বৈঠকখানায় প্রচারের কোনও অভাব কোনও দিন ছিল না, আজও নেই। অবশ্য তার পদ্ধতির বিশ্লেষণ করতে যাওয়া সমীচীন হবে না। 'ওলো শুনেছিস্ সই, আমাদের বাড়ীর বড়বাবু বলছিলেন যে এ গাঁয়ের কাছাকাছি কোথায় না কি একটা চিনির কল খোলা হবে।' 'হ্যাঃ, তা আর জানি নে। আমাদের বাড়ীর বাবুরা বলাবলি করছিলেন যে যত বদমায়েসীর এবার ষোলকলা পূর্ণ হবে।' এ ভাবে সংবাদ প্রচার আবহমান কাল থেকে নিয়মিত ভাবে চলে আসছে। সহরে অবশ্য আবহাওয়ার ও সাধারণ জ্ঞানের কিছু পার্থক্য থাকায় ভাবধারাও স্বতন্ত্র। এখানে, মোড়ের চায়ের দোকানে বা রোয়াকে যে সব সান্ধ্য-বৈঠক বসে তাতে কথাবার্তার গণ্ডী আরও একটু পরিসর হয়। সেখানে রাজনীতি, ব্ল্যাক মার্কেট, ষ্টক এক্সচেঞ্জ থেকে স্বামীহরণ অবধি সব আলোচনাই করা হয়। হয়ত এ-হেন একটি বৈঠকের সব-কিছু লিপিবদ্ধ করা গেলে দেখা যাবে, একটি ছোটখাট সংবাদ-পত্রের সব খবরই তার মধ্যে আছে। সিনেমা, থিয়েটার, গান-বাজনার কথা ত এ ধরণের বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ প্রথা যে শুধু বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ তা নয়, ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই এবং প্রায় সব সমাজেই অল্প-বিস্তর এ-ধরণের বৈঠকের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

পুরানো আমলে পাশ্চাত্য দেশেও এক রকম প্রথায় গ্রামের বা সহরের সংবাদ সংগ্রহ করা হত—ধনীরা একটি বলিয়ে-কইয়ে লোক নিযুক্ত করতেন যিনি তাঁদের প্রতিদিন সব খবর দিয়ে যেতেন; তা সে 'সু'ই হক বা 'কু'ই হক। যাত্রা, বাইনাচ, পুতুলনাচ, কুস্তি ইত্যাদি ত তার মধ্যে থাকতই। এই ব্যক্তিদের বলা হত 'গেজেটিয়ার'। সম্ভবতঃ এখনকার 'গেজেট' কথার জন্ম এর থেকেই হয়েছে। প্রাচ্য দেশেও এই প্রথায় সংবাদ সংগ্রহের কথা জানা যায়। ভারতবর্ষের পুরাণে দেখা যায়, ত্রেতা যুগেও না কি এই রকম এক চরিত্রের সৃষ্টি করা হয়েছিল। খবর সকলেই চায়, দেবতাদের মধ্যেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। নারদ মুনি না কি তেত্রিশ কোটি দেবতাদের খবর সরবরাহ করতেন। যে কোনও স্থূলশরীরবিশিষ্টের পক্ষে একা এ কাজ সম্ভব নয়, সেই জন্য তাঁকেও দেবতা হতে হয়েছিল। তিনি উত্তেজক খবর দেওয়ার ফলে, বর্ত্তমান যুগের Herr Hessএর মত দেবাদিদেব মহাদেবকে দিয়ে প্রলয় এনে ফেলেছিলেন।

ঢ্যাঁট্রা পিটে জনসাধারণকে ঘোষণা জানাবার রীতিও বহু পুরাতন। এখনও এই প্রথায় পল্লীগ্রামে বা সহরে সরকারী নির্দ্দেশ জানান হয়। বর্ত্তমান যুগে এরই একটা আধুনিক সংস্করণ দেখা যাচ্ছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় থেকে মোটর লরীতে রেডিও এমপ্লি-ফায়ার লাগিয়ে রাস্তায় রাস্তায় সরকারী ঘোষণা জানিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ হয়েছে। ভারতবর্ষে অশিক্ষিতের সংখ্যা বেশী হওয়ায় এ ভাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার রীতি অত্যন্ত কার্য্যকরী হয়েছে।

সম্রাট্ অশোকের সময় শিলালিপির দ্বারা জনসাধারণকে সরকারী ঘোষণা জানান হত। সম্রাট্ যখন কালাপাহাড় অবস্থা থেকে বৌদ্ধ সম্রাট্ প্রিয়দর্শী হলেন, তখন সারা দেশে তিনি এই মাধ্যমের (Media) দ্বারাই জনসাধারণের নিকট তাঁর অহিংসা নীতি প্রচার

(কালো-বাজার বন্ধ কর)

করেছিলেন। এ প্রথায় প্রচার-কার্য্য যদিও সুরুচির পরিচয় দেয় কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। স্থায়িত্বের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে অবশ্য এর সঙ্গে কোনও প্রচার মাধ্যমই দাঁড়াতে পারে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অচল অটল অবস্থায় শিলালিপি তার বিজ্ঞপ্তি জনসাধারণকে জানিয়ে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"পাঠকের মতো তুমি ব'সে আছো অচল আসনে,
সনাতন পুঁথিখানি তুলিয়া লয়েছো অঙ্ক-পরে।
পাষাণের পত্রগুলি খুলিয়া গিয়াছে থরে থরে
পড়িতেছ একমনে। ভাঙ্গিল গড়িল কত দেশ
গেল এলো কত যুগ—পড়া তব হইল না শেষ।"

পাণ্ডুলিপির দ্বারা প্রচার-কার্য্যের কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। প্রচার মাধ্যম হিসাবে পাণ্ডুলিপির ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ। বর্ত্তমান

(কালো-বাজার নয়—নিয়ন্ত্রিত মূল্য)

(গ্লিসারিন সাবান—বেঙ্গল কেমিক্যাল)

যুগে পাণ্ডুলিপি মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকারূপে দেখা যায়; কিন্তু দশ হাত ঘোরার পর এ ধরণের পত্রিকার আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

তার পর এল মুদ্রণের যুগ। সংবাদ-পত্রের সৃষ্টি হল। সংবাদ-পত্রের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞপ্তি ও বিজ্ঞাপনের প্রচলন দেখা গেল। শিল্প-পতিরা শিল্পের প্রসারের জন্য বিজ্ঞাপনরূপী প্রচার মাধ্যমের শরণাপন্ন হলেন। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন ধীরে ধীরে কার্য্যকরী হয়ে উঠল। শিল্পপতিরা দেখলেন, এই মাধ্যমের দ্বারা অল্প খরচে বহু পাঠকের কাছে তাঁদের প্রচার-বার্ত্তা পৌঁছে যাচ্ছে। বাংলা সংবাদ-পত্রের সৃষ্টি ও বাংলা বিজ্ঞাপনের প্রসারও ক্রমশঃ দেখা গেল। সে যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে 'বসুমতী' অন্যতম। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' 'যুগান্তর' ইত্যাদির জন্ম হয়েছে পরবর্ত্তী কালে। সংবাদপত্র এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য্য বস্তু হয়ে পড়েছে এবং সেই জন্য সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনকে প্রচার-কার্য্যের একটি বিশেষ মাধ্যম বলে গণ্য করা যায়। চারুশিল্পীরাও কালের গতির সঙ্গে পা ফেলে চলেছেন। বর্ত্তমান যুগে ভারতীয় বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা বা নক্সা (Advertisement lay out) পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনায় বিশেষ পিছিয়ে নেই।

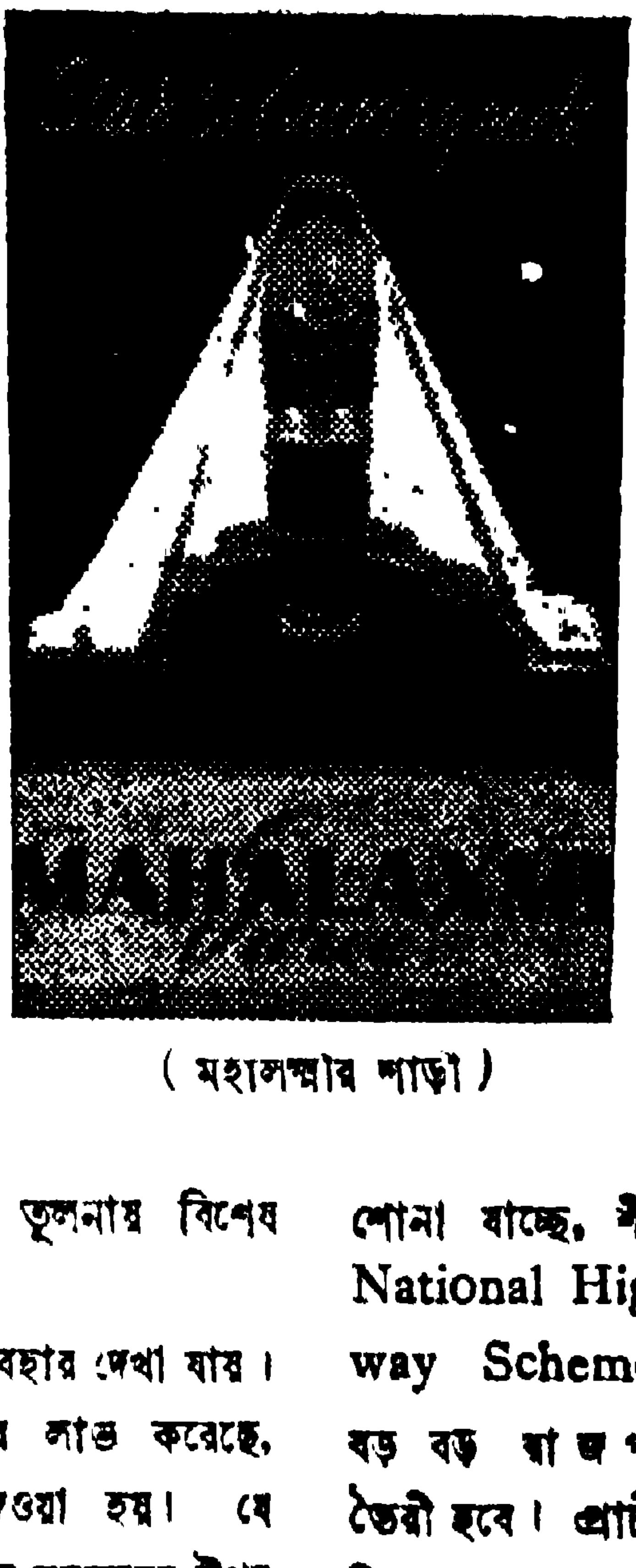
(মহালক্ষ্মীর শাড়ী)

প্রচার-কার্য্যে নানারূপ মাধ্যমের (Media) ব্যবহার দেখা যায়। পাশ্চাত্যে বা মার্কিণ দেশে প্রচার-কার্য্য খুবই প্রসার লাভ করেছে, কারণ, সে দেশে প্রচারতত্ত্বকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। যে কোনও ব্যবসায়ে প্রচার-কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে করতে হলে মনস্তত্বের উপর কিছু জ্ঞান থাকা উচিত। জনসাধারনকে কখন কি ভাবে আকর্ষণ বা আক্রমণ করতে হবে তা জানতে হলে জনসাধারণের মনের খবর কিছুটা রাখতেই হবে। কৃতকার্য্য হওয়ার মূল ভিত্তিই হল এইখানে। এই ধরণের প্রচার-কার্য্যকেই বৈজ্ঞানিক প্রচার (Scientific advertising) বলা হয়।

প্রাচীর-পত্র (poster) এবং প্রাচীর চিত্র (hoarding) এই দুইটি প্রচার মাধ্যমের বর্ত্তমান যুগে এদেশে খুবই প্রচলন হয়েছে। প্রাচীর ও প্রাকারের যুগ যখন ছিল তখনই প্রাচীর-পত্র ও প্রাচীর-চিত্রের সৃষ্টি হয়। মিশর দেশে এই দুই প্রথায় বিজ্ঞপ্তি জানানর রীতি ছিল। পরবর্ত্তী কালে পাশ্চাত্যে এই দুইটি মাধ্যমের বিশেষ উন্নতি সাধন করা হয়। আধুনিক প্রাচীর-পত্র এক রকম পাতলা কাগজে ছাপা হয়। সংখ্যায় সাধারণতঃ এগুলি হাজার হাজার এবং মুদ্রণের সুবিধার জন্য Offset মুদ্রণ-কৌশলে ছাপা হয়। রং এবং ভাষার পারিপাট্য এই মাধ্যমের প্রধান অঙ্গ। প্রাচীর-পত্র চিত্রে এবং ভাষার চটকে এক লহমায় জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করে। দেশী এবং বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি এই মাধ্যমের নিয়মিত ব্যবহার করেন। ইদানীং সরকারী প্রচার-কার্য্যেও ইহার ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। নিদর্শন-স্বরূপ এই প্রবন্ধের সঙ্গে কয়েকটি সাময়িক সমস্যা সংক্রান্ত প্রাচীর-পত্রের ছবি দেওয়া হ'ল। যদিও এগুলি ইংরাজীতে ব্যক্ত করা হয়েছে, কিন্তু প্রায় সবগুলিই বাংলায় অনায়াসে অনূদিত হতে পারে। প্রাচীর-চিত্রেরও আধুনিক ব্যবহার কলিকাতায় প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। মধ্যযুগে বিদেশী ব্যবসায়ীরা তাঁদের দেশ থেকে তাঁদেরই চারুশিল্পীদের দিয়ে চিত্রাঙ্কণ করিয়ে এদেশে প্রচার করবার জন্য আনতেন: কিন্তু দেখা গিয়েছিল, তার ফল বিশেষ সুবিধাজনক হয়নি। পরে তাঁরা দেশীয় শিল্পীদের শরণাপন্ন হলেন এবং এই পরিবর্ত্তনে দেখা গেল, তাঁদের প্রচার অনেক বেশী কার্য্যকরী হয়েছে। প্রাচীর-চিত্রকে একটি বড় মিউর্যাল চিত্র বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এগুলি খুব বড় বড় হয়; সাধারণতঃ ১২ × ৮ ফিট এবং কখনও কখনও ১২ × ২০ ফিট হয়। উদ্দেশ্য হল, বহু দূর থেকে যাতে পথচারী এগুলি দেখতে পান। ভারতবর্ষ একটি প্রকাণ্ড দেশ। এখানে এখনও বিশেষ ভাবে দেশব্যাপী রাস্তার সৃষ্টি হয়নি। শের শার আমলের গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডই এখনও আমাদের একমাত্র প্রশস্ত দেশব্যাপী রাজপথ!

(আরও ফসল বাড়াও)

শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই National Highway Scheme-এ বড় বড় রাজপথ তৈরী হবে। প্রাচীর-চিত্রে আশা করি তখন সারা দেশ ছেয়ে যাবে। কয়েকটি বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান এখনই প্রচারের এই মাধ্যমটির বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন।

(ভারতীয় চা)

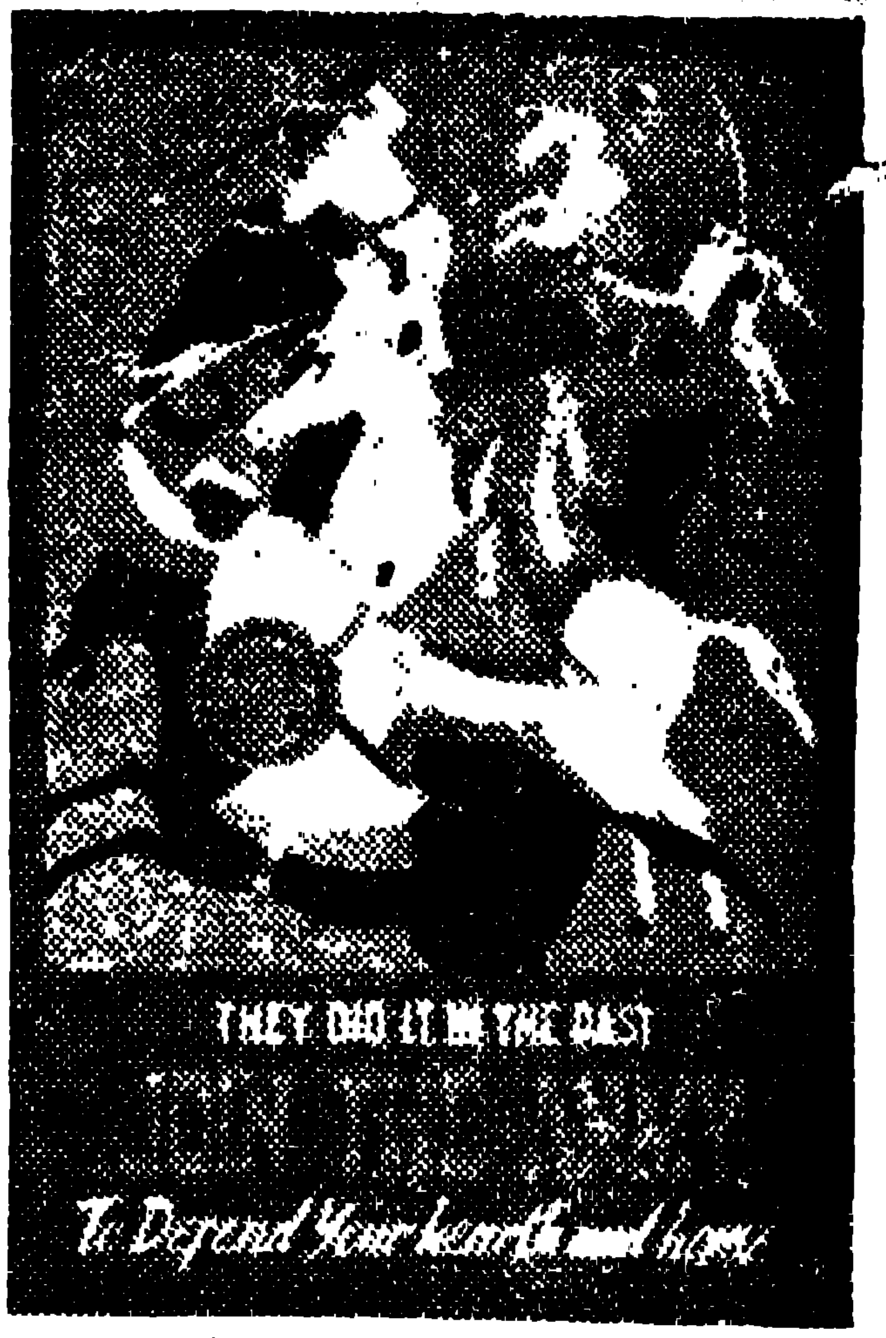

(সৈন্য বিভাগে যোগ দিন)

প্রাচীর-চিত্র যে শুধু চিত্রাঙ্কণেই দেখান যায় তা নয়। একটি বিশিষ্ট তামাক-ব্যবসায়ী সম্প্রতি কলিকাতায় বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে প্রাচীর-গাত্রে কাঁচি সিগারেটের একটি চালু বিজ্ঞাপন (Neon sign) দেখাচ্ছেন। দেখা যায়, কাঁচিটি সব সময় কেটেই চলেছে। এই বিজ্ঞাপনটি একটি বড় বাড়ীর চারতলার গায়ে দেওয়ার জন্য প্রায় ৩ মাইল দূর থেকে দেখা যায় এবং রাত্রের অন্ধকারে মনে হয়, আকাশের গায়ে কোন যাদুকর তার ভেল্কী দেখিয়ে চলেছে। এ এক অভিনব আলেয়া। কলিকাতায় চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়ালে বর্ত্তমান যুগের বৈদ্যুতিক প্রচার-কার্য্যের কিছু নমুনা পাওয়া যায়। বর্ষপঞ্জী (Calendar) প্রচারের অন্যতম মাধ্যম। এই মাধ্যমটি নীরবে ৩৬৫ দিন ধরে নিজেকে প্রচার করে চলে। অবশ্য ইহাতে এমন একটি ছবি দেওয়া উচিত যে, মানুষ তার দিকে দিনের পর দিন চেয়ে থেকে যেন শ্রান্ত হয়ে না পড়ে। বর্ত্তমান যুগে শিল্পপতিদের মধ্যে প্রচারের এই মাধ্যমটির ব্যবহারও খুব বেশী দেখা যাচ্ছে। প্রচার-সাহিত্যের (Publicity literature) অর্থাৎ পুস্তিকা (booklet), হ্যাণ্ডবিল, ব্লটিং-পেপার ইত্যাদির ব্যবহার ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছে। শিল্পমূলক চলচ্চিত্র (Documentary films) এবং বেতারের মধ্য দিয়ে প্রচারের রীতিও এদেশে ধীরে ধীরে স্থান পাচ্ছে। মনে হয়, ৫।১০ বছরের মধ্যেই এই দুইটি মাধ্যমের আরও অনেক উন্নতি হবে। বাংলা দেশে প্রচার-কার্য্যের বিশেষ উন্নতি দেখা দিয়েছে। সম্ভবতঃ আমরা, বাঙ্গালীরা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ জাতি বলিয়া, সামান্য প্রচারেই এখানে কার্য্যোদ্ধার হয়। অবশ্য শিল্পপতিদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, ভিত্তিহীন প্রচারের কোনও দাম নেই অর্থাৎ প্রচারের মূলে কিছু সত্যের বিকাশ থাকা চাই। মিথ্যা আড়ম্বরে ব্যবসায়ের ক্ষতিই হয়, উন্নতি হয় না। জনসাধারণ মিথ্যা প্রচারে ভুলে একবারই ঠকে, বারে বারে ঠকে না।

সামান্য মুখের কথায় কারও নির্দ্দেশ কিংবা নিষেধ যাই বলুন না কেন, সাধারণতঃ কেউ কানেই শুনতে চায় না। ঠাকুর তাই অনেক দুঃখে বলেছিলেন,—'কারেই বা বলবো, কেই বা বুঝবে।'

সাধারণ মানুষের মুখের কথা তো কেউ শুনতেই চায় না, আর তার প্রভাব অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পরিস্থিতির ভেতর সীমাবদ্ধ থাকে।

সে জন্য এই প্রচার-কলার বিকাশ। শিল্প আর সাহিত্যের এমন অপূর্ব যোগাযোগের আর অন্য কোন মাধ্যম নেই—যা শিক্ষিত ও

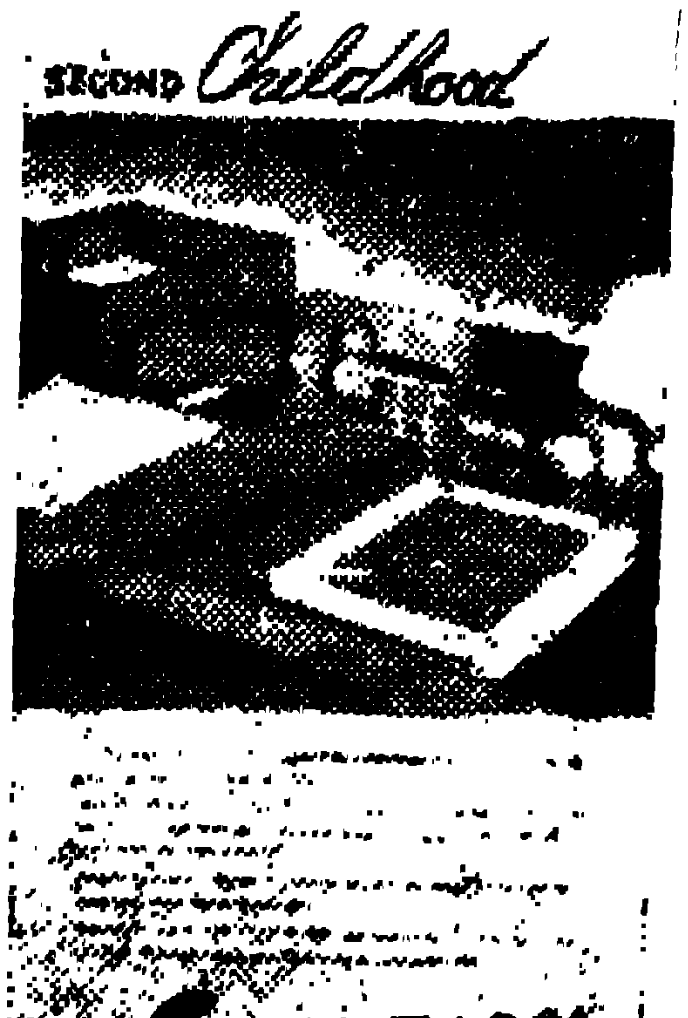

(কা[illegible]ও)

অশিক্ষিতের চোখে ও মনে সমানে আলোকপাত করতে পারে। তাই ছবি এঁকে আর কাব্য ক'রে মানুষকে জানিয়ে দিতে হয়, কালোবাজার সমর্থন করবেন না; শীতকালে গ্লিসারিন মাখতে পারেন; মহালক্ষ্মীর কাপড় পরলে বেশ মানাবে; ভারতীয় চায়ের তুলনা হয় না; খাদ্যাভাবের দিনে আরও ফসল চাই; কাগজ না থাকলে যতটা পারেন কম কাগজ ব্যবহার করুন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সত্যিই প্রচার-কলার কী অদ্ভুত ক্ষমতা।

ভারতের গবর্ণর জেনারেল শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী

শ্রীধর কথক

[শ্রীধর কথক প্রতি মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয় আমাদের উপহার দেবেন। এই সংখ্যায় ভারতের রাষ্ট্রপাল রাজাজীর জীবন-কাহিনী পাঠ করুন]

ভারতের জননায়ক ও রাজনীতিবিদ্‌দের মধ্যে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি বরাবর যে দূরদৃষ্টি ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে সকলের শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছে। রাজাজীর সহিত রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁহাদের মত-বিরোধ আছে, তাঁহারাও তাঁহার বাস্তব বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। কথায়-বার্তায় ও আচরণে রাজাজীর মার্জিত ব্যবহার তাঁহাকে সকলের প্রিয়পাত্র করিয়া তুলিয়াছে। রাজাজীর ঘটনাবহুল জীবন নানা দিক দিয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে ১৮৭৯ সালে দক্ষিণ-ভারতের সালেম জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রামে এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে রাজাজী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা চক্রবর্তী আয়েঙ্গার গ্রাম্য মুনসেফ ছিলেন। রাজাজীর শিক্ষা আরম্ভ হয় বাঙ্গালোরে এবং তাহা সমাপ্ত হয় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে। ছাত্রাবস্থায় তিনি তীক্ষ্ণধী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। মাদ্রাজে আইন অধ্যয়নের সময় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসেন। স্বামীজীর বিরাট ব্যক্তিত্বের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে রাজাজী দেশসেবার নব আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন। অধঃপতিত দেশবাসীর কথা চিন্তা করিয়া তিনি তাহাদের কল্যাণ সাধন নিজ জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯০০ সালে রাজাজী সালেমে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় তাঁহার সমাজ-সংস্কারের কাজ। রাজাজী খুব শীঘ্র উকিল হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সময়ে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও মদ্যপান নিবারণের জন্য রাজাজী সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এ জন্য তিনি প্রচুর অর্থব্যয়ও করেন। অস্পৃশ্যতার লীলাস্থান দক্ষিণ-ভারতে তাঁহার সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া যে কিরূপ আকারে দেখা দিবে, রাজাজী সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, সমাজের রক্ষণশীল দল তীব্র বিরোধিতা করিয়া তাঁহার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। সমাজ-সংস্কার চেষ্টার ফলে তাঁহাকে 'একঘরে' হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু এ সব জানিয়া-শুনিয়াও রাজাজী এক মুহূর্তের জন্যও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। রাজাজী যাহা বিশ্বাস করেন, তদনুযায়ী কাজ করিবার মত মানসিক দৃঢ়তা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। জীবনের বহু সংকটময় মুহূর্তে রাজাজীকে নিজ বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য চরম বিপদের ঝুঁকি লইতে হইয়াছে। লোকনিন্দা, অখ্যাতি ও ব্যক্তিগত বিপদ-আপদ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি বরাবর নিজ বিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করিয়া গিয়াছেন। তরুণ বয়স হইতেই তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সালেমে রাজাজী তাঁহার নিজ গৃহে বিভিন্ন জাতির একত্র পান-ভোজনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করেন। সালেম মিউনিসিপ্যালিটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি সহরের ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত অঞ্চলে হরিজনদিগকে কর্মে নিযুক্ত করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ব্রাহ্মণ ও উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু ছাত্রদের হোষ্টেলে হরিজন বালক কর্মে নিযুক্ত হয়। রাজাজীর এই সমস্ত কার্য্যকলাপের পরিণাম চিন্তা করিয়া তাঁহার পিতা আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। তিনি রাজাজীকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজাজী তাঁহার সংকল্পে অবিচলিত থাকেন। গোঁড়া রক্ষণশীল সমাজ রাজাজীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করে। সমাজে রাজাজীকে 'একঘরে' করিয়া রাখা হয়। কিন্তু রাজাজী ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা সম্পর্কে রাজাজীকে বিপদে পড়িতে হয়। সমাজের কেহই তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে রাজী হন না। রাজাজী বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে বৈদিক রীতি অনুযায়ী পিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। অস্পৃশ্যতা তাঁহার নিকট ঘৃণ্য পাপ বলিয়া মনে হয় এবং দক্ষিণ-ভারতে এই পাপ দূরীকরণের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হন। সমাজের ভ্রূকুটি, ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি, কোন কিছুই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। অস্পৃশ্যতা দূর করিতে গিয়া রাজাজীকে যে কত প্রকার বিঘ্ন-বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দক্ষিণ-ভারতের তিরুচেনগোদে নামক স্থানে রাজাজী যখন গান্ধী-আশ্রমের পরিচালক, তখন একবার তাঁহাকে বিশেষ বিপদে পড়িতে হয়। রাজাজীর আশ্রমে হরিজন ও ব্রাহ্মণ একসাথে বাস করিতেন। এক দিন দুই জন স্থানীয় স্ত্রীলোক দেখিতে পাইল যে আশ্রমের প্রাঙ্গণে দুই জন আশ্রমবাসী নীচে মাথা রাখিয়া ও উপরে পা তুলিয়া যৌগিক প্রক্রিয়া অভ্যাস করিতেছে। তাহারা স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিল যে, রাজাজীর আশ্রমে ঘোরতর অনাচার চলিতেছে। আশ্রমবাসীরা আকাশের দিকে পা করিয়া আকাশকে ব্যঙ্গ করিতেছে এবং ইহার ফলে আকাশ ক্রুদ্ধ হওয়ায় ঐ স্থানে বৃষ্টি হইতেছে না। এইরূপ প্রচার-কার্য্য হাস্যকর মনে হইলেও অশিক্ষিত গোঁড়া জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ প্রচার-কার্য্যের

ফল যে কিরূপ মারাত্মক হইতে পারে, তাহা অনেকেই জানেন। রাজাজী অবিচলিত ভাবে সমাজের এই সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিয়া তাঁহার কাজ করিয়া যাইতে থাকেন।

রাজাজীর সহিত গান্ধীজীর প্রথম পরিচয় খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। রাওলেট আইন সম্পর্কিত আন্দোলনের সময় গান্ধীজী মাদ্রাজ সফর করেন। তিনি মাদ্রাজে রাজাজীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাজাজীর গৃহে অবস্থান কালে গান্ধীজী বিশেষ ভাবে কর্মব্যস্ত থাকেন—দিবা-রাত্র লোক-জন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে থাকে। এই কর্মব্যস্ততার মধ্যে গৃহস্বামীর খোঁজ লইবার কথা গান্ধীজীর মনে হয় নাই। গৃহস্বামী রাজাজীও অতি সন্তর্পণে নিজেকে আড়াল করিয়া রাখেন।' মহাদেব দেশাই রাজাজীর অসাধারণত্বের প্রতি গান্ধীজীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। তখন গান্ধীজীর সহিত রাজাজীর আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয় এবং গান্ধীজী তাঁহার চিন্তাশক্তি ও তীক্ষ্ণধার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন। রাজাজী গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ মন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী কালে দেশের স্বাধীনতার জন্য অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করেন। গান্ধীজীর প্রিয় পার্শ্বচরদের মধ্যে রাজাজী অন্যতম। গান্ধীজী রাজাজীকে সত্যাগ্রহ নীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মনে করিতেন। গান্ধীজী-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহের রীতিনীতি সম্পর্কে রাজাজীর ধারণা এত সুষ্ঠ ছিল যে, অনেকেই মনে করিত যে, গান্ধীজী রাজাজীর সহিত পরামর্শ করিয়া সত্যাগ্রহের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন। রাজাজীর বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রতি গান্ধীজীর চিরদিন বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে রাজাজী অসাধারণ সংগঠন-শক্তির পরিচয় দেন। আবার দেশ-শাসক হিসাবেও তিনি যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী, মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তিনি তাঁহার পরিচয় দেন। মাদ্রাজে তাঁহার নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত কংগ্রেস মন্ত্রিসভা বৃটিশ শাসকদেরও প্রশংসা অর্জন করে। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের অন্যতম নায়ক হিসাবে রাজাজী বহু বৎসর কংগ্রেস পরিচালনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। রাজাজী কোন দিন অন্ধ ভাবে কোন কিছু সমর্থন করেন নাই। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তিনি প্রত্যেক জিনিষ বিচার করিয়া দেখেন। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তিনি গম্ভীর ভাবে ভবিষ্যৎ ফলাফলের কথা চিন্তা করেন। এই সব কারণে তিনি যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেন, প্রায়ই তাহা সত্যে পরিণত হয়। রাজাজীর সহিত তাঁহার সহকর্মীদের যে কখনও মতানৈক্য ঘটে নাই, তাহা নহে। কিন্তু মত-বিরোধ হওয়া সত্ত্বেও রাজাজী কোন দিন তাঁহার সহকর্মীদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা হতে বঞ্চিত হন নাই। রাজাজীর প্রতিভা কেবল মাত্র রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই, তিনি জীবন-শিল্পী। তিনি জীবনকে নানা দিক্ হইতে উপভোগ করিয়াছেন। রাজাজী এক জন সুলেখক। তাঁহার ছোট গল্পগুলি গভীর রসবোধের পরিচায়ক। রাজাজীর বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনা হইতে তাঁহার রসজ্ঞান ও পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজাজীর ধৈর্য্য অনন্যসাধারণ। অত্যন্ত উত্তেজনার মুহূর্ত্তেও তিনি ধীর-স্থির ভাবে কাজ করিতে পারেন। রাজাজীর অসাধারণ ধৈর্য্য সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। আগষ্ট আন্দোলনের সময়ে একবার তিনি বোম্বাইএ বক্তৃতা করিতে-ছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে এক দল তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আলকাতরা নিক্ষেপ করিতে থাকে। কিন্তু ইহাতেও রাজাজীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই। তিনি বিক্ষুব্ধ জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, You can force me to change my clothes but not my opinion অর্থাৎ আপনারা আমাকে আমার পোষাক পরিবর্তন করিতে বাধ্য করিতে পারেন কিন্তু আপনারা আমার মত পরিবর্তন করিতে পারিবেন না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণই রাজাজীর প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য রাজাজীর কর্মপ্রচেষ্টা সুবিদিত। ১৯৪৮ সালের ২১শে জুন তারিখে রাজাজী ভারতে প্রথম ভারতীয় গবর্ণর জেনারেল হিসাবে দেশ-শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিরাট দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত শক্তি তাঁহার আছে। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে ভারত অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হইবে, আমরা ইহাই বিশ্বাস করি।

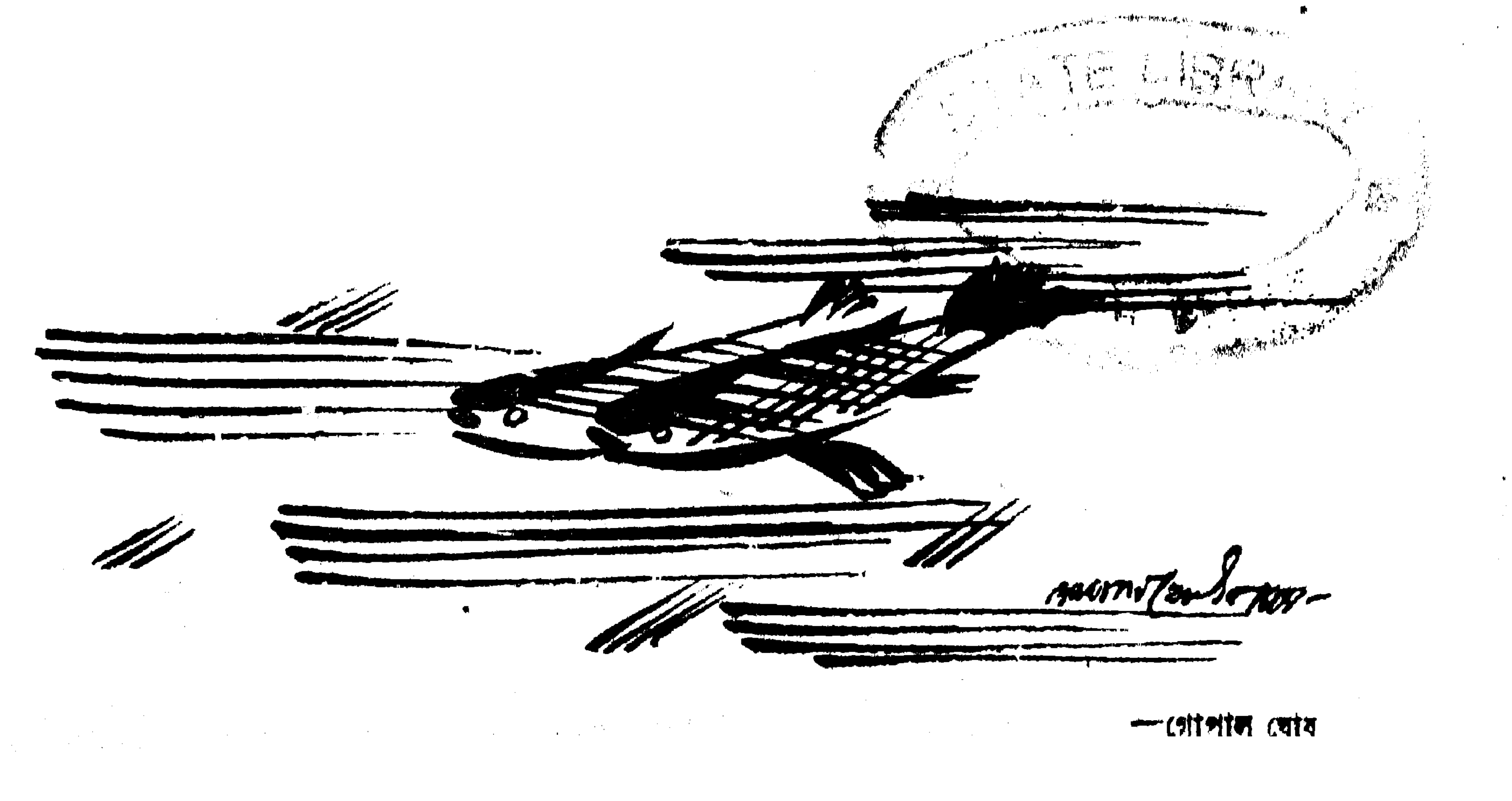

—গোপাল ঘোষ

আমেরিকার কথাসাহিত্যিক

এডগার এ্যালেন পো

অজয়কুমার ভাদুড়ী

আমেরিকার সাহিত্য-জগতে যাঁরা দিক্‌পাল, এডগার এ্যালেন পো তাঁদের এক জন। যে স্বল্প কাল বেঁচে ছিলেন তিনি পৃথিবীতে তার মধ্যেই তাঁর ছোট গল্প, কবিতা বিদ্বৎ-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইউরোপ ও আমেরিকায় দুই মহাদেশেই তাঁর লেখার সমাদর হয়েছে এবং জীবিত কালেই সাহিত্য-জগতে তাঁর স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে পেরেছেন তিনি। আমেরিকায় তিনি এক জন বাস্তব কবি, বিশ্লেষক, গোয়েন্দা গল্পের প্রথম পথপ্রদর্শক।

পো'র সমসাময়িক ফরাসী কবি গুঁটেয়ার ও বোদলেয়ার—দের এক জন আবার প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকও বটে—পো'কে বলতেন আমেরিকার উদীয়মান প্রতিভা। তাঁরাই পো'র লেখা ফরাসী সমাজে পরিচিত করিয়েছেন। এই সুযোগে পো'র যশঃসৌরভ অল্পকালের মধ্যেই সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। পো'র মৃত্যুর চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই সুইডিশ, ইতালীয়, ড্যানিশ ও স্প্যানিশ প্রভৃতি দশটি বিভিন্ন ভাষায় তাঁর সমস্ত লেখার অনুবাদ নতুন করে প্রকাশিত হয়েছে।

আমেরিকায় পো ছোট গল্পের এমন একটি দিক্‌ প্রবর্তন করে গেছেন যা আজও একটুও পুরোনো হয়নি। "দি ব্ল্যাক ক্যাট", "দি ফল অফ দি হাউস অফ উসার", "দি পিট অ্যাণ্ড দি পেণ্ডুলাম", "দি মাস্ক অফ দি রেড ডেথ", "দি কাস্ক অফ এ্যামনটিলাডো" ও "দি টেল-টেল হার্ট" প্রভৃতি লোমহর্ষক গল্পগুলি আতংক ও ভীতি উৎপাদক রচনা হিসেবে অতি সার্থক ও অনবদ্য সৃষ্টি। এই অসম্ভব, অস্বাভাবিক গল্পগুলি পড়তে পড়তে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে, আবার কিছুটা যুক্তিরও ধার ঘেঁসে চলায় মুহূর্তে মনকে এমন এক রহস্যময় রাজ্যে উড়িয়ে নিয়ে আসে যার সঙ্গে বাস্তবতার লেশমাত্র সংস্পর্শ নেই—কিন্তু যা সহজে মন থেকে মুছেও ফেলা যায় না। অর্থাৎ অবিশ্বাস্য হলেও গল্পগুলিকে একেবারে হেসে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন।

কিন্তু পো'র এই উদ্দাম কল্পনার সঙ্গে সমান তালেই তাল রেখে গেছে পো'র ক্ষুরধার বিশ্লেষণ-শক্তি। তিনি এমন কতকগুলি রহস্য-নিগূঢ় গোয়েন্দা গল্প রচনা করে গেছেন যেখানে কূট বিচার-বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-প্রতিভা অফুরন্ত রহস্যকেও ছাপিয়ে গেছে। তাঁর গোয়েন্দা গল্পগুলির কাঠামো এবং রহস্য উদ্‌ঘাটন-প্রণালী এমনিই অননুকরণীয় যে "দি গোল্ড বাগ", "দি মার্ডারস ইন দি রিউ মর্গ", "দি মিষ্ট্রী অফ ম্যারী রজেট" ও "দি পারলয়েণ্ড লেটার" প্রভৃতি গল্পগুলির সমকক্ষ লেখা আজো দৃষ্টিগোচর হোল না।

কবি পো'র 'র‍্যাভন'ই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাই বলে "দি বেলস." লেনোরও কম অনবদ্য নয়। সর্বশেষ রচনা "এ্যানাবেল লী"ও একটি উৎকৃষ্ট রচনা।

সাহিত্য সমালোচক হিসাবেও পো শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করতে পারেন। মিডিয়োকার রচনার নীরসত্বের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী [illegible] অতি তীব্র ভাবে অক্লান্ত সংগ্রাম পরিচালনা করে গেছে। একটি মাত্র সমালোচনার দ্বারা তিনি হথর্নকে সাহিত্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

'This finest of finest of artists'—পো সম্বন্ধে এই হোল বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী বার্ণাড শ'র সংক্ষিপ্ত প্রশস্তি এবং হাল্কা ভাবে কোন বিশেষণ প্রয়োগ করা শ'র রীতি নয়। বস্তুতঃ, সাহিত্য-জগতে পো'র প্রভাব চিরকাল দুরতিক্রমণীয় হয়ে থাকবে।

১৮০৯ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে পো বোষ্টনের ম্যাসাচুসেট্‌সে প্রথম পৃথিবীর আলোক দেখেছেন চোখ মেলে। তাঁর বাবা জাতিতে আইরিশ। বাবা-মা দু'জনেই অভিনেতা ছিলেন—সহরে সহরে অভিনয় করে বেড়াতেন তাঁরা। পো'র বয়স যখন প্রায় তিন, তার মধ্যেই তিনি বাপ-মা দু-জনকেই হারান। তখন ভার্জিনিয়ার রিচমণ্ড সহরের জন এ্যালান নামক এক জন সদাশয় স্কচম্যান তাঁকে নিয়ে আসেন নিজের বাড়ীতে। তাঁরই দয়ায় পো'র যা-কিছু লেখাপড়া শেখা। ১৮২৬ সালে সতের বছর বয়সে পো ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। কিন্তু এই সময় তিনি উচ্ছৃংখল জীবনের ফাঁদে পা বাড়িয়ে দেন—জুয়ো খেলে বাজারে ঋণের পরিমাণ দাঁড়াল পঁচিশ শ' ডলার। কিন্তু জন এ্যালান এই ঋণ পরিশোধ করে তাঁকে নিশ্চিত জেলের হাত থেকে উদ্ধার করে বাড়ী নিয়ে আসেন। তবে তিনি পো'র কলেজীয় জীবনের এইখানেই খতম করে তাঁকে নিজের অফিসে একটি কাজে বহাল করে দেন।

পনের বছর বয়স থেকে পো কবিতা লেখা সুরু করেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই "ট্যামারলেন" যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠার। কিন্তু অপরিণত রচনা বলে অভীষ্ট ফল লাভ হোল না।

এদিকে অফিসের শ্রীহীন নীরস কাজ-কর্মে একটুও আকর্ষণ ছিল না পো'র। মনের সুখ-শান্তিও পলায়িত। শুধু গভীর হতাশা আর মর্মবেদনায় নিপীড়িত হতে লাগলেন তিনি। তাঁর প্রিয়াও সকল বন্ধন ছিন্ন করেছেন তাঁর সঙ্গে। এক দিন তাই মরীয়া হয়ে তিনি কুশ্রী জীবনের নাগপাশ ছিন্ন করে পালিয়ে এলেন বোষ্টনে। জন এ্যালান যখন তাঁর সংবাদ পেলেন তখন পো সৈন্যবিভাগে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন। সৈন্যবিভাগে তিনি সার্জেণ্ট মেজরের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স হবে কুড়ি। এর পর পালক পিতার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হওয়ায় এ্যালেন শেষ বারের মত তাঁকে ওয়েষ্ট পয়েণ্টের সামরিক কলেজে ভর্তি করে দেন। কিন্তু ছ'মাস যেতে না যেতেই অনিয়মানুবর্তিতা আর স্বেচ্ছাচারিতার দরুণ কলেজ থেকে বিতাড়িত হলেন পো।

ইতিমধ্যে পো'র স্বভাব ও চরিত্র এমন একটা বিশিষ্ট দিকে মোড় নিয়েছে যার আর পরিবর্তন হয়নি সারা জীবনের। পো মদ্যপায়ী হয়ে উঠেছেন; পো পাকা জুয়াড়ী; আর ধার করা যেন একটা দুরতিক্রমণীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছে পো'র। কিন্তু সৈন্যদলে দু'বছর তাঁকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে কাটাতে হয়েছিল। এই নিয়মানুবর্তিতা আর সংযমকেই তিনি আজীবন কামনা করে গেছেন। সংযত জীবনই ছিল তাঁর জীবনাদর্শ। হয়ত পালক পিতার ব্যয়কুণ্ঠতাই তাঁকে জুয়াড়ীর জীবনে প্রলুব্ধ করেছিল। পো'র কামনা-কল্পনা ছিল অপরিসীম, আশা-আকাংখা গগনচুম্বী, যার সঙ্গে এই ব্যয়কুণ্ঠতা কিছুতেই খাপ খেতে পারে না। সৈনিকের জীবন হয়ত তাঁকে শাসন-শৃংখলার পথে চালিত করতে পারত [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে তিনি পেয়েছেন মরুদের হাতছানি

যেখানে দারিদ্র্য ও মিতাচারের কড়া শাসন অসহ্য। পো দেখতে ছিলেন অপরূপ সুন্দর, তেমনি সাজতে-গুজতেও ভারী ভালবাসতেন তিনি। এমন কি দুঃখ-দৈন্যের কঠোর দিনগুলিতেও সুবেশ পরিধান করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। পোর হাত-পার আঙুলগুলি ছিল মেয়েদের মত অতি পেলব, কিন্তু শরীরে শক্তি ছিল জোয়ান মরদের। পো এক জন ভাল কুস্তিগীরও বটে। ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি লাটিন আর ফ্রেঞ্চে খুব সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনখানি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর, কিন্তু অর্থের দিক্ থেকে কোনই সুরাহা হোল না। এই সময় দুই পরস্পর-বিরোধী দুর্দম জীবনানুভূতির সংঘর্ষ দেখা দিল তাঁর জীবনে। নিয়মনিষ্ঠ, মিতাচারী, সাহিত্যসাধনায় পূত সুস্থ জীবন গ্রহণ অথবা উচ্ছৃংখল কল্পনাবিলাস ও স্বেচ্ছাচারিতা। কিন্তু ইতিমধ্যেই পো প্রায় রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছেন—পকেট রিক্ত। সেদিন আমেরিকায় গিয়ে জীবিকা অর্জন করা অতি তিক্ত ব্যবসা ছিল। পো'ও চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু দুর্নিবার কল্পনা আর অধৈর্য বার বার তাঁকে পর্যুদস্ত করেছে। যেখান থেকে যাত্রা সুরু করেন সেখানেই ফিরে আসতে বাধ্য হন। উদ্ধত গর্ব, লাম্পট্য আর অপরিমিত মদ্যপান কোন সংবাদপত্র অফিসই বরদাস্ত করতে পারত না। সুরাপানাসক্তির জন্য পো নিজেও লাঞ্ছিত। তিনি সামাজিক মানুষ হবার সুস্থ স্বপ্ন দেখতে ভালবাসতেন। বিশেষ করে তখন থেকেই যখন তিনি নতুন প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়েছেন। বাইশ বছর বয়সে মার্চ মাসে পো এলেন বাল্টিমোরে। আশ্রয় নিলেন আণ্ট মিসেস্ ক্লেমের গৃহে। মিসেস্ ক্লেম তখন থেকে পো'র খবরদারি নিজের হাতে তুলে নিলেন। মিসেস্ ক্লেম ভার্জিনিয়ারও মা। একেই পো পরে বিয়ে করেছিলেন। এই পরিবারের প্রতি ক্রমশঃ একটা দায়িত্ববোধও আসতে লাগল পো'র। মাঝে-মাঝে অতি সুচারু ভাবে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন, তার পরই আবার সব ভণ্ডুল হয়ে যেত অতি দুঃখজনক পরিণতিতে। তার কেটে যেত বীণার।

এখন থেকে পো ছোট গল্প লিখতে সুরু করেন এবং পরবর্তী বছরে (১৮৩২) কয়েকটি ছোট গল্প ছাপাও হয়েছে বিভিন্ন সমসাময়িক পত্রিকায়। এর পর "আরমস ফাউণ্ড ইন এ বটল" নামক গল্পটি লিখে 'বালটিমোর স্যাটারডে ভিজিটার' কর্তৃক প্রদত্ত পঞ্চাশ পাউণ্ড পুরস্কার পান। এই পুরস্কারপ্রাপ্তি সাহিত্যকেই জীবনের পেশা হিসেবে পুরোপুরি গ্রহণ করার জন্য ভাবিয়ে তুলল পো'কে। এই ত তাঁর প্রতিভা-স্বীকৃতির শুভ সূচনা। 'সাউদার্ন লিটারেরী মেসেঞ্জারে' তিনি গল্প লিখতে সুরু করলেন। "বেরেনিস" নামক গল্পটি এখানেই ছাপা হয়েছে। ১৮৩৫ সালে পো রিচমণ্ডে ফিরে আসেন—সঙ্গে কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আর মনে সাফল্যের দৃঢ়বিশ্বাস। তিনি 'সাউদার্ন লিটারেরী মেসেঞ্জারের' সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। সপ্তাহে পারিশ্রমিক দশ ডলার। যাই হোক, টাকাটা নিয়মিত হাতে পাওয়া যাবে ত। পো'র সম্পাদনা কালে কাগজের প্রচার বেড়ে গিয়েছিল পাঁচ গুণ। পরে অন্য যে সব কাগজে তিনি যোগ দিয়েছেন তাদেরও প্রচার ঐ ভাবে বেড়ে গিয়েছে বহু গুণ। প্রতিভাশালী সম্পাদক ছিলেন পো। নিজের কাগজ নিজে সম্পাদনা করবেন এই ছিল পো'র জীবনের চরম আদর্শ। কিন্তু কাগজ চালানোর মত পর্যাপ্ত অর্থ কোথায়? আবার পত্রিকা প্রকাশ নিয়েই সুরু হোল নতুন বিপদ। পো প্রায়ই মদে চুর হয়ে থাকতেন। অবশেষে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। দু'বছর পরে আবার তিনি বালটিমোরে ফিরে এলেন ক্লেমের কাছে। এইবার এক দিন তিনি ত্রয়োদশবর্ষীয়া ভার্জিনিয়াকে গোপনে বিয়ে করে বসলেন। এর পর পো'র জীবন একেবারে ঝড়ের বেগে চলতে লাগল। নানা প্রচেষ্টা, সাময়িক সাফল্য, পরাভব, নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া—এক স্থান থেকে আর এক স্থানে চরকিবাজীর মত ঘুরে বেড়িয়েছেন পো। "লেজিয়া", "দি ফল অফ দি হাউস অফ আশার" ও ছোট গল্পের একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। বাজারে নামও হয়েছে কিছুটা। পো সুরু করলেন 'গ্রাহাম ম্যাগাজিন' সম্পাদনা। এ কাজ চলল তেত্রিশ বছর বয়স অবধি। এই সময় তিনি সাহিত্য সমালোচনা ও বিশ্লেষণমূলক গল্প রচনায় মনোনিবেশ করেছেন এবং এই সময়ই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বিখ্যাত গোয়েন্দা-কাহিনী—"দি মার্ডারস ইন দি রিউ মর্গ।"

১৮৪২ সালে একটি দুঃখজনক ঘটনায় পো'র জীবন সম্পূর্ণ ওলোট-পালট হয়ে গেল। গান গাইতে গাইতে এক দিন পত্নী ভার্জিনিয়ার শির ছিঁড়ে গেল। এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে পো একেবারে ভেঙে পড়লেন। ভার্জিনিয়ার বার-বার রক্ত মোক্ষণ হচ্ছে—ভার্জিনিয়ার যক্ষার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কখন কি হয় এই দুশ্চিন্তা—দুঃস্বপ্নে দুর্বিষহ হয়ে উঠল পো'র জীবন। অবিরত মদ খেতে লাগলেন তিনি দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্য। সম্পাদকের কাজটিও গেল। আবার সুরু হোল যাযাবর জীবনের দুঃসহ দুঃখ। পো'র উচ্ছৃংখল কল্পনা আর স্ত্রীর রুগ্ন অবস্থার কথা ছেড়ে দিলেও ভার্জিনিয়ার প্রথম রক্ত-মোক্ষণের সঙ্গে হপম্যানের "দি ক্রিমজন ভায়োলিন" নামক গল্পটির অদ্ভুত মিল দেখা যায়। গল্পের নায়িকাও অদ্ভুত সুন্দরী আর সুগায়িকা। তারও বুকের দোষ ছিল। মেয়েটি যখন গান গাইত দেহের সমস্ত রক্ত যেন দু'টি রক্ত-গোলাপের মত গালে এসে জমা হোত। গান গাইতে গাইতেই এক দিন মারা যায় মেয়েটি। কিন্তু এই গল্প ভার্জিনিয়াকে দেখার বহু আগেই লেখা।

সাহিত্য জগতে কিছু প্রতিষ্ঠা নিয়েই পো এলেন নিউইয়র্কে। তাঁর "র‍্যাভেন" প্রকাশিত হয়েছে। "র‍্যাভেন" তাঁকে এনে দিল প্রভূত নাম। পো তাঁর গল্পের একটি সংগ্রহ প্রকাশ করলেন। অবশেষে একটি পত্রিকাও পেলেন সম্পূর্ণ নিজের এক্তিয়ারে—'দি ব্রডওয়ে জার্নাল।' কিন্তু বেপরোয়া জীবন আরো বেপরোয়া, আরো দুর্বার হয়ে উঠতে লাগল। কোন নিয়মানুবর্তিতার আর বালাই রইল না। সাংসারিক দুঃখ-অনটন যত বাড়তে লাগল জীবনের শ্রীও ততই নষ্ট হতে লাগল। তিনি আরও বেশী পানাসক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। পত্রিকা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোল। সমগ্র পরিবার নিয়ে পো নিউ ইয়র্কের উপান্তে একটি কুঁড়েতে উঠে এলেন।

ভার্জিনিয়া দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। চিকিৎসার টাকা নেই—ঘরে খাবার নেই—জ্বালানীর অভাব—অভাব জল পোষাক-পরিচ্ছদের। এই সময়কার একটি ঘটনায় কল্পনাবিলাসী কবির শেষ জীবনের একটি অতি করুণ মর্মস্পর্শী চিত্র পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় গৃহস্থালীর স্নিগ্ধ পরিবেশের আভাস যার পটভূমিকায় কবির

চরম দুর্নীতি ও চমৎকারিত্ব ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে পো এক দিন বনেতে বেড়াচ্ছিলেন। লাফান'র একটা বাজী ধরা হোল। পো'ই জিতলেন, কিন্তু লাফাতে গিয়ে তাঁর জুতো গেল কেটে। হতবুদ্ধি বাক্‌রুদ্ধ পো লাফান বন্ধ করলেন। বন্ধুরা অবস্থার গুরুত্ব বুঝে একে একে সরে পড়ল। কিছুক্ষণ বাদে এক জন বন্ধু কুঁড়েতে ফিরে এসে দেখলেন—পো নিঃশব্দে কুঁকড়ে বসে আছে। আর মিসেস্ ক্লেম মাতৃসুলভ সমবেদনার সঙ্গে তাঁকে বলছেন—'এডি! 'জুতোটা ফাটালে কেমন করে? উত্তর দাও।'

১৮৪৭ সালে প্রিয়তমা ভার্জিনিয়ার রোগক্লিষ্ট জীবনের অবসান হোল। পো'র তখন বয়স আটত্রিশ। এর পর পো তাঁর দীর্ঘ "সেলসগারী ইউরেকা" নিয়ে পড়লেন। প্রকাশকের হাতে বই দেওয়ার সময় তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতির সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ১৮৪৮এর গোড়ার দিকে "এ্যানাবেল লী" প্রকাশিত হোল এবং বেশ নামও হোল। গ্রীষ্মের দিকে পো রিচমণ্ডে ফিরে এলেন—প্রতিজ্ঞা করলেন মিতাচার জীবনের। নতুন করে বিয়ের সম্বন্ধও ঠিকঠাক। একটি শান্তিময় নীড়—নিরবচ্ছিন্ন আরাম আর সুখের প্রতিশ্রুতি। এই আসন্ন প্রত্যাশার আনন্দে মত্ত পো আবার মদে ডুবে গেলেন। ১৮৪৯ সালের অক্টোবরে পো'কে মত্ত অবস্থায় পাওয়া গেল বাল্‌টিমোর নগরীতে। এক দল ভোট-সংগ্রাহক তাঁকে দেখতে পেয়ে আরো মদ খাইয়ে ভোটের কাগজ হাতে দিয়ে বিভিন্ন পোলিং বুথে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াল তাঁকে। পরে বন্ধুরা দেখতে পেয়ে পোকে উদ্ধার করলেন এদের কবল থেকে। এই ঘটনার চার দিন বাদে ৮ই অক্টোবর চল্লিশ বছর বয়সে ব্যর্থ আশা, বিফল মনোরথ নিয়ে বিদায় নিলেন মরমী কবি পৃথিবী থেকে।

বিপজ্জনক ও বিপন্ন লোকটি চলে গেল। কিন্তু তাঁর লেখা রইল পড়ে পিছনে, দিন-দিন তাঁর সম্মান ও জনপ্রিয়তা আরো বাড়িয়ে তুলতে। কিন্তু মানুষটি কি ভাবেই না হারিয়ে গেলেন!

ভূস্বর্গ

সন্তোষ ভট্টাচার্য

ভূস্বর্গ আজ চঞ্চল হ'ল
চঞ্চল হল অমৃতের সন্তান।
নর-দেবতার স্বর্গের পথে পথে
ঐ কা'রা এলো কালো কালনেমি দল?

অন্যায় আর লালসার লিপ্সায়
বাংলা এবং পঞ্চনদের রক্তমাখানো ছুরি
স্বর্গের দ্বারে ঝলসে উঠলো
'যুদ্ধং দেহি' রবে।

বুনো শ্বাপদের অগ্নিদৃষ্টি
জ্বল্-জ্বল্ করে লোভা শোণিতের লোভে।
ভূস্বর্গবাসী জাগো—
পদ্ম-ছড়ানো ডাল্ লেক গেল নর-রক্তেতে ভরে।
শ্রীনগর আর জম্মুর পথে পথে
অস্ত্র শাণায় বুনো জানোয়ার দল।
দেরী নয়, ওগো কাশ্মীর-সুন্দরি—
বিলাসিতা আর অঙ্গ-প্রসাধনী ছেড়ে
জাগো—জেগে ওঠো দানবদলনীরূপে
ন্যায়ের কৃপাণে ঝলুক শাণিত রোদ।

কালো-কিম্ভুত চোয়াড়ে দস্যুদল
হে স্বর্গবাসী, তোমাদের ঘরে ঘরে
হৈ-হৈ করে ছড়ায় বারুদ-বিষ;
তোমাদের ঐ পর্বত-সানুদেশে
দ্রাক্ষাকুঞ্জ, সবুজের সংকেত,
রৌদ্র-রাঙানো চাষ-ফসলের গান
শেষ হতে কভু দিও নাকো,
হানো মসৃণ তলোয়ার।
হাত-পেতে-চাওয়া স্বাধীনতা
আর, ভিখিরীর মত প্রাণ-ধারণের কথা
মেকী হয়ে গেছে সীসের টাকার মত।

নরসিংহের দল—
ঘুম ছেড়ে ওঠো অরণ্য-গুহা ভেদি';
নেমে এসো সবে
উরী-বরমুলা-ঝানগড় সীমানায়
বুক-ভরা তেজে—মুক্তি-মশাল হাতে।
বর্বরতাকে কবর দেওয়ার
আদেশ এসেছে আজ।
এ আদেশ সেই অত্যাচারিত
গণদেবতার সকরুণ চীৎকার।
তাই—
তোমাদের দিকে চেয়ে আছে দেশ
চেয়ে আছে আজ ভূস্বর্গ কাশ্মীর।

মাতালের ময়না

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

এক

গল্পকে আমরা গল্প ব'লেই গ্রহণ করি এবং সত্যিকার মানুষের জীবনের সঙ্গে তা'র যে কোন বিশেষ সম্পর্ক আছে, প্রায়ই এমন কথা মনে করি না। কিন্তু অনেক সময়ে সত্যিকার মানুষের জীবনও যে এমন কত বিচিত্র ঘটনা সৃষ্টি করতে পারে, যে-সব হয়ে দাঁড়ায় গল্পের চেয়েও অদ্ভুত, এটা বোধ হয় সকলে সহজে ধারণা করতে পারবেন না।

ঠিক তারিখ মনে নেই, তবে ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বৎসর কিংবা তারও আগেকার কথা।

'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' অথবা 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে'র একটি খবরে জানা গেল যে, নিমতলার শ্মশানে এক অলৌকিক শক্তিশালিনী নবীন সন্ন্যাসিনীর আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁকে দর্শন করবার জন্যে চারি দিক্ থেকে আসছে দলে দলে লোক। খবরের কাগজে সন্ন্যাসিনীর বা ভৈরবীর একখানি ছবিও যেন দেখেছিলুম ব'লে মনে হচ্ছে।

কলকাতার শ্মশানগুলি হচ্ছে চিত্তাকর্ষক জায়গা। সেখানে কেবল অসাড় মৃতদের ঘিরে মুখের জীবন্তরা অশ্রু-করুণ নাটকীয় দৃশ্যেরই অবতারণা করে না, সেই সঙ্গে তাদের আশ-পাশ দিয়ে আনাগোনা করে এমন সব অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ, বড় বড় নাটকের পাত্র-পাত্রীরূপেও অনায়াসে যারা আত্মপরিচয় দিতে পারে। মৃত্যুর সামনে ব'সেও তারা থাকে মৃত্যু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার।

বিশেষ ক'রে ওদের দেখবার জন্যেই আমি এ-শ্মশানে ও-শ্মশানে কত বার যে ঘুরে বেড়িয়েছি, তার আর সংখ্যা নেই। সাধারণতঃ শ্মশানে যাই আমি রাত্রিকালেই। কারণ, ও-সব জায়গায় ভালো ক'রে জ'মে ওঠে রাত্রির দৃশ্যই।

একে সন্ন্যাসিনী অলৌকিক শক্তিশালিনী, তার উপর আবার নবীন বয়সেই হয়েছেন শ্মশানবাসিনী। সংবরণ করতে পারলুম না তাঁকে দেখবার প্রলোভন। দর্শনার্থীর জনতা হালকা হবে এই আশায় একটু বেশী রাতেই শ্মশানের দিকে যাত্রা করলুম।

দুই

আয়োজনের কোন ত্রুটিই ছিল না।

সন্ন্যাসিনী আস্তানা গেড়েছেন শ্মশানের বাইরে, গঙ্গার ঢালু পাড়ের উপরে। সামনে জ্বলছে ধুনী। পাশেই মাটির ভিতরে পোঁতা সিন্দুরারক্ত ত্রিশূল। নবীন সন্ন্যাসিনী নিমীলিত নেত্রে একটা হারিকেন লণ্ঠনের আলোতে একখানা ছোট বইয়ের দিকে তাকিয়ে বিড়-বিড় করে যেন কি মন্ত্রপাঠ করছেন। পরনে তাঁর রক্তবসন। গায়ে জামা নেই, কাপড়ের ভিতর থেকে ফুটে উঠেছে পীবর বক্ষের সুডৌল গঠন। রং কালো হ'লেও দেহে আছে যৌবনের লালিত্য। টানা ভুরু, টানা চোখ, এলানো চুল। বয়স হবে চব্বিশ কি পঁচিশ! ভাবছিলুম, এই কাঁচা বয়সে ইনি তপস্যার দ্বারা অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন করলেন কেমন ক'রে?

সন্ন্যাসিনী হঠাৎ চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন—ক্ষণিকের জন্যে। দৃষ্টির মধ্যে কোন অলৌকিক উচ্চ ভাব নেই, আছে লৌকিক বিলাসের বিদ্যুল্লীলা। এতটা দেখবার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। মনে লাগল চমক।

রাত এগারোটা হবে। কিন্তু তখনও সন্ন্যাসিনীর দিকে তাকিয়ে এখানে অপেক্ষা করছে কয়েক জন লোক তীর্থের কাকের মত। লোকগুলির শ্রদ্ধা-ভক্তি যে মূল্যবান, ধুনীর পাশে সাজানো তাম্রপাত্রের দিকে তাকালে সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় না। তার উপরে জমে আছে পয়সা, সিকি, আধুলি, টাকা। অনেকে ফলমূলও উপহার দিয়েছে দেখলুম।

সন্ন্যাসিনীর দুই পাশে বসে আছে দুই জন পুরুষ। বোধ হয় চ্যালা। এক জন হেঁট হয়ে সন্ন্যাসিনীর কাণে-কাণে কি বললে। বেশ শুনলুম, সন্ন্যাসিনী একটু হেসে মৃদু স্বরে বললে, "মাইরি?"

আর কিছু দেখবার বা শোনবার প্রবৃত্তি হল না। ঢালু পাড়ের উপর দিয়ে চললুম শ্মশান-ঘাটের সিঁড়ির দিকে। সেখানেও আবার আর এক দৃশ্য।

তিন

ঘাটের রাণার উপরে আসনপিঁড়ি হয়ে জাঁকিয়ে বসে আছে এক দীর্ঘবপু হৃষ্টপুষ্ট পুরুষ। তার কালো রং, লম্বা লম্বা চুল উস্কো-খুস্কো, জোড়া ভুরুর তলায় ছোট ছোট কিন্তু ধারালো চক্ষু, খোঁচা-খোঁচা দাড়ী-গোঁফ, গায়ে একটা আধময়লা গেঞ্জী, কাপড় কোমর বেঁধে পরা। তার বয়স পঁয়তাল্লিশের কম হবে না। সামনে রয়েছে একটা দেশী মদের বোতল, তিন-চারটে মাটির ভাঁড়, আর একটা শালপাতার ঠোঙায় বোধ হয় কিছু খাবার-দাবার। তার এ-পাশে ও-পাশে বসে আছে আরো তিন জন লোক।

দীর্ঘবপু একটা মদ-ভরা ভাঁড় এক চুমুকে নিঃশেষ ক'রে বাঁ হাতের

চেটো দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললে, "কেন রে তিনু, মদ খাবি নে কেন?"

তিনু নামধারী লোকটি বললে, "তোমার এখানে বসে মড়া দেখতে দেখতে আমার মদ খেতে ইচ্ছে হয় না।"

—"ওরে মুখ্যু, মড়াদের সঙ্গে আমাদের কতটুকু তফাৎ রে? গেল কাল ওরা ছিল আমাদেরই মত জ্যান্তো। আবার আসছে কাল আমরা হতে পারি ওদেরই মতন মড়া। আমরা নিশ্বাস ফেলতে পারি, আর ওরা নিশ্বাস ফেলতে পারে না, তফাৎ তো খালি এইটুকু। তবে তুই মদ খাবি নে কেন?"

দার্শনিক মাতাল, মন্দ নয়। আরো দুই পা এগিয়ে দাঁড়ালুম।

দীর্ঘবপুর দৃষ্টি হঠাৎ আমার দিকে আকৃষ্ট হ'ল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, "তুমি আবার কে বাবা?"

বললুম, "তোমার মতই মানুষ।"

—"তা তো দেখছি। এই বয়সে এত রাতে এখানে দাঁড়িয়ে কেন?"

—"তোমার কথা শুনছি।"

লোকটা হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "আমার কথা? আমি একটা ডাকসাইটে মাতাল, আমার কথার না আছে মুণ্ডু, না আছে মাথা। তা আবার শুনবে কি?"

—"তোমার নাম কি?"

—"মাতাল।"

—"ওটা নাম নয়। অন্য নাম বল।"

—"আমার পরিচয় জেনে লাভ নেই। সবাই আমাকে রাজা বলে ডাকে, তুমিও ডাকতে পারো। কিন্তু এত কথা জিজ্ঞাসা করছ, তুমি কে বল তো? পুলিশের লোক না কি?"

"—না।"

—"তোমার নাম?"

—"তুমি নিজের নাম বললে না, আমিও বলব না।"

—"নিধু বাবুর টপ্পায় আছে—'শুধু নামে কি করে'! তোমার নাম আমি জানতে চাই না। আমি তোমাকে বাবু ব'লে ডাকি, কেমন?"

—"বেশ।"

—"আচ্ছা বাবু, সত্যি করে বল দেখি, এখানে তুমি কি করতে এসেছ?"

—"ঐ সন্ন্যাসিনীকে দেখতে।"

—"দেখা হয়েছে?"

—"হ্যাঁ।"

—"দেখে কি বুঝলে বাবু?"

—"কিছু বুঝিনি রাজা, কিছু বুঝিনি।"

রাজা মুখ ফিরিয়ে একবার সন্ন্যাসিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে। তার চোখ দু'টো একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার পর ধীরে ধীরে বললে, "সাধু-সন্ন্যাসীদের বাইরে থেকে দেখে ভেতরের কথা ক'জন লোক ধরতে পারে?"

—"তুমি ওকে ক'দিন দেখছ?"

—"হপ্তাখানেক।"

—"কিছু বুঝেছ কি?"

—"বোধ হয় কিছু কিছু বুঝেছি।"

—"কি বুঝেছ বল।"

—"আজ নয়, কাল এস, বলব।"

—"এইখানেই দেখা হবে তো?"

—"হ্যাঁ, এই তো আমাদের রাতের বৈঠক। তবে রাত বারোটার আগে এস না।"

—"বেশ, তাই আসব।"

চ'লে যাবার উপক্রম করছি, রাজা আবার পিছু ডাকলে, "বাবু, শুনছ?"

—"আবার কি শুনব?"

—"চকোরের জ্যোৎস্না ফুরোয়, মাতালের মদ ফুরোয়। তখন চকোর আর মাতালের দুঃখের অবধি থাকে না গো! এই দেখ, আমার বোতল ঢুঁ-ঢুঁ!" রাজা বোতলটা তুলে দেখালে।

—"তোমার মনের কথা কি?"

—"খুব স্পষ্ট। সঙ্গে যা আছে, পুরো এক বোতলের দাম হবে না। একটা টাকা ছাড়তে পারো বাবু?"

তার অনুরোধ ঠেলতে পারলুম না।

চার

পরদিন। রাত বারোটা।

নিমতলার শ্মশানের ভিতরে পা দিয়েই শুনলুম, গঙ্গার ও-দিকে বসে কে গাইছে—

"সুরাপান করি নে আমি, সুধা খাই মা তারা বলে।

মন-মাতালে মেতেছে আজ, যত মদ-মাতালে মাতাল বলে।"

ঘাটে গিয়ে রাজা বা তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের দেখা পেলুম না। কিন্তু ডান দিকে ফিরেই সচমকে দেখি, ভৈরবীর আসরে রাজা বিরাজমান সদলবলে! ধুনীর আলো আজ আরো জোরালো, হ্যারিকেন লণ্ঠনও একটার বদলে দুটো।

গান ধরেছিল রাজাই, চোখ তার ঢুলু-ঢুলু, হাতে তার মদের ভাঁড়।

এগুবো না পালাব ভাবছি, হঠাৎ রাজা আমাকে দেখতে পেলে। চেঁচিয়ে বলে উঠল, "এই যে, বাবু যে! আরে, পরের মত ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, কাছে এস বাবু, কাছে এস!"

কাছে গিয়ে দেখলুম, প্রত্যেকেরই হাতে মদের ভাঁড়—এমন কি ভৈরবীরও! শুধালুম, "আজ বাইরের ভক্তরা গেল কোথায়?"

রাজা বললে, "সব শালা বাড়ী গিয়েছে।"

ভৈরবী এড়িয়ে এড়িয়ে বললে, "যাবে না তো এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোর গালাগাল শুনবে না কি?"

রাজা সে কথায় কাণ না পেতে বললে, "ভৈরবীর দয়ায় আমরাও সবাই আজ ভৈরব হয়েছি। তুমিও দলে ভিড়ে যাও বাবু!"

ভৈরবী ঢুলতে ঢুলতে বা টলতে টলতে বললে, "তুমিও একটু কারণ-বারি নাও বন্ধু! এ যে-সে কারণ নয়, আমি নিজে মন্ত্র প'ড়ে দিয়েছি, এ খেলে নেশা হয় না!"

নেশাই হয় না বটে! ভৈরবী নিজেই নেশায় এমন বুঁদ হয়ে আছে যে, সোজা হয়ে বসতে বা ভালো ক'রে চোখ মেলে তাকাতেও পারছিল না।

রাজা বললে, "বেশ বাবু, মদ না খাও, খানিকটা মহাপ্রসাদ তো নিতে পারো?"

—"মহাপ্রসাদ ?"

—"হ্যাঁ। অর্থাৎ সাক্ষাৎ মা-কালীর সামনে বলি দেওয়া কচি পাঁটা-ভোগ। আজ ষোড়শোপচারে মায়ের সাধনা হবে।"

আমি বললুম, "না রাজা, এইমাত্র খেয়ে-দেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি।"

ভৈরবী ঠোঁট ফুলোবার চেষ্টা করে বললে, "বন্ধু, তুমি বদরসিক।" তার পরেই গুন্-গুন্ ক'রে গান ধরলে—

"আমার এমন দিন কি হবে মা তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে
তারা ব'য়ে পড়বে ধারা।"

রাজা উৎসাহিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "দেখ বাবু, দেখ। ভৈরবীদের বাইরে থেকে দেখে সব সময়ে চেনা যায় না। চেয়ে দেখ, সত্যি সত্যিই ভক্তিভরে ভৈরবীর চোখ দিয়ে আজ ধারা ঝরছে।"

হ্যাঁ, কাঁদছে বটে ভৈরবী—কিন্তু ভক্তির আতিশয্যে না নেশার মহিমায়, সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন।

রাজা আবার বললে, "কেঁদ না ভৈরবী, কেঁদ না! এই নাও, আর একটু কারণ-বারি খাও, প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে।" সে নিজের ভাঁড়টা ভৈরবীর মুখের কাছে এগিয়ে দিলে।

ভৈরবী আর এক চুমুক মদ্য পান করতে গিয়েও পারলে না, হঠাৎ টলে পড়ে মাটির উপরে হল লম্বমান।

রাজা চীৎকার ক'রে বললে, "ওরে তিনু, ওরে মোনা! ভৈরবীর ভাব হয়েছে রে, ভাব হয়েছে! ওকে হাওয়া কর, ওর মুখে জল দে!" (তার পর আমার দিকে ফিরে) "দেখছ বাবু, ভক্তির জোর? এই বারে ভৈরবীকে চিনেছ তো?" তার কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা গেল না, সে ব্যঙ্গ করছে কি না।

তার পর ভৈরবীর অচেতন দেহ নিয়ে সবাই যখন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল, সেই ফাঁকে আমি চটপট্ সরে পড়লুম বুদ্ধিমানের মত।

শ্মশানের বাইরে এসে অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবলুম, যাক্, ভৈরবী-রহস্যটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল।

কিন্তু যে খবরের কাগজওয়ালারা ফোটো তুলে এদের নাম বিজ্ঞাপিত করে, তাদের হাঁড়ি হাটের মাঝে ভেঙে না দিয়ে ছাড়ব না।

তবু শেষ পর্য্যন্ত সেটা আর করা হয়নি। আমার দুর্ব্বলতাই ঐখানে। রাগের মাথায় যা নিশ্চয়ই করব বলে মনে করি, রাগ জল হয়ে গেলে পর ইচ্ছা করলেও আর তা করতে পারি না।

কিন্তু ভৈরবী এবং রাজার বিচিত্র ইতিহাস এখনো শেষ হয়নি, অবশিষ্ট আছে আরো কিছু। এবং এই যৎকিঞ্চিৎ-এর মধ্যেই পাওয়া যাবে সত্যিকার মানুষের জীবন-নাট্য। যা বলব তা গল্পলেখকের কল্পনা নয়, আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা।

পাঁচ

কেটে গেল মাস দেড়েক।

মনে এক দিন প্রশ্ন জাগল, ভৈরবী আর রাজার খবর কি?

পায়ে-পায়ে এগিয়ে চললুম নিমতলার শ্মশানের দিকে। রাত তখন প্রায় এগারোটা।

কিন্তু শ্মশানে প্রবেশ করবার আগেই দেখি, ভিতর থেকে প্রায় টলো-টলো অবস্থায় বেরিয়ে আসছে স্বয়ং রাজা।

শুধালুম, "কি হে রাজা, চিনতে পারো?"

রাজা একগাল হেসে বললে, "এক কথায় এক টাকার মদ খাইয়েছিলে, চিনতে আবার পারব না?"

—"আজ যে তুমি বড় একলা। তোমার স্যাঙাতরা কোথায়?"

—"বাসায়। আজ-কাল বাসাতেই বৈঠক বসে কি না? আমার বাসা দেখবে তো চল আমার সঙ্গে। ময়নাও সেখানে আছে।"

—"ময়না? ময়না কে আবার?"

—"তোমাদের সেই সখের ভৈরবী গো! তার নাম যে ময়না।"

বিস্মিত কণ্ঠে বললুম, "সে তোমার বাসায় কেন

—"গঙ্গার ধারে আর তার থাকবার উপায় নেই। ময়না ভৈরবী সেজে যেখানে আস্তানা গেড়েছিল, সে জায়গাটা আগে ছিল আর এক বুড়ো ভৈরবীর দখলে। হঠাৎ শরীর খারাপ হওয়ায় বুড়ী বুঝি দিন কয়েকের জন্যে কোথায় হাওয়া খেতে গিয়েছিল; তার পর ফিরে এসে দেখে তার আস্তানা বেদখল হয়ে গিয়েছে। তখন বুড়ী আর ছুঁড়ী দুই ভৈরবীতে লেগে গেল দস্তুরমত চুলোচুলি কাণ্ড। আর সে কি কাঁচা খিস্তি রে বাবা, শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। কিন্তু কাঁচা খিস্তিতে বুড়ী ছিল পাকা, ময়না তার সঙ্গে পারবে কেন? কাজেই শেষটা তাকেই চম্পট দিতে হল তল্পিতল্পা গুটিয়ে। আমি তখন তাকে বললুম, "ময়না, এই সোমত্ত বয়সে পথে-বিপথে টো-টো করে ঘুরে মরবি কেন, তার চেয়ে আমার বাসায় চল্, দু'জনে মিলে মনের সুখে ঘর-সংসার পাতব। ময়না বড় সেয়ানা মেয়ে, আমার কথায় রাজি হয়ে গেল তখনি। সেই দিন থেকে আমরা আছি মাণিকজোড়ের মত। ময়নাকে দেখতে চাও তো আমার সঙ্গে চল।"

যাকে দেখেছিলুম ভৈরবীরূপে, এখন নূতন রূপে তাকে দেখতে কেমন হয়েছে, জানবার আগ্রহ হল। রাজার সঙ্গে চললুম গুটি-গুটি।

জোড়াবাগান অঞ্চলের এক বস্তী। একখানা [illegible]লা মাঠ-কোঠার সামনে দাঁড়িয়ে রাজা বললে, "এই [illegible], বাবু।"

রাস্তার ধারে একখানা চাটের দোকানে পাশাপাশি সাজানো রয়েছে গলদা চিংড়ী, কাঁকড়া, ডিম, চপ ও কাটলেট প্রভৃতি। দোকানী বসে বসে সশব্দে ভাজছে বড় বড় পরোটা।

দোকানের পাশেই প্রবেশপথ এবং পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাণপণে সেজে-গুজে কয়েকটা নারীমূর্ত্তি, চক্ষু তাদের বুভুক্ষু।

রাজা কর্কশ কণ্ঠে বললে, "সরে দাঁড়া! বাবুর দিকে অমন করে তাকাচ্ছিস্ কেন? বাবু তোদের খোরাক হতে আসেনি?"

কোন রকমে পাশ কাটিয়ে মাঠকোঠার ভিতরে ঢুকলুম। সামনেই একখানা কাঠের সিঁড়ি। উপরে উঠতে উঠতে শুনলুম হার্মোনিয়ামের সঙ্গে কে গান ধরেছে—

'কেটে দিয়ে প্রেমের ঘুড়ি আবার কেন লটকে ধর?
এক টানেতে বোঝা গেছে তোমার সুতোর মাঞ্জা খর।'

রাজা বললে, "ময়না গাইছে। আড্ডা খুব জ'মে উঠেছে দেখছি। এস বাবু, এই ঘরে।"

ঘরের এক পাশে ধবধবে বিছানা-পাতা খাট। তার উপরে াকিয়া ও বালিসের ভিড়। এক পাশে একটা আয়না-বসানো ালমারি। দেওয়ালের গায়ে নানা আকারের কতকগুলো ছবি— লাতী ছবি, ঠাকুর-দেবতার ছবি, কালিঘাটের পট। দেওয়াল-লনার থান-কয় কোঁচানো সাড়ী।

ঘরের মেঝের মাদুরের উপরে বসে আছে রাজার স্যাঙাতরা। কলেই মদ্যপান করছে—কেউ কলাই-করা গেলাসে, কেউ হাতল-াঙা চায়ের পেয়ালায়। মাঝখানে বিরাজমান হার্মোনিয়াম এবং ানা—খোঁপায় তার বেলফুলের মালা; মুখে তার রং-পাউডার ও াচপোকার টিপ; পরনে তার রামধনু-রঙের সাড়ী; নাক, কাণে, লায় ও হাতে নাকছাবি, এয়ারিং, চেন-হার, তাগা আর চুড়ী-বালা ং তার কোলের উপরে আরাম করে বসে আছে একটা ল্যাজ-াটা বিড়াল। শ্মশানবাসিনী, নিরাভরণা, রক্তাম্বরা ভৈরবীর পূর্ব্ব রূপান্তর!

আমি ঘরে ঢুকতেই থেমে গেল গান ও বাজনা।

রাজা বললে, "কি রে ময়না, বাবুকে চিনতে পারিস্?"

ময়না খিল্-খিল্ করে হেসে উঠে ভুরু নাচিয়ে বললে, "একবার াকে দেখি তাকে কি আর ভুলি ইয়ার? তুমি তো আমার সেই ঙ্গাতীরের বন্ধু।" বলেই সে একটা বিড়ি তুলে নিয়ে ধরিয়ে ফেললে।

আমার গা ঘিন-ঘিন করতে লাগল। তার পর আরো মিনিট-াঁচেক কোন রকমে কাটিয়ে কেমন করে ওজর দেখিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলুম, সে-সব কথা আর না বললেও চলবে।

ছয়

মাস আষ্টেক পরের ঘটনা। এর মধ্যে রাজার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। দেখা করবার ইচ্ছাও ছিল না।

এক দিন সকালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে গঙ্গাস্নান সেরে উপরে এসে উঠেছি, হঠাৎ দেখি রাজা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার উপরে।

তার চেহারা বদলে গেছে। কি শ্রান্ত-ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে! চোখের তলায় কালি, উদাস দৃষ্টি, বিশীর্ণ দেহ, আদুড় গা, খালি পা।

সবিস্ময়ে বললুম, "রাজা?"

ঠোঁটে একটু ম্লান হাসি মাখিয়ে রাজা বললে, "হ্যাঁ বাবু।"

—"এখানে কি করছ?"

—"খুঁজছি।"

—"কাকে?"

—"ময়নাকে।"

—"সে কোথায়?"

—"সেইটেই তো জানি না।"

—"এ আবার কি কথা?"

রাজা করুণ স্বরে বললে, "বাবু, ময়না আমার পালিয়ে গিয়েছে।"

—"পালিয়ে গিয়েছে! কেন?"

—"তা আমি জানি না। তাকে বড় আদরে রেখেছিলুম। জামা, কাপড়, গা-মোড়া গয়না কিছুই দিতে বাকি রাখিনি। তবু সে পালিয়ে গিয়েছে আর যাবার সময় আমার বাক্স থেকে নিয়ে গিয়েছে একশো পনেরো টাকা।"

—"সেই টাকার জন্যেই কি তুমি ময়নাকে খুঁজছ?"

দুঃখিত ভাবে মাথা নেড়ে ভর্ৎসনার স্বরে রাজা বললে, "টাকা? না বাবু, না। আমি টাকা চাই না, আমি ময়নাকে চাই।"

—"এমন একটা দুষ্ট স্ত্রীলোকের জন্যে তোমার এত খোঁজাখুঁজি কেন রাজা?"

হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে রাজা বলে উঠল, "খুঁজব, খুঁজব! যত দিন তাকে ফিরে না পাই, তত দিন ধরে খুঁজে বেড়াব! ময়না দুষ্ট তো আমার কি? আমি তাকে ভালোবাসি বাবু, ময়নাকে আমি ভালোবাসি—হ্যাঁ, বড় ভালোবাসি!" বলতে বলতে সে হন্ হন্ ক'রে চলে গেল।

রাজা ময়নাকে খুঁজে পেয়েছিল কি না জানি না। কারণ তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।

জন্মদিন

শ্রীঅমলা দেবী

৬

আসল খবরটি কিন্তু রাধানাথের কানে পৌঁছিয়া গিয়াছে। পৌঁছাইয়াছে—প্রফুল্ল ও মহেশ ভট্টাচার্য্য। রাধানাথের নও এমনই একটা কিছু ঘটিতেছে, সন্দেহ হইয়াছিল। গাঁয়ের করাদের দু'-এক জনকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল। তাহারা কিছুই দ নাই। কিন্তু সেদিন পাশের একটা গ্রাম হইতে বাড়ী ফিরিবার সময়ে একটা বাগদী-ছেলের মুখে একটা গান শুনিয়া াহার সন্দেহ দৃঢ় হইল।

গ্রামের বাহিরে গোচর-মাঠ। এক পাল গরু এখানে-সেখানে রতেছিল। বাগাল ছোঁড়াটা একটা গাছের ডালে বসিয়া গান কিতেছিল—

'গাঙ্গুলী মশয়, মোদের অতি মহাশয়,
গরীবের মা-বাপ—অতি সদাশয়—'

ছোঁড়াটাকে গাছ হইতে নামাইয়া রাধানাথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ান কোথায় শিখেছিস রে?"

—"আমাদের মনসা-মেলায় দিন গাওনা হচ্ছে যে। শুনে ন শিখেছি—"

—"তোদের কীর্ত্তনের দলে আজকাল এই সব গান হচ্ছে কি?"

—"এজ্ঞে হ্যাঁ, বাবুরা বেঁধে দিয়েছেন—"

—"কোন বাবু?"

—"তা' কি করে জানব এজ্ঞে! মুরুব্বিরা জানে। ওনারাই া গাইছে—"

—"কি জন্তে গাইছে জানিস? বল্ না—পয়সা দেব দু'টো, বিড়ি তে।"

—"এজ্ঞে না, আমি ছেলেমানুষ, জানি না কিছুই।"

সেই দিনই রাধানাথ সান্ধ্য-বৈঠকে সাঙ্গোপাঙ্গদের কাছে কথাটা ড়িল। গানটি শুনিয়া সকলে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। অতি াশয়, গরীবের মা-বাপ। এক-এক জন এক-এক বার করিয়া দ, আর হা-হা করিয়া হাসে। এক জন কহিল—"যাচ্ছি আমি বাগদী-পাড়ায়—গানটা একটু বদলে দিয়ে আসি। বলব, ভুল করে গাইছিস কেন, শুদ্ধ করে গা—

গাঙ্গুলী মশায় মোদের অতি দুরাশয়,
খাতকের যম তিনি—প্রজাদের ভয়—"

বলিয়া লোকটি আবার হাসিয়া গড়াইয়া গেল। রাধানাথও হাসিতেছিল। হাসি থামাইয়া গম্ভীর হইয়া কহিল—"হাসি থাক। আসল ব্যাপারটা জানবার চেষ্টা কর দেখি। মাষ্টার ঘন-ঘন সহরে যাচ্ছে; বাগদীরা গাঙ্গুলী বুড়োর নামে বাঁধা গান গাচ্ছে; লাইব্রেরী-ঘরটা মেরামত হয়েছে; ছোকরাগুলো উঠে-পড়ে কিসের জন্তে আয়োজন করতে লেগে গেছে। কি এমন ব্যাপার যে, ছোটলোক, ভদ্রলোক এক-জোট হয়ে করবার চেষ্টা হচ্ছে? ওদের দলের কা'কে ধরলে একটা হদিশ পাওয়া যাবে বলতে পার?"

এক জন কহিল—"মহেশ পণ্ডিতটাকে ধরলে বোধ হয় সুবিধে হবে।"

আর এক জন কহিল—"প্রফুল্ল মাষ্টারও ওদের উপর সন্তুষ্ট নয়। ওদের নিন্দে করে খুব।"

আর একজন কহিল—"এক দিন ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা হোক। আমরা জন দশ তো আছিই। প্রফুল্ল মাষ্টার ও মহেশ পণ্ডিত এই দু'জনকেও নেমন্তন্ন করা হোক। সেই দিনেই ওদের তেলিয়ে-খেলিয়ে কথাটা বার করে নিলেই হবে।"

রাধানাথ কহিল—"তার জন্তে আর ভাবনা কি! কালই ব্যবস্থা কর।"

সেই দিনই কথাটা বাহির হইয়া পড়িল। গাঙ্গুলী মশায়ের 'জন্মদিন' উৎসব হইবে, সহর হইতে বড় বড় হাকিমরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবেন, গাঙ্গুলী মশায়ের এক আত্মীয়, কংগ্রেসের এক জন বড় পাণ্ডা, কলিকাতা হইতে আসিবেন, বাগদীরা গাঙ্গুলী মশায়ের প্রশংসা কীর্ত্তন করিবে, ছোকরারা গাঙ্গুলী মশায়ের জয়ধ্বনি করিবে ও কেহ বাধা দিতে আসিলে মার-ধর করিবে, বিনয় মাষ্টারের স্ত্রী আর শালীরা শাঁখ বাজাইয়া ও উলুধ্বনি দিয়া গাঙ্গুলী মশায়কে সভার মাঝে বরণ করিবে।

সমস্ত খবর শুনিয়া রাধানাথ গুম হইয়া রহিল। পাড়াগাঁয়ে এ-রকম একটা ব্যাপার হইতে পারে, সে কোন দিন কল্পনা করিতে পারে নাই। সে ভাবিয়াছিল, খদ্দর পরিয়া, জেলা কংগ্রেসে আনা-গানা করিয়া সে বাজিমাৎ করিবে। কিন্তু গাঙ্গুলী বুড়ো যে এমন একটা চাল দিবে তাহা কে কোন দিন ভাবিয়াছিল! একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রাধানাথ গর্জন করিয়া উঠিল—হুম্!

পাত্র-মিত্রেরা সকলেই স্তম্ভিত। এ রকম একটা চাল!, ইহাকে কাটানো যায় কি করিয়া!

গালে হাত দিয়া সকলে চিন্তাবিষ্ট হইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ পরে রাধানাথ কহিল—"বুদ্ধিটা দিলে কে?"

পণ্ডিত কহিল—"হেড-মাষ্টার, তা'ছাড়া ও-সব বুদ্ধি আর কার হবে?"

রাধানাথ কহিল—"গাঙ্গুলী-গিন্নী সব জানে?"

পণ্ডিত কহিল—"কি করে জানব?"

এক জন কহিল—"গাঙ্গুলী-গিন্নীকে যদি বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে, 'জন্মদিন'টা ভাল নয়, ওটা হ'লে গাঙ্গুলী বুড়ো মরে যাবে পট্ করে, তা'হলে বুড়ী হয়তো সব বন্ধ করে দেবে।"

রাধানাথ কহিল—"বোঝাবে কে? ও তো পুরুষদের কর্ম্ম নয়—মেয়েরা ছাড়া পারবে না।"

এক জন কহিল—"মুখী দিদির দলটাকে লাগালে হয় না?"

রাধানাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"তাই ভাবছি। দেখি একবার মুখী দিদিকে বলে।"

প্রফুল্ল মাষ্টার এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল; এতক্ষণে মুখ খুলিল। কহিল—"আর একটা খবর আছে। যা শুনলে গাঙ্গুলী-গিন্নী একেবারে ক্ষেপে উঠবে, গাঙ্গুলী মশায়ের ঠ্যাং ভেঙ্গে ওঁকে বিছানায় ফেলে রাখবে।"

সকলে সমস্বরে কহিল—"কি খবর?"

প্রফুল্ল কহিল—"বিনয় মাষ্টারের যে ধুমড়ী শালীটা সভায় গাঙ্গুলী মশায়কে মালা-চন্দন পরাবে, সেইটাকে গাঙ্গুলী মশায়ের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছে বিনয়—"

সকলে কহিল—"মানে?"

পণ্ডিত মশায় কহিল—"মানে খুব সোজা। গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে—"

রাধানাথ কহিল—"মেয়েটার বয়স কত?"

—"ত্রিশ অনেক দিন পার হয়ে গেছে। নেহাৎ বেমানান হবে না"

—"কে কে জানে এ খবর?"

—"মাষ্টার, বিনয় আর গাঙ্গুলী মশায় ছাড়া কেউ জানে না। আমার স্ত্রী কলে-কৌশলে কথাটা বিনয়ের স্ত্রীর কাছ থেকে বার করেছে।"

রাধানাথ কহিল—"বুড়ীকে জানিয়ে দিতে হবে তো! এ কথাটাও বলে দেব না কি মুখী দিদিদের?"

প্রফুল্ল কহিল—"ও-কথাটা আর ওঁদের বলে কাজ নাই। আমার স্ত্রী গিয়ে এক দিন বলে আসবে। তাতে বেশী কাজ হবে। চাক্ষুষ সাক্ষী কি না—"

রাধানাথ কহিল—"তাই কোরো ভাই! সবাই মিলে চেষ্টা করে গাঙ্গুলী বুড়োর এই চালটা কাটিয়ে দাও দেখি, তার পর আমি দেখে নেব।"

৭

সন্ধ্যার পরে গাঙ্গুলী-গিন্নী বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। রাত্রির রান্না শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। ঝি পায়ে তেল মালিশ করিতেছিল। এমন সময়ে সৌদামিনী বাড়ীতে ঢুকিয়া ডাক দিল—"কি করছ গো খুড়ি!" সৌদামিনী পাড়ার মেয়ে। বিধবা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। সম্পর্কে গাঙ্গুলী মশায়ের ভাইঝি।

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"আয় মা, আয়, বস।"

সৌদামিনী আসিয়া পাশে বসিল, কহিল—"কাকাকে দেখছি নে?"

—"এ সময়ে কি করে দেখতে পাবি তোর কাকাকে? খামার-বাড়ীর বৈঠকখানায় এখন জমজমাট আড্ডা। রাত দশটার আগে বাড়ী ফেরে না।"

—"এত বড় বাড়ীতে একা-একা থাকা তো ভারী কষ্ট! নাতি-নাতনীরা কেউ কেউ কাছে এসে থাকলে পারে—"

—"তারা তো এসে থাকতে চায়। আমার সাহস হয় না। পাড়াগাঁয়ে আজকাল যা অসুখ-বিসুখ! তা মা, হঠাৎ আজ এলি যে? এমনই তো খুড়া বেঁচে আছে কি মরেছে, খবর নিস্ না—"

—"খবর নেওয়া তো উচিত খুড়িমা, কি করব বল! এত বড় সংসারটি সব আমার ঘাড়ে। বৌগুলি তো ছেলে-মেয়ে নিয়েই অস্থির। তা আজ এলাম একবার সময় করে। নানা রকম কথা শুনছি গাঁয়ে। ভাবলাম, খুড়ীকে জিজ্ঞেস করে আসি। খুড়ী তো সবই জানে!"

গাঙ্গুলী-গিন্নী সন্দিগ্ধ স্বরে কহিলেন—"কি কথা বল্ দেখি?"

—"কাকার না কি 'জন্মদিন' পরব করছে গাঁয়ের লোক?"

গাঙ্গুলী-গিন্নী বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন—"সে আবার কি কথা? আমি তো কিছুই জানি না।"

সৌদামিনী আকাশ হইতে পড়িল। দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল—"সত্যি, জান না? গাঁয়ের সবাই জানে। যার কাছে যাবে, তার মুখেই ঐ কথা।"

গাঙ্গুলী-গিন্নী ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিলেন—"মিছে কথা বলে লাভ কি, মা! আমি কিছুই জানি না। যার দিব্যি করতে বল, তারই দিব্যি করে বলছি—" সখেদে কহিলেন—"আমাকে তো কিছুই বলে না। মানুষ হতাম তো বলত, জন্তু-জানোয়ারের অধম যে!"

সৌদামিনী কহিল—"সে কি কথা খুড়ি?" গাঁয়ের মধ্যে যদি কেউ মানুষ থাকে তো তুমি, আমরা সবাই এ কথা বলাবলি করি। কাকাটি তো আমার ভোলা মহেশ্বর! ওঁর সাঙ্গোপাঙ্গ ভূতগুলো ওঁকে নাচিয়ে নানা কাজ করায়—তা'তে লোকে নিন্দেই করুক, আর ঠাট্টাই করুক। নিজের নিজের কাজ সবার হাসিল হলেই হল।" মুচকি হাসিয়া কহিল—"কাকার জন্মদিন হচ্ছে শুনে ছেলেমেয়ে-গুলো হেসে কুটি-কুটি; বলছে—ঠাকুরদাদার আবার দাঁত বেরিয়েছে, তাই জন্মদিন হবে। বৌরা তো বাইরে হাসতে পারছে না—যতই হোক শ্বশুর তো? তবে আড়ালে হাসি-ঠাট্টা করছে।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"রাধানাথ কাকা বলছিল কি জানেন?—জন্ম-দিন তো হবেই ওঁর দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্ছেন তো! কাজ-কর্ম্ম মতিগতি দেখলেই বুঝা যায়। এখন গাঙ্গুলী-বৌঠানকে পছন্দ

হলে হয়।" আর একটু থামিয়া কহিল—"আরও কত লোক কত কি বলছে—সব কথা শুনে তোমার কাজ নাই।"

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"আমি কি বলব বল। আমার কথা কি কানে নেয়। আমি বাড়ীর রাঁধুনী—পেটের ভাতে চাকরাণী—আমাকে এ সব শুনিয়ে কি হবে বল?"

সেদিন রাত্রি দশটার পর গাঙ্গুলী মশায় বাড়ী ফিরিলেন। গৃহিণী মাদুরে শুইয়াছিলেন। গাঙ্গুলী মশায় ডাক দিয়া কহিলেন—"খেতে দাও।" কোন জবাব নাই।—আবার ডাক দিলেন গাঙ্গুলী মশায়।

এবার গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—"আমি কি মাইনে-করা রাঁধুনী না কি? পারব না উঠতে। পার তো বেড়ে খাও গে—"

গাঙ্গুলী মশায় বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত! কি ব্যাপার! কোন কথা কানে গিয়াছে না কি! কহিলেন—"শরীর খারাপ তো উঠে কাজ নাই।' আমি নিজেই বেড়ে নিচ্ছি—"

রান্না-ঘরে গিয়া গাঙ্গুলী মশায় সশব্দে ঘটি-বাটি নাড়িতে লাগিলেন। হঠাৎ দুম্-দুম্ পায়ের শব্দে মুখ না ফিরাইয়াই বুঝিলেন, গৃহিণী আসিতেছেন। কিন্তু কিছুই যেন বুঝিতে পারেন নাই, এই ভাবে থালা লইয়া ভাত বাড়িবার উপক্রম করিতেই গৃহিণী পাশে আসিয়া হাতের থালা কাড়িয়া লইয়া সরোষে কহিলেন—"রাঁধা ভাত সবাই বেড়ে খেতে পারে—ওতে বাহাদুরী কিছু নাই। যাও, খেতে বস গে—" গাঙ্গুলী মশায় আসিয়া খাইতে বসিলেন।

গাঙ্গুলী মশায় গভীর মনোনিবেশ সহকারে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহিণী ঠিক সামনে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঙ্গীনের মত উঁচাইয়া বসিয়া আছেন বুঝিতে পারিয়াও নির্ব্বিকার রহিলেন। শেষে গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন—"তোমার না কি জন্মদিন হচ্ছে?"

গাঙ্গুলী মশায় চমকিয়া উঠিয়া মুখ তুলিয়া কহিলেন—"কে বললে তোমাকে?"

—"যেই বলুক, কথাটা সত্যি কি না বল।"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"তা সত্যি—"

—"আমাকে বলনি কেন?"

—তোমাকে পরে বলতাম। মেয়েমানুষ তো! মুখ আলগা। পাঁচ কান হয়ে গেলে—"

—পাঁচ কান হ'তে বাকী আছে না কি? গাঁ-শুদ্ধ সবাই জানে যে—"

গাঙ্গুলী মশায় চিন্তিত মুখে কহিলেন—"তাই তো দেখছি।"

—"কিন্তু গাঁয়ের সব কি বলছে জান? বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে তোমার—"

—"ভীমরতি কিসের?"

—"ভীমরতি নয়? জ্ঞান-গম্যি থাকলে কি পরের কথায় বাঁদর-নাচ নাচতে! বুড়ো বয়সে জন্মদিন! বাপের জন্মে কখনও শুনিনি—"

—"তুমি আর শুনবে কি করে? লেখাপড়া জানতে, খবরের কাগজ পড়তে তো দেখতে—নিত্যি ঐ খবর। আজ এর জন্মদিন, কাল ওর জন্মদিন। বোয়ান-বুড়ো বাছ-বিচার নাই। অবশ্যি, যাঁরা দেশের গণ্য-মান্য লোক, তাঁদেরই হয়। রেধোর মত হারামজাদাদের হয় না—"

ব্যঙ্গের স্বরে গৃহিণী কহিলেন—"কি গণ্যি-মান্যি লোকটা! গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল!"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"তুমি বললে কি হবে। লোকে মান্যি-গণ্যি না ভাবলে করছে কেন?" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"তোমাকে কে বললে, বল দেখি?"

—"সদি বলে গেল। পাড়ার বৌরা, ছেলেমেয়েরা না কি হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে তোমার জন্মদিন হওয়ার কথা শুনে। রাধানাথ না কি বলেছে—তুমি দিন-দিন খোকা হয়ে যাচ্ছ—লোক আর মানবে না তোমায়—হাকিমরাও পাত্তা দেবে না—"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"রেধো হারামজাদা, আর তার ঐ চর মাগীগুলো কি বলছে, তাতে কান দিও না। গাঁয়ের যারা শিক্ষিত লোক, ভাল লোক, তারা আমায় সম্মান করছে, হাকিমরা যখন দেখবে—"

গৃহিণী কহিলেন—"হাকিমরা আসবেন না কি?"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"নিশ্চয়। তাঁরা আসবেন বৈ কি! তাঁরা যখন এই সব দেখবেন, আমার কত খাতির বাড়বে বল দেখি! রেধো ভাবছিল, খদ্দর চড়িয়ে আমার উপর টেক্কা দেবে। এবার আর ট্যা-ফোঁ করতে হবে না। তাই রেধো ঐ মাগীটাকে চর পাঠিয়ে তোমাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে কাজটাকে পণ্ড করবার চেষ্টা করছে। আমরা এই ভয় করেই কথাটা চাউর করিনি—তোমাকে পর্য্যন্ত বলিনি। কিন্তু আমাদেরই কেউ কথাটা চাউর করে দিয়েছে বুঝতে পারছি।"

গৃহিণী অনেকটা শান্ত হইয়া কহিলেন—"আমাকে যদি কোনও কথা ব'লে কাউকে বলতে মানা কর, আমি কি কখনও তা কাউকে বলি?"

—"বল না বটে। বলতামও তোমাকে। তবে মাষ্টার নিষেধ করলে। বললে, দিদিমাকে এখন বলবেন না। পাড়াগাঁয়ে এ সব তো সচরাচর হয় না। উনি হয়তো মত দেবেন না—"

গৃহিণী কহিলেন—"যদি এতে তোমার মান বাড়ে, ভাল হয়, তো মত দেব না কেন? আমি কি এত অবুঝ!"

৮

পরের দিন। গাঙ্গুলী-গিন্নী পুকুরে স্নান করিতে গিয়াছেন। একটু বেলা হইয়া গিয়াছে। ঘাটে অন্য মেয়েরা কেউ নাই। শুধু এক জন প্রৌঢ়া স্নান করিতেছিলেন। প্রৌঢ়ার নাম মোক্ষদা। সম্পর্কে গাঙ্গুলী-গিন্নীর ননদ। গাঙ্গুলী-গিন্নীকে দেখিয়া মোক্ষদা কহিলেন—"এত দেরী হল যে, বৌ?"

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন— "ঘর-দোরগুলো পরিষ্কার করছিলাম। একলা মানুষ, সব দিন পেরে উঠি না।"

—"কেন, তোর তো লোকের অভাব নাই! মুনিষ, মান্দের, কামিন—কত লোক রয়েছে। তারা করে না?"

—"দিন-কাল কেমন পড়েছে জান তো, ঠাকুরঝি! পাওনা-থোওনার বেলায় সব আঠারো আনা, কাজের বেলায় গাফিলতি! ওদের কথা বোলো না, ঠাকুরঝি।"

মোক্ষদা বলিলেন— "একটু কড়া হয়ে করিয়ে নিবি। না হলে দাদাকে বলবি। এই বয়সে এত খাটবার দরকার কি? তা ঘর-দোর এত পরিষ্কার করছিস যে? কেউ আসছে না কি?"

—"হ্যাঁ—ওঁর এক মামাতো ভাই-এর ছেলে আসবে কি—কলকাতায় থাকে। আজকাল না কি খুব গণ্যি-মান্যি

—"কি নাম ?"

"না? বল্লে কি তুমি চিনতে পারবে ঠাকুরঝি ?"

—"বলই না। না চিনতে পারি না চিনব। নামটা তো শুনে রাখি !"

হঠাৎ গাঙ্গুলী-গিন্নীর সন্দেহ হইল—অত নাম শুনিবার আগ্রহ কেন ? সতর্ক হইয়া উঠিয়া কহিলেন—"ভাল নামটা তো জানি না ঠাকুরঝি, ডাক-নামটি জানি—"

—"তাই-ই বল।"

—"ডাক-নাম—পটলা।"

মোক্ষদা চিনিতে পারিলেন না। হঠাৎ কি-যেন একটা কথা মনে পড়িল, এমনই ভাবে ভ্রূ নাচাইয়া মোক্ষদা কহিলেন—"এ্যাই দেখ, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম। বয়স হ'লে মনে-টনে থাকে না কিছুই। ক'দিনই ভাবছিলাম, তোর সঙ্গে দেখা হ'লে কথাটা জিজ্ঞেসা করব।"

গাঙ্গুলী-গিন্নী ঔৎসুক্য সহকারে কহিলেন—"কি বল দেখি ?"

—"হ্যাঁ লা ! দাদার না কি সবাই জন্মদিন করছে ?"

গাঙ্গুলী-গৃহিণী কহিলেন—"হ্যাঁ, করছেই তো ! আজকাল মান্যি-গণ্যি লোকদের জন্মদিন করা রেওয়াজ। গাঁয়ের মধ্যে তো উনিই মানুষের মত লোক—কত লোকের কত উপকার করেন। তাই সবাই মিলে ওকে মান্যি করছে।"

মোক্ষদা কহিলেন—"কিন্তু এটা কি ভাল ? শুনে থেকে মনটা আমার খচ্-খচ্ করছে। ছোট ছেলে-মেয়েদের মা-বাপরা সখ করে জন্মদিন করে ; তা'-ও আমাদের গরীব-গেরস্থদের ঘরে ও-সব হয় না ; সহরের বড়লোকদের ঘরেই হয়, শুনেছি। কিন্তু এত বয়সে 'জন্মদিন' হওয়া তো কখনও শুনিনি। তা'-ও ঘরের লোকে করে—সে এক কথা। কিন্তু গাঁ-শুদ্ধ সবাই মিলে 'জন্মদিন' করা—"

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"সবাই মিলে না করলে মান্যি হবে কি করে, ঠাকুরঝি ?"

—"দেখ, বৌ ! দাদার মান্যি হ'লে শুধু তোরই গৌরব নয়, গৌরব আমাদেরও। যেখানেই যাই, দাদার নাম করে বলি—দাদা আমার এমন ! দাদা আমার তেমন ! এর মানটা দেখছিস, কিন্তু এর মানেটাও বুঝে দেখ। সবাই মিলে একটা বুড়োর 'জন্মদিন' করা মানে তাকে বলে দেওয়া—তোমার এত বয়স হয়েছে, অনেক দিন বেঁচে আছ তুমি। এমনই করে বয়স নিয়ে টোকা কি ভাল ! তুই বুঝে দেখ—"

গাঙ্গুলী-গিন্নী চিন্তিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

মোক্ষদা বলিতে লাগিলেন—"ছোট ছেলেরা একটু চাঁদ-পানা হলে, নাদুস-নুদুস হলে আমরা মাদুলী পরাই, টিপ পরাই, পাছে ডান-এ খুঁড়ে দেয় ; কিন্তু এই যে গাঁ-শুদ্ধ লোক বয়স নিয়ে খুঁড়তে থাকবে, তা'তে কি বল ভাল হবে ?" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"দাদার মত একটা লোক গাঁয়ে আছেন, কত সাহস, কত ভরসা ! বুড়ো বয়সে কেউ যদি কিছু না করে তো ভাবি, দাদা তো আছেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, উনি নদীর বালির মত পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাকুন, কিন্তু গাঁয়ের হিংসুটে হাড়-বজ্জাত লোকগুলো খুঁড়ে-খুঁড়ে দাদার যদি একটা কিছু ঘটিয়ে দেয় তো—" মোক্ষদার গলার স্বর কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল। কথা শেষ না করিয়া তিনি গামছায় চোখ চাপিলেন।

সেই দিন দুপুর বেলায় আহারের সময়ে গৃহিণী কহিলেন—"দেখ, ও জন্মদিন-টন্মদিন বন্ধ করে দাও—"

গাঙ্গুলী মশায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন—"আরে ! সে কি ! সব তৈরী হয়ে গেছে, মাঝে একটা দিন মাত্র বাকী। হাকিমদের নিমন্ত্রণ হয়ে গেছে ! এখন ও-কথা বললে কি চলে ?"

—"বেশ তো, নেমন্তন্ন হয়ে গেছে, তাঁরা আসুন, খাওয়া-দাওয়া করে চলে যান। জন্মদিন তোমার হবে না।"

সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"কি হয়েছে বল দেখি ? আবার কোন চর এসেছিল বুঝি ?"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন—"চর আবার কে ? চর-টর কেউ আসেনি"—একটু থামিয়া কহিলেন—"যারা তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তারা সবাই মানা করেছে—"

—"মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীটির নাম বল না ?"

—"মোক্ষদা ঠাকুরঝি। তোমাকে তো খুবই স্নেহ-ছেদ্দা করে।"

গাঙ্গুলী মশায়ের বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। কহিলেন—"কি বলছিল ?"

—"বলছিল—ও-সব করলে ভাল হবে না—ওতে অমঙ্গল হবে।"

—"কি অমঙ্গল হবে ?"

গাঙ্গুলী-গিন্নী রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন—কি অমঙ্গল হবে—বলতে পারব না। সে কথা মুখে বলা যায় না !"

গাঙ্গুলী মশায় হাসিয়া কহিলেন—"মৃত্যু হবে—এই কথা বলেছে তো ? মুখ্যু মেয়েমানুষের কথা শুনছ কেন ! দেশের অত লোকের 'জন্মদিন' হচ্ছে, কা'র মৃত্যু হয়েছে শুনি ? ওতে মৃত্যু হয় না, বরং পরমায়ু বাড়ে। সবাই মিলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে—যেন অনেক দিন বেঁচে থাকি, অনেক দিন শক্ত-সমর্থ থেকে যেন দেশের উপকার করি—"

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"দল বেঁধে কিছু চাইলে ভগবান দেন না। 'জন্মদিন' করলে যদি পরমায়ু বাড়ে তো আমি বাড়ীতে 'জন্মদিন' করব। ও-রকম বারোয়ারী 'জন্মদিন' চলবে না !"

গাঙ্গুলী মশায় চুপ করিয়া খাইতে লাগিলেন ! জানেন—প্রতিবাদ নিরর্থক। একবার যখন গোঁ ধরিয়াছে, কিছুতেই বুঝিবে না। কাজেই চুপ করিয়া থাকাই উচিত। যা হইবার তা হইবেই। এখন 'স্তোক-বাক্য' বলিয়া কোন রকমে থামাইয়া রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ !

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"কথাটা কানে ঢুকল না না কি ?"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"ঢুকেছে বৈ কি ! মাষ্টারের সঙ্গে পরামর্শ করব। যদি বন্ধ করলে অসুবিধে না হয়, বন্ধই করে দেব।"

গৃহিণী দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন—"অসুবিধে হলেও বন্ধ করে দিতে হবে—বোলো নাতিকে আমার নাম ক'রে—"

সেদিন সন্ধ্যার পরে—'দিদিমা, মা বাড়ীতে আছেন ?'—বলিয়া একটি ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর বয়সের যুবক আসিয়া শোবার ঘরের

দরজার সামনে দাঁড়াইল। গাঙ্গুলী-গিন্নী ঘরে বসিয়া গাঙ্গুলী মশায়ের একটা পুরাতন চশমা চোখে দিয়া কি একটা সেলাই করিতেছিলেন। আপ্যায়ন সহকারে কহিলেন—"এস, ভাই! এস, বস।"

ঘরটী মাঝারি আয়তনের। এক পাশে একটি পালঙ্কে ধবধবে ফর্সা চাদর দিয়া ঢাকা বিছানা-পাতা, দেওয়ালে নানা দেব-দেবীর পট, ও দেশের বড়লোকদের—যথা, মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ইত্যাদির ছবি টাঙ্গানো। আর এক পাশে দেওয়াল ঘেঁসিয়া কাপড়ের আলনা। সামনের দেওয়াল ঘেঁসিয়া একটা বেঞ্চির উপর ছোট-বড় নানা আকারের ট্রাঙ্ক উপরি-উপরি সাজানো। ঘরটি ঝকঝকে, তকতকে; অন্যান্য জিনিষগুলিও বেশ গোছানো; সর্বত্র গৃহিণীর কর্মকুশল হাতের পরিচয় পরিস্ফুট।

যুবকটি ঘরে ঢুকিয়া বিছানার উপরে বসিল।

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"হঠাৎ এলে যে?"

যুবকটি কহিল—"কাল রবিবার যে।"

—"ওঃ! তাই। তা বৌ, খোকা বেশ ভাল আছে?"

যুবকটি কহিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

যুবকটির নাম অপরেশ। বি,-এ পাশ। সহরে কালেক্টরীতে কেরাণীর কাজ করে। সহরেই সপরিবারে থাকে। ছুটি-ছাটাতে মাঝে-মাঝে বাড়ী আসে।

যুবকটি কহিল—"দাদামশায়ের না কি জন্মদিন হচ্ছে দিদিমা?"

গৃহিণী কহিলেন—"হচ্ছিল—বন্ধ করতে বলে দিয়েছি। ওতে আমার মত নাই।"

অপরেশ কহিল—"বেশ করেছেন। আমিও তাই বলতে এসেছিলাম—"

—"উনি বলছিলেন—সহরে বড়-বড় লোকদের জন্মদিন হয়।"

—"হয় তো। কিন্তু ফল কি হয়! ক'জন জন্মদিন-এর ধাকা সামলাতে পারে? এই যে দেশের বড় বড় লোকগুলো পটপট করে মরে গেল, এর কারণ জানেন? ঐ জন্মদিন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, এমন কি মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত—"

গাঙ্গুলী-গিন্নী বাধা দিয়া কহিলেন—"মহাত্মা গান্ধীকে তো খুন করে দিয়েছিল?

"সে তো দেখিতে খুন; আসল খুন করেছিল দেশের লোক—জন্মদিন ক'রে ক'রে। না হলে একশ পঁচিশ বৎসর বাঁচব বলেছিলেন, বাঁচতেনও।"

হঠাৎ দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া কহিল—"যতগুলি লোকের ছবি দেখছেন, সব জন্মদিন-এর ধাকায় গেছে—"

পালঙ্ক হইতে নামিয়া, দেওয়ালের কাছে গিয়া সুভাষচন্দ্রের বাঁধানো ছবিটি লইয়া আসিয়া দিদিমার হাতে দিয়া কহিল—"দেখুন দেখি চেহারা।"

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"আহা! চমৎকার চেহারা! কে ভাই?—"

—"সুভাষচন্দ্র। কেমন ডাকাবুকো চেহারা দেখছেন! কিন্তু ভক্তের দল বার কয়েক 'জন্মদিন' করতেই দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে কোন্ বিদেশে বেঘোরে মারা গেলেন।"

—"আহা! বিয়ে হয়েছিল?"

—"বিয়ে করেননি! সন্ন্যাসী মানুষ, দেশের জন্যেই প্রাণ-মন সঁপে দিয়েছিলেন। ও-সব দিকে মন ছিল না। এত বড় একটা লোক এ দেশে কম ছিল।"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গাঙ্গুলী গিন্নী কহিলেন—"আমি তো মানা করে দিয়েছি—তাতেও যদি না শোনে তো বুকফাটা বাধিয়ে দেব।"

রাত্রে গাঙ্গুলী মশায় বাড়ী ফিরিতেই গৃহিণী কহিলেন—"মাষ্টার নাতিকে বলেছ?"

গাঙ্গুলী মশায় বিরক্তির সহিত কহিলেন,—"হাঁ, হাঁ—বলেছি—"

—"কি বললে?"

—"কি আর বলবে? হাসছিল। পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু মেয়েমানুষের কথা শুনে ওদের মত শিক্ষিত লোক হাসবে না তো কি করবে?"

—"আমি না হয় মুখ্যু মানুষ, অপরেশ তো মুখ্যু নয়। ও তো ঐ কথা বলে গেল—"

গাঙ্গুলী মশায় বলিলেন—"অপরা হারামজাদা এসেছিল বুঝি! কি বললে?"

ছবিগুলার দিকে হাত বাড়াইয়া গৃহিণী কহিলেন—"বললে—ঐ যতগুলো লোকের ছবি রয়েছে—সব জন্মদিনের জন্যে মারা গেছে।"

—"মুখ্যু মেয়েমানুষ পেয়ে বোকা বানিয়েছে আর কি! ওঁরা কত বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে ছিলেন জান? কেউ ষাট, কেউ সত্তর, কেউ আশী পেরিয়ে গিয়েছিলেন। বাংলা দেশে ক'জন বাঁচে এত দিন? ওঁরা বেঁচেছিলেন—লোকে ওঁদের 'জন্মদিন' করেছিল বলে।"

গৃহিণী লম্বা-লম্বা পা ফেলিয়া দেওয়ালের কাছে গিয়া সুভাষচন্দ্রের ছবিটি লইয়া আসিয়া গাঙ্গুলী মশায়ের চোখের সামনে ধরিয়া কহিলেন—"এরও বয়স সত্তর-আশী! এ গেল কি করে?"

—"আরে এ তো সুভাষচন্দ্র! যুদ্ধ করেছিলেন ইংরেজের সঙ্গে। সেখানেই মারা গেছেন। যুদ্ধে যে লক্ষ লক্ষ লোকে মারা গেছে, সব কি জন্মদিন-এর জন্যে? মুখ্যু মেয়েমানুষ আর কাকে বলে! আসল কথা কি জান—আমার জন্মদিন হবে, গাঁয়ের লোক আমাকে সম্মান দেখাবে, হাকিমদের কাছে আমার মান বাড়বে, রাধানাথের সহ্য হচ্ছে না। তাই নানা লোক পাঠিয়ে তোমাকে নাচাচ্ছে। জানে তো—তোমাকে নাচানো কত সোজা, আর নাচতে সুরু করলে মা-কালীকেও হার মানিয়ে দাও—"

গৃহিণী চুপ করিয়া রহিলেন, মনে সন্দেহের দোলা লাগিল।

গাঙ্গুলী মশায় তাহা বুঝিলেন, সোৎসাহে বলিলেন—"রাধানাথ এত কথা বলে পাঠাচ্ছে, কিন্তু নিজে মাষ্টারকে ডেকে কি বলেছে জান? বলেছে, যা' খরচ হয়েছে সব দেবে, তাছাড়া স্কুলে একশ' টাকা চাঁদা দেবে, ওর জন্মদিন হোক—"

গৃহিণী কহিলেন—"মিথ্যে কথা! রাধানাথ তোমার মত বোকা নয়, নিজের ভাল-মন্দ খুব বোঝে।"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"মিথ্যে কথা! বেশ তাই! তবে একটা কথা জেনে রেখো, রাধানাথ যদি বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হয় তো গাঁয়ে বাস করব না।"

গৃহিণী কহিলেন—"সে আর নতুন কথা কি শোনাচ্ছ? সে কথা তো সেদিন হয়ে গেছে। কাশীবাস করব দু'জনে—"

কাশীবাসের কথাটা গাঙ্গুলী মশায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। গৃহিণীর কথায় মনে পড়িল। কহিলেন—"তা তো করব। কিন্তু তা বলে রেখোর হাতে বোর্ড তুলে দিয়ে গাঁয়ের সর্ব্বনাশ করতে পারব না! তাছাড়া, ঘর-বাড়ী, সম্পত্তি তো কাশী নিয়ে যেতে পারব না। সে সব এখানেই থাকবে। রেখো যদি গাঁয়ের কর্ত্তা হয় তো ফন্দি-ফাঁদা করে সব তছনছ করে দেবে।"

গৃহিণী কহিলেন—"তা কেন করবে? রাধানাথকে যত খারাপ লোক বল, তত নয়—"

গাঙ্গুলী মশায় বিকৃত স্বরে কহিলেন—"হ্যাঁ-হ্যাঁ, খুব ভাল লোক! —"তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীও—"

—"খুব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী!"

—"তোমার দুর্ম্মতি হয়েছে কি না, নিজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের তুমি চিনবে কি করে? তাঁদের কথা তো তোমার কানে ঢুকবে না। আমার কথাই যখন ঢুকছে না। তবে একটা কথা মনে রেখো— মন্দোদরীর কথা না শুনে রাবণের ঘোর অমঙ্গল হয়েছিল। আমার কথা না শুনলে তোমারও তাই হবে—" কণ্ঠস্বর খাটো করিয়া কহিলেন—"আর একটা কথা, মন্দোদরীর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপ করে দেখবার মেয়ে আমি নয়। যদি দেখি 'জন্মদিন' হচ্ছে, তাহলে যেদিনে হবে, সেদিন ভোরে তুমি উঠবার আগে শোবার ঘরে ভারী তালাটা লাগিয়ে দিয়ে চাবিটা পুকুরের জলে ফেলে দেব। কেমন করে 'জন্মদিন' হয় দেখব আমি—"

[ক্রমশঃ।

দু'টি বিলাতী কবিতা

অমিয় ভট্টাচার্য্য

নৈশ প্রস্তাব

(মাইকেল ফীল্ড)

এসো নিদ্রা ধ্বান্ত-ক্রতু, সাহসিকা রাত্রির দুহিতা,
আমাকে তোমার স্বপ্ন ভিক্ষা দাও। দাও মিথ্যাগুলি।
দিবা-অস্বীকৃত সুখ নিয়ে এসো আমার শিয়রে,
কণ্টকিত, শৃঙ্গারিত শুভ্র তোরণের দ্বার খুলি'।

নিষ্ঠুর অধর হ'তে যে চুম্বন পারিনি কাড়িতে,
সে চুম্বন ওষ্ঠে আনো; আনো শিলীভূত সে হৃদয়,
প্রেম-বজ্রে যে হৃদয় পারিনি ভাঙিতে; শান্তি আনো,
যার আশে এ জীবন ভেঙ্গে ভেঙ্গে আজো বেঁচে রয়।

ঢের ভালো,—যদি স্বপ্ন-মায়া-মাখা নৈশ মিথ্যাগুলি
সুমধুর বঞ্চনার মন্ত্রোচ্চারে করে অভ্যর্থনা।
নিশিগন্ধ ওষ্ঠাধর হোক্ মোর নৈশ উপাধান,
শান্তি হোক্ নির্দ্দয় দিনের :—তার চরম লাঞ্ছনা।

মেঘ

(রুপার্ট ব্রুক্)

সুনীল-নিশীথ-গর্ভে অন্তহীন মেঘস্তম্ভগুলি
নৈঃশব্দের আলোড়নে ভাঙ্গে, বয়, আনে তরঙ্গিমা।
সুদূর দক্ষিণ-প্রান্তে উৎক্ষিপ্ত তাদের করাঙ্গুলি
তুষার-প্রলেপে ঢাকে গুপ্ত শ্বেত শশি-মাধুরিমা।

সাথিহীন সংক্রমণে কেহ থেমে যায় অগোচরে।
অস্পষ্ট-মন্থর-ভঙ্গী,—ফিরে চায়;—দৃষ্টি মসীলীন।
যেন কোন যোগ-পন্থী পৃথিবীর হিত ভিক্ষা ক'রে,
অকস্মাৎ বোঝে সত্য : আশীর্ব্বাদ শূন্য, অর্থহীন।

লোকে বলে : মৃত্যু নেই। মৃতেরা তাদেরই পার্শ্ব-জন,
ফেলে-আসা সুখ-দুঃখ বেঁটে নিয়ে যারা বিত্তশালী।
আমি ভাবি : তারা শান্ত-নভোচারী (মেঘেরই মতন)।
প্রভুত্ব-গরিমা-দৃপ্ত-ভঙ্গিমায় উদ্বৃত্ত কপালী।

: সেথা হ'তে দেখে চাঁদ, দেখে, সিন্ধু আজো গর্জ্জমান,
দেখে, পৃথিবীর বুকে মানুষের প্রবেশ-প্রস্থান।

দামোদরগুপ্ত প্রণীত

কুট্টনী মত

অনুবাদক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

"উদ্দীপ্ত-কাম-তারুণ্য বশতঃ বা চাপল্য হেতু বা কৌতূহল-বশে কিংবা অনুকম্পাবশে, অথবা আমার ভাগ্যগুণে বা দূতীর কৌশলে অথবা স্বভাববশে তুমি আমার প্রতি আমার জীবনধারণের উপায়স্বরূপ যে প্রেমকণাংশ প্রদর্শন করিয়াছ প্রেম সম্বন্ধে গণিকাদিগের অন্যরূপ ভাব (১) বিবেচনা করিয়া সেই প্রেম হইতে যেন আমাকে বঞ্চিত করিও না। স্নেহ, ক্রোধ, শাঠ্য, দাক্ষিণ্য, সরলতা, ব্রীড়া এই সমস্ত ধর্ম সাধারণ নারীর ন্যায় জীবধর্ম অনুসারে তাহাদেরও (অর্থাৎ গণিকাদিগেরও) আছে। অকপট ও আন্তরিক প্রবল প্রেমে অভিভূত-হৃদয়া, দয়িতের বিরহ-ব্যথা সহ্য করিতে অক্ষমা গণিকাগণ নিজ প্রাণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে। সত্যই যাহা ঘটিয়াছিল সেই উপাখ্যান আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। আজিও সেই ঘটনার সাক্ষিস্বরূপ বটবৃক্ষ "বেশ্যাবট" নামে পরিচিত হইয়া থাকে। [১৭১—১৭৫]

হারলতা উপাখ্যান

পাটলীপুত্র নামে এক মহানগর আছে; ইহা পৃথিবীর তিলকস্বরূপ, সরস্বতীর নিত্য নিবাসস্থল এবং (ঐশ্বর্যে) ইহা ইন্দ্রপুরীকেও পরাজিত করিয়াছে। ব্রহ্মা কর্তৃক ত্রিভুবনের পুর-রচনা-কৌশল (২) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিশ্বকর্মা যেন চিত্র দ্বারা আপন শিল্পচাতুর্য প্রদর্শন করিয়াছেন। (তথায়) কোন অমঙ্গল নাই, (যুদ্ধে) পরাভূত হইয়া শত্রু কর্তৃক তাহা নির্জিত হয় নাই (৩), (নৈসর্গিক) উৎপাত-সমূহ দ্বারা উপদ্রুত নহে (৪) এবং কলিকালোচিত দোষ সমূহ তাহাকে স্পর্শ করে নাই (৫)। ভোগিগণের (৬) নিবাস হেতু ইহা পাতালতল তুল্য, বিবিধ রত্নসমুচ্চয়ে (ঐশ্বর্যশালী হইয়া রত্নাকর) সমুদ্রতুল্য, বিবুধগণের (৭) বাস হেতু স্বর্গতুল্য; অর্থসমৃদ্ধি হেতু ইহা কুবের-ভবনতুল্য, মহিলাগণের বাস হেতু ইহা অসুর-বিবর (৮) তুল্য, গন্ধর্বগণের (৯) বাস হেতু ইহা হিমালয়ের সানুদেশ তুল্য, যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠের প্রাচুর্য হেতু ইহা হরিনগরের (১০) ন্যায় এবং শমবিভবের (১১) হেতু ইহা মুনিজনস্থান (অর্থাৎ বদরিকাশ্রম) তুল্য। [১৭৬—১৮০]

এই নগরীতে সকল শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা মার্জিত-বুদ্ধি বিপ্রগণ বাস করেন এবং নিকষ প্রস্তরে যেরূপ সুবর্ণের গুণ নির্ণীত হয় সেইরূপ এইখানে ললনাগণের সদসদ্ গুণ নির্ণীত হইয়া থাকে (১২)। কলি-কালের আবির্ভাবে (শীতার্ত) কম্বলাচ্ছাদিত বৃষের ন্যায় ধর্ম যজ্ঞীয় ধূমরূপ কম্বলাচ্ছাদিত হইয়া নিভৃতে এই স্থানে বাস করেন (১৩)। শশধর নিজ কলংক আচ্ছাদন করিবার নিমিত্ত কররাশি প্রসারণ করিয়া নিশীথে এই স্থানের নারীগণের বদনপংকজকোষ হইতে লাবণ্য অপহরণ করিয়া থাকেন। এই নগরীতে অভিসারিকা তরুণী বল্লভের সহিত মিলনাভিসারকালে নিজ তনুকান্তি বিস্তার পূর্বক পথ হইতে ঘনান্ধকাররূপ কৃষ্ণ যবনিকা অপহরণ করিয়া থাকে (১৪)। হেথায় পথিক সমূহ নিতম্বতীগণের চঞ্চল কটাক্ষের তীক্ষ্ণ শরাঘাতে বিদ্ধ হওয়ায় তাহাদিগের নিজ বনিতাগণের সহিত সমাগমের উৎকণ্ঠা শিথিল হইয়া যায়। [১৮১—১৮৫]

এই নগরীর কুলমহিলাগণ যেরূপ স্বল্পভাষিণী তাহাদের কর-পদপল্লবও সেইরূপ নাতি পরিসর, তাহাদের মন যেরূপ স্বচ্ছ চঞ্চল বিশাল নয়নযুগলও সেইরূপ। তাহাদের স্তন, জঘন ও কেশভারের ন্যায় তাহাদের প্রিয়জনের প্রতি অনুরাগও নিবিড়, কুলদেবতাদিগের অর্চনায় তাহাদের বলিশোভা (১৫) যেরূপ তাহাদের দেহমধ্যভাগের বলিসকলের শোভাও সেইরূপ। মনোভবের বাণের তূণতুল্য তাহাদের নাভিকুহর তাহাদের স্বভাবের ন্যায় গম্ভীর, বিশাল নিতম্বের ন্যায় তাহাদের গুরুজন-পূজানুরক্ত চিত্তও বিশাল। [১৮৬—১৮৮]

সেথায় বিচ্ছিত্তি (১৬) কেবল হরিণায়তনয়নাগণের বেশে, কোষ

---

(১) অর্থাৎ কেবল নিজলাভের চেষ্টা বা স্বার্থপরতাই গণিকা-দিগের অন্তরে থাকে, সেখানে প্রেম নাই এরূপ মনে করিও না। (২) নগরস্থাপনের কৌশল ব্রহ্মা জানিতে চাহিলে যেন বিশ্বকর্মা তুলির সাহায্যে তাহা অংকিত করিয়া ব্রহ্মাকে নিজ শিল্পচাতুর্য দেখাইয়াছেন এমনি সুন্দর অর্থাৎ পটে আঁকা যেন ছবিখানি! (৩) শত্রু কর্তৃক যাহা পরাভূত হয় নাই ইহা দ্বারা তাহার বীর্যবত্তা অক্ষুণ্ণ, গৌরব অম্লান, এবং শোভা অবিনষ্ট ইহা সূচিত করিতেছে। (৪) নৈসর্গিক উৎপাত যথা—ভূকম্পন, উল্কাপাত, অগ্ন্যুৎপাত, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি। (৫) কলিকালোচিত দোষ অর্থাৎ চৌর্য, লাম্পট্য, অনাচার, অধর্ম ইত্যাদি। (৬) ভোগী—ঐশ্বর্য-ভোগী (luxurious) এবং পক্ষে সর্প; পাতাল সর্পদিগের বাসস্থান। (৭) বিবুধ—পণ্ডিত, পক্ষে দেবতা (৮) অসুরদিগের বিবর অর্থাৎ সুরক্ষিত গোপন নগরে মহিলাদিগের প্রাচুর্যের কথা প্রাচীন কাব্য সমূহে প্রসিদ্ধ; বাণভট্টের হর্ষচরিতে চক্রবর্তী সম্রাটকে দেখিবার জন্য সামন্তরাজগণের অন্তঃপুরচারিণী-গণের আগমনের বর্ণনায় "অসুরবিবরাণীব অপাবৃতানি" এই উৎ-প্রেক্ষা দৃষ্ট হয়; দশকুমারচরিতে—"দেব, যদি ভবাবতীর্ণে বিন্ধ্যোপ-কান্তারাসুরবিবরং" (দ্বিতীয়োচ্ছ্বাস)। (৯) গন্ধর্ব—দেবযোনি বিশেষ পক্ষে গীতবাদ্যকলাবিৎ। (১০) হরিনগর—হরিদ্বার অথবা সূর্য-বংশের রাজধানী অযোধ্যা যেখানে বহু যজ্ঞশালা বিদ্যমান।

(১১) শান্তভাব (sereneness); 'মুনিজনস্থান' অর্থে তপোবনও হইতে পারে। (১২) অর্থাৎ সেই স্থানে এমন সকল রসিক ব্যক্তির বাস যাহারা নিকষ প্রস্তরে স্বর্ণ পরীক্ষা করার ন্যায় ললনাগণের গুণাগুণ সহজেই বুঝিতে পারে। (১৩) বৃষ শব্দের এক অর্থ ধর্ম। এই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য স্থলে কলির প্রভাবে অধর্মের প্রাচুর্য হইয়াছে, কেবল এই স্থানের জনসাধারণ অবিরত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া বৈদিক ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। (১৪) তরুণীদিগের অসামান্য দেহ-লাবণ্যের প্রভায় অন্ধকার পথ আলোকিত হয়। (১৫) উপচারের দ্রব্যের সমারোহ, নৈবেদ্যাদি, পক্ষে ত্রিবলি। (১৬) বিচ্ছিত্তি—বিচ্ছেদ, অমিল (discord); পক্ষে স্ত্রীলোকের শৃঙ্গারচেষ্টা বিশেষ, যথা—"স্তোকা মাল্যাদি রচনা বিচ্ছিত্তিঃ

কান্তিহরণ(১৭) কেবল অঙ্গে, কুটিলত্ব কেবল অলকরাশিতে এবং কামচেষ্টিত (১৮) কেবল শিশুগণের ক্রীড়ায় দৃষ্ট হয়। সেখানে সংযম (১৯) কেবল ইন্দ্রিয় সকলের পক্ষে, ইনের(২০) উপঘাতরূপ(২১) গ্রহ(২২) কেবল রাহুর পক্ষে, স্বরস্ব(২৩) কেবল তালতরুর পক্ষে এবং তরল-সংগতা(২৪) কেবল হারলতার পক্ষেই প্রযোজ্য।

সেখানে পররন্ধ্রান্বেষণ(২৫) কেবল সর্পেরাই করিয়া থাকে, লোকে সেখানে কেবল প্রিয়তমার অধরই খণ্ডন করে (অন্যথা অপরকে খণ্ডন(২৬) করে না। সূচী ব্যথার(২৭) অনুভূতি কেবল নৃত্যাভ্যাস প্রবৃত্ত ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। অতি সরলা যুবতীগণ সেখানে নতদেহা(২৮), নর্মদা সেখানে মন্থর-গমনা(২৯)। সেই স্থানের মুগ্ধ-স্বভাবা রমণীগণ গুরুজনের শাস্ত্রে(৩০) অনুরক্তা। [১৮৯-১৯২]

সেইখানে ইন্দ্রের ন্যায় শত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্বান পুরন্দর নামে এক দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাস করেন। তিনি সত্যনিষ্ঠায় যুধিষ্ঠিরকে, কামদমনে শংকরকে এবং জিতেন্দ্রিয়তায় ব্রহ্মাকে সতত উপহাস করিয়া থাকেন। শিব বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহার পীড়ার কারণ হইয়াছেন, কৌস্তুভভূষণ নারায়ণ (বলির নিকট যাচ্ঞা করিয়া) যাচক হইয়া নিন্দনীয় হইয়াছেন, কপিলমুনি (সগরসন্ততিগণ কর্ত্তৃক) পৃথিবীর খননের কারণ হইয়া আদর্শচ্যুত হইয়াছেন কিন্তু তিনি তাঁহাদের ন্যায় গুণশালী অথচ তাঁহার মানের কোন ন্যূনতা হয় নাই। প্রাণিদেহের প্রতি হিংসায় বিমুখ হইয়াও তিনি মার্গানুসরণ (৩১) হেতু ব্যাধবৎ, পরদার বিমুখ হইয়াও গুরুজন-দিগের প্রমদাকাংক্ষা (৩২) করেন। তিনি যে দুইটি মহৎ কুল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা বিশাল সরসীর ন্যায় সমস্ত সত্ত্বের (৩৩) আধারস্বরূপ, সদাচারের জন্মভূমি এবং তাহা কলিকালোচিত দোষ সমূহ হইতে মুক্ত। তথায় পিতৃতর্পণের জন্য খড়্গ (৩৪) গ্রহণ করা হয় অন্যথা শৌর্যদর্পে কেহ খড়্গ গ্রহণ করে না। (এই উভয় বংশের) বালকগণ ব্রহ্মচর্য অবস্থায় যে মেখলা বা মৌঞ্জীবন্ধন করে তাহা (জীর্ণতাবশতঃ) ছিন্ন বা স্খলিত হইয়া যায় অন্যথা সুরতসংমর্দপ্রসঙ্গে কেহ মেখলা শিথিল করে না। বেদের পাঠভেদ হেতু (এই বংশীয়গণ) বিতর্ক করে নচেৎ অর্থ বিভাগ হেতু রোষবশে কেহ বিবাদ করে না। (এই দুই পরিবারে) যজ্ঞীয় অগ্নিতেই তেজের প্রকাশ দেখা যায়, জিতেন্দ্রিয় ভূদেবগণ তেজ বা ক্রোধ প্রকাশ করেন না। বার্ধক্যহেতু (এই বংশীয়গণের) পাদাদির স্খলন হয় অন্যথা শাস্ত্রাদিতে স্খলন হয় না। জপ হেতু (তাঁহাদের) অধর স্ফুরিত হয় অন্যথা রোষাবেশে হয় না। যজ্ঞার্থিগণই যজ্ঞার্থ সমিধ্ ইচ্ছা করেন অন্যথা কেহ সমিৎ (বা যুদ্ধ) ইচ্ছা করেন না। কৃষ্ণসারের চর্মনির্মিত আসনে উপবেশন হেতু যেটুকু কৃষ্ণতার সহিত তাঁহাদের সংপর্ক অন্যথা কোনরূপ কৃষ্ণতার (বা অপবিত্রতার) সহিত কোন সংপর্ক নাই। [১৯৩—২০০]

সেই বৃহস্পতিতুল্য পণ্ডিতের কচের ন্যায় গুণশালী সুন্দরসেন নামে এক পুত্র হইয়াছিল। তিনি সকল কলায় শিক্ষিত হইয়া পূর্ণকলা শশধরের ন্যায় (পিতৃ ও মাতৃ) উভয় পক্ষকে (বা কুলকে) উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। বিধাতা যেন পুষ্পধনুকে পশুপতির নয়নাগ্নিতে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া রতির তৃপ্তি হেতু তাঁহারই ন্যায় রূপশালী ইঁহাকে দেহধারী দ্বিতীয় মন্মথের ন্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন। অপর কুলললনাদিগের কথা কি বলিব, মহর্ষিপত্নীও (৩৫) তাঁহার রূপ দেখিয়া অতি কষ্টের সহিত চরিত্র রক্ষা করেন। তাঁহার সুবর্ণফলকের ন্যায় বিশাল বক্ষ দেখিয়া নারায়ণের বক্ষস্থিতা লক্ষ্মী আপন আসন যেন কষ্টকর বলিয়া মনে করেন। কামিনী সকল তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার স্বরূপ ঠিক করিতে পারে না (তাহারা মনে করে)— যদি তিনি সূর্যের কিরণ হইতে সৃজিত হইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে দেখিয়া নয়ন স্নিগ্ধ হয় কেন? আর যদি চন্দ্রের কিরণ হইতে তাঁহাকে নির্মাণ করা হইয়া থাকে তবে তাঁহার রূপ (মদনোদ্দীপন হেতু পীড়াই বা দেয় কেন?* তিনি চন্দ্রের প্রসন্নতা, পর্বতের ধৈর্য জলধরের উন্নতত্ব এবং সমুদ্রের গাম্ভীর্য হরণ করিয়াছেন। তিনি বিনয়ের নিবাস, বৈদগ্ধের আশ্রয়, মর্যাদার স্থান, প্রিয় বাক্যের

পোষকৃৎ" অর্থাৎ কান্তিকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য যে অল্প পরিমাণ মাল্যাদি রচনা দ্বারা প্রসাধন তাহাকে বলে বিচ্ছিত্তি। (১৭) কোষহরণ—কোষ হইতে হরণ (misappropriation); পক্ষে কোষ হইতে নিষ্কাশন (unsheathing)। (১৮) কামচেষ্টিত— যথেচ্ছাচার বা লাম্পট্য; পক্ষে ইচ্ছামত ক্রীড়া।

(১৯) সংযম—দমন (control), পক্ষে বন্ধন (arrest of guilty persons)। (২০) ইন—সূর্য, পক্ষে প্রভু। (২১) উপঘাত—আচ্ছাদন, পক্ষে প্রাতিকূল্য (disaffection)। (২২) গ্রহ—গ্রহণ (eclipse), পক্ষে চরণ ধারণ। (২৩) সরল-প্রাংশুত্ব, পক্ষে প্রতিকূল বৃত্তি। (২৪) মধ্যমণির সহিত সংযোগ, পক্ষে তরল প্রকৃতি নায়কের সহিত মিলন (association with ficklelover)। (২৫) অপর জীবের বিবরের অন্বেষণ, পক্ষে পরের ছিদ্র বা দৌর্বল্যের অন্বেষণ। (২৬) অপরের ক্ষতি করা। (২৭) ভাব-ব্যঞ্জনার জন্য নৃত্যের আংগিকাভিনয়ে, ভাবি বাক্যকে উপজীব্য করিয়া যে কর চালনা তাহাকে বলে সূচী—"বর্ত্তনা সা ভবেৎ সূচী ভাবিবাক্যোপজীবনাৎ" [সংগীতরত্নাকর]; পক্ষে শূল বেদনা। (২৮) স্তন-ভারে অবনতদেহা। (২৯) নর্মদা সাধারণতঃ খরস্রোতা নদী এই ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে নর্মপ্রিয়া পরিহাস-রসিকা রমণীগণ স্তনজঘনভারালসা। (৩০) গুরুজনদিগের শাসন বা উপদেশ, পক্ষে যে শাস্ত্র সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ চর্চা করিয়া থাকেন।

১৮৮ হইতে ১৯১ শ্লোক পর্যন্ত শ্লেষাত্মক পরিসংখ্যালংকার।

(৩১) মার্গ—মৃগযূথ, পক্ষে সদাচারের আচরণ।

(৩২) প্রমদ আকাংক্ষা অর্থাৎ হর্ষের আকাংক্ষা। প্রমদা-আকাংক্ষা রমণীতে অভিলাষ। (৩৩) সত্ত্ব—সত্ত্বগুণ, পক্ষে প্রাণী অর্থাৎ জলচর। (৩৪) খড়্গ—গণ্ডার। বার্ধীনস বা গণ্ডারের মাংসে পিতৃ-পুরুষগণের তর্পণ করা অত্যন্ত পুণ্যের কার্য। খড়্গ-গ্রহণ—গণ্ডার শিকার (৩৫) বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী অথবা অত্রিপত্নী অনসূয়া। * তত্ত্ব সুখবাসের সংস্করণে যে পাঠ আছে তাহাতে এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ হয়—"কামিনীগণ মনে করে সে নিশ্চয়ই চন্দ্রের খণ্ড সকল দিয়া সৃজিত নতুবা চন্দ্রের ন্যায় তাহাকে দেখিতে এত আনন্দই বা হয় কেন, আবার মনে (কামোদ্দীপন হেতু) পীড়াই বা হয় কেন?

আয়তন এবং সাধু চরিত্রের নিকেতন। তিনি প্রমদাদিগের মদনস্বরূপ, সজ্জনরূপ কুমুদকুসুমের চন্দ্রতুল্য, গুণের নিকষ-প্রস্তর ও পথিকজনের ছায়াতরু। সজ্জনের সভায় তাঁহার বাস, স্বর্ণমূল্য নির্দ্ধারক নিকষ প্রস্তরের ন্যায় কাব্য-কথার তিনি যথার্থ সমালোচক, প্রণয়িগণের (৩৬) কল্পবৃক্ষস্বরূপ এবং লক্ষ্মীর লীলাবিহার স্বরূপ। [২০১-২০৯]

সমুদ্র যেরূপ চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেইরূপ তাঁহার সুখ-দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন (শীলাদি) সকল বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ গুণপালিত নামে তাঁহার এক সুহৃৎ ছিলেন। [২১০]

একদা তাঁহার সহিত নির্জ্জনে অবস্থান কালে তিনি (অর্থাৎ সুন্দর সেন) সহসা শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহারই চিন্তানুরূপ এই আর্য্যাটি গান করিতেছে—

"গুরুজনের উপাসনায় নহে মন যার
দেশান্তরের বেশ, ভাষা, আচার, ব্যবহার
না জানে যে জানবে তারে সেই সে অভাজন
শৃঙ্গবিহীন ষণ্ড যথা নিষ্ফল তেমন।"

ইহা শুনিয়া সুন্দর তাঁহার প্রিয় মিত্রকে বলিলেন—"গুণপালিত, ঐ সাধু লোকটি গীতচ্ছলে যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। লোকে দেশ ভ্রমণ করিয়া সাধুব্যক্তিদিগের আচরণ, খলদিগের চাতুরী, বিভিন্ন লোকের মনোভাব, রসিকজনোক্ত নর্ম্মপরিহাস, কুলটাগণের বক্রোক্তি, গুরু-নিগূঢ় (৩৭) শাস্ত্রতত্ত্ব, বিটদিগের চরিত্র, ধূর্ত্তদিগের বঞ্চনাকৌশল এবং সসাগরা ধরিত্রীর স্বরূপ জানিতে পারে। অতএব গৃহে বাস করার সুখের কথঞ্চিৎ ত্যাগ করিয়া আমার সহিত দেশভ্রমণে উদ্যত হইতে মনঃস্থির কর, ইহাতে পরিণামে বিবিধ লাভ হইবে। [২১১-২১৮]

সুন্দর সেন এইরূপ বলিয়া সুহৃদের উত্তর শুনিতে ইচ্ছুক হইলে লজ্জিত হইয়া তাঁহার সহচর তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন—"তোমার মত সুহৃদ্ কর্ত্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হওয়া আমার পক্ষে লজ্জাজনক, তথাপি পথিকদিগকে যেরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর—মলিন পরিচ্ছদে অঙ্গ আবৃত করিয়া দূর পথ ভ্রমণ হেতু অবসন্ন ও ধূলিরাশি-ধূসরিত দেহে দিনাবসানে (তাহারা) কোথাও গিয়া এই বলিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করে—'মা, ভগিনি, দয়া কর, আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর হইও না, তোমাদেরও তো ভ্রাতাপুত্র কার্য্যবশে গৃহ হইতে বিদেশে গিয়া থাকে। আমরা কি সকালে উঠিয়া যাইবার সময় বাড়ীখানি উঠাইয়া লইয়া যাইব? ইহা কি সাধু ব্যক্তির কার্য! পথিকগণ যেখানে বিশ্রাম করিতে পায় তাহারা তাহা আপন গৃহসম মনে করিয়া থাকে। মা, আজিকার রাত্রিটা কোন রকমে তোমার আশ্রয়ে কাটাইতে দাও, সূর্য অস্ত গিয়াছে, বল এখন কোথায় যাই'?"

"দীন অবস্থায় পতিত হইয়া বেচারী এইরূপ বহু প্রকার মিনতি-বাক্য দ্বারে দ্বারে বলে ও গৃহিণীগণ কর্ত্তৃক এইরূপে ভর্ৎসিত হয়—'কর্ত্তা বাড়ী নাই, কেন মিছে চেঁচামেচি করছ! যাও, দেবমন্দিরে যাও—ব'লছি তবু যাচ্ছে না। দেখ দেখি লোকটার কি জেদ'।"

(৩৬) সুহৃদ্বর্গ, যাহারা তাহাকে স্নেহ করে।

(৩৭) গুরুমুখী বিদ্যা অর্থাৎ যাহা গুরুর সাহায্য ব্যতীত শিখিতে পারা যায় না।

"সেইস্থান হইতে (বিতাড়িত হইয়া) অপর কোথাও হয়ত বহু কষ্টে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার পর গৃহস্বামী অবজ্ঞাভরে কোন জীর্ণ গৃহকোণ দেখাইয়া বলে—'ঐখানে নিদ্রা যাও'।"

"সেই স্থানে হয়ত সমস্ত রাত্রি ধরিয়া 'অচেনা লোককে কেন থাকতে দিয়েছ' এই বলিয়া গৃহিণী স্বামীর সহিত কলহ করে; (নতুবা) নিকটবর্ত্তী গৃহ হইতে প্রতিবেশিনীগণ তৈজসপত্র চাহিবার অছিলায় আসিয়া তাহাকে (অর্থাৎ ঐ গৃহিণীকে) আপ্তবাক্যে বলে—'কি ক'রবে বল বোন, তোমার স্বামী নেহাৎই সরল লোক! তবে, রাতটা একটু সজাগ থেকো, এই রকম অনেক জোচ্চোর ঘুরে বেড়ায়'।"

"শতাধিক গৃহ এইরূপে ঘুরিয়া (ভিক্ষা-লব্ধ) শালিধান্যের চাউল, কুলথের ক্ষুদ, ছোলা ও মসুর প্রভৃতি একত্র পাক করিয়া ক্ষুৎপীড়িত পথিক আহার করে। আহার পরাধীন, শয্যা ভূমিতল, আশ্রয় দেবালয়, উপাধান ইষ্টকখণ্ড—পথিকদিগের জন্য ইহাই বিধির বিধান।" [২১৯—২৩০]

তিনি এই কথা বলার পর সুন্দর সেন উত্তর দিতে যাইবেন এমন সময় কথাপ্রসঙ্গে কোন লোক এই গানটি গাহিল—

"আপন সাধন সাধিতে যেজন
দৃঢ় করিয়াছে পণ
দেবালয় তার সুখের আধার
নিজ বাসনিকেতন,
অতি মনোহর মনে হয় তার
ভূমিতল হেন শয্যা,
কদশন তার অমৃত সুস্বাদ
ইথে তার কিবা লজ্জা?"

ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া পুরন্দরের পুত্র সুহৃৎকে বলিলেন—"এই গানে আমার মনের কথাই প্রকাশ পাইয়াছে, এতএব চল আমরা একসঙ্গে বাহির হইয়া পড়ি।" [২৩১—২৩৩]

অনন্তর সহচরমাত্র সহায় হইয়া ক্লেশ-সমুদ্রে অবতরণ করিতে স্থিরসংকল্প সুন্দর সেন পিতার অজ্ঞাতে কুসুমপুর হইতে যাত্রা করিলেন। সুন্দরসেন সুহৃদের সহিত সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিলেন এবং তাহাতে তাঁহার বহু রসিকজনের সঙ্গলাভ হইল, নানাবিধ অস্ত্রে শিক্ষালাভ হইল, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন, অনেক কৌতুক দর্শন করিলেন, পত্রচ্ছেদ্য, আলেখ্য, মোম ও কাষ্ঠের পুত্তলিকা নির্ম্মাণ কৌশল, নৃত্য, গীতাদি, বীণা-মুরজ প্রভৃতি বাদ্য ইত্যাদি কলায় জ্ঞানলাভ করিলেন, বঞ্চকদিগের চাতুরী এবং বিট ও কুলটাগণের সরস ও বক্রোক্তির অর্থ বুঝিতে শিখিলেন। [২৩৪—২৩৯]

তাহার পর সকল শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়া নানাবিধ লোকের সমাচার জানিয়া তিনি নিজগৃহে ফিরিতে ইচ্ছুক হইয়া অর্বুদাচলের নিকট উপস্থিত হইলেন। সুন্দরকে এই পর্বতের পৃষ্ঠদেশ দেখিতে ইচ্ছুক বুঝিয়া গুণপালিত তাঁহাকে বলিলেন—"চল আমরা এই বিশাল পর্বতটিতে আরোহণ করি—ইহা হিমালয়ের একটি পুত্র, ইহা হইতে শীতল স্বচ্ছসলিলনিঃস্রাবী প্রস্রবণ সকল নিঃসৃত হইয়াছে। হিমালয় যেন লোকের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ মেরুপ্রদেশে ইহাকে ... গি সকল বিদ্যমান

(ন্যায়) ইহা চন্দ্রচূড়, (সানুদেশে বায়ুভুক্ তপস্বিগণ বাস করায়) কটিস্থিত-পবনভোজন, (৩৮) (ইহাতে গুহা সকল বিদ্যমান থাকায়) সগুহ, (৩৯) এবং (বিদ্যাধরগণ দ্বারা শোভিত হইয়া) ইহা বিদ্যাধরোপসেবিত শম্ভুর শোভা ধারণ করিয়াছে। 'নিশীথে মুগ্ধা কামিনীগণ তারা সকলকে তরুশিখরস্থিত পুষ্পসমূহ মনে করিয়া বিস্মিত চিত্তে সেইগুলি সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়! (বহু উর্ধে স্থিত) সপ্তর্ষিমণ্ডলকেও ইহার নিকটস্থ বলিয়া মনে হয়। না হইবেই বা কেন? মহদ্ব্যক্তিগণ নিজ মহত্ত্বের বলে কাহাকে না নিকটে আকর্ষণ করেন? সূর্যের রথাশ্বসমূহ গগনমার্গে নিরবলম্বন হইয়া ভ্রমণ করিতেছে দেখিয়া বিধাতা এই ভূধরকে তাহাদের বিশ্রামের জন্য নির্মাণ করিয়াছেন। ইহাকেই আশ্রয় করিয়া ওষধিগণ (ওষধীশ) চন্দ্রের সান্নিধ্য লাভ করে—প্রায়ই দেখা যায় (কৃপাপ্রার্থিগণ) মধ্যস্থ অনুগ্রাহকের সাহায্যে প্রভুদিগের নিকট উপস্থিত হয় (৪০)। [২৩৮—২৪৫)

"দিগ গজগণ পৃথিবীধারণ হেতু পরিশ্রান্ত হইলে এই ভূধর নির্ঝর সলিল-কণা সেকে তাহাদের শ্রম বিনোদন করে। একই রূপ কার্য করিলে নিশ্চয়ই পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্য হইয়া থাকে (৪১)। হারীত পক্ষিগণ (৪২) শোভিত, শুক পক্ষিগণের বিহারস্থান, ব্যাস হেতু, (৪৩) রমণীয়, ভরদ্বাজ পক্ষিগণের বিশ্রামস্থল (৪৪) এই পর্বত শুক-হারীত-ব্যাস-ভরদ্বাজ মুনিগণ অধ্যুষিত তপোবন তুল্য। এই স্থলে নিঃসঙ্গ হইয়াও পরলোক (৪৫) প্রাপ্তির উপায়ে কৃতযত্ন, বায়ুভুক্ (৪৬) হইয়াও অহিংসক, বানর না হইয়াও ফলভুক্, একমাত্র শুভকর্মে নিরত হইয়াও ষট্‌কর্ম নিরত, (৪৭) যত (৪৮) হইয়াও স্বাধীন, রৌদ্র-চরিতে (৪৯) অনভিমত হইয়াও শিবপ্রিয়, শান্তস্বভাব (তপস্বিগণ) বাস করিয়া থাকেন। মৃগের বাস হেতু মৃগাংকের মূর্তির ন্যায়, সপ্তপত্র বৃক্ষ (৫০) শোভিত হইয়া সপ্তপত্র (৫১) যুক্ত সূর্যের রথের ন্যায়, (পলাশ বৃক্ষে শোভিত হইয়া) পলাশিনী রাক্ষসীর ন্যায় (৫২), মদন বৃক্ষের (৫৩) অবস্থিতি হেতু) সমদনা উৎকণ্ঠিতা (৫৪) নায়িকার ন্যায়, (তিলগুল্মে শোভিত হইয়া) তিলকশোভিতা বাসকসজ্জিতার ন্যায় (৫৫), বহু (হরিচন্দন ও পীলু বৃক্ষ সমাযুক্ত হওয়ায়) হরি(৫৬)-পীলু (৫৭)-সমাকুল রাজপ্রাসাদের দ্বারভূমির ন্যায়, (বহু অর্জুন ও বাণ (৫৮) বৃক্ষ সমাযুক্ত হওয়ায়) অর্জুন-বাণজাল-ভিন্ন কুরুরাজের বাহিনীর ন্যায়, (সহস্র সহস্র ঋক্ষ দ্বারা পূর্ণ হওয়ায়) সহস্র ঋক্ষ-(৫৯) শোভিত গগন শোভার ন্যায়, (মিষ্টক অর্থাৎ আম্রবৃক্ষে অধিষ্ঠিত হওয়ায়) মিষ্টক দৈত্য পরিচালিত দানব সেনার ন্যায়, (রোহিণী (৬০) বৃক্ষের উদ্গম হেতু) রোহিণী উদয়ে রাত্রির ন্যায় এই উপত্যকা রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে।" [২৪৬—২৫৩]

[ক্রমশঃ।

---

(৩৮) যাঁহার কটিদেশে বায়ুভুক্ সর্প ভূষণস্বরূপে বিরাজ করিতেছে। (৩৯) গুহ অর্থাৎ কার্তিকেয়ের সহিত বিদ্যমান।

(৪০) এই পর্বতে বহু ওষধি (medicinal herbs) আছে এবং ইহা এত উচ্চ যে ওষধিসমূহ চন্দ্রের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে। চন্দ্রের একটি নাম ওষধীশ, কবি তাই বলিতেছেন, ওষধিগণ যেন চন্দ্রকিরণরূপ কৃপার প্রার্থী, তাই অর্বুদপর্বত যেন মধ্যস্থ হইয়া অনুগ্রাহকের ন্যায় ওষধিগণকে প্রভু চন্দ্রের সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দিতেছে। (৪১) পর্বতও ভূধর এবং দিগ্‌গজগণও ভূমি বা পৃথিবীকে ধারণ করে, সেই হেতু উভয়ের একই কর্ম। (৪২) হারীত = হরিয়াল পক্ষী (green dove)। (৪৩) = ব্যাস-বিস্তার (expansion), (৪৪) ভরদ্বাজ। ভরতপক্ষী বা চাতকপক্ষী; ইহারা অতি উর্ধে উড়িয়া বেড়ায় এবং বহুক্ষণ অবিশ্রান্ত ভাবে উড়িতে পারে ও পর্বত-শিখরে বিবর মধ্যে বাসা করে। (৪৫) পরলোক—, অন্য লোক বা মনুষ্য, পক্ষে মৃত্যুর পর যে লোক প্রাপ্তি হয়। (৪৬) বায়ুভুক সর্প হিংসক জীব। (৪৭) অধ্যয়ন, অধ্যাপন যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ ইহাই ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম। (৪৮) যত—বদ্ধ, পক্ষে জিতেন্দ্রিয়। (৪৯) রৌদ্রচরিত—রুদ্রের চরিত বা জীবনী, পক্ষে ভয়ংকর আচরণ। (৫০) সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, ছাতিম (Alstonia scholaris)। (৫১) পত্র = অশ্ব।

(৫২)—পলাশিনী অর্থাৎ পল (মাংস) যে ভক্ষণ করে। (৫৩) ময়না গাছ (Randia Dumetorum)। (৫৪) অষ্ট নায়িকার মধ্যে একটি; ইহার লক্ষণ, যথা "দুর্বার দারুণ মনোভব বাণ পাত পর্যাকুলাং তরলমানসমুদ্বহন্তীম্। প্রস্বেদবেপথুযুতাং পুলকাঞ্চিতাঙ্গীমুৎকণ্ঠিতাং বদতি তাং ভরতঃ কবীন্দ্রঃ।" (৫৫) ইহা অষ্ট নায়িকার মধ্যে অপর; একটি ইহার লক্ষণ যথা—"যা বাসবেশ্মনি সুকল্পিত তল্পমধ্যে তাম্বুল-পুষ্পবসনৈশ্চ সমং সসজ্জ। কান্তস্য সংগমরসং সমবেক্ষমানা সা কথ্যতে কবিবরৈরিহ বাসসজ্জা।" (৫৬) হরি—অশ্ব, পক্ষে হরিচন্দন বৃক্ষ। (৫৭) পীলু—বৃক্ষবিশেষ (Salvadora Indica), পক্ষে হস্তী। (৫৮) বাণবৃক্ষ—নীলঝিণ্টী। (৫৯) ঋক্ষ—নক্ষত্র। (৬০) রোহিণী—হরীতকী (Terminalia Chebula), পক্ষে চন্দ্রের সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের চতুর্থ নক্ষত্র।

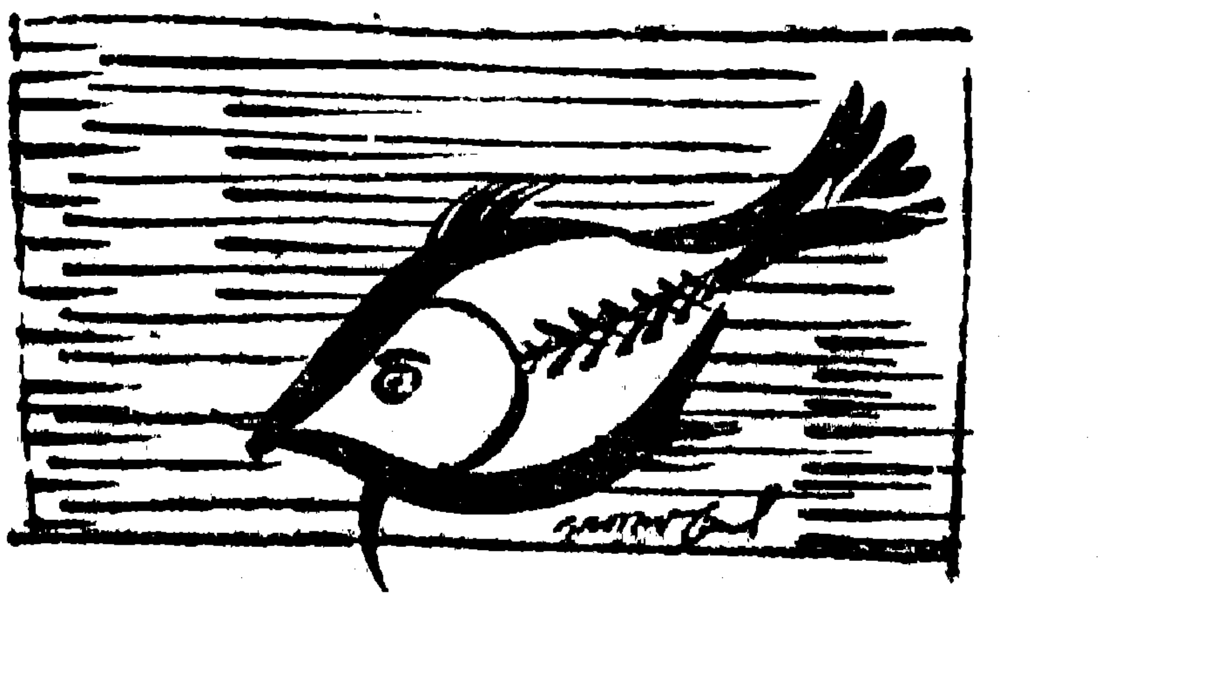

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উপমায় অতিরঞ্জন

শ্রীকামিনীকুমার রায়

উপমা প্রয়োগ করিয়া বিষয় বর্ণনার রীতি সকল দেশের মৌখিক কথায় এবং সাহিত্যে সুপ্রচলিত। উপমার ইঙ্গিতে রূপের চিত্রখানি সুন্দরতর হইয়া উঠে, মানসিক অবস্থাটি অতি সহজেই প্রকাশ পায়, যাহা থাকে অস্পষ্ট এবং অপরিজ্ঞাত, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে বিলম্ব ঘটে না। অতি অল্প কথায় বক্তব্য বিষয় স্পষ্টতর, মনোজ্ঞ ও রসাল করিয়া তুলিবার শক্তি উপমার অসাধারণ। যে বিষয়টি বুঝাইতে দুই-এক পরিচ্ছেদ চলিয়া যায়, উপমার সাহায্যে অনেক সময় তাহা মাত্র একটি-দুইটি কথায় সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য উপমাবহুল। এত উপমার প্রয়োগ পৃথিবীর অন্য কোন ভাষা-সাহিত্যে আছে কি না আমাদের জানা নাই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা 'অনুবাদ-শাখা।' এই অনুবাদ-সূত্রে শিক্ষিত বাঙ্গালী সংস্কৃত সাহিত্যের উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও শব্দৈশ্বর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করে এবং যদৃচ্ছাক্রমে সেই সকল সম্পদ বাংলা সাহিত্যে আমদানী করিতে থাকে। কোনও নূতন ভাষা-সাহিত্যের গঠন-যুগে অনুবাদ-সাহিত্যের প্রয়োজন ও মূল্য কম নহে। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী এবং অন্য অসংখ্য কাব্যকথার অনুবাদ বাংলা ভাষার পরিপুষ্টির ক্ষেত্রে যথেষ্ট রসসিঞ্চন করিয়াছিল। আবার এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, সংস্কৃত যুগের উপমা উৎপ্রেক্ষাগুলি অনেক স্থলে বাংলা সাহিত্যের স্বচ্ছন্দ গতিপথে বাধাও দিয়াছে। সংস্কৃত-গ্রন্থের 'আজানুলম্বিত', 'আকর্ণ-বিস্তৃত চক্ষু', 'সিংহগ্রীব', 'খগরাজনাসা' নায়কেরা এবং 'গজেন্দ্রগামিনী', 'কুরঙ্গ-নয়না', খঞ্জনচপলা', 'কটিক্ষীণা' নায়িকারা আমাদের কবি ও সাহিত্যামোদীদের মন-বুদ্ধি হরণ করিয়া লইয়াছিল। তাঁহাদের অধিকাংশেরই দৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের সেই মধ্যযুগে প্রকৃতির সহজ-দৃষ্ট দৃশ্য হইতে ফিরিয়া পুঁথির দিকে নিবদ্ধ হইয়াছিল। পরের বিপুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং নিজেদের প্রয়োজন ও আত্মস্থ করিবার ক্ষমতার দিকে না চাহিয়া যাহা পাইয়াছেন, তাহাই আহরণ করিয়াছেন, ফলে অনেক পরিশ্রম হইয়াছে এবং সময় গিয়াছে, কিন্তু মুখ্য বস্তু ঘরে আসিয়াছে কম।

প্রাচীন যুগে প্রকৃতির লীলা-নিকেতন তপোবন ছিল সভ্যতার কেন্দ্রভূমি। ঝরণার বুকে আকাশ যেমন তাহার অনন্ত বৈচিত্র্য লইয়া প্রতিফলিত হয়, সেই যুগের কবিদের অনাবিল চিত্তেও তেমনি চতুষ্পার্শ্বস্থ লোক-চরিত্র ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী যুগপৎ প্রতিফলিত হইত। প্রকৃতি-জগৎ ও প্রাণি জগতের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল, সেই পরিচয় তাঁহারা নিজেদের কাব্যোক্ত নায়ক-নায়িকার রূপ ও মানসিক অবস্থার বর্ণনায় সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে উপমানের সাহায্যে রূপের চিত্রটি সুন্দরতর হইয়া ফুটিবে, বক্তব্যটি সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইবে, তাঁহারা তাহাই প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রযুক্ত উপমার অনেকগুলিই যে দেশ-কাল-পাত্রের ব্যবধান হেতু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজে একরূপ অচল ও দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। সর্ব্বদা-দৃষ্ট এবং অধিকতর পরিচিত মনোজ্ঞ দৃশ্য বা বস্তুর ইঙ্গিতে কোনও অদৃশ্য বা নূতন বিষয়ের ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া উপমার কাজ। গজেন্দ্র-গমনের সঙ্গে নায়িকার গমনের তুলনা, মৃগ-নয়নের সহিত তাহার চক্ষুর উপমা, চামরীর পুচ্ছের সঙ্গে তাহার কেশের সাদৃশ্য-কল্পনা সেই যুগেই মানুষকে মুগ্ধ করিত, যে যুগে ঐ সকল উপমান বস্তুর সহিত মানুষের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। যখন হরিণীরা যখন মানুষের প্রতিবেশী, তাহার অঙ্গনে, এদিকে-ওদিকে স্নিগ্ধ চপল নয়নে দলে দলে চরিয়া বেড়াইত, তখন কাহাকেও 'মৃগনয়না' বলিলে তাহার চক্ষু যে অতীব সুন্দর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু দলে দলে হরিণ দেখা তো দূরের কথা, যখন একটিকেও দেখিতে হইলে চিড়িয়াখানার দিকে যাত্রা করিতে হয়, তখন বাংলা সাহিত্যের মৃগ-নয়না নায়িকার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে বিলম্ব ঘটে। স্বচ্ছন্দ-বিহারী গজ-যূথের গতি-ভঙ্গিমা দর্শন যে যুগে দুর্লভ ছিল না এবং উহা মানুষকে অহরহ আকৃষ্ট করিত, আনন্দ দিত, তখন কোনও রমণীকে 'গজেন্দ্রগামিনী' বা 'গজন্দমে হাটে' বলিলে তাহার অটুট যৌবনশ্রী এবং সুন্দর চলনভঙ্গিটিই মানস-নেত্রে ভাসিয়া উঠিত। কিন্তু করি-যূথের দর্শন যেখানে দুর্লভ, রাজা-জমিদারের বহিরঙ্গনে শৃঙ্খলিত শ্লথপদ হস্তীই যেখানে সাধারণত দৃষ্ট হয়, সেখানে কোন নায়িকাকে 'গজেন্দ্রগামিনী' বলিয়া বিশেষিত করিলে সুরূপের চেয়ে তাহার কুলক্ষণ কুরূপই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িবে। যে সমাজ, যে পরিবেষ্টনীর মধ্যে আসর গাড়িয়া প্রাচীন কবিগণ আজানুলম্বিত বাহু, আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু ও সিংহগ্রীব, খগরাজনাসা নায়কের এবং খঞ্জন-চপলা, কটিক্ষীণা নায়িকার চিত্র আঁকিতেন, সেকালে সে-সমাজে ঐরূপ ধরণের নর-নারীর অভাব ছিল না। কিন্তু বাংলার মাটিতে, বাঙ্গালীর সমাজে সেইরূপ নর-নারী কয়টি দেখা যায়? উপমান বস্তুগুলি যেখানে প্রায়ই দৃষ্টি-বহির্ভূত এবং অপরিচিত এবং যে সমাজে অধিকাংশ নরনারী নাতিদীর্ঘ, বিশীর্ণদেহ, সেখানে সুদূর সংস্কৃত যুগের আবরণে নায়ক-নায়িকাকে সাজাইলে তাহারা সৌন্দর্য্যের চিত্র না হইয়া কিম্ভূত-কিমাকারই ঠেকিবে। বাঙ্গালী নর-নারীরও যে একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে, তাহা ঐ প্রাচীন অবাঙ্গালী মানুষগুলির দৌরাত্ম্যে প্রায়ই ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, উপমা উৎপ্রেক্ষার ক্ষেত্রে একটা ঘোরতর অতিরঞ্জন ও বিকৃতি দেখা দিয়াছিল। বাংলা-রচয়িতারা সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারতাদির উপমা উৎপ্রেক্ষা যথাযথ অনুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই;—একে তো সেইগুলি তখন অচল এবং দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল,—তাহার উপরও তাঁহারা আবার নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি ফলাইয়াছিলেন। উপমা প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া বা উপেক্ষা করিয়া, উপমার দ্বারা বক্তব্য বিষয় সহজ, সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্টতর করার পরিবর্ত্তে তাঁহারা উহাকে বিশদ বিকৃত ও দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। শুধু সংস্কৃতজ্ঞ কবি এবং সাহিত্যামোদিগণই নহেন, অনেক পল্লীগীতিরচকও এই বিকৃতি, বৈসাদৃশ্য ও আতিশয্য হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। ইহাদের অনেকেরই এক চক্ষু ছিল সহজদৃষ্ট প্রকৃতির রাজ্যে, অপর চক্ষু ছিল সংস্কৃত গ্রন্থের অভিজাত উপমান বস্তুর দিকে।

মুকুন্দরাম কালকেতুর রূপ-বর্ণনায় এক দিকে যেমন লিখিলেন, "নাক মুখ চক্ষু কাণ, কুন্দে যেন নিরমাণ ; দুই বাহু লোহার সাবল। রূপশীল রূপ বাড়া যেন সে শালের কোঁড়া", অন্য দিকে তেমনি লিখিলেন, "গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ, মোতি পাঁতি জিনিয়া দশন।" নায়িকার রূপ-বর্ণনায় এক জন পল্লীকবি লিখিয়াছেন, "আষাঢ় মাস্যা বাঁশের কেরুল (অঙ্কুর) মাটি ফাট্যা উঠে। সেই মত পাও দুইখানি গজন্দমে (গজগমনে হাঁটে।" এইরূপ একই কবির রচনার মধ্যে দ্বিবিধ উপমার অবধি নাই।

আমরা এখানে উপমার রাজ্যে বিকৃতি এবং অতিশয়োক্তিগুলি লইয়াই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 'নৈষধ-চরিত'এ দময়ন্তীর রূপ-বর্ণনায় আছে, "দময়ন্তীর চক্ষু হরিণের চক্ষু হইতেও সুন্দর, তাই হরিণ ভূমিতলে খুরাঘাত করিয়া স্বীয় পরাজয় ও ক্ষোভ ঘোষণা করিতেছে ;" আর ভারতচন্দ্র বিদ্যার চক্ষু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"কেড়ে নিল মৃগ-মদ নয়ন হিল্লোলে, কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে।" দময়ন্তীর মুখের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা হইয়াছে,—"বিধাতা চন্দ্রের শ্রেষ্ঠভাগ গ্রহণ করিয়া দময়ন্তীর মুখ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই জন্য চন্দ্রমণ্ডলে একটি গর্ত্ত হইয়াছে, লোকে তাহাকে কলঙ্ক বলে।" বিদ্যার মুখের বর্ণনায় ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন,—

"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা।"

এক জন পল্লীকবি লিখিয়াছেন—

"পুষ্প না বাগানে কন্যা পুষ্প তুলিতে যায়।
মৈলান (মলিন) হইয়া ফুল পাতাতে লুকায়।
চান্দমুখ দেখিয়া চান্দ আন্ধাইরেতে লুকে
পন্থের পথিক লীলার মুখ চাইয়া দেখে।"

বেচারী চাঁদের কি দুরবস্থা! কোন রমণীর মুখের জ্যোতিতে সে কলঙ্কিত, কোন রমণীর বা পদনখের উপর পড়িয়া সে গড়াগড়ি দিতেছে, আবার কাহাকেও দেখিয়া সে কাছে আসিতেও সাহস পাইতেছে না, আপনাকে একেবারে অযোগ্য, অপাংক্তেয় মনে করিয়া লজ্জায় অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া ফেলিতেছে। চাঁদের যেখানে এইরূপ শোচনীয় পরিণতি, সেখানে 'তারা'র কি যোগ্যতা! সে তো নায়িকার শাড়ীর 'বুঁটি' দেখিয়াই লজ্জায় অধোমুখ! তাই পল্লীকবি লিখিয়াছেন—

"অগ্নিপাটের শাড়ী কন্যা যখন না কি পরে।
স্বর্গের তারা লাজ পায় দেখিয়া কন্যারে।"

এই সকল অতিশয়োক্তিতে চূড়ান্ত পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু কোনও রূপের চিত্র অঙ্কিত হয় নাই ; অন্ততঃ তাহা পাঠককে আকৃষ্ট করে না।

নায়িকার নিতম্বের বর্ণনায় এক জন লিখিয়াছেন,—"তাহার নিতম্ব আল্কা পাহাড়ের ন্যায়।" পল্লীকবি বলিয়াছেন—

"নিতম্ব দেখিয়া তার নিতম্বের তরে।
আসমান ছাড়িতে চান্দ মনে আশা করে।"

ভারতচন্দ্র আরও একটু উপরে গিয়াছেন :—

"মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।"

এরূপ পর্ব্বত-প্রমাণ, মেদিনীত্রাস, চন্দ্রগর্ব্বনাশী নিতম্বের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার রূপ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করা চলে কি? আপাততঃ আমরা বিরত রহিলাম।

স্তনের বর্ণনায় এক জন পল্লীকবি শুধু ইঙ্গিত করিয়াই নীরব রহিয়াছেন, কিন্তু সে-ইঙ্গিতের পরিমাণও সামান্য নহে—"যৌবনের ভারে কন্যা সামনে পড়ে এলি।" আর এক জন বলিয়াছেন,—"হৃদয় উপরত শোভা করে গুয়া নারিকল।" কিন্তু রায়গুণাকর সকলের উপর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—

"কুচ হতে কত উচ্চ মেরুচূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।"

এখানেও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সংস্কৃত সাহিত্যে কটিক্ষীণা নারীর সৌন্দর্য্যের অনেক বর্ণনা আছে। তাহার অনুকরণে এক জন বলিলেন, "মুষ্টিতে আঁটয়ে লীলার চিকণ কাঁকালী।" আর এক জন লিখিলেন, "দেখিতে রামের ধনু কন্যার যুগ্ম ভুরু। মুষ্টিতে ধরিতে পারি কটিখানি সরু।" স্বনামধন্য কৃত্তিবাসের রামায়ণেও আছে,—"মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালী।" এই ক্ষীণত্বের আর একটি দৃষ্টান্ত,—"কাকুনি (খুব লম্বা) সুপারি গাছ বায়ে (বাতাসে) যেন হেলে।" এই সকল উক্তি হইতে কোনও স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী যুবতীর মূর্ত্তি আমাদের মানস নেত্রে ভাসিয়া উঠে না,—যাহা উঠে, তাহা অস্থিচর্ম্মসার রোগিণীর। অনুবাদ-যুগের আর এক জন লেখক উপরোক্ত কোন উক্তিতেই সন্তুষ্ট না হইয়া একেবারে লিখিয়া বসিলেন,—"তাহার কটিদেশ চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম, বরং তাহারও অর্দ্ধেক।" কটিক্ষীণা নারীর যতই সৌন্দর্য্য থাকুক না কেন, তাহাকে চুলেরও অর্দ্ধেক দেখিবার দুর্ভাগ্য যেন কাহারও না হয়। উপমার অতিরঞ্জন ও বিকৃতি কত দূর পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছিল, দেখুন।

'পদ্মাবৎ' কাব্যে পদ্মিনীর 'বেণী'র বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

"যেন গিরিবর হস্তে (হইতে) অজগর
লটকি রহিল সুখে
জীবন-পতঙ্গ ভক্ষিতে ভুজঙ্গ
বিষফুল করি মুখে।"

ভারতচন্দ্রের উক্তি আর উদ্ধৃত করিলাম না, সেখানে বিদ্যার 'বেণী' দেখিয়া ভুজঙ্গ আর কাছে নাই, একেবারে বিবরে পলায়ন করিয়াছে। যে নায়িকার এমন ভীষণ বেণী-বন্ধন, তাহাকে দেখিয়া নায়ক পুলকিত হইবেন কি ভীত হইবেন, গবেষণার বিষয় বটে! 'পদ্মাবৎ' কাব্যেই রাজকুমারীর বিরহ-ব্যথার এক বর্ণনা আছে। শুক পক্ষী রত্নসেনকে কন্যার বিরহ-ব্যথা জানাইবার জন্য দূতরূপে যাত্রা করিয়াছে—

"দুঃখের সংবাদ লয়ে বিহঙ্গ উড়িল।
সেই দুঃখে জলদ শ্যামবর্ণ হৈল।
স্ফুলিঙ্গ পড়িল উড়ি চাঁদের উপর।
অন্তরে শ্যামল তাই ভেল শশধর।
* * *
সমুদ্র উপর দিয়া করিল গমন
জলনিধি হৈল তাই পূর্ণিত লবণ।

যে দুঃখের স্পর্শে জলধর ও শশধর শ্যামবর্ণ প্রাপ্ত হইল এবং রত্নাকর লবণে পূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহা যে কত বড় দুঃখ, সে-ই দুঃখভোগী ছাড়া অপর কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল হইতে উপমা-বাহুল্যের আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। দেবী অন্নদার শুধু চলন-বলন-ই সুন্দর নয়, তাঁহার কঙ্কনের ধ্বনিটিও অনন্য। তাহারই বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলা হইতেছে—

"কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।
দলে দলে কোকিল কোকিলা চারি পাশে॥
কঙ্কন ঝঙ্কার হইতে শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী॥"

এখানে আমরা অন্নদার কণ্ঠস্বরের, তাঁহার কঙ্কন-ধ্বনির বা চক্ষুর চলনির কোন-ধারণা করিতে পারি কি? কিন্তু কবির বাক্‌চাতুর্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া থাকি। নারীর কত মিহি সুর, কঙ্কনের না হউক,—চুড়ির তো বটে,—কত রুণুঝুনুই না আমাদের কাণে আসে, কিন্তু ঝাঁকে-ঝাঁকে কোকিল-কোকিলা বা ভ্রমর ভ্রমরী তো দূরের কথা—তাহাদের একটিকেও তো কোন যুবতীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে দেখিলাম না। তবে ভারতচন্দ্রের অন্নদার কথা স্বতন্ত্র, তাঁহার প্রভাব অসাধারণ!

পল্লীকবিদের রচনা হইতে উপমার বিকৃতি ও অতিশয়োক্তির আর দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। এক জন নায়িকার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইতেছে—

"বাতাসে বসন যদি যখন উড়ে পড়ে।
ভৃঙ্গ যত উড়িয়া আসে পদ্মফুল ছাইড়ে॥
নাকের নিশ্বাসে তার বায়ুতে সুবাস।
চান্দের কিরণ যেমন অঙ্গে পরকাশ॥"

আমরা অনেক সুন্দরী যুবতী দেখি এবং তাহাদের এলো-মেলো অবস্থাও অনেক সময় হয়, কিন্তু ভৃঙ্গকে কখনো পদ্ম ফুল ছাড়িয়া তাহাদের চারি পাশে ভিড় করিতে দেখিলাম না, এই যা দুঃখ! কবির দৃষ্টি হয়তো এখানে সংস্কৃত গ্রন্থের দিকেই নিবদ্ধ ছিল। যেহেতু নায়িকা সুন্দরী, অতএব তাহার নাকের নিশ্বাসও সুরভিযুক্ত এবং সে সুরভিতে বাতাস ভরপুর। আহা! কবির এই উক্তি যদি সত্য হইত, আমাদের দরিদ্র-সংসারের প্রসাধন-সামগ্রীর কত অর্থই না বাঁচিয়া যাইত। আর এক জন কবি তাঁহার নায়িকা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"কাজল মেখে সাজল হাসিয়ে বিজুলীর মালা।
আন্ধাইর ঘরে থাকলে সোনাই গো আন্ধাইর ঘর উজালা।"

চাঁদের কিরণ মনোহারী বটে, কিন্তু তাহাতে গৃহের কাজকর্ম্ম চলে না, দীপের আলোর প্রয়োজন হয়। 'সোনাই'র মতো দরিদ্র-সংসারের মেয়েদের রূপে যদি অন্ধকার গৃহ আলোকিত হইত, তাহা হইলে আর কেরোসিনের এই দুষ্প্রাপ্যতা এবং দুর্মূল্যতার দিনে পল্লীবাসীর ভাবনা থাকিত না।

আমরা আর অধিক দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিব না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পরিক্রমণ করিলে যে কেহ উপমা উৎপ্রেক্ষার এই বিকৃতি ও অতিরঞ্জন লক্ষ্য করিবেন।

আপনি কি জানেন?

১। আঠার-শ' সাতান্ন সালের আটই এপ্রিল তারিখে ব্যারাকপুরে সামরিক বিচারের রায়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ-বংশীয় সৈনিক ফাঁসীর দড়িকে পবিত্র করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সেই প্রথম শহীদের নাম জানেন কি?

২। সতেরো-শ' আশী সালের উনত্রিশে জানুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হয়। যে বিদেশী মানুষটি নানা ঝড়-ঝাপটার মধ্যে সেটিকে পরিচালনা করেন, তাঁর নাম বলুন ত?

৩। ভারতবর্ষের গড়-প্রতি তেতাল্লিশ হাজার লোকের জন্য ক'জন নার্স আছে জানেন?

৪। ভারতবর্ষের এক জন লোকের গড়-প্রতি বাৎসরিক আয় কত জানেন?

৫। উনিশ-শ' সাত সালে কলিকাতায় প্রথম ছবি-ঘর স্থাপনা করেন কে?

৬। উনিশ-শ' সতেরো সালে প্রথম বাংলা বই তোলেন ম্যাডান থিয়েটার। কি বই বলুন ত?

৭। গাছেরা অনেকেই দীর্ঘায়ু। চার হাজার বছরের সাক্ষী হয়ে আছে আমেরিকার কি গাছ জানেন?

৮। ভাষা-তাত্ত্বিকরা বলেন যে, এক প্রাচীন বর্ণমালা থেকে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান বিবিধ বর্ণমালা সৃষ্টি হয়েছে। সে বর্ণমালা কি?

৯। ব্রিটিশ-শাসনে এক জন ভারতবাসীর স্বাস্থ্যের জন্য সরকার বৎসরে কত খরচ করতেন জানেন?

[উত্তর ২৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

শীতে উপেক্ষিতা

"রঞ্জন"

আট

অন্ধকার শুধু আলোর অনুপস্থিতি, এই নঞর্থক ভ্রান্ত ধারণাটা বিজলী আলোর বিজ্ঞাপনের কল্যাণে আজ অত্যন্ত ব্যাপক। দিনের আলোর চাইতেও উজ্জ্বলতর রাত্রি সৃষ্টি করবার জন্যে প্রত্যহ উদ্ভাবিত হচ্ছে নব নব কৃত্রিম ব্যবস্থা। নগরবাসী গ্রাম পরিভ্রমণে গিয়ে সব চাইতে সরবে যে অভিযোগ করে থাকেন তা অন্ধকার নিয়ে। বর্তমানে পল্লী-উন্নয়নের জন্য যে যে পরিকল্পনা ভোট-চুম্বকের সম্মান লাভ করেছে তার সবগুলিই মূলত পল্লী-উচ্ছেদ পরিকল্পনা। কেন না আদর্শ পল্লী বলে তাকেই বরণ করা হচ্ছে যার নগরের অনুকরণ সব চেয়ে বেশী, পল্লীর সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটুকু যেখান থেকে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই নয়া গ্রামগুলি ম্যালেরিয়াশূন্য হয়ে স্বাস্থ্যকর হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা গ্রাম থাকেনি। এরা যেন রাশিয়ার "নয়া ডিমক্র্যাসি," এমন নয়া যে গণতন্ত্রের বাষ্পমাত্র নেই সেখানে।

অন্ধকার আর আলোর মধ্যে এমন একটা অবাস্তব বিরোধের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয়েছে যে আজ 'সভ্যতার আলো' এবং 'কু-সংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন' ইত্যাদি কথাগুলির প্রচলন একান্তই স্বাভাবিক বলে পরিগণিত। আলো যেন সভ্যতারই প্রতীক, অন্ধকার যেন বর্বরতার নামান্তর।

পৃথিবীর প্রারম্ভের সঠিক বিবরণ আমার জানা নেই, কিন্তু সৌরমণ্ডলের সামগ্রিকতায় অন্ধকার যে একেবারে অস্বাভাবিক নয় এ তথ্য আলোর উপাসকরাও অস্বীকার করবেন না। মানুষ একদিন মঙ্গল এবং অন্যান্য গ্রহে অনায়াসে যাতায়াত করবে এমন সম্ভাবনাকে স্বপ্ন বলে অবজ্ঞা করি নে; কিন্তু সেখানে মানুষকে এই ক্ষুদ্রতম উপগ্রহ, পৃথিবী থেকে আলো বহন করে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে পৌঁছে আলো মিলবে না কোথাও।

এই আলো পৃথিবীকে হয়তো শত-সহস্র গ্রহ-তারার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে, হয়তো করেনি। ইতিহাসের সর্বশেষ অধ্যায়ের সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত না পৌঁছানো পর্যন্ত তার গ্রহণযোগ্য চরম প্রমাণ পাওয়া যাবে না। কিন্তু মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে প্রমিথিয়ুসকে পরম ব্রহ্ম বলে জ্ঞান করলে বাড়াবাড়ি হবে।

আলো যদি সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী বাহন হয়ে থাকে তাহ'লে সে সভ্যতা একান্তই নাগরিক সভ্যতা, কেন না, ভারতীয় সভ্যতার জন্মস্থান যে-অরণ্য এবং পল্লী এবং পর্বত তার কোথাওই আলোর আধিক্য ছিল না এবং নেই।

দিনের আলোয় মানুষ কাজ করে, রাতের আঁধারে সে একা বসে ভাবে। পশ্চিমের বস্তুসর্বস্ব সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে সেখানকার অধিবাসীদের অধ্যবসায়ের বলে, আমাদের ধ্যানসর্বস্ব সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের চিন্তাশীলতার ফলে। ওদের সভ্যতাকে তাই বলা যায় দিনের সভ্যতা, আলোর সভ্যতা। আমাদের সভ্যতা রাত্রির, অন্ধকারের।

দিনের বেলায় মানুষ কর্মস্থলে একত্রিত হয়। একসঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ হয় অনেকের সঙ্গে। কিন্তু সেটা সাক্ষাৎই, মিলন

দিনে তাই আমরা একত্রিত হলেও পরস্পরের কাছে বিচ্ছিন্ন। মিলনের ক্ষণ রাত্রি। দিনের বেলায় ট্রামে আপিস যাওয়ার সময় পুরো আধ ঘন্টা যার পাশে বসে থাকি তার সঙ্গে সামান্যতম পরিচয়ও ঘটে না, পরিচয়ের ইচ্ছাও হয় না, কিন্তু অন্ধকারে পার্কের কোনো বেঞ্চিতে একান্ত আগন্তুকের সঙ্গেও আত্মীয়তা আছে বলে মনে হয়, আত্মীয়তা না থাকলেও তার সম্বন্ধে কৌতূহলের অন্ত থাকে না। দিনে তাই আমরা সকলের, অর্থাৎ কারোই নই। সন্ধ্যার পরে আমরা আমাদের, কিম্বা বিশেষ কারো।

মিসেস্ রায়কে নিয়ে নিঃশব্দে পথ চলতে চলতে যেখানে গিয়ে বসলেম, সেটা জলাপোহাড়ে উঠবার পথে ক্লান্ত জনের বিশ্রামের জন্ত সরকারী একটা ঘর। তার মাথার উপর একটা ছাদ আছে, ভিতরে আছে গোটা দুই বেঞ্চি, কিন্তু দেয়াল বলতে কিছু নেই। ঠাণ্ডা হাওয়ার পথ একেবারেই অবারিত।

নগ্নদেহে শীতের সম্মুখীন হওয়া শাস্তি, কিন্তু পর্যাপ্ত আচ্ছাদন থাকলে শীতের মতো উপভোগ্য ঋতু আর নেই। তখন শুধু শীত বোধ না করারই আনন্দ নয়, এমন কি, শুধু শীত বোধ করার আনন্দও নয়। শীতকে জয় করার আনন্দ। সে আনন্দের আলাদা উত্তাপ আছে যা শীতকে শুধু সহনীয় করে না, রমণীয় করে।

একা পথ চলতে চলতে যদি কেউ নিজের মনে কথা কয় তবে তার দ্বারা কথকের মানসিক অবস্থার অস্বাভাবিকতাই সূচিত হয়। কিন্তু জাগ্রত দু'জন ব্যক্তি যদি অনেকক্ষণ একটি মাত্র কথাও না বলে কেবলমাত্র চুপ করে স্থির হয়ে বসে থাকে, তাহ'লে সেটাও স্বাভাবিক নয়। আমি এবং মিসেস্ রায় যে সেই ছোটো ঘরটায় এতক্ষণ নিঃশব্দে স্থির হয়ে বসেছিলেম সেটা এমনিতেই স্বাভাবিক নয়; আমাদের পরিচয়ের দৈর্ঘ্যে বা গভীরতায় তার সমর্থন ছিল না। তার উপর কোনো কিছু বলতে বা শুনতে না পেরে আমার অস্বস্তির অবধি ছিল না।

বাক্য-বিনিময় হয়নি, কিন্তু তাই বলে আমরা দু'জন যে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং যোগাযোগের সকল সূত্রবিহীন বিভিন্ন দু'টি য়ুনিটরূপে বসেছিলেম তা নয়। ভাবের বিনিময় কি হয় শুধু মাত্র বাক্যের মাধ্যমে? এমন কি, কবি-কথিত আঙুলের স্পর্শ দিয়েও সেতু-নির্মাণের প্রয়োজন হয় না সব সময়। দার্জিলিঙের অন্ধকারের অসাধারণ ক্ষমতা আছে কাছের প্রকৃতিকে দূরের মতো অদৃশ্য করবার এবং দূরের মানুষকে অনুভূতির অতি-কাছে এনে দেবার।

সেই সন্ধ্যায় মিসেস্ রায়ের সঙ্গে অজানা অন্ধকারে বেড়াতে বেরিয়ে এবং পরে বিশ্রাম করতে বসে তাঁর সঙ্গে যে নিহিত ঐক্য অনুভব করেছিলেম তার সর্বাঙ্গীণ সন্তোষজনক কোনো সংজ্ঞা দিতে পারব না, কিন্তু কোনো প্রকার অন্তরঙ্গতা ব্যতিরেকেও আমাদের অপরিচয়ের সকল বাধা অতিক্রম করে সেদিন যে নিবিড় আত্মীয়তার পরিবেশ রচিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ করবার উপায় নেই। তা নইলে মিসেস্ রায় পারতেন না আমার মতো দক্ষিণাদাতা অতিথির কাছে তাঁর জীবনের এত না-বলা কথা এমন নিঃসংকোচে প্রথম বারের জন্তে ব্যক্ত করতে, আমিও পারতেম না এমন সানুকম্প শ্রবণের মধ্য দিয়ে মিসেস্ রায়ের বিলাপ আর অভিযোগের পরোক্ষ সমর্থন জানাতে।

অনেকক্ষণ পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ্যে অতিবাহিত হলে মিসেস্ রায় প্রায় অপ্রকৃত কণ্ঠে বললেন, "কী, একেবারে চুপ করে আছেন যে? কী ভাবছেন?"

অনেক কিছু ভাবছিলেম অস্পষ্ট ভাবে, তার একটারও প্রকাশযোগ্য নির্দিষ্ট রূপ ছিল না। রায় বা মিসেস্ রায় কারো সম্বন্ধেই কিছু জানি নে। দাম্পত্য-পরিস্থিতি এমনিতেই বাইরের লোকের কাছে দুর্বোধ। বন্ধু হিসাবে যাকে বহু দিন থেকে জানি, স্বামী হিসাবে তার স্বরূপের কিছুই না জানতে পারি। সরাই-রক্ষয়িত্রীরূপে যে মহিলার দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি, মিসেস্ রায় হিসাবে তার পরিচয় একেবারেই বিভিন্ন হতে পারে। শ্রীসম্মুখীন রায়ের ভীরুতা দেখে যাকে নিরীহ বেচারী বলে মনে করেছি, তার কতটুকু পরিচয়ই বা পেয়েছি অতটুকু দেখার মধ্যে? রায় কেন ছিল তা-ও জানি নে, কেন চলে গেছে তা-ও জানি নে। এমন বৃহৎ অজ্ঞতা নিয়ে বিমূঢ় বোধ করতে পারি, কিন্তু বলব কী? তাই মিসেস্ রায়ের প্রশ্নের উত্তরে বললেম, "তেমন কিছু ভাবছি নে।" অন্ত কথা তুলতে চেষ্টা করে যোগ করলেম, "ভীষণ শীত, না?"

"না তো। আমার তেমন ঠাণ্ডা লাগছে না তো।"

"বলেন কি!"

"সত্যি, আমার আর দার্জিলিঙের শীতকে শীত বলেই মনে হয় না।"

অবিশ্বাস গোপন না করে বললেম, "শীতে লোকে দার্জিলিং থেকে নীচে নামে, আপনার ইচ্ছে বুঝি ফালুং ওঠবার?"

পরিহাস উপেক্ষা করে মিসেস্ রায় কঠোর ভাবে বললেন, "হয়তো কালই সেখানে যেতে হবে। আরেকটু পরেই জানতে পারব।"

আমি কিছুই বুঝলেম না। আবার চুপ করে রইলেম। ঘোর অন্ধকারকে এমনিতেই বোঝার মতো মনে হয়। তার উপর নৈঃশব্দ্য বিরাজ করতে থাকলে তা বহন করা আরো দুরূহ হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ আগে মিসেস্ রায় যখন কি ভাবছি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন জানতেম যে আমরা দু'জনেই একটি কথা ভাবছিলেম, রায়ের কথা। কিন্তু আমার সে কথা উল্লেখ করবার উপায় ছিল না। অপেক্ষা করছিলেম মিসেস্ রায়ের নিজে থেকে কিছু বলার জন্ত। তিনিও বোধ হয় আমার স্বল্পভাবিতায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। সুযোগ মিলল ফালুঙের উল্লেখে। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, রায়কে আপনি কত দিন থেকে জানেন?"

"আপনাকে যত দিন থেকে জানি ঠিক তত দিন থেকে, সাত দিন আগে দার্জিলিঙে আসার পূর্বে তাঁকে কখনো দেখিনি।"

"বা রে, তাহ'লে আমাদের ওখানে উঠলেন কি করে? আমাদের ওই জায়গাটার নাম তো বিশেষ কেউ জানে না।"

"আমিও জানতেম না। আমার এক বন্ধু এসে গত অক্টোবরে আপনাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনিই কাঞ্চনজংঘার ঠিকানা দিয়েছিলেন।"

"তাই না কি। আমার সম্বন্ধে কিছু বলেননি আপনার বন্ধু?"

"প্রচুর সুখ্যাতি করেছেন।"

"আর?"

"তা ছাড়া কিছু বলেননি তো।"

মিসেস্ রায়ের সন্দিগ্ধতায় সন্দেহ হল আপন স্মৃতিশক্তির উপর। যা মনে পড়ল তা উল্লেখযোগ্য নয়। জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, আর কি বলার আছে?"

"অনেক, অনেক আছে! সত্যি, মিথ্যে…"

"আমার বন্ধুর ভদ্রতাবোধ সম্বন্ধে আপনার খুব শ্রদ্ধা নেই দেখছি!"

"কারো ভদ্রতা সম্বন্ধেই আর শ্রদ্ধা নেই, শুধু আপনার বন্ধুর নয়।"

মিসেস্ রায়ের উক্তিতে প্রেজেন্ট কম্প্যানি বাদ দেয়া ছিল কি না জানি নে। কিন্তু কথাটা শুনতে ভাল লাগল না। বিরক্তি গোপন করে বললেম, "তার চেয়ে বলুন কালুং যাচ্ছেন কেন?"

"আমার বাড়ী, লোকজন সবাই যে সেখানে।" হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শুনে সচকিত হয়ে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলেন মিসেস্ রায়। কাউকে না দেখতে পেয়ে অধৈর্যসূচক স্বরে বললেন, "এত দেরী হওয়ার তো কথা নয়!"

আমি ভাবলেম বুঝি রায়ের কথা বলছেন। আশ্বস্তির সুরে জিজ্ঞাসা করলেম, "মিষ্টার রায়ের এখানে আসবার কথা আছে বুঝি?"

"না-না-না—, রায় নয়", মিসেস রায় অন্ধকারের বুক চিরে প্রায় কেঁদে উঠলেন, "রায়ের কথা বলছিনে। কালুতে যাকে খবর আনতে পাঠিয়েছি তার আসবার কথা। রায়কে আর আসতে হবে না।"

আমি আবার চুপ। অন্ধকারে মিসেস্ রায়কে ভালো করে দেখবার উপায় ছিল না কিন্তু বুঝতে বাকী রইল না যে তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত। প্রভাতের বিস্ফোরণের পরে অপরাহ্ণে যে করুণ শান্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেম তা যে একেবারেই অস্থায়ী তাতে আর সন্দেহ ছিল না। মিসেস্ রায়ের সশব্দ নিশ্বাস-প্রশ্বাসে শান্তির আভাস ছিল না এতটুকুও, বরং অদৃশ্য সর্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তা। আমার দুশ্চিন্তা যে স্বার্থলেশশূন্য ভাবে কেবল মাত্র রায়ের নিরাপত্তার জন্যেই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তা নয়। গভীর উদ্বেগ গোপন করে বললেম, "এবারে বাড়ী ফেরা যাক। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।"—যদিও ওভার-কোটের তলায় ঘামছিলেম।

আমি উঠবার নাম করতেই মিসেস্ রায়ের প্রজ্বলিত রোষ কেন জানি না নিমেষে নির্বাপিত হয়ে গেল। আবার সেই বিকালের অসহায় সুরে বললেন, "আমাকে সেই লোকটার জন্যে এখানে অপেক্ষা করতেই হবে। আপনি আর একটু বসবেন না—আমার জন্যে?"

বৈশাখের ঝড়, জ্যৈষ্ঠের বিদ্যুৎ এবং আষাঢ়ের বর্ষণ—এই তিনের এমন ত্বরিত পরিবর্তন—যা প্রায় যুগপৎ ঘটছিল বলে মনে হচ্ছিল, একই নারীর মধ্যে, মাত্র একটি দিনের পরিসরে এমন স্পষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ করে আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কোনটি আসল মিসেস্ রায়? যিনি রায়ের নামের সামান্যতম উল্লেখে অবর্ণনীয় উত্তেজনা গোপন করতে পারছেন না, না যিনি রায়ের আকস্মিক অন্তর্ধানে অবিন্যস্ত কেশরাশি পিঠের পরে ছড়িয়ে আজ সকালে আমার ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, না যিনি এক মুহূর্ত পূর্বে অসহায় শিশুর মতো আমাকে থাকতে মিনতি করছিলেন?

আমি মিসেস্ রায়ের অনুরোধ অনুযায়ী অপেক্ষা করতে থাকলেম! হিমশীতল দেহ এবং উত্তপ্ত অতৃপ্ত কৌতূহল আর বাধা মানল না। বললেম, "বলছিলেন যে আমার বন্ধুর অনেক কিছু বলবার ছিল। কী বলুন তো!"

"এতক্ষণ আপনার এই প্রশ্নেরই জন্যে অপেক্ষা করছিলেম, গভীর দুঃখের সময় কোনো কাউকে বিশ্বাস করে দুঃখের কাহিনী না বলতে পারার দুঃখ যে কত বেশী গভীর হয়ে বাজে জানেন না আপনি। আপনার সঙ্গে আজ বেড়াতে বেরিয়েছিলেম এই ভেবে যে যে কথা কাউকে বলিনি আজ তাই বলব আপনাকে। ভেবেছিলেম বাক্যের অপব্যয়ে হয়তো লাঘব হবে হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনার।"

মিসেস্ রায়ের দীর্ঘশ্বাসের ভঙ্গে বিরতির সুযোগে বললেম, "যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, আপনার বাক্য অপব্যয়িত নয়, অপরূপ ভাষা-মাধুর্যে তা সমৃদ্ধতর হয় মাত্র।" মিসেস্ রায় বোধ হয় আমার কথা শুনতেও পেলেন না।

"সেই এখানে এসে বসা থেকেই বলবার চেষ্টা করছি। এক দিকে আপন সংকোচ, অপর দিকে আপনার অকৌতূহল, তাই বলা আর হয়নি।"

"আপনার রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকলে বলতেন, 'শোনোনি কি জননীর অন্তরের কথা?"

মৃদু, প্রায় অদৃশ্য-অশ্রুত হাস্যে মিসেস্ রায় বললেন, হাঁ, রবীন্দ্র-নাথ পুরোপুরি ভুলিনি এখনো।" একটু পরে বললেন, "আচ্ছা, আমার বাঙলার প্রশংসা করেছিলেন না আপনি একটু আগে?"

"হ্যাঁ এবং আবার করতে যাচ্ছিলেম।"

"কখনো আর কিছু মনে হয়নি আপনার? একটু অদ্ভুত, একটু অসমঞ্জস?"

বন্ধুর দু'-একটা হাস্যকর ইঙ্গিতের কথা অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ল, মনে এলো চিরুণী-কাংগোর কথা. কিন্তু বললেম, "আর মনে হয়েছে আপনার নেপালী ভাষায় সমান দক্ষতার কথা।"

"এই দেখুন, না জেনে একটা রায় দিয়ে বসলেন। আপনি তো নেপালী ভাষার কিছুই জানেন না। কি করে বুঝলেন ও-ভাষা আমি ভালো বলি?"

নিন্দা করলে জেরা হয় জানি. প্রশংসা তো লোকে অসত্য হলেও নির্বিবাদে মেনে নেয়! মিসেস্ রায় প্রশংসার কথা ভাব-ছিলেনই না।

আমি ইতস্তত করে বললেম, "আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না, কিন্তু তাই বলে আপনার বাঙলার আন্তরিক প্রশংসাকে কপট স্তুতি বলে মনে করবেন না যেন!"

"অথচ বাঙালীই নই!" মিসেস্ রায় সশব্দে হেসে উঠলেন।

"বাঙালী নন!" মিসেস্ রায় যদি বলতেন সামনে হিমালয় নেই, যদি বলতেন আমি দার্জিলিঙে নেই, যদি তিনি বলতেন তিনি আমার সঙ্গে একই বেঞ্চিতে বসে নেই, তাহ'লেও এমন অবাক হতেম না।

"না, জন্ম ধারাও নয়, বিবাহসূত্রেও নয়, হা—হা।" মিসেস্ রায়ের উচ্চহাস্যে শুধু উপহাস বা পরিহাস ছিল না। অনির্দেশ্য আরো কিছু।

আমি হতবুদ্ধিতা সম্বরণ করে বললেম, "তাহ'লে রায়ও বাঙালী নয়?"

"রায় বাঙালী, অতএব…?"

"অতএব?" আমার প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু করবার ক্ষমতা ছিল না।

"নাঃ, আপনার কলেজে-পড়া লজিক দেখি একেবারেই ভুলেছেন। প্রোসেস্ অব্‌, এলিমিনেশান করলে কি থাকে?"

এবারে বুঝতে দেরী হোলো না। কিন্তু কিছু বলতে পারলেম না। আবার অসহ্য নৈঃশব্দ্য এলো। চুপ করে থাকা সোনার মতো দামী হতে পারে কিন্তু সে যে কখনো-কখনো লোহার চেয়েও ভারী হতে পারে প্রবাদে তার উল্লেখ নেই।

"কিছু বললেন না যে?" মিসেস্ রায়ের কম্পিত কণ্ঠে অশ্রুর আভাস ছিল নির্ভুল, "ঘৃণা বুঝি নির্বাক্ করেছে?"

"না, মিসেস্ রায়, আমার সকল ঘৃণা নিজেরই পরে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। আর কারো জন্যে অবশিষ্ট নেই এক কণাও।"

"কিন্তু সবটা না জেনে ফাঁসির হুকুম দেবেন না।"

"আমি ফাঁসির হুকুম দিলেও তা তামিল করার মতো কেউ নেই, অতএব সে ভয় করবেন না।"

"না, ভয় কাউকেই করি নে। ও-বস্তুটি, আপনারই ভাষায়, বিধাতা বাঙালীদের এমন নিঃশেষে দান করেছেন যে অ-বাঙালীদের জন্যে কিছুই বাকী থাকেনি। তবে কি না…"

মিসেস্ রায় আরেক বার কি একটা শব্দ শুনে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কেউ আসছে কি না। কাউকে না দেখতেও পেয়ে আবার সুরু করলেন।

"তবে কি না, যে যাই বলুক, কেউ—সে যেই হোক না কেন, অপরিচিত, অক্ষম, অধম বা নগণ্য—কেউ আমার সম্বন্ধে খারাপ কিছু ভাবছে এটা কারোই ভালো লাগে না।"

নানা দার্শনিকতায় ভূমিকা কেবলি দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হচ্ছিল। প্রশ্নটার অশোভনতা সত্ত্বেও বললেম, "তার চেয়ে ভালো লাগার কথা বলুন। রায়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় হোলো কবে বা কি করে?"

মিসেস্ রায় দোষ নিলেন না, বললেন, "তার আগে আমার কথা বলি। জন্ম হয়েছিল সভ্য লোকালয়ের বাইরে ফালুতের ডাক-বাংলোর কাছে। মা-বাবা কেউ কখনো ফালুৎ থেকে নীচে নামেননি, তাই তাঁদের নীচের সমতল দেশের সভ্যতর সমাজ সম্বন্ধে ছিল অপরিসীম ভীতি এবং তার চেয়েও বেশী অজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা। আমার বয়স যখন বছর পাঁচেক তখন কি একটা লটারিতে যেন বাবা অনেকগুলি টাকা পেয়ে গেলেন। অত টাকার সঞ্চয় বা ব্যয়ের পরিকল্পনা তো দূরের কথা, তার পরিমাণ কল্পনা করাও ছিল তাঁর সাধ্যাতীত। গ্যাংটকের মিশনারী সায়েব—আসলে যাঁর নামে টিকিটটা কেনা হয়েছিল—তিনি যখন বাবাকে পুরস্কারের প্রাপ্য টাকার অংকটা বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন তখনই বাবা আনন্দাতিশয্যে হার্ট ফেল করে মারা যান।"

আমি দুঃখ জ্ঞাপন করে বললেম, "আপনার মা?"

"তিনি আমার জন্মের পরেই মারা যান। বাবার মৃত্যুর পরে সেই মিশনারী সায়েব আমাকে পাঠিয়ে দিলেন কার্শিয়ঙে মিশনারী ইস্কুলে, অভিভাবক আর একসিকিউটর করে দিলেন একটা ব্যাংককে। সেখান থেকে সীনিয়র কেমব্রিজ পাশ করবার আগেই চলে যাই শান্তিনিকেতনে। সেখানে ছিলেম তিন বছর, বাবার টাকার উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ না করা পর্যন্ত।"

"তাই বলুন। এবারে বুঝতে পারছি আপনি কোথায় এমন সুন্দর বাঙলা বলতে শিখেছেন।"

"কিন্তু আমার ভাষা-পারদর্শিতার কারণ বলতে এত কথা বলছি নে আপনাকে। শান্তিনিকেতনে শুধু বাঙলাই শিখিনি, গানও শিখে ছিলেম। তার চেয়েও বেশী শিখেছিলেম গানকে ভালোবাসতে।"

"অস্কার ওয়াইল্ডের কিন্তু একটা এপিগ্রাম আছে যে মেয়েরা গানকে কখনোই ভালোবাসে না, ভালোবাসে গায়ককে!" শুষ্ক আলোচনায় লঘু তরলতার সুর আনতে চেষ্টা করলেম। চেষ্টাটা ভয়ানক রকম সফল হল না।

"মিথ্যে কথা। শান্তিনিকেতনে যতগুলি পুরুষ দেখেছি তার একটাকেও এতটুকুও ভালো লাগেনি। তখন গানকেই ভালোবেসে ছিলেম। কিন্তু যাক সে কথা। চেক সই করবার ক্ষমতা পাওয়ার পরেই মনে পড়ল দেশের কথা। ভাবলেম, যাই একবার দেখে আসি গাঁয়ের আপনার লোকজনদের—সফল পুরুষ যেমন বিজয়-গৌরবে বার্মা বা বিলেত থেকে ফেরে। সে নৈরাশ্যের কথা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। বাঙলা দেশে এসে পরকে আপন করতে পারিনি, দেশে এসে আপনাকে মনে হল নিতান্ত পর বলে। ফিরে এলেম মাঝামাঝি জায়গা—দার্জিলিঙে, যা কিছু বাঙলা, কিছু নেপাল, কিছু ভূটান।"

একটু হেসে মিসেস্ রায় স্থির, অকম্পিত কণ্ঠে বলে চললেন, "এমনি মিশ্রিত একটা জায়গাতে এক রকম কেটে যাচ্ছিল কিন্তু বড়ো নিঃসঙ্গ বোধ করছিলেম।"

"কম্পোজিট জায়গা যদি বা মেলে, কম্পোজিট মানুষ পাওয়া শক্ত।" আমি মিসেস্ রায়ের কাহিনী সংক্ষেপ করবার সুযোগ দিলেম।

"যে-হোটেলে ছিলেম তার ম্যানেজার ছিল রায়। একা একটা ঘর নিয়ে একটি মহিলা মাসের পর মাস কোনো সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ কারণ বাদেই থেকে যাচ্ছে এতে আর সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমি তা উপেক্ষা করেছিলেম অনায়াসেই। রায়ের সঙ্গেও দু'-চার বার যা কথা হয়েছিল তা ম্যানেজার হিসাবেই। হঠাৎ একদিন…"

আমি বাধা দিয়ে বললেম, "মাপ করবেন, কিন্তু রায়কে তো কখনোই একটা কম্পোজিট চরিত্রের লোক বলে মনে হয়নি আমার।"

"আজ আর তা কারোই মনে হবে না। কেউ বিশ্বাসও করবে না। কিন্তু সেদিন রাত্রে রায় যখন আপন মনে নিজের ঘরে বসে বাঁশী বাজাচ্ছিল সেদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর গুন্-গুন্ করছিলেম না, বৈষ্ণব পদাবলীই সেদিন আমার কথা বলছিল। পাঁচ বছর আগের কথা এটা। তখনকার রায়ের সঙ্গে আজকের রায়ের এতটুকু সাদৃশ্য নেই। পুরুষ এতও বদলাতে পারে!"

শুধু পুরুষ বদলায় না, সবাই। যত বিরোধ, যত বিচ্ছেদ, যত বেদনা, সে তো পরিবর্তন নিয়ে নয়, পরিবর্তনের গতি এবং বেগ নিয়ে। রায়ের মতো মিসেস্ রায়ও নিশ্চয়ই পাঁচ বছর আগেকার মিসেস্ রায় নেই। তাঁরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ট্র্যাজেডি এটা নয় যে দু'জনেই বদলেছে, ট্র্যাজেডি এই যে উভয়ের পরিবর্তন সমান্তরাল গতিতে হয়নি, সমান তালে চলেনি। এক জনের আকর্ষণ যখন বেড়েছে, অপরের কমেছে। একের কমলে অপর পক্ষের বেড়েছে। ঘনিষ্ঠতার প্রথম কয়েকটা মুখর সন্ধ্যার কথা বাদ দিলে, নরনারীর প্রেমের নক্ষত্রলোকে নিয়তই

এই পরিবর্তন চলেছে—একের মিলন-পিপাসা যখন শুক্লপক্ষের শশিকলার মতো কেবলি বৃদ্ধি পেতে থাকে, অপরের তখন কৃষ্ণপক্ষ, সেখানে গতি হ্রাসের দিকে, হ্রাস থেকে গ্রাসের দিকে।

কিন্তু এ-সব কথা তখন মিসেস্ রায়কে বলতে যাওয়া বৃথা। দর্শকের পক্ষেই দার্শনিক নির্লিপ্ততা সম্ভব। অনাহত বিচারকের পক্ষেই সম্ভব সাক্ষ্য আর প্রমাণের নির্ভুল, নিরপেক্ষ নিক্তির ওজন করা। যে আঘাত পেয়েছে, যার উপর অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার বিচারের মান আলাদা হবেই। অন্যরূপ আশা করাই অন্যায়।

মিসেস্ রায় একটু থেমে নীরবে অশ্রুমোচন করে পুনরায় কাহিনীর বিবৃতি সুরু করলেন। পাঁচ বছর আগেকার প্রাণবন্ত আনন্দমুখর মুহূর্তগুলি মরে গেছে বহু দিন আগে। আজ তাদের ময়না-তদন্তে আনন্দের লেশ মাত্র নেই; আছে শুধু তিক্ততা, বিদ্বেষ আর আপন নির্বুদ্ধিতায় অপরিসীম অনুতাপ।

"রায় তখন সত্যি ভালো বাঁশী বাজাতে পারতো। আমার যেটা সব চাইতে লেগেছিল সেদিন তা হচ্ছে এই যে ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর বাজাতো। রবীন্দ্র-সঙ্গীত তখনো পংকজ মল্লিকের কল্যাণে এমন জনপ্রিয়তা লাভ করেনি—তাঁর গান তখনো নিবদ্ধ ছিল বোলপুরের আশ্রমে আর বালিগঞ্জের দু'-একটা বসবার ঘরে। রায় দূরে বাঁশীতে সুরটা বাজাতো, আমি মনে-মনে গুন্-গুন্ করতেম কথাগুলো নিয়ে। সঙ্গীত যেমন করে ব্যবধানের অবসান ঘটাতে পারে এমন আর কিছু পারে না। গায়ক আর শ্রোতা তাদের পৃথক্ সত্তা হারিয়ে ফেলে এক হয়ে যায় সঙ্গীতের মূর্ছনায়। তাই রায়ের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় অবিশ্বাস্য রকম অল্প সময়ের মধ্যে দু'জনে দু'জনকে জানলেম অসীম ব্যপ্ততায়। অসীম গভীরতায় যে নয় সে কথা আজ জানি।"

"জানার কি শেষ আছে মিসেস্ রায়? মরবার পূর্ব মুহূর্তেও বলবার উপায় নেই যে একটি লোকের সম্বন্ধেও চরম জানা জেনেছি।"

"কিন্তু না-জানা নিয়ে রসায়নাগারে গবেষণা চলে, বাঁচা চলে না। বাঁচবার জন্যে কোন একটা মুহূর্তের জানাকে চরম বলে মানতেই হয়। এবং সেই জানা অনুযায়ী কাজ করতে হয়। কিন্তু সে কথায় পরে আসছি। এখন বলছি বিয়াল্লিশের ডিসেম্বরের কথা। এমনি শীত ছিল সেদিন, কিন্তু এমন অন্ধকার ছিল না। আমি আর রায় বসেছিলেম অবজার্ভেটরির কাছে আমাদের একটা প্রিয় জায়গায়। আজো কানে বাজছে, রায় সেদিন রবীন্দ্রনাথের সেই পূরবী সুরে আমার জীবন-পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান—'তুমি জান নাই তুমি জান নাই তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ' এই গানটার সুর বাজিয়েছিল। বুঝতে বাকী ছিল না যে এ ওরই মনের কথা। আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। তার পরে যা হয়েছিল তা বলতে গেলে আমার কাছে মনে হবে নিষ্ঠুর পরিহাস বলে, আপনার কাছে মনে হবে সাধারণ প্রেমের গল্প বলে। যদিও আমার কাছে তা আদৌ সাধারণ ছিল না। যাক সে কথা।

"ডিসেম্বরের দার্জিলিঙেও সেবার অনেক লোক, সবই প্রায় খাকি। রায়ের হোটেলে অত খাকির ভীড় আমার ভালো লাগত না। তাই তখন এই 'কাঞ্চনজংঘা' বাঙলোটা কিনে সেখানে চলে এলেম। রায়ের হোটেলে কাজ ছিল ভয়ানক, কিন্তু কাজে মন ছিল না তেমন। বেশীর ভাগ সময়ই কাটতো আমার বাড়ীতে। হোটেলের মাড়োয়ারি মালিক এক দিন রায়কে একটু জোরেই বোধ হয় ধমকেছিল এই নিয়ে। রায় সন্ধ্যা বেলা মুখ ভার করে আমার কাছে এসে বলল, 'এই যুদ্ধের সময় এত লোক ব্যবসা করে এত টাকা করছে, আর আমি মরছি সামান্য মাইনের চাকরি করে ধমক খেয়ে। সামান্য মূলধন নেই বলে'।"

"সামান্য মূলধন কেন, আমার সমস্ত টাকা, সমস্ত গয়না সেদিন হাসিমুখে রায়ের হাতে তুলে দিতে পারতেম। কিন্তু যুদ্ধের ব্যবসায় আমার মত ছিল না। তাছাড়া রায় যে ব্যবসায় কিছু করতে পারবে তা বিশ্বাস করিনি। যার অন্তর থেকে উদ্ভূত হাওয়ায় অমন স্বর্গীয় বাঁশী বাজে, সে-মনে ব্যবসায়িক কূটবুদ্ধির বা নীচতার স্থান কোথায়? আমি তাই রাজী হইনি, বলেছিলেম, "ব্যবসা তোমার জন্যে নয়। তুমি শিল্পী। ব্যবসার কথা ভেবো না।'

"ব্যবসার কথা ভাবেনি আর, কিন্তু চাকরিতেও মন ছিল না। চুয়াল্লিশের মাঝামাঝি, জুন মাসেই, একদিন হঠাৎ দুপুর বেলা ও এসে বলল, 'আজ আবার মাড়োয়ারীটা এসেছিল ধমকাতে—কাল সেই পাঁচ মিনিটের জন্যে একবার হোটেল ছেড়ে তোমার কাছে এসেছিলেম না!—সেই জন্যে। আজ আর ভাল লাগল না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি।'

"চাকরিটা এমন কিছু একটা বিরাট চাকরি ছিল না, কিন্তু ওর আর কেউ নেই, হাতেও এক পয়সা নেই, তাই জন্যেই চাকরি ছাড়াতে আমি খুশী হইনি। কিন্তু কিছু বলিনি আমি। কাজ ছেড়ে দিয়ে ও কোথায় ছিল, কি করতো আমি জানতেম না। সন্ধ্যা বেলা আসতো প্রায়ই বাঁশী শোনাতে, কিন্তু ঠিকানা বা কাজের কথা জিগেস্ করলে অসন্তুষ্ট হতো। বুঝতে পারতেম যে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিন চলছে ওর, কিন্তু আমাকে বলতো না কিছু। বুঝি পৌরুষে বাধতো। আমারও মন চাইতো না এমন প্রিয়জনকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে অপমান করতে।

"একদিন বাঁশী বাজাতে বাজাতে হঠাৎ ভয়ানক রকম কেসে উঠল। সে কাসির আওয়াজে যেন শ্মশানের কান্না ছিল। আমি বাঁশী সরিয়ে রেখে শুইয়ে দিলেম আমার বিছানার উপর। কপালে হাত দিয়ে দেখি ভীষণ গরম। ডাক্তার ডাকলেম, সেবা করলেম। সেরে উঠে সুস্থ হতে, কর্মক্ষম হতে প্রায় তিন মাস লাগল। তার পর বাড়ী ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, কেন না, বাড়ী বলতে কিছু ছিল না রায়ের। শরীর তখনো একটু দুর্বল ছিল। একদিন বলল, 'এবার আমি যাবো।' আমি জিগেস করলেম, 'কোথায়?' আমার থাকতে বলার উপায় ছিল না। এরই মধ্যে কালুতের মোড়লদের মধ্যে আমার বাড়ীতে রায়ের থাকা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছিল বলে শুনেছিলেম। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরে রায় যখন করুণ ভাবে আমার দিকে চেয়ে চুপ করে রইল তখন কিছুতেই পারলেম না ওকে বাইরে পাঠিয়ে দিতে। ও থেকে গেল। কেন না, যাওয়ার জায়গা ছিল না।

"কেবল মাত্র বাঁশী বাজিয়ে আমার ঋণ শুধবে, সেইটেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হত। কিন্তু পুরুষের স্থূল মন বুঝবে কোত্থেকে অমন সূক্ষ্ম দেনা-পাওনা? রায় চাইল ঐশ্বর্য দিয়ে সমৃদ্ধি দিয়ে আমার দ্বিধা ভাঙতে, সংকোচ জয় করতে। একদিন বলল, 'কাজি, যদি কিছু টাকা ধার দাও তাহ'লে ক্যান্টিনে একটা সাপ্লাইয়ের কন্ট্রাক্ট পেতে পারি। খুব লাভ। অবিশ্যি এখনি একসঙ্গে সব

টাকাটা দিতে হবে না। আপাতত হাজার পাঁচেক হলেই সুরু করতে পারি।'

"কোন প্রশ্ন করিনি। পরের দিন সকালে ব্যাংক থেকে পাঁচ হাজার তুলে দিয়েছি। পরে আরো। কিন্তু যুদ্ধ তখন প্রায় শেষ হতে চলেছে। সরকারের বহু চর তখন চুরি ধরবার কাজে নিযুক্ত। যুদ্ধের কনট্রাক্ট তখন আর দু'টাকার জিনিষ দিয়ে (বা না দিয়ে) দু'শো টাকার বিল পাস করানো নয়। বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা তখন লাভ নিয়ে সরে গেছে, লোভী মূর্খরা শেষে এসেছে ক্ষতি কুড়োতে। রায় হল তাদেরই এক জন। যুদ্ধ যেদিন থামল সেদিন রায়ের কনট্রাক্টও শেষ হল—কিন্তু আমাকে শেষ করার আগে নয়। আমার সঞ্চিত অর্থের আর হাজার তিনেকের বেশী অবশিষ্ট ছিল না।

"আমার রবীন্দ্র-সঙ্গীত আর রায়ের বাঁশী, দুই-ই তখন চুলোয় গেছে। আমাদের আলোচনার বিষয় তখন কালের যাত্রার ধ্বনি নয়, কালকের বাজার। গুরুদেবের ভাষায় জীবন নয় জীবিকা। টাকার যা সামান্য অবশিষ্ট ছিল, তাই নিয়ে আমিই তখন এই কাঞ্চনজংঘায় ছোটো-খাটো একটা বোর্ডিং-হাউস সুরু করলেম। দেখা-শোনা সব আমিই করি, কিন্তু রায়কে সামনে রেখে, নইলে সম্ভ্রান্ত অতিথিরা আসতে ভয় পায়।"

"আপনি এত করলেন ওর জন্যে আর রায় তার পরে আপনাকেই এমন ভাবে ফেলে চলে গেল?" আমি সমবেদনা না জানিয়ে পারলেম না।

"এই প্রথম নয়। কালুভের কাছাকাছি একটা জায়গায় জ্ঞানতুপ বলে একটা জংলী ভুটিয়া মেয়ে আছে। আমি মাস ছয়েক আগে প্রথম জানতে পারি যে রায়ের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ। সেই থেকেই রায় কি একটা ব্যবসার কাজে কলকাতা যাওয়ার কথা প্রায়ই আমায় বলে। আমি জানতেম সবই, কিন্তু কিছু বলিওনি, যেতেও দিইনি।"

"আপনার এখনো এই অকৃতজ্ঞ লোকটার জন্য মমত্ববোধ আছে দেখছি।" আমি রায়ের সম্বন্ধে অযাচিত মন্তব্য না করে পারলেম না।

"না, মমতাই নয় শুধু, প্রয়োজনও ছিল। রায় চলে গেলে আমার বাঁচবারই উপায় থাকতো না। 'কাঞ্চনজংঘা' বন্ধ করে দিতে হত তখনি। তা'ছাড়া, কাউকে মুখ দেখাতে পারতেম না। স্বামি-পরিত্যক্তার জন্যে লোকের করুণা হয়। কিন্তু রায় তো আমার স্বামী নয়, প্রণয়ী। সে ছেড়ে গেলে ধিক্কার, উপহাস ছাড়া আর কিছু জোটে না কোন মেয়ের। সে উপহাস আমি সইব না কোন মতেই। আমার সব গেছে, কিন্তু এই শেষ গর্বটুকু খোয়াতে পারব না। তাই শেষ পর্যন্ত…"

মিসেস্ রায় হঠাৎ আবার একটা শব্দ শুনে কথা থামিয়ে চার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। অন্ধকারে আমি কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেম না। অন্ধকারের মধ্য থেকে, প্রায় শূন্য থেকে, একটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলো। মিসেস্ রায় তৎক্ষণাৎ উঠে একটু দূরে গিয়ে সেই লোকটির সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন। লোকটা আবার অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল, মিসেস্ রায় ফিরে এসে বসলেন না আর। বললেন, "আপনাকে অনেকক্ষণ রেখেছি, অনেক বাজে কথা বলে বিরক্ত করেছি। এবারে বাড়ী চলুন, আর কিছু বলে আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। আর কিছু বলবার নেইও অবিশ্যি।" স্বরে নিশ্চিত আশ্বাসের সুর।

অন্ধকার থেকে আবির্ভূত লোকটার সঙ্গে শ্রীমতী কাঞ্চির কি কথা হয়েছে শুনিনি, যা শুনেছি তার এক বর্ণও বুঝতে পারিনি। হঠাৎ কণ্ঠে আশ্বাসের সুরের কি কারণ হতে পারে, তাও ভেবে পেলেম না। আমার মনে শুধু ধ্বনিত হতে থাকল কৃতঘ্ন রায়ের জন্য অন্তহীন ঘৃণা আর মিসেস্ রায়ের জন্য অপরিসীম শ্রদ্ধা-মিশ্রিত করুণা।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ মিসেস্ রায় রীতিমত জোরে হেসে উঠলেন। আমি চমকে উঠলেম ভয়ে আর বিস্ময়ে। সে-হাসি চার দিকের অসংখ্য তরুরাজির মধ্যে তার অজেয়তা ছড়িয়ে দিল। আমি কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেম, "কি, হঠাৎ এমন জোরে হেসে উঠলেন যে?"

"খুব জোরে হয়ে গেছে, না? বড়ো অভদ্র, না?" হাসি কিন্তু থামল না, বা কমল না। হিস্টীরিক হাসির মধ্যে আবার বললেন, "আপনার ভদ্র বাঙালী মেয়েরা এমন হাসতো না, না? কিন্তু ভুলবেন না, আমি বাঙালী নই। রায় এই সহজ কথাটা ভুলেছে বলেই না ওর আজ এই বিপদ।"

"কি বিপদ আবার?" স্বতই এই সভয় প্রশ্নটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

"বিশেষ কিছু হয়নি এখনো, তবে…"

"তবে কি?" আমি অপেক্ষা করতে পারছিলেম না।

"ভয় পাবেন না। ওই লোকটি এসেছিল দেখলেন না? ও সব ঠিক করে দিয়েছে। আমারও, আপনারও।"

"আমার কি করেছে আবার?" আমার ভয়ের শেষ ছিল না।

"আপনার জিনিষ-পত্তর সরিয়ে দিয়েছে অন্য একটা হোটেলে। সেখানে আপনি নিরাপদ থাকবেন।"

বিপদ কেটে গেলে বীরত্ব দেখাতে বাধা নেই। বললেম, "আমার নিরাপত্তার জন্য ওর সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আপনার কি করেছে?"

"আমার যা করবার আমিই করব। ওকে শুধু ব্যবস্থা করতে বলেছিলেম। তা ও করেছে। বাকীটা নিজের হাতে করতে হবে। অন্যের কানে গান শোনা কি গান শোনা? তেমনি আরো কতগুলি কাজ আছে যা নিজে হাতে না করলে করাই নয়।" আবার সেই হাসি, কণ্ঠে সকালের সেই অস্বাভাবিক দৃঢ়তার স্বর।

"রায়কে একদিন সত্যি ভালবাসতেম। রায়ও আমাকে সত্যি ভালবাসত। রায় যখন আমার টাকায় ব্যবসা করে লোকসান করতে থাকল, তখন থেকেই সব কিছুর পরিবর্তন হতে থাকল। ক্রমে জানলেম যে আমার সব টাকা ব্যবসায়ও যায়নি, অনেকটা গেছে জ্ঞানতুপের ভরণ-পোষণে। উঃ, সে কি অসহ্য যন্ত্রণা, আপনি জানেন না। একমাত্র পুরুষরাই পারে এমন হৃদয়হীন ভাবে অকৃতজ্ঞ হতে! আমাকে কোন দিন বলেনি জ্ঞানতুপের কথা। আমিও ভেবেছিলেম অমন নীচতার কথা তুলে নিজেকে নীচ করব না। কিন্তু পরশু যখন কালুং থেকে এক দূর-সম্পর্কীয়া পিসী এসে হাসতে হাসতে অনেক কথা শুনিয়ে গেল তখন আর পারলেম না চুপ করে থাকতে। ও আমাকে আর ভালবাসে না, আমিও

বাসি নে। আমার মনে ওর জন্তে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। কিন্তু তাই বলে এই অপমান সহ্য করব কেমন করে? জিগেস্ করলেম জ্যানতুপের কথা। সোজা অস্বীকার করল। হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল কথাটা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলেম, এবারে আরো রূঢ় ভাবে। অনেক অপমান করাতে তখন রেগে গিয়ে বলল, হ্যাঁ, ও জ্যানতুপকে ভালবাসে। দু'বছর থেকেই বাসছে। মুখের উপর স্পষ্ট আমায় বলল যে আমাকে আর ওর ভাল লাগে না। আমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হয় না, কাছে আসতে বিরক্ত লাগে। তার পর আমি কিছু বলতে বা করতে পারার আগেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।"

আমরা তখন ক্যাস্কাটা রোডের মোড়ের প্রায় কাছে এসে গেছি। মিসেস্ রায় আমাকে দূরে ডান দিকে একটা বাড়ী দেখিয়ে বললেন, "আপনার জন্তে ওখানে জায়গা ঠিক করে দিয়েছি। আপনি সোজা ওখানে চলে যান। ওরা জানে যে আপনি যাবেন, কোন অসুবিধা হবে না।"

আমি মোড় ফেরবার আগে মিসেস্ রায় হঠাৎ ওভার-কোটের ভিতর থেকে একটা কি বের করে বললেন, "এটা কি জানেন? থাক, জেনে কাজ নেই। কিছুক্ষণ আগে জিগেস্ করছিলেন না যে ওই লোকটা আমার জন্তে কি করেছে? এইটে ওই দিয়ে গেছে। জ্যানতুপ শেষ হয়েছে, এবার রায়ের পালা। সেটা কি আর অন্য কাউকে দিয়ে করাতে পারি! এখন সেখানে যাচ্ছি যেখানে রায় হাতে-পায়ে বাঁধা আছে। এর মতো সমাধান আর নেই। রায় নিরুদ্দেশ হলে অনেক বাজে কথা শুনতে হত। এর পরে আর কেউ বলতে পাবে না যে রায় আমাকে ফেলে চলে গেছে!"

মিসেস্ রায় বাঁ দিকে গেলেন। আমি ডান দিকে।

[ক্রমশঃ।

সুরের মূল্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

একদা—রাজ-দরবারেতে নৃত্য-গীতের আসর চলে,
পড়ছে না কো মোটেই 'ফেরি' কৃপণ রাজার রঙমহলে।
ভাবতো নটী মিলবে মোহর মিলবে মধুর কণ্ঠী চেলী,
দেখাবে তায় মুক্তামালা যে সুধাবে "বল কি পেলি?"

প্রহর পরে কাটছে প্রহর রাকা রাতি যায় যে ফাঁকা।
দেয় না কেহ ওড়না রুমাল এমন কি কেউ রূপার টাকা।
ভগ্নহৃদয় ক্ষুণ্ণ নটী গীতের সুরে বলছে ডেকে—
রঙ্গ করে রঙ্গিণী তার দিল-দরদী সারেঙ্গীকে—

'হে নটরাজ পোহায় যে রা'ত দণ্ড কয়েক কেবল বাকি
বেশ তুমি ত তাল দিয়ে যাও মোর যে ঘুমে ঢুলছে আঁখি।'
বুঝি গোপন মরম-ব্যথা ছড় বুলায়ে তাহার তারে—
সারঙ্ সুরের গিটকারীতে প্রবোধ সে দেয় বারে বারে।

'এমন মোহন নৃত্য সখি প্রায় ত্রিযামা কাটিয়ে দিয়ে
শেষে যেন তাল কাটে না হয় না রসভঙ্গ প্রিয়ে।'
সে আওয়াজে বেদন বাজে দেন যুবরাজ রত্নমালা,
সোনার কাঁকন রাজকুমারী চাকরাণী তার রূপার বালা।

মিতব্যয়ী মন্ত্রীও দেন তাঁহার হীরক অঙ্গুরীয়,
কম্বল এবং দেয় লোটা তার মুগ্ধ গীতে সন্ন্যাসীও।
সবিস্ময়ে শুধান রাজা কারণ কি হে? কারণ কি হে?
সহসা বৈরাগ্য কেন? যার যা আছে দেয় বিলিয়ে!

সন্ন্যাসী ক'ন, 'রাজৈশ্বর্য্য ভোগ-বাসনা জাগিয়েছিল।
পদস্খলন হয় না যেন সারঙ্ আমায় জানিয়ে দিল।'
কুমার বলেন, 'বিদ্রোহী ভাব করছে ক'দিন তোলাপাড়া
'দেখো যেন তাল কাটে না' ফিরিয়ে দিলে জীবন-ধারা।

দুর্ব্বল এবং অসাবধানী যে আছে, সুর করছে মানা
হয় না রসভঙ্গ যেন শেষে যেন তাল কাটে না।
অর্দ্ধোদয়ে স্নান করিয়া সুরের মণি-কর্ণিকাতে
হৃদয় হল স্নিগ্ধ শুচি মালিন্য আর নাই কো তাতে।'

তন্ময়তায় আবেগ ভরে যে বেথা গায় বাজায় নাচে,
তাদের সকল ছন্দে সুরে শিব-শিবানীর পরশ আছে।

১৯

বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে—আউস ধান রোয়ার সময় বয়ে যায়—এখন জমি দখল না করলে এ বছর আর কোনও কাজ হবে না, জমি পতিত থাকবে। ঘন বৃষ্টি নামলে আর সেখানে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। অনেক অসুবিধা হবে। জমি কিনে দখল করতে না পারলে টাকা যা যাওয়ার তা তো গেলই—মান-সম্মানও দেশে আর থাকবে না। সব চেয়ে অসুবিধা আইনের বিচারেও অনেকখানি পিছিয়ে যেতে হবে।

বিপ্রপদ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তিনি ছুটির জন্য অনেক মিনতি করে দরখাস্ত করেন। সপ্তাহ-খানেক চলে যায় কিন্তু উত্তর আসে না কিছুই। রোজ পোষ্ট আফিসে লোক পাঠান হয়—সব সংবাদ আসে, আদেশ-নির্দ্দেশ আসে, কিন্তু ছুটির কোনও সংবাদ আসে না।

বিপ্রপদ মহা ফাঁপরে পড়েন। তিনি নিজেই সদরে ছুটে যান। বাবুরা কোথায় যেন গেছেন, পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে আসবেন না। অতএব বিপ্রপদকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। বাবুদের মধ্যে বড়বাবুই কর্ত্তা। একে একে সব বাবু আসেন কিন্তু তাঁরা বিপ্রপদর সাথে কথাই বলেন না, যেন চেনেন না। সর্বশেষে আসেন বড়বাবু। বিপ্রপদকে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি বিপ্রপদ বাবু, কি মনে করে?'

'আমাকে কিছু দিনের জন্য ছুটি দিতে হবে।"

'কত দিনের জন্য?'

'এই পাঁচ মাসের।'

'এই তো আপনি কত দিন কাটিয়ে সবে ক'মাস এসেছেন। এ ভাবে ছুটি নিলে আমাদের কাজ চলবে কি করে?'

'আমার তো তেমন কোনও মারাত্মক কাজ বাকী নেই, আদায়-উসুলও খারাপ হয়নি, কোনও কিস্তিও খেলাপ যায়নি। আমি আবার সময়মত হাজির হবো। আমি—'

'তাতে কি মহাল থাকে? নায়েব-গোমস্তার ওপর ভরসা করে বসে থাকা যায় না।'

'কিন্তু কি করব? আমি যে কতটুকু জমি কিনেছি। তা যদি দখল করতে না পারি, সব টাকাই মাটি। মরসুম যায়-যায়। আমি ফিরে এসে কাছারীর সব ঠিক করে নেবো।'

'মুখে যা-ই বলুন, ক্ষতি কিছু-না-কিছু আমাদের হয়ই, তা কিন্তু আপনারা স্বীকার করতে চান না।'

'কেন, এ কথা বলছেন কেন?'

'এই দেখুন না, ঐ মৌজাটার নাম, কি নাম হে উমেশ?'

'মহারাজ চৌদ্দরসির কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চৌদ্দরসির কথাই বলছি—সেখানের অবস্থা কেমন সঙ্গীন হলো ম্যানেজারকে ছুটি দিয়ে। বুঝলেন, তাঁরও আপনার মত অবস্থা। ছুটি না দিয়ে আর পারা গেল না। কিন্তু শেষে ক্ষতি হলো আমাদেরই। কিছু বলার জো নেই, আপনারা পুরোন কর্মচারী।'

'তাহ'লে এখন ছুটি পাওয়া যাবে না?'

'এর চেয়ে কি না বলা ভাল?'

বিপ্রপদর মনে-মনে ধিক্কার জন্মে। ইচ্ছা হয় চাকরীতে ইস্তাফা দিয়ে দিতে। কিন্তু কতকটা নিজের প্রয়োজনে কতকটা বাবুদের পূর্বপুরুষদের কাছে ঋণী বলে তা পারেন না। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে উঠে যান।

একটা বছরের জন্য জমি পতিত পড়ে থাকবে, এত সাধের জমিতে দেওয়া হবে না চাষ—বিপ্রপদর যেন প্রাণ ফেটে যেতে চায়। তিনি কাছারীতে ফিরে যান। নিজের ক্ষুদ্রতা ও গ্লানি নিজেকেই ধীরে ধীর হজম করতে হয়।

কিছু-দিন বাদে বাবুরা ভেবে-চিন্তে যা লিখে পাঠান তা কতকটা কশাঘাত তুল্য।

এ কশাঘাতে যে মানুষ সে ক্ষেপে দাঁড়ায়, কিন্তু বিষয়লোভী বিপ্রপদ তা পারেন না। বাবুরা ছুটি মঞ্জুর করেছেন—চিঠিও এসেছে তাঁর বাড়ী থেকে যে, এক্ষুণি বাড়ী আসা চাই, নইলে তালুকটা হাতছাড়া হবে।

মেজ ঘোষাল রমণী বড়বাবুর বাল্যবন্ধু। বিপ্রপদর ছুটি নিয়ে যেটুকু টালবাহানা হলো তার মধ্যে যে সে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল তা কেউ টের পেল না। জানল শুধু রমণী আর বড়বাবু।

বিপ্রপদ তাড়াতাড়ি পোঁটলা-পুঁটলী বেঁধে রওনা দিলেন।···

পথে কোনও স্থানে একটুও অপেক্ষা করলেন না। শুধু সময় সময় আসমানের শূন্য ঘরটার কথা মনে পড়ল—আর মনে পড়ে ডালিমবাগের কবর-স্থানের কথা। আসমান চলে গেছে, শিশুটাও তার চলে গেছে, তখন এ দাগ কেন রেখে গেল বিপ্রপদর বুকে? কত দূরে তিনি কাছারী-বাড়ীটা ফেলে এসেছেন কিন্তু স্মৃতিটা কেন চলছে তাঁর সাথে-সাথে?

ভাদ্রের ভরা গাঙ।···

ঘোলা জল ও কালো আকাশ ঐ বাঁকের আবডালে ঘন সবুজ বন্-বনে গাছ-গাছালি ও লতা বেতসের বুকের তলায় গিয়ে মিশেছে। নাম-না-জানা কত যে ফুল লতিয়ে লতিয়ে গাছের বুকে ও মাথায়

দক্ষিণের বিল

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

ফুটেছে তা দেখলে চোখ জুড়ায়। এ-পার থেকে ও-পারে একবার আসছে, আবার উড়ে যাচ্ছে বড় বড় হরিয়াল ও টিয়ার ঝাঁক। তাদের রংও সবুজ। সবুজ ঢেউয়ে দোলন্ত কচুরীপানাগুলো। বর্ষার শেষ সমারোহে আজ যেন সবুজ মেয়েটা অবুঝ হয়ে উলংগ করে দিয়েছে তার পূর্ণ যৌবনটা শক্তিগড়ের নারে চলা পথের দু'ধারে।

পথে দেশী লোকের সাথে দেখা হয়। তারা ডোঙা-নায়ে এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা করছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকে চেয়ে থাকতে বিপ্রপদর ভালই লাগে কিন্তু তার চেয়েও ভাল লাগে দেশী লোকের সাথে আলাপ করতে—জিজ্ঞাসা করতে তাদের দৈহিক ও আর্থিক কুশল। কে কেমন আছে? এবার দেশে ধানের অবস্থা কি? কার কার হালের বলদ আছে, কারটা মরেছে? দেশে অসুখ-বিসুখ মামলা-মকর্দমা আছে কি না এবং থাকলে তা গুরুতর না সামান্য?

'বাবু, আপনি না কি দক্ষিণের বিলে কতক সম্পত্তি কিনেছেন?'

'তোমাকে তো চিনি নে, তোমার নাম?'

'আমার নাম ফটিক। বাড়ী, ঐ যে একটা ঝাঁকড়া শিমুলগাছ দেখছেন, যার ডালে অনেকগুলো বাবুইর বাসা দুলছে, নদীর দক্ষিণ পাড়ে, ঐখানে। গাঁয়ের নাম গোপালপুর, আমি নিতাইর দূর-সম্পর্কের শালা।' কথাগুলো বলে একটু লজ্জা বোধ করে লোকটা। 'তার কাছেই জমির কথা শুনেছি। অনেক দিন নিতাইর সাথে দেখা নেই, খবরাখবরও রাখতে পারিনি—জমিগুলো কি করেছেন?'

বিপ্রপদ উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করতে থাকেন, 'জমিগুলো··· নিতাই···'

'ও বুঝেছি, বড়লোক মানুষ, হাল-হালুটির খবর রাখেন না—ও-সব নিতাই জানে—বাড়ী যারা থাকে তারাই দেখা-শুনো করে। আপনার কি সে খোঁজ রাখার সময় আছে!' শ্রদ্ধায় ফটিকের মন ভরে ওঠে।

বিপ্রপদও যেন একটা উদ্যত অপমানের হাত থেকে রেহাই পান।

'আচ্ছা বাবু পেন্নাম হই, আমি যাবো ঐ খাল দিয়ে।'

'সুখে থাকো। নিতাইর বাড়ী বেড়াতে গেলে একবার আমাদের বাড়ীও যেও।'

'যাবো বাবু, নিশ্চয় যাবো।'

'মাঝি, নৌকা ভিড়িয়ে কতক মাছ নেওয়া যায় কি না?'

'ঐ তো জালিয়ার নাও, বাদাজাল পাড়ছে, মাছ কিছু-না-কিছু পাওয়া যাইবেই।'

বিপ্রপদর নৌকা স্রুমুখের দিকে তর-তর করে এগিয়ে আসছে—দূর থেকে শংকিত জেলে বলে ওঠে, 'এই মাঝি, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার—জালের ওপর এসে পড়ো না—নায়ের পাশে নাও ভিড়াও।'

দেখতে দেখতে বিপ্রপদর নৌকাখানা জেলের ডিঙির পাশে এসে ভেড়ে। জেলের নৌকাখানা মাঝ-নদীতে নোঙর করে ভাসান রয়েছে। তিন-চার হাত জলের নীচে একটা ত্রিকোণ কালো জাল রাক্ষসের মত হাঁ করে রয়েছে। স্রোতের জলে যা ভেসে আসছে, তার আর রেহাই নেই—একেবারে পেটের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে। চিংড়ি বেলে শিলন—কেউ বাদ যায় না।

'কি কি ভাল মাছ আছে?'

'শিলন মাছ আছে বাবু, দাম কিছু বেশী হবে। একেবারে তাজা টাট্‌কা।'

বিপ্রপদর ডিঙির কাছেই এসে একখানা ডোঙা থাম্‌ল—এক গৃহস্থের নাও। 'বাবু কিনবা না কি এই অকালের ফল কয়ডা?'

'কি ফল? আনারস?'

ভাদ্র মাস—এখন পাকবো পাকবো করছে এমন আনারস পাওয়া দুর্লভ। আবার একটা-দু'টো নয়—দশটা! বিপ্রপদ নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকে দেখেন। বাস্তবিক চমৎকার মিষ্টি গন্ধ বের হচ্ছে, রসে টপ্‌-টপ করছে ফলগুলোর বুক। ছেলেমেয়েদের জন্য এগুলো তিনি কিনেই নেবেন। কিন্তু গরজ বেশী দেখালে কত না কত দাম চেয়ে বসে তাই তিনি একটু টিল কাটেন। 'গাছ-পাকা আনারস খেতে জলসা লাগে—আরো অকালের জিনিষ কেমন না কেমন হয়, ও-নিয়ে পয়সা দণ্ড হয় না কি কে জানে—না আমি কিনব না, কিন্তু কত চাও তুমি?'

'বাবু, আমার এট্টা সংগীন মামলার তারিখ, এহনই যাইতে হইবে সদরে—যা তুমি দেও তা নিমু হাত পাইত্যা—কত দেবা তুমি কও?'

এবার বিপ্রপদ আর ঠকাতে পারেন না। মাঝি ও জেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, ন্যায্য কত দাম হয়? তারা দেখে-শুনে সাব্যস্ত করে দেয় দশ আনা। তাই তিনি দিয়ে দেন লোকটাকে। সে খুশী-মনে চলে যায়। ফল কয়টা বড়ই পছন্দমত হয়েছে। বাড়ী গেলে এ নিয়ে একটা হুড়োহুড়ি অনিবার্য্য। বিপ্রপদর চোখের স্রুমুখে কোলাহলরত ছেলেমেয়েগুলোর রূপ ফুটে ওঠে।

'এখন মাছটা তোল ওপরে, দামের জন্য ঠেকবে না।'

জেলেটা একটা শিলন মাছ নৌকার পাটাতনের ওপর তুলে রাখে। মাছটার ঠোঁটের কাছে একেবারে সিঁদুর ভেঙ্গে দিয়েছে যেন।

'কত দাম?'

'আট আনা।'

মাঝিটা অবাক্ হয় দাম শুনে। 'আট আনা! কও কি জালিয়ার পো?'

বিপ্রপদ দাম-দস্তুর না করে জেলের হাতে সাত আনা পয়সা গুঁজে দেন। তিনি বোঝেন যে মাছটা নিতান্ত ছোট না। এর চেয়ে কম এ মাছের দাম কিছুতেই হতে পারে না।

'আপনার হাতে সঁইত করলাম—আশীর্বাদ করবেন বাবু।'

বিপ্রপদ হেসে সম্মতি জানায়। মাঝি নৌকা ছেড়ে জোরে জোরে বইঠা বাইতে থাকে, আর চেয়ে-চেয়ে দেখতে থাকে পাটাতনের তলা। এ সব জিনিষ ওকে কতখানি কেউ দেবে না, তবু ওর মনে আনন্দ হয় খুবই।

খালের পাড়ে বাড়ীর ঘাটে যখন এসে নৌকা ভেড়ে তখন খালের বুকে জোয়ার এসেছে। দেখতে দেখতে খাল ভরে গেল। কতগুলো লম্বা-লম্বা হেউলী ঘাস চিরে নৌকা এসে ঠেকল একেবারে পাড়ে। সংবাদ পেয়ে ছেলেমেয়ের দল এলো কলরব করে ছুটে। সেবা এলো কোলে চড়ে হাসতে হাসতে। 'কই, বাবু কই!··· ওই!' সে কচি একটা আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে।

বিপ্রপদ একটু হাসেন।

অমরেশ দৌড়ে এসে মাছটা নিয়ে পালাতে চায়।

বিপ্রপদ বাধা দেয়, 'আরে থাম্ থাম্, তুই পারবি কেন?'

'না না, আমি পারব, খুব পারব—ইঃ, বড় তো একটা মাছ!'

'তাহ'লে নিয়ে যা, দেখব কত শক্তি তোর!'

খানিকটা নিয়ে গিয়েই অমরেশ হাঁপিয়ে পড়ে।

'কি রে, তখন বলেছিলাম না!' অমরেশকে সাহায্য করেন বিপ্রপদ। এখন সে অবলীলাক্রমে মাছটাকে নিয়ে যেতে পারে।

বিমলা বিদ্রূপের হাসি হাসে—অমরেশ দাঁতে জিভ কেটে উত্তর দেয়।

বিপ্রপদ দু'জনকেই চোখ রাঙান।

বাড়ী এসে বিপ্রপদ একটুও বিশ্রাম না করেই হাঁটতে হাঁটতে বাগানের দিকে যান। তাঁর প্রিয় গাছগুলো কেমন আছে—কত বড় হয়েছে—নিজের চোখে একবার না দেখে সুস্থ থাকতে পারেন না। ওরা যেন কোন মায়ায় বিপ্রপদকে আকর্ষণ করে নেয়। এই তো সুগন্ধি নেবুর চারাটি। কেমন অজস্র ফল হয়েছে। কিন্তু কি যেন একটা বুনো লতায় জড়িয়ে ধরেছে ওকে শক্ত করে। গাছটা একে ছোট এখন, তাতে ফলন্ত—যেন শ্বাসরোধ হয়েছে। বিপ্রপদ লতাটাকে ছিঁড়ে গাছটা মুক্ত করে দেন। তিনি বাড়ী নেই, ওদের কে-ই বা দেখে কে-ই বা যত্ন করে! ঐ তো আমের কলমী দু'টি। বাঃ, কি সুন্দর দু'টি দু'টি আমও হয়েছে! ওরা ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। যেন লজ্জিতা দু'টি যুবতী বান্ধবী গাছপালার আবডালে এসে থমকে রয়েছে। ওরা বিদেশী। বিদেশ থেকে এসে এখনও যেন সম্পূর্ণ পরিচিত হতে পারেনি এদেশী বন্ধু-বান্ধবীর সাথে। তবু মানিয়েছে বড় সুন্দর। বিপ্রপদ ঘুরে ঘুরে সব গাছগুলো দেখেন। লতা-পাতা ধরে একটু নাড়া-চাড়া করেন। কত দিন তিনি এ গাছগুলো দেখেছেন, তবু আজ তাঁর কাছে নতুন বলে মনে হয়—বিস্ময়ের সৃষ্টি করে পদে-পদে। মমতার কাজল পরিয়ে দেয় চোখে। একখানা পাতলা মেঘ নিচু দিয়ে ভেসে যায়, আসে একটা ছোট্ট পুবালী দমকা হাওয়া, বর্ষা নামে—ভিজিয়ে দিয়ে যায় মুগ্ধ বিপ্রপদকে। দূর থেকে একটা অজানা ফুলের মৃদু সৌরভ ভিজা বাতাসে জড়িয়ে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বিপ্রপদ আঘ্রাণ করেন বুক ভরে।···

অমরেশ পা টিপে-টিপে পিছন থেকে এসে বিপ্রপদর হাত ধরে মারল এক টান। 'বাবা, মা তোমাকে ডাকছে, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছ?'

'দেখছি বাগানের গাছগুলো কেমন হলো।'

'তোমার যে গা-হাত-পায় কাদা লেগেছে। চলো, ধোবে চলো। বোশেখ-জৈষ্ঠি মাসে আমরা এবার কি কষ্টই না করেছি! কত জল ঢেলেছি ঐ গাছগুলোর গোড়ায়। জল টেনে আনতে আনতে দিদিরা এক একবার নেতিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি হাঁপাইনি একটুও। এক-এক দিন আমি একাই—'

'জল টেনেছ, আর কেউ আসেনি, না?'

'হ্যাঁ বাবা, আমি একাই টেনেছি, আবার একাই সব গাছে জল ঢেলেছি।'

'দূর! অসম্ভব কথা বলতে নেই বাবা! ওকে মিথ্যা কথা বলা বলে। কখনও মিথ্যা বলা কি ভাল?'

ঘাটে এসে বিপ্রপদ পায়ের কাদা ছাড়িয়ে ওপরে ওঠেন। অমরেশও পা ধুয়ে ওঠে। পুকুরটার বুক-বোঝাই কালো জল টলমল করছে। তার ভিতর চার দিকে অগুণ্তি রাঙা ও শাদা শাপলা ফুল ফুটে রয়েছে। তারই মধ্যে জোড়ায়-জোড়ায় বাড়ীর হাঁসগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। লম্বা-লম্বা পা ফেলে একটা ডাহুক লুকাল গিয়ে ঢেঁকিতলার বনে।

নিতাই মেঠো-পথে জল-কাদা ভাঙতে ভাঙতে ধানের মোরার মাঝ দিয়ে এসে উপস্থিত হয়। সে-ও ঘাটে এসে পা ধুয়ে বিপ্রপদর পিছু নেয়।

'কেমন আছো নিতাই? ইমামই বা আছে কেমন?'

'আমাদের থাকা-না-থাকা দুই সমান বাবু!'

'সে কেমন?'

'সেই বাড়ী থেকে গেলেন, বলে গেলেন—এই তো এলাম বলে, আর আমাদের কথা ভুলেই গেলেন। বোশেখ গেল,—জৈষ্ঠি গেল—বর্ষা নামল—আমি ভাবি এই তো বাবু আসেন, কিন্তু বাবুর দেখা নেই। মাঠাকরুণ বলেন তিনি ছুটির দরখাস্ত করেছেন, তুমি ভেবো না—ঠিক সময় মত এসে হাজির হবেন। আউসের মরসুম গেল, আমনের জো এলো, পথের দিকে চেয়ে হা-পিত্যেস করে বসে থাকি, কিন্তু কোথায় আপনি! লোকের টিটকারীতে আমার আর মুখ দেখাতে ইচ্ছা করে না, ইমাম তো বড় একটা এদিকে আসেই না। আমরা বিদায় নিতে এসেছি—ইমাম আর আসবে না।'

'বসো নিতাই, তামাক-টামাক খাও। যখন ইচ্ছা তখনই তো যেতে পারবে, কিন্তু অনেক দিন বাদে দেখা হলো একটু কথাবার্তা বলি। তোমরা তো আর আমার মাইনের চাকর না, তোমাদের আটকায় কে? ছুটির জন্য যে আমি কত চেষ্টা করেছি তা বললে তো বিশ্বাস করবে না।' বিপ্রপদ জামা-কাপড় বদলাতে বদলাতে বলেন, 'সে হদ্দ চেষ্টা; কিন্তু কিছুতেই কিছু সময় মত হলো না। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ নিতাই—অদৃষ্ট মন্দ!'

'তা না হলে একটা বছর জমিগুলো খিল যায়, চুনো-পুঁটিতেও করে অপমান! দেখেনি নিতাই-ইমামের থাবা, কত শক্তি এই বুনো থাবায়!' বলেই নিতাই সশব্দে একটা থাবড়া মারে মাটির ওপর।

ছেলে-মেয়েরা ভয় পেয়ে বাড়ীর মধ্যে পালিয়ে যায়।

'দুঃখ করো না নিতাই, সবুরে মেওয়া ফলে—সবুর করে দেখো।'

'কি ভুল যে হলো বাবু, ঘোষালেরা আস্কারা পেল, একটা খন্দ মাটি হলো।'

'বিগত বিষয় নিয়ে দুঃখ করে লাভ কি? যা হওয়ার না তা হয়নি, সে কথা আর ভেবে কাজ নেই। আসছে বছর দেখা যাবে। এ দিকের সংবাদ কি?'

'তালুকের?'

'হ্যাঁ।'

'মেহেরপুরের বাঁকে নৌকা লাগিয়ে সেন মশাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। ওখানে তাঁদের একটা কাছারী আছে।'

'বেশ, তা হলে আজই বিকালে চলো।'

'তাই চলুন, দেরী করা ভাল না। আমি সময় মত আসবো। এখন তা হলে উঠি।'

'ইমাম কেমন আছে? ওর সেই ছেলেটা?'

'সব ভাল আছে। এখনও সংবাদ পায়নি, তাই আসেনি। আপনার ওপর কি আমাদের রাগ সাজে! ওরা সেন মশাইর সাথে কথা চালাচ্ছে।'

'বুড়ো বলেন কি?'

'সে নিজের কানেই শুনতে পাবেন। সে কি যে-সে বুড়ো!'

কিন্তু আমরা যখন যাবো তখন যদি ঘোষালেরা টের পায়? চুপে-চাপে কি কাজ করা ভাল নয়?'

'এ সব গোপনে হলেই ভাল হয়—শত্রুর তো অভাব নেই—কিন্তু ধড়িবাজ বুড়ো নিজেই ঢাক বাজাচ্ছেন, আপনি আর চুপ করে করবেন কি?'

'তবে চলো বিকাল বেলা, ইমামদের সংবাদ দিও।'

'আচ্ছা বাবু।'

২০

আহার করতে বসে বিপ্রপদ জিজ্ঞাসা করেন, 'দীনুদা'র খবর কি? তিনি তো এদিকে এলেন না। আর আমিও তো তাঁকে সংবাদ দিতে সময় পাইনি।'

কমলকামিনী বলেন, 'সংবাদ দেবে কি, তিনি এদিকে আজকাল বড় একটা আসেন না। বাড়ীতে না কি একখানা দোকান দিয়েছেন—হরদম গাহেক-পত্তর—কোথাও বেড়াবার তাঁর সময় নেই।'

ভালই তো—নিজের কাজ নিয়ে নিজে ব্যস্ত থাকেন। দোকানদারীর সুবুদ্ধি তাঁকে কে দিল? টাকা-পয়সাই বা পেলেন কোথায়? এখন বোধ হয় সংসারে অভাব-অভিযোগটাও কম। বেশ, বেশ।'

উত্তরে কমলকামিনী হাসেন। একটা সন্দেহ হয় বিপ্রপদর, তাই খেয়ে উঠে তিনি একখানা লাঠি-হাতে দীনুর বাড়ীর দিকে রওনা দেন।

বারান্দায় তিন-চার জন গ্রাহক বসে। দীনু তামাক টানছে—গ্রাহক ক'টি প্রসাদের আশায় অধীর হয়ে আছে। ঝুরঝুরিয়ে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। উঠানটায় কাদা হয়েছে খুবই। দীনু সুপারি গাছ অর্দ্ধেক করে চিরে পাশাপাশি রেল লাইনের মত পেতে দিয়েছে। বাড়ীর প্রয়োজনীয় জায়গাগুলিতে যেতে আর কাদা মাড়াতে হয় না। পুকুরঘাট থেকে পা ধুয়ে সরাসরি বিপ্রপদ বারান্দায় গিয়ে ওঠেন। 'দীনুদা, প্রণাম। আজ এসেছি। আপনি না কি দোকান নিয়ে খুবই ব্যস্ত, তাই নিজেই এলাম দেখা করতে। দোকান কোথায়?'

'ভাল, ভাল। সুখে থাকো। দোকান করি আর যা-ই করি তুমি এসেছ শুনলে আমি একবার অবশ্য যেতাম, তোমায় কি এত দূর আসতে হতো। পথ-ঘাট এঁটেল মাটি গলে যে পিছল হয়েছে!'

'দোকান কোথায় দীনুদা?'

'বাইরে কি সাজিয়ে রাখার জো আছে? সব শালা চোর, ছেলে-বুড়ো সব শালা। তাই তো দোকান তুলে মাচায় রেখেছি। দেখবে তুমি আমার দোকান? সব আছে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব—তেল, নুণ, চাল, ডাল, বেনেতি, মনোহারী সব আছে দেখবে, দাঁড়াও, সব নিয়ে আসছি।'

বিপ্রপদ বুঝতেই পারেন না যে এত বড় একখানা দোকা যদিও মাচায় তোলা থাকে তবুও অত সহজে কি করে নামিয়ে আনা যায়।

'ধরো, ধরো—এই ধরো' বলে দীনু অতি কষ্টে মাচার ছয়া থেকে একখানা ডালা নামিয়ে এনে বিপ্রপদর সুমুখে রাখে 'এই দেখ।'

দেখার সামগ্রীই বটে। হরেক রকম চিজ—না আছে এমন বস্তু নেই! এমন নির্বাচন, এমন সংরক্ষণ শুধু দীনুর মত ব্যবসায়ী পক্ষেই সম্ভব।

গাব ও কুঁড়ো দিয়ে ডালাখানা বেশ পরিপাটি করে লেপা। পিঁপড়েটির পর্যন্ত প্রবেশ নিষেধ। তামাক একপো, চিটাগুড় সেই পরিমাণ, ডাল আধ সের, তেল, নুণ, লঙ্কা, হলুদ ইত্যাদি এক সের—বাকীটা চাল; এই গেল মুদি মাল—এতেই যা ওজন। বেনেতি পোঁটলায় পোঁটলায় কবিরাজী অষুধের মতো মোড়ক করা—মায় খাই-সোডা পর্যন্ত। তার পর মনোহারী—দু'টি সুঁই, দু'টো 'আলোকজান' সুতোর গুলি, দু'খানা ছোট সাবান, মূল্য এক আনা। হোমিওপ্যাথিকের বড় একটা শিশিতে কি যেন লাল রং, তাই না কি তরল আলতা—আরো কত কি! মোট জমা পাঁচ টাকা কয়েক আনা! একটা হিসাবের খাতাও দেখায় দীনু। লেখা আছে অন্ত পর্যন্ত পঁচিশ টাকা বিক্রি হয়েছে, মূলধন ঠিকই আছে। তবু দীনুর সে কি চিন্তা! প্রায় সওয়া পাঁচ আনা বাকী পড়েছে। তবে চিটাগুড়টায় খুবই আয় দেখাচ্ছে, কারণ বলা উচিত না—বর্ষাকালে যথেষ্ট কাদা ভেজাল দেওয়া চলে। নুণ সোডা তো জলো হাওয়ায় ওজনে বাড়ে, বেচে বেচে ফুরায় না এ সব বিপ্রপদর কানে-কানে সগর্বে দীনু বলে যায়, কিন্তু প্রকাশে গ্রাহক-সমাজে বলে যে বিলেত বাকীর জন্য তার দোকান আর কিছুতেই চলবে না। এ দুনিয়ার লোক বাকী খেয়ে কেবল দীনুকে ফাঁকি দেওয়ার মতলবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতে কি তাদের ভাল হবে!

'ঠাকুরদা, এক পয়সার লঙ্কা দেবেন? ভাল লঙ্কা আছে?'

'থাকবে না কেন—পয়সা?'

'দেখি কেমন লঙ্কা?'

'দেখি কেমন পয়সা?'

'ঠাকুরভাই একেবারে নগদ-নুগদ—ভাল জিনিষ চাই।'

'জিনিষ বাপু খুবই ভাল, কিন্তু পয়সাটা কোথায়?'

'ওজন করুন না, এই তো।'

'হাতে দাও, যবা না ভাল দেখে নি, তার পর তো জিনিষ?'

'সওদা আগে, না পয়সা আগে?'

'পয়সা আগে বাবা, পয়সা আগে। কথায় বলে, ফেল কড়ি মাখ তেল। কড়ি আগে না তেল আগে? তুমি তো কচি খোকাটি নও যে কিছু বোঝ না!'

'পয়সাটা কাল সুপারী বেচে হাটের পর দিয়ে যাবো—এটুকু বিশ্বাস হচ্ছে না আমাকে?'

'তুমি কি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির না কি হে! আমিও যে কাল তোমাকে লঙ্কা মেপে দেবো এটুকু কি বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'দিন দিন—এই যে পয়সাটা।' বলে লোকটি দীনুর হাতে পয়সাটি দিয়ে নিজের মনে-মনে বলতে থাকে, ভেবেছিলাম এই পয়সাটার পান নেবো, ধোপা-বৌ যে মুখরা—তা আর হলো না। ঠাকুরভাই একেবারে নাছোড়বন্দা। এত শক্ত হলে কি মুদী কারবার পাড়াগাঁয়ে চলে?'

এ সব কথা দীনু শুনেও শোনে না। সে পয়সাটা ভাল করে দেখে-শুনে একটা তৈলাক্ত থলিতে ভরে রেখে লঙ্কা মেপে দেয়। গোটা আষ্টেক লঙ্কা তাও গ্রাহকটি দু'-তিন বার অদল-বদল করে একটা-আধটা বেশী নিতে চায়। সামান্য বচসাও হয়, অবশেষে তা নিয়ে চলে যায়। বোঝা যায়, নগদ পয়সা দিয়ে এমন হাতকুঁড়ো-পড়া মাল সে নিতান্ত ঠেকেই নিয়ে গেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, 'ঠাকুরদা, আমি যে বসে রইলাম।'

'কেন বসে আছ বাছাধন?'

'ছেলের কাছে এক ছটাক ডাল মেপে দিয়েছেন, তা তো ওজনে কম।'

দীনু রেগে ওঠে। 'তবে কি আমি চোর? বামুনের ছেলেকে চোর বললে তোমার চোদ্দ পুরুষ নরকে যাবে। আমি ত্রিসন্ধ্যে যে হাত দিয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করি সেই হাতে মেপে দেবো কম? বলুক দেখি এরা কে বলতে পারে আমায় চোর?'

দীনু গলার জোরে জিতে গেল, কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না।

'তবে ডাল হলো কি ঠাকুরদা? এ তো নুণ নয় যে জল হয়ে যাবে।' গ্রাহকটিও সহজে ছাড়বার লোক নয়। সে-ও জেঁটি দিয়ে বসে থাকে।

'ভূতে খেয়েছে আর হবে কি? দেখি তোমার ডাল, দাও তো পাল্লার ওপর।'

লোকটি গামছার এক কোণা খুলে ডালগুলো ঢেলে দেয়।

দীনু সুকৌশলে পাল্লা ধরে। বাস্তবিক ডাল মাপে কম হলেও পাল্লা সরল রেখায় দুলতে দুলতে এমন স্থানে স্থির হয় যে মাপটা সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়।

'দেখ, দেখ তোমরা—আমি না কি মাপে কম দিয়েছি? ব্যাটা বেআক্কেলে ছোটলোক কোথাকার!'

লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, তবু বলে, 'হাটের মাপে আর এ-মাপে যেন কেমন কম-বেশী আছে। আমরা সওদা করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলাম!

'দেখছ, দেখছ—তবু ওর গড়গড়ানি দেখছ? তবু সন্দেহ! তুই জাহান্নামে যাবি।'

লোকটা আর কিছু না বলে ডালগুলো গামছায় বেঁধে উঠে যায়।

যারা বোঝে তারা অন্তরে অন্তরে শিউরে ওঠে, আর যারা না বোঝে তারা দীনুর ন্যায্য মানদণ্ডের দিকে চেয়ে ভক্তিতে মাথা হেঁট করে।

বিপ্রপদ মনে মনে ধন্যবাদ দেয় দীনুকে, 'বাহাদুর বটে!'

যারা এসেছিল, তারা ক্রমে ক্রমে চলে যায়। দীনু অস্থি-জীর্ণ বাটখারাগুলো দু'-এক বার নেড়ে-চেড়ে উঠিয়ে রাখে। ডালাটা সাজিয়ে গুছিয়ে বেশ করে বাঁধে। মাচার দুয়ারে তুলে রাখে। তার পর বিপ্রপদর কাছে এসে বসে। 'খবর কি ভায়া?'

'বৈকালে আপনাকে যেতে হবে আমার সাথে।'

'কোথায়?'

'সেনেদের কোষ নৌকায়।'

'নিশ্চয় যাবো' তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। ঘোষালেরা আমায় খবর দিয়েছিল কিন্তু আমি যাইনি ওদের সাথে।'

'কেন যেতে হবে বুঝেছেন বোধ হয়?'

'হুঁ, সে আর বুঝিনি! শত হলেও তুমি আমার প্রতিবেশী স্বজাতি। তোমার তুল্য আমার আর কে আছে বিপ্রপদ? আমার ভাই নেই, বন্ধু নেই, রোগে-শোকে, আপদে-বিপদে, উত্থানে-পতনে তুমিই আমার ভাই—তুমিই আমার বন্ধু। দীনুর ভাষা গদগদ হয়ে আসে—চোখেও যেন জল দেখা যায়।

বিপ্রপদ মোহাবিষ্টের মত চেয়ে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে বলেন, 'তবে চলুন দীনুদা—আজ আপনার অগ্নি-পরীক্ষা হবে সেনেদের কোষ নৌকায়।'

'আমি একনিষ্ঠ—নিশ্চয় উত্তীর্ণ হবো এ পরীক্ষায়।'

'তাই তো আমি চাই দীনুদা, তাই তো চাই।'

রিক্ত

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

রিক্ত দিনেরা ভিড় ক'রে আসে শূন্যতায়,
কত ব্যথালতা হৃদয়ের তরু-শাখা জড়ায়—
দেহ মন জুড়ে আগুন জ্বলে।

মাঠের ফসল ঘরে নেওয়া হলে—

শূন্য শ্মশান পরে,
তৃষিত প্রাণের হাহাকার ক'রে পড়ে।
মন-মরুভূমি বর্ষণ-মেঘ চায়—
হায় কোথায়?

স্তব্ধ প্রাণের গান
চেতনাশূন্য হ'বে কি আমার শক্তিবিহীন প্রাণ?
ক্রন্দন শুধু আবেগের মেঘে ভাসে নীল অম্বরে;
শ্রাবণের ধারা শ্রান্তিবিহীন ঝরে।

শুভ্র হয়ে ফোটে রজনীগন্ধা ফুল,
গন্ধ ছড়ায় ঝরা সে বকুল।
আমার এ প্রাণ অসহ শূন্যতায়,
দিকে-দিগন্তে শুধু যে ছড়ায়
ব্যথায় অনল তায়—
প্রাণ-অরণ্য পুড়ে হ'ল ছারখার।

ঝান্সী রাণীবাহিনী

রাণু ভট্টাচার্য্য

[আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ যোদ্ধা বিভাগ]

[গৌরচন্দ্রিকা

স্বস্তিবাচন একটা প্রথায় দাঁড়িয়েছে, কিন্তু বিশেষ স্থলে ইহার উপযোগিতা আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপর আলোকসম্পাত করা প্রয়োজন তার গূঢ় অর্থ উদ্‌ঘাটনের জন্য।

ঝান্সী রাণীবাহিনী কি? "A mere effloresence of decay, a stage-dream, which the first break of day-light will dissipate into dust"—তা নয়। তবে কি? ঘন মেঘের সমাবেশ, বিপুল বজ্রনির্ঘোষ, প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত, প্রবল বারিবর্ষণ ও প্রচুর ফলের সম্ভাবনা! ইহা নেতাজীর নিজস্ব পরিকল্পনা। একটা psychological factor—স্বপ্ন ও বাস্তবের সমন্বয়!

বিপ্লবের মধ্য দিয়া স্বাধীনতার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ভারতের অবিসম্বাদী নেতা আমাদের নেতাজী। হিংসা-অহিংসার দ্বন্দ্ব সমাধান করেছিলেন তিনিই। তাহারই মূর্ত্ত প্রতীক আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ এবং তাহা বিশিষ্ট ভাবে রূপায়িত হয়েছিল ঝাঁসী রাণীবাহিনী মধ্যে দিয়ে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার গণশক্তি ছিল সুপ্ত, তাকে জাগ্রত জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। আর ছিল প্রয়োজন, দেশের যুব-শক্তির প্রেরণা দান। উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছিল, আশাতীতরূপে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করা হয়েছিল পুরুষ-বাহিনী গঠনেই। নারী-বাহিনী গঠন করে নেতাজী sex disability তুলে দিলেন। চিরতরে উঠিয়ে দিলেন bar-sinister—যাকে complex বলা হয়। যা পৃথিবীতে কোথাও নাই নেতাজী তিন মাসের মধ্যেই তাই করলেন। জার্ম্মাণী ও জাপান—যে দুই দেশ সব চেয়ে জঙ্গী বলে বিখ্যাত সেই দেশেও মেয়েদের যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সৈন্য-বাহিনী (fighting force) নেই, যাহা আছে তা Auxiliary Force—non-combatants—সেবা, শুশ্রূষা ও অন্যান্য সাহায্য করবার জন্য; ইহা সত্যই "whispering galleries" of the Westএ আলোচনার বিষয়-বস্তু হয়েছিল। অতঃপর পুরুষ ও নারী সমপর্য্যায়ে সমাজ ও দেশ-সেবার অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হলো। আমরা "জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন" পেলাম।

আজাদ হিন্দ্‌ সরকারের জন-শক্তি বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী হিসাবে বলিতে পারি যে দঃ-পূঃ এশিয়াতে খুব কম বাঙ্গালী মহিলাই ছিলেন যাঁরা আজাদ হিন্দ্‌ সঙ্ঘ অথবা ঝাঁসী রাণী বাহিনীতে যোগদান করেন নাই। নেতাজী সকল বয়সের মেয়েদেরই দেশসেবার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। বালিকা হইতে প্রৌঢ়াদের পর্য্যন্ত সকলেরই যথাযোগ্য কার্য্যে নিয়োগ করেছিলেন। ঝাঁসী রাণী বাহিনীতে ১৪ বৎসর হইতে ৩০ বৎসরের পর্য্যন্ত "রংরুটদের" ভর্ত্তি করা হত।

ঝাঁসী রাণী-বাহিনীর সামরিক শিক্ষা কোন অংশেই শত্রুদের চেয়ে এমন কি জাপানী সৈন্যবাহিনী হতেও নিকৃষ্ট ছিল না। কিন্তু যে সময়ের মধ্যে প্রথমোক্ত সৈন্যদের শিক্ষা হত তার এক-চতুর্থও ... সময় ঐ শিক্ষা সমাপন করা হইত। তাহার কারণ, বাইরের চেষ্টা অন্তরের নিষ্ঠা; সর্ব্বোপরি নেতাজীর ব্যক্তিগত সংস্পর্শ। এই বাহিনীতে দুইটি section ছিল—একটা Fighting (যোদ্ধা) আর একটি Nursing (শুশ্রূষাকারিণী), তবে শেষোক্তদেরও মোটামুটি সামরিক শিক্ষা দেওয়া হত। স্বাস্থ্য ও অভিরুচি হিসাবে বিভাগ করা হতো। এটা খুবই আনন্দের কথা ছিল যে, যোদ্ধা-বিভাগে ঢুকবার জন্য বেশীর ভাগ মেয়েরাই জিদ্‌ করত এবং বিশেষ কারণে না দিলে নেতাজীর নিকট গিয়ে আবদার করতে কসুর করত না। অনেক চেষ্টা করে বুঝোতে হত যে দুই-এরই সমান প্রয়োজন এবং দুই কাজের দ্বারাই তুল্য ভাবে সেবা করা যায়। আমি বলতে গর্ব্ব বোধ করছি যে, যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে তেমনি রোগীর পার্শ্বে মেয়েরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। অফিসারদের সৈন্য পরিচালনা ও আনুসঙ্গিক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। মোট কথা, যাহাতে এই সৈন্য-বাহিনী স্বাধীন ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে সেরূপ ভাবেই তৈরী করা হয়েছিল। সব চেয়ে নেতাজী এই বাহিনীর প্রতি বেশী মনোযোগ দিতেন। এটা একরূপ তাঁর দিবসের চিন্তা ও রাত্রির স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে যে বিশ্বাস ন্যস্ত করেছিলেন তা পূর্ণ হয়েছিল অপরিমেয়রূপে। এই প্রসঙ্গে কয়েক জন বাঙ্গালী অফিসার ও সৈন্যদের (Officer and other ranks) নাম বোধ হয় আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করা হবে—

(১) লেঃ গৌরী ভট্টাচার্য্য B.A. বার্ম্মা—যোদ্ধা বিভাগ
(২) লেঃ প্রতিমা সেন— বার্ম্মা— "
(৩) সেঃ লেঃ লাবণ্য চাটার্জ্জি—মালয়—শুশ্রূষা বিভাগ
(৪) সেঃ লেঃ প্রতিমা পাল— মালয়—যোদ্ধা বিভাগ
(৫) সেঃ লেঃ অরুণা গাঙ্গুলী— বার্ম্মা— "
(৬) সেঃ লেঃ করুণা গাঙ্গুলী— " "
(৭) সাব অফিসার মায়া গাঙ্গুলী— " "
(৮) সাব অফিসার রাণু ভট্টাচার্য্য—"—(প্রবন্ধের লেখিকা)
(৯) সাব অফিসার রেবা সেন— "—শুশ্রূষা বিভাগ
(১০) হাবিলদার শান্তি ভৌমিক—মালয়—যোদ্ধা বিভাগ
(১১) হাবিলদার বেলা দত্ত— "—শুশ্রূষা বিভাগ
(১২) নায়ক অঞ্জলি ভৌমিক— "—যোদ্ধা বিভাগ

ইঁহারা প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান; স্কুল বা কলেজে পড়া শান্ত স্বভাবের। মোটেই দুর্দ্ধর্ষ নয়। বয়স ১৪ হইতে ২৫এর ভিতরে ঠিক আমার এখানকার মেয়েদের মত। অভিভাবক উকি[ল] ডাক্তার, চাকুরিজীবী ইত্যাদি। বেশীর ভাগই এখন দেশে এসে[ছে] কিন্তু একরূপ অপাংক্তেয় হয়ে আছে। "স্বাধীন ভারতে" (?) এ[দের] স্থান পাচ্ছে না। অদৃষ্টের পরিহাস!

সমাজ-দেহের দুষ্ট ক্ষতের মত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী; সত্যই উ[হা] জৈবিক প্রয়োজন (biological necessity); বোধ হয়, শান্তি[র] মত এ-ও অবিভাজ্য (indivisible)। সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ—সকলের উপর "মানব-বাদ"; এবং যত দিন মানুষ মানুষ থাকবে তত দিন যুদ্ধ চলবেই। দেবতাদের ভিতরে কি সংগ্রাম ছিল না? Fallen angels কোথা থেকে এল? কিম্বদন্তী, জনশ্রুতি না হ[য়] নিলাম না, কিন্তু ইতিহাস ত আর ফেলে দেওয়া যায় না? সকলে যে ভগবান, বুদ্ধ বা যীশুখৃষ্ট হইবে তার লক্ষণ ত আপাতত দেখা[যায়] না; বরং কাঁটা অন্য দিকে ঘুরছে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে যুদ্ধ কঠোর সত্য স্বতঃসিদ্ধ, সমাজ-ক্ষতের নিদর্শন। এই ক্ষতের উপর প্রলেপ দেওয়া[র] জন্যই হয়েছিল ঝাঁসী রাণী-বাহিনী। কবিগুরুর ভাষায় তা

"লেপে দিল দেহ আপনার করে
সিতচন্দন-পঙ্কে"

ঝাঁসী রাণীবাহিনী কি আজ মৃত? না, তবে "ঘন মেঘে অবলুপ্ত!" ভারতের প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে আছে, নেতাজীর দ্যোতনা—প্রাণের ব্যঞ্জনা। বাহিরের প্রকাশ? বোধ হয়, ভারতের সেই মহামানবের শুভাগমনের প্রতীক্ষা করছে। জয়তু নেতাজী।

শ্রী এ, এন, সরকার

প্রাক্তন মন্ত্রী, আজাদ হিন্দ্ সরকার, জনশক্তি ও রাজস্ব বিভাগ]

পটভূমিকা

১৯৪২ সাল; মে মাস। রেঙ্গুন জাপানীদের অধিকারে সবে মাত্র আসিয়াছে। চারি দিকে থমথমে আতঙ্কগ্রস্ত ভাব। অনাগত ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় সবাই উদ্বেলিত হৃদয়ে দিন কাটাইতেছে। সবাই যেন অসহায় ও আত্মবলে অবিশ্বাসী। অদৃষ্টের দোহাই দিয়া সকলেই বসিয়া আছে। প্রথমে পলায়মান ইংরেজদের পোড়া মাটি নীতির (Scorched earth policy) ফলে সমস্তই প্রায় ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া গিয়াছে, তার পর তাহাদের অনুচর চীনা সৈন্যদের হিংসা-চরিতার্থের ফলে সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। অবশেষে নৃশংস বর্ম্মীদের লুণ্ঠন ও নরহত্যার লীলাতে রেঙ্গুন ও তাহার উপকণ্ঠ শ্মশানে পরিণত। এমন কি গৌড়ীয় মঠের কয়েক জন সাধু-সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত রেহাই পায় নাই। এই জন্য জাপানীদের আগমন যদিও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখা হইত, তবুও সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ছিল না। কেন না, অন্ততঃ তাহারা সভ্য ও শক্তিশালী জাতি হিসাবে আইন ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সমর্থ হইবে এবং এশিয়ার জাতি হিসাবে সহানুভূতির সহিত ব্যবহার করিবে। জাপানের ঘোষিত নীতি "বৃহত্তর এশিয়া" গঠন (Greater Asia co-prosperity sphere) আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছিল ও সমবেদনার সুর জাগাইয়া তুলিয়াছিল। কয়েক দিন জাপানীদের সংস্পর্শে আসিয়া দেখা গেল যে, তাহারা সরল ও আড়ম্বরশূন্য ও মোটেই দাম্ভিক নয়। ব্যবহারিক জীবনে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনই পার্থক্য দেখা গেল না।

বাল্যজীবন, সংস্কার ও ঐতিহ্য

আমাদের পরিবারের বাসভূমি বাংলার নদীমাতৃক দেশে, যাহা বীরত্বের জন্য বিখ্যাত ছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্বে হিন্দু রাজাদের এবং পরে মুসলমান নবাবের অধীনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। বাল্যকালে রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যায়িকায় যুদ্ধের বৃত্তান্ত অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বলিয়া বোধ হইত এবং বীরত্বের কাহিনী শরীরে রোমাঞ্চের সঞ্চার করিত। অনেক সময় মনে হইত রামের কি অর্জ্জুনের মত যোদ্ধা কি একালে হওয়া সম্ভব? তার পর একটু বড় হইলে ইতিহাসের ঘটনা শুনিতে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতাম। বিশেষতঃ অহল্যাবাঈ, চাঁদবিবি ও ঝাঁসীর রাণীর বিবরণ শুনিয়া রক্তে উদ্দাম স্রোত বহিয়া যাইত ও বিপুল শিহরণ অনুভব করিতাম। সঙ্গে সঙ্গে কবির রণভেরী কানে বাজিয়া উঠিত—"না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" তখন হইতেই মনে হইত যে আমি একটি সামান্য বালিকা হইলেও যদি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রচেষ্টা করি তবে কি আমি এক জন যোদ্ধা হইয়া ভারতমাতার নিগড় চূর্ণ করিতে পারিব না? তখন স্বাধীনতার কোনই ধারণা ছিল না, তবে ইংরাজদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে ইহার একটা আবছায়া ধারণা ছিল।

অঙ্কুর উদ্গম

বাল্যকালে যে শিক্ষার বীজ বপন করা হইয়াছিল, তাহা এত দিনে গজাইয়া উঠিল। ইংরাজ-শাসনের সম্বন্ধে আমাদের একটা বিদ্বেষ ছিল, ঘটনা-পরম্পরায় তাহা ঘনাইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসনের নগ্ন রূপ ক্রমেই পরিস্ফুট হইতে লাগিল। বেতার-যোগে যে সমস্ত বার্ত্তা আসিতে লাগিল তাহাতে আমার মন বিষাইয়া গেল। ইংরাজ বণিকগণের মানদণ্ড ক্রমশঃ রাজদণ্ডে পরিণত হইয়া অবশেষে যে কদর্য্য বীভৎসতায় পরিণত হইয়াছিল তাহার সমস্ত ইতিবৃত্ত আমার মানস-পটে ভাসিয়া উঠিল। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ায় ইংরাজদের পরাজয়ের ফলে আমাদের ধারণা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। স্বতঃই মনে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, তবে কি ইংরাজকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করা সম্ভব? মনের ভিতরে যখন এইরূপ দোল দিতেছিল, তখনই এক দিন শুনিলাম, নেতাজী সোনানে (সিঙ্গাপুরে) পদার্পণ করিয়াছেন এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়কের পদে বৃত হইয়াছেন। তথাকার ভারতবাসীরা নেতাজীর বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব (তন্, মন্, ধন্) নেতাজীর পায়ে সমর্পণ করিয়াছেন। আমরা নেতাজীর রেঙ্গুন আসিবার সম্ভাবনায় উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম। কিছু দিন পরেই আজাদ হিন্দ্ সরকার সমারোহের সহিত গঠিত হইল এবং উহা ভারতবাসীদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে আমাদের ভিতরে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। এইবারে বর্ম্মাতেও আজাদ হিন্দ্ সরকারের কার্য্যকলাপ প্রসারিত হইবার সম্ভাবনায় আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, এমন সময় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কয়েক জন অফিসার রেঙ্গুনে আসিয়া উপনীত হইলেন। সহরের বাহিরেই একটি নাতিবৃহৎ সভার আয়োজন করা হইল। আমরা সকলেই সেই সভায় যোগ দিলাম। স্বস্তিবাচনের পরই নেতাজীর মহান্ আদর্শ সম্বন্ধে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যের বিষয় বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী কিরূপে গঠিত হইয়াছে এবং তাহার শিক্ষা ও দীক্ষার আয়োজন কি করা হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা হইল। এই বাহিনীর একটি বিশিষ্ট অংশ হিসাবে অভিনব একটি মহিলা সৈন্যবাহিনী অনতিপূর্ব্বে গঠিত হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করা হইল। ঝাঁসীর ঐতিহাসিক রাণী লক্ষ্মীবাঈর নাম অনুসারে ও তাঁহার মহান্ স্মৃতির রক্ষাকল্পে ঐ বাহিনীর নামকরণ "রাণী ঝাঁসী বাহিনী" হইয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ নেতাজীর মৌলিক ধারণা ও পরিকল্পনা। জাপানী মিলিটারীর অনেক আপত্তি সত্ত্বেও তিনি ঐ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। এমন কি, তাহাদের বাধা-বিঘ্ন অপসারণ করিবার জন্য জাপানের তদানীং প্রধান মন্ত্রী হিদেকি তোজোর সহিত সাক্ষাৎ পত্রালাপ করিয়াছিলেন। আরও শুনিলাম যে অনেক পুরাতন-পন্থী এই বাহিনীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বালিকা ও তরুণী ভর্ত্তি হইবে না বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন নেতাজীর আহ্বান চারি দিকে তূর্য্য-নিনাদের মত পৌঁছিল তখন মালয়ের

উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম হইতে দলে দলে মেয়েরা যোগদান করিতে লাগিল।

উদ্বেলিত হৃদয়; আশা ও আকাঙ্ক্ষার দোল

এই সব বৃত্তান্ত শুনিয়া আমরা বিহ্বল হইয়া গেলাম। এক এক বার মনে হইতে লাগিল যে ইহা যেন রূপকথা। আমরা যেন প্রত্যেকেই শত দেউড়ীর ভিতরে সুরক্ষিত দৈত্যের বিরুদ্ধে উদ্যত অসিহস্তে অগ্রসর হইতেছি, আমাদের মাতৃভূমিকে ঐ দৈত্যের হাত হইতে রক্ষা করিতে। মনে হইল, নেতাজী যেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান্ ভাস্কররূপে আমাদের মুক্তি-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। আমাদের শিরা-উপশিরায় রক্তের উদ্দাম স্রোত বহিতে লাগিল "জীবন-মরণ পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন" হইল। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে আমি ঝাঁপাইয়া পড়িলাম মুক্তি-সংগ্রামে, ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর আহ্বানে, অবলার মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদে ও শিশুর করুণ ক্রন্দনে।

১৯৪৩ সনের ডিসেম্বর মাস আমার জীবনের স্মরণীয় সময়। যাহা কিছু মহান্, পবিত্র ও সম্মানজনক, তাহার আস্বাদ পাইয়াছিলাম সেই দিনই। আত্মীয়-স্বজন, পরিবার, সমাজ, সে তো আছেই, কিন্তু যা নাই, তাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম সেই দিনই।

১৯৪৩ সনের ২৪শে ডিসেম্বর আমি থিঙ্গানজন (রেঙ্গুনের উপকণ্ঠ) ক্যাম্পে গিয়া হাজির হইলাম। তখন মিসেস্ চন্দ্রন ক্যাম্প-কমাণ্ডার ছিলেন। সবে মাত্র ফৌজে ভর্ত্তি আরম্ভ হইয়াছে এবং ৫।৭ জন মেয়ে ক্যাম্পে দাখিল হইয়াছে। মিসেস্ চন্দ্রন আমাকে স্বাগত করিয়া ক্যাম্পে গ্রহণ করিলেন ও অন্য মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমার জন্য যে ঘর নির্দ্দিষ্ট হইল সেই ঘরে আরও তিনটি মেয়ে ছিল—তাহাদের নাম অরুণা, মায়া ও নীরা, সকলেই বাঙ্গালী। আমরা সকলেই মেঝেতে মাদুর পাতিয়া শুইয়া থাকিতাম ও শীঘ্রই ক্যাম্পের শিক্ষা আরম্ভ হইবে এ বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা করিতাম। তবে আমরা স্থির সংকল্প করিয়াছিলাম যে, শিক্ষা যতই কঠিন হউক না কেন আমরা তাহা সমাপন করিব, কারণ আমরা বেশ জানিতাম যে নেতাজীর আহ্বানে দেশমাতৃকার সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি এবং ব্রত উদ্‌যাপন করিতেই হইবে।

ঝান্সী রাণীবাহিনী গঠন

১৯৪৩ সালে জুন মাসের প্রথমে নেতাজী সাইগন হইতে এরোপ্লেনযোগে সিঙ্গাপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সকাল ৯টার মধ্যে আসিবার কথা ছিল কিন্তু আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন থাকায় ও সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত হওয়ায় দরুণ প্লেন আসিতে বিলম্ব হইল। এই দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া তাঁহারই জীবনের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু ক্রমশ: আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই দিক্‌চক্রবালে একখানি প্লেন দৃষ্টিগোচর হইল। সেলাং এরোড্রোমে সমবেত জনতা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। প্রায় ১১টার সময় নেতাজী আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সকলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কাজং উপকণ্ঠের বাড়ীতে রওনা হইয়া গেলেন।

৪ঠা জুলাই পূর্ব্ব-এশিয়া সম্মেলনে নেতাজী আজাদ হিন্দ, ফৌজের 'বাগ-ডোর' হাতে লইয়াছেন ঘোষণা করিলেন এবং তাহার কিছু দিন পরেই একটি মেয়ে সৈন্যবাহিনী গঠন করিবার পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নেতাজীর আহ্বানে অভূতপূর্ব্ব সাড়া মিলিল এবং মেয়েরা দলে দলে আসিয়া যোগ দিল। কমাণ্ডার কে হইবে এই চিন্তা তাঁহাকে একটু বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। ঘটনাক্রমে ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথনের সংস্পর্শে আসিলেন এবং তাহারই মধ্যে ভবিষ্যৎ অধিনায়কের স্বরূপ দেখিয়া তাঁহাকেই এই কার্য্যের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই মহিলাটি অদ্ভুত খেয়ালী; ঝড়ের মত গতিবেগশীলা ও ধরিত্রীর মত ধৈর্য্যসম্পন্না—একটু অনন্যসাধারণ প্রকৃতির। নেতাজীর দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া সে স্থির ও নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল; তার পরই একেবারে নাচিয়া উঠিয়া বলিল যে, সে ঐ পদের দায়িত্ব আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবে এবং তাহার প্রতি যে সম্মান দেখান হইল তাহা জীবনে ভুলিবে না। এখন সমস্যা হইল, কোথায় ট্রেনিং-ক্যাম্প খোলা যায়। আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের পুনর্গঠন বিভাগের জন্য তিন-চারিটি বাড়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক লেঃ কর্ণেল (পরে মেজর জেনারেল) এ, সি, চাটার্জ্জি ও বিভাগীয় সম্পাদক এ, এন, সরকার (এঁরা পরে মন্ত্রী হইয়াছিলেন) ডাঃ লক্ষ্মীকে (পরে কর্ণেল) সঙ্গে করিয়া বাড়ী কয়েকটি দেখাইলেন এবং মেয়ে সৈন্যবাহিনীদের শিক্ষার জন্য যে কোন বাড়ী দিতে স্বীকৃত হইলেন। অবশেষে নানা কারণে ঐ সব বাড়ী লওয়া হইল না। সিঙ্গাপুর সহরের মধ্যস্থলে একটি নূতন ক্যাম্প তৈরী করা হইল। ২২শে অক্টোবর একটি রোমাঞ্চকারী বক্তৃতা দিয়া নেতাজী ঐ ক্যাম্পের উদ্বোধন করিলেন। বক্তৃতার শেষ অংশে তিনি বলিলেন—"সত্য ঝান্সীর রাণীর মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু তাঁহার আত্মা অবিনশ্বর, অজেয়, অমর। আবার ভারতের বুকে ঝাঁসীর রাণীর একা নয়, হাজারে হাজারে আবির্ভাব হইবে ও ভারতের বিজয়-কেতন প্রভাতের আলোতে উড়িতে থাকিবে।"

প্রথমে দুইটি Company গঠিত হয় কিন্তু ক্রমশঃ মেয়ে "রংরুট"এর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় এই বাহিনীটির সম্প্রসারণ করা হয়। ক্রমে এই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া মোট ৬টা Companyতে উন্নীত করা হইয়াছিল ও উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল Front lineএর যোগ্য করিবার জন্য। তার পর রেঙ্গুনে ঝাঁসী বাহিনীর শাখা খোলা হইলে সেখানেও একটা Company গঠন করিয়া রেঙ্গুনের প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া একটি পল্টনকে যুদ্ধক্ষেত্রে দাখিল হইবার জন্য মেমিওতে পাঠান হইয়াছিল। এই পল্টনে আমিও অভিযানে গিয়াছিলাম ও সামান্য সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

ফৌজি শিক্ষা

যেমন যোগীর মূলসূত্র চিত্তবৃত্তি নিরোধ সেইরূপ ফৌজি শিক্ষার প্রাথমিক গুণ সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা—উহাকে জঙ্গী ভাষায় ভিত্তি-প্রস্তর (bed-rock) বলা হয়। উহার ফলে অনেক লোক একসঙ্গে কাজ করিবার প্রেরণা পায় ও হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করিতে পারে। কথায় আছে, সৈন্য মরে কিন্তু সৈন্যবাহিনী মরে না—ইহার গোড়ার কথা espirit de corps; সংযমই একের অন্যের সঙ্গে কাজ করিবার শক্তি দেয় এবং নিয়মানুবর্ত্তিতাই শৃঙ্খলার সহিত কাজ

করিবার স্পৃহা জন্মায়। এ সব ছিল মামুলি পদ্ধতি। এ ছাড়া নেতাজী জোর দিতেন নৈতিক শিক্ষার উপর। সাধারণতঃ ইহাকে নেপোলিয়ানের প্রবর্ত্তিত নীতি বলা হয়—যাহা জাপানীরাও অনুসরণ করিত: কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ভারতেরই নীতি।

আমাদের ক্যাম্পের শিক্ষা খুব কঠিন ছিল। যাহা সাধারণ সিপাহীরা—অবশ্যই ইংরাজ সৈন্যবাহিনী এক বছরে শেখে তাহা আমাদের তিন মাসের মধ্যে শেষ করিতে হইয়াছিল। সম্পূর্ণ শিক্ষা মায় জঙ্গলের যুদ্ধ ও পাহাড়ের যুদ্ধ এবং গেরিলা রণকৌশল ৬ মাসের মধ্যে আয়ত্ত করিতে হইয়াছে। নিম্নে আমাদের শিক্ষার ও দৈনন্দিন কার্য্যের কিছুটা আভাস দেওয়া দেওয়া গেল: (১) ভোর পাঁচটায় উঠে নিজের নিজের জায়গা পরিষ্কার করে হাত-মুখ ধুয়ে সৈনিকের পোষাকে সজ্জিত হইতে হইত; (২) সাড়ে ৫টার সময় ঝাণ্ডা সেলামী হইত; (৩) তার পরই শরীরচর্চার জন্য প্রত্যহ বাহিরে দুই মাইল দৌড়াইবার পর P. T. হইত। (৪) বেলা ৭টার সময় চা-পানের জন্য অবসর মিলিত। অবশ্য এই চা বিলাসের সামগ্রী ছিল না, চায়ের পুরানো শুকনা পাতা গুড়মিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার নির্য্যাস গলাধঃকরণ করিতাম। সাড়ে ৭টার সময় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কুচ-কাওয়াজের ময়দানে গিয়া বেলা বারোটা পর্য্যন্ত অবিরাম নানারূপ শিক্ষা চলিত। তৎপরে আমরা ক্যাম্পে ফিরিতাম ও তিনটা পর্য্যন্ত ছুটি পাইতাম। ঐ সময়ের মধ্যে আমাদের আহারাদি বিশ্রাম চিঠিপত্র ইত্যাদি শেষ করিতে হইত। আহার্য্যস্বরূপ আমরা পাইতাম ভাতের সহিত সামান্য ডালসিদ্ধ (খোসাশুদ্ধ), কিছু শাকসব্জী ও কখনও কখনও একটু মাছ অথবা মাংস। প্রথম অবস্থায় কিছু দুধও পাওয়া যাইত ও কদাচিৎ ডিম পাওয়া যাইত। ঠিক ৩টার সময় বাঁশী বাজিলে আমরা হিন্দী ক্লাসে যাইতাম। তৎপর বিকাল পর্য্যন্ত প্যারেড হইত। কোন কোন দিন অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করিতে হইলে সেদিন প্যারেড বন্ধ থাকিত। পুনরায় বিকাল সাড়ে ৫টার সময় "কৌমী গানে" সমবেত হইতাম। ঐ অনুষ্ঠান শেষ হইবামাত্র আমরা রাত্রের আহার সন্ধ্যার মধ্যেই গ্রহণ করিতাম। রাত্রে বাতি জ্বালানো নিষেধ ছিল। মিতব্যয়িতা বাদেও হাওয়া-জাহাজের আক্রমণ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য এই সাবধানতা অবলম্বন করা হইত। সপ্তাহে তিন দিন full kit লইয়া লম্বা রুট মার্চ্চ করিতে হইত; সাধারণতঃ দৈনিক ১৫ মাইল রুট মার্চ্চ হইত। এমন কি আমরা একবার মেমিও হইতে মাণ্ডালে পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৪৫ মাইল দুই দিনে অতিক্রম করিয়াছিলাম। যে সব অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার আমাদের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল তাহার নাম: (১) রাইফেল, (২) বেয়নেট, (৩) হ্যাণ্ড গ্রেনেড, (৪) টমিগান, (৫) ব্রেণগান, (৬) ষ্টেন্গান, (৭) এণ্টি ট্যাঙ্ক রাইফেল, (৮) ২" মর্টার, (৯) পিস্তল।

আমাদের নিজের ক্যাম্পে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেন্ট্রি ডিউটি নিজেদেরই করিতে হইত। কখনও কখনও আমাদের নিশীথ আক্রমণের (night attack) মহড়া দেওয়া হইত। আমরা সঙ্গীন শিক্ষা সুচারুরূপে লাভ করিয়াছিলাম। জঙ্গলী ও পার্ব্বত্য যুদ্ধে খুব অভ্যস্ত হইয়াছিলাম, কারণ, বার্ম্মা ফ্রণ্টে ঐরূপ দেশই অবস্থিত। ইহা বলিতে গর্ব্ব বোধ হয় যে, জাপানীরা আমাদের শিক্ষা-প্রণালী দেখিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন।

আমাদের রেজিমেণ্ট দুইটি মোটা বিভাগ ছিল; যথা, ১। যোদ্ধার ইউনিট (Fighting force) ২। সেবিকা ইউনিট (Nursing unit)। শেষোক্ত বিভাগের সভ্যাদের হাসপাতালে প্রাথমিক ও আনুসঙ্গিক কতকগুলি চিকিৎসা-পদ্ধতি ও সেবা-শুশ্রূষা শেখান হইত। অবশ্য বৈকালিক অস্ত্রশিক্ষা আমাদের মতই তাহাদের লাভ করিতে হইত। সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও অফিসার ও অন্যান্য সিপাহী শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য ছিল। অফিসারদের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনার পদ্ধতি বিশেষ করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত এবং এই উদ্দেশ্যে কম্পাসের ব্যবহার, ম্যাপের জ্ঞান ও সঙ্কেত শিক্ষা দেওয়া হইত।

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা

ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘে কৃষ্টি ও জ্ঞানবিকাশ বিভাগের মত আমাদের ভিতরেও অনুরূপ চেষ্টা করা হইত। ক্যাম্প-কমাণ্ডার স্বয়ং অবসর সময়ে আমাদিগকে সমবেত করাইয়া উপরে উল্লিখিত বিষয় সমূহ বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনার দ্বারা বিশদ্ ভাবে বুঝাইয়া দিতেন। কিছু কিছু পুস্তক ও পত্রিকা আমাদের ভিতরে বিতরণ করা হইত এবং উহার উপর ভিত্তি করিয়া বিতর্কের সৃষ্টি হইত। কখনও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসার অথবা স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভ্যেরা আসিয়া প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। সর্ব্বোপরি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে নেতাজী স্বয়ং আসিয়া তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতার দ্বারা আমাদের অনুপ্রাণিত করিতেন। আমরা অনেক বিষয়ে বালিকাসুলভ চপলতার সহিত তাঁহাকে কৌতূহলপ্রদ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতাম এবং তিনি সহাস্যে তাহার উত্তর দিতেন এবং সেই উত্তর হইতেই আমরা অতি দুরূহ বিষয়েও সহজে জ্ঞান অর্জ্জন করিতাম। যে শিক্ষা এখানে পাইয়াছিলাম তাহা দুর্লভ এবং এই শিক্ষাই পরবর্ত্তী কালে আঁধারের ভিতরে আলোক-শিখারূপে পথ দেখাইয়াছিল। অবশ্য এই শিক্ষার সহিত কোন ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না, উহা ছিল উদার ও অসাম্প্রদায়িক। আধ্যাত্মিক শিক্ষার অর্থ কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা যাহা ইংরাজীতে spiritual trainning বলা হইত। উহার সঙ্গে ধর্ম্মের কোনই যোগ ছিল না। দেশই ছিল আমাদের ধর্ম্ম—জনগণই দেবতা।

জঙ্গী তৈয়ারী (mobilization)

বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পাইলাম যে, আমাদের রণাঙ্গনে যাইতে হইবে। কি আনন্দ! কি পুলক! ইহাই আমরা চাহিতেছিলাম। নেতাজীকে আমরা কত বার অনুযোগ করিয়াছিলাম যে, আমাদের কেন মুক্তিসংগ্রামে উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিতে পাঠান হইতেছে না? তিনি ইহা শুনিয়া কেবল হাসিতেন। কিন্তু কিছু দিন পরই বিষয়টি আজাদ হিন্দ্ সরকারের মন্ত্রি-সভায় উপস্থাপিত হইয়াছিল এবং সব দিক্ হইতে বিবেচনা করিয়া ঐ অভিযানে একটী companyকে পরীক্ষামূলক ভাবে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। তদনুযায়ী অনতিবিলম্বে সমস্ত বন্দোবস্ত করা হইল। আমরা অবশ্য অসম সাহসিক কার্য্য বিশেষ কিছু করি নাই, কিন্তু যে গুরুভার আমাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় আমরা সম্পন্ন করিয়াছি। আমাদের আত্মপ্রসাদ এই যে নেতাজীর নিকট মাতৃভূমির সেবায় রক্তদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম তাহা পূরণ করিয়াছি। ে stageএ আমাদের রণাঙ্গনে যাইবার সুযোগ মিলিয়াছিল তাহাতে দর্শনীয় কিছুই করিবার ছিল না; তবে আমরা যাহা করিয়াছিলাম

তাহা I. N. A.র despatchএ বিশেষ ভাবে উল্লিখিত আছে—উহার পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন।

প্রথম রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা

১৯৪৪ সাল। আমাদের মেমিও ক্যাম্পের স্থাপন সম্বন্ধে শত্রুরা গুপ্তচর হইতে সংবাদ পাইয়াছিল এবং যেহেতু নারীরা সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করায় পুরুষদের ভিতরেও অভূতপূর্ব্ব সাড়া দিয়াছিল, ইহার ফলে রংরুটের সংখ্যা দিন-দিন বাড়িতেছিল এবং যেহেতু নারী সৈন্যবাহিনী গঠনের প্রতিক্রিয়া ভারতবাসীদের উপরেও বিশেষ করিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল, সেই হেতু ঐ বাহিনীকে অঙ্কুরে বিনাশ করা শত্রুদের লক্ষ্যবস্তু হইয়াছিল।

আমরা আমাদের ক্যাম্পের নিয়মানুযায়ী সন্ধ্যার কিছু পরেই শুইয়া পড়িয়াছিলাম। সমস্ত ক্যাম্প-প্রাঙ্গণ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, নীরব, নিস্তব্ধ; কদাচিৎ ঈষৎ ঝিল্লীরব শ্রুত হইতেছে, আমরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হঠাৎ প্লেনের শব্দে পাহারা-রত সান্ত্রী বিপদের সঙ্কেত করিল। সকলেই ত্রস্ত ভাবে উঠিয়া নিকটবর্ত্তী পরিখাতে আশ্রয় গ্রহণ করিল; কিন্তু আমি ও অরুণা বেপরোয়া হইয়া নিজ নিজ জায়গাতেই রহিলাম। তার পর কর্ণেল লক্ষ্মী আসিয়া আমাদের তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী আশ্রয়ে যাইতে বলিলেন। অরুণা প্রথমে এবং পরে আমি বাহির হইলাম। অরুণা একটি পরিখাতে আত্মগোপন করিল। আমি তখনও চলিতেছিলাম আর একটি পরিখার সন্ধানে। সহসা প্লেন হইতে flood light আমার উপর পড়িল এবং আমার রাত্রের পরিধান সাদা রঙের থাকায় আলো উজ্জ্বল ভাবে প্রতিফলিত হইল। তৎক্ষণাৎই মারণাস্ত্র বোমাগুচ্ছ শ্রাবণের বারিধারার মত বর্ষিত হইল ও সঙ্গে সঙ্গে মেসিন গান চলিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ঐরূপ ধ্বংসলীলা চলিতে লাগিল। যদিও ভীষণ ভাবে বোমাবর্ষণ হইয়াছিল কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় কোনও প্রাণহানি হয় নাই। আমি ও কয়েক জন সঙ্গী যে পরিখাতে ছিলাম তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছিল, আমরা সকলেই চাপা পড়িয়াছিলাম এবং কতকক্ষণ পর্য্যন্ত মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থার স্বাদ পাইয়াছিলাম। শীঘ্রই রিলিফ দল আসিয়া আমাদের উদ্ধার করিল। বলা বাহুল্য, আমাদের ক্যাম্পের জিনিষ-পত্র সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বোমাবর্ষণের ভিতরেই সাংঘাতিক বিপদকে অগ্রাহ্য করি নাই। নেতাজী আমাদের ক্যাম্পে আসিয়া হাজির হইলেন এবং প্রত্যেকটি বালিকার খোঁজ নিলেন। ক্যাম্প-কমাণ্ডারের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের তালিকা সংগ্রহ করিলেন। যদিও ক্যাম্পের কতকটা অংশ খাড়া ছিল তবুও কলের কামানের গুলীতে তাহা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। নেতাজী অবশ্য আমাদের অন্য স্থানে গিয়া আরামে রাত্রি যাপন করিতে বলিলেন, কিন্তু আমরা স্থান ত্যাগ করিব না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইলাম। ক্যাম্প-কমাণ্ডার অবশ্য ইহাতে আনন্দিত হইলেন এবং নেতাজী আমাদের moralএর প্রশংসা করিলেন। তৎপর দিবস আমাদের ক্যাম্প পরিবর্ত্তন করার সময় আবার হাওয়া-জাহাজের আক্রমণ হইল ও মেসিন গান হইতে মাথার উপর দিয়া অবিরাম গুলী চলিতে লাগিল। আমরা মাটির উপর শুইয়া পড়িলাম মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া, কিন্তু ইহা শেষ-পর্য্যন্ত হইল না। এইরূপ অনেক বার হইয়াছিল; কারণ জাপানীদের প্লেনবিধ্বংসী কামান সামরিক কারণে কার্য্যে লাগান হইত না। কয়েক বার আমরা Time Bombএর হাত হইতে আশ্চর্য্য ভাবে রক্ষা পাইয়াছি। একটি বিশেষ কৃতিত্বের বিষয় উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। ১৯৪৪ সালের শীতের প্রারম্ভে নেতাজী একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে মিঙ্গলাডনের (রেঙ্গুন) এক সভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন। সেখানে আমাদের সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছিল। অকস্মাৎ শত্রুপক্ষীয় একটি প্লেনের আবির্ভাব হইল ও সঙ্গে সঙ্গে সাইরেণ বাজিয়া উঠিল। প্লেনটি সভাস্থলের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে যাইতে কলের কামান দাগিতে লাগিল। তবুও সকলে স্থির ভাবে নিজ নিজ স্থানে রহিল। অতর্কিতে আর একটি bomber আসিয়া হাজির হইল ও সেই সময়েই anti air craft ব্যাটারী চলিতে লাগিল। উক্ত বম্বারটি গুলীবিদ্ধ হইয়া টাল খাইতে খাইতে নীচু হইয়া চলিতে লাগিল। সমূহ বিপদের সম্মুখে নেতাজীকে কিছুতেই মঞ্চ হইতে সরাইতে রাজী করান গেল না। অবশেষে তাঁহার বিশেষ অফিসারগণ একরূপ হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। মেসিনগানের গুলীতে বিদ্ধ হইয়া একটি সিপাহী লাইন হইতে অকস্মাৎ ভূতলে পড়িয়া গেল। নেতাজী তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেখিতে গেলেন, কিন্তু তখন সে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছে। বিশেষ কৃতিত্বের বিষয় এই যে, যে গুলীতে শত্রুর Bomber বিদ্ধ হইয়াছিল তাহা ঝান্সী রাণী-বাহিনীরই একটি বালিকার কার্য্য।

আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান

সৈন্য-জীবনে ফৌজি শিক্ষার অবসরেও বিশেষ বিশেষ উৎসবে আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান চিরাচরিত প্রথা। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আর্ম্মীতে Tattoo নামীয় অনুষ্ঠান ফৌজি আনন্দ-রসিকদের খুব পরিচিত, আমরা অবশ্য উহার পুনরাবৃত্তি করিতাম না, কেন না, উহা ইংরাজদের অনুষ্ঠানের নকল। আমাদের আমোদ-প্রমোদ ভারতের প্রথানুযায়ী হইত এবং তাহাতে মৌলিকতা ছিল। বিশেষ উৎসবে খেলাধুলা ও নাচ-গান হইত; বাংলার, দাক্ষিণাত্যের ও পাঞ্জাবের বৈশিষ্ট্য তাহাতে প্রকাশ পাইত। ইহা ছাড়া অনেক রকম অভিনয় হইত। নাটক, কবির গান—যাহাতে প্রাণে দেশপ্রেম জাগায় এইরূপ অনুষ্ঠান উৎসবের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। নেতাজী নিজে উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত শুনিতেন ও সকলকে উৎসাহিত করিতেন। অনেক সময় তিনি নিজেই সুর যোজনা করিয়া দিতেন ও আর্টের দিক হইতে ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া দিতেন। যখন ইম্ফলের পতন আসন্ন হইয়াছিল তখন অনুষ্ঠানগুলি একেবারে প্রাণবন্ত বলিয়া বোধ হইত। নেতাজীর অবস্থা একেবারে তুরীয়, ও অন্যান্য অফিসারেরা আনন্দে ভরপুর হইয়াছিল। সকলেই আজাদ হিন্দের স্বপ্ন সফল হইতে চলিতেছে বলিয়া স্থির নিশ্চিত। আমরাও আহ্লাদে আত্মহারা হইয়াছিলাম।

এই সব উৎসবে full dress রুট মার্চ্চ হইত। আমরা জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া মার্চ্চ করিতাম। সকলেই মুগ্ধ হইয়া দেখিত—এমন কি জাপানীরাও আশ্চর্য্যান্বিত হইত। সংহতি, কৃচ্ছ্র-সাধন ও কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার পরিচায়ক ছিল এই সব রুট মার্চ্চ। ইহা ছাড়া বিশেষ কুচকাওয়াজ হইত, যাহাতে সকলেই

খুব বেশী রকম অস্বাভাবিক হলেও শেষ পর্যন্ত আমারই উপর ভার পড়ল কনে দেখতে যাবার। প্রথমটা খুবই নার্ভাস হয়ে গেছলাম, কি জানি ওজন-দরে কথা বলা, আপ্যায়িতের হাসি হেসে অবাঞ্ছিত অতিথিকে অভ্যর্থনা করা, ঘাড়টি ঈষৎ হেলিয়ে, দু'টি হাত জোড় করে, দন্তরাজি বিকশিত করে গদগদ ভাবে নমস্কার জানানো, এর কোনটাই আমার ধাতে কেমন সহ্য হয় না। তবুও যখন স্বামীর বন্ধু এবং স্বামী স্বয়ং আমাকে অনুরোধ করলেন এবং বললেন, আমার certificateএর উপরেই নির্ভর করছে সেই বন্ধুটির বিবাহ, শ... আর অমত করতে পারলাম না। প্রথম জনের অনুরোধ যদি এ ব্যাপে... যাওয়া সম্ভব ছিল, শেষের জনের অনুরোধ রক্ষা না করার দিয়ে আগলে... ল না, শেষে কি গৃহবিবাদের সৃষ্টি করব? অতএব কিছু নয়? সাথে... লাম যে নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে আমি তকোন ও-শালা বুক... বারে...” বাকী কথাটা ... া কনের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিলাম। ...কেটাকে ছুঁকে... পুরুষরা পুরু... ানায় এবং আমি মহিলাদের অন্তঃপুরে আহূত হয়ে বিশ্র... আরম্ভ করলাম। এ-সব ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। মন খুব চঞ্চল হয়ে উঠছে কখন সেই মনোনীতা কুমারীকে পরীক্ষার্থে নিয়ে আসা হবে। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম, আমিই সেখানের বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে পড়েছি, এ-জানলায় সে-জানলায় জোড়া জোড়া চোখ এক একবার দেখা যাচ্ছে, আবার অদৃশ্য হচ্ছে। এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ কনের মাসীর সাথে আজে-বাজে কথা বলার পর, কনের বাবা আমাকে অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করে জোড়হস্তে বললেন, "আপনি যদি দয়া করে একটু বাইরের ঘরে এসে বসেন তো ভাল হয়, এই ঘরটাতে বেশ আলো আছে, দেখার সুবিধা হবে।"

আমার পিতার বয়সী ভদ্রলোকের এইরূপ বিনয় প্রকাশে আমার সত্যিই অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। তাঁর পিছনে পিছনে বাইরের ঘরে গিয়ে কনের প্রতীক্ষায় বসে আছি, কনের মাসীমা হঠাৎ পিছন হতে পাখার বাতাস দিতে আরম্ভ করলেন। আমি ব্যস্ত হয়ে বলি, আম... করেন কি, পাখাটা আমার হাতে দিন।" এক রকম জোর করেই পাখাটা তাঁর হাত হতে কেড়ে নিলাম। তার পর আমাদের পরীক্ষার্থিনী শ্রীমতী মানসীর আবির্ভাব হল তার বউদিদির সাথে! অদূরে তার জন্য একটি চেয়ার নির্দিষ্ট ছিল। মানসী লজ্জা, ভয় ও গাম্ভীর্য্য-ভরা মুখে এসে আমাকে একটি ঢিপ করে প্রণাম করলে। আমি তো আবার ভীষণ অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম। সে কিন্তু সেদিকে না তাকিয়ে তার চেয়ারে বসে পড়ল। পুরুষেরা সকলেই ঘর হতে বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন, কারণ সেদিনের পরীক্ষক শুধু আমারই হবার কথা ছিল। সুতরাং অগত্যাই নিজেকে সংযত করে মানসীকে বল্লাম, "ও কি ভাই, তুমি ঐ দূরে চেয়ারে বসে থাকলে তোমার সাথে আলাপ করব কি করে? তুমি এস, আমার কাছে বসবে এস, ভয় কি?" সে বেচারী একবার বউদি, ও একবার মাসীর দিকে তাকিয়ে আমার পাশে চৌকিতে বসে পড়ল। তখনও তার ভয় ও লজ্জা সম্পূর্ণরূপে কাটেনি। মেয়েটির বয়স বছর চব্বিশ হবে, বেশ সুশ্রী চেহারা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে টানা-টানা কালো ভাবালু চোখ দু'টি সত্যই অপূর্ব্ব।

দু'-চার কথায় আলাপে বুঝলাম মানসী আই-এ পর্যন্ত পড়েছিল। তার পর হঠাৎ জ্বরে মা মারা যাওয়ায় সংসারের সকল দায়িত্ব এসে পড়ায় আর পরীক্ষা দেওয়া হয়ে ওঠেনি। এখন আর সংসার দেখবার

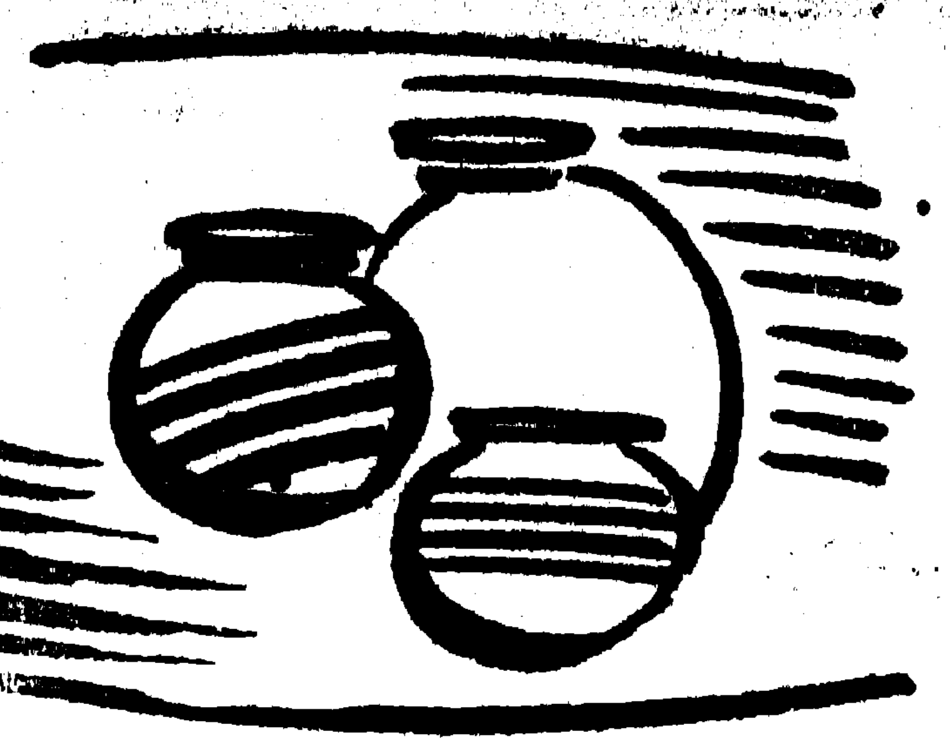

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

প্রয়োজন নাই বলে বাবা উঠে-পড়ে লেগেছেন কন্যাকে পাত্রস্থ করবার জন্য, মানে বেশ Llrge acaleএ এই কনে দেখার ব্যাপার চলছে। এমন কি প্রয়োজন হলে সকালে এক পক্ষ বিকেলে আর এক পক্ষ এসেও তাকে যাচাই করে গেছে।' আমি তাকে সস্নেহে বললাম, "আমি কিন্তু তোমাকে যাচাই করতে আসিনি ভাই, আমি তোমার সাথে আলাপ করতে এসেছি। আচ্ছা, এ বিবাহে তোমার মত আছে?"

সে উত্তর করলে, "মতামতের তো কোনও প্রশ্ন উঠছে না, বাবার বয়স হয়েছে, তিনি চান আমার বিয়ে দিতে। তাঁর যাঁকে পছন্দ হবে, আমার ভালো-মন্দ বুঝে যাঁর হাতে আমাকে তিনি দিতে চাইবেন, তাঁর সাথেই হবে আমার বিয়ে।"

তার কথার আভাষেই বুঝলাম, এখনও সে আমাকে তার প্রতি-পক্ষ মনে করছে। আরও সহজ করবার জন্য আবার প্রশ্ন করলাম, "এ রকম ভাবে কনে দেখার প্রথাটা খুব খারাপ লাগে, না? আমার তো ভারী বিশ্রী মনে হয়।"

এবারে সে আমাকে দরদী বন্ধু পেয়ে বললে, "হ্যাঁ সত্যিই বড় বিশ্রী লাগে। আমাদের সমাজের এই যে কি প্রথা—একটুও ভালো লাগে না।"

আমি হেসে বলি, "বেশ তো, যা ভালো লাগে তাই করলেই তো পারো—নিজের পছন্দ মত বিয়ে করলেই তো পারো?"

"তাতেও তো নিন্দে, লোকে যা-তা বলবে।"

"হ্যাঁ, প্রথমটা হয়তো নিন্দে করবেই। সবাই হাসবে আড়ালে, ঠাট্টা করবে। কিন্তু এ-সব নিন্দা ও আলোচনাটা ঈর্ষাপ্রসূত এবং সেটাকে fall করার মতন মনের জোর থাকলে দেখা যায়, পরে সবাই বোঝে যে তারা নিন্দনীয় কিছু করেনি। দেখ, আমি নিজে ভুক্ত-ভোগী। আমি নিজেই এক দিন আমাদের পরিচিত সমাজের মধ্যে একটা আলোচনার প্রসঙ্গ হয়ে পড়েছিলাম, এখন আবার তারাই আমার মতন মেয়েকে কনে দেখার মত সামাজিক কাজের ভার দেয়।"

মানসীর লজ্জা ও ভয় তখন অনেকটা কেটে গেছে, সে বেশ সহজ ভাবেই বলে, "শুধু যে নিন্দের ব্যাপার তা নয়, ঐ ভাবে তো সকলের বিয়ে হতে পারে না? আপনি না হয় নিজের পছন্দ মত স্বামী পেয়েছেন, এবং আপনাদের প্রেম হয়তো সার্থক হয়েছে। কিন্তু যারা পছন্দ মত স্বামী বেছে নিতে পারল না বা সে-রকম সুযোগ পেল না পুরুষের সাথে মিশবার মতন, তারা কি করবে? তারা যদি পনেরো-ষোল বছরের ছোট মেয়ে হয়, তাহ'লে তবু ঐ ভাবে

কনে দেখা

মৃণালিনী দাশগুপ্তা

বাচাই করে বিয়ে চলতে পারে, কিন্তু আমাদের মতন তেইশ-চব্বিশ বছরের মেয়েকে নিয়ে পণ্য দ্রব্যের মতন যখন বাচাই করা হয়, তখন আর আমাদের লজ্জা রাখবার জায়গা থাকে না।"

তাকে তখনকার মতন বললাম, "পড়েছ রবীন্দ্রনাথের সবলা ?

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
কেন তুমি সংকোচের মোহজাল পাতো
হে বিধাতঃ চিত্ত ঘিরে।'

সত্যিই দেখ আমাদের সঙ্কোচ এসে আমাদের বিহ্বল করে দেয়। বিয়েটাকে আমরা জীবনের চরম পরিণতি মনে করেছি, সেখানেই আমাদের গলদ। বিয়েটা প্রয়োজনীয় ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন আমাদের জীবনের। জীবনের চলার পথে সঙ্গী যদি জুটে যায় তো ভালই—পথ বেঁধে দেবে বন্ধনহীন গ্রন্থি। আর যদি নাই জুটে তো কেন আমরা এ ভাবে নিজেদের পণ্য দ্রব্যের সামিল করে তুলব দিন-দিন ? এ-সব বুঝেও আমরা সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারি কই ?"

এই সব কথা-বার্ত্তার মধ্যেই বাইরে থেকে আমার সঙ্গের ভদ্রলোকেরা ফিরবার জন্ত ব্যস্ত হওয়ায় আমাদের আলোচনা সেখানেই বন্ধ হল। মানসীকে জানিয়ে দিলাম, "তোমার সাথে আলাপ করে খুব খুশী হয়েছি, এবং আমার স্বামীর বন্ধুর মানসী যাতে তুমি হতে পারো, সেই চেষ্টাই করব।"

সে একটু দুষ্টু হেসে গুরুজনদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমরাও জলযোগান্তে বাড়ী ফিরে এলাম।

বাড়ী এসেও কিন্তু মানসীর প্রশ্ন আমার চিন্তাকে অভিভূত করে রইল। তার প্রশ্নের সমাধান চাই। মনে হতে লাগল, শত শত মানসী আমাকে বলছে, "আমরা বয়স্থা শিক্ষিতা মেয়েরা, সবাই আমাদের অপবাদ দেয়, আমাদের নারীত্ব সতীত্ব সব না কি লোপ পেতে বসেছে, যেহেতু আমরা উচ্চশিক্ষা পেয়েছি ও রাস্তায় একা বার হই। আমরা না কি উচ্ছৃঙ্খল, এক কথায় আমরা একেবারে যা-তা। অথচ আমাদের দিক্ হতে কেউ বিচার করে কেন দেখবে না ? আমাদের যৌবন অস্তোন্মুখ, আমরা লেখাপড়া শিখেছি, নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি। যৌন উত্তেজনামূলক উপন্যাস পড়ছি, সিনেমা দেখছি, আমাদের যৌন আবেগ আছে, অথচ আমাদের যৌন পরিতৃপ্তি হয় নাই, আমাদের মনে বৈচিত্র্য আনবার জন্ত নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা নাই, আমাদের জন্ত পাঠাগার নাই, আমাদের জন্ত ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ নাই, আমাদের জন্ত ক্লাব নাই, আমাদের জন্ত কিছুই ব্যবস্থা নাই। আমাদের পুরুষ-বন্ধু থাকলে সেই সমাজ চোখ রাঙায়—যে সমাজ পারে না উপযুক্ত বয়সে আমাদের বিবাহের ব্যবস্থা করতে। বিবাহের বাজারে আমরা পণ্য দ্রব্য, টাকা এবং কটা রং না হলে আমরা বাজারে অচল। প্রেম করে বিয়ে করার মতন সুযোগ আমাদের দেওয়া হয় না। যৌবনের শেষে বহু কষ্টে হয়তো এমন এক জনের সাথে আমাদের জুড়ে দেওয়া হয়, যাঁর অর্থ আছে হয়তো প্রচুর কিন্তু হৃদয় নাই। বংশে তিনি খুবই বড়, সমাজে প্রতিষ্ঠাবান, কিন্তু স্ত্রীকে যথেষ্ট সম্মান দিতে জানেন না। চোদ্দ বছরের বালিকার পক্ষে সম্ভব নিজেকে নূতন করে শ্বশুরবাড়ীর মতন করে গড়ে তুলতে, কিন্তু আমাদের আত্মসচেতন পরিণত মন কি করে তা পারবে ?

এই সব প্রশ্নের সমাধান খুঁজছিলাম। আসল গলদ আমাদের নিজেদের মধ্যে। আমরা মেয়েরা ভুলে গেছি নিজেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে, সমাজের উপর নির্ভর না করে কেন আমরা আমাদের নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করব না ? শুধু পুরুষের বেলা কেন, নারীর বেলাতেও কেন প্রযোজ্য হবে না—one should be the m... of one's own fortune।"

আমাদের ভালো-মন্দ পরিণত বয়সে আমরা নি... তার জন্ত যদি বিপদ আসে সে বিপদের ফল আ... বিবাহ আমাদের জীবনের লক্ষ্য এবং ... আমরা জোর করে আমাদের বিবাহ-প... সমাজের শিক্ষায়, দীক্ষায় কৃষ্টিতে যদি প্রগ... ...ণয়ে প্রগতি কেন আসবে না ? একটা অংশকে পি...ন ফেলে রেখে সমাজের বাকী অংশটা কিছুতেই এগিয়ে যেতে পারবে না। সমাজের সকল ক্ষেত্রেই এক-সাথে বিপ্লব আনতে হবে। পরিণয়ে প্রগতি আসলে নারী-সমাজও এগিয়ে যাবে। সে-দিন আর কনে দেখার পালা থাকবে না, সে-দিনের মানসী এই কথাই বলবে,—

...বির্ভাব ... সভাস্থলের ...গিতে লাগিল। অতর্কিতে আর ও সেই সময়েই anti উক্ত বক্তৃতারটি গুলীবিদ্ধ চলিতে ...

"যাব না বাসর-কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী
আমারে প্রেমের বীর্য্যে কর অশঙ্কিনী
বীরহস্তে বরমাল্য লব এক দিন
সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে ?
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা
বিনম্র-দীনতা সম্মানের যোগ্য নহে তার
ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্ব্বল লজ্জার।
মাথার গুণ্ঠন খুলি ক'ব তারে মর্ত্ত্যে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।"

...এর ...না, আমোদ-

মনে হয় সেদিন সুদূর নয়।

অতীত দিনের কাহিনী

হাসিরাশি দেবী

ঘরের পেছনে কলাবাগান ; ওরই পাতার ওপোর বৃষ্টিপাতের একটা একটানা শব্দ শোনা যাচ্ছে :···ঝর ঝর ঝর······

খড়ের ঘর। তারও চালা কয়খানা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল দীর্ঘ দিনের অ-মেরামতে। জল তো পড়েই, বিদ্যুতের চমকও দেখা যায় মাঝে-মাঝে। এমনি একটা দুর্য্যোগের রাত্রে ঘুম ভেঙে বিছানার ওপোর হঠাৎ উঠে বসলো ধ্যাদা। তার পর শূন্য বিছানাটার আর এক প্রান্তে হাত বুলিয়ে ডাক দিলে : "ঝোড়ো, এই ঝোড়ো ! জবাব দিচ্ছিস্ না যে বড়। গেলি কোতায় ? এই—!" ধ্যাদার কণ্ঠস্বর নিস্তব্ধ বর্ষা-রাত্রের বুকেই প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো যেন, কেউ এ-ডাকের কোনও জবাব দিল না। অগত্যা, টিনের ল্যাম্পটা হাতড়ে হাতড়ে জেলে ফেললে ধ্যাদা; তারই আলোয় দেখলে, বাঁশের দরোজাটা খোলা অবস্থায় বাদল হাওয়ায় ঝাপটায় থেকে থেকে আছাড় খাচ্ছে কেবল।

ছেঁড়া কাঁথাখানা গায়ে টেনে নিয়ে থ্যাদা নেমে এলো চৌকী থেকে। তার পর বাঁশের দরোজাটা টেনে খুঁটার সঙ্গে বাঁধতে বাঁধতে পলাতক পুত্র ঝোড়োর উদ্দেশ্যে যে মধুর বাক্যালাপ সুরু করলো : "শালাছেলে! য়্যাত্তটুকুন মানে চোকে চোক্ নেগেচে কি না নেগেচে, ওম্‌নি ঘরে থেকে বেরিয়ে দে সটকান্! সাধে বলি শালাছেলে! ঝড় নেই, জল নেই, আঁধার নেই, আলো নেই,··· এ য়্যাকেবারে মানে যাকে বলে ইয়ে······। ঘর-সংসার কি বুক দিয়ে আগলে থাকবার কত্তা একলা আমারই? তোর—মানে কিছু নয়? সাধে মনে হয় এক একবার—সব ছেড়ে-ছুড়ে পালাই! তকোন ও-শালা বুঝবে, নইলে, দুত্তোর মাইরি······এ য়্যাকেবারে···" বাকী কথাটা শেষ না করেই ফিরে এসে তামাক ধরায়, তার পর কলকেটাকে হুঁকোর মাথায় বসিয়ে অশান্ত চিত্তে টানের-পর টান দিয়ে চলে অনবরত।

কাহিনীটার পূর্ব্ব-ইতিবৃত্ত একটুকু আছে বই কি এবং তাই বলছি। সাতবাঁকা গ্রামের ডোমপাড়ার ইতিহাসটা একটু প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এই থ্যাদারই কোন এক পূর্ব্বপুরুষের সময়ে। সেই পূর্ব্বপুরুষটির নাম—ষষ্ঠীচরণ। ষষ্ঠীচরণের নামে আজ লোকে পথ চিনে পৌছায়—সেই স্বনামধন্য ব্যক্তিটি যে এক দিন এই থ্যাদারই বংশাবলীতে জন্মগ্রহণ করেছিল, এ জন্য থ্যাদা আজও গৌরব অনুভব করে থাকে, কিন্তু এখনকার লোক তা মানে না। তবে, চলিত কাহিনী শুনতে বাধা নেই বলেই শুনে যায়; কাহিনীটা এই :—

সে-বার গ্রামে মড়ক দেখা দিয়েছিল বিদ্যুৎগতিতে।' দিনের পর দিন ধরে যখন এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রাম আর ও-গ্রাম থেকে সে-গ্রাম শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে, তখন এক অমাবস্যার রাত্রে ষষ্ঠীচরণ স্বপ্নে দেখ্‌ল, মা কালী স্বয়ং তাকে ডেকে বলছেন : "ষষ্ঠী রে! আমারে পূজো দে,—তোর নিজের হাতের পূজো। না হলে কেবল সাতবাঁকা কেন, এদেশের মঙ্গল নেই,—কিছুতেই ভাল হবে না।"

স্বপ্নেই ষষ্ঠী শুধিয়েছিল : "কি পূজো দেব মা? আমি যে জাতে ডোম। আমার হাতের কেনে পূজো খেতে চাস্ তুই?"

উত্তর হয়েছিল : "রক্ত! রক্ত! একশো-একটা নরবলির রক্ত খাব আমি। দে, দে, তাই দে!"

কথাটা বহু দিনের।

ষষ্ঠীচরণ একশো-একটা নরবলি দিয়ে সেদিন ক্ষুধার্ত্তা গ্রাম্যদেবীর ক্ষুধা কিছু নিবৃত্ত করতে পেরেছিল কি না, আজ তার প্রমাণ কিছু নেই, তবে একখানা খড়্গ আজও গ্রামের কালীতলা, অর্থাৎ সাতবাঁকার নদী কঙ্কনার তীরে যে ঝাঁপালো অশ্বত্থ গাছটা বছরের পর বছর ধরে নিজের বংশাবলী বিস্তার করে চলেছে, তারই তলায় কয়েকখানা পাথরের ওপোর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে দেখা যায়। আর দেখা যায়, এত বছরের এত জল, রৌদ্র কি হিমেও সে খাঁড়া পুরু মরিচায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, তবে চন্দন আর সিন্দুরের প্রলেপে ওর উজ্জ্বলতা কিছু কমে গেছে কেবল। সেদিনের সে-কাহিনীর প্রত্যক্ষদর্শী আজ কেউ না থাকলেও পরবর্ত্তী কালের দুই-এক জন বলতে পারে, থ্যাদার বাপ পরাণহরির ওপোর মাঝে-মাঝে মায়ের ভর হতো, ফলে অনেকে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিরও ঔষধ পেয়েছে সেই অবকাশে।

কিন্তু, থ্যাদা যে সৌভাগ্য-বঞ্চিত। ভাগ্য-বিড়ম্বনাতেই হোক, আর যাতেই হোক, কু-লোকে তার নামে কু-ব্যাখ্যাই করে আসছে এত কাল। তাই বংশ-গৌরবের নিদর্শন থ্যাদার বিড়ম্বিত ভাগ্যে এক কণাও জোটেনি এত দিন, জুটেছিল অপযশ। আর সে অপযশ দিয়েছিল ঐ প্যানা চৌকীদার।

অন্ততঃ থ্যাদা তো তাই বলে। বলে : ওর ওপোর প্রাণকেষ্ট অর্থাৎ প্যানার রাগ বহু কালের। তাই যে রাত্রে মনসা-ভাসানের গানে হাটতলা জনবহুল, সেই রাত্রে পুলিশ-পেয়াদা এনে থ্যাদার হাতে দড়ী পরিয়েছিল চৌর্য্য অপরাধে।

সেদিনের স্মৃতিটা জ্বল্-জ্বল্ করে মনে পড়ে থ্যাদার। সেদিন শিশু ঝড়োকে কোলে নিয়ে তার মা আন্না গিয়েছিল গান শুনতে। আর সে? সে কোথায়, কি অবস্থায় ছিল, সে কথা আজ না তোলাই ভালো। কেবল মনে আছে, জুড়ীর দল তখন সবে মাত্র গান ধরেছে—

"ও হায় কান্দে রে!—
মায়ে কান্দে, বাপে কান্দে, কান্দে সতী নারী,—
সাপে খাইল লখীন্দরে, বেউলো হইল রাঁড়ী—
সতী কান্দে রে!···"

সেদিন হুস্-হুস্ শব্দে হাতের বিড়িটা নিঃশেষ করে প্যানা চৌকীদার বাকীটুকু ছুঁড়ে ফেলে হেসেছিল,—তীক্ষ্ণ হাসি। সে হাসি, সেদিন থ্যাদার অন্তরের যেখানেই বিঁধুক, কালক্রমে তার আঘাতটা সহনীয় হয়ে এসেছিল, সইতও—অন্তত প্যানা যদি না আবার দীর্ঘ দিন পরে ওর মা-মরা ছেলে ঐ ঝোড়োর ওপর কটাক্ষপাত করতো।

সেই কথাগুলো আজ এই নিস্তব্ধ রাত্রেও মনে পড়ে গেল হঠাৎ। কানে এলো প্যানা চৌকীদারের কণ্ঠস্বর। এই ঝড়-জলের রাত্রেও চৌকী দিতে সে বার হয়েছে সাতবাঁকার পথে।

থ্যাদার দরোজায় দাঁড়িয়ে প্যানা যথারীতি ওর কর্ত্তব্য শেষ করলে, বললে : "বলি থ্যাদা, ও-থ্যাদা, জেগে আছ?···"

গভীর বিরক্তিতে থ্যাদার মুখখানা বিকৃত হলেও কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে জবাব দিলে : "আছি গো!—"

প্যানা শুধোলে : "আর ঝোড়ো?—"

ঘরের মধ্যে থেকে থ্যাদার জবাব এলো : "ও! তার তো এ্যাকোন য়্যাক্ পহর রাত। কানের কাছে বাগ ডাক্‌লেও সাড়া মিলবে না। আর বলবোই বা কি খুড়ো, সারা দিন ঘুরা-ফেরায় ওর খাটা-খাটুনির শরীল, পড়েচে কি মরেচে!"

প্যানার জিহ্বা এবং কণ্ঠতালুও বোধ হয় এই সজল রাত্রে থ্যাদার ঘরের দরোজায় দাঁড়িয়ে এক ছিলিম তামাকের তৃষ্ণায় শুকিয়ে উঠেছিল, কিন্তু থ্যাদা উঠলো না। বললে : "আর আমার কত্তা বলবে? তা আমার এমন জ্বর এয়েছে যে হাত-পা নাড়াবার পর্য্যন্ত ক্ষ্যামতা নেই।"

এর পর, বারান্দায় দণ্ডায়মান তামাক-প্রত্যাশী প্যানার কানে আসে একটা প্রবল কম্পনের ক্ষীণ শব্দ···।

থ্যাদা কাঁপছে! শব্দ শোনা যাচ্ছে···"উঁ হুঁঃ হুঁঃ-হুঁ···" করে কাঁপতে কাঁপতেই থ্যাদা বলে : "কবে যে এ ভোগ থেকে মুক্তি পাব, তাই ভাবি খুড়ো! হি-হিঃ হিঃ!"

অগত্যা প্যানাকে বিদায় নিতে হয়। হাতের আলো ছাতার আড়ালে ঢেকে ও হাঁক দিতে দিতে চলে সখী বোষ্টমীর বাড়ীর দিকে। হাঁকের শব্দ ওর দূর থেকে দূরান্তরে চলে যায় ক্রমশঃ। হাতের আলোর রেখাও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতম হয়ে ডুবে যায় অন্ধকারের অতলান্তিকে।

থ্যাঁদার দৃষ্টিতে সেই অন্ধকারের মধ্যেও পরিপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় একটা ক্রুর—বৈর-নির্য্যাতনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

সখী বোষ্টমী থ্যাঁদারই প্রতিবেশিনী। থ্যাঁদারই ঘর আর হাতনের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটুকুন পার হয়ে গিয়ে সখীর বাড়ী পড়ে, সেইখানে সখীকে আজ প্রায় সুদীর্ঘ নয় বছর আগে নবদ্বীপ থেকে মালা-বদল করে এনেছিল মাখন বোষ্টম। কালে সেই মাখনের গঙ্গাপ্রাপ্তি হলেও ওর যা-কিছু বিষয়-আশয়, সহায়-সম্পত্তি—সব সখীর নামে লেখাপড়া করে রাখায় সখীর বাস এই গ্রামেই চিরস্থায়ী হয়, তা ছাড়া বোষ্টমের জাত-ব্যবসা অর্থাৎ প্রত্যহ গ্রামের প্রতি গৃহস্থের দরোজায় ভিক্ষা গ্রহণেও তার বাধে না।

সেই সখীই সে-দিন ভিক্ষা সেরে গ্রাম থেকে ফিরছিল অবসন্ন পদক্ষেপে। নিটোল স্বাস্থ্যের ওপোর থেকেও যেন ওর বিগত যৌবনের লাবণ্যটুকু ঝরে পড়তে চায়।

কণ্ঠ-সঙ্গীতের মৃদু সুরটাকে ভাঁজতে ভাঁজতে সখী হঠাৎ থ্যাঁদার বাড়ীর কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়ালো। শুনলে, থ্যাঁদা আর ওর ছেলে ঝোড়োর মধ্যে মহা কলরবে লঙ্কাকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে। যা প্রায় হয়েই থাকে!···

থ্যাঁদা তাই বলে চলেছিল: "শালাচ্ছেলে! কেবল বসে বসে ভাতের কুণ্ডু গিলবে, আর পাখম্যালা খেলে বেড়াবে এখানে-ওখানে আড্ডা দিয়ে? আর আমি মানে, শালার ধরা পড়েচি যত্ত-কিছুর চোরদায়ে,—নয়? য়্যাঃ, মাইরি আর কি!"

উত্তরে কানে এলো ঝোড়োর গর্জ্জন: "বাপ তুলো না বলছি,—শেষ পরে একটা যা-তা কাণ্ড হয়ে যাবে কিন্তুক্!"

আর এক পর্দ্দা কণ্ঠস্বর চড়িয়ে থ্যাঁদা বললে: "বটে! একবার নয়, একশো বার, হাজার বার ব'লবো শালাচ্ছেলে! বলবো না? আলবৎ বলবো,···কি করতে পারিস্ তুই আমার, তাই বে!···"

প্রতিবাদের ইচ্ছাতেই বোধ হয় ঝোড়ো উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু পারলে না। মাঝপথে সখীকে দেখেই উদ্যত হাতখানা নামিয়ে নিয়ে ঝড়ের বেগে বাড়ীর বার হয়ে গেল!

থ্যাঁদাও হঠাৎ তাকে বাধা দিতে পারলে না; কেবল, সখীর দিকে সকাতর দৃষ্টিপাত করে বললে: "দেখলি সখি! নিজের চোখে দেখলি! হাজার হোক, আমি যকোন তোর বাপ—তকোন এমনি ব্যাভার আমার ওপোর করাটা কি তোরই উচিত? এ-রম করলে কোন বাপের কোন ব্যাটার ওপোর ছেদ্দা-ভক্তি থাকে, তুই-ই বল?"

সখী হয়তো এ স্থলে কোনও জবাব দেওয়াটা সমীচীন বোধ করলে না, আর করলে না বলেই মুচকি হেসে ধীরে-ধীরে সামনের পথটুকু পার হয়ে গেল।

কালীতলায় যাত্রা বসেছে; যাত্রাটা জমেছে বেশ। দূর থেকে হ্যাচাকের আলো উজ্জ্বল হয়ে চোখে পড়ে, আর কানে আসে মানুষের কলগুঞ্জন।

বেসুরো হারমোনিয়ম আর ডুগি-তবলার শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গেও শোনা যায় যাত্রা-দলের গায়কদের গান। থ্যাঁদার ছেলে ঝোড়ো তখন রাজার পোষাক পরে সবে মাত্র গান ধরেছে:—

"শিকলি-কাটা ময়না পাখী
আয় না তোরে হিয়ে রাখি—"

আলো জ্বলছে। এদিকে ওদিকে জনসমুদ্র। এরই মধ্যে এক ধারে পুরুষ আর এক ধারে মেয়েরা রং-বেরংয়ের শাড়ীতে সমুজ্জ্বল। সখীও ওরই মধ্যে বসে মাথায় একটু কাপড় টেনে দিয়েছিল। ঝোড়ো ওর দিকেই লক্ষ্য করে গান ধরেছিল কি না, কে জানে, কিন্তু সখী মুচকী হেসে ওরই উদ্দেশ্যে মধুর সম্ভাষণ জানালে: "আ মুখপোড়া!"

সেই মুহূর্ত্তেই একটা বিভ্রাট ঘটে গেল অকস্মাৎ—বিভ্রাটটা আর কিছু নয়, প্যানা চৌকীদারের অকস্মাৎ বীরত্ব-প্রকাশ।

দর্শকদের মধ্যে থেকে প্রাণকেষ্ট যেন ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো ঝোড়োর ওপোর এবং তার পরেই যাত্রার আসরময় লাফিয়ে গড়িয়ে উভয়ের মধ্যে চললো গজ-কচ্ছপের মহাসমর।

ভয়ার্ত্ত দর্শকবৃন্দ রসভঙ্গ করে যে যেখানে পারলো অদৃশ্য হলো তখনি, একলা কেবল দাঁড়িয়ে রইল সখী।

নিমেষে যে এ কাণ্ড ঘটে যাবে, সে কথা সে-ও ভাবেনি বোধ হয়, তাই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে থ্যাঁদাকে লাঠি হাতে নিয়ে রঙ্গভূমি মধ্যে প্রবেশ করতে দেখেই ও ডুকরে কেঁদে ওঠলো—"দোহাই তোমার! ব্যাগাত্তা করছি থ্যাঁদা, কাউরে যেন জখম করো না, তার চেয়ে ছাড়িয়ে দাও বরঞ্চ!···"

ওর অনুরোধের ফলে কি না ঠিক বোঝা গেল না, তবু থ্যাঁদা যখন দু'টো সবল হাতে দু'জনকে দু'দিক্ থেকে আটকে ফেললে, তখন কারোই ক্ষমতা রইলো না সে বজ্রমুষ্টি ছাড়িয়ে যাবার।

প্যানার গর্জ্জন-ধ্বনি তবু থামে না! কালীতলা আর কঙ্কনা কূলে কূলে যেন তার তীব্র চীৎকার-ধ্বনি ভেসে বেড়াতে লাগলো—"মেয়েছেলের অপমান! গোল্লায় গেছে, বনে গেছে, একেবারে গেছে! যাবে না! য্যামন বাপ তার তেমন ব্যাটা হবে তো?" বলতে বলতে আর একবার সে ঝোড়োকে মেয়েদের সম্মান-জ্ঞান সম্বন্ধে সমুচিত শিক্ষা দেবার চেষ্টায় থ্যাঁদার বজ্রমুষ্টি ছাড়াবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না।

সুখে-দুঃখে কিম্বা ভাবনা আর নির্ভাবনাতেই হোক, এর পর কয়েক সপ্তাহ কেটে গিয়েছিল সখী বোষ্টমীর। সেদিনও সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রদীপ জ্বেলে সে একলা বসেছিল দাওয়ায় আঁচল পেতে। মনটা অকারণেই আজ যেন কেমন একটা ঔদাস্যে ভরে উঠেছিল, কিছু ভালো লাগছিল না। ঘরে অন্ধকার, এরই একটা পাশে আলোকিত করে যে প্রদীপ জ্বলছে সে প্রদীপের আলোয় দেখা যায় নবদ্বীপ থেকে আনা মাখন বোষ্টমের রাধেকৃষ্ণ মূর্ত্তি, গোপাল মূর্ত্তি এবং আরো সব ধর্ম্মাবতারের মূর্ত্তি-প্রতিমূর্ত্তি, আজও লাল শালুর আসন অধিকৃত করে সসম্মানে পূজা পেয়ে আসছে সখীর কাছে

লক্ষ্য হলো টাটকা রাখা
SALES
★ সেল্‌স ম্যানেজার
ব্রুক বণ্ড-এর অতুলনীয় সরবরাহ ব্যবস্থার
ইনি হলেন পরিচালক। এঁর অভিজ্ঞতা মূল্যবান,
ক্ষমতা প্রচুর ; অধীনস্থ কর্ম্মীদের ইনি সঙ্ঘবদ্ধভাবে পরিচালিত
করেন। সেল্‌স ম্যানেজার এবং তাঁর কর্ম্মীদের একই লক্ষ্য—সে
লক্ষ্য হচ্ছে এই বিশাল দেশের প্রত্যেকটি দোকানে নিয়মিতভাবে ব্রুকবণ্ড
চা-এর সরবরাহ বজায় রাখা—স্বাদে ও গন্ধে যে-চায়ের তুলনা নেই।
Brooke Bond Tea
Brooke Bond Tea
ব্রুক বণ্ড চা
দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি

থেকেও, কিন্তু মাখনের মত পূজা সে করতে পারে না। কোথায় যেন নিষ্ঠার—একাগ্রতার ত্রুটি হয়!

সখী ভাবে। আজও তেমনি কোনও কিছুই ভাবছিল হয়তো। হঠাৎ বেড়ার ও-পাশের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে সচকিত হয়ে উঠলো। প্রশ্ন করলে,—"কে-ও, ওখানে দাঁড়িয়ে কে?"

যে দাঁড়িয়েছিল, সে মিহি সুরে জবাব দিল:—"আমি, আমি গো। আমি পাণকেষ্ট।" সখী ডাকলে—"তা ওখানে কেন, বাড়ীর ভেতরেই এসো না হয়, জাত তো আর যাবে না।"

"প্যানা হেসে উঠলো অকারণেই। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে আসতে সসঙ্কোচে জানালে—"কি যে বল বোষ্টমী—মানুষ থাকলেই মানুষের বাড়ী যাতায়াত করে থাকে, তার সঙ্গে জাত-বিজেতের সম্বন্ধ কি?"

সখী আসন পেতে দিয়েছিল, এইবার ঘরের কোণে রাখা প্রদীপটিকে এনে এমন জায়গায় রাখলো, যার আলোয় প্রায় প্যানার কদর্য্য মুখখানাও স্পষ্ট দেখা চলে।

প্যানা নিজেই আসনখানা টেনে নিয়ে বসলো। বললো—"বিনা কারণেই খ্যাঁদার ছেলেটা আমার ওপর যে রকম মার-মূর্ত্তি হয়ে এলো, তাতে অন্য কেউ হলে—হুঁ!"

সখী হঠাৎ কোন জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলে—"চা খাবে একটুকুন চৌকীদার, চড়াব?"

প্যানা মধুর হাসি হাসলো। পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরালো দিয়াশলাই জেলে। তার পর সকৌতুকে বললে—"অমৃতয় অরুচি কার গা বোষ্টমী? তবে যদি না তোমার কষ্ট হয়, তবেই—"

বাকী কথাটা ওর মুখের মধ্যে থাকতেই সখী উঠে গেল এবং এক আঁটি খড়ের জ্বাল দিয়ে পাথর-বাটিতে ঢেলে যে চা-টুকু তৈরী করে নিয়ে এলো, তার গন্ধ কি বর্ণ বিশেষ কিছু না থাকলেও মহা পরিতৃপ্তিতে সেটুকু উদরস্থ করতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করলো না প্রাণকেষ্ট; এর পরের নানা গল্প-গুজবে সময় কাটিয়ে প্রাণকেষ্ট সেদিন যখন সখী বোষ্টমীর কাছ থেকে বিদায় নিলে, তখন রাত্রি গভীর।

চারি দিকে একটা গভীর নিস্তব্ধতা থম্-থম্ করছে।…এরই মধ্যে সখীর আলোয় সামনের খানিকটা জায়গা দেখে নিয়ে পথে নেমে পড়লো প্যানা; প্রদীপ নিয়ে সখীও ফিরে গেল। একা পথ চলতে চলতে প্যানার আজ এই সর্ব্বপ্রথম সমস্ত গা ছম্ ছম্ করে উঠলো একবার, তার পর অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করলে—"রাম্, রাম, রাম্, রাম!……"

এর কয়েক মাস পরে।……

কালীতলায় বসে খ্যাঁদা তাকিয়েছিল কঙ্কনার দিকে।……

মঙ্গলবার।…পূজো আসবে অনেকের অনেক শুভাশুভের, মানত অমানতের। এরই অপেক্ষায় চুপ করে বসেছিল খ্যাঁদা।…দৃষ্টি তার বহু দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত।

কঙ্কনার জল ছোট-ছোট ঢেউ তুলে ছুটে চলেছে; আর ওরই মধ্যে ডুব দিচ্ছে পানকোউড়ীর দল।…দুই-একটা জেলে-নৌকা চলে যাচ্ছে—দাঁড় টানবার ছপাছপ শব্দ করে; ওপারে কেউ গানও ধরেছে হয়তো। হঠাৎ কালীতলার অন্ত প্রান্তে দেখা গেল দুই জন কনেষ্টবলকে। আগে আগে আসছে প্যানা চৌকীদার।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনে এসে দাঁড়ালো প্রাণকেষ্ট। তার পর শুকনো শির-ওঠা হাতখানা নেড়ে জিজ্ঞেসা করলে—তোমার ছেলে কোথায় হে খ্যাঁদা—?"

খ্যাঁদা সচকিতে ফিরে তাকালো; দেখলে প্যানার শুকনো বিবর্ণ ওষ্ঠাধরে আজ আবার সেই হাসি দেখা দিয়েছে—যে হাসি আর এক দিন তার হাতেও দড়ী পরাবার সময় দেখা দিয়েছিল। প্যানার কথার কোনও জবাব অত তাড়াতাড়ি দিল না খ্যাঁদা। একটু পরে আড়-চোখে একবার প্যানার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল—"কোতায়, তার আমি কি জানি?…কেন, তার খোঁজ কিসের জন্যে?"

প্যানা মুখ ভেংচালো—"জানো না কিসের জন্যে? ন্যাকা না কি—?"

কনেষ্টবল দু'জন এগিয়ে এলো। ভেংচি কেটেই প্যানা বললে—"বলি, কাল রাতে সে কোতায় ছিল হে ধর্ম্মপুত্তুর?…সত্যি কথা বলবে,—বিশেষ এই মায়ের থানে বসে!…"

খ্যাঁদা এবার চীৎকার করে উঠলো:—"মুক্ সামলে কতা বলবে বলচি,…নইলে…"

প্যানা এগিয়ে এলো, বললে:—"নইলে কি? কি করতে পারবে তুমি আমার, তাই শুনি?"

শোনার অবকাশ হলো না আর, এই সময়ে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় ঝোড়োকে প্রবেশ করতে দেখা গেল রঙ্গমঞ্চে, তার পেছনে সখী।

ঝোড়ো বললে,—"চৌকীদার ঠাকদ্দা, বাবাকে হায়রাণ করো না, তার চেয়ে যা জিজ্ঞেস করবার তা আমায় শুধোও,—আমিই জবাব দেব তার।"

প্যানা এবার আরো এগিয়ে এলো, ওর রহস্যজনক দৃষ্টিপাতের উত্তরে কনেষ্টবল দু'জন এসে ঝোড়োর হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দিতেই খ্যাঁদার কণ্ঠে একটা অস্পষ্ট আর্ত্তস্বর শোনা গেল—"ই কি? বলি, ই কি তাজ্জব ব্যাপার!…য়্যাঁ, ই কি?"…যেন অনেক দিনের অনেক বিশ্বাস, অনেক আশা—যা সে এত দিন ঝোড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল, এই এক লহমায় সে আশা সমূলে উৎপাটিত হয়ে গেল কোনও একটা আকস্মিক ঝঞ্ঝায়।

ওর বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে প্যানা হেসে উঠলো; হাসলো সখীও, কিন্তু ঝোড়োর মুখে কোনও জবাব এলো না। যেন আজই প্রথম সে খ্যাঁদার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলে—জেনে হোক, আর না জেনেই হোক, কত বড় অপরাধ সে করেছে!

খ্যাঁদার চোখের সুমুখে দিনের আলো যেন নিবে এলো, সেই সঙ্গে কানে এলো—ঝোড়োর অপরাধের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বসম্মত প্রমাণ!

সে গত কাল রাত্রের কোনও ডাকাতি-কেসের আসামী, এবং সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে তার ঐ মাথার ক্ষতস্থান। খ্যাঁদা শিউরে উঠে চোখ বোজে, তার পর তাকিয়ে দেখে, ঝোড়োকে ওরা নিয়ে চলেছে প্যানারই প্রদর্শিত পথে—কাঁড়ির দিকে।

এর পরেও—দিন চলে যায়।…

খ্যাঁদার দিন কাটে বদ্ধ-অবরুদ্ধতার মধ্যে—ব্যাকুলিয়া ধরে

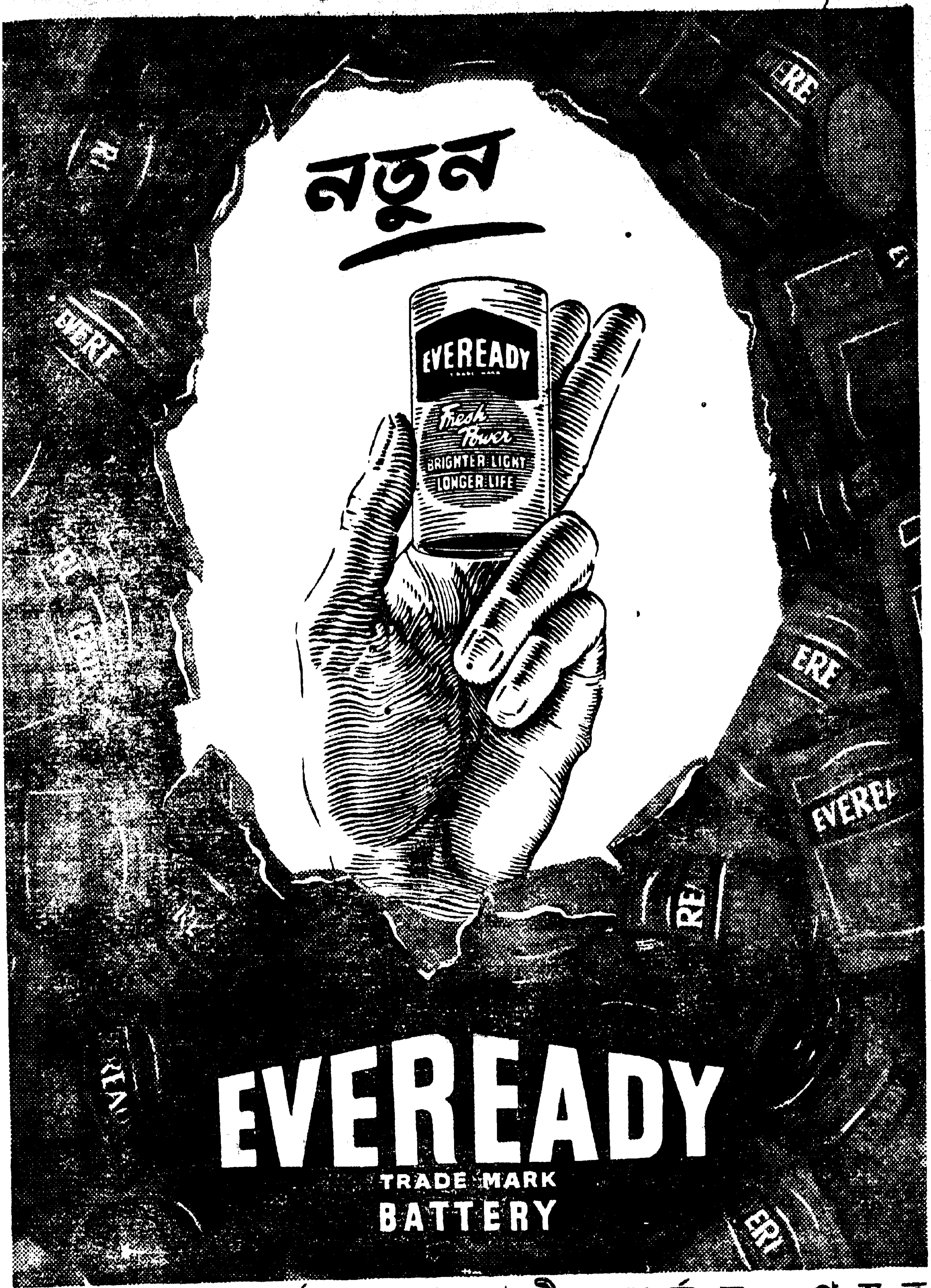

ন্যাশনাল কার্বন কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুত

ভুগে, আর অসুস্থ শরীরে প্রতিবাসীদের সাহায্য ভিক্ষা করে। খ্যাদার সেই সবল বাহু আজ শিরা-বহুল, দুর্বল; চোখের সম্মুখেও অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠে অকারণে। খ্যাদা হাঁপায়।

বহু দিন হ'লো, দোড়ো শহরের জেলখানায় আবদ্ধ; কবে সে মুক্তি পাবে খ্যাদা তা জানে না,—জানবার উৎকণ্ঠাও যেন নেই তার। কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে—প্রাণকেষ্টর অনুগ্রহে সখী বোষ্টমীর কাঁচা-ঘরের পরিবর্তে তৈরী হচ্ছে পাকা ইমারত, আর তার গায়ে পড়ছে চুণ-বালির প্রলেপ। খ্যাদা তাকিয়ে থাকে।···তাকিয়ে তাকিয়ে কাঁপে চোখের পাতা দু'টো, কাঁপে সমস্ত মনটাও বোধ হয়! তার পর বোধ হয় অজ্ঞাতেই হাতখানা এসে থামে মন্ত্রপূত সেই খাঁড়াখানার ওপোর—যেখানা আজও কালীতলার কয়েকখানা পাথরের ওপোর প্রতিষ্ঠিত থেকে গ্রামবাসীর ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্জন ক'রে চলেছে।···সেই খাঁড়াখানাই আবার যেন নতুন হয়ে খ্যাদার দৃষ্টির সম্মুখে ঝক্-ঝক্ করে!···কোন্ অলক্ষ্য পুরী থেকে কে তার কাছে প্রার্থনা জানায়:—"রক্ত দে রে, রক্ত দে! বড় খিদে—"

খ্যাদা শিউরে ওঠে···।

রাত্রি গভীর।···

আর এক দিনের মত অবিশ্রান্ত জল ঝ'রছে আকাশ থেকে, মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎও দেখা যাচ্ছে আকাশের এক-এক দিকে।

—স্বন্-স্বন্-স্বন্!

বড় হাওয়া!···গায়ের কাপড়খানা গায়ে টেনে সখী ঘুম-কাতর চোখে বিছানার ওপোর উঠে বসেই চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—"কে, ও কে?···"

দরোজার পাশে যে মানুষটা এসে আলো-অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল, সে অকুণ্ঠ পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো একেবারে সামনে। সখী দেখলে ওর হাতে সেই খাঁড়া—যে খাঁড়া প্রতিদিন কঙ্কনার তীরে ফুলে-চন্দনে আর সিন্দূরে ঢাকা থাকে। সখী বিদ্রুপের মত উচ্চারণ করলে—"তুমি, খ্যাদা তুমি?···"

কিন্তু এ যেন খ্যাদা নয়, খ্যাদার প্রেতাত্মা। তাই শুক্‌নো, ফাটা ঠোঁট দু'টোকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে খ্যাদা জবাব দিলে—"হ্যাঁ, আমি খ্যাদা! আমিই এসেছি আজ প্যানা চৌকীদারের খোঁজ নিতে। বল—কোতায় সে?···সে কোতায়···লুকিয়েচিস্ তাকে?"

সখী এবার কেঁদে উঠলো ককিয়ে:—"মাইরি বলচি খ্যাদা, আমি জানি নে প্যানার কথা, মাইরি জানি নে!···"

সঙ্গে সঙ্গে খ্যাদার বজ্রমুষ্টি ওর কণ্ঠশ্বাস রুদ্ধ করবার জন্যে এগিয়ে আসে,—অনলবর্ষী দৃষ্টিতে সে সখীর দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করে—"য়্যাকনও? য়্যাকনও মিচে কতা? আমার ছেলেটাকে যাবজ্জীবনের জন্যে জেলখানায় পাঠিয়েও?···য়্যাঁ!"

সখী আর কিছু শুনতে পায় না, দেখতেও পায় না চোখে কেবল মনে হয়, খ্যাদার হাতের খাঁড়াখানা সবেগে এগিয়ে আসছে তারই দিকে,—তাকেই লক্ষ্য করে!

সখী চীৎকার করতে যায় প্রাণপণে, কিন্তু পারে না; চারি দিকের অন্ধকারের মধ্যে ওর অসহায় হাত দু'খানা যেন কোন আশ্রয় অন্বেষণ করে আকুল চেষ্টায়—তার পর লুটিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালের আলো পৃথিবীর বুকে এসে পৌঁছাতেই সাতবাঁকীর প্যানা চৌকীদার আর গ্রামবাসী সবিস্ময়ে আর সভয়ে দেখলে, সখী বোষ্টমকে কে তার ঘরেই শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা ক'রে গেছে; আর কঙ্কনার কালীতলায়, বেদী আঁকড়ে ধরে রক্তাক্ত দেহে উপুড় হয়ে পড়ে আছে খ্যাদা ডোম।

মুখে আজ তার পরম সান্ত্বনার আশ্বাস; এখনো হাতের মুষ্টিতে তখনও সেই সিন্দুর-মাথা খড়্‌গখানার একটা প্রান্ত ধরে থাকতে দেখা যায়! সে খড়্‌গের ওপোর থেকে সিন্দূরের আর চন্দনের দাগ তখনও সম্পূর্ণ মিলায়নি, কেবল তারই ওপোরে খ্যাদার বুকের রক্তের গাঢ় একটা ছাপ লেগেছে মাত্র।···

গ্রামবাসীর সঙ্গে প্যানা চৌকীদারও একবার সভয়ে চমকে ওঠে,—তার পর আকুল কণ্ঠে উচ্চারণ করে "মা, মা গো, রক্ষে করো,—বাঁচাও আমাদের, আমরা কিছু জানি নে, কিছু বুঝি নে, নির্দ্দোষী আমরা, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী!"

উৎসুক

রাজলক্ষ্মী দেবী

তোমার কাছে শিখব প্রীতির রীতি,—
এই মিনতি রাখতে আমায় হবে।
আকাশ-ভরা পূর্ণিমাসীর তিথি,
তারার মেলা মিলন-মহোৎসবে।

তোমার কাছে শুনব, কেমন সুরে
দখিণ বাতাস কয় কুসুমের কানে,
জানব আমি, আকাশ-ভুবন জুড়ে
কোন্ কথাটি বাজছে গানে গানে।

নাই বলিলে, সময় যদি লাগে,
কোন্ কথাটি তোমার মনে আছে,
নিখিল ধরা ভরা যে-অনুরাগে,
তার কথা আজ বোলো আমার কাছে!

আমার ছেলে হওয়ার সময়
জীবাণু-সংক্রমণের
কথা ভেবে ভয় হয়েছিল
দাই বললে
একটুও ভেবোনা, আমি তখন 'ডেটল' ব্যবহার করব
প্রসবের সময়
চমৎকার—'ডেটল' যখন রয়েছে তখন আর সংক্রমণের ভয় নেই
একটি ফুটফুটে ছেলে হয়েছে আপনার—আর 'ডেটল'-এর গুণে আপনার স্ত্রী এখন ভালই থাকবেন
দাই বলে
ডাক্তাররা সব প্রসূতিকেই প্রসবের সময় 'ডেটল' ব্যবহার করতে পরামর্শ দেন এবং বাড়ীতেও সর্ব্বদা 'ডেটল' রাখতে বলেন।
'DETTOL'
এটলান্টিস (ইষ্ট) লিঃ. ২০-১, চেতলা রোড, কলিকাতা

যে ঘরে হোলো না খেলা

- ইউ-তা-ফু

সুখবঞ্চিতা নারী!

এই নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে আমি একা বসে আছি। বাড়ীতে যারা ছিলো সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। চারি পাশের এই শব্দহীন শান্ত পরিবেশে আমার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ কোরে জেগে আছে—একাকীত্বের নিবিড় অনুভূতি—আমার সমস্ত ভাবনাগুলি যেন কোন অজানা ব্যথার সুরে গাঁথা।

এখন সাড়ে তিনটা বেজে গেছে। বাইরে পথের উপর সূর্য্যকিরণ ঝলমল কোরছে; বাতাসে ভেসে আসছে বসন্তের সৌরভ। কিন্তু সেই বাতাস আমার ঘরে এমন বিষণ্ণ, এমন বদ্ধ হোয়ে উঠছে কেন? সবুজ মাঠের কোলে, পীচ-গাছের ছায়ায়, লাংহোয়ার শ্যামল বীথিতে কত তরুণ-তরুণীর সমাবেশ, কত রঙের খেলা, ঘন নীল আকাশের নীচে ভেসে যাচ্ছে তাদের হাসি গানের সুর। কিন্তু আমার জানলার ধারে, আমার ব্যথিত আত্মার সম্মুখে সেই আকাশকেই এমন একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মত মনে হয় কেন? কেন আমার দেহ, মন, প্রাণ নব জীবনের এই স্পন্দনে সাড়া দিচ্ছে না? বসন্তের এই উষ্ণ-মধুর সোহাগে, প্রকৃতির বুকের কচি কিশলয় আজ শ্যামল বীথিতে পরিণত, কিন্তু এই মধু ঋতুতে আমি কেন যোগ দিতে পাচ্ছি না? হায় রে নারী! যাকে ভালবাসলে ধন্য হোতো এ জীবন,—তবু যাকে ভালবাসতে পারি না! সমস্ত পৃথিবীর উপর আমার ঘৃণা, নিজেকেও ঘৃণা করি কেন জানো? তোমার উপর আমার পাশবিক নিষ্ঠুর অত্যাচারের জন্য।

তুমি চলে যাচ্ছো, হয়ত এতক্ষণ তোমার ট্রেণ সান কিয়াংও ছাড়িয়ে গেছে। কল্পনায় তোমার ছবিখানি আমার চোখের সামনে মূর্ত্ত হোয়ে উঠছে। তুমি বসে আছো, তোমার কালো চোখের উদাস দৃষ্টিখানি পাঠিয়ে দিয়েছো সবুজ মাঠের বুকে রাঙা মাটির পথে পথিকদের উপর। কি ভাবছো তুমি? সে তো বলা কঠিন নয়—তোমার ঐ কালো চোখের কাণায় কাণায় যে জোয়ার এসেছে। তোমার মনে জেগে উঠছে একে একে—তোমার উপর আমার নিষ্ঠুর আচরণের সব স্মৃতি—যখন আমরা দু'জনে একসঙ্গে ছিলাম। নারী! যাকে ভালোবাসা আমার আদর্শ, কিন্তু তবুও যাকে পারি না বাসতে, সেই তুমিই শোনো—অতীতের সব কিছুর পরিবর্ত্তে, আমার অন্তরের অন্তরতম স্থলে ছিলো তোমার প্রতি নিবিড় সহানুভূতি—আমার সেই সব অপমান, অত্যাচার, গালি আসলে কি তা জানো? সে হোচ্ছে আমাদের সমাজ, যেখানে আমাদের মত লোকের সৃষ্টি হয় তার প্রতি চরমতম ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ। সত্যি যদি তোমায় আমার মনের ভিতরটি উন্মুক্ত কোরে দেখাতে পারতাম, তবে হয়তো আমার সব অত্যাচারই তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সম্ভব হোতো।

আমার মনে হয়—আজ চিং মিংএর উৎসব, প্রকৃতির বুকে তরুণ-তরুণীর আনন্দ সম্মিলন। হয়তো তুমি তোমার গাড়ীর জানলা থেকে অনেককেই দেখতে পাচ্ছো। আচ্ছা, এই দৃশ্য তোমার মনটিকে আমার উপর আরও বিরূপ কোরে তুলছে না? আমায় ঘৃণা কোরেই যেন তুমি সান্ত্বনা পাও—তোমার মনের অনুভূতিগুলি তার ভিতর নিবিড় কোরে ফুটে উঠুক। তুমি প্রার্থনা করো, যেন আমার এই জীবনের শীঘ্রই অবসান ঘটে। কিন্তু হায় রে অভাগিনী, আমি জানি তুমি তা কোরতে পারো না—তুমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অক্ষম, এমন কি যে মুহূর্ত্তে তুমি চেষ্টা কর, সেই মুহূর্ত্তে আবার আমাকে ক্ষমা করার জন্য কারণ খুঁজতে চাও। তোমার মনটি যে কি কোমলতায় ভরা—সে বিষয়ে কি কোনো প্রশ্নই জাগে?

জানি না কতগুলি (কিম্বা ক'টি মাত্র) দিন আমরা এক সঙ্গে কাটিয়েছি। আমাদের বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা—সে যেন ছিলো বিধির বিধান। তুমি জানো যখন আমি সাগর-পারে চলে যাই, তখন আমার বয়স সতেরো। তবু ঐ বয়সেও নিজের বাড়ীর চেয়ে যে কোনো অজানা-অচেনা, এমন কি কঠিন পরিবেশের মধ্যেও থাকতে ভালোবাসতাম। আমি আটটি বছর ঘর-ছাড়া হোয়েছিলাম, এই সুদীর্ঘ দিনগুলির মধ্যে এমন কি শীত-গ্রীষ্মের অবকাশের সময়ও একটি বারের জন্য বাড়ী ফিরিনি। কেন তা জানো? কারণ বিবাহের প্রতি আমার নিবিড় ঘৃণা ছিলো—না, না, তোমার উপর নয়—ছিলো শুধু ঐ আগে থেকে স্থির কোরে রাখা সেকালের বিবাহ-প্রথার উপর। আমি ঠিক কোরেছিলাম বিদ্রোহ করবো—তাই যত দিন জাপানে ছিলাম তত দিন বিবাহ কোরতে পারিনি।

অবশেষে চার বছর আগের এক গ্রীষ্মকালে আমি ফিরে এলাম। তার পরই আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বিবেকের বিরুদ্ধে বিবাহে সম্মতি দিতে বাধ্য করা হোলো। আমাদের দেশের সেই চিরকালের কঠিন প্রথা বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙতে দিলে না। তোমার মা, বাবা, আর দেরী করা উচিত নয় বলে জোর কোরতে লাগলেন, আর আমার মা চোখের জল ফেলে 'অবাধ্য সন্তান' বলে আমাকে অভিযুক্ত কোরলেন। চার পাশের এই হৃদয়হীন লোকগুলি—এরা যেন জোর কোরে আমাদের এক অবাঞ্ছিত মিলনে বেঁধে দিলে। আমার সে বিদ্রোহ ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হোলো। তাই বলছি, আজকের এই ব্যর্থ পরিণামের জন্য আমরা তো দায়ী নই—আমাদের বাপ, মা এমন কি, সমগ্র চীন দেশ দায়ী। কিন্তু এত দিন ধরে এর কৈফিয়ৎ দিতে অস্বীকার করা আমার উচিত হয়নি।

উৎসবটা তোমার কাছে খুবই অস্বস্তিকর হোয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু আমি তা নিয়ে একটুও মাথা ঘামাইনি। আমি ভেবেছিলাম যখন সহ্য কোরতেই হবে, তখন এ নিয়ে আন্দোলন না করাই ভালো। অতিথি-সমাগম, আদর-অভ্যর্থনা—আইন অনুযায়ী কাজ—সে সব কিছুই হয়নি—এমন কি দু'টি দীপও জ্বলেনি। এখান থেকে ২২ লী দূরে তোমাদের বাড়ী; তুমি এলে সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে। একটি ছোটো সিডান চেয়ারে তোমাকে আনা হোয়েছিলো। সে রাত্রে আমার মায়ের সঙ্গে একা-একাই তুমি খাওয়া শেষ কোরলে। তার পর নিজেই উপরে যাবার সিঁড়ি খুঁজে নিয়ে ছোটো বাঁধা পা দু'খানি ধীরে ধীরে ফেলে একা এসে ঢুকলে আমার ঘরে।

আমাকে বলা হোয়েছিলো, তুমি ম্যালেরিয়ায় ভুগছো। গভীর রাত্রে আমি এসে তোমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তোমার দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইলাম। তোমার পরনে ছিলো পাতলা পশমের একখানি রাত্রিবাস—দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে তুমি ঘুমাচ্ছিলে। আজও মনে জাগে, সে রাত্রে তোমার আকুল আকাঙ্ক্ষা-ভরা ব্যগ্র দৃষ্টি। আমি বিছানায় ঢোকবার সময় তুমি জেগে উঠলে, বাতির ম্লান আলোয় আমার দিকে স্তব্ধ হোয়ে চেয়ে রইলে। দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো, তোমার মুখখানি আরক্তিম, ঠোঁট দু'খানি কেঁপে কেঁপে

উঠেছিলো—আর কি করুণ ক্লান্তিতে তোমার কচি মুখখানি ম্লান হোয়ে উঠেছিলো। সে রাতের কথা ভেবে আজও চোখে জল ভরে আসে।

তুমি জীবনে সেই প্রথম সহরে এলে। তার আগের জীবন কেটেছে সেই ছোট্টো শান্ত পল্লীর বুকে। ছোটো থেকেই অন্তঃপুরে বন্ধ ছিলে, কখনও স্কুলে যাবার অনুমতিও পাওনি:—তাই বুঝি ছিলে অমন ভীরু, লাজুক মেয়েটি। কিন্তু চীন দেশে নারীর যে কর্তব্য, সে শিক্ষায় তোমার এতটুকু ত্রুটি হয়নি। মনে আছে আমাদের বাড়ী আসার সময় তুমি একটি ছোটো-খাটো লাইব্রেরী সঙ্গে এনেছিলে,—তাতে ছিলো, বিখ্যাত মহিলাদের জীবনী, আর ঐ ধরণের কত বই যা তোমাদের পরিবারে তোমাকে পড়তে হোয়েছিলো—জীবন সম্বন্ধে সব ধারণা যা' থেকে পেয়েছিলে। এ কথা খুবই সত্যি, পুরুষের মন আকর্ষণ কোরতে তুমি শেখনি, আধুনিক ধরণে বেশবাসও তোমার জানা ছিল না। কিন্তু 'কনফুশিয়াং'এর 'নম্র ব্যবহার' সম্বন্ধে যে উপদেশ ছিলো তার একটি বাণীও তুমি শিখতে বাকী রাখনি।

বিবাহের উৎসব শেষ হোলে সহরের গণ্ডী থেকে একটু মুক্তি পাবার জন্ম আমরা তোমার মা-বাবার কাছে গিয়েছিলাম—সেখানে মিলেছিলো সত্যিকারের আনন্দের স্বাদ, তখন যদি থেকে যেতাম! ……কিন্তু তোমার সেই বদ্‌মাইশ ভাইপোটা? সে তোমাকে সব সময় জ্বালাতন কোরতো, তার অত্যাচারে আমি রাগে জ্ঞান হারাতাম আর তুমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে। ঐ নিয়ে ঝগড়া-ঝাটির পরদিনই আমরা সহরে ফিরে এলাম। সেখানে দু'দিন থাকার পরই আমি অসুস্থ হোয়ে পড়লাম, তোমারও ম্যালেরিয়া সুরু হোলো। দু'জনেই তখন হতাশ, কিন্তু আমি অসুখটাকে তুচ্ছ করে এই বিশ্রী আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাবার জন্ম মরীয়া হোয়ে উঠলাম। তোমার মনে পড়ে, কতকগুলি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আমি বেরিয়েছিলাম, বাড়ী ফিরলাম সম্পূর্ণ মাতাল অবস্থায়, এসেই বিছানায় শুয়ে পড়লাম—বলো তো ব্যাপারটা ভারী অসহ্য হোয়ে উঠেছিলো না? তোমার সম্বন্ধে একটা আবছা চেতনা ছিলো আমার—মনে হয়, ম্লান আলোয় রাত্রির মত নিস্তব্ধ হোয়ে বসেছিলে। পরদিন ভোরে জেগে দেখি সেই একই ভাবে বসে আছো, সমস্ত রাতের মধ্যে একবারটিও বিছানার ধারে আসতে সাহস করনি। তোমাকে বলবার মত একটি কথাও সেদিন খুঁজে পাইনি। তুমিও বলনি একটিও কথা—এমন কি যখন চোলে যাচ্ছি তখনও না। ভোরের কিছু পরেই মা এসে খবর দিলে 'ডিয়ার হিল'এর তলায় জাহাজ দেখা যাচ্ছে। সেদিনের বিদায়ের স্মৃতিটি তোমার মনে গেঁথে দু'বছরের জন্তে তোমাকে ছেড়ে এসেছিলাম। তোমার চিঠিতে খবর আসতো বুড়ী ঠাকুমা আমাকে দেখতে চায়, কবে ছুটিতে বাড়ী যাবো সেই আশায় দিন গোণে। তুমি জানাতে, মায়ের বয়স দিন দিন বাড়ছে ছাড়া কমছে না তো, মাকে একটু তৃপ্তি দেবার জন্তেও আমার আসা উচিত। কিন্তু তাদের মত তোমার কথাটি তো তুমি জানাতে না। আর আমি তখন রাজ্যের অকর্মা বন্ধু জুটিয়ে জাপানী সুন্দরীদের মোহে মত্ত ছিলাম। চীনের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণও আমার ছিল না—সব দায়িত্ব ভার সম্পূর্ণ ত্যাগ কোরেছিলাম। স্বাধীন ভাবে বাঁচতে না পারলে জীবনে লাভ কি? অত্যধিক মদ খেয়ে দিনের মধ্যে অধিকাংশই মাতাল হোয়ে পড়ে থাকতাম। কতগুলি বিলাসিনী রূপসী যে আমার কাছে এলো আর গেলো, তা' আমার মনেও নেই—তারা যেন প্রাণহীন জড়পিণ্ডের রাশি। যাই হোক, আমাকে আমোদ দিতে পারলেই হোলো, আর কিছুতেই আমার এসে-যেতো না। কিন্তু এমন কোরে মদে ডুবে থাকা সত্ত্বেও তোমার কথা মনে পড়তো মাঝে মাঝে, আর তখনই যেন রাতের কালো অন্ধকারে স্নিগ্ধ হাওয়া বয়ে যেতো—আকাশে চাঁদ [illegible] আরও উজ্জ্বল। কখনও কখনও আকুল হয়ে [illegible] কাঁদতে নিজেকে ধিক্কার দিতাম আমার এই হতভাগ্য দশায় তোমাকে বেঁধেছি বলে।

গত বছরের আগের বছর [illegible] আমি চীনে ফিরে এলাম কিছু দিনের জন্ম, সেবারের মত অত [illegible] হোয়ে আমার ঘৃণা আর কখনও প্রকাশ পায়নি। তোমার কাছে না গিয়ে [illegible] আমার এক বন্ধুর অতিথি হোয়ে সেখানেই [illegible] মাস কাটিয়ে তার পর 'সাংহাই'তে গিয়ে নববর্ষ উৎসব শেষ করে 'টোকিও'তে ফিরে আসি। শেষে গত বসন্ত কালে যখন আমার থিসীস লেখা শেষ হোলো তখন জীবনের মুখোমুখী দাঁড়াবার জন্ম প্রস্তুত হলাম। রাশীকৃত বাক্স বইয়ের বোঝা নিয়ে 'সাংহাই'তে ফিরে কাজের চেষ্টায় ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু কি কাজ? কি-ই বা করবার ক্ষমতা ছিলো? তবে আমাদের গভর্ণমেণ্ট আর অশিক্ষিত দেশবাসীদের ধন্যবাদ—আমাকে অর্থাৎ একটি অকেজো, ভীরু লোককে—সমুদ্রপারে বৃত্তি দিয়ে শিক্ষার জন্ম পাঠানো হোলো। গভর্ণমেণ্টের ঐ সাহায্যে আমার খাবার-খরচই চলতো না, তবে নিয়মিত ভাবে টাকাটা হাতে পেতাম। তাছাড়া নানা রকম ফন্দী করে আমি মা আর ভাইদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতাম। তাইতে ঐ নব ঐশ্বর্য্যসম্ভার, ভোগবিলাসে ভরা রাজধানীতে পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করবার খুবই সুবিধা হোতো। কিন্তু তার পর এলো সেই নির্দ্দিষ্ট দিন—আমাকে লাইব্রেরীর সাহায্য ত্যাগ করে সরে যেতে হোলো। কয়েক জন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ইতিমধ্যেই ছাত্রদের বৃত্তি-ফাণ্ডটির ভার পেয়েছিলেন—গত জুনে আমার মাসিক বৃত্তিটা একেবারেই বন্ধ হোলো।

যাক্, সাহায্য তো বহু দিন ধরেই পেয়েছিলাম, বয়সও তখন ত্রিশের কাছাকাছি। সমাজের বাধা-বিঘ্ন সব-কিছুর ভিতর দিয়ে পথ করে নেবারই তো সময় তখন। তাছাড়া সে সময় আমি বিদেশের 'জাতীয় বিশ্ববিত্তালয়ে'র গ্রাজুয়েট, তখন আর মা-ভাইয়ের কাছে সাহায্য নেবার মুখ ছিল না। তুমি কি জানো? কেন গত গ্রীষ্মকালে বাড়ী ফেরবার আগে মাসখানেকেরও বেশী আমি সাংহাইতে ছিলাম? আর গোপন করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য এটা ঠিক যে, যত দিনের পথ-খরচ ছিলো তত দিন ধরেই গড়িমসি করার ইচ্ছাটাই ছিলো প্রবল, কিন্তু আরও একটা কারণ ছিলো। আমি জানতে চেষ্টা করছিলাম যে আমার আর বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে কি না। আমার হৃদয়ের সব উৎস শুকিয়ে গিয়েছিলো, পার্থিব প্রয়োজনের মত কিছুই বাকী ছিল না। এক দিন রাত্রে 'হোয়াংপু' নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলের বুকে ঢেউয়ের দোলা দেখছিলাম। তীব্র নিরাশায় আমার সমস্ত অন্তর ভরে গিয়েছিলো।

সমুদ্রপারের দিনগুলি কাটিয়েছি কি এক ভীরু বিদ্বেষণী মন নিয়ে। নিজের উন্নতির জন্ম কিছুমাত্র চেষ্টা ছিল না। একটাও প্রবন্ধ লিখিনি, একটি বাক্যের জন্যও ছাত্রদের উত্তেজিত তর্ক-সভায়

যাইনি, কিম্বা আর সব আধুনিক তরুণদের মত আমাদের গণ-আন্দোলনেও যোগ দিইনি। সর্ব্বদাই কেমন যেন বিমর্ষ বোধ কোরতাম। কোনো কাজে নিজের কাছ থেকে একটু সাড়া পেতাম না। কি জানি কি হোয়েছিলো আমার। এই অবস্থায় জীবনের মূল্য কিছু ছিলো কি? কোথাও কোনো কাজ, কোনো চাকরী খুঁজে পেলাম না—তাই শেষে মুক্তির সব চেয়ে ভালো উপায় ঠিক কোরলাম—অর্থাৎ আত্মহত্যা।

এই নেশা আমাকে আচ্ছন্ন কোরে তুললো। প্রতি রাত্রেই উঠে ধীরে ধীরে এসে হোয়াংপু নদীর তীরে দাঁড়াতাম। কিন্তু একটা সত্যিকারের প্রয়োজনীয় কিছু করবার জন্ত মন অস্থির হোয়ে পড়েছিলো। প্রয়োজনীয় কাজ অর্থে আমার আদর্শ ছিলো প্রথমতঃ অনেক টাকা পাওয়া, তার পর মদের প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে দু'-এক জনকে হত্যা কোরে জীবনের যবনিকা টেনে দেওয়া। যদি সে ধনী হোতো তবে তাকে হত্যা করলে সমাজের কল্যাণ হোতো, আর গরীব হোলে তাকে হত্যা কোরে তার ভারবাহী জীবন থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হোতো—তারও পরে? হোয়াংপুর জলে নিজেকে বিসর্জ্জন। তাছাড়া তুমি জান কি যে সারা ক্ষণ এই উন্মত্তের মত চিন্তা করার অবসরে একটি বারও একথা ভাবিনি যে আমার মৃত্যুর পর তোমার কি হবে? মা কি ঠাকুমার কথাও একবারও ভাবিনি। তুমি হয়তো বলবে আমার দায়িত্বজ্ঞান চিরদিনই নেই। সত্যিই তাই, আমি এতে কেমন একটা নিষ্ঠুর আনন্দ পেতাম। এর জন্ত দোষী কে জানো? প্রথমতঃ, আমাদের এই বর্ব্বর সমাজ যাতে আমাদের বাধ্য হোয়ে থাকতে হয়, অথচ কোনো উপকারেই আসে না, দ্বিতীয়তঃ, তোমার মা, বাবা যাঁরা তোমাকে এতটুকুও স্বাধীনতা আর আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেননি। সবার শেষে দায়ী আমার মা, আমাদের সমগ্র পরিবার আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা, মৃত্যুর পরেও যাঁদের প্রভাব এদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আমার অক্ষমতার কথা জানা সত্ত্বেও জেদ কোরে আমাকে এই বিয়েতে বাধ্য করা হোয়েছিলো। কিন্তু তখন এ সব কারণ মাথায় আসেনি, ভাবিনি তোমার কথা।

যদি ট— সেদিন রাত্তে অমন অপ্রত্যাশিত ভাবে 'এ্যাময়ে'র বন্ধুর কাছ থেকে ঐ চিঠিটা নিয়ে আমার বাসায় না আসতো তাহ'লে কি যে হোতো তা বোলতে পারি না। সাধারণতঃ ট—র সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎটা নেহাৎই একতরফা ছিলো, কারণ আমার নিমন্ত্রণের প্রতিদান ও কখনও দিত না। তাই জুনের সন্ধ্যায় তাকে হঠাৎ আসতে দেখেই আমি বুঝেছিলাম যে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষ খবর আছে। ঠিকই ভেবেছিলাম। আমার ভাঙা ডেস্কটার পাশে বসবার আগেই ও চিঠিটার কথা বোললে—"তুমি 'এ্যাময়'তে একটা শিক্ষকতার কাজ পেয়েছো—এখন কি বল?" তুমি তো জানো, এই শিক্ষকের কাজে আমার কি বিতৃষ্ণাই ছিলো, শিক্ষিতদের কাছে এটা যেন একটা বিশেষ শ্রেণীর নরক। প্রায় দু'মাস আমার কাছে থাকার পর তোমার এ সম্বন্ধে কোনো ভুলই থাকতে পারে না। সব চেয়ে বিশ্রী ব্যাপার যে, এই কলেজটা নানা রকম গোপন ষড়যন্ত্রে ভরা ছিলো—ক্ষমতাপত্তির পাবার আকাঙ্ক্ষায় কতকগুলি লোকের পরস্পর রেষারেষিই এর মূলে ছিলো; তাই যাঁরাই সেখানে শিক্ষকতা কোরতেন তাঁদেরই বাধ্য হোয়ে এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হোতো। আমি না এখনও তুমি বুঝবে কি না যে অনাহারের মুখে দাঁড়ানো সত্ত্বে এই পারিপার্শ্বিকতায় কাজ নেওয়া আমার পক্ষে কতটা অসহ ছিলো। হায় রে! মনে পড়ে সেই সব চিঠি—খুবই ব্যস্ত আছি জানিয়ে তখন যা' তোমাকে লিখতাম।

বাস্তবিক আমি যেন দিশাহারা হোয়ে পড়েছিলাম, তাই এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করার সাহস কিছুতেই পাচ্ছিলাম না। ট— যখন আমার হাতে চিঠিটা দিলে তখন আমি একেবারে নিঃস্ব, আমার যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি কাপড়-চোপড় অবধি বাঁধা পড়েছে। আমার অবস্থা ঠিক সেই জার্ম্মাণ কবি Grabbe-এর মত হোয়েছিলো—সে-ও খ্যাতির আশাতেই সহরে এসেছিলো। আসার আগে তার বৃদ্ধা মা তাকে একপ্রস্থ পৈতৃক আমলের রূপার বাসন দিয়েছিলেন। বহু দিন ধরে ঐগুলি রক্ষিত হোয়েছিলো। কিন্তু কবিকে সহরে এসে ঐ বাসন বাঁধা দিয়েই জীবিকা উপার্জ্জন সুরু কোরতে হোলো। প্রতিদিনই একটি চামচ কিম্বা অন্য কিছু বাঁধা দিয়ে চালাতেন। অল্প দিনেই সব বাসন শেষ হোয়ে যায়। কিন্তু আমার তো অমন দামী পৈত্রিক সম্পত্তি কিছু ছিলো না, থাকার মধ্যে ছিলো একটি রূপার ছবি রাখা ফ্রেম। টোকিও থেকে তোমার জন্ত কিনেছিলাম। কত বার লোভ হোয়েছিলো ঐটি বাঁধা দেবার, কিন্তু কোনো রকমে সব সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত কাটিয়ে উঠে ঠিক কোরেছিলাম, যদি সত্যিই সম্ভব হয় তবে এটিকে ছাড়বো না—কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস! তাই সে সত্ত্বেও চিঠিখানি পেয়ে এক মহাজনের কাছে ওটি বাঁধা দিয়ে নিয়ে এলাম তোমাদের কাছে যাবার পাথেয়—মাকে, ঠাকুমাকে আর আমার লাজুক ভীরু বধূটিকে দেখবার জন্ত।

জুন মাসের সেই দ্বিপ্রহর—কি বুকভাঙা সৌন্দর্য্যে ভরা ছিলো! সেদিন হাংচাউ থেকে চায়েন টুং নদীর বুকের উপর দিয়ে, হোলিনেস আর লী পাহাড়ের গ্রাম্য সেতুটির নীচ দিয়ে শ্যামল উপত্যকার তলায় আমাদের জাহাজ ভেসে চোললো আমার জন্মভূমির দিকে। আমার আনন্দের ভিতরও কেমন যেন এক অজানা আশঙ্কা বার-বার কেঁপে উঠছিলো। সহরে ঢোকবার পর থেকে পাহাড়ের পর পাহাড়ের শ্রেণী দেখে আমার যেন মনে হোলো দম বন্ধ হোয়ে আসছে। আমি তবুও গুন-গুন কোরে গান গাইছিলাম, আর এমন পরস্পর-বিরোধী দু'টি অনুভূতি যদি একই সঙ্গে সম্ভব হয় তবে তখন আমার মনে এই প্রার্থনাই জেগেছিলো যে—"হে ঈশ্বর, যেন পরিচিত কেউ আমাকে জাহাজ থেকে নামতে না দেখে। এমন দীন-হীন অবস্থায় যে কেউ আমাকে ফিরতে দেখবে তা আমার সহ্য হবে না।"

জাহাজ নোঙর কোরতেই তীরে নেমে পড়লাম। দুই হাতে দু'টি বাক্স নিয়ে সেই প্রখর রোদের মধ্যেই দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে এগোলাম। চারি দিকের জনতার মধ্যে আমি পলাতকের মত মাথা নীচু করে যাচ্ছিলাম। বাড়ী অবধি নিরাপদেই পৌঁছানো গেলো, সদর দরজায় ঢুকতেই চোখে পড়লো, মা একা-একা বসে চা খাচ্ছেন। আশ্চর্য্য! জানো, আমার বরাবর ইচ্ছে ছিলো প্রথম দেখার মুহূর্ত্তেই ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ডাকবো—"মা গো, মা আমার!" কিন্তু গিয়ে যখন মাকে দেখলাম আবার সেই ঘৃণার ভাবটা মনে জেগে উঠলো—কিছুতেই আর মায়ের কাছে যেতে পারলাম না। যে অবিচারের ফলে আমার এমন দশা, তাকে ধিক্কার না দিয়ে পারলাম না। কোনো কথাই না বলে [illegible] উপর [illegible] দু'টি

ফেলে তাড়াতাড়ি উপরে চলে এলাম—পাছে হৃদয়াবেগের অবতারণা সুরু হয়।

উপরে এসে অবাক্ হোয়ে দেখি, তুমি বিছানার সামনে নতজানু হোয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছো, চোখের জলে তোমার মুখখানি ভেসে গেছে। আমি হতবুদ্ধি হোয়ে কিছুক্ষণ তোমার দিকে চেয়ে রইলাম, অনুশোচনায় মন ভরে গেলো। কিন্তু শেষে নীরস গলায় জিজ্ঞাসা কোরলাম—"কি হোলো কি তোমার?"—তুমি আরও আকুল হোয়ে কাঁদতে লাগলে, আমার বার-বার প্রশ্নের কোনো উত্তরই না দিয়ে আরও উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে উঠলে। কিন্তু হায় ভগবান! কারো কান্না থামানো দূরে থাক, লোকের দুরবস্থা দেখলে আমি নিজের চোখের জল সামলাতে পারি না। পর-মুহূর্ত্তেই আমি তোমার মাথাটি বুকে চেপে ধরি, চোখের জলে নিজের ব্যথাও তোমার সঙ্গে মিলিয়ে দিলাম। একটু পরেই মা উঠে এলেন সম্রাজ্ঞীর মত দৃপ্ত ভঙ্গিতে—"কি গো নবাব-নন্দিনী, দু'টো ভালো কথাই বলেছিলাম, কিন্তু খুব যে রাগ দেখিয়ে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলে?—আর তুই ক্ষুদে শয়তান, সাংহাই থেকে বেড়িয়ে ফিরলি! একটি মাস সহরে বসে কুঁড়েমি কোরে কাটালি। তার পর এসে একটা কথা অবধি না বলে পায়ের কাছে যে ব্যাগ দু'টো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এলি—এ কেমন ধারা শিক্ষা? নবাব-পুত্তুর হলেও এত অপমান সহ্য করা যায় না···আমি তখনই জানি, তোরা স্বামি-স্ত্রীতে লুকিয়ে চিঠিপত্র লিখতিস—এই আমাকেই মারবার মতলবে, উঁহু, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।"

আমার চোখের জল শুকিয়ে বুকের রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেলো। সেই দারুণ গরমেও আমার সমস্ত দেহ পাথরের মত শক্ত হোয়ে গেল, ঠিক ভরা শীতের রাতে দম্‌কা হাওয়া লেগে যেমন ঠাণ্ডা হোয়ে যায়। অত-বড় একটা ঘা খেয়ে প্রতিশোধের জন্য আমি চিৎকার কোরে উঠতে গেলাম, তুমি যদি না সেদিন পিছন থেকে আমায় ধরে রাখতে তাহ'লে একটা ভীষণ কিছু কোরে বোসতাম যার সমাপ্তি ঘটতো মায়ের কাছে চিরবিদায় নিয়ে। অন্ততঃ এই জন্যও, অবাধ্য সন্তানকে আরও একটা বড় অপরাধের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

তোমরা কেউই আশা করনি যে সেদিন আমি ফিরবো। পরে সমস্ত ব্যাপারটা একটু শান্ত হোলে জানলাম মা সারাক্ষণ কেমন কোরে তোমায় গালি দিতেন, আর সাংহাইতে আমার পড়ে থাকার জন্য তোমাকেই কোরতেন দোষী। যখন শুনলে যে আবার আমি তোমাকে ছেড়ে 'এ্যাময়'তে যাবে, তখন তোমাকে সান্ত্বনা দেবার মত কিছু ছিল না, কারণ এ ব্যাপার তোমার কাছে এই প্রথম নয়।

যেমন সব কিছুতেই আত্মসমর্পণ আর নম্র ভাব তোমার ঐ অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণার মূলে ছিলো, তেমনি সব কিছুতেই অধৈর্য্য অথচ সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যাবার অক্ষমতা ছিলো আমার দুঃখের মূল। আর বিদ্রোহ? বিদ্রোহ কথাটাই শুধু জানি কিন্তু কোথায় কেমন ক'রে এ কথার ব্যবহার করবো? আমার মত দুর্ব্বল অস্থিরচিত্ত লোক কখনই তা' বোলতে পারে না।

ওই বিশ্রী ঘটনার পর থেকেই তোমার দিকে আমার লক্ষ্য হোলো। দেখলাম, যখন তুমি ম্যালেরিয়ায় ভুগছো তখনকার চেয়ে তুমি অনেক রোগা, ফ্যাকাশে, রক্তহীন হোয়ে গেছো। তোমার রক্তমাংসহীন পা দু'খানি বাঁশপাতার মত সরু হোয়ে গেছে। আমি ঠিক কোরলাম 'এ্যাময়'তে তোমাকেও নিয়ে যাবো, পথ-খরচা পাঠাবার জন্য কলেজে একটি চিঠিও দিলাম। যখন ঐ দু'শো ডলার পাবার জন্য আমাদের প্রতীক্ষা চোলছিলো, তখন অবধি মাকে এই গোপন পরামর্শের একটি কথাও জানাইনি। শেষ অবধি যখন টাকা এলো তখনও তোমার ইতস্ততঃ ভাব ঘোচেনি। তুমি বোললে, "যদি ওখানে তোমার চাকরী যায়? যদি আমরা নিঃসম্বল হোয়ে পড়ি তখন কি হবে? কোথায়ই বা যাবো?"—গ্রীসের গণৎকারদের মত তুমি ভবিষ্যৎ দুর্দ্দিনের নির্দ্দেশ দিলে, কিন্তু তখন কি জানতাম আজকের এই মর্ম্মান্তিক সমাপ্তির কথা?

আমাদের ক'টি মাত্র মিলিত দিন, কি অবাঞ্ছিত ফলই এনে দিলে! তখন আমরা সবে মাত্র 'এ্যাময়'তে বসবাস সুরু কোরেছি—এমন সময় তোমার স্বাস্থ্য ভাঙলো। তুমি কিছুই খেতে পারতে না, সর্ব্বদাই ক্লান্তিতে অবসন্ন হোয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে। আমি প্রথমে আসল ব্যাপারটা জানতাম না, তাই তোমাকে কত রূঢ় কথাই বলেছি। এমন কি তৃতীয়, চতুর্থ মাসেও, যখন এর স্থিরতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই জাগে না, তখনও কি নিষ্ঠুর ব্যবহার কোরতাম তোমার সঙ্গে। আমার মনের সমস্ত আক্রোশ, ক্ষোভ তোমার উপর দিয়েই মিটিয়ে নিতাম।

আমি এই ছেলে-পড়ানোর কাজকে সত্যিই ঘৃণা কোরতাম, আমার মনে হোতো এর চেয়ে নীরস, ক্লান্তিকর বুঝি আর কিছুই নেই। সমস্ত ক্ষণ এ যেন আমাকে কাঁটার মত বিঁধে থাকতো, আর যখন এ-ক্লাশ, ও-ক্লাশ যাওয়া-আসা কোরতাম তখন মনে হোতো যেন আমাকে বিনা অপরাধে বন্দী করে অত্যাচার কোরছে। এই দুঃখটা সব সময় আমার মনে জাগতো, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী করুণা আর দুর্ব্বলতা ছিলো তোমার উপর—যেটা আমি সর্ব্বদাই চাপা দেবার চেষ্টা কোরতাম।

ব্যাপারটা হোলো, আমার বহু দিন আগের একটি রচনা একটি পত্রিকায় আমার অজানাতেই প্রকাশিত হোয়েছিলো। এইটিতে আমার উপর চারি দিক্ থেকে আক্রমণ সুরু হোলো, বিশেষ করে কয়েক জন হিংসুক সহকর্মীদের কাছ থেকে। আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। রুদ্ধ আক্রোশে, নিষ্ফল ক্রোধে আমি আত্মহারা হোয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তবুও প্রফেসারিটা ছাড়তে পারিনি। আবার হোলো সেই গত জুনের আগেকার অবস্থার পুনরাবৃত্তি; তা-ও শুধু তোমাকে নিয়ে নয়, আরও একটি অনাগত শিশুকে নিয়ে—উঃ, এ আমি কল্পনাতেও আনতে পারিনি। কিন্তু এর জন্য তুমি কি দুঃখই না সয়েছিলে!

নিজেকে সমাজচ্যুত কল্পনা কোরে নিয়ে, সমাজের কোনো কাজেই না লাগার ভীরুতাটা তোমার উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন কোরেই মিটিয়ে নিতাম। তুমিই, না,—আমি না নয়—তুমিই সমাজের পায়ে নিজেকে বলি দিয়েছিলে, সমাজের কঠোর অত্যাচার নিরীহ পশুর মত তোমাকে জবাই কোরেছিলো—তবে, হ্যাঁ, সেটা ঘটেছিলো আমারি মধ্যস্থতায়। নিজের কাজের সমর্থনের জন্য কত বাজে ভিত্তিহীন ওজরই না দেখাতাম—কোথাও অপমানিত হোয়ে ফিরে এলে তোমার রান্নার খুঁত ধরে, গৃহস্থালীর নিন্দা কোরে তোমাকেই আমার সকল অশান্তির মূল সাব্যস্ত কোরতাম। যখন ঐ চাকরীটা

যাবার ভয়ে উত্তেজিত হোয়ে তোমাকে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত কোরতাম, তখনকার প্রতিটি কথা এখনও আমার মনে গাঁথা আছে।

আমি বলেছিলাম—"কেন? কেন তুমি মরছো না? শুধু তুমি গেলেই আমি আবার শান্তি পাবো। তুমি আমার কে? কেন তোমার জন্তে এই পশুর মত পরিশ্রম কোরবো—আমি কি তোমার কেনা চাকর? ওঃ, মুক্তি—একটু শুধু মুক্তি—এই নরক-যন্ত্রণা থেকে তুমি আমায় মুক্তি দাও—আমাকে বাঁচতে দাও। তুমি তো মরার বাড়া, তবু—তবু কেন তুমি আজও বেঁচে আছো?"

তুমি নীরবে শুনতে সব; যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতো, তখন চোখের জলের বাঁধও ভাঙ্গতো, কিন্তু তুমি কাঁদতে নিঃশব্দে, চাইতে না সে গোপন বেদনার আমি সাক্ষী থাকি। অনুশোচনায় মন ভরে যেতো, আবার তোমার কাছে ক্ষমা চাইতাম, আদর কোরে বোঝাবার চেষ্টা কোরতাম। তোমাকে এই কথাই তখন বোঝাতে চেয়েছি যে তোমার উপর আমার বিন্দুমাত্র রাগ নেই, আমি ঘৃণা কোরতাম এই জগৎটাকে, এই পৃথিবীর বিরুদ্ধে আমার সব দুঃখ, অভিযোগ, তোমার ভিতর দিয়েই মুক্তির পথ নিত। তাইতেই বোধ হয় তুমি আরও উচ্ছ্বসিত হোয়ে কাঁদতে, আর বেশী সময়েই পরস্পরের বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হোয়ে এই কান্নার সমাপ্তি হোতো। প্রথম দিকে এ ব্যাপার প্রায়ই ঘটতো, কিন্তু বিশেষ কোরে নববর্ষের ছুটিতে প্রায় প্রতিদিনই ঘটতে লাগলো, এমন কি দিনে দু'বার কোরেও।

আমাদের দু'জনার মাঝে কি দুঃসহ ব্যথা-ভরা দিনগুলি এলো। আচ্ছা 'বিবাহ'টাই অপরাধ, না, যে সমাজ এই বিবাহে জোর করে অপরাধ তার? প্রথমটি যদি সত্য হয়, তবে তো জীবনটাই মিথ্যে, আর সমাজ দায়ী হোলে আমাদের উচিত এর প্রথাগুলি সম্পূর্ণ ভাবে সংস্কৃত করা। আমাদের মত ক্রমাগতই বংশবৃদ্ধি কোরে দুঃখকে গভীর না কোরে এর থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ থাকা উচিত। মাস-খানেক বয়স হবার আগেই আমাদের দু'জনার ব্যাধি দেখা দিলো আমাদের সন্তানের মধ্যে—এই অবাঞ্ছিত জীবনের ক্ষুদ্র বোঝাটির মধ্যে—আমাদের ভবিষ্যৎ দুঃখের এই ভরা পাত্রটির মধ্যে……। কি অসম্ভব দুর্ব্বল, ভীরু-প্রকৃতি হোলো তার সেটা লক্ষ্য করবার বিষয় ছিলো, আর কত সামান্য কারণেই কেঁদে উঠতো। দুধ দিতে এক মুহূর্ত্ত দেরী হোলেই কপালের নীল নীল শিরাগুলি ফুলে উঠতো। হায় রে! আমি জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হোয়ে মৃত্যুকামনা কোরতে কোরতে কেমন কোরে আর একটি অবাঞ্ছিত জীবনের জন্ম দিলাম?

এ তো সত্যিই অপরাধ—না, না—একে আমি কিছুতেই সমর্থন কোরতে পারি না। যদি তোমাকে এ বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করে তবে অনুগ্রহ কোরে আমার হোয়ে এর উত্তরটা দিও।

মাত্র এক মাস আগে আমাদের অবস্থা চরমে এলো। তোমার হয়ত আমার মত এত স্পষ্ট মনে নেই। হ্যাঁ, তোমার পক্ষে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হোয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু প্রতিটি ঘটনা আমার মনে এত স্পষ্ট আঁকা আছে, যেন কেউ পাথরের উপর খোদাই করে দিয়েছে। সে ছিলো এক রাত্রি, চাঁদ তখন সবে পূব-গগনে দেখা দিয়েছে। তখন আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে, ভাইয়ের সাহায্যে একটা নতুন ব্যাঙ্কে কাজ পেয়েছি, কিন্তু রাজনৈতিক গোলমালে ব্যাঙ্ক খুলতে দেরী ছিলো। ইতিমধ্যে আমার প্রকৃতি আরও অলস হোয়ে পড়েছিলো। সেদিন রাত্রে পূর্ণ মত্ত অবস্থায় বাড়ী ফিরেছিলাম অন্য দিনের চেয়ে আরও বেশী নিরাশ ভগ্নমনে—বাড়ী ঢুকেই তোমাকে তার পর ছোট্টো খোকাকে দেখেই আমার মাথায় যে আগুন জ্বলে উঠলো। আজ মনে পড়ছে, যেন ডুবে মরবো বলে ভয়ও দেখিয়েছিলাম,—তোমাকে কত কঠিন অভিশাপ আর নিষ্ঠুর বিদ্রূপে জর্জ্জরিত কোরে বোলেছিলাম—তোমরা দু'জনে আমার পায়ের শৃঙ্খল। অত্যাচারের শেষে ক্লান্তি আর ঘরে অর্দ্ধে চেতনাহীন হোয়ে শুয়ে পড়লাম। তা সত্ত্বেও মনে পড়ে, নেটের মশারির ভিতর দিয়ে আবছা ভাবে তোমাকে দেখেছিলাম তুমি খোকাকে কোলে নিয়ে অনেকটা এই ভাবে কথা বলছিলে—"নাঃ, ছিঃ, দুষ্টুমি করো না, সোণা আমার, ভাল লক্ষ্মী ছেলে হবে। ঘুমোও খোকন ঘুমোও—মা চোলে গেলে বাবাকে যেন বিরক্ত কোর না—"। প্রদীপের আলোয় মনে হচ্ছিল তুমি কাঁদছো, মনে পড়ে এই ঘরোয়া দৃশ্যে অন্ধ রাগে অধৈর্য ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। আরও অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে মাঝে-মাঝে তুমি কাঁদছিলে—আরও জানি একবার কাছে এসে ধীরে ধীরে মশারিটা তুলে আমার দিকে চেয়ে রইলে, আমি তাড়াতাড়ি নিস্পন্দ হোয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চাইলাম।

হঠাৎ জেগে উঠে শুনি, কে যেন ভীষণ জোরে দরজা ঠেলছে আমি লেপের ভিতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিলাম। কতকগুলি রিক্সাওলা দাঁড়িয়ে। কিন্তু বিস্ময় আমার চরমে ঠেকলো যখন দেখলাম তারা তোমাকে বয়ে আনছে আমি তোমার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালাম। তোমার খোলা চুল জলে ভিজে গুচ্ছ-গুচ্ছ হোয়ে জড়িয়ে আছে, তোমার জামা-কাপড় থেকে জল ঝরছে, তোমার পোষাকের নীল কালো রঙগুলি জলে ভিজে মিশে গেছে। আকাশের ক্ষীণ চাঁদের ম্লান আলো তোমার মৃতের মত বিবর্ণ মুখের উপর অদ্ভুত পাণ্ডুর মনে হচ্ছিল। চোখের পাতা দু'টি মুদ্রিত, কিন্তু ঠোঁট দুখানি ধীরে ধীরে কেঁপে উঠছিলো ভয়ে আত্মহারা হোয়ে তোমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বার-বার তোমার নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরে চোখের পল্লব দু'টি যেন ঈষৎ উন্মুক্ত হোয়ে তখনি আবার বন্ধ হয়ে গেলো। চোখের কোণ বেয়ে ঝরছিলো অজস্র মুক্তার ধারা হায় রে, তখনই আমি প্রাণ দিয়ে অনুভব কোরলাম যে তুমি আমাকে ঘৃণা করতে না। সেটা যে কতখানি সত্য তা আমি বুঝেছিলাম তোমার অশ্রুধারায়, কিন্তু অনুভব কোরলাম দীর্ঘশ্বাসে সঙ্গে আমার সমস্ত সুখ ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে।

ওরা তোমাকে ঘরের ভিতর নিয়ে এলো। গোলমালে খোকা জেগে উঠে একঘেয়ে কান্না সুরু কোরলে। বোধ হয়, ওর ঐ একঘেয়ে কান্নার শব্দে তুমি একবারটি চোখ খুললে, তার পর ধীরে ধীরে আমার দিকে চাইলে। আমি তোমার ভিজে জামা-কাপড় খুলে নিচ্ছিলাম খোকার জন্য ব্যস্ত হোতে বারণ কোরে তোমায় ঘুমাতে বললাম এমন সময় পাশের ঘর থেকে ঘুম ভেঙে ওর আয়া উঠে এলো কি হোয়েছে জানতে—তুমি চাইছো দেখে আমি বলেছিলাম ছেলেকে তোমার কাছে দিতে। মনে পড়ে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কাছের একটা ষ্টীমার বাঁশী বাজিয়ে বন্দর ছেড়ে যাবার সঙ্কেত কোরলে। যে শব্দের

দিন হাসপাতালে অসুস্থ হোয়ে রইলে, সে ক'দিনের মত অমন প্রশান্ত নির্মল মন আমার কখনও হয়নি। সমস্ত অন্তর ভালোবাসায় আর পবিত্রতায় ভরে ছিলো। কিছু দিনের জন্ত নিজেকে তোমার মধ্যে সম্পূর্ণ কোরে হারিয়ে ছিলাম। প্রবল জরে তুমি প্রলাপ বলতে, আর আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমার পাশে বসে থাকতাম।

শেষ কালে যখন আমরা 'এ্যাময়' ছাড়লাম তখন দেশে ফিরে গিয়ে থাকাই ঠিক কোরেছিলাম। আমার মনে হোয়েছিলো, আধুনিক জগতের সঙ্গে চলতে গিয়েই আমার এই দুঃখ। এমন কি যদি একটা চাকরীও পেতাম, তবুও সেটা দরকারী বলে মনে হোতো না, আমার পৈত্রিক ভিটাই সব চেয়ে ভালো মনে হোলো। সেখানে কিছুই নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যা ছিলো, আমাদের খেতে-পরতে তাই যথেষ্ট। তোমার এখন সাতাশ বছর আর আমার আটাশ। ধর, আমাদের আয়ু—জোর পঞ্চাশ বছর, তার আর বেশী দিন তো বাকী নেই। তাছাড়া ধন-দৌলত বা যশের আকাঙ্ক্ষা, সে সব আমার কিছুই ছিল না। আর বড়লোকের মোসাহেবী কোরে রোজগারে প্রবৃত্তি আমার নেই।

আমরা বেশীর ভাগ সময় কাটাতাম বাড়ী তৈরীর জন্য নক্সা দখে—তোমার পছন্দ করবার জন্ত যেগুলি এনেছিলাম। আর হরের উত্তর দেওয়াল ঘেঁষে নিজেদের জন্ত একটি ছোটো ছাউনী-দরা বাড়ীর নক্সা দু'জনে নানা ভাবে আঁকতাম। যখন 'গোল্ডেন গাণ্ড' নদীর জলের উপর দিয়ে ভেসে চলেছি, কিম্বা যখন সাংহাই সে পৌছলাম তখনও আমার মত বদলায়নি। দ্বিতীয় দিনেও াই ছিলো। তোমার নিশ্চয় ভালো কোরেই মনে আছে আমরা 'জনে ছবি তুলিয়েছিলাম, তার পর একসঙ্গে রাতের খাওয়াও শেষ রি। তার পর আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা কোরতে গেলাম, দ সম্প্রতি জাপান থেকে এসেছে। তার সঙ্গে কথা বোলতে বোলতে ামাদের পরামর্শের কথা তাকে জানালাম। সে ভালো-মন্দ, কি া না, কিছুই বোললে না, কেবল কিছু দূরে কতকগুলি ছেলেমেয়ে লা কোরছিলো তাদের দেখিয়ে বোললে, "ঐ দেখো, ওরাই আমার ায়িত্ব, আর এ দায়িত্ব আমি এড়াতেও চাই না—আমার বোঝা তামার চেয়েও ভারী, কিন্তু আমি তা নিয়ে কখনও নালিশ জানাই া।" ভাবলাম, হায় রে! কত সহজেই আমার হার হোলো। ারারাত নিদ্রাহীন চোখে ভাবতে লাগলাম বন্ধুর কথা, আর আমার াজের মীমাংসার কথা। তুমি তোমার স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে সবই ঝলে, তাই একটি কথাও বলনি। হয়তো ভেবেছিলে, ভয় পেয়েছিলে এই ভেবে যে একটি কথা বললেই না জানি কি নিষ্ঠুর অভিসম্পাত দেবো তোমাকে।

তোমার হাসপাতালে যাওয়ার পর থেকে এই প্রথম আবার আমার মনের ভিতর সেই আগেকার ক্ষুব্ধ বিক্ষোভের সৃষ্টি হোলো। পুরো তিনটি দিন ঐ অবস্থায় কাটলো, শেষ পর্যন্ত কাল রাত্রে আমি যখন বিছানায় নিস্পন্দ হোয়ে পড়েছিলাম, তখন আমার দুঃখে ব্যথিত হোয়ে তুমি এসে বোললে, "তোমাকে আর আমি অসুখী দেখতে চাই না। তুমি এখানে সাংহাইতে একাই থাকো, আমি খোকাকে নিয়ে চোলে যাবো। তুমি শুধু আমাকে ট্রেণে তুলে দিয়ে এসো। আর দেরী না কোরে কালই আমি পেকিং চোলে যাবো।"

আজ রাত্রে আমাদের এক জায়গায় নিমন্ত্রণ ছিলো, যাবো বোলে আমরা ঠিকও কোরেছিলাম। কিন্তু তোমার ভয় হোলো, পাছে আমার মত বদলে যায় তোমাকে যেতে না দিই, তাই তুমি এখনি যাবার জন্য ব্যস্ত হোলে। স্বীকার করছি, এক দিকে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ কোরছিলাম, কিন্তু অপর দিকে একটা তিক্ত অনুভূতি দমন কোরতে পারিনি। তাই জন্যে তুমি যখন জিনিষ-পত্র গোছাতে ব্যস্ত ছিলে প্রস্তুত হবার জন্ত, তখন একটি কথাও তোমার সঙ্গে বলিনি। এমন কি আমরা ষ্টেশনে এসে তুমি ট্রেণে ওঠবার পরও একটি কথার বিনিময় করিনি। শেষে আমি বোকার মত প্রশ্ন কোরলাম—"দিনটা খুব খারাপ দেখাচ্ছে না তো?"

তুমি বুঝতে পেরে মুখ ফিরিয়ে নিলে। আকাশের অবস্থা বোঝবার ভাণ করে অনেকক্ষণ ধোরে সেই দিকে চেয়ে রইলে। তুমি যদি তোমার ঐ কাণায় কাণায় ভরে আসা চোখ দু'টি একটি বারও আমার মুখের উপর তুলে ধরতে তো আমি কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারতাম না। হয়তো তোমাকে ধরে রাখতাম কিম্বা নিজেই তোমার সঙ্গে যেতাম, অন্ততঃ হাংচাউ অবধি জোর কোরে যেতাম। কিন্তু আর একটি বারও তুমি আমার দিকে চাইলে না, আমিও আর একটি কথাও বলিনি। এমন কোরে আমরা বিদায় নিলাম। ষ্টেশন-প্লাটফর্মের উপর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম তোমার কামরার জানলার দিকে চেয়ে, যতক্ষণ না এঞ্জিন চোলতে শুরু কোরলো ততক্ষণ অবধি হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাইনি। চোখে পড়লো তোমার বাঁ দিকের গাল বেয়ে জলের ধারা। সবাই চোলে যাবার পরও বহুক্ষণ ট্রেণের দিকে চেয়ে রইলাম। তার পর যখন ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে ধীরে ধীরে আসছি তখন মনে হোলো, জীবনে আর কখনও তোমাকে দেখতে পাবো না—কোনো দিনও না।

তবুও সমস্ত অন্তর কেঁদে ওঠে তোমারই জন্ত।

অনুবাদিকা—শ্রীশান্তা বসু

প্রভাত-সঙ্গীত

মহাস্থবির

বাতায়নে

জানলার ধারে বসে আছি—বাইরে জগৎ গড়িয়ে চলেছে, রোদও গড়াতে গড়াতে গলি পেরিয়ে চলে গেল। ঠিকে-ঝি'রা সব কাজে আসতে লাগল। বিকেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার রংই বদলে গেল।

দুপুরের ফেরিওয়ালার দল চলে গেছে অনেক দূরে। বিকেলের ফেরিওয়ালারা প্রায়ই খাবার-দাবার ও শৌখিন জিনিষ বিক্রি করে। একটা জিনিষ সেকালে খুবই চলত, সেটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ-বেকারির পাঁউরুটি-বিস্কুট। মাথায় টিনের বাক্স, খালি গায়ে গলায় লম্বা পৈতে-ঝোলানো ব্রাহ্মণ ফেরিওয়ালার দল বেরুত। শীতকালে জামার গলার কাছে পৈতের খানিকটা বের করা থাকত। সেদিনের হিসেবেও সেগুলো ছিল যাচ্ছে-তাই খাদ্য। সে সময় পাঁউরুটি খাওয়ার রেওয়াজ খুবই কম ছিল, বিশেষ করে মুসলমানের দোকানের কিংবা গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের পাঁউরুটি অধিকাংশ বাড়ীতেই ঢুকতে পেত না।

চলেছে বিকেলের ফেরিওয়ালার দল—ঘুগনিদানা, নকলদানা, চীনে-বাদাম, চানাচুর, পাঁঠার ঘুগনি, ডিমের ঘুগনি, আলু-কাবলি, যত সব মুখরোচক ও প্রাণঘাতক অখাদ্য। পাঁঠার ঘুগনি, ডিমের ঘুগনি ছেলেরা লুকিয়েই খেত। সাধারণ লোক প্রকাশ্যে মুরগী অথবা মুরগীর ডিম খাওয়ার কথা ভাবতেও পারত না। হাঁসের ডিমও অনেক বাড়ীর হেঁশেলে ঢুকতে পেত না, বিশেষ করে যে বাড়ীতে উড়ে-বামুন পাচক থাকত। এই উড়ে-বামুনের প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে পড়ল।

সেকালে, শুধু সেকালে কেন, একালেও অনেক বাঙালী গৃহস্থের বাড়ীতেই উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ রাখা হোতো রান্না করবার জন্য। কেন জানি না, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ডিমের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল। আমাদের একটি বিশেষ জানা লোক উড়িষ্যার কোন দেশীয় রাজ্যে চাকরী করতেন। মাঝে মাঝে ছুটিতে তিনি বাড়ীতে অর্থাৎ কলকাতায় এসে কিছু দিন করে কাটিয়ে যেতেন। এই রকম সময়ে এক দিন সকাল বেলায় ভদ্রলোক বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন এমন সময় সামনের বাড়ীর ঠাকুর কি কাজে বেরুচ্ছিল—পড়ে গেল তাঁর সামনে। লোকটাকে তিনি চিনতেন, কারণ চাকুরী-স্থানে তাঁর বাগানে সে দিন-কয়েক মালীর কাজ করেছিল। সে ছিল জাতে 'পান' অর্থাৎ হাড়ি-মুচী শ্রেণীর—কলকাতায় এসে গলায় পৈতে ঝুলিয়ে বামুন সেজে লোকের জাত মেরে বেড়াচ্ছিল। যেখানে সে কাজ করত, তাঁরা ছিলেন অব্রাহ্মণ। তাই রাঁধুনি-বামুন হলেও পাপঋদ্ধির ভয়ে পা দিয়ে ফেলা—তখুনি ঠিকে-গাড়ী চড়ে বাড়ি এসে ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁরা গঙ্গা নাইতে ছুটলেন এত দিনের জমে-ওঠা পাপ খণ্ডাবার জন্য। সেদিন আর তাঁদের বাড়ী হাঁড়ি চড়ল না। এ রকম ব্যাপার নিত্য ধরা না পড়লেও অনেক অব্রাহ্মণকে কলকাতায় এসে দায়ে পড়ে যে ব্রাহ্মণ হতে হ'ত সে কথা বলাই বাহুল্য।

ছাতে

ছাতের ছবি সারা দিন ধরেই বদলে চলত সেকালে। বাড়ীর সব চাইতে উঁচুতে ও সবার মাথার ওপরে থেকেও প্রতিদিন নিজের অঙ্গে সে এত ধুলো মাখে কোথা থেকে, ছেলেবেলা সে একটা সমস্যা ছিল। তা ছাড়া, আর এক রকম কালো কালো গুঁড়ো, ধুলোর চেয়ে একটু শক্ত জিনিষ—সেগুলোই বা কি? দু'পা চলতে না চলতে পায়ের তলাটা একেবারে কালো হয়ে যায়।

খুব ভোরে ছাতে উঠে দেখছি দূরে এক বাড়ীর ছাতে এক জন সন্ত রোগমুক্ত—রাস্তায় বেরুবার শক্তি নেই কিন্তু চলচ্ছক্তি আছে, ধীরে ধীরে বেড়াচ্ছেন। দু'-এক জন অতি-বৃদ্ধকেও দেখেছি, এই সময় ছাতে উঠে তাঁরা আয়ু বাড়াবার চেষ্টা করছেন। রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এই দল নীচে নেমে যেতেন। ব্যস্! বাড়ীর পুরুষদের সঙ্গে ছাতের সম্পর্ক এই পর্যন্ত। কারণ, অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে আসার পূর্ব্বে পুরুষেরা আর ছাতে উঠতে পারতেন না—পাড়ায় সদ্ভাব রেখে যাঁরা থাকতে চাইতেন তাঁরা এ নিয়মটির প্রতি খুবই সজাগ থাকতেন।

বৃদ্ধ ও রুগ্নের দল নেমে গেলে ঝি উঠল ছাত ঝাঁট দিতে আর সন্ধ্যে বেলায় দেওয়া-দেওয়া কাগজের আগুন খুঁচিয়ে, পাট করে তুলতে। এই ছাত ঝাঁট দেবার সময়টা ছিল তাদের সকালবেলা বিশ্রামের সময়। একবার ছাতে চড়তে পারলে আর নামবার নামটি নেই। নীচে থেকে গিন্নিরা চেঁচাচ্ছেন, ঝিয়ের কানেও পৌঁছচ্ছে না। যদি বা একবার সাড়া দিলে তো কাজ তখনো অনেক বাকি। শেষ কালে গালাগালি দিয়ে এক রকম টেনে নীচে নামানো হোতো—এ ব্যাপার প্রায় প্রতি সংসারেই প্রাত্যহিককার ব্যাপার ছিল। অনেক গিন্নিকেই বলতে শুনেছি যে, ওরা সারা রাত জাগে কি না তাই ছাতে উঠে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আসল কথা, তারা ছাতে গিয়ে ঘুমোত না, সেখানে গিয়ে জেগে উঠত।

তখনকার দিনে, শুধু তখন কেন এখনকার দিনেও ঝি'রা থাকে বস্তির মধ্যে খোলার বাড়ীতে। সে সব বাড়ী আমরা দেখেছি। ছোট্ট একখানা ঘর, মাটির দেওয়াল, মাটির মেঝে, খোলার চাল। হয়ত কোনো ঘরে একহাত চৌকো বাঁশের জালি দেওয়া একটু জানলা। সে মেঝেতে শোওয়া যায় না, তাই তক্তাপোষ একখানা করতেই হয়। তক্তাপোষের চারটে পায়ার নীচে ইট দিয়ে

পাশাপাশি ঘর প্রায় চারি দিকেই, মাঝখানে ছোট্ট একটি উঠোন। উঠোনের এক কোণে একটা কুয়ো। এই কুয়োর জলই ব্যবহৃত হয়, যার গন্ধ আছে সে রাস্তার কল থেকে খাবার জল সংগ্রহ করে। ঘরের সামনে হাত-তিনেক চওড়া একটু বারান্দা মতন, এই বারান্দা অথবা দাওয়া যার ঘরের সামনে যতটুকু পড়েছে সেইটুকু রান্না করবার জায়গা। দাওয়ার চালটা উঠোনের দিকে এতখানি কোনা যে, যে-কোনো সাইজের মধ্যে লোককে প্রায় ঘাড় হেঁট করে ঢুকতে হয়, অসাবধান হ'লে মাথা বাঁচানো দায়। আলো-বাতাস একদম ঢোকে না বললেই চলে। শব্দ শুনে টের পেতে হয় যে বাইরে ঝড় উঠেছে কিম্বা চাঁদ কোটা বৃষ্টি হলেই তা চালের ফাঁক দিয়ে ঘরে পড়ে। তার ওপরে বাড়ীর মধ্যে কি গন্ধ! উঃ, সে কথা মনে করলেও পাপ হয়।

এই নরককুণ্ডের মধ্যে বাস করে মনিব-বাড়ীর উঁচু ছাতে উঠে সকাল বেলাকার সেই ঝলমলে আলো, দৃষ্টি-দিগন্ত অবধি উঁচু, নীচু, ছোট-বড় বাড়ী, এর মধ্যে মধ্যে নারকোল ও কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ, কোন্ দূরে কলের চিম্নি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, কোন মন্দির চূড়ায় স্বর্ণকুম্ভ ঝকঝক করছে। অনেক—অনেক দূরে মনুমেণ্ট দাঁড়িয়ে আছে, প্রথম দৃষ্টিতেই আবার তাকে দেখা যায় না, উঁচু উঁচু বাড়ীগুলোর মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে—এ সবই যে তার কাছে নতুন, তার জীবনযাত্রার সীমার বাইরে। এই দিব্যলোকে উঠে তারা আত্মহারা হয়ে যেত—গিন্নির কর্কশ চীৎকারে সম্বিত ফিরে পেয়ে আবার কাজে লেগে যেত।

এ আমার কল্পনা নয়। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীতে এক জন ঝি ছিল, তাকে আমরা কুঁজোবুড়ি ডেকেছি। খুব বয়স হয়েছিল তার, কোমরটা এমন বেঁকে গিয়েছিল যে হাঁটবার সময় নীচের দিকে মুখ করে চলত। ভোর হ'তে না হ'তে সে আসত। বলত, সারা রাত ঘুম হয় না, রাত পোয়ালেই বেরিয়ে পড়ি। বেলা দশটা নাগাদ চলে যেত, আবার আসত তিনটের আর বাড়ী ফিরত রাত্রি ন'টায়—কোন দিন আমরা আবার ধরলে রাত্রে বাড়ী যেত না—আমাদের কাছে শুয়ে গল্প বলত। শরতের মা কে কোন কাজ করতে হোত না, শুধু আমাদের অর্থাৎ ছোট ছেলেমেয়েদের তদারক করতে হোত। সে কাজ যে কতখানি শক্ত তা যেদিন সে কামাই করত সেদিন বাড়ীর সবাই হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারতেন। শরতের মা তার নিজের জীবনের দুঃখের কাহিনী-গুলোকে খুব মর্মস্পর্শী করে বলতে পারত। প্রধানত এই গুণেই সে আমার মতন সাংঘাতিক দুষ্টু ছেলেকেও বশে এনেছিল। তারই মুখে শুনেছি যে প্রথম প্রথম চাকরী করতে এসে ছাতে গিয়ে চারি দিকের ঐ দৃশ্যের মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলত—দু'-তিন জায়গায় এই অপরাধে চাকরীও গিয়েছে।

শরতের মা'র আর একটি গুণ ছিল এই যে, তাকে ব'কে-ঝ'কে গালাগালি দিয়ে কেউ রাগাতে পারত না। গালাগালি দিলে সে ফোকলা মুখ হাঁ করে হাসতে থাকত। দুঃখ পেয়ে-পেয়ে সংসারের কাছে এমন নিঃশেষে সে আত্মসমর্পণ করেছিল যা 'যোগিজনোচিত' বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আড়াই বছরের মেয়ের খেলায় সঙ্গী হয়ে যখন সে প্রথম চাকরী করতে ঢোকে তখন তার বয়েস আট বছরের বেশী হবে না। বড়লোকের বাড়ী, চতুর্দিকে কত রকমের সব জিনিষ পড়ে থাকে যা তার চোখে আগে কখনো পড়েনি—ভাঙা চুড়ির ঝকঝকে টুকরো, কাগজের ভাঙা বাক্স, হাত-পা-মাথা-ভাঙা মাটির পুতুল, ছেঁড়া রেশমের ও রঙিন কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি মহামূল্য জিনিষ যেখানে যা কুড়িয়ে পেত তাই নিয়ে বাড়ীর এক জায়গায় সে খেলা-ঘর জমিয়ে তুলেছিল। মেয়েটিকে নিয়ে সে এই খেলা-ঘরে গিয়ে বসত। সে খেলতে থাকত আর মেয়েটি চুপচাপ বসে একমনে তার কথা শুনত আর খেলা দেখত।

কিছু দিন খেলা দেখতে দেখতে মেয়েটিরও খেলার সখ চাপল। তখন শুরু হোল দু'জনে ঝগড়া। এক দিন একটু বাড়াবাড়ি হ'তেই মেয়েটা উঠল কেঁদে, ফলে দু'-তিন জন গিন্নি ছুটে এলেন ওপরে। দু'পক্ষের কথা শুনে তাঁরা তার সব জিনিষপত্র টেনে এনে মেয়েটিকে দিয়ে তাকে বললে, এ সব জিনিষ কি তুই তোর বাপের ঘর থেকে নিয়ে এসেছিলি?

সে বললে—আমার জিনিষ ফেরৎ না দিলে আমি কাজ করব না।

তারা বললে—দূর হ'য়ে যা!

এই অবধি বলে সে একটা নিশ্বাস ফেলে বলত—কিন্তু দূর যে হওয়া যায় না, তা আমার অন্তরাত্মা জানত। তাই তাদের চোখের সামনে থেকে সরে গিয়ে বাগানের দিকের একটা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম গরাদ ধরে।

বেলা গড়াতে লাগ্‌ল। দু'-এক বার তাঁরা খেতে ডাকলে কিন্তু আমার জিদ—জিনিষ না পেলে কিছুতেই খাব না।

ক্রমে সন্ধ্যে হ'য়ে গেল, চারি দিক্ অন্ধকার—থমথম করছে, আমার ভয় করতে লাগল। মনে হ'তে লাগল যে, মা'র কাছে চলে যাই কিন্তু সেও অনেকখানি অন্ধকার পেরুতে হবে। ভাবছি লাগাই দৌড়—এমন সময়ে বাগানের দিক থেকে কে যেন আমাকে ডাক্‌লে—শোন্।

এত ভয় করছিল তো, কিন্তু আওয়াজটা কানে যেতেই আমার সব ভয় চলে গেল। মুখ ফিরিয়ে বাগানের দিকে চেয়ে দেখি যে জানলা থেকে একটু দূরে এক জন লোক শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে। তার নাক, মুখ, চোখ কিছুই ভাল করে দেখতে না পেলেও সে যে মানুষ, তা বেশ বোঝা যেতে লাগল। আমাকে বলতে লাগ্‌ল—তুই এ বাড়ীর ঝি, ঝিয়ের আবার অভিমান কিসের রে! তোকে জীবন-ভোর ঝি-গিরি ক'রে খেতে হবে, এ রকম অভিমান করলে সারা জীবন কষ্ট পাবি।

এই রকম সব অনেক কথা, সব কথা আর মনেও নেই, বলতে বলতে লোকটা শূন্যেই মিলিয়ে গেল।

সে বলত—সেই থেকে ঠিক করলুম, ভগবান যদি আজকের দিনটা আমার ভালয় ভালয় কাটিয়ে দেয়, তা হলে আর কখনো অভিমান করব না। তা ভগবান ভালয় ভালয় কাটিয়ে দিলেন। একটু পরেই সেই মেয়েটির মা এসে আমার জিনিষপত্র ফিরিয়ে

সেই কথাগুলো যে আমায় বলেছিল সে নিশ্চয় কোন দেবতা-টেবতা হবে। কারণ, তার কথাগুলো ঠিক ফলে গেছে—আমাকে সারা জীবন খেটেই খেতে হোলো। স্বামী, পুত্র কেউ আমাকে ভাত দেয়নি। সারা জীবন ধরে কত আপনার লোক ও পর কত অন্যায় করেছে, অত্যাচার করেছে আমার ওপর কিন্তু কারুর ওপরে রাগ বা অভিমান করিনি। নিজের বরাতকেই দূষেছি। এই জন্য ভগবান আজও আমাকে অন্নবস্ত্রের দুঃখ দেয়নি।

বাল্যকালে, অনুভূতির অরুণ রাগে মানসাকাশ যখন সবে মাত্র রাঙিয়ে উঠছে, সেই সময় শরতের মা'র এই কাহিনী সেখানে একখণ্ড কালো মেঘ ঘনিয়ে তুলেছিল, এত দিন পরে এখানে তার বর্ষণ হয়ে গেল।

আবার ছাতে ওঠা যাক্!

ঝি ছাত থেকে নেমে যেতেই বাড়ীর মেয়েরা ছাতে উঠতে আরম্ভ করলে। একসঙ্গে নয়, পরে পরে, যার যখন স্নান শেষ হচ্ছে, আসছে একে একে—কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, খালি পিঠে ভিজে চুল এলানো। সকলে নিজের নিজের শাড়ী প্রভৃতি পরিপাটি করে শুকোতে দিয়ে নেমে গেল।

সে-যুগে বাঙালী পরিবারে ফ্রকের এত বাহুল্য ছিল না। অনেক বাড়ীতে পাঁচ-ছয় বছরের মেয়েরা শাড়ী পরত। তার পরে আসতে লাগল কাঁথা, মাদুর, সতরঞ্চি, মশারি, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, কি নয়! ছাতে কাপড় শোকানো দেখে বাড়ীর হাল-চাল সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে দিতে পারা যেত।

এর পরে গ্রীষ্মের খর রোদ পোহাতে এল আমসত্ত, আমচুর, জারক লেবু, গুল ইত্যাদির দল। গিন্নিরা যে যার শয়ন-গৃহে ঢুকে পড়লেন। বাড়ীর মধ্যে সব চাইতে ভাগ্যহীনার ওপরে রইল ছাতের ওপরকার ঐ মহার্ঘ দ্রব্যগুলির তদারকের ভার—শুধু কাক নয়, বাড়ীর ছোটরাও যে তক্কে-তক্কে ফিরছে, সে কথা সবাই জানে।

প্রকৃতি দেবী নারীরই স্বজাতি, মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ করা তাঁর স্বভাব। তাই গ্রীষ্মের দারুণ দ্বিপ্রহরকে চমকে দিয়ে হঠাৎ আকাশ কালো করে যেদিন তিনি ঝড় তুলতেন সেদিন লাগত মজা। রাস্তার ধুলো পাক খেয়ে-খেয়ে উঠতে লাগল ঘরে ও ছাতে, দুমদাম্ করে দরজা জানলা পড়তে লাগল। গিন্নিদের ঘুম ছুটে গেল। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে চোখ খুলেই আকাশের ঐ মূর্ত্তি দেখে ছুটলেন ছাদের সিঁড়ির দিকে—যাবার সময় চিল-চীৎকারে বাড়ী ফাটিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁরা ঘুমের কোলে যে যেমন অবস্থায় ছিলেন, উঠে সেই অবস্থাতেই ছুটলেন ছাতের দিকে—ছোটরাও হুল্লোড়ের এমন সুযোগ পেয়ে ছুটল তাঁদের পিছু-পিছু।

প্রকৃতির বুকে উঠেছে ঝড় আর ছাতে-ছাতে উঠেছে ঝড়-রূপিণীর ঝাঁক—চুল উড়ছে, আঁচল উড়ছে, কাপড় উড়ছে, অর্দ্ধ বিবসনা কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাতও নেই—ঝড়ের উন্মাদ নর্ত্তনের মাঝে তারা যেন একাকার হয়ে গিয়েছে। আমসত্ত বাঁচাতেই হবে—ছোট ছেলেটা কি কারণে আম খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু আমসত্ত পেলে খায়। অমুকে আমচুর ভালবাসে, তমুকে আম্‌সি ভালবাসে। মিষ্টি আচার ও জারক লেবুকেও ভালবাসবার লোকের অভাব সংসারে নেই। শুকনো কাপড়গুলো, বিশেষ করে ছোটদের কাপড় ও কাঁথাগুলি বাঁচাতে না পারলে বিকেলের মধ্যে সংসারচক্র লাইনচ্যুত হবার সম্ভাবনা—বাঁচা বাঁচা, তোল তোল, ছোট্ট ছোট্ট—যাক, সব বেঁচে গেল।

ঐ যা! গুল্‌গুলো তোলা হয়নি। সে বেচারারা ছাতের এক কোণে পড়ে ভিজতে লাগল। গুল্ খেতে কেউ ভালবাসে না, তাই তার কথা কারুরই মনে পড়ল না।

কবি বলেছেন, গ্রীষ্মের 'দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ'৷৲ কথাটা সে যুগের কলকাতার লোকেদের বাড়ীর ছাত সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বিকেল হবার আগে থাকতেই মেয়েদের চুল বাঁধবার পালা সুরু হোতো। তার পরে কাজ-কর্ম সেরে স্নান করে ধোপদোস্ত, একেবারে ঝকঝকে হয়ে ছাতে উঠতেন, ছোট-বড় কেউ বাদ নয়। কুমারী ও যাদের ছেলেপুলে এখনো হয়নি এমন বৌরা সাধারণতঃ কাঁচপোকা বা খয়েরের টিপ পরত। বড়রা টিপ পরতেন না এবং যত দূর মনে পড়ছে, সিঁদুরের টিপ পরার রেওয়াজ সে সময় ছিল না।

এ-ছাত ও-ছাত ও সে-ছাতে সশব্দে আলাপচারী সুরু হয়ে গেল। বাড়ীর ছেলেদের এবং কর্ত্তাদের উদ্ভাবিত অথবা সংগ্রহ করা যত সব বাতেল্লা পল্লবিত হয়ে শাখা বিস্তার করতে লাগল ছাত থেকে ছাতান্তরে। যে ছাতে পুরুষের কণ্ঠস্বর অবধি পৌঁছয় না—সেই ছাতের সঙ্গেও নিঃশব্দ-ইসারায় আলাপচারী হ'তে লাগল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রত্যেকেই প্রত্যেক বাড়ী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে গেল—এমন কি ও-বাড়ীর সেজো-বৌয়ের মেজ ভাজ ক'মাস গর্ভবতী সে খবরটি পর্য্যন্ত।

এ আড্ডায় বয়সের পার্থক্য এক রকম উপেক্ষাই করা হোতো। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তারা সব বাড়ী ফিরতে লাগলেন আর মেয়েরাও একে একে ছাত থেকে নেমে পড়তে আরম্ভ করলেন। অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত হয়ে পড়ল ভোঁ-ভাঁ—শুধু এখানে-সেখানে দু-একখানি অভাগিনী শাড়ী আকুল আবেগে বন্ধন-মোচনের চেষ্টা করতে লাগল।

[ক্রমশঃ।

★

উত্তর

১। মঙ্গল পাণ্ডে। ২। জেম্‌স হিকি। ৩। এক জন।
৪। ৬৫৲ টাকা। ৫। জে, এফ, ম্যাডান। ৬। নল-দময়ন্তী
৭। রেড উড ও বাওবব। ৮। ব্রাহ্মী। ৯। আট আনা।

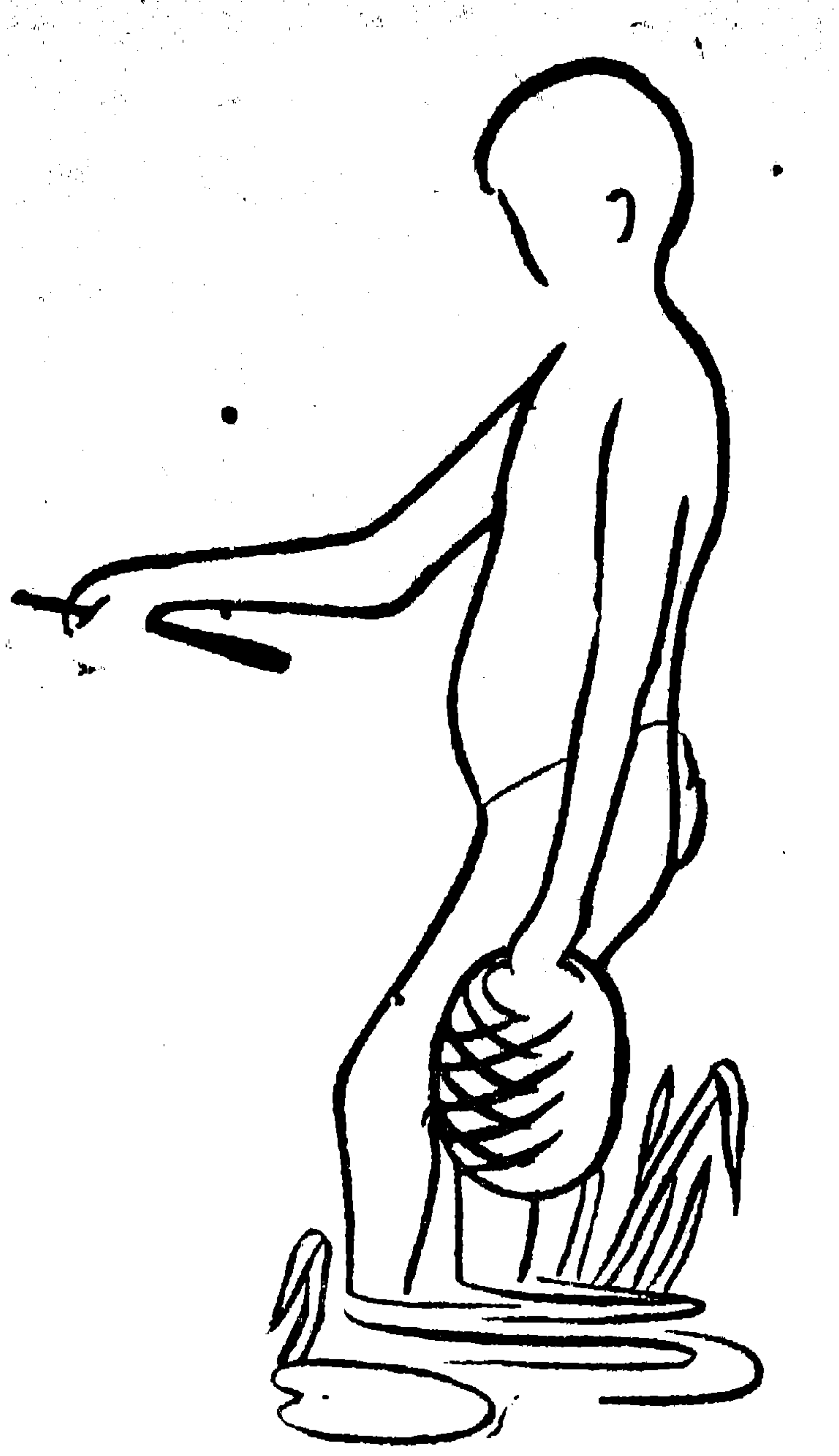

ছোটদের আসর

কমলা

(সত্য ঘটনা)

গোলোকেন্দু ঘোষ

শিক্ষিত মানুষের মনে পুরাকাল হইতে মানুষের সন্তান পশু-পিতা-মাতার দ্বারা প্রতিপালিত হইলে কিরূপ ভাবে বাড়িয়া ওঠে তাহা জানিবার কৌতূহল রহিয়াছে। মানবিকতা ও চক্ষু-লজ্জার বালাই না থাকিলে বহু বৈজ্ঞানিককে এইরূপ পরীক্ষা করিতে দেখা যাইত, কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা এই সকল বালাইএর উর্দ্ধে নয় বলিয়া এই ধরণের স্বাভাবিক সুযোগ বড় একটা নাই। দৈব সুযোগের প্রতি তাঁহাদিগকে যুগ যুগ অপেক্ষা করিতে হয় এবং তাহা এতো কচিৎ কদাচিৎ উপস্থিত হয় যে, এই ধরণের পরীক্ষার বিবরণ মোট ষোলো-সতেরটির বেশী বৈজ্ঞানিক-মহলে জানা নাই। সম্প্রতি বাংলা দেশের এইরূপ এক কাহিনীর বিবরণ নিউ হ্যাভেনের ক্লিনিক অব চাইল্ড ডেভেলেপমেণ্টের ডাঃ আর্ণল্ড গেজেল প্রকাশ করিয়াছেন। ঘটনাটি যে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে, এ কথা বলা বাহুল্য।

মিশনারী রেভারেণ্ড জে, এল, সিং বাংলা দেশে কোন এক নেকড়ে বাঘের গুহা হইতে দু'টি শিশুকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। শিশু দু'টির নাম কমলা ও অমলা। উদ্ধার কালে কমলার বয়স আট, অমলার দেড়। শিশু দু'টিকে খুব কচি অবস্থায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। অনুমান হয়, নেকড়ে-জননীর মানুষ-শিশুর প্রতি মাতৃত্ববোধ খুবই তীক্ষ্ণ ছিল, নতুবা সে কখনও দ্বিতীয় বার মানুষ-শিশু প্রতিপালন করিবার উৎসাহ বোধ করিত না।

মেদিনীপুরে মিঃ সিং ও তাঁহার স্ত্রীর দ্বারা পরিচালিত এক দুঃস্থ আশ্রম ছিল। শিশু দু'টিকে তিনি সেখানে লইয়া আসেন। অমলা এক বছরের মধ্যেই মারা যায় কিন্তু কমলা নয় বছর পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল। কিরূপ দীর্ঘ ও ধীর পদ্ধতিতে তাহার নেকড়ে-জীবনযাত্রা কাটাইয়া স্বাভাবিক মানুষ-জীবনযাত্রায় আসিতে লাগিয়াছিল তাহার বিশদ দৈনন্দিন বিবরণ সিং-দম্পতির ডায়েরী পাঠে জানা যায়।

কমলার জন্ম স্বাভাবিক ভাবে মানুষের মত হইয়াছিল। কিন্তু উদ্ধার কালে তাহার স্বভাব ছিল নেকড়ের মত। চার হাত-পায় ভর করিয়া সে চলিত। সাধারণত হাত ও হাঁটুর উপর ভর করিত এবং এতো জোরে দৌড়াইত যে তাহাকে পরাস্ত করা কঠিন ছিল। সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিত না। চার হাত-পায় ভর করিয়া করিয়া পেশী ও হাড় বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। দিনের বেলায় আলো হইতে দূরে এক কোণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুটি পাকাইয়া অনড় অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। রাত্রি বেলায় উঠানের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। এবং ঘড়ি ধরিয়া যেন ঠিক রাত দশটায় ও দুপুর তিনটায় নেকড়ের মত এক অস্বাভাবিক চীৎকার করিত। সে দুধ চাটিয়া খাইত এবং খাদ্য গ্রহণের সময় হাত ব্যবহার করিত না। তাহার তীক্ষ্ণ আঘ্রাণ-শক্তি জঙ্গালের মধ্যে কোথায় মুরগীর নাড়ি-ভুঁড়ি পড়িয়া আছে ঠিক বলিয়া দিত এবং সে উহা চুরি করিত। অন্য বালকেরা তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে আসিলে সে দাঁত দেখাইয়া খেঁকানি দিত। শুধু মাত্র তার নেকড়ে গহ্বরের সঙ্গী অমলার প্রতি কোনরূপ বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখাইত।

সকল প্রকার সামাজিক প্রভাব ও মানুষের সঙ্গ হারাইলে আট বছরের মানব-শিশুও যে কিরূপ অস্বাভাবিক ভয়াবহ চরিত্রের হইয়া উঠে কমলা তাহার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু কমলাকে বুঝিতে ভুল করা উচিত হইবে না। পরিণত মানুষ শিশুর মত বিকাশ লাভে শুধু যে অসমর্থ হইয়াছিল তাহা নহে, তাহার কৃতকার্যতার বিশেষ পরিচয়—নেকড়ের সংস্পর্শে আসিয়া নেকড়ে-জীবন-যাত্রা গ্রহণে সে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহার খাদ্য গ্রহণের পদ্ধতি পশুর মত ছিল বটে, কিন্তু সে পরিষ্কার করিয়া খাইত, কিছু ফেলিত না। মনে হইত, তাহাকে যেন আচরণ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। চার হাত-পায় দ্রুতবেগে চলা তাহাকে নিশ্চয়ই শিক্ষা করিতে হইয়াছিল এবং সে ভীত হইলে নেকড়ে-জননীর কাছ হইতে কাণ কাঁপাইবার ও দরকার মত মাংসপেশী সঞ্চালন করিবার অনুকরণ করিয়াছিল।

আশ্রমে সিং-দম্পতি অসীম ধৈর্যের সহিত ব্যবহার করিতেন। প্রতিদিন দু'-এক ঘণ্টা ধরিয়া মিসেস্ সিং কমলাকে মালিশ করিয়া দিতেন। ইহা তাহাকে মানুষের নতুন পরিবেশে বিশ্বাস স্থাপন করিতে ও মানুষের স্বাভাবিক ভঙ্গি ও চলাফেরা গ্রহণ করিতে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিল। দশ মাস পরে অমলার মৃত্যুতে কমলা দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়াছিল, কিন্তু তাহার মুখের ভাব বদলায় নাই। দু'-এক মাস পরে সে মিসেস্ সিংএর কাছে যাইয়া তাঁহার হাত ধরিত। আশ্রমে আসিবার আঠারো মাস পরে সে হাঁটুর উপর ভর করিয়া হাঁটিত, কিন্তু তাহার পেশী এত বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে

তাহার আরো এক বছর কাটিয়া গেল। আরো ছয় মাসে অন্ধকারকে আর ভয় না করিবার মত নেকড়ে-বৃত্তি পরিত্যাগ করিল। এবং ঐ সময় সে তাহার দু'-একটা কথা বলিতে শিখিল, যথা—'ওঃ' ও 'আম যাব।' কিন্তু তিরিশটি কথা শিখিতে তাহার আরো দুই বছর কাটিয়া গেল। তখন সে পায়ে হাঁটিতে পারে এবং নিজ নগ্নতায় লজ্জা বোধ করিতে শিখিয়া ফ্রককে আদর করিতে সুরু করিয়াছে; এবং তাহার তখন কিছু সামাজিক দায়িত্ববোধ জন্মিয়াছে; অন্যান্য শিশুদের সাহায্য করিতে পারিলে ও মিসেস্ সিংএর চিঠি বহিয়া দিতে পারিলে সে আনন্দ বোধ করিত। এই সময় আশ্রমে তাহার সাত বছর কাটিয়া গিয়াছে—সে তখন স্বাভাবিক তিন বছরের শিশুর মত ব্যবহার করিত অবশ্য তখন তাহার বাস্তবিক বয়স ষোল; প্রায় এইরূপে অত্যন্ত ধীরে হইলেও একান্ত ধৈর্যের সহিত কমলাকে মানুষ-জীবনে অভ্যস্ত করা হইতেছিল, কিন্তু প্রায় সতেরো বছর বয়সে তাহার মৃত্যু ঘটিল। তাহার পূর্ণ শিক্ষার বিবরণ হইতে বহু শিক্ষা লাভ করা যায়। প্রথমত নেকড়ে-জীবনে অভ্যস্ত হইয়া সে মানুষের মনের অসাধারণ সামঞ্জস্য করিবার ক্ষমতার প্রমাণ করিয়াছিল, কিন্তু আট বছর বয়সেও সারা শিশু-জীবনের শিক্ষা ও অভ্যাস, কষ্টসাপেক্ষ হইলেও সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ও নতুন জীবন-যাত্রা গ্রহণ করিয়া মানুষের মনের অসাধারণ সামঞ্জস্য করিবার ক্ষমতার পরিমাণ যে কি বিরাট তাহাও সে প্রমাণ করিয়াছিল।

গোলকধাঁধা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীসুজিতকুমার মহলানবিশ

গোলু নিজের ঘরে বসে মাথার দিকের জানলা দিয়ে দূরে তাকিয়ে দেখছিল। দিনের আলোয় হরদেওর দু'তলার ঘর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। সে লক্ষ্য করল যে ঘরের সব ক'টি জানলাই বন্ধ রয়েছে। সে মনে মনে ভাবল যে এই জানলায় যদি কোন দিন কিছু দেখতে পায়, তাহ'লে হরদেও তখন কোথায় আছে খোঁজ করতে হবে। সে উঠে নীচে যাবে ভাবছে, এমন সময় হুড়মুড় করে কানাই আর বরেন ঘরে ঢুকল।

ঘরে ঢুকেই কানাই দু'হাত তুলে 'ছুটি—ছুটি—ছুটি' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই খাটের নীচে থেকে কালু ভীষণ জোরে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। কানাই বেচারা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে চমকে শূন্যে তিন হাত লাফ দিয়েই তক্তাপোষের উপর বসে পড়ল।

বরেন গম্ভীর হয়ে বলল, "তুই এত ভাল হাইজাম্প পারিস তা ত জানতাম না, স্পোর্টস্‌য়ের দিন তোর হাইজাম্পে ফার্ষ্ট হওয়া উচিত ছিল।"

কালু ততক্ষণে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে কানাইয়ের পায়ের তলাটা শুঁকে নিয়ে একবার ল্যাজ নেড়ে "মিত্র" এই সঙ্কেতটি জানাল। কানাই বরেনের কথায় কাণ না দিয়ে গোলুকে বলল, "এই জানোয়ারটার গর্জনই যদি এত ভীষণ হয়, তাহ'লে না জানি দংশনটি কেমন!"

গোলুর হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধরে গিয়েছিল। সে প্রকৃতিস্থ হয়ে তক্তাপোষের উপর বসল ও একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সুরু করল, "আমার মাথার দিকের জানলাটা দিয়ে হরদেওর দু'তলার ঘর পরিষ্কার দেখা যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ওই ঘরের জানলা দিয়ে মাঝে-মাঝে কেউ কাউকে আলো জ্বালিয়ে সঙ্কেত জানায়, যদিও দিনের বেলা সব সময় জানলাগুলি বন্ধ থাকে। আমার পায়ের দিকের জানলা দিয়ে পোড়ো-বাড়ীর কিছু অংশ দেখা যায়, তবে আমার মনে হয় যে, হরদেওর জানলা দিয়ে পোড়া-বাড়ীটা সম্পূর্ণ দেখা যায়। হরদেও এ বিষয়ে সহজে কিছু বলবে না। আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে আমরা কি উপায়ে হরদেওর কাছ থেকে এ বিষয় কিছু জানতে পারি।"

বরেন বলল, "সোজা উপায় বাতলে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে তোরা চল, আমি গিয়ে হরদেওর ঘাড়টি টিপে ধরছি, আর তোরা যা জানতে চাস তাকে প্রশ্ন কর, উত্তর না দেয় ত—"

কানাই বলল, "থাম্ থাম্, তুই নিজের ঘাড়টা টিপে ধর ত, তা'তে বেশী কাজ হবে।"

গোলু বলল, "আঃ, ওকে চটাচ্ছিস্ কেন?"

কানাই গোলুকে বলল, "আমাদের এখন উচিত, হরদেওর বাড়ীটা নজরে রাখা এবং সন্দেহজনক কিছু দেখলেই বাড়ীটায় ঢুকে সব খুঁজে দেখা।

গোলু বলল, "সে আমাদের বাড়ীতে ঢুকতে দেবে কেন?"

কানাই হেসে বলল, "সে যখন থাকবে না তখন আমাদের কাজ সারতে হবে, এবং এ বিষয়ে গয়ারাম আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।"

গোলু চিন্তিত মুখে বলল, "কথাটা মন্দ বলিসনি।"

বরেন এবারে বলল, "যাই বলিস, কতগুলো জিনিষ আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। যেমন, ধরেই নিলাম যে হরদেও, রামরতন, বিষণলাল প্রভৃতি লোকেরা সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করে, কিন্তু এই ঘোরাঘুরি ছাড়া আর কি অন্যায় কাজ এরা করেছে? শুধু তাই নয়, ওই পোড়ো-বাড়ীর ঘটনার সঙ্গে আমরা এদের কি করে জড়াই?"

গোলু শুনে বলল, "এখন সব কথা আমি বলতে পারব না, কারণ প্রমাণের অভাবে জোর করে কিছুই বলা উচিত নয়, তবে এইটুকু আমি বলে দিচ্ছি যে আমাদের খুব সাবধানে চলতে হবে। যতগুলো লোককে আমরা দেখছি, তাদের মধ্যে একটাও আসল লোক নয়। এদের কার্য্যকলাপ দেখে আমি বুঝতে পারছি যে আসল লোকটি অত্যন্ত চতুর ও হিংস্র প্রকৃতির, সে দরকার হলে লোক খুন করতে পেছপাও হবে না।"

এই কথা শুনে বরেন সোজা হয়ে উঠে বসল। কানাই জিজ্ঞেস করল, "আসল লোক সম্বন্ধে কিছু জানতে অথবা আবিষ্কার করতে পেরেছিস?"

গোলু বলল, "কিছুই না, কারণ, সবে আমি তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে পেরেছি, তবে কিছুতেই বুঝতেই পারছি না যে, এত ছোট একটা জায়গায় তার মত লোকের কি দরকার থাকতে পারে?"

কথায় কথায় বেলা হয়ে গিয়েছে দেখে কানাই ও বরেন বিদায় নিল।

সেদিন বিকেল বেলা কানাই ও বরেন, গোলুকে নিয়ে গয়ারামের খোঁজে বেরোল। গয়ারাম তার আস্তানাতেই ছিল।

সেদিন বোধ হয় গোলুদের ভাগ্যটা ভাল ছিল; কারণ, নানা কথার পর হরদেওর কথা উঠলে গয়ারাম বলল যে, সে সকালের ট্রেনে কোথায় চলে গেছে এবং বোধ হয় রাত্রের ট্রেনেই ফিরবে। হরদেওর সঙ্গে তার ষ্টেশনের পথে দেখা হয়েছিল এবং তখন সে তাকে এই কথাই বলে।

গয়ারামের কথা শুনে তিন বন্ধু নীরবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কানাই বলল, "এবারে তাহ'লে ওঠা যাক।"

বিদায় নেবার আগে গোলু গয়ারামকে পোড়ো-বাড়ী সম্বন্ধে নতুন খবর কিছু আছে কি না জিজ্ঞেস করল। প্রশ্ন শুনে গয়ারামের মুখটা যেন একটু শুকিয়ে গেল, এবং সেটা গোলুর নজর এড়াল না। সে দু'-তিন বার রামনাম করে বলল যে, এর মধ্যে এক দিন ষ্টেশনের কাছে বিষণলালের সঙ্গে দেখা হওয়াতে, তারা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে ক্রমে পোড়া-বাড়ীর সামনে চলে আসে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সঙ্গে বিষণলাল থাকাতে তার ভয় হয়নি, তবে সেখান থেকে সে তাড়াতাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ বিষণলাল বলল, সে না কি পোড়া-বাড়ীর জমিতে একটা লোক চলে যেতে দেখেছে। সে গয়ারামকে সেইখানেই দাঁড়াতে বলে লোকটাকে অনুসরণ করে ও নিমেষের মধ্যে গাছের আড়ালে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। এই পর্য্যন্ত বলে গয়ারাম ঢোক গিলে দুই-তিন বার রামনাম করল।

কানাই সাহস দিয়ে বলল, "বল, বল তার পর—"

গয়ারাম তখন বলল যে, বিষণলাল চলে যেতে সে সেখানে দাঁড়িয়ে বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে রামনাম করতে লাগল। হঠাৎ সে দেখে, (গয়ারামের গলার স্বর কেঁপে গেল) বাড়ীটার এক পাশ থেকে একটা লোক লম্বা-লম্বা পা ফেলে সামনে এসে দাঁড়াল। সেই আবছা আলোয় যেটুকু দেখা গেল, সেইটুকুই ভীতিজনক। লোকটার মুখটা সাদা ফ্যাকাশে, চোখের বদলে দু'টো গর্ত্ত কেবল, এবং দন্তহীন মুখবিবর ঈষৎ ফাঁক হয়ে রয়েছে। এ অদ্ভুত মূর্ত্তিটির মাথায় সাদা পাগ্‌ড়ি বাঁধা এবং পরনে লম্বা সাদা পায়জামা ও গায়ে একটি ফতুয়া। গয়ারামের অনুমানে এই প্রেতলোকবাসীটি লম্বায় অন্তত ১৫ ফিট! সে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে দু'টো হাত দোলাতে আরম্ভ করল এবং মাঝে-মাঝে দন্তহীন মুখবিবর ব্যাদান করতে লাগল। তার দৃষ্টিহীন চক্ষুকোটর যেন গয়ারামের উপরই নিবদ্ধ। অল্পক্ষণ এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার পর সেই মূর্ত্তি ধীরে ধীরে বাড়ীর এক পাশে আড়ালে সরে গেল। গয়ারামের যেন এতক্ষণ পরে বল ফিরে এল ও সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল। গয়ারাম তার কাহিনী শেষ করে আরও কয়েক বার রামনাম করল ও যুক্তকর কপালে ঠেকাল। দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে গোলুরা বিদায় নিল। কিছু দূর যাবার পর, কানাই জিজ্ঞেস করল, "কি রকম শুনলি,—বিশ্বাস হয়?"

গোলু গম্ভীর হয়ে বলল, "সবটাই বিশ্বাস হয়।"

কানাই তাড়াতাড়ি বলল, "এটা ঠিক যে ও কিছু একটা দেখেছে, তবে ভয়ের চোটে বাড়িয়ে বলছে না ত?"

গোলু বলল, "অনেক দিন আগে হরদেও এই রকমই কি একটা বলেছিল কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি, তবে গয়ারামের কথা মিথ্যা নয় এটা আমি বুঝতে পেরেছি।"

বরেন রেগে গোলুকে বলল, "তুই কি বলতে চাস যে ওটা সত্যি ভূত?"

গোলু হেসে বলল, "তাহেই বা দোষ কি, কারণ ভূতের উদ্দেশ্য ভয় দেখান এবং সে উদ্দেশ্য তার সফল হয়েছে। ওটা যদি রাক্ষস হোত, তাহলে খেয়ে ফেলত হয়ত!"

গোলুকে থামিয়ে দিয়ে কানাই জিজ্ঞেস করল, "তুই কি এই ভূতেরও সন্ধান নিবি না কি?"

গোলু বলল, "নিশ্চয়। অন্তত কি জাতীয় ভূত, সে খোঁজটা নিতে হবে,—যদিও খোঁজ না নিয়েই সেটা বুঝতে পেরেছি।" গোলু আর কোন কথা না বলে জোরে হাঁটতে আরম্ভ করল।

বরেন জিজ্ঞেস করল, "এখন আমরা কোথায় যাব?"

গোলু বলল, "হরদেওর বাড়ী"

গোলুরা যখন হরদেওর বাড়ীর কাছে এসেছে, তখনও দিনের আলো যথেষ্ট আছে। বাড়ীটার সামনে এসে গোলু দেখল, দোকান-ঘর থেকে আরম্ভ করে দু'তলার ঘর পর্য্যন্ত সব বন্ধ। গোলুরা তিন জন বাড়ীটার পিছন দিকে গেল। বাড়ীর উঠানটি ঘিরে একটা উঁচু পাঁচিল ছিল। গোলুর কথা মত বরেন আগে কানাইকে পাঁচিলে তুলে দিল। কানাই পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে উঠানের ভিতরটা বেশ করে দেখল ও তার পর গোলুকে বলল, "উঠান দেখে বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছে না।"

গোলু কানাইকে বলল, "যা যা দেখতে পাচ্ছিস সব বলে যা, তার পর দরকার মনে হলে আমিও উঠব।"

কানাই বলতে সুরু করল, "উঠানের এক কোণে কয়েকটা কাঠের প্যাকিং কেস্ পড়ে আছে ও অন্য কোণে একটা খড়ের গাদা। সারা উঠানময় আবর্জ্জনা—"

গোলু তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, "কি জাতীয় আবর্জ্জনা?"

কানাই বলল, "উঠানময় ভাঙ্গা মাটির হাঁড়ি ও কলসীর টুকরা এবং অনেক ভাঙ্গা কেরাসিনের বোতলও পড়ে আছে। উঠানের এক দিকে মাটিতে একটা লম্বা মই পড়ে আছে এবং একতলার ঘরের কাছে একটা জালার মত কি রয়েছে।"

গোলু এবার উত্তেজিত হয়ে বলল, "ভাল করে দেখে আমায় বল সেটা কি জিনিষ।"

কানাই অনেকক্ষণ দেখে বলল, "মনে হচ্ছে যেন একটা রং-করা চিনেমাটির জালা, কাঠের পায়ার উপর বসান এবং সেই জালার নীচে মনে হচ্ছে একটা ছোট কল লাগান রয়েছে।"

গোলু উৎসাহে "ভেরী গুড্‌," বলে ফেলল। বরেন এবার জিজ্ঞেস করল, "কি রে আমাদেরও উঠতে হবে না কি?"

গোলু বলল, "হ্যাঁ।"

উঠানের পাঁচিলটা যদিও গোলু এবং বরেনের মাথার চেয়ে উঁচু ছিল, তবুও তারা হাত বাড়িয়ে পাঁচিলটা ধরে, শুধু হাতের জোরেই উঠে পড়ল। তার পর তারা তিন জনে সন্তর্পণে ভিতর দিকে লাফিয়ে পড়ল। গোলু মাটি থেকে মইটা তুলে দেওয়ালের উপর কাত করে রাখল। মইয়ের মাথাটা বাইরের দিকে খানিকটা বেরিয়ে রইল। গোলু চারি দিক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে সেই চিনেমাটির জালাটার কাছে গেল।

হঠাৎ সে মাটি থেকে কি একটা তুলে নিয়ে বলল, "এই পেয়েছি।"

কানাই তাকিয়ে দেখে, সেটা একটা লম্বা কাঠের হাতা। সে জিজ্ঞেস করল "ওটা দিয়ে কি হয়?"

গোলু বলল, "মনে হয়, এটা দিয়ে এই জালার ভিতরের পদার্থগুলি ভাল করে নেড়ে মেশান হয়।"

গোলু দেখল যে জালাটার আগাগোড়াই চিনেমাটি দিয়ে তৈরী। সে উপরের ভারী ঢাকাটা সবে তুলে দেখতে যাবে এমন সময় কানাই হঠাৎ "দেখ দেখ" করে চেঁচিয়ে উঠল। গোলু তাকিয়ে দেখে যে পাঁচিলের বাইরে থেকে কে মইটা টেনে নেবার চেষ্টা করছে। তিন জনেই দৌড়ে গিয়ে মইটাকে টেনে ধরাতে, বাইরের লোকটা মইটা ছেড়ে পালিয়ে গেল। গোলু তখন মইটা মাটিতে শুইয়ে রাখল।

বরেন আস্তিন গুটিয়ে বলল, "ব্যাটা পালিয়ে গেল, নইলে বাছাধনকে একবার দেখাতাম।"

গোলু বলল, "এই ত মুস্কিল হোল, আমি ভেবেছিলাম, উপরের ঘরটা একবার দেখতে চেষ্টা করব, এখন দেখছি তা হবে না, কারণ বাইরের লোকটার মতলব কি, বুঝতে পারছি না।"

বরেন বলল, "আজ যদি এখানে আর কাজ না থাকে, তাহলে চল সরে পড়ি।"

গোলুর সম্মতিক্রমে তিন জনেই পাঁচিল টপকে বাইরে চলে এল। বাইরে এসেই একটি লোকের সঙ্গে তাদের দেখা হোল। সে লোকটা ভাবেনি যে তারা অত শীগ গির ভিতর থেকে চলে আসবে; কাজেই সে নিশ্চিন্ত মনে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যাই হোক, গোলুদের দেখে সে একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলল, "আবার দেখা হয়ে গেল, ভাল আছেন ত?"

গোলু অবাক হয়ে দেখে যে লোকটি বিষণলাল। বিষণলালই যে বাইরে থেকে মইটা টেনে নেবার চেষ্টা করেছিল এ বিষয় গোলুর আর সন্দেহ ছিল না, তাই সে একটু তিক্ত ভাবেই বলল, "আজকেও কি আম পাড়তে না কি?"

বিষণলাল এক-গাল হেসে বলল যে, সে হরদেওর খোঁজে এসেছিল। সে হরদেওর দেখা পেয়েছে কি না জিজ্ঞেস করাতে বিষণলাল বলল যে, সে আজ সারা দিন হরদেওর দেখা পায়নি এবং বাড়ীতেও সে নেই। যাই হোক, গোলু বাড়ী ফিরতে উদ্যত হয়ে বিষণলালকে জিজ্ঞেস করল, সে ওই দিকে যাবে কি না, কিন্তু বিষণলাল মাথা নেড়ে জানাল, সে উল্টো দিকে যাবে।

কিছু দূর গিয়ে কানাই গোলুকে বলল, "বিষণলাল নিশ্চয় আবার হরদেওর বাড়ীতেই ফিরে গেছে, এবং আমার মনে হয় সেখানে ও কিছু খুঁজছে।"

গোলু বলল, "কিছুই আশ্চর্য্য নয়, এই লোকটাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। সাহেবের দরোয়ান হয়ে কতক্ষণ সে দরোয়ানী করে জানি না; কেবল ত এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়।"

কানাই বলল, "বিষণলালের বন্ধু ওই খানসামাটাও শয়তান!"

গোলুরা গল্প করতে করতে বাড়ী ফিরে এল। কানাই গোলুকে বলল, "চল, তোর ঘরে একটু বসি।"

গোলুর ঘরে বসে তিন জনে গল্প সুরু করল। গোলু বলল, "আজ একবার ষ্টেশনে গিয়ে দেখতে হবে। শেষ গাড়ী আসে দশটায়, সেই গাড়ীতে হরদেও ফেরে কি না দেখতে চাই। যদি সে না ফেরে, তাহ'লে বুঝতে হবে যে পরের দিন ছাড়া তার আর ট্রেণে ফেরার উপায় নেই।"

কানাই এই সময় জিজ্ঞেস করল, "কেন, রাত দশটার পরে সে যদি অন্য কোন উপায়ে ফেরে?"

গোলু জিজ্ঞেস করল, "ট্রেণে না ফিরে অন্য কি উপায়ে সে ফিরতে পারে?"

কানাই বলল, "সে যদি আজ রাত্রেই ফিরতে চায় তাহলে তাকে অন্য কোন উপায়ে ফিরতে হবে, কারণ কাল সকালের আগে কোন ট্রেণ নেই; তবে সেটা সম্ভব হয় যদি সে কাছাকাছি কোথাও গিয়ে থাকে।"

গোলু বলল, "কি উপায়ে ফিরতে পারে বললি না?"

কানাই এবার মুস্কিলে পড়ল। সে বলল, "সেটাই বুঝতে পারছি না, হয়ত হেঁটে ফিরবে, আর নয় ত গরুর গাড়ীতে।"

গোলু বলল, "এর কোনটাই বলে মনে হয় না। কারণ, প্রথমতঃ, হরদেও দৈহিক পরিশ্রমের পক্ষপাতী নয় এবং দ্বিতীয়ত সে যদি আজ রাতের মধ্যে তাড়াতাড়ি ফিরতে চায় তা'হলে গরুর গাড়ী চলবে না, গরুর গাড়ীতে দেরী হবে, জানাজানি হবে, ইত্যাদি।"

বরেন এবারে বলল, "তা'হলে সে কি উপায়ে ফিরবে শুনি?"

গোলু বলল, "আমার বিশ্বাস, তার সঙ্গে আরও লোক থাকবে এবং এই লোকেদের সাহায্যে সে ফিরবে। আমি এই লোকগুলোকেও দেখতে চাই।"

বরেন হতাশ হয়ে বলল, "কিছুই বুঝলাম না।"

কানাই বলল, "এই মেঝেতে গোটা-দশেক ডন আর গোটা-কুড়ি বৈঠক দে, তোর মাথা পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

বরেন কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলে "তোর বুদ্ধি খুলবে আমার কাছে 'রাম গাট্টা' খেলে।"

গোলু হাসতে হাসতে বলল, "তোদের লাঠিগুলোতে তেল লাগাচ্ছিস্ ত?"

বরেন বলল, "আমার লাঠিটা তেল খেয়ে এর মধ্যেই যা তৈরী হয়েছে—চমৎকার!"

কানাই বলল, "এক কাজ কর, তোর লাঠি দিয়ে নিজের মাথায় এক ঘা দিয়ে দেখ, যদি মাথা ভাঙ্গে ত বুঝবি লাঠি ঠিক তৈরী হয়েছে, আর যদি লাঠি ভাঙ্গে, তা'হলে ত বুঝতেই পারবি যে বৃথা তেল খাইয়েছিস এত দিন ধরে।"

বরেন রেগে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কথা উল্টাবার জন্য গোলু তাড়াতাড়ি বলল "এখন আমাদের কি করতে হবে বলছি শোন। রাত্রে খাওয়ার পর আমরা ষ্টেশনে যাব ও রাত দশটার ট্রেণে কেউ আসে কি না দেখব। যদি দরকার হয় তাহলে আরও রাত পর্য্যন্ত থাকব।"

কানাই গোলুকে বলল "তুই অত রাত পর্য্যন্ত বাইরে থাকবি কি করে?"

গোলু বলল, "সে ব্যবস্থা আমি করে নেব। সেদিন আমি বাবাকে পোড়ো-বাড়ী সম্বন্ধে কিছু-কিছু বলেছি এবং তিনি জানেন যে আমরা খোঁজ খবর নিচ্ছি এবং গোয়েন্দাগিরী করছি। কাজেই আমার মনে হয়, তাঁর কিছু আপত্তি হবে না।"

বরেন বলল, "আমার ত কোনই বাধা নেই। সে বছর আমার মনে আছে ওই নদীটা পেরিয়ে বিকেল বেলা চলে গিয়েছিলাম দূরের শালবনে। খেয়াল ছিল না, হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর গিয়ে হঠাৎ রাত হয়ে চারি দিক এত অন্ধকার হয়ে গেল যে পথ হারিয়ে ফেললাম। পাছে উল্টো দিকে চলে যাই এই ভেবে একটা গাছে উঠে সারা রাত কাটালাম। নীচে দিয়ে, খড়-খড় সর-সর করে কত কি যে সারা রাত চলা-ফেরা করল। সকাল বেলা গাছ থেকে নেমে বাড়ী চলে এলাম।"

কানাই বলল, "বাড়ী ফিরে কারুর কাছে রাম-গাঁট্টা খেলি না?"

বরেন হেসে বলল, "সকলে এত ভয় পেয়েছিল যে, অক্ষত শরীরে ফিরে আসাতেই সকলে খুসী। এর পর থেকে আমি অবাধে ঘোরা-ফেরা করি।"

কানাই বলল, "আমার ব্যবস্থা আমি করে নিতে পারব, কারণ কাকা এখানে নেই এবং সারা ছুটির মধ্যে আর ফিরবেন না। বাকী যাঁরা আছেন, তাঁরা জানেন যে আমি নিজের দেখা-শোনা নিজেই করতে পারি, কাজেই তা নিয়ে মাথা ঘামান না বা অযথা গোলমাল করেন না।"

গোলু সব শুনে বলল, "তাহলে ত ভালই হোল। এখন এক কাজ করা যাক্‌। তোরা বাড়ী চলে যা এবং রাত্রের খাওয়া শেষ করে বরেনের বাড়ী দু'জনে অপেক্ষা করিস, আমি বরেনের বাড়ীতেই তোদের সঙ্গে দেখা করব।"

যাবার আগে কানাই জিজ্ঞেস করল, "সঙ্গে লাঠি বা টর্চ নেবার দরকার আছে।"

গোলু বলল, "আজ আর দরকার হবে না।"

[ক্রমশঃ

এ্যাটমের বিচিত্র কথা

(জন্ম-কথা)

শ্রীঅতুলচন্দ্র সরকার

আমরা আলোচনা করছিলুম এ্যাটম নিয়ে নয় কি? এ্যাটম কাকে বলে? এক কথায় বলতে গেলে এ্যাটমের অর্থ হচ্ছে 'যাকে ভাগ করা যায় না'। কথাটা ঠিক বুঝলে না? বুঝিয়ে বলছি শোন। তোমার হাত থেকে এক টুকরো কয়লা মেজের উপরে পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে গেল! এইবার যে টুকরোগুলো হল তাদেরও যদি আরও ভেঙ্গে ফেলা যায় তবে? পাওয়া যাবে এক-একটি ছোট্ট কয়লার কণা। এমনি ধারা ক্রমাগত যদি ভাগই করে যাওয়া যায় তবে কি হবে?—এমন একটা অবস্থা কি আসবে না যার পরে ভাগ করা অসম্ভব? এই যে সব চেয়ে ক্ষুদে কয়লার টুকরো একেই বলা হবে একটা কয়লার এ্যাটম। অল্প কথায় বলতে গেলে এ্যাটম হচ্ছে কোনও মৌলিক পদার্থের সব চেয়ে ক্ষুদ্র কণিকা।

সে হচ্ছে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগের কথা, আমাদের প্রাচীন আর্য্য ঋষি মহর্ষি কণাদ সর্ব্বপ্রথম পরমাণু বা এ্যাটম সম্বন্ধে নানা প্রকারের তথ্য আবিষ্কার করেন। তার পরে কেটে গেছে বহু যুগ, এ নিয়ে আর কোন আলোচনা হয়নি। যীশু খৃষ্টের জন্মের ৪০০ বৎসর আগে গ্রীস দেশের পণ্ডিত ডিমোক্রিটাস বহু দিন পরে এই তথ্য নিয়ে হঠাৎ এক দিন চিন্তা করলেন। দুপুর বেলায় টেবিলের উপরে ছুরি দিয়ে তিনি কাটছিলেন এক টুকরো খড়, হঠাৎ তিনি ভাবলেন, "এই যে খড়ের টুকরোগুলো হল, এগুলোকে কি এমন করে কাটা যায় না যার চেয়ে ছোট খণ্ড খড় থেকে পাওয়া সম্ভব নয়?" ডিমোক্রিটাসের এই চিন্তা থেকেই জন্ম নিয়েছিল আজকের দিনের 'এ্যাটম-তথ্য'। ডিমোক্রিটাস এ্যাটমদের কথা আবিষ্কার করলেন বটে, কিন্তু দেশের বড়-বড় পণ্ডিতেরা তাঁর ঐ সব কথাকে পাগলামি বলে উড়িয়ে দিল। নানা রকমের প্রশ্ন-বাণে তাঁকে করে তুলল ব্যতিব্যস্ত। তখন তিনি শান্ত ভাবে বুঝিয়ে দিলেন সব কথা।

কঠিন আর তরল পদার্থের কথা বুঝিয়ে দিতে গিয়ে তিনি বললেন যে, তরল পদার্থের 'ক্ষুদ্রতম কণা'গুলো তেলতেলে, এই জন্যে তারা ইতস্তত গড়িয়ে চলতে পারে। কঠিন পদার্থের 'ক্ষুদ্র কণা'গুলো খসখসে আর তাদের গায়ে লাগানো আছে 'হুক'; এই হুকের সাহায্যেই তারা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে রাখে। তোমরা কি গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টোটল-এর নাম শুনেছ?—তিনি ছিলেন ডিমোক্রিটাসের তথ্যের ঘোর বিরোধী। এই জন্যেই কিছু কালের জন্যে এই তথ্য জনসমাজে মিথ্যা বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু ঐ তথ্যের মূলের সত্য প্রকাশ পেতেই সকলে সমাদরে তা গ্রহণ করলে।

আজকালকার যুগের এ্যাটম-তথ্য' ডিমোক্রিটাসের তথ্যের চেয়ে অনেকাংশে ভিন্ন ধরণের। এর প্রায় অনেকটুকুনই বিজ্ঞানী ডালটনের গবেষণার ফল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত রসায়নবিদ্‌ জন ডাল্টন ডিমোক্রিটাসের 'এ্যাটম-তথ্য' নিয়ে পরীক্ষা করে ১৮০৮ সালে এক বইয়ে তাঁর মত লিপিবদ্ধ করলেন। ডালটনের ঐ মতের উপরেই হচ্ছে আজকের রাসায়ন শাস্ত্রের ভিত্তি।

এ্যাটমই হচ্ছে কোন একটা পদার্থের সব চেয়ে ক্ষুদ্র কণা। কাজেই এ কথা বলা ভুল হবে না যে এ্যাটমের সমষ্টিই হচ্ছে পদার্থ। আমাদের চার পাশে যা-কিছু আমরা দেখি সবই তো তবে এ্যাটমের সমষ্টি। এমন কি আমাদের নরদেহও হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের কতকগুলো এ্যাটমের সমষ্টি মাত্র। কাজেই বেশ বোঝা যায় যে, কোনও কিছুর গুণ নির্ভর করে যে প্রকারের এ্যাটম নিয়ে তা গড়ে উঠে তার উপরে। ওজনের ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি ধারা। তুলা আর লোহা,—এদের মধ্যে কোনটা হালকা? কি বললে, তুলা? এইবার বল তো, এক মণ তুলাই বেশী ভারী না এক মণ লোহা?—দু'টোই সমান কিন্তু পরিমাণের দিক থেকে দেখতে গেলে তুলাই হবে বেশী। যে জিনিষ পরিমাণে কম হয়ে ওজনে হয় বেশী তাকেই বলা হয় ভারী। এই যে ভারী-লঘুর কথা হচ্ছে এর মূলেও কিন্তু রয়েছে তোমার ঐ এ্যাটম। ভারী জিনিষের যে এ্যাটমগুলো থাকে তার ওজনও যে বেশী তা তো সহজেই বোঝা যায়?

কোন জিনিষের ওজন সম্পূর্ণ ভাবেই নির্ভর করে এ্যাটমদের ওজনের উপরে। দুনিয়ার সব চেয়ে হালকা পদার্থ কি জানো?—'হাইড্রোজেন।' এ হচ্ছে এক রকমের বাতাস। সব চেয়ে ভারী পদার্থ হচ্ছে এক রকম ধাতু, নাম তার ইউরেনিয়ম। এ্যাটম বোমার যুগে এই ধাতুর কদর একটু বেশী রকমের। কারণ, এ ছাড়া 'এ্যাটম বোমা' তৈরী করা যায় না বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। হাইড্রোজেন সব চেয়ে হাল্‌কা, তার এ্যাটমও হচ্ছে সব চেয়ে হাল্‌কা। এই কারণেই

হাইড্রোজেনের একটা এ্যাটমের ওজন ধরা হয় এক, আর অন্য সব জিনিসের এ্যাটমগুলোকে ওজন করা হয় হাইড্রোজেনের এ্যাটমের তুলনায়। যেমন ধরো, সের-বাটখারার তুলনায় ওজন করা হয় সব জিনিস—চাল, ডাল, চিনি···। ওই ভাবে ওজন করে দেখা গেছে যে, ইউরেনিয়মের এক-একটা এ্যাটম ওজনে ২৩৮টা হাইড্রোজেন এ্যাটমের সমান। বাজারে যেমন কোন জিনিসের ওজন বলতে গিয়ে দোকানী বলে—পাঁচ সের-ছ'সের-সাত সের,—এ্যাটমের ওজনের বলায় কিন্তু শুধু পাঁচ-ছ-সাত বললেই যথেষ্ট। কিসের তুলনায় তা আর বলতে হয় না, শুধু বলতে হয় সংখ্যাটা। যেমন ধরো, ইউরেনিয়মের এ্যাটমের ওজন ২৩৮ (হাইড্রোজেন এ্যাটমের তুলনায় তা আর বলা হল না)। এই যে সংখ্যা একেই বলা হয় 'এ্যাটমের ওজন' (Atomic weight)।

আগেই বলেছি, এ্যাটম 'ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র' কাজেই এর আকার কল্পনা করাও অসম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানীরা অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। তাঁদের মতে ওজনের সাথে সাথে এ্যাটমের আকারও ছোট-বড় হয়। নানা রকমের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, হাইড্রোজেনের ২৫০,০০০,০০০টা এ্যাটম সারি দিয়ে দাঁড়ালে তবে এক ইঞ্চি জায়গা লাগে, কিন্তু ইউরেনিয়ম ধাতুর মাত্র ১০০,০০০,০০ এ্যাটমেই এক ইঞ্চি জায়গা নেয়।

"পাঁচ জুতি"

শ্রীসুশীলচন্দ্র দাস

কথায় বলে, পয়সায় বাঘের চোখ মেলে। তার মানেই হল মূল্য দিয়ে কি না পাওয়া যায়। অতি সত্যি কথা! পয়সা পেলে লোক গোখরো-চন্দ্রবোড়া সাপের মাথায় কামড়িয়ে দেয়, কাচ চিবিয়ে খায়, আগুনের ভেতর হেঁটে চলে, সাগরের তলায় পর্যন্ত চলে যায়, মাটির নীচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। পয়সায় কি অসাধ্য না হয়, আর কি ঘটান না যায়!

বুঝলাম, সবই মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু পৃথিবীতে এমনি একটি জিনিষ আছে যা কোন মূল্য দিয়েই সংগ্রহ করতে পারবে না। অথচ একেবারে বিনা পয়সায় তা পেতে পার! মজা বটে! এক দিকে সে দ্রব্য যেমন অমূল্য, আবার নগদ কিনতে গেলে কাণাকড়িও লাগে না। একটু হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে তোমাদের ভেবে যে ব্যাপারখানা কি তবে।

শত শত বছর ধরে সেটা লোকের হস্তান্তর হয়ে চলেছে। এরা সাধারণ রাম-রহিম নয় কেউ! মস্ত বড়-বড় সব রাজা-বাদশা। শক্তির তাহারা এক-একটা। বলপ্রয়োগ করে এক রাজা আর এক জন থেকে আদায় করেছে সেটা। আদায়ের সাথে রাজার রাজ্যটিও বকশিস্ মিলেছে। আর না পাবেই বা কেন? কেড়ে নিতে গেলে সে যে কি ঝাঁক পোহাতে হয়! কষ্ট করার পুরস্কার যতটা মিললো! যে রাজার শিরোভূষণ চলে গেল, তাঁর বেঁচে থেকে রাজ্য দিয়েই কি আর লাভ! মাথার মণি হারিয়ে অসম্মান পুঁজি করে ক'টা রাজা-বাদশা বেঁচে থাকতে পারেন!

গোলকুণ্ডার নাম শুনে থাকবে তোমরা। কত শত মণির আকর সেখানে ছিল। ভূগোলের ছাত্র, ছাত্রীদের অন্তত পরীক্ষা পাশের জন্য একবার করে ওর নামটা কিছুদিন মুখস্থ করতে হবেই। ভারতের বাইরে যে সব রাজ্য আছে, সেখানকার রাজনৈতিক যুবকদের গোলকুণ্ডার নাম মনে আসতে আমাদের দেশের ঐশ্বর্যের কথা ভেবে মনে একটু ঈর্ষা জাগবে বৈ কি!

প্রথমে ছিল তা গোলকুণ্ডার আকরে। সেখান থেকে উঠিয়ে এনে অঙ্গাধিপতি মহারাজ কর্ণের রাজকোষে তুলে রাখা হল। এক সময়ে সেটা উজ্জয়িনীরাজের শিরোভূষণের শোভা বর্দ্ধিত করেছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন মালব দেশ জয় করে তা নিজ অধিকারে আনলেন। পাঠান রাজত্বের ধ্বংসের সংগে মোগলদের হাতে গেল সেটা। নাদির শাহ পেয়েছিলেন মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহকে পরাজিত করে। নাদিরের হত্যার পর কাবুলের আহম্মদ শাহ, আহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে শাহসুজা সে জিনিষ হস্তগত করলেন। শেষে মহারাজ রণজিৎ সিংহ শাহসুজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে পেয়েছিলেন তা। সর্বশেষ পড়ল যেয়ে বিদেশী ইংরেজ বণিকদের হাতে। ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট আছে এখন সেটা।

এক দিন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি রণজিৎ সিংহকে ওর মূল্য জিগ্গেস্ করলে উত্তরে বললেন তিনি, "এস্কো কিম্মৎ পাঁচ জুতি।" জোর যার মুলুক তার যেমন করে হয়। মুরোদ যার হয়েছে, কেড়ে নিয়েছেন।

এক যে ছিল ছোট্ট পরী

প্রভাকর মাঝি

এক যে ছিল ছোট্ট পরী রামধনুকের দেশে,
খুকুর চোখে ঘুম দিতো রোজ সন্ধ্যে বেলা এসে।
টুকটুকে তার রাঙা ঠোঁট খাসা, মিষ্টি চাহনিটি,
রূপনগরের চম্পাবতীর ঝিলিক-লাগা দিঠি।
তার তরে ঐ কানন জুড়ে ফুটছে রঙীন ফুল
একশো পাখী গান ধরিছে আনন্দে মশগুল।
একশো তারার প্রদীপ আঁকে তাহার পথ-রেখা,
রামধনুকের সাতটি রঙে তার কথাটি লেখা।
আকাশ-বীণার গোপন তারে তার কথাটি ঝরে,
নির্ঝরিণীর কলধ্বনি জাগছে তারি তরে।
সবুজ দু'টি পাখনা মেলে আসতো লঘু বায়ে,
ঝুমুর-ঝুমুর কনক নূপুর বাজতো রাঙা পায়ে।
যেথায় বসে দস্যি ছেলে কথায় কথায় আড়ি,
তাদের কাছে ছোট্ট পরী যায় যে তাড়াতাড়ি।
ঘুম দিতে ভরা খুকুর কাজল দু'টি চোখে,
সোনার স্বপন দেয় বুনে সে নাম-না-জানা লোকে।

প্রথম প্রেম

জেমস্ জয়স

নর্থ রিচমণ্ড স্ট্রীট কানা। কোন গলি বেরোয়নি তার থেকে রাস্তাটা তাই নির্জন—নিরিবিলি। এক কেবল ছুটির পর পাদরীদের ইস্কুলের ছেলেরা ওটাকে মাতিয়ে তুলত মুখর কলকাকলিতে। কানা পথটা যেখানে এসে শেষ হয়েছে একখানা দোতলা বাড়ী ছিল সেখানটায়। চার-কোণা একখণ্ড জমি বাড়ীটাকে পৃথক্ করে রেখেছিল পাশের বাড়ীগুলো থেকে। কেমন দুরন্ত অপর বাড়ীগুলো বুঝি নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করত ওটার দিকে চেয়ে!

আমাদের এই বাড়ীখানা পূর্বে ভাড়া নিয়েছিলেন এক পাদরী সাহেব। ভিতরকার বৈঠকখানা-ঘরেই তিনি মারা যান। অনেক দিন তার পর বাড়ীখানা খালি পড়েছিল। কেমন একটা পচা, ভ্যাপসা গন্ধ বেরোত রুদ্ধ ঘরগুলি থেকে। রান্না-ঘরের পেছন দিককার পোড়ো ঘরটায় পুরোন এক গাদা কাগজ-পত্র জমে উঠেছিল। কাগজ-পত্রের গাদা থেকে কাগজে মোড়া খানকয়েক বই আমি খুঁজে পেয়েছিলাম এক দিন: স্কটের Abbot, Devout communicant আর ভিদকের Memoirs. বইগুলো বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পাতাগুলি গিয়েছিল দুমড়ে। শেষের বইখানা আমার খুব ভালো লাগত। কেন না, ওটার পাতাগুলো ছিল হলদে। বাড়ীর পিছনকার অযত্ন-রক্ষিত বাগানের মাঝখানটায় ছিল একটা আতা গাছ আর আশ-পাশের লতা-পাতার কয়েকটা ঝোপ। ওই ঝোপের মাঝখান থেকেও আমি এক দিন আগের ভাড়াটিয়েদের একটা মরচে-ধরা সাইকেল পাম্প কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। পাদরী সাহেব অকাতরে দান করতেন। উইলে তিনি তাঁর টাকা-পয়সা সব কিছু দান করে গেছেন দেশের সৎ-প্রতিষ্ঠানগুলিকে। আসবাব-পত্রগুলিও দিয়ে গেছেন তাঁর বোনকে।

শীতকালের দিনগুলি দেখতে না দেখতেই শেষ হয়ে আসত। 'ডিনার' খেয়ে নেবার পূর্বেই রাত্রির অন্ধকার আসত নেমে। খেয়ে-দেয়ে আমরা যখন রাস্তায় এসে জড়ো হতাম, আশ পাশের বাড়ীগুলো তখন ঝিমিয়ে পড়ত। মাথার উপরে শুধু ধোঁয়াটে অনন্ত আকাশ। মিটমিটে রাস্তার আলোগুলো চেয়ে আছে মুখ তুলে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড়-গোড় আমাদের পাকিয়ে উঠত।
ছুটোছুটি করে বেড়াতাম। নিরিবিলি রাস্তাটা
উঠত আমাদের চিৎকারে। খেলতে খেলা
বাড়ীগুলোর পেছন দিকটায় এসে পড়তা
তার পর ঢুকে পড়তাম অন্ধকার বাগা
এসে লাগত। অন্ধকার আস্তা
ঘোড়াটার গুচ্ছ আঁচড়ে দিচ্ছে
পোষাকটা বাজাচ্ছে টুং-টাং
জানলা দিয়ে আলো
মোড় ফিরতে দেখা
মধ্যে তিনি যখন
বোন ভাইকে
সামনে, অ
দেখতাম।
মাঝখানের
থেকে।
খোলা দ
দিদিকে জ

ওর দিকে। চলবার সময় ওর পোষাকটা আর চুলের ফিতেটা দুলে উঠত এদিক্-ওদিক্।

রোজ সকাল বেলা সামনের বারান্দায় চিৎ হয়ে শুয়ে আমি চেয়ে থাকতাম ওদের দরজার দিকে। শার্সিটা এমনি করে ভেজিয়ে দিতাম কেউ যেন আমায় দেখতে না পায়। দোরগোড়ায় ও এসে দাঁড়ালে বুকটা আমার নেচে উঠত। বইখানা নিয়ে আমি তখন হল-ঘরের দিকে ছুটে যেতাম। ওর কটা মূর্তিটা সব সময় ভেসে উঠত চোখের উপর। যেখানটায় পৌঁছে আমরা দু'জন দু'দিকে চলে যেতাম, পা চালিয়ে আমি তখন কয়েক পা এগিয়ে আসতাম তার পর পাশ কেটে যেতাম ওর। এমনি করতাম রোজই। কাটা-কাটা গোটা-কয়েক কথা ছাড়া ওর সঙ্গে আমার আর কোন কথাই হোত না। তবু ওর নামটি কি ঝড়টাই না তুলত আমার মুগ্ধ হৃদয়ে!

যেখানে রোমান্সের কোন নাম-গন্ধও নেই এমন স্থানেও ওর মুখখানা ভেসে উঠত আমার চোখের উপর। প্রত্যেক শনিবারের বিকেল বেলা খুড়িমা হেক্ষেত্রে সওদা করতে। জিনিষ-পত্র বয়ে আনতে আমাকেও যেতে হোত সঙ্গে। রাস্তার দু' পাশের কড়া আলোগুলো তখন জ্বলে উঠেছে। কোথাও হতে মাতালেরা ঠেলাঠেলি সুরু করে দিয়েছে। পথে-পথে সওদা করে বেড়াচ্ছে মেয়েরা। দিন-মজুরেরা বসে বসে কোথাও হতে খিস্তিখেউড় করছে। শুওরের মাংসের পিপার পাশে দাঁড়িয়ে দোকানী-ছোকরারা বুঝি পথিকদের ডাকাডাকি করছে বাজখাঁই গলায়। পথের গায়কেরা নাকি-সুরে কোথাও ...
কিন্তু ...

ওই প্রথম কথা কইল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম ভয়ানক, কি জবাব দেব ভেবে উঠতেই পারলাম না। ও বুঝি শুধিয়েছিল : 'Araby দের মেলায় আমি যাচ্ছি কি না। প্রকাণ্ড মেলা বসছে ওখানে। ও বুঝি আরও জানিয়েছিল : সেও যেতে চায়।

'বেশ তো চলো না ?'

কব্জির উপরকার রূপোর ব্রেসলেটখানা নাড়া-চাড়া করতে করতে জবাব দিয়েছিল সে : 'যাই কি করে ? আমাদের মঠে এ সপ্তায় ভক্তি হচ্ছে এক গুচ্ছ ছেলে এসে।'

ওর ভাই আর অপরের দু'টি ছেলে টুপি নিয়ে তখন ঝগড়া করছিল। রেলিংএর কাছে আমরাই কেবল একা। রেলিংএর একটা শিক ধরে ঝুঁকে দাঁড়াল ও আমার দিকে মুখ করে। খোলা দরজা দিয়ে আলো ছিটকে এসে পড়েছে ওর শাদা ধবধবে ঘাড়, চুল আর রেলিংএর উপর এলিয়ে-পড়া একখানি হাতের উপর। ফেঁপে-ওঠা ওর পরিপূর্ণ বডিসের একটা পাশ আমার নজরে পড়ল।

'আমি না গেলে, তোমার তো ভালই হয়।' ও জানালে।

'আমি যদি যাই, কিছু কিনে আনব তোমার জন্য।'

সেদিনকার সন্ধ্যের সেই মুহূর্তগুলির পর থেকে কে যেন আমায় পেয়ে বসল। শনিবার রাত্রিতে মেলায় যাবার জন্য আমি ছুটি চাইলাম। খুড়িমা মুখ তুলে তাকালেন। ভাবখানা এই : আমি কি আমার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার কথা ভুলে গেলাম ? ক্লাশেও সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে উঠতে পারলাম না। মাষ্টার মশাইয়ের মুখখানা ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠল। এলোমেলো নানা কথা ভাবতে লাগলাম বসে বসে। কিছু একটা করতে গেলেই মনটা পড়ে থাকত আর কোথায়। সব কিছুই মনে হতে লাগল তুচ্ছ, একঘেয়ে, [illegible]।

[illegible] দিলাম

নীচে নেমে এসে দেখলাম, মিসেস্ মারসার বসে আছেন আগুন-টার কাছে। তিনি হলেন এক মহাজনের বিধবা পত্নী। বয়েস হয়েছে অনেক। কথা কইতে খুব ভালবাসেন। কোন একটা মহৎ কাজের জন্য এখন তিনি সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছেন পুরোন টিকিট। চায়ের টেবিলে বসে বসে ঘ্যানঘ্যানানী তাঁর শুনে যেতে হোল। ঘণ্টা-খানেক বুঝি কেটে গেল। কাকার তবু দেখা নেই। মিসেস্ মারসারও উঠে পড়লেন। তিনি আর অপেক্ষা করতে পারেন না। আটটা বেজে গেছে। অস্থির পা ফেলে আমি পায়চারী করতে লাগলাম ঘরের মধ্যে। টন টন করে উঠল মুঠোর আঙুলগুলো।

খুড়িমা বলে উঠলেন : 'আজ তোমার বুঝি আর যাওয়া হোল না মেলায়।'

ন'টা বাজল। হল-ঘরের দরজায় এবার চাবি ঘুরানোর শব্দ শোনা গেল। কাকা বিড়-বিড় করে আপন মনে কি যেন বললেন। আলনায় তাঁর ভারী ওভার-কোটটা রাখার শব্দ কানে এল।

খাবার খেয়ে নেবার আগেই আমি কাকার কাছে মেলায় যাবার টাকা চেয়ে বসলাম। তিনি বুঝি কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন। বললেন : 'এখন মেলা কি রে ? সবাই এতক্ষণে এক ঘুম দিয়ে নিয়েছে।'

আমার কিন্তু একটুও হাসি পেল না।

'তুমিই তো দেরী করে দিলে ওর।' খুড়িমা ওকালতি করলেন। —'পয়সা-কড়ি কিছু দিয়ে দাও না ওকে ?'

কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন বলে কাকা অনুতাপ করলেন বললেন : 'হ্যাঁ, আমোদ-আহ্লাদ একটু-আধটু করাটা ভালো। এব কাজে একঘেয়ে লেগে থাকলে বোকা বনে যেতে হয়।'

কোথায় যাচ্ছি কাকা আমায় জিজ্ঞেস করলেন। এবার [illegible]

দিয়ে দু'বার তাঁকে বলেছি। তিনি তখন আমায় প্রশ্ন করলে[illegible]

The Arab's Farewell Too His Steed কবিতা[illegible]

[illegible]ড়ছি কি না। খাবার-ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে[illegible]

কাকা কবিতাটির প্রথম কয়টি পংক্তি আবৃ[illegible]

[illegible]ছেন।

আমি ছুটে চললাম ষ্টেশনের দিকে

[illegible]ড় ধরলাম মুঠোর মধ্যে। গ্যাসে[illegible]

[illegible]পে। এখানে-ওখানে চাপ চা[illegible]

[illegible] আমায় স্মরণ করিয়ে দি[illegible]

[illegible]টে ট্রেণের এক পরিত্য[illegible]

[illegible] দেরী করেই ছা[illegible]

[illegible]স্তূপ আর ঝিক[illegible]

[illegible]াড়ী এসে থাম[illegible]

[illegible]। গার্ড এ[illegible]

[illegible]প্যাল ট্রে[illegible]

কয়েক [illegible]

[illegible] করে আ[illegible]

[illegible]ভজে [illegible]

দু' পেনীর টিকিটের কোন ব্যবস্থা নেই মেলা পাছে ভেঙে যায় এই ভয়ে গোটা একটা শিলিংই আমি গেট-কিপারের হাতে গুঁজে দিলাম। একটু পরেই প্রকাণ্ড এক হল-ঘরে এসে পড়লাম। বহু ষ্টলই তখন বন্ধ হয়ে গেছে। আলোগুলোও প্রায় নিবে গেছে। গীর্জায় উপাসনার পর স্তব্ধ যে নীরবতা থম-থম করতে থাকে এ যেন তারই পূর্বাভাষ! ভীরু পা ফেলে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম মেলার মধ্যে। যে কয়টি ষ্টল এখনও খোলা আছে, কিছু-কিছু লোক গিয়ে জড় হয়েছে ওদিকটায়। রঙিন আলোর বর্ণমালায় দেখলাম লেখা আছে এক জায়গায়: কাফে ক্যানটন। দু'জন লোককে দেখা গেল টাকা গুণে সাজাচ্ছে একখানা থালা থেকে। টাকার টুং-টাং শব্দ ভেসে এল আমার কানে।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমার মেলায় আসা—কথাটা মনে পড়ে যেতেই একটা ষ্টলের সামনে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম। একমনে তার পর দেখতে লাগলাম ষ্টলের চীনা বাসন আর ফুল-তোলা চায়ের সেট্‌গুলি নেড়ে চেড়ে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে দু'টি যুবকের সঙ্গে কথা বলছিল হেসে হেসে। কাটা-কাটা ওদের অস্পষ্ট কথাগুলি আমি শুনতে লাগলাম কান পেতে।

'উহুঁ, কক্ষনো অমন কথা আমি বলিনি!'

'উহুঁ, বলেছিলে!'

'উহুঁ, আমি বলিনি।'

'কি বে বলে নি?'

'হুঁ, আমি শুনেছি!'

মেয়েটি আমায় দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। শুধাল, কি কিনতে চাই নিরস কণ্ঠ। কোন আগ্রহই প্রকাশ পেল না ওর গলায় কর্তব্যের খাতিরেই যেন প্রশ্নটা করা। ষ্টল প্রবেশ-পথের দু'পাশের প্রহরীর মত দণ্ডায়মান বড়ো 'জার' দুটোর দিকে আমি তাকালাম শুধু অসহায়ের মত। আমতা আমতা করে তার পর জবাব দিলাম: 'না, ধন্যবাদ।'

মেয়েটি একটা 'জারকে' সরিয়ে রাখল। তার পর ফিরে গেল যুবক দু'টোর পাশে। ওরা আবার আগেকার কথার জের টেনে চলল। বার দুয়েক বুঝি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আমার দিকে।

পায়চারী করতে লাগলাম আমি ষ্টলটার সামনে। জানি, কোন ফল হবে না তাতে। 'জার' দু'টো আমার কোন দিনই কেনা হবে না। ওখান থেকে আমি চলে এলাম আস্তে আস্তে পা ফেলে। হল-ঘরটা থেকেও বেরিয়ে এলাম এক সময়। পকেটের আধ শিলিংটা আর পেনী দু'টো বাজাতে লাগলাম টুং-টাং করে হল-ঘরের এক প্রান্ত থেকে কে যেন ডেকে বলে উঠল, আলোগুলো সব নিভিয়ে দিতে। অন্ধকারে ছেয়ে গেল হল-ঘরটা।

নিবন্ধ অন্ধকারে আমি তাকিয়ে রইলাম অপলক। মনে হোল, মুগ্ধ একটা কীট যেন ছুটে এসেছে এত দূর শুধু অহমিকায়! ব্যর্থ রাগ ও যন্ত্রণায় চোখ দু'টো আমার জ্বলে উঠল দপ্‌ করে।

অনুবাদ: নিখিল সেন

কোন এক জগৎ

সুশীলকুমার গুপ্ত

রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে কোন এক বিপন্ন নিমেষে
অন্ধকারে খিল খুলে ছাদে উঠে এসে—
ধর যদি আকাশের মত কোন স্বপনের হাত
তাহ'লে পেতেও পার কোন এক জগতের
চকিত সাক্ষাৎ!

হঠাৎ তখন হবে মনে—
আশে-পাশে ঘরদোরের, সিঁড়ি, মাচা, উঠোনের কোণে,
ঐ দূরে নদী-সাঁকো, শাল-বাঁশ-ঝাড়ে
আলেয়ার আলো হাতে ঘন অন্ধকারে
সারা দেহ ঢেকে কুয়াশায়—
কোন সে জগৎ এক হেঁটে চলে যায়;
তাহার নিশ্বাসে
উথলায় রাশি রাশি আঁধারের ঢেউ,
মাঠ, পথ, ক্ষেত, বন ঘুমে ঢুলে আসে।
ঝিঁঝিঁদের সুরে
সে জগৎ কাকে যেন ডাকে দূরে দূরে।

কখনও বা এক দিন বিষণ্ণ দুপুরে
কোন ক্লান্ত মাঠো পথ বহু ক্রোশ ঘুরে
থমকে পড়ছে যবে পরিচিত অশত্থ-ছায়ায়,
দূরে বাঁকা নদীটির শাণিত রেখায়
সহসা তখন
ঝিকমিক করে যাবে কোন এক অবাক পৃথিবী,
কোন এক বিস্মিত স্বপন;
খাঁচা-পোষা স্তিমিত হৃদয়
উড়ে যাবে আকাশের গাঢ় নীলিমায়,
জড়িয়ে ডানায়
ঘুঘুর করুণ সুরে কেঁপে ওঠা এক মুঠো
সোনালী সময়।

ভোল তুমি, যতই ভোল না,
তবু এর আনাগোনা
জীবনের অবারিত প্রহরে প্রহরে
কোন এক দাগু অর্থ কে দুকেয় তারে!
দেখে নিতে তবু তার মুখ
হয়ে ওঠে এ-হৃদয় উদ্দাম-উৎসুক।
দিতে সে ত পারে না কো অর্থ-স্বচ্ছলতা,
কুণ্ঠিত বিস্ময় তবু, অনুভূতি, কথা—
ফেলছে প্রেমের মোহ-ফাঁদে,
তাই আজও এ হৃদয় মাঝে মাঝে কাঁদে,
ছুঁড়ে ফেলে চারি পাশে ধূলো, ধোঁয়া, ছাই,
লাভ-ক্ষতি, ভীড়, রোশনাই—
ছুটে যায় তাহার আহ্বানে
মাঠ, বন, আকাশের পানে।

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কিছু দিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে চাষী সম্মেলনে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সভাপতিরূপে কতকগুলি সুচিন্তিত এবং সর্ব্বজন-প্রণিধানযোগ্য কথা বলিয়াছেন। ডাঃ ঘোষ বলেন: "পশ্চিম বাংলায় বিঘা-প্রতি গড়ে ৫-৬/মণ ধান উৎপন্ন হয়। শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন হয় বিঘা-প্রতি গড়ে ১২/মণ এবং স্পেনে ১৭/মণ। আমাদের এই প্রদেশে যদি গড়ে বিঘা-প্রতি ৮/মণ ধান উৎপন্ন হয় তাহলে শুধু বর্ত্তমান অধিবাসীদেরই যে খাওয়া চলতে পারে তা নয়, অন্ততঃ আগামী ২৫ বৎসরে যারা আসছে তাদের ব্যবস্থাও হতে পারে। চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়ে বেশী খাদ্য উৎপন্ন করার কথা ভাবার চেয়ে যে পরিমাণ জমি চাষ হয় তাতেই বেশী উৎপন্ন করার চেষ্টা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। যাতে বিঘা-প্রতি গড়ে অন্ততঃ ৮/মণ ধান উৎপন্ন হয় পশ্চিম বাংলার বেঁচে থাকবার জন্যই এ বিষয়ে সকলের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন।" পশ্চিম বাংলা সরকারের একটি কৃষি বিভাগ আছে। কৃষি-মন্ত্রীও এক জন আছেন। আশা করি, তাঁহারা ডাঃ ঘোষের উপরোক্ত কথাগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন—অবসর মত। কিন্তু এ-বিষয় কেবল সরকারই নহেন, চাষী এবং যাঁহারা বেশী জমি লইয়া চাষবাস করেন, তাঁহারাও আশা করি এ-বিষয় মনোযোগ দিবেন। বৎসরের পর বৎসর বাঙ্গলাকে পরের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে। ইহা চির-সম্ভব নহে। বাঙ্গলার খাদ্য-সমস্যা বাঙ্গালীকেই যেমন করিয়া হউক মিটাইতে হইবে। পশ্চিম বাঙ্গলা সরকারের পাঁচ-দশ বছরী পরিকল্পনা অপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু খাদ্য-সমস্যার সমাধান আশু প্রয়োজন।

• • • •

তাহার পর ডাঃ ঘোষ প্রসঙ্গক্রমে আর একটি সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ডাঃ ঘোষের মতে: "পশ্চিম বাংলায় ধান চাষ হতে ধান কাটার যখন সময়, তখন প্রায় সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়া দেখা দেয় বেশ কড়রূপে। ধান ছাড়তে না ছাড়তেই ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহে যেতে হয় অনেককে মাঠে। এতে ফসল যদি বেশী না হয় তাতে আশ্চর্য্য হবার কি? তারা উৎপন্ন করে বটে কিন্তু নিতান্ত দায়ে পড়ে—সৃষ্টির ভিতরে যে আনন্দ রয়েছে, যে মাধুর্য রয়েছে তা তারা বুঝতেই পারে না। অঘ্রাণে ভরা ক্ষেতের মধুর হাসি তাদের প্রাণে আনন্দের জোয়ার এনে দেয় না। ধান কাটতে গিয়ে কম্প দিয়ে ম্যালেরিয়া এসে অনেকে শীতের আমেজ ভরা রোদে মাঠের আলে শুয়ে পড়ে। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টা খুব ভালো ভাবেই হওয়া দরকার। প্রতি ইউনিয়নে একটি এমন কি সম্ভবপর হলে দুইটি ডাক্তারখানা হওয়া প্রয়োজন।" 'সৃষ্টির আনন্দ বা মাধুর্য্যের'—প্রভৃতি কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাস্তব দিক হইতে বিচার করিলে সমস্যাটি গুরুতর। চাষীদের সাধারণ স্বাস্থ্য বছরের পর বছর খারাপের দিকে চলিয়াছে। অথচ ব্যাপক ভাবে ইহার কোন প্রতিকার-চেষ্টা অদ্যাবধি হয় নাই। বিদেশী সরকারকে ইহা লইয়া আমরা কম গালি-গালাজ করি নাই। কিন্তু দেশী সরকার কায়েম হইবার পরেও অবস্থার কোন উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গলার বর্ত্তমান ভাগ্যবিধাতা ডাঃ রায় খ্যাতিমান চিকিৎসক। আশা করি, তিনি ভাল করিয়া গ্রামাঞ্চলের ম্যালেরিয়ার কথা জানেন। কলিকাতা শহরে ডাক্তার এবং হাসপাতালের বাহুল্য না করিয়া গ্রামের দিকে কিছু চালান করিলে কোন দোষ হইবে কি? দেশীয় চিকিৎসকমণ্ডলীর কর্ত্তব্য এ-বিষয়ে যথেষ্ট রহিয়াছে!

• • • •

কৃষিকার্য্যের জন্য সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির প্রয়োজন। সেই সঙ্গে বাঙ্গলার মৎস্য-সমস্যারও হয়তো কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। কি করিয়া তাহা করা যায়, ডাঃ ঘোষ তাহাও বলিয়াছেন: "বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি জেলার কোন কোন অঞ্চলে আমাদের পূর্ব্বজরা সেচের জন্য মাঠে মাঠে বহু পুকুর কাটিয়েছিলেন, বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। গত পঞ্চাশ বৎসরের অবহেলায় তাদের অধিকাংশই আজ মজেছে। সেগুলির পুনঃ সংস্কার প্রয়োজন। ভূতপূর্ব্ব বাংলা সরকার এজন্য পুষ্করিণী সংস্কার বিল করেছিলেন। সে বিলের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। সে বিলে রয়েছে মালিক ভিন্ন পুষ্করিণী অন্য কেহ সংস্কার করলে ২০ বৎসরের জন্য তার অধিকার থাকবে, পরে পুনরায় মালিকের দখলে যাবে। আমার মনে হয়, এই ধারাটির পরিবর্ত্তন দরকার। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মালিক যদি পুকুর সংস্কার না করে, তাহার পরে যে কাটিয়ে নিবে তাহারই স্থায়ী স্বত্ব হওয়া উচিত,—অবশ্য যে যে জমি সেচের জন্য জল পাওয়ার অধিকারী তারা জল পাবে এবং যে হারে খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তা দিতে হবে। এখানে এ কথাও বলে রাখা প্রয়োজন, মালিক কাটাতে অক্ষম হলে প্রথম সরকার, তার পর কোন সেবা অথবা কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান এবং সর্ব্বশেষে ব্যক্তিবিশেষকে কাটাবার অধিকার দেওয়া সঙ্গত। এই পরিবর্ত্তন হলে, বহু পুকুরের পঙ্কোদ্ধার হবে—ফলে বহু জমি পুনরায় দো-ফসলা হবে—মাছ চাষও কিছু বেশী হবে। জাতির কল্যাণের জন্য পুষ্করিণী সংস্কার বিলের এই অত্যাবশ্যক পরিবর্ত্তন বিষয়ে আশা করি পশ্চিম বাংলা সরকার অবহিত হবেন।" এ-কথাও যুক্তিযুক্ত। স্বার্থ-সংযুক্ত—বাৎসরিক চার আনা (বিঘা) হিসাবে জমা লওয়া খাল-বিলগুলিকে প্রায় তিরিশ টাকা বিঘা হিসাবে বিলি-ব্যবস্থা করিলে ব্যক্তিবিশেষের হয়ত লাভ হইবে—

দেশের কিছুই হইবে না। বাঙ্গলা সরকার চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন।

* * *

ডাঃ ঘোষ ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিতেও কসুর করেন নাইঃ "কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতের প্রধান মন্ত্রী আমাদের প্রিয় নেতা জওহরলালজী বলেছিলেন, নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ার পরে কয়েক মাসের মধ্যে কাপড় তৈরী ও বিক্রীর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসাদাররা প্রায় ১০০ কোটি টাকা অন্যায্য মুনাফা করেছে—কিন্তু তাদের কাছ থেকে সে টাকা বের করার কোন উপায় সরকার এখনো স্থির করতে পারেননি। শিশুরাষ্ট্রের প্রথম নম্বরের শত্রু এই ধরণের পুঁজিপতি ও ব্যবসাদার। এরাই নবলব্ধ স্বাধীনতাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার কার্যে লিপ্ত। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা-বিরোধী কার্যে যারা নিযুক্ত তাদের অগ্রণী হচ্ছে এরা। কিন্তু শিল্পপতিরা সঙ্ঘবদ্ধ, তাই তারা এমন কি অন্যায় কার্য করেও উঁচু-মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে, আর চাষীরা নিজেদের ন্যায্য দাবী পূরণের কথা বললেও তাদেরকে অপরাধী বলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হয়। তাই আপনাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে—ঐ শিল্পপতিদের মত অন্যায় মুনাফার জন্য নয়—আপনাদের ন্যায্য দাবীর কথা সংযত অথচ সুদৃঢ় ভাবে সরকারকে বলে দেশের কল্যাণে বেঁচে থাকার জন্য।" ইহাদের সঙ্গে কোটিপতি কালোবাজারীদের নামও করা যাইতে পারে। প্রধান মন্ত্রী, কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে—পণ্ডিত নেহরুরূপে বলেছিলেন যে, ক্ষমতা হাতে থাকিলে এবং পাইলে তিনি দেশের কালোবাজারীদের ফাঁসী দিতেন। কিন্তু মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পর তাঁহার এ সাধু ইচ্ছা কোন্ কারণে কর্পূরের মত উবিয়া গেল? এখন ত দেখা যাইতেছে, কালোবাজারীরা শশিকলার মত দিনের পর দিন আত্ম এবং পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন বেশী করিয়াই করিতেছে। পশ্চিম-বাঙ্গলা সরকারও এ বিষয় নীরব। দুষ্ট লোকে যখন বলে যে বর্ত্তমান সরকার কালোবাজারীদের দ্বারাই পরিচালিত, তখন প্রতিবাদ করিবার কিছু পাই না। তবে ইহাও হয়ত কমিউনিষ্টদের কারসাজি হইতে পারে! ডাঃ ঘোষও দেখিতেছি কমিউনিষ্ট বনিয়া গেলেন! তাহা না হইলে তিনি ঘোর কংগ্রেসী হইয়া পুঁজিপতি ও ব্যবসাদারদের নিন্দা করেন কোন্ সাহসে?

* * * *

ডাঃ ঘোষের নিম্নলিখিত বাক্যগুলিও হয়ত কুবাক্য নহেঃ "ধানের দাম বাড়ালে মুদ্রাস্ফীতি বা inflation হবে, ইহা নিতান্তই অপযুক্তি। শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য তুলনায় অত্যধিক বেশী হওয়া মুদ্রাস্ফীতির একটি কারণ। আর একটি কারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে মোটা মোটা বেতনের কর্মচারী নিয়োগ এবং সরকারী দপ্তরখানায় কর্মচারী সংখ্যা-বৃদ্ধি বশতঃ ব্যয়-বৃদ্ধি। আর একটি কারণ সরকার কর্তৃক ক্রমবর্দ্ধমান নোট চালু করা। এই মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপারে সরকারী দায়িত্বই সর্বাধিক।" মিলওয়ালারা কাপড়ের দাম বাড়াইতে পারে, সরকার তাহাতে সানন্দে অনুমতি দিবেন, কিন্তু যত দোষ বেচারা গরীব চাষীদের! ধান-চাউলের মূল্য সামান্য বৃদ্ধি করিতে চাহলে তাহাদের বলা হইবে দেশদ্রোহী! তাহারা সাম্যবাদ-প্রভাবান্বিত! অথচ চাষীদের ধান-চাউল বিক্রয়লব্ধ পয়সায় সংসার চালাইতে হইবে! যাহার দশ কোটি আছে, তাহার বিশ কোটি হইলে দোষ নাই, কিন্তু যাহার মাসিক আয় দশ টাকা না হইলে সংসার অচল হয়, তাহার সেই দশ টাকা আয়-বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এবং ন্যায্য দাবী অতীব অপরাধজনক কার্য্য! দেশের বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশানের জন্য যাহারা সত্যই দায়ী, তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিবার সাহস বর্ত্তমান সরকারের নাই বলিয়া আমরা মনে করি।

* * * *

'বর্দ্ধমান' পাঠে জানিতে পারি:—"শুনা যাইতেছে, দুর্নীতি দমন-কার্যে রত স্বেচ্ছাসেবকগণ চোরাবাজার বন্ধ করিবার সময় স্থানীয় পেট্রলগার্ড কর্তৃক নানারূপে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছেন। কালনা থানার রায়জামনা গ্রামের দুই জন স্বেচ্ছাসেবকের চেষ্টায় গত কয়েক দিনের মধ্যে কতকগুলি ধান ও চাউলের চোরাকারবার ধরা পড়িয়াছে। স্থানীয় পেট্রলগার্ড তাহাদের কার্যে সাহায্য করা দূরে থাকুক বাধা দিতেছেন। সরকারী নুণ খাওয়ার পরিবর্ত্তে এইরূপ ব্যবহার সরকার আর কত দিন সহ্য করিবেন?" এ প্রশ্ন অনাবশ্যক। জানিবেন, বর্ত্তমান সরকারের চোখ আছে কিন্তু দৃষ্টি নাই, লম্বা কাণ আছে—শ্রবণশক্তি নাই, হাত আছে—দড়ি-বাঁধা অবস্থা, পা আছে—অচল। দেশের লোক যদি নিজের হাতে পাপ এবং অন্যায় বন্ধ করিবার ভার গ্রহণ করে, এক দিনেই সব বন্ধ হইবে। কলিকাতা সহরেও এমন বহু বিচিত্র ব্যাপার দেখিতেছি। গরীব গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা দুই সের চাউল বিক্রি করিতে আসিয়া পুলিশের খর-দৃষ্টি এড়াইতে পারে না, কিন্তু লরি-বোঝাই মাল সাদা-বাজার হইতে প্রকাশ্য কালোবাজারে অন্তর্ধান করিতেছে! বিদেশী সরকারের আমিলে দেশীয় পুলিশের সুনাম যে-সব বিষয়ে ছিল, সাময়িক ভাবে তাহা দেশীয় সরকারের উদয়ে বন্ধ হয়, কিন্তু গত কিছু কাল হইতে আবার সেই সব গুণাবলী মহামারী স্কেলে দেখা যাইতেছে। কর্তা-মহল একটু চোখ মেলিয়া চাহিলে অনেক কিছুই দেখিতে পাইবেন।

* * * *

হয়ত যুক্তিযুক্ত হইবে না—কিন্তু শ্রীবলরাম রায়-চৌধুরী লিখিত কবিতাটি 'গণরাজ' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না। 'মহাশয়' ব্যক্তিগণ ক্ষমা করিবেন—

"টিকৃটিকি হয়ে কুমীরের মত করিয়াছে যারা কাজ,
সুখ-সংসার ভাঙ্গিয়াছে যারা, হানিয়াছে শিরে বাজ,
বিধবা'র আঁখি-তারকায় যারা উপাড়ি লয়েছে কাড়ি,
প্রিয়-বিচ্ছেদ-বেদনার ভারে কাঁদায়েছে শত নারী,
তাজা প্রাণ যত পচায়ে মেরেছে অন্ধ-কারার ঘরে,
কারো প্রাণ গেছে ফাঁসির কাষ্ঠে, কারো বা দ্বীপান্তরে,
আজ হাসি পাই শুনি যবে তারা 'বিশ্বাসী-লোক' ভাই,
খুঁজে আনো আজ টিকৃটিকিগুলো, বিচার তাদের চাই!

বন্ধু, আজিও তারা আছে সুখে রাষ্ট্রের অনুগত,
মরে তো মরুক অন্ন-অভাবে মানুষ তোমার মত!
তুমি ত বন্ধু অনেক দিয়েছ সয়েছ অনেক জ্বালা,
আজিও পৃষ্ঠে বেত্রের দাগ, নাগিনী'র বিষ ঢালা,
ভালবাসিয়াছ দেশ-জননীরে তার দুখে প্রাণ কাঁদে,
কারাগারে তুমি বন্দী হয়েছ শুধু এই অপরাধে!
দেশের বক্ষে হানিয়াছে ছুরি অর্থের লালসায়,—
কারা হীন-চেতা দেশ-সন্তান? বিচার তাদের চাই!"

বিচার করিবে কে? দেশটা বাঙলা না হইলে অবশ্যই বিচারব্যবস্থা সম্যক্ ভাবেই হইত। কিন্তু আমরা এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরেই বাস করিতেছি—কেবল মাত্র এক দল লোকের চ্যাঙড়ামো দমন করিতেই পশ্চিম-বাঙলা সরকার ক্ষীণ কণ্ঠে আবেদন-নিবেদন ছাড়িতেছেন।

* * *

'দামোদর' পত্রিকা কিছু কাল পূর্ব্বে মন্তব্য করিয়াছেন: "সরকারী আইন অমান্য করিলে এবং সরকারকে অবজ্ঞা করিলে বৃটিশ আমলে অপরাধীকে শুধু সাজাই দেওয়া হইত না, উপরন্তু তাহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব পর্যন্ত সরকারী অনুগ্রহ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইতেন, কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার পর স্বাধীন ভারতের কোন কোন হাকিমের বিচার দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইতেছি। সম্প্রতি বর্ধমানের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী এম, সি, সেন বর্ধমান সদরঘাটের অপর তীরে মুলকাটি-উচালন বাস সার্ভিসের মালিক বিশিষ্ট ধনী শ্রীরামমোহন বসুকে বিনা লাইসেন্স ও বিনা পারমিটে অযোগ্য বাস চালাইবার অপরাধ হইতে বে-কসুর মুক্তিদান করিয়াছেন। প্রকাশ, উক্ত বাস-মালিকের বাস খারাপ থাকায় কেন্দুড় গ্রামের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ দোলগোবিন্দ ভট্টাচার্যের প্রাণহানি ঘটে। ইতিমধ্যে উক্ত বাসের চালক সর্পাঘাতে মারা গিয়াছে। অতএব সে এখন মানুষের বিচারের বাইরে। আমরা অনুসন্ধানে জানিলাম, এই মামলায় সরকার পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ ভাল থাকিতেও বাস-চালককে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা আইনজীবী না হইলেও সাধারণ যুক্তিতে বলিতে চাহি, সরকারী লাইসেন্স ও পারমিট না লইয়া উক্ত বাস-মালিক কোন্ সাহসে এবং কাহার আদেশে বাস চালাইলেন? ইহাতে যে অপরাধ হইয়াছে, তাহার বিচার করিবে কে? যাহার বা যাহাদের অপরাধে এক জন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি তাহার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে অগাধ বিপদে ফেলিয়া প্রাণত্যাগ করিল, এই নরঘাতকতার বিচার কি আইনের পাতায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? তাঁহার অমূল্য জীবনের ক্ষতিপূরণ করিবে কে?" বিষয়টি অবহেলার নহে। জানি না, এদিকে পশ্চিম-বাঙলা সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে কি না। না হইয়া থাকিলে অবিলম্বে হওয়া উচিত। মহামান্য হাই-কোর্টের দৃষ্টি এ-বিষয় আমরা আকর্ষণ করিতেছি।

* * * *

বর্দ্ধমান হাসপাতালের আলোচনা সম্পর্কে 'বিদ্রোহী' মন্তব্য করিতেছেন: "যাহাদের পয়সা ব্যয় করিয়া চিকিৎসিত হইবার সাধ্য নাই তাহাদের আবার ঠাঁই দিবার ব্যবস্থা ও স্বাচ্ছন্দ্যতা বিধান করা! নচেৎ বহু পূর্ব্বেই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়িত যে বর্ত্তমান সময়ে অখাদ্য কু-খাদ্যের বাহুল্যতায় ও পূর্ব্ববঙ্গের বহু লোক বৃদ্ধি পাওয়ায় রোগীর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রত্যহ বহু দরিদ্র রোগী স্থানাভাবে ফিরিয়া গিয়া গাছতলায় ও পথের ধারে পড়িয়া শৃগাল-কুকুরের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিতেছে। এমতাবস্থায় সত্যই হাসপাতালের ঘর ও বেড বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অবশ্যই বলিবেন যে, যাহা হইতেছে হইতে দাও, বেড বৃদ্ধি বর্ত্তমানে অসম্ভব। এইরূপ মনোভাবের ফলেই আজ বর্দ্ধমান হইতে মেডিকেল স্কুল উঠিয়া যাইতেছে এবং তাহার এই চতুঃসীমায় কিরূপ কুফল ফলিবে সরকারের তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর কোথায়? বর্দ্ধমান ও তাহার চতুষ্পার্শ্বের ত্রিসীমানায় আর এত বড় চিকিৎসালয় নাই, তাহা যদি আজ অব্যবস্থায় নষ্ট হইয়া যায় তবে আমাদের আর লজ্জা রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য করি নাই বলিয়া অভিশপ্ত হইব। বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর ও অন্যান্য প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ এবং জনসাধারণ এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন ইহাই আমরা শীঘ্র দেখিতে চাই।" 'বিদ্রোহী' অপেক্ষা করিতে থাকুন। শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন, দেশের নেতারা, প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ এবং বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর জনকল্যাণ কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন! হাসপাতালে অনাচার-অবিচার আজ দেশের সর্ব্বত্র একই প্রকার। কলিকাতার সরকারী হাসপাতালগুলির কথা না বলাই ভাল। ঐ সকল হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ রোগী এবং তাহার আত্মীয়কুটুম্বদের সঙ্গে কি প্রকার ভদ্র ব্যবহার করেন, তাহা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে কি?

* * * *

পাকিস্তান-আগত দুর্গতদের জীবিকার্জ্জনের বিষয়ে 'শিল্প ও সম্পদ' পরামর্শ দিতেছেন: "বর্ত্তমানে চাকুরির বাজার ভাল নয়—বিভিন্ন অস্থায়ী অফিস ও কল-কারখানা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বহু বেকার সৃষ্টি হইয়াছে; আমদানী-বাণিজ্যও বর্ত্তমানে নিয়ন্ত্রিত, এবং যে সমস্ত মাল আসিতেছে তাহাদের আণ্ডার-রেটে মাল দেওয়ায় দেশী বাজার পড়িয়া গিয়াছে। বাঙালী পুঁজিদার নাই, যাঁহারা আছেন তাঁহারা সুবৃহৎ মৌলিক শিল্প-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কাজেই ব্যাপক ভাবে ছোট ও মাঝারী শিল্প-ব্যবসায়গুলি আমাদিগকে হস্তগত করিতে হইবে। চাকুরী ও স্বাধীন ব্যবসা দুই-ই ইহাতে আছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বাঙালী হিন্দু উহা পারে। যে সব কাজ-কারবারে বাঙালী হিন্দু আত্মনিয়োগ করে নাই, অবিলম্বে সেগুলিতে নিযুক্ত হওয়া দরকার। আমরা প্রথমে ছাপাখানার মেসিনম্যান, কালিওয়ালা প্রভৃতি কাজগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কলিকাতা ও মফঃস্বলে যে সব ছাপাখানা আছে তাহাতে সর্ব্বসাকুল্যে তিন হাজার হিন্দু জমাদার, মেসিনম্যান, কালিওয়ালা প্রভৃতি আছে কি না সন্দেহ, অথচ মোট কর্ম্মচারীর সংখ্যা তিরিশ হাজার হইবে। মেসিনের কাজে বুদ্ধিমানের পরিচয় দিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে—রীতিমত পারিশ্রমিকও পাওয়া যায়। কাজেই শিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত ও কারিগরী-কার্য্যে আগ্রহসম্পন্ন বাঙালী হিন্দু অবিলম্বে তৎপর হইলে বেকার সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। পশ্চিম-বঙ্গের বাঙালী হিন্দু আয়াসপ্রিয় ও অকর্ম্মণ্য—বেশী পরিশ্রমে অভ্যস্ত নহে। বসিয়া থাকিয়া অর্দ্ধাশনে কাটাইবে তবু স্বাধীন ভাবে গতর খাটাইয়া পেট ভরিয়া খাইবে না। সে হিসাবে পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দুগণ বিহার, যুক্তপ্রদেশের অবাঙালীদের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে, কাজেই পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে আগত হিন্দুদের এই জীবিকাটিতে অবিলম্বে যোগদান করা দরকার।" অবশ্য-স্বীকার্য্য কথা। এ-বিষয় সাধারণ ভাবে বাঙালীদের সম্পর্কে আমরাও বহু কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু ফলোদয় কিছুই হয় নাই। সুদূর পাঞ্জাব হইতে বহু বাস্তুত্যাগী কলিকাতায় আসিয়া চাকরির খোঁজ করে নাই। কোন না কোন ব্যবসা করিয়া দিন চালাইতেছে। কিন্তু হতভাগ্য বাঙালী যুবকের দল বাজে হৈ-চৈ এবং সিনেমা-ম্যাচ প্রভৃতির 'কিউ'-এ দাঁড়াইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছে! মাথায় সুপারি রাখিয়া খড়ম-পেটা করিলেও ইহাদের কোন জ্ঞানোদয় হইবে না।

ভাগ্যের সন্ধানে

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

১৯৩৪ ও ১৯৪৮ বহু দূর। ১৯৩৪ সালে আমি হায়দ্রাবাদ গিয়াছিলাম। চৌদ্দ বৎসর পরে, ১৯৪৮ সালে হায়দ্রাবাদের কথা বলিতে চলিয়াছি। চৌদ্দ বৎসর বনবাস করিয়া আসিয়া রাজার কুমার রাজেশ্বর হইয়া প্রজানুরঞ্জন করিয়াছিলেন, নজীর আছে; ক্ষুদ্র মানবক, তৃণাদপি তুচ্ছ ব্যক্তি চৌদ্দ বৎসর পরে মৌনব্রত ভঙ্গ করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কি বা থাকিতে পারে? সুদীর্ঘ-কালব্যাপী মৌনব্রতের কারণ ছিল। হায়দ্রাবাদ ভ্রমণ-কাহিনী লিখিতে হইলে কেবল অপমান ও লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিতে হইত; তাহাতে রুচি ছিল না। উত্তর কালে দেখা গেল, হায়দ্রাবাদ ষ্টেট্ ঐগুলো নিজস্ব আর্ট হিসাবেই ব্যবহার করিয়া থাকে এবং তাহাতে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। নহিলে মীর লায়েক আলি বড়লাট লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনকে এ কথা কেমন করিয়া বলে, যদি দরকারী কথা থাকে, তাহা হইলে হিন্দু যমুনার তীরে, মুসি নদীর ধারে, দিল্লীতে নহে, হায়দ্রাবাদে আসিতে ইচ্ছা হোক। কথাগুলা ভাবিয়া দেখিবার মত। বলিতেছেন, নাইজামের প্রধান মন্ত্রী, মীর লায়েক আলি: শ্রোতা, অপর কেহ নহে, ইংলণ্ডেশ্বরের ভ্রাতা, লর্ডস কার্জ্জন ও রেডিঙের উত্তর-পুরুষ, ভারতের শেষ ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনেরাল, লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন। সন্তান-সন্ততি সূতিকাগার হইতে বাহির হইলেও তাহাদের অঙ্গে আঁতুড়ের গন্ধ লাগিয়া থাকে, লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের ভাইসরয়ালটি মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে খসিলেও অঙ্গ হইতে সৌরভ তখনও ঘুচে নাই। লর্ডস কার্জ্জন ও রেডিঙের নাম এই সঙ্গে কেন করিলাম, সে কথাটা বলা দরকার। লর্ড কার্জ্জন ছেলের হাতের মোয়া বেরার কাড়িয়া লইয়াছিলেন; আর, লর্ড রেডিং বৃটিশের বিশ্বস্ত বন্ধুর নাইজামের স্বাধীনতা-কামতরুটির শিকড় কাটিয়া ভূখণ্ডটির উপর দিয়া প্রথমে লাঙ্গল, পরে মই চালনা করিয়া সমতল ভূমিতে চীনা-বাদামের চাষ করিয়া দিয়াছিলেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তাঁহাদেরই উত্তর-পুরুষ কিন্তু তা হইলে কি হয়! কালের সূক্ষ্ম গতি এইরূপই বটে। আবার এইখানেই শেষ নহে। "কাহার গোলাম কে যাহার মাহিনা চোদ্দ সিকে" সেই কাশিম রাজভীই বা কম যাইবে কেন? পণ্ডিত জওহরলালকেও এই ব্যক্তি রোক্কা ভেজিয়াছিল, মহম্মদ অচলায়তন ও অচল অতএব সচল পর্ব্বতেরই আসিতে আজ্ঞা হোক। লোকে, সেই সময়ে একবাক্যে নিদারুণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল; এমন কি বিলাতের লোকেও বলিয়াছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট এবম্বিধ প্রেম-সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলে 'কি' উত্তর দিতেন। সে কথা যাক্। পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তির পরে আমার মান-অপমানের গোড়ায় ছাই ঢালিতে বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। হায়দ্রাবাদের একটা পানি-পাণ্ডে আমাদিগকে ঠাণ্ডা-গারদে পুরিতে চাহিয়াছিল; 'জুতা কসূর' বলিয়াছিল দেখিয়া লইবে। যে যেমন মানুষ, যাহার যেমন দর, তাহার সমাদর তেমন লোকের দ্বারা তেমন ভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে; কাজেই দুঃখ জল হইয়া গিয়াছে। এখন দু'টা কথা বলিতেও পারি। কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনী লিখিব না; ভ্রমণের বৃত্তান্ত স্মরণ নাই এবং থাকিলেও মেঘ ও গিরির মত একাকার হইয়া গিয়াছে, পাঠকের চিত্তবিনোদনের আশা অল্প। তথাপি বলিবার কথা কিছু আছে এবং দায়ে পড়িয়া অনেকেই রায় মহাশয় হইতে হইয়াছে, আমিই বা না হই কেন? দায় যে, দারুণ বিষম দায়।

মনে আছে, হায়দ্রাবাদ মরুভূমি না হইলেও নির্জন নীরবতা মরুভূমিকেই স্মরণ করাইয়া দিত। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ মাত্রেই ঠাসাঠাসি গাদাগাদি ঠোকাঠুকি করিয়া বাস করিতেছে; স্থানাভাবে গুঁতাগুঁতি, হাতাহাতি, সময়বিশেষে মাথা ফাটাফাটি করিয়াও মরিতেছে, কোথায় 'ভেটো' লইয়া, কেহ বা এ্যাটম বোমা লইয়া হস্ত-পদ ছড়াইবার চেষ্টায় পাড়া-প্রতিবাসীকে শাসাইতেছে; একমাত্র হায়দ্রাবাদ যেন সেই জনকণ্টকাকীর্ণ বিশ্বের বাহিরে—বহু দূরে। হিন্দুর পুণ্যতীর্থ কাশীধাম না কি বিশ্বনাথের ত্রিশূলের ডগায় অবস্থিত, সেই জন্য কাশীতে ভূমিকম্প হয় না, সৃষ্টি রসাতলে ভাসিয়া গেলেও বারাণসী মহা প্লাবনে দ্বীপটির মত জাগিয়া থাকে। এ সবই শোনা কথা, সত্য-মিথ্যা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না; কিন্তু এই জনাকীর্ণ পৃথিবীতে, হায়দ্রাবাদ এক বিপুল বিস্ময়। বিস্ময় ঐ একটি মাত্র নহে; আরও আছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে, কলিকাতা সহরের চৌরঙ্গীর ভোজনশালায় যখন পান-ভোজন পরিতৃপ্ত সুপ্রসন্নভাগ্য নর-নারীর কলহাস্যে মহানগরী মুহুর্মুহুঃ সচকিত হইতেছিল, মদিরাপ্রমত্ত বিলাসী-বিলাসিনীর সঙ্গীত-গুঞ্জনে, নর্ত্তনের স্বননে স্বর্গের ইন্দ্রসভা বারম্বার লজ্জা মানিতেছিল, ঠিক তখনই সম্মুখবর্ত্তী আবর্জ্জনা-কুণ্ডের উচ্ছিষ্টাবশিষ্ট খাদ্যের জন্য মানুষে-গরুতে কুকুরে-বিড়ালে প্রবল প্রতিযোগিতায় পরাস্ত ও পর্য্যুদস্ত মানুষের শবে চৌরঙ্গীর রাজবর্ত্ম আকীর্ণ হইতে অনেকেই দেখিয়াছিলেন। ভগবান মঙ্গলময়, অধিক কাল এই দৃশ্য দেখিতে হয় নাই, পট-পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হায়দ্রাবাদে পট-পরিবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। মুসি, গোদাবরী, তুঙ্গভদ্রা, তিনটি নদীর ধারেই দেখিয়াছি এক দিকে ধনৈশ্বর্য্যের প্রবল প্রবাহ, বিলাসের উত্তাল স্রোতাবর্ত্ত, উত্তুঙ্গ শক্তিমদমত্ততা, আর তাহারই পাশে দারিদ্র্যের সে কি ভীষণ, নগ্ন কঙ্কালমূর্ত্তি! বন্যার উচ্ছ্বাসী বারিপ্রবাহ হইতে গ্রাম, নগর, গৃহ, গরু, বাছুর, গাছ-পালা, ক্ষেত খামার রক্ষা করিতে যে ভাবে বাঁধের পর বাঁধ তুলিতে হয়, ভারতবর্ষের বৈধম্মিক বেগোভাটগুলিকেও তেমনই যত্ন সহকারে আটকাইতে হইয়াছে হায়দ্রাবাদকে। জল কভু নীচু বিনা উঁচু দিকে যায় না, কমলা ঠাকুরাণীরও না কি নীচের দিকেই অবাধ গতি-বিধি, নাইজামের পক্ষে সে'ও এক দারুণ দুর্ভাবনা। অপাত্রে অথবা কুপাত্রে ধনরত্ন ন্যস্ত না হয়, তাহার জন্য নাইজাম সরকারের যত্ন ও অধ্যবসায়ের অন্ত ছিল না। চেষ্টা সার্থক হইয়াছিল; লক্ষ্মী ঠাকুরাণী সে সুউচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মভ্রাতৃবর্গের শ্রীবৃদ্ধির পাশে অ-ধার্ম্মিকদিগের চরম দুর্দ্দশা সেই জন্যই সারা হায়দ্রাবাদময় মেঘ ও রৌদ্র, আলো ও আঁধার, হাসি ও অশ্রুর চিরন্তন করুণ চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছিল। আজ পূর্ব্ব-পাকিস্তানে এক জাতীয় মনুষ্য অবস্থিতি করিতেছে, কেহ তাহাদিগকে মারে না, কাটে না, তাহাদের ঘরে আগুন দেয় না, তথাপি তাহারা সেখানে থাকিতে চাহে না, থাকিতে পারে না, পালাইতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যায়। কি জানি, জন্মস্থান, পিতৃ-পিতামহের বাসভূমি, স্মরণাতীত কালের কত স্মৃতি, কত সুখ, কত দুঃখ, কত হাসি, কত অশ্রু, কত আনন্দ, কত শোক, কত আসা, কত যাওয়া, কত পাওয়া, কত হারানোর কত শত কাহিনী জড়ানো ঘর-করণা, দিন ছিল, যখন বুকে জড়াইয়া ধরিতে বুক ভরিয়া যাইত, তাহার অঙ্গহানি দেখিলে আপন অঙ্গে ব্যথা বাজিত, সেই

ভূমির মৃত্তিকা-সমষ্টি রক্ষা করিতে সর্ব্বস্ব ত অতি তুচ্ছ, প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে পারিত ; আর, আজ, আশ্চর্য্য মানুষের মন ! আর ততোধিক আশ্চর্য্য তাহার পরিবর্ত্তন, ফেলিয়া পালাইবার সময় একবার কি পিছু ফিরিয়াও চাহে না ? চোখের জলের কথা ধরি না, চোখের জল যে পড়ে না, তাহাতেও আশ্চর্য্য হই না ; কারণ, যাহা সারা জীবনের সম্বল, আজই তাহা শেষ করিবে কেন ? অনাগত চিরদিনের সঙ্গীটিকে সযত্ন সঙ্গোপনে লইয়াই নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতেছে। কাঁদিবার অনেক সময় পাইবে ; অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ত চোখের জলের আলপনা দিয়াই সাজানো রহিল ; আজ, বিদায়-বেলায় বিড়ম্বনায় কাজ নাই। কি জানি, অশ্রু ত নিঃশব্দ নহে, তাহার শব্দে লোক জড়ো হইয়া যদি বলিয়া বসে, "যেতে নাহি দিব।" আকাশে চাহিয়া দেখে, নীলিমা ঘুচে নাই, নদীর জল বিস্বাদ হয় নাই, বায়ুমণ্ডল বিষ-বাষ্পে ভরে নাই, গ্রাম, ঘর, বৃক্ষ-লতা চিরকাল যেমন ছিল, আজও তেমনই রহিয়াছে, তবু কোথা দিয়া কি যে বিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, সে যেন কাহাকেও আর বিশ্বাস করিতে পারে না ; আসল কথা, ভরসা হারাইয়াছে। গ্রহণের ছায়াপাতে বিশাল বিশ্ব যেমন মলিন বিবর্ণ হইয়া যায়, নির্ভরসাও তেমনই চির পরিচিত বহু পুরাতন পৃথিবীকেও বিবর্ণ, বিস্বাদ ও ম্লান করিয়া দিয়াছে। হায়দ্রাবাদে হিন্দুর মুখে সেই ম্লান ছায়া আমরা সেই সেকালেও দেখিয়াছিলাম। আমাদের তিন দিনের বন্ধু তিরুমল রাওকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁ গা, এইটিই কি তোমার ঘর ? তিরুমল বলিল, এইখানে আমরা থাকি। জমি, তিরুমল ইজারা বা ক্রয় করিয়া লইয়াছে, ঘর, সে নিজে বাঁধিয়াছে, বেড়া তাহারাই দিয়াছে, বেড়ায় রাংচিত্রের গাছ উঠাইয়াছে, উঠানে চিনাবাদামের চাষ করিয়াছে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্ধ জননী লইয়া বাস করিতেছে, তবু তাহার মুখ দিয়া প্রাণান্তেও "আমার" শব্দটা বাহির হইল না। জীবের জীবন পদ্মপত্রে নীর, তাহা আমরা না জানি কে ? তাই বলিয়া আমার জিনিষকে আমার বলিব না ? তিরুমল বলিয়াছিল ইহাদের ঘর-সংসার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি কচু পাতার জলের মত ; অহমিকা প্রকাশে লাভ কি ? অহমিকার বিরুদ্ধে স্থায়ী আইন ছিল, তাহাও শুনিয়াছি। আমরাও, তিন দিন তিন রাত্রি—'তীর্থ স্থানে' ত্রিযাম যাপন করা বিধি—হায়দ্রাবাদে বাস করিয়াছিলাম, বাপের আভাবেও অহমিকা প্রকাশ পাইতে দিই নাই। পানি-পাণ্ডে ও সেলাই 'ক্লবের' কথা আগেই বলিয়াছি, গাড়োয়ান গাড়ী-ভাড়ার নামে গালে চড়াইয়াছে, ভাগ্যে যীশুর জীবন-কাহিনী পাঠ করা ছিল, তাই রক্ষা। যে লোকটি হোটেলে স্নানের জল দিত—ভিস্তি, কলসীর কাণা ছুঁড়িয়া রক্তারক্তি করিয়া দিয়াছে, আমরা নবদ্বীপচন্দ্র হইয়া গুঞ্জন করিয়াছি—"মেরেছ কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না ?' তিরুমলের জননী চিনাবাদামের ক্ষেত আগলাইত, দিবা দ্বিপ্রহরে কাহারা আসিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, বৃদ্ধা বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছিল, তদবধি অন্ধ।

কিন্তু, তবু বলিব, চোখে হায়দ্রাবাদ ভাল লাগিয়াছিল। ভবঘুরে লগ্নেও ধনক্ষয় ; রাশিতে জন্ম, ভ্রমণ করি নাই ভারতবর্ষে এমন স্থানও মনে পড়ে না ; কিন্তু হায়দ্রাবাদের মত এমন সুন্দর রাস্তা খুব কম দেখিয়াছি। রাজ্যটাকে রেলের লৌহ-নিগড় পরাইয়াও তাহাদের সাধ মেটে নাই, রেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া পাশাপাশি রাস্তায় "নাজারী" মোটর ছুটাইয়াছে। Charabancs (সারাব্যাঙ্কসের) কথা বিলাতের গল্পে পড়া ছিল, হায়দ্রাবাদে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইল। বৃটিশ-ভারতে বহু বার বহু জন বহু নক্সা ছকিয়াছে, তথাপি যে কারণেই হৌক, ভারতবর্ষে রেল-রোড কো-অর্ডিনেটেড সার্ভিস হয় নাই, হায়দ্রাবাদে হইয়াছিল। সমগ্র প্রাচীতে ইহার জোড়া ছিল না, এইটিই ছিল অদ্বিতীয়। বৃটিশ-ভারতে একটি অপাংক্তেয় নীচ জাতি ছিল, নাম ভারতীয় জাতি। সেই অপাংক্তেয় জাতি বৃটিশের রেলের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় বৃটিশের ইহা অনভিপ্রেত ছিল বলিয়াই নক্সাগুলা বাজে কাগজের ঝুড়িতে অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এখানকার অবস্থা স্বতন্ত্র। অপাংক্তেয় জাতি এখানেও ছিল, বিপুল সংখ্যাগুরু হইয়াই ছিল, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার দুরাশা মনের কোণেও ঠাঁই পাইত না। নদ-নদী-হ্রদ-নির্ঝরিণী সকলেরই যেমন এক লক্ষ্য ও এক পরমা গতি—সাগর, হায়দ্রাবাদেও তেমনই অর্থকোষ একটি—নাইজামের রত্ন-ভাণ্ডার ; কাজেই স্বার্থ সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের জাতীয় সরকারের পুলিশ বাহিনী যে 'ফুস মন্তরে' "আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়োলো" করিতে পারিয়াছিলেন, রাজ্যের রাস্তাগুলিই তাহার পথ সহজ ও সুগম করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই তাহা সম্ভব হইয়াছিল।

আজ আমরা কাশিম রাজভীর সহিত পরলোকগত (!) ফুয়েরার হের হিটলারের সাদৃশ্য খুঁজিয়া তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া কালহরণ করিতেছি, অত্যদ্ভুত নরখাদক বোধে পালি-গালাজও বড় কম করি নাই ; কিন্তু রাজভী বা মীর লায়েক আলি একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা নহে। রাস্তার ধারে গাছের চেয়ে আগাছারই যেমন শ্রীবৃদ্ধি, অসংখ্য অগণিত রাজভীকে সদা-সতর্ক প্রহরীর মত হায়দ্রাবাদ পাহারা—রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আমরাই দেখিয়াছি। কি পাহারা দিত, জানি না ; কিন্তু পাহারাদার ভিন্ন অমন চোখ-মুখ হয় না। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা হয়ত ভাল জবাব দিতে পারিবে, আমি তখন জবাব খুঁজিয়া পাই নাই। পাঠকের নিশ্চয়ও স্মরণ আছে আমি ১১৩৪ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছি। বিশ্বযুদ্ধের তূর্য্য নাদ তখনও হয় নাই, পঞ্চবর্ষাধিক কাল বিলম্ব রহিয়াছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন সুদূর-পরাহত, সশিষ্য মহাত্মাজী কারাগারে দুর্ব্বাসার পারণ করিতেছেন, পাকিস্তান জিন্না সাহেবের মগজেও গুটি বাঁধে নাই, গলিত নখ-দন্ত পলিত-কেশর বৃটিশসিংহ যে ভারতে 'ভবের খেলা' সাঙ্গ করিবে, বৃটিশেরও তাহা কল্পনা-বহির্ভূত দুঃস্বপ্নেও স্থান পায় নাই, এ-হেন সময়েও রাজভী-বংশাবতংসদিগের দাপটে হায়দ্রাবাদের বৃহত্তর অংশ ও অধিকাংশ মানুষের পক্ষে, বিহারের ভূমিকম্প। জিন্না, সুরাবর্দ্দী, মুস্লিম লীগ ত বহু কাল হইতে রাজনীতি করিতেছিল, কিন্তু ১১৪৬ সালের গোড়ায় ইলেকসানের পূর্ব্বে কেহ কি সুদূর কল্পনাতেও চিন্তা করিতে পারিত যে ইহারাই অতঃপর পারস্য দেশাগত নাদির শাহের পদাঙ্কানুসরণে পৈশাচিক উল্লাসে নরমেধ রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে ? নৃশংস নাদিরশাহী অভিযানের সূচনা ঐ ইলেকসান এবং ১৬ই আগষ্টের ইতিহাস-কলঙ্কিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম তাহারই স্বাভাবিক পরিণতি। সেদিনের কথা পাঠকের স্মরণ আছে ত ? বিশ্বসুদ্ধ লোক জানে, ইলেকসানে আত্মনেপদির প্লাবন ছুটে বক্তৃতার

আসমান-তারা ফুটে, গ্রাম, সহর, নগর, মহকুমা, জেলা নিতুই নব নামাবলী পরিধান করে, শ্রীচৈতন্যের বিনয়, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, আকাশেরও অমাবস্যার চাঁদ ধরিয়া টানাটানি চলে; লোকের এ সবকই গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু লীগ এক অভিনব ও অভাবনীয় কৌশল প্রদর্শন করিল। লীগ আবিষ্কার করিল, 'বলং বলং বাহুবলং'; বাহির করিল, ন্যাশানাল গার্ড, কাটারী কুড়ালী হইতে বোমা বন্দুক বর্শা তলোয়ার ঝলসিতে লাগিল। ন্যায়শাস্ত্রে লেখে, ধোঁয়া দেখিলে অগ্নি অনুমান করিতে হয়। ইলেকসানে নবীন সাজ-সজ্জা দেখিয়া আমাদেরও অনুমান করা উচিত ছিল, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অত্যাসন্ন। সতর্ক হইলে ভাল হইত; প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম পর্ব্বে শত-সহস্র বলি না পড়িতেও পারিত। কেঁচো, কেন্নুই, সাপ-খোপ হঠাৎ জন্মায় না, তাহারা পৃথিবীতেই বাস করে এবং ঋতুকালে ও সময় বুঝিলে বহির্বিকাশ ঘটে। কাশিম রাজভী-লায়েক আলি চিরকালই ছিল এবং স্বকার্য্য সাধনে অবহেলা করিয়াছে বলিয়াও শুনি নাই, বাহিরে দংষ্ট্রাবিকাশের যত দিন প্রয়োজন হয় নাই, করে নাই; পাদপ্রদীপের সম্মুখীনও হইত না যদি না যে হিন্দু দলন ও দমন করাই রাজধর্ম্ম, সেই হিন্দু-ভারতের সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইবার আহ্বান আসিত। চিরাচরিত ধর্ম্মে বৈপরীত্য কে কবে বরদাস্ত করিতে পারিয়াছে? হায়দ্রাবাদের প্রাচীন অপিচ মহান্ ঐতিহ্য বিস্মৃত হইলেই বা চলিবে কেন? জিজিয়া-প্রবর্ত্তক ঔরঙ্গজীব ভারতবর্ষ জ্বালাইয়া, অবশেষে রাজপুতানার রাজসিংহ ও মারাঠার শিবাজীর—ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর—সাঁড়াশীর ত্রাসে স্খলিত-শিরস্ত্রাণ এই দাক্ষিণাত্যেই মরিতে আসিয়াছিল এবং শেষ গরল-শ্বাস এইখানেই পরিত্যাগ করিয়াছিল। হায়দ্রাবাদ সে ঐতিহ্য রক্ষা করিবে না ত কে করিবে? ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে বর্ষাধিক কালের রাজাকার-সংগ্রামে কত হিন্দু মরিয়াছে, হিন্দুর কত ঘর-বাড়ী পুড়িয়াছে, কত ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইয়াছে, কত নারী মদনোৎসবে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে, সংখ্যা নির্ণয় কে করিবে? সে ত রাজকরেরই সামিল, রাজভাণ্ডারে রাজকর দিতেই হয়, স্বতন্ত্র হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন দেখি না। প্রয়োজন থাকিলেও হিসাব দিবে কে? কলিকাতার হিসাব কি আজও পাওয়া গিয়াছে? দেশে সংখ্যাতত্ত্ববিদের অভাব না থাকিতে পারে, কিন্তু আগ্রহের অভাব নাই এ কথা কে বলিবে? হায়দ্রাবাদেই বা সে সম্ভাবনা কোথায়? আর তাও বলি, ঘটি-বাটি করিয়া জল তুলিয়া গোদাবরীর জলের মাপ পাওয়া যায় কি?

অজন্তা-ইলোরার গুহা হইতেই আমাদের সদাশয় গাইড্ হায়দ্রাবাদের সুখ-সমৃদ্ধির কলগানে কর্ণ সুশীতল করিতেছিল কিন্তু চিঁড়া ভিজে নাই; দ্বিতীয় তাজমহলের উচ্ছ্বাসে বাজীমাৎ করিয়া ফেলিল। বলিল, ঔরঙ্গাবাদের বিবি-কা-মুকবরা না দেখিলে ভারত ভ্রমণ অসম্পূর্ণ ও অতীত কীর্ত্তি দর্শন অসিদ্ধ। লোকটি মনস্তাত্ত্বিক, কোপ চিনে কোপ মারিতে জানে। ঔরঙ্গজীব পিতামহের রাজনীতিতে বদনা বদনা জল ঢালিয়া দিয়াছিল, জিজিয়া তাহার প্রমাণ; পিতার কীর্ত্তি তাজমহলকে ছুয়ো দিবার সাধও হইয়াছিল, রাবেয়া বিবির সমাধি-মন্দির তাহার নিদর্শন। সে যাই হোক, বিবি-কা-মুকবরা দেখিয়া খুশী হইয়াছিলাম এবং সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই গাইড সাহেব আসফজাহি কীর্ত্তি-কলাপ দর্শনের প্রস্তাবে সম্মতিটাও আদায় করিয়া লইয়াছিল। বিধাতা সূতিকাগৃহে ভাগ্যে বিড়ম্বনা লিপিবদ্ধ কা গিয়াছেন, তাঁহাকে দোষী করিয়া লাভ কি? ঔরঙ্গাবাদ হা হায়দ্রাবাদ পথ অনেক, দূরত্বও কম নহে; কখনও রেলে, কখ 'লাক্সারী ট্রাভেলে,' যখনই, যে দিক্ দিয়া গিয়াছি, তৃণহীন নীর দেখিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছি। অনন্ত বিস্তারিত, দিগন্ত হা দিগন্ত পরিব্যাপ্ত ধূসর প্রান্তরের কাছে কোথায়ও একটি পত্রপুষ্পাদি বিচিত্রাবয়ব তরুবরকে দেখিয়া বারম্বার কেবল ইহাই মনে হইয়া বেচারীর নিঃসঙ্গ জীবনের চির বিরহের দীর্ঘনিশ্বাস শুনিবার হায়, যদি আর একটি বৃক্ষও তথায় থাকিত! বিশুষ্ক, করুণ ম বিনিময় করিয়াও অভিশপ্ত জীবনের গুরুভার লাঘব কর পারিত। পূর্ব্বাঞ্চলে বনানী প্রবেশ করিবার পূর্ব্বক্ষণ প পক্ষিকূজন শুনি নাই। আমরা সাঁওতালে বাঙলা দেশের কে পাখীরা কেবল ঘুম পাড়ায় ও ঘুম হইতে জাগায় না, আমা অহর্নিশ শ্রবণ বিনোদন তাহারাই করে। হায়দ্রাবাদে দিবা-রা উৎকর্ণ থাকিতাম, হায় রে হায়, কর্কশ কাকও কি আমাদিগকে ব করিল? আজ ভাবি, ভগবান দয়াময়, যাহা করিয়াছেন, ভা জন্যই করিয়াছেন, ভালই হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদের পরিধি এক লক্ষ চারশ' পঁয়ষট্টি বর্গ-মাইল; লো সংখ্যা এক কোটি আশী লক্ষ—রাজাকররা কতগুলি 'রাজকর' আদ করিয়াছে, তাহা জানি না, দশ-বিশ লক্ষ হ্রাস করিয়া থাকিলে বিশেষ কিছু যায়-আসে না। এই সঙ্গে হতভাগিনী পশ্চিম-বাঙল হিসাবটা স্মরণ করা অসঙ্গত হইবে না। স্যার সিরিল র‍্যাডক্লি সাহেবের কি অসীম অনুকম্পা! দুই কোটি উনিশ লক্ষ ছেঁচা সহস্র এক শত ত্রয়োদশটি প্রাণীর (মাত্র!) অঙ্গবিন্যাস তরে সুবিশ আটাশ হাজার তেত্রিশ বর্গ-মাইল ভূমি দানসাগর করিয়া গিয়াছে এতখানিটাই যে দিয়াছেন সেই ঢের, না দিলেই বা আমরা করিতাম? কংগ্রেস কলার পাতায় সর্ত্ত লিখিয়া দিয়াছিলে সাহেব যাহা করিবেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রচিত বর্ণপরিচয় দ্বিত ভাগের সুশীল সুবোধ হিরোটির মত তাহাই শিরোধার্য্য করা হইবে উক্ত নাট্যের 'ভিলেন অফ দি পিস্'টার মত মাসীর নাসিকাগ্রভ দন্তদ্বারা স্পৃষ্ট হইবে না। প্রাকৃতিক বিধানে পিতার এক পিতা, অর্থাৎ পিতামহ থাকিতে বাধ্য, অনিবার্য্য বা অপরিহার্য্য বলা যায়। আইনের বিধানও দেখি, ছোট আদালতের উপর ব (জেলা) আদালত, তদুপরি হাইকোর্ট, তস্যোপরি ফেডারে কোর্ট, বুঝি-বা তাহারও উপরে ভূতপূর্ব্ব প্রিভি কাউন্সিল, বর্ত্তমা বড়লাট এবং রাজার বকলমে রাজাজী মহারাজ। কিন্তু কংগ্রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে আগাগোড়া বৈপরীত্য দৃষ্ট হইল। "শুন বাঙ্গালী (পাঞ্জাবী) ভাই, সবার উপরে সিরিল্ সত্য, তাহার উপ নাই!" আত্ম এবং আপোষে দিগ্বিজয়ের মোহ এমনই ঠিকে প করিয়া ফেলিয়াছে যে বৃটিশ ডাইনের হস্তে পুত সমর্পণেও দ্বি জাগিল না। "জন্ম গেল ছেলে খেয়ে" আজ তাহাকে ডাইনী ব কাহার সাধ্য? বাড়ীতে বেরালের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাইলে ছেলে ধরিতে পারিলে, বেরালটাকে থলেয় পুরিয়া মুখ বাঁধিয়া দমাদ পেটে। সিরিল্ র‍্যাডক্লিফ সাহেবও পশ্চিম-বাঙলাকে বোর ভরিয়া যে উত্তম-মধ্যম দিয়াছেন, বেরালের ন'টা প্রাণ, একটা এক করিয়া খাঁচা ছাড়িতে অনেক সময় লাগে বলিয়াই বোধ করি আ

বাঙ্গালীরা বাঁচিয়া থাকিয়া "ম্যাঁও ম্যাঁও" করিতে পারিতেছে। ২৮ হাজার বর্গ-মাইলে সওয়া দুই কোটি সুজন সজ্জন নরনারী তেঁতুল পাতায় বসতি। কিন্তু সওদা কিনিলে ফাউ পাওয়া যায়, বোঝা থাকিলেই শাকের আঁটি চাপে, বিশ-পঁচিশ লক্ষ ইতিমধ্যেই পদ্মা পার হইয়াছে, এখনও হইতেছে, পরে আরও হইবে। তেঁতুল পাতাতেও আর যে কুলায় না।

পাঞ্জাবের কথা থাক্, পরনিন্দার মত পরচর্চ্চাও পরিত্যজ্য। ভাল হৌক, মন্দ হৌক, কংগ্রেস-নীতি পালিত অথবা পদদলিত—যাহাই হোক, পাঞ্জাব পরপ্রত্যাশী হইয়া, পরের মুখের পানে চাহিয়া, 'দিন কৈনু রাতি ও রাতি কৈনু দিন' ভাবিয়া বসিয়া ছিল না। গোঁজামিল দিয়াই হৌক কিম্বা পরীক্ষা-ঘরে অবলম্বিত অসাধু উপায়ই হৌক, যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ করিয়া হেস্ত-নেস্ত—হিসাব-নিকাশ—শোধ-বোধ করিয়া লইয়া, কর্ত্তৃপক্ষকে অনেক দুশ্চিন্তা হইতে পরিত্রাণ করিয়াছে। দুর্ভাবনা নাই বলি না, আছে, তার অনেকখানি হাল্কা করিয়া দিয়াছে। মুখে স্বীকার করিতে শুনি নাই বটে, কিন্তু, ভাবাই ত সব নহে, নিশ্বাসেও যে অন্তরের ভাষার প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হয়, বুঝিতে একটু কষ্ট হয় না। কিন্তু হায়, হতভাগ্য বঙ্গদেশ! আরও হায়, স্বাধীনতা সংগ্রামের আদ্যাপীঠ পশ্চিম-বঙ্গ!

পশ্চিম-বাঙ্গলা 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' হাঁকিয়া কণ্ঠ চৌচির করিয়া ফেলিলেও পূর্ব্ব-পাকিস্তানের হিন্দুকে পশ্চিমাস্ত হইতে নিরস্ত করিতে পারিবে না। রেল, ষ্টীমার বন্ধ করিলেও তাহাদের আগমন বন্ধ হইবে না। আমাদের এমত শঙ্কাও আছে, ডিনামাইট্ ফাটাইয়া সাঁড়ার পুল উড়াইয়া দিলেও তাহারা কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড—বিল্বমঙ্গল চিন্তামণি সংযুক্ত হইয়া সাঁতরাইয়া পদ্মা পার হইবে। কটু-কাটব্যের এ্যাটম্ বম ছুঁড়িয়া মারিলেও নিরুদ্দেশ যাত্রা থামিবে না। কিন্তু ভরাডুবির বিলম্ব কত? আমাদের সজ্জন প্রতিবাসিগণের মনোভাব জানিতেও আজ বাকী নাই। পশ্চিম-বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় নাবিক লোক, সকল বন্দরেই ঘর বাঁধিয়াছেন; স্বমুখে প্রকাশ, বিহারে জন্ম, অতএব বিহারী, বঙ্গদেশে ক্রিয়া-কলাপ, কাজেই বাঙ্গালী, আসামে তাঁহার ব্যবসা-বাণিজ্য, সুতরাং অসমেয়া (অনুমতি হইলে আমরা দু'-একটি জাত্যভিমান সংযোগ করিতে পারি। যথা, স্বাধীন ভারতবর্ষে সংযুক্ত প্রদেশের প্রথম গভর্ণর নিয়োগের কথাটা ধরিলে তাঁহাকে সংযুক্তী না বলিয়া পারা যাইবে কি?), প্রাদেশিকতার ছোঁয়াচ যে তাঁহার ত্রিসীমানা স্পর্শ করিতে পারে না, তাহা সকলেই স্বীকার করে। সম্প্রতি আসামের শিলঙে তিনি তাঁহার অসমেয়া ভ্রাতৃ-বর্গকে (শুধু গন্ধে যদি না কুলাইয়া উঠে) গদ্যে-পদ্যে স্তবস্তুতি করিয়াছেন কিন্তু ফলং মড়কং। বিহারের কাছা ধরিয়া টানা-হেঁচড়া করিলে বিহারী ভেইয়াগণ পশ্চিম-বঙ্গের কোঁচা মালদহ হেঁচকা টানে খিচিয়া লইবার বাসনা ব্যক্ত করিতেছেন। উড়িষ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবের পদধূলি পড়িয়াছিল, বৈষ্ণব-বিনয় একেবারে বিসর্জ্জন দিতে আজও বোধ হয় পারে নাই, তাই বাস্তহারা ছন্নছাড়াদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া দুই-দশ জন ডাক্তারকে স্থান দিতেও পারে। অর্থাৎ উড়িষ্যার প্রান্তপ্রবাহী বঙ্গোপসাগর হইতে কয়েক কলসী লবণ জল তুলিয়া ফুল-বাগানে ঢালিয়া বৈজ্ঞানিক সারের উপযোগিতা বিচার করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সমস্যা যেদিন জুড়িয়া হইয়াছিল, এক বৎসর তিন মাস পরেও ঠিক সেই স্থানেই রহিয়াছে। বিন্ধ্য মহোদয়ের অগস্ত্য-প্রণাম বলিব কি?

তাই ভাবিতেছিলাম, হায়দ্রাবাদের একাংশে বাঙ্গালীকে আশ্রয় দেওয়া কি সম্ভব হইবে না? নাইজাম মাথার মণি হইয়া থাকুন, আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নাই। রাজভী অনন্ত কাল দিল্লীর লাল কেল্লায় সুখাসীন হৌক অথবা অসীম বেহেস্তে রাজাকার বাহিনী সংগঠনে মনোনিবেশ করুক, তাহাতেও আমরা কথাটি বলিব না। আমরা গৃহহারা, হতচ্ছাড়া, ছন্নছাড়া, বুঝি বা লক্ষ্মীছাড়াদের জন্য মাথা গুঁজিবার ঠাঁই খুঁজিতে বাহির হইয়াছি, ভিক্ষার চাল কাঁড়া ও আকাঁড়া, সে বিচার-বিশ্লেষণের অধিকার আমাদের থাকিতে পারে না। অঙ্কশাস্ত্রে আমি দ্বিতীয় বিদ্যাদিগ্‌গজ উপাধি বালক কালে অর্জ্জন করিয়াছিলাম, অদ্যাবধি উপাধি উপভোগ করিতেছি, কাজেই ত্রৈরাশিক কষিবার ভার পাঠক সমাজের উপরও দিতে হইতেছে। তাঁহারাই ঝটিতি গণিতাঙ্ক কষিয়া ফেলুন। অঙ্কটি এই: হায়দ্রাবাদে স্থান অফুরন্ত, মনুষ্যের অত্যন্তাভাব; আর, পশ্চিম-বাঙ্গালায় মা-ষষ্ঠী ও দেবী ধূমাবতীর কল্যাণে মনুষ্য জাতি প্রবাদের রক্তবীজকেও পরাজিত করিয়াছে কিন্তু স্থানের একান্তই অভাব! অঙ্ক-ফল কি বলে? সবুর, আরও একটু বাকী আছে। হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত গোলকুণ্ডায় অদ্যাপি হীরকখণ্ড জন্ম গ্রহণ করে কি না জানি না, আমাদের সর্ব্বজ্ঞ গাইড্, বিদেশী ও বিধর্মী বলিয়াই বোধ করি বহু সাধ্য-সাধনা সত্ত্বেও সে সংবাদটা প্রকাশ করে নাই; তবে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের সমৃদ্ধি, সে না বলিলেও, দর্শকের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই—করিতে পারে না। মিশর দেশের সূক্ষ্ম তুলার বড় গরব, হায়দ্রাবাদের "কৃষ্ণ ভূখণ্ডের" (black soil area) তুলা মিশরকে হলো বিট্ করিতে পারে। হায়দ্রাবাদ তাহার নিজস্ব কয়লা জাহাজ বোঝাই করিয়া বিদেশে রপ্তানী করিত। আমরা তখনই সাতটা কাপড়ের কল, চিনি, সিমেণ্ট, কাগজ ও চামড়ার বড়-বড় কারখানা দেখিয়া আসিয়াছিলাম। হায়দ্রাবাদের হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক সম্পদ ভারতের ঈর্ষ্যার বস্তু। তথাপি এ সমস্তই বৃহৎ ও বিশালের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। মহামান্য নাইজাম ও রাজভী ছিয়াশীকে বোধনে বিসর্জ্জন ও ত্রয়োদশের "মামলিকৎ আসাফিয়া" সাম্রাজ্য সঙ্ঘটনেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, কি বহিঃপ্রকৃতি, কি অন্তঃপ্রকৃতি, সম্যক বুঝা-পড়া করিবার সুযোগ হয় নাই। আজ সুযোগ প্রদত্ত হইলে এই গৃহহারা ছন্নছাড়ারা প্রকৃতি দেবীর সহিত আপোষ নিষ্পত্তি অনায়াসে ও ভালরূপেই করিতে পারিবে। এমন করিয়াছে; অনেক দেশের ইতিহাসে সে কথা সোনার অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কৃতঘ্ন আফ্রিকা, অকৃতজ্ঞ ব্রহ্মদেশ ও নিমকহারাম সিংহল ইতিহাসের লিখন মুছিবে কেমন করিয়া আমি কেবল তাই ভাবি।

পশ্চিম-বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জগুলিকে বাস্তহারা আবাসে রূপান্তরিত করিবার কল্পনা করিতেছেন শুনিতে পাই। খবর সত্য হইলে প্রাতর্বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতে কাহারও দ্বিধা হইবে না। আন্দামানের ম্যালেরিয়া নির্ম্মূল ও বন-জঙ্গল সাফ করিয়া বসবাস ও চাষ-আবাদ করিয়া হতভাগ্যেরা সুখের জীবন যাপন করিতে পারিবে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে, সকলের অজ্ঞাতসারে, হয়ত বা তাহাদেরও অজানে, একটা দুর্দ্ধর্ষ সামুদ্রিক নৌজাতির সৃষ্টি হইয়া স্বাধীন

ভারতের সিংহদ্বার রক্ষা করিতেও শিখিবে। আজ অত্যন্ত মর্ম্মবেদনার সহিত মনে পড়ে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের কালে ভারতবাসী যদ্যপি তাহার জলপথটা আগুলিয়া রাখিতে পারিত, এক শতাব্দী পূর্ব্বে তাহার দাসত্ব-শৃঙ্খল স্বীয় বিক্রমভরেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে পারিত। বৃটিশের দায়ে-পড়া দয়াদত্ত স্বাধীনতার গলিতকুষ্ঠ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—পাকিস্তান ও বাস্তুহারার সমস্যায় সুন্দর ভারতের শরশয্যায় শয়ান ঘটিত না। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাহা বুঝিতেন এবং বুঝিতেন বলিয়াই বিরামবিহীন আপোষহীন সংগ্রামের তূর্য্য-নিনাদের দ্বারাই স্বাধীনতা নাটকের প্রস্তাবনা রচনা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য ভারতের, নেতাজীর "জয়-হিন্দ" শব্দ গ্রহণ করিয়া নেতাজীকে বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে। নীর ত্যজি ক্ষীর গ্রহণ করা বিশ্বের রীতি: আমরা ক্ষীর ত্যজিয়া নীর লইয়াছি। অপার দুর্ভাগ্য!

পূর্ব্ব-পাকিস্তানের কঠিন ও দুরূহ সমস্যা সমাধানকল্পে আন্দামান অপেক্ষা হায়দ্রাবাদের উপর আমরা অধিক গুরুত্ব অর্পণ করি বলিয়াই আজ যাঁহারা পশ্চিম-বঙ্গের রাষ্ট্র-তরণীর কাণ্ডারী তাঁহাদিগকেও তৎপ্রতি অবহিত হইতে সবিনয় ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। কুব্জপৃষ্ঠ দুর্ব্বলদেহ পশ্চিম-বঙ্গ দেহ রক্ষা করিবার পূর্ব্বে সুষ্ঠু সমাধান হওয়া সঙ্গত। মনের অগোচর পাপ নাই, শশকবৃত্ত হইয়া মনকে আঁখি ঠারা সম্ভব কিন্তু ব্যাধের শর হইতে আত্মরক্ষা অসম্ভব। যে হিন্দু-বিদ্বেষের উপর ভিত্তি করিয়া স্বতন্ত্র মুস্লিম রাষ্ট্রের উৎপত্তি, সে রাষ্ট্রে হিন্দুর স্থান নাই। সে রাষ্ট্র তাহারা নিজেরা গড়িবে, অপরের সাহায্য লইবে কেন, অপরকে সাহায্য করিবেই বা কেন? সে ইচ্ছা থাকিলে হাঁড়ী আলাদা করিত না।

কিন্তু বন্ধু-বান্ধবগণের দুশ্চিন্তার অবধি নাই: তাঁহারা বলেন, হায়দ্রাবাদ বড় দূর: আন্দামানের ভারি দুর্নাম। হায়দ্রাবাদে জলাভাব: আন্দামানে ফুল অদৃশ্য; এবং আরও কত কি। অর্দ্ধ শতাব্দী কাল পূর্ব্বে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ দুঃখে, ক্ষোভে, মর্ম্মান্তিক বেদনায় ভর্ৎসনার ছলে বলিয়াছিলেন, "সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননি, রেখেছ বাঙালী ক'রে, মানুষ করনি।" দেখিতেছি সে মর্ম্মান্তিক দুঃখের হেতু আজও ঘুচে নাই; গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া হইয়াও শীর্ণ, শান্ত, সাধু পুত্রগণ পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে আজও ভাল ছেলে হইয়া রহিয়াছে। শিয়ালদা ষ্টেশনের বাহিরে ভাগাড়ে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইবে, তবু "দেশ-দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান"—তাহাতে রুচি দেখি না। তাই বিশ্বকবির কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া, এখনও মুগ্ধ জননী বঙ্গমাতার উদ্দেশেই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—

> "প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
> সংগ্রাম করিতে দাও ভালমন্দ সাথে।"

চাই না আমি

বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু

রাজপথে আজ এখানে-ওখানে কিসের রেশ
হৈ-চৈ শুধু ভাবছি আজ এই তো বেশ—কিসের রেশ?
তবুও আমি জানি না কেনো কিসের টানে—
কি যেন দোলা দিয়ে যায় মোর এই প্রাণে—কিসের টানে?
বেশ তো বেশ এই যদি হয় খুব ভালো
তোমার-আমার সবার প্রাণে দীপ জ্বালো—খুব ভালো!
অতি নির্জ্জনে এখানে বসে ভাবছি তাই
'নোতুন আলো' উঠেছে দেখো ভয় তো নাই—ভাবছি তাই।
তবুও আমি জানি না কেন কিসের টানে
মন যে আমার দোলা দিয়ে যায় কি এক গানে?
বেশ আছি ভাই বেশ আছি আমি বহু দূরে
মিছা কেনো বলো জ্বালাতে আসো সেই সে সুরে?
চলে যাও তুমি—সরে যাও তুমি সেই তো ভালো—
কেন মিছা শুধু ভীরু অন্তরে দীপ জ্বালো?
চাই না আমি—কিছু এই সব কিসের রেশ?
হৈ-চৈ তবু ভাবছি আমি এই তো বেশ—কিসের রেশ?

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস

সন্তোষ ঘোষ

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন ও পরবর্তী অধ্যায়

১৯০৬—১৯১৮

স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দের ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান একটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আচার্য্য হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা হইতে বাংলায় আগমন করিলেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি দেশের মধ্যে নূতন ভাবধারা প্রচারে ব্রতী হইলেন। শ্রীঅরবিন্দই প্রথম 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় তরুণ ভারতের লক্ষ্য বর্ণনা করিয়া লিখিলেন, "We want absolute autonomy—free from British Control"—আমরা বৃটিশ নিয়ন্ত্রণের বাহিরে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার চাই।' শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দে মাতরম্', ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকা দেশবাসীর চিত্তে নূতন আদর্শ ও নূতন উদ্দীপনা জাগ্রত করিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ১৯০৬ সালের ২০শে জুলাই তারিখে রাজদ্রোহকর রচনা প্রকাশের জন্য 'যুগান্তর'-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। রাজদ্রোহের অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত হইয়া 'সন্ধ্যা'-সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলিলেন, 'বিধাতা-নির্দিষ্ট' স্বরাজ অর্জনের প্রচেষ্টায় আমি যে সামান্য অংশ গ্রহণ করিয়াছি, সে জন্য আমি কোন বিদেশী গবর্ণমেন্টের নিকট জবাবদিহি করিতে রাজী নহি।' আদালতে মামলা চলিবার কালেই এই নির্ভীক, দেশহিতৈষী নেতা ইহজগৎ হইতে বিদায় লইলেন।

গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করিলেন যে, ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। এই দুঃখ ও বেদনার দিনটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য উভয় বঙ্গের মিলনের প্রতীক-স্বরূপ রাখীবন্ধন উৎসব পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। এই উৎসবের পরিকল্পনা করেন রবীন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ঠিক করেন যে ক্ষোভ ও শোক প্রকাশের জন্য ১৬ই অক্টোবর তারিখটিতে বাংলার জনসাধারণ অন্নজল গ্রহণ করিবেন না। সেদিন কোন বাঙ্গালীর গৃহে চুল্লী জ্বলিবে না। সেদিন ব্যবসা-বাণিজ্য ও সকল প্রকার কাজকর্ম বন্ধ থাকিবে এবং সকলেই খালি পায় থাকিবেন। বাংলার জনসাধারণ অক্ষরে অক্ষরে নেতৃবৃন্দের নির্দেশ পালন করিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রাখীবন্ধনের উৎসব পরিচালনা করেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত বিখ্যাত সঙ্গীতটি রচনা করেন,

"বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান—
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান—
বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা
বাঙ্গালীর কাজ, বাঙ্গালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান—
বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন,
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান।"

রাখীবন্ধন দিবসে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে এই অপূর্ব সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। ঐ দিন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় আনন্দমোহন বসু-স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণা-পত্র পাঠ করা হয়। ঘোষণা-পত্রটি বাংলায় পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ। উক্ত ঘোষণা-পত্রে বলা হয়, "যে-হেতু বাঙ্গালী জাতির সার্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পার্লামেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, সে-হেতু আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙ্গালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙ্গালী জাতি, আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব, তাহার সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।"

দ্রুতগতিতে আন্দোলন বাংলার সর্বত্র বিস্তার লাভ করিল। ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায় বিলাতী দ্রব্য বর্জনে অগ্রণী হইল। আন্দোলনের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের দমননীতি কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিতে লাগিল। স্বদেশী আন্দোলন হইতে ছাত্র সম্প্রদায়কে দূরে রাখিবার জন্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহা সম্ভব না হওয়ায় ছাত্র সম্প্রদায়ের উপর কঠোর দমননীতি প্রযুক্ত হইল।

রংপুর ও ঢাকার বহু ছাত্রকে স্কুল হইতে বিতাড়িত করা হইল। এই সকল ছাত্রের জন্য কলিকাতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। রাজা সুবোধচন্দ্র বসু-মল্লিক এই উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকা দান করিলেন। বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন প্রবল ও তীব্র হইয়া উঠিল। অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন বরিশালের নেতা। তাঁহার নেতৃত্বে বরিশালে বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন অসামান্য সাফল্য লাভ করিল। বরিশালের জনসাধারণের প্রতিরোধ শক্তি ভাঙ্গিবার জন্য নবগঠিত প্রদেশের ছোটলাট ব্যামফিল্ড ফুলার বরিশালের নানা স্থানে গুর্খা সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। তিনি নিজে বরিশালে গমন করিয়া অশ্বিনীকুমার দত্ত-প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে নিজ লঞ্চে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে অপমানিত করিলেন। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করা হয়। সম্মেলনের নির্দিষ্ট তারিখ ১৩ই এপ্রিল তারিখে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বরিশালে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্বে পূর্ব-বাংলায় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করা বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছিল। নেতৃবৃন্দের শোভাযাত্রায় বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করার জন্য পুলিশ নেতৃবৃন্দের উপর লাঠিচালনা করিল। ইহার ফলে কয়েক জন গুরুতররূপে আহত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইলেন। বরিশালের সম্মেলনে নেতৃবৃন্দের উপর পুলিশের অত্যাচারের ফলে বাংলার জনসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আন্দোলন চালাইয়া যাইতে মনস্থ করিল। ব্যামফিল্ড ফুলার ও

শাসন-কর্তৃপক্ষের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া আন্দোলন শক্তিশালী হইতে লাগিল। ইহার কিছু দিন পরে কলিকাতায় শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। এই উৎসবে সভাপতিত্ব করিলেন লোকমান্য তিলক। এই উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী'-শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করেন।

১৯০৫ সালে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল। এই প্রসঙ্গে গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিলেন, "বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার ফলে বাংলা দেশে যে বিরাট গণ-জাগরণ দেখা দিয়াছে, তাহা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।" লালা লজপৎ রায় বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে পূর্ণ ভাবে সমর্থন করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে অভিনন্দন জানাইলেন। বাংলায় সরকারী দমননীতির কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, "I am rather inclined to congratulate them on the splendid oppertunity, which an all wise providence in his dispensation has afforded to them by heralding the dawn of a new political era for this country. I think the honour was reserved for Bengal"— 'এ দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে নব যুগ আনয়নের জন্য ভগবান বাঙ্গালীদিগকে যে অপূর্ব সুযোগ দিয়াছেন, সে জন্য আমি তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আমার মনে হয় যে বাঙ্গালীদের জন্যই এই সম্মান সংরক্ষিত ছিল।'

১৯০৬ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি দাদাভাই নৌরজী স্বদেশী আন্দোলন ও স্বার্থত্যাগের জন্য বাঙ্গালী জাতিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। এই অধিবেশনেই দাদাভাই নৌরজী সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, ভারতের লক্ষ্য হইতেছে 'স্বরাজ' অর্জন। কংগ্রেস-মঞ্চ হইতে এই সর্বপ্রথম 'স্বরাজ' শব্দটি উচ্চারিত হইল। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে বাংলা দেশের বয়কট আন্দোলনকে সমর্থন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ রুশিয়ার জারের নির্মম দেশ-শাসনের সহিত বাংলার তদানীন্তন সরকারী শাসনের তুলনা করিলেন। কংগ্রেস-সপ্তাহে কলিকাতায় একটি শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইল।

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে বাঙ্গালী জাতির বিপুল স্বার্থত্যাগ ব্যর্থ হইল না। আন্দোলন আরম্ভ হইবার ছয় বৎসর পরে উভয় বঙ্গকে পুনরায় যুক্ত করা হইল। এই জয়লাভের ফলে পরাধীন জাতির মনে আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর হইল এবং সমগ্র জাতি উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনের পথে অগ্রসর হইল।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে নানা দিক্ দিয়া বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যুগান্তর আনয়ন করিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যন্ত কংগ্রেস আন্দোলন আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আবেদন-নিবেদনের ভিতর দিয়া যে ভারতের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব নহে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে দেশবাসী তাহা বুঝিতে পারিল। কংগ্রেসের মধ্যে যাঁহারা নরমপন্থী ছিলেন, তাঁহাদের সহিত চরমপন্থীদের বিরোধ উপস্থিত হইল। লোকমান্য তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, লালা লজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের নির্দেশে কংগ্রেসের চরমপন্থী দল কংগ্রেসকে অধিকতর বিপ্লবমুখীন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে কংগ্রেসে চরমপন্থী দল জয়লাভ করিল। তাহাদের নেতৃত্বে কংগ্রেস গতানুগতিক নিয়মতান্ত্রিক পথ ত্যাগ করিয়া সক্রিয় আন্দোলনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধ ১৯০৭ সালে সুরাট অধিবেশনে চরমে উঠিল। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ সুরাট অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯০৭ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার কথা ছিল নাগপুরে, কিন্তু গণ্ডগোলের আশঙ্কায় সুরাটে অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গণ্ডগোলের জন্য সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন ভাঙ্গিয়া যায়। কংগ্রেসে চরমপন্থীদের সহিত নরমপন্থীদের এই যে বিরোধ, ইহা ছিল আদর্শগত সংঘাত। আবেদন-নিবেদন ও ভিক্ষার সাহায্যে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব নহে, ইহাই ছিল চরমপন্থীদের অভিমত। নরমপন্থীরা গতানুগতিক ভাবে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হইবার পক্ষপাতী ছিলেন। চরমপন্থীদের নেতা ছিলেন মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলক, পাঞ্জাবের লালা লজপৎ রায়, বাংলার শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। শ্রীঅরবিন্দ চরমপন্থীদের কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "অপরের সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব নহে। জাতিকে নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে।" বিপিনচন্দ্র পাল স্বরাজের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, যে স্বরাজ বলিতে আত্মকর্তৃত্বকেই বোঝায়। তিনি বলিলেন, "স্বরাজ কেহ কাহাকেও দান করিতে পারে না। স্বরাজ অর্জন করিতে হয়।" লোকমান্য তিলক দলের কর্মপন্থার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "আমাদের আদর্শ হইতেছে আত্মনির্ভরতা। আমরা ভিক্ষাবৃত্তির বিরোধী। বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আমাদের অস্ত্র। আমরা কাহারও উপর বলপ্রয়োগ করিবার পক্ষপাতী নহি। কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিতে গিয়া যদি আমাদিগকে দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, আমরা তাহা করিতেও পশ্চাদপদ হইব না।"

১৯০৮ সালে চরমপন্থীদের বাদ দিয়া মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল—সভাপতিত্ব করিলেন ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র রচিত হইল। উক্ত গঠনতন্ত্রে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশ হিসাবে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার অর্জন করা কংগ্রেসের আদর্শ বলিয়া স্থির হইল। কনভেনশনে এই মর্মে আর একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, যাঁহারা কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য স্বীকার করিয়া কংগ্রেসের নিয়মাবলী মানিয়া চলিবেন, তাঁহারাই কংগ্রেসের প্রতিনিধি হইবার যোগ্যতা অর্জন করিবেন। ১৯০৮ সালে সরকারী দমননীতি রুদ্ররূপ ধারণ করিল। লোকমান্য তিলক রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তিলকের কারাদণ্ডে সমগ্র ভারতে বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। বাংলার অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েক জন বিশিষ্ট জন-নায়ক ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুসারে ধৃত হইয়া বন্দী হইলেন। বিভিন্ন প্রদেশে কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রচার বন্ধ করা হইল, কয়েকটি ক্ষেত্রে মুদ্রাযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হইল। ১৯০৮ সালের কংগ্রেসে সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অধিবেশন হইল। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। সেই সময়ে ভারতে মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের তোড়জোড় চলিতেছিল। ১৯০৯ সালের কংগ্রেসে প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারের তীব্র সমালোচনা করা হইল। ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার ভারতে প্রবর্তিত হইল। ১৯১০ সালে ভারতবন্ধু স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার উপর জোর দিলেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিভেদ দূর করার জন্যও তিনি আবেদন জানাইলেন। মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারে দেশের কোন সম্প্রদায়ই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। শাসন সংস্কার প্রবর্তনের সংগে সংগে পূর্ণবেগে সরকারী দমননীতিও চলিতে লাগিল। ১৯১১ সালে পণ্ডিত বিষণনারায়ণ ধরের সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। পণ্ডিত বিষণনারায়ণ তাঁহার অভিভাষণে বলিলেন, "ভারতে এমন এক দল সাহসী লোকের প্রয়োজন, যাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট হইবেন না। আমাদের এমন লোকের প্রয়োজন, যাঁহারা দেশের সেবায় সর্বশক্তি নিয়োগ করিবেন।" ১৯১১ সালে ১২ই ডিসেম্বর দিল্লী দরবারে রাজা পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে ভারতের প্রথম ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন জয়যুক্ত হওয়ায় ভারতবাসী নূতন প্রেরণা লাভ করিল। ১৯১২ সালে বাঁকিপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। এই বৎসর কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউম সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া এ বৎসরের কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই বৎসরের অধিবেশনে মহামতি গোখলে দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা ও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কথা বিশদ ভাবে বর্ণনা করেন। ১৯১৪ সালে মাদ্রাজ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু। তিনি তাঁহার অভিভাষণে ভারতের স্বায়ত্ত শাসনের দাবী স্পষ্ট ভাষায় জ্ঞাপন করিলেন। মিসেস্ অ্যানী বেশান্ত এই বৎসর সর্বপ্রথম কংগ্রেসে যোগদান করিলেন। তিনি কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করেন, কিন্তু নানা কারণে তখন উভয় দলে মীমাংসা সম্ভব হইল না। ১৯১৫ সালে বোম্বাইএ অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতির মঞ্চ হইতে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বলিলেন, 'কংগ্রেসের আদর্শ হওয়া উচিত, Government of the people for the people and by the people." ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বৃটেনকে সাহায্য করিবার নীতি গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালের জুন মাসে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া লোকমান্য তিলক যুদ্ধে বৃটেনকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাইলেন এবং ইহার কিছু দিন পরে দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহাত্মা গান্ধী সক্রিয় ভাবে এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। যুদ্ধ চলিবার কালে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে হোমরুল আন্দোলন। মিসেস্ বেশান্ত হোমরুল আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন। ভারতবাসীর স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে হোমরুল আন্দোলন পরিচালিত হয়। মিসেস বেশান্ত ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। লোকমান্য তিলক হোমরুল আন্দোলন সমর্থন করিয়া তাঁহার দৈনিক সংবাদপত্র 'কেশরী' ও সাপ্তাহিক 'মারাঠা' পত্রিকায় সাহায্যে হোমরুলের বার্তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং দেশের সর্বত্র হোমরুলের অনুকূলে সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। সরকার দমননীতির সাহায্যে আন্দোলন নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সরকারের রোষ-দৃষ্টিতে পতিত হইলেন। বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের দিল্লী ও পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। মিসেস্ বেশান্ত ও তাঁহার সহকর্মী একগুচ্ছ ভারত সরকারের নির্দেশে অন্তরীণ হইলেন। ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে মিসেস্ বেশান্তকে সভাপতি নির্বাচিত করিয়া দেশবাসী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিল। অ্যানী বেশান্তের সভাপতি পদ লাভের ফলে কংগ্রেসে চরমপন্থীদের জয়লাভ সম্পূর্ণ হইল। ১৯১৮ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সভাপতিত্ব করিলেন। এই বারের অধিবেশনে ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী জানাইয়া কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। ১৯১৮ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক পথে চলার পালা শেষ হইল। ইহার পর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দ্রুতগতিতে সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল।

[ক্রমশঃ

নগরবাসী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

মানুষ এ-ভাবে ছাতু খায় এটা হয়তো জীবনে কোন দিন চোখেও পড়ত না মণির। যদি না ময়দানের পাশে ট্রাম-লাইনের ধারে গাছ-তলায় উবু হয়ে বসে গোকুলকে ও-ভাবে সে ছাতু খেতে দেখত। নীলিমার ভাই গোকুল ? রিক্সাওলা বা ঠেলা-গাড়ীওলা বা ফিরিওলারা সে গাছতলায় ছাতু খায় ?

বাড়ীতে দম আটকে আসায় মণি হঠাৎ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। সুশীলের সঙ্গে দ্বিতীয় বার ঝগড়ার পরে এবং কোথায় যাবে কি করবে না জেনে। শুধু পরনের সাধারণ কাপড়টা বদলে ফেলেছিল আর পাঁচ টাকার একটা নোট ভাঁজ করে হাতের মুঠোয় নিয়েছিল। বাড়ীর বাইরে দু'দণ্ডের মুক্তি ও শান্তি খোঁজার এমন অন্ধ তাগিদ জীবনে তার এই প্রথম এল। অনেক দিন আগে এ-বাড়ী থেকে আরেক বার সে পালিয়েছিল, চিরতরে পালিয়েছিল, এই সুশীলকেই বগলদাবা করে। আজ একলা কোথায় যাবে ? ট্রাম চলেছে, ট্রামেই উঠে বসা যাক। ট্রামটাতেই না হয় একটা চক্র দিয়ে ঘুরে এসে ফের এখানে নামবে।

আপিসগামী যাত্রীতে ট্রাম ভরা। মেয়েদের রিজার্ভ সিট থেকে দু'জন বৃদ্ধকে উঠিয়ে বসে আনমনে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে একটা অস্পষ্ট ইচ্ছা ভেসে উঠে মনের মধ্যে রূপ পেতে থাকে। তার পরিত্যক্ত ছোট নীড়টিতে ফিরে গেলে কেমন হয় ? থাক সেখানে কারফিউ আর গোপন ছোরা, আতঙ্কে ভরাট হয়ে থাক দিন ও রাত্রি। তবু সেখানে সে ধাতস্থ ছিল, নিজের ভেতর থেকে নিজে এ রকম ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে বসেনি। সেখানে থাকার সময় সুশীল যদি যতীনের দয়ায় বালীগঞ্জের নিরাপদ আশ্রয়ে পালাবার ব্যবস্থা করত, কত খুশীই না সে হত ? মনে মনে যতীনকে কৃতজ্ঞতার কত অর্ঘ্যই না জানাত—ঠিক করে ফেলত যে শীঘ্রই এক দিন বেড়াতে গিয়ে যতীনের স্ত্রীকে আপ্যায়িত করে আসাটা বিশেষ জরুরী কর্ত্তব্য। কী অদ্ভুত পাগলামিতেই তাকে পেয়েছে যে এমন একটা সুবিবেচনার প্রস্তাব করায় সুশীলকে সে যা মুখে এল বলে বসল ? একবার নয়, দু'বার ? পাড়ার অবস্থাটা দেখে এলে কেমন হয়, তার নিজের বাড়ী যে পাড়ায়, কুক্ষণে সেখান থেকে প্রাণের ভয়ে সে প্রণবের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে ? এখন যাবে ! একা ? অন্তত কাছাকাছি যতটা যাওয়া সম্ভব গিয়ে বুঝে আসবে হাঙ্গামা কমেছে কি না, ফিরে যাওয়া যায় কি না !

এই ভাবনার মধ্যে ছাতু খাওয়ায় রত গোকুলকে দেখে ট্রাম থেকে নেমে সে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সহরে কারা রাঁধে আর কারা পথে ঘাটে খাবার কুড়িয়ে খায়, প্রকাণ্ড হোটেলের প্রায় সামনেই কেমন সস্তায় সহজে ছাতু খাবার ব্যবস্থা থাকে, এ সব বর্ণনা গোকুল তাকে শুনায়। নিজেই শোনায়, জল খেয়ে কোঁচায় মুখ-হাত মুছে, ভূমিকাও করে না। মণি যে একা এসে এখানে দাঁড়িয়েছে এতে যেন আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, স্বাভাবিক ঘটনা।

'ছাতু খুব পুষ্টিকর জিনিষ। এক দিন খেয়ে দেখবেন।'

'আর কিছু পুষ্টিকর নেই ?'

'বেশী পয়সা লাগে। গাঁটে পয়সা কম থাকলে সস্তায় পুষ্টি চাই।'

'সকালে খেয়ে বেরোলে হত।'

'অত ভোরে কি খাব ?'

'কত ভোরে বেরোন ? রাত থাকতে ?'

'না, ভোরেই বেরোই। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ।'

'কেন ?'

'ছেলে পড়াই, দু'জায়গায় দু'জনকে। এক জনকে ছ'টায় পড়ানো সুরু করতে হয়, নইলে সময় কুলোয় না।'

'ছেলে পড়িয়ে দশটা নাগাদ এখানে এসে ছাতু খান ? ছাতু খেয়ে যান কোথায় ? আপনাকে কিন্তু আমি দশটা-এগারোটায় সময় বাড়ীতে দেখেছি মনে পড়ছে—'

কথাটা বলে মণি ঠোঁট কামড়ে ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকে। গোকুল বাড়ীতে থাকে, নীলিমার সে ভাই। এত দিন এক বাড়ীতে বাস করে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের জলজ্যান্ত এই ছেলা মানুষটা কখন বাড়ীতে থাকে, কখন যায়, কি করে, কিছুই সে সত্যই খেয়াল করেনি।

'গোকুল হেসে বলে, রোজ এখানে ছাতু খাই না, ছেলে পড়িয়ে বাড়ী ফিরি। একটা কাজ আছে তাই। আপনি কোথায় যাবেন ?'

'আমি ? আমি যাব রাজাপাড়া লেন।'

'ও-পাড়ায় একা যাবেন ?'

'কেন ? পাড়ার খবর জানেন আপনি ? এখনো গোলমাল চলছে ? আচমকা বাড়ী ছেড়ে এলাম, ভাবছিলাম গিয়ে দেখে আসি—'

গোকুল ধীরে-ধীরে সার্টের পকেট থেকে একটা আধপোড়া সিগারেট ধরায়, একটি বার ক্ষণেকের জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মণির মুখখানা দেখে নেয়। বলে, 'শুনেছি ওদিকে হাঙ্গামা চলছে। আপনার যাওয়া ঠিক হবে না। আমি বরং খবর নিয়ে ও-বেলা আপনাকে জানাব। আপনি বাড়ী ফিরে যান।'

'তাহ'লে তো ভালই হয়।' মণি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে।

পরের ফিরতি ট্রামেই গোকুল তাকে তুলে দেয়। তার পর এত জোরে এসপ্ল্যানেডের দিকে পা চালায় যে বেশ বোঝা যায়, মণির সঙ্গে কথায় তার জরুরী কাজের সময় নষ্ট হয়েছে। কথা বলার সময় কিন্তু মণি সেটা টেরও পায়নি।

বাড়ী ফিরে নীলিমাকে সে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার ভাই কি করেন ?'

অসময়ে এই আকস্মিক প্রশ্নে নীলিমা একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলে, 'কত কিছু করে। ছেলে পড়ায়, কবিতা লেখে, খবরের কাগজে লেখে, মজুর উস্কায়—'

জবাব শুনে নীলিমা তামাসা করছে ভেবে মণি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। এদের সঙ্গে নিজের অমিলটা আরও স্পষ্ট অনুভব করে। মুখ ফিরিয়ে সে চলে যাচ্ছিল, নীলিমা কোথা থেকে একটি লম্বাটে আকারের হাল্কা বই তার হাতে দিয়ে বলে, 'ওর লেখা কবিতা।'

গোকুল তবে সত্যই কবিতা লেখে ? কবিতার ছাপানো বই পর্য্যন্ত তার আছে ? ঘরে গিয়ে বিছানায় বসে পাতা উল্টোতে প্রথমেই পৃষ্ঠার মাঝামাঝি ছোট হরফে নামহীন ক'লাইন কবিতা চোখে পড়ে। উৎসর্গ বা ভূমিকা হবে—কবিতার বই-এ বোধ হয় এ-রকম লেখা রীতি।

আমি কবি, শুঁড়ি নই।
শব্দ-মদ তৃষ্ণা নিয়ে এ লেখা প'ড়ো না।
জীবনের সব তৃষ্ণা
সব ঋণ শুধে
সৃষ্টির পেয়েছে অধিকার
দখল করেছে ভবিষ্যৎ।
সে প্রেমের গান,
মনে হবে তোমারই মৃত্যু-পরোয়ানা।
দু'টো দিন বাকী আছে,
থাক,
পড়ো না ঘোষণা।

পড়ে মানে যে মণি ভাল বুঝতে পারে তা নয়। মৃদু অস্পষ্ট একটা আতঙ্ক অনুভব করে। জাপানী বোমা বা দাঙ্গার আতঙ্কের মত নয়। এ আতঙ্কের স্থান যেন হৃদয়ের অন্য স্থানে, সমস্ত অনুভূতির একেবারে মূলে।

এত বড় সহরের জীবনযাত্রা যখন বেশী দিনের জন্য পঙ্গু ও ব্যাহত হয়, যুদ্ধ-বিপ্লব বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা যে কারণেই হোক, সেই ভয়ানক বিশৃঙ্খলার মধ্যে তার মারাত্মক সঙ্গেই সামঞ্জস্য করে নিয়ম-রীতি গড়ে ওঠে। কোন এলাকা কার পক্ষে কতখানি নিরাপদ বা বিপজ্জনক, কোন পথে দিবা-রাত্রির কখন যাতায়াত চলে, কখন চলে না, এ সব মোটামুটি আন্দাজ করে ফেলে মানুষ। উন্মাদ ও গুণ্ডাদের রক্তপিপাসাকে ফাঁকি দেবার দু'-একটা কৌশলও শিখে ফেলে। তেমন দরকার হলে সাজ-পোষাকের অদল-বদল ঘটিয়ে অন্য ধর্মীর সব চেয়ে বড় ঘাঁটির ভেতর থেকেও যে ঘুরে আসা চলে দুঃসাহসী কর্মী বা সাংবাদিক দু'-চার জন এটা প্রমাণ করেই দেয়। ধর্ম যেন উভয় পক্ষেই নিছক পোষাকী চরমতায় উঠে গেছে। সায়েবী পোষাকে তবু খানিকটা অনিশ্চয়তা থাকে, গুণ্ডারা মাঝে-মাঝে যাচাই করে নেবার চেষ্টা করে, কি নাম কি দরকারে কোথায় যাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু তুমি যে হিন্দু কিম্বা তুমি যে মুসলমান বাইরে তার একটা চিহ্ন ধারণ করে, একটা গান্ধী-টুপি বা ফেজ হলেই যথেষ্ট, হত্যার জন্য উগ্র অসহিষ্ণু হিন্দু বা মুসলমান-পাড়ায় তুমি অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পার। গুণ্ডারা বিরক্ত করতে সাহস পাবে না। গুণ্ডারাও তো জানে তারা কিসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সুন্দর নরকে পরিণত করে রাখতে পেরেছে সহরটাকে!

যে পথে সম্ভব যতক্ষণ সম্ভব ট্রাম বাস গাড়ী আর পদাতিক মানুষ চলাচল করে, বাজার বসে, দোকানে বেচা-কেনা হয়, আপিস চলে, কারখানা চলে, সিনেমা চলে, রেডিও বাজে, বস্তিতে বস্তিতে মানুষ বাঁচে আর অভিশাপ দেয়, ফুটপাতে ঘুমানোর লোকদের পর্য্যন্ত ফুটপাতে ঘুমোতে দেখা যায়। বিরাট মহানগরীর বিপুল জনসাধারণ দাঙ্গাকে সয়ে চলেছে, কিন্তু জীবনকে সস্তা হতে দেয়নি। এই তো সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মরে গেল হিন্দু-মুসলমানের বাংলায়, সহরের অলিতে-গলিতে মরা ইঁদুরের চেয়ে অগণতি মানুষ চোরাকারবারীর লোভ আর লাভের অস্ত্রে খুন [illegible]

সকলের অন্ন আর বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠী হাতে পাওয়ার জন্যই যুগ-যুগ ধরে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আনন্দ বেদনা বিশ্বাস ও আবেগ পর্য্যন্ত বশীকরণের ওষুধ মিশিয়ে কর্ত্তারা পরিবেশন করে এসেছে। দুর্ভিক্ষ দিয়ে পঁয়ত্রিশ লক্ষকে হত্যা করা হল, হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে, ওটা হল কৌশলে হত্যা করা। কৌশলটা ধরি-ধরি করেও সাধারণ মানুষ ধরে উঠতে পারেনি। কিন্তু ধর্মের নামে, একটা অর্থহীন 'স্থান' লড়ে নেবার এবং তাতে বাধা দেবার নামে, রাজপথে ছোরা মেরে হত্যা চলতে দেবার অসঙ্গতি জনসাধারণ অনুভব করে। তাই এ রকম হত্যা ঠিক যতটুকু চলতে দিয়েও মোটামুটি বাঁচা যায় শুধু ততটুকু হত্যাই জনসাধারণ সইতে রাজী হয়েছে।

রাজাপাড়া লেনের মধ্যে আটকা পড়ে গোকুলের তাই আত্মরক্ষায় দুঃসাহসিক প্রেরণা জাগে। মণিদের বাড়ীর সংবাদ নিতে এদিকে এসেছে, পাড়াটা শান্ত ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সব ধর্মের সব পোষাকের মানুষের স্বাধীন ভাবে চলাচলের পিচ-ঢালা নোংরা সঙ্কীর্ণ পথটুকু তার মৃত্যুর ফাঁদে পরিণত হয়েছে—ধুতি-পরা সে হিন্দু যুবক।

হেঁটে, জোরে হেঁটে, এ পথটুকু পেরোতে মিনিট তিনেক লাগবে, তার পর ট্রাম-রাস্তা, নিরাপত্তা। কিন্তু এই তিন মিনিটের পথে শ'খানেক ছোরা কিল-বিল করছে। পিছন থেকে পিঠে বা সামনে থেকে বুকে একটা ছোরা বসাতে দুই কি তিন সেকেণ্ড লাগে। গোকুল পিছনে তাকায়। ওদিকে জবরদস্ত ঘাঁটি—ওদিকে ফেরা অসম্ভব। দাঁড়িয়ে থাকাও অসম্ভব। সামনে তাকে এগোতেই হবে। দু'শ-আড়াইশ' গজ গলিটুকু পেরোতে যদি মরতে হয়, মরবে। অন্য কোন দিকে অন্য কোন উপায়ে বাঁচা সম্ভব নয়।

দু'-এক পলকের মধ্যে সহজ স্পষ্ট বাস্তব অবস্থাটা গোকুল আয়ত্ত করে ফেলে আর আয়ত্ত করতে করতে সেই দু'-এক পলকের মধ্যেই পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে পান বিড়ির দোকানটাতে যায়। দোকানে পাঁচ জন বিড়ি বানাচ্ছে একমনে। তাদের এই গলিতে যে একটা খুন হয়ে গেল, আরও খুনের জন্য গলিটায় তৃষ্ণা চরমে উঠে গেল, এ সব তুচ্ছ বিষয়ে তাদের যেন ভ্রূক্ষেপও নেই। বিড়ি পাকানো শেষ না করলে হয়তো আজও তাদের, আস্তানার বাল-বাচ্চার, দু'-এক দিনের ভুখা থাকার মীমাংসা হবে না।

নারকেলের দড়ির আগুনে বিড়ি ধরিয়ে গোকুল বেপরোয়া ভাবে মুখ উঁচু করে ধোঁয়া ছাড়ে। বিড়িতে টান দিতে দিতে হেলে-দুলে ধীর-পদে অগ্রসর হয়। তার তাড়া নেই, তার আতঙ্ক নেই, সে এই পাড়ারই লোক—চকচকে শাণানো ছোরা যারা নিয়ে আসে তাদেরই আপন জন। নইলে, বিধর্মী অনাত্মীয় কেউ কি এ সময় এখান দিয়ে এ ভাবে চলতে পারে? পরনে অবশ্য সার্ট আর ধুতি, কিন্তু আজকাল কোন মুসলমান-ছেলে কি সার্ট আর ধুতি পরে না?

দশ-এগার বছরের একটা ছেলে, তার পরনে মকমলের পোকায় কাটা পরিত্যক্ত ট্রাউজার কেটে তৈরী করা হাফ-প্যাণ্ট, গায়ে হাত-কাটা নকল খদ্দর, ছিটের বোতাম-ছেঁড়া কোট, সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'তুম কোন হায়?'

গোকুল গর্জন করে বলে, 'চোপরাও। শালা বাঞ্চোত!'

ছেলেটা ছিটকে সরে যায়।

ধীরে ধীরে এগোয় গোকুল। সেই যেন এই গলির কর্তা, মালিক। সে জানে, প্রত্যেক পলককে জানে, প্রাণটা সে [illegible]

যাবছে অভিনয় দিয়ে, ঢং করে। কেউ কখনো যা করে না সে তাই করছে।

গলির মোড়ে পৌঁছে, ট্রাম বাস গাড়ী ঘোড়া লোকজনের চলাচলের মধ্যে এসে, সে যেন হঠাৎ দিশে হারিয়ে ফেলে। নামাবলি গায়ে জড়িয়ে পিতলের শূন্য কুণ্ড হাতে ঝুলিয়ে এক জন উড়িয়া দোকানে দোকানে ঘণ্টা নেড়ে একটা ফুল আর একটু জল ছিটিয়ে হিন্দুধর্মের ব্যবসা চালিয়ে চলেছিল, অসাবধানে পা বাড়াবার ফলে সে বেচারীকে গোকুল না জেনে লেংড়ি মেরে বসে।

মুখ থুবড়ে সে ফুটপাতে পড়ে যায়। তার জীর্ণ তসরের কাপড়ের তলা থেকে একটা বোতল ফেটে কাচ আর ধেনো মদের গন্ধ চারি দিকে ছাড়িয়ে পড়ে। এই দাঙ্গা-বিধ্বস্ত সহরেও সে হিন্দুর ধর্মকে আশ্রয় করে দিব্যি ব্যবসা চালাচ্ছিল। এক পয়সা মূলধন দরকার হয়নি, গায়ে দেবার সাধারণ একটা চাদরের বদলে নামাবলী চাদর, কয়েকটা ফুল-পাতা, একটু কলের জল। কলকাতার কলে গঙ্গার পবিত্র জলই সরবরাহ হয়।

সামলে-সুমলে উঠে ধর্ম-ব্যবসায়ী উড়িয়াটি গোকুলের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তার পর পরিষ্কার বাংলায় বলে, 'লেংড়ি মারার মানেটা কি মশায়?'

'কে লেংড়ি মেরেছে?'

শুনে লোকটি সিধে হয়ে দাঁড়াল। পায়ের কাছে পিতলের ফুল-চন্দন সজ্জিত দেবতার সাজিটি যে গড়াগড়ি যাচ্ছে সেদিকে খেয়ালও করে না। গায়ের নামাবলীটা খুলে কোমড়ে জড়িয়ে রুখে দাঁড়িয়ে বলে, 'দেখুন, আপনিও বাঙ্গালী। আপনি দাঁতের মাজন ফিরি করছেন, আমি অন্য জিনিষ ফিরি করছি। আমাকে লেংড়ি মেরে ফেলে দেবার মানেটা কি মশায়?'

সামনেই একটা ট্রাম যাচ্ছিল। ছুটে গিয়ে লাফিয়ে গোকুল ট্রামটায় উঠে বসে, ওখানে ওই অবস্থায় জীবন-যুদ্ধের দুই ফিরিওলার যুদ্ধ-সৃষ্টির সাধ তার ছিল না। বেচারীর দেশী মদের বোতলটা চূর্ণ হয়ে গেছে, মিষ্টি কথায় ও-জ্বালা শান্ত হবার নয়। মার খেলে জীর্ণ শরীরে আরও ব্যথা পাবে। তার চেয়ে হার মেনে তার পলায়ন করাই ভাল।

আরও একটু কাজ ছিল। বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা হয়। সন্ধান করে গিয়ে দেখতে পায়, কোমরে আঁচল জড়িয়ে মণি রান্না-বান্নার কাজে নেমেছে,—একা। নীলিমা, সরস্বতী বা উষা এরা কেউ ধারে-কাছে নেই।

মণি বলে, 'এত দেরী হল? যাক গে, এক টুকরো রুটি আছে, চা খেয়ে নিন। আধ ঘণ্টার মধ্যে ভাত দেব।'

গোকুল বলে, 'বলেন কি? সন্ধ্যা বেলা ভাত খেয়ে নিলে মাঝ-রাতে খিদে পাবে যে? চা-টা খাই, ভাত ঠিক সময়েই খাব। একা রাঁধছেন কেন?'

'ভারি রান্না, এতে আবার ক'জন দরকার?'

মুখ-হাত ধুয়ে এসে গোকুল চা খায়, তার বাড়ীর কথা মণি তোলে না। আসলে, কথাটা সে ভুলে গিয়েছিল।

গোকুল নিজে থেকে বলে, 'আপনাদের ও-পাড়াটা দেখে এলাম। অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। মাল-পত্র কিছু রেখে এসেছিলেন?'

'[illegible] ক'খানা জামা, এই সব ছিল।'

'বোধ হয় আর নেই।'

'বাড়ীতে ঢুকেছিলেন? তালা দিয়ে এসেছিলাম।'

'তালা নেই। অন্য লোক বাড়ী দখল করেছে, ভেতরে যেতে পারিনি। এমনিই প্রাণটা যেতে বসেছিল।'

মণি ব্যাকুল হয়ে বলে, 'কেন গেলেন পাড়ার মধ্যে? আমি শুধু বলেছিলাম ভাসা-ভাসা পাড়ার অবস্থাটা একটু জেনে আসতে। বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে তো বলিনি আপনাকে?'

যে বিপদ ঘটতে পারত তার জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করে মণিকে কাতর হয়ে পড়তে দেখে গোকুল বুঝিয়ে বলে, 'জানলে আমিই কি যেতাম? প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারিনি। হঠাৎ কি একটা ঘটল, নইলে ভাবনা ছিল না।'

নীলিমাকে গোকুল জিজ্ঞাসা করে, 'ওঁকে একা রাঁধতে দিলে কেন?'

'ওঁনার সখ। আমাদের খেদিয়ে দিলেন। কারো কিছু করবার দরকার নেই, উনি একা সব করবেন।'

মণি হঠাৎ প্রায় গায়ের জোরে সেই যে রান্নার দায়িত্ব গ্রহণ করল, মনে হল মরলেও আর এ দায়িত্ব ছাড়বে না। অধিকাংশ সময় সে রান্না-ঘরেই কাটায়। এ দেশের মেয়েরা যে সত্যই নিছক পুরুষের ভোগের সামগ্রী, রাঁধুনী চাকরাণী আর পুরুষের সন্তান-সন্ততির দুধ-মা ধাই এ খবরটা সে চিরকালই জানত। মাসিক-পত্রাদিতে কি কম লেখা সে পড়েছে এ বিষয়ে। এ দেশের নারী-সমাজকে মনে মনে সে কি কম আহা জানিয়েছে! সুশীলকে কেঁচো বানিয়ে নিজের ঘর-সংসারে তার ছিল অখণ্ড প্রতাপ, নিজেকে ওই অভাগীদের দলে সে ভাবতে পারত না। অহর্নিশি মায়ার ছলনায় ভুলিয়ে, স্নেহ-সেবা কান্না-অভিমানের জাল বুনে, কি অধ্যবসায়ের সঙ্গেই একটি দুর্ব্বল পুরুষ আর তিনটি ছেলে-মেয়ে এই চারটি প্রজা নিয়ে গড়া সাম্রাজ্য বশে রেখে সে অখণ্ড প্রতাপে শাসন করে এসেছে! নিজের ঘরের কোণে নিজেকে সে যাই ভাবুক, আসলে সে-ও ওই বিরাট রাঁধুনী চাকরাণী-মার্কা মেয়েদেরই দলে, এটা টের পেয়ে তার প্রচণ্ড অভিমান ফেটে পড়েছিল। দেশ-বিদেশ যুদ্ধ-বিপ্লব রাজনীতি নেতা নিয়ে বেশী মাথা-ঘামানোর বিরুদ্ধে তার সেদিনের অসহিষ্ণুতা সুশীলের সঙ্গে শত্রুর মত ঝগড়া, রান্না-ঘরে আশ্রয় নেওয়া সবই তার প্রতিক্রিয়া। দেশটা বড়, দেশ-বিদেশ আরও বিরাট, রাজনীতির সুতো টানলে নিরালা ঘরের কোণে মশারির অন্তরালের গোপন মুহূর্তগুলিতে পর্য্যন্ত বুঝি টান পড়ে: এ-সব কথা সামনে রাখলে নিজেকে তুচ্ছ হয়ে যেতে হয়।

তুচ্ছ যে হয়ে গেছে তার প্রতিকার মণির জানা নেই, নিজের ছোট সংসারটিতে ফিরে গেলেও আগের দিনগুলি তার ফিরবে না। নিজেকে বড়ই সে অসহায় বোধ করছিল। রান্না বান্নায় মেতে যদি ভুলে থাকা যায়। প্রহৃত আদুরে ছেলের মত শঙ্কিত কাঁদো-কাঁদো মুখ করে সুশীল যে আশে পাশে ঘুর-ঘুর করবে, এটা থেকে অন্ততঃ রেহাই পাওয়া গেছে।

তার রান্না-ঘরে আশ্রয় নেওয়ার মানে সুশীল বুঝেছে এক রকম। সে ভেবেছে, ঝগড়া করে মণি এখন অনুতাপে কাতর। মণিকে নরম করবার কল্পনা করে তার পৌরুষ খাটো হয়েছে। সে-ও গম্ভীর মুখে বই আর কাগজে মন দিয়েছে।

সকালে প্রণব এসে রান্না-ঘরে টুলটা টেনে বসল। বলে, 'হঠাৎ রান্নার মধ্যে ডুব মারলে কেন?'

'কারো সঙ্গে বনে না, কি করব।'

'কারো সঙ্গে বনে না বলে একা এতগুলো লোকের রান্না রেঁধে মরতে হয় বুঝি?'

'যে যে-কাজের যোগ্য। রাঁধা-বাড়া বাসন-মাজা ছেলে-বিয়োনো আমার কাজ। দেশ-বিদেশ যুদ্ধ-বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ মার্কসবাদ এ সব কি আমার জন্য? আমার চাল-চলন কথা-বার্তায় তোমাদের হাসি পায়, তোমরা বিরক্ত হও। তার চেয়ে যা পারি তাই করছি।'

কথাগুলি করুণ কিন্তু তাতে কী ঝাঁঝ! ঝাঁঝটা বোধ হয় প্রণব পছন্দ করে, নইলে মণির কথাগুলি সত্যই নিছক ন্যাকামি হয়ে যেত।

'আমরা যে হাসি, বিরক্ত হই, এটা তোমার মনগড়া হতে পারে তো?'

'ও-সব আমি বুঝি ঠাকুরপো।'

'তুমি কিছুই বোঝ না! নিজেই বলছ, এত কাল ঘর-কন্নায় মুখ গুঁজে কাটিয়েছো, বড়-বড় কথা তোমার জন্য নয়। নিজেই আমায় বলছ তুমি সব বোঝো। এই ক'টা দিনে তোমার বুঝবার ক্ষমতায় ম্যাজিক ঘটে গেল? তুমি বুঝে ফেললে যে রাজনীতি সমাজনীতি বোঝ না বলে আমরা মনে-মনে হাসি? নিজেকেই তুমি বুঝতে পার না, তুমি আমাদের কি বুঝবে? তোমার গোলমাল, নিজের সঙ্গে, নিজের মনগড়া ধাঁধায় তুমি পাক খাচ্ছ।'

শুনতে শুনতে মণির দু'চোখে রোষের দীপ্তি ঝলক মেরে যায়। খুন্তির গোড়াটা থুতনিতে ঠেকিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে সে এমন ভঙ্গি করে যেন খুন্তি দিয়ে প্রণবকে মেরে বসবার ঝোঁক সামলাচ্ছে। বলে, 'ঠাকুরপো, আমার স্বামীও মস্ত বিদ্বান, ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে যেও, কেঁচো বনে যাবে। অনেক বড়-বড় পণ্ডিত প্রফেসার আমার বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে বড়-বড় কথা বলেছে, আমার দেওয়া চা-বিস্কুট খেয়েছে। তাদের কথা এক বর্ণ বুঝিনি। তাই বলে কি আমার মনটা জুবুথুবু উই-ঢিবি হয়েছিল? আমি হাসিনি কাঁদিনি ভাবিনি? তোমার বিদ্বান দাদার মনের খুসী-অখুশীতে পুতুল নেচেছি? কি বুদ্ধি তোমার ঠাকুরপো! বড়-বড় কথায় যেতে তোমার সহজ-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আমার মনগড়া বিচার-বিবেচনা নিয়ে আমি চলব না তো কি তোমার মনগড়া বিচার-বিবেচনা ধার করতে যাব? আমার মনটা যেমন ছোট তোমার মনটা তেমনি বড়, তাই বলে কি তোমায় আমি বলব যে তোমার মনটা দিয়ে আমার মনটা চালাও?'

মণির দু'চোখ জলে ভরে যায়। গাল বেয়ে টপ-টপ জল গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সে হিসাবী মেয়ে, বাপ-দাদার জুটিয়ে দেওয়া পুরুষটার সঙ্গে বহু বছর তিনটে ছেলে-মেয়ে বিইয়ে খাওয়া পরা রোগ-ব্যারাম সামলে, নিজে খেয়ে-পরে আর সবাইকে খাইয়ে-পরিয়ে জীবন কাটিয়েছে, সে জানে এখন কাঁদলেই সর্ব্বনাশ হবে। চোখ দিয়ে জল পড়ে তবু সে তাই কাঁদে না। ন্যাতা দিয়ে কড়াই মুছে নতুন ব্যঞ্জন রান্না সুরু করার মত আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নতুন সুরে বলে, 'দু'বার তুমি আমার দিশেহারা করেছ ঠাকুরপো, আর পারবে না।'

'দু'বার তোমায় দিশেহারা করেছি? আমি?'

'ভীরু নতুন বৌ পেয়ে একবার মাথা বিগড়ে দিয়েছিলে। সবাই নিয়মে চালাত, ওঠাত বসাত, তুমি তোমার কলেজী চ্যাংড়ামি আর গোঁয়ার্তুমি দিয়ে নিয়ম ভাঙতে, আমার রাইট নিয়ে ফাইট করতে, বিদ্রোহ শেখাতে। মনে আছে সে সব কথা? তোমার পাল্লায় পড়ে সংসারের দশ জনের সঙ্গে মানিয়ে চলার বদলে স্বাধীন হতে শিখলাম,—আহা, কি স্বাধীনতাই শেখালে! বড় ছেলের বৌ, বাড়ীর হাল-চাল বুঝে আস্তে-আস্তে দশটা দায়িত্ব নিয়ে বাড়ীর এক জন হয়ে উঠব সবাই এটা চেয়েছিল—কাজেই ঠিক তার উল্টোটা কর, সকলকে পর করে দাও। উঠতে-বসতে ঠোকাঠুকি লাগাও। একটু যে স্নেহ চায় গালে তার চড় মারো। নইলে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না, সবাই তোমায় গিলে ফেলবে। কেন ঠাকুরপো? আমায় কি খেতে-পরতে দিত না, গাল দিত, মারত কেউ? আমায় একটু খুশী করার জন্যেই বরং কে কি করবে ভেবে পেত না। তুমি মাথা বিগড়ে না দিলে আজ কি আমার এ দশা হত? এ বাড়ীতে ফিরে এসে মনে হত শত্রুপুরীতে এসেছি? মা বেঁচে থাকলে এ সংসারে যে ঠাঁই পেতেন, আমি আজ সেখানে থাকতাম।'

'শেষের দিকে মা'র মাথাটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল মণি বৌদি। তীর্থে যাবার নাম করে পালাতেন, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনতে হত। মা'র চিকিৎসায় দু'বছরে বাবার সমস্ত জমা টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল। মা এক দিন ছাত থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন।'

'বেশী জ্বরে মা হার্টফেল করেছিলেন।' মণির মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেছে। তার নিশ্বাস আটকে আটকে যাচ্ছে।

'তাই আমরা সবাইকে বলেছিলাম। বাড়ীর সকলেও জানত না। গুরুদেব এসেছিলেন মা'র কথা সব শুনে বাবাকে বললেন, ছাতে একটা সর্ব্বতীর্থ সৃষ্টি করতে হবে, তিন দিন হোম পূজা চলবে। মা যেন হঠাৎ সুস্থ হয়ে গেলেন, সারা দিন ছাতে সব আয়োজন করতে মেতে গেলেন। আমি বাড়ী ছিলাম না, অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরতেই মা আমায় ছাতে ডেকে নিয়ে গেলেন। বোধ হয় আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, খোকা, আমায় সব তীর্থ দেখাবি বলেছিলি, এই ছাখ, সব তীর্থ তৈরী হচ্ছে। তোরা বাপ-ব্যাটায় আমায় ঠকাচ্ছিস কেন রে?'

'ঠাকুরপো!'

'বুড়ো বয়সে তীর্থও করতে দিবি না তোরা? গরু-ছাগলের মত ঘরের গোয়ালে মরতে পারব না খোকা। তীর্থে আমি যাবই। বলে সোজা গিয়ে রেলিং ডিঙিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।'

কড়াই-এ তরকারী পুড়ে যেতে সুরু করে। মণির হাত থেকে খুন্তি খসে পড়েছে। কথা বলতে বলতে প্রণব এমন ভাবে হাতে হাত কচলিয়ে চলেছিল যেন তার মায়ের হত্যাকারীদের টুঁটি দু'হাতে চেপে মারছে।

'মা কোন্ তীর্থে যেতে চেয়েছিলেন মণি বৌদি? সে তীর্থ এ জগতে নেই, সমাজ-জীবনে নেই। দু'বার ভারতের সমস্ত তীর্থ ঘুরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রত্যেক বার দু'-একটা জায়গা ঘুরে হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে একা এই বাড়ীতে ফিরে এলেন। বেঁচে থাকতে সব কাজ ফুরিয়ে গেলে, মানুষ কাসতু

হলে, এ রকম হয়। সবার বেলা আমার মা'র মত চরম হয় না, মা'র মান-অভিমান চিরদিন খুব উগ্র ছিল। কিন্তু মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে পুরানো মায়েদের এই গতি, অবলম্বনহীন শেষ জীবন। শুধু সংসারটুকু জীবনের ভিৎ, সংসারের ভিৎটাই ধ্বসে যাচ্ছে।'

'তুমি আবার আমায় দিশেহারা করছ ঠাকুরপো।'

'মাপ চাইছি। মা'র কথা তুললে কি না, আমার জন্ম এ সংসারে মার স্থানটি নিতে পারনি বললে কি না, তাই এ সব বলে ফেললাম। অবান্তর কথা আমি বলি না মণি বৌদি।'

কড়াই-এ তরকারী পুড়েই চলেছিল, খেয়াল করে মণি তাড়াতাড়ি ঘটি কাৎ করে জল ঢেলে দেয়। ক্ষুব্ধ চোখে তরকারীটার দিকেই চেয়ে থাকে। এ তরকারী আর পরিবেশন করা চলবে না, খানিক আগেও যা ছিল সবুজ সতেজ আলু-কুমড়া, ভেজাল তেলে সাঁতলে খাস্ত হচ্ছিল, দু'দণ্ডে তা কয়লায় পরিণত হয়ে গেছে। দু'-এক মিনিটে জগতে কি অঘটন ঘটে যায়! সকলে নিন্দা করবে, যা-তা বলবে। অন্ততঃ মনে মনে ভাববে যে, আহা, গায়ের জোরে রান্নার ভার নিয়ে কি সুন্দর পোড়া তরকারীই ইনি খাওয়াচ্ছেন!

'একটু বোসো ঠাকুরপো।'

তরকারীর ঝুড়ি দেখে মণির কান্না পায়। আধখানা বেগুন, গোটা-তিনেক আলু, একটু টুকরো আদা, কয়েকটা পেঁয়াজ আর কালচে-মারা শুকনো গোটা-দুই কাঁচা কলা ছাড়া তরকারীর ঝুড়িতে কিছু নেই। ডাল আর তরকারী দিয়ে একুশ জন লোক ভাত খাবে।

মণি ফিরে গিয়ে বলে, 'ঠাকুরপো, আমায় কিছু তরকারী এনে দাও, এদিকের বাজারে তো কারফিউ হয়নি?'

পুরোনো ভাঙা বাঁকানো হাতাটা দিয়ে উনুন খুঁচিয়ে কিছু কয়লা দিয়ে হাত ধুয়ে মণি আবার মিনতি করে বলে, 'আলু পটোল বেগুন কুমড়ো যা পাও এনে দাও ঠাকুরপো, তোমার পায়ে পড়ি। আমাদের কথা শেষ হয়নি, অনেক কথা আছে। তরকারীটা রেঁধে সারা রাত তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

প্রণব উঠে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসে। বলে, 'গোকুলকে বাজারে পাঠিয়েছি, এখুনি আসবে। দ্বিতীয় বার কবে তোমায় দিশেহারা করলাম বল ত শুনি?'

'প্রথম বারের সব কথা বলা হয়নি। তুমি কেমন বিশ্বাস-ঘাতক সেটা শোনো।'

'বলো।'

'তুমি হঠাৎ মাকে টেনে আনলে। তুমি বিগড়ে না দিলে আমি এ সংসারেই মানিয়ে থাকতাম, মা'র আসনটি পেতাম। তার মানে কি এই, আমি অবিকল মা'র মত হতাম? সংসার বদলাত না? সংসার যেমন বদলেছে, আমিও তেমনি বদলে যেতাম—আমিও একালের মেয়ে। তুমি আমার মনের মোড় ঘুরিয়ে দিলে, বড় সার্থকতার পথ দেখালে। বেশ, আমি আজও বলি, তোমার ওই বিদ্রোহের পথেই ফাঁকি থেকে মুক্তি পেতাম, জীবনটা সত্য হতে পারত। কিন্তু তুমি কি করলে? তোমার বাইরের জীবন বড় উঠল, দু'দিন পরে আর তোমার পাত্তা পাই না। একটু ঘোলা জল ঢুকিয়ে তুমি নাগালের বাইরে সরে গেলে। নিজের পথ খুঁজে নিতে লাগলে, আমায় ছেড়ে দিলে এক অদ্ভুত অসহ্য অবস্থায়। সবার সঙ্গে বিরোধ, শুধু অশান্তি, আর কিছুই নেই। কেন, কি তোমার দরকার ছিল গোবেচারী আমার মনটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করায়? বিচার বুদ্ধিতে ধাঁধা লাগিয়ে তোমার পথে দু'পা সাথে করে এগিয়ে নিয়ে ফেলে পালাবার?'

'আমার সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে পালাতে চেয়েছিলে। আজও কি তুমি মনে কর সেটা ঠিক হত? ওই ছিল তোমার আমার মুক্তির পথ?'

'তোমার কথা জানি না। আমি মুক্তি পেতাম। দু'জনের জীবন না হয় ধ্বংস হয়ে যেত, তুমি হয়তো এক রকম কিছু হতে, আমি হয়তো বেশ্যাপাড়ায় ঘর ভাড়া নিতাম। ধ্বংসের মধ্যে কি মীমাংসা নেই? মনের মধ্যে ঝড় নিয়ে জড়-ভরত হয়ে থাকার চেয়ে যে ভাল।'

'আজও তুমি আমায় ভুল বুঝে রেখেছ। আমি কি এই ঝড় তুলতে চেয়েছিলাম? জীবনে কত কাজ, তোমার মত ঘর-সংসারে থেকেও কত হাজার হাজার মেয়ে—'

'উপদেশ ঝেড়ো না ঠাকুরপো। বড়-বড় কাজ, বড়-বড় আদর্শ সবার সামনেই থাকে। আমি সে কথা বলিনি। আজ বুড়ো হয়েছি, স্পষ্ট বলতে আটকাবে না, তোমার সঙ্গে পালাতে চেয়েছিলাম কি শুধু পিরীত করতে? পালিয়ে গিয়ে নাম-সম্পর্ক ভাঁড়িয়ে একসঙ্গে থাকতে গেলে পিরীত আমরা নিশ্চয় করতাম, কিন্তু তাই কি আমার উদ্দেশ্য ছিল? তোমার সঙ্গে ঘর ছাড়ার সাধ নিয়ে তো এ বাড়ীর বৌ হয়ে আসিনি। ও ঝোঁকটা তুমিই গাজিয়েছিলে। বেশ তো, ঝোঁকটা শুধরে নিয়ে ঘরে থেকেই যাতে বড় আদর্শ মেনে বড় কাজ করতে পারি, সেটা করলেই পারতে? আমি তো তোমা বই আর জানতাম না? তুমি হুকুম দিলেই তো আমি দেশের জন্য প্রাণটা দিতে পারতাম। বোকা-সোকা একটা সাধারণ বৌ, সে তো শিশুর সমান তোমার ও-সব সংসার-ছাড়া ব্যাপারে। তাকে শুধু ক্ষেপিয়েই দেবে, ঠিক পথে চলতে শেখানোর দায়িত্ব নেবে না? সেটাই তো বিশ্বাসঘাতকতা।'

[ক্রমশঃ

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে বেলুড় মঠের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মন্দিরের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকচিত্র মুদ্রিত হল। আলোকচিত্রশিল্পী—সুধীরচন্দ্র ঘোষাল, সাধন দে, চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় ও রণজিৎকুমার ঘোষ।

রঙ্গ-পট

প্রসাদ রায়

হলিউডের বাইরেটা যত চকচকে, ভিতরটা তত নয়। তত নয় কেন, মোটেই নয় বলাও চলে।

ও-দেশী সিনেমার চিত্র-বিচিত্র সাময়িক পত্রিকাগুলিতে যখন-তখন বিজ্ঞাপিত হয়, চিত্রনট বব মণ্টগোমারি না কি এত বড় পণ্ডিত যে, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি ও সমাজনীতি আছে তাঁর নখদর্পণে,—এমন কি তিনি বৈজ্ঞানিক, পুরাবিদ্যাবিশারদ, ডাক্তার ও বড় বড় অধ্যাপকের সঙ্গে সমযোগ্য ব্যক্তির মত আলাপ করতে পারেন; এবং চিত্রনটী ডিয়ানা ডারবিন না কি প্রতি বৎসরে তিনশোখানারও বেশী পুস্তক পাঠ করেন, বার্বরা ষ্টানউইক না কি কোরোটের নিসর্গ-চিত্র ও থ্যাকারের উপন্যাস ভারি পছন্দ করেন, এবং রে মিল্যাণ্ড না কি বলেছেন যে, "আমি জ্যোতির্বিদ্যা আর জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসি। আপাতত আমি 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র চব্বিশ খণ্ড গ্রন্থের মধ্যে দৃষ্টিচালনা করছি" প্রভৃতি।

কিন্তু আসলে হলিউডের যে কয় জন "তারকা" চিত্র বা গ্রন্থ—অর্থাৎ আর্ট বা সাহিত্য নিয়ে মস্তক ঘর্মাক্ত করেন, তাঁদের সংখ্যা এক রকম নগণ্য। বরং অধিকাংশ নট-নটীই আজেবাজে টুকিটাকি জিনিষ সংগ্রহের জন্যে আগ্রহ জাহির করেন রীতিমত শিশুর মতই। যেমন জোয়ান ক্রফোর্ড পুতুল সংগ্রহ করতে ভালোবাসেন, ক্লার্ক গেবেলের ঝোঁক আগ্নেয়াস্ত্রের দিকে এবং জো ই ব্রাউনের সখ হরেক রকম এসেন্সের শিশি সংগ্রহ করা। হলিউডের অনেক নট-নটীর আবার বাতিক হচ্ছে, থিয়েটারের পুরাতন 'প্রোগ্রাম' জোগাড় করা।

অবশ্য হলিউডের অনেক বাড়ীতেই আলমারি-সাজানো বই যে নেই, এমন অপবাদ দেওয়া যায় না। সে-সব কেতাবকে ভাগ করা যায় তিন শ্রেণীতে। প্রথম: যে সব বিখ্যাত বই সাজিয়ে না রাখলে ফ্যাসনের মুখ রক্ষা হয় না। দ্বিতীয়: সৌখীন লোকদের বই—যেমন কুকুর ও ঘোড়া পালন, ঘর-বাড়ী সাজানো, নৌকা চালানো প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা। তৃতীয়: যে সব পুঁথির ভিতরে এই সব বিষয় থাকে—কেমন করে হাতের বা পায়ের যত্ন নিতে হয় বা কেমন করে লাগসৈ চিঠিপত্র লিখতে হয় বা ব্যবসায়ের গুপ্তকথা কি, প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, হলিউডে শেষোক্ত দুই শ্রেণীর কেতাবেরই চাহিদা বেশী।

চিরদিনই পূজার প্রতিমার ভিতরে থাকে সাধারণ মাটি। সেই পঞ্চাশ খৃষ্টাব্দেও রোমের সৌখীন ধনীদের ভবনে গিয়ে সেনেকা লক্ষ্য করেছিলেন যে, সেখানে যে সব বই কিনে সাজিয়ে রাখা হয় তা কখনো পাঠ করা হয় না। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার বোষ্টন সহর সম্বন্ধে দার্শনিক এমার্সন সাহেব বলেছিলেন, "বোষ্টন জ্ঞান, দর্শন, সঙ্গীত ও ললিত কলা নিয়ে উত্তেজিত তরঙ্গের মত আগ্রহ-চঞ্চল হয়ে উঠবে, এইটে দেখবারই সাধ ছিল। কিন্তু তার বদলে দেখছি সে তার পকেটে হাত পুরে সাবধানে হিসাব করছে।"

সেকালের সেই আমেরিকা এক শতাব্দীর পরে হয়ে উঠেছে আরো বেশী হিসেবী। এবং হলিউড সেই ফ্যাসনমুগ্ধ ও ডলারলুব্ধ ইয়াঙ্কিস্থানেরই অংশবিশেষ বৈ তো নয়।

এই হাল-ফ্যাসনের রাজ্য হলিউডের চিত্রতারকারা লণ্ডনে এসে হাজির হয়েছেন অস্কার ওয়াইল্ডের বিখ্যাত নাটক "An Ideal Husband"কে ছবির পর্দায় রূপান্তরিত করবার জন্যে। দীর্ঘ তিন বৎসর কাল বিশ্রাম করবার পর আলেকজাণ্ডার কোর্ডা এই ছবিখানির প্রযোজনা ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। ছবিখানি প্রস্তুত করেছেন লণ্ডন ফিল্ম। "একটি আদর্শ স্বামী" কলকাতায় প্রদর্শিত হবে অদূর ভবিষ্যতেই।

ঊনিশ শতাব্দীর শেষ যুগে হাল-ফ্যাসনের মানসপুত্র ছিলেন ঐ অস্কার ওয়াইল্ড। পোষাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তায়, আবৃত্তি-প্রক্রিয়াতে তিনি ছিলেন উপাধিধারী সৌখীন সমাজের আদর্শ পুরুষ। তাঁর সরস সংলাপের শক্তি ছিল অসাধারণ, তাঁর মুখের এক-একটি সুনির্বাচিত বচন ফিরত অন্যান্য লোকেরও মুখে-মুখে। তার উপরে লিপিকুশলতাতেও তিনি করেছিলেন নব্য সমাজের হৃদয় জয়। তাঁর প্রথম নাটক Lady Windermere's Fan" যখন ৫থ? অভিনীত হয়ে সাফল্য লাভ করে, তখন লণ্ডন সহর লুটিয়ে পড়ে যেন তাঁর পায়ের তলায়।

কিন্তু চরম উত্থানের পরেই চরম পতন। কুৎসিত অপরাধের জন্যে অস্কার হলেন কারাগারে বন্দী। মুক্তি পেয়ে বায়রণের মতন তিনিও করলেন স্বদেশ ত্যাগ। ছদ্মনামের আড়ালে এখানে-ওখানে অজ্ঞাতবাস করতে লাগলেন অভিশপ্তের মত। তাঁর "একটি আদর্শ স্বামী" নাটকখানি রচিত হয় ঐ সময়েই। যে সৌখীন ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি বিলাসে-ব্যসনে যৌবন কাল কাটিয়ে দিয়েছিলেন, নাটকখানির মধ্যে আছে তারই সমুজ্জ্বল চিত্র। আদর্শ স্বামীর চারি দিক ঘিরে আনাগোনা করে যে-সব মানুষ, তারা সাবিত্রীও নয়, সত্যবানও নয় এবং অনেকেরই দেহ পঙ্কিল মাটি দিয়েই গড়া। তাদের মুখেও অস্কারের ব্যক্তিগত সরস সংলাপ শোনবার সুযোগ পেয়ে চিত্রপ্রেমিকরা নিশ্চয়ই আনন্দ উপভোগ করবেন।

এই চিত্রাভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন পলেট গডার্ড, স্যর অব্রে স্মিথ, হিউগ উইলিয়মস, ডায়ানা উইনওয়ার্ড ও মাইকেল উইল্ডিং প্রভৃতি বিখ্যাত নট-নটীরা। কোর্ডা সাহেব ছবিখানি সব দিক

অবিলম্বে মুক্তি পাইবে

নিউ থিয়েটার্স কৃত

নবতর রস কথা-চিত্র

★

পরিবেশনা : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ, কলিকাতা

দিয়ে নিখুঁৎ ও স্মরণীয় করে তোলবার জন্যে জলের মত টাকা খরচ করেছেন। ধনী ও উপাধিধারী পাত্র-পাত্রীদের ভবনে যে-সব আসবাব-পত্তর দেখানো হয়েছে তা 'ষ্টুডিয়ো'র নকল ও খেলো মাল নয়, একেবারে আসল ও বহুমূল্য জিনিষ। একটি মাত্র ঘরে যে-সব চিত্র-যবনিকা (tapestries) ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলিরই মূল্য দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার কম নয়! নাটকে লণ্ডনের হাইড পার্কের দৃশ্য আছে। সেখানে থাকবে শতাধিক অশ্বারোহী, শত শত ক্ষুদ্র নটের জনতা এবং পঞ্চাশখানা গাড়ী। কর্মব্যস্ত ও জনবহুল লণ্ডনের বুকের উপরে এ-রকম দৃশ্য তোলা দুঃসাধ্য বলে 'ষ্টুডিয়ো'র ভিতরেই অজস্র অর্থব্যয় করে প্রকাণ্ড এক নকল হাইড পার্ক প্রস্তুত করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য চিত্র-নির্ম্মাতারা ছবির জন্যে মুক্তহস্তে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন, তার পরিমাণ শুনে এ-দেশী ছবিওয়ালারা এত দিন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পড়তেন। কিন্তু আর বোধ করি তাঁদের হতবাক্ হতে হবে না। কারণ, বিজ্ঞাপনের প্রসাদে জানা গেল, মাদ্রাজী ষ্টুডিয়োতে এমন একখানি আশ্চর্য্য হিন্দী ছবি প্রস্তুত হয়েছে যার পিছনে খরচ করা হয়েছে মোট পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা! এর পরেও দেখছি ভারতবর্ষকে আর গরীব দেশ বলে রোদন করা চলবে না।

প্রকাশ, ছবিখানির মধ্যে দেখা যাবে, আড়াই হাজার শিল্পী, বারো ফুট উঁচু ছয় শত 'ড্রামে'র উপরে দাঁড়িয়ে ছয় শত বালক-বালিকার নৃত্য, দুই-দুইটি সার্কাসের দলের ক্রীড়া এবং রাজা শশাঙ্কের প্রমোদ-কক্ষ (যা তৈরি করতে খরচ হয়েছে পঁচাত্তর হাজার টাকা)। সবই বুঝলুম, কেবল বুঝলুম না এই রাজা শশাঙ্ক কে? ইনি কি সেই হর্ষবর্দ্ধনের যুগের বাংলা-বিহারের রাজা শশাঙ্ক? তাহ'লে তাঁর সময়ে সার্কাসের খেলোয়াড়রা খেলা দেখায় কেমন করে?

ছবিখানি হয়তো সত্য সত্যই ভালো হয়েছে। কিন্তু একটা কথা মনে করি। লক্ষ লক্ষ টাকা ঢাললেই কোন ছবি ভালো হয় না। অর্থব্যয়ে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের অভাবে সমস্ত অর্থব্যয়ই হয়ে পড়ে ব্যর্থ। কিছু দিন আগেই এক জন বিখ্যাত পরিচালক এ-দেশের এক অমর উপন্যাসিকের রচনায় চিত্ররূপ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর কাজেও বড় কম অর্থব্যয় হয়নি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত খোদার উপরে খোদকারী করতে গিয়ে পণ্ড হয়ে যায় তাঁর সমস্ত চেষ্টা।

আমরা পাশ্চাত্য চিত্র-নির্ম্মাতাদের অর্থব্যয়টাই বড় করে দেখি, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদের মস্তিষ্ক ও প্রতিভা যে কত নব নব ভাব, রূপ ও রস-নিবেদনের চেষ্টা করে সে-সব কেউ খুঁটিয়ে বিচার করে দেখি না। ঘি দিয়ে ভালো খাবার তৈরি হয়, আবার অনেক নির্ব্বোধ দেয় ভস্মেও ঘৃতাহুতি।

অভিনয়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জনৈক পেশাদার

কৃত্রিম স্বর-নিক্ষেপের ফলে যে ভাবে অভিনেতার কণ্ঠের বিকৃতি ঘটে এবং তার দ্বারা তার অভিনয় শত চেষ্টাতেও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়, সে সম্বন্ধে পূর্ব-সংখ্যায় আমরা আলোচনা করেছি এবং তার প্রতিকারকল্পে যে বিশেষ অনুশীলন করা প্রয়োজন তার উল্লেখ করেছি। এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পর স্বভাবতঃই আসে বাচনের আলোচনা। লেখক তার মানস-জগৎ থেকে একটি কাহিনী সৃষ্টি করেন যার সঙ্গে বাস্তবের গভীর মিল থাকাই স্বাভাবিক। সেই কাহিনীতে নাট্যকার বর্ণনার সুযোগে তার চরিত্রগুলির মূল বৈশিষ্ট্য অথবা স্থান-কালের বিশদ বর্ণনা দিতে পারেন না। যে সুযোগ গল্পলিখিয়ে অথবা উপন্যাস-রচয়িতার আছে, তা থেকে নাট্যকার বঞ্চিত। ভাষার দ্বারা যে রস সঞ্চিত হয় পাঠকের মনে, নাটকের সামান্য মাত্র সংলাপে সেই রস দর্শক ও শ্রোতার মনে সঞ্চিত করার মধ্যেই নাট্যকারের পুরাপুরি কৃতিত্ব। সে হিসাবে নাট্যকার সংযত শিল্পী। নাটকের চরিত্রগুলির মুখেও যথেচ্ছ এবং প্রচুর সংলাপ দিলে নাটক এতো দীর্ঘ হয়ে ওঠে যে এক রাত্রে এতখানি নাটক জমিয়ে শেষ করা নয়। বিশেষ করে বর্ত্তমান কালে যখন দর্শকের হাতে সময় কম, তখন সম্পূর্ণ একটি কাহিনীকে সুরু থেকে শেষ অবধি নাটকীয় সংঘাতের মধ্যে দিয়ে চালনা করার জন্য নাট্যকারের সুযোগ পূর্বের চেয়ে আরো অনেক কমে গিয়েছে সন্দেহ নেই।

সেই স্বল্প এবং সংযত সংলাপের মধ্যেই চরিত্রগুলি যাতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সেই দিকেই নাট্যকার ও পরিচালকের চারি চোখের দৃষ্টি। সুতরাং অভিনেতার মুখে সুষ্ঠু বাচনই হোল নাটকের প্রাণ যেন। অথচ সাধারণ অভিনেতা এইখানেই চরম ভুল করে বসতে পারে। যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে মন দিয়ে নিজের সংলাপগুলি আবৃত্তি করার সময় অভিনেতা যদি যথেষ্ট মাত্রায় সচেতন থাকেন তাহ'লে নাটকের রস বিনষ্ট হয়।

এ সম্বন্ধে গোড়ার দিকে আমরা বলেছি যে সংলাপে এক কৃত্রিম স্বাভাবিকতা ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই যেমন নাটক হয়ে ওঠার সুযোগ থাকে, তেমনি অভিনেতার কৃতিত্ব বাড়ারও সুযোগ থাকে! সেই কৃত্রিম স্বাভাবিকতাই হোল অভিনয়ের ধারক। সুতরাং বাচনভঙ্গী যদি চেষ্টাকৃত হয় তবে গোড়াতেই গলদ হয়ে পড়বার সম্ভাবনা। নাটকের একটি বিশিষ্ট চরিত্র যখন কথা কইছে তখন দর্শক ও শ্রোতার মনে হওয়া দরকার যে এইমাত্র কথাগুলি নাটকীয় চরিত্রের মনে জেগেছে এবং সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। এর জন্য প্রত্যেক পরিচালক আশা করেন যে অভিনেতা নিজের সম্বন্ধেই কেবল যে বিস্মৃত হবেন তা নয়, পাদপ্রদীপের সামনে অসংখ্য দর্শকের মুখোমুখী হয়ে তিনি ভুলে যাবেন নাট্যকার সম্বন্ধে অথবা নাটকের যে কপি থেকে তিনি পার্ট মুখস্থ করেছেন। বার-বার আবৃত্তির দ্বারা এই ভাবটিও যেমন নষ্ট হয় বড় কম নয়, তেমনি যে সব অভিনেতা প্রম্পটারের সাহায্যে বাজীমাৎ করার চেষ্টা করেন, তারাও কম হাস্যাস্পদ হন না রঙ্গমঞ্চে। তবু এ কথা ভুললে চলবে না যে ভাঙা-ভাঙা অংশের উচ্চারণের দ্বারা যে ক্ষতি হয় অভিনয়ে, তার চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতি হয় যদি অভিনেতা পার্টের সংলাপ বুঝে-বুঝে উচ্চারণ করেন। এর বহু দৃষ্টান্ত আমরা বহু রাত্রিতে নানা রঙ্গমঞ্চে দেখেছি।

চেঁচিয়ে পড়া, বক্তৃতা দেওয়া এবং অভিনয় করা এ সব আলাদা টেকনিকের জিনিষ, এ-কথা ভোলা উচিত নয় অভিনেতার পক্ষে। কাউকে শুনিয়ে যখন আমরা পড়ি বা বলি, তখন শ্রোতার কানে

প্রত্যেকটি কথা পৌছিয়ে দেওয়াতেই আমাদের দায়িত্ব সারা হয় না, বক্তব্যের মূল ভাবটুকুও শ্রোতার মনে পৌছিয়ে দেওয়াও দরকার। কিন্তু সেই তার সীমানা। তার অতিরিক্ত আর কিছু আশা করে না সে। যেমন স্কুল অথবা কলেজে বক্তৃতা-মঞ্চে। যেখানে শিক্ষক অথবা অধ্যাপক বা বক্তা ছাত্র বা জনসাধারণের মনে মূল বক্তব্যটুকু ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করতে কসুর করেন না।

কিন্তু জীবন ত আর পাঠ্য-বস্তুর বক্তব্য বিষয় না। বরং রঙ্গমঞ্চে অনেক সময় অভিনয়ের টেকনিকের উপর বক্তৃতার সাফল্য নির্ভর করে। যদিও অধিকাংশ বক্তা এই বাচনশৈলীকে উপেক্ষা করে চলেন।

ছোট-ছোট সংলাপের মধ্যে যেখানে জীবন-স্রোত বেগবান প্রবাহে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, পাদপ্রদীপের এতটুকু জমির উপর যেখানে নাটকীয় সংঘাতে ঘটনা বৃহত্তর পরিণতির দিকে কখনো ধীরে, কখনো তড়িৎ গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং অভিনেতাদের বাচনে ও ভঙ্গীতে যেখানে জীবন-ব্যঞ্জনা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিকাশ লাভ করছে, সেখানে কেবল মাত্র স্পষ্ট ও উচ্চকণ্ঠ-উচ্চারণেই সর্বসিদ্ধি লাভ হতে পারে না। যে রস সেই বিশেষ অংশে নাট্যকার ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তাকে সার্থক করে তোলার জন্য অভিনেতার সহযোগিতা একান্ত ভাবেই প্রয়োজন। এবং স্বাভাবিকতা ভ্রষ্ট হয়ে পড়লে আর তার চারা থাকে না : পার্ট ঝাড়া মুখস্থ করে, স্পষ্ট উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করে এবং সুন্দর চেহারার অধিকারী হয়েও, আমি দেখেছি দেবদাস নাটকের করুণতম দৃশ্যে অভিনেতা-দেবদাস দর্শকদের হাসির খোরাক যুগিয়েছেন। অথবা গৈরিক পতাকা অভিনয়ে শিবাজীর বীরত্বব্যঞ্জক চরিত্র চিত্রণের বিফল প্রচেষ্টায় দর্শকদের পরিহাস-প্রবৃত্তিকে সুযোগ দিয়েছেন। বাচনের অস্বাভাবিকতাই এই ধরণের সৃষ্টিছাড়া পরিস্থিতি রচনা করার সুযোগ করে দেয়।

সেই জন্য অভিনেতা নিজেকে প্রথম উপদেশ দেবেন—আত্মবিস্মৃত হও। তুমি যে ডেলী প্যাসেঞ্জার সে কথা ভোলো। দশটার অফিস করার জন্য তুমি যে ঠিক সময়ে বাড়ীতে ভাত না পাওয়ায় রোজ সংসারে অশান্তি করো সে কথা ভুলে যাও। এই খানিক আগে তোমার পড়শী রাম বাবুর সঙ্গে তোমার যে কটু কথার বিনিময় হলো তা ভুলে যাও। মনে করো তুমি দেবদাস, তুমি শিবাজী, তুমি গোলাম হোসেন।

শোনো, এইমাত্র পার্ব্বতী তোমায় কি কথা বল্লে—তার পর তার জবাব দাও। কি জবাব দেবে? এইমাত্র তোমার মনের তল থেকে উঠে এসেছে তার জবাব, স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক জবাব। কোন স্মরণ নয়, কোন প্রম্পটার নয়, হাতে-লেখা কপির কোন্ পৃষ্ঠায় আছে তা মনে করে নয়। পারুর কথা শুনে যে স্বাভাবিক ভাব তোমার মনে উদয় হয়েছে, ঠিক সেই ভাবের বাহনে উচ্চারণ করো তার জবাবগুলি। মুখ থেকে উচ্চারণ নয়, মন থেকে উচ্চারণ। যেমন করো তোমার ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে, নিজের সচেতন জ্ঞাতসারেই হয়ত নয়।

যদিও তোমার সহ-অভিনেতা তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার কান তোমার মুখ থেকে দু'হাতের অন্তরও নয়, তবু তুমি ভাবছ যে সে আছে ঘরের দূরতম কোণে, তাকে শুনিয়ে তুমি জবাব দিলে। সেই হোল তোমার বাচনভঙ্গীর চরম সফলতা।

আদর্শ নারীর কর্ত্তব্য!

অর্থের অনাটনে কর্ম্মক্লান্ত স্বামী যখন বিচলিত, বিভ্রান্ত—তার সারা জীবনের সাধনা ও উচ্চ আদর্শ যখন বানচাল হবার উপক্রম হয়—তখন আদর্শ স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি?

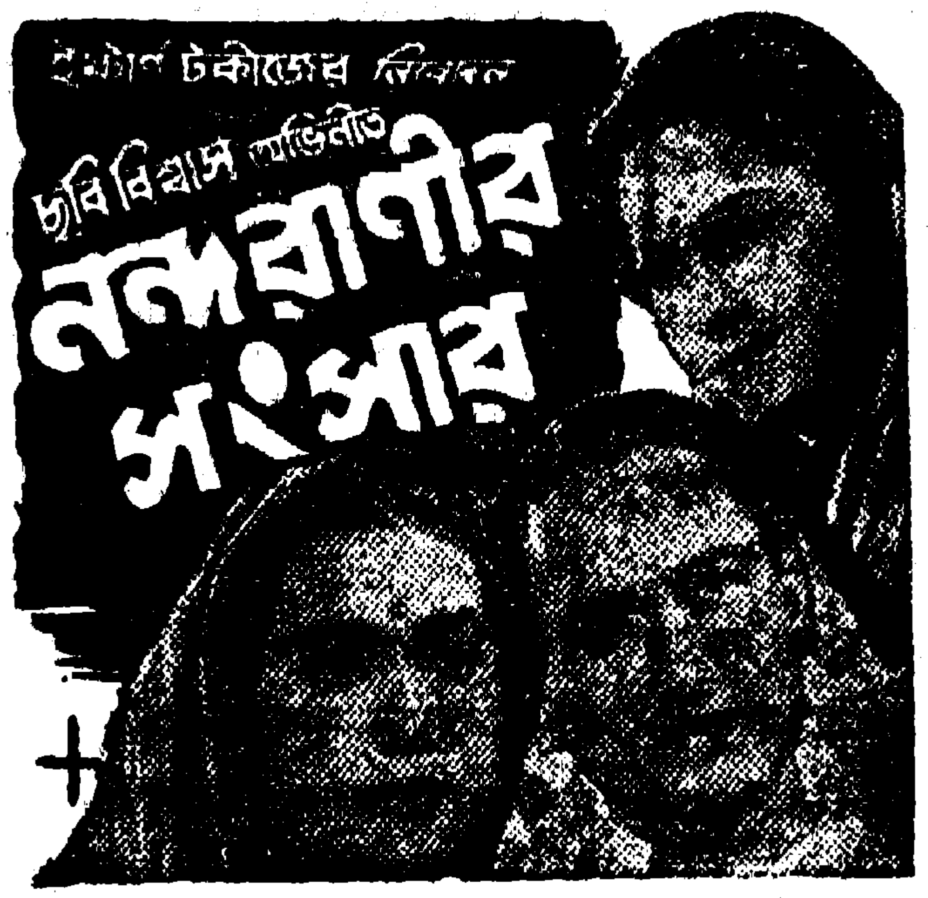

স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় নন্দরাণীর চরিত্রে তা সুষ্ঠুভাবে অঙ্কিত করেছেন এবং নন্দরাণীর ভূমিকায় শ্রীমতী রাণীবালা মধুর অভিনয়ে চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করেছেন।

একাধিক্রমে ১৩শ সপ্তাহ চলিতেছে

* শ্রী *

প্রত্যহ ২।০, ৫-৪৫ ও রাত্রি ৯টায়

পরিবেশক : ইষ্টার্ণ টকীজ লিমিটেড, কলিকাতা
ফোন বি, বি, ৫৫৫৭

ইষ্টার্ণ টকীজের পরবর্ত্তী চিত্রগুলি

'পরশ পাথর' * জলসা * অভিমান

পরিচালনা : সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার
পরিচালক : অমিয় ঘোষ

বিশিষ্ট চিত্রগুলিতে আগতপ্রায়

ভঙ্গী, বাক্যবিন্যাস, ভাব এবং বাচন এক সাথে মিলে তোমার অভিনয় জীবন্ত শুধু দেখাল না, শোনালও বটে।

অনেক পরিচালক আছেন যাঁরা ভাব পরিস্ফুটনের জন্ত অভিনেতাকে আরো অগ্রসর ও সাহসী হতে উপদেশ দেন। কথার পর কথা পার্ট মুখস্থ কোরো না। তার দ্বারা বার বার আবৃত্তির ফলে ভাবের মধ্যে সহজিয়া বস্তটুকু হারিয়ে যাবে। এ উপদেশ অলস ফাঁকিবাজ অভিনেতার পক্ষে আশীর্বাদের মতো। পার্ট মুখস্থ করার কষ্ট স্বীকার না করে যদি একেবারে রঙ্গমঞ্চে নেমে পড়া যায়, তবে আর ভাবনা কি? কিন্তু এর দ্বারা সেই সব অভিজ্ঞ পরিচালক এই গুরুতর কথাই বোঝাতে চান যে ভাবপ্রকাশের সহজ আনন্দটুকু যেন বাঁধা কথার আবৃত্তির দ্বারা ব্যাহত না হয়। যে মানুষটি যে চরিত্র অভিনয় করছে তার মনের স্বাভাবিক গঠনের সঙ্গেই যেন নাটকের সংলাপটুকু সহজে মিল খায়। সেই জন্ত তরুণ অভিনেতাদের নির্বাচন করার দায়িত্ব এত গুরুতর। এবং অনেক সময় দেখা যায় যে, অভিনেতা বহু দিন ধরে রঙ্গমঞ্চে যশস্বী হতে পারছেন না, তাকে কোন এক পরিচালক এক বিশেষ শ্রেণীর পার্টে নির্বাচিত করে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ করে দেন।

পার্ট মুখস্থ করার কষ্টকর পরিশ্রমকে যখন অভিনেতা আনন্দের বলে মনে করবেন তখনই পার্ট নির্বাচন সার্থক হয়েছে বলতে হবে। আর নাট্যকার তখনই সার্থকনামা যখন প্রত্যেকটি অভিনেতা এ কথা তাঁর কাছে স্বীকার করেছে যে তাঁর বিশিষ্ট চরিত্রটির রূপায়ণে নাটকের সংলাপের মধ্যেই সে আত্মপরিচয় খুঁজে পেয়েছে।

ভাব পরিস্ফুটন এবং বাচনের মধ্যে এই যে ঐকান্তিক সম্বন্ধ তা ভুললে চলে না কোন অভিনেতার। এবং নাট্যকারের ও পরিচালকের যৌথ দায়িত্ব এইখানেই।

[ক্রমশঃ

ঢাকায় ন্যাশনেল ও হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার

শ্রীসুনীলকুমার চক্রবর্ত্তী

বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস অধিক দিনের পুরাতন নয়। রুশদেশবাসী হেরাসিম লেবেডেফ (Herasim Lebedeff) ১৭৯৫ সালের শেষ দিকে কলিকাতায় এক ক্ষণস্থায়ী বাংলা নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টার পর ১৮৩৩ সালে নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজারস্থিত বাড়ীতে যে রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় তাহাও স্থায়ী রঙ্গালয়ে পরিণত হয় নাই। বাংলা নাট্যশালার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। সতু বাবুর (আশুতোষ দেব) সিমলার বাড়ীতে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' (৩০শে জানুয়ারী, ১৮৫৭), মার্চের প্রথম সপ্তাহে নূতন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়ীতে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব', ইহার দশ-বার বৎসরের মধ্যে মেট্রোপলিটান থিয়েটার (২৩শে এপ্রিল, ১৮৫৯), শোভাবাজার রাজবাড়ীর প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি (১৮ই জুলাই, ১৮৬৫), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয় (৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৬৫), জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর নাট্যশালা (৫ই জানুয়ারী, ১৮৬৭), বলদেব ধর ও চুনীলাল বসুর উদ্যোগে স্থাপিত বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয় (১৮৬৮) প্রভৃতি কতকগুলি অ্যামেচার রঙ্গমঞ্চই বাংলা নাট্যশালার স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে এবং পরবর্ত্তী কালে বাংলার প্রথম পেশাদারী ন্যাশনেল থিয়েটারের (ডিসেম্বর, ১৮৭২) উৎপত্তিও ইহাদের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণাতেই ঘটে।

ন্যাশনেল থিয়েটার প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার মাত্র চার মাস পরে নিজেদের মধ্যে বিরোধের ফলে 'হিন্দু ন্যাশনেল' ও 'ন্যাশনেল' নাম গ্রহণ করিয়া পৃথক্ ভাবে অভিনয় দেখাইতে শুরু করেন। দুই দলে বিভক্ত হইবার দেড় মাস পরে উভয় দলই বাংলার দ্বিতীয় শহর ও রাজধানী ঢাকাতে অভিনয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করেন। এই ইতিহাস এখন সকলের অগোচরে। শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সুপরিচিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই। 'নাট্যশালার ইতিহাস লিখিতে হইলে দুটি বিশেষ উপকরণের সাহায্য লইতে হয়;—পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল ও বিজ্ঞাপনের তাড়া।' তাহা না করিয়া কিংবদন্তী, স্মৃতিকথা, অথবা পরবর্ত্তী কালের রচনার উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে গেলে মৌলিক উপাদানের অভাব ঘটে এবং রচনার মধ্যেও নানা রকম ভুল-ভ্রান্তি ও মতবিরোধ দেখা দেয়। সঠিক তারিখ নির্ণয়ের বেলাতেই উহাতে গুরুতর ভুল রহিয়া যায়। 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' এই নীতি অনুসরণ করিয়া লেখা। আমরাও ব্রজেন্দ্রীয় এই নীতি অনুসরণ করিয়া যথাসম্ভব গ্রহণযোগ্য প্রামাণ্য উপকরণের উপরে নির্ভর করিয়া ঢাকায় 'ন্যাশনেল' ও 'হিন্দু ন্যাশনেল' থিয়েটারের প্রদর্শিত অভিনয়গুলি সম্পর্কে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে 'ন্যাশনেল' ও 'হিন্দু ন্যাশনেল' থিয়েটারের পূর্ব্ব-ইতিহাসের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি।

'ন্যাশনেল' ও 'হিন্দু ন্যাশনেল' থিয়েটারের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হইবে 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার'এর কথা। পরে উহা 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' এই পরিবর্ত্তিত নামে পরিচিত হয়। বাগবাজারের নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতি জন কয়েক উৎসাহী যুবকের প্রচেষ্টায় এই সখের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্ত্তী সময়ে ইঁহারা সকলেই বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

বাগবাজারের এই সখের নাট্য সম্প্রদায় প্রথমে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাটক মঞ্চস্থ করেন। ১৮৭০ সালের শ্রীপঞ্চমীর রাত্রিতে এই নাটকের চতুর্থ বারের অভিনয়-সাফল্যে উদ্যোগীরা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন। পরে ১৮৭২ সালের মে মাসে উক্ত নাট্যসমাজ 'লীলাবতী' নাটক অভিনয় করিয়া বিপুল সাফল্য ও প্রশংসা অর্জন করেন। ইহাতে উক্ত দলের অভিনেতা ও সংগঠকদের মত অনেক লোকের মনেই একটি সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার চিন্তা উদয় হয়। সংবাদপত্র সমূহেও এই নিয়া বিস্তৃত আলোচনা চলে। 'কস্যচিৎ দর্শকঃ' এই ছদ্মনামে জনৈক ভদ্রলোক 'এডুকেশন গেজেটে' লেখেন: "...আমার বোধ হয় এই নাটকাভিনেতৃগণ মনোযোগ করিলে এমন একটি 'দেশীয় নাট্যশালা' স্থাপন করিতে পারেন, যেখানে লোকে ইচ্ছা করিলে টিকিট ক্রয় করিয়া যাইতে পারেন এবং দেশেরও একটা সামাজিকতার পরিচয় হয়।"

এই সমস্ত আন্দোলন এবং কলিকাতাতে একটি সাধারণ

রঙ্গালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া বাগবাজারের এই সব যুবকেরাই 'ন্যাশনেল থিয়েটারের' প্রতিষ্ঠা করেন। নূতন নাট্যশালার 'ন্যাশনেল থিয়েটার' এই নামকরণ লইয়া দলের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে এক বিরোধের সৃষ্টি হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রচুর সাজ-সরঞ্জামের অভাবে 'ন্যাশনেল' থিয়েটার নাম গ্রহণ এবং টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় প্রদর্শন প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু অধিকাংশ সভ্য তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া 'ন্যাশনেল থিয়েটার' নাম ও টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় প্রদর্শন প্রভৃতি প্রস্তাব বজায় রাখেন। ফলে গিরিশচন্দ্র দল ছাড়িয়া চলিয়া আসেন।

গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর 'নীলদর্পণ' অভিনয় করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতে থাকেন। ন্যাশনেল থিয়েটারের অভিনয়-খ্যাতি ক্রমেই বিস্তৃততর হইয়া পড়ে। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র 'A Father', 'A Spectator' ইত্যাদি ছদ্মনামে এবং স্ব-নামে সাময়িক পত্রিকাদিতে ন্যাশনেল থিয়েটারের অভিনয় সম্পর্কে কঠোর নিন্দাপূর্ণ সমালোচনা সুরু করেন। তিনি মনে মনে 'ন্যাশনেল থিয়েটারে'র সাফল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু উহা যখন ক্রমেই দেশবাসীর প্রশংসা ও খ্যাতি অর্জন করিতে থাকে তখন গিরিশচন্দ্র বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়াই এই সব অবাঞ্ছিত ত্রুটিপূর্ণ নিন্দা বদ্ধপরিকর হইয়া প্রচার করিতে থাকেন। অবশ্য ১৮৭৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারীর' যে অভিনয় হয় তাহাতে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়া খ্যাতির সংগে ভীমসিংহের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' নাটকটির অভিনয়ের কিছু পূর্বে ন্যাশনেল থিয়েটারের অধ্যক্ষগণের মধ্যে এক বিরোধের সৃষ্টি হয়। ইহার কারণ সম্পর্কে জনৈক পত্র-প্রেরক 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' বলেন:

"The cause of this faction, as the secretary of the society announces, is the failure on the part of the Treasurer to render the accounts. The other party ascribes the cause of this faction to some short coming on the part of the secretary."

এই বিবাদ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য 'ন্যাশনেল পেপারে'র নবগোপাল মিত্র, 'মধ্যস্থ' পত্রিকার মনমোহন বসু ও হেমন্তকুমার ঘোষকে লইয়া এক সালিশী বসে। কিছু দিন বিবাদ চলিবার পর সৌভাগ্যক্রমে সালিশী কমিটির প্রচেষ্টাতেই উহা মিটিয়া যায় এবং নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই পুনরায় সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

সালিশী কমিটির হস্তক্ষেপে বিবাদ সাময়িক ভাবে মিটিয়া গেলেও অর্থ-সম্পর্কিত মনোমালিন্যই বৃহদাকারে ৮ই মার্চের পূর্বে আবার বিরোধের সৃষ্টি করে। ন্যাশনেল থিয়েটারের কর্মকর্তারা এই সময়ে পাকাপাকি ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। এক দলে নগেন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, অর্দ্ধেন্দুশেখর, বেল বাবু, ক্ষেত্র বাবু প্রভৃতি; অন্য দলে ধর্ম্মদাস, মতিলাল, মহেন্দ্র প্রভৃতি প্রধান হইয়া দাঁড়ান। ষ্টেজ-ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুরের নিকট ষ্টেজ থাকায় তাঁহারা ষ্টেজ পান এবং নগেন্দ্রনাথের বাড়ীতে পোষাক থাকিত, কাজেই তাঁহারা পোষাক পান। ধর্ম্মদাস সুর প্রাপ্য জিনিষপত্র সহ গিরিশচন্দ্রের শরণ নেন এবং 'ন্যাশনেল থিয়েটার' নাম লইয়া তাঁহারা অভিনয় করিতে সংকল্প করেন। এই 'নাম' লইয়া দুই দলে কিছু দিন টানা-হেঁচড়া চলে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের কৌশলে এবং চাতুরীতে তাঁহারাই 'ন্যাশনেল থিয়েটার' নাম গ্রহণ করিয়া টাউন-হলে ও পরে রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে ষ্টেজ বাঁধিয়া অভিনয় দেখাইতে সুরু করেন। অগত্যা অর্দ্ধেন্দুশেখর ও নগেন্দ্রনাথ বাধ্য হইয়া হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার নামে লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের এক অপেরা হাউসে অভিনয় দেখাইতে সংকল্প করেন। ন্যাশনেল ও হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটারের ইহাই পূর্ব-ইতিহাস। মূলতঃ অর্দ্ধেন্দুশেখর ও নগেন্দ্রনাথের চেষ্টায় যে ন্যাশনেল থিয়েটার প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহাই মনোমালিন্যে বিভক্ত হইয়া ন্যাশনেল ও হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার নাম গ্রহণ করিয়া শহরে এবং মফঃস্বলে অভিনয় দেখাইতে সুরু করেন। আমরা প্রথমে হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটারের প্রদর্শিত অভিনয়ের কথা বলিয়া পরে ন্যাশনেল থিয়েটারের কথা বলিব।

হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার

হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার ১৮৭৩, ২৭শে এপ্রিল তারিখে হাওড়া রেলওয়ে থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয় করিয়া মে মাসের প্রায় মাঝামাঝি ঢাকায় আগমন করেন। এ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে'র ১২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: "মে মাসের গোড়ায় হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার ঢাকায় চলিয়া যায়।" ব্রজেন্দ্র বাবু উপকরণের অভাবে সঠিক তারিখ উল্লেখ করিতে পারেন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দুই-তিন তারিখে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ১২ই মে, সোমবার, ১৮৭৩ (৩১শে বৈশাখ, ১২৮০) তারিখে ঢাকায় আসিয়া পৌঁছেন। এ সম্পর্কে স্থানীয় পত্রিকা 'ঢাকা-প্রকাশ' ঘোষণা করিতে যাইয়া থিয়েটারের নাম সম্পর্কে ভুল করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাহা সংশোধন করিয়া নেন। ১৮ই মে, ১৮৭৩ (৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০) তারিখের 'ঢাকা-প্রকাশে' লেখেন: "কলিকাতা ন্যাশনেল থিয়েটারের সভ্যগণ গত সোমবার এখানে পৌঁছিয়া গত রাত্রিতে 'নীলদর্পণে'র অভিনয় করিয়াছেন। এখন বিদ্যালয়াদি বন্ধ থাকাতে ইঁহাদের আশানুরূপ লাভ না হইতে পারে ভাবিয়া কলেজ খোলা পর্য্যন্ত ইঁহারা এখানে মধ্যে মধ্যে অভিনয় করিবেন। ঢাকার ধনাঢ্যগণ ইঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন প্রার্থনীয়। ইঁহাদের দুই দল, অন্য দলও শীঘ্রই ঢাকায় আসিবেন।" পরের সপ্তাহে আবার লেখেন: "সম্প্রতি কলিকাতা ন্যাশনেল থিয়েটারের কতিপয় ব্যক্তি ঢাকায় আগমন করিয়াছেন। পূর্বে যাঁহারা আসিয়া অভিনয় করিয়াছেন তাঁহারা 'হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার' এবং শেষোক্ত ব্যক্তিরা কেবল 'ন্যাশনেল থিয়েটার' নামে অভিহিত। আগামী সপ্তাহের প্রারম্ভেই শেষোক্ত থিয়েটারের অভিনয় আরম্ভ হইবে।"

হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটারের ঢাকা আগমনের তারিখ সম্পর্কে অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় 'জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম' বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেও দুই-তিন দিনের গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে তখন ঢাকায় এক দিনে আসা সম্ভব হইলেও 'ঢাকা-প্রকাশে'র বিজ্ঞাপিত সংবাদ

অনুযায়ী ঢাকায় তাঁহারা যদি ৩১শে বৈশাখ তারিখে আসিয়া পৌছেন তাহা হইলে রওনা হইয়াছেন ১২৮০, ৩০শে বৈশাখ তারিখে। জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এ কথা সত্য নয়।

'হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার' ঢাকায় আসিয়া সহরের বাঁধা ষ্টেজ 'পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'তে অভিনয় দেখাইতে থাকেন। ঢাকার নাটক-প্রিয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা : বিষয়ে তাঁহাদের প্রচুর সাহায্য করেন। অমৃতলালের স্মৃতিকথায় তাহার উল্লেখ আছে। তাঁহারা ১২ই মে সোমবার ঢাকায় আগমন করিয়া প্রথম অভিনয় দেখান—দীনবন্ধুর বহুখ্যাত 'নীলদর্পণ' ১৭ই মে শনিবার দিন। উহার পর ২১শে মে বুধবার 'সধবার একাদশী'। সঙ্গে কতগুলি পেণ্টোমাইম ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' অভিনীত হয়। ১৮ই মে'র এক বিজ্ঞাপনে দেখা যায় :

"আগামী ২১শে মে বুধবায় হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটারের সভ্যগণ 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো', 'The Hemch back' (?) 'বিলাতী বাবু' 'সিবিল সার্ব্বিস শ্রেণী এবং তৎপরীক্ষা', 'মস্তবী সাহেব কা পাকা তামাসা' প্রভৃতির অভিনয় করিবেন। ২৪শে মে শনিবার 'নবীন তপস্বিনী'র অভিনয় হইবে।"

'হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার' সর্বপ্রথম 'নীলদর্পণ' মঞ্চস্থ করিবেন শুনিয়া ঢাকার লোকেরা বিশেষ উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। তখন বাংলা দেশে নীলদর্পণের মত খ্যাতি আর কোন নাটকের ভাগ্যেই ঘটে নাই। ইহা ব্যতীত ঢাকা বাংলা যন্ত্রেই ইহা প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া ঢাকাবাসী ইহার অভিনয় বিষয়ে বিশেষ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার অভিনয় দেখিতেও বিস্তর লোক-সমাগম হইয়াছিল। 'ঢাকা-প্রকাশ' এ সম্পর্কে লেখেন :

"কলিকাতার উক্ত থিয়েটার (হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার) কর্ত্তৃক অত্রত্য 'পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'তে গত-পূর্ব্ব শনিবার 'নীলদর্পণে'র, গত বুধবার 'সধবার একাদশী'র এবং গত শনিবার 'নবীন তপস্বিনী'র অভিনয়-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নীলদর্পণ যে একখানি অতি-প্রসিদ্ধ নাটক, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। বঙ্গভাষার আর কোন নাটকের ভাগ্যেই এত প্রসিদ্ধি লাভ ঘটে নাই। প্রথমতঃ পূর্ব্ব-বাঙ্গলায় এই ঢাকা নগরীতে আমাদিকের 'বাঙ্গলা যন্ত্র'ই এই 'নীলদর্পণে'র জন্ম হয়। তৎপর সমস্ত বঙ্গদেশের—ভারতবর্ষের—ইংলণ্ডের—এমন কি সমুদয় ইয়োরোপের প্রধান প্রধান নগরে স্বপ্রভাব বিস্তার করিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করে। ঢাকাস্থ ব্যক্তিগণ যখন শুনিতে পাইলেন, সেই সর্ব্ববিখ্যাত নীলদর্পণ তাঁহাদের নাটকের অভিনয় এই ঢাকাতেই হইতেছে, তখন তদ্দর্শনার্থ কতদূর কৌতূহল জন্মিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। যাবতীয় বিদ্যালয় বন্ধ, সুতরাং বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমুদায় লোক স্থানান্তরিত থাকাতেও সেদিন নাট্যালয়ে এত লোক উপস্থিত হইয়াছিল যে, উপযুক্ত স্থানাভাব প্রযুক্ত অনেক দর্শককে দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু অভিনয় দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত দর্শকবৃন্দের আশানুরূপ তৃপ্তি হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। কারণ, নীলদর্পণ যে-যে কারণে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা এবং নাটকোচিত গুণাবলী একই পদার্থ নহে। ফলতঃ, নীলদর্পণে নাটকোচিত গুণাবলী বা তুর্য্য বড় অধিক দৃষ্ট হয় না। সুতরাং হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটারের অভিনেতৃগণ সবিশেষ যত্ন সহকারে অভিনয় করিয়াও দর্শকবৃন্দের আশানুরূপ তৃপ্তি সাধন করিতে পারেন নাই।···গুণপণার তারতম্যানুসারে নীলদর্পণের অভিনেতৃবর্গকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। গোলোকচন্দ্র বসু, আই, আই, উড, তোরাপ এবং রোক্তার প্রথম শ্রেণীতে ; সরলা, ক্ষেত্রমণি, আদুরী ও সাধুচরণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং অবশিষ্ট অভিনেতৃগণ তৃতীয় শ্রেণীতে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত।···

সীন, উপকরণ ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমাদিগের অনেক বক্তব্য আছে। হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার কোম্পানী অভিনয়ের জন্য এক-খানি সীন অথবা একটি উপকরণও সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। অত্রত্য রামাভিষেকের নাটকাভিনয়ের সীন লইয়া নীলদর্পণাদির অভিনয়-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। এক নাটকের সীন অন্য নাটকে ব্যবহৃত হইলে সর্ব্বাঙ্গ সুসঙ্গত হওয়া অসম্ভব।···আমাদের সংস্কার ছিল ঢাকার রামাভিষেক নায়িকাদের পরিচ্ছদ বিষয়ে সবিশেষ উৎকর্ষ প্রদর্শন করিবেন কিন্তু বাস্তবিক তদপেক্ষা অপকর্ষতাই দৃষ্ট হইয়াছে।

···বাস্তবিক ঢাকার রামাভিষেক, জামাই বারিক ও চক্ষুদান প্রভৃতির অভিনয় অপেক্ষা নীলদর্পণের অভিনয় অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর হইয়াছিল।

গত বুধবাসরীয় 'সধবার একাদশী' প্রভৃতির অভিনয়ও ভালই হইয়াছে।"

নীলদর্পণ অভিনয়ে হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার যে কেন সীন আনিতে পারেন নাই তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ন্যাশনেল থিয়েটারের অধ্যক্ষদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে ষ্টেজের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর উক্ত থিয়েটারের ষ্টেজের সমস্ত উপকরণ পান। তাঁহারা ঢাকাতেও সেই সমস্ত সীন ও ষ্টেজ আনিয়াছিলেন এবং ঢাকাবাসীদের প্রশংসা পাইয়াছিলেন। সে কথা যথাস্থানে উল্লেখ করিব। মোট কথা, হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার উপরি-উক্ত নাটক সমূহের অভিনয় করিয়া ঢাকা সহরে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, 'এক রাত্রেই আমরা কিস্তিমাৎ করিয়া দিলাম'—ইহা সত্য। [ক্রমশঃ

কথিকা

এক স্থানে এক জন কথক দক্ষযজ্ঞের কথা কহিতেছিলেন। স্থা. [illegible] দাশরথি রায় যেমন আগমন করেন, কথক রহস্যচ্ছলে দাশরথিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—"এস বাপু, ভূত এস।" সভাস্থ সকলে এই কথা শুনিয়া হাস্য করেন। দাশরথি সভাস্থগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—"আপনারা একটা ভূতের কথাতে যে হেসে পাগল হলেন ; আর দু'টো-পাঁচটা জুটলে কি হইত, বলিতে [illegible] হইলেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি
পুস্তক পাঠাইতে হয়

সাহিত্য পরিচয়

বইয়ের বাজার

বাংলা দেশের প্রকাশকদের সাম্প্রতিক অভিযোগ হচ্ছে—হালে না কি বইয়ের বাজার অত্যন্ত মন্দা। কথাটা মিথ্যা তা নয়। সাধারণ বাজারটাই যখন মন্দা, তখন বইয়ের বাজার তেজী হবার কোন পার্থিব কারণ নেই। দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করতেই লোকে হিমঝিম খেয়ে যাচ্ছে, কন্‌ট্রোলের সমস্যা আজও দূর হয়নি। যুদ্ধের মরশুমে সাময়িক কাজে নিযুক্ত ছিলেন যাঁরা তাঁরা পথে পথে ভবঘুরের মতন ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছেন। "জাতীয় সরকারের" দপ্তরে এমন কোন বাস্তব শিল্প-পরিকল্পনার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না যাতে লক্ষ লক্ষ লোকের অদূর ভবিষ্যতে বেকারত্ব ঘোচার সম্ভাবনা আছে। তার ওপর মা'র'বনী মুদ্রার কলেবর যে-রকম ক্রমেই স্ফীত হয়ে চলেছে তাতে সাধারণ মানুষের চোখের সামনে আশার জোনাকি পর্য্যন্ত জ্বলার কোন আশা নেই। বাঁধ-ভাঙা মুদ্রার বন্যায় ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্যমূল্যের তরঙ্গে হাবুডুবু খাচ্ছে সাধারণ মানুষ, থৈ পাচ্ছে না, পানিও পাচ্ছে না হালে। টাকা বাড়ছে, অথচ টাকা নেই লোকের। তার কারণ রাজকোষ থেকে যে টাকার বন্যা নেমে আসছে তাতে মুষ্টিমেয় কয়েক জনের ব্যাঙ্কের আমানত ফাঁপছে মাত্র। সাধারণ লোক যে তিমিরে ছিল সেই তিমির দিন দিন আরও গাঢ়তর হচ্ছে। ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্য লাল বাতি জ্বালছে। ইতিমধ্যে যে কতো ছোট দোকানের গণেশ উল্টেছে তার হিসেব নেই। দানবীয় মনোপলি ও ফিনান্স ক্যাপিটালের যুগে ক্ষুদে ব্যবসাদার ও দোকানদাররা চোখে সরষের ফুল দেখছেন। এক কথায় বলা যায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেক স্তরের লোকেরই জীবনযাত্রা আজ বানচাল হয়ে গেছে। বাংলা দেশের তো কথাই নেই, কারণ বাংলায় আর্থিক সঙ্কটের সঙ্গে রয়েছে "বঙ্গবিভাগের" সঙ্কট। তার ফলে, বাংলা দেশে শুধু অন্নের নয়, বাস্তুভিটের হাহাকারটাও বড় সত্য।

মধ্যবিত্ত পাঠকগোষ্ঠীর সর্ব্বাত্মক সঙ্কট

বইয়ের পাঠক প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা আজ কঠিন উভয় সঙ্কটে পড়েছেন, বিশেষ ক'রে বাঙালী মধ্যবিত্তরা। তাঁদের না আছে বাসস্থান, না আছে অন্নের সংস্থান। এই অবস্থায় বই পড়ার কথা বলাটা তাঁদের কাছে ইয়ার্কি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। বই পড়ার জন্যে চাই সুস্থ মন। অসুস্থ মন যাঁদের তাঁরা যে বই পড়েন না তা নয়, গোগ্রাসে সস্তা যৌন-সাহিত্য ও রহস্য সিরিজের বই তাঁরা গিলতে থাকেন। কিন্তু তাও চানাচুর বা তেলেভাজার মতন কিনে গিলতে গেলে পয়সা দরকার। পয়সার আজ যথেষ্ট অভাব, সুতরাং সস্তা সুড়সুড়ি দেওয়ার মতন "সাহিত্য" ও আজ বাজারে কম বিকোচ্ছে। অন্যান্য বইয়ের তুলনায় অবশ্য বেশী বিকোচ্ছে ঠিকই, কারণ নানাবিধ সমস্যা ও সঙ্কটের ঘূর্ণীর মধ্যে পড়ে লোকের মানসিক সুস্থতা পর্য্যন্ত বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। শোনা যায়, আজকাল না কি অন্যান্য তুলনায় মদের বিক্রী বেড়েছে। যে কারণে বেড়েছে, ঠিক সেই কারণেই অশ্লীল ও রোমাঞ্চকর "সাহিত্যের" চাহিদাও বেড়েছে। তবু যতটা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত, সেই অনুপাতে বাড়েনি। এমন কি, চীৎপুরের দু-এক জন বনেদী প্রকাশকের মুখ থেকে যা শুনেছি তাতে বিক্রী ক্রমেই কমছে বলা চলে। পড়ার ইচ্ছে আছে, কিন্তু কেনার পয়সা নেই। অতএব প্রকাশকরা বিক্রীর সঙ্গে বই পড়তে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ বই তাঁরা বিক্রীও করেন, ভাড়াও দেন।

সস্তা সাহিত্যের যখন এই অবস্থা তখন ভাল সাহিত্যের যে আরও দুরবস্থা হবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। ভাল সাহিত্যের ভাল পাঠকের সংখ্যা অনেক কম। তার মধ্যে আবার কিনে পড়ার মতন ক্ষমতা আছে এ-রকম ভাল পাঠকের সংখ্যা আরও কম। বছর দুই আগে এ-রকম পাঠকের সংখ্যা বাংলা দেশে ছিল ৫০০০ থেকে ৬০০০ মাত্র। বইয়ের দাম ৩ টাকা থেকে ৪ টাকার মধ্যে হলে ৩০০০ কপির দু'টো সংস্করণ প্রায়ই হ'তে দেখা যায়। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সালের কথা বলছি। ১৯৪৭ সাল থেকে বইয়ের বাজার মন্দা হতে থাকে। এই মন্দা হবার কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হ'ল :

(ক) সাধারণ আর্থিক সঙ্কট।

(খ) ছাপা, ব্লক ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধি।

(গ) বঙ্গবিভাগের ফলে বইয়ের বাজারে বিপর্য্যয়।

আর্থিক সঙ্কটের কথা আগেই বলেছি। সে কথা বাদ দিলেও বলা যায়, ছাপাখানার বড়-বড় মালিকদের চক্রান্তের ফলে বইয়ের বাজার আরও খারাপ হয়েছে। ছাপাখানার মালিকরা ক্রমেই কর্ম্মার মুদ্রণ-হার বাড়িয়ে চলেছেন, ব্লক-মেকাররাও তাই। কাগজের তথাকথিত কন্‌ট্রোল থাকলেও, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সাদা-বাজারে কাগজ পাওয়া যায় না, কালো-বাজার থেকে চড়া দামে কাগজ কিনে বই ছাপতে হয়। সুতরাং প্রত্যেকটি বইয়ের প্রকাশন-মূল্য (Publication costs) আগের তুলনায় (যুদ্ধের আগে) গড়ে প্রায় চার গুণ বেড়েছে বলা চলে। এই অবস্থায়, লেখকদের রয়ালটি দিয়ে, বিক্রেতাদের কমিশন দিয়ে, যে-কোন বই অন্ততঃ ২০০০ কপির

কম ছাপলে প্রকাশকদের চলে না। প্রকাশকরা একখানা বইয়ের মূল্য নির্দ্ধারণ সাধারণতঃ এই ভাবে করে থাকেন:

লেখক :	২০%
প্রকাশন-ব্যয় :	২৫%
বিক্রেতার কমিশন :	২৫%
প্রকাশকের লাভ :	২০%
ক্ষয়-ক্ষতি :	৫%
বিজ্ঞাপন :	৫%

অর্থাৎ একখানা বইয়ের দাম যদি ২।০ টাকা হয় তাহ'লে প্রত্যেকে তার এই হারে অংশ পান:

লেখক :	।০
প্রকাশন-ব্যয় :	।৶০
বিক্রেতার কমিশন :	।৶০
প্রকাশকের লাভ :	।০
ক্ষয়-ক্ষতি :	৶০
বিজ্ঞাপন :	৶০

একখানা বই ২০০০ কপি ছাপার খরচ (ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, আর্টিষ্ট, ব্লক, কভার ইত্যাদির খরচ "প্রকাশন-ব্যয়" হিসেবে ধরা হয়েছে) যদি ১২৫০ টাকা আন্দাজ হয় তা'হলে তার দাম ২।০ টাকা করা চলে। আজ-কালকার ছাপার খরচ, কাগজ ব্লক বাঁধাই ইত্যাদির মূল্য ধরে হিসাব করলে দেখা যায়, ডবল ক্রাউন (১।১৬) সাইজের একখানা সাধারণ ৮ ফর্ম্মার (১২৮ পৃষ্ঠার) বইয়ের প্রকাশন-ব্যয় এই রকম পড়ে।

১২৮ পৃষ্ঠার একখানা সাধারণ বইয়ের দাম যদি ২।০ টাকা করা যায় তাহ'লে ক্রেতারা তাকে দুর্ম্মূল্য বলে অভিযোগ করেন। অভিযোগটা সাধারণতঃ প্রকাশকদের বিরুদ্ধেই করা হয়ে থাকে। অন্যায় মুনাফালোভী প্রকাশক যে আমাদের দেশে নেই তা নয়, অনেকে আছেন। সাধারণতঃ তাঁরা লেখকের প্রাপ্য মজুরীটা আত্মসাৎ করে থাকেন। বিক্রেতার কমিশন তাঁদের দিতে হয়, ছাপার সব খরচও তাঁদের লাগে, অবশ্য তার পরিমাণটা আগে অনেক কম ছিল। তাহ'লেও উপরি মুনাফাটা ছিল তাঁদের লেখক ঠকিয়ে এবং লেখকদের বইয়ের সমস্ত স্বত্ব কিনে নিয়ে। এখন যাঁদের সামান্য প্রতিষ্ঠা আছে সে-রকম প্রত্যেক লেখককেই প্রত্যেক সংস্করণের (Edition) জন্য রয়্যালটি দিতে হয় এবং লেখক হিসেবে তার অংশ ১০% থেকে ২০% পর্য্যন্ত দিতে হয়। তাছাড়া অন্যান্য খরচও এখন যথেষ্ট বেড়েছে। সুতরাং প্রকাশকরা বইয়ের দাম বিশেষ কমাতে পারেন না। ছাপাখানার মালিকরা যদি দলবদ্ধ হয়ে মুদ্রণ-হার বৃদ্ধির চেষ্টা না করেন, ব্লক-মেকাররা যদি মুনাফার হার একটু কমান, কাগজের চড়া-বাজার ও কালো-বাজার যদি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, তাহ'লে লেখককে না ঠকিয়েও সাধু প্রকাশকেরা বইয়ের দাম কিছুটা কমাতে পারেন। তা কি সম্ভব?

আর এক উপায়ে বইয়ের দাম কিছুটা কমতে পারে। বই যদি তাড়াতাড়ি বিক্রী হয় এবং মোট প্রকাশ-সংখ্যা যদি বাড়ে, অর্থাৎ পাঠকদের সংখ্যা যদি আরও বাড়ে। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ আগেই বলা হয়েছে, ধার করে, অথবা না-কিনে যাঁরা বই পড়েন সে-রকম পাঠকের সংখ্যা বেড়ে বিশেষ লাভ নেই। ক্রেতা-পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধিতে লাভ আছে। কিন্তু সে-রকম ক্রেতা-পাঠকের সংখ্যা আমাদের মতন গরীবের দেশে অত্যন্ত কম। যে-দেশের মধ্যবিত্তদের ভাত-কাপড়ের সংস্থানই নেই, মিথ্যা আত্মসম্মানবোধটুকু সম্বল করেই যাঁরা ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত, তাঁরা বই কিনে পড়বেন কোথা থেকে? বই কিনে পড়াটা তাঁদের কাছে অনাবশ্যক বিলাসিতা মাত্র। তাছাড়া, বর্ত্তমানে মধ্যবিত্তের সামনে যে সর্ব্বাত্মক সঙ্কট দেখা দিয়েছে তাতে বই কিনে পড়ার ক্ষমতা তো অনেকের নেই-ই, এমন কি বই পড়ার যে মেজাজ, ইচ্ছা ও অবসর থাকা দরকার তা-ও অনেকের নেই। সাধারণতঃ দেখা যায়, অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্তদের মধ্যে বইয়ের অনুরাগীর সংখ্যা অনেক কম, সিনেমা জুয়া ক্লাব হোটেল ইত্যাদির অনুরাগীর সংখ্যাই বেশী। বই দু'দশখানা চকচকে শেলফে তাঁদের বাড়ীতে থাকে অন্যান্য আসবাবের মতন গৃহের শোভা ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য। ক্রেতা-পাঠকদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনই সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের পাঠক এবং তাঁদের অবস্থা আজ এত দূর শোচনীয় যে বই যত ভালই হোক না কেন, তা কিনে পড়ার ক্ষমতা, এমন কি চেয়ে পড়ার মেজাজ পর্য্যন্ত তাঁদের অনেকেরই নেই।

প্রকাশক, এমন কি লেখকদের মধ্যে অনেককে অভিযোগ করতে শোনা যায় যে ভাল সাহিত্যের পাঠক-সংখ্যা অনেক কম, সমাদরও তেমন নেই। এটা হঠোক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। যা-কিছু "ভাল" তার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি আমাদের এই বর্ত্তমান সমাজে অনেক কম। "ভাল" মানুষেরই সমাদর নেই, "ভাল" বইয়ের থাকবে কোথা থেকে? তার মানে এই নয় যে মন্দ লোক ছাড়া সমাজে আর কিছুই নেই এবং ভাল মানুষের সমাদর হয়ই না। হয় এবং যথেষ্ট হয়, তা না হলে সমাজ ও সভ্যতা সব এত দিনে ধ্বংস হয়ে যেত, কিছুই আর এগুতো না। "Gulter Press", "Pornography", "Crime stories" ইত্যাদির সমঝদার ও পাঠকদের সংখ্যা এ-সমাজে বেশী হওয়া স্বাভাবিক। এ-সত্যকে কেউ-ই অস্বীকার করছে না। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড়ো সত্য হল এই যে ভাল বই, ভাল লেখা, ভাল সাহিত্যের সমাদর ও সমঝদার সমাজে বাড়তে থাকে, সমাজে তারই প্রতিষ্ঠা হয় সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর। ভাল বইয়ের পাঠক-সংখ্যা আমাদের দেশে অনেক বেড়েছে। কি ভাবে বেড়েছে তার একটা আনুমানিক হিসেব এই ভাবে দেওয়া যেতে পারে:

	বইয়ের দাম	বিষয়	বিক্রয়-সংখ্যা	সময়
১৯৩০-'৩৯	১৲—২৲	উপন্যাস	৫০০ থেকে ১০০০	২ বছর
	২।০—৪৲	ঐ	ঐ	৪-৫ ঐ
	১৲—২৲	প্রবন্ধ	ঐ	৪-৫ ঐ
	২।০—৪৲	ঐ	ঐ	১০ ঐ
	১৲—২৲	ছোট গল্প ও কবিতা	৫০০	৫-১০ ঐ
১৯৪৪-'৪৭	১৲—২৲	উপন্যাস	২০০০—৩০০০	১ ঐ
	২।০—৪৲	ঐ	ঐ	১-২ ঐ
	১৲—২৲	প্রবন্ধ	ঐ	১ ঐ
	২।০—৪৲	ঐ	ঐ	১-২ ঐ
	১৲—২৲	গল্প	১০০০	২ ঐ
	১৲—২৲	কবিতা	৫০০	২ ঐ

বাংলা দেশের প্রকাশকদের কাছ থেকে নানা বিষয়ের বইয়ের বিক্রয়-হারের যে হিসেব পাওয়া যায় তা থেকে এই ধরণের একটা বিক্রয়-সূচী তৈরী করা যায়। এখনও এই আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে, ১৯৪৮ সালে প্রত্যেক ভাল প্রবন্ধ ও উপন্যাসের বই যে বিক্রী আছে, যুদ্ধের আগের তুলনায় তা দ্বিগুণের কম নয়। সুতরাং ভাল বইয়ের বাজার নিশ্চিত বেড়েছে, ভাল পাঠকদের সংখ্যাও যে অন্ততঃ দ্বিগুণ বেড়েছে তাতে কোন ভুল নেই। তাই ভাল বইয়ের বাজার মন্দা বলে এ কথা বলা যায় না যে ভাল লেখার পাঠক কমে যাচ্ছে। ভাল সাহিত্যের পাঠক বাড়ছে, বাজারও অনেক ভাল হচ্ছে। লোকের শিক্ষা ও সুরুচির উন্নতি হয়েছে ও হচ্ছে। তাই হয়ে থাকে। ভাল জিনিষ যদি লোককে দেওয়া যায় তাহ'লে তাদের রুচিও বদলায়, তারা তারিফও করে। সম্প্রতি বইয়ের বাজার যে বিশেষ ভাবে মন্দা হয়েছে তার কারণ:

(১) মধ্যবিত্তের আর্থিক ও সামাজিক সঙ্কট
(২) প্রকাশনের ব্যয়বৃদ্ধি
(৩) ভাল লেখা ও নতুন লেখার অভাব

এক কথায় বইয়ের বাজার যে মন্দা হয়েছে তার কারণ প্রেসের মালিকদের লোভ বেড়েছে, কাগজের বাজার কালোই রয়েছে, প্রকাশকদের দূরদৃষ্টির অভাব এবং লেখকদের ভাল বই লেখার অক্ষমতা। ভাল পাঠকের সংখ্যা বাড়লেও ভাল লেখকের সংখ্যা কমছে—এইটাই বড় সত্য। পাঠকদের বিচার-বুদ্ধি বাড়ছে, সুতরাং প্রকাশক বা লেখক কারও মন-ভোলানো ধাপ্পাতে আর তাদের ভুলানো সম্ভব হচ্ছে না। আর্থিক সঙ্কট যে বইয়ের মন্দা বাজারের একমাত্র কারণ তা কখনই নয়।

বিদেশী বইয়ের বাজার

বিদেশী বইয়ের বাজারও এখানকার মতন। অনেকের ধারণা আছে, বিলেতে বা আমেরিকায় বই পড়ে অসংখ্য লোক, বই বিক্রীও হয় অসংখ্য। ও-সব হল গালগল্প। বিলেতে যুদ্ধের আগে ভাল উপন্যাসই প্রথম সংস্করণ ছাপা হত খুব বেশী হলে ৫০০০ কপি। এখনও অবশ্য এর বেশী ছাপা সম্ভব হয় না, কাগজের অভাবের জন্যে। কবিতার বই যুদ্ধের আগে বিলেতে ছাপা হত ৩০০ থেকে ৪০০ কপি মাত্র। আজকাল প্রায় ১০০০ কপি ছাপা হয়। বইয়ের বাজার বিলেতেও আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে—

বইয়ের ব্যবসা

১৯৩৭	—	১০,৫০৭,২০৪ পাউণ্ড
১৯৪৭	—	৩০,২০৩,৭৬৩ পাউণ্ড

প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা

১৯৩৭	—	১৭,১৩৭ কপি
১৯৪৫	—	প্রায় ৭০০০ "
১৯৪৭	—	১৩,০৪৬ "

(নিউজ রিভিউ, ২৩।১।৪৮)

খারাপ বইয়ের সংখ্যা ও পাঠক যুদ্ধের মধ্যে যথেষ্ট বাড়লেও, বিলেতে যুদ্ধের মধ্যে ভাল বই ও পাঠকের সংখ্যাও যে যথেষ্ট বেড়েছে, তাতে কোন সন্দেহই নেই।

বই পড়ার অভ্যাস

সম্প্রতি বিলেতের কয়েকটি শহরে মধ্যবিত্তের বই পড়ার অভ্যাস সম্বন্ধে তদন্ত করা হয়েছে। তদন্তের ফলে দেখা গেছে—

১৬—২০ বছর বয়সের মধ্যে শতকরা ৮০ জন বই পড়ে
২০—৪০ বছর বয়সের মধ্যে শতকরা ৬০ জন বই পড়ে
৪০—বছর বয়সের বেশী শতকরা ২০ জন বই পড়ে।

অর্থাৎ বয়স যত বাড়ে, বই পড়ার অভ্যাস তত কমে। এ-ছাড়া অন্য ঘটনা হ'ল এই—

- বই যারা পড়ে তাদের মধ্যে শতকরা ২০ জন ক্রেতা-পাঠক
  পুরুষ-ক্রেতার সংখ্যা মেয়েদের চেয়ে তিন গুণ বেশী

বিলেতেও বই কিনে পড়ার অভ্যাসের দৌড় এই পর্যন্ত। তার মধ্যে আবার যে-শ্রেণীর বই সব চেয়ে বেশী বিক্রী হয় তা'হল ঐ "Crime, Mystery, Pornography" ইত্যাদি। আমাদের দেশের মধ্যবিত্তের সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষা-দীক্ষা বিলেতের মধ্যবিত্তের তুলনায় ভাল তো নয়ই, অনেক খারাপ। সুতরাং এখানেও যদি তদন্ত করা যায় তাহ'লে হয়ত আরও খারাপ ফলাফল জানা যাবে। বিলেতে আজও (সাম্প্রতিক তদন্তে) জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রথম দেখা যায় Edgar Wallace-এর নাম, এবং সর্বশেষে দেখা যায় Shakespeare-এর নাম। আমাদের দেশেও যদি তাই রবীন্দ্রনাথ জনপ্রিয়তার পথে সকলের পিছনে পড়ে থাকেন এবং "মোহন সিরীজের" অথবা "উদয়ের পথের" লেখকরা সকলের আগে হঠাৎ গিয়ে পড়েন, তাহ'লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কথা হল, এইটা সত্য নয়, বড় সত্যও নয়। বড় সত্য হল, ভাল বইয়ের ভাল পাঠকও বাড়ছে। সেই অনুপাতে ভাল লেখা বাড়ছে কি?

আগামী সংখ্যায়
"বই পড়া"
সজনীকান্ত দাস

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

মানুষের অধিকার—

১০ই ডিসেম্বর (১৯৪৮) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে মানুষের মৌলিক অধিকার সম্বলিত ঘোষণা-বাণী (The Human Bill of Rights) ৪৮—০ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। দক্ষিণ হনোরাস এবং ইয়েমেন ভোটের সময় অনুপস্থিত ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন, পূর্ব্ব-ইউরোপের পাঁচটি রাষ্ট্র এবং সৌদী আরব ভোট দেয় নাই। সাধারণতঃ ভোটের ব্যাপারে যেরূপ ঘটিয়া থাকে, রাশিয়ার সমস্ত সংশোধন প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং ৩ নং ধারা সংশোধনের জন্য বৃটেনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মানুষের মৌলিক অধিকারের এই সনদে মোট ৩১টি ধারা আছে। আড়াই বৎসরের পরিশ্রমের ফলে এই যে একত্রিশটি ধারা রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে নূতন কিছুই নাই। এই ঘোষণা ইংলণ্ডের 'ম্যাগনা কার্টা', আমেরিকার 'স্বাধীনতার ঘোষণা' এবং ফ্রান্সের 'মানুষের অধিকারের' প্রতিধ্বনি মাত্র। উহাদের মধ্যে যে আশাবাদ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, এ-পর্য্যন্ত উহা শুধু মরীচিকা বলিয়াই কি প্রমাণিত হয় নাই? মানুষের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই ঘোষণা-বাণী পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের মনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্বলন্ত বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে পারিবে, এইরূপ আশা করিবার মত কিছুই দেখা যাইতেছে না। এই ঘোষণা-বাণীর মুখবন্ধে বলা হইয়াছে, "স্বৈরাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে শেষ পন্থা হিসাবে মানুষকে যদি বিদ্রোহ করিতে না হয়, তাহা হইলে আইনের শাসন দ্বারা মানুষের অধিকার রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।" কিন্তু মানুষ স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির হাতে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা তুলিয়া দেয়, এই কাল্পনিক অবাস্তব ভিত্তির উপর যত দিন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তত দিন মানুষের এমন কোন অধিকার নাই যাহা এই সকল নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা যে-কোন অজুহাতে কাড়িয়া লইতে না পারিবেন। শুধু দ্বিতীয় মহাসমরের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই নয়, শুধু দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যেই নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে চিরকালই মানুষকে তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষিত অধিকারও যে শুধু কাগজে-পত্রেই লিপিবদ্ধ থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

এই ঘোষণা-বাণীতে অবাধ মেলা-মেশা, স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম ও বাসস্থান নির্ব্বাচন, বিবাহ, সামাজিক নিরাপত্তা, বেতন সহ ছুটি এবং বিশ্রামের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ঘোষণা-বাণীতে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, এই সকল অধিকার গ্রহণ করা না করা সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের শুধু নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকিবে। সুতরাং এই সকল অধিকার শুধু এক মহান্ আদর্শ হইয়াই থাকিবে, কিন্তু এই আদর্শে পৌঁছিবার কোন চেষ্টা পর্য্যন্ত হইবে না। রাশিয়া একটি সংশোধন প্রস্তাবে বিশেষ ভাবে ঔপনিবেশিক জনগণের জন্য মানুষের অধিকারের একটি বিস্তৃত তালিকা উত্থাপন করিয়াছিল। প্রস্তাবটি ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। মানুষের অধিকার সংক্রান্ত নীতি কার্য্যকরী করিবার জন্য সব কয়েকটি রাষ্ট্রেরই নিজ নিজ আইন সংশোধন করা উচিত, এই মর্ম্মে রাশিয়া যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, তাহার পক্ষে ১০ ভোট এবং বিপক্ষে ৩২ ভোট হওয়ায় প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়া যায়। চৌদ্দটি রাষ্ট্র ভোট দেয় নাই। খসড়া ঘোষণা-বাণীর একটি ধারায় বলা হইয়াছিল যে, এই ঘোষণা-বাণীতে বর্ণিত সমস্ত অধিকারই ঔপনিবেশিক ও ট্রাষ্টীশিপের অধীনস্থ জনগণের প্রতি প্রযোজ্য হইবে। এই ধারাটি সংশোধন করিয়া বৃটেন যে প্রস্তাব উত্থাপন করে, তাহা গৃহীত হইয়াছে। খসড়া প্রস্তাবে সোজাসুজি উপনিবেশ ও ট্রাষ্টী-শিপের দেশগুলিতে মানুষের অধিকার সংক্রান্ত নীতি প্রযোজ্য হওয়ার কথা ছিল। গৃহীত সংশোধন প্রস্তাবে সোজা ভাষায় কিছুই বলা হয় নাই। শুধু বলা হইয়াছে যে দেশটি স্বাধীন, না ট্রাষ্ট, না স্বায়ত্ত শাসনবিহীন মানুষের অধিকার সংক্রান্ত নীতি প্রয়োগের ব্যাপারে সে সম্পর্কে কোন পার্থক্য করা হইবে না। বৃটেনের সাম্রাজ্য এখনও বহু বিস্তৃত, এ-কথা স্মরণ রাখিলেই এই সংশোধন প্রস্তাবের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়।

পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাঁহারা অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, প্রত্যেক দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাঁহাদের করতলগত, তাঁহারা এই ঘোষণা-বাণীকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যই প্রদান করিবেন। এই ঘোষণা তাঁহাদিগকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির একচেটিয়া অধিকার হইতে একটুকুও বঞ্চিত করে নাই। বরং তাঁহাদের সুবিধাই হইয়াছে। নিপীড়িত মানব-সমাজ শুধু এই ঘোষণা-বাণীর আলেয়ার পিছনে ঘুরিয়া মরিবে, আর কায়েমী স্বার্থবাদীরা নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় ক্ষমতা ভোগদখল করিতে পারিবেন।

ব্যর্থ অধিবেশন—

বার সপ্তাহ পর গত ১২ই ডিসেম্বর (১৯৪৮) সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের প্যারী অধিবেশন শেষ হইয়াছে। এই অধিবেশন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তৃতীয় অধিবেশনের প্রথমার্দ্ধ। সুতরাং আগামী ১লা এপ্রিল (১৯৪৯) লেকসাকসেসে তৃতীয় অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্দ্ধ আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত অধিবেশন মুলতুবী রহিল। শান্তির শ্রান্ত আবহাওয়ার মধ্যেই প্যারী অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে, প্রতিনিধিবৃন্দ শান্ত ভাবে কোনরূপ উৎসাহ উদ্দীপনা প্রকাশ না করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বার্লিন-সমস্যার কৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় প্রবল যুদ্ধাশঙ্কার মধ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্যারী অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল

অধিবেশনের শেষে যুদ্ধাশঙ্কা হয়ত অনেকটা দূরে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্যারী অধিবেশনে কাজের মত কাজ কিছুই হয় নাই। এই অধিবেশনের কার্য্যসূচীতে যে সকল বিষয় স্থান পাইয়াছিল, তন্মধ্যে বার্লিন-সমস্যা ব্যতীত নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন :—(১) প্যালেষ্টাইন, (২) কোরিয়া, (৩) গ্রীস, (৪) ইন্দোনেশিয়া, (৫) কাশ্মীর-সমস্যা, (৬) পরমাণু শক্তিনিয়ন্ত্রণ, (৭) সমর-সজ্জা হ্রাস এবং (৮) ইটালীর উপনিবেশ সমূহ। এই সকল সমস্যা সমাধানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতটুকু সমর্থ হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ না হইয়া পারা যায় না।

প্যারী অধিবেশনে প্রকৃত কাজ কি কি হইয়াছে, তাহা বলিতে গেলে প্রথমেই মানুষের মৌলিক অধিকারের কথা বলিতে হয়। সাধারণ পরিষদ কর্ত্তৃক মানুষের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা-বাণী গৃহীত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত জাতি-হত্যা নিষিদ্ধ করিয়া চুক্তির একটি খসড়া রচিত হইয়াছে। এই চুক্তি এখন বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়ার অপেক্ষা করিতেছে। বৃটিশ প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে ঘোষণা করেন যে, জাতি-হত্যা নিরোধ সংক্রান্ত চুক্তি বৃটেন মানিয়া লইবে। জাতি-হত্যা সংক্রান্ত অপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জ্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জ্জাতিক আইন কমিশন গঠনের প্রস্তাবও সাধারণ পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃতি-গত জাতিবিনাশ বে-আইনী করিবার জন্য রাশিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল তাহা গৃহীত হয় নাই। জাতি-হত্যা বা genocideএর নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে :

কোন জাতি, বর্ণ, কৌম বা ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়কে,

(১) উহার লোকজনকে হত্যা করিয়া,

(২) তাহাদের দৈহিক বা মানসিক গুরুতর ক্ষতি সাধন করিয়া,

(৩) উক্ত সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাদিগকে জীবনধারণের অনুপযোগী অবস্থায় বাস করিতে বাধ্য করিয়া,

(৪) তাহাদের মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া, এবং

(৫) এক সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাদিগকে বলপূর্ব্বক অন্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে উক্ত সম্প্রদায়ের বিনাশ সাধনই জাতি-হত্যা (Genocide)।

কার্য্যক্ষেত্রে এই জাতি-হত্যা নিরোধের চুক্তিও যে নিষ্ঠুর পরিহাস ব্যতীত আর কিছুই হইবে না, সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশনে পাকিস্তানকে আমরা জাতিবিনাশ নিরোধ করিবার প্রস্তাবের গোঁড়া সমর্থকরূপে দেখিয়াছি। ইহাও কি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিহাসেরই অন্তর্গত ?

উল্লিখিত দুইটি বিষয় ব্যতীত পরমাণু-শক্তি কমিশনকে আরও এক বৎসর জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু আগামী এক বৎসরে পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণ সমস্যার সমাধান হইবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণ সমস্যার সমাধান হইতেছে না কেন, তাহা বুঝিতে খুব বেশী বুদ্ধি খরচ করিতে হয় না। বর্ত্তমানে একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই পরমাণু-বোমা তৈয়ার করিতে জানে, তাহার অস্ত্রাগারে কিছু সংখ্যক পরমাণু-বোমা মজুতও আছে। এই অবস্থায় পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কমিশন যে প্রস্তাব করিয়াছে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য—আর কোন দেশ যেন পরমাণু-বোমা তৈয়ারীর ফরমূলা আবিষ্কারের জন্য গবেষণা চালাইতে না পারে। এই কারণেই কমিশনের প্রস্তাবে রাশিয়ার আপত্তি।

গত ১১ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে প্যালেষ্টাইনে শান্তিস্থাপনের জন্য একটি নূতন আপোষ-কমিশন গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, তিন জন লইয়া গঠিত একটি আপোষ-কমিশন প্যালেষ্টাইনে যাইবে। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় কাউণ্ট বার্ণাডোটের পরিকল্পনা কার্য্যতঃ বাতিল হইয়া গেল এবং বৃটেনের প্রস্তাবেরও বিশেষ কিছুই আর রহিল না। এই দিক্ দিয়া প্রস্তাবটিকে ভালই বলিতে হইবে। কিন্তু আপোষ-কমিশনকে কোন কর্ম্মসূচী প্রদান করা হয় নাই, ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রস্তাবে এইটুকু মাত্র বলা হইয়াছে যে, প্যালেষ্টাইনের তীর্থস্থানগুলি রক্ষা করিতে হইবে, জেরুজালেম জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে এবং উহা হইতে সমস্ত সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে এবং আশ্রয়প্রার্থীদিগকে তাহাদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দিতে হইবে। আপোষ-কমিশন গঠিত হইবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং তুরস্কের প্রতিনিধি লইয়া। এই কমিশনের চেষ্টা যে সাফল্যমণ্ডিত হইবে, সে-সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছু নাই।

ইটালীর উপনিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা প্যারী অধিবেশনে উত্থাপন না করিয়া মুলতুবী রাখা হইয়াছে। রাশিয়ার বিরোধিতা সত্ত্বেও বলকান কমিশনকে আরও এক বৎসর জীয়াইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিবেশনের শেষ মুহূর্ত্তে রাশিয়ার প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য বর্ত্তমানের অস্থায়ী কমিশনের পরিবর্ত্তে একটি স্থায়ী কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই কমিশন কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টা এবং কোরিয়া হইতে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনী অপসারণের উদ্যোগ করিবে। কোরিয়া-কমিশন ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রাশিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ-কোরিয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন যে গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে তাঁহারা না কি আরও দুই বৎসর কোরিয়ায় মার্কিণ সৈন্য রাখিবার জন্য আমেরিকাকে অনুরোধ করিয়াছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সদস্য হইবার ১২টি দেশের আবেদন এবং ভেটো ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার জন্য 'ক্ষুদ্র পরিষদে'র সুপারিশ সম্বন্ধে কোন সমাধান সম্ভব হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ১২টি দেশের আবেদন বিবেচনাধীন রহিয়াছে :— (১) আলবানিয়া, (২) অষ্ট্রিয়া, (৩) বুলগেরিয়া, (৪) সিংহল, (৫) আয়ার, (৬) ফিনল্যাণ্ড, (৭) হাঙ্গেরী, (৮) ইটালী, (৯) মঙ্গোলীয় প্রজাতন্ত্র, (১০) পর্ত্তুগাল, (১১) রুমানিয়া এবং (১২) ট্রান্সজর্ডান। গত ২৮শে নবেম্বর (১৯৪৮) এড হক রাজনৈতিক কমিটিতে উল্লিখিত ১২টি দেশের মধ্যে ৬টি দেশের আবেদন পুনর্ব্বিবেচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। উহাদের নাম :— ইটালী, পর্ত্তুগাল, ফিনল্যাণ্ড, আয়ার, অষ্ট্রিয়া এবং ট্রান্সজর্ডান। এই প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট হইয়াছে। সিংহলের আবেদনকে

একটা বিশেষ পর্য্যায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। রাশিয়ার বিরোধিতা সত্ত্বেও সিংহলের আবেদন সমর্থন করিয়া এবং নিরাপত্তা পরিষদকে উহা পুনর্ব্বিবেচনার জন্ত অনুরোধ করিয়া গত ১ই ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উল্লিখিত বারটি দেশের মধ্যে সাতটি দেশের আবেদন মঞ্জুর করা বৃটেন ও আমেরিকা সমর্থন করেন। রাশিয়ার ভেটোর জন্ত উহাদের আবেদন মঞ্জুর হইতেছে না, এ-কথাও সত্য। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের ভেটোর জন্ত আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী এবং মঙ্গোলীয় প্রজাতন্ত্রের আবেদন মঞ্জুর হইতে পারিতেছে না। এই কয়েকটি দেশ রাশিয়ার অনুকূল হইবে, ইহাই ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের একমাত্র কারণ বলিয়াই কি মনে হয় না? সুতরাং রাশিয়ার জন্তই এই ১২টি আবেদন মঞ্জুর হইতে পারিতেছে না, ইহা মনে করা ভুল। বরং বলিতে পারা যায় যে, বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে বিরোধের ফলেই এই বারটি রাষ্ট্রের আবেদন মঞ্জুর হইতে পারিতেছে না। ইসরাইল রাষ্ট্রও সদস্ত হওয়ার জন্ত আবেদন করিয়াছে।

গত বৎসর যে ক্ষুদ্র পরিষদ (Little Assembly) গঠিত হয়, সেই পরিষদ ভেটো ক্ষমতা সংশোধন করিবার জন্ত কতকগুলি সুপারিশ করে। এই সুপারিশগুলির মধ্যে সাধারণ সম্মেলন (General Conference) আহ্বান অন্ততম। এই সকল সুপারিশ এতই সুদূরপ্রসারী যে, পশ্চিমী শক্তিবর্গ পর্য্যন্ত সেগুলি সমর্থন করিতে পারে নাই। আর্জ্জেনটিনার ডাঃ আর্কের মত গোঁয়ার-গোবিন্দ ব্যক্তিরাই এইরূপ সুপারিশ সমর্থন করিতে পারিয়াছেন। মঃ মানুলিস্কি ডাঃ আর্ককে ডন কুইকজোটের সহিতও তুলনা করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহাকে ডন্ কুইক-জোটের ঘোড়ার সহিত তুলনা করিয়াছেন। গত ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৪৮) এড হক্ রাজনৈতিক কমিটিতে বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পক্ষ হইতে উত্থাপিত ভেটো নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবকে ৩৫টি বিষয়কে কার্য্যবিধি সংক্রান্ত বিষয় বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করা চলিবে না। সাধারণ পরিষদে এ সম্পর্কে কোন আলোচনা হইতে পারে নাই। কিন্তু এই প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে গৃহীত হইলেও সমস্তার সমাধান হওয়া দূরের কথা, সমস্তা আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা। কোন্‌টি কার্য্যবিধি সংক্রান্ত বিষয় ইহা লইয়া প্রবল মতভেদের অবকাশ থাকিবে। গত ৩রা ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদে ক্ষুদ্র পরিষদকে আরও এক বৎসরের জন্ত বহাল রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পরিষদ যে ভেটো সমস্তা এড়াইবার জন্ত পশ্চিমী শক্তিবর্গের উপায়স্বরূপ, রাশিয়া সে-কথা গোপন রাখে নাই। রাশিয়ার সহিত বুঝা-পড়ার উহা একটি প্রধান অন্তরায়।

প্যারী অধিবেশনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কাশ্মীর-সমস্তায় হাত দিতে পারে নাই। হায়দ্রাবাদ-সমস্তা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আর উত্থাপিত হইবে না বলিয়া যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন তাঁহাদের সেই আশা অমূলক প্রমাণিত হইয়াছে। হায়দ্রাবাদ-সমস্তা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্তই রহিয়াছে। রাজনৈতিক কমিটিতে প্যালেষ্টাইন সংক্রান্ত আলোচনায় ভারত আরব-রাষ্ট্রবর্গের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল। উহার অব্যবহিত পরেই বোধ হয় এই সমর্থনের জন্ত ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই সিরিয়া অবিলম্বে হায়দ্রাবাদ-সমস্তা আলোচনার জন্ত দাবী উত্থাপন করে। পাকিস্তানও হায়দ্রাবাদ সমস্তা আলোচনার জন্ত দাবী উত্থাপন করিয়াছিল। হায়দ্রাবাদ-সমস্তাকে কার্য্যসূচীতে বহাল রাখিতে শুধু যে আরব রাষ্ট্রগুলি, পাকিস্তান এবং আর্জ্জেণ্টিনাই ইচ্ছুক তাহা নয়। ওয়াকিবহাল মহলের ইহা দৃঢ় ধারণা যে, বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের অন্ততম এক বৃহৎ রাষ্ট্রও হায়দ্রাবাদ-সমস্তাকে চালু রাখিতে চায়। এই বৃহৎ রাষ্ট্রটির পরিচয় স্পষ্ট করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। ভারতের দৃষ্টি সতর্ক ও সুদূরপ্রসারী হওয়া আবশ্যক।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্যারী অধিবেশন ১২ই ডিসেম্বর শেষ হওয়ায় সাধারণ পরিষদে বার্লিন-সমস্তা লইয়া আলোচনা হওয়া সম্ভব হইল না। বার্লিন-সমস্তা যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ না থাকিলেও এই সমস্তা মিটাইয়া ফেলিবার জন্ত সাধারণ পরিষদ বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের উপর পর্য্যাপ্ত নৈতিক চাপ দিতে পারিত ইহা স্বীকার করা কঠিন। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি কোন না কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের উপগ্রহস্বরূপ। বৃহৎ রাষ্ট্রের মুখ চাহিয়াই তাহাদের চলিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রই বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যাইতে অসমর্থ। এই অবস্থায় বার্লিন-সমস্যা সম্বন্ধে সাধারণ পরিষদের অভিমত কি হইতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। বার্লিন-বিরোধ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্ত নিরাপত্তা পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি ডাঃ ব্রামুগলিয় ছয় জন নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ লইয়া যে কমিশন গঠন করিয়াছেন তাহার ফল কি তাহা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। বার্লিনের সোভিয়েট অধিকৃত এলাকায় ঐ এলাকার বার্লিন পৌর-পরিষদের সদস্যগণ উক্ত অঞ্চলের জন্ত একটি অস্থায়ী পৌর-পরিষদ গঠন করিয়াছেন এবং সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ উহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পশ্চিমী ত্রিশক্তি ইহাতে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা বার্লিনকে কার্য্যতঃ বিভাগ করা হইয়াছে। আবার পশ্চিম বার্লিনে যে পৌর-সভার নির্ব্বাচন হইয়াছে তাহাতে কম্যুনিষ্টরা পরাজিত হইয়াছে এবং জয়লাভ করিয়াছে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, একটি শাসনতন্ত্র রচনা পরিষদ বন্ সহরে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর জন্ত একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিতেছেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, পশ্চিমী শক্তিত্রয় জার্ম্মাণীকে বিভক্ত করিবার জন্ত উদ্যত হইয়াছে এবং রাশিয়া উহাতে প্রাণপণে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে। বার্লিন-সমস্যা উহারই একটা অভিব্যক্তি মাত্র।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্যারী অধিবেশন কার্য্যতঃ ব্যর্থতার মধ্যে শেষ হইয়াছে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে বিরোধই ইহার কারণ, শুধু রাশিয়াকে দোষ দিয়া লাভ নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশন ইলিয়টের কবিতাই স্মরণ করাইয়া দেয়: "In my beginning is my end."

ইন্দোনেশিয়ার ভবিষ্যৎ—

গত ৫ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, হল্যাণ্ড এবং ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধের অবসান অ[illegible] সমাধানের জন্ত শেষ মুহূর্ত্তের চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। হল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি দল স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। স্বদে[illegible]

প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে মন্ত্রিসভা প্রতিনিধি দলের নেতা মি: ই, এম, জে সাসেন অবশ্য বলিয়াছেন যে, প্রতিনিধি দল হয়তো আবার ফিরিয়া আসিতেও পারেন। তিনি না কি এখনও আশা ছাড়েন নাই। প্রতিনিধি দলকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল হেগ হইতে তাহা অস্বীকার করা হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ায় নেদারল্যাণ্ডের হাই কমিশনার ডা: লুই বীল ওরা ডিসেম্বরের বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, আগামী ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বেই ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয় ইহাই হল্যাণ্ডের অভিপ্রায়। এই সকল আশা ও অভিপ্রায় সত্ত্বেও আলোচনা কেন নিষ্ফল হইল, এই প্রশ্ন উপেক্ষা করা যায় না। ইন্দোনেশিয়া প্রায় তিন বৎসর কাল জাপানের অধীনে ছিল। তিন বৎসরের অধিক কাল হইল ইন্দোনেশিয়া জাপ-কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু স্বাধীনতা এখনও পায় নাই। লিঙ্গাজাতি চুক্তি হওয়ার সময় যে সামান্য আশা দেখা গিয়াছিল, তাহাও এখন লুপ্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ, ১৯৪৭ সালের ২৫শে মার্চ্চ এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর হইতেই উহাকে ব্যর্থ করিবার জন্য ডাচ-সাম্রাজ্যবাদীরা যে-চেষ্টা করিয়া আসিতেছে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইতে বড় বেশী বাকী নাই। তাহাদের এই চেষ্টা ১৯৪৭ সালের ২১শে জুলাই তারিখেই সামরিক আক্রমণের আকার গ্রহণ করে। হল্যাণ্ড ইহাকে পুলিসী কর্ম্মতৎপরতা বলিয়া অভিহিত করিলেও উহার প্রকৃত স্বরূপ কাহারও অজানা নাই। জাতিপুঞ্জের শুভেচ্ছা কমিশনের চেষ্টায় আর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উহার নাম রেনভাইল চুক্তি (Renville Agreement)। এই চুক্তি দ্বারাই হল্যাণ্ড এবং ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রকে পুনরায় আলোচনা চালাইতে

আপনার একান্ত প্রিয় কেশকে যে বাঁচায় শুধু তাই নয়, নষ্ট কেশকে পুনরুজ্জীবিত করে, তাকে আপনি বহুমূল্য সম্পদ ছাড়া আর কি বলবেন? শালিমারের "ভৃঙ্গমিন" এমনই একটি সম্পদ। সামান্য অর্থের বিনিময়ে এই অমূল্য কেশতৈল আপনার হাতে ধরা দেবে। "ভৃঙ্গমিন" পুরাপুরি আয়ুর্ব্বেদীয় মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ত বটেই, তাছাড়াও উপকারী ও নির্দ্দোষ গন্ধ-মাত্রায় সুবাসিত। একই সাথে উপকার আর আরাম······

ভৃঙ্গমিন কিনুন তার বদলে অন্য কিছু নয়।

শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রচারিত

সমত করা সম্ভব হইয়াছে। এই চুক্তিও বাক্ষরিত হইয়াছে প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল। কিন্তু মীমাংসার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

তিন বৎসরের পুরাতন এই বিরোধের মীমাংসার জন্য পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে গত ২৪শে নবেম্বর (১৯৪৮) ডাচ-মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি দল বাটাভিয়ায় আগমন করেন। আলোচনা চালাইবার জন্য তাঁহারা গত ২৭শে নবেম্বর ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানী যোগজাকার্ত্তায় গিয়াছিলেন। ১লা ডিসেম্বরের (১৯৪৮) সংবাদে প্রকাশ যে, চারি দিন আলোচনার পর আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কোন মীমাংসা হয় নাই। ডাচ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি দলের স্বদেশযাত্রার প্রাক্কালে বাটাভিয়ায় মীমাংসার জন্য শেষ মুহূর্তের যে-চেষ্টা হয় তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে। ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী বৎসর অন্তর্বর্ত্তী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সময় ওলন্দাজ সৈন্য সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ও নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার সময়ই অচল অবস্থার উদ্ভব হয়। ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ হাত্তা দাবী করেন যে, অন্তর্বর্ত্তী যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতি ব্যতীত ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে ওলন্দাজ সৈন্য নিয়োগ বন্ধ করিতে হইবে। ডাচ প্রতিনিধি দল দাবী করেন যে, সার্ব্বভৌম কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকিবে ওলন্দাজ হাই কমিশনারের হাতে। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে গুডেন্থা কমিশনের অনেক সদস্য বলিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমানে যে-সকল প্রস্তাব আলোচনার বিষয়, সেগুলি গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রস্তাবের রূপ গুডেন্থা মিশনের মার্কিণ সদস্য Mr. Merle Cochran হল্যাণ্ড এবং ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র উভয় পক্ষের নিকট গত সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, যুক্ত ইন্দোনেশীয় গণ-পরিষদের জন্য এবং জানুয়ারী মাসে অন্তর্বর্ত্তী যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য নির্ব্বাচন হইবে এবং ফেব্রুয়ারী মাসে অন্তর্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হইবে। নূতন গবর্ণমেণ্ট ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা এবং নেদারল্যাণ্ড ইন্দোনেশীয় ইউনিয়নের জন্য বিধান রচনা করিবেন। এই কাজ সম্পন্ন হইলে পর নেদারল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ার হাতে সার্ব্বভৌম কর্তৃত্ব অর্পণ করিবেন। এই প্রস্তাব না কি উভয় পক্ষই গ্রহণ করেন। এত দূর অগ্রসর হওয়ার পর যে কারণে সাম্প্রতিক আলোচনা ব্যর্থ হইল তাহা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। হাই কমিশনার অন্তর্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করিতে পারিবেন না এবং যুক্ত সামরিক ষ্টাফ বোর্ড গঠন করিতে হইবে, এই দুইটি দাবী সাম্রাজ্যবাদী হল্যাণ্ডের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। কারণ, ডাচ-সাম্রাজ্যবাদীরা সমগ্র ইন্দোনেশিয়াকে পুনরায় জয় করিবার অভিপ্রায়ের দিক হইতেই আলোচনা চালাইতেছিলেন।

হয়তো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপেই হল্যাণ্ড পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিল। আবার যদি আলোচনা আরম্ভ হয় তবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপেই আরম্ভ হইবে। ক্ষমতা অধিকার করিবার জন্য ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্টরা যে বিদ্রোহ করিয়াছিল ওলন্দাজদের সাহায্য ছাড়াই ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র এই বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইয়াছে। যদিও বিপদ এখনও কাটে নাই, তথাপি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হয়তো মনে করে যে, কম্যুনিজমের প্রসার নিরোধে ইন্দোনেশিয় প্রজাতন্ত্র একটি প্রধান স্তম্ভস্বরূপ হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গুডেন্থা মিশন নিরাপত্তা পরিষদের নিকট যে চতুর্থ অন্তর্বর্ত্তী রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে, "The truce between the Netherlands and the Indonesian Republic is being increasingly strained towards breaking-point." অর্থাৎ 'নেদারল্যাণ্ড এবং ইন্দোনেশিয় প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির উপর ক্রমেই চাপ এত বাড়িতেছে যে, উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। আবার যদি যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, তাহা হইলে উহার পরিণাম কি হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র অবরোধ অবস্থার মধ্যে দিন কাটাইতেছে। কাহারও নিকট হইতে অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্য পাওয়াও তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের চক্রান্তের ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ইন্দোনেশিয়া-সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছে না। এই সুযোগে ডাচ-সাম্রাজ্যবাদীরা এতই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে যে, ল্যাপষ্টোনে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনের বৈঠকে ইন্দোনেশিয়া উক্ত কমিশনের সহযোগী সদস্যরূপে গৃহীত হইলে নেদারল্যাণ্ডের প্রতিনিধি উক্ত কমিশনের অধিবেশন হইতে চলিয়া যান। ইন্দোনেশিয়াকে সহযোগিরূপে গ্রহণের প্রস্তাব সম্পর্কে ভোটের অবস্থা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বৃটেন, ফ্রান্স ও শ্যাম ভোট দানে বিরত ছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং নেদারল্যাণ্ড এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট দেয় ভারত, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, চীন, ফিলিপাইন এবং সোভিয়েট রাশিয়া।

চীনে গৃহযুদ্ধের শেষ অধ্যায়—

চীনা কম্যুনিষ্টদের নানকিং অধিকারের অভিযান পূর্ণোদ্যমেই চলিতেছে। নানকিং অধিকার করিতে চীনা কম্যুনিষ্টদের কত দিন লাগিবে তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। অবশ্য ইয়াংসী নদী যে একটি দুর্ভেদ্য প্রাকৃতিক বাধা তাহাতে কেহই সন্দেহ করে না। কম্যুনিষ্ট বাহিনীকে এই নদী অবশ্যই পাড়ি দিতে হইবে। কিছু দিন পূর্ব্বে ইয়োলো নদীকেও দুর্ভেদ্য প্রাকৃতিক বাধা বলিয়া গণ্য করা হইত। ইয়োলো নদীর উপর অনেক ভরসাই স্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। নানকিং হইতে প্রেরিত গত ৭ই ডিসেম্বরের (১৯৪৮) সংবাদে প্রকাশ যে, নানকিং-এর সত্তর মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকস্থ সরকারী ব্যূহে ভাঙ্গন ধরাইবার উদ্দেশ্যে ইয়াংসী নদী অতিক্রম করিবার জন্য চীনা কম্যুনিষ্ট বাহিনী বহু জলযান তলব করিয়াছে। চীনের সাধারণ লোকের ধারণা, রাজধানী হিসাবে নানকিং পতন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সরকারী মহল হইতে পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করা সত্ত্বেও রাজধানী নানকিং হইতে ক্যানটনে স্থানান্তরের আয়োজন চলিতেছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের পরিজনবর্গকে দ্রুত স্থানান্তরিত করা হইতেছে। যে-সরকারী লোকজন নানকিং ও সাংহাই পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। সুতরাং নানকিং পতন সম্বন্ধে কাহারই কোন সন্দেহ আর নাই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে কুয়োমিণ্টাং চীনের জন্য অধিকতর সাহায্য আদায়ের চেষ্টা করিবার জন্য মাদাম চিয়াং কাইশেক গত ১লা ডিসেম্বর ওয়াশিংটনে পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিশেষ

কোন সুবিধাই তিনি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ (৪ঠা. ডিসেম্বর, ১৯৪৮) যে, আমেরিকাস্থিত চীনের রাষ্ট্রদূত ডাঃ ওয়েলিংটন কু চীনকে সাহায্য করিবার জন্য চারি দফা প্রস্তাব-সম্বলিত একটি কর্মসূচী প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নিকট দাখিল করিয়াছেন। এই কার্য্যসূচী যদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করে, তাহা হইলে চীনা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনের ভার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে। জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক হয়তো তাহাই চাহিতেছেন। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের ঝুঁকি না লইয়া এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে না। মার্কিণ সামরিক মুখপাত্র 'আর্মি ও নেভী জার্ণালে' চীনা কম্যুনিষ্টদের অগ্রগতি বন্ধ করিতে অসমর্থ হওয়ায় চিয়াং কাইশেকের সেনাপতিদের কঠোর সমালোচনা করা হইয়াছে। ১০ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ওয়াশিংটনস্থ 'নিউইয়র্ক টাইমসের' সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, মাদাম চিয়াং কাইশেক কর্তৃপক্ষকে তাঁহার আবেদনের গুরুত্ব উপলব্ধি করাইতে পারেন নাই এবং কম্যুনিষ্টদিগকে বাধা দান করা চীন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব করিয়া তুলিতে একমাত্র শক্তি হিসাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্দ্ধমান দায়িত্ব সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি করিতেও তিনি সমর্থ হন নাই। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান আধ ঘণ্টাব্যাপী বে-সরকারী বৈঠকে মাদাম চিয়াং কাইশেকের আবেদন বিশেষ সহানুভূতি সহকারেই শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ মহল মনে করেন, সহানুভূতির অর্থ মাদাম চিয়াং কাইশেকের পরিকল্পনা গ্রহণ করা বলিয়া মনে করা সমীচীন নহে। ইকনমিক কো-অপারেশন এডমিনিষ্ট্রেটর মিঃ পল জে. হফম্যান চীনে গিয়াছেন। মাদাম চিয়াং কাইশেকের আবেদনের সহিত তাঁহার চীনে যাওয়ার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই প্রকাশ। চীনে ই-সি-এর (E C A) কাজ কিরূপ সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইতেছে তাহা পরিদর্শন করাই না কি তাঁহার চীনে যাওয়ার উদ্দেশ্য।

নানকিং হইতে ৮ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক তাঁহার অন্তরঙ্গদের কাছে বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্টদের সহিত সংগ্রাম ব্যর্থ হইলে তিনি নানকিংস্থ সান ইয়াৎসানের স্মৃতিসৌধে আত্মহত্যা করিবেন। তাঁহার এই উক্তির মধ্যে একটা অভিমান ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার এই আত্মহত্যার সঙ্কল্প ঘোষণায় কোয়ামিণ্টাং গবর্ণমেণ্ট সামরিক শক্তিতে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবে ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তিনি যদি সান ইয়াৎসানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে চীন গৃহযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইত না। গত ১০ই ডিসেম্বর জেঃ চিয়াং কাইশেক সমগ্র চীনে সামরিক আইন জারী করিয়াছেন। যেখানে সামরিক শক্তিরই মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সেখানে সামরিক আইন জারী করার কোন সার্থকতা নাই। আজ সমগ্র চীন কম্যুনিষ্টদের অধিকারে চলিয়া যাইবার প্রবল সম্ভাবনার মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পাওয়ার ভরসা করিবার মত কিছুই দেখা যাইতেছে না। মিঃ বেভিন কমন্স সভায় চীনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করার নীতিই ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, "শান্তি প্রতিষ্ঠিত এবং পুনর্গঠন কার্য্য আরম্ভ হইলে আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করিব।" তাঁহার এই উক্তি খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, মিঃ বেভিনের বিবৃতি চীনা কম্যুনিষ্টদের অধিকৃত চীনে বৃটিশারদের পূর্ব্বেরই মতই ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা আরও মনে করেন যে, আমেরিকার অভিপ্রায়ও উহা হইতে স্বতন্ত্র নয়। বস্তুতঃ, কম্যুনিষ্টদের অধিকৃত চীনে বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষা করিবার ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহ আমেরিকার দেখা দিতেছে।

কম্যুনিজমের প্রসার নিরোধ করিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কুয়োমিণ্টাং চীনকে আরও সাহায্য করিবে কি না সে-সম্বন্ধে জেঃ চিয়াং কাইশেকের মনেও বোধ হয় সন্দেহ জাগিয়াছে। বস্তুতঃ নবেম্বর মাসের (১৯৪৮) শেষ ভাগে ডাঃ সান ফুকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করার উদ্দেশ্য যে আমেরিকার সমর্থন লাভের চেষ্টা তাহাতে সন্দেহ নাই। জেঃ চিয়াং কাইশেক হয়তো মনে করিয়াছেন, ডাঃ সান ফুকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করিলে চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি আমেরিকার আস্থা ফিরিয়া আসিবে। ডাঃ সান ফু-ও বোধ হয় আমেরিকার সাহায্য সম্বন্ধে খুব আশান্বিত নহেন। সাংহাই হইতে ৪ঠা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মাদাম চিয়াং কাইশেক যদি চীনের জন্য পর্য্যাপ্ত মার্কিণ-সাহায্যের ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তাহা হইলে নবনিযুক্ত প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সান ফু নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কম্যুনিষ্টদের নিকট শান্তির প্রস্তাব করিবেন। সাংহাই হইতে ১১ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, চীনের ওয়াকিবহাল রাজনৈতিক মহলের ধারণা যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চীনা কম্যুনিষ্টদের সহিত শান্তি-চুক্তির জন্য আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য চিয়াং কাইশেকের উপর চাপ দিতেছে। ওয়াশিংটনে মাদাম চিয়াং কাইশেকের মারফৎ এবং নানকিংস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূত ডাঃ লাইটন ষ্টুয়ার্টের মারফৎ না কি এই চাপ দেওয়া হইতেছে। এ সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, হোয়াইট হাউস কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। চীনা কম্যুনিষ্টরা অতি দ্রুত জয়ের পথে অগ্রসর হইতেছে। আলাপ-আলোচনা চালাইতে গেলেই যুদ্ধ-বিরতির কথা উঠিবে। আসন্ন বিপুল বিজয়ের সম্মুখে কম্যুনিষ্টরা যুদ্ধ-বিরতিতে রাজী হইবে কি? তাহারা হয়তো মনে করিবে যে, যুদ্ধ-বিরতির অর্থ শক্তি বৃদ্ধির জন্য চিয়াং কাইশেককে সময় দান মাত্র। আর একবার যখন শান্তির প্রস্তাব করা হইয়াছিল তখন চিয়াং কাইশেক যেরূপ অশোভন দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে-কথাও এই প্রসঙ্গে মনে না পড়িয়া পারিবে না।

লাল চীন ও তাহার প্রতিক্রিয়া—

সমগ্র চীনে কম্যুনিষ্ট-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায়, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে, এই প্রশ্ন কেহই আর এখন উপেক্ষার বিষয় বলিয়া মনে করেন না। চীনের তথাকথিত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে চীনের অবস্থা কিরূপ হইবে, সে-সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন, ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড চীনের অস্তিত্ব আর থাকিবে না, চীন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। সকলে এইরূপ ধারণা পোষণ করেন না। বস্তুতঃ, কম্যুনিষ্টরা চীনকে ঐক্যবদ্ধ রাখিতে

পারিবে না কেন, তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। চীন ঐক্যবদ্ধ থাকিলেও তাহার অর্থনৈতিক অবস্থার কোন উন্নতি হইবে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন না। আমেরিকার নিকট হইতে অর্থসাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতি, চোরা-কারবার, মুদ্রাস্ফীতি এবং গৃহ-বিবাদের জন্ত কুয়োমিণ্টাং চীন চীনের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন উন্নতি তো করিতে পারেই নাই, অধিকন্তু চীনের অর্থনৈতিক দুর্গতি চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। কিয়োমিণ্টাং চীনের রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্ব্বলতার কারণও এইখানেই। লাল চীনেও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইবে না, বরং অর্থনৈতিক দুর্গতি আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা বিদেশের অর্থনৈতিক সাহায্যের উপর একান্ত বিশ্বাসী। লাল চীনের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্ত আর্থিক সাহায্য দিবার মত সামর্থ্য সোভিয়েট রাশিয়ার নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতেও লাল চীন অর্থ সাহায্য পাইবে না। কাজেই কম্যুনিষ্টদের পক্ষে চীনের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হইবে না। ফলে লাল চীনে চরম অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

কেহ কেহ মনে করেন, চীনের কম্যুনিষ্টরা যতখানি কম্যুনিষ্ট তাহা অপেক্ষা বেশী জাতীয়তাবাদী। কাজেই রুশ-মার্কা কম্যুনিজম ও বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যে 'বাফার ষ্টেট' হিসাবে লাল চীনকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান করা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তব্য হইবে। অর্থনৈতিক সাহায্য না দিলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র লাল চীনের সহিত বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কেহ কেহ প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী রাশিয়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বাহির হইতে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য না পাইলেও কম্যুনিষ্টরা চীনের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় লাল চীনের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে তাহা ভাবিয়াই অনেকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতেছেন। তাঁহারা মনে করেন, লাল চীনের সাফল্য এবং প্ররোচনায় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহের অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ মনে করেন, লাল চীনের কম্যুনিষ্টরা তাহাদের রাজনৈতিক শক্তিকে সংহত করিবার এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে এত ব্যাপৃত থাকিবে যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কম্যুনিষ্ট-বিদ্রোহের প্ররোচনা দিবার মুহূর্ত্ত সময়ও তাহারা পাইবে না। কিন্তু চীনে কম্যুনিষ্টদের সাফল্য দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কম্যুনিষ্টদিগকে বিদ্রোহে উৎসাহিত করিবার আশঙ্কা তাঁহারাও উপেক্ষা করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ প্ররোচনা না দিলেও চীনের কম্যুনিষ্টরা যে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিজমের ভাবধারা প্রচারে প্রধান সহায় হইবে, তাহাও উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ভিয়েটনাম প্রজাতন্ত্র প্রকৃত পক্ষে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুই নয়। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ইন্দোচীনে একটি জাতীয়তাবাদী গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু ডাঃ হো চি মিনের বিরুদ্ধে এই তাঁবেদার জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সমগ্র চীনে কম্যুনিষ্ট অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার প্রতিক্রিয়া ইন্দোচীনে কিরূপ হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। মালয়ে কম্যুনিষ্টদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পূর্ণরূপে দমন করা এখনও সম্ভব হয় নাই। ইন্দোনেশিয়ায় ক্ষমতা অধিকারের জন্ত কম্যুনিষ্টরা বিদ্রোহ করিয়াছিল। হল্যাণ্ড এই বিদ্রোহ দমনে কোনরূপ সাহায্য না করিলেও ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র এই বিদ্রোহ আপাততঃ দমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা এখনও জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া মাঝে-মাঝে হঠাৎ আক্রমণ করিতেছে। ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট ১২ই ডিসেম্বর (১১৪৮) ঘোষণা করিয়াছেন যে, ডাচ-ইন্দোনেশিয়া বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে এবং প্রজাতন্ত্র-বহির্ভূত এলাকায় অবিলম্বে অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই অবস্থায় ক্ষমতা অধিকারের জন্ত কম্যুনিষ্টরা যদি আবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সাফল্য লাভ করা বোধ হয় কঠিন হইবে না। প্রজাতন্ত্র-বহির্ভূত এলাকায় উহার প্রতিক্রিয়া উপেক্ষার বিষয় হইবে না। ব্রহ্মদেশে কম্যুনিষ্ট-বিদ্রোহ প্রশমিত করা সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু বিপদ কাটে নাই। ব্রহ্মদেশের সুদীর্ঘ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বাহির হইতে কম্যুনিষ্টদের প্রবেশ নিরোধ করাও অসম্ভব। থাকিন নু গবর্ণমেণ্টের বামপন্থী প্রীতিও উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। শ্যাম দেশে সঙ্করামের গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়হস্তে কম্যুনিষ্ট দমনের যেমন ব্যবস্থা করিয়াছেন, তেমনি উদারনৈতিক দলেরও গলা চাপিয়া ধরিতে ত্রুটি করেন নাই। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট চরম বামপন্থীদের অভ্যুত্থানের সম্মুখে এইরূপ গবর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিয়া পড়ার আশঙ্কাও উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই কম্যুনিজম নিরোধের প্রধান স্তম্ভরূপে শ্যামের সঙ্করাম গবর্ণমেণ্টকে শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করিতেছে। ৩রা আগষ্ট তারিখে মালয়ে সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্ত উ তিয়েনওয়াং যে-পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার সংবাদ পাইয়াই মালয়ের বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করিবার জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থাই শুধু গ্রহণ করেন নাই, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় বৃটিশ-অধিকার রক্ষার জন্ত কম্যুনিজমবিরোধী পরিকল্পনা গঠনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন। তদনুসারে ৬ই আগষ্ট সিঙ্গাপুরে এক সম্মেলন আহূত হয়। হংকং-এর গবর্ণর, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কমিশনার জেনারেল, মালয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্থায়ী হাই-কমিশনার এবং সারওয়াকের গবর্ণর এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া তিন দিন ধরিয়া গোপনে আলোচনা করেন। ইহার পরেই কম্যুনিজম নিরোধের জন্ত মালয়ের বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ইন্দোনেশিয়ার ডাচ কর্ত্তৃপক্ষ এবং শ্যামের সঙ্করাম গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। সম্প্রতি ৮ই ডিসেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট দমনের জন্ত বৃটেন ও শ্যাম ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। আমেরিকাও ব্রহ্মের সঙ্করাম গবর্ণমেণ্টকে শক্তিশালী করিতে ইচ্ছুক।

সমগ্র চীনে কম্যুনিষ্ট অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেও কম কঠিন সমস্যা দেখা দিবে না। রাশিয়া চীনের নূতন কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইতে চাহিবে, কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গ চিয়াং কাইশেকের গবর্ণমেণ্ট যেখানেই থাকুক না কেন তাহাকেই চীনের গবর্ণমেণ্ট বলিয়া গণ্য করিবার দাবী ছাড়িবে না। এইরূপ অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে কাজ চালান অসম্ভব হইয়া উঠিবে। নিরাপত্তা পরিষদে যে পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্র স্থায়ী সদস্য তাহাদের মধ্যে চীন ও ফ্রান্স অন্যতম। উভয়ের ঘাড়েই বৃহৎ রাষ্ট্রের মর্য্যাদা জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উভয় রাষ্ট্রই বিনা আপত্তিতে মার্কিণ

যুক্তরাষ্ট্রের মতে মত দিয়া থাকে। চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্টই হইবে প্রকৃত পক্ষে চীনের গবর্ণমেণ্ট এবং এই গবর্ণমেণ্টই নিরাপত্তা পরিষদের জন্য সদস্য মনোনয়নের অধিকার দাবী করিবে। রাশিয়া কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্টকে এবং বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিবে। উভয় পক্ষেরই ভেটো ক্ষমতা রহিয়াছে। কাজেই এই প্রশ্নের সমাধান হওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। চীনের বাহিরে চীনের গবর্ণমেণ্টরূপে চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্টের অবস্থান চীনের শান্তি ও উন্নতির পক্ষে কল্যাণকর হইবে কি না, তাহাও খুব গুরুতর প্রশ্ন। চীনের নির্ব্বাসিত জাতীয়তাবাদী গবর্ণমেণ্ট পুনরায় চীনদখলের চেষ্টায় বিরত থাকিবে, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। কাজেই সমগ্র চীন কম্যুনিষ্টদের অধিকারে যাওয়ার পরেও, চীনের বাহিরে জাতীয়তাবাদী চীন গবর্ণমেণ্টের অবস্থান, গৃহযুদ্ধের সমাপ্তির পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করিবে।

এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য অর্থনৈতিক সম্মেলন—

এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক চতুর্থ অধিবেশন ব্যর্থতার মধ্যেই সমাপ্ত হইয়াছে। গত ২১শে নবেম্বর (১৯৪৮) অষ্ট্রেলিয়ার ল্যাপষ্টোন সহরে এই অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশন শেষ হয় ১১ই ডিসেম্বর (১৯৪৮)। আঠারটি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। যে বিপুল আশা লইয়া এই অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল, অধিবেশনের শেষে তাহা অপূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। এই কমিশনের (E.C.A.F.E) প্রধান উদ্দেশ্যই হইল, এশিয়ার পুনর্ব্বসতি ও পুনর্গঠনের জন্য কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ করা। কমিশনের ওয়াকিং পার্টি কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি পঞ্চম বার্ষিকী ব্যাপক পরিকল্পনা (master plan) রচনা করিয়াছিলেন। ইহার জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তাহা এক দিতে পারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, আর দিতে পারে বিশ্ব-ব্যাঙ্ক। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলেন, ইউরোপকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা একান্তই প্রয়োজন এবং ইউরোপ তাহার জন্য প্রস্তুতও হইয়াছে। পক্ষান্তরে এশিয়ার অবস্থা এখনও অশান্ত। ইহার জন্যই প্রচুর পরিমাণে ঋণ দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

এই অধিবেশনে একটি মাত্র ভাল কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়াকে এই কমিশনের সহযোগী সদস্য করার প্রশ্ন লইয়া গত তিনটি অধিবেশনে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছে। এই অধিবেশনে ভোটের সংখ্যাধিক্যে ইন্দোনেশিয়া সহযোগী সদস্যরূপে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু হল্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা রাগ করিয়া অধিবেশন ছাড়িয়া চলিয়া যান। এই অধিবেশনে যে ১৭টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে জাপানের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধি করার সুপারিশ অন্যতম। কিন্তু জাপানের সহিত বাণিজ্যিক আদান-প্রদান হইবে ষ্টার্লিং-এর ভিত্তিতে। কাজেই জাপানের সহিত বাণিজ্য বাড়িলেও ডলার পাওয়া সম্ভব হইবে না।

আরব-প্যালেষ্টাইন ও রাজা আবদুল্লা—

প্যালেষ্টাইনের আরব-ইহুদী বিরোধটা যেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের মধ্যে 'টাগ অব্‌ ওয়ারে' পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বার্ণাডোট পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বৃটেন যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে খুশী করিবার জন্য বার তিনেক সংশোধনের পর উহার বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত প্যালেষ্টাইনের জন্য আপোষ-কমিশন নিয়োগ করিয়া সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে বার্ণাডোট-পরিকল্পনার কিছুই আর অবশিষ্ট রহিল না। কিন্তু অন্য উপায়ে উহাকে চালু করিবার চেষ্টা চলিতেছে, জেরিকোতে ট্রান্সজর্ডানের রাজা আবদুল্লার সমর্থকদের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে রাজা আবদুল্লাকে আরব-প্যালেষ্টাইনের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনকে ট্রান্সজর্ডানের সহিত সংযুক্ত করিবার প্রস্তাব রাজা আবদুল্লার মন্ত্রিসভাও অনুমোদন করিয়াছেন। রাজা আবদুল্লাও নিজেকে প্যালেষ্টাইন ও ট্রান্সজর্ডানের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আরব-মহল হইতে অবশ্য বলা হইয়াছে যে, জেরিকোতে যে সম্মেলন হইয়াছে তাহা প্যালেষ্টাইনের আরব আশ্রয়প্রার্থীদের সভা ছাড়া আর কিছুই নয়। আরব রাষ্ট্রসমূহের পক্ষ হইতে কোন কথা বলিবার এই সম্মেলনের নাই। এদিকে নিরাপত্তা পরিষদের স্যাংশন কমিটিতে বৃটেন এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছে যে, ইসরাইল সৈন্য দুইটি ক্ষেত্রে টান্সজর্ডান সীমান্তে হানা দিয়াছে এবং ইহার ফলে টান্সজর্ডানের সহিত চুক্তি অনুযায়ী বৃটেন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে পারে। ইসরাইল গবর্ণমেণ্ট দুইটি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে, বৃটেন আরব সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করিতেছে। আরব-প্যালেষ্টাইনকে টান্সজর্ডানের সহিত সংযোগ করিয়া নিজেকে হাসেমী যুক্তরাষ্ট্রের অধিপতি বলিয়া রাজা আবদুল্লার ঘোষণা যে বৃটিশেরই একটা চাল তাহাতে সন্দেহ নাই। বার্ণাডোট-পরিকল্পনায় নেগেভ অঞ্চল হইতে ইহুদীদিগকে বঞ্চিত করিবার এবং আরব-প্যালেষ্টাইন ট্রান্সজর্ডানের সহিত যুক্ত করার সুপারিশ করা হইয়াছে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জন্যই বৃটেন ঐ পরিকল্পনা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে দিয়া গ্রহণ করাইতে পারে নাই। কাজেই অন্য উপায়ে নেগেভ অঞ্চল সহ আরব-প্যালেষ্টাইন রাজা আবদুল্লাকে দিবার চেষ্টা চলিতেছে। টান্সজর্ডান মধ্য-প্রাচীতে বৃটিশ-প্রভাবাধীন দেশ। এই জন্য রাজা আবদুল্লার দাবী বৃটিশের সমর্থন লাভ করিতেছে। তিন জন সদস্য লইয়া যে আপোষ কমিশন গঠিত হইয়াছে তাহার হাতেই প্যালেষ্টাইন-সমস্যা সমাধানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সঙ্গত মনে করিলে যে কোন সুপারিশ করিবার অধিকার এই কমিশনের আছে। নেগেভ অঞ্চল না পাইলে ইসরাইল রাষ্ট্র যে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র হইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কমিশন কি ইহুদীদিগকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবার সুপারিশ করিবেন? আপোষ-কমিশনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও রহিয়াছে। এই কমিশনের সুপারিশ রচনায় মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গণ-পরিষদ

বিচার ও শাসন বিভাগ—

ভারতীয় গণ-পরিষদে শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথক্ করা সংক্রান্তে ডঃ আম্বেদকর প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, "শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইবার তিন বৎসরের মধ্যে যাহাতে শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক্ করার ব্যবস্থা হয়, তাহার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।" পরের দিন তিনি নিজেই তাঁহার প্রস্তাবের একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যাহার উদ্দেশ্য মূল প্রস্তাব হইতে 'তিন বৎসর' কথাটি বাদ দেওয়া। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত কুঞ্জরু বলেন যে, এই সংস্কারটি যথাসম্ভব দ্রুত সম্পন্ন হউক তাহা গবর্ণমেণ্ট চান না বলিয়াই সংশোধন প্রস্তাবের অবতারণা। মূল প্রস্তাবের সময়ের মেয়াদ তুলিয়া দেওয়ার অর্থ এই যে, রাষ্ট্র এই সংস্কারের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না। পণ্ডিত নেহরু ইহার উত্তরে বলেন যে, এই পরিষদে উত্থাপিত যে কোন বিষয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পেশ করা হইয়াছে, এইরূপ মনে করা অসঙ্গত। এই উক্তির ফর্মের দিক্ দিয়া যুক্তি আছে। কিন্তু বাস্তব দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, যাঁহারা ভারত গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছেন। (অর্থাৎ কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব), তাঁহারাই গণ-পরিষদেও নেতৃত্ব করিতেছেন এবং গণ পরিষদে কংগ্রেস-মনোনীত সদস্য-সংখ্যাই বেশী। কাজেই পণ্ডিত কুঞ্জরু কোন অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেন নাই। 'তিন বৎসর' কথাটি তুলিয়া দিবার সমর্থনে পণ্ডিত নেহরু যুক্তি দিয়াছেন, "তিন বৎসর খুবই দীর্ঘকাল। এত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন কি? ইহার চেয়ে অল্প সময়ে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে।" কথার মার-প্যাঁচে যুক্তিটি খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, কিন্তু ইহাই কি সত্য কারণ?

পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ দেশের বর্ত্তমান শাসকদের সম্বন্ধে বিহার সরকারের বিচার বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া বলেন, "ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য এত দিন যাঁহারা সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন, বিচার ও শাসন-ক্ষমতার একত্র সমাবেশ ঘটিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা যে কতখানি বিপন্ন হয়, সে কথা তাঁহাদের অজানা নয়। অথচ এই বেদনাদায়ক অবস্থার উন্নতির জন্য যাঁহারা শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা এই ত্রুটির সংশোধনের জন্য এ যাবৎ প্রায় কিছুই করেন নাই। ক্ষমতা হাতে পড়িলেই যে মানুষের অবনতি ঘটে, তাঁহাদের আচরণে এই কথাই প্রমাণিত হয়।" নিজ দলীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহারা কি না করিতেছেন! ন্যায়বিচার স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি দিতেছেন। যে অডিন্যান্স-রাজত্ব এত দিন দেশবাসী সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিত, আজ তাহাই কায়েম হইতে বসিয়াছে।

পণ্ডিতজী শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "যদি কোন প্রাদেশিক সরকার তিন বৎসরের পূর্ব্বেই বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক্ করিতে পারেন, তাঁহাকে এই 'তিন বৎসর' কথাটি দিয়া আটকাইয়া রাখা ঠিক হইবে না।" এই সম্পর্কে সার ক্লিফোর্ড আগরওয়ালা বলিয়াছেন যে, "কিছুদিন পূর্ব্বে বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক্ করার একটি পরিকল্পনার কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখন তাহা ধামা-চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি? ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে যে ব্যবস্থাকে সকলে অপরিহার্য্য মনে করিতেন, আজ তাহার সমর্থন নাই কেন? এক কালে যাঁহারা এই পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বা আজ নীরব কেন?" উত্তর তিনি নিজেই দিয়াছেন,—"ক্ষমতা হাতে আসিলেই মানুষের অবনতি ঘটে।" ইহার অধিক সদুত্তর হইতে পারে না।

অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ—

ভারতীয় গণ-পরিষদে অস্পৃশ্যতাকে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া শাসনতন্ত্রে একটি ধারা গৃহীত হইয়াছে। রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সমস্ত নাগরিকই সমান, সুতরাং ধর্ম্ম, বর্ণ, জাতি অথবা স্ত্রী-পুরুষভেদে যে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণই নিষিদ্ধ করিয়া আইনগত দিক্ হইতে ভারতীয় সমাজের একটা কলঙ্ক দূর করিবার ব্যবস্থা যে প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল আইন থাকিলেই আইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? আধুনিক ভারতে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের সমস্যা দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অজ্ঞতা দূর করার সমস্যা হইতে ভিন্ন কিছু নহে। সমাজে আজ যাহারা তথাকথিত নিম্নশ্রেণী বলিয়া পরিচিত, তাহাদের অধিকাংশই দরিদ্র ও অশিক্ষিত। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর সহিত সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া ইহাদের পার্থক্য এতই অধিক যে, পার্থক্য দূর না হইলে সমস্যা সমাধানের কোন উপায় নাই।

মৌলিক অধিকার—

ভারতীয় গণ-পরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ১৩ নং ধারায় ভারতীয় নাগরিকদের সাত রকম স্বাধীনতার কথা আছে:

(১) কথা বলার এবং মনের ভাব প্রকাশ করার স্বাধীনতা,

(২) শান্তিপূর্ণ ভাবে এবং নিরস্ত্র হইয়া সমবেত হওয়ার স্বাধীনতা,

(৩) সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা,

(৪) ভারতের সর্ব্বত্র স্বাধীন ভাবে চলা-ফেরা করিবার অধিকার,

(৫) ভারতের যে কোন অংশে বাস করার স্বাধীনতা,

(৬) কোন সম্পত্তি অর্জ্জন করা, উহার মালিক থাকা এবং উহা হস্তান্তর করিবার স্বাধীনতা,

(৭) যে কোন বৃত্তি গ্রহণ অথবা যে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনের স্বাধীনতা।

আপাত দৃষ্টিতে এইগুলি মোটেই মন্দ বলিয়া মনে হইবে না। কিন্তু পাঁচটি উপধারায় এই সকল স্বাধীনতা যে-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা বাদ দিয়া মৌলিক অধিকারের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। খসড়া শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা পরিষদ এবং শাসন-কর্তৃপক্ষকে যদি মৌলিক অধিকার সমূহ সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে মৌলিক অধিকার অর্থহীন হইয়া পড়ে।

অধ্যাপক কে, টি, শা তাঁহার সংশোধন প্রস্তাবে 'চিন্তা ও উপাসনা' এবং 'সংবাদপত্র ও সংবাদ প্রকাশের' স্বাধীনতা মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভূক্ত করিবার কথা বলিয়াছেন। অতীতে যাঁহারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, রাষ্ট্রশক্তি হাতে পাইয়া তাঁহারাই খসড়া শাসনতন্ত্র রচনার সময় উহাকে মৌলিক অধিকারভুক্ত করেন নাই। ইহাকে ভুল বলিয়া মনে হয় না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্রে উহা বাদ রাখার ব্যবস্থা অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। শ্রীযুক্ত কামাথ তাঁহার সংশোধন প্রস্তাবে প্রত্যেক নাগরিকেরই আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র রাখিবার অধিকার দাবী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবেও এই দাবী সমর্থন করা হইয়াছিল।

ভোটদানের অধিকার মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। এই অধিকার যদি শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভূত না হয় এবং প্রচলিত আইন যদি অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় নাগরিকদের যে অত্যন্ত অসুবিধা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে বলিতে গেলেই সিডিশন বা রাজদ্রোহের কথাও স্বতঃই আসিয়া পড়ে। মূল ধারায় রাজদ্রোহ কথাটির অস্তিত্ব খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪(এ) ধারাটি রাজদ্রোহ সম্পর্কে। বৃটিশ আমলে এই ধারাটির এত ব্যাপক অর্থ করা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে যে কোন সমালোচনাকেই রাজদ্রোহ বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়। এই জন্য শ্রীযুক্ত কে, এম, মুন্সী 'রাজদ্রোহ' শব্দটি বাদ দিবার জন্য সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। এই শব্দটি যদি মূলধারা হইতে বাদ দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সরকারী কোন কাজেরই ন্যায়-সঙ্গত সমালোচনা করাও সম্ভব হইবে না। আমাদের নেতৃবর্গ মুখে সর্ব্বদাই গণতন্ত্রের বুলি আওড়ান, কিন্তু যে ভাবে মৌলিক অধিকারের বিধান রচিত হইতেছে, তাহাতে স্বাধীন ভারতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকিবে না।

মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের বিধান—

ভারতীয় গণ-পরিষদের অধিবেশনে জনসাধারণকে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার সমূহ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার অধিকার প্রদান করিয়া যে ধারাটি গৃহীত হইয়াছে, তাহা যে সত্যই গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাঃ আম্বেদকর এই ২৫ নং ধারাটিকে খসড়াতন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধারা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, কেবল মৌলিক অধিকার প্রদানই যথেষ্ট নহে, সেগুলির সংরক্ষণের বিধান ছাড়া কোন শাসনতন্ত্রই পূর্ণাঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কিন্তু এই ধারায় জনসাধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করা ব্যয়বহুল ব্যাপার। কোন দরিদ্রের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে শাসনতন্ত্রে ২৫ নং ধারায় বিধান সত্ত্বেও শুধু দারিদ্র্যের জন্যই প্রতিকারপ্রার্থী হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। অথচ ভারতের ৩০ কোটি অধিবাসীর মধ্যে ২১ কোটি ৮০ লক্ষ লোকই দরিদ্র। ডাঃ আম্বেদকরের ২৫ নং ধারার ৩ নং উপধারায় যে সংশোধন প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, সুপ্রীম কোর্টকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া যে কোন আদালতকে স্বীয় এলাকায় সেই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দিতে পারিবেন। কিন্তু বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক্ না করা পর্য্যন্ত এই উপধারার কোন ফলই হইবে না। শাসনতন্ত্রে এই দুইটি বিভাগকে পৃথক্ করিবার নির্দ্দেশ আছে বটে, কিন্তু ঐ নির্দ্দেশকে বাধ্যতামূলক এবং কার্য্যকরী করিবার কোন বিধান রচিত হয় নাই। ২৫ নং ধারার ১ নং উপধারায় মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, ৪ নং উপধারায় তাহা আবার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। ৪নং উপধারায় বলা হইয়াছে যে, এই ধারায় যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, শাসনতন্ত্র-বিহিত বিধান ব্যতীত উহা স্থগিত রাখা যাইবে না। কিন্তু শাসন-ব্যবস্থা বিপন্ন হওয়ার কারণ ঘটিয়াছে কি না তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব শাসন-কর্তৃপক্ষের। তাঁহারা নিজেদের কর্তৃত্ব বহাল রাখার প্রয়োজনে যে কোন সময়েই বা অতি সামান্য কারণেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া জনসাধারণকে ২৫ নং ধারার অধিকার প্রয়োগ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার কেহ থাকিবে না।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা—

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে ভারতীয় গণ-পরিষদে একটি অনুচ্ছেদ গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে প্রথমে বলা হইয়াছে, "সম্পূর্ণরূপে সরকারী অর্থে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে না।" ইহার পরেই বলা হইয়াছে,—"কিন্তু যে সকল বিদ্যালয় ধর্ম্মশিক্ষা দানের সর্ত্তে কোন দান বা ট্রাষ্ট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সকল বিদ্যালয় রাষ্ট্র কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেও ঐগুলির প্রতি এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।" উক্ত অনুচ্ছেদের অপর এক অংশে বলা হইয়াছে,—"কোন শিক্ষায়তনের ছুটির পর উহাতে কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ছাত্রদিগকে ঐ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশিক্ষা-দানে বাধা নাই।" উল্লিখিত বিধানগুলির আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, আমাদের শাসনতন্ত্র রচয়িতারা বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে মতৈক্য স্থির করিতে পারেন নাই। যে সকল পরস্পরবিরোধী বিধান তাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাহার ফলে কতকগুলি বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইবে এবং কতকগুলিতে হইবে না।

হিন্দু-পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা বহু হইলেও বিদ্যালয়ে হিন্দু-ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। এই দিক্ দিয়া যদি বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায়, হিন্দুদের অর্থে ও পরিচালনে চালিত বিদ্যালয়-গুলিই প্রকৃতপক্ষে লৌকিক বিদ্যালয়। কোন ধর্ম্ম-ব্যবস্থাই এই সকল বিদ্যালয়ে নাই। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ মুখে লৌকিক রাষ্ট্রের কথা বলিলেও কার্য্যতঃ বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে যে বিধান রচনা করিলেন, তাহাতে লৌকিক রাষ্ট্র গঠনের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সরকারী অর্থে পরিচালিত বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দান নিষিদ্ধ করিয়া

যে মূল ধারা রচিত হইয়াছে, তাহাও বানচাল হইয়া গিয়াছে পরবর্ত্তী উপধারাগুলির দ্বারা। ফলে ভারতের বিদ্যালয়ে খৃষ্টানধর্ম্ম ও মুসলমানধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা হইবে মাত্র। সর্ব্বোপরি বিদ্যালয়ে ছুটির পর কোন সম্প্রদায়ের ছাত্রদিগকে ঐ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশিক্ষা দিবার যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমাদের কাছে আরও বেশী মারাত্মক বলিয়া মনে হয়। কারণ, হিন্দুদের অর্থে ও পরিচালনায় চালিত বিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদিগকে ঐ স্কুল-গৃহে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য মুসলমান সম্প্রদায় অনায়াসে দাবী করিতে পারিবে। স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের এই দাবী পূরণ না করিলে তাঁহারা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া অভিহিত হইবেন এবং লৌকিক রাষ্ট্রের কোপে পড়িয়া বিদ্যালয়টি উঠিয়াও যাইতে পারে।

—

সর্দ্দারজীর সুভাষিতাবলী

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছেন, "রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক এই দুইটি দিক্ হইতেই দেশ এক অতলস্পর্শী গহ্বরের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং পাদক্ষেপে একবার ভুল হইলেই ধ্বংস অনিবার্য্য। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে, উৎপাদন প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ে নাই, একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানীর 'ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে এবং এই ব্যয় বহন করা দেশের পক্ষে সম্ভব নয়।" উৎপাদন হয়ত আশানুরূপ বাড়ে নাই, কিন্তু গত বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে এ পর্য্যন্ত ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পের উৎপাদন শতকরা ১৬ ভাগ বাড়িয়াছে। অথচ দাম না কমিয়া বাড়িয়াই

লাটপ্রাসাদে সাংবাদিক সম্মেলন

প্রথম সারিতে—(বাম হইতে দক্ষিণে) ভারতের গভর্ণর জেনারেল রাজাজী, শ্রীভবতোষ ঘটক, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আগরওয়ালা, শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য্য (আনন্দবাজার)। দ্বিতীয় সারিতে—শ্রীসুধীন্দ্রলাল ঘোষ (যুগান্তর), শ্রীঅজিত বসু-মল্লিক (হিন্দবার্ত্তা), শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার রায় (এডভান্স). শ্রী, কে, এন, রামনাথম্ (এসোসিয়েটেড প্রেস ও রয়টার), শ্রীরমেন গোস্বামী (বসুমতী)। তৃতীয় সারিতে—শ্রীকালীপদ বিশ্বাস (অমৃতবাজার), শ্রীবিজয় দাশগুপ্ত (যুগান্তর), শ্রীঅনিলধন ভট্টাচার্য্য (হিন্দবার্ত্তা), শ্রীমাধব ভট্টাচার্য্য (এসোসিয়েটেড প্রেস), শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (কিশোর), শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগীয় ডিরেক্টর), শ্রীপুণ্যপ্রিয় দাশগুপ্ত (ইউনাইটেড প্রেস), শ্রীসত্যেন সেন (অমৃতবাজার), মিঃ আবদুল গণি (ইত্তেহাদ) প্রভৃতিকে দেখা যাইতেছে।

চলিয়াছে। সুতরাং উৎপাদন কম বলিয়া মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। কারণ স্বতন্ত্র।

সর্দ্দারজী জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের জন্ত তাঁহারা যে পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন, তাহাতে জীবনযাত্রার ব্যয় আরও বাড়িবে এবং শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও অন্তান্ত ধনীদের হাতে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন,—"আজ যে সময়ে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, সেই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছে। আদর্শগত পার্থক্যের জন্ত নয়, শুধু নেতৃত্ব লইয়া সংগ্রাম।" সহজ অর্থ এই যে, কংগ্রেস ব্যতীত আর সকল দলই স্বার্থান্বেষী, অতএব জনসাধারণকে অন্ত কোন দলে টানিবার অধিকার কাহারও নাই। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বাত্মক যুদ্ধে জনসাধারণই দেশরক্ষার দ্বিতীয় ব্যূহ। অন্ত কোন রাজনৈতিক দল না থাকিলে কেবল মাত্র কংগ্রেসের অর্থাৎ শাসকদের নেতৃত্বে সজীব প্রাণবাণ ভারতীয় জাতি গড়িয়া উঠিবে না।

সর্দ্দার প্যাটেল প্রাদেশিকতারও নিন্দা করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্রাদেশিকতা কি, তাহা বুঝিতে হইলে পশ্চিম-বঙ্গে যাওয়া প্রয়োজন। সেখানে পাঞ্জাবীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালীকে ট্যাক্সির লাইসেন্স দেওয়া হয়। বিহারে ও আসামে যখন বাঙ্গালীকে জোর করিয়া মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে হিন্দী ও অসমীয়া ভাষা শিখান হয়, তাহা প্রাদেশিকতা হয় না। কিন্তু বিহারের বাঙ্গালাভাষাভাষী অঞ্চল দাবী করিলেই প্রাদেশিকতা হয়। অন্ত প্রদেশে বাঙ্গালীকে চাকরী না দেওয়া প্রাদেশিকতা নয়, কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গে বাঙ্গালীরা ট্যাক্সির লাইসেন্স পাইলেই প্রাদেশিকতা হইয়া দাঁড়ায়। পাঞ্জাবী ট্যাক্সি এবং বাসচালক ও কণ্ডাক্টররা যে রকম দুর্ব্ব্যবহার করে, বাঙ্গালা প্রদেশই তাহা সহ্য করিয়া লয়। অন্ত প্রদেশ হইলে তাহাদের কি অবস্থা হইত তাহা না বলাই ভাল।

*   *   *   *   *

বেনারসের এক জনসভায় দেশের বস্ত্রাভাবের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া সর্দ্দারজী বলিয়াছেন,—"শ্রমিকরা উৎপাদন বৃদ্ধি না করিয়া মজুরী বাড়াইবার দাবী করিতেছে। বস্ত্রশিল্পের কলকজাও বিদেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে না। উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। অবস্থা যদি এইরূপ চলিতে থাকে, তাহা হইলে ভারতকে আমদানী বস্ত্রের উপরই নির্ভর করিতে হইবে।" অথচ ভারত সরকারের শিল্পসচিব কিছু দিন পূর্ব্বে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের কাপড়-কলের মালিকদের মুখপাত্র শ্রীযুক্ত এস, সি, রায় বলিয়াছেন,—"দেশে যে পরিমাণ কাপড় আছে, তাহাতে ঠিকমত বণ্টন হইলে সহজেই দেশবাসীর অভাব মিটিতে পারে।" সরকারী অক্ষমতা ঢাকিবার জন্ত আর একটু কৌশলপূর্ণ উপায় অবলম্বন করা উচিত ছিল।

*   *   *   *

গোয়ালিয়রে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সর্দ্দারজী বলিয়াছেন,—"যে সকল মুসলমান রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত রহিয়াছে, তাহাদের প্রতি নিজ ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে। যদি কেহ মনে করিয়া থাকে যে, মুসলমানদিগকে উত্যক্ত করিবার অধিকার তাহার রহিয়াছে, তবে আমাকে বাধ্য হইয়াই বলিতে হইবে যে, আমাদের স্বাধীনতা লাভের প্রয়োজন ছিল না।" যে ভাষায় তিনি এই অপ্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা-প্রচারকার্য্য চালাইবার সুযোগ প্রদান করিবে। পাকিস্তানের কোন

কলিকাতা টেলিফোন কোম্পানীর উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে (বাম দিক হইতে) জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ভাইস, শ্রীযুক্ত ভবতোষ

সংবাদপত্র ইতিমধ্যেই ভারতের বুকের উপর একটি পাকিস্তান সৃষ্টির দাবী তুলিয়াছেন। এই রকম কথায় সেই দাবী দৃঢ়তর হইবে।

* * * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক-সঙ্ঘকে তিনি আক্রমণ করিয়াছেন। যদি এই সঙ্ঘ না থাকিত, তাহা হইলে পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে একটি হিন্দু ও শিখও জীবিত অবস্থায় ভারতে আসিতে পারিত না। তাঁহারা ভারতীয় রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট করিতে উদ্যত, এই কথাই তিনি ঘুরাইয়া বলিয়াছেন। সরকারের এই মনোভাবের জন্ত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক-সঙ্ঘের কোন কোন সেবক সত্যাগ্রহ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। সেই সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন,—"আমি জানাইয়া দিতেছি যে, এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইবার ক্ষমতা আমাদের আছে। সত্যাগ্রহীর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া সহজ। কংগ্রেসের আন্দোলনের মধ্যে তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। কিন্তু এই ধরণের হুমকী দিতেন বৃটিশ শাসকগণ কংগ্রেস সত্যাগ্রহীদের প্রতি।

উপদেশ এইখানেই শেষ হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন—"হিন্দুত্ব কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। আমরা হিন্দু।" 'আমরা' বলিতে তিনি কাহাদের বুঝাইয়াছেন, জানি না। তবে আমরা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, হিন্দুত্ব হিন্দুদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। হিন্দুত্বকে ধ্বংস করিবার জন্য হিন্দু সাজিবার অধিকার কাহারও নাই।

তার পর উপদেশ দিয়াছেন দেশীয় নৃপতিদের। আজ তিনি পূর্ব্বেকার কুখ্যাত দেশীয় নৃপতিদের তাল ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহারা পূর্ব্বে ছিলেন ভারতে বৃটিশরাজ কায়েম রাখিবার প্রধান স্তম্ভ। আজও সেই ভূমিকাতেই রহিয়াছেন, কেবল 'বৃটিশ' শব্দটি কাটিয়া 'কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্ব' বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পরিশেষে অত্যন্ত উদার ভাব দেখাইয়া সর্দ্দারজী বলিয়াছেন,—"যদি অধিকতর কার্য্যক্ষম গবর্ণমেণ্ট খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহা হইলে সহজেই বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে অপসারিত করা যাইতে পারে। যাঁহারা অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিবেন, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিব।" কিন্তু দক্ষতার বিচার তো সর্দ্দার প্যাটেল প্রভৃতি বর্ত্তমান রাষ্ট্রনায়করাই করিবেন? আর পাছে ভবিষ্যতে কোন দক্ষ দল তাঁহাদের গদীচ্যুত করে সেই ভয়েই তো সকল দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে। তাঁহার এই সকল উপদেশ লাভে দেশবাসীর মনে কিরূপ ধারণা হইবে, তাহা আলোচনা না করাই ভাল।

ভারত ও কমনওয়েলথ

কমনওয়েলথের সহিত ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের মর্মমূলা সম্বন্ধে কয়েকটি সন্দেহ নিরসনের জন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত নিবিড় সম্বন্ধ রক্ষা করার নীতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়াই শুনিয়াছি। প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, কংগ্রেসী দলের সদস্যগণ পরস্পরবিরোধী মত পোষণ করেন। কেহ এই নীতির স্বপক্ষে, কেহ বিপক্ষে। বিপক্ষ দল মনে করেন যে, ভারত যদি কমনওয়েলথের বাহিরে থাকে, তাহা হইলেই সুবিধা হইবে বেশী। কিন্তু ভিতরে থাকিলে রুশ-পক্ষীয় দলের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হইবে। উভয় দলের মধ্যে পার্থক্যটা এতই সূক্ষ্ম যে, একমত বলিলে ভুল হইবে না। সংবাদের এক অংশে প্রকাশ যে, গত কয়েক দিনের আলোচনায় যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে সন্দেহ নিরসনের জন্য পণ্ডিত নেহরু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র দিয়াছেন। সংবাদের অপর অংশে প্রকাশ, কোন সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে কংগ্রেসী দল কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। সেই জন্য ভারতের প্রজাতন্ত্রী মর্য্যাদার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সূত্র বাহির করিবার জন্য দুই গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, নেতৃবৃন্দের ইচ্ছায় ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথেই থাকুক, এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

[illegible]

শীঘ্রই গৃহীত হইবে বলিয়া আশাও প্রকাশ করা হইয়াছে। এবং হইবেও, কারণ এই গণ-পরিষদের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়া লইতে হইবে। তৎপরে সেই মত ভারতের খসড়া শাসনতন্ত্রকে সংশোধন করিতে হইবে। বিলম্বে এই দুইটি কার্য্য সম্ভব নাও হইতে পারে। তাহার পর বোধ হয়, ভারতের এবং বৃটেনের প্রধান মন্ত্রিদ্বয় যুগপৎ এমন কোন ঘোষণা করিবেন, যাহাতে ভারত বৃটিশ কমন-ওয়েলথের ভিতরে রহিল, ইহা স্বীকৃত হয়। তথাকথিত স্বাধীনতার এই স্বরূপ !

কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশন

কংগ্রেসের জয়পুর অধিবেশন আরম্ভ হইবে ১৪ই ডিসেম্বর হইতে। ভারত স্বাধীন হইবার পর কংগ্রেসের এই প্রথম অধিবেশন। জয়পুর কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতি নিম্নলিখিত কার্য্যসূচী স্থির করিয়াছেন :

১৪ই ডিসেম্বর বেলা ৩ ঘটিকায় আচার্য্য বিনোবা ভাবে কর্ত্তৃক সর্ব্বোদয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন।

১৫ই ডিসেম্বর বেলা ২ ঘটিকায় স্পেশ্যাল-ট্রেণযোগে জয়পুর রেল-ষ্টেশনে নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতির আগমন এবং বেলা তিন ঘটিকা হইতে সাড়ে পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভাপতির শোভাযাত্রা।

১৬ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৮ ঘটিকায় গান্ধীনগরে পতাকা উত্তোলন। বেলা ১০ ঘটিকায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা। অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৪টা এবং পুনরায় সাড়ে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন।

১৭ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৮টা হইতে সাড়ে ১১টা, বেলা ২টা হইতে ৪টা এবং সাড়ে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন।

১৮ই ও ১৯শে ডিসেম্বর বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন।

এই অধিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারত স্বাধীন হইয়াছে বলিয়া নয়, স্বাধীন ভারতের শাসন-কর্ত্তৃত্ব আজ কংগ্রেসের বৃহৎ-নেতৃত্বেরই করতলগত, সেই কারণেই ইহার গুরুত্ব। এই অধিবেশনের প্রস্তাব ও আলোচনার মধ্যে স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের নীতি কি হইবে, তাহা ফুটিয়া উঠিবে। সোস্যালিষ্ট দল কংগ্রেস পরিত্যাগ করায় কংগ্রেসের ভিতর এমন কোন গ্রুপ নাই, যাঁহারা সাহস করিয়া বৃহৎ নেতৃত্বের নীতির ব্যর্থতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারেন। তথাপি নীতি সমর্থন করেন না, এরূপ বহু কংগ্রেসসেবী আছেন বলিয়াই মনে হয়। তাঁহারা কতখানি নিজেদের মত ব্যক্ত করিতে পারিবেন, তাহা অনুমান করা শক্ত। তবে দৃঢ়তার সহিত নিজেদের মত ব্যক্ত করিতে না পারিলে শত জাঁক-জমক সত্ত্বেও অধিবেশন মূল্যহীন এবং প্রাণহীন হইবে। ভোটে তাঁহারা হারিয়া যাইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু বৃহৎ নেতৃত্বের নীতিরও যে সমালোচনা হইতে পারে; তাহা স্বাধীন ভারতের শাসকবর্গের জানা উচিত।

কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্বের কার্য্যকলাপ গণতন্ত্রবিরোধী। মুখে তাঁহারা গণতন্ত্রের জয়গান করিলেও সকল বিরোধী দল ধ্বংস করিতে উন্মুখ। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন বিরোধী দল ছাড়া গণতন্ত্র হয় না। কেবল স্বদলীয় 'বাহবা'-ধ্বনিতে নিরপেক্ষ ভাবে দেশের কল্যাণ ও গঠনমূলক কাজ করা যায় না। মানুষ মাত্রেই ভুল করে, কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্বও করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। কেউ সেই ভুল দেখাইয়া দিলে শোধরান সম্ভব হয়। ইহা ধ্বংসাত্মক কার্য্য নহে, গঠনমূলক কার্য্য। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহা চান না। অথচ দেশের কল্যাণের জন্য নিরপেক্ষ সমালোচনা একান্ত প্রয়োজন। জয়পুর অধিবেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ এই কথাটি যদি মনে রাখেন, তাহা হইলে ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁহারা অনেকখানি সহায় হইতে পারিবেন। এই অধিবেশনে আর একটি বড় প্রশ্ন উঠিবে কংগ্রেসের সহিত শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের সম্বন্ধ লইয়া। এ সম্পর্কে যে অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ উঠিয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই জয়পুর অধিবেশনে বিবেচিত হইবে এবং যথাবিহিত নির্দ্দেশও প্রদান করা হইবে।

কংগ্রেসসেবীরা এক দিন ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আর ত্যাগের পথে যাইতে রাজী নহেন। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ কাজ গুছাইতে ব্যস্ত। তরুণ-প্রাণ স্বভাবতঃই ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত ও আকৃষ্ট হয়। আজিকার কংগ্রেসের মধ্যে এই আদর্শের অভাবের জন্যই তরুণরা বিভিন্ন বামপন্থী দলে যোগদান করিয়া থাকেন। দেশের তরুণ-প্রাণকে নিজের দিকে টানিতে হইলে অন্য সকল দলকে দমন এবং তাহাদের প্রতি উৎপীড়ন করিলে কোন সুফল তো হইবেই না, বরং কুফলই ফলিবে। ত্যাগের ও সেবার আদর্শে তাহাদের মন জয় করিতে হইবে। কংগ্রেস প্রতিনিধিবৃন্দের এই সত্যটিও মনে রাখিতে হইবে।

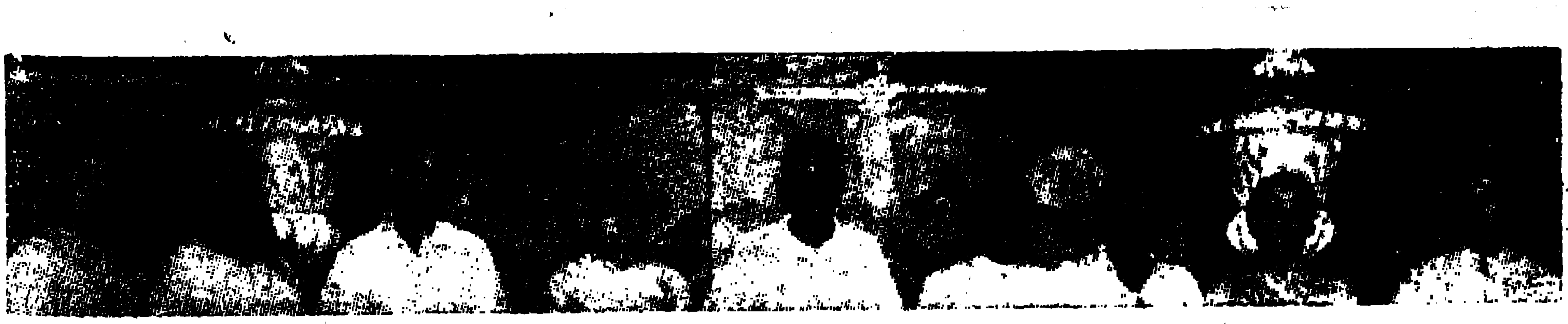

বসুমতী-কর্ত্তৃপক্ষের এক বরোয়া উৎসবে ভারত সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (মধ্যে) ও (বাম দিক থেকে) চিত্ততোষ, ধীরেন্দ্রনাথ মুখো, মনোতোষ, সত্যপ্রিকাশ বন্দ্যো, বামাপ্রসাদ মুখো, শিবতোষ ও (শেষে) কলিকাতায় হাইকোর্টের নবনিযুক্ত বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখা যাইতেছে।

হাইকোর্টের নতুন বিচারপতি

কলিকাতা হাইকোর্টের নবনিযুক্ত অতিরিক্ত বিচারপতি শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলার কীর্ণাহার গ্রামে জন্মলাভ করেন এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এস-সি ও ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এস-সি উপাধি লাভ করেন। এম, এস-সি পরীক্ষায় তিনি গণিত-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

তিনি ১৯১৯ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হন এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে একটি মামলা সম্পর্কে লণ্ডন গমন করিয়া তথা হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী ও কুমার ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুষমা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

ইনি ব্যারিষ্টারীতে যেরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা যেমনই বিরল ঠিক তেমনই বিস্ময়কর। ধর্মপ্রাণ শম্ভুচন্দ্র নীরবে সমাজ-সেবা করিয়া আসিতেছেন এবং ঢক্কা-নিনাদী তথাকথিত বদান্যতার বিরোধী। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় ও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তিনি প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন।

উত্তর-কলিকাতার বিখ্যাত লাহা-পরিবারের ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা আগামী বৎসরের (১৯৪৯) জন্য কলিকাতার শেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া এই পরিবার হইতে মোট ছয় জন শেরিফ নিযুক্ত হইলেন। প্রদেশের বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা ব্যতীত ডাঃ লাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর, পশ্চিম-বঙ্গের শিল্প-বোর্ডের চেয়ারম্যান, পশ্চিম-বঙ্গ শিক্ষা কমিটির সদস্য এবং কয়েকখানি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের সদস্য, কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, কলিকাতা পোর্টের কমিশনার এবং বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভার সভাপতি ছিলেন।

শোক সংবাদ

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভিজিটিং সার্জন ডাঃ রমেন্দ্রনাথ ঘোষ অল্প দিন রোগ ভোগের পর গত ২রা নবেম্বর রাত্রে প্রিন্স অব ওয়েলস হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন।

ডাঃ ঘোষ ছাত্র-জীবনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৯২১ সালে তিনি প্যাথলজি ও ফার্মাকোলজিতে অনার্স সহ এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি ইংলণ্ড গিয়া ১৯৩৪ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ, আর, সি, এস পরীক্ষা পাশ করেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যোগ দেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙ্গলার ষ্টেট মেডিক্যাল ফেকাল্টির সার্জ্জারী ও এনাটমির পরীক্ষক ছিলেন।

তিনি ষ্ট্যাটিষ্টিক্স এণ্ড কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্সের পরলোকগত ডিরেক্টর রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের তৃতীয় পুত্র। তিনি বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী মায়ারাণীকে বিবাহ করেন। তিনি তাঁহার বিধবা পত্নী, একটি শিশু কন্যা এবং বহু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব ও অনুরক্ত ছাত্রকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক ও ছাত্র নিমতলা শ্মশানঘাটে তাঁহার শবানুগমন করেন।

গত ২৮শে নবেম্বর কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার জে, এন, ব্যানার্জ্জি এল, এম, এস, ১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল। ডাঃ ব্যানার্জ্জি তাঁহার কর্ম্ম-বহুল জীবনে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রসার ও উন্নতির জন্য যথেষ্ট ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নিখিল বঙ্গ হোমিওপ্যাথিক সম্মেলন সংগঠনের ব্যবস্থা হয়। তিনি কয়েক বৎসর এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। ভারতে হোমিওপ্যাথি যাহাতে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয় তজ্জন্য তিনি মৃত্যুকাল অবধি চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক হানিম্যানিয়ান সোসাইটির ভারতীয় শাখার তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৫ সালে হাঙ্গেরীর বুডাপেষ্টে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক হোমিওপ্যাথি লীগ কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। ডাঃ ব্যানার্জ্জি স্ত্রী, পাঁচ পুত্র, পাঁচ কন্যা, ভ্রাতা ও বহু আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন।

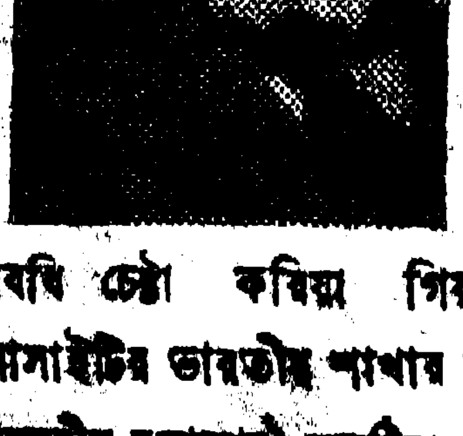

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
[illegible] বসুমতী রোটারী মেশিনে শ্রী[illegible] দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৭শ বর্ষ—পৌষ : ১৩৫৫ সাল

২য় খণ্ড : ৩য় সংখ্যা

"হাতীকে ছাড়িয়া দিলে সে চারিদিকের বৃক্ষাদি ভাঙ্গিতে থাকে, তাহার মস্তকে ডাঙ্গস মারিলে স্থির হয়, এইরূপ মনকে ছাড়িয়া দিলে সে নানা কুচিন্তা করিতে থাকে, বিবেকরূপ ডাঙ্গস মারিলে মন সুস্থির হইয়া থাকে। ধ্যানেতে মনের একাগ্রতা সাধনের জন্য হাততালি দিয়া কিয়ৎক্ষণ হরিবোল হরিবোল বলিবে। গাছের তলায় দাঁড়াইয়া হাতে তালি দিলে যেমন গাছের পাখী উড়িয়া যায়, সেইরূপ তাহাতে মনোবৃক্ষের অন্ত চিন্তারূপ পক্ষী সকল উড়িয়া যায়।"

"সতী স্ত্রী বিদ্যার শক্তি ; তিনি আপন স্বামীকে বিষয়সুখের জন্ত লালায়িত দেখিলে সাবধান করিয়া বলেন, ছি ছি জঘন্ত বিষয়সুখ অন্বেষণ করিও না, ঈশ্বরের অর্চ্চনা কর। মন্দ স্ত্রী অবিদ্যার শক্তি, সে ভগবদ্ভক্ত পতিকে সংসারাসক্ত করিতে চেষ্টা করে।"

"লোকে পৃথিবীর শোভা কামিনী প্রভৃতি দেখিয়া মোহিত হয়। যিনি পৃথিবী সৃজন করেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে চাহে না। প্রায় সকলেই বাগান ও পরির মূর্ত্তি দেখে ভুলে যায়, যাহার বাগান ও পরির মূর্ত্তি তাঁহাকে অতি অল্প লোকই দেখিতে চায়। স্ত্রীলোকেরাই পরি, তাহারা মোহিনী মায়া। মেয়ে আর মায়া এক। অবিদ্যারূপ মেয়ে কাল সাপের ন্যায় পুরুষের চৈতন্য হরণ করে। কিন্তু যাহারা প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে জগজ্জননীকে দেখিতে পান, তাঁহাদের নিকটে প্রত্যেক মেয়ে জগজ্জননীর প্রেরিতা।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

হাতে কলমে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"আমাদের দেশের বাগীশবর্গ বলেন, agitate কর, অর্থাৎ বাক্‌যন্ত্রটাকে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম দিয়ো না। ইলবর্ট বিল ও লোকেল সেলফ গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে পাড়ায় পাড়ায় বক্তৃতা করিয়া বেড়াও। তাহার একটা ফল হইবে এই যে, লোকেদের মধ্যে পলিটিক্যাল এডুকেশন বিস্তৃত হইবে। স্বদেশের হিত কাহাকে বলে, লোকে তাহাই শিখিবে। ইত্যাদি। কিন্তু ইন্দ্রদেবের ন্যায় আকাশের মেঘের মধ্যে থাকিয়া মর্ত্ত্যবাসীদের পরম উপকার করিবার জন্য কনষ্টিটিউসানেল হিষ্ট্রী পড়া, ইংরাজি বক্তৃতার শিলা-বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তাহাদের মাথা ভাঙ্গিয়া দিলেও তাহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে পলিটিক্যাল এডুকেশন প্রবেশ করে কি না সন্দেহ। আমি বোধ করি, ঐ সকল শিক্ষা ঘরের ভিতর হইতে হয়, অত্যন্ত পরিপক্ব লাউ কুমড়ার মতন চালের উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে না।"

"আমাদের চারিদিকে জড়তা, নিশ্চেষ্টতা, হৃদয়ের অভাব। কেহ কাহারও সাড়া পাই না, কেহ কাহারও সাহায্য পাই না, কেহ বলে না মাভৈঃ। এমন শ্মশানক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া ইহাকেও গৃহ মনে করা অসাধারণ কল্পনার কাজ। আমি উপবাসে মরিয়া গেলেও আমাকে এক মুঠা অন্ন দেয় না, আমাকে বাহিরের লোক আক্রমণ করিলে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখে, আমার পরম বিপদের সময়েও আমার সম্মুখে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নৃত্যগীত উৎসব করে, তাহাদিগকে আমার আত্মীয় পরিবার মনে করিতে হইবে; কেন করিতে হইবে? না, সহরের কলেজ হইতে একজন বক্তা আসিয়া অত্যন্ত উর্দ্ধকণ্ঠে বলিতেছেন, তাহাই মনে করা উচিত।"

"আমাদের সন্তানরা যখন দেখিবে, চারিদিকে স্বদেশীয়েরা সাহায্য করিতেছে, তখন কি আর স্বদেশপ্রেম নামক কথাটা তাহাদিগকে ইংরাজের গ্রন্থ হইতে শিখিতে হইবে। তখন সেই ভাব তাহারা পিতার কাছে শিখিবে, মাতার কাছে শিখিবে, ভ্রাতার কাছে শিখিবে, সঙ্গীদের কাছে শিখিবে। কাজ দেখিয়া শিখিবে, কথা শুনিয়া শিখিবে না। তখন আমাদের দেশের সম্ভ্রমরক্ষা হইবে, আমাদের আত্মমর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে, তখন আমরা স্বদেশে বাস করিব, স্বজাতিকে ভাই বলিব। আজ আমরা বিদেশে আছি, বিদেশীয়দের হাজতে আছি, আমাদের সম্ভ্রমই বা কি, আস্ফালনই বা কি। আমাদের স্বজাতি যখন আমাদিকে স্বজাতি বলিয়া জানে না, তখন কাহার কাছে কোন্ চুলায় আমরা agitate করিতে যাইব?"

"স্বজাতির যথার্থ উন্নতি যদি প্রার্থনীয় হয়, তবে কলকৌশল, ধূর্ত্ততা, চাণক্যতা পরিহার করিয়া যথার্থ পুরুষের মত মানুষের মহত্ত্বের সরল রাজপথে চলিতে হইবে, তাহাকে গম্য স্থানে পৌঁছাইতে যদি বিলম্ব হয়, তাহাও শ্রেয়, তথাপি সুড়ঙ্গ-পথে অতি সত্বরে রসাতলরাজ্যে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য।"

"আমরা আজ পৃথিবীর রণভূমিতে কি অস্ত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম? কেবল বক্তৃতা এবং আবেদন? কি চর্ম্ম পরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছি? কেবল ছদ্মবেশ? এমন করিয়া কতদিনই বা কাজ চলে এবং কতটুকুই বা ফল হয়?

একবার নিজেদের মধ্যে অকপট চিত্তে সরলভাবে স্বীকার করিতে দোষ কি, যে, এখনো আমাদের চরিত্রবল জন্মে নাই? আমরা দলাদলি ঈর্ষা ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ। আমরা একত্র হইতে পারি না, পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, আপনাদের মধ্যে কাহারও নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের

বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলি বৃহৎ বুদ্‌বুদের মত ফুটিয়া যায়; আরম্ভে ব্যাপারটা খুব তেজের সহিত উদ্‌ভিন্ন হইয়া উঠে, দু'দিন পরেই সেটা প্রথমে বিচ্ছিন্ন, পরে বিকৃত, পরে নির্জীব হইয়া যায়। যতক্ষণ না যথার্থ ত্যাগ-স্বীকারের সময় আসে, ততক্ষণ আমরা ক্রীড়াসক্ত বালকের মত একটা উদ্যোগ লইয়া উন্মত্ত থাকি, তারপরে কিঞ্চিৎ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইলেই আমরা নানান ছুতায় স্ব স্ব গৃহে সরিয়া পড়ি। আত্মাভিমান কোন কারণে তিলমাত্র ক্ষুণ্ন হইলে উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের আর কোন জ্ঞান থাকে না। যেমন করিয়া হোক কাজ আরম্ভ হইতে না হইতেই তপ্ত তপ্ত নামটা চাই। বিজ্ঞাপন, রিপোর্ট, ধুমধাম এবং খ্যাতিটা যথেষ্ট পরিমাণে হইলেই আমাদের এমনি পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধ হয় যে, তাহার পরেই প্রকৃতিটা নিদ্রালস হইয়া আসে, ধৈর্য্যসাধ্য কাজে হাত দিতে তেমন গা লাগে না।

এই দুর্ব্বল অপরিণত শত জীর্ণ চরিত্রটা লইয়া আমরা কি সাহসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহাই বিস্ময় এবং ভাবনার বিষয়।

এরূপ অবস্থায় অসম্পূর্ণতা সংশোধন না করিয়া অসম্পূর্ণতা গোপন করিতেই ইচ্ছা যায়। একটা কোন আত্মদোষের সমালোচনা করিতে গেলেই সকলে মিলিয়া মুখ চাপিয়া ধরে, বলে, আরে চুপ চুপ, ইংরাজেরা শুনিতে পাইবে—তাহারা কি মনে করিবে?"

—ভারতী, ১২৯১

গ্রামের মেলা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ছোট একটি গ্রাম, ছোট নদীর তীর,—
যেখানে এক মেলা লক্ষ লোকের ভীড়।
কিসের লাগি মেলা? কার লাগি উৎসব?
কোন্ সে মহাত্মার প্রাপ্য এ গৌরব?
কোন্ সে দিগ্বিজয়ীর জয়ের স্মরণ-তিথি?
কোন্ বা মহারাজার বহন করে স্মৃতি?

বৃদ্ধজনেক কয়, শুনুন মহাশয়।
সামান্ত এক লোক, বড় কেহই নয়।
লোকটি ছিল ভাল, লোকটি ছিল খাঁটি,
একাই ছিলেন তিনি উজল করে গাঁটি।
শিক্ষা দিলেন তিনি 'হিংসা করা পাপ'
করলে প্রাণী বধ আসবে অভিশাপ।
গ্রামে যে সব পাখী আছে এবং আসে,
কুলায় যারা বাঁধে বাড়ীর চারি পাশে,
রক্ষা সবাই করো, রক্ষা করাই চাই
তাহার চেয়ে বেশী পুণ্য কিছুই নাই।
গ্রামের অধিবাসী তখন থেকে আর
বধ করে না পাখী ভাবছে আপনার।
গ্রামের প্রতি ঘরে, গ্রামের প্রতি গাছে,
আনন্দেতে সব কুলায় বেঁধে আছে।
দুষ্ট শিশুটিও মারবে নাকো ঢিল—
জানে, পাখীর দল তার করে না ভিল।
হেথা সবাই থাকে যেন মায়ের কোলে—
ওই যে কৈফুল গাছে হাজার বাদুড় দোলে।

ফেলছে দীঘি ছেয়ে বুনো হাসের ঝাঁক,
পাড়ায় পাড়ায় শুনুন পাপিয়াদের ডাক।
অযুত কাকের ডেরা বেণুর বনে বনে,
মিলায় বাঁশের ডগা পুকুর-জলের সনে।
দেখুন বকুল-শাখায় উপনিবেশ বকের,
'বটে' হরিয়ালের শিবির কত সখের।
তালের প্রতি শাখায় বাবুই বুনে বাসা,
থাকে কুলের গাছে টুনটুনি দল খাসা।
পড়বে যখন বেলা দেখতে পাবেন গ্রামে—
জোড়মাণিকের দল জোড়ায় জোড়ায় নামে।
এই যে গ্রামের শোভা এই যে বিশিষ্টতা,
স্মরয়ে তা'রা শুধু একটি লোকের কথা।
ছিলেন নাকো ধনী, ছিলেন নাকো বীর,
পর্য্যাক্রমে তাঁর হয়নি কেউ অস্থির।
নন কো মুনি-ঋষি—কিন্তু তিনি সব
দেবের মত প্রাণ ক্ষুদ্র এক মানব।
জীবনে তাঁর কেহ লক্ষ্য করে নাই
করছে স্মৃতি-পূজা লক্ষ লোকে তাই।

আলডুস হাকসলি

বৈজ্ঞানিক টমাস হাক্সলি এবং কবি ম্যাথু আর্নল্ড, দু'জনেরই রক্তের ধারা বহন করেছেন দার্শনিক সাহিত্যিক আলডুস হাক্সলি। কবি এলিয়ট ও নাট্যকার ইসারউডের সমসাময়িক হাক্সলি, চিন্তা-ধারায় একই গোত্রের। আজকের দিনে ইউরোপ ও আমেরিকা যে পথে এগিয়ে চলেছে তার প্রতি এদের সকলেরই সতর্ক জাগ দৃষ্টি। বস্তুবাদী সভ্যতার তাগিদে পশ্চিম দেশগুলি যে ভাবে বিজ্ঞানকে ভবিষ্যৎ সর্বনাশের জন্য ব্যবহার করছে, তার বিরুদ্ধে সাহিত্যিক হাতিয়ার কঠিন করে ব্যবহার করছেন তাঁরা। ব্যক্তিকে এবং ব্যক্তিগত মানুষের জীবনে জিজ্ঞাসাকে টুঁটি টিপে মেরে কোন দেশের সরকারই যে সমষ্টিগত মানুষের সত্যকার মঙ্গল সাধন করতে পারে না, তা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন এবং সে কথা প্রচার করেছেন পবিত্র নিষ্ঠার সঙ্গে।

কেউ বলে হাক্সলির পতন ঘটছে, কেউ বলে আত্মোপলব্ধির দ্বারা তিনি জীবনের বৃহৎ তত্ত্বকে আয়ত্ত করার সাধনায় মগ্ন হয়েছেন।

আর হাক্সলি বলেন, 'পশ্চিম দেশগুলির পক্ষে ভারত-তীর্থের পথ আজো চীনের মৃত্তিকার উপর দিয়ে। তাও, বৌদ্ধ এবং জেন বৌদ্ধধর্মের সাধনার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলে তবেই বেদান্ত অধ্যাত্মবাদে আমাদের মনস্থির হতে পারবে।'

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের ইতিহাস যে ভাবে বিবর্তিত হয়ে এসেছে সে সম্বন্ধে বর্তমান যুগের একান্ত অন্ধতা নিয়ে হাক্সলি গভীর বেদনা বোধ করেছেন। মানব-সভ্যতার বিবর্তন আমরা ঠিক ভাবে ধরতে পারিনি, এই কথা উল্লেখ করে বলেছেন—'অজ্ঞতা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রান্তির উপর নির্ভর করেই ইতিহাস লেখা হয়েছে এবং প্রত্যেক ঐতিহাসিকই সেই হিসাবে মিথ্যাকারী। অন্ধ-সংস্কার যুগের কথা আমরা আলোচনা করি, যে সময় মানুষ ডাইনীর ক্ষমতায় বিশ্বাস করত এবং শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয়ের চেষ্টা করত। আসলে কার্য-কারণ নিয়ে আমরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ি। সমগ্র একটা যুগকে আমরা ঐতিহাসিক মুহূর্তের মুঠির মধ্যে ধরে নিয়ে বিচার করি। আমরা বলি যে অমুক যুগে এই নিয়ে ঐ নিয়ে মানুষের মন বিব্রত ছিল, যেন সত্য ভাবে সেই যুগের কথা আমরা সব কিছু জেনে ফেলেছি। মূল নিবন্ধগুলি আমাদের অধ্যয়ন করা উচিত, তবেই না আমরা জানতে পারব যে 'রোমান ও বর্বর,' 'ক্যাভেলিয়ার ও রাউণ্ড হেড' সম্বন্ধে আমাদের বিচার কত ভ্রান্তিপূর্ণ। আর ইতিহাস রচনা করা যদি প্রায় অসম্ভবই হয় (কেন না, কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক তথ্য নিয়ে যে ইতিহাস তা হেরোডোটাস ও গিবনসের মতই মিথ্যা ইতিহাস এবং সেই ইতিবৃত্তে সেই বিশেষ যুগের ভাবধারা ও আদর্শের যথার্থ স্বাক্ষর থাকতে পারে না), তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আরো কত দুরূহ।'

বর্তমানে হাক্সলি হলিউডের জন্য চিত্রনাট্য রচনায় ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু সে ভিন্ন আরো দু'টি রচনায় তিনি গভীর ভাবে মনোনিবেশ করেছেন এবং সেই সম্বন্ধে পড়ছেন ও চিন্তা করছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগের ফ্লোরেন্স নিয়ে তিনি যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করছেন তার চরিত্রাংশে আছেন বোকাসিও, সিয়েনার সেন্ট ক্যাথারিন এবং স্যার জন হকউড। আর একটি প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু নিয়ে গবেষণা করছেন তা হোল মৃতের মূর্তি ভাস্কর্য। ইউরোপের মধ্যযুগ থেকে সুরু করে এই ভাস্কর্য কি ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সে সম্বন্ধে নিজের গবেষণা প্রতিষ্ঠা করতে হাক্সলি শুধু যে আশ্চর্য উৎসাহী তা নয়, সমগ্র শরীরের ব্যঞ্জনায় তিনি কি অপূর্ব ভাবে নিজের বক্তব্য বোধগম্য করে দিচ্ছিলেন শ্রোতার কাছে তার সুন্দর একটি বর্ণনা দিয়েছেন 'হোরাইজন' পত্রিকার সম্পাদক।

নিজের জীবনের পথে হাক্সলি এক আশ্চর্য তীর্থ-পরিক্রমায় এগিয়ে চলেছেন। তাঁর তরুণ জীবনের শিক্ষা তাঁকে যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিল উত্তর-জীবনে তিনি তা হননি। গুণী অধ্যাপক, বৃটিশ কাউন্সিলের ধুরন্ধর সদস্য অথবা রাষ্ট্রসেবার পুরস্কার স্বরূপ নাইটত্ব, সে সব দিক দিয়ে তিনি গেলেন না। সাহিত্যিক জীবনের গোড়ার দিকে যে দৃষ্টিভঙ্গী ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ তাঁর সমস্ত রচনায় অনবদ্য জীবন-শিল্পের ছাপ রেখেছিল, তা থেকে তিনি সরে এসেছেন পরে। পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট, ক্রোম ইয়োলো, দোজ ব্যারেণ লিভস, ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড রচয়িতা হাক্সলি নিশ্চিন্ত ভাবে বিবর্তিত হয়েছেন জীবনে ও সাহিত্যে। আজ তিনি এক জন ধর্ম-সংস্কারক, চিন্তানিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদী। হলিউডের চিত্রনাট্য রচয়িতা হিসাবে প্রচুর অর্থ তিনি উপার্জন করছেন।

হাক্সলির জীবনের যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছিল বারো বছর আগে তার একমাত্র কারণ সমসাময়িক য়ুরোপ আমেরিকার জীবনবাদী বিপ্লব। যে সব চিন্তা সামগ্রীকে পৃথিবী যুগে যুগে আহরণ করেছে এবং সযত্নে রক্ষা করে এসেছে, তার যথার্থ মূল্য যখন দিতে চাইল না রাষ্ট্র তখনই চিন্তাশ্রয়ীদের মধ্যে শিবির ভাগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। সে এক্সেসর্সের এক রুক্ষ মরুভূতে হাক্সলি আত্মনির্বাসনে গেলেন। সেই সময় থেকেই আপন সাধনায় নিবিষ্টচিত্ত হয়ে আছে হাক্সলি।

আজ তিনি ইউরোপকে ভালও বাসেন, ঘৃণাও করেন এবং দুই-ই ঐকান্তিক ভাবে। তার মধ্যে তাঁর কোন ভুল বোঝাবুঝি নেই। বার্টাণ্ড রাসেলের পর এত বড়ো তীক্ষ্ণধী সাহিত্যিক আসেননি বলে অনেক সমালোচকের মত, কিন্তু আপন জীবনে অধ্যাত্মবাদকে উপলব্ধি করার সাধনায় হাক্সলি যেন তার পূর্বগামীদের পিছনে রেখে আরো অগ্রসর হয়ে যাচ্ছেন।

পঞ্চান্ন বছর বয়সে হাক্সলির মুখে বুদ্ধির দীপ্তি আরো প্রখর হয়েছে। সমস্ত অবয়বে এসেছে শান্ত শ্রী। স্নিগ্ধ ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ করে দেন সকলকে। এক দিন তাঁকে দেখে সবাই বলত— 'আশ্চর্য বুদ্ধিমান লোক'। আজ যারা তার কাছে গিয়ে বসে, তার কথা শোনে, তারা বলে, 'কি শান্তশীল মানুষটি!' পৃথিবীর তুচ্ছতাকে হারিয়ে দিয়ে তিনি চিত্তলোকে অগাধ শান্তি ভোগ করছেন এবং সমগ্র মানব-সমাজের মুক্তির পথ চিন্তা করছেন। সত্যাসত্যের চিরকালীন সংঘর্ষে যে ভাবে মানুষের চেতনা আপন কল্যাণ থেকে, সত্য থেকে, আনন্দ থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছে, তা নিবারণের উপায় আবিষ্কার করার জন্য সাধনা করছেন যোগী!

মৎস্যভোজী হাক্সলি মাংস স্পর্শ করেন না। মদ্যপান করা ত্যাগ করেছেন। সকাল সকাল শয্যাগ্রহণের নিয়ম-নিষ্ঠা তাঁর শরীর-মনকে উপকৃত করেছে। পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপে তাঁর বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই। অথচ হলিউডের বড়ো বড়ো প্রযোজকরা বহু সময় তাঁর কাছে প্রত্যাখাত হন। আপাত-দৃষ্টিতে হাক্সলিকে যেন সমসাময়িক পৃথিবী সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন বলে ভুল ঘটে। কিন্তু মানুষটির শান্ত সুন্দর উজ্জ্বল অথচ নিরাড়ম্বর

পরিচয়ের অন্তরালে গোপন আছে একটি সচেতন সত্তা। বর্তমান যুগের যত কিছু সমস্যা মানুষকে আর্ত করছে তার কোনটিই তাঁর দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী-দৃষ্টির অগোচর নয়।

পৃথিবীর বহু বৎসরের ইতিহাসে মানুষের সভ্যতার যে সংঘর্ষময় অগ্রগতি হয়েছে, তার চরম বিপন্নতা আজকের মত এমন প্রত্যক্ষ হয়নি কোন দিন। ব্যক্তি হয়েছে সমষ্টির হাতের ক্রীড়নক। অগ্রগতির নামে সেই সব জীর্ণ বস্তু প্রথারই প্রবর্তন হচ্ছে যা একদা বিশ্ব-শান্তিকে খণ্ডিত করেছিল। জাতীয়তার নামে এবং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের অজুহাত দেখিয়ে অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্রই জন-সাধারণকে বর্তমানের দুঃখ-দৈন্য ও অভাবকে মেনে নিতে বলছে এবং সেই ভাবে নিজেদের কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী করার চক্রান্ত করে চলেছে। বর্তমান সভ্যতার এই কৃত্রিমতা ও ধাপ্পাকে হাক্সলি তার লেখনী-মুখে তীক্ষ্ণ যুক্তির দ্বারা প্রতিরোধ করতে চেয়েছেন।

আলডুস হাক্সলির সাম্প্রতিক ছবি

বিংশ শতাব্দীতে আমরা আবার দেখছি ক্রীতদাস ব্যবস্থার পূর্ণ প্রবর্তন, পীড়ন, বলপূর্বক স্থানচ্যুতি, মতবাদের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং সব-কিছুর উপর কড়া সেন্সর। গত আড়াই হাজার বৎসরের ন'শ জাতিগত লড়াই ও ষোলো-শোর অধিক ঘরোয়া-দ্বন্দ্বের ইতিবৃত্ত ঘেঁটে অধ্যাপক সোরোকিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বর্তমান শতাব্দীই হোল পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বাধিক রক্তাক্ত যুগ এবং গত পঞ্চাশ বৎসরে যা ঘটেছে তা সত্ত্বেও আমরা প্রগতির অলীক স্বপ্ন ত্যাগ করছি না।

বর্তমান যুগের দু'টি সর্বশ্রেষ্ঠ ধাপ্‌পা হোল প্রগতি ও জাতীয়তা। প্রথমটির বক্তব্য হোল, স্বর্গ অনন্তলীন নয়, স্বর্গ ভবিষ্যৎ কালের গর্ভে নিহিত। এই তত্ত্ব থেকে একনায়করা, (যাঁরা অতি মাত্রায় প্রগতিবাদী) তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বর্তমান কাল হোল সেই ভবিষ্যৎ কালে পৌছানোর প্রথম ধাপ মাত্র এবং সেই মহিমামণ্ডিত, (একান্ত অলীক) বলিষ্ঠ নূতন পৃথিবী যার পত্তনী হয়ত বাস্তব হবে দ্বাবিংশ শতাব্দীতে, তার জন্য মানুষকে দাস করা চলবে, আইনের সাহায্যে পীড়ন করা চলবে এবং প্রয়োজন বোধে তাদের স্বার্থ বলি দেওয়া চলবে।

প্রগতির ধাপ্পার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত যে জাতীয়তার ধাপ্পা, তা আরো বিপজ্জনক, কেন না, তার বক্তব্য হোল ঈশ্বর ব্যক্তিগত মানুষের অন্তর্বাসী নন, সার্বভৌম রাষ্ট্রেই তাঁর অধিষ্ঠান। সুতরাং রাষ্ট্র হোল দৈবশক্তিসম্পন্ন এবং রাষ্ট্রের নামে জনসাধারণকে সে দ্রব্যের মত যেমন খুশী ব্যবহার করা চলতে পারে।

সাধারণতঃ এই সকল ধাপ্পা যুক্তির দ্বারা সারবান নয়, পরিকল্পনার দ্বারা পুষ্ট। যে সকল দেশে জাতীয় অর্থনীতি রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেখানে প্রগতির ধাপ্পার প্রতীক হোল পরিকল্পনা। 'আজ তোমার দৈন্যদশা, কিন্তু বর্তমান দুর্গতির বিনিময়ে আমাদের পঞ্চ-বার্ষিকী, দশ-বার্ষিকী অনিশ্চিত বার্ষিকী পরিকল্পনায় ভবিষ্যৎ সম্পদ একান্ত নিশ্চিত।' ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অবশ্য এ সকল পরিকল্পনার বালাই নেই। সেখানে প্রগতির ধাপ্পার পরিচয় মেলে জনপ্রিয় পত্রিকার পৃষ্ঠায়।

এ সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য আরো পরিষ্কার করে হাক্সলি লিখেছেন—'প্রগতির জনপ্রিয়তা এই প্রকাণ্ড যুক্তিহীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত যে কিছু না থেকেও কিছু পাওয়া সম্ভব।' কিন্তু এই পৃথিবীতে (একমাত্র দান ভিন্ন) আর সব কিছুর জন্য দাম লাগে। মানব-জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লাভ ও উন্নতির জন্য মূল্য দিতে হয়। কখনো বা সে মূল্য কিছু কম, কখনো বা সে মূল্য এত অধিক যে বর্তমান সুবিধাগুলির চেয়ে অসুবিধাগুলিই হয়ে ওঠে প্রধান। কৃষিতে, বনজ সম্পদে, যন্ত্রশিল্পে এবং ভূসম্পদের উত্তোলনে আমরা কি পরিমাণ উন্নতিশীল তার পরিমাপ হোল ওজনে এবং বিনিময় মূল্যে। কিন্তু রক্ষণশীল-গোষ্ঠী এই যুক্তি প্রদর্শনে ক্লান্ত নন যে সেই উন্নতি আমরা লাভ করছি প্রকৃতিকে শোষণ করে। মৃত্তিকাকে দেউলে করে এবং প্রকৃতির অপূরণীয় সম্পদকে মাত্র কয়েক শতাব্দীতে নিঃশেষ করে আমরা সেই উন্নতি লাভ করছি।'

বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সংকটে মানুষের জীবন যে ভাবে কৃত্রিম হয়ে উঠেছে তার সম্বন্ধে হুঁসিয়ার করে দিয়ে হাক্সলি ইউরোপীয় সমাজকে বলেছেন—'অসুস্থ সমাজ।' মানুষের জীবন ও চিন্তা যে নৈসর্গিক পরিবেশে সহজে বিকশিত হতে পারে, বর্তমান যান্ত্রিক আবেষ্টনীতে তা সর্বদিকে বিনষ্ট হচ্ছে এবং মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন শ্রীহীন হয়ে পড়ছে। নব নব ঔষধের উদ্ভাবনে যেমন নানা রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে মানুষ, তেমনি এই অসুস্থ জীবন-ব্যবস্থার ট্রাজেডীতে সে নিয়ত

ক্লান্ত হচ্ছে। আজকের দিনে ইউরোপ-আমেরিকার সমাজে নারী-পুরুষ এমন বিচিত্র বিবিধ মনোবিকারে পীড়িত, যার কোন ধারণাই ছিল না আমাদের পূর্বপুরুষদের। আর সভ্যতার রোগ ত বর্তমানে মহামারীতে পরিণত হচ্ছে।

তথাকথিত বস্তুবাদীরা বিশ্বাসই করেন না যে, প্রতিটি মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের বেদী এবং সেখানে তিনি নিত্য বিরাজমান। তাই বাহিরের জগতে ভোগের উপকরণ বাড়িয়ে দিয়ে তারা জনসাধারণের চিত্ত জয় করে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তার দ্বারা যে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না, তা তারা বিস্মৃত হন।

আসলে আপন অন্তর্লোককে পরাজিত করে এই যে মানব-সমাজের প্রগতির ধুয়া তা কোন কালেই জয়ী ও সার্থক হতে পারেনি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সেই উদাহরণ প্রচুর। হাক্সলি তাই প্রচেষ্টাকে পরিহাস করে লিখেছেন—'রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আমরা একই ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হই। প্রগতির আর এক সোপান বলে যা মনে হয়েছিল, সেই আমাদের কৃতকর্মের কত দাম আমরা দিলাম, তা আমরা আবিষ্কার করি পরে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জেমস মিল স্থিরবিশ্বাসী হয়েছিলেন যে যদি প্রত্যেক নরনারী লিখতে পড়তে শেখে, নির্বাচনে যুক্তি ও সততা অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বজায় থাকবে। মিলের পর দু'টি যুগ অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠা হোল। কিন্তু তার ফল কল্যাণপ্রসূ হোল না। বরং ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জীর দিক্ দিয়ে এই সর্বজনীন শিক্ষাপ্রসার অত্যাচারী শাসকশ্রেণী, সমর-নায়ক ও কুযুক্তি-প্রচারকদের হাতের শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।'

ষোলো বছর আগে ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড রচনা করেন যখন তখন তিনি বৈজ্ঞানিকের কল্পিত এক নূতন পৃথিবীর কথা লিখেছিলেন যেখানে মেয়েরা সন্তান-প্রসবের মধুর বেদনা থেকে নিষ্কৃতি পাবে, কেন না টেষ্টটিউবে দক্ষ বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম তত্ত্বাবধানে প্রয়োজন মত শিশু জাত হতে পারবে। মানুষের বৃদ্ধত্ব ও মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা হবে নানা বৈজ্ঞানিক ঔষধ, হরমোন ও ট্যাবলেটের দ্বারা। সমাজের প্রয়োজন অনুসারে আর এক নূতন শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি হবে এবং সেই শ্রেণি-স্বার্থের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ মানুষ থাকবে, কেন না, মানুষ নিয়ন্ত্রণ তখন রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে। প্রত্যেকটি নারী-পুরুষ হবে রাষ্ট্রের বেদীতে নিবেদিত। অতি শিশুকাল হতেই তার অবচেতন মনের মধ্যে সেই সব চিন্তা, বোধ এবং কর্মপ্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দেওয়া হবে যা ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্র তার কাছে দাবী করবে। ভয়, সংশয় এবং নীতির বালাই থাকবে না।

ষোলো বছর পরে আর এক হাক্সলি লিখেছেন—'আমার উপন্যাসে যে জগতের কল্পনা ছিল তার কাল ছিল ছ' শতাব্দী পরে। আজ মনে হচ্ছে, সর্বগ্রাসী যুদ্ধ, বিশ্বব্যাপী বন্যা এবং ব্যাপক মহামারীর হাত থেকে মানব-সমাজ যদি কোন ক্রমে আত্মরক্ষা করতে পারে, তবে অনতিদূর ভবিষ্যতেই সেই নূতন জগতের অবতারণা ঘটতে পারে। গত ষোলো বৎসরে কেবল যে যান্ত্রিক টেকনিকই যথেষ্ট উন্নত হয়েছে তা নয়, জাতীয় সরকারদের কর্তৃত্ব অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনসাধারণের মঙ্গলের অজুহাতে সেই কর্তৃত্ব অবাধে চালনা করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে।

হাক্সলি তাই বলছেন যে, সুস্থ মানব-সমাজ সৃষ্টি করাই যদি আমাদের বাসনা ও কর্তব্য হয়ে থাকে এবং এই সুন্দর পৃথিবীতে আনন্দের সঙ্গে বাস করা এবং ভাবী সমাজের জন্য সুন্দরতর পরিবেশের উত্তরাধিকার রেখে যাওয়াই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে সর্ব প্রকারের ধাপ্পাবাজী থেকে আমাদের নিরস্ত হতে হবে। ব্যক্তিগত মানুষের মধ্যে আত্মোপলব্ধি যদি না ঘটে তবে সামাজিক চেতনা জাগ্রত হতে পারে না এবং পৃথিবীর চিরস্থায়ী শান্তির স্বপ্ন বাস্তব হতে পারে না।

তাই তিনি নিজেকে জানবার চেষ্টা করছেন আরো গভীর ভাবে, যার দ্বারা তিনি সমগ্র মানব সমাজকে জানতে পারেন এবং সেই ভাবে এই বিশ্বসৃষ্টির রহস্য মন্থন করে পরম সত্যকে আবিষ্কার করতে পারেন।

নিজের জীবনবাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে হাক্সলি বলেছেন—'কোন মাধ্যমকে অবলম্বন না করেই বহু মানুষ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করেছে যুগে-যুগে। সেই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী আছেন সর্বধর্ম-প্রতিষ্ঠানেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য মানুষের, তাদের এক জন হওয়া বড়ো দুরূহ সাধনা। ডাক পড়ে ত অনেকেরই, কিন্তু নির্বাচিত হন বড়ো অল্প।'

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেছেন, 'এ অত্যন্ত শুভ নিদর্শন যে বর্তমানে রোম-গীর্জা প্রাচ্যধর্ম নিয়ে আরো অধিক গবেষণা করছেন।···পশ্চিম ভূখণ্ডের পক্ষে ভারত-তীর্থের পথ আজো চীনের মৃত্তিকার উপর দিয়ে। তাও, বৌদ্ধ ও জৈন বৌদ্ধধর্মের সাধনার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলে তবেই বেদান্ত অধ্যাত্মবাদে মনস্থির হবে।'

বৈজ্ঞানিক—দার্শনিক—সাহিত্যিক হাক্সলি তাই যোগীর আসনে বসেছেন। বেদান্তের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের দিকে তার একাগ্র দৃষ্টি।

আগামী সংখ্যায়

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মবাদিনী

শ্রীসুশীলকুমার দে

ভারতীয় চিত্রকলার চরম সঙ্কট

"The true beauties of art are eternal—all generations will accept them; but they wear the habit of their century."—DELACROIX.

রূপানন্দ গুপ্ত

চিড়িয়াখানা আর চারুকলা—এই দু'টো জিনিসই ক্রিস্‌মাসের মরশুমে কলকাতা শহরে হঠাৎ যেন একটা যাদুকরী প্রভাব বিস্তার করে সকলের মনে। চিড়িয়াখানার বাঘ-ভালুক, বাঁদর-শিম্পাঞ্জীগুলো এই সময় যে হঠাৎ মনের আনন্দে হুংকার ছাড়ে বা কিচির-মিচির করে তা নয়, কোন দৈহিক রূপান্তরও তাদের ঘটে না। আর পৌষ মাস এমন একটা মাসও নয় যে, শিল্পীদের প্রেরণার উত্তাপ খুব বেশী পরিমাণে বেড়ে যাবে। তাহলে হঠাৎ এই পৌষ মাসের ক্রিস্‌মাসের সময় হাজার হাজার লোক চিড়িয়াখানায় যায় কেন, আর চারি দিকে চারুকলার প্রদর্শনীরই বা এ-রকম হিড়িক লাগে কেন? প্রত্যেক পথচারীর মনে এই প্রশ্নটা জাগা খুবই স্বাভাবিক। উত্তরটাও খুব সোজা।

কলকাতা শহরটাকে ক্রিস্‌মাসের সময় মদের বোতল, হোটেলের হুল্লোড়, ফিরিঙ্গি মেমসাহেব, ঘোড়দৌড় ইত্যাদিতে চাঙ্গা করে তোলার কৃতিত্বটা পুরোপুরি ইংরেজ সাহেবদেরই প্রাপ্য। সারা বছর রাজদণ্ড ধারণ করে ক্লান্ত হয়ে ইংরেজ রাজপুরুষরা এই সময় কয়েকটা দিনের জন্যে কলকাতা শহরে আসতেন ত্রিমকারের সাধনায় ক্লান্তি দূর করতে। তাঁদের পিছু-পিছু রাজভক্ত পোষা দেশী কুকুরদেরও আমদানি হত কলকাতায়। নেটিভ ষ্টেটের মহারাজা, মহারাণী, নিজাম, বেগমসাহেবা, রাজা-বাদ্‌শাহ, নাইট-কমাণ্ডার-কর্ণেল্‌-কাপ্তেন, রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর সকলেই একে-একে এসে কলকাতার হোটেল, বাগানবাড়ী, রাজবাড়ীগুলো দখল করে বসতেন। হীরে-মুক্তো-জহর-পান্নার দোকান ঝলমলিয়ে উঠতো, জুতো থেকে শীতের হরেক রকমের পোশাক-পরিচ্ছদে ছেয়ে যেত দোকান-বাজার। জুয়োখেলার কার্নিভাল, ঘোড়দৌড়, কুত্তাদৌড়, সার্কাস, চিড়িয়াখানা চতুর্দ্দিকে গজগজিয়ে উঠতো। পিপে পিপে স্কচ, হুইস্কি রম্ জিন্ উজাড় হয়ে যেত। রাত দুপুর পর্য্যন্ত ক্যাবারেনর্ত্তকীর নাচ আর জিটারবাগের আওয়াজ শোনা যেত চৌরঙ্গীতে, শহরতলীর বাগান-বাড়ীতে। রঙচঙে, চকচকে স্ত্রীলোকদের বগলে করে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে যেত শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ট্যাল্‌বট পণ্টিয়াক্‌। "গোটা কলকাতা শহরটা এমন একটা বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করত, যাকে স্বচ্ছন্দে আপনি "গ্র্যাণ্ড কার্নিভাল" বা "গ্র্যাণ্ড সার্কাস" বলতে পারেন। এই ছিল ক্রিস্‌মাসের কলকাতা।

কার্নিভাল, সার্কাস," জুয়ো, ঘোড়দৌড়, হোটেল, বাগান-বাড়ীর নাচ-গান খানা-পিনা নিয়ে মশগুল ক্রিস্‌মাসের কলকাতায় কেন যে জন্তু-জানোয়ারদের চিড়িয়াখানা, চিত্রশিল্পীদের চারুকলা-প্রদর্শনী এবং সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের যাবতীয় কনফারেন্স একটা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতো তা এখন যে কেউ সহজেই বুঝতে পারবেন। এত বড়-বড় সাহেব মেমসাহেব, এত রাজা-মহারাজা, নিজাম, বাদ্‌শাহ, আমীর-অমাত্যের ভীড় আর অন্য কোন সময় কলকাতায় হত না। এই সব লাট-বেলাট রাজা-মহারাজার মনোরঞ্জন ও পুলক-শিহরণের জন্যেই আমাদের দেশের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন, বিশেষ করে সঙ্গীত ও শিল্পকলা। তাই এঁরা যখন শহরের কয়েকটা দিন লুঠতে আসেন তখন এঁদের পৃষ্ঠপোষকতার আশায় কনফারেন্স ও এক্সিবিশনের ব্যবস্থা করা হয়। বৈজ্ঞানিক কংগ্রেস ও কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করেন এঁরাই, চিত্রকলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এঁরাই গুরু-গম্ভীর রায় দেন এবং ভারতীয় সঙ্গীতের ঐশ্বর্য্য ও রসাস্বাদনের জন্মগত অধিকার এঁরাই পান। বাইরের যে বিশাল জীবন্ত সমাজ, যে বিপুল বাস্তব জীবন, যে অগণিত জনসাধারণ তারা সব এঁদের বিচারে স্থূল, নীরেট প্রস্তরখণ্ড মাত্র। আমাদের চিত্রশিল্পী ও সুরশিল্পীদের কাছেও তাই। সেই জন্যই সাধারণ সামাজিক মানুষের কাছে এই সব কনফারেন্স, আর্ট এক্সিবিশন, সঙ্গীত সম্মেলনও যা, আর ঐ চিড়িয়াখানা, গ্রাণ্ড সার্কাস আর কার্নিভালও ঠিক তাই। কারও কোন বৈশিষ্ট্য, কোন পার্থক্য বা কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। চারুকলার প্রদর্শনীও যা, চিড়িয়াখানাও তাই; সঙ্গীত-সম্মেলনও যা, বাঁদরের কিচিরমিচিরও তাই; বড়-বড় কন্‌ফারেন্স এবং তার জরাজীর্ণ বাণী-বক্তৃতাও যা, এসিয়ান সার্কাসের ভেল্‌কি খেলাও ঠিক তাই। সবই হাস্যকর মজার ব্যাপার, ক্রিস্‌মাস ফান্।

আগে তোম বাগে তোম•••

—অনাথবন্ধু সেন

মজুর —তাপস দত্ত

একাডেমী অফ ফাইন আর্টস

প্রত্যেক বছর ক্রিস্‌মাসের সময় কলকাতার মিউজিয়মে "একাডেমী অফ ফাইন্‌ আর্টসের" বাদ্‌শাহী প্রদর্শনী দেখে যে-কোন ব্যক্তির ঐ সার্কাসের আর কার্নিভালের কথা মনে হবে। এ-বছরেও তার চেয়ে অভিনব কিছু মনে হয়নি। প্রদর্শনীর মাননীয় দর্শকবৃন্দের মধ্যে রাজা মহারাজা নিজাম আমীর লর্ড লেডীরাই উল্লেখ-যোগ্য। চিত্রকলার সমঝ্‌দার তাঁরাই, পৃষ্ঠপোষকও তাঁরা এবং ক্রেতাও তাঁরা। একে একে পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে তাঁরা চারুকলা প্রদর্শনীতে পদধুলি দেন, মিউজিয়মের বিশাল সিঁড়ি দিয়ে শিল্পিবৃন্দ (বিশেষ করে উদ্‌যোগী শিল্পরথীরা) তাঁদের পিছু-পিছু উঠতে থাকেন, বারান্দায় লট্‌কানো ছবির পাশে-পাশে মহারাজা ও রাণীকে মাছির মতন ঘিরে তাঁরা ধীর পদক্ষেপে চলতে থাকেন। মহারাজা হাতের ছড়িটা দিয়ে ছবি ঠুকৃতে, ঠুকৃতে এগিয়ে যান, পেছনের অনুচরদের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগে। ঠোকা মানেই কেনা। শিল্পীরা উদ্যত ছড়ির দিকে আকুল আগ্রহে চেয়ে থাকেন, যদি ছবির কপালে ঠোকাটা লাগে। তার পর হয়ত এক দিন স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী এসে ভারতীয় শিল্পকলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা সোনালী বক্তৃতা দিয়ে যান এবং চা-পানের পর চারুকলার বাৎসরিক প্রদর্শনী শেষ হয়ে যায়।

ব্যাপারটা যদি এই ভাবেই শেষ হয়ে যেত তাহ'লে আপত্তির কিছু থাকত না। কিন্তু তা হয় না। প্রত্যেক বছরেই ঢাক পিটিয়ে নবত বাজিয়ে প্রচার করা হয় যে, ভারতীয় চারুকলার শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে মিউজিয়মে। এত-বড় একটা হাসি-তামাসার সার্কাস্‌-শো যদি চারুকলার প্রদর্শনী বলে বাজারে চলে তাহ'লে সাধারণ লোকের এবং দেশেরও তাতে ক্ষতি হয়। আর্থিক ও নৈতিক ক্ষতি দুই-ই হয় এবং কি ভাবে হয়, বলছি।

এ-বছর প্রদর্শনী দেখতে যাবার দিন মিউজিয়মের সামনের ফুটপাথে দেখলাম এক দল গ্রাম্য মেয়ে-পুরুষের ভিড় জমেছে। উট আর হাতির কথাবার্ত্তা শুনে বুঝলাম যে তারা চিড়িয়াখানা-ফেরত যাত্রী, চব্বিশ পরগণার সোনারপুর অঞ্চলের চাষী, জাদুঘর ঘুরে হাওড়া ময়দানে এসিয়ান সার্কাস দেখতে যাওয়াই তাদের পরিকল্পনা। কিন্তু একাডেমির নবত্‌ বাজনায় তাদের মাথা ঘুরে গেছে। মিউজিয়মের বিরাট অট্টালিকার গহ্বর থেকে যদি সানাই পোঁ ধরে তাহ'লে সাপ-খেলানোর মতন কিছু একটা ভেল্‌কি খেলার ব্যাপার ভেতরে হচ্ছে, এ-কথা ভাবা গাঁয়ের চাষীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। মন্ত্রমুগ্ধের মতন তারা ভেতরে ঢুকলো আট গণ্ডা করে পয়সা নগদ দর্শনী দিয়ে। ঢুকে যা ব্যাপারটা হ'ল তা স্বচক্ষে দেখলাম এবং আপনারা না দেখলেও সহজেই কল্পনা করতে পারেন। তারা হতভম্ব হয়ে বসে পড়ল বারান্দার উপর, কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত দেশী ভাষায় গালাগাল দিতে-দিতে বেরিয়ে গেল। এই ভাবে এই অসহায় বেচারীদের আর্থিক দোহন করা কি উচিত হয়েছে?

নৈতিক ক্ষতি যা একাডেমী করছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। চারুকলার শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনী বলে একে প্রচার করাটাই অন্যায়। মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ১১৩৩ সালে যে সাধু উদ্দেশ্য নিয়েই কলকাতায় "একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের" প্রতিষ্ঠা করে থাকুন না কেন এবং স্যার আবদুল গজনভী বা লেডী রাণু মুখার্জ্জি বিশুদ্ধ শিল্পপ্রেরণায় যতই উদ্‌বুদ্ধ হ'ন না কেন, "একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের" প্রদর্শনীকে চারুকলার প্রদর্শনী না বলে, অভিজাত উল্লাসিত কাগজের বাহারে ফুলের মতন কৃত্রিম সমাজের উগ্র ছলা-কলার একটা মনোরম এক্‌জিবিশন ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। একেই যদি শ্রেষ্ঠ চারুকলার আদর্শ অথবা ভারতীয় চারুকলার ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ নতুন সৃষ্টি বলে লোকসমাজে প্রচার করা হয় তাহ'লে তাদের নৈতিক ক্ষতি করা হয় বলেই আমরা মনে করি।

এলতলা বেলতলা ঘুরে সেই ভাগাড়ের ছাতিমতলা
ভারতীয় চারুকলার অগ্রগতি

ভারতীয় চারুকলার অগ্রগতির যে পদচিহ্ন আমরা "একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের" প্রদর্শনীতে প্রত্যেক বছর দেখতে পাই তাকে অগ্রগতি না বলে পশ্চাদ্‌গতি বলাই যুক্তিসঙ্গত। তবে "পশ্চাদ্‌গতি" বলতেও আমরা রাজী নই, কারণ আগে-পিছে কোন দিকেই ভারতীয় চিত্রকলার গতি নেই। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের নিয়ে নব জাগরণের যুগের যে শিল্পিগোষ্ঠী আবির্ভাব হয়েছিল এক দিন, তাঁদের সৃষ্টির পালা অনেক দিন আগেই ফুরিয়ে গেছে। ভারতীয় শিল্পের মৃত ও বিকৃত কঙ্কালে রক্তমাংস দিয়ে প্রাণসঞ্চার করার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যুগ-সন্ধিক্ষণে দায়িত্ব তাঁরা এক দিন পালন করেছিলেন। তাঁদের শক্তি ছিল প্রতিভা ছিল, তাই তাঁরা সারা দেশব্যাপী একটা শিল্পান্দোলন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। আজ তাঁর আদর্শের ক্ষীণ রশ্মিটুকু রয়েছে

—সতীশ সিংহ

আর রয়েছেন সেই আদর্শের তথাকথিত উত্তরাধিকারীরা, যাঁদের শক্তিও নেই, প্রতিভা তো নেই-ই। তা ছাড়া অবনীন্দ্র-যুগের যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও ভূমিকা ছিল, আজকের ভারতীয় শিল্পীদের ভূমিকা নিশ্চয়ই তা নয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে শিল্পীদের কোন চেতনা আছে বলে মনেই হয় না। তাঁরা শুধু কাকাতুয়া পাখীর মতন কতকগুলো বাঁধা বুলি শিখেছেন, যেমন "ওরিয়েণ্টাল", "ভারতীয়", "রাজপুত", "মুঘল" ইত্যাদি। সেই অজন্তার গুহা-চিত্রের রূপ, সেই রাজপুত ও ও মুঘল-দরবারের রাজকীয় আর্ট—এই হল ভারতীয় শিল্পের চরম কথা। এর আগেও কিছু ছিল না, পরেও যেন আর কিছু হয় না। ভারতীয় চারুকলার পরিত্যক্ত ভাগাড়ে শুধু কতকগুলো হাড়গিলে শকুন আর শিয়াল-কুকুরের বিকট চীৎকার শুনতে পাওয়া যায়, যাঁরা রঙ আর তুলির ব্যবহার জানেন বলে "শিল্পীর" সম্মান দাবী করেন। এঁরা সকলেই ভাল "ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান", আমিন ও কানুনগো হবার যোগ্যতা হয়ত এঁদের আছে, কিন্তু শিল্পীর কল্পনা-শক্তি, স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিভার কোন বালাই নেই এঁদের। একাডেমীর এক্‌জিবিশনে মিউজিয়মের প্রশস্ত করিডোরের এপার-ওপার বার-বার ঘুরে এই কথাই মনে হয়, শুধু এ-বছর নয়, প্রত্যেক বছর।

কি আছে প্রদর্শনীতে উল্লেখযোগ্য? কিছুই না। সেই জে, পি, রায়ের ও পল-রায়ের দৃশ্য-চিত্র, তেল-রঙের ছবি। চমৎকার ঠিকই, একটা স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে ছবিগুলোর মধ্যে, কিন্তু তাতে হ'ল কি? একই রূপসী মেয়েকে সাজিয়ে-গুজিয়ে যদি বার-বার বলা হয় "দেখে যাও, কিবা শোভা", তাহ'লে হাবা-গোবাদের যতই পুলক জাগুক, বুদ্ধিমান চক্ষুষ্মান্ দর্শকের তৃপ্তি হয় কি তাতে? এ ছাড়া সতীশ সিংহের সেই হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড়-তোলা, নিতম্বভারি, আধা-গেঁয়ো ধরণের স্ত্রীলোক বা মা-ছেলের ছবি, অথবা জাঁকাল ঐতিহাসিক চিত্র বাগান-বাড়ীর নাচঘরের পক্ষে ভাল, অন্যত্র অসহ্য। আর যাঁরা বৌদ্ধ, মোগলাই ও রাজস্থানী টেক্‌নিকের কসরৎ দেখিয়ে কৃতিত্ব অর্জ্জনের চেষ্টা করেছেন তাঁদের "এক্‌জিবিশনের" বদলে "শিল্পের সার্কাস" খোলা উচিত ছিল। তামাম্ দুনিয়া ঘুরে সেই বৌদ্ধ, মোগলাই ও রাজপুত যুগে ফিরে যাওয়া ছাড়া যাঁদের গত্যন্তর নেই তাঁদের ছবি "এক্‌জিবিট্" করার অত আগ্রহ কেন? দেশের লোকের চোখ দু'টো আজও অন্ধ হয়ে যায়নি, মাথাও খারাপ হয়নি যে দিল্লীর শৈলজ ('শৈলজা' নহে) মুখার্জ্জির মোগলাই ও রাজপুত প্যাঁচ অথবা রাম শ্যাম যদুর "ওরিয়েণ্টাল" টেক্‌নিক দেখার জন্যে তারা উদ্‌গ্রীব হবে। শৈলজ বাবু নিজেই ভেবে দেখুন, বিংশ শতাব্দীতে জন্মে তিনি যদি মোগলাই যুগের দরবেশ ফকিরদের আলখাল্লা, অথবা সম্রান্তদের চোগা চাপকান পাশায়াজ জামাকাপড় প'রে কোন চারুকলা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে আসেন তাহ'লে তাঁকে পাগলা গারদের রুগী বলে মনে করা স্বাভাবিক কি না। মুঘল ও রাজপুত চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যথেষ্ট আছে, "হামজা-নামার" চিত্রাবলী অথবা সৈয়দ আলী, আবদুস সামেদ, দেশমণ্ড, কেশবলাল প্রমুখ চিত্রকরদের কথা কোন যুগে কোন মানুষই বিস্মৃত হবে না। অজন্তার গুহা-চিত্রও আমরা দেখেছি, জন্ মার্শালের ভাষায় বলা চলে, আজও ভুলিনি তাদের "rhythmic composition, their instinctive beauty of line, the majestic grace of their

নালন্দার কৃষ্ণ বুদ্ধ —এন, এস, বেন্দ্র

figures and the boundless wealth of their decorative imagery"—কিন্তু তাই ব'লে তার অত্যন্ত অক্ষম অনুকরণ দেখে চোখ খারাপ করতে কেউ রাজী নয়। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী দেলাক্রোয়ার (Delacroix) কথা মনে পড়ে: "The true beauties of art are eternal—all generations will accept them; but they wear the habit of their century." এত সুন্দর সহজ কথাটার সুগভীর তাৎপর্য্য যদি আমাদের দেশের শৈলজ মুখার্জ্জিরা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন তাহ'লে তাঁদের নিজেদের এবং ভারতীয় শিল্পের কল্যাণ হতে পারে। শ্রেষ্ঠ

মহিষ —হ. ন ভট্টাচার্য

ভারতীয় বসন্ত —শৈলজ মুখোপাধ্যায়

শিল্পকলার যে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য, যে ঐশ্বর্য্য, সব যুগেই তা সমাদৃত হয়, তা সকলের সম্পদ অর্থাৎ জাতীয় সম্পদ। কিন্তু কি সাহিত্য, কি শিল্পকলা, সব কিছুই "wear the habit of their century", তাদের যুগের পোশাক পরে থাকে। কথাটা হ'ল শিল্পকলার 'টেক্‌নিক' বা 'আঙ্গিক' (Form) ও 'উপাদানের' (Content) কথা এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা।

শিল্পের আঙ্গিক ও বিষয়-বস্তু বিচ্ছিন্ন নয়, একসূত্রে গাঁথা। প্রত্যেক যুগের শিল্পকলার আঙ্গিকের সঙ্গে সেই যুগের জীবনাদর্শ ও বাস্তব সমাজের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। অজন্তার গুহা-চিত্রে কি বৌদ্ধ যুগের সমাজ-জীবনের ইতিহাস আঁকা নেই? রাজপুত ও মুঘল চিত্রকলাতেও কি রাজকীয় জীবনের প্রতিফলন অত্যন্ত স্পষ্ট নয়? প্রাচীন যুগের প্রতিভাবান ভারতীয় শিল্পীরা এ-কথা জানতেন, জীবনের সঙ্গে শিল্পের যোগাযোগ ছিল তখন। "প্রতিভা" সম্বন্ধে তাই ভারতীয় শিল্পকলার অন্যতম সমালোচক আনন্দ কুমারস্বামী বলেছেন: "Genius was not an individual achievement, but the quality of the society at any given period." এ-কথা তলিয়ে বোঝার মতন শক্তি আমাদের দেশের ক'জন সাহিত্যিক, ক'জন শিল্পীর আছে?

একাডেমীতে যাঁদের ছবি লটকানো হয়েছে তাঁদের অন্তত কারো নেই। এ-কথা আজ খুব জোর করে বলার সময় হয়েছে, ভারতীয় চারুকলার নামে যে জঘন্য ন্যাকামি-কলার চর্চ্চা চলেছে আজ কয়েক বছর ধরে, এবারে তাকে ঝাড়ে-বংশে নির্ম্মূল করার সময় এসেছে। আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে। এইবার সোজাসুজি এই সব অর্দ্ধশিক্ষিত ন্যাকা-চূড়ামণি তথাকথিত "ভারতীয়" শিল্পীদের বলার সময় হয়েছে—আর নয়, ক্ষান্ত হন, ত্বরায় তুলি সংযত করুন। অজন্তার অন্ধ অনুকরণ যদি করতেই হয়, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বা চির বসন্তের চিরাচরিত রঙিন ছবি যদি আঁকতেই হয় তাহ'লে ময়ূরভঞ্জ বা পাতিয়ালার রাজ-দরবারে চাকরী নিয়ে চ'লে যান। রাজপুত ছবি আঁকার জন্যে যোধপুর জয়পুরের মহারাজার বিলাস-ভবনে যান এবং মোগলাই প্যাঁচ নিজামের চিত্রশালায় গিয়ে মনের আনন্দে দেখান। বর্ত্তমান সমাজ, বর্ত্তমান যুগ ও জীবনের সঙ্গে যাঁদের কোন সম্পর্ক নেই, তাঁরা প্রত্যেক বছর মিউজিয়মে ছবি না দেখিয়ে নিজেরাই সশরীরে কাচের আলমারির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন অথবা দেয়ালের গায়ে ঝুলতে পারেন। সেটা অনেক বেশী দর্শনীয় হতে পারে।

সঙ্কটের মুক্তি কোথায়?

ভারতীয় শিল্পকলার এই চরম সঙ্কটের মধ্যেও যে মুক্তির পথরেখা দেখা গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই বছরেই গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের তরুণ ছাত্র-শিল্পীদের অনেকের ছবির মধ্যে তার আভাস পাওয়া গেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল পঞ্চম বার্ষিক ছাত্র ভট্টাচার্য্যের "মহিষ" (৩০৩), সতীশ দাশগুপ্তের "ওরা কাজ করে" (৪২৫), তাপস দত্তের "মজুর" (৪১৮), এবং সোমনাথ হোড়ের তেলরঙা ছবি। প্রত্যেকটির যুগোপযোগী চিত্রোপাদান এবং প্রকাশভঙ্গী এত বলিষ্ঠ যে তার মধ্যে জীবন্ত শিল্পী-মনের স্পর্শ অনুভব করা যায়। আর্থিক সামাজিক দুর্বিপাকে প'ড়ে যদি এই তরুণ শিল্পীদের ভবিষ্যৎ শিল্পী-জীবন কেন্দ্রচ্যুত না হয়ে যায়, তাহ'লে এঁদের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় আশান্বিত হবার কারণ আছে।

অবনীন্দ্র-যুগের পরে ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে, বিশেষ করে বাংলায়, বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিল্পান্দোলন হিসেবে দু'টির কথা এখানে বলা উচিত। এই "ছাতিমতলাপন্থী" শিল্পীদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেন শিল্পী ভোলা চ্যাটার্জ্জির (ভি, সি,) নেতৃত্বে এক দল বিদ্রোহী শিল্পী। তার পরবর্ত্তী যুগে উল্লেখযোগ্য হ'ল "ক্যাল্‌কাটা গ্রুপের" স্বাতন্ত্র্য ও বিদ্রোহ। ভোলা চ্যাটার্জ্জি অথবা ক্যালকাটা গ্রুপের গোপাল ঘোষ, সুভো ঠাকুর, নীরদ মজুমদার, রথীন মৈত্র, ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত প্রমুখ আধুনিক শিল্পীদের কাউকেই মিউজিয়মে দেখা যায়নি। তার কারণ এঁরা মনে-প্রাণে "ভারতীয়" হয়েও প্রতিভাবান, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও সমাজ-চেতনা হারিয়ে ফেলেননি। ভারতীয় শিল্পকলার সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে এপ্‌ম্যানের মতন কপি না করে এঁরা তাকে সমীকৃত করে নতুন যুগোপযোগী আঙ্গিকের বিকাশের জন্যে চেষ্টা করছেন। চেষ্টা এঁদের অনেকটা সার্থকও হয়েছে। এঁরাই সত্যিকারের ভারতীয় শিল্পকলার ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী। মিউজিয়মের "একাডেমীতে" এঁদের অনুপস্থিতি স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। মিউজিয়ম মিউজিয়মই, চলন্ত ও জীবন্ত সমাজ-সভ্যতার ধারক ও বাহক যাঁরা তাঁদের ছবি মিউজিয়মের দেয়ালে এখনই না লটকানোই ভাল।

★

চতুঃষষ্টি কলা কি কি ?

(সংগ্রহ)

প্রাণতোষ ঘটক

['কলা' অর্থে মূলধনবৃদ্ধিঃ, অর্থাৎ যে শিল্পের মাধ্যমে অর্থপ্রাপ্তি বা অর্থবৃদ্ধি হয়। এক কথায় সরস্বতী ও লক্ষ্মীর একত্র যোগাযোগ। চতুঃষষ্টি কলা বা চৌষট্টি কলার প্রত্যেকটি অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত একদা ব্যবহৃত হত। অধুনা কয়েকটি 'কলা'র প্রচলন নেই প্রয়োজন ও পোষকতার অভাবে। এই রচনাটির জন্য 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি]

১। গীতম্—গীত কি, সকলেই জানেন। গীতে কোন শিল্প-সংযোগ আছে কি না এবং গীত শুনিয়ে অর্থোপার্জ্জন হয় কি না তাও সকলেই জানেন।

২। বাদ্যম্—বাদ্য গীতের সহচর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গীতের সঙ্গে বাদ্যের যোগাযোগ পছন্দ করতেন না, সেই কারণে হয়তো আধুনিক গীতের সঙ্গে বাদ্যের খুব বেশী যোগ নেই। বাদ্য বহু প্রকার। আধুনিক কালে বাদ্যই আয়ের একমাত্র মাধ্যম। নিজের ঢাকে নিজের বাদ্য বাজাতে না পারলে আজকাল না কি কোন আয় হয় না।

৩। নৃত্যম্—নৃত্যকলা আজ ঘরে ঘরে উৎকর্ষ লাভ করছে। দিন দিন নতুন নতুন নৃত্যকলার বিকাশ হচ্ছে অভিনব নামকরণে। বাঙলা দেশে খেমটা নাচের কথা সকলেই জানেন। উদয়শঙ্করের নামে আজ আমেরিকার অধিবাসীরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নাচ দেখিয়ে অর্থোপায় সম্ভব কি না 'কল্পনা' চিত্রই তার প্রমাণ দেয়। নৃত্যকলা দেখবার জন্য যদিও আজ অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় না, রাস্তায় বেরুলেই কত শত নরনারীর কত রকমের নাচ দেখতে পাওয়া যায়।

৪। নাট্যম্—নাট্যকলা বাঙলা দেশে যত উন্নতি লাভ করেছে, ভারতবর্ষে আর কোন দেশে তত হয়নি। গত দশ বৎসর যাবৎ প্রথম শ্রেণীর নাটকের দেখা না পাওয়া গেলেও নাটক রচনার ক্ষেত্রে বহু গুণী ব্যক্তি আত্মোৎসর্গ করেছেন। এই বিষয়টির জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' পাঠ করতে পারেন ও অর্থোপায় হয় কি না কলিকাতার ষ্টার রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ উত্তর দিতে পারবেন। তৃতীয় শ্রেণীর নাটক প্রদর্শন ক'রে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন আজকাল অনেকেই করছেন। তথাপি নাট্যকাররা বলেন, বাংলায় না কি নাটকের মাল-মশলার বড় অভাব। আমরা বলি, মাল-মশলার অভাব নয়, নাট্যকারের অভাব।

৫। আলেখ্যম্—চিত্রকার্য্যের অপর নাম আলেখ্য। লেখ্য ও চিত্র-কার্য্য একই পর্য্যায়ভুক্ত। কালীঘাটের পটশিল্প থেকে আজকের আধুনিক চিত্রকলা বাঙলা দেশে এক ক্রমোন্নতির পথে বিকাশ লাভ করেছে। প্রচুর রঙে প্রচুর চিত্র অঙ্কিত করতে পারলে যে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হয় শিল্পী যামিনী রায় তার সদুত্তর বলে দিতে পারেন। চিত্র-কার্য্যের বড় সমাদর নেই দেশে, শিল্পীরা অন্ততঃ এই অভিযোগ করে থাকেন। কিন্তু আমরা জানি, ভারতবর্ষে এমন কোন রাজা-মহারাজা নেই, যাঁর খাসমহলে শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের একখানি সিক্তবসনের ছবি নেই। চিত্রকলায় পোষণ দরিদ্র বাঙালীর দ্বারা সম্ভব হয় না, তাই দরিদ্র বাঙালী শিল্পীরা বহু করদ রাজ্যের সভা-শিল্পীর পদ গ্রহণ ক'রে থাকেন। এমন কি, বহু বিলীতি প্রচার-ব্যবসায়ের কার্য্যালয়ে বহু বাঙালী শিল্পী আছেন।

৬। বিশেষকচ্ছেদ্যম্—পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে নরনারীগণ চন্দন ও কুঙ্কুম দ্বারা শরীর চিত্রিত করতেন। এই চিত্র রচনার (অলকা-তিলকা প্রভৃতি) কৌশল-বিশেষকে "বিশেষকচ্ছেদ্য" বলা হয়। মালীর মেয়ে ও নাপ্তিনী প্রভৃতির এই কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ হত। আধুনিক কালে সভ্য সমাজে সাধারণতঃ কেউ অলকা-তিলকার ব্যবহার করে না। সে জন্য "বিশেষকচ্ছেদ্য" এখন আর জীবিকা পদবাচ্য নয়। কেবল মাত্র নাপ্তিনীরা কোন কোন গৃহে আলতা লাগিয়ে কিঞ্চিৎ অর্থ এখনও উপার্জ্জন করে। 'বিশেষকচ্ছেদ্য' কি ও তার নিদর্শন এখনও কলিকাতা ও কাশীধামের গঙ্গাস্নানার্থীর কপালে ও কপোলে দেখা যায়। গঙ্গাতীরস্থ উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী ঘাটওয়ালারা যে চন্দনের ছাপা দেয় তা পূর্ব্বকালের বিশেষকচ্ছেদ্যের অপভ্রংশ বা অনুকরণ বলা যায়। কেবল মাত্র বিবাহের দিনে আজও অনেকে কপালে চন্দন-রেখার ব্যবহার করে থাকেন।

৭। তণ্ডুলকুসুমবলিবিকারা—পূজা কিংবা যাগ-যজ্ঞের জন্য তণ্ডুলের নৈবেদ্য রচনা, কুসুমের স্তবক রচনা ও উপহার-দ্রব্যের সংস্থান রচনা। পূর্ব্বকালে অকর্ম্মণ্য ব্রাহ্মণের এই কার্য্য ছিল। এখন আর এই বিশেষ কলার প্রচলন নেই, প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। এ যুগে ঘরে ঘরে তণ্ডুলের অভাব। কুসুমের আদর নেই। উপহার দেওয়ার বাসনা থাকলেও সামর্থ্যের একান্ত অভাব।

৮। পুষ্পাস্তরণম্—ফুলের শয্যা ও ব্যজন প্রভৃতি নির্ম্মাণের বিশেষ কলাকে 'পুষ্পাস্তরণং' বলা হয়। মালীদের এই কার্য্য ছিল। এখনও ফুলের স্তবক (তোড়া), পাখা ও নানা প্রকার গহনা

প্রভৃতি রচনা করে মালীরা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। কলিকাতার প্রায় প্রত্যেক বাজারে এই ব্যবসায়ীদের দোকান আছে। বিবাহের লগ্ন-কালে তারা নির্দ্ধারিত মূল্য বর্দ্ধিত করে এবং অধিক অর্থ লাভ করে। কলিকাতার হগ সাহেবের বাজারে এই ব্যবসায়ীদের একটি পৃথক্ বিভাগ আছে।

৯। দশনবসনাঙ্গরাগাঃ—দন্তরঞ্জন, বস্ত্ররঞ্জন ও অঙ্গরঞ্জন। সেকালে দাঁতে বহু প্রকার ছককাটা ও গায়ে উলকী দেওয়ার রীতি ছিল। বস্ত্ররঞ্জনের নূতন ব্যবসা আজকাল প্রচুর দেখা যায়। সুসজ্জিত শাড়ীর অভাব হেতু রমণীরা থান কাপড় কিংবা ধুতি প্রভৃতি নিজেদের ইচ্ছামত রঞ্জিত করিয়ে থাকেন। অঙ্গরঞ্জনের জন্য এখন তাঁরা আর পরের সাহায্য বিনা নিজেরাই এ কাজ সমাধা করেন। সাগর-পারের অঙ্গরাগ ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং দেশী অঙ্গরাগের ব্যবহারও প্রচলিত আছে। ম্যাক্স ফ্যাক্টর, বটকৃষ্ণ পাল ও বেঙ্গল কেমিক্যাল এই ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তক হিসাবে পরিচিত। দন্তরঞ্জন এখন আর ভদ্র সমাজে চলে না।

১০। মণিভূমিকাকর্ম্ম—মণি অর্থে প্রস্তর। এই প্রস্তর দ্বারা চত্বর, পিণ্ডিকা ও প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করার বিশেষ কলাকে মণিভূমিকর্ম্ম বলা হয়। এই জীবিকাটি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক গৌরবের ও উপার্জ্জনের ব্যবসা হয়েছে। বার্ড কোম্পানী, মার্টিন কোম্পানী প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা প্রস্তর দ্বারা এই সকল বস্তু নির্ম্মাণ করে থাকেন। বহু ভাস্কর প্রস্তর দ্বারা কেবল মাত্র প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। বিদেশে হেনরী মুর ও বাঙলায় শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী বিশিষ্ট মূর্ত্তি নির্ম্মাণকারক হিসাবে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন।

১১। শয়নরচনম্—খাট, পালঙ্ক, তক্তাপোষ প্রভৃতি শয়নীয় দ্রব্য নির্ম্মাণ করণ একটি স্বাধীন ও উত্তম জীবিকা। কলিকাতার বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ ফিরিঙ্গী কালীর চতুষ্পার্শ্বে এই ব্যবসায়ীদের বহু বিপণী দেখা যায়। আধুনিক রুচিসম্মত নিত্য-নূতন ধারায় এই শয়ন-রচনা উন্নতি লাভ করছে। কলিকাতায় 'ল্যাজারাস' ও 'প্রবর্ত্তক' এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট সুনাম লাভ করেছেন।

১২। উদকবাদ্যম্—জলে কোন পাত্র স্থাপন করে কিংবা পাত্র জলে পূর্ণ করে নানা তালে বাদ্য করণ। আমোদ-প্রমোদের জীবিকা, সে জন্য এই কলা ব্যাপক নয়। জলতরঙ্গ বাদ্যকেই উদকবাদ্য বলা হয়। তিমিরবরণ এই বাদ্যের এক জন ওস্তাদ।

১৩। উদকঘাতঃ—প্রাচীন গ্রন্থে উদকঘাত শব্দের "জলস্তম্ভ বিদ্যা" এরূপ অর্থ দেখা যায়। মহাভারতে উল্লেখ আছে, দুর্য্যোধন জলস্তম্ভ বিদ্যা জানতেন এবং এই বিদ্যার দ্বারা তিনি দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকায়িত হয়েছিলেন। এ ছাড়া উদকঘাতঃ শব্দের অন্য কোন অর্থ আমাদের জানা নেই। জলমগ্ন জাহাজের বস্তু উত্তোলন-কারী ডুবুরিরাই এখন জলস্তম্ভ বিদ্যার অনুকরণ করে। জলস্তম্ভ বিদ্যা জ্ঞাত হলে প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের সম্ভাবনা আছে।

১৪। চিত্রযোগাঃ—অদ্ভুত কার্য্য প্রদর্শন করণ। এক প্রকার বাজী।

১৫। মাল্যগ্রথনবিকল্পাঃ—বিভিন্ন প্রকার মালা ও হার প্রস্তুতের বিশেষ কলা। কেবল মাত্র পুষ্পমাল্য নয়, পুঁতি, কাচ ও

১৬। শেখরাপীড়যোজনম্—শিরোভূষণ অর্থাৎ টুপি, পাগড়ী ও তার অলঙ্কার প্রস্তুত করণ। বাঙালীর মস্তক অনাচ্ছাদিত থাকে সে জন্য বাঙলা দেশে এই শিল্পকলার প্রচলন নেই। বড়বাজার ও কলুটোলা অঞ্চলে যে কয়েকটি ব্যবসায়ী আছেন তাঁরা মাড়োয়ারী ও মুসলমানদের শিরোভূষণ তৈয়ারী করে থাকেন।

১৭। নেপথ্যযোগাঃ—রঙ্গরচনা, অভিনেতাদিগকে সাজানো ও তার উপকরণ প্রস্তুত করণের কলা। প্রত্যেক মঞ্চের জন্য এই শিল্পীর প্রয়োজন।

১৮। কর্ণপত্রভঙ্গাঃ—সেকালে স্ত্রীলোকরা মৃগমদ ও চন্দনাদির তিলকশ্রেণী ধারণ করতেন এবং এই রীতির নাম কর্ণপত্রভঙ্গ। যে নারী এই কার্য্যে কুশলা সেই নারীই পূর্ব্বে রাজমহিষীগণের নিকট সৈরিন্ধ্রী নামক দাসীর পদ প্রাপ্ত হতেন।

১৯। গন্ধযুক্তিঃ—নানা প্রকার সুগন্ধ প্রস্তুত করণ। আতর, নির্য্যাস ও পারফিউম (perfume) এখন উপার্জ্জনের এক প্রশস্ত পথ।

২০। ভূষণযোজনম্—অলঙ্কার নির্ম্মাণ ও তার গ্রন্থনাদি। নির্ম্মাণ-কার্য্যটি এখন স্যাকরার হস্তে ও গ্রন্থন-কার্য্যটি পাটওয়ারদের হাতে আছে। বহুবাজারের সরকার-পরিবার এই ব্যবসাটির যথেষ্ট উন্নতি করেছেন।

২১। ইন্দ্রজালম্—ভোজবাজী। এই ব্যবসায়ে লোককে বিস্মিত ও আশ্চর্য্য করে এবং প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করায়। বাঙলার ইন্দ্র-জাল পৃথিবীতে আজ খ্যাতিলাভ করেছে। যাদুকর রাজা বসু ও পি, সি সরকার পৃথিবী বিখ্যাত যাদুকর।

২২। কৌচুমারযোগাঃ—নানা প্রকার লিপিক্রিয়াকে কৌচুমার যোগ বলে। ইতর ভাষায় 'জাল' শব্দের নামান্তর। অত্যন্ত অসাধু জীবিকা। তস্কর-জীবিকা নামে অভিহিত। বহু লোক এই পন্থা অবলম্বন করেন এবং অবশেষে এক দিন ধরা পড়েন।

২৩। হস্তলাঘবম্—অলক্ষ্যে অতি শীঘ্র হস্ত সঞ্চালন দ্বারা বস্তুর পরি-বর্ত্তন করা। এখনও বহু হস্তলাঘবপটু বাজীকর আছেন।

২৪। চিত্রশাকপূপভক্ষ্যবিকারক্রিয়া—অনেক রকম আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করণের দক্ষতা প্রদর্শন। রন্ধন বিলক্ষণ শিল্প সংযোগ না থাকলে মানুষের রসনা পরিতৃপ্ত হয় না। দিন দিন নূতন কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। এই বিশেষ শিল্পে বাঙলা দেশের বহু মহিলার বহু স্থানে সুনাম আছে। অর্থোপায়ের জন্য এই শিল্পটি অনেকে অবলম্বন করেন। বাবুর্চ্চি ও হালুইকারের উপার্জ্জন সামান্য নয়।

২৫। পানকরসরাগাসবযোজনম্—মদ্য, বহু প্রকার সরবৎ ও আচার মোরব্বা প্রভৃতির মিশ্রণ ও প্রস্তুত করণের শিল্প। বাঙলা দেশে প্রথমটি এবং শেষোক্ত বিষয় তিনটি বাঙলার বাইরে প্রচলিত। এই শিল্পটিতে প্রচুর আয়ের পথ আছে।

২৬। সূচীবাপকর্ম্মাণি—সূচীকার্য্য ও বস্ত্র বয়নকার্য্য। এই বিশেষ শিল্প-পদ্ধতির বিনাশ সাধনের জন্য ইংরেজ আমাদের দেশে তাঁতিদের হাতের আঙুল কেটে নিয়েছিল। তাদের ঘর-দোর জ্বালিয়ে, তাঁত কেড়ে নিয়ে শুধু ক্ষান্ত থাকেনি, বহু তাঁতির জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট করেছিল। মিলের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ফরাস-ডাঙ্গা ও শান্তিপুর এখনও শিল্পের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

২৭। সূত্রক্রীড়া—সূত্র সংযোগে পুত্তলিকা পরিচালন। অর্থাৎ পুতুলের নাচ। আজকাল এ শিল্পের সমাদর নেই। সে জন্য বড় আয় হয় না।

২৮। প্রহেলিকা—কবিতার গোপনীয় অর্থ পরিজ্ঞান। সেকালে লোকে চমৎকৃত হয়ে অর্থ পুরস্কার দিত। এখন কেউ কানেও শোনে না।

২৯। প্রতিমালা—বস্তুর প্রতিরূপ প্রস্তুত করণ। উনবিংশ শতাব্দীতে এই বিদ্যার একটি শাখা আবিষ্কৃত হয়েছে, তার নাম আলোকচিত্রশিল্প বা ফটোগ্রাফী।

৩০। দুর্ব্বচকযোগাঃ—যে সকল বাক্যের লিপির অর্থ সাধারণ লোকে বলতে পারে না, সেগুলি বলে দেওয়া। এ বিদ্যাটি পুরাতত্ত্বানুসন্ধানিগণের বিশেষ উপকারী।

৩১। পুস্তকবাচনম্—অতি শীঘ্র বিলুপ্ত বর্ণ যোজনার দ্বারা পুস্তক পাঠ করা এবং নানা প্রকার অক্ষর পড়ায় দক্ষতা অর্জ্জন করা। এটিও পুরাতত্ত্বানুসন্ধানিদের সাহায্যকারী।

৩২। নাটিকাখ্যায়িকাদর্শনম্—যাত্রাওয়ালাদের এক প্রকার কার্য্য কিংবা নাটকাভিনয় দেখানো।

৩৩। কাব্যসমস্যাপূরণম্—কোন কাব্যের কিংবা শ্লোকের একাংশ বললে তৎক্ষণাৎ তাদের অবশিষ্টাংশ পূরণ করে দেওয়া।

৩৪। পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্পাঃ—হস্তী, ঘোটক ও উষ্ট্র প্রভৃতির সাজ প্রস্তুত এবং যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ-শিল্প। বহুবাজারের চীনা পাড়ায় উক্ত সাজের দোকান আছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে যুদ্ধাস্ত্র শিল্প যে বিদেশে কিরূপ উন্নতি লাভ করেছে জাপানের হিরোসিমার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তা স্পষ্ট দেখা যায়।

৩৫। তর্কুকর্ম্মাণি—ভ্রমিযন্ত্র ও তার সূক্ষ্ম শলাকার নাম তর্কু। এই তর্কু দ্বারা বহুবিধ স্থুল ও সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করণ।

৩৬। তক্ষণম্—কাষ্ঠের কার্য্য। ছুতার-মিস্ত্রীদের জীবিকা।

৩৭। বাস্তুবিদ্যা—গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য। রাজমিস্ত্রীদের উপজীবিকা।

৩৮। রূপ্যরত্ন পরীক্ষা—সোনা, রূপা ও হীরক প্রভৃতি বিবিধ রত্নের পরীক্ষা করা। জহুরীরা এই বিদ্যার উপকারিতা জানে। বহু ধনী পরিবারের বাবুরা এই বিদ্যায় পারদর্শী।

৩৯। ধাতুবাদঃ—সুবর্ণাদি ধাতুর সাঙ্কর্য্য পরিহার করণ ও তার প্রস্তুত করণের বিধি।

৪০। মণিরাগজ্ঞানম্—হীরক প্রভৃতি রত্নের বর্ণ পরীক্ষা ও নির্ম্মল করণ প্রভৃতি জানা।

৪১। আকরজ্ঞানম্—পরীক্ষার দ্বারা কোথায় কোন বস্তুর খনি আছে, তা জানতে পারা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই পরীক্ষার প্রচলন আছে।

৪২। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগাঃ—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, প্রভৃতি উদ্ভিদসমূহের রোপণ, সংরক্ষণ, বৃদ্ধিকরণ ও চিকিৎসা-বিষয়ক জ্ঞান। নার্সারী ব্যবসায়ীরা এই বিদ্যা জানেন।

৪৩। মেষকুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধিঃ—মেষের লড়াই, মোরগের লড়াই, বটেরের লড়াই প্রভৃতি এ সকল খেলা এখন নেই। মুসলমান বাদশাহদের সময় এই শিল্পের দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন হত।

৪৪। শুকসারিকাপ্রলাপনম্—পক্ষীদের বুলি শেখানো। পূর্ব্বে এই শিল্পের অধিক প্রচলন ছিল। এখন সচরাচর দেখা যায় না।

৪৫। উৎসাদনম্—কৌশলে শত্রুর বাস উচ্ছেদ করা।

৪৬। কেশমার্জ্জনকৌশলম্—চুলের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করবার বিবিধ উপায়। পূর্ব্বে ধনাঢ্যগণ এ জন্য ভৃত্য পোষণ করতেন। এখন 'সেলুন' যা করে তাতেই বাবুরা খুশী থাকেন।

৪৭। অক্ষরমুষ্টিকাকথনম্—সাঙ্কেতিক লিপি-বিজ্ঞান। ইংরেজীতে 'কোড' শব্দের অর্থ অনেকেই জানেন।

৪৮। ম্লেচ্ছিতকবিকল্পাঃ—ম্লেচ্ছ শাস্ত্র ও ম্লেচ্ছ ভাষা জানা।

৪৯। দেশভাষাজ্ঞানম্—বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা পরিজ্ঞাত থাকা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও হরিনাথ দে বহু ভাষা জ্ঞাত ছিলেন। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বহু ভাষা জানেন।

৫০। পুষ্পশকটিকানিমিত্তজ্ঞানম্—পুষ্পশকটিকা নামক বিদ্যার মূল উপকরণ জানা। পুষ্পশকটিকা বিদ্যা কি তা আমরা জানি না।

৫১। যন্ত্রমাতৃকা—অল্প আয়াসে যন্ত্র নির্ম্মাণ করবার জন্য বিবিধ যন্ত্র নির্ম্মাণ করা।

৫২। ধারণমাতৃকা—পূজার নিমিত্ত, ধারণের নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত রেখাময় যন্ত্র রচনার বিদ্যা।

৫৩। সংপাট্যম্—মণি-মুক্তাদি রত্নের কৃত্রিম নির্ণয় করা ও কৃত্রিম রত্ন প্রস্তুত করা। আধুনিক জহুরীদের এই বিদ্যায় পারদর্শী দেখা যায়। কৃত্রিম রত্ন আসল ব'লে বাজারে চালিয়ে দেন।

৫৪। মানসীকাব্যক্রিয়া—অন্যের মনের ভাব ছন্দের দ্বারা প্রকাশ করা। এরূপ কৌতুক আর নেই।

৫৫। ক্রিয়াবিকল্পাঃ—একটি কার্য্য বহু উপায়ে নির্ব্বাহ করতে জানা।

৫৬। ছলিতকযোগাঃ—পর-প্রতারণার কৌশল। এক প্রকার বাজী। অনেকেই করেন।

৫৭। অভিধানকোষচ্ছন্দোজ্ঞানম্—শব্দশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া।

৫৮। বস্ত্রগোপনানি—এক বস্ত্র থেকে অন্য প্রকার বস্ত্র দেখানো। অর্থাৎ কার্পাস বস্ত্রকে রেশমী বস্ত্রে পরিণত করে দেখানো।

৫৯। দ্যূতবিশেষঃ—নানা প্রকার জুয়া খেলায় দক্ষতা। বাঙলা দেশে এ বিদ্যার বড় সমাদর।

৬০। আকর্ষক্রীড়া—এক প্রকার খেলা, অর্থাৎ আকর্ষণ ক্রীড়া। আধুনিক যুগের সম্মোহন বিদ্যা এই শিল্পের অন্যতম শাখা।

৬১। বালক্রীড়নকানি—বালকদের জন্য নানা প্রকার খেলনা প্রস্তুত করা।

৬২। বৈনায়িকীনাং বিদ্যানাং জ্ঞানম্—বিনয় বা শালীনতা (modesty) বিদ্যা। বাঙলা দেশে আজ এই শিল্পকলাটির অত্যন্ত অভাব দেখা যাচ্ছে। ফলে অভদ্রতা ও নির্লজ্জতা অত্যন্ত প্রকট রূপ ধারণ করছে। ভদ্র ও অভদ্রে আর কোন পার্থক্য থাকছে না।

৬৩। বৈজয়িকীনাং বিদ্যানাং জ্ঞানম্—যুদ্ধে ও রণে বিজয়লাভের বিশেষ শিল্প। বিরাট সৈন্য-সমাবেশ ও বহু পন্থা অবলম্বন সত্ত্বেও যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না। এই শিল্প আয়ত্ত হলে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য থাকলেও যে কোন যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায়।

৬৪। বৈতালিকীনাং বিদ্যানাং জ্ঞানম্—এক প্রকার সঙ্গীত-বিদ্যা। সেকালে বহু রাজসভায় বৈতালিকদের সমাদর ছিল। সভার কার্য্যারম্ভে ও কয়েকটি বিশেষ লগ্নে বৈতালিকের প্রয়োজন হত।

জীবন, সাহিত্য ও দর্শন

শ্রীসরোজকুমার দাস

(দর্শনাধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ)

উল্লিখিত বিষয়ত্রয়ের সম্বন্ধ নির্ণয়কল্পে প্রাথমিক প্রয়োজন "সাহিত্য" শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থবোধ। বৈয়াকরণিক দৃষ্টিতে "সাহিত্য" অর্থাৎ নানা উপকরণের মেলন-বোধক যে শব্দ তাহাই "সাহিত্য"। বিশেষজ্ঞদের মতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ভাব অভিব্যক্ত হয় তাহা সম্বন্ধ-বিশেষ-স্বীকার বা পরিহার নিয়মের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত ও সাধারণ গ্রাহ্য। ("সম্বন্ধ-বিশেষ-স্বীকার পরিহার নিয়মানধ্যবসায়াৎ সাধারণ্যেন প্রতীতৈরভিব্যক্তঃ") এই সাধারণ প্রতীতির বলে তখনকার মত সকল পরিমিত প্রমাতৃভাব অপনীত হইয়া উদ্বেলিত হয় অন্য-কোন-জ্ঞেয়-বস্তু-সম্পর্ক-বিরহিত একটি অপরিমিত ভাব এবং সকল সহৃদয় ব্যক্তির মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্য থাকাতে, এই ভাবরসের যথার্থ অনুভূতি হয় ("সাধারণোপায়বলাৎ তৎকালবিগলিত—পরিমিত প্রমাতৃভাব বশোন্মিষিতবেদ্যান্তর সম্পর্ক শূন্যাপরিমিতভাবেন প্রমাত্রা সকল সহৃদয়সংবাদভাজা···গোচরীকৃতঃ")। এই অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় রসের স্বরূপ-নির্ণয়কল্পে রূপকের ভাষায় সাহিত্যরসিক তদীয় ব্যাখানে নির্দ্দেশ করিলেন—"সমস্ত বিচার, বিতর্ক, উদ্দেশ্য অপসারিত করিয়া ব্রহ্মানন্দ-আস্বাদনের সদৃশ অনুভূতির উদ্রেক করিয়া অলৌকিক চমৎকারকারী (ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর) এই রস, স্বরূপের আভাস দেয় ("অন্যৎ সর্ব্বমিব তিরোদধৎ ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন্ অলৌকিক চমৎকারকারী···রসঃ")। অতএব সার কথা এই যে, তাহাকেই "সাহিত্য" নামে অভিহিত করা যায় যাহাতে রসানুভূতির মধ্যস্থতায় হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের যোগ সাধিত হয়। কারণ, শেষ পর্য্যন্ত রস ভিন্ন আর কিছুতেই মানুষের সহিত মানুষের মেলা সম্ভবপর হয় না। "সাহিত্য"ই এই সেতুবন্ধ রচনা করিতে পারে। ইহারই অনুরূপ আভাস পাই "সভা" শব্দটির মধ্যে। "সভা" শব্দটি সেখানেই প্রযোজ্য যেখানে আভা, যেখানে আলোক বিচ্ছুরিত হয়। এ আলোক ত জড়চক্ষুর আলোক নয়—এ যে হৃদয়ের আলোক, প্রীতির, আলোক, অদ্বৈকত্ব-উপলব্ধির আলোক। এই আলোকেই মানুষের স্বরূপ, সত্যরূপ প্রকাশিত হয়। এই জন্যই প্রাচীনতম যুগের সেই মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা নবযুগের সকল সাংস্কৃতিক মেলন-চেষ্টায় আজও জৈব-প্রেরণারূপে কাজ করিয়া চলিয়াছে—

"তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে"—"হে জগতের পোষক আদিত্যমণ্ডল! সত্যধর্ম্মাশ্রয় দৃষ্টির জন্য (সত্যের যে মুখ হিরণ্ময় পাত্রে আচ্ছাদিত রহিয়াছে) তাহা অপসারিত কর।" ইহাই নবযুগের অন্তরতম বাণী—"হে মানব, তোমার আবরণ উন্মোচন কর, তোমার যে উদার, উন্মুক্ত স্বরূপ তাহাই প্রকাশ কর। 'তোমার একলা আপনের' আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া 'তোমার সকল আপনের সত্যে প্রকাশিত হও,' সেইখানেই তোমার মুক্তি।"

তবেই দেখিতেছি, মানুষের প্রকাশের আলোক নিজ একাকিত্বের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সে আলোক পাই সকলের সহিত মেলাতে। গণিতের রাজ্যের এক আর একে পাই দুই, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে এক আর একের যোগফল দু'য়ের পরিবর্ত্তে হয় তিন—কোথা হ'তে হয় আকস্মিক ও অদৃষ্টপূর্ব্ব এক তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব। আধ্যাত্মিক বা নৈতিক অনুশাসনের রাজত্বে যেখানেই একান্ত ভাবে দু'য়ের সংমিশ্রণ বা মেলন, সেখানেই ঋতরক্ষক অর্থাৎ সত্য ও নীতি-শাসন-বিধায়ক বরুণ তৃতীয় পক্ষরূপে বিদ্যমান ("বরুণস্তৃতীয়ঃ") ঋগ্বেদের এই উচ্ছ্বাসোক্তি সমর্থন লাভ করে ভাষ্য ও টীকার যুগে, ভামতী-টীকার প্রাঞ্জল ভাষায় এবং অধিকতর ব্যাপক অর্থে:—"নাপি স্বার্থমাত্রপরত্বৈব পদানাম্। তথা সতি ন বাক্যার্থপ্রত্যয়ঃ স্যাৎ" অর্থাৎ "বাক্যান্তর্গত পদ-সমুদায় একান্ত নিজস্ব, স্বীয় স্বীয় অর্থ প্রকাশ দ্বারাই সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। তাহা যদি পারিত তবে কোনও সম্পূর্ণ বাক্যার্থ-বোধ হইতে পারিত না।" কারণ একটি বাক্য এক অখণ্ড, সমস্ত সত্তা, সমষ্টিমাত্র নয়। ইহা এক অখণ্ডার্থ বা এক প্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত তাৎপর্য্যজনিত সত্তা। ইহার অন্তর্গত পদগুলি এক নৈর্ব্যাক্তিক "আকাঙ্ক্ষা" ও "তাৎপর্য্য" বা তাৎপরতা অথবা পরার্থপরতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও একত্রীকৃত। ভাবার্থ এই যে, পদসমুদায়ের স্বার্থ-(মাত্র) পরতায় কোনও একটি বাক্যার্থপ্রত্যয়, সম্পূর্ণ বাক্যও রচনা করা যায় না, স্বার্থ-(মাত্র) পর ব্যক্তি সমূহের সমাবেশে কোনও সমাজ-বন্ধন রচনা করা ত দূরের কথা। এই মেলনতত্ত্ব যেখানে, যে পরিমাণে অবজ্ঞাত বা ক্ষুণ্ণ হয় সেখানেই মানুষের সত্য পরিচয় সেই পরিমাণে আচ্ছন্ন বা ব্যাহত হয়। এই তত্ত্বের গভীরতম উপলব্ধি পাই ভক্তসাধক রজ্জবের ঋষিসুলভ ভাগবত দৃষ্টি ও উক্তির মধ্যে:—

"প্রীত অকেলী ব্যর্থ মহাসিন্ধু বিরহী দিল হোয়।
বুংদ পুকারৈ বুংদকো গতিমিলে সংজোয়।
অকেলবুংদ পহুচৈ নহী সূখৈ পংথ জীবজোর।
পংথ ভর ভরে একহোয় দরশ দয়া প্রভু তোর।"

"একেলার প্রেম ত ব্যর্থ। যদি বিন্দুর হৃদয়ে সিন্ধুর বিরহ জাগিয়া থাকে তবেই একটি বিন্দু ডাক দেয় অপর সকল বিন্দুকে, কারণ সবাই এক হইলেই স্রোতরূপে চলিতে পারে বহিয়া অর্থাৎ তাহাতে মেলে গতি। একলা একটি বিন্দু ত পৌছিতেই পারে না। পথের ব্যবধানই ফেলে শুকাইয়া তাহার সব শক্তি ও জীবন। আর সব বিন্দু এক হইলে, সেই পথকেই পারে সে আপন প্রাচুর্য্যের বন্যায় ভাসাইয়া দিতে। হে প্রভু, তখন তোমার দয়াতেই মেলে তোমার দরশন।"* "এই মেলার মধ্যে যে নিয়ম বা সংযমের অনুশাসন রহিয়াছে, তাহার যোগেই সত্যের শান্তরূপ এবং সত্য শান্তম্ অতএব শিবম্। আবার যিনি শিবম্ তাঁর মধ্যেই অদ্বৈতম্ পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশমান। মঙ্গলই শক্তিযোগে সকল ঐক্যবন্ধন বা সংহতির প্রতিষ্ঠানভূমি এবং বিরোধ বা বিচ্ছেদ অমঙ্গলেরই নামান্তর"। এই জন্যই বোধ করি মহারাজ অশোক তাঁর সুপ্রসিদ্ধ দ্বাদশ শিলালিপি অনুশাসনে স্বীয় আধ্যাত্মিক তথা রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ যে সারগর্ভ-বাণী জনসমাজে প্রচার করিয়া

---

* শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠ ও ব্যাখ্যান দ্রষ্টব্য।

দিয়াছেন তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য—"সমবায় এব সাধুঃ" অর্থাৎ সংহতিই পরমক্ষেম ও পরম ধর্ম।

দর্শনের পারিভাষিক ও ব্যবহারিক অর্থ

প্রসঙ্গতঃ, "দর্শন" শব্দটির একটি কার্য্যকরী সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা এক্ষণে অপরিহার্য্য হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে যে "দর্শন" শব্দটির যৌগিক বা যোগরূঢ় অর্থ এবং তার ক্রম-বিবর্ত্তনধারা অনুধাবন করার চেষ্টা—স্থান, কাল ও অধিকার বিবেচনায়—সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। সে জন্য বিশেষজ্ঞদের অনুসরণ করিয়াই বলিব যে তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন অর্থে—ইংরাজী philosophyর প্রতিশব্দরূপে—সংস্কৃত সাহিত্যে "দর্শন" বা "দার্শনিক" শব্দটির প্রয়োগ অতিবিরল, নাই বলিলেও চলে। তবে আমরা যে সাধারণ ভাবে "দর্শন" শব্দ ব্যবহার করি তাহার বৈকল্পিক অর্থনিচয় এই ভাবে তালিকাভুক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) প্রথমতঃ, ঐন্দ্রিয়ক বা চাক্ষুষ জ্ঞান (২) মনশ্চক্ষুঃ দ্বারা মানস-বস্তু বা অন্তঃকরণ-বৃত্তিসকল নিরীক্ষণ (৩) ধ্যানের দ্বারা সত্যবিশেষের উপলব্ধি বা ধ্যানজ প্রমা, যেমন রামায়ণে আছে—"দৃষ্ট্বা বৈ ধ্যানচক্ষুষা"—অথবা রামানুজের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে যেমন পাই, "ভাবনা-প্রকর্ষাদ্ দর্শনীয়রূপতা" ধ্যান বা চিন্তনের অবিচ্ছিন্ন বিস্তার বা উপচয় হইতে যে দর্শন-রূপের উদ্ভব হয় (৪) অলৌকিক অনুভূতি বা সমাধিগত-প্রজ্ঞা। এই অর্থ-সমূহ-ব্যতিরেকে উত্তরকালে "দর্শন" শব্দটি বিচার, বিশ্লেষণ, সমীক্ষণ-প্রভৃত বিশিষ্ট মতবাদ, এই অর্থে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। অতএব অর্থক্রিয়াকারিত্বের প্রমাণ প্রয়োগে "দর্শনে"র এই অর্থই গ্রহণীয়—মতবাদ বা চিন্তা-পদ্ধতি দ্বারা ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানকে মননের আনুকূল্যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের সাহচর্য্যে পরীক্ষিত ও পরিশুদ্ধ করিয়া ভাষায় প্রকাশ ও তদবলম্বনে জ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শ্রৌত জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক সত্য উপলব্ধি, সমাধিলব্ধ জ্ঞান বা প্রজ্ঞার অনধিকার প্রবেশ। কারণ, যখনই এই তথাকথিত অলৌকিক দর্শন বা জ্ঞান ভাষায় প্রকাশ করি তখনই তার অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ সত্য অংশতঃ বিনষ্ট হয় এবং শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় বলিতে হয় সত্য ও মিথ্যা সংমিশ্রণ পূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত হয় এই লোকব্যবহার ("সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য…অয়ং লোকব্যবহারঃ")।

অতএব দর্শন শব্দের ইতিবৃত্ত হইতে প্রতীয়মান এই হয় যে, লোকসিদ্ধ প্রণালীলব্ধ যে লৌকিক জ্ঞান (এবং বিশেষ অর্থে বিজ্ঞানও তদন্তর্গত), তাহা দর্শনের একমাত্র উপজীব্য। এই জন্যই ব্যাপক অর্থে জীবনের সহিত দর্শনের নাড়ীর যোগ—উভয়েই অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট। চিত্রার্পিত অনুলেখনে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষভাগে "জীবন"কে স্থাপিত করিলে তলদেশের দুই কোণে যথাক্রমে "সাহিত্য" ও "দর্শন" স্থান পাইতে পারে। কোণদ্বয়স্থিত দুইটিই জীবনের গহন-গুহাহিত "জিজ্ঞাসায়" সঞ্জাত ও সংবর্দ্ধিত এবং এই জিজ্ঞাসার প্রকৃষ্ট নির্ব্বাচন (definition) "জীবন-যোনি-প্রযত্ন" (instinctive activity), এই অভিধানে। বিচার ও মীমাংসা-সম্ভূত জ্ঞানের উৎস-স্বরূপ এই যে জিজ্ঞাসা, তাহার জীবন-পুরঃসর প্রবৃত্তির মধ্যেই সন্ধান পাই, ইহার প্রাণস্পর্শ ও জৈব প্রেরণায়। সাংখ্য-দর্শনে বলা হয় যে বোধ বা জ্ঞান প্রাকৃতিক বিকারের অনুগ্রহ বা পশ্চাদ্‌গ্রহণ প্রসূত ফলমাত্র ("ঋস্তেচতনাশক্তেরনুগ্রহঃ তৎফলং প্রমা বোধঃ")। এই উক্তিটির যেন প্রতিধ্বনি করিয়াই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সোরেন কিরকেগার্ড (Soren Kiarkegaard) নামক এক ডেনমার্ক দেশীয় দার্শনিক বলিয়াছেন—"We live forwards but understand backwards" অর্থাৎ "আমাদের জীবনের গতি পুরোভাগে কিন্তু অবগতি পশ্চাদ্‌ভাগে। জীবন আগ্রহাত্মক, চিন্তন অনুগ্রহশীযক।' ইংরাজীর "reflection" শব্দটির মৌলিক অর্থ এই পরাবৃত্ত-গতিরই ইঙ্গিত করে, জ্ঞান বা চিন্তন-ক্রিয়া সম্পর্কে। বিচার, মীমাংসা বা চিন্তনের সহজ-ধারা যেন শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত গতিচ্ছন্দ!

জীবন ও জিজ্ঞাসা

জীবনের ভূমিকায় নিখিল জ্ঞানের উৎসভূত জিজ্ঞাসার স্থান-নির্দ্দেশ-কল্পে বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার "ভামতী" টীকায় বলিয়া গিয়াছেন—"জিজ্ঞাসা সংশয়ের কার্য্য এবং (সেই অধিকার) তৎ-কারণীভূত সংশয়ের সূচনা করে। পরন্তু সংশয়ই (সকল) মীমাংসার সূত্রপাত করে।" ("জিজ্ঞাসা তু সংশয়স্য কার্য্যমিতি স্বকারণং সূচয়তি। সংশয়শ্চ মীমাংসারম্ভং প্রযোজয়াতি") প্রতীচ্য দর্শনেও দেখি, কেহ বলেন তত্ত্ববিদ্যার বা দর্শনের জনক বিস্ময় ("wonder"), আবার কাহারও মতে তাহা সংশয় ("doubt")। প্রথম উক্তিটির সম্প্রসারণ দেখি কবি কোলরিজের বাণীতে—"All our knowledge begins and ends in wonder; the first is the child of ignorance, the last is the parent of adoration"—অর্থাৎ "আমাদের সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি বিস্ময়ে এবং বিস্ময়েই তার পরিণতি। প্রাথমিক বিস্ময়টি অজ্ঞানতার সন্ততি, প্রান্তিক বা অন্তিম বিস্ময়টি অর্চ্চনার প্রসূতি।" দর্শন, বিচার, বা মীমাংসার মূলীভূত কারণ যাহাই হউক না কেন, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে মানুষ জীবনের সর্ব্ব-বিভাগে শান্তি ও আরাম অন্বেষণ করে এবং সেই কারণেই এই সংশয় ও জিজ্ঞাসার অশান্তি সভয়ে পরিহার করে। তাই চিন্তার রাজ্যে ইহারা অস্পৃশ্যজাতির মধ্যে গণ্য; এবং তৎসম্পর্কে চিন্তার আভিজাত্য ও অভিমানকে প্রতিপদেই পরাভব স্বীকার করিতে হয়। সত্যসন্ধ যে ব্যক্তি এই দুর্গম পথের যাত্রী তাঁহাকে সংশয় ও জিজ্ঞাসার অবশ্যম্ভাবী অনিশ্চয় ও অস্বস্তি বরণ করিয়া লইলেই হইবে। বার্টরাণ্ড রাসেল এক স্থানে বলিয়াছেন—"Men fear to think as children fear to go into darkness"—অর্থাৎ "শিশুরা যেমন অন্ধকারে ভয় পায়, পরিণত-বয়স্ক মানুষও তদ্রূপ (নিরঙ্কুশ) চিন্তাকে ভয় করে।" রাসেলের মত সংশয়বাদী নাস্তিকের এ ক্ষেত্রে কিছু বলা অশোভন এবং অনধিকার-চর্চ্চা বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু স্বয়ং গীতাকার এবং অন্যান্য ধর্ম্মাচার্য্যগণ যে কেবল তত্ত্বাঙ্গে ইহার মূল্য স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা নয়; ধর্ম্মজীবনের অন্যতম অপরিহার্য্য সাধনক্ষেত্রে প্রণিপাত, সেবা, অভ্যর্চ্চা প্রভৃতির সহিত একযোগেই "পরিপ্রশ্নে"র উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে যে, জর্ম্মণ্যদেশীয় সুবিখ্যাত দার্শনিক হেগেল (Hegel) অন্যান্য ধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচারী, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের ন্যায় ধর্ম্মমন্দিরে রবিবাসরীয় উপাসনায় যোগদান করিতেন না। পক্ষান্তরে সেই

সময়ে তাঁহার গৃহকোণে সমাসীন হেগেল তদীয় বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থরাজি রচনা করিতেন। এই অনাচার ক্রমেই তাঁর ধর্ম্মভীরু পরিচারিকার পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিল। অবশেষে তাঁহার পারলৌকিক সদ্‌গতি সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া এক দিন সসম্ভ্রমে তার মর্ম্মব্যথা হেগেলকে জানাইলে জ্ঞানতপস্বী হেগেল স্মিতহাস্যে উত্তর করিলেন—"ভদ্রে, সুগভীর চিন্তা (জ্ঞান-সাধনা) ও ঈশ্বরোপাসনা" ["Denken ist auch Gottes dienst"—"Thinking is also Divine Service]"

জীবন-জিজ্ঞাসা-সম্ভূত দর্শনের চলমান ধারা

তবেই দেখা যাইতেছে যে, জিজ্ঞাসা মানব-জীবনের আকস্মিক উপদ্রব মাত্র নয়, তাহার চিরন্তন উপস্বত্ব। বস্তুতঃ পক্ষে উপচীয়মান জিজ্ঞাসা আশা ও আনন্দ উভয়ই সূচিত করে, সংশয়-জিজ্ঞাসা-নির্ব্বাণ জ্ঞানের যে শান্তি তাহা রিক্তের, প্রেতভূমির শান্তি। আমাদের মধ্যে জাগ্রত থাকুক অসমাহিত চিত্তের সেই অনির্ব্বাণ জিজ্ঞাসা, যাহা মানবাত্মার স্বাস্থ্যের নিশ্চিত লক্ষণ। এই কারণেই জীবন-জিজ্ঞাসা-সম্ভূত যে দর্শন—কি ভারতীয়, কি ইউরোপীয়—তাহার সাধনায় একটি চলমান ধারা আছে। ভারতীয়-দর্শন-ক্ষেত্রে ইহার শাস্ত্রীয় বা ঐতিহাসিক নজীর পাই ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। ব্রাহ্মণ-ঋষি-তনয় শূদ্রী গর্ভজাত মহীদাস ছিলেন ইহার রচয়িতা। শিক্ষা ও দীক্ষা বিষয়ে পিতা কর্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া জ্ঞানভিক্ষু পুত্র মাতার নির্দ্দেশে আদিমাতা বসুন্ধরায় শরণাপন্ন হইলেন। মাতা মহীর দীক্ষায় দীক্ষিত সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আপনাকে "মহীদাস" এবং "ঐতরেয়" বা "ইতরাপুত্র" অর্থাৎ "ব্রাহ্মণেতরা শূদ্রীমাতার পুত্র" এই নামকরণেই স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ইতিহাসের ভূমিকায় এই "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ" প্রাগৈতিহাসিক তথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "ভারত-পন্থে"র এক অপূর্ব্ব জয়-তিলক রচনা করিয়া গিয়াছে। ইহারই এক অধ্যাত আখ্যায়িকায় রূপকের ভাষায় গ্রন্থকার ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম-সাধনার তথা দর্শন-মীমাংসার মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, রাজপুত্র রোহিত দীর্ঘকাল পর্য্যটন করিয়া ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম-লাভের আশায় যখন গৃহাভিমুখে চলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ-বেশী ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখীন হইয়া এই প্রত্যাদেশ করিলেন—"হে রোহিত, চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি যে, যে ব্যক্তি চলিতে চলিতে শ্রান্ত, তাহার শ্রী বা সৌন্দর্য্যের অন্ত থাকে না ; শ্রেষ্ঠ জনও যদি চলিতে বিমুখ হয় সে অধোগামী, অপদার্থ হইয়া যায় ; আর যে চলে স্বয়ং ইন্দ্র তার সখা ও সহচর হন ;—অতএব হে রোহিত চলিতে থাক, চলিতে থাক।"

"নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুমা
পাপো নৃষদ্‌বরো জনঃ ইন্দ্রইচ্চরতঃ সখা।
চরৈবেতি, চরৈবেতি।"

"যে চলে, তাহার প্রতি পদক্ষেপে পুষ্পিত হইয়া উঠে তাহার চলার পথ, বৃহৎ বৃহত্তর ফললাভ করে তাহার আত্মা। মুক্ত পথে চলার শ্রমে হতবীর্য্য হইয়া ঝরিয়া পড়ে তাহার যত পাপক্লেদ ; অতএব অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।···কারণ নিদ্রাতুর হইয়া শয়ন করাই কলিযুগ, জাগরণই দ্বাপর, গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হওয়াই ত্রেতা এবং অগ্রসর হওয়াই সত্যযুগ ; অতএব অগ্রসর হও, অগ্রসর হও! যে চলিতে থাকে, সেই অমৃতলাভ করে। চাহিয়া দেখ সূর্য্যের কি আলোক-সম্পদ, কারণ সে যে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এক দিনের জন্যও চলিতে চলিতে তন্দ্রাবিষ্ট হয় না। অতএব হে রোহিত, অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।"

"চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরণ্।"
চরৈবেতি চরৈবেতি।"

ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্ম-সাধনার এই মনোজ্ঞ ব্যাখ্যান একাধারে এত প্রাচীন, অথচ এত নবীন। "ইহাই ভারতের সনাতন পন্থা—অতএব ইহা অদ্যতনজীবনোপযোগী হইতেই পারে না" এইরূপ মনোবৃত্তি সত্যানুসন্ধিৎসার চরম পরিপন্থী। অথচ অথর্ব্ববেদে কুৎস ঋষি "সনাতন" শব্দটির মনোরম ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সনাতনমেনমাহুরুতাদ্য স্যাৎ পুনর্ণবঃ" ; "ইহাকে বলা হয় সনাতন কিন্তু অদ্যই ইহা নবজীবনে সঞ্জীবিত"। এই ঋষিবাক্যের সমর্থনে নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, স্মরণাতীত যুগের এই "চরৈবেতি" বাণী বিস্মৃতির অতলগর্ভ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নবজীবন পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের গানে—"পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে, পথে চলা সেই ত তোমায় পাওয়া" কিংবা মার্কিণ কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের (Walt Whitman) "Song of the Open Road"এ এই ছন্দের মধ্যে—

"Allons! Whoever you are,
come travel with me!
Travelling with me you find
what never tires.

* * *

Be not discouraged, keep on, there
are divine things, well envelop'd."

ভয়ের রাজ্য হইতে আত্মার স্বরাজ্য বা অভয়-লোক প্রাপ্তি

জ্ঞান-পরিপন্থী যে অজ্ঞান সকল অনর্থের মূল, তাহার অত্যাচার সমূলে বিনাশ করিতে হইলে মানুষ যে অধ্যাত্ম-সম্পদের অধিকারী, তাহার জ্ঞানই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন, পরম-পুরুষার্থ। মানব-সভ্যতার প্রথম উন্মেষের সময় অথবা আদিম অসভ্য অবস্থা হইতেই এই অজ্ঞানতা-প্রসূত ভয়-প্রণোদিত স্তব ও আরাধনা, প্রশস্তি বা প্রায়শ্চিত্ত সর্ব্বত্র চলিয়া আসিতেছে এবং ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে প্রথম সোপানরূপে পরিগণিত হইতেছে। কেহ বলিলেন, জগতে ভয় হইতেই দেবতাদের প্রথম সৃষ্টি, যথা, Lucretius—"It was fear that first made gods in the world." কেহ বা বলিলেন—"fear is the mother of all morals" অর্থাৎ "ভয়ই সমস্ত পাপ-পুণ্য-জ্ঞানের প্রসূতি"। ঋগ্বেদের সংহিতাভাগ এই ভাবের স্তব, স্তুতি, প্রার্থনায় পরিপূর্ণ। কোথাও অগ্নি, কোথাও বায়ু, কোথাও ইন্দ্র, কোথাও বরুণ প্রভৃতি দেবগণ ভয়-বিহ্বলচিত্ত উপাসক কর্ত্তৃক অভিনন্দিত ও পূজিত হইতেছেন। এই ভয়-শাসিত রাজ্যের পরিধি যতই বিস্তৃত হউক, ইহার একটি অবধি আছে এবং সেই সীমা-নির্দ্দেশ-কল্পে কঠোপনিষদের ঋষি বলিলেন :—

[৪০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বই পড়া

পাঠক ও সমালোচক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বই বস্তুটি আধুনিক সভ্যতার দান। বিজ্ঞানসম্মত মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত, নির্মিত ও প্রচারিত হওয়ার পর এই বস্তুটি সর্বজনগ্রাহ্য এবং এর বহুল প্রচারের ফলে এটি বর্তমান জগতের একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে ছিল পাথরে-খোদাই স্তম্ভলিপি বা শিলালিপি, তার পর তাম্র প্রভৃতি ধাতুর ওপর উৎকীর্ণ শাসন বা দান-ঘটিত অনুজ্ঞা। মানুষের সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের তাগিদে ভূর্জপত্র, তালপত্র ও তুলাপত্রের ব্যবহারের দ্বারা মনের ভাব লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি সে আয়ত্ত করতে থাকে। ফলে পুঁথির জন্ম হয়। দুষ্প্রাপ্যতা গুণে পুঁথি ছিল মহা মূল্যবান বস্তু। এক বা একাধিক পুঁথি যে দেশে থাকত দেশ-বিদেশ থেকে সেখানে শুধু নকলনবিশদের নয়, শ্রদ্ধাশীল পণ্ডিতদেরও সমাবেশ হত, তাঁরা পুঁথি আয়ত্ত করে স্বদেশের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতেন। ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে যে পুঁথির প্রচলন ছিল না—মুখে মুখে এবং কানে শুনে যে ঋষিদের তপস্যালব্ধ জ্ঞান প্রচারিত হ'ত তার প্রমাণ শ্রুতি ও স্মৃতি-কথা দু'টির মধ্যেই পাওয়া যায়। সৌতিক বৈশম্পায়ন প্রভৃতি প্রচারকেরা আজও বিখ্যাত হয়ে আছেন।

প্রাচীন কালের লোকেরা সত্যিই ভাগ্যবান ছিলেন। পুঁথির সংখ্যা কম ছিল বলেই পুঁথির প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ছিল অসাধারণ। অধীত পুঁথি তাঁরা নিঃশেষে আয়ত্ত করবার অবকাশ পেতেন। বাহুল্যের হাটে আগ্রহ হারিয়ে তালকাণা হয়ে পড়তেন না। পুঁথির মালিক হতে হলে গোটাটি নকল করতে হত ও নকল করতে গেলেই সম্যক্ অনুধারণার প্রয়োজন হত। ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের আগে পুঁথির সংখ্যা এত কম ছিল যে, কথিত আছে—সিসেরোর বক্তৃতা নকল করবার জন্যে ফ্রান্স থেকে রোমে ঘটা করে রাষ্ট্রদূত পাঠানো হয়েছিল। সমগ্র ফ্রান্সে এই মূল্যবান পুঁথির একটি সম্পূর্ণ কপি ছিল না। জেমব্লুর্সের পাদরি অ্যালবার্ট প্রভূত পরিশ্রম করে এবং অবিশ্বাস্য রকমের মূল্য দিয়ে দেড়শ' পুঁথি তাঁর লাইব্রেরীতে সংগ্রহ করেছিলেন, এর দ্বারা ইউরোপের সম্পূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার তাঁর আয়ত্তে এসেছিল; তাঁর লাইব্রেরী একটা বিস্ময়ের বস্তু ছিল। ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে উইন্‌চেষ্টারের বিশপের সুবিখ্যাত লাইব্রেরীতে মাত্র সতেরখানি পুস্তক ছিল, তারও সবগুলি খণ্ডিত, সেন্ট সুইদিনের কনভেণ্ট থেকে একখণ্ড বাইবেল একবার ধার নেবার জন্যে তাঁকে রীতিমত একটা মূল্যবান চুক্তিপত্র সই করতে হয়েছিল। এই সময়ে কেউ যদি একটা বই খরিদ করতেন দেশ-দেশান্তর থেকে গণ্যমান্য গুণী ব্যক্তিরা এই ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করবার জন্যে উপস্থিত হয়ে আনন্দ লাভ করতেন।

২

লাইকোরগাস পিথাগোরাস সোলন প্লেটো হিরোডোটাস থ্যালেস প্রভৃতিকে কি ভাবে জ্ঞানার্জনের জন্যে মিশর পারস্য ভারতবর্ষ প্রভৃতি ভ্রমণ করতে হয়েছিল তার কাহিনী যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি বিস্ময়কর। এ সত্ত্বেও সেই বিরল পুস্তক-যুগে ভারতবর্ষে এবং ইউরোপে যে শ্রেণীর মনীষীদের আবির্ভাব ঘটেছিল আজ বইয়ের ছড়াছড়ির মধ্যেও তার তুলনা মেলে না। পাণিনি বেদব্যাস শঙ্কর প্লেটো অ্যারিষ্টটলের আবির্ভাব এ যুগে সম্ভব নয়।

এর প্রধান কারণ এই যে আমরা গাদা-গাদা বই পড়িও, কিন্তু জ্ঞান অর্জন করি না। চিন্তা করবার দায়িত্ব আমরা অন্য লোকের অর্থাৎ গ্রন্থকারদের ওপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। বিবিধ খাদ্য আমাদের সম্মুখে থরে-থরে সাজানো রয়েছে, আমরা খাবার আগ্রহে নয়, চোখের নেশায় এটা চাখছি ওটা চাখছি, কিন্তু কোন খাদ্যই হজম করবার মত পরিশ্রমও করছি না। পরিপাকের সময়ও দিচ্ছি না। মহাকবি সেক্সপীয়র চাদের সম্বন্ধে বলেছেন—

> "And this our life exempt from public hawnts
> Finds tongues in trees, books in the
> running brooks,
> Sermons in stones, and good in every thing."

আমরা তারা নই, মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে আমরা প্রাতঃকালে খবরের কাগজ থেকে আরম্ভ করে মধ্য-রাত্রে নৈশভোজনান্তিক হালকা গল্প পর্য্যন্ত একটার পর একটা গিলে খাচ্ছি, প্রতি মুহূর্ত্তে আক্রান্ত হচ্ছি লক্ষ লক্ষ বইয়ের চটকদার বিজ্ঞাপনের দ্বারা, কি পড়ব কি পড়ব না এ ভেবে কূল-কিনারা না পেয়ে ফ্যাশনের খাতিরে কতক-গুলো চালু বইয়ে চোখ বুলিয়ে জ্ঞানার্জন-স্পৃহা নিবৃত্ত করছি, কিন্তু আসলে আমাদের মনে ও মজ্জায় কিছুই প্রবেশ করছে না। আমরা এ যুগে সকলেই বই পড়ার ব্যাপারে মন্দাগ্নি রোগে ভুগছি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এ বিষয়ে মহা মহা চিকিৎসক জন্মেছেন, তাঁদের উপদেশ ও ব্যবস্থায় সাধারণে কতকটা আত্মস্থ হতেও পেরেছে, প্লিনি, সেনেকো, বেকন, এমার্সন, অ্যাডামস্, টড, কবেট এবং বর্তমান কালে আর্থার কুইলার, আর্ণল্ড বেনেট, ল্যাসেলস অ্যাবার, ক্রম্বি, মিডল্‌টন মারে, টি, এস, এলিয়ট প্রভৃতির সাহায্য ও নির্দ্দেশে বইয়ের দুর্গম অরণ্যের মধ্যে সাধারণ মানুষে পথ খুঁজেও পেয়েছে, কিন্তু আমাদের এই দুর্ভাগ্য বাংলা দেশে তেমন পথ-প্রদর্শকের আবির্ভাব ঘটেনি। আমরা এই রাজ্যে সবে নতুন প্রবেশ করেছি বলে বিস্ময়ের ঘোর আমাদের কাটেনি। এই প্রচণ্ড বিস্ময়ের মধ্যেই আমাদের রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ক্ষীণ আহ্বান-ধ্বনি উত্থিত হয়েছে, তিনি বাঙ্গালী জাতিকে এই পুস্তক-কল্লোলের মধ্যে সাধ্যমত তরঙ্গ তুলতে ডাক দিয়েছেন, মানব-সমাজকে আমাদের নিজস্ব কিছু সংবাদ দিতে বলেছেন। তিনি বলেছেন—

"কত নদী সমুদ্র পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে—কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এস এখানে এস, এখানে আলোকের জন্ম-সঙ্গীত গান হইতেছে।

"অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে কোন দিন আপনার চারি দিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন—তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্য-ধামে বাস করিতেছ—সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠেই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরীর মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

"এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানব-সমাজকে আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই? জগতের একতান সঙ্গীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে?...

"দেশ-বিদেশ হইতে অতীত বর্ত্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানব জাতির পত্র আসিতেছে, আমরা কি তাহার উত্তরে দু'টি-চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখিব? সকল দেশ অসীম কালের পথে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে, বাঙালীর নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা' থাকিবে? জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শৃঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠানের মাচার' উপরকার লাউ-কুমড়া লইয়া মকর্দ্দমা ও আপীল চালাইতে থাকিব?"

প্রায় ষাট বছর আগেকার এই ডাক, এর আগে রামমোহন মধুসূদন ভূদেব বঙ্কিম এবং এর পরে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর বাঙলা দেশের কিছু কথা পৃথিবীর মানব-সমাজকে শুনিয়েছেন কিন্তু তাই কি যথেষ্ট? সৃষ্টির আদিকাল থেকে আহৃত পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারের পূর্ণ উত্তরাধিকারী আমরা, সে উত্তরাধিকারের মর্য্যাদা আমি রাখতে পারছি কই? তার জন্যে দরকার মননশীলতা, ছাপা বই শুধু ইঙ্গিত দেয়, সেই ইঙ্গিত অনুযায়ী মানুষকে ভাবতে হয়, তবেই মানুষ কিছু দান করতে পারে। আজকের দিনে অসংখ্য বই সারি-সারি সাজানো রয়েছে চার দিকে, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটা পথ্য, কোনটা অপথ্য—এর মধ্যে থেকে নিজের ক্ষমতা ও প্রয়োজন মত বাছাই করে কাজে লাগানো সাধারণ পাঠকের কাজ নয়; এর জন্যে প্রয়োজন সমালোচকদের সাহায্য। নিভৃত সাধনায় ঋষি-মুখে বেদমন্ত্র উদ্‌গীত হয়েছিল কিন্তু তাকে সর্বজনগ্রাহ্য করতে পেরেছেন সায়ণ তাঁর টীকার সাহায্যে, বেদান্তসূত্রকে সহজ করেছেন শঙ্কর-রামানুজ, পুরাণ-ভাগবত বুঝতেও নীলকণ্ঠ প্রভৃতির সমালোচকদের নির্দেশ প্রয়োজন হয়েছে। ইংলণ্ডের সেক্সপীয়রকে সহজ ও বিশদ করেছেন হাজার খানেক টীকাকার, ব্রাউনিংকে বুঝতে ও বোঝাতে ব্রাউনিং-চক্রের কাজ এখনও শেষ হয়নি। পৃথক্ পৃথক্ কবিদের কাব্যরস হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যে যেমন সমালোচকের প্রয়োজন, পৃথিবীর পুস্তক-গহনে পথ খুঁজে পাবার জন্যেও তেমনি তাদিকে দরকার। এ যুগে বইকে বাদ দিয়ে কোনও মানুষের চলে না, চলা উচিত নয়।

এক জন বিখ্যাত ইংরেজ মনীষী বলেছেন—পৃথিবীর যাবতীয় বিশিষ্ট লোকের অভ্যাস হচ্ছে অবিরাম বই পড়া। এই অভ্যাস ছাড়া সাধারণ থেকে বিশেষ হয়ে ওঠার আর কোনও পথ নেই। বেকন বলেছেন, 'Reading makes a full man; conversation a ready man writing an exact man.' অর্থাৎ গোটা মানুষ হতে হলে পড়া চাই। বেকন "গোটা" বলতে যা বুঝেছেন প্রভূত অধ্যয়ন ও বইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে তা হবার জো নেই। বই পড়ে যে জ্ঞান লাভ হয় ভগবদ্দত্ত প্রতিভার বলে তা আপনা থেকে অর্জিত হয় না; অতি মনস্বী দু'-এক জন মানুষ হয়তো নিজস্ব একটা পথ বের করতে পারেন, কিন্তু যখন আদিকাল থেকে যুগ যুগ ধরে মানুষের সমবেত চেষ্টায় প্রশস্ত পথ প্রস্তুতই রয়েছে তখন চেষ্টা করে নতুন পথ গড়ার সার্থকতা কি? মানুষের জীবন সীমাবদ্ধ কিন্তু জ্ঞান অনন্ত, এই অনন্ত কালের সমুদ্রে সাধারণ পাঠকদের ভাসবার ভেলা হচ্ছেন টীকাকাররা, সমালোচকরা যাঁরা নিজেরা সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করে জটিল দুর্গম পথকে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী করে তোলেন, যাঁরা গন্ধমাদন বহন করে আনেন না, সেখান থেকে বিশল্যকরণী মৃতসঞ্জীবনী সংগ্রহ করে এনে সকলকে দান করেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে—সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুকরণ যতটা দরকার এমনটি আর জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই নয়।

ইংরেজী সাহিত্য বা পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্য আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। বাংলা সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত বিরল-সম্পদ অরণ্যে যথার্থ পথনির্দ্দেশ করবার লোকেরও অভাব আছে। অতীতে যেখানে বনস্পতির বাহুল্য সেখানে আমাদের ভয় নেই, কারণ আমাদের অতীত অতি দূরবর্ত্তী নয়। বৌদ্ধ গান ও দোহা বা চর্যাপদে আমাদের সুরু। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচি, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু এই সূত্রপাত যুগের যত দূর সম্ভব জ্ঞাতব্য তথ্য আমাদের দিয়েছেন। আঁধার তিমিরগর্ভ থেকে সংগৃহীত মণিগুলি ও কালি-ঝুলি আবর্জ্জনার আবরণ মুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে স্বকীয় উজ্জ্বলতায় প্রকাশ পাচ্ছে। তার পর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বাংলা ভাষার আদিতম খাঁটি নিদর্শন নিয়ে পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মশায়ের চেষ্টায় আমাদের আয়ত্তাধীন হয়েছে। এর পরে বাংলা সাহিত্যে পদাবলী-শাখা, মংগল কাব্যশাখা ও অনুবাদ শাখা জড়াজড়ি হয়ে আছে। কিছুটা জট ছাড়িয়ে সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করে দিয়েছেন নীলরতন মুখোপাধ্যায়, রমণীমোহন মল্লিক, সারদাচরণ মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু, যোগেশচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র রায়, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বাঙালী পাঠকেরা চেষ্টা করলে এখন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর, গোবিন্দদাসের পার্থক্য বুঝতে পারবেন। রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, মাণিক গাংগুলী ও ঘনরামের ধর্ম্মমংগল, কাণা হরিদত্ত ও বিজয় গুপ্তের মনসামংগল, কৃত্তিবাস ও জগৎরামের রামায়ণ, কাশীদাস ও শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে, কৃষ্ণপ্রেমতরংগিনী ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্যে গোলগোল পাকিয়ে ফেলবে না। তারা সহজেই বলতে পারবে যে, চণ্ডীদাস যেমন পদাবলী-শাখার শ্রেষ্ঠ কবি, মংগলকাব্যে তেমনি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকংকণ, বলতে পারবে কাশীরাম দাস অনুবাদে অতুলনীয়, বলতে পারবে ভারতচন্দ্র প্রথম নিখুঁত ছন্দ ও শব্দশিল্পী। তার পর এসেছে চৈতন্য-যুগ—বাংলা কাব্য-সাহিত্যের রৌপ্যযুগ। এই যুগে জীবনী-শাখায় বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ; পদাবলী-শাখায় বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ দাস সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্যকে। তার পর মাঝখানে রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের প্রায় সমকালে বাংলা দেশে এসেছে কবির যুগ—অপেক্ষাকৃত অন্ধকার যুগ। এই অন্ধকারেও আলোকপাত করে গেছেন কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ওদিকে পূর্ব্ববংগে যে অপরূপ কাব্যকথা-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল—চন্দ্রকুমার দে, দীনেশচন্দ্র সেনের চেষ্টায় সে অপূর্ব্ব রস থেকেও বাংগালী পাঠক আজ বঞ্চিত নয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে এসেছেন পাদরি কেরি। আরম্ভ হয়েছে বাংলা সাহিত্যে গদ্য-যুগ—এসেছেন রাম-রাম বাবু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামমোহন ও কৃষ্ণমোহন, সুরু হয়েছে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে শিথিল গদ্যকে

শিল্প-সংগত করে সাহিত্য সৃষ্টি—তার পর আধুনিক যুগ অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণ-যুগের পত্তন, গুরু ঈশ্বর গুপ্ত, শিষ্য বংকিমচন্দ্র, দীনবন্ধু। এর পরে বন্যা-স্রোতের মত সাহিত্য ক্ষেত্রে ঢুকেছে বইয়ের স্রোত, ভাল-মন্দ মাঝারি নাটকই ছাপা হয়েছে হাজার হাজার, কবিতার বই দশ হাজারের হিসেবে। রাজা রাজেন্দ্রলাল, কালীপ্রসন্ন, প্যারীচাঁদ, দ্বারকানাথ এক দিকে, অন্য দিকে রংগলাল, মধুসূদন, বিহারীলাল। এল বংগদর্শনের যুগ, সমালোচনার হস্তে অংগনে অবতীর্ণ হলেন বংকিমচন্দ্র, অসহায় বাঙালী পাঠক যেন অকূল সমুদ্রে কূল পেল, বংকিমচন্দ্রের তীব্র কশাঘাতে যাচাই হতে লাগল ভালমন্দ—অনেক জঞ্জাল সাফ হয়ে গেল। এলেন রবীন্দ্রনাথ—তিনিও গুরু বংকিমচন্দ্রের পদাংক অনুসরণ করে সাধনা নব পর্য্যায় বংগদর্শন মারফৎ দিগ্‌ভ্রান্তদের দিক্‌নির্ণয়ে সাহায্য করলেন। বিংশ শতাব্দীর দশক থেকে-পশ্চিম-সমুদ্র থেকে যে বেনোজল ঘরে ঢুকল তারি ধাক্কায় বাংলা দেশের সাহিত্য-প্রাংগণ ভরে উঠল ভাল-মন্দ গাছে ও আগাছায়। এখন দিশেহারা পাঠককে রক্ষা করবার জন্যে প্রয়োজন দরদী সত্যনিষ্ঠ সমালোচকের। বাংলা সাহিত্যকে ভরা-ডুবি থেকে রক্ষা করবার জন্যে তাঁদের আবির্ভাব এবার প্রয়োজন হয়েছে।'

আনটুনী ফিরিঙ্গী

ক খ, গ

বাঙলা দেশে কবিগানে আনটুনী অত্যধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি জাতে পর্ত্তুগীজ, ব্যবসায়-কর্ম্ম উপলক্ষে বাঙলা দেশে আগমন করেন, ফরাসডাঙ্গায় তাঁহার প্রথম অধিবাস এবং এই স্থানেই তিনি এক ব্রাহ্মণ-যুবতীর প্রেমে পড়েন। শেষে যুবতীকে লইয়া গরীটির নিকট গিয়া বসবাস করেন। তাঁহার বিস্তৃত বাগান-বাটীর ভগ্নাবশেষ বহু কাল তথায় দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় "সেকাল আর একাল" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন—"আমার কোন আত্মীয় বলেন,—"আনটুনী সাহেবের বাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি আমার স্মৃতিপথে বিলক্ষণ জাগরূক আছে। উহা ফরাসডাঙ্গার নিকট গরীটির বাগানে ছিল। রেলরোড্‌ হইবার পূর্ব্বে বাটী যাইবার পূর্ব্বে বাটী যাইবার সময়ে আমাদিগের নৌকা সর্ব্বদাই গরীটির বাগানের নীচে দিয়া যাইত। সুতরাং আনটুনী সাহেবের ভগ্নবাটী সর্ব্বদা আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইত। কিছু দিন পরে গরীটির বাগান ভয়ানক অরণ্যে পরিণত হইয়া দস্যুদলের আশ্রয় স্থান হইয়া উঠিয়াছিল।"

আনটুনী যৌবন কালে ফরাসডাঙ্গায় কয়েকটি অসৎ প্রকৃতি লোকের সংসর্গে পড়িয়া নষ্টচরিত্র হন। তিনি প্রথমে এক জন হিন্দু কবিওয়ালার দলে প্রবিষ্ট হন, পরে নিজেই দল গঠন করেন।

আনটুনীর প্রেমিকা ব্রাহ্মণকন্যা ম্লেচ্ছস্পৃষ্টা হইলেও তিনি হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবতী ছিলেন,—নিজ গৃহে দুর্গোৎসবাদি করিতেন। পূজায় তাঁহার বাটীতে কবি হইত। বাঙালী ব্রাহ্মণ-কন্যার সম্পর্কে থাকিয়া, আনটুনী সাহেবও উত্তমরূপে বাঙলা শিখিয়াছিলেন। কবির গান বেশ বুঝিতে পারিতেন। ক্রমে তাঁহার কবির নেশা জমিয়া যায়, তিনি সখের দল গঠন করিলেন। প্রেমে পড়িয়া ইতিপূর্ব্বে তিনি বাণিজ্য-ব্যবসায়ে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, এক্ষণে যা কিছু সঞ্চিত বিত্ত ছিল, সখের কবির দলে তাহাও নিঃশেষ করিলেন। কাজেই তখন সখের দলকে পেশাদারী করিতে হইল। ক্রমে ক্রমে দলের পসার বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইল,—অর্জ্জিত অর্থে পরম সুখ ও সচ্ছন্দে সংসার চলিতে লাগিল। গোরক্ষনাথ ঠাকুর প্রথমতঃ ইহার দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। শেষে আনটুনী নিজেই উত্তম উত্তম গান রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একবার ঠাকুরদাস সিংহের দলে রাম বসু আনটুনীকে বলেন,—

"কও হে এনটুনী ! আমি এইটি শুনতে চাই।
এসে এ দেশে এ বেশে, তোমার গায়ে, কেন কুর্ত্তি নাই।"

আনটুনী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—

"এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকুরো সিঙ্গীর বাপের জামাই কুর্ত্তি-টুপী ছেড়েছি।"

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, আনটুনী সাহেবী বেশ—কোর্ত্তা কিংবা টুপি পরিতেন না,—তৎকালীন বাঙালীর ন্যায় ধুতি চাদরই ব্যবহার করিতেন।

আর একবার নিজের দলে থাকিয়া রাম বসু আনটুনী সাহেবকে বলেন,—

"সাহেব ! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মুড়ালি।
ও তোর পাদরি সাহেব শুনতে পেলে গালে দিবে চূণ-কালি।"

আনটুনী জবাব দিলেন—

"খৃষ্টে আর কৃষ্ণে কিছু প্রভেদ নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে, হিঁদুর হরি সে—
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে,—
আমার মানব-জনম সফল হবে,—যদি রাঙ্গা চরণ পাই।"

একবার দুর্গোৎসবের সময় চুঁচুড়ার কোন ধনবান লোকের বাড়ী আনটুনীর দলের বায়না হয়। গোরক্ষনাথ ঠাকুর তখন সাহেবের দলের বাঁধনদার। গোরক্ষনাথ আনটুনীকে বলিলেন,—"আমার সংবৎসরের মাহিনা এই পূজার আগে শেষ করিয়া দিতেই হইবে,—না দিলে,—আমি নূতন আগমনী বাঁধিয়া দিব না।" সাহেব এবার বড়ই রাগিয়া উঠিলেন। তিনি আর গোরক্ষনাথের তোয়াক্কা রাখিলেন না,—নিজেই আগমনীর নূতন গান বাঁধিয়া লইলেন। এই গানের দুই ছত্র এইরূপ ;—

"আমি ভজন-সাধন জানিনে মা ! নিজে তো ফিরিঙ্গী।
যদি দয়া করে কৃপা কর হে শিবে মাতঙ্গি !

একটি বিপক্ষ দল আনটুনী সাহেবকে বলেন,—

আনটুনী ফিরিঙ্গী কফন চোর। ভাঙ্গে রাত হলে সব মৌত গোর।
টাটকা গোরে শুটকো ভূতের রব,—এ কি অসম্ভব,—
এ হুমকি দিয়ে বস্তু লোটে সব,—এর ঠাঁর-ঠিকানা গেল জানা,
মানুষ হলো তিন সহর।'

ললিতকলা ও সুভাষচন্দ্র

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সুভাষচন্দ্র বসুর অতুলনীয় স্বদেশপ্রেম, রাজনৈতিক জ্ঞান ও ঘটনাবহুল কর্মজীবন নিয়ে বড় বড় লেখক ও বক্তা বড় বড় আলোচনা করেছেন। সেগুলি পাঠ বা শ্রবণ করলে পরম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে কেবল এই কথাই মনে করি, অতি-আধুনিক ভারতে অবহেলিত ক্ষুদ্র বাংলা দেশ এখনো হারিয়ে ফেলেনি এমন মহামানুষকে জন্ম দেবার শক্তি।

কিন্তু আজ আমি সুভাষচন্দ্রকে ঐ-রকম বড় বড় দিক্ থেকে দেখতে বা দেখাতে চাই না। মহামানুষরা কেবল বড় বড় আসর-জমানো ব্যাপার নিয়ে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেন না, তাঁদের জীবন বিচিত্র এবং বহুধা বিভক্ত এবং সাধারণতার মধ্যেও তাঁরা হন অসাধারণ।

ধরুন নেপোলিয়নের কথা। তাঁর নাম করলেই মনে হয় এমন এক জন একাধিপতি দিগ্বিজয়ীর মূর্ত্তি, যাঁর নিষ্ঠুর রক্তরঞ্জিত তরবারি কোন দিন হয়নি কোষবদ্ধ। কিন্তু আসলে এই মূর্ত্তিই তাঁর সমগ্র মূর্ত্তি নয়। যুদ্ধক্ষেত্রের রক্তগঙ্গায় যখন মানুষের প্রাণ নিয়ে চলছে ছিনিমিনি খেলা, যখন জয় হবে কি পরাজয় হবে সেটাও সুনিশ্চিত নয় বলে মন দুলছে সন্দেহ-দোলায়, যখন চারি দিক থেকে ক্রমাগত আসছে যুদ্ধরত সেনানীদের কাছ থেকে রকম-রকম আবেদন, তখন সেই মারাত্মক গণ্ডগোলের মধ্যেও দেখি অশ্বারোহী নেপোলিয়ন করছেন সুদূর প্যারি সহরের মেয়ে-বিদ্যালয়ের জন্যে জরুরী ব্যবস্থা। নেপোলিয়নের আর একটা বিশেষত্ব দেখি মস্কো সহরে, যেখান থেকে তাঁর অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। সেখানে যখন তাঁর নিজের জীবন অশান্তিময় এবং সমগ্র সৈন্যদল বিপদগ্রস্ত, তখনও তিনি মস্কো নগরে ফরাসী নাট্য-জগতের প্রভাব বিস্তারের জন্যে বন্দোবস্ত করছেন। নেপোলিয়ন কেবল যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য চালনাই করেননি, তিনি ইতিহাস ও ছোট গল্প রচনাও করেছেন এবং তিনি ছিলেন সাহিত্য ও নাট্য-কলারও বিশিষ্ট ভক্ত। তাঁর আরও অনেক রূপ আছে, কিন্তু এখানে সে-সব দেখাবার দরকার নেই।

একালের হিটলারের কথাও ধরুন। নেপোলিয়নের মত বিচিত্র ও সুবৃহৎ প্রতিভার অধিকারী না হলেও, তিনিও এক জন নির্মম একাধিপতি ও রাজনীতিবিদ্ এবং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে যে ভয়াবহ রক্তস্রোত প্রবাহিত করেছেন, আজও তা শুকিয়ে যায়নি। কিন্তু হিটলারের আর এক মূর্ত্তি দেখেছি যখন তিনি গিয়েছেন রঙ্গালয়ে গীতি-নাট্যাভিনয় উপভোগ করতে। সঙ্গীতবিদ্ না হলেও সঙ্গীতকলা ছিল তাঁর পরম প্রিয়। তাঁকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানতেন এমন এক ব্যক্তি বলেছিলেন: "Hitler needs music like dope;" নিজের সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলতেন: "I think I am one of the most musical people in the world." কেবল তাই নয়, তিনি স্থাপত্য ও চিত্রকলারও অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন।

অমন যে নিরক্ষর, দুর্দ্ধর্ষ ও হত্যাকারী রণবীর তৈমুরলং, তাঁরও মনের মধ্যে ছিল ললিতকলার প্রভাব। উত্তর-পশ্চিম ভারত যখন তাঁর পায়ের তলায় রক্ত-বন্যায় ভাসছে, তখনও তিনি দুই চোখে তাকিয়ে আছেন ভারতের শিল্প-সৌন্দর্য্যের দিকে। অনুভব করলেন শ্রেষ্ঠ স্থপতির অভাবে তাঁর নিজের দেশ স্থাপত্যকলায় কি দরিদ্র! অতএব যাবার সময় এখান থেকে তিনি ধরে নিয়ে গেলেন দলে দলে ভারতীয় শিল্পীকে!

যদি আরো প্রাচীন যুগের দিকে তাকাই তাহ'লে দেখি, দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত (ভিনসেন্ট স্মিথ যাঁকে "ভারতের নেপোলিয়ন" উপাধি দিয়েছেন) কেবল রাজ্য ও অস্ত্র-চালনাই নয়, সেই সঙ্গে করেছেন বীণার উপরে অঙ্গুলিচালনাও। তাঁর সভাকবি হরিষেণ বলেন. তিনি সুকবি ও সুগায়কও ছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনও ছিলেন একাধারে যোদ্ধা, কবি ও অভিনেতা।

সুভাষচন্দ্রের মনও ছিল বহুমুখী। কেবল রাজনীতি নিয়েই তিনি একান্ত ভাবে নিযুক্ত হয়ে থাকতেন না, "অসামরিক" বলে নিন্দিত বাঙালীর ছেলে হয়েও দরকার হ'লে তিনি যে যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভীক্ ভাবে দাঁড়িয়ে লক্ষাধিক সৈন্য চালনা করতে পারতেন প্রবীণ সেনাধ্যক্ষের মত, এ সত্যও আজ কারুর অবিদিত নেই।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপ থেকে তিনি 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে যে পত্র লিখেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর জীবনের আর একটা দিক্ দেখতে পাই। পত্রের একাংশ এই: "শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্য-প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। 'নিবেদিতা'র মত আমিও মনে করি যে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের (স্বরূপের) দুই রূপ। আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ তাঁকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম। যাহা হউক, যত দিন জীবিত থাকিব তত দিন 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে'র একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব—এ কথা বলা বাহুল্য।"

কূট রাজনীতি নিয়ে যাঁরা সর্ব্বদাই নাড়া-চাড়া করেন তাঁদের অধিকাংশেরই মন এমন নীরস ও এক দিক-ঘেঁষা হয়ে যায় যে, সাহিত্য ও সূক্ষ্মতর ললিতকলা তাঁদের আর আকর্ষণ করতে পারে না। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে বক্তৃতা-মঞ্চে আরোহণ করে সাহিত্য ও ললিতকলা নিয়ে কিছু বলতে বাধ্য হলে মুখরক্ষার জন্যে তাঁরা অল্প নয়—বিস্তর বাক্যোচ্ছ্বাসই প্রকাশ করতে পারেন বটে, কিন্তু সে-সব কথা হয় এতই শূন্যগর্ভ যে উচ্চতর চিত্তকে স্পর্শ ই করতে পারে না। এ জন্যে দোষ দিই না, কারণ কর্ম্মব্যস্ত জীবনে "রসের ক্ষেত্রে চাষ দেবা"র প্রতিভা বা অবসর থাকে না সাধারণ রাজনৈতিকদের।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রতিভা হচ্ছে অসাধারণ এবং সর্ব্বতোমুখী। কখনো তিনি আত্মত্যাগী স্বদেশ-প্রেমিক, কখনো সৈনিক, কখনো কূট যোদ্ধা রাজনৈতিক, কখনো সন্ন্যাসী, কখনো পরমহংস-বিবেকানন্দের অনুগত এবং কখনো যুবকদের নিয়ে সংগঠন-কার্য্যে নিযুক্ত। বিদেশী রাজদণ্ডের নির্দ্দয় শাসনে বার বার তিনি কারাগারের ভিতরে বন্দী হয়েছেন, স্বদেশ থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছেন, বা অজ্ঞাতবাস করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু কখনো নির্ব্বাপিত হয়নি তাঁর জ্বলন্ত দেশ-হিতৈষণা এবং কখনো রুদ্ধ হয়নি তাঁর ভাব থেকে ভাবান্তরে আনাগোনা।

বিশ্বের বিস্তৃত রাজপথে মিছিলের নেতারূপে সবাই দেখেছে [illegible]। কিন্তু সেখানে তিনি রূপ-রসের কুঞ্জবনে আবার,

বেঁচে আছে, আর সেই হিসেবেই গভীরার যা মূল্য। সুতরাং যাঁরা ও-প্রকার সঙ্গীত ও নৃত্য পুনর্জীবিত করতে চান, তাঁদের মালদা থেকে কাজ আরম্ভ করাই সুবিধা।

"লোক-সঙ্গীত ও নৃত্যের দিক্ থেকে বর্ম্মা এক আশ্চর্য্য দেশ। খাঁটি দিশী নাচ ও গান এখনও পুরোদমে এখানে চলেছে, আর সুদূর পল্লীতে পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোককে আমোদ-আহ্লাদের খোরাক যোগাচ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির অনুশীলন করার পর তুমি যদি ব্রহ্মদেশের সঙ্গীতের চর্চ্চা কর ত মন্দ হয় না।

"সে সঙ্গীত হয়ত তত সূক্ষ্ম বা উন্নত নয়, কিন্তু দরিদ্র ও অশিক্ষিতকেও প্রচুর আনন্দ দান করিবার যে ক্ষমতা তার আছে, আপাততঃ আমি তাতেই আকৃষ্ট হয়েছি। শুনি না কি এখানকার নাচও বড় সুন্দর। বর্ম্মায় জাতিভেদ না থাকাতে এখানকার শিল্পকলার চর্চ্চা কোন শ্রেণীবিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ফলে বর্ম্মায় আর্ট চারি দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। বোধ হয় এই কারণে, আর লোক-সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রচলন থাকার দরুণ, ব্রহ্মদেশে ভারতবর্ষের চেয়ে জনসাধারণের মধ্যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান অনেক বেশী পরিণতি লাভ করেছে। দেখা হলে এ বিষয়ে আরও কথা হবে।"

★

"আত্মহত্যা কি পাপ ?"

[প্রতিবাদ]

শ্রীরামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

আষাঢ়ের 'বসুমতী'তে "আত্মহত্যা কি পাপ" প্রবন্ধটি পড়িলাম, এ রকম প্রবন্ধ মাসিক কাগজে আলোচিত হওয়া সমাজ-জীবনের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ এই প্রশ্নটা আজকের জগতে অনেকের জীবনেই এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রশ্নটা খুবই ব্যাপক। লেখক বিষয়টির যে দিক্ থেকে যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছেন সেটা মোটেই ঠিক নয়।

বিষয়টির আলোচনা করতে হলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগবে—পাপ কি এবং পুণ্য কি ? লেখক এদিক্‌টার কোনও পরিষ্কার উত্তর দেন নাই। তিনি লিখেছেন, পাপ ও পুণ্য "সূক্ষ্ম ন্যায় ও সূক্ষ্ম অন্যায়"—তাহাও আবার ব্যক্তিবিশেষের জন্যে যাহা ন্যায়—অপরের পক্ষে সেটা অন্যায়। কিন্তু বিষয়টা এত সহজ নয়, এবং লেখকের প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে বিষয়টা মোটেই পরিষ্কার হয় নাই।

পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা দিতে হলে প্রথমেই একটা কথা মনে রাখতে হবে। পাপ-পুণ্যের ভিত্তি জন্মান্তরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা জীবাত্মার জন্মান্তর স্বীকার করেন না তাঁহারা "যাবৎ জীবেৎ" নীতি অনুসরণ করেন ; যাহা পার্থিব সুখের অনুকূল তাহাকেই পুণ্য বলে মনে করতে পারেন এবং সাময়িক দুঃখে মোহগ্রস্ত হয়ে এ দেহ নষ্ট করতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী, তাঁহারা জীবাত্মার কর্ম্ম দ্বারা ক্রমোন্নতি স্বীকার করেন। যাহা জীবাত্মার ক্রমোন্নতি সহায়ক তাহাই পুণ্য এবং যে কার্য্যের দ্বারা জীবাত্মার অবনতি হয়ে থাকে তাহাই পাপ। এখন দেখতে হবে, আত্মার উন্নতি বা অবনতি বলতে কি বুঝায়। সাধারণতঃ আমরা বলে থাকি, "এ লোকটির চরিত্র দেবতার মত," বা "এ লোকটা একেবারে নীচ"—কিন্তু কেন ? মানুষের মন "সত্ত্ব", "রজ" ও "তম" এই তিন গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে, সাত্ত্বিক ব্যক্তি ধীসম্পন্ন, উদার ও নিঃস্বার্থপর এবং তামসিক ব্যক্তি ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপুর একান্ত অধীন হয়ে থাকে। তম গুণের দ্বারা যে মন পরিচালিত হয় তাহার কোনও বিচার-শক্তি থাকে না এবং তাহার প্রবৃত্তি পশুর ন্যায় হয়ে থাকে। তাই সাত্ত্বিক গুণের বৃদ্ধিই উন্নতির পরিচয় এবং ইহার হ্রাস অবনতির সূচনা করে।

এখন দেখতে হবে, আত্মহত্যার সময়ে মানুষের মনের অবস্থা কিরূপ হয়ে থাকে। মানুষ নিশ্চয়ই দুঃখের দ্বারা অভিভূত হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। যে সুখী, সে কখনও নিজের জীবনকে অন্যায় বলে কল্পনা করতে চায় না। তাহ'লেই আত্মহত্যার পূর্ব্বক্ষণে মন দুঃখের দ্বারা একান্ত ভাবে আচ্ছন্ন থাকে, নিজের উপরে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস হারায়—ভবিষ্যতের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে বিচার ক্ষমতা থাকে না এবং শুধু নিজের বর্ত্তমান পার্থিব দুঃখ ভিন্ন অপর কোন বিষয় চিন্তাও করতে চায় না। এক কথায় মন সে সময় মোহাচ্ছন্ন ও তম গুণের দ্বারা প্রভাবান্বিত থাকে। এই অবস্থায় যদি জোর করিয়া জীবাত্মাকে দেহত্যাগ করতে বাধ্য করা যায়, তবে দেহত্যাগের সময় যে মনটি নিয়ে সে বাহির হয়ে যায় সেই মনটি নিয়ে বহু কাল অসীম কষ্ট পায় ; কারণ, যে কারণে সে আত্মহত্যা করেছে সে কারণটি তখনও তাঁহার মনে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। তাছাড়া শাস্ত্র বলেন, মানুষের মনে মৃত্যুর পূর্ব্বে যে-ভাব প্রবল হয় তাহাই তাহার পরজন্মের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বে মন তম গুণাচ্ছন্ন থাকিলে পরজন্মও তম গুণাচ্ছন্ন আবেষ্টনেই হ'য়ে থাকে। তাই হিন্দু-শাস্ত্র মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে ভগবদ্‌-গুণানুকীর্ত্তনের ব্যবস্থা দিয়েছেন। এই কারণেই আত্মহত্যাকে মহাপাপ বলে বর্ণনা করেছেন।

লেখক শ্রীরামচন্দ্র, সক্রেটীশ ও মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের "আত্মহত্যা" ও অধ্যাত্ম তত্ত্বে বলীয়ান যোগী-ঋষিদের "দেহত্যাগ" এক নয়। যাক, এ-বিষয়ে আর বেশী লিখলে হয়ত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। তাই এখানেই সিদ্ধান্ত করছি, "আত্মহত্যা" মহাপাপ এবং আমাদের প্রাচীন ত্রিকালদর্শী মহাত্মাগণ যে-সিদ্ধান্ত করে গিয়েছেন আমাদের অল্প বিদ্যায় তাহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত করা খুবই অনুচিত ও সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর।

পত্রগুচ্ছ

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চিঠি

[কৃষি প্রদর্শনী উপলক্ষে ভারতীয় কৃষি ও কৃষকদের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য অনুরোধ করিয়া মাননীয় লেফটেনান্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট লিখিত পত্র।]

"বহুবিধ সম্মানপূর্ব্বক নিবেদনমিদং,

শ্রীযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুরের উৎসাহ ও উদ্যোগে আগামী জাম্নুয়ারি মাসে আলীপুরে সপ্তাহ ব্যাপিয়া এক বৃহৎ কৃষি-কার্য্যের প্রদর্শন-ব্যাপার হইবে। ভারতবর্ষের কৃষিকার্যের উৎসাহ প্রদান এবং উন্নতিসাধন করাই উক্ত প্রদর্শন-ব্যাপারের প্রধান তাৎপর্য্য। আপনাদিগকে উহার তাৎপর্য্য অবগত এবং উক্ত প্রদর্শন-স্থলে আহ্বান করণার্থে উক্ত গবর্ণর বাহাদুর ভারতবর্ষীয় সভাকে এবং লোয়ার প্রবিন্‌সের কমিশনরদিগকে যে পত্র লেখেন, উক্ত দুই পত্রেরই অনুবাদ এতৎ পত্রসহ প্রেরিত হইতেছে; পাঠ করিলে তন্মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন।

ফলতঃ কৃষিবিদ্যার উন্নতিসাধনই যে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির নিদান সে বিষয়ে কোন ব্যক্তিরই সংশয় জন্মিবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু একণে এ দেশের কৃষিকার্য্যের অবস্থা যে প্রকার দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহা মনে হইলে এবং অন্যান্য দেশের কৃষিকার্য্যের অবস্থার সহিত তাহার তুলনা করিয়া দেখিলে স্বদেশোন্নতিচিকীর্ষু লোকের মনে অবশ্যই লজ্জা ও ক্ষোভের উদয় হয়, সন্দেহ নাই। দয়াবান লেফটেনেন্ট গবর্ণর কেবল এ দেশের কৃষিবিদ্যার এই দুরবস্থা দূর করিবার উদ্দেশেই প্রস্তাবিত প্রদর্শন-ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অতএব আপনারা তাঁহার উক্ত মহৎ উদ্দেশের সহকারিতা করিয়া স্বদেশের শ্রীসাধন ও স্ব-স্ব নামের গৌরব বর্দ্ধন করিলেই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলের বিষয় হয়।

উক্ত প্রদর্শন-স্থলে বাঙ্গালা ও অন্যান্য দেশজাত গো, বৎস, অশ্ব, মেষ, মহিষ প্রভৃতি নানা প্রকার জীবজন্তু এবং বিভিন্ন প্রকার ফল, শস্য ও কৃষিকার্য্যোপযোগী বহুবিধ যন্ত্র সংগৃহীত হইবে। যে ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট গো কি মহিষ ও মেষাদি প্রদর্শন করাইতে পারিবে কি যে কৃষক সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল কি শস্য আনিয়া ঐ প্রদর্শন-স্থলে উপস্থিত করিবে, তাহারা আপন-আপন যোগ্যতা ও পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। আপনারা স্বীয় স্বীয় অধিকারস্থ প্রজাদিগকে ইহা অবগত করিয়া উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের দ্বারা উৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদন করাইয়া উক্ত প্রদর্শন-স্থলে প্রেরণ করিবেন অথবা [illegible] লইয়া আসিবেন। এই প্রদর্শন-ব্যাপারের এই প্রথম সূত্র, ইহাতে যে সকল কৃষকেই কৃতকার্য্য হইয়া তুল্যরূপ পারিতোষিক লাভ করিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাহাদিগকে নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নহে। যাহারা পারিতোষিক না পাইবে, তাহারা অন্য দেশের পারিতোষিক যোগ্য উৎকৃষ্ট উৎপন্ন বস্তু দেখিয়া তদ্রূপ করিতে পারিবার জ্ঞান লাভ ও আশা প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর উপকৃত হইতে পারিবে। অতএব কেবল পারিতোষিক-লোভে প্রদর্শন-স্থলে দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। উক্ত প্রদর্শন-স্থলে কৃষকদিগের স্ব স্ব উপস্থিত হওয়া উচিত। উপস্থিত হইলে আপন অপেক্ষা অন্যের উৎপন্ন উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদি দেখিয়া উভয় বস্তুর আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষ তুলনা করিয়া অনায়াসক্রমে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভবনা। প্রত্যেক প্রদর্শন-স্থলে যদি গ্রামের অধিকাংশ প্রজার উপস্থিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে সহজ ও সাধ্য না হয়, তত্রাপি অন্ততঃ এক-এক গ্রাম হইতে এক-এক জন প্রধান ও বুদ্ধিজীবি প্রজারও এ ব্যাপারে উপস্থিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তাহা হইলেও লেফটেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুরের অনেক অভিলাষ পূর্ণ ও কৃষকদিগের মঙ্গল সিদ্ধ হইতে পারিবে। এই বিবেচনা করিয়া মহাশয় স্বীয় ও অন্য অন্য অধিকারের প্রজালোকদিগকে সঙ্গে লইয়া এই ব্যাপারে উপস্থিত হইয়া কৃষি-কার্য্যের উৎসাহ প্রদান করিবেন ইহাতে যে কেবল লেফটেনেন্ট গবর্ণরের অনুরোধ রক্ষন এবং প্রদর্শন-দর্শনে নিজ নিজ কৌতুহল নিবারণ হইবে, এরূপ নহে, ইহাতে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। কেবল প্রজার নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজাকে প্রদান করা জমিদারের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য নহে। যাহাতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইয়া প্রজার মঙ্গল হয়, জমিদারদিগের সর্ব্বতো-ভাবে তাহার যত্ন করা বিধেয়। জমিদারেরা প্রজার উপস্বত্বভোগী; প্রজার মঙ্গল হইলে অবশ্যই জমিদারও তাহার কুশলভাগী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব যাহাতে উপস্থিত ব্যাপারে আপনাদিগের স্ব স্ব অধিকারস্থ প্রজালোকের সমাগম হইয়া কৃষিকার্য্যের উৎসাহ প্রদান করা হয়, আমাদিগের এই একান্ত নিবেদন, এবং লেফটেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুরেরও এই প্রধান তাৎপর্য্য। ইতি।

সম্পাদকস্য

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।"

নেপোলিয়ানের চিঠি

[রক্তাক্ত বিজয়-শকট চালিয়ে যে ক'জন মানুষ দিগ্বিজয়ের অভিযানে বেরিয়েছিলেন নেপোলিয়ান তাদের অন্যতম। সফল তিনি হননি বটে পৃথিবী-জয়ে, কিন্তু বীরত্বের এক অতুলনীয় কাহিনী তিনি রেখে গেছেন ইতিহাসের পাতায়।

নেপোলিয়ান তখন চিন্তা করছিলেন প্রাচ্যের দিকে অগ্রসর হবার। ভারতবর্ষে ইংরেজকে পরাজিত করে সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব স্থাপনের দুরাশায় অধীর হয়েছিলেন তিনি। প্রাচ্য জয় করবার জন্য রাশিয়ার বন্ধুত্ব লাভ করা যে একান্ত প্রয়োজন তা তিনি জানতেন। ১৮০৬ সালের দুরন্ত শীতকালে ওয়ারসর রাজপ্রাসাদে বসে নেপোলিয়ান নিজের হৃদয়বৃত্তির তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠলেন। তখন সম্রাটের তরুণ যৌবন, রক্তে জোয়ার, মনে ভালবাসার পিপাসা। বয়সে বড়ো সম্রাজ্ঞী জোসেফিনকে নিয়ে তাঁর হৃদয়ে শান্তি ছিল না। এই সময় এক দিন একটি আঠারো বছরের কিশোরী মেয়ের সাথে নেপোলিয়ানের পরিচয় ঘটল এবং সে মেয়েটির নীল নয়নের দ্যুতি সম্রাটকে বন্দী করল। নেপোলিয়ান জানতে পারলেন যে পোলাণ্ডের এক বৃদ্ধ কাউন্টের সঙ্গে মেয়েটি বিবাহিতা, কেন না, তার পিতৃ-গৃহের অবস্থা স্বচ্ছল নয়।

পরদিন সকালেই নেপোলিয়ান পত্রবাহক ডুরকের হাতে তাঁর প্রেমপত্র পাঠালেন। কিন্তু তার উত্তর মিলল না। যে সম্রাট কোন দিন কোন রাজকুমারীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হতে অভ্যস্ত, ছিলেন না, সেই দাম্ভিক সম্রাটের পক্ষে এই প্রত্যাখ্যান আশ্চর্য কাজ করল। নেপোলিয়ান আরো উন্মত্ত হলেন প্রেমে। গেল দ্বিতীয় চিঠি। তাতে নেপোলিয়ান নিবেদন করলেন নিজেকে কিশোরীর হৃদয়ের উপান্তে। তৃতীয় লিপিতে তিনি কাঙালপনা করলেন আর যোগ করে দিলেন যে তার সঙ্গে প্রেমের আসনে সম্মত হলে পোলাণ্ডেরও মঙ্গল হবে। ভালবাসা এবং মাতৃভূমির বৃহত্তর মঙ্গল মুঠির মধ্যে নিয়ে মেয়েটি নেপোলিয়ানকে গ্রহণ করলেন।

এমিল লুডউইগ লিখেছেন যে সম্রাট কিছু কাল তার রাজনীতি, যুদ্ধ, প্রাসাদ, দিগ্বিজয় সব কিছু সরিয়ে রাখলেন দূরে। ভালবাসার দাস হলেন তিনি। একটি কিশোরীর হৃদয়ের ভালবাসা সবটুকু পাবার জন্য সম্রাট সব কিছু ঢেলে দিলেন তার সমীপে। যৌবনের লীলা চঞ্চল আনন্দে শিহরণে মাধুর্যে। নেপোলিয়ানের জীবনের সে এক আশ্চর্য অধ্যায়।

বীর সম্রাট নেপোলিয়ানের হৃদয়ে যে ভালবাসার তৃষ্ণা ছিল, তার অপূর্ব বিকাশ ঘটেছে এই তিনখানি পত্রে। মনে রাখা প্রয়োজন যে সেই তন্বী কিশোরীর নাম ছিল মেরী ওয়ালেস্কা।]

১

আমার দু'টি নয়ন ভরে তোমাকে শুধু দেখেছি, চিত্তশিখায় করেছি তোমার আরতি, আমার সারা হৃদয়ের আকুতি শুধু তোমাকেই চায়। একটি অধীর প্রাণের জ্বালা নেবাতে অবিলম্বে উত্তর দাও।

'এন'

২

আমি কি তোমায় অসুখী করেছি? আশা করি তা সত্যি নয়। তবে কি প্রথম অনুভূতির মধুরতা তোমার মন থেকে

সরে গেছে? আমার কামনা বেড়ে চলেছে। আমার শান্তি অপহরণ করেছ তুমি। যে দীন প্রাণ তোমার আরতি করে তার জন্য সামান্য একটু আনন্দ, স্বল্প একটু সুখ তুলে রাখতে তুমি কার্পণ্য করো না। একখানা চিঠি দেওয়া কি এতই কঠিন কাজ? দু'খানা চিঠির ঋণজালে আবদ্ধ তুমি ইতিমধ্যেই।

(স্বাক্ষরহীন)

৩

জীবনে এমন সব মুহূর্ত্ত আসে যখন বড়ো প্রতিষ্ঠা দুর্বহ বোঝার মত বোধ হয়। সেই বোঝার দুর্বহতা ভোগ করছি আমি এখন এই মুহূর্তে······শুধু তুমি যদি কৃপা করো। যে প্রতিবন্ধক তোমায় আমায় বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তা অপসরণ করতে পারো শুধু তুমিই তোমার পক্ষে কাজ করার জন্য আমার বন্ধু ডুরক যথাসাধ্য করবে। ওগো, তুমি এসো, চলে এসো। তোমার সব বাসনা চরিতার্থ হবে। তুমি যদি আমায় দয়া করো, তোমার মাতৃভূমি আমার কাছেও প্রিয়তর হবে।

'এন'

মিস্ হেষ্টিংসের চিঠি

[মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে নিষ্ঠুর মৃত্যু Marie Bashkirtseffকে ছিনিয়ে নিয়েছে পৃথিবীর কোল থেকে। কিন্তু এই গুণবতী রাশিয়ান মহিলা একধারে যেমন নিষ্পাপ ও চতুরিকা ছিলেন তেমনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টিও ছিল অতি গভীর। যত দিন তিনি বেঁচেছিলেন রোগ তাঁকে এক দিনের জন্যেও পরিত্যাগ করেনি। তবুও তার চিঠি ও রোজ-নামচার দ্বারা তিনি সেদিন বহু পাঠকের চিত্ত জয় করেছিলেন। সেই অনবদ্য চিঠিগুলিতে শুধু যে তাঁর জটিল মানসেরই পরিচয়

পাওয়া যায় তা নয়, বরং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপের বিদগ্ধ সমাজের একটি উজ্জ্বল নিখুঁত চিত্রও দেখতে পাই আমরা।

বারো বছর বয়স থেকে সুরু হয়েছে মেরীর বিখ্যাত ডায়রী লেখা আর সেই সঙ্গে বহু অপরিচিতের সাথে প্রেমানুরাগ, মান-অভিমানের পালা। প্রাক্তন রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিস ও ডিউক অফ হ্যামিলটনও এই প্রেমাস্পদের দলভুক্ত ছিলেন। মেরী সংগীত বা চিত্রাংকনে তেমন পারদর্শিতা লাভ করতে পারেননি বটে, কিন্তু তার চিঠি ও রোজ-নামচা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তখনকার দিনের বহু সাহিত্যিকের সাথেই তার একটি মধুর সম্পর্ক ছিল এবং রোমান্টিক পত্রের মাধ্যমে চলত এই প্রেম নিবেদন।

মৃত্যুর কিছু কাল আগে মেরী মোঁপাসাকে চিঠি লিখতে সুরু করেন। সাহিত্য-জগতে মোঁপাসা তখন উদীয়মান জ্যোতিষ্ক। উদ্ধত শ্লেষে ঝাঁঝাল অথচ হৃদয়াবেগের স্নিগ্ধ ধারায় সিক্ত মন নিয়ে লেখা চিঠিগুলি। মিস্ হেস্টিংস এই ছদ্মনাম নিয়ে মেরী চিঠি লিখতেন। Le gaulois পত্রিকায় এই নামেই মোঁপাসার একটি গল্পও ছাপা হয়েছে। অবশ্য পরে গল্পটির নাম বদলিয়ে রাখা হয় 'মিস্ হ্যারিয়েট'।']

আপনার লেখা পড়ে সত্যি খুবই আনন্দ পাই। আপনার রচনায় প্রকৃতি আপন প্রকাশ। ধর্মীয় নিষ্ঠার সঙ্গে আপনি প্রকৃতির অনুকরণ করেন এবং এমন এক অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেন যা সত্যিই মহান্। আপনার লেখা পড়ে পাঠকদের চিত্ত তাই এমন একটি প্রগাঢ় মানবীয় অনুভূতির স্পর্শে বিচলিত হয়ে ওঠে যে মনে হয় যেন নিজেদেরই ছবি দেখছি, আপনার লেখার পাতায় পাতায় এবং আপনার প্রতিও এক নৈর্ব্যক্তিক ভালবাসায় সিক্ত হয়ে ওঠে মন। একে কি নিছক অর্থহীন স্তুতিবাদ বলবেন? ক্ষমা করবেন, এতে কপটতার লেশ মাত্র নেই।

বুঝতেই পারছেন, অনেক সুন্দর সুন্দর চটকদার কথা আপনাকে বলতে আমি চাই, কিন্তু এই ভাবে সুরুতেই হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করে সব কথা বলাও সম্ভব নয়। আমার ক্ষোভ তাই এত অধিক—আপনি এত বড়ো যে, আপনার সুন্দর হৃদয়ের প্রিয়জন হওয়ার মধুর স্বপ্নে উদ্‌বুদ্ধ হওয়া এবং সেই সুন্দর হৃদয়কে তুলে ধরার প্রত্যাশা করা যায় না।

আর সত্যিই যদি আপনার হৃদয় অত সুন্দর না হয় এবং সত্যি যদি প্রকৃতির অনুলিখন না থাকে আপনার রচনায়, তবে আপনার হয়ে আমি না হয় দুঃখ করছি—তার পর সাহিত্য-স্রষ্টা হিসেবে আপনাকে আমার মনের মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত করব এবং প্রতিষ্ঠা করে আগেকার সব কিছুকে মুছে ফেলব মন থেকে।

একটি বছর ধরে আপনাকে চিঠি লিখব ভাবছি এবং অনেক বার প্রায় লিখেওছি। সময় সময় মনে হয়েছে, আপনার গুণপণার অতিরঞ্জন করছি যার যোগ্য আপনি নন। দু'দিন আগে Gaulois-এ হঠাৎ চোখে পড়ল কে যেন আপনাকে স্তুতিবাদ করে চিঠি লিখেছে এবং আপনি সেই সদাশয় ব্যক্তির চিঠির উত্তর দেওয়ার জন্য তার ঠিকানা খোঁজ করছেন। তখুনি ঈর্ষায় মন সজাগ হয়ে উঠল—আপনার সাহিত্যিক খ্যাতি নতুন করে চোখ ঝলসে দিল আর সেই কারণেই আমার এই লিপি।

এই সঙ্গে জানিয়ে রাখি যে, আমার পরিচয় সব সময় গোপন থাকবে। এমন কি, দূর থেকেও আপনাকে চোখে দেখার ইচ্ছা আমার নেই—আপনার মুখশ্রী হয়ত আমাকে খুশী না-ও করতে পারে। কে বলতে পারে সে কথা? বর্তমানে আপনার সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি—আপনি তরুণ যুবক, অবিবাহিত। দূর থেকে বিমুগ্ধ চিত্ততার পক্ষে এই দু'টিই একান্ত প্রয়োজন।

আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আমিও মনোরমা মেয়ে। এই মধুর কল্পনা আপনাকে চিঠি লিখতে প্রেরণা যোগাবে। অনেক সময় মনে হয় আমি যদি পুরুষ হতাম, যে যা-ই ভাবুক না কেন এক জন আতংক-সৃষ্টিকারী বুড়ী ইংরেজ রমণীর সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতাম না—এমন কি চিঠির ভিতর দিয়েও নয়।

মিস্ হেস্টিংস
ডাকঘর—ম্যাডেলিন ষ্টেশন।

[এই চিঠি পেয়ে মোঁপাসা বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। জোলা, গঁকোর্টও এই ধরণের বহু চিঠি পেয়েছেন মেরীর কাছ থেকে। কিন্তু তাঁরা কেউ তার উত্তর দেননি। কিন্তু মোঁপাসা এ চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করে অজানিতাকে চিঠি লিখেছিলেন।]

(মোঁপাসার উত্তর)

সুচরিতাসু—

আমার চিঠি নিশ্চয়ই তোমার আশানুরূপ হবে না। অবশ্য গোড়াতেই তোমার স্তুতিবাদ ও আমার প্রতি অনুকম্পার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি। এবার প্রকৃতিস্থের মত কথা কওয়া যাক।

তুমি আমার মনের মিতা হতে চেয়েছ। কিন্তু কিসের অধিকারে? আমি ত তোমায় চিনি না। যে কথা আমি আমার মেয়ে-বন্ধুদের অতি সঙ্গোপনে বা মৃদুভাষে বলব সে কথা তোমায় কেন বলতে যাব—তুমি আমার অপরিচিতা, যার মন-মেজাজ-প্রকৃতি আমার মানসিকের সঙ্গে হয়ত এক সুরে বাঁধা না-ও ত হতে পারে? এটা কি অত্যন্ত নির্বোধ অবিশ্বাসী বন্ধুর কাজ হবে না?

রহস্যময় চিঠি-বিনিময়ে কি মধুর সম্পর্ক সঞ্চারিত হতে পারে? নারী ও পুরুষের মধ্যে অনুরাগ, নিষ্পাপ অনুরাগের মাধুর্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে মেলা-মেশায়, কথা-বার্তায় এবং বন্ধুর কাছে চিঠিতে, মানসীর মূর্তি ধ্যানে ও রূপায়নেই শুধু সম্ভব হতে পারে।

হৃদয়ের গোপন কথা তার কাছে কি করে প্রকাশ করা যেতে পারে যার তনুদেহ, চুলের রং, মুখের হাসি ও বর্ণিমা—কোন কিছুর সঙ্গেই যখন পরিচয় নেই?

সম্প্রতি পাওয়া একখানা চিঠির উল্লেখ করেছ তুমি? চিঠিখানি এসেছে এক জন পুরুষের কাছ থেকে যে উপদেশপ্রার্থী। আর অজানিতা মেয়ের চিঠি পাওয়ার কথা যদি ধর, গত দু'বছরে আমি প্রায় পঞ্চাশ-ষাটখানা এমনি ধারা চিঠি পেয়েছি। তোমার ভাষায় এদের ভিতর থেকে কাকে আমি মনের মিতা বেছে নেব বল ত?

যখন তারা আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছুক এবং সভ্য সমাজের রীতি-সংগত ভাবেই ঘনিষ্ঠতার জন্য একান্ত উদ্‌গ্রীব, তখনই একমাত্র বন্ধুত্ব আর মিতালির সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। নতুবা, কেন আমি এক জন অজ্ঞাতকুলশীলা বান্ধবীর জন্য—লেই বা সে মাধুর্যময়ী,—আমার জানিত বান্ধবীদের ত্যাগ করব? সেই অজ্ঞাতকুলশীলা বাহ্যতঃ এবং মনের দিক্ থেকেও হয়ত প্রীতিকর না-ও হতে পারে!

কাজেই এ ঠিক উচিত হবে না, নয় কি? ধর, আমি যদি নিজেকে তোমার চরণপ্রান্তে উৎসর্গ করি, তাহ'লেই কি আমায় তুমি প্রেমের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ভাবতে পারবে?

ক্ষমা করো সুচরিতাসু। মানুষের চিন্তাধারা যত না কবিত্বময় তার চেয়ে আরো বাস্তব। ইতি—

অনুগত

মোঁপাসা

পুনঃ—লেখায় কাটাকুটির জন্য ক্ষমা করো। কাটাকুটি না করে আমি লিখতে পারি না এবং আবার নতুন করে টোকার সময়ও আমার নেই।

[কিছু কাল এই পত্র-বিনিময় চলেছিল। মোঁপাসার চিঠির উত্তরে মেরী রহস্য করে লিখেছিলেন—'মাত্র ষাট জন? আপনাকে যতটা জনপ্রিয় ভাবা গিয়েছিল আপনি ঠিক তা নন। আপনার এক-ষষ্টিতম প্রেমিকা, হবার বাসনা আমার নেই। আরো ঢের বেশী রহস্যময়ী আমি।

যতই দিন যেতে লাগল, চিঠিগুলিতে ক্রমশঃ মেরীর মনের বিভিন্ন মানসিকেরও ছাপ পড়তে লাগল। মোঁপাসা পরে স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি প্রথম যে চিঠি লিখেছিলেন তখন তাঁর মনের অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু বৃথাই তিনি মিস্ হেষ্টিংসের সহানুভূতির প্রত্যাশা করতে লাগলেন। মেরী আর তাঁকে আমল দিতে নারাজ। মোঁপাসা তখন মিস্ হেষ্টিংসকে পুরুষ ভাবার ভাণ করলেন এবং মেরীও সঙ্গে সঙ্গে এই ছলনার ফাঁদে ধরা দিলেন। আবার চলল চিঠির পর চিঠি।

অবশেষে মেরী নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন সমস্ত ঘটনার উপর এবং এই ভাবে চিঠি লেখালেখির পালা শেষ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু মোঁপাসা তখন অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন—অজানিতার রহস্য ভেদ করতে বদ্ধপরিকর তিনি। কিন্তু মেরী তাঁর পরিচয় কখনো প্রকাশ করেননি।

তবে জনশ্রুতি এই যে, মৃত্যুর পূর্বে দু'জনের না কি দেখা হয়েছিল।]

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চিঠি

[যে বিরাট ব্যক্তিত্বের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল সেই বাংলার শার্দুল শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাঙালীর চির নমস্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁরই সৃষ্টি। যে কয় জন বাঙালী সেদিন ভারতের শিক্ষা, সমাজ ও জাতীয় জীবনে গঠনমূলক পরিকল্পনাকে বাস্তবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আশুতোষ তাঁদের অন্যতম। রসায়নের প্রধান অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করে আশুতোষ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে সেই পদ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে নীচের এই চিঠিখানা লিখেছিলেন।]

সিনেট হাউস

কলিকাতা

২৫শে জুন, ১৯১২

প্রিয় ডক্টর রায়,

আপনার হয়ত স্মরণ থাকিতে পারে যে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী সিনেটের সভায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদ সৃষ্টির প্রস্তাব

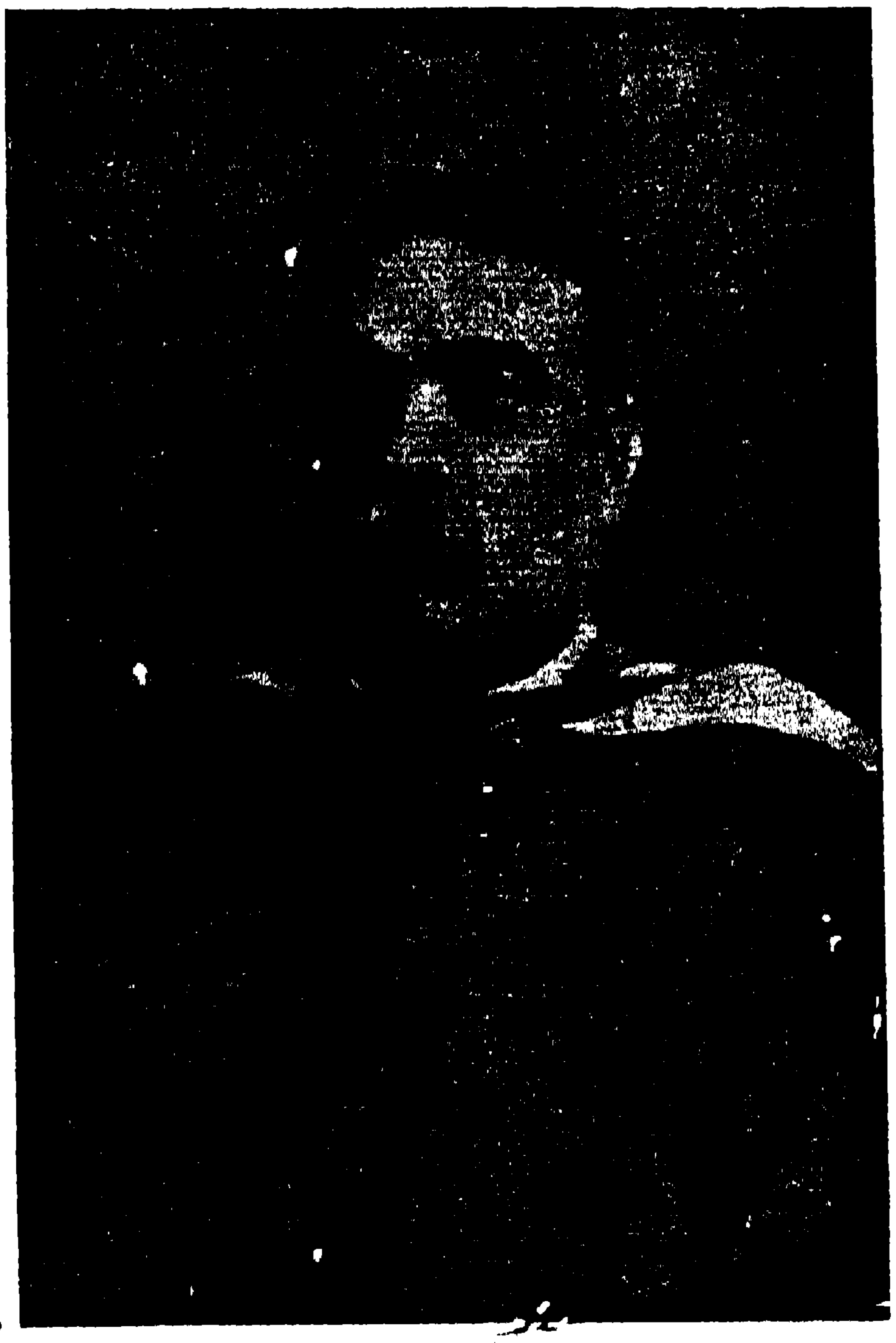

উঠিয়াছিল, তখন আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের কোন চেয়ারের ব্যবস্থা না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই মুহূর্তে আপনাকে আমি এই আশ্বাস দিয়াছিলাম যে, বিজ্ঞানের চেয়ার অদূর ভবিষ্যতেই সৃষ্টি হইয়া যাইতে পারে। শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমার ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়াছে এবং আপনার ও আমার এত দিনের আশাও সফল হইয়াছে। আমরা রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যার দুইটি প্রধান অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করিয়াছি। অচিরাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠারও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পালিতের বদান্যতা ও আমাদের সংরক্ষিত তহবিল হইতে আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্যের ফলেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। গত শনিবার সিনেটের বক্তৃতায় আমি সমস্তই পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি। আমার বক্তৃতার একটি অনুলিপি এই সঙ্গে পাঠাইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের প্রথম প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য আপনাকে আমি সানন্দে আহ্বান জানাইতেছি। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, আপনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, আপনাকে যাহাতে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় তাহারও যথাযথ ব্যবস্থা করা হইবে। আপনি ফিরিয়া আসিলেই আপনার সহযোগিতায় প্রস্তাবিত গবেষণাগারের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত নির্মাণ-কার্য সুরু করিয়া দেওয়া যাইবে। ফিরিয়া আসিবার পূর্বে যদি ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারগুলি পরিদর্শন করিয়া আসিতে পারেন তাহা হইলে আমাদের কার্যের পক্ষেও যথেষ্ট সহায়ক হইবে।

আপনি সি. আই. ই. উপাধি ভূষিত হইয়াছেন দেখিয়া পরম প্রীত

হইয়াছি। দশ বৎসর পূর্বেই আপনাকে এ উপাধি প্রদান করা উচিত ছিল।

আশা করি, কুশলে আছেন। ইংল্যাণ্ড পরিভ্রমণে নিশ্চিত উপকৃত হইয়াছেন। ইতি

শুভার্থী
আশুতোষ মুখার্জি

[আচার্যদেব এই চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন—'আমার সমগ্র জীবনের স্বপ্ন বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা সফল হইতেছে, ইহাই আমার ধারণা এবং কেবল মাত্র কর্তব্য হিসাবেই নয় পরন্তু ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতার সহিতই আমি ঐ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিব এবং আমার সমস্ত ক্ষমতা তাহাতে নিয়োজিত করিব।'

আচার্যদেব যত দিন বেঁচে ছিলেন এই কলেজের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই কলেজের উন্নতিই ছিল তাঁর শয়নে-জাগরণের একমাত্র স্বপ্ন।]

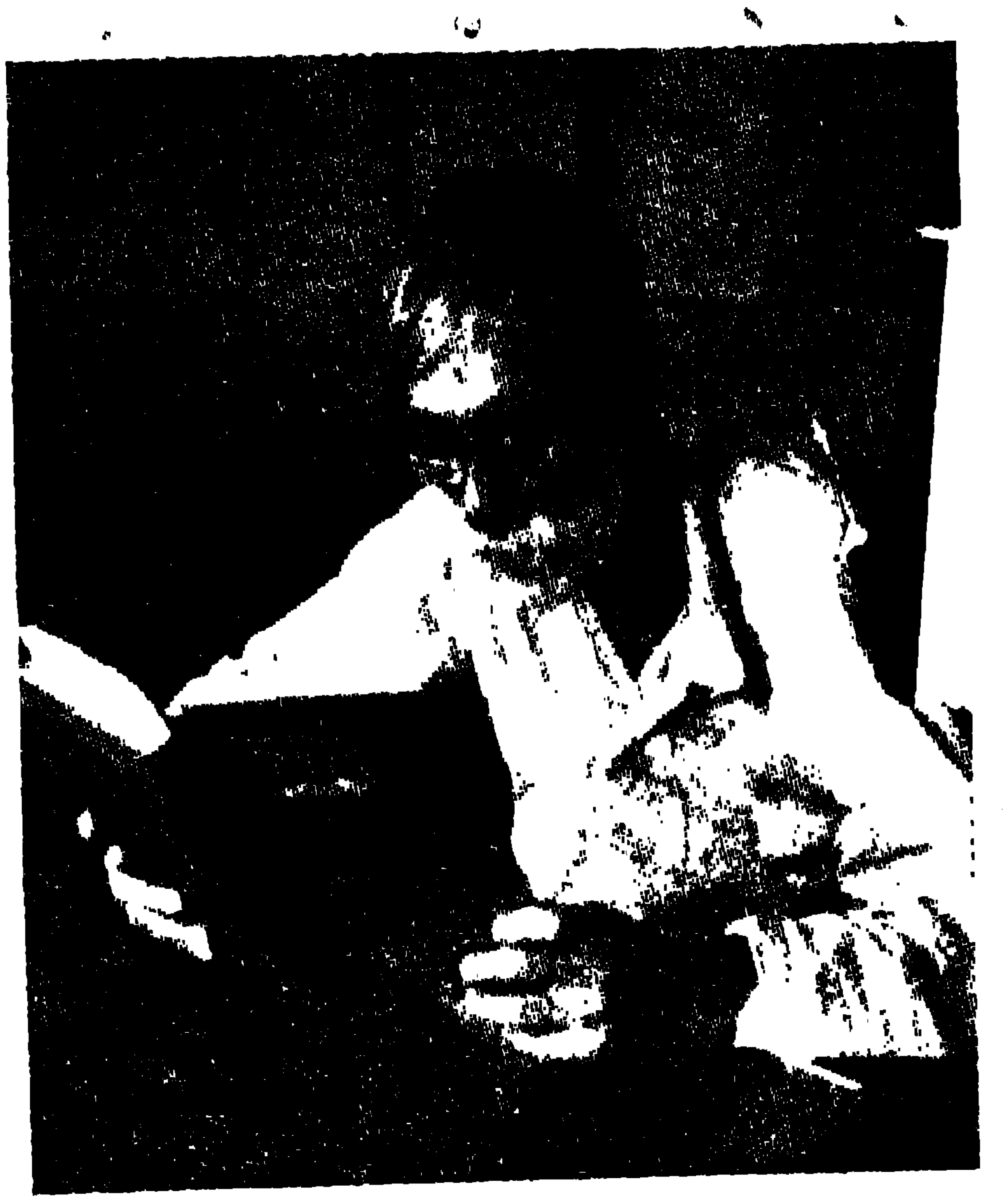

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চিঠি

৯২, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা (ভারতবর্ষ)
১৩ই অক্টোবর, ১৯২৪

প্রিয় অধ্যাপক উইনি,

আপনার ১১ই তারিখের টেলিগ্রামের জন্য ধন্যবাদ। রসায়ন-সংসদের কার্যকরী সমিতি ও আপনার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আমার পক্ষে যে কত মূল্যবান তাহা প্রকাশ করাই বাহুল্য। সি. সি. এসকে আমরা চিরদিনই আমাদের প্রতিষ্ঠানের জনয়িতৃ মনে করিব। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে রসায়ন-সংসদের জার্ণালই এত দিন রাসায়নিকদের একমাত্র মুখপত্র ছিল এবং ইহার প্রকাশনী সংসদের পক্ষে গবেষণা-প্রসূত রচনার আয়তনের স্থান সংকুলান করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল। প্রায়ই তাঁহারা লেখকগণকে তাঁহাদের রচনা সংক্ষিপ্ত করিবার আবেদন জানাইতে বাধ্য হইতেন। এক মাত্র এই উদ্দেশ্যেই নিজস্ব মুখপত্র সহ ভারতীয় রসায়ন-সংসদ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে ছাত্রাবস্থায় যখন এডিনবরায় ছিলাম তখন স্বপ্ন দেখিতাম, ঈশ্বরের করুণায় এমন এক দিন নিশ্চিত আসিবে, যেদিন আমাদের ভারতবর্ষও বিশ্বের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-ভাণ্ডারকে ঋদ্ধিশালিনী করিতে সক্ষম হইবে। সেই স্বপ্নই এত দিনে বাস্তবে পরিণত হইতে দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। ভারতীয় রসায়নের ইতিহাসে আমি দেখাইয়াছি যে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের এই শাখাতেও অতি আন্তরিকতার সহিত প্রচুর গবেষণা হইয়াছিল। আজ পরম সন্তোষের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে ভারতের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করিয়াছে আমারই ছাত্রেরা এবং তাহারা প্রত্যেকেই জার্ণালের নিয়মিত লেখক।

আপনাদের মূল সংসদের সহিত কেবল সৌহার্দ্যপূর্ণই নয়, অনুজোচিত সম্পর্ক রাখিতেই আমি সতত চেষ্টা করিব এবং ইহা হইতে যে অনুপ্রেরণা লাভ করিব তাহা আমাদের পক্ষে পরম মূল্যবান হইবে। এই পত্র লিখিবার সময় মনে যে অনুভূতির সঞ্চার হইতেছে তাহা বোধ করা অতি কঠিন আমার পক্ষে। আমার স্মৃতি স্বতঃই সেই চিরস্মরণীয় আঠারশ' একচল্লিশ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের দিকেই ধাবিত হইতেছে, যেদিন উদ্যোক্তাগণ লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটি স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়া সমবেত হইয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি যে, লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির প্রথম সদস্যদের অন্যতম লর্ড প্লেফেয়ারকে আমার জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ক্রেমবাউ তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। ইতি

আপনার শুভাকাংখার জন্য ধন্যবাদ।

আপনার বিশ্বস্ত
পি. সি. রায়।

—বিভাস মিত্র (পাশে)

—সরলকুমার দত্ত (নীচে)

STATE LIB...

[illegible] দেখা

অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা—
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্য্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহভরে।"

—রবীন্দ্রনাথ

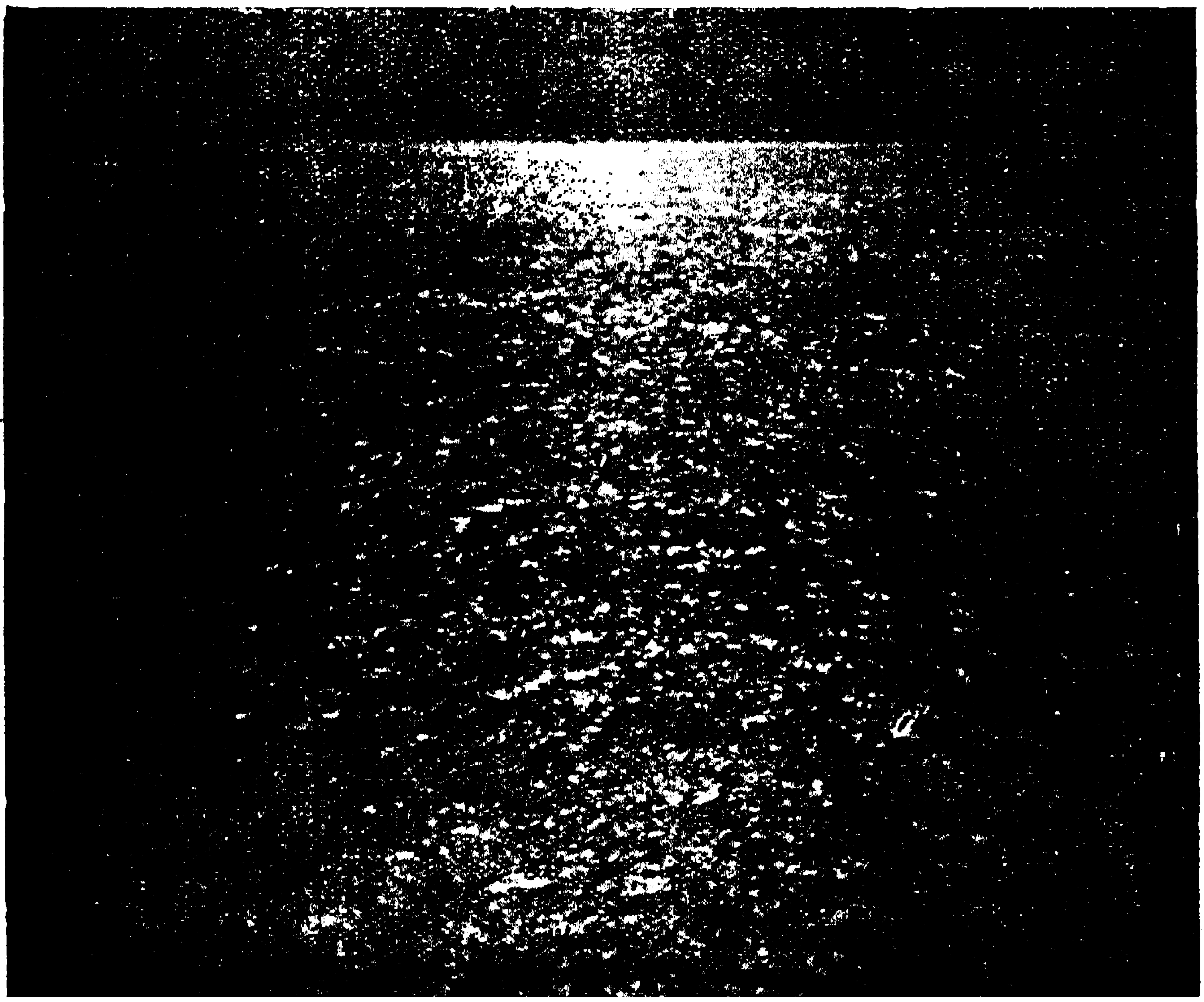

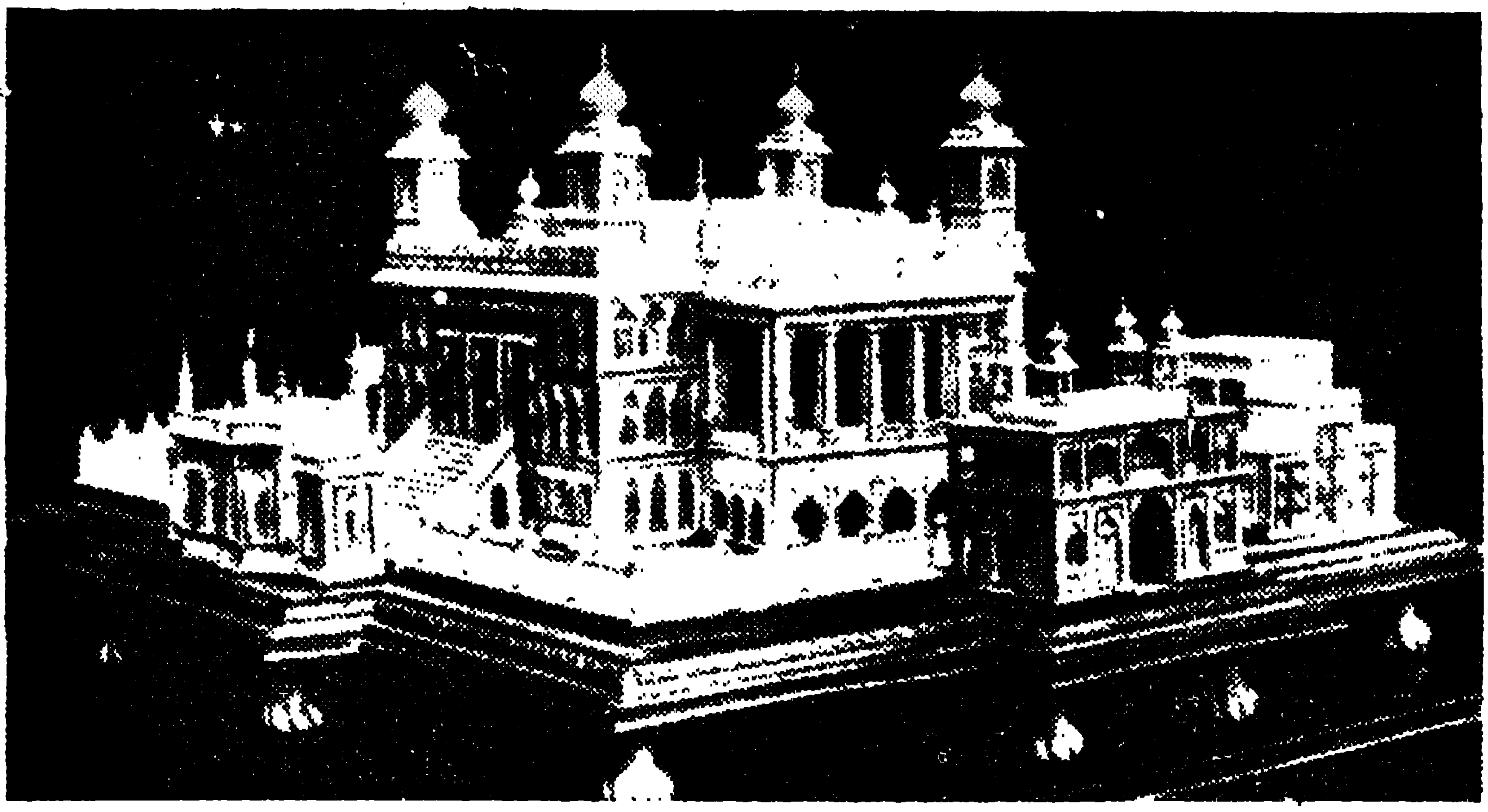

প্রাসাদ —ক, খ, গ

পর্ণ-কুটীর —অজ্ঞাতনামা

মার্ক টোয়াইনের ভালবাসা

'কোয়েকার সিটি' এ-পাশ থেকে ও-পাশে আন্দোলিত হচ্ছিল, আর মার্ক টোয়াইন এবং তার সহযাত্রীকে বাঙ্ক থেকে ছিটকে ফেলে দিচ্ছিল। জাহাজের পাশের ছিদ্রপথ দিয়ে সারা আটলান্টিক যেন ভেঙে পড়ছে জাহাজের মধ্যে। মিসিসিপির নৌ-চালক, সম্পাদক, রিপোর্টার, ক্যালিফোর্ণিয়ার খনি-অনুসন্ধানীদের অন্যতম মার্ক টোয়াইনের মুখ দিয়েও গালি-গালাজ আর অভিসম্পাতের খই ফুটছিল। মার্ক টোয়াইন উঠে ঘরের ছিদ্রমুখ বন্ধ করে দিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই দমকা হাওয়ায় দরজা খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে মাতালের মত টলতে টলতে ভিজে জবজবে সাদা চাদরে মোড়া একটি অপছায়া মূর্তি প্রবেশ করল ঘরে। মার্কের অনুপম ভাষায় সহসা ছেদ পড়ল—মুখাবয়বের ভাবও হয়ে উঠল অতি কোমল। ছেলেটিকে তিনি স্বাগতম্ জানালেন। 'আজকের রাতটা আপনার ঘরে থাকতে দেবেন? আমার ঘর জলে ভেসে গেছে।' মার্ক হেসে উঠলেন হো-হো করে—তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে ধরাধরি করে উপরের খটখটে বার্থে তুলে দিলেন।

কয়েক দিন আগে ছেলেটি মার্ককে তার বোন অলিভিয়ার একখানি ছোট ছবি দেখিয়েছিল। পুরোনো হাতীর দাঁতের উপর হাল্কা রংয়ে আঁকা এক অপরূপ সুন্দর মুখ। বিনিময়ে অবশ্য লেখক মহাশয় তার বিশেষ কোন উপকার করতে পারেননি। মাঝে-মাঝে একটা কোন ছল করে ছেলেটির ঘরে গিয়ে ছবিটা দেখে এসেছেন। এমন কি একবার ছবিখানি চেয়েওছিলেন তার কাছে। কিন্তু বোনের ছবি হস্তান্তরিত করতে একান্ত নারাজ ভাইটি।

জাহাজখানি বাত্যা-তাড়িত হয়ে দুলছে সমুদ্রবক্ষে, আর জাহাজের আরোহীরা নিজেদের অতীত অভিজ্ঞতার বর্ণনায় মুখর হয়ে উঠেছে। মার্ক টোয়াইন ঐ ছোট প্রতিকৃতিটি সম্বন্ধে বার-বার আতিশয্য প্রকাশ করায় ছেলেটি তার বোনের কথাই সুরু করলে। ছেলেটির নাম ল্যাংডন।—'একবার রাত্রে আমরা এলমিরাতে স্কেট করতে গিয়েছিলাম। অলিভিয়া পড়ে গিয়ে চোট খায় মেরুদণ্ডে। দু'টি বছর তাকে শুয়ে থাকতে হয়েছিল বিছানায়। সব সময় অসহ্য যন্ত্রণা। বাবা সহরের সেরা-সেরা ডাক্তারদের দেখালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। শুধু এক জন ডাক্তার একটি কপিকলের ব্যবস্থা করে দিলেন, যার সাহায্যে তাকে শোয়া অবস্থা থেকে তুলে বসান হোত। এত আস্তে আস্তে তোলা হোত, যে শোওয়া আর বসার মাঝ পথে আসতেই এক ঘন্টা লেগে যেত। কিন্তু এত করেও সে অজ্ঞান হয়ে পড়ত যন্ত্রণায়।'

মার্ক টোয়াইনের কাছে তখন আটলান্টিকের ঝড় থেমে গেছে। ঝড় সুরু হয়েছে তাঁর বুকে। তাঁর মনে তখন একটি মাত্র চিন্তা। নির্জন কক্ষে একটি কিশোরী শুয়ে—পুলীর সাহায্যে যাকে তুলে বসান হয় আর ব্যথায় যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

—'এক দিন বাতাস তার ঘরে উড়িয়ে নিয়ে এল একটুকরো কাগজ। কাগজটি দৈব-চিকিৎসার বিজ্ঞাপন। মা বিষয়টি নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনা করলেন। বাবার এই সব দৈব-চিকিৎসায় বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু মা নাছোড়বান্দা। একবার চেষ্টা করে দেখতেই বা দোষ কি? কাজেই এক শুভক্ষণে দৈব-চিকিৎসক এসে উপস্থিত হলেন আমাদের বাড়ীতে। মানুষটি কৃশ কিন্তু তার চোখ দু'টি থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। অলিভিয়ার ঘরটি অন্ধকার ছিল। ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন—'আলোয় ভরে উঠুক ঘর।' মশারি খুলে দিলেন। অলিভিয়ার দেহের উপর ঝুঁকে বিড়-বিড় করে কি বীজমন্ত্র পড়লেন। তার পর অলিভিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে উঠে বসতে বললেন। এবং অলিভিয়াও উঠে বসল। আমাদের ত নিজের চোখকেই অবিশ্বাস হতে লাগল। পরের দিন লোকটি তাকে উঠে দাঁড়াতে বললেন। আর সত্যিই উঠে দাঁড়াল অলিভিয়া। একটুও কষ্ট হোল না। আমাদের দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। তৃতীয় দিন সারা ঘর হেঁটে সে লোকটির কাছে গেল। লোকটি তখন বললেন—'স্বাস্থ্য আর শক্তি ফিরে আসুক তোমাতে।' বাবা টাকা দিতে গেলেন কিন্তু তিনি কিছুই নিলেন না। আর কোন দিন তাকে আমরা চোখেও দেখিনি। কিন্তু সেই দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত অলিভিয়া ভালই আছে।'

সমস্ত কাহিনী শোনার পর মার্ক টোয়াইন শুধু মুখ ফুটে বলতে পেরেছিলেন—'তোমার সঙ্গে এক দিন দেখতে যেতে হবে তোমার বোনকে। অদ্ভুত ব্যাপার, এ রকম ভাবে রোগ-সারানোর কথা আর আগে কখনো শুনিনি ত!'

অলিভিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার এ ছ'মাস আগেকার ঘটনা। ১৮৬৭ সালের নভেম্বর মাসে 'কোয়েকার সিটি' নিউইয়র্কে ফিরে আসে। তরুণ লেখক সহরে পদার্পণ করেই চাকুরীর সন্ধানে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। 'ইনোসেন্টস্ এ্যাবরড' নামক যে বইখানি লিখেছেন জাহাজে, সেটিকেও ছাপাতে হবে। আর—আর একবার সাক্ষাৎ করতে হবে অলিভিয়ার সঙ্গে। ক্রিষ্টমাসের সময় ল্যাংডন লিখে পাঠাল—'বাড়ীর লোকেরা সবে ফিরে এসেছেন এলমিরা থেকে। তাঁদের সঙ্গে আপনার একবার দেখা হওয়া দরকার।'

ষ্টাইনওয়ে হল'য়েতে চার্লস ডিকেন্স কি পড়ে শোনাবেন। মার্কও একটি বক্সে আসন নিয়েছেন। ল্যাংডনদের আসার আধ ঘন্টা আগেই এসেছেন তিনি। অলিভিয়াকে দেখে মার্ক একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেল। এত সুন্দর, এত লঘু নারীমূর্তি তার জীবনে কখনো চোখে পড়েনি। সে রাত্রে ডিকেন্স ষ্টীয়ারফোর্থের মৃত্যু আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু মার্কের কানে তার একটি কথাও প্রবেশ করেনি। এর আগে বহু বার প্রেমে পড়েছেন এমন ধারণা ছিল মার্কের। কিন্তু আজকের অনুভূতিই হোল তাঁর জীবনের সর্বোত্তম উদ্ঘাটন।

নব-বর্ষের দিনে মার্ক টোয়াইন মেয়েটির সঙ্গে দেখা করলেন কিন্তু তার পর বহু মাস আর দেখা-সাক্ষাৎ নেই মেয়েটির সঙ্গে। বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নানান জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসে টোয়াইনের, কিন্তু অলিভিয়ার কাছ থেকে একটি ছত্রও আসে না। টোয়াইন একেবারে মুষড়ে পড়লেন। তাই এক দিন সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে সোজা এলমিরার ট্রেণ ধরতে সংকল্প করলেন তিনি। এমনি সময় একখানি চিঠি এল ল্যাংডনের কাছ থেকে। সে অনুরোধ জানিয়েছে সপ্তাহ খানেক তাদের ওখানে কাটিয়ে আসতে।

চলে আসার দিন মার্ক টোয়াইন ল্যাংডনকে বললেন—'অলিভিয়াকে আমি ভালবেসে ফেলেছি।' ল্যাংডন ত একেবারে থ। লোকটি বলে কি! ল্যাংডন মনে মনে মার্ক টোয়াইনকে

পূজো করলেও এক জন পশ্চিমী দেহাতী লোক যে তার বোনের পাণিপ্রার্থী হবে এ তার ধারণার অতীত। মার্ক টোয়াইন কখনই তার বোনের উপযুক্ত হতে পারে না। তাই সে বললে—'বাবা শুনলে ভয়ংকর রাগ করবেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই একটা ট্রেণ আছে। চলুন আপনাকে ট্রেণে তুলে দিয়ে আসি।'

অলিভিয়া স্মিত হেসে বিদায় জানাল মার্ক টোয়াইনকে। ঘোড়া ছুটল লাফাতে লাফাতে। কিন্তু গাড়ীর পিছনের আসন খুব ভাল করে বাঁধা না থাকায় ঘোড়া ছোটার সঙ্গে সঙ্গেই আসন খুলে পড়ে গেল রাস্তায়, আর আরোহী দু'জন ছিটকে গিয়ে পড়ল ইটের পাঁজায়। মার্ক চলতে না পারার ভাণ করলেন। এমন যন্ত্রণা-কাতর ভাব দেখালেন যে তাকে তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না ভাই-বোনের। যত দিন না সেরে ওঠেন তত দিন থেকে যাওয়ার জন্য বার বার অনুরোধ আসতে লাগল অলিভিয়ার কাছ থেকে। অলিভিয়া তাঁর রাত্রি-দিনের শুশ্রূষার ভার তুলে নিল নিজের হাতে। মার্ক টোয়াইন আরো দু'সপ্তাহ রয়ে গেলেন সেখানে।

এই ঘটনার পর মার্ক টোয়াইন ল্যাংডনের বাড়ীতে প্রায়ই যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। কিন্তু বিয়ের দিক্ থেকে কোন যোগাযোগের লক্ষণ দেখা গেল না। এক দিন তিনি মেয়েটিকে তাঁর বক্তৃতা শুনতে আহ্বান করলেন। বক্তৃতা শোনার পর সে-রাত্রে মেয়েটি আর দেখাই করলে না মার্কের সঙ্গে। দ্বিতীয় রাত্রে মেয়েটি স্বীকার করলে যে সে-ও ভালবাসে তাঁকে; কিন্তু সে ভালবাসা তার বেদনা মাত্র, কিন্তু পরদিনই স্বীকার করল অলিভিয়া যে দুঃখের বদলে সে গর্বই অনুভব করে।

অবশেষে মার্ক টোয়াইন জয় করতে পেরেছেন তাঁর মানসীকে। কিন্তু প্রণয়িনীর বাপকে তখনও জয় করা হয়নি। এলমিরার 'কয়লা-সম্রাট' জেরাভিস ল্যাংডন তাঁর মেয়েকে ত আর সামান্য এক জন সৌখীন লেখকের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন না। মার্ক উপদেশ দিলেন অলিভিয়ার ভাইকে—'স্যানফ্রানসিসকোর জোকে চিঠি লেখ। তার জন্য হাজারো বার আমি মিথ্যা কথা বলেছি। আমার জন্য সে অন্ততঃ একবার মিথ্যা বলবেই।' মার্ক ল্যাংডনকে খোঁজ-খবর নেবার সময় দিলেন। ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি চূড়ান্ত বোঝা-পড়ার জন্য কোমর বাঁধলেন। ল্যাংডন জানাল—'আপনার বন্ধু অবশ্য জানিয়েছেন, আপনি বড় লেখক কিন্তু স্বামী হিসেবে এ পৃথিবীতে আপনার স্থান সবার পিছনে। এ দিক্ থেকে সুপারিশ করবার মত আপনার মত আপনার জানা আর কেউ আছেন?' মার্ক টোয়াইন মাথা নাড়লেন। বৃদ্ধ তখন হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—'বেশ, কেউ যখন এ সম্বন্ধে তোমার হয়ে সুপারিশ করতে নারাজ আমাকেই তাহ'লে তোমার জামীন দাঁড়াতে হচ্ছে।'

মার্ক টোয়াইন তাঁর বন্ধু জো টুইচেলকে চিঠি লিখে জানালেন। 'এবার বাজাও ডঙ্কা। এত দিনে জিতেছি লড়াইয়ে। তিন বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছি—একবার সসম্মানে স্থান ত্যাগ করার উপদেশও পেয়েছিলাম—অবশেষে স্বাগতম্ সম্ভাষণ পেয়েছি। পেয়েছি প্রীতি ও ভালবাসা। সহরে যদি খুব উঁচু চূড়ার গীর্জা থাকত……একবার লাফিয়ে দেখতাম।'

এক বছর পরে তাদের বিয়ে হোল। ল্যাংডনের এজেন্ট স্ত্রীকে মার্ক টোয়াইন ছোট-খাট একটা বোর্ডিং-হাউস খুঁজে দিতে অনুরোধ করলেন। বিয়ের পর স্ত্রী বর-কনেকে একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকায় এনে তুললেন। তারা গৃহ-প্রবেশ করল। আলোর বন্যায় চোখ ধাঁধিয়ে দিলে। চাকরেরা সুসজ্জিত কক্ষে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। মার্ক ত ভীত-সন্ত্রস্ত। এত সবের দাম দেবার ক্ষমতা নেই তার।

—'বাবা এই বাড়ীটা আমাদের যৌতুক হিসেবে দিয়েছেন। অলিভিয়া জানাল। বুড়ো ল্যাংডন উইলের কাগজ-পত্র হাতে নিয়ে সহাস্য মুখে এসে দাঁড়ালেন তাদের সামনে। মার্ক টোয়াইনের মুখে অবশেষে কথা যোগাল। 'আপনি ভারী ভাল লোক। যখনই এই সহরে আসবেন আমাদের বাড়ীতে উঠবেন। এমন কি রাতে হলেও। কোন খরচা লাগবে না আপনার।'

বহু বিষয়েই মার্ক আর তাঁর স্ত্রীর মতের মিল হোত না কিন্তু তাঁদের মিলন আদর্শস্থানীয় ছিল। মার্ক যেমন স্ফূর্তিবাজ ছিলেন তেমনি চটেও যেতেন সহজে। 'আর অলিভিয়া'—উইলিয়ম ডীন হাওয়েল লিখেছেন—'তার মতন চমৎকার মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। যেমন মধুর আচরণ তেমনি অতি দয়া-মায়ার শরীর। তাই বলে তার মন একটুও দুর্বল ছিল না। ক্লেমনস বিনা প্রতিবাদেই কেবল তার অভিভাবকত্ব মেনে নেননি গর্বও করতেন।'

দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে তাঁদের প্রেমমধুর জীবন ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়েছে। অলিভিয়া কোন দিনই শরীরে যথেষ্ট শক্তি পায়নি। তার প্রথম শিশু শৈশবেই মারা যায়। আরো অনেকগুলি পর-পর শোকের কারণ ঘটেছিল যা ধীরে-ধীরে ক্ষয় করেছিল তার স্বাস্থ্য। মৃত্যুর দু'বছর আগে থেকে অলিভিয়া সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। এমন বহু দিনই গেছে যখন তার স্বামী সারা দিন ও রাত্রে মাত্র কয়েক মিনিট তাকে সঙ্গ দিতে পেরেছেন। তার সূক্ষ্মতম পরিবর্তন স্বামীকে যেমন খুশীতে আত্মহারা করে দিত তেমনি ভীত সন্ত্রস্তও করে তুলত। মার্ক টোয়াইন তখন এক ছত্রও লিখতে পারতেন না—ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি খুশীর মুহূর্তের জন্য রোগিণীর ঘরে বসে থাকতেন চুপটি করে।

১৯৩০ সালের জুন মাসে তার স্বাস্থ্যের অবস্থা অনেকটা ভাল হয়। চিকিৎসকেরা শীতের সময় ইতালীতে বায়ু-পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন। মার্ক ফ্লোরেন্সের দিকে একটি প্রাচীন প্রাসাদ ভাড়া নিলেন। এইখানেই ১৯০৪ সালের ৫ই জুন এই মধুর রোমান্সের চির-পরিসমাপ্তি ঘটল। সেদিন মার্ককে পুরো একটি ঘণ্টা রোগিণীর ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। যখন তাঁকে বাইরে ডেকে পাঠান হোল মার্ক নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলেন এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য। কিন্তু অলিভিয়া বললে, এতে এমন কি ক্ষতি হয়েছে।—তার পর চুমু খেলে মার্ককে।

—'আবার ফিরে আসছ ত?' প্রশ্ন করলে সে।

—'নিশ্চয়। শুভরাত্রি জানাতে আসব বই কি।'

মার্ক টোয়াইন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। উপরে গিয়ে সোজা পিয়ানোর ধারে বসলেন। মেয়েটি মারা যাওয়ার পর আর এক দিনও তিনি পিয়ানো স্পর্শ করেননি। মার্ক টোয়াইন আজ নিজের থেকে পিয়ানো বাজিয়ে অনেকগুলি গান গাইলেন। সেই গান শুনে

নীচে মৃত্যুপথযাত্রিণী অলিভিয়ার রোগ-পাণ্ডুর মুখ মধুর হাসিতে ভরে গেল। ক্লান্ত কণ্ঠে বললে সে—'মার্ক ত ভাল। সে শুভরাত্রির গান গেয়ে শোনাচ্ছে আমায়।' তাকে ধরে তুলে বসিয়ে দিতে বললে আর ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রাণ তাকে ছেড়ে পালাল। উপরে মার্ক বাজিয়েই চলেছেন—মনে আজ তার খুশীর জোয়ার নেমেছে—প্রাচীন ইতালীয় রাজপ্রাসাদে সেই অপূর্ব সংগীত শ্রবণ করে সময়ের দূতেরাও থমকে থেমেছিল বোধ হয়।

মার্ক শুভরাত্রি জানাতে এল—'আমি তার মুখের দিকে তাকালাম, মনে হোল কথাও বললাম কিন্তু সে আমাকে লক্ষ্য করলে না দেখে আমার কেমন খটকা লাগল এবং বিস্ময় বোধ হোল। তার পর সব বুঝতে পারলাম—আমার হৃদয় ভেঙ্গে গেল। ······আমি ক্লান্ত, আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি। আমাকেও লিভি যদি তার সঙ্গে নিত।'

গ্রিজ অম্বার জাহাজে করে অলিভিয়ার মৃতদেহ আমেরিকায় নিয়ে আসা হোল। সেদিন নির্জন কেবিনে জাহাজের দোলায় পৃথিবীর পূজ্য লেখক যখন এ-পাশ ও-পাশ করছিলেন তখন নিশ্চিত তাঁর মনে বহু দিন আগে ঘটা আর একটি ঘটনার কথা উদয় হয়েছিল। সেদিনও এমনি ধারা জাহাজে চলেছিলেন তিনি। তবে সেদিন সে ছিল শুধু ছবি—পটে লিখা।

মার্ক টোয়াইন অলিভিয়ার কবরের ফলকে নীচের এই ক'টি কথা লিখে দিলেন—'আমার আনন্দের শিখা, ভগবানের করুণা ঝরে পড়ুক তোমার উপর।' আর 'ঈভস ডায়রী'তে অলিভিয়ার সঙ্গে এই প্রেমকে তিনি অমর করে রেখেছেন এই ক'টি কথার বন্ধনীতে—'যেখানেই সে গেছে অমরাবতীতে পরিণত হয়েছে।'

সেদিন থেকে সত্যিই তিনি ক্লান্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন। জীবনের সকল আকর্ষণ মুছে গেছে তাঁর। ১৯১০ সালে তাঁর চির বিদায়ের লগ্ন এল যেদিন মার্ক টোয়াইন একটুও অসুখী হননি—একটুও ক্ষোভ ছিল না তাঁর মনে, কারণ এবার তিনিও অলিভিয়ার পাশেই চিরশয্যা নিতে পারবেন।

কবি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

দিনের পর দিন, কত দিন
প্রায়ই সকাল বেলায় সরু গলি-পথে
তোমার জানালার তলা দিয়ে আমি যাই।
দেখি তুমি দাঁড়িয়ে আছ
কি দেখ কা'কে প্রত্যাশা কর জানি না।
কিন্তু কৌতূহল বা প্রতীক্ষায় প্রদীপ্ত
তোমার চোখ দু'টি যেন প্রশ্ন করে,
কে তুমি প্রতিদিনের অচেনা পথিক
তুমি কি দুঃখী ?

আমি কবি, বাঙ্গলার কবি
আমার খ্যাতি ভাগীরথীর তীর
পদ্মা যমুনা মেঘনার তীরে তীরে
ছড়িয়ে গেছে। আধুনিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
প্রতিভা নিয়ে তরুণেরা যখন তর্কযুদ্ধে
উত্তেজিত হয়ে ওঠে ; তুমি জেনো
সে আমারই কবিতা নিয়ে।
ওরা অর্থ খুঁজে পায় না বলেই
আমার প্রতিভা সার্থক।

দুঃখী ? ওটা বাঙ্গলার কবিদের নিয়তি।
কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মত
যমজ ভাই-বোনের মত
কবি ও দুঃখ।
দুঃখে দুঃখময় জীবন নিয়ে
ওরা যখন আলোচনায় গদগদ হয়
নিশ্চয় জেনো, সে আমি, সে যে আমি।

স্মৃতিস্তম্ভ

শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য

একটি পুলের ধারে এসে ঠিকাদার বললেন : ঐখানেই দুর্ঘটনা ঘটেছিল দশ বৎসর পূর্ব্বে। কোথাও তেমন কিছু ত্রুটি ছিল না। ইটের গাঁথনির উপর সিমেণ্টের নিঁখুত প্রলেপ। কিন্তু, তথাপি তা এমন আকস্মিক ভাবে ধ্বসে পড়ল যে আমরা অবাক্ হয়ে গেলাম।

ঠিকাদার যা বললেন না, লোকেরা তা বুঝে নিল। প্রাচীর ধ্বসে পড়ে কয়েকটি জীবন শেষ হয়ে গেল। লোকগুলি অনায়াসেই মাটির বুকে আশ্রয় নিল। তাদের মৃতদেহগুলি উদ্ধার করাও সম্ভবপর ছিল না।

ঠিকাদার সকলের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন : কিন্তু লোকগুলি যদি একটু সতর্ক হয়ে কাজ করত, তবে হয়ত এমন ঘটত না।

বিপদ ঘটত কি ঘটত না, সেটা তর্কের বিষয়। আপাততঃ সেটা বন্ধ রেখে কাজ করবার জন্য লোকগুলি চঞ্চল হয়ে উঠল। ঠিকাদার তা বুঝতে পারলেন। বললেন : বিপদের কথা চিন্তা করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। আবার, এখানেই আমাদের কাজ আরম্ভ করতে হবে।

এসিষ্টাণ্টের হাত থেকে একটি 'প্লান' নিজের হাতে তুলে নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার বললেন : দেরী করে লাভ নাই, কাজ আরম্ভ করা যাক।

মাটির বুকে লৌহ-শলাকা বিদ্ধ করে দেওয়া হল। পৃথিবীর পাঁজরগুলি স্তরে স্তরে খুলে গেল এবং লোকগুলি পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। ইঞ্জিনিয়ার সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : আর মাত্র কয়েক ফিট, এর নীচেই ম্যাঙ্গানীজের সন্ধান পাওয়া যাবে।

আবার চলল ডায়নামো। বিপুল আর্ত্তনাদ করে পৃথিবীর বুক চিরে-ফুঁড়ে সে যা নিয়ে আসল, তা ম্যাঙ্গানীজ বা অন্য কোন পদার্থ নয়। সামান্য কিছু জল ও কাদামাটি। সে মাটি ও জল নিয়ে তারা ছুটে গেল রাসায়নিকের তাঁবুতে। মাইক্রোস্কোপের নীচে পরীক্ষা চলল সে জল-সম্পদের। এসিড মিলিয়ে ধাতব ও ক্ষার জাতীয় জিনিষগুলিকে আলাদা করে ফেলা হল। কিন্তু কই, ম্যাঙ্গানীজের চিহ্ন মাত্রও নাই। আবার চলল পরীক্ষা। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। প্রতিটির অণু-পরমাণুর গতি-পথে বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম ও সন্ধানী দৃষ্টি বিচরণ করছে। সন্ধান করছেন তিনি ম্যাঙ্গানীজ-কণিকার। কিন্তু কোথাও নাই, কোথাও তা পাওয়া গেল না। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে নৈরাশ্য ফুটে উঠল। বললেন : ধাতব পদার্থের কিছুমাত্র সন্ধান পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল কয়েকটি জান্তব পদার্থের সন্ধান, পৃথিবীর গহ্বরে সুরক্ষিত জীব-কঙ্কাল, গলিত অবস্থায় কয়েকটি ফুলের পাপড়ি।

সকলের দৃষ্টিতেই প্রশ্ন ও কৌতূহল। বৈজ্ঞানিক তা লক্ষ্য করলেন। বললেন : এ অবিশ্বাস্য কিছু নয়। যে ভাবেই হউক, পৃথিবীর কয়েকটি জীবজন্তু ও অরণ্যের ফুল ডুবে গিয়েছে এখানে, আজ তাই ভেসে উঠেছে।

ঠিকাদারের দৃষ্টিতে নৈরাশ্যের কালো শিখা জ্বলে উঠল। সকলের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। বৈজ্ঞানিকের টেবিলের উপর অনেকটা ঝুঁকে পড়ে তিনি প্রশ্ন করলেন : আর কোন জিনিষেরই কি সন্ধান পাওয়া গেল না?

পুনরায় ডায়নামো আর্ত্তনাদ করে উঠল। পৃথিবীর বক্ষপঞ্জর হাতড়ে দেখার উল্লাসেরও যেন পরিসীমা নাই। এদিকে পৃথিবীও কাঁপছে। তার বুকের গোপন সম্পদকে বাইরে উজাড় করে দিয়ে সে যেন অসহায় বেদনায় কাঁপছে। লক্ষ বা কোটি বৎসর যাবৎ পৃথিবী এ সম্পদকে রূপ দিয়েছে, তিলে-তিলে সঞ্চয় করেছে, মানুষের লোভী দৃষ্টি থেকে এ সম্পদকে রক্ষা করার জন্য পৃথিবীর সে কি অপরিসীম ও নিঃশব্দ ব্যগ্রতা! আজ পৃথিবীর মানুষ বহু সন্ধান করে বের করে নিয়ে আসল সে সম্পদকে।

কথাটি বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল। অরণ্য অঞ্চলকে অতিক্রম করে তা চলে গেল বহু দূরে, দলে দলে আসল সম্পদ-সন্ধানীরা। আসল পৃথিবীর বৃহৎ লোক-সমাজ। অরণ্যের আদিম নীরবতাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে আধুনিক জীবন উঠল কলরব করে। ধুঁয়া আর ধূলিতে আকাশের নীলাম্বর উঠল মলিন হয়ে।

দুই

সে সহরে একদা এক জন মানুষের আবির্ভাব ঘটল। এ সহর বা কোন সহরকেই সে চিনে না। তথাপি, এর ধূলি-সমাকীর্ণ রাজপথ ও অট্টালিকাশ্রেণী তার ভাল লাগল। ভাল লাগল সহরের প্রাত্যহিক জীবনধারা। সে এগিয়ে চলল।

লাঠিতে ভর করে সে এগিয়ে চলছে। চলার শক্তি তার নাই। তথাপি সে এগিয়ে চলছে। স্রোতের মুখে এক টুকরা খড়ের ন্যায় সে এগিয়ে চলেছে। এক-এক বার ইচ্ছা হয়, এদের সংগে সে কথা বলে। অপরিচিত জগতের অধিবাসীদের সংগে সে মৈত্রীর রাখি বেঁধে যায়। কিন্তু তা অসম্ভব। এরা অন্য ভাষায় কথা বলে, অন্য দৃষ্টিতে তাকায়। তথাপি সে ভালবাসল এই নগরকে। একটি জলের কলের সম্মুখে এসে সে দাঁড়াল। এ এক অপূর্ব্ব বিস্ময়! পৃথিবীর ইতিহাস থেকে ঝর্ণা মুছে গেলেই বা ক্ষতি কি? অঞ্জলি ভরে জলপান করে সে এগিয়ে চলল। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সে এ সহরে আসে নাই। নানা স্থান পর্য্যটন করে সে নিতান্ত আকস্মিক অনেকটা অনাহূত ভাবেই এখানে এসে পৌঁছেছে। অবশ্য এ সহর সম্পর্কে সে কিছু শোনে নাই, তা নয়। যেদিন অরণ্য অঞ্চলের নিঃশব্দতা ভেদ করে প্রথম বার ডায়নামো আর্ত্তনাদ করে উঠল, সেদিনই কথাটা তার কানে পৌঁছেছিল। তার পর দলে-দলে প্রতিবেশীরা এ কারখানা-সহরের দিকে যাত্রা করল। ফিরে গেল যখন, তখন তাদের জীবনধারা, এমন কি, কথা বলবার ভঙ্গীটিও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেছে। গ্রামবাসীরা বিস্মিত দৃষ্টিতে সহর-প্রত্যাগত এ সকল মহাজন ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে থাকত। রতনলালের মনেও সম্ভব-অসম্ভব নানা রকম কল্পনার উদয় হত। তথাপি কোন দিন তার সখ হয় নাই যে, সহরে যায় বা সহরবাসীদের সংগে পরিচিত হয়ে উঠে। সাঁওতাল পরগণার এক অখ্যাত পল্লীতে তার জীবন নিঃশব্দে, আপন গতিতেই বয়ে চলেছিল। কিন্তু, একদা আকাশে উঠল মেঘ, আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় অরণ্যের আদিম বিটপী স্তব্ধ হয়ে উঠল।

সে ঝড়ের মুখে শুধু অরণ্যের লতা-পাতাই উড়ে গেল না।

রতনলালের জীবনেরও একটি অধ্যায় ছিঁড়ে গেল। সে অধ্যায়টিকে পুনরায় সংগ্রহ করে এনে যথাস্থানে জুড়ে দিয়ে একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করতে সে পারল না। তার ভালবাসার কাহিনী তার হৃদয়েই সমাধিস্থ হল। সেটাকে খুঁজে বের করে আনা সম্ভবপর ছিল না।

তার পর বহু দিন কেটে গেছে। রতনলালের দেহে ও মনে বহু পরিবর্ত্তনের পর আজ একটা পরিণতিতে এসে পৌঁছেছে। ইতিমধ্যে সে বহু স্থান পর্যটন করেছে ও বহু লোকের সান্নিধ্য লাভ করেছে। কিন্তু কোথাও জীবনের পুরাতন দিন বা পুরাতন মানুষগুলির সন্ধান সে পায় নাই। অনেকটা ভবঘুরের ন্যায় সে ঘুরে বেড়িয়েছে। আজ এই সহরে আসারও তেমন কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তথাপি সে আসল—স্রোতের মুখে ভেসেই সে আসল।

পিঠের উপর একটা পুঁটলিতে নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষগুলি নিয়ে সে এগিয়ে চলেছে। সহরের জনস্রোতে সে যেন একটি তরঙ্গ। কোনরূপ বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য তার নাই। কিন্তু তার চোখগুলির দিকে তাকালে তাকে একটু স্বতন্ত্র বলেই মনে হয়। সে চোখগুলি কেবলমাত্র সম্মুখের দিকেই তাকাচ্ছে না যে—আশে-পাশেও কিসের যেন সন্ধান করছে।

পেট্রলের গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে একটা মোটর গাড়ী এগিয়ে গেল। অরণ্যের লতা-পত্র বা অজানা-অনামা ফুলের গন্ধ এটা নয়। তথাপি তার ভাল লাগল। রাজপথের অন্য সকলকে ফাঁকি দিয়ে সে সেই গন্ধ নাকে টেনে নিল।

রাজপথের এক ধারে একটি খোলা জায়গায় পাতলুন-পরিহিত এক জন মধ্যম-বয়সী লোক বক্তৃতা দিচ্ছে এবং তার চতুর্দ্দিকে বহু লোক বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে গভীর অভিনিবেশের সংগে সে-বক্তৃতা শুনছে। রতনলাল এগিয়ে গেল এবং লোকগুলিকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে কান পেতে দিল।

অদূরে একটি কারখানার দিকে অঙ্গুলী সংকেত করে লোকটি যা বলছে, তার মর্ম্মকথা এই যে, ওখানে চাকুরী করলে প্রচুর অর্থ, মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ হবে।

রিক্রুটিং অফিসার সকলেরই হাতে একটি করে সিগ্রেট বণ্টন করে দিলেন। তার পর সমবেত সকলের দিকে তাকিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহের সংগে বলে উঠলেন : যত খাটবে তত পয়সা। বড়-বড় বাংলো রয়েছে, সেখানেই হবে তোমাদের বাসস্থান। কেরোসিনের বাতির কাছে বসে রাত কাটাতে হবে না—ইলেক্ট্রিক পাখার নিচে বসে দিন কাটাতে পারবে—এসো সকলে মিলে চাকুরী নাও।

লোকগুলি নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যে রিক্রুটিং অফিসারের দিকে তাকাল। তিনি আবার বেশ জোরের সংগেই বললেন : নিজের কোন স্বার্থ-সিদ্ধির মতলব আমার নাই। এসো, সকলে মিলে ওখানে চাকুরী নিই।

অনেকেই এ আহ্বান শুনে সরে আসল। আবার কেউ-কেউ দ্বিধা-জড়িত ভাবে এগিয়েও গেল।

লাঠিটি এক পাশে ছুঁড়ে দিয়ে এবং পুঁটলিটি মাটিতে রেখে রতনলাল রিক্রুটিং অফিসারের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াল। রিক্রুটিং অফিসার তার আপাদমস্তক ধীর ভাবে নিরীক্ষণ করে বললেন : হাঁ, তুমি পারবে, এমন কঠিন কিছু কাজ নয়।

একটি প্রকাণ্ড কারখানার ফটকে এসে তারা জন কয়েক লোক দাঁড়াল। ভিতরে যে কি কাণ্ড চলছে, বাইরে দাঁড়িয়ে তা অনুমান করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই তাদের দৃষ্টিতে বিস্ময় ও কৌতূহল। অপরিচিত পৃথিবীতে শঙ্কিত ভাবে পা ফেলে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

পাশের একটি ঘর থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস এসে তাদের নাকে-মুখে প্রবেশ করল। কোন রকমে নাক-মুখ বন্ধ করে অনেকটা নীচু হয়ে তারা এগিয়ে চলল। তাদের এই অসহায় অবস্থা দেখে একটু দূরে দাঁড়িয়ে অন্য শ্রমিকরা মুচকি হাসছে।···ওখানে বয়লার থেকে অত্যন্ত জোরে ষ্টীম বের করে দেওয়া হচ্ছে। মাথার ঠিক উপরে ইলেকট্রিক ক্রেণ কখনও সামনের দিকে, কখনও বা পিছনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

জীবনের একটি নূতন অধ্যায়। রতনলালের ভাল লাগল, নেশার মত ভাল লাগল। এই বিপুল কর্ম্ম-ব্যস্ততা, অসংখ্য যন্ত্রের অজ্ঞাত আর্ত্তনাদ—রতনলালের দেহ-মন শিহরিত হয়ে উঠল।

সে এগিয়ে চলল। এই যন্ত্রকে সে ভালবাসবে। পুরাতন জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে সে নূতন মানুষ হয়ে উঠবে। হাঁ, নূতন জীবনধারায় সে দীক্ষিত হয়ে উঠবে। তবেই না সন্ধ্যা কাটিয়ে বাংলোতে বসে সিগ্রেট টানার অপূর্ব্ব আরাম।

সামনেই একটি স্মৃতিস্তম্ভ। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য যন্ত্রপাতির রুক্ষ আলাপ। তার মধ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ লতা-পত্র ও তৃণকুঞ্জের মধ্যে শুভ্র সান্ত্বনার ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে।

"যাঁরা নিজেদের জীবন বিসর্জ্জন করে এই খনি আবিষ্কার করেছেন,—বিশেষতঃ সেই একমাত্র নারীটি—তাঁদের কথা স্মরণ করেই এই স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা হল।"

নিঃশব্দ পাষাণ কোন কালেই মুখর হয়ে উঠবে না—এমন কি কোন দিন কারু কানে-কানেও বিস্মৃত জীবনের গোপন কাহিনী প্রকাশ করবে না, এ কথা রতনলাল জানে। তথাপি এই স্মৃতিস্তম্ভের দিকে তাকিয়ে আজ তার ইচ্ছা হয়, চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করে, মেয়েটির চুলের বেণীতে কোন ফুল ছিল কি? লাল ফুল?

চতুর্দ্দিকে বিস্ফোরণ চলছে। পৃথিবীর বক্ষ-পঞ্জরে বিপুল কম্পন। অরণ্যে অগ্নি-সংযোগ করে অরণ্য-অধিবাসীকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। পৃথিবীর গভীর অন্ধকারে দু'টি সজল ও শান্ত চোখের নিঃশব্দ প্রতীক্ষা।

রতনলাল রেলিংয়ের উপর আরও অনেকটা ঝুঁকে পড়ল। মেয়েটির চোখ দু'টি আজও তার মনে আছে। মুখের আদলটি সে আজও বিস্মৃত হয় নাই।

কিন্তু, ও-পাশে ব্লাষ্ট ফারনেস চার্জ্জ করা হচ্ছে। আকাশের দিকে মাথা তুলে সে বিপুল রবে আর্ত্তনাদ করছে। কার্ব্বণ গ্যাসের গন্ধে চতুর্দ্দিক্ ভরে উঠেছে। সামনে "পাওয়ার হাউসের" সুইচ-বোর্ডে সারি-সারি লাল বাতি। লাল ফুল নয়—ইলেকট্রিকের লাল বাতি।

জীবনের এই দ্বিতীয় প্রিয়তমা। প্রথমা মরে যাক—ঘুমিয়ে থাকুক স্মৃতিস্তম্ভের নীচে হিম-শীতলতায়। তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে কি-ই-বা লাভ হবে? তার চাইতে দ্বিতীয়াকেই সে আজ ভালবাসবে—বাসনা জাগবে তারই সংগে।

নগরবাসী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

প্রণব নিজের মনে বলে, 'শিশুর সমান। সংসারের ব্যাপারে নয়, সংসার-ছাড়া ব্যাপারে। সংসার-ছাড়া ব্যাপার। শিশুর সমান।'

মণি বলে, 'আগে শুনে নাও, পরে সমালোচনা করবে। এই তো গেল সস্তা পুরানো বাবের হিসেব। এবার কি করলে? একটু বীরত্ব দেখিয়ে খতমত খাইয়ে সাজানো সংসার থেকে হ্যাঁচকা টানে শিকড়-শুদ্ধ তুলে ফেলতে চাইলে। আমায় যদি দলে টানার সাধ, গড়ে-পিটে নাও, জানতে-বুঝতে শেখাও? মুখ্যু তো আছিই, জ্ঞানও নেই, অভিজ্ঞতাও নেই। সেটা নতুন কিছু নয়। ডেকে নিয়ে, টেনে নিয়ে অপদস্থ করা কেন? আমার চালচলন কথাবার্তায় তোমরা যে হাসাহাসি কর, সেটা তোমাদের লজ্জা বুঝতে পার না?'

'বুঝতে একটা অসুবিধা আছে, তাই বুঝতে পারি না। তোমার নিয়ে কেউ হাসাহাসি করে এটা তোমার মনগড়া কথা। তোমার মনের বাইরে কোন অস্তিত্ব নেই। তোমার মনের মধ্যে না ঢুকলে কি করে এটা আমাদের বোধগম্য হবে?'

প্রণবের কথা যেমন বাঁকা কথার সুর তেমনি কড়া হয়ে উঠছে খেয়াল করে মণি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তার পর প্রণবের মেজাজকে উপেক্ষা করে বলে, 'হাসাহাসি মানে কি ইয়ার্কি তামাসা? আমার কথায় ব্যবহারে তোমাদের অবজ্ঞা কখনো জাগেনি—বলতে চাও ঠাকুরপো?'

'অবজ্ঞা জাগার তো কোন কারণ নেই।'

'নেই? সেদিন তোমরা খালি বড়-বড় কথা বলছিলে, আমি বিরক্ত হয়ে গান-টান শুনতে চাইলাম। সবাই তোমরা কি রকম চুপ হয়ে গেলে আমি টের পাইনি ভেবেছ?'

'মনগড়া টের পেয়েছ। নইলে এটুকু নিশ্চয় টের পেতে, তোমার মত আমিও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ, তখন শুধু জাবর-কাটা চলছিল। একঘেয়ে লাগছিল সবারি, তুমি মুখ ফুটে বলে আলোচনাটা থামিয়ে দেওয়ায় সকলে বরং কৃতজ্ঞতাই বোধ করেছিল। তুমি উল্টোটা বুঝলে। মনগড়া বোঝা এই রকম হয়। বোঝাটা মনের মত হলেই হল, আর কিছুই দরকার হয় না।'

প্রণব উঠে দাঁড়ায়।

'অন্য সব কিছুও তোমার মনগড়া মণিবৌদি। যার সংস্পর্শে আসবে, যে তোমায় নতুন কিছু শোনাবে, একটু বিচলিত করবে, তাকেই যদি তোমার দায়িত্ব নিতে হয়, সংসারে একা থাকা ছাড়া তোমার গতি নেই। তোমার হিসাবে দাঁড়ায়, বন্ধু মাত্রেই বিশ্বাসঘাতক।'

'রাগ করলে? আমি কিন্তু সাধারণ লাভ-লোকসান নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলিনি। ওটা আদর্শগত বিশ্বাস রাখা-না-রাখার কথা।'

'তোমার বিশ্বাসও তবে দু'রকমের? একটা সাধারণ লাভ-লোকসানের, আরেকটা আদর্শগত? কখন কোন হিসাবটা ধরবে ঠিক কর কি করে?'

মণি দু'চোখে আগুন জ্বালিয়ে তাকায়, তাতে তার চোখ দু'টিই শুধু কটমটে মনে হয়, যেনো মদখোর মেয়ের চোখের মত। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও সে বুঝতে শিখেছিল, যে চোখের ধমকে কাউকে কাবু করার সাধ্য তার আর নেই।

'তর্ক করে আমার কাছে পার পেলে, জগতের কাছে পাবে না।'

'তর্কটাও তবে আমিই করলাম?'

জবাবের অপেক্ষা না করেই প্রণব বেরিয়ে যায়।

গোকুল চটের থলিতে তরকারী এনে ঢেলে দিচ্ছিল, তাকেই সাক্ষী মেনে মণি বলে, 'দেখলে? গাল দিয়ে জবাবটা শুনবার ধৈর্য্য রইল না, গট-গট করে বেরিয়ে গেল? এরাই দেশোদ্ধার করবে!'

ঝিঙে-বেগুন গুছিয়ে রাখতে রাখতে গোকুল হেসে বলে, 'ভাবছেন কেন? আপনার জবাব না শুনে যাবেন কোথা? যেচে এসে জবাব শুনতে হবে।'

'মানে কি হল?'

'মানে খুব সোজা। আপনার বিষয়ে অজানা কিছুই নেই। মানুষটা আপনি কেমন, কি ভাবে জীবন কাটিয়েছেন, সব জানা কথা। যে আপনাকে জানে তার মনে আজ প্রথম প্রশ্ন জাগা উচিত: আপনার মধ্যে এমন তোলপাড় উঠল কেন? এমন সংসারী মানুষ আপনি, কেন আপনি এমন ভাবে নাড়া খেলেন? দেখে-শুনে মন-রাখা কথা কইতেন, মিষ্টি করে হাসতেন, চুকে যেত। তার বদলে, সবাই কি ভাবে কি বলে কি করে তাই নিয়ে হয়েছে আপনার জ্বালা। কেন? এর জবাবটা তো আপনার কাছেই পেতে হবে।'

খুন্তির গোড়াটা খুন্তিতে ঠেকিয়ে মণি সংশয় ভরে তাকায়। তার আশঙ্কা হয়, হয়তো গোকুল তার ক্ষোভ দূর করতে মন-রাখা কথা বলছে।

'আমি আবার একটা মানুষ!'

গোকুল হাসিমুখেই বলে, 'সে প্রমাণটাই তো দিলেন যে এত কাল চোখ-কান বুজে সংসার করেও মানুষ রয়ে গেছেন। নইলে আপনার এত জ্বালা হবে কেন? শুধু যদি আপনার মনে হত, আমাদের রকম-সকম আপনার পছন্দ নয়, সেটা আপনার মনে-মনেই থাকত। কিন্তু আপনি একেবারে ছটফট করছেন—এ তো সোজা ব্যাপার নয়! আপনার ভেতরে ওলোট-পালোট চলেছে। ফল কি দাঁড়াবে সে অবশ্য আলাদা কথা। তবে আপনি আর আপনি থাকবেন না মণি বৌদি, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'কি হব?'

'কে জানে কি হবেন—বন্ধু অথবা শত্রু। কিন্তু বাইরের জগৎকে ঠেলে সরিয়ে উদাসীন হয়ে সংসার নিয়ে মেতে আর থাকতে পারবেন না।'

'বন্ধু হওয়া কপালে নেই। কারো সঙ্গে মিলছে না।'

'গলায়-গলায় ভাব দিয়েই বুঝি শুধু বন্ধুত্ব সুরু হয়? শুধু মিল নিয়ে সৃষ্টি চলে? মিল আর অমিল আছে বলেই জগৎটা এগোচ্ছে, নইলে কবে পচে-গলে যেত। তা জানেন?'—এক মুহূর্ত না থেমে এই কথার সঙ্গেই গোকুল যোগ দেয়, 'আবার কেন তরকারী রাঁধার হাঙ্গামা করবেন? বেগুন ভেজে ফেলুন।'

'বেগুন ভাজায় হাঙ্গামা কম না কি! না, খিদে পেয়েছে?'

কয়েক দিন গোকুলের কথাগুলিই মণির মনে ঘুরে বেড়ায়। কথাগুলি সরল কিন্তু সাংঘাতিক, তবু মণির বড় ভাল লেগেছে। নিজের মাধ্যমে জগৎকে বিচার করা তার চিরদিনের অভ্যাস। গোকুল এই মাধ্যমকে আমল দেয়নি, কিন্তু ওর অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে। সেটা মণির কাছে গোকুলের সততার একটা বিরাট পরিচয় হয়ে উঠেছে। প্রণব যেন সে তুলনায় অনেক বেশী অনুদার।

চার

নাজিমের প্রথমে মনে হয়েছিল, পাড়ায় এবং জানা-চেনা লোকেদের কাছে সে আর কোন দিন মুখ দেখাতে পারবে না। বেঁচে থাকতে মাকে সে যে খেতে দিত না, বাড়ী-বাড়ী ঘুঁটে বেচে সে পেট চালাত, এ জন্ম নাজিমের বিশেষ কোন লজ্জা ছিল না। গরীবের কঠোর বাস্তব জগতে মনগড়া লজ্জার ঠাঁই নেই। কোন রকমে পেটে খেয়ে কে বেঁচে আছে সেটাই চরম কথা, কি ভাবে খাওয়াটা সে যোগাড় করছে, কলে খেটে না ঘুঁটে বিক্রি করে, তা নিয়ে বেশী মাথা-ঘামানোর গরজ কারো নেই। বয়সের ভারে নুয়ে পড়ুক, নিজেকে সকলের নানী করে তুলে গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে বেচে নাজিমের মা যে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারত যে নিজের পেট চালিয়ে যাবার ক্ষমতা তার নিজেরই ছিল? সুতরাং তাকে খেতে-পরতে না দেওয়ায় নাজিমের কোন দোষ হয়নি। দয়া-মায়ায় কারো পেট ভরে না, শূন্য থেকে খানা নামে না। যে খায় সে যোগাড় করেই খায়। কথার কথা যে যতই বলুক, মাকে ছেড়ে সুন্দরী বৌ নিয়ে থাকার জন্যে সত্যিকারের নিন্দা কেউ নাজিমের করেনি। বৌ নিয়ে, খাপসুরৎ বৌ নিয়ে থাকবে না তো কাকে নিয়ে থাকবে মানুষ? বুড়ী যদি কাৎ হয়ে পড়ত, রোগে বা অনাহারে সত্যই মরতে বসত পথের ধারে, তখন তার দিকে না তাকালে দোষ হত নাজিমের। লোকে বলত, ছিঃ, নাজিমের মা এ ভাবে প্রাণ দিয়েছে। তার চেয়েও বুঝি আপশোষের মরণ হয়েছে বুড়ীর। বিধর্মী কাপুরুষ তাকে কুৎসিত ভাবে হত্যা করেছে।

যোয়ান মদ্দ মানুষ হলে কথা ছিল, শক্ত-সমর্থ স্ত্রীলোক হলেও বুঝি মনে করা চলত ওরা শয়তানকেও ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু বয়স যাকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে দিয়েছে, শণের মত সাদা করে দিয়েছে মাথার চুল, মুখের চামড়া কুঁচকে যার গায়ের চামড়া লোল হয়ে ঝুলে পড়েছে, এক পা কবরে দিয়ে যে প্রতিদিন মরণের অপেক্ষাই করছে—তাকে এ ভাবে হত্যা করা কিসের পরিচয়? কেন, আর মানুষ ছিল না বেছে নেবার? শিশুর মত নিরীহ ভাল মানুষ এ বুড়ীকে কেন?

আপশোষে এমনিই নাজিমের বুক পুড়ে যায়, মানুষের মুখের দিকে তাকাতে না পারায় গুম খেয়ে সে মাটিতে চোখ পেতে রাখে, তার উপর ক'জন চেনা লোক নানা কথা বলে তাকে উন্মাদ করে দিতে চায়। বলে, এ কেবল দাঙ্গার ব্যাপার নয়, পাকিস্তানের ঝগড়া নয়। আমি তোমায় মারলাম, তুমি আমায় মারলে, এ তা নয়। এ নাজিমের কলঙ্ক, সমস্ত বস্তির কলঙ্ক, মুসলমান সমাজের কলঙ্ক। প্রাণ যাক, এর উপযুক্ত প্রতিশোধ নাজিমকে নিতে হবে। বেছে বেছে নাজিমের মাকে ওরা সাবাড় করেছে, এর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র ছিল। শুধু ওই ভদ্রপাড়ার দুষমণদের নয়, হিন্দু-প্রধান সে বস্তি থেকে বৌকে নিয়ে এদিকে সরে আসতে হয়েছে নাজিমের, যে বস্তির লোকেদেরও কারসাজি আছে তলায়-তলায়। রাত্রে ওরাই তো টেনে বার করেছে নানীকে, হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে টেনে নিয়ে গেছে মন্দিরের কাছে···

এক জন বলে আপশোষের সুরে, এক জন বলে খোঁচা দিয়ে, নাজিমের মরদের রক্তে তারা আগুন ধরিয়ে দিতে চায়। সে আগুন রাতে সামনের ওই বস্তিটাকে লাগে, সেখান থেকে চারি দিকে আরো দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। এত করেও এদিকে ভাল করে হাঙ্গামা বাড়েনি, ইয়াসীন-সিংহীর চাল ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়েছে। বস্তিতে অধিকাংশই মজুর, দাঙ্গায় তাদের মন নেই। উত্তেজিত হয়ে প্রায় বাধিয়ে বসবার উপক্রম করেও কি ভেবে যেন তারা আবার অল্পেই সামলে নিয়ে থমকে থেমে গেছে।

নাজিম যদি সক্রিয় হয়ে নামে তাহ'লে বেধে যাবে। দো-মনা মন কম নয়। নাজিম ডাক দিলে নানীর কথা ভেবেও অনেকে মরিয়া হয়ে নেমে পড়বে।

পরীবাণু বলে, 'না।'

'মুখ দেখাতে সরম লাগে।'

'আরও সরম লাগবে। ওরা যে এ সব বলছে ওদের মতলব আছে। অর্দ্ধেক মিছে কথা।'

'মিছে কথা?' নাজিম চোখ তুলে তাকায়। তার দু'চোখে আক্রোশ ঝিলিক দিয়ে যায়।

'টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল কে বললে? আব্দুলের মা আমায় বলেছে, তোমার ব্যারাম বলে কে যেন ডেকে নিয়েছিল। আরও কেউ কেউ জানে।'

'কে ডেকে নিয়েছিল?'

'তা শুধোয়নি আবদুলের মা।'

কি বলতে চায় পরীবাণু, কি বোঝাতে চায়? ছেলের ব্যারামের কথায় ভুলিয়ে তার মাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এতে বড় জোর প্রমাণ হয় একেবারে ঘর থেকেই কুকুর-বেড়ালের মত তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাতেই হত্যাটা শুধরে গেছে পরীবাণুর কাছে? অথবা পরীবাণু শুধু কোন রকমে ঠেকিয়ে রেখে তাকে বাঁচাতেই ব্যাকুল, দিশে হারিয়ে যা মনে আসছে তাই বলছে? ওই দুর্ঘটনার পর থেকে বৌটার ওপর ধীরে ধীরে অদ্ভুত একটা বিতৃষ্ণা জেগেছে নাজিমের। পরীবাণু সত্যে এই দাঙ্গা বাধায়নি। তার মার অপমৃত্যুর জন্যও সে কোন দিক্ দিয়ে দায়ী নয়। এ সব কথা অবশ্য মনেও আসে না নাজিমের, পরীবাণুর বিশেষ কোন দোষ খুঁজে মন তার বিগড়ে যায়নি। পরীবাণুকে নিয়ে মশগুল হয়ে দিন-যাপনের অদ্ভুত খাপছাড়া একটা প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। উদাসীনতা নয়, গভীর কষ্টকর প্রতিক্রিয়া।

রূপ যেন এত দিন সে চোখ মেলে চেয়ে ভাখেনি বৌয়ের, শুধুই মুগ্ধ হয়ে যেতে ছিল—আর সব বিষয়ে আনমনা হয়ে। রূপ? রূপ আছে পরীবাণুর, এমন ছিপছিপে নিটোল দেহ, এমন মোলায়েম রং, সুন্দর কোমল এই মুখ এমন আর কারো ঘরে নেই। কিন্তু বৌয়ের রূপ আছে বলে কি আর কিছু থাকতে নেই জগতে? সন্তর্পণে গা বাঁচিয়ে আগলেছে কোন রকমে সমাজ-সংসার বন্ধু-বান্ধব পুরুষের

জীবন-ধারণের নিয়ম-রীতি বজায় রেখে কেবল বৌয়ের রূপে মশগুল হয়ে দিন-রাত্রি কাটাতে হবে ? পরীবাণুকে পাবার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত নিজের জীবনটা খুঁজে এই একটি নেশা ছাড়া আর কিছুই নাজিম দেখতে পায় না। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এ সবও যেন স্বপ্নের ঘোরে ভিন্ন এক জগতে ঘটেছে, তার শুধু ছিল নিজের ঘরটি, যে ঘরে তার পরীবাণু থাকে।

পরীবাণু ঝুঁকে ঘরের কাজ করে, সোজা হয়ে দাঁড়ায়, সামনে দিয়ে এদিক্ ওদিক্ চলা-ফেরা করে—তার দেহের চেনা রেখা ও ভঙ্গিগুলি, সজীব লতার মত গড়নে যৌবনের পুষ্ট সম্ভারগুলি নাজিমের অচেনা মনে হয়। মনে হয়, ঘরের বৌ রূপ দিয়ে এমন ভাবেই ভুলিয়ে রেখেছিল যে এ রূপও সে ঠিক মত ভোগ করেনি, নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পরীবাণুকেও সে যেন স্বপ্নের মত গ্রহণ করেছে।

বাস্তব সংসার ভুলে নরম হয়ে গেলে এই রকম হয় পুরুষের, সব দিকে সে ঠকে, ফাঁকিটুকু নিয়ে সে খুশী হয়ে থাকে।

নাজিমের বিতৃষ্ণা নতুন। রুক্ষ কঠোর বাস্তব জগৎ তাকে আচমকা কুৎসিত আঘাত দিয়ে সচেতন করেছে। সেই সঙ্গে তার তৃষ্ণাও জেগেছে নতুন—পরীবাণুর রূপেরই তৃষ্ণা, নতুন ধরণের। উগ্র স্ফূর্তির উপভোগের মধ্যে এত দিন পরীবাণুকে পায়নি বলে নিজেকে তার বঞ্চিত প্রতারিত মনে হয়। রহমৎ খলিলেরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রূপহীনা নোংরা সাধারণ স্ত্রীলোককে নিয়ে কি প্রচণ্ড তেজের সঙ্গে নিজেদের পৌরুষ জাহির করে, হৈ-চৈ করে সত্যিকারের মরদের মত দিন কাটায়। পরীবাণুর মত বৌ থাকতে সে নিরীহ গোবেচারী সেজে ভীরু কাপুরুষের মত মিইয়ে মিইয়ে জীবনটা কাটিয়ে এসেছে! এমনি পৌরুষবিহীন হয়ে গেছে সে যে বেছে-বেছে তার মাকে খুন করেছে বিধর্ম্মীরা।

খপ করে সে হাত ধরে পরীবাণুর। হ্যাঁচকা টানে গায়ের ওপর এনে ফেলে। চিরকাল যে ডাকলে খুশী হয়ে হাসিমুখে যেচে এসে বুকে আশ্রয় নেয়, কোমল দু'টি হাতে গলা জড়িয়ে ধরে—সকাল না সন্ধ্যা না মাঝরাত্রি খেয়াল রাখে না!

পরীবাণু ভয় পেয়ে বলে, 'কি হল ? কি হল ?'

সকাল বেলা ন'টার সময় তার বড়-বড় চোখের সে বিস্ফারিত চাহনি নাজিমের সহ্য হয় না, তার বিগড়ানো মনের উগ্র ভাব ঝিইয়ে শীতল হয়ে যায়। আরও বেশী যায় হ্যাঁচকা টানের ব্যথায় যখন চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে!

'লাগল ?'

'লাগবে না ? হাতটা তুমি ভেঙ্গে দিয়েছ!'

পরীবাণুর ভয় ও রাগ ভাঙ্গিয়ে আপিস যেতে সেদিন দেরী হয়ে যায় নাজিমের। দপ্তরীর কাজ নিয়ে এই তার প্রথম গাফিলতি।

আপিসের কাজের পর সেদিন ইয়াসিনের কাছে তার ডাক আসে। ডাকতে আসে বুড়ো একটি লোক, মাথায় সমস্ত পাকা চুল তার রঙ করা, গোল-গাল মুখখানা মেয়েদের চেয়ে কোমল। মুখ দেখলে আর মিহি-গলার কথা শুনলে মনে হবে এমন নিরীহ ভাল মানুষ লোক বুঝি জগতে আর হয় না, মনটা না জানি কত কোমল। তার নাম রেজ্জাক, স্ত্রীলোক সেজে শিশুহরণ তার প্রধান পেশা। অজানা পুরুষের চেয়ে অচেনা স্ত্রীলোকের কাছে ছোট ছেলেমেয়েরা সহজে বশ হয়।

রেজ্জাক রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। রেজ্জাক মেয়েলি সুরে মেয়েলি সুরে কথা কয়। বলে, 'ইয়াসিন সা'ব একটু ডাকছিল গো।'

নাজিম ইতস্ততঃ করে।

'আজ আসলি বিলাতী মাল।'

গলির মধ্যে মদের দোকানে ইয়াসিন দু'জন সঙ্গীর সঙ্গে গেলাস সামনে নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছিল। বিলাতী মদের এই সাদাসিধে দেশী বারটিতে দাঙ্গার আগে এক দিন নাজিম এসেছিল, আপিস-ফেরত বাবুদের ভীড়ে সেদিন এত বড় ঘরটা সন্ধ্যার আগেই গমগম করছিল। বসবার ব্যবস্থা সস্তা কাঠের লম্বা-লম্বা টেবিল ও বেঞ্চে, আজ সেগুলি বেশীর ভাগ খালি পড়ে আছে। বারটা যে পাড়ার মধ্যে পড়েছে তাতে ইয়াসিনের জাত-ভাই ছাড়া ভরসা করে কেউ ফূর্ত্তি করতে আসবে না সহজেই বোঝা যায়। বিশেষ ভাবে ইয়াসিনরা সদলবলে দখল করে থাকায় তাদের জাত-ভাইরাও অনেকে এখানে ঢুকতে সাহস পায় না। ইয়াসিনদের কাছে নিজের জাত পরের জাত খানিকটা সুবিধার ব্যাপার মাত্র—তার বেশী কিছু নয়। এ সহরে অত ধর্ম্মের আত্মীয়তা মেনে গুণ্ডামির ব্যবসা চালানো যায় না। ইয়াসিন নিজেই বলে যে অত মানতে গেলে পলিটিক্স করতে হয়, তাদের ব্যবসা চলে না।

নাজিমের এ সব অজানা নয়। তার গা ছমছম করে। তবু সেই আতঙ্কের মধ্যেই সে এক নতুন উন্মাদনার সন্ধান পায়। যে হিংসা ও ক্ষোভের জ্বালা সে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলতে পারে না এমনি সব ভয়ানক মানুষের সংস্পর্শে এমনি পরিবেশে একটা বেপরোয়া মরিয়া ভাবের মধ্যে সে তা থেকে খানিকটা মুক্তি পায়। এক চুমুকে সে গ্লাসের অনভ্যস্ত পানীয় অর্দ্ধেকটা পেটে চালান করে দেয়, আগলহীন বিহ্বল কল্পনায় নানীর হত্যার উদ্ভট অমানুষিক প্রতিশোধের ঘটনা ঘটিয়ে চলতে থাকে।

ইয়াসিন বলে, 'ঔর মৎ পিজিয়ে ভাই।'

নাজিম বলে, 'আরে ভাই, লাও লাও। সব ঠিক হ্যায়।'

ইয়াসিন মুখ বাঁকিয়ে আড়চোখে তাকায়। দু'দিন দেখে মানুষটার ওপর তার পর্য্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে গেছে। একে দিয়ে কি হবে ? কোন কাজের, কোন দায়িত্বের যোগ্যতা কি এর আছে ? মানুষ মাপার মাপকাঠি ইয়াসিনেরও আছে, এক দিকে তাকেও কঠোর ভাবে নিয়ম মেনে চলতে হয়। অনেক ভয়ঙ্কর লোকের সঙ্গে তার কারবার, নিজে শক্ত না হলে শক্ত হাতে দলকে শাসনে রাখার, প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঠেকিয়ে চলার সাধ্য তার হত না, কবে সে ধ্বংস হয়ে যেত তার বিখ্যাত গুণ্ডামির স্বার্থের বিরামহীন সংঘাতের জগতে।

সন্ধ্যার কিছু পরেই বার বন্ধ হয়ে যায়। তার মধ্যেই চেঁচামেচি সুরু হয়ে যায় নাজিমের।

রাস্তায় তাকে একা রেখে ইয়াসিনেরা চলে যায়। ইয়াসিন কেন তাকে ডেকেছিল জানবার কৌতূহলও দেখা যায় না নাজিমের। চলতে চলতে ইয়াসিন বলে, 'বাজে মার্কা লোক।'

রেজ্জাক বলে, 'বৌটা ওকে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছে।'

'বৌ ?'

'আঃ!' রেজ্জাক যেন মেয়েলি ভঙ্গিতে জিভে চেটে স্বাদ পায়, 'বহুৎ খাপসুরৎ বিবি আছে ওর। সিনেমা-স্টারসে আচ্ছা।'

শুনে ইয়াসিন কৌতূহল অনুভব করে।

নাজিম টলতে টলতে এগিয়ে চলে। নেশার মধ্যে রাগটা তার জমাট বেঁধেছে পরীবানুর ওপর। মনটা গিয়েছে বাড়ীর দিকে। কাদু কখন সঙ্গ নেয় সে তাল বুঝতে পারে না। কাদুই তাকে বাড়ী পৌঁছে দেয়।

সেদিন রাত্রে প্রতিবেশীরা প্রথম পরীবানুর কান্না ও চীৎকার শোনে।

কাদু মিস্ত্রীর ঘর নাজিমের ঘরের লাগাও। তার স্ত্রী রাবেয়া বলে 'লোকটার হল কি?'

কাদু বলে, 'নবজানের খপ্পরে পড়েছে, মাথা বিগড়ে গেছে। খুব মাল টানছে ইদানিং বিরাদের সাথে।'

'এমনি বেশ ভাল ছিল লোকটা।'

'অমন ভাল সবাই থাকে। কে কেমন চিজ ইয়ানদ'দিতে জানা যায়। সব খবর না জানতে পারে, মোটমাট তো জানা আছে নানীর জানটা কেন গেল? কিন্তু জেনেও জানবে না, সে সুবোধ নেই—নাজেমালি সাহেব মোসাহেব তো! বড়লোকের পা-চাটা কুত্তা এমনি করে, ঘরে বিবির ওপর ঝাল ঝেড়ে দেখায় আমি মস্ত মরদ!'

কাদুর ঝাঁঝালো সমালোচনায় রাবেয়া একটু হকচকিয়ে যায়। মানুষটার চিরদিন এ রকম সহজ স্পষ্ট কথা। ভদ্রপাড়ার লোকেরা তাকে তাই বড়ই অপছন্দ করে। তবে গরীব খাটিয়েদের মধ্যে খাতির দিয়ে সেটা বোধ হয় পুষিয়েও বেশী হয়েছে। বস্তির লোকে তাকে বিশ্বাস করে, এ-পাড়ায় আগুন জ্বলে উঠেও যে বিশ্বিয়ে আছে, নানীর হত্যা নাজেমালিদের আশানুরূপ ফলপ্রদ হয়নি, সে জন্য কাদুও অনেকটা দায়ী।

পরীবানুর চাপা-কান্নার আওয়াজ থেমে যায়—বাইরে থেকে আর শোনা যায় না। ঘরে কান্না তার থেমেছে কি না সেটা অবশ্য অনুমান করা যায় না। কয়েকটি কণ্ঠ থেকে আচমকা উগ্র হিংসার ধ্বনি রাত্রির আকাশে কর্কশ আঁচড় কাটে—আরও কতগুলি কণ্ঠ থেকে ওঠে তার প্রতিধ্বনি। জবাবের মত দূরে শোনা যায় তেমনি কর্কশ আওয়াজের ওঠা-নামা। খানিক আগে পরীবানুর তীব্র বেদনার্ত চীৎকার যেন ঘরের পর্যায়ে চলে যায়।

রাবেয়া বলে, 'লোকটা হয়তো জানে না? ওরা হয়তো অন্য রকম বুঝিয়েছে? কাল এক দফা বাত-চিত কর না?'

কাদু বলে, 'কুলি-মজুরের সাথে বাত-চিত করতে কি গরজ হবে?'

তবু সে রাবেয়ার কথা রাখে, সকালে কাজে যাবার আগে নাজিমের ঘর হয়ে যায়। নাজিম তখন মড়ার মত ঘুমোচ্ছে। রাত্রির আঘাতের চিহ্ন গোপন করতে পরীবানু মুখ ঢেকে কাদুর সামনে আসে, কাদুর কাছে তার পর্দা ছিল না। তাকে কাদু জানিয়ে যায়, বিকালে সে আপিসে নাজিমের সঙ্গে দেখা করবে, জরুরী কথা আছে। কাদুর খাটুনি চারটে পর্য্যন্ত, তবু যদি কোন কারণে দেরী হয়, নাজিম যেন কাজের পরেও তার জন্য অপেক্ষা করে।

পাঁচটার সময় ডালহাউসী স্কোয়ারে আপিসে খবর নিয়ে কাদু জানতে পায়, দপ্তরী নাজিম এক ঘণ্টা আগে ছুটি নিয়ে চলে গেছে। কাদু নিজের মনে বলে, শালা বেইমান!

দপ্তরীর এই চাকরীটা পেয়ে মস্ত লোক হবার আগে বড়ই যখন খারাপ সময় চলছিল তখন কাদুর কাছে পাওয়া উপকারগুলির কথা নাজিমের মনে নেই। মনে থাকলে নেহাৎ জরুরী কাজে বেরিয়ে যেতে হলেও অন্ততঃ একটা খবর সে রেখে যেত কাদুর জন্য।

বস্তিতে ফিরে ঘরের সামনে ছোট খোয়ার নাজিমকে বসে থাকতে দেখে কাদু একটু আশ্চর্য্য হয়ে যায়। তবে বুঝতে পারে, এটা কালকের প্রতিক্রিয়া। পাকা—ওস্তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নেশা করা এখনো তার অভ্যস্ত হয়নি, নেশার ঝোঁকে এক দিন বৌকে মার-ধর করলে পরদিন মনটা এখনো বিগড়েও যায়—তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে ভাল ছেলে হয়ে একটু প্রায়শ্চিত্ত করার সাধ জাগে।

'এই যে কাদু ভাই! কি কথা আছে বলছিলে?'

সস্তা কাঠের একটা জলচৌকিতে সে কাদুকে বসতে দেয়, একটা বিড়িও দেয়। এটাও কালকের ওস্তাদির প্রতিক্রিয়া, নয় তো কাদুকে এতটুকু খাতির করতেও অনেক দিন আগেই নাজিম ভুলে গিয়েছিল।

[ক্রমশঃ

আপনি কি জানেন?

১। পৃথিবী কমলালেবুর উত্তরার্ধে না দক্ষিণার্ধে স্থলভাগ বেশী? বলুন তো, আমরা কোন্ দিকে?

২। যতীন সেনগুপ্ত, যতীন মুখোপাধ্যায় ও যতীন দাস, কে আমাদের বাঘা যতীন?

৩। যে ডাক-টিকিটের মাত্র দু'খানি সংগৃহীত আছে, একখানি ভারত সরকারের দপ্তরে আর একখানি বাকিংহাম প্রাসাদের সংগ্রহে। সেই প্রথম ভারতীয় ডাক টিকিটের প্রবর্তন হয় কবে?

৪। 'বাংলার স্কট' বলে এক সময় আমরা ছোট করতাম এক জন স্রষ্টা সাহিত্যিককে। তিনি কে বলুন?

৫। ভারতের শতকরা ৯০ জন লোক বাস করে গ্রামে। কিন্তু শতকরা ৯০ জন ডাক্তার কোথায় বাস করে জানেন?

৬। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে জিয়াউদ্দিন কে?

৭। 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গ ভরা' এ সত্য ভাষণ কার?

৮। আজ পর্যন্ত এক জন মাত্র মহিলা দু'বার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। সেই মহীয়সী মহিলার নাম কি বলুন তো?

৯। ভারতবর্ষের আদিবাসীর সংখ্যা কত?

[উত্তর ৬৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

শীতে উপেক্ষিতা

"রঞ্জন"

নয়

পরিব্রাজকের ঝোলাঝুলিতে অবশ্য-বহনীয় কতগুলি জিনিস আছে—যেমন দাড়ী কামাবার সরঞ্জাম, ফ্লাসক্, বাড়তি মোজা-রুমাল-অন্তর্বাস, ফার্স্ট এইডের বাক্স ইত্যাদি, ইত্যাদি। এগুলি সঙ্গে না থাকলে বিদেশে-বিভুঁয়ে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু ভ্রাম্যমানের মানসিক ঝুলিতে যে দু'টি জিনিস না থাকলে পরিব্রজনই ব্যর্থ হয় তা হচ্ছে কৌতূহল আর বিস্ময়বোধ।

আদর্শ পর্যটক এই দু'টি বৈশিষ্ট্য দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত। সে ঘর ছাড়ে বহির্বিশ্বকে আবিষ্কার করতে, আবিষ্কার করে ঘরে ফিরে সবাইকে সে কাহিনী শোনাতে। তার চোখজোড়া জিহ্বার চর মাত্র, নানা খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহের ভার তাদের উপর। কোথায় কোন জিনিস ভাল, কোন কোন দোকানে কি কিনলে সস্তায় পাওয়া যায়, কোন হোটেলের খাবার সব চেয়ে ভাল আর কোন হোটেলের শয্যা, এমনিতর সহস্র প্রয়োজনীয় তথ্যের সম্ভারে সংগ্রহ তার সমৃদ্ধ। তার পরিচিত পরিবেষ্টনীর বাইরে সে যা-কিছু দেখে তার নূতনত্ব তার মনকে আকৃষ্ট করে প্রবল ভাবে, তাই কোনো কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না। সে নিজেকে মনে করে পথিকৃৎ বলে। তার সংগৃহীত সংবাদে পরবর্তী পর্যটক অনুসরণকারী সবাই উপকৃত হবে, তার কাহিনীর বিবৃতি শুনে পিছে-পড়ে-থাকা সবাই চমৎকৃত হবে—এবং ঈর্ষিত হবে—এমনিতর অনেক ভাবনা তার বহিদৃষ্টিকে জাগ্রত রাখে প্রতিটি প্রহর।

আমি এই দ্বিবিধ বোধ থেকেই একেবারে মুক্ত। আমার যা কৌতূহল তার প্রত্যক্ষ নিবৃত্তির সন্ধানে আমার রুচি সামান্যই। ছাপার অক্ষরের দৌত্যে, অর্থাৎ অপরের রচনার মধ্যস্থতায়, জ্ঞান-সংগ্রহেই আমার পক্ষপাতিত্ব। তার অনেক সুবিধা। এতে নৈরাশ্যের সম্ভাবনা অনেক কম, কেন না, রচনার কৌশলে সাধারণ অসাধারণের বৈচিত্র্য-সমন্বিত হয়ে ওঠে, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরের সম্বন্ধেও কৌতূহল উদ্দীপিত হয় এবং একান্ত তুচ্ছ বস্তুও পরম উপাদেয়ত্ব লাভ করে।

পরের মুখে ঝাল খাওয়ার সুবিধাই এই যে এতে রস থেকে বঞ্চিত হতে হয় না, অথচ রসনাও লাঞ্ছিত হয় না।

তা'ছাড়া নিজের ভ্রমণের চাইতে পরের বিবরণের আরো একটা সুবিধা এই যে, কাহিনীতে অভিজ্ঞতার সেটুকুই শুধু গ্রহণ করতে হয় যা উপভোগ্য। ডি-এচ রেলওয়ের খেলনা-গাড়িতে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙে উঠতে যে দীর্ঘ, প্রায় নিঃসীম, ক্লান্তিকর ঘন্টাগুলি অতিবাহিত হয়, পাঠকের সে শাস্তি ভোগ করতে হয় না একেবারেই। মধ্য-রাত্রে শয্যা ত্যাগ করে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে টাইগার হিলে আরোহণ করে যে অবর্ণনীয় সূর্যোদয়ের শোভা দেখতে পাওয়া যায়, পাঠককে শুধু সেই আনন্দেরই অংশ গ্রহণ করতে হয়; পরের সাত দিনের সর্দিতে তাঁকে হাঁচতে হয় না, তিন দিনের পায়ের ব্যথাটাও পুরোপুরিই পরিব্রাজকের নিজের। আমি আড্ডাতে, অর্থাৎ সামান্যতম শারীরিক পরিশ্রমে আমার অপরিসীম বিরাগ। দিনে দুটি ঘন্টা টেবিল-চেয়ারে বসে ভ্রমণ

কাহিনী বা যে-কোনো বই পড়তে পারি, বা লিখতে; কিন্তু হাতের কাজে আমি বিশ্বের অক্ষমতম ব্যক্তি। মহাত্মা গান্ধীর বেলিন্‌ গৃহকেশলে আমার অচলা ভক্তি, কিন্তু আপনি আচরি কখনো সে ধর্ম পরকে শেখাতে আদিষ্ট হলে বড়ই বিপন্ন বোধ করব।

পরিব্রজনের আবিষ্কার আবার দু'রকমের। কারো কৌতূহল বস্তুতে, কারো বা ব্যক্তিতে। কেউ কলকাতা এলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখতে যান, কেউ বা সাক্ষাৎ করতে যান প্রদেশপাল বা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির সঙ্গে। এদিক থেকেও আমার কৌতূহল অত্যন্ত পরিমিত। আগ্রায় যে তাজমহল আছে তা আমি ঐতিহাসিকের জবানিতে এবং কবির কবিতায় জেনেই সন্তুষ্ট থাকি, প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি নে। আর ব্যক্তিদর্শনে যে আদৌ স্পৃহা ছিল না তা তো বলাই বাহুল্য—তার জন্যে কি আর কেউ শীতের সময় জনশূন্য দার্জিলিঙে আসে?

আমি যে-আবিষ্কারের জন্যে আলস্য পরিহার করে ঘরের বাইরে বেরুই তা একান্তই আভ্যন্তরীণ। চক্ষু দ্বারা সাধ্য নয় সে-আবিষ্কার, আদৌ সম্ভব কি না তা-ও নিশ্চিত ভাবে জানি নে। আমার একমাত্র কাম্য আবিষ্কার নিজের আবিষ্কার, নিজকে আবিষ্কার। আমার ভ্রমণ তাই দ্রষ্টব্যের সন্ধান নয়, দর্শনের সন্ধান। দার্জিলিং বা যেখানেই আমি যাই না কেন তা আমার লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ মাত্র। আত্মাবিষ্কারের পরিবেশ মাত্র। সে শুধু পট-ভূমিকা, চিত্র নয়; সে শুধু ভূমিকা, গ্রন্থ নয়।

দার্জিলিঙের নির্জনতায় এসেছিলেম অনেকগুলি জিজ্ঞাসার বোঝা বহন করে। এসেছিলেম অনেকগুলি সমস্যার সমাধানের আশায়, অনেকগুলি সমাধানের পুনর্বিবেচনার বাসনা নিয়ে। ভেবেছিলেম সম্মুখের অবিভক্ত অবসরের মধ্যে একটু চেষ্টা করব আমার দ্বিধাবিভক্ত, সন্দেহ-বিক্ষত মনের মধ্যে কিঞ্চিদধিক শান্তিপূর্ণ সামঞ্জস্যের বিধান করতে। ঈশ্বর, মানব, দৈব, কর্ম, ভাল, মন্দ, হিংসা, ন্যায়, অন্যায় ইত্যাদি নানা সূক্ষ্মতত্ত্বের বিবেচনা করে অন্তত সাময়িক কয়েকটা আত্মতুষ্টিজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হবো, এই রকম প্রতিজ্ঞা করেছিলেম নিজের কাছে।

এই ধরণের অ্যাবস্ট্রাক্ট চিন্তায় আমার অধিকার অল্পই, দার্শনিকের শিক্ষা নেই আমার। সাম্প্রতিকতার কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা আমার চিন্তাক্ষেত্রে নিরাকার চিরন্তনতার প্রবেশ-পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ। কিন্তু মিনিট তো ঘণ্টার অংশ, সাময়িকতা চিরন্তনীর খণ্ড।

অংশকে না জানলে যেমন সমগ্রকে জানবার উপায় নেই, তেমনি সমগ্রকে না জানলেও বোধ হয় সাময়িককে সম্যক্ জানা হয় না। বৃক্ষকে বাদ দিয়ে অরণ্য হয় না, কিন্তু দৃষ্টি যদি কেবল মাত্র বৃক্ষেই আবদ্ধ থাকে তা'হলে অরণ্য অজ্ঞাত থেকে যায়। আমার সংসার-যাত্রা বৃক্ষসংকুল, কিন্তু অরণ্যকেও উপেক্ষা করতে পারিনে। এই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর বিলাসে বন্ধুজনের হাস্যোদ্রেক হলে আপত্তি করব না। কিন্তু ধনিজনের শিকার বীরত্বের চাইতে আমার এই স্বভাব যে অপেক্ষাকৃত অহিংস তা অস্বীকার করা হবে না আশা করি।

আমার এই চিন্তানুশীলন থেকে বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, এমন দুরাশা পোষণ করি নে। এ আমার নিজেরই মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে ব্যায়াম মাত্র। যাঁরা বেতারে-রেকর্ডে শুধু মাত্র আধুনিক গান গেয়ে থাকেন তাঁরাও যেমন কণ্ঠের উন্নতিসাধন মানসে স্বরগ্রাম সাধনা করেন, আমার এই দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-বহির্ভূত চিন্তার অভ্যাসও সেই রকম।

উপরে যে প্রশ্ন বা সমস্যাগুলির উল্লেখ করেছি সে তালিকা সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু সেগুলিকে যোগ করলে যে দু'টো প্রশ্নে এসে দাঁড়ায় তা হচ্ছে এই যে কেন বাঁচব? কেমন করে বাঁচব? চিন্তাশক্তির বয়ঃপ্রাপ্তির পর থেকে বহু বার এই দুই প্রশ্নের বহু উত্তর স্থির করেছি নিজের মনে। কিন্তু হায়, সেই স্থিরতাগুলি স্থায়ী হতে পারল না আজও। আমার সকল গভ কল্যকার সেই অসংখ্য উত্তরগুলি যেন সংখ্যাহীন শূন্যের অন্তহীন মালা—তার বাঁয়ে একটা এক নেই বলে তারা সব শূন্যই রয়ে গেল, সংখ্যা হতে পারল না।

জীবনকে তখন মনে হয় একটা বোবা দেয়াল বলে, শত মাথা কুটলেও যার কাছ থেকে কোন উত্তর মেলে না, মেলে শুধু আপন প্রশ্নের বিকৃত প্রতিধ্বনি। বেঁচে থাকার দিনগুলিকে তখন মনে হয় একটা সংখ্যাতীত সিঁড়ির সমষ্টি বলে, দিনের পর দিন একটি একটি করে তাদের অতিক্রম করা শুধু অতিক্রম করারই জন্যে—কোথাও পৌঁছোবার জন্যে নয় যেন।

দার্জিলিঙের অনবচ্ছিন্ন অবসর আর অনাবিল রৌদ্র আর আলোর মধ্যে আমার সেই অনুচিন্তনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কোথায় হারিয়ে গেছে। এখন সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে যা বলি তার মর্মটা মোটামুটি এই যে সকল-রকম চিন্তা যেন শত হস্ত দূরে রাখতে পারি। প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে গেল, শূন্য শূন্যই।

এদিকে দেখাও হোলো না কিছু। অবজার্ভেটরি, মহাকাল, লয়েড, বটানিক্‌স্, মুজিয়ম, ভিক্টোরিয়া ঝর্ণা, মন্দির-মসজিদ-মনাস্ট্রেরি ইত্যাদি যত কিছু টুরিস্টের হৃদয় জয় করবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তার সব-কিছু রয়ে গেল দেখার বাইরে। ওগুলি দেখতে যাওয়ার মত উৎসাহই অবশিষ্ট নেই। মনের ক্লান্তি সংক্রামিত হয়েছে দেহে।

না পেলেম প্রশ্নের উত্তর, না হোলো দৃশ্য দেখা। না পেলেম চিত্তের প্রশান্তি, পর্যটকের উত্তেজনাও রইল অজানা।

অভিজ্ঞ ব্যক্তির বুঝতে কষ্ট হবে না কেন এর পরে প্লিজা-র অভিমুখে যাত্রা করলেম।

দার্জিলিঙের অনাবাসিক খাবার-জায়গাগুলির মধ্যে প্লিজারই খ্যাতি সর্বাপেক্ষা অধিক। শুনেছি, দোকানটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কোন সুইস্ ব্যবসায়ী। বর্তমানে ভারতীয় তত্ত্বাবধানে খাদ্যের অবনতি ঘটেছে বলে যে অভিযোগ শুনেছিলেম তা পরীক্ষা করে না দেখলেও সত্য বলে মনে করি নে। অন্তত অন্যান্য সার্ভিসে যে অবনতি ঘটেনি তার প্রমাণ পেয়েছি। কলকাতায় দুর্লভ এমন বহু জিনিস ওখানে মেলে।

বাকী দার্জিলিঙের মতো এই রেস্টুরেন্টটাও এখন প্রায় জনহীন। শূন্য টেবিলগুলি করুণ ভাবে শূন্য চেয়ারগুলির দিকে তাকিয়ে আছে। নীরব বাদ্যযন্ত্রগুলি—একটা পিয়ানো, গোটা-দুই ড্রাম আর একটা ডাবল্ বেস্ বা চেলো—অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে সামনের উঁচু জায়গাটায়। এক দিন তাদের বাজনায় অনেক আনন্দকামীর

পদধ্বনি চঞ্চল করেছে। আজ কেউ নেই সেখানকার অন্ধকারে। তাই বা তাতেও কেউ নেই। কাউণ্টারের এক কোণে দু'টো বেয়ারা শীতে কাঁপছে চোখ বুজে। অধীর ভাবে অপেক্ষা করছে কখন বন্ধ করবার সময় হবে। বাইরের অন্ধকার বাড়ে আপন খাদে স্থির, তাড়া নেই কোনো কিছুরই জন্তে, বেয়ারাদের অধৈর্য সত্ত্বেও। কাল নিরবধি।

আমার যা দরকার ছিল তা নিয়ে আমি জানালার ধারে একটা টেবিলে এসে বসলেম। জানালাটা বন্ধ, কিন্তু কাচের। দেখবার বাধা ছিল না।

লোকগুলি ক্ষুদ্রকায়, বাড়ীগুলি ছোটো, রেলগাড়ীগুলি শিশুদের খেলার উপযুক্ত, এই সব মিলিয়ে দার্জিলিঙ জায়গাটা এমনিতেই অদ্ভুত। ওখানে উঁচু, এত উঁচু যে আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। এখানে নীচু, এত নীচু যে তার অতল গহ্বরে পড়লে আর কখনো খোঁজ পাওয়া যাবে না। ওখানে একটা অতি আধুনিক ধরণের বাড়ী, আগামী কালের ডিজাইনে তৈরী। এখানে একটা কুঁড়ে ঘর, সেটা যেন মানুষেরই তৈরী নয়, তার যেন সৃষ্টি হয়েছিল ধরা-বক্ষে মানবের আবির্ভাবেরও আগে, বুঝি বা ইতিহাসের আরম্ভের পূর্বে। দার্জিলিঙ দর্শনে কল্পনাবিলাসী আগন্তুকের মনে প্রথম যে ধারণা জন্মে থাকে তা এই যে জায়গাটা যেন বিশ্বকর্মার সৃষ্টি নয়, বিশ্ববিধাতা যেন খেলার ছলে তৈরি করেছেন বাঙলা দেশের উত্তর কোণের এই খেলা-ঘরটা। লেবেঙের রোপ্‌ওয়ের লাইনটা ওই যে দূরে আকাশের গায়ে বেতারবার্তার—তারের মত দীর্ঘায়ত হয়ে শুয়ে আছে, ওটা যেন বৃহৎ একটা অসঙ্গতি। খেলার মধ্যে বাণিজ্যের অপ্রীতিকর স্মারক, যেন ছবির খাতায় প্রোডাক্‌শন কার্ড।

রাতের বেলায় শহরটার এই খেলা-ঘরের রূপটা যেন আরো বেশী পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। দূরে সারি সারি কয়েক ঘরে টিম্‌টিম করে আলো জ্বলছে, চতুর্দিকের কালো একটা বিরাট জন্তুর হাঁ-র মতো আবহ অন্ধকারের মধ্যে সেই ক্ষীণ আলোর ঔজ্জ্বল্য চাঞ্চল্যকর। ছোট বাড়িগুলিকে আরো ছোট বলে মনে হচ্ছে, তাদের ভিতরের আলোর মালা যেন কোন শিশুর কোমল হাতে সাজানো পরিকাঘাটের দীপালি। দূর থেকে দেখা এই আলো আর অন্ধকারে অদৃশ্য বৃহতী প্রকৃতি, সব কিছু জড়িয়ে আমার চার দিকের বিশ্বকে মনে হচ্ছিল কোন বিরাট শিশুর নিঃশব্দ অট্টহাস্যের মত।

•   •   •   •

বাইরে থেকে চোখ ফেরাতে হোলো শব্দ এক অট্টহাস্য শুনে। এই প্রথম বুঝতে পারলেম যে আমি একা নেই। হাসির শব্দ অনুসরণ করে দ্বিতীয় দোতলার খাবার ঘরের দূরতম স্বল্পালোকিত কোণে যাকে দেখলেম তাকে চেনবার উপায় ছিল না। সারা গায়ে গরম জামা, মাথায় এবং গলায় মোটা মাফ্‌লার, হাতে দস্তানা; শুধু রক্তবর্ণ চোখ দু'টো জ্বল-জ্বল করছে।

আমার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময়ের তিনি যে অর্থ করলেন তা বুঝতে বিলম্ব হোলো না। ভদ্রলোক উঠে এসে আমার টেবিলে বসলেন। অনুমতি প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল না। স্থানবিশেষে, কালবিশেষে সকল লৌকিকতা বিসর্জন দেওয়া হয় উভয় পক্ষের অনুক্ত সম্মতিতে। আলাপের সূত্র হয়েছিল ভিতে।

"What will you have?"

"The [illegible] poison, if I may" আমি মামুলি উত্তর দিলেম।

ভদ্রলোক বেয়ারাকে তদনুযায়ী আদেশ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি অত ভাবছিলেন বাইরের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থেকে?"

যা ভাবছিলেম তা কাউকে বলবার মতো নয়। বললেম, "বিশেষ কিছু নয়। এমনি বসেছিলেম। আপনি কতক্ষণ থেকে আছেন?"

"আপনারও অনেক আগে থেকে। আপনাকে লক্ষ্য করছিলেম অনেকক্ষণ থেকেই। একা-একা ভালো লাগছিল না বলে এখানে এলেম।"

"আমারও একা ভালো লাগছিল না।" কথাটা কেবল মাত্র ভদ্রতার জন্তই বলিনি।

"তাহ'লে এবার বলুন অবিশেষ কি ভাবছিলেন।"

"এই—অতীত—বর্তমান—ভবিষ্যৎ," আর এমনি একটা সর্বকালীন উত্তর দিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নের পথ রোধ করবার চেষ্টা করলেম।

ভদ্রলোক কথা বলবার জন্তে উন্মুখ হয়ে ছিলেন। আমার অনির্দিষ্ট উত্তরও তার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি আমার দিকে না তাকিয়ে, প্রায় আপন মনে বলে চললেন, "ভাবতে গেলেই মুস্কিল। ভাবিয়া কোরো না কাজ, করিয়া ভাবিও না—এই হচ্ছে ঠিক কথা।" আপন মনে হাসলেন ভদ্রলোক।

ভাবতে বারণ করে নিজেই বোধ হয় একটু ভেবে যোগ করলেন, "অবিশ্যি সব চেয়ে ভালো কাজ না করা। যেমন আমি করি নে।" আবার হাসলেন।

তাঁর বাক্যের জড়তার মত চিন্তার জড়তাকেও স্মিতহাস্তে ক্ষমা করলেম। আমার হাসি তাঁর দৃষ্টি এড়ালো না। কিন্তু তিনি ক্ষুণ্ণ হননি। বরং আমারই অজ্ঞতাকে যেন তিনি ক্ষমা করছেন, এমনি ভাবে হাসলেন, বোধ হয় আমার মতো সকল পণ্ডিত-মূর্খের উদ্দেশে আবৃত্তি করলেন:

"And if the Wine you drink, the Lip you press
End in the Nothing all Things end in—Yes—
Then fancy while Thou art, thou art but what
Thou shalt be—Nothing—Thou shalt not be less,

এবং বেশীও নয়, এক কাণাকড়িও নয়। শত পরিশ্রম করলেও নয়।"

শ্লোকটির গঠন একটু ঘোরালো। তবু পূর্ব-পরিচিতি এবং ভদ্রলোকের আবৃত্তির তত্ত বিরতির জন্তে অর্থোদ্ধারে কষ্ট হয়নি। কিন্তু কাব্যের অথবা উক্তির সঙ্গে তো যুক্তি দিয়ে যুদ্ধ করা চলে না। বললেম, "হুঁ, মুস্কিল এই যে জীবনটা কাব্য নয়। কঠোর সত্য।"

"কঠোর, কিন্তু সত্য নয়। কাব্যই সত্য।"

"ভিপেণ্ডস্, সত্যের কোন সংজ্ঞা আপনার মনঃপূত।"

"কোনটাই নয়। এর মধ্যেই নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে মেটাফিজিক্স্ আমার লাইন নয়। তাছাড়া বিশ্বাসে কৃষ্ণ মেলে বলে যদিও বিশ্বাস করি নে, তর্কে যে মেলে না তা জানি।" একটু থেমে বললেন, "আচ্ছা, জীবন যদি কাব্য নাও হয়, তাকে কাব্যের মতো ভাবলে, স্বপ্ন করলে দোষ কী?"

"দোষ কিছু নেই হয়তো, কিন্তু সম্ভব কি না সেইটেই প্রশ্ন।"

"আমার উত্তর হচ্ছে এই যে চেষ্টাই করা হয়নি। যারা চেষ্টা করেছে তাদের উৎসাহ দেওয়া তো দূরের কথা, কেবলই বাধা দেওয়া হয়েছে।"

আমি নিজে প্রায়শই বিশ্বের, সমাজের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ করে থাকি। তখন সেগুলি অত্যন্তই সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু অপরের মুখে অপরের অভিযোগ শুনে মৃদু বিরক্তি হোলো, ভাল লাগল না। আপন অক্ষমতা, আপন ব্যর্থতার জন্য আর সবাইকে দোষী করাকে মনে হোলো কাপুরুষতা বলে। ভদ্রলোককে সে কথা স্মরণ করিয়ে না দিয়ে বললেম, "তাই তো বলেছিলেম, এই বাধা অস্বীকার করা যায় না বলেই জীবন কঠোর সত্য।"

"হয়তো আপনি ঠিক বলেছেন, হয়তো নয়। তর্ক করব না। জীবন কঠোর সত্য বলেই হয়তো কোমল সত্য বনকে বরণ করে নিয়েছিলাম। ভুল করিনি, এ কথা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি। অনেক দিন আগেই আমি

Divorced old barren Reason from my Bed,
And took the Daughter of the Vine to Spouse"

আমি বললেম, "আধুনিক পরিভাষায় তাকে পলায়ন বলে কিন্তু। নতুন সমাজ যে এই সব পলাতকদের ক্ষমা করবে না সেই হুঁসিয়ারি আপনার এখানে এসে পৌঁছোয়নি বোধ হয়।"

"পৌঁছেছে, কিন্তু আর যারই অভিযোগ থাক আমাদের বিরুদ্ধে সমাজের কিছু বলা উচিত নয়। সমাজের ক্ষতি আমরা করিনি। সমাজের ক্ষতি করেছে আপনার নিষ্কলংক, চরিত্রবান, ধর্মপরায়ণ সমাজহিতৈষীরা। যারা সমাজের ভাল করবার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে বলে উচ্চৈস্বরে গগন বিদীর্ণ করে সহস্র সহস্র অপরের দেহ বিদীর্ণ করে প্রাণ নিয়েছে নির্মম ভাবে, ভাল করবার অজুহাতে। আপনার মুসোলিনী অ্যাবিসীনিয়াকে সভ্য করবে বলে যুদ্ধ বাধিয়েছে, আপনার হিটলার জর্মাণ সংস্কৃতি সারা বিশ্বে বিকিরণ করে মানব জাতির উন্নতি বিধান করবে বলে লড়াই করেছে, আপনার ষ্ট্যালিন শোষণের নিষ্পেষণের উচ্ছেদের নামে অগণ্য নিরপরাধের রক্তধারায় অবগাহন করেছে। আমরা পলাতকেরা নিজেদের নিয়ে যাই করে থাকি অপরের বা সমাজের কোনো ক্ষতি করিনি। তার সকল দায়িত্ব আপনার হিতৈষীদের দরজায় রাখতে হবে। তাদের দরজায় যারা জগতের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে—অর্থাৎ মঙ্গল সম্বন্ধে তার নিজের যা ধারণা তা আর সকলের উপর চাপাবার উদ্দেশ্যে—বিরোধ বাধিয়েছে। আমরা অন্তত এই ধারায় নষ্ট শিশুটি।" ভদ্রলোক বক্তৃতার শেষ লাইনে এসে একটু হাসলেন, কিন্তু উত্তেজনার আভাস ছিল সেই হাসিতেও।

প্রতিবাদ করলেম না। বক্তৃতা শেষে পূর্বের সৌজন্যের প্রতিদানের জন্যে বেয়ারাকে নিঃশব্দে আদেশ দিলেম হস্তসঞ্চালন করে।

সামাজিক মানুষের সকল আলোচনায় যে অবশ্যম্ভাবী সাম্প্রতিকতা আছে, তা পরিহার করবার জন্যেই আমিও সাময়িক ভাবে পলায়ন করে দার্জিলিঙে এসেছিলেম। এই তর্কে যোগ দিতে তাই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু, সত্যি, উত্তর কী এই প্রশ্নের? মনুষ্য-সমাজে এত যে মন্দের জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়ে আছে তার থেকে মুক্তি হবে কি উপায়ে? বক্তৃতা আর প্রচার করে যদি অর্থলোভী ব্যবসায়ী আর শক্তিলুব্ধ রাজনীতিকের বিবেকের পরিবর্তন সাধন করতে হয়, তবে কত যুগ লাগবে সেই চিকিৎসায়? আর দ্রুত আরোগ্যের লোভে যদি ছুরি ওঠে সার্জেনের হাতে, তা'হলে সে ছুরি শেষে কার বুকে বসবে কে জানে?

বেয়ারা আদেশ পালন করলে ভদ্রলোকের দিকে সময়োচিত ইঙ্গিত করে বললেম, "সমাজের কথা ভাবছিলেম না ঠিক। যে লোক নিজেরই জীবনে সামঞ্জস্য আনতে পারলে না তার অপরকে ভালো করবার মতো ঔদ্ধত্য নেই। আমি ভাবছিলেম নিজের কথা।"

আমার অনাহূত সঙ্গীও তাই ভাবছিলেন, তাঁর নিজের কথা। সহসা আত্মসচেতন হয়ে বললেন, "আমারও সে ঔদ্ধত্য নেই। আমি চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক। এমন কি, পরজন্মে ব্রজের রাখাল বালক হবারও বাসনা নেই। গতজন্ম ছিল না এবং ঈশপের গল্পের বোকা কুকুরের মতো পরজন্মের ছায়ার লোভে ইহজন্মের মাংসের টুকরোটা হারাতে মোটেই রাজি নই।" আবার আবৃত্তি করলেন,

"A Muezzin from the Tower of Darkness cries
Fools ; your Reward is neither Here nor There"

ভদ্রলোক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এবং শুধু ক্লান্ত নয়। কিন্তু তাঁর কথা ফুরোয়নি, হয়তো আরম্ভই হয়নি এখনো। আবার মাথা তুলে বললেন, "আমার কি মনে হয় জানেন? মানুষের কর্ম-ক্ষমতা ছাড়িয়ে গেছে তার শুভবুদ্ধিকে। তার উদ্ভাবনী শক্তি উন্মত্ত বেগে এগিয়ে যাচ্ছে তার মঙ্গলবুদ্ধিকে পিছনে ফেলে রেখে। মানুষ তাই দুরন্ত শিশুর মত নিজের ধ্বংস-ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে যা-কিছু সামনে পাচ্ছে তাকেই ভাঙছে।" উদাম, অদ্ভুত হাস্যে যোগ করলেন, "ভাঙছে যে নিজেরই বর্তমানকে এবং নিজেরই ভবিষ্যৎকে তা যখন বুঝতে পারবে তখন হয়তো বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নামক দু'টো খেলনারই অবস্থা মেরামতের বাইরে চলে গেছে।" আবার বিপুল, বিকট হাসি। "অবস্থাটা উপভোগ্য বটে।"

উপভোগ্য? না কি অশ্রু-বিসর্জনের যোগ্য? ভদ্রলোকের হাসির অর্থ বুঝতে পারলেম না। শুধু বললেম, "আপনার বিভীষিকা-ময়ী ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে হাসির উচ্ছ্বাসের যোগ খুঁজে পাচ্ছি নে তো?"

"যোগ আছে", ভদ্রলোক এক মুহূর্তও না ভেবে উত্তর দিলেন, "যোগ আছে। কেন না, যে পৃথিবীর ধ্বংসসাধন হচ্ছে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। ঈশ্বরকে, অর্থাৎ আমাকে, ধন্যবাদ; আমি সময় থাকতে সরে এসেছি।"

"ভাজার মাছ যেমন তপ্ত কড়া থেকে জ্বলন্ত উনানে সরে আসে।"

"মোটেই নয়। নোয়া যেমন করে বন্যা থেকে তার নৌকায় সরে এসেছিল। আমি তেমনি সরে এসেছি। এখন আমি দর্শক—প্রাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড থেকে দেখব আর হাসব।"

"এতে আর যাই থাক বীরত্ব নেই। বিচক্ষণতাও আছে কি না সন্দেহ করি।"

"বীরত্বে লোভ নেই। বিচক্ষণতা ঘৃণা করি। আপনারা বোকা ক্যাসাবিয়াংকার মতো বার্ণিং ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ুন। আপনাদের জন্যে করুণাও হয় না।" কণ্ঠে তীব্র তিক্ততা।

"যারা দাঁড়িয়ে পুড়ছে তাদের আপনার করুণায় প্রয়োজন নেই। তারা জানে কেন মরছে। তাদের কাছে আর যাই থাক বা না থাক, তাদের উদ্দেশ্যের মহত্ব অস্বীকার করবেন কী করে ?"

"দোহাই আপনার, মূর্খতাকে মহত্বের আখ্যা দেবেন না। দু'টো একেবারেই আলাদা জিনিষ। বরং বলি একটা বড়, আরেকটা মিথ্যা—একেবারে মীথ্। দু'টোরই পরিণাম অবিশ্যি এক।

Why, all the Saints and Sages who discuss'd
Of the two Worlds so learnedly, are thrust
Like foolish prophets forth, their Words to Scorn
Are ⁻cattered,, and their Mouths are Stopt with Dust.

তাই। ধুলো। সেখানেই শুরু এবং সেখানেই শেষ। এই দু'য়ের মাঝের সময়টায় আপনারা পরিশ্রমীরা ঘাম ফেলে তাই দিয়ে ধুলোকে কাদা তৈরি করুন। সেই কাদা দিয়ে মূর্তি গড়ে আত্মসান্ত্বনা লাভ করুন। We know better, আমরা জীবন নামক উইণ্ডমিলের সঙ্গে ডন্ কুহোটির মতো লড়াইয়ের আস্ফালন করি নে। পরিহাসকে আমরা পরিহাস বলে জানি। তাই আমি হাসছি আর আপনি লম্বা মুখ নিয়ে বসে আছেন।"

উচ্চ হাস্যে চীৎকার করলেন, "বেয়ারা—"

"মুখ যতই লম্বা করুন, জীবনটা দীর্ঘ নয়। সময় নেই সময় নষ্ট করবার। আসুন।"

"কিন্তু সময় অল্প বলেই তো তার অপব্যয় আরো বেশী অন্যায়।"

"ডিপেণ্ডস্, আপনি কাকে অপব্যয় বলেন।"

"কিছু না করা নিশ্চয়ই অপব্যয়।"

"টাকার বেলায় তাকেই তো সঞ্চয় বলে।" ভদ্রলোকের সূক্ষ্ম রসবোধ তখনো অক্ষুণ্ণ আছে, হেসে বললেন, "কিন্তু রসিকতা থাক। কোনো কিছু করা—তা সে যতই ভুল হোক, যতই অন্যায় হোক, যতই ক্ষতিকর হোক—তাকে যদি সময়ের সদ্ব্যবহার বলেন তা'হলে অবিশ্যি বলবার কিছু নেই।"

"না, তা বলছি নে। কিন্তু ভাল কাজ বলেও তো সংসারে কিছু আছে।"

"আছে না কি ? জানি নে তো। কার ভালো ?" মৃদু বিদ্রূপের আভাস।

"নিজের এবং অপরের। সকলের ভাল।"

"নিজের ভাল মানে তো laissez faire অর্থাৎ পাঁচ বছরের শিশুকে সুতোর কলে খাটানো আর তিন দিনের শিশুকে কোলে নিয়ে তার মাকে কয়লা খনির তলায় পাঠানো। এই তো নিজের ভাল।"

"কিন্তু—"

"দাঁড়ান। আর পরের ভাল মানে তো হিটলার আর ষ্টালিন। অর্থাৎ যুদ্ধ আর বিপ্লব। অর্থাৎ রক্ত আর রক্ত।"

"কিন্তু এ দু'য়ের মাঝখানে কি কিছু নেই ?"

"কিচ্ছু না। নট এ থিং। অন্তত..."

এবারে আমি বাধা দিলেম, "কিন্তু আপনার ডায়াগনোসিস্ যদি বা ঠিক, চিকিৎসা কি ? সে সম্বন্ধে তো কিছু বলছেন না।"

"চিকিৎসা নেই। থাকলেও আমাদের তা জানা নেই।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু নেই আর। শান্তিপূর্ণ উপায়ে একক চেষ্টা যদি ভাল করতে যান, কোন লাভ হবে না। কেউ শুনবে না। এই মুহূর্তে দিল্লীতে এক পাগল এই মোহের ভুলে কেঁদে মরছে আপন দুঃখে। কেউ কানে তুলছে না তার কথা।"

এর উত্তর ছিল না। উনাশি বছরের বৃদ্ধ মহাত্মা সেদিন দু'টো বৃহৎ সম্প্রদায়ের হিংস্র উন্মত্ততা শান্ত করবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে অনশন করেছিলেন। বহু সহস্র সম্পূর্ণ নির্দোষ লোকের মনে তাইতে শোকের ছায়া পড়েছিল। কিন্তু দুর্বৃত্তদের চিত্তের পরিবর্তন হোলো কই ? অন্যায় চলেছে অপ্রতিহত। এদিকে স্তব্ধ হতে চলেছে মহত্তম জীবনের জীর্ণ আধারের ক্ষীণ স্পন্দন।

শ্রান্ত কণ্ঠকে একটু বিশ্রাম দিয়ে ভদ্রলোক পুনরায় বললেন, "আর জোর করে দল বেঁধে ভালো করতে যান, দেখবেন, দলের নেতৃত্ব গিয়ে পড়েছে তাদেরই হাতে যাদের ইচ্ছা আপনার সাধু উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। দলের পাণ্ডা হয়ে দাঁড়াবে গুণ্ডারা। বহু হিংসা বহু হত্যার পরে আপনার দল যদি বা যখন জয়লাভ করে, তখন দেখবেন সেই জয়ের প্রথম ক্যাসুয়েল্টি আপনার আইডিয়াল। তাতে এক অন্যায়কে সরিয়ে অপর অন্যায়কে সে-জায়গায় বসানো হবে। আর কিছু লাভ হবে না।"

"কিন্তু—"

"আবার কিন্তু। কিন্তু নেই। এ দু'য়ের মাঝে আর কিছু নেই।"

এ তো অসীম নৈরাশ্য। এ তো শুধু সমস্যার ব্যাখ্যান। সমাধান কোথায় ? এ তো শুধু প্রশ্ন। উত্তর কোথায় ? হতাশ অনুত্তরতার অতৃপ্তি নিয়ে আমি চুপ করে রইলেম।

আমার সঙ্গী আমার অস্বস্তি লক্ষ্য করে আপন মনে হাসছিলেন। বললেন, "আমি যা বললেম তা আপনার মনঃপূত হোলো না নিশ্চয়ই। আপনার বোধ হয় ধারণা একটা কিছু করা চাই'ই চাই। তা সে যতই ভুল হোক।" একেবারে কাছে এসে বললেন, "আমি জানি, শুনুন আমার কথা। কিছু করবার নেই। একেবারে কিছু নয়। মাইরলি ইনয্যাকিইভিটী—ব্যস্।" আমার কানের আরো কাছে এসে তীব্র, কর্কশ কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, "কিছু করবার নেই। কিছু করবার নেই। কাল এগিয়ে আসছে ভীষণ বেগে। তার আগে যে কটা মুহূর্ত আছে, মেক্ দি মোষ্ট অব দেম্। এই একমাত্র সত্য কথা

...that life flies ;
One thing is certain, and the Rest is Lies."

আর কিছু বলার শক্তি ছিল না ভদ্রলোকের। জড় প্রস্তর-খণ্ডের মত তাঁর মাথাটা টেবিলের উপর পড়ল একটা বিকট শব্দ করে।

আমি তাঁকে জাগালেম না। ও যে বিরাম মাগে নির্মম ভাগ্যের পায়ে। ও যে মৃত্যু চাওয়া দিতে চাহে অতল জলাঞ্জলি। দুরাশার দুঃসহ ভার দিক নাবায়ে; যাক্ ভুলে, যাক্ ভুলে অকিঞ্চন জীবনের বঞ্চনা।

● ● ●

এ নয়, এ নয়। নেতি, নেতি। অনিশ্চিত পদক্ষেপে সিঁড়ার কাঠের সিঁড়ি দিয়ে যখন নীচে নেমে এলেম তখন লণ্ঠনের ধূমের স্তিমিত আলোর ক্ষীণ শিখা হৃদয়ে আমার সাড়ায় তুলল না। কিন্তু নিজের মনে জপতে থাকলেম, এ নয়, এ নয়! নেতি নেতি!

যখন বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছোলেম তখন ভদ্রলোকের চেহারাটা পর্যন্ত মনে আনতে পারলেম না। তার সঙ্গে এতক্ষণ বসে এত কথা বলেছিলেম। এত কথা শুনছিলেম?

সত্যি কি কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল? না কি আমারই একটা বিচ্ছিন্ন, অর্ধপরিচিত, অবজ্ঞাত একটা অংশকে বসিয়েছিলেম আমার টেবিলের উল্টো দিকে? আমার জীবনের উল্টো দিকে?

কিছুতেই মনে করতে পারলেম না।

দার্জিলিং জায়গাটাই কিছুটা অলৌকিক। এখানে কোথায় যে ধরণীর শেষ আর কোথায় আকাশের সুরু, বাস্তবের আরম্ভ আর কল্পনার শেষ, তা বোঝা যায় না। এখানে সত্য আর মিথ্যার মাঝখানে সীমা-রেখা যদি বা থেকে থাকে তা দৃষ্টির অতীত।

না কি, ওই লোকটা যা বলেছিল, এ দু'য়ের মাঝখানে কিছু নেই অন্তহীন, অর্থহীন শূন্যতা ছাড়া? [ক্রমশ।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

শ্রীধর কথক

প্রতি সংখ্যায় এক এক জন কংগ্রেস-নেতার জীবন-কাহিনী শোনাবার ভার নিয়েছেন শ্রীধর কথক। এই সংখ্যায় ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী আজাদের বৈচিত্র্যময় কাহিনী শুনুন।

"দাসত্ব দাসত্বই এবং ইহা ভগবানের অভিপ্রায় ও নির্দেশের বিরোধী। আমার দেশকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করা আমি আমার অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি"—১৯২৩ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই বজ্রগর্ভ বাণী উচ্চারণ করিয়া দেশবাসীকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে আহ্বান করেন। বর্তমান ভারতের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে মৌলানা আজাদ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অতুলনীয় রাজনৈতিক দূরদর্শিতা মৌলানা আজাদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শক্তিশালী লেখক ও বক্তা হিসাবে মৌলানা আজাদ প্রখ্যাত। মৌলানা আজাদ ১৮৮৮ সালে মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। আরব দেশেই তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হয়। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ পণ্ডিত, ধর্মগুরু ও বিপ্লবী হিসাবে মুসলমান সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য তাঁহার অন্যতম পূর্বপুরুষ হজরৎ শেখ জামালুদ্দীন আকবর বাদশাহের বিরাগভাজন হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পিতা মৌলানা খায়রুদ্দীন ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহে যোগদান করেন। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ভারত হইতে পলায়ন করিয়া মক্কা নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেখানেই বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। মৌলানা খায়রুদ্দিন সুফী মতবাদের সমর্থক ছিলেন। সুফী ও পণ্ডিত হিসাবে তিনি সমগ্র মুসলমান-জগতে খ্যাতিলাভ করেন। ধর্মগুরু হিসাবে ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরেও তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। মৌলানা আজাদের মাতাও বিদুষী মহিলা ছিলেন। মৌলানা আজাদ শৈশব কালেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। মাতার নিকট হইতে আরবী শিক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে উর্দু ও ফারসী শিক্ষা করেন। ১৮৯৮ সালে তিনি তাঁহার পিতার সহিত কলিকাতায় আগমন করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতায় কিছু দিন পড়াশুনা করিয়া তিনি মিশরের বিখ্যাত 'আল আজহার' বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৫ বৎসর বয়সেই মৌলানা আজাদের বিদ্যাবত্তার খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বালক আজাদের জ্ঞানের গভীরতা ও কুশাগ্র বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া মুসলমান সমাজের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইতেন। তাঁহার বয়স যখন মাত্র ১৬ বৎসর, তখন তিনি লাহোরের বিখ্যাত পণ্ডিত-সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। প্রধান অতিথির বক্তৃতা শুনিবার জন্য কবি হালি, কবি নজির আহমদ ও কবি ইকবাল প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত হন। প্রধান অতিথি হিসাবে এই অজাতশ্মশ্রু বালককে দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হন। মৌলানা আজাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণের পর তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, বয়সে বালক হইলেও তিনি পাণ্ডিত্যে ও জ্ঞানের গভীরতায় বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতকে অতিক্রম করিয়াছেন। মৌলানা আজাদকে লক্ষ্য করিয়া কবি হালি রহস্য করিয়া বলেন—'An old head on young shoulders'. পিতার মৃত্যুর পর মৌলানা আজাদ সহজেই পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মুসলমান সমাজের ধর্মগুরু হিসাবে সম্মানের সহিত নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না, তিনি ভারতের মুসলমান সমাজকে মুক্তির পথ

নির্দেশের ভার গ্রহণ করিলেন—এই মুক্তি আধ্যাত্মিক মুক্তি নহে, বিদেশী শাসকের দাসত্ব হইতে মুক্তি। সেই সময়ে ভারতের মুসলমান সমাজ প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় ইংরাজের শাসনকে পরম কাম্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের ভুল ভাঙ্গাইবার জন্য মৌলানা আজাদ ১৯১২ সালে 'আল হেলাল' নামক বিখ্যাত উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। 'আল হেলাল' খুব অল্প দিনের মধ্যে মুসলমান সমাজের চিন্তাধারায় যুগান্তরকারী পরিবর্তন সাধন করে। 'আল হেলাল' (অর্ধচন্দ্র) প্রকাশিত হইত কলিকাতায়, কিন্তু এই পত্রিকার প্রভাব ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। 'আল হেলালে'র সম্পাদক ভারতের মুসলমান সমাজের মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি ও গোঁড়ামীর তীব্র সমালোচনা করিয়া ভারতের মুসলমান সমাজকে নূতন আদর্শ ও নূতন পথের সন্ধান দিল। 'আল হেলাল'এ ইসলাম ধর্মের যে উদার ব্যাখ্যা করা হইল, তাহা মুসলমান সমাজের বহু যুগের ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামীর দুর্গ ধূলিসাৎ করিয়া দিল। সে যুগে বহু বিশিষ্ট মুসলমান নেতা 'আল হেলালে'র দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। ১৯১৪ সালে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। 'আল হেলালে'র তরুণ নির্ভীক সম্পাদক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মনোবৃত্তির সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। ইহার ফলে 'আল হেলালে'র উপর রাজরোষ পতিত হইল। প্রকাশিত হইবার ১৮ মাস পরে 'আল হেলালে'র প্রকাশ বন্ধ হইল। তরুণ সম্পাদক মৌলানা আজাদ ভারত সরকারের নির্দেশে রাঁচিতে অন্তরীণে আবদ্ধ হইলেন।

১৯২০ সালে মুক্তিলাভ করিয়া মৌলানা আজাদ অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করেন। এই সময়ে তিনি মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন ও গান্ধীজীকে নেতা হিসাবে বরণ করিয়া বিশ্বস্ত সৈনিকের ন্যায় গান্ধীজীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতে থাকেন। কংগ্রেসে যোগদানের পর হইতে মৌলানা আজাদ আজ পর্যন্ত অতুলনীয় নিষ্ঠার সহিত কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিয়া আসিতেছেন। মৌলানা আজাদ সত্যের উপাসক। জীবনে যাহা তিনি সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করার জন্য কোন দিন তিনি কোন প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠা, অনন্যসাধারণ বিচার-বুদ্ধি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ সর্বদাই শ্রদ্ধার সহিত মৌলানা আজাদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সর্বদাই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মহাত্মা গান্ধী মৌলানা আজাদের মতামতকে বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করিতেন। মৌলানা আজাদ যখন ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ৩৫ বৎসর। এত অল্প বয়সে আর কেহ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিবার সম্মান লাভ করেন নাই। মৌলানা আজাদ বিশেষ যোগ্যতার সহিত তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করেন। কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা হিসাবে মৌলানা আজাদকে বহু বার কারাগারে যাইতে হইয়াছে। লাঞ্ছনা ও অত্যাচার, ভীতিপ্রদর্শন ও প্রলোভন, কোন কিছুই তাঁহাকে সত্যপথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ১৯৪০ সালে রামগড় কংগ্রেসে মৌলানা আজাদ দ্বিতীয় বার কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে জাতিকে পরিচালিত করিবার সম্মান লাভ করেন। সভাপতি হিসাবে রামগড়ে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও জনসাধারণের কর্তব্য নির্দেশ, এই উভয় দিক্ দিয়াই তাহা অনবদ্য হইয়াছিল। মৌলানা আজাদ তাঁহার অভিভাষণে বলেন, "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ শান্তি ও সুবিচারের পরিপন্থী। ভারতের দাবীই বৃটেনের ঘোষণার আন্তরিকতা যাচাই করিবার কষ্টিপাথর।" ১৯৪০ সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মৌলানা আজাদ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। এই কয়েক বৎসর কংগ্রেসের ইতিহাস সর্বাপেক্ষা ঘটনাবহুল।

১৯৪২ সালের আগষ্টে পরাধীনতার বিরুদ্ধে ভারতের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরণরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। নগর হইতে নগরে, গ্রাম হইতে গ্রামে সর্বাত্মক বিপ্লবের অগ্নি ছড়াইয়া পড়িল। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত মৌলানা আজাদও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। আমেদনগর বন্দিশালায় অবস্থান কালে তাঁহার পত্নী ও ভগিনী পরলোক গমন করেন। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন বিদেশী শাসক-শক্তি তাঁহাকে পত্নীর মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকিবার অনুমতিও প্রদান করে নাই। তিনি নিঃশব্দে এই তীব্র আঘাত সহ্য করেন। ধর্মতত্ত্ব নিরূপণের পথ পরিত্যাগ করিয়া যেদিন তিনি পরাধীন জাতির মুক্তি-সাধনায় যোগদান করেন, সেদিনই তিনি সর্বপ্রকার ত্যাগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরাধীন জাতির রাজনৈতিক নেতার জীবনে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কোন স্থান নাই, মৌলানা আজাদ তাহা ভালো ভাবেই জানিতেন এবং সেই জন্য তাঁহার সুদীর্ঘ রাজনীতিক জীবনে তিনি কোন দিন কোন বিপদে বিচলিত হন নাই। হাসিমুখে তিনি কঠোর বাস্তবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ক্রিপস প্রস্তাবের আলোচনার সময় ও পরবর্তী কালে সিমলায় ওয়াভেলের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে মৌলানা আজাদ অসাধারণ দৃঢ়তা, বাস্তববুদ্ধি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন।

অনেকের ধারণা এই যে মৌলানা আজাদ ইংরাজী জানেন না। ইহা সত্য নহে। মৌলানা আজাদ ইংরাজী ভাষা ভালো ভাবেই আয়ত্ত করিয়াছেন যদিও তিনি কথাবার্তায় কদাচিৎ ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি উচ্চশ্রেণীর বক্তা। বিতর্ক সভায় তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা বহু বার উপস্থিত ব্যক্তিদের মুগ্ধ করিয়াছে, মুসলমান দেশগুলি সম্পর্কে মৌলানা আজাদের গভীর জ্ঞান আছে। তিনিই সর্বপ্রথম 'আল হেলালে'র সাহায্যে ভারতীয় মুসলমান সমাজকে মুসলমান-জগতের নূতন চিন্তাধারার সহিত পরিচিত করান। কোর-আন শরীফের ভাষ্যকার হিসাবে মৌলানা আজাদের নাম মুসলিম-জগতে সুখ্যাত। তাঁহার এই বিখ্যাত গ্রন্থের নাম "তারজুমানুল কোর-আন"। রাঁচীতে অন্তরীণাবদ্ধ থাকিবার সময় তিনি এই পুস্তকের অধিকাংশ রচনা করেন। ইসলামিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এই পুস্তক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। মৌলানা আজাদ সমগ্র জীবন ধরিয়া সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা ও দীনতার ঊর্ধে থাকিয়া দেশবাসীর সম্মুখে স্বাধীনতার ও মানবতার বাণী প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। বর্তমানে তিনি ভারত সরকারের শিক্ষা-সচিব। তাঁহার পরিচালনায় অদূর ভবিষ্যতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও ধনি-দরিদ্র নির্বিশেষে ভারতের প্রত্যেকে যথাযোগ্য শিক্ষালাভ করিয়া নব ভারত রচনায় আত্মনিয়োগ করিবে, আমরা ইহাই আশা করি।

ষ্টেশনে নেমে কেমন যেন সব নতুন নতুন ঠেকতে থাকে বিপিনের। ভয়ে ভয়ে তাকায় সে চারি দিকে, যেন কোন এক নতুন জায়গায় এসেছে। অপরিচিত দেশে এলে মনটা যেমন শির্‌শির্ করে অহেতুক ভয়ে, কমে আসে আত্মপ্রত্যয়, নিজের চেনা-জানা মুলুকে সম্পর্কে বিচরণের সহজ-স্বাভাবিকতা, তেমনি এক শঙ্কাজড়িত অনুভূতিতে অসহায় ভাবে মোচড় দিয়ে উঠল বিপিনের মন।

লাল সুরকি-বিছানো প্লাটফর্মে তার সুটকেশ আর বিছানা নাবিয়ে রেখেছিল, সেগুলি ধরে টানাটানি করছিল একটা কুলি। বিপিন তাকে ধমকে দিল: এই, ছোড় দোও···

কুলি নেহি লাগে গা?

নেহি।

টিনের শেডের নিচে সোরাবজীর রেস্তোরাঁর পাশে হুইলার ষ্টলটার দিকে অভ্যাস বশে চোখ দু'টো খুঁজে ফিরতে লাগল মঙ্গল বাবুকে। দেখা গেল না তাকে কিংবা তার সহচর সোরাবজীর দোকানের ঠোঁট-কাঁপার বেটাকে। ট্রেণ এলেই এদের দু'জনকে ষ্টলের সামনে দেখা যেত আগন্তুক যাত্রীদের উপর চোখ বুলিয়ে চলেছেন সাগ্রহে।

বিপিন বাবু যে! এই ট্রেণে এলেন বুঝি: চোখাচোখি হতেই মঙ্গল বাবু জিজ্ঞাসা করতেন!

বিপিন এগিয়ে যেত তার ষ্টলের দিকে।

হ্যালো ফ্রেণ্ড, হাউ ডু ইউ ডু? সোৎসাহে সুরু করত। সুটকেশ আর বিছানা জমা হত মঙ্গল বাবুর দোকানের কাউন্টারের পাশে।

মঙ্গল বাবুর সঙ্গে তার খাতির জমে কলেজ-জীবন থেকে। সহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে কলেজ। দশটার আগে ছেলেরা জড়ো হত প্লাটফর্মে। শাটেল ট্রেণ ছাড়বার আগে যারা সদলবলে ট্রেণের কামরায় খিস্তি আর প্রফেসারের মুদ্রাদোষ-চর্চায় আসর না জমায়, সেই সব বিচ্ছিন্ন সঙ্গিহীন ছেলেরা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় প্লাটফর্মে। করে মঙ্গল বাবুর ষ্টলের সামনে ভীড়। বই আর সাময়িক-পত্র যত না কেনে তার দশ গুণ করে ঘাঁটাঘাঁটি। দু'আনায় একখানা কাগজ কিনে ফাউস্বরূপ পড়ে নেয় দু'-তিনখানা সিনেমাসাপ্তাহিকের সভমুক্তিপ্রাপ্ত ছায়া-ছবির সমালোচনা, 'ভারতবর্ষে' বনফুলের সদ্য একটি ছোট গল্প, 'শনিবারের চিঠিতে' তারাশঙ্করের ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাসের একটা কিস্তি। মঙ্গল বাবু মনে মনে গজ-গজ করেন, কিন্তু কিছু বলেন না। তবে যদি বুঝতে পারেন কারও ফাউয়ের মাত্রাটা বেশী হয়ে যাচ্ছে, ঈষৎ উষ্ণ হয়ে সিগনাল দেন বই ছাড়বার: 'কিনবেন না কি বইখানা? না কেনেন ত ছেড়ে দিন।' অপ্রস্তুত হয়ে ছেলেটি বইখানা রেখে দেয়, কিংবা পকেটে পয়সা থাকলে বার করে দেয় গম্ভীর চালে। এবার অপ্রস্তুত হবার পালা মঙ্গল বাবুরই। পয়সাটা কপালে ছুঁইয়ে নিত হাতে তিনি ক্যাশ সিন্দুকেটের টিনে রেখে দেন। তখন দরিদ্রতার

মঙ্গল বাবুর সৌজন্যের হাসিটাকে আমল দেয়নি তার জবাবটা এই: বইখানা কেনা ত সে ঠিকই করেছিল। পড়তে পড়তে শুধু দাম দেবার কথা ভুলে গিয়েছিল।

এমনি একবার অপ্রস্তুত হয়েছিল বিপিন। প্রায় পনেরো মিনিট গ্রাস করে বসেছিল সে নতুন বার হওয়া ত্রৈমাসিক 'কবিতার' সংখ্যাটা। কতই বা পাতা পত্রিকাখানার। তার উপর বর্জাইস টাইপে ছাপা। প্রায় পনেরো মিনিটের মধ্যেই আগা-পাশতলা শেষ করে এনেছিল বইখানা বিপিন। কলেজ-লাইব্রেরীতে বা কমন-রুমে এই বইখানা আসে না।

হঠাৎ মঙ্গল বাবু বইখানা ধরে টান দিলেন: নেবেন না কি? না নেন ত রেখে দিন। আরও অনেক ছেলে দাঁড়িয়েছিল ষ্টলে। লজ্জিত, অপ্রস্তুত হল বিপিন। তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়াতে লাগল। ছ'আনা পয়সা বেরিয়ে এল।

কম পড়তিছে। আচ্ছা রাইখে দেন, কাল নেবানে।

মঙ্গল বাবু বাঁকা হাসলেন। গা জ্বলতে থাকে বিপিনের। পকেট হাতড়ানোটা তার শুধুই অভিনয়। কারণ, কোন পত্রিকা কেনবার সামর্থ্য তার নেই। মঙ্গল বাবু যেন তা বুঝতে পারেন। মনে-মনে রুষ্ট হয়ে যায় বিপিন ভদ্রলোকের বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ হাসি দেখে। অবশ্য পরে সে বুঝতে পারত রাগটা তার অহেতুক। ভদ্রলোক দোকান সাজিয়েছেন কেনা-বেচার জন্য। ফ্রী রিডিং ষ্টল ত খোলেননি। তার তখনকার সেই ছেলেমানুষি রাগের কথা মনে পড়ে বিপিনের এখনও হাসি পায়।

তার পর মঙ্গল বাবুর সঙ্গে তার প্রচণ্ড বন্ধুত্ব জমে যায়। সে

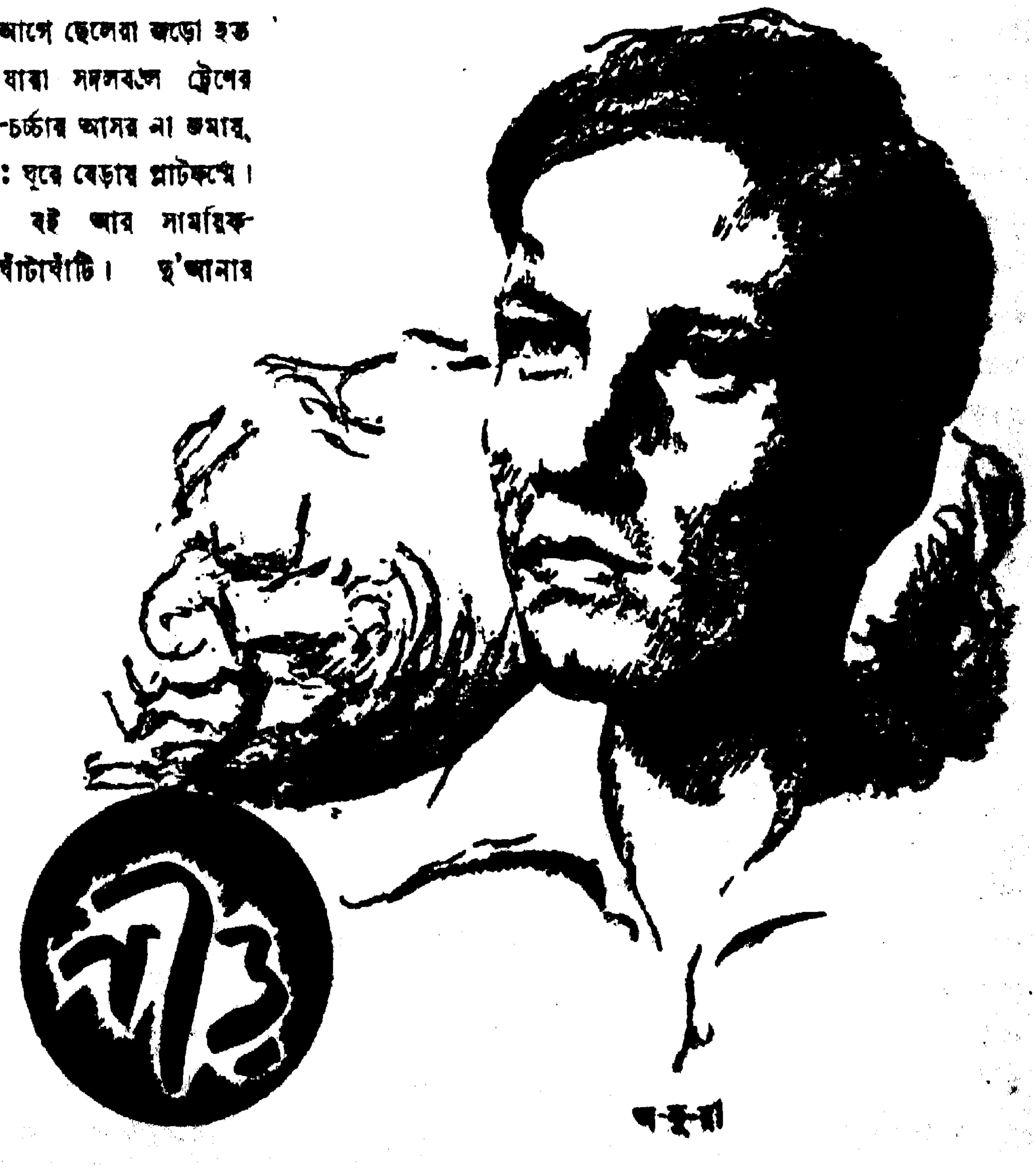

এখন হয়ে পড়েছে তার এক জন অতি পুরোনো খরিদ্দার। সেই সুবাদেই বিপিন কলেজ-ইউনিয়নের সাহিত্য সভার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হল। ভার পেল মাস মাস সাহিত্য সভা আর কমন-রুমের পত্র-পত্রিকা কেনবার। মনে পড়ল তার মঙ্গল বাবুর ষ্টলের কথা। এবার সে কিনবে সাময়িক পত্র, বই, অজস্র কিনবে মঙ্গল বাবুর ষ্টল হতে। দেখাবে মঙ্গল বাবুকে সে একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের হাউ-পড়া খদ্দের নয়।

প্রায় সমস্ত সাময়িক পত্রের এক একখানা কপি মাস মাস কিনতে লাগল বিপিন গম্ভীর মুখে—দশ টাকা পাঁচ টাকার কড়কড়ে নোট মঙ্গল বাবুর হাতে ছুঁড়ে দিয়ে। দু'-এক মাসের মধ্যেই বুঝলেন তিনি তার গুরুত্ব। খাতির করতে লাগলেন আপনা থেকেই। বন্ধুত্বও পরে দানা বাঁধল এই কেনা-বেচার পথে। যদিও মঙ্গল বাবুর বন্ধুত্বের জন্ত আগ্রহ বেশী ছিল বিপিনেরই।

মঙ্গল বাবুর ষ্টলে হ'ল তার অবাধ আধিপত্য। ষ্টলের পাশে লোহার চেয়ারটায় বসে বিকালে ছুটির পর পেটুক ছেলের মত বিপিন গিলে চলে যত রাজ্যের মাসিক, সাপ্তাহিক, দু' পেনএর পেঙ্গুইন সিরিজ, ডিটেক্টিভ বই···। মঙ্গল বাবু এখন আর আপত্তি করেন না। বরং নতুন বইয়ের প্যাক খুলে আগেই তাকে একখানা এগিয়ে দেন। মমতা জমে গেছে ঘন। এক-আধ ঘণ্টার জন্ত বাড়ী ঘুরে আসবার প্রয়োজন হলে, বিপিনের হাতে দোকানের ভার দিয়ে যান মঙ্গল বাবু।

কলেজ ছাড়বার পর বিহারে, চাকরী নিয়েও বন্ধুত্বের যোগসূত্র' ছিন্ন হয়নি তাদের। যাতায়াতের পথে এই ষ্টেশনেই মঙ্গল বাবুরই ছিল তার এখানকার প্রথম ও শেষ স্নিগ্ধ হাসিমুখর বন্ধু-মুখ।

কুলিটিকে ভাগিয়ে দিয়ে বিপিন ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগল ষ্টলটা। একটা নতুন মুখ দেখতে পেল সেখানে। ঢিলে পাজামা, কালো কোট গায়ে একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে ষ্টলের মাঝে, যেখানে মঙ্গল বাবুকে দেখা যেত। দোকানটা তা হলে হাত-বদল হয়েছে। সুটকেশ আর বিছানা মঙ্গল বাবুর ষ্টলে রেখে নিশ্চিন্তে অন্যবারের মত সে আর বাড়ী যেতে পারবে না। ডাকতে হবে একটা ছ্যাকরা গাড়ী। অন্যবার সে এখানে রেখে যেত সুটকেশ আর বিছানা। তার পর ওদের বুড়ো চাকর সংনামী এসে নিয়ে যেত।

জামার পকেট থেকে টিকিটটা বার করল বিপিন। সুটকেশ আর বিছানাটা তুলে নিল হাতে।

ষ্টেশনের লম্বা টিনের সেডের এক পাশে ঘেরা জায়গাটা যাত্রীদের জন্য। আর এক পাশে ষ্টেশন-মাষ্টার, মাল-বাবু, বুকিং-ক্লার্ক ও গার্ডদের অফিস। মাঝে সদর গেট, টিনের পাতের সরকমান কবাট লাগানো। তার একখানা বন্ধ করে আর একখানা ঈষৎ উন্মুক্ত করে অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতেন টিকিট-কালেকটর মহিম বাবু। সেখানে আজ আর মহিম বাবুকে দেখতে পেল না। 'অপট' করে হিন্দুস্থানে চলে গেছেন নিশ্চয়ই। তার জায়গায় এক জন নতুন লোক দাঁড়িয়ে। মুখে চাপদাড়ী। পশ্চিমা বলে মনে হল। তার হাতে টিকিটটা গুঁজে দিয়ে রেলিং এর বাইরে এসেই বিপিনের চোখে পড়ল, খাকির ফুল প্যান্ট, বুশ সার্ট পরনে, হাতে ছোট ছড়ি, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি যুবক তাকে লক্ষ্য করছে।

আমেদ না? চিনতে পারল বিপিন।

হ,—বিপিন নাকি? একেবারে বদলে গিছিস দেহি। জিজ্ঞাসা করে আমেদ। আমেদের কথাবার্তায় একটা ভারিক্কি চাল। উঁচু উঁচু ভাব।

মিলিটারী পরিছিস ক্যান রে?

ন্যাশনাল গার্ডের সালারে হইছি যে।

ওঃ, তাই ক। তা, এহানে খাড়ায়ে কি এখিস্।

আমেদ মাতব্বরি চালে বললে: তা বোঝবা না তুমি।

পরে অবশ্য বুঝেছিল তাদের মত ছেলেদের আসা-যাওয়ার উপর নজর রাখার জন্যই তার ওখানে অবস্থিতি। আমেদ আর ইব্রাহিম দু'ভাই স্কুলে একসঙ্গে বিপিনের সঙ্গে পড়ত। ছিল পিছনের বেঞ্চে বসে নরক গুলজার করবার সাথী।

ইব্রাহিম কি এর্তিছে রে?

চাকরি পাইছে সিভিল সাপ্লাইতি।

পথের পাশেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল বিপিন। প্রবহমান যাত্রীদের বাক্স-প্যাটরার খোঁচা লাগছিল তার গায়ে। সে আর দাঁড়ালো না সেখানে। এগিয়ে গেল রিকসা আর ঘোড়া-গাড়ী-ষ্ট্যাণ্ডের দিকে।

আচ্ছা পরে দেখা হবে।

ষ্টেশনের শেডের বাইরে আসতেই তার কানে ভেসে এল সাইকেল-রিকসা-বাহিনীর সমবেত চিৎকার: রূপসো, রূপসো—

ষ্টেশনের নিচেই গোল বৃত্তাকার পিচের রাস্তা। মাঝখানের বৃত্তাকার জায়গাটাতে সাইকেল, রিকসা আর ঘোড়া-গাড়ীর ভীড়। অনেকগুলি রিকসা বৃত্তাকার পথের বাঁ হাতে সহরে যাবার রাস্তার ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সহসা বিপিনের চোখে পড়ল বাঁ-হাতি রাস্তার পাশে হিন্দু হোটেলের গায়ে প্রকাণ্ড একটা দেওয়াল-বিজ্ঞাপন। সুগন্ধি তেলের শিশি হাতে নারীমূর্ত্তি।

এ বিজ্ঞাপনটা কবে লাগালো। আগে ত দেখিনি।

রূপসো, রূপসো। সাইকেলের বেল বাজিয়ে হেঁকে চলেছে রিকসা-ওয়ালারা। সহরের দক্ষিণে রূপসার খেয়া-ঘাট। মাইল দেড়েকের পথ। আট আনা ভাড়া। ফেরী ষ্টীমারের অনেক আগে গিয়ে ধরিয়ে দিতে পারবে রূপসার ওপারের ট্রেণ। রূপসার যাত্রী পেলে আর সহরের যাত্রী তুলবে না। সহরের ভাড়া যে অনেক কম। তা ছাড়া রূপসার যাত্রীদের মত তাদের তাড়া নেই ট্রেণ ধরবার। কবুল করে না বেশী ভাড়া। বরং উল্টে আরও দর-দস্তুর করে, চোট-পাট করে ভাড়া যেতে রাজী না হলে।

কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় ঘোড়া-গাড়ী-ষ্ট্যাণ্ডে ধলা আর মাধুদের গাড়ী খুঁজতে লাগল বিপিন।

কই, ধলা বা মাধু, কারও গাড়ী ত সে দেখতে পাচ্ছে না কৃষ্ণচূড়ার তলায়।

এগিয়ে এল কবিমুদ্দি। বুড়ো হয়ে গেছে। বাঁকানো, পাকানো শরীর। এখনও ছাড়েনি গাড়ী চালানো? বিপিন ভাবতে লাগল আশ্চর্য্য হয়ে।

গাড়ী চাই বাবু?

মাধুর গাড়ী কোহানে কতি পার?

মাধু গাড়ী বেচে হিন্দুস্থানে চলে গেছে। বনগাঁয়।

কবিমুদ্দি তার জিনিষ-পত্র তুলে নিল গাড়ীতে। বিপিন আপত্তি

করল না। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কবিবুদ্দি কোচবক্সে উঠে লাগামটা টেনে নিয়ে আছোড় মারলে ঘোড়াগুলির পিঠে।

হেট হেট।

ক্যাচ-ক্যাচ শব্দ তুলে গাড়ীটা চলতে সুরু করল।

মাধুদাও চলে গেছে। অস্ফুট স্বরে কথাগুলি বেরিয়ে পড়ল তার মুখ দিয়ে।

ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান হিসাবে ধলা আর মাধু দুই ভাই এ সহরে বিখ্যাত।

ছোটবেলায় ধলা আর মাধু সম্বন্ধে নানা রকমের রোমাঞ্চকর কাহিনী সে শুনত। ধলা আর মাধু অন্য গাড়োয়ানদের মত পশ্চিমা নয়, বাঙ্গালী। সহরে যে কয়খানা ঘোড়া-গাড়ী ছিল তার মধ্যে ধলা আর মাধুদের গাড়ী আর ঘোড়াই সব চেয়ে বেশী জাঁকালো। উঃ, কি তেজী ঘোড়া! বিপিনের মনে পড়ে, চকচকে নতুন কেনা গাড়ীতে জোড়া ধলার সাদা রংএর ঘোড়াটা যখন টগবগ করে হাওয়ার বেগে গাড়ীখানা উড়িয়ে নিয়ে চলত খোয়ার পাতবার-করা রাস্তার উপর দিয়ে, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে এসে যে ভীড় করত রাস্তায়। ছেলেদের সরে যাবার জন্য পায়ের নিচের ঘণ্টা বাজাত ধলা অনবরতঃ ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। তখনও সহরে পিচের রাস্তা হয়নি। ধুলো উড়িয়ে হন হন করে রোজ সকালে চলে যেত গাড়ী খান ষ্টেশনের দিকে। বেলের শব্দে পড়া ছেড়ে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ত বিপিন আর তার জ্যাঠতুত ভাই নিতাই চৌরাস্তার মোড়ে!

ধলার গাড়ী যাচ্ছে।

চার ফুটের উপর উঁচু ঘোড়াটা। গায়ের ছাঁটা রোঁয়াগুলি বুরুষ দিয়ে ঘষা-মাজা। মখমলের মত চিকণ মসৃণ। মাংসপেশীর শক্ত বাঁধনে সুদৃশ্য আঁট-সাট দেহ। দৃপ্ত পদক্ষেপে ছুটে চলেছে রাস্তা কাঁপিয়ে।

'জানিস, যুদ্ধের ঘোড়া। খারাপ হয়েছিল, ধলা নিলামে কিনে এনেছে।' ভক্তিতে গদগদ হয়ে বলত নিতাই।

এ খবরটা নিতাই কোথায় পেল বিপিন তা জানে না। ঘোড়াটা যে কবিবুদ্দি বা লক্ষ্মণ সিংএর হাড়গোড় বার-করা হ্যাংলা অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রাণী নয়, তার কাছে স্পষ্ট হবার কারণ, কিছু দিন পূর্ব্বে সহরে মিলিটারীর আগমন।

১৯৩৪-৩৫ সাল। সন্ত্রাসবাদীদের উচ্ছেদ করতে এন্‌ডারসন জেলায় জেলায় সৈন্যের ছাউনী ফেলেছেন। এক দল এসেছিল বিপিনদের ছোট সহরেও। যেখানে ছেলেরা ফুটবল খেলে সেই সার্কিট হাউসের মাঠে তারা তাঁবু ফেলে। তাদের সঙ্গে ছিল কয়েকটা কুলীন জাতের ঘোড়া। এক দিন সহরে টহল দেবার সময় সেগুলি নিতায়ের চোখে পড়ে। প্রাণীগুলির মনোহর দেহকান্তি নিমেষে নিতায়ের মন হরণ করে। সশ্রদ্ধ কণ্ঠে সে বিপিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দেখ, ঘোড়া দেখ একখানা!

ধলার ঘোড়ার সঙ্গে মিলিটারীর ঘোড়ার কৌলিন্যের যোগসূত্র আবিষ্কার করতে তার দেরী হয়নি।

ধলার গাড়ীতে ছিল একটা ঘোড়া। মাধুর দু'টো। এ দু'টি অভিজাত টাট্টু। কবিবুদ্দি বা লক্ষ্মণ সিংহের দেশজ প্রাণীগুলির সঙ্গে সহজেই পার্থক্য ধরা পড়ত চোখে।

ধলা আর মাধুর সম্বন্ধে সব চেয়ে রোমাঞ্চকর খবর হল, ওরা না কি আসলে গাড়োয়ানই নয়। শাপভ্রষ্ট হয়ে গাড়োয়ানী করছে শুধু। না হলে অমন দামী চকচকে গাড়ী, আর তেজীয়ান ঘোড়া কিনবে কি করে? ফিসফিসানিতে শোনা যেত সহরের এক জন ধনাঢ্য জমিদারের নাম। ওদের মা ছিল তার রক্ষিতা।

'আরে, এ জান না, আসলে কান্তি রায়, আর ধলা মাধু ত সৎভাই!' এই যুক্ত-গোপন তথ্যটি সকলে সত্য বলেই যেন ধরে নিয়েছে।

ঘোড়া-গাড়ী রাস্তায় বার হলেই ছোট ছেলেরা, যারা একটু বেশী দুঃসাহসী তারা গাড়ীর পিছনে ছুটবে। ছুটতে ছুটতে গাড়ীর সমগতিতে এসে এক সময় বুক পেতে জড়িয়ে ঝুলতে থাকবে দরোয়ান দাঁড়ানোর জায়গাটা ধরে। তার পর আশ্চর্য্য কৌশলে পাশ ফিরে উঠে বসবে জায়গাটায়। এই ভাবে চলে তাদের বিনামূল্যে গাড়ী চড়ার আনন্দ। গাড়ী খালি থাকলে কোচোয়ান বুঝতে পারে। সপাং করে করে দেয় পিছনে চাবুক। চাবুকটা হয়ত গায়ে লাগে না। কিন্তু ভয় পেয়ে ছেলেরা ছেড়ে দেয়। চলন্ত গাড়ী ছেড়ে দিয়ে কেউ বা হুমড়ি খেয়ে পড়েও যায় রাস্তায়।

ধলার আর মাধুর একটা গুণ ছিল তারা পিছনে চাবুক মারে না, বলে দিলেও না। পিছনে বসা ছেলে দেখলে অনেক দুষ্টবুদ্ধি ছেলের ধর্ম্মবুদ্ধি জেগে ওঠে। চেঁচিয়ে সচেতন করে দেয় গাড়োয়ানকে: পিছনে চাবুক, পিছনে চাবুক!

ধলা আর মাধু তাতে সাড়া দিত না। বিনামূল্যে গাড়ী চড়া শিশু-মহলে ধলা মাধুর ছিল তাই দুর্লভ সুযশ।

মাধুদা, ষ্টেশনে নিয়ে যাবে?

ওঠ। রাশ টেনে গাড়ীর গতি মন্থর করে রুক্ষ মেজাজে বলত মাধু!

বিপিনের চমক ভাঙ্গল কবিবুদ্দির হাঁকে: সব চলে যাচ্ছে বাবু! ছোট বেলা থেহে দেখতিছি আপনাগো, বড় দুঃখ্যু হয় আপনাগো বাত্তি দেহে···

আমাদের বাড়ী ত সকলে আছে! আমরা ত যাইনি! বিপিন বলল।

আপনাগো কথা কচ্ছি নে। আপনি ত আজ কত কাল দেশছাড়া। কচ্ছি যারা যাচ্ছে, তাগো কথা। এই মাধুরে কতো কলাম, যাইস নে। তা শোনলো না। আচ্ছা বাবু, এমন অবস্থা আর ক'দিন চলবে।

এই সব ওলট-পালট ব্যাপার দেখে কবিবুদ্দি হয়ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। বুঝতে পারছে না কোথায় কি অনর্থ ঘটেছে। কেন ঘটেছে। বিপিন চুপ করে রইল। কথা বাড়িয়ে ওর সান্ত্বনা নষ্ট করে লাভ কি? কবিবুদ্দি বলে চলল: মারা গেলায় বাবু আমরা। সারা দিনির মধ্যি একটা ভাড়া মেলে না। চড়বে কেডা গাড়ী, সব ত চলে যাচ্ছেন আপনারা। মাধুরই বা কি দোষ দিই। ভাড়া-পত্তর নেই। এহানে মানষি খাবে ক্যামবায়? ভাবিলাম রিক্সা চালাবো। তা রিকসোআলাগোও ঐ দশা। সারা দিনি মালেকের টাহা ওঠে না।

ছোট সহর। পুরানো অধিবাসীরা সকলের চেনা। বিপিনের

সহরের আদিবাসী বললেও চলে। বিপিন জিজ্ঞাসা করল : ধলা কাহানে ?

ধলা ত আগেই ভাগিছে।

যেতে যেতে বিপিন লক্ষ্য করল, ষ্টেশনের রাস্তার দু'পাশে নতুন চালা-ঘর উঠেছে। পথের দু'ধারে পাকা ড্রেনের উপর বাঁশের মাচা গড়ে তার উপর চালা তোলা হয়েছে। চোগলা ও চাচের তৈরী ছোট-ছোট খুপরি। খুপরিতে ছোট-ছোট দোকান। বেশীর ভাগই পান-বিড়ি আর ফুলুরীর পেঁয়াজীর। দু'-একটা চায়ের দোকানও লক্ষ্য করলে। সামনে টিনের তোলা-উনুনে কেটলিতে জল ফুটছে। দু'টিন সিগারেট, এক ডজন ম্যাচবাক্স, সামনের বাড়িতে টাঙান এক ছড়া কালো দাগ-ধরা কলা, কোলের উপর বিড়ির কুলো নিয়ে বিড়ি পাকাচ্ছে নবাগত দোকানী। নোংরা অপরিচ্ছন্ন করে তুলেছে রাস্তাটা। অথচ আগে কি সুন্দর পরিচ্ছন্ন ছিল এ রাস্তাগুলি। বিকালে হাওয়া খেতে, বেড়াতে আসত লোকে এধারে। সহরের এক পাশে পড়ে ষ্টেশনটা। লোকের সদা-সর্বদা যাতায়াতের পথে নয় জায়গাটা। এখানে দোকান বেঁধে এরা কি আয় করবে বিপিন তা বুঝতে পারে না।

ষ্টেশনের এলেকা ছাড়িয়ে বাজারের রাস্তায় পড়ল গাড়ীটা। এখান থেকে মিউনিসিপ্যাল এলেকা আরম্ভ হয়েছে। এখানে মোড়ের মাথায় বট গাছটার নিচে গোবিন্দ ঘোষের 'গাড়ীর দোকান'। কেরোসিন কাঠের তৈরী এই সচল 'গাড়ীর দোকানটা' কবে কোন কালে গোবিন্দ ঘোষের ছিল। গোবিন্দ সহরে প্রথম ঘোড়া-গাড়ী আনায়। পাঁচ-ছ'খানা গাড়ী ছিল তার। দোকানের গায়েই রাস্তার পাশে শান-বাঁধানো চাতে গাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে থাকত যাত্রীর অপেক্ষায়। পান-বিড়ির দোকানের খদ্দের সামলেও গোবিন্দ নজর রাখত, কোন কোচোয়ান কখন গাড়ী নিয়ে বার হল। তার পর গোবিন্দ ঘোষের গাড়ী একে একে সব অদৃশ্য হয়েছে সহরের রাস্তা থেকে। গোবিন্দ ঘোষ গাড়ীর ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেছে কেউ তার খোঁজ রাখে না। দোকানটা হাত-বদল হয়েছে। বিন্তু শুধু দোকানটার নাম রয়ে গেছে গোবিন্দ ঘোষের দোকান। বিপিন লক্ষ্য করলে দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করছে।

বেলা হয়েছে বেশ। বারোটা বাজে। ট্রেণটা লেট করেছে অনেক।

কবিরুদ্দিনের গাড়ীখানা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ তুলে চলেছে একটানা। রাস্তায় লোক-চলাচল কম। সদর রোডের সোজা রাস্তাটা সরল রেখায় ঘুরে মিলিয়ে গেছে ষ্টেশন এলেকার পাশ দিয়ে। রাস্তার নিচে রেলওয়ে কলোনীর খেলার মাঠটায় কয়েকটা সাদা বক আর ঘুঘু পাখী আসন্ন দুপুরের মৃদু রোদে ঝিমাচ্ছে। মাঠের পাশের ছোট জলাটায় লাল শালুকের কুঁড়িগুলি এখনও ফোটেনি। জলার পাড়ের কুল গাছটার দিকে দৃষ্টি পড়ল বিপিনের। এ হে, কুল গাছটা একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে যে। ডালগুলি শুকনো, পাতাগুলি তামাটে, মরে পড়বার পূর্ব্ব-লক্ষণ। স্কুলে পড়বার সময় টিফিনের সময় গাছটার উপর দৌরাত্ম্য করে কত দিন কুল খেয়েছে সে আর নিতাই। চ্যাঙ্গা মেরে কুল পাড়তে নিতায়ের হাতের টিপ ছিল অব্যর্থ। দু'-চার ক্ষেপ জোরে চ্যাঙ্গা মারলেই ঘুম ভেঙে বেত রেলওয়ে হাসপাতালের উড়ে মালি রঘুরামের। গাছটা হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের লাগায়া, কাজেই তার উপর রঘুরামের অধিকার রয়েছে বই কি ?

এই, চ্যাঙ্গা মারুচি কৌন ? মাড়ি ফিড়ি পকাই দিব···। রঘুরাম তেড়ে আসবার আগেই নিতাই আর বিপিন 'দে ছুট।'

স্কুল কমপাউণ্ডে এসে নিতাই বিপিনকে ধমকায় : অত জোরে চ্যাঙ্গা মারতি বারণ করিলাম না ? শুনলি নে ক্যান তখন ! মধু টের না পালি আরও কতা পাবা যাত !

মাত্র এক-পকেট কুলের ফসলে তার মন ওঠেনি। থরে-থরে লালচে হলদে কুলের গুচ্ছ তখনও তার চোখের সামনে ভাসছে।

কুল গাছটার দিক থেকে সে চোখ ফিরিয়ে নিল। তেজালো রোদে খাঁ-খাঁ করছে খাবলা-ওঠা পিচ-ঢালা সদর রোড, রেল কম্পাউণ্ডের মাঠ, শিরিষ গাছের ছায়া-ঘেরা জলাটা।

ক্যাঁচ-ক্যাঁচ-ক্যাঁচ। একটানা শব্দ উঠছে গাড়ীখানা থেকে। সদর রোডটা বাঁয়ে রেখে গাড়ীখানা এবার পড়ল শীতলাতলা রোডে। রাস্তার দু'ধারে একতলা বাড়ী। টিনের ঘর। খোলা জমি। মাঝে মাঝে দু'-একটা দু'তলা তিনতলা বাড়ী মাথা উঁচু করে চেয়ে আছে নিচের একতলাগুলির উপর। বিপিনদের পাড়া শুরু হল এখান থেকে। নতুন সহর গড়ে উঠছিল। সমৃদ্ধ মধ্যবিত্তের বসতি। এ সহরের প্রতিটি বাড়ী বিপিনের চেনা, অর্দ্ধেক বাড়ী সে তৈরী হতে দেখেছে। অনেক বাড়ী তৈরী হবার ইতিহাসও সে জানে। এই জ্যোতিষ ডাক্তার। বিধবা শালীর টাকা ভেঙে তৈরী করেছিল বাড়ীটা। শালীও তেমনি জাঁহাবাজ মেয়ে। ডিসপেনসারির পরদার আড়ালে বসে থাকত, জ্যোতিষের রোগী দেখবার সময়। রোগীরা চলে গেলে ছোঁ মেরে এসে দখল করত ক্যাশ-বাক্স। এত দিনে বোধ হয় উঠে গেছে তার টাকাটা। আর ঐ যে নারকেল গাছ-জোড়া রামনিধির বাড়ী। ও ত মর্টগেজ দেওয়া তিন জনের কাছে! উঁকি মেরে লক্ষ্য করতে লাগল বিপিন কোন বাড়ীর বারান্দায় কোন চেনা-মুখ দেখা যায় কি না। শীতলাতলার মোড় পেরিয়ে, কালী দত্তের বাড়ী পেরিয়ে, হরি সান্যালের ডাইং ক্লিনিং বাঁয়ে রেখে দেখা গেল বুলু মল্লিকদের বাড়ী। বুলু মল্লিকদের বাড়ীর পরে মধুদের বাড়ী। তার পর দ্বিজপদ উকিলের দোতলা। ঝুল-বারান্দায় জং লোহার বরগা তিনখানা বেরিয়ে আছে। ঝুল-বারান্দা হব-হব করেও আর হয়নি। তার পর মুড়িওয়ালীদের কাঁচা খোড়ো ঘরগুলির সারি। আর একটু এগিয়েই সোনার চায়ের দোকান। দোকানে পরিচিত কাউকে লক্ষ্য করলে না। আশ্চর্য্য। কোন বাড়ীতেও কোন চেনা-মুখের সাক্ষাৎ নেই।···

হঠাৎ কখন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ীটা থেমে গেল। তাদের বাড়ী এসে গেছে, বিপিন দেখতে পেল।

সামনের বারান্দায় দরজা-জানলাগুলি বন্ধ। বাড়ীখানা ঘিরে কেমন একটা থমথমে ভাব। আশঙ্কায় শিউরে উঠল বিপিন।

কবিরুদ্দির প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে স্যুটকেশ আর বিছানা বারান্দায় তুলল। বাঁ দিকের দরজাটার কড়া ধরে আস্তে নাড়া দিল।

মা।

মনে পড়ল আগে তার আসবার খবর পেলে মা রাস্তার উপরকার ঐ বড় জানলাটার কাছে বসে থাকতেন সদর রাস্তার দিকে তাকিয়ে। কড়া নাড়বার দরকার হত না। দূর থেকে দেখতে পেলেই মা দরজা

খুলে দিতেন। আজকে কেন মা বসে নেই ওখানে! হয়ত রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত আছেন। তাছাড়া দুপুরের ট্রেনে সে ত বড় আসে না।

দরজাটা খুলে দিল ছোট বোন প্রেমা। বিপিনকে সে ছল-ছল চোখে বলল: দাদা, আর দু'দিন আগে আসলে না কেন?

ঘরটাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে বিপিন। ঘরের দু'খানা খাটের একখানাও নেই। এরই একটাতে সেজ বোন বিনি অসুখের সময় শুতেন। 'ওর বিছানা কি ছোট ঘরে করেছিস আজকাল?' জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল বিপিন। অকস্মাৎ প্রেমার চোখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। টপ-টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে চোখের কোণ দিয়ে।

তাহ'লে কি—

পরশু দিন মারা গেছে। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে ফেলল সে।

ছোট ঘরে মা শুয়েছিলেন। বিপিন প্রণাম করলে তাঁকে গিয়ে।

মা ছল-ছল চোখে বললেন: বেশী কাঁদা-কাটা করিস না। ছেলেটাকে বুঝতে দিইনি যে মা মারা গেছে। বুঝতে পারলে ঐ কচি ছেলেটাকে আর বাঁচানো যাবে না।

বিপিন চলে এল সে ঘর থেকে। মুগ্ধ হয়ে গেল মায়ের দৃঢ়তা দেখে। ভেবেছিল মা একেবারে ভেঙ্গে পড়বেন। এই বোনটিকে মা অত্যন্ত ভালোবাসতেন। অল্প বয়সে বিপিনদের বাবা মারা যান। সামান্য ক'টা লাইফ ইনসিওরের টাকা বড় মেয়েটির বিয়ের দেনাদায়িক, ওঁর মৃত্যুকালীন অসুখের খরচেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। বাকী যেটুকু ছিল তা তার এক হিতৈষী ভাইপো ভেঙে-চুরে সরে পড়েন। বিনির তখন বয়স এগারো বছর। বিপিনের বারো। বিপিন পড়ছে ইস্কুলে। বিনিকে ইস্কুল ছাড়িয়ে দেওয়া হল। এককালি খাজনা তালুকের নায়েব-গোমস্তার ফাঁকি দেওয়া আয়ের সামান্য তলানি, আর বর্গা জমির কয়ারী ধান এই সম্বল করে মায়ের উপর সংসার চাপিয়ে এসেছেন। জননী টানা-হ্যাঁচড়া করে। বিপিনকে স্কুলে পড়িয়েছেন। দু'টো বছর কলেজের খরচও টেনেছেন। সেই দুঃখের দিনে সংসারের ভার মাথায় করেছিল মেয়েটা। টাকা-পয়সার অভাবে ভালো বিয়ে দিতে পারেননি। সামান্য মশলা-পাতির দোকান রতনের। লেখা-পড়া জানেই না। তার সঙ্গে বিনির মত মেয়েকে মানায় না। তবু দিতে হল। অথচ ওরই বড় বোনের বিয়ে দিয়ে গেছেন বিপিনের বাপ ধুমধাম করে। সেই যুদ্ধের আগের বাজারেই দু'-তিন হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। অবশ্য জননীর গহনাগুলি সব অদৃশ্য হয়েছিল। তা হোক, মেয়েটা ত সুখী হক। যেমন বর তেমনি ঘর। তার কাছে রতন!

দিদির বর, দিদির বিয়ের আড়ম্বরের সঙ্গে বিনি মনে-মনে তুলনা করত বোধ হয়, নিজের উৎসবহীন গরীবানা বিয়ে। শ্বশুর-বাড়ীর দুঃখের সংসার। বিপিন বোঝে, বিয়ের রাত থেকেই কাল অসুখটা ঢোকে ওর শরীরে। অব্যবস্থার অন্ধকারের মত বিনির মৌনস্তব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে হু-হু করে উঠত বিপিনের মন। অপরাধী মনে হত নিজেকে বিপিনের!

তবু মাঝে-মাঝে বিপিনের মনে হত, বিনি বুঝি চেষ্টা করছে রতন বাবুদের অসচ্ছল সংসারের মাঝে নিজেকে মানিয়ে নেবার। বুঝি ভুলে গেছে অতীতের খেলা···আদরের দাবী, শ্বশুর-ঘরের যে ধারা বিনির মত সব মেয়েরাই মেনে থাকে···

ভেতরের বারান্দায় ইজি-চেয়ারটায় অভিভূতের মত বসে পড়ল বিপিন। প্রেমা বলতে লাগল: এমনিই ত মনমরা বিয়ের পর থেকে, তার পর যে দিন থেকে লোক পালাতে লাগলো, ভয়ে ককিয়ে উঠল: আমরা কোথায় যাব? সবাই চলে যাচ্ছে···

মা ধমক দিতেন: তোর অত ভাবতি হবে না। খোকা যা হয় করবে আইসে।

হ্যাঁ, দাদার ভরসায় থাক তোমরা। দাদা একটা অপদার্থ। আমি চিনি।

বিপিনের মা চুপ করে থাকেন। বিয়ের পর থেকে বিপিনের উপর বিনির ক্ষোভের কারণ তিনি বোঝেন।

রতন বাবু অস্থির হয়ে হাঁক-পাক করেন: দোকান ত অচল। খদ্দেররা সব চলে যাচ্ছে। মাল-পত্তর পাওয়া যায় না। কারবার করব কি ছাই···

সেই যে শুকিয়ে যেতে লাগল সেজদি, কিছু হল না ডাক্তার-কবিরাজে। ডাক্তারেরা বলল টি বি। এখানে আর আমরা কিছু করতে পারব না।

অর্থহীন দৃষ্টিতে বিপিন লক্ষ্য করতে লাগল উঠানের অপর দিকে তুলসী-তলাটা। তার বাবা, সেজ জেঠা মশায় মারা যাবার পর শবদেহ ওখানে রাখা হয়েছিল শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে। বিনিকেও বোধ হয় ওখানে রাখা হয়েছিল।

উঠানের উপর সুরেন বাবুর বাড়ীর বেল গাছটার ডালগুলি আবার প্রসারিত হয়ে পড়েছে। সারা উঠান ঝরা-পাতায় ছেয়ে গেছে। বিপিন বাড়ী থাকে না। কে আর ঝগড়া-ঝাঁটি করে কাটাবে ডাল। মা শান্তিপ্রিয় মানুষ। সুরেন বাবুরা বড়লোক। মা এ নিয়ে তাই ঝগড়া-ঝাঁটিও করতে সাহস করেন না। পড়ছে পড়ুক। ঝাড় দিয়ে ফেলব আমি।

অকস্মাৎ বহু দিনের একটা ঘটনা মনে পড়ে মৃদু হাসি এল বিপিনের মনে।

এক দিন বিপিনদের বাড়ীতে তার এক দূর-সম্পর্কের মেসো মশায় এসেছিলেন। তার ছিল ডাইরী লেখার বাতিক। বড় ডাইরীটা থাকত তার পাঞ্জাবীর পকেটে। এক দিন চুপি-চুপি বার করে সেটার পাতা উল্টাচ্ছিল বিপিন। ডাইরীর প্রথম দিকে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য, পোষ্টেজ-রেট, রেভিন্যু-রেট, ছুটির তালিকা, সাধারণ জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত তথ্য, কার্ড-নির্দেশ, সাধারণ আইনের টুকি-টাকি জানবার বিষয়। আইনের পাতায় বিপিন এক জায়গায় পড়ল লেখা রয়েছে, প্রতিবেশীর বাড়ীর গাছের ডাল-পালা যদি কারও বাড়ীর সীমার মধ্যে প্রসারিত হয়ে আসে, আইনের আশ্রয় না নিয়ে অনায়াসেই তা কেটে দেওয়া যেতে পারে। তার পরদিনই বিপিন মহোৎসাহে একটা 'জন' ডেকে সুরেন বাবুর বেল গাছের ডাল সাফ করে দিল।

ডাল কাটতিছ যে বড়: সুরেন বাবু হা-হা করে তেড়ে এলেন।

বিপিন ভারিক্কি চালে বলে: আপনি কোর্ট করতি পারেন। সে নিশ্চিন্ত, আইনে সে অপরাধযোগ্য কোন কাজই করেনি।

আমার কপাল হত। আমি কাটায়ে নেতাম। গজ-গজ করতে থাকেন সুরেন বাবু।

বিপিনের হাসি পেল ঘটনাটা মনে পড়ে। সুরেন বাবুর দিকে তাকাল। দোতলার জানালাগুলি বন্ধ। কেউ নেই হয়ত।

বিপিনকে ও-বাড়ীর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে প্রেমা বলল: ওরা সব হাওড়া গেছে। বাসা পেয়েছে। শুধু বুড়ো-বুড়ী পড়ে আছে···বাড়ী বেচতে পারলে ওরাও চলে যাবে।

প্রতিবেশী হিসাবে সুরেন বাবুদের সঙ্গে ওদের কোন দিনই সখ্যতা ছিল না। সীমানা নিয়ে মামলাও হয়েছিল। কিন্তু তবু আজ ওদের দেশ-ত্যাগের সম্ভাবনায় কেন যেন বেদনার্ত হয়ে উঠল বিপিনের মন।

বসু-ভিলার বণুরা আছে?

ওরা ত চলে গেল আর মাসেই।

বুলু মল্লিকরা?

বাড়ী বেচে দিয়েছে ওরা। ওর দাদা না কি বহরমপুরে মোক্তারি করবে।

শান্তিধামের গিন্নীরা?

ওরা যায়নি এখনও। বিষয়-সম্পত্তির একটা হিল্লে করতি পারতিছে না—

শ্যামলরা?

ওর কাকা হিন্দুস্থান লিখিলো। বদলি করিছে ওর কাকারে খড়গপুর।

পরিচিত প্রতিবেশী জনের ছবি একে-একে ভেসে উঠতে থাকে মনে। নোনা, বণু, হিরুয়া, বুলু মল্লিক, শ্যামল, তার বাল্যের সাথী। জীবিকার টানে এক-এক দিকে ছিটকে পড়েছিল তারা এক-এক জন। তবু ওরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়নি পরস্পরের কাছ থেকে। লম্বা ছুটি-ছাটাতে জড় হত সবাই একত্র। চলত নতুন বইয়ের বিশ্লেষণ, ফুটবলের মাতন, জানার দোকানে সেই আগের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডার হুল্লোড়। দূর-প্রবাসের একঘেয়েমি উঠে গিয়ে দীপ্ত হয়ে উঠত মন-প্রাণ। কি এক যাদু আছে যেন এই ছোট মফঃস্বল সহরের মন্দাক্রান্তা ছন্দে চলা জীবনের। দূর থেকে তাকে হাতছানি দেয় দেশ। আমার দেশ, বাল্য-শৈশবের মিষ্টি-মধুর স্বপ্নে-ঘেরা আমার দেশ। সহস্র স্মৃতি-জড়ানো, হোক মলিন, হোক তুচ্ছ, তবু একে সে ভুলবে কি করে এক নিমেষে···

সুরেন বাবুর বাড়ীর বেল গাছটার নতুন চিকণ পাতাগুলির দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে বিপিন ভাবতে থাকে: কোথায় হবে তার বসতি? কোথায় সে বাঁধবে তার ঘর? এক কলমের খোঁচায় তারা যাযাবরের সামিল হয়ে পড়েছে! দু'হাতে উপড়ে তার মত শত-সহস্র বিপিনদের সংসারের সহস্রমূল শেকড় আলাদা করে দিয়ে গেছে বহু যুগের পুরানো মাটির স্নেহ হতে। এ-মাটিতে নেই আর তাদের কোন অধিকার। কোথায় বাঁধবে সে ঘর? বিনি মরেছে তিলে-তিলে এই চিন্তায়, দুর্ভাবনায়। কোথায় বাঁধবে তারা ঘর? আরও কত বিপিন, কত বিনি এমনি ধারা চিন্তায় শুকিয়ে যাচ্ছে কে রাখে তার হিসাব? বাহির থেকে ঘুণ-ধরা বাঁশের মত মনে হয়, সবই ত ঠিক আছে। ভেতরে-ভেতরে কুরে খাচ্ছে বিনাশের কীট সংসারের মর্মমূল। মা, ছোট বোন প্রেমা, এমন কি ঐ বুড়ো চাকর সন্যাসী পর্য্যন্ত বুঝেছে তা। পায়ের নিচে নেই শক্তিদায়িনী মাটি—যে মাটিকে আপনার বলে দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে পারে আদরে স্নেহে। শুকিয়ে যাচ্ছে সংসারের মর্মমূল। প্রথমে গেল বিনি। তার পর কার পালা কে জানে?

ও ঘর থেকে মা বললেন: আর বেলা করিস্ না বিপিন। পুকুর থেকে একটা ডুব দিয়ে আয়।

যন্ত্রচালিতের মত বিপিন উঠে পড়ল। টেনে নিল বারান্দার বাঁশের আড়ায় টাঙ্গান গামছাটা। খিড়কির দিকে চলল স্বপ্নাবিষ্টের মত।

তেল মাখলে না দাদা: প্রেমা বলল।

ওঃ, ভুলে গেছি। লজ্জিত হয়ে বলল বিপিন।

পাঁচ রাস্তার মোড়ে গোকুলের দোকানে কয়েকটি অপরিচিত ছেলে ভীড় করেছিল। বিপিনকে সম্মুখ দিয়ে যেতে দেখে গোকুল চেঁচিয়ে ডাকল: আরে, বিপিন নাকি···

হ। থামল বিপিন।

কখন আলি?

এগারোটার টেরেনে।

আজ মাঠে যাইস। ক্রাউন ক্লাব ইনেস পোটিং-এর খেলা আছে।

যাবানে।

বিপিন আবার চলল এগিয়ে তার কাঁটা-ঘেরা মিউনিসিপ্যাল পুকুরের দিকে।

এখনও কি ক্রাউন ক্লাব আর ইউনিয়ন স্পোর্টিং নিয়ে তেমনি মাতামাতি আছে? ওই দু'টো ফুটবল টীমের মাঝে খেলার আগে সারা সহর যেন দু'টো ক্যাম্পে ভাগ হয়ে যেত। দু'টোই এখানকার লীগের উপরের দিকের টীম। খেলার আগে সমর্থকদের চোখে ঘুম নেই! কাটে নিজ নিজ দলের যুদ্ধায়োজনের গোপন তথ্য-সংগ্রহের কর্মব্যস্ত দিন। কলকাতা থেকে আসবে কে কে? হাফ-ব্যাক আর লেফট আউট বড় উইক। কাকে নাবানো হবে। বলাই মিত্তির আর নন্দ সেন। ওরা এরিয়ান্সে খেলছে। ওদের আনা হলে প্রতিপক্ষ প্রোটেষ্ট করতে পারে কি না তা নিয়ে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম আইনগত বিতর্কের ঝড় ওঠে জানার রেস্তোরাঁয় চায়ের কাপের উপর। মুখর হয়ে ওঠে শুধু জানার রেস্তোরা নয়, কলেজের কমন রুম, সাটল ট্রেনের কামরা, রাস্তার মোড়ের জটলা, বার-লাইব্রেরীতে জুনিয়ার উকিলের বৈঠক।

বিপিনদের ক্লাশেও দু'টো দল ছিল ছেলেদের মধ্যে। এক দল ক্রাউন ক্লাবের সমর্থক, আর এক দল ইউনিয়ান স্পোর্টিং-এর।

ক্লাশ বসবার আগে সমর্থকদের মধ্যে এক পশলা বাকযুদ্ধ হয়ে যেত নিত্যই খেলার ক'দিন আগে থেকে।

ক্রাউন ক্লাব: হাঁক ছাড়ত উৎসাহী সমর্থক দল। অর্থাৎ জিতবে ক্রাউন ক্লাব।

ইনেস পোটিং: আর এক দল অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব দিত।

আমাদের আসতিছে, এরিয়ান্সের বলাই মিত্তির, নন্দ সেন। সেন্টার ফরোয়ার্ডে জয়কালি। দেবে তিন গোল ঠুকে।

ইউনিয়ন স্পোর্টিং-এর সমর্থক সদর্পে ঘোষণা করত: আমাদের আছে মোহনবাগানের রবি ঘোষ, অজ···

এলেই হোল আর কি! হায়ার-করা প্লেয়ারে খেলালি প্রোটেষ্ট করবে না?

হায়ার-করা কি রকম? ওরা ত খেলত আগে ইনেসপোটিং-এ।

এই সব ওয়াকেবহাল মহলের গোপন তথ্য ছেলেরা কি ভাবে পেত ভেবে আশ্চর্য্য হত বিপিন।

বিপিন এ বিষয়ে ছিল অত্যন্ত ধূর্ত। সে ক্রাউন ক্লাব বা ইউনিয়ন স্পোর্টিং কোন পক্ষ হয়েই আগে থেকে চেঁচাত না ক্লাবে। কে যে জিতবে তার ঠিক নেই। কোন দলের সঙ্গে নিজেকে এখন জড়িয়ে ফেলে পরে পরাজয়ের গ্লানি বহন করে মুখ কালি করে সে বসে থাকতে পারবে না ক্লাবে। সে তখন চেঁচানির মুখে এ সময় নেপথ্যে থাকত। তার পর মীমাংসার শেষে জয়োন্মত্ত দলের চেঁচামেচির উল্লাসে সে ভীড়ে পড়ত।

বলিনাথ না, ক্রাউন ক্লাব জেতবে।

ঘাটে ক্রাউন ক্লাবের 'বস' সুধো ঘোষের সঙ্গে দেখা হল। মোটা বেঁটে-খাট লোকটি। কনট্রাকটরী করেন। খেলায় অদম্য উৎসাহ। কনট্রাক্টরীর কাজে সাইকেলে সারা সহর চষে বেড়ান। খেলার আগে সে সময় স্বপক্ষের সমর্থকদের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে খবর নেন তাদের আয়োজনের। সাধারণ বিষণ্ণতা সুধো ঘোষের মুখেও সংক্রামিত হয়েছে। বিপিন জিজ্ঞাসা করল: এবারও খেলা হচ্ছে তাহ'লে···

হুস-হুস করে একসঙ্গে দু'-তিনটে ডুব দিয়ে, তোয়ালেখানা বার কয়েক গায়ের উপর সশব্দে চালনা করে সুধো ঘোষ বললেন: আর খেলা! কবে মাদুর-বিছানা গুটোতে হয় তার নেই ঠিক··· ঠাট বজায় রাখতে হয় তাই হচ্ছে সবই। প্রাণ আছে না কি কারও খেলায়। তুমি আইলে কবে? বিহারেই আছ ত?

হ্যা।

সুধোদা'র সেই প্রাণখোলা আসর-মাতানো হাসি আর নেই মুখে। নেই আর অনর্গল কথা বলার উৎসাহ। সংক্ষিপ্ত, সঙ্কোচিত হয়ে এসেছেন তিনি। লুঙ্গিটা সামলে, সর্বাঙ্গে জল টানতে টানতে উঠে পড়লেন।

ইস্‌, কি শ্যাওলা জমেছে সিঁড়ির ধাপে-ধাপে। পা পিছলে যাচ্ছিল বিপিনের। পা টিপে-টিপে নামতে লাগল সে। এই অতি-পুরানো পরিচিত ঘাটেও পায়ের উপর তার বিশ্বাস নেই···

খাবার সময় মা বললেন: এখানে থাকা চলবে না আর। সবাই চলে যাচ্ছে। বাড়ী-ঘর যদি বিক্রী করা যায়, চেষ্টা দেখ।

লোভীর মত নারকেলের বড়াটা আপন মনে চিবোতে থাকে বিপিন। নিজেদের গাছের নারকেল, আলো চালের গুঁড়, ব্যাসন। একেবারে বিনামূল্যে মা তৈরী করেন অমৃত। কি লোভ ছিল বস্তুটির উপর ছোট-বেলায় বিপিনের। মনে হল এখনও যায়নি।

বিক্রি ত করতি চায় সকল শুদ্ধ সকলি। কেনবে কেডা?

ও-বাড়ীর যতীশ বলতিছিলো রেজা আলিরা নাকি খুব কেনা-কাটা করতিছে। সেই যে পুব-পাড়ার রেজা আলি, তোর সঙ্গে পড়ত।

যতীশ অর্থাৎ বিপিনের খুড়তুত ভাই।

রেজা আলিদের বেশ পয়সা-কড়ি হয়েছে আজ-কাল। কাকাদের সম্পত্তি পেয়েছে। তার উপর বিস্তর ধানী জমি। ধান-চালের চড়া দামে লাল হয়ে গেছে।

ওরা কি কেনবে?

না কেনে, বলে দেখ না। দু'খানা ত কিনিছে। কালী ডাক্তারের আর ভুবন সেনের। আমাদের এ-বাড়ীর কত্তই বা দাম হবে।

আচ্ছা; বলবানে।

দুপুরে একটু গড়িয়ে নেবার পর বিপিন মনে মনে ভাবতে লাগল কি করবে সে। দুঃস্বপ্নের মত সারা সহরের বুকে পরিবর্তনটা চেপে বসে আছে। চলে যাবার জন্য মনে-মনে সকলেই প্রস্তুত। গেছেও অনেকে। যাবেও অনেকে। তারাই বা এখানে থাকবে কাদের ভরসায়? গত দু'বছরের বিভীষিকাময় ঘটনাগুলির কথা মনে পড়ল। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে থাকবেই বা কিসের মায়ায়?

ঘরের কোণের ছোট টেবিলটার উপর দৃষ্টি পড়ল। তার পাশে টিনের চেয়ারটাও তেমনি আছে।

ওখানে বসে এই ত' সেদিন সে রাত জেগে গায়ে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে ম্যাটি কের পড়া তৈরী করেছে। শীতের কাঁপুনির মাঝে অতন্দ্র চোখে মুখস্থ করেছে কেমিষ্ট্রীর ফরমূলাগুলি। দিদি ধমক দিত। মা লণ্ঠনে তেল কম পুরতেন যাতে তাড়াতাড়ি নিবে যায় আলো।

অত রাত জেগে পড়তে হবে না। ঐ ত শরীর। বাঁচবি কি করে।

পুরানো বইগুলি টেবিলের উপর এখনও তেমনি সাজানো রয়েছে। ওর আর ভাই নেই যে পড়বে। তবু মা কাউকে দেননি বইগুলি। কি যে মমতা ও-গুলির প্রতি কে জানে। মুখ ফিরিয়ে নিল বিপিন। ডান দিকের জানলা দিয়ে উঠানটা চোখে পড়ে। এই ত এখানে সেদিন ছাদনাতলা পড়া হয়েছিল দিদির বিয়ের। সে দিদি অবশ্য অনেক আগেই মারা গেছে। তার পর বিনির বিয়ে হল। তা-ও ওখানে। উঠানটা আগাগোড়া শান-বাঁধানো—একটা পাশ শুধু কাঁচা। এ জায়গাটা বাবা পাকা করেননি। বিনির বাকি বিয়েতে কলা গাছ পোঁতা যাবে না। উঠানের অপর প্রান্তে ঐ নতুন রান্না-ঘরটা বাবা নিজে তদারক করে তৈরী করেছেন। রান্না-ঘর সম্বন্ধে বাবার ক্ষ্যাপামির কথা মনে পড়ল। বিপিনদের কোঠা বাড়াটা অনেক দিনের পুরানো। কাঁচা গাঁথুনি। বেশী বৃষ্টি হলে ছাদের নলের গোড়ায় জল জমত। চুইয়ে চুইয়ে জলও ঝরত তখন ভিতরে। রান্না-ঘর তৈরী করার সময় বাবা এ জল-জমা বন্ধের পরিকল্পনা বার করলেন। এবার নল বসানো হবে না। তার বদলে ছাদের কার্নিশের নীচে ফুটো রাখা হবে। দেওয়াল বেয়ে জল ঝরবে। জল জমবে না নলের গোড়ায়। রসিক মিস্ত্রী বললে রেগে: বলেন কি বাবু! দেওয়াল বেয়ে দরজা-জানলা দিয়ে জল যাবে যে ঘরে। যা বলি তাই কর, কঠোর আদেশের স্বরে বললেন বাবা। রসিক গজ-গজ করতে করতে তাই করল। বর্ষায় রান্না-ঘরের মেঝে থৈ-থৈ করতে লাগল জলে। রসিক বিজয়-গর্বে বলল: বলেছিলাম না। শেষে নলই বসানো হল। পুরানো দালানের ছাতে ওঠবার সিঁড়ি ছিল না। রান্না-ঘরে কাঠের সিঁড়ি হল। বিপিনের আর আনন্দ দেখে কে? ছাদের কোণে লুকিয়ে বাবার বইয়ের বাক্সের নিষিদ্ধ বইগুলি পড়বার একটা নিরাপদ স্থান হল তার। বঙ্কিম, গিরিশ, মাইকেল, বাঁধানো বসুমতীর গ্রন্থাবলীতে ঐ ছাদের কোণে তাদের সঙ্গে পরিচয় হয় বিপিনের। কতই বয়স তার। ক্লাশ সিকস্থ-এ ছেলে। সব বুঝত না ভাল করে, তবু যেন নেশার ঝোঁকে গিলে চলত।

এ-বাড়ীর প্রতিটি ইট কাঠ, প্রতিটি গাছ-পালা, অঙ্গন-প্রাঙ্গণ এক-একটি ইতিহাস বহন করছে। এ যেন সজীব প্রাণবন্ত কোন আপনজন। তারই বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন জীবনেতিহাসের অচ্ছেদ্য

জল! ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বিপিনের। বৃথা ভাবালুতা। জীবনের স্লেটের এই হিজিবিজি আঁকা-বাঁকা টানগুলি মুছে ফেলে নতুন করে সুরু করতে হবে তাকে। যেমন আর সকলে চেষ্টা করছে।

কলতলার উপরে নিম গাছের আড়ালে সূর্য্য আশ্রয় নিয়েছে। নিম গাছের সরু পাতাগুলির মাঝে ঝিলমিল করছে রোদ্দুর। কয়েকটা কাক ডাক করে আছে কলতলার উচ্ছিষ্ট বাসনগুলির প্রতি।

বিপিন বিছানায় উঠে বসল। দুপুর দুটো। পশ্চিমে নিম গাছের আড়ালে সূর্য্যটা ঢাকা পড়লেই বোঝা যাবে দু'টো বেজে গেছে। দল বেঁধে রাজমিস্ত্রীরা কি এখনও ফিরছে তেমনি আগের মত টুটপাড়ার পথে?

সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল বিপিন। বসল গিয়ে বাড়ীর সামনের সিমেণ্টের কালভার্টের উপর। বাড়ীখানার ছায়া পড়েছে কালভার্টের উপর। রাস্তার মাঝামাঝি পর্য্যন্ত গেছে ছায়াটা। খাঁ-খাঁ করছে রাস্তা। মোড়ের মাথার মিউনিসিপ্যালিটির সরকারী কলতলায় জড় হয়েছে উড়ে-মালিদের টিন, মুড়িওয়ালাদের মাটির কলসি, বালতি। উড়ে-মালিদের জটলা তখনও সুরু হয়নি কলতলায়। ৪টায় জল আসবে কলে। সাড়ে তিনটার আগে আসবে না তারা। জল আসলেই সুরু হবে কে আগে টিন পেতে রেখে গেছে, তার মীমাংসা নিয়ে এক পশলা ঝগড়া। কিন্তু চুণ আর সুরকি মেখে ধূলি-ধূসরিত দেহে রাজমিস্ত্রীর দল ফিরছে না ত এখন টুটপাড়ার পথে?

ক্লান্ত দুপুরে কত দিন বিপিন দেখেছে সহরের এই অলস ছবি। ভারী ভাল লাগে তার। আজ ত কোন মিস্ত্রিকে ফিরতে দেখছে না বিপিন—এই প্রয়োজনীয় প্রশ্নটা পেয়ে বসল বিপিনকে।

হঠাৎ চোখে পড়ল আকবরকে। পাঁচ মাথার মোড় থেকে সে যাচ্ছিল টুটপাড়ার দিকে।

বিপিন ডাকল আকবর, ও আকবর!

আকবর ফিরে দাঁড়াল।

কাজে যাওনি?

কাজ কোথায়? রাজমিস্ত্রী আমরা ত বিড়ি বাঁধতিছি। করাবে কে কাজ?

বিপিন ঘরে ফিরে এল। রোদটা এখনও বেশ চড়া। এখন বার হওয়া যাবে না। পাঁচটার পর বার হবে। হ্যাঁ, রেজা আলির কাছেই সে যাবে একবার। পুরানো দিনের স্মৃতির মমতায় লাভ কি নিজেদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার ভরে রেখে? যদি সে পায় কোথাও নিরাপদ পোতাশ্রয়, কেন ফেলবে না সেখানে নোঙর! হিরুরা, মন্নু, বুলু মল্লিকের সৌহৃদ, কাউন ক্লাব-ইউনিয়ন স্পোর্টিংএর উন্মাদনা, ধলা-মাধুর গাড়ী, রেলওয়ে কলোনীর কৃষ্ণ গাছের স্মৃতি, কলনাদিনী রূপসার রোদ-পড়া চিকচিকে ঢেউ মুছে যাক এ-সব তার জীবন থেকে। নূতন পরিবেশে আবার সে সুরু করবে নূতন হিরুরা, মন্নু, বুলু মল্লিকদের নিয়ে।…হ্যাঁ। রেজা আলিরই শরণাগত হবে সে।

কাঁপতে থাকে বিপিনের বুক রেজা আলির বাড়ীর সামনে এসে। যন্ত্রাবিষ্টের মত উঠে পড়ে রেজা আলিদের সামনের বারান্দায়। হিরুরা, মন্নু, বুলু মল্লিক, কাবার দোকান, কাউন ক্লাব-ইউনিয়ন স্পোর্টিং, বাবা, দিদি, মিনি, রূপসা, রেলওয়ে কলোনীর মাঠ, ধলা-মধুর তেজী ঘোড়া—লুপ্ত হয়ে যাক তার জীবন থেকে। সে কঠিন হবে। হবে বস্তুতান্ত্রিক। ছেলেমানুষী এই ভাবালুতা। হে অজানা, হে অজ্ঞেয়, তোমার বন্ধুর পথে পা বাড়াল বিপিন। চলার পথে তুমি তাকে শক্তি দিও, শান্তি দিও, অমূল তরুর অসহায়তায় তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিও না মহাকালের ধ্বংস-স্তূপে।

রেজা আছিস্: কড়াটা আস্তে আস্তে নাড়তে লাগল বিপিন।

দুপুরের ঘুম-জড়ানো চোখে বেরিয়ে এল রেজা।

আরে বিপিন যে, কি মনে করে?

না, না, না। অকস্মাৎ মনের বাঁধন শক্ত করে ফেলল বিপিন। তার ধূল্যের স্বর্গ সে নিজ-হাতে ধ্বংস করবে না। এ তার দুর্লভ সম্পদ—কোন মূল্যে হবে না এর ক্ষতিপূরণ। মহাবিশ্বের আর কোন প্রান্তে পড়তে পারবে না সে এর বিকল্প।

স্বরে স্বাভাবিকতা টেনে বলল বিপিন: এই আলায় তোর সঙ্গে দেখা করতি—কেমন আছিস?

বস: একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল রেজা। নিজে বসল সামনেরটায়।

দুই সহপাঠীতে মাতল গল্পে।

বাড়ী বিক্রীর প্রস্তাব তুলল না বিপিন।

মায়ে মা জিজ্ঞাসা করলেন: গিছলি রেজার কাছে?

হাঁ। ওরা কেনবে না।

• ২১

আজ যা হক একটা কিছু হয়ে যাবে। তাই যথেষ্ট লোক-সমাগম হয়েছে।

মেহেরপুরের বাঁকে একখানা প্রকাণ্ড কোষ নৌকা নোঙর-করা রয়েছে। সাত-পাঁচ জন মাল্লা কোনও কাজ নেই, বসে বসে ঝিমোচ্ছে। আজ যাই কাল যাই করে প্রায় দু'সপ্তাহ কেটে গেল, তবু বন্দিবস্তান হয় না—খরিদ্দার মেলে না, যাওয়াও হয় না। সেন মশাই মহা বিরক্ত হয়ে গেছেন। আজ যা হক একটা কাওয়ার-কিনার করতেই হবে। খাজনা থেকে বাজনা এবার বেশী হয়ে গেল। তালুক বেচে যে টাকা পাবেন তা যদি মাঝি-মাল্লার জাঁক-জমকে খরচ হয়ে যায় তবে আর লাভ রইল কি। বড়লোকের বড় সখ। তিনি মরে গেলেও কি কোষ নৌকা পেয়াদা-সিপাই না নিয়ে এ মহালে আসতে পারেন। তাঁদের পূর্বপুরুষরাও কি কেউ বিনা জাঁক-জমকে এখানে এসেছেন।

এক কালে এদিকের সমস্ত চকগুলিই তাঁদের ছিল। যেখানে নৌকা ভিড়েছে সেখানেই সহস্র হাতের সেলাম পেয়েছেন। কত ভেট-নজর খাসি পাঠা মদ ঘি মশল্লা যে প্রজারা নিয়ে এসেছে তার কথা ভাবলে আজ স্বপ্ন বলে মনে হয়। যখন সমস্ত সরিকের তিনিই কমন-ম্যানেজার ছিলেন, তখন তাঁর পূর্ণ যৌবন। তিনি অসংযম ও ব্যভিচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন এ মুলুকে। এখনও তাঁর নাম শুনলে লোকে শিউরে ওঠে। নিঁখুত মেয়েমানুষ ব্যতীত তিনি ভুলেও কারুর কোন আর্জি মঞ্জুর করেছেন বলে তাঁর মনে নেই। দিনের মধ্যে তিনি তিন-তিনটা মেয়েমানুষও অদল-বদল করে চেখে দেখেছেন। ছেনে নিংড়ে ভোগ করে দেখেছেন স্ত্রী-দেহ। তিনি ছিলেন এ দেশের জমিদার—মূর্তিমন্ত অভিশাপ। মদে-মাগীতে চুর।

তাঁর পেশা ছিল দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রজা-শাসন এবং হীন-বীর্য সরিক-লুণ্ঠন। হঠাৎ একটা মেয়েমানুষ খুন হয়—প্রতিবাদ করতে এসে গুম হয় তার পিতা। ভাইটা লাথি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে নদীর জলে। একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় ডাকিনী ডাকায়। মেয়েটা মুসলমানের হলেও হিন্দুরা সমবেত হয়। আসে পুলিশ—জোর দেয় মরা সরিকেরা। মামলা চলে—ঘোর মামলা। তিনি অতি কষ্টে বাঙালী পুলিশ সাহেবকে বাধ্য করেন ইংরেজ রাজার নম্বরী ছাপওয়ালা টাকার বকলোশ পরিয়ে। সাহেবটি প্রজা ও মনিবের মধ্যে পড়ে একটা নিরপেক্ষতার ভাণ করে সে যাত্রা বাঁচিয়ে দেন সেন মশাইকে। প্রাণে বাঁচলেও তাঁকে যে কস্তুরীভৈরব করতে হয়েছিল তার ঠেলায় এ সেনদের জমিদারী গেল পাঁচ আইনে নিলাম হয়ে। দু'-একটা তালুক-মুলুকও যায় সেই ধাক্কায়। প্রজারা তাঁকে এখনও মহারাজ বলেই ডাকে।

কিন্তু তাঁর হাসি পায়। তিনি কি সেনবংশীয় শেষ মহারাজাধিরাজ? রাজ্য গেছে কিন্তু সেতাকটা এখনও দাঁত বের করে হাসছে। মেয়েটার নাম ছিল মরিয়ম। মরিয়ম মরেছে, কিন্তু মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে গেছে ডাকিনী ডাকার বর্বর উদ্ধত অত্যাচারের।

সন্ধ্যা অতীত। কোষ নৌকার বড় কামরায় একটা ডে-লাইট জ্বলছে। মাঝখানে একটা ছোট টেবিল—তার দু'পাশে দু'খানা চেয়ার, সুমুখে একটা বেঞ্চ—বেঞ্চটার ঠিক বিপরীত দিকে একখানা আরাম-কেদারায় স্বয়ং সেন মশাই উপবিষ্ট। তিনি অম্বুরী তামাক টানছেন। সুগন্ধে কামরাটা ভরে গেছে। কামরাটার গায় বড় বড় ফ্রেমে আঁটা অনেকগুলি বিলাতি ছবি। তার মধ্যে অর্ধনগ্ন নারী, উলংগ নর্তকীর মূর্তিই বেশী। সেগুলির অযত্নে রং নষ্ট হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। সব চেয়ে যেখানা সুন্দরী রমণীর চিত্র, সেখানাই বড় বেমানান দেখাচ্ছে—বুড়ো সেন মশাইর মত অনেক কিছুই গেছে যেন গড়িয়ে তার দেহের ওপর দিয়ে, তবু কাল তাকে ক্ষমা করেনি। তার অব্যর্থ সন্ধানে রমণী নেত্রহীনা।

এগুলি সেন মশাই ও তাঁর স্বনামধন্য পূর্বপুরুষদের মার্জিত রুচির পরিচায়ক। যৌবনের প্রমোদ-তরী, অদৃষ্টের পরিহাসে আজ বার্ধক্যের বিক্রয়-বিপণীতে পরিণত হয়েছে।

ঘোষালেরা তিন ভাই, এজেন্তজিরা পিতা-পুত্রে এবং সদল বলে বিপ্রপদ এসেছেন। দীনুও এসেছে। কিন্তু সে একটু দূরে সরে বসেছে—ঠিক কোন্ দলের বোঝা যায় না। সে একটু একটু হাসছে। এ হাসির অর্থ যে তার মনবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়েছে। বাঘে-ঘোষে লড়াই বেধেছে।

• • •

• বিপ্রপদ ভাবছেন: দীনুদা তাঁর স্বপক্ষে থেকে বিপক্ষকে কটাক্ষ করছে—আর ঘোষালেরা ভাবছে ঠিক তার উল্টো। এজেন্তজি ভাবছে যে তার কাছ থেকে যে টাকা পাঁচটা কর্জ নিয়ে দীনু মুদী-দোকান ফেঁদেছে, এ হাসি সেই টাকারই সুদের হাসি। ক্ষুরের মতই শাণিত কিন্তু বক্র তার অর্থ।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত তামাক টেনে টেনে সেন মশাই বললেন, 'কত কথাই তো হলো—কিন্তু কেউ তো টাকার কথা বলছেন না? লজ্জা করলে যে যার আমাকে গোপনেও বলতে পারেন। আমি কারুরটা কেউকে বলব না।'

ঘোষালেরা যেখানে বসেছে ঠিক তার পাশেই একটা কামরা—একটা পর্দার অন্তরালে একটি মহিলা উপবিষ্টা। সে খোপেও একটা বাতি জ্বলছে। বাতির আলো উজ্জ্বল, ততোধিক উজ্জ্বল তাঁর তপ্ত গৌর কান্তি। মুখে একটা অনমনীয় দৃঢ়তা। তিনি দু'টি সরিকের অভিভাবিকা। বললেন, 'আপনি একটা দর চাইলে তো খরিদ্দারেরা

দক্ষিণের বিল

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

যা-হক একটা কিছু বলবেন। না আপনি তা আমার সমুখে খোলসা করতে চাইছেন না? তাই গোপন এবং গড়িমসি।'

'সে কি, সে কি কথা বৌঠান—এ সব বলছেন কি! আমি কি নাবালক ভাইদের ঠকাব না কি? আমার টাকা কে খাবে? ওরা ছাড়া আমার কে আছে?'

'থাকা না থাকার কথা হচ্ছে না—এখন একটা টাকার অংক বলুন, আমিও শুনি, যাঁরা এসেছেন তাঁরাও জানুন, তা না হলে মাথা-মুণ্ডু কি বলবে?'

দীনু বলে, 'মহারাজের ধৈই ধরিয়ে দেওয়া উচিত, নইলে বোঝা-বুঝি হবে কি নিয়ে?'

দাড়িতে হাত বুলিয়ে এজেজদি একটু হাসে।

দীনু আবার বলে, 'এঁরা সব তীরন্দাজ—লক্ষ্যটা তো এঁদের সমুখে উপস্থিত করবেন! মহারাজ, রাজধর্মে ভুল করছেন কেন? এ-ও তো একটা স্বয়ম্বর সভা।' দীনু হাসে।

সেন মশাই নীরবে সে হাসির অর্থ গ্রহণ করেন।

'তালুকটা একটা জমিদারীর সামিল—এর দাম কম পক্ষে বার হাজার টাকা। সেই বার হাজার টাকা না পেলে আমাদের বিক্রি করার কোন লাভই থাকে না। ওর কমে আমরা হস্তান্তর করবও না।'

এজেজদি কঞ্জুষ প্রকৃতির লোক। দামটা শুনে বলে ওঠে, 'হোবান আল্লা,—আমার গো কম না তালুক কেনা।' সে তৈল-সিক্ত টুপীটা খুলে ফুঁ দিয়ে আবার মাথায় পরে।

ব্যস্ত হয়ে দীনু বলে, 'কেন, কেন বার হাজার চাইলেই কি বার হাজার দিতে হবে? চাওয়া আর দেওয়া এক কথা নয় তালুকদার সাহেব। অস্থির হয়ে কি সওদা করা যায়?'

ঘোষালেরা বার হাজার তো দূরের কথা বার আনায় পেলেও আর এজমালীতে কোনও সম্পত্তি খরিদ করবে না। তারা খরিদ্দারের ছদ্মবেশে এসেছে বিপ্রপদর ক্রয়ে বিঘ্ন জন্মাতে। এজেজদি বাস্তবিক বিপ্রপদর প্রতিযোগী। সে উঠে যায় দেখে, তারা তিন ভাই ধরে বসায়। অবশ্য এর মধ্যে দীনুরও ইসারা আছে।

সে বলে, 'মহারাজ, আপনি যদি নামমাত্র মূল্যে বিপ্রপদকে দিয়ে যান তবে তারা রাখতে পারে। না হলে ওর পক্ষে অসম্ভব। কারণ এর পরেও যথেষ্ট অর্থব্যয় আছে হাতী পুষতে।'

দ্বিতীয় কামরা থেকে তীব্র স্বরে মন্তব্য হয়, 'তার চেয়ে দান করাই ভাল। হাতী দান ঘোড়া দান তো রীতিই রয়েছে হিন্দুদের।'

'বিপ্রপদ যে কায়স্থ, মহারাণী? দান গ্রহণ করবে কে?'

'তবে ঘোষালদের জিজ্ঞাসা করুন—তাঁরা তো ব্রাহ্মণ। লাখ টাকায়ও ব্রাহ্মণ না কি ভিখারী!'

'বৌঠান, এ সব ব্যংগে লাভ কি! সকলে শুনুন—আমি যা চাই না কেন, আপনারা কি দিতে পারবেন একে একে বলুন, বিপ্রপদ বাবু?'

বিপ্রপদর হ'য়ে ইসমাইল মিঞা বলে, 'পাঁচ হাজার।'

এজেজদির জিদ হয়, সে দাঁড়িয়ে বলে, 'ছ' হাজার।'

ইসমাইল মিঞা বলে, 'সাড়ে ছ হাজার বাবু দেবে ওন্যা।'

এজেজদির ছেলেটা ফস উঠে বলে, 'সাত হাজার দেবে বা'জান ব্যাপারি বেইচ্যা।'

ইসমাইল মিঞা জবাবে ডাক আরও চড়ায়। 'জেলের ভাত কুত্তায় খায়—দিবু সাড়ে সাত হাজার, দিবু আট হাজার, দেহি কেডা রাখতে পারে। আমরা কি মরইয়া গেছি না কি?'

এজেজদি চুপ করে থাকে। তার ছেলেই সকলকে স্তম্ভিত করে বলে, 'দিবু দশ হাজার, দিবু পোনর হাজার—যা লাগে হাড়া থাড়া বেইচ্যা দিবু। হইছে কি? কেনতে আইছি কিনইয়া যাবু।'

ঘোষালেরা হাসতে থাকে। দীনুও পা নাচাতে নাচাতে মুখ টিপে হাসে। বিপ্রপদ হাসেনও না কিছু বলেনও না। তাঁর বুকটা ঢিব-ঢিব করছে।

সেন মশাই একটু স্মিতমুখে বলেন, 'আহা উত্তেজিত হয়ে লাভ কি? সেই বার হাজার দিতে রাজী আছ এজেজদি? চৌদ্দ পনর হাজার বাত্‌কে বাত্‌ কথা।'

ঘোষালেরা বলে, 'রাজী আবার না? নিশ্চয় রাজী আছে।'

'তা হলে এখনই বায়না-পত্তর করো। কি ঘোষাল মশাইরা, আপনাদের কি কোনও আপত্তি আছে? বিপ্রপদ বাবু আপনার?'

ঘোষালেরা প্রায় সমস্বরে বলে ওঠে, 'না না, কিছু না। এজেজদি রাখাও যা আমরা রাখাও তাই। ও বুদ্ধিমান, পয়সা-ওয়ালা বড় লোক, ওর সঙ্গে যাবো একটা সামান্য তালুক নিয়ে ডাকাডাকি করতে! আমাদের তো কত রয়েছে, ওর সখ হয়েছে, ও রাখুক। এখন চলি—সেন মশাই নমস্কার! নমস্কার বিপ্রপদ বাবু!'

টাকার অংক শুনে বিপ্রপদ নীরব—এবং তার পক্ষের লোকজনও।

রাগে-দুঃখে ইমাম দাঁতে দাঁত ঘসতে থাকে। টাকার কাজ তো মুখের কথায় সারে না।

দীনু বিপ্রপদর কানে কানে বলে, 'ভালই হয়েছে। মূর্খের মত অর্থব্যয় করার কোন পৌরুষই নেই। এমন দিন আসবে যে এজেজদি সেধে তোমায় তালুক দেবে। ওটার কাজ কি তালুক রক্ষা করা? গো-মূর্খ, তা না হলে বার হাজার টাকা দিয়ে কি কেউ রাখে তিন শো টাকা মুনফার তালুক! চলো, আমরাও এখন উঠে পড়ি। রাত কম হয়নি। ঐ ঘোষালেরা তাদের নৌকা ছাড়ল।'

ব্যংগহাস্য-মুখরিত একখানা নৌকা জানালার কাছ দিয়ে ভেসে যায়।

দীনু অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, এখনও সন্ধ্যাহ্নিক বাকী।

বিপ্রপদ বিমর্ষ মুখে বসে থাকেন।

ইমাম আর সহ্য করতে পারে না। সে বলে ওঠে—'দিবু সেই বার হাজার—দিবু আমার সব জমি-ঘ্যাত বেইচ্যা বাবুরে টাহা। এহনও কি চাবে না মহারাজ পুরান পেয়জার দিকে? পুরান ছাওয়াল কি বাঘের ডে বেইচ্যা খাবে? পরকালের ভয় নাই একটুও।'

কিন্তু ইহকালের, বিশেষত বর্তমান কালের হিসেবী সেন মশাই চোখের জলে ভোলেন না। তিনি এ সব অনেক দেখেছেন—তাই ইস্পাতের মত দৃঢ় হয়ে থাকেন।

কিন্তু নৌকার মধ্যে এক জন অশ্রুমুখী হয়ে ওঠেন। তিনি দুরু-দুরু বক্ষে অপেক্ষা করতে থাকেন।

এজেজদির ছেলেটা ক্ষেপে ওঠে, 'আর এক হাজার বেশী দিলে হইবে কি? আমরা পুরান পেয়জাও না খাইওও না, আমরা দিবু আক্কেল-সেলামী।'

বিপ্রপদ উঠে পড়েন, আর না, যথেষ্ট হয়েছে। লোভ এবং লাভ এদের মনুষ্যত্বের গণ্ডী থেকে অনেক দূরে টেনে নিয়ে গেছে। 'চলো মায়, আমরা যাই, ভাগ্যে থাকলে যথেষ্ট সম্পত্তি হবে। নমস্কার সেন মশাই, নমস্কার।'

বুড়ো সেন মশাই সেদিকে ফিরেও তাকান না। এন্তেজদ্দির ছেলেকে লক্ষ্য করে বলেন, 'দাও বায়নার টাকা—এক্ষুণি লেখাপড়া হক। নায়েব, নায়েব!'

'এই যে মহারাজ, হাজির।' বলে, বৃদ্ধ নায়েব বিড়ালের মত এগিয়ে আসে। এটি তাঁর যৌবনের সহচর। অনেক প্রসাদীকৃত মদ ও মেয়েমানুষ এটি ভক্তিভরে মহারাজের উচ্ছিষ্ট পাত্র থেকে এক কালে গ্রহণ করেছে। তাই সব কর্মচারী একে একে বিদায় হলেও নায়েব কৃতজ্ঞতা-পাশ ছিন্ন করতে পারেনি।—কত কটূ ভাষা, বল-প্রয়োগ, ঘাড়-ধাক্কা সে বেচারা সয়ে টিঁকে আছে! বেতন পায় না তবু ব্যভিচারের সঙ্গী, মনিব-চাকরের অংশাংশী নরকটুকুর নেশা আজও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এ নেশা এমন চিত্তহারী যে জীবনে কোনও দিনই কাটবে কি না সন্দেহ।

এতগুলো টাকার কথা শুনেও নায়েব ব্যস্ত হয় না। এমন কত বার-তের হাজারের যে বায়না-পত্র সে লিখেছে তার কাগজপত্র অদ্যাবধি তার জিম্মায় আছে। অনেক হিসাব তার মুখস্থও হয়েছে। জমিদারী গেল পাঁচ আইনে নিলাম হয়ে, তার পর কত যে তালুক বেচা হলো, খাসের জমি পত্তন দেওয়া হলো, কিছুতেই খরচ আর পোষায় না। হিসাব হয় প্রতিবারই কিন্তু খরচ হয় হিসাবের বাইরে। আয় করে খাওয়ার প্রশস্ত পথ ছিল জমিদারী, সেটা গিয়ে আসল ভেঙ্গে খাওয়া শুরু হয়েছে। বয়স ও অবস্থার ভাঁটার সংগে সংগে মেয়েমানুষ অবশ্য ভাঁটিয়ে তলিয়ে গেছে। কিন্তু প্রিয়পাত্রের কাছে সহস্র গেলাসের অজস্র বুদ্বুদের রঙিন খোসবু লগ্নি করে রেখে গেছে, সে নাগপাশ সেন মশাই এখনও এড়াতে পারেননি। সমস্ত বেচে-কিনেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে এক ফোঁটা মুখে দিয়ে মরতে হবে। নায়েব তা জানে, তাই ভাবে: এ বার হাজার কিম্বা তের হাজারের ভাগের ভাগে আর ক'দিন চলবে! এবার করবেন কি! দামী এবং বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি তো এইটাই শেষ।

নায়েব বিরস মুখে বলে, 'কই, টাকা দাও!'

এন্তেজদ্দির ছেলে বলে, 'বা'জান, এহন টাহা দেও—বায়না করো।'

এন্তেজদ্দি এতক্ষণ নীরবে সব শুনছিল, সে বলে উঠল, 'পাডাডা টাহা দিবি তুই। তুই না কইছ বার হাজার না তের হাজার। আমার ডে কিছু জিগাইয়া কইছ? আমি ঠেকছি কি সে যে টাহা দিমু? তুই আমার এডাও রাখতে পারবি না। তুই আমার পোলা তো না একটা পাডা—হাল ছাড়া হইয়া পাডা তুই এহানে থাক, আমি যাই।' সে রাগে গর্‌গর্ করতে করতে কোষ নৌকা থেকে বেরিয়ে পড়ে।

ছেলেটাও অপ্রতিভ হয়ে পিছু নেয়। ক্রুদ্ধ পিতাকে প্রবোধ দেয়, 'রাগ হইও না বা'জান, আমি কি কিছু বুঝি না কি? আমি যে তোমার নাবালক পোলা!'

'বাইশ বছর বয়স হইল এহনও তোর নাক দিয়া দুধ গলে! খাসতা[illegible] যে জবাই দিয়া বাবুরা সব সরাইয়া নেছে। আর, আমাগো তালুক-[illegible]কে কাম নাই। আমরা ফুলের ক্ষ্যাতে গাজাইয়া পয়সা কামাই করি, আমাগো সেই ভাল। এহন চল্ খাসীর-পো খাসী! চল্ চল্।'

ওরা ডোঙ্গায় উঠে ভাটা দেয়।

সেন মশাইর চোখের ও মুখের ওপর কে যেন কালি মেড়ে দেয়।

এবার দুর্দান্ত সেন নিরুপায় হয়ে বিপ্রপদকে অপেক্ষা করতে বলেন। 'দেখুন আপনি ভাগ্যবান, এ তালুক আপনার কপালেই আছে। এখন সব-দস্তর আপনার কাছে। আমি জানি ওরা কেউ তালুক রাখবে না—ওদের আস্ফালন বৃথা।' বলতে বলতে সেন মশাই নিস্তেজ হয়ে পড়েন। এখন আপনার দয়া, বুঝে-সুঝে যা হক আজই করে যান—আমি কাল নৌকা খুলতে চাই। বড্ড খরচ—আর সামলাতে পারি নে।'

ধার-করা পেয়াদা-সিপাই, ঠিকা-করা নৌকার মাঝি-মাল্লা সব অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। এদের এক সপ্তাহের কথা বলে এনে প্রায় দু'সপ্তাহ কাটিয়ে দিয়েছেন—আর একটি দিনও এরা থাকবে না। গিয়েই তো এদের বিদায় করতে হবে নগদ টাকা দিয়ে। ক্রয়-বিক্রয়ের এরা ধার ধারে কি! একটু বেতাল হলে সব গোমর ফাঁক হয়ে যাবে। ঠাঁট যাবে গুঁড়িয়ে।

ভিতর থেকে মহিলাটি বলেন, 'এবার ঠাকুরপো ঠেকে সোজা পথ ধরেছেন। টাকা-কড়ি এক দিকে আর প্রজার মনস্তুষ্টি এক দিকে। শুনেছি, পূর্বে কর্তারা এ সব খুব বিবেচনা করেই করতেন।'

দীনু বলে, 'ঠিক বলেছেন মহারাণী! আমিও ভাবছিলাম, রাণী-মা যখন উপস্থিত রয়েছেন তখন বিপ্রপদর ভাবনা কি! আর জন্ত বিশেষতঃ এই মুসলমান প্রজাদের জন্ত তিনিই তো ঢেলে দেবেন করুণার স্নেহধারা। মা, আপনাকে প্রণাম, আপনি জগন্মাতা।'

কথাবার্তা একটা স্থির হয়—টাকার অংক কমের দিকেই যায়—বায়না বাবদ নগদ দেওয়া হয় কিছু—সপ্তাহ মধ্যে দলীল রেজিষ্ট্রী হবে। সেন মশাইর হিসাবে গরমিল বাধে—আয় করতে গিয়ে ব্যয়ের অংকটা দাঁড়ায় মোটা, তবু বিপ্রপদর প্রস্তাব স্বীকার করে নিতে হয়।

ইসমাইল মিঞা, ইমাম খুবই খুশী হয়েছে। বিপ্রপদও খুশী—শুধু মুখ শুকিয়ে গেল দীনুর। এত দিন বসে যা ভেবে-চিন্তে মোক্তারদের সাথে পরামর্শ করে সাজিয়ে-গুছিয়ে এনেছিল, তা বানচাল হয়ে গেল। তা ছাড়া এন্তেজদ্দির কাছ থেকে যে পাঁচ টাকা আনা হয়েছে তাও ফিরিয়ে দিতে হবে। তালুক যখন কিনে নিতে পারল না তখন টাকা রাখবে কি করে? এবার দোকানটিও গেল!

সপ্তাহ কাল মধ্যে দীনুর হবে সর্বনাশ আর বিপ্রপদ হবেন গাঁয়ের ভিতর মহারাজাধিরাজ—এর চেয়ে ওর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ!

নৌকা চলে, হাসি-গল্প হয়—দীনু হিংসায় অন্তরে অন্তরে জ্বলে-পুড়ে মরে।

ঘাটে এসে নৌকা থামতেই সবাই উঠে গেল দীনুকে কেউ ডাকল না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মাঝি বলে, 'ঠাহুর ভাই, ঘুম ভাঙছে? ওঠেন, সকলডি চলইয়া গেছে।'

দীনু ধড়মড় করে উঠে বসে। চোখ রগড়ায়, হাই তোলে—পরে নেমে যায় নৌকা থেকে। 'সকলে চলে গেল, এখন যাই কি করে—যে পিছল পথ, তাতে ঘোর অন্ধকার।'

'তাগো দোষ কি ? তারা তো ভাবছে আপনে ঘুমে।'

এ যে কি ঘুম তা দীনুর বুঝতে কষ্ট হয় না। বাবানলের পর নিস্তব্ধতা।

'চলেন, আমিও বাড়ীর মধ্যে যামু।' একটা লণ্ঠন নিয়ে মাঝি নেমে আসে। চার দিক ঘুটঘুটে অন্ধকার, বর্ষাকাল—জল-কাদায় হাঁটু সমান। মাঝি আগে আগে যায় পথ দেখিয়ে দীনু যায় পিছে পিছে।

বোসেদের বাড়ীর ভিতর থেকে উলুধ্বনি শোনা যায়—কমল-কামিনী হয়ত বায়না-পত্রখানা বরণ করে ঘরে তুলছেন, হয়ত গ্রাম্য প্রতিবেশীদের ডেকে পান-বাতাসা বিলাচ্ছেন।

দীনুর মন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে অন্ধকার অগ্রাহ্য করে, মাঝিটাকে একা ফেলে ভিন্ন পথ ধরে।

চিরদিনই তার অভিযান এইরূপ ভিন্ন পথে।

১২

কবলা রেজেষ্ট্রী হয়ে গেছে কাল—তাই একটা ছোট-খাট প্রীতি-ভোজের আয়োজন করেছেন কমলকামিনী ও বিপ্রপদ। হিন্দু মুসলমানের পৃথক্ পৃথক্ বন্দোবস্ত হ'য়েছে। হিন্দুরা খাবে বাড়ীর ভিতর, মুসলমানরা খাবে বাইরে রেঁধে। কমলকামিনী মেয়েদের নিয়ে তাই জোগাড় করে দিতে ব্যস্ত। ইমাম না কি রান্নায় ওস্তাদ, সে নিয়েছে তাদের স্বজাতির রান্নার ভার। একটা উনুন তৈরী করে তার চারি দিকে ঘেড়া দেওয়া হয়েছে নাট-মন্দিরের দক্ষিণ দিকের বড় আম গাছটার তলায়। অমরেশের আজ আর আনন্দ ধরে না—সে যেন ইমামের সহকর্ম্মী। কারুর নিষেধ সে শুনছে না—এই জল আনছে, এই পাতা কেটে দিচ্ছে, বার-বার হুকুম করছে বিনুকে। প্রয়োজনের তাগিদ আসারও আগেই সব জোগাড় করে আনছে, তরি-তরকারী ধুয়ে আনছে ঘাট থেকে। ছোট কাল থেকে সে মা ও বাবার কাছে যা শিখেছে তাই শিখিয়ে দিচ্ছে বিনুকে। তা ছাড়া ইমামদের বাড়ী গেলে যা আদর-যত্ন পায় তার বিনিময়ে সে আজ চুপ করে থাকবে কি করে ?

বিপ্রপদ ছেলের রকম-সকম দেখে হাসেন। শ্রীমান একেবারে হাঁপিয়ে গেছে। ফুটফুটে মুখখানা ঘেমে রাঙা হয়ে উঠেছে।

কমলকামিনী এসে বলেন, 'ইমাম, আমার ইচ্ছা করে তোমাদের নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতে, কিন্তু তোমরা তা খাবে না—খেলে দোষ কি ?'

'কিছুই দোষ নাই মাঠাইন। ভাবলে আমরা সকলড়ি এক। কিন্তু তোমরা যে আমাগো ঘরে ওঠ্‌তে দাও না, আমরা ক্যান খামু তোমাগো হাতে ?'

'তুমি ঘরে উঠলে—আমাদের ভাতের হাঁড়ী ছুঁলে কি হয় ইমাম সত্যি সত্যি আমি বুঝতে পারি নে ! অথচ তুমি তো জান না, আমার এক দূর-সম্পর্কের মামা বিলাত থেকে এসে ঘরে না কি রান্নার জন্য মুসলমান বাবুর্চি রেখেছেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধব আসছে-যাচ্ছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, তাতে তো তাঁর কিছু হয়নি। কিন্তু এ কথা এদেশে কেউ শুনলে শিউরে উঠবে—দশ হাত পিছিয়ে যাবে। আমার ছেলে আজ খাবে না আমার হাতে, উঠতে পারবে না আমার ঘরে—এ ব্যবস্থা নিতান্ত অচল।' কিন্তু তিনিই কি পারেন সচল করে নিতে ? না, তা পারেন না। তাঁর সংস্কারে বাধে। কেন বাধে এর সঠিক জবাব খুঁজে পান না। নিতাই ও ইমামের ভিতর কি পার্থক্য—যখন এক জন আসবে ঘরে ঠিক তখনই আর এক জন থাকবে নীরবে বাইরে দাঁড়িয়ে ! তিনি একটা ব্যথা নিয়ে ইমামের সুমুখ দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান।

কিছুক্ষণ বাদে আবার তিনি ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার এখন আর কি কি লাগবে ? কোন জিনিষের অভাব হলে আমাকে জানিও।'

'তা আমায় আর জানান্ লাগবে না—দাদু-ভাইরা আমার খিদ্যাও করিত-কম্মা।' বলে ইমাম একটা সপ্রশংস দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অমরেশ ও বিনুর দিকে।

'অমরেশ, আজ আর তুই কিছু খেলি নে সকালে ? বিনু তো খেয়ে এসেছে। আয়, চারটি গরম-গরম ভাত কুটন্ত ডাল দিয়ে খেয়ে যা। বাবা, নইলে পিত্তি পড়ে অসুখ করবে তোমার।'

'মা একটু থামো—এই কাঠগুলো সাজিয়ে রাখি।'

'কাঠ আমি সাজিয়ে রাখছি, তুই খেয়ে আয়—যা।'

'তুমি পারবে না, আবার ভিজে কাঠ রাখবে ওপরে সাজিয়ে—কত কষ্ট হবে মিঞা-ভাইর রাঁধতে।'

'ইস্, বড্ড দরদ তো দেখছি মিঞা-ভাইর জন্যে। বড় হয়ে এ দরদ থাকলে বাঁচি।'

'তহন ভুলইয়া যাবে বিত্তাশে গিয়া। কি দাদু-ভাই, ঠিক কইছিনি ?' বলে ইমাম অমরেশকে বুকের মধ্যে টেনে আনে, 'কি, ভুলইয়া যাবা না কি ?'

জবাবে অমরেশ কিছু বলে না। কিন্তু মিঞা-ভাইকে সে কিছুতেই ভুলবে না এমনই একটা দৃঢ়তা তার মুখে-চোখে ফুটে ওঠে। তা ইমাম ও কমলকামিনীর দৃষ্টি এড়ায় না।

ইমাম বলে, 'যাও এহন কিছু খাইয়া আস্তো দাদু-ভাই।'

'না, একটু পরে যাবো—এখন না।'

কমলকামিনী জোর করেই তাঁর আঁচল দিয়ে অমরেশের সুকুমার মুখখানি মুছিয়ে দেন। 'চল আমি ভাত বেড়ে দেবো—চারটি খেয়ে আসবি, এখন তো কত দেরী।'

'যাও দাদু-ভাই, যাও।'

'হ্যাঁ রে অমরেশ, তুই রাঁধতে পারিস ? বল্ তো মাছের ঝোল রাঁধে কি দিয়ে ?'

'আমি আবার রাঁধতে জানি নে ? মাছের ঝোল তো সহজ, অম্বলও রাঁধতে পারি।'

'আয়, খেতে বসে আমায় বলবি চল।'

রান্না-ঘরে এসে একখানা পিঁড়ি টেনে এনে অমরেশকে বসতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'এখন বল্।'

'শুনবে কি করে রাঁধতে হয় অম্বল ?'

এক গ্রাস ভাত ছেলের মুখে তুলে দিয়ে বলেন, 'শুনব না আবার ! বলে যা।'

'আগে ধ'নে-লঙ্কা দিয়ে তার পর দেবে তেঁতুল।'

'বেশ ঝাল-ঝাল হবে, কেমন অমরেশ ?' কমলকামিনী হাসি চেপে থাকেন।

'হুঁ, বেশী না, একটু-একটু ঝাল হবে।'

এমন সময় বিমলা এসে পড়ে। 'কিসে ঝাল হবে মা ?'

'অমরেশের অবলে।'

'ওমা গো, ভাইটি আমার পাকা রাঁধুনী! অম্বলে দেবে ঝাল, আর ঝোলে দেবে তেঁতুল!'

'ওমা, আমি খাবো না ভাত—আমি তাই বলেছি না কি? বিমলিকে চুপ করতে বলো—না হলে এই উঠলাম কিন্তু।'

'আঃ বিমলা, চুপ কর! ও রাঁধবে আমি খাবো—তোদের মুখে লাগবে না কি ঝাল? তোরা শুধু-শুধু বলে মরছিস কেন? সব রাঁধুনী কি এক রকম রাঁধে? ও যেমন রাঁধবে আমাকে তেমনি খেতে হবে।' চোখ ইশারা করে কমলকামিনী বিমলাকে শাসন করেন। ও মুখে আঁচল গোঁজে। হাসি কি থামতে চায়!

অমরেশের শেষ গ্রাসটা মুখে দেওয়া পর্যন্ত বিমলা অতিকষ্টে হাসি চেপে ছিল, এখন একেবারে হেসে উঠল খিল-খিল করে। 'মা, তুমি ওকে বোকা পেয়ে ঠাট্টা করলে—ও না-হয় রাঁধতে না-ই বা জানে, তবু তো তোমার ছেলে। তোমায় কি ওর সাথে ঠাট্টা সাজে?'

'কি মা?' অমরেশ কমলকামিনীর মুখে-চোখে একটা চাপা হাসি দেখতে পেয়ে একেবারে ক্ষেপে ওঠে। 'আমায় ঠাট্টা, খাব না, খাব না, আর কোনও দিন খাব না তোমার হাতে।'

'না, না, আমি তোমায় ঠাট্টা করতে পারি বাবা?—বিমলা মিথ্যা বলছে।'

'তবে হাসলে কেন?'

'তাহ'লে কি কাঁদব?'

'না, না, আমি সব বুঝি—তুমি ঠাট্টা করছ আমাকে—আমি সব বুঝি।'

'তবে এটুকু বোঝ না কেন যে অম্বলে লঙ্কা দিতে নেই?'

অমরেশ এবার কেঁদে-কেটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ঘণ্টা দু'-তিন বাদে দেখা যায়: সে আবার ইমামের কাছে বসে গল্প করছে। হাসছে তার কথায়।

অম্বলের ঐতিহাসিক ঘটনাটা বিপ্রপদর কানে যায়। তিনি স্নান করতে যাওয়ার সময় ছেলেকে ডেকে সংগে নিয়ে যান। তাকে বুঝিয়ে বলেন, 'আমরা বড় হয়েছি, তোমরাও বড় হবে—তখন আমরা যাবো বুড়ো হয়ে—এখন থেকে দেখে-শুনে না শিখলে তখন পারবে কেন? পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, যারা আসবে তাদের আদরযত্ন করে আপ্যায়িত করে খাওয়াতে হবে। ধুলো-কাদা থাকলে তারা তোমাকে দেখলে বলবে কি? বিনুটা কোথায়? তাকেও তুমি সাজিয়ে-পরিয়ে আন গে? তুমি বড় বাবু, সে মেজ বাবু। যাও তাড়াতাড়ি—এক্ষুণি সব এসে পড়বে।'

বড় বাবু সগর্বে মেজ বাবুকে ডাকতে বাড়ীর ভিতর যায়।

রান্নার সাথে-সাথেই সব তুলে রেখা হয় নাট-মন্দিরের এক পাশে। বর্ষা কাল, বৃষ্টি নামতে কতক্ষণ! ইমাম বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেই রেঁধেছে! কিন্তু লঙ্কা ও পেঁয়াজ-রসুনের ভাগটা বেশী দিয়েছে নিজেদের রুচি অনুসারে। তাই সব ব্যঞ্জনই লাল টক্-টকে হয়েছে। পাতলা তেল ভাসছে ওপরে।

কমলকামিনী ঘর থেকে হাতে তৈরী নানাবিধ মিঠাই নিয়ে গিয়ে দিয়ে এলেন। এখানে তো মিঠাইর দোকান নাই, তাই ক'দিন ঘরের কেউ বিশ্রাম পায়নি।

একটু উচ্চাংগের মুসলমানী প্রথায় বিপ্রপদ প্রজাদের অভ্যর্থনা করেন—সমাদর করে বসতে দেন নাটমন্দিরে। আহারান্তে তারা খুশী মনে পান-তামাক খায়। বলে যে হিন্দুর মধ্যে এমন আদপ কায়দা খুব কম লোকেই জানে। মোষালেরা এ দেশের বনেদী ঘর হলেও কত যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে সে কথাও এখানে ওঠে। এবং সে জন্য লজ্জা বোধ করেন বিপ্রপদ। তিনি মুসলমানদের কেন হিন্দু প্রজাদেরও সমান আদর-যত্ন করেছেন। অবজ্ঞা করেননি কাউকে। তাই সকলে একবাক্যে তাঁকে প্রশংসা করে। খাওয়ার সময় প্রজারা নজর দেয়। টাকাগুলো দেখে তাঁর মন অহংকারে ভরে ওঠে। এই তো রাজোচিত সম্মান! আজ সেনেদের বদলে এ-সব তাঁরই পাওনা। তাঁরই ন্যায্য দাবী। অমরেশ এবং বিনুও কিছু-কিছু নজর পায়। তারা চকচকে টাকাগুলো নিয়ে বাড়ীর ভিতর চলে যায়—সবাইকে দেখাবে।

এই খাওয়া-দাওয়া মেলা-মেশা নতুন একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রইল শক্তিপড়ে। ইসমাইল মিঞারা যে কত সন্তুষ্ট হয়েছে তা আর বলা যায় না। তারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ! তিক্ত হয়ে উঠল বয়োবৃদ্ধ হিন্দুরেরা—প্রাচীনপন্থীর দল। কিন্তু কেউ সাহস করে বিপ্রপদর সুমুখে কিছু বলতে পারল না। কি জানি আবার আর্জি দায়ের করে দিতে কতক্ষণ! তাই এমন একটা মধুময় ঘটনায় আবার আনাচে-কানাচে বসেই নিতে হয়। [ক্রমশঃ

প্রভাত-সঙ্গীত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মহাস্থবির

ছাতে

ছাতের সঙ্গে আরও কিছু স্মৃতি জীবনকে জড়িয়ে আছে, যা না বললে ছাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা করা হবে। সুখ-স্মৃতি হলেও তা অক্ষয় সুখ-স্মৃতি।

গ্রীষ্মকালে বাড়ীর প্রায় সকলেই, মানে বড়রা রাত্রে ছাতে শুতেন। ছোটদের ছাতে শোওয়া বারণ ছিল। ছাতে শুতে আমাদের দুই ভাইয়ের প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু ইতিপূর্বেই ছোটদের ছাতে শোওয়ার বিরুদ্ধে বাড়ীতে এমন একটা আবহাওয়া তৈরী হয়ে ছিল যে, মনের ইচ্ছাটা সকলের সামনে প্রকাশ করতে সাহসই হত না। ছাতে শুলে ছোটদের বিছে, সাপ ও নানা প্রকার বিষাক্ত পোকা-মাকড় কামড়াতে পারে, তা ছাড়া ঠাণ্ডা লেগে কি না হতে পারে!

সংসারে এত ভাল-ভাল জায়গা থাকতে ঐ কাঁকড়া-বিছে প্রমুখ সাংঘাতিক জীবগুলি ছাতে বাস করেন কেন এবং দংশনবিলাসের ভাল-ভাল উপকরণ চারদিকে এখানে-সেখানে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও বিশেষ করে ছোটদের ওপরে তাঁদের এত আক্রোশের কারণ কি—এ প্রশ্নটা সে সময় খুবই পীড়া দিয়েছিল।

তথাপি এক দিন এই বিরুদ্ধ ব্যূহ ভেদ করে মা'র কাছে মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করে ফেলা গেল। কিন্তু মা হাঁ কিম্বা না কিছুই না বলায় আমাদের সাহস বেড়ে গেল। দুই ভাই, মাকে একলা পেলেই ছাতে শোবার জন্য বায়না সুরু করে দিলুম। শেষ কালে মা-ই আমাদের হ'য়ে সুপারিশ করায় বাবা আমাদের ছাতে শোওয়া মঞ্জুর করলেন—কিন্তু সব দিন নয়। কেবল মাত্র শনি ও রবিবার রাতে, তবে জামা গায়ে দিয়ে শুতে হবে। শনিবার আমার জীবন-প্রভাতেই মধুবার-রূপে দেখা দিয়েছিল।

ছাতে শোবার আবেদন মঞ্জুর হওয়াতে যে কি রকম খুশী হলুম, তা উল্লেখ করাই বাহুল্য। প্রায় শৈশব থেকেই আমাদের আলাদা ঘরে শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। নেহাৎ অসুখ-বিসুখ না করলে রাতে মাকে কাছে পেতুম না। ছাতে শোওয়া হবে, আর মা'র কাছে শোওয়া হবে, এটা কম খুশীর কথা ছিল না সেদিন।

একটা বড় সতরঞ্চির ওপরে পাশাপাশি তিনটে বালিশ। মধ্যে মা শুয়ে, দু'পাশ থেকে আমরা দু'-ভাই তাঁকে একান্ত দখল করেছি। বাবা একটু দূরে শুয়ে, আমাদের কণ্ঠস্বরের নাগালের বাইরে—কারণ তাঁর বিছানাটা আমরাই করেছি কি না। আর আর দু'-চার জন, তাঁরাও দূরে দূরে শুয়ে আছেন।

ছাতে শুয়ে আকাশের সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলো। দীর্ঘ দ্বিপ্রহরে আমসত্ব বা আচার চুরি করতে উঠে কিম্বা দিনের বেলায় কখনো-সখনো ঘাড় তুলে যে আকাশ এত দিন দেখেছি, সে আকাশ আকাশই নয়। চোখের সামনে আলোর আবরণ দিয়ে আকাশ তার আসল রূপ আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিল—আকাশের স্বরূপ প্রকাশ হয় রাত্রে।

কোনো আয়াস নেই, চিৎ হয়ে শুয়ে-শুয়ে দেখি চাঁদে আর মেঘে লুকোচুরি খেলা চলেছে। নীল পটে হাল্কা মেঘ দিয়ে ছবি এঁকে চলেছে বাতাস। কত সম্ভব ও অসম্ভব চিত্রলেখা—কিছুক্ষণ দেখতে দেখতে আত্মহারা হয়ে যেতে হয়। তাদের কথা ভাবতে ভাবতে কল্পনা হাঁপিয়ে পড়ত—এই রহস্যের আবরণ মা একটু একটু ক'রে মোচন করতেন।

ঐ যে চাঁদ, ওকে ঘিরে সাতাশটি তারা আছে, তারা সব চাঁদের স্ত্রী—দক্ষ রাজার মেয়ে তারা। দেবতা হোলেও এক দিন ওরা আমাদেরই মতন পৃথিবীতে বিচরণ করত। চাঁদের বুকে ঐ কলঙ্কের দাগ কেমন করে হলো, এমনি কত কি কাহিনী—কত যুগ-যুগ আগের লোকেরাও চাঁদকে ঠিক এমনিই দেখেছে আজ আমরা যেমনটি দেখ্‌ছি। এখানে আর ওরা আসতে পারে না, আমরাও ওখানে যেতে পারি না, তবুও এইখানকার কত সুখ ও বেদনার ইতিহাস ওদের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। ওরা এই পৃথিবীর লোকের কত কীর্তিই না দেখেছে। ওরা আমাদেরই আপনার লোক, আজ অনেক দূরে চলে গেলে কি হবে, ওদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়নি। ওদের আমরা সব জানি, ওরাও আমাদের সব জানে। ঐ যে জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত তারার দল, ওর নাম সপ্তর্ষি। বশিষ্ঠ ঋষিরা ঐখানে থাকেন। কোন এক রাজার সঙ্গে বশিষ্ঠের বাধল ঝগড়া, তার ফলে ত্রিশঙ্কু বেচারা সপরিবারে ঐখানে আটকে আছেন। কি আর করবেন, ঐখানেই তাঁরা ঘর-বাড়ী বানিয়ে নিয়েছেন।

শুনতে শুনতে রহস্যলোকের অনেক গুপ্তকথাই আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ত। আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হত—আমাদের সঙ্গে তারারাও যেন গল্প শুনছে। আমরা ওদের কথা জানতে পেরেছি দেখে মিট্‌-মিট্ করে কৌতুক-ভরা হাসি হেসে আমাদের দিকে চেয়ে থাকত। দোষ ধরা পড়ে গেলে যেমন ধরা পড়বার ভয় আর থাকে না, থাকে মাত্র একটু লজ্জা, তারার দল তেমনি যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়ত আমাদের কাছে। একটু পরেই দুই দলে হয়ে যেত ভাব, মনের কথা সুরু হ'য়ে যেত।

মা গল্প বলতেন খুবই আস্তে আস্তে। গল্প সুরু হবার আগেই আমাদের কল্পনা-ঘোড়া চনমন্ করতে থাকত ছোটবার জন্য—গল্প আরম্ভ হওয়া মাত্র আসল কাহিনীকে পেছনে ফেলে সে মাইলের পর মাইল এগিয়ে ছুটত। প্রায়ই গল্প পুরো শোনা হত না, ঘুম এসে করত বিশ্বাসঘাতকতা—আজ যে ঘুমের প্রতীক্ষায় সারা রাত ঘড়ির দিকে চেয়ে বসে থাকতে হয়।

এক দিন, সেদিন ভয়ানক গরম। বাড়ীশুদ্ধ সব কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। খালি গায়ে রাস্তায় বেরুনো-রূপ অন্যায় কার্যের

শাস্তি-স্বরূপ সেই নিমন্ত্রণ-স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে গৃহাঙ্গণ্যে একতলা তেতলা করে বেড়াচ্ছি। মিত্রপ্রকৃতি কুলচুর আমচুর প্রভৃতির সন্ধানে ফিরতে থাকলেও, সংসারে আমি একক, আমার কেউ নেই, আমিও কারুর নই, এই রকম একটা উচ্চ ভাব মনের মধ্যে লালন করে চলেছি বিকেল থেকে। এই ভাবটিকে মনের মধ্যে বেশ জমিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে ছাতে চড়া গেল শোবার উদ্দেশ্যে—যদিও ছাতে শোওয়া সেদিন আমার বারণ ছিল।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হয়। বাড়ীতে কেউ নেই এই ভরসায় বীরদর্পে ছাতে উঠেই চোখে পড়ল, সেখানে বাবা শুয়ে রয়েছেন। নিঃশব্দ ত্বরিতগতিতে একেবারে উল্টোমুখ হ'য়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই বাবা আমাকে কাছে ডাকলেন। বাবা যে সে সময়ে ছাতে শুয়ে আছেন বা তাঁর সেখানে থাকবার সম্ভাবনা আছে, সে কথা আমার কল্পনাতেও ছিল না। যা হোক, উপায় নেই, কাছে যেতেই হোলো।

বাবার ভয়াল গাম্ভীর্য্য, কঠিন শাসন, সামনে পড়লেই পাঠ্যবিষয়ক অপ্রীতিকর প্রশ্ন, চরিত্র সংশোধনের জন্য তস্মিন্ প্রীতি ও তস্য প্রিয়-কার্য সাধনের উপদেশাবলী—এই সব মাল-মশলা মিলিয়ে পিতা-পুত্রের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘনীয় ব্যবধান রচিত হয়ে উঠেছিল। মোট কথা, তাঁর সান্নিধ্যে এলে আমরা অত্যন্ত অস্বস্তি ভোগ করতুম।

কাছে যেতেই বাবা বললেন—এইখানে, আমার পাশে শোও।

বাক্যব্যয় না করে শুয়ে পড়লুম। একটু বাদেই তিনি আদর করে আমার মাথায় হাত বুলোতে আরম্ভ করলেন। 'বিকেল থেকে 'সংসারে আমার কেউ নেই' এই ভাব মনের মধ্যে পোষণ করে শুতে' এসে বাবার এই আদর—দুই বিপরীত ভাব-তরঙ্গের মাঝখানে পড়ে মন-তরী টাল-মটাল খেতে সুরু করলে।

বাবা বলতে লাগলেন—আজ সারা বিকেলটা ধরে তোমাকে দেখলুম যে তুমি খালি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কেন, তোমার কি চটি নেই?

—আছে।

—তবে? এই এক বছরও এখনো হয়নি, পায়ে ট্যাংরা মাছের কাঁটা ফুটে কত দিন কষ্ট পেলে। তিন তিন-বার অস্ত্র করে কাঁটা বেরুল না, শেষে অজ্ঞান করে কাঁটা বের করতে হলো—ভুলে গেছ! এত কষ্ট পেলে শুধু খালি পায়ে ঘোরার অভ্যেসে।

চুপ করে রইলুম। বাবা বলে চল্লেন—শুধু কি তুমিই কষ্ট পেলে? তোমার সেই কষ্ট দেখে আমি কি কম কষ্ট পেয়েছি? তোমার পায়ে এক-এক বার অস্ত্র করা হয়েছে, আর চিন্তায় ও কষ্টে দু'-তিন রাত্রি ধরে আমি ঘুমুতে পারিনি, আপিসেও কাজ করতে পারিনি। তুমি বড় হচ্ছ, এ-সব তোমার বোঝা উচিত।

এমন করুণ ও স্নেহের সুর বাবার কণ্ঠে এর আগে আর শুনিনি—বাধার প্রাচীর ধূলিসাৎ হয়ে গেল। বাবা বল্লেন—প্রতিজ্ঞা কর যে আজ থেকে আর কখনো খালি পায়ে ঘোরা-ফেরা করব না।

সেদিনের বাবার দেওয়া দেড় টাকা মূল্যের জুতো জোড়া আজ নিজের পয়সায় পঁচিশ টাকা দিয়ে কিনতে হবে এমন দুরদৃষ্টের কথা শুধু আমি কেন, বোধ হয় পৃথিবীর কোন বালকেরই কল্পনায় আসেনি, তাই প্রতিজ্ঞাটা টপ্ করেই করে ফেলেছিলুম। সেই কথা মনে হচ্ছে আর ভাবছি, বাবা এখন থাকলে কি দুর্ভিক্ষটাই না হতো!

জুতোর পাট শেষ করেই তিনি কাজের কথা পাড়লেন—আচ্ছা, এই যে আকাশ দেখছ, এর শেষ কোথায় বল তো?

বললুম—এর শেষ নেই, আকাশ অসীম।

শৈশব থেকেই অসীম, অনাদি, অনন্ত, অখিল ইত্যাদি কথা-গুলোর সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—কথাটা ভাল মতন লাগাতে পেরে বেশ খুশী হয়ে উঠলুম।

বাবা আবার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, বল তো, এই আকাশ কে তৈরি করেছে?

বললুম—ভগবান।

উপরি উপরি তত্ত্ববিদ্যার এই রকম দু'টি দুরূহ প্রশ্নের নিখুঁত উত্তর পেয়ে বাবা বেশ মতন উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, ভগবান কোথায় থাকেন বল তো?

খুব ছেলেবেলা থেকে রাত্রে ঘুমোবার আগে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় খাবার আগে আমরা চোখ বুজে হাত-জোড় করে প্রার্থনা করতুম। খাবার ও শোবার পূর্বের প্রার্থনার ভিন্ন ভিন্ন বয়েৎ বাবাই আমাদের শিখিয়েছিলেন। এ ছাড়া, অন্যায় কাজ করে শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য, না-পড়ে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য, কড়া মাষ্টারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য, জাগ্রত অবস্থায় প্রায় প্রতি মুহূর্তেই ভগবানের নাম জপ করতে থাকলেও তাঁর বাসস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবার কৌতূহলই কখনো হয়নি—কাজেই এবারকার প্রশ্নে কাৎই হলুম।

কিছুক্ষণ উভয় পক্ষই চুপ-চাপ। শেষ কালে আমিই উল্টে প্রশ্ন করলুম—ভগবান কোথায় থাকেন বাবা?

—তিনি সব জায়গাতে সব সময়েই থাকেন।

—তাঁকে দেখা যায় না কেন বাবা?

—যারা তাঁকে দেখতে চায় তারা দেখতে পায়। তুমি ধ্রুবর গল্প জানো তো? ধ্রুব তাঁকে দেখবার জন্য কত কষ্ট করেছিলেন—শেষ কালে ভগবান তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন।

একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন—সাধু লোককে ভগবান দেখা দেন।

—আচ্ছা বাবা, তাঁকে চিঠি লেখা যায় না?

—না।

—তিনি কারুকে চিঠি লেখেন?

—হ্যাঁ, তিনি আমাদের সকলের জন্যই চিঠি লিখে লিখে রেখেছেন—ফুলে, ফলে, গাছের পাতায়, কত জায়গায় তাঁর লেখা ছড়িয়ে রয়েছে—সাধু লোকেরা সে সব লেখা পড়তে পারেন।

বাবা বলতে লাগলেন—আমরা ঐ যে আকাশ দেখতে পাচ্ছি—ঐ যে তারা-ভরা আকাশ, ওখানেও কত কথা লেখা আছে।

বললুম—কৈ, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না বাবা?

বাবা বল্লেন—মনে কর, আকাশটা যেন একখানা বিরাট শ্লেট—তার ওপরে তিনি জ্যোতির অক্ষরে ঐ সব লেখা লিখে রেখেছেন—কায়মনে চেষ্টা করলে বুঝতে পারা যায়, তিনি কি বলছেন।

—আমরা বুঝতে পারি না বাবা?

এবার তিনি নিবিড় ভাবে আমায় আদর করতে করতে ধরা-ধরা গলায় বললেন—তুমি যখন বড় হবে বাবা, তখন চেষ্টা কোরো, ঠিক বুঝতে পারবে।

বাবা আরও অনেক কথা বলতে লাগলেন, কিন্তু সে-সব আর আমার কানে গেল না। ঐ কালো শ্লেটে আলোর অক্ষরে চিঠির কথাই কেবল মনের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে গুঞ্জরণ করতে লাগল।

সেই থেকে, সেই সুদূর অতীতে, বাল্যকালের বিস্মৃতিপ্রায় এক রাত্রির অন্ধকারে আকাশের সঙ্গে যে আকর্ষণে আমি বাঁধা পড়েছিলুম, সে বন্ধন আজও অটুট আছে। সারা জীবন ধরে, সুখে দুঃখে শোকে ও ভোগে সর্ব অবস্থায় আকাশ আমাকে টেনেছে তার কাছে—ভোগের অজস্র উপাদানের মধ্যে আত্মহারা হয়ে সমাজ, সংস্কার ও সময়ের খেই হারিয়ে ফেলেছি, তারই মধ্যে আহ্বান পাঠিয়েছে আমাকে সেই কালো শ্লেটে আঁকা জ্যোতির অক্ষর। উন্মাদনা ঝেড়ে ফেলে ছুটে গিয়ে বসেছি তার নীচে। কত দিন আকাশের দিকে দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, ঐ সুনীল রহস্যের যবনিকা এইবার বোধ হয় খসে পড়ল—ঐ জ্যোতির ইঙ্গিত এক দিনে বুঝি বা ধরা দেয়। কিন্তু হায়! বারে বারেই আমারই মানসাকাশ আত্ম-অভিমানের মেঘে আচ্ছন্ন হয়েছে, আর সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।

বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে আকাশের চেয়ে বড় আকর্ষণ আমার আর নেই।

[ক্রমশঃ।

বহুমুখী নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনা

শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আমাদের ভারতবর্ষ নানা প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। যে সমস্ত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যে আমাদের দেশ সমৃদ্ধ তাহাদের মধ্যে নদ-নদীর প্রাচুর্য্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বহু পুরাকাল হইতেই এই সব নদ-নদী আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে।

যদিও ভারতবর্ষ নদীবহুল দেশ, তথাপি নদীর সম্যক্ ব্যবহার আজিও আমরা করিয়া উঠিতে পারি নাই। মোটামুটি হিসাব করিয়া জানা গিয়াছে যে, আমাদের দেশে যতগুলি নদ-নদী আছে, তাহাদের স্রোতশক্তির কেবল মাত্র শতকরা ছয় ভাগ জল সেচনের জন্য ও দেড় ভাগ জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়; বাকী সমস্ত স্রোতশক্তি নষ্ট হয় এবং প্রায়ই এই সকল অনিয়ন্ত্রিত ও অব্যবহৃত জলের জন্য দেশের স্থানে স্থানে ভীষণ বন্যা দেখা দেয়।

ইহা সুচিন্তিত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, ভারতের এই অতুলনীয় জল-সম্পদ যদি সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। যুদ্ধোত্তর ভারতে এই জল-সম্পদকে কাজে লাগাইবার জন্য বহুবিধ পরিকল্পনা করা হইতেছে। সাধারণ ভাবে আমাদের জল-সম্পদকে নিম্নলিখিত যে কোনও উন্নয়ন কার্য্যের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে,—(১) বন্যা-নিরোধ, (২) জলসেচ, (৩) জলপথের সুব্যবস্থা, (৪) বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, (৫) মৎস্য-চাষ, (৬) ভূমি-ক্ষয় নিবারণ, (৭) পরিশ্রুত জল-সরবরাহ, (৮) ম্যালেরিয়া নিবারণ, (৯) অবসরবিনোদন, (১০) বন-আবাদের সুব্যবস্থা, ইত্যাদি। আধুনিক কালে যাহাতে এই জল-সম্পদকে এককালীন বহু প্রকার কার্য্যে ব্যবহার করা যায় তাহার চেষ্টা চলিতেছে। এই প্রকার পরিকল্পনাকে Multi-purpose project বা বহুমুখী নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হয়।

ইংরাজ শাসন-কালে আমাদের দেশের নদ-নদীগুলি উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। ভারতে স্বাধীনতা-সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় সরকার দেশের নানা প্রকার সমস্যার সমাধান উদ্দেশ্যে কয়েকটি বহুমুখী নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনা আশু প্রবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। নিম্নে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :—

(১) বঙ্গদেশ ও বিহারের দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা :—এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দামোদর ও তাহার শাখা বরাকর ও কোনার নদীতে ৮টি বাঁধ যথাক্রমে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে করা হইবে :—(১) তিলাইয়া, (২) বেল পাহাড়ী, (৩) মাইথন, (৪) আয়ার, (৫) বারমো, (৬) পাঞ্চেৎ পাহাড়, (৭) কোনার ও (৮) বোকারো। এই সকল বাঁধ দ্বারা প্রায় ৪৭ লক্ষ একর ফুট জায়গায় জল ধরিয়া রাখা সম্ভব হইবে। এই পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করিতে আনুমানিক ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং প্রায় ১০ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত সময় লাগিবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দামোদরের বন্যা-নিরোধ, ন্যূনাধিক ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ও তিন লক্ষ কিলো-ওয়াট্ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন সম্ভব হইবে। তাহা ছাড়া অণ্ডাল হইতে হুগলী পর্য্যন্ত প্রায় এক শত মাইল জলপথে যাতায়াতের সুবিধা হইবে। এই পরিকল্পনার কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

(২) উড়িষ্যার মহানদী পরিকল্পনা :—এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মহানদীর উপর তিনটি বাঁধ যথাক্রমে হীরাকুণ্ড, টিকারপাড়া ও নারাজ নামক স্থানে নির্ম্মাণ করা হইবে। এই সকল বাঁধ দ্বারা প্রায় ২,৩০,০০,০০০ একর ফুট জায়গায় জল ধরিয়া রাখা সম্ভব হইবে। নির্ম্মাণের ব্যয় আনুমানিক ৪৮ কোটি টাকা এবং নির্ম্মাণকার্য্য ৫ বৎসরে শেষ হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে ন্যূনাধিক ৩০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ও প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ কিলো-ওয়াট্ বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে প্রায় ৩ শত মাইল দীর্ঘ জলপথে যাতায়াত ও মাল পাঠানোর সুবিধা হইবে। ব্যাপক আকারে মৎস্য-চাষও সম্ভব হইবে।

মহানদী পরিকল্পনার কার্য্য ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গত ১২ই এপ্রিল ভারতের মহামান্য প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল সম্বলপুর সহর হইতে নয় মাইল পশ্চিমে হীরাকুণ্ডে নদীর বুকে প্রথম বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে ১০ লক্ষ একরেরও অধিক জমিতে সেচ-কার্য্যের সুবিধা হইবে এবং প্রায় ৩ লক্ষ কিলো-ওয়াট্ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। অন্য দুইটি বাঁধের বিষয়ে এখনও অনুসন্ধান চলিতেছে।

(৩) নেপাল ও বিহারের কোশী নদী পরিকল্পনা :—এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নেপালের ছত্রগিরি খাতের সন্নিকটে একটি সুদীর্ঘ বাঁধ কোশী নদীর উপর নির্মাণ করা হইবে। এই বাঁধ দ্বারা প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ একর ফুট জায়গায় জল ধরিয়া রাখা যাইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে বিহারে বন্যা-নিরোধ ও প্রায় ৩০ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচের সুব্যবস্থা হইবে এবং প্রায় ১৮ লক্ষ কিলো-ওয়াট্ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। কোশী নদী পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইতে ১ শত কোটির উপর টাকা ব্যয় হইবে এবং ন্যূনতম ১০ বৎসর সময় লাগিবে।

(৪) পশ্চিমবঙ্গের ময়ূরাক্ষী নদী পরিকল্পনা :—এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ময়ূরাক্ষী নদীর গমন-পথে দুইটা বাঁধ—একটা বাঁধ সিউড়ীর সন্নিকটে এবং অপরটি সাঁওতাল পরগণায় মেসেঞ্জোর নামক স্থানে নির্মাণ করা হইবে। এই পরিকল্পনাটিতে প্রায় ৬ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচের ব্যবস্থা এবং ৪ হাজার কিলো-ওয়াটের উপর বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা যাইবে। পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করিতে হইলে কিঞ্চিদধিক ৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

(৫) উত্তর-বঙ্গে তিস্তা উপত্যকা পরিকল্পনা :—এই পরিকল্পনায় তিস্তা নদীর উপর দুইটি বাঁধ নির্মাণ করা হইবে এবং তাহার দ্বারা প্রায় ৪০ লক্ষ একর ফুট জায়গায় জল ধরিয়া রাখা যাইবে। ইহাতে ৪৫ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচ ও ৩ লক্ষ কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। এই পরিকল্পনাটির মোট ব্যয়ের পরিমাণ এখনও অনুমিত হয় নাই।

(৬) বোম্বাইএর নর্মদা-তাপ্তী পরিকল্পনা :—এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নর্মদা ও তাপ্তী নদীর গমন-পথে ৪টি বাঁধ নির্মাণ করা হইবে। ইহাতে বোম্বাই প্রদেশের বন্যা-পীড়িত জেলাগুলিতে বন্যা নিবারণ হইবে এবং ৪০ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচ এবং ১০ লক্ষ কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন সম্ভবপর হইবে।

(৭) পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের ভাকরা বাঁধ পরিকল্পনা :—এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে শতদ্রু নদীর উপরে একটা বাঁধ নির্মাণ করা হইবে। ইহাতে ২০ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচ ও ১ লক্ষ ৬০ হাজার কিলো-ওয়াট্ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। ইহার দ্বারা পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও শিল্প-সম্প্রসারণ বৃদ্ধি পাইবে।

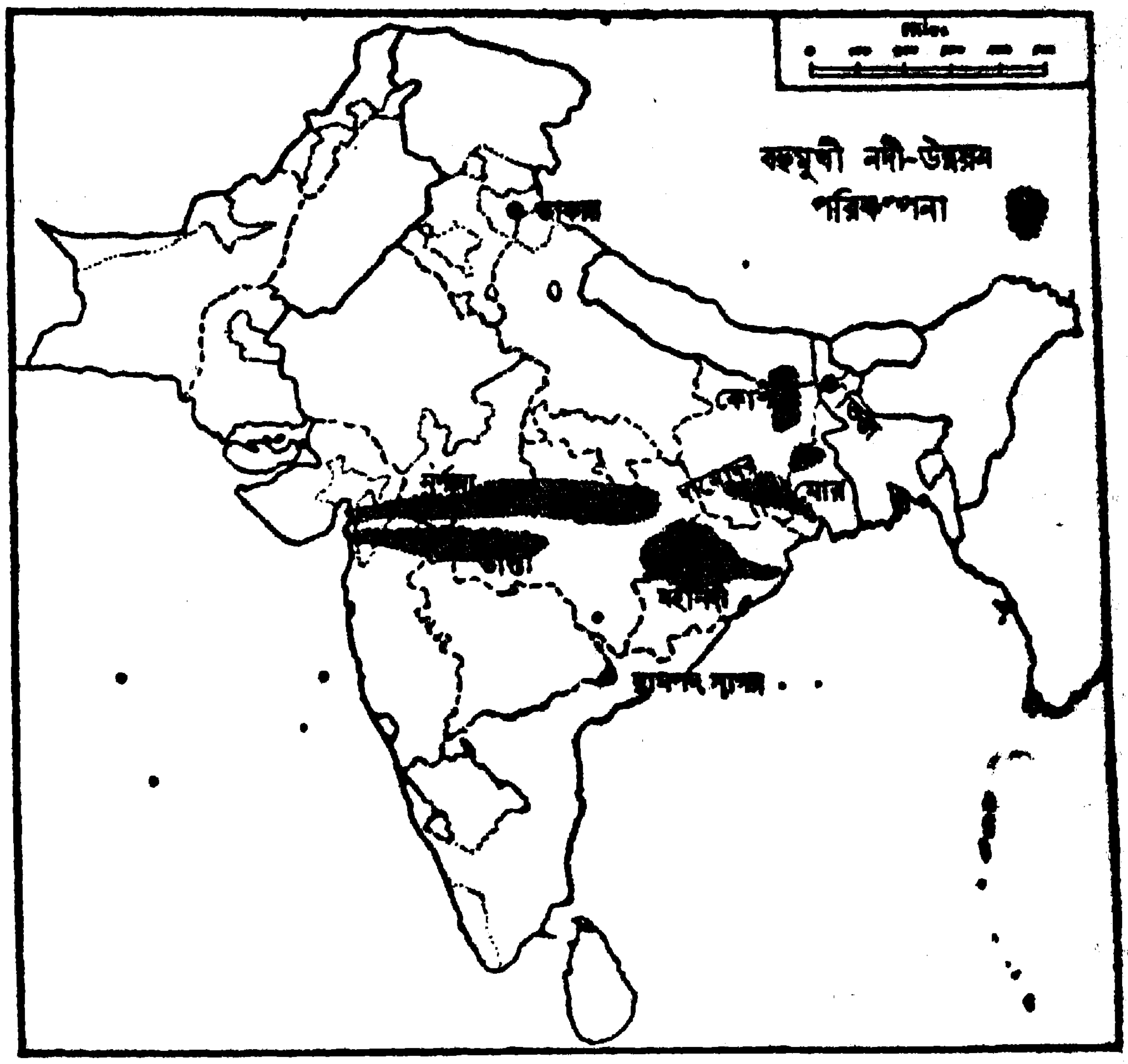

(৮) মাদ্রাজের রামপদ সাগর পরিকল্পনা :—এই পরিকল্পনায় রামপদ সাগরের সন্নিকটে গোদাবরী নদীর উপর একটা বাঁধ নির্মাণ করা হইবে। ইহাতে ২০ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচ ও ৭৫ হাজার কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইবে। এই পরিকল্পনাটির আনুমানিক ব্যয় ন্যূনপক্ষে ১ শত কোটি টাকা হইবে।

STATE LIBRA
COOCH BE

কৃষি ও শিল্প উন্নয়নে জল-বিদ্যুৎ

অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়

কৃষিক্ষেত্রে জলসিঞ্চনের জন্ত এবং কল-কারখানা চালাইবার জন্ত জল-বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। কল-কারখানা চালাইবার জন্ত কয়লা, পেট্রল অথবা প্রচুর কাষ্ঠের প্রয়োজন, বাংলা ও বিহারেই সমগ্র ভারতে উৎপন্ন কয়লার দশ ভাগের নয় ভাগ উৎপন্ন হয়। সেই উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। ভারতে উৎপন্ন পেট্রলের পরিমাণ খুবই অপর্য্যাপ্ত। মোটর ও বিমান-বহর চালু রাখিবার জন্ত সম্পূর্ণরূপে বহির্জগতের পেট্রলের উপর নির্ভর করা ভিন্ন ভারতের গত্যন্তর নাই। নূতন তৈল-খনি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তৈলের সাহায্যে কল-কারখানা চালু রাখিবার কোন ভরসাই নাই। পরিশেষে কাষ্ঠ সংগ্রহের কথা উঠিবে। বিভক্ত ভারতে ১,৫৫,০০০ বর্গ-মাইল বনভূমি আছে। পাহাড়ের সংলগ্ন বৃহৎ বৃক্ষগুলিকে রক্ষা করা প্রয়োজন। নচেৎ বর্ষার স্রোত পাহাড়-পর্ব্বতের দেহ হইতে প্রস্তরখণ্ডগুলি খসাইয়া ফেলিলে সেই অঞ্চলে পুনরায় বৃক্ষ জন্মানোর পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। যুক্তপ্রদেশের অনেক স্থান এইরূপে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

ভারতের মত বৃহৎ দেশের শিল্পোন্নয়নের পক্ষে এই বনভূমি হইতে সংগৃহীত কাষ্ঠ যথেষ্ট নয়। বিশেষতঃ এই ভাবে কাষ্ঠ সংগ্রহ করা খুবই ব্যয়সাধ্য। জলস্রোত হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া কৃষি ও শিল্পে তাহা ব্যবহার করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয় এবং ইহার খরচও খুবই কম। এ কথা স্বীকার্য্য যে, ভারতের বৃষ্টিপাত জলশক্তি উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল নহে। পার্ব্বত্য নদী ও জলপ্রপাতগুলির মত সহজে ও প্রভূত পরিমাণে জলশক্তি নদীর জলে বাঁধ সৃষ্টি করিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতবর্ষে জল-প্রপাতেরও অভাব নাই। ইউরোপ, আমেরিকা ও মিশরের ন্যায় এই জলশক্তির সাহায্যে কৃষি ও শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

নদীর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক গতি হইতে এই বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হইয়া থাকে। আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত হইতে যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা বহু দূরবর্ত্তী সহরের কল-কারখানাগুলি চালিত হইয়া থাকে। জলশক্তির প্রভাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মিনিয়াপোলিস নামক একটি বিখ্যাত বাণিজ্য-স্থান এবং সেণ্ট পল নামক একটি সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গম-পেশা কলটি এই সহরে অবস্থিত। এখানকার কাগজের কল, কার্পাস-শিল্প, পশম-শিল্প এবং লৌহ-শিল্পের কারখানাগুলির অধিকাংশই এই জল-বিদ্যুতের শক্তির দ্বারা পরিচালিত।

মেক্সিকোর ভেরাক্রুজ বন্দরের যাবতীয় কাপড়ের কল উপসাগরীয় জলস্রোত হইতে সংগৃহীত জল-বিদ্যুতের সাহায্যে চালনা করা হয়। ইউরোপে আল্পীয় অঞ্চলে জলপ্রপাত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিয়া অনেক কল-কারখানা চালানো হইতেছে। সুইডেনে জল-বিদ্যুতের সাহায্যে কাগজ, দেশলাই, কাপড়ের কল, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির কারখানাগুলি চলিতেছে। ভারতবর্ষেও টাটা কোম্পানীর পরিচালনায় দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিমঘাট পর্ব্বতে লোনাভলা, নীলামুলা ও অন্ধ্র উপত্যকায় জলশক্তি হইতে বৈদ্যুতিক উৎপন্ন করিয়া অনেকগুলি কল-কারখানা চালানো হইতেছে।

ভারতে কয়লার উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে। ১৯৩৯-৪০ সালে কয়লার মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ১৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টন, ১৯৪৫-৪৬ সালে ২ কোটি ৬৪ লক্ষ ৮১ হাজার টন এবং ১৯৪৬-৪৭ সালে ২ কোটি ৬২ লক্ষ ১৮ হাজার টন, এই ক্রমক্ষীয়মান উৎপাদনের ফলে কল-কারখানা চালনার শক্তিও হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। ভারতের শিল্প-উন্নয়নের পক্ষে যে পরিমাণ কয়লার প্রয়োজন, তাহার চেয়ে অনেক গুণ অধিক শক্তি জল-বিদ্যুতের সাহায্যে সংগ্রহ করা সম্ভবপর।

পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের বাঁশলৈ, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, ময়ূরাক্ষী, কোপাই, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, শিলাই, কসাই, হলদী প্রভৃতি ছোট-বড় নদীগুলি বর্ষাকালে ভাগীরথী নদীর বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া তোলে, এই জলের পরিমাণ কখনো কখনো এত অধিক হয় যে ইহার ফলে প্লাবনের সৃষ্টি হয়, ১৯১৩, ১৯১৭, ১৯৩৫ এবং ১৯৪৩ সালের দামোদর বন্যার স্মৃতি অতীব হৃদয়বিদারক, অথচ বর্দ্ধিত জলের এই গতিবেগকে সংহত করিয়া কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারিলে মানব-সমাজের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে শস্যের ঘাটতি পূরণ করিয়া অতি শীঘ্রই এই দেশকে শস্যভাণ্ডারে পরিণত করা যায়। এই পশ্চিমবঙ্গে গত বৎসরের চাউল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৩ লক্ষ টন অর্থাৎ ৮ কোটি ১১ লক্ষ মণ। কিন্তু মাথা-পিছু দৈনিক অর্দ্ধ সের হিসাবে এখানকার ২ কোটি ২৫ লক্ষ অধিবাসীর জন্ত প্রয়োজন ১০ কোটি ৩৬ লক্ষ ১৮ হাজার ২৫০ মণ। বাহির হইতে আমদানী চাউল অথবা গমজাত দ্রব্যাদিকে যোগ করিলে খাদ্য ঘাটতির কোন কারণই থাকে না। দামোদর ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গকে অনায়াসে কেবলমাত্র ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত করাই সম্ভবপর নয়, ইহাকে শিল্প-সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত করাও সম্ভবপর।

দামোদর ও বরাকর নদীতে ৭টি বাঁধ নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার ফলে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া,—হুগলী ও হাওড়া জেলার ১০ লক্ষ একর জমীতে চাষের জন্ত জল সেচন করা যাইবে, এবং ১,০৮,০০,০০০ মণ শস্য উৎপন্ন হইবে। প্রায় ৫ কোটি টাকা মূল্যের রবিশস্য পাওয়া যাইবে। এই সাতটি বাঁধের কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইলে ইহার সাহায্যে যে জলস্রোতকে সংহত করা যাইবে, তাহার ফলে তিন লক্ষ কিলো-ওয়াট জল-বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে। এই জল-বিদ্যুতের শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া দামোদরের তীরে যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা সম্ভব, তাহা দেশের চাহিদা পূরণ করিবার পক্ষে খুবই কার্য্যকরী হইবে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ৫,১৫,০০০ একর জমীতে সেচের ব্যবস্থা হইবে, ১,০০,০০০ একর জমীতে রবিশস্য উৎপাদন সম্ভব হইবে এবং দুমকা ও সিউড়ী সহরে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। এতদ্ব্যতীত শিল্পোন্নয়নের জন্ত সাধারণতঃ ৪০০০ K. W. Farm Power সরবরাহ করা চলিবে। দুমকা ও

সিউড়ীর জন্য প্রয়োজন হইবে মাত্র ৫০০ K. W. F. P. অবশিষ্ট ৩৫০০ K. W. সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম জেলার শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় করা যাইবে। এই বাঁধের ফলে ১৫ লক্ষ মণের কাছাকাছি ফসল জন্মিবে। সাঁওতাল পরগণার কুটীর-শিল্প এই জল-বিদ্যুতের সাহায্যে যথেষ্ট উন্নত হইবে।

বিদ্যাধরী ও পিয়ালী নদীতে যে জল-নিকাষণের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হইতেছে, তাহা কার্য্যকরী হইলেও কলিকাতার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্বের গ্রামগুলি বিশেষ উপকৃত হইবে। হীরাকুঁদ বাঁধের পরিকল্পনাও অচিরে কার্য্যকরী হওয়া প্রয়োজন।

আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ইউরোপের আল্পীয় অঞ্চলে জলপ্রপাত হইতে সাধারণতঃ জল-বিদ্যুৎশক্তি সংগ্রহ করা হয়। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে হাজা-মজা নদী কাটিয়া ও প্লাবনমুখী নদীতে বাঁধ নির্ম্মাণের দ্বারা জলস্রোত সংহত করিয়া জলবিদ্যুৎ সংগ্রহ করা সুবিধাজনক। মিশরের নীল নদের জলকে সংহত করিয়া যে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার ফলে মিশরের কৃষি উর্ব্বর হইয়া সেখানে ফসলের প্রাচুর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। শুধু তাই নয়, মিশরের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি নীল নদের জল-বিদ্যুৎশক্তির নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। আমেরিকার টেনেসি উপত্যকা পরিকল্পনার ফলে কলোরেডো নদীর তীরে জল-বিদ্যুতের সাহায্যে অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষে জলপ্রপাতের অভাব নাই। কাবেরী নদীর জলপ্রপাত হইতে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি প্রথমে কোলার স্বর্ণখনি অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালোর ও মহীশূরের প্রায় দুই শত সহরে এই জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। পাঞ্জাবের উল নদীর জলপ্রপাত হইতে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি অমৃতসর, লাহোর ও লুধিয়ানায় অনেকগুলি কল চালাইতেছে। নীলগিরির পিকারা নদীর জলপ্রপাত হইতে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা কোয়েম্বাটুর, মাদুরা প্রভৃতি সহরে কল-কারখানাগুলি চালানো হইতেছে। শিলং ও দার্জ্জিলিং-এও বৈদ্যুতিক শক্তি জলপ্রপাত হইতে সংগ্রহ করা হইতেছে।

নদীতে বাঁধ দিয়া ও বিভিন্ন স্থানে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ করা হইতেছে। ঝেলাম নদীর উপর বাঁধ দিয়া যে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইতেছে, তদ্দ্বারা শ্রীনগরের রেশমের কারখানাগুলি চালানো হইতেছে। মেতুর বাঁধের জল হইতে ত্রিচিনাপল্লী, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থানের কল-কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে, এইরূপে নদীর জলে বাঁধ সৃষ্টি করিয়া জল-বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিয়া শিল্পের সমৃদ্ধি সাধন খুবই লাভজনক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা ভারত সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা যদি বাস্তবে রূপায়িত হয়, তবে জল-বিদ্যুৎশক্তির যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইবে এবং ইহার ফলে ভারতের কৃষি ও শিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। আমাদের কয়লার অভাবের জন্য কল-কারখানা বন্ধ রাখিতে হইবে না এবং উৎপাদন হ্রাসের কোন সম্ভাবনাও থাকিবে না, বরং অনেক অল্প খরচে প্রভূত পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, শিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস পাইবে, কৃষিজাত ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, গ্রামে গ্রামে ছোট-বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে এবং পরিত্যক্ত জনবিরল গ্রামগুলি জনবহুল সমৃদ্ধিশালী সহর ও বন্দরে পরিণত হইবে।

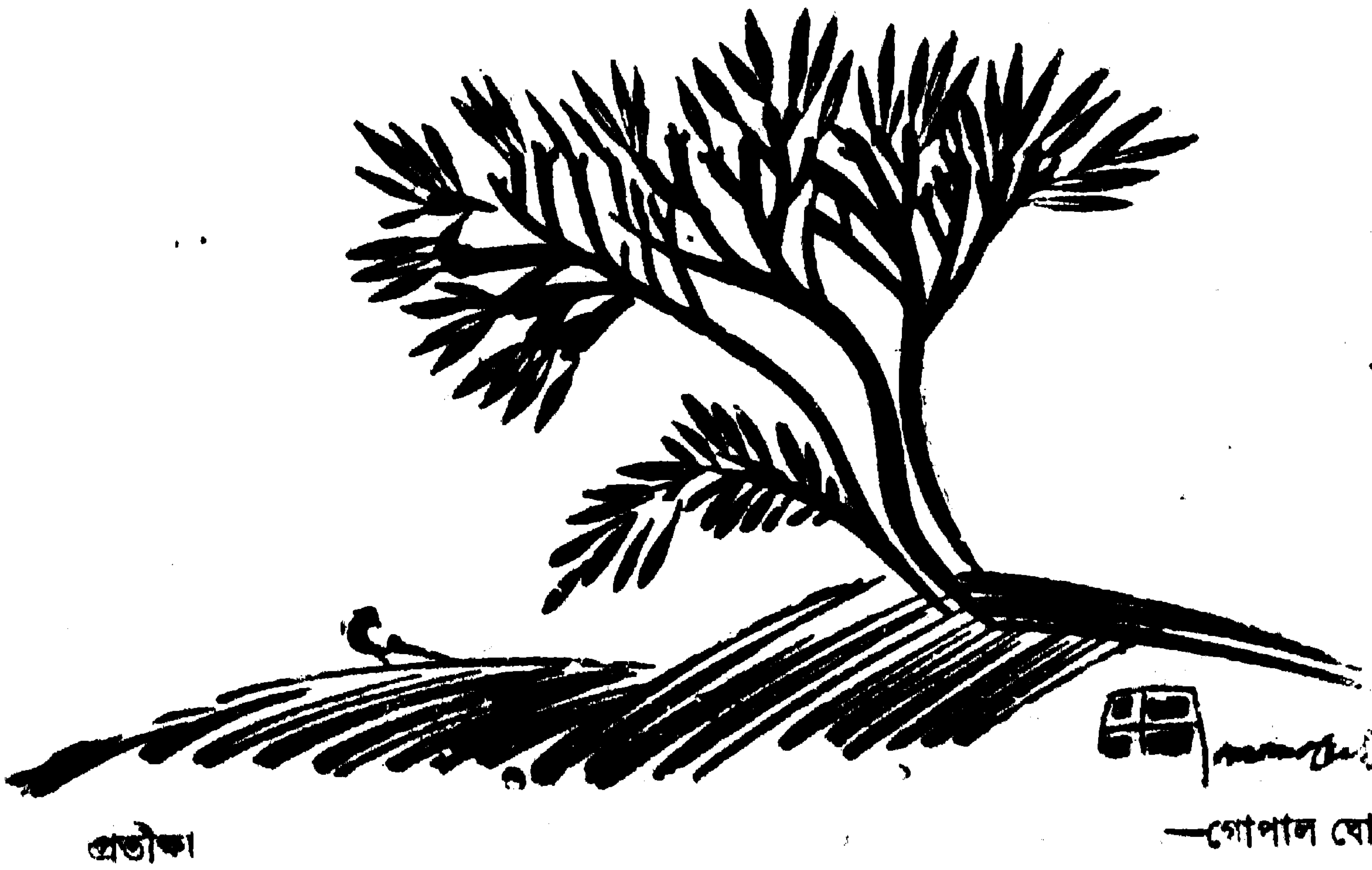

প্রতীক্ষা —গোপাল ঘোষ

জন্মদিন

শ্রীঅমলা দেবী

১

পরদিন রবিবার। খোকার জন্মোৎসবের দিন ধার্য্য হইয়াছে। সকালেই গাঙ্গুলী মশায় মাষ্টারের বাড়ীতে গিয়া ডাক দিলেন। মাষ্টার মশায় বৈঠকখানাতে বসিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়া বসাইলেন। কহিলেন—"কি ব্যাপার? সকালেই বেরিয়ে পড়েছেন যে?"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"বেরিয়ে না পড়ে উপায় কি? মেয়েরা কি বাড়ীতে থাকতে দেবে। সব খবর চাউর হয়ে গিয়েছে—জান তো?"

—"জানি।"

—"মেয়েরা চর লাগিয়েছে। তারা রাত-দিন গিন্নীর কাছে আনাগোনা করে—এতে ভাল হবে না, এতে আমার পরমায়ু ক্ষয় হবে—এই সব বলে তাঁর মন খারাপ করে দিচ্ছে। আর গিন্নীকে জান তো? পরের কথায় কেমন নেচে উঠেন। বাড়ীতে পা দিলেই নাচন সুরু করছেন। তাও কোন রকমে—ও-সব কথা শুনো না, ও বুড়ো মেয়েমানুষগুলো কিছু জানে না—ইত্যাদি বলে ঠাণ্ডা করেছিলাম। কাল রাত্রে আবার অপরা হতভাগা সহর থেকে এসে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। সারা রাত দাউ-দাউ করে জলেছেন; সকালেও গন-গন করছেন দেখে পালিয়ে এলাম বাড়ী থেকে।"

—"কি বলছেন দিদিমা?"

—"যা বলা উচিত—বন্ধ করে দাও। বললাম—হাকিমদের নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে, তো বললেন—বেশ তো, আসুনে তারা, খান, দান, চলে যান, জন্মদিন চলবে না। বুঝালাম সব খুলে বলে—এটা অত্যন্ত দরকার, তাতেও সেই একই কথা। তা কি করবে, বন্ধ করেই দেবে না কি?

মাষ্টার কহিলেন—"পাগল! তা কি আর হয়! সব প্রস্তুত। 'জন্মদিন' বলে নেমন্তন্ন করা হয়েছে সবাইকে, না হলে লোক-হাসানো হবে যে!"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"তা তো সত্যি!" একটু চুপ করিয়া কহিলেন—"তাও তো মেয়েরা বলা করবে—এ কথাটা কানে যায়নি।

—"ওরা কি এ কথাটা জানে না?"

—"তা কি হয়। সব কথাই জানে, এটা আর জানবে না? তবে মেয়েরার বজ্জাতি তো। ধাপে ধাপে দাওয়াই দিচ্ছে। এটা হয়তো দেবে সব শেষে, যখন আর কোন উপায় থাকবে না।"

মাষ্টার নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"তোমার কথা তো খুব শোনে, তুমি যদি একবার বুঝিয়ে দাও—"

—"আমার কিছুই কি বলে নাই ভেবেছেন? ঠিক বলেছে—"

—"তাহ'লেও তোমাকে ভারী স্নেহ করে তো। দেখলেই জল হয়ে যাবে।"

—"এখন থাক। ওদের যা'-যা' অস্ত্র আছে, প্রয়োগ করা হয়ে যাক্। ইতিমধ্যে শ্যামলাল বাবু এসে পড়বেন। বিকেলে ঠিক অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে আমরা দিদিমাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে দেব।"

—"যদি ঠাণ্ডা না হয়?"

—"না হলেও শ্যামলাল বাবুর সামনে অসৌজন্য কিছু করতে পারবেন না।"

গাঙ্গুলী মশায় করুণ স্বরে কহিলেন—"রেগে গেলে যে ওঁর জ্ঞান-গম্যি থাকে না। বলছিলেন কি জান—ঘরে তালা বন্ধ করে, চাবিটা পুকুরের জলে ফেলে দেব।"

মাষ্টার হাসিয়া কহিলেন—"যা বলেন বলুন, চুপ করে শুনে যান। বলবেন, বন্ধই করে দেওয়া হয়েছে। তার পর আমরা ওঁকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করব এখন। এখন কাজের কথা শুনুন। ছেলেদের আয়োজন সব প্রস্তুত। বিকেলে একবার গিয়ে দেখে-শুনে আসতে বলেছে। বাগ্‌দী-পাড়ার মোড়ল মাহিন্দী বলে পাঠিয়েছে—ওদের ওখানে গিয়ে গানটা শুনে আসতে হবে; আর কি কি করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে। বিকেলে তাহ'লে দু'জনে বেরিয়ে প্রথমে ছেলেদের ওখানে যাব, ওখানটা সেরে বাগ্‌দী-পাড়ায় যাব।"

গাঙ্গুলী মশায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"আচ্ছা ভায়া, বলতে পার, কে কথাটা চাউর করলে?"

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন।

—"আমার মনে হয়, মদন পণ্ডিতের কাজ। চোকো পণ্ডিত- [illegible] কিছুই থাকে না।"

—"তা আপনি চটালেন কেন? ওকে পাত্তা দিলেন না। বিনয়ের দিকেই ঢলে পড়লেন!"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"চটালাম আবার কি? বলেছিলাম তো পত্ত পড়তে, তো নিজে থেকেই পড়ল না। বিনয়ের দিকে ঢলা তো তোমাদেরই কথায়। তোমরাই বললে—মেয়েদের দিয়ে বরণ-টরণ করানো রেওয়াজ। বিনয় বলল—ও সব ব্যবস্থা করতে পারবে। তা এ কাজটি তো গাঁয়ে ও ছাড়া কারও দ্বারা হত না।"

মাষ্টার মুচকি হাসিয়া কহিলেন—"তা বটে।"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"হাসলে যে?"

—"এমনই। মানে—বিনয়ের অন্ত মতলব কিছু নাই তো?"

গাঙ্গুলী মশায় সন্ত্রস্ত ভাবে কহিলেন—"পাগল না কি? ঐ রকমই ছেলেমানুষী বুদ্ধি! কথার আঁট-সাট নাই। যা-তা বলে ফেলে। না হলে লোকটা খারাপ নয়?"

—"খারাপ তো নয়। কিন্তু বিপদেও তো কম পড়েনি। তিন-তিনটি শালী ঘাড়ে চড়ে বসেছে। গোদের উপর এক-আধটি নয়, তিন-তিনটে বিষ-ফোড়া! কোন গতিকে কারও ঘাড়ে একটাকেও চাপিয়ে দিতে পারলে কতকটা রেহাই পায়।"

—"সত্যি? তা কাজটা চুকে-বুকে যাক! একটা ব্যবস্থা করতে হবে বৈ কি! আমাদের হিল্লে যখন হয়েছে—"

—"সত্যি। শ্যামলাল বাবু আসুন, ওঁকে ধরে যদি কিছু ব্যবস্থা করা যায়।"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"ওদের কথা ছেড়ে দাও, ভায়া! ওরা বক্তৃতাই করতে পারে। কাজের বেলায় কিছু না। আমারই কি করে দেখ—"

গাঙ্গুলী মশায় বৈঠকখানায় আসিতেই দেখিলেন—বিনয় বসিয়া আছে। কহিলেন—"কি খবর?"

বিনয় কহিল—"সব ব্যবস্থাই ঠিক। উদ্বোধন-সঙ্গীত, সমাপ্তি-সঙ্গীত দু'টোই মিনু গাইবে। ছোকরাদের ত তাই ইচ্ছে। গান অভ্যেস হয়ে গেছে।" বৃদ্ধ হাসিয়া কহিল—"মেয়েগুলোর খুব উৎসাহ! ফুলের ব্যবস্থা করেছে দারোগা বাবুর বাগান থেকে। আরও যা-যা দরকার সংগ্রহ করেছে। মোট কথা, আমার মনে হচ্ছে, যে ভাবে অনুষ্ঠানটি হবে, সহরের চেয়ে কোন অংশে খারাপ হবে না।"

গাঙ্গুলী মশায় পুলকিত হইয়া কহিলেন—"ভগবানের কৃপা আর তোমাদের চেষ্টা! এখন ভালয়-ভালয় সব হয়ে যায় তাহ'লেই। তবে তোমাদের উপকার আমি কোন দিন ভুলব না—" শেষ-দিকটায় কণ্ঠস্বর সরস হইয়া উঠিল।

বিনয় কহিল—"মেয়েরা বলছে, আজ একবার আপনাকে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে নেবে। থিয়েটারের যেমন ড্রেস-রিহার্সাল হয়, তেমনই আর কি!"

—"বেশ, মাষ্টারকে নিয়ে যাব এখন।"

—"না, না, মাষ্টার মশায় থাকুন এবার। মানে, সে রকম দেখবার-শুনবার তো দরকার নাই। মিনুর তো এ সব অনেক বারই করা আছে। ত্রুটি কিছু হবে না। তবে আপনার পছন্দ হওয়া চাই তো!"

—"আমার আবার পছন্দ-অপছন্দ কি? যা করবে তাই ....।"

বিনয় আবদারের সুরে কহিল—"তবু মেয়েদের ইচ্ছে, আপনাকে একবার দেখায়।"

—"বেশ, যাব তাহ'লে। কখন যেতে হবে?"

—"সন্ধ্যের সময়।"

—"সন্ধ্যেতে তো হবে না। মাষ্টারকে নিয়ে মনসা-মেলায় যাব। বাগ্‌দী ছোঁড়াগুলো কি রকম রপ্ত করলে দেখবার জন্তে।"

—"বেশ, ওটা শেষ করে আমাদের ওখানে আসবেন। আমরা সব প্রস্তুত করে রাখব। বেশী দেরী হবে না।"

বিকাল বেলায় গাঙ্গুলী মশায় বাহির হইবার জন্ত প্রস্তুত হইতেই গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় বেরোচ্ছ এত বেলাবেলি?"

গাঙ্গুলী মশায় রাগতঃ স্বরে কহিলেন—"যাচ্ছি আমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে। সব তো ভণ্ডুল হয়ে গেল তোমার একগুঁয়েমির জন্তে। সহর থেকে হাকিমরা আসবেন, কলকাতা থেকে শ্যামলাল আসবে, তাল সামলাতে হবে তো। তারই জন্তে পরামর্শ করতে যাচ্ছি সবার সঙ্গে।"

সন্ধ্যায় গাঙ্গুলী-গৃহিণী গা-হাত ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া তুলসী-তলায় প্রণাম সারিয়া, রান্না-ঘরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী আসিল। সঙ্গে সৌদামিনী।

প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী কহিল—"কি করছেন জ্যেঠাইমা?"

গাঙ্গুলী-গিন্নী আপ্যায়ন সহকারে কহিলেন—"এস মা এস, অনেক দিন আসনি; কেমন আছ?"

ঝি আসিয়া মাদুর পাতিয়া দিতেই দুই জনে বসিল। প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী কহিল—"আপনিও বসুন, আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।"

যে ভাবে কথাটা বলিল, তাহাতে গাঙ্গুলী-গৃহিণী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বসিয়া উদ্বেগের স্বরে কহিলেন—"কি কথা?"

প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী কহিল—"ছেলেটার আজ জ্বর। বাড়ী থেকে বেরোতাম না। কিন্তু ব্যাপার দেখে থাকতে পারলাম না, ছুটে চলে এলাম—"

গাঙ্গুলী-গিন্নী সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি ব্যাপার বল দেখি?"

—"আপনার কর্তাটির 'জন্মদিন' হচ্ছে আপনি জানেন?"

—"সে তো বারণ করে দিয়েছি। উনি বলে গেছেন—হবে না। তবে হাকিমদের নেমন্তন্ন হয়ে গেছে; তাঁরা আসবেন তো। তারই ব্যবস্থা করবার জন্তে পরামর্শ করতে বেরিয়েছেন।"

প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—"উনি বললেন—হবে না। আপনিও ভালমানুষ; বুঝে বসে রইলেন হবে না!"

সৌদামিনী কহিল—"তাই বটে! চিরদিন ভালমানুষী করে জ্বলে-পুড়ে মরল আমার খুড়িটি!"

গাঙ্গুলী-গিন্নীর রাগ হইল; কি এমন জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিয়াছেন তিনি স্বামীর জন্ত! স্বামী কি তাঁহার মাতাল না দুশ্চরিত্র! কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না।

প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী কহিল—"উনি বলে গেলে কি হবে, বন্ধ হয়নি। আমাদের পাড়ায় সারা দিন গান-বাজনা আর বক্তৃতা চলছে। বাড়ীতে টেঁকা যাচ্ছে না! বাড়ীতে অসুখ। তবু তো কিছু বলবার যো নাই। ফুলের কর্তার জন্তে হচ্ছে।"

সৌদামিনী কহিল—"তা ছাড়া কর্ত্তার পেয়ারের লোক সব। দু'দিন বাদে একেবারে আপনার লোক হয়ে যাবে।"

কথাটা গাঙ্গুলী-গিন্নীর কানে খোঁচার মত লাগিল। তবু কথাটাকে অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন—"তোমাদের পাড়ায় গান-বাজনা হচ্ছে কেন?"

প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী তীক্ষ্ণস্বরে জবাব দিল—"হবে না? বিনয় বাবুর ত্রিশ বছরের ধুমড়ো, আইবুড়ো শালীটি সভায় গান গাইবে—বক্তৃতা করবে যে!"

সৌদামিনী কহিল—"গলায় মালাও পরাবে। তা ছাড়া আরও ডাগর মেয়ে আছে কতকগুলো। আমাদের সধবা মেয়েরা যেমন পূজোর সময় মা দুর্গাকে উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে বরণ করে না? তেমনই করে কাকাকে বরণ করবে!"

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"এত সব ব্যাপার হবে, সে কথা তো কেউ বলেনি?" সৌদামিনীকে কহিলেন—"তুইও তো বলিসনি, বাছা?"

সৌদামিনী খন্-খন্ করিয়া বলিল—"আমি কি জানতাম না কি এত সব! আজই তো শুনলাম। তাছাড়া আরও ব্যাপার আছে, খুড়ি, শোন তো, মাথা ঘুরে পড়ে যাবে!"

আতঙ্কে গাঙ্গুলী-গিন্নীর মুখ ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল। শুষ্ক স্বরে কহিলেন—"আবার কি!"

প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী কহিল—"আপনাদের বাগান থেকে রোজ তরি-তরকারী বিনয়ের বাড়ী যাচ্ছে—পুকুর থেকে বড়-বড় মাছ যাচ্ছে! নূতন করে ঘর ছাওয়া হয়ে গেছে, বিনয় বাবুর শালীর জন্যে ভাল শাড়ী, ব্লাউস কেনবার জন্যে সহরে না কি লোক পাঠানো হয়েছে—"

গাঙ্গুলী-গিন্নী নীরস কণ্ঠে কহিলেন—"শাড়ী-টাড়ীর কথা জানি না। কিন্তু মাছ-তরকারী তো সব মাষ্টারদের বাড়ীতেই যায়। তোমাদের বাড়ীতেও যায়—"

—"সে কথা কে অস্বীকার করবে জ্যেঠাইমা! ওঁর খুব অনুগ্রহ আমাদের উপর। খুব ভাল লোক উনি। কিন্তু ওঁর ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে যদি কেউ ওকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করে, ওঁর শান্তির সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা করে, ওঁর মা ভগবতীর মত স্ত্রীকে পথে বসাবার চেষ্টা করে—"

গাঙ্গুলী-গিন্নী তীব্র উৎকণ্ঠার সহিত আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"সে আবার কি?"

—"ব্যাপার কি জানেন? বিনয় মাষ্টার চেষ্টা করছে, ওর শালীটার সঙ্গে আপনার কর্ত্তাটির বিয়ে দিতে।"

গাঙ্গুলী-গৃহিণীর সর্ব্বাঙ্গ যেন পাথর হইয়া গেল। বুকের স্পন্দন যেন থামিয়া আসিল। কণ্ঠে স্বর ফুটিল না। বিহ্বল চক্ষে প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

সৌদামিনী কহিল—"দেখ খুড়ি, ও-রকম করে হাল ছেড়ে দিলে হবে না। বুড়ো বয়সে ভীমরথী হয়েছে কাকার। তুমি শক্ত না হলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে!"

গাঙ্গুলী-গিন্নী ক্ষীণ স্বরে কহিলেন—"আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না—"

প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী কহিল—"আমার সঙ্গে আসুন। নিজের চোখে সব দেখুন, নিজের কানে সব শুনুন। তার পর যদি বিশ্বাস হয়তো, যা [illegible]।"

১১

রাত্রি আটটা। গাঙ্গুলী মশায় একা বিনয় মাষ্টারের বাড়ীতে হাজির হইলেন। বিনয় মাষ্টার বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া বসাইল।

বিনয় মাষ্টারের বাড়ীর পাশেই প্রফুল্ল মাষ্টারের বাড়ী। মাটীর দোতলা। খড়ে ছাওয়া। দোতলার ঘরটির একটি ছোট জানালা বিনয় মাষ্টারের বাড়ীর দিকে। সেটি দিয়া বিনয় মাষ্টারের বাড়ীর সমস্ত উঠানটা, বারান্দারও কতকটা দেখা যায়। জানালাটি সারা দিন বন্ধ থাকে, রাত্রে খোলা হয়। তবে প্রফুল্ল-গৃহিণীর বিনয়-গৃহিণীর সঙ্গে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইলে দিনের বেলাতেও জানালাটি কিছুক্ষণের জন্য খোলা হয়। সম্প্রতি জানালাটি অর্দ্ধোন্মুক্ত; তাহার পিছনে অন্ধকারের মধ্যে কয়েক জোড়া চোখ বিনয় মাষ্টারের বাড়ীর দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

গাঙ্গুলী মশায় বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেই কয়েকটি মেয়ে উলুধ্বনি করিল ও শাঁখ বাজাইল। মেয়েগুলি সাজগোজ করিয়াছে, পরনে রং-বেরং-এর শাড়ী, ব্লাউস। মাথার চুল লম্বা বেণীতে আবদ্ধ হইয়া সাপের মত পিঠে লুঠাইতেছে। উঠানের এক পাশে দাঁড়াইয়া তাহারা বায়ু-হিল্লোলিত বেতস লতার মত আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

সৌদামিনী কহিল—"কাকার আমার শালী-ভাগ্য বরাবরই ভাল। তোমারাও তো চার-পাঁচ বোন ছিলে, নয় গো খুড়ী?

সৌদামিনীর কথাগুলি একমুঠা গরম নুণের মত গাঙ্গুলী-গিন্নীর মনের উপর ছড়াইয়া পড়িল। জ্বালা ধরিল, কিন্তু চুপ করিয়া রহিলেন। স্বামীর যাহার এমন দুর্ম্মতি হইয়াছে, তাহাকে লোকে ঠাট্টা করিবে বৈ কি!

গাঙ্গুলী মশায় ঘরে ঢুকিলেন। মেজের উপর একটি গালিচার আসন পাতা। তাহার সামনে একটি থালায় লুচি, থালার চারি দিকে কয়েকটি বাটিতে নানা রকমের তরকারী, রেকাবীতে মিষ্টি ও পায়স, এক পাশে এক গ্লাস জল। একটু দূরে একটি ফ্রক-পরা ছোট মেয়ে পাখা হাতে বসিয়া আছে।

গাঙ্গুলী মশায় বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন—"এ আবার কি?"

বিনয় সবিনয়ে কহিল—"একটু খেয়ে যেতে হবে।"

"এ বয়সে এত খাওয়া সহ্য হবে কি"—গাঙ্গুলী মশায়ের মুখে আসিল, কিন্তু চাপিয়া গেলেন। আসনে বসিতেই মেয়েটি দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পাখা করিতে লাগিল।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"থাক্, থাক্, পাখা করতে হবে না!"

বিনয় কহিল, "করুক। এখন থেকে মানী লোকদের সেবা করতে শেখা দরকার। তা ছাড়া আপনার মত লোকের সেবা করবার সৌভাগ্য ক'দিন হয় ওদের!"

খাওয়া শেষ হইলে গাঙ্গুলী মশায় বারান্দায় আসিলেন। একটি মেয়ে আসিয়া হাতে জল ঢালিতে লাগিল।

সৌদামিনী কহিল—"এতক্ষণে খাওয়া শেষ হল; হবু শ্বশুর-বাড়ীর খাওয়াটা ভালই হল বোধ হয়!"

প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী কহিল—"প্রায়ই তো আসেন, খান-দান!"

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"না তো। দিনই রাত্রে তো বাড়ীতে [illegible]।"

সৌদামিনী কহিল—"তোমাকে খাওয়া দেবার জন্তে দিনই দু'বার করে খেতে হয় বেচারাকে। এই বয়সে এই করতে গিয়ে পেটের রোগ না হয়ে যায় শেষে!"

হাত ধোওয়া শেষ হইলে গাঙ্গুলী মশায় ঘরে গিয়া মাদুরে বসিলেন। অদূরে আর একটি মাদুর পাতা, তাহার উপরে একটি হারমোনিয়াম বসানো। কিছুক্ষণ পরে বিনয় মাষ্টারের বড় শালী ঘরে ঢুকিল। সাজগোজের বাহার আজ সেদিনের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী। মেয়েটি গাঙ্গুলী মশায়কে নমস্কার করিয়া মাদুরে বসিল ও অবিলম্বে গান শুরু করিল।

মেয়েদের কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ কোমল ও মধুর। তাহা ছাড়াও এ মেয়েটির কণ্ঠস্বরে বহু দিনের শিক্ষা ও অভ্যাসের পরিচয় পাওয়া গেল। গাঙ্গুলী মশায় মেয়েদের গান, গ্রামোফোনে ছাড়া, সামনে বসিয়া কখনও শুনেন নাই। একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন।

প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী কহিল—"বিনয় বাবুর বড় শালী গান গাচ্ছে; সভায় গাইবে কি না!"

সৌদামিনী কহিল—"হ্যাঁ গা, নাচতে জানে?"

—"জানে বৈ কি!" পূর্ব্ববঙ্গের মেয়ে,. ওরা নাচতে জানে, নাচাতেও জানে।"

সৌদামিনী কহিল—"নাচুনে, গাউনে মেয়ে দেখে কাকার আমার মুণ্ডু ঘুরে গেছে। ওকে পেলে আমার বুড়া খুড়োটিকে যে বনবাসে পাঠাবে, তাতে আশ্চর্য্য কি!"

চমকিয়া উঠিলেন গাঙ্গুলী-গিন্নী। বনবাস! বনবাস না হোক কাশীবাস তো বটে! গাঙ্গুলী মশায় তাঁহাকে কাশীবাস করিবার জন্ত সেদিনও জপাইতেছিলেন, সে কথা তাঁহার মনে পড়িল।

গান শেষ হইল। সুরের মধুর রেশটুকু ঘরের বাতাসে পাক খাইয়া খাইয়া ক্রমশঃ লীন হইয়া গেল। গাঙ্গুলী মশায় সশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন—"বেশ হয়েছে।"

তার পর কবিতা পাঠ। ধীরে, ধীরে, সুস্পষ্ট কণ্ঠে ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত মেয়েটি কবিতা পাঠ করিতে লাগিল।

প্রফুল্ল মাষ্টারের কোঠার উপরেও তাহা শুনা যাইতে লাগিল। প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী কহিল—"বক্তৃতা করছে মেয়েটা—"

সৌদামিনী কহিল—"কতই জানে! ধন্যি মেয়ে বাবা! খুড়ো ঘুরুং!, খুড়ীর কপালে এমন শত্রু ছিল কে জানত!"

কবিতা পাঠের পর বিনয় মেয়েটিকে কহিল—"মালাটা কি ভাবে পরাতে হবে, একবার দেখে নেবে না কি?"

মেয়েটি লজ্জায় মাথা হেঁট করিল। গাঙ্গুলী মশায় শশব্যস্তে কহিলেন—"থাক, থাক, ও আর আজ কেন?"

বিনয় কহিল—"একটা মালা তৈরী করা আছে যে—"

—"তা থাক গে।"

বিনয় মেয়েটিকে কহিল—"তাহ'লে এক কাজ কর মিনু, মালাটি ওঁর পায়ে দিয়ে, ওঁকে প্রণাম করে চলে যাও।"

বিনয়ের চোখের ইঙ্গিতে একটি ছোট মেয়ে একটি ফুলের মালা আনিয়া মেয়েটির হাতে দিল। মেয়েটি মালাটি হাতে লইয়া মৃদুপদে, নত-মস্তকে গাঙ্গুলী মশায়ের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মালাটি পর-পর গাঙ্গুলী মশায়ের দুই পায়ে ঠেকাইয়া গাঙ্গুলী মশায়ের কোলের উপরে নামাইয়া রাখিল, তার পর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। গাঙ্গুলী মশায়ের আপাদ-মস্তক ঘন-ঘন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল, নেশাগ্রস্ত লোকের মত মাথাটা ঝিম-ঝিম করিতে লাগিল এবং কয়েক মুহূর্তের জন্ত বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র চেতনা রহিল না। সম্বিত লাভ করিতেই দেখিলেন—মেয়েটি চলিয়া গিয়াছে এবং বাহিরে মেয়েরা উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতেছে।

সৌদামিনী কহিল—"সব দেখলে শুনলে তো? এতেও বিশ্বাস হল না?"

রাগে, দুঃখে গাঙ্গুলী-গিন্নীর সারা মন জ্বলিতেছিল, কান্নার আবেগ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল, সবলে তিনি নিজেকে সংযত করিলেন।

গাঙ্গুলী মশায় চলিয়া গেলেন। এতক্ষণে মেয়েটি উঠানে নামিল। তাহার বোনেরা তাহাকে ঘেরিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—"কি দিদি! কতখানি ঘায়েল হল?"

এক জন কহিল—"যে রকম মাতালের মত টলতে-টলতে গেলেন, বাড়ীতে পৌঁছবেন তো, না রাস্তায় কাৎ হয়ে থাকবেন।"

আর এক জন কহিল—"মালাটা আজ কোল পর্য্যন্ত উঠল, এর পর গলায় উঠবে!"

গাঙ্গুলী-গিন্নী দুই চোখ ভরিয়া মেয়েটিকে দেখিয়া লইলেন। কান ভরিয়া কথাগুলি শুনিলেন। সমস্ত ব্যাপারটির সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না।

১২

সৌদামিনীর সঙ্গে বাড়ী ফিরিলেন গাঙ্গুলী-গৃহিণী। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে। মুখ-চোখ জ্বালা করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। চলিতে কষ্ট হইতেছে। নিদারুণ ক্রোধ ও লজ্জা। বুড়া বয়সে এই কেলেঙ্কারী! বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়াছে! এত দিন যাহার সঙ্গে সুখে-দুঃখে ঘর-সংসার করিয়াছে, তাহাকে পথে বসাইয়া কোথাকার কে একটা মেয়েকে ঘরে ঢুকাইবার চেষ্টা! মাঝে-মাঝে ক্রোধের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে দুই চোয়াল আপনা হইতে দৃঢ় হইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বসিতেছে। মাঝে-মাঝে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেছেন—"ছিঃ ছিঃ, এই দেখতে হল! এর চেয়ে মরণ হ'ল না কেন?"

সৌদামিনী নীরবে তাঁহার সঙ্গে পথ চলিতেছে। কোন উত্তেজক কথা বলিতেছে না, সান্ত্বনাও দিতেছে না। গাঙ্গুলী-গৃহিণীর অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছে সে।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল। হঠাৎ গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিয়া উঠিলেন—"বুড়োর সামনে আজ গলায় দড়ি দেব।"

সৌদামিনী এতক্ষণে কথা কহিল—"ও-সব কোরো না, খুড়ী! ওতে কি আর লাভ হবে! বুড়ো নিশ্চিন্তি হয়ে দশ দিন পেরোতে না পেরোতে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসবে!"

গাঙ্গুলী-গিন্নী রোষ-তীব্র কণ্ঠে কহিলেন—"ঠিক বলেছিস! কি করা যায় বল দেখি?"

—"কোথাও নিয়ে, পালিয়ে যাও। কোন মেয়ের কাছে। তোমার তো যাবার যায়গার অভাব নাই।"

কাশী যাওয়ার কথা মনে পড়িল। বেয়াই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। কহিলেন—"ঠিক বলেছিস! তাই করব। বুড়োকে নিয়ে পালাব। গাঁয়ে ফিরব না, যত দিন না ঐ ডাকিনী মাগীগুলো গাঁ থেকে সরে যায়!"

পাড়ায় ঢুকিয়া গাঙ্গুলী-গিন্নী সৌদামিনীকে কহিলেন—"আমাকে রাধানাথ ঠাকুরপোর কাছে নিয়ে চল।"

সৌদামিনী বিস্ময়ের স্বরে কহিল—"কেন?"

—"রাধানাথ ঠাকুরপোকে দিয়ে যাবার ব্যবস্থা করাব। ও ছাড়া কেউ পারবে না।"

রাধানাথ বাড়ীতেই ছিল। গাঙ্গুলী-গিন্নী বাড়ীর মধ্যে ঢুকিলেন না। সৌদামিনী গিয়া রাধানাথকে ডাকিয়া আনিল। রাধানাথ সসম্মানে কহিল—"বৌঠান! এত রাত্রে? কি খবর? সব ভাল তো?"

গাঙ্গুলী-গিন্নী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—"ভাই! আমার সর্বনাশ হতে বসেছে—"

রাধানাথ বিস্ময় ও ত্রাসের ভাণ প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"কি হয়েছে?"

—"বুড়ো আবার বিয়ে করতে যাচ্ছে।"

—"সে কি? তা তো শুনিনি? শুনেছিলাম, কি সব হচ্ছে! জন্মদিন, টন্মদিন—"

গাঙ্গুলী-গিন্নী সরোষে কহিলেন—"ও সব ধাপ্পা! বিনয় মাষ্টারের একটা ধাড়ী শালী আছে। এই ফন্দিতে মেয়েটার সঙ্গে মাখামাখি করে, তাকে বিয়ে করবার চেষ্টা—"

রাধানাথ সবিস্ময়ে কহিল—"এ্যাঁ! বলেন কি? এই সব ব্যাপার!" সৌদামিনীর দিকে তাকাইয়া কহিল—"আমি বলিনি তোকে—গাঙ্গুলী দাদার বুদ্ধি-শুদ্ধি বিগড়ে যাচ্ছে?"

সৌদামিনী কহিল—"শুধু তুমি কেন, গাঁ-শুদ্ধ সবাই বলছে—ভীমরথী হয়েছে বুড়োর!"

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"কি উপায় বল দেখি?"

রাধানাথ কহিল—"কি আর উপায় করবেন? কুলীন বামুনরা আগে পঞ্চাশ-ষাটটা বিয়ে করতো। এখন যদি আর একটি মাত্র বিয়ে করতে চায় তো কে মানা করবে?"

—"মেয়ে-জামাই রয়েছে। এক-ঘর নাতি-নাতনী রয়েছে, তা সত্ত্বেও বিয়ে করবে?"

রাধানাথ মুরুব্বিয়ানার স্বরে কহিল—"তা তো করা উচিত নয়, বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলে ভদ্রলোকে তা করে না আজকাল। তবে যদি ঐ দু'টোই কারও বিগড়ে গিয়ে থাকে—"

—"যদি এখান থেকে নিয়ে চলে যাই?"

"কোথা যাবেন?"

—"কাশী। সেখানে আমার বেয়াই-বেয়ান থাকেন—আমাদের যেতে বলেছেনও—"

—"আপনি তো নিয়ে যেতে চান, কিন্তু উনি যদি যেতে না চান?"

—"তাই তো তোমার কাছে এসেছি, ঠাকুরপো। তুমি সব ব্যবস্থা করে দাও। তুমি ছাড়া কেউ পারবে না। তোমার গাড়ী আছে, লোক-জন আছে। যদি বুড়ো না যেতে চায় তো হাতে-পায়ে বেঁধে চ্যাংদোলা করে গাড়ীতে উঠিয়ে দেবে।"

রাধানাথ মুখ টিপিয়া হাসিল, সৌদামিনীও পিছনে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল, কিন্তু অন্ধকারে গাঙ্গুলী-গিন্নীর কিছুই ঠাহর হইল না।

সৌদামিনী কহিল—"তোমাদের তো লোকজন, গরুর গাড়ী, কিছুরই অভাব নাই। রাধানাথ কাকাকে বলবার দরকার কি?"

গাঙ্গুলী-গিন্নী তীব্র কণ্ঠে জবাব দিলেন—"আছে তো। তাতে আমার কি! কর্তারই যদি এমন মতি-গতি হয় তো চাকর-বাকর আমার কথা শুনবে কেন?"

রাধানাথ কহিল—"বেশ, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। দু'জন লোক সঙ্গে যাবে। তারা টিকিট করে আপনাদের ট্রেণে তুলে দেবে। কাল সকালের গাড়ীতে যাবেন তো? রাত তিনটেয় বেরোতে হবে এখান থেকে। আপনারা প্রস্তুত থাকবেন।"

১৩

পরদিন বেলা আটটায় হেড-মাষ্টার, বিনয় মাষ্টার ও গ্রামের কয়েকটি মাতব্বর ছেলে গাঙ্গুলী মশায়ের বৈঠকখানায় হাজির হইল। খামার-বাড়ীতে একটা লোক কাজ করিতেছিল। কহিল—"কত্তা এখনও আসেন নাই, এজ্ঞে—"

মাষ্টার মশায় আশ্চর্য্য হইলেন। কাল গাঙ্গুলী মশায় নিজেই তাহাকে সকলকে সঙ্গে করিয়া এই সময়ে বৈঠকখানায় আসিতে বলিয়াছিলেন, আর নিজেই অনুপস্থিত! শরীর খারাপ হইয়াছে না কি? আজই সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান, আজ যদি তাঁহার কোন অসুখ-বিসুখ হইয়া থাকে তো বিপদের কথা!

সকলে বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল। ঝি উঠান ঝাঁট দিতেছিল; ডাকাডাকিতে ঝাঁটা-হাতেই বাহির হইয়া আসিল। সমস্বরে প্রশ্ন হইল—"গাঙ্গুলী মশায় কোথায়?"

ঝি সাফ জবাব দিল—"ওনারা তো ভোর রেতে চলে গেছেন।"

সমবেত, সন্ত্রস্ত স্বরে প্রশ্ন হইল, "কোথায়?"

ঝি কহিল—"তীথ করতে কাশী"—বলিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সকলে হতবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সমাপ্ত

ভাগ্যলিপি

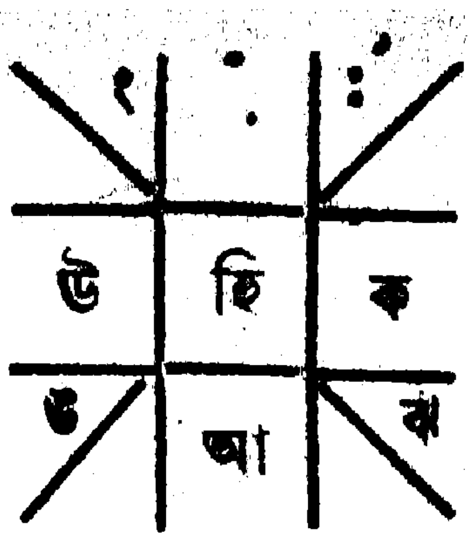

শ্রীবারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

ভাগ্যলিপি জানিতে কাহার না আগ্রহ হয়? অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস থাকুক বা নাই থাকুক, এই সম্বন্ধে আলোচনা চলিলে সকলেই তাহাতে কৌতূহলী হইয়া উঠেন। বিশেষতঃ দশ জনের আড্ডায় কিংবা মজলিসে হাতের রেখা দেখিয়া জীবনের ফলাফল বলিতে পারেন, এমন কেহ উপস্থিত হইলে প্রায় সকলেই নিজ নিজ ভাগ্যফল জানিবার জন্ত হাত বাড়াইয়া দেন। নিজেকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দেন, কিংবা পুরুষকারে বিশ্বাসী ব্যক্তিকেও এইরূপ ক্ষেত্রে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতে দেখা যায়। হাত দেখিয়া মনের মত দুই-চারিটা কথা বলিতে পারিলে কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের সুবিধাও করা যায়। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে অনেক আজগুবি কাহিনীও শুনা যায়। যাঁহারা জ্যোতিষের ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই,—কোন কোন জ্যোতিষী হাত দেখিয়া কিংবা কোষ্ঠী বিচার করিয়া নির্ভুল ভাবে অনেক কথা বলিতে পারেন। ভবিষ্যতের কথা যে কোন কোন স্থলে সুন্দর ভাবে মিলিয়া গিয়াছে, এইরূপ অভিজ্ঞতারও অভাব নাই।

ভাগ্যলিপি জানিবার জন্ত কেহ কেহ আবার বাতিকগ্রস্ত হইয়া পড়েন; কোথাও কোন জ্যোতিষীর খ্যাতি শুনিলে তাহার কাছে ছুটিয়া যান। ভৃগুসংহিতার সন্ধানে কেহ কেহ অজস্র অর্থব্যয়ও করেন। মানুষের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া ব্যবসায়ী জ্যোতিষীরাও নিজেদের সুবিধা করিয়া লন। কবচ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন দ্বারা গ্রহদোষ কাটাইবার জন্ত কেহ কেহ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া সাধারণ বুদ্ধি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলেন। এই রকম ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী জ্যোতিষীরা যেন মক্কেলের হইয়া গ্রহের দরবারে ওকালতির, ভূমিকায় নামিয়া আসেন।

মানুষ যে ভাগ্যলিপি জানিতে কিরূপ বাতিকগ্রস্ত হইতে পারে, তাহার বহু অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। এক জন খ্যাতিমান সাহিত্যিক সম্বন্ধে এইরূপ একটি অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। তিনি একবার শুনিলেন যে শ্রীরামপুরের কোন এক দুর্গম পল্লীতে এক জন তান্ত্রিক জ্যোতিষী আছেন, তাঁহার অতুলনীয় ক্ষমতা। এই কথা শুনিবা মাত্র সাহিত্যিক মহাশয় কয়েক জন বন্ধু সহ তাঁহার সন্ধানে ছুটিলেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে এক জন গ্রাজুয়েট ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তান্ত্রিক মহাশয় বলিলেন, 'তুমি বাপু ম্যাট্রিক পাশ করিতে পারিবে না।' ভদ্রলোক উত্তর করিলেন, 'আজ্ঞে, আমি ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছি।' তখন তান্ত্রিক বলিলেন, 'তবে কিছুতেই তুমি আই-এ পাশ করিতে পারিবে না।' উত্তরে ভদ্রলোক বলিলেন, 'আজ্ঞে, তাও করিয়াছি।' তান্ত্রিক বলিলেন, 'তাহা হইলে কিছুতেই বি-এ পাশ করিতে পারিবে না।' ইহার উত্তরে যখন শুনিলেন বি-এ পাশ করিয়াছেন; তখন তান্ত্রিক ক্ষেপিয়া গিয়া বলিলেন, 'তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি ফাঁকি দিয়া পাশ করিয়াছ।' এইরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াও তাঁহার যেখানে-সেখানে ভাগ্য যাচাই করিবার বাতিক সারে নাই!

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, 'এই সকল হাত-দেখা কিংবা কোষ্ঠী-বিচারে তাঁহাদের মোটেই বিশ্বাস নাই।' অথচ দেখি,—যখন কোন জ্যোতিষী বলিল, 'মহাশয়, অমুক বর্ষে আপনার পত্নীহানি যোগ আছে।' তাহার দুই-চারি দিন পরে তাঁহারই হাতে প্রতিষেধকরূপে প্রবালের আংটী রহিয়াছে দেখিতে পাই। আমাদের এক নিরাকারবাদী প্রবীণ সাহিত্যিক বন্ধু তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে নিরাকার পরম ব্রহ্মের প্রভাব অপেক্ষা নবগ্রহের প্রভাবই অধিক স্বীকার করিয়া তাহার প্রতীকস্বরূপ প্রবালের হার পরেন ও হাতে গোমেদের আংটী ধারণ করেন।

খ্যাতনামা জ্যোতিষীদিগের বিজ্ঞাপন দেখিলেই বুঝা যায়, হাইকোর্টের বিচারপতি, জেলার কর্ত্তা, মন্ত্রী, জমিদার, অধ্যাপক, কেরাণী প্রভৃতি জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর গণ্যমান্ত লোকই তাঁহাদের গণনায় এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতিতে সন্তুষ্ট ও বিশ্বাসী। এখন স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, এই জ্যোতিষ-বিদ্যার মূলে কি কোন সত্য আছে? কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর কি ইহা প্রতিষ্ঠিত? বর্ত্তমান যুগে বেদের বাণী অথবা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের বাণী বলিয়া কোন বিষয় চালাইয়া দেওয়া শক্ত। সুতরাং ইহার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার চেষ্টাই যুক্তিসঙ্গত। দুঃখের বিষয়, আমাদের গবেষণা-বুদ্ধি নানা দিকে পরিচালিত হইলেও এই দিকে তেমন কেহই দৃষ্টি দেন নাই। শুধু বুজ্‌রুকি বলিয়া উড়াইয়া যে জিনিষকে দেওয়া যায় না, তাহার মূল তত্ত্বের অনুসন্ধান করাই উচিত।

জন্ম-সময়ের উপর যে মানুষের দেহ-মনের অনেকখানি নির্ভর করে, তাহা বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ না করিলে বুঝা কঠিন। এইরূপ করিলে বুঝা যাইবে যে, জ্যোতিষশাস্ত্র সত্য সত্যই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সম্ভবতঃ সুদীর্ঘ কাল পর্য্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা হইতেই ইহার তথ্যগুলি গৃহীত হইয়াছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের বচনগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত, পরীক্ষা করিলে তাহাই প্রমাণিত হয়। জন্মকালীন গ্রহসন্নিবেশ অনুযায়ী মানুষের দেহ-মনের যে বিকাশ সাধন কিরূপে হইতে পারে, একটি সাধারণ অথচ সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। রবি একটি প্রধান গ্রহ। শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও সৌরমণ্ডলে রবির প্রভাব সর্ব্বজনবিদিত। পৃথিবী সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করে, এই পরিভ্রমণে সূর্য্য হইতে দূরত্ব অনুযায়ী গ্রীষ্মাদি ঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। দেখা যায়, সকল মাসে বা সকল সময়ে পৃথিবীর উপর সূর্য্যের প্রভাব সমান থাকে না; সুতরাং বৈশাখ মাসে যেরূপ প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হয়, নিশ্চয়ই পৌষ মাসে সেরূপ হয় না। বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে সূর্য্যের অবস্থান। এই মাসে যে সকল ব্যক্তির জন্ম, তাঁহাদের মধ্যে মানসিক কতকটা সাদৃশ্য থাকিবে। প্রত্যেক মাসের বেলায়ই সেই কথা খাটে। বৈশাখে নূতন পত্র-পল্লবভূষিতা পৃথিবী, অপর দিকে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ। এক দিকে নব উন্মাদনা, অপর দিকে বিরাট অসহিষ্ণুতা। বৈশাখে জাত ব্যক্তির দেহ-মনে প্রকৃতির এই ছাপ পড়ে। তাঁহার অল্পে উত্তেজনা আসে, মান-অভিমান প্রবল হয়। সামান্ত জিনিষকে বড় করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি ইহাদের জন্মে। আবার নব নব সৃষ্টির উদ্ভাবনী প্রতিভাও থাকে। অন্তান্ত গ্রহ প্রবল হইলে এইরূপ জাতক কবি, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি হইতে পারেন। আবার কু-গ্রহের প্রভাবে মান-অভিমান হইতে প্রতিশোধপরায়ণ, অল্প উত্তেজনা হইতে অতি-ক্রোধী, অস্থির-চিত্ত হইতে পারেন। মোটের উপর তীক্ষ্ণ ভাবে লক্ষ্য করিলে এই কথাগুলির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

জন্মকালীন গ্রহসন্নিবেশে মানুষের দেহ-মনের উপর যে প্রভাব পড়ে, তাহা শুধু জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বচন অনুযায়ী না বুঝাইয়া আমরা অন্য ভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিব। প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব কিরূপ হইয়াছে, তাহা আমাদের আদর্শ হইবে। এই জন্য বৃত্তি অনুযায়ী মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া আমরা বিভিন্ন রাশিচক্রের তুলনামূলক আলোচনা করিব। রাশিচক্রের আলোচনা করিতে হইলে এই সম্বন্ধে অনেকগুলি পারিভাষিক কথা আসিয়া পড়ে, এই জন্য আমাদের আলোচনায় সাহায্য করে এমন কতকগুলি পরিভাষার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। প্রথমেই একটি রাশিচক্র দেখুন—

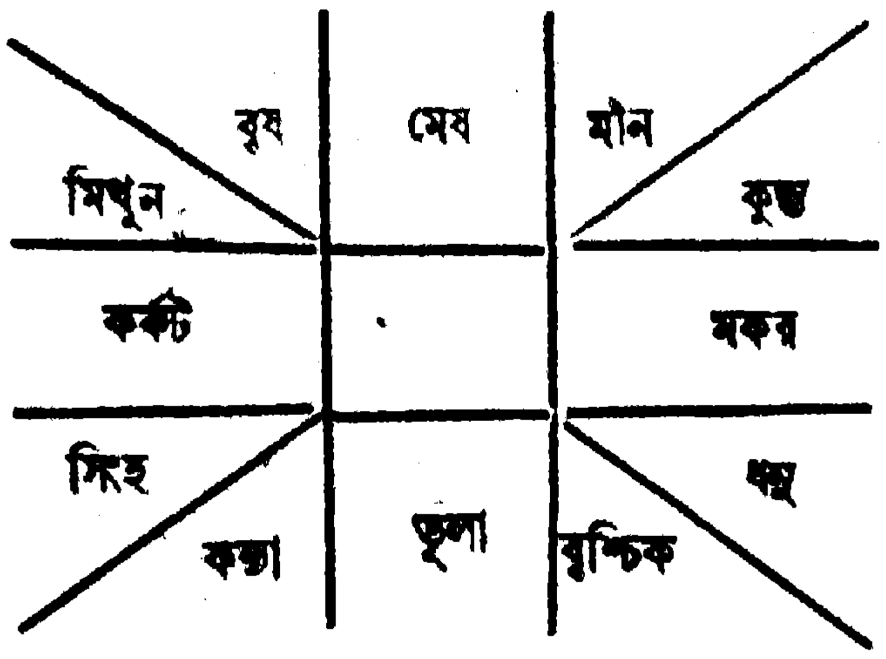

দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ ৬০ দণ্ডের মধ্যে যথাক্রমে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন—এই বারোটি রাশির উদয় হইয়া থাকে; এইগুলিকে বলে লগ্ন। জন্মের সময় অনুযায়ী জাত-ব্যক্তির লগ্ন নির্ণয় করা হয়। জন্মকুণ্ডলীতে 'লং' এই সাঙ্কেতিক কথার দ্বারা লগ্ন সূচিত হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্ত্তে দ্বাদশটি স্থানে তৎকালীন গ্রহ-সন্নিবেশ অনুযায়ী মানুষের ভাগ্যফল নির্দ্ধারিত হয়। যথা—১। তনুভাব, ২। ধনভাব, ৩। সহজ বা ভ্রাতৃভাব, ৪। বন্ধু বা মাতৃভাব, ৫। পুত্রভাব, ৬। রিপুভাব, ৭। জায়াভাব, ৮। নিধনভাব, ৯। ধর্ম্ম বা ভাগ্যভাব, ১০। কর্ম্মভাব, ১১। আয়ভাব, ১২। ব্যয়ভাব। লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম এই চারিটি গৃহকে 'কেন্দ্র' বলা হয়। কেন্দ্রস্থিত গ্রহ মহা বলবান হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে নবম ও পঞ্চম গৃহকে 'ত্রিকোণ' বলা হয়। দ্বাদশটি গৃহের মধ্যে লগ্ন, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, দশম ও একাদশ—এই আটটি গৃহকে শুভ গৃহ বা শুভ ভাব এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ এই চারিটি গৃহকে অশুভ গৃহ বা অশুভ ভাব বলা হয়। প্রত্যেক গৃহ বা ভাবের আবার অধিপতি গ্রহ আছেন। যেমন,—মেষের অধিপতি মঙ্গল, বৃষের শুক্র, মিথুনের বুধ, কর্কটের চন্দ্র, সিংহের রবি, কন্যার বুধ, তুলার শুক্র, বৃশ্চিকের মঙ্গল, ধনুর বৃহস্পতি, মকর ও কুম্ভের শনি, মীনের বৃহস্পতি। যে যে রাশির গৃহ শুভ ভাব, সেই সেই রাশির অধিপতি গ্রহকে শুভ ভাবাধিপতি আর যে যে রাশির গৃহ অশুভ ভাব হয়, সেই সেই রাশির অধিপতিকে অশুভ ভাবাধিপতি বলা হয়। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র—এই তিনটি শুভগ্রহ; রবি, শনি, মঙ্গল, রাহু ও কেতুকে পাপগ্রহ বলা হয়। বুধ আবার পাপগ্রহের সহিত মিলিত হইলে পাপগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হয়। ক্ষীণ চন্দ্র পাপগ্রহরূপে পরিগণিত। চন্দ্র যে গৃহে অবস্থান করে, তাহাই জাতকের রাশি। গ্রহগণের আবার তুঙ্গস্থান ও নীচস্থান আছে। মোটামুটি মনে রাখিতে হইবে যে মেষরাশি রবির, বৃষরাশি চন্দ্রের, মকররাশি মঙ্গলের, কন্যারাশি বুধের, কর্কটরাশি বৃহস্পতির, মীনরাশি শুক্রের, তুলারাশি শনির তুঙ্গ বা উচ্চস্থান। রাহুর উচ্চস্থান মিথুন, কেতুর উচ্চস্থান ধনু। তুঙ্গ বা উচ্চস্থানস্থ গ্রহ বিশেষ বলবান্ হইয়া থাকে। এখন নীচস্থানের কথা বলা হইতেছে—রবির নীচস্থান তুলারাশি, চন্দ্রের নীচস্থান বৃশ্চিকরাশি, মঙ্গলের নীচস্থান কর্কট, বুধের মীন, বৃহস্পতির মকর, শুক্রের কন্যা, শনির মেষ, রাহুর ধনু ও কেতুর বৃষরাশি নীচস্থান। প্রত্যেক রাশির অধিপতি গ্রহের পঞ্চম ও নবম রাশির অধিপতি গ্রহ তাহার মিত্র এবং সপ্তম রাশির অধিপতি গ্রহ তাহার শত্রু।

আমরা রাশিচক্র বিচারের জটিল বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোন আলোচনা এখানে করিব না। নির্ভুল গণনা করিতে হইলে বা অধিকতর স্থির ফল নির্ণয় করিতে স্ফুট-অনুযায়ী ভাবচক্র নিরূপণ করিতে হয়। কিন্তু এখানে তাহা না করিলেও আমাদের বিশেষ বাধা হইবে না। শুধু গ্রহগণের দৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। যে গ্রহ যে গৃহে অবস্থান করে, সেই গৃহ হইতে তৃতীয় ও দশম স্থানে (শনি ব্যতীত) গ্রহগণের একপাদ দৃষ্টি, চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে (মঙ্গল ব্যতীত) গ্রহগণের ত্রিপাদ দৃষ্টি, পঞ্চম ও নবম স্থানে (বৃহস্পতি ব্যতীত) অপর গ্রহগণের দ্বিপাদ দৃষ্টি, সপ্তম স্থানে সকলেরই পূর্ণ দৃষ্টি। অধিকন্তু তৃতীয় ও দশমে শনির পূর্ণ দৃষ্টি, নবম ও পঞ্চমে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি এবং চতুর্থ ও অষ্টমে মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি। পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও দ্বাদশে (দাক্ষিণাবর্ত্তে) রাহুর পূর্ণ দৃষ্টি; কেতুর কোন দৃষ্টি নাই। কোষ্ঠী-বিচারের অসংখ্য যোগ ও জটিল বিচার পদ্ধতির কথা আলোচনা না করিয়াই আমরা সাধারণ ভাবে গ্রহগণের অবস্থিতি অনুযায়ী জাত-ব্যক্তির জীবনের একটা আভাস পাইতে পারি।

মনে রাখিতে হইবে যে, পাপগ্রহ যে গৃহে থাকে বা দৃষ্টি করে, সেই ভাবেরই হানি হয়; তবে স্বগৃহে থাকিলে অনিষ্ট হয় না। শত্রুগৃহস্থ গ্রহ ভাবফলের হানি করে, মিত্রগৃহে ভাবফলের বৃদ্ধি করে, তুঙ্গীগ্রহ অত্যন্ত শুভ। আবার যদি কোন শুভ ভাবের অধিপতি অশুভ স্থানে অবস্থান করেন, তবে সেই শুভ ভাবের হানি হয়।

আমরা প্রায় একধর্ম্মী কয়েকটি রাশিচক্রের পর পর আলোচনা করিব। পৃথক্ ভাবে বিচার না করিয়া সাদৃশ্যমূলক আলোচনাই আমাদের লক্ষ্য হইবে। প্রথমেই সংসারবিরাগী জগতের হিতবাণী-প্রচারক মহাপুরুষদের কথাই বলিব। প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মকুণ্ডলী দেখুন—

শ্রীচৈতন্যদেব

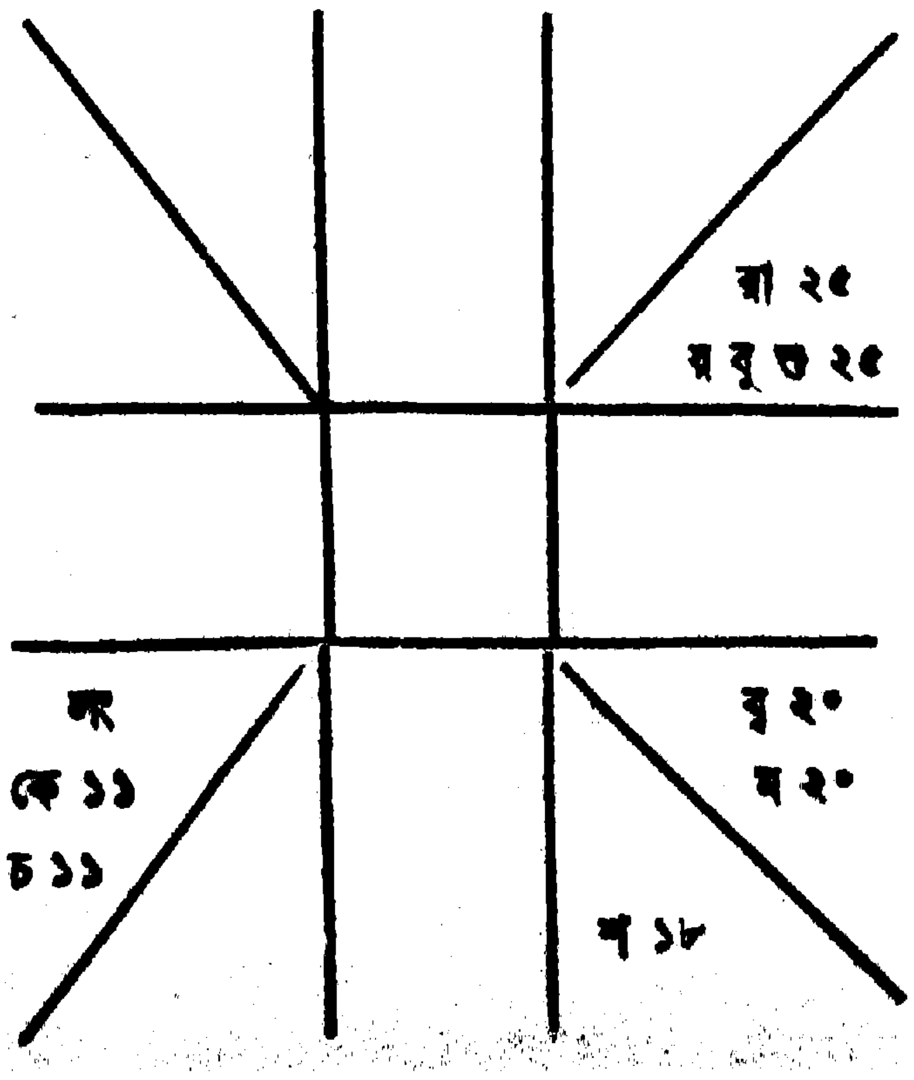

শ্রীচৈতন্যদেবের সিংহলগ্নে জন্ম, লগ্নে চন্দ্র ও কেতু, চতুর্থে শনি, পঞ্চমে বৃহস্পতি ও মঙ্গল, সপ্তমে রবি, বুধ ও রাহু অবস্থান করিতেছেন। অর্থাৎ সাতটি গ্রহ কেন্দ্রে এবং দুইটি গ্রহ কোণে। ইহা একটি প্রবল সন্ন্যাস-যোগ। চতুর্থস্থানে ও পঞ্চমস্থানে বিদ্যার বিচার হইয়া থাকে। ইহার চতুর্থের অধিপতি মঙ্গলে ও পঞ্চমের অধিপতি বৃহস্পতি একত্রে পঞ্চম স্থানে অবস্থান করায় বিদ্যা বিষয়ে অতিশয় শুভ হইয়াছে। বৃহস্পতির তুল্য জ্ঞানী ও মহাপাণ্ডিত্য জাতক লাভ করিয়াছেন। ইহার লগ্ন হইতে সপ্তম স্থানে পাপগ্রহ রহিয়াছে, পত্নীকারক গ্রহ শুক্র পাপযুক্ত, চন্দ্রও পাপযুক্ত সুতরাং পত্নীহানি যোগ ও দাম্পত্যজীবনে অনাসক্তি বুঝাইতেছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব

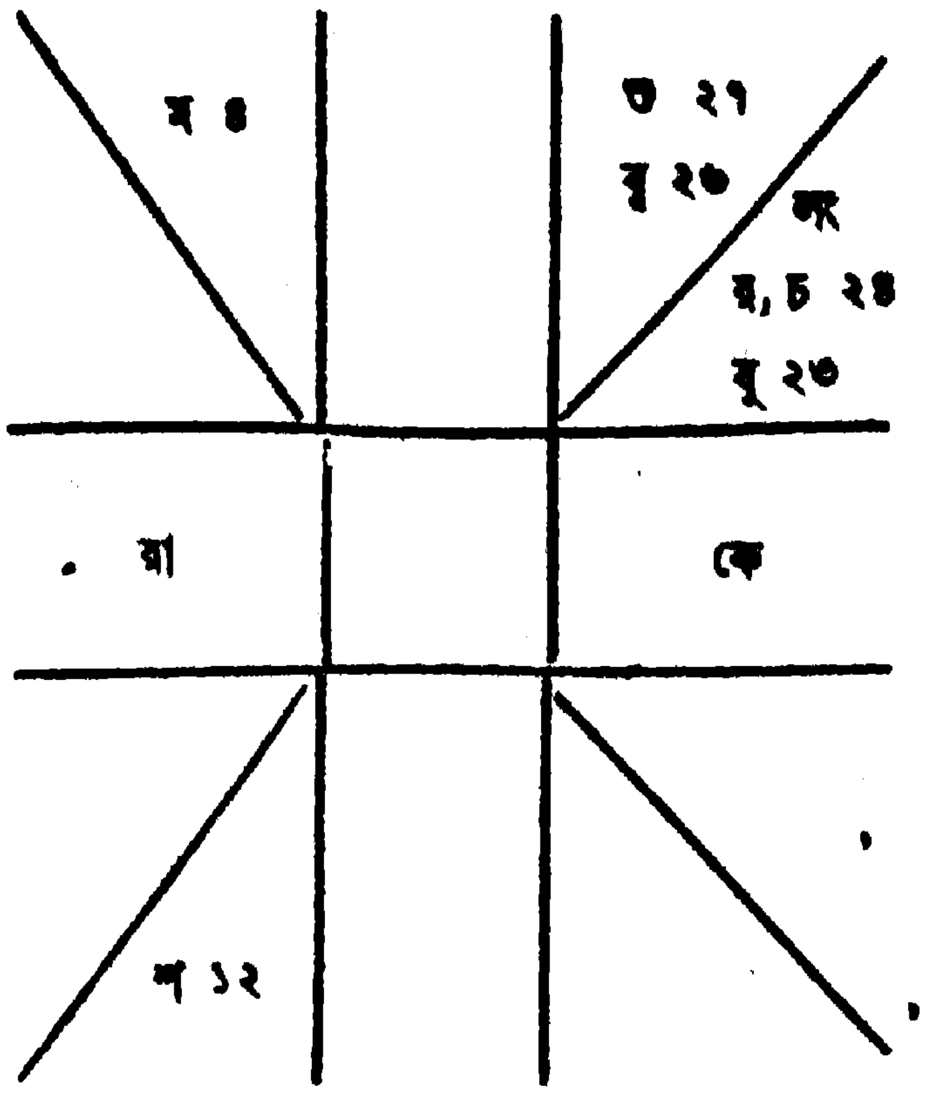

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মকুণ্ডলীতে দেখা যায়, পঞ্চমাধিপতি বুধ ও লগ্নাধিপতি শনি পরস্পর ক্ষেত্র বিনিময় করিয়াছে; নবমাধিপতি শুক্র তুঙ্গস্থ ও শনির সঙ্গে পরস্পর পূর্ণ দৃষ্টিতে আবদ্ধ। শনির সহিত পঞ্চমপতি ও নবমপতির সম্বন্ধই তাঁহাকে তপশ্চর্য্যার ব্রতী করিয়াছে। মৃত্যুভাবে শনি, শুক্র ও বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট, লগ্নে শুভগ্রহ ও দশমপতি মঙ্গল চতুর্থে, সেই হেতু জাতক সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং একটি সম্প্রদায়ের স্রষ্টা হইয়াছেন। ইহার পত্নীস্থান পাপগ্রহমধ্যস্থ অর্থাৎ রাহু ও শনির মধ্যবর্ত্তী; মঙ্গলের অবস্থানও পত্নীহানিকারক, এতদ্ভিন্ন সন্ন্যাসযোগ থাকায় দাম্পত্য-জীবন সূচনা করে না :—এইরূপ ব্যাখ্যা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনুযায়ী ও জটিল। সুতরাং সাধারণ-বুদ্ধি অনুযায়ী উভয় রাশিচক্র পরীক্ষা করুন, উভয় চক্রেই কতকটা সাদৃশ্য আছে; একটি চক্রে লগ্নে দুইটি গ্রহ ও সপ্তমে চারটি; অপরটিতে লগ্নে তিনটি, কিন্তু সপ্তম স্থান গ্রহশূন্য। এক জনের সপ্তম স্থান শনির ক্ষেত্রে, অপর জনের লগ্ন শনির ক্ষেত্রে। সাধারণ ভাবে বিচার করিলেও দেখা যাইবে, উভয় রাশিচক্রেই সংসারধর্মের কারণ, একই হেতুতে বিনষ্ট হইয়াছে।

সন্ন্যাস, সিদ্ধি ও মোক্ষলাভের সূচনা করে, এইরূপে বিভিন্ন যোগ জ্যোতিষ-শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করা এখানে সম্ভব নহে। নিম্নে দেশে সুপরিচিত এবং জীবনে অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ প্রশ্নের বন্ধুর জন্মকুণ্ডলী দেওয়া হইল; তাঁহার জীবনে প্রব্রজ্যার ভাব পরিস্ফুট, তিনি চিরকুমার ও স্বাধীনচেতা। সুতরাং পরীক্ষামূলক রাশিচক্র হিসাবে তাহা প্রকাশিত হইল :—

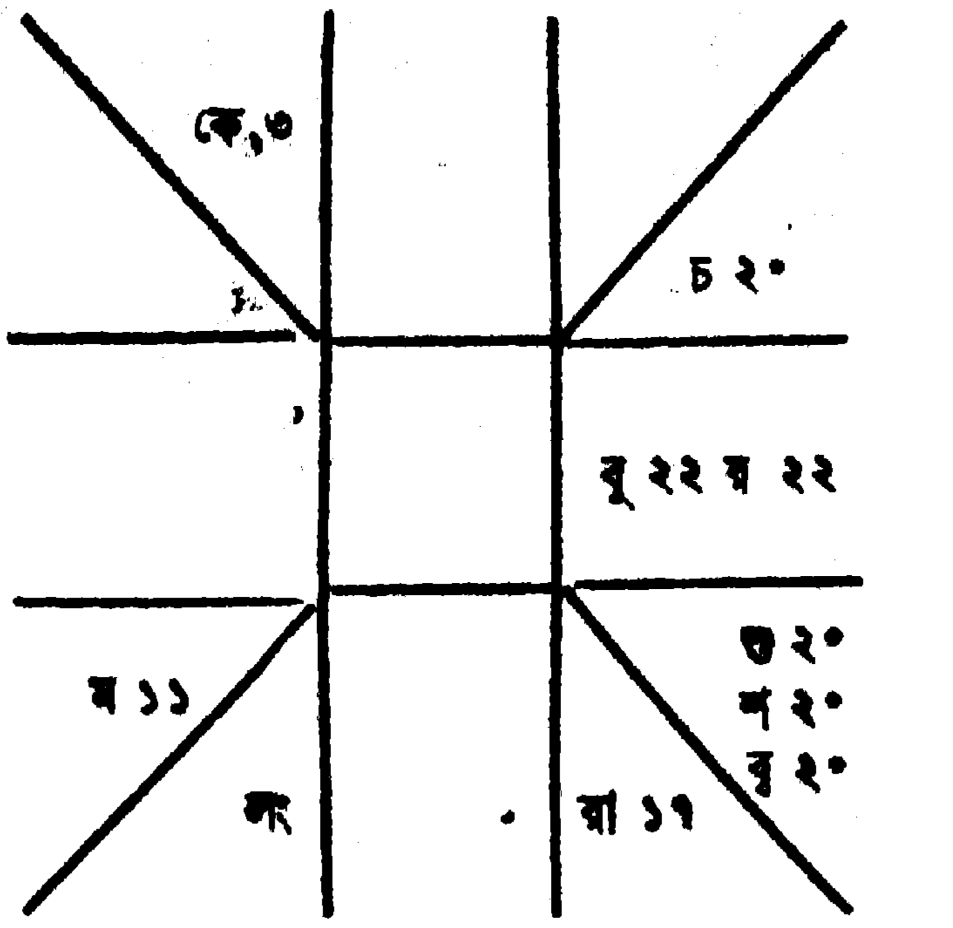

মঙ্গলের অবস্থান পত্নীহানিকারক এবং ইহা বিবাহের সূচনাও করিতেছে না। চতুর্থপতি বৃহস্পতি ও পঞ্চমপতি শনি একত্রে চতুর্থে অবস্থান করায় ইহাকে বিদ্বান ও যশস্বী করিতেছে; কিন্তু পঞ্চমস্থ বুধ ও রবি যশে ও বিদ্যাফলে বিলম্ব ঘটাইয়াছে। তথাপি মনে হয়, শনি ইহাকে গূঢ় রহস্যে বলীয়ান ও আত্মিক শক্তির যোদ্ধা করিবে। এইরূপ জাতক বিবাহ করিতে পারে না, সন্ন্যাসী হওয়ারই কথা। বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন, লগ্নাধিপতি বুধ যদিও পঞ্চমে শুভ স্থানে, কিন্তু পাপগ্রহের ক্ষেত্রে একটি পাপগ্রহ সহ; আবার সেই পাপগ্রহ অর্থাৎ রবি, একটি অশুভ ভাবের অর্থাৎ দ্বাদশের অধিপতি; সুতরাং লগ্ন অর্থাৎ তনুস্থান এবং পঞ্চম অর্থাৎ পুত্রস্থানের হানি ঘটিয়াছে; লগ্নকে কোন শুভগ্রহই দেখিতেছে না। দ্বিতীয় স্থান বা ধনস্থানের অধিপতি শুক্র, চতুর্থ কেন্দ্রে, সুতরাং শুভ ও বলবান, কিন্তু বৃহস্পতি ইহার শত্রু এবং শনি একটি পাপগ্রহ; ইহারা তিন জন একত্রে অবস্থান করায় ফলে কতকটা বিঘ্ন ঘটিতেছে; তবুও এখানে স্বক্ষেত্রে থাকায় বৃহস্পতিই প্রবল; সুতরাং বিদ্যা ও সুখে পরিণাম মঙ্গলজনকই হইবে। তৃতীয়ে রাহু, ইহার অধিপতি মঙ্গল দ্বাদশে, সুতরাং ভাবফলের হানি ঘটিয়াছে। ষষ্ঠে একাদশ পতি চন্দ্র, সুতরাং একাদশ ভাবের ফলহানি ঘটিয়াছে। সপ্তমের অধিপতি বৃহস্পতি চতুর্থে বিবাহের যোগ প্রবল হইলেও পত্নীকারক গ্রহ শুক্র শনিই পাপযুক্ত, আবার দ্বাদশে মঙ্গল, সুতরাং ফলের হানি হইয়াছে। অষ্টমাধিপতি মঙ্গল দ্বাদশে, নবমাধিপতি শুক্র চতুর্থে বলবান হইয়াও স্বস্থান দেখিতেছে না; দশমাধিপতি বুধ পঞ্চমে থাকিয়া আয়স্থান দেখিতেছে, এই জন্য বিদ্যাচর্চায় আয় বুঝায়। ভাগ্যস্থানে শুক্র ও বৃহস্পতি, এই দুইটি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকায় শুভ সূচনা করে। এমন সম্ভাবনাও আছে যে, ইনি কোন নূতন আত্মিক তত্ত্বের প্রচারে মানব-সমাজের মঙ্গল করিয়া জগতে যশস্বী হইবেন।

উপরি-উক্ত ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সাধারণ ভাবে বিচার করিলেও রাশিচক্র সম্বন্ধে একটি ভাল-মন্দ ধারণা করা কঠিন নহে।

একটি অদ্ভুত ঘটনা

(এডগার এলেন পো)

আর্নেষ্ট ভেল্ডমার সম্পর্কীয় অদ্ভুত ঘটনাটি লইয়া লোক-সমাজে বেশ একটু উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলিতেছিল এবং ইহাতে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হই-নাই ; বরং ব্যাপারটি যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আলোচনা না হইলেই অবাক হইয়া যাইবার কথা। আমি এবং আর যাঁহারা এই ব্যাপারে জড়িত ছিলাম—আমরা সকলেই চেষ্টা করিয়াছিলাম, লোক-সমাজে যেন ঘটনাটি প্রকাশ না হইয়া পড়ে। অন্ততঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই ঘটনাটির সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জানিবার সুযোগ আমাদের না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই ঘটনা জনসাধারণ যাহাতে না জানিতে পারে, সে চেষ্টা আমরা করিয়াছিলাম। ইহার ফলে সত্য ঘটনার পরিবর্ত্তে মিথ্যার দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও বিকৃত এক কাহিনী সমাজে চলিতে থাকে। এই কাহিনীও আবার সমাজের বিভিন্ন লোকের মুখে কুৎসিত ভাবে বিকৃত হইয়া পড়ার দরুণ লোকের মনে স্বভাবতঃই এই ঘটনা সম্বন্ধে দৃঢ় অবিশ্বাস জন্মাইয়া যায়।

এরূপ অবস্থায় আমি এই ঘটনা সম্বন্ধে যাহা জানি, তাহা প্রকাশ করা প্রয়োজন বলিয়াই মনে করি।

গত তিন বৎসর ধরিয়া আমার মন সম্মোহন বিদ্যাচর্চ্চার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রায় নয় মাস আগে হঠাৎ আমার মনে হয় যে, আজ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে যত কিছু পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে একটি দিক্ সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হইয়াছে। আজও পর্য্যন্ত মরণোন্মুখ কোন ব্যক্তিকে সম্মোহিত করা হয় নাই। প্রধানতঃ—তিনটি বিষয় আমার মনে কৌতূহল জাগাইয়াছিল।

প্রথমত ঐরূপ কোন রোগীকে সম্মোহিত করা যায় কি না ?

দ্বিতীয়ত—ঐরূপ রোগীকে সম্মোহিত করায় সুবিধা বেশী না অসুবিধা বেশী ?

তৃতীয়ত—ঐরূপ রোগীকে সম্মোহিত করিয়া মৃত্যুর আগমন বিলম্বিত করা যায় কি না ? অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু আরও কিছু-ক্ষণের জন্য রোধ করা যায় কি না ?

আরও অনেক জানিবার ছিল, কিন্তু এই তিনটি প্রশ্নই বিশেষ ভাবে আমার মনকে নাড়া দিয়াছিল—বিশেষ করিয়া শেষেরটি, কারণ এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সম্মোহনের উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করার কথা মনে হইতেই আমার মনে পড়িল আমার বন্ধুর কথা। আমার বন্ধুর নাম আর্নেষ্ট ভেল্ডমার, ইনি "বিব্লোথিকা ফোরেনসিকা" নামক গ্রন্থের সংগ্রাহকরূপে সুধী-সমাজে সুপরিচিত। ইনিই আবার ওয়ালেনষ্টেইন ও গারগানটুয়া নামে দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থ পোল ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ সাল হইতে আমার বন্ধু নিউ ইয়র্কের অন্তর্গত হার্লেমে বসবাস করিতেছিলেন। তিনি অত্যন্ত শীর্ণকায় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নিম্নাঙ্গের দিকে দৃষ্টি পড়িলে জন্ র‍্যাণ্ডলফের কথা মনে পড়িত। তাঁহার কেশ ছিল যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ—তাঁহার পক্ব শ্মশ্রু ছিল সেই তুলনায় সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ। অনেকে তাঁহার চুলকে পরচুলা বলিয়া মনে করিত। তিনি অতি অল্পেই বিচলিত হইয়া পড়িতেন এবং সেই কারণে সম্মোহনের পাত্র হিসাবে তিনি খুব উপযুক্ত পাত্রই ছিলেন। দুই-তিন বার তাঁহাকে আমি অতি অল্প আয়াসেই সম্মোহন-নিদ্রায় অভিভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার শীর্ণকায় গঠন হেতু অন্য যে সমস্ত সুবিধা পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই পাই নাই। কোন সময়েই তাঁহার ইচ্ছাশক্তিকে আমি আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করিতে পারি নাই এবং তাঁহার উপর এই বিদ্যারই পরীক্ষা দ্বারা এমন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাই নাই, যাহাতে বিশ্বাস করিতে পারি যে, আমার দ্বারা সম্মোহিত হইবার পর তিনি তাঁহার ইন্দ্রিয়ানুভূতির বহির্ভূত ও দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত কোন বস্তু দেখিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতেন। প্রত্যেক সময়েই আমি তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্যকে আমার অসাফল্যের কারণ বলিয়া ধরিয়া লইতাম। কারণ, আমার সহিত পরিচয় হইবার কিছু কাল পূর্ব্বেই তাঁহার চিকিৎসকগণ তাঁহাকে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু তাঁহার আসন্ন মৃত্যুকে খুব ধীর ভাবেই মানিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার আসন্ন মৃত্যুকে তিনি মনে করিতেন অবশ্যম্ভাবী—ইহাতে যেন তাঁহার দুঃখ করিবার কিছুই ছিল না।

এখন বুঝিতে পারিতেছেন, মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে সম্মোহিত করিবার কথা মনে উদয় হইতেই উপযুক্ত পাত্র হিসাবে আমার বন্ধু ভেল্ডমারের নামই আমার মনে আসাটাই স্বাভাবিক। এই ভদ্রলোকের অকেল জীবনাদর্শের সহিত আমি সুপরিচিত ছিলাম এবং সেই কারণেই তাঁহার তরফ হইতে কোন বাধার আশঙ্কা করি নাই। আমেরিকাতে তাঁহার এমন কোন আত্মীয়-স্বজনও ছিল না যাঁহাদের নিকট হইতে বাধার আশঙ্কা করা যাইতে পারে। আমি এই বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত খোলাখুলি ভাবে কথা কহিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে এই ব্যাপারে খুব বেশী রকম উৎসাহিত দেখিয়া বেশ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। আমি সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম কারণ, যদিও ইহার পূর্ব্বে যত বার তাঁহার উপর সম্মোহন-বিদ্যার পরীক্ষা করিয়াছি, কোন বারই তাঁহাকে অসম্মত দেখি নাই, তথাপি এই ব্যাপারে ইহার আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয় কখনও পাই নাই। ইহার রোগও এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর সময়ও প্রায় ঠিক করিয়া বলিয়া দেওয়া যাইত এবং তাঁহার সহিত আমার ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, তাঁহার চিকিৎসকগণ যে সময়কে তাঁহার অন্তিম কাল বলিয়া ঠিক করিবেন, তাহার চব্বিশ ঘন্টা পূর্ব্বে তিনি যেন আমাকে সংবাদ দেন। বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় তিন মাস আগে আমি তাঁহার নিকট হইতে এই চিঠিটি পাই!

প্রিয় মহাশয়,

আপনার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমার জীবনের মেয়াদ যে আগামী কল্য মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত, এ বিষয়ে দুই জন চিকিৎসকই একমত এবং আমারও মনে হয় ইহারা ঠিকই হিসাব করিয়াছেন।

ভেল্ডমার

এই চিঠিটা লেখার পর আধ ঘন্টার মধ্যেই ইহা আমার হস্তগত হয় এবং পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমি তাঁহার কক্ষে উপস্থিত হই। প্রায় দশ দিন তাঁহার সহিত আমার দেখা হয় নাই এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার দেহের উপর যে ভয়াবহ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছিল তাহা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহার মুখমণ্ডল সীসকের বর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং চক্ষু জ্যোতিঃহীন বোধ হইতেছিল। তিনি এত শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে মনে হইতেছিল, তাঁহার গণ্ডদেশের অস্থি-মাংস ভেদ করিয়া বাহির হইয়া

আসিতেছে। যদিও তিনি খুব ঘন ঘন কাসিতেছিলেন ও তাঁহার নাড়ীর স্পন্দন ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল, তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ অবস্থাতেও তাঁহার মানসিক শক্তি ঠিকই ছিল এবং কিছু পরিমাণে শারীরিক শক্তিও তখনও তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। তিনি তখনও বেশ স্পষ্ট স্বরে কথা বলিতেছিলেন এবং কাহারও সাহায্য না লইয়াই ঔষধ গ্রহণ করিতেছিলেন। নীচে বালিশ দিয়া বিছানার উপর তাঁহার মস্তক একটু উঁচাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমি যখন ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন তিনি ঐরূপ অবস্থায় শায়িত হইয়া ডাইরীতে স্মৃতি-লিখনে নিযুক্ত ছিলেন। দুই জন চিকিৎসক তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। আমার বন্ধুর সহিত করমর্দ্দন করিয়া আমি চিকিৎসক দুই জনকে অন্য পার্শ্বে লইয়া গিয়া রোগীর প্রকৃত অবস্থা অবগত হইলাম। শুনিলাম, আঠারো মাস ধরিয়া বাম দিকের ফুসফুসটি প্রায় ক্ষমতাহীন ও নিস্তেজ এবং বর্ত্তমানে প্রাণশক্তিমূলক যে কোনও কার্য্যের পক্ষে অযোগ্য অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দক্ষিণ দিকেরটির উপরের অংশের অবস্থাও তদ্রূপ এবং নীচের অংশটিও পূঁজে পরিপূর্ণ, কতকগুলি ফোটকাকার ক্ষতের সমষ্টিতে পরিণত হইয়াছিল। এই ফোটকাকার ক্ষতগুলির আবার একটির মুখ অন্যটির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। কয়েক স্থানে ক্ষতমুখ বেশ বোঝা যাইতেছিল এবং এক স্থানে নালীক্ষতের মুখ পাঁজর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল। যাহা হউক, দক্ষিণ দিকের ফুসফুসের এই পরিণতি অল্প দিন হইল সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া চিকিৎসকদিগের অভিমত। তবে এ কথা সত্য যে, ঐই দিকটিও খুব দ্রুত হীনবল হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু পূর্ব্বে এই পরিবর্ত্তন ধরা পড়ে নাই এবং ক্ষতের মুখে যে পাঁজর আক্রমণ করিয়াছে ইহাও চারি দিন পূর্ব্বে ধরা যায় নাই। প্রধানত, রোগীর রোগটি ছিল যক্ষ্মা, কিন্তু ইহা ছাড়া রোগীর হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ প্রধান রক্তনালীটি মারাত্মক রকম ফুলিয়া উঠিয়াছিল—অন্তত চিকিৎসকগণ এইরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন। কিন্তু রোগীর অবস্থা এতই খারাপ যে, এই শেষের ব্যাপারটি সম্বন্ধে ঠিক করিয়া কিছু বলা যাইতেছিল না। সেই দিন শনিবার সন্ধ্যা সাতটা। পরদিন রবিবার মধ্যরাত্রি নাগাদ আমার বন্ধুর যে মৃত্যু হইবে, এ বিষয়ে দুই জন চিকিৎসকই একমত ছিলেন। চিকিৎসক দুই জন আমার সহিত কথা কহিতে যাইবার পূর্ব্বেই আমার বন্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, ইহাই তাঁহাদের শেষ বিদায় গ্রহণ। পুনরায় আসিবার ইচ্ছা আর তাঁহাদের ছিল না। যাহা হউক, আমার অনুরোধে তাঁহারা পরদিন রাত্রি দশটায় আবার আসিতে সম্মত হইলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর আমি আমার বন্ধুর সহিত তাঁহার আসন্ন মৃত্যু ও আমার প্রস্তাবিত পরীক্ষা সম্বন্ধে খোলাখুলি ভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলাম। দেখিলাম, তিনি উৎসুক ও আগ্রহান্বিত ত বটেই, এমন কি পরীক্ষা তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করিতে তিনি আমায় অনুরোধ জানাইলেন। দেখিলাম, এক জন পুরুষ ও এক জন সেবিকা তাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত। পরীক্ষা আরম্ভ করিতে গিয়া আমার মনে ভয় হইতে লাগিল, যদি কোন অঘটন ঘটিয়া যায়! পূর্ব্বোক্ত ওই শুশ্রূষাকারী ও শুশ্রূষাকারিণী মাত্র ঐ দুই জনকে সাক্ষী রাখিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিতে আমার মন সম্মতি দিল না। আমি পরীক্ষা স্থগিত রাখিলাম। পরদিন রাত্রি আটটার সময় আমার পরিচিত এক জন চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ছাত্র রোগীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলে পর আমার এই আশঙ্কা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইল। প্রথমে ঠিক করিয়াছিলাম, চিকিৎসক দুই জন না আসা অবধি অপেক্ষা করিব। কিন্তু দুইটি কারণে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিলাম। প্রথমত, দেখিলাম রোগীর নিজের উৎসাহ খুব, তিনি আমাকে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিবার জন্য আগ্রহ সহকারে অনুরোধ পর্য্যন্ত করিতেছিলেন। দ্বিতীয়ত, দেখিলাম তাঁহার অবস্থা খুবই খারাপ, আর এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করা যায় না। কারণ, স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম তিনি দ্রুত মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছেন। আমার অদৃষ্ট ভালই বলিতে হইবে। কারণ ছাত্রটিও দেখিলাম খুব সদাশয় ভদ্রলোক। এমন কি আমি যখন তাঁহাকে পরীক্ষাটির বর্ণনা লিখিয়া রাখিতে অনুরোধ জানাইলাম, তিনি তাহাতে সহজেই সম্মত হইলেন। তাঁহারই লেখা হইতে কিছু অংশ সংক্ষিপ্ত করিয়া আমি আপনাদের নিকট পরীক্ষাটির বর্ণনা দিতেছি।

তখন আটটা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকী। রোগীর একটি হাত আমার হাতের মধ্যে লইয়া আমি তাঁহাকে শেষ বারের মত অনুরোধ করিলাম যে, তাঁহার এই পরীক্ষায় সম্পূর্ণ সম্মতি আছে এ কথা তিনি যেন একবার নিজ মুখে ছাত্রটিকে জানাইয়া দেন।

খুব ক্ষীণ স্বরে অথচ সম্পূর্ণ শোনা যায় এমন ভাবে উত্তর আসিল, "হাঁ, আমার সম্মোহিত হইবার ইচ্ছা আছে।" প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমার আশঙ্কা হইতেছে আপনি বড় বেশী বিলম্ব করিতেছেন।" যতক্ষণ তিনি কথা বলিতেছিলেন ততক্ষণ আমি পূর্ব্বে যে সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা তাঁহাকে অভিভূত করা সহজ, সেই সমস্ত প্রক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় পর তাঁহার কপালের উপর আড়াআড়ি ভাবে প্রথম মৃদু আঘাতেই তিনি যে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল। ইহার পর বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল—রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। এতক্ষণ ধরিয়া আমার সমস্ত মানসিক শক্তি নিয়োগ করিয়া একাগ্রচিত্তে কাজ করিয়াও বিশেষ কোন সুফল পাইলাম না। দশটার পর পূর্ব্বের কথামত চিকিৎসক দুই জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি কি ভাবে পরীক্ষা চালাইতেছি তাহা তাঁহাদিগকে সংক্ষেপে বুঝাইলাম। যখন দেখিলাম তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই, তখন তাঁহাদিগকে রোগী যে মৃত্যু-যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছে, এ কথা জানাইয়া দিয়া আমি রোগীর কাছে আসিয়া কিছু মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া আমার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমার দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভাবে রোগীর দক্ষিণ চক্ষুর উপর নিবদ্ধ করিয়া, আমি নিম্নমুখী আড়াআড়ি আঘাতের প্রক্রিয়া আবার আরম্ভ করিয়া দিলাম। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার নাড়ীর স্পন্দন খুব ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং বেশ কিছুক্ষণ দেরী করিয়া তাঁহার নিশ্বাস পড়িতেছিল। নিশ্বাসের সংগে একটি ঘড়-ঘড় করিয়া শব্দও হইতেছিল। একবার নিশ্বাস পড়ার পর অন্তত আধ মিনিট পর আবার নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছিল। প্রায় পনেরো মিনিট কাল এই অবস্থায় কাটিল। পনরো মিনিট কাটিবার পর রোগীর অন্তস্তল হইতে একটি স্বাভাবিক দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, ঘড়-ঘড় শব্দটিও বন্ধ হইয়া গেল, অন্তত ঐরূপ শব্দ আর শুনা যায় নাই। কিন্তু নিশ্বাসের মধ্যে

সম্মোহন-নিদ্রা হইতে জাগরিত করিবার পরীক্ষা তাঁহার উপর আরম্ভ করি—অন্তত চেষ্টা করিয়া দেখিব তাঁহাকে জাগরিত করা যায় কি না। আর আমার মনে হয়, আমাদের এই নূতন পরীক্ষার দুঃখময় পরিণতির জন্যই সমাজে এই ঘটনা লইয়া এত আলোচনা হইয়াছে এবং লোকের মনে অমূলক সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। ভেল্ডমারকে সম্মোহন-নিদ্রা হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমি প্রথামত প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলাম। কিছুক্ষণ কোনই ফল পাইলাম না। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসার প্রথম লক্ষণ দেখিতে পাইলাম যখন চক্ষুর মণি কিছুটা নামিয়া আসিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল এই যে চক্ষুর মণি নামিয়া আসার মধ্যে মধ্যে চক্ষুর পাতার নীচে হইতে প্রচুর পরিমাণে ঝরিতে লাগিল পীতাভ এক প্রকার তরল পদার্থ। উঃ, কি উৎকট দুর্গন্ধ সেই তরল পদার্থের!

আমার সঙ্গীদের কথা-মত আমি রোগীর বাহু পূর্ব্বের ন্যায় আমার প্রভাবাধীন করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু আমার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন পূর্ব্বোক্ত দুই জন চিকিৎসকের এক জন রোগীকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমায় অনুরোধ করিলেন। আমি রোগীকে নিম্নলিখিত প্রশ্নটি করিলাম:

"ভেল্ডমার, আপনার মনের বর্ত্তমান অনুভূতি ও কামনা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়া কিছু বলিতে পারেন কি?"

সেই মুহূর্ত্তে গণ্ডস্থলের গোলাকার দাগটি আবার দেখা গেল: জিহ্বায় দেখা দিল কম্পন—শুধু কম্পন বলিলে ভুল হইবে—দেখা গেল, জিহ্বা মুখ-বিবরের মধ্যে দ্রুত আবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু চোয়াল ও ওষ্ঠের অবস্থা পূর্ব্ববৎ। অবশেষে শুনিতে পাইলাম পূর্ব্ব-বর্ণিত সেই ভয়ানক বীভৎস কণ্ঠস্বর:

"উঃ, কি অসহ্য অবস্থা···ঈশ্বরের দোহাই···যাহা করিবার শীঘ্র করুন···হয় আমাকে শীঘ্র নিদ্রাভিভূত করিয়া দিন···না হয় শীঘ্র আমাকে জাগ্রত অবস্থায় আনিয়া দিন···আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি এখন মৃত।"

প্রথমে আমি সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম, কি যে করিব তাহা ঠিক করিবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া রোগীকে পুনরায় সম্পূর্ণ সম্মোহিত অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু রোগীর ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণরূপে দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় আমার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। আমি রোগীকে জাগ্রত অবস্থায় আনিবার জন্য প্রক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলাম··· রোগী যাহাতে জাগরিত হইয়া উঠে তজ্জন্য আমি প্রাণপণ শক্তিতে ব্যাকুল ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম, আমার এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে—অন্তত আমার মনে হইল আমি পূর্ণ সাফল্য লাভ করিব। ঘরে আর যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও নিশ্চিত হইয়া গিয়াছিলেন যে রোগীকে এইবার তাঁহারা জাগ্রত অবস্থায় দেখিবেন।

কিন্তু যাহা ঘটিল তাহা পৃথিবীর কোন ব্যক্তিই কোন দিনই ধারণা করিতে পারিবেন না এবং নিজেকে ঐরূপ ঘটনার জন্য প্রস্তুত করিয়াও রাখিতে পারিবেন না।

রোগীর ওষ্ঠাধর স্থির—অনড় জিহ্বাতে রহিয়াছে কম্পন—ক্রমাগত জিহ্বা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে সেই অদ্ভুত স্বর—শুধু শুনা যাইতেছে দু'টি কথা—"আমি মৃত"······"আমি মৃত"······। আমি আমার প্রক্রিয়া দ্রুততার সহিত আরম্ভ করিলাম। ঠিক সেই সময় বোধ হয় এক মুহূর্ত্ত সময় লাগিল কি না সন্দেহ, সমস্ত দেহটা কুঁকড়াইয়া ছোট হইয়া গেল—হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গেল—উঃ, কি ভয়ানক ঘটনা—সকলে বিছানার উপর তাকাইয়া দেখি সেখানে রোগীর চিহ্নমাত্র নাই—তাহার পরিবর্ত্তে পড়িয়া রহিয়াছে অনেকটা পচা দুর্গন্ধযুক্ত, বমনোদ্রেক গলিত এক তরল পদার্থ।

অনুবাদ: অজিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

রোদ

অরবিন্দ গুহ

রোদের নরম হাত ঘাসের সবুজ থেকে সকল শিশির
যদি আহা মুছে ফেলে; আকাশের নীল দিয়ে যদি বাঁধে নীড়
মাঠের তিতির দুটি; যদি আহা সাগরের দু'-চামচ জল
তোমার চোখের তারা ক'রে তোলে বিসারিত সুনীল শ্যামল!
একা তবে জানালায় মাঘের ভোরের শীত না-ই পোহালাম;
আমার মনের পাশে জেগে থাক ছোটো মিঠে তোমার ও-নাম!

তোমার চুলের স্রোতে ছায়া-কালো রাত ধুয়ে কবিতার ভোর
এসে গেছে; উড়ে গেলো মাথার ওপর দিয়ে একটি কি দুইটি চকোর!
আমার জানালা ছুঁয়ে সাঁইবাকনার বনে মাঘের সকাল—
তোমার মুখের মতো, তাই বুঝি ঝাঁকে ঝাঁকে ডাকে হড়িয়াল!
দোলানো লতার গায়ে নীল পাখি মুখ উঁচু ক'রে দেয় দোল,—
তোমার দু'চোখে আহা এখনো কী আঁকা আছে ঘুমের কাজল?
আমার মনের কাছে ভেঙে দিয়ে রাত ভরা সব অবরোধ,—
মাঘের নরম স্নেহের তুমি না কি হয়ে এলে সকালের রোদ?

শীত

প্রচণ্ড শীত পড়েছে। পাতা-ঝরা গাছের শূন্য ডালে ডালে
আঘাত করছে উত্তুরে হাওয়া। ঘরে-বাইরে ঘাটে-মাঠে সর্বত্র লেগেছে তার
হিমশীতল স্পর্শ। এই হাড়-কাঁপানো শীতের অসহ্য আড়ষ্টতায় এক পেয়ালা গরম চায়ের
চেয়ে আরামের জিনিস বুঝি আর কিছু নেই। আর শুধু তাই নয়,
সস্তা এবং সহজ-লভ্য বলেও চা আজ ঘরে ঘরে সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছে।

চা

স ব স ম য়ে ই চ লে

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

ITX 330

নূতন যুগের ভোরে

(কৃষাণ-মজুর-মধ্যবিত্ত সমস্যা)

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ধীরোদাত্ত প্রখ্যাতবংশীয় প্রতাপবান্ ভাগ্যমন্ত লোকদের প্রশস্তি ছাড়িয়া যেদিন হইতে কবি, সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কৃষাণ-মজুরদের জয়গান গাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই পৃথিবীতে যে একটা নূতন যুগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অবশ্য যাহারা নিপীড়িত, যাহারা লাঞ্ছিত, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি যে আমাদের কোনও দিন ছিল না তাহা নহে, তবে সে দৃষ্টি ছিল করুণার দৃষ্টি,—উপর হইতে উদ্ধত করুণায় নিম্নবিত্ত অথবা নিম্নবর্ণের লোকদের প্রতি একটা অনুগ্রহের দৃষ্টি, সমাজের শাসক ও পালকদের তরফ হইতে সমাজের নাবালক অথবা কুপোষ্য-স্থানীয়দের প্রতি একটা অভিভাবক-জনোচিত আত্মপ্রসাদ-পরিপুষ্ট স্নেহদৃষ্টি। তাহাতে সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের পেট ভরিলেও মন ভরিত না, তাহারা নিজেদের ন্যায্য পাওনা যে অসম্ভব রকমের একটা উপরি-পাওনা মনে করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করিত, দাতা তাহাদিগকে দান করিত ধনীর উচ্চাসন হইতে, আর গ্রহীতা তাহা গ্রহণ করিত নতজানু হইয়া দীন ভিখারীর ভঙ্গীতে, তাহাতে গ্রহীতার অভাব মিটিলেও মনের দীনতা মিটিত না।

আজকাল যে কৃষাণ-মজুরদের কথা উঠিয়াছে, ইহার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর একটা পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। বর্তমানের গণ-নায়কেরা আজ কৃষাণ-মজুরদের দয়া করিবার কথা বলিতেছেন না, তাঁহারা তাহাদের 'দাবীর' কথা বলিতেছেন; তাহাদের প্রতি করুণা করিতে অথবা স্নেহ দেখাইতে বলিতেছেন না, তাঁহারা তাহাদের দাবী সম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্ম আমাদের বলিতেছেন। এইখানেই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সার্থকতা।

অকপট বিশ্বাসে যাঁহারা কৃষাণ-মজুরদের দাবীর কথা বলেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অমত থাকিতে পারে না। কিন্তু এই দাবীর ব্যর্থ আস্ফালনে ও ভূয়া শ্লোগানে যে আজ আকাশ-বাতাস ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইতেছে তাহার সবটুকুই ঠিক হইতেছে না। কচি কবি এবং ছাত্র-সাহিত্যিক হইতে বুনো রাজনৈতিক নেতা পর্য্যন্ত যে কৃষাণ-মজুরদের কথা বলেন, তাহার মধ্যে অনেকেই গড্ডালিকা-প্রবাহে পড়িয়াই তাহা করেন; তাঁহাদের গালভরা বড় কথার ফাঁকে-ফাঁকে অনেক হিসাবের গলদ আছে, অনেক আপত্তিকর যুক্তি আছে; তাঁহাদের শ্লোগান অন্তরের আন্তরিক অনুভূতির স্ফুরণ নহে, চলতি ক্যাসানের অনুরণন মাত্র। একটু ভাবিলেই তাঁহাদের যুক্তির ভুল বুঝিতে পারা যায়।

প্রথমতঃ হইতেছে কৃষাণ ও মজুরদের যে একসঙ্গে ধরা হয়, তাহা ঠিক নয়। কারণ তাহাদের সমস্যা এক জাতীয় নয়, তাহাদের জীবন-যাত্রা ও জীবন-পরিবেশও সম্পূর্ণ পৃথক্।

শ্রমিক বা মজুর বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা হইতেছে শহরের কল-কারখানায় নিযুক্ত মজুরদের দল, সাধারণতঃ তাহারা হইতেছে সহরের ভাসমান জন-সমাজের মধ্যে প্রায় নাম-গোত্রহীন বস্তীবাসীর দল। তাছাড়া বাস করে একসঙ্গে বহু লোক ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া, পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের তাহাদের সামাজিক সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে, এবং শুধু কর্ম্ম-জগতের প্রতিযোগিতামূলক পরিচয় ছাড়া কর্ম্ম-জগতের বাহিরে আর কোনও হৃদয়গত পরিচয় তাহাদের নাই। কিন্তু তাহাদের এ বোধটুকু আছে যে, সংহতি ও সংখ্যাগুরুত্বের জন্ম তাহাদের শক্তি আছে প্রচুর, তাহাদের পিছনে "ইউনিয়ন" নামক একটি বিরাট শক্তির উৎস আছে। এই ইউনিয়নের সাহায্যে, পার্টির খবরের কাগজের সাহায্যে তাহারা অনেক কিছু করিতে পারে। তাহারা ইহাও জানে, একটি বস্তীর লোক যদি পাড়ার একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে কলহ করে, তাহা হইলে সমস্ত বস্তীর লোক তাহার হইয়া লাঠি ধরিবে, পুলিস-হাঙ্গামা হইলে সে সহজেই আত্মগোপন করিতে পারিবে, ধরা পড়িলেও বহুর মধ্য হইতে তাহাকে সনাক্ত করার ব্যাপার লইয়া তাহার নাগাল পাওয়া পুলিসের পক্ষে কঠিন হইবে। ফলে তাহারা পুলিসকে ভয় করে না, ধনিককে গ্রাহ্য করে না, সাধারণ ভদ্রলোকের প্রতি অপমানজনক ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করে না।

কৃষাণদের অবস্থা ঠিক এরূপ নয়; তাহারা বাস করে বিচ্ছিন্ন ভাবে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত বহু-পুরুষ ধরিয়া সামাজিক পরিচয়ে এবং বৈষয়িক সম্পর্কে সম্পর্কিত, বিদ্যা-বুদ্ধি খুব না থাকিলেও তাহাদের একটা সংযম ও সাধুত্বের বন্ধন আছে, তাহাদের 'ইউনিয়ন' তেমন নাই, মাটির সহিত তাহাদের জীবনযাত্রা জড়াইয়া আছে বলিয়া তাহারা ভাসমান নাগরিকদের মত বেপরোয়া হইতে পারে না, সমাজ-বন্ধনে তাহারা নানা দিক্ দিয়া নানা লোকের সঙ্গে জড়াইয়া আছে বলিয়া এক দিকে আলগা দিতে হইলে তাহাদের বহু দিকে টান পড়ে; এক জনের সঙ্গে শত্রুতা করিতে হইলে বহু লোক লইয়া দলাদলি করিতে হয়। ফলে তাহারা কল-কারখানার লোকেদের মত বেপরোয়া হইতে পারে না। তাহাদের আঘাত তেমন শক্তিশালীও নয়, সংহতও নয়, তাহারা বস্তীবাসী অপেক্ষা শান্ত, ভদ্র ও দুর্ব্বল। জমিদারকে তাহারা ভয় করে জমির খাতিরে, পুলিসকে ভয় করে তাহারা ভাসমান জনতা নয় বলিয়া এবং তাহাদের নাম-গোত্র-ঠিকানা সুপরিচিত বলিয়া। পাড়ায় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের তাহারা খাতির করে, তাঁহাদের কলা-কৃষ্টির সহিত তাহাদের পরিচয় আছে বলিয়া।

কাজেই দেখা যাইতেছে, কৃষাণ এবং মজুররা এক-জাতীয় মানুষ নয়। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে সমস্যাগুলিও এক-জাতীয় নয়। মজুরদের সমস্যা হইতেছে—কি ভাবে তাহাদের শান্ত, সংযত, সুখী নাগরিক করিয়া তোলা যায়। আর কৃষাণদের সমস্যা হইতেছে—কি ভাবে তাহাদের শক্তিশালী ও সংহত করিতে পারা যায়।

কৃষাণ-মজুর লইয়া অনেক নিরর্থক 'শ্লোগানের' কথা আজকাল সুলভ নেতা ও সাহিত্যিকদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। "দুনিয়া কাহার?—মজুরদের।" "দুনিয়ার মালিক কাহারা?—মজুররা।" ইত্যাদি। অবশ্য স্রষ্টা এবং কর্ম্মী মাত্রকেই যদি মজুর বলা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর হইতে কবি ইঞ্জিনিয়ার; কামার, কুমার, ছুতার, কেরাণী হইতে কুলি, মুটিয়া পর্য্যন্ত সকলেই মজুর হইয়া পড়ে। দুনিয়া তাহাদের নিশ্চয়ই। কিন্তু মজুর বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহাদিগকে বুঝি, দুনিয়া কেবল শুধু তাহাদেরই? এক দিন দুনিয়া ছিল যাজক-শক্তির হাতে; তার পর ক্ষাত্রশক্তির সহিত যাজক-শক্তির সংঘর্ষ হইয়া দুনিয়াকে তাহারা কখনও বা ভাগাভাগি করিয়া, কখনও বা এক জনে অপরের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া (আমরা এখানে

প্রসবকালে
জীবাণু-সংক্রমণ
সম্বন্ধে
কাণ্ডজ্ঞানহীন অসতর্কতা
প্রসবের পূর্বে…
হাতের কাছে "ডেটল" যেন ঠিক থাকে
হ্যাঁ রাখব
এদিকে মনে মনে ভাবছে "কিছু বিপদ হবে না— অযথা কেন "ডেটল" কিনে রাখা ?"
জরুরী অবস্থার জন্য ডাক্তার তৈরি হয়ে এসেছিলেন— তাঁর সঙ্গে "ডেটল" ছিল
এঁরা "ডেটল" এনে রাখেনি কেন
বিপদের ঝুঁকি নিতে যাবেন না — ঘরে সর্ব্বদা "ডেটল" রাখবেন।
ডাক্তার বলেন
আমি সমস্ত প্রসূতিকেই প্রসবের সময় "ডেটল" ব্যবহারের উপর নির্ভর করতে বলি এবং ঘরেও সর্ব্বদা "ডেটল" রাখতে বলি
DETTOL
'DETTOL'
এটলান্টিস (ইষ্ট) লিঃ, ২০-১, চেতলা রোড, কলিকাতা।

আশ্রমবাসী সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মণদের কথা বলিতেছি না) দুনিয়াকে ভোগ করিয়াছে। আজ দেখিতেছি, রাজ-শক্তি-ক্ষাত্র-শক্তিকে পিছাইয়া হটাইয়া দিয়া বৈশ্য-শক্তি ও শূদ্র-শক্তির (মজুর) মধ্যে দুনিয়ার মালিকানি লইয়া একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়া উঠিয়াছে। এ যুদ্ধে যাহারা জিতিবে দুনিয়া তাহার হইবে—বীর্য্যশুল্কা ধরণী বিজয়ীরই হইবে, ইহা সত্য। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" এই কথাটা কঠোর সত্য কথা হইলেও ইহা আদর্শের কথা নয়। "বসুন্ধরা সর্ব্বসাধারণ-ভোগ্যা" ইহাই হইল আদর্শের কথা। দুনিয়াতে যাহারা আছে—ছোট হউক, বড় হউক, সংখ্যালঘু হউক, সংখ্যাগরিষ্ঠ হউক, সকলকেই ভদ্র ভাবে নিরাপত্তার সহিত বাঁচিবার অধিকার দেওয়াই হইতেছে আদর্শের কথা। স্লোগান তুলিতে হয় সেই আদর্শ লইয়াই,—যাহা অত্যন্ত রূঢ় ভাবে ঘটিতেছে, সেই কুৎসিত কঠোর বাস্তবকে লইয়া স্লোগান তুলিবার প্রয়োজন নাই, তাহার সংস্কারের প্রয়োজনেই স্লোগানের ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রশ্ন আসিতে পারে—"হঠাৎ এ কথা উত্থাপিত হইল কেন? মজুরদের বিরুদ্ধে হঠাৎ এ বিক্ষোভ কেন?"

তাহার উত্তর হইতেছে—আজকাল মজুরদের চাপে ধনিকদের না হউক মধ্যবিত্তদের পিষ্ট হইবার ভয় দেখা গিয়াছে, সেই জন্যই এই সতর্ক-বাণীর প্রয়োজন হইয়াছে। যখন একটা নূতন কথা ওঠে, তখন তাহা লইয়া এতটা বাড়াবাড়ি হয় যে, পুরাতন কথা চাপা পড়িয়া যায়। মানুষের মনের মধ্যে একটা ঘড়ির দোলকের (pendulum) মত আতিশয্যপ্রিয়তার দোষ আছে, তাহা একবার এক প্রান্তে গিয়া ভুল করিয়া বসে, আবার সেই ভুলটি সংশোধন করিবার জন্য একেবারে বিপরীত প্রান্তে যাইয়া আর একটি ভুল করে, অথচ এই উভয় প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী অনেকখানি যে একটা জায়গা থাকিতে পারে, সে কথা স্মরণ করে না।

"শ্রমিকের চাপে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা পিষ্ট হইতেছে কিরূপে?"—এইরূপ প্রশ্ন আসিতে পারে। একটু উদাহরণ দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ধরা যাইতে পারে, রমানাথ বাবু এক জন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। তিনি ব্যাঙ্কে চাকরি করিয়া মাসে ১২০ টাকা ঘরে আনেন। তাঁহার ঘরে মা আছেন, দু'টি অবিবাহিতা বোন, দু'টি ভাই, স্ত্রী এবং একটি পুত্র আছে। এই আট জনের খাওয়া-পরা লোক-লৌকিকতা, এমন কি ছোট ভাই দু'টির পড়া-শুনার খরচ, শিশু-পুত্রটির দুধ-সাগু—এই সমস্তই ঐ ১২০ টাকাতেই করিতে হয়। উপরের চাল বজায় রাখিবার জন্য তিনি নিজেকে পেটে মারিলেন, ছেলে-পুলেদের ভোগ-বঞ্চিত করিলেন, তবুও তাঁহার সঙ্কুলান হয় না। তখন বাড়ীর পাশের পুরানো গোয়াল-ঘরটির কিছু সংস্কার করিয়া ঘরখানি রামরূপ বেহারিকে ভাড়া দিলেন মাসিক চারটি টাকায়। ঐ টাকাটিতে খোকার দুধের ব্যবস্থা হইল। রামরূপ রিক্সা চালায়, দিনে সে ৬৷৭ টাকা উপায় করে, তার স্ত্রী ধান্‌পাকিয়া একটা জুট-মিলে কাজ করে, সে-ও মাসে ৭০৷৭২ টাকা আনে, তাছাড়া সস্তায় রেশন্‌ও পায়। রামরূপের দু'টি ভাই আছে, এক জন গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান্ আর এক জন একটা মিলের খাইস্ম্যান্। এই চারটি বেহারী শ্রমিক রমানাথ বাবুর ঐ একখানি ঘরেই বাস করে। এরা সকলে একত্রে রমানাথ বাবুর প্রায় ৫ গুণ উপায় করে, অথচ এদের সাংসারিক খরচ রমানাথ বাবুর এক-চতুর্থাংশও নয়। রমানাথ বাবু দিন-দিন কৃশ হইয়া যাইতেছেন, অভাবের চাপে শুকাইয়া শুকাইয়া তিনি অকালে বার্দ্ধক্যে পৌঁছিতেছেন; তাঁর ভাই দু'টি পুষ্টির অভাবে টি বি'র দিকে চলিতেছে; ছেলেটি রিকেটি হইয়া যাইতেছে; ভগিনী দুইটি সময়ে পাত্রস্থা না হইবার জন্য পাকাইয়া শ্রীভ্রষ্টা হইয়া যাইতেছে; জননীর অলঙ্কার বিক্রী হইয়া যাইতেছে, স্ত্রী রুগ্না গত-যৌবনা হইয়া যাইতেছেন, অভাবের জন্য সংসারে নিত্যই খিটিমিটি লাগিতেছে। রামরূপের ঘরের ছবি অন্য প্রকার। তাহাদের অভাবের সংসার নহে, দেশে তাহারা জমি-জমা কিনিতেছে, মাঝে-মাঝে বাড়ীর উঠানে রামায়ণ গান দিতেছে। রমানাথ বাবু যখন পাঁচ সিকা সের আলু কিনিতে সমর্থ না হইয়া কচুর দ্বারা তরকারীর সমস্যা মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, রামরূপ তখন আলু-মাছ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কিনিতেছে, তাহারা সুখে আছে। রমানাথ বাবুকে মাঝে-মাঝে রামরূপের কাছে ঋণ করিতে হয়। কিছু দিন পরে হয়ত দেখা গেল, রামরূপ চারিখানি গোরুর গাড়ী ও পাঁচটি রিক্সা কিনিয়াছে এবং রমানাথ বাবুর বাড়ীর পাশের বাগানটি কিনিয়া তাহাতে দ্বিতল বাড়ী হাঁকরাইয়াছে। তাহার ছেলে শিওপ্রসাদকে প্রচুর মাহিনায় ভাল প্রাইভেট টিউটার রাখিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছে এবং তাহার চাল-চলন রীতিমত অভিজাত-ঘেঁসা হইয়া যাইতেছে। অপর পক্ষে রমানাথ বাবুর অবস্থা কঠিন দারিদ্র্যের চাপে দীন হইতে দীনতর হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার পুত্রটি শিক্ষা-ব্যবস্থার অভাবে মূর্খ ও অসংযত হইয়া উঠিতেছে।

রমানাথ বাবুর সংসারই হইতেছে বাংলা দেশের সহর অঞ্চলের মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের খাঁটি চিত্র। বাংলার কৃষাণদের ঘরের ছবিও এইরূপ। এদিক্ দিয়া কৃষাণ এবং মধ্যবিত্তেরা এক-জাতীয়। মজুর বলিতে সহর অঞ্চলে আমরা যাহাদের বুঝি—সেই বেহারী, পশ্চিমা, মাদ্রাজী, জব্বলপুরী, বিলাসপুরী প্রভৃতির দল, তাহারা অন্য শ্রেণীর। বাঙ্গালী শুধু অবাঙ্গালী কোটিপতিদিগের দ্বারাই শোষিত ও পিষ্ট হইতেছে না, এই অবাঙ্গালী শ্রমিকদের দ্বারা আরও বেশী ভাবে শোষিত হইতেছে। উপর হইতে ধনিক এবং নীচের দিক্ হইতে শ্রমিকদের চাপে তাহাদের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। শুনা যায়, দিনে দশ কোটি টাকা এই ভাবে বাংলা হইতে শোষিত হইতেছে এবং এই শোষণ চলিতেছে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের মধ্য হইতেই সর্ব্বাধিক। অথচ এই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই দেশে-দেশে যুগে-যুগে জন্মগ্রহণ করে কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক, শিল্পী, শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি অর্থাৎ যাহাদের কেন্দ্র করিয়া জাতির সভ্যতা দানা বাঁধিয়া উঠে।

ইহাদেরও বাঁচাইতে হইবে। শ্রমিকদের স্বার্থ দেখিতে যাইয়া যদি ইহাদের স্বার্থ ব্যাহত হয়, তাহা হইলেও দেশের কল্যাণ হইবে না।

কি ভাবে ইহাদের বাঁচাইতে হইবে? শ্রমিকদের দাবাইয়া? না; শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আমরা কিছু অভিযান চালাইতে বলিতেছি না, কিন্তু যে ভাবে তাহাদের মাঝে-মাঝে তোষণের ব্যবস্থা হয়, তাহাতে অনেক হিসাবের ভুল থাকে, এইটুকুই বলিতেছি। এই তোষণের ফলে শ্রমিকদের তেমন মঙ্গল হয় না, কিন্তু মধ্যবিত্তদের ক্ষতি [illegible]। সে-বার শ্রীরামপুরের চার-পাঁচটা মিলে প্রত্যেক

শ্রমিককে ১০৩ টাকা করিয়া পূজা-বোনাস্ দেওয়া হইল। শ্রমিকরা শ্রমিক নেতাকে শোভাযাত্রায় পুরোভাগে রাখিয়া ফুলের মালায়, আলোক-সজ্জায়, ব্যাণ্ডবাদ্যে হৈ-চৈ করিল, মিল-মালিকের জয়ধ্বনি করিল। কিন্তু ইহাতে তাহাদের স্থায়ী লাভ হইল কতটুকু? শ্রমিকদের যদি শিক্ষা, দীক্ষা, সংযম, সভ্যতার ব্যবস্থা করা না হয়, তাহা হইলে ঐ অর্থের অধিকাংশই যাইবে অস্থানে এবং অপাত্রে এবং বাকী অর্থ দিয়া তাহারা বেপরোয়া ভাবে খরচ করিয়া প্রতিযোগিতায় হাট-বাজারের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির মূল্য বাড়াইয়া দিয়া কালোবাজারকে প্রশ্রয় দিবে; ফলে অসুবিধায় পড়িবে শিক্ষক, অধ্যাপক, কেরাণী, সাংবাদিক প্রভৃতির দল। মিল-মালিক ঐ ১০৩ টাকা কাঁচা টাকা হিসাবে শ্রমিকদের হাতে তুলিয়া না দিয়া (আমরা এ ক্ষেত্রে ছাঁপোষা গৃহস্থ শ্রমিকদের বাদ দিতেছি) যদি তাহাদের শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খাটাইতেন অথবা তাহাদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, রিলিফ্ ফাণ্ড বা ঐ জাতীয় একটা ফাণ্ডে গচ্ছিত রাখিবার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে তাহারা ঐ হঠাৎ-পাওয়া টাকার অহঙ্কারে মধ্যবিত্তদের প্রতিযোগিতায় হারাইয়া দিতে সমর্থ হইত না। সৈনিকদের মধ্যে যেমন খাওয়া-পরার সব-কিছু ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ হইতে ঠিক করিয়া দিয়া কাঁচা পয়সার বেপরোয়া খরচ সংযত করিবার জন্য family allotment-এর ব্যবস্থা থাকে, অশিক্ষিত অথবা অসংযমী শ্রমিকদের মধ্যেও সেইরূপ ব্যবস্থা করা ভাল।' তাহাদের হাতে বেশী কাঁচা টাকা থাকিলে মদের দোকানের যতটা লাভ হইবে, তাহাদের নিজেদের পুত্র-কন্যা-পরিবারের ততটা লাভ হইবে না এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের ক্ষতিই হইবে।

বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের যা গঠনভঙ্গী, তাহাতে পুরুষেরা উপার্জ্জন করে এবং নারীরা ঘরের কার্য্য করে। অনেক ক্ষেত্রেই সমগ্র পরিবারের মাথার উপর একটি মাত্র উপার্জ্জনশীল পুরুষ থাকে। এই অবস্থায় যদি বাহির হইতে এমন বহু শ্রমিকের আমদানি হয়, যাহারা স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বালিকা-নির্ব্বিশেষে উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে সেই শ্রমিকদের চাপে বাঙ্গালী সমাজের ক্ষতি হইবেই। কিন্তু এ অবস্থার প্রতিকার করা অসম্ভব নহে। যাহাদের জীবনযাত্রার মান উচ্চতর, তাহাদের দেশে যদি নিম্নতর মানের জীবনবিশিষ্ট লোকের প্রচুর আমদানি হয় তাহা হইলে প্রতিযোগিতায় উচ্চতর মানের লোকেরা হটিয়া যায়। সেই জন্য প্রত্যেক দেশেই এই অবাঞ্ছনীয় আমদানি বন্ধ অথবা সংযত করিবার জন্য বিধিবদ্ধ আইন আছে। আমাদের দেশেও তাহা করা উচিত—কথাটা হঠাৎ শুনিতে খুব খারাপ লাগিলেও। ঠিক বিধিবদ্ধ আইন করিলে যদি সেই জিনিষটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে একটু পরোক্ষ ভাবে এই কাজটি করা যাইতে পারে। শ্রমিকদের নিয়োগের সময় কল-কারখানার মালিকদের দেখা উচিত, যে সমস্ত পরিবারে স্ত্রী-পুরুষে বাহিরে কাজ করিতে পারে—সেই জাতীয় প্রার্থীদের সকলেরই চাকরি পাওয়া ঠিক হইবে কি না। যদি দেখা যায়, একটি শ্রমিক-পরিবারে অনেকেই পূর্ব্ব হইতে কোনও না কোনও কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তখন সেই পরিবারের অন্য কোন প্রার্থীকে সহজে চাকরি না দিয়া অভাবগ্রস্ত স্থানীয় বাঙ্গালী শ্রমিকের সন্ধান করা উচিত।

মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিকদের উভয়েরই মঙ্গলের জন্য, আরও অনেক ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ; যথা—(১) দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের বাড়ীতে অবসর সময়ে যাহাতে বিধবা ও নিরাশ্রয়া নারীরা তাঁহাদের সম্মান ও আবরু বজায় রাখিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন এই জাতীয় কুটীর-শিল্পের প্রচলন হওয়া উচিত।

(২) যখন ইহা স্পষ্ট ভাবেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে অবাঙ্গালী শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বাঙ্গালীদের অপেক্ষা নিম্নতর হওয়ার জন্য তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালীরা হটিয়া যাইতেছে তখন বাংলা দেশে প্রত্যেক কল-কারখানায় অবাঙ্গালী শ্রমিক শতকরা কত জন থাকিতে পারিবে তাহার একটা ঊর্দ্ধতন সীমা-রেখা থাকা উচিত।

(৩) শ্রমিক-মধ্যবিত্ত-সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে বস্তী প্রভৃতির কিছু আলোচনা থাকা অবান্তর হইবে না। বস্তী প্রভৃতি নির্ম্মাণের সময় কল-কারখানার কর্ত্তৃপক্ষের লক্ষ্য রাখা উচিত যেন কোন মতেই বস্তীগুলি পাড়ার ভদ্রলোকদের বিভীষিকার কারণ হইয়া না উঠে। পাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের সংখ্যা যাহাতে সব সময়েই বস্তীর ভাসমান জনসংখ্যার অপেক্ষা অনেকখানি বেশী থাকে, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখা উচিত। বস্তীবাসীদের সংহতি এবং যুযুৎসা অনেক সময়েই নিরীহ পল্লীবাসীদের ভয়ের কারণ হইয়া থাকে। একটু কিছু উপলক্ষ পাইলেই তাহারা যে দলে-দলে বাহির হইয়া অভিযান আরম্ভ করিবে, তাহা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

(৪) প্রত্যেক বস্তীরই এক জন করিয়া সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট জাতীয় অফিসার থাকা প্রয়োজন ; তিনি ভাসমান অধিবাসীদের হিসাব-নিকাশ রাখিবেন, তাহাদের নাগরিক কর্ত্তব্য, শুচিতা, স্বাস্থ্য এবং সাধারণ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

(৫) বস্তীর মধ্যে যাহাতে রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িক, বা প্রাদেশিক বিদ্বেষের অপপ্রচার না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

(৬) বস্তীবাসীর জন্য ব্যাপক ভাবে বয়স্ক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার প্রচারের জন্য নৈশ বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা উচিত।

(৭) পাড়ার ভদ্রলোকদের তরফ হইতে বস্তীবাসীর প্রতি ঘৃণা এবং বস্তীবাসীর তরফ হইতে ভদ্রলোকদের প্রতি হিংসা ...ীভাব প্রভৃতি দূর করিবার জন্য মাঝে-মাঝে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের ব্যবস্থা করা উচিত। বস্তী-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট মাঝে-মাঝে পাড়ার ভদ্রলোকদের আহ্বান করিয়া বস্তীবাসীদের সংস্কৃতিগত উন্নতির জন্য সভা-সমিতির ব্যবস্থা করিতে পারেন, ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা প্রভৃতি করিয়া তাহাদের নগর-স্বাস্থ্য ও নাগরিকতা সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখান যাইতে পারে। বস্তীবাসীরা যদি সাধারণ ভদ্রলোকদের নিকট হইতে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে কিছু উপকার পায় এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রদ্ধা-প্রীতি জাগিয়া উঠে তাহা হইলে বস্তী জিনিষটা পাড়ার লোকের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করিবে না।

কৃষাণদিগের সমস্যা আরও গুরুতর ; অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজ কবি গোল্ডস্মিথ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "যে দেশে সম্পদ বাড়িয়া চলে আর মানুষ (বিশেষ ভাবে কৃষক সম্প্রদায়) শীর্ণ হইতে থাকে, সে দেশ দুর্ভাগা দেশ।" আজ এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আসিয়া এই মহাপুরুষের বাক্যের সার্থকতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। আজ কালোবাজারের কৃপায় দেশে ধনী লোকের খুব অভাব নাই, কিন্তু দেশের জনসাধারণের উন্নতি তাহাতে মোটেই হয় নাই। সহরের আকর্ষণে আজ পল্লীগ্রামগুলি জনশূন্য হইয়া যাইতেছে কিন্তু কৃষক সম্প্রদায়কে তাহার জমির খাতিরে পল্লীগ্রামের শ্মশান আগলাইয়া বসিয়া থাকিতে হইতেছে—শিক্ষা নাই, স্বাস্থ্য নাই, গোচরণ-ব্যবস্থা নাই, শস্যবীজ নাই, সেচ-ব্যবস্থা নাই, ডাক্তার-বৈদ্য নাই, ঔষধ নাই, পথ্য নাই, বস্ত্র নাই, রাত্রের অন্ধকার দূর করিবার জন্য কেরোসিন্ নাই, মনের অন্ধকার দূর করিবার জন্য বিদ্যালয় লাইব্রেরী সংবাদপত্র নাই, শুধু আছে আদিম যুগের নিষ্ঠুর প্রাকৃতিক পরিবেশ, বর্ত্তমান যুগের নিষ্ঠুর সমাজ এবং উদাসীন রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত, হৃত-স্বাস্থ্য ক্ষীণ-প্রাণ মুমূর্ষু কৃষকবৃন্দ।

ইহাদেরও বাঁচাইতেই হইবে এবং সে জন্য প্রয়োজন আরও বৃহত্তর ও ব্যাপকতর পরিকল্পনা। ষ্টেটের অধিকাংশ শক্তিই এই দিকে নিযুক্ত করিতে হইবে, কৃষকদিগের জন্য শুধু কতগুলি মিথ্যা চমকবিশিষ্ট ফাঁকা শ্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে জয়ী হইয়া ক্ষমতার সিংহাসনে দলবিশেষকে বসাইবার মধ্যে গণতন্ত্রের কোন আদর্শই ফলপ্রসূ হয় না। দেশের সাধারণ মানুষকে মানুষের মত হইয়া বাঁচিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বাধীনতার নূতন যুগের ভোরে ইহাই হইবে জাতির আদর্শ।

আগামী সংখ্যা থেকে

মীনাকুমারী

(নূতন উপন্যাস)

সতীনাথ ভাদুড়ী

ছোটদের আসর

বিপ্লব

(আয়ার্লণ্ড)

শ্রীঅনিলকুমার দাশগুপ্ত

এই বিপ্লবের ইতিহাস পড়তে পড়তে তোমরা আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে ভারতবর্ষের সঙ্গে অনেক বিষয়ে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে।

একাদশ শতাব্দীতে "উইলিয়াম দি কন্‌কারারে"র নেতৃত্বে নর্ম্মাণ জাতি ইংলণ্ড জয় করেন। তার প্রায় একশ' বছর পরে অর্থাৎ ১১৬১ খৃষ্টাব্দে ঈঙ্গ-নর্ম্মাণরা আয়ার্লণ্ড আক্রমণ করে 'পেল' (Pale) নামে একটি জায়গা দখল করেন। সেই থেকে একশ' বছর ধরে ক্রমাগত তাঁরা আয়ার্লণ্ডের উপজাতিদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। ইংরাজরা তখন থেকেই আয়ার্লণ্ডবাসীদের অর্দ্ধ অসভ্য জাত বলে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন এবং আয়ার্লণ্ড বিজয়ের পরেই আইন করে ইংরাজ ও আয়ার্লণ্ডবাসীদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করেন। তার কারণ, ইংরাজরা ছিলেন ঈঙ্গ-স্যাক্সন জাতি আর আয়ার্লণ্ডবাসীরা ছিলেন কেল্ট। এই জাতিগত পার্থক্য ছাড়াও তাঁদের মধ্যে ধর্ম্মগত পার্থক্য ছিল। ইংরাজরা ছিলেন প্রটেষ্ট্যাণ্ট ও আয়ার্লণ্ডবাসীরা রোমান ক্যাথলিক।

বিজিত আইরিশরা সহজে পরাজয় মেনে নিলেন না। তাঁরা ক্রমাগত বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ সৃষ্টি করে চললেন এবং যখনি সুযোগ পেয়েছেন তখনি প্রত্যক্ষ ভাবেই হোক আর পরোক্ষ ভাবেই হোক ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, এমন কি ইংরাজের শত্রু ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতির পক্ষ সমর্থন করেছেন। এমনি ভাবে ইংরাজ পদে পদে আয়ার্লণ্ডের শত্রুতায় জর্জ্জরিত হয়ে প্রতিশোধের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। এই উদ্দেশ্যে ইংরাজরা ষোড়শ শতাব্দীতে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে স্থির করলেন যে, আয়ার্লণ্ডে ইংরাজ জমিদারদের বসান হবে। সেই জমিদাররা আয়ার্লণ্ডবাসীদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে অনায়াসেই প্রজাদের দমন করতে পারবেন। তদনুযায়ী আয়ার্লণ্ডীয় জমিদারদের কাছ থেকে তাঁরা জমি কেড়ে নিয়ে বিদেশী জমিদারদের হাতে দিয়ে দিলেন। এলিজাবেথের পর ইংলণ্ডের প্রথম জেমস ছ'টি জেলা-সমেত সমগ্র আলষ্টারে বিদেশী ঔপনিবেশিক স্থাপনের সিদ্ধান্ত করলেন। দলে-দলে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড থেকে লোক আসতে লাগলো আলষ্টারে। এই জমিদার বসান কাজে সহায়তা করবার জন্য ইংলণ্ডে একটি সমিতি পর্য্যন্ত গঠিত হল। এই সমিতির কাজ 'Plantation of Ulster' অর্থাৎ 'আয়ার্লণ্ডের রোপণ' নামে খ্যাত ছিল। আয়ার্লণ্ডের এই রোপণ বীজ-রোপণ নয়, এ হল বিদেশী জমিদার-রোপণ। এই বিদেশী জমিদাররা আয়ার্লণ্ডীয় কৃষক প্রজাদের ঘৃণার চক্ষে দেখেছেন এবং চিরদিনই তাঁরা আয়ার্লণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আজ এই এত বছর পরেও সে বাধা দূর হল না। আজও এই বিদেশীরা আয়ার্লণ্ডীয়দের থেকে আলাদা হয়ে রইলেন।

ইংরাজদের বিদেশী জমিদার বসানর কাজ শেষ হওয়ার অনতি-বিলম্বেই তখনকার রাজা প্রথম চার্লস ও পার্লিয়ামেণ্টের মধ্যে গৃহ-বিবাদ সুরু হয়ে গেল। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী আয়ার্লণ্ড রাজার পক্ষে ও প্রটেষ্ট্যাণ্ট আলষ্টার পিউরিটান প্রভৃতি পার্লিয়ামেণ্টের স্বপক্ষে হলেন। এই সময় আয়ার্লণ্ডকে এক মহা দুর্য্যোগময় কাল অতিক্রম করতে হয়েছিল। দুই পক্ষে অবিরত হানাহানি যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে চলতে অবশেষে লিমারিকের যুদ্ধের পর ইংরাজ ও আয়ার্লণ্ডের মধ্যে এক মীমাংসা হল। ইংরাজরা প্রতিশ্রুতি দিলেন, ক্যাথলিক আয়ার্লণ্ডকে নাগরিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা দেওয়া হবে; কিন্তু কার্য্যতঃ আলষ্টারের ইংরাজ জমিদাররা তা ভঙ্গ ত করলেনই, অধিকন্তু ডাবলিনে অবস্থিত নিম্ন পার্লিয়ামেণ্টে আইন প্রণয়ন করে আয়ার্লণ্ডবাসীদের পশম ব্যবসায় নষ্ট করে দিলেন।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য আয়ার্লণ্ড থেকে সমস্ত বৃটিশ সৈন্য পাঠিয়ে দিতে হল। এই সময় বৃটিশের শত্রু ফ্রান্স আয়ার্লণ্ড আক্রমণ করতে পারে এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে প্রটেষ্ট্যাণ্ট প্রজা ও ক্যাথলিক জমিদাররা একত্রে দেশ-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পাছে আমেরিকার মত আয়ার্লণ্ডও সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এই আশঙ্কায় আয়ার্লণ্ডকে স্বাধীন পার্লিয়ামেণ্ট গঠনের ক্ষমতা দিলেন।

এর কিছু কাল পরেই অর্থাৎ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-বিপ্লব সুরু হয়। তার ফলে আয়ার্লণ্ডে আশার সঞ্চার হয় এবং ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যাণ্ট উভয় সম্প্রদায়ই একত্রে একটি সঙ্ঘ গঠন করে নাম দিলেন United Irishmen বা মিলিত আয়র্লণ্ডবাসী। বৃটিশ কিন্তু এই নব জাগরণে প্রমাদ গণলেন। সে জন্য তাঁরা এই সমিতিকে সমর্থন করলেন না। ফলে যে বিদ্রোহ দেখা দিল তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন এবং এর নেতা উলফ্‌ টোন্‌কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

'ইউনাইটেড আইরিশমেন' দলকে বিভক্ত করবার জন্য ১৮০০ খৃষ্টাব্দে "Act of Union" অর্থাৎ "মিলন আইন" পাশ করেন

এবং ইংলণ্ডে অবস্থিত স্বাধীন পার্লিয়ামেন্টকে ভেঙে দেন। আয়ার্লণ্ড ও ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেন্টের মিলন হল বটে, কিন্তু আয়ার্লণ্ডের মিলনের বদলে বিভাগ দেখা দিল এবং আয়ার্লণ্ডে যে একতার বন্ধন গড়ে উঠছিল তার অবসান হল। প্রটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত আয়ার্লণ্ড থেকে ক্যাথলিক আলষ্টার আলাদা হয়ে গেল। এ ছাড়া আরও একটি বিভেদ দেখা দিল। আলষ্টার শীঘ্রই শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হল; কিন্তু আয়ার্লণ্ড চাষ-আবাদ নিয়েই থাকলো।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে আয়ার্লণ্ডের নেতা ডেনিয়েল ও' কোনেলের চেষ্টায় ক্যাথলিক আয়র্লণ্ডবাসীরা বৃটিশ সাধারণ সভায় (British House of Commons) যোগ দেবার ক্ষমতা অর্জন করেন। এর আগে ক্যাথলিকদের সে অধিকার ছিল না। ক্রমে ক্রমে আরও পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হতে লাগলো। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত সংস্কার-বিলের ফলে বৃটিশের সঙ্গে সঙ্গে আয়ার্লণ্ডীয়দের ভোট দেওয়ার ক্ষমতা অনেক বেশী লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সুতরাং বৃটিশ সাধারণ সভা পুরাপুরি জমিদারদের অধিকারে থাকার পরিবর্ত্তে আয়ার্লণ্ডের ক্যাথলিক প্রজাদের মুখপাত্র হ'য়ে দাঁড়াল।

দরিদ্র আয়ার্লণ্ডের প্রধান জীবিকা ছিল আলু; সুতরাং এই আলুর ফসল যখন ব্যর্থ হল তখন দেখা দিল এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও জমিদাররা প্রজাদের খাজনা মাপ করলেন না। ফলে তারা দেশ ছেড়ে দলে-দলে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে চলে গেলেন।

আয়ার্লণ্ডের কৃষকেরা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াতে জমি-চাষ বন্ধ হয়ে গেল; সুতরাং এই সব ছেড়ে যাওয়া জমিকে কালক্রমে মেষ-চারণ ক্ষেত্রে পরিণত করা হল। এর কারণ হচ্ছে ইংলণ্ডে ক্রমাগত উলের পোষাক তৈয়ারীর কারখানা বেড়ে চলছিল। এর চাহিদা মেটাবার জন্য আয়ার্লণ্ডের জমিদাররা মেষ-পালন বাড়াতে লাগলেন। জমিদারদের এতে জমি চাষ করানর চেয়ে অনেক বেশী লাভ হতে লাগলো।

এই মেষপালন ব্যবসায় প্রবর্ত্তিত হওয়াতে চাষীরা অধিকাংশই বেকার হয়ে পড়লো; কারণ মেষ-পালনের কাজ খুব কম লোক দিয়েই হয়ে যেত। এই বেকার লোকদের জমিদাররা তাড়িয়ে দিতে লাগলেন। বিতাড়িত লোকের অনেকে তখন আমেরিকায় এসে বসবাস সুরু করে। কালক্রমে এরা আমেরিকাতেই আয়ার্লণ্ডের স্বাধীনতার জন্য একটি সঙ্ঘ গঠন করলো। এদের নাম হল ফেনিয়ান্‌স্ (Fenians)। দেশের জনগণের সঙ্গে বিদেশের এই দলের যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি। তাই জনগণের সহযোগিতার অভাবে এই দুর্ব্বল দলকে অনায়াসেই দমন করা হল।

ওদিকে জমি নিয়ে জমিদার ও প্রজার মধ্যে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হল তাকে বন্ধ করার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জমিদারদের কাছ থেকে টাকা দিয়ে কিনে প্রজাদের ভাগ করে দিলেন। জমিদাররা জমির দাম পাওয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন না। পক্ষান্তরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেরও কোন ক্ষতি হল না; কারণ তাঁরা এ সব জমির মূল্য বাবদ সম্পূর্ণ টাকাটা যে সমস্ত চাষীরা জমি পেলে তাদের উপরেই চাপিয়ে দিলেন। অবশ্য এ টাকাটা তাদের একসঙ্গে দিতে হ'বে না—বছর বছর কিস্তিতে টাকাটা শোধ করতে হবে।

ক্রমাগত যুদ্ধ করে আয়ার্লণ্ড অবসন্ন হয়ে পড়েছে; তাই আয়ার্লণ্ড থেকে যখন পুরান স্বাধীনতার দাবীর বদলে Home Rule বা স্বায়ত্ত-শাসন চাওয়া হল তখন অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশ "হোম রুলের" পক্ষপাতি হল, কারণ দেশবাসীরা তখন আর অশান্তির মধ্যে যেতে প্রস্তুত হলেন না। এই হোম রুলের উদ্দেশ্য হল, আয়ার্লণ্ডে স্থানীয় ব্যাপারে কাজ করার জন্য একটি নিম্ন পার্লিয়ামেণ্ট পুনঃপ্রবর্ত্তন করা। বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট পারনেল British Home of Cmomons-এ 'হোম রুলের' নেতৃত্ব করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন যে পার্লিয়ামেণ্টে বৃটিশ দলগুলি তা প্রাচীনপন্থীই হোন বা উদারনৈতিক দলই হোন কেউই আয়ার্লণ্ডের ব্যাপারে আগ্রহ দেখান না; সুতরাং তিনি এঁদের পার্লিয়ামেণ্ট সম্বন্ধীয় কাজে দীর্ঘ বক্তৃতা বা অন্যান্য নানা রকম কৌশলে বিলম্ব ঘটাতে লাগলেন। ইংরাজরা এই কাজকে বে-আইনী, অন্যায়, অভদ্রোচিত প্রভৃতি বলে সমালোচনা করতে লাগলেন। তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তিনি পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করেছেন দেশসেবার জন্য; তাই সেখানে অনবরত আয়ার্লণ্ডের সমস্যাকে জাগিয়ে রাখলেন। অবশেষে বিরক্ত হয়ে প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন নিজে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 'হোম রুল' বিল আনলেন। এই বিলের বিপক্ষে প্রাচীনপন্থীরাও গেলেনই, এমন কি গ্লাডষ্টোনের উদারনৈতিক দলেও ভাঙন ধরলো। এই দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে এক দল ইউনিয়নিষ্ট (Unionist) বা মিলনকামী নাম দিয়ে বিলের বিরোধিতা করলেন। ফলে এই বিল ও তা'র সঙ্গে সঙ্গে গ্লাডষ্টোন মন্ত্রিসভার পতন হ'ল।

এর সাত বছর পরে অর্থাৎ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গ্লাডষ্টোন আবার প্রধান মন্ত্রী হলেন। আবার তিনি হোম রুল আনলেন। এবার সামান্য ভোটে তিনি জিতে গেলেন; কিন্তু House of Lords বা লর্ডদের সভায় বিল পাশ হ'ল না। কোন বিলকে আইনে পরিণত করতে হলে তাকে লর্ডসভায় অনুমোদন করতে হবে নতুবা আইন হবে না। সুতরাং হোম রুল বিল লর্ড-সভার সমর্থন না পাওয়াতে কার্য্যকরী হতে পারলো না।

হোম রুল বা আইরিশ জাতীয় দল বিফল-মনোরথ হলেও ভবিষ্যতে কৃতকার্য্য হওয়ার আশায় পার্লিয়ামেণ্টের কাজ করে চললেন। কিন্তু দেশের লোক তাঁদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ও রাজনীতিতে বিরক্ত হয়ে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কাজে নিযুক্ত হলেন।

দেশবাসী বুঝতে পারলেন যে, দেশকে জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হলে নিজের দেশের ভাষা ও সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে—বিদেশী ভাষার সাহায্যে তা সম্ভব নয়, তাই তাঁরা গেলিক লীগ (Gaelic Leugue) স্থাপন করলেন। ইংরাজী ভাষা সেখানে বিশেষ ভাবে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তাঁরা গেলিক ভাষার সাহায্যে তাঁদের পুরান সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রেখে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার চেষ্টা করলেন।

আগেই বলেছি, আয়ার্লণ্ডের জাতীয় দলের উপর দেশবাসী বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। এখন তাঁরা দেখলেন যে, এঁদের এই বক্তৃতায় কোন কাজই হ'বে না। ফেনিয়ানরাও (Fennians) এঁদের 'হোম রুল' নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। বর্ত্তমানে দেশের যুবকরাও হোম রুল নীতি সমর্থন করলেন না। তখন দেশের মধ্যে আবার সশস্ত্র বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। আর্থার গ্রিফিথস্ নামে একটি

যুবক নতুন নীতি প্রচার শুরু করলেন, তার নাম হল—সিন্ ফেন (Sinn Fein) অর্থাৎ আমরা নিজেদের (We ourselves)। এই দলের উদ্দেশ্য হল ইংলণ্ডের কাছে তাঁরা ভিক্ষে করতে যাবেন না। তাঁরা দাঁড়াবেন নিজেদের পায়ে। তাঁরা Gaelic আন্দোলনকে সমর্থন করলেন; কিন্তু হোম রুল বা ন্যাশানালিষ্ট দলের পার্লিয়ামেণ্ট সম্বন্ধীয় কার্য্য-কলাপ সমর্থন করলেন না, কারণ তাতে বৃটিশের সহযোগিতা করা হয়। আবার সশস্ত্র বিদ্রোহকে সেই মুহূর্ত্তে সম্ভব মনে করলেন না। তাঁরা যে নীতি প্রচার করলেন সেটা এক রকম অসহযোগ আন্দোলন এবং এর নাম হল ডিরেক্ট এ্যাকসন্ বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। সিন ফেনের নীতি যুবকদের মধ্যে দ্রুত প্রসার লাভ করলো। এর মধ্যে লিবারাল দল বা গ্ল্যাডষ্টোনের দল শক্তিশালী হয়ে তৃতীয় বার হোম রুল বিল উপস্থিত উত্থাপন করে পাশ করিয়ে নিলেন।

আয়ার্লণ্ড হোম রুল পেলেন; কিন্তু আলষ্টারের তা সহ্য হল না। তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রস্তুত হতে লাগলেন। বিদেশ থেকে লুকিয়ে অস্ত্র আমদানি হতে লাগলো এবং স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে তাদের প্রকাশ্যে কুচ-কাওয়াজ শেখান হতে লাগলো। এই বিদ্রোহ প্রকৃত পক্ষে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের বিরুদ্ধে, কারণ পার্লিয়ামেণ্টই আয়ার্লণ্ডকে হোম রুলের অধিকার দিয়েছে। তবু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাচীনপন্থী বা রক্ষণশীল দল আলষ্টারের এই বিদ্রোহকে সব রকমে সাহায্য করতে লাগলেন, এমন কি দরকার মত বিদ্রোহীদের টাকা দিতে লাগলেন। তোমরা আরও আশ্চর্য্য হয়ে যাবে যে, এই বিদ্রোহী দলের এক জন নেতা উত্তর-কালে গবর্ণমেণ্টের বড়-বড় পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আলষ্টার পার্লিয়ামেণ্টের ঘোষণার বিরুদ্ধতা করলেও বৃটিশ রক্ষণশীল দল তাঁদের সাহায্য করলেন। তার কারণ হল, তাঁরা বৃটিশের চির-শত্রু ও বিদ্রোহী আয়ার্লণ্ড থেকে আলাদা হতে চেয়েছেন এবং আয়ার্লণ্ডের স্বাধীনতার অগ্রগতিকে বাধা দিয়েছেন।

কিছু দিন পরে আয়ার্লণ্ডও আলষ্টারের অনুকরণে জাতীয় স্বেচ্ছা-সেবক দল গঠন করলেন। এই দলের উদ্দেশ্য হল হোম রুলের হয়ে যুদ্ধ করা এবং দরকার হলে আলষ্টারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এঁরা হোম রুলের স্বপক্ষে থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এঁদের দমন করতে চাইলেন; কিন্তু তাঁরা যে আলষ্টার কার্য্যতঃ পার্লিয়ামেণ্টের বিরুদ্ধতা করলেন তাঁদেরই সাহায্য করলেন। এটাই মজার ব্যাপার এবং এর কারণ তোমাদের আগেই বলেছি।

আয়ার্লণ্ড ও আলষ্টার এই দু'দলের স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে গৃহ-বিবাদ হবার উপক্রম হল; কিন্তু ১৯১৪ সালের মহাসমর লাগার জন্য গৃহ-যুদ্ধ চাপা পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে হোম রুলও চাপা পড়লো। বৃটিশ জানিয়ে দিলেন, হোম রুল আইনে পরিণত হলেও তা কার্য্যকরী হবে যুদ্ধের পরে।

বিদ্রোহী আলষ্টার বৃটিশ কর্ত্তৃক নানা ভাবে পুরস্কৃত হওয়ায় আয়ার্লণ্ডে অসন্তোষ দেখা দিল। তাঁরা তখন স্থির করলেন যে ইংলণ্ডের জন্য তাঁরা আত্মবলি দেবেন না। তদনুযায়ী আয়ার্লণ্ডের সকল সক্ষম লোককেই সৈন্য হতে বাধ্য থাকতে হবে, এই নিয়ম ঘোষিত হলে তাঁরা একে প্রতিরোধ করবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ঈষ্টারের ছুটির সপ্তাহে এক জাগরণ হল। তার ফলে আয়ার্লণ্ডে গণতন্ত্র ঘোষিত হল। এই জাগরণকে বলা হয় ঈষ্টার অভ্যুত্থান (Easter Rising)। বৃটিশ এই অভ্যুত্থানকে দমন করলেন। ঈষ্টার জাগরণ ব্যর্থ হল, কিন্তু বৃটিশ এর নেতাদের উপর যে নির্ম্মম অত্যাচার করেছিলেন তা আয়ার্লণ্ডের লোকের মনে ছাপ রেখে গেল। তাঁরা যে বিদ্রোহের আগুনকে ছাই-চাপা দিলেন সেই আগুন আবার দেখা দিল 'সিন ফেনের' মধ্যে।

মহাযুদ্ধের পর বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বত্র নির্ব্বাচন হল। আয়ার্লণ্ডে সিন ফেন দলের লোকেরাই অধিকাংশ আসন দখল করলেন। ফলে জাতীয়তাবাদীরা যাঁরা বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছিলেন তাঁরা সরে যেতে বাধ্য হলেন। সিন ফেন দল ১৯১৯ সালে আবার ডাবলিনে গণতন্ত্র ঘোষণা করলেন এবং তার নাম দিলেন ডেইল ঈরীন (Dail Eireann)। এর সভাপতি হলেন ডি ভ্যালেরা এবং সহ-সভাপতি হলেন গ্রিফিথস্। এই দলের নীতি হল অসহযোগ ও বয়কট বা বর্জ্জন। এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা হিংসাত্মক গেরিলা যুদ্ধ করে ইংরাজদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। তাঁরা আবার জেলের মধ্যে অনশন করে ইংরাজদের আরও বিব্রত করতে লাগলেন। টেরেন্স ম্যাকসুইনীর অনশন সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি ৭৫ দিন উপবাসের পর মারা যান।

গেরিলা যুদ্ধ দমনের জন্য ইংরাজরা যুদ্ধ-ফেরত হিংসাপ্রবণ সৈন্যদের নিয়ে একটি বিশেষ বাহিনী গঠন করলেন। এদের পোষাক থেকে এরা Black and Tans (কৃষ্ণ ও পিঙ্গল) বলে পরিচিত হল। Black and Tans, দল নানা ভাবে ত্রাসের সঞ্চার করতে লাগলো। গ্রামের পর গ্রাম তারা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করতে লাগলো। এই ভাবে ভয় দেখিয়ে তারা সিন ফেন দলকে বশ্যতা স্বীকার করাতে চেষ্টা করলো; কিন্তু আয়ার্লণ্ড তাতে দমলো না। তাঁরা ১৯১৯—১৯২১ পর্য্যন্ত ৩ বছর ধরে ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন।

এর মধ্যে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট অতি দ্রুত নতুন হোম রুল বিল পাশ করলেন। এই বিলের উদ্দেশ্য হল আয়ার্লণ্ডকে আলষ্টার বা উত্তর-আয়ার্লণ্ড ও বাকী সমগ্র আয়ার্লণ্ড বা দক্ষিণ-আয়ার্লণ্ড এই দু'ভাগে বিভক্ত করা। দু'ভাগে আবার দু'টি আলাদা পার্লিয়ামেণ্ট হল। আলষ্টারে পার্লিয়ামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হল; কিন্তু আয়ার্লণ্ডের অপর অংশ একে সমর্থন না করে সিন ফেন দল কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্রোহে মত্ত হলেন।

১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ আয়ার্লণ্ডের নেতাদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য তাঁদের আমন্ত্রণ করলেন এবং ডিসেম্বর মাসে উভয় পক্ষে একটি আপোষ হল। আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে ইংরাজরা চুক্তি করতে বাধ্য হলেন আর ক্রমাগত যুদ্ধে বিব্রত ও শ্রান্ত হয়ে আয়ার্লণ্ডের অধিকাংশ নেতা মেনে নিলেন। কিন্তু সিন ফেন দলের মধ্যে এই নিয়ে বিরোধ দেখা দিল। এক দলে হলেন ডেইল ঈরীনের সভাপতি ডি ভ্যালেরা অপর, দিকে গেলেন সহ-সভাপতি গ্রীফিথস্, মাইকেল কলিন্স্ প্রভৃতি। ডি ভ্যালেরার দল চুক্তির বিরুদ্ধে এবং গ্রীফিথসের দল হলেন স্বপক্ষে। গ্রীফিথসের দল আয়ার্লণ্ডে ইংরাজ-পরিকল্পিত আইরিশ ফ্রী ষ্টেট স্থাপন করলেন। এই নিয়ে দু'দলের মধ্যে লাগলো ঘরোয়া যুদ্ধ। বিপক্ষ অর্থাৎ ডি ভ্যালেরার

দলকে দমন করবার জন্ত ইংরাজ ফ্রী ষ্টেটকে সাহায্য করতে লাগলেন। মাইকেল কলিনকে ডি ভ্যালেরার দল (রিপাবলিক দল) গুলী করে মারলেন। তার পাল্টা আবার আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের লোকেরা রিপাবলিক দলের অনেক নেতাকে মারলেন, হত্যা করলেন এবং দলকে দল গ্রেপ্তার করে আয়ার্লণ্ডের জেল ভর্ত্তি করে ফেললেন। আয়ার্লণ্ডের লোকের বিরুদ্ধে আয়ার্লণ্ডকে লাগিয়ে দিয়ে বৃটিশ মজা দেখতে লাগলেন।

কালক্রমে গৃহ-বিবাদ থেমে গেল; কিন্তু ডি ভ্যালেরার দল ও কস্‌গ্রেভের আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের মধ্যে মতদ্বৈধ রয়ে গেল। ডি ভ্যালেরার দল গরীব চাষী ও মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। তাঁরা আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের বাইরে রইলেন দু'টি কারণে। প্রথমতঃ, ইংরাজরা তাঁদের গণতন্ত্র স্বীকার করেননি বলে; দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে বলে। কস্‌গ্রেভের দল ধনীদের প্রতিনিধি। তাঁরা রাজ্য-শাসন পরিচালনার ভার নিলেন।

ক্রমে ডি ভ্যালেরা দেখলেন যে, তাঁদের বাধা সত্ত্বেও যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন আর তা থেকে দূরে থাকলে তাকে প্রতিরোধ করা যাবে না। কাজেই তিনি স্থির করলেন যে, প্রথমে আনুগত্য স্বীকার করে শাসন পরিষদে প্রবেশ করবেন তার পরে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। ১৯৩২ সালের নির্ব্বাচনে ডি ভ্যালেরার দলের বেশীর ভাগ লোকেরই জয় হল। তখন আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে এখন থেকে আর তাঁরা রাজার আনুগত্য স্বীকার করবেন না এবং ভবিষ্যতে জমির মূল্য বাবদ কিস্তির টাকা দেবেন না।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এর প্রতিবাদ করলেন। তখন দু'দলের মধ্যে আইনের প্রশ্ন উঠলো। আইনের প্রশ্ন নিয়ে মতদ্বৈধ হলে সালিশীর দরকার হয় এবং দু'পক্ষই তা মানতে রাজী; কিন্তু কা'কে সালিশী মানা হবে তাই নিয়েই তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। বৃটিশ মত প্রকাশ করলেন, সাম্রাজ্যের মধ্য থেকেই লোক নিয়ে ট্রাইবুনাল গঠিত হবে; কিন্তু মুস্কিল হল ডি ভ্যালেরা তাঁদের বিশ্বাস করেন না। তিনি বললেন—আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়ে এর মীমাংসা হ'বে। আবার বৃটিশ তাতে রাজী নন। এমনি ভাবে ঝগড়া চলতে চলতে বাৎসরিক কিস্তির টাকা দেবার সময় এসে পড়লো, অথচ আয়ার্লণ্ড তা দিলেন না। ইংলণ্ড তা সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরা তখন আয়ার্লণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এ যুদ্ধ অস্ত্র-যুদ্ধ নয়, এ যুদ্ধ অর্থনৈতিক যুদ্ধ। তাঁরা ইংলণ্ডে আয়ার্লণ্ডের মাল আমদানীর উপর বেশী শুল্ক চাপিয়ে দিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন আয়ার্লণ্ড এতে জব্দ হয়ে সন্ধি করবেন; কিন্তু তা হিতে বিপরীত হল। এর প্রত্যুত্তরে আয়ার্লণ্ড বৃটিশ মাল আমদানীর উপর শুল্ক চাপিয়ে দিলেন। এতে দু'পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগলেন, কিন্তু কেউই কারও কাছে নতি স্বীকার করলেন না। ১৯৩৩ সালে ডি ভ্যালেরার দল আবার নির্ব্বাচিত হওয়াতে বৃটিশ আয়ার্লণ্ড বিজয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন।

আয়ার্লণ্ড স্বাধীন হল; কিন্তু সেই স্বাধীনতা-সূর্য্যের অগ্রগতির পথে বিন্ধ্য পর্ব্বতের মত দাঁড়িয়ে আছে আলষ্টার-সমস্যা। কে সেই অগস্ত্য যিনি এই বাধা সরিয়ে দেবেন? আয়ার্লণ্ডে হবে কি তাঁর আবির্ভাব?

আয়ার্লণ্ডের রাষ্ট্র-নায়কেরা ভাবছেন, কেমন করে এই বিভক্ত আয়ার্লণ্ডকে এক করা যায়। কেননা, তাঁরা আজও কূল-কিনারা করতে পারেননি, আজও সে দেশ বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এই সম্বন্ধে খণ্ড-বিখণ্ড ভারত সম্বন্ধে ভুক্তভোগী আয়ার্লণ্ড বলেছিলেন—এ ভাল হল না। আমাদেরই মত অবস্থা হল ভারতবর্ষের।

ধীরে ধীরে ফল ফলে

শ্রীইন্দিরা দেবী

সেদিন কুমকুমের একেবারে পড়া হয়নি, তার মানে পড়া তৈরী করতে পারেনি। কেমন করেই বা পারবে? একে তো ক্ষণুদের দল এসে যা তাড়া লাগালো খেলতে যাবার জন্ত, সেই জন্ত ভালো করে খাবার খাওয়াই হ'লো না। হালুয়া আর পাঁপড়-ভাজা খেতে কতটুকুই বা সময় লাগে কিন্তু তাও খেয়ে উঠতে পারলো না। খাবার জলের গেলাসে পাঁপড়-ভাজা ডুবিয়ে যেই না খেতে গেছে, পড়বি তো পড়, একেবারে পিসির চোখে! পিসি একালের আধুনিকা মেয়ে হলে কি হবে, যা রাগী মেয়ে, বাবা! ওকে পড়বার সময় দেখলে আর পড়া হয় না। হবে কেমন করে? বই হাতে দেখলেই বলে বসবে—কই দেখি কুমকুম, কেমন পড়া হয়েছে? ও-কথা শুনলেই অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে—না পারলেই বকুনী আর ঐ সব শব্দগুলো—যা শুনে-শুনে কুমকুম মুখস্থ বলতে পারে: এ সব মেয়েদের কিছু হবে না। কেবল খেলা, নাচ, গান। কোথায় মিটিং হচ্ছে, স্কুল পালিয়ে চল সেখানে, আজ ষ্ট্রাইক, কাল এর ছুটি, হেন-তেন, একটা না একটা বুদ্ধি বেরুবেই। বড়দা যেমন কিছু বলে না! দেখবে কেমন মেয়ে হবে···ইত্যাদি।

কুমকুম ভাবে পিসি যে অত বলে, তা ওরা কি ছোট বেলায় গঙ্গার ঘাটের সাধুর মত চোখ বুজে বসে থাকতো, না ঠাকুমার মত ঠাকুর-ঘরে মালা জপ করতো—তা করলে কেমন করে পাশ করলো আবার কলেজ থেকে? হঠাৎ কুমকুমের কানে আসে—ওর ছোটদা পিসিকে শুনিয়ে শুনিয়ে ওকে বকুনী খাওয়াবার জন্ত যেন পড়ছে: ABC ত্রিভুজের A বিন্দু হইতে BCর মধ্য-বিন্দু Dর উপর AD লম্ব টানা হইয়াছে। প্রমাণ করিতে হইবে যে—

কুমকুমের আরো বেশী রাগ হয়, জ্যামিতির ঐ ABC শুনলে তার গায়ে জ্বালা ধরে, ছোটদা জানে বলে বেশী করে অমনি করে। তাছাড়া গাধার মত চেঁচালে ওখানে পড়া যায় না কি? এই কথা বলেছিল বলেই তো ছোটদা ওর বেণী ধরে টান মারলো; এত পাজী ছেলে, আর পিসি বলবে অলকের মত পড়াশুনোয় ভালো ছেলে দেখা যায় না, কুমিটা হচ্ছে ফাঁকিবাজ। এ কথা শুনলে কার না কান্না পায়? আবার সুন্দর নামটাকে কাট-ছাঁট করে কুমি বলা হচ্ছে। ছোটদা তো শিখলেই যখন-তখন বলবে বন্ধু-বান্ধবের সামনেই। মাকে বলেও তো ফল হলো না, বললেন: আচ্ছা', সবাই তোমায় কুমু বলবে, রবীন্দ্রনাথ এই নাম তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছিলেন—

ধুত্তোর রবীন্দ্রনাথ, কুমকুমের ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে। ওর অমন সুন্দর নামটাকে যা-তা করবে সবাই, অথচ অনুযোগ করলে কেউ আমোল দেয় না। সব চেয়ে রাগ তার পিসির উপর, অত যে সাধু সেজে বলা হয়, মিটিং, ষ্ট্রাইক—যেন নিজেরা কিছুই করেননি—এই সেদিন স্বকর্ণে কুমকুম শুনেছে, পিসির সেই বন্ধ

অলকা সেনকে পিসি বলছে : তোর মনে পড়ে অলকা, স্কুল পালিয়ে প্রমীলাদের বাড়ীর ছাদে লুকোচুরি খেলা আর কেঁতুল খাওয়া ? এক দিন ছাদের আলসেতে নামা হয়েছিল আর পাশের বাড়ীর গিন্নী কাপড় তুলতে এসে চীৎকার করেছিল আমাদের দিকে চেয়ে ?

অলকা সেনও তো বলছিল : মনে নেই আবার, সেদিন তো শুধু বকুনি নয়, মারও খেতে হয়েছিল—

তবে যে পিসি অমন করে বলে, এবার এক দিন স্পষ্ট কুমকুম বলে দেবে, তার পর মার খেতে হয় খাবে।

কিন্তু মুস্কিল তো ঐখানে, আজই রুপুরা এলো, আজই খেলতে যাবার জন্তে পাঁপড়গুলো জলে ডুবিয়ে খাওয়া হলো, সবই আজ, আর পিসিই দেখলো—নাঃ, কুমকুম আর ভাবতে পারে না। পড়া ছেড়ে আস্তে-আস্তে শোবার ঘরের ভিতর ঢুকলো। ঘরের পিছন দিক্‌কার জানলাগুলোর কাছে একটা বড় গাছ ছিল, সেই গাছে থাকতো এক-ঘর শালিক। কর্তা, গিন্নী আর বাচ্চা-কাচ্চা। কুমকুম অনেক সময় লক্ষ্য করেছে ওরা কি বলাবলি করে, কিন্তু কিছু সে বুঝতে পারে না। আজ যেন কুমকুমের মনে হচ্ছে, ওরাই ওর বন্ধু, বকা-ঝকা করে না, কালো চোখ বার করে মিটমিট করে ওর দিকে তাকায়, আবার বন্ধ করে, মাঝে-মাঝে বাসা ছেড়ে উড়ে এ-ডাল ও-ডাল করে বেড়ায়। খেলা-ধূলো না থাকলে কুমকুম এই সব দেখে।

গাছটাও মস্ত গাছ, ডালে-পাতায় ভরতি, একটুকু ফাঁক নেই। উপর তলা নীচে তলা হয়ে গেছে তিন-চার তলা বাড়ীর মত। সব উপরের তলায় থাকে এক-ঘর চন্দনা, মাঝের তলায় ভাড়াটে শালিক-পরিবার আর নীচের তলায় চড়াই-গিন্নী ছানা-পানা নিয়ে আরাম করে বাস করে। তাদের খাবার-দাবার কুমকুমদের ভাঁড়ার থেকে যা আসে তাই যথেষ্ট—ইচ্ছা করলে কিছু বিলিয়ে দিতেও পারে। কিন্তু যে সুবিধাটা চড়াই-গিন্নী এই রেশন-এর দিনে পাচ্ছে, তা কিন্তু উপরতলা বা মাঝের তলার ভাড়াটেরা পায় না। তা না পাক, তাদের খাবার সংগ্রহ করবার শক্তি আছে।

এই ঝাঁকড়া-মাথা গাছটার নীচে যদি দাঁড়ানো যায়, বেশ খানিক জায়গা জুড়ে নীল আকাশের একটুও দেখা পাবে না। খাটে শুয়ে কুমকুম কত রাতে ঘুম ভেঙে ভয় পেয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। সারা দিন ধরে দিনের আলোয় যে গাছকে দেখেছে, গভীর রাতে নিস্তব্ধ পৃথিবীতে তার যেন অন্ত রূপ দেখে সে আতঙ্কিত হয়েছে।

তবু তিন তলার তিন-ঘর অধিবাসীদেরই সে চেনে। বেশী ভালো লাগে তার মাঝের তলার বাসিন্দাদের। তাদের বাসার সঙ্গে তাদের ঘর একেবারে এক সমান লাইনে। কুমকুম ভারী-মুখে জানলার রেলিং ধরে গাছের দিকে চেয়ে রইল।

শালিক-গিন্নীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল : দেখেছ, বাগচি-বাড়ীর মেয়েটা অভিমানে মুখ ফুলিয়ে রয়েছে।

কর্তা ঘাড় গুঁজে আরাম করছিল, বললে : দেখেছি বই কি, বেচারার পড়া হয়নি আর ওদের বাড়ীর ছোট ছেলেটা গলা ফাটিয়ে পড়ছে, শুনছো না ?

—শুনছি বৈ কি। আহা একরত্তি দুধের মেয়ে এতে ... তার চাপ দেওয়াই বা কেন ? ঐ ওর পিসিটা, উঁচু জুতো পরে খটখটিয়ে ছাতা হাতে করে বেরোয়—ওই তো বেশী শাসন করে। শালিক-গিন্নী স্নেহভরে একবার কুমকুমের দিকে তাকালো।

কর্তা বললে : কিন্তু যে বয়সের যা। এখন ছোট কিন্তু এক দিন তো বড় হবে, চিরদিন ছোট থাকবে না, লেখা-পড়া তো করতেই হবে।

গিন্নী ঠোঁটটা একবার গাছের ডালে ঘষে নিলো, তার পর বললে : তা তো বটেই—তবে বড় ছেলেমানুষ।

কর্তা বললে : তা আর কি হবে বলো ? একটু-একটু করে সব দিক্ দিয়ে বড় হবার চেষ্টা করা উচিত, আর এখন থেকেই—এই ছোট থেকেই।

গিন্নী আর একবার নরম চোখে তাকালো কুমকুমের দিকে, তার পর বলে উঠলো : আহা, তা হোক, কচি বাচ্ছা।

কর্তা রেগে বাধা দিয়ে বললে : কচি বাচ্চা—কচি বাচ্চা করে তুমি তোমার ছেলে-মেয়েদেরও মাথা খেয়েছ, বিশেষ করে বড় ছেলেটার।

—কেন কি করেছে সে ?

কর্তার মেজাজ তখনও সমান পর্দায় : হয়েছে আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু !

গিন্নী কিছু বলবার আগে ছোট ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে তাদের কাছে এসে ডাকলো : মা ! বাবা !

গিন্নী ব্যস্ত হয়ে বললে : কি হয়েছে রে, এত হাঁপাচ্ছিস্ কেন ?

ছোটর সারা মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললে : অনেক—অ—নে—ক দূর উড়ে বেড়িয়ে এলাম। দিদি সঙ্গে ছিল। আকাশটা কোথায় শেষ হয়েছে কেবল তাই দেখতে ইচ্ছা করে।

গিন্নী ছোটর কাছে সরে এসে বললে : ষাট, ষাট,, অত দূর যাস নে বাপু

কর্তা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো : না যাবে না, তোমার কোলের কাছে বসে থাকবে ?

—আচ্ছা, তুমি থামো, তোর দাদা কোথায় রে ছোট ?

আবার কর্তার সপ্তমে-চড়া কণ্ঠ শোনা গেল : কোথায় আবার যাবে, বাসায় পড়ে-পড়ে ঘুমুচ্ছে, একটুও উড়তে পারে না, পোকা ধরতে পারে না—একবারে হাঁদা গঙ্গারাম—অমন ছেলে থাকার চেয়ে যাওয়া ভালো।

গিন্নী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো : বলি, বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে না কি ? ষাট, বাছা আমার বেঁচে থাক।

—বেঁচে থাকবে কি করে ? শক্তি চাই, বুঝলে গিন্নি। নির্জীব হয়ে পড়ে থাকলে এ যুগে বাঁচা চলবে না। উড়তে পারবি না, পোকা ধরতে পারবি না, তবে পাখী হয়ে জন্মেছিস্ কেন ? মানুষের ঘরে জন্মালেই তো পারতিস।

—তা বেচারা পারে না কি হবে ? গিন্নীর কথার সুরে অনুকম্পা।

—পারে না কেন শুনি ? তার ছোট ভাই, ছোট বোন যখন আকাশের শেষ কোথায় দেখবার চেষ্টা করে, পোকা-মাকড় ধরে খায়, তখন ধেড়ে ছেলে বাসায় শুয়ে পড়ে-পড়ে ঘুমুচ্ছে, আর মা-বাপের হাত-তোলা খাচ্ছে, লজ্জা করে না—ছিঃ।

—তা কি করবে? বেচারার ডানায় জোর নেই।

—কে বললে জোর নেই? ভয়েই সারা, এ যুগে ঐ কুঁড়েমী আর ভয় থাকলে তোমার ছেলে ঐ বাসায় পচে মরবে, বুঝলে?

গিন্নী রেগে বললে: একশো বার ঐ ছাই কথাগুলো বলো না বলছি।

ছোট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল, এবার বলে উঠলো: আমারও এই রকম ভয় করতো, মনে হতো উড়তে পারবো না, ডানা ভেঙ্গে পড়ে মরবো।

কর্ত্তাও বলে উঠলো: হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছোটবেলায় আমারও অমনি হতো, সকলেরই হয়।

ছোট একদমে বলে চললো: চেষ্টা করতেই দেখলাম, বেশ উড়তে পাচ্ছি। আর সে কি মজা আর আনন্দ!

গিন্নী একটু ভেবে বললে: বড়কে একবার চেষ্টা করে দেখতে বললে হয়।

কর্ত্তা বিরক্ত হয়ে বললে: কিন্তু চেষ্টা করে দেখবার কি মন আছে? মন থেকে ভয়কে মুছে ফেলতে না পারলে কোনো কালেই কিছু হবে না, শুধু বয়সই বাড়বে, বুদ্ধি আর পাকবে না। শোনো গিন্নি, বড়কে ওড়া শেখাতেই হবে, আজ কেউ ওকে খাবার দিতে যেও না।

—বা রে, না খেয়ে থাকবে ছেলেটা? গিন্নীর কণ্ঠস্বর ভিজে।

—না, না নিজের চেষ্টায় ও খাবার খুঁজে নিক, উড়তে শিখুক। আত্মনির্ভরশীল হওয়া দরকার, শক্তি চাই! কর্ত্তা জোর দিয়ে বলে উঠলো।

ছোট তার দিদির সঙ্গে আবার উড়ে চললো আকাশে। উড়তে উড়তে নীল আকাশের কোন্ অসীম শূন্যে তারা মিলিয়ে গেল ক্রমশঃ।

বাসায় শুয়ে বড় ঝিমুচ্ছিল—সে দেখলো ওরা উড়ে গেল, নীচের তলার চড়াই-গিন্নীর সে-দিনের কচি বাচ্চাটা পর্য্যন্ত তার আহার সংগ্রহের চেষ্টা করছে। উপরতলা থেকে সে আসতো মাঝে-মাঝে, কথা বলতো; চন্দনার সেই ভাইটাও পাখা মেলে উড়ে গেল।

বড় দেখছে এক-মনে, একমাত্র সে-ই বাসায় পড়ে আছে অথর্ব্বের মত।

মা ডাকলো: বড় এসো, খাবার নাও।

বড় এগিয়ে আসার চেষ্টা করলো—কিন্তু পারলো না। মা আবার ডাকলো, বললে: চেষ্টা কর বড়, ঠিক পারবে।

বড় নড়ে-চড়ে উঠলো: না মা, পড়ে যাচ্ছি যে!

—একবার পড়বে, দু'বার পড়বে, তিন বারে ঠিক উড়তে পারবে।

বড় প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো। শালিক-গিন্নী তখনও বলছে: নিজের শক্তি জাগাতে হবে, ওঠো বড়, ঠিক উড়তে পারবে।

কুমকুম তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

মনে হলো, তাদের সব কথা সে বুঝতে পেরেছে। ভারী আরাম আর আনন্দ হচ্ছিল তার। মনে হলো, সে-ও যদি ডানা মেলে অমনি অসীম শূন্যে উড়তে পারতো!

শালিক-গিন্নীর বড় ছেলে মাটিতে পড়ে গেছে, উড়তে চেষ্টা করছিল, পারেনি।

মা এসে ছেলের মুখে খাবার দিয়ে বললে: ঠিক উড়তে পারবে বড়, চেষ্টা কর, চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। মনে রেখো, নিজের শক্তি জাগাতে হবে।

পিসির কণ্ঠ শোনা গেল: কুমকুম কই রে? পড়তে বসেনি?

ছোটদের উচ্চকণ্ঠ তখনও ঘোষণা করছে: ABC ত্রিভুজের A বিন্দু হইতে BCর মধ্য-বিন্দু Dর উপর লম্ব টানা হইয়াছে—

কুমকুম আর একবার নীল আকাশের দিকে চাইলো—দেখলো, শালিক-গিন্নীর বড় ছেলে উড়ে চলেছে...।

কুমকুমের কানে বাজতে লাগলো: মনে রেখো, নিজের শক্তি জাগাতে হবে...।

সত্যের পূজা

(কাউন্ট লিও টলষ্টয়ের "Three Mendicants" গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

শ্রীমতী ইন্দিরা ঘোষ

পৌষ মাস—সংক্রান্তির আর দেরী নেই। বিশাল নদীর স্রোতে কতগুলি যাত্রী নিয়ে একটি নৌকা সাগরের দিকে এগিয়ে চলেছিল। নৌকার যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন জয়রামপুরের বিষ্ণুপদ শর্ম্মা। বিষ্ণুপদ পণ্ডিত লোক, সে জন্য সকলেই তাঁকে মান্য কোরত।

শীতে নৌকার যাত্রীরা জড়সড় হয়ে বসে-বসে গল্প করছিল। বিষ্ণুপদ এক ধারে নীরবে বসেছিলেন। হঠাৎ এক জন যাত্রী চেঁচিয়ে উঠল—"ওই দূরে, নদীর জলের মধ্যে ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট ওটা কি?"

এক জন মাঝি শুনে বলল—"ওটা একফালি জমি, চারি ধারে জল। ওখানে তিন জন সংসার-বিবাগী সন্ন্যাসী থাকে।"

সে কথা শুনে বিষ্ণুপদ আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, বললেন—"সংসার-বিবাগী সন্ন্যাসী! এরা কে, তুমি জান? আমার এদের বিষয়ে খুবই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

মাঝি উত্তর করল—"আজ্ঞে, আমি এদের কথা আগেও অনেক শুনেছিলাম। এবারে চোত মাসে একবার এখানে ঝড়ে আমার নৌকখানাকে ঠেলে নিয়ে যায় ওই চরে। কোথায় এলাম বুঝতে না পেরে খানিক দূর হেঁটে যেতেই দেখি সামনে একটা মাটীর ঘর। সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তিন জন বুড়ো লোক। তারাই আমায় খাওয়ালে, কত যত্ন করলে—আমার নৌকো সারাতে তারাই সাহায্য করলে।"

তারা কি ধরণের লোক—জিজ্ঞাসা করায় মাঝি বলল—"এক জন বাঁটকুল মত, কুঁজো আর খুব বুড়ো। সে পরেছিল একটা পুরানো আলখাল্লা মত। তাকে দেখে আমার মনে হোল, তার বয়স একশ' বছরেরও বেশী। তার দাড়ী তো একেবারে সাদা। কিন্তু তার মুখে সব সময় হাসিটি ঠিক লেগেছিল। আর এক জন আর একটু ঢেঙ্গা, আর বেশ বুড়ো। সে পরেছিল একটা ছেঁড়া জামা—তার লম্বা দাড়ী যেন হলুদ মত দেখাচ্ছিল। কিন্তু উঃ! তার গায়ে কি জোর,—একাই আমার নৌকখানা উল্টে দিলে, আর কি স্ফূর্ত্তি! অন্য লোকটি খুব লম্বা [illegible]

অবধি নেমে এসেছিল—কোমরে একখানি কাপড় ছাড়া তার গায়ে কিছু ছিল না। এর মুখে কোন কথা ছিল না, যেন মনমরা মত।"

"তারা তোমার সঙ্গে কি কথা বলল?" বিষ্ণুপদ জিজ্ঞাসা করল।

"তারা কথা খুব কম বল্‌ছিল। কত দিন ধরে ওই চরে তারা আছে আমি জিজ্ঞেস করায় খুব ঢেঙ্গা যিনি, যেন তার রাগ হয়ে গেল। তখন খাটো বুড়ো লোকটি একটু হেসে তার হাতটি চেপে ধরতে সে আর কিছু বল্‌লে না।"

নৌকাটি তখন ক্রমশঃ সম্মুখবর্ত্তী চরটির সন্নিকটে এসে পড়েছিল। বিষ্ণুপদ নৌকার বুড়ো মাঝিকে ডেকে বল্‌লেন—"আমার বড়ই ইচ্ছে হচ্ছে একবার এই অদ্ভুত লোকগুলিকে দেখ্‌তে। ওই চরে একবার কি আমায় নিয়ে যেতে পারবে?"

বুড়ো মাঝি বিষ্ণুপদকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল—"আপনাকে আমি নিয়ে যেতে খুব পারব, কিন্তু শুধু সময় নষ্ট হবে তা আপনাকে বলে দিচ্ছি; কারণ ওদের দেখে আপনার কিছুই লাভ হবে না। আমি লোকদের মুখে শুনেছি, এই বুড়ো লোক তিনটি একেবারে বোকা, না কিছু বোঝে, না কিছু বল্‌তে পারে।"

"তবু আমি যেতে ইচ্ছে করি"—বল্‌লে বিষ্ণুপদ। "এর জন্য আমি আলাদা কিছু তোমাদের দেব। আমাকে নিয়ে চল।"

মাঝিরা তখন নৌকাটা সেই চরের নিকটে বেয়ে নিয়ে এসে নোঙর ফেলে দিল। নৌকার সকলেই দেখতে পেল, জলের ধারে তিন জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক জন খুব দীর্ঘদেহ, তার কোমরে শুধু এক টুকরা কাপড়। ছিন্নবস্ত্র গায়ে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ততটা দীর্ঘ নয়। তৃতীয় ব্যক্তিটি কুব্জ ও ক্ষুদ্রকায়—তার অঙ্গে পুরাতন একটি আলখাল্লা।

বিষ্ণুপদ নৌকা থেকে নাম্‌তেই সেই তিন জন বুড়ো তাঁকে প্রণাম জানাল। বিষ্ণুপদ তাদের আশীর্ব্বাদ করে বললেন—"আমি তোমাদের কথা শুন্‌লাম যে, তোমরা এখানে নির্জ্জনে ভগবানের আরাধনা কর। আমিও তাঁরই অযোগ্য ভক্ত, সে জন্য আমি তোমাদের দেখতে এলাম,—যদি তোমাদের কিছু জানবার থাকে আমি তা তোমাদের বুঝিয়ে দিতে পারব।"

এ কথা শুনে সেই লোকগুলি শুধু নীরবে হাস্‌ল।

"তোমরা ভগবানকে কি ভাবে পূজো কর?"—বিষ্ণুপদ জিজ্ঞাসা করল।

অতি-বৃদ্ধ সাধুটি হেসে উত্তর দেয়—"ঠাকুর, আমাদের কি ক্ষমতা আছে যে আমরা ভগবানের পূজো করব। আমরা যাতে নিজেরা দু'টো খেতে পাই তারই চেষ্টা করি।"

"তবু, তোমরা তাঁকে কি ভাবে ডাক?" জিজ্ঞাসা করলেন বিষ্ণুপদ।

লোকটি বলল—"আমরা শুধু বলি—হে ত্রিশক্তি, আমাদের তিন জনকে দয়া কর।"

বিষ্ণুপদ শুনে হাসলেন—"তোমরা ভগবানের ত্রিশক্তির কথা হয়ত কিছু শুনেছ, কিন্তু নিশ্চয়ই তাঁর বিষয়ে তোমাদের সম্যক্ জ্ঞান নেই। এস, আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

তার পর বিষ্ণুপদ অনেকক্ষণ ধরে সেই সাধুদের অনেক তত্ত্বকথা বোঝালেন এবং তার পর একটি সুন্দর স্তোত্র আবৃত্তি করে তাদের বল্‌লেন—"এই স্তোত্রটি আমি তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এখন থেকে এই স্তোত্রটি বলে ভগবানের আরাধনা কর।"

প্রথমে লোকগুলি স্তোত্রটির একটি কথাও বল্‌তে পারল না। তখন বিষ্ণুপদ বার-বার করে একটি-একটি কথা উচ্চারণ করতে লাগলেন। তাঁর ঠোঁট-নাড়া দেখে তারা ধীরে ধীরে সেই রকম উচ্চারণ করতে চেষ্টা করতে লাগ্‌লো। বহুক্ষণ চেষ্টা করার পর তারা একে একে তিন জনই স্তোত্রটি বল্‌তে পারল।

তখন বিষ্ণুপদ তাদের বার-বার তাঁর সঙ্গে স্তোত্রটি আবৃত্তি করালেন। যখন তাদের কথাগুলি একেবারে কণ্ঠস্থ হয়ে গেল, তখন বিষ্ণুপদ তাদের আশীর্ব্বাদ করে নৌকায় ফিরে গেলেন।

তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌ছিল, এবং চাঁদ ধীরে-ধীরে আকাশে উঠছিল। নৌকা ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ অবধি নৌকা থেকে চরের লোকগুলি তখনও যে স্তোত্রটি আবৃত্তি করছিল, তার কথাগুলি শোনা যাচ্ছিল। তার পর আর কিছু শোনা গেল না। নৌকা ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছিল—চরের লোক তিনটিকে ধীরে-ধীরে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হোল না, শুধুই জল।

রাত্রি গভীর হতে লাগল, যাত্রীরা একে একে নীরব হয়ে গেল। চারি ধার নিস্তব্ধ। বিষ্ণুপদ একা—পশ্চাতে যেখানে তাঁরা চরটি ফেলে এসেছিলেন, সেই দিকে দৃষ্টি রেখে বসেছিলেন, এবং সেই অদ্ভুত লোক তিনটির কথা চিন্তা করছিলেন। তিনি যে তাদের ভগবানের বিষয়ে শিক্ষা দিতে পেরেছেন, সে জন্য তিনি মনে-মনে আনন্দ অনুভব করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হোল, যেন চাঁদের আলোয় জলের মধ্যে কিছু একটা ঝিকমিক করছে। তার মনে হতে লাগল, যেন একটা সাদা পালের নৌকা তাঁদের নৌকার দিকে জলে ভেসে আসছে।

বিষ্ণুপদ মাঝিকে আহ্বান করলেন—"দেখ তো ভাই মাঝি, ওটা কি? কিছু বুঝতে পারছ?" কিন্তু তখন তিনি নিজেই দেখতে পেলেন। দূরে জলের উপর দিয়ে সেই তিন জন বুড়ো দ্রুত পদবিক্ষেপে চলে আসছে। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় তাদের সাদা দাড়ী ঝকঝক করছিল।

মাঝি হাল ছেড়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠল—"ওরে, এ কি রে—সেই সাধুরা যে জলের উপর দিয়ে চলে আসছে, যেন মাটির উপর দিয়ে হেঁটে আস্‌ছে!"

মাঝির চীৎকার শুনে নৌকার লোকেরা সকলেই উঠে বসল। ততক্ষণে সেই তিন জন সাধু নৌকার উপরে উঠে এসেছে। তারা বিষ্ণুপদর নিকটে এসে বলল—"ঠাকুর, আপনি যে আমাদের ভগবানকে পূজো করবার জন্য স্তোত্রটি শিখিয়েছিলেন, তা আমরা ভুলে গিয়েছি। যতক্ষণ আপনি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, ততক্ষণ আমাদের তা বেশ মনে ছিল, কিন্তু ঘণ্টা খানিক পরে আমরা স্তোত্রটি বলতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু দেখি, আমরা সবটাই ভুলে গিয়েছি। আপনি আবার আমাদের স্তোত্রটি শিখিয়ে দিন।"

বিষ্ণুপদ সাধুদের সম্মুখে মাথা নত করে বললেন—"আপনাদের পূজাই ভগবান গ্রহণ করেছেন—আমার পক্ষে আপনাদের কিছু শিক্ষা দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। আপনারা আমাদের মত পাপীদের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করবেন।"

এই বলে পণ্ডিত বিষ্ণুপদ মাথা নত করে সাধুদের পদধূলি দিলেন। তাঁরা এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তার পর জলের উপর [illegible]

শুধু সকালে দেখা গেল, নৌকার উপরে যেখানে সেই সাধুরা তিন জন এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সেইখানে যেন এক টুকরা আলো ঝকঝক করছে।

দোষ স্বীকার

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

(Marienkind—Grimm)

কাঠুরে।	রাজপুত্র।
কাঠুরের মেয়ে সুখী।	রাজবাড়ীর মেয়েরা।
দেবকন্যারা।	প্রজারা।
বনদেবী।	শিকারীর দল।

প্রথম দৃশ্য

[গভীর বন···প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে—কাঠুরে একটি কাঠের আঁটি বাঁধিতেছে—কাঠুরের মেয়ে]

সুখী। বাবা, আমার বড় খিদে পেয়েছে—

কাঠুরে। খিদে তো পেয়েছে জানি···কিন্তু এ বনের ভেতর তোকে কি খেতে দি বল তো।

সুখী। আমার পেটের ভেতর জ্বালা করছে বাবা (ক্রন্দন)।

কাঠুরে। একটা মেয়ে···হে ভগবান, তাকেও পেট ভরে খেতে দিতে পারি না···মেয়েটার কষ্ট আর সহ্যও করতে পারি না।

(হঠাৎ চারি দিক্ আলোকিত হয়ে উঠল—বনদেবী তাদের সামনে এসে হাজির হলো)

কাঠুরে। কে তুমি মা!

বনদেবী। আমি বনদেবী···তোমার মেয়েটিকে আমায় দেবে?

কাঠুরে। (সুখীকে বুকে জড়াইয়া ধরিল) সে কি! আমার যে আর কেউ নেই।

বনদেবী। আমি মেয়ে বড় ভালোবাসি—দাও না তোমার মেয়েটি, ওকে আমি কত সুখে রাখবো।

কাঠুরে। কিন্তু মা, ওই যে আমার সম্বল।

বনদেবী। তোমার যখনই ইচ্ছে হ'বে তখনই তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে।

কাঠুরে। তা হ'লে······

বনদেবী। তা হ'লে সুখীকে আমি নিয়ে যাই।

(হঠাৎ চারি দিক্ আলোকিত হয়ে উঠলো—দেখা গেল সুখী আর বনদেবী নেই, আর কাঠুরের কুড়ুলটা সোনার হয়ে গেছে)

কাঠুরে। (কুড়ুলের দিকে চেয়ে) এ কি! হ্যাঁ! এ যে একেবারে খাঁটি সোনা···সুখী···সুখী···কই, সুখী কোথা গেল···হ্যাঁ, আমার সুখী নেই···সুখী সুখী···(ছুটিয়া বনের ভিতর প্রবেশ করিল—তার গলার আওয়াজ ক্রমশঃ ক্ষীণতর হতে লাগলো)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(স্বর্গের উদ্যান—নানা রকম অদ্ভুত ফুল—দূরে একটি ঝর্ণা—সোনার মত তার জল—চারি দিকে মিষ্টি গান—বনদেবী আর সুখী)

বনদেবী। সুখী, তোমার বাবার জন্যে মন কেমন করছে না?

সুখী। না···বাবার কথা আমি ভাববারও সময় পাই না—এখানে এসে।

বনদেবী। আজীবন তোমায় আমি আমার কাছে রেখে দেবো—দেবকন্যারা হবে তোমার খেলার সাথী—স্বর্গের পাখীরা শোনাবে তোমায় মিষ্টি গান···কিন্তু সাবধান, আমার অবাধ্য হলেই তোমায় মস্ত বিপদে পড়তে হবে। কাল আমি দেশ-ভ্রমণে যা'বো···তুমি স্বর্গের সব জায়গায় যেতে পারবে—সব জিনিষই তুমি নিতে পারবে, কিন্তু সাবধান, ঐ ঝর্ণার জলে যেন কখনো হাত দিও না···বুঝলে?

সুখী। আচ্ছা।

বনদেবী। ঐ ঝর্ণার ধারে বসে থাকবে···ঐ ঝর্ণার জলে দেখতে পাবে সারা পৃথিবী···পৃথিবীর সুন্দর ছবির মত একে একে তোমার সামনে ভেসে উঠবে—কিন্তু সাবধান, ঐ ঝর্ণার জলে যেন তুমি হাত দিও না।

সুখী। আমার বাবাকে ঐ ঝর্ণার জলে দেখতে পাবো?

বনদেবী। হ্যাঁ, তোমার বাবাকে দেখতে পাবে···দেখতে পাবে তোমার খেলার সাথীদের···কিন্তু দেখো যেন ঐ ঝর্ণার জলে হাত দিও না।

সুখী। না।

বনদেবী। কাল সকালেই আমি চলে যাবো···আমার কথা তোমার মনে থাকবে তো?

সুখী। হ্যাঁ, (বনদেবী চলে গেলেন···কতগুলি দেবকন্যা নাচিতে নাচিতে সেখানে এলো)

এক জন দেবকন্যা। বা রে, আমরা তোমায় খুঁজে মরছি আর তুমি একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছো—চাঁদের মা যে আজ আমাদের খাওয়াবেন, তুমি ভুলে গেছো বুঝি?

সুখী। আচ্ছা বোন···ঐ ঝর্ণার জলে কি আছে?

দেবকন্যা। ঐ ঝর্ণার জলে আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর ছবি···কিন্তু কারুর ঐ ঝর্ণার জলে হাত দেবার হুকুম নেই।

সুখী। কেন ভাই?

দেবকন্যা। তা কি করে জানবো ভাই···আর জেনেই বা আমাদের লাভ কি বল?

সুখী। তা বটে।

দেবকন্যা। চ', তুই যাবি নে?

সুখী। আমার মনটা আজ ভালো নেই, তোরা যা।

(দেবকন্যারা নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল)

সুখী। কি আশ্চর্য্য ঝর্ণা! অথচ হাত দেবার হুকুম নেই!

(সুখী চলিয়া গেল—কিছুক্ষণ পরে বনদেবী বাগানের ভেতর এলেন) (১০ মিনিট কাটিয়ে দিতে হবে—নেপথ্যে কোন সঙ্গীত)

বনদেবী। সুখী···সুখী···কোথায় গেল মেয়েটা—

(ছুটিতে ছুটিতে সুখীর প্রবেশ—একটি হাত সে আঁচলের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে—সামনে বনদেবীকে দেখিয়া)

সুখী। হ্যাঁ! আপনি!

বনদেবী। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি অমন কাঁপছ কেন?

সুখী। কাঁপছি···না···কই কাঁপিনি তো

বনদেবী। তুমি ঝর্ণার জলে হাত দিয়েছো ?

সুখী। না না—হাত দেব কেন। আমি দেখছিলাম আমার বাবাকে, তিনি আমার জন্যে কাঁদছেন···মস্ত বড় কোটা বাড়ী আমাদের—কত দাস-দাসী···কিন্তু বাবা আমার কাঁদছেন আর সুখী সুখী বলে ডাকছেন···আমি হাত বাড়িয়ে বাবাকে ধরতে গেলেম···

বনদেবী। তুমি ঝর্ণার জলে হাত দিয়েছিলে ?

সুখী। না না, আমি কেন হাত দেবো ?

বনদেবী। মিছে কথা বলছো।

সুখী। না না, আমি হাত দিইনি।

বনদেবী। দোষ স্বীকার করো সুখী···তা না হ'লে আমি তোমায় ভীষণ শাস্তি দেবো।

সুখী। না না, আমি হাত দিইনি।

বনদেবী। বেশ, তবে তুমি আবার পৃথিবীতে ফিরে যাও···আজ থেকে আমি তোমার কথা কইবার শক্তি হরণ ক'রে নিলাম—যেদিন তুমি তোমার দোষ স্বীকার করবে সেই দিন আবার তুমি কথা কইবার শক্তি ফিরে পাবে···যাও···

(সুখী যেখানে দাঁড়িয়েছিল সে জায়গাটা দু' ফাঁক হয়ে গেল—সেই সঙ্গে অদৃশ্য হল সুখী)

তৃতীয় দৃশ্য

(গভীর বন—একটা গাছের গুঁড়ির কাছে সুখী দাঁড়িয়ে···তার কাপড়-জামা কিছু নেই—মেঘের মত কালো চুল তার সারা অঙ্গ ঢেকে রেখেছে। চারি দিকে বাজনা-বাদ্যি···আর কুকুরের ডাক—হঠাৎ একটি সুন্দর যুবক সুখীর কাছে ঘোড়ায় চড়ে এসে পড়ল···সুখী ভয়ে জড়সড় হয়ে গাছের গুঁড়ি ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইল। (মিনিট পাঁচেক পরে)

রাজপুত্র। কি সুন্দরী মেয়ে! কিন্তু একলা ও বনের ভেতরে কেন···তুমি কে ?

সুখী। (কোন উত্তর দিল না)

রাজপুত্র। তুমি একলা এখানে কেন ?

সুখী। (কোন উত্তর দিল না)

রাজপুত্র। তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?

সুখী। (কোন উত্তর দিল না)

রাজপুত্র। উত্তর দাও···তুমি কি কথা কইতে পারো না ?

সুখী। (ঘাড় নাড়িল)

রাজপুত্র। আমার সঙ্গে যাবে···আমি তোমায় ভালো করে দেবো।

সুখী। (ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে যাবে) (সেই সময় চার জন শিকারী সেখানে এসে পৌঁছাল)

রাজপুত্র। আমার হাতীটা এখানে নিয়ে এসো, একে আমি নিয়ে যাবো।

সকলে। সে কি! রাজকুমার···ও ডাইনি···চুপ করে বোবা সেজে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজপুত্র। যাও, যা বলছি শোনো—

(শিকারীরা চলে গেলো)

সুখী। (কাঁদিতেছে)

রাজপুত্র। তোমার কোন ভয় নেই···আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমায় বিয়ে করবো—

সুখী। (আরো কাঁদিতে লাগিল)

রাজপুত্র। কাঁদছ কেন ?···আমায় বিয়ে করতে তোমার ইচ্ছে নেই ?

সুখী। (ঘাড় নাড়িয়া জানাইল আছে)

(হাতী আসিয়া পড়িল—রাজকুমার সুখীকে হাতীর উপর তুলিয়া লইয়া চলিল)

১ম শিকারী। দেখলে একবার রাজকুমারের কাণ্ড ?

২য়। ছেড়ে দাও ভাই, রাজ-রাজড়ার ব্যাপার।

৩য়। ও নিশ্চয় ডাইনি!

৪র্থ। দু'দিন পরেই বোঝা যাবে।

চতুর্থ দৃশ্য

(দুই বছর পরে)

(রাজ-প্রাসাদ—একটি কক্ষ—সুখী একটি সোনার পালঙ্কে শুয়ে—তার পাশে সুন্দর একটি শিশু···ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলছে, আর কেউ নেই—হঠাৎ ঘরের দরজা ফুঁড়ে একটা আলো এসে সুখীর মুখের উপর পড়তেই সুখী চমকে বিছানার উপর উঠে বসলো···দেখতে দেখতে বনদেবী ঘরের ভিতর এসে হাজির হলো)

সুখী। আবার—আবার আপনি এসেছেন ?

বনদেবী। হ্যাঁ, তোমার দোষ স্বীকার করবে ?

সুখী। দোষ···কি দোষ···কত বার তো বলেছি আমি হাত দিইনি ঝর্ণার জলে ?

বনদেবী। এখনো তোমার দোষ স্বীকার কর সুখী, তোমার একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে আমি নিয়ে গেছি···যদি তুমি দোষ স্বীকার না করো তাহ'লে এ ছেলেটিকেও আমি নিয়ে যাবো, বল, হাত দিয়েছিলে ঝর্ণার জলে ?

সুখী। না।

বনদেবী। না, তবে দাও ও-ছেলেটিকে।

সুখী। না না, দেব না কিছুতেই দেব না।

বনদেবী। তুমি দোষ স্বীকার করলে সব ফিরে পাবে, তোমার সুখের আর সীমা থাকবে না। তোমার কথা কইবার শক্তি ফিরে পাবে···তোমার ছেলে-মেয়েকে ফিরে পাবে···এখন বলো, তোমার দোষ স্বীকার করবে ?

সুখী। না, আমি সে ঝর্ণার জলে হাত দিইনি।

বনদেবী। বেশ···দাও তোমার ছেলেকে (দেবী সুখীর কাছে এগিয়ে গিয়ে তার কোল থেকে ছেলেকে তুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো···ভোর হতে পাখী ডেকে উঠলো···ঘরে ঝি প্রবেশ করলো···সুখীকে বিছানার উপর বসে থাকতে দেখে)

দাসী। ও মা! এ কি গো···তোমার ছেলে কই···এটাকেও খেয়ে ফেললে! যাই রাজপুত্তুরকে খবর দি। [প্রস্থান।

(সুখী বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল···প্রাসাদময় খুব গোলমাল—রাজা ও তার সঙ্গে দু'টি স্ত্রীলোক সুখীর ঘরে এসে প্রবেশ করে।

রাজা। (সুখীর কাছে গিয়া) ছেলে কোথা ?

সুখী। (কাঁদিতে লাগিল)

১ম স্ত্রী। ন্যাকা! চুপ করে আছেন···মা হয়ে নিজের ছেলেকে খায় এমন তো কখনো দেখিনি!

২য় স্ত্রী। দেখছো না, পাছে কেউ বুঝতে পারে সে জন্যে হাড়গুলোকে পর্য্যন্ত কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়েছে।

রাজা। তোমায় কি শাস্তি দেবো তাই ভাবছি।

১ম স্ত্রী। কি শাস্তি আবার দেবে—উপরে নীচে কাঁটা দিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেল।

২য়। তার চেয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারো।

রাজা। তাই হক···কাল সকাল বেলা সূর্য্যি ওঠবার আগে তোমায় জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়ে মারা হবে···কি করব! তোমায় বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই···আবার একটা ছেলেকে তুমি খেয়ে ফেলেছ শুনলে প্রজারা ভীষণ ব্যাপার বাধিয়ে তুলবে। কাল তোমায় মরতে হবে—ভোর হবার আগে।

[সকলের প্রস্থান।

শেষ দৃশ্য

(রাজার কক্ষ—রাজা একাকী—ঘরের পিছনে একটি জানলা খোলা···দূরে কোলাহল)

রাজা। কিছু বুঝতে পারলাম না, প্রজাদের সন্তুষ্ট করবার জন্তে রাণীকে এই ভীষণ শাস্তি দিতে হলো—কিন্তু আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না রাণী রাক্ষসী! (চিন্তিত ভাবে) না না না, এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না—মা কখনও নিজের ছেলেকে খেয়ে ফেলতে পারে? (বাহিরে ভীষণ কোলাহল···"পুড়িয়ে মারো" "পুড়িয়ে মারো" বলে চিৎকার) রাণীকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে··· ···তাই তো কোন উপায় কি নেই রাণীকে বাঁচাবার (চিন্তিত ভাবে) না না, আর কোন উপায় নেই।

(একটি দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ!

রাজা। কি সংবাদ!

দূত। মহারাজ, প্রজারা আপনার জয়গান করছে।

রাজা। আমার জয়গান করছে! রাণী কি করছেন?

দূত। তিনি কেবল কাঁদছেন···আর আকাশের দিকে চেয়ে আছেন।

রাজা। আচ্ছা, তুমি যাও।

[দূতের প্রস্থান।

(দূরে বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল···বাহিরে চিৎকার···"দাও আগুন"···"আগুন দাও") আগুন দিচ্ছে ওরা রাণীকে পুড়িয়ে মারবে। আগুনের আলো রাজার ঘরে এলো—বাহিরে কোলাহল—"দাও এই রাক্ষসীকে আগুনের ভেতর ফেলে"···"ফেলে দাও") হ্যাঁ···সত্যি তাহ'লে পুড়িয়ে মারবে (হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠিল—মেঘ ডাকিয়া উঠিল—ভীষণ বৃষ্টি)।

(একটি দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! মহারাজ!

রাজা। রাণী পুড়ে গেল?

দূত। কি অদ্ভুত! আশ্চর্য্য কাণ্ড···আকাশ কুল করে গর্জ্জে উঠলো—ঘন কালো মেঘের দল···আর সেই মেঘের বুক চিরে নেমে এলো—আলোর রথে চড়ে স্বর্গের দেবী আপনার দু'টি ছেলে আর একটি মেয়েকে নিয়ে—কি সুন্দর ছেলে!

রাজা। সে কি?

দূত। হ্যাঁ, মহারাজ···রাণীকে যেই চিতার উপর জোর করে তুলে দেওয়া হল। রাণী জোড় হাত করে আকাশের দিকে চেয়ে বললো···"আমি দোষ স্বীকার করবো"···সঙ্গে সঙ্গে মুষল-ধারে বৃষ্টি—কার সাধ্য আগুন জ্বালে।

রাজা। কোথা তারা?

দূত। আসছেন···প্রজারা আনন্দে নাচতে নাচতে তাদের সঙ্গে নিয়ে আসছে।

রাজা। চলো চলো, আমিও যাই···তাদের নিয়ে আসি।

চিন্তা

শ্রীঅনসূয়া সান্যাল

রতন পড়েছে আজ মহা চিন্তায়—
ভূতগুলো সন্ধ্যায় কোন্ গান গায়?
সহরের ভূতগুলো কেন গান গায় না?—
মাঠেদে'য় বসে সে যে ভেবে কূল পায় না।
এক সুরে ঝিঁ-ঝিঁ করে কি যে বলে উহারা!
ওরাও কি পড়ে বসে কোনখানে সাহারা?
ভূতেদের মাসি-পিসি কতখানি লম্বায়?—
শীতকালে ওরা সব কোন্ জামা গায় দেয়?
কালোপানা গেছো-ভূত বাস তার কোন গাছ?
আঁকা-বাঁকা জল-ভূত ভালবাসে কোন মাছ?
ভূতেদের পণ্ডিত চোখে দিয়ে চশমা,
কুড়মুড় করে খালি চিবোয় কি কদমা?
কদমা ও আরশোলা এক সাথে মাখি রে—
কচমচ খায় না কি এক গাল হাসি রে?
কত শত প্রশ্নই ওঠে মোর মাথাতে,
উত্তর পাই বল কাহারই বা কাছেতে?
ও-পাড়ার জটে-বুড়ী নাম তার ডাইনী,
সেই না কি জানে সব ভূতেদের কাহিনী;
পেত্নীর সাথে সেই ডাইনীর ভারী ভাব,
ছোট ছেলে মেরে না কি পেত্নীরে দেয় ভাগ।
তার কাছে যেতে হবে সবায়েরে লুকিয়ে—
পাড়লে মায়ের চোখে উঠিবে রে খেঁকিয়ে।
মায়েদের ভারী মজা পড়তে তো হয় না,
আটটা বাজায় সাথে ঘুম তাই পায় না।
এত যার চিন্তা, তার পড়া হয় কি?
পড়া-শুনো সে তো সোজা কতগুলো ফুটকি!
মাষ্টারগুলো সব সেরা পাজী দুনিয়ায়!
এই সব ভেবে ভেবে মাথা তার ধরে যায়।
টেবিলেতে মাথা রাখি ঘুমোয় সে শেষটায়,
ভোর বেলা উঠে দেখে শুয়ে আছে বিছনায়।

দামোদরগুপ্ত প্রণীত

কুট্টনী মত

অনুবাদক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

বয়স্য কর্তৃক এইরূপে প্রদর্শিত হইয়া সুন্দর সেন যখন সানন্দে দেখিতেছিলেন সেই সময় শুনিলেন, কোন ব্যক্তি তাঁহাদেরই প্রসঙ্গ মত এই গানটি গাহিতেছে—

"অর্বুদের পৃষ্ঠখানি অমর নিবাস জিনি
যাঁর আঁখি না জুড়াল হেরি,
ভ্রমিয়া বিবিধ দেশ সহিয়া অশেষ ক্লেশ
বিফলে সে ফিরিয়াছে ঘুরি।"

ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"এই মহাত্মা ঠিকই বলিয়াছেন; চল বয়স্য, পর্বতের উপর উঠিয়া উহার রমণীয় শিখর দেশ দেখিব।" [২৫৪-৫৬]

অনন্তর পর্বতে আরোহণ করিয়া তাঁহারা বহু দেবালয়, বাপী, উদ্যান-ভূমি, সরোবর, স্রোতস্বিনী প্রভৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

(এমন সময়ে) তাঁহারা পুষ্প-সমাকীর্ণ রমণীয় উপবন-ভূমিতে এক ললনাকে সখীসহ ক্রীড়াভরে বিচরণ করিতে দেখিলেন। সে যেন মেঘ-বিচ্যুতা ক্ষণপ্রভা, চন্দ্র-হীনা জ্যোৎস্না, মন্মথ-রহিতা রতি, হরিবক্ষ-চ্যুতা লক্ষ্মী; বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সকল জীবের সার, রমণীদের দৃষ্টান্ত, মনোভবের বিজয়াস্ত্র; পুষ্পসমৃদ্ধ বসন্ত ঋতুটি, শৃঙ্গার রসে সন্তরণরতা কলহংসীটি, লীলা-পল্লব-সমাচ্ছন্না বল্লীটি, তপস্বিগণের সমাধি-বর্ম-ভেদিকা ভল্লীটি। [২৫৭-৬১]

দেখিতে দেখিতে মদন-বাণে বিদ্ধ হইয়া তিনি (সুন্দর সেন) বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মনে মনে বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—

কে এই রমণী। যাহাকে সৃজন করিতে বিধাতা অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়াছেন! যাহার ফলে বিরুদ্ধ ভাব সকলের একত্র সমন্বয় ঘটিয়াছে, যেমন—নয়ন-তারকার উজ্জ্বল দীপ্তিতে রমণীয় নির্দোষ তাহার ললিত দেহ, অনির্বচনীয় তাহার বদন-কমল-(শোভা), বীণা-নিন্দিত তাহার কণ্ঠঝংকার, প্রকটিত(১) তাহার শরীরবিন্যাস, অতিশোভন তাহার অবয়বসংশ্লেষ, পীনোন্নত তাহার পয়োধর যুগল, শরদিন্দু জ্যোৎস্নার ন্যায় তাহার দেহকান্তি, মনোরম তাহার সুন্দর গতি ও স্থিতিভঙ্গী, তাহার চরণ যুগলের আকৃতি দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়, অতি বিপুল তাহার জঘনদেশ এবং বিধ্বস্তদেহ (মদন) তাহার সমস্ত শোভার বিধান করিয়াছেন।* [২৬২-২৬৬]

অনন্তর সেই মৃগলোচনাও তাঁহার প্রতি সহসা দৃষ্টিপাত করায় সে-ও অনুরাগের আবির্ভাব হেতু কুসুমেষুর বশবর্তিনী হইয়া পড়িল। অপর সকল কার্য্য বিস্মৃত হইয়া সে তরুমূলে উপবেশন করিল এবং তৎক্ষণাৎ সাত্ত্বিক ভাবের (২) উদয় হওয়ায় তাহার গাত্রলতা অংকুরিত (৩) হইয়া উঠিল। (বসন্তকালোচিত) উপবনসমৃদ্ধি সেই সময়ে যেন কামদেবকে স্মরণ করিয়া (৪) তাহাকে বেদনা দিতে আরম্ভ করিল—সকলেই প্রভুর কার্য্যের অনুসরণ করিয়া থাকে। অন্তর্জ্বলিত কামাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তাহার গাত্র-শিরা-সন্ধি সকল হইতে স্বেদজল নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই তন্বী মদনজালে পতিত হইয়া যন

---

(১). পরিস্ফুট অর্থাৎ যেন 'পাথরে কোঁদা' (beautiful in high-relief)।

* ২৬৪-২৬৬ পর্যন্ত শ্লোক তিনটিতে কবি পদশ্লেষ সাহায্যে 'বিরোধাভাস অলংকার' দ্বারা নায়কের নায়িকা-দর্শনজনিত বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। অনুবাদে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করা সম্ভব নহে। আমরা শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেছি—

"ললিতবপুর্নির্দোষা স্ফুরদুজ্জ্বলতারকাভিরামা চ।
নির্বাচ্যা বদনকমলা জিতবীণাক্বণিতবাণী চ।
প্রকটিত বিগ্রহসংস্থিতিরতিশোভাঘটিত সন্ধিবন্ধা চ।
উন্নতপয়োধরাঢ্যা শরদিন্দুকরাবদাতা চ।
অভিমত সুগতাবস্থিতিরভিনন্দিতচরণযুগলরচনা চ।
অতিবিপুলজঘনদেশা বিধ্বস্তশরীরবিহিতশোভা চ।

[illegible] 'রাত্রি' এবং 'দোষ' অর্থে [illegible]

বিপরীত' সুতরাং 'নির্দোষা' অর্থে 'বাহুহীনা' পক্ষে 'রাত্রিহীনা' পক্ষে 'দোষহীনা' অতএব 'নির্দোষা', অর্থাৎ বাহুহীনা হইলে 'ললিতবপু' কিরূপে বলা যায়, আবার 'রাত্রিহীনা' হইলে 'স্ফুরদুজ্জ্বল-তারকাভিরামা' কিরূপে হওয়া সম্ভব?

'নির্বাচ্য' অর্থে 'বাচ্যহীনা' পক্ষে 'অনির্বচনীয়া' সুতরাং বদন-কমল নির্বাচ্য হইলে তাহা 'জিতবীণাক্বণিতবাণী' কিরূপ হয়?

'বিগ্রহ' অর্থে 'যুদ্ধ' পক্ষে 'শরীর' এবং 'সন্ধি' অর্থে 'বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মিলন' পক্ষে দেহের অবয়বের সংযোগ স্থল (joints) সুতরাং 'বিগ্রহসংস্থিতি' (অর্থাৎ যুদ্ধের অবস্থা) স্পষ্ট ভাবে বর্তমান থাকিলে 'সন্ধিবন্ধন' ঘটিত হইবে কিরূপে?

'পয়োধর' অর্থে 'কুচ' পক্ষে 'মেঘ' সুতরাং 'পয়োধরাঢ্যা' অর্থাৎ 'মেঘাবৃতা' হইলে 'শরদিন্দুকরাবদাতা' কিরূপে সম্ভব?

'সুগত' অর্থে 'বুদ্ধ' পক্ষে 'সুন্দর গতি' এবং 'অবস্থিতি' অর্থে অবস্থানের ভাব (presence) পক্ষে 'স্থিতি-ভঙ্গী'; 'চরণযুগলরচনা' অর্থে বেদশাখাদ্বয়ের (ঋক্ ও সাম বা ঋক্ ও যজু বা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ) রচনা, পক্ষে পদদ্বয়ের আকৃতি (shape) সুতরাং সুগতের অভিমত হইলে তাহা আবার বেদের চরণ যুগল রচনা দ্বারা অভিনন্দিত হইবে কিরূপে?

'বিধ্বস্ত শরীর' অর্থে 'দগ্ধদেহমদন', পক্ষে 'জীর্ণদেহ' সুতরাং বিপুলজঘনার শরীর-শোভাকে 'বিধ্বস্ত শরীর' বলা যায় কিরূপে?

(২) সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ যথা—"স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চ-স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা মতাঃ।"

(৩) রোমাঞ্চিত এ স্থলে দেহকে লতার সহিত তুলনা করায় অংকুরিত শব্দের প্রয়োগ শোভন হইয়াছে।

(৪) উপবন-সমৃদ্ধি মদনের সহায়, সুতরাং তাহা যেন মদনের কার্য স্মরণ করিয়াই নায়িকাকে পীড়িত করিতে লাগিল। অনুচরের স্বভাবই প্রভুর অনুকরণ করা।

ঘন গাত্র বিবর্তন করিতে লাগিল এবং মংস্তবধূর ন্যায় নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিতে লাগিল। পঞ্চবাণের প্রকোপে তাহার দেহ স্তম্ভিত, কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, দেহ হইতে স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল এবং তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। শঠ ব্যক্তি সাধু ব্যক্তিকে নিজ কবলে পাইলে এইরূপই করিয়া থাকে। তাহার উচ্চ কুচযুগল উচ্ছ্বাস ভরে আরও উদ্বেলিত করিয়া, অভিলাষ দ্বারা বিলাস-সমূহের অধিকতর চারুতা সম্পাদন করিয়া, প্রেম দ্বারা নয়নদ্বয়ের স্নিগ্ধত্বকে আরও মনোহর করিয়া, অনুরাগে মদনের রক্তিমাভাকে আরও রক্তিম করিয়া, বাক্যে ও গমনে সাধ্বসহেতু(৫) স্খলন দ্বারা মদন তাহার চারুতাকে চরম অবস্থায় লইয়া গিয়াছিল। প্রিয় নিকটে অবস্থিতি করা সত্ত্বেও কামশরাসন দ্বারা পীড়িত হইয়াও সে প্রণয়-ভঙ্গ ভয়ে নিজ মনোভিলাষ নিবেদন করিতে পারিল না।(৬) [২৬৭-২৭৫]

অনন্তর তাহার দৃষ্টি প্রিয়তমের প্রতি আকৃষ্ট দেখিয়া সখী তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া মদনতাপে দহ্যমানা তাহাকে (একান্তে) আকর্ষণ করিয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—

"অয়ি, হারলতে, হৃদয়স্থকৃতিতে দগ্ধদেহ মদন কর্তৃক তোমার যে দেহ-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে তাহা সম্বরণ কর। পণ্য-নারী-গণের পক্ষে আভিমানিকী প্রীতি(৭) হিতকারী নহে। ধনহীন ব্যক্তিকে অবজ্ঞা কর, ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিকে গৌরবদান কর, হে মুগ্ধে, আমাদের রূপস্থিতি ধনসংগ্রহের হেতু। কেবল মাত্র রূপ ও তারুণ্যযুক্ত পুরুষের প্রতি মনোনিবেশ করিলে বিবিধ লাভের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করা হয়। হে সুমধ্যে, ব্যবসায়-চতুরা বারাঙ্গনা-কুল ইহাতে উপহাস করিবে। যৌবন যাহাদের শ্লাঘনীয়, বিধি যাহাদের প্রতি প্রসন্ন, যাহাদের সৌভাগ্য সুফল প্রদান করিয়াছে, যাহাদের জীবন কেবল সুখের জন্য তাহারা অবশ্য আপনা হইতেই মদন-বাণবিদ্ধ হইয়া তোমাকে কামনা করিবে। হে কৃশোদরি, ভ্রমরগণ চূতমঞ্জরী কর্তৃক অন্বেষিত হয় না (বরং তাহার বিপরীতই ঘটিয়া থাকে।)" [২৭৬-২৮১]

সখী এইরূপ বলিলে কামবাণবিদ্ধাঙ্গী হারলতা কষ্টের সহিত অব্যক্ত ও স্খলিত বাক্যে তাহাকে বলিল—

"সখি, তৎক্ষণ (আমার) বেদনার প্রতিকার যাহাতে হয় সেই জন্য নিপুণতর যত্ন কর, বিপদ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তখন উপদেশের সময় নহে। অনায়ত্ত (৮) প্রিয়, মৃদু পবন, চৈত্র মাস ও উদ্যান এই সকল সামগ্রী (বিরহিণীর) আয়ুক্ষয়ের কারণ।" [২৮২-২৮৪]

শশীপ্রভা সখীকে মদনাশীবিষের বিষবেগে আকুলিত দেহ দেখিয়া পুরন্দরের পুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—

"যদিও গণিকা বলিয়া লজ্জায় আপনাকে বলিতে আমার কথা বাধিয়া যাইতেছে তথাপি আমাকে বলিতে হইতেছে ; সখীর বিপদে ভালমন্দ বিচার করিবার সময় নহে : এই বিরাট সংসারে যে সকল উদ্দীপ্ত-বুদ্ধি সার্থকজন্মা ব্যক্তি বিপন্নকে পরিত্রাণ করিতে ব্যাকুল হৃদয় হন তাঁহাদের সংখ্যা বিরল। যে মুহূর্তে আপনি আমার সখীর নয়নপথে পতিত হইয়াছেন তখন হইতেই সে পোড়া মদনের করায়ত্ত হইয়াছে। মনোভবের কোদণ্ড-নিক্ষিপ্ত বাণ সকল তাহার অন্তঃকরণ ভেদ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যেন রোমাঞ্চরূপে তাহার দেহ ছাইয়া ফেলিয়াছে (৯) শৃঙ্গার-রসানুকূল মৃদু পবন নিত্য মুহুর্মুহু পীড়ন করিতেছে। সেই দীনা কি-ই বা বলিবে, কোথায় বা আশ্বাস পাইবে আর কাহারই বা শরণ লইবে ? (স্বরভঙ্গ হেতু) তাহার বাক্য গদ্‌গদ্ হইয়াছে দেখিয়া (বৈরনির্যাতনে) আনন্দিত পিকগণ অবসর বুঝিয়া অচিরে মৌনব্রত ত্যাগ করতঃ অনর্গল কুহুধ্বনি করিয়া সখীকে ব্যথা দিতেছে। (১০) বেপথু হেতু সেই তরুণীর গমন স্খলিত হওয়ায় (দীর্ঘ বিশ্রামে) অপগতশ্রম হংস সকল বহু কাল পরে অবসর পাইয়া সানন্দে যাতায়াত করিতেছে (১১)। তাহার উষ্ণ নিশ্বাসে দগ্ধ হইয়াও মধুকরগণ তাহার অলকস্থিত কুসুম-সমূহ ত্যাগ করে না ; কষ্ট হইলেও বিষয় ত্যাগ করা কঠিন। সে দেহভার বহনে অক্ষম, তাহার কর্ণস্থিত কুবলয় পুষ্প সমীপে গুঞ্জনরত মধুকর তাহার কাণে কাণে যেন বলিতেছে, 'আমাকে এখন তাড়াইয়া দিও না। (মরদশায়) (১২) তাহার ভুজলতা বিশীর্ণ হইয়া যাওয়ায় তাহা হইতে বিগলিত সুবর্ণকংকণ ভূতলে পতিত হইয়া তাহার মুক্তহস্ততার (১৩) সূচনা করিতেছে। তাহার নিতম্ব হইতে একই সময়ে রশনাবন্ধন মঞ্জুর

(৫) ভয়হেতু। নবযৌবনের উদয়ে রমণীর মনে যে প্রেম-ঘটিত ব্যাপারে ভয়ের সঞ্চার হয় তাহাকে 'সাধ্বস' বলে।

(৬) পাছে প্রিয় তাহাকে নির্লজ্জা মনে করিয়া অনাদর করে এই আশংকায় সে নিজের মনোভিলাষ ব্যক্ত করিতে পারিল না। "সর্বা এব হি কন্যাঃ পুরুষেণ প্রযুজ্যমানং বচনং বিষহন্তে ন তু লঘুমিশ্রা-মপি বাচং বদন্তীতি ঘোটকমুখ" [কা, সু ৩।২।১৭]। অর্থাৎ সমস্ত কন্যাই প্রযুজ্যমান পুরুষের বাক্য (সানন্দে) শ্রবণ করে কিন্তু স্বয়ং (লজ্জাবশতঃ) একটি কথাও বলে না।

(৭) প্রীতি চতুর্বিধ, যথা—"অভ্যাসাদভিমানাচ্চ তথা সংপ্রত্যয়া-দপি। বিষয়েভ্যশ্চ তন্ত্রজ্ঞাঃ প্রীতিমাহুশ্চতুর্বিধাম্।" [কা, সু, ২।১।৭১] তাহার মধ্যে অভিমানিকী প্রীতি হইতেছে—"অনভ্যস্তে-ষপি পুরাকর্মস্ববিষয়াত্মিকা। সংকল্পাজ্জায়তে প্রীতির্যা সা স্যাদভি-মানিকী।" [কা, সূ ২।১।৭৩] রূপগোস্বামী আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন—"সন্ত রম্যাণি ভূয়াংসি প্রার্থ্যং স্যাদিদমেব মে। ইতি যো নির্ণয়ো ধীরৈরভিমানঃ স উচ্যতে।" অর্থাৎ ভূরি ভূরি রমণীয় বস্তু আছে, থাকুক, কিন্তু আমার এইটিই প্রার্থনীয় এই নিশ্চয়করণকে পণ্ডিতগণ অভিমান বলেন। এ ক্ষেত্রে সখী বলিতেছে—'অনুরাগ-

(৮) যে নায়কের সঙ্গ কামনা করা হয় তাহাকে যদি লাভ করা না যায়।

(৯) মদনের বাণ তাহার দেহ বিদীর্ণ করিয়া অপর দিকে বাহির হইয়া স্তব্ধগতি হইয়াছে, তাহাই যেন রোমাঞ্চরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

(১০) ইহাতে নায়িকার কোকিল-নিন্দিত বাণী সূচিত হইতেছে।

(১১) ইহাতে তাহার মরাল-নিন্দিত গতি সূচিত হইতেছে।

(১২) নয়নপ্রীতি, চিন্তাসঙ্গ, সংকল্প, নিদ্রাচ্ছেদ, তনুতা, বিষয়-নিবৃত্তি, লজ্জানাশ, উন্মাদ, মূর্ছা এবং মৃত্যু ইহাই কায়িক স্মরদশা। মানসিক স্মরদশা, যথা—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্তন, উদ্বেগ, [illegible]প, উন্মত্ততা, ব্যাধি, জড়তা ও মৃত্যু।

প্রসন বড়ই বিচিত্র! না হইবেই বা কেন! গুরু-কলত্রের (১৪) সতত নিষেবন (১৫) পতনের কারণই হইয়া থাকে। পোড়া হার (প্রিয়ের স্থায়) বক্ষের উপর লালিত হইয়াও মনোভবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, সেই কাল হইতে সখীকে কষ্ট দিতেছে। অন্তর্ভিন্ন (১৬) ব্যক্তি হইতে কোথায় বা মঙ্গল হইয়া থাকে? তাহার গৌর-দেহনিঃসৃত শ্বেত স্বেদধারা-কজ্জল-মলিন অশ্রুধারার সহিত মিলিত হইয়া কুচতটে পতিত হইয়া প্রয়াগস্থ গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের বারিধারাকে অনুকরণ করিতেছে। আপনার আলিঙ্গনসুখলালসিতা বালা পিকতান, মলয়-পবন, পুষ্পরাশি, মদন ও ভৃঙ্গ এই পঞ্চ অগ্নিদ্বারা পরিবেষ্টিত পঞ্চতপ(১৭) আচরণ করিতেছে। যাবৎ সেই দীনা স্মরদশার দশমী(১৮) অবস্থায় পতিতা না হয় হে সুভগ, তাবৎ তাহাকে রক্ষা করুন। শরণাগতগণকে রক্ষা করাই মহৎ ব্যক্তিগণের ব্রত।" [২৮৫-৩০০]

অনন্তর তাহার বাক্যবিন্যাসে সুন্দের অনুরাগ সম্যকরূপে উদিত হইয়াছে দেখিয়া বেশ্যানুসরণজনিত নিন্দার ভয়ে গুণপালিত তাঁহাকে বলিলেন—

"যদ্যপি তরুণ বয়সে জীবগণের কামবিকার দুর্বার হইয়া উঠে তথাপি বিবেকশালী ব্যক্তিগণ কর্তৃক বারাঙ্গনাগণের প্রেমের পরিণাম চিন্তা করা উচিত। বারস্ত্রীগণের বিভ্রম, অনুরাগ, স্নেহ, অভিলাষ ও কামবাধা (১৯) কামুকদিগের সম্পদের বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদের সুহৃদ্গণের স্থায়, বৃদ্ধিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (২০)। যাহাদিগের নিকট ক্ষণদৃষ্ট ব্যক্তি প্রণয়ভাজন হয় আবার বহু কালের প্রণয়ীকে যাহারা 'যেন পূর্বে কখনও দেখে নাই' এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া উপেক্ষা করে সেই সকল নারীর সহিত সৎকুলজাত ব্যক্তি কিরূপে সঙ্গ করে? অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিকে গণিকাগণ সতত প্রদ্যুম্ন বা দ্বিতীয় কামদেব বলিয়া গণনা করে; যে ব্যক্তি অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহাকে তাহারা কুৎসিত বলিয়া মনে করে; বহু সম্পত্তিশালী ব্যক্তিমাত্রই তাহাদিগের নিকট স্নেহশীল এবং (অর্থহীন) স্নেহশীল ব্যক্তি তাহাদিগের নিকট রুক্ষ-প্রকৃতি বলিয়া বিবেচিত হয়।"

"তাহারা অপরের কৌতূহল বৃদ্ধির জন্যই জঘন আবরণ করে, লজ্জায় (২১) নহে, তাহাদের উজ্জ্বল বস্ত্রালংকারাদিতে বেশবিন্যাস কামিজনকে আকৃষ্ট করিবার জন্য, লোকমর্যাদার জন্য নহে। মাংস ও তৃপ্তিকর খাদ্য তাহারা অত্যন্ত-পুরুষ-সংসর্গজনিত দেহক্ষয়ের পুষ্টি হেতু আহার করিয়া থাকে, স্পৃহাবশতঃ নহে (২২)। চিত্রাংকনাদি ব্যসন তাহাদের বৈদগ্ধ্যখ্যাতির জন্য, চিত্তবিনোদনের জন্য নহে। 'রাগ'(২৩) তাহাদের অধরে, অন্তরে নহে; সরলতা ভুজলতায়, প্রকৃতিতে নহে; সমুন্নতি কেবল তাহাদের কুচভারে, সজ্জন-অভিনন্দনোচিত আচরণে নহে। গৌরব(২৪) তাহাদের জঘনস্থলে, আকৃষ্ট-ধন সৎকুলজাত ব্যক্তির প্রতি নহে। অলসতা তাহাদের গতিতে, মানব-বঞ্চনাভিযোগে নহে (২৫)।"

"প্রসাধনের সময় তাহারা বর্ণবিশেষের বিচার করে, অন্যথা রতিপ্রসঙ্গে তাহাদের বর্ণবিচার নাই (২৬); ওষ্ঠে তাহারা মদন (২৭) আসঙ্গ (২৮) করিয়া থাকে, অন্যথা পুরুষবিশেষের সহিত সম্ভোগে তাহাদের মদনোদয় হয় না। বালকের প্রতিও তাহারা অনুরাগবতী, বৃদ্ধকেও কামাবেগ প্রদর্শন করে, ক্লীবের প্রতিও কান্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকে এবং দীর্ঘকাল রোগগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতিও আকাংক্ষিত হয়। (রতিশ্রমজনিত) স্বেদাম্বুকণা দ্বারা তাহাদের দেহ সিক্ত হইলেও মনের আবাস ভূমি যে হৃদয় তাহা কিছু মাত্র আর্দ্র নহে (পুরুষপ্রতারণার জন্য) বাহিরে বেপথুভাব দেখাইলেও অন্তরে তাহারা হীরকখণ্ডের ন্যায় কঠিন।"

"তাহারা জঘনচপলা" ও অনার্যা (২৯), পরভৃতিকা

---

(১৪) গুরুকলত্র-গুরুপত্নী, পক্ষে নিবিড় নিতম্ব।

(১৫) নিষেবন—কামভাবে উপসেবন, পক্ষে সতত সংশ্লিষ্ট হওন।

(১৬) 'গৃহে বা মনে কলহাদি দ্বারা বিচ্ছিন্ন', পক্ষে 'সচ্ছিদ্র'। মুক্তা প্রভৃতি বিদ্ধ না হইলে হার গাঁথা যায় না সেই জন্য হার বা হারের মুক্তা সকলকে 'অন্তর্ভিন্ন' বলা হইয়াছে।

(১৭) পঞ্চতপ বা পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপস্যা-বিশেষ, যথা—"বহ্নিভি-র্জ্বলদ্ভিঃ শুচৈশ্চতুর্দিক্ষু চতুষ্কৃতম্। বহ্নিসংস্থাপনং গ্রীষ্মে তীব্রাংশুস্তত্র পঞ্চমঃ।...তন্মধ্যস্থা পূর্ববিম্বং বীক্ষন্তী বহুলাংশুকা।" ইতি—কালিকাপুরাণে।

(১৮) স্মরদশার শেষ অবস্থা অর্থাৎ 'মৃত্যু'।

(১৯) "প্রেমাভিলাষো রাগশ্চ স্নেহপ্রেমরতিস্তথা। শৃঙ্গারশ্চেতি সংভোগঃ সপ্তাবস্থঃ প্রকীর্তিতঃ।"

(২০) অর্থাৎ যতক্ষণ কামুকদিগের সম্পদ থাকে ততক্ষণ তাহাদের বিভ্রমাদির বিকাশ এবং সম্পদের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও হ্রাস হইতে থাকে। সেইরূপ "সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়। অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।"

(২১) অর্থাৎ জঘনদেশ অনাবৃত থাকিলে তাহারা যে তা আবৃত করে তাহা লজ্জাহেতু নহে, কামুকগণের কৌতূহলোদ্দীপনের জন্য।

(২২) সুখাদ্যে তাহাদের অনুরাগ রসনা-তৃপ্তির জন্য নহে রতিক্ষয়জনিত বলাধানের জন্য।

(২৩) রাগ—'রক্তিমাভা' পক্ষে 'অনুরাগ'।

(২৪) গৌরব—'গুরুত্ব' পক্ষে 'সম্মানপ্রদর্শন'।

(২৫) অলসতা—'মন্থরগামিত্ব' পক্ষে 'দীর্ঘসূত্রতা'। অর্থাৎ তাহারা শ্রোণিকুচভারে অলসগমনা বটে কিন্তু লোকবঞ্চনায় তাহাদের দীর্ঘসূত্রতা নাই।

(২৬) অর্থাৎ প্রসাধনকালে তাহারা অঙ্গরাগে এবং বেশাদিতে বর্ণবিচার করে কিন্তু রতিপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বর্ণবিচার করে না। (২৭) মদন—'কাম,' পক্ষে 'মোম'। (২৮) আসঙ্গ—নিবেশন, পক্ষে 'অনুরাগ'। এই শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ সম্ভব, যথা—(১) তাহারা ওষ্ঠে শীত হেতু বা অধর দংশনজনিত ক্ষতের ব্যথা প্রশমনের জন্য 'মদন' অর্থাৎ 'মোম' ব্যবহার করে; অথবা (২) তাহাদের কামপ্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রেম তাহা কেবল মুখেই, অন্তরে নহে। আমাদের মনে হয়, কবি প্রথম অর্থই বুঝাইতে চাহিয়াছেন; কারণ পরে দ্বিতীয় অর্থের অনুরূপ উক্তি আছে, সুতরাং একই কথা দুই বার বলিবার কোন অর্থ হয় না। (২৯) জঘন-চপলা—আর্যা ছন্দের অন্তর্গত একটি বিশেষ ছন্দ সুতরাং 'জঘনচপলা' ও 'অনার্যা' (অর্থাৎ আর্যা ছন্দ নহে) বলিলে বিরুদ্ধ উক্তি হয়। কিন্তু অপর পক্ষে 'জঘনচপলা' অর্থে যে বহু ব্যক্তিকে জঘন দান করিয়া থা

কৃত্রিমনয়নরাগসম্পন্না (৩০), (কামুককে) সমস্ত দেহদানে দক্ষ অথচ হৃদয় দান করে না। তাহারা (সৎ-)কুল সমুৎপন্না নহে (সুতরাং ন-কুলা (৩১) এবং ভুজঙ্গ-দংশনের (৩২) বেদনায় অভিজ্ঞা ; কন্দর্পের দীপিকা হইয়াও তাহাদের হৃদয়ে স্নেহের(৩৩) সংপর্ক নাই। বৃষ-যোগ(৩৪) বর্জন করিয়াও রতিকালে নরবিশেষে(৩৫) কোন অপেক্ষা রাখে না। কৃষ্ণে(৩৬) নিতান্ত অনুরক্তা অথচ সতত হিরণ্যকশিপুপ্রিয়া(৩৭)। মেরুপর্বতের নিতম্বের ন্যায় তাহাদের নিতম্ব সহস্র কিম্পুরুষ দ্বারা(৩৮) সেবিত ; রাজনীতিতে যেরূপ অনর্থ-সংযোগ(৩৯) পরিহার করা হইয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপ অনর্থের সংযোগ সর্বস্থ পরিহার করে। পদ্মসমূহের ন্যায় তাহারা বহু-মিত্র-কর-বিদারণ দ্বারা অভ্যুদয় (৪০) লাভ করে, ডাকিনীদিগের ন্যায় তাহারা রক্ত-আকর্ষণ-কৌশল(৪১) জানে। গণিকাগণ প্রতি পুরুষের(৪২) সন্নিহিতা হইয়া কৃত্যপরা(৪৩) বিবিধবিকারযুক্তা(৪৪) ও বহু অর্থ-প্রাহিণী(৪৫) হইয়া প্রকৃতির(৪৬) ন্যায় দুর্গ্রহা(৪৭)।* ক্ষুদ্রাগণ (অর্থাৎ মধুমক্ষিকাগণ) যেরূপ কুসুমস্তবক হইতে নিঃশেষে মধু পান করিবার জন্য তাহাকে বহুক্ষণ চুম্বন করে সেইরূপ এই ক্ষুদ্রাগণ (অর্থাৎ গণিকাগণ) নরবিশেষকে (আকর্ষণ করিয়া) যাবৎ সে নিঃস্ব না হয় তাবৎ তাহাকে চুম্বনাদি করিয়া থাকে। (কঠিন) চুম্বক প্রস্তর যেরূপ অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইলেও লৌহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে সেইরূপ অন্তরে কঠোর-হৃদয়া বেশ্যাগণ বিরয়াসক্ত পুরুষগণকেও নিজের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে। হস্তিনীগণ যেরূপ পুরুষগণ কর্তৃক আক্রান্তা (অর্থাৎ আরূঢ়া) হইয়া সর্বদা শৃঙ্গার-রাগে সজ্জিতা (অর্থাৎ সিন্দুর ভূষণাদিতে অলংকৃতা) ও (চালক কর্তৃক) নিতম্বদেশে অংকুশ দ্বারা আহতা হইয়া থাকে সেইরূপ বারযোষাগণ পুরুষগণ কর্তৃক পরিবৃতা হইয়া সর্বদা কৃত্রিম শৃঙ্গার-রাগের অভিব্যক্তি হেতু রমণীয়তা প্রদর্শন করিয়া (সুরত কালে সমস্তলাদি) তাড়ন (৪৮) উপভোগ করিয়া থাকে। উচিত (অর্থাৎ অভ্যস্ত)

অর্থাৎ ব্যভিচারিণী ; অনার্যা অর্থে হীনপ্রকৃতি বা বিবেকশূন্যা। (৩০) পরভৃতিকা—যে পরের অর্থে জীবিকা নির্বাহ করে, পক্ষে কোকিল। কোকিলের চক্ষু স্বভাবতঃই রক্তিম কিন্তু পরভৃতিকা গণিকার মদ্যাদি হেতু যে নয়নের রক্তিমা তাহা কৃত্রিম ; সুতরাং এখানে বিরোধালংকার হইতেছে। (৩১) নকুলা—কুলহীনা, পক্ষে স্ত্রী-বেজী। (৩২) ভুজঙ্গ—সর্প, পক্ষে বিট। সুতরাং যে নকুল সর্পের ভীতিস্থানীয় সে ভুজঙ্গ-দংশনে অভিজ্ঞ হইবে কিরূপে ?

(৩৩) 'দীপিকা' অর্থে প্রদীপ, পক্ষে 'উদ্দীপনকারিণী' এবং 'স্নেহ' অর্থে 'অনুরাগ', পক্ষে 'তৈল', সুতরাং গণিকাগণ মদনোদ্দীপন করে কিন্তু তাহাদের অন্তরে স্নেহের লেশ নাই, পক্ষে তাহারা কন্দর্পের দীপ অথচ তৈললেশহীন। (৩৪) 'কামশাস্ত্রোক্ত বৃষলক্ষণযুক্ত পুরুষের সংযোগ', পক্ষে বৃষ অর্থাৎ ধর্মের সহিত সংযোগ। সুতরাং অর্থ হইতেছে গণিকা ধর্মহীনা ও রতিকালে শশ, বৃষ বা অশ্ব যে কোন জাতীয় পুরুষের সংযোগে তাহাদিগের আপত্তি নাই। (৩৫)যদি তাহারা নরবিশেষের অপেক্ষা না করে তবে 'উজ্ঝিত-বৃষযোগা' বলা হইতেছে কেন ? ইহাই বিরোধালংকার। কামশাস্ত্রকারগণ লিঙ্গের পরিমাণ-ভেদে ছয় অঙ্গুলি লিঙ্গবিশিষ্ট শশ, নয় অঙ্গুলি বৃষ ও দ্বাদশাঙ্গুলি লিঙ্গবিশিষ্ট অশ্ব এইরূপে পুরুষের জাতিনির্দেশ করিয়াছেন। (৩৬) কৃষ্ণ—'বাসুদেব', পক্ষে 'পাপ'। (৩৭) হিরণ্যকশিপু—'স্বনামখ্যাত দৈত্যরাজ', পক্ষে হিরণ্য অর্থাৎ স্বর্ণ এবং কশিপু অর্থাৎ অন্নবস্ত্র। (৩৮) কিম্পুরুষ—'দেবযোনিবিশেষ', পক্ষে 'কিং' অর্থাৎ 'কুৎসিত' পুরুষ। (৩৯) অনর্থ-সংযোগ—'নাশ বা ভয়োৎপত্তির উপলব্ধি', পক্ষে 'অর্থহীন ব্যক্তির সহিত সমাগম।' (৪০) বহু-মিত্র-কর-বিদারণ—মিত্র অর্থাৎ প্রণয়িগণের বহু নখরক্ষত তাহা দ্বারা অভ্যুদয় অর্থাৎ ঐশ্বর্য লাভ করে, পক্ষে বহু সূর্যকিরণ দ্বারা পত্রোদ্ঘাটনে পদ্মের অভ্যুদয় বা বিকাশ লাভ হয়। (৪১) রক্ত—'রুধির', পক্ষে 'অনুরক্ত ব্যক্তি', আকর্ষণ 'শোষণ' পক্ষে 'আকৃষ্টকরণ।'

(৪২) পুরুষ—(১) ব্যাকরণের প্রথম, মধ্যম ও উত্তম পুরুষ ; (২) যে শরীরে বাস করে অর্থাৎ আত্মা। "যৎকারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্। তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে।" (৩) জীবাত্মা ; (৪) প্রজান্তর্গত প্রতি পুরুষ। (৪৩) কৃত্য—(১) তব্যাদি প্রত্যয় ; (২) সুখ, দুঃখ মোহাত্মক মহদাদি কার্য ; (৩) নিজ নিজ করণীয় কার্য ; (৪) সপ্তরাজ্যাঙ্গের কর্তব্য কার্য (functions)। (৪৪) বিকার (১) শপ্‌ শ্যনাদি প্রত্যয়ের যোগে যে বৃদ্ধি আদি বিকার হইয়া থাকে ; (২) সাংখ্যদর্শনোক্ত ষোড়শ বিকার ; (৩) ক্রোধলোভাদি ; (৪) বিবিধ উপকরণ।

(৪৫) অর্থ—(১) শব্দের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য ; (২) দৃশ্যত্ব ও পরিণামিত্ব বিশিষ্ট পদার্থ ; (৩) ধর্মার্থকাম এই ত্রিবর্গের মধ্যে ঐহিক ধনজাত সৌভাগ্য ; (৪) স্বরাজ্যের রক্ষা ও পররাজ্যের অনুসন্ধানাদিরূপ রাজনীতি অথবা রাজকর। (৪৬) প্রকৃতি—(১) ব্যাকরণের প্রকৃতি অর্থাৎ শব্দ (subject) ও ধাতু (predicate) ; (২) সত্ত্বরজঃতম গুণাত্মক জগতের মূল কারণ ; (৩) জীবাত্মার স্বভাব ; (৪) স্বামী, মন্ত্রী, সহায়, ধন, দেশ, দুর্গ ও সৈন্য এই সপ্তবিধ রাজ্যাঙ্গ। (৪৭) দুর্গ্রহ—(১) দুর্‌ এই উপসর্গকে যাহা গ্রহণ করে, (২) শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা যাহা কষ্টে বুঝিতে পারা যায় ; (৩) কষ্টের সহিত যাহাকে নিয়মিত করা যায় ; (৪) অপরাজেয়।

* এইবার সম্পূর্ণ শ্লোকের চারিটি গূঢ়ার্থ দেখান হইতেছে—(১) ব্যাকরণের প্রকৃতি প্রথমাদি পুরুষ ভেদে, কৃত্যাদি প্রত্যয়যোগে, শপ্‌ শ্যনাদি বিকরণ প্রত্যয়ের প্রয়োগে বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং দুর্‌ এই উপসর্গও গ্রহণ করিয়া থাকে। (২) ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি বা আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া সুখ দুঃখ মোহাত্মক মহদাদি কার্য করে, বিবিধ বিকার প্রাপ্ত হয়, দৃশ্যত্ব ও পরিণামিত্ব বিশিষ্ট বহু পদার্থ গ্রহণ করে, শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত তাহার স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। (৩) জীবাত্মার প্রকৃতি বা স্বভাব (nature) প্রত্যেক পুরুষ বা জীবাত্মাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, নিজ নিজ করণীয় কার্য করে, কাম-ক্রোধ-লোভাদি বিবিধ বিকারে পুষ্ট হয়, নানাবিধ সৌভাগ্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাকে নিয়মিত করা অত্যন্ত কঠিন। (৪) রাজনীতির স্বামী মন্ত্রী সহায় প্রভৃতি প্রকৃতি-প্রকার প্রতি পুরুষের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া স্ব স্ব কর্তব্য কার্য্য করিয়া বিবিধ উপকরণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া স্বরাজ্য রক্ষাদি অর্থ সম্যক্ আয়ত্ত করিয়া অথবা বহু রাজকর দ্বারা শক্তিশালী হইয়া অপরাজেয় হইয়া থাকে।

(৪৮) তাড়ন বা প্রহণন বিবিধ, পুরুষ কর্তৃক প্রযোজ্য ও রমণী কর্তৃক প্রযোজ্য। পুরুষ কর্তৃক প্রযোজ্য তাড়ন চতুর্বিধ—অপহস্তক,

ব্যক্তি কর্তৃক গুণ (অর্থাৎ সূত্র) দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া তুলাযন্ত্র যেরূপ সুবর্ণকণা স্থাপন মাত্রই তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে সেইরূপ বেশ্যাগণও যদ্যপি উচিত গুণশালী ব্যক্তির প্রতি প্রবৃত্তকামা হয় তথাপি সম্মুখে সুবর্ণকণা স্থাপন মাত্রেই তাহারা সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। যেরূপ স্বভাবতঃ কঠিন কাঁটার বহির্ভাগ নানা বর্ণে চিত্রিত অথচ তাহা অন্তঃসারশূন্য এবং যন্ত্র দ্বারা আহত হইলেই ঝনৎকার করে সেইরূপ স্বভাবতঃ কঠিনহৃদয়া বেশ্যাও বাহিরে নানা বেশ ও অলংকারাদিতে সুসজ্জিতা হইলেও অন্তঃসারশূন্যা এবং যন্ত্র প্রয়োগে (অর্থাৎ ছল ব্যাপারে) অনুকূলভাষিণী হইয়া উঠে। যে সকল হতভাগ্য বারবনিতাগণের প্রতি বদ্ধপ্রণয় হয় তাহারা পরিণামে (ভিক্ষার্থ) যুক্তহস্ত প্রসারণপূর্বক বেশ্যাবাটী হইতে নির্গত হয়।" [৩০১-৩২৪]

মন্মথ-ব্যথিত সুন্দর সেনকে বসন্ত যখন এইরূপ উপদেশ দিতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহারা শুনিলেন, কোন ব্যক্তি প্রসঙ্গ অনুসরণ করিয়া নিম্নলিখিত গীতিকা তিনটি গান করিল—

"কামবশীভূতা　　রূপগুণযুতা
তরুণী রমণী কভু
আপনি আসিয়া　　প্রেম নিবেদিয়া
সম্মুখে দাঁড়ায় তবু
যে জন তাহায়　　বিফলে ফিরায়
জানিবে সকলে তারে.
মূর্খের মাঝে　　চূড়ামণি সে যে
নহিলে ইহা কি পারে?"

"জনম কারণ　　জীবন ধারণ
পুরুষ কামনা করে
সারাটি যৌবন　　করি 'নিধুবন'
পরম আনন্দ ভরে
বরারোহা ধনী　　সুন্দরী রমণী
তাহার সহিত সুখে
কাটে বারো মাস　　এই তার আশ
বুকে বুকে মুখে মুখে।"

"কুসুমেষু অগ্নিদাহে　　দগ্ধ হয়ে মরিতেছে,
প্রেমাবেগে যাহার রমণ
যুবতী কামিনী চাহে　　জুড়াইতে কামদাহে,
অতি পুণ্যবান্ সেই জন।"

এই সকল গীত শুনিয়া পুরন্দরের পুত্র সুহৃদকে বলিলেন, "এই সাধু ব্যক্তি আমার অন্তরের কথাই গীতচ্ছলে বলিয়াছেন। অতএব হে গুণপালিত, চল, সেই কামবাণবিকলা হরিণশাবকতরলাক্ষী হারলতাকে আশ্বাস দান করিতে যাই।" [৩২৫—৩৩০]

প্রস্তক, মুষ্টি ও সমতলক তাহার প্রয়োগ স্থান, যথা—স্কন্ধদ্বয়, মস্তক স্তনদ্বয়, পৃষ্ঠ, জঘন ও পার্শ্ব।

যতীন দাস
—মণি পাল নির্মিত মর্মর মূর্তি

আশীর্বাদের দিন পদ্ম-পাপড়ীর মত ধবধবে দু'খানি হাত মাথায় ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন "সর্ব্ব অবস্থায় সুখী হয়ো মা।" দু'টি চক্ষু বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে। স্বামী দোকানের কাজ সেরে রাত্রে ফেরেন, খেতে বসেন, চোখে জল দেখেও কোন দিন প্রশ্ন করেন না, মুখে হাসি দেখলেও তার কারণ খোঁজেন না। গীতার সেই স্থিতপ্রজ্ঞ যেন। হায় রে, কি-এ পাপের অভিশাপ···! এর মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর আমাদের সঙ্গে মিতালী পাতিয়েই আছে, যমে-মানুষে টানাটানি চলে। কী আশা আছে জীবনে, কি সুখ আছে!

যাক্, নিজের দুঃখের কাহিনী লিখে চিঠি আর ভারাক্রান্ত করতে চাই না। আমার দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে, যদি ভাব, তোমার করুণা উদ্রেকের প্রয়াস করছি, তাহ'লে মস্ত ভুল করবে ভাই!

আজ চলি, প্রণাম নাও। ইতি সবযূ।

"আমাকে ভুলিও না—"

(ইংরাজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

শ্রীমতী তৃপ্তি বসু

অনেক—অনেক দিন আগে এক দিন এক বাগানে কতকগুলি ফুল মৃদু-মন্দ বাতাসে দুলে-দুলে গল্প করছিল। এই রকম ভাবে দুলে-দুলে তারা গল্প করত, গান করত আর ঝগড়াও করত বটে, কিন্তু তাদের নিজেদের কোনও নাম ছিল না। এই জন্যে বিশেষ করে ঝগড়ার সময়ই—তাদের অসুবিধার সীমা ছিল না। কারণ উদ্দেশ্যহীন ঝগড়ায় এক জনের দোষ আর এক জনের ঘাড়ে চাপাতে কিছু মাত্র দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করত না।

এক দিন এই অদ্ভুত বাগানে ঈশ্বর বেড়াতে এসে নামহীন ফুলগুলির এই অসুবিধা লক্ষ্য করে প্রত্যেকের এক-একটি নামকরণ করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও জানিয়ে দিলেন যে, সপ্তাহ শেষে প্রত্যেক ফুলকে একবার করে নিজেদের নাম ঈশ্বরের কাছে বলে আসতে হবে।

ঈশ্বরের আদেশানুসারে সাত দিন পরে প্রত্যেক ফুলটি নিজের নিজের সৌন্দর্য্যে ভরপূর হয়ে স্বর্গে যাওয়ার পরে ঈশ্বর এক-এক করে তাদের কাছে ডেকে আদর করে নাম জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ফুলগুলিও হাসিমুখে একে-একে তাদের নাম বলে যেতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ একটা ছোট্ট ফুল অনেক চেষ্টা করেও তার নিজের নাম মনে করতে পারল না। ভয়ে ফুলটির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে তার সমস্ত সৌন্দর্য্যও নষ্ট হোল। এক-এক করে সব শেষে তার পালা এলে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার নাম কি?" অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে জড়িত স্বরে ফুলটি উত্তর দিল, "আমি—আমি ভুলে গেছি।" কান্নায় তার গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাকে অত্যন্ত আদর করে মিষ্টি কথায় তার নাম মনে করিয়ে দিলেন।

এর ঠিক সাত দিন পরেই আবার সমস্ত ফুলগুলি সেজে-গুজে ঈশ্বরের সভার উদ্দেশ্যে রওনা হোল। বাগান থেকে বের হবার সময় সেই ছোট্ট ফুলটি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে পা ফেলে চলতে লাগল; কারণ, এবার তার নাম কণ্ঠস্থ—ঠোঁটস্থ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু দু'-চার জন তাদের নাম বলার পরই হঠাৎ ফুলটির স্মরণ হোল, সে তার নিজের নাম ভুলে গেছে। তার দুই পা ভয়ে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে লাগল, আজ নিশ্চয়ই ঈশ্বর তার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। সব শেষে মধুর স্বরে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার নাম?"

"আমি···আমি···"অবস্থা বুঝতে পেরে আগের দিনের চেয়েও বেশী আদর করে ঈশ্বর আবার তার নাম বলে দিলেন।

এর পর আরও দুই-এক সপ্তাহ ঠিক ঐ ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হোল।

পরের সপ্তাহে পালা মত সেই ছোট্ট ফুলটিকে ঈশ্বর সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় ফুলটি নির্ব্বাক্ ভাবে দাঁড়িয়ে রইল আর তার গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ল জলের দু'টি ধারা।

প্রচুর হাসি আর অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে ঈশ্বর বললেন, "আচ্ছা, আজ থেকে তোমাকে এমন একটি নাম দেব যা তুমিও ভুলবে না বা অন্যেরও ভুল হবে না। তোমার নাম দিলাম আমি—ফরগেট্ মি নট্—অর্থাৎ···আমাকে ভুলিও না।"

অন্তরা

শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাস

সোনালী পাতা-ঝরা নিরাভরণ নীল চৈত্রের আলো চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে! লেডিজ হষ্টেলের একটি কক্ষ। নিভৃত, নিঃশব্দ, অস্ত-গোধূলির আলোয় অন্তরা ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে দ্রুত-হস্তে বেশ-বিন্যাস সমাপন করছিলো। রাঙা আলো এসে পড়েছে তার ঈষৎ কুঞ্চিত তাম্রাভ বেণী-বন্ধনে, নিটোল দু'টি বাহুর ভাঁজে-ভাঁজে, তার উদ্ধত কালো চোখের সুগভীর ইসারায়।

কি শাড়ীখানা পরা যায়? চাঁপা রঙের ওপর জরীর পাড় বোনা, ওইখানা? আর গেরুয়ার ওপর সোনার সূচোর কাজ-করা ওই ব্লাউজটাই বোধ হয় চলতে পারে। অন্তরা মনে-মনে ভেবে নিলে। ছন্দোবদ্ধ দেহ তার চাঁপার বাহু-বন্ধনে বাঁধা পড়ল। অতি সূক্ষ্ম আভরণ সুন্দরতর তনু-দেহে ঝিকিয়ে উঠছে···আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের প্রতি চেয়ে অন্তরা মৃদু হাসল। বিজয়িনীর হাসি। নিটোল দু'টি গালে টোল পড়ল। আর দেরীক্ষণ নয়, এখনি। সে আসবে, ওই গোলাপের আভাময় গাল দু'টি তার মৃদু চুম্বনে রক্তিমতর হয়ে উঠবে, তাই নয় কি অন্তরা?

নীচে ট্রামের ঝড়-ঝড়, বাসের ঘড়-ঘড় শব্দ ভেদ করে শোনা গেল মোটরের হর্ণের থামবার সুগভীর গর্জ্জন। অন্তরা তোমার অন্তরতর এসে পড়েছে। শেষ বারের মতো দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখখানি দেখে নিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগটা টেনে অন্তরা বেরিয়ে পড়ল। সিঁড়ির মাঝখানে ছোট একটি টেবিল, বোর্ডারদের নাম, গন্তব্য-ধাম এবং আগমন-নির্গমনের সময় তাতে লিখে রাখতেই হবে, এই নিয়ম—এক এই সব ঝঞ্ঝাট। বিরক্তিতে ভ্রূ দু'টি কুঞ্চিত করে সে লিখল:

অন্তরা বসু

৫১, রসা রোড

সন্ধ্যা ছ'টা।

ওমা, অন্তরা যে! কোথায় বেরোচ্ছ তুমি ভাই?···

অতি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার সুরে আর একটি মেয়ে ইতিমধ্যে গায়ে ঘেঁষে পড়ে প্রশ্ন করছে; পুনশ্চ সে শুধোলো: নীচে দেখলাম প্রাইভেট কার। সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক। কোথায় বেরোচ্ছ ভাই?

উত্তরের অপেক্ষা না করে ইলা অদম্য কৌতূহলে খাতাখানার ওপর ঝুঁকে পড়ে।

খট্‌-খট্‌ হাই-হীল জুতোর সুউচ্চ শব্দ···। সচকিত হয়ে মুখ তুলে ইলা দেখলো, তার এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সেখানে কেউ নাই। অন্তরা নীচে নেমে গেছে।

বটে, এতখানি। মুখখানি ঘোরাল করে ইলা পা টিপে-টিপে উপরে উঠে যায়। সিঁড়ির সামনের ঘরটি নিভাননীর। সেখানে ঢুকে ও দরজা বন্ধ করে দেয়।

···মোটর চলার গর্জন শোনা গেল। হষ্টেলের ওপরে অনেকগুলি কৌতূহলী আঁখি যে তাদের লক্ষ্য করছে, সেদিকে ওদের লক্ষ্যই নাই। তাহলে কি আর অন্তরা সেই সুন্দর চেহারার ভদ্রলোকটির অতখানি গা ঘেঁষে বসতে পারত? আর লক্ষ্য থাকবেই বা কি করে? ওরা যতই গলা সাফাই করুক না কেন, যাদের প্রেমের খেলা সুরু হয়েছে, তারা তা খেলবেই। অপর দিকে ওরা এখন লক্ষ্য রাখে কি করে?···

• • • •

নিভাননীর গৃহে ইলা, নিভা, রাধা সকল বোর্ডারদের একটি বৈঠক বসেছে। এমন কি সুপারও উপস্থিত আছেন। আলোচনাটি য এর পূর্ব্বে অত্যুগ্র হয়ে গেছে, তা বোঝা যায়। এখনও কণ্ঠস্বর কলের একটু নরম হলেও আলোচনার তীব্রতার হ্রাস হয়নি।

ইলা হাতখানি আন্দোলিত করে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বোঝাচ্ছে, আপনি অন্তরার ভুল-দোষ-ত্রুটি তো দেখবেনই না। আমাদের হষ্টেলের একটি মেয়ে যদি সর্ব্বদা ছেলেদের সঙ্গে হৈ-চৈ করে ঘুরে বেড়ায়, তাতে আমাদেরো morality সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ আছে বৈ কি!

নির্ম্মলা এদের মধ্যে বয়সে ছোট, অভিজ্ঞতাতেও। মুখখানি ফিরিয়ে সে অনেক কষ্টে হাসি চাপল। মর্যালিটি আশঙ্কা? তাই বটে। কিন্তু অন্তরার বেলায় না হয় বোঝা যায় আশঙ্কাটা কোথা থেকে আসছে; যে রকম সুন্দর মেয়ে! আর ওর হাসিমাখা কথাবার্তায় একটা অন্য রকম আকর্ষণ। কিন্তু এদের? যৌবন গেছে পেরিয়ে, বিয়ের কোন দিকেই কোন আশা নাই, ভবিষ্যতে স্কুল-মাষ্টার না হওয়া ছাড়া এদের নাস্তি গত্যন্তরথা, এদেরো আশঙ্কা!···

নিভা বললো, না, সে কথা ছাড়াও কথা হচ্ছে হষ্টেলের তো একটা সুনাম-দুর্নাম বলে বস্তু আছে! আমাদেরি হষ্টেলের একটি মেয়ের নামে যদি সকলে অখ্যাতি করে, তাতে সমস্ত হষ্টেলেরই······

রাধা কথাটা লুফে নিয়ে বললো: তাতে আমাদের নামেও কথা উঠতে কতক্ষণ?

কমলা ঈর্ষ্যা-কুটিল আঁখির কটাক্ষ হেনে বললো: সে কথা আর বলতে? আর ভাই রাধাদি, ওর সবি যেন কেমন কেমন! হষ্টেলে এসে ওর আলাদা প্রাইভেট রুম চাই, আর অত দামী-দামী জামা-কাপড় পরে থাকবার সব সময় কি প্রয়োজন? বি-এ পড়ছে না কিসে অভিনয় করছে, বোঝা মুস্কিল।

নির্ম্মলা হেসে ফেলে বললো: তা কমলাদি, ওই মেয়েই কিন্তু আই-এতে ষ্ট্যাণ্ড করে স্কলারশিপ পেয়েছে। আর ও যাই করুক না কেন, তাতে আমাদের বলবার কী প্রয়োজন ভাই?

কমলা রোষবিকৃত মুখে কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তার পূর্ব্বেই নির্ম্মলাকে বললেন: দেখ নির্ম্মলা, যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা কয়ো না। আজ অন্তরা এলে সকলের সামনেই আমি তাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করব।

সুপার উঠে চলে গেলেন। অন্তরাকে তিনি সত্যই আন্তরিক স্নেহ করতেন। আজ তাকে নিয়েই এত সব কুৎসিত আলোচনা তাঁর অসহ্য বোধ হচ্ছিল।

• • • •

ছোট একখানি রম্য গৃহ। বাইরের ঘরের সোফায় হেলান দিয়ে একটি বিশেষ ভঙ্গীতে অন্তরা বসে, তার সুন্দর মুখে-চোখে-বক্ষে সূর্য্যের অপর্য্যাপ্ত আলো এসে পড়েছে। অসিত পোর্ট্রেটের সামনে তুলিতে রং মাখাতে-মাখাতে মুগ্ধ কণ্ঠে বললো: তুমি সৃষ্টির প্রথম কবিতা।

সত্যি না কি? অন্তরার বাঁকা চাহনিতে বিদ্যুতের ইঙ্গিত।

···আহা-হা। অন্তরা, এক মিনিট, লক্ষ্মীটি। ঠিক ওই 'পোজে' একটুখানি থাক তো। এঁকে নিই।

বাবা রে বাবা। 'আর্টিষ্ট' প্রেমিক যে এমন হয়, কে জানতো! অন্তরার চোখে-মুখে কৌতুক ঝলমল করে ওঠে। কিন্তু এবার শেষ কর, আমায় হষ্টেলে ফিরতে হবে এবার।

অসিত নিবিষ্ট মনে তুলি চালাতে চালাতে বলে: আর একটু, অন্তরা লক্ষ্মীটি।

বা রে, হষ্টেলে যে···

আঃ! অসিত এবার ধৈর্য্যহারা হয়। কবে যে ওই হষ্টেল থেকে তোমায় বার করে আনতে পারব।

আনলেই তো হয়। অন্তরা সহসা অনামিকার হীরকাঙ্গুরীয়ের পানে চেয়ে গম্ভীর হয়ে যায়।

অসিত তুলি ফেলে অন্তরার কাছে ধীরে-ধীরে এগিয়ে যায়। বাহুপাশে প্রিয় দেহ-বল্লরীকে বেষ্টন করে বলে: অন্তরা, সত্যি বলছ? এখনো বল; তোমায় পেলে আমার সমস্ত কিছু ধন্য হয়ে উঠবে। শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণা আমি মাঝে-মাঝে হারিয়ে ফেলি, জানো রাণী। কিন্তু তুমি এলে তুমিই হবে আমার অফুরন্ত প্রেরণা। তুমিই তো বলেছিলে, তোমার বি-এ পরীক্ষা হবার পূর্ব্বে তুমি এ সব চাও না।

প্রিয়-বাহুপাশে বদ্ধ হয়ে অন্তরার দেহ বারে-বারে কেঁপে উঠছে। সুখাবেশে আচ্ছন্ন নয়নে সে অস্ফুট কণ্ঠে বললো: ছাই পরীক্ষা।

অসিতের মুখ ধীরে-ধীরে গভীর আবেগে অন্তরার মুখের উপর নত হয়ে পড়ছে। নিরাবরণ গোধূলির স্নিগ্ধ আলো ওরা নিজেদের প্রেমের ঐশ্বর্য্যে রাঙিয়ে দিলো।

• • •

রাত্রি আটটা। লেডিজ হষ্টেলের সিঁড়িতে 'অন্তরার জুতো'র সুপরিচিত পদশব্দ শোনা গেল। ওপরে ওঠা মাত্র সুপার নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডাকলেন: অন্তরা, শোনো।

ঘরের ভিতরে ইলা, নির্ম্মলা, রাধার ভীড়। সকলেরই মুখভাব কঠোর, উত্তেজিত। এ যেন সত্যিই কোনো অপরাধীর সন্ধান পেয়ে আদালতে জুরীর দল বসেছে মহা সমস্যা নিয়ে।

অন্তরা অবাক্! সুপার ডাকলেন: শোনো, অন্তরা! আজ যিনি তোমায় মোটরে করে পৌঁছে দিয়ে গেলেন তিনি তোমার কে?

অন্তরার মুখ সহসা গভীর লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠল। চাপা রঙের শাড়ীর ভেতর থেকে ক্যালিফর্ণিয়া পপির উগ্র সুগন্ধ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তারি সাথে মেশা অন্তরার আশ্চর্য্য সুন্দর চোখ দু'টির মায়া। বুনে দিয়ে গেছে ওর ঈষৎ লজ্জিত আঁখির কালো মায়া রাত্রির করুণ ছায়া।

ইলা নিভার প্রতি ইঙ্গিত-ভরা কটাক্ষ হানল।

বলো, উনি তোমার কে?

অতি অস্ফুট কণ্ঠে অন্তরা উত্তর দিলো: আমি ওর সাথে এনগেজড্।

গৃহের সকলে স্তব্ধ অবাক্। সুপার নির্ব্বাক্। শুধু দূর আকাশের তারার হাসির সাথে তাল রেখে নির্ম্মলার হাসির জল-তরঙ্গ বেজে উঠলো।

নারী ও পুরুষ

নমিতা পালচৌধুরী

পরেশ বাড়ী ফিরছে। বৈচিত্র্যহীন জীবনের একটা দিনের কলম-পেশা চুকিয়ে পরেশ বাড়ী ফিরছে। ভারী পায়ের শব্দ তুলে সে একটানা পথ চলে। তার চলার শব্দে ফুটে ওঠে বেশ একটা ছন্দ! অশান্ত, এলোমেলো পদক্ষেপ তার নয়।

ক্লান্ত অবসন্ন পরেশ অবশেষে বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছয়। গেটের বাইরে থেকেই সে দেখতে পায় লাল রঙের জরাজীর্ণ রঙচটা বাড়ীটা। এ তার সেই ঠাকুর্দার আমলের বাড়ী। পরেশ ভাবে—ঠাকুর্দা চলে গেলেন, বাবা চলে গেলেন, কিন্তু বাড়ীটা আজও ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। পরেশ ভাবতে ভাবতে আনমনে এগিয়ে যায়। পেয়ারা গাছটা পেরিয়ে যেতেই পরেশের চোখে পড়ে তার ঘরের ছোট জানলাটা, জানলার গায়ে ঝুলছে সেই বিবর্ণ মলিন পর্দা। মনে পড়ে তার বিয়ের দু' মাস পরেই অলকা সখ করে এই পর্দাটা টাঙিয়েছিল। তার পুরান ছাপা শাড়ীখানা কেটেই সে তৈরী করেছিল এই পর্দা।

পরেশ ঘরে পা দিয়ে প্রথমেই বিছানার কাছে এগিয়ে যায়। শ্রান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে—"কি, আজ জ্বর আসে নি তো?" তার কণ্ঠস্বরে কোন ব্যস্ততা প্রকাশ পায় না। দেড় মাস আগে অলকা যখন প্রথম রোগশয্যা গ্রহণ করেছিল, তখন যে ব্যাকুলতা ফুটে উঠতো তার প্রতিটি কথার ফাঁকে ফাঁকে, আজ তার লেশমাত্রও লক্ষিত হয় না।

অলকা শুকনো মুখে তার স্বাভাবিক হাসি টেনে এনে বলে—"হ্যা, আজও এসেছে।"

পরেশের কাছ থেকে আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। সে ভাবলেশহীন মুখে গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলতে থাকে। অত্যন্ত সন্তর্পণে আলগোছে সে জামা খোলে। যে অবস্থা হয়েছে পাঞ্জাবিটার!

জামা খুলে পরেশ ফিরে দাঁড়াতেই অলকা তার মুখ পানে চেয়ে হাসে। ছোট্ট মিষ্টি হাসি! যে হাসি অলকার অসুন্দর মুখকে কোরে তোলে অপরূপ! পরেশের হঠাৎ মনে হয়, অলকার মুখপানে সে যেন কত দিন ভাল করে চেয়ে দেখেনি—অলকা যেন কত দূরে সরে গেছে। আবার সে তাকিয়ে দেখে ঐ ছোট্ট মিষ্টি হাসিটুকু। পরেশ আশ্চর্য্য হয়ে যায়। হঠাৎ সে উপলব্ধি করে তার নিজের মনের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। অলকার হাসি তো আজ তাকে স্পর্শ করছে না। তার মন তো আজ উচ্ছ্বাসে আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠছে না। তবে কি মনটা তার মরে গেছে।

মনে পড়ে ফুলশয্যার রাত্রের কথা। সে রাত্রে অলকার এই হাসিটুকুই পরেশকে পাগল কোরে তুলেছিল। নববধূর সৌন্দর্য্যের অভাব তার মনে কোন ক্ষোভের সঞ্চার করেনি। মুগ্ধ পরেশ অলকার পানে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার হাত দু'টি ধরে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলেছিল—"রাণী আমার, আমি অর্থ চাই না, মান-সম্মান চাই না, তোমার মুখের হাসিই আমার জীবনকে ভরিয়ে রাখবে।" অলকা হেসে মাথা নত করেছিল। পরেশের মনে পড়ে সে রাত্রের প্রতিটি কথা। আরও মনে পড়ে আবেগভরা দু'টি চোখ তুলে সেদিন সে বিহ্বল হয়ে বলেছিল—"অলকা, আমি বেশী আশা রাখি না—বড় বাড়ী, দামী গাড়ী আমি চাই না। আমার এই ছোট বাড়ীতেই আমি তোমায় নিয়ে বাঁধব আনন্দের নীড়। কেমন?"

আজ পরেশের হাসি পায় সেদিনের কথা মনে করতে। বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে মন তার আজ ক্ষত-বিক্ষত। সমস্ত দেহ-মন জর্জ্জরিত। তাই তো অলকার মিষ্টি হাসি তাকে আর উন্মনা কোরে তোলে না। অলকার মুখের পানে তাকিয়ে দেখতে সে ভুলে যায়। ভুলে যায়, রুগ্না অসুস্থা অলকাকে একটু আদর করতে। পরেশ বুঝতে পেরেছে মানুষের জীবনে অর্থের প্রয়োজন কতখানি। সে বুঝতে পেরেছে টাকার দাম। অর্থের অভাব মানুষকে পশুত্বের পর্য্যায়ে টেনে নামায়—অভাবের তাড়নায় মানুষ তার মনুষ্যত্ব বিকিয়ে ফেলে। মুহূর্ত্তের মধ্যে পরেশের মন তিক্ত হয়ে ওঠে। তার ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে তিক্ত শ্লেষপূর্ণ হাসি। এই সেই অলকা—তার জীবনের রাণী। যার কাছে সে বড়-মুখ কোরে নির্ব্বোধের মতই বলেছিল—"অর্থ চাই না, মান-সম্মান চাই না।" পরেশের মুখ ঠেলে হঠাৎ একটা বিপুল অট্টহাসি বেরিয়ে আসতে চায়—উন্মত্তের মত হো-হো করে সশব্দে হাসতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু পাগল হ'তে এখনও বাকী আছে—তাই সে নিঃশব্দে ফের অলকার দিকেই তাকিয়ে দেখে। পাশ ফিরে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে আছে অলকা। ও যেন কত ছোট হয়ে গেছে। সমস্ত শরীরটাই যেন ওর হ'য়ে গেছে ছোট্ট মেয়ের মত। আহা বেচারী! পরেশ তাকে এক দিনও ভাল করে খেতে দিতে পারেনি। পারেনি দিতে একখানা ভাল শাড়ী। অনাদরে, অযত্নে অলকা তাই অকালে শুকিয়ে চুপসে গেছে। কিন্তু—কিন্তু উপায়ই বা কি! পরেশের বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘনিশ্বাস। সে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে হাঁক দেয়, "ওরে বেণু, তোর চায়ের জল হোল?"

কথার শেষে পরেশ এগিয়ে গিয়ে অলকার শয্যার একপাশে পা ছেড়ে দেয়। অলকা শশব্যস্তে বলে ওঠে—"ওমা, ও কি! ওখানে শুয়ে পড়লে কেন? পায়ে পা লাগবে যে।"

পরেশ তার ব্যস্ততার প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না—নির্ব্বিকার ভাবে শুয়ে থাকে। অলকা ফের বলে—হাত বাড়িয়ে স্বামীর একটা হাত ধরে আব্দারের সুরে বলে—"লক্ষীটি, ভাল হোয়ে শোও। স্বামীর গায়ে পা লাগলে দোষ হয়,

পরেশ অকারণে হঠাৎ চটে ওঠে। অলকার হাতখানা এক ঝাঁকুনিতে সরিয়ে দিয়ে বলে—"যাও, আর ন্যাকামী করতে হবে না। যত্তো সব—।"

পরেশের কথার সাথে ঝরে পড়ে অসীম বিরক্তি। ভাল লাগে না তার এ সব আদর-আব্দার। অলকা কেন ভুলে যায় তাদের বিয়ের পর পেরিয়ে গেছে সুদীর্ঘ দু'টি বছর। এখন কি আর এ সব শোভা পায়। কেরাণীদের জীবনে যে দু'টো বছরই বিশ বছরের সমান। ভীত-স্তম্ভিত অলকা স্বামীর পানে একবার তাকিয়ে দেখেই দৃষ্টি অবনত করে। অশ্রুভারে চোখ দু'টি যেন তার আপনিই নত হয়ে আসে।

সন্ধ্যা হতেই হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে রেণু এসে এ ঘরে ঢোকে। সাদা চিম্‌নীটা ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। আজও সেটা পরিষ্কার করা হয়নি। পরেশ বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে—"হ্যা রে রেণু, তুই করিস্ কি সারা দিন? চিম্‌নীটা একটু পরিষ্কার করতে পারিস না?"

রেণু মুখ-ভার করে হাতের লণ্ঠনটা মেঝের উপর ঠক্ করে নামিয়ে রাখে। তার পর গজ-গজ করতে করতে বেরিয়ে যায়—"সারা দিন কি করি একবার চোখ চেয়ে দেখো। সব কিছু যদি এত ঝকঝকে তকতকে চাই, তা'হলে একটা চাকর রাখলেই হয়।"

পরেশ স্তম্ভিত হয়ে যায়। এ কি সেই রেণু! মাত্র বছর খানেক আগে নিজের পৈত্রিক বাড়ীখানা বাঁধা রেখে পরেশ যার বিয়ে দিল। মনে পড়ে বোনটির বিয়ের সময় অনেকেই বলেছিল—"দরকার কি তোমার বিয়ের এত আড়ম্বর করার? নিজের ভবিষ্যৎ সকলের আগে—বুঝলে হে? নিজের সাধ্যে যা কুলোয় তাই কর—নইলে পরে তুমিই পস্তাবে।"

পরেশের চিন্তা-স্রোতে বাধা দিয়ে রেণু কের এ ঘরে এসে ঢোকে। উবু হয়ে বসে কি যেন করে। হ্যারিকেনের মৃদু আলোকেও পরেশ দেখতে পায় রেণুর সীঁথের সিঁদুর। সীমন্তের ঐ জ্বলন্ত রেখাটুকুই যেন রেণুকে ছিনিয়ে নিয়েছে পরেশের কাছ থেকে অনেক দূরে।

"একটু মিছরী দিবি দিদি—এই নেবুর টুকরোটা দিয়ে একটু সরবত করে খেতে?" ধীরেশকে হঠাৎ দোর-গোড়ায় দেখতে পাওয়া যায়। পরেশের ছোট ভাই ধীরেশ। সলজ্জ বোকা-বোকা ভাবটা তার। কিন্তু রেণু কোন উত্তর দেবার আগেই পরেশ ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে বলে ওঠে—"রেণু, ধীরুর হাতে নেবু কেন? জানো একটু সাবু-মিছরী—দু'টো নেবু জোগাড় করতেই আমার জিভ্ বেরিয়ে পড়ে?"

"তা ধীরুরও যে পেটের অসুখ দাদা।" রেণু কৈফিয়ৎ দেয়।

"হোক পেটের অসুখ"—পরেশ সবেগে উঠে বসে। মুহূর্ত্তের মধ্যে তার মুখ-ভাব ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে—চোখে ফুটে ওঠে হিংস্র-কুটিল দৃষ্টি। সে চিৎকার করে বলে—"পাবে না ধীরু নেবু। ওকে যদি দেওয়া হয় তাহলে বলে দিচ্ছি এর পর থেকে আর পারব না আমি এ সব আনতে।"

এক মুহূর্ত্তে ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে ওঠে। অলকা তার স্বামীর এই নতুন মূর্ত্তি দেখে লজ্জায়-দুঃখে মুখ ঢেকে পড়ে থাকে। একবার একটু হেসে ধীরেশের পক্ষ নিয়ে কি যেন বলতে যায় কিন্তু পারে না। শত অভাব-অনটনের ভেতরও তার মুখের যে মিষ্টি হাসিটুকু ছিল অম্লান—আজকের ঘটনায় সে হাসি হয়ে গেল ম্লান—বিকৃত।

নিস্তব্ধ রাত্রি। পাশাপাশি শুয়ে পরেশ ও অলকা। কারুর মুখে কথা নেই। কেবল দূর থেকে মাঝে-মাঝে ভেসে আসছে দু'-একটা কুকুরের ডাক। পরেশের মন আজ অনুতপ্ত, ক্ষত-বিক্ষত। সে হঠাৎ করুণ অসহায়ের সুরে বলে ওঠে—"অলকা, আর পারি না। অভাবের তাড়নায় আমি একটা পশুরও অধম হয়ে গেছি। এত দুর্দ্দশা আর সহ্য হয় না।"

একটু থেমে পরেশ হঠাৎ অলকার একটা হাত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে উত্তেজিত স্বরে বলে—"জানো অলকা—জানো, এক-এক সময় মনে হয় বুকে দিই ছুরি বসিয়ে—আগে তোমার তার পর আমার। ব্যস্—তাহ'লেই সব দুঃখ-কষ্টের শেষ।"

অলকার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে একটা অস্ফুট কাতর-ধ্বনি। সে শিউরে উঠে নিজের পেটের ওপর একটা হাত রাখে। সে যে আজ মা। সন্তানের অমঙ্গল কি সে সইতে পারে, অলকা তার স্বামীর কাছ থেকে সভয়ে একটু দূরে সরে যায়। বারে-বারে সে হাত দিয়ে অনুভব করে তার গর্ভস্থ সন্তানের অস্তিত্ব। সন্তানের মঙ্গল-কামনার কাছে তার স্বামীও বুঝি আজ তুচ্ছ হয়ে যায়।

গাঢ় অন্ধকারের ভেতরও পরেশ অনুভব করে অলকার ভাবান্তর—তার নিভৃত মনের গোপন কথা। সে ঈষৎ ম্লান হেসে তার শিথিল অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে—"এ খবরও আমার আনন্দ দেয় না অলকা। কারণ—কারণ শুধু ঐ অভাব।"

অজন্তা

শর্ব্বাণী ভট্টাচার্য্য

সমাধি-মন্দির।

অতীতের বেদনা-পুঞ্জীভূত সমাধির উপরে নিস্তব্ধ প্রকৃতির সমাপ্তিহীন সাধনায় নীরব দেউল। দিগন্তের বিলীয়মান রশ্মি অতি ধীরে ধীরে তাহারই উপরে অস্পষ্ট ম্লানিমার পরশ বুলাইয়া দিয়া দিক্‌চক্রবালে শেষ অভিনন্দন জানাইয়া যাইতেছে। অপরাহ্ণের আঁধার ঘনাইয়া আসে।

কিন্তু ইহা ক্ষণিকের।

সন্ধ্যা দেবী যখন তাহার স্খলিত অঞ্চল লুটাইয়া বরণডালা হাতে এই ধ্যানমগ্ন চরাচরের উপরে নামিয়া আসিবেন, প্রকৃতির প্রতি অঙ্গ স্পন্দিত হইবে এক অপরূপ উন্মাদনায়। প্রদীপ্ত তারকার দীপালিতে, উচ্ছলিত তরঙ্গিনীর দূরাগত কলনাদে এই নিস্তব্ধতার বক্ষ উজাড় করা শান্তি-চন্দনলিপ্ত শ্রদ্ধাপুষ্প-অর্ঘে প্রকৃতি অপরূপ আবেগে এই সমাধি-মন্দিরে সন্ধ্যারতি করিবেন।

কিন্তু আমি ঈর্ষা-দ্বেষ জর্জ্জরিত মানব জাতির প্রতিভূ, সভ্যতার নিদারুণ অভিশাপে সংশয়-কুটিল আমার মন। আমার অধিকার নাই এই পবিত্র দৃশ্যকে নয়ন মেলিয়া উপভোগ করিতে। শুধু একবার ইহাকে দর্শন করিতে। সুখ-দুঃখ পুণ্য-পাপ-বিজড়িত পার্থিব মানুষের অনাঘ্রাত ঐকান্তিক শ্রদ্ধা জানাইতে, লুপ্ত সংস্কৃতির অবদানের পাদমূলে বসিয়া বর্ত্তমান কৃষ্টিকে হৃদয়ের প্রতি অনুভূতি দিয়া উপলব্ধি করিতে আমি সশ্রদ্ধ হৃদয়ে প্রবেশ করিলাম অতীত সভ্যতার এই নিস্তব্ধ সমাধি স্তূপে।

অজন্তার প্রাসাদ-গুহা।

সম্মুখে সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণী ঈষৎ বঙ্কিম গতিতে তরঙ্গায়িত হইয়া গিয়াছে। যেন কোন ভয়াল বিষধর সর্প সব দ্বেষ-হিংসা ভুলিয়া নীল আকাশের বুকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এমনি শান্ত সে রূপ। তাহারই কোল ঘেঁসিয়া একটি ক্ষীণ স্রোতস্বতী মৃদুগতিতে বহিয়া চলিয়াছে। আর এই নিবিড় অরণ্যাবৃত পাহাড়ের বুকে স্থানে-স্থানে শূন্যবিবর প্রসারিত করিয়া আছে অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ গুহা, সুবিখ্যাত অজন্তার গুহা।

যাত্রী আমি একা নহি। ভারতবর্ষের দূর-দূরান্তর হইতে কত যাত্রী কত পর্য্যটক কত শিল্পী কত কবি আসিয়াছে অজন্তার পাদমূলে তাহাদের ভক্তি-অর্ঘ উৎসর্গ করিতে। কিন্তু ইহাদের মিলিত কলরোলের অন্তরালে প্রকাশমান উচ্ছৃঙ্খলতা আমাকে আঘাত দিল। মনে হইল, অজন্তার আত্মা যেন আর্ত্ত রোলে ইহারই নিকট পরিত্রাণ ভিক্ষা করিতেছে। কিন্তু এ ভ্রান্তি আমার টুটিল যখন অজন্তার প্রথম গুহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভাব যেখানে আসিয়া ভাষার প্রকাশকে, কাব্যের আবেগকে, উচ্ছ্বাসের অসংযমকে হারাইয়া ফেলে। বুঝি আজ বাস্তব আসিয়া কল্পনার সেই সীমান্তে পৌঁছিয়াছে। বিরাট 'হল'-এর চারি পার্শ্বে অগণ্য স্তম্ভ জাগ্রত প্রহরীর মত উন্নতশীর্ষ। সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় লতা-পাতা ইত্যাদি চিত্রে আপাদমস্তক পরিব্যাপ্ত। ইহাদের পিছনে প্রাচীর-গাত্রে অসংখ্য রঙ্গিন মানব-মূর্ত্তি অপরূপ প্রতিভায় চিত্রিত। কালের ব্যবধানে কোনটি বা ধ্বংস হইয়াছে-কিন্তু বর্ণের ঔজ্জ্বল্য মুছিয়া যায় নাই। দু'হাজার বছর যেন একটি মাত্র দিনের মত কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু এই বর্ণের প্রখরতাকে বিন্দুমাত্র ম্লান করিতে পারে নাই। শুধু মাত্র বৌদ্ধযুগের যে সব কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া ইহাদের মূর্ত্তি নির্মিত হইয়াছিল, আজ কালির আখর, কালের ব্যবধানকে অস্বীকার করিয়া প্রস্তরের বুকে তাহারাই চিরঞ্জীব হইয়া রহিয়াছে।

স্থানে-স্থানে ভগবান তথাগতের শান্ত, সুস্মিত ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি। সর্ব অবয়বে কি গভীর প্রশান্তি। বর্ত্তমান হিংসা-উন্মত্ত বিংশ শতাব্দী মানুষকে প্রস্তরে পরিণত করে কিন্তু প্রস্তরের বুকে মানুষের সাধনা করিবার অমানুষিক শক্তি এই শিল্পীদের ছিল বলিয়াই এই প্রস্তরের বুকের মুখে শান্ত নির্বিকার ঔদাসীন্যের সহিত মানব প্রেমিকতার অনির্বচনীয় ভাবের মিলন হইয়াছে, যাহার সম্মুখে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ী সম্রাটের মস্তকও আনত হইয়া আসে।

গুহার পর গুহা দেখিয়া গেলাম। অনেক অযত্ন অসাবধানতার সুনিশ্চিত ফল চোখে পড়িল, কিন্তু তাহাকেই বড় করিয়া ধরিবার মত মনের অবস্থা ছিল না। হঠাৎ মনে হইল, যেন নিস্তব্ধতার এক ভয়াল সমুদ্র আমাকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে, আমি যেন বড় একা। সত্রাসে চারি পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলাম, সহযাত্রীরা সকলেই তো আছে। নাই শুধু ইহাদের মাঝের ক্ষণিক পূর্বের সেই রূঢ় পৃথিবীর বৈষয়িক মানুষেরা। ইহাদের কাহারো মাঝে নাই কোন ব্যবধান, সবাই এখানে সত্য, শুভ ও সুন্দরের উপাসক। সৌন্দর্য্যের অগাধ সমুদ্রে সকলেই এখানে একান্তে অবগাহন করিতে চায়। তাই এখানে সকলেই একা, সকলেই নিঃসঙ্গ। সর্বশেষে দেখিলাম ভগবান বুদ্ধের নির্বাণ দৃশ্য। শোক ও শোকাতীতের একান্ত অপূর্ব মিলন।

অজন্তার নিভৃত গহ্বর হইতে যখন বাহির হইয়া আসিলাম, সন্ধ্যা হইতে তখনও বাকী। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা সশব্দে গুহা-দ্বার বন্ধ করিতে লাগিল। জাগিয়া উঠিল কলকোলাহল-মুখরিত মানব-প্রকৃতি। ইহার স্পর্শ হইতে সরিয়া আরেক বার নয়ন ভরিয়া অজন্তাকে দেখিলাম। কি পাইলাম আর কি হারাইলাম বিচার-শক্তির সেই অবশিষ্ট শক্তিটুকু অর্ঘ করিয়া একটি প্রণামে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিলাম।

দিবাস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল—

কোথায় অজন্তা? কোথায় তাহার প্রাসাদ-গুহা? বিংশ শতাব্দী আবার আমাকে রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন করিয়াছে। সহর-সভ্যতার আবেষ্টনী চারি দিকে ঘনাইয়া আসিতেছে। নিয়মের কঠোর শৃঙ্খলপাশ আবার আমি সর্ব অঙ্গে উপলব্ধি করিতেছি।

উত্তর

১। উত্তরে। ২। যতীন মুখোপাধ্যায়। ৩। ১৮৫২।

৪। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। ৫। শহরে। ৬। নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

৭। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ৮। মাদাম কুরী।

৯। আড়াই কোটি প্রায়।

উত্তর বায় জানায় শাসন—.

শীতের হাওয়ায় রুক্ষ শাসন শুধু বনের গাছেই লাগে না, মানুষের দেহেও লাগে।

বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গে দেহকে খাপ খাওয়াবার জন্য সব চেয়ে পরিশ্রম করতে হয় লিভারকে। লিভার তার রক্তকণিকাগঠন, পিত্তনিঃসারণ, রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা প্রতিনিয়তই দেহকে রক্ষা করছে।

তাই **কুমারেশ** অজীর্ণ, উদরাময়, অ্যামিবাঘটিত আমাশয়, শিশু যকৃৎ, সূতিকা প্রভৃতি লিভার ও পেটের সকল পীড়া নিশ্চিতরূপে নিরাময় ত করেই তা ছাড়াও লিভারকে শক্তিশালী ক'রে অন্য রোগের আক্রমণও প্রতিরোধ করে।

কুমারেশ

দি ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ্চ এণ্ড কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ

সালকিয়া :: হাওড়া

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস

সন্তোষ ঘোষ

(অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন)

১৯১৯—১৯২৪

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯১৯ সাল একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। ১৯১৮ সালের শেষ দিকে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল। যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়লাভে ভারতের অবদান ছিল অসামান্য—ভারতের অপরিমিত অর্থ ও সম্পদ এবং দুর্ধর্ষ ও অপরাজেয় সৈন্যদল যুদ্ধজয়ে বৃটিশ-শক্তির প্রধান সহায় ছিল। যুদ্ধের সময় মহাত্মা গান্ধী ও ভারতের অন্যান্য নেতা অকুণ্ঠ চিত্তে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষকে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার প্রদান করা হইবে। ভারতের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট ১৯১৮ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হইল। ভারতবাসী দেখিতে পাইল যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতে দায়িত্বশীল লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষ যুদ্ধে সাহায্যের পরিবর্তে আত্মশাসনের অধিকার চাহিয়াছিল—ভারতের ভাগ্যে জুটিল অপরিমেয় লাঞ্ছনা ও অত্যাচার। সাম্রাজ্যবাদী, বলগর্বী, বিদেশী শাসক ভারতের ক্রমবর্ধমান মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে বিনষ্ট করার জন্য দমননীতি ও অত্যাচারের সকল প্রকার পন্থা অবলম্বন করিল। এক দিকে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারের নামে ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থা করা হইল আর অন্য দিকে কুখ্যাত রাওলেট বিল, আইনে পরিণত করিয়া ভারতবাসীর ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ভাবে হরণ করা হইল। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর ভারতের নেতৃবৃন্দ দলনির্বিশেষে ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল এই রিপোর্ট সমর্থন করিল না। এই রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনার জন্য কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী শাসন-সংস্কার গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে ভারতের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে যে কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তাহাই অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য বিশেষ অধিবেশনে দাবী জানান হইল। ১৯১৮ সালে দিল্লী কংগ্রেসে বিশেষ অধিবেশনের এই সকল দাবী সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল। কংগ্রেসের এই দাবীর উত্তরে বৃটিশ সরকার ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাওলেট বিল উত্থাপনের ব্যবস্থা করিল। ১৯শে জানুয়ারী তারিখে রাওলেট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। ১৯১৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী সুপ্রীম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে রাওলেট বিল উত্থাপিত হইল—মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে বিলটি আইনে পরিণত হইল। এই বিলের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদের জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত করিবার ভার লইলেন গান্ধীজী। গান্ধীজী পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করিলেন যে, রাওলেট কমিটির সুপারিশ আইন করিয়া বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা করিলে, সমগ্র দেশ এই কুখ্যাত আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিবে। মহাত্মা গান্ধী এই উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশে পরিভ্রমণ করিলেন—দেশবাসী সাগ্রহে গান্ধীজীর প্রস্তাব সমর্থন করিল। রাওলেট বিল সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার সংগে সংগে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। ইহার পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেসের কর্মপ্রচেষ্টা আবেদন-নিবেদন ও প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যেই অনেকখানি পরিমাণে সীমাবদ্ধ ছিল। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ভারতবাসী সক্রিয় ভাবে কোন প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে পারে, এ বিশ্বাস কাহারও ছিল না। গান্ধীজীই সর্বপ্রথম দেশবাসীকে জানাইলেন যে ভারতবাসীর পক্ষে বৃটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা সম্ভব। গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণের পূর্বে কংগ্রেসের কর্মপ্রচেষ্টা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গান্ধীজী কংগ্রেসকে গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিলেন। তিনি তাঁহার অভিনব পন্থায় দেশকে সংগ্রামের পথে আহ্বান করিলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক নূতন পরীক্ষা সুরু হইল। রাওলেট আইনের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইল। গান্ধীজী ঘোষণা করিলেন যে, আন্দোলন আরম্ভের প্রাক্কালে সমগ্র জাতি উপবাস ও প্রার্থনার ভিতর দিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে আত্মিক প্রতিরোধের জন্য শক্তি সংগ্রহ করিবে। ১৯১৯ সালের ৩০শে মার্চ তারিখটি উপবাস ও প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট হইল। পরে এই তারিখটি পরিবর্তন করিয়া ৬ই এপ্রিল করা হইল। ৬ই এপ্রিল তারিখে দেশের সর্বত্র জনসাধারণ উৎসাহ সহকারে গান্ধীজীর নেতৃত্বে হিন্দু ও মুসলমান, ভারতের এই দুই প্রধান সম্প্রদায় হাতে হাত মিলাইল। জনসাধারণের আত্মিক প্রতিরোধের শক্তি দেখিয়া বৃটিশ সরকার প্রমাদ গণিল। কঠোর দমননীতির সাহায্যে জনসাধারণের মনোবল বিনষ্ট করার জন্য বিদেশী সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করিল। সরকারী অত্যাচারের প্রধান কেন্দ্রস্থল হইল পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাব। ১৯১৯ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে পাঞ্জাবের নেতা ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ কিচলুকে গ্রেপ্তার করিয়া অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ করা হইল। জনসাধারণ কর্তৃপক্ষের কার্য্যের প্রতিবাদ করায় তাহাদের উপর গুলী চালান হইল। ১৩ই এপ্রিল তারিখে জালিওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল। জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে জালিওয়ানাবাগে সমবেত বিংশ সহস্র নিরস্ত্র নরনারী ও শিশুর উপর ১৬০০ রাউণ্ড গুলী চালান হইল। বাগের একমাত্র প্রশস্ত নির্গম-পথ রুদ্ধ করিয়া সৈন্যদল জনতার উপর গুলী চালনা করিল। ইহার ফলে কয়েক সহস্র নরনারী হতাহত হইল। জালিওয়ানাবাগের নিষ্ঠুর বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের ফলে সমগ্র দেশে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিল। জালিওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর দেশবাসী ও নেতৃবৃন্দ নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করিলেন। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী করার প্রতিবাদে স্যার শঙ্করণ নায়ার বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিলেন। দেশের সর্বত্র পাঞ্জাবের অত্যাচার সম্পর্কে তদন্তের দাবী করা হইল। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ও মহাত্মা গান্ধীকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। গান্ধীজীর দিল্লী প্রবেশও নিষিদ্ধ হইল। দিল্লীর পথে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হইল। তাঁহার গ্রেপ্তারের সংবাদে দিল্লী, আহমেদাবাদ ও অন্যান্য স্থানে হাঙ্গামা হইল। বোম্বাইএ লইয়া গিয়া গান্ধীজীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কয়েক স্থানে হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠানের ফলে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। পাঞ্জাবের অত্যাচার সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য সরকার হাণ্টার কমিটি নামে এক কমিটি গঠন করিলেন। কংগ্রেসের উদ্যোগে পাঞ্জাবের অনাচার সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি তদন্তকারী কমিটি গঠিত হইল। ১৯১৯ সালে পণ্ডিত মতিলাল

নেহরুর সভাপতিত্বে অমৃতসরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইল। এই বারের কংগ্রেস অধিবেশনে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার অগ্রাহ্য করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। অন্য একটি প্রস্তাবে পাঞ্জাবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া পাঞ্জাবের গবর্ণর স্যার মাইকেল ও জেনারেল ডায়ারের পদচ্যুতি দাবী করা হইল। রাওলেট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাবও কংগ্রেসে গৃহীত হইল।

১৯২০ সালের প্রথম দিকে খিলাফৎ সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করিল। যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার ভারতীয় মুসলমানদিগকে খিলাফৎ সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করা হইল না। ইহাতে ভারতীয় মুসলমানগণ বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ হইলেন। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাইএ তৃতীয় খিলাফৎ সম্মেলন হইল। খিলাফৎ সমস্যা সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের মতামত জানিবার জন্য ইংলণ্ডে এক মুসলমান প্রতিনিধি দল প্রেরিত হইল। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ প্রতিনিধি দলকে যে উত্তর প্রদান করিলেন, তাহাতে ভারতের মুসলমান সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। গান্ধীজী ঘোষণা করিলেন যে, তুরস্কের সহিত যে সন্ধি করা হইবে তাহার সর্ত্ত যদি ভারতীয় মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে তাহা হইলে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। ১৯২০ সালের ৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত জাতীয় সপ্তাহ হিসাবে উদ্‌যাপিত হইল। মে মাসে তুরস্কের সহিত সন্ধির সর্ত্ত প্রকাশিত হইল। ইহাতে ভারতের মুসলমান সমাজ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সন্ধির সর্ত্ত প্রকাশিত হইবার কিছু দিন পরে গান্ধীজী মুসলমানদের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে অসহযোগ আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত করিলেন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা লোকমান্য তিলক গান্ধীজীর প্রস্তাবিত আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু তিনি কোনরূপ বাধা সৃষ্টিও করিলেন না। গান্ধীজী-প্রস্তাবিত আন্দোলন সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়া বলিলেন, যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে সত্য ও অহিংসার প্রয়োগ সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। গান্ধীজী বলিলেন, "I believe that it is possible to introduce uncompromising truth and honesty in the political life of the country. Whilst I would not expect the league to follow me in my civil disobedience methods, I would strain every nerve to make truth and non-violence accepted in all our national activities." ১৯২০ সালের ২৮শে মে তারিখে খিলাফৎ কমিটি গান্ধীজীর অসহযোগের প্রস্তাব গ্রহণ করিল। ২৮শে মে তারিখে পাঞ্জাবের ঘটনাবলী সম্পর্কে হাণ্টার কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। এই রিপোর্টে জনসাধারণ বিশেষ ভাবে অসন্তুষ্ট হইল। খিলাফৎ সমস্যা ও পাঞ্জাবের অত্যাচার সম্পর্কে আলোচনার জন্য কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। ইতিমধ্যে মুসলমানগণ তুরস্কের সহিত সন্ধির প্রতিবাদে 'হিজরাত' আন্দোলন আরম্ভ করিল। সহস্র সহস্র মুসলমান বৃটিশ-ভারত ত্যাগ করিয়া আফগানিস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। সিন্ধুতে এই আন্দোলন আরম্ভ হইল। শীঘ্রই ইহা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িল। কয়েক স্থানে সৈন্যবাহিনীর সহিত সংঘর্ষের ফলে বহু যাত্রী হতাহত হইল। আফগান কর্ত্তৃপক্ষ আফগানিস্থানে মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করায় এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটিল। গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আরম্ভ হইল। লালা লজপৎ রায় এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিলেন। এই অধিবেশনে গান্ধীজীর অসহযোগ সম্পর্কিত প্রস্তাব-গৃহীত হইল। কংগ্রেসের পরবর্ত্তী নাগপুর অধিবেশনে পাঞ্জাবের অত্যাচার ও খিলাফৎ সমস্যার কথা বর্ণনা করিয়া অসহযোগ সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হইল, "উপরোক্ত অন্যায় দুইটির প্রতিকার করা না হইলে ভারতে কোন প্রকার শান্তি আসিতে পারে না। ভবিষ্যতে যাহাতে আর এই ধরণের অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে না পারে এবং ভারতবাসীর জাতীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, সে জন্য স্বরাজ প্রতিষ্ঠাই একমাত্র উপায়। কংগ্রেস আরও মনে করেন যে, যে পর্য্যন্ত উপরোক্ত অন্যায় দুইটির প্রতিবিধান করা না হয় এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত ক্রম-পরিণতিমূলক অহিংস অসহযোগ নীতি অনুমোদন ও গ্রহণ করা ব্যতীত আর অন্য কোন পথ নাই।" নাগপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিলেন শ্রীযুক্ত বিজয় রাঘবাচারিয়া। নাগপুর অধিবেশনে ইহাও ঠিক হইল যে, 'বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ লাভই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।'

গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে নবযুগ আরম্ভ হইল। নিরস্ত্র, অসহায়, লাঞ্ছিত ভারতবাসীর অন্তরে নূতন আশার আলোক প্রজ্বলিত হইল। গান্ধীজী দেশবাসীকে স্বরাজ লাভের জন্য দুঃখ ও ত্যাগের পথে আহ্বান করিলেন। গান্ধীজী বলিলেন যে, সত্য ও অহিংসাই হইবে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতবাসীর সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুধ—সত্য ও অহিংসার পথে অবিচলিত থাকিয়া জনসাধারণকে দুঃখ বরণ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে—দুঃখ ও ত্যাগের পথেই স্বরাজ আসিবে। দেশবাসী আগ্রহের সহিত গান্ধীজীর এই নূতন আদর্শ গ্রহণ করিল। অসহযোগ আন্দোলন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। জনসাধারণ আত্মশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল। ছাত্রগণ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিল, আইনজীবীরা সরকারী আদালত পরিত্যাগ করিল, উপাধিধারীরা সরকারী উপাধি ত্যাগ করিয়া. বিদেশী সরকারের সহিত অসহযোগ করিল। অসহযোগ আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে বাংলা দেশ পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। দেশবন্ধুর আহ্বানে সহস্র সহস্র ছাত্র স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করিয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বিদেশী বস্ত্র ও বিদেশী দ্রব্য বয়কট এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। দেশের সর্বত্র জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় ও জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়িয়া উঠিতে লাগিল। গান্ধীজীর উদাত্ত আহ্বানে বহু যুগের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেশ জাগিয়া উঠিল। দেশবাসী নূতন আদর্শে ও নব প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিল। আন্দোলনের গতিরোধ করার জন্য সরকার দমন-নীতিমূলক সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিল। দেশপ্রেমিক অসহযোগীদের পাদস্পর্শে ভারতের কারাগার সমূহ পবিত্র হইয়া উঠিল। সরকার একে-একে নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ১৯২১

সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখে প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমন উপলক্ষে দেশের সর্বত্র হরতাল অনুষ্ঠিত হইল। বোম্বাইএ জনসাধারণের সহিত পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষের ফলে কয়েক শত লোক হতাহত হইল। কর্তৃপক্ষ বাংলায় দেশবন্ধু দাশ, বাসন্তী দেবী ও তাঁহাদের পুত্রকে গ্রেপ্তার করিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, লালা লজপৎ রায়-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ একে একে গ্রেপ্তার হইলেন। স্বরাজ লাভের জন্য দেশবাসী হাসিমুখে সরকারী দমন-নীতির সম্মুখীন হইল। সরকার ৩০ হাজারের অধিক লোককে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু জনসাধারণের উৎসাহ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতে লাগিল। স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসী সর্বস্ব ত্যাগের মন্ত্র গ্রহণ করিল। কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। তিনি কারাগারে থাকায় হাকিম আজমল খাঁ আমেদাবাদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিলেন। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু দেশবন্ধুর অভিভাষণ পাঠ করিলেন। আমেদাবাদ অধিবেশনে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নীতি সমর্থন করা হইল এবং দেশবাসীকে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইল। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হইল, "এই অধিবেশনের মতে সকল প্রকারের অত্যাচার-অবিচারের প্রতিকার হিসাবে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিবর্তে একমাত্র কার্যকরী পন্থা হইতেছে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা। সুতরাং যে সমস্ত কংগ্রেসকর্মী বিশ্বাস করেন যে, এই দায়িত্বহীন সরকারকে স্থানভ্রষ্ট করিতে হইলে আত্মত্যাগ ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই, এই অধিবেশন তাহাদিগকে ব্যক্তিগত আইন অমান্য ও যেখানে জনগণকে অহিংস থাকিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে সেখানে ব্যাপক ভাবে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছে।" আমেদাবাদ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সক্রিয় আন্দোলনের পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হইল। গান্ধীজী নিজ তত্ত্বাবধানে গুজরাটের বরদৌলী তালুকে কর-বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত করিলেন। ১৯২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে বড়লাট লর্ড রিডিংএর নিকট লিখিত এক পত্রে গান্ধীজী বলিলেন, "Had the Government policy remained neutral and allowed public opinion to ripen and have its full effect, it would have been possible to advise postponement of the adoption of civil disobedience of an aggressive type till the congress had acquired fuller control over the forces of violence in the country and enforced greater discipline among the millions of its adherents. But the lawless repression (in a way unparalleled in the history of this unfortunate country) has made immediate adoption of mass civil disobedience an imperative duty." অর্থাৎ "গবর্ণমেন্ট যদি নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়া দেশের জনমতকে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে দিতেন, তাহা হইলে দেশের হিংসাত্মক শক্তি সমূহের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ না করা পর্যন্ত কংগ্রেস দেশবাসীকে আক্রমণাত্মক আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে পরামর্শ দিত না। কিন্তু গবর্ণমেন্ট বে-আইনী দমন-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করায় কংগ্রেসের পক্ষে ব্যাপক ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা ব্যতীত আর কোন পথ নাই।" আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইল। দেশের তরুণ সম্প্রদায় সর্বত্র শান্তিপূর্ণ ভাবে আইন অমান্য করিয়া হাসিমুখে নির্যাতন সহ্য করিতে লাগিল। ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যুক্তপ্রদেশের চৌরীচৌরা নামক স্থানে জনসাধারণ হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করিল। ইহার ফলে কয়েক জন পুলিশ কনস্টেবল অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা গেল। ইহার পূর্বে বোম্বাইএ ও মাদ্রাজে জনসাধারণের মধ্যে হিংসার মনোভাব আত্মপ্রকাশ করে। এই সকল হিংসাত্মক কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়ায় গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখের বৈঠকে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠক হইল। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ব্যক্তিগত আইন অমান্য করিবার অনুমতি দিল, কিন্তু এই বৈঠকে ব্যাপক ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার সিদ্ধান্তের জন্য গান্ধীজীকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইল। ১৩ই মার্চ তারিখে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হইলেন। ১৮ই মার্চ তারিখে আমেদাবাদে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক বিচার আরম্ভ হইল। গান্ধীজীর সহিত শ্রীযুত ব্যাংকারও অভিযুক্ত হইলেন। গান্ধীজী এক লিখিত বিবৃতিতে বলিলেন, "In fact I believe, I have rendered a service to India and England by showing in non-co-operation the way out of the unnatural state in which both are living. In my humble opinion non-co-operation with evil is as much a duty as co-operation with good." অর্থাৎ "ভারত ও ইংলণ্ড যে অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে অবস্থান করিতেছে, অসহযোগের মধ্য দিয়া, তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিবার উপায় প্রদর্শন করিয়া, আমি উভয় দেশের সেবা করিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করি। আমার মতে শুভের সহিত সহযোগিতা করাও যেরূপ আমাদের কর্তব্য, অশুভের সহিত অসহযোগিতা করাও আমাদের সেইরূপ কর্তব্য।" বিচারে গান্ধীজীর ছয় বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইল। শ্রীযুত ব্যাংকারের এক বৎসর কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইল। গান্ধীজীর কারাদণ্ডের পর সরকার কঠোর দমন-নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইল। গ্রামবাসীদের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হইল। নবেম্বর মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠক হইল। এই বৈঠকে এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, দেশ ব্যাপক ভাবে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত নহে। কাউন্সিল প্রবেশের প্রশ্ন কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের জন্য স্থগিত রাখা হইল। ১৯২২ সালে গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইল—সভাপতিত্ব করিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। কংগ্রেসের অধিবেশনে কাউন্সিল প্রবেশের প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল—কাউন্সিল বয়কটের পক্ষেই

অধিকাংশ প্রতিনিধি মত দিলেন। ইহার ফলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নিখিল ভারত স্বরাজ্য দল গঠন করিলেন। স্বরাজ্য দলের সভাপতি হইলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং সম্পাদক হইলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দল গঠনে তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় সংগঠন-প্রতিভা ও কুশাগ্রবুদ্ধি নিযুক্ত করিলেন। দেশবন্ধু দাশের নেতৃত্বে অচিরেই স্বরাজ্য দল আইন সভা সমূহে প্রবেশ করিয়া সরকারকে অচল করিয়া তুলিল। কাউনসিল প্রবেশ সম্পর্কিত বিরোধ মীমাংসার জন্ত কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার সিদ্ধান্ত করা হইল। দিল্লীতে কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দিল্লী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিলেন। যে সকল কংগ্রেসকর্ম্মী আইন সভায় প্রবেশ করিতে চাহেন, দিল্লী অধিবেশনে তাঁহাদিগকে আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেওয়া হইল। দিল্লী অধিবেশনের কিছু দিন পূর্বে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে নাগপুরে পতাকা সত্যাগ্রহ সাফল্যমণ্ডিত হয়। সত্যাগ্রহীদের অভিনন্দিত করিয়া দিল্লী কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। ১৯২৩ সালে কোকনদে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। মৌলানা মহম্মদ আলী কোকনদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। কোকনদে দিল্লী কংগ্রেসের কাউনসিল প্রবেশ সম্পর্কিত প্রস্তাব সমর্থিত হইল। ১৯২৪ সালের প্রথম দিকে গান্ধীজী কারাগারে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদে সমগ্র দেশে উদ্বেগের সঞ্চার হইল। কর্তৃপক্ষ গান্ধীজীকে মুক্তিদান করিলেন। গান্ধীজী কিছু দিন সমুদ্রতীরে জুহুতে অতিবাহিত করিলেন। সেখানে স্বরাজ্য দল সম্পর্কে তাঁহার সহিত পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আলোচনা হইল। এই আলোচনার পর গান্ধীজী এক বিবৃতিতে কাউনসিল বয়কটের পক্ষপাতী কংগ্রেসকর্মীদের গঠনমূলক কর্মসূচী অনুসরণ করিতে বলিলেন। ১৯২৪ সালে দেশের নানা স্থানে—দিল্লীতে, নাগপুরে, এলাহাবাদ ও কোহাটে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইল। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় বিশেষ ভাবে ব্যথিত হইয়া গান্ধীজী মৌলানা মহম্মদ আলীর গৃহে ২১ দিনব্যাপী অনশন আরম্ভ করেন। গান্ধীজী সাফল্যের সহিত অনশন সমাপ্ত করেন। ১৯২৪ সালের শেষ দিকে গান্ধীজী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মতিলালজীর কাউনসিল প্রবেশ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। ১৯২৪ সালের বেলগাঁও কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী সভাপতিত্ব করিলেন। বেলগাঁও কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীজী ঘোষণা করিলেন, "I would strive for swaraj within the Empire but would not hesitate to sever all connection if severence became a necessity through Britain's own fault" অর্থাৎ—"আমি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী, কিন্তু প্রয়োজন হইলে সাম্রাজ্যের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে ইতস্ততঃ করিব না।" গান্ধীজী স্বরাজ লাভের জন্ত চরকা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও অস্পৃশ্যতা বর্জনের উপর জোর দিলেন এবং স্বরাজের ভিত্তি সম্পর্কে তাঁহার পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন। এ বৎসর বাংলা দেশে বহু যুবককে গ্রেপ্তার করা হইল। সুভাষচন্দ্রও গ্রেপ্তার হইলেন। কঠোর দমন-নীতির সাহায্যে সরকার বাংলার প্রাণশক্তিকে বিনষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলকে আঘাত করা গবর্ণমেণ্টের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বাংলা দেশে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা অচল হইয়া উঠিল। দেশবন্ধু বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠন করিতে অস্বীকার করিলেন এবং অন্ত কাহারও পক্ষে বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হইল না। মধ্যপ্রদেশ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও কম-বেশী পরিমাণে আইন সভার অভ্যন্তরে গবর্ণমেণ্টকে বাধা দিবার নীতি কার্য্যকরী করা হইল। স্বরাজ্য দলের সমবেত চেষ্টার ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রায় অচল হইয়া উঠিল।

[ক্রমশঃ

সে

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

বিকেলের আলো যেন ডানা-ভেঙে-যাওয়া ছোট পাখি—
হলুদ-ডানার সুরে নেমে এলো রূপালি নদীতে,
ওপারে শ্যামলী সন্ধ্যা রূপনীবি—অঞ্চল ছড়ালো ;
ঘনিষ্ঠ আকাশ হ'য়ে আমারে কি এসেছিলে নিতে ?

তবে কেন সেই মাঠ-বন আর নদীর আঁচলে
চলে-যাওয়াটির ছায়া পড়ে-আসা বাতাসে ঘনালো ?

আজ আমি মুছে গেছি যেন কা'র চোখের কাজলে !

সেদিনের দেয়ালিতে যার মুখ লেগেছিলো ভালো,
[illegible] মুহূর্ত হ'য়ে ছায়া-পথে সে কেন দাঁড়ালো ?

[৩০৪ পৃষ্ঠার পর]

জীবন, সাহিত্য ও দর্শন

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।"

"(যিনি উদ্যত-বজ্র, ভয়াভিভবকারী মহদ্ভয়) তাঁহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং মৃত্যু স্ব স্ব ধর্ম পালনে তৎপর"। অতএব আপাত-দৃষ্টিতে যাহা দ্বৈতশাসন, অন্তর্দৃষ্টিতে তাহার অদ্বৈত-স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এই জন্যই ঈশোপনিষদের মর্মস্থল হইতে এই সত্যধর্মাশ্রয় অদ্বৈত-তত্ত্ব সূর্য্যোপাসনা-প্রসঙ্গে প্রচারিত হইল :—

"পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোহ সাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।"

"হে জগতের পোষক সূর্য্য, হে একচারী, হে সংযমনকারী, হে প্রজাপতি-তনয় সূর্য্য, তোমার তেজ সংবরণ কর এবং তোমার রশ্মিসমূহ সংহত কর। তোমার যে কল্যাণতম রূপ, তাহাই আমি দর্শন করি। ঐ যে আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ তিনিই আমি।" ইহারই ব্যাখ্যাক্রমে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"কিঞ্চ ন তু অহং ত্বাং ভৃত্যবদ্ যাচে"—"অধিকন্তু (হে আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ) আমি তোমার সমীপে ভৃত্যের ন্যায় প্রার্থনা করিতেছি না"। এই উক্তিটি আকারে সামান্য হইলেও ইহার ব্যঞ্জনা অসামান্য। মানুষের এই বোধ যখন জাগ্রত হয়, তখন সে প্রকৃতির দাসত্ব হইতে স্বভাবের মহিমায়, ভয়ের নৈরাজ্য হইতে আত্মার স্বারাজ্যে উত্তীর্ণ হয়। অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের ইতিহাসে এই স্বাধিকার-বোধ, এই আত্ম-স্বরূপ প্রতিষ্ঠা, এই অন্তরলোক-প্রাপ্তি এক যুগসন্ধির সূচনা করে। যদিও এ ক্ষেত্রে প্রায়ই বলা হয়—"Fear of the Lord is the beginning of all wisdom"—কিন্তু এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, বিশ্বেশ্বরের এই রুদ্ররূপধ্যান প্রজ্ঞানের উপক্রমণিকা মাত্র, কদাচ তাহার উপসংহার হইতে পারে না।

সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে "স্ব"—অধীনতার সাধনা

এই স্বাধীনতা বা "স্ব"-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ভারতীয় দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ। ইহা নঞর্থক বন্ধন-মুক্তির অবস্থা মাত্র নয়, কিন্তু সদর্থক স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার অনুশাসন। এই মুক্তিতত্ত্বই সকল দর্শন-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাভূমি। অধিকাংশ স্থলেই মুক্তিকে বাসনা-কামনার অতীত এক চাঞ্চল্যবিহীন, পরিতৃপ্ত, আত্মকেন্দ্রিক অবস্থারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। মানুষ মুক্তি চায় অর্থাৎ অভাবের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্ব-ভাবের, আত্মকাম, আত্মরতি, আত্মার স্বাধিকারে স্থির-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্বাধীনতা" শব্দটির মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা, যা'র উৎপত্তি ছিল তাঁর "জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ের" ধ্যানজ-প্রমায়, সহজ প্রত্যয়ের মধ্যে। তাঁরই ভাষায় বলি "স্বাধীনতা আত্মার অন্তরের ভাব। সেই স্বাধীনতা সুখই সকল সুখ, যাহা আমরা লাভ করিতে পারি স্বাধীন ভাবে ঈশ্বরের অধীন হওয়ায়।" স্বাধীনতার সম্পর্কে এই অধীন হওয়ার শিক্ষাও সাধনা যে অপরিহার্য্য, তাহা এখনও আমাদের উপলব্ধিতে আসে নাই। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য-সুন্দর ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়, "মানুষ মুক্তির চেয়ে ঢের বেশী চায়। মানুষ অধীন হ'তেই চায়—যার অধীন হলে অধীনতার অন্ত থাকে না তারই অধীন হবার জন্য সে কাঁদছে।···সে বলছে "হে নাথ, আমাকে অধীন করে নত করে বাঁচাও।" আধ্যাত্মিক জীবনের এই চরম সার্থকতা অপরূপ প্রকাশ-মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে পূর্ব্ববঙ্গের অশিক্ষিত সেই বাউলের দোঁহাতে, যিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় গাহিয়া উঠিয়াছিলেন :—

"হৃদয় কমল উঠ্‌তেছে ফুটি কত যুগ ধরি
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, উপায় কি করি?
ফুটে ফুটে কমল ফুটার না হয় শেষ,
আমার প্রভুর একটি কমল, রস যে তায় বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারো না যে তাই,
তা'তে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা মুক্তি কোথাও নাই।"

যেমন মুক্তিতত্ত্বে তেমনই সৃষ্টিতত্ত্বে পাই এইরূপ "ব্রাত্য" অর্থাৎ অসংস্কৃত বাউল, আউল, সহজিয়া প্রভৃতি "ভারত-পন্থ" সাধকের প্রাণময় স্পর্শ ও তাহাদের চিরন্তন অবদান। এর সমর্থনও দেখি উপনিষদ ঋষির প্রাণপ্রশস্তিতে—"ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণঃ"—"হে প্রাণ, তুমি প্রথমজাত ও অসংস্কৃত এবং (সেই কারণেই) তুমি আজন্মশুদ্ধ ও সংস্কারপ্রয়োজনরহিত"। সংস্কৃত সাহিত্য-সভায় অপাংক্তেয় এই সব কবি ও ভজন-সাধকদের একমাত্র উপজীব্য লৌকিক ভাষা—রূপকনাট্য, দেহতত্ত্বের গান ইত্যাদি। এই জন্যই ভক্ত কবীরের খেদোক্তি মনে পড়ে—"সংস্কৃত হৈ কূপজল ভাষা বহতানীর।" অবরোধ সুরক্ষিত কূপজলেরই শোধন-প্রয়োজন অনুভূত হয়, কিন্তু চিরপ্রবহমান জলধারার সহজ নৈর্ম্মল্য ও শুদ্ধসত্ত্ব ত প্রত্যক্ষ। ভারতীয় সংস্কৃতি এই ভাব ভাষার সাহচর্য্যে আবহমান কাল বন্যাধারার ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে জনগণচিত্তকে অভিষিক্ত ও অনুপ্রাণিত করিয়া আসিয়াছে। পঠন-পাঠনে অক্ষম লোকদের মধ্যেও এইভাবে সার্থক হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ যাহাকে বলিয়াছিলেন—"শিক্ষার বিকিরণ"।

সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্পর্কে প্রাচ্য বা প্রতীচ্য দর্শনের বিবিধ শাখা-প্রশাখায় যে সকল মতবাদ—যথা, দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ কিংবা সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদ প্রভৃতি এ যাবৎ পল্লবিত হইয়াছে, তাহাতে সৃষ্টির মূলরূপই আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞান বিচার-বিশ্লেষণ-পদ্ধতিতে অণু-পরমাণু, সংযোগ-বিয়োগাত্মক তাড়িত-শক্তির তাড়নায় রেখাকার-মাত্রিক এমন এক জগতের ("metrical world") সীমানায় উপনীত হয়, যেখানে সত্যদৃষ্টিতে সৃষ্টিই নাই, থাকিলেও প্রলয়েরই নামান্তর। জড়বস্তু বা জগৎ কেবল মাত্র আকার-নির্দ্দেশক চিহ্নসমষ্টি (schedule of pointer-readings") নয়। দেশকালের বৈচিত্র্য-ভূমিকায় আমাদের মন, আমাদের চেতনাশক্তি, প্রতি মুহূর্ত্তে যাহা গ্রহণ করিতেছে, তৎসমুদায়ই "সৃষ্টি"-পদবাচ্য। জ্ঞানমাত্রেই যে মানসী-ক্রিয়া, তাহা ছায়ামাত্র গ্রহণে পর্য্যবসিত হইতেই পারে না—সৃষ্টিতে মনের সম্পর্ক নিবিড়তর, মন সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। এই মনের ব্যাপক অথবা সমগ্র দৃষ্টি আপেক্ষিক বা ঐকদেশিক ভগ্নাংশ দৃষ্টিসামগ্রীর সমন্বয়ে লাভ করা যায় না। সেই সৃষ্টির উদ্ভব হয় এই বোধে যে, জগতটা আমার—আমার জ্ঞানের, আমার হৃদয়াবেগের, আমার আনন্দ বা

সৌন্দর্য্যরসানুভূতির যোগেই সৃষ্ট—ওটা মেডিয়ো চাঞ্চল্য মাত্র নয়। "ঈথর" (ether) পদার্থের কম্পন মাত্রেই আলোকের সৃষ্টি হয় না, আলোকের উদ্ভব আলোকের অনুভবে। "অনুগ্রহ" বা পশ্চাদ্‌গ্রহণ যেরূপ পৌরুষের বোধের কারণ,—"অনুনয়" সেরূপ সৌন্দর্য্য-বোধের প্রাণ। যখনই কোনও সুন্দর বস্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার অন্তস্তল হইতে যেন এই আবেদন শুনিতে পাই—"তোমাদেরই মন পাইবার জন্য এই বিশ্বের প্রাঙ্গণে আমরা উন্মুখ হইয়া আছি। আমাদের দিকে কি একবার তাকাইয়া দেখিবে না? তাকাইয়া দেখিতেই হয়, কারণ কোথায় যেন নিবিড় নাড়ীর যোগ অনুভব করি, কি যেন পরিচিত আলোকের আভা আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করে। এ ক্ষেত্রেও দেখি, পূর্ব্ববঙ্গের এক অশিক্ষিত গ্রাম্য কবি সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মর্ম্মবাণী ব্যাখ্যা করিয়া সরল ভাষায় বলিয়াছেন—

"রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে।"

এই আপনার রূপ, এই "স্ব"-রূপকে কেন্দ্র করিয়াই ত আমাদের সব ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বন্ধন ও মুক্তি। মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরবই এই যে, সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের তুলনায় সে এক অসমাপিকা সৃষ্টি। মানুষ তার সমস্ত বেদনা ও কামনা, আকৃতি ও আপ্তির মাধ্যমে নিরন্তর আপনাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এই জন্যই প্রত্যেক মানুষ এক একটি "ব্যক্তি" অর্থাৎ এক অতীন্দ্রিয়, অব্যক্ত শক্তির সহিত ব্যক্ত রূপের একটি যোজক সেতু মাত্র। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে সে জন্য বলা হয়—"selfhood is a process", "ব্যক্তিত্ব একটি নিরবচ্ছিন্ন পরিণাম-পদ্ধতি।" উপনিষদ দর্শনে ইহাকে "অতিসৃষ্টি" বলা হইয়াছে এবং ইহার সৃষ্ট্যূর্দ্ধ সত্তা যে অথর্ব্ববেদোক্ত "উচ্ছিষ্ট" দ্বারা প্রভাবিত, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। "ব্যক্তি" শব্দটির মৌলিক অর্থ প্রকাশ অর্থাৎ আমার প্রতি মুহূর্ত্তের আচার-ব্যবহার, আহার-বিহারে আমি আপনাকেই প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু এই প্রকাশকে আমি অতিক্রম করিয়াও আছি। "আমার এক কোটিতে অন্ত, আর এক কোটিতে অনন্ত। আমার অব্যক্ত-আমি আমার ব্যক্ত-আমির যোগে সত্য, আমার ব্যক্ত—আমি আমার অব্যক্ত-আমির যোগে সত্য।" এরই জন্য আমার এই "আমিত্ব" বা "ব্যক্তিত্ব" অনির্দ্দেশ্য ও অনির্ব্বচনীয়।

তথাপি এই "স্ব" বা "ব্যক্তি"কে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সকল শিক্ষা ও দীক্ষা, প্রেরণা ও প্রয়াস। একে চাক্ষুষ দৃষ্টিতে লাভ করা যায় না, অথচ মনে করি যে, আমাদের এত কাছে-কাছে যে রয়েছে অনুক্ষণ, সে ত চোখে-চোখেই আছে। দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-সভায় পঞ্চ নলের মধ্যে চির-আকাঙ্ক্ষিত মানুষ নলকে চাক্ষুষ দৃষ্টিতে নির্ব্বাচন-অসমর্থা দময়ন্তীর বিহ্বলতার মধ্যে; রূপকের ভূমিকায় এই সত্যেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। প্রতীচীর কবিও সেই গহন-গোপন, প্রেমিকসুলভ ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে এই নিগূঢ় তত্ত্বের আভাস দিয়াছেন—

"Room after room
I hunt the house through
We inhabit together,
Heart, fear nothing, for, heart,
thou shalt find her,
Next time, herself !......
Yet the day wears,
And door succeeds door,
I try the fresh fortune—
Range the wide house from the
wing to the centre,
Still the same chance ; She goes
out as I enter"...
—(Browning : "Love in a life")

"নাই, তুমি নাই।
এ-ঘর ও-ঘর শুধু আতি-পাতি খুঁজিয়া বেড়াই।
এই গৃহে আছ তুমি জানে এ হৃদয়,
তাই তার অটুট প্রত্যয়
—পাবে তব দেখা !...
বেলা যায় বৃথা অন্বেষণে,
দ্বার হতে দ্বারান্তরে ফিরি শুধু চঞ্চল চরণে।
সুবিপুল এই গৃহে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াই,
হই ব্যর্থ, তবু ভাবি এইবার যদি দেখা পাই !
যেমনি ঢুকিনু কোনো ঘরে,
মনে হল অমনি সে পালাল সত্বরে।
ধীরে ধীরে গোধূলি ঘনায়,
কত ঘর আছে বাকী! শূন্য মনে ফিরি পায় পায়।"
—(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র "ব্রাউনীং পঞ্চাশিকা"—"অন্বেষণ")

চাক্ষুষ-দৃষ্টিতে যদি এই একান্ত-প্রার্থিত ব্যক্তিকে না পাই, তবে কি প্রত্যয়, ভাব-ব্যঞ্জনা, বা সংকল্পের মধ্যে পাই? তাও ত নয়। এই জন্যই ত শিশুর মা বুঝিতে পারেন না, কি যাদুমন্ত্রে সর্ব্বসাধারণী "খোকা" তাঁর অনন্য-সাধারণ খোকাতে বিকশিত হয়ে উঠে—

"নির্ণিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝি নে রে
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে।"

ব্যক্তিত্বের এই চিরন্তন রহস্য উপলব্ধি করলেন দুঃখদাহের মধ্যে বিপ্রলব্ধা রাণী সুদর্শনা তাঁর অশ্রুসজল স্বীকৃতিতে—

"তুমি সুন্দর নও, প্রভু, সুন্দর নও তুমি অনুপম"। এই নির্ব্বাচনত্বের নিরন্তন প্রয়াসের মধ্যে এই যে অনির্ব্বচনীয়ত্বের উপলব্ধি, ইহাই সৃষ্টির নিগূঢ়তম রহস্য, একাধারে ইহার তথ্য ও তত্ত্ব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সুন্দর ভাষায় বলিতে হয়—"আমি ধন্য যে, আমি পান্থশালায় বাস করচি নে, রাজপ্রাসাদের এক কামরাতেও আমার বাস নির্দ্দিষ্ট হয়নি; এমন জগতে আমার স্থান, আমার আপনাকে দিয়ে যার সৃষ্টি; সেই জন্যই এ কেবল পঞ্চভূত বা চৌষট্টি ভূতের আড্ডা নয়, এ আমার হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলা-ভবন, আমার প্রেমের মিলন-তীর্থ।"

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

দেশের কথা

'আসানসোল হিতৈষী' বলিতেছেন :—"স্বাধীন ভারতে সাহেবেরা দেশ ছাড়িয়া গেল। কিন্তু লজ্জার কথা, সাহেবীয়ানা দেশ ছাড়িল না। সেদিন কার্য্যোপলক্ষে আসানসোল আদালতে গিয়াছিলাম, দেখিলাম কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইংরাজী আমলের মত সেই কোট, প্যাণ্ট, হ্যাট প্রভৃতি ইংরাজী পোষাক-পরিহিত হাকিম এবং উকিল। সেই "বিলাতি ধরণে হাসি, বিলাতি ধরণে কাশি এবং পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে বড্ডই ভালবাসি"। এখনও সেই ইংরাজী আদব-কায়দা আয়ত্ত করিবার উৎকট প্রয়াস। কেবল তাহাই নহে, যিনি যত বেশী নিখুঁত ভাবে বিজাতীয় পোষাক পরিতে পারিয়াছেন, তিনি তত বেশী আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন এবং তাঁহার এই এই সাহেবী পোষাকের জন্য দেশবাসী তাঁহাকে সম্ভ্রম করুক, ইহাই যেন আশা করিতেছেন এবং জাতীয় পোষাক-পরিহিত জন-সাধারণের প্রতি যেন অনুকম্পা-মিশ্রিত দৃষ্টিতে চাহিতেছেন। স্বাধীন ভারতে এই লজ্জাকর দৃশ্য আর কত দিন দেখিতে হইবে? এই সকল দাঁড়কাকদিগকে কে বুঝাইবে—এই ধার-করা ময়ূরপুচ্ছের জৌলুস দেখাইবার দিন আর নাই। যাহাদের খুসী করিবার জন্য তাঁহারা দেশী পোষাক ছাড়িয়া এই দাসত্বের সাজ গায়ে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহারাই যে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে না হয় বুঝিতাম, ইংরাজ লাটকে খুসী করিবার জন্য দেশী কমিশনার, ইংরাজ কমিশনারকে খুসী করিবার জন্য দেশী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে খুসী করিবার জন্য দেশী এস, ডি, ও বিলাতি পোষাক পরিতেন। কিন্তু আজ তো লাট সাহেবের দেশী পোষাক, গভর্ণর জেনারেলের ধুতি, পাঞ্জাবী, উত্তরীয়, আজ কাহার জন্য তাঁহাদের এই বিসদৃশ আচরণ?" সহযোগীর বক্তব্য আমরা অতি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি এবং দেশ ও সমাজ-নায়কদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

* * * *

সহযোগী আরো বলিতেছেন :—"আজ স্বাধীন ভারতে যাঁহারা সরকারী দায়িত্বশীল এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এবং যাঁহারা সমাজে মান্য ও প্রতিপত্তিশালী বলিয়া বিবেচিত—যেমন উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি। উঁহাদিগের এই দণ্ডেই, অন্ততঃ কর্ম্মক্ষেত্রে ইংরাজী পোষাক ছাড়িয়া দেশী পোষাক গ্রহণ করা উচিত। জাতীয় সরকারের উচিত, অবিলম্বে এ বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট নির্দেশ দান; কেন না, এখানে ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং আদালতে উকিলগণ কর্ম যে ইংরাজী পোষাক পরিবেন, তাহার কোন কারণই আমরা খুঁজিয়া পাই না এবং উহাকে জাতির আত্ম-সম্মানের হানিকর এবং নৈতিক বিকাশের ও জাতীয়তা পথের অন্তরায় বলিয়া মনে করি। আজ যদি দেশের জনসাধারণ না দেখে যে, তাহাদেরই মত ধুতি পাঞ্জাবী বা পায়জামা পাঞ্জাবী-পরিহিত তাহাদেরই দেশের লোক দেশের সর্ব্ববিধ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সাহেবদের অপেক্ষাও ভাল ভাবে করিয়া যাইতেছেন, তাহা হইলে তাহাদের আত্মবিশ্বাস, দায়িত্ববোধ, সাহস এবং নৈতিক বলের স্ফুরণ হইবে কিসে? ইংরাজী পোষাকের ভূতের ভয় স্বাধীন ভারতে আজিও কি চালাইয়া যাইতে হইবে? সরকারী কর্ম্মচারীরা Public Servant বা জনসেবক। ইংরাজী পোষাক পরিয়া সার্কেল অফিসার পল্লীগ্রামে যাইলে কেহ তাঁহাকে জনসেবক মনে করিবে, না মনে করিবে, আমাদের উপর কতকগুলা হুকুম চালাইতে আসিয়াছে। সেই জন্য এই সকল ব্যবস্থা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে শীঘ্রই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং ইংরাজী পোষাক পরিহিত সরকারী কর্ম্মচারী-রূপ কুদৃশ্য হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" কিন্তু সাহেবী পোষাকের বিরুদ্ধে বলিবার বহু কিছু থাকিলেও ইহার স্বপক্ষে বলিবার কি কিছুই নাই? এমন কতকগুলি কাজ-কর্ম্ম বর্ত্তমান জগতে আছে যাহা ধুতী-চাদর পরিয়া করা সহজ নহে—উচিতও নয়। কাজেই সামাজিক ভাবে বিদেশী পোষাক বর্জ্জন সমর্থন করিলেও ইহা কোন কোন বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের ব্যবহার করিতে হইবেই।

* * * *

'বর্দ্ধমান' বলেন :—"জমিদারগণ কর্ত্তৃক বেগার ও বাজে আদায় বহু দিন হইতে সরকার বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু কুদে জমিদার ও জোতদারগণের নিকট দেশ ও রাষ্ট্রের কোন আইনই বড় কথা নয়। নিজ নিজ এলাকায় তাহারাই তো দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। দরিদ্র শ্রমিকগণের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া তাহারা আজও নিরঙ্কুশ ভাবে এই বে-আইনী কার্য্য চালাইতেছেন। সরকারী কর্ম্মচারিগণ স্বার্থের লোভে ইহাদের চটাইতে রাজী নহেন। অতঃপর যাহাতে এই বে-আইনী কার্য বন্ধ হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিবার জন্য আমরা জেলা-শাসককে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি এবং জমিদার-দিগকেও সময়ের সহিত তাল রাখিয়া চলিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।" ইহার প্রতিকার বোধ হয় সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নহে। জনগণ এ-অত্যাচারের প্রতিবাদ অতি সহজে এবং এক দিনেই করিতে পারেন। কেমন করিয়া, তাহা বোধ হয় খুলিয়া বলিবার দরকার নাই।

* * * *

ঢাকার 'জিন্দেগী' পত্রিকার প্রকাশ :—"ইদানিং বিভিন্ন সরকারী, বে-সরকারী অফিস ও ব্যবসায় কেন্দ্র হইতে যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, উজিরে আজমের বাণী দেশবাসী ভুলিয়া গিয়াছে। আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ও স্বেচ্ছাচারিতা এখনও বিদ্যমান। উৎকোচের উৎখাত এখনও হয় নাই। ডিপুটি সার্জেন জেনারেলের নারায়ণগঞ্জস্থ ষ্টোরের যে সমস্ত সংবাদ ও দলিলপত্র আমরা পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয়, সরকার আশু ইহার প্রতি মনোযোগ না দিলে অবস্থা আরো খারাপ হইবে। কিছু দিন পূর্ব্বে উক্ত অফিস হইতে কড়া আর্ম গার্ডের প্রহরার মধ্য হইতে গবর্ণমেন্টের বহু টাকার কাপড় রহস্যজনক ভাবে চুরি হয়। যদিও অধিকাংশ চোরাইমাল উদ্ধার হইয়াছে, কিন্তু সুদক্ষ কূট-কৌশলী চোর চোখের সামনে ঘুরিয়াও ধরা পড়িতেছে না। প্রহরারত পুলিশদিগকে ঘটনার পর কৌশলে অপসারণ করিয়া তৎস্থলে নতুন পুলিশ আমদানী করার ফলে তাহাদের নিকট হইতে চুরির কোন হদিসই পাওয়া সম্ভবপর হয় নাই। অধিকন্তু কতিপয় নিরপরাধ যোগ্যতাসম্পন্ন সিনিয়ার অফিসারকে অন্যায় ভাবে বদলী, বরখাস্ত ও নিম্নস্থ পদে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং মজার কথা, রাতারাতি নিম্নপদস্থ এসিষ্টেন্টদিগকে প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে। জনৈক গ্রাজুয়েট সিনিয়ার এসিষ্ট্যান্টকে ছুটিতে কিছু দিন অনুপস্থিত রাখিয়া নানা ছুতানাতায় তাহাকে আর কাজে যোগ দিতে দেওয়া হয় নাই; পরন্তু তাহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হইয়াছে। উক্ত ভদ্রসন্তানটি অভাবের তাড়নায় প্রকৃতই পাগল হইতে বসিয়াছে। ইহার জন্য কে দায়ী?" এ-দিকেও যা' ও-দিকেও তা। অর্থাৎ কি না দ্রব্যবিশেষের এ-পিঠ ও-পিঠ। তাই নয় কি?

* * * *

'নীহার'-এ প্রকাশ সংবাদ :—"রাজ্য-পরিচালন, দেশ ও জাতি গঠন এবং সমাজ ও জনমত সুনিয়ন্ত্রণাদি দুরূহ কর্ত্তব্য-সাধনে সংবাদ-পত্রের শক্তি অসাধারণ বলিয়া স্বাধীন দেশে সংবাদপত্রের মর্য্যাদা সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বোচ্চে সংরক্ষিত হয়। এই সংবাদপত্রসেবিগণের সঙ্ঘবদ্ধতা আবার উহাকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া থাকে। সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত কোন বিরাট্ কাজই সহজে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। কলিকাতার সাপ্তাহিক সহযোগী 'বিশ্ববার্ত্তা'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেদিন ডায়মণ্ড হারবারে উপনীত হইয়া মফঃস্বলের সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলিকে লইয়া একটি শক্তিশালী সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘ নামে সমিতি স্থাপনের বিষয় উত্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া সহযোগী 'ডায়মণ্ডহারবার হিতৈষী' ঐ প্রস্তাবের সমীচীনতা উল্লেখ করিয়া ইহার সাফল্য উপভোগের কামনা করিয়াছেন। আজকাল নব-স্বাধীনতার উৎকট অধৈর্য্যে চারি দিকেই যেরূপ নানা বিভেদ ও বিক্ষোভ বিভিন্নাকারে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে এখন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ঐ দেশ ও জন-কল্যাণকর প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করিতেছি। সংবাদপত্র পরিচালন কার্য্যে সুরেন্দ্র বাবুর যেরূপ দূরদর্শিতা ও নৈপুণ্য রহিয়াছে, তাহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ কার্য্যের দ্বারা প্রকৃত সুফল ফলিবে, যদি মফঃস্বলস্থ সংবাদপত্রসেবিগণ এই কার্য্যে অগ্রসর হন। আমরা এই কার্য্যে মফঃস্বল সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পরিচালক-মণ্ডলীর সহযোগিতা কামনা করিতেছি।" আমরাও করিতেছি। আশা করি, এই মফঃস্বল সাপ্তাহিক সংবাদপত্র-সঙ্ঘ নির্ভীক ভাবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিবেন। পত্র জোটবদ্ধ করিয়া কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে ভয় পাইবেন না।

* * *

'দৃষ্টি'র খবর :—পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সরকারী দপ্তরখানায় সাংবাদিকদের সম্মুখে বর্গাদার ও জমির মালিকের মধ্যে ফসল বণ্টন সম্পর্কিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি ঘোষণা করেন। ডাঃ রায় বলেন যে, বীজধান্য বাদে জমীর মোট উৎপন্ন ফসল তিন ভাগে ভাগ করিয়া এক ভাগ জমির মালিক, এক ভাগ বর্গাদার ও অবশিষ্ট এক ভাগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই ভাগ চাষের বলদ ও লাঙ্গল সরবরাহকারী এবং বাকী এক ভাগ জমির সার ও যান-বাহন প্রভৃতির ব্যয়বহনকারী পাইবেন। ফসল বণ্টনের এই নীতি বর্ত্তমান ফসলের মরশুম হইতেই প্রযোজ্য হইবে এবং ফসল বণ্টনে কোথাও কোন মতভেদ উপস্থিত হইলে বিভিন্ন কালেক্টার-গণ উপরোক্ত নীতি অনুসারেই বিরোধের মীমাংসা করিবেন বলিয়া গভর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।" শেষ পর্য্যন্ত সেই তে-ভাগা! কিছু দিন পূর্ব্বে এই ব্যবস্থা হইলে নানা হাঙ্গামা বাঁচিত, অনেকগুলি প্রাণও রক্ষা পাইত। নীতি ঘোষণা অবশ্য ভালই হইল, কিন্তু ইহার বাস্তব প্রয়োগ কি ভাবে হয়, তাহা দেখিবার অপেক্ষায় রহিলাম। সরকার একটা কথা মনে রাখিলে ভাল করিবেন, নীতি প্রয়োগ দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের হাতে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করে।

* * *

ভাগচাষীদের সম্বন্ধে 'ত্রিস্রোতা' বলিতেছেন :—"জেলার সর্ব্বত্র ধান কাটা সুরু হইয়াছে। নূতন ধান জোতদারের গোলায় উঠিতেছে। যাহারা ধান্য উৎপন্ন করিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই ভাগচাষী অর্থাৎ আধিয়ার। আধিয়ার হইতেছে উৎপন্ন ধান্যের অর্দ্ধাংশের মালিক। এই উৎপন্ন ধান্যের অর্দ্ধাংশও পায় না বলিয়া আধিয়ারদের দুঃখের অন্ত নাই এবং উদয়াস্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া ক্ষেত্রে ধান্য উৎপন্ন করিয়াও বৎসরের নিতান্ত পক্ষে ছয় সাত মাস তাহাদের অর্দ্ধাহারে থাকিতে হয়, না হয় নিজ নিজ জোতদারের নিকট হইতে কর্জ্জা ধান্য লইয়া সংসার চালাইতে হয়। নূতন ধান্য উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সুদ সহ জোতদার কর্জ্জা ধান্য আদায় করিয়া লয়। এই কর্জ্জা ধান্যের জের আধিয়ার তাহার আধিয়ারী জীবনে পরিশোধ করিয়া যাইতে পারে না। শুধু কেবল কর্জ্জা ধান্য ও তাহার সুদ আদায়ই শেষ নয়, ইহার উপর আরও কয়েক প্রকার আদায় আছে। প্রকৃত চাষী যাহারা, তাহাদের উৎপন্ন ধান্যে অর্দ্ধভাগ এবং যাহারা জমির মালিক তাহাদের অর্দ্ধভাগ। আইনে এই সকল আধিয়ারদের জমিতে কোন স্বত্ব দেওয়া হয় নাই। তাহারা মজুরদার মাত্র অর্থাৎ ফসলের অর্দ্ধ-ভাগের জন্য জোতদারের মুজুরী খাটে মাত্র। এই সকল দুর্দ্দশাগ্রস্ত, অভাবে জর্জ্জরিত, নিরন্ন ভাগচাষীদের দিয়া আবাদ চলিতেছে, আর আমরা বলিতেছি—জমিতে অধিক ফসল ফলাও। কাহার জমিতে কে অধিক ফসল ফলাইবে? জোতদার হাল চাষের বলদ দিলে তাহার জন্যও আধিয়ারদের অর্দ্ধভাগ হইতে ধান্য কাটিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে। জোতদারের এই সকল দাবী-দাওয়া মিটাইয়া ধান্য

উৎপন্ন করিয়াও ধান্য কাটা-মাড়ার পর যে ভাগচাষীদের প্রায় শূন্য-হস্তে ঘরে আসিয়া বসিতে হয়, তাহাদের নিকট গিয়া অধিক শস্য উৎপন্ন কর—এ কথা বলা প্রায় পরিহাসেরই সামিল।"

• • • •

'ত্রিস্রোতা' আরো বলেন :—"ধান কাটা-মাড়ার পর প্রবল জোতদার ও দুর্গত আধিয়ারদের মধ্যে ধান্যের ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া বিরোধ দেখা দেয়। আধিয়ার নিজ গৃহে কিছু ধান্য লইয়া যাক, ইহা অনেক জোতদার চায় না। অনেক জোতদার তখন তাহার কর্জ্জা ধান্য, ঐ ধান্যের সুদ, হাল ও বলদ বাবদ পাওনা, ইত্যাদি বহু পাওনা সম্বলিত দীর্ঘ তালিকা অথবা হিসাব দিয়া আধিয়ারদের অর্দ্ধভাগ হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করে। এই সকল বিরোধকে ভিত্তি করিয়া বিক্ষুব্ধ আধিয়ারদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এ জেলার কোন কোন অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বে তে-ভাগা আন্দোলন সুরু হইয়াছিল। তাহাতে গুলীও চলিয়াছিল। এই অশান্তির আগুন যাহাতে ছড়াইয়া না পড়ে, যাহাতে ন্যায়সঙ্গত ভাবে আধিয়ারদের দাবী-দাওয়া মিটিতে পারে, তাহার জন্য গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব বিভাগের নির্দ্দেশক্রমে জেলায় ভাগচাষ নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠিত হইয়াছিল। তখন এরূপ শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল ও আধিয়ারগণও শুনিয়াছিল যে, শীঘ্রই এরূপ আইন হইতেছে, যাহাতে তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অবসান হইবে।" 'ত্রিস্রোতার' কথা অবহেলার নহে। সহরবাসীরা সহরে বসিয়া এ-সব বিষয় হয়ত যথার্থ বুঝিবেন না। চাষী এবং ভাগচাষীদের সমস্যার উপর দেশের এবং জনগণের ভালমন্দ বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। এ সমস্যা সমাধানে কেবল নীতি ঘোষণা করিয়াই সরকার কর্ত্তব্য সমাপন করিতে পারিবেন না, নীতির মর্য্যাদা যাহাতে রক্ষা পায়, সে-বিষয়েও তাঁহাদের সজাগ থাকিতে হইবে।

• • • •

'দৃষ্টি' মন্তব্য করিতেছেন :—"বিদেশ হইতে খাদ্য-শস্য আমদানী হইতেছে, তবুও সঙ্কট অবস্থার অবসান হইতেছে না। শুধু খাদ্যেই নয়, পরিধান বস্ত্র সমস্যাও তদ্রূপ। লক্ষ্য করিয়া দেখা যাইতেছে, যে দ্রব্যই নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাই বাজারে আত্মগোপন করে। বিনিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের মূল্য বেশী হইলেও প্রকাশ্য বাজারে পাওয়া যায়। এইখানেই সরকারকে বিশেষ ভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া এর কারণ সন্ধানে সবিশেষ তৎপর হইতে হইবে। এই বিষয়ে সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যে কোনরূপ ঔদাসীন্য বা অসাধুতা প্রকাশ পাইলে তাহাদের এইরূপ সমাজ-বিরোধী মনোবৃত্তির জন্য কঠোর দণ্ড দিতে হইবে। চোরাকারবারী এবং তাহাদের সমর্থকদেরও অনুরূপ ভাবে দণ্ডনীয় করিতে হইবে। সমাজের এই সকল দুর্নীতিপরায়ণদের দমন করিবার জন্য সরকারকে শুধু জনগণের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেকেই অধিকতর সক্রিয় হইতে হইবে। তবেই এইরূপ দুর্নীতি দূর হওয়া সম্ভব। জনগণ দুর্নীতি দমনে প্রয়াসী হইলেও বহু ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের দরুণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। সরকার যদি দেশের দুর্নীতি দমনকল্পে অধিক তৎপরতার সহিত সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেন, তবে দেশের জনসাধারণও সরকারকে এই বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া আসিবে, এবং সরকারও জনগণের শুভবার্তাই হইবেন। অপর পক্ষে সরকারকেও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। শুধু মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বরাদ্দ-প্রথার প্রবর্ত্তনে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। প্রদেশের রাজধানী এবং সহর অঞ্চলগুলিতেই নিয়ন্ত্রণ এবং বরাদ্দ-ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না, মফঃস্বল অঞ্চলেও করিতে হইবে। এই সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থাও সরকার এবং সমবায় সমিতি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। অর্থাৎ পল্লী ও সহর অঞ্চলে কৃষি এবং শিল্প উৎপাদন-শক্তি যত দূর সম্ভব সরকার এবং সমবায় সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে, এবং উৎপাদিত দ্রব্যও সরকারের ও সমবায় সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীনে বণ্টন করার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং সেই সঙ্গে বণ্টনেরও সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করার নিমিত্ত আয়ের উপর অতিরিক্ত কর বসাইয়া অত্যধিক আয়ের পথ বন্ধ করিতে হইবে। দ্রব্য-মূল্য যাহাতে না বাড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং সাধারণের প্রয়োজনার্থে বাজারে দ্রব্য আমদানীর উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্রব্য-মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়াই শ্রমিকদের আয় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে; তবেই এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সার্থক হইতে পারে।" সরবরাহ-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের দৃষ্টি উপরিউক্ত মন্তব্যের প্রতি আকর্ষণ করিতে চাই, যদিও জানি, তিনি ঐ সব সমস্যা সম্বন্ধে সজাগ এবং সমাধানেও তৎপর রহিয়াছেন। তাহা হইলেও গরীবদের কথার মধ্যে হয়ত বা কিছু সারবস্তুর সন্ধান পাইতে পারেন।

• • • •

'জিন্দেগী' সংবাদ দিতেছেন :—"সম্প্রতি হবিগঞ্জ সহরে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। স্থানীয় বাজারের একটি মাঠে প্রায় ২০০ লোক কতক দিন যাবৎ সামরিক কুচকাওয়াজ শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ২।৩ দিন পূর্ব্বে এক দিন তাঁহারা মাঠে গেলে তাঁহাদের মধ্যে ১১ জন লোকের পায়ে ভাঙ্গা বোতলের টুকরা ও আরও নানা জাতীয় কাঁটা গাঁথিয়া যায়। অনুসন্ধানে দেখা গেল যে সমস্ত মাঠেই ঘাসের নীচে ঐরূপ অসংখ্য কাঁটা ও বোতলের টুকরা পুতিয়া রাখা হইয়াছে। পরদিন রাত্রে স্থানীয় কয়েক জন লোক কয়েকটি হিন্দু যুবককে ঐ কাজ করিতে দেখিয়া হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলেন ও পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া আসে। তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গিয়াছে যে, তাহারা বয়স্ক লোকদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই ঐ কাজ করিয়াছে এবং এই কাজটি না কি বড় রকমের একটি ষড়যন্ত্রের সূচনা মাত্র। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের নিকট এ যাবৎ যে উদারতা ও সদ্ব্যবহার পাইয়া আসিতেছেন ইহা কি ঐ সদ্ব্যবহারেরই প্রতিদান?" সত্য কথা। প্রতিদান হিসাবে ইহা সত্যই অতি কম! তবে সংবাদটি আমরা 'গাঁজা' হিসাবেই গ্রহণ করিলাম, কিন্তু নেশা হইল না। মজার কথা এই যে, অন্য কোনো পত্রিকায় এই বহুমূল্য সংবাদ প্রকাশ হয় নাই। কেন? 'জিন্দেগী' special।

সমালোচনার জন্ত দুইখানি
পুস্তক পাঠাইতে হয়

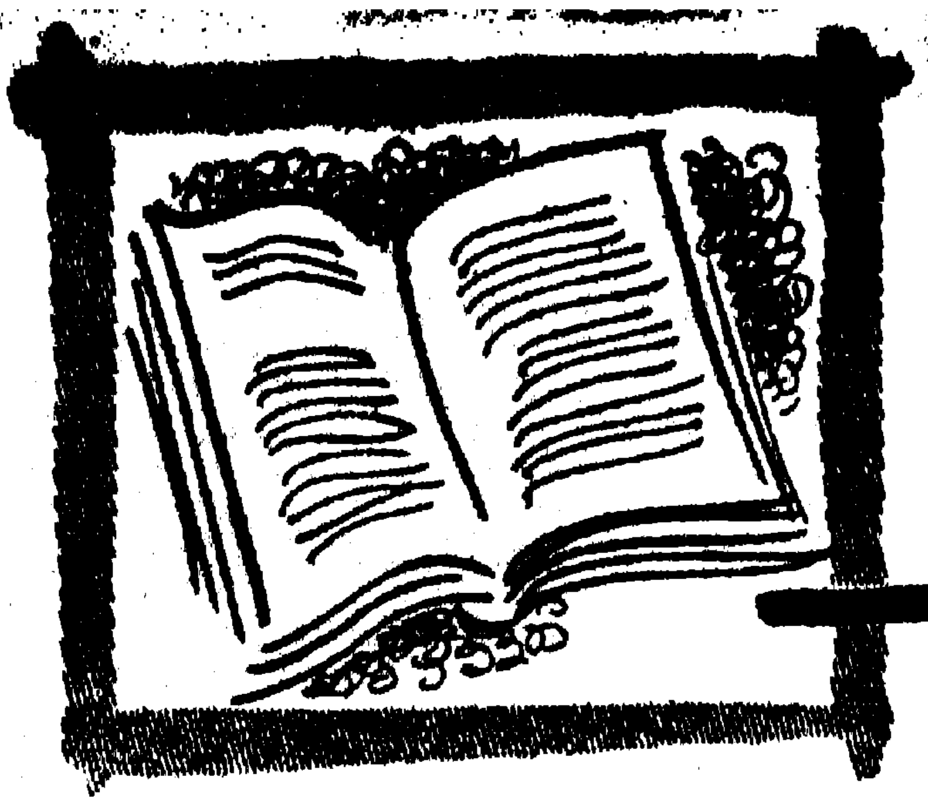

সাহিত্য পরিচয়

বাংলা কাব্যের ধারা

ফেরারী ফৌজ : প্রেমেন্দ্র মিত্র : প্রকাশক সিগ্‌নেট প্রেস, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী যুগের আধুনিক কবিদের মধ্যে দু'জন কবির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। যতীন্দ্রনাথ ও প্রেমেন্দ্র মিত্র একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবিস্বাতন্ত্র্য ও কাব্যবৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলার কাব্যজগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আজও তাঁরা জলাঞ্জলি দেননি, যদিও দু'জনেরই সাম্প্রতিক কাব্যপরিণতি দেখে আশান্বিত হবার বিশেষ কোন কারণ নেই। দু'জন কবিই সমাজের এমন এক শ্রেণীর মানুষ যে-শ্রেণীর নিজস্ব কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নেই, ব্যক্তিত্ব নেই, অর্থাৎ স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা বলছি। সমাজের উপর-তলা ও নীচের তলার মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী "সেতুবন্ধন" ছাড়া আর কিছুই না। যে পরিবেশের মধ্যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষের জীবন কাটে, সেই পরিবেশেই তার বৃহত্তর জীবনাদর্শ তৈরী হয়। কৃষাণ ও মজুরের চোখে মানুষ ও সমাজের যে চেহারাটা যেমন ভাবে ধরা পড়ে, যে ধারণা যেমন ভাবে জন্মায়, নিশ্চয়ই কোন "আলালের ঘরের দুলালের" চোখে তেমন ভাবে পড়ে না, পড়তে পারে না। মধ্যবিত্তের যে সামাজিক পরিবেশ সেটা হল আত্মচিন্তা ও আত্মতৃপ্তির অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক পরিবেশ, জীবনটা বসরাই গোলাপ না হলেও ফণিমনসার কাঁটা নয়। "ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন" দেখার যে লোকপ্রবাদ, তার উৎপত্তি মধ্যবিত্ত জীবনের বদ্ধ ডোবা থেকেই হয়েছে। কবজা-ভাঙা জানলার ফাঁক দিয়ে চাঁদের সৌন্দর্য্য মধ্যবিত্ত-চিত্ত যেমন গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে অভ্যস্ত, আর কেউ সে-রকম অভ্যস্ত নয়। "চিত্ত" নামক বস্তুটা "বিত্তের" সঙ্গে বর্ত্তমান সমাজে এমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত যে চিত্তের যত কিছু বুদ্‌বুদ্‌ সবই ঐ বিত্তের উস্‌কানিতে। সুযোগ-সুবিধার সুখ-স্বপ্নে বিভোর মধ্যবিত্তের কাছে জীবনটা তাই একটা "লটারী" ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সেই জন্যই দেখা যায়, সমাজে মধ্যবিত্তের প্রাধান্য বাড়তে লটারী নামক জুয়াখেলার প্রচলনও খুব বেশী হয়েছে। মধ্যবিত্ত ভাবুক, কবি, দার্শনিক, সকলেরই জীবনদর্শন তাই "অজ্ঞেয়তাবাদ" "অনিশ্চয়তাবাদ" থেকে কঠিন "নৈরাশ্যবাদ" অথবা অসহায় "অদৃষ্টবাদের" পাকচক্রে ঘুরপাক খায়। হাক্সলি-অডেন-ইশারউড-কোয়েষ্টলার-এলিয়ট-প্রাট্-মানবেন্দ্রের মতন অনেকে আবার ইন্দ্রিয়-শৈথিল্যের ফলে "অধ্যাত্মবাদের" মধ্যে আত্মসমাধিস্থ হয়ে যান। এক কথায় বলা চলে, মধ্যবিত্তের চোখে (বিশেষ করে যাঁরা মোটামুটি আরামে ও নির্ঝঞ্ঝাটে আছেন) জীবনটা রাস্-ঘোড়দৌড়-লটারীর মত একটা জুয়াখেলা বিশেষ, লাগে তাক্ না-লাগে তুক্, অর্থাৎ মারি তো বাজি একেবারে উজীর, আর না-মারি তো বিলকুল ফকির। সংগ্রাম ও সংঘাতের প্রশস্ত রাজপথ ছেড়ে গলি-ঘুপচির "শর্ট কাট্" মেরে চলার জন্যেই যাঁরা আজীবন ব্যস্ত, তাঁদের জীবন-দর্শন বলিষ্ঠ ও সহজবোধ্য হবে কেন? জুয়াখেলার হার-জিতের মধ্যেই যাঁদের জীবনের চরম সার্থকতা ও ব্যর্থতা, তাঁদের অনিশ্চয়তা-বাদ-নৈরাশ্যবাদ-অধ্যাত্মবাদের চক্রে ঘুরপাক খাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

যতীন্দ্রনাথ ও প্রেমেন্দ্র মিত্র দু'জনেই অত্যন্ত সমাজ-সচেতন কবি এবং যতীন্দ্রনাথ খানিকটা পড়লেও, প্রেমেন্দ্র মিত্র আজও নৈরাশ্যবাদ-অধ্যাত্মবাদের পাকচক্রে পড়েননি। অবশ্য সমাজ-সচেতন সকলেই, এমন কি যে-সব কবি ও শিল্পী সমাজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই বলে বৈষ্ণবী ন্যাকামি করেন তাঁরাই বোধ হয় সব চেয়ে বেশী সমাজ-সচেতন। সমাজের বুক থেকে লেজটা গুটিয়ে যাঁরা যত বেশী নিজের বুকের মধ্যে সেটা কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকেন তাঁরাই যে সব চেয়ে বেশী বাইরের খোঁচড় সম্বন্ধে সজাগ, সে-কথা কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার করে না। যাই হোক, সেই অর্থে যতীন্দ্রনাথ বা প্রেমেন্দ্র মিত্র সমাজ-সচেতন নন। তাঁদের সমাজ-চেতনার বিশেষ গুরুত্ব আছে। গতিশীল বাস্তব সমাজ ও ইতিহাস সম্বন্ধে দু'জনেই সচেতন, দৃষ্টিও দু'জনের তাই শ্রেণী-সীমানা ছাড়িয়ে অনেকটা দূর প্রসারিত। তবু শ্রেণী-কৌলীন্য সম্বন্ধেও দু'জনেই অত্যন্ত সজাগ। তাই বাংলার এই দুই আধুনিক কবির কাব্যে মানসিক দ্বন্দ্বের সুর অত্যন্ত প্রবল। এবং ঠিক সেই জন্যই আজও এঁরা বেঁচে আছেন কবি হিসাবে।

বর্ত্তমান যুগে কবির মানসিক দ্বন্দ্ব থাকা অস্বাভাবিক নয়। দ্বন্দ্ব ও বিরোধই যে-সমাজের সব চেয়ে বড় সত্য; সেই সমাজে দ্বন্দ্বহীন কাব্য-সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি কি করে সম্ভব? তা'ছাড়া জীবনের (Life) মূল কথাই হল দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, প্রগতিরও (Progress) তাই। সুতরাং সমাজ-সচেতন কবির কাব্যে দ্বন্দ্ব থাকবে না, সংঘাত থাকবে না, এমন ব্যাপার হতে পারে না। প্রেমেন্দ্র মিত্র মূলতঃ রোমান্টিক কবি, যতীন্দ্রনাথ কড়া রিয়ালিষ্ট—দু'জনের কাব্যের 'ইমেজ' দেখলেই বোঝা যায়। তার চেয়েও বড় কথা হল, দু'জনেই জীবনকে অত্যন্ত ভালবাসেন, জীবনের একনিষ্ঠ পূজারী। কিন্তু এই সমাজে জীবনকে ভালবাসার পথে অন্তরায় আছে, প্রাণের পূজার আয়োজনে বিঘ্ন আছে, তাই দু'জনের চিত্তই সংশয়াকুল। প্রেমেন্দ্র মিত্র রোমান্টিক, তাই তাঁর সংশয় স্বপ্নাচ্ছন্ন কুয়াশার মতন কাব্যের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে, তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বটাও

আশা-নিরাশার দোলায় প্রবল ভাবে দুলতে থাকে। যতীন্দ্রনাথ মিয়াপিষ্ট, তাই তাঁর "সংশয়" নৈরাশ্যের গ্র্যানিট মূর্তিতে রূপান্তরিত হতে চায়, তাঁর দ্বন্দ্বও অত্যন্ত তীব্র, বিষ-জর্জরিত বলে মনে হয়। নির্মম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শ্লেষের দিকে তাই যতীন্দ্র-কাব্যের ঝোঁক বেশী, আর কুয়াশাচ্ছন্ন কথার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে আত্মবিস্মৃত হওয়ার দিকেই প্রেমেন্দ্র কাব্যের গতি। যতীন্দ্রনাথ বাংলার স্যাঁতসেঁতে কালবোশেখী, বাংলার একঘেয়ে শ্যামল প্রান্তর তাই ভালবাসতে পারেননি, তিনি ভালবেসেছেন মরু-জীবনের বিশালতা ও উগ্রতাকে; শ্রাবণ-সন্ধ্যায় পসারিণীকে দেখে নয়, 'শীতের সন্ধ্যায় বৃদ্ধ রুটি ভাণ্ডওয়ালাকে দেখে তাঁর মন কেঁদেছে; বেদে-বেদেনীর প্রাণোচ্ছ্বাসকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন, কারণ "ঝড়ে ঘর ওড়ে, মাঠ তো ওড়ে না"—"লোহার বাথা" ইঞ্জিনিয়ার-কবি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। আর "জীবন শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল, সে মিথ্যায় মত্ত হয়ে সত্য তোর ভোল"—যে-কবির বাণী সেই কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রকেও নৈরাশ্যবাদী বলি কি করে? প্রেমেন্দ্র মিত্রও ভালবেসেছেন তাঁদের "অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম" এবং "দুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে" যারা উদ্দাম, "হুয়েরি বল্গা নাই" তাদেরই তিনি চিনতে চান। তিনি কবি "কর্মের ও ঘর্মের", "বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই" তাঁর "সময় যে যায় নাই।" কিন্তু মরু-বন্ধা ও বেদে-বেদেনীর জীবনছন্দের বিদ্রোহী কবি যতীন্দ্রনাথ আজ অধ্যাত্মবাদের হাড়িকাঠে আত্মহত্যা করার জন্যে উদ্গ্রীব, আর "প্রথমার" কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র আজ "ফেরারী" হতে চান।

"প্রথমার" কবি "সম্রাট" থেকে "ফেরারী ফৌজ"

কে কবে এই পৃথিবীকে সূর্য্যের দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়েছিল, আর সেই থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সূর্য্যের চারি দিকে এই পৃথিবী ঘুরপাক খাচ্ছে—"প্রথমার" এই করুণ সুর প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরবর্তী কাব্য "সম্রাট" এবং আলোচ্য "ফেরারী ফৌজের" মধ্যে অনেক শান্ত স্থির সংযত হয়েছে। কিন্তু "প্রথমার" মধ্যে জীবনের যে "প্রভাতী" সুরের ঝঙ্কার ছিল "সম্রাট" থেকে "ফেরারী ফৌজের" মধ্যে ক্রমেই তা অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম
চেন কি তাদের ভাই!
দুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম
হুয়েরি বল্গা নাই!

* * *

বলি তবে ভাই শোন তবে আজ বলি,
অন্তরে আমি তাদেরই দলের দলী;
রক্তে আমার এমনি গতির নেশা;—(প্রথমা)

'প্রথমা'র এই উদ্দাম সুর "সম্রাটে" অনেক ক্ষীণ হয়ে গেছে, কারণ

বিস্ফোরণে বিদীর্ণ মৃত্তিকা
উদ্গারিছে বিষ-বাষ্প;
—আজ শুধু বাতাসে বারুদ।—(সম্রাট)

বাতাসে বারুদ, তাই মধ্যবিত্ত মনের সংশয় আরও গভীর হয়েছে, আরও দানা বেঁধেছে—

অকাতরে কত রক্ত বৃথা হ'ল পাত;
শুভ্র জ্যোতি পবিত্র প্রভাত
আজো কই দিল না'ত দেখা।
—দেবে কি কখনো?—(সম্রাট)

দেবে কি কখনো? এ-প্রশ্ন "প্রথমার" কবির মনে জাগেনি। জাগলেও তা উদ্দাম আশা ও রঙিন স্বপ্নের বন্যায় ভেসে গেছে, কিন্তু তার পর বাতাসে বারুদ দেখে কবি আর "জীবন-শিয়রের স্বপ্ন" দেখতে চান না, "সম্রাট" হতে চান—

শুধু সমস্ত আমরা নই, আমরা যে সম্রাট!

* * *

একচ্ছত্র অধীশ্বর আমার সাম্রাজ্যের—
সে সিংহাসন থেকে আমায় চেও না হটাতে;
সমবায় সমিতি সেখানে যেন না দেয় হানা,
তাহ'লেই বাধবে কুরুক্ষেত্র।—(সম্রাট)

বাইরের বাতাসে বারুদের গন্ধ ক্রমেই যত উগ্র হয়েছে, আত্মনিরাপত্তার প্রশ্ন ক্রমেই যত বড় হয়ে উঠেছে, ততই যে "প্রথমার" কবির সুপ্ত রাজকীয় চেতনা উগ্র হয়ে উঠেছে, তা "ফেরারী ফৌজের" মধ্যেই বোঝা যায়। "ফেরারী ফৌজ" কাব্যের মূল রাগিণী হল তাই—

গান নয়, সুর নয়,
প্রেম, হিংসা, ক্ষুধা,—কিছু নয়,
—সীমাহীন শূন্যতার শবমূর্তি শুধু।—(ফেরারী ফৌজ)

কবি বলছেন—

মনের অরণ্যে যত হাওয়া তোলে
কথার মর্মর,
বেদনা ও ভালোবাসা
উদ্দীপনা, আশা ও আক্রোশ,
জেনেছি সমস্ত দোলা।
সব বড় পার হ'য়ে, আছে এক
শব্দের নীলিমা,
অন্তহীন, নিষ্কম্প, নির্মল।—(ফেরারী ফৌজ)

"প্রথমার" কবি, কামারের ছুতোরের কাঁসারীর আর মুটে-মজুরের কবি শেষ পর্য্যন্ত ধাঁ-ধাঁ রোদে নিস্তব্ধ দুপুরে শুষ্ককণ্ঠ কাকের ডাক শুনছেন "ফেরারী ফৌজে" এবং তাঁর পরিণত কাব্যে দেখা যায়—

অবাক হৃদয়
আপনার সঙ্গে একা একা
সেই সব কুয়াশার মতো কথা কয়।

* * *

তার পর জীবনের কাটলে কাটলে
কুয়াশা ছড়ায়,
কুয়াশার মতো কথা হৃদয়ের দিগন্তে ছড়ায়।
—(ফেরারী ফৌজ)

কিন্তু কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের আজও যে অপমৃত্যু হয়নি তার প্রমাণ "সম্রাটের" মধ্যেও যেমন "ফেরারী ফৌজের" মধ্যেও তেমনি রয়েছে। "সম্রাট" হয়েও সম্রাটের কবি স্বপ্ন দেখতে ভোলেননি—

অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামী কালের পানে—
স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক,
বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়,
পৃথিবীতে উত্তাল দুরন্ত শান্তি।—(সম্রাট)

নিস্তব্ধ দুপুরে খাঁ-খাঁ রোদে কাকের ডাকের মধ্যেও কবি "ফেরারী ফৌজের" কথা ভেবেছেন, স্বপ্ন দেখেছেন "কবে তারা গড়ে তুলবে সংশপ্তক বাহিনী"—

দুর্বের কণা চূর্ণ
তাই যেথা সেথা ছড়ানো।
আজো তারা সব ফেরারী
রাত যারা মুছে ফেলবে।

তবু গুঁড়ো গুঁড়ো দুর্গ
মাঝে মাঝে ওঠে বলসি
কালে কালে দেশে বিদেশে
গুপ্তসেনার কৃপাণে।

জড় করে সব কণিকা
আগামী দিনের দুর্গ
কবে তারা গড়ে তুলবে
সংশপ্তক বাহিনী।—(ফেরারী ফৌজ)

কল্পনার ঐশ্বর্যে, ইমেজের মাধুর্যে, কথার গভীর ব্যঞ্জনায় ও অব্যক্ত ইঙ্গিতময়তায়, অনুভূতির স্বাতন্ত্র্যে ও কাব্যনিষ্ঠায় বাংলার আধুনিক কবিদের মধ্যে যিনি নিঃসংশয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, "ফেরারী ফৌজ" পড়ে তাঁকে বলতে ইচ্ছা হয়—

সপ্তসাগর কিনারে
আজো শিঙা বাজে অবিরাম,
ফেরারী ফৌজ সাড়া দাও
অজ্ঞাতবাস হলো শেষ।—(ফেরারী ফৌজ)

ছাড়পত্র : সুকান্ত ভট্টাচার্য্য : প্রকাশক, ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

শিল্পি-জীবনে ফেরারীর অজ্ঞাতবাস প্রয়োজন হয়নি যাদের তাদের মধ্যে বাংলার তরুণ বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য অন্যতম। বিপ্লবী রুশ-কবি মায়াকভ্‌স্কির মতন সুকান্তও বলতে পারত :

40 Crores speak through these lips of mine.

এবং সত্যিই মায়াকভ্‌স্কির মতনই বালক-কবি সুকান্ত বলেছে :

I don't want to be a wayside flower.
Plucked after work in an idle hour···
I want the pen to equal the gun···

বিপ্লবী বালক-কবি সুকান্তর অন্তরোৎসারিত বাণী তার সমস্ত কবিতায় মধ্যে অনুরণিত হয়েছে—

And I, like the spring of humanity,
born in labour and the fighting line,
sing of my society,
this motherland of mine.—(Mayakovsky)

সুকান্তরই সহযোগী বাংলার অন্যতম বিপ্লবী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় "ছাড়পত্রের" কবিতাগুলি সংকলিত করেছেন এবং ভূমিকায় লিখেছেন—

"১৩৪৩ থেকে ১৩৪৭ সাল—যুগসন্ধির এই পাঁচটা বছর 'ছাড়পত্রের' রচনা-কাল। এক দিকে মৃত্যুকীর্ণ যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ, বন্যা আর মহামারী, অন্য দিকে জীবনপ্রতিষ্ঠার মৃত্যুপণ সংগ্রাম—জয়-পরাজয় আর উত্থান-পতনে, সুখ-দুঃখ আর আশা-নিরাশায় ঘেরা এই পাঁচটা বছর 'ছাড়পত্রে' উৎকীর্ণ হয়ে আছে। কোটি কোটি মানুষের বলিষ্ঠ আশা কবির কণ্ঠে নির্ভীক ঘোষণায় ফুটে উঠেছে।"

যুগসন্ধিক্ষণের পাঁচটা বছর ধরে সুকান্ত যখন কবিতা লিখতে শুরু করল তখন আর কতই বা তার বয়স হবে? সুকান্ত তখন স্কুলে পড়ে, বয়স তার বছর পনের-ষোল। তবু "আঠারো বছর বয়স" বলে যে কবিতা তাতেই বালক সুকান্তর কবি-মন যে কি ধাতু দিয়ে গড়া তা বোঝা যায়—

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সের কেউ মাথা নোয়াবার নয়
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে ষ্টীমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোন সংশয়—
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।   —(ছাড়পত্র)

সুকান্তর প্রথম দিকের কবিতা "প্রস্তুত," "দুরাশার মৃত্যু," "কলমের ডাক," "কৃষকের গান," "এই নবান্নে" ইত্যাদির মধ্যে তার জীবন-দর্শন অত্যন্ত উগ্র মনে হতে পারে। কাব্যরসিকরা কবিতার মধ্যে অতটা উগ্রতা, অতটা স্পষ্টবাদিতা পছন্দ করবেন না। কিন্তু এই পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার নিয়ে এবং কবিতার বক্তব্য বা মতবাদ প্রকাশের তত্ত্বকথা নিয়ে বৃথা তর্ক করে লাভ নেই এখানে, বিশেষ করে সুকান্তর প্রসঙ্গে। কারণ সুকান্ত যে বয়সের কবি এবং যে সময়ের কবি, বিশেষ করে প্রথম দিকের কবিতাগুলি যে বয়সে লেখা, তখন কাব্যের প্রকাশভঙ্গীর সূক্ষ্ম কলা-কৌশল নিয়ে মাথা-ঘামানোর সময় নয় এবং সেটা আয়ত্ত করাও প্রায় সাধনাতীত ব্যাপার বলা চলে। তবু মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সুকান্তর শেষের দিকে লেখা "খবর," "চিল," "প্রার্থী" প্রভৃতি কবিতা যাঁরা পড়বেন তাঁরা নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবেন, এমন কি গজদন্ত-মিনারজীবীরাও। সুকান্তর "প্রার্থী" কবিতার তুলনা কোথায়—

হে সূর্য!
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।

হে সূর্য !
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—
শুনেছি তুমি এক জলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
এক দিন হয়ত আমরা প্রত্যেকে এক-একটা জলন্ত অগ্নিপিণ্ডে
পরিণত হবো,
তার পর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়ত গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবো
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী।

—(ছাড়পত্র)

বাস্তবিকই সুকান্ত নতুন যুগের সার্থক কবি। তার কাব্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি অপূর্ণতা হয়ত আছে, থাকাই স্বাভাবিক। তবু বলতে হয়, বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হয়েও সুকান্তর মতন কবিত্ব-শক্তি নিয়ে বাংলায় ক'জন আধুনিক কবি জন্মেছেন? বিচারসাপেক্ষ-কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা আমরাও সমর্থন করি—

"সুকান্তর কবিতা যাঁরা পড়বেন, তাঁরা এ-কথা স্বীকার করবেন যে, সুকান্তর কবিতা শুধুই বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত নয়, তাতে আছে মহৎ পরিণতির সুস্পষ্ট পদধ্বনি। 'ছাড়পত্র' তাই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবে।"

অনুবাদ-সাহিত্য

Anandamath: Translated by Sree Aurobindo. and Barindra kumar Ghose. Published by Basumati Sahitya Mandir. 166 Bowbazar Street, Calcutta. Price Rs 3 only.

পাশ্চাত্য ও বিদেশী সাহিত্যের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্তে যেমন প্রয়োজন, আমাদের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সাহিত্য-সম্পদ বৈদেশিক ভাষায় অনুবাদ করাও ঠিক সেই কারণেই আরও বেশী প্রয়োজন। কাজটা অবশ্য বিদেশীদেরই করা উচিত, কিন্তু আমাদের দেশেই যদি সুযোগ্য ব্যক্তি থাকেন তাহ'লে সে কাজ তাঁদের দিয়ে করানো আরও ভাল। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" যে আমাদের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার করবেন। শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতের জাতীয় সম্পদ "আনন্দমঠ" বলা চলে। "আনন্দমঠ" বিভিন্ন ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হওয়া তো নিশ্চয়ই উচিত, ইংরেজীতেও সর্বাগ্রে অনূদিত হওয়া দরকার। আর শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া, শুধু বাংলা দেশে নয়, সারা ভারতবর্ষে, আর কোন যোগ্য ব্যক্তি আছেন কি না সন্দেহ, যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠের" ইংরেজী অনুবাদ করার দায়িত্ব নিতে পারেন। "আনন্দমঠের" সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে এবং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গেও আমাদের জাতীয় জীবনের প্রথম যুগ-সন্ধিক্ষণের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। শ্রীঅরবিন্দ ১৪ বছর বিলাতে থাকার পর এ দেশে ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফিরে আসেন। তখন তাঁর বয়স ২১ বছর। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রিল মারা যান। তখন শ্রীঅরবিন্দের বয়স ২২ বছর। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তিনি 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় বঙ্কিম-প্রতিভার নানা দিক্ নিয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। ১৬ই জুলাই থেকে ২৭শে আগষ্ট, ১৮৯৪ পর্যন্ত 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। যেমন :

"Youth to College Life" (july 16)
"The Bengal he lived in" (July 23)
"His official career" (July 30)
"His Versatility" (Aug-6)
"His Literary History" (Aug 13)
"What He did for Bengal" (Aug 20)
"Our hope in the future" (Aug 27)

প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ, আজ পর্যন্ত বোধ হয় বঙ্কিম-প্রতিভার নানা দিক্ নিয়ে এত গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ আর কেউ লেখেননি। এর মধ্যে বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমের ঔপন্যাসিক প্রতিভার সঙ্গে ইংরেজ ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং-এর তুলনা করেন, এবং স্কটের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যাঁরা কথায় কথায় তুলনা করেন তাঁদের তিনি বিদ্রূপ করেন। তিনি বলেন—

…"he bears a striking resemblance to the father of English fiction; Henry Fielding; … Bankim, after a silly fashion now greatly in vogue, has been pointed out by some as the Scott of Bengal……it conveys an insult,……Scott could paint outlines but he could not fill them in. Here Bankim excels; speech and action with him are so closely interpenetrated and suffused with a deeper existence that his characters give us the sense of being real men and women."

—(Indu Prakash, Aug 23, 1894)

১১০৫ সালে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে "ভবানী মন্দির" লেখেন। এ-বই হল বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের ধর্মগ্রন্থ। "ভবানী মন্দির" যে বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠের" দ্বারা প্রভাবান্বিত তা রৌলট্ কমিটির রিপোর্টে পর্যন্ত স্বীকার করা হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায়, শ্রীঅরবিন্দের জীবনে "আনন্দমঠের" কি গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য্য ছিল। আর বাস্তবিকই "আনন্দমঠ"ই তো বাংলার তথা সারা ভারতের রাজনৈতিক জীবনের "ইশ্‌তেহার"। ১১০১ সালের ১৪ই আগষ্ট থেকে 'কর্মযোগী' পত্রিকায় "আনন্দমঠের" ইংরেজী অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। এই ভাবে প্রথম ভাগের পঞ্চদশ অধ্যায় পর্যন্ত তিনি নিজে অনুবাদ করেন। পরবর্তী অংশ তাঁর সহোদর বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের অনূদিত।

তাই "আনন্দমঠের" এই ইংরেজী অনুবাদের শুধু সাহিত্যিক মূল্য নয়, ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর মূল্যবান ভূমিকায় তা ব্যাখ্যা করে বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের "আনন্দমঠ" নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র মর্যাদা ও মূল্য দাবী করতে পারে এবং সেই জন্যই শ্রীঅরবিন্দের এই ইংরেজী "আনন্দমঠ" শুধু অন্য ভাষাভাষীদের নয়, বাঙালীদেরও অবশ্যপাঠ্য। বসুমতী সাহিত্য মন্দির এই মূল্যবান ঐতিহাসিক অনুবাদ প্রকাশ করে সত্যই দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

আন্তর্জাতিক ঘটনাপুঞ্জের গতিপথে—

খৃষ্টীয় নববর্ষ ১৯৪৯ সালে আন্তর্জাতিক ঘটনাপুঞ্জের গতিধারা কোন্ পথে প্রবাহিত হইবে, তাহা হয়ত অনুমান করা খুব সহজ নয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ভবিষ্যতের যে ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে, তাহা বিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য। ১৯৪৮ সাল যখন আরম্ভ হয়, তখন আন্তর্জাতিক আকাশের ঈশান কোণে তৃতীয় মহাসমরের ঘন মেঘাড়ম্বর জমিয়া উঠিতেছিল। এই যুদ্ধাশঙ্কার গভীর অন্ধকারের মধ্যেও সামান্য আশার আলোক যে একেবারেই দেখা যায় নাই, তাহাও নয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পাঁচ মাস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৪৮) বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে আসিয়া ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভ অনেকের কাছেই পরাধীন এশিয়ার ইতিহাসে নবযুগের সূচনা বলিয়া মনে হইয়াছে। ইহার পরেই ১৭ই জানুয়ারী ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের সহিত ডাচ গবর্ণমেন্টের রেনভাইল চুক্তি (Renvilla Agreement) সম্পাদিত হওয়ায় অবশেষে ইন্দোনেশীয় সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা গিয়াছিল। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভের এক মাস পরে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) সিংহলের বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্ত-শাসনশীল ডোমিনিয়নের মর্য্যাদা লাভ অনেকের কাছেই স্বাধীনতার পথে প্রথম পদক্ষেপ বলিয়া যে মনে হয় নাই তাহাও নয়। সিংহলের ডোমিনিয়ন-মর্য্যাদা লাভের পূর্ব্বেই ২১শে জানুয়ারী (১৯৪৮) মালয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। মালয় ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে, ইহা ব্যতীত মালয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়ার আর কোনই সার্থকতা অবশ্য ছিল না। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের পথে মালয় পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে, এই আশাও অনেকের মনে স্থান পাইয়াছিল। এই সকল ঘটনাবলীর মধ্যে আশার যে আলোক দেখা যাইতেছিল, তাহা যে বিদ্যুৎচমকের মতই 'ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় আঁধার মাত্র বাঁধিতে পথিকে', তাহা বুঝিতে খুব বেশী সময় লাগে না। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্ট অভ্যুত্থানের ফলে ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতে থাকে। মালয়েও নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পর হইতেই বিভিন্ন ধর্মঘটের মধ্য দিয়া নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং পরিশেষে মে মাসের শেষ ভাগেই উহা পরিণত হয় কম্যুনিষ্টদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে। চীনের গৃহযুদ্ধ পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। নূতন শাসনকেন্দ্র প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর ১৯শে এপ্রিল (১৯৪৮) জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক চীনের প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন। কম্যুনিষ্টদের সহিত কোনরূপ আপোষ মীমাংসা করিতে তিনি দৃঢ়তার সহিত অস্বীকৃত হন। ফলে চীনের গৃহযুদ্ধ নূতন করিয়া প্রবল আকার ধারণ করে। কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' যে ভাবে ক্রমশঃ উগ্র হইয়া উঠিতেছিল, তাহার সম্মুখে এই সকল ঘটনাবলী যেন ম্লান হইয়া গিয়াছিল।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন আকস্মিক ভাবে পরিসমাপ্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক আকাশে যুদ্ধাশঙ্কার মেঘসঞ্চার হইতে থাকে এবং উহা ঘনীভূত হইয়া উঠে রাশিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও মার্চ্চ মাসে (১৯৪৮) লণ্ডন সম্মেলনে জার্ম্মাণীর মার্কিণ, বৃটিশ এবং ফরাসী-অধিকৃত অঞ্চলত্রয়ে যৌথ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার মধ্যে। ইহার পরই এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাশিয়া মিত্রশক্তিবর্গের নিয়ন্ত্রণ পরিষদের অধিবেশন হইতে বাহির হইয়া আসে এবং জার্ম্মাণীর পশ্চিম অঞ্চলত্রয় হইতে সড়ক ও রেলপথে বার্লিন যাতায়াত এবং মাল প্রেরণের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করে। বার্লিন-সঙ্কটের প্রথম সূত্রপাত এইখানেই। এই প্রথম বার্লিন-সঙ্কটের মধ্যেই অনেকে তৃতীয় মহাযুদ্ধের তূর্য্যধ্বনি শুনিবার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। প্রথম বার্লিন-সঙ্কট সাময়িক ভাবে ধামাচাপা দেওয়া হইল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় বার্লিন-সঙ্কটের বীজ বপন করিতে বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু উহার পূর্ব্বেই যুদ্ধের জন্য আয়োজনের একটা কূটনৈতিক পরিকল্পনা ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। ১৭ই মার্চ (১৯৪৮) ব্রুসেলস নগরীতে পশ্চিমী ইউনিয়ন গঠিত হয় এবং সেই সময়েই মঃ স্পাক (Spaak) এবং তাঁহার সহযোগিবৃন্দ পশ্চিমী ইউনিয়নকে সম্প্রসারিত করিবার এবং এই ইউনিয়নকে রিও ডি জেনেরিও চুক্তির সহিত সংযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি পশ্চিম গোলার্দ্ধের যৌথ রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য রিও ডি জেনেরিওতে আন্তঃ-আমেরিকা চুক্তিতে (pan American pact) স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি রিও ডি জেনেরিও চুক্তি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। জুন মাসের (১৯৪৮) প্রথম ভাগে লণ্ডনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবার্গ এই ষড়রাষ্ট্রের সম্মেলনে জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ গবর্ণমেন্ট গঠন এবং জার্ম্মাণীর বৃটেন, মার্কিণ এবং ফরাসী-অধিকৃত অঞ্চলে নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৮ সালের ২০শে জুন জার্ম্মাণীর পশ্চিম অঞ্চলত্রয়ে নূতন মুদ্রা প্রবর্ত্তিত হয় এবং ২৩শে জুন হইতে বার্লিনের পশ্চিমাঞ্চলে এবং রুশ-অধিকৃত অঞ্চলে পরস্পরের মুদ্রাকে নিজ নিজ অঞ্চলে অচল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। আরম্ভ হয় দ্বিতীয় বার্লিন-সঙ্কট। বৃটেন ও আমেরিকা বিমানযোগে পশ্চিম-বার্লিনে খাদ্য প্রেরণ করিতে আরম্ভ করে এবং এখনও ঐ ভাবেই খাদ্য প্রেরণ করা হইতেছে। দ্বিতীয় বার্লিন-সঙ্কটের ফলে এক দিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন এবং অপর দিকে রাশিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক বিরোধের তীব্রতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, অনেকেই এই বার্লিন-সঙ্কট লইয়া তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়া

উঠিবার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। এই আশঙ্কাও বাস্তব রূপ গ্রহণ করে নাই।

বার্লিন-সঙ্কটকে তৃতীয় মহাযুদ্ধে পরিণত করিতে হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনকেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণ আরম্ভ করিতে হয়। কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কি বৃটেন কেহই তাহা সম্ভব বলিয়া মনে করে নাই। ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া এবং সংযত-ক্রোধ হইয়া পশ্চিমী শক্তিত্রয় বার্লিন-সঙ্কট সমাধানের জন্য মস্কোতে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু মস্কোতে যে মতৈক্য হইয়াছিল তাহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। নিরাপত্তা পরিষদ কর্ত্তৃক বার্লিন-সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। অতঃপর সমগ্র বার্লিনে সোভিয়েট মার্ক প্রবর্ত্তনের বিষয় বিবেচনা করিবার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের বিদায়ী সভাপতি মঃ ব্রামুগলিয়া যে বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা রাশিয়া এবং পশ্চিমী শক্তিত্রয় কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উহার অব্যবহিত পরেই রাশিয়ার তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও বার্লিনের পশ্চিম অঞ্চলে বার্লিন সিটি কাউন্সিলের নির্ব্বাচন হওয়ায় বার্লিন-সমস্যা সমাধান সম্পর্কে আশা পোষণ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মার্শাল-পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হওয়া ১৯৪৮ সালে ইউরোপের একটি প্রধান ঘটনা হইলেও এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মধ্য-প্রাচীর ঘটনাবলীর কথাই প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৯৪৮ সালে মধ্য-প্রাচী নূতন আর একটি সংগ্রামক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের নবেম্বর মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্যালেষ্টাইন বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা লইয়া প্রবল সমস্যা দেখা দেয়। ১৫ই মে প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট অবসান হওয়ার তারিখ ধার্য্য হয়। আরব-ইহুদী সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এপ্রিল মাসে প্যালেষ্টাইন বিভাগ প্রস্তাব বর্জ্জন করিয়া ট্রাষ্টিশিপের এক প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং জাতিপুঞ্জ-সভাও এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বিলম্ব করেন নাই। ১৪ই মে (১৯৪৮) ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনে নূতন ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে। এই নূতন শিশুরাষ্ট্রটি গঠিত হওয়ার পরই তিন দিক্ হইতে আরব বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা নিষ্পত্তি করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কাউণ্ট বার্ণাডোটকে সালিশ নিযুক্ত করেন। তাঁহার চেষ্টায় একটা সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি হয়। কিন্তু আরবরা বার্ণাডোট পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে রাজী হয় নাই। ইহুদীদের কাছে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার কোন মূল্যই ছিল না। ১৭ই সেপ্টেম্বর ইহুদী এলাকায় যাইবার সময় কাউণ্ট বার্ণাডোট আততায়ীর গুলীতে নিহত হইলে ডাঃ বাঞ্চে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। অক্টোবর মাসে খোলাখুলি ভাবেই যুদ্ধ-বিরতি ভঙ্গ করিয়া প্যালেষ্টাইনে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে নিরাপত্তা পরিষদ আবার যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ প্রদান করেন এবং ১১ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে প্যালেষ্টাইনের জন্য একটি আপোষ কমিশন গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ২৩শে ডিসেম্বর হইতে নেগেভ অঞ্চলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে ট্রান্সজর্ডানের রাজা আবদুল্লা নিজকে আরব-প্যালেষ্টাইনের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করায় আরব লীগের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্র লইয়া মুসলিম ব্লক গঠনের একটা অভিপ্রায় পাকিস্তানের ছিল। সে সম্ভাবনা সফল হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। অধিকন্তু আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি মধ্য-প্রাচীতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাবই সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবে। আরব রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করিয়া মিশর, ইরাক, সিরিয়া এবং লেবানন বৃটেনের সহিত চুক্তি করিবার জন্য না কি বর্ত্তমানে খুব ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। আরব রাজনৈতিক মহলগুলির দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, পৃথিবীর কোন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ব্যতীত শিল্প-সম্পদবিহীন আরব জগতের পক্ষে টিকিয়া থাকা অসম্ভব। প্যালেষ্টাইন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে এরূপ ধারণা জন্মিয়া থাকিলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। আরবদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, মিশর এবং ইরাক এই দুইটি বৃহৎ আরব রাষ্ট্র সমস্ত মতভেদ ও বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বৃটেনের সহিত যদি সন্ধি করিতে পারিত, তাহা হইলে প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় হইত না। কারণ, তাহারা বৃটিশ সামরিক বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ও পরামর্শ পাইত, বৃটিশের নিকট হইতে পাইত যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা এবং প্যালেষ্টাইন-সমস্যাই না কি আরব রাষ্ট্রগুলিকে বৃটেনের সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ হইবার জন্য অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সন্ধির সর্ত্তগুলি কি হইবে, তাহা লইয়া এখন আলোচনা করা সম্ভব নহে। তবে দেশরক্ষার জন্য পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে যে চুক্তি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই আরব দেশগুলিকে বৃটিশ সৈন্যের জন্য ঘাঁটি প্রদান করিতে হইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে আরবরা পাইবে বৃটিশ অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক মিশনের সাহায্য। সুদান সম্পর্কে মিশরকে বৃটিশের সর্ত্ত না মানিয়া লইলে চলিবে না। কিন্তু প্যালেষ্টাইনের ইজরাইল রাষ্ট্রের পক্ষে ইঙ্গ-আরব চুক্তি যে খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ হইবে তাহা অনস্বীকার্য্য। ইজরাইল রাষ্ট্র টিকিয়া গিয়াছে এবং টিকিয়া থাকিবেই। কিন্তু বৃটিশ সামরিক সাহায্যে শক্তিশালী এবং শত্রুভাবাপন্ন আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইজরাইল রাষ্ট্রের অবস্থা যে কিরূপ হইবে, তাহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এক দিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন, অপর দিকে রাশিয়া, এই উভয় পক্ষের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাসমর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই ঠাণ্ডা যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। কখন যে উহা সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হইবে, এই আশঙ্কা কেহই উপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। এই 'ঠাণ্ডা যুদ্ধের' মূল কোথায়, তাহাও কাহারও অজানা নাই। মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন রাশিয়ার তথা কম্যুনিজমের সম্প্রসারণের আশঙ্কা তুলিয়া উহা নিরোধের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। রাশিয়াও ধনতান্ত্রিক পৃথিবীতে নিজকে নিঃসঙ্গ ভাবিয়া ভীত না হইয়া পারে নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল-পরিকল্পনা দিয়া রাশিয়া তথা কম্যুনিজমের সম্প্রসারণ ঠেকাইবার আয়োজন করিয়াছে। কমিনফরমও তেমনি রাশিয়ার মিত্রশক্তিবর্গকে সংহত করিবার প্রচেষ্টা মাত্র। মার্শাল-পরিকল্পনার প্রতিষেধকরূপেই কমিনফরমের সৃষ্টি। অর্থনৈতিক দিক্ হইতে মার্শাল-পরিকল্পনা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামরিক দিক্ হইতে উহা যে সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, পশ্চিমী ইউনিয়ন গঠন ও উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তির খসড়া প্রণয়নই তাহার প্রমাণ। মার্শাল-পরিকল্পনার

দেশগুলি প্রত্যেকেই আর্থিক উন্নয়নের পৃথক্ পৃথক্ পরিকল্পনা গঠন করিয়াছে। কিন্তু বৃটেনের পরিকল্পনায় অন্যান্য দেশগুলি বিশেষ করিয়া ফ্রান্স সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। এ ক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রতিবাদ কতটুকু কার্য্যকরী হইবে, তাহা বলা কঠিন। তবে রুঢ় সম্পর্কে যে নূতন কর্মসূচী গঠন করা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, পশ্চিমী ইউনিয়নের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ সৃষ্ট হইতে দেওয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চায় না। রুঢ় অঞ্চলে উৎপাদন এবং উৎপাদিত পণ্য বন্টনের ব্যাপারে ফ্রান্সকেও কথা বলিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আমেরিকার সৈন্যবাহিনী জার্ম্মাণী হইতে চলিয়া গেলেও ফ্রান্সের এই অধিকার বজায় থাকিবে। রাজনৈতিক দিক্ হইতে চেকোশ্লাভাকিয়ার গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে কম্যুনিষ্টদের হাতে চলিয়া গেলেও ফ্রান্সে এবং ইটালীতে কম্যুনিজমকে কতক পরিমাণে ঠেকান সম্ভব হইয়াছে। ইউরোপে কম্যুনিজমের প্রসার ঠেকান সম্ভব হইলেও এশিয়ায় সম্ভব হয় নাই। চীনে কম্যুনিষ্টদের উত্তরোত্তর জয়লাভ তাহার প্রমাণ। এশিয়ার আর এক বিপদ—সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়ায় তাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে। ওলন্দাজদের অতর্কিত আক্রমণে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের ভাগ্য-বিপর্য্যয় এশিয়ার পক্ষে কম্যুনিজম অপেক্ষা কম বিপদ সূচনা করিতেছে কি না, তাহা অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ প্রশ্ন।

১৯৪৮ সালের উল্লিখিত ঘটনাবলী ১৯৪৯ সালের অবস্থা সম্বন্ধে কি সূচনা করিতেছে? যদিও বার্লিন-সঙ্কটের সমাধান হয় নাই, যদিও গ্রীসে, প্যালেষ্টাইনে, ব্রহ্মদেশে, মালয়ে এবং চীনে অশান্ত অবস্থা অব্যাহতই রহিয়াছে, যদিও চীনের নানকিন গবর্ণমেণ্টের পতন আসন্ন বলিয়াই মনে হয়, তথাপি ১৯৪৯ সালেই তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। রাশিয়া পরমাণু বোমা আবিষ্কারের পূর্ব্বেই প্রতিষেধক যুদ্ধ আরম্ভ করার কথা অনেকে বলেন বটে; কিন্তু প্রতিষেধক যুদ্ধ আরম্ভ করার অর্থ সর্ব্বাগ্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকেই পরমাণু বোমার দ্বারা রাশিয়া আক্রমণ করিতে হইবে। ইহাতে বিশ্ববাসীর কাছে আমেরিকার নৈতিক মর্য্যাদা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তা ছাড়া পরমাণু বোমা লইয়া রাশিয়া আক্রমণের সামরিক পরিণাম কি হইতে পারে, তাহা উপেক্ষার বিষয় বলিয়া আমেরিকাও বোধ হয় মনে করে না। পশ্চিমী ইউনিয়ন এখনও শিশু। সুতরাং রাশিয়াকে আক্রমণ করিলেই রাশিয়া অতি সহজেই সমগ্র ইউরোপ দখল করিয়া বসিবে। পরমাণু বোমাবাহী বিমান ধ্বংস করিবার জন্য রাশিয়া যে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে না, সে-কথাই বা বলা যায় কিরূপে? কাজেই পরমাণু বোমা থাকা সত্ত্বেও প্রথম আক্রমণের ঝুঁকি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র লইবে না। প্রথম আক্রমণ রাশিয়া আরম্ভ করিবে, তাহাও কল্পনা করা যায় না। সশস্ত্র সংগ্রাম যত বিলম্বে আরম্ভ হইবে, রাশিয়া ততই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ় করিতে পারিবে, হয়ত পরমাণু বোমা আবিষ্কার করাও তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। হিরোসিমা ও নাগাসিকির ভীতিপ্রদ পরিণামের পরে রাশিয়ার হাতে পরমাণু বোমা যে আমেরিকাবাসীর মনে ভীতির সঞ্চার করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উভয় পক্ষের হাতে পরমাণু বোমা থাকিলে যুদ্ধে উহা না-ও ব্যবহৃত হইতে পারে। সুতরাং ১৯৪৯ সালে তৃতীয় মহাসমর আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' যে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের বাণী—

৩রা জানুয়ারী (১৯৪৯) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একাশীতিতম কংগ্রেসের যে ছয় মাসব্যাপী প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ৫ই জানুয়ারী তারিখে কংগ্রেসের উভয় পরিষদের নিকট তাঁহার বাণীতে যে কর্ম্মসূচী ঘোষণা করিয়াছেন, পৃথিবীর সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আশাপূর্ণ সাগ্রহ দৃষ্টি তাহার উপর বিশেষ ভাবেই নিবদ্ধ হইয়াছে। এক দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের কর্ম্মসূচী যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নব বিধান বা New Deal হইতেও বৃহত্তর এবং ব্যাপকতর তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান কংগ্রেসে ডেমোক্রেটিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ১৯৪২ সাল বা ১৯৪৪ সাল অপেক্ষাও অনেক বেশী। নূতন প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদলের সদস্য-সংখ্যা ২৬২ এবং রিপাবলিকান দলের সদস্য-সংখ্যা ১৭১ জন। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান দলের সদস্য-সংখ্যা ২৪৩ এবং ডেমোক্র্যাটিক দলের সদস্য-সংখ্যা ১৮৫ জন ছিল। নূতন সিনেটে ডেমোক্র্যাটিক দলের সদস্য-সংখ্যা ৫৪ এবং রিপাবলিকান দলের সদস্য-সংখ্যা ৪২ জন। পূর্ব্ববর্ত্তী সিনেটে রিপাবলিকান দলের সদস্য-সংখ্যা ৫১ এবং ডেমোক্র্যাটিক দলের সংখ্যা ৪৫ জন ছিল। সুতরাং নূতন কংগ্রেস যদি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের কার্য্যসূচী কার্য্যে পরিণত করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাতে বাধা না হইবারই কথা। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের বাণীতে পররাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চার কথা মাত্র বলা হইয়াছে, কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহার কর্ম্মসূচী শুধু ব্যাপকই নহে, উহাকে অনেকে সমাজতন্ত্রবাদ-ঘেঁষা বলিয়াও মনে করেন। বস্তুতঃ রিপাবলিকান দলের কোন কোন সেনেটর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের কর্ম্মসূচীকে 'সোশ্যালিষ্ট মেনিফেষ্টো' বা সমাজতান্ত্রিক ফতোয়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই কর্ম্মসূচীর প্রধান বিশেষত্ব এই যে, নির্ব্বাচনী বক্তৃতায় প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কংগ্রেসের নিকট তাঁহার ঘোষণা-বাণীর কর্ম্মসূচীতে সেই সকল প্রতিশ্রুতিই স্থান পাইয়াছে। তাঁহার বাণীতে নূতনত্ব না থাকিলেও সুপারিশগুলির বাস্তব গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা বিবেচনা করিলে, এই সকল সুপারিশকে বাস্তব ভিত্তিহীন শুভেচ্ছা বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। আগামী দুই বৎসরের মধ্যে এই সকল সুপারিশ কার্য্যে পরিণত হইয়া আইনের রূপ গ্রহণ করা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। প্রতিনিধি পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ম্যাক্ করম্যাক প্রেসিডেণ্টের বাণীকে সত্যিকার প্রগতিশীল (Real progressive Message) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেনেটর স্কট লুকাস বলিয়াছেন, "এই কার্য্যসূচীর অধিকাংশই আমরা আইনে পরিণত করিতে পারিব বলিয়া আমি আশা করিতেছি।"

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের কর্ম্মসূচী বিশ্লেষণ করিলে উহার মধ্যে পুঁজিপতিদের ক্ষমতা কত পরিমাণে হ্রাস করিবার এবং জাতীয় আয়ের বৃহত্তর অংশ সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি করিবার অভিপ্রায়

অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বাণীতে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার, অধিকতর ব্যক্তি-স্বাধীনতা, এবং সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদিগকে অধিকতর সুযোগ দিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোনও শ্রেণীর কথাই তিনি বিস্মৃত হন নাই। আমেরিকার মত ধনী দেশেও মুদ্রাস্ফীতির জন্য সাধারণ পণ্যব্যবহারকারীদের সাংসারিক ব্যয়-নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাহাদের জন্য মূল্য হ্রাসের আট দফা-সম্বলিত এক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ এবং জীবনযাত্রার ব্যয়হ্রাসের জন্য তিনি পুনরায় মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন এবং ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া ৪০০ কোটি ডলার সরকারী আয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইন বাতিল করিয়া ওয়েজনার আইন পুনঃ প্রবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ওয়েজনার আইনে সুবিধা আদায়ের জন্য শ্রমিকদিগকে অধিকতর অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও বস্তী আছে, কাজেই বস্তিবাসীও আছে। গৃহহীন লোকের সংখ্যাও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী আমেরিকায় বড় কম নয়। বস্তিবাসী এবং গৃহহীনদিগকে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বস্তী সংস্কারের এবং অল্প ভাড়ায় গৃহ সরবরাহের আশ্বাস দিয়াছেন। করদাতাদিগকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, ট্যাক্সের বোঝা ন্যায়সঙ্গত ভাবে বন্টন করা হইবে। নিগ্রোদিগকে যাহাতে একঘরে করিয়া রাখা না হয় এবং তাহাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা না হয় সে জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ নাগরিকদিগকে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুবিধা অধিকতর বিস্তৃত করিবার আশ্বাস প্রদত্ত হইয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ধনতন্ত্রের অপ্রতিহত প্রভাবের কথা বিবেচনা করিলে এই সকল আশ্বাসকে সমাজতন্ত্রবাদ বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু আসলে ইহা যে মার্কিণ ধনতন্ত্রকে আসন্ন সঙ্কট হইতে ত্রাণ করিবার জন্য সমাজতান্ত্রিক আবরণে আবৃত করিবার প্রচেষ্টা, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। বস্তুতঃ, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান নিজেই বলিয়াছেন, "যে সকল নৈরাশ্যবাদী ভবিষ্যদ্বক্তা মার্কিণ ধনতন্ত্রের পতন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাঁহারা বোকা বনিয়া গিয়াছেন।" মার্কিণ ধনতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে সমগ্র পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক আধিপত্য রক্ষা করা প্রয়োজন। রাশিয়া তথা কম্যুনিজমের সম্প্রসারণ নিরোধ উহারই নেতিবোধক দিক্ মাত্র। এই প্রয়োজনের তাগিদ হইতেই মার্শাল-পরিকল্পনা, পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন, উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি, এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক সামরিক শিক্ষা দান ব্যবস্থার উদ্ভব। অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন যে, কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই একই সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তার প্রসার এবং জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকা-নির্ব্বাহের উন্নয়ন ও সমর আয়োজনের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করা সম্ভব নয়। মাখন অথবা বন্দুক এই দুইটির মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে হয়। হিটলারের জার্ম্মাণী সম্বন্ধে ইহা যে সত্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সমগ্র পৃথিবীকেই আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বীহীন বাজারে পরিণত করা প্রয়োজন। ইহার জন্য প্রয়োজন সমগ্র পৃথিবীতে আমেরিকার পরোক্ষ রাজনৈতিক আধিপত্য রক্ষা করা। আবার রাজনৈতিক আধিপত্য রক্ষা করিতে হইলে কম্যুনিজমের প্রসার নিরোধ করা এবং উহার জন্য ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কি ঠিক সেই পথেই চলিতেছে না? প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁহার বাণীতে বলিয়াছেন, "আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে কার্য্যকরী ভাবে সংগঠন করার কাজে গত বৎসর আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। কিন্তু আমাদের জাতীয় আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার আরও উন্নয়ন করার প্রয়োজন।" মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুবকদিগকে ব্যাপক সামরিক শিক্ষা দিবার জন্য আইন প্রণয়ণের জন্য সুপারিশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "আমরা নির্ভর করিতে পারি, এরূপ ভাবে বিশ্বের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে-পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্ন না হয়, সে-পর্য্যন্ত আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পর্য্যাপ্ত সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী গঠন ও রক্ষা করার দায়িত্ব হইতে আমরা মুক্তি পাইতে পারি না।" উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি, পশ্চিম-ইউরোপকে সামরিক সাহায্য দান এবং মার্শাল-পরিকল্পনার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ সম্পর্কে তিনি খুব অল্প কথাই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু এই অল্প কথাই ব্যাকরণের সূত্রের মত বহু অর্থ প্রকাশ করিতেছে। আমেরিকাবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য, বেকার-সমস্যা নিরোধের জন্য প্রচুর উৎপাদন করা প্রয়োজন। কিন্তু এত পণ্য আমেরিকাবাসীর প্রয়োজন হইবে না। তাই পশ্চিম ইউরোপকে সামরিক সাহায্য দান, সামরিক প্রস্তুতি এবং মার্শাল-পরিকল্পনার ভিতর দিয়া এই সকল পণ্য কাটাইবার এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে আমেরিকার অধিবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িবে বটে। কিন্তু বেল পাকিলে কাকের লাভ কি?

মিশরের প্রধান মন্ত্রী নিহত—

গত ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৪৮) মিশরের প্রধান মন্ত্রী নোকরশী পাশা আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া এ-পর্য্যন্ত মিশরের তিন জন প্রধান মন্ত্রী আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিশরের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী বুতরস ঘালি নিহত হন। তৎপরে ১৯৪৫ সালে মিশরের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী আহমদ মাহের পাশা নিহত হন। ইহা ব্যতীত গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মিশরে আরও তিনটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। ১৯৪৪ সালের নবেম্বর মাসে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড ময়েন, ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে ওয়াফদ দলের প্রাক্তন অর্থসচিব আমীন ওসমান পাশা, ১৯৪৮ সালের মার্চ্চ মাসে কায়রোর আপীল আদালতের সহকারী সভাপতি আহমদ হাজিন্দার বে নিহত হন। ওয়াফদ দলের নেতা ও প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশাকে হত্যা করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত আট বার চেষ্টা করা হইয়াছে। শেষ চেষ্টা হয় গত নবেম্বর মাসে।

মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘকে বে-আইনী ঘোষণা করার তিন সপ্তাহ পর নোকরশী পাশাকে হত্যা করা হয়। তিনি যখন স্বরাষ্ট্র-দপ্তর ভবনের লিফ্‌টে আরোহণ করেন, সেই সময় জনৈক যুবক তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। যুবকটি পুলিশ অফিসারের পোষাক পরিহিত ছিল বলিয়া নোকরশী পাশার দেহরক্ষী সরকারী চাকুরিয়া মনে করিয়া তাহাকে কোনরূপ বাধা দেয় নাই।

খুব নিকট হইতে সে নোকরশী পাশার উপর গুলী নিক্ষেপ করে। প্রথম ছুটি গুলী তাঁহার মুখে ও বুকে লাগে। তিনি মেঝের পড়িয়া যাইবার সময় আততায়ী আরও চারি বার গুলী করে। তিনি পড়িয়া যান এবং প্রচুর রক্তমোক্ষণ হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু হয়। চিকিৎসকগণ আসিয়া আর তাঁহাকে জীবিত পান নাই। আততায়ীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার নাম আবদুল মেগুইড হাসান। যুবকটি কায়রো বিশ্ববিভালয়ের চিকিৎসা বিভাগের ছাত্র এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্বসঙ্ঘের সদস্য।

নোকরশী পাশা এক সময়ে ওয়াফদ দলের প্রধান হুইপ হইয়াছিলেন। ওয়াফদ দলের উদ্ভব হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পর জগলুল পাশার নেতৃত্বে। মিশরের পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্জনই এই দলের লক্ষ্য। মিলনার মিশনের সুপারিশ সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করা হইবে, ইহা লইয়া ওয়াফদ দলের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ফলে ওয়াফদ দল হইতে কতক বাহির হইয়া আসেন এবং তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হন। আদিল পাশার নেতৃত্বে অহরয় দল গঠিত হয়। দ্বিতীয় আর একটি দল গঠিত হয় ওয়াতনী নামে। জগলুল পাশার নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যসম্পন্ন ওয়াফদীরা বিপ্লবের পরিবর্ত্তে আলাপ-আলোচনা দ্বারা স্বাধীনতা অর্জনের পথ সমর্থন করেন। অহরর দল বিপ্লববিরোধী। তাঁহারা সম্মানজনক আপোষের সমর্থক। ওয়াতনী দল দাবী করেন যে, আপোষ সম্পর্কে আলোচনা চালাইবার পূর্ব্বে মিশর হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারিত হওয়া আবশ্যক। ক্রমে ওয়াফদী দলের শক্তি আরও হ্রাস পাইতে থাকে এবং ১৯৩৭ সালে এক দল ওয়াফদী ওয়াফদ দল হইতে পৃথক্ হইয়া আহমদ মাহের পাশার নেতৃত্বে সাদ দল গঠন করেন। নোকরশী পাশা এই নূতন দলের সহকারী সভাপতি হন। পরে এক দল পুরাতন ওয়াফদীকে সংহত করিয়া নাহাশ পাশা কুৎলা আল ওয়াফদ নাম দিয়া এক নূতন দল গঠন করেন। মিশরের বর্ত্তমান বিভিন্ন দলের প্রত্যেকেই জগলুল পাশার ওয়াফদ দলের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবী করিলেও ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া তাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক দিক্ হইতে কোন সত্যিকার পার্থক্য দেখা যায় না।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নাহাস পাশা প্রধান মন্ত্রী হন এবং অক্টোবর মাসেই তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিতে হয়। তাঁহার নীতি বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পছন্দ না হওয়াই ইহার কারণ। সুতরাং তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন, এ কথা বলার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে বিতাড়িত করা হইয়াছিল, এ কথা বলিলেও ভুল বলা হয় না। বস্তুতঃ ১৯৪৪ সালের ৭ই অক্টোবর আরব জাতীয় ইউনিয়নের প্রোটোকোল স্বাক্ষরিত হওয়ার পরের দিনই তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে বিচ্যুত হন। অনেকে মনে করেন যে, মাকৃরাম ওবেদ পাশার বিদ্রোহের সহিত তাঁহার পতন ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। অতঃপর সাদ দলের নেতা আহমদ মাহের পাশা কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ওয়াফদ দল ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দলই এই কোয়ালিশনে যোগদান করে। যে-সকল দেশ জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই তাহারা সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে যোগদান করিতে পারিবে না, এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় মাহের পাশা জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্তের ফলেই ১৯৪৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। মাহের পাশা নিহত হওয়ায় নোকরশী পাশা প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার প্রথম মন্ত্রিসভার পতন হয়। ঐ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সমর্থ হন। মধ্যবর্ত্তী সময় সিদ্‌কী পাশার নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার শাসন-কাল। ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশরীয় সন্ধি সংশোধনের জন্য নোকরশী পাশার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার দায়িত্ব যে সম্পূর্ণ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের তাহা অনস্বীকার্য্য। সিদ্‌কী পাশা মিঃ বেভিনের মতে মত দেওয়াতেই তাঁহার মন্ত্রিসভার পতন হয়। ইঙ্গ-মিশরীয় বিরোধ, বিশেষ করিয়া সুদানের ভবিষ্যৎ লইয়া বিরোধের মীমাংসার জন্য নোকরশী পাশা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দ্বারস্থও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে ব্যর্থ হইয়াই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। এই ব্যর্থতার জন্যই তিনি উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদীদের অসন্তোষভাজন হইয়াছিলেন। মিশরের প্যালেষ্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র আক্রমণ যে জনমতকে সন্তুষ্ট করারই প্রয়াস তাহাতে সন্দেহ নাই। পরাজয়ের গ্লানিই এই আক্রমণের একমাত্র ফল এ কথা বলা যায় না। আততায়ীর হস্তে নোকরশী পাশার প্রাণ বিসর্জ্জন যে এই পরাজয়েরই অন্যতম ফল তাহাতে সন্দেহ নাই।

নোকরশী পাশার মৃত্যুতে মিশরের রাজনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইবে, এরূপ আশা করার কোন কারণ দেখা যায় না। মিশরের রাজা, সাদ দল এবং ওয়াফদ দলের মধ্যে ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ির ফলে মিশরের রাজনীতি ক্ষেত্রের সঙ্কট চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। ইহার উপর আছে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মিশরের অর্থনৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। অর্থনৈতিক কারণে জনসাধারণের মধ্যে গভীর অসন্তোষ প্রধূমিত হইতেছে। মিশরের ফেলাহিনদের (কৃষক) দুঃখ-দুর্দ্দশার সীমা নাই। প্রতি কৃষক-পরিবারের জমির পরিমাণ এক একরের বেশী নয়। অনেক কৃষকের আদৌ জমি নাই। দারিদ্র্য, কুসংস্কার এবং অজ্ঞতার জন্য তাহাদের রাজনৈতিক-চেতনাও জাগ্রত হইতেছে না। রাজার প্রতি তাহাদের গভীর ভক্তি। গ্রাম্য মোল্লাদের দ্বারা তাহারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চিরসঙ্কট এবং অর্থক্ষেত্রে চিরস্থায়ী দুর্দ্দশার জন্যই জনসাধারণের অসন্তোষ মাঝে-মাঝে হিংস্র বিস্ফোরণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলিম ভ্রাতৃত্বসঙ্ঘের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার ইহাই কারণ। এই সঙ্ঘের সদস্য-সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। প্রথমে প্রবল মুসলিম মনোভাব দ্বারাই এই সঙ্ঘ অনুপ্রাণিত ছিল। ক্রমে উহা রাজনৈতিক দলে পরিণত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট বলপ্রয়োগে ধ্বংস করিয়া ক্ষমতা অধিকার করাই এই দলের লক্ষ্য। ইহাদের নিজেদের অস্ত্রাগার পর্য্যন্ত আছে। দলের তরুণদিগকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়। প্যালেষ্টাইন পরিস্থিতি তাহাদের শক্তিবৃদ্ধির নূতন সুযোগ প্রদান করে। মুসলিম ভ্রাতৃত্বসঙ্ঘের হিংসামূলক কার্য্যকলাপের জন্যই এই সঙ্ঘকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে মিশরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কোন সমাধানই হইবে না। মিশরে কোন বামপন্থী রাজনৈতিক দল নাই, ইহা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। গণতান্ত্রিক ভাবধারা মিশরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। মিশরে সমাজতন্ত্রী দলের অভাবও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য এবং বেকার সমস্যা মিশরকে ক্রমেই

অশান্ত করিয়া তুলিতেছে। কম্যুনিজম মিশরে প্রবেশ করিতে পারিবে কি না, তাহাও অবশ্য বলা কঠিন। কিন্তু এই সকল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড যে মিশরের গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষেরই ফল তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীব্যাপী ধনতন্ত্র ও কম্যুনিজমের সঙ্ঘাতের মধ্যে মিশরে যদি ব্যাপক রাজনৈতিক বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে উহার পরিণাম কি হইবে তাহা বলা কঠিন।

ইন্দোনেশীয়ার ভাগ্য-বিপর্য্যয়—

ইন্দোনেশীয়ায় ডাচ-সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, রেনভাইল চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বিমান-বাহিনী ওলন্দাজ সৈন্য গত ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৪৮) অতর্কিতে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের রাজধানী যোগ্যাকর্ত্তা দখল করিয়াছে এবং প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সোয়েকরণো, প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের সদস্যগণ এবং প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ওলন্দাজদের হাতে বন্দী হইয়াছেন। ২১শে ডিসেম্বর তারিখে প্যারীতে অবস্থিত ইন্দোনেশীয়া প্রজাতন্ত্রের মুখপাত্র অবশ্য দাবী করিয়াছেন যে, প্রজাতন্ত্রী বাহিনী পুনরায় যোগ্যাকর্ত্তা দখল করিয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে পরে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইন্দোনেশীয়া প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আর আছে কি না, তাহাতেই যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সিঙ্গাপুর হইতে ২৪শে ডিসেম্বরের এক সংবাদ প্রকাশ, সুমাত্রার কোনও স্থানে হাত্তা গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিবের নেতৃত্বে অস্থায়ী ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। ইন্দোনেশীয়া প্রজাতন্ত্রের সমগ্র রাজ্য দখল করিবার জন্য এই আক্রমণের পরিকল্পনা যে অত্যন্ত গোপনে এবং খুব সুকৌশলে করা হইয়াছিল এবং অত্যন্ত দক্ষতার সহিত এবং অতর্কিত ভাবে এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গত ২০শে ডিসেম্বর (১৯৪৮) প্যারী নগরীতে প্রকাশিত এক ওলন্দাজ-বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে নেদারল্যাণ্ডের প্রতি প্রজাতন্ত্রীরা তাহাদের মনোভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ না করায় হল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভা একমত হইয়া ইন্দোনেশিয়ায় আক্রমণ চালান সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেন। গত ১২ই ডিসেম্বর ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, ডাচ-ইন্দোনেশিয়া বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে এবং অবিলম্বে প্রজাতন্ত্র-বহির্ভূত এলাকায় অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হইবে। সুতরাং ১২ই ডিসেম্বর বা পরবর্ত্তী কোন দিন ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র আক্রমণের জন্য সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা অনুমান করা অসম্ভব। বিমান-বাহিত সৈন্য দ্বারা অতর্কিতে শুধু যোগ্যাকর্ত্তাই দখল করা হয় নাই, স্থলপথ, জলপথ ও বিমানপথ তিন দিক্ হইতে যবদ্বীপ আক্রমণ করা হয়। সুমাত্রাও যে আক্রমণ করা হয়, সে-সম্বন্ধে ডাচ-কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে নীরব ছিলেন। ২১শে ডিসেম্বর তারিখের বিশ্বাসযোগ্য বে-সরকারী সংবাদে জানা যায় যে, যবদ্বীপ এবং সুমাত্রা উভয়ই ডাচ সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের গতি অতিদ্রুত অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং এই আক্রমণের জন্য হল্যাণ্ড যে অনেক পূর্ব্ব হইতেই গোপনে গোপনে প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রেনভাইল চুক্তি হইয়াছিল এই আয়োজন গোপন রাখিবার কৌশলপূর্ণ শ্রেষ্ঠ আবরণ।

১৯৪৬ সালের শেষ ভাগে লিঙ্গাজাতি চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা চলে এবং ১৯৪৭ সালের ১৭ই মার্চ্চ এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির সময়ই এই আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে, শক্তি সংহত করিয়া পুনরায় আক্রমণের জন্য সময় লইবার উদ্দেশ্যেই ডাচ-সাম্রাজ্যবাদীরা এই চুক্তি করিয়াছিল। এই আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, ১৯৪৭ সালের ২১শে জুলাই হঠাৎ হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়া আক্রমণ করাতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। অতঃপর ইন্দোনেশিয়া সমস্যা নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ দিয়া শান্তি স্থাপনের জন্য শুভেচ্ছা কমিটি (good office commitee) গঠন করেন। এই কমিটি ১৯৪৭ সালের আগষ্ট সরেজমিনে উপস্থিত হইয়া কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ডাচ-কর্ত্তৃপক্ষ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া উত্তর-পূর্ব্ব সুমাত্রায় ব্যাপক ভাবে আক্রমণ আরম্ভ করেন এবং মোগ্যাক দখল করিয়া বসেন। বস্তুতঃ শুভেচ্ছা কমিটি তিন বার ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক যুদ্ধ-বিরতি সর্ত্ত ভঙ্গ করিবার অভিযোগ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গোচরীভূত করিয়াছিলেন। অবশেষে সুদীর্ঘ আলোচনার পর 'রেনভাইল' (Renville) নামক মার্কিণ জাহাজে ১৯৪৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহাই রেনভাইল চুক্তি নামে খ্যাত। নূতন আক্রমণের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই যে ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ এই চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল, ১৯শে ডিসেম্বরের আক্রমণ হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে। অদৃষ্টের মর্ম্মান্তিক পরিহাস এই যে, জয়পুর কংগ্রেসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে-সময়ে ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্যে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই ওলন্দাজ বাহিনী যোগ্যাকর্ত্তা দখল করিতেছিল। ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষের অহমিকা এবং প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি এত বেশী যে, ডাঃ সোয়েকরণো এবং অন্যান্য প্রজাতন্ত্রী নেতাদিগকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া যোগ্যাকর্ত্তার রাজপথে পদব্রজে ভ্রমণ করান হইয়াছিল।

প্রজাতন্ত্রীরা সরল বিশ্বাসেই রেনভাইল চুক্তি মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ নির্ব্বাচনে রাজী না হইয়া ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ এই চুক্তি কার্য্যতঃ অগ্রাহ্যই করিয়াছিলেন। গত জুন মাসে (১৯৪৮) শুভেচ্ছা কমিটির মার্কিণ সদস্য ইন্দোনেশীয়া সমস্যা সমাধানের জন্য যে প্রস্তাব করেন, আলোচনার ভিত্তি হিসাবে প্রজাতন্ত্রীরা তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ তাহা মানিয়া লইতে রাজী হন নাই। গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৪৮) মার্কিণ সদস্য চুক্তির একটি খসড়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ উহা অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু প্রজাতন্ত্রীরা উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুভেচ্ছা কমিটি নিরাপত্তা পরিষদের নিকট যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আলাপ-আলোচনার সমস্ত পথ নিঃশেষে শেষ হইয়া যায় নাই, আলোচনা চালাইবার সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্যক্ ভাবে বিবেচনা করাও হয় নাই এবং ডাচ প্রতিনিধি দল উত্তরের জন্য যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা পূরণ করাও অসম্ভব ছিল। বস্তুতঃ গত ডিসেম্বর মাসে আলোচনা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরও ডাঃ হাত্তা বিশেষ ভাবে মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি মার্কিণ প্রতিনিধির নিকট ১৩ই ডিসেম্বর এক পত্রে ডাচ-কর্ত্তৃপক্ষকে আরও সুবিধা দিবার জন্য স্বীকৃত হওয়ার কথা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ডাচ-কর্ত্তৃপক্ষ ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন কতিতে ইচ্ছুক বলিয়াই মীমাংসা সম্ভব হয় নাই। রেনভাইল চুক্তির ১০ নং ধারায় এই সর্ত্ত

আছে যে, যুদ্ধ-বিরতির অবসান ঘটাইতে হইলে অপর পক্ষকে এবং শুভেচ্ছা কমিটিকে নোটিশ দিতে হইবে। শুভেচ্ছা কমিটির সদস্যরা অনেক বিলম্বে নোটিশ পাইয়াছেন এবং আক্রমণ আরম্ভ করার পূর্ব্বে যুদ্ধ-বিরতির নোটিশ যোগাকর্ত্তায় পৌঁছে নাই। রেনভাইল চুক্তিকে ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ এক টুকরা ছেঁড়া কাগজের মতই মনে করিয়াছে, নিরাপত্তা পরিষদকে অগ্রাহ্য করিতেও দ্বিধা করে নাই। ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ-সমাজ্যবাদীরা তাহাদের সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়। এই ব্যাপারে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরাও যে ওলন্দাজদের সহায়, তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা গিয়াছে।

ইন্দোনেশিয়া ও নিরাপত্তা পরিষদ—

ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ-সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাইবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের উপর নির্ভর করা যে নিরর্থক, তাহা সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝা গিয়াছে। অবশ্য ডাচ-আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পরই ২০শে ডিসেম্বর তারিখে প্যারীতে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। ঐ দিন রাশিয়া, ইউক্রেন ও কলম্বিয়া এই তিনটি রাষ্ট্র অনুপস্থিত থাকায় কোরাম হয় নাই। অতঃপর ২৪শে ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে ওলন্দাজ ও প্রজাতন্ত্র উভয় পক্ষকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া এবং ডাঃ সোয়েকরণা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ডাচ-আক্রমণের নিন্দা করিয়া একটি কথাও এই প্রস্তাবে বলা হয় নাই। এমন কি আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বের স্থানে ডাচ সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইবার পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। ডাচ গবর্ণমেণ্টের মুখপাত্র ডাচ-ইন্দোনেশিয়া বিরোধে নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকারই স্বীকার করেন নাই। তিনি ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকারও অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট মাত্র শতকরা ৩৫ ভাগ লোকের প্রতিনিধি। ভারতবাসী আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের এই ধরণের যুক্তির সহিত অপরিচিত নই। ডাচ মুখপাত্র আরও বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ-বিরতির সময় প্রজাতন্ত্রীরা যত লোকের প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছে, ডাচ আক্রমণের ফলে যে তাহা অপেক্ষা কম লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইবে, তাহা ইতিমধ্যেই বুঝিতে পারা গিয়াছে। প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট কম্যুনিষ্টদিগকে আশ্রয় দিতে ইচ্ছুক এবং ওলন্দাজদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ইন্দোনেশীয়দের উপর অত্যাচার করিতেছিল, এইরূপ অভিযোগও তিনি উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু লণ্ডনস্থ ইন্দোনেশিয়া অফিসের প্রচার বিভাগের অফিসার মিঃ এট কিনসন নিউ ইয়র্ক হেরল্ড ট্রিবিউনে (ইউরোপীয় সংস্করণ) এই সকল অভিযোগের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, "যবদ্বীপে কম্যুনিষ্ট অভ্যুত্থান হইয়াছিল এবং প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট তাহা দমন করিয়াছেন। ডাচ কর্ত্তৃপক্ষ এই অভ্যুত্থানের অতিরঞ্জিত বিবরণই শুধু প্রকাশ করেন নাই, পলায়নপর বিদ্রোহীদিগকে আশ্রয়ও দিয়াছেন।······প্রজাতন্ত্রের বহির্ভূত ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্রগুলির উল্লেখ খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। ওলন্দাজরা যে হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছিল, তাহা উল্লেখ করা হয় নাই। সেলিবেস দ্বীপে ক্যাপ্টেন ওয়েষ্টার্লিং যে ৩০ হাজার ইন্দোনেশীয়কে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহার কথাও উল্লেখ করা হয় নাই।"

২৪শে ডিসেম্বর যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। পাঁচ দিন পরে ডাচ-মুখপাত্র নিরাপত্তা পরিষদকে জানান যে, জাভায় ৩১শে ডিসেম্বর মধ্য-রাত্রি পর্য্যন্ত যুদ্ধ থামিবে এবং সুমাত্রায় আরও কিছু বিলম্ব হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আক্রমণের উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ওলন্দাজরা যুদ্ধ বন্ধ করিবে না। হইয়াছেও তাহাই। প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট এবং অন্যান্য সদস্যদিগকেও মুক্তি দেওয়া হয় নাই। গত ৭ই জানুয়ারী (১৯৪৯) ওলন্দাজ প্রতিনিধি ডাঃ ভান রায়েন নিরাপত্তা পরিষদকে জানাইয়াছেন, 'বন্দী প্রজাতন্ত্রী নেতৃবর্গকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার সর্ব্বত্র তাঁহাদিগকে চলাফেরা করিতে দিলে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিপন্ন হইবে বলিয়া সাময়িক ভাবে তাঁহাদিগকে শুধু বানকা দ্বীপেই চলাফেরা করিতে দেওয়া হইবে।' ইহার সোজা অর্থ, বানকা দ্বীপে তাঁহাদিগকে অন্তরীণ করা হইয়াছে। ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ কেন যে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতেছেন না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়! নিরাপত্তা পরিষদে ওলন্দাজ বাহিনীকে আক্রমণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বের স্থানে ফিরাইয়া আনিবার নির্দ্দেশ দিবার জন্য ইউক্রেন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়া রাশিয়াও এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল। ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে উভয় প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হইয়াছে। ইউক্রেনের প্রস্তাবে বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, আর্জ্জেন্টিনা ও কানাডা এবং রাশিয়ার প্রস্তাবে বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, আর্জ্জেন্টিনা, কানাডা ও কলম্বো ভোটদানে বিরত ছিল। কাজেই প্রস্তাবের পক্ষে ৭ ভোট না হওয়ায় প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায়। ইউক্রেনের প্রস্তাবে যাহারা ভোট দেন নাই, তাঁহারা চান না যে, ওলন্দাজ সৈন্যবাহিনী আক্রমণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসুক। যাঁহারা সোভিয়েট রাশিয়ার প্রস্তাবে ভোট দেন নাই, তাঁহারা চান না যে, যুদ্ধ-বিরতির জন্য ওলন্দাজদের উপর কোন সময় নির্দ্দেশ করা হউক। ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।

গত ৭ই জানুয়ারী হইতে লেকসাকসেসে পুনরায় নিরাপত্তা-পরিষদের অধিবেশনে ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে বটে; কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার ভাগ্য-বিপর্য্যয় তাহাতে রোধ হইবে না। বৃটেন এবং ফ্রান্স দুই-ই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। নিরাপত্তা পরিষদ কার্য্যকরী ভাবে কোন ব্যবস্থা যাহাতে গ্রহণ করিতে না পারে, সেই জন্যই তাহারা চাপ দিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও প্রত্যাশা করিবার কিছুই নাই।

ইন্দোনেশিয়া ও এশিয়া সম্মেলন :—

ওলন্দাজদের ইন্দোনেশিয়া আক্রমণে ভারত তথা এশিয়ায় যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। ভারতের আকাশের উপর দিয়া ওলন্দাজ কে-এল-এম বিমান কোম্পানীর বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সিংহলের জাহাজ ও বিমান বন্দরে ওলন্দাজ সৈন্য ও সমরোপকরণবাহী জাহাজ ও বিমানের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে আলোচনার জন্য এশিয়া সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। ২০শে জানুয়ারী (১৯৪৯) সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার

দিন ধার্য্য হইয়াছে। নিম্নলিখিত ২০টি দেশ সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্ত আমন্ত্রণ পাইয়াছে:—মিশর, ইরাণ, আফগানিস্থান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, অষ্ট্রেলিয়া, শ্যাম, তুরস্ক, ইথোপিয়া, সৌদী আরব, সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্সজর্ডন, ইরাক, ইয়েমন, চীন, নেপাল, পাকিস্থান, নিউজীল্যাণ্ড এবং ফিলিপাইন। এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্য্যন্ত সংবাদে প্রকাশ যে, প্রথম ছয়টি দেশ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রণ গ্রহণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শ্যাম সম্মেলনে যোগদান করিতে অসামর্থ্য জানাইয়াছে।

এশিয়ার দেশসমূহের ঐক্যবদ্ধ চাপ দিয়া ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ আক্রমণের অবসান ঘটান এবং ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য এ কথা অবশ্যই বলিতে পারা যায়। কিন্তু এই সম্মেলনের জন্ত কোন কার্য্যসূচী নির্দ্ধারিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। কি পন্থা গ্রহণ করা হইবে তাহা অনুমান করা হয়ত কঠিন নয়। আক্রমণের পূর্ব্বের স্থানে সৈন্ত ফিরাইয়া আনিবার জন্ত হল্যাণ্ডকে নির্দ্দেশ দিতে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট দাবী এবং এই নির্দ্দেশ প্রতিপালিত না হইলে হল্যাণ্ডকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হইতে বহিষ্কৃত করিবার দাবী করা হইবে কি না, এবং দাবী করা হইলে তাহার ফল কি হইবে, তাহা আলোচনা করিয়া লাভ নাই। বৃটেনকে জিজ্ঞাসা না করিয়া এই সম্মেলন আহ্বান করায় বৃটিশ যেমন বিস্মিত হইয়াছে তেমনি সন্তুষ্টও হয় নাই। ইন্দোনেশিয়া হইতে ডাচদের বিতাড়ন অষ্ট্রেলিয়ার শ্বেতকায়গণ শ্বেত-অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া মনে করে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনেকে এই সম্মেলনের মধ্যে নেহরু-ডকট্রিন ও প্রাচ্য ব্লক সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিতে পাইতেছেন। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিরে এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি যদি ঐক্যবদ্ধ ভাবে ব্যবস্থা করিতে সাহসী না হয়, তাহা হইলে ইন্দোনেশিয়ার মুক্তি সম্বন্ধে কোন ভরসা করা অসম্ভব। এই সম্মেলনের কার্য্যসূচীর মধ্যে ভিয়েটনামের স্থান পাওয়া উচিত ছিল।

চীনে শান্তিপ্রতিষ্ঠার গোলকধাঁধা:—

চীনে শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চীনা গোলকধাঁধার কথাই শুধু স্মরণ করাইয়া দেয়। জেনারেল চিয়াং কাইশেক পদত্যাগ করিবেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি পদত্যাগ করেন নাই। নববর্ষ উপলক্ষে তাঁহার বাণীতে চিয়াং কাইশেক বলিয়াছেন, "শান্তিপূর্ণ ভাবে গৃহ-যুদ্ধের মীমাংসা করিতে কম্যুনিষ্টরা যদি আন্তরিক আগ্রহ দেখায়, তাহা হইলে আমার ব্যক্তিগত মর্য্যাদা ভবিষ্যতে যাহাই হউক তাহাতে কিছু আসে-যায় না।" কম্যুনিষ্টরা এ-পর্য্যন্ত বহু বার মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু চিয়াং কাইশেকের জন্তই মীমাংসা সম্ভব হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্টদের যদি দেশবাসীর কল্যাণ ও জাতীয় স্বার্থের প্রতি আগ্রহ থাকে তাহা হইলে তিনি তাহাদের সহিত শান্তি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। চিয়াং কাইশেকের গবর্ণমেণ্টের শাসনে চীনবাসীদের যে কিরূপ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহা পৃথিবীর কাহারও অজানা নাই। চিয়াং কাইশেক কম্যুনিষ্টদিগকে ভয় দেখাইয়াছেন, কম্যুনিষ্টরা যদি আগ্রহান্বিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার গবর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবেন। গৃহ-যুদ্ধের গতি দেখিয়া তাঁহার এই হুমকী যে অর্থহীন তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। ২৭শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, বড়দিন উপলক্ষে কম্যুনিষ্ট বেতারে চীনের সরকারী নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। যুদ্ধাপরাধীদের মধ্যে চিয়াংকাইশেক ও মাদাম চিয়াং কাইশেক আছেন।

চীন গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থতা করিবার জন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা অগ্রাহ্য হওয়ার পর সমস্ত রণাঙ্গনে পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া কম্যুনিষ্টদের সহিত সরাসরি আপোষ মীমাংসার আলোচনা চালাইবার চেষ্টা চলিবে বলিয়া ২১শে ডিসেম্বর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এমন কি চেঙ্গিস খাঁর বংশধর প্রিন্স তে ওয়ান নানকিংএ আগমন করায় এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, মীমাংসার ভার তাঁহার উপরেই দেওয়া হইবে। কিন্তু চিয়াং কাইশেকের নববর্ষের ঘোষণার সহিত শান্তি-প্রচেষ্টার কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ৩১শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ইয়াংসি নদীর তীরবর্ত্তী ৬৫০ মাইল বিস্তৃত রণাঙ্গনে কম্যুনিষ্টরা ১০ লক্ষ সৈন্ত সমাবেশ করিয়াছে। কম্যুনিষ্ট সৈন্তদের মধ্যে চীনা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিমান হইতে শান্তিপত্র বিতরণকে আপোষ মীমাংসার পথ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করা যায় না।

২রা জানুয়ারী কম্যুনিষ্ট রেডিও হইতে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, শান্তি-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কম্যুনিষ্টদের নির্দ্ধারিত সর্ত্তেই তাহা করিতে হইবে। চীনে পিপলস্ রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গঠন করাই তাহাদের দাবী। শান্তি আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বিশ্বাসঘাতকদিগকে ও মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকদিগকে নিশ্চিহ্ন করার দাবীও কম্যুনিষ্টরা করিয়াছে। ১৯৪৯ সালের প্রারম্ভে চীন গবর্ণমেণ্টের শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইবার অভিপ্রায়ের মধ্যে ৮ই জানুয়ারী নানকিংএর এক শত মাইল উত্তরে কম্যুনিষ্ট বাহিনী যখন নূতন অভিযান আরম্ভ করিল, তখন চীনের সরকারী মহলে নূতন করিয়া শান্তির আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। নানকিং হইতে ৯ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কম্যুনিষ্টদের সহিত মীমাংসার ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্ত চীন গবর্ণমেণ্ট বৃহৎ রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। কূটনীতির গহন-পথে পরিচালিত এই প্রচেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু অসমর্থিত সংবাদে চিয়াং কাইশেক নানকিং হইতে তল্পিতল্পা গুটাইবার আয়োজন করিতেছেন বলিয়া যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ।

প্যালেষ্টাইন ও বৃটেন—

প্যালেষ্টাইন বিরোধে বৃটেনের জড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা প্যালেষ্টাইন সমস্যায় যে নূতন পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে তাহা খুবই গুরুতর। নেগেভ অঞ্চলে অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতির জন্ত বৃটেনের প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও গত ২৩শে ডিসেম্বর হইতে নেগেভ অঞ্চলে মিশর ও ইহুদীদের মধ্যে আবার যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। গত ২১শে ডিসেম্বর বৃটিশ প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদে জানান যে, ইসরাইল সৈন্তরা মিশর আক্রমণ করিয়াছে এবং তাহারা মিশর সীমান্ত অতিক্রম করিয়া এল আরিশ ময়দানের ছয় মাইল দূরে পৌঁছিয়াছে। মিশরের ভিতরে সীমান্ত হইতে ৩৫ মাইল দূরে

এল আরিশ অবস্থিত। ইহুদীরা প্রথমে এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করিলেও পরে তাহা স্বীকার করে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপে ইহুদী-বাহিনীকে মিশর হইতে সরাইয়া আনা হইয়াছে। ১৯৩৬ সালের সন্ধি অনুসারে বৃটেন যদি মিশরকে পরাজয়ের হাত হইতে রক্ষা করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে ইসরাইল রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থা বড় সহজ হইবে না। নেগেভ অঞ্চলে যুদ্ধ-বিরতি আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহুদী বিমান পাঁচখানি টহলদার বৃটিশ বিমান ভূপতিত করার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিবার আশঙ্কা আছে। ১৯৪৮ সালের ইঙ্গ-ট্রান্সজর্ডান চুক্তি অনুযায়ী বৃটেন প্যালেষ্টাইন সীমান্তের নিকটবর্ত্তী ট্রান্সজর্ডানের বন্দর আকাবায় ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। আম্মানে বৃটিশ বিমানের এবং মিশরের খাল অঞ্চলে মোতায়েন বৃটিশ-সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কথাও শোনা যায়। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা অস্বীকার করেন। কিন্তু ইসরাইল হইতে বৃটিশ নাগরিকদিগকে অপসারণ করা হইতেছে।

ইসরাইল রাষ্ট্রের সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধ সত্যই না-ও বাধিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু অবস্থার ক্রমাবনতি বিবেচনা করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া ইসরাইল রাষ্ট্রকে সাহায্য দেওয়ার আশ্বাস দিয়াছেন। ইসরাইল রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে আমেরিকার প্রভাবাধীন, ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন। কিন্তু বৃটেন বেশ কৌশলপূর্ণ উপায়ে আরব রাষ্ট্রগুলির উপর তাহার প্রভাবকে সংহত করিবার আয়োজন করিয়াছে। মধ্য-প্রাচ্যে বৃটেনের কর্ম্মতৎপরতার ইহাই প্রধান তাৎপর্য্য।

জেনারেল তোজোর ফাঁসী—

আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের রায়ের নির্দ্দেশ অনুসারে গত ২২শে ডিসেম্বর (১৯৪৮) জাপানের যুদ্ধকালীন প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হিদেকী তোজো এবং অপর ছয় জন জাপ সমরনেতার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। ফাঁসীর অব্যবহিত পূর্ব্বে জেনারেল তোজো জনৈক বৌদ্ধ পুরোহিতের মারফৎ বিশ্বের চিন্তাশীল নরনারীর নিকট এই আবেদন জানাইয়াছেন, "এশিয়ার জনসাধারণের প্রতি আপনারা সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন এবং তাহাদের মনোভাব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন।"

তাঁহার এই অন্তিম আবেদনের কি ফল হইত, তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদ এবং বর্ণবিদ্বেষই যে জাপানকে বিগত মহাসমরে বৃটিশ ও মার্কিণ রাজ্য আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সার কথা বহু শুনিয়াছি। সাম্রাজ্য-লিপ্সু জাপান তো দূরের কথা, স্বাধীন রাষ্ট্ররূপেও তাহার অস্তিত্ব নাই বলিয়াই এশিয়া হইতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। প্রত্যেক এশিয়াবাসীই জাপানের জন্য দুঃখ বোধ না করিয়া পারিবে কি ?

তারাশঙ্কর ও দেবকীকুমারের সম্মিলিত প্রতিভায় প্রোজ্জ্বল

চিত্র-মায়ার আগতপ্রায় নিবেদন

কৃষ্ণচূড়ার তলায়, মন পাগল-করা গানের পরিবেশে, গোড়ে উঠেছিল যে প্রেম, তার অসামাজিক মাধুর্য নিয়ে—শ্রাবণ পূর্ণিমার মত আধো মেঘে-ঢাকা চাঁদের স্নিগ্ধতায়—সমাজ ও সভ্যতা তাকে হয় ত স্বীকার করে নি—

কবি

সেই জীবনের প্রতিচ্ছবি যার অভিব্যক্তি ও পরিণতি আপনাকে মুগ্ধ করবে।

সুর-সৃষ্টিতে
অনিল বাগচী

পরিচালনা ও প্রযোজনা
দেবকীকুমার বসু

প্রধান চরিত্র-চিত্রণে:
রবীন মজুমদার
অনুভা গুপ্তা
নীলিমা দাস
নীতীশ মুখো:

নৃত্য-গীত ও সংগীতের লালিত্যে অনুপম
নববর্ষের
স্মরণীয় অবদান!

শব্দানুলেখনে:
নৃপেন পাল

পরিবেশক: ডিলাক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স: কলিঃ

চিত্র-মায়ার প্রচার-বিভাগ হইতে প্রচার-সচিব সুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্ত্তৃক প্রচারিত।

রঙ্গ-পট

প্রসাদ রায়

কাংগ্রা ভ্যালির পালামুর থেকে শ্রীমতী নোরা রিচার্ড নামে এক ইংরেজ-মহিলা সংপ্রতি একখানি দৈনিকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেছেন : "বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে আয়ার্ল্যাণ্ডের কবি ও লেখকরা মিলে যে সুবিখ্যাত অ্যাবি থিয়েটার স্থাপন করেছিলেন, দিল্লী সহরেও তেমনি কোন 'ষ্টুডিয়ো থিয়েটারের' প্রতিষ্ঠা কি সম্ভবপর নয় ? আমি শীঘ্রই দিল্লীতে গিয়ে স্থানীয় নাট্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।"

সাধু সংকল্প। কিন্তু ও-শ্রেণীর রঙ্গালয়ের পক্ষে দিল্লী নগর উপযোগী কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ও অঞ্চলটি উচ্চশ্রেণীর নাট্যকার বা নাট্যশিল্পী বা নাট্যরসিকের জন্যে বিখ্যাত নয় আদৌ। আধুনিক ভারতে এ বিভাগে সব চেয়ে অগ্রসর হতে পেরেছে কলকাতা। শ্রীমতী নোরা রিচার্ড যদি কলকাতায় এসে চেষ্টা করেন তাহলে হয়তো সফল হলেও হতে পারেন।

এই সূত্রে আর একটি কথা মনে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বাছা-বাছা রসিকদের আসরে উচ্চশ্রেণীর নাটকাদির জন্যে বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন করতেন। কেবল তাই নয়, তাঁর বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্ম্মব্যস্ত জীবনেও তিনি যে রঙ্গালয় নিয়ে মস্তিষ্ক-চালনা করবার অবসর পেতেন, এক দিন আমরা সে প্রমাণও পেয়েছিলুম।

একুশ-বাইশ বছর আগেকার কথা। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। কথায় কথায় সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রসঙ্গ উঠল। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে মূল্যবান কথাগুলি বলেছিলেন, আমি বাড়ীতে এসে একখানি খাতায় তার সার মর্ম্ম নিজের ভাষায় টুকে রেখেছিলুম। তা হচ্ছে এই :

"যে ভাবে এখন সাধারণ রঙ্গালয় চলছে তা একেবারেই আশাপ্রদ নয়। যাঁর মনে রসবোধ ও কলাজ্ঞান আছে, সেখানে গিয়ে তাঁদের প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠোতে পারবে না। সর্ব্বসাধারণের জন্যে নয়,—যাঁরা ললিতকলার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে চান তাঁদের জন্যে কি বাংলা দেশে একটি অতিরিক্ত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করা চলে না ? সাধারণ রঙ্গালয়ে হপ্তায় অনেক দিন করে অভিনয় হয়। এই অতিরিক্ত রঙ্গালয়ে তা হবে না। সাধারণ রঙ্গালয়ের শিল্পীরা দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধরে একই নাটকে একই ভূমিকায় নামতে বাধ্য হন। মানুষ কলের পুতুল নয়, আসল শিল্পীর প্রাণ এই একঘেয়ে জীবনের ভিতরে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত রঙ্গালয়ে কোন নাটকই দীর্ঘকাল ধরে চালানো হবে না। এমন একটি অতিরিক্ত রঙ্গালয় অবশ্য সর্ব্বসাধারণের সাহায্যে চলতে পারে না। এ জন্যে কয়েক জন গুণগ্রাহী রসিকের সাহায্য আবশ্যক। দেশে খুঁজলে এমন দু'শো লোক নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, যাঁরা মাসে দশ টাকা করে দর্শনী দিতে পারেন। তার উপরে অন্যান্য দর্শকের কাছ থেকেও সাহায্য পাওয়া যাবে। তাতেই এই অতিরিক্ত রঙ্গালয়ের ব্যয় সংকুলান হবে। অতিরিক্ত রঙ্গালয় আকারে খুব বড় না হলেও চলবে, কারণ সেখানে যাঁদের মিলনক্ষেত্র হবে তাঁরা সকলেই বাছা-বাছা ব্যক্তি। সেখানকার আসনাদির সমস্ত ব্যবস্থাই

দেবী চৌধুরাণী চিত্রের নায়িকা সুমিত্রা

এক্ষণে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলিতেছে

ওরিয়েন্ট, বসুশ্রী ও বীণা

হবে উচ্চশ্রেণীর উপযোগী। পাশ্চাত্য দেশে 'লিটল্ থিয়েটার' নামে যে ছোট-ছোট প্রতিষ্ঠানগুলি আছে, এই অতিরিক্ত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হবে সেই আদর্শেই। দর্শকদের মুখ চেয়ে সাধারণ রঙ্গালয় যেমন চলছে চলুক, অতিরিক্ত রঙ্গালয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই থাকবে না। এখানে যে সব নাটক নির্ব্বাচিত হবে, কলারসিকের উন্নত মনে তা ভাবের রেখাপাত করতে পারবে। সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নয় বলে যে সব উঁচু দরের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অচল, এখানে অনায়াসেই সেই সব নাটকের অভিনয় সম্ভবপর হবে। এমন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদেরও অভিনয় দেখতে সাধ হয় এবং মনের ভিতরে নাটক লেখবারও ইচ্ছা জাগে।" '

বিশ্বকবির ঐ বাণী যে সময়ে আমরা শুনেছিলুম, তার পর আমাদের সাধারণ রঙ্গালয় ধাপে-ধাপে উপর দিকে ওঠেনি, নেমে এসেছে নীচের দিকেই। শক্তিশালী নূতন নাট্যকারের এত অভাব যে, বস্তা-পচা কুনাটক "বঙ্গে বর্গী" ও "কিন্নরী" প্রভৃতিরও পুনরভিনয় হয় মহা সমারোহে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকেও বার-বার ভেঙে না সাজলে এখনো নাটকের দুর্ভিক্ষ দূর হয় না। শিশিরকুমার, নির্ম্মলেন্দু ও অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতির অবসর-গ্রহণের কাল আসন্ন হয়ে এসেছে, কিন্তু তাঁদের আসনের পাশে এখনো দাঁড়াতে পারে, এমন এক জন মাত্র তরুণ অভিনেতারও দর্শন নেই। এমন অবস্থায়ও যদি রবীন্দ্রনাথ-কথিত অতিরিক্ত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টা না হয়, তবে আমাদের নাট্য-জগতের ভবিষ্যৎ যে রীতিমত আশঙ্কাজনক হয়ে উঠবে তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। এবং অদূর- ভবিষ্যতে এটা দেখলেও আমরা বিস্মিত হব না যে, রাজনীতি ক্ষেত্রের মত নাট্যকলার ক্ষেত্রেও বাঙালীকে পিছনে ঠেলে এগিয়ে গিয়েছে ভারতের অন্য কোন প্রদেশ।

শ্রীমতী নোয়া রিচার্ড আয়ার্ল্যাণ্ডের যে অ্যাবি থিয়েটারের কথা বলেছেন তার উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হচ্ছে এই :

আয়ার্ল্যাণ্ডে যখন নাট্যকলার অবস্থা শোচনীয়, সেই সময়ে পৃথিবী-বিখ্যাত কবি উইলিয়ম বাটলার ইয়েট্স্ স্থির করলেন, তাঁর স্বদেশে জাতীয় রঙ্গালয়ের অভাব মোচন করতে হবে। আদর্শরূপে তখন তাঁর সামনে ছিল ষ্টানিস্লাভ্স্কির মস্কো আর্ট থিয়েটার। তিনি এডওয়ার্ড মার্টিন, জর্জ্জ মুর ও লেডি গ্রিগরি প্রভৃতি আইরিস লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে পরামর্শ করে "আইরিস লিটারেরি থিয়েটার" স্থাপন করলেন এবং সেই সঙ্গেই হ'ল আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় নাটকের জন্ম। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে, আয়ার্ল্যাণ্ডের নিজস্ব রঙ্গালয়ের কাজ চালাতে পারেন এমন আইরিস অভিনেতার অভাবে প্রথম প্রথম অভিনেতা আমদানি করতে হল ইংলণ্ড থেকেই। ওখানকার প্রথম দু'খানি নাটক হচ্ছে ইয়েট্সের The Countess Cathleen ও মার্টিনের The Heather Field. পর-বৎসরেও (১৯০০ খৃঃ) ওখানে মার্টিন, জর্জ্জ মুর ও অ্যালিস মিলিগান প্রভৃতির নাটকাবলী অভিনীত হয়।

ইয়েটসের উপরে মেটারলিঙ্কের প্রভাব ছিল অত্যন্ত। তিনি চেয়েছিলেন এক কবিত্বপূর্ণ রঙ্গালয়। কিন্তু তাঁর সহকর্ম্মীরা পরে যখন ইয়েটসের প্রতিষ্ঠানকে পরিচিত করলেন অ্যাবি থিয়েটার নামে (১৯০৪ খৃঃ), তখন তাঁরা কিন্তু তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। উদার ইয়েট্স্ও নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা দমন করে বন্ধুদের মতেই সায় দিলেন। তিনি অনেকগুলি নাটক রচনা করেছিলেন, "The Hour Glass" হচ্ছে সেগুলির মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত। ঐ পালাটির জন্যে দৃশ্য পরিকল্পনা করেছিলেন নাট্যজগতে সুপ্রসিদ্ধ গর্ডন ক্রেগ।

অ্যাবি থিয়েটারের দৌলতে যত শক্তিশালী নাট্যকার আত্মপ্রকাশ করেছেন এখানে তাঁদের সকলকার কথা উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন জন মিলিংটন সিঞ্জ (১৮৭১—১৯০৯)। আয়ার্ল্যাণ্ডের নিজস্ব নাট্য-সাহিত্য সৃষ্টি করবার জন্যে তিনি দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুত হয়েছিলেন। ইয়েটসের পরামর্শে তিনি আরান দ্বীপে গিয়ে কয়েক বৎসর বাস করেছিলেন আইরিশ কৃষকদের ভাষা ও কথার ছন্দে দক্ষতা অর্জ্জন করবার জন্যে। সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে যখন তিনি লেখনী ধারণ করলেন, তখন আয়ার্ল্যাণ্ড লাভ করলে এমন অপূর্ব্ব এক জাতীয় নাট্য-সম্পদ, যার মধ্যে সর্ব্বত্রই আছে প্রতিভার শীলমোহর। সিঞ্জ দীর্ঘজীবীও হননি অনেক নাটক রচনা করবারও অবসর পাননি, কিন্তু স্বদেশের জন্যে তিনি যা দিয়ে গিয়েছেন, তাই-ই তাঁকে অমর করে রাখবে। তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক হচ্ছে The Playboy of the Western World (১৯০৭ খৃঃ)। এই নাটকখানি য়ুরোপ ও আমেরিকায় অর্জ্জন করেছে একসঙ্গে সুখ্যাতি এবং কুখ্যাতি। আমেরিকার জনসাধারণ এই পালাটিকে নিশ্চয়ই বর্জ্জন করত, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট তার পক্ষাবলম্বন করেই নাটকখানিকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। নাটকখানি জনসাধারণের চেয়ে নাট্য-সমালোচকদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল অধিকতর। অমর রূপ-লেখক ম্যাক্সিম গোর্কি বলেছিলেন, "এই নাটকের মধ্যে যা হাস্যকর তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবেই পরিণত হয়েছে ভয়ঙ্করে এবং তেমনি সহজেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে হাস্যকর।"

পেশাদার রঙ্গালয়ের বিকিকিনির হিসাব ছেড়ে অ্যাবি থিয়েটার সৃষ্টি করতে চেয়েছে উচ্চশ্রেণীর জাতীয় নাট্যকলা ও সাহিত্য রস এবং সার্থক হয়েছে তার সে প্রচেষ্টা। সে আশ্রয় পেয়েছে স্বদেশের প্রাণকেন্দ্রে, তাই সামলাতে পেরেছে উপর-উপরি দুই-দুইটি পৃথিবী-ব্যাপী মহাযুদ্ধের ধাক্কা। কিন্তু তবু চিরদিন সমান যায় না। অ্যাবি থিয়েটারের নাট্যকারদের উচ্চতর প্রতিভা আর নেই এবং তার শ্রেষ্ঠতর অভিনেতৃগণ এখন পাড়ি দিয়েছেন আটলাণ্টিক মহাসাগরের ও-পারে—নিউ ইয়র্কে কিংবা হলিউডে।

আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার হচ্ছেন ইউজিন ও-নীল। নিজের অসাধারণ প্রতিভার প্রসাদে তিনি আজ আসন লাভ করেছেন বিশ্ব-সাহিত্যেও। নিশ্চিত তাঁর অমরত্ব। প্রথম জীবনে তিনি কয়েকখানি নাটক রচনা করলেও কোন সাধারণ রঙ্গালয়ই সেগুলি মঞ্চস্থ করতে রাজী হয়নি। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত Provincetown Thatre নামে স্বাধীন রঙ্গালয়ই সর্ব্বপ্রথমে তাঁর নাটক অভিনয় করে তাঁকে সুপরিচিত করেছিল নিউ ইয়র্কে। তার পর থেকেই তাঁর নাটক অভিনয় করবার সুযোগ পেলে আমেরিকার প্রত্যেক সাধারণ রঙ্গালয় নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে।

কলকাতাতেও এই শ্রেণীর কোন স্বাধীন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হলে যে একাধিক শক্তিশালী নাট্যকারের আবির্ভাব সম্ভবপর নয়, জোর ক'রে বলা যায় না এমন কথা।

সাড়ে বত্রিশ ভাজা

রঙ্গমঞ্চ বনাম মঞ্চরঙ্গ

আমাদের দেশে রঙ্গের অভাবে কি মঞ্চের অভাবেই হবে, কে জানে, রঙ্গমঞ্চগুলি ক্রমশঃ যেন কাহিল হয়ে আসছে ; ছিন্ন দৃশ্যপট সম্বল, বেতন-বঞ্চিত প্রায়-নিঃসম্বল অভিনেতা-অভিনেত্রী আক্রান্ত দেশীয় রঙ্গমঞ্চের আজ যা হচ্ছে তাকে farce বলাই উচিত হবে, সে-আয়েক মঞ্চরঙ্গই হবেও বা। রঙ্গমঞ্চের এই দুর্দশায় দেশের সংস্কৃতির ক্ষতি হচ্ছে বলে আর্তনাদ করছেন যাঁরা, তাঁরা কোন বাস্তব লোক-সমাজের জন্ত নয়, সেন্টিমেন্টের জন্তই এই মায়া-কান্নায় বিভোর। পিতার মৃত্যু হবেই জেনেও আমরা যেমন পিতৃহীন হলে স্বভাবতই মুহ্যমান হই, রঙ্গমঞ্চের যুগ অতিক্রম করে এসেও তার জন্তে তেমনি আমাদের অর্থহীন হা-হুতাশ। মানুষ প্রথম তার বক্তব্যকে খোদিত করেছে পাথরের ওপর ; তার দ্বিতীয় বাণী-মুক্তি তালপাতায় লিখে, এবং তার পর সে এলো বাণী-বিস্তারের সহজ রাস্তায়—ছাপাখানা মারফৎ। কিন্তু ছাপাখানা তৈরী করেও সে নিশ্চিন্ত হতে পারলো না! তখন তার একমাত্র চিন্তা হলে যারা লেখা পড়তে পারে না তাদের কাছে কেমন করে পৌঁছে দেওয়া যায় মানুষের মহৎ চিন্তাকে। এলো যাত্রার যুগ। পৌরাণিক কাহিনীর ভেতর দিয়ে আনন্দের সঙ্গেই বিতরিত হল শিক্ষা। কিন্তু কিছুতেই সে খুশী হয় না, সেই মানুষের মন বললে : 'আরো চাই ; আরো দাও'। রঙ্গমঞ্চ তৈরী হল। পৌরাণিক আখ্যান থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের আধুনিকতম সমস্যা পর্য্যন্ত আলোকিত হল পাদ-প্রদীপের আলোয়। তার পর যার সৌভাগ্যসূর্য কখনও অস্ত যাবে না মনে হয়েছিলো, সেই বই মঞ্চকে মনে করে এক দিন ছায়াচিত্র এলো নিঃশব্দে। তার পর তার মুখে ভাষাও ফুটলো বহু প্রচেষ্টা, বহুতর পরীক্ষার পর। দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করল মানুষের চিন্তা। ছায়াচিত্র যেদিন perfect হবে, সেদিন থিয়েটারের কোন সার্থকতাই থাকবে না ; তার জন্তে অনর্থক শোকাম্বিত হবারও দরকার নেই। ছায়াচিত্রকে আজও যারা শুধু entertainment ভাবে নয়, সিনেমার যে কি বিপুল সম্ভাবনা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে, সেই সম্বন্ধে ভারত সরকারের মত আজও যারা ভাবতে পারছে না একমাত্র তারাই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংস্কৃতিরও পুনরুজ্জীবনের স্বপ্নে মাতোয়ারা। অনেকটা তাদের মতই; যারা 'সংস্কৃতকে' Lingua Franca করবার আদর্শ-বিলাসেস্বপ্নে আছেন আজও।

হ্যামলেট উইদাউট দি

এপার সিনারিও! ফলে সেক্সপীয়ারের নাটক নিয়ে সিনেমা করতে গিয়ে সিনেমাও হয়ই-নি, থিয়েটারও হয়নি, যা হয়েছে তা হল বিলাতি যাত্রা। কিন্তু বিলিতি বেগুণ যদি বা খাওয়া যায়, বিলিতি যাত্রা তাও বায়স্কোপের বদলে ভেজাল হিসেবে মোটেই দর্শনযোগ্য ব্যাপার নয়। আর্থার র‍্যাঙ্কের এই প্রচেষ্টা খুবই নীচু র‍্যাঙ্কের হয়েছে শুধু এক গোয়ার্তুমীর ফলে যে হুবহু সেক্সপীয়ারের হ্যামলেট যেমনি লেখা তেমনি সিনেমায় দেখাতে হবে। সেক্সপীয়ারের লেখা অরিজিন্যালি সিনেমার জন্যে নয়। তিনি যদি সিনেমার জন্যে লিখতেন তাহ'লে একেবারেই অন্য টেকনিকে লিখতেন। ফলে 'হ্যাম'-টুকু ঠিকই হয়েছে কিন্তু 'হ্যামলেট' হতে এখনও অনেক লেট হবে।

নাম-ভূমিকায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা

জেমিনী পিকচার্সের 'চন্দ্রলেখা' এখন কলকাতায় সব চেয়ে বেশী লোক টানছে। ছবিটিতে ক্যামেরার কাজ হয়েছে প্রথম শ্রেণীর। এর জন্যে যিনি কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন তিনি এক জন বাঙ্গালী, শ্রীকমল ঘোষ। 'চন্দ্রলেখা' দেখে একটা ভরসা হয় যে উপযুক্ত স্কোপ পেলে আমাদের দেশেও সত্যিকারের বায়স্কোপ হওয়া সম্ভব। এই 'টেকনিক্যাল'-দিকটায় যদি বাঙ্গালী প্রযোজকরা এখনও নজর না দেন ত বম্বে-মাদ্রাজ বাঙ্গলাকে অনেক দূর ফেলে যাবে অদূর ভবিষ্যতেই। এখনও পর্যন্ত বাঙ্গলায় কোন ষ্টুডিওতে ক্রেন বলে কোন বস্তু নেই। ক্রেন হচ্ছে ভালো শটের জন্তে বড় সেটের জন্তে এক অপরিহার্য অঙ্গ। ক্রোয়েল, ইউক্রেন যেমন রাশিয়ার।

Censor না more Sense Sir ?

আমাদের পরিচালকদের এখনও সত্যিকারের ছবি-তোলায় হাতখড়ি হয়নি, আমাদের ষ্টুডিওর অবস্থা এখনও সন্তোষজনক নয়, আমাদের ছায়াছবির কাহিনীকার ওরিজিনাল গল্প ভাবা ত দূরের কথা, সুস্থ ভাবান্তর করতেও সক্ষম হননি আজও, কিন্তু আমাদের যেমন সেন্সর-বোর্ড পৃথিবীর আর কোথাও এত নন-সেন্স-bo বোধ হয় নয়। সত্যিকারের সাহিত্য-রসসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব-সমৃদ্ধ পণ্ডিত লোকের প্রয়োজন যেখানে সব চেয়ে বেশী সেখানেই সব চেয়ে 'পচা আপেলগুলি' গন্ধে ভুরভুর করছে। হবেই বা না কেন? যে দেশে খাবারের মধ্যেও ভেজাল দেয় সে দেশে ছবি Censor-ওয়ালাদের কাছে "আরোও Sense Sir" বলা অরণ্যে রোদন করা ছাড়া আর কি হবে? হতে পারে আর একটা অবশ্য। সে হল শুয়োরের সামনে মুক্তো ছড়ানো! কিন্তু আর কিছু হবে না এ ছাড়া, এটা ঠিকই!

'জয় হিন্দ' নয়, জয় হিন্দি বলুন

'উদয়ের পথের' পর থেকেই বাংলা ছবি দ্রুত অধঃপাতের দিকে এগুচ্ছে, গল্পবিহীন ছবির শেষে শুধু পতাকা উড়িয়েই তার দর্শক-চিত্ত হরণের বৃথা চেষ্টা। কিন্তু পতাকা যার-তার হাতে কি সয়? 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।' ফলে যে দিকে তাকাই, শুধু পতাকাই দেখি, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে দু'উইকের পর লোক দেখি নে আর, পরিবেশকের কাহানি শুনি—ছবি too week। কাজেই পতাকা একাই ওড়ে। 'জয় হিন্দ' মতই বাংলা ছবিতে পর্দা বিদীর্ণ করুক, আসলে বাংলাকেও খোদ হিন্দি ছবির জয়-জয়কার। যদি নাক উঁচু করে আর বেশী দিন 'হিন্দি ছবি ও খাচ্ছে তাই!—ও-যাত্রা' ইত্যাদি বলে কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি, তাহ'লে এর পর নিজেদের নাক কেটেও ওদের যাত্রা ভঙ্গ করা যাবে না। মহৎ ছবি তুলতে গিয়ে লোক না হাসিয়ে লোকে যাতে হাসে সেই রকম হিন্দি ছবির এনটারটেনমেন্ট, এনতার এনটারটেনমেন্ট যদি বাংলা ছবিতে না দেওয়া যায় তাহ'লে ১১৫৫তেই ৬৫ দিতে হবে বাংলা ছবির প্রযোজকদের।

বাংলায় প্রথম রহস্যচিত্র কালোছায়া

শেষ পর্যন্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাদের বহু দিনের অভিযোগ দূর করলেন একটি নতুন ধরণের ছবি তুলে। ললিত 'সঙ্গীত ও গুলিত রোমান্স'র বিবর্জিত কালোছায়া সত্যিকারের রহস্যচিত্র হতে পেরেছে শুধু গল্পটিকে সাজানো এবং চমৎকার টিম-ওয়ার্কের জন্যে। সব চেয়ে ভালো অভিনয় করেছেন আমার মতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কালোছায়ার' প্রযোজক ছবিটির হিন্দি চিত্ররূপ দিতে ভালোই করেছেন।

তারাশঙ্করের কবি : দেবকী বসুর প্রযোজনা

দেবকীকুমার বসু প্রযোজিত 'কবি' তারাশঙ্করের সুবিখ্যাত রচনা। কিছু দিন আগে দেবকী বাবুর চন্দ্রশেখরে বঙ্কিম-বিকৃতি সম্বন্ধে তারাশঙ্করের বিবৃতি পড়ে ভয় হয়েছিল তারাশঙ্করের 'কবি'তে 'শঙ্কর' দোষে না 'ভুলি নাই'-রচয়িতা মনোজ বসুর আপত্তি হয়? তখন আবার মনোজ বসুর 'বিপর্যয়' নিয়ে নারাণ গাঙ্গুলীর 'সুবিচার চাই' বলে কতোয়া কাকার কেন নারাণ বাবুর "উপনিবেশ" নিয়ে…ওরে বাবা দেবকী বাবু তাহ'লে কোথায় দাঁড়াবেন? সে যাক। শোনা যাচ্ছে, 'অমুক' না কি 'কবি'তে সব চেয়ে বড় আকর্ষণ হবেন 'ঠাকুরঝি'র ভূমিকায়। হতেও পারে, এ-যুগে ঠাকুরপো ও ঠাকুরঝিদের অসাধ্য নেই কিছুই, ছবিটি তাড়াতাড়ি শেষ সপ্তাহে কলকাতায় মুক্তি পাবে।

বঙ্কিমচন্দ্র আবার ছায়াচিত্রে

'দেবীচৌধুরাণী' তুলতে শুরু করেছিলেন সতীশ দাশগুপ্ত। জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যাবলীগুলি তোলবার জন্যে প্রফুল্ল রায়ের সহযোগিতায় সুটিং প্রায় শেষ হয়ে এলো। সুমিত্রা আছেন নাম-ভূমিকায়। ক্যামেরার কাজ করছেন বহু-অভিজ্ঞ শৈলেন বসু। এ-বছর বোধ হয় সব চেয়ে বেশী খরচ প্রস্তুত হবে এই ছবিটি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে ছায়ায় রূপান্তর করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হল সিনেমার উপযোগী নির্বাচন। ছায়া-ছবি করবে অথচ তার জন্যে যা দরকার তা করব না এ হচ্ছে সেই আব্দার যে না কি হাফ টিকিটে রেলে যেতে হবে বলে ভগবানের কাছে 'বামন' হয়ে জন্মাবার আরজি পেশ করবার মত দরুই কেন খুদে-দর্শক বায়না।

৮

———আগামী সংখ্যায়———

সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা

(জীবন-কথা)

আধুনিকতম গবেষণার জন্য অবলম্বন করিয়া এই অভিনব রেডিও সেটটী তৈরী হইয়াছে এবং তারই ফলে গায়ক-গায়িকা অথবা বক্তার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ইহাতে স্পষ্ট শোনা যায়।

ডিষ্ট্রিবিউটর্স
এন, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স
১১নং এস্‌প্ল্যানেড্‌ ইষ্ট,
২১নং চৌরঙ্গী, কলিকাতা

নিকটবর্ত্তী ক্ষমতাপ্রাপ্ত জি. ই রেডিও ডিলারের নিকট অনুসন্ধান করুন অথবা আমাদের নিকট পত্র লিখুন।

শ্রমণ রায়োকোয়ান

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সৈয়দ মুজতবা আলী

জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রপারের এক গ্রামে ১৭৫৮ সালে রায়োকোয়ানের জন্ম হয়। রায়োকোয়ান বংশ সে অঞ্চলে আভিজাত্য ও প্রতিপত্তির জন্য সুপরিচিত ছিল। রায়োকোয়ানের পিতা গ্রামের প্রধান বা অগ্রণীরূপে প্রচুর সম্মান পেতেন।

রায়োকোয়ানকে বুঝতে হলে তাঁর পিতার জীবনের কিছুটা জানতে হয়। তিনিও কবি ছিলেন এবং তাঁর কবিতাতেও এমন একটি দ্বন্দ্ব সব সময়েই প্রকাশ পায় যে দ্বন্দ্বের অবসান কোন কবিই এ জীবনে পাননি। সাধারণ কবি এ-রকম অবস্থায় কাব্য-জীবন ও ব্যবহারিক জীবনকে পৃথক্ করে নিয়ে পাঁচ জনের সঙ্গে যত দূর সম্ভব মিলে-মিশে চলবার চেষ্টা করেন, কিন্তু রায়োকোয়ানের পিতার দ্বন্দ্ব-মুক্তি প্রয়াস এতই নিরঙ্কুশ ও পরিপূর্ণ আন্তরিকতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল যে তিনি শেষ পর্য্যন্ত কোন সমাধান না পেয়ে আত্মহত্যা করেন।

রায়োকোয়ানের অন্যান্য ভাই-বোনরাও কবিতা রচনা করে জাপানে খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের জীবন ও সমাজের আর পাঁচ জনের জীবনের মত গতানুগতিক ধারায় চলতে পারেনি। রায়োকোয়ানের ছোট দুই ভাই ও এক বোন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

ধন-সম্পত্তি খ্যাতি-প্রতিপত্তি সব কিছুই ছিল, রাজধানীতে রায়োকোয়ানের পিতা সুপরিচিত ছিলেন, বসত-গ্রামের অধিবাসীরা রায়োকোয়ান-পরিবারকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত, তৎসত্ত্বেও পরিবারের পিতা আত্মহত্যা করলেন, তিন পুত্র এক কন্যা চীবর গ্রহণ করলেন এ রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা রায়োকোয়ান জীবনীকার অধ্যাপক য়াকব ফিশার করেননি। তবে কি জাপানের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন সে-যুগে এমন কোন দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল যে স্পর্শকাতর পরিবার মাত্রকেই হয় মৃত্যু অথবা প্রব্রজ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে সর্ব সমস্যার সমাধান করতে হত? ফিশার সে-রকম কোন ইঙ্গিতও করেননি।

* * * * *

ফিশার বলেন, রায়োকোয়ান শিশু বয়স থেকেই অত্যন্ত শান্ত-প্রকৃতির পরিচয় দেন। অন্যান্য বালকেরা যখন খেলা-ধূলায় মত্ত থাকত তখন বালক রায়োকোয়ান তন্ময় হয়ে কন-ফুৎসিয়ের তত্ত্ব-গভীর রচনায় প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে দিতেন। তাঁর এই আচরণে যে তাঁর পিতা-মাতা ঈষৎ উদ্বেগগ্রস্ত হয়েছিলেন তার ইঙ্গিত ফিশার দিয়াছেন।

রায়োকোয়ানের সব জীবনী-লেখকই দু'টি কথা বার-বার জোর দিয়ে বলেছেন। রায়োকোয়ান বালক বয়সেও কখন মিথ্যা কথা বলেননি এবং যে যা বলত তিনি সরল চিত্তে তাই বিশ্বাস করতেন। এই প্রসঙ্গে ফিশার রায়োকোয়ানের বাল্য-জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

রায়োকোয়ানের বয়স যখন আট বৎসর তখন তাঁর পিতা তাঁকে সামান্য একটি কারণে অত্যন্ত কঠিন বাক্য বলেন। বালক রায়োকোয়ান অত্যন্ত ব্যথিত মন ও ক্ষুব্ধ-নয়নে পিতার দিকে তাকান। পিতা রায়োকোয়ানের আচরণ লক্ষ্য করে বললেন, "এ রকম চোখ করে বাপ-মায়ের দিকে তাকালে তুমি আর মানুষ থাকবে না, ঐ চোখ নিয়ে মাছ হয়ে যাবে।" তাই শুনে বালক রায়োকোয়ান বাড়ী ছেড়ে অন্তর্ধান করলেন। সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। উদ্বিগ্ন পিতা-মাতা চতুর্দিকে সংবাদ পাঠালেন। অবশেষে এক জেলে খবর পাঠাল, সে রায়োকোয়ানকে সমুদ্রপারের পাষাণ-স্তূপের কাছে দেখতে পেয়েছে। পিতা-মাতা ছুটে গিয়ে দেখেন, রায়োকোয়ান পাষাণ-স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, আর সমুদ্রের ঢেউ তাঁর পায়ে এসে লাগছে। কোলে করে বাড়ী এনে বাপ-মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ওখানে নির্জনে সমস্ত দিন কি করছিলে?" রায়োকোয়ান বড়-বড় চোখ মেলে বললেন, "তবে কি আমি এখনো মাছ হয়ে যাইনি, আমি না দুষ্টু ছেলের মত তোমাদের অবাধ্য হয়েছিলুম?"

রায়োকোয়ান কেন যে সমস্ত দিন সমুদ্রপারে জলের কাছে কাটিয়েছিলেন তখন বোঝা গেল। মাছই যখন হয়ে যাবেন তখন জলের কাছে গিয়ে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকাই তো প্রশস্ততম পন্থা।

সংসার ত্যাগ করেও রায়োকোয়ান পিতা-মাতা সম্বন্ধে কখনো উদাসীন হতে পারেননি। মায়ের স্মরণে বৃদ্ধ শ্রমণ রায়োকোয়ান যে কবিতাটি রচনা করেন সেটি মায়েরই ভালোবাসার মত এমনি সরল সহজ যে অনুবাদে তার সব মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়:—

সকাল বেলায় কখনো গভীর রাতে
আঁখি মোর ধায় দূর 'সাদো'* দ্বীপ পানে
শান্ত-মধুর কত না স্নেহের বাণী
মা আমার যেন পাঠায় আমার কানে।

প্রব্রজ্যা

রায়োকোয়ানের বয়স যখন সতেরো তখন তাঁর পিতা রাজধানীতে চলে যাওয়ায় তিনি গ্রামের প্রধান নির্বাচিত হলেন। তার দুই বৎসর পরে রায়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

ধনজন সুখ-সমৃদ্ধি সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে যৌবনের প্রারম্ভেই কেন যে রায়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করলেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফিশার প্রচলিত কিংবদন্তী বিশ্লেষণ করেছেন। কারো মতে রায়োকোয়ানের কবিজনসুলভ অথচ তত্ত্বান্বেষী মন জনপদপ্রমুখের দৈনন্দিন কূটনৈতিক কার্যকলাপে এতই ব্যথিত হত যে তিনি তার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে সঙ্ঘের শরণ নেন; কারো মতে ভোগ-বিলাসের ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে তিনি সংসার ত্যাগ করেন।

রায়োকোয়ান না কি এক সন্ধ্যায় তাঁর প্রণয়িনী এক গাইশা † তরুণীর বাড়ীতে যান। এমনিতেই তিনি গাইশাদের কাছ থেকে প্রচুর খাতির-যত্ন পেতেন তার উপর তখন তিনি গ্রামের প্রধান। গাইশা তরুণীরা রায়োকোয়ানকে খুশী করার জন্যে নাচল, গাইল—

---

* রায়োকোয়ানের মাতা 'সাদো' দ্বীপে জন্মেছিলেন।

† 'গাইশা' ঠিক বেশ্যা বা গণিকা নহে; [illegible] বসন্তসেনা অথবা প্রাচীন গ্রীসের 'হেটেরা' শ্রেণীর।

প্রচুর মদও খাওয়া হল। কিন্তু রায়োকোয়ান কেন যে চিন্তায় বিভোর হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন তার কোন কারণ বোঝা গেল না। তাঁর প্রিয়া গাইশা-তরুণী বার-বার তাঁর কাছে এসে তাঁকে আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেবার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হল না। তিনি মাথা নিচু করে আপন ভাবনায় মগ্ন রইলেন।

প্রায় চারশ' টাকা খরচ করে রায়োকোয়ান বাড়ী ফিরলেন।

পরদিন সকাল বেলা রায়োকোয়ান বাড়ীর পাঁচ জনের সঙ্গে খেতে বসলেন না। তখন সকলে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখে, তিনি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। কি হয়েছে বোঝবার জন্য যখন কম্বল সরানো হল তখন বেরিয়ে এল রায়োকোয়ানের মুণ্ডিত-মস্তক আর দেখা গেল তাঁর সর্বাঙ্গ জাপানী শ্রমণের কালো জোব্বায় ঢাকা।

আত্মীয়-স্বজনের বিস্ময় দূর করার জন্যও রায়োকোয়ান বিশেষ কিছু বললেন না, শুধু একটুখানি হাসলেন। তার উপর বাড়ী ছেড়ে পাশের কহ্‌শহ্‌জী সঙ্ঘের (মন্দির) দিকে রওয়ানা হলেন। পথে তাঁর বল্লভা গাইশার বাড়ী পড়ে। সে দেখে অবাক, রায়োকোয়ান শ্রমণের কৃষ্ণবাস পরে চলে যাচ্ছেন। ছুটে গিয়ে সে তাঁর জামা ধরে কেঁদে, অনুনয়-বিনয় করে বলল, "প্রিয়, তুমি এ কি করেছ। তোমার গায়ে এ বেশ কেন?"

রায়োকোয়ানেরও চোখ জলে ভরে এল। কিন্তু তবু দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি সঙ্ঘের দিকে এগিয়ে গেলেন।"

হায়, অনন্তের আহ্বান যখন পৌঁছয় তখন সে ঝড়ের সামনে গাইশা-প্রজাপতি ডানা মেলে কি মরুতকে ঠেকাতে পারে?

কিশায় বলেন, এ-সব কিংবদন্তী তাঁর মনঃপূত হয় না। তাঁর মতে এগুলো থেকে রায়োকোয়ানের বৈরাগ্যের প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না।

কিশায়ের ধারণা, রায়োকোয়ান প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকে সন্ন্যাসের অনুপ্রেরণা পান। তিনি যে-জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন সে-জায়গার প্রকৃতি গ্রীষ্ম-বসন্তে যে-রকম মধুর শান্ত ভাব ধারণ করে ঠিক তেমনি শীতকালে ঝড়-ঝঞ্ঝার রুদ্র রূপ নিয়ে আঘাত আবেগ দিয়ে জনপদবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। কিশায়ের ধারণা, রায়োকোয়ানের প্রকৃতিতে এই দুই প্রবৃত্তিই ছিল; এক দিকে ঋজু শান্ত পাইন-বনের মন্দ-মধুর গুঞ্জরণ, অন্য দিকে হিম ঋতুর ঝঞ্ঝা-মথিত বীচি-বিক্ষোভিত সমুদ্র-তরঙ্গের অন্তহীন উদ্বেল উচ্ছ্বাস।

প্রকৃতিতে এ দ্বন্দ্বের শেষ নেই—রায়োকোয়ান তাঁর জীবনের দ্বন্দ্ব সমাধানকল্পে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন কিশায় দৃঢ়কণ্ঠে এ কথা বলেন না—এই তাঁর ধারণা।

মানুষ কেন যে সন্ন্যাস নেয় তার সদুত্তর তো কেউ কখনো খুঁজে পায়নি। সন্ন্যাসী-চক্রবর্তী তথাগত জরা-মৃত্যু দর্শনে না কি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন; আরো তো লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতিদিন জরা-মৃত্যু চোখের সামনে দেখে, কিন্তু কই, তারা তো সন্ন্যাস নেয় না? বার্ধক্যের ভয়ে তারা অর্থসঞ্চয় করে আরো বেশী, মৃত্যুর ভয়ে

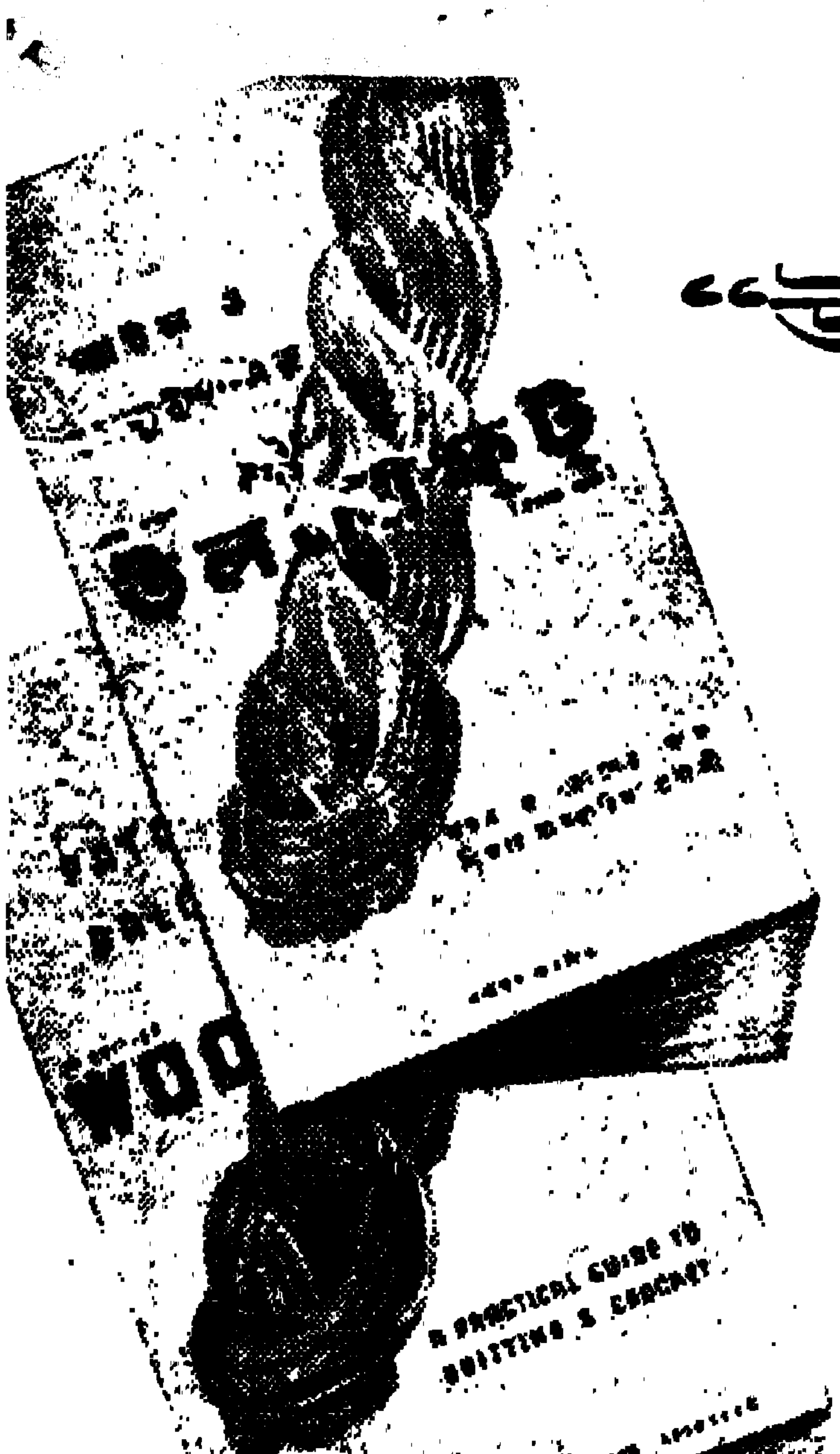

সুসংবাদ!

"উলক্র্যাফ্‌ট" বুননের এই বইটি
এখন ইংরেজী ও বাংলাভাষায় পাবেন

উলক্র্যাফ্‌ট দেখে আপনি এখন ছেলেমেয়েদের পোষাক, মোজা, পুলওভার ও জাম্পার প্রভৃতি বোনা অনায়াসে শিখতে পারেন। সোজা অথবা ক্রোশের কাঁটায় একেবারে প্রথম ঘর তোলা থেকে শুরু ক'রে জামাটি সম্পূর্ণ করা পর্যন্ত সব কিছু নির্দেশ নিখুঁতভাবে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, এত ছবি আছে ও নির্দেশগুলি এমন সরল যে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষেও এই বই দেখে বোনা খুব সহজ।

দাম ১৷৹ আনা — ভাল বইয়ের দোকান বা উলের দোকানে কিনতে পাবেন। অথবা জি, এথারটন এণ্ড কোং লিঃ, ৪, মিশন রো, কলিকাতা — এই ঠিকানায় লিখলে ডাকেও পাঠানো হয় — ডাকখরচ সহ মূল্য ১৷৵৹ আনা।

P&B

প্যাটন্‌স এণ্ড বল্‌ডুইন্‌স লিমিটেড কর্তৃক সংকলিত